৯ম বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩৭ [৩য় সংখ্যা

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ? *

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ?—এ প্রশ্ন আজকাল য়ুরোপীয়েরাও জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছেন। এ প্রশ্নের অর্থ এ নয় যে, সে সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে য়ুরোপের কোন জহুরীর মনে কোনরূপ দ্বিধা আছে। অবশ্য য়ুরোপীয় বিশেষণটি বাদ দিয়ে সভ্যতা বস্তুটি যে কি, সে প্রশ্ন সে দেশের কোন লোকের মনে উদয় হয় না। এর কারণ বোধ হয় এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, যার নাম য়ুরোপীয় সভ্যতা, তার নামই সভ্যতা ; আর যার নাম সভ্যতা, তার নামই য়ুরোপীয় সভ্যতা। এ ধারণা যাদের মজ্জাগত, তাদের মধ্যে এ প্রশ্ন ওঠে কেন ?

য়ুরোপের গত যুদ্ধ সে দেশের লোকের আত্মপ্রসাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে। উক্ত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় হঠাৎ জেগে উঠে তারা এটা কি, ওটা কি, জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছে। য়ুরোপের লোক পরস্পর মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরণের মুখে অগ্রসর হয়েছিল ; সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠে এখন তাদের প্রধান ভাবনা হয়েছে, কি ক'রে তারা ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা করবে ? ফলে সকল জাতিকে এক দলবদ্ধ করবার চেষ্টা সে দেশের পলিটিসিয়ানরা করছেন। পরস্পরের স্বার্থের সংঘর্ষ দূর না করতে পারলে যে সকলের স্বার্থরক্ষা করা যাবে না, এ ধারণা অনেকের মনে জন্মেছে।

কিন্তু মনোরাজ্যে ঐক্য স্থাপন না করতে পারলে য়ুরোপীয়ের জীবনে যে ঐক্য থাকবে না, ধ'রে বেঁধে যে ফ্রান্সের সঙ্গে জর্ম্মাণীর পিরীত করানো যাবে না,—এই মোটা সত্যটি সে দেশের সূক্ষ্মদর্শী লোকদের চোখে পড়েছে। ফলে স্বদেশের ও স্বজাতির শুভকামী ও মহদাশয় ব্যক্তিরা য়ুরোপের প্রতি তাঁদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত ক'রে আবিষ্কার করেছেন যে, য়ুরোপীয়েরা আসলে সকলেই মনে ও চরিত্রে এক ; যে সব বিষয়ে তাদের প্রভেদ আছে, সে সব সভ্যতার অঙ্গও নয়, ফলও নয়। তাঁরা নিজে যা আবিষ্কার করেছেন, সেই সত্যটি পাঁচজনকে দেখিয়ে দিলেই তাঁদের মতে য়ুরোপের বাঘে-বকরীতে এক ঘাটে জল খাবে। আর গত যুদ্ধের নানা কুফলের মধ্যে মহা সুফল ঘটেছে এই যে, য়ুরোপীয় মনের মূলগত ঐক্যের প্রতি সকল জাতির চোখ এখন ফোট'-ফোট' করছে।

২

প্রথমেই এ বিষয়ে জনৈক জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মত শোনা যাক্। Dr. Haas য়ুরোপের এক জন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, এবং

* "What is European Civilisation"—by Wilhelm Haas, Professor of the Technological College Charlottenburg, and Lecturer of the Deutsche Hochschule für Politik.

সেই সঙ্গে সহজ দার্শনিক। কারণ, তিনি জাতিতে জর্ম্মাণ। যে ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই যেমন শঙ্করের অংশ-অবতার, তেমনি যে জর্ম্মাণীতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেও Kantএর অংশ-অবতার। ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে আধ্যাত্মিক হওয়া যেমন সহজ, জর্ম্মাণদের পক্ষেও ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, দার্শনিক হওয়া তেমনি সহজ। একাধারে যিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, তাঁর কথা মন দিয়ে শোনা উচিত।

পুরাকালে ভারতবর্ষে বৈদান্তিকরা যখন বলেন যে, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা", তখন মীমাংসকরা উত্তরে বলেন, এ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? ব্রহ্ম যদি থাকেন ত এত বড় সত্য সম্বন্ধে কার জ্ঞান নেই? দ্বিতীয়তঃ, এ জিজ্ঞাসার ফলই বা কি? মানুষের কর্ম্ম-জীবনের উপর এ জ্ঞানের ফল কি?

এ যুগেও তেমনি য়ুরোপের কর্ম্মীর দল, "য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি?"—এ প্রশ্ন শুনে এ কথা বলতে পারেন যে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ব'লে যদি কোন বস্তু থাকে ত, সেই প্রকাণ্ড জল-জ্যান্ত সত্যের প্রতি কে অন্ধ? আর তার গূঢ় মর্ম্ম জেনেই বা কার কি লাভ? এ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের কর্ম্মজীবনের কি ইতরবিশেষ করবে?

আর যদি জনসাধারণের কথা বল ত, এ জ্ঞান লাভ করায় তাদের কি লাভ? তারা ত য়ুরোপীয় সভ্যতার ফলভোগী মাত্র। হিন্দুস্থানীরা বলে, "আম খাও, পেঁড় মত খোঁজ"; উক্ত উপদেশ অনুসারে তাদের য়ুরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ জানবার ও মূল অনুসন্ধান করবার কোনই প্রয়োজন নেই। "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও" বলেই নিশ্চিন্ত থাকা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব জিজ্ঞাসা যে নিষ্ফল, এ আপত্তি চারিধার থেকে উঠবে। এ আপত্তির খণ্ডন না ক'রে কোনও দার্শনিক অগ্রসর হ'তে পারেন না। সেকালে শঙ্করও পারেন নি, একালে Haasও পারেন নি।

৩

এখন এ জিজ্ঞাসার সার্থকতা কি, তা Deutsche Hochschule *für* Politikএর শিক্ষকের মুখে শোনা যাক্। য়ুরোপীয়েরা যে প্রকৃতপক্ষে এক জাতি, এ বিষয়ে য়ুরোপের সকল জাতির সজাগ হওয়া উচিত, নচেৎ য়ুরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। তিনি বলেছেন যে, অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে—"Europe has reached a turning-point in its history and that it must collect its forces for a decisive struggle against Asia or other important enemies." অর্থাৎ জাতি-শত্রুতায় বলক্ষয় না ক'রে য়ুরোপের বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য হচ্ছে, তার সম্মিলিত শক্তির দ্বারা বহিঃশত্রুকে পরাভূত করা; আর এই বহিঃশত্রু হচ্ছে এসিয়া। কারণ, other important enemies যে কারা, সে কথাটা উহ্য রয়ে গিয়েছে।

যেমন উক্ত জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মতে সমগ্র য়ুরোপ এক-মন, একপ্রাণ, তেমনি তাঁর বিশ্বাস, সমগ্র এসিয়াবাসীরাও একমন ও একপ্রাণ; আর সে মনের একমাত্র প্রবৃত্তি হচ্ছে, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সমূলে বিনাশ করা। এ হচ্ছে ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মাণ কাইসরের প্রসিদ্ধ আবিষ্কার। কারণ, এসিয়াবাসীরা যে য়ুরোপের মারাত্মক শত্রু, তার কোনও বাহ্য প্রমাণ নেই। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে যে-এসিয়া মারবে—সে-এসিয়া বোধ হয় এখন গোকুলে বাড়ছে; কারণ, তার সন্ধান সকলে জানে না।

এ সব কথা শুনে মনে হয়, এসিয়ার উপর য়ুরোপের যে বর্ত্তমান আধিপত্য আছে, ভবিষ্যতে তা নষ্ট হ'তে পারে, এই ভয়েই য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সম্প্রদায় আকুল হয়েছেন। এসিয়ার অভ্যুদয় হ'লেই যে য়ুরোপ অধঃপাতে যাবে, এই বোধ হয় জর্ম্মাণ দর্শনের স্থিরসিদ্ধান্ত। আমার ছেলে বাড়লেই যে তোমার ছেলে বামন হবে—এ সত্য কোন্ লজিকের হাতে ধরা পড়ে, তা আমার অবিদিত। সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিকরা যাকে Conservation of energy বলেন, তারই যোগ-বিয়োগের নিয়মানুসারে।

কিন্তু সে যাই হোক, পণ্ডিতমহাশয়ের বক্তব্য বোঝা যাচ্ছে। পৃথিবীর অপর ভূভাগের উপর যদি মালিকি-স্বত্ব বজায় রাখতে হয় ত, য়ুরোপীয়দের দলবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, এবং এই কারণেই তাঁর মতে "League of Nations, Disarmament, Economic conferences, Intellectual co-operation" প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয়েরা যে মনে এক, তা প্রমাণ না করতে পারলে তাদের জীবনে এক করা যাবে না। অতএব য়ুরোপীয় মনের মূল ঐক্যের সন্ধান নিতে হবে।

৪

য়ুরোপীয়দের বিশেষত্ব কোথায়, তার সন্ধান নিতে হ'লে প্রথমেই জানা দরকার, য়ুরোপ বলতে কি বোঝায় ? তাই অধ্যাপক Haas প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন,—"What is Europe ?"

তাঁর মতে য়ুরোপের অর্থ, একটি বিশেষ ভূভাগ নয় ; কেন না, পুরাকালে ভৌগোলিক হিসেবে য়ুরোপের যে স্বাতন্ত্র্যই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে সে স্বাতন্ত্র্য নেই, অন্ততঃ থাকবে না। কারণ, "Everything connected with space, position and distance is steadily dwindling in importance."

এ সত্যটি য়ুরোপীয়দের স্মরণ করিয়ে দেবার আবশ্যক ছিল। কারণ, গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা প্রমাণ করেছিলেন যে, য়ুরোপীয়দের মাহাত্ম্যের মূলে আছে য়ুরোপের মাটি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন যে, "বিলেত দেশটা মাটির।" ও-কথা শুনে আমরা হেসে কুটি-কুটি হয়েছিলুম, কিন্তু য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে, বিলেত দেশটা মাটির হ'লেও, যে-সে মাটির নয়—একেবারে বিলেতী মাটির। অতএব তা নির্গুণ নয়, সগুণ। আমরাও দেখতে পাই যে, নেংড়া-আমের আঁঠি বাঙলায় পুঁতলে যে আঁঠির গাছে আম ফলে না, ফলে আমড়া। মাটির গুণের ভক্ত হবার জন্য, বৈজ্ঞানিক হবার প্রয়োজন নেই, কবি হলেই আমরা ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে "আমার দেশ" বলতে বলতে দশাপ্রাপ্ত হতে পারি। অনেক ছেলেমি কথা পাকামি ক'রে বল্লেই যে তার নাম হয় বৈজ্ঞানিক-দর্শন, তার পরিচয় ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় শাস্ত্রে মেলে। সুতরাং য়ুরোপের অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়কে, এ কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, একমাত্র মাটির উপর আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।

অবশ্য অধ্যাপক Haas ঠিক যে কি বলেছেন, তা বোঝা যায় না। দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করবার কৌশল আজ মানুষের করায়ত্ত। তাই ব'লে নানাদেশের যে position বদলে গেছে; তা নয়—অবশ্য position ব'লে বস্তুর যদি কোন অবস্থা থাকে। নব-অঙ্কের ঠেলায় here শুনছি now হয়ে গিয়েছে। সে যাই হোক, বিলেতও ভারতবর্ষ হয়ে যায়নি, ভারতবর্ষও বিলেত হয়ে যায়নি। এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের physical ব্যবধান কমে গিয়েছে বলেই, তাদের ভিতর psychological ব্যবধানটা ফুটিয়ে তোলাই বোধ হয় অধ্যাপক মহাশয়ের উদ্দেশ্য। কারণ, এসিয়ার সঙ্গে য়ুরোপের decisive struggleএর জন্য স্বদেশের যুবকদের মন প্রস্তুত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

৫

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা মানুষের গুণাগুণের মূল সন্ধান করেছিলেন, এবং তা পেয়েছিলেন মাটির অন্তরে। বলা বাহুল্য যে, এ প্রবন্ধে আমি বাঙলা মাটিশব্দ সংস্কৃত পঞ্চভূত অর্থেই ব্যবহার করছি। আর বছর পঞ্চাশেক আগে আমি যখন স্কুলে পড়তুম, তখন সেকালের B. A.M. A.রা ভক্তিভরে Buckle's History of Civilization পড়তেন ; আর সেই পুস্তকেই শুনতে পাই, সভ্যতার চরম আধিভৌতিক ব্যাখ্যা আছে।

তার পর পণ্ডিতরা আবিষ্কার করলেন, সে ব্যাখ্যা অচল। একমাত্র জিওগ্রাফিই যে সভ্যতা গড়ে, এ কথা সত্য নয়। কারণ, তা যদি হয়, তা হ'লে Red-Indianদের সঙ্গে বর্ত্তমান Americanদের সভ্যতার অর্থাৎ কৃতিত্বের আকাশ-পাতাল প্রভেদ হত না। এর থেকে দেখা যায় যে, মানব-সভ্যতার অন্তরে soil নয়, race ; ক্ষেত্র নয়, বীজই প্রবল। ক্ষেত্র ও বীজের বলাবলের বিচার মনুতেও আছে ; অর্থাৎ এ সমস্যা বহু পুরাতন !

এই বস্তাপচা বিচার ethnology, anthropology প্রভৃতি নাম ধারণ ক'রে নব বিজ্ঞানরূপে পরিচিত হল। এই নব বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করলেন যে, মানবজাতির মধ্যে Aryan নামে এক দেবজাতি আছে। সেই জাতিই মানব-সভ্যতা অতীতে গড়েছে, আর ভবিষ্যতেও গড়্‌বে। কারণ, Progress করা তাদের জাতিধর্ম্ম। আর এই জাতি মাটি ফুঁড়ে উঠেছিল উত্তর-জর্ম্মাণীতে। মানুষের মধ্যে য়ুরোপীয়রা শ্রেষ্ঠ ; কারণ, তাদের ধমনীতে নীললোহিত আর্য্যশোণিত তেড়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এ বিষয়েও তাদের মনে এখন সন্দেহ জন্মেছে। তাই অধ্যাপক Haas বলেছেন, "It is true, that Europe is on the whole inhabited by Aryan peoples, but the same Aryans have produced quite a different culture in India." বোধ হয়, এই কারণে যে,

ভারতবর্ষের জলবায়ুর দোষে তাদের রক্তের নীল রঙ ঝল্‌সে গিয়েছে, ও লাল গোলাপী হয়েছে।

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল ক্ষেত্রও নয়, বীজও নয়।

৬

য়ুরোপ বলতে লোকে যা বোঝে, তার মর্ম্ম য়ুরোপের মাটির অন্তরেও পাওয়া যাবে না, য়ুরোপীয়দের দেহের অন্তরেও পাওয়া যাবে না। কারণ, মানব-সভ্যতার সৃষ্টি জিওগ্রাফি করে না, করে হিষ্টরি; মানুষের দেহ করে না, করে তার মন। এই কারণে "It is only as a spiritual and cultural entity that Europe can have a meaning for us"। এরপরই অধ্যাপক মহাশয় প্রশ্ন করেছেন—"Europe, its spirit, its civilisation, is something unique", এ হেন কথা কি সত্য?

তিনি বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকরা, যথা Voltaire, Rousseau প্রভৃতি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীময় মানুষের একই চরিত্র, এবং Pekin থেকে Paris পর্য্যন্ত মানুষমাত্রই এক গোত্রজ। আর সে গোত্রের নাম মানব গোত্র। এ মত যাঁরা মেনে নিয়েছেন, তাঁদের মতে য়ুরোপীয় সভ্যতার কোনও বিশেষত্ব নেই। কিন্তু আজকের দিনে "Biology teaches us that every kind of living organism has a world of its own." অর্থাৎ মানুষমাত্রেই এক জগতে বাস করে না, কেউ করে ব্রহ্মার সৃষ্ট পৃথিবীতে, কেউ বা আবার বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতে। অতএব মানুষে মানুষে কতক অংশে মিল থাকলেও, অনেক অংশে প্রভেদ আছে। আর এই ভেদজ্ঞানটুকু উপেক্ষা ক'রে সাধারণ মানবচরিত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয়। আর আমরা যাকে মানব-সভ্যতা বলি, তা কোন একটি বিশেষ জাতির মানসিক বিশিষ্টতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানব ব'লে কোন এক শ্রেণীর জন্তু নেই।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে "what is the specifically European element"এরই অনুসন্ধান করতে হবে; এবং তার সন্ধান আমরা পাব, যদি আমরা ধরতে পারি "what is common to their culture, despite all national differences, without its being a characteristic of mankind in general." সংক্ষেপে, কোন্ গুণে সকল য়ুরোপীয় এক, এবং অন্-য়ুরোপীয়দের সঙ্গে পৃথক, তাই হচ্ছে জিজ্ঞাস্য। এখন এ জিজ্ঞাসার মীমাংসা শোনা যাক্।

৭

য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল যদি য়ুরোপ নামক দেশের অন্তরেও না পাওয়া যায়, য়ুরোপীয় মানবের দেহের অন্তরেও না পাওয়া যায়, তা হ'লে সে মূল কোথায় নিহিত? অধ্যাপক মহাশয় বলেন যে, এ সভ্যতা য়ুরোপীয় spirit থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ইংরাজী ভাষায় যাকে spirit বলে, তার বাঙলা কি সংস্কৃত প্রতিবাক্য আমি জানিনে। কারণ, আত্মা ও spirit পর্য্যায়শব্দ নয়। Spiritকে আত্মা বলা বোধ হয় ঠিক নয়, "অহং" বলাই উচিত। কারণ, "অহং" জিনিষটে ভেদবুদ্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ প্রবন্ধে আমি European spiritকে য়ুরোপীয় আত্মা বলব; কিন্তু সে আত্মাকে "অহং" অর্থেই বুঝতে হবে।

য়ুরোপীয় আত্মার বিশিষ্টতা যে কি, তার পরিচয় নিতে হবে, উক্ত আত্মার আত্মপ্রকাশ থেকে।

এখন এ সত্যটি যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি স্পষ্ট যে, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা হচ্ছে technical civilization অর্থাৎ technical scienceএর উপর প্রতিষ্ঠিত। এ হচ্ছে আসলে ব্যবহারিক সভ্যতা। প্রকৃতির যে মতিগতি science আবিষ্কার করেছে, সেই মতিগতিকে মানুষের ঘরকন্নার কাযে নিয়োগ করা, এক কথায় প্রকৃতিকে মানুষের সেবাদাসীতে পরিণত করাই য়ুরোপীয়দের চরম কৃতিত্ব।

কিন্তু কোন নায়িকাকে বশ করা যে কেবলমাত্র কামনা-সাপেক্ষ নয়, এ কথা সেকেলে তান্ত্রিকরাও জানতেন। বশীকরণের পিছনে মন্ত্র থাকা চাই। প্রকৃতির বশীকরণের মন্ত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছেন য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু এ মন্ত্র লাভ করা সাধনাসাপেক্ষ। য়ুরোপীয় আত্মা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। বিজ্ঞানের কঠোর সাধনার ফলে য়ুরোপীয়রা সমগ্র অনাত্ম জগতের উপর প্রভুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু য়ুরোপীয়রা প্রকৃতিকে দাসাগিরি করাবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনা করে নি, করেছিল শুধু তাকে প্রকৃষ্টরূপে জানবার জন্য। এ শাস্ত্রের প্রথম সূত্র হচ্ছে "অথাতো প্রকৃতিজিজ্ঞাসা"। জ্ঞানই তাদের মুখ্য বস্তু ছিল, কর্ম্ম তার ফল মাত্র। বিজ্ঞানের আচার্য্যেরা কর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, এবং তা ছিলেন বলেই এ বিদ্যা তাঁরা

আয়ত্ত করতে পেরেছেন। কথা সত্য। এবং আমার বিশ্বাস, অধ্যাপক মহাশয় যদি ফলনিরপেক্ষ হয়ে য়ুরোপ-সভ্যতা বস্তু কি জিজ্ঞাসা করতেন, তা হ'লে তিনিও তার সন্ধান পেতেন।

৮

তিনি বলেন যে, এই সূত্রেই আমরা য়ুরোপীয় আত্মার বিশেষত্বের সন্ধান পাই। য়ুরোপীয় আত্মার ধর্ম্মই এই যে—"to organise everything with which it has to deal, to mould everything whether it be material or spiritual, in such a way that it constitutes a unity in multiplicity।" অর্থাৎ বহুকে এক ক'রে দেখবার এবং বহুকে এক সূত্রে গাঁথবার প্রকৃতি। এক কথায়, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎকে organise করবার প্রবৃত্তি ও শক্তিই হচ্ছে য়ুরোপীয় আত্মার বিশেষত্ব। Kepler আবিষ্কার করেছিলেন যে, "wherever there was matter, there was geometry।" তার পর Galileo আবিষ্কার করেন যে,"the book of nature is written in the language of mathematics ;" এবং এ দুটি কথাই হচ্ছে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। এবং এই মন্ত্রের সাধনা করেই য়ুরোপ জড় প্রকৃতির উপর একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেছে।

কিন্তু প্রকৃতিকে জানবার এবং বাগ মানাবার প্রবৃত্তি সার্থক হয়েছে এই জন্য যে, কি উপায়ে তাকে জানা যায়, সে পদ্ধতি গ্রীকরা উদ্ভাবন করে ; তার পর কি উপায়ে মানুষের উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায়, তার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে রোমানরা। তার পর মধ্যযুগে য়ুরোপীয়েরা পরলোক জয় করবার জন্য যে আত্মশক্তি সঞ্চয় করে, সেই শক্তিই এ যুগে তারা ইহলোক জয় করবার কার্য্যে প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ গ্রীকদের জ্ঞান, রোমানদের কর্ম্ম, এবং মধ্যযুগের ভক্তি, এই তিনে মিলেমিশে বর্ত্তমান technical civilisation-এর সৃষ্টি করেছে। অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতাকে একটি ভগবদ্গীতা বলা যায়। কারণ, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির সমন্বয়ে এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে ; এবং বর্ত্তমানে য়ুরোপের পককেশ মন থেকেই technical civilisation উদ্ভূত হয়েছে। এই হচ্ছে য়ুরোপীয় আত্মার চরম পরিণতি। এই কথাটা বুঝতে পারলেই য়ুরোপের জাতিসমূহ ভবিষ্যতে আর পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করবে না। একেই বলে জ্ঞানে মুক্তি। এখন জিজ্ঞাস্য তবে প্রলয়ের আশঙ্কার কারণ কি ?

৯

এখন এ বিষয়ে একটি ফরাসী লেখকের মতামত শোনা যাক। (Nation et Civilisation, par Lucien Romier) Lucien Romier বিজ্ঞান কিংবা দর্শনের আচার্য্য নন, তিনি এক জন প্রবন্ধলেখক সাহিত্যিক মাত্র ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জর্ম্মাণ অধ্যাপকের কথার অপেক্ষা, ফরাসী সাহিত্যিকের কথা ঢের বেশী সহজবোধ্য। জড়ানো হাতের লেখার সঙ্গে ছাপার অক্ষরের যে প্রভেদ, জর্ম্মাণ পাণ্ডিত্যের রচনার সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের রচনার সচরাচর সেই একই প্রভেদ দেখা যায়। সুতরাং য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ? এ বিষয়ে ফরাসী মত সত্য হোক, মিথ্যা হোক, জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মতের চাইতে অনেক সুবোধ ; এবং সম্ভবতঃ সুবোধ বলেই Romier-এর Nation et Civilisation, ইংলণ্ডের যে সম্প্রদায় লেখাপড়ার কারবার করেন, সে সম্প্রদায়ের মনকে বেশী ক'রে স্পর্শ করেছে।

Romier প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন,—qu'est-ce que l'Europe ? অর্থাৎ য়ুরোপ বস্তু কি ? তিনি বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, আজকের দিনে বিশ্ব-মানবের কাছে য়ুরোপের নামডাক অসম্ভবরকম বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং য়ুরোপ বলতে কি বোঝায়, তা বুঝতে হ'লে, য়ুরোপের জিওগ্রাফির এবং ইকনমিক অবস্থার জ্ঞানই যথেষ্ট নয়,—উপরন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রধান গুণগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

অবশ্য য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্ম্ম উদ্ঘাটিত করতে হ'লে য়ুরোপ নামক ভূভাগ আর সে দেশের অধিবাসীদের raceএর উপেক্ষা করা যায় না। কারণ, য়ুরোপ নামক দেশটা যে তার অধিবাসীদের অনেক পরিমাণে গ'ড়ে তুলেছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধনী হবার, শক্তিমান হবার যতটা সুযোগ য়ুরোপের অধিবাসীরা তাদের দেশের কাছ থেকে পেয়েছে—পৃথিবীর অন্য জাতিরা ততটা পায়নি। য়ুরোপের সৌভাগ্য যে কতক অংশে প্রকৃতির অনুগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কথা অস্বীকার করা মূর্খতা।

...rial civilisation য়ুরোপের কিন্তু য়ুরোপের ...on নয়। যাঁরা মনে করেন, য়ুরোপের যথার্থ civ...র সভ্যতার চরম ফল, তাঁদের বলা দরকার যে, যদি ...ই হ'ত, তা হ'লে ভবিষ্যতে তাঁদের ঐশ্বর্য্যের দিন দিন বৃদ্ধি হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। অতীতে যে-সব কারণে ও যে-সব উপকরণের সাহায্যে য়ুরোপ তার বর্ত্তমান ধন-দৌলত লাভ করেছে, সে সব কারণ যে ভবিষ্যতেও তার সহায় হবে, এরূপ আশা করা বৃথা।

একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই তাদের নিজের নিজের দেশকে exploit করতে শিখছে, এবং করছে, এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে য়ুরোপের মত সমান কৃতকার্য্য হবে। অর্থাৎ material civilisation-এ য়ুরোপ অপর সকল দেশের উপর চিরকাল টেক্কা দিতে পারবে না। যাকে বলে technical বিদ্যা, তা বিশ্বমানবের করায়ত্ত হয়েছে। সুতরাং technical civilisationই যদি European civilisation হয়, তা হ'লে সে civilisationএর য়ুরোপীয় নামের কোনও সার্থকতা থাকবে না।

সত্য কথা এই যে, য়ুরোপকে সৃষ্টি করেছে প্রধানতঃ হিষ্টরি—জিওগ্রাফি নয়; অর্থাৎ য়ুরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক নয়—আর তার ভিত্তি হচ্ছে একটি বিশেষ "moral and intellectual tradition." সেই ভিত্তির উপরই য়ুরোপীয় সভ্যতার এমারত গ'ড়ে উঠেছে, এবং সেই ভিত আল্‌গা হ'লেই য়ুরোপীয় সভ্যতা ভেঙে পড়বে। এই ভিত্তির গোড়া আল্‌গা হয়েছে বলেই য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়েছিল। সুতরাং য়ুরোপীয় সভ্যতা যাঁরা রক্ষা করতে চান, তাঁদের জানা উচিত—য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি? কারণ, য়ুরোপের তথাকথিত material civilisation যাঁরা যথার্থ civilisation ব'লে ভুল করেন, তাঁরাই য়ুরোপীয় সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বস্তুজগতের উপর প্রভুত্ব যথার্থ সভ্যতার ফল মাত্র—তার মূল নয়।

১১

গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা ও খৃষ্টধর্ম্ম—এই তিনে মিলে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতাকে গ'ড়ে তুলেছে।

গ্রীকজাতি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তিপত্তন ক'রে গিয়েছেন। রোমানজাতি সমাজরক্ষার ও রাজ্যশাসনের নিয়ম বিধিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রেয়র চাইতে শ্রেয়র মাহাত্ম্য যুগ যুগ ধ'রে প্রচার করেছে।

খৃষ্টধর্ম্মের idealism, গ্রীক realism, ও রোমান legalism-এর মিলনের ফলে য়ুরোপীয় মানব তার গৌরব লাভ করেছে।

কিন্তু Renaissance-এর যুগ হতেই গ্রীক বিজ্ঞান, খৃষ্ট নীতি, ও রোমান রাজনীতি পরস্পর পৃথক্ হ'তে সুরু করে। ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতার balance ভঙ্গ হয়। Balance যে ভঙ্গ হয়েছে, এ সত্য অনেক দিন আমাদের কাছে ধরা পড়ে নি। শেষটা পলিটিকাল materialism যখন য়ুরোপের লোকের মনকে গ্রাস করলে, তখন গ্রীক বুদ্ধি এবং খৃষ্ট ধর্ম্মনীতি মানুষের মন থেকে খসে পড়ল। ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতার এখন এই দুর্দ্দশা ঘটেছে। অর্থাৎ তার বাহ্য ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু ভিতরটা ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে।

পৃথিবীর অপরাপর জাতির কাছে য়ুরোপীয়রা এখন আর একটা বড় সভ্যতার প্রতিনিধি ব'লে মান্য নয়। এ যুগে তারা চতুর বণিক অথবা নিপুণ শিল্পী বলেই গণ্য। তারা আজকের দিনে স্বার্থসাধন করতে অতিশয় পটু, কিন্তু এ নিপুণতা, এ পটুতার অন্তরে কোনরূপ বিশেষ সভ্য মনোভাব নেই। কারণ, এ জাতীয় কর্ম্মকৌশল পৃথিবীর অপর সকল জাতিই আত্মসাৎ করতে পারে, সেই সঙ্গে য়ুরোপের nationalism, industrialism-এর ধর্ম্মেও অনুপ্রাণিত হ'তে পারে। আর যখন পলিটিকাল nationalism এবং industrialismএর মূলমন্ত্র হচ্ছে অপর জাতির সঙ্গে বিরোধ, তখন যে-সব জাতিকে য়ুরোপ এই নব মন্ত্রে দীক্ষিত করবে, এবং সে মন্ত্রের সাধনে সিদ্ধিলাভ করবার যন্ত্রপাতিও তাদের দেবে, সে সব জাতি য়ুরোপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুত হবে। এই হচ্ছে য়ুরোপের তথাকথিত নব সভ্যতার কর্ম্মফল।

১২

এখন দেখা গেল যে, জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ও ফরাসী সাহিত্যিক উভয়ই মনে করেন যে, সম্মুখে মস্ত বিপদ আছে—অর্থাৎ য়ুরোপীয় সভ্যতা এখন টলমল করছে। তার পর য়ুরোপী

সভ্যতা যে গ্রীক জ্ঞান, রোমান রাজনীতি ও খৃষ্টধর্ম্ম, এ তিনের সমবায়ে গ'ড়ে উঠেছে, এ বিষয়েও উভয়েই একমত। শুধু বর্ত্তমান সভ্যতার রূপগুণ সম্বন্ধে তাঁদের মতে মেলে না।

জর্ম্মাণ অধ্যাপকের মতে technical civilisation হচ্ছে য়ুরোপীয় সভ্যতার চরম পরিণতি; ফরাসী লেখকের মতে কিন্তু তা অবনতি। কারণ, সভ্যতার যা প্রাণ—অর্থাৎ intellectual and moral tradition—বর্ত্তমান য়ুরোপ তার থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এখন য়ুরোপে রোমান রাজনীতিই প্রভুত্ব করছে। বিশ্বমানবের উপর প্রভুত্ব করাই এ যুগে য়ুরোপের একমাত্র মনোভাব। এ মনোভাব সভ্য মনোভাব নয়, এবং এই মনোভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি বলেই রোমান সভ্যতা ধূলিসাৎ হয়েছে।

জাতিতে জাতিতে যে মনের ও চরিত্রের প্রভেদ আছে, সে কথা ফরাসী লেখকও মানেন, এবং স্বধর্ম্মপালন করেই জাতি যে সভ্য হয়ে উঠতে পারে, এই তাঁর দৃঢ় ধারণা; সুতরাং তিনিও nationalismএর মহাভক্ত; কিন্তু যে nationalism অপর nationalism-এর হন্তারক, সে nationalismকে তিনি political nationalism বলেন। কারণ, এ nationalism intellect ও morals-এর ধার ধারে না; অতএব হিংস্র হতে বাধ্য।

এখন য়ুরোপীয় সভ্যতা কি ক'রে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে? ফরাসী লেখক বলেন যে, য়ুরোপের মনে আবার কেউ যদি ধর্ম্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তা হলেই য়ুরোপীয় সভ্যতা রক্ষা পায়—কিন্তু তা করবে কে?

জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মতে, যদিও য়ুরোপীয় সভ্যতা তার চরমপদ লাভ করেছে—তবুও আরও উন্নতির অবসর আছে। এ বিষয়ে তাঁর শেষ কথা ক'টি উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :—

"If it is true that it has passed through all spheres of being and accomplished all tasks, it will begin the cycle a second time, and enriched by the experience and success of the first cycle, will be able to attain new heights. Perhaps the time is not far off when following the example of the Greeks, it will once more find its chief aim in the shaping of man. Let us hope so. For it has become very necessary."

আমি জিজ্ঞাসা করি, মানুষ তৈরি করা কি সভ্যতার শেষ কথা না প্রথম কথা? আগে মানব-সভ্যতা গ'ড়ে তার পর মানুষ গড়া, গাড়ীর লেজে ঘোড়া-জোতার মত বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নয় কি?

১৩

য়ুরোপীয় সভ্যতা যে কালে ভেঙে পড়বে, এ ভয় আমরা পাইনে। কারণ, যে গুণে য়ুরোপ সভ্য, সে গুণের ধ্বংস নেই। জর্ম্মাণ অধ্যাপক ও ফরাসী সাহিত্যিক উভয়ের মতেই পুরাকালের গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান, রোমের কল্পিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও মধ্যযুগের ধর্ম্মমনোভাবই য়ুরোপীয় সভ্যতার মালমশলা। এক কথায়, য়ুরোপীয়দের মনই তাদের সভ্যতা গড়েছে।

গ্রীক সভ্যতা অনেক কাল হ'ল ভেঙেচুরে গিয়েছে, কিন্তু গ্রীক দর্শন ও গ্রীক সাহিত্য আজও মানুষকে সভ্য করছে।

রোমের সাম্রাজ্য সেকালে য়ুরোপের অসভ্য জাতিদের এক ধাক্কায় সমূলে বিনষ্ট হয়েছিল; কিন্তু আজও সমগ্র সভ্য জগৎ রোমের বিধিনিষেধ শাস্ত্র মেনেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছে।

মধ্যযুগের ধর্ম্মপ্রাণ সভ্যতার বিষয় আমরা বেশি কিছু জানিনে, সুতরাং জর্ম্মাণ ও ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের কথা মেনে নিতে আমার কোনও আপত্তি নেই। মধ্যযুগের সভ্যতা জ্ঞানকর্ম্মহীন ছিল। একমাত্র ভক্তির উপর কোন সভ্যতাই চির-প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। ফলে য়ুরোপ যখন গ্রীক সাহিত্যের ও রোমান রাজনীতির সন্ধান পেলে, তখন মধ্যযুগের সভ্যতার অবসান হ'ল। যেমন এ যুগে আমরা য়ুরোপের জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের সন্ধান পেয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অবলম্বিত ভক্তিমার্গ ত্যাগ করেছি। তবে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতে, য়ুরোপীয় মানবের ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান মধ্যযুগের সৃষ্টি। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। য়ুরোপের নব ধর্ম্ম ডিমোক্রাসির মূল গ্রীকদর্শন নয়, নব বিজ্ঞানও নয়। যে মনোভাবের উপর ডিমোক্রাসি প্রতিষ্ঠিত, সে মনোভাবের স্রষ্টা হচ্ছেন যিশুখৃষ্ট।

এর থেকে দেখা যায় যে, কোন জাতিবিশেষ যে অংশে সভ্য, সে অংশে অমর। শুধু তাই নয়, যেই সত্যের সন্ধান পাক্ না কেন, সে সত্য সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। গ্রীক জাতি মারা গেল, কিন্তু তার দর্শনবিজ্ঞান সাহিত্যের উত্তরাধিকারী হ'ল বিশ্বমানব। রোমান জাতি বিনষ্ট হ'ল, কিন্তু তার সাহায্যে য়ুরোপের তির্য্যক্ সামান্য অসভ্য জাতিরা মধ্যযুগের সভ্যতা

ড়ে তুলেছে, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সাহায্যে। মধ্য-যুগের ব্রহ্মবিদ্যা (theology) গ'ড়ে উঠেছে আরিষ্টটলের দর্শনের ভিত্তির উপর ; এবং তার খৃষ্টসঙ্ঘ (church) গ'ড়ে উঠেছে রোমান রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুকরণে।

৯৪

সভ্যতা বলতে অধিকাংশ লোকে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও আর্ট বোঝে না—বোঝে অর্থ ও স্বার্থ; এবং তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুলও নয়। অর্থ ও কাম, প্রবৃত্তিরেষা নরাণাম্। এবং যে সমাজে মানুষের এ দুটি প্রবৃত্তি চরিতার্থ না হয়, সে সমাজ কখনই চিরস্থায়ী হ'তে পারে না। যাকে আমরা material civilisation বলি, সে বস্তু হচ্ছে সকল সভ্যতার যুগপৎ আধার ও ফল। না খেয়ে পরে মানুষ যে বাঁচতে পারে না, এ কথা কে না জানে? আমাদের পূর্ব্বপুরুষরাও উপবাসী হয়ে হিন্দু সভ্যতা গড়তে পারেন নি। এ হিসাবে য়ুরোপের বর্ত্তমান material civilisation অবজ্ঞার বস্তু নয়।

সংস্কৃতে একটি বচন আছে, যা সর্ব্বলোকবিদিত—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।" এই অর্থগত সভ্যতা গড়বার বিদ্যা গ্রীসেরও জানা ছিল না, রোমেরও জানা ছিল না। এ উভয় জাতিই পরস্ব অপহরণ করেই নিজের স্বার্থ বজায় রাখতেন। গ্রীক সভ্যতা দাঁড়িয়ে ছিল দাসের কর্ম্মশক্তির উপর ; আর রোমক সভ্যতা অপর দেশ লুণ্ঠতরাজের উপর। ফলে উভয় সভ্যতারই ভিত নেহাৎ কাঁচাই ছিল।

বর্ত্তমান য়ুরোপ, যে বিদ্যার বলে মানুষে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে, সে বিদ্যা অর্জ্জন করেছে। এ হিসাবে Scienceকেই য়ুরোপীয় মনের চরম পরিণতি বলা অত্যুক্তি নয়।

কিন্তু গ্রীক দর্শন ও রোমান আইন যেমন ও দুই সভ্যতার একচেটে জিনিষ নয়—বিশ্বমানবের সম্পত্তি ; তেমনি modern scienceও বর্ত্তমান য়ুরোপের একচেটে জিনিষ নয়। এ বিদ্যা বিশ্বমানব শিখবে, এবং ফলিত বিজ্ঞানও বিশ্বমানবের করায়ত্ত হবে। ফলে এ বিষয়েও য়ুরোপের বর্ত্তমান প্রাধান্য আর থাকবে না। য়ুরোপীয় অর্থে, এসিয়াও সভ্য হবে। এর জন্য য়ুরোপের ভয় পাবার কোনও দরকার নেই। কোনও সভ্যসমাজকে অপর কোন সভ্যসমাজ বিনাশ করে নি। সভ্যতার প্রধান শত্রু যে অসভ্যতা, য়ুরোপের ও এসিয়ার ইতিহাসের পাতায় পাতায় তা লেখা আছে।

এ তো গেল বহিঃশত্রুর কথা। এ ছাড়া ধ্বংসের মূল জাতির অন্তরেও থাকে। য়ুরোপের material civilisationএর মূলে যদি এই মনোভাব থাকে যে, য়ুরোপীয়েরা পরের খাটনির ফল ভোগ করবে আর পরের দেশ লুঠে খাবে; তা হ'লে অবশ্য গ্রীস-রোমের মতই তার ধ্বংস অনিবার্য্য। এ অবস্থায় "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ"—আদেশ মানলে তবেই তার ফাঁড়া কেটে যাবে।

কারণ, ধর্ম্ম আচরণের গুণ এই যে, তাতে লোকের অহংবুদ্ধি খর্ব্ব করে। যে তিন পূর্ব্ব-সভ্যতা য়ুরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছে, সে তিনই ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে সে তিন cultureই য়ুরোপের অহং-জ্ঞানকেও পরিস্ফুট করেছে। এ বিষয়ে জনৈক আমেরিকান সাহিত্যিকের কথা নিয়ে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, তার থেকে সকলেই দেখতে পাবেন যে, য়ুরোপীয় সভ্যতার spirit হচ্ছে অহঙ্কার :—

"There is the pride of culture, like that of the ancient Greeks; our word "barbarian", from their term for all aliens, still expresses the feeling.

There is the pride of religion, remnant of the mediæval perversion of Christianity, which transformed acceptance of the most inclusively loving and humble teacher earth has known, into a ground for arrogance. The tone in which "pagan" and "heathen" are often pronounced, tells the story.

There is the pride of political efficiency, inherited perhaps from Rome, causing us to despise those unpossessed of organised power.

Last to grow, perhaps, is the pride of scientific and mechanical achievement—that which impels a Westerner to identify sanitary plumbing and speedy communication with civilisation.".

এই মনের পাপই য়ুরোপের প্রধান শত্রু; এবং Haas প্রমুখ পণ্ডিতরা এ পাপের প্রশ্রয় আজও দিচ্ছেন।

১লা আষাঢ়, ১৩৩৭

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পারমার্থিক রস

৯

সুখ নিত্যসিদ্ধ ও আত্মস্বরূপ হইলেও তাঁহার অভিব্যক্তি সর্ব্বদা হয় না। কারণ, তাহা অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকে, সেই অবিদ্যার আবরণ যে অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা অপসারিত হয়, তাহাই এ সংসারে সুখ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ অন্তঃকরণবৃত্তি সকল সময়ে থাকে না, শুভাদৃষ্টবিশেষ দ্বারা অভিলষিত ভোগ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ হইলে সুখের অভিব্যঞ্জক বা আবরণনিবর্ত্তক অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ উৎপন্ন হইলে আমরা মনে করি, সুখ উৎপন্ন হইল এবং ঐ প্রকার বৃত্তিবিশেষ বিনষ্ট হইলে আমরা মনে করি, সুখ বিনষ্ট হইল। বাস্তবপক্ষে সুখ উৎপন্নও হয় না বা বিনষ্টও হয় না, ইহাই হইল বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত। অনাদিকাল হইতেই আত্মার এই সুখাংশে এইরূপ অবিদ্যার আবরণ বিদ্যমান আছে এবং যত দিন সেই আবরণ একবারে বিধ্বস্ত না হইবে, তত দিন আমাদের এই আবরণ ধ্বংস করিয়া আত্মস্বরূপ সুখের অভিব্যক্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রযত্ন হইতেই থাকিবে; সুতরাং সুখকে নিত্য ও আত্মস্বরূপ বলিয়া অঙ্গীকার করিলে সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষা বা প্রযত্ন হওয়া সম্ভবপর নহে, এই প্রকার যে দ্বৈতবাদিগণের উক্তি, তাহা যুক্তিসহ নহে।

সুখ এবং জ্ঞান একই বস্তু, ইহাই উপনিষদের সিদ্ধান্ত এবং আত্মা সুখ ও জ্ঞান হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, ইহাও উপনিষদের সিদ্ধান্ত। ইহা অদ্বয়জ্ঞানবাদী বৈদান্তিক অথবা ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক স্বীকার করিলেও অদ্বয়জ্ঞানবাদীর সহিত ভেদাভেদবাদী ভক্ত দার্শনিকগণের যে বিষয়টিতে ঐকমত্য হয় না, তাহা না বুঝিলে হ্লাদিনীর স্বরূপ বুঝা কঠিন, তাই এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

অদ্বয়জ্ঞানবাদিগণ বলিয়া থাকেন, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র বাস্তব তত্ত্ব, সেই বাস্তব তত্ত্বের দ্রষ্টা বাস্তব তত্ত্ব নহে অর্থাৎ তাহা কল্পিত বা ব্যবহারিক বস্তু মাত্র। তাঁহাদের মতে দৃশ্য বস্তুমাত্রই যেমন কল্পিত, দ্রষ্টাও সেইরূপ কল্পিত ছাড়া আর কিছুই নহে। দৃশ্য ও দ্রষ্টা কল্পিত, সুতরাং তাহা মিথ্যা অর্থাৎ বাস্তব সৎ নহে। এই অবাস্তব দৃশ্য ও দ্রষ্টার সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ যে পর্য্যন্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সংসারের সত্তা কল্পিত হইলেও বিনিবৃত্ত হইবে না। সুতরাং সংসারে যাহার বিরক্তি আসিয়াছে, তাহার পক্ষে এই দৃশ্য ও দ্রষ্টার উচ্ছেদই হইল একমাত্র সাধ্যবস্তু বা পরমপুরুষার্থ। ইহারই নাম মোক্ষ বা নির্ব্বাণ; জ্ঞানীর ইহাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

ভেদাভেদবাদী ভক্ত দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, সুখ থাকিবে অথচ সুখের আস্বাদয়িতা থাকিবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত উপনিষদের মধ্যে পাওয়া যায় না এবং ইহা শ্রুতিনিরপেক্ষ যুক্তি দ্বারাও সংস্থাপিত হইতে পারে না। কেন যে উপনিষদের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, তাহাই অগ্রে বুঝাইব। অদ্বৈতবাদিগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে যাইয়া প্রধানভাবে যে উপনিষৎপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাহা এই :—

"যদা ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।"

যখন এই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সকল বস্তুই আত্মা হইয়া যায়, তখন সে কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে? আর কাহার দ্বারাই বা কাহাকে বুঝিবে? তাৎপর্য্য এই যে, সকল বস্তুই যদি এক আত্মাই হইল, তবে দ্রষ্টাই বা কে রহিল, দৃষ্টির সাধনই বা কোথায়? আর দৃশ্য বস্তুই বা কি থাকিল? রহিল কেবল একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ইহাই হইল মোক্ষ। এই অবস্থায় দ্রষ্টা থাকে না, দৃশ্য থাকে না, দৃষ্টির কোন করণও থাকে না। সুখ এই অবস্থার আস্বাদ্য থাকে না, কিন্তু আস্বাদই হইয়া উঠে, সুখের আস্বাদ্যতাই সংসার, আর তাহাতে আস্বাদ্যতার নিবৃত্তিই নির্ব্বাণ, ইহাই হইল অদ্বৈতবাদীর মতে সকল উপনিষদের তাৎপর্য্যার্থ।

ভক্তিবাদী দার্শনিক বলেন, উপনিষদের যে অংশটিকে অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ অদ্বয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আপাততঃ তাহার এইরূপ অর্থ প্রতীত হইলেও ঐ অংশের পূর্ব্বাপর বাক্য-সমূহ পর্য্যালোচন করিলে কিন্তু অদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত টিকে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায় হইতে অদ্বৈতবাদিগণ এই অংশটিকে নিজ সিদ্ধান্তের প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঐ চতুর্থ অধ্যায়ে ঐ যাজ্ঞবল্ক্যজনক-সম্বাদের মধ্যেই ব্রহ্মস্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহর্ষি

তুমি আদিদেব, তুমিই পুরাণ পুরুষ, এই বিশ্বের তুমিই একমাত্র আধার, তুমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞেয় এবং তুমিই পরম ধাম অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ। হে অনন্তরূপ, তুমিই এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছ।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিয়াছিলেন—নিজের যথার্থ স্বরূপ কি, তাহাই দেখাইবার জন্ত। সেই দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জ্জুন ভক্তিভরে তাঁহারই স্বরূপবর্ণনাত্মক স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে বলিতেছেন—তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয়, আবার তুমিই জ্ঞান। ইহা দ্বারা ইহাই ত স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভগবান্ কেবল নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমাত্রই নহেন, তিনি জ্ঞানও বটেন, জ্ঞাতাও বটেন এবং জ্ঞেয়ও বটেন। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা পরস্পর পৃথক্ই হইয়া থাকে, ব্যবহারিক দৃষ্টির সাহায্যে ইহাই আমাদের সকলের সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু দিব্য বা পারমার্থিক দৃষ্টির সাহায্যে অর্জ্জুন যে পরমার্থ-তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু ত্রিতয়াত্মক অর্থাৎ জ্ঞানও বটে, জ্ঞাতাও বটে, আবার তাহাই জ্ঞেয়ও বটে। তাহা যে নিগুর্ণমাত্রই, তাহাও নহে। কারণ, অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে তাহা অনন্তরূপ। এই অনন্তরূপবিশিষ্ট বস্তুই জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা হইতে পৃথক্ নহে। এইরূপ পরমাত্মতত্ত্বই অর্জ্জুনের পারমার্থিক বা দিব্য দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছিল। ইহাই যদি গীতার পরমাত্মতত্ত্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাববর্জ্জিত একমাত্র অদ্বৈতজ্ঞানতত্ত্বই উপনিষৎ-সমূহের সিদ্ধান্ত? উপনিষদের সার সিদ্ধান্তই গীতাতে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ কথা ত অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সকলেই এক-বাক্যে বলিয়া থাকেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত যে গীতার একমাত্র সিদ্ধান্ত, ইহা কোন বিবেচক ব্যক্তিই অঙ্গীকার করিতে পারেন না, প্রত্যুত একের অনেকাত্মতা বা অনেকের একাত্মতারূপ যে ভেদাভেদসিদ্ধান্ত, তাহাই উপনিষৎসমূহের বাস্তব সিদ্ধান্ত এবং ভগবদ্গীতাও সেই সিদ্ধান্তকেই বিশদভাবে বুঝাইবার জন্ত বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কেবল গীতাই নহে, মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত সকল পুরাণই এই ভেদাভেদতত্ত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তাহাই অগ্রে প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বর্ষায়

এলায়ে বিনোদবেণী মোর চারি পাশে,
মেঘের মধুর মায়া কর গো সঞ্চার
কুন্দশুভ্র শুভহাস্যে সুধাকলভাষে
তোল-শ্রুতিমূলে মৃদুমল্লার-ঝঙ্কার।

আতপ্ত নিশ্বাস-বায়ে উড়াইয়া লহ,
হৃদিকুঞ্জ হতে শুষ্ক শষ্প-পুষ্পধূলি
দূর কর এ দুরন্ত আতপ দুঃসহ
চুম্বনে ফুটাও প্রেমমুকুলিকাগুলি।

অপাঙ্গ-বিভঙ্গে হানি কটাক্ষ উজ্জ্বল
নাচুক তিমিরমাঝে মোহিনী দামিনী,
ঢাল অশ্রু বহে যাক প্লাবন প্রবল
পভুক সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে চম্পক-কামিনী,

হোথা যমুনার পারে অস্ত যায় রবি—
এ নহে মিলনসুখ—যেন স্বপ্নচ্ছবি।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

পথের সাথী

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

হরমোহনের অসুখটা খুবই যন্ত্রণাকর ও রোগটাও খুব কঠিন হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিন্দুর সেবা-যত্নের গুণে তাঁর অনেকখানি কষ্টের লাঘব হইল। মায়ের কোল পাইলে শিশু যেমন নিশ্চিন্ত নির্ভর করে, তেমনই করিয়া মেয়ের কোলে মাথা রাখিয়া ব্যাকুল হইয়া তিনি বলিলেন, "এখন আর তুই আমায় ছেড়ে যাস্‌নে বিন্দু. আমার কাছে থাক, তুই চ'লে গেলে আমি ম'রে যাব।"

বিন্দু হাসি-হাসি মুখে বাপের কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া শান্ত স্বরে কহিল, "এখন ছেড়ে, এখন অনেক দিনই আমি তোমার কাছ থেকে ত যাব না, বাবা! গেলেও শীগ্‌গিরই আবার ফিরে আস্‌বো, বেশী দিন তোমায় ছেড়ে আর দূরে থাকবো না।"

রোগদুর্ব্বল চিত্ত এই স্বার্থপরতাটুকু ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না।

এক দিন শশাঙ্ক হঠাৎ বলিয়া বসিল, "দাদামশাই! তুমি কিন্তু বড্ড শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভাল হয়ে উঠছো!"

তার গলার স্বরে এই কথাটায় দাদামশায়ের রোগমুক্তির অভিনন্দনের অপেক্ষা অভিযোগই প্রকাশ পাইল।

শুনিয়া হরমোহন হাসিয়া বলিলেন, "তোর তাতে কোন আপত্তি ছিল না কি রে? তা ত কৈ আগে আমায় বলিস্‌নি?"

শশাঙ্ক কহিল, "ছিল কেন, আজও আছে, দাদামশাই! আচ্ছা, তুমি একটা কায করবে? এই ১লা চৈত্র পর্য্যন্ত তোমার রোগটাকে একটু সুপ্রচারিত এবং আরোগ্যসম্বাদটাকে সম্পূর্ণ অপ্রচারিত ক'রে রাখবে? তার পর ২রা চৈত্র থেকে শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখে এক দিন তখন তোমায় আরোগ্যস্নানটান খুব ঘটা ক'রে করিয়ে দোব'খন।"

হরমোহন হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "তার পর নূতন পঞ্জিকার কি শুভদিনের নির্ঘণ্টে মৃতহিবুকযোগের পাতাখানা ছিঁড়ে ফেলে দেবে? তখন আবার এ বুড় বেচারার কি ব্যবস্থা করবে, ভায়া? গঙ্গাযাত্রাটা কি সেবার জবরদস্তিই করাবে না কি?"

শশাঙ্ক ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিল, "তার ত তবু দেরি আছে, এখন যে শিয়রে শনি। কিছু মনে করো না, দাদু! আমাদের পরমপূজ্য শাস্ত্রেই ত সুস্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছে, 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ—' তা আমার ত 'দার'ও নেই, ধনও নেই, কি দিয়ে আত্মরক্ষা করি বল ত? ভাগ্যে একটি দাদামশাই ছিল, আর কি ভাল সময়েই যে তার অসুখটি করেছে! এমন নৈলে দাদামশাই!"

হরমোহন কহিলেন, "তোমাদের যদি তাতেই কাযে লাগি, তা হ'লে নয় আমি আমার বাকি দিন কটা এই রকম বিছানা পেতে রুগী হয়ে প'ড়ে থেকেই কাটিয়ে যেতে রাজি আছি।"

শশাঙ্ক দাদামশাইএর টাকওয়ালা মাথাটিতে আদর করিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল,—"আহা, তুমি কি ভাল গো! যেন এই ভরা কলিতেও সাক্ষাৎ একটি দধীচি মুনি, তা নেহাৎ বড্ড বেশী অত্যাচার যদি না মনে করেন, হাঁ্যা, তা হ'লে তা—তা হ'লে বড় মন্দ হয় না। এই ধরো, তুমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠ্‌তে থাকলে, ডাক্তাররা নাড়ী ছুঁয়ে, কবিরাজ মশাইরা নাড়ী টিপে আর কোন রোগই খুঁজে পান না, বেশ! নাই বা পেলেন? রোগ ত আর শুধু নাড়ীর মধ্যেই বাসা বেঁধে নেই; তোমার ডায়াবিটিস আছে, সায়াটিকা আছে, এ.ত ঠিক। আচ্ছা, ধ'রে নাও সায়াটিকাটা খুব জোর বাড়লো, যন্ত্রণায় রে! মা রে! বিন্দু রে!' ক'রে একটু একটু আর্ত্তনাদ করতে থাকলে আর এমনি ক'রে শুয়ে শুয়ে বড়মায়ের তৈরি করা চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চর্ব্বণ, লেহন ও পান ক'রে যেতে লাগলে, তোমার ত তাতে কোনই লোকসান হ'তে পেলো না? হলো কি?"

হরমোহন সহাস্তে উত্তর করিলেন, "কৈ আর হলো? বরং—"

শশাঙ্ক বাধা দিয়া উঠিল, "ওটা আমাকেই বলতে দাও। হাঁ, ওই যা বলছিলে,—বরং তোমার পক্ষে ভালই হ'তে থাকলো। বলা যেতে পারে, কেমন, না? কেন না, এ রকম না হ'লে আমার বড়মাটিকে—তোমার কন্সাটিকে ত আর তুমি খুব বেশী দিন এখানে তোমার কাছে ধ'রে রাখতে পেরে উঠবে না? আর তাঁকে নৈলে এই রোগাবস্থায় যে তোমার দিন খুবই সুখে কাটবে না, সে আমিও যেমন জানি, তুমিও জানো, কি বল? ঠিক কথা বলিনি?"

হরমোহন ঈষৎ নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন,—"ঠিকই বলেছিস, ভাই! কিন্তু ও কি ওর ঘর-সংসার ফেলে আমার কাছে বেশী দিন থাকতে পারবে? আমি জানি, ওর নিজের সংসারকে ও প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভালবাসে, তাই হাজার দুঃখ অসুবিধা হলেও আমি কোন দিনই ওকে সহজে আটকাতে চাইনি।"

শশাঙ্ক কহিল, "তুমি খুব উদার বলেই অত বড় স্বার্থ ত্যাগ করতে পেরেছ, আমি কিন্তু তুমি হ'লে কখনই তা করতে পারতুম না, দাদু! পরের জন্তে, তা আবার যে সে পর নয়, যে জামাই আমার বড়মার মতন স্ত্রীর জীবনটাকে এমন ক'রে নষ্ট ক'রে দিতে পারলে, তার সাংসারিক সুখ-শোয়াস্তি বজায় রাখতে নিজেকে নিজের একমাত্র আরাম ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলে, এতে নিশ্চয়ই তোমার খুব Heroism প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ও জিনিষটার সেই আমাদের পৌরাণিক আর গ্রীক-স্পার্টার যুগে খুব কদর ছিল, এখন কিন্তু আর ওর তেমন আদর নেই।"

এই একান্ত অপ্রিয় আলোচনায় হরমোহন অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, কিন্তু তিনি যথাসাধ্য সে ভাবটাকে অপ্রকাশ রাখিয়াই ঈষৎ হাস্তের সহিত কহিলেন, "তা ব'লে কি বলতে হবে, তোমার এই স্বার্থ-সর্বস্ব, দুর্বলচিত্ততা-পূর্ণ আধুনিক যুগটাই সেই পৌরাণিক ও স্পার্টার যুগের চেয়ে ভাল?"

শশাঙ্ক হাসিল, হাসিয়া কহিল, "ভালই হোক আর মন্দই হোক, ঢেউ যখন উল্টোদিকেই বয়ে চলেছে, তখন একা একা বিপরীত দিকে ভাসতে গিয়ে লাভ কি? সবাই যখন নিজের নিজের সুখ-শান্তি খুজে ব্যস্ত, তখন আমারটাই বা আমি ছাড়ি কেন?"

হরমোহন শুষ্কভাবে কহিলেন, "সুখের আইডিয়াটাই যে জগতে এক নয়, ভাই! সেইখানেই ত একটুখানি গোল বেধে আছে, দাদা! তোমার যাতে সুখ, আমারও যে ঠিক তাইতেই সুখ পেতে হবে, এমনও ত কিছু লেখা-পড়া নেই?"

শশাঙ্ক উত্তর করিল, "তবু ত একটা সাধারণভাবে মিল সব্বার মধ্যেই থেকে থাকে, কিন্তু কোন এক জনও কি আজকালকার দিনে—"

বাধা দিয়া হরমোহন কহিয়া উঠিলেন, "আজকালকার দিনকেও যত তুমি স্বার্থ-সর্ব্বস্ব ব'লে বাহবা দিচ্ছো, শশাঙ্ক, ঠিক হয় ত ততটাই তার পাওনা নয়। ধরো এই মহাত্মা গন্ধীর কথা, ওই যে বুড়মানুষ এখনও পর্য্যন্ত দেশের লোকের কাছে গালমন্দ খেয়েও বারে বারে হতাশ হয়ে হয়েও দেশের লোকের ভাল করবার স্বপ্ন দেখা ত্যাগ করতে পাচ্ছেন না, তার জন্তে প্রাণপাত করতে বসেছেন, এই যে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যবিলাসের প্রচণ্ড প্রলোভন পরিত্যাগ ক'রে ওই নেংটীপরা লোকটার পিছনে ফিরেছেন, এগুলোকেও ত ঠিক তোমার বর্ণিত যুগোচিত কার্য্য ব'লে মনে করতে পারছিনে। তবেই দেখ, সুখের আইডিয়াটা প্রত্যেকেরই বিভিন্ন, সে আজও বর্ত্তমান রয়েছে, তার জন্তে তোমার স্পার্টানদের কবর খুঁড়ে বার ক'রে আনতে যেতে হবে না।"

শশাঙ্ক এ যুক্তিতেও হার মানিল না। সে নিজের মতকেই আঁকড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "তা তুমি যা-ই বল, আর তাই বল, দাদু ভাই! বড়মাকে যে তুমি কেমন ক'রে ওখানে ফেলে রাখলে, এ আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনে! আমাদের পক্ষে এতে যে কত বড় লাভ হয়েছে, সে অবশ্য আমি ভুলিনি, কিন্তু ওঁর পক্ষে যে এটা নিতান্ত অবিচার হয়েছে, তা' একশোবার বলতে হবে। সতীনের ছেলে মানুষ ক'রে উনি কি সুখ পেলেন? অথচ সে পরের ছেলে, তার উপর ওঁর জোর ত নেই!"

হরমোহন ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন, তার পর ঈষৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "সুখ সে যদি না-ই পেতো, নিশ্চয়ই সে তার দুঃখের ঘর ছেড়ে আমার কাছে ফিরে আসতো। সে ত জানতো, এ বুক তার জন্তে পাতাই আছে। পরকে আপন করার সুখ সে নিশ্চয়ই পেয়েছিল, আর আমার মনে হয়, তার সে সাধনাও নেহাৎ ব্যর্থ হয়নি, শশাঙ্ক! হয় ত এরকম করতে পেরেছিল বলেই তার নিজের পেটের

ছেলের চাইতেও সে পরের ছেলের উপর দাবী না করেও বেশী জোর পাবে। কে বলতে পারে কিসে কি হয়?"

শশাঙ্ক সহসা হরমোহনের পায়ের দিকে সরিয়া আসিয়া তাঁর পাদুটিতে হাত দিয়া সেই হাত মাথায় দিল, মৃদু কণ্ঠে কহিল, "তাই যেন হয়, দাদামশাই! আশীর্ব্বাদ করুন, আর যা করি তা করি, বড়মাকে যেন কোন রকম দুঃখ না দিয়ে ফেলি।"

হরমোহন কথায় ইহার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া নীরবে একমাত্র কন্যার সপত্নীপুত্রকে নিজের বুকের উপর দুই হাত দিয়া টানিয়া লইলেন। তাঁর দুই চোখ জলে ভরিয়া ছলছল করিতে লাগিল; বুক তাঁর কি একটা ব্যথা-মিশ্রিত আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল।

আত্মগতভাবে ঈষৎ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, "সন্তানের জন্য মাবাপকে যে কত সহ্য করতে হয়, ইয়ংম্যান তোমরা এখন সে ত বুঝতে পারবে না, এক দিন আমিই কি কল্পনা করতে পারতুম!"

বিন্দুবাসিনী একটা কাচের গ্লাসে ঢালা মিক্শ্চার এবং একটি রেকাবে কিছু কাটা ফল হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল। তার পদশব্দ চিনিয়া শশাঙ্ক তেমনই করিয়া হরমোহনের বুকের উপর মাথা দিয়া পড়িয়া থাকিয়াই উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল. "বড়মা! দেখছো! দাদু আমায় কি রকম আদর করছে, শুভি পোড়ারমুখীটা কোথায় গেল, ডাকো না একবারটি, দেখে যাক।"

"বড়মা! ভারি অন্যায় কিন্তু! ছোড়দা আমায় চব্বিশ ঘণ্টা পোড়ারমুখী পোড়ারমুখী করবে কেন? আমার কি হনুমানের মত পোড়া মুখ? ওতে প্রমাই কম হয়, তা জানো? বেশ ত বলতে দাও না, আমি যখন ম'রে যাবো, তখন মজা টের পাবে।" শোভা ঘরে ঢুকিয়াই সমর ঘোষণা করিয়া দিল।

"বালাই, ষাট্!" বলিয়া বিন্দুবাসিনী তাড়াতাড়ি মা ষষ্ঠীকে স্মরণ করিলেন, মনে মনে তাঁর কাছে মাথা খুঁড়িয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনেই বলিলেন, "দেখ মা! বাছার আমার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে!" প্রকাশ্যে শশাঙ্ককে লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ রুক্ষ স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "কেন বাপু, তুই সর্ব্বদাই ওকে যা' তা ব'লে উত্যক্ত করিস? সত্যি শশাঙ্ক, এখন বড় হয়েছে, বিয়ে হয়ে গ্যাছে, আর এখন ওকে অমন ক'রে যা খুসি সব বলিসনি, বুঝলি?"

শশাঙ্ক উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"বুঝেছি বৈ কি, বড়মা! এত দিন ত তুমি এ কথা আমায় বুঝিয়ে দাওনি, তাই বুঝতে পারিনি, নৈলে এর আগে, কবে থেকেই ত আমি ওকে আপনি, মহাশয়া, ম্যাডাম, মিসেস্ দাস প্রভৃতি ব'লে ডাকতে পারতুম। আমায় উনি 'ছোড়দা' ব'লে হাঁক দিলে আমি 'জী হুজুর' ব'লে জবাব দিতুম। বেশ, এবার থেকে তাই হবে। শোভা বলতে এখন থেকে ভুলেই যাবো, কি বলেন, মিসেস পি, এন, ডাস, Do you agree?'

শোভা বলিল,—"দ্যাখো না—বড়মা!—"

শশাঙ্ক চটিয়া উঠিল,"দ্যাখো না বড়মা', কি দেখবে বাপু! বড়মা? আপনাকে মান্য-গণ্য করতে হুকুম হলো, তথাস্তু।—তাই মেনে নিলুম, সেই জন্যই ত আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলুম যে, আপনার পছন্দ হচ্ছে কি না?"

"আঃ, যাও, আমি তোমার জ্বালায়—"

শশাঙ্ক তাহাকে ভেংচাইয়া বলিল, "শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাবো। কেমন? এই ত?"

শোভা আরও রাগিয়া গেল, ঝাঁঝিয়া বলিল, "তাই হলেই তুমি বাঁচো। আমি যেন তোমার আপদ হয়েছি, না? তবু ত ঘরে এখনও বউ আসেনি, সে হ'লে আরও কত হবে।"

শশাঙ্ক উত্তর দিল, "হবেই ত! তোর কি হচ্ছে না? তোর ননদিনী রায়বাঘিনীকে তুই কি একটুও ভালবাসিস? আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল, খবরদার, মিথ্যে বলবিনে কিন্তু।"

শোভা সগর্ব্বে উত্তর দিল, "মিথ্যাই বা কিসের দুঃখে বলতে যাবো? সত্যিই আমি তাকে তাদের বাড়ীর মধ্যে সব্বার চাইতেই বেশী ভালবাসি। আমি তাকে—"

শশাঙ্ক উচ্চ-কণ্ঠে বাধা দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "শোন বড়মা! দাদু? তুমি বিচার করো, কত বড় মিথ্যে কথা এই শোভাটা বলছে, তোমরাই বলো, ওর শ্বশুরবাড়ীর মধ্যে ওর ননদকেই সব্বার চাইতে বেশী ভালবাসে। হ্যাঁ দাদু! তুমি বিশ্বাস করবে ওর এই এত মিথ্যে কথা? বলো? খোসামোদ ক'রে নয়, সত্যি ক'রে বল্?—"

এক দিক দিয়া শোভা গর্জ্জিয়া উঠিল; "কে বল্লে তোমার মিথ্যে কথা? আমি হলপ ক'রে বলতে পারি যে, আমি—"

আর এক দিক হইতে ঔষধসেবনান্তে ফলাহারে নিবিষ্ট

ভূতপূর্ব্ব বিচারক মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "নাঃ, এ অবিশ্বাস্য সত্য! শোভা দিদি!"

শোভা নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত নিজের বক্তব্য শেষ না করিয়াই প্রতিপ্রশ্ন করিয়া উঠিল, "কেন দাদু?"

হরমোহন বেদানার রসে চুমুক দিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া সহাস্যে উত্তর করিলেন, "তুমি যে আমার নাতজামাইটির চাইতে তার ভগ্নীর প্রেমেই বেশী মজেছ, এ নিতান্ত সন্দিগ্ধ সত্য নয় কি, ভাই? হাজার বুড়ো হই, তবু এমন সব উদ্ভট সত্যকে মনের থেকে মানতে পারা শক্ত যে!"

শোভা এইবার হার মানিবার ভাবে সলজ্জে ও সরোষে কোপকুটিল কটাক্ষ হানিয়া সতর্জ্জনে "যান! দাদু! আপনিও ভারি দুষ্টু হচ্ছেন!" বলিয়া ঘর হইতে পলাইল।

তার পিছনে শশাঙ্কর কৌতুক হাস্য বিজয়ানন্দে উচ্চগ্রামে উৎসারিত হইয়া উঠিল এবং সদম্ভে সে বলিতে লাগিল, "বেচারা প্রবোধ! আহা! আহা! বৃথাই তুমি শোভাকে পনেরো পৃষ্ঠার চিঠি লিখে খুন হচ্ছো! শোভা কিন্তু তোমার বদলে ভালবাসে তার ছোট ননদ পটলীকে! আহা! প্রবোধ! বৃথা চেষ্টা, বৃথা আকিঞ্চন!"

শোভা এবার আর সাড়া দিল না, তার কলহস্পৃহা তখন চলিয়া গিয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

আগ্নেয়ী

অয়ি আগ্নেয়ী, কি অনল তুমি প্রাণের স্নেহে
জ্বালিয়া রেখেছ, জ্বালা-লাবণ্য উছলে দেহে।
হৃদয়ে গুপ্ত আগ্নেয়াচল
রোমে রোমে তব জ্বলে দাবানল,
লকলক্ শিখা অঙ্গুলিগুলি শোণিত লেহে।

বিনা-সোহাগায় ঠোঁটের আঙারে সোনাও গলে,
নিশ্বাসে তব জলের কমলো ঝলসি ঢলে।
নয়নে তোমার যে অনল ক্ষরে
স্মর ছাড়া তায় সব পুড়ে মরে
সেই শুধু জাগে ভস্ম হইতে দ্বিগুণ বলে।

জ্বালাময়ি, তুমি হাসিছ তাতেও ভরসা কই?
আশার শস্যে যেন খর তাপে ফুটিছে খই।
ধূমপুঞ্জেরে কুণ্ডলী করি
বেঁধেছ ও শিরে ভুজগ-কবরী।
নীলবাস দহি অনলের আভা ছুটিছে ঐ।

ও অনলে মোর পুড়ে যৌবন, পুড়িছে রূপ,
ছন্দোলীলায় গন্ধে মিলায় হইয়া ধূপ।
জীবনযজ্ঞ কামনা-হবিতে
জ্বলে জ্বালাময়ি তব বহ্নিতে,
শোণিতসিক্ত ভোগ-পিপাসার যজ্ঞযূপ।

ও অনল জ্বলে মম স্নায়ু-শিরা ধমনী জুড়ে
এ মূঢ় অঙ্গ হয়ে পতঙ্গ ঘেরিয়া ঘুরে।
ও অনল শোষে সব সুখরস
পুড়ে যায় মোর লোভ-লাভ যশ,
গ্রন্থ তন্ত্র অসি, কেতু রথ সবাই পুড়ে।

জানি, ও অনল নিভিবে না মম তনু না দহি',
সে দিনের আশে অগ্নিহোত্রি-জীবন বহি।
যে মিলন হেথা হল না গহন
পূর্ণ করিবে তোমার দহন,
ও তনু-চিতায় সহ-মরণের আশায় রহি।

শ্রীকালিদাস রায়।

অপরাধের জের

১

ভগিনী রতনমণিকে আনিয়া বাড়ীতে রাখিয়া বৃন্দাবন তীর্থ করিতে গিয়াছিল।

রতনমণি বিধবা, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহার বাড়ী। মাঝে মাঝে এখানে আসিত, এক দিন দুই দিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইত।

ভাইয়ের সংসারে এত দিন বউ ছিল, সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায় বৃন্দাবন পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। সাগরকে সে নাকি জীবনাপেক্ষা ভালবাসিত, সাগরও নাকি কথা দিয়াছিল, সে স্বামীকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না, এমন কি, মৃত্যু আসিলেও সে তাহাকে বাধা দিবে।

এরূপ শক্ত প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও সেই সাগর যে চলিয়া গেল, ইহাতে বৃন্দাবন যে পাগলের মত হইয়া যাইবে—তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? দীর্ঘ ১৮ বৎসর অবিচ্ছিন্ন মিলনে যাহারা যাপন করিয়াছে, তাহাদের এক জন আজ অনির্দ্দিষ্ট লোকে যাত্রা করিয়াছে; যে পড়িয়া আছে, তাহার পক্ষে এই বিরহ নিদারুণ নহে কি?

সাগর যখন বধূরূপে এ গৃহে আসিয়াছিল, তখন তাহার বয়স মাত্র ৭ বৎসর, বৃন্দাবন তখন ১৪ বৎসরের কিশোর। সে দিনে রতনমণি নূতন বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছিল, তাহার পর বছর পাঁচেক সে এখানেই টিকিয়া থাকিয়া বধূকে সব বুঝাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে নিজের গৃহে চলিয়া গিয়াছিল।

বৃন্দাবন দিদিকে এখানে থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, সাগর বউ কাঁদিয়া তাহার দুই পায় জড়াইয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু রতনমণি কাহারও অনুরোধ-উপরোধ রাখে নাই। সে স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছিল, ভগবান্ নিজের হাতে তাহার সকল বাঁধন খুলিয়া দিয়াছেন, স্বামী গিয়াছেন, দুইটি পুত্র গিয়াছে। নূতন করিয়া সংসার সাজাইয়া বসিবার ইচ্ছা আর তাহার নাই। বৃন্দাবন এত দিন নিতান্ত ছেলে-মানুষ ছিল বলিয়াই তাহাকে সংসার পাতিয়া দিয়া সে চলিয়া যাইতেছে।

ভ্রাতৃগৃহ হইতে গিয়া সে নিজের ঘরে থাকিয়া ভগবানের নামগান করিয়া দিন কাটাইয়া দিত। উদরান্নের জন্য তাহার ভাবনা ছিল না। জাত-বৈষ্ণবের মেয়ে, ভিক্ষা করিয়া সে নিজের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিত, কেবল মাঝে মাঝে বৃন্দাবন ও সাগর বউয়ের একান্ত জেদে পড়িয়া দুই এক দিনের জন্য সুরপুরে থাকিয়া যাইত।

সাগর বউয়ের ব্যারামের সময় সে এখানে আসিয়া জড়াইয়া পড়িয়াছিল, আর যাইতে পারে নাই। অবশেষে সাগর বউ তাহার উপর সংসার ও স্বামীর ভার দিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিল।

শোককাতর বৃন্দাবনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, ঘর-সংসারের চারিটি গরুর সেবা করিবার জন্য অগত্যা রতনমণিকে এখানেই থাকিতে হইয়াছিল। চক্ষু মুছিয়া সে বলিয়াছিল—"হতভাগীকে নিয়ে এসে তার সংসার তাকে বুঝিয়ে দিয়ে মনে ভাবলুম, ছুটী নিলুম। হতভাগী আবার আমার মাথায় এই বোঝা চাপিয়ে দিয়ে স'রে পড়ল।"

বৃন্দাবন যে দিন মোহান্তজীর সঙ্গে তীর্থভ্রমণে যাইবার কথা তুলিয়াছিল, রতনমণি তাহাতে আপত্তি করে নাই। সে ভাবিয়াছিল, তীর্থ-ভ্রমণে তাহার ভ্রাতা শান্তিলাভ করিবে।

ইহারই মধ্যে রতনমণি মনে মনে বৃন্দাবনের আর একটা বিবাহেরও মতলব ঠিক করিয়াছিল। ন-পাড়ার রামদাসের মেয়েটি বেশ বড়সড়, বয়স তের-চৌদ্দ হইবে, দেখিতেও খাসা। এই মেয়েটির সঙ্গে ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া সে নিজেই এক দিন ন-পাড়ায় উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাভাবে রামদাস মেয়েটির বিবাহ দিতে পারিতেছিল না, রতনমণির প্রস্তাবে সে তখনই রাজি হইয়াছিল। বৃন্দাবন ছিল সে অঞ্চলের

বিখ্যাত গায়ক, তাহার মত কীর্ত্তন গাহিতে আর কেহ পারিত না, তাহাকে জামাতৃরূপে লাভ করা রামদাসের সৌভাগ্য।

তীর্থে যাইবার আগেই বৃন্দাবন দিদির অভিসন্ধি বুঝিয়াছিল। সে তাই শুষ্ক হাসিয়া বলিয়াছিল, "মিথ্যে তুমি আশা করছো দিদি, আমি আর বিয়ে করব না। বিয়ে মানুষের একবারই হয়ে থাকে, দুবার হয় না। তা ছাড়া বয়েসও ত বড় কম হ'ল না।"

দিদি উত্তরে বলিয়াছিল, "বয়েস আবার কিসের রে? ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়েস পুরুষমানুষের নাকি বয়েস!—ও ত ছেলে-বয়েস। ছেলেদের যখন বিয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, তখন করবি নে কেন? সংসারটা ত বজায় রাখতে হবে? তোকে বারমাস ভাত-জল কে দেবে বল দেখি? অসুখ-বিসুখ হলেই বা কে দেখবে? আমি যে বারমাস শেষবয়সে ভগবানের নাম করা ছেড়ে তোর সংসারে প'ড়ে থাকব, তা ত হয় না। আর এখনই ত তোকে আমি বলছি নে, তুই ঘুরে আয়, তার পর দেখা যাবে।"

বৃন্দাবন কেবল মাথা নাড়িয়াছিল। সত্যই সে আর বিবাহ করিবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল বলিয়াই রতনমণি রামদাসকে পাকা কথা দিতে পারে নাই।

২

যাওয়ার সময় রতনমণি অশ্রুসিক্ত নেত্রে বার বার মাথার দিব্য দিয়াছিল—যেখানেই সে যাক, যেন একখানা করিয়া পত্র দেয়।

বৃন্দাবন প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছিল। তাহার তীর্থ করিতে ৬ মাস বিলম্ব হইয়া গেল। শেষ পত্রে সে জানাইল, সে বাড়ী আসিতেছে।

রতনমণি সংবাদটা আনন্দের আতিশয্যে রামদাসকে জানাইয়া ফেলিল। মহানন্দে সে ভ্রাতার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এক দিন বৃন্দাবন একখানা গরুর গাড়ী করিয়া সত্যই উপস্থিত হইল। গাড়ী হইতে সে নামিল, তাহার পশ্চাতে নামিল একটি মেয়ে, অবগুণ্ঠনে তাহার মুখখানা ঢাকা। বৃন্দাবন যখন দিদিকে প্রণাম করিল, তখন অবগুণ্ঠিতাও রতনমণিকে প্রণাম করিল।

বিস্ময়ে দিদির চোখ দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ মেয়েটি কে রে, বিন্দে?"

বৃন্দাবন কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া উত্তর দিল, "ও তোমার ভাই-বউ, দিদি। ওকে বিয়ে ক'রে এনেছি।"

বিয়ে!—দিদি যেন আকাশ হইতে পড়িল, এত বড় মেয়েকে বিবাহ করিয়া আনা একবারেই অসম্ভব। রতনমণি ত তাহার জীবনে এত বড় মেয়েকে কৌমার্য্য রাখিয়া থাকিতে দেখে নাই। যদিও সে মুখ দেখিতে পাইল না, তথাপি মেয়েটির দৈর্ঘ্য অনুমান করিয়া ঠিক করিয়া লইল, বধূর বয়স কুড়ি বাইশ, কি আরও বেশী।

ধর্ম্মসঙ্গত কুমারী কন্যা-বিবাহ কখনও নহে, এ নিশ্চয়ই কণ্ঠীবদল, রতনমণির যেন আজ ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। অবস্থা যতই হীন হউক, বংশমর্য্যাদায় তাহার পিতৃকুল বড় কম নহে। সেই বংশের ছেলে হইয়া বৃন্দাবন এমন কায করিয়া বসিল! লোকালয়ে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

কথায় বলে, জাত হারাইয়া বৈষ্ণব হয়। কথাটা যে খুবই সত্য, তাহাতে রতনমণির অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কত হাড়ী-কাওরা, জেলে-মালাও বৈষ্ণব হইয়াছে। তাহারাও একমাত্র বৈষ্ণব নামে নিজেদের জাতির পরিচয় দিয়া থাকে। সেই দারুণ ঘৃণায় রতনমণি নিজের শুচিতা লইয়া সমাজে অতি সন্তর্পণে চলা-ফেরা করিত, ভেকধারী-বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিশিত না। বৃন্দাবনের পুত্রের বিবাহ সে বেশ ভাল ঘরেই দিয়াছিল। রামদাসও জাতবৈষ্ণব, তাহার পূর্ব্বপুরুষ বেশ ভদ্রবংশে জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন এ করিল কি? কোথা হইতে কোন্ নেড়া বৈষ্ণবীকে বিবাহ করিয়া আনিল? এ বিবাহ কখনই শাস্ত্রসম্মত বিবাহ নহে, এ কণ্ঠীবদল মাত্র।

তাহাকে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বৃন্দাবন প্রমাদ গণিল। বিশুষ্ক মুখে বলিল, "তা ওকে ঘরে নিয়ে যাও দিদি, ও কি বাইরেই এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে?"

দিদির অন্তরের মধ্যে যেন ধূম সঞ্চিত হইতেছিল, এইবার হঠাৎ তাহা জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি গরু নড়িয়ে বাঁধতে যাচ্ছি, তুই নিয়ে যা।" বলিতে বলিতে সে দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

নূতন বধূ নয়নতারা ব্যাপারটা বেশ বুঝিতেছিল।

নির্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃন্দাবন খানিক হতবুদ্ধি-প্রায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "দিদির সত্যি অনেক কায আছে। তুমি আমার সঙ্গে এসো, দিদি গরু নড়িয়ে বেঁধে এখনি আসবেন।"

খানিক দূর অগ্রসর হইয়া সে ফিরিয়া দেখিল, বধূ তখনও সেইখানে তেমনই আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বৃন্দাবন ডাকিল,—"এসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

অতি গোপনে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নয়নতারা স্বামীর পিছনে পিছনে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বৃন্দাবন বিবাহ করিয়া নূতন বধূ আনিয়াছে, কথাটা চকিতে সমস্ত গ্রামখানির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ায় দলে দলে মেয়েরা অপরাহ্ণে বউ দেখিতে আসিল। কেহ নূতন বধূর রূপের নিন্দা করিল, কেহ প্রশংসা করিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়াই কেহ বলিয়া গেল, "এ নিশ্চয়ই কণ্ঠী-বদল, বিয়ের ক'নে এত বড় হয়, তা ত জানিনে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, মেয়েরা চলিয়া গেল। বউটা দেখিতে যদিও ভাল, তবু মুখে হাসি নাই, কথা নাই, ইত্যাদি অনেক কথাই নয়নতারার কাণে আসিল। পাছে বেফাঁসে কোন কথা বলিয়া ফেলে, এই ভয়ে সে দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

তখনও রতনমণির দেখা নাই। বৃন্দাবন নূতন স্ত্রীর নিকট বড় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। এই চালাক মেয়েটি যে-সবই বুঝিতে পারিতেছে, তাহাতে তাহার অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

সে নয়নতারার সম্মুখে যখন দাঁড়াইল, তখন নয়নতারা মুখ নত করিয়া কি ভাবিতেছিল। বৃন্দাবনের পদশব্দ পাইয়া সে মুখ তুলিল, হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "মন্দ নয়, আমি আসামাত্রই তোমার দিদি বাড়ী ছাড়লেন, আর দলে দলে মেয়েরা এসে নিজেদের মত ব্যক্ত ক'রে গেল। যাই হোক, তোমার দিদি কি সত্যই একেবারে বাড়ী ছাড়লেন না কি?'

বৃন্দাবন মাথা চুলকাইয়া বলিল, "না না, হয় ত গরুটা কোথাও পালিয়েছে, খোঁজ ক'রে ধ'রে আনতে—"

নব বধূ মুখখানা এমন ভাবে বিকৃত করিয়া ফেলিল যে, বৃন্দাবন হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

নিতান্ত নিঃশব্দে রতনমণি যখন বাড়ী ফিরিল, তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে।

বারান্দায় থাকিয়া নূতন বউ সহজেই তাহাকে দেখিতে পাইল, বৃন্দাবন চুপি চুপি বলিল, "দিদি এসেছে, নতুন বউ। তুমি একটা কায করো। দিদি যদিও না ডাকে, তুমি একটু কাছে কাছে ঘুরো, ফাই-ফরমাসটা খাটলেও মানুষের মন অনেক নরম হয় কি না?"

সে দিদির মনস্তুষ্টির জন্য চলিয়া গেল, কিন্তু নয়নতারা নড়িলও না। সে তেমনই আড়ষ্টভাবে সেইখানে একই ভাবে বসিয়া রহিল।

৩

রতনমণি বৃন্দাবনের নিকট গিয়া বলিল, "আমি বাড়ী চললুম বিন্দে, তোর বাড়ী-ঘর সব রইল। হিসেবপত্রগুলো এই বেলা বুঝে সুঝে নে, নইলে আবার দৌড়াবি আমায় জ্বালাতন করতে। তোদের জ্বালায় দুদণ্ড যে ভগবানের নাম করব, তা ত হবার যো নেই। তা যা-ই বল বিন্দে, এবার যদি জ্বালাতন করতে যাস, গুরুর দিব্যি, আমি বাড়ী হ'তে পালাব, আর কখ্‌খনো আসব না।"

পশ্চাৎ হইতে নিতান্ত ভালমানুষের মতই নয়নতারা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে গা, দিদি! শ্রীবৃন্দাবন না নবদ্বীপ?"

অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া রতনমণি বলিল, "ওই শোন বিন্দে, ভালখাগী ছুঁড়ীর কাটা কাটা কথা শোন একবার। সাধে কি তোদের সম্পর্ক আমি ছাড়তে চাই রে। ও যা বউ এসেছে, আমাদের হাড়মাস খেয়ে চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে, তা দেখতে পাচ্ছি।"

উচ্ছ্বসিত হাসি অঞ্চলে চাপা দিয়া তরলকণ্ঠে নয়নতারা বলিল, "ভিক্ষে করবার সময় তা কাযে লাগে, দিদি। তা যাক, পয়সা খরচ ক'রে ডুগডুগি কিনতে হবে না, তোমাদের চামড়া দিয়ে সে জিনিষটা তৈরী ক'রে নিলেই চলবে। জাত-বোষ্টমের মেয়ে, ভিক্ষে ক'রে পেটের ভাতের যোগাড় ত করতেই হবে, কি বল?"

এমন অকস্মাৎ সে বাহির হইয়া গেল যে, রতনমণি জবাব পর্য্যন্ত দিবার অবকাশ পাইল না। কেবল স্তম্ভিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

পরক্ষণেই গর্জিয়া উঠিয়া, দ্বিগুণ ঝাঁজের সঙ্গে বলিল,

"শুন্‌লি, সব নিজের কাণেই শুন্‌লি, বিন্দে? ওরই সঙ্গে মিশে আমার ঘর করতে বলিস তুই? হ্যাঁ, সে ছিল বটে সাগর বউ, তা না হবেই বা কেন? হাজার হোক জানা-শোনা বংশের মেয়ে ত, তাদের সাতপুরুষে কেউ কোন দিন চোপা করেছে, এ কথা অতি বড় শত্রুতেও বলতে পারে না। কোন্ হাড়হাবাতে হাড়ী-বাগ্দীর ঘরের বুড়ো-খাড়ী একটাকে কণ্ঠী-বদল ক'রে নিয়ে এলি, সাপের মত সে শুধু বিষই ঢেলে দিচ্ছে। তা সইবি ত তুই-ই, আমার কি দায় পড়েছে বল্ দেখি? রইল তোর সব, আমি যাচ্ছি। এই নাক-কাণ মলা খেয়ে যাচ্ছি, আর যদি কোন দিন তোর ভিটে মাড়াই, আমার গুরুর দিব্যি।"

বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ভাসাইল।

পত্নীকে দিদির সম্বন্ধে তাঁহার সম্মুখে বিদ্রূপ করিতে দেখিয়া বৃন্দাবন বড় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিল।

বিকৃত-কণ্ঠে সে বলিল, "দিদি, চল, আমি তোমায় রেখে আসি।"

সেই অত বেলায় অস্নাত অভুক্ত রতনমণি ভাইয়ের সঙ্গে নিজের বাড়ী চলিয়া গেল। নয়নতারা একবারমাত্র নিকটে আসিয়া শান্তভাবেই বলিয়াছিল, "এই সকালবেলাই চলছো দিদি? না হয় বেলাটা পড়ুক, দুটো যা হোক খেয়ে পিত্তি রক্ষে ক'রে, বিকেলের দিকে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় পথ হেঁটো এখন। এই সকালে এতকাল বাদে বাড়ী গিয়ে কোথায় চাল, কোথায় তরকারি, কোথায় তেল, নুণ ক'রে আবার বেড়াতে হবে ত?"

দারুণ বিরাগভরে রতনমণি মুখ ফিরাইল। দুর্ব্বিনীতা ভ্রাতৃবধূর মুখ সে আর দেখিবে না। অদূরস্থিত ভাইয়ের পানে তাকাইয়া বলিল, "শুনলি ত বিন্দে, সেখানে আমায় ভিক্ষে ক'রে খেতে হয়, তাই তোর বউ আমায় ঠাট্টা ক'রে নিলে। ওকে বল না, জাত-বোষ্টমের মেয়ে দোরে দোরে ভিক্ষে করলে তার জাত যায় না।"

দুই ভাই-বোনে বাহির হইয়া গেল। সমস্ত দিন কাটাইয়া সন্ধ্যার পরে বৃন্দাবন বাড়ী ফিরিল, তখন নয়নতারা বারান্দায় একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া প্রদীপালোকে একখানা পুরাণ পড়িতেছিল। স্বামীকে দেখিয়া সে নড়িল না, উঠিল না, বরং তাহার নিবিষ্টচিত্ততা যেন আরও বাড়িয়া গেল।

বৃন্দাবন ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল, ঘরের সব কায সারা হইয়া গিয়াছে, গরু দুইটা পর্য্যন্ত প্রচুর জাবনা পাইয়া আনন্দিতভাবে রোমন্থ করিতেছে।

খুসী হইয়া বৃন্দাবন পত্নীর পার্শ্বে মাদুরের উপর আসিয়া বসিল। ললাটের ঘাম মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?"

বই মুড়িয়া রাখিয়া নয়নতারা উত্তর দিল, "হবে না কেন?"

বৃন্দাবন একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "না, তাই বলছিলুম।"

নয়নতারা একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, "অতটা পতি-ভক্তি আমার হয়নি যে, পতি-দেবতাকে সামনে বসিয়ে না খাইয়ে নিজে অন্ন গ্রহণ করব না। জানছি, বোনের সঙ্গে গেছ, বোন্ তোমায় না খাইয়ে পাঠাবে না।"

বৃন্দাবন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মিথ্যে কথা বলছো কেন,নূতন বউ? আমি রান্নাঘর দেখে এলুম, তোমার আজ রান্নাই হয় নি। এখন ওঠ, যা হোক দুটো রেঁধে খেয়ে নাও গে। সারাদিন উপোস ক'রে থাকা এই গরমের সময় কি ভাল?"

নয়নতারা উত্তর না দিয়া বইখানার উপর আবার চোখ রাখিল। বৃন্দাবন কিছুতেই তাহাকে উঠাইতে পারিল না। আর দুই চারবার কথাটা বলিতেই নয়নতারা বলিয়া উঠিল, "তোমার এ বেলাকার মত খাওয়া হয়েছে না কি? না খেয়ে থাক, চিঁড়ে-দুধ আছে, আম আছে, খাও, ভাত আমি আজ রাঁধতে পারব না।"

বৃন্দাবন নীরব হইয়া গেল।

নয়নতারা মেয়েটি মন্দ ছিল না, কিন্তু তাহার চরিত্রে একটা বিশেষত্ব ছিল। তাহার চিত্ত যেমন কোমল ছিল, এতটুকু আঘাত পাইলে তাহার মন ঠিক ততখানি কঠোর হইয়া উঠিত, সে আঘাতের বেদনা তাহার মন হইতে আর কিছুতেই মিলাইত না।

প্রথম এ বাড়ীতে পা দিয়াই সে যে অনাদর লাভ করিয়াছিল, সেইটাই তাহার মনে জাগরিত ছিল। তাহার উপর প্রতিবাসীরা, রতনমণি যখন সাগর বউয়ের অসীম পতিভক্তি, সংসারের উপর আসক্তি প্রভৃতির আলোচনা করিত এবং নয়নতারার সহিত তাহার তুলনা করিত, সাগর

বউয়ের গুণ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে বৃন্দাবনের চোখ দুইটা যখন ছলছল করিয়া উঠিত, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত, তখন নয়নতারার বুকের মধ্যে যেন নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। সে ক্রমেই সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। যে যাহা বলিত, সে ঠিক তাহার বিপরীত করিয়া বসিত। যখনকার যে কায করা কর্ত্তব্য, সে তাহা ফেলিয়া রাখিয়া শুইয়া বসিয়া গল্প করিয়া সময় কাটাইয়া দিত।

বৃন্দাবন একটি কথাও বলিত না। সে-ও যেন দিন দিন সংসারের আসক্তি কাটাইতেছিল। প্রতিবাসীরা সেই নূতন বউয়ের সম্বন্ধে অনুযোগ করিলে সে শ্রান্তভাবে একটু হাসিয়া উত্তর দিত—"মরুক গে, ওর যা খুসী, ক'রে শান্তি পাক, এই ত সবে ওর প্রথম বয়েস, বিয়ে হ'ল আমার মত একটা রুগ্ন বুড়োর সঙ্গে। ওর জীবনের কোন্ সাধই বা মিটল বল? ও কি সাধে ঐ রকম করে। ভগবান্ কোন্ সাধটা পুরালেন বল দেখি? এমন গরীব যে, একখানা লালপেড়ে কাপড় কতবার চাইলেও দেওয়ার ক্ষমতা আমার হ'ল না। গয়না ত দূরের কথা। সাগর বউ তবু অনেক পেয়েছিল, তখন জোয়ান বয়েসও ছিল, অবস্থাও ভাল ছিল, এখন সে সব গেছে. কাযেই ও রাগ করবে না কেন বল?"

নয়নতারার কাণেও কথাগুলো আসিয়া পৌঁছাইত, সে চুপ করিয়া শুনিয়া যাইত। শুধু তাহার মুখে মৃদু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিয়া আবার তখনই তাহা মিলাইয়া যাইত।

৪

কেহই কাহাকে ঠিক বুঝিল না। তাই উভয়ে পরস্পরের পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। যে বৃন্দাবন আগে কোন দিন মাঠের কায দেখিত না, জমীজমা ভাগে বিলি করিয়া দিয়া ভাগে যাহা পাইত, তাহা লইয়াই পরম সুখে দিন কাটাইয়া দিত, সেই বৃন্দাবন অকস্মাৎ মাঠের কাযে মন দিল। নিজের ক্ষেত কয়েকখানা ত রহিলই, তাহা ছাড়া চেষ্টা করিয়া আরও কয়েক বিঘা জমী ভাগে লইল।

সকালবেলা কোন দিন পান্তা জুটে, কোন দিন জুটে না, তাড়াতাড়ি সে মাঠে চলিয়া যায়; সারাদিন রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, কায করিয়া, সন্ধ্যাবেলা সে ঘরে ফিরে। নয়নতারা পা ধোওয়ার জল দেয়, তামাক সাজে, ভাত বাড়িয়া খাওয়ায়। অর্থাৎ সংসার যেমনভাবে চলে, ঠিক তেমনই চলিতেছে।

বৃন্দাবনের কার্য্যে অতিরিক্ত উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছিল, ও দিকে আকৃতি যে দিন দিন খারাপ হইতেছিল, সে দিকে সে খেয়ালই করে নাই। নয়নতারা এক দিন আস্তে আস্তে বলিল, "এ রকম ক'রে খাটলে ক'দিন বাঁচবে বল দেখি? যা রয় সয়, তাই করাই কি ভাল নয়?"

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়, বৃন্দাবন এক দিনও নয়নতারার মুখে তাহার সম্বন্ধে একটা কথাও শুনিতে না পাইয়া স্থির করিয়া লইয়াছিল যে, মানুষটার মধ্যে জীবনের বিকাশ নাই, পুতুলের মতই এ শুধু দৈনিক কায সম্পন্ন করিয়া যায় মাত্র। আজ এই একটিমাত্র কথা তাহাকে আনন্দে পরিপ্লুত করিয়া তুলিল। না, নয়নতারা তাহার কথা ভাবে।

উৎফুল্ল-মুখে সে বলিল, "বাঁচব বৈ কি, আমি যদি মরব, তবে বাঁচবে কে?"

নয়নতারা আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে ধীরে ধীরে বলিল, "পাড়ার শ্রীচরণের মা, কানুর দিদি, হরের পিসী সবাই এ জন্যে আমায় বলে। ওরা বলে, আমিই তোমায় খাটিয়ে খাটিয়ে রোগা ক'রে দিচ্ছি।"

মুহূর্ত্তে বৃন্দাবনের হৃদয়টা অবজ্ঞায় ভরিয়া উঠিল। ওঃ, নিজের জন্য নহে, পরের খাতিরে কথা বলিতে আসা!—

সে ধমকের সুরে বলিল, "যাও যাও, ঢের হয়েছে, এখন পথ ছাড়, আমায় আবার এখনই বেরুতে হবে, অনেক কায আছে।"

স্বামী স্ত্রী কেহই কাহারও কাছে ধরা দিল না। সংসারের সুখের আশায় হতাশ হইয়া নয়নতারা ধর্ম্মে মন দিল, বিলাসপুরের গোঁসাইরা নাকি তাহাদের গুরুগোষ্ঠী। সে দীক্ষা লইবে বলিয়া সেখানে একখানা পত্র লিখিয়া দিল।

বৃন্দাবনের সম্বন্ধে অনেক গুজব তাহার কাণে আসিতেছিল, সে নাকি রামদাস বাবাজীর আখড়ায় নিত্য যাওয়া আসা করিতেছে, কোন কোন দিন সেখানে খাওয়া-দাওয়াও হয়। এক দিন এমনও হইল যে, রাত্রিতে সে মোটে বাড়ী আসিল না।

রামদাসের কন্যা ইচ্ছা সম্প্রতি বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লইয়াছে, এবং বৃন্দাবন কেবল তাহার জন্যই না কি বাবাজীর আখড়ায় এত যাওয়া আসা করে, কোনকালে

যাহা করে নাই, সেই সঙ্কীর্ত্তন পর্য্যন্ত করে। এ সব কথা নয়নতারা মেয়েদের মুখেই শুনিতে পায়, শুনিয়া শুম্ হইয়া বসিয়া থাকে।

সে রাত্রিতে বৃন্দাবন আসে নাই, তাহার পরদিন সে ফিরিলে নয়নতারা জিজ্ঞাসা করিল, "রাতে থাকা হয়েছিল কোথায়?"

বৃন্দাবন উত্তর দিল, "কীর্ত্তন ছিল, অনেক রাতে কীর্ত্তন ভাঙ্গায় বাবাজী আর আসতে দেন নি।"

নয়নতারা দৃপ্ত নয়ন বৃন্দাবনের মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়াছিল। বৃন্দাবন সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়াছিল।

নয়নতারা কাঁদিবে কি হাসিবে, ঠিক পাইল না। যাহাকে সে তিরস্কার করিবে, সে যে হাত ছাড়াইয়া অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার সন্দেহ ছিল না। হয় ত সে অনুনয়-বিনয় করিয়া বৃন্দাবনকে ফিরাইতে পারে, কিন্তু ছিঃ, কিসের জন্য সে অনুনয়-বিনয় করিবে? স্বামী সে—দেবতা, কিন্তু দেবতা ততক্ষণই দেবতা—যতক্ষণ দেবতার মত কায করিয়া যান। দেবতা যদি নিজেকে ভক্তের চোখের সামনে একবারে হেয় করিয়া ফেলিয়া ভক্তির পরিবর্ত্তে ঘৃণাই কুড়ান, সে দোষ ভক্তের নহে। নয়নতারা দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিল, দীর্ঘনিশ্বাসটাকে হালকাভাবে ছাড়িয়া বুকের ব্যথা লঘু করিতে চাহিল।

অভিমান তাহার অন্তরটাকে পূর্ণমাত্রায় দখল করিয়া বসিয়াছিল, সে ফুলিতে ফুলিতে প্রতিজ্ঞা করিল, রোস, তোমাকেও যদি জব্দ করতে না পারি, আমার নাম নয়নতারাই নয়।

গুরুপুত্র এক দিন আসিয়া পৌঁছিলেন। গলায় কন্ঠীর মালা, ভিক্ষার ঝুলিটি একটা আসবাবের মতই সঙ্গে সঙ্গে থাকে। বাহুতে মোটা সোনার তাগা, গলায় সোনার হার, হাতে পাথর-বসান আংটী। বয়স যদিও ত্রিশ বত্রিশ, তথাপি ভঙ্গিতে অতিবৃদ্ধকেও হার মানাইয়া দেন।

যে কয় দিন গুরুপুত্র বাড়ী রহিলেন, সে কয় দিন বৃন্দাবন বাড়ী ছাড়িল।

শিষ্যাকে দীক্ষা দিয়া গুরুপুত্র এখানেই কিছু দিন অবস্থিতি করিবেন জানাইলেন। নয়নতারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও মুখে গুরুদেবকে কিছু বলিতে পারিল না, বরং মুখে আরও স্ফূর্তি দেখাইতে হইল। মন বলিতেছিল, গুরুদেবের এ কায মোটেই শোভন হইল না।

গুরুদেব বেশ জাঁকাইয়া বসিলেন। সকাল হইতে এগারটা পর্য্যন্ত বাহিরে দলে দলে লোক আসে, কত ধর্ম্মের কথাবার্ত্তা হয়, দ্বিপ্রহরে গুরুদেব নয়নতারাকে উপদেশাদি দেন, আবার বৈকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বাহিরে কোন দিন ধর্ম্মব্যাখ্যা হয়, কোন দিন সঙ্কীর্ত্তন হয়।

গুরুদেবের উপদেশাত্মক কথাগুলা নয়নতারার মোটেই ভাল লাগে না। গুরুদেবের উদ্দেশ্য যে সাধু নহে, নয়নতারার মনে সে সন্দেহও জাগিয়াছে। তিনি তরুণী শিষ্যার নিকটবর্ত্তী আত্মীয় হইতে চান।

এক দিন বাস্তবিকই ব্যাপারটা অধিক দূর অগ্রসর হইল। গুরুদেবকে পাণ দিতে যাইবামাত্র তিনি শিষ্যার হাত চাপিয়া ধরিলেন। ক্রোধে নয়নতারা জ্ঞান হারাইল সে দিন ভুলিয়া গেল, গুরু নারায়ণ। রসচর্চ্চায় উন্মত্ত গুরুদেবকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করিয়া সে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

পরদিন সকালে গ্রামের অনুরক্ত ভক্তরা আসিয়া দেখিল, গুরুদেবের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তিনি অতি কষ্টে, তখনই মাত্র বিছানা হইতে উঠিয়া বাড়ী যাইবার জন্য কাপড়-চোপড় গুছাইতেছেন। ভক্তরা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল, গুরুদেব কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া শিষ্য-গৃহ ত্যাগ করিলেন।

নয়নতারা সারা উঠান ও বাড়ীময় গোবর-জলের ছড়া দিতে দিতে বলিল, "আপদ্ গেল, বাঁচলুম।"

৫

এখানকার সব কথাই পল্লবিত হইয়া রতনমণির কাণে গিয়া পৌঁছাইতেছিল। সে অস্থির হইয়া উঠিয়া ঘাটে পথে যাহাকেই সম্মুখে দেখিতেছিল, তাহাকেই বলিতেছিল, "ছিল বটে সাগর বউ,—লক্ষ্মী যাকে বলে, বেন্দা কোথা হতে যে এই এক অলক্ষ্মী নিয়ে এলো, যার জ্বালার হাড় ভাজা ভাজা হয়ে আমি বেরিয়েছি, আবার তাকেও বেরুতে হ'ল।"

বৃন্দাবন ন-পাড়ায় রামদাস বাবাজীর আস্তানায় আশ্রয় লইয়াছে শুনিয়া রতনমণি ভ্রাতার কাছে সংবাদ পাঠাইল।

এক দিন বৃন্দাবন দিদির বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল।

দিদি সস্নেহে ভাইয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সজলনেত্রে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এ কি চেহারা হয়েছে, বেন্দা! তোকে দেখে যে আর চেনা যাচ্ছে না। এই বছর দুইয়েক এই বউকে বিয়ে ক'রে বয়েসটাকে একেবারে পনের বছর এগিয়ে নিয়ে গেলি?"

বৃন্দাবন কেবল হাসিল মাত্র।

তাহার হাসি দেখিয়া দিদি আরও চটিয়া গেল; বলিল, "তুই আর হাসিসনে বেন্দা, তোর না বাড়ী-ঘর, সম্পত্তি? তাকে বিয়ে ক'রে এনে সব তাকে দিয়ে নিজে পরের কাছে দিন কাটাচ্ছিস, তোর একটু লজ্জা করছে না?"

বৃন্দাবন বলিল, "কি করব দিদি, ব'লে দাও না।"

একটু খুশী হইয়া দিদি বলিল, "দূর ক'রে দে ছোট লোকের মেয়েকে! ওকে যেখান হতে এনেছিস, সেখানে পাঠিয়ে দে, সেখানে যা খুসী ক'রে থাক গিয়ে, তাতে তোর আমার কিছু এসে যাবে না। রামদাসের মেয়ে ইচ্ছের সঙ্গে তোর কণ্ঠী-বদল করিয়ে দি, তার পর—"

বৃন্দাবনের মুখের উপর হাসির রেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "বিধবার সঙ্গে বিয়ে!"

রতনমণি বলিল, "হোক না। জাত-বোষ্টমের ঘরে কণ্ঠী-বদল ঢের চলে। আজকাল যে ভদ্দর লোকের ঘরেও বিধবা-বিয়ে হয়, এটা ত নতুন নয়। মেয়েটার সঙ্গে তোরই ত বিয়ের ঠিক হয়েছিল, বিন্দে। তুই নতুন বউকে বিয়ে ক'রে আনলি দেখেই না বাবাজী রাগ ক'রে একটা সত্তর বছরের বুড়োর হাতে মেয়েটাকে দিলে।"

বৃন্দাবন মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ, তুমি ভুল শুনেছ, দিদি। আমার ওপর রাগ ক'রে নয়, সেই বুড়োর কাছে অনেক টাকা বাবাজী পেয়েছিল, তা ছাড়া বুড়োর অন্তে অনেক সম্পত্তিও পেয়েছে।"

রতনমণি বলিল, "যাই হোক, ছয়টি মাস গেল না, মেয়েটি বিধবা হয়ে এসেছে। তুই যদি মত করিস, এখনও আমি ওরই সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক ক'রে ফেলি।"

বৃন্দাবন খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "দেখা যাক কি হয়।"

রতনমণি ধরিয়া বসিল, "দেখা যাক কি, এখনও কি ওই বউ'ক নিয়ে ঘর করতে তোর প্রবৃত্তি হয়, বেন্দা? গুরু-পুত্তুরকে নিয়ে চলাচলি করছে, লোকে কি না বলছে শোন্ দেখি। তুই-ই না হয় কাণে আঙুল দিয়েছিস। আমার যে ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়। বাপ-মার মুখ একেবারে ডুবালি ওই ছোট বংশের মেয়ে বিয়ে ক'রে, কি কেলেঙ্কারীটাই না করছে। সাধে বলছি, দূর ক'রে দে ওকে। তোর ঘর তুই দখল ক'রে বোস।"

বৃন্দাবন এ কথাটায় রাজি হইয়া গেল, "তাই হবে, দু'দিন যাক।"

"দিদি বলিল, "আবার দু'দিন যাবে কেন?"

হা হা করিয়া হাসিয়া বৃন্দাবন বলিল, "বুঝলে না, ভিখিরীর মেয়ে, অনেক ভাগ্যে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে সুখ-ভোগ করছে। দু'দিন আশা মিটিয়ে সুখ ভোগ ক'রে নিক, তার পর বিদেয় ক'রে দিতে কতক্ষণ? একবার গিয়ে এক লাঠি দেখিয়ে বলব, বিদেয় হবি ত হ, নইলে এক ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে দেব। বুঝেছ দিদি, দেখো, তখন পালাতে আর পথ পাবে না। এই হচ্ছে জব্দ করবার একমাত্র উপায়।"

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল, অগত্যা বাধ্য হইয়া তাহার হাসির সহিত রতনমণিকে হাসি মিশাইতে হইল।

সে বলিল, "যাই হোক, তোর যা খুসী, তুই তাই করিস। একটা কথা এই—আজ হ'তে আর কোথাও যেতে পাবি নে, আমার এখানে থাক। আমি থাকতে তুই যে বউয়ের ওপর রাগ ক'রে এখানে ওখানে থাকবি—খাবি, তা হ'তে পারে না। কেন, আমি কি মরেছি? বুঝলি বেন্দা, আমার কথা শুনছিস?"

বৃন্দাবন মাথা নাড়িয়া জানাইল, বুঝিয়াছে।

খুসী হইয়া রতনমণি বলিল, "তবে আর কোথাও যাস নে যেন, এইখানে আজ হ'তে থাক। আমি দু'জনের মত ভাত চড়িয়ে এসেছি, তরকারীও কোটা হয়ে গেছে।"

বৃন্দাবন সহজেই রাজি হইয়া গেল।

৬

কয়েকবার লোক পাঠাইয়া নয়নতারা বুঝিল, বৃন্দাবনের আসিবার ইচ্ছা থাকিলেও রতনমণি তাহাকে আসিতে দিবে না।

আজ কয় দিন হইতে শুনা যাইতেছিল, বৃন্দাবনের জ্বর হইয়াছে। আজ সকালে ঘাটে কাপড় কাচিতে গিয়া সে

শুইতে পাইল, বৃন্দাবন জরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে, ভুল বকিতেছে। রামদাস বাবাজী তাহার চিকিৎসার ভার লইয়াছেন। তিনি নিজেই ঔষধ-পত্র দিতেছেন, তাঁহার কন্তা ইচ্ছা বৃন্দাবনের সেবার ভার লইয়াছে। কিন্তু ইহাতে রোগের প্রতীকার হইবে কি না, তাহা বলা শক্ত। কারণ, রামদাস বাবাজী তাঁহার জানিত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধসমূহ দেওয়া সত্ত্বেও রোগ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া নয়নতারার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিতে লাগিল। পায়ের তলা হইতে মাটী যেন সরিয়া যাইতেছিল। কোনক্রমে সে ঘাট হইতে বাড়ী ফিরিয়া ভিজা কাপড়েই কতক্ষণ বসিয়া রহিল। বৃন্দাবনের কি কিছুই নাই, যাহা দ্বারা সে বিজ্ঞ ডাক্তার দেখাইতে পারে? নিজের ঘর ছাড়িয়া কোথায় সে পরের ঘরে দেহত্যাগ করিবে, আর তাহার বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি নয়নতারা ভোগ করিবে? সে নয়নতারাকে এমনই স্বার্থপর ভাবিয়াছে বটে, তাই সে স্বেচ্ছায় হাতুড়ের ঔষধ সেবন করিয়া বোনের বাড়ীতে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে? নিজের বাড়ীতে সাড়ে তিন হাত যায়গা তাহার জুটিল না? একটা খবরও সে নয়নতারাকে দিল না? পত্নীকে সে কি কোন দিন নিজের বলিয়া ভাবিতে পারিল না? কিন্তু কেন?—

নয়নতারা ভাবিতে লাগিল। আর্দ্র বস্ত্র তাহার অঙ্গে শুকাইয়া গেল। না, আর অভিমান করিয়া থাকিলে চলিবে না। বৃন্দাবন তাহার স্বামী; তাহারই সর্ব্বস্ব। এখন তাহাকেই দীনভাবে বৃন্দাবনের পায়ের কাছে লুটাইতে হইবে। লজ্জা? কিসের লজ্জা? স্বামী যে স্ত্রীর দেবতা। না, সে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবে না।

সম্পর্কীয় জ্যেঠামহাশয় বৃদ্ধ রামহরিকে ডাকাইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে নয়নতারা বলিল,"একটিবার আপনাকে ডাক্তার বাবুকে নিয়ে দিদির বাড়ী যেতে হবে, জ্যেঠামশাই। শুনলুম, আপনার ভাইপোর বড় ব্যারাম, বাঁচেন কি না সন্দেহ। আমিও গৌরকে নিয়ে এখনই সেখানে যাচ্ছি। ডাক্তার যদি এখনই আনবার মত দেন, আমি পাল্কীতে সঙ্গে ক'রে বাড়ী আনব। যা হবার, এ বাড়ীতেই হোক, বাড়ী থাকতে পরের বাড়ীতে আমি ওঁকে—"

কথাটা শেষ করার আগেই অকস্মাৎ অশ্রুধারা উছলাইয়া পড়িল।

অত্যন্ত খুসী হইয়া রামহরি বলিল, "বেশ কথা বলেছ, মা। আমি এখনই ডাক্তার নিয়ে গাড়ীতে যাচ্ছি, তুমি গৌরকে নিয়ে যাও"

তখনই দরজায় চাবি দিয়া নয়নতারা রামহরির পুত্র বালক গৌরকে লইয়া রওনা হইয়া পড়িল। ও-দিক হইতে রামহরিও ডাক্তার লইয়া চলিল।

হঠাৎ এত কাল বাদে নূতন বউকে আসিতে দেখিয়া রতনমণি যেন আকাশ হইতে পড়িল। খানিকক্ষণ সে একটা কথাও বলিতে পারিল না। তাহার স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া নয়নতারা নিজেই অগ্রসর হইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইল। স্থির-কণ্ঠে বলিল, "ওঁর অসুখ শুনে ওঁকে দেখতে, আর যদি সাধ্য থাকে, তা হ'লে নিয়ে যেতে এলুম, দিদি!"

রতনমণি এতক্ষণে কথা বলিবার অবকাশ পাইল। জলিয়া উঠিয়া বলিল, "আগা কেটে আর গোড়ায় জল ঢালতে আসা কেন, নতুন বউ? ওর সব নিয়ে ওকে পথের ভিখিরীর মত তাড়িয়েছ। তাই সে কোথাও যায়গা না পেয়ে আমার কাছে এসেছে। তবু সে না তোমাদেরই প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাই না যতবার বলেছি তোমায় তাড়িয়ে দিয়ে বাড়ী কেড়ে নিতে, ততবার চুপ ক'রে গেছে? যাই হোক, কথায় চিঁড়ে ভিজবে না, আমি ওকে তোমার মত রাক্ষসীর হাতে দিচ্ছি নে, কে জানে, তুমি ওকে নিয়ে যাচ্ছ মেরে ফেলে নিজের পথ পরিষ্কার করবার জন্তে কি না। তোমার অসাধ্য কিছু নেই ত।"

নয়নতারা শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানা সাদা হইয়া গেল। সে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই সময়ে রামহরির সহিত ডাক্তার বাবু আসিয়া পৌছাইলেন।

রতনমণি সগর্জ্জনে জানাইল, "ডাক্তারী চিকিৎসা চলবে না, এই ব্যারামে কতকগুলা ম্লেচ্ছের জল খাইয়ে ওঁর জাত্-ধর্ম্ম নষ্ট করতে দেব না। বাবাজীর ওষুধ যেমন চলছে, তেমনি চলুক।"

ডাক্তার বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন, কি করিবেন, ঠিক পাইলেন না। নয়নতারা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি চুপ কর, দিদি। আমার স্বামী, আমার ভালমন্দ যেমন ওঁর হাতে,

ওঁর ভালমন্দও তেমনি আমার হাতে। তুমি কণ্ঠী-বদলই বল আর যা-ই বল, আমি জানি, আমার জীবনে দেবতা প্রত্যক্ষরূপে এই একবারই স্বামীর বেশে এসেছেন। আমি সেবা না ক'রে আমার এ জীবনটাকে এখন ব্যর্থ হয়ে যেতে দেব না। ডাক্তার বাবু, আপনি রোগীকে একবার দেখুন, বলুন, আমি ওঁকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারব কি না?"

বৃন্দাবনকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার মত দিয়া গেলেন, রোগীকে এখনও লইয়া যাওয়া যায়, কিন্তু ইহার পর আর স্থানান্তরিত করা অসম্ভব হইবে।

নয়নতারা গৌরকে পাঠাইয়া পাল্কী আনাইল। এতক্ষণ সে বৃন্দাবনের সম্মুখে যায় নাই, এখন সে বৃন্দাবনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "বাড়ী চল, আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।"

বৃন্দাবন ব্যাপারটা এতটুকুও বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ ডাক্তার আসিল কেন, দেখিল কেন, কে ডাক্তার ডাকিল, সে তাহাই ভাবিতেছিল। নয়নতারাকে দেখিয়া সে সমস্ত ব্যাপার বুঝিল। তাহার দুই চোখ দিয়া নিঃশব্দে শুধু অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

অতি কষ্টে নিজের অশ্রুধারা গোপন করিয়া সযত্নে নিজের অঞ্চলে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে বিকৃত-কণ্ঠে নয়নতারা বলিল, "কাঁদছ কেন? বাড়ী চল, পরের বাড়ীতে বিনা চিকিৎসায় এমন ক'রে তোমায় মরতে দেব না। মরতেই যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে, নিজের বাপ-পিতামোর ঘরে মরবে চল, আত্মাটা তাতে তবু তৃপ্ত থাকবে।"

গৌর ও রামহরির সাহায্যে সে রুগ্ন স্বামীকে পাল্কীতে উঠাইয়া শুয়াইয়া দিল।

ফিরিয়া আসিয়া নির্ব্বাক্ রতনমণির পায়ে মাথা রাখিয়া অশ্রুবিগলিতকণ্ঠে নয়নতারা বলিল, "জোর ক'রে নিয়ে চললুম, দিদি। আশীর্ব্বাদ কর—এ জোর যেন বজায় থাকে। ও-বেলা একবার যেয়ো, দিদি। তোমার বাপ-পিতামোর ঘর ত তোমাদেরই। আমায় দয়া ক'রে এনেছ, আমি তোমাদের দাসী মাত্র। দাসীর ওপর রাগ ক'রে ঘর ছেড়ে দূরে যাওয়া কি ভাল দেখায়? বল—যাবে, তোমার ভাইয়ের ঘরে—বল?"

এক মুহূর্ত্তে রতনমণি দ্রব হইয়া গেল। তাহার দুই ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়া নয়নতারার মাথার উপর পড়িল। রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "আমি এখনই যাচ্ছি, নতুন বৌ, তুই ততক্ষণ এগিয়ে যা।"

নয়নতারা পাল্কীর সঙ্গ ধরিল।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী (সরস্বতী)।

আষাঢ়ে

আবরি গগন রাজে মেঘমালা—
দশদিশ নিবিড় তিমির-ঢালা।
গরজে বজ্র ঝরিছে ধারা,
ছুটিছে পবন আপনহারা,
চমকে বিদ্যুৎ অনল-জ্বালা।

অদূরে দাহুরী ডাকিছে সঘনে,
ঝিল্লী ঝঙ্কারে পল্লী-কাননে
দুলিছে কুঞ্জ কদম-মালা।

গুরু গুরু গুরু গভীর রবে
বাদল বাজায় মাদল নভে,
গগন যেন রে নাট্যশালা।

ধারার নির্ঝরে মেঘের কোলে
ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বোলে—
করিছে জলকেলি ত্রিদিব-বালা।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পরন্তু সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যসম্প্রদায় মৃত্তিকাবিশেষ হইতে বিদ্যমান ঘটের যে আবির্ভাব বলিয়াছেন, ঐ আবির্ভাবও সেই ঘটের ন্যায় সৎ, ইহাই তাঁহাদিগের স্বীকার্য্য। কারণ— তাঁহাদিগের মতে যাহা অসৎ, তাহার উৎপত্তি হয় না। সুতরাং তাঁহারা ঘটের আবির্ভাবকে অসৎ বলিলে তাঁহাদিগের সৎকার্য্যবাদের ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কিন্তু ঘটের ন্যায় উহার আবির্ভাবও সৎ হইলে সেই আবির্ভাবের জন্যও কর্ত্তার প্রযত্ন অনাবশ্যক। কারণ, যাহা সৎ অর্থাৎ বিদ্যমানই আছে, তাহার জন্য কেহ প্রযত্ন করে না। মৃত্তিকাবিশেষে ঘটের ন্যায় উহার আবির্ভাবও বিদ্যমান থাকিলে কুম্ভকার কিসের জন্য প্রযত্ন করিবে? যদি বল, সেই আবির্ভাব বিদ্যমান থাকিলেও উহার আবির্ভাবের জন্যই কর্ত্তার প্রযত্ন আবশ্যক হয়। কিন্তু ইহা বলিলে সেই আবির্ভাবের যে আবির্ভাব, তাহাকে অসৎ বলিতে হয়। নচেৎ উহার জন্যও প্রযত্ন ব্যর্থ হয়। আর সেই আবির্ভাবের আবির্ভাবকেও সৎ বলিয়া উহার আবির্ভাবের জন্যই কর্ত্তার প্রযত্ন আবশ্যক বলিলে উক্তরূপে সেই আবির্ভাবেরও আবির্ভাব এবং তাহারও আবির্ভাব প্রভৃতি অনন্ত আবির্ভাবের স্বীকার অনিবার্য্য হওয়ায় অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "সৎকার্য্যবাদ" উপপন্ন হইতে পারে না।

শিষ্য। অসৎকার্য্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতেও ত ঘটের ন্যায় উহার উৎপত্তিও পূর্ব্বে অসৎ বলিয়া সেই উৎপত্তির উৎপত্তি এবং তাহার উৎপত্তি প্রভৃতি অনন্ত উৎপত্তি-স্বীকার অনিবার্য্য হওয়ায় অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। তাহা হইলে "অসৎকার্য্যবাদ"ই বা কিরূপে উপপন্ন হইবে? আর উক্ত অনবস্থা প্রামাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য হইলে "সৎকার্য্যবাদ" পক্ষেও উহা প্রামাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য। প্রামাণসিদ্ধ অনবস্থা ত দোষ নহে।

গুরু। সাংখ্যসম্মত "সৎকার্য্যবাদ" সমর্থন করিতে "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তে শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়বৈশেষিকসম্মত "অসৎকার্য্যবাদ" পক্ষেও তুল্যভাবে উক্তরূপ অনবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, এবং তিনি সেখানে বিচারপূর্ব্বক "অসৎকার্য্যবাদ" খণ্ডন করিতে আরও বলিয়াছেন যে, ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে মৃত্তিকাবিশেষে পূর্ব্বে অবিদ্যমান ঘটের যে উৎপত্তি হয়, ঐ উৎপত্তি ঐ ঘট হইতে অভিন্ন পদার্থ বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে "ঘট" শব্দ প্রয়োগ করিলেই ঘটের উৎপত্তির বোধ হওয়ায় "ঘটের উৎপত্তি" এইরূপ প্রয়োগে পুনরুক্তিদোষ হয়। সুতরাং ন্যায়-বৈশেষিক মতে মৃত্তিকাবিশেষে উৎপন্ন ঘটের যে "সমবায়" নামক নিত্য সম্বন্ধ, তাহাই ঘটের উৎপত্তি, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে উক্তমতে ঘটের উৎপত্তির জন্য কুম্ভকারের প্রযত্ন আবশ্যক এবং উহার সমস্ত কারণের ব্যাপার আবশ্যক, ইহা ত বলাই যায় না। কারণ, ঘটের উৎপত্তি সমবায়সম্বন্ধরূপ নিত্য পদার্থ হইলে উহার ত কোন কারণই নাই।

কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য এই যে,— যেক্ষণে মৃত্তিকাবিশেষে অবিদ্যমান ঘটের উৎপত্তি হয়, ঐ ক্ষণের সহিত সেই ঘটের যে কালিক সম্বন্ধ, তাহাই ঐ ঘটের উৎপত্তি বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু ঐ উৎপত্তিও সেই ঘট-স্বরূপ, অর্থাৎ উহা সেই ঘট হইতে বস্তুতঃ কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং ঘটের উৎপত্তির উৎপত্তি প্রভৃতি অনন্ত উৎপত্তি স্বীকারে অনবস্থাদোষ হইতে পারে না। কারণ, ঘটের উৎপত্তির যে উৎপত্তি, তাহাও ঘটস্বরূপ, তাহাও সেই ঘট হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। কিন্তু ঘটের উৎপত্তি ঘট-স্বরূপ হইলেও উৎপত্তিমাত্রই ঘটস্বরূপ নহে। সুতরাং ঘট-মাত্রগত ঘটত্ব নামক ধর্ম্ম হইতে উৎপত্তিমাত্রগত উৎপত্তিত্ব নামক ধর্ম্ম ভিন্ন। সুতরাং "ঘটের উৎপত্তি" বলিলে পুনরুক্ত দোষও হয় না। কারণ, একধর্ম্মরূপে একই পদার্থের পুনরুক্তি হইলেই পুনরুক্ত দোষ হয়। যেমন "ঘটঃ কলসঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে সেখানে ঘট ও কলসের ন্যায় ঘটত্বধর্ম্ম ও কলসত্বধর্ম্ম একই পদার্থ। ঘটত্ব হইতে কলসত্বধর্ম্ম পৃথক্ নহে। সুতরাং উক্ত স্থলে অর্থ পুনরুক্ত দোষ হয়। কিন্তু ঘট ও তাহার উৎপত্তি বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ হইলেও ঘটত্বধর্ম্ম হইতে উৎপত্তিত্ব-নামক ধর্ম্মের ভেদ থাকায় "ঘটোৎপত্তি" শব্দ প্রয়োগ করিলে অর্থ পুনরুক্তদোষ হয় না। আর পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যমতেও ত মৃত্তিকাবিশেষ হইতে বিদ্যমান ঘটের যে আবির্ভাব, তাহাও সেই ঘট হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ

বলা যাইবে না। তাহা বলিলে পূর্ব্বোক্ত অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। সুতরাং ঘটের আবির্ভাব ও সেই ঘট অভিন্ন পদার্থ হইলে সাংখ্যমতেও "ঘটের আবির্ভাব" বলিলে অর্থ পুনরুক্ত দোষ কেন হইবে না, ইহাও ত বক্তব্য। এ বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আরও অনেক সূক্ষ্ম বিচার আছে।

শিষ্য। বিচারের অন্ত নাই, ইহা ত বুঝিতেছি। কিন্তু ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" (২।১৬)। অর্থাৎ অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই। তাহা হইলে উক্ত ভগবদ্‌বাক্যের দ্বারা সৎকার্য্যবাদই কি প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝা যায় না?

গুরু। "সৎকার্য্যবাদ" সমর্থন করিতে অনেকে তাহাই বুঝিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাই "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী"তে শ্রীমদ্‌বাচস্পতিমিশ্রও ভগবদ্‌গীতার ঐ শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু অসৎকার্য্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় উক্ত শ্লোকের দ্বারা সাংখ্যসম্মত সৎকার্য্যবাদ বুঝেন নাই। মীমাংসাচার্য্য পার্থ সারথিমিশ্রও "শাস্ত্রদীপিকা"র তর্কপাদে বিচারপূর্ব্বক "অসৎকার্য্যবাদে"র সমর্থন করিতে ভগবদ্‌গীতার উক্ত শ্লোকের উল্লেখ পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, ঐ শ্লোকের পূর্ব্বে "ন ত্বেবাহং জাতু নাসং" (২।১২) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা আত্মার নিত্যত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং পরে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—এই বাক্যের দ্বারা প্রকারান্তরে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই কথিত হইয়াছে বুঝা যায়। কারণ, আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে উক্তস্থলে ঐ ভাবে "সৎকার্য্যবাদে"র উল্লেখ অনাবশ্যক। "অসৎকার্য্যবাদ" পক্ষেও আত্মার নিত্যত্ব-সিদ্ধান্তের কোন বাধক নাই। বস্তুতঃ ভগবদ্‌গীতার উক্ত শ্লোকের দ্বারা আত্মাতে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান শীত উষ্ণ প্রভৃতির সত্তা নাই এবং সৎস্বভাব আত্মার অভাব অর্থাৎ কখনও বিনাশ নাই—ইহাই কথিত হইয়াছে। টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীও সরলভাবে উক্তরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (১) সুতরাং ভগবদ্‌গীতার উক্ত শ্লোকের দ্বারা যে পূর্ব্বোক্ত "সৎকার্য্যবাদ"ই উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা কখনই নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন করা যায় না।

সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত "সৎকার্য্যবাদ" যে নানাযুক্তির দ্বারা সমর্থিত সুপ্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন মত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "অসৎকার্য্যবাদ"ও নানা যুক্তির দ্বারা সমর্থিত সুপ্রাচীন মত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধে বেদস্তুতির মধ্যে (৮৭।২৫) অন্যান্য মতের ন্যায় উক্ত অসৎকার্য্যবাদেরও উল্লেখ হইয়াছে। উক্ত "অসৎকার্য্যবাদ"ই পূর্ব্বোক্ত আরম্ভবাদের মূল। উক্ত "অসৎকার্য্যবাদ" গ্রহণ করিলে সাংখ্যাদিসম্মত পরিণামবাদের সমর্থন করা যায় না। সুতরাং অসৎকার্য্যবাদী মহর্ষি কণাদ ও গৌতম পূর্ব্বোক্ত "আরম্ভবাদে"রই সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত মতে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু হইতে সজাতীয় দ্ব্যণুকাদিক্রমে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় সমস্ত ভূতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পঞ্চমভূত আকাশের কোন অবয়ব না থাকায় উহার মূল পরমাণু নাই। সুতরাং আকাশের মূলকারণের অভাবে উহার উৎপত্তি হইতে পারে না এবং বিনাশও হইতে পারে না। অতএব পূর্ব্বোক্ত "আরম্ভবাদে" আকাশের নিত্যত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। উক্তমতে "আকাশো নিত্যঃ, নিরবয়বদ্রব্যত্বাৎ আত্মবৎ"—ইত্যাদিরূপে অনুমান-প্রমাণ দ্বারা আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈত্তিরীয় উপ ব্রহ্মানন্দ) অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম হইতেই প্রথমে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। আর অন্যান্য শাস্ত্রেও ত পরমেশ্বর হইতে আকাশের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে আকাশের নিত্যত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায়?

গুরু। আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতমের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে যখন আকাশের উৎপত্তি হইতেই পারে না, তখন তাঁহাদিগের মতে "আকাশঃ সম্ভূতঃ"—এই শ্রুতিবাক্যে "সম্ভূত" শব্দের দ্বারা আকাশের অভিব্যক্তিরূপ গৌণ উৎপত্তিই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রলয়কালে আকাশ বিদ্যমান থাকিলেও তখন তাহার প্রকাশ থাকে না।—পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই নিত্য আকাশের প্রকাশ করিয়া পরে বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টি করেন। যেমন ভূগর্ভে আকাশ বিদ্যমান থাকিলেও তাহার প্রকাশ থাকে না, কিন্তু

৫৫

(১) "অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে, তথা "সতঃ" সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো বিনাশো ন বিদ্যতে।" স্বামিটীকা।

মৃত্তিকা খনন করিলে সেই বিদ্যমান আকাশেরই প্রকাশ হয় এবং সেখানে পূর্ব্বে খননকারীর প্রতি "আকাশং কুরু" অর্থাৎ আকাশ কর, এইরূপ গৌণ প্রয়োগ হয় এবং সেই আকাশের প্রকাশ হইলে তখন "আকাশো জাতঃ"—অর্থাৎ আকাশ জন্মিয়াছে, এইরূপ গৌণ প্রয়োগও হয়, তদ্রূপ পরমেশ্বর হইতে প্রথমে নিত্য আকাশের প্রকাশই হইয়াছে এবং ঐ তাৎপর্য্যেই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে প্রথমে "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এইরূপ গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। অবশ্য পরে বায়ু প্রভৃতির পক্ষে "সম্ভূত" শব্দের মুখ্য অর্থই গ্রাহ্য। কারণ, বায়ু প্রভৃতির মুখ্য উৎপত্তিই হইয়াছে।

পরন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে "বায়ুশ্চান্তরীক্ষঞ্চৈতদমৃতং" (২।৩।৩) এই শ্রুতিবাক্যে অন্তরীক্ষ অর্থাৎ আকাশ যে অমৃত, ইহা কথিত হওয়ায় ঐ "অমৃত" শব্দের দ্বারা আকাশের বিনাশ নাই, আকাশ নিত্য, ইহাও বুঝা যায় এবং আচার্য্য শঙ্করের উদ্ধৃত "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ"—এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও আকাশের নিত্যত্ব বুঝা যায়। সুতরাং আকাশের উৎপত্তিবাদী আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতিও উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা আকাশের মুখ্য নিত্যত্ব গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যে "অমৃত" শব্দের গৌণ অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণ "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতিবাক্যে আকাশের পক্ষে "সম্ভূত" শব্দেরই পূর্ব্বোক্তরূপ গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়া আকাশের নিত্যত্ববোধক পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও অনুমানপ্রমাণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও বৈশেষিক মতানুসারে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষরূপে আকাশের নিত্যত্ব সমর্থন করিতে বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পরম্পরা-প্রাপ্ত ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছেন এবং "আকাশঃ সম্ভূতঃ"—এই শ্রুতিবাক্যে "সম্ভূত" শব্দটি আকাশের পক্ষে গৌণার্থ এবং বায়ু প্রভৃতির পক্ষে মুখ্যার্থ, ইহা যে বলা যায়, ইহা তিনিও সেখানে স্বীকারই করিয়াছেন (১) কারণ, তিনি সেখানে ঐ কথার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মতে পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর আকাশাদি জগৎ-প্রপঞ্চের উপাদানকারণ। নচেৎ ছান্দোগ্য উপনিষদে এক পরব্রহ্মের জ্ঞানে যে, সর্ব্ববিজ্ঞান কথিত হইয়াছে, তাহার উপপত্তি হয় না। সুতরাং আকাশাদি সমস্তই সেই পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ আকাশাদি সমস্তই রজ্জুতে সর্পের ন্যায় পরব্রহ্মে কল্পিত মিথ্যা, সুতরাং অনিত্য। কিন্তু এ বিষয়ে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহাদিগের মতে পরব্রহ্ম নিমিত্তকারণ হইলেও যোগীর যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে তখন সেই যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারাই সর্ব্বসাক্ষাৎকার হয়।

ফল কথা, আকাশের উৎপত্তি বহুসম্মত সিদ্ধান্ত হইলেও আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতমের যে উহা মত নহে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, উক্ত মতে আকাশের মূল পরমাণু বা অবয়ব না থাকায় আকাশের সমবায়িকারণের অভাবে উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং আকাশ নিত্য। এইরূপ নিরবয়ব দ্রব্য বলিয়া উক্ত মতে পরমাণু ও আকাশের ন্যায় কাল, দিক্ এবং মনেরও নিত্যত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বেও কোন স্থলে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, এবং আকাশ ও কালকে স্বভাবতঃ শাশ্বত নিত্য বলা হইয়াছে। (১) কিন্তু স্থূল ক্ষিত্যাদি চতুর্ভূতকে কখনই স্বভাবতঃ শাশ্বত নিত্য বলা যায় না। সুতরাং সেখানে পরমাণুরূপ ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ুকে গ্রহণ করিয়াই ঐ কথা বলা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। তাই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে কোন কোন নবীন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, মহাভারতের ঐ স্থলে কণাদ ও গৌতমের সিদ্ধান্তই উপদিষ্ট হইয়াছে।

শিষ্য। কণাদ ও গৌতমের মতে কিরূপে সৃষ্টি ও প্রলয় হয়, তাহা কি তাঁহারা বলিয়াছেন?

গুরু। নানাদর্শনের প্রকাশক মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের প্রকাশিত শাস্ত্রের যাহা "প্রস্থান" অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য, তাহারই প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে

---

(১) তস্মাদ যথা লোকে "আকাশং কুরু", "আকাশো জাতঃ",—ইত্যেবংজাতীয়কো গৌণপ্রয়োগো ভবতি, যথা চ ঘটাকাশঃ করকাকাশো গৃহাকাশ ইত্যেকস্যাপ্যাকাশস্য এবং জাতীয়কো ভেদব্যপদেশো গৌণো ভবতি, বেদেঽপি "আরণ্যানাকাশেষালভেরন্নি"তি—এবমুৎপত্তিশ্রুতিরপি গৌণী দ্রষ্টব্যা।" বেদান্তদর্শন ২য় অঃ, ৩য় পাঃ তৃতীয় সূত্রের শারীরক ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(১) "বিদ্ধি নারদ পঞ্চৈতান্ শাশ্বতানচলান্ ধ্রুবান্।
মহতস্তেজসো রাশীন্ কালষষ্ঠান্ স্বভাবতঃ॥
আপশ্চৈবান্তরীক্ষঞ্চ পৃথিবী বায়ুপাবকৌ।
অসীদ্ধি পরমং তেভ্যো ভূতেভ্যো মুক্তসংশয়ং॥"
শান্তিপর্ব্ব ২৭৪ অঃ, ৩।৭।

তাঁহাদিগের অন্যান্য সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে এবং সুপ্রাচীন-কালে তাঁহাদিগের শিষ্য-প্রশিষ্যাদিপরম্পরা ভারতে সেই সমস্ত সিদ্ধান্তেরও প্রচার করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তদনুসারেই ভারতের পূর্ব্বাচার্য্যগণ নানাগ্রন্থের দ্বারা সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সেই ব্যাখ্যায় ক্রমশঃ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদও হইয়াছে এবং তাহা অবশ্যম্ভাবী। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ কণাদের মতের ব্যাখ্যায় চতুর্ব্বিধ মহাভূতের যে সৃষ্টি-সংহার-বিধির বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, (১) উহাই উক্ত বিষয়ে তাঁহার গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত সন্দেহ নাই এবং আরম্ভবাদী নৈয়ায়িক সম্প্রদায়েরও উক্ত রূপই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। সৃষ্টিপ্রবাহ যে অনাদি, ইহা আমাদিগের সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। সুতরাং কোন প্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টিই আদিসৃষ্টি বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাই প্রশস্তপাদ প্রথমে প্রলয়ের প্রকার বর্ণন করিয়া পরে সৃষ্টির প্রকার বর্ণন করিয়াছেন।

প্রশস্তপাদের সেই বর্ণনার মর্ম্ম এই যে, ব্রাহ্মপরিমাণে ব্রহ্মার শতবর্ষ অতীত হইলে, (২) তখন ব্রহ্মার মুক্তি বা দেহ-বিসর্জ্জনকালে সকলভুবনপতি মহেশ্বরের সংহারেচ্ছা জন্মে। সেই সময় সংসার-খিন্ন সমস্ত প্রাণীর পক্ষে বিশ্রামের সময় বলিয়া রাত্রিতুল্য। তাই উহা রাত্রি বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই রাত্রিতে সমস্ত প্রাণীর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তখন সেই মহেশ্বর জগতের সংহার করেন। সমস্ত প্রাণীর যে সমস্ত অদৃষ্ট ঐ সংহার বা প্রলয়ের জনক, সেই সমস্ত অদৃষ্টই তখন ফলোন্মুখ হওয়ায় তখন সৃষ্টি ও স্থিতির জনক যে সমস্ত অদৃষ্ট, তাহার বৃত্তি-রোধ হয়। অর্থাৎ তখন সেই সমস্ত অদৃষ্ট বিদ্যমান থাকিলেও উহা ফলজনক হয় না। কারণ, সমস্ত প্রাণীর নানাবিধ ভোগসম্পাদনের জন্যই জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি হয়। সুতরাং প্রলয়জনক অদৃষ্ট সমূহ ফলোন্মুখ হইলে তখন তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রাণীর ভোগজনক সমস্ত অদৃষ্ট প্রতিবদ্ধ হওয়ায় উহা তখন কোন প্রাণীর ভোগসম্পাদন করিতে পারে না। তখন প্রলয়জনক সেই সমস্ত অদৃষ্ট ফলোন্মুখ হইয়া সমস্ত প্রাণীর শরীর ও ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক মূল পরমাণু-সমূহে স্পন্দন অর্থাৎ ক্রিয়া উৎপন্ন করে। তাহার ফলে তখন ক্রমশঃ সমস্ত প্রাণীর শরীরাদির আরম্ভক বা উৎপাদক সমস্ত সংযোগ বিনষ্ট হওয়ায় সমস্ত শরীরাদি বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তখন সমস্ত প্রাণীর সেই সমস্ত শরীরাদির আরম্ভক মূল পরমাণুমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এইরূপ তখন অন্যান্য পৃথিবীর আরম্ভক মূল পরমাণুসমূহে স্পন্দন বা ক্রিয়াবিশেষ উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমশঃ মহা পৃথিবী পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। সুতরাং তখন তাহার মূল পরমাণুসমূহমাত্র অবশিষ্ট থাকে। পরে উক্তরূপে যথাক্রমে জল, তেজ ও বায়ুর বিনাশ হওয়ায় মূল পরমাণু-সমূহ-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তখন পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু-সমূহ বিভক্তরূপে অবস্থিতি করে এবং অসংখ্য জীবাত্মার নানাবিধ অসংখ্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট এবং পূর্ব্বোৎপন্ন নানাবিধ জ্ঞানজন্য নানাবিধ অসংখ্য সংস্কার এবং উহার আশ্রয় সমস্ত জীবাত্মা এবং আকাশাদি অন্যান্য নিত্য পদার্থমাত্রই অবস্থিতি করে।

পূর্ব্বোক্ত প্রলয়কালের অবসানে আবার সমস্ত জীবের ভোগের জন্য পুনর্ব্বার মহেশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়। তখন সেই প্রলয়জনক অদৃষ্ট-সমূহের ফলনিষ্পত্তি হওয়ায় উহা সর্ব্বজীবের ভোগজনক অদৃষ্ট-সমূহের বৃত্তি রোধ করিতে পারে না। সুতরাং তখন সর্ব্বজীবের পুনর্ব্বার ভোগজনক সেই সমস্ত অদৃষ্ট ফলোন্মুখ হওয়ায় সেই সমস্ত অদৃষ্ট জন্য প্রথমে বায়ুর পরমাণু-সমূহে স্পন্দন বা ক্রিয়াবিশেষ জন্মে। তাহার ফলে সেই সমস্ত পরমাণুর পরস্পর সংযোগজন্য পূর্ব্বোক্ত দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ বায়ু উৎপন্ন হয় এবং উহা অনবরত কম্পমান হইয়া আকাশে অবস্থিত হয়। উক্তরূপ মহাবায়ু পর্য্যন্ত বায়ুসৃষ্টির পরে পূর্ব্বোক্তরূপে জলীয় পরমাণুসমূহে স্পন্দন বা ক্রিয়াবিশেষ জন্মে এবং তাহার ফলে ঐ সমস্ত পরমাণুর পরস্পর সংযোগজন্য দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ জলরাশি উৎপন্ন হয় এবং উহা পূর্ব্বোৎপন্ন সেই মহাবায়ুর বেগে কম্পমান হইয়া সেই মহাবায়ুতেই অবস্থিত হয়। পরে পূর্ব্বোক্তরূপে পৃথিবীর পরমাণু-সমূহে স্পন্দন বা ক্রিয়াবিশেষ উৎপন্ন হওয়ায় তাহার ফলে সেই সমস্ত পরমাণুর পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহা পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন

---

(১) "ইহেদানীং চতুর্ণাং মহাভূতানাং সৃষ্টিসংহারবিধিরুচ্যতে"— ইত্যাদি। প্রশস্তপাদভাষ্য—কাশীসংস্করণ ৪৮শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) মনুষ্যলোকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দ্বাদশ মাস দেবগণের পক্ষে এক অহোরাত্র। ৩৬০ অহোরাত্রে দেবগণের এক বর্ষ এবং তাহাদিগের দ্বাদশসহস্রবর্ষের নাম চতুর্যুগ। এক সহস্র চতুর্যুগ ব্রহ্মার এক দিন। উক্ত মান অনুসারে ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ুঃ বুঝিতে হইবে। উক্ত বিষয়ে প্রমাণ ও ব্রহ্মার শতবর্ষান্তে মতান্তরে প্রলয়ের বিবরণ— মার্কণ্ডেয়পুরাণের ৪৬শ ও ৪৭শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

সেই জলরাশিতে অবস্থিত হয়। তাহার পরে পূর্ব্বোক্ত তৈজস পরমাণু-সমূহে ক্রিয়াবিশেষ উৎপন্ন হওয়ায় তাহার ফলে সেই সমস্ত পরমাণুর পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে দীপ্যমান মহান্ তেজোরাশি উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বোক্ত সেই জলরাশিতেই অবস্থিত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ চতুর্ব্বিধ মহাভূত উৎপন্ন হইলে তখন সেই সকলভুবনপতি মহেশ্বরের সংকল্পমাত্রে পার্থিব পরমাণুর সহিত তৈজস পরমাণু-সমূহ হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ অণ্ড বা বিম্ব উৎপন্ন হয়। তখন সেই মহেশ্বর সেই অণ্ডে সমস্ত ভুবন (১) এবং সর্ব্বলোকপিতামহ চতুর্ব্বদন ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া অর্থাৎ তাঁহার ঐরূপ দেহবিশেষ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকেই প্রজাসৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করেন। অতিশয় জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সেই ব্রহ্মা সমস্ত জীবের সমস্ত কর্ম্মের যে সময়ে যেরূপ ফলভোগ হইবে, তাহা জানিয়া ক্রমশঃ সমস্ত জীবের সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ সম্পাদন করেন এবং তিনি প্রথমে মনু প্রভৃতি মানস পুত্রগণ এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রাণিগণের সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে স্বস্বকর্ম্মানুরূপ ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদিযুক্ত করেন।

শিষ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" (তৈত্তিরীয় উপ) কিন্তু বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ বায়ুর পরে জলের সৃষ্টি বলিয়া পরে পৃথিবীর সৃষ্টি ও তৎপরে তেজের সৃষ্টি বলিয়াছেন কেন? আর সৃষ্টির প্রথমে পরমাণুতে কিরূপে ক্রিয়া জন্মিবে? তখন ত ঐ ক্রিয়ার কারণ কোন প্রযত্নাদি নাই। কণাদের মতে তখন ত কোন জীবের চৈতন্যই নাই। সুতরাং তখন অচেতন জীবের অচেতন অদৃষ্টও ত পরমাণুতে ক্রিয়ার জনক হইতে পারে না। কণাদের "পরমাণুকারণবাদ"-খণ্ডনে শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর ইহা বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

গুরু। বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টির ক্রমবিষয়ে শাস্ত্রে নানাস্থানে নানারূপ উল্লেখ হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে জলেরই সৃষ্টি হয়, ইহাও অনেক শাস্ত্রে আছে। আবার প্রথমে তেজেরই সৃষ্টি হয়, ইহাও উপনিষদে আছে। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি স্ব স্ব মতানুসারে সেই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া উহার সমন্বয় করিয়াছেন। কণাদের মতের ব্যাখ্যায় প্রশস্তপাদ উক্তরূপ ক্রম বলিলেও আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু শারীরক ভাষ্যে (২।২।১২) কণাদমতের ব্যাখ্যায় তোমার কথিত শ্রুতিবাক্যানুসারে বায়ুসৃষ্টির পরে যথাক্রমে অগ্নি, জল ও পৃথিবীর সৃষ্টিই বলিয়াছেন। এ সকল বিষয়ে বহু বিচার আছে। সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। তবে পূর্ব্বোক্ত "আরম্ভবাদে" সৃষ্টির প্রথমে পরমাণুতে সংযোগজনক ক্রিয়া কিরূপে জন্মিবে? কারণের অভাবে উহা জন্মিতেই পারে না—এই যাহা বলিয়াছ, তদুত্তরে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

তাঁহাদিগের কথা এই যে, সৃষ্টির প্রথমে কোন জীবের প্রযত্ন না থাকিলেও তখন ত সৃষ্টিকর্ত্তা সত্যকাম সত্যসংকল্প সেই মহেশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা ও প্রযত্ন আছে। তাঁহার সেই জ্ঞানরূপ সংকল্প এবং ইচ্ছা ও প্রযত্ন জন্য তখন পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে এবং জীবগণের অদৃষ্টসমষ্টিও ঐ ক্রিয়ার কারণ। সৃষ্টিকর্ত্তা মহেশ্বর সেই অদৃষ্টসমষ্টির অধিষ্ঠাতা। সুতরাং সেই সমস্ত অদৃষ্ট অচেতন হইলেও চেতন মহেশ্বরের অধিষ্ঠান বশতঃ তখন কার্য্যজনক হয়। জীবগণের সেই অদৃষ্টসমষ্টি মহেশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে সহকারী কারণরূপ সহকারিশক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং উহা অতি দুর্জ্ঞেয় অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া "মায়া" নামেও কথিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আর সেই মহেশ্বরের যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাও অতি দুর্জ্ঞেয় অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি বলিয়া "মায়া" নামে কথিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করও ত ঈশ্বরের অচিন্ত্য মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তের উপপাদন করিয়াছেন। তবে তাঁহার সম্মত সেই মায়া মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ উহা সৎও নহে, অসৎও নহে। কিন্তু আরম্ভবাদী ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় উক্তরূপ মায়া স্বীকার না করিলেও মহেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি এবং জীবের অদৃষ্টসমষ্টিরূপ সহকারিশক্তিকেই অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া নিজ সিদ্ধান্তের উপপাদন করিয়াছেন, ইহা তুমি সর্ব্বত্র মনে রাখিবে।

শিষ্য। প্রশস্তপাদ যে সৃষ্টিকর্ত্তা মহেশ্বর ও ব্রহ্মার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কণাদ নিজে বলিয়াছেন কি না? অনেকে বলেন যে, কণাদের বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বর নাই।

গুরু। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন। তবে আমরা তাঁহাকে

(১) সমস্ত ভুবনের বিবরণ—যোগদর্শন, বিভূতিপাদের ২৬ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

দেখিতে পাই না। ভক্ত যোগিগণই সময়ে তাঁহাকে দর্শন করেন। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্।" বৈশেষিক দর্শনের নবম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে মহর্ষি কণাদও যোগীর যোগজ সন্নিকর্ষ জন্য আত্মার অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা বলিয়া জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মা ঈশ্বরেরও প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা বলিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি সেখানে পরে "তথা দ্রব্যান্তরেষু প্রত্যক্ষং" (৯।১।১২) এই সূত্রের দ্বারা যোগীদিগের যে অন্যান্য সমস্ত অতীন্দ্রিয় পদার্থেরও অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহাও বলিয়াছেন এবং উহার পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ যোগী যে দ্বিবিধ, ইহাও বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষব্যাখ্যায় পরে তাহা বলিব।

এখন বক্তব্য এই যে, মহর্ষি কণাদ তাঁহার প্রথমোক্ত নববিধ দ্রব্যপদার্থের উল্লেখ করিতে পঞ্চম সূত্র বলিয়াছেন,—"পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি।" পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন ব্যক্তিভেদে অসংখ্য হইলেও যেমন উক্ত সূত্রে পৃথিবীত্বাদিরূপে এক একটি দ্রব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ আত্মাও অসংখ্য হইলেও আত্মত্বরূপে একটি দ্রব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সূত্রে "আত্মা" এই পদের দ্বারা আত্মত্বরূপে অসংখ্য জীবাত্মা ও এক পরমাত্মা ঈশ্বর এই দ্বিবিধ আত্মাই গৃহীত হইয়াছে বুঝা যায়। কারণ, পরমাত্মা ঈশ্বরও "আত্মন্" শব্দের বাচ্য। কণাদের উক্ত সূত্রানুসারে প্রশস্তপাদও পৃথিব্যাদি নববিধ দ্রব্যের উল্লেখ করিতে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকেও গ্রহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সেখানে "ন্যায়কন্দলী" টীকাকার শ্রীধর ভট্টও ইহা বুঝাইতে লিখিয়াছেন।—

"ঈশ্বরোঽপি বুদ্ধিগুণত্বাদাত্মৈব।"

অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞান যাহার গুণ, তাহাই আত্মা। সুতরাং নিত্যজ্ঞান যাহার গুণ, সেই ঈশ্বরও আত্মাই। তাৎপর্য্য এই যে, প্রশস্তপাদ কণাদের উক্ত সূত্রানুসারে নববিধ দ্রব্যের মধ্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকেও গ্রহণ করিয়াছেন। কণাদ-সূত্রের ব্যাখ্যাতা শঙ্কর মিশ্রও পূর্ব্বোক্ত কণাদসূত্রে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকেও গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি "কণাদ-রহস্য" গ্রন্থেও কণাদোক্ত আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ এই দ্বিবিধ বলিয়া বিচার দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার অস্তিত্বও সমর্থন করিয়াছেন। ফল কথা, বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণও যে, কণাদোক্ত "আত্মন্" শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকেও গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কণাদের অনেক সূত্র বিকৃত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাও পূর্ব্বাচার্য্যগণের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কণাদের বৈশেষিক দর্শনের সুপ্রাচীন রাবণ ভাষ্যও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর বৈশেষিক দর্শনের সুপ্রাচীন ভাষ্যানুসারেই কণাদের মতের প্রকাশ করিয়া উহার খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তিনিও বৈশেষিক দর্শনে জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর নাই, এমন কথা বলেন নাই। পরন্তু বৈশেষিক সম্প্রদায়ও যে ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও তিনি শারীরক ভাষ্যে (২।২।৩৭) স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং উহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে।

বস্তুতঃ কণাদ ও গৌতম মুমুক্ষুর পক্ষে নিজের আত্মার বেদবিহিত মননের জন্যই জীবাত্মা যে দেহাদিভিন্ন ও নিত্য, এই বিষয়েই বিশেষরূপে অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নিজ মতানুসারে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বকর্ত্তব্য আত্ম-মননেরই সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তাই মহর্ষি কণাদও তাঁহার কথিত দ্রব্যপদার্থের মধ্যে পরমাত্মার উল্লেখ করিলেও তৃতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার তত্ত্বই অনুমান-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কারণ, সেখানে উহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। কিন্তু তদ্দ্বারা তিনি যে পূর্ব্বে তাঁহার কথিত দ্রব্যপদার্থের মধ্যে "আত্মা" এই পদের দ্বারা কেবল জীবাত্মারই উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পরমাত্মার উল্লেখই করেন নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, তিনি তাঁহার প্রতিপাদ্য অনুসারেই তৃতীয় অধ্যায়ে আত্ম-পরীক্ষায় কেবল জীবাত্মার তত্ত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরন্তু পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্য প্রসঙ্গে তিনি ঈশ্বরবিষয়ে তাঁহার কর্ত্তব্য অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করায় পরে আর উহা করেন নাই। পূর্ব্বে তিনি কি প্রসঙ্গে কিরূপে ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও এখানে বলিতেছি।

কণাদের মতে বায়ু লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। তাই তিনি বায়ুর অস্তিত্ব-সাধক অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া "বায়ু" এই সংজ্ঞাবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সূত্র বলিয়াছেন—"তস্মাদাগমিকঃ" (২।১।১৭) অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান-প্রমাণ দ্বারা বায়ু-পদার্থ সিদ্ধ হইলেও উহার নাম যে

"বায়ু,"—ইহা ঐ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ না হওয়ায় উহা "আগমিক" অর্থাৎ বায়ু এই নাম বেদপ্রমাণসিদ্ধ।

কণাদের পূর্ব্বোক্ত কথায় অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, বেদে "বায়ু" নামের উল্লেখ থাকিলেও তদ্বিষয়ে সেই বেদবাক্য প্রমাণ হইবে কেন? বেদোক্ত ঐ নাম যে, যে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছাকল্পিত নহে, ইহা কিরূপে বুঝিব? তাই কণাদ সেখানেই পরে দুইটি সূত্র বলিয়াছেন—

সংজ্ঞাকর্ম্ম ত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গং ॥ ২।১।১৮।

প্রত্যক্ষপ্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞাকর্ম্মণঃ ॥২।১।১৯।

প্রথম সূত্রের দ্বারা কণাদ বলিয়াছেন যে, বায়ু প্রভৃতি পদার্থের যে সংজ্ঞাকর্ম্ম অর্থাৎ নামকরণ, তাহা আমাদিগের ইহাতে বিশিষ্ট পুরুষগণের লিঙ্গ বা অনুমাপক। অর্থাৎ উহার দ্বারা সেই সমস্ত বিশিষ্ট পুরুষ অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অনুমানের সমর্থন করিতে কণাদ বলিয়াছেন যে, যেহেতু সংজ্ঞাকর্ম্ম বা নামকরণ কর্ত্তার প্রত্যক্ষসম্ভূত। তাৎপর্য্য এই যে, বেদে বায়ু, স্বর্গ ও দেবতা প্রভৃতি অসংখ্য নামের যে উল্লেখ হইয়াছে, তাহা ঐ সমস্ত পদার্থের প্রত্যক্ষ ব্যতীত হইতে পারে না। যাঁহারা ঐ সমস্ত পদার্থের প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহারা কখনই ঐ সমস্ত নাম নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থের ঐরূপ সংজ্ঞাকর্ম্ম দ্বারা আমাদিগের হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ ঐ সমস্ত নামকরণে সমর্থ নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ যে আছেন, ইহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়। ফল কথা, কণাদ পূর্ব্বোক্ত প্রথম সূত্রে "অস্মদ্বিশিষ্টানাং"—এই বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিয়া তদ্দ্বারা প্রশস্তপাদোক্ত সকলভুবনপতি মহেশ্বর এবং ব্রহ্মা প্রভৃতিরও গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

কণাদ-সূত্রের ব্যাখ্যাতা নব্য বৈশেষিকাচার্য্য শঙ্করমিশ্র উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অস্মদ্বিশিষ্টানাং" "ঈশ্বরমহর্ষীণাং" এবং তিনি কণাদের উক্ত দুই সূত্রে "সংজ্ঞাকর্ম্মন্" শব্দে সমাহারদ্বন্দ্বসমাস গ্রহণ করিয়া উহার দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সংজ্ঞা ও কর্ম্ম। কর্ম্ম বলিতে সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি কার্য্য। শঙ্করমিশ্রের মতে যিনিই "বায়ু" প্রভৃতি সমস্ত সংজ্ঞার কর্ত্তা, তিনিই দ্ব্যণুকাদি কার্য্যরূপ কর্ম্মের কর্ত্তা, ইহা সূচনা করিবার জন্য কণাদ উক্ত সূত্রে "সংজ্ঞাকর্ম্ম" এইরূপ সমাহারদ্বন্দ্বসমাস প্রয়োগ করিয়াছেন এবং উক্ত সূত্রের দ্বারা সেই জগৎকর্ত্তা, পরমেশ্বরবিষয়ে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যমাত্রেরই কর্ত্তা আছে, ইহা পরিদৃশ্যমান ঘটাদি কার্য্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যের ন্যায় সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন যে দ্ব্যণুকাদি কার্য্য, তাহারও কোন কর্ত্তা আছেন এবং তিনি অতীন্দ্রিয়দর্শী, অনাদিসর্ব্বজ্ঞ, ইহাও অনুমান-প্রমাণ-সিদ্ধ হয়। কারণ, দ্ব্যণুকের উপাদানকারণ অতীন্দ্রিয় পরমাণুর প্রত্যক্ষ ব্যতীত দ্ব্যণুকের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না এবং বায়ু প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রত্যক্ষ ব্যতীত ঐ সমস্ত পদার্থের সংজ্ঞাকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং যিনি প্রথমে দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বহু বহু অতীন্দ্রিয় পদার্থের সংজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি যে নিত্য সর্ব্বজ্ঞ, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং তিনিই বেদকর্ত্তা এবং তিনিই সৃষ্টির প্রথমে দেহবিশেষ ধারণ করিয়া কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা উপদেশ করেন এবং তিনিই অনেক শরীরবিশেষ ধারণ করিয়া লোকস্থিতির জন্য অনেক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। কারণ, তিনি ভিন্ন প্রথম শিক্ষক আর কেহই হইতে পারে না; এবং তিনি সময়ে অনেক পূর্ব্বসিদ্ধ মহর্ষির শরীরে আবিষ্ট হইয়াও অনেক কর্ত্তব্য করেন। শঙ্করমিশ্র "ঈশ্বরমহর্ষীণাং" এই বাক্যে "মহর্ষি" শব্দের দ্বারা সেই সমস্ত পূর্ব্বসিদ্ধ মহর্ষিকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়।

সে যাহা হউক, বস্তুতঃ মহর্ষি কণাদ উক্ত স্থলে পূর্ব্বোক্ত মহেশ্বর বা ঈশ্বরের নামাদির উল্লেখ না করিলেও তিনি যে উক্ত সূত্রের দ্বারা মহেশ্বরের অস্তিত্বসাধক অনুমান-প্রমাণ সূচনা করিয়াছেন, ইহা অবশ্য বুঝা যায়। কণাদের ন্যায় মহর্ষি পতঞ্জলিও যোগদর্শনে "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং" (১।২৫) এই সূত্রের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধক অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা ঈশ্বরের নাম ও অন্যান্য তত্ত্ব বুঝা যায় না—ইহা বলিয়া ভাষ্যকার ব্যাসদেব সেখানে বলিয়াছেন—"তস্য সংজ্ঞাদিবিশেষপ্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্য্যন্বেষ্যা"। অর্থাৎ সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের নাম ও অন্যান্য তত্ত্ব বেদাদি শাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে। এইরূপ বৈশেষিক দর্শনে পূর্ব্বোক্ত স্থলে মহর্ষি কণাদেরও উক্তরূপ তাৎপর্য্যও অবশ্য বুঝা যায়। পরন্তু উক্ত স্থলে কণাদের পূর্ব্বোক্ত বায়ুর ন্যায় তাঁহার বুদ্ধিস্থ মহেশ্বরের নামাদিও যে "আগমিক" অর্থাৎ

শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ, ইহাও তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "তন্মাদা-গমিকং"—এই সূত্রের দ্বারা সূচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাও অবশ্য বুঝা যায়। অর্থাৎ বায়ুর সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বকথিত ঐ সূত্রটির উক্তস্থলে পরেও অনুবৃত্তি তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। সূত্রগ্রন্থে কোন কোন স্থলে পূর্ব্বোক্ত সূত্রবিশেষের পরেও অনুবৃত্তি-সূত্রকারের অভিমত থাকে, ইহা জানা আবশ্যক। আর সূত্রকারদিগের স্বল্পাক্ষর সূত্রের দ্বারা যে বহু অর্থ সূচিত হইয়াছে, এই জন্যই উহার নাম "সূত্র"—ইহাও মনে রাখা আবশ্যক।

পরন্তু ইহাও মনে রাখা অত্যাবশ্যক যে, মহর্ষি কণাদ ও গৌতম শাস্ত্রান্তরোক্ত যে সমস্ত মতের প্রতিষেধ করেন নাই অর্থাৎ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগের প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ নহে, তাহাও তাঁহাদিগের অনুমত সিদ্ধান্ত বলিয়াই গ্রাহ্য। কারণ, "তন্ত্রযুক্তি" অনুসারে তাহা বুঝা যায়। সুশ্রুত-সংহিতা'র উত্তরতন্ত্রে "তন্ত্রযুক্তি" অধ্যায়ে ৩২ প্রকার "তন্ত্রযুক্তি'র লক্ষণ ও উদাহরণ কথিত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের শেষেও সেই সমস্ত "তন্ত্রযুক্তি"র উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে একটির নাম "অনুমত"। অন্যের মত প্রতিষিদ্ধ না হইলে উহাকে বলে "অনুমত"। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও উক্ত "তন্ত্রযুক্তি"কে গ্রহণ করিয়া মনের ইন্দ্রিয়ত্ব যে গৌতমেরও সম্মত, ইহা সমর্থন করিতে ন্যায়দর্শনের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যশেষে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গৌতম ইন্দ্রিয়বিভাগ-সূত্রে কথিত ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে মনের উল্লেখ না করিলেও তিনি ত মনের ইন্দ্রিয়ত্বের প্রতিষেধ করেন নাই অর্থাৎ মন যে ইন্দ্রিয় নহে, ইহা ত তিনি বলেন নাই। সুতরাং "অনুমত" নামক তন্ত্রযুক্তির দ্বারাও শাস্ত্রান্তরোক্ত মনের ইন্দ্রিয়ত্ব যে গৌতমেরও সম্মত, ইহা বুঝা যায়। বাৎস্যায়নও সেখানে উক্ত তন্ত্রযুক্তির স্পষ্ট প্রকাশ করিতে সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন—"পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতমিতি হি তন্ত্রযুক্তিঃ"। সুতরাং বাৎস্যায়নের ঐ কথানুসারে তাঁহার মতেও কণাদ ও গৌতম অন্যান্য যে সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্তের প্রতিষেধ করেন নাই, তাহাও তাঁহাদিগের সম্মত বলিয়া অবশ্যই গ্রাহ্য। তাহা হইলে কণাদ যে, জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, ইহা ত কোনরূপেই বলা যায় না। সুপ্রাচীনকাল হইতে কোন সম্প্রদায়ও কখনও তাহা বলেন নাই। মহর্ষি কণাদ যে কঠোর তপস্যার দ্বারা মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহে বৈশেষিক শাস্ত্র লাভ করিয়া উহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহাও চিরপ্রসিদ্ধই আছে। আমরাও বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদের ন্যায় পরিশেষে পরমশৈব মহর্ষি কণাদকে নমস্কার করি—

> "যোগাচারবিভূত্যা যস্তোষয়িত্বা মহেশ্বরং।
> চক্রে বৈশেষিকং শাস্ত্রং তস্মৈ কণভুজে নমঃ" ॥

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

শুনছো

ওগো আমার, হাঁগো আমার, ওগো আমার শুনছো,
অমন ক'রে দিন-রাত্রি কিসের তারিখ গুণছো।
পার্শী-শাড়ীর উড়ছে আঁচল
পাশনে ঢাকে চোখের কাজল
আপন জনায় করে পাগল কি মায়াজাল বুনছো!
ওগো শুনছো।

কবির কলম হার মেনেছে চারু চরণ বন্দনে।
বিজ্ঞান আজি আজ্ঞা দিল রোধ করিতে নন্দনে।
চাও অধিকার পুরুষ-সভায়
কটাক্ষটাও রাখবে বজায়
হে ধুরন্ধরি, রসের পরী! কি মায়াজাল বুনছো।
ওগো শুনছো।

প্রগতির ঐ গতির চালে এগিয়ে চল সংসারে।
আমরা জানি নারীই দেবী নারীই হেথা সব পারে।
চাই না তবু ক্রিকেট খেলায়
বেখাপ লাগে মোহন মেলায়
তোমার তরে রস-সাগরে আমরা খুঁজি উঁছো।
ওগো শুনছো।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

আলেয়া
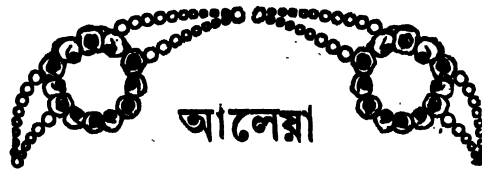
১

পাতকপাটীর চৌধুরী বাবুদের প্রতাপে না কি এক সময়ে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত।

নিজের প্রতাপবলে যে অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তি এই অঘটন ঘটাইতে কোন অতীতকালে সমর্থ হইয়াছিলেন, আজকালকার দিনে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে সার্‌কাসওয়ালাদের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত সন্দেহ নাই।

সেই অখণ্ড প্রতাপ কালক্রমে ম্যালেরিয়া এবং অবস্থা-বৈগুণ্যে এখন যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নিজের বার্দ্ধক্যদশা যাপন করিতেছিল, তাঁহার নাম মুকুন্দ চৌধুরী। বিষয়-সম্পত্তি অনেক হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াও এখনও যাহা আছে, তাহা মুকুন্দের পক্ষে যথেষ্ট। আটখানি গ্রাম লইয়া পাতকপাটীর সমাজ, মুকুন্দই এখন ইহার সমাজপতি বলিলেই হয়।

শরতের প্রভাত। এ সময়ে এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়াটা খুব বেশী হয় বলিয়া মুকুন্দ চৌধুরী প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যার চায়ের সঙ্গে একটি করিয়া কুইনাইনের বড়ী খাইতেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইতে চলিল, কিন্তু খুব সাবধানে সর্ব্বদা থাকেন বলিয়াই পাতকপাটীর ম্যালেরিয়া এখনও তাঁহাকে ভালরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই, শরীরটা বেশ ভালই আছে।

সকালে ঠিক চায়ের সময়েই গ্রামের অনেকেই তাঁহার কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আসিতেন। ভৃত্য গোপীনাথ একখানি থালায় সাজাইয়া ১০।১২টি নানা আকারের এনামেলের ধূমায়িত বাটি আনিয়া রাখিবামাত্রই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাটিটা তুলিয়া লইয়া পীতাম্বর শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "মুকুন্দভায়া, শত্তুরে যে যাই বলুক না কেন, পাতকপাটী গাঁখানা তোমার আমলে যেমন উন্নতি করেছে, এমন ত কৈ তিনপুরুষের মধ্যে করে নি।"

এই নিছক খোসামোদের অন্তরালে আসল প্রস্তাবটা যে কি, তাহা কেহ অনুমান করিতে না পারিয়া সকলেই শিরোমণির মুখের দিকে উৎসুকভাবে চাহিয়া রহিলেন।

বাটিটায় ফুঁ দিয়া অত্যুষ্ণ চা একবার ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়াই শিরোমণি বলিলেন, "বাবা গুপী! চিনির ঠোঙাটা একবার নিয়ে এসো ত বাবা!" আর একটি চুমুক দিয়া জিহ্বাটি একবার ওষ্ঠে বুলাইয়া বলিলেন, "সেকালে গাঁয়ে বারো মাসে তের পার্ব্বণ হোত। কিন্তু এদানীং ত সে সব উঠেই গিছলো বলতে গেলে। ধর্ম্ম-কর্ম্ম কি আর কিছু ছিল? কিচ্ছু না! কিন্তু তুমি ভায়া—হ্যাঁ, হক্ কথা বলবো, তাতে আর কি, কতকাল পরে বারোয়ারীতে গেল বারে চড়কটা হোল ত? আর সে ত তোমারই উদ্যোগে হোল ভায়া! এই যে বাবা গুপীনাথ, চিনি এনেছো, উঁহু, ও সব চামচে-ফামচে নয়, এই বাটিটায় খানিকটা একেবারে ঢেলে দাও। হ্যাঁ, তাই কাল বলছিলাম যে, তোমাদের পাঁচপোতা যতই করুক না কেন, আমাদের পাতকপাটীর কাছে কিছুতেই টক্কর দিতে পারবে না।"

এক ব্যক্তি বলিলেন, "কি, ব্যাপারটা কি শিরোমণি মশাই?"

শিরোমণি চায়ের বাটিটায় আর এক চুমুক দিয়া বলিলেন, "ব্যাপার? শুনবে বৈ কি? তোমাদেরই ত পাঁচ জনের কাম, তোমরা শুনবে না? বাবা গুপীনাথ, আহা বাবা, চা তৈরী করেছ যেন অমৃত, কিন্তু আর একটু দুধ না হ'লে ত বাবা"—

গোপীনাথ আসিয়া শিরোমণির বাটিতে খানিক দুধ ঢালিয়া দিল। শিরোমণি আর এক চুমুক পান করিয়া বলিলেন, "দুধটা যে বড় বেশী হ'ল গুপীনাথ। এ হে হে—আর একটু কম ক'রে দিতে হয়। তা বাবা, চায়ের কেটলীটা এনে একটু কাঁচা চা ঢেলে দাও, সামঞ্জস্য হয়ে যাবেখন, বাবা।"

উপস্থিত সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিল। শিরোমণি মহাশয়ের এই অফুরন্ত চা-পান মুকুন্দ চৌধুরীর বৈঠকখানায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

শিরোমণি বলিতে লাগিলেন, "বুড়ো হয়েছি। কবে আছি, কবে নেই ভায়া, এবার এসো, আমরাও একটা কীর্ত্তি রেখে যাই এসো।"

মুকুন্দ চৌধুরী গড়গড়ায় একটা টান দিয়া বলিলেন, "কি কীর্ত্তি?"

"পাঁচপোতারা দুর্গোৎসব কচ্ছে। আমরাই বা পেছু

থাকি কেন? এসো আমরাও যাকে আনি। পাঁচপোতা কি আমাদের চেয়ে বেশী হবে?"

মুকুন্দ চৌধুরী একটু ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "হুঁ, পাঁচপোতারা এবার বুঝি দুর্গোৎসব কচ্ছে?"

"আরে হ্যাঁ ভাই, এ দুঃখু কি আর রাখবার যায়গা আছে? কালকের ছোঁড়া সে হোল গিয়ে গাঁয়ের মাতব্বর। উঃ, এ কি সহ্য হয়, ভায়া? বাবা গুপীনাথ—চায়ের শেষটুকু যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাবা—আর এক কাপ গরম গরম—চিনিটে একটু বেশী ক'রে দিও বাবা, তা নইলে চা খেয়েই সুখ নেই।"

সুবোধ নামধারী এক জন 'আপ-টু-ডেট' যুবক, চসমাটা একবার মুছিয়া লইয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, আমিও শুনছিলাম বটে। শুধু তাই নয়, খুব সমারোহ ব্যাপার! কাঙালী-ভোজন হবে, বৃন্দাবন শাহার যাত্রা বায়না দেওয়া হয়েছে না কি।"

মুকুন্দ চৌধুরী আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "কখনও নয়। পাতকপাটী কখনও পাঁচপোতার কাছে খাটো হবে না। লাগাও দুর্গোৎসব। চাঁদার একটা লিষ্ট ক'রে ফেল। আর ওরা যাত্রা বায়না করেছে, আমরা আরও ভাল রকম কিছু এসো।"

শিরোমণি বলিলেন, "আহাঃ, ছেলেবেলায় পাঁচালীর গান শুনেছিলাম, সে সব যেন কাণে এখনও বাজছে। এত দিন—"

আর একটি যুবক বলিল, "শিরোমণি মশাই, ও সব সেকেলে পাঁচালী-ফাঁচালীর দিন কি আর আছে? এখন হচ্ছে শ্রেফ আর্টের যুগ। অজন্তার ছবি থেকে আরম্ভ ক'রে কাঁচালঙ্ক পর্য্যন্ত—"

"কাঁচা কি—?" বলিয়া শিরোমণি গোপীনাথের হাত হইতে চায়ের দ্বিতীয় বাটিটি গ্রহণ করিলেন।

সে ব্যক্তি বলিল, "এই আর্টের যুগে কি না সেকেলে পাঁচালী! কলকাতা থেকে ভাল থিয়েটার নিয়ে এসে তিন নাইট প্লে করা যাক যে, লোকে দেখে বলবে—"

সুবোধ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ঠিক ঐ কথাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। একটা কাষ যখন করতেই হবে, তখন এমনভাবে করুন যে, দেশের লোক সব বলবে যে, হাঁ, পাতকপাটীতে মানুষ আছে বটে।"

মুকুন্দ বাবু বলিলেন, "তা হ'লে সে ভারটা তুমিই নাও, সুবোধ।"

সুবোধ বলিল, "নিশ্চয়ই। আমি খুব অল্প টাকাতেই একদম 'ইণ্ডিয়া থিয়েটার'কে নিয়ে আসবো। আর তাদের 'আখরোট'কে শুদ্ধ।"

শিরোমণি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তাদের কাকে—?"

সুবোধ বিজ্ঞের মত শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিল, "আখরোট! 'ইণ্ডিয়া'র 'আখরোট'। আখরোটবালার নাম শোনেন নি?"

"আখরোটবালা! মানুষের নাম না কি?"

হো হো করিয়া হাসিয়া সুবোধ বলিল, "সেই ত আজকাল 'ইণ্ডিয়া থিয়েটারের' 'লিডিং একট্রেস' কি না! দেশ-বিদেশে নাম। তার ফিল্মের ছবি দেখে আমেরিকা, ফ্রান্সের লোক পর্য্যন্ত বলেছে যে, হাঁ, এক জন একট্রেস বটে। তা, সে ত নেহাৎ রাজারাজড়ার বাড়ী না হ'লে মফঃস্বলে কোথাও যায় না কি না। কিন্তু আপনি দেখবেন শিরোমণি মশাই, ইণ্ডিয়া থিয়েটারের সঙ্গে সেই আখরোটকে পর্য্যন্ত আমি এই পাতকপাটীতে আনবো, তবে আমার নাম সুবোধ।"

মুকুন্দ বাবু বলিলেন, "কুছ পরোয়া নেই, সুবোধ। নিয়ে এসো তোমার থিয়েটার আর আখরোট। পাঁচপোতায় ব'সে যে সেই মতে ছোঁড়াটা মুড়ুলী করবে, আর আমার ওপর টেক্কা মারবে, এ ত আর আমার রক্ত-মাংসের শরীরে সহ্য হয় না।"

২

সহ্য না হইবার একটা পুরাতন ইতিহাস ছিল।

পাতকপাটীর ত্রিলোচন ঘোষের অবস্থা বড় সচ্ছল ছিল না, কিন্তু মুকুন্দ চৌধুরীর এষ্টেটে গোমস্তাগিরি করিয়া ত্রিলোচন মাহিনা এবং উপরিতে যাহা পাইতেন, তাহাতে পল্লীগ্রামে কায়ক্লেশে সংসারটা কোন রকমে চলিয়া যাইত। সে আজ প্রায় বিশবৎসরের কথা।

ত্রিলোচনের সংসারে থাকিবার মধ্যে ছিল রুগ্না স্ত্রী আর দশবৎসরবয়স্ক একটিমাত্র পুত্র—সতীশ। সে গ্রাম্য স্কুলে পড়াশুনা করিত।

স্ত্রীর অসুখের সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক অসুবিধাও ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল, কাযেই বাধ্য হইয়া ত্রিলোচন তাঁহার এক সম্পর্কীয়া ভগিনীকে নিজের বাড়ীতে আনিলেন।

ভগিনীটি যদি একাকিনী আসিতেন, তাহা হইলে হয় ত দুইটি সংসারের ইতিহাস অন্যরকম হইয়া যাইত, কিন্তু ভগিনীর একটি বিধবা কন্যা ছিল, তাহার নাম নীরদা। অভাব-অনটনের ঘরেও বিধাতা যে নিখুঁত রূপ দিতে কার্পণ্য করেন না, তাহা নীরদাকে দেখিলেই প্রমাণিত হইত।

পল্লীগ্রামে আন্দোলনের তরঙ্গ অতি সহজেই উদ্দাম হইয়া উঠে, কিন্তু নানা লোকের নানা মন্তব্য শুনিয়াও ত্রিলোচন বিচলিত হইলেন না। এমন সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল।

ত্রিলোচনের জীর্ণ বাড়ীখানির ঠিক পাশেই যে পোড়ো ভিটাটা বহুকাল হইতেই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল, হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, অনেকগুলি লোকজন মিলিয়া তাহার জঙ্গল সাফ করিতেছে। মুকুন্দ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ত্রিলোচন জানিলেন যে, তরী-তরকারী রোপণের পক্ষে পোড়ো ভিটার ন্যায় উর্ব্বরা ভূমি না কি আর নাই, সে জন্য মুকুন্দ স্থির করিয়াছেন, ঐ স্থানে একটি তরকারীর বাগান করিবেন।

বাড়ীর পাশের পোড়ো জমীর জঙ্গলটা পরিষ্কার হইয়া গেল, ইহাতে ত্রিলোচন মনে মনে বেশ খুসীই হইলেন, কিন্তু এই উপলক্ষে মুকুন্দ চৌধুরী দিনের মধ্যে বহুবার ঐ তরকারীর বাগানটুকুর তত্ত্বাবধান করিতে স্বয়ং আসিয়া ত্রিলোচনের বাড়ীতে বসিয়া বহুক্ষণ কাটাইতেন, এটা যেন তাঁহার দৃষ্টিকটু বোধ হইত। সামান্য একটু বাগানের জন্য জমীদার বাবুকে স্বয়ং সারাদিন তত্ত্বাবধান করিতে হয়, এটাও যেন কেমন কেমন ঠেকিত।

কিছু দিন এইভাবে গেল। তার পর হঠাৎ এক দিন মধ্যরাত্রিতে নীরদার একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া শশব্যস্ত হইয়া ত্রিলোচন ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, নীরদার হাতে একগাছা ঝাঁটা, তাহারই দ্বারা সে প্রাণপণে যে ব্যক্তিটির পৃষ্ঠে ক্রমাগত আঘাত করিতেছিল, তাহার মাথায় ও মুখে এমনই ভাবে কাপড় জড়ানো যে, চিনিবার উপায় নাই। ত্রিলোচনকে দেখিয়াই সে ব্যক্তি প্রাচীরের একটা ভাঙ্গা অংশ দিয়া পলায়ন করিল। তাড়াতাড়িতে পলাইবার সময় তাহার পায়ের এক পাটী জুতা বাড়ীর ভিতরে পড়িয়া রহিল। সেই জুতার পাটাটি দেখিবামাত্রই ত্রিলোচনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, আগন্তুকটি যে কে, তাহা বুঝিতে দেরী হইল না তরকারীর বাগানের গোপন উদ্দেশ্যটাও তাঁহার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চেঁচামেচি শুনিয়া পাড়ার লোকও ২।৪ জন আসিয়া পড়িল, কিন্তু ব্যাপারটার শেষ সেইখানেই হইল না।

ঘৃণায় ও লজ্জায় ত্রিলোচন সকালে আর কাছারীর দিকে গেলেন না, কিন্তু অপরাহ্ণে পেয়াদা আসিয়া তাঁহাকে মুকুন্দ চৌধুরীর আহ্বান জানাইল, কাযেই ত্রিলোচন গেলেন

গ্রামের সকলেই তখন সেখানে জমায়েৎ হইয়াছেন নীরদার চরিত্র যে বহুদিন হইতেই কলুষিত, তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ অনেকেই দিলেন। মুকুন্দ চৌধুরী জানাইলেন যে, এরূপ নষ্টা স্ত্রীলোক গ্রামে থাকিলে গ্রামের সর্ব্বনাশ হইতে আর বড় বেশী দেরী হইবে না।

গত রাত্রির আলোচনাটা যখন শ্লেষ ও বিদ্রূপে পরিণত হইল, তখন ত্রিলোচন আর সহ্য করিতে পারিলেন না জুতার পাটাটা চাদরের মধ্যে লুকাইয়া আনিয়াছিলেন সেটি ছুড়িয়া মুকুন্দ চৌধুরীর মুখে মারিলেন।

তাহার ফল যাহা হইবার, তাহা হইল। ত্রিলোচন যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন, তখন তাঁহার পিঠের ও মুখের অনেক স্থান কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে এবং একটা কাতর চীৎকারে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন যে, অতগুলি নরপশুর মাঝখানে নীরদাকে আনিয়া তাহার মাথার চুলগুলি কাটিয়া দেওয়া হইতেছে।

ইহার পর সামাজিক দণ্ড বা একঘরে হওয়া তাঁহার কাছে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই রাত্রিতেই ত্রিলোচন তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার ভাঙ্গিয়া চিরদিনের মত পাতকপাটী পরিত্যাগ করিলেন।

এই হতভাগ্য পরিবারের কোন সন্ধানই বহুকাল যাবৎ কেহই রাখে নাই, কিন্তু ১৫ বৎসর পরে—মুকুন্দ চৌধুরী যখন জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায় পা দিয়াছেন, তখন শুনিলেন যে, নদীর ও-পারের পাঁচপোতা গ্রামখানির যিনি নূতন জমীদার হইয়াছেন, তিনি এক জন বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার, পাঁচপোতা গ্রামখানিকে একখানি আদর্শ গ্রাম করিবার সংকল্প লইয়াই না কি তিনি উক্ত জমীদারীটি খরিদ করিয়াছেন।

কথাটা অবশ্য হাসিবার বটে, কিন্তু নূতন জমীদারটির

পরিচয় লইয়া যখন তিনি জানিলেন যে, সে ব্যক্তি তাঁহারই ভূতপূর্ব্ব গোমস্তা ত্রিলোচন ঘোষের পুত্র সতীশ, তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ভাগ্য যে এমন নিষ্ঠুরভাবে তাঁহাকে পরিহাস করিবে, তাহা তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

এই নবাগত যুবকটিকে প্রতিপদে অপদস্থ করিবার জন্য তিনি যতগুলি চেষ্টা করিয়াছেন, সবগুলিতেই তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এক দিন যাহার পিতার মাথায় অপমানের গুরুভার চাপাইয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়াছিলেন, আজ তাহারই সহিত প্রতিযোগিতা করিবার কল্পনা করিতেও মুকুন্দ চৌধুরীর সমস্ত রক্ত যেন ক্রোধে ও ঘৃণায় ফুলিয়া উঠিতেছিল।

৩

দুর্গোৎসবের সমারোহে পাঁচপোতা যে পাতকপাটীর কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছে, এ কথা পরম নিন্দুকরাও স্বীকার করিল। কলিকাতা হইতে "ইণ্ডিয়া থিয়েটার" নামে তাহাদের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী "আখরোটবালা" আসিয়া তিন দিন অভিনয় করিল।

বিজয়ার দিন প্রভাতে মুকুন্দ বাবু সুবোধকে একটু নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে সুবোধ, একটা কায কর না, তোমাদের ঐ যে বাদাম না পেস্তা—কি হে—"

"আখরোট—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আখরোট! খাসা গায় কিন্তু। ওকে ২।৪ দিন এখানে থাকতে বল না। থিয়েটারের দল কলকাতায় ফিরে যাক, ওকে দিয়ে একটু কীর্ত্তন-টীর্ত্তন—এই, পাঁচটা ঠাকুরের নাম আর কি,—বুঝেছো ত—"

সুবোধ বলিল, "তা আর বুঝি নি? কিন্তু থাকতে কি চাইবে? ওই হ'ল ওদের—কি বলে—সাধু ভাষায় যাকে গিয়ে বলে 'মেরুদণ্ড'।"

মুকুন্দ বলিলেন, "আহা, মেরুদণ্ডটিকে বলেই দেখ না হে। টাকার জন্যে তুমি ভেব না, সুবোধ। সেকালে দাশু রায়ের গান শুনে কত লোক পরিবারের গায়ের গয়না খুলে এনে দিয়েছে, জান ত? তারা যদি এই—কি নামটা হে?"

"আখরোট।"

"বড় বিদ্‌ঘুটে নাম। এই আখরোটের গান যদি তারা সব শুনতো, তা হ'লে কি করতো ভাব দেখি?"

সুবোধ বলিল, "উঃ! তা আর বলতে। যেন কাণে এখনও লেগে রয়েছে। আবার ইংরাজী কবিতা যদি ওর মুখে শোনেন, তা হ'লে একেবারে অবাক্ হয়ে যাবেন। এ বয়সে বিলাতী একট্রেসদের মুখ থেকে ত কতই শুনেছি, ওর নাম কি—সেক্সপীয়রের মিল্টনও শুনেছি, স্কটের ইমলসনও শুনেছি, কিন্তু এর মুখে যা শোনা গিয়েছে—যাই হোক, আমি এখনই গিয়ে বলছি, আপনি কিছু ভাববেন না।"

সুবোধকে বাহাদুর ছেলে বলিতে হইবে বৈ কি? ঘণ্টাখানেক পরেই সে আসিয়া জানাইল যে, আখরোট তিন দিন এখানে থাকিতে রাজী হইয়াছে। মুকুন্দ বাবু আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। সে দিন বিজয়া-দশমীর উৎসব খুব ঘটা করিয়াই সম্পন্ন হইল।

দুই দিন আসরে কীর্ত্তন-গান হইল, সবাই ধন্য ধন্য করিল। দ্বিতীয় দিনে দেখা গেল যে, শীতকাল না হইলেও মুকুন্দ বাবু একখানি বহুমূল্য শাল গায়ে দিয়া আসরে বসিয়াছেন এবং খানিক পরেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিল যে, সেই শালের যোড়া তিনি আখরোটবালার স্কন্ধে ফেলিয়া দিলেন।

তৃতীয় দিনে আর গান হইল না। শোনা গেল যে, ঠাণ্ডা লাগিয়া বাইজীর জ্বর হইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার দুর্ভোগে যাহারা অভ্যস্ত নহে, এই জ্বর সহজে তাহাদের নিষ্কৃতি দেয় না। কাযেই এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, বাইজীর রোগের কোন উপশম হইল না। কেহ কেহ পরামর্শ দিল যে, পাঁচপোতা হইতে সতীশ বাবুকে আনাইয়া একবার দেখান যাক, কিন্তু মুকুন্দ বাবু তাহাতে তীব্র আপত্তি জানাইলেন।

পরদিন মুকুন্দ বলিলেন যে, বেচারী যখন তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়াই এই ভাবে পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহার যথাযোগ্য চিকিৎসাদির ব্যবস্থা ত তাঁহাকেই করিতে হয়, নহিলে হাজার হউক ধর্ম্ম বলিয়া একটা জিনিষ ত—

অনেকেই মুখ টিপিয়া হাসিল, এবং প্রকাশ্যে বলিল যে, নিশ্চয়ই।

সেই দিনই পীড়িতা আখরোটকে লইয়া মুকুন্দ কলিকাতায় রওনা হইলেন।

৪

আখরোটের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাতকপাটীর লোক যে বড় বেশী উদ্বিগ্ন ছিল, তাহা নহে, কিন্তু মুকুন্দ বাবু তিন মাসের মধ্যে দেশে ফিরিলেন না, ইহাতে তাঁহার হিতৈষীরা স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

মুকুন্দর সঙ্গে একবার দেখা করিবার অছিলায় শিরোমণি মহাশয় গঙ্গাস্নানটা সারিয়া আসিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময়ে মুকুন্দ বাবুর নায়েবের নামে যে পত্র আসিল, তাহাতে জানা গেল যে, তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে পশ্চিম রওনা হইতেছেন। হাজার পাঁচেক টাকা যেন নায়েব মহাশয় অতি শীঘ্র পাঠাইয়া দেন।

নায়েব মহাশয় প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, তহবিলে আর এক পয়সাও নাই, টাকা-কড়ি যাহা মজুত ছিল, সবই দুর্গোৎসবে খরচ হইয়াছে, এখন পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন হইলে সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

হুকুম আসিল, তাহাই কর। যে কোন উপায়ে টাকা চাই-ই।

পল্লীগ্রামের জমীদারী বলিবামাত্রই কেহ বন্ধক রাখিয়া টাকা দেয় না। কাযেই পাঁচপোতার শরণাপন্ন হইতে হইল। মুকুন্দ চৌধুরীর বিষয়সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া সতীশ ঘোষ টাকা দিল।

৫

মুকুন্দ চৌধুরী দেশে ফিরিলেন প্রায় ৫ বৎসর পরে। তাঁহার চেহারা দেখিয়া অনেকেই হঠাৎ চিনিতে পারিল না, এমনই একটা বিশ্রী পরিবর্ত্তন তাঁহার সর্ব্বদেহে ঘটিয়া গিয়াছে। বাড়ীখানিতে তখন জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। শিরোমণি মহাশয় খানিকক্ষণ তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া অবশেষে জানাইলেন যে, পাতকপাটী দেনার দায়ে সতীশ ঘোষ কিনিয়া লইয়াছেন। শিরোমণি মহাশয় এখন তাহারই গ্রামের গোমস্তাগিরি করিতেছেন।

মুকুন্দ চৌধুরী স্থাণুর মত বসিয়া রহিলেন।

সে দিন হাটবার। সকালে ডাক-পিয়ন গ্রামে পত্র বিলি করিতে আসে।

বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া সে একখানা খামে আঁটা পত্র বাহির করিয়া শিরোমণির প্রসারিত হাতে অর্পণ করিল।

শিরোনামায় মুকুন্দ চৌধুরীর নাম।

কম্পিত হস্তে পত্রখানি হাতে লইয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "চশমা জোড়া কাছে নেই। সুবোধ, পড় ত চিঠিখানা কে লিখলে।"

সুবোধ পড়িল,—

"জীবনের এক সময়ে আপনিই সর্ব্বনাশ করিয়া আমাকে পথে বসাইয়াছিলেন, সে কথা ভুলিবার নয়। আজ আপনাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া নিজে চিরদিনের মত পথে বাহির হইলাম, এ আনন্দ আর রাখিতে পারিতেছি না।

নীরদা।"

মুকুন্দ চৌধুরীর দেহ ঈষৎ টলিয়া পড়িল। তাঁহার বিবর্ণ দেহ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল।

শিরোমণি চক্ষুর্দ্বয় কপালে তুলিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ, হারামজাদা বেটী, আলেয়া! আলেয়া! আমি তখনই বলেছিলাম।"

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

দয়িত-বিরহে

শত বাধা অতিক্রমি' ছেড়ে শত দেশ-দেশান্তর
সাগরের পানে নদী ধায়,
লেলিহান-বহ্নিশিখা পূর্ণতেজে ছাড়িয়া প্রান্তর
আকাশের দিকে সদা যায়।
মরু-তৃষা লয়ে বুকে আকুলিত চাতক-হৃদয়
খুঁজে কোথা মেঘ-বরিষণ,
তেমতি মিলন-ব্যগ্র বিরহিণী-প্রাণ সদা রয়
দয়িতের দিকে অনুক্ষণ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

প্রাচীন কাহিনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৮) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতজ্ঞতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, কলিকাতা-বড়বাজারে দয়েহাটায় ভাগবতচন্দ্র সিংহ ও তৎপুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহের বাটীতে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং ও তাঁহার দুইটি সহোদর পিতার সহিত ঐ বাটীতে থাকিয়া সংস্কৃত-কলেজে পড়িতে যাইতেন। তখন তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। জগদ্দুর্লভ সিংহের মৃত্যু হইলে কৃতজ্ঞ বিদ্যাসাগর মহাশয়, জগদ্দুর্লভের বিধবা পুত্রবধূ মোক্ষদায়িনীকে ১০৲ টাকা এবং তাঁহার কন্যাকেও ১০৲ টাকা করিয়া ১৯ বৎসর মাসহারা দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ধন্য আপনার কৃতজ্ঞতা!—*R. G. Sannyal's Great Men, Part I. p. 28*

(১৯) রাজা পীতাম্বর মিত্র

পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, যদি কোন দেশীয় রাজা কলিকাতায় আসিতেন এবং এই স্থানের লোকেদের নিকটে কোনরূপে দেনাদার হইতেন, তাহা হইলে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিতে হইত যে, "তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার পাওনাদারেরা যেন শীঘ্র আসিয়া আপনাদের প্রাপ্য টাকা লইয়া যান।" সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র মহাশয় পশ্চিমাঞ্চলে কর্ম্ম করিতেন। তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন:—"রাজা পীতাম্বর মিত্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। যদি তাঁহার নিকটে কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকে, তবে তিনি আসিয়া ইহা লইয়া যান। নচেৎ তিনি আর ইহা পাইবেন না।"—*Delhi Gazette, 1876.*

(২০) বুলবুলির লড়াই

১৮১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় বুলবুলি-পক্ষীর লড়াইএর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এইরূপ লড়াই দেখিয়া অতুল আনন্দ অনুভব ও বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। লড়াই দেখিবার জন্য সহরের যাবতীয় লোক আসিয়া উপস্থিত হইত। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রামদুলাল সরকার মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণ দিকে একখণ্ড বিস্তৃত জমী পড়িয়া থাকিত। লোকে ইহাকে "ছাতুবাবুর মাঠ" বলিত। পরে এই স্থানে Bengal Theatre বসিয়াছিল। এখন এই স্থানে একটি বাজার ও ডাকঘর বসিয়াছে। ছাতুবাবুর মাঠেই সাধারণতঃ "বুলবুলির লড়াই" হইত।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "সম্বাদ-ভাস্কর" পত্রের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) মহাশয় স্বীয় সংবাদপত্রে "বুলবুলির লড়াই"এর একটি বিবরণ দিয়াছেন। নিম্নে ইহা উদ্ধৃত হইল;—

"এ বৎসর (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) শ্রীযুক্ত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র একপক্ষ এবং শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মল্লিক, বাবু প্রাণকৃষ্ণ সেন, বাবু কালীচরণ দত্ত প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি পক্ষান্তর হইয়া পক্ষিযুদ্ধার্থ পাথুরিয়াঘাটাস্থ ১৬৯ নং বাটীতে গত রবিবারে সভা করিয়াছিলেন, পরে ১০ ঘণ্টা সময়ে যুদ্ধারম্ভ হইয়া দুই প্রহর তিন ঘটিকাকালে সমাধা হয় তাহাতে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বশাখ উভয়ে মধ্যস্থ ছিলেন, এ বৎসর যেরূপ পক্ষির যুদ্ধ হয় এমত আশ্চর্য্য যুদ্ধ কখন দেখা শুনা যায় নাই, রাজমিত্র পক্ষীয় একজন পক্ষিশিক্ষক অর্থাৎ খলিপার বিপক্ষ পক্ষীয় ২৫ পক্ষিকে জয় করে, বিপক্ষ পক্ষের কেবল ৩টি পক্ষী জয়ী হইয়াছিল, কিন্তু সে জয়কে পরাজয় বলিলেও বলা যায়, কেননা একটা পক্ষী মৃতবৎ হইয়া ভূমিতলে পতিত থাকিয়া জয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা হউক, রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় যিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ভয়ে ব্যাকুল ছিলেন তিনিও এই জয়ে আহ্লাদিত হইয়া খলিপাকে অন্যূন ২০০ তঙ্কা মূল্যোপযুক্ত এক জোড়া শাল পারিতোষিক দিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন ঐ খলিপা রাজার ও মিত্রবাবুর নিকট হইতে প্রায় ১০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে।"—সম্বাদ-ভাস্কর, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ। (১)

(১) "সম্বাদ-ভাস্কর" যে স্থান হইতে যে যে বারে প্রকাশিত হইত, তাহাও নিম্নে লিখিত হইল:—

"এই সম্বাদ ভাস্কর পত্র, সহর কলিকাতা শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।"

(২১) দীনবন্ধু মিত্রের বাল্য-কবিতা

দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় সুরসিক, সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তিনি যৌবনে যে মধুমাখা কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার আভাস তাঁহার বাল্যকালেই জানিতে পারা গিয়াছিল। তাঁহার কবিতা যেরূপ সরস ও সরল, সেইরূপ আবার ভাব-ব্যঞ্জক। তাঁহার বাল্যকালের কবিতায় রসের কিরূপ ফোয়ারা ছুটিয়াছে, তাহা একবার পাঠকগণ দেখুন। "জামাই-ষষ্ঠী" সম্বন্ধে তিনি এই কবিতা লিখিয়াছিলেন :—

"তাপ বাড়ে, ক্রমে যত তপনের তাপ।
রবি অস্ত দেরি দেখে বাড়িছে বিলাপ॥
মনের আঁধার যায় দেখিয়া আঁধার।
নিশিতে প্রণয়-নীরে দিবেন সাঁতার॥
মেয়ের মায়ের মন রসে টলমল।
ভূষণে ভূষিতা করে তনয়া কমল॥
জামাই-সোহাগি টিপ্ ভালে ফেটে দিল।
বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল॥
নির্জ্জনে নলিনী সনে কর প্রেমালাপ।
আমরা থাকিলে হেথা বাড়িবে বিলাপ॥
কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে ভাবিয়া না পাই।
পরিণত বিধুমুখ তাহে কথা নাই॥
রূপের গৌরবে বুঝি হ'য়ে গরবিণী।
প্রেমাধীন জনে দুখ দেও আদরিণী॥
তব সনে প্রণয়িনী এই দরশন।
বল দেখি আমি তব হই কোন্ জন॥
রসিকা বালিকা করে সরস উত্তর।
তব পরিচয় দিব শুন প্রাণেশ্বর॥
জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুরঝির ঠাঁই।
তুমি প্রাণ হও মোর ঠাকুর-জামাই॥
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল।
বাহিরে মহিলাদল হাসিতে লাগিল॥" (১)

সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ।

(২২) সেকালের কাটোয়া

"যখন বাঙ্গালা দেশ মুরশেদাবাদের নবাবের অধীন ছিল তখন কাটোয়াতে নবাবের দৌলৎখানা ছিল এবং বাঙ্গালার খাজনার টাকা সেইখানেই জমা হইত এই হেতুক নবাব ঐ মোকামে একটা মৃত্তিকার গড় করিয়াছিলেন এখন সে গড় অনেক লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু তাহার গড়ের দক্ষিণ দিকে কিঞ্চিৎ অনুভব হয় এবং একটা পোল অদ্যাপি অবশিষ্ট আছে।"—

সমাচার-দর্পণ, ৯ জানুয়ারি, ১৮১৯

(২৩) কাশীপুরে রতন বাবুর ঘাট

স্যার ডব্লিউ ম্যাক্‌ন্যাটন সাহেবের স্মৃতি-রক্ষার্থ কলিকাতার বড় বড় লোক চাঁদা করিয়া গঙ্গাতীরে স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিবার কল্পনা করেন। নড়ালের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার রামরতন রায় মহাশয় কাশীপুরে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তৎকালে এই স্থানে বাস করিতেন। সে সময় কাশীপুরে স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের স্নান করিবার জন্য বাঁধা ঘাট না থাকায় তাঁহাদিগের বিশেষ কষ্ট হইত। মহাত্মা রায় মহাশয় এই কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত ২৬০০০৲ (ছাব্বিশ হাজার) টাকা ব্যয় করিয়া একটি ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের প্রথমে এই ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছিল।—*The Friend of India, 13 March, 1845, p, 181.*

(২৪) ধীরাজের গান

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের Emerald Bower এ ধীরাজ এই গানটি গাহিতেন :—

আমায় হের হর-অঙ্গনা,
আমি ফলার করব না।
তুমি কালশশী শ্মশানবাসী
ঘরে চা'ল বাড়ন্ত গেল না।
গেল ভজার মার কাঁথা
ম'লো রাজা মান্ধাতা,
ইচ্ছের আরম্ভ হবে ওষুদ্ পাই কোথা?
আবার নদের রাজার রাজ্য গেল,
আমার আইবুড় নাম ঘুচ্‌ল না,
আমি ফলার করব না।

---

(১) এই সুদীর্ঘ কবিতাটি "সংবাদ প্রভাকরের" উপর্য্যুপরি দুই সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। এ স্থলে কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত হইল। —লেখক

কাকে নিয়ে গেল কাণ,
তোমায় দিব খয়েন ধান,
আউটে ক্ষীর করো
না হয় পেতে শুয়ো প্রাণ।
আবার শিবে শুঁড়ি কাটা গেল,
আমার খেউরী হওয়া হ'লো না।
আমি ফলার করবো না। (১)

পুরাতন-প্রসঙ্গ, ১৬০ পৃষ্ঠ।

(২৫) সোণাগাছীর ইতিহাস

সোণাগাছীর প্রকৃত নাম "সোণাগাজী।" সোণাগাছী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা মহাত্মা দুর্গাচরণ মিত্রের সময়ে যেরূপ মহাপুণ্যভূমি ছিল, এক্ষণে ইহা সেইরূপ মহাপাপ-পঙ্কিল স্থান হইয়াছে। এই স্থানেই দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন মহাশয় এক দিন গাহিয়াছিলেন,—

"দে মা আমায় তপিলদারী
আমি নেমোক-হারাম নই শঙ্করি!"

আজ আর সেই "সোণাগাছী" নাই। ক্রমে ক্রমে সেই সোণাগাছী মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কত শত ধনাঢ্য ব্যক্তির যে ধন ও মান এই স্থানে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। "সোণাগাছী" এরূপ নাম হইল কেন, তাহাই এ স্থলে বর্ণিত হইতেছে।

এখন আমরা যে স্থানকে সোনাগাছী বলি, সেই স্থানে সোণাউল্লা নামক এক জন দুর্দ্দান্ত মুসলমান বাস করিত। লাঠালাঠি, মারামারী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। সংসারে এক বৃদ্ধা জননী ভিন্ন তাহার আর কেহই ছিল না। বাল্যকালে আমরা বৃদ্ধাদিগের মুখে সোণাউল্লার কত অদ্ভুত গল্প শুনিতাম এবং ভয়ে শিহরিয়া উঠিতাম। যতটুকু মনে আছে, তাহা এইরূপ—"সোণাউল্লা মরিয়া যাইবার পরে তাহার মাতা এক দিন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিল, কিন্তু পর্ণ-কুটীরের ভিতর হইতে সোণাউল্লার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া বৃদ্ধা রোদন করিতে ক্ষান্ত হইল, এবং শুনিতে পাইল, "মা, তুই আর কাঁদিস না, আমি মরিয়া গাজী হইয়াছি। যত দিন বাঁচিয়াছিলাম, তত দিন অনেক লোককে মারিয়াছি, অনেকের মালপত্র লুঠ করিয়াছি এবং অনেকের অনেক ক্ষতি করিয়াছি। এখন আমি ঔষধ দিয়া লোকের প্রাণদান করিব। আর যে আমার সিন্নি দিবে, তাহার খুব ভাল করিব। ইহাতেই তোর খোরাক, পোষাক চলিবে।" এই কথা চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল। হাজার হাজার নরনারী সোণাউল্লার বাটীর সম্মুখে আসিয়া জনতা করিতে লাগিল। জীর্ণ-শীর্ণ, চির-রুগ্ন, অন্ধ, খঞ্জ ও কুষ্ঠরোগী দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এবং বন্ধ্যা, মৃতবৎসা প্রভৃতি ইতর ভদ্র নর-নারী, মকদ্দমা প্রভৃতি বিপদগ্রস্ত সম্ভ্রান্ত, ধনী, নির্ধন, সকল শ্রেণীর লোকের জনতায় রাস্তা, ঘাট, মাঠ, বাগান পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। টাকা, পয়সা ও বাতাসার পর্ব্বত হইয়া উঠিল। সকলেই ব্যাকুল-হৃদয়ে সোণাগাজী সাহেবের দোহাই দিতেছে। এক এক জন সম্মুখে আসিয়া ক্ষমতানুসারে সিন্নি দিয়া নিজ রোগের বা দুঃখের কথা বলিলে তাহার বৃদ্ধা মাতা "বাবা সোণাউল্লা" "বাবা সোণাউল্লা" বলিয়া ডাকিত, অমনি ঘরের ভিতর হইতে নাকী সুরে "কি মা" বলিয়া মৃত সোণাউল্লা গাজী উত্তর দিত। বৃদ্ধা মাতা আগন্তুকের কথা বলিবামাত্র আবার নাকী সুরে উত্তর আসিত, "পুকুরে কলাপাত-মোড়া ঔষধ ভাসিতেছে; প্রত্যহ সকালে উঠে একটু জলে ধুয়ে খেতে বল, আরাম হইবে।" রোগী আহ্লাদে পুষ্করিণীতে গিয়া দেখে যে, কলাপাত জড়ান কি ভাসিতেছে। সে তাহা তুলিয়া লইল এবং খুলিয়া দেখিল যে, একটি শিকড়। সে তাহা আনন্দে লইয়া বাড়ীতে গেল, এবং প্রত্যহ ব্যবস্থানুসারে সেবন করিয়া দেখিতে দেখিতে আরোগ্য লাভ করিল।

এইরূপে কাহারও ঔষধ পুকুরে ভাসিত, কাহারও ঔষধ কুটীরের ছাদ হইতে পড়িত, কাহারও ঔষধ অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে লইয়া যাইতে আদেশ পাইত। মকদ্দমায় বিপদগ্রস্ত লোকেরা মৌখিক আশ্বাস ও উপদেশ পাইত। আবার কোন কোন লোকের উপর গাজী সাহেব ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত। তাহার দাঁত-কিড়মিড়ি ও তর্জ্জন-গর্জ্জন, চালের মড়মড়ানী ও আস্ফালন দেখিয়া উপস্থিত লোকেরা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিত। বিকট নাকী সুরে মহৎ আস্ফালন করিয়া সোণাউল্লা বলিত, "এ লোকটা আমাকে ঠাট্টা করিতে আসিয়াছে; এর সিন্নি রাস্তায় ছুড়ে ফেলে

(১) আমি ত ইহার অর্থ বুঝিলাম না। পাঠকগণ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক অর্থ করিয়া লইবেন।—লেখক

যে, আমি এর সপুরী একগার করিব। দেখি, এ কেমন ক'রে ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করে,"—ইত্যাদি ভয় দেখাইত।

কয়েক মাস পরেই সোণাউল্লার মাতা একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইল। মসজিদ্‌টি যেরূপ বৃহৎ, সেইরূপ সুন্দর। বৃদ্ধার আর কেহই নাই; বিশেষতঃ তাহার হাতে যথেষ্ট টাকাও রহিয়াছে। এই হেতু, সে অকাতরে মন্দির-নির্ম্মাণে অর্থ ব্যয় করিয়াছিল। ইহা সোণাগাজীর মন্দির বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিল। এই মসজিদের নামানুসারে "মসজিদ-বাড়ী ষ্ট্রীট" হইয়াছে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অর্ম্মির ম্যাপে এই রাস্তার কিছু কিছু অংশ দেখা যায়; তাহাতে রাস্তার উত্তর পার্শ্বে খানিকটা খালি জমীর পরে একটি বৃহৎ মসজিদের চিত্র অঙ্কিত আছে। বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক মুসলমানগণ প্রেতাত্মা ও বুজরুকী এই উভয়েরই ঘোর বিরোধী, এই হেতু কোন বিজ্ঞ মুসলমান সোণাউল্লার গাজীত্বে বিশ্বাস করেন নাই, এবং অসদুপায়ে সংগৃহীত অর্থে মসজিদ্ নির্ম্মিত হইতে পারে না। সুতরাং সোণাগাজীর মসজিদে তাহার মাতা, বা তাঁহার কোন পরিচিত লোক, কিংবা কোন আগন্তুক ঔষধপ্রার্থী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন মুসলমান প্রবেশ করিতেন না। সোণাউল্লার মাতার মৃত্যুর পরেই বুজরুকী বন্ধ হইয়া গেল, এবং মসজিদও বন-জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সোণাউল্লার বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর পাড়ে তাহার কবর হইয়াছিল। এই পুষ্করিণীটি চিৎপুর রোডে বটতলার সম্মুখে দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটের মোড়ে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের পরে নবভাবে গঠিত হইয়াছিল। "লটারি-কমিটী" সেই পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও সংস্কার করিয়া স্থানীয় লোকের পানীয় জলের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বে সোণাগাজীর কবর ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত করা হয়। এক জন ফকীর থাকিতেন, এবং লোকের প্রদত্ত সিন্নি ও পয়সা সেই ব্যক্তিই লইতেন।

সম্প্রতি সেই কবরটি একটি ক্ষুদ্র সুন্দর ও সজ্জিত ঘরে আচ্ছাদিত হইয়াছে। পুষ্করিণীটি ভরাট করিয়া তাহার উপর ঘোড়ার গাড়ীর আস্তাবল হইয়াছে। এই সোণাউল্লা গাজীর নাম হইতেই "সোণাগাজী" নাম হইয়াছিল। এক্ষণে লোকে ইহাকে সোণাগাছী বলে।"—নব্যভারত, বিংশ খণ্ড, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, ৩৭৮-৩৮০ পৃষ্ঠ।

১২৬৪ বঙ্গাব্দে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) মহাশয় স্বীয় "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সোণাগাছীর যে অবস্থা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"মতিলাল দলবল সমেত সোণাগাজীতে আইসেন। সেখান হইতে এক জন গুরুমহাশয়কে তাড়ান। বাবুয়ানা বাড়াবাড়ি হয়, পরে সৌদাগরি করিয়া দেনার ভয়ে প্রস্থান করেন।

"সোণাগাজী দরগায় কুনী বুনী বাসা করিয়াছিল। চারিদিক্ ছেদলা শেওলা ও বোনাজে পরিপূর্ণ—স্থানে স্থানে কাকের ও সালিকের বাসা—ধাড়ীতে আহার আনিয়া দিতেছে—পিলে চিঁ চিঁ করিতেছে—কোনখানেই এক ফোঁটা চুণ পড়ে নাই—রাত্রি হইলে কেবল শেয়াল-কুকুরের ডাক শোনা যাইত ও সকল স্থানে সন্ধ্যা দিত কিনা সন্দেহ। নিকটে এক জন গুরুমহাশয় কতকগুলি ফরগুল গলায় বাঁধা ছেলে লইয়া পড়াইতেন—ছেলেদিগের লেখাপড়া যত হউক বা না হউক, বেতের শব্দে ত্রাসে তাহাদিগের প্রাণ উড়িয়া যাইত—যদি কোন ছেলে একবার ঘাড় তুলিত অথবা কোঁচড় থেকে একগাল জলপান খাইত তবে তৎক্ষণাৎ তাহার পিটে চট ২ চাপড় পড়িত। মানবস্বভাব এই যে কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে সে কর্ত্তৃত্বটি নানারূপে প্রকাশ চাই তাহা না হইলে আপন গৌরবের লাঘব হয়—এইজন্য গুরুমহাশয় আপন প্রভুত্ব ব্যক্ত করণার্থ রাস্তার লোক জড় করিতেন—লোক দেখিলে সেই দিগে দেখিয়া আপন পঞ্চম স্বরকে নিখাদ করিতেন ও লোক জড় হইলে তাঁহার সরদারি অশেষ বিশেষ রকমে বৃদ্ধি পাইত এ কারণ বালকদিগের যে লঘুপাপে গুরু দণ্ড হইত তাহার আশ্চর্য্য কি? গুরুমহাশয়ের পাঠশালাটি প্রায় যমালয়ের ন্যায়—সর্ব্বদাই চটাচট পটাপট, গেলুমরে মলুমরে ও "গুরুমহাশয় ২ তোমার পড়ো হাজির" এই শব্দই হইত আর কাহার নাকখত—কাহার কানমলা—কেহ ইটে খাড়া—কাহার হাত-ছড়ি—কাহাকেও কপিকলে লটকান—কাহার জলবিচাটি, একটা না একটা প্রকার দণ্ড অনবরতই হইত।

"সোণাগাছির গুমর কেবল উক্ত গুরুমহাশয়ের দ্বারাই হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ প্রান্তভাগে দুই এক জন বাউল থাকিত—তাহারা সমস্ত দিন ভিক্ষা করিত। সন্ধ্যার পর পরিশ্রমে আক্রান্ত হইয়া শুয়ে শুয়ে মৃদুস্বরে গান করিত।

"সোণাগাছির এইরূপ অবস্থা ছিল। মতিলালের শুভাগমনাবধি সোণাগাছির কপাল ফিরিয়া গেল। একবারে

"ঘোড়ার চিঁ হিঁ, তবলার চাঁটি, লুচি পুরির খ্‌চাখচ," উল্লাসের কড়াংধুম রাতদিন হইতে লাগিল আর মণ্ডামিঠাই গোলাপ ফুলের ও আতর চরস গাঁজা মদের ছড়াছড়ি দেখিয়া অনেকেই গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার লোক চেনা ভার—অনেকেই বর্ণচোরা আব। তাহাদিগের প্রথমে এক রকম মূর্ত্তি দেখা যায় পরে আর এক রকম মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। ইহার মূল টাকা—টাকার খাতিরেই অনেক ফেরফার হয়। মনুষ্যের দুর্ব্বল স্বভাব হেতুই ধনকে অসাধারণরূপে পূজ্য করে। যদি লোকে শুনে যে অমুকের এত টাকা আছে তবে কি প্রকারে তাহার অনুগ্রহের পাত্র হইবে এই চেষ্টা কায়মনোবাক্যে করে ও তজ্জন্য যাহা বলিতে হয় বা করিতে হয় তাহাতে কিছুমাত্র ক্রটি করে না। এই কারণে মতিলালের নিকট নানারকম লোক আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ উলার ব্রাহ্মণের ন্যায় মুখপোড়ারকমে আপনার অভিপ্রায় একেবারে ব্যক্ত করে—কেহ বা কৃষ্ণনগরীয়দিগের ন্যায় ঝাড় বুটা কাটিয়া মুনসি আনা খরচ করে—আসল কথা অনেক বিলম্বে অতি সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ হয়—কেহ বা পূর্ব্বদেশীয় বঙ্গভায়াদিগের মত কেনিয়ে কেনিয়ে চলেন—প্রথম প্রথম আপনাকে নিস্প্রয়াস ও নির্লোভ দেখেন—আসল মৎলব তৎকালে দ্বৈপায়ন-হ্রদে ডুবাইয়া রাখেন—দীর্ঘকালে সময়বিশেষে প্রকাশ হইলে, বোধ হয়, তাহার গমনাগমনের তাৎপর্য্য কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য।"   [ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে (কবিভূষণ, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি-এ)।

"সারা বসন্ত দিয়ে সেই এক চৈত্রের রাতি ঘেরা—"

বিদায় দিয়েছি তোমারে প্রেয়সী চৈত্র-রাতের শেষে
রজনী-শেষের চন্দ্রেরি মত পাণ্ডুর হাসি হেসে!

জানিতাম আমি একদা সহসা ভাঙিবে ফুলের মেলা,
ফাগুন আসিয়া বিদায় মাগিবে সে দিন ভোরের বেলা!
কাল-বৈশাখী দ্বারে যাবে ডাকি' উঠিবে ঝঞ্ঝা-রোল,
ঝরিবে মুকুল, ঝরিবে বকুল, ফুরা'বে ফুলের দোল!

সে দিন তখনো ওঠেনি তপন, বহেনি বোশেখী বায়ু,
রয়েছে জ্যো'স্না, উষার আলোক হরেনি তাহার আয়ু!
মলয় তখনো লুকায়ে ফিরিছে, কাটাতে পারে নি মায়া—
বসুধা ব্যাপিয়া বসন্ত-মধু; ফাগুন ত্যজিছে কায়া!
কোকিল তাহার বিদায়-কূজন বিলাইছে অবিরল,
ফুল-বালকে ফোটা-ফুল যত ফেলিছে চোখের জল!
চৈত্র তখন শেষ হয়ে যায়, চ'লে যায় মধু-ঋতু
রুদ্র নূতন অতিথির ভয়ে প্রকৃতির রাণী ভীতু!
তোমারে সে দিন ঝরা বকুলের সাথে সাথে আঁখিজলে
বিদায় দিয়েছি হে প্রিয়া আমার, মৌন কানন-তলে!

তুমি চ'লে গেছ সকরুণ চোখে চাহিয়া আমার মুখে,
তোমার নিবিড় বিদায় পরশ রাখিয়া তৃষিত বুকে,
যতবার চাই ততবার তুমি আসিয়াছ ফিরে ফিরে,
দু'জনার বুক ভরিয়া গিয়াছে দু'জনার আঁখি-নীরে!
সে দিন সকলি লাগিছে মধুর, সবি ক্রন্দনময়—
শরতের আলো বরষার জলে লাগিলে যেমন হয়!
মান অভিমান সে দিন সকলি কোথায় হয়েছে দূর!
নিদয়ে, সে দিন তোমারো হৃদয়ে শুধুই প্রেমের সুর!

আহা সে সে-দিন! সেই এক দিন! সকল দিনের সেরা—
সারা বসন্ত দিয়ে সেই এক চৈত্রের রাতি ঘেরা!

বিদায় দিয়েছি কেঁদে কেদে সই, তুমিও গিয়াছ কাঁদি'
রাঙা আঁখি দু'টি মুছিতে মুছিতে শিথিল কবরী বাঁধি'!
তারি সাথে সাথে ডুবে গেছে শশী, জ্যো'স্না গিয়াছে চ'লে,
শেষ বসন্ত-রাতি চলিয়াছে বোশেখী প্রভাত-কোলে!
তুমি চ'লে গেছ সাথে নিয়ে গেছ কোকিলের কলতান
নিশীথ-মলয় গাহিয়া গিয়াছে ফাগুন-শেষের গান!
আমি আজি হায় পথের ধূলায় পড়িয়া রয়েছি একা!
জানি না কো আর পাবো কি পাবো না কখনো তোমার দেখা!
মোর পথপরে আর নাহি ঝরে শিথিল বকুলরাশি,
গাহে না কোকিল, ক্ষরে না কো আর জ্যো'স্নার মধু হাসি,
কাল-বৈশাখী আজি চলে ডাকি' মাথার উপরে মোর,
উড়ে চারিদিকে মরু-বালুরাশি, নয়নে শ্রান্তি-ঘোর!
আমার জীবনে হেরি বৈশাখ মেলিছে আপন রূপ,
ভস্ম শুধুই উড়িয়া বেড়ায় পুড়িয়া গিয়াছে ধূপ!
হায় আজি আর মাধবী-নিশার কিছু নাই অবশেষ,
মরীচিকা পানে চাহিয়া রয়েছি, নয়ন নির্নিমেষ!

আসে আর যায় যাহারা, তাদের কে পারে রাখিতে ধরি'
তুমি চ'লে গেছ পারি নি রাখিতে,—স্মৃতিরে তোমার স্মরি'
যাবে বলেছিলে, দিয়েছি বিদায়, চলিয়া গিয়াছ তুমি,
কে জানে তখন ধরণী এমন হয়ে যাবে মরুভূমি!
হয় ত সে দিন জীবনের শেষ হাসিটি দিয়েছি হেসে,
যে দিন তোমায় দিয়েছি বিদায় চৈত্র-নিশীথ-শেষে!

শ্রীরাজেন্দু দত্ত।
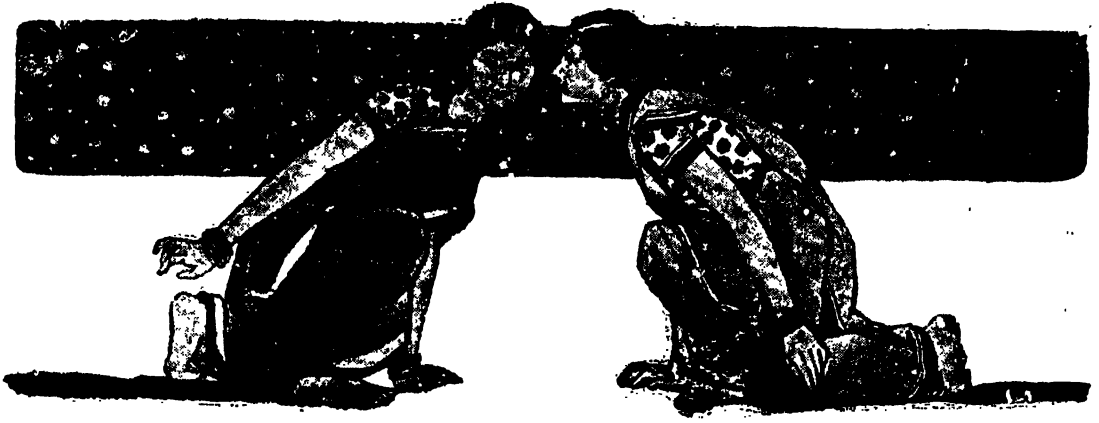
উড়ো মেঘ

১

নিদাঘকান্তি তাহার পাটনানিবাসী বন্ধু সূর্য্যকে লিখিল, "প্রফেসার সাহেব, সাত দিনের ছুটী, পাটনায় ব'সে ব'সে কি করবে? এখানে চ'লে এস, দু'জনে বায়স্কোপ-থিয়েটার দেখা যাবে। তা ছাড়া আরও একটি জিনিষ তোমাকে দেখাব। তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করেছ, অতএব তোমার কোনও ভয় নেই।"

নিদাঘরা চার পুরুষে টালার বাসিন্দা। নিদাঘের প্রপিতামহ পশ্চিমের কোনও এক সহরে তিসির আড়তে নায়েব-গোমস্তার কায করিতেন। তখনও এ দেশে রেল আসে নাই। ১৫ বৎসর গৃহত্যাগী থাকিবার পর হঠাৎ এক দিন তিনি নৌকাপথে দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং টালায় জমী কিনিয়া মস্ত এক চক্‌মিলানো অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া নানা প্রকার ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিলেন। নিজের পিতৃদত্ত বাসুদেব নামটা বোধ করি তেমন পছন্দসই মনে না হওয়ায় উহা বদলাইয়া গোবর্দ্ধন মিত্র নামে পরিচিত হইলেন। ব্যবসায়ে অচিরাৎ উন্নতি দেখা গেল। তার পর মৃত্যুকালে মা কমলার পায়ে একটি সোনার শিকল পরাইয়া শিকলটি একমাত্র পুত্রের হস্তে দিয়া গেলেন। সেই অবধি চঞ্চলা লক্ষ্মী শিকল পায়ে দিয়া কাকাতুয়ার মত মিত্র-পরিবারে বিরাজ করিতেছেন।

নিদাঘকান্তি এই বংশের একমাত্র সন্তান। দেখিতে বেশ সুশ্রী, বলবান্, দীর্ঘদেহ। প্রথম বিভাগে আই, এ পাশ করিয়া বি, এ, পড়িতে পড়িতে হঠাৎ এক দিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া নিদাঘ ঘরে আসিয়া বসিল। পিতা হরিধন মিত্র বুদ্ধিমান্ লোক। লেখাপড়া না শিখিয়াও পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ছেলের মতিগতি দেখিয়া বোধ করি মনে মনে খুসী হইলেন, কিন্তু মুখে একটু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া চুপ করিয়া গেলেন। নিদাঘের মা কিন্তু সত্যই অসুখী হইলেন। যে বংশে কেহ কখনও প্রবেশিকার সিংহদ্বার উত্তীর্ণ হয় নাই, সেই বংশে তাঁহার ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত উপাধি অনায়াসে দখল করিয়া বসিবে, তাঁহার মনে এই উচ্চাশা অহরহ জাগিয়া থাকিত। তাই নিদাঘ যখন তাঁহার সমস্ত আশা নির্ম্মূল করিয়া দিয়া আসিয়া বলিল,—"মা, দেখলুম সব ফাঁকি। কলেজে পড়া আমার হ'ল না। এখন থেকে বাড়ীতে পড়ব", তখন জননী বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু কোনও কথা কহিলেন না। নিদাঘের স্বেচ্ছাচারে কেহ কখনও বাধা দেয় নাই, আজও সকলে তাহা নিঃশব্দে স্বীকার করিয়া লইল।

কিন্তু এই যে নিদাঘ নিজের ইচ্ছাটাকে নির্ব্বিরোধে অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইত, তাহার প্রধান কারণ, তাহার সকল কার্য্য এবং চিন্তার মধ্যে এমন একটা নির্ভীক আত্মবিশ্বাস ছিল যে, সে যে ভুল করিয়াছে বা অন্যায় করিয়াছে, এ কথা কাহারও মনে উদয় হইত না, এবং তর্ক-যুক্তির দ্বারা তাহাকে পরাস্ত করিবার বাসনাও আজ পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই। কারণ, স্পষ্ট কথাকে এত রূঢ় করিয়া বলিবার ক্ষমতাও বোধ করি ভগবান্ আর কাহাকেও দেন নাই।

সূর্য্য কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবার পর প্রথম চারি পাঁচ দিন দুই জনে বায়স্কোপ-থিয়েটার দেখিয়া পুরাতন বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখাসাক্ষাৎ প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলিল। শেষে যখন সূর্য্যর ছুটী ফুরাইবার আর দুই দিন-মাত্র বাকী আছে, তখন সে বলিল,—"কৈ হে, কি দেখাবে ব'লে লিখেছিলে!"

নিদাঘের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে আজ কয় দিন সতীকুমার বাবুর বাড়ীর কোনও খোঁজই সে রাখে নাই—অথচ শুনিয়াছিল যে, কয়েক দিন যাবৎ সতীকুমার বাবুর স্ত্রী অসুখে ভুগিতেছেন। নিদাঘ তাঁহাকে মাসীমা বলিয়া ডাকিত। সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; বলিল,—"তাই ত, একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। একটু বসো ভাই, আমি চট্ ক'রে আস্‌ছি।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সতীকুমার বাবু শিক্ষা-বিভাগে খুব বড় চাকরী করিতেন। নিদাঘদের প্রকাণ্ড বাড়ীখানার পাশেই তাঁহার ক্ষুদ্র অথচ পরিপাটী বাড়ীখানি মানোয়ারী জাহাজের পাশে ক্ষুদ্র মোটর-লঞ্চএর মত শোভা পাইত। নিদাঘ চটি ফট্-ফট্ করিয়া তাঁহার অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া হাঁকিল,—"মাসীমা কেমন আছেন?"

সৌদামিনী রুগ্ন ছিলেন। প্রায় জ্বরে পড়িতেন—সারিয়া উঠিতেন, আবার পড়িতেন। এ জন্য তাঁহার মেজাজ সর্ব্বদা খুব প্রফুল্ল থাকিত না। কা'ল রাত্রিতে জ্বর ছাড়ার পর আজ সকালে গুটিকত খৈ খাইয়া তিনি বিছানায় বসিয়া একখানা উপন্যাস পড়িতেছিলেন। নিদাঘকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ক'দিন কোথায় ছিলে?"

নিদাঘ বলিল, "ছিলুম এখানেই। একটি বন্ধু পাটনা থেকে এসেছেন, তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম।"

সৌদামিনী কৈফিয়তের কোনও জবাব দিলেন না। তখন নিদাঘ একটু হাসিয়া বলিল, "আপনার অসুখ আমাদের এতই গা-সওয়া হয়ে গেছে, মাসীমা, যে, সামান্য জ্বরটা-আসটাতে আর আমাদের বেশী ভাবিত করতে পারে না।"

তাঁহার অসুখের ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া দেখিলে সৌদামিনী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন। তিনি শুষ্ক "হাঁ, তা ত বটেই" বলিয়া মুখখানা টিপিয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন।

এমন সময় উপর-তলার রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটি দশ এগার বছরের মেয়ে ডাকিল, "নিদাঘদা, একবারটি ওপরে এস না, তোমাকে ভারী একটা মজার জিনিষ দেখাব।"

নিদাঘ উঠান হইতে উপরদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কে, তনু?—

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা
ত্রিলোকের হৃদি-রক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা—"

"ভবে যাও" বলিয়া তনু রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কবিতা সে আদৌ সহ্য করিতে পারিত না এবং সেই জন্য নিদাঘ তাহাকে দেখিবামাত্র যাহা মুখে আসিত, একটা কবিতা আবৃত্তি করিয়া দিত। তাহার ফলে তনুর সঙ্গে তাহার ভাব রাখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু নিতান্ত জ্বালাতন হইয়াও তনু বেচারী তাহার সহিত শাশ্বতভাবে আড়ি করিতেও পারিত না। ভাব এবং আড়ির মধ্যবর্ত্তী একটা স্থানে তাহাদের সম্বন্ধটা সর্ব্বদা ত্রিশঙ্কুর মত আন্দোলিত হইতে থাকিত।

উপস্থিত ক্ষেত্রে তনু ক্যারম্-খেলায় কিরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্য নিদাঘকে অত উৎসাহের সহিত ডাকিয়াছিল। দিদিকে সে যে কিরূপ অবলীলাক্রমে হারাইয়া দিতে পারে, তাহা নিদাঘ না দেখিলে সমস্তই বৃথা!

ক্ষুণ্ণমনে তনু ফিরিয়া আসিয়া খেলিতে বসিল। তাহার দিদি অণু এতক্ষণ খেলিতেছিল, এবার মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল,—"থাক ভাই, আর খেলব না।"

তনু অনুনয় করিয়া বলিল,—"খেল না দিদি, এই ত আর একটু বাকী আছে।" বলিয়া বোর্ডের উপর ঘুঁটি সাজাইতে লাগিল। তাহার মনে তখনও ক্ষীণ একটু আশা ছিল যে, হয় ত নিদাঘদা হঠাৎ আসিয়া পড়িতেও পারেন।

খেলা আবার আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে নিদাঘ নিঃশব্দে আসিয়া অণুর পশ্চাতে দাঁড়াইল। খেলায় উন্মত্ত তনু সম্মুখে থাকিয়াও তাহাকে দেখিতে পাইল না।

নিদাঘ বলিল,—"যে রকম খেলোয়াড় হয়ে উঠেছ, শীগ্‌গির তোমাদের হকি এবং ফুটবল ক্লাবে ভর্ত্তি না ক'রে দিলে চল্‌ছে না!"

তনু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। কথাগুলার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু ছিল, তাহা কিন্তু অণুকে গিয়া বিঁধিল। সে খেলা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

নিদাঘ চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"রাগ হ'ল না কি?"

পাশের ঘরে সম্পূর্ণ নীরবতা ভিন্ন আর কিছুরই নিদর্শন পাওয়া গেল না। নিদাঘ তখন গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল,—"অণু, আমি ডাকৃছি, শুনে যাও। কথা আছে।"

অণু দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া নিদাঘের সম্মুখে দাঁড়াইয়া

বলিল,—"কি ?" নিদাঘ বলিল,—"আজ বিকালবেলা তোমার ফটো তোলা হবে—ভাল কাপড়-চোপড় প'রে তৈরী হয়ে থেকো।"

"বেশ" বলিয়া অণু পূর্ব্ববৎ দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

নিদাঘ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তনুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হয়েছে কি ?"

তনু বলিল, "বাঃ, মনে নেই ? সেই সে দিন তুমি যে দুপুরবেলা ঘুমোনোর জন্য বকেছিলে—"

"ও:,—" মুখখানা খুব গম্ভীর করিয়া নিদাঘ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

নীচে বাহিরের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিল। সৌদামিনীর ঘরে গিয়া দেখিল, অণু মায়ের পায়ের কাছে মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছে। নিদাঘ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"অণুর বয়স কত হ'ল, মাসীমা ?"

নিজের রোগের ভাবনার অবকাশে যতটুকু সময় পাইতেন, সে সময়টা সৌদামিনী মেয়ের বিবাহের কথা ভাবিতেন। তিনি বলিলেন,—"এই ত গেল মাসে তের পেরিয়ে চোদ্দয় পড়েছে। তা ওঁর কি সে দিকে নজর আছে ? মেয়ে থুবড়ো হয়ে থাকুক ত ওঁর কি বল না! আমিই শুধু ভেবে মরি।"

নিদাঘ বিরক্তির স্বরে বলিল,—"কি আশ্চর্য্য, মাসীমা; অণু ত আমার চেয়ে মোটে আট বছরের ছোট, আর আমার বয়স হ'ল—চব্বিশ।" বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অণুর মুখখানা পলকের মধ্যে কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে তাহার মায়ের মুখের দিকে তাকাইতে পারিল না; দ্রুত উঠিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

২

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিদাঘ সূর্য্যকে বলিল, "ওহে, তোমাকে আজ একটা ফটো তুলতে হবে।"

সূর্য্য একটা আরাম-কেদারায় শুইয়া কাগজ পড়িতেছিল, কাগজখানি মুড়িয়া রাখিয়া বলিল,—"সে কি রকম, কার ফটো তুলতে হবে ?"

নিদাঘ বলিল,—"কুমারী অণিমা বসু, আমার একটি বাল্যকালের বন্ধু।"

স্ত্রীলোকের ফটো তুলিতে হইবে শুনিয়া সূর্য্য অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিল।—"আরে না না, আমি যে ফটো তুলতে জানিনে।"

নিদাঘ নিজের দামী ক্যামেরা আলমারী হইতে বাহির করিতে করিতে বলিল, "শিখে নেবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে তালিম দেব।"

করুণকণ্ঠে সূর্য্য বলিল, "কিন্তু আমি কেন ? তুমি নিজে তুললেই ত পার।"

"তা পারি, কিন্তু তুমি তুললেই বা ক্ষতি কি ? তোমার ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ভঙ্গ হবার কোন ভয় আছে কি ?"

সূর্য্য লজ্জিতভাবে বলিল,—"তা নয়। তবে আমি একেবারে অপরিচিত—"

"সেই জন্যেই ত পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, পরে কোনো দিন হয় ত—" বলিয়া নিদাঘ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এই পরিচয় করাইয়া দিবার আবশ্যকতা যদিও সূর্য্য কিছুই বুঝিল না, তবু উপরোধে পড়িয়া শেষে কুণ্ঠিতভাবে রাজী হইল।

সমস্ত দিন ক্যামেরা নামক যন্ত্রটির কলকব্জার জটিল তত্ত্ব সূর্য্যকে বুঝাইয়া দিয়া বৈকালে যথাসময়ে উভয়ে সতীকুমার বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইল। বৈঠকখানায় গিয়া সতীকুমার বাবুর সহিত সূর্য্যের পরিচয় করাইয়া দিয়া নিদাঘ বলিল,—"আজ অণুর ফটো তোলানো হবে। ইনি তুলবেন।"

সতীকুমার বাবু লোকটি বড়ই ভালমানুষ এবং সংসার সম্বন্ধে ইঁহার অভিজ্ঞতা অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তাঁহাকে কোনও বিষয়ে রাজী করাইতে কাহাকেও বেগ পাইতে হয় নাই। তিনি খুব খুসী হইয়া বলিলেন,—"ঠিক ঠিক। আমিও কদিন ধ'রে এই কথাই ভাবছিলুম। ফটো তোলানো দরকার। আর কি, বয়স ত কম হ'ল না, এবার বিয়ে-থা দিতে হবে ত।"

কয়দিন ধরিয়া ভাবা দূরে থাকুক, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এ সম্ভাবনা তাঁহার কল্পনার ত্রিসীমায় আসে নাই। অন্য কেহ হইলে নিদাঘ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিত; কিন্তু সতীকুমার বাবুর সম্বন্ধে তাহার কেমন একটা দুর্ব্বলতা ছিল। সে তাঁহার এই অমায়িক মিথ্যা কথাগুলার কিছুতেই প্রতিবাদ

করিতে পারিত না। সে মনে মনে হাসিয়া বলিল,—"হাঁ, সেই কথাই ত আজ মাসীমাকে বললুম। বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন উদ্যোগ করা চাই ত।" বলিয়া সূর্য্যকে তাঁহার কাছে বসাইয়া বাড়ীর ভিতর তত্ত্বাবধান করিতে গেল।

ফটো তোলা শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিবার মুখে নিদাঘ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন দেখ্‌লে?"

সূর্য্য একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, চমকাইয়া উঠিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া লজ্জিত-মুখে বলিল, "বেশ, ভারী চমৎকার!" শেষাংশটা সে এক রকম ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়াই বলিয়া ফেলিল।

নিদাঘ জানিত, সূর্য্য অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের লোক। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সে কোন কথাই বলিতে পারে না। তাই তাহাকে আর বেশী প্রশ্ন করিল না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রশংসাটুকু সে যে খুব অকপটভাবেই করিয়াছে, তাহা বুঝিয়া নিদাঘ হাসিতে লাগিল।

পরদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে সূর্য্য পাটনা ফিরিয়া গেল। তাহাকে হাওড়া পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া নিদাঘ ফিরিবার পথে সতীকুমার বাবুর বাড়ীতে গিয়া বসিল। এ দুই দিন যে কথাটা তাহার মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল, তাহারই উপক্রমণিকাস্বরূপ বলিল,—"সূর্য্যকে ষ্টেশনে পৌছে দিয়ে এলুম।"

সৌদামিনী মাদুর পাতিয়া বসিয়া বালিসের ওয়াড় শেলাই করিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই বলিলেন,—"ছেলেটি চ'লে গেল বুঝি? দিব্বি দেখতে কিন্তু। এই ত ক'দিন ছিল। কি করে ও, নিদাঘ?" তাঁহার মনটা আজ ভাল ছিল।

"পাটনায় প্রফেসারী করে।"

"কি জাত?

"কায়স্থ। দত্ত।"

সৌদামিনীর শেলাই বন্ধ হইল। মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কায়েত? পড়াশুনোয় কেমন?"

"এম এতে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়েছিল।"

সৌদামিনী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "ও মা, এত ভাল ছেলে! কিন্তু এ দিকে ত খুব বিনয়ী নম্র—" সৌদামিনী ভাবিতে লাগিলেন।

তনু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "নিদাঘদা, দিদির ছবি কেমন হয়েছে, দেখাও না।"

নিদাঘ হাসিয়া বলিল, "ছাই হয়েছে! 'চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতানু'—"

সৌদামিনী মাঝখান হইতে প্রশ্ন করিলেন,—"বিয়ে হয়েছে?"

"কার? ওঃ—না, সে বিয়ে করবে না।—যার ফটো, তাকে ডেকে আন, তার পর দেখাচ্ছি।"

কবিতা বলার জন্য মুখ ভার করিয়া তনু চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি পড়ছে, এখন আসতে পারিবে না।"

"আচ্ছা, চল তবে আমিই যাচ্ছি—"

নিদাঘ অণুর পড়িবার ঘরে উপস্থিত হইল।

অণু গম্ভীরভাবে পড়া মুখস্থ করিতেছিল। নিদাঘ ফটোখানা বুক-পকেট হইতে বাহির করিয়া টেবলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"এই নাও।"

অণু ফটোর দিকে দৃষ্টিপাত করিল না, পড়া মুখস্থ করিতে লাগিল।

"এখনও রাগ পড়েনি দেখছি" বলিয়া নিদাঘ অণুর সম্মুখস্থ চেয়ারটায় বসিল। তনু উৎসুকভাবে দিদির অনাদৃত ছবিটার পানে হাত বাড়াইতেছিল। নিদাঘ তাহাকে প্রশ্ন করিল, "তোর দিদি আজকাল দুপুরবেলা ঘুমোয় রে, তনু?"

"না, ঘুমোয় না। তুমি ব'কে অবধি—" দিদির চোখে ভ্রূকুটি দেখিয়া তনু সহসা থামিয়া গেল।

নিদাঘ খুশী হইয়া বলিল, "কথাটা যখন শোনাই হয়েছে, তখন আর রাগ কেন? এস—ভাব।" বলিয়া যেন শেক-হ্যাণ্ড করিবার জন্য ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিল।

অণু হাসিয়া ফেলিল। ভাব হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে নিদাঘ বলিল, "খুব ত লেখা-পড়া হচ্ছে! কিন্তু এ রকমটা আর বেশী দিন চলবে না।"

"কেন?"

নিদাঘ ফটোখানা তুলিয়া লইয়া নিবিষ্ট-মনে দেখিতে দেখিতে বলিল, "কেন?—অম্‌নি।" বলিয়া একটু একটু হাসিতে লাগিল।

"হাসছ কেন?"

"অম্‌নি।"

"যাও" বলিয়া অণু আরক্তিম মুখখানা নীচু করিয়া ফেলিল। নিদাঘ তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল,—"বুঝতে পেরেছ ত? তবে 'যাও' কেন! ভাবতে দোষ নেই, বল্লেই বুঝি দোষ?"

মুখ নীচু করিয়াই অণু বলিল,—"আমি বুঝি ভাবি?"

"ভাবো না?"

"যাও।"

তনু বলিল,—দিদি আজকাল খুব ভাবে, নিদাঘদা। পড়তে পড়তে ভাবে, খেলতে খেলতে ভাবে—"

অণু তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "তুই থাম্। ভারী গিন্নী হয়েছেন। নিদাঘদা, আমার তর্জ্জমার খাতাটা দেখে দাও না।" বলিয়া তাড়াতাড়ি একখানা খাতা আগাইয়া দিল।

হাস্য-মুখে খাতাটা তুলিয়া লইয়া নিদাঘ দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সহজ কণ্ঠস্বর উত্তরোত্তর এক এক পর্দ্দা চড়িতে লাগিল—"এর নাম ইংরিজী লেখা!—কি লিখেছ মাথামুণ্ডু!—লেখবার সময় মন কোথায়..—বাঃ, নিজের ব্যাকরণ তৈরী করা হয়েছে দেখছি যে—এ কথাটি কি? কি চমৎকার হাতের লেখাই হচ্ছে দিন দিন—পীজন্ বানান্ এই—" অপরাধী শব্দটাকে পেন্সিলের একটা নিষ্ঠুর খোঁচা দিয়া নিদাঘ ক্রুদ্ধ হস্ত-সঞ্চালনে খাতাটা টান মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"দরকার নেই তোমার পড়াশুনো ক'রে। ফেলে দাও বইগুলো। যার পড়াশুনো করবার ইচ্ছে নেই, তাকে মিছি-মিছি পড়িয়ে লাভ কি?"

বকিতে বকিতে নিদাঘ চলিয়া গেল।

অণু এতক্ষণ নীরবে তিরস্কার শুনিতেছিল। নিদাঘ চলিয়া গেলে সে হঠাৎ টেবলের উপর একখানা বইয়ের পাতার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া মনের আবেগ চাপিতে লাগিল।

তনু বেচারী এই দৃশ্যের সাক্ষিস্বরূপ দাঁড়াইয়া দিদির উপর এই তিরস্কার শুনিতেছিল। সে অণুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ম্লান-মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "দিদি, কাঁদছ?"

অণু মুখ তুলিল। তখন তনু অবাক্ হইয়া দেখিল, হাসির অদম্য উচ্ছ্বাস চাপিবার চেষ্টায় দিদির গৌরবর্ণ সুন্দর মুখখানি একেবারে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

৩

এই ঘটনার প্রায় দিন পাঁচেক পরে নিদাঘ অণুদের বাড়ী মাথা গলাইবামাত্র সৌদামিনী তাহাকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা নিদাঘ, তোমার সঙ্গে ত তোমার ঐ বন্ধুটির অনেক দিনের জানাশোনা—"

"হ্যাঁ, প্রায় ১০ বছরের। স্কুল থেকেই একসঙ্গে পড়েছি।"

"তা হ'লে ওর বিষয় তুমি সমস্তই জানো—"

"সমস্তই। ওর স্বভাব-চরিত্র খুবই ভাল—তা না হ'লে আমার বন্ধু হ'তে পারত না। লেখাপড়ার কথা ত বলেইছি।"

"বাপ-মা আছেন?"

"না।"

"তা হ'লে ও যা উপার্জ্জন করে, তাতেই ওর বেশ চ'লে যায়?"

"স্বচ্ছন্দে। প্রফেসারী করে ও সখের জন্যে। ওর বাপ যা রেখে গেছেন, তাতে ওর তিন পুরুষের আরামে কেটে যাবে।"

সৌদামিনী উত্তেজনা দমন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "তা হ'লে অণুর জন্যে ওকে একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয় না? ছেলেটি সব বিষয়েই যখন সুপাত্র—তোমার বন্ধু—"

নিদাঘ শান্ত স্বরে বলিল,—"সূর্য্য বিয়ে করবে না, মাসীমা।"

সৌদামিনী ঈষৎ রুক্ষ স্বরে কহিলেন,—"ছেলেমানুষ, টাকার অভাব নেই, বিয়ে করবে না, এ কি আবার একটা কথা হ'ল! চিরকাল আইবুড় থাকতে গেলই বা কোন্ দুঃখে? এমন নয় যে, স্ত্রীকে খেতে দিতে পারবে না। আর তোমরাও ত বন্ধুবান্ধব আছ, বুঝিয়ে বললে কি বোঝে না?"

তাঁহার ঝাঁজ দেখিয়া নিদাঘ একটু হাসিয়া বলিল,—"বোঝাতে আমি ত্রুটি করিনি মাসীমা। বন্ধু ত আমারই।"

সৌদামিনী নরম হইয়া বলিলেন,—"তবু আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না, বাবা। এ ত তোমারই করা উচিত, নিদাঘ। এক দিকে অণু আর এক দিকে তোমার বন্ধু। দু' জনের বিয়ে হ'লে কি চমৎকারই হবে, একবার ভেবে দেখ ত।"

কল্পনাটা কতদূর প্রীতিপ্রদ হইল, তাহা নিদাঘের মুখের

দিকে ভাল করিয়া তাকাইলেই সৌদামিনী হয় ত দেখিতে পাইতেন; কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। নিদাঘ উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "বেশ, আপনি যখন বলছেন, তখন আমি আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখব।"

বলিয়া ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

হরিধন মিত্রের পরিবারের সহিত সতীকুমার বাবুদের পরিচয় আজিকার নহে। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে সতীকুমার যখন হরিধন বাবুর বাটীর পাশে জমী ক্রয় করিয়া বাসস্থান প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হন, তখন ধনী প্রতিবেশীর নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই সহায়তার ফলে সতীকুমার হরিধন বাবুর নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন। ক্রমে এই কৃতজ্ঞতা উভয় পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল।

সৌদামিনীর সহিত নিদাঘের মাতার মনের মিল কিন্তু ততটা হইতে পায় নাই—যতটা উভয় পরিবারের কর্ত্তাদিগের মধ্যে হইয়াছিল। বোধ হয়, সৌদামিনী অপরার অতুল ঐশ্বর্য্যের জন্য মনে মনে তাহাকে একটু ঈর্ষ্যা করিতেন। তা ছাড়া মিত্র-পরিবারের বংশানুগত মূর্খতার জন্য তিনি তাহাদিগকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে যে না দেখিতেন, এমন বলা যায় না। শিক্ষা-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীর গৃহিণীর মনে শিক্ষার অভিমান একটু বেশী পরিমাণেই থাকিবার কথা।

অণুর সহিত নিদাঘের বিবাহ হইতে পারে, এ সম্ভাবনার কথা সৌদামিনী কখনও ভাবেন নাই, এমন নহে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার মনে দুই একটি ক্ষুদ্র বাধা ছিল। প্রথমতঃ নিদাঘ তাঁহার মতে তেমন সুশিক্ষিত নহে। বাড়ীতে বসিয়া পড়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি অর্জ্জন করা এক জিনিষ নহে। অতএব বিশ্ববিদ্যালয় যাহাকে উচ্চ উপাধি দেয় নাই, এমন পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতে তাঁহার মাতৃহৃদয় যে ব্যথিত হইয়া উঠিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? দ্বিতীয়তঃ অণুকে নিদাঘের মা'র পুত্রবধূ হইতে হইবে, এটাও না জানি কেন তাঁহার কাছে বিশেষ প্রীতিপ্রদ বোধ হইত না।

কিন্তু মেয়ের ১৬ বছর বয়স পর্য্যন্ত কেন যে তিনি তাহার বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই, তাহাও বলা কঠিন। বোধ করি, তিনি অণুর বিবাহের ভারটা ভগবানের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, অণুর অদৃষ্টে যদি নিদাঘই থাকে, তবে কেহই তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে না। এরূপ ভাবার একটি সূক্ষ্ম কারণ এই যে, নিদাঘদের বার্ষিক আয় যে আশী হাজার টাকার এক পয়সা কম নহে, তাহাও সৌদামিনীর অবিদিত ছিল না।

এমন সময় সূর্য্য আসিয়া দেখা দিল। সূর্য্য দেখিতে শুনিতে খুবই সুন্দর, বিদ্বান্, আর্থিক অবস্থাও ভাল। সৌদামিনী সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ভগবানের হাত ছাড়াইয়া নিজের হাতে হাল ধরিলেন। ইহাতে ভগবান্ স্বস্তি বোধ করিলেন কি বিমর্ষ হইলেন, মানুষের সসীম দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িল না এবং পরিষ্কার আকাশের মাঝখানে কোথা হইতে যে একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া পড়িল, তাহাও এক অন্তর্য্যামী ছাড়া সকলের অগোচরে রহিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিদাঘ অনেকক্ষণ নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শেষে সূর্য্যকে এইরূপ পত্র লিখিল,—

"বন্ধু,

তোমার ব্রহ্মচর্য্যরূপ কঠোর তপস্যায় স্বর্গে দেবতারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছেন। শীঘ্রই তোমার বিরুদ্ধে এক ঝাঁক অপ্সরা স্বর্গ থেকে রওনা হবে। অতএব আমার উপদেশ, এখনও তোমার এ বিষয়ে একটু সতর্ক হওয়া দরকার। দেবতাদের বেশী চটানো ভাল নয়। মর্ম্মার্থ:— শীঘ্র বিয়ে ক'রে ফেল। তোমার জন্য একটি খুব ভাল পাত্রী পাওয়া গেছে। আমার অনেক দিনের বন্ধু—নাম অণিমা। তুমি যার ফটো তুলেছিলে।

তোমার অভিমত অবিলম্বে জানাইবে। ইতি।"

চিঠিখানা নিদাঘ হাজার চেষ্টা করিয়াও আর বড় করিতে পারিল না। যে সকল যুক্তিতর্কের দ্বারা পূর্ব্বে সে অনেকবার সূর্য্যকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহার একটাও চিঠির মধ্যে স্থান পাইল না।

৮ দিন পরে সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের নীরব ক্ষতচিহ্ন বক্ষে লইয়া চিঠির জবাব আসিল। চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়িয়া নিদাঘ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকখানি ভণিতা করিয়া শেষে সূর্য্য লিখিয়াছে—মানুষের জীবন বেশীর ভাগই দুঃখময়, তাহার মধ্যে যতটুকু সুখ পাওয়া যায়, মানুষের বরণ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য,—অবিবাহিত জীবন এক হিসাবে ভাল,

কিন্তু পরিপূর্ণ নয়,—সে এত দিন নিজের ভুল বুঝিতে পারে নাই, অতএব—।

পত্রের শেষে পুনশ্চ করিয়া লেখা ছিল যে, নিদাঘ কেন তাহাকে এক অপরিচিতা কুমারীর ফটো তুলিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল. তাহা এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে।

নিদাঘ ভাবিতে লাগিল,—ভণ্ড! মিথ্যাবাদী! আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া—উঃ, এমন লোকের সহিত সে বন্ধুত্ব করিয়াছিল। এই দুর্ব্বল স্ত্রীলুব্ধ লোকটাকে সে এত দিন পরমাত্মীয় মনে করিতেছিল। ধিক্!

নিদাঘ অণুকে ভালবাসিত। ছেলেমানুষী ভালবাসা নহে, নিজের সহচরীর মত—প্রেয়সীর মত ভালবাসিত। কবে যে অণুর প্রতি এই ভাবটা প্রথম জাগিয়াছিল, তাহাও তাহার বেশ মনে আছে। বছর তিনেক আগে ঠাণ্ডা লাগাইয়া অণু এক দিন অসুখ করিয়া বসে। সেই অসুখের খবর প্রথম শুনিয়া নিদাঘ বুঝিয়াছিল, অণু তাহার জীবনের কতখানি। সেই দিন হইতে সে স্থির জানিয়াছিল যে, অণু না হইলে তাহার চলিবে না এবং একান্ত আত্মবিশ্বাসে সে একবার ভাবিতেও পারে নাই যে, কোনও কারণেই অণু তাহার দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে। এই ভাবে ৩ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নিদাঘ মনে ভাবিয়াছে—আর কিছু দিন যাক, আর একটু বড় হোক—লেখাপড়া শিখুক;—কিন্তু মনের কথা ইঙ্গিতেও কাহাকে জানিতে দেয় নাই।

কিন্তু শেষে কি সত্যই তাহাকে আশা ছাড়িতে হইবে? নিদাঘ কল্পনানেত্রে অণু-হীন ভবিষ্যৎ জীবনটা দেখিতে চেষ্টা করিল। ব্যর্থ! ব্যর্থ! কোথাও একটু রস নাই, স্বাদ নাই, গন্ধ নাই। আগাগোড়া একটা বজ্রাহত বিদীর্ণ-বক্ষ বৃক্ষের মত নিষ্প্রাণ—অভিশপ্ত।

কতক্ষণ যে এইভাবে বন্ধুর চিঠি মুঠার মধ্যে লইয়া চেয়ারে বসিয়া কাটিয়া গিয়াছিল, তাহা নিদাঘ কিছুই জানিতে পারে নাই। সন্ধ্যার পর মা ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ রে, ঘরে চুপটি ক'রে ব'সে আছিস যে, বেড়াতে যাসনি?"

"ওঃ" বলিয়া নিদাঘ চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল। তাই ত! এ যে রাত্রি হইয়া গিয়াছে।

মা ইলেক্ট্রিক বাতি জ্বালিয়া ছেলের মুখ দেখিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে কহিলেন,—"অসুখ করেছে না কি, নিদাঘ! মুখ ভারি শুকনো দেখাচ্ছে।"

"মনটা ভাল নেই" বলিয়া নিদাঘ তাড়াতাড়ি অন্যত্র চলিয়া গেল।

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া সে কথাটা অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে ভাবিতে চেষ্টা করিল। সে অণুকে ভালবাসে। সূর্য্যও বোধ হয় তাহাকে দেখিয়া—হাঁা, বোধ হয় কেন—নিশ্চয়। তাহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? সূর্য্য তাহার বাল্যকালের বন্ধু—তাহার আপনার বলিবার পৃথিবীতে কেহ নাই। নিদাঘের মা আছেন, বাপ আছেন। এ ক্ষেত্রে—কিন্তু তবু অন্যায়! অন্যায়! ছেলেবেলা হইতে অণু তাহারই—আর কাহারও অণুর উপর দাবী নাই। আবার সূর্য্য সকল বিষয়ে সুপাত্র—নিদাঘের তুলনায় সুপাত্র;—তাহার রূপ আছে, বিদ্যা আছে, অর্থ আছে; কন্যার এবং কন্যার পিতামাতার যাহা কিছু প্রার্থনীয়, সমস্তই তাহার আছে। অণু যদি তাহার হাতে পড়িয়া সুখী হয়, তাহা হইলে নিদাঘের কি কর্ত্তব্য নহে—

স্বার্থত্যাগ? হাঁ, যাহাকে ভালবাসে, তাহার জন্য এই স্বার্থত্যাগ সে করিতে পারিবে না? যদি না পারে, তবে তাহার ভালবাসার মূল্য কি? এবং কেই বা সে মূল্য দিবে?

সোদামিনী ঠিকই বলিয়াছিলেন, এক দিকে অণু আর এক দিকে সূর্য্য—ইহাদের মিলনের অপেক্ষা সুখের আর কি হইতে পারে? কিন্তু—নিদাঘ চিন্তা করিতে লাগিল।

সে কি নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করে নাই? কি দরকার ছিল অণুকে সূর্য্যের সম্মুখে বাহির করিবার? সূর্য্য যদি ইহাকে ঘট্‌কালীর চেষ্টা বলিয়া ভাবিয়া থাকে ত তাহাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কিরূপে? দোষ ত সম্পূর্ণ তাহার নিজের। কেন সে নির্ব্বোধের মত নিজের দুর্ভাগ্যকে এমন ভাবে টানিয়া আনিল? এখন নির্ব্বুদ্ধিতার দণ্ডভোগ তাহাকে করিতেই হইবে।

বিছানার উপর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া নিদাঘ মনে মনে বলিল,—'দণ্ডভোগ আমাকে করিতেই হইবে। সুতরাং আর ভাবনার কিছু নাই।' বলিয়া শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু নিদ্রা সে রাত্রিতে তাহাকে স্নেহক্রোড়ে স্থান দিল না।

৪

পরদিন প্রভাতে নিদ্রাহীন রজনীর সমস্ত গ্লানি মুখে চোখে বহন করিয়া নিদাঘ চিঠি হাতে সৌদামিনীর নিকট উপস্থিত হইল। হাসিয়া বলিল, "মাসীমা, আপনিই ঠিক বুঝেছিলেন। ১০ বৎসরের বন্ধুত্বের ওপর নির্ভর করেও আজকাল আর কোনও কথা বলা চলে না। এই নিন্।" বলিয়া চিঠিখানা তাঁহার হাতে দিল।

চিঠি পড়িয়া সৌদামিনী সগর্ব্বে একমুখ হাসিয়া বলিলেন, "বলেছিলুম কি না আমি? আমরা যেমন মানুষের মন বুঝতে পারি, তোমরা কি তা পার? হাজার হোক, আমরা মেয়েমানুষ আর তোমরা পুরুষমানুষ!"

এ কথা নিদাঘ অস্বীকার করিতে পারিল না। তাঁহার মন বুঝিবার শক্তি যে অসাধারণ, ইহা সে বারবার ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ করিতে করিতে গমনোদ্যত হইল।

তনু উপরতলা হইতে নিদাঘের গলা শুনিতে পাইয়াছিল, নীচে আসিয়া বলিল,—"নিদাঘদা, একবার ওপরে এসো না, দিদি ডাক্‌ছে।"

"দিদি ডাকছে!" নিদাঘ স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিদ্যুতের শিখার মত তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রাগে জ্বলিয়া উঠিল। অণুর যে এই অসম্ভব স্পর্দ্ধা হইতে পারে, তাহা যেন সে কল্পনা করিতেই পারিল না। অত্যন্ত রুক্ষস্বরে কহিল,—"বল গিয়ে, আমি যেতে পারব না, আমার অন্য কায আছে।" তার পর সৌদামিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "এখন থেকে বোধ হয়, আমার মধ্যস্থতা আর দরকার হবে না, ভালও দেখাবে না। সূর্য্যর ঠিকানা মেসোমশায়কে দিয়ে যাচ্ছি, বাকীটা আপনারাই ক'রে নেবেন।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

নিদাঘের এই অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় তনু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, নিদাঘ যে পথে বাহির হইয়া গেল, সেই দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দুপ দুপ করিয়া সে উপরে চলিয়া গেল।

* * *

বিবাহের সম্বন্ধ যে এত শীঘ্র স্থির হইয়া যাইতে পারে, তাহা নিদাঘের জানা ছিল না। উল্লিখিত ঘটনার দিনদশেক পরে নিদাঘ সূর্য্যের একখানা পত্র পাইল। চিঠিখানা আগাগোড়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ। সূর্য্য লিখিয়াছে যে, বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। দিন এখনও ঠিক হয় নাই—শীঘ্রই হইবে। দাম্পত্যজীবনের অপরিসীম সুখ যাহা সে শীঘ্রই লাভ করিবে, তাহার জন্য সমস্ত প্রশংসা নিদাঘেরই প্রাপ্য। নিদাঘই যে তাহার একমাত্র প্রকৃত বন্ধু, তাহা সে চিরদিনই জানিত, সে বন্ধুত্ব যে এতখানি অমৃতময় হইয়া উঠিবে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু বন্ধুর চরম সুখের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই নিদাঘের ক্ষান্ত হওয়া উচিত নহে, সে নিজেও যাহাতে ঐ সুখ অচিরাৎ লাভ করে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। সূর্য্য নিজেও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট নাই। দানের পরিবর্ত্তে প্রতিদান সে যেমন করিয়া হউক শীঘ্রই দিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিদাঘ চিঠিখানা একপাশে সরাইয়া রাখিল। তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে স্তিমিত রেখার মত যে হাস্য বিকশিত হইল, তাহাতে মথিত হৃদয়ের ক্রন্দন চাপা পড়িয়াছিল কি?

হঠাৎ তাহার মনে হইল যে, এই বিবাহ উপলক্ষে অণুকে তাহার অভিনন্দন জানানো সঙ্গত—বুকে আগুন জ্বালিয়া থাকিলে চলিবে না। ক্রূর আত্মপরিহাসের তিক্ত রসটা বিন্দু বিন্দু করিয়া পান করিয়া সে যেন তখন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে যে কত খুসী হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য কি কি রসিকতা করিবে, তাহারই একটা চিত্র মনে উদিত হওয়ায় সে আপনা আপনি হাসিয়া উঠিল। ভাবিল, মানুষ কি নির্ব্বোধ, দুঃখকে উপভোগ করিতে জানে না।

কয়দিন যাবৎ শরীরের বিশেষ যত্ন লওয়া হয় নাই। আজ বেশ ভাল করিয়া স্নান করিয়া, চুল আঁচড়াইয়া, একটা চাদর লইয়া নিদাঘ সতীকুমার বাবুর বাড়ী গেল এবং নীচে অপেক্ষা না করিয়া একবারে উপরে উঠিয়া গেল। উপরে উঠিয়া 'তনু অণু' করিয়া দুইবার ডাকিল; কিন্তু তনুর সাড়া পাওয়া গেল না। তনু উপরে নাই মনে করিয়া সে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া অণুর ঘরে প্রবেশ করিল।

অণু বিছানার উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। তাহার চুলগুলা রুক্ষ এবং মুখখানা অত্যন্ত নিষ্প্রভ। মাথার কাছে টুলের উপর একটা অডিকলোনের শিশি ও একটা কাচের পেয়ালা।

নিদাঘ দোরগোড়াতেই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। এ কি! অণুর অসুখ করিয়াছে!

জুতার শব্দে চোখ মেলিয়া, নিদাঘকে দেখিয়া অণু বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে নিদাঘ বলিল,—"তোমার অসুখ করেছে, কৈ, আমি ত কিছু জানতুম না।"

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া অণু বলিল,—"সে দিন আমি তোমাকে ডেকে পাঠালুম, তুমি এলে না কেন?"

নিদাঘ আরক্তমুখে বলিল,—"তোমার যে অসুখ, তা ত আমি—বড্ড জ্বর হয়েছে না কি?" বলিয়া তাহার কপালের দিকে হাত বাড়াইয়াই সে উহা টানিয়া লইল।

অণু বলিল,—"জ্বর হয়নি, বড্ড মাথা ধরেছে। কদিন থেকে সমানে যন্ত্রণা হচ্ছে—"

নিদাঘ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"যাক, কিন্তু ওষুধ-বিষুধ খাওনি কেন? শুধু অডিকলোনে কি মাথা-ধরা যায়? মেসোমহাশয়কে একবার বল্লেই ত—"

অণু বিরক্ত হইয়া বলিল,—"বাবা আবার কবে আমাদের ওষুধ দেন, নিদাঘদা? তুমিই ত চিরকাল দাও।"

অপরাধের ভারে নিদাঘ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। হোমিওপ্যাথিক বাক্সটার জন্য সে একবার ঘরময় ওলট্-পালট্ করিয়া বেড়াইল, কিন্তু বাক্সটা কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া হাসিবার একটা অসম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়া বলিল,—"ওষুধের বাক্সটা খুঁজে পাচ্ছি না। যাক গে, ও ওষুধে আর কি হবে? শীগ্‌গির তোমার মাথা ধরার একটা খুব ভাল ওষুধ আসছে।"

অণু কিছুই বুঝে নাই, এমনই ভাবে বলিল,—"কোথা থেকে? কি ওষুধ?"

নিদাঘ গম্ভীরভাবে বলিল,—"পাটনা থেকে, শ্রীমান্ সূর্য্যকান্ত।"

অণু চুপ করিয়া রহিল। নিদাঘ বলিল,—"চুপ করলে কেন? ভাল ওষুধ নয়?"

শ্রান্তকণ্ঠে অণু বলিল,—"তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি, নিদাঘদা, যে, তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ?"

নিদাঘ সহসা চমকিয়া উঠিল। এ কি কথা অণুর মুখে? সে তাহার প্রতি শত্রুতা করিতেছে!

কয়েক মুহূর্ত্ত নিদাঘ বিস্ময়স্তম্ভিতভাবে ষোড়শী তরুণীর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া সকলেই অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু একপক্ষের যে প্রধান উপলক্ষ, সেই অণুর বিবাহ-বিষয়ে কোনও মতামত থাকিতে পারে, এ চিন্তা ত তাহাদের কাহারও মনে উদিত হয় নাই! অণু এখন জ্ঞানহীন বালিকা নহে। সে প্রাপ্তযৌবনা; শিক্ষাপ্রাপ্তা নারী। তাহার হৃদয় লইয়া—ভবিষ্যৎ লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার অধিকার কাহারও আছে কি?

ক্ষুব্ধকণ্ঠে নিদাঘ বলিল, "আমি তোমার শত্রু, অণু? তোমার মঙ্গলের জন্য—"

তাহার সুগৌর বাহুলতা আন্দোলিত করিয়া মধ্যপথে বাধা দিয়া অণু বলিল, "তোমায় পায় পড়ি, নিদাঘদা, ও কথা আর তুলো না।"

তার পর সহসা দীপ্তকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "হিন্দুর মেয়ের কখনো দু'বার বিয়ে হয়, দেখেছ?"

বজ্রাহতভাবে নিদাঘ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চটুল রসনা নির্ব্বাক্ হইয়া গেল।

শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ঐ যে তরুণী উচ্ছ্বসিত হৃদয়বেগকে সংবরণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, উহার আন্দোলিত দেহের অন্তরালে—হৃদয়ের মধ্যে কি দুর্ভেদ্য রহস্য বিরাজিত, তাহা নির্ণয় করিবার মত শক্তি মূঢ় নিদাঘের আছে কি?

স্খলিত-কণ্ঠে নিদাঘ বলিল, "কি বলছ, অণু? বিয়ে—দু'বার—"

অণু শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া মিনতিপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "আমার জন্য তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। আমি মাকেও বলেছি, তোমাকেও বল্লাম। আমাকে একাই থাকতে দাও।"

বিমূঢ় নিদাঘ কোন কথাই খুঁজিয়া পাইল না। বিচিত্র এই নারী—বিধাতার সৃষ্ট জগতে নারীর হৃদয় বুঝিবার চেষ্টা করা পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার!

এ পর্য্যন্ত অণুর ব্যবহারে সে কোনও ইঙ্গিত পায় নাই। আজ যেন সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া গেল। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপুল আনন্দের শিহরণ তাহার সর্ব্বদেহে লীলায়িত হইয়া উঠিল।

"নিদাঘদা, মা তোমায় ডাকছেন।" বলিয়া, আনন্দ নির্ঝরের ন্যায় তনু কক্ষমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তার পর দিদির দিকে চাহিয়া দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা কি বুঝিল, সেই জানে। সে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার নিদাঘদার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

নিদাঘ কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "অণু, আজ একটা মস্ত ভুলের হাত থেকে আমরা দু'জনেই বেঁচে গেছি। এর জন্য তোমার কাছেই আমাকে চিরঋণী থাক্‌তে হবে।"

তনু সহসা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তার পর হাসির বিরামস্থলে বলিয়া উঠিল,—"দিদি, তোমার মাথা-ধরা ছেড়ে গেছে? এই জন্যে বুঝি রোজ জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে আর বল্‌তে, মাথার যন্ত্রণা—"

অণু নিদাঘের স্মিত-সস্নেহ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

তনুর হাসি সহজে থামিল না। সে ছেলেমানুষ হইলেও বুদ্ধিতে ছোট নহে। তার পর নিদাঘের হাত ধরিয়া বলিল, "চল, মা তোমাকে এখুনি ডাক্‌ছে।"

নিদাঘ নীচে নামিয়া আসিয়া সৌদামিনীর ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"মাসীমা, ভেবে দেখলুম, অণুর এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

মাসীমা বলিলেন, "সেই কথা বল্‌ব ব'লে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তোমার বাবার কাছ থেকে উনি, এইমাত্র অনুমতি নিয়ে ফিরে এসেছেন। তোমার মা'রও মত আছে। এখন বাবা, তুমি অণুকে গ্রহণ না করলে—"

নত হইয়া নিদাঘ তাড়াতাড়ি তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ করুন, মাসীমা।"

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদায়-আশীর্ব্বাদ

শুধু ক্ষমা—শুধু আশীর্ব্বাদ
ক'রে যাই বিদায়ের বেলা,
নিয়ে যাই—পাথেয়-স্বরূপ—
প্রিয়তম তব অবহেলা।

দিয়ে যাই আর কিবা দিব
নয়নের এক বিন্দু নীর,
অন্তরের অন্তস্তল হ'তে
দীর্ঘশ্বাস একটি গভীর।
নিয়ে যাই দাহময় স্মৃতি
রেখে যাই চির-বিস্মরণ,
বঁধু তুমি রবে বঁধু মোর
যত দিন না আসে মরণ।
বঁধু তব বধির শ্রবণে
গাহিয়াছি প্রেমপূর্ণ গীতি—
কৃপণের দুয়ারে আসিয়া
ফিরে গেছি বুভুক্ষু অতিথি।
সিন্ধু-কূলে শৈলপাদ-মূলে
তরঙ্গের বৃথা গতায়াত,
ব্যর্থকাম ফিরে যাই আজি
হৃদে লয়ে নির্ম্মম আঘাত।
বুক ফাটে রুদ্ধ অভিমানে
আঁখি ভাসে উত্তপ্ত ধারায়
তবু ক্ষমা—তবু আশীর্ব্বাদ
আজি এই বিদায়-বেলায়।

যাই তবে যাই আমি, তব
নয়নের পথ হ'তে দূরে,
লক্ষ্যহারা উষ্ণ বায়ু সম
মরুপথে মিছে মরি ঘুরে।
যাই তবে বুকে ক'রে লয়ে
স্মৃতিটুকু পথের সম্বল,
জীবনের জাগ্রত স্বপন,
একাধারে মধু ও গরল।
নিশীথের দুঃস্বপন সম
ভুলে যাবে তুমি মোর কথা,
দূরে থেকে সুখী হব আমি
শুনে তব সুখের বারতা।
হয় হোক ম্লান মুখ মোর
হাসি-মুখ হউক তোমার,
যায় যাক্ ফেটে মোর বুক
সুখ তব হউক অপার।
জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি মম,
প্রিয়তম তব অবহেলা,
শুধু ক্ষমা—শুধু আশীর্ব্বাদ
ক'রে যাই বিদায়ের বেলা।

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা।

সিংভূম

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি নিদারুণ গ্রীষ্মে আমি ঘাটশিলায় গিয়া উপস্থিত হই।

তাম্র ও লৌহ প্রভৃতি যে সমুদয় খনিজ পদার্থ ঐ অঞ্চলের ভূগর্ভে নিহিত আছে—এমন কি, স্বর্ণও আছে বলিয়া অনুমিত

সুবর্ণরেখা নদী

হয়, তাহা উদ্ধৃত করিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কয়েকখানি আলোকচিত্র সংগ্রহ করিয়া সিংভূমের একটা মোটামুটি বিবরণ-প্রদানই মূল উদ্দেশ্য ছিল।

সিংভূমের সম্পূর্ণ ইতিহাস বিবৃত করা আমার উদ্দেশ্য নহে এবং ইহা আমার মত লোকের সাধ্যাতীত বলিয়াই মনে হয়।

পর্ব্বতমালায় পূর্ণ উল্লিখিত প্রদেশ কিওঞ্জর ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। তথাকার শৈলশ্রেণী সুনীল গগনপটে চিত্রিত মেঘমালার ন্যায় দূর হইতে অনুভূত হয়। শুনিলাম, বর্ষাকালে কোন কোন শৈলশৃঙ্গ হইতে স্তরে স্তরে জলধারা পতিত হইয়া সেই মনোহর পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করে। ঐ সমস্ত পর্ব্বত নিরাপদ্ নহে। নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত তাহাদের কন্দরে ও শিখরে হস্তী, ব্যাঘ্র ও ভল্লূক প্রভৃতি বনচর হিংস্র জন্তু সর্ব্বদা বিচরণ করে এবং প্রায়ই গভীর রজনীতে পর্ব্বত-পাদদেশস্থ লোকালয়ে আসিয়া পালিত পশু হনন পূর্ব্বক আহারার্থে লইয়া যায়। সেই সমুদয় বিপৎসঙ্কুল শৈলরাজিতে কেবল যে হিংস্রজন্তু বাস করে, এমন নহে; কখনও কখনও হরিণ, শশক প্রভৃতি নিরীহ পশুও বিচরণ করিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দেশটি অসমতল—কোনখানে উঁচু, কোন-খানে নীচু। নানাবিধ শিলারাশি বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক "সুবর্ণরেখা" ও "খরস্রোতী" প্রভৃতি তথাকার নদীগুলি প্রান্তর ভেদ করিয়া—আবার কোনখানে বা শৈলশ্রেণীর পাদ বিধৌত করিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। ঐ সব নদীর তলদেশ এরূপ প্রস্তরময় যে, তাহাতে নৌকা চলা দুষ্কর। কেবল বর্ষাকালেই নাকি ছোট ছোট খেয়া-নৌকার দ্বারা লোক নদী পার হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত নদীতে নানা-প্রকার জলচর পক্ষীকে বিচরণ করিতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ নয়নরঞ্জক স্রোতস্বতীতে ও শৈলমালায় সুশোভিত এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভাবুক চিত্রকরের দ্বারা অঙ্কিত হইবার উপযুক্ত।

সিংভূমের অন্তর্ব্বর্ত্তী ধলভূমে অবস্থিত যে ঘাটশিলায় কিছুদিনের জন্য আমি ছিলাম, তাহাতেই "ধল" বা ধবল"-বংশীয় রাজগণের পূর্ব্বপুরুষরা আসিয়া রাজধানী স্থাপন

সুবর্ণরেখা নদী —অপর দৃশ্য

খরস্রোতী নদীর পুল

করেন; এবং ক্ষমতা বিস্তার পূর্ব্বক বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কালের কুটিলচক্রে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-অর্জ্জিত গৌরব ও ক্ষমতা যদিও এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি এই পুরাতন রাজধানী আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া ধবল-বংশীয় অধিপগণের পূর্ব্বের সেই যশোভাগ্যের কথা জনসাধারণের স্মৃতিতে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

কথিত আছে, ধবলবংশীয় রাজগণ স্বনামধন্য নৃপাল বিক্রমাদিত্যের বংশসম্ভূত এবং উজ্জয়িনী হইতে আগমন পূর্ব্বক ধলভূমে রাজত্ব স্থাপন করেন। এ জন্য তাঁহারা "ধল" বা "ধবল" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ধবল-বংশীয়রা এ স্থানে আসিয়া রাজত্ব করার দরুণই এই অঞ্চলের নাম ধলভূম হওয়া অসম্ভব নহে। ধবলবংশীয় রাজগণের এক শাখা ঘাটশিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিছু দিন হইতে নরসিংগড়ে বাস করিতেছেন।

সিংভূম যে সুপ্রাচীনকাল অবধিই লোকের বাসভূমি ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ সময় হইতে তথায় লোক বাস করিত, ইহা সুনিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। যাহা হউক, ঐ প্রদেশের অন্তঃপাতী কোন কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি দ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতগণ কহেন—প্রাগৈতিহাসিক যুগেও যে উক্ত অঞ্চলে লোক বাস করিত, তাহা ঐ দুই একটি দ্রব্য প্রতিপন্ন করে।

সেই সুপ্রাচীনকালের ঐ অঞ্চলনিবাসী ব্যক্তিগণ কোন্ জাতীয় ছিল, এ কথা অবগত হওয়া যায় না। "সাঁওতাল" "কোল" ও "ভূমিজ" প্রভৃতি যে সমুদয় পার্ব্বত্যজাতীয় লোক অধুনা উক্ত অঞ্চলে বাস করিতেছে, সম্ভবতঃ তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষরাই সেই সময়ে তথায় বাস করিত। এতদ্ব্যতীত বর্ণিত প্রদেশের নাম কি পূর্ব্বাবধি সিংভূমই ছিল কিংবা অপর কোন আখ্যা ছিল, ইহাও বলিতে পারি না।

নরসিংগড়ের রাজবাড়ী

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কিওঞ্জর রাজ্যের আদিম নিবাসী "হো"-গণ বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে কাপ্তেন বীচিং (Captain Beeching) সসৈন্যে রাঁচি হইতে এই প্রদেশে আগমন করেন। সেই সময়ে তিনি চক্রধরপুর ও চাঁইবাসার সমীপে প্রবাহিত নদীতীরে যে কতিপয় প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্রব্য প্রাপ্ত হন, তৎসমুদয় আদিপ্রস্তর-যুগের বলিয়া অনুমিত হয়।

তাহার পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আরও কতকগুলি প্রস্তরের দ্রব্য ঐ অঞ্চল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে অতি দৃঢ়

শিলা-নির্ম্মিত যে একখানি বৃহৎ কুঠার এবং কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত আর একখানি ক্ষুদ্র কুঠার ছিল, ঐ দুইটিই ব্রহ্ম (বরমা)-দেশীয় অস্ত্রের অনুরূপ বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। এই কারণ বশতঃ উক্ত দুইটি কুঠার দেশান্তর হইতে আসিয়াছে, এইরূপ মনে হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ দুইটিই ঐ অঞ্চলের প্রস্তরে নির্ম্মিত।

বেণুসাগরে অবস্থিত গণেশমূর্ত্তি

* সার্ আর্থার ফেয়ার (Sir Arthur Phayre) বলেন—ব্রহ্মদেশের যে ইরাবতী উপত্যকা হইতে প্রস্তরনির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তথায় "মন" নামক জাতিবিশেষ লোক বাস করে। তাহাদিগের ভাষা এবং সিংভূমনিবাসী "মুণ্ডা"গণের ভাষাতে অনেক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে অনুমিত হয় যে, সুদূরদেশনিবাসী উক্ত দুই বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে একদা কোনরূপ সংস্রব ছিল। অথবা এক ধারা হইতেই এই দুই পৃথক্ জাতি উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

সিংভূমের সুপ্রাচীন বিষয় যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া নূতন কোনও বিষয় অবগত নহি। তবে কালক্রমে উহা যে প্রস্তরযুগের তিমিরাবরণ অপসারিত করিয়া সভ্যতার আলোতে আলোকিত এবং নানা সভ্যদেশের বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিল, এ বিষয় উক্ত অঞ্চল হইতে উদ্ধৃত বিভিন্ন প্রদেশের মুদ্রা প্রতিপন্ন করে। কিন্তু কোন্ সময়ে কিরূপে তাহা সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা অবগত হওয়া যায় না।

বর্ণিত প্রদেশের সংলগ্ন ময়ূরভঞ্জের অন্তঃপাতী "বামনহাটী" নামে যে পুরাতন গণ্ডগ্রাম অবস্থিত, জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেখান হইতে "কনষ্টেণ্টাইন" (Constantine) ও "গর্ডিয়েন" (Gordian) প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ রোমীয় সম্রাট্গণের প্রচলিত বহু স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চাইবাসার দক্ষিণদিকের একটি গ্রাম হইতে তাম্রমুদ্রা-পূর্ণ একখানি পাত্র পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি "ইন্দো-সাইথিয়েন" (Indo-Seythian) মুদ্রা বলিয়া সম্ভাবিত হয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সুদূর দেশনিচয় ও এই প্রদেশের মধ্যে কোন এক কালে বাণিজ্য-ব্যবসা প্রচলিত ছিল এবং তদুপলক্ষেই মুদ্রাগুলি মেদিনীপুরের অন্তর্ভূত রূপনারায়ণ নদের তীরবর্ত্তী প্রাচীন নগর "তাম্রলিপ্ত" হইতে উক্ত প্রদেশে আসিয়া থাকিবে—এইরূপ অনুমিত হয়।

উল্লিখিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের নিদর্শন ব্যতিরেকে নিম্নে যাহা বিবৃত হইতেছে, তাহার দ্বারা এই প্রদেশের প্রাচীন গৌরবের বিষয়ও জ্ঞাত হওয়া যায়।

সিংভূমের দক্ষিণ প্রান্তে "বেণুসাগর" নামে খ্যাত যে প্রাচীন জনপদ আছে, একদা তথায় কতিপয় মন্দির ও নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান ছিল—এইরূপ জানিতে পারা যায়। অধুনা সেই সমুদয় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশিতে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে সমুদয় প্রস্তরমূর্ত্তি ছিল, ইহার কতকগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে,—সেই সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কহেন—ঐ সমুদয় মূর্ত্তির শিল্পচাতুর্য্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর কারুকার্য্য হইতে কোন অংশেই হীন নহে, বরং উৎকৃষ্ট।

বর্ণিত জনপদ হইতে প্রায় ৬।৭ মাইল দূরে অবস্থিত ময়ূরভঞ্জের অন্তর্বর্ত্তী "খিচিং" নামে প্রসিদ্ধ স্থানে যে সমুদয় মূর্ত্তি আছে, উল্লিখিত মূর্ত্তি-নিচয় তদনুরূপ বলিয়া কথিত হয়। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এক কালে "বেণুসাগর" ময়ূরভঞ্জের অন্তর্ভূত ছিল। তাহাতে মনে হয়—"খিচিং" ও "বেণুসাগর"এর মূর্ত্তিগুলির প্রতিষ্ঠাতা একই ব্যক্তি হইবে।

জনশ্রুতি এই—"শশাঙ্ক" নামে সুপ্রসিদ্ধ জনৈক বুদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী নৃপালের দ্বারা "খিচিং"এর মূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক "হিউএন্-তসেং"এর লিখিত তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উল্লিখিত নৃপাল "কর্ণসুবর্ণপুর" নামক একটি প্রখ্যাত নগরীতে রাজত্ব করিতেন। সেই জনপদ কোথায় ছিল এবং তাহার কোন নিদর্শন বর্ত্তমান আছে কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ জেনারল কনিংহাম (General Cunningham) অনুমান করেন, সিংভূম কিংবা বরাভূম প্রদেশের অন্তর্গত সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী কোন এক স্থানে নৃপাল শশাঙ্কের রাজধানী "কর্ণসুবর্ণপুর" অবস্থিত ছিল; কিন্তু এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন না।

দেবনাগরী অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপিবিশিষ্ট খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর যে দুইটি তাম্রশাসন ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত "বামনঘাটী" গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে উৎকীর্ণ লিপি হইতেও এই অঞ্চলের পূর্ব্ব-গৌরবের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উক্ত দুইটি তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, ভঞ্জবংশীয় নৃপালগণ অনেক ব্যক্তিকে অনেক জনপদ দান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই বংশ হইতেই ময়ূরভঞ্জের রাজবংশ সম্ভূত। উক্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ নৃপাল "বীরভদ্র" বর্ণিত প্রদেশের অন্তর্ভূত "তপোবন" নামে খ্যাত সুবিশাল অরণ্যে রাজত্ব করিতেন, এবং সেই সময়ে তথায় অগণিত সংসারত্যাগি

বেণুসাগরে অবস্থিত মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি

সাধু যোগসাধনে রত থাকিতেন। কথিত আছে, অদ্যাপি তাহাতে বহু সন্ন্যাসী অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীভগবানের আরাধনায় কালযাপন করিতেছেন।

প্রাগুক্ত বিষয় ব্যতিরেকে এই প্রদেশের অন্তর্গত নানা স্থানের নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ এবং সুপ্রাচীন কালের তাম্রখনি প্রভৃতির চিহ্ন এই অঞ্চলের অতীত সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন আজ পর্য্যন্তও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

"বেণুসাগর" নামে খ্যাত যে পুরাতন জনপদের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—কেশ্‌নাগড়ের অধিপতি 'কেশ্‌না'র পুত্র রাজা "বেণু" তদীয় নাম-সমন্বিত এখানকার সুপ্রসিদ্ধ দীর্ঘিকা "বেণুসাগর" খনন করান। কালক্রমে ইহার নামানুসারে জনপদটির নামও "বেণুসাগর"রূপে পরিণত হইয়াছে। উক্ত দীর্ঘিকা ব্যতীত তাঁহার দ্বারা এই স্থানে একটি দুর্গও নির্ম্মিত হইয়াছিল।

উক্ত সরোবরের অনেক অংশই মৃত্তিকারাশি ও এড়কাদি জলজ গুল্মলতাতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাহার কিয়দংশ এখনও জলময় পরিলক্ষিত হয় এবং জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাহার কোন কোন স্থান না কি অতীব গভীর।

বর্ণিত জলাশয়ের মধ্যবর্ত্তী একটি দ্বীপোপরি যে কতকগুলি ভগ্নমন্দিরাদি একদা বিদ্যমান ছিল, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই সমুদয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর নির্ম্মিত—বেগলার (Beglar) সাহেব এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তথায় অবস্থিত প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তিনি বলেন—এখানে যে সমুদয় মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে কেবল দুইটি ব্যতীত আর সমস্ত মূর্ত্তিই হিন্দুধর্ম্মানুসারে নির্ম্মিত। ঐ দুইটির মধ্যে ক্ষুদ্রাকারের নগ্ন মূর্ত্তিটিকে জিন-মূর্ত্তি বলিয়াই মনে করি। শিক্ষাপ্রদানের হস্ত-ভঙ্গীতে উপবিষ্ট আর একখানি মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার কুঞ্চিত কেশদাম উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ বুদ্ধমূর্ত্তির কেশের অনুরূপ। কিন্তু ইহা জিনমূর্ত্তি হওয়াও বিচিত্র নহে। অপরগুলি মহাদেব, কালী, গণেশ, মহিষমর্দ্দিনী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীরই প্রতিমূর্ত্তি। ঐ সমস্তের মধ্যে নতজানুকৃত যে একখানি হস্তিমূর্ত্তি আছে, তাহার কারুকার্য্য অতি প্রশংসনীয়। উহা কোন মূর্ত্তির পাদপীঠে অথবা নিকেতনবিশেষের ভিত্তিতে সংলগ্ন থাকা সম্ভব।

বেণুসাগরে অবস্থিত কতকগুলি মূর্ত্তি

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল টিকেল (Colonel Tickel) বর্ণিত গ্রাম ও দীর্ঘিকা পরিদর্শন পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

বেণুসাগরে অবস্থিত হনুমানমূর্ত্তি

“ঔলাপির”এর অন্তর্গত অতি দক্ষিণে এককালের আড়ম্বর-বিশিষ্ট যে জলাশয়টি আছে, তাহার তীরে কয়েক জন কোল-জাতীয় ব্যক্তি সামান্তরূপের কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছে। সরোবরটি “বেণুসাগর” নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, “বেণু” নামক জনৈক রাজার দ্বারা ইহা খনিত, এবং মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণের ভয়ে তিনি এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। সম্ভবতঃ খ্যাত-নামা মহারাষ্ট্রীয় নায়ক “মুরারি”রাওএর অভ্যুত্থানকালেই ইহা ঘটিয়া থাকিবে। কারণ, এখানকার ভগ্ন নিকেতনাদিতে যে সমুদয় বৃক্ষ-লতা জন্মিয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় ২ শত বৎসর অতীত হইয়া থাকিবে, এই স্থান পরি-ত্যক্ত হইয়া ছিল।

সরোবরটির পরিমাণ প্রায় ১২ শত হস্ত আয়ত ক্ষেত্রবর্গ হইবে। ইহার প্রশস্ত তীরোপরি কারুকার্য্যবিশিষ্ট বহু প্রস্তরখণ্ড দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহাতে অনুমান হয় যে, এককালে তথায় মন্দি-রাদি অবস্থিত ছিল এবং ঐ সমুদয় শিলাখণ্ড তাহার বিধ্বস্ত অংশ। ইহার পূর্ব্বতীরে পাষাণনির্ম্মিত সুন্দর একটি ঘাট আছে। পশ্চিমতীরেও তদ্রূপ আর একটি ঘাট থাকা সম্ভব ; কিন্তু ঐ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ বলিয়া তাহার অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায় না।

বর্ণিত জলাশয়ের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে সুদৃঢ় প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাকারে বেষ্টিত ক্ষুদ্র একটি দুর্গের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তাহার মধ্যবর্ত্তী দুই খণ্ড নিম্ন-ভূমিতে বহু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি বিকীর্ণ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি মূর্ত্তি মৃত্তিকায় প্রোথিত।

[ক্রমশঃ]

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

মেঘদূতের উদ্ভিদাবলী

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
বসি কোন্ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত, মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের প্রবাসী যত সকলের শোক
রাখিয়াছ আপন হৃদয়ে স্তরে স্তরে
সঘন জলদ-মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

রবীন্দ্রনাথ।

মেঘদূতের পরিচয় অনাবশ্যক; যদিও আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উপরি-উদ্ধৃত কয়েকটি মর্ম্মস্পর্শী পংক্তি হইতে তাহা পাওয়া যাইবে। মহাকবি কালিদাসের অন্যতম খণ্ডকাব্য মেঘদূতের জগৎ-বিমোহন সৌন্দর্য্য আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ স্থলে কেবলমাত্র মেঘদূত কাব্যে যে সমস্ত উদ্ভিদের উল্লেখ দেখা যায়, তৎসমুদয়কে সনাক্ত করিবার (identify) চেষ্টা করা হইয়াছে। এরূপ চেষ্টার পথে বিঘ্ন অনেক। প্রথমতঃ, সাধারণ কাব্যে অথবা বৈদ্যকশাস্ত্রে যে সকল উদ্ভিদের নাম পাওয়া যায়, সেগুলির সম্যক্ ও সঠিক বৈজ্ঞানিক বর্ণনা পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়তঃ, অভিধানকারগণ বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের অনেক প্রতিশব্দ দিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সেগুলি উদ্ভিদের স্বরূপ-বর্ণনা-মূলক (descriptive) নহে। তৃতীয়তঃ, নামের সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভিদজাতি নির্ণয় করিতে যাওয়া সমীচীন নহে; কারণ, একই নামে বিভিন্ন স্থানের লোকরা বিভিন্ন উদ্ভিদ বোঝে—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে কোন নির্দ্দিষ্ট নামে কি উদ্ভিদ বুঝাইত, তাহা খুব সুপরিচিত বৃক্ষাদি ভিন্ন অন্য কোন উদ্ভিদ সম্বন্ধে বলা দুরূহ। যাহা হউক, এ স্থলে শুধু আভিধানিক নামের উপর নির্ভর না করিয়া, যেরূপ স্থলে যে উদ্ভিদের নাম করা হইয়াছে, সেরূপ স্থলে সেই প্রকারের কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ জন্মান সম্ভবপর, তৎসম্বন্ধীয় বিবেচনাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে।

যক্ষ মেঘকে যে ভার দিয়াছে, তাহা লঘু নহে। অবশ্য ভুবনবিদিত পুষ্কর-আবর্ত্ত-বংশজাত জলদ সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ, কিন্তু তাহাকে তজ্জন্য কম পথ অতিক্রম করিতে হইবে না। কোথায় পুরাতন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের পশ্চিম-প্রান্তস্থিত রামগিরি, আর কোথায় হিমাচলের পরপারে অলকা! এখনকার দিনে এই পথে যাইতে হইলে অন্ততঃ চারিটি প্রদেশ উত্তীর্ণ হইতে হইবে, যথা—মধ্যপ্রদেশ, মধ্য-ভারত, পঞ্চনদের পূর্ব্বভাগ ও যুক্তপ্রদেশ।

যক্ষ নির্ব্বাসিত হইয়া বাস করিতেছিল রামগিরিতে। ইহা বাস্তাররাজ্যের রাজধানী জগদ্দলপুর হইতে ২২ মাইল দূরবর্ত্তী চিত্রকূট বলিয়া মল্লিনাথ দ্বারা অনুমিত হইলেও, এক্ষণে সাধারণতঃ ইহাকে রামগড় বলিয়া ধরা হয়। রামগড় মধ্য-প্রদেশের ছত্রিশগড় বিভাগের অন্তর্গত সরগুজা রাজ্যে অবস্থিত; পূর্ব্বে ইহা ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ছিল। এখানে উচ্চ মালভূমি বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, তাহা পার হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই আম্রকূট অথবা অমরকণ্টক পর্ব্বতে আসা যায়। অমরকণ্টক মৈকুল গিরিমালার একটি শৃঙ্গ; উহার উচ্চতা ৩ হাজার ৪ শত ৯৩ ফুট। প্রচুর পরিমাণে বন্য আমের গাছ থাকায় ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। মৈকুল পর্ব্বত-শ্রেণীর পাদদেশ হইতে নর্ম্মদা, শোণ প্রভৃতি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

অমরকণ্টক ত্যাগ করার পর মেঘের পথ বিন্ধ্যগিরি-শ্রেণীর নিম্নে প্রবাহিত নর্ম্মদা অথবা রেবা নদী ধরিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়াছে। এই পথে মধ্যপ্রদেশ হইতে আসিয়া মালব-দেশে মেঘ মধ্যভারতে প্রবেশ করিল। প্রাচীনকালে পূর্ব্ব-মালবে দশার্ণ দেশ ছিল; তাহার রাজধানী বিদিশা। উহা ভোপালের উত্তরপূর্ব্বে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এখান হইতে আবার কিছু দূর দক্ষিণপশ্চিমে গিয়া মহাকবির প্রিয় মহানগরী উজ্জয়িনীতে মেঘ উপনীত হইল। মেঘদূতে এই অঞ্চলের কয়েকটি নদীর বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—বিদিশার নিকট দিয়া প্রবাহিত বেত্রবতী, উজ্জয়িনীতল-বাহিনী শিপ্রা ও উহার শাখা-নদী গন্ধবতী ও গম্ভীরা, মলিন-সলিল সিন্ধু, বেত্রবতী ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বিন্ধ্যা এবং মধ্য-রাজপুতানার অন্যতম নদী চর্ম্মণ্বতী অথবা চম্বল। চম্বল ব্যতীত অন্য নদীগুলি ক্ষুদ্র ও বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময় জলও অধিক থাকে না। নদীগুলির জলস্রোত যে প্রখর নহে, তাহা শামুক ও পদ্মের প্রাচুর্য্য হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই নদীগুলির সহিত উদ্ভিদ-সংস্থানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মধ্যপ্রদেশ ও মধ্য-ভারতের নদী-বিহীন স্থানসমূহে উদ্ভিদাদির সংখ্যা সামান্য এবং বৃক্ষ অপেক্ষা খর্ব্বকায় গুল্মের প্রাধান্য

অধিক। নদীতট-সমূহেই পাদপাদির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থলে আরও দ্রষ্টব্য এই যে, কবি এক দিকে যেমন পার্ব্বত্য বনমালার শাল ব্যতীত অন্যান্য প্রধান উদ্ভিদের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনই উদ্যানজাত উদ্ভিদের উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হন নাই। বেত্রবতী-তীরবর্ত্তী কুঞ্জাদি ও দশার্ণ দেশের বাগান-সমূহ ইহার পরিচায়ক। বাওড়া রাজ্যের অন্তর্গত দশপুর, বর্ত্তমান মান্দাশের অঞ্চল, এখনও পর্য্যন্ত মালব দেশের প্রকৃষ্ট উর্ব্বরাংশ বলিয়া পরিগণিত হয়।

মধ্যভারত পরিভ্রমণ করিয়া মেঘ উত্তরদিকে চলিল এবং ব্রহ্মাবর্ত্তে উপস্থিত হইল। এইখান হইতেই পঞ্চনদপ্রদেশ আরম্ভ। কুরুক্ষেত্র আম্বালা জিলার দক্ষিণে। এই জিলায় প্রবাহিত সরস্বতী বৈদিক কালে ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়া বিস্তীর্ণ ছিল; এখন উহা মজিয়া গিয়াছে। কবির সময়েও এই অঞ্চল যে প্রায় পাদপশূন্য হইয়াছিল, তাহা মেঘকে ব্রহ্মাবর্ত্তে ছায়াদান করিবার অনুরোধ হইতেই বুঝা যায়। পাণিপথ ও থানেশ্বরের বিশাল প্রান্তর-সমূহ বর্ষভোর বর্ষার বারিপাতের প্রতীক্ষায় থাকে। এই উত্তপ্ত ও অর্দ্ধদগ্ধ অঞ্চলের কোন উদ্ভিদ কবি উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই।

ব্রহ্মাবর্ত্ত ছাড়িয়া মেঘ পূর্ব্বদিকে গিয়া যখন হরিদ্বারের নিকটস্থ কনখলে আসিল, তখন সে যুক্তপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। তৎপরে গড়বাল অঞ্চলে গঙ্গোত্রী ও বদরীনাথের পথে গিয়া মেঘ ক্রমশঃ হিমালয়ের উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিতে করিতে নৈনিতালের উর্দ্ধে গরলা-মান্ধাতা নামক হিমাদ্রিশৃঙ্গের সম্মুখীন হইল। এই শৃঙ্গ ২৫ হাজার ৩ শত ৫০ ফুট উচ্চ; ইহাকে উল্লঙ্ঘন করা সহজ-সাধ্য নহে। সেই জন্য যক্ষ মেঘকে বলিতেছে যে, তুমি ক্রৌঞ্চরন্ধ্র অর্থাৎ নীতি-নামক সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট দিয়া হিমালয়ের অপর পারে গমন কর। উক্ত গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইলেই মানস-সরোবর এবং কিছু দূরেই ২০ হাজার ৩ শত ফুট উচ্চ কৈলাস পর্ব্বত। যক্ষের গৃহ কৈলাসক্রোড়ে অবস্থিত অলকা নগরীতে। এ স্থানে কয়েকটি সমৃদ্ধ জনপদ এখনও দেখা যায় বটে, কিন্তু বিপুল ঐশ্বর্য্যশালিনী অলকা যে কোথায় ছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই।

মেঘের গমন-পথের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মেঘকে তিনটি উদ্ভিদ-তাত্ত্বিক মণ্ডলের (Botanical region) মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল, যথা—দাক্ষিণাত্যের উর্দ্ধভাগ ও সিন্ধু-প্রান্তর এবং পশ্চিম-হিমালয়ের পূর্ব্বভাগ। তিনটি মণ্ডলের মধ্যে উদ্ভিদ-সমাবেশের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কবি প্রত্যেক মণ্ডলেরই দুই চারিটি বিশিষ্ট গাছের উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলি বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অঙ্গস্বরূপ। ইহা হইতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, কবি এ সকল স্থান একাধিকবার স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উদ্ভিদবিষয়ক জ্ঞানও সামান্য ছিল না। এমন কি, উপমা হিসাবে যেখানে কোন উদ্ভিদের নাম করা হইয়াছে, সেখানেও তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে এমন এক একটি কথা বলা হইয়াছে যে, তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ভিন্ন তাহা সম্ভবে না।

মেঘদূতকাব্যে উল্লিখিত উদ্ভিদরাশির উদ্ভিত-তত্ত্বের দিক্ হইতে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কবি সর্ব্বসমেত ৩৬টি উদ্ভিদের নাম করিয়াছেন। সেগুলি ২১টি প্রাকৃতিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ১৩টি বর্গের মাত্র এক একটি করিয়া উদ্ভিদের নাম আছে ও ৬টি বর্গের দুইটি করিয়া উদ্ভিদ উল্লিখিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন শিম্বী-বর্গের ৪টি ও পদ্মবর্গের ৭টি উদ্ভিদ এই অমর কাব্যে স্থান পাইয়াছে। এই সমুদয় উদ্ভিদের মধ্যে ১৩টি বৃক্ষ, ৮টি গুল্ম, ৪টি লতা, ২টি কন্দ, ৭টি জলজ উদ্ভিদ, ১টি কোমল কাণ্ডবিশিষ্ট গাছ এবং ১টি বৃহৎ তৃণ অর্থাৎ বাঁশ। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, এগুলির মধ্যে কেবল ৫টি পার্ব্বত্য প্রদেশে আবদ্ধ, যথা—দেবদারু, সরল, মন্দার, কনক-কদলী ও লোধ্র; অবশিষ্ট উদ্ভিদ-সমূহের অধিকাংশই সমতল প্রদেশ হইতে হিমালয়ের অত্যুচ্চ স্থান পর্য্যন্ত জন্মাইয়া থাকে। ভারতের বাহির হইতে কোন অতীতকালে এতদ্দেশে আসিয়াছে, এরূপ গাছের মধ্যে কেবল জবা ও স্থলপদ্ম। উদ্ভিদ-মণ্ডল হিসাবে কুরচি ও অর্জ্জুন উত্তর-দাক্ষিণাত্যের, জম্বু ও বনডুমুর সিন্ধুপ্রান্তরের এবং দেবদারু ও সরল পশ্চিম-হিমালয়ের বিশিষ্ট বৃক্ষ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। দুই একটি গাছের অনুল্লেখ একটু আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয়—যেমন শাল ও মহুয়া। মেঘকে অনেক স্থলেই ইহাদের জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে এবং আষাঢ়ই ইহাদের ফলনের সময়। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন অনুমান বৃথা—কবির উপর কোন দাবী-দাওয়া চলে না।

মেঘদূতে যে সকল উদ্ভিদের নাম পাওয়া যায়, এ স্থলে তদ্রূপ প্রত্যেক উদ্ভিদসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে; কেবল কল্পতরুবিষয়ক কোন কথা বলা হয় নাই। উহা কাল্পনিক উদ্ভিদ। প্রত্যেক উদ্ভিদের নামের সঙ্গে যে অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রথমটি পূর্ব্ব (১) অথবা উত্তর (২) মেঘ এবং দ্বিতীয়টি শ্লোকসংখ্যাসূচক।

কুটজ ঃ—(১।৪); মধ্যপ্রদেশ ও মধ্য-ভারতের পর্ব্বতসমূহে কুরচির (Holarrhena antidysenterica wall) আশুপত্রপতনশীল ক্ষুদ্র বৃক্ষ খুবই সুলভ। গিরিগাত্রে প্রচুর পরিমাণে ফুটিয়া থাকে বলিয়া ইহার অন্য নাম গিরি-মল্লিকা। বনৌষধি-দর্পণে দুই প্রকার কুরচির (সিত ও অসিত) উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কুরচির আর কোন বর্ণভেদ নাই। কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যের কুরচির গর্ভতন্তু (style) কিছু অধিক লম্বা। এইরূপ ভ্রম হওয়ার কারণ এই যে, পূর্ব্বে কুরচি Wrightia গণের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং দুই জাতীয় Wrightiaর (W. tinctoria ও W. tomentosa) কুরচির সহিত কতকটা সাদৃশ্য থাকায় উহাদিগকে কুরচির অন্য জাতি বলিয়া গণ্য করা হইত। এখন কুরচিকে স্বতন্ত্র গণে স্থাপিত করা হইয়াছে। কুরচিপুষ্প ঈষৎ পীতাভ শ্বেতবর্ণ ও গন্ধহীন। কুরচি-ফুল আষাঢ়ে ফুটিয়া থাকে।

কন্দলী ঃ—(১।২১); কবির বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে, ইহা কন্দজ গাছ; ইহার ফুল অথবা পত্র-পুষ্প মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রতি বৎসর বর্ষারম্ভে বহির্গত হয় এবং ইহা উষ্ণ, আর্দ্র স্থানের গাছ। কবি এ স্থানে রামগড়ের কথা বলিতেছেন। এখানে উক্তরূপ লক্ষণযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে ভূমি-চম্পকই অন্যতম। ভূমিচম্পক (Kaemferia rotunda L) কাণ্ডহীন; ছায়াযুক্ত অথবা সরস মাটীতে জন্মায় এবং বর্ষার প্রথমে ইহার পুষ্প ও পরে পত্র নির্গত হয়। 'প্রকৃতি' পত্রে 'কালিদাসের বৃক্ষলতা' প্রবন্ধ-লেখক ইহাকে ব্যাঙের ছাতা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ, ব্যাঙের-ছাতা অপুষ্পক উদ্ভিদ, উহা গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপর জন্মায় এবং তাহা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে (Saprophyte)। ইহা মাটী ফুঁড়িয়া উঠে না। 'আবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ'-রূপ লক্ষণ ব্যাঙের ছাতার পক্ষে প্রযুজ্য নহে।

নিচুল ঃ—(১।১৪,৪১); ইহার অন্য নাম বেতস, বানীর। বেত প্রায়ই সিক্ত মৃত্তিকায় জন্মিয়া থাকে; সেই জন্যই 'সরসনিচুলাঃ' বলা হইয়াছে। বেতের বহুবিধ জাতি আছে এবং সেগুলির অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম প্রভৃতি আর্দ্র দেশের গাছ। মধ্য-ভারতে দুই প্রকার বেত দৃষ্ট হয়। কবি সম্ভবতঃ সেইগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন—

১। Calamus Rotung L—দাক্ষিণাত্য ও মধ্যপ্রদেশে ইহা সুলভ; নদীতীরে ও সরস, সারবান্ মৃত্তিকায় বর্ষায় ইহার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সমধিক। বঙ্গদেশে ইহা ছাঁচিবেত নামে পরিচিত। বেত মাটীর উপর লতাইয়া যায় অথবা সন্নিকটে তরুগুল্মাদি পাইলে তাহার উপর উঠিয়া যায়। মধ্য-ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর তীরে ইহা প্রচুর জন্মায়; সম্ভবতঃ বেত্রবতী নদীর নাম নদীতটে বেতের প্রাধান্যের জন্য হইয়াছে।

২। Calamus tenuis Roxb—উত্তর-ভারত ও বঙ্গদেশে ইহাই সাধারণ বেত অথবা বাজারি বেত। বহুকাল হইতে ইহা নানাবিধ গৃহসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

কাননাম্র ঃ—(১।১৮); আম্রকূট (১।১৭)—আম্রের প্রায় ৩০টি জাতি আছে; অধিকাংশই মালয়-দেশবাসী। ভারতে বন্য আম গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ হিমালয়, খাসিয়া পর্ব্বত, বিহার, দাক্ষিণাত্য ও মধ্যপ্রদেশের গিরিশ্রেণীতে দৃষ্ট হয়। কবি এ স্থলে শেষোক্ত স্থানের আর্দ্রপাদপমণ্ডিত একটি গিরিশৃঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। জঙ্গলী আমের ফল ক্ষুদ্র এবং জ্যৈষ্ঠমাসেই পাকিতে আরম্ভ করে। আষাঢ়ের প্রথমে রক্ত ও পীতবর্ণ পক্ব-ফলযুক্ত আম্র-কানন এ সকল স্থানের অন্যতম দৃশ্য।

জম্বু ঃ—(১।২০, ২৩); এ স্থলে জম্বু অর্থে প্রায় সকল টীকাকারই কালজাম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কালজাম অবশ্য মরুস্থল ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্রই সুলভ; কিন্তু এ স্থলে কবি সম্ভবতঃ Eugenia Heyaniana Duthie নামক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন; নর্ম্মদাতীরস্থ জামের কথা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। মধ্য ও পশ্চিম-ভারতে নদীতীরে এই জাতীয় জামই প্রধানতঃ জন্মিয়া থাকে। ইহার পত্র ও ফল সাধারণ কালজাম (E. Jambolana Lam) অপেক্ষা কিছু ছোট; কিন্তু অন্য সমস্ত বিষয়ে ইহা প্রকৃত কালজাম সদৃশ ও অনেকে ইহাকে প্রকৃত কালজামই মনে করেন।

নীপ ঃ—(১।২১,২৫, ২।২); 'কালিদাসের বৃক্ষলতা' প্রবন্ধ-লেখক নীপ ও কদম্বকে একই বৃক্ষ বলিতে চান। মল্লিনাথ এই দুইটিকে স্বতন্ত্র বৃক্ষ বিবেচনা করেন এবং তাঁহার মতই সমীচীন বলিয়া ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কদম্ব (Anthocephalus Cadamba Miq) ভারতের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইলেও অধিকাংশ স্থলে ইহা প্রায় রোপিত অবস্থায় দেখা যায়। বর্ষাকালে কদম্বের ফুলকে প্রৌঢ় বলার কারণ এই যে, উহা গ্রীষ্মের শেষভাগে ফুটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, নীপের (Adina Cordifolia Hf.) ফুল বর্ষাকালেই প্রথম বিকসিত হয়। মধ্য ও উত্তর-ভারতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এবং গাছও খুব বড় হয়। ইহার অন্য নাম কেলিকদম্ব, মহাকদম্ব, ধারাকদম্ব ইত্যাদি এবং সাধারণ নাম হলদু। লেবু পাকিলে যেরূপ হরিতাভ পীতবর্ণ হয়, ইহার ফুলের রং অনেকটা তদ্রূপ। হিমালয়ের পাদদেশে গ্রামসমূহে বর্ষাকালে কাজরী উৎসবের সময় সুন্দরীগণকে মাথায় নীপফুল পরিয়া গাছে দোল খাইতে এখনও দেখা যায়। হলদু গাছের জঙ্গলের ন্যায় কদম্ব-জঙ্গল সাধারণ নহে।

ককুভ ঃ—(১।২২); ইহার সাধারণ নাম অর্জ্জুন (Terminalia Arjuna Bedd)। মধ্য-ভারতের অরণ্যে ইহা সুলভ। বর্ষার কিছু পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পমঞ্জরী বহির্গত হয়; ফুলের এক প্রকার গন্ধ আছে। অনবধানতা বশতঃ কোন কোন স্থানে ককুভকে কুরচি বলা হইয়াছে।

কেতকী ঃ—(১।২৩); কেয়াগাছ (Pandanus Odoratissimus L) বন্য অবস্থায় উপকূল-অরণ্যসমূহেই সমধিক সংখ্যায় জন্মায়। সুন্দরবন ও পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উপকূলে ইহার দুর্গম, নিবিড় জঙ্গল সাধারণ। দশার্ণ গ্রাম পূর্ব্বমালবের কোন সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। উক্ত স্থলে কেতকী বন্য অপেক্ষা রোপিত অবস্থায় থাকাই অধিক সম্ভবপর। পূর্ব্বকালের ন্যায় এখনও বেড়া তৈয়ারীর জন্য কেয়াগাছ নানা স্থানে ব্যবহৃত হয়। পত্রপ্রান্তে তীক্ষ্ণ কণ্টকের প্রাচুর্য্যের জন্য ইহার অন্য নাম সূচীপুষ্প। সাধারণ কেয়া একই জাতির অন্তর্গত; তবে ইহার পুং ও স্ত্রী-বৃক্ষ স্বতন্ত্র; সেই জন্য অনেকের ধারণা আছে যে, ইহার জাতি দুইটি। প্রধানতঃ পুং-বৃক্ষের শ্বেত ও কোমল-পৌষ্পিক পত্রেই কেতকীর মনোরম গন্ধ অবস্থিতি করে। কেতকীগণ-ভুক্ত আর একটি জাতি Pandanus Foetidus Roxb। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ইহা বন্য অবস্থায় দেখা যায়। ইহাকে কেয়াকাঁটা বলে; শীতকালে ফুল হয়। ইহার পুং ও স্ত্রী-পুষ্প উভয়ই দুর্গন্ধযুক্ত। প্রকৃত কেয়ার ফুল বর্ষাকালেই ফোটে।

যূথিকা :—(১।২৬); যূথিকার অপর নাম মাগধী, গণিকা, অম্বষ্ঠ ইত্যাদি। ইহা কতকটা লতানিয়া ধরণের, গুল্ম (Jasminum aurienlatum L)। বেত্রবতী-তীরে অর্দ্ধবন্য অবস্থায় ইহা জন্মান স্বাভাবিক। পুষ্প কিছু ক্ষুদ্র হইলেও সুগন্ধযুক্ত। সামান্য যত্ন করিলেই এই জাতীয় যুঁই প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রসব করে। বর্ষা-সমাগমে ইহার ফুল হয়।

পদ্ম ও শালুক :—এই দুই জাতীয় উদ্ভিদের নাম মেঘদূতের নানা স্থানে আছে :—

কর্ণোৎপল—১।২৬	কুবলয় দল—১।৪৪
স্ফুটিত কমল—১।৩১	হেমাম্ভোজ—১।৬২
কুবলয় রজঃ—১।৩৩	লীলা-কমল—২।২
নলিনী—১।৩৯	কনক-কমল—২। ১
কুমুদ বিশদ—১।৪০,৫৮	পদ্মিনী—২।২২

পূর্ব্বে প্রকৃত পদ্ম (Nelumbium) ও শালুকের (Nymphaea) মধ্যে কোন পার্থক্য পরিগণিত হইত না। উদ্ভিদ-শাস্ত্র হিসাবে এই দুইটি গণ (genus) কিন্তু পৃথক্। নানা প্রকার পদ্ম ও শালুকের জাতি-ভেদ বুঝিতে হইলে ইহাদিগের কিছু বিশেষ বিবরণ জানা আবশ্যক। নিম্নে তাহা দেওয়া হইতেছে :—

Nelumbium :—এই গণের পত্র ও পুষ্প জলের কিছু ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। বীজ অন্তরাল-বিরহিত (exalbuminous)। N. Speciosum willd প্রকৃত পদ্ম; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুল ফোটে, ফুলের ব্যাস ৪ হইতে ১০ ইঞ্চ। বর্ণের তারতম্যে পদ্মের বিভিন্ন নাম আছে, যথা—শ্বেত—পুণ্ডরীক; গোলাপী—রক্ত পদ্ম; পীত—হেমাম্ভোজ।

Nymphaea :—এই গণের পত্র ও পুষ্প জলের উপরেই ভাসমান থাকে; বীজ অন্তরালযুক্ত (albuminous)। N. Lotas L—ইহাকে পূর্ব্বে প্রকৃত পদ্ম বলিয়া ধরা হইত; কিন্তু স্থানে স্থানে ইহা উৎপল ও কুমুদ নামে অভিহিত

হইয়াছে। বর্ষায় ফুল হয়, ফুলের ব্যাস ২ হইতে ১০ ইঞ্চ; বর্ণ শ্বেত, রক্ত ও পাটল। সুদি শালুক এই জাতির অন্তর্গত। সমতল প্রদেশের জলাশয়ে ইহা সাধারণ। ইহার উপজাতি—Var. pubescens Hkf—অন্যান্য লক্ষণাদি পূর্ব্বোক্তবৎ; কেবল ফুল ছোট, ব্যাস ৩ হইতে ৪ ইঞ্চ।

N. Slellata willd:—ইহা উষ্ণ মণ্ডলস্থ ভারতের অধিকাংশ স্থানেই দৃষ্ট হয়; ফুলের ব্যাস ১০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হয়; বর্ণ শ্বেত, লাল, গোলাপী অথবা বেগুনি; ঈষৎ গন্ধযুক্ত; ইহার উপজাতি—Var. Cyanea Hf & T—পুষ্প মধ্যমাকৃতি নীলবর্ণ; ইহাকে কহ্লার, ইন্দীবর, নীলপদ্ম ইত্যাদি বলা হইয়াছে। Var. parviflora Hf & T—ফুল পূর্ব্বোক্ত ভেদ অপেক্ষা ছোট, বর্ণ নীল, নাম কুবলয়। Var. Versicolor Hf & T—ফুল বৃহত্তর, বর্ণ শ্বেত, নীল, বেগুনি অথবা উহাদের সংমিশ্রণ; বর্ষায় ফুল হয়।

N. pygmace Ait:—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট শালুক; ইহা কিন্তু সাধারণ নয়; প্রধানতঃ আসামের খাসিয়া পাহাড়েই জন্মাইতে দেখা যায়।

পদ্ম ও শালুক নির্ব্বিশেষে গাছের বিভিন্নাংশের সংস্কৃত-সাহিত্যে নাম নিম্নরূপ :—

সমস্ত গাছ=পদ্মিনী, কমলিনী।	কেশরদণ্ড=কিঞ্জল্ক।
পত্রবৃন্ত=মৃণাল।	পুষ্পমধু=মকরন্দ।
কন্দ=কিসলয়।	বীজাধার=কর্ণিকার।

সাধারণতঃ সমতলপ্রদেশে পদ্ম ও শালুক অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও হিমালয়ের ঊর্দ্ধাংশের জলাশয়ে, বিশেষতঃ হ্রদ-সমূহে এই দুই জাতি এবং ইহাদের ভেদসমূহ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। কাশ্মীরের ডাল, মানসবল্ ইত্যাদি হ্রদ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অবগত আছেন। পদ্ম ও শালুকের এ সকল দেশে ব্যবহারিক মূল্য কম নহে; ইহাদের মূল, বীজ ও পরাগ খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়।

জবাপুষ্প ঃ—(১৩৬); সাধারণ জবা (Hibisms Rosa-Sinensis L); ইহা চীনদেশের আদিম অধিবাসী। বহুকাল পূর্ব্বে ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাসের সময় উহার প্রচার যে যথেষ্ট হইয়াছিল, তাহা এই পংক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

কানন উডুম্বর ঃ—(১৪০); ইহাকে অনেকেই যজ্ঞডুমুর বলিয়া ধরিয়াছেন। যজ্ঞডুমুর প্রায়ই গ্রাম ও গ্রাম-সন্নিহিত স্থানে জন্মায়; এখানে দেবগিরির কথা হইতেছে। উহা দশপুরের (বর্ত্তমান মাঙ্গালোর) নিকটবর্ত্তী এবং যাওড়া রাজ্যের অন্তর্গত। এরূপ স্থলে গিরি-অরণ্যে বরং Ficus Cunia Buch Ham অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। কবি সম্ভবতঃ ইহাকেই বনডুমুর বলিয়াছেন। ইহার গাছ অপেক্ষাকৃত ছোট এবং কাণ্ড-গাত্র-নিষ্ক্রান্ত নগ্ন শাখা হইতে বহির্গত হয়।

কুন্দ ঃ—(১৪৭); ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Jasminum pubescens willd, ইহা কতকটা লতানিয়া প্রকৃতির গুল্ম। সুগন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, গুচ্ছবদ্ধ ফুল-সমূহ পৌষ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফোটে; বর্ষাকালেও কতক পরিমাণে ফুল হয়। ভারতের সমতল প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া হিমাচলের ৩ হাজার ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত কুন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালের ফুল অপেক্ষাকৃত ছোট হয় বলিয়া উহাকে বালকুন্দ বলা হইয়াছে। কুন্দ-ফুল রাত্রিতেই বিকশিত হয়, সূর্য্যতাপ প্রখর হইতে আরম্ভ হইলেই ঝরিয়া পড়ে। প্রাতঃকুন্দ সম্বন্ধে কবির মন্তব্য তাঁহার গভীর পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিচায়ক।

সরল ঃ—(১৫৩); ইহার সাধারণ নাম চির্ অথবা চিড়। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে সরল (Pinus longifolia Roxb) ও ইহার নির্য্যাসকে সরলদ্রাব বলা হইয়াছে। সরলদ্রাব বাজারে গন্ধবিরোজা নামে পরিচিত; ইহা হইতে আজকাল প্রভূত পরিমাণে তার্পিণ ও রজন প্রস্তুত হইতেছে। সরল কাষ্ঠে যথেষ্ট সহজদাহ্য নির্য্যাস আছে বলিয়া ইহা মশাল-রূপে ব্যবহৃত হয়। ঘনসন্নিবিষ্ট সরলকাণ্ড ও শাখার পরস্পর ঘর্ষণজনিত দাবানলের কথা কবি এ স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। এখন বনভূমি-সমূহ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংরক্ষিত হয় বলিয়া অরণ্যাগ্নির তত আধিক্য নাই; তবুও চির্-জঙ্গলে মাঝে মাঝে আগুন লাগে। পূর্ব্বে সেরূপ ব্যবস্থা না থাকায় অগ্নিদাহে বন যে প্রায়ই নষ্ট হইত, তাহা বলা বাহুল্য। দেবদারু ও সরল বিভিন্ন বৃক্ষ। চির্ গাছ পশ্চিম-হিমালয়ের পাদদেশ হইতে ৭ হাজার ও শত ফুট উচ্চতা পর্য্যন্ত সচরাচর জন্মিয়া থাকে।

কীচক ঃ—(১।৫৬) ; সংস্কৃত অভিধানকারগণের মতে যে বাঁশে বাতাস প্রবেশ করিয়া শব্দ উৎপাদিত হয়, তাহার নাম কীচক। ইহা কোন বিশেষজাতীয় বাঁশ নহে। কবি এ স্থলে যে স্থানের কথা বলিতেছেন, তাহা কুমায়ুন। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ বাঁশ Dendrocalamus Strictus Nees। শুষ্ক স্থানে ইহা প্রায়ই নীরেট হয় এবং অন্যস্থানে কাণ্ডের ভিতর রন্ধ্র-পরিসর কমই থাকে। কাণ্ডের ব্যাস ১ হইতে ৩ ইঞ্চ মাত্র। কাণ্ড কীটদষ্ট হইলে কিম্বা কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ফাটিয়া গেলে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। সেই জন্য কীচক বাঁশ খুব সাধারণ নহে। এ স্থলে বলা দরকার যে, বাঁশ-জঙ্গলে বেণুরব যত শুনিতে পাওয়া যাউক্ আর না যাউক্, বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণজনিত যে কর্কশ শব্দ সময় সময় শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ভয়ের সঞ্চার হয়।

লোধ্র ঃ—(২।২) ; পার্ব্বত্য লোধের বৈজ্ঞানিক নাম—Symplocos crataegnoides Buch-Ham। বর্ষাকালেই ইহার পরাগ-বহুল শ্বেত পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। ইহা মধ্যমাকৃতি বৃক্ষ ; সমতল দেশের লোধ ইহাপেক্ষা আকারে ছোট ও পুষ্প পীতবর্ণ।

কুরুবক ঃ—(২।২) ; সাধারণ ঝাঁটি-ফুলের সংস্কৃত নাম কুরণ্টক, কুরুবক ইত্যাদি। হিমালয়-গাত্রে ৬।৭ হাজার ফুট উচ্চ স্থানে যে কুরুবক জন্মায়, তাহা Barleria cristata L। ইহার ফুল শ্বেত অথবা বেগুণি আভাযুক্ত নীল। আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ফুল হয়। অলকায় স্বভাবতঃ কুরুবক জন্মান সম্ভব নহে। বর্ত্তমান শ্লোকে কিন্তু কবি কেবলমাত্র বন্য ফুলাদির উল্লেখ করেন নাই ; অলকার উদ্যানরাজিতে হয় ত বিশেষ প্রথায় গ্রীষ্ম ও সমমণ্ডলের উদ্ভিদের চাষ হইত ও অসময়ে ফুল ফোটানর কৌশলও অবিদিত ছিল না।

শিরীষ ঃ—(২।২) ; ইহা অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলের গাছ—Albizzia Lebbek Benth ; এই বৃক্ষ সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য প্রযুজ্য।

মন্দার ঃ—(২।৬, ১১, ১৪) ; মাদার অর্থে সাধারণতঃ পালতে মাদার (Erythrina indica Lum.) ধরা হয়। কিন্তু উচ্চ পার্ব্বত্য দেশে ইহা কচিৎ দৃষ্ট হয় এবং তাহাও উদ্যানে রোপিত অবস্থায়। পক্ষান্তরে, E. Suberosa Roxb Var. glabrescens prain পশ্চিম-হিমালয়ের উষ্ণ উপত্যকায় যথেষ্ট পরিমাণে জন্মায়। ইহার গাছ ৫০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ ও প্রশস্ত শীর্ষ-বিশিষ্ট। সিমলা-পাহাড়, বুসায়র প্রভৃতি স্থানে পার্ব্বত্য নদী ও ঝরণার ধারে ইহা বিরল নহে। ইহাই সম্ভবতঃ মন্দাকিনী-তীরের মন্দার। বাল-মন্দার সম্বন্ধেও বোধ হয় যে, উহা E. resupinata জাতীয় ছোট মন্দার। এই গাছের একটু বিশেষত্ব আছে। অন্তর্ভৌম কাণ্ড হইতে পাতা বাহির হওয়ায় পূর্ব্বেই ঘন পুষ্পগুচ্ছ লইয়া পুষ্পদণ্ড দেখা দেয়, তৎপরে যে ক্ষুদ্র অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত কাণ্ড নির্গত হয়, তাহাও খুব কোমল ও সুদৃশ্য। বর্ষার শেষে সমস্ত পত্র-পুষ্প মরিয়া যায়। ফুল উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। হস্তপ্রাপ্য স্তবক-নমিত এরূপ বাল-মন্দার বিলাসিনী যক্ষ-বনিতা যে সখ করিয়া চাষ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

কনক-কদলী ঃ—(২।১৬) ; কবির বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, এই জাতীয় কদলী বাগানের শোভা-বর্দ্ধনার্থ রোপিত হইত। পূর্ব্ব-হিমালয় অপেক্ষা পশ্চিম-হিমালয়ে কদলীজাতি কম। কিন্তু গড়বাল ও কুমায়ুনে, M. paradisiaca L Var. Sylvestris Prain দেরাদুনের উত্তরে দেখিতে পাওয়া যায় ; জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহা জন্মায় এবং দেখিতে সুদৃশ্য। কবি সম্ভবতঃ ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

রক্তাশোক ঃ—(২।১৭) ; Saraca indica L—সুপরিচিত গাছ। বৈশাখ মাসে ফুল ফোটে ; ফুলের বর্ণ প্রথমে পীত, পরে রক্তবর্ণ হয়।

কেসর ঃ—(২।১৭) ; বকুলকেই কেসর বলা হয় (Mimusops Elengii L)। অলকার উদ্যানে ইহা রোপিত বৃক্ষ।

মাধবী :—(২।১৭) ; Hiptage Madhablota Gaertu—সুকোমল পল্লব ও চাকচিক্যময় সুবাসিত পুষ্পের জন্য লতামণ্ডপ তৈয়ারী করিতে ইহা বিশেষ উপযোগী।

বিম্ব :—(২।২১) ; ইহার সাধারণ নাম তেলাকুচ (Cephalandra indica Naud) ; পাকিলে ফলের রং উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হয়।

স্থলকমলিনী—(২।২৯) ; স্থলপদ্ম (Hibiscus mutabilis L) চীনদেশীয় পুষ্প ; বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। বাগানেই ইহা দৃষ্ট হয়। প্রভাতে ফুটিবার সময় ইহার ফুল প্রায় সাদা থাকে, রাত্রিতে লাল হইয়া যায়

সূর্য্যালোক অভাবে ইহা পূর্ণ বিকসিত হয় না। কবি এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

মালতী :—(২১৩৭); মালতীজালক অর্থাৎ মালতী লতা. (Echites caryophyllata Roxb) পার্ব্বত্য প্রদেশীয় বৃহৎ লতা। বাগানে লতাকুঞ্জ প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা রোপিত হয়। লবঙ্গের ন্যায় গন্ধযুক্ত, শুভ্র পুষ্প-গুচ্ছ-সমূহ বর্ষাকালেই ফুটিয়া থাকে।

শ্যামা :—(২১৪৩); ইহার অন্য নাম নন্দিনী, প্রিয়ঙ্গু ইত্যাদি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সুদৃশ্য অবয়বের জন্য ইহা পূর্ব্বে বিশেষ আদৃত হইত। ইহার বৈজ্ঞানিক নামেও (Aglaia Roxburghiana Miq) তদ্রূপ আভাস পাওয়া যায়, Aglaiaর অর্থ দীপ্তিমতী। শ্যামা বৃহদাকার তরু; নিমের ন্যায় পল্লবযুক্ত। পত্রগুলি কোমল ও ঈষৎ বিলম্বিত; পুষ্প পীতবর্ণ ও সুগন্ধযুক্ত। বীজেও অল্পবিস্তর সদগন্ধ আছে। ইহা দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলে স্বভাবতঃ জন্মায়।

দেবদারু :—(২১৪৬); দেবদারু গাছ (Cedrus Libani Barrel, Var. Deodara Hf) হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে ৩ হাজার ৫ শত ফুট হইতে ১২ হাজার ফুটের মধ্যে জন্মিয়া থাকে। ইহা হিমালয়ের অন্যতম মূল্যবান্ কাষ্ঠ। চির-হরিৎ পল্লবযুক্ত ঋজু কাণ্ড ২ শত ৫০ ফুট পর্য্যন্তও উচ্চ হয়। ইহার কাষ্ঠ হইতেও এক প্রকার নির্য্যাস পাওয়া যায় এবং স্থানীয় লোক উহা নানাবিধ কার্য্যে প্রয়োগ করে। দেব-দারুর বাসস্থান পশ্চিম-হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ-সমূহ—হিন্দু দেব-দেবীগণের আলয়; সুতরাং ইহাও দেবদ্রুম। দেবদারুকাষ্ঠ এত দীর্ঘস্থায়ী যে, কাশ্মীরের মন্দির প্রভৃতিতে ৮ শত বৎসরের পুরাতন কাষ্ঠ আজ পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

বীর-জননী

মরবার তরে দরবার করে হাজার রাঠোর বীর।
"আমিও মরিব স্থির,"—
আসি কয় এক বিধবার পুত সুন্দর অদ্ভুত।
"তুমি মা'র এক পুত,—"
"আইন কড়া, তোমার মরা হতে যে পারে না তাই,
"ফিরে যাও ঘরে ভাই।"

"মায়ের পুত্র মায়ের কার্য্য"—বিধবা রুখিয়া কয়,—
"করিতে পাবে না,—তাও কি কখনো হয়?
মা-হারা মা যদি পায়,
"রাজার রাজার তাই যদি বিধি হায়।
'তাই হোক তবে, তাই তবে হোক"—এত বলি সেই নারী,
লুটাইল ভূমে বক্ষে হানিয়া তীক্ষ্ণ সে তরবারি।

পুত্র কাঁদিয়া কয়,—
চক্ষে অশ্রু দর দর ধারা বয়,—
"জননি, তোরও বক্ষঃস্তন্যে বাঁচায়েছিলি এ প্রাণ,
"এ নব জীবনো সেই বক্ষেরি রক্তে করিলি দান।"
মুমূর্ষু কয়,—"কাঁদিতে কি বাছা, হয়?

"মহাজননীর মহাপুত্রের দুঃখ শোভন নয়।
"চলিলাম আমি, মহামায়া তোর জননী রহিল আজ,
"সাধ্ রে পুত্র, সাধ্ রে তাঁহারি কাজ।
"এক মা গেল এ, ঘরে ঘরে তোর রহিল হাজার মা,
"কিসের দুঃখ বল্ দেখি তবে, কিসেরি হুতাশ হা?"
নীরব কণ্ঠ, আর না ফুটিল বাণী,
"জননীর জয়"—গর্জ্জি উঠিল হাজার কণ্ঠখানি।

শ্রীসাহাজী।

কৈলাস-যাত্রী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

১২ই আষাঢ়, ইং ২৬শে জুন, বুধবার

বেরীনাগে ডাকঘর থাকায় আমরা পূর্ব্বদিন নিজ নিজ বাটীতে এক একখানি পত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম। অদ্য প্রভাতেই যাত্রার পথে বাহির হইলাম। এবারের পথ ক্রমশঃ উতরাই এ নামিয়াছে। দুই মাইল চারি মাইল করিয়া প্রায় সাত মাইল পথ পর্য্যন্ত নীচে নামিয়া আসিতে হইল। সুখের বিষয়, এ উতরাইএ নামিতে ঘোড়াকে ততদূর ক্লেশ পাইতে হয় নাই। উতরাইএর স্থানে স্থানে পাহাড়ের কোলে ধানের ক্ষেতের উপরে দৃষ্টি পড়িল। কচিৎ দুই একটি পাহাড়ী চাষী আপন মনে নিকটস্থ ঝরণা হইতে জল ধরিয়া, কিরূপে এই ধানের ক্ষেতে জল আনিতে পারা যায়, তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছিল। এক স্থানে একটি বৃহৎ পেয়ারা-বাগান দেখা গেল। এইভাবে উতরাই ছাড়িয়া আরও ৩ মাইল আন্দাজ পথ চলিয়া আসিয়া বেলা প্রায় সাড়ে ১০টার সময়ে আমাদের ঘোড়া "থলে" আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই গ্রামে ৮।১০ ঘর লোকের বসবাস ও তিনটি দোকান আছে দেখিলাম। দোকানে নূতন চাউল, মসুর ডাল, পেঁয়াজ, চিনি, ঘৃত, আটা ও কিছু কিছু মসলা পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে ন্যাসপাতি এখানে প্রচুর। খুচরা খরিদ করিলে এক পয়সায় চারিটি হিসাবে উহা পাওয়া যায়। একটি প্রাচীন শিবমন্দির জরাজীর্ণাবস্থায় এখনও অতীতের ধর্ম্মযুগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। নীচেই "রামগঙ্গা" নদী কুলুকুলু নিনাদে বহিয়া যাইতেছে। ইহার গতি খুবই বেগবতী। এই নদীর উপরের দোদুল্যমান লৌহ-সেতু পার হইয়া ডাক-ঘরের পার্শ্বের স্কুল-প্রাঙ্গণে আসিয়া আমাদের উভয়ের ঘোড়া যখন উপস্থিত হইল, তখন ডাণ্ডীওয়ালাগণ দিদিদের লইয়া এখানেই অপেক্ষা করিতেছিল। যত শীঘ্র সম্ভব আহারাদি শেষ করিয়া এখান হইতে পুনরায় রওনা হইবার কথা ছিল। কারণ, এখনও প্রায় ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিলে তবে আজিকার মত আশ্রয়স্থান পাওয়া যাইবে। তদনু-সারে আমি ও শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ নিকটস্থ একটি ঝরণার ধারায় স্নান করিতে গিয়া তৎপার্শ্বের একটি জলস্রোতে চালিত জাঁতার কলের নীচের স্রোতোধারায় রীতিমত অবগাহন স্নানাদি সত্বর শেষ করিলাম। পরে তৈয়ারী অন্ন উভয়েই দুইচারি গ্রাস মুখে দিয়া বেলা ১২টার মধ্যে পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ডাণ্ডীওয়ালারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার জন্য সর্ব্বদাই শশব্যস্ত, কারণ, তাহারা যত শীঘ্র ধারচুলায় পৌঁছিতে পারিবে, তত শীঘ্র আলমোড়ায় ফিরিয়া আসিবে। মজুরী আলমোড়ার তহশীলদারী হইতে অগ্রিম লইয়াই তবে রওনা হইয়াছে। সুতরাং আহারাদির পরক্ষণে তাহারা বিনা বিশ্রামেই দিদিদের লইয়া আগে চলিল। বন্দুক হস্তে ভূপ সিং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে বাধ্য হইল। আমাদের ঘোড়াওয়ালারা কিন্তু এ সময়ে যাইতে আদৌ প্রস্তুত হইতে চাহিল না। কারণ, ১০ মাইল পথ চলিয়া আসিয়া পরিশ্রান্ত ঘোড়াকে, পুনরায় সম্মুখের ৩ মাইল সাড়ে ৩ মাইল খাড়া চড়াই পথ এই দিবা দ্বিপ্রহরে লইয়া যাওয়া কত দূর কষ্টকর, তাহাই তাহারা এক্ষণে আলোচনা করিতেছিল। এমত অবস্থায় আমাদের অনেক কাকুতি-মিনতির পরে অনিচ্ছায় তাহারা ঘোড়াকে যাত্রার জন্য তৈয়ার করিল। ভারবাহী ঘোড়াগুলিও অদ্য এখানে বিশ্রাম করি-বার অবসর পাইল না। কারণ, বোঝা লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাদিগকেও নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে হইবে। এইরূপে আমরা আপন আপন ঘোড়ায় উঠিয়া চলিতে বাধ্য হইলাম।

এ কয় দিন ঘোড়ার পৃষ্ঠে আসিয়া আমাদের উভয়ের শরীর বেদনায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে গেলে পাহাড়ের চড়াই উঠা চলে না। এ সময়ে সকলেরই শুধু একই সাধনা—"আগে চল, আগে চল ভাই!' সকলেরই মনে শুধু 'কৈলাস' পৌঁছিবার দুরাকাঙ্ক্ষা প্রতি মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিতেছিল। ঘোড়া চড়াইয়ের পথে হাঁফাইতে হাঁফাইতে উঠিতেছে। তাহার পৃষ্ঠদেশে আমরা উভয়ে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে নিঃশব্দে বল্‌গা ধরিয়া বসিয়া রহি-য়াছি। ৩ বা সাড়ে ৩ মাইল খাড়া চড়াই অতিক্রম শেষ হইল। কিন্তু যখন আমরা চড়াইএর উপরে উঠিলাম, তখন দুই দিকের ঘন জঙ্গলে আমাদের রাস্তা একবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্রমশঃ সারা পথ ঘোর অন্ধকারময়

হইয়া উঠিল। আমাদের অবসন্ন শরীর এই জঙ্গলের ছায়ায় প্রথমে একটু শীতল হইয়াছিল; কিন্তু এইভাবে প্রায় সমস্ত অপরাহ্নকাল যখন এই জনমানবশূন্য জঙ্গলের মাঝখানেই অতিবাহিত হইতে চলিল, তখন আমরা দুই জনেই (এমন কি, ঘোড়াওয়ালা পর্য্যন্ত) ভীত-সন্ত্রস্ত-চিত্তে কতক্ষণে গন্তব্যস্থানে গিয়া পৌছিব, তাহারই চিন্তায় দ্রুতগতি অশ্বচালনার দিকে অবহিত হইলাম। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, শুধুই সম্মুখে চলিয়াছি। মনুষ্য বা কোন প্রকার পশু-পক্ষীর সাড়া-শব্দ পাইলে হয় ত মনে তখন একটু সাহসের সঞ্চার হইত। দিনের বেলা এই জঙ্গলের রাস্তা দিয়া যাইতে বাস্তবিকই এমন একটা আতঙ্ক হইতেছিল। মাথার উপরের গাছ হইতে একটি পাতা ঝরিয়া পড়িলেই মনে হইতেছিল, বুঝি বা কোন হিংস্র জন্তু আমাদিগের পশ্চাদ-নুসরণ করিতেছে।

এইরূপে কতক্ষণে প্রায় ৪ মাইল জঙ্গল পশ্চাতে রাখিয়া আরও আড়াই মাইল আন্দাজ পথ উতারে নামিয়া অবশেষে একটি শ্যামতৃণশোভিত ময়দানে আসিয়া পড়িলাম। সে পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই আমাদের ঘোড়া "ডাণ্ডির হাটে" আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যা সমাগত। দূরে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তুষারময় পর্ব্বত-প্রাসাদের চূড়ার উপরে অপরাহ্নের শেষ সূর্য্যরশ্মিগুলি আপন আপন মায়াজাল বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। উজ্জ্বল তুষার-রাশির উপরে তাহাদের লাল আভা দূর হইতে খুবই সুন্দর দেখাইতেছিল। দেখিলাম, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত যাত্রীর দলসহ স্বামীজীরা সকলেই তখন এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টি সেই মধুর দৃশ্য-গুলির উপরে নিবদ্ধ রহিয়াছে। দূরবীণ হস্তে বৃদ্ধ গঙ্গাধর ঘোষ বুঝি বা তন্ময় হইয়াই বিধাতার সেই বিচিত্র দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ডাণ্ডীওয়ালারা ডাণ্ডী নামাইয়া একধারে বসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিল। আমরাও ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে নীচে অবতরণ করিলাম।

স্বামীজী মহারাজ (অনুভবানন্দজী) আমাদের কুশলাদি প্রশ্ন করিলে আমরা রাস্তায় ভয়াবহ দৃশ্যের কথার উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন, যখন 'কৈলাস' যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তখন এ প্রকার রাস্তা খুবই সুগম বলিয়া আপনা-দের মনে রাখা উচিত। যাহা হউক, পরিশ্রান্ত শরীর, তখন ভয়ের রাস্তা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। চোখের উপরে সম্মুখের দৃশ্যগুলি নবরাগ-রঞ্জিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সুতরাং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সকল ক্লেশ ও ভয় কোথায় দূর হইয়া গেল। এই ডাণ্ডির হাট আলমোড়া হইতে ৬২ মাইল দূরে। এ স্থানটিতে মাত্র চারি পাঁচ ঘর লোকের বসবাস আছে, তাহা ছাড়া একটি ধর্ম্মশালা বিদ্যমান। তাহার অবস্থা দেখিলে তাহাকে গোশালা বলিয়াই মনে সাধারণতঃ ভ্রম উপস্থিত হয়। সে ঘরটিও তখন একটি বেদিনী নর্ত্তকী ও তাহার দুই জন সারঙ্গওয়ালা দুই তিন দিন হইতে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। স্বামীজী ও অন্যান্য যাত্রিগণ এখানকার একটি ঘরের সম্মুখস্থ খোলা বারান্দায় আশ্রয়লাভ করিয়াছেন দেখিয়া আমাদের কোথায়ও স্থান পাওয়া যাইবে কি না, এ বিষয়ে কিছুক্ষণ অনুসন্ধান চলিল। অবশেষে স্থানীয় দোকানদারের নিকট তাহার একটিমাত্র দোকানের উপরের ইন্ধন-আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ একটি কুঠারীর একধারে রাত্রিযাপনের অনুমতি পাইয়া সেদিনকার মত আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলাম। আসবাবাদি প্রায় সমস্তই ঘোড়াওয়ালাদের নিকট বাহিরে পড়িয়া রহিল। এই দোকানে দ্রব্যাদি কি কি পাওয়া যায়, সন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, এখানকার ঘৃত উৎকৃষ্ট, অথচ অপেক্ষাকৃত সুলভ শুনিয়া কিছু ঘৃত আমরা (টাকায় ১৪ ছটাক হিসাবে) সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। স্বামীজীরাও এখান হইতে কিছু ঘৃত খরিদ করিয়া লইয়াছেন শুনিলাম। রাত্রিকালে ষ্টোভ জ্বালিয়া কয়েকখানি লুচি ও কিছু হালুয়া তৈয়ার করিয়া জলযোগ করা গেল। দুঃখের বিষয়, এখানে জলকষ্ট খুবই বেশী। বহুকষ্টে লোকের দ্বারা প্রায় আধ মাইল দূরের একটি ঝরণা হইতে জল আনাইয়া তবে সেদিনকার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইয়াছিল।

১৩ই আষাঢ়, ইং ২৭শে জুন, বৃহস্পতিবার

অদ্য প্রভাতেই আমরা আপন আপন আসবাবপত্রাদি ঘোড়ার পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া সকলেই একে একে আসকোট উদ্দেশে রওনা হইলাম। পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে মধ্যে মধ্যে এবারে তৃণ-গুল্মে পরিপূর্ণ সমতল স্থান পড়িলেও এ পথে ঝরণার ধারা খুব কমই দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই সকল সমতল স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলে পাহাড়গুলি উচ্চ প্রাচীরের মত আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই মনে হইত। আগে যাইতে

গেলে কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে সম্মুখের পথের অস্পষ্ট রেখাই আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে ধীরে ধীরে লইয়া চলিয়াছে। এইরূপে প্রায় ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ৯টা আন্দাজ সময়ে আমরা "আসকোট্" পৌঁছিলাম।

দূর হইতে এই আসকোটের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। আলমোড়া হইতে ধারচুলা পর্য্যন্ত ৯০ মাইল পথ যাইতে গেলে তিনটি বড় গ্রাম পড়ে, ইহা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। প্রথম বেরীনাগ, দ্বিতীয় আসকোট, তৃতীয় ধারচুলা। প্রথমটির বিষয় ইতিপূর্ব্বে পাঠকবর্গ জানিতে পারিয়াছেন। এখানে দ্বিতীয়টি এই আসকোট—আলমোড়া হইতে ৬৯ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামখানি বেশ ঝক্‌ঝকে ও পরিষ্কার। চারিদিকেই দূরে দূরে সারি সারি পাহাড়গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকায়, অপেক্ষাকৃত উচ্চ পাহাড়ের কোলের এই গ্রাম বেশ প্রশস্ত বলিয়া মনে হইতেছিল। গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে। রাস্তার ধারে ধারে চারি পাঁচখানি দোকান দেখিতে পাইলাম। কোনটিতে মনোহারী দ্রব্য, কোনটিতে বা চাউল, ডাল, মশলা প্রভৃতি এবং কোনটিতে বা কাপড়, জামা ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে। এখানে ন্যূনকল্পে ২৫।৩০ ঘর লোকের বসবাস আছে মনে হইল।

আমাদের ঘোড়া ক্রমশঃ গ্রামবাসীদের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির মাঝখানে চলিতে চলিতে এক ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এত দিন পরে এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের একমাত্র ধর্ম্মশালাটি দেখিয়া বাস্তবিকই সে সময়ে ইহা কৈলাসযাত্রীদিগের আশ্রয় লইবার মত স্থান বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মিল। ধর্ম্মশালাটি নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। নীচে ৪খানি ঘর ও তৎসংলগ্ন বারান্দা; উপরেও সেইরূপ ৪খানি ঘর ও বারান্দা রহিয়াছে। তবে তাহার নির্ম্মাণকার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। ধর্ম্মশালার উত্তরাংশে খানিক দূরে, পাহাড়ের গায় দুইটি প্রাসাদ ছবির মত শোভা পাইতেছিল। তাহা দেখিলে তাহার অধিকারিগণকে সাধারণ অশিক্ষিত পাহাড়ী বলিয়া কখনই মনে হয় না। বাটী দুইখানির সম্মুখের সজ্জিত বারান্দাগুলি পুরাতন এবং কতকটা আজকালকার নূতন এই উভয় 'ফ্যাসানে' নির্ম্মিত বলিয়া এ প্রদেশে তাহা দেখিতে বেশ অভিনব ও রুচিসঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছিল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, এই বাটীর মালিক এখানকার রাজওয়ারা সাহেব মহোদয়। তাঁহারই ধর্ম্মশালায় আজ আমরা আশ্রয় লইয়াছি। ধর্ম্মশালায় দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটি ও দরোয়ান ভূপসিং ইতিপূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা এইখানেই বিশ্রাম ও আহারাদি শেষ করিয়া যাইবার কথা তুলিলেন। দোকান হইতে চাউল, ঘৃত প্রভৃতি খরিদ করিয়া আনা হইল। ধর্ম্মশালা হইতে খানিক দূরে একটি আমবাগানের মধ্য দিয়া গিয়া এক স্থানে একটি ঝরণার ধারায় আমরা সকলে একে একে স্নানাদি শেষ করিয়া আসিলাম। ন্যাসপাতি ও কাঁচা আম এখানেও প্রচুর দেখিতে পাওয়া গেল।

আহারাদি তৈয়ারী হইলে আমরা ভোজনে বসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এক জন চাপরাশী একটি বড় থালায় করিয়া চাউল, দাল, ঘৃত, মশলা, আটা, চিনি ও নানারকমের আচারদ্রব্য প্রভৃতি ভেট লইয়া আমাদিগের সম্মুখে হাজির হইল। এ ব্যাপারে তখন আমরা সকলেই যুগপৎ বিস্মিত হইয়া পড়ায়, সেই অপরিচিত লোকটি এখানকার রাজওয়ারা সাহেবের, প্রতি বৎসরেই প্রত্যেক কৈলাসযাত্রীদের প্রতি এইরূপে তীর্থপথ-ক্লেশ দূর করিবার নিয়ম জ্ঞাত করাইল। শুধু তাহাই নহে, কোন বিষয়ে আমাদের অসুবিধা হইতেছে কি না, লোকটি সে সম্বন্ধেও পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এই দুর্গম অপরিচিত পার্ব্বত্য প্রদেশে চিরপরিচিতের মত আত্মীয় রাজওয়ারা সাহেব মহোদয়কে তখনই দেখিয়া আসিবার যথেষ্ট আগ্রহ থাকিলেও তাঁহার ভৃত্য এ সময়ে রাজওয়ারা সাহেবের সহিত দেখা করার সময় নহে, এ কথা জানাইতে, আমরা নিরস্ত হইলাম। কৈলাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইব, এ কথা ভৃত্যটিকে জানাইয়া কিছু বখশিস দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে আহারান্তে বেলা ২॥টা আন্দাজ সময়ে আসকোট পরিত্যাগের জন্য উদ্যোগী হইলাম। আসকোটের এই রাজওয়ারা সাহেবের পরিচয় সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর সংবাদ জানিয়াছিলাম। ইঁহারা রাজা গজেন্দ্রসিংহ পাল বাহাদুরের বংশধর, 'কুতুর' রাজবংশ বলিয়া ইঁহাদের খ্যাতি চলিয়া আসিতেছে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ঢাকা

বিক্রমপুরের পালবংশীয় রাজগণ মুসলমান বাদশাহ বখতিয়ার খিলিজীর আমলে বিতাড়িত হইয়া এইখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই রাজওয়ারা সাহেব এক্ষণে তাঁহাদেরই বংশধর। এ সংবাদ কতদূর সত্য, তাহা ঐতিহাসিকগণই বলিতে পারেন। বর্ত্তমানে কুমার বিক্রমসিংহ পাল বাহাদুর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারা উপস্থিত চারি ভাই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার খুল্লতাত-ভ্রাতা কুমার খড়্গ সিংহ পাল বাহাদুর পিথোড়াগড়ের পলিটিক্যাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইঁহাদের জমীদারীর আয়তন সামান্য নহে মনে হইল। কারণ, ধারচুলায় পূর্ব্ববর্ত্তী খেলা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত স্থানই ইঁহাদের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত, ইহা সে সময়ে শুনিয়া আসিয়াছিলাম।

আসকোট পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতেই প্রথমে উতরাই পড়িল। এ উতরাই ক্রমশঃ এতই নিম্নমুখী হইয়া নামিয়াছে যে, অশ্বপৃষ্ঠে যাওয়া আমার পক্ষে অতীব কঠিন বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন। দেশে তিনি অভ্যস্ত অশ্বারোহী হইলেও এ ক্ষেত্রে তাঁহার সে অভ্যাস বোধ করি অসহ্য বোধ হইতেছিল। তাই তিনি মধ্যে মধ্যে এই অনভ্যস্ত ঘোড়সওয়ারের দুর্দ্দশা এক একবার আড়নয়নে দেখিয়া লইতেছিলেন। আমাদের অক্ষমতা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই ঘোড়াওয়ালা নিজেই আমাদিগের উভয়কে ঘোড়া হইতে নামিবার পরামর্শ দিতে আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এইবার পদব্রজে প্রায় ৩ কি সাড়ে ৩ মাইল নীচে চলিয়া আসিতে পথিমধ্যে, ডাণ্ডীওয়ালা ও দিদিদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। এরূপ কঠিন উতরাইএ বাহকগণ খুবই সাবধানে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে লইয়া আসিতেছিল। তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আমাদের নামিয়া আসিবার সময়ে, সত্য কথা বলিতে কি, আমি নিজে একবার টাল সামলাইতে পারি নাই; ঢালু পথে সম্মুখপানে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম। সুখের বিষয়, ডাণ্ডীবাহকের মধ্যে এক জন আমাকে ধরিয়া ফেলায় আমি সে যাত্রা আঘাত হইতে রক্ষা পাই। এইরূপে নীচে নামিয়া বেলা ২টা আন্দাজ সময়ে 'গৌরীগঙ্গা' নদীর পুল সম্মুখে পড়িল। এই নদী উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিতা। এইখানে আসিয়া আমরা সকলেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ডাণ্ডীওয়ালাগণ দিদিদের ডাণ্ডী হইতে নামাইয়া দিয়া নদীতে হস্ত-মুখ প্রক্ষালনের জন্য অগ্রসর হইল।

খড়্গ সিংহ পাল বাহাদুর

এই নদীর বিস্তৃতি ২৫।৩০ হাতের বেশী হইবে না। তীরে দুই দিকেই আকাশস্পর্শী পাহাড় খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ের অঙ্গ নানাজাতীয় গাছ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তাহারই মধ্য দিয়া নদীর তীরে তীরে একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ রাস্তা গিয়াছে। মনুষ্যসমাগমহীন সে রাস্তা দিনের বেলা অতি ভয়ানক বলিয়া মনে হইতেছিল। এইরূপ জঙ্গলের মাঝখানে নদীর ধারের সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া একাকী যাওয়া চলে কি না, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে একটু জল্পনা-কল্পনা চলিলে, দিদি ও আমি নিজ নিজ যানবাহনাদি ও বাহকগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া পদব্রজে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া চলিলাম। সঙ্গে উভয়েরই হস্তে পাহাড়ে উঠিবার সেই হাল্কা অথচ লম্বা যষ্টি। এইভাবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে মনে কতই না চিন্তাস্রোত চলিতে লাগিল। কোথায় 'কৈলাস', কোথায় 'মানস', কত দিনে পৌঁছিব, পৌঁছিতে

গৌরী নদীর পুল

ব্রহ্মচারীর একটি সুন্দর আশ্রম আছে শুনিতে পাইলাম। কিন্তু সে সময়ে পাছে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে আশ্রম দেখা স্থগিত রাখিয়া জোলজুবী পরিত্যাগ করিলাম। এই জোল-জুবীতে কার্ত্তিকমাসে ভুটিয়াদিগের একটি বিশেষ মেলা বসিয়া থাকে।

এইবার আমরা এই কালী নদীর তীরে তীরে চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই নদী প্রচণ্ড-বিক্রমে দুইটি পাহাড়ের মাঝখানে বহিয়া চলিয়াছে। ইহার ওপারে নেপালরাজ্য, এপারে বৃটিশ রাজত্ব। মধ্যে এই নদীই একমাত্র ব্যবধান, এপারে হইতে ওপারে নেপাল-রাজ্যের কিছুই দেখা যায় না। সম্মুখে শুধু প্রকাণ্ড আকাশচুম্বী পাহাড় রাজ্যটিকে দুর্গ-প্রাচীরের মত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে দেখা যায়। এপারে ঐ নদীর তীরে তীরে পাহাড়ের কোল দিয়া আমাদের রাস্তা আঁকাবাঁকাভাবে চলিয়া গিয়াছে। কখনও বা কিছু চড়াই অতিক্রম করিয়া পরক্ষণেই উতরাইএ নামিলাম, আবার উতরাই হইতে কচিৎ বা চড়াইএর পথ উঠিয়াছে। এই পথে কালী নদীর গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে প্রায় ৬ মাইল অগ্রসর হইয়া সন্ধ্যা ৭টা আন্দাজ সময়ে আমরা "বালুয়া-কোটে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পারিব কি না, এ দুর্গম পথে শারীরিক সকলে কুশলে থাকিবে ত? না থাকিলে কি দুর্দ্দশাই না ভোগ হইবে ইত্যাদি অনেক প্রকার ভাবনায় সে সময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। নদীর ধারে ধারে এইভাবে এক মাইল আন্দাজ চলিয়া আসিলে পশ্চাৎ হইতে শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ, ভূপসিং এবং ডাণ্ডী ও ঘোড়া লইয়া বাহকগণ একে একে উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, আমরাও নিজ নিজ যান-বাহনে আবার উঠিয়া বসিলাম। এই নদীর ধারে ধারে অযত্নসম্ভূত কেবল ভাঙ্গের জঙ্গল রাস্তাকে একপ্রকার ঢাকিয়া রাখিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলিতে চলিতে একটি চড়াইএর মুখে নদীর ভীষণ গর্জ্জন কাণে পৌঁছিতে সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম, রাস্তার পূর্ব্বদিক হইতে একটি নদী আসিয়া এই গৌরীগঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হওয়ায় উভয়ের সঙ্গমস্থল হইতে এই গর্জ্জনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদীর নাম "কালী"। এই কালী নদী যে স্থলে গৌরীগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহারই পার্শ্বে "জোলজুবী নামে একটি ছোট গ্রাম দেখিতে পাওয়া গেল। এখানে ১০।১২ ঘর ভুটিয়ার বসতবাটী রহিয়াছে। তাহা ছাড়া এই উভয় নদীর মিলিত কোণে, তীরের উপরেই এক জন

জোলজুবী গ্রাম—গৌরী ও নদীর সঙ্গমস্থলে

এই বালুয়াকোট আলমোড়া হইতে ৮৯ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার তলদেশে কালী নদীর জলই গ্রামবাসীদের অবলম্বনস্বরূপ বহিয়া চলিয়াছে। গ্রামে একটি স্কুলবাড়ী আছে। স্বামীজীরা অন্যান্য যাত্রিগণ সহ পূর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানে জনৈক মুসলমানের একটি-মাত্র দোকান আছে। গ্রামে ভুটিয়াদিগের অনেকগুলি বাড়ী চাবিবদ্ধ অবস্থায় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া প্রথমে আমাদের মনে খুবই ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। বুঝি বা গ্রামে মহামারীর উৎপাত * আরম্ভ হইয়াছে, তাই গ্রামবাসিগণ এ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইয়া থাকিবে। কিন্তু প্রকৃত

বালুয়াকোটের নীচে কালী নদী

কারণ তাহা নহে জানিয়া পরে সে আশঙ্কা দূর হইল। শুনিলাম, ভুটিয়াবাসীরা এ সময়ে প্রতি বৎসরেই ব্যবসায় উদ্দেশে উপরে অর্থাৎ গার্ব্বিয়ং ও তিব্বত অঞ্চলে বাহির হইয়া থাকে। গরমকালটা প্রায় ৫।৬ মাসকাল ইহাদের উপরে ব্যবসায় চলে। কার্ত্তিক মাস হইতে সমস্ত শীতকাল ভরিয়া নীচেই থাকিয়া এখানে বসবাস করে। যাহা হউক, অন্য কোন স্থানে আমাদের আশ্রয় খুঁজিয়া পাইলাম না। স্বামীজীরা অন্যান্য যাত্রিগণের সহিত পূর্ব্বেই আসিয়া এখানকার স্কুল-বাড়ীর ঘর দুইখানি অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের অন্য ঘর না পাওয়ায় অগত্যা দোকানের পার্শ্বে একটি দরজা-জানালা-বিহীন অশ্ব-বিষ্ঠা-পরিপূর্ণ ঘরে রাত্রিযাপনের সংকল্প করিতে বাধ্য হইলাম। ইহাই হইল যাত্রীদিগের সেখানকার ধর্ম্মশালা। উৎকট দুর্গন্ধে প্রথমে ইহাতে প্রবেশ করিতে সকলেরই নাসিকা সঙ্কুচিত হইতেছিল। বাহিরেই কম্বল মুড়ি দিয়া রাত্রিযাপনের ইচ্ছা থাকিলেও আকাশে সে দিন বিলক্ষণ মেঘের উৎপাত আরম্ভ হওয়ায়, বাধ্য হইয়া সেই ঘরই পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া হইল। ঘরটির এক পার্শ্বের দিকে সমস্ত আসবাব রাখিয়া আর্দ্র মাটীর মেঝের উপরে পাতিবার জন্য একটি বড় নূতন "চটাই" (পাটীর আকারে) দোকানদারের নিকট পাওয়া গিয়াছিল। তাহার উপরে আপন আপন বিছানাপত্রাদি যথাসম্ভব বিছাইয়া রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা গেল। দোকান হইতে আটা, ঘৃত প্রভৃতি খরিদ করিয়া বাহিরের চৌতারায় আহারাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দোকানে এখান হইতে কেরোসিন তৈলের মূল্য মহার্ঘ্য হইতে আরম্ভ হইল। প্রতি বোতল ।৷৹ আনা হিসাবে খরিদ করিতে হইয়াছিল।

সমস্ত দিনের অত্যধিক পরিশ্রমে রাত্রিতে আহারাদির পরে যখন সকলেই বিশ্রামের অবসর খুঁজিতেছিলাম, তখন আকাশে মেঘের সঙ্গে সঙ্গে দুই এক ফোঁটা করিয়া ক্রমশঃ প্রবল বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ হইল। সেই বৃষ্টির জল আমাদের তথাকথিত ধর্ম্মশালার শতছিদ্রময় ছাদ ভেদ করিয়া বিছানাপত্র সহ সমস্ত আসবাবাদি একবারে ভাসাইয়া দিল। সে রাত্রি আমাদিগের সকলকেই বসিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। অন্ধকার রাত্রিতে জনমানব-হীন পাহাড়-জঙ্গলের মাঝখানে দুর্গন্ধময় ঘরে বসিয়া বর্ষার দিনে রাত্রিজাগরণ সেই দিনই আমাদের প্রথম। এ দিনের দুর্দশার কথা যখনই মনে হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে। এই দারুণ দুর্য্যোগের দিনে আমাদের বিহারী দরোয়ান ভূপসিংএর সেই ঘরের একটি কোণে বসিয়া বসিয়া নাসিকাগর্জ্জন সে সময়ে কেবল আশ্চর্য্যরূপে শ্রুতি-সুখকর মনে হইয়াছিল।

* গ্রামের লোক "হৈজা কী বিমারী" বলিয়া থাকে।

পরদিন প্রভাতে পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে উঠা গেল। সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়া তখনও আকাশ মেঘমুক্ত হয় নাই। বর্ষার দিনে বৃষ্টি হইবে না, এ ব্যবস্থায় বিধাতা কেন সন্তুষ্ট রহিবেন? আমাদের কয়জনের দুর্দ্দশায় সারাজগতের কিছুমাত্র আসে যায় না। ঘোড়ার সাজের দ্রব্য বলিতে যেটুকু আমাদের বসিবার কম্বল-আসন, তাহাও ভিজিয়া গিয়াছে। রাত্রিকালে ঘোড়া-ওয়ালা বা ডাণ্ডীবাহক কেহই গাছতলা ভিন্ন অন্যত্র আশ্রয় পায় নাই। এমত অবস্থায় ঘোড়ার পৃষ্ঠের ভিজা কম্বল-আসনে বসিয়া এক হস্তে নিজ নিজ মস্তকোপরি ছাতা এবং অন্য হস্তে ঘোড়ার মুখের ভিজা দড়ি ধরিয়া বর্ষাপিচ্ছিল পথে, বাধ্য হইয়া আমাদের রওনা হইতে হইল। দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী ডাণ্ডীর উপরে ছিলেন। তাই ছাতা ধরিয়া যাইতে তাঁহাদের সেরূপ কষ্ট না হইলেও আমি ও শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ বড়ই বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। বৃষ্টিপাতে ঘোড়ার গা পিচ্ছিল হওয়ায় চড়াই উঠিবার কালে, কিম্বা পিচ্ছিল পথে উতরাইএ নামিবার সময়ে উভয় ক্ষেত্রেই খুব সাবধানে অশ্ব-বল্গা সংযত রাখিতে হইতেছিল। তবে সুখের বিষয়, এ দিনে বেশী দূর যাইবার কথা ছিল না। মাত্র ১১ মাইল দূরে গেলেই ধারচুলা —"তপোবন"।

স্বামীজীরা অতি প্রত্যুষেই বর্ষা মাথায় করিয়া পদব্রজে রওনা হইয়াছেন। তাঁহাদের নিজেদের আশ্রমে পৌছিতে পারিলেই এ কয় দিনের সব ক্লেশ দূর হইয়া যায়। মনের মধ্যে আশা রহিয়াছে, আজই যে কোন উপায়ে সেখানে পৌছিতে পারিব। এ দিনে তেমন উচ্চ পাহাড় পথে পড়িল না। ৩।৪ মাইল পথ অতিক্রম করিলে আকাশ কিছু পরিষ্কার হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পথ প্রায় সমতল ক্ষেত্রের উপরে আসিয়া পড়িল। এইরূপে ৮ মাইল আন্দাজ আসিবার পরে "গোপালগাঁও" নামক গ্রামে আমরা প্রবেশ করিলাম। এ গ্রামে রাস্তার ধারে ধারে যথেষ্ট কলাবাগান, আম, পেয়ারা ও গোঁড়ানেবুর গাছ রহিয়াছে দেখিয়া আনন্দ-কৌতূহল-দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গ্রামের লোক সকলেই উৎসুক-নয়নে আমাদিগের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ "কঁহা জাতে হ্যায়, কৈলাস?" ইত্যাদি প্রশ্নে হর্ষমিশ্রিত উৎসাহ জ্ঞাপন করিতেছিল। গ্রামের দুই ধারে কোথাও ইক্ষুক্ষেত্র, আবার কোথাও বা ভুট্টার ক্ষেত দেখা যাইতেছিল। তবে গ্রামের অধিকাংশ ঘরই তালাবদ্ধ রহিয়াছে দেখিলাম। এখানকার অধিবাসিগণও ব্যবসায় উদ্দেশে উপরে গিয়াছে। উপরে যাইবার সময়ে সাধারণতঃ ইহারা কাপড়, গম, চাউল, আটা প্রভৃতি এখান হইতে লইয়া যায় এবং সেখান হইতে তৎপরিবর্ত্তে উল, লবণ, সোহাগা প্রভৃতি আনয়ন করে। এইরূপে তাহাদের ব্যবসায় বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। আমরা বেলা ২টা আন্দাজ সময়ে "ধারচুলা" গ্রামে পৌছিলাম। এ গ্রামখানিতে অনেক লোকেরই বসবাস রহিয়াছে। পঞ্জাব হইতে জনৈক দোকানদার ব্যবসায় উদ্দেশে এখানে আসিয়া একবারে বসতবাড়ী করিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে বাস করিতেছে দেখিলাম। একটি পাদ্রীর আড্ডাও দৃষ্টিগোচর হইল। আলমোড়া হইতে ৯৯ মাইল দূরে পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই! সে সময়ে এই আড্ডায় এক জন ইশাহী খৃষ্ট-সঙ্গীত গাহিতেছিল। গ্রামে ৩।৪ খানি দোকান। একটি দোকান ও তৎসংলগ্ন পোষ্ট-আফিসের সম্মুখে আসিয়া ডাণ্ডীওয়ালারা ডাণ্ডী নামাইয়া বিশ্রাম লইল, এ গ্রাম ছাড়িয়া তখন আর আগে যাইতে চাহিল না। এখান হইতে আরও ২ মাইল দূরে স্বামীজীদের "তপোবন"। এই তপোবন পর্য্যন্তই ভাড়া দেওয়া ছিল। তহশীলদারী কাছারীর এজেন্সিতে টাকা জমা দেওয়ার রসীদপত্র দেখাইয়া, কিছুক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডার পরে স্থানীয় গ্রামবাসীদের তিরস্কারে অগত্যা কুলীরা পুনরায় অগ্রসর হইল। মনে হয়, কিছু বখ্‌শিশ পাইবার অজুহাত দেখাইয়া তাহারা এইরূপে আমাদিগকে গ্রামে রাখিবার মতলব করিয়াছিল। যাহা হউক, বেলা ২৷৷০টা আন্দাজ সময়ে আমরা সকলেই তপোবনে প্রবেশ করিলাম। পথিমধ্যে কালী নদীর উপরে ওপার হইতে এপারে আসিবার একটি দড়ির পুল দেখিয়াছিলাম। নেপাল-রাজ্যের লোক এই দড়ির পুল দিয়া এপারে অর্থাৎ বৃটিশ রাজত্বে আসা-যাওয়া করিয়া থাকে।

এখানে পৌছিতেই তপোবনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ অনুভবানন্দজী মহারাজ বিশেষ আদর-আপ্যায়ন সহযোগে আমাদিগকে তাঁহাদের আশ্রমে স্থান দিলেন। একসঙ্গে যুগপৎ অনেকগুলি মূর্ত্তি আমাদিগের আগমনে হর্ষধ্বনি প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্ব-পরিচিত যাত্রীর দল ব্যতীত আরও তিন জন বাঙ্গালী সে সময়ে এখানে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হইল। শুনিলাম, তাঁহারাও কৈলাসযাত্রী;

এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে আসিয়া এ যাবৎ আমাদেরই অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। আনন্দের মাত্রা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। কিছুক্ষণ পরে ভারবাহী ঘোড়াগুলি আমাদের বোঝা প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইল। ডাণ্ডীওয়ালা, ঘোড়াওয়ালা সকলেই প্রসন্ন-চিত্তে বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, স্বামী-জী মহারাজের কথামত তাহাদিগের আপন আপন প্রাপ্য মজুরী চুকাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

সওয়ার ঘোড়াওয়ালা দুই জনের প্রাপ্য মজুরী ৫২ টাকার মধ্যে দুই টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাদে ৫০ পঞ্চাশ টাকা এবং দুই জনের ৷৷০ আট আনা হিসাবে ১ টাকা বখশিশ দেওয়া হইল। ভারবাহী ৩টি ঘোড়ার প্রতি ঘোড়া ২ মণ হিসাবে মোট ৬ মণ লগেজ আনার মজুরী ৪২ টাকা চুকাইয়া দিলাম। ডাণ্ডীওয়ালারা প্রথমেই মজুরী লইয়া তবে ডাণ্ডী মাথায় তুলিয়াছিল। তাহারা এক্ষণে বখশিশ চাহিল। দিদির ইচ্ছামত তাহাদের বারো জন প্রত্যেককে ।০ আনা হিসাবে মোট ৩ টাকা বখশিশ দিলাম। এই তীর্থপথে যাহা কিছু খরচপত্র হইবে, তাহার হিসাব রাখিবার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত ছিল। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণকে টাকাকড়ি রাখিবার জন্য প্রথমটা পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি এ বিষয়ে বিশেষ ওস্তাদের মত জবাব দিয়াছিলেন যে, টাকা-কড়ি দিলে তিনি আনন্দের সহিত রাখিবেন, পরন্তু খরচের হিসাব তাঁহার নিকট কেহই লইতে পারিবেন না। দুঃখের বিষয়, এ প্রস্তাবে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী আদৌ সম্মত হয়েন নাই। কাযেই সে বোঝা আমাকেই আগাগোড়া বহন করিতে হইয়াছিল।

এই স্থানে একটি কথা আমার বলিবার আছে। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, পথিমধ্যে দিদির ডাণ্ডীখানি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নূতন একখানি ডাণ্ডী বারিছিনা হইতে প্রত্যহ ৷৷০ হিসাবে ভাড়ায় চুক্তি করিয়া আনা হয়। ধারচুলা পর্য্যন্ত তাহার মজুরী ৫ দিনে ২৷৷০ টাকা এবং এখান হইতে পুনরায় বারিছিনা পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া যাওয়ায় ৫ দিনের মজুরী ২ টাকা ৮ আনা মোট ৫ টাকা কুলীদিগের হস্তেই দেওয়া হইয়াছিল। আর এই ডাণ্ডীখানি বারিছিনায় পৌঁছিয়া দিতে এবং সেখান হইতে ভাঙ্গা ডাণ্ডী লইয়া আলমোড়ার দোকানে লইয়া যাইতে স্বতন্ত্র মজুরী ৮ টাকা ৫ আনা আমাদের অতিরিক্ত লাগিয়াছিল। খরিদ-করা ডাণ্ডীখানি দোকানে ফেরত দিবার কারণ এই, যদি দোকানদার ইহার ভগ্নাবস্থা দেখিয়া কিছু মূল্য ফেরৎ দিতে স্বীকৃত হন। এ সকল বিষয়ের যাহা কিছু বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক, সমস্তই আমাদের তপোবনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ অনুভবানন্দ মহারাজ স্বেচ্ছায় ভার লইয়াছিলেন। আমাদের মত গৃহী ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট হইতে শুধুই উপকারই গ্রহণ করিয়া আসিল; এজন্য তাঁহার নিকট চিরদিনের জন্য ঋণী হইয়াই রহিয়া গেলাম।

সকলের প্রাপ্য মজুরী শেষ করিয়া দিয়া আমি ও শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ পূর্ব্ব হইতেই আগত তিন জন কৈলাসযাত্রীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। ইঁহাদের নাম, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত শীতাংশু সরকার। প্রথমোক্ত দুই জনের কলিকাতায় নিবাস। বয়সে নবীন হইলেও, ইঁহারা মেডিকেল কলেজ হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার এবং শেষোক্ত ভদ্রলোকটিও এই ডাক্তারী বিদ্যা উক্ত কলেজেই এখনও শিক্ষা করিতেছেন। ইঁহার নিবাস উলুবেড়িয়ায়। বিদেশে, বিশেষতঃ কৈলাসের মত দুর্গম পার্ব্বত্য পথে, হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত হিমের রাজ্যে একসঙ্গে এই আড়াই জন ডাক্তার আমাদের সহযাত্রী হইবেন, এ সংবাদে সমতলবাসী আমরা একে বাঙ্গালী, তায় স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে "কৈলাস" দর্শনোৎসাহী হইয়াছি, এ ক্ষেত্রে সে সময়ে মনে কিরূপ সাহস লাভ করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে।

রুক্মা দেবী এইখানেই আছেন শুনিয়া তাঁহার দর্শনাভিলাষে মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। আমরা পাহাড়ের কোলে সরকারী রাস্তার অতি নিকটেই, তপোবনের চারিখানি ঘর-সংলগ্ন-বারান্দায় উপস্থিত ছিলাম। ঘরগুলির দুইখানিতে ঔষধপত্রাদি ও ডাক্তারের রোগী দেখার ব্যবস্থা ছিল; এবং অপর দুইখানিতে স্বামীজী ও আমাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখান হইতে প্রায় দেড় বিঘা জমী আন্দাজ দূরে, একটু নীচে আসিয়া আশ্রমের মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহারই নিকটে রান্নাঘরের সহিত আরও ৩ খানি ছোট ছোট ঘর সংলগ্ন রহিয়াছে। তাহারই একটি ঘরে দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটির থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রুক্মাদেবী তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। কৈলাসযাত্রীদিগের মধ্যে এই রুক্মাদেবী

চিরদিনই প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। উড ষ্ট্রীট-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে সময়ে "কাগুপের" সহিত "কৈলাস" প্রভৃতি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন এই রুমাদেবীর ইতিবৃত্ত "মডার্ণ রিভিউ"এ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি নিজে এই যাত্রায় বাহির হইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রমুখাৎ এই রুমাদেবীর ও কৈলাসযাত্রার আবশ্যক দ্রব্যাদি কি কি লাগে, তাহার ইতিবৃত্ত শুনিয়া আসিয়াছি। তার পর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "কৈলাসযাত্রা" এবং অধুনা শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "হিমালয়পারে কৈলাস ও মানসরোবরের ভ্রমণ-কাহিনী"তে এই রুমাদেবীর সহিত তাঁহারা কিরূপ পরিচিত ছিলেন, তাহার যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই আশ্রম-বাসিনীর দর্শনলাভের আশায় ব্যগ্র হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমরা যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, দিদি ও সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটিকে লইয়া তিনি তখন আশ্রমের সমস্ত "খুঁটিনাটী" অর্থাৎ কোথায় কোন্ ঘর, কোন্‌খান দিয়া কালী-নদীতে স্নানে যাইবার পথ, কোন্‌খানে বা রান্না করিবার স্থান ইত্যাদি দেখাইতে ব্যস্ত ছিলেন।

আমরা তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলে এই "আমাদের রুমা দেবী" বলিয়া দিদি তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমাদের দেখিয়া রুমাদেবী যেন চির-পরিচিতের মত কত মিষ্ট স্বরে "আইয়ে, বৈঠিয়ে, আপলোঁগ কৈলাসযাত্রী ভাগ্যবান্ হ্যায়" ইত্যাদি নানাপ্রকার আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে মন্দিরাদি দেখিয়া সেখান হইতে উপরে ফিরিবার কালে তিনি "দেখিয়ে, আপ-লোঁগ নয়া আদমী," "কুছ তকলীফ ন হোয়," "আপলোঁগোকে সেবা মে হম্ হাজির হ্যাঁয়" ইত্যাদি বিনয়-মধুর বাক্যে অল্পক্ষণমধ্যে আমাদিগকে আপন করিয়া লইলেন।

স্বামীজীদের মধ্যে এ সময়ে কালিকানন্দজী মহারাজ এখানে যাত্রীদিগের সুখ-সুবিধার যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটি না হয়, তজ্জন্য বিশেষ তৎপর ছিলেন। এখানে যে কয় দিন আমাদের থাকিতে হইয়াছিল, আমরা বেশ আনন্দেই দিনযাপন করিতে পারিয়াছি। কালিকানন্দজী মহারাজ আশ্রমের জন্য প্রত্যহই গ্রামের মধ্য হইতে হাট-বাজার-দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া আনিতেন। সে সময়ে আলু ও কাঁচকলার যথেষ্ট আমদানী ছিল। আমাদের মত নিরামিষাশীর পক্ষে তাহা অতীব উপাদেয় বলিয়াই মনে হইত। যাত্রীদিগের মধ্যে পাবনা-নিবাসী শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এক জন সদাচারসম্পন্ন, প্রকৃত নিষ্ঠাবান্, ধার্ম্মিক ব্যক্তি। আসিয়া অবধি মন্দির-ঘরের বারান্দার এক পার্শ্বে এক স্থান লইয়া, প্রত্যহই এক-বারমাত্র স্ব-পাক নিরামিষ আহারে দিনযাপন করিতেন। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ চিরদিনই আমিষপ্রিয়, এ জন্য সেখানে তিনি প্রায়ই আহারকালে স্বামীজী ও ডাক্তারদের দলে যোগ-দান করিতেন।

চারিধারে পাহাড় থাকিলেও অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে শীত অপেক্ষাকৃত কম। কারণ, এখানকার উচ্চতা ৩ হাজার ফুটের বেশী হইবে না। আশ্রমে ৩।৪টি গরু আছে, মধ্যে মধ্যে রুমাদেবী আমাদিগকে তাঁহার খাঁটি দুগ্ধ দিয়া পরিতৃপ্তি প্রদান করিতেন। এ দিকের পাহাড়ীরা অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে খাঁটি ঘৃত বিক্রয় করিয়া থাকে। স্বামীজীর কথামত আমরা এখান হইতে কিছু ঘৃত, আটা ও চিনি খরিদ করিয়া তৎসংযোগে একপ্রকার মিঠাই প্রস্তুত করিয়া কৈলাসের পথে ব্যবহারের জন্য সঙ্গে রাখিলাম। এখানে এই তপোবনের একটু ইতিবৃত্ত পাঠকবর্গকে জানানো আবশ্যক মনে করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই তপোবনটি ধারচুলা হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে, সরকারী রাস্তার নিকটেই অবস্থিত। আশ্রমের নীচে অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে কালীনদী বিপুলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিকেই উন্নত পাহাড়। সে সকল পাহাড়ের উপরে প্রায়ই মৃগাদি দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে কতকটা সমতল ক্ষেত্রের উপরে আশ্রমটি স্থাপিত হইয়াছে। নিকটেই গরম জলের একটি ঝরণা আছে। আশ্রমের এই জমী, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত আসকোটের রাজওয়ারা সাহেবের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমৎ অনুভবানন্দজী মহারাজ ইহার প্রয়ো-জনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া, বহু কষ্টে আশ্রমের নামে উক্ত রাজওয়ারা সাহেবের নিকট হইতে এই জমীর দানপত্র লিখিয়া লইয়াছেন। ইং সন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উক্ত অনুভবানন্দজী মহারাজ ও স্বামী বীরেশ্বানন্দজী শ্রীকৈলাস ও মানস দর্শনের আশায় যখন এই অঞ্চলে আসেন, তখন এখানকার ভুটিয়াবাসীদিগের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া

তী প্রেস]

ভোরের আলো

[শিল্পী— শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ]

ইহাদের যত্নে ও সাহায্যে এতদঞ্চলবাসী ও কৈলাস-যাত্রীদিগের সেবার্থে তপোবন-প্রতিষ্ঠার প্রথম আয়োজন হয়। এই শুভ আয়োজনে আমাদের এই রুমাদেবী ও শ্রীমতী হিমতী পাধানী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও সাহায্য না পাইলে ইঁহারা এত শীঘ্র এ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এই আশ্রমে ইং-সন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শিবপ্রতিষ্ঠা করা হয়। সে সময়ে দ্বিতীয়া মহিলা হিমতী পাধানী একখানি পাকাঘর ও মন্দিরের নির্ম্মাণজন্য সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ভুটিয়াবাসিগণের চেষ্টায় এইরূপে আরও একখানি পাকা বাড়ী তৈয়ার হইয়াছে। আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ অনুভবানন্দজী মহারাজ অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রমে এই আশ্রমে বর্ত্তমান সময়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। আজ ৪ বৎসর যাবৎ এই হাঁসপাতালের কার্য্য সুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছে। এতদঞ্চলে প্রায় আড়াই শত তিন শত মাইল পথ অর্থাৎ তিব্বত পর্য্যন্ত আর কোন চিকিৎসালয় নাই। সুতরাং ইহার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় পাহাড়ীরা ও কৈলাস-যাত্রীরা খুবই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই চিকিৎসালয়ের ডাক্তার এক জন উদীয়মান বাঙ্গালী যুবক, নাম শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পালধি এল্, আর্, এফ্, মহাশয়। ইনি হুগলী জেলার ঠাকুরাণীচক গ্রামের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র পালধি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইং সন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি এই হাঁসপাতালে মেডিকেল অফিসার হইয়া আসিয়াছেন। ইনি আসা পর্য্যন্ত তপোবনটির শ্রী আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। যাহাতে এই আশ্রম ও হাঁসপাতালের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, রোগীদিগের সেবা-শুশ্রূষা ও থাকিবার জন্য যথোচিত সুব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য স্বামীজী মহারাজ এ সময়ে ভিক্ষাঝুলি হস্তে দ্বারে দ্বারে প্রার্থী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার এই শুভ উদ্দেশ্যে সকলেরই শক্তি অনুসারে সাহায্য করা উচিত। আশ্রমের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, ঔষধপত্রাদি খরিদ করিবার জন্য আলমোড়ার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রতি বৎসরে ৩ শত ৬০ টাকা এবং যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট্ মেডিকেল বোর্ড বার্ষিক ৪ শত টাকা ডাক্তারের বেতনের জন্য সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। আলমোড়া হইতে এত দূরে পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝখানে মিশনের এই সেবাব্রতের আয়োজন বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসার্হ।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ডাকের চিঠি

সারামাস খেটে আজিকে বিকালে বেতন পেয়েছি সবে,
টাকা কুড়ি আজ পাঠাই তোমাকে—এতেই চালা'তে হবে।

তুমি ত আমার অবুঝ নহ গো,—তোমারে ত ভাল চিনি,
সদা হাসি-মুখ নাহি কোন দুঃখ—হৃদয়ে অমৃত-খনি।
নিরাশায় যবে কেটেছিল দিন, ফেলেছি নয়ন-জল,
হাসিমুখে তুমি দিয়েছ অভয়, পেয়েছিনু বুকে বল।

তব অন্তরের শুভ ইচ্ছায় হয়েছি কাজের লোক,
অন্ন-বস্ত্র হবে ত জোগাড়—বিলাস তাতে না হ'ক।
প্রতি হপ্তায় একখানি ক'রে হৃদয়ের কথা-মালা
পাঠা'ব তোমারে,—দিলাম এ কথা, হবে নাকো অবহেলা

ডাক-টিকিটের মূল্য জুটেছে—আর কোন খেদ নাই,
এত দিন ধ'রে চিঠি যে লিখিনি, তার ক্ষমা যেন পাই।
উত্তর দিও সকাল সকাল, পাঠানু মাশুল তার,
আজ হ'তে প্রিয়ে নেবে গেল যেন জীবনের গুরুভার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বি-এল)।

কাবুলী

১
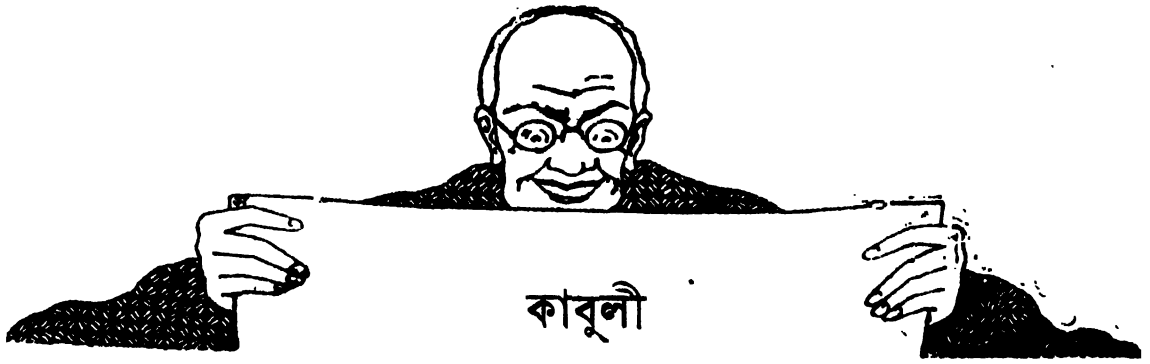
বিহার অঞ্চলে হোসেনাবাদ সবডিভিজনে সম্প্রতি একটি "সোশাল ক্লাব" স্থাপিত হইয়াছিল। দুই চারি জন সরকারী কর্ম্মচারী, দুই এক জন উকীল, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ইত্যাদি জন কয়েক লোক এখানে নিত্য আসিয়া বসেন, নিজের নিজের পকেট হইতে বাহির করিয়া সিগার প্রভৃতি দগ্ধ করেন ও পরচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন তাস পিটেন। একটা টেনিসকোর্ট তৈয়ারী হইতেছে, কলিকাতায় সাহেববাড়ী টেনিস্, র‍্যাকেট ও বল ইত্যাদির অর্ডার গিয়াছে। পৌঁছিতে বিলম্ব মনে হওয়ায় একটা তাগিদ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

কার্ত্তিকের সন্ধ্যা। বিহার বলিয়া ইহারই মধ্যে বেশ একটু শীত বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু সে শীতটুকু বেশ প্রীতিপ্রদ। আজিও অন্য দিনের মত জন কয়েক আসিয়া সোশাল ক্লাবে আসর জমাইতেছেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের নাম জওয়ালাপ্রসাদ। হাইকোর্টের বিখ্যাত জজের নামের সঙ্গে নিজের নামের মিল হওয়ায় তিনি একটু গৌরবান্বিত।

জওয়ালাপ্রসাদ একটা সিগার ধরাইয়া বলিলেন, "ডাক্তারের দুঃখ এখানে ঘুচল না।"

সবডেপুটীর নাম মহম্মদ সলীম বাঙ্গালাভাষী। তিনি বলিলেন, "কেন, ডাক্তার ব্যানার্জ্জি ত বেশ চিকিৎসা করেন।"

ম্যানেজার একটু ক্ষুন্নভাবে বলিলেন, "বেশ আর কি? তবে চ'লে যায় এই পর্য্যন্ত। কিন্তু চিকিৎসা যাই হোক, ব্যবহার বড় অভদ্র।"

রেভিনিউ অফিসারের নাম দীনবন্ধু সামন্ত। আদি-নিবাস উড়িষ্যায়। তিনি মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "লোকটা বেজায় মাতাল।"

সলীম।—ও কথা ছেড়ে দিন। ঘরে ব'সে একটু-আধটু অনেকেরই চলে।

জওয়ালাপ্রসাদের উহা নিত্যকার অভ্যাস;—তবে ঘরের ভিতর, বাহিরে নহে। সলীমের কথায় তিনি একটু 'মুখ-চোপ' খাইয়া গেলেন। সুচতুর লোক তৎক্ষণাৎ সে ভাব দমন করিয়া বলিলেন, "ঘরের ভিতর কে কি করছে, তা না হয় ছেড়েই দিলাম; কিন্তু ভদ্রতা ত সকলেরই কাছে আশা করা যায়।"

সলীম।—নিশ্চয়ই। কিন্তু ডাক্তার বাবুকে ত বেশ ভদ্র বলেই মনে হয় আমার।

দীনবন্ধু সামন্ত।—হাজার হোক বাঙ্গালী ত, অহঙ্কার যাবে কোথায়?

জওয়ালা।—তবু যদি একে একে সবাইকে বেহার উড়িষ্যা থেকে স'রে পড়তে না হ'ত।

"কি হে, কার মুণ্ডপাত করছ, ম্যানেজার?—" বলিতে বলিতে শান্তশরণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শান্তশরণ ডাক্তার। জেলায় ডাক্তারী করেন। পসারও বেশ হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসুখের সংবাদ পাইয়া বাড়ী আসিয়াছেন।

ম্যানেজার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বলিলেন, "মুণ্ডপাত আর কার করব বলুন? এই বলছিলাম, ডাক্তারের বড় অসুবিধা এখানে। আপনি ত আর দেশে রইলেন না, কিছু দেখবেনও না।"

শান্তশরণ।—যা বলবে, ভূমিকা ছেড়ে, একটু প্রকাশ করেই বল না। ডাক্তার কি করেছে?

জওয়ালা।—সেই কথাই ত বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনি এলেন। সে দিন দীনবন্ধু বাবুর বাড়ীতে অসুখ। ডাক্তার দুপুরে এসে দেখে গেল। কিন্তু চাপরাসী যখন ওষুধ আনতে গেল, তখন ওষুধ ত পেলই না, উপরন্তু ডাক্তারের কাছে অনেকগুলো কথা শুনলে।

শান্তশরণ।—কথার কারণ?

জওয়ালা।—চাপরাসীর যেতে একটু দেরী হয়েছিল, তাই।

শান্ত।—তা চাপরাসীকে ডাক্তার যদি একটা কথা ব'লে থাকে, তাতে আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নি।

জওয়ালা।—মজা ত ঐখানেই। চাপরাসীকে একটা কথাও সে বলে নি। চাপরাসী যখন যায়, বাবু তখন পড়্‌ছিলেন। যেমন চাপরাসী গিয়ে বল্লে, বাবু, দাওয়াই। বাবু একবারমাত্র তার পানে চেয়ে বই হাতেই উঠে পড়্‌লেন। চাপরাসী ভাবলে, ডাক্তার বুঝি বা তাকে নিজেই ওষুধ দেবার জন্যে উঠলেন। সেও পিছু পিছু চল্‌ল। ডাক্তার হাঁসপাতাল না গিয়ে বরাবর এল দীনবন্ধু বাবুর বাসায়। এসে যা ইচ্ছে তাই ব'লে অপমান কর্‌লে।

শান্তশরণ।—অপমান ক'রে থাকেন ত অন্যায় বৈ কি। কিন্তু তিনি কি বলেছিলেন?

জওয়ালা।—সে কত কথা। বল্লে, আমরা কি মানুষ নই মনে করেন? জানেন, পাঁচটায় হাঁসপাতাল বন্ধ, আপনি লোক পাঠালেন ৬টায়। কম্পাউণ্ডার সমস্ত দিন খেটে একটু বাইরে গেছে, আবার আপনার এই ফিবার-মিক্‌শ্চারটুকু দেবার জন্য তাকে ডেকে পাঠাতে হবে। শক্ত অসুখ-বিসুখে ত আমরা সর্ব্বক্ষণ কাযের জন্য প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই মামুলী জ্বর, মাথাব্যথার জন্য যদি সমস্ত সময়ে হাতযোড় ক'রে থাকতে হয়, তা হ'লে ত আর প্রাণ বাঁচে না। আরও কত কি বল্লে। তার বলার ধরণই এক আলাদা।

শান্ত।—কথাটা ডাক্তার বড় দুঃখেই বলেছিল, মাপ করবেন দীনবন্ধু বাবু, আমি সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে বল্‌ছি। সকাল-বিকাল অবিশ্রান্ত রোগী দেখা, তার ওপর জেল দেখা, মড়া কাটা আছে। এ দিকে মোটরের কল্যাণে দুর্ঘটনার অভাব নেই। সে-ও ডাক্তারের দেখতে হবে। এ ছাড়া গভর্ণমেন্ট অফিস্যারের বাড়ীতে অসুখ হলেই গিয়ে দেখতে-হবে। নিয়ম যাই হোক্, তাদের বাড়ীতে টিকটিকিটির পর্য্যন্ত অসুখ হ'লে দেখা চাই—নইলে অনর্থ হবে। এ সব ক'রে সকল সময়ে মেজাজ ঠিক রাখা খুবই শক্ত।

জওয়ালা।—যদি এঁদের মত লোকের সঙ্গে ডাক্তারের ব্যবহার এইরূপ হয়, সামান্য লোকেদের সঙ্গে সে যে কি ব্যবহার করে, তা সহজেই বোঝা যায়।

শান্ত।—না, সেটা ঠিক বোঝা যায় না, কারণ, এ ডাক্তারের বিশেষত্ব এই যে, ইনি গরীবের বন্ধু। শুধু রোগ দূর করবার জন্য নয়, রোগীর কষ্ট কমাবার জন্যও এঁর অগাধ পরিশ্রম আমরা লক্ষ্য করেছি। তবে হাকিমি মেজাজ সহ্য করতে পারে না, এই লোকটির প্রধান দোষ।

জওয়ালা।—আপনি বল্‌ছেন, তার কি বল্‌ব। যত দিন বিহারে বিহারী ডাক্তার আমরা না পাব, তত দিন আমাদের এ সব অসুবিধা থাক্‌বেই। লোকটা বাঙ্গালা, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। তাই বিহারীদের ঘৃণার চোখে দেখে।

শান্ত।—ও কথা বলবেন না। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি, ওঁর সকলের প্রতি সমান ব্যবহার। উপদেশমত ঔষধ, পথ্য বা শুশ্রূষার ব্যবস্থা না হ'লে উনি সকলের উপরেই রেগে যান—তা কে জানে হাকিম, কে জানে কৃষক। সে দিন বড় সাহেব (S. D. O.) বল্‌ছিলেন, মশায়, ডাক্তার বড় কঠিন লোক। আমার ছেলের জন্য একটা ওষুধ গয়া থেকে আন্‌তে বলেন; সেটা আন্‌তে একটু দেরী হয়। অপরাধের মধ্যে কা'ল তাঁকে বলেছিলাম, ডাক্তার, ওষুধটা ত আজও আসেনি, তা ওর যায়গায় আর একটা ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দাও না—যা এখানে পাওয়া যায়। ডাক্তার অমনি রেগে গেল। হাতযোড় ক'রে বল্লে, 'মাপ করবেন। আমি সামান্য নেটিভ ডাক্তার, বেশী বিদ্যে নেই। অন্য ওষুধ দেবার মত জ্ঞানও নেই। আপনি সবডিভিজনের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা; কিন্তু সেজন্য যদি চিকিৎসা-শাস্ত্রের উপরেও প্রভাব বিস্তার করেন, তা হ'লে আমরা যাই কোথায়? কল্‌কাতা থেকে আপনার প্রতি সপ্তাহে ফলের টুক্‌রি আস্‌ছে, আর ওষুধটা এই সদর থেকেও আসে না?' মনে মনে চট্‌লাম খুবই, কিন্তু কিছু বল্‌তে পারলাম না। ওষুধটা সেই দিনই আনিয়ে নিলাম। এক দিনেই অদ্ভুত ফল হ'ল। তখন রাগ যায়।

বাঙ্গালী তাই এ রকম—এভাব আপনাদের মনে কেন হয় জানিনে।

জওয়ালা।—আপনি বাঙ্গালাদেশে অনেক দিন ছিলেন, কল্‌কাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র—তাই আপনার বাঙ্গালীর উপর এত টান্। নইলে—

শান্ত।—নইলে এতে কিছু নেই। এঁর আগে ত বিন্ধ্যেশ্বরীলাল ছিলেন। তিনি ত এ দেশেরই লোক—স্বজাতি। এঁর যা গুণ আছে, তার সিকির সিকিও বিন্ধ্যেশ্বরীলালের ছিল না, তা ত সবাই আমরা জানি। ব্যবহারের

লোক হলেই যে সব ভাল হবে ও সব দুঃখ দূর হবে, এ ভাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। আমার এটি ভারি আশ্চর্য্য লাগে, সাহেবদের বড় বড় পোষ্টে দেখলে আমাদের ক্ষোভ হয় না, আর বাঙ্গালীদের ওই সব পোষ্টে বা ওর নীচের পোষ্টে দেখলেই কেন আমাদের অন্তর্দাহ হয়!

ইহা বলিয়া শান্তশরণ উঠিলেন। জওয়ালাপ্রসাদ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"উঠলেন?"

"হ্যাঁ যাই, তোমাদের আর একটু সদালাপ চলুক" বলিয়া শান্তশরণ বাহির হইয়া গেলেন।

তখন কয়জনে মিলিয়া গভীর পরামর্শে নিমগ্ন হইল।

পরদিনই ডাক্তারের বিরুদ্ধে কয়েকখানি দরখাস্ত প্রেরিত হইল।

২

অগ্রহায়ণের শেষ। রাত্রি ২টা আন্দাজ হাঁসপাতালে একটা কোলাহলের সৃষ্টি হইল। খাটুলি (পাল্কী-জাতীয় একপ্রকার যান) করিয়া এক কাবুলীওয়ালা আসিয়া চীৎকারের চোটে সকলকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। চৌকীদার কম্পাউণ্ডারকে ডাকিয়া আনিল।

কম্পাউণ্ডার আসিয়া দেখিল, খাটুলির মধ্যে এক প্রকাণ্ড কাবুলীওয়ালা জানুদ্বয় বুকের কাছে আনিয়া যথাসম্ভব গোলাকার হইয়া শুইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে।

কম্পাউণ্ডারকে দেখিবামাত্র কাবুলীওয়ালা তাহার স্বদেশী ভাষায় 'হাউমাউ' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কম্পাউণ্ডার যত জিজ্ঞাসা করে, কি হইয়াছে, সে ততই কাঁদিয়া বলে, তাহার জান্ গেল, একবারে গেল। বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়া এইটুকু-মাত্র সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিল যে, সন্ধ্যা হইতে তাহার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হইয়াছে; মদনপুরে সে ব্যবসা উপলক্ষে আসিয়াছিল। সেখান হইতে ২০ টাকা দিয়া খাটুলি ও কাহার (পাল্কীবাহক) সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে।

বাহকরা বলিল, মিঞা বাজারের মাঝখানে চীৎকার করিতেছিল দেখিয়া এক দোকানী তাহাদের ডাকিয়া দেয়। সেই হইতে এই পর্য্যন্ত কাবুলী সমান কাতরাইয়াছে।

কম্পাউণ্ডার বলিল, "হাঁসপাতালে বিছানা আছে, সেখানে গিয়া শোও। ঔষধ দিতেছি, খাইলে এখনি যন্ত্রণা কমিবে।"

কাবুলী আর্ত্তনাদের সঙ্গে কেবল এই কথা কয়টি বলিল, "বেশ, আমায় শোয়াইয়া দাও। কিন্তু আমাকে মারিয়া ফেলিও না—বাঁচাইও।"

ধরাধরি করিয়া তাহাকে একটি শয্যায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। কম্পাউণ্ডার ডিস্পেন্সারী-ঘর খুলিল ও একটা ঔষধ তৈয়ার করিয়া আনিয়া বলিল, "সাহেব, মুখ খোল।"

'সাহেব' মুখের বদলে চোখ খুলিল; কম্পাউণ্ডারের হাতে ঔষধ দেখিয়া বলিল, "তুমি ত কম্পাউণ্ডার; তোমার ঔষধে আমার এ কঠিন রোগ সারিবে না। ডাক্তারকে ডাকিয়া দাও,—নহিলে আমি বাঁচিব না।"

কম্পাউণ্ডার বলিল, "তোমার এ রোগ এমন অদ্ভুত কিছু নয় যে, আমরা বুঝিতে পারিব না। এই ঔষধে তুমি আরাম পাইবে; তোমার ঘুমও হইবে।"

কাবুলী তাহার বিশাল দাড়ি নাড়িয়া বলিল, "না, এই ঔষধ আমি খাইব না—যদি ইহাতে বিষ থাকে? তুমি ডাক্তারকে ডাকিয়া দাও।"

কম্পাউণ্ডার চটিয়া বলিল, "কে বাবু তুমি কাবুলের আমীর আসিলে যে, তোমাকে বিষ দিয়া আমি আমীরি কাড়িয়া লইব?"

কাবুলীওয়ালা ইহার কোন প্রতিবাদ করিল না। তাহার মুখে সেই একই কথা লাগিয়া রহিল—"আমার জান্ গেল।" ইহার উপর একটা কথা বাড়িল, "ডাক্তারকে ডাকিয়া দাও।"

কম্পাউণ্ডার বিরক্ত হইয়া পাত্রস্থিত ঔষধ ফেলিয়া দিয়া ডাক্তারকে খবর দিতে গেল।

ডাক্তারের পড়িবার ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। বামদিকে টুলের উপর আলোক রাখিয়া আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া বসিয়া ডাক্তার Faustএর ইংরাজী অনুবাদ পড়িতেছিলেন আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল, এক অপার্থিব আনন্দে তাঁহার সারাচিত্ত ভরিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় বাহির হইতে কম্পাউণ্ডারের আহ্বান আসিল।

ডাক্তার এতই তন্ময় হইয়া পড়িতেছিলেন যে, প্রথম দুই ডাক তিনি শুনিতে পাইলেন না। তৃতীয় ডাক তিনি শুনিতে পাইলেন। শুনিবামাত্র তিনি কম্পাউণ্ডারের গলা বুঝিতে পারিলেন ও দুয়ার খুলিয়া বলিলেন, "ভিতরে এস।"

কম্পাউণ্ডার ভিতরে আসিয়া কাবুলীওয়ালার উপদ্রবের কথা নিবেদন করিয়া বলিল, "সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া আছে

পাছে তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিই। আপনি না গেলে সে ঔষধ খাইবে না, চেঁচাইতেও ছাড়িবে না।"

ডাক্তার নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিলেন। এক দিকে আনন্দ, অপর দিকে কর্ত্তব্য। সকল কাযেরই প্রায় একটা সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, একটা সীমাও আছে; কিন্তু ডাক্তারের—যদি তিনি ধর্ম্ম ভাবিয়া কায করেন—তাহা নাই। নিদ্রা, ভোজন, বিশ্রাম, বিশ্রম্ভালাপ সবই তিনি কর্ত্তব্যের পদে বিনাক্ষোভে বলি দিয়াছেন, পারেন নাই কেবল এই অধ্যয়ন-স্পৃহাকে।

পাশের ঘরেই শুভ্র তপ্ত শয্যায় তাঁহার স্ত্রী অঘোরে ঘুমাইতেছেন। পাশেই কনিষ্ঠ পুত্রটি নিদ্রিত। অপর একটি ঘরে তাঁহার কন্যা দুইটি ঘুমে অচেতন। ভৃত্যরাও পৃথক্ ঘরে শুইয়া; কাহারও কোন সাড়া নাই।

একবার স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন। স্ত্রী চক্ষু মেলিয়া চাহিতে বলিলেন, "হাঁসপাতালে এখনই একটি রোগী এসেছে; ভারি চীৎকার করছে, আমি যাচ্ছি। বাইরে চাবি দিয়ে চল্লাম।"

স্ত্রী বলিলেন, "আচ্ছা।" বলিয়া চক্ষু মুদিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। ইহা ত স্বামীর পক্ষে নূতন কিছু নহে।

ডাক্তার ভাবুক। তাঁহার মনে পড়িল, প্রথম প্রথম অধিক রাত্রিতে শয্যাত্যাগ করিয়া গেলে স্ত্রীর মনে কতই আঘাত লাগিত। কতবার স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছিলেন, "আচ্ছা, এনে রাতে একটা সময় কি তোমার থাকতে নেই, যখন মনে জানব, এখন আর তোমার কোথাও যেতে হবে না?" দুজনেই হার জন্য কত দুঃখ, কত আঘাত পাইয়াছেন। আহা, স্ত্রী ত দিনে সে দুঃখ অন্তর হইতে দূর করিতে পারিয়াছেন।

আজ শীত বড়ই তীব্র। একখানি 'রাগ' লইয়া ডাক্তার র গায়ে জড়ানো লেপের উপর বিছাইয়া দিলেন। তার র ঘরের বাহিরে আসিয়া দুয়ারে তালা দিয়া হাঁসপাতালের কে চলিলেন।

হাঁসপাতালে রোগী তখনও সমান কাতরাইতেছে। হারা বারান্দার উপরেই শয়নের ব্যবস্থা করিতেছে। ডাক্তার কাছে আসিতে কাবুলীওয়ালা শয্যা হইতে উঠিতে কিন্তু পারিল না। আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "ডাংগদার বাবু, আর জান্ যায়, আমায় বাঁচান।"

ডাক্তার তাহাকে স্থির থাকিতে বলিয়া সযত্নে ও বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহাকে পরীক্ষা করিলেন। রোগ সম্বন্ধে ধীরে ধীরে দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আবার পরীক্ষা করিলেন। তার পর কম্পাউণ্ডারকে একটা ঔষধের কথা বলিলেন ও ষ্টোভ জ্বালিয়া জল গরম করিতে আদেশ করিলেন।

এবার ঔষধ আনিবামাত্র রোগী সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া কম্পাউণ্ডারের নিকট হইতে ঔষধের গ্লাস লইয়া মুখে তুলিল।

কম্পাউণ্ডার ফিরিয়া গেল ও ড্রেসারের ঘরে গিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিল। ডাক্তার গরম জলের অপেক্ষায় বারান্দায় পাইচারী করিতে লাগিলেন।

কম্পাউণ্ডার গরম জল, ফ্লানেল ও শুভ্র বস্ত্রখণ্ড লইয়া আসিলে ডাক্তার আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রোগীর কাছে বসিয়া কম্পাউণ্ডারকে বলিলেন, "তুমি তৈয়ারী করিয়া দাও, আমি ফোমেণ্ট দিই।" কম্পাউণ্ডার ফ্লানেলখণ্ডটুকু গরম জলে ভিজাইয়া শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে নিংড়াইয়া ডাক্তারের হাতে দিতে লাগিল।

ফোমেণ্ট করিবার সঙ্গে সঙ্গে কাবুলীর আর্ত্তনাদ কমিতে লাগিল এবং কয়েকবারের পরেই কাবুলী কৃতজ্ঞভাবে ডাক্তারের হাত দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ডাংদার বাবু, আমার যন্ত্রণা দূর হইয়াছে, আমায় আপনি বাঁচাইলেন।"

তার পর আপনার কোমর হইতে একটা মুদ্রার থলি বাহির করিয়া ডাক্তারের হাতে তাহা গুঁজিয়া দিতে গেল।

ডাক্তারের মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য একবার কঠিন হইয়া আসিল। তৎক্ষণাৎ সে ভাব দমন করিয়া তিনি কাবুলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ছেলে-মেয়ে আছে?"

কাবুলী বলিল, "হ্যাঁ বাবু, আছে। আমার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তাহারা দেশেই আছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "এই টাকায় তাহাদের জন্য কোন উপহার লইয়া যাইও। এখন শান্ত হইয়া ঘুমাও।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি হাঁসপাতাল পরিত্যাগ করিলেন।

৩

পৌষ শেষ হইতে চলিয়াছে। প্রচণ্ড শীত। 'মতিয়া বিন্দু' অর্থাৎ চোখের ছানি কাটাইবার ভিড় খুব বেশী। ডাক্তারের উপর লোকের অসীম বিশ্বাস; তাই অতিবৃদ্ধরাও ছানি কাটাইতে আসিয়াছে।

হাঁসপাতালের সব সিট্ ভরিয়া গিয়াছে। ইহার উপরেও দুইটি রোগীকে ডাক্তার নিজের বাসায় স্থান দিয়াছেন; দুই দিন আগে আবার এক বৃদ্ধ আসিয়া হাত যোড় করিয়া বলিয়াছিল যে, এবার তাহার চোখে অস্ত্র না করিলে আবার একটি বৎসর অন্ধকারে থাকিতে হইবে। হতভাগ্যের দুইটি চক্ষুতেই ছানি পড়িয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আছে।

বারান্দা ঘিরিয়া তাহার জন্য একটি পৃথক্ শয্যা রচিত হইয়াছে। কা'ল হইতে তাহাকে সেখানে রাখা হইয়াছে। আজ অস্ত্রোপচারকক্ষে তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে আনা হইল। নিপুণ হস্তে ডাক্তার তাহার দুইটি চোখেই অস্ত্রোপচার করিলেন। বৃদ্ধের বুক দুরু দুরু করিতেছিল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার তাহার চোখের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, তোমার চোখ হইবে। তুমি আবার দেখিতে পাইবে। কিন্তু কয় দিন চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবে। নড়া-চড়া একেবারে বন্ধ।"

তার পর এক এক করিয়া আরও কয়েকটি রোগীর চোখে অস্ত্রোপচার করা হইল। সর্ব্বশেষে একটি পৃষ্ঠ-ব্রণের রোগীকে আনা হইল।

কম্পাউণ্ডার দুই জন ক্লোরোফরম্ প্রস্তুত করিয়া লইল। এক জন নাসিকার নিকট ঔষধ ধরিল, অপরে নাড়ী ধরিয়া রহিল। ডাক্তারের নির্দ্দেশমত রোগী গণিতে লাগিল, এক দুই, তিন ইত্যাদি। ৩০এর পর হইতে গণনা জড়াইয়া আসিতে লাগিল। ৪০এর কাছে আসিবার পূর্ব্বেই তাহা বন্ধ হইয়া গেল। ডাক্তার অস্ত্রাদি পূর্ব্বেই পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে একখানি সুদৃশ্য বৃহৎ 'কার' হাঁসপাতালের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক জন দীর্ঘাকার ইংরাজ গাড়ী হইতে নিঃশব্দে অবতরণ করিয়া ডাক্তারের কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি টেবলের উপরকার প্রকাণ্ড খাতাখানা খুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে কিয়ৎক্ষণ দেখিলেন। কম্পাউণ্ডারের ঘরের দিকে একবার উঁকি মারিলেন। লক্ষ্য করিলেন, সব বেশ সুসজ্জিত। বাহিরের (out door) রোগী এক এক করিয়া পাশের ঘরে সমবেত হইতেছে। আগন্তুক এবার হাঁসপাতালের ভিতরকার রোগীদের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চৌকীদার এতক্ষণ সাহেবকে দেখিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব কে, তাহা সে জানিত না, কিন্তু সাহেব দেখিলেই সেলাম করিতে হয়, এ তথ্য সে অবগত ছিল।

সাহেব সেলাম ফেরৎ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার কোথায় ?"

চৌকীদার আবার সেলাম করিয়া বলিল, "ডাক্তার সাহেব অস্ত্র করিতেছেন।"

সাহেব বলিলেন, "খবর দাও, বল, সিভিল সার্জ্জেন আসিয়াছেন।"

চৌকীদার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। অস্ত্রোপচারের কক্ষের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবু, সিভিল সার্জ্জেন আসিয়াছেন।"

ঠিক সেই সময়ে ডাক্তার ছুরি উঠাইয়াছেন। মুখ না ফিরাইয়াই তিনি বলিলেন, "বল, আমি অস্ত্র করিতেছি। তাঁহাকে বসিবার যায়গা দাও; আর যদি এখানে আসিতে চান, লইয়া এস।"

চৌকীদার তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে সেই কথা বলিল।

সাহেব খুসী হইলেন কি রাগ করিলেন, বুঝা গেল না। অস্ত্রোপচার-গৃহের দিকে যাইতে চাহিলেন। চৌকীদার পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

সাহেব নিঃশব্দে ডাক্তারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার তখন অস্ত্রোপচারে ব্যস্ত। নিপুণ ও দৃঢ় হস্তে অস্ত্রপ্রয়োগের পর ক্ষিপ্রহস্তে ডাক্তার বৃহৎ পৃষ্ঠব্রণের ভিতরকার সমস্ত ক্লেদ বাহির করিয়া দিয়া গরম জল ও ঔষধের দ্বারা ধুইয়া ফেলিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন।

সাহেব মৃদুস্বরে বলিলেন, "Splendid ! I could not have done better !" (চমৎকার। আমি ইহার চেয়ে ভাল করিয়া পারিতাম না।)

ডাক্তার মুখ তুলিয়া সাহেবের পানে চাহিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন ও শিরোনমনের দ্বারা অভিবাদন করিলেন।

রোগীকে ষ্ট্রেচারে করিয়া তাহার শয্যায় লইয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার হাত ধুইয়া অস্ত্র করিবার পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সাহেবের সঙ্গে বাহিরে আসিলেন।

চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে দুই জনে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তাহার পর হাঁসপাতালের বিষয় সাহেব একে একে

পরিদর্শন করিলেন ; সব দেখিয়া অতিমাত্রায় প্রীত হইলেন। সাহেব লক্ষ্য করিলেন যে, ইহারই মধ্যে ডাক্তার কম্পাউণ্ডারকে বলিয়া দিলেন, "সাদাসিদা রোগীকে তুমি ঔষধ রিপীট করিয়া দাও। শক্ত কেসগুলি আমার জন্ত বসাইয়া রাখিও।"

সাধারণ ডাক্তার হইলে বলিতেন, "আজ সাহেব আসিয়াছেন, আজ সবাইকে যাইতে বলিয়া দাও।"

পরিদর্শনকার্য্য শেষ হইলে সাহেব মন্তব্য লিখিতে বসিলেন। ডাক্তার ততক্ষণে শক্ত কেসগুলি দেখিয়া ফেলিলেন।

মন্তব্য লেখা শেষ হইলে সাহেব ডাক্তারের সম্মুখে তাহা রাখিয়া বলিলেন, "পড়িয়া দেখ।"

ডাক্তার মনে মনে পড়িতে লাগিলেন, "আমি কোন সংবাদ না দিয়াই এই হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলাম। হাঁসপাতাল যে অবস্থায় পাইলাম, সংবাদ দিয়া গেলেও এত সুন্দর অবস্থায় এ পর্য্যন্ত কোন হাঁসপাতাল পাই নাই।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ডাক্তারের গভীর জ্ঞান, তাঁহার নিপুণ অস্ত্রচিকিৎসা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যজ্ঞান দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। ভারতবর্ষে আসিয়া এরূপ ডাক্তার আমি খুব অল্পই দেখিয়াছি।

অথচ এই ডাক্তারের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ মিনিষ্টার হইতে আমার কাছ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। অভিযোগ এই যে, ডাক্তার অলস, উদ্ধত, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। সত্যের সঙ্গে এ উক্তির কোন সম্বন্ধ নাই।

আর এক দিনের কথা বলিয়া আমি আমার মন্তব্য শেষ করিব।

একদা রাত্রি ২টার সময় এক কাবুলী পেটের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে এখানে আসে। কম্পাউণ্ডার ঔষধ দিলে সে সে ঔষধ খায় না ও বলে যে, সে ডাক্তারের হাতে ছাড়া আর কাহারও হাতে ঔষধ খাইবে না।

সেই গভীর রাত্রে ডাক্তার উঠিয়া হাঁসপাতালে আসেন ও পরম যত্নে রোগীটির চিকিৎসা করেন। সে সুস্থ হইয়া ডাক্তারকে তাহার মুদ্রার থলি পুরস্কার দিতে গেলে, ডাক্তার অতি মহত্ত্বের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

ইহা একটি কাহিনী নহে, সত্য ঘটনা ; ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিবার কারণও নাই—যেহেতু এই লেখকই সেই রাত্রিকার কাবুলী।"

ডাক্তার সবখানি পড়িয়া সাহেবের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সাহেব মৃদুহাস্ত করিতেছেন।

ডাক্তার বলিলেন,—"I beg to thank you so much, But I really wonder।" (আমি আপনাকে অজস্র ধন্তবাদ দিতেছি, কিন্তু আমি সত্যই অবাক্ হইতেছি।)

সাহেব হাস্তমুখে বলিলেন, "And I really admire you!" (আমি সত্যই তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে প্রশংসা ও সম্মানের চোখে দেখিতেছি।)

ডাক্তার দাঁড়াইয়া নতমস্তকে সাহেবকে অভিবাদন করিলেন।

সাহেবও দাঁড়াইয়া উঠিয়া সসম্মানে ডাক্তারের সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

অমৃত-পরশ

(গান)

আজি মনোমাঝে দোলে তারি ছন্দ।
সে যে এসেছে ওগো এনেছে আনন্দ!

নাহি ব্যথা নাহি জ্বালা
হৃদয়ে অমৃত ঢালা
ফুটন্ত ফুল-বাসে
ভরিল দিগন্ত

আভূমি গগন ছেয়ে
তারি বাঁশী চলে গেয়ে।

উঠ রে ঘুমন্ত জাগি
শুভাশিস লহ মাগি,
এ মর জীবনে লভ
অমৃত-সুগন্ধ!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ।

সাইমন রিপোর্ট

সাইমন সপ্তকের রিপোর্ট দুই দফায় প্রকাশিত হইয়াছে। দেশবাসী যে এই কমিশন বর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার সার্থকতা এই রিপোর্টই প্রমাণ করিয়াছে। যাঁহারা রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাঁহারা যে অসম্ভব পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা এমন রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, যাহাতে 'সমগ্র ভারতবর্ষ জ্বলিয়া উঠিয়াছে,' পরন্তু 'আই, সি, এস্,' 'আই, এম্, এস্,' 'আর্ম্মি' ও 'ক্লাইভ ষ্ট্রীট' ইহাকে তাঁহাদের রক্ষাকবচ বলিয়া সানন্দে বক্ষে ধারণ করিয়াছে! ইহা কি সাধারণ ক্ষমতা?

বস্তুতঃ রিপোর্টখানি পাঠ করিলে মনে হয়, উহা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে অনুগৃহীত সিবিল সার্ভিসের লোকের যত্নে রচিত হইয়াছে এবং কিছু দিন পূর্ব্বে য়ুরোপীয় এসোসিয়েটেড্ চেম্বার অফ কমার্স ও তাঁহাদের দোসর কলিকাতার য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েসান যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারই প্রতিধ্বনি মাত্র! আমাদের মনে হয়, এ যাবৎ যত কমিশন কমিটী বসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনটিই এমন করিয়া মুক্তিকামী জাতিকে মুক্তি দিবার ভানে এমন বিরাট ও নিষ্ঠুর প্রহসন রচনা করে নাই। সাইমন সপ্তকের নিকট শান্তির সুধা চাওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে যাহা দিয়াছেন, তাহা সুধার বিপরীত ত বটেই, পরন্তু একটা জাগ্রত জাতির আত্মসম্মানের পক্ষে অপমানকর। অবশ্য ভারতীয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহাদের মৌখিক সহানুভূতি-প্রদর্শনের কোন ত্রুটি নাই—তাঁহারা ভারতীয়ের জাতীয় আন্দোলনের আন্তরিকতা ও বিশালতার খ্যাতিপ্রচারে পঞ্চমুখ হইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, দ্বৈতশাসন স্বায়ত্ত-শাসনের নামে প্রহসন, উহা থাকিতেই পারে না। তাঁহারা পরামর্শ দিতেছেন, বিলাতের মত ক্যাবিনেট প্রণালীতে রাজ্য-শাসন চালাইতে হইবে, ক্যাবিনেট মিনিষ্টারদের (মন্ত্রীদের) বিলাতের মিনিষ্টারদের মত দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহারা বলিয়াছেন, ধাপে ধাপে (Gradual instalment of Self Go-vernment) স্বায়ত্তশাসন কোন কাযের কথা নহে, এখন হইতে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে—যাহাতে স্বভাবতঃই উপ-নিবেশিক স্বায়ত্তশাসন গড়িয়া উঠিতে পারে। এ সকল মন্তব্য পাঠ করিলে মনে হয়, উদারতা ও দৃষ্টির বিশালতা তাঁহাদের অসীম।

কিন্তু যখনই দেখি, সৈন্যমণ্ডলীর ব্যবস্থার কথায় তাঁহারা বলিতেছেন যে, "আমরা ভাবিয়া পাই না, কখন্ কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে ভারতের সীমান্তরক্ষী সেনার ব্যবস্থা বৃটেনের সাম্রাজ্যিক (Imperial) কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে," তখনই বুঝি, এই উদারতার অন্তরালে কি প্রবল প্রভুত্বপ্রয়াসের আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করিতেছে! যখনই দেখি, কমিশন পরামর্শ দিতেছেন,—"সঙ্কটকালে (emergency) গভর্ণর ক্যাবিনেট ব্যতীত শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে পারিবেন," তখনই বুঝি, তাঁহাদের আসল অভিসন্ধি কি? বস্তুতঃ এমন অসার দলিলকে মডারেট-শিরোমণি সার শিবস্বামী আয়ার জঞ্জালের স্তূপে (scrapheap) ফেলিয়া দিতে বলিয়া মন্দ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না।

জিনিষটা কি?

প্রথম ভাগ রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হয়, তখনই লোকের মন সংশয়াকুল হইয়াছিল। কেন না, উহাতে সৈন্যমণ্ডলী সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই মনে হইয়াছিল, দ্বিতীয় ভাগে কমিশন যে পরামর্শ দিবেন, তাহা মুক্তিকামী ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূল হইবে না। দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইবার পর দেখা গেল, আশার অনুকূল হওয়া ত দূরের কথা, উহা আশার ঘোর প্রতিকূল। বস্তুতঃ উহাতে ভারতের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যের ও তথা আই, সি, এসের নাগ-পাশের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করা হইয়াছে। এক রাশি কথার কারসাজির মধ্য হইতে যেটুকু সার খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝা যায়, ইহাতে আনন্দ করিবার হিন্দুদের ত কিছু নাই-ই, যে মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহাদেরও ইহাতে আনন্দিত করিবার কিছুই নাই। মোটের উপর কমিশনের রিপোর্ট যে ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে বৃটেনের কর্তৃত্ব-ক্ষমতা ভারতের উপর অক্ষুণ্ণই রহিবার কথা।

প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারত-সমস্যার সম্পর্কে বৃটেনের সাম্রাজ্যিক দিকটা রিপোর্ট একবারও ভুলে নাই। বৃটেনের সাম্রাজ্যিক দিকের সমস্যার কোনকালে অবসান হইবে বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং সে দিকটা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ভারতের ভাগ্যে বৃটেনের পক্ষ হইতে স্বরাজ্যলাভ কখনও ঘটিয়া উঠিবে না। এই হেতু রিপোর্টকারীরা পরামর্শ দিয়াছেন যে, এখন হইতে ভারতের সৈন্যমণ্ডলীর উপর ভারত-সরকারের কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকিবে না। অর্থাৎ ভারতে ব্যুরোক্রেশীই প্রতিষ্ঠিত থাকুক বা গণতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত হউক, সেই সরকার সৈন্যমণ্ডলীর উপর কর্তৃত্ব করিতে

পারিবেন না। এখন হইতে ইহা (Imperial Army) অথবা সাম্রাজ্যের সেবায় নিযুক্ত সৈন্যমণ্ডলী বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং রাজপ্রতিনিধি (বড়লাট অর্থাৎ Governor General নহেন) রাজার প্রতিনিধিরূপে উহার শাসন ও ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিবেন। আর ভারত সরকার (সপারিষদ বড়লাট) ও ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ উহার রক্ষণার্থ বাৎসরিক ৫৫ কোটি টাকা সরবরাহ করিবেন। বিলাতের Imperial Governmentকে এই টাকা দিতে হইবে, বিনিময়ে তাঁহারা ভারতের শান্তিরক্ষা করিবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার

ইহা কি চমৎকার ব্যবস্থা নহে? কেন এমন ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহাও তাঁহারা বুঝাইয়াছেন। ইহার তিনটি কারণ আছে:— (১) সীমান্ত-রক্ষা, (২) আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা, (৩) সেনাসংগ্রহ (recruitment)। ভারতের সীমান্তের সহিত কোন বৃটিশ উপনিবেশের সীমান্তের তুলনা হইতে পারে না, কেন না, ভারতের সীমান্ত দুর্দ্ধর্ষ বহিঃশত্রুগণের (যথা, রাসিয়ান, চীন, আফগান) দ্বারা সর্ব্বদা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। সেই আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বৃটিশ সেনার উপস্থিতি ভারতে একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই বৃটিশ-সেনা বিলাতে সংগৃহীত হয় এবং বৃটিশ সেনানী দ্বারা পরিচালিত হয়। বৃটিশ সেনা ও সেনানী ভারত সরকারের ও তথা ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ভাড়াটিয়া সেনারূপে কায করিতে কখনও সম্মত হইবে না। এ অবস্থায় বৃটিশ সেনাকে ভারতরক্ষার্থ নিযুক্ত করিতে হইলে Imperial Government এর উপর তাহাদের কর্তৃত্বভার দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার্থ হিন্দু-মুসলমানের অথবা অন্যপ্রকার সাম্প্রদায়িক বা শ্রেণীগত বিবাদ ও সংঘর্ষ দমনার্থ বৃটিশ সৈন্য এ দেশে রাখিতেই হইবে। সেই বৃটিশ সেনার কর্তৃত্ব Imperial Government এর হস্তে রাখিতেই হইবে। তৃতীয়তঃ, ভারতে যে ভাবে সৈন্য সংগৃহীত হয়, তাহাতে জাতীয় সেনাদল গঠন করা দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ। কেন না, সকল প্রদেশের লোকই সমরপ্রিয় নহে, সকল প্রদেশ হইতেই সৈন্য সংগৃহীত হয় না। বিশেষতঃ সমরপ্রিয় জাতিদের রাজনীতিক বক্তা জাতির সহিত সহানুভূতি নাই, তাহারা তাহাদের কর্তৃত্ব মানিবে না। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাদলের মধ্যে spirit of camraderie অথবা সৌভ্রাত্র বা বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বৃটিশ সেনার উপস্থিতি অপরিহার্য্য এবং সেই সেনার কর্তৃত্বভার বিলাতেই থাকা উচিত।

যুক্তি কি সুন্দর! বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহের সীমান্তের সহিত ভারতের সীমান্তের তুলনা হয় না, এ কথার অর্থ কি? অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্তই প্রথমে ধরা যাউক। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ, সুতরাং জলপথে তাহার বহিঃশত্রুর অভাব নাই। স্বয়ং জাপান ত তাহার প্রধান শত্রুরূপে দাঁড়াইতে পারেন। সেই হেতু বৃটিশ নৌশক্তি অষ্ট্রেলিয়াকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি বৃটেন হইতে সৈন্য ধার করার তাহার প্রয়োজন হয়? বৃটেন সার্ব্বভৌম শক্তি—তাহার আশ্রয়ে অষ্ট্রেলিয়ার উপনিবেশ রহিয়াছে, এই কথা ভাবিয়াই না জাপান ও অন্যান্য প্রবল শক্তি ইচ্ছা সত্ত্বেও এই দেশ আক্রমণে নিরস্ত রহিয়াছে? নতুবা অষ্ট্রেলিয়ার নিজস্ব যে স্থল ও নৌ-সেনা আছে, তাহা ত জাপান ইচ্ছা করিলেই নিমিষে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারে। তাহার পর কানাডার দৃষ্টান্ত দেখুন। কানাডার প্রতিবেশী প্রবল মার্কিণ যুক্তরাজ্য, সেখানেও বৃটিশ সৈন্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। অথচ মার্কিণ ইচ্ছা করিলে কানাডার মুষ্টিমেয় কানাডিয়ান সেনাকে বিধ্বস্ত করিয়া কানাডা অধিকার করিতে পারে, কিন্তু কেবল বৃটিশ শক্তি কানাডার সার্ব্বভৌম কর্ত্তা জানিয়া মার্কিণ সেই সংকল্প কখনও মনে স্থান দেয় না। তাহার পর জার্ম্মাণ-যুদ্ধকালে যখন বৃটিশ সৈন্য (মাত্র ১৫ হাজার ছাড়া) ভারত হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তখন ভারতীয় সৈন্যই সীমান্ত রক্ষা করিয়াছিল, আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিয়াছিল, এবং তখন তাহাদের মধ্যে spirit of camraderieর অভাব হয় নাই! এখন যদি ভারতীয় সেনাই ভারত রক্ষা করে, তাহাদের মধ্যে camraderieর অভাব হইবে কেন? বরং তাহারা ভাবিবে, তাহারা স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য অস্ত্রধারণ করিতেছে, ইহার জন্য বরং তাহারা গৌরব অনুভব করিবে।

আভ্যন্তরীণ শান্তি বহুকাল এ দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহকালে স্বতন্ত্র কথা। হিন্দু-মুসলমানে রাজ্য লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ হইত বটে, কিন্তু সে জন্য গ্রামে হিন্দু-মুসলমান প্রজা সদ্ভাবে বাস করিতে পাইত না, এমন নহে। আর ইংরাজ চলিয়া গেলেই যে উহারা গলাকাটাকাটি করিবে, এমন নহে, কেন না, দেশীয় রাজ্যেও হিন্দু-মুসলমান প্রজা বহুকাল হইতেই সুখে ও শান্তিতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। বিরোধের মূলে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্ররোচনাও দেখা যায়। স্বাধীনতা পাইলে যখন হিন্দু-মুসলমানের দায়িত্ব-বৃদ্ধি হইবে, তখন তাহাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের কথাও অতলের তলে তলাইয়া যাইবে।

সৈন্য-সংগ্রহ ব্যাপারেই বা কেন গোলযোগ হইবে? সকল প্রদেশের লোক সামরিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন নহে, এ কথা সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া মুসলমান আমলে সামরিক প্রবৃত্তিহীন জাতিরা

যে দেশে তিষ্ঠিতে পারিত না, তাহার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এমন অনেক জাতি আছে, যাহাদিগকে দুর্ব্বল ও কাপুরুষ করিয়া ফেলা হইয়াছে, নতুবা তাহারা পূর্ব্বে কাপুরুষ ও বে-সামরিক জাতি ছিল না। বাঙ্গালী জাতির দৃষ্টান্তই ধরা যাউক। বাঙ্গালী নৌ-সেনার সাহস ও বীর্য্যের কথা এবং বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়ের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীরাই জলপথে ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্ম, শ্যাম, মলয়, বলি, যব প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। দোর্দ্দণ্ড মোগল প্রতাপের আমলে বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্য, বাঙ্গালী চাঁদ রায়, কেদার রায়, এবং সীতারাম স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, নবাব সিরাজের সৈন্যমণ্ডলীতে বাঙ্গালী সেনা ও সেনানী ছিল। জার্ম্মাণ-যুদ্ধকালে ইংরাজ নিরস্ত্র বাঙ্গালীকে অস্ত্র দিয়া সৈন্য-শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালী যে শৃঙ্খলা, সাহস, ধৈর্য্য ও সঙ্ঘগুণ দেখাইয়াছিল, তাহা ইংরাজের গোরা বা পাঠানরাও দেখাইতে পারে কি না সন্দেহ।

সুতরাং বে-সামরিক জাতি ও সামরিক জাতি বলিয়া লাইন টানিয়া এই কারচুপি করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। যাহাকে যাহাতে অভ্যস্ত করা যায়, সে তাহাতেই অভ্যস্ত হয়। কলিকাতা কংগ্রেসের সময় বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভলাণ্টিয়াররা যে সুন্দর শৃঙ্খলা ও সেবার পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের দ্বারা জগতে শ্রেষ্ঠ সেনাদল গঠন করা যায়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সেই ভাবে শিক্ষা দিলে সামরিক ও বে-সামরিক জাতিদের মধ্যে camaraderie, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাNationalism,—যাহাই বল, তাহাই গড়িয়া উঠিবে না কেন?

সুতরাং যে ছলই ধরা হউক না কেন, তাহা এ দেশে Imperial Army কায়েম মোকাম করার অনুকূলে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট

কেবল আর্ম্মি বা সৈন্যমণ্ডলী সম্বন্ধে নহে, (১) ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্কে এবং (২) বৈদেশিক ব্যাপারে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বা ভারত সরকারের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না। ভারত সরকারের সপারিষদ্ বড়লাট বা Governor General এই দুইটি বিষয়ে সৈন্যমণ্ডলীর ব্যাপারেরই মত কোন কথা কহিতে পারিবেন না, ব্যবস্থাপক সভাও নহে। এ বিষয়ে কথা কহিবেন, ব্যবস্থা করিবেন, রাজার প্রতিনিধি Viceroy. সুদূর-ভবিষ্যতের কোন কালেও ভারতের ব্যবস্থাপকরা অথবা বড়লাটরা যে এই সকল বিষয়ে আপনাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন, সাইমন কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে কোথাও সে ব্যবস্থা করেন নাই। অথচ তাঁহাদের রিপোর্টকে বলা হইতেছে যে, উহা ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনের পথে দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দিয়াছে! বিড়ম্বনা আর কি! ইহা ত ছেলের হাতের মোওয়া নহে যে, ভারতবাসী দুইটা কথার কায়দানিতে ভুলিয়া যাইবে?

এই তিনটি Imperial subject বড়লাট ও ভারত সরকারের কর্তৃত্ব হইতে অপসারিত করিবার পর ভারত যে অবস্থায় থাকিবে বলিয়া পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকার ও বড়লাট ঠিক পূর্ব্বেরই মত দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী থাকিবেন, ব্যবস্থাপক সভার নিকট তাঁহারা কোনমতে দায়ী থাকিবেন না।

ব্যবস্থা-পরিষদটিকে এমনভাবে ঢালিয়া সাজা হইবে যে, উহা একটি Federal Assemblyতে পরিণত হইবে। ইহার রহস্য বড় চমৎকার! ইহার সদস্যরা Indirect election দ্বারা নিযুক্ত হইবেন অর্থাৎ মিণ্টো-মর্লিসংস্কারের মত ইহার সদস্যরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের মারফতে নিযুক্ত হইবেন, অর্থাৎ গভর্ণর ও মন্ত্রিগণ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা হইতে সদস্য বাছিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রেরণ করিবেন। এইভাবে দেশে Federal Government প্রতিষ্ঠিত হইবে। ফলে direct election by constituencies অর্থাৎ সরা-সরি দেশের ভোটারদের দ্বারা নির্ব্বাচনে যে সুবিধা ছিল, তাহাও উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

একে ত গোড়ায় এই গলদ, তাহার উপর ইহার মধ্যে দেশীয় রাজ্যসমূহকে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। তবেই বুঝা যাইতেছে, প্রলয়ান্তকালের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসনলাভ ভারতের অদৃষ্টে হইবে না। ভারতীয় রাজন্যগণের মধ্যে অধিকাংশই গণতন্ত্র-শাসনের স্বপ্নও কখনও দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। স্বৈরাচারই তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বুঝেন ভাল। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অনেককে গণতন্ত্রের পর্য্যায়ে উঠাইয়া লইতে হইলে এখনও হাজার দুই তিন বৎসর লাগিবে, তত দিন বৃটিশ ভারতীয়কে স্বরাজের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। ইহা কি চমৎকার ব্যবস্থা নহে?

Federal কথাটা National কথার ঠিক বিপরীত। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা হইতে যাঁহারা ব্যবস্থা-পরিষদে নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশের স্বার্থের কথা ভাবিবেন। জাতীয়তার দিক হইতে ইহা অতীব অনিষ্টকর হইবে, কেন না, তাঁহারা সমগ্র ভারতের জাতীয় স্বার্থের মুখ চাহিয়া কথা কহিবার প্রবৃত্তি পোষণ করিবেন কি না সন্দেহ। সাইমন সপ্তক ভারতে জাতীয়তার ক্রমপুষ্টি কামনা করিলে কখনই এ

ব্যবস্থা করিতেন না। তাঁহারা ইহার এক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ এত বৃহৎ দেশ যে, উহার লোকসংখ্যা এত অধিক যে, যদি direct popular* representation অর্থাৎ সাধারণভাবে সারাদেশের ভোটারদের দ্বারা ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইত, তাহা হইলে constituency গুলি আকারে অত্যন্ত বৃহৎ হইত। কিন্তু এ কথার উত্তরে বলা যায়, মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের আয়তন ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩ শত ৭১ বর্গ-মাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা ১১ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৩ হাজার ১ শত ৬৫ জন, অথচ সেখানে ত জাতীয় মহাসভায় direct representation অর্থাৎ সরাসরি সমগ্র দেশের নির্ব্বাচনমণ্ডলীর দ্বারা মহাসভার সদস্যসমূহ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। তবে ভারতেই বা তাহা সম্ভব হইবে না কেন? মার্কিণ যুক্তপ্রদেশে প্রায় universal sufferage আছে, কিন্তু সাইমন কমিশন এ দেশে মাত্র শতকরা ১০ জনের অধিক লোককে ভোটাধিকার দেন নাই।

জগতের অন্যান্য সভ্যদেশের সহিত ভারতের তুলনা করা যাউক। মার্কিণ যুক্তপ্রদেশ, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া, ব্রাজিল ও মেক্সিকো দেশের Larger Chamber অর্থাৎ বড় ব্যবস্থাপক সভায় Indirect election এর ব্যবস্থা নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফরিকা উপনিবেশে Federal form of government এর ব্যবস্থা আছে। এ সকল দেশেও কোথাও বড় ব্যবস্থাপক সভায় Indirect election এর ব্যবস্থা নাই। কিন্তু সাইমন সপ্তক ভারতের বড় ব্যবস্থাপক সভায় Indirect election এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে বিলম্ব হয় না। প্রায় সকল সভ্য দেশেরই নিয়ম এই যে, কেন্দ্রীয় বড় ব্যবস্থাপক সভায় জনসাধারণের নির্ব্বাচন কেন্দ্র-সমূহ হইতে সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হন, আর খণ্ড ব্যবস্থাপক সভাসমূহে হয় direct না হয় indirect election হয়। নেহেরু কমিটীতেও এই নীতির সার্থকতা স্বীকৃত হইয়াছে।

Federal Assembly র সম্বন্ধে ত কমিশনের এই ব্যবস্থা। Federal Executive এরও সম্পর্কে তাঁহারা যে ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার কিছু পরিচয় আমরা দিয়াছি। ইহা যে Federal Assembly র ব্যবস্থা হইতেও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। Executive অর্থাৎ শাসন-পরিষদের শিরোদেশে থাকিবেন রাজপ্রতিনিধি। তিনি বৃটিশ পার্লামেণ্টের নিকট নামমাত্র দায়ী থাকিবেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হইবেন পূর্ণ Autocrat (স্বেচ্ছাচারী শাসক)। জগতের কোন Federal Government এর শীর্ষস্থানীয় শাসকের, ভারতের রাজপ্রতিনিধির মত অখণ্ড অব্যয় ক্ষমতা থাকিবে না। এ ব্যবস্থার তুলনা জগতের কোনও নিয়মতান্ত্রিক দেশে নাই, কখনও ছিল না। শাসনপরিষদের শীর্ষস্থানীয় রাজপ্রতিনিধি দেশের লোকের প্রতিনিধিদের নিকট ত দায়ী থাকিবেনই না, বরং তাঁহার ক্ষমতা সর্ব্বোচ্চ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অপ্রতিহত হইবে। তাঁহার শাসন কাউন্সিলের সদস্যরা তাঁহার দ্বারা মনোনীত ও নিযুক্ত হইবেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট তাঁহাদের কার্য্যের জন্য (এবং তাঁহার মারফতে ভারত-সচিব ও বৃটিশ পার্লামেণ্টের নিকটে) দায়ী থাকিবেন। অবশ্য এক বা ততোধিক সদস্য ব্যবস্থাপক সভা হইতে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে রাজপ্রতিনিধির মরজির উপর আপনাদের সদস্যগিরির জন্য নির্ভর করিতে হইবে। এ ব্যবস্থায় স্বরাজ কিরূপ দ্রুত আমাদের হস্তগত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়!

অটনমি

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে ত এই ব্যবস্থা। এইবার প্রাদেশিক সরকার-সমূহের বিষয়ে সাইমন সপ্তক কি পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক। এক কথায় বলিতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্বন্ধে যেমন 'ইস্পাতের কাঠামো' পূর্ণরূপে বজায় রাখা হইয়াছে, প্রাদেশিক সরকারেও তাহাই! আই, সি, এস; আই, পি, এস যেমন ভারত-সচিবের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে, তেমনই থাকিবে। লি কমিশন যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সে সকল মানিয়া চলা হইবে। এই সিবিলিয়ানী শাসন পূর্ণরূপে বজায় ত থাকিবেই, কিন্তু যদি মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া যায় (Breakdown) এবং নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে গভর্ণর মন্ত্রিমণ্ডল (Cabinet) ব্যতীত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন!

কি চমৎকার স্বায়ত্ত-শাসন! একবারে সোনার পাথরবাটি! সাইমন সপ্তক Diarchy, দ্বৈতশাসনের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন, বলিয়াছেন, ইহা কোনমতেই চলিতে পারে না। ইংরাজ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা গুরুগম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন,—"যদি তোমরা ভারতবাসীকে যথার্থই দায়িত্বপূর্ণ শাসনক্ষমতা দিতে-মনস্থ করিয়া থাক, তাহা হইলে দ্বৈতশাসন ভাঙ্গিয়া দিতেই হইবে, অন্যথা স্বায়ত্তশাসনের অর্থ কি?" এইটুকু পাঠ করিলেই মনে হইবে, সাইমন সপ্তক কত উদার, কত মহান্! কিন্তু তাহার পরেই তাঁহারা বৃটেনের পার্লামেণ্টকে যেন আশ্বাস

দিয়াছেন, "ভয় নাই! গভর্ণরের হস্তে আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষার ব্যাপারের যে অতিরিক্ত সংরক্ষিত ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে শাসন-ব্যাপারে বৃটিশ কর্ত্তৃত্বহানির কোন আশঙ্কা নাই, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থহানির, রাজস্ব-সংক্রান্ত বা ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আইন-কানুন গঠন করার বিষয়ে এবং সিবিল সার্ভেণ্টদের বিষয়েও বৃটিশ কর্ত্তৃত্বহানির আশঙ্কার কারণ নাই। আর তাহা ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগের গঠনের দায়িত্বভার থাকিবে গভর্ণরের উপর।"

গভর্ণরের ক্ষমতার এইখানেই অবসান হইবে না। তিনি তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল মনোনীত করিবেন। এই মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে দুই জন সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবেন। মন্ত্রিমণ্ডল বরখাস্ত হইতে পারেন, কিন্তু Service Ministers অর্থাৎ সরকারী কর্ম্মচারিশ্রেণী হইতে নিযুক্ত ঐ দুইটি মন্ত্রী বরখাস্ত হইবেন না, তাঁহাদের বরখাস্ত-ব্যাপার ব্যবস্থাপক সভার হুদ্দার অতীত থাকিবে। যদি এই দুই মন্ত্রী কার্য্যে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে সরকারী তহবিল হইতে তাঁহাদের পেন্সন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। আইনে যত না হউক, গভর্ণরের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া এ সকল বিষয়ে কার্য্য করা হইবে। গভর্ণর ইচ্ছা করিলে মন্ত্রিমণ্ডলের সকলকেই নির্ব্বাচিতগণের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা প্রতি ১০ বৎসর অন্তর এমন একটি আইনানুগ মন্তব্য গ্রহণ করিতে পারিবে, যাহার দ্বারা তাঁহারা (১) দেশবাসীর নির্ব্বাচনাধিকার বৃদ্ধি করিতে, (২) নির্ব্বাচনমণ্ডলী গঠনের প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে অথবা (৩) সম্প্রদায় হিসাবে নির্ব্বাচনের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। ব্যবস্থাটি ভাল। কিন্তু উহার সহিত যে লেজুড়টি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ব্যবস্থাটির আদ্যশ্রাদ্ধেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যবস্থা হইয়াছে যে,—এমন মন্তব্য গ্রহণ করিতে হইলে ব্যবস্থাপক সভাকে দেখাইতে হইবে যে, সভার অন্ততঃ ৩ ভাগের ২ ভাগ সদস্যের ইহাতে মত আছে, পরন্তু যে সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা করা হইতেছে, সেই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ৩ ভাগের ২ ভাগের লোকের উহাতে মত আছে। কেবল ইহাই নহে, ইহার উপরে আর কিছু 'যদি' আছে। গভর্ণর যদি বুঝেন যে, এই মন্তব্যে প্রদেশের লোকের মত আছে, তাহা হইলে তিনি সেই মন্তব্য বড়লাটের অনুমতির জন্য প্রেরণ করিবেন। বর্ত্তমানের মত প্রাদেশিক আইন গঠনে বড়লাটের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়েও এইভাবের বেড়া দেওয়া আছে।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন

সাইমন সপ্তক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন এবং স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনমণ্ডলীর ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছেন। ভারতের ৮টি প্রদেশের মধ্যে ৬টিতে তাঁহারা মুসলমানদের জন্য বিশেষ নির্ব্বাচনাধিকার দিবার পরামর্শ দিয়াছেন। পঞ্জাব ও বাঙ্গালায়—যেখানে হিন্দুরা সংখ্যায় অল্প—সেখানেও তাঁহারা সাংখ্যাধিক মুসলমানগণকেই তাহাদের ইচ্ছানুসারে মিশ্র নির্ব্বাচন গ্রহণ করা না করার অধিকার দিয়াছেন। ইহাকে সোজা কথায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কমিশনের মতে এখন স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনই প্রচলিত থাকা কর্ত্তব্য। ইহা হইতে কেমন জাতীয়তা ও স্বরাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়! ইহার ফলে প্রত্যেক প্রদেশে রাজনীতিক দলের পরিবর্ত্তে কেবল সাম্প্রদায়িক দল-সমূহ পরস্পরের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইবে, দেশের বড় স্বার্থের জন্য আদৌ যত্ন লইবে না।

সাইমন রিপোর্ট ধরিতে গেলে লক্ষ্ণৌ চুক্তি (Pact) খানিকেই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। রিপোর্ট স্পষ্টাক্ষরে মুসলমানদিগকে বলিতেছে,—"চুক্তির কোন কিছু পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা থাকিলে হিন্দুদিগের দ্বারস্থ হইতে হইবে।" ইহার অপেক্ষা নেহরু রিপোর্ট যে অনেক ভাল ছিল; বরং শেষে হিন্দুপক্ষ হইতে এমন কথাও বলা হইয়াছিল যে, নেহরু রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া উহার অদলবদল করিয়া চুক্তির চেষ্টা করা যাইতে পারে। মহাত্মা গন্ধী ত নেহরু রিপোর্টকে বাতিল করিয়া দিয়া মুসলমানদের প্রার্থনা-মত অনেক দাবী মানিতে চাহিয়াছিলেন।

শিখদিগকে কমিশন কোন আশা দিতে পারেন নাই। ফেডারল এসেম্ব্লিতে শিখদিগের জন্য তাঁহারা মাত্র শতকরা ২টি স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, অথচ যে য়ুরোপীয়দের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, তাহাদিগকে এসেম্ব্লিতে শতকরা ১০টির কম স্থান দেওয়া হয় নাই!

কমিশনের ছাড়

সাইমন সপ্তক কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদ করিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শিত হইল। এইবার তাঁহারা যে কর্ত্তব্য কাযগুলি করিতে ভুলিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শন করিব। তাঁহারা রিপোর্টের কোথাও বলেন নাই, গভর্ণরকে কি ভাবে এবং কে নিযুক্ত করিবে। সুতরাং গভর্ণর যে ভবিষ্যতে সিবিলিয়ান হইতে সংগৃহীত হইবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? মন্ত্রিমণ্ডলের যে দুই জন সরকারী কর্ম্মচারী (সিবিলিয়ান) থাকিবেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে গভর্ণরী

পাইবার লোভ করিবেন না কেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? ক্যাবিনেটের সেক্রেটারী হইবেন এক জন সিবিলিয়ান। তিনি ক্যাবিনেটের কার্য্যাবলীর কথা গভর্ণরকে জানাইবেন। জানাইবেন, না গোয়েন্দাগিরি করিবেন? এই পদে সিবিলিয়ানকে বসাইবার এত আগ্রহ কেন?

শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথক্ করার কোনও আভাস এই রিপোর্টে নাই। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ সম্বন্ধেও রিপোর্ট বিশেষ কিছু উল্লেখ করে নাই।

ব্রহ্মদেশ

কমিশন ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে স্বতন্ত্র করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ইহা তাঁহারা ব্রহ্মবাসীদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে করিতে বাধ্য হইয়াছেন কি না, বুঝিবার উপায় নাই। অনেকে বলিতেছেন, ব্রহ্মটাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিলে তথায় বৃটিশ বাণিজ্যের ও বৃটিশ সিবিলিয়ান ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর অনেক সুবিধা হইবে বলিয়া এইরূপ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বিলাতের বেকার-সমস্যার কতকটা সমাধান হইবে বটে, কিন্তু ব্রহ্মের কি উপকার হইবে, বুঝা যায় না। ভারতের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিলে ব্রহ্মও শীঘ্র স্বরাজ প্রাপ্ত হইত। এ সুবিধা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

শেষ

লর্ড বার্কেণহেড যখন এই কমিশনে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তখনই জানা গিয়াছিল, এই শ্বেত কমিশনের মতামত কি প্রকৃতির হইবে। ভারতবাসী এই হেতু ইহাকে বর্জ্জন করিয়াছিল। এখন বুঝা যাইতেছে, তাহারা বর্জ্জন করিয়া ভালই করিয়াছিল। এখন তাহাদের কর্ত্তব্য, এই রিপোর্টখানিকেও কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইয়া দেওয়া।

মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড এখন যে মূর্ত্তিই ধারণ করুন, এ যাবৎ কিন্তু বলিয়া আসিয়াছেন যে, ভারতকে স্বরাজ দেওয়া হইবে এবং তিনি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন যে, সাইমন কমিশন ভারতকে সেই পথে লইয়া যাইবে। বড়লাট লর্ড আরউইনও এই কমিশনের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা রিপোর্ট পাঠ করিয়া কি বলিতে চাহেন? বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, বড়লাট ও শিমলার কর্ত্তারা এই রিপোর্টে আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

তবে? এখন তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি? গোল টেবল বৈঠক হইতে এই রিপোর্টখানাকে দূর করিয়া দিলে কি তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করা হয় না? অবশ্য যদি গোল টেবল বৈঠকে যথার্থ কাযের কথা হইবার আশা থাকে আর যথার্থ ভারতীয় প্রতিনিধিরা তথায় আমন্ত্রিত হন।

অমৃত-স্মরণে *

ওগো, কে এলো ভুবনে হের আজ!
অবাক্ ধরণী জানে না সে কেন
পরেছে এ হেন মোহন সাজ!

কেন রোমাঞ্চ ওঠে তৃণে তৃণে
কেন ফোটে ফুল নিখিল বিপিনে
অপরাজিতারে কে নিল গো জিনে
কুসুম-শায়কে লুকায়ে বাজ!

হাসিতে যাহার হাসিল বিশ্ব
অশ্রু ভুলিয়া হাসিল নিঃস্ব
আঁকিল কত যে সরস দৃশ্য
[illegible] পরিল তাজ!

জীবন মথিয়া এলো অমৃত
অমর হইল ছিল যারা মৃত
দেবতা মানব পুলকিত প্রীত
গর্ব্বিত যত নট-সমাজ!

ছোটে বায়ু যেন বহি আনন্দ
লোটে অলিকুল কমল-গন্ধ
গুঞ্জরি ওঠে হৃদয়ে ছন্দ—
নব নব নব হে রসরাজ!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেব

* অমৃতচক্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রসরাজ অমৃতলালের অষ্ট-সপ্ততিতম জন্মোৎসবে পঠিত।

পঞ্চাশতল ভবনে রঙ্গালয়

নিউইয়র্ক সহরে একটি ৫০ তল অট্টালিকা আছে। ইহার সর্ব্বোচ্চতলে একটি রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। এই রঙ্গালয়ে

৫০ তল ভবনে রঙ্গালয়

২ শত লোকের বসিবার আসন বিদ্যমান। রাজপথের প্রায় ৫ শত ফুট উপরে এই রঙ্গালয়। অবশ্য সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া এই রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করা সম্ভবপর নহে। বৈদ্যুতিক আরোহিণী, অবরোহিণীর সাহায্যেই মানুষ এখানে অভিনয়াদি দর্শন করিতে আসে।

চলমান গ্রীষ্মাবাস
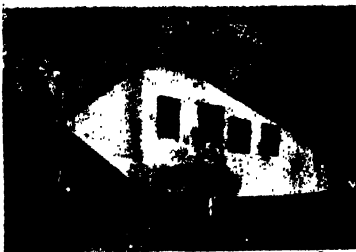
চলমান গ্রীষ্মাবাস

জনৈক মার্কিণ বিমানপোতের আকার বিশিষ্ট একটি গ্রীষ্মাবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দূর হইতে এই বৃহৎ ভবনটিকে একটি যাত্রি-জাহাজ বলিয়াই ভ্রম জন্মে। দৃঢ় চক্রের উপর এই গ্রীষ্ম-ভবনটি অবস্থিত। প্রয়োজনমত যত্র তত্র ইহাকে লইয়া যাওয়া যায়। এই গ্রীষ্মাবাসের কক্ষগুলি বেশ প্রশস্ত, বাসের পক্ষে পরম আরামপ্রদ।

নূতন টর্পেডো

বৃটিশ রণতরী বিভাগে, বায়ুর চাপের সাহায্যে টর্পেডো নিক্ষেপের ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইখানে যে চিত্র প্রদত্ত হইল,

বায়ুর চাপে টর্পেডো নিক্ষেপ

তাহাতে দেখা যাইবে, বায়ুর চাপে টর্পেডো তাহার আধা হইতে নির্গত হইতেছে। ধূম্রের মত যে পদার্থ দৃষ্টিগো হইতেছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা ধূম্রজাল নহে—বায়ুর চাপ ন হইতে মুক্তি পাইয়া বাষ্পাকারে দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানে সকল টর্পেডো যুদ্ধব্যাপদেশে ব্যবহৃত হইতেছে, জলের ম তাহাদের গতি ঘণ্টায় ৩৫ মাইল। ৭ হইতে ৮ হাজার এই সকল টর্পেডো ধাবিত হইতে পারে এবং ৫ শত পাউণ্ড প্রায় ৬ মণ ওজনের বিস্ফোরক পদার্থ বহন করিতে সমর্থ।

জোড়া আম্র

যুগ্ম কলা, বেগুন প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যুগ্ম আম্র সহজদর্শন নহে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়

যুগ্ম আম্র

যুগ্ম আম্র পাইয়াছিলেন। আম্রের অর্দ্ধাংশ কাটিয়া ফেলিয়া তিনি উহার আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। বসুমতীর পাঠকবর্গের জন্য আমরা এই যুগ্ম আম্রের চিত্র প্রদান করিলাম।

বায়ুপূর্ণ অঙ্গাবরণ

শিকারী ও ধীবরদিগের জন্য বাজারে বায়ুপূর্ণ এক প্রকার জামা (সোয়েটার) বাহির হইয়াছে। এই জামা গায়ে দিয়া জলের উপর কয়েক ঘণ্টা নিরাপদে ভাসিয়া থাকা যায়। সাধারণ সোয়েটার জামার সহিত ইহার আকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য

বায়ুপূর্ণ অঙ্গাবরণ

নাই। শুধু জামার ভিতরে রবারের নল আছে। এই নলগুলি বায়ুপূর্ণ অবস্থায় থাকে। প্রয়োজন হইলে রবারের নলগুলি খুলিয়া লওয়া যায়।

অশ্বহীন গাড়ী

অশ্ববিহীন গাড়ী

৪ শত বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট প্রথম ম্যাক্সমিলিয়ান্ প্রসিদ্ধ শিল্পী ডুরারকে অশ্ববিহীন স্বয়ংচালিত একখানি রথ নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন। এই রথ প্রকৃতপ্রস্তাবে নির্ম্মিত হয় নাই। তবে শিল্পী উহার একটা নক্সা করিয়াছিলেন। সেই নক্সায় দেখা যায় যে, এই রথে এমনভাবে চক্রসমাবেশ করিবার পরিকল্পনা হইয়াছিল যে, চালক কোন এক স্থানে চাপ দিয়া ধরিলেই সমাবিষ্ট চক্রগুলি পরস্পরের সাহায্যে চলিতে থাকিবে। তাহারই ফলে রথ আপনা হইতেই অগ্রসর হইবে। ইহা হইতে স্বয়ংচালিত মোটর-গাড়ীর কল্পনা পরবর্ত্তী যুগে আসিয়াছিল কি না, কে বলিবে ?

শ্বাসরোগে মুখোস

বার্লিন সহরে যে সকল রোগী শ্বাসরোগ বা হাঁপকাসে কষ্ট পাইয়া থাকে, তাহাদের চিকিৎসার জন্য মুখোস ব্যবহৃত হইতেছে। এই মুখোসগুলি গ্যাস-মুখোসের অনুরূপ। নলের মধ্য দিয়া রোগীরা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকে। একটি বাক্সের সঙ্গে উক্ত নলগুলি সংশ্লিষ্ট থাকে। আধারমধ্যে প্রয়োজনীয়
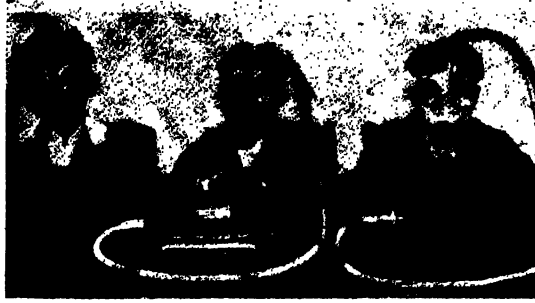
মুখোস সাহায্যে হাঁপকাসের চিকিৎসা

ঔষধ সন্নিবিষ্ট করা হয়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই উপায়ে রোগীরা শীঘ্র নিরাময় হইয়া থাকে।

অভিনব উভযান

কালিফএর অন্তর্গত আলামেডা নামক স্থানের দুই জন এঞ্জিনীয়ার একখানি নূতন ধরণের যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহারা সহোদর ভ্রাতা, নাম রাসেল ও মিল্টন রবার্টসন। এই মোটর-চালিত যান জলের উপর দিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে পারে, আবার শূন্যে উড়িয়া যাইতেও সমর্থ। জলের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইবার সময় যখন মোটর চলিতে থাকে, তখন প্রথম ২৫ ফুট জলের উপরেই থাকে। ১ শত ফুট যাইবার পর যানটি শূন্যের উপর দিয়া চলিতে থাকে। ঘণ্টায় যখন ৪০ হইতে ৫০ মাইল বেগে উহা চলিতে থাকে, তখন ইচ্ছাক্রমে কখনও শূন্যে কখনও বা জলের উপর দিয়া উহা চলিতে থাকে। এই জাতীয় উভযান পূর্ব্বে দেখা যায় নাই।
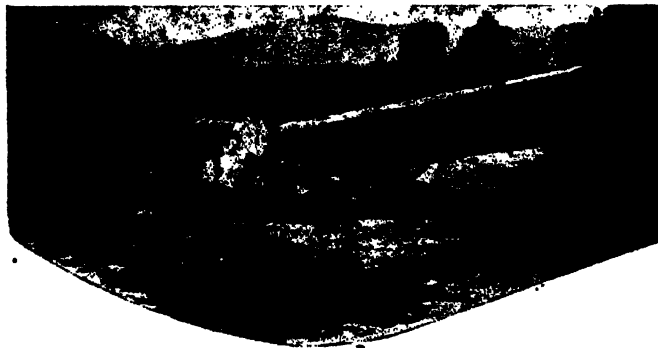
অভিনব উভযান

নারী-নির্ম্মিত কাষ্ঠপদ

মিচিগান সহরের কোনও স্ত্রীলোকের একটি ফক্সটেরিয়ার কুকুর ছিল। ইস্পাতের ফাঁদে পড়িয়া বেচারা কুকুরের একটি চরণ ভাঙ্গিয়া যায়। অস্ত্রোপচার করিয়া কুকুরটির প্রাণ-রক্ষা হয়। কুকুরের অধিস্বামিনী তাঁহার প্রিয় জীবটির জন্য একটি কাঠের চরণ তৈয়ার করিতে থাকেন। কাষ্ঠ, রবার ও পালকের সাহায্যে মহিলাটি কুকুরের ব্যবহারোপযোগী এমন একটি চরণ তৈয়ার করেন যে, বর্ত্তমানে উহার সাহায্যে কুকুরটি অনায়াসে দৌড়াইতে পারে।

কুকুরের কাষ্ঠচরণ

অত্যুচ্চ সৌধ

নিউইয়র্কে সম্প্রতি একটি ৬০ তল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে। উহার নক্সা বাহির হইয়াছে। এই অত্যুচ্চ ভবনটিকে ইন্দ্রধনুর বর্ণে অনুরঞ্জিত করা হইবে।

অত্যুচ্চ রঙীন সৌধ

পাদদেশ হইতে শীর্ষভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই রঙ্গের খেলা থাকিবে।

৩৬ ঘোড়া-বাহিত গাড়ী

আলবার্টা নামক স্থানের জনৈক কৃষক ৮ খানা গাড়ী শস্য-পূর্ণ

৩৬ ঘোড়া-বাহিত গাড়ী

করিয়া উহাতে ৩৬টি ঘোড়া জুতিয়া দেয়। তার পর একাই সেই বিরাট অশ্ববাহিনীকে চালিত করিয়া বাজারে লইয়া যায়। অশ্বগুলি এরূপ শিক্ষিত যে, অশ্বরক্ষার সামান্য আকর্ষণে কোন্ দিকে যাই হইবে, তাহা বুঝিতে পারে।

জুতার নীচে স্প্রাং

জুতার নিম্নভাগ স্প্রীং সংযুক্ত করিয়া দিলে দীর্ঘপথপর্য্যটনে কো ক্লান্তি ঘটে না। ইহাতে জুতার তলদেশ শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না

জুতার নীচে স্প্রীং

এই স্প্রীং ইদানীং অনেকেই ব্যবহার করিতেছে। উহা অনায়াসে জুতায় সংলগ্ন করা যায় এবং স্বল্পায়াসেই খুলিয়া ফেলা যায়।

মোটরগাড়ীর বেড়াবাজি

মোটরগাড়ীর বেড়াবাজি

লস্ এঞ্জেলেসের এক জন মোটর-চালক জনৈক প্রসিদ্ধ অশ্বচালকের সহিত বাজি রাখিয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়াছেন। এই বিপৎসঙ্কুল কার্য্যে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত সাফল্য লাভ করিয়াছেন। শিক্ষিত ঘোড়া যেরূপ অবলীলাক্রমে বেড়া অতিক্রম করিয়াছে, মোটরগাড়ীও লম্ফ দিয়া তেমনই অনায়াসে বেড়া পার হইয়াছে। গাড়ী অথবা আরোহীর কোনও ক্ষতি হয় নাই।
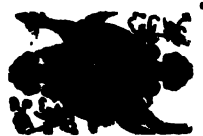
আমার পূর্ব্বস্মৃতি

৯

ব্যবসা-সমস্যা।

আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক লোকই বলেন, ব্যবসা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। ইহা খাঁটি সত্য কথা। কিন্তু ব্যবসার সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ ধারণা আছে, তাহা একবারেই ভ্রান্ত। আমাদের বিশ্বাস, ব্যবসা করিতে গেলে কিছু মূলধন, একটা দোকানঘর বা আফিস, এবং কিছু মাল চাই, তাহা হইলেই ব্যবসা আরম্ভ করা যায়; ইহার জন্য কোন শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন নাই। উকীল হইতে গেলে এ, বি, সি হইতে আরম্ভ করিয়া বি-এল্ পাশ করিতে হইবে; অন্যূন ১৬ বৎসর শিক্ষার প্রয়োজন। ডাক্তার হইতে গেলে আই-এস্-সি কি বি-এস্-সি পাশ করিতে হইবে; তার পর ডাক্তারী পাশ করিতে গেলে অন্যূন ৬ বৎসর। কেরাণীগিরি করিতে হইলেও ৭।৮ বৎসর অথবা ১০ বৎসর শিক্ষার প্রয়োজন। প্রত্যেক কার্য্যের উপযুক্ত হইতে হইলে অন্যূন ৭।৮ বৎসর শিক্ষার প্রয়োজন। নতুবা মানুষ কোন কার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু ব্যবসা করিতে গেলে আমাদের সাধারণতঃ ধারণা—শিক্ষা-দীক্ষা বা শিক্ষানবীশি করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আমি এইখানে একটি ঘটনার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে একটি ১২ বৎসরের মাড়োয়ারী বালক ৫ হাজার টাকা তাগাদা আদায় করিয়া রাত্রি ১০টার সময় রাজপথ দিয়া আসিতেছিল। কতকগুলি বদমায়েস মিলিয়া সে টাকা কাড়িয়া লয়; বালক আসিয়া গদীতে খবর দেয়, মালিক গিয়া থানাতে খবর দেয়; এক জন লোককে সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। নবাব সায়েদ আমীর হোসেনের কাছে সেই লোককে বিচারের জন্য আনা হয়। নবাব সাহেব যখন শুনিলেন, ১২ বৎসরের বালক রাত্রি ১০টার সময় ৫ হাজার টাকা আদায় করিয়া আনিতেছিল, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; মালিককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "You deserved to be robbed,—তোমার উপযুক্ত সাজাই হইয়াছে।" তাহা শুনিয়া মালিক বলিল, "হুজুর, ছেলেবেলা হইতে না শিখাইলে ইহারা কখনই ব্যবসা শিখিবে না, ব্যবসাদার করিতে হইলে, খুব অল্পবয়স হইতেই তাহাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।" এই গূঢ় সত্যটুকু বুঝিতে পারিলে তবে আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণকে ব্যবসাদার করিয়া তুলিতে পারিব।

ব্যবসাদার সম্বন্ধে এই সাধারণ প্রবাদকথাটি একবারেই খাটে না, "বন হ'তে বেরোলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।" এরূপ কখন হইতে পারে না। আজকালকার দিনেও ব্যবসাদারী ধারণাটি ঠিক এইরূপই। দোকান খুলিয়া বসিলেই ব্যবসাদার হইয়া যাইবে। আমি জানি, আমার এক নিকট-আত্মীয়ের চার পুত্র। তাঁহাদের মোমবাতির ব্যবসা, বিশেষ ফালাও কারবার। কিংবদন্তী আছে, তিন পুরুষ আগে, তাঁহাদের মূল কর্ত্তা অতি যৎসামান্য পুঁজি লইয়া মোমবাতি প্রস্তুতের কায করেন। তাহাতে প্রভূত অর্থাগম হয়। হুগলী জেলার অধীনস্থ চুঁচুড়ায় তাঁহার নিবাস। মোমবাতির কায করিয়া তিনি অনেক ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তাঁহার নাম ছিল, স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র সাধু। ঐ মোমবাতির ব্যবসা করিয়া তিনি ধনসম্পত্তি আরও বর্দ্ধিত করেন। তাঁহার মাথায় এই ধারণা হয় যে, একটি পুত্রকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিলে মোমবাতির ব্যবসায় আরও শ্রীবৃদ্ধি করা হইবে। এ ধারণা সমীচীন। তদনুসারে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সাধুকে কেমিষ্ট্রীতে এম্-এ পাশ করাইলেন। কিন্তু তিনি মোমের ব্যবসা না লইয়া ওকালতী ব্যবসায় যোগ দিয়াছিলেন। তাহার পর মুন্সেফ্, ক্রমে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। সত্য বটে, এই অধিক মাস্তের কার্য্য করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ও পিতামহ মোমবাতির ব্যবসা করিয়া অন্ততঃ তাহার দশগুণ উপার্জ্জন করিয়াছেন।

আমার মেসোমহাশয় স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র সাধু একই উদ্দেশ্যে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। তিনি এঞ্জিনিয়ার হইলেন বটে, কিন্তু মোমের কার্য্য দেখিলেন না। তিনি এখন সরকারী কার্য্য লইয়া অ্যাসিস্টেন্ট এঞ্জিনিয়ার হইয়া আছেন। তাঁহার নাম রায় সাহেব

মুনীন্দ্রনাথ সাধু। কলিকাতার সহরবিভাগেই এখন তিনি নিযুক্ত আছেন। কিন্তু তাঁহার পৈতৃক বোমের কায চালাইলে হয় ত তাঁহারা কোটীশ্বর হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইল না; কারণ, ব্যবসা করিতে গেলে যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের হয় নাই। টানা পাখার হাওয়া বা বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহার ব্যবসাদারের কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

আমরা প্রত্যহ বাঙ্গালা দেশে, ভারতবর্ষে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমাদের পরমাত্মীয় ও ব্যবসাদারদিগের মুখোজ্জ্বলকারী স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পালের নাম শুনিতে পাই, যাহা এখন বি, কে, পাল এণ্ড কোম্পানীর, সিনিয়ার পার্টনার স্যার হরিশঙ্কর পালের নামে অভিহিত। তিনি কেমিষ্ট্রীতে এম্-এও হন নাই, বি-এস্-সিও নহেন, এবং আমরা যাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা বলি, তাহাও তিনি পান নাই; কিন্তু তিনি যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা অপর লোকের দুষ্প্রাপ্য। তিনি বাল্যাবস্থা হইতেই ব্যবসাদার হইবার শিক্ষা পাইয়াছিলেন; অর্থাৎ অতি শৈশব হইতেই অন্যান্য ব্যবসাদারের কাছে শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন, এবং পরে ৺মাধবচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের ব্যবসাতে যোগদান করিয়া ব্যবসাদার হইবার উপযোগী হইয়াছিলেন; অর্থাৎ প্রভূত পরিশ্রমী, বেশ-ভূষার দিকে সামান্য নজর, অল্পব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ এবং প্রত্যেক গ্রাহককেই সন্তুষ্ট করিবার মনোবৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। মিষ্টভাষিতা, সত্যনিষ্ঠা এই সকল গুণই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল, এবং এই সকল গুণ ছিল বলিয়াই তিনি এত বড় ব্যবসাদার হইতে পারিয়াছিলেন। সকলেই জানেন, ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যবসাদার আর দ্বিতীয় নাই; উপরন্তু এক জনের দ্বারা একটা ব্যবসা খুব বড় হইতে পারে না। শুধু বটকৃষ্ণ পাল হইলে, "বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানী" এত বড় হইত কি না, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। কিন্তু বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল ও তাঁহার ভাগিনেয় স্বর্গীয় হরিদাস দাঁ মহাশয় বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের দক্ষিণ ও বাম হস্তের ন্যায় তাঁহার দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান এবং নবীন উৎসাহে, উদ্যমে বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানীকে জগদ্বিখ্যাত করিয়া গেলেন। বটকৃষ্ণ পাল না থাকিলে যেমন ভূতনাথ পাল হইত না, তেমনই ভূতনাথ পাল না থাকিলে বি, কে, পাল এণ্ড কোম্পানী জগদ্বিখ্যাত হইত না। স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল, যাঁহাকে সকলে ভূতিবাবু, ভূতিবাবু বলিয়া জানিত, আমি জীবনে তাঁহার মত কর্ম্মঠ ব্যক্তি আর দেখি নাই। তিনি যেমন পরিশ্রমী, তেমনই মিতব্যয়ী ছিলেন। সত্যবাদিতা ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহার ভিতরে প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, "Honesty is the best policy"—সৎপথই ব্যবসার উন্নতির সোপান। তিনি বলিতেন, অতি সামান্য লাভে মাল বেচা-কেনা কর, তোমার লাভের শেষ থাকিবে না, এক টাকার ধন পাঁচ টাকায় বেচিবার প্রয়োজন নাই; এক টাকার ধন এক টাকা এক আনায় বেচিতে পার, ও সেই টাকাটি যদি দশবার হাতফের হয়, তবে তোমার লাভের সীমা থাকিবে না।

স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল মহাশয় সকলের সহিতই অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন। যখন ভূতনাথ পাল মহাশয় হিন্দু স্কুল ছাড়িয়া পিতাকে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে পিতার দোকানে আসিয়া যোগ দিলেন, তখন সেই ব্যবসায়ে পাঁচটিমাত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল; কিন্তু ভূতনাথ পাল মহাশয় তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় দুই সহস্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশে খুব ধুম করিয়া সরস্বতীপূজা হইত। সরস্বতীপূজার বিসর্জ্জনের দিন, আমি দেখিয়াছিলাম, বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের সরস্বতীপ্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতেছে, সঙ্গে প্রায় ৫ শত লোক; বাজনা-বাদ্যি লইয়া মহা আনন্দে শোভাযাত্রা চলিয়াছে। আমি নিকটে যাইয়া ভূতিবাবুকে খুঁজিলাম। এইখানে বলিয়া রাখি, তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন; উভয়ে উভয়কেই দাদা বলিয়া ডাকিতাম। আমি উঁহাকে সেই দলে না দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁহার এক জন প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন, বন্ফিল্ডস্ লেনের দোকানে আছেন। আমি বিশেষ কৌতূহলপরবশ হইলাম। তাঁহার বাটীর প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য এত লোক সঙ্গে করিয়া প্রতিমা যাইতেছে, আর তিনি দোকানে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন? দোকানে গিয়া দেখি, তিনি এক জন কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তিন টাকা ছ' আনা, দু'টাকা দশ আনা, এক টাকা আধ আনা; এই সব গুলি জিনিষের দাম, তিনি সেই দামগুলি ফর্দ্দে ফেলাইয়া দিতেছেন। আমি গিয়া বলিলাম, "ভূতিদা,

আপনি সরস্বতীর সঙ্গে যান নাই?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সরস্বতীর সঙ্গ ত অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছি, এখন দেখি, যদি লক্ষ্মীর সঙ্গে আলাপ করিতে পারি।" তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তারকদা, আমি যদি যাই সরস্বতীর সঙ্গে, তাহা হইলে আমার এই ৫ শো কর্ম্মচারীদের সেই সঙ্গে যাইবার অসুবিধা হইবে; অথচ এই ৫ শত লোককে ছুটী দিয়া, তাহাদের আমোদ করিতে দিবার সুবিধা দিয়া, আমি যদি একা কার্য্য করি, সেই কার্য্যে একটা নবীন মাদকতা আসে; সেই জন্য তাহাদের সকলকে ছুটী দিয়া, আমি কয় ঘণ্টার জন্য নিজের স্কন্ধে সমস্ত কার্য্যভার লইয়াছি।" কর্ম্মবীরের ইহাই লক্ষণ।

বাঙ্গালার ব্যবসাদার হিসাবে আর এক জন কর্ম্মবীর আছেন, তিনি স্যার আর, এন, মুখার্জ্জী। যে সব গুণ থাকিলে ব্যবসায়ে মানুষ উন্নতি করিতে পারে, তাঁহাতে সেই সব গুণই বর্ত্তমান আছে। তিনি কর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, ও পরিশ্রমী। এমন সময় গিয়াছে, যখন তিনি নিজ হস্তে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, পরিশ্রমে তিনি কখনই বিমুখ হন নাই। যখন তিনি মেসার্স কে, এন, মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর এঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে কার্য্য করিতেন, এখনও অনেক লোক জীবিত আছেন, যাঁহারা তাঁহাকে আস্তীন গুটাইয়া হাতুড়ি ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন। তিনি ৪৫ টাকা মাহিয়ানার চাকরীতে জীবনের আরম্ভ করিয়া এখন কোটীশ্বর হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন। তিনি বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আরও যে সকল দেশীয় ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই উল্লিখিত গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত ছিলেন, আর অধিকাংশ কর্ম্মবীরই তাঁহাদের স্ব স্ব পুত্রকে নিজ কর্ম্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়া নিজেদের সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। যাঁহারা নিজেদের পুত্রদিগকে ব্যবসাবিষয়ে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতে পারেন না, তাঁহাদেরই ব্যবসা অকালে লয়প্রাপ্ত হয়।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে চোরবাগানিবাসী স্বর্গীয় রামনারায়ণ সাধু মহাশয় তাঁহার ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি করেন; তিনি তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় রাধানাথ সাধু মহাশয়কে নিজ ব্যবসায়ের সহায়করূপে গড়িয়া লন; কিন্তু স্বর্গীয় রাধানাথ সাধু মহাশয়ের সে সুবিধা ঘটে নাই। তাঁহার পুত্র ভালরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, সঙ্গীতচর্চ্চার বিশেষ নাম ছিল। তিনি সুপুরুষ ছিলেন, এবং সব সময়ে ফিটফাট থাকিতেন; কিন্তু ব্যবসা শিক্ষা করেন নাই। পিতা রাধানাথ সাধু মহাশয়ের দোকানে শিক্ষানবিশীও করেন নাই। কাযেই রাধানাথ সাধুর স্বর্গারোহণের পর ব্যবসা স্বর্গীয় রমানাথ সাধুর হাতে আসিয়া পৌছিল; তাঁহার কর্ম্মচারিগণ বুঝিতে পারিল, তাঁহার ব্যবসা-শিক্ষা হয় নাই, অপর কর্ম্মচারী ও আত্মীয় কর্ম্মচারিগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ঠকাইতে আরম্ভ করিল; ফলে কয়েক বৎসর ব্যবসার পর যখন পীড়া আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল, তিনি এক বৎসর ধরিয়া ব্যবসা দেখিতে পারিলেন না; আত্মীয় ও অনাত্মীয় কর্ম্মচারিগণ তাঁহার চলন্ত কারবারের সর্ব্বনাশসাধন করিল। সুন্দরমূরতি, শিক্ষিত, সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় রমানাথ সাধু তাঁহার পৈতৃক চল্‌তি ব্যবসা চালাইতে অক্ষম হইলেন। ব্যবসা সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই তাঁহার ছিল না। কাযেই একটি ভাল ব্যবসা খারাপ হইয়া গেল এখন দেখা যাক, ভাল ব্যবসাদার হইতে গেলে কি কি শিক্ষার প্রয়োজন।

প্রথম:—ভাল ব্যবসাদার হইতে গেলে বিশেষ উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নাই। এণ্টেন্স ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা তদুপযোগী শিক্ষা পাইলেই যথেষ্ট হইল; সাধারণতঃ ইহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষা পাইলে ব্যবসা-বৃদ্ধির ও ব্যবসা-বুদ্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, বি-এ বা এম্-এ পাশ করিলে সে ব্যক্তি ব্যবসাদারের প্রথম জীবনটাকে কষ্টকর ও তাহার অনুপযোগী বলিয়া মনে করে; সেই জন্য যে বালককে ব্যবসাদারী শিক্ষা দিবার মতলব আছে, তাহাকে কলেজে উচ্চশিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। সে ব্যবসা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি নিজে মেধাবী হইয়া উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার উপযোগী বইগুলি পাঠ করে, তাহা মঙ্গলজনক হইবে, ব্যবসার অন্তরায় হইবে না।

দ্বিতীয়:—সত্যনিষ্ঠা বা ধর্ম্মনিষ্ঠা ব্যতীত ব্যবসার উন্নতি হইতে পারে না। মিথ্যার উপর ব্যবসার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহা বালির উপর অট্টালিকা প্রস্তুত করার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর হইবে। তাসের বাড়ীর ন্যায় যে কোন মুহূর্ত্তেই তাহা ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে; "Honesty is the best policy" এ কথাটির দাম অমূল্য, সৎপথে থাকিলে ব্যবসার উন্নতি হইবেই হইবে।

তৃতীয়:—প্রভূত পরিশ্রম। ব্যবসার উন্নতি করিতে হইলে প্রভূত পরিশ্রমের প্রয়োজন, কর্ম্মঠ না হইলে

ব্যবসাকার্য্যে নামা সম্পূর্ণ ভুল; দিন-রাত পরিশ্রম করিলে তবে ব্যবসার উন্নতি হয়। যাঁহারা দশটা পাঁচটা কার্য্য করিয়া জীপনযাপন করিতে চাহেন, তাঁহারা কেরাণীগিরি করুন, অন্য চাকরী করুন বা অন্য যাহাই করুন, স্বাধীন ব্যবসা করিতে আসিবেন না; কারণ, স্বাধীন ব্যবসায় ষোল আনা প্রাণ দিতে হইবে, প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে, তবেই ব্যবসায়ে উন্নতি। যে ব্যবসা করিবে, সে অন্য কিছু করিতে পারিবে না অর্থাৎ প্রথম প্রথম অনন্যকর্ম্মা হইয়া শুধু ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য কায করিতে হইবে।

চতুর্থ:—ব্যবসা করিতে গেলে প্রথমতঃ ব্যয়বাহুল্য একবারেই চলিবে না। যত কম খরচ করিবে, ততই ব্যবসার সুবিধা হইবে। কেন না, যে টাকাটি অন্যায়রূপে খরচ করিবে, সেই টাকায় মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবে। এক দিন পুত্রের বিবাহে বা পিতৃশ্রাদ্ধে কিঞ্চিৎ খরচ কর, তাহাতে আসিয়া যায় না। কিন্তু প্রত্যহ বাক্সের চাবি বন্ধ রাখিতে হইবে। "যত্র আয় তত্র ব্যয়" করিতে গেলে ব্যবসা চলিবে না; কখনও কোন দেশে চলে নাই, এখনও চলিতে পারে না, তবে জুয়াচুরি ব্যবসার কথা আলাদা। আমরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকি, মাড়োয়ারী বা ভাটিয়ারা ব্যবসায় উন্নতি করিতেছে, কত দূর-দেশ হইতে আসিয়া, টাকা লুঠিয়া লইয়া যাইতেছে ও আমরা তাহাদেরই তারবাবু, মাষ্টারবাবু, আফিসবাবুরূপে জীবনযাপন করিতেছি। তাহার অন্যতম কারণ, তাহাদের এক শত টাকা আয় হইলে মাত্র কুড়ি টাকা খরচ করিয়া তাহারা সন্তুষ্ট থাকিবে। কারণ, তাহাদের অভাব অনেক কম। আর আমাদের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ১ শত টাকা আয় হইলে একশো কুড়ি টাকা মাসে খরচ হইবে। আমরা খালি শিখিয়াছি—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" যেমন করিয়াই হউক, জোরে জীবনযাত্রা চালাইতে হইবে। কিছু কাল পূর্ব্বে আমি এক মোকদ্দমা উপলক্ষে কোন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়াছিলাম. তিনিও উত্তরকালে অতুল ধনের মালিক হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ক্রোরপতি হইয়াছেন। তাঁহার এক জন মাড়োয়ারী কর্ম্মচারী ১০ হাজার টাকা তাঁহার লোহার সিন্দুক হইতে লইয়া গিয়াছিল। আমি তাঁহার বাটীতে গিয়া দেখি, পাশাপাশি তিনটি ঘর আছে;—একটি শয়নঘর, তাহাতে একটি খাট, একটি তোষক পড়িয়া রহিয়াছে, একখানা ভাঙ্গা আরসি ও একটি দশ আনা দামের কাপড়ের ব্র্যাকেট আলনা। পাশেই আফিসঘর, তাহাতে একটা লোহার সিন্দুক, একটা সতরঞ্চি, একটা দোয়াতকলম ও একটা বেঞ্চি, যাহার উপর খাতাপত্র চাপানো আছে; পার্শ্বে একটা রসুই-ঘর, তাহাতে একটা চৌকা, একটা ঘিয়ের টিন, কিঞ্চিৎ আটা ও কিছু শাকসব্জী। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে তাঁহার লাখ টাকার জীবনবীমা ছিল। সে সময়ও তাঁহার মাসিক আয় দশবারো হাজার টাকা; কিন্তু তাঁহার খরচ—খাওয়া-দাওয়া, বাটীভাড়া সব লইয়া ১শত ৫০ টাকা মাত্র। ব্যবসায়ে যত তাঁহার লাভ হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মূলধন বাড়িতে লাগিল। কারণ, তাঁহার খরচ কম। এক জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দুলক্ষ টাকা খরচ করিয়া একটি বাড়ী প্রস্তুত করিলেন, দুইটি ঘর ব্যতীত সব ঘরই ভাড়া দিলেন; বাটীতে ভাড়া আসিতে লাগিল—১৪ শত, ১৫ শত টাকা; সদরে এক সিপাহী রহিল; প্রত্যেক ভাড়াটিয়া, যে কুড়ি টাকা ভাড়া দিয়া একটি শয়নঘর ও একটু রসুই-স্থান লইয়া বাস করে, সে-ও পরিচয় দিবার সময় বলে, "যো বাটীমে সঙীন লেকে সিপাহী খাড়া হায়, ঐ হামারা রয়নেকা মোকাম্"। আর, এক জন বাঙ্গালী যদি দুলক্ষ টাকা খরচ করিয়া বাড়ী করিলেন, সব বাটীটিই তিনি ব্যবহার করিতে লাগিলেন; অন্ততঃ কুড়িটি চাকরের কম তাঁহার বাড়ী সাফ থাকে না। ফলে ঐ ১৪।১৫শো টাকার আয় ত হইলই না, উপরন্তু ৫ শত টাকা খরচ হইতে লাগিল; কাযেই মিতব্যয়ীর মূলধন বাড়িতে লাগিল, অমিতব্যয়ীর মূলধন কমিতে লাগিল; সেই হেতু বলিতেছিলাম, ব্যবসায় উন্নতি করিতে হইলে মূলধন বাড়াইতে হইবে। টাকা বেশী পরিমাণে নিজ হাতে রাখিতে হইবে, যাহাতে প্রয়োজন হইলে অপরের নিকট বেশী সুদে ধার করিতে না হয়; তাহা করিলে ব্যবসায়ে সামঞ্জস্য সুনিশ্চিত। ১২ পারসেণ্ট হইতে ২৪।৩৬ পারসেণ্ট সুদ দিয়া, ব্যবসা বেশী দিন চলে না; তবে যাঁহারা বাজার মারিবার অভিপ্রায়ে ব্যবসা খোলেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

পঞ্চম:—কোন ব্যবসায় সামান্য ও নীচ বলিয়া ঘৃণা হইতে পারে না। যে ব্যবসায়ে অর্থ উৎপাদিত হয়, সেই ব্যবসায়ই অবলম্বনীয়। অবশ্য ধর্ম্মপথে। প্রত্যেক ব্যবসায়ের আদি উৎপত্তি অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু সামান্য, অকিঞ্চিৎকর আরম্ভ হইতে অনেক ডালপালা বিস্তার করিয়া

ব্যবসার সামান্ত ক্ষুদ্র গাছটি মহীরুহরূপে অনেকটা স্থান ছাইয়া থাকে এবং অনেক লোককে আশ্রয় দেয়। আজকালকার দিনে যে বংশধরদের 'রোল্সরয়েস্' চড়িতে দেখিতেছেন, তাহাদের তিনপুরুষ আগের মহাপ্রাণরা নিজে সঙ্গে করিয়া তেল আনিয়া হাটে বেচিয়াছেন, চালের ব্যবসায়ে ও গমের ব্যবসায়ে পয়সা রোজগার করিয়াছেন, বর্ত্তমান পুরুষদের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষই তেলের, গমের ও চালের কাযের লভ্যাংশ মূলধন করিয়া তেজারতি কায সুরু করিয়াছেন; তাঁহাদের খরচ অতি সামান্ত ছিল; লভ্যাংশ হইতে ক্রমান্বয়ে কেবল মূলধন বাড়াইয়াছেন; তাই এখন তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ 'রোল্সরয়েস্' চড়িতে সমর্থ হইতেছেন; তাহারা এখন কোটিপতি; কিন্তু এই প্রভূত ধনসঞ্চয় তিন পুরুষ পূর্ব্বে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা অর্জ্জিত হইয়াছিল; প্রথম হইতেই যদি তাঁহারা ব্যয়বাহুল্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এমন কোটীশ্বর হইতে পারিতেন না; ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া মূলধনবৃদ্ধি ব্যবসাদারের উন্নতির প্রথম সোপান; একমাত্র সোপান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শতকরা ১২ হইতে ৩৬ টাকা সুদ দিয়া ব্যবসার উন্নতি অসম্ভব।

ষষ্ঠ ঃ—ব্যবসাদার হইতে গেলে মিষ্টভাষী হইতে হইবে। আমি চাটুকার হইতে বলিতেছি না; ব্যবসা ছাড়া অন্ত দিকে তাকাইতে পারিবে না। ব্যবসাতে ব্রহ্মচারীর ন্তায় লাগিয়া থাকিতে হইবে; যত দিন ব্যবসার প্রতি এক-লক্ষ্যভাবে চাহিয়া থাকিবে, তত দিন তাহার উন্নতি; ছোট পুত্রের ন্তায়, কিংবা ছোট গাছের ন্তায়, ইহার সেবা করিতে হইবে; যখন ইহা ৩০ বৎসরের সন্তানরূপে বা মহীরুহরূপে ইহাদের নিজ নিজ স্থান অধিকার করিবে, তখন একটু আধটু কম দেখিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অনন্তমনা হইয়া ব্যবসার সেবা করিতে হইবে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"keep your shop and your shop will keep you." তুমি যদি অনন্তমনে তোমার ব্যবসার সাধনা কর, ব্যবসা তোমার খাওয়া-পরার অভাব অভিযোগ সমস্তই মোচন করিবে। কিন্তু যদি তোমার ব্যবসার প্রতি অনন্তমনা না হও, উহার সচল অবস্থা একবারেই অসম্ভব। আমি যে যাইবে যে, একনিষ্ঠভাবে ব্যবসার সেবা না করিলে, ব্যবসা চলিতে পারে না।

অনেক দিন পূর্ব্বে ফকির মহম্মদ নামে এক মুসলমান ভদ্রলোক আমার কাছে একটি মামলা করিবার জন্ত আসেন। তাঁহার জামাতা জান্ মহম্মদ—তাঁহার যে কার্য্যটি ছিল, দেখিতেন। ব্যবসাটি চামড়ার ব্যবসা (Hide business)। তিনি আড়তদারী করিতেন; মফঃস্বল হইতে লোক তাঁহার কাছে চামড়া পাঠাইয়া দিত; তিনি সেই সব মাল বেচিয়া মহাজনের টাকা মহাজনকে দিতেন, লাভের ও আড়তদারীর অংশ নিজে লইতেন। সাধারণ ভাষায় যাহাকে ধনী বলে, তিনি তাহাই ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার কোন অভাব ছিল না। তিনি প্রথমে যখন ব্যবসা স্থাপন করেন, তখন তিনি নিজেই সমস্ত কায দেখিতেন, অবশ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। তাহারা যাহা করিত, তিনি নিজে তাহাদের সমস্ত কার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; সামান্ত আরম্ভ হইতে তাঁহার ব্যবসাটি বিশেষ বড় ব্যবসা হইয়া দাঁড়ায়। তিনটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুদাম, ইহাতে সব সময়ে চামড়া ভরা থাকিত; তিন চারিটি যাচনদার, অন্তান্ত অনেকগুলি কর্ম্মচারী তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইত। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না, একমাত্র কন্তাই তাঁহার জীবনের অবলম্বন। তিনি কন্তার বিবাহ দিয়া জামাতাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন, অর্থাৎ সাধারণ ভাষায় আমরা যাহাকে ঘর জামাই বলি, তাঁহার জামাতা সেই ঘর-জামাইরূপেই তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেই কর্ম্মচারীদের সমস্ত কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহা তিনি নিজে দেখিতেন না। কথায় বলে—

"খাটে খাটায় সোনার গাঁতি
তার অর্দ্ধেক মাথায় ছাতি,
ঘরে ব'সে পুছে বাত
তার কপালে হা-হা ভাত।"

তিনি নিজে সামান্ত অবস্থা হইতে ৩০ বৎসর ধরিয়া অনন্য-উদ্যমে ও প্রভূত পরিশ্রমে এই ব্যবসার উন্নতি করেন। মফঃস্বলের ব্যাপারীদের কাছে তাঁহার বেশ নাম ও যশ হয়; সকলেই তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত; তিনি যে কোন অধর্ম্মকার্য্য করিতে পারেন, তাহা তাহাদের ধারণা

মাল পৌঁছাইয়া দিলেই তাহারা নিশ্চিন্ত ; প্রকৃত বাজার-দরেই সেই মাল বিক্রয় হইবে ও তাহাদের টাকা মণি অর্ডারে দেশে আসিয়া পৌঁছিবেই পৌঁছিবে। যদি ব্যাপারীদের এই আড়তদারের ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে চোখ বুজিয়া এই আড়তদারের আড়তে মাল পাঠাইয়া দিত না। ৩০ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার ব্যবসা বেশ চলিতেছে, তিনি একটু একটু অবসর লইতে লাগিলেন; জামাতাকে সেই কার্য্যে বসাইয়া কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু সেই নিশ্চিন্তভাবই তাঁহার ব্যবসার সমাধিরূপে পরিণত হইল। তিনি ব্যবসাদারী শিক্ষা পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই এক আড়তদারের কাছে শিক্ষা করিয়াছিলেন; তার পর সেখানে চাকরী করেন, পরে ভবিষ্যতে বখ্‌রাদার হন। এইরূপ করিয়া ২০ বৎসর শিক্ষা প্রাপ্ত হন; ১০ বৎসর বয়স হইতে শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত খুব ভালরূপে শিক্ষা করেন। তাহার পর তাঁহার মহাজনের পুত্রের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় নিজের ব্যবসা আরম্ভ করেন। যখন তিনি নিজের ব্যবসা করেন, তখন তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর; এই ৩০ বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া নিজেকে ব্যবসা চালাইবার উপযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজ ব্যবসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এত দিন ধরিয়া শিক্ষা ছিল বলিয়াই ব্যবসার উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

জান্ মহম্মদ যখন ফকির মহম্মদের কন্যা ফতেমাকে বিবাহ করিলেন, তখনই তিনি বুঝিলেন, তিনি প্রভূত ধনের অধীশ্বর; বেশভূষা আর শারীরিক পারিপাট্যেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। ব্যবসায়ীর নিকটে শিক্ষানবিশী করেন নাই; কাযেই তিনি ব্যবসা চালাইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। তিনি ত কর্ত্তার একমাত্র জামাতা, সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অধিকারী; তিনিই ত মালিক। এই অনভিজ্ঞ, ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত যুবকের হাতে ব্যবসায়ের কর্তৃত্বভার পড়িল। এ অবস্থায় ফল যাহা হয়, তাহাই হইল, ব্যবসায়ে ক্রমে ভাঙ্গন ধরিল, কিন্তু ৩০ বৎসরের গঠিত ব্যবসা ত ৫ বৎসরে নষ্ট হয় না, নষ্ট হইতেও কিছু সময় লাগে। কাযেই বৃদ্ধ ফকির মহম্মদ সহসা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন না। তাহার এমন অনেক কর্ম্মচারী ছিল, যাহারা ব্যবসায়ে প্রথম অবস্থা হইতেই কার্য্য করিতেছিল। কিন্তু আমাদের দেশে কারবারে যে চাকর, সে মালিক হইতে পারে না; কাযেই ফকির মহম্মদ কাহাকেও বখরাদার করেন নাই।

আমাদের দেশীয়দের যে কারবার চলে না, তাহার প্রধান কারণ, আমরা বিশেষ সুদক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে বখ্‌রাদার করিতে অনিচ্ছুক। আমরা মনে করি যে, অশেষ পরিশ্রমের দ্বারা যে ব্যবসাটি গঠন করিয়াছি, তাহা এক জন অনাত্মীয়ের হাতে দিয়া যাইব, ইহা ত হইতে পারে না। এই কারণে আমাদের অনেক ব্যবসায়ীর অধঃপতন হয়। মালিকের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র বা অপর আত্মীয় ব্যবসা-বিষয়ে অশিক্ষিত, পরিশ্রম করিতে অপারগ, ব্যবসাদারের যে সব গুণ থাকা উচিত, তাহার কিছুই নাই, তথাপি মালিকের অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক অনুপযুক্ত পুত্র বা আত্মীয় যখনই ব্যবসায়ে যোগ দিলেন, তখনই তিনি বড়-বাবু হইলেন। আর ৪০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার পিতা বা আত্মীয়ের ব্যবসার বিষয়ে যে আত্মীয়টি ব্যবসাটির সম্যক্ গঠনে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি এখনও চল্লিশ, পঞ্চাশ কি একশো টাকা বেতনের কর্ম্মচারী। মালিকের অশিক্ষিত, অনুপযুক্ত পুত্র ব্যবসায় যোগ দিয়াই বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর উপর হুকুম চালাইতে লাগিলেন, এমন কি, অসম্মানসূচক কার্য্য করিবার জন্য তাহাকে হুকুম চালাইতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় এই সকল কর্ম্মচারীর মনোভাব কিরূপ হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন, খালি পারেন না কর্ত্তার নালায়েক পুত্র বা আত্মীয়। আমি জানি যে, অনেক বৃদ্ধ, উপযুক্ত এবং ধার্ম্মিক কর্ম্মচারীরা মালিকের অল্পবয়স্ক অনুপযুক্ত ও ধর্ম্মজ্ঞানহীন পুত্র বা আত্মীয়ের হস্তে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হইয়া থাকে।

আমাদের ও ইংরাজদের মধ্যে এ বিষয়ে পার্থক্য অসাধারণ। আমি জানি, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ফার্ম্মের স্বত্বাধিকারী "লরি" সাহেব যখন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুত্র "লরি জুনিয়ার" মালিক হইয়া আসিয়া বসেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী সিনিয়ারের পরবর্ত্তী যে কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারাই সিনিয়ার বখরাদার হইলেন। আর "লরি-জুনিয়ারকে" শিক্ষানবিশী করিতে হইল, এই রকম ৪।৫ জন অপরাপর কর্ম্মচারী বখরাদার ও বড়-সাহেব হইবার পর "লরি সিনিয়ারের" অবসরপ্রাপ্তির ২০ বৎসর পরে, তবে "লরি জুনিয়ার" পিতার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে

বড় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। একটা ২৮ বছরের যুবক মালিকের আত্মীয় বলিয়াই অফিসে আসিয়াই ৬০ বৎসরবয়স্ক কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারীকে অযথা লাঞ্ছনা করিতে আরম্ভ করেন, উদ্দেশ্য সকলকে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া, তিনিই ভবিষ্যতের মালিক, বৃদ্ধ কর্ম্মচারী কেহই নহে। আমাদের দেশী ব্যবসার কখনও উন্নতি হইবে না, যত দিন না এইরূপ মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়, যত দিন না বৃদ্ধ কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারীর প্রতি উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রকাশ করিতে না শিখিব, যত দিন না আমরা আমাদের উদ্ধতস্বভাব যুবক আত্মীয়দিগকে বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর অধীনে শিক্ষানবিশী করিতে না দিব, যত দিন না আমরা আমাদের আত্মীয়তার বাঁধন ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়া প্রকৃত কর্ম্মঠ লোককে ব্যবসা চালাইবার জন্য নিযুক্ত না করি, তত দিন আমাদের ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা উন্নতির পথে চলিবে না। মালিকের মূলধন নিশ্চয়ই; কিন্তু শুধু মূলধনে ত ব্যবসা চলে না; কর্ম্ম চালাইবার লোক দরকার, আর সেই লোক দক্ষ হইয়া উঠিতে অনেক দিনের শিক্ষা ও দীক্ষার প্রয়োজন। যত টাকাই মালিক খরচ করুন না কেন, তিনি মনে করিবেন, আর বাহির হইতে মনের মত কর্ম্মচারী পাইবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। আর যে কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিবেন, সে যদি না জানে যে, এই কর্ম্মে তাহার ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে, তবে মন-প্রাণ দিয়া সে কেন কার্য্য করিবে?

ফকির মহম্মদ এই ভুল করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সত্যনিষ্ঠ, কর্ম্মঠ, পুরাতন কর্ম্মচারিগণকে উচ্চ পদে না বসাইয়া উচ্চ বেতন ও বখরা না দিয়া, অশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ, সুন্দরমূরতি জামাতাকে কার্য্যের মালিক করিয়া বসাইলেন, ফলে সুবিধা পাইয়া অধীনস্থ পুরাতন কর্ম্মচারীরা কার্য্যে অবহেলা করিতে লাগিল এবং তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানহীন যাহারা, তাহারা সুবিধামত চুরি করিতে আরম্ভ করিল। চুরি হইতেছে বুঝা যায়, কিন্তু কি রকম ভাবে চুরি হইতেছে, তাহা প্রথম প্রথম বুঝা গেল না। ভাল করিয়া কাগজ ঘাঁটাঘাঁটির পর ইহা বেশ বুঝা গেল যে, তাহাদের এক জন কর্ম্মচারী কবিরুদ্দিন খালি লেজার লিখিত; তাহার হাতে টাকাকড়ি আসিত না, টাকাকড়ির সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্কও ছিল না, খালি ব্যাপারীদের লেজার লিখিত, লেজারে দেখাইত কত টাকার মাল তাহার এই কার্য্যে আসিয়াছে ও তাহার মধ্যে কত টাকা পাইয়াছে। কবিরুদ্দিন খাতাতে দেখাইতে লাগিল, যথার্থ যত টাকার মাল আসিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বেশী; অর্থাৎ যদি তাহারা ২৫ হাজার টাকার মাল দিয়া থাকে, জমা দেখাইল ৩৫ হাজার, এবং তাহাদের নামে যদি খরচ থাকে ২০ হাজার, দেখাইল ১৫ হাজার। কাযেই লেজার পাওনা দেখাইল ২০ হাজার। এই রকম মাল বৃদ্ধি ও টাকা দেওয়া কম দেখাইল দুইটি ব্যাপারীর হিসাবে। কবিরুদ্দিনের হিসাবপর্য্যায় অনুযায়ী তাহাদের যত টাকা যথার্থ প্রাপ্য, তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা বাহির করিয়া লইল; লইয়া অর্দ্ধেক তাহারা নিয়ে লইল, আর অর্দ্ধেক কবিরুদ্দিনকে দিল। ইহা সম্ভব হইল, কারণ, বুড়া ফকির মহম্মদ খাতাপত্র কিছুই দেখিতেন না। যুবক জান্ মহম্মদের খাতা দেখিবার সময় ও প্রবৃত্তি ছিল না। পুরাতন কর্ম্মচারীরাই মালিকের অন্যায় ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া সৎপথ ছাড়িয়া অসৎপথ ধরিল।

খাতাপত্র দেখিয়া মামলা রুজু করিলাম কবিরুদ্দিনের নামে, আর যে দুটি আড়তদার কবিরুদ্দিনের মিথ্যা হিসাবমত প্রাপ্যের অধিক টাকা বাহির করিয়াছিল, তাহাদের নামে। মামলা পুলিস-কোর্টে আরম্ভ হইল। আমি চার্জ্জ খাড়া করিয়া দিলাম। সেসঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট কেস্ পাঠাইয়া দিলেন। এই স্থানে কিরূপভাবে চার্জ্জের ওলটপালট হয়, তৎসম্বন্ধে দুএকটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেসঙ্গে কেস্ যাইবার পর, এক জন এটর্ণী ও দুই জন কাউন্সেল নিযুক্ত হইল; চার্জ্জ ঠিক হইয়াছে কি না, এই সম্বন্ধে একটি কনসাল্টেসন্ হইল, তাহাতে রহিলেন একটি সেমি সিনিয়ার ও একটি জুনিয়ার কাউন্সেল। পরামর্শ সুরু হইলে কৌন্সুলী দুটি বলিলেন, "মিষ্টার সাধু, আপনার চার্জ্জটি ঠিক হয় নাই।" তখন হয় ত বাস্তবিক ইহাতে গলদ আছে, অনেক তর্কাতর্কির পর ইহাই সাব্যস্ত হইল, তাঁহারা ডিক্টেট্ করিবেন, আর আমি তাঁহাদের ডিক্টেশনমত চার্জ্জ লিখিয়া লইব। তাঁহারা আরম্ভ করিলেন, "ইউ (you)" তাহার পর আসামীগণের নাম অন্ অর অ্যাবাউট্ দি ডে.(on or about the day)—এইটুকু বলিবার পরে আর ডিক্টেশন চলে না, কারণ, দেখা গেল, তিন জনকে জড়াইয়া চার্জ্জ (charge) করার অনেকগুলি অসুবিধা আছে। তাঁহারা তিন চারিবার চার্জ্জের প্রথমাংশটাই লিখাইয়া কাহিল হইয়া পড়েন; দ্বিতীয় অংশ আর বলেন না।

স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল

সার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শেষ এইরূপ দুই ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "দেখুন মিষ্টার সাধু, এখন এই রকমই থাক্, তার পর জজ যদি এই চার্জ্জের কোন আপত্তি তোলেন, তখন বিবেচনা করা যাইবে।" ফলে তাহাই হইল; আমি যা চার্জ্জ খসড়া করিয়া দিয়াছিলাম, সেই চার্জ্জই রহিয়া গেল, জজ কোন আপত্তি করিলেন না, অপরপক্ষের কাউন্সেলও কোন আপত্তি করিলেন না; ফলে সেই চার্জ্জেই তিন জনের পাঁচ বৎসর করিয়া জেল হইয়া গেল। ফরিয়াদীর পক্ষে যে দুটি কৌন্সলী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন ক্রিমিন্যাল লএর এক্সামিনার (examiner) ছিলেন; তাঁহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার লালসা আমি পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "মহাশয়, আপনি ত ক্রিমিন্যাল লএর (criminal law) পরীক্ষক, আপনি এই চার্জ্জ খাড়া করিবার জন্য একটি প্রশ্ন দিলে কি নম্বর দিতেন? দুই অথবা চার, তার বেশী নয়। আপনারা সকলেই অভিজ্ঞ লোক, ফৌজদারী আইন ভালই জানেন, আর আমিও এই কার্য্য কয়েক বৎসর হইতে সুনামেরই সহিত করিতেছি, দুঘণ্টা তর্কাতর্কির পর যদি আমরা এই চার্জ্জ ঠিক করিতে না পারি, তবে একটা ফাইন্যাল ল ষ্টুডেণ্টকে এই চার্জ্জ ড্র করিতে দিয়া কেবলমাত্র চার নম্বর দেওয়ার অধিকার থাকা কি ঠিক? আমি আশা করি, আপনি ছেলেদের কাগজ দেখিবার সময় তাহাদের সুবিধা অসুবিধার কথা ভুলিবেন না; কেবল দেখিবেন, তাহারা প্রিন্সিপ্‌লটি ঠিক বুঝিয়াছে কি না।" মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "হোয়াট ইস্ পারফেক্টলি ট্রু—অব্যর্থ সত্য।" মামলার ফলে আসামীদের জেল হইল বটে, কিন্তু কারবারেরও বিশেষ সুবিধা হইল না। মোকদ্দমায় অনেকগুলি টাকা নষ্ট হইল। আমি ছিলাম, দু'জন কাউন্সেল ছিলেন, হাইকোর্টে আর একটি সিনিয়ার কাউন্সেল দেওয়া হয় ও এটর্ণীও ছিলেন। তিন জন আসামী অনেকগুলি টাকা আত্মসাৎ করে; তাহার উপর সেই আসামীদিগকে সাজা দিতে গিয়া আইন-ব্যবসায়ীদের হস্তে অনেকগুলি টাকা দিতে হয়; ফলে রাবণের হাতেই মরুক বা রামের হাতেই মরুক, ফকির মহম্মদের ব্যবসা-জীবনের শেষ হইল; তিনি খন বেশ করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া দেখিলেন, কারবার গুটাইয়া ওয়াই সর্ব্বদিক্ হইতে প্রশস্ত; কারণ, জামাইকে শ্রেষ্ঠ করিয়া, এই সব পুরাতন কর্ম্মচারী, যাহাদের প্রতি তিনি ভাল ব্যবহার করেন নাই, তাহাদের নিকট হইতে কোন সাহায্যের আশা করিতে পারেন না। অনুপযুক্ত ও ব্যবসায় অনভিজ্ঞ জামাইকে দিয়া কার্য্য চলিতেই পারে না। অতএব জাল গুটানোই প্রশস্ত। এইরূপ অবস্থায় উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাবে তাঁহাকে কারবার উঠাইয়া দিতে হইল; এবং কারবারের মূলধনে কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া তাহার সুদেই নিজের ও জামাতার ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভুলের জন্য এত দিনের পরিশ্রমে গঠিত চল্‌তি কারবারটি উঠাইয়া দিতে হইল।

অব্যবসায়ী, অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, ধর্ম্মজ্ঞানহীন ব্যবসায়ী, অপরিমিতব্যয়ী ব্যবসায়ী কখনও ব্যবসাদার হইতে পারেন না। তিনি ব্যবসাদার নাম ধরিতে পারেন, কিন্তু তিনি ব্যবসায়ী নন। ব্যবসা-বিষয়ে রীতিমত শিক্ষা না পাইলে এক জন লোক ব্যবসাদার হইতে পারে না। ভাল ব্যবসাদার হইতে গেলে উচ্চশিক্ষার একবারেই প্রয়োজন নাই, বরং সেটি প্রতিবন্ধক। এক জন লোক উচ্চশিক্ষা পাইলে ব্যবসাদারকে যেরূপ সাদাসিধাভাবে থাকিতে হয়, তাহা সে পারে না। অন্ততঃ বর্ত্তমান অবস্থায় পারিতেছে না। দশটা পাঁচটায় খাটিয়া—টপ্পাবাজি করিয়া যাঁহারা জীবনযাপন করিতে চান, ব্যবসা তাঁহাদের জন্য নহে।

আমি এইখানে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সকলেই এণ্ড্রু কার্ণিজের নাম শুনিয়াছেন। তিনি এক জন আমেরিকান কোটীশ্বর। তিনি প্রথম-জীবনে দোকান ঝাঁট দিবার কায করিতেন। তাহার পর ক্রমোন্নতির দ্বারা বহুকোটি টাকার অধীশ্বর হন। তাঁহার অগাধ দান। তিনি পৃথিবীতে সাধারণের উন্নতির জন্য প্রভূত ধনসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক Empire of businessএ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, জীবনে তিনি প্রথম কায করিয়াছিলেন—দোকানে ঝাড়ু দেওয়া। সেই সামান্য কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া কত বড় বড় কায করিয়াছেন, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। ব্যবসায়ে জীবন সফল করিতে হইলে সকলকেই দোকান ঝাড়ু ও ধুনা-গঙ্গাজল দিয়া দোকান সাফ করিতে হইবে। আগে ছোট হও, তবে বড় হইবে। আগে সামান্য কায করিতে শেখ, তবে বড় কাযে হাত দিও।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)

হইতে আইসে, ইহা সত্য। কেহ কেহ এমনও মনে করেন, সেগুলি এখনকার শিক্ষারই অঙ্গ এবং সেই জন্য তাঁহাদের মত— স্ত্রীশিক্ষা সমাজের পক্ষে অনিষ্টেরই হেতু। শিক্ষা কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও পক্ষে কোন দিন অনিষ্টের কারণ হইতেই পারে না। শিক্ষার ধর্ম্ম ইহা নহে, ইহার দ্বারা মানব-জীবনের উৎকর্ষতাই আনয়ন করে। যেখানে বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ছেলে-মেয়েদের ভারতীয় ভাববিপর্য্যয় ঘটে বা আত্মম্ভরিতা-দাম্ভিকতার সৃষ্টি করে, বুঝিতে হইবে, সেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা দূষণীয়, বিজাতীয় আদর্শে সে শিক্ষাবিধি কলুষিত। আমাদের মেয়েদের শিক্ষাকল্পে যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই সব আদর্শের সংস্কারে সর্ব্বপ্রথম মনোযোগী হইতে হইবে।

নারীশিক্ষার পবিত্র কার্য্যে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এখানকার মত স্থানে এ কার্য্য কত কঠিন। বাহিরের দৃষ্টিতে ছেলেদের ন্যায় মেয়েদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করার মধ্যে এমন কিছু কাঠিন্য পরিলক্ষিত না হইলেও বাস্তবে আমাদের মেয়েদের শিক্ষা দিবার উপযোগী একটি উপযুক্ত শিক্ষালয়-প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা আদৌ সহজ কার্য্য নহে। কলিকাতায় বা কোন একটি বড় জনবহুল সহরে এ বিষয়ে শিক্ষার্থী ও অনুষ্ঠাতা বা পরিচালক উভয় পক্ষের যে সব সুযোগ-সুবিধা আছে, এখানে তাহার অনেক কিছু নাই। নিতান্ত প্রাথমিক শিক্ষালয়-প্রতিষ্ঠা বিষয় বরং কোন প্রকারে সম্ভবপর হয়, কিন্তু একটু উচ্চশ্রেণীর ভাল একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এখানকার মত স্থানে অতীব দুরূহ। এখানে অধিবাসীর সংখ্যা কম এবং নাগরিক সভ্যতা হইতেও এ স্থান অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে; সুতরাং ছাত্রীসংখ্যাও কম। কিন্তু এই ছাত্রী স্বল্প হইলেও তাহাদের অভিভাবকদিগের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা-বিষয়ক বহু প্রকার মতাবলম্বীর অভাব নাই। কেহ বলে, মেয়েরা শুধু সামান্য একটু বাঙ্গালা ও একটু আধটু হিসাব রাখিবার উপযোগী অঙ্কমাত্র শিখিবে, না হয় বড় জোর ইংরাজীতে চিঠি-পত্রের ঠিকানাটা পর্য্যন্ত লিখিতে পড়িতে পারে, এই পর্য্যন্ত। আবার কাহারও মত, মেয়েরা ছেলেদেরই মত ইংরাজী বাঙ্গালা সকল বিষয় শিখিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা হইবে। কেহ কেহ বলেন, মেয়েদের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ছাড়া অন্য কিছু শিক্ষার প্রয়োজন নাই। কেহ ইচ্ছা করেন, যন্ত্র ও কণ্ঠ-সঙ্গীতে মেয়েরা বেশ পারদর্শিনী হইবে। কাহারও মতে ভদ্রলোকের ঘরে মেয়েদের গান-শিক্ষা খুবই গর্হিত কায। অনেকেরই মত—নারী শিক্ষয়িত্রী মেয়েদের শিক্ষালয়ে অপরের স্থান থাকা অবিধেয়। আবার অনেক অভিভাবককে পুরুষ-শিক্ষক-পরিচালিত বিদ্যালয়ে বয়স্থা মেয়েদের পাঠাইতেও কোন আপত্তি দেখা যায় না। কাহারও মতে গৃহকর্ম্মরতা ব্রীড়াবনতা পতিসোহাগিনী নারী আমাদের সংসারের লক্ষ্মী। আবার কাহারও মতে নৃত্যকুশলা, জুতা-জামা-আঁটা, রিষ্টওয়াচ-শোভিতা, সজ্জাসজ্জিত পার্টি-মোটরবিহারিণী মেয়েরাই যথার্থ সুশিক্ষিতা।

কলিকাতার মত সহরে এই বহু বিভিন্ন মতের মধ্যে এক প্রকার মতেরও বহু লোক আছে, সুতরাং সেখানে বিদ্যালয়সমূহ যে ভাবেই যে উদ্দেশ্য লইয়াই সৃষ্টি হউক, প্রায় কোন শ্রেণী না কোন শ্রেণীর মনোমত হইবেই। সেই বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হউক বা ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা নির্বাচিত হউক, নৃত্যগীত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাক বা সঙ্গীত শিক্ষা বিবর্জ্জিত হউক, গাউন-বডি পরিয়া আসাই ব্যবস্থা থাক অথবা গরদ তসর নামাবলী তথাকার ছাত্রীদের বাধ্যতামূলক পরিচ্ছদ হউক, কোথাও ছাত্রীর অভাব হইবে না; সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষদেরও সেই সব বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার পরিচালনা অনেক সহজসাধ্য হয়। আর এখানে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কোন গতিকে যদিই বা একটা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল, সেই একটির দ্বারাই সকল শ্রেণীর লোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। অকিঞ্চিৎকর সামর্থ্য লইয়া সর্ব্ববিষয়ে এই দায়িত্বপূর্ণ সুমহান কর্ত্তব্যপালন বড় সহজ কথা নহে। তাহার উপর গ্রামবাসীদের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ছোট হউক, বড় হউক, এক দল লোক থাকিবেই এবং তাঁহারা যে এই সকল প্রতিষ্ঠান-বিষয়ে শুধু উদাসীন থাকিবেন, তাহা নহে; তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে, সাধ্যমত উহার অনিষ্টসাধনে তাহা প্রয়োগ করিবেনই।

এমন সব স্থানে প্রতিবন্ধক কি শুধু ইহাই? অর্থের অভাব ত আছেই, তদ্ভিন্ন ভাল শিক্ষয়িত্রী পাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। আর পাইলেও তাঁহাদের সুব্যবস্থা করিয়া থাকিতে দেওয়া ও তাঁহাদের বেতনাদির ব্যয়ভার বহন করা—ইহাও পল্লীগ্রামের পক্ষে একটা বড় কম সমস্যা নহে। স্বল্পতা হেতু এবং বর্ত্তমানে কলিকাতা করপোরেশনের অধীন বহুসংখ্যক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় এখন অধিক বেতন দিলেও সুযোগ্য শিক্ষয়িত্রী পাওয়া খুবই কঠিন। যাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকেই লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই, বাছাই করিবার উপায় নাই, কলিকাতায় শিক্ষয়িত্রীদের থাকিবার স্থান দিবার জন্য অনেক সময় ভাবিতে হয় না এবং তুলনায় তথায় তাঁহাদের জন্য ব্যয়ভারও কম।

এত সব প্রতিকূল অবস্থাকে ছাড়াইয়া একটি ভাল নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহার কথা বোধ হয় অধিক করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। মেয়েদের বিদ্যালয় সর্ব্বপ্রকারে মহিলা-পরিচালিত হইলেই ভাল হয়, সেখানে পুরুষের সংস্রব পর্য্যন্ত না থাকাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাহাও কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। যদিও বোর্ডিং স্কুলে কতকটা সুবিধা আছে, কিন্তু শিক্ষয়িত্রীদের থাকিবার স্থান না দিলে উপায় নাই। সুতরাং তত্ত্বাবধানের অনেকটা ভার কর্ত্তৃপক্ষদের উপরই আসিয়া পড়ে। ছোট ছেলেপুলে লইয়া শিক্ষকতা-কার্য্য অসুবিধা হয়, নচেৎ বিবাহিতা মহিলা স্বামি-পুত্রসহ থাকিয়া শিক্ষকতা-কার্য্যের জন্ম কোন অসুবিধা দেখি না, বরং আমারও ভালই মনে হয়। কিন্তু তাহা পাওয়া কম যায় এবং পাইলেও তাঁহাদের নিযুক্ত করিতে হইলে ব্যয় এত অধিক হইবে যে, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনেকে একটু বেশী বয়সের পুরুষ শিক্ষকের পক্ষপাতী, আমি কিন্তু তাহা সমর্থন করি না। নারীর শিক্ষা সাধারণতঃ নারী ভিন্ন অপরের দ্বারা উচিত নহে।

নারী-শিক্ষা-মন্দিরের বিশুদ্ধতাই উহার প্রাণ। উহার শুচিতা পবিত্রতা বালিকার ভবিষ্যৎ-জীবন গঠনের প্রধান সহায় হইবে। সেখানে কোন আবিলতার স্থান না থাকে। শুনিতে কটু হইলেও ইহা বলিতে হইবে, পুরুষ শিক্ষকের সংস্রবে সর্ব্বক্ষেত্রে বলিতেছি না, কোন কোন ক্ষেত্রে সে আশঙ্কা থাকে। কর্ত্তৃপক্ষদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, মেয়েদের শিক্ষাভার লওয়া এ একটা সখের বা খেয়ালের বিষয় নহে, তাঁহাদের দায়িত্ব অনেক। মাতৃজাতির কল্যাণের সঙ্গেই জাতির কল্যাণ বিজড়িত। ভাল সন্তান পাইতে হইলে ভাল মা প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। একমাত্র সুশিক্ষার দ্বারাই অধিক-সংখ্যক ভাল মা গঠিত হইতে পারে।

অধুনা মেয়েদের সুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন, এমন লোক খুবই বিরল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই সুশিক্ষার সংজ্ঞা লইয়াই যত মতভেদ। দেশের চিন্তাশীল প্রধানগণ ও শিক্ষাবিষয়ক পরিষৎ-সকল মিলিত হইয়া আমাদের মেয়েদের উপযোগী শিক্ষার বিষয় ও ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করা একান্ত দরকার। এক্ষণে তাহা যখন নাই এবং যত দিন পর্য্যন্ত সেরূপ কোন ব্যবস্থা না হয়, তত দিন অনুষ্ঠাতৃবর্গের বিবেচনা-মত ব্যবস্থাই করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস, এখানে পাঠ্য-বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা পাঠ্যতালিকা এবং সুচিন্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা নিশ্চয়ই প্রণীত হইয়াছে। আমার এ সম্বন্ধে যে সামান্ত একটু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে মনে হয়, নারীর নারীত্ব এবং অন্তঃপুরবর্ত্তিতা রক্ষা হইয়া উহাদের বিবিধ জ্ঞান ও মানসিক উৎকর্ষ-সাধনার্থ যে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। নারীর শিক্ষা-মধ্যে নারীজীবনের উন্নতির সহিত যাহাতে হিন্দুসংসার শ্রীসম্পন্ন হইয়া হিন্দুর পবিত্র গৃহ স্বর্গসুষমায় উদ্ভাসিত হয়, তাহাই উদ্দেশ্য; এ ছাড়া তাহাদের জন্ম শিক্ষার মধ্যে অন্ত স্বার্থের স্থান নাই। দেশকালের দিকে চাহিয়া আজকাল আমাদের নারীদের কোন কোন বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া দরকার হইয়াছে, এ কথা সত্য, কিন্তু অর্থবিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা ঠিক এখানকার নহে। তাঁহাদের শিক্ষা, তাঁহাদের কর্ম্ম, তাঁহাদের ধর্ম্ম পুরুষের সঙ্গে সর্ব্বাংশে এক নহে। তাঁহাদের কর্ম্মের ক্ষেত্র প্রধানতঃ অন্তঃপুর, আত্মীয়-পরিজন-পরিবৃত অন্তঃপুররাজ্য পুরুষ-শাসিত বাহিরের জগতের তুলনায় অনেক ছোট, কিন্তু ইহার সুমহান্ কর্ম্মপরিসর কম বিস্তৃত নহে এবং সেখানে নারীই সর্ব্বেসর্ব্বা। নারীর নারীত্ব-মাতৃত্বই তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা গৌরবের জিনিষ। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে এ দেশে যে সব নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতেছে, সেখানে আর যে শিক্ষা ও যত প্রকার শিক্ষারই ব্যবস্থা থাকুক, নারীর এই অমূল্য গৌরবের বস্তুটির ঔজ্জ্বল্য-বৃদ্ধির কোন চেষ্টা সেখানে ত থাকেই না, বরং তথাকার শিক্ষা ও শিক্ষালয়ের আনুষঙ্গিক ধারায় উহা ম্লান হইতেই দেখা যায়। পুরুষের মুখে নারীত্বের গৌরবের কথা শুনিয়া কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতা মহিলা ইহাকে পুরুষের স্বার্থরক্ষার্থ তাঁহাদের ভুলাইবার জন্ম স্তোকবাক্য—এরূপও মনে করেন। কিন্তু নারীর সেবা, তাঁহাদের ত্যাগ ও আত্মদানসহনশীলতা, সংসারশৃঙ্খলানুবর্ত্তিতা সব কিছুই ঐ নারীত্বের আবরণে সমুজ্জ্বল। নারীত্ববিহীন নারীর নিকট হইতে মনুষ্যত্বের সমস্ত উপাদানযুক্ত দেহ-মন-সম্পন্ন সুসন্তানলাভ দুরাশা। এক কথায় নারীত্বের মধ্যেই মনুষ্যত্বের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে।

নারীজাগরণ ও স্ত্রী-স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়, তাহা ঠিকমত আমি বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও উভয়ের সম্পর্ক যে খুবই ঘনিষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাগরণ শুভেরই লক্ষণ, সুতরাং সত্য যদি নারী জাগিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণেরই নিদান, ইহা বলিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, তাঁহারা সুষুপ্তির কোলে নিমজ্জমানা থাকায় এতাবৎ যাহা দৃষ্টির অগোচর থাকা প্রযুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল, এক্ষণে তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। সেই দৃষ্টির অগোচরের বস্তুটি যদি পুরুষের বন্ধন, ইহাই লক্ষ্য হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে মুক্ত

হওয়ার নামই যদি স্বাধীনতা হয়, তবে ইহা নিশ্চিত বলিয়াই মনে করিতে পারা যায় যে, সে বন্ধন বিধাতৃরচিত স্ত্রী-পুরুষ-সংক্রান্ত বিধির যত দিন পর্য্যন্ত আমূল পরিবর্ত্তন না হইবে, তত দিন নারীর পক্ষে পুরুষের সম্পর্কমুক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। নারীর সম্বন্ধচ্ছেদ করা পুরুষের পক্ষে যেমন অসম্ভব, নারীর পক্ষেও তেমনই পুরুষের সাহচর্য্য চাই-ই। নরনারীর মধ্যে ছোট বড় করিয়া ভাবা—ইহাও এ দেশের নহে। উভয়েই আপন আপন গণ্ডীর মধ্যে বড়। নারী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপায় করে না, পুরুষের উপর তাঁহাকে ভরণপোষণের জন্য নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। পুরুষের সেবা, তাঁহাদের জন্য আত্মদান এই সকলের জন্য পুরুষ নিজেকে বড় মনে করিয়া গৌরবান্বিত হইবার অথবা নারীকে ছোট মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইবার কিছু নাই। নারীর দান জগতে বড় কম নহে। হেলায় শ্রদ্ধায় পাওয়া যায়, তাই পুরুষ তাহার মূল্য নির্ণয় করিতে পারে না বা করিতে চাহে না। ভারতের নারী—হিন্দুর নারী কোন দিন নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া ক্ষুণ্ণও হয় নাই, গর্ব্বও বোধ করে নাই। সন্তান ও স্বামীর জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়া, স্বামীর চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করিয়া বা বৈধব্যে ঐহিক সুখের-যাহা কিছু, তাহার সমস্ত ত্যাগ করিয়াও মৃত পতির উদ্দেশে নিত্য পূজার্ঘ্য দিয়া শুধু তৃপ্তি, অশ্রুসিক্ত নয়নেও একটা অনন্ত তৃপ্তি অনুভব ভিন্ন কোন দিন নিজেকে ছোট বা বড় বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। ঘর-সংসার করিতে স্বামীর সঙ্গে কলহ-অবনিবনাও কোন দিন হিন্দু-নারীর মনে স্বামিত্যাগের কথা কল্পনায়ও স্পর্শ করে নাই। স্বামী সকল অবস্থাতে সকল সময়ই স্বামী। সম্পদেও স্বামী, বিপদেও স্বামী, কলহেও স্বামী, কল্যাণেও স্বামী। জীবনে মরণে এ সম্বন্ধ চির-অবিচ্ছিন্ন।

আমাদের চির-বিশিষ্টতাময় জগতে অতুলনীয় হিন্দুর নারীত্বই মন্ত্রশক্তির ন্যায় তাঁহাদের শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ ঝঞ্ঝা হইতে রক্ষা করিয়া যাইতেছে। পুরুষের সংকীর্ণতা, অত্যাচার, অবিচার শুধু গৌরবময় নারীত্বের প্রভাবেই আমাদের মাতৃজাতিকে সর্ব্বদা ভুলাইয়া রাখিয়া থাকে। এই অমূল্য নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ ও সম্পদ নারীত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ করিতে না পারে, ইহাই শিক্ষার মূলমন্ত্র হউক। এই নবীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার পরিমাণের দিকে বেশী করিয়া দৃষ্টি না দিয়া শিক্ষার গুরুত্বের দিকেই লক্ষ্য রাখা সঙ্গত।

মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তির সঙ্গে তাঁহাদের পুরুষভাবাপন্ন বা নারীত্ববর্জ্জিত হওয়ার জন্য যে আশঙ্কা, তাহা অনেক ক্ষেত্রে অমূলক নহে। দেখা যায়, অনেক যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা সকল উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক মনোভাবের আসন হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইয়াছেন। ইহা আমরাও যেমন দেখি, নারী-সমাজও তেমনই দেখিয়া থাকেন। এই ভাববিচ্যুতির মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা লেখাপড়া শিক্ষার জন্য সাধারণ হইতে আপনাদিগকে উচ্চ স্তরে দেখিয়া থাকেন এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ছেলেরা যদি এখনও শত শত যুবককে প্রতি বৎসর বি-এ, এম্-এ পাশ করিতে দেখিয়াও এই মনোভাব পায়, তবে মেয়েরা—যাঁহারা পুস্তকের পৃষ্ঠায় সেকালের নারীশিক্ষার শাস্ত্রগত প্রমাণার্থ "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" বা এইমত আর দুই একটি শ্লোক শুনিয়া থাকেন, আর বিদুষী নারীর উল্লেখে সেই গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী অথবা অপলা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববরা, সর্পরাজ্ঞী প্রভৃতি নিতান্ত কতিপয়ের নামমাত্র আজন্ম শুনিয়া আসিতেছেন, আর এই গার্গী, লীলাবতী, মৈত্রেয়ীর যুগের পর বহু শতাব্দীর মধ্যে ওরূপ আর দুই পাঁচটি নাম পান না, তাঁহারা এখন পুরুষদের সমকক্ষ বিদ্যায় বিদ্যাবতী হইয়া নিজেদের পুরুষের সঙ্গে সমান মনে করিয়া একটা স্পর্দ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া নারীত্বের সীমা হইতে যদি পৌরুষত্বে অগ্রসর হন, তাহা বাঞ্ছনীয় কি অবাঞ্ছনীয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাতে বিচিত্রতা আদৌ নাই। সেটা তাঁহাদের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বা চরিত্রগত ত্রুটি বলিয়াও অভিহিত করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা মানবের অন্য সাধারণ দুর্ব্বলতার সঙ্গে সমান। আরও এক কথা, বাঞ্ছনীয় বা অবাঞ্ছনীয়, ইহা ত পুরুষের কথা। পুরুষের বিবিধ স্বার্থপরতামূলক ব্যবহারে তাঁহারা এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কথায় আস্থা করিতে পারেন না। শত্রুর হিতকথায় ও বিপরীত প্রতীয়মান হওয়ার ন্যায়, তাঁহাদের এ মন্তব্যের মধ্যেও তাঁহারা স্বার্থগন্ধ খুঁজিয়া পান। ইহাতে এক কলসী দুগ্ধে এক বিন্দু গোমূত্রপাতের ন্যায়, তাঁহাদের সব পরিশ্রম, সব শিক্ষা অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়া যায়। তাঁহাদের চিরাগত পবিত্রতা যে ম্লান হইয়া যায়, এ কথা বুঝিবার আর অবকাশই থাকে না। অনুরোধ করি, এ ভাব তাঁহাদের মধ্যে কোন দিন প্রবিষ্ট হইতে না পারে, শৈশব হইতেই আপনারা সে শিক্ষা দিবার জন্য যত্নবান্ হউন। নারীর শিক্ষা, নারীর কর্ম্ম, নারীর ধর্ম্ম সবই যেন নারীত্বের—মাতৃত্বের গৌরবে সমুজ্জ্বল থাকে। তাঁহারা নারী, তাঁহারা মায়ের জাতি, তাঁদের দান জগতে অতুলনীয়। তাঁহারা যে বিশিষ্টতা লইয়া আসিয়াছেন, তাহা উপেক্ষার বস্তু নহে। তাঁহাদের করিবার অনেক কিছু আছে, এ সব কথা তাঁহাদের মনে গাঁথিয়া দিতে হইবে।

শ্রীহরিহর শেঠ।

সেগুলিকে বর্জ্জন ক'রে স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করতে যাওয়া মারাত্মক। গবর্ণমেণ্ট-প্রবর্ত্তিত ইউনিভারসিটী যদি মুসলমানদের সমস্ত অভাব পূরণ করতে না পারে, তা হ'লে সে ইউনিভারসিটীর আবশ্যকানুযায়ী সংস্কার ক'রে নেওয়া দরকার, তা' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সঙ্গত নহে।

আমাদের মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্য-বিবাহ, পর্দ্দা প্রভৃতি সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। নূতন ক'রে এ বিষয়ে বলবার কিছুই নেই; তবুও অতি সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলতে হচ্ছে, কেন না, কিছু না বললে কেউ বা মনে করেন, বিষয়টিকে আমি ততটা গুরুতর ব'লে মনে করি না। ঠিক তার উল্টো—ভারতীয় মুসলমানের জন্য পর্দ্দা ও স্ত্রীশিক্ষা-সমস্যা যেরূপ গুরুতর হয়ে উঠেছে, এরূপ আর দ্বিতীয়টি নেই। এ কথা আজ সর্ব্ববাদিসম্মত যে, স্ত্রী-শিক্ষা ব্যতীত জাতির উন্নতি অসম্ভব। অন্য পক্ষে পর্দ্দা উঠিয়ে না দিলে তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করা অসম্ভব, এটাও প্রমাণিত হয়েছে। এই সব খেয়াল ক'রে উন্নততর মুস্‌লিম দেশগুলি পর্দ্দা তুলে দিয়েছে, এবং মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। বাস্তবিকই মেয়েদের শিক্ষা না দিলে দেশের মঙ্গল কি ক'রে সম্ভবপর হবে? মেয়েরা পঙ্গু হয়ে থাকলে সমাজের এক অর্দ্ধেক যে কেবল পঙ্গু হয়ে রইল, তা নয়—বাকী অর্দ্ধেকও অকেজো হয়ে পড়ে। এ পর্য্যন্ত মেয়েদের আমাদের দেশে কেবল Child-bearing machine ক'রে রাখা হয়েছে। কিন্তু একটা machine এর দ্বারাও ভালো কাজ পাবার জন্য তার যতটা যত্ন নেওয়া দরকার, মেয়েদের প্রতি তাও আমরা নেইনি। সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ সন্তান ধারণ করতে হ'লে মাকে স্বাস্থ্যবতী হতে হবে, কিন্তু কৈ, আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্য কোথায়? অস্বাস্থ্যকর গৃহে আজীবন বদ্ধ থাকার দরুণ তাদের মনও যেমন দিন দিন সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—তাদের স্বাস্থ্যও তেমনি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। Dr. Bentley প্রভৃতির Health report দেখলে জানতে পারা যায় যে, কি ভয়াবহরূপে মুসলমান-মেয়েরা যক্ষ্মা-রোগে মারা যাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ, খোলা হাওয়া ও আলোর অভাব অর্থাৎ পর্দ্দা। এ দিকে এই স্বাস্থ্যহীনা মেয়েরা যে সব সন্তান প্রসব করছেন, তা'রা স্বভাবতঃই হীন স্বাস্থ্য নিয়ে এসে জাতিকে দুর্ব্বল ক'রে ফেলছে। বাস্তবিক এই পর্দ্দা যে কি ঘৃণিত অনুষ্ঠান, তা ভাবতেই লজ্জা হয়। এটা নারীত্বের প্রতি এক নিদারুণ অপমান বা Standing insult-স্বরূপ। এ সর্ব্বক্ষণই যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, যৌনজীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন মেয়েদের নেই। এই পর্দ্দা-প্রথার ফলে আমার মনে হয়, আমাদের মেয়েদের অতি অল্পবয়সেই Sex concious ness এসে পড়ে। এখনও এই সব কুৎসিত প্রথা বাঁচিয়ে রাখায় ভারতীয় মোস্‌লেম সমাজকে মধ্যযুগের যাদুঘর বা museum বলেই মনে হয়। যদি মানুষ হিসাবে মেয়েদের দাবীর কথা আলোচনা করা যায়—তা' হ'লে বলতে হয়, পুরুষের কোন অধিকারই নেই মেয়েদের এরূপ আটকে রাখার। যদি ধর্ম্মের কথা বলা হয়—তা' হ'লে দেখতে পাই, ইস্‌লামে এমন কোন নির্দ্দেশ নেই, যদ্দ্বারা এইরূপ অবরোধ-প্রথা সমর্থন করা চলে। যদি এর ভাল-মন্দের আলোচনা করা হয়, তা হ'লে দেখতে পাই, এর চাইতে অনিষ্টকর institution মানুষের কল্পনা কোথাও কোন দিন সৃষ্টি করেনি।

মেয়েদের শিক্ষার দরকার কেন? যদি মেয়েদের আর কিছুই না হ'তে হয়, তাদের গৃহিণী ও মাতা এ দুটি ত নিশ্চয় হ'তে হবে। শিক্ষার অভাবে তাঁ'রা বর্ত্তমান জগতের প্রয়োজনানুযায়ী সুগৃহিণী হ'তে পারছেন না। সুজননী ত নয়ই। শিক্ষা না পাওয়ায় তাঁদের মনের প্রশস্ততা জন্মিতে পারে না; এমন কি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ যে জ্ঞান সকলের থাকা দরকার, তাও তাঁদের হয় না। সে কারণে কি গৃহস্থালী, কি সন্তানপালন, কোনটাই তাঁরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারেন না। মায়েদের অজ্ঞতার দরুণ অনেক শিশুই যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তা বোধ হয়, আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হ'তে সাক্ষ্য দিতে পারবো। এই গেল সাধারণ গৃহস্থালী কাযের জন্য শিক্ষার আবশ্যকতা। কিন্তু এ সামান্য শিক্ষাই মেয়েদের জন্য যথেষ্ট নহে। বৃহত্তর জাতীয় জীবনে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁদের উচ্চ শিক্ষা পেতে হবে। পণ্ডিত স্বামীর স্ত্রী মূর্খ হ'লে সে সংসার সুখের হ'তে পারে না। মূর্খ স্ত্রী পণ্ডিতের কিরূপভাবে সহকর্ম্মিণী হ'তে পারে? বিশেষ কথা, আমাদের দৃষ্টিকে বিস্তৃত করবার সময় এসেছে, ক্ষুদ্র সংসার-প্রাঙ্গণ ছেড়ে বৃহত্তর জাতীয় জীবন—তার সমাজ ও সভ্যতার বিষয় ভাবতে হবে। নারীর শারীরিক বীর্য্য, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি হেলার বস্তু নহে। তার সেই সুপ্ত শক্তি পুরুষের শক্তির সঙ্গে মিলিত করতে হবে; তা হ'লেই জাতির কল্যাণ হবে। আজ ইংরেজ, আমেরিকান, তুর্কী প্রভৃতি জাতির কথা ভাবলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

* * * * *

নারী-সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সমাজের অনেক হিতৈষীরা পর্য্যন্ত বহু প্রবন্ধ লিখেছেন ও বক্তৃতা করেছেন; কিন্তু কায্যকালে কেহই বিশেষ কিছু করেন নি। তাঁরা বোধ হয় ভুলে যে, an ounce of example is worth a ton of

precepts। যা তার ব'লে মনে করা যায়, তা' না করায় চাইতে কাপুরুষতা নেই।

মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা সব চেয়ে হৃদয়-বিদারক। অর্থ'ই জাতির শোণিত। যদি কোন লোকের শরীরে কোন জখম হয় এবং তা হ'তে ক্রমাগত রক্তপাত হ'তে থাকে, তা হ'লে যেমন তার মৃত্যু অনিবার্য্য, মুসলমানদেরও শোণিতরূপ অর্থ ক্রমাগত বের হয়ে তারা যেরূপ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, এবং তা নিবারণার্থে যেরূপ কোন ব্যবস্থা করাও হচ্ছে না, তাতে এ সমাজ সত্বরই ধ্বংসমুখে পতিত হবে। ধীরভাবে আমাদের সুদ-সমস্যাটিকে বিচার ক'রে দেখা কর্ত্তব্য। অর্থাভাব হেতু আমাদিগকে ক্রমাগত মহাজনের নিকট হ'তে ঋণ ক'রে সুদ দিতে হচ্ছে, কিন্তু হারাম বলে ঋণ দিয়ে সুদ নেবার বিধি আমাদের নেই। কি spirit এ রেবা নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং কোন্ সুদ রেবা, তা বিবেচনা ক'রে না দেখে আমরা শনৈঃ শনৈঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছি। যাতে লোকের উপর জুলুম করা হয়, এরূপ সুদ গ্রহণ করাই পাপ। কোরাণের মধ্যে usury condemn করা হয়েছে।

'ইয়া আইও হাল্ লাজিনা আ' মানুলা তা' কুলুর্‌রেবা আ'দ্-আ-কাম্ মুদা-আ-কাতান্।

"Do not devour usury making addition again and again or doubling and redoubling."

Banking sysem এর সুদে ব্যক্তিবিশেষের উপর জুলুম হয় না, কাজেই আমাদের এটাকে রেবা ব'লে হারাম করা সঙ্গত হবে না। অন্যপক্ষে বাজারদর সুদ Market rate of interest নিয়ে কর্জ্জ দেওয়াও অসঙ্গত বোধ হয় না। আমার কান বন্ধুর কথা জানি, যিনি provident fund এর সুদ হারাম ানে ক'রে হাজার টাকা ক'রে গবর্ণমেণ্টকে ছেড়ে দিচ্ছেন। এখন 'ন করুন, এই টাকাগুলি মুসলমান শিক্ষার জন্য কিম্বা এই র্ভিক্ষের দিনে Relief work এ ব্যয়িত হ'লে কি দেশের পকার হ'ত না? বালুরঘাটের দুর্ভিক্ষের সময় সে বন্ধুকে ামরা অনুরোধ করেছিলাম যে, তুমি এ টাকা নিয়ে নিজে ব্যবহার ক'রে এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের জন্য ব্যয় ণ। কিন্তু বন্ধুবর কিছুতেই সম্মত হলেন না। এরূপে কত হ লক্ষ টাকা যে মুসলমানরা নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য াচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এই সমাজের লোকই াভাবে মরছে, বস্ত্রাভাবে শীতের যন্ত্রণা ভোগ করছে, অর্থাভাবে ড়তের চিকিৎসা হচ্ছে না এবং সহস্র সহস্র মেধাবী ছেলেদের শিক্ষার সংস্থান হচ্ছে না। মুসলমানদের রেবার বিকৃত অর্থ ক'রে যে কোন সুদকে নিষিদ্ধ মনে করায়, গোটা সামাজিক জীবনে লাভ ও ক্ষতি যার উপরে ভিত্তি ক'রে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য চলে—সেই লাভ ও ক্ষতির ধারণাটি তাদের ভিতর লোপ পেয়ে গিয়েছে। ফলে মুসলমানরা বেহিসাবী হয়ে পড়েছে। তাই তাদের ভিতর দেখা যায় অমিতব্যয়, অপব্যয়, সঞ্চয়ের প্রতি উদাসীনতা।

বাঙ্গালী মুসলমানের অবস্থা আলোচনা-প্রসঙ্গে তার প্রতিবেশী হিন্দুর সম্বন্ধে দু একটি কথা না বল্‌লে এ প্রসঙ্গ একবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

হিন্দু আজ শিক্ষা-দীক্ষা সর্ব্ববিষয়ে মুসলমান হ'তে প্রায় পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেছে। তারা বিশ্ব-সভ্যতায় ইতোমধ্যেই অনেক কিছু দান করেছে। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী আজ তাই জগদ্বিখ্যাত। ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রেও হিন্দু আজ দিন দিন খুবই সফলকাম হচ্ছে। তুলনামূলক সমালোচনা করলে তাই দেখা যায়, হিন্দু আজ জমীদার, মুসলমান তার প্রজা, হিন্দু আজ চিকিৎসক, মুসলমান চিকিৎসিত রোগী; হিন্দু প্রফেসার, মুসলমান ছাত্র; হিন্দু উকীল, মুসলমান মক্কেল, হিন্দু সওদাগর, মুসলমান তা'র খরিদ্দার, হিন্দু উত্তমর্ণ বা মহাজন, মুসলমান অধমর্ণ বা দায়িক্—এক কথায়, জাতীয় জীবনে সমস্ত দিকেই হিন্দুর প্রভাব অনুভূত হয়। মুক্তি কিসে, হিন্দু সে কথা বুঝতে পেরেছে। মুসলমান এখনও যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হিন্দুর কর্ম্মধারা আজ সহস্রমুখে উৎসারিত হচ্ছে—আর মুসলমান এখনও যেন নেশাখোরের মত ঝিমোচ্ছে। হিন্দু যুবকরা আজ কি প্রাণোন্মাদনায়ই না মত্ত; তারা বন্যা-দুর্ভিক্ষের সময় যে অদম্য উৎসাহের সহিত পীড়িতদের শুশ্রূষা করে, তা অতীব প্রশংসার বিষয়। হিন্দুর সেবাশ্রম, নৈশ বিদ্যালয়রূপ বহু সদানুষ্ঠান দেশের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করছে।

অবশ্য সমাজ হিসাবে হিন্দুদের মধ্যে এখন বহু কু-প্রথা আছে—সে সবের সংস্কার হওয়া একান্ত দরকার। তাদের অস্পৃশ্যতা, বর্ণ-বিভাগ প্রভৃতি সমস্যাগুলির এখনও সুমীমাংসা হয় নি। তাদের বিধবাদের দশা এখনও আগের মতই মর্ম্ম-বিদারক; পণপ্রথা এখনও বহু পরিবারের সর্ব্বনাশ-সাধন করছে। কিন্তু এ দিকেও হিন্দুরা চুপ ক'রে ব'সে নেই। এই বাঙ্গালাতেই গত এক শত বছরের মধ্যে কত না মহাপ্রাণ সংস্কারক এলেন—তাঁদের সমাজের সংস্কারের জন্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির নাম প্রাতঃস্মরণীয়। কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরের দু' এক জনের কথা ছেড়ে দিলে গোটা ভারতীয় মোসলেম সমাজে এমন এক জন সমাজ-সংস্কারকও জন্ম

নেয়নি, যা'র কথা মনে ক'রে এতটুকু গর্ব্বও অনুভব করা যায়। বাস্তবিকই আজ দেড়শত দুশত বছর ধ'রে বাঙ্গালীর,তথা ভারতীয় মুসলমানদের ভিতর কি মৃত্যু সম অবসাদ, কি ভীষণ চিন্তার দারিদ্র্য—ভাবের দৈন্য, ভাবুকের অভাবই না দৃষ্ট হয়। ফলে মুসলমানদের ভিতর এখনও সেই ঘৃণিত পর্দা-প্রথা তেমনি অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করছে—মৌলানা-মৌলবী সাহেবদের দাওয়াৎ খাওয়ার ঘটা ও কথায় কথায় কাফেরী ফৎওয়া দেওয়া তেম্‌নি জোরে চল্‌ছে। আজ মুসলমানদের একতার আদর্শ নিয়ে হিন্দুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের চেষ্টায় উঠে প'ড়ে লেগেছে। ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিকে—যারা ইতঃপূর্ব্বে অহিন্দু ব'লে পরিচিত ছিল, আজ হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে—আর তারা হিন্দু ব'লে পরিচিত হচ্ছে, কিন্তু মুসলমানরা আজ নিজেদিগকে শত ভাগে বিভক্ত ক'রে দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ছে। শিয়া, সুন্নি, হানাফী, হাম্বালী প্রভৃতি দল ত আগে হতেই ছিল, এখন বাঙ্গালা দেশে এক হানাফী বিভাগই না কত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন মৌলানা সাহেবদের নেতৃত্বে পরস্পরকে গালাগালি ও কাফেরী ফৎওয়া দিয়ে, ও বিবাহসাদী, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সামাজিক কার্য্যকলাপে পরস্পরকে একঘরে ক'রে কি ভয়াবহ-ভাবেই না ইসলামকে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ও শক্তিহীন ক'রে তুল্‌ছে। এক কথায় বলতে গেলে, বর্ত্তমানে হিন্দুরা পরকে আপন ক'রে নিচ্ছে, আর মুসলমানরা আপনাকেও পর ক'রে দিচ্ছে।

ইতঃপূর্ব্বে মুসলমানরা স্বাস্থ্য ও শারীরিক বীর্য্য হিসাবে দেশের গৌরব ছিল; কিন্তু আজকাল তারাই দুর্ব্বল ও ভীরু ব'লে কলঙ্কিত হচ্ছে। হিন্দুরা শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আজ খেলা-ধূলায় দেশ-বিদেশ হ'তে তারা জয়-মাল্য নিয়ে আসছে। শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক শৌর্য্যও ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। বিমানপোত-চালনা প্রভৃতি সাহসিক কার্য্যে তারাই আজ অগ্রগণ্য। মুসলমান এ সব কি ক'রে করবে? তাদের মৌলানা সাহেবরা যে বলেছেন, এ সব হারাম! হায় হতভাগ্য সমাজ!

মুসলমানদের কর্ত্তব্য তুরস্ক, ইজিপ্ট, পারস্য প্রভৃতি মুস্‌লিম দেশগুলির বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা। হালিদা এদিব, সেখ মুহম্মদ আব্‌দুহ্‌, প্রভৃতি বিদেশীয় লেখক-লেখিকাদের লেখা পড়্‌লে, তাদের ভিতর উন্নত হবার স্পৃহা জাগরিত হবে। তাদের চোখের সাম্‌নে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ খুলে যাবে। বিশেষ ক'রে তাদের প্রতিবেশী হিন্দু-সমাজ সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী কুসংস্কার ও অবসাদের শৃঙ্খল থেকে, বীর সাম্‌নের মত কি অদম্য Determination এর ব'লে মুক্ত হচ্ছে, এবং শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, তা তাদের অনুধাবন করা দরকার।

এই সম্পর্কে গত কয়েক বৎসরের হিন্দু-মোসলেম বিরোধের কথা স্মরণ হয়ে মনে বড়ই দুঃখের উদ্রেক হচ্ছে। এ নিতান্তই লজ্জার বিষয় যে, একই দেশে যাদের জন্ম—একই দেশের সুখ-দুঃখের ব্যথায় যারা ব্যথিত—একই দেশের আলো-বাতাস যাদের প্রাণে আনন্দ-গান বহন ক'রে আনে, একই দেশের মাটী যাদের শেষ শয্যা—তাদের মধ্যে কলহ, তাদের মধ্যে বিরোধ। এর কারণ, আমার এই মনে হয় যে, হিন্দু মুসলমান এখনও পরস্পরের সহিত ভালরূপে পরিচিত হ'তে পারে নি—বিশেষ আজও তারা বৃহত্তর জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয় নি, বা ভাব্‌তে শিখেনি।

হিন্দু-মুসলমান-মিলনের জন্য পরস্পরকে পরস্পরের সভ্যতা ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য পরস্পরের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প নিবিড়ভাবে জান্‌তে হবে। তাদের ক্রমে ক্রমে এই মনোভাব আনয়ন করতে হবে যে, হিন্দু মুসলমান এক জাতি, ভারতীয়। তাদের মনে করতে হবে যে, শুধু ধর্ম্মবিষয়ে তারা হিন্দু—তারা মুসলমান; সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তারা ভারতীয়। এ কথা স্মরণ থাকলে যে পরমত-অসহিষ্ণু militant Islam ও militant Hinduism দেখা দিয়েছে, তা অচিরেই দূরীভূত হবে। এই দুই জাতির ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের পথ সহজ করণার্থে পরিবারে পরিবারে এদের সামাজিকভাবে মেলা-মেশার ব্যবস্থা করার দরকার হয়েছে। বিশেষ ক'রে এমন উদার সাহিত্য প্রচলনের ব্যবস্থা করা দরকার মনে হয়—যাতে জাতিবিদ্বেষ আদৌ স্থান পাবে না। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে মিলন হওয়া খুব সোজা—কেন না, সাহিত্য চিন্তার বাহন হওয়ায় যেরূপ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি আনয়ন ও মিলনস্থাপন আপনাদের সাহিত্য-সমাজের এক মহান্‌ প্রয়াস হোক্‌।

আশা হয়, ইসলামের প্রাণশক্তি এখনও নিবে যায় নি। মনীষী H. G. Wells বলছেন—'Islam is an open air religion, it knows not how to die', এ কথার সত্যতা কি আজ প্রমাণিত হচ্ছে না? আরবে, তুরস্কে, পারস্যে ইস্‌লামের কি নব অভিযান সুরু হয় নি? আমার মনে হয়—এবং বহু য়ুরোপীয় মনস্বীরাও বলছেন যে, ইসলামে এমন একটি vitality আছে যে, তার গভীর নিরাশার সময় এমন এক একটি মহাপুরুষের সে জন্ম দেয়, যিনি এই ঘন নিরাশার কালিমাকে আশার আলোকে রূপান্তরিত ক'রে তুলেন। মুস্তাফা কামাল, রেজাশাহ্‌, ইবনে সউদ, আমানুল্লা, নাদির খাঁ প্রভৃতি এ কথার

সভ্যতা প্রমাণ করছেন। মুসলমানদের ভিতর এমন একটা Stamina আছে যে, যদি তার মুক্তি কিসে, ইহা একবার বুঝতে পারে, তাদের কোন প্রতিবন্ধকই আটকিয়ে রাখিতে পারবে না।

Stoddard পঞ্চদশ শতাব্দীর খৃষ্টানদের সঙ্গে বর্ত্তমান মুসলমানদের তুলনা ক'রে বলেছেন :—

"ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে, Reformation-এর প্রারম্ভে, খ্রীষ্টীয় জগতের যে অবস্থা ছিল, মোস্‌লেম জগতের আজ ঠিক সেই অবস্থা। Reason এর উপর dogmaর একই রকম প্রাধান্য ও একই রকমের অন্ধ গতানুগতিকতা এবং স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রতি একই রকমের সন্দেহ ও বিরুদ্ধ ভাব। সন্দেহ নাই, মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি, বিশেষতঃ শরিয়ত পড়লে, এবং তাদের গত সহস্র বৎসরের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করলে মনে হয় যে, ইসলাম বর্ত্তমান উন্নতির এবং সভ্যতার পরিপন্থী। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্টীয় জগতের কি হুবহু এই অবস্থা ছিল না? শরিয়তকে খৃষ্টান Canon Law র সঙ্গে তুলনা কর, দুটিরই উদ্দেশ্য এক। উদাহরণস্বরূপ সুদ নেওয়ার নিষেধ-বিধির উল্লেখ করা যেতে পারে, যা মানলে আধুনিক জগতের শিল্প-বাণিজ্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইস্‌লাম যে বর্ত্তমান সভ্যতার সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তাহার প্রমাণস্বরূপ এই সুদ-নিষেধ-বিধিকেই দেখান হয়। খৃষ্টান Canon Law ঠিক এই ভাবেই সুদ-নিষেধ করেছিল এবং এত কড়াকড়িভাবে এই নিষেধ-বিধি চালিয়েছিল যে, কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া য়ুরোপের সমস্ত কারবার ইহুদীদের একচেটিয়া ছিল। যে সব খৃষ্টান সর্ব্বপ্রথম সুদে টাকা খাটাইতে সাহস করেছিল (The Lombards), তা'রা প্রায় ধর্ম্মদ্রোহী ব'লে বিবেচিত হ'ত, এবং সকলেই তাদের ঘৃণা করত এবং অনেক সময় তারা অত্যাচারিত হ'ত।

স্বাধীন চিন্তা এবং বিজ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধের কথা ধরা যা'ক!—ন্যূনাধিক তিন শত বছর পূর্ব্বে Papal inquisition মহাত্মা গ্যালিলিওকে 'পৃথিবী সূর্য্যের চার দিকে ঘুরছে' এই সর্ব্বনেশে ধর্ম্মদ্রোহী (?) মত অস্বীকার করতে, ভীষণ শারীরিক অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেছিল। ইসলামের ইতিহাসে এর চেয়ে জঘন্যতর কিছু আছে কি?

Christianity যদি এ সব কুসংস্কার অজ্ঞানতা প্রভৃতির আবর্জ্জনা হ'তে মুক্ত হ'তে পেরেছে, তবে ইস্‌লাম কেন পারবে না?

খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন আহমদ্ (এম্-এ, বি-এল)।

চিতানল

তোমারি দুয়ারে এসে রয়েছি ভিখারি-বেশে
একবার চাও প্রিয়ে! ফিরে,
প্রাণের অনন্ত জ্বালা— জ্বলন্ত অনল ঢালা—
দেখ যদি বুকখানা চিরে!
মরমের বাণী হায়! মুখে না ফুটিতে চায়,
ভাব, ভাষা, সব যাই ভুলে;
সাজায়ে প্রেমের ডালি, নীরবে রয়েছি খালি
নিজ হ'তে লও যদি তুলে!
ইহকাল—পরকাল— তোমারি ত ইন্দ্রজাল,
তোমারে দেখিতে তাই আসি;
স'রে স'রে যাও দূরে, আমি মরি কাছে ঘুরে;
কি বুঝাব, কত ভালবাসি?
আজি শুভক্ষণে দেখা, থাকিতে পারি না একা
ত্রিসংসার শূন্য নিরিবিলি;
আকাশে চন্দ্রমা হাসে, ধরণী জ্যোৎস্নায় ভাসে,
এসো দেবি! এক সাথে মিলি।
এ হৃদি-মন্দির-মাঝে, তোমারি প্রতিমা রাজে,
আয়োজন করেছি পূজার;
কত আঁখিজলে মাখা, কত লাজ, ভয় ঢাকা,
অন্তরের কামনা আমার!
দীপে আলো, গন্ধ ধূপে, এস বরদাত্রীরূপে,
দোঁহে পূর্ণ হই পূর্ণিমায়,
জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, সুখ, দুঃখ, পুণ্য, পাপ,
ক্ষণতরে মাগুক বিদায়।
কত সুধা—কত বিষ— পান করি অহর্নিশ,
কণ্ঠে মোর ভীমের পিপাসা
বিছাইয়া ওষ্ঠ দুটি, এ বক্ষে পড় গো লুটি,
অভাগারে দাও ভালবাসা।
আর এক সাধ প্রিয়ে! যমে যবে যাবে নিয়ে,
মরি যেন পূর্ণিমা-নিশিতে,
সে মরণে দুঃখ নাই, তব দেখা যদি পাই,
চ'লে যাব হাসিতে হাসিতে।
সারা মধুনিশি ধ'রে জ্যোছনা পড়িবে ঝ'রে
অভাগার শেষ শয্যা'পরে,
ঢালিয়া নয়নজল, নিবা'য়ো সে চিতানল,
মুক্তি দিও—তোমারি ভিতরে।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বি, এ)।

লেখার নমুনা

মান্যবর শ্রীযুক্ত বসুমতী-সম্পাদক মহাশয়

শ্রীকরকমলেষু—

শ্রীযুক্ত কলমবাজ কালিরাম সেবারে ঠিক কথাই লিখিয়াছিলেন,—সাহিত্য আর্টের অঙ্গীভূত না হইলে বৃথা সাহিত্য-চর্চ্চা। 'দেশ দেশ নন্দিত করি' এই বাণীই 'নন্দিত' হইতেছে, 'দিন আগত'ও দেখিতেছি; কিন্তু 'বসুমতী' 'তবু কৈ?' এজন্য আমি ভাবিলাম, আমার যেরূপ সাহিত্য-প্রতিভা, আমায় আপনাদের সম্পাদকীয় আসরে গ্রহণ করিলে আপনাদের মঙ্গল হইবে, এবং সাহিত্যও আর্টের তুঙ্গশৃঙ্গোপরি আরোহণের সুযোগ-লাভে উন্নত হইতে পারিবে।

আপনি ভীত হইবেন না। আমার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী …সাহিত্যের যে বিবিধ বিভাগ আছে, সে সমুদয় বিভাগেই আমার রীতিমত পারদর্শিতা আছে। কন্টিনেণ্টাল সাহিত্য—আজকাল সাহিত্য-জ্ঞানের মাপকাঠি; সে মাপকাঠি দিয়া পরখ করিলে বুঝিবেন, আমি একখানি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। বহু মাসিকে ও সাপ্তাহিকে আমি বহু বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়াছি। সে সব পত্র-পত্রিকার সম্পাদক আমার রচনা সাদরে ছাপাইয়াছেন এবং আমার ভূয়োদর্শিতায় বিমুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন—'এসিয়ার বিজ্ঞতম-সুধী' উপাধিতে আমার বিভূষিত করিবার জন্ম! কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ না কি 'মড়া' ছাড়া 'জীবিতের' সহিত সম্পর্ক রাখেন না, এ-কারণে তাঁদের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে,—এক বৎসরের মধ্যে এ-উপাধি আমায় না দিলে, মহীয় কৃপালাভে গৌরবান্বিত সম্পাদক-সঙ্ঘ উক্ত উপাধিতে আমায় বিভূষিত করিবেন।

এই ব্যাপার হইতে আমার পরিচয় কিয়দংশে অবগত হইবেন বলিয়াই কথাটার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু তাঁদের কথার উপর আপনাকে নির্ভর করিতে বলি না—আমার qualifications? ফলেন পরিচীয়তে! আমার বিবিধ লেখার নমুনা পাঠাইলাম। ইহা পাঠে বুঝিবেন, আপনি যদি আপনার সমস্ত লেখকজনের বিদায় দেন, একা আমিই লেখনী-গাণ্ডীবযোগে আপনার পত্র-পত্রিকা বিবিধ রচনা-সম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারিব।

বৃথা বাক্যাড়ম্বর ছাড়িয়া আমার লেখার নমুনা দিলাম। ইহা পাঠে অচিরে আমার নিয়োগ-পত্র পাঠাইয়া এবং অভয়-লাভে পরিতৃপ্ত হৌন। ইতি…

মাসিক পত্রে প্রথমেই চাই 'ছোট গল্প'। ছোট গল্পের রচনায় আধুনিক যুগে আমি মিটার টেক্কা! আমার লেখা ছোট গল্পের নমুনা দি। গল্পটি আগাগোড়া উদ্ধৃত করিয়া দিলে আমার পক্ষে ক্ষতি; তাই প্লটটুকু ও সেই সঙ্গে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। গল্পটির নাম,—'চাউনির ছাউনি'।

নায়ক সুধাকর জোয়ান্ যুবা। তার অগাধ ঐশ্বর্য্য; সে একা থাকে; লেক রোডের কাছে বাড়ী। সুধাকর মুগুর ভাঁজে, ডন্ কষে; ব্রিজ ও ফুটবল খেলে; থিয়েটারে যায়; গান গায়, মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে ছবি আঁকে, গল্প লেখে, সখের থিয়েটারে নাচ শেখায়, পেশাদারী থিয়েটারের গ্রীণ রুমেও মাঝে মাঝে গিয়া বসে। ইউনিভার্সিটি থেকে সব কটা ডিগ্রীও আদায় করেছে। বাড়ীতে তিনটি ভৃত্য, পাচক ব্রাহ্মণ, মোটর, সোফার আর দরোয়ান্। অর্থাৎ নায়ক সুধাকর হলো এ যুগের আদর্শ নব্য হীরো।

সে-দিন কুমার শান্তনুনন্দনের গৃহে ছিল প্রমোদ-উৎসব। সে-উৎসব সেরে সুধাকর যখন বাড়ী ফিরলো, রাত তখন দু'টো বেজেছে। ড্রাইভার গ্যারেজে গাড়ী তুলে শুতে চ'লে গেল। সুধাকর নিজের শয়ন-কক্ষে এসে চাকরকে বললে—তুই যা, শুগে যা ..

ভৃত্য চ'লে গেল। আলো নিবিয়ে সুধাকর বিছানায় শুয়ে পড়লো।

শুয়ে শুয়ে সুধাকর ভাবছিল,…শান্তনুনন্দনটা কি মূর্খ! আমায় বলে, বিবাহ করো! তার অর্থ, নারীকে বিবাহ! নারী…দুনিয়ার যত আরাম, সুখ-শান্তি হরণের মূল! এই মুক্ত জীবনে নারী কঠিন শৃঙ্খল!…

সহসা একটা শব্দ…খুট্-খুট্ খস্-খস্…সুধাকর ভাবে,—কুকুরটা? সে কাণ খাড়া ক'রে রইলো। আবার খস্-খস্, খুট্-খুট্…

না, কুকুর তো নয়! খস্-খসে মানুষের পায়ে চলার শব্দ…তাতে ছন্দ আছে! সুধাকরের ওস্তাদী কাণ! তাই

হুলটুকু খাঁ করে বুঝে ফেললে! সুধাকর শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো; নিশ্চল, নিথর দাঁড়িয়ে রইলো মেঝের উপর...ওদিকে পাশে বাথ-রুমে আবার সেই পায়ে চলার অতি-মৃদু শব্দ!

নিশ্চয় চোর! সুধাকর অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এসে ড্রয়ার থেকে নিঃশব্দে রিভলভার বার করলে, রিভলভার হাতে তাগ ক'রে বাথ-রুমের দোর এক-টানে খুলে ফেললে... সঙ্গে সঙ্গে কে বাথটবের পিছনে ব'সে পড়লো। সুধাকর সুইচ্ টিপলো, বাথরুমে আলো জললো...সে আলোয় সুধাকর চেয়ে দেখে, বাথ-টবের পিছনে একটা কাপড়ের আবরণে... কে ও?...

সুধাকর বললে—বেরিয়ে এসো...না হ'লে আমার হাতে ...দেখচো? পিস্তল...গুলি-ভরা...শীগ্‌গির উঠে এসো... এক...দুই...

একটা আর্ত্ত রব ফুটলো,—না, না, গুলি করো না... আমার এ তরুণ বয়স, শ্যামা ধরণীরে আমি বাসিয়াছি ভালো!

সুধাকর অবাক্! এ যে নারীর কণ্ঠ! বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি উঠে দাঁড়ালো। তার মুখের আবরণ খ'সে পড়লো...সুন্দর একখানি মুখ...কুঞ্চিত কালো কেশরাশির নীচে, গোলাপ-গঞ্জিত... লাল-টুক্‌টুকে...অপূর্ব্ব! সুধাকর ভাবলে, যক্ষ প্রিয়ার যে ছবি এঁকেছিল, সে-ছবিতে এ মুখখানি বসাতে পারলে...

কিন্তু না...এ তরুণ বয়সের মোহ...এ মোহের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না!...

কঠিন স্বরে সুধাকর বললে,—এগিয়ে এসো ..

অশ্রু-ভরা দুই চোখ...চোখে কাতর দৃষ্টি, তরুণী এগিয়ে এলো...তার কৃশ দেহলতা ভয়ে থর-থর কাঁপচে!...সুধাকর বললে,—তুমি চুরি করতে এসেচো!...তুমি চোর...

তরুণী কম্পিত-কলেবরে বললে,—না, না, আমি চোর নই...

[সম্পাদক মশায়, আমার কৌশল অর্থাৎ লেখার আর্ট লক্ষ্য করেছেন! সুধাকর যখন বললে—তুমি চোর? ..তখন আপনারা ভেবেছিলেন, তরুণী বলবে, যে, হাঁ, সে চোর... জীর্ণ কুটীরে তার বাস...মা নেই, বুড়ো বাপ রোগে ...পথ্য মেলে না, পয়সার অভাব...তাই তার তরুণী গভীর রাত্রে এসেচে চুরি করতে! কিন্তু কোথা থেকে এলো? দরোয়ান-চাকরের লক্ষ্য এড়িয়ে? এ ভেবেও মুস্কিলে পড়েচেন! সে চোর নয়, এ পরিচয়ে আমি গ্রামুলিফ বর্জন ক'রে চমৎকার twist (মোচড়) দিলুম, এটুকু লক্ষ্য করবেন! তার পর এত বড় লোকের বাড়ীর দোতলায় আসা ...এ সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলবো না। কারণ, এটুকু ধ'রে নিতে হবে—যেমন করেই হোক, সে এসেচে...গাছে চ'ড়ে, নয়তো দাসী সেজে, নয়তো...অর্থাৎ তার আসা চাই—গল্পের নায়িকা যে, তাই সে এসেচে! আর এ সব খুঁটি-নাটি ধরলে গল্প পড়া চলে না।]

সুধাকর তরুণীর উত্তর শুনে বিস্ময়-বিমূঢ়! তরুণী আবার বললে—আমি চোর নই...এবার তার কণ্ঠ বেশ স্পষ্ট! স্বরে কোন জড়তা নেই!

সুধাকর বললে—যদি চোর নও, তবে এ-রাত্রে এখানে কেন এসেচো? কিসের প্রয়োজনে?...

তরুণী বললে—বুঝবে না, বুঝবে না,—তা বিশ্বাস করবে না গো...

সুধাকর বললে,—তবু...আমি জানতে চাই...কেন এসেচো...

তরুণী বললে—এখানকার নারী-অক্ষৌহিণীর আমি সেক্রেটারী। নারী-চিত্ত-মুক্তি আমাদের ব্রত। সে ব্রতে চাঁদা চেয়ে তোমায় পত্র লিখেছিলুম...তুমি তার জবাব দাওনি ...চাঁদাও দাওনি...তাই এসেচি আমি। তরুণীর চোখে জল, অধরের তারায় আগুনের ফুল্‌কি...

সুধাকর বললে,—তোমার স্বামী এ কথা জানেন?

তরুণী বললে,—কোথায় স্বামী? আমি বিবাহ করিনি। বিবাহে চিত্তের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়!

সুধাকর বললে—হু...! যাও, ঐ বালিশের তলায় চাবি আছে, আমার সিন্দুকের চাবি। সিন্দুক খুলে টাকা নাও...যত চাও, যা পাও...

তরুণী মৃদু হাস্যের বিদ্যুৎ ফুটিয়ে সুধাকরের কক্ষে ঢুকলো ...বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুললে। সিন্দুকে টাকা, নোট, গিনি...এবং অলঙ্কারের রাশি...মুক্তা, চুনী, পান্না ও হীরা জহর...

দু'হাতে টাকা-কড়ি সংগ্রহ ক'রে অঞ্চলে বেঁধে, তরুণী সুধাকরের পানে চাইলো। সুধাকর তারি পানে চেয়েছিল, তার দৃষ্টি...সে দৃষ্টিতে কী যে ছিল!

তরুণী বললে—আপনার স্ত্রীর গহনা বুঝি এগুলি?...

সুধাকর বললে—না। আমি বিবাহ করিনি…

তরুণী বিস্মিত দৃষ্টিতে সুধাকরের পানে চাইলো…তার হাতের মুঠি শিথিল হলো। আঁচল থেকে টাকা-কড়িগুলো ঝন্ ঝন্ শব্দে অমনি মাটীতে পড়লো…

সুধাকর বললে—এ কি, টাকা-কড়ি…?

তরুণী একেবারে অশ্রু-বিগলিত স্বরে ব'লে উঠলো,—মিথ্যা, মিথ্যা এ অক্ষৌহিণীর মুক্তির অভিযান…

সুধাকর বিস্মিত!…খোলা খড়খড়ি দিয়ে একরাশ জ্যোৎস্না এসে সুধাকরের মুখে পড়েছিল…সুধাকর ডাকলে,—নারী…

তরুণী এ কথায় বিহ্বল বিবশ হলো…নিমেষের জন্য… বললে,—নারী না। আমার নাম রুবি রায়। বলতে বলতে আবেগে একেবারে সুধাকরের বুকের উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো, প'ড়ে বললে,—না, আমি চোর…চোর…আমায় বন্দী করো…সন্ধি নয়…!

দু'হাতে তরুণীকে বেষ্টন ক'রে তাকে বুকে টেনে সুধাকর বললে,—তাই করলুম, নারী…আমি শক্তির উপাসক, তুমিই শক্তি…তোমার সঙ্গে সন্ধি করলুম, তোমায় বন্দীও করলুম!

চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে কুহক-মায়া রচনা ক'রে হাসতে লাগলো…বাতাস এসে দু'জনকে ছুঁয়ে গেল…দূরে কোন্ চাল্‌তা গাছের ডালে ব'সে একটা পাখী গেয়ে উঠলো—পিয়া, পিয়া, পিয়া…

[দেখলেন, সম্পাদক মশায়…আমার লেখার কৌশল! এ গল্পে তরুণ, তরুণী, শক্তি, ব্যায়াম-চর্চ্চা, যৌবনের ডাক, নাচ-শেখানো, প্রমোদ-উৎসব, অক্ষৌহিণী, সঙ্ঘ, মুক্তি এবং শেষে সেই সনাতন সত্য,—মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা—কি পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলেচি!]

এ হলো ছোট গল্প, তার পর কবিতা চাই? একটি কবিতা নমুনা-স্বরূপ পাঠাই…কবিতার নাম, 'আলকাৎরা'। ফুল, জ্যোৎস্না, এ সবের উপর বহু কবিতা লেখা হয়েচে! লেখা শক্ত নয়! কিন্তু "আলকাৎরা"…উপেক্ষিত আলকাৎরা! Stern reality! এ কবিতা লেখার কল্পনাও কেউ করেচে কখনো? নমুনা দেখুন।

গ্রীষ্ম আসুক, বর্ষা নামুক,
শীতের বাতাস কাঁপিয়ে দে যাক্ হাড়,
বসন্ত সে আসচে-যাচ্ছে—
আমি শুধু কাৎ ক'রে এ ঘাড়
জানলাটিতে ব'সে আছি,
নয়ন মেলে শুধুই আছি চেয়ে—
কোন্ ঘরে হায়, কোন্ তরুণী
শাম্‌লা দেশের কমলা-মুখী মেয়ে
চাইবে কবে আমার পানে,
কইবে আশার বাণী—
জাগিয়ে আমার বক্ষে ওগো
এ-যৌবনের গানের কাণাকাণি?
কেউ চাহে না…ঘর-বাসিনী, পথ-চারিণী!
হায় রে হতভাগা—
মিছে আমার দিনের চাওয়া,
ফাগুন-বায়ে আকুল-নিশি জাগা!
বুকে আমার সেই শাহারা…
ধূ-ধূ ক্ষুধা…কিছুতে না মিটে—
ছেঁড়া কথার টুকরো খুঁজি,
খুঁজি চোখের চাউনি-চিনির ছিটে!
মিল্‌লো না কো কিছু রে তা।
তরুণ বুকে এই যে রঙীন আলো
শাহারারি বালির খোলায়
নিরাশ-ঝাঁজে পুড়ে হলো কালো!
শুধুই কালো? তরল যা রস
চল্‌চলে তার শুকিয়ে গেল গ্রস্ত!
সেই আলো আজ বুকে জম্‌লো
আলকাৎরার কালো চাপড় যত!

[এ কবিতায় দেখবেন, মামুলিত্ব নেই,—তবুও আধুনিক যৌবন-সমস্যার কি সুর বেজেচে! এমন কবিতা ভূরি ভূরি লিখেচি এবং লেখার শক্তি রাখি। আমার কাব্য কল্লোলিয়া ভাবসিন্ধু কালি-কলমের মুখে বরি,—বিচিত্রা প্রগতি ধরি উত্তরার পৃষ্ঠ দিবে ভরি,'—বুঝলেন!]

তার পর সাহিত্যিক, সামাজিক প্রবন্ধাদি? তারো কিছু নমুনা দি—

"যে সাহিত্য এক দিন বাঙলা দেশে সাহিত্য নামে আপনাকে পরিচিত করিয়া তুলিতেছিল, সে সাহিত্য ফাঁকি, জাল, সাহিত্যের ধাপ্পাবাজী! কারণ, বাঙলার মাটীর যোগ তাহাতে ছিল না। বাঙালীর বাঙালীত্ব তার হৃদয়ের প্রেম প্রকাশতায়! নারী দেখিলেই তার চরণে ঢলিয়া পড়িবার যে

প্রচণ্ড আগ্রহ, তাহাই বাঙালীর বাঙালীত্ব! নহিলে ভারতচন্দ্র পশার করিতেন না এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাসও কবি হইতে পারিতেন না। 'রজকিনী রামী'—এ কথার eternal সত্য কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আজো রজকিনী-গৃহে রজকিনী-দলে যৌবনের যে কোমল-কঠিন নিটোল বাঁধন দেখা যায়—যৌবন কত রাখিব ধরিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া রে···এ ছন্দের সার্থকতা আজো রজকিনী-গৃহে ঘুচে নাই! এই রজক-গৃহে গর্দ্দভ এখন একমাত্র যৌবন-স্তুতি প্রচার-কল্পে তার কণ্ঠে যে-সুর বাহির করে, কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? আমরা বৈজ্ঞানিক psycho-analysis দ্বারা রাসভের সুর টিউন্ ও টোন্ করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলি,—

গ্‌গ্‌-গগ্‌-গ্‌গ্‌-গ্‌গ্‌। • গগ্‌-গগ্‌— ও—ও...

এ-রাগিণী অনভিজ্ঞের কর্ণে শুধু বিশ্রী বেতালা গাধার চীৎকার মাত্র। কিন্তু আমরা নানা প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ঐ গাধার গানে খাঁটী গান্ধার! গাধার গান= গা+ধা+র+গা+ন=২গা+ধা+র+ন=গা+ন+ধা+র (২সংখ্যা-নির্দ্দেশক অর্থাৎ মাত্রা, বাদ গেলে থাকে গা+ন+ধা+র)=গান্ধার।

আজ Cultureএর অভাবে গাধার সুরে করুণতার অভাব—তাব কিন্তু lyric। এখন culture কামীমাত্রের উচিত, ঐ সুরে সুর মিশানো"···ইত্যাদি...একপ্রস্থ।

দ্বিতীয় প্রস্থ শুনুন···

—"বেদব্যাস বা বাল্মীকির, ভার্জিল বা হোমারের লেখা পড়লে মনে হয় না যে, তাঁদের কালে কোনও রকম সমস্যা ছিল বা সমস্যার কোনো সমাধান দিতে চেয়ে কিংবা দিতে না পেরে তাঁরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁরা শুধু খপরের মত গল্প ব'লে গেছেন। ধরুন, ঐ দ্রৌপদীর কথা···পাঁচটি স্বামী মিলিয়ে কি কাণ্ডই ঘটালেন! অসভ্য-যুগের ছায়াপাত হলো! তার চেয়ে ঐ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে দিয়ে দ্রৌপদীকে অপর চার ভাইয়ের প্রতি আসক্ত দেখালে আধুনিক সভ্য-যুগের কি ছবিই ফুটতো! বিরাট Sex সমস্যা দেখা দিত। Eternal cry of Sex! তার পর শূর্পণখা! বেচারা শূর্পণখা···তরুণ বয়সে একাকিনী প্রেম-পাগলিনী··· লক্ষ্মণকে দেখে বিহ্বল হলো···আর ইডিয়ট লক্ষ্মণ কি করলে...! ঐ লক্ষ্মণ আবার বীর! ও কি ভদ্রতা? হায় রে! নেহাৎ মুলো···বাল্মীকির বুড়ো বয়সের বিকৃত মস্তিষ্কের দোষে কতখানি রোমান্স মাটী হয়ে গেছে। তার পর মায়া-মৃগের আহ্বানে গমন-বিমুখ লক্ষ্মণকে সীতার ভর্ৎসনা—বদমায়েস, তুমি রামচন্দ্রের সাহায্যে যাচ্ছো না কেন, বুঝেচি! তিনি মারা গেলে আমায় নেবে...সেই লোভে বনে এসেচ সঙ্গী হয়ে!...লক্ষ্মণ এ-কথা শুনে কাণে আঙুল দিয়ে পালালেন! এ'ও বাল্মীকির বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ!···এইখানে লক্ষ্মণের উচিত ছিল বলা—চুপ করো নারী...যে-কথা অন্তরের অন্তরে গোপন ছিল···তাকে উস্কে তুলো না—

থাক্। এ সম্বন্ধে আর বেশী বলবো না। বহু গবেষণায় পুরাণ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় আমি নূতন আধুনিক আলোক-পাত করচি; তা ছাড়া এই subject নিয়ে আমার একখানি আধুনিক নাটক লেখার বাসনাও আছে। নাট্য-কলার দিকে বহু তরুণের ঝোঁক পড়েচে এবং এমনি ultra-modern idea তাঁরা 'পাচ্ছেন আমাদের আলোচনা থেকে। কাজেই তাঁরা যদি আগেই যাত্রা সুরু ক'রে দেন···

একটা কথা অকপটে বলবো, আমাদের তরুণ দল বাঙলার হামসুন্। আমাদের লেখায় কনটিনেণ্টের কেমন হাওয়া বইাচ্ছি···বাঙলা নামগুলোর ফাঁকে ফাঁকে নরওয়ের কন্‌কনে বাতাস, বেলজিয়ামের কাঁচের কারখানার ঠুনঠুন শব্দ, বিলাতী রান্নাঘরের সুবাস, রাসিয়ান্ ভড্‌কার তীব্র কটু গন্ধ, মস্কোর সাদা ভাল্লুকের ঘোঁৎঘোঁতানি প্রতি মুহূর্ত্তে জাগ্রত হয়ে উঠচে না? আমাদের সাহিত্য বিশ্ব-হাটের সাহিত্য হয়ে উঠেচে। নারীর মাতৃত্ব বার্দ্ধক্যে জরজর হয়ে গেছে...সে বস্তুকে নিম-তলার ঘাটে চিতায় চড়িয়ে তরুণের এই যে সাহিত্য-অভিযান সুরু হয়েচে নারীর যৌবনকে অগ্রদূতিনী ক'রে—তাঁদের সৃষ্টিতে নারী যে উন্মদ বেশাভরা যুবতী-বেশে জেগে উঠচেন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দম ব্যথা নিয়ে···এতে মনে হয় না কি জার্ম্মিজত্, নীডেনসাকেন, শীলার, কোলরুস্ত, ডাষ্টুভস্কি, সাজানিকা, কর্কোলাড, নিউজীল্যাণ্ড, গোলার বেয়ার, হোটেনটট্, ম্যাডাগাস্কার অক্টোপাশ প্রভৃতি চিন্তাশীল ধুরন্ধররা যে pseudo-romantic ও nomadic স্বপ্ন দেখচেন, বাঙলার তরুণ সাহিত্যিক-দল সে স্বপ্ন সফল করলেন বলে! মেরে-কেটে আর ঐ পুজোর ছুটিটা··· তার পর দেখবেন, বাঙলা সাহিত্য দুই দেশকে গ্রাস ক'রে

বসেচে। গোবর্দ্ধনের বেশে লিজা এসে দাঁড়াবে মাজা বাসন নিয়ে; করিম মিয়ার চায়ের দোকানে কারেনিনা, এথেলের দল নৃত্য সুরু ক'রে দেবে...তখন মানুষ ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডী কেটে গৃহত্যাগ ক'রে এসে বিশ্ব-মানবকে প্রণয়াবেশে আলিঙ্গন করবে,—গৃহে গৃহ থাকবে না, গৃহের বন্ধন থাকবে না—থাকবে শুধু পথ, আর পথিক... ।...

তার পর মাসিক সাহিত্য-সমালোচনার নমুনা দি··· পরকে গালিতে দাবালে নিজেকে বড় ব'লে সমাজে চালানোর সুৎ হয় না? এ সম্বন্ধে ঐ সমালোচনী-পত্র "ধুমসী চর্ম্মছানি'র আদর্শই আমি শিরোধার্য্য করি। নিজের মধ্যে 'ধ্যাড়' কেবলি 'ধ্যাড়'; তাই সেই 'ধ্যাড়ে' 'তোবড়া' বানিয়ে সারা দুনিয়ার গায়ে নোংরা কালো কালি ল্যাপেন মহা আস্ফালনে!

আমার সমালোচন-শক্তি দেখে জগৎ স্তম্ভিত হয়ে ভাববে, ভঙ্গুর মনুষ্যদেহে এত বিক্রমও সম্ভব! রূপকথার সেই ক্ষ্যাপা হাতীকে মনে আছে? শুঁড়ে জড়িয়ে, যাকে খুশী সিংহাসনে বসাতো? তেমনি হাতীর বিক্রমে লেখনী-শুঁড়ে তুলে যাকে খুশী সিংহাসনে বসাবো, যাকে খুশী সিংহাসন থেকে হিঁচড়ে টেনে রসাতলে নামাবো!

এ-মাসের 'ছুছুন্দরের' সমালোচনা নমুনা-স্বরূপ দিচ্ছি:

"বস্তীর সুখ-কিরিস্তি" গবেষণামূলক প্রবন্ধ। লেখকের চিন্তাশক্তির পরিচয় পাই। "বেদান্তে পলিটিক্স" শ্রীকিপ্‌পিন চন্দ্র মাল প্রণীত। আজ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া লেখক পলিটিক্সের ক্ষেত্রে তুড়ি-লাফ খাইয়া বেড়াইতেছেন—এ প্রবন্ধটি তাঁর বিচিত্র লম্ফের হৃৎকম্পকারী গবেষণার ফল। বেদান্তে মায়াবাদই জানিতাম—তার মধ্যে চরকার শূন্যবাদ এ-ভাবে বিবৃত আছে জানিয়া চমৎকৃত হইলাম। "দূর্ব্বা" ভক্ত-কবি কৃত্তিবাস ছাদের রচনা। ভক্ত-কবির হাড়ে হাড়ে অপরূপ দূর্ব্বা-বীজ ভক্তি অশ্রুসেচনে অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধমান হইয়াছে দেখিয়া তৃপ্তি পাইলাম। দু'ছত্র তুলিয়া দিতেছি—

"মাটী-ফোঁড়-সম্ভবা কচি কচি দূর্ব্বা মা,
তুই দেবী গোরুর আহার।
হাড়ে হাড়ে গজাইয়া তারি রসে কাব্যে যে
গবেয্যি পবিত্র বাহার।"

খাসা, চমৎকার! এমন পবিত্র দেব-কবিতা বহুকাল পাঠ করি নাই। "একপাটী নাগ্‌রা" শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা দে রচিত। গল্পের আখ্যায়িকা-ভাগ ভালো; তবে লেখকের ভাবাজ্ঞান আজো হয় নাই। বানান নির্ভুল, তবে প্রথম অংশ শেষে এবং শেষাংশ প্রথমে দিলে গল্পটি মন্দ জমিত না। "ছুঁচোর কীর্ত্তন" সাহিত্যিক সন্দর্ভ। শ্রীবৎসলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। নারদের কীর্ত্তনের কথা মনে পড়ে, তা পড়িলেও এ প্রবন্ধের মৌলিকতা অপূর্ব্ব। "কবিবর প্রণয়লাল ঢোলে"—শ্রীশাখাবিহারী পুচ্ছ। কবির কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উক্ত হইয়াছে। "সার্শির আড়ালে"—শ্রীযুক্ত গবাক্ষ রায়। পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। "সঙ্গীতে ক্ষুণ্ণুন্দু" শ্রীযুক্ত কেঙ্কর বসু। লেখক মাদলের সুরে পিয়ানো বাজাইতে উপদেশ দিয়াছেন। "চোখের তারা"—শ্রীযুক্ত নবনীনাথ চট্টপাধ্যায়। আরও কিছু বলিলে ভালো হইত। 'ফরাসী সাহিত্যের সহিত বাঙলা সাহিত্যের মিল" মেদারবক্স। পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। "মাতৃত্ব ও নারীত্ব" শ্রীসরেশচন্দ্র রায়। পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।... "ধাপার মাঠ" শ্রীধর্ম্মেন্দ্রকুমার শীল। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস।

এবারে লেখার এই নমুনা পাঠাইলাম। আশা করি, দেখিয়া খুশী হইবেন, এবং অচিরে···

শ্রীজপ্রকাশ গুপ্ত (এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী)।

প্রকৃতি

চতুরা গোলাপ-বালা পাতার আড়ালে
কি লাজে সহসা বল নিজেরে হারালে?

নিষেধ-কণ্টকে ভরা তর্জ্জনী তুলিয়া
ইঙ্গিতে তর্জ্জন করি' কি চাহ বলিতে
কুহকিনি, হে গুণ্ঠিতে, রূপসি, ললিতে?
কি ক্ষতি,—চাহিতে আঁখি-পল্লব খুলিয়া?
আমি ত ভ্রমর নহি, নহি প্রজাপতি,
এসেছি দৃষ্টিতে শুধু করিতে আরতি—
পরশ-বাসনা নাহি। অয়ি মনোরমে,
বারেক হেরিব শুধু স-শ্রদ্ধ সম্ভ্রমে;
তব রূপ, তব হাসি, বাঁধি নিয়া সুরে
অসীমের পাথীসম আমি যাব দূরে।
তুমি যে কবিতা মোর আমি তব কবি,
দূরে থেকে দেখে শুধু আঁকি' লব ছবি।

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

ভাদুড়ী মশাই

৩৭
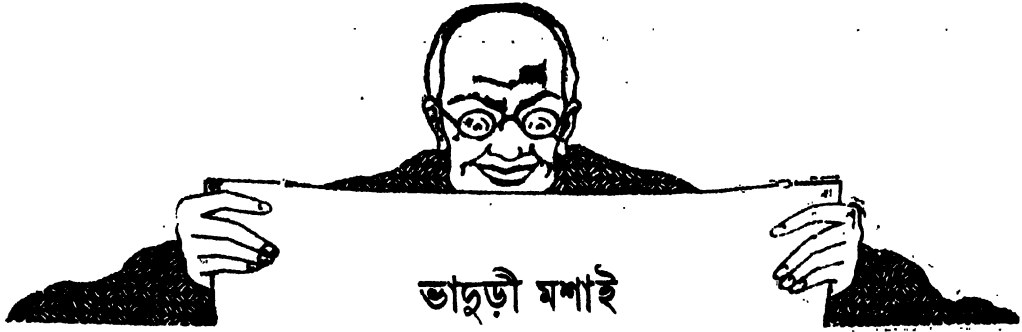
নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে ঢুকে,—যেমন ঢুকেছিল, তেমনি অবস্থাতেই নবনী ঘরের মেজেয় দাঁড়িয়ে রইল। মস্তক অবনত, দৃষ্টি ভূমি-সংলগ্ন অপলক, শ্বাস-প্রশ্বাস স্তব্ধ। সে যে সজীব, ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে তার বুকের ধীর-মন্থর বিস্তার-সঙ্কোচই তার অজ্ঞাতে কেবল সে প্রমাণ রেখে চলেছিল। সে যে কিছু ভাবছিল, তাও বোধ হয় না,—অর্থাৎ স্তব্ধ।

একটা বিড়াল ঘরের এধার ওধার ঘুরে তার পায়ের কাছে এসে মিউ ক'রে একটা করুণ শব্দ করতেই সে চম্‌কে উঠলো।—একটা গভীর নিশ্বাস বেরিয়ে গিয়ে বুকের ভার একটু কমিয়ে দিলে।

কিছু না পেয়ে বিড়ালটির গায়ে হাত বুলুতে ব'সে গেল। তাতে যেন সে একটু আরাম বোধ করলে,—জগতে যেন ওই বিড়ালটিই আছে।

'শুভ্রা'কে মনে পড়তে, হারানো জগৎ যেন ফিরতে লাগলো। সে চঞ্চল হয়ে চারিদিকে চাইলে।

আচার্য্য মশাই কোথায়?

. . . . .

ব'সে থেকে থেকে সময়টাও নষ্ট করা হয়েছে, শরীরও মাটী করা হয়েছে,—আজকাল তাই চারটে না বাজতেই ভাদুড়ী মশাই মোটরে চ'ড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়েন। তাতে ভালই বোধ করছেন, মনে একটু স্ফূর্ত্তিও পাচ্ছেন।

নবনী না থাকায় আচার্য্য মশারও সময় কাটে না। চতুরী সিংয়ের ভাং খেয়ে আর তাঁদের সঙ্গে গল্প ক'রে কাটাচ্ছিলেন। আজ ক'দিন তিনিও পায়জলই বল সঞ্চয় করতে লেগে গেছেন। সন্ধ্যার পর ফিরলেও—চতুরীকে খুঁজে করেন না।

তাঁকে না দেখতে পেয়ে নবনী ছটফট্ করতে লাগলো। দায় থাকতে না পেরে শেষ পথে বেরিয়ে পড়লো। নিজের অজ্ঞাতেই জানা পথে পা প'ড়ে গেছে! চলেছে লোক খুঁজতে, চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে রাস্তায়।

.

"এ কি—নবনী না?"

নবনী চম্‌কে চাইলে, উদাস দৃষ্টি।

সহাস-চক্ষুতে আচার্য্য মশাই বললেন,—"বাঃ, কলকেতার জল-হাওয়া যে একদম শুষে এসেছ! ক'দিনেই যে চেহারা ফিরে গেছে,—চেনবার জো নেই! আশ্চর্য্য,—কত অল্পের মধ্যে কত বড় জিনিষ ঢাকা প'ড়ে থাকে;—উত্তর-মেরু কাণ ঘেঁসেই জুল্‌পি-চাপা ছিল, আর তার জন্যে এদ্দিন কিনা বড় বড় অভিযান চলছিল! ব্রাভো, খুব বার করেছ ভায়া! এলে কখন্?"

শেষ কথাটি ছাড়া আচার্য্যমশার আর কোনো কথাই নবনীর কাণে বা প্রাণে স্পষ্ট হয়ে পৌঁছয়নি। বললে—"সাড়ে তিনটের পর।—এখানকার"—বলেই আচার্য্য মশায়ের সঙ্গে এক জন হ্যাট্‌-ধারীকে দেখে থেমে গেল।

"ওঁকে চিনতে পারলে না? আমাদের প্রিয় বন্ধু মতি বাবু, অনেক দিন পরে ওঁকে হঠাৎ আজ রাজবেশে, Cruelty to animals নিবারণের ড্রেসে পেলুম।—

—"মানুষের ওপর দয়ার বিধান একেলে মনু মেকলে বানিয়ে রেখে গেছেন,—কিন্তু জানোয়ারের মুখ কেউ চায়নি!—অথচ এ দেশটা জানোয়ারে ভরা,—গউ মাতা থেকে ষষ্ঠী নাগ-পূজা পর্য্যন্ত প্রচলিত, তাই—জানোয়ারের জন্য যাঁদের প্রাণ কাঁদে, তাঁরা আমাদের কাছে মানুষ নন—দেবতা। মতি বাবুকে দেখে আজ হিংসে হচ্ছে।—কাষ করছেন উনিই। ধর্ম্মক্ষেত্র ধরেছেন,—আকরে টানে যে, হবে না—হিন্দুর ছেলে। ভারি আনন্দের কথা। উনি যখনি 'পঞ্চাননের' কথা জানতে চেয়েছিলেন, তখনই বুঝেছিলুম, সাধারণ মানুষ

মন, ওঁর মধ্যে সাধুভাব প্রবল। আমরা অভিধান হয়েই রইলুম।"

নবনী মতি বাবুকে নমস্কার করলে। তিনি নির্লিপ্ত লোক, কিছু শুনতে ত পান না,—প্রতিনমস্কার জানিয়ে ভদ্রতার দেনা শোধ করলেন মাত্র। কথা কইলেন বটে আচার্য্যের সঙ্গে—"তুলসীদাসের রামায়ণের বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায় কি?"

আচার্য্য আনন্দ প্রকাশ ক'রে বললেন—"বাঃ, বরাবরই লক্ষ্য করছি, আপনার মাথায় খাঁটি জিনিষই খেলে! পাবেন না কেনো,—কিন্তু সে প্রাণের আখর কি অনুবাদে মিলবে, সে যে ভক্তি গুলে লেখা!"

"তবু আদর্শ বাছাই ত চলে?"

আচার্য্য মশাই বললেন—"ওইখানে আমার খট্‌কা আছে। যার প্রকৃতি যে ভাব দিয়ে গড়া—দেখতে পাই তার ওপরে—সেই ভাবের চরিত্রেরই আকর্ষণ আর প্রভাব বেশী। নিজের চেয়ে প্রিয় কিছু যে নেই। যে চরিত্রের মধ্যে নিজের প্রাণের সাড়া বেশী, যা তার নিজের প্রকৃতির অনুকূল, সেই-টাই তার 'সাইকলজির' সহায়!"

মতি বাবু বললেন—"কিন্তু ভালো যা, তাকে কে না ভালো বলে?"

"বলাই ত উচিত। তবে পরমহংসকেও নিন্দা করবার লোক পাই, মহাত্মার মূর্খতা প্রমাণ করেও ত অনেকে। ভালো আর সত্য—সব সময় এক জিনিষ ত নয়। যাক্, মাথা-ঘামানো কথা থামানোই ভালো।"

মতি বাবু থামলেন না,—"না না—আমার জিজ্ঞাস্য—রামায়ণের মধ্যে আমাদের বড় পাওনাটা কি? রাম-রাজ্য রামরাজ্য যে লোকে করে"—

আচার্য্য বাধা দিয়ে বললেন—"আপনি তাতে ক্ষুণ্ণ হবেন না,—ওটা লোকের মুদ্রাদোষ। আপনি উত্তম প্রশ্নই করেছেন—ওই 'পাওনার' মধ্যেই আসল যা তা আপনি কোটে, প্রাণের পৃষ্ঠায় স্বপ্রকাশ! দেখুন না—রামায়ণের 'পাওনা' খতাতে গেলে খাঁটি জিনিষ পাই—হনুমান আর মিত্র বিভীষণ। তাদেরই বুঝে নিন, তখন ভালো মাল কত কম মিলতো।—ও দুই-ই একটি একটি; তাই তাঁদের আদরও বেশী,—উভয়েই অমর হয়ে আছেন। সার আগে কম মিলতো, তাই তার কদরও ছিল, এখন হাজিৎ-সার, গোবরও সার। এক জন ছিলেন আদর্শ সেবক, এক জন আদর্শ মাত্র। এখন তাঁদের গৌরবের সৌরভ মাটী হয়ে আসছে,—এখন অমৃতত্ব পুত্রার হড়াহুড়ি। শিক্ষাদীক্ষা 'মধুরে কলে'। বিভে বেড়েছে কি না।"

মতি বাবু বললেন—"রামায়ণে আর কোনও আদর্শ চরিত্র নেই কি?"

"আছে বৈ কি, তবে লাইন এক নয়। দেবতাদের প্রাগুকর্ত্ত, এর লুপ্,—নাম জটায়ু। যিনি মহিলা-হরণে বাধা দিয়ে জান্ দিয়েছিলেন। তখন জানোয়ারে যে কাজে এগুতো, এখন স্বামীতেও তাতে স'রে পড়েন,—বাপের নাম খোঁজেন। সম্ভবতঃ সাম্যভাব এসে গেছে। উন্নতিই বলতে হবে। আপনি যখন গরুড়াসন নিয়েছেন, ওটা এসেই যাবে সবই সাধনা-সাপেক্ষ।"

মতি বাবু হি-হি ক'রে হেসে বললেন, "যাক্, আবার অন্য সময় শুনবো।"

শুনে আচার্য্য স্বস্তি বোধ করলেন,—উঁচু পরদা থেকে রেহাই পেলেন। বললেন—"শুনবেন বৈ কি,—ধর্ম্মের ঝোঁক যে কচ্ছপের কামড়।—

—"আপনার সঙ্গে দেখা হ'লে আমারও পুরণো পুঁজি আউড়ে নেওয়া হয়,—সাধুসঙ্গের লাভই ওই। তাঁরা সজাগ ক'রে দেন, —Sword of Democles"—

মতি বাবু সব কথা শুনতে পান না,—হেসে সারেন নবনীর কাণ থাকতেও কোনো কথাতেই কাণ ছিল না,—সে অতিষ্ঠ আর বিরক্ত হচ্ছিল।

মতি বাবু কালা ব'লে বরাবরই নবনী দুঃখ করতো,—"অমন চেহারা, অমন ভদ্রলোক, শিক্ষিত, কিন্তু ওই খুঁৎটিতে তাঁর আখের মাটী ক'রে দিয়েছে, কোনও ভাল পোষ্ট মিলবে না!"

আজ তাঁকে পাকা uniformএ (উর্দীতে) পেয়ে নবনী মনে মনে খুসীও হয়েছিল, আশ্চর্য্যও কম হয়নি। মতি বাবু তার সঙ্গে পূর্ব্বের মত আলাপ না করায়, congratulate করার (আনন্দ প্রকাশের) সুবিধা পায়নি। ভাবছিলো, ভদ্রলোক হতাশ হয়েই বোধ হয় যোগে আত্মনিয়োগ করেছিলেন,—ধর্ম্মকথাই ভালোবাসেন। তাই এত তন্ময়। যাক্—ভগবানের কৃপায় এখন ভালো চাকরীই যোগাড় ক'রে ফেলেছেন—বড় ভালো হয়েছে।—

পরে আচার্য্য মশাইকে সহজ সুরেই বললে—"যোগ্য হয়েই মরার কাষ পড়েছে,—ভগবানের কৃপা,—না হ'লে বধিরের চাকরী হওয়ার মধ্যে বাধা অনেক। জানি না, উনি কি ক'রে ঢুকলেন ?"

"তুমি ছেলেমানুষ, তাই ও কথা ভাবছো। আমাদের চাকরীর যে ওইটাই প্রধান qualification হে। ওর ভাগও ভালো। গালাগাল আর সত্যি কথা না শুনতে পাওয়াই ত দরকার। খবরের কাগজে দেখনি—উন্নতি কাণ ধরেই এগোয়। যার কানহজমের বালাই নেই, সেই ত 'বাহাদুর।' চাকরী করবে—এ সব স্মরণ রেখো।"

—মতি বাবু ছোট কথা শুনতে পান না, অন্যদিকে চেয়ে চললেন। মাঝে একবার ব'লে উঠলেন,—"জঙ্গলের দিকে বেড়াতে গিয়ে—ওই আপনারা যে পথে বেড়াতেন, যে দিকে আমাদের সঙ্গে প্রথম দেখা,—দেখলুম, একটা যায়গা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর সেখানে কাঠগড়ার মত কি একটা খাড়া হয়েছে! বেশ হিসেব ক'রে তয়েরি,—দেখেছেন কি? ওটা কি বলুন দিকি ?" এই ব'লে তার বর্ণনা করলেন।

আচার্য্য মশাই একটু চিন্তিতভাবে ভ্রূ কুঁচ্‌কে বললেন,—"এখানে বড় তান্ত্রিক কেউ আছেন না কি ?—যা বলছেন, ঠিক তাই যদি হয়,—সে যে আজকাল বিরল! এমন সাধক আর কৈ!"

মতি বাবু ব্যগ্রভাবে বললেন,—"কেন,—কি বলুন দিকি ?—ওটা কি ?"—

"যা বললেন, তাতে ত ওটা সিদ্ধ-তন্ত্রের বাসবীমুদ্রার দাঁড়ায়। 'মাথা-কাটা ওপস্তার' আসন বলেই সন্দেহ হয়। না—তা হবে না, তত বড় তান্ত্রিক বাংলায় আর কৈ,—দ্রাবিড়ে বা গুর্জ্জরে যদি কেউ থাকেন। ও সাঁওতালদের হিঁদু একটা টেঁকি-কল্‌চর্ন্‌ হবে।"

. মতি বাবু আগ্রহ-সঙ্কোচ ক'রে বললেন—"যাই হোক্—আমি ত থাকতে পারছি না, নতুন চাকরী,—কালই অমলুকে চললুম। আপনাদের সখ থাকে ত দেখবেন—তাই বললুম। ও-কাযের দিনক্ষণ আছে না কি ?"

"তা ত থাকেই—যে-সে সাধনা ত নয়। অমাবস্যাই প্রশস্ত। এই ত কদিন পরেই—"

মতি বাবু সহজভাবেই হাসতে হাসতে বললেন—"আমি ত চললুম, থাকলে দেখা যেতো।"

নবনী নির্ব্বাক্ হয়ে শুনছিল। মতি বাবুর চোরা-চাউনি কিন্তু তার মুখের ওপরই ছিল।

আচার্য্য উচ্চকণ্ঠে নবনীকে বললেন—"সাধুসঙ্গ এইজন্যেই ত দরকার,—কত বড় কথাটা কাণে এনে দিলেন।—দুর্ল্লভ প্রাপ্তি।" মতি বাবুর দিকে ফিরে বললেন,—"তাই ত, থাকতে পারবেন না? তা হোক্,—যে চাকরী মিলেছে, চতুর্ব্বর্গ ত এখন হাতেই,—দয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, পরমার্থ এক গোয়ালেই বেঁধেছেন। চাকরী বজায় আগে।—"

—"যে-চর্চ্চায় ইচ্ছাশক্তির বল যে এখন ক'মে গেছে, তবু একবার প্রয়োগ ক'রে দেখবো—আপনাকে টেনে আনতে পারি কি না,—প্রস্তুত থাকবেন কিন্তু।"

মতি বাবু জোরগলায় বললেন,—"অসম্ভব।"

"গুরু-কৃপা থাকলে,—অসম্ভব কিছুই নেই মতি বাবু।"

মতি বাবু ঈষৎহাস্য-মিশ্রিত গাম্ভীর্য্যে বললেন,—"এখন একটি বছর এমুখো নয়। আচ্ছা, চললুম,—নমস্কার। রাত্রেই সব গুছিয়ে রাখতে হবে।"

আচার্য্য বললেন—"চা'টা খেয়ে যাবেন না? preparationটা যে বড় পছন্দ করতেন।"

বোধ হয় শুনতে পেলেন না,—চ'লে গেলেন।

আচার্য্যমশাই নবনীকে বললেন—"কৈ হে, তোমার জেণ্টেল্‌ম্যান্ যে তোমার দিকে একবার ফিরেও চাইলেন না,—একটা কথাও কইলেন না!"

নবনী বললে,—"কেন বলুন দিকি ?—কখনও যেন দেখেন নি! কারণ ত বুঝতে পারলুম না। বোধ হয় বড় ব্যস্ত আছেন, চ'লে যাচ্ছেন কি না।"

আচার্য্য বললেন,—"লোকের সর্ব্বনাশ করবে আর বুঝবে না। খুব লোক ত!"

নবনী অবাক্ হয়ে গেল।—"আমি?"

"মীরা দেবী ত ওঁরই হোতো,—সম্প্রদানটাই বাকি ছিল, তুমি যে এক দিনেই ওঁকে হটিয়ে দিলে। ভদ্রলোককে কত বড় মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়েছ বল দিকি? কি সর্ব্বনেশে রূপ নিয়েই জন্মেছ!

কলকেতার Retouching (চান্‌কানো) সেরে এসেছ! আবার কি ঘটাবে, জানি না।"

আচার্য্য মশাই কয়েক দিন পরে নবনীকে পেয়ে দু'টো কথা কয়ে বাঁচবেন ভেবেই—রসের রাস্তা ধরেছিলেন।

মীরার নামটা নবনীকে যেন বিদ্রূপের মত বিঁধলে। যে মানসিক অবস্থা নিয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়েছিল, মুহূর্ত্তে তাকে সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিলে। সে বিরক্তি-কাতর কণ্ঠে বললে,—"সব জেনে শুনে ও কথা তুলে আমাকে কেন আর বিদ্রূপ করছেন? বাসায় আপনাকে না পেয়ে, বড় বিক্ষিপ্ত চিত্ত নিয়ে আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম—একটু শান্তির আশায়—"

আচার্য্য বুঝলেন—নবনী দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছে, সুতরাং তার মনের অবস্থা যে কি, তাও বুঝলেন। সত্যই তাকে আঘাত করা হয়েছে। নবনীকে তিনি ভায়ের মতই ভালবাসেন।—

তাকে কাছে টেনে গায়ে হাত দিয়ে বললেন— "আমাকে মাপ করো ভাই, আমি ব্যথা দেবো ব'লে বলিনি,—আমার স্বভাব ত জান, নবনী!"

একটু কোমল স্পর্শ পেয়েই নবনীর চোখে জল বেরিয়ে এসেছিল। চোখ মুছে বললে,—"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,—দিদিকে এমন দেখলুম কেন?—এ অবস্থায়—" আর সে বলতে পারলে না।

আচার্য্য সস্নেহে বললেন,—"তাঁর পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য ক'রে আমার মত বে-পরোয়া লোকেরও বড় ব্যথা লেগেছে ভাই,—তোমার ত লাগবেই। অথচ এমন কিছুই নয়। তবে কি না—হিসেবের গোল পণ্ডিতে না হয় আদালতে মেটাতে পারে, —মাথা ঘামিয়ে। তার একটা মাপকাঠি আছে,—পাঁচ আর সাতে সব দেশেই বারো হয়। কিন্তু মনের গোলের মাপ-কাঠি নেই,—তাই মনের হিসেব মনের বাইরে মেটে না, তার আপীল আদালত হৃদয়ে,—মাথা বাদ দিয়ে। যত গোল ত তাই।

বাসার গেটে পৌঁছে আচার্য্য মশাই বললেন,—"চলো, চা খেতে খেতে সব বলছি। অত বিচলিত হয়ো না, নবনী! ভেব না—ও সব মিটে যাবে।"

"দিদি যে আর এক দণ্ডও এখানে থাকতে চাচ্ছেন না।"

"তা আমি জানি।"

মত্তি বাবু লম্বা পা ফেলে প্রফুল্লচিত্তে চলতে চলতে একটা মোড়ের বাঁকে পৌঁছে, হ্যাট হাতে ক'রে আচার্য্য আর নবনীর গন্তব্য দিক্‌টা ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে নিয়ে ক্রূরদৃষ্টিতে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁরা বাসার গেটে ঢুকলে, মত্তি বাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে আপন মনে আত্মপ্রসাদ আস্বাদ করতে করতে ডাকবাংলোর দিকে রওনা হলেন।

মনের উত্তেজনায় এক একটা কথা তাঁর অজ্ঞাতেই বাইরে বেরিয়ে আসছিল।—"দেখা যাক্ মীরারাণীর মনচোরের শুভ বরযাত্রাটা কোথায় হয়!—বড় কটক্‌দার রাজবাড়ীতেই হওয়া উচিত!"—'দড়ি দে বেঁধেছি' বলে না!—সেটাও ত চাই!—অ্যাবেটার (জুড়িদার) ত বটেই?—

—"ওই shrewed beggar আচার্য্যটা ভাবে—আমি ওর কথা বিশ্বাস করি! খুব নিজেকে মস্তো চালাক্ মনে করে! বাসবী-মুদ্রা বার করবে এই বধির শর্ম্মা!—

—"বেটা বলে আমাবস্তে, প্রশস্ত দিন! কখনই না, a bluff ধাপ্পাবাজি। নিশ্চয় তার আগেই কাষ সারবে, বড় জোর চতুর্দ্দশী। সেই রাত্রেই সট্‌কাবে—সিংহলযাত্রা!—হুঁঃ, তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি, বন্ধু!—সাগরপারেই পাঠাবো।"

মত্তি বাবু মনের আনন্দে—হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।—"এই কালা-ই মালা পরাবে!"

কল্পনা কম আনন্দ দেয় না। সাফল্যের আনন্দে মত্তি বাবু একলাকে ডাক্‌বাংলোর দাওয়ায় উঠে পড়লেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৈত্রেয়ী ও আত্মতত্ত্ব

(আলোচনা)

ভারতের গৌরব-সমৃদ্ধ অতীত ইতিহাস যে সব পুণ্য-শীলা মহীয়সী নারীর কীর্ত্তির অবদানে সমুজ্জ্বল, মৈত্রেয়ী তাঁহাদের অন্যতমা। মৈত্রেয়ী-চরিত্রে ভারতের বিশেষ প্রকৃতি অলক্ষ্যে আপনার বিশিষ্ট ছাপ মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে, কাযেই জগতের আর কোনও নারী-চরিত্রের পাশে মৈত্রেয়ীকে দাঁড় করান যায় না। মৈত্রেয়ীর জীবনে ভারতবর্ষীয় সাধনার ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ রূপ ও একটি বিশেষ ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে। মৈত্রেয়ী-চরিত্রের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও অতুলনীয় আদর্শ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আমাদিগকে বর্ত্তমান কল-কোলাহল, জীবনের দ্বন্দ্ব ও হানাহানি ভুলিয়া স্বপ্ন-মদির গতিমন্থর ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবন-ধারার মাঝে পুনরায় জাগিতে হইবে।

সমস্ত জগতের বক্ষে তখন এমন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ও হাহাকার জাগে নাই, মানুষে মানুষে সংঘর্ষ জটিল হইয়া উঠে নাই। শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে মানুষের দিন একটানা আনন্দের স্রোতে তখন বহিয়া যাইত। চারিদিকে অজস্র প্রাচুর্য্য, চারিদিকে অফুরন্ত উৎসব। সেই আনন্দ-মধুর দিনে ভারতের শান্তরসাস্পদ তপোবনে আরণ্যক জীবনের পুলকোচ্ছ্বাসের মাঝে মৈত্রেয়ীর অনুপম চরিত্র বিকসিত হইয়া উঠে।

বৈদিক যুগে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসাধনার তিনটি স্তর দেখা যায়। সদ্যোজাগ্রত শিশুর চোখে সুন্দর বিশ্বের চারু ছবিখানি যেমন অপূর্ব্ব অননুভূত এক বিপুল পুলকের সঞ্চার করিয়া থাকে, তেমনই বৈদিক ঋষির প্রথম ধর্ম্মবোধদীপ্ত অন্তরে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর অন্তরালে যে অজ্ঞেয় অসীম লীলা করে, তাহার আভাস জাগিয়া উঠিলে ঋষি-পুলকিত-ছন্দে অগ্নি, পবন, আকাশ প্রভৃতির জয়গান গাহিতে লাগিলেন।

সাধনা যখন গভীরতর হইল, তখন ঋষি বুঝিলেন, সমস্ত দেবতাই এক দেবদেবের বিভূতিমাত্র। এক দেবতার বিভিন্ন প্রকাশ ও আবির্ভাবই ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নামে পূজিত হয়। তত্ত্ববিদ্ ঋষি ধ্যানসমাধিতে অবগত হইলেন—

> ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিম্ আহুঃ
> অথো দিব্যঃ সঃ সুপর্ণো গরুত্মান্
> একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
> অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ।

অর্থাৎ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি মূলে এক। কেবল দ্রষ্টা ঋষি তাঁহাদিগকে বিবিধ ও বিভিন্ন উপাধিতে পরিকল্পিত করিয়াছেন।

কিন্তু এখানেও যাত্রা শেষ হইল না। অনির্ব্বচনীয় যিনি, তাঁহাকে এখানে শক্তিমান এক দেবতারূপে ভাবা হইতেছে। কিন্তু পরে উপনিষদের যুগে গভীর সাধনায় জগতের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ঋষিরা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন। ইহাই বেদের সারভাগ, এক কথায় ইহাকে বেদান্ত বলা হয়।

উপনিষদের এই ব্রহ্মসাধনার গৌরবোজ্জ্বল যুগে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ভারতবর্ষের ধূলিকে পবিত্র করেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের খ্যাতি বৈদিক সাহিত্যে অসামান্য। বৃহদারণ্যক নামক সুবিখ্যাত উপনিষদের তিনিই প্রধানতম উপদেষ্টা। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা তাঁহার সাধনা ও চিন্তায় গভীরভাবে পুষ্ট হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে তাঁহাকে বাজসনেয় বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য-প্রবর্ত্তিত শুক্ল যজুর্ব্বেদকে বাজসনেয়-সংহিতা বলা হয়। মনে হয়, যাজ্ঞবল্ক্যের কোনও পূর্ব্বপুরুষের নাম বাজসান ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সময়ে সকলের অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

জনক রাজা এক সময়ে সমসাময়িক ঋষিগণের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মিষ্ঠ, জানিতে সমুৎসুক হইয়া এক যজ্ঞ করিলেন। সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ-বিশিষ্ট সহস্র গাভী রাখিয়া জনক সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে বলিলেন, "হে ভূদেবগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনিই এই সকল গাভী গ্রহণ করুন।"

বিরাট সভাক্ষেত্রে নানাদেশাগত ব্রাহ্মণগণের কেহই সাহসী হইলেন না। পরমজ্ঞানী আত্মবিশ্বাসী যাজ্ঞবল্ক্য নির্ভয়ে সামশ্রব শিষ্যকে গাভী লইয়া যাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন জনকের সভায় দর্শনের কূট সমস্যা লইয়া অশ্বল, আর্ত্তভাগ, ভুজ্যু, উষস্ত, কহোড়, উদ্দালক ও শাকল্য নামক ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণের সহিত ও বাচক্নবী গার্গীর সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিষম বিচার-প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তাহাতে একে একে সকলেই

যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞানের বিরাট প্রভাবে প্রতিনিবৃত্ত হন। উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু, কিন্তু তিনিও যোগ্য শিষ্যের হাতে আনন্দোৎফুল্লচিত্তে পরাজয় বরণ করিলেন। এই বিদেহনিবাসী অসামান্য ঋষির অসামান্যা পত্নী মৈত্রেয়ী।

মৈত্রেয়ীর সাধারণ জীবনের বিশেষ পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। তাঁহার শৈশবের শিক্ষা ও দীক্ষার, তাঁহার যৌবনের প্রেম ও প্রীতির, তাঁহার নারীজীবনের সুখ ও দুঃখের পসরা-ভরা দিনগুলির কোন সংবাদই উপনিষৎকার ঋষির হাত হইতে আমাদের দ্বারে উপনীত হয় নাই।

তাঁহার জীবনে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে ও কোথায় ব্রহ্মপিপাসার মধুময় বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কেমন করিয়া দিনে দিনে তপোনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ পতির সহবাসে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। ঋষিকন্যাগণের সহবাসে তপোবনের স্নেহাবেষ্টনে যে মৈত্রেয়ী হাস্য ও লাস্যে দিগন্ত মুখরিত করিতেন, ঋষিবধূ হইয়া ত্যাগ ও সংযমোজ্জ্বল যে সুপবিত্র ও শুচিসুন্দর জীবন তিনি যাপন করিতেন, কল্পনায় তাহার মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করা ছাড়া উপায় নাই।

আমরা যখন মৈত্রেয়ীকে দেখি, তখন তিনি ব্রহ্মবাদিনী অমৃত-রস-পিপাসাতুরা মহীয়সী নারী। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রশ্নোত্তর, তাঁহার অমৃতত্বের প্রতি আসক্তি আমাদিগকে মুগ্ধ ও চকিত করিয়া তুলে। বিস্ময়ে ভাবিতে বসি, ইহা কি কবিকল্পনা না বাস্তব ঘটনা?

কিন্তু ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার মাপকাঠীতে মাপিলে মৈত্রেয়ীর জীবনে অসামান্যতা থাকিলেও অসম্ভাব্য কিছুই নাই। ধর্ম্মৈকনিষ্ঠ ভারতবাসীর মাঝেই মৈত্রেয়ীর মত পুণ্যশীলা নারীর আবির্ভাব হইতে পারে। মৈত্রেয়ীকে তাই কবির মানসী সৃষ্টি বলিয়া মানিতে অন্তর সাড়া দেয় না—মৈত্রেয়ীকে সত্যকার নারী ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ঋষিপত্নী বলিয়া ভাবিতেই আমরা উল্লসিত হই।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন;—কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। কাত্যায়নী ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ধার ধারিতেন না, সাধারণ স্ত্রীলোকের মত ঘর ও সংসার লইয়া তাঁহার দিন কাটিত। কাত্যায়নীকে তাই স্ত্রীপ্রজ্ঞা বলা হইয়াছে। মৈত্রেয়ী কিন্তু বৈরাগ্য, ত্যাগ ও মুমুক্ষুতাকে জীবনে অনুভব করিতে শিখিয়াছিলেন। যোগ্য স্বামীর যোগ্যা স্ত্রী, শাস্ত্রে তাই ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে তখন চতুরাশ্রমের অব্যাহত প্রভাব। গৃহীর সুকঠোর কর্ত্তব্য-নিচয় সম্পন্ন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন সংকল্প করিলেন। কিন্তু বানপ্রস্থ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রিয়তমা পত্নীগণের মধ্যে নিজের যৎসামান্য যে সম্পত্তি ছিল, তাহা বণ্টন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

কাত্যায়নীর ইহাতে বিষাদ বা অপরিতৃপ্তির হেতু ছিল না। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি যাপন করিবার মত ধনৈশ্বর্য্য বুঝাপড়া করিয়া লইবার জন্য কাত্যায়নী ব্যগ্র রহিলেন; কিন্তু মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্য শুনিয়া প্রশ্ন করিলেন;—"হে প্রভু, যদি এই সসাগরা ধরণী বিত্তে পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে কি আমি অমৃত হইতে পারিব?"

যাজ্ঞবল্ক্য প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। স্নেহগদ্গদ স্বরে জানাইলেন যে, ধন ও সম্পৎ অমৃত-সুধা আহরণ করিতে পারে না।

মৈত্রেয়ী তখন হাস্য-বিভাত প্রফুল্ল কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?"

যাহাতে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহা দ্বারা আমি কি করিব?

কত সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এ মহাবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি কালের ব্যবধান ও সমস্ত বিবর্ত্তনের ব্যবধানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের এই শাশ্বত সুর আমাদের কর্ণে মধুধারা ঢালিয়া দেয়। এ যেন আমাদের কত পরিচিত সুর। আমাদের জীবনে ও ধর্ম্মে, আমাদের শিল্পে ও সাহিত্যে, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষায় এই অমৃতত্বের সুর চিরন্তন ধ্বনিত হইয়াছে। ভারতের ইহাই 'kultur', ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য, ইহাই তাহার সভ্যতা ও সাধনা।

ভারতবর্ষ সাম্রাজ্য চাহে নাই, ভারতবর্ষ বিজয়কীর্ত্তি চাহে নাই, ভারতবর্ষ গৌরব ও অহঙ্কারের সীমাকে বাড়াইয়া তুলিতে চাহে নাই। মৃত্যুর কোলে সে অমৃতের পূজা করিয়াছে, দুঃখ ও লাঞ্ছনাকে উপেক্ষা করিয়া দারিদ্র্য ও দৈন্যকে বরণ করিয়াছে। ভারতবর্ষ অমৃতত্বের কাঙ্গাল। ভিখারী শিব তাহার দেবতা, জীবনের বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠের মত অমৃত জাগরণের জন্যই তাহার তপস্যা। কাম ও কামনা

তাহার তপস্যার অগ্নিশিখায় দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সংস্কারের বেড়াজাল ভাঙিয়া, সংসারের দুর্ব্বিষহ দাবদাহকে পশ্চাতে ফেলিয়া, অসীমের সহিত সসীম জীবনের ঐক্য করিয়া দিতেই ভারতের যোগী ও সাধক সাধনা করিয়া চলিয়াছেন।

মৈত্রেয়ীর বাণী তাই ভারতবর্ষের বাণী। ভারতের অন্তরাত্মা আজিও যেন মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতেছে, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্ ?" মৈত্রেয়ীর কাহিনী তাই আমাদের অনবদ্য আনন্দের উৎস, অফুরন্ত উৎসাহের ভিত্তি, অশেষ অনুরাগের বস্তু।

যাজ্ঞবল্ক্য প্রিয়তমা পত্নীর এই অপূর্ব্ব প্রশ্ন ও উত্তর শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দসাগরে যেন ডুবিয়া গেলেন। ঋষির মনেও যেন যৌবনের হারানো সুর জাগিয়া উঠিল। প্রীতিসিক্ত ভাষায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে মৈত্রেয়ি, তুমি আমার পরম প্রিয়পাত্রী ছিলে, তোমার মধুর বাক্যে আমি আরও প্রীত হইলাম। এস, তোমায় অমৃত-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইব।"

যাজ্ঞবল্ক্য তখন মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। ঋষি বলিলেন, পতি, পুত্র, জায়া তাহাদের নিজের জন্য প্রিয় নয়, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি, পুত্র, জায়া প্রিয় হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ, দেবতা ও প্রাণী, কেহই নিজের জন্য প্রীতিভাজন নয়, আত্মার প্রীতির জন্যই সর্ব্ববস্তু ও সর্ব্বপ্রাণী প্রিয়। অতএব এই আত্মাকে জানিতে হইবে।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

হে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। কারণ, আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানের দ্বারা এই সমুদায় জ্ঞাত হওয়া যায়।

আত্মতত্ত্ব ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তার গভীর সাধনার ধন। আত্মা কথার প্রথম অর্থ ছিল নিশ্বাস, পরে আত্মা দেহ ও প্রাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরে চিন্তা ও ধারণার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি বা পুরুষকে বুঝাইতে আত্মা কথার প্রয়োগ হইতে লাগিল।

পরে দার্শনিক জিজ্ঞাসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মা এক অপূর্ব্ব সংজ্ঞা ও অভিধা ধারণ করিল—যাহা সহজে বুঝান যায় না। গীতাকার এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন :—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্যবৎ বলে, কেহ অদ্ভুত বলিয়া দেখে, কেহ অপূর্ব্ব বলিয়া শোনে; কিন্তু শ্রুতিগোচর করিয়াও আত্মার বিষয়ে কেহই কিছু জানিতে বা বুঝিতে পারে না। কারণ, আত্মা দুর্জ্ঞেয়।

এই আত্মা বলিতে কেবল ব্যক্তির অন্তর্য্যামী পুরুষ বুঝিলে ভুল করা হইবে, দেহের ক্ষুদ্রনীড়ে তাহার বাসা হইলেও নীড়ের বাহিরে বিরাটের পানে তাহার লুব্ধ দৃষ্টি। নীড় ভাঙিলেই এই জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়। মৃত্যুহীন, ক্ষয়হীন, অক্ষর ও অমর যে শক্তি, তাহাই আত্মা, বিশ্বভুবনকে এই আত্মা ওতপ্রোত করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের মনে যে অন্তর-দেবতা কাম করিয়া চলেন, অসীম ও অজ্ঞেয়ের সহিত তাহার সুনিবিড় সম্বন্ধ। জাগতিক বস্তুসত্তাকে যখন খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি, তখন তাহাদিগকে জানিতে পারি না, কিন্তু যখন বুঝি, তাহারা এক অখণ্ড আনন্দরূপ আত্মা, তখনই অজ্ঞানের তমোজাল খুলিয়া যায় আর সত্যের দিব্যোজ্জ্বল রূপের সম্মুখে আমরাও অনন্ত আনন্দে আপ্লুত হই।

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রজাপতি-ইন্দ্র-সংবাদে এই আত্মতত্ত্বের উদ্ভবের একটি চমৎকার ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন, "জরা, মরণ, দুঃখ, শোক, পাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা যাহাকে স্পর্শ করে না, সেই আত্মাকে খুঁজিতে হইবে।" ইন্দ্র প্রথম জানিলেন যে, দেহ আত্মা নহে। কারণ, দেহের বিনাশ আছে, আত্মার নাই। ইন্দ্র ক্রমান্বয়ে আত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার কথা শুনিলেন।

প্রজাপতি বুঝাইলেন, স্বপ্নাবস্থায় আত্মার স্বরূপ প্রকট হয়, কারণ, আত্মা তখন শরীরের বন্ধন ছাড়িয়া অনেকটা মুক্তাবস্থায় ভ্রমণ করে। কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে তৃপ্ত হইলেন না। কারণ, স্বপ্নের কল্পনা আত্মাকে পীড়িত ও ব্যথিত করে। স্বপ্নাবস্থায় মানুষ চিন্তাধারার

প্রজাপতি তখন বলিলেন, সুষুপ্তিতে আত্মার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থাকে না, জ্ঞেয় বস্তু থাকে না, কিন্তু সুষুপ্তির পূর্ব্বে জ্ঞান থাকে, পরেও থাকে, এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের মধ্যে জ্ঞানের স্থিতি আত্মার নিত্যতার প্রমাণ। ইন্দ্র বলিলেন, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, বিষয় ও বিষয়ী যদি না থাকে, তাহা হইলে সুষুপ্তিকালে আত্মা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তখন প্রজাপতি বুঝাইলেন, বিষয়কে যিনি জানেন, যিনি জ্ঞান লাভ করেন, চক্ষুর যিনি চক্ষু, শ্রোত্রের যিনি শ্রোত্র, তিনিই আত্মা। বিষয়ী আত্মা যখন শরীরের সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করে, তখনই দুঃখ ও হর্ষ তাহাকে অভিভূত করে, শরীরের সহিত আপনার ভিন্নতা জানিলেই আত্মার দুঃখ-ক্লেশ তিরোহিত হয়।

উপনিষদের মতে আত্মা অসীম, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, চৈতন্যময় ও বিজ্ঞানময়। সমস্ত বিকল্প ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আত্মা আপন জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া আনন্দরূপে বর্ত্তমান থাকে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া কিছু ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ গঠিত হইয়াছে। কাহারও মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ, অদ্বৈত আত্মাই একমাত্র তত্ত্ব। অপরে বলেন যে, সর্ব্বাধার অথচ পরমাত্মার বাহিরে বা অতিরিক্ত কিছু না থাকিলেও, ব্যষ্টি চৈতন্যের পৃথক্ পারমার্থিক অস্তিত্ব থাকে।

আত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ লইয়া অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত ও সাধন-প্রণালী গঠিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভবপর নহে।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে আত্মা অদ্বৈত, বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, সসীম ও অসীম, সান্ত ও অনন্ত, খণ্ড ও অখণ্ড।

আত্মা বৈচিত্র্যময় বিশ্বের অনন্ত বস্তুর মধ্যে একটিমাত্র বস্তু নহে, সকল বস্তু আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও আত্মায় বিসর্পিত। আত্মাকে না জানিলে ও আত্মার সহিত বিভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধ না জানিলে সম্যক্ জ্ঞান হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আত্মতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া বস্তুর ও বিশ্বের জ্ঞান-লাভের প্রয়াস বৃথা। সত্য এরূপ মিথ্যারম্ভকারীর নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য তাই মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিলেন, যে ব্যক্তি ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ভূতসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করে; যে ব্যক্তি সমুদায় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, সমুদায় বস্তু তাহাকে ত্যাগ করিবে।

"ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোকসমূহ, ভূতসমূহ, বস্তুসমূহ প্রভৃতি সকলই আত্মা।

যাজ্ঞবল্ক্য পরে কতিপয় উপমা দ্বারা বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ বুঝাইলেন। ঋষি তাড্যমান দুন্দুভি, বাদ্যমান শঙ্খ, বাদ্যমান বীণা ও ধূমায়মান অগ্নির উদাহরণ দিয়া বক্তব্যটিকে সরল করিয়াছেন। দুন্দুভি, বীণা ও শঙ্খ যখন বাজান যায়, তখন যেমন বিনির্গত শব্দকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু যন্ত্র ও বাদককে গ্রহণ করিলেই এই শব্দ পাওয়া যায়, তেমনই আত্মা হইতে উদ্ভূত এই বিশ্বচরাচরকে স্বতন্ত্রভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, আত্মা বিদিত হইলেই সকলই বিদিত হয়। অগ্নি হইতে যেমন ধূমের পৃথক্ ও স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, তেমনই বিষয়ী ও জ্ঞাতা আত্মা হইতেও বিষয়ের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। পৃথিবীর যাহা কিছু, সকলই আত্মা হইতে নির্গত হইয়াছে, সকলই আত্মা হইতে নিশ্বসিত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যেমন সমুদ্র জলের একায়ন, ত্বক্ স্পর্শের একাশ্রয়, নাসিকা গন্ধের একাধার, জিহ্বা রসের একায়ন, চক্ষু রূপের একায়ন, শ্রোত্র শব্দের একায়ন, মন সংকল্পের একায়ন, হৃদয় বিদ্যার একায়ন, যেমন অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্মের মধ্যে আশ্রয় ও আশ্রিতের সম্বন্ধ, তেমন আত্মাও সমুদয় বিশ্বের একায়ন, তেমন আত্মা ও বিষয়ের মধ্যে আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যেমন সৈন্ধবখণ্ড সলিলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলে বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু যেখান হইতেই জল লওয়া যায়, তাহা যেমন লবণাক্ত হয়, তেমনই এই মহাভূত অনন্ত, অপার, বিজ্ঞানঘন। মহান্ আত্মা এই সমুদায় ভূত হইতে উত্থিত হইয়া তাহাতেই আবার বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর আত্মার আর সংজ্ঞা থাকে না।

মৈত্রেয়ী শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনিলেন। মৃত্যুর পরে আত্মার কোনই সংজ্ঞাই থাকিবে না, জ্ঞান, প্রেম, চৈতন্য, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি আত্মার শ্রেয় শক্তি যদি না-ই থাকে, তবে সংজ্ঞাহীন আত্মার অনন্ত অস্তিত্বে কি প্রয়োজন?

মৈত্রেয়ী তাই সঙ্কোচ ও শঙ্কার উত্তর দিলেন, "ভগবন্, মৃত্যুর পর সংজ্ঞা থাকিবে না, ইহা বলিয়া আমায় কেন মোহ-গ্রস্ত করিতেছেন ?"

যোগিসত্তম যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে প্রেয়সি ! আমি মোহজনক কিছুই বলিতেছি না। আত্মা অবিনাশী ও উচ্ছেদ-বিহীন।"

জীবিতকালে মানুষের জ্ঞানে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার, বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ থাকে, কিন্তু মৃত্যুর পরে এই ভেদ চলিয়া যায় ; সুতরাং কোন জ্ঞানই থাকে না। জ্ঞানের জন্য জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা থাকা চাই।

মৃত্যুতে জ্ঞেয় জগৎ থাকে না, কাজেই আত্মাও জ্ঞান-গোচর থাকেন না। যাজ্ঞবল্ক্য তাই বলিতেছেন, "যে স্থলে মনে হয়, দ্বৈত রহিয়াছে, সেখানেই এক জন অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দর্শন, শ্রবণ, অভিবাদন, মনন করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখনই সমুদয় আত্মময় হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে ঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে দর্শন, শ্রবণ, অভিবাদন বা মনন করিবে, কে কাহাকে জানিবে ? তখন আর জানিবার পথ থাকে না। যাহা দ্বারা এই সমুদায় জানা যায়, তাহাকে কেমন করিয়া জানিবে ? হে মৈত্রেয়ি, কেমন করিয়া বিজ্ঞাতাকে জানিবে ?"

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর পরমরমণীয় আধ্যাত্মিকা এখানে শেষ হইল। ভারতবর্ষের নারী ধন, জন, সম্পদ্ ও বিলাসের মোহ ভুলিয়া অমৃতত্বের রসধারা চাহিয়াছিলেন, ইহা কল্পনা করিতেও মন অপূর্ব্ব আনন্দরসে সিক্ত হয়। ভারতবর্ষের নারীকে যাঁহারা শুধু পরিচারিকা করিয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, ভারতবর্ষের নারী পুরুষের সহধর্ম্মিণী। সত্যের ও জ্ঞানের চিরবর্দ্ধমান যাত্রাপথে পুরুষের প্রিয় সহচরী নারী। তমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে পুনরায় মৈত্রেয়ীর ন্যায় ব্রহ্ম-বাদিনী নারীর আবির্ভাব হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট আত্মতত্ত্ব সকলকে তৃপ্ত করে না। কেহ কেহ বলেন, বিষয়-সম্পর্কহীন নিরালম্ব আত্মার অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। আত্মার অসীমরূপে ও সমষ্টিরূপে যে প্রকাশ, তাহা যেমন সত্য, আত্মার ব্যষ্টি ও সসীমরূপে প্রকাশও তেমনই সত্য। অসীম জ্ঞানময় পরমাত্মা যেমন স্থায়ী পার-মার্থিক সত্তা, সসীম জীবাত্মাও তেমনই স্থায়ী পারমার্থিক সত্য। জ্ঞেয়-জ্ঞাতায় ভেদহীন আত্মার যে অস্তিত্ব, তাহা সম্ভব নহে কিংবা সম্ভব হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে। ব্যষ্টি-চৈতন্ত তিরোভাবের সময় সমষ্টি-চৈতন্তে বিলীন হয়, কিন্তু ব্যষ্টি তাহার সমস্ত ভেদ লইয়া পরমাত্মায় অবস্থিতি করে। পরমাত্মার জ্ঞানে ভেদ আছে, তাহা না হইলে জগতে ভেদ প্রকাশিত হইতে পারিত না, কারণ, যাহা নাই, তাহা নাই, যাহা আছে, তাহা আছে। গীতাও ইহা বলিয়াছেন :—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

অতএব বিষয় ও সসীম বিষয়ী স্থায়ী ও পারমার্থিক বস্তু। এই উক্তি ভেদাভেদবাদীর। তাঁহাদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নির্ব্বিশেষ ও অভেদ বস্তু নহে। তাঁহাদের মতে জীবাত্মা পরমাত্মার সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য লাভ করে, কিন্তু একবারে পরমাত্মায় লীন হইয়া যায় না।

কিন্তু অদ্বৈতবাদীদের মতে যখন মুক্তিলাভ হয়, তখন জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলাইয়া যায়। তখন সকল এক হইয়া যায়—সর্ব্বে একীভবন্তি'। বিবর্ত্তনশীল এই জগতে দ্বন্দ্ব হইতে সৃষ্টি ও প্রকাশক্রিয়া চলিতেছে, কিন্তু অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্ম-লোকে বৈচিত্র্য ও বাহুল্য চলিয়া যায়। এক অচিন্তনীয় উপায়ে আত্মার সমস্ত শক্তি তিরোহিত হইয়া আত্মা এক অসীম, অপরিবর্ত্তনীয় অখণ্ড জগতে পরমপরিপূর্ণতায় ও গভীরতম আনন্দে অবস্থান করে। সেই অপূর্ব্ব অবস্থা মানুষের ধারণায় আসে না। মানুষের কল্পনা এখানে ব্যর্থ হইয়া যায়। সেই অনির্ব্বচনীয় জগতের অবস্থা বর্ণনা করা তাই মানুষের ভাষায় সম্ভবপর নহে।

কিন্তু এ অবস্থা যাহাই হউক, ইহা মৃত্যু নহে, ইহা বিনাশ নহে, ইহা ক্ষয় নহে, জীবাত্মা পরমাত্মার চৈতন্তে ভেদ-ভাবেই বলুন আর অভেদভাবেই বলুন, সে অবস্থা আনন্দঘন ও অমৃতময়। আত্মতত্ত্ব জানিলেই তাই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। তাই ত ঋষি বড় গলায় বলিয়াছেন—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥"

বাক্য যাহাকে জানে না, মনও যাহার কাছে পৌঁছায় না, সেই আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিলে কোথাও ভয় থাকে না।

আত্মতত্ত্বই এই অভয়-মন্ত্র, এই আনন্দ-কবচ। এই আত্মা মহান্ ও অজ। আত্মাই অজর, অমর, অমৃত, অভয় ব্রহ্ম। এই অভয় ও আনন্দময়

জীবাত্মার প্রচেষ্টা। খণ্ডজীবনের খণ্ডপরিধির মাঝে তাই অখণ্ডতার আগ্রহ জাগিয়া ওঠে। অপূর্ণতার বেদনায় তাই পূর্ণতার জন্ম গুমরিয়া মরি।

বিশ্বজগৎ বিশ্বাত্মার অভিব্যক্তি, তাই বিশ্ব ভরিয়া সীমা অসীমতার জন্ম সাধনা করিয়া অসীমতায় মিশিতেছে। মানুষের প্রাণেও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনন্ত অসীমের আহ্বান জাগিয়া উঠে। মানুষ তখন সংসারের গাঢ় অন্ধকারে ব্যথিত হইয়া কাঁদিয়া উঠে আর বলে,"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমায় আলোয় লইয়া চল, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।" এ যাত্রার পথ প্রেমের ও কল্যাণের মধ্য দিয়াই বিস্তৃত।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত একই আত্মায় পরিপ্লুত। অতএব ঘৃণার বা দ্বেষের কিছুই নাই। সকলই আমি এবং আমিই সকল। কাযেই আমাদের দৃষ্টির প্রসার করিতে হইবে। প্রেমে যতই আমরা সকলকে আত্মীয় করিব, ততই অন্তের আত্মাকে জানিতে পারিব।

আর অসীম আত্মা যাহার উৎস ও আশ্রয়, জাগতিক বস্তু তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি কিছুই মানুষের চিত্তে শান্তি আনয়ন করে না। কেবল সচ্চিদানন্দময়কে জানিলে ও চাহিলে পূর্ণ শান্তি পাওয়া যায়। মুমুক্ষু মানুষ তাই শান্ত, দান্ত, উপরত ও সমাহিত হইয়া আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে। এই আত্মজ্ঞানের চেষ্টাকে ঋষি 'প্রাণারামম্ মন আনন্দম্ শান্তি সমৃদ্ধমৃতম্' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কল্যাণ-ঘন প্রেম-গভীর এই আত্মতত্ত্ব আমাদের অন্তরে আনন্দ-রসের সৃষ্টি করুক, আমাদের প্রাণে পূর্ণতার রূপ অভিব্যক্ত করুক।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীমতিলাল দাস (এম্, এ, বি, এল)।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির-প্রকাশিত বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রামাণ্য সংস্করণে ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর ব্রহ্মজ্ঞান-সিদ্ধান্ত ও বিচার সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞানপিপাসু পাঠক পাঠে শান্তিলাভ করিবেন।—সম্পাদক

মুক্তির অভিযান

(আনি বেসান্টের ইংরাজী কবিতা হইতে)

ঐ শোন ঐ অযুত সেনার দৃপ্ত পদধ্বনি,
গভীর নিদ্রা ত্যজিয়া ভারত জাগিতেছে রণরণি';
ডাকিছে সে—আয়, আয়।
অস্ত্র হানে না, দানে না মরণ, কাড়ে না কাহারো প্রাণ,
শোণিতে লেখে না লোহিত আখরে বিজয়ের অভিযান,
শান্তি-শঙ্খে ফুকারি' ফুকারি' মৈত্রী উচ্চে গায়;
মুক্তির উষা আজি তার উজলায়।
ন্যায়ধর্ম্মের বর্ম্মেতে ঢাকা সেনানীর কলেবর
সাধু যুক্তির কিরীচ সঙ্গে নহে তাহা ক্লেশকর,
সত্যনিষ্ঠা বল্লম অভিরাম।
ঐ শোন ঐ সঙ্গীত তার স্বর্গের খোলে দ্বার,
দূরে চ'লে যায় ঘৃণা-বিদ্বেষ ছাড়িয়া মুল্লুক তার,
তৃষিত জগতে বিলায় ভারত হর্ষ, শান্তিধাম,
নয়নে তাহার প্রেম ঝরে অবিরাম।

জননী আমার, আরাধ্যা অয়ি, সর্ব্বকালেতে জয়ী,
দেখেছ মানসে সুখের স্বপন, ওগো গৌরবময়ি,
মুক্তিস্বপ্নে বিভোর চিত্ততল।
স্বপ্ন বুঝি বা সার্থক হয় এইবার এইবার,
গোপন তৃষ্ণা সত্যের রূপ ধরে উজ্জ্বলাকার,
আশা ও বাসনা হইবে মূর্ত্ত, হবে নাকো নিষ্ফল;
হিমালয় হ'তে উথলে জলধিজল।
জননি, বিশাল প্রান্তর তব, তুহিন-শোভন গিরি,
বেগবান্ নদ, বেগবতী নদী, উৎস গিরিরে ঘিরি',
নভ ভেদ করে হিমালয় ভীমাকার;
তোমার অতীত ভাতি গৌরব কীর্ত্তি মহিমাময়,
অতীত সমান ভবিষ্যতের আশা যে উচ্চ রয়,
আত্মবোধের জ্ঞানধর্ম্মের অটুট শৌর্য্যভার,—
শৌর্য্যে শোভায় লভ, গো জননি, মুক্তির অধিকার।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

মৌ-বনের কবিতা

(গল্প)

১

সখীর দলে সুভাষিণীর যে খাতির বাড়িয়াছিল, সেটা মৌ-বনের দৌলতে। মৌ-বন মাসিক-পত্র। তরুণ-তরুণীর দলে মৌ-বনের ভারী পশার। যৌবন-বসন্তে মৌ-বনের যারা খোঁজ রাখে না, সাহিত্যের আসরে তারা বাতিল!

এই মৌ-বনের সহকারী সম্পাদক সুভার তরুণ স্বামী রাধানাথ। বি-এ'র অর্গলে রাধানাথ তিন-চারিবার ধাক্কা দিয়াও সে অর্গল মুক্ত করিতে পারে নাই। চতুর্থবার অর্গল ছাড়িয়া সে সাহিত্যের খাতায় নাম লিখাইল। রাধানাথের শাশুড়ী হতাশ-চিত্তে কহিলেন,—কি যে বোঝে, বাপু… ভেবেছিলুম, উকীল-টুকিল হবে—আমার চিরদিনের সাধ…

সুভার সখী চারুবালা একধারে বসিয়া এ-মাসের 'মৌ-বন' পড়িতেছিল। সে কহিল,—কি যে বলো তুমি, মাসিমা… ওকালতি তো বাঙলা দেশের তিন লক্ষ বাঙালী করচে… এমন রচনা-শক্তি ক'জনের আছে…!

মাসিমা বলিলেন,—থাম্ বাপু…লিখে তো সব দুঃখ ঘুচবে! দেখে ওই হরেন্দর…ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না…বৌটো কেঁদে মরে…

তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া চারু কহিল,—হরেন বাবু সাপ্তাহিক কাগজের খপর তর্জমা ক'রে বেড়ান; তাঁর সঙ্গে রাধানাথ বাবুর তুলনা! কি কবিতা লিখেচেন এ-মাসের কাগজে…পড়েচো?

মাসিমা কহিলেন,—তোরা পড়্ বাপু…আমি মুখ্যু, ও-সব লেখা বুঝতেও পারি না। একালের কাগজ যা হয়েচে, আমাদের কালে কি মাসিক-পত্র ছিল না? না, পড়িনি…? বঙ্গদর্শন ছিল, সাহিত্য ছিল, ভারতী ছিল…

চারু কহিল,—একবার প'ড়ে দেখো, অন্ততঃ নিজের জামাইয়ের লেখা…

কথাটা বলিয়া কৌতুক-ভরে চারু সুভার পানে চাহিল। সুভার মুখে অভিমানের ছায়া! দক্ষগৃহে পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, একালে ততদূর না হোক, অভিমানও হইবে না? বিশেষ সতী সুভা তরুণী এবং তাদের বিবাহের তিন বৎসর পূর্ণ হইতে এখনো ঠিক আড়াই মাস বাকী!

চারু কহিল,—তুই তো পড়েচিস্ ভাই সুভা…বরের লেখা ব'লে নয়, সত্যি বল্ তো, এমন কবিতা ক'জন লিখতে পারে? ভালো হয়নি?

সুভা কহিল,—ছাই…!

চারু কহিল,—তোমায় শুনতেই হবে, মাসিমা…আমি ছাড়বো না! আমার শ্বশুর-বাড়ীতে রাধানাথ বাবুর লেখার কি খাতির…তাদের কি ক্লাব আছে…সে ক্লাব থেকে ওঁকে অভিনন্দন দেবে, ঠিক করেচে।

মাসিমা তকলী ও তুলা লইয়া সূতা কাটিতেছিলেন; কহিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, পড়্ বাছা, শুনি…

চারু পড়িল;—

> ফাগুনে আজ গন্ধ বয়ে ছন্দ লয়ে
> উঠলো জেগে মন্দানিল,…
> বন্ধ ঘরে অন্ধকারের তন্দ্রা ভেঙ্গে
> রন্ধ্রপথে ছুটলো দিল…

হাসিয়া মাসিমা কহিলেন,—থাম্ বাছা…ও-সব আমরা বুঝি না। ছেলেমানুষের ছেলেখেলা…ও তোদেরই ভালো লাগবে।

চারু কহিল,—কেন? এ তো চমৎকার! কেমন অনু-প্রাস, বলো দিকিনি…মানেও পরিষ্কার—ফাগুনে ছন্দ নিয়ে গন্ধ নিয়ে হাওয়া বয়েচে, বসন্ত এসেচে…বসন্তের রঙীন

আলোর দুনিয়ার বদ্ধ ঘরের অন্ধকার ঘুচলো—যেন অন্ধকারের তন্দ্রা ভাঙলো···আর ঐ তন্দ্রা-ভাঙা জাগরণের ফাটলে-ফাটলে আলো পেয়ে দিল কি, না, মন ছুটলো!··· কেন, মাসিমা. মন্দ কি? রবিবাবু এ লাইনগুলো লিখলে সুখ্যাতি করতে! আর এ তোমার জামাই লিখেচে কি না···

মাসিমা কহিলেন,—ওরে, কবিতা পড়ার সময় এখন তোদের · আমাদের পড়া শেষ হয়ে গেছে। তোরা এখন পড়্,···এর পর সংসার ঘাড়ে পড়লে পড়বার সময় পাবিনে···

চারু কহিল,—থামো মাসিমা—তুমি যা বল্‌চো, যেন কত সেকেলে হয়ে গেছ! এই তো সেদিনও রবিবাবুর নতুন বই পড়ছিলে···

মাসিমা কহিলেন,—ঐ সবের নেশায় রাধানাথ লেখাপড়া সাঙ্গ ক'রে বসলো! জামাই···পরের ছেলে···কিছু বলতে পারি না···সুভাকে বলি, তুই একটু রাগ করিস্, অভিমান করিস্,—বলিস্, ও-সব রেখে আগে পাশের কাজটা গুছিয়ে শেষ করো···লেখা তো আর পালাবে না···

নীচের তলা হইতে ঝী হাঁকিল,—ও মা, একবার নীচে এসো গো · ঘুঁটেউলি এয়েচে···তুমি বলেছিলে, কি বলবে তাকে···আমি বাপু ওর কথা বুঝি না—ও কি ক্যায়সা-ম্যায়সা ক'রে কথা বলে···

চারু হাসিল, হাসিয়া কহিল,—ঐ নাও, ডাক এসেচে···

মাসিমা কহিলেন,—আমার মাসিক-পত্র ঐ ওরাই বাছা···আনাজউলি আস্‌চে, ঘুঁটেউলি আসচে···মন ঝুঁকে পড়ে ওদের পশরার উপর···ঐ আমার কবিতা।

তিনি উঠিলেন এবং সংসারের নিত্যকর্ম্মের ডাকে সাড়া দিতে চলিলেন।

সুভা কহিল,—ফের যদি তুই মা'র কাছে ওর ঐ কবিতা-টবিতার কথা তুলবি তো তোর সঙ্গে ঝগড়া হবে, ভারী ঝগড়া···তা কিন্তু ব'লে রাখচি।

সবিস্ময়ে চারু কহিল,—ক্যান্ লো?

সুভা কহিল—না।···মা ও-সব ভালোবাসে না। বাবাও রাগ করে। আমায় মা কেবল বলে,···ও-সব রেখে লেখাপড়া করতে বল্···না হ'লে এর পর তোকেই পস্তাতে হবে!

চারু কহিল—এই করেই ভাই, আমাদের দেশে কত কবির প্রতিভা যে নষ্ট হচ্ছে!···আচ্ছা, তুই কি বলিস···?

সুভা কহিল—আমি ভাই, অত বুঝি না। তবে দেখেছি তো সেখানে থাকতে···কি মান, কি খাতির সকলে ওকে করে। কত লোক চিঠি লেখে, মিনতি জানায় তাদের লেখা কাগজে ছাপাবার জন্য···কত লোক লেখা নিয়ে ওকে দেখাতে আসে! আর ও কি বলে জানিস্? সেবার ফেল্ হতে আমি দুঃখ করেছিলুম বলে ···?

চারু কহিল—কি?

সুভা কহিল,—ও বলে, রবিবাবু একটিও পাশ করেন নি, আর তাঁর যে এই জগৎজোড়া নাম, সে ঐ কবি-প্রতিভার জন্যই! তাছাড়া আরো কি বলে, জানিস্?

চারু কহিল—কি?

সুভা কহিল—সেদিন কবি মকরাক্ষ চক্রবর্ত্তী মারা যেতে শোক-সভা হলো না? কত গান, বক্তৃতা···তবে মকরাক্ষ বাবুর ছবি ছাপা হলো কাগজে···তা বললে···উকিল-ডাক্তার ব'লে এ সম্মান পায় তারা, না, এমন শোকসভা হয়?

কথার শেষে সুভার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া উঠিল···বুঝি ভবিষ্যতের কোনো দুর্দ্দিনের করুণ স্মৃতির কল্পনায়···

চারু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তা ভাই, সে সম্মান যতই হোক, মকরাক্ষ বাবুর স্ত্রীর দুঃখ কি তাতে যাবে?

সুভা কহিল—দুঃখ যাবে না···তবু অত-বড় দুঃখে তার এটুকু সান্ত্বনা তো আছে যে, স্বামীর জন্য এত লোক সভা ডেকে শোক প্রকাশ করচে···

উক্ত রিপোর্টটুকু তুচ্ছ ব্যাপার, হয় তো এ কথা না বলিলেও চলিত—তবে কবি-প্রতিভাকে কত বাধা ঠেলিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হয়, এ তারি একটু পরিচয় দেওয়া মাত্র!

শ্বশুর পশারওয়ালা উকিল, কাজেই কবি-প্রতিভার জন্য রাধানাথ এ-গৃহে বড় তারিফ পায় না! বি-এ ফেল হওয়ার পর শ্বশুর উপদেশ দিতে ছাড়েন নাই···শাশুড়ীও দু'চারিটা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন, ছেলেমানুষী রাখিয়া এই বেলা নিজের দিন যদি কিনিতে পারো তো, তোমার নিজের মঙ্গল···

নিজের গৃহে উপদেশের বালাই ছিল না। বিধবা মা; এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া তার উপর কথা কেহ বলিতে পারে না! মা অনুযোগ তুলিলে রাধানাথ বুঝাইয়া দেয়, মামুলি পথ তার নয়! দেবী বীণাপাণির মঞ্জীর-ধ্বনি তার মর্ম্মে পশিয়াছে···

২
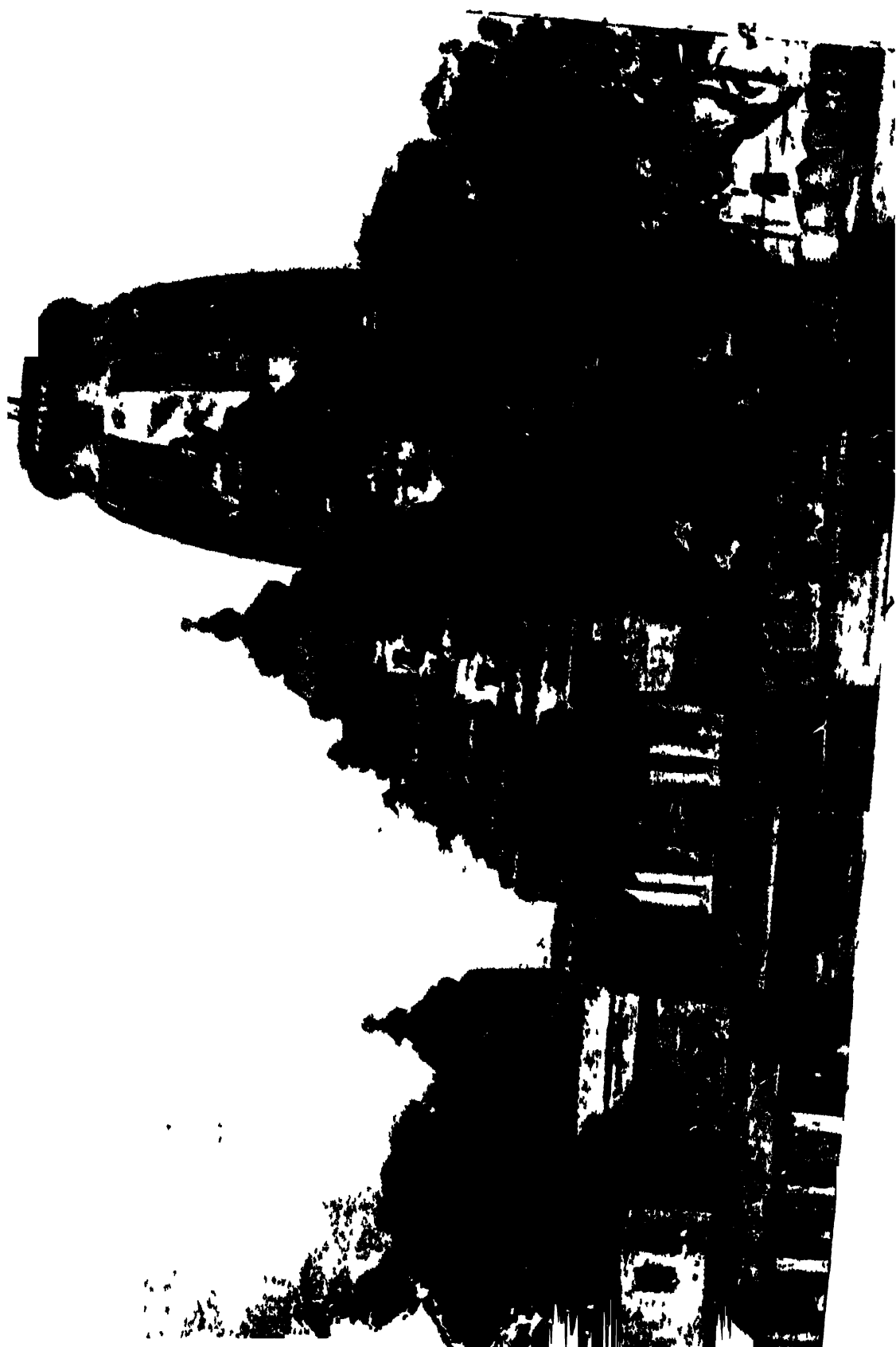
রাধানাথ শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল, আজ বাড়ী
[যা]চ্ছে। বিদায় প্রার্থনা করিলে রাধানাথের হাত ধরিয়া
তাকে বসাইল; বসাইয়া কহিল—একটা কথা আছে।
রাধানাথ কহিল—কি কথা ?
সুভা কহিল,—আমায় তোমার সহধর্ম্মিণী ক'রে নাও...
[তোমা]র এই সাহিত্য-ব্রতে···
রাধানাথ সুভার পানে চাহিল, এ কথার অর্থ ?
সুভা কহিল—তোমাদের কাগজের প্রুফটাও অন্ততঃ
[দেখ]তে শেখাও···
সুভাকে রাধানাথ জানিত, নারী-কুল-রত্ন! কোন্ তরুণ
স্ত্রীকে তা না মনে করে? কিন্তু তা বলিয়া সুভা এমন...
তার কাগজের প্রুফ দেখিয়া দিতে চায়!
রাধানাথ কহিল,—না, না—প্রুফ দেখা হলো মোটা
...তুমি আমার রূপসী পাঠিকা...তাই থাকো, সুভা...
সুভা কহিল—না। জানো তো রাজা-রাণীর সুমিত্রার
বাহিরে মহিষী তব অন্তরে প্রেয়সী!···আমি তাই
চাই। তোমার যখন এই ব্রত, তখন আমাকেও
পাশে নাও···
রাধানাথ কহিল—অর্থাৎ কি বলতে চাও...?
সুভা কহিল—কায়ে-মনে আমি কবিপ্রিয়া হতে চাই—
ভাবের উৎস আমিই তো...সে ভাব প্রকাশের
আমি তোমার ..পাশে-পাশে থাকবো···তোমাদের
[কাগজে]র সম্পাদকীয় আসরে আমার স্থান যদি না হয় তো
-হিসাবে···
রাধানাথ কহিল—লেখিকা!
সুভা কহিল—হ্যাঁ···তুমি দেখিয়ে দিলে কেন আমি
পারবো না ?···তোমাদের মাসিকে যে-সব বই আসে,
[সমালোচ]নার জন্ত···কতবার আমায় দিয়ে তা পড়িয়ে
[তা]ই নিয়ে সমালোচনা লিখেছো তো!
[সুভা]র প্রদীপ্ত দুই চোখের পানে চাহিয়া রাধানাথ
—তা লিখেছি।...
সুভা কহিল—তবে? আমায় কবিতা লিখতে শেখাও,
[লিখ]তে শেখাও···আষাঢ় মাস থেকে নিয়মিত আমি
[তোমা]র মৌ-বনে লিখতে চাই। চারুকে জানো তো!
[সে]ই চারু...'রমণী' কাগজে তার একটা কবিতা ছাপা
হয়েচে এ-মাসে। আমায় একখানা 'রমণী' পাঠিয়েচে। সে যদি
কবিতা ছাপায়, আমি তোমার স্ত্রী হয়ে চুপ ক'রে থাকবো না।

রাধানাথ কোনো জবাব দিল না। সে ভাবিতেছিল,
মৌ-বনের সম্পাদক সুবল হাজরার কথা। ভারী অহঙ্কার!
সে যেমন লিখিতে পারে, সে যেমন লেখা বোঝে···এমন
আর কেহ নয়! রাধানাথের কবিতা যে ছাপা হয়, রাধানাথ
মাসে মাসে চাঁদা দেয়, বিজ্ঞাপন জোগাড় করে, তাই!
তার উপরে তার কবিতার কত লাইনে কাটকুট করিয়া কি
অদল-বদলই না ঘটায়!···বাহিরে মৌ-বনে তার অধিকার
লইয়া যত বড়াই সে করুক, মর্ম্ম-কথা সে তো জানে!
অত কাজ করে নিজের লেখা-পড়া বিসর্জন দিয়া, তাই
রাধানাথ মৌ-বনের সহকারী সম্পাদক,···নহিলে···

সুভা কহিল—ঐ যে মেজমামার কাছারির ব্রীফ্ মেজমামী
গুছিয়ে দেয়···আমারো ভারী ইচ্ছে···

রাধানাথ কহিল—মন্দ নয়···ব্রাউনিং-দম্পতি ছিলেন
না···আচ্ছা, তোমায় লিখতে শেখাবো।

সুভা কহিল—আমি একটা কবিতা লিখেচি···

—লিখেচো ?

সুভা কহিল—হাঁ, সে কবিতা...তোমায় ছাপাতেই হবে
এই মাসের মৌ-বনে···

রাধানাথের চোখের সামনে সুবলের সেই গর্ব্বিত মুখচ্ছবি
জাগিয়া উঠিল—যে-লেখাই সে আনিয়া দেয়, দেখিয়া সুবল
তাচ্ছল্য-ভরে বলিয়া ওঠে, Damn it!

সুভার কথায় তাই তাঁর বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল।
সে তো জানে, কবিদের প্রথম চেষ্টার ফল প্রায়ই কেমন হয়।
রচনা-সম্বন্ধে সুভাও এমন শক্তির পরিচয় কোনো দিন দেয়
নাই—তাই সে কহিল—আমার কাগজে ছাপা...ভালো
দেখাবে কি? লোকে বলবে, স্ত্রীর লেখা বলেই ছেপেচে···
ওর গৌরব তাতে কমে যাবে···নয় কি, সুভা?

সুভা কহিল—আমি গৌরব চাই না, কবিতা ছাপাতে
চাই। এনে দি···

সুভা আলমারি খুলিল এবং ড্রয়ার হইতে একটা চিঠির
কাগজ বাহির করিয়া আনিয়া রাধানাথের হাতে দিল, দিয়া
কহিল,—পড়ো···পড়ে বলো, কোথায় দোষ আছে···আমি
ছাড়চি না···এর চেয়ে ঢের খারাপ কবিতা তোমাদের
মৌ-বনে ছাপা হয়েচে, আমি দেখিয়ে দিতে পারি···

রাধানাথ কহিল—কিন্তু ঐ তো বলেচি, সুভা, তুমি স্ত্রী বলেই…

সুভা কহিল—বা রে! নিজের স্ত্রীর বেলায় এত কষাকষি! আর পর-স্ত্রীর লেখা হ'লে তখনি তা মিষ্ট-মধুর হয়, না? আর ছাপাতে আপত্তি থাকে না!

তার দুই চোখের দৃষ্টিতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল!

রাধানাথ তরুণ কবি,—অতএব…

সুভা কহিল—পড়ো আমার কবিতা…

রাধানাথকে পড়িতে হইল। মন্দ নয়…তবে নূতন কথা বা ছন্দের কেরামতি এমন কিছু নাই…স্ত্রীর রচনা-গর্ব্বে গৌরব যাহাতে জাগে…!

সুভা কহিল—কেমন হয়েচে? বলো, খারাপ? ছাপার অযোগ্য?

রাধানাথ কহিল—তা ঠিক নয়। একটু আধটু কাটকুট্ করলে…খাশা হবে।…বেশ, দাও, আমি ঐ 'অমরাবতী'তে ছাপিয়ে দেবো। তার সম্পাদক বক্কেশ্বর বাবু আমায় খাতিরও করেন—বলবো, আমার স্ত্রীর লেখা…

সুভা কঠিন স্বরে কহিল—না, 'অমরাবতী'তে নয়… তোমার কাগজে ছাপাতে হবে। চারু আমার লিখেচে— হাতে মাসিক-পত্র রয়েছে…তুই কেন কবিতা লিখিস না? স্ত্রী-কবি আর নেই রে! এখন মেয়েরা কেবল উপন্যাস-গল্প লিখতে ছুটেচে—এখন কবিতা ছাপালে চট্ ক'রে নাম হবে।…

রাধানাথ কহিল—আচ্ছা, দাও…আমাদের কাগজেই ছাপাবো…কিন্তু তোমার নামটা যদি বদলে দি? ধরো, লেখিকা শ্রীমতী সুভাষিণী দেবীর জায়গায় নাম দেবো শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী, কিম্বা রাণী দেবী…

সুভা কহিল,—আমার খ্যাতি বুঝি সহ্য হবে না?

রাধানাথ কহিল,—তা নয়, তা নয়…

—তবে?

রাধানাথ কহিল,—ওরা তোমার নাম জানে কি না… বলবে, স্ত্রী বলেই…

সুভা কহিল,—তবে থাক্,…এত লজ্জা…! কিন্তু মনে পড়ে—এক বছর আগেও তুমি আমায় সেধেচো—লেখো সুভা, কবিতা লেখো, গল্প লেখো, লেখো তুমি…তোমার লেখার ক্ষমতা আছে…সহজেই হবে—আমি দেখে দেবো?

সুভার সুন্দর মুখে অভিমানের কালো ছায়া বেশ ঘন হইয়া উঠিতেছিল। রাধানাথ তাহা লক্ষ্য করিল। এ ছায়া আরো ঘনাইলে তার আর দুর্গতির সীমা থাকিবে না! কাজেই সে বলিল,—আচ্ছা, দাও…তোমারি নামে ছাপা হবে…এবং আমাদের মৌ-বনেই।

সুভা কহিল,—আমি অন্যায় অনুরোধও করচি না। বেশ, তোমাদের সম্পাদকীয় আসরেই এ কবিতা দিয়ো…যদি তাঁদের বিবেচনায় ছাপার অযোগ্য হয়, ছেপো না। আর যদি যোগ্য হয়…?

রাধানাথ কহিল,—বেশ, তাই হবে…

সুভা কহিল,—না, বিচারে কোন পক্ষপাতিত্ব চাই না…

রাধানাথ কবিতা লইয়া পকেটে রাখিল। তার মনে গর্ব্বও বোধ হইল, স্ত্রী কবিতা লেখা ধরিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে একটু কেমন সঙ্কোচও! সম্পাদক সুবল হাজরা…যদি না ছাপে?… যদি বলে, রাধানাথ নিজে লিখিয়া স্ত্রীর নামে চালাইয়া দিয়াছে…?

৩

কাল, রাত্রি। স্থান, রাধানাথের নিজের গৃহ। শয়ন-কক্ষে সে একা…শ্বশুর সুভাকে পাঠান নাই—বেশ দৃঢ় স্বরেই বলিয়া দিয়াছেন,—আবার প'ড়ে পাশ করা চাই…কবিতা-রচনা ছাড়ো, মৌ-বন ছাড়ো। মক্কেলগুলোর ভার যদি তোমার হাতে দিয়ে যেতে পারি…

শ্বশুর পয়সাওয়ালা লোক,—রাশভারি…সুভা তাঁর আদরের মেয়ে…এবং বিবিধ উপঢৌকন ও বাবু-সজ্জার বিচিত্র উপকরণ,…যার জোরে রাধানাথ বেশে-ভূষায় শ্রী ফুটায়, সে-সব আজো তাঁর দান—এ দান সাহিত্যিক বন্ধু-সমাজে তার ইজ্জৎ কতখানি উঁচু করিয়া রাখিয়াছে! কৃতজ্ঞতা না হোক, ইজ্জতের খাতিরেও শ্বশুরের উপদেশ শিরোধার্য্য করিতে হয়!…

সুভার কথা বার-বার মনে জাগিতেছিল। সহসা মনে হইল, কবিতাটা একবার দেখিয়া শুধরানো যাক…

উঠিয়া সে জামার পকেট হাতড়াইল—এটা…? জেনারেল ষ্টোর্সের ক্যাশ-মেমো এক টুকরা,—এক বাক্স সাবান দেড় টাকা; এক-টুকরা পেন্সিল, কাগজ। সেই কবিতা-লেখা কাগজখানা? সর্ব্বনাশ, নাই!…

ঘরের কোথাও নাই···মণিব্যাগের মধ্যে? না, তাও নাই!···বই-খাতা ঘাঁটিয়া কোথাও সে-কবিতা-লেখা কাগজ মিলিল না!

রাধানাথ ভাবিল, ঠিক, প্রেশের সেই প্রুফের তাড়া, তার পাশেই কবিতাটি রাখিয়াছিলাম। মৌ-বন অফিসে সেই এক দল বন্ধুর প্রবেশ ও বিরাট কোলাহল···এক-ঠোঙা কচুরির সদ্ব্যবহার···সেই মত্ত কোলাহল-কলরবে কোথাও হয় তো খোয়া গিয়াছে···!

কিন্তু সুভার অত-যত্নে দেওয়া কবিতা···খোয়া গিয়াছে শুনিলে সুভার যে অভিমানের সীমা থাকিবে না! সুভা ভাবিবে, এ শুধু রাধানাথের কাপট্য···গোড়া হইতে সে নিষেধ তুলিয়াছিল, ছলনায় স্তোক দিয়া গিয়াছে শুধু! নিজেই নূতন একটা লিখিয়া দিবে? বলিবে, কাটকুট করিয়া এমনি দাঁড় করানো হইয়াছে! কিন্তু সেটা কি-কবিতা ছিল? তা'ও যে ভালো লক্ষ্য করে নাই! সুভা পড়িতে বলিয়াছিল; সে কি পড়িয়াছে? শুধু চোখ বুলাইয়া গিয়াছে —ছেলেমানুষকে ভুলাইবার জন্য···তাদের মৌ-বনে কত সমস্যা লইয়া তারা প্রবন্ধ কবিতা গল্প লেখে, সমস্যা ছাড়া লেখাই হয় না···সেখানে সুভা কি কবিতা ছাপাইবে! এই ভাবিয়া···

কবিতা খোয়া গিয়াছে, এ কথা জানানো হইবে না— একটা নয় নূতন কিছু লিখিয়াই দিবে! ভাবিয়া চিন্তিয়া সে চিঠি লিখিল,—"তোমার কবিতা আজ আসরে পড়া হইয়াছে, সকলে ভারী সুখ্যাতি করিয়াছে। তবে তার কতকগুলা লাইনে কাটকুট করা হইয়াছে। কাটকুটের পর যা দাঁড়াইয়াছে, অপূর্ব্ব!"

চিঠিখানা খামে আঁটিয়া ভাবিল, কাল সকালেই ডাক-বাক্সে দিতে হইবে, বিলম্ব নয়!···

দু'দিন পরের কথা···মৌ-বন অফিসে রাধানাথ চলিয়াছিল; বেলা পাঁচটা বাজে···ডাকওয়ালা একখানা চিঠি দিল। খামে চিঠি; সুভা লিখিয়াছে। চিঠি খুলিয়া রাধানাথ দেখে, চারটি মাত্র ছত্র। সুভা লিখিয়াছে,—

"আমার সে কবিতা ছাপিয়ো না। খবর্দ্দার। আমায় এখনি ফেরত পাঠিয়ো। মতামতে দরকার নেই। আমি ছাপাতে চাই না, তোমায় জেদ ক'রে অপরাধ করেচি। সেজন্য মাপ করো।···"

চিঠি পড়িয়া রাধানাথের চক্ষু স্থির! তার সে চিঠির জবাব এই?···নিশ্চয় কবিতাটি তাহা হইলে সেখানেই ফেলিয়া আসিয়াছে। আর সে কবিতা পাইয়া ও তার চিঠিতে মিথ্যার বহর দেখিয়া সুভা চটিয়া এ চিঠি লিখিয়াছে!···এ ব্যাপারের পর কোন্ মুখে সে এখন সুভার কাছে দাঁড়াইবে! সুভাকে সে কি না বুঝাইয়াছে, সুভা তার ভাবের উৎস, তার কর্ম্মে উদ্দীপনার বহ্নিশিখা! সুভার কাছে সে জীবনে কোন কথা গোপন করিবে না. বলিয়াছিল,···তার অন্তর অকপটে ধরিয়া দিবে! তার কালির লেখা, আলোর রেখা···কিছু লুকাইবে না! আর এই কবিতার ব্যাপারে···?

মৌ-বন অফিসে গিয়া প্রুফের তাড়া সে পকেটস্থ করিল এবং চট্ করিয়া আসিয়া বাসে চড়িল···বাসে চড়িয়া একেবারে কালীঘাটে শ্বশুর-গৃহে!···

ঐ বাড়ী···ঐ দোতলার ঘর···ঐ জানলা···জ্যোৎস্না-নিশীথে ঐ জানলায় দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিয়া সুভাকে অন্তরের কত কথাই সে গদগদ-ভাবে শুনাইয়া বিহ্বল বিবশ করিয়া দিয়াছে···

বাড়ীর দ্বারে পা দিতে তার পা কাঁপিল! তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া কি কাণ্ডই ঘটিল! এর চেয়ে বেশ সহজ ভাবে সত্য কথা লিখিলে চলিত,—তোমার কবিতাটি ফেলে এসেচি রাণি! আর-একটা কাপি ক'রে শীঘ্র পাঠিয়ো···তা না, কি বুদ্ধিই যে উদয় হইল!

চোরের মত আসিয়া সে একেবারে দোতলায় উঠিল। সামনে শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা! শাশুড়ী কহিলেন,—এই যে বাবা···! তোমার শ্বশুর বলছিলেন, তুমি কলেজে আবার ভর্ত্তি হয়েচো···ভালো কথাই! বেশ ক'রে পড়ো এবার, ও-সব ছেড়ে···তা, এধারে এসেছিলে বুঝি?

রাধানাথ কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ অভয় ভড়ের ওখানে পার্টি ছিল। ক'জন লেখকের নিমন্ত্রণ হয়েছিল, আলাপ-পরিচয় করবে ব'লে···

কথাগুলার দিকে শাশুড়ী বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেখাইলেন না, কহিলেন,—বসো, ঘরে···সুভাকে পাঠিয়ে দি···সে বুঝি ওর ঘরে ব'সে রেডিও শুনচে!

সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া রাধানাথ খাটের বিছানায় বসিয়া রহিল—যেন নির্জীব জড় পুতুল!

সুভা আসিল—তার মুখে-চোখে প্রসন্ন হাসির সে দীপ্তি কৈ?

রাধানাথ উঠিয়া হাত বাড়াইল, কহিল,—এসো সুভা…

সুভা সরিয়া গেল, কহিল—থাক্, আমার আদর করতে হবে না। আদর নয়। আমার সে কবিতা কৈ? এনেচো?

রাধানাথ কোনো কথা না বলিয়া মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে সুভার পানে চাহিয়া রহিল। সে যেন চোর…অপরাধের লজ্জায় কাতর…এমনি তার ভাব! কি যে বলিবে? চুপ করিয়া নিজের অপরাধটুকু লঘু কৌতুকের রঙে রাঙাইয়া… কিন্তু তার অবসর কৈ মেলে…?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুভা কহিল,—অমন ক'রে চেয়ে আছো যে! কি দেখচো?

—বুঝতে পারচো না?…লক্ষ্মীটি, আমায় তুমি মাপ করো…

কথার সঙ্গে সঙ্গে সুভা একেবারে সেই কবি-লিখিত বাত্যাহত বেতস-লতার মত রাধানাথের পায়ের উপর লুইয়া পড়িল।

রাধানাথ তার দুই হাত দিয়া ধরিয়া সুভাকে তুলিল, কহিল,—কি করেচো সুভা যে এমন ক'রে মাপ চাইছো…?

রাধানাথের দুই চোখে একরাশ বিস্ময়!

সুভা তার পানে চাহিল, চাহিয়া পরক্ষণে মুখ নত করিল।

রাধানাথ কহিল,—কোনো অপরাধ করো নি তো সুভা…একে কি অপরাধ বলে?

সুভা কাতর নয়নে তার পানে চাহিল, কহিল,—অপরাধ নয়? আমি চোর। লোকের ঘটি-বাটি চুরি করলে চোরের জেল হয়; আর…

সুভার কথা শেষ হইল না। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

রাধানাথ ভড়কাইয়া গেল! সে কহিল,—কি বলচো সুভা…?

সুভা কহিল,—বলো, আমায় মাপ করবে? ঘৃণা করবে না? আমায় ত্যাগ করবে না?

ঘৃণা, ত্যাগ…ব্যাপার কি?

সুভা কহিল,—ক্ষমা চাইবার যোগ্যতাও আমার নেই। আমি চোর—সে কবিতা আমার লেখা নয়, পরের। সে লেখা আমি চুরি করেচি। আর বছরের পূজার সংখ্যা 'বারাণসীতে' ছাপা হয়েছিল—তারিতচন্দ্র বক্সীর লেখা।…

রাধানাথের যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল! হাসিয়া সে কহিল—এই…?

সুভা কহিল,—লজ্জায় তোমার পানে আমি চাইতে পারচি না। অপরে লেখা ছাপিয়ে নাম করচে দেখে আমি নিজে অক্ষম হয়েও পরের লেখা চুরি ক'রে কাগজে ছাপাতে পাঠিয়েচি…তাও নিজের স্বামীর হাত দিয়ে! ঘটি-বাটি চুরি ক'রে যে-চোর জেলে যায়, তার সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায়?

আবেগোচ্ছ্বাসে সুভা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আঁচলে সে মুখ ঢাকিল। রাধানাথ তার হাত ধরিয়া তাকে আনিয়া খাটে বসাইল। তার চোখের জল মুছাইয়া রাধানাথ ডাকিল,—সুভা…

সুভা কহিল,—কি?

রাধানাথ কহিল,—পরের লেখা চুরি ক'রে ছাপতে পাঠানো ঠিক নয়…সম্পাদকরা কত লেখা পড়ে; মনে রাখতে পারে, কোন্‌টা কোথায় ছাপা হয়েচে কবে…? তারা এ-বিশ্বাসে লেখা নেয় যে, এ-লেখা যে পাঠিয়েচে, এ তার নিজের লেখা…

সুভা কহিল,—আমায় মাপ করবে না? সে লেখা তোমার বন্ধু-সম্পাদকরা দেখে কি ভাবলেন…!

রাধানাথ কহিল,—ভয় নেই সুভা…সে লেখা কেউ দেখেনি…

সুভার চোখের জল শুকাইয়া আসিতেছিল; সে রাধানাথের পানে চাহিল। রাধানাথ কহিল,—সে লেখা আমি হারিয়ে ফেলেচি। সেই রাত্রে সে-লেখা খুঁজে পাইনি…

সুভা উঠিয়া দাঁড়াইল—বেশ বেগে…যেন পটকার পলিতায় আগুন ছোঁয়ানো হইয়াছে! তেমনি তীব্র ঝাঁজে কহিল,—তবে ও চিঠির মানে?

রাধানাথ কহিল,—পাছে তুমি কিছু মনে করো যে, তোমার অমন সাধের কবিতার যত্ন নিইনি!…ভেবেছিলুম, নিজে একটা কবিতা লিখে মৌ-বনে ছাপিয়ে দেবো তোমার নামে। তুমি বুঝতে পারবে না। কাল একটা লিখে ছাপতেও দিয়েচি…

সুভা কহিল,—খবর্দার! তা দেবে না!…কিন্তু তুমি না বলেছিলে, আমার কাছে কোনো কথা কোনো দিন গোপন করবে না…অকপটে…

রাধানাথ মৃদু নম্র কণ্ঠে কহিল,—পাছে তোমার মনে আঘাত লাগে সুভা, তাই···রাধানাথ সস্নেহে সুভার হাত ধরিল।

সজোরে হাত ছাড়াইয়া সুভা জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। কাছেই কোন্ বাড়ীতে কাঁসর বাজাইয়া ঠাকুরের আরতি হইতেছিল···

রাধানাথ আসিয়া সুভার পাশে দাঁড়াইল, ডাকিল,—সুভা···

সুভা ফিরিল, কহিল,—কি? তার স্বরে অভিমানের ঝাঁজ!

রাধানাথ কহিল,—আমায় তুমি মাপ করো···

সুভা কহিল,—আমি ভাবচি, কার অপরাধ বেশী··· আমার, না তোমার?···আমি চোর···

রাধানাথ কহিল,—আমি ঠক···

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভা কহিল,—আমার গা ছুঁয়ে বলবে একটা কথা?···

—কি কথা?

—যে, কখনো আর আমার সঙ্গে এ ছলনা করবে না?

আমিও কথা দিচ্ছি, কাগজে লেখা ছাপাবার সাধ কখনো আমি করবো না···

রাধানাথ কহিল,—বিশ্বাস করো···সুভা, এ ছলনা আর কখনো না···

সুভা কহিল,—যত ছোট হোক···স্বামি-স্ত্রীর মনের বিশ্বাস যেন অটুট থাকে!

রাধানাথের মনে জাগিতেছিল, 'চন্দ্রশেখর'-উপন্যাসে সেই শৈবলিনীর কথা—'কিন্তু কতদিন প্রতাপ?'···এ ক্ষেত্রে সে কথা খাটে কি না, তা সে বোঝে না···তবু কথার সুর···

হঠাৎ বাহির হইতে মা ডাকিলেন,—ওরে সুভা···

—যাই মা···

মা কহিলেন,—আসতে হবে না। তবে, রাধানাথকে বল্, ওঁর এক মক্কেল এই মাত্র হরিণের মাংস দিয়ে গেছে··· রাধানাথ খেয়ে তবে যাবে···

রাধানাথের পানে হাসি-ভরা দৃষ্টিতে সুভা চাহিল, রাধানাথও চোখের তেমনি দৃষ্টিতে উত্তর দিল, বেশ···

সুভা কহিল,—তাই হবে মা···এখান থেকে খেয়েই যাবে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বাদল অন্ধকারে

মেঘ-কুণ্ডলে আকাশ ঢাকি,
এ অশ্রু-বাণী কে চলে আঁকি?
চলিতে চপলা চমকি ফিরে,
থমকি নূপুর বোলিছে ধীরে!
সঘনে কোন্ ব্যথা গরজে নভে,
ত্রাসিছে বিশ্ব কি বজর-রবে?
ছুটিছে ঝঞ্ঝা কি ভয় ভীত,
ধরণী শ্যামল মুহু শিহরিত?
স্তবধ পিক-বাক্ সে গীতি-কল,
ঝরিছে মূরছিয়া কুসুম-দল!

আর্ত্ত রবে ওই তটিনী ছুটে,
তৃণ লতা তীরে কাঁদিয়া লুটে!
গোপন গেহে বক্ষ সুনিবিড়—
বাঁধন মাগে মরমী দরদীর!
কোথা হে বঁধুয়া মুক্ত কর দ্বার,
দীপ ধরি করে পথ কর পার!
অধর অধরে, নয়ন নয়নে,
বাঁধ হে বাহুতে প্রেম-শয়নে!
আবরি হৃদয়ে নাশ সব ভীতি;
শোনাও তমপারে নব আলো-গীতি!

শ্রীঅমূল্যকুমার রায়চৌধুরী।

রহস্যের খাসমহল

দ্বাবিংশ প্রবাহ

গুপ্ত গৃহ

ক্রেণকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখিয়া আমি আগ্রহভরে বলিলাম, "কোথায় দেখিলেন ?"

ক্রেণ বলিল, "স্কয়ারের কোণের কাছে। পথের অপর পাশে দাঁড়াইয়া আপনি সেই জানালা দেখিতে পাইবেন।"

আমি তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেই পথে পূর্ব্বে আমি অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু ঠিক বাড়ী চিনিতে পারি নাই; চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রেণকে বলিলাম, "কোন্ বাড়ী ? আমি দেখিতে চাই।"

কোন দিকে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না। সেই স্কয়ারের চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন, রহস্যাবৃত, নিস্তব্ধ।

ক্রেণ আমাকে কিছু দূরে লইয়া গেল। সেখানে কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও শ্যামল তৃণদল রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ক্রেণ সহসা তাহার সম্মুখে থামিয়া অদূরবর্ত্তী একটি অট্টালিকার দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, "ঐ কোণের বাড়ীখানি। উপর তলায় একটিমাত্র জানালা আছে, সেই দিকে চাহিয়া থাকুন।"

আমি নির্নিমেষনেত্রে সেই জানালার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সেই অট্টালিকার দুই পাশে যে সকল বাড়ী ছিল, সেই সকল বাড়ীর দ্বিতলস্থ ঘরের জানালার খড়খড়িগুলি বন্ধ। দুইটি পথের সংযোগস্থলে তিনখানিমাত্র বাড়ী ছিল; তিনখানি বাড়ীই বৃহৎ, উচ্চ ও সুদৃশ্য। তাহা অন্যান্য অট্টালিকা হইতে বিচ্ছিন্ন। সেই তিনখানি বাড়ীর মধ্যে কেবল একখানির তে-তলায় একটিমাত্র জানালা। সেই জানালা হইতে আলোকরশ্মি লক্ষিত হইতেছিল। আমার পশ্চাতে স্কয়ারের লোহার রেলিং; সেই রেলিঙের ভিতর বাগান, বাগানে একটি নিষ্পত্র বৃক্ষ, অন্ধকারে তাহা ভূতের মত দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই আলোকিত বাতায়নের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সেই বাড়ীতে কোন আতঙ্কজনক কাণ্ড ঘটিয়া থাকে—এরূপ কোন সন্দেহ কোন পথিকের মনে স্থান পাইত না।

আমি বলিলাম, "আমরা ঐ জানালার দিকে চাহিয়া আছি, ইহা যদি ঐ ঘর হইতে কেহ দেখিতে পায় ?"

ক্রেণ বলিল, "অসম্ভব কি ? কিন্তু কি করিয়া আমরা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিব ? কুপ কিরূপ চতুর ও মতলববাজ, তাহা ত আপনার অজ্ঞাত নহে। এ অবস্থায় আমরা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিলেই কি তাহাকে প্রতারিত করিতে পারিতাম ?"

আমরা স্কয়ারের উত্তরদিকে কিছু দূর সরিয়া গিয়া একটি আলোকস্তম্ভের নিকট দাঁড়াইলাম। সেই স্থান হইতেও সেই আলোকিত জানালা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই সময় যদি কেহ সেই বাড়ীর সম্মুখের দরজায় আসিত, তাহা হইলে পথের দিকে চাহিয়া সে আমাদিগকে দেখিতে পাইত না। কেহ আমাদিগকে দেখিতে না পায়, এই উদ্দেশ্যেই আমরা সেই স্থানে আশ্রয় লইলাম।

হঠাৎ সেই জানালা হইতে উজ্জ্বল নীলাভ আলোক-স্ফুলিঙ্গ পুনর্ব্বার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই স্ফুলিঙ্গগুলির একটি বড়, একটি ছোট। তাহা সাঙ্কেতিক চিহ্ন বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু আমরা তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

ক্রেণ বলিল, "আমি ঐ বাড়ীতে বেতারের কলের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না; আপনি দেখিতে পাইতেছেন কি?"

আমি বলিলাম, "না।"—তাহার পর প্রায় ১০ মিনিটকাল সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। সেই বাড়ীর নিকটে গিয়া যদি উর্দ্ধে কোন রকম তার দেখিতে পাওয়া যায়, এই আশায় আমি পরে একাকী সেই অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইলাম।

সেই বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার উর্দ্ধে প্রসারিত যে সকল তার দেখিতে পাইলাম, তাহা টেলিফোনের তার; তাহাতে কিছু অসাধারণত্ব আছে বলিয়া মনে হইল না। হয় ত চিমনীগুলির ব্যবধানে কোন তার প্রচ্ছন্ন ছিল, পথ হইতে তাহা দেখিবার উপায় ছিল না।

৫ মিনিট পরে আমি ক্রেণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আমার সন্দেহের কথা বলিলাম।

ক্রেণ বলিল, "কিন্তু ঠিক বাড়ী ত আমরা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপনি কি ঐ বাড়ী চিনিতে পারিতেছেন না?"

আমি বলিলাম, "না, আমি যে ঠিক চিনিতে পারিয়াছি, এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেছি না। দরজা সেই রকমই মনে হইতেছে, কিন্তু সম্মুখের বারান্দায় সেই রকম সাদা কাল টালির বাহার নাই, বিশেষতঃ ইহার রং গাঢ় লাল।"

ক্রেণ সবিস্ময়ে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, ইহা সেই বাড়ী নহে?"

আমি বলিলাম, "সে কথাই বা কি করিয়া বলি? কোন কোন বিষয়ে বাড়ীখানি পরিচিত বলিয়াই মনে হইতেছে, কিন্তু ইহার সকল অংশ লক্ষ্য করিয়া, ইহা ঠিক সেই বাড়ী বলিয়া নিঃসন্দেহ হইতেও সাহস হইতেছে না। তবে আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে বোধ হয় ঠিক চিনিতে পারিব।"

ক্রেণ বলিল, "হাঁ, আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতেই হইবে, আপনি এখানে দাঁড়াইয়া বাড়ীখানার উপর নজর রাখুন, কেহ বাহির হইতে ভিতরে যাইলে বা বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিলে আপনি তাহার উপর লক্ষ্য রাখিবেন। যদি কোন পরিচিত লোককে দেখিতে পান, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিবেন; নতুবা আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ এখানে থাকিবেন, অন্য কোন দিকে চাহিবেন না। আমি এখন টেলিফোনের সন্ধানে চলিলাম। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে কাহাকেও এখানে না আনাইলে চলিতেছে না।"

ক্রেণ তৎক্ষণাৎ বাঁ-দিকে চলিয়া গেল। আমি অদূরবর্ত্তী স্কয়ারের দিকে চাহিয়া স্কয়ারের নামটি পড়িবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু আমার চেষ্টা সফল না হইলেও স্থানটি আমার পরিচিত বলিয়াই মনে হইল। আমি রহস্যের খাসমহলের সন্ধানে কত দিন রাত্রিকালে ঘুরিতে ঘুরিতে এই পল্লীতে আসিয়াছি, প্রত্যেক অট্টালিকাই পথ হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু পূর্ব্বে যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আমার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, তাহা চিনিতে পারি নাই। ক্রেণ আমাকে যে বাড়ী দেখাইয়া দিল, তাহা ঠিক সেই বাড়ী, ইহাও ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেছি না! না, এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই।"

হঠাৎ যোয়ানের আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ আমার স্মরণ হইল। সে আমাকে বলিয়াছিল, যে বাড়ীতে আমি অশেষ দুর্গতিভোগ করিয়াছিলাম, সেই বাড়ী আমি সহস্র চেষ্টাতেও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব না। সেই বাড়ীর বাহিরের দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হওয়াতেই কি সে ঐ কথা বলিয়াছিল? বাহিরের বারান্দায় যে সাদা-কাল টালিগুলি দেখিয়াছিলাম, তাহা কি তুলিয়া ফেলিয়া দরজায় সবুজ রং এর পোঁচড়া দেওয়া হইয়াছে?

আমি ক্রেণের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলাম এবং পথ পার হইয়া সেই বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। অতঃপর তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দ্বারটি পরীক্ষা করিবার জন্য ধীরে ধীরে দ্বারের নিকট গমন করিলাম।

দ্বার পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বের একটি জিনিস দেখিতে পাইলেও বৈদ্যুতিক ঘণ্টার হাতলটি দৃষ্টিগোচর হইল না; তৎপরিবর্ত্তে সেকেলে একটা পিত্তল-নির্ম্মিত হাতলের উপর 'দর্শনার্থী' এই কথাটি মসৃণ প্লেটে ক্ষোদিত দেখিলাম। বহুদিন হইতে নিয়মিতভাবে মার্জ্জিত হওয়ায় সেই অক্ষরগুলি ক্ষয়িতপ্রায় হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন দ্বারের সম্মুখস্থ বারান্দায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, তাহাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সাদা ও কাল টালিগুলি তুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে 'সিমেণ্ট' মাজিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সেই অট্টালিকার বাহিরের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কুপ অসাধারণ চতুর, ইহার প্রমাণ পদে পদে পাইয়াছি! আমি স্পন্দিত-বক্ষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসিয়া ক্রেণের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, ক্রেণ কোন স্থানে টেলিফোন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে।

আমি সেই স্থানে একাকী দাঁড়াইয়া কুপের কৌশলের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। সে তাহার বাসগৃহের বাহ্য আকার পরিবর্ত্তনের জন্য অদ্ভুত তৎপরতা অবলম্বন করিয়াছিল। ভবিষ্যতে বিপন্ন হইতে পারে, এই আশঙ্কাতেই সে এই কায করিয়াছিল। যোয়ান তাহার পিতার ফন্দী-ফিকিরের কথা জানিত বলিয়াই আমাকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছিল,আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও কুপের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব না। যোয়ানের এই ধারণা সত্য; কিন্তু নীল আলোক-ফুলিঙ্গ বাতায়ন-পথে আমাদের দৃষ্টি-গোচর হওয়াতেই তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল।

সেই আলোক-ফুলিঙ্গ দেখিয়া আমার মন নানা চিন্তায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমার মনে হইল, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তব্ধ সন্ধ্যায় হয় ত কোন নিরীহ পথিক কুপের করকবলিত হইয়া কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিতেছিল। আমরা কি ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিব?

সহসা সেই অট্টালিকার দ্বার উন্মুক্ত হইল। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু ভিতরে কোন আলোক দেখিতে পাইলাম না; হল-ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন।

কয়েক মিনিট পরে একটি স্ত্রীলোক সেই পথে বাহিরে আসিয়া পশ্চাতের দ্বার রুদ্ধ করিল। রমণী দীর্ঘাকৃতি, ক্ষীণাঙ্গী, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ পরিচ্ছদ-মণ্ডিত।

আমি তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করিয়া, তাহার মনে ভয় বা সন্দেহের উদ্রেক না হয়, এই ভাবে তাহার সম্মুখে আসিলাম। সে পথের একটি আলোকস্তম্ভের নীচে আসিলে সেই দীপের আলোকে তাহার আপাদমস্তক দেখিতে পাইলাম।

এই রমণীকে আমি পূর্ব্বে কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না। সে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহার বয়স প্রায় ৩০ বৎসর বলিয়াই অনুমান হইল। তাহার চক্ষুতারকা ও কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ। তাহার মস্তক একটি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ টুপীতে আবৃত দেখিলাম। তাহার পরিহিত কোটটি দীর্ঘ, কৃত্রিম লোম দ্বারা সুসজ্জিত। তাহার আকার-প্রকার ও বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে উচ্চশ্রেণীর পরিচারিকা বলিয়াই ধারণা হইল; অনুমান হইল, সে কয়েক ঘণ্টার জন্য অবসর-যাপন করিতে বাহিরে যাইতেছিল। তাহার হাত কৃষ্ণবর্ণ দস্তানা-মণ্ডিত, হাতে একটি ব্যাগ ছিল।

সে কিঞ্চিৎ দূরে প্রস্থান করিলে আমি পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া চলিলাম; আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, আমার অলক্ষ্যে আর কেহ সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিপরীতদিকে চলিয়া যাইতে পারে। আমি কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ক্রেণকে তাড়াতাড়ি আমার দিকে আসিতে দেখিলাম।

সে আমাকে নিম্নস্বরে বলিল, "ডেনম্যান ১৫ মিনিটের মধ্যেই এখানে উপস্থিত হইবেন। তিনি একখানি ট্যাক্সি লইয়া বাহির হইয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার প্রতীক্ষা করিব। কয়েক মাস হইতে তিনি তদন্তের ভার লইয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে সেই তদন্তের ফল আমা-দিগকে তিনি জানাইতে পারিবেন।"

ক্রেণ বলিল, "হাঁ, নিশ্চিতই পারিবেন।"

অতঃপর আমরা উভয়ে কিছু দূরে সরিয়া গিয়া সেই খ্যাতনামা ডিটেক্টিভের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমরা এক স্থানে না থাকিয়া পরস্পর হইতে কিছু দূরে রহিলাম। আমাদিগকে একত্র দেখিলে কাহারও মনে হয় ত সন্দেহের উদ্রেক হইত।

সহসা হল-ঘরের ভিতর আলোক দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, কেহ সেখানে আসিয়াছে। কেহ সেখানে না আসিলে অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইত না। কিন্তু দুই তিন মিনিট পরে সেই আলোক নির্ব্বাপিত হইল। আমার মনে হইল, কুপ কি এতই মিতব্যয়ী যে, সে যখন হল-ঘরে উপস্থিত না হইয়া থাকে, তখন সেই কক্ষের আলো নিবাইয়া রাখে? ইব্রাহিম সেখানে লুকাইয়া আছে কি হাঁসপাতাল ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই পুলিসের হাতে পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই পথের কোণ দিয়া কয়েকখানি ট্যাক্সি দ্রুতবেগে চলিয়া গেল; কয়েক মিনিট পরে একখানি ট্যাক্সি অপেক্ষাকৃত মন্থর-গতিতে আমাকে অতিক্রম

করিয়া ক্রেণের সম্মুখে গিয়া থামিল। এক জন দীর্ঘকায় শীর্ণ লোক ট্যাক্সি হইতে নামিয়া ক্রেণের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলাপ করিলেন, তাহার পর তাঁহারা উভয়ে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন।

ক্রেণ আগন্তুককে আমার সহিত পরিচিত করিয়া বলিল, "ইনি আমাদের সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ডেনম্যান।"

সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ডেনম্যান আমার নাম শুনিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আনন্দিত হইলাম, মহাশয়! শুনিয়াছি, আপনি এই পল্লীতে আসিয়া এক দিন অতি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। আমরা এত দিন যে বাড়ীখানির সন্ধান করিতেছিলাম, তাহা না কি আপনি দেখিতে পাইয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমিও আনন্দিত হইলাম, মিঃ ডেনম্যান! হাঁ, আমার যে অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন, তাহা অত্যন্ত শোচনীয় বটে। আমার বিশ্বাস, আপনি তদন্তের ফলে এ সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানিতে পারিয়াছেন।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "হাঁ, যৎকিঞ্চিৎ। সকল বিষয় জানিতে পারি নাই। সে সকল কথা আপনাকে পরে বলিব।"

তিনি ক্রেণকে বলিলেন, "কোন্ বাড়ীখানির কথা বলিতেছিলে?"

ক্রেণ বলিল, "একটু দূরেই তাহা দেখিতে পাইবেন। আমি প্রথমে যাই, আপনারা স্বতন্ত্রভাবে আমার অনুসরণ করুন। আমি যাই, বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নাক ঝাড়িব।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "বেশ, ভাল কথা।"

অতঃপর আমরা পৃথক্ হইলাম। ডেনম্যান কিছু দূরে থাকিয়া ক্রেণের অনুসরণ করিলেন। আমি সকলের শেষে সেই রহস্যপূর্ণ ভবনের অভিমুখে চলিলাম। কয়েক মিনিট পরে ক্রেণ সেই অট্টালিকার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিল, এবং তাহা নাকের উপর চাপিয়া ধরিয়া সজোরে নাক ঝাড়িল। মিঃ ডেনম্যান তাড়াতাড়ি তাহার অনুসরণ করিয়া সেই অট্টালিকার দ্বার অতিক্রম করিলেন। অতঃপর আমরা তিন জনে পার্কের অভিমুখে প্রসারিত অনতিদীর্ঘ পথটির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

"আমি বলিলাম, "এই রাস্তার নাম কি?"

ডেনম্যান বলিলেন, "নামটি আমার জানা নাই। আমি এই পথে অন্যূন এক শতবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু কোন অংশে ইহার নাম দেখিতে পাই নাই। নাম লেখা থাকিলে অন্ধকারে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

ক্রেণ বলিল, "আমরা পরে তাহা জানিতে পারিব। এখন প্রশ্ন এই যে, বাঘটাকে আমরা কি উপায়ে তাহার গুহার ভিতর ধরিতে পারিব?"

আমি বলিলাম, "সে বাড়ীতেই আছে, এ বিষয়ে আপনি কি নিঃসন্দেহ হইয়াছেন?"

ক্রেণ বলিল, "এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনারা আমার সঙ্গে ঐ কোণে চলুন।"—সে কয়েক গজ দূরে একটি ক্ষুদ্র বাতায়নের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল। সেই বাতায়ন হইতে উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক দেখা যাইতেছিল।

ক্রেণের সহিত আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইলে ক্রেণ বলিল, "এ সেই জানালা। আপনারা লক্ষ্য করিলে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইবেন।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "অদ্ভুত দৃশ্য?"

ক্রেণ বলিল, "হাঁ, অতি অদ্ভুত, অসাধারণও বটে। নীল বর্ণ বিজলীর স্ফুলিঙ্গ। কখন ছোট, কখন বড়।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "কেহ বোধ হয় বিদ্যুতের সাহায্যে কোন রকম পরীক্ষা করিতেছে।"

আমি বলিলাম, "পরীক্ষার পরিবর্ত্তে কোন সাঙ্কেতিক কৌশল বলিয়াই আমার ধারণা। ইহা মোর্সের সাঙ্কেতিক বর্ণমালার অনুসারে প্রদর্শিত হইতেছে। আপনি ইহার অর্থ আবিষ্কার করিতে পারিবেন?"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "মোর্সের সাঙ্কেতিক বর্ণমালায় আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে, আমাকে উহা শিখিতে হইয়াছিল।"

আমি আগ্রহভরে বলিলাম, "তাহা হইলে আপনি ঐ জানালা লক্ষ্য করুন। যে সাঙ্কেতিক আলোক-স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইবেন, তাহার অর্থ করুন।"

আমরা তিন জনেই উৎকণ্ঠাকুল-চিত্তে ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং কয়েক মিনিট রুদ্ধনিশ্বাসে সেই দিকে চাহিয়া সেই অদ্ভুত রহস্য-ভেদের আশায় গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

ত্রয়োবিংশ প্রবাহ

রুদ্ধদ্বার কক্ষের রহস্য

পুনর্ব্বার সেই নীলাভ আলোকস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইল। তাহা দেখিয়া ডেনম্যান বলিলেন, "অদ্ভুত বটে! মিঃ কোলফাক্স, ইহাই যে সেই বাড়ী, এ বিষয়ে কি আপনি নিঃসন্দেহ ?"

আমি বলিলাম, "না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই; বরং আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই বাড়ীর বাহিরে যে সকল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি, তাহা পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই।"

অতঃপর সেই নীল আলোকের স্ফুরণ আরম্ভ হইল; নীলাভ আলোকের দীর্ঘ জিহ্বা অদৃশ্য হইবামাত্র একটি ক্ষুদ্র জিহ্বা পরিস্ফুট হইল; এইভাবে পর পর সাঙ্কেতিক আলোকের বিকাশ লক্ষিত হইল।

মিঃ ডেনম্যান তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হাঁ, সাঙ্কেতিক আলোকস্ফুরণের অর্থ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। উহার অর্থ—"তিন জন লোক পাহারায় আছে।"

আমি বলিলাম, "কাহাকেও সতর্ক করিতেছে ?"

ক্রেণ বলিল, "কিন্তু এই সঙ্কেত কাহাকে লক্ষ্য করিয়া পাঠাইতেছে ?"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "ইহা বেতারের সংবাদ বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয়, নিকটস্থ কোন বাড়ীতে এই সংবাদ প্রেরিত হইতেছে।"

ক্রেণ বলিল, "কেহ আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ?"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আমরা বোধ হয় সব গোল করিয়া ফেলিলাম! আপনারা দু'জনে বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিলেন ?"

আমি বলিলাম, "আমরা যাহা করিয়াছি, সতর্কভাবেই করিয়াছি; কিন্তু এই সাঙ্কেতিক আলোকে তিন জন লোকের কথা জানাইতেছে।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "লোকগুলা অত্যন্ত চতুর। তাহারা আমাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়াছে। চলুন, আমরা দরজায় আঘাত করি; যে উপায়ে হউক, ভিতরে প্রবেশ করিয়া সকল কায শেষ করিতে হইবে। যদি আমরা তল্লাসী পরোয়ানা সংগ্রহের জন্য বিলম্ব করি, তাহা হইলে তাহারা আমাদের মুঠার ভিতর হইতে পলায়ন করিবে। আমি সেই অদ্ভুত-প্রকৃতির বৃদ্ধটির মতি-গতি সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছি। আমি প্রথমে ভিতরে প্রবেশ করিব, আপনারা প্রস্তুত থাকুন। নিকটে কোথাও লুকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন, যেন আপনাদিগকে কেহ দেখিতে না পায়। যদি কেহ বাহিরে আসে, ক্রেণ, তুমি তাহার অনুসরণ করিবে। তবে আমাকে আধঘণ্টার জন্য ইয়ার্ডে যাইতে হইবে। ততক্ষণ সতর্ক থাক, যেন কেহ পলায়ন করিতে না পারে।"

ক্রেণ ও আমি পৃথক্ স্থানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি দ্বারের বাহিরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এক জন কন্‌ষ্টেবল আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল; সৌভাগ্যক্রমে সে আমাকে দেখিতে পাইল না। এক এক মিনিট এক এক ঘণ্টার মত দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল।

শীতের রাত্রি, তাহার উপর বৃষ্টিধারায় পথ সিক্ত, পথে তখন পথিকের একান্ত অভাব। দূরে বড় রাস্তায় মালবাহী শকটের শব্দ ও মোটর-গাড়ীর 'হর্ণ' আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল।

সেই রহস্যপূর্ণ অট্টালিকার দ্বার আমি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছিলাম; সেই দ্বার দিয়া কে এক জন বাহিরের দিকে চাহিল, কিন্তু আমাকে সে দেখিতে পাইল না। কিছু কাল পরে এক জন ডাকপিয়ন চিঠিপত্র বিলি করিবার জন্য পাশের বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল এবং সেই বাড়ীর ডাক-বাক্সে চিঠি-পত্র ফেলিয়া, আমি যেখানে লুকাইয়া ছিলাম, সেই দিকে আসিতে লাগিল। লোকটা আমাকে দেখিতে পাইবে না কি ? আমি সঙ্কুচিতভাবে তাহার ব্যাগের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

কি বিপদ! লোকটা ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ক্রেণ কোথায় ?"

কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম, ডাকপিয়ন ছদ্মবেশী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেনম্যান!

আমি বলিলাম, "ঐ ওধারে সাদা বাড়ীখানার বিপরীত দিকে।"

মিঃ ডেনম্যান আমাকে বলিলেন, "আমার অনুসরণ করুন। উহারা দরজা খুলিবামাত্র ভিতরে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু ক্রেণকে আগে ডাকিয়া আমুন।"

মিঃ ডেনম্যান ডাকপিয়নের মত আরও কয়েকটি দরজায় আঘাত করিলেন। তাঁহার ছদ্মবেশে খুঁত ছিল না।

আমি ক্রেণের নিকট উপস্থিত হইয়া মিঃ ডেনম্যানের আদেশ জানাইলাম। তাহার পর আমরা ল্যাংনি ষ্ট্রীট দিয়া মিঃ ডেনম্যানের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন একখানি ঘরের বারান্দায় উঠিয়া দরজায় ধাক্কা দিলেন এবং গৃহবাসীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমি বুঝিতে পারিলাম, তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বাড়ীতে ঘুরিতে লাগিলেন যে, কুপের বাড়ী হইতে কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া থাকিলে সে বুঝিতে পারিত, ডাক-পিয়নই চিঠি বিলী করিতে বাহির হইয়াছে।

আমরা তিন জনে রহস্যের খাসমহলের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মিঃ ডেনম্যান ঘণ্টাধ্বনি করিলে কেহ দ্বারের নিকট আসে কি না, জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল; কিন্তু কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলাম না। গৃহকক্ষ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

মিঃ ডেনম্যান পুনর্ব্বার দ্বারে আঘাত করিলেন। আমরা দ্বারে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। হঠাৎ গৃহমধ্যে কাহার পদশব্দ হইল। গৃহবাসীরা বোধ হয় আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়াছিল, কারণ, আমাদিগকে তাহারা ভিতর হইতে দীর্ঘকাল দেখিতে পায় নাই। কয়েক মিনিট পরে দ্বারের অর্গল খুলিবার শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হইল। একটি বিদেশী যুবক ভৃত্য দ্বার খুলিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

মুহূর্ত্তমধ্যে আমরা তিন জনেই সেই ভৃত্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া মুক্ত দ্বারপথে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

ভৃত্য ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিল, "এ কি! এ কি রকম ব্যবহার? কে তোমরা? ডাকাত না কি?"

আমি তৎক্ষণাৎ আমার পিস্তলটি তাহার ললাটে উদ্যত করিয়া বলিলাম, "চুপ রহ! গোলমাল করিয়াছ ত মরিয়াছ। মিঃ কুপ কোথায়?"

ভৃত্য বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জড়িতস্বরে বলিল, "মিঃ কুপ? তাহার কথা কিরূপে বলিব? আমি ত তাহাকে চিনি না।"

মিঃ ডেনম্যান ক্রেণকে ইঙ্গিত করিবামাত্র ক্রেণ ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চাবি পকেটে ফেলিল। তাহার পর ডেনম্যান কঠোর স্বরে বলিলেন, "এখানে আছে কে? আমি পুলিস-কর্ম্মচারী। সতর্কভাবে কথা বলিও। কে তুমি?"

ভৃত্য বলিল, "আমি খানসামা। আমি মিঃ থরোল্ডের সর্দ্দার খানসামা হিন্‌রিচ ক্লিন।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "থরোল্ড! মিঃ থরোল্ড কি এখানে থাকেন?"

ভৃত্য বলিল, "হাঁ মহাশয়, তিনি এখন রিভিয়ারায় গিয়াছেন। বাড়ী বন্ধ আছে। এখানে আমি ও তাঁহার সফেয়ার বার্ণি ভিন্ন আর কেহ নাই।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "কিছু কাল পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটি বাহিরে গেল, সে কে?"

ভৃত্য বলিল, "সে প্রত্যহ জিনিষপত্র ঝাড়িতে ও ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিতে আসে। তাহার নাম মিসেস্ মরিস্।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "তোমাকে ত অনেক সময় 'ল্যাম্‌ব্রিনসে' দেখিতে পাওয়া যায়। এ কথা কি সত্য নহে?"

তাঁহার প্রশ্নে চাকরটা ভয়ে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে জড়িতস্বরে বলিল, "হাঁ—আমি—আমি কখন কখন সেখানে যাই বটে, আমরা—জার্ম্মাণরা অবসর পাইলেই সেখানে যাই।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আমি তাহা জানি। কিন্তু তুমি যাহাদের সঙ্গে সেখানে মিশিয়া থাক, তাহারা কি সৎ-লোক? তাহারা সকলেই তোমার জার্ম্মাণ বন্ধু? আমি তাহাদের দুই এক জনকে চিনি। বৃদ্ধ ওয়াজারম্যান, ঘড়ী-ওয়ালা ক্রুসিডিজ প্রভৃতি আমার পরিচিত। আরও দুই এক জনের নাম বলিব কি?"

ভৃত্য বুঝিতে পারিল, সেই পুলিসের লোকগুলি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে। তাহার আতঙ্ক বর্দ্ধিত হইল।

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আমার কাছে মিথ্যা কথা বলিও না। এই বাড়ীতে আর কে আছে, বল। আমি সত্য কথা শুনিতে চাই।"

ভৃত্য বলিল, "আর কেহ নাই। বার্ণি ৫টার সময় বাহিরে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।"

মিঃ ডেনম্যান হাসিয়া বলিলেন, "আর তোমার মনিব

রিভিয়ারায় গিয়াছেন বলিলে ; তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব না ? আমার বিশ্বাস, আমি রিভিয়ারায় না গিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব।"

ভৃত্য বলিল,"না, তিনি ক্যাপেসের বো সাইটে আছেন।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "তোমার মনিব মিঃ থরোল্ডের আর একটা নাম আছে জান ?—সেই নামটি কুপ।"

ভৃত্য বলিল, "আমি কোন দিন ঐ নাম শুনি নাই।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "তিনি কবে বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছেন ?"

ভৃত্য বলিল, "গত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। তিনি প্রতি বৎসরই দক্ষিণাঞ্চলে বেড়াইতে গিয়া থাকেন।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আর সেই মেয়েটি—মিস্ মনক্রিফ, সে কোথায় ? যাহাকে তোমরা যেসি বলিয়া ডাক, সেই মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

ভৃত্য বলিল, "মিঃ থরোল্ডের ভাইঝি ঈষ্টবোর্ণের স্কুলে লেখাপড়া করে। আমার বিশ্বাস, মিঃ থরোল্ড তাহাকেও সেখান হইতে লইয়া গিয়াছেন।"

মিঃ ডেনম্যান।—সকলে তাহাকে যেসি বলিয়াই ডাকে ত ?

ভৃত্য।—না মহাশয়, সকলে তাহাকে রোজ বলিয়া ডাকে।

মিঃ ডেনম্যান।—তা তাহাকে যে নামেই ডাকা হউক, তাহাকে সনাক্ত করা কঠিন হইবে না। আমরা এই বাড়ীর আগাগোড়া খানাতল্লাস করি। উপরের ঘরে বসিয়া কে বিজলীর আলোকের সাহায্যে কাহাকে সঙ্কেত করিতেছে ?

ভৃত্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সভয়ে বলিল, "বিজলীর আলো, সঙ্কেত—এ সকল আপনি কি বলিতেছেন ? এই বাড়ীতে এখন কেবল আমিই আছি, আর কেহ নাই।"

মিঃ ডেনম্যান অবিশ্বাসভরে বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও, উপরের যে কুঠুরীর জানালা পথ হইতে দেখা যাইতেছে, সেই কুঠুরীতে কেহই নাই ?"

ভৃত্য।—না মহাশয় ! আমার কথা বিশ্বাস না করেন, উপরে গিয়া দেখিতে পারেন।

মিঃ ডেনম্যান।—আমার বিশ্বাস, তুমি আমাদের সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করিতেছ। আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করিলে তোমার বিপদ ঘটিবে, এ কথা স্মরণ রাখিও। তুমি সকল কথা সরলভাবে খুলিয়া বল।

ভৃত্য বলিল, "আমি ত বলিয়াছি। কিন্তু আপনারা পুলিসের লোক হইয়া জোর করিয়া কেন এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা এখনও বলেন নাই। ইহা ভদ্রলোকের বসতবাড়ী, আমার উপর এই বাড়ীর ভার আছে। যদি আমার কাযের কোন ত্রুটি হয়, সে জন্ম আমি থরোল্ডের নিকট দায়ী।"

মিঃ ডেনম্যান।—আমি আমার এই দুইটি বন্ধুকে লইয়া এখানে তদন্ত করিতে আসিয়াছি। আমরা এরূপ কোন কোন বিষয় জানিতে পারিয়াছি, যাহা সত্য কি না, পরীক্ষা করিবার জন্ম এইভাবে আমাদিগকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে হইয়াছে। যদি এই বাড়ীর ঘরগুলি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারি, আমাদের সন্দেহ অমূলক, আমরা ভুল করিয়া এখানে আসিয়াছি, তাহা হইলে আমরা আমাদের ভ্রমের জন্ম তোমার মনিবের কাছে ক্ষমা চাহিব। কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে আমরা খানাতল্লাস না করিয়া ফিরিতে পারিব না।"

আমি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সেই জার্ম্মাণ ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তাহার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। সেই বাড়ীতে হঠাৎ পুলিস প্রবেশ করায় তাহাকে আতঙ্কে বিহ্বল হইতে দেখিয়া আমার ধারণা হইল, সেই বাড়ী সতর্কভাবে খানাতল্লাস করিলে আমাদের চেষ্টা বিফল হইবে না।

আমি সেই কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে সকল সামগ্রী দেখিতে পাইলাম, তাহাদের কতকগুলি পূর্ব্বে সেখানে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই মনে হইল। এত দিন পরে সত্যই আমরা রহস্যের খাসমহলের সন্ধান পাইয়াছি।

হল-ঘরে যে সকল আসবাব দেখিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ওক-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আন্‌লাটি, উচ্চ কাঁধবিশিষ্ট কারুখচিত তিনখানি চেয়ার, ওক-কাষ্ঠের একটি বৃহৎ সেকেলে সিন্দুক—সেখানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল। সেইগুলি দেখিয়াই সেই স্মরণীয় দিনের লোমহর্ষণ স্মৃতি আমার হৃদয় বিচলিত করিয়া তুলিল। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিলাম। সেবার যে সিঁড়ি দেখিয়াছিলাম, তাহা সেই কক্ষের বাঁ ধারে ছিল, এবার তাহা ডাইন ধারে দেখিলাম। হলঘরটি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর মনে হইল ; কিন্তু তাহার মেঝের উপ[illegible] লাল ও নীলের

"করিবর রাজহংস- গতিগামিনী
চললিত সঙ্কেত-গেহা।
অমল তড়িত দণ্ড হেম-মঞ্জরী
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥" বিদ্যাপতি।

ডোরা-বিশিষ্ট যে গালিচা প্রসারিত দেখিয়াছিলাম, এবারও সে গালিচাখানি দেখিতে পাইলাম।

আমার স্মরণ হইল, যোয়ান আমাকে আগ্রহভরে অনুরোধ করিয়াছিল, আমি যেন রহস্যভেদের জন্য চেষ্টা না করি। তাহার সেই অনুরোধ আজ অগ্রাহ্য করিয়াছি ভাবিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করিলাম, কিন্তু এত দিন পরে আমার চেষ্টা সফল হইল ভাবিয়া মনে একটু আনন্দও হইল। মিঃ ডেনম্যান জার্ম্মাণ চাকরটার কোন কথা বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে নানাপ্রকার জেরায় বিব্রত করিয়া তুলিলেন।

অবশেষে তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ কোলফাক্স, আপনি ত ঘরের ভিতর আসিয়াছেন, এখন আপনার কি মনে হইতেছে? এই কক্ষটি আপনার পরিচিত নহে কি?"

আমি বলিলাম, "কোন কোন জিনিষ আমার পরিচিত বটে; কিন্তু আমি পূর্ব্বে এখানে দেখি নাই—এরূপ সামগ্রীও আছে।"

মিঃ ডেনম্যান দক্ষিণ পাশের একটি দ্বার খুলিলেন। তাঁহার আদেশে চাকরটা সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল।

আমি সেই দ্বারের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "হাঁ, এই কক্ষ আমার পরিচিত, আমি এখানে আসিয়াছিলাম। ইহা সেই বাড়ীই বটে।"

তাহা পাঠ-কক্ষ। সেই কক্ষের প্রত্যেক সামগ্রী আমার পরিচিত। পুস্তকের আলমারীগুলি, তাহাদের ডালার উপর বেলোয়ারি কাচের হাতল, মেহগ্নি-কাঠের প্রকাণ্ড টেবলখানি, স্প্রিঙের গদী-আঁটা চেয়ার, আরামপ্রদ সোফা, তাহার উপর লাল রেশমী ওয়াড়-বিশিষ্ট উপধান সকলই আমি চিনিতে পারিলাম।

ইব্রাহিম কাফির পেয়ালা আনিয়া যোয়ানের হাতে দিতে উদ্যত হইলে যোয়ান যে চেয়ারে বসিয়া অনিচ্ছার সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছিল, সেই চেয়ারখানি সেই স্থানেই সংস্থাপিত দেখিলাম। ইব্রাহিম ও কুপ যোয়ানকে সেই কাফির পেয়ালা গ্রহণে বাধ্য করিলে যোয়ানের মুখে যে হতাশ ভাব, তাহার চক্ষুতে যে আতঙ্ক প্রতিফলিত দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা আমার মনশ্চক্ষুতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কাফি-পানের পর তাহার চোখ-মুখের যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা সুস্পষ্টরূপে আমার স্মরণ হইল।

মিঃ ডেনম্যান আমার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি ঠিক এই কক্ষেই আসিয়াছিলেন, তাহা আপনার স্মরণ আছে ত?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, ইহাই ঠিক সেই কক্ষ—যে কক্ষে অপরিচিত পথিকগণকে ভুলাইয়া আনিয়া পরে তাহাদিগকে নানাভাবে উৎপীড়িত করা হয়। কুপ আমাকে কৌশলে ভুলাইয়া আনিয়া এই কক্ষেই আমার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। আমি এখানে আসিয়া তাহার ফাঁদে ধরা দিই, এই উদ্দেশ্যে আমাকে কিরূপ মিষ্ট কথায় অভিনন্দিত করিয়াছিল, তাহা আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না। এই কক্ষেই সে আমাকে তাহার কন্যা যোয়ানের সহিত পরিচিত করিয়াছিল। এই কক্ষেই আমি যোয়ানকে কুপের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অভিভূত হইতে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে আতঙ্কে অভিভূত হইতে দেখিয়াছিলাম।"

মিঃ ডেনম্যান দৃঢ়স্বরে জার্ম্মাণ চাকরটাকে বলিলেন, "তুমি আমার কাছে আগাগোড়া মিথ্যাকথা বলিয়াছ, তাহার প্রমাণ পাইলে ত! এখন সত্য কথা বলিবে? আমি এখনও তোমাকে সত্য কথা বলিবার সুযোগ দিতেছি। তোমার মনিব থরোল্ড আর কুপ অভিন্ন লোক, এ কথা কি তুমি অস্বীকার করিতে সাহস করিবে?"

চাকরটা মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি সত্যই তাহা জানি না, মহাশয়! কুপ নামক কোন লোককে আমি চিনি না।"

আমি বলিলাম, "ইব্রাহিম নামক আরবটাকেও তুমি চেন না? ইব্রাহিম এখানেই বাস করে, আর তুমি তাহাকে চেন না?"

চাকরটা মাথা নাড়িয়া বলিল, "এখানে কোন কালা আদমী বাস করে না।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "তুমি শপথ করিয়া এ কথা বলিতে পার?"

জার্ম্মাণটা তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে বলিল, "হাঁ, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এখানে কোন আরব-টারব বাস করে না।"

আমি বলিলাম, "সে হয় ত এখানে বাস করে না; কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে এখানে আসে ত?"

চাকরটা বলিল, "না, সে এখানে আসে না, যদি আসিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতাম, তাহার নামও জানিতে পারিতাম।"

আমি সেই কক্ষের চারিদিক্ লক্ষ্য করিয়া চিন্তামগ্ন হইলাম। সেই কক্ষটি যত বড় দেখিয়াছিলাম—এবার তাহা

অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বড় বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু সেবার আমার মন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিল না, এই জন্য এই কক্ষের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সম্বন্ধে তখন আমার যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা ভ্রমসঙ্কুল হওয়া বিচিত্র নহে। সেই বিষাক্ত কাফি পান করিয়া আমার পরিমাণ-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। এই জন্য সেবার ঘরটিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। উপরের যে কক্ষে নীত হইয়া আমি নিদারুণ পীড়ন সহ্য করিয়াছিলাম, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইল। এত দিন পরে নর-পিশাচ কুপের প্রেতকীর্ত্তির নিদর্শন দেখিতে পাইব ভাবিয়া আমি অধীর হইলাম। হাঁ, এত দিন পরে তাহার মুখোস উন্মোচিত হইবে।

আমি উৎসাহভরে মিঃ ডেনম্যানের অনুসরণ করিয়া সেই অট্টালিকার প্রত্যেক অংশ—প্রতি কোণ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। নীচের তলার প্রতি কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কুপের শয়তানীর কোন নিদর্শন আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। ভোজনকক্ষ, ধূমপানের কক্ষ প্রভৃতি সকল কক্ষ পরীক্ষা করিয়া অবশেষে আমরা সেই অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগে একটি দ্বার দেখিতে পাইলাম, তাহা তালাচাবি দিয়া বন্ধ দেখিলাম।

চাকরটা মিঃ ডেনম্যানের প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "ঐ দরজার তালার চাবি আমার কাছে নাই।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "বেশ, তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না, আমরা তালা ভাঙ্গিয়া দরজা খুলিতে পারিব।"

তিনি পকেট হইতে একটি যন্ত্র বাহির করিয়া তাহার অগ্রভাগ সেই তালার ভিতর পুরিয়া দিলেন। ২ মিনিটের মধ্যে দ্বার উন্মুক্ত হইল। সেই কক্ষে একখানি পুরাতন সবুজ বর্ণের জীর্ণ গালিচা ও একখানি টেবল দেখিতে পাইলাম। টেবলখানি আবরণহীন। টেবলের উপর ধূলার পুরু স্তর। কক্ষটি দীর্ঘকাল রুদ্ধ থাকায় অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। অগ্নি বহুদিন ব্যবহৃত না হওয়ায় তাহাতে মরিচা ধরিয়াছিল।

দেওয়ালে কয়েকখানি ছবি ছিল, তাহার কাচের উপর ধূলার স্তর ও মাকড়সার জাল। ফ্রেমগুলির গিল্‌টি চটিয়া গিয়াছিল। গিল্‌টির অধিকাংশ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলাম।

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "এই কামরাটি কি কাযে ব্যবহৃত হইত ?"

চাকরটা তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, "তাহা জানি না। মহাশয়! এই কামরা তালাচাবি দিয়া বন্ধ থাকিত। আমি এখানে চাকরী লইবার পর কোন দিন এই কামরা খুলিতে দেখি নাই।"

আমি বলিলাম, "তোমার মনিব কোন দিন রাত্রিকালে গোপনে এই কামরায় প্রবেশ করিত কি ?"

চাকরটা বলিল, "আমার তাহা জানা নাই।"

ক্রেণ বলিল, "এই কামরার দরজা তালাচাবি দিয়া সর্ব্বদা বন্ধ থাকে কেন, ইহা জানিবার জন্য তোমার কি কোন দিন কোন কৌতূহল হয় নাই ?"

চাকর বলিল, "না, আমার তাহা কখন জানিবার ইচ্ছা হয় নাই; আমার মনিবের খেয়ালের কারণ জানিবার চেষ্টা করা আমি অনাবশ্যক মনে করি।"

আমি সেই পুরাতন সবুজ গালিচাখানি পরীক্ষা করিয়া বলিলাম, "দেখুন, ইহার মধ্যস্থলে বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার দাগ দেখিতেছি, এ কিসের দাগ, বলিতে পারেন ?"

মিঃ ডেনম্যান ও ক্রেণ উভয়েই সেই দাগটি পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর মিঃ ডেনম্যান গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই দাগ পরীক্ষা করিয়া আমার মনে হইতেছে, ইহা রক্তের দাগ। এখানে রক্ত জমিয়াছিল, দীর্ঘকাল ঐ ভাবে থাকায় তাহা কালো হইয়া গিয়াছে। আশা করি, আমার এই অনুমান মিথ্যা নহে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "রক্তের দাগ! তাহা হইলে এই কক্ষে কোন লোমহর্ষণ নিষ্ঠুর কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, কোন নিরীহ ব্যক্তিকে এই কক্ষে ভুলাইয়া আনিয়া এখানে তাহার প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার হইয়াছিল, এই রক্ত সেই পীড়নের নিদর্শন।"

মিঃ ডেনম্যান অঙ্গুলি দ্বারা সেই রক্তচিহ্ন স্পর্শ করিয়া তাহা সাবধানে পরীক্ষা করিবার পর বলিলেন, "হাঁ, যে দুর্ঘটনার কথা বলিতেছেন, তাহা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল; আমার বিশ্বাস, দুই চারি দিনের অধিক পূর্ব্বে নহে।"

আমি বলিলাম, "আবার একটা নূতন রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল! রহস্যের খাসমহল নানা গুপ্ত রহস্যে পূর্ণ!"

আমি স্তম্ভিতভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রী

চিত্র-জগতের অন্দর-মহল

অধুনা-প্রকাশিত প্রায় প্রতি ফিল্‌ম্‌-নাট্যের মধ্যে ফটোগ্রাফীর কৌশল প্রভূতরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। যে-সমস্ত বৃহৎ চিত্র-শিল্পশালা হইতে নিত্য নূতন বিচিত্র ধরণের ছবি বাহির হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেক তিনখানির মধ্যে ন্যূনপক্ষে একখানি ছবি কিছু-না-কিছু ফটোগ্রাফীর ফাঁকিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্যামেরা সর্ব্বদাই মিথ্যাকে সত্যের মোহে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে; এই যন্ত্রটির অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কার্য্য-কুশলতা দর্শকের চোখের সমক্ষে কোন-রূপ কৃত্রিমতার আভাস আনিয়া দেয় না। এই ক্ষুদ্র যন্ত্র অসংখ্য সৌধ-মালা, অভ্রংলিহ তুষারমৌলি শৈলরাজি প্রভৃতির দৃশ্য ছবিতে জীবন্ত করিয়া তোলে; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে শিল্পীর পটে কিম্বা একটি কাচের পরকলায় ভিন্ন কোনদিনই অন্য কোথাও ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না!

চিত্র-প্রদর্শনী রঙ্গালয়ে (Cinema Theatre) দর্শক-মণ্ডলী বহুবিধ বিস্ময়কর অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে। তাহারা লক্ষ্য করে—একটি অশ্ব এবং এক জন সশস্ত্র আরোহী বীর নিরাপদে এক সঙ্কীর্ণ অথচ সুগভীর পার্ব্বত্য খাত (canyon) ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে; তাহারা দেখে—ভীম-বিক্ষুব্ধ জলপ্রবাহের সংঘাতে সেতু-বিচ্যুত হইয়া রেল-গাড়ীর সারি (train) বিপুল স্রোতের বেগে কোথায় অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; নায়িকা গম্বুজশোভিত, পরিখা-পরিবেষ্টিত ও টানা-পুলে সুসমৃদ্ধ বহু প্রাচীনযুগের দুর্গ-প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছে! এ-সব দৃশ্যই দর্শকের চোখের সামনে বাস্তব রেখায় ফুটিয়া ওঠে। দর্শকের নয়ন-সমক্ষে ক্যামেরা-প্রদত্ত এই সকল দৃশ্য-কৌশলের বর্ণ ও রূপ সত্যের মহিমায় প্রাণবন্ত হয়, সে জন্য কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহের প্রশ্ন উত্থিত হয় না। তথ্য ও সত্যের সজীব লীলা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া ক্যামেরা সকলকে অভিভূত করিয়া তোলে।

এই সকল মিথ্যাকে সত্য করিয়া তুলিবার পক্ষে ক্যামেরার যে শক্তি আছে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, উল্লিখিত অশ্ব ও আরোহী বীর কোনকালেই গভীর পাহাড়ী খাত লাফাইয়া পার হয় নাই; প্রবল বন্যা ট্রেণগাড়ীকে কোন-দিনই ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই; এবং যে দুর্গসৌধে নায়ি-কার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ভিত্তিও কোথাও কোনদিন সংস্থাপিত হয় নাই! যদি দুর্গের কোন অস্তিত্ব থাকে, তাহা কেবলমাত্র একটি একতলা বাড়ীর সামান্য কাঠামো, না আছে তাহার গম্বুজের চূড়া, না আছে তাহার দন্তুর-বৃতি (battlements, দুর্গ-প্রাচীরের খাঁজ) কিম্বা পরিখা। ক্যামেরা এই সকল বস্তু এমন বাস্তবতায় মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ শিল্পিগণও ছবির দৃশ্যগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়া সব সময়ে বলিতে পারেন না—কোথায় বাস্তবতার সমাপ্তি এবং কোন্‌খানেই বা ফাঁকির কারসাজি সুরু হইয়াছে।

ছবি তোলার ব্যাপারে ফটোগ্রাফীর চাতুর্য্য অবলম্বন করা কোনক্রমেই অযশস্কর নয়। পরন্তু এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্য্য-কুশলতার পরিচায়ক ও ব্যবসায়ের পক্ষে অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক পন্থা, এবং সেই ব্যবসায়কে চিত্রব্যবসায়ীদের মধ্যে কয়েক জন শ্রেষ্ঠ শিল্পী শিল্পকলার জাতে তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। অনেক উঁচুদরের চিত্র-প্রয়োগ-শিল্পীর বিশ্বাস যে, ছবি তোলা শেষ হইয়া যাইবার পর দর্শকদের নিকট তাঁহাদের ক্যামেরার গোপন কথা প্রকাশ করিলে কোন ক্ষতি নাই; বরং এক জন বুদ্ধিমান্ দর্শকও যদি বুঝিতে পারেন, কোন্ কোন্ দৃশ্যে সযত্ন-রচিত কৌশলের সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি অধিকতর আন্তরিকতা ও মনোযোগের সহিত সে সকল বিষয় উপভোগ করিবেন। ক্যামেরা যে সমস্ত মিথ্যার জাল অতি অনায়াসে ও বাস্তবতার রঙে রঙীন করিয়া গড়িয়া তোলে, তাহার সমগ্রতা নেত্রপাতে সত্যমূর্ত্ত হইয়া উঠে। এক্ষণে ক্যামেরার সেই কলা-চাতুরী-ভরা অন্দর-মহলের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ তাঁহার কতকগুলি বৃহত্তম ফিল্‌ম্‌-চিত্রে বহুবিধ সুকৌশলপূর্ণ ছবি তোলার রীতি ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ঈপ্সিত যে জিনিষটিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা তিনি বিশালভাবে সুসম্পন্ন করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার চলচ্চিত্রের সৌধরাজি সত্যই নির্ম্মাণ করা হয়, তাঁহার ছবি-নাট্যের জনতা জীবন্ত লোক লইয়া সংগঠিত; ইহা সত্ত্বেও তিনি জনসাধারণের সামনে যে ছবি প্রকাশ করিবেন, তাহাকে বিচিত্র রূপ দিতে প্রয়াসী হন; তিনি বিপুলকায় সৌধ-অট্টালিকাকে আরও বড়,

গ্লাশ্-শটের কৌশল; পছনের ব্যাক্-গ্রাউণ্ড কতটুকু আঁকা হইয়াছে, এ-চিত্র দেখিলে বুঝা যাইবে।
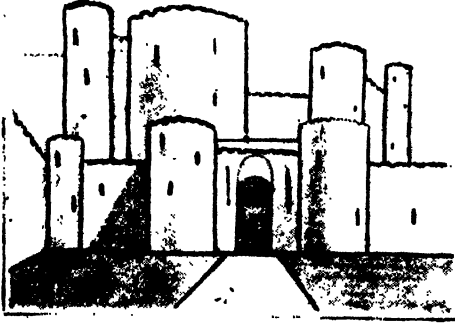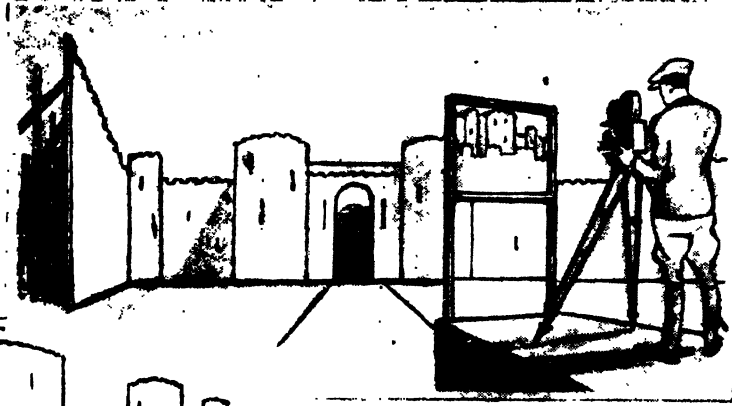
প্রথমেই "গ্লাশ-শটের" (Glass shot) কথা। ইহা সার্ব্বজনীনভাবে ছবি তোলার কাযে লাগানো হইয়া থাকে। "গ্লাস্-শট" কথাটির অর্থ অত্যন্ত সরল। একখানি চাদরের মত পাতলা অথচ চওড়া কাচের উপর চিত্রাঙ্কন করিয়া ভিতর ও বাহিরের দৃশ্য তুলিবার অভিপ্রায়ে আর একটি অতিরিক্ত পশ্চাৎপট (Back-ground) সংগৃহীত করা হয়। এই আলেখ্যটিকে ক্যামেরার সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ইহার উপর এমনভাবে আলোক-রশ্মি কেন্দ্রগত করা হয় যে, ক্যামেরার মধ্যপথ দিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, আলেখ্যের শেষ রেখাটি নির্ম্মাণ-দৃশ্যের আরম্ভের সহিত যথাযথ সম্মিলিত হইয়াছে; এবং এই সন্ধি-ক্ষণে আঁকা ছবি ও গঠিত দৃশ্যের একসঙ্গে ফটোগ্রাফ তুলিয়া লওয়া হয়।

"গ্লাস-শট" বেশীর ভাগ ভিতর-ছাদ, অত্যুচ্চ অট্টালিকা বা

আরও আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া দেখাইতে চান; কখনও কখনও তিনি এমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে উৎসুক হইয়া উঠেন— যাহার সফলতা কেবলমাত্র ফটোগ্রাফীর কৌশলের উপরই নির্ভর করে।

"দি থিফ অফ বাগদাদ্" (বাগদাদের চোর) চিত্রে যে বিচিত্র মোহন জাদু-কারপেট দর্শকের চোখের 'পরে ইন্দ্রজাল রচনা করে, "দি ব্ল্যাক্ পাইরেট" (কৃষ্ণ-বর্ণ জলদস্যু) চিত্রে গ্রীষ্ম-মণ্ডল-দ্বীপের দৃশ্যে, কিম্বা ঐ ছবিতেই বহুসংখ্যক জলদস্যুর ডুব-সাঁতার-দৃশ্যে যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবগুলিই ডগলাস্ ক্যামেরার চাতুরীতে বাস্তবতার রঙে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ফেয়ারব্যাঙ্কস্ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া এই পরিণতি ঘটাইয়াছেন, সে বিষয় সুবোধ্য করিবার পূর্ব্বে ক্যামেরার কৌশল-দৃশ্য কি কি পদ্ধতিতে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহার প্রধান কয়েকটি পন্থার বিবৃতি সঙ্গত বলিয়া মনে করি।
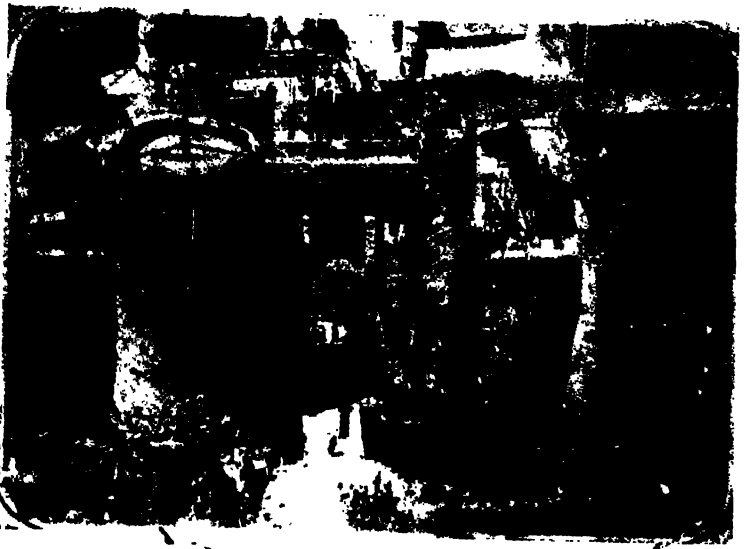
"রবিন-হুডে"র অসম্পূর্ণ প্রাসাদ; উহার সহিত আরো বহু প্রাসাদ-চূড়া সংলগ্ন হইয়াছে

দুর্গ এবং পর্ব্বতশ্রেণী চলচ্চিত্রে প্রতিভাত করিবার পক্ষে বড়ই উপযোগী। একটি সুবৃহৎ চার্চ্চের অভ্যন্তরদেশ কিরূপে তৈয়ার করা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ "দি প্রিজ্‌নার অফ জেন্দা" (জেন্দার বন্দিনী) চলচ্চিত্রটির অন্তর্ব্বর্ত্তী রাজ্যাভিষেক-দৃশ্য উল্লেখযোগ্য।

রঙ্গমঞ্চের উপর ইষ্টক-দৃঢ় প্রাচীরগুলি মাত্র ত্রিশ ফিট বিস্তার লাভ করিয়াছিল। নানাবর্ণে রঞ্জিত কাচের জানালা ও স্থাপত্য-কারু-খচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খিলান-সমেত সেই প্রধান চার্চ্চের শেষ অংশ কাচের উপর চিত্রিত হইয়াছিল। পর্দ্দার উপর এই ছবিটিকে সূক্ষ্মভাবে দেখিয়াও কোন্ স্থানে নির্ম্মাণ-দৃশ্যের সমাপ্তি এবং কোন্‌খানেই বা অঙ্কন-দৃশ্যের আরম্ভ, তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ ব্যাপার নয়। পর্ব্বতমালার বহির্দৃশ্য সকল এইরূপ একই উপায়ে গৃহীত হইয়া থাকে। গ্লাশ-শটের ব্যবহারের বিশেষ অর্থ হইতেছে এই যে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান সকল, যেমন ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার অ্যাবে, নোত্ররদাম্, দি গ্রাণ্ড কেনাল্ (ভেনিস্), মণ্ট ব্লাঙ্ক, মন্টিকারলো,—যে কোন ষ্টুডিওর অভ্যন্তর সমূহ পর্দ্দার উপর নিখুঁৎভাবে প্রতিলিখিত হইতে পারে; দৃশ্য-সমূহের ঘনপীনদ্ধকায়ার যথার্থ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করার ব্যবস্থার কিংবা যে যে স্থানের ছবি তোলা প্রয়োজন, সেই সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের যাতায়াতের খরচ বহন না করিয়াও কেবলমাত্র গ্লাশ-শটের সহায়তায় এই কার্য্য সফল করিয়া তোলা যায়।

গ্লাশ-শটের পর, হ্রস্বায়তন দৃশ্য-কায়ার (Miniatures) বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। বন্যার দৃশ্য, ধ্বংসের দৃশ্য, ভূমিকম্প, সশব্দ স্ফোটন, এবং অগণ্য সমর-দৃশ্য যথাযথ চিত্রে রূপান্তরিত করিবার জন্য বন, সেতু, গ্রাম, গড় ও পরিখা এবং আর যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়েরই একটি ক্ষুদ্র আকারের প্রতীক নির্ম্মিত হয়। যে বৃহৎ দৃশ্যে অভিনেত্রীগণ আপন আপন ভূমিকা অভিনয় করিয়া যায়, ইহা সেই বৃহতেরই অতি ক্ষুদ্র সঠিক প্রতিরূপ।

Wire-শট। প্রমোদ-নাট্যে লম্ফনকারী তুরঙ্গ, অলৌকিক ও অদ্ভুত ব্যাপার-সংঘটনকারী মোটর-গাড়ী, যে পোষাক এবং শিরস্ত্রাণ অভিনেতার তনু হইতে জাদু-প্রভাবে অপসারিত হইয়া স্বস্থানে পুনরায় উড়িয়া চলিয়া যায়—এ সকল প্রয়োগ ক্রিয়ার কালে Wire-shot অত্যধিকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফিল্‌ম্-রচনায় "double exposure" ব্যাপার ক্যামেরার অন্যতম কৌশল। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলচ্চিত্রে প্রেতাত্মা-প্রকাশে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। "Double exposure"-ক্যামেরা-রীতির অত্যন্ত আধুনিক ও উৎকৃষ্ট উদাহরণ, "পিটার গ্রীমের প্রত্যাবর্ত্তন" (The Return of Peter Grimm) নামক চলচ্ছবিখানি। এই ছবিতে পিটার গ্রীমের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত আলেক্‌ফ্রান্‌সিস্‌কে (Mr. Alec Franci) মৃত্যুর পরে তাঁহার পূর্ব্ববাস-পল্লীতে প্রেতাত্মা-রূপে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। তিনি অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে সুদীর্ঘ দৃশ্য-সমূহে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন; প্রত্যেক দৃশ্যেই তাঁহার দেহ ছিল স্বচ্ছ, ঘরের আসবাবপত্র কিম্বা দেওয়ালগুলি, এমন কি, অপর অভিনেত্রীবর্গকেও তাঁহার ঐ স্বচ্ছ দেহের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছিল।

এইরূপ দৃশ্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রত্যেক দৃশ্য দুইবার করিয়া তৈয়ার করিতে হইয়াছিল;—একবার সাধারণ আকারে, আর একবার কালো ভেলভেট দিয়া। এই কালো ভেলভেট-দৃশ্যে শ্রীযুক্ত ফ্রান্‌সিস্ একাকী আপনার ভূমিকা অভিনয় করিয়া গেলেন; তাঁহার অভিনয় শেষ হইয়া গেলে, ফিল্‌ম্‌টি গুটাইয়া লওয়া হইল, অন্য সকল শিল্পী অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিল, এবং সেই সময় প্রকৃত দৃশ্য-সংস্থানের (real set) সম্মুখ-ভাগটিতে পুনর্ব্বার exposure দেওয়া হইল। এই প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিয়া "পিটার গ্রীমের প্রত্যাবর্ত্তন" নামক চলচ্চিত্রটিকে প্রয়োগ-শিল্পী সার্থক করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ "বাগদাদের চোর" (The thief of Bagdad) নামক ছবিতে জাদু-কারপেটের উপর রাজকন্যা-রূপিণী শ্রীমতী জুলানি জন্‌ষ্টন্ ও মিজে বসিয়া কি উপায়ে ঐ কার্পেটটিকে শূন্যমার্গে উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে-বিবরণ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

এই বিষয়-সম্পর্কিত ছবিটির প্রতি লক্ষ্য করুন। কোন্ পন্থায় এই কৌশল-দৃশ্যের ফটোগ্রাফী লওয়া হইয়াছিল, ছবিতে তাহার সন্ধান মিলিবে। একটি বাহির-পথের দৃশ্য-সংস্থানের খুব কাছ ঘেঁসিয়া সুবৃহৎ ভারোত্তোলন-যন্ত্র (crane) সংবদ্ধ হইল; ক্যামেরা এবং প্রয়োগ-কর্ত্তার জন্য তদুপরি বিভিন্ন উচ্চস্তরে দুইখানি মঞ্চ প্রস্তুত করা

হইল। যন্ত্রটির (crane) শীর্ষ-দেশে এধার-ওধার দীর্ঘ একখানি মঞ্চ সংস্থাপিত করিয়া চরম সীমানায় একটি কপিকল (pulley) সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইল। এই কপি-কলের মধ্য দিয়া কতকগুলি তার চালাইয়া দেওয়ার পর বহু নীচে ভূমিতলে রক্ষিত জাদু কারপেটের কতক অংশের সহিত প্রত্যেক তার সংবদ্ধ করা হয়।

'থীফ্ অফ্ বাগদাদে'র বহির্দৃশ্যের নিকটে ১০০ ফুট্ দীর্ঘ ক্রেণ্-বাহু। ইহার উপর অনেকগুলি ক্যামেরা-মঞ্চ রচিত হয়। সর্ব্বোচ্চ মঞ্চ হইতে তার ঝুলাইয়া 'জাদু-কার্পেটে' সংলগ্ন হইয়াছে। ক্রেণের সাহায্যে ক্যামেরা-প্ল্যাটফর্ম ও সেই সঙ্গে জাদু-কার্পেট শূন্যপথে উঠানো হইল; তার পর সেই কার্পেট চক্রাকারে শূন্যপথে ঘুরানো হয়। ইহার ফলে মডেলে-রচা প্রাসাদ ও গৃহসমূহের চূড়া ও নীচের পথ ছবিতে ওঠে এবং দর্শক দেখে, শূন্যপথে কার্পেট উড়িয়া চলিয়াছে ও নীচে গৃহচূড়াদিও লক্ষ্য হয়।

শ্রীযুক্ত ফেয়ার-ব্যাঙ্কস্ এবং শ্রীমতী জনষ্টন্ কারপেটের উপর স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিবার পর উত্তোলন-যন্ত্রটি তাঁহাদিগকে উচ্চে শূন্যের দিকে সজোরে তুলিয়া লইয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত কারপেটটি ক্যামেরা-মঞ্চগুলির সমরেখাগতভাবে অথচ তাহা হইতে অনেক দূর-ব্যবধান রাখিয়া ঝুলিতে থাকে। নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত অনুসারে যন্ত্রের সম্পূর্ণ হাতলটি যখন বৃত্তাকারে ঘোরানো হইতে লাগিল, তখন ইহা রাস্তা এবং গৃহসমূহের ছাদের উপর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে লাগিল; ইতিমধ্যে সর্ব্বক্ষণই ক্যামেরার কার্য্য সমানে চলিতেছে। এই রীতিতে কারপেট্-ওড়া দৃশ্য সফল হইয়াছিল। ক্যামেরার দলকে ঠিক-মত জায়গা সংকুলান করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে নিম্নে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মঞ্চগুলির বামদিকে দৃষ্ট মইখানি জমি স্পর্শ করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তোলন-যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়; ইহাতে ক্যামেরার লোকেরা গুড়িসুড়ি মারিয়া উচু হইয়া বসিতে সমর্থ হইয়াছিল।

জাদু-কার্পেটে ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ ও জুলানি জনষ্টোন। তার অদৃশ্য থাকায় চোখে লক্ষ্য হয় না

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু বলিবার আছে। চলচ্চিত্রের গৃহ-অট্টালিকা কিরূপ অসম্পূর্ণভাবে তৈয়ার করা হয়, এবং এই অসমাপ্তি একটি "গ্লাশ-শটেই" সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, প্রথম ছবিটির প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজে তাহা বুঝা যায়। বামপার্শ্বের গোল দুর্গ-প্রাকার এবং তোরণ-দ্বারের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। গম্বুজ এবং তোরণ-পথ অসমাপ্তভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু পর্দ্দার উপর এই চলচ্ছবিটি দেখিবার সময় আমরা লক্ষ্য করি, উভয়েরই গম্বুজ এবং সমুন্নত চূড়া আছে।

"দি ব্ল্যাক্ পাইরেট" (কৃষ্ণবর্ণ জলদস্যু) চিত্রে জলতলের সন্তরণ-দৃশ্য-কৌশল অতি অপূর্ব্ব।

প্রকৃতপ্রস্তাবে এই দৃশ্য তুলিবার সময় এক বিন্দু জল কোথাও ছিল না। জলদস্যুরা সত্য সত্য জলের মধ্যে সাঁতার দেয় নাই, তাহারা এমনই হাওয়ায় সাঁতার কাটিয়াছিল!

এই সম্পর্কীয় ফটোগ্রাফটি গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবে। ষ্টুডিওর অভ্যন্তরে একটি রঙ্গমঞ্চের উপর গতি-শীল জলের ন্যায় দেখিতে হইবে বলিয়া পুঞ্জ-পরিমাণ ক্যাম্বিশ স্তরে স্তরে ঢেউ-রচনার পদ্ধতিতে স্তূপীকৃত হইয়াছিল। এই ক্যাম্বিশের উপর তড়িৎ-প্রবাহ-সঞ্চারিত প্রবল সূর্য্য-বৃত্ত-মণ্ডলী সন্নিবেশিত হইয়াছিল। নীল রঙে রঞ্জিত একখণ্ড বৃহৎ ক্যাম্বিশ মেঝে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত উত্তোলিত হইল, ইহা ঝুলিতে লাগিল, দেখাইল—ঠিক যেন প্রাচীর!

রঙ্গমঞ্চের ঊর্দ্ধে "ওড়ার" দৃশ্য যে-পদ্ধতিতে সফল করা যায়, ঠিক সেই রীতি-অনুযায়ী ক্যাম্বিশ-প্রাচীরের উপরিভাগে কাঠের গ্যালারী সকল বহুলোকের ভার-বহন-ক্ষম একটি উত্তোলন-যন্ত্রের হাতলে (crane arm) সংবদ্ধ হয়। এই গ্যালারীগুলি হইতে অনেকগুলি সরু পিয়ানোর তার নিম্ন-দিকে ঝুলিয়া থাকে, প্রত্যেকটি তারের সহিত একটি চাকা (wheel) ও একটি হাতল (handle) লাগাইয়া দেওয়া হয়। জলদস্যুরা প্রত্যেকে শক্ত সাজ (harness) পরিধান করে। মনে হয় যেন, প্রতিজনই তরবারির মণিবন্ধ পরিয়াছে। এই রূপ সাজে সজ্জিত হইয়া, তাহারা ক্যাম্বিশ-তরঙ্গ-মালার উপর চিৎ হইয়া শয়ন করে। তারগুলি নামাইয়া দেওয়া হয়, তাহার পর সাজসজ্জা-তত্ত্বাবধায়কগণের সাহায্যে সেগুলিকে জলদস্যুদের সঙ্গে আঁটিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক দস্যুর কোমরের সঙ্গে একটি করিয়া তার সংবদ্ধ করা হয়। যখন প্রত্যেক তার এমনই ভাবে বাঁধা হয় যে, বিপদের আর আশঙ্কা থাকে না, তখন মাথার 'পরে গ্যালারীর লোকজন তার-গুলিকে গুটাইয়া জলদস্যুদের মধ্যপথে হাওয়ায় দোদুল্যমান রাখে। যতগুলি সাঁতারী দেখা গিয়াছিল, ঠিক সেই সংখ্যক লোক মাথার উপর চোখের আড়ালে বিদ্যমান ছিল।

চিৎ-হওয়া অবস্থায় সাঁতারীগণ মধ্য-বায়ুপথে গিয়া পৌছাইলে (তাহাদের পূর্ব্ব হইতেই একএকটি করিয়া দলে ভিড়ানো হইয়াছিল, সেই জন্য) ভিন্ন ভিন্ন দল বিভিন্ন উচ্চ-তার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। প্রয়োগকর্ত্তার আদেশমত তাহারা সন্তরণে-বুক-বাহিয়া-চলার-ভঙ্গীতে অঙ্গ সঞ্চালন করে। ক্যামেরা তাহাদের সমুদয় কার্য্য তুলিয়া লইল। গতিশীলতার ফল ফলাইবার জন্য ঊর্দ্ধে উত্তোলন-যন্ত্রমঞ্চখানি সম্মুখভাগে ও পিছনদিকে ইলেক্‌ট্রিক শক্তির সাহায্যে চালিত করা হয়, ইহাতে মনে হয়, এক জন সাঁতারী আর এক জনকে আগাইয়া যাইতেছে এবং কেহ কেহ-বা পাশাপাশি সাঁতরাইয়া চলিয়াছে।

প্রত্যেক জলদস্যুকে রূপালি-অঙ্কনে চিত্র-বিচিত্র করা ছোট ছোট শেলুলইড (celuloid) বল (ball) দেওয়া হইয়াছিল; অসংখ্য বুদ্বুদের ন্যায় দেখাইবে বলিয়া এই বলগুলিকে তাহারা হাওয়ার বুকে ছুড়িয়া দিতেছিল। সমুদ্রের ঝাঁঝি উপর হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, এবং ইলেক্‌ট্রিক-পাখা দ্বারা সঞ্চালিত হইতে থাকে, তাহাতে বোধ হয় যেন সমুদ্র হইতেই সেগুলি উত্থিত হইয়াছে।

যে সকল ক্যামেরায় এই ছবি লওয়া হইত, সেগুলিকে উল্‌টাইয়া রাখা হইত। এই কারণে যখন এই চলচ্চিত্রটি দেখানো হয়, সাঁতারীরা সম্মুখদিকেই সাঁতার কাটিয়াছিল, চিৎ হইয়া সাঁতার দেয় নাই, এইরূপ পরিদৃষ্ট হয়। সাঁতার-দৃশ্য তোলা সমাপ্ত হইবার পর ফিল্মটি গুটাইয়া লওয়া হয়, এবং পুনর্ব্বার তদুপরি আলোক-সম্পাত করা হয়। এই প্রকার রীতিতে প্রবহমান সমুদ্র-জল-তলের ছবি ওঠে।

যখন ইহা সাধারণ-সমক্ষে প্রদর্শিত হয়, জলদস্যুরা সত্য সত্যই জলের তলদেশে সন্তরণ দিতেছে, ইহা বিশ্বাস করিতে মনে তখন সন্দেহ জাগে না, বরং এই দৃশ্য বাস্তবের যথার্থ রূপ প্রকট করে। দৃশ্যের এই স্বভাবসুন্দর সজীবতা
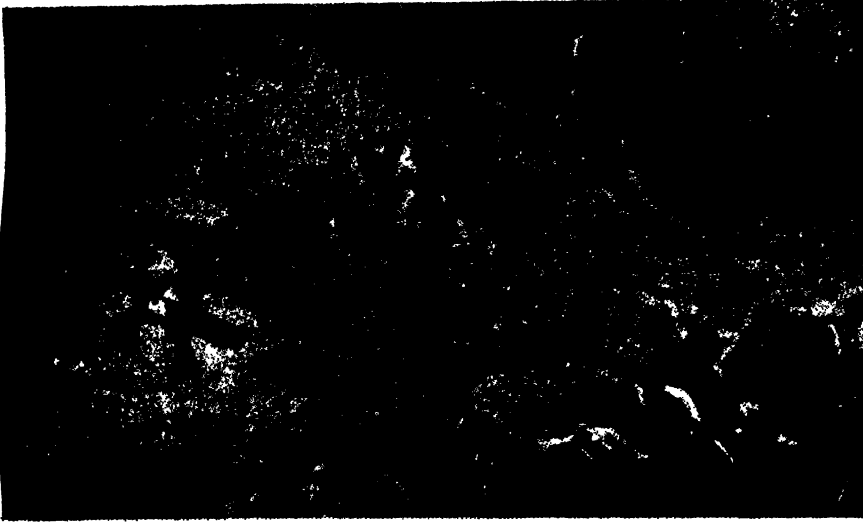
সন্তরণকারীদের তারে ঝুলানো হইয়াছে। তারা চিৎ হইয়া আছে। কোমরে বেল্ট্; তার সেই বেল্টে বাঁধা। বেল্টগুলি তলোয়ার-বন্ধনী বলিয়া ভ্রম হইবে বলিয়া কৃত্রিম তলোয়ারও তাদের কোমরে বাঁধা। উপর হইতে ক্যামেরা ধরিয়া ছবি তোলা হইয়াছে। নেটের পর্দার অন্তরাল দিয়া জলের বিভ্রম উৎপন্ন করা হইয়াছে।

এই অপরূপ চিত্রটির সমস্ত অভিনবত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা চলে। চলচ্চিত্রটি রঙীন্ বলিয়া ইহার স্বাভাবিকতা আরো জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

উক্ত চিত্রে দেখিতে পাই—ডগলাস্ ফেয়ার-ব্যাঙ্কস্কে মরু-দ্বীপে দৈবক্রমে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। সমুদ্র-জলবিধৌত বালুময় বেলাভূমি, তাল-তমাল-খর্জ্জুর এবং পাষাণ-গিরি-সুশোভিত বিচিত্র দ্বীপে ডগলাস্ অনেক দৃশ্যে অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরবর্ত্তী দ্বীপে গমন করিয়া তিনি এই দৃশ্যগুলি তৈয়ার করিবার মত সময় পান নাই; সেই কারণেই তাঁহার ছবির "দ্বীপটি" হলিউডের ষ্টুডিওর মধ্যে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল।

স্থানান্তরে প্রকাশিত ছবিখানি দেখিলে বুঝা যাইবে, পর্দার উপর কিরূপে দ্বীপটি প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা যেন সভ্য জনপদ হইতে দূরান্তরে অবস্থিত অপর একটি

'ব্ল্যাক্-পাইরেটে' দ্বীপের দৃশ্য। দ্বীপ নয়, ষ্টুডিওর কাছে কৃত্রিম দ্বীপ রচিত হইয়াছে। দক্ষিণদিকে 'রিফ্লেক্টর'-সাহায্যে অতিরিক্ত আলোক-পাত করা হয়।

'ব্ল্যাক পাইরেটে'র দ্বীপপুঞ্জ

(miniature) ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেশের অতি প্রাচীন একখানি বৃহৎ সমরপোতের অতি-ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি হইতে প্রকাশিত করা হইয়াছে। ষ্টুডিওর অভ্যন্তরদেশের একটি পুষ্করিণীতে ইহাকে ভাসাইয়া দেওয়া হয়।

প্রাচীন স্পেনের সমর-পোতটির যে ক্ষুদ্র আকার ছবিতে পরিদৃষ্ট হয়, তাহার অবস্থান সুনির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে। ইহার ফটোগ্রাফ মেরী পিক্‌ফোর্ডের বাঙলোর বহির্দ্দেশে গ্রহণ করা হয়। এই বাঙলোয় জগতের নানা দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে পিক্‌ফোর্ড অতিথিরূপে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

লুপিনো লেন্ (Lupino Lane) নামক ইংরেজ কমেডি-অভিনেতা হলিউডে চলচ্চিত্র-প্রমোদ-নাট্যে অভিনয় করিতে ব্রতী হইয়াছেন। লুপিনো লেন্ ইহার পূর্ব্বে লণ্ডনে বহু প্রকার নাচ-গানের অনুষ্ঠানে, গীতি-নাট্যে, এবং সঙ্গীতশালায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রকাশ যে, লুপিনো লেনের ছবির কাজে wireshotএর

ছবিতে ষ্টুডিওর অন্তরদেশে দ্বীপের সত্যরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহার পশ্চাদ্ভাগে একটি বৃহৎ রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত, জলের তট-কিনারে প্রতিফলক রহিয়াছে, দ্বীপমধ্যস্থিত একটি বালির পাহাড়ের পিছনে রবিন্ হুডের দুর্গ-প্রাসাদের অংশ এখনও অবস্থিত, এবং অতি দূরে হলিউডের উত্তর-সীমান্তে প্রকৃত পাহাড়শ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে।

"দি ব্ল্যাক্ পাইরেট" চলচ্চিত্রে পোতের যে অপূর্ব্ব ক্ষুদ্রায়তনটি
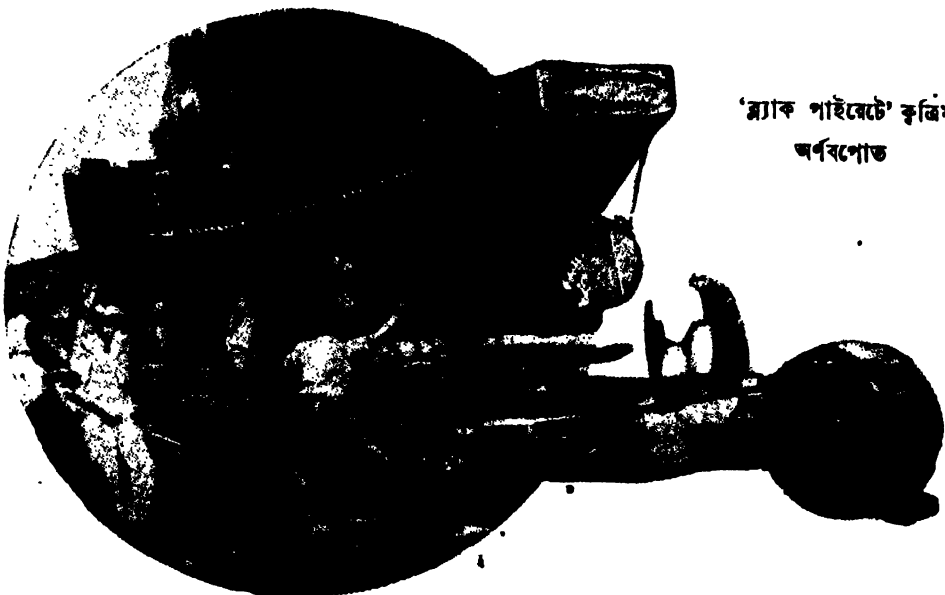
'ব্ল্যাক পাইরেটে' কৃত্রিম অর্ণবপোত

ব্যবহার হয় অত্যধিক। তাঁহার হিসাব দেখিয়া বুঝা যায় যে, তাঁহার "মন্‌টি অফ দি মাউন্টেড" (Montie of the Mounted) চলচ্ছবিতে একটি কৃত্রিম অশ্ব সুকৌশলে চালনা করিবার জন্য কম পক্ষে চব্বিশটি তার ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক তারটির শেষ ভাগে এক জন করিয়া লোক ছিল।

যে জটিল পদ্ধতি-অনুসারে তারগুলি সংযুক্ত ও কার্য্যকর হয়, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার নিমিত্ত মোটামুটি একটা নক্সা দেওয়া হইল। কৃত্রিম ঘোড়াটির সন্ধান এইখানে মেলে; মাথার উপরি-স্থিত কড়ির সঙ্গে সংলগ্ন ঘূর্ণনশীল আংটাগুলিও দেখা যায়। এইগুলির মধ্য দিয়া সমস্ত তার চালাইয়া দেওয়া হয়। যে লরীর (lorry) উপর কড়িটি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহাও এই রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে। এই লরীর এঞ্জিনের সম্মুখবর্ত্তী একটি ছোট মঞ্চের ঠিক সাম্‌'ন ক্যামেরা লাগানো রহিয়াছে।

এই রকম কোনও দৃশ্য যদি অভিনয় করিতে হয় যে, অভিনেতাকে একটি অশ্বে আরোহণ করিতে হইবে; ঘোড়াটি আরোহীকে মাথার উপর দিয়া তাহার আসন হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে, অভিনেতাকে সম্পূর্ণভাবে একটি ডিগ্‌বাজি খাইয়া এই টাল সাম্‌লাইতে হইবে এবং তৎপরে ভূমি হইতে পুনরায় ঐ প্রক্রিয়ার দ্বারা জীনের উপর লাফাইয়া উঠিতে হইবে, তাহা হইলে এই চিত্র আরম্ভের সময় অভিনেতাকে জীবন্ত ঘোড়ায় উঠিতে হইবে; কিন্তু এই দৃশ্যের সমাপ্তি কৃত্রিম অশ্ব এবং অয়ার-শট্ (wire-shot) ব্যতিরেকে সম্ভবপর হইতে পারে না।

লুপিনো লেন্‌কে ঠিক এইরূপ একটি দৃশ্যে অভিনয় করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্যের উপযোগী করিয়া একটি কৃত্রিম অশ্ব তৈয়ার করা হয়, তাহার নাম দেওয়া হইল—"ইয়েলো ষ্ট্রীক্" (Yellow streak)। এই কৃত্রিম জীবটিকে সৃষ্টি করিতে আট সপ্তাহ সময় লাগিয়াছিল। দুইটি মৃত অশ্বের গায়ের ছাল ব্যবহার করা হয় এবং ফিল্‌মচিত্রের বাস্তব ঘোড়াটির ফটোগ্রাফ লইয়া আসল কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহার মাপ লওয়া হয় এবং ঠিক ইহার আকার-অনুযায়ী পিপার আকারে একটা কাঠের কাঠামো তৈয়ার করা হয়। ইহাকে প্যারিস্ প্লাস্টারের ছাঁচ দিয়া আবৃত করিয়া দেওয়ার পর মোটা করিয়া কাগজের মণ্ড (Papier mache) লেপিয়া দেওয়া হয়। সকল রকম আঘাত ও ধাক্কা খাইতে পারে, এমনি মজবুত করিয়া কৃত্রিম ঘোড়া তৈয়ার হয়।

ঘোড়ার প্রত্যেক অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হয়, এবং এক একটি ঘূর্ণায়মান কীলকের (swinel) উপর এরূপ ভাবে সংস্থাপিত হয় যে, সেটি যেন স্বাভাবিক গতিতে নড়িতে চড়িতে পারে। প্যারিশ-প্রলেপ এবং কাগজ-মণ্ডের মধ্য দিয়া তার চালাইয়া চতুষ্পদে, চোখে, চোখের পাতায়, মুখগহ্বরে, কর্ণে, গলায় সে-তার সংবদ্ধ করা হয়। তার পর চামড়া দুইটি বিস্তৃত এবং শেলাই করিয়া আবার তাহা জুড়িয়া দেওয়া হয়। "ইয়েলো ষ্ট্রীক" এবার

কৃত্রিম অশ্ব। তারের সাহায্যে লুপিনো লেনকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধে তোলা হয়। তারের বন্ধন-কৌশল পরের চিত্রে লক্ষ্য হইবে।

ঠিক জীবন্ত অশ্বের ন্যায় দেখাইল। কেবলমাত্র ঘোড়াটি দাঁড়াইবার শক্তি পাইল না। তারগুলির সহায়তায় সে সামর্থ্যও তাকে দেওয়া হইল। প্রথমেই ঘোড়াটি ক্যামেরার সামনে আত্মপ্রকাশ করিলে সজীব ঘোড়ারা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল; জীবগুলি ইহার যথার্থ পরিচয় উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

লরীর বুকে তারের বন্ধন

এ দৃশ্যটির ফটোগ্রাফ যখন লওয়া হয়, তখন লেনের পোষাকের অন্তরালে প্রতি দাবনাতে তার এবং পৃষ্ঠদেশে আলাদা একটি তার লাগাইয়া দেওয়া হয়। এই তারটি তাঁহার পায়ের মাঝ দিয়া সম্মুখদিকে চালানো হয়, ইহাতে তাঁহাকে শূন্যে-ডিগ্‌বাজি-খাওয়া-অবস্থায় উত্তোলন করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

এই কাযের জন্য সর্ব্বদাই পিয়ানোর তার ব্যবহৃত হয়। তারগুলি আয়োডিনে (Iodine) ছোপানো থাকে, আলোক-চিত্রে সেই জন্য তারগুলি দেখা যায় না।

ফিল্‌ম্‌ নাট্যের এই যে নিগূঢ় কথা প্রকাশ হইতেছে, তাহাতে প্রয়োগশিল্পীদের উৎসাহ ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। চিত্র-জগতের যথার্থ সত্য বাস্তব-সত্যের সঙ্গে অনেক সময়ে মেলে না; প্রয়োগকর্ত্তারা বাস্তবতাকে অমান্য করিয়া কৃত্রিমতাকে সত্যের রঙে ফুটাইয়া তুলিতে যত্নশীল হইয়াছেন। যেখানে বাস্তবচিত্র না লইলে নয়, সেইখানেই তাঁহারা সত্যের শরণাপন্ন হন। সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নিখুঁৎ ইন্দ্রজাল চিত্রে প্রায় সর্ব্বকালেই বাস্তব অপেক্ষা সত্যের খুব কাছাকাছি পৌছিতে পারে, অভিজ্ঞতার ফলে এটুকু আবিষ্কার করিতে তাঁহারা সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

দর্পণের গান

ভব-অরণ্য-সংসারে মোরে সৃজিয়া প্রভু !
কি খেলা খেলিতে পাঠালে জানি না, খেলি গো তবু ;
আমি দরপণ, জনম অবধি বুকেতে মোর,
রূপ ও কুরূপ কত যে বহিনু নাহিক ওর ;

কত চাঁদমুখ ক্ষণেক স্নিগ্ধ করিল হিয়া,—
কত যুঁই, বেলী তুলিল হৃদয় উথেলিয়া।
মুক্ত নাগিনী, দংশন ভয়ে—মরি গো মরি !—
কত যে হরিণী ত্রস্তে চাহিয়া গিয়াছে সরি'।

বিরাট হস্তী, সাম্নের কত আসিল কাছে,
দন্ত বিকাশি মর্কট কত ঘুরিয়া নাচে !
সব অনুরাগে বুকে লই তুলি' যে আসে যবে,
পারি না রাখিতে, তবু যায় ভাসি' নিমিষে সবে ;

আদান-প্রদান জগতে আবার অহর্নিশ,—
বিফল সকলি, জলিছে কেবলি বিছার বিষ !
ক্ষণভঙ্গুর দর্পণ ! তার হৃদয়ে সাধ—
এতখানি হায় ! কেন দিলে প্রভু জগন্নাথ !

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম, এ)

চীনের জলদস্যুদের বোম্বেটেগিরি

(সত্য ঘটনা)

মগ, পর্টুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি বোম্বেটেরা ভারতের বিভিন্ন সমুদ্রোপকূলে ও নদীপথে বোম্বেটেগিরি করিত, বণিকের পণ্যবাহী জাহাজ পর্য্যন্ত লুঠ করিত; এ কালে ভারতে ঐ সকল জলদস্যুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু চীন-দেশের সন্নিহিত সমুদ্রে চীনা জলদস্যুদের অত্যাচারের বিবরণ এখনও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। অধিক দিনের কথা নহে, গত সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর-চীনের একখানি ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল,—

"জলদস্যু কর্ত্তৃক নরউইজিয়ান জাহাজ লুণ্ঠিত এবং জাহাজের কর্ম্মচারিগণ ধৃত ! জাহাজ চরে বাধিয়া অচল হইবার পর জলদস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত

(রয়টারের প্যাসিফিক সার্ভিস)

"জেয়পিং ১৪ই সেপ্টেম্বর,—হাকাউ নামক স্থানে ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে জলদস্যু কর্ত্তৃক বটনিয়া জাহাজ (১৩২৬ টন) লুণ্ঠিত হইবার সংবাদ নরউইজিয়ান রাজদূতের হস্তগত হইয়াছে। এই সংবাদে জানিতে পারা গিয়াছে—বটনিয়া চরে বাধিয়া গতিহীন হইলে, জলদস্যুরা সেই নিরুপায় জাহাজ আক্রমণ করে, তাহারা জাহাজের কাপ্তেন হারল্যাণ্ড ও প্রধান কর্ম্মচারী ওয়েষ্টারহেমকে ধরিয়া তাঁহাদের মুক্তিপণ আদায় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। জলদস্যুরা তাঁহাদের মুক্তিপণস্বরূপ পাঁচ লক্ষ ডলার দাবী করিয়া এই ভয়প্রদর্শন করিয়াছে যে, যদি তাহাদিগকে দশ দিনের মধ্যে ঐ অর্থ প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে বন্দিদ্বয়কে হত্যা করা হইবে।"

জলদস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বটনিয়া জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী আর্থার ওয়েষ্টারহেম কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাকে ও জাহাজের কাপ্তেন হারল্যাণ্ডকে কিরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল ইত্যাদি বিবরণ তাঁহার নিজের কথায় সম্প্রতি পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ যেরূপ লোমহর্ষণ, সেইরূপ কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার তুলনায় কাল্পনিক 'ডিটেক্‌টিভ কাহিনী' তুচ্ছ মনে হয়।

আর্থার ওয়েষ্টারহেম বলিয়াছেন,—আমি আমার যে বিপদের কাহিনী আজ বলিতে বসিয়াছি, সেই বিপদ এত অল্পদিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল যে, আমি এখন পর্য্যন্ত তাহার ধাক্কা সামলাইতে পারি নাই। সেই ভীষণ কাণ্ডের স্মৃতি আমার মানস-পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে বহুকাল লাগিবে।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। সেই সময় হইতেই আমি নরওয়ের বার্জেন নগরের উইলিয়ম হানসেন কোম্পানীর চাকরী করিয়া আসিতেছি, এবং তাঁহাদের চাকরী উপলক্ষেই আমি পৃথিবীর সকল দেশে পদার্পণ করিয়াছি। সুতরাং বলা বাহুল্য, মানবজীবন সম্বন্ধে আমি যৎসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং অনেকবার অনেক বিপদেও পড়িয়াছি; কিন্তু এ কথা আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, এই বোম্বেটেগুলার কবলে পড়িয়া আমি উদ্ধার লাভ করিতে পারিয়াছি, ইহা আমার পুনর্জ্জন্ম বলিতে হইবে। আমি অতিকষ্টে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আমি বটনিয়া জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত আছি; ইহা মালবাহী ক্ষুদ্র জাহাজ। এই জাহাজে চীনের সমুদ্রোপকূলের বিভিন্ন স্থানে লবণ রপ্তানী করা হইত। আমার জাহাজের কাপ্তেন এমেন হারল্যাণ্ড বহুদর্শী নাবিক, তিনি ৬৬ বৎসরের বৃদ্ধ। আমার সমুদ্র-যাত্রায় আর কখন এরূপ বহুদর্শী বিচক্ষণ নাবিকের সহযোগিতা লাভ করিতে পারি নাই। নরওয়ের একই নগরে আমাদের উভয়ের বাসস্থান। এই জন্য তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছিল; বস্তুতঃ কোন জাহাজের অধ্যক্ষ ও কাপ্তেনের মধ্যে এরূপ আত্মীয়তা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের জাহাজে ৯ জন চীনা লস্কর ছিল। দেশীয় লোকের সহিত কথাবার্ত্তার জন্য এক জন দোভাষী ছিল, সে একাধারে দোভাষী এবং জাহাজের খাতাঞ্জী। আমি ও কাপ্তেন হারল্যাণ্ড ভিন্ন জাহাজে অন্য কোন শ্বেতাঙ্গ ছিল

না। আমাদের আর্দালীর কায করিবার জন্য দুইটি চীনা বালককে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু জাহাজে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বারো জনের অধিক ছিল না।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রায় মাঝামাঝি আমরা এক জাহাজ লবণ লইয়া হাকাউ হইতে উত্তর-দিকের একটি ক্ষুদ্র বন্দরে যাইতেছিলাম। এই সমুদ্রের স্রোতে নির্ভর করিবার উপায় ছিল না, তাহার উপর চোরা বালির চর আমাদের গন্তব্য পথটি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা এক জন চীনা আড়কাঠী নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সে সময়ে সময়ে আমাদের দোভাষীর কাযও করিত। চীনদেশে বহু বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকায় এক স্থানের চীনাম্যান ৫ শত মাইল দূরবর্ত্তী কোন স্থানের চীনাম্যানের কথা বুঝিতে পারে না।

জাহাজ-পরিচালনে যে দিন আমাদের অসুবিধা আরম্ভ হইল, সে দিন বুধবার। সে দিন মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই; অবশেষে একটা চোরা বালির চরে বাধিয়া আমাদের জাহাজ ধীরে ধীরে কাত হইল। ব্যাপারটি তেমন অস্বাভাবিক নহে; আমরা তৎক্ষণাৎ এঞ্জিন ঘুরাইয়া দিলাম। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা জাহাজখানিকে মুক্ত করিতে পারিলাম না। আমাদের আড়কাঠী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল; সে ক্রমাগত লাফালাফি করিতে লাগিল। তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, তাহার মনের উপর একটা প্রকাণ্ড ভার চাপিয়া বসিয়াছে। পরে বুঝিতে পারিলাম, আমার এই সন্দেহ অমূলক নহে।

সমুদ্রোপকূলের এই অংশে চোরা বালিতে জাহাজ মধ্যে মধ্যে বাধিয়া যায়, এ কথা জানিতাম, সুতরাং আমার দুশ্চিন্তার তেমন কোন কারণ ছিল না। আড়কাঠী এই তুচ্ছ কারণে এত বেশী উৎকণ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া কাপ্তেন হারল্যাণ্ড ও আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না; কিন্তু আমাদের সেই হাসির ফল কিরূপ হইবে, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।

আরও আধ ঘণ্টা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও 'বটনিয়াকে' বালির চর হইতে জলে নামাইতে পারিলাম না, তাহা বালিতে আঁটিয়া বসিয়া রহিল; তখন আমাদের মনে হইল, ব্যাপার যত সহজ মনে করিয়াছিলাম, তত সহজ নহে! নিশাগমের আর অধিক বিলম্ব ছিল না, এবং সেরূপ স্থানে নিরাশ্রয়ভাবে রাত্রিবাস করা সঙ্গত বলিয়াও আমাদের মনে হইল না। আমাদের আড়কাঠী বলিল, সে সেনানিবাসে গিয়া জাহাজ পাহারা দেওয়ার জন্য কয়েক জন সৈন্য লইয়া আসিবে। আমরা তাহার এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলাম। আমরা অনেকবার শুনিয়াছিলাম, সমুদ্রের সেই অংশে জলদস্যুরা উপদ্রব করিয়া থাকে; কিন্তু আমাদের আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। আমরা ভাবিয়াছিলাম, জলদস্যুরা এরূপ নির্ব্বোধ নহে যে, তাহারা জাহাজের দ্বাদশ জন সশস্ত্র পুরুষকে আক্রমণ করিতে আসিবে। যাহা হউক, মনে হইল, যদি আমরা সরকার হইতে প্রহরীর সহায়তা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আশঙ্কার কোন কারণ থাকিবে না। কিছু কাল পরে আড়কাঠী আমাদের মোটর-বোট লইয়া প্রহরী আনিতে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে আমরা একখানি বৃহৎ যুদ্ধের নৌকা আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিলাম। কিছু কাল পরে তাহা আমাদের অদূরে ফিরিয়া আসিল। তাহার ডেকের উপর আমরা
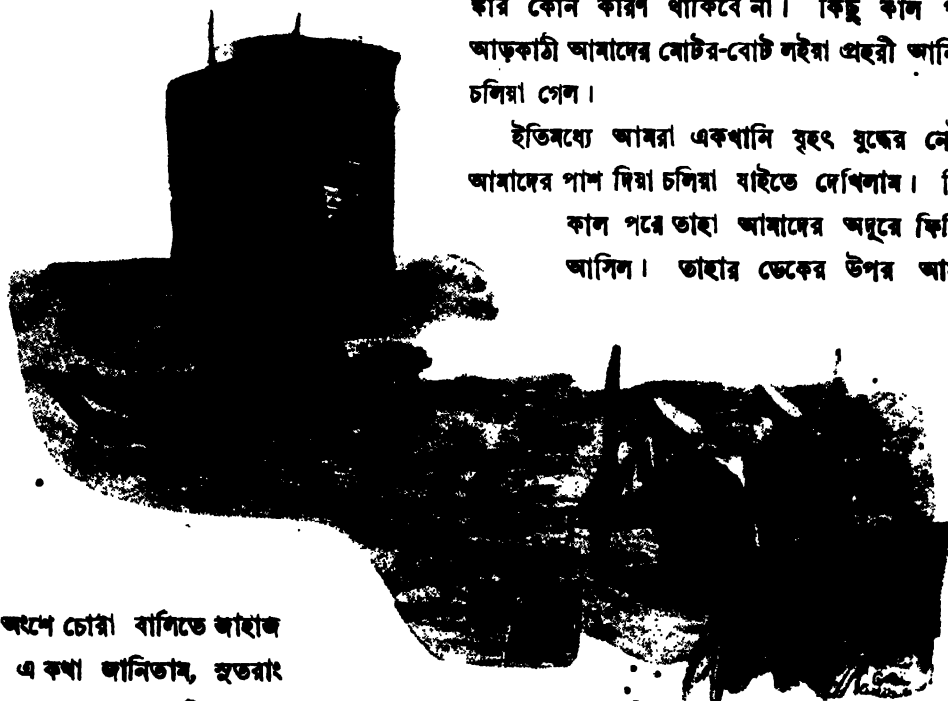
দূরবীণের সাহায্যে জলদস্যুদের নৌকা পর্য্যবেক্ষণ

একটিও লোক দেখিতে পাইলাম না। সেই নৌকাখানি দেখিয়া আমাদের মনে সন্দেহ না হইলেও, যখন তাহা ধীরে ধীরে আমাদের কাছে সরিয়া আসিল, তখন একটু দুশ্চিন্তা হইল। আমি দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিলাম—সেই নৌকার পাশে যে আলগা তক্তার আবরণ ছিল, তাহার অন্তরালে বসিয়া এক দল লোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিল।

তাহাদের ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক বলিয়াই মনে হইল। আমি তৎক্ষণাৎ কাপ্তেনকে আমার সন্দেহের কথা বলিলাম; প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ব্যবহার করিতে পারিব, এই আশায় আমাদের নিকট ৩৮ শক্তির পিস্তল রাখিয়াছিলাম, তাহাই বাহির করিয়া গুলী বর্ষণ করিতে লাগিলাম। তাহার পর আমি নক্সাঘর হইতে বাহির হইয়া জাহাজের লস্করগুলিকে এক স্থানে জুটাইবার জন্ত আহ্বান করিলাম; তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করিব, এইরূপ আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেই দোভাষী খাতাঞ্জী ভিন্ন এক জনও লস্করকে দেখিতে পাইলাম না। সে বলিল, চীনাম্যানদের যুদ্ধের নৌকা জাহাজের অত্যন্ত নিকটে আসিয়াছে দেখিয়া তাহারা প্রাণভয়ে জাহাজের পাশে একখানি লাইফ-বোটের আড়ালে লুকাইয়া আছে।

আমি লাইফ-বোটের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, লস্করগুলা সত্যই সেখানে লুকাইয়াছিল। অতগুলি লোককে ঐ ভাবে প্রাণভয়ে কাঁপিতে দেখিয়া আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। আমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছি, সেই সময় চীনাম্যানদের সেই নৌকার সুবৃহৎ পালের দীর্ঘ ছায়া আমাদের জাহাজের ডেকের উপর পড়িতে দেখিলাম। তাহার পর চীনা বোম্বেটের দল তাহাদের নৌকার পাশ হইতে একটা সাঙ্কেতিক শব্দ শুনিবামাত্র একসঙ্গে তাড়াতাড়ি পিস্তল ও রাইফেলের গুলী-বর্ষণ আরম্ভ করিল। আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই গুলী বর্ষিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই সকল গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। কোন কোন গুলী সশব্দে আমার মাথার ঠিক উপর দিয়া চলিয়া গেল।

আমার মনে হইল, এই সঙ্কটকালে জাহাজের ব্রীজের উপর কাপ্তেনের সঙ্গেই আমার উপস্থিত থাকা উচিত; সুতরাং আমি অবিলম্বে সেই স্থানে গমন করিলাম। ইত্যবসরে বোম্বেটেদের নৌকা আমাদের জাহাজের পাশে ভিড়িল এবং মুহূর্ত্ত পরে বোম্বেটের দল পিস্তল লইয়া আমাদের উপর চড়াও করিল। পিস্তল ব্যতীত কয়েক জনের হাতে রাইফেল, কাঠের সুদীর্ঘ লাঠী এবং সীসার নল ছিল।

বোম্বেটের দল ব্রীজের দুই পাশ হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। আমি তাহাদিগকে বাধা দিলাম না, কারণ, কাপ্তেন আমাকে নিষেধ করিলেন; কৌশলক্রমে তাহাদিগকে বিদায় করিবার চেষ্টা করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। তাঁহার আশা ছিল, যদি আমরা তাহাদিগকে কম্বল, ল্যাম্প ও দুই চারি রকম মনোহারী দ্রব্য উপহার দিই, তাহা হইলে তাহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নৌকা ভাসাইয়া চলিয়া যাইবে।

এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, নৌচালক প্রত্যেক চীনাম্যান সুযোগ পাইলেই বোম্বেটেগিরি করে। দূর হইতে কোন বিদেশী জাহাজ দেখিলে তাহারা সেই জাহাজ লুঠ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করে; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে দমনের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। কারণ, যে মুহূর্ত্তে কোন সৈন্তদল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আসে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা নিরীহ মাঝি বা মৎস্তজীবীর পেশা অবলম্বন করিয়া ভাল মানুষ সাজে!

কিন্তু যে চীনাম্যানগুলা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা পেশাদার বোম্বেটে। নানাবর্ণের কাপড়ের টুকরা দ্বারা তাহাদের পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহারা সমাজের নিম্নস্তরের লোক, কিন্তু তাহাদের রাইফেলগুলি আধুনিক এবং তাহাদের সঙ্গে টোটা ও গুলীবারুদ প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে ছিল। এক সময় তাহারা সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। চীনদেশে এরূপ রণকুশল জলদস্যুর অভাব নাই—যাহারা সৈন্তদল হইতে পলায়ন করিয়া বোম্বেটেগিরি আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত চীনের অন্তর্দ্দেশে তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়, সুযোগ পাইলে দস্যুবৃত্তি করে এবং বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে শান্তশিষ্ট গৃহস্থের ন্যায় কালযাপন করে, অবশেষে যখন তাহারা সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হয়, তখন বোম্বেটের পেশা অবলম্বন করে।

যাহা হউক, আমাদের বিপদের কথা বলি। বোম্বেটের নিক্ষিপ্ত গুলী যখন আমাদের কাছে আসিয়া পড়িতে লাগিল, তখন কাপ্তেনের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমি দুই হাত মাথার উপর তুলিলাম, তাহাদিগকে বুঝাইলাম, আমি আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্ত প্রস্তুত আছি। তাহা দেখিয়া বোম্বেটে

দলপতি সদলে আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার দলের লোকগুলা তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা তাহাদিগকে কৌশলে ভুলাইবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টাই বৃথা হইল।

দস্যুরা আমাদের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল

বোম্বেটের দলপতি জাহাজের নক্সা-ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই যে কায করিল, তাহাতে তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম। সে তাহার হাতের পিস্তলটা উঁচু করিয়া তুলিয়া তাহার কুঁদা দিয়া কম্পাসের উপর এরূপ জোরে আঘাত করিল যে, কম্পাসটি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইল। সে তাহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার পর সে পিস্তল চালাইতে চালাইতে 'এঞ্জিনরুম' অধিকার করিল এবং তাহার অনুচররা তাহার অনুসরণ করিয়া, সম্মুখে যাহা কিছু পাইল, সমস্তই চূর্ণ করিল। আমাদের সমুদ্রপথের নক্সা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহা মেঝের উপর ছড়াইয়া দিয়া সঙ্কেতের পতাকাগুলিও নষ্ট করিল। তাহারা এরূপ ইতর যে, আমাদের পেন্সিলগুলিও সংগ্রহ করিয়া চূর্ণ করিল।

সেই সময় আমি ও কাপ্তেন দেওয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাঁচ ছয় জন বোম্বেটে তাহাদের হাতের পিস্তল আমাদের দিকে বাগাইয়া ধরিল। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য কোন কৌশল-অবলম্বন আমাদের অসাধ্য হইল। জাহাজের অন্যান্য অংশে কি বিভ্রাট আরম্ভ হইয়াছে, তাহা জানিতে না পারায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। কতকগুলা বোম্বেটেকে তাহাদের নৌকা হইতে আমাদের জাহাজের ডেকের উপর উঠিতে দেখিয়াছিলাম, তাহারা নিশ্চেষ্ট নাই, ইহাও বুঝিতে পারিলাম। বস্তুতঃ বোম্বেটেগুলা যে বোম্বেটেগিরিতে সুদক্ষ, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

বোম্বেটেগুলা আরও দুই ঘণ্টা ধরিয়া জাহাজের উপর যথাসাধ্য অত্যাচার করিল; সকল জিনিষই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করিল; শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যাগুলি ছিঁড়িল; ভোজনকক্ষে যে সকল বাসন ছিল, তাহা সমস্তই চূর্ণ করিল। অবশেষে তাহারা আমাকে ও কাপ্তেনকে বাঁধিয়া তাহাদের নৌকায় তুলিল; আমরা অসহায়ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, জাহাজে যাহা কিছু মূল্যবান্ দ্রব্য ছিল, তাহা লুঠ করিয়া তাহাদের নৌকায় লইয়া গেল। আমাদের লাইফ-বোটের দাঁড়গুলি, এক বস্তা আলু, এক পিপা ময়দা, আমাদের বিছানার চাদর প্রভৃতি নানা সামগ্রীতে তাহাদের নৌকা পূর্ণ হইল। অবশেষে অপরাহ্ণকালে লুণ্ঠন শেষ হইলে তাহারা জাহাজ ত্যাগ করিল। আমাকে ও কাপ্তেনকে বন্দী করিয়া নৌকায় তুলিয়া তাহারা নৌকা চালাইয়া দিল। আমাদের

ভাগ্যে আরও কি দুর্গতি আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, এবং তাহা জানিবার জন্তও আগ্রহ হইল না।

কাপ্তেন হারলাণ্ড বৃদ্ধ হইলেও বোম্বেটেদের সকল অত্যাচার ধীরভাবে সহ্য করিলেন, তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখিলাম না। আমাদের কোটের পিঠের দিকের কাপড় তাহারা পূর্ব্বেই টানিয়া ছিঁড়িয়াছিল। কাপ্তেনকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার মোজা ও জুতা কাড়িয়া লইয়াছিল, এজন্ত তিনি খালি পায়ে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিছু কাল পরে তাহারা আমারও সেই অবস্থা করিল।

আমি সেই নৌকার খোলের ভিতর কাপ্তেনের পাশে হতাশভাবে বসিয়া পড়িলাম। সহসা কে পশ্চাৎ হইতে আমার মস্তকে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল। সেই আঘাতে আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। অল্পকাল পরে এক দল বোম্বেটে আমাকে সবলে চাপিয়া ধরিয়া আমার পরিহিত পরিচ্ছদ খুলিয়া লইল।

আরও কিছু কাল পরে কয়েকটা বোম্বেটে আমাদের দুই জনকে বাণ্ডিলের মত বাঁধিয়া নৌকার পাটাতনের নীচে লইয়া গেল। সেখানে একটা সঙ্কীর্ণ কামরা ছিল, আমরা সেই কামরায় আবদ্ধ রহিলাম। কামরাটি এরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহার ভিতর সোজা হইয়া বসিয়া থাকা আমাদের অসাধ্য হইল; অতঃপর আমাদিগকে শয়ন করিতে বাধ্য করা হইল। পিস্তলধারী প্রহরীরা আমাদের মাথা ও পায়ের কাছে বসিয়া পাহারা দিতে লাগিল। আমরা উভয়ে নিম্নস্বরে কথা কহিবামাত্র প্রহরীরা তাহাদের হাতের পিস্তল আমাদের মুখের কাছে আনিয়া এরূপ ভঙ্গীতে নাড়িতে লাগিল, যেন আমরা কথা কহিলেই পিস্তলের কুঁদার আঘাতে আমাদের দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিবে।

সন্ধ্যার সময় খাদ্যসামগ্রীর গন্ধে বুঝিতে পারিলাম, বোম্বেটেদের ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু আমাদিগকে খাইতে দেওয়া হইল না।

রাত্রি গভীর হইলে নৌকাখানি এক স্থানে নঙ্গর করিল। আমরা দুই একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বোম্বেটেগুলা আমাদের মাথার উপর নৌকার পাটাতনে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে এরূপ তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছিল যে, সেই হট্টগোলে আমাদের নিদ্রাকর্ষণ হইল না। কিছু কাল পরে নৌকা পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় দিনও ঐ ভাবে চলিল; উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে নৌকা নঙ্গর করিলে আমাদিগকে সেই কাঠের গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়া নৌকার ডেকের উপর লইয়া যাওয়া হইল। সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পাইয়া স্বস্তি বোধ করিলাম, কিন্তু ক্ষুধায় কাতর হইলাম। কাপ্তেনের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা বুঝিতে পারিলাম। বৃদ্ধ তিনি, আর কত সহ্য করিবেন?

আমরা অন্য একখানি নৌকায় তীরে প্রেরিত হইলাম, বোম্বেটেরা আমাদিগকে স্থলপথে লইয়া চলিল। আমরা কখন সমতল ক্ষেত্র, কখন দলদলে পঙ্কিল জলা, কখন বন্ধুর পার্ব্বত্য ভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। বোম্বেটেগুলা আমাদের পশ্চাতে সঙ্গীন উদ্যত করিয়া আমাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। আমাদের পায়ে জুতা ছিল না, পদতল ক্ষতবিক্ষত হইল। আমাদের কাপ্তেন বেঁটে ও স্থূলদেহ; ভারী শরীর লইয়া কিছু দূর চলিয়া তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার রক্তাক্ত পদদ্বয় বোম্বেটেদের দেখাইলে তাহারা তাঁহার কষ্টে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করিল না।

আমরা দিবারাত্রি চলিতে লাগিলাম; পরদিন প্রভাতে ঝড় উঠিল, সেই সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, বৃষ্টিধারা অত্যন্ত শীতল। এই সময় কাপ্তেনের ও আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। আমাদের আহার-নিদ্রা ছিল না, দেহ অর্দ্ধোলঙ্গ, পায়ের অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, আমাদের চলৎশক্তি রহিত হইয়া উঠিল। তথাপি বোম্বেটেগুলা নির্দ্দয়ভাবে আমাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিল। অবশেষে আমাদের জাহাজ লুঠ হইবার পর পঞ্চম দিন রাত্রিতে একটি পাহাড়ের উপর আমরা একটি ক্ষুদ্র গোল ঘরে উপস্থিত হইলাম। এখানে আমরা কিঞ্চিৎ চীনদেশীয় খাদ্য পাইলাম; তাহা আহার করিয়া কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইলাম।

কিন্তু আমরা দীর্ঘকাল বিশ্রাম করিতে পাইলাম না। দস্যুরা মধ্য-রাত্রিতে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া টানিয়া তুলিল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, সেই বৃষ্টির মধ্যেই তাহারা আমাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া চলিল। দস্যুরা পরস্পর যে আলাপ করিতেছিল, তাহার কিছু কিছু শুনিতে পাওয়ায় বুঝিতে পারিলাম, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কেসকল সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা দস্যুদলের গুপ্ত আড্ডার সন্ধান পাওয়ায় আমাদিগকে এই ভাবে পলায়ন করিতে হইল।

আমি পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, বোম্বেটেরা আমাদিগকে ধরিবার পর কোন অজ্ঞাত উপায়ে আমাদের জীবনের জন্ত ৫ লক্ষ ডলার দাবীর সংবাদ দিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা ৫ হাজার ডলার পাইলেই আমাদিগকে মুক্তিদান করিতে সম্মত ছিল। আমাদের কোম্পানীর সাংহাই-স্থিত এজেণ্ট মেশার্স উইলহেম কোম্পানী আমাদের উদ্ধারের জন্ত এই মুক্তিপণ প্রদান করিতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা দস্যুদের ঠিকানা জানিতে পারেন নাই।

কোন অজ্ঞাত উপায়ে এই দাবীর সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম। আমাদের জাহাজ বালির চরে বাধিলে জাহাজের আড়কাঠী তাড়াতাড়ি জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। দস্যুদলের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং তাহারই সাহায্যে দস্যুদের দাবীর সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে আমরা বোম্বেটে-দল কর্ত্তৃক কিছু দূরে নীত হইবার পর আমাদের সম্মুখদিক্ হইতে হঠাৎ গুলী-বর্ষণ আরম্ভ হইল। বোম্বেটেরাও তৎক্ষণাৎ গুলী চালাইতে লাগিল। তাহার পর আমাকে লইয়া পশ্চাতে হটিয়া অন্তদিকে চলিয়া গেল। সেই সময় আমি কাপ্তেনকে আর দেখিতে পাইলাম না, দস্যুরা তাঁহাকে কোন্ দিকে কি উদ্দেশ্যে সরাইয়া দিল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে তাঁহাকে পথিমধ্যে দশ বারোটি বোম্বেটের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অতি কষ্টে চলিতে দেখিলাম। তিনি তখন কম্পিতপদে ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন। বোম্বেটেরা সঙ্গীনের খোঁচার ভয় দেখাইয়া এবং রাইফেলের কুঁদার গুঁতা দিয়াও তাঁহাকে তাড়াতাড়ি চালাইতে পারিল না। তিনি এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাহারা দ্রুতবেগে চলিতে বাধ্য করিলে তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া আর উঠিতে পারিলেন না। তখন দস্যুরা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি শঙ্কিত হইলাম।

আমাকে দেখিয়া কাপ্তেন হারল্যাণ্ড ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে আমাকে কি বলিলেন, আমি অন্ধকারে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, একটা বোম্বেটে তাঁহার কণ্ঠরোধ করিবার জন্ত দুই হাতে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। কাপ্তেন সেই ভাবে আক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার অতিকষ্টে আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি তাঁহার নিকট যাইবার চেষ্টা করিবামাত্র একটা বোম্বেটে আমার গতিরোধ করিবার জন্ত আমার হাতে সঙ্গীনের খোঁচা দিল, সঙ্গীনের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ আমার বাহুর মাংস ভেদ করিয়া অস্থি স্পর্শ করিল। আমার হাতখানি রক্তে ভাসিতে লাগিল।

আমি কাপ্তেনের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম; দেখিলাম, তিনি মাটীতে পড়িয়া প্রহরীদের সহিত ধস্তাধস্তি করিতেছিলেন। সেই সময় অদূরে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলাম। সেই শব্দে ভয় পাইয়া বোম্বেটেরা আমাকে দূরে টানিয়া লইয়া গেল। তাহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত কাপ্তেনকে দেখিতে পাই নাই; তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, জানিতে না পারায় আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম।

যাহা হউক, আমি মুক্তিলাভ করিয়া সাংহাই আসিবার পর সংবাদ পাইয়াছি, কাপ্তেন জীবিত আছেন। বোম্বেটেদের কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে শেষ যে দিন দেখিয়াছিলাম, সে দিন তিনি এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আর চলিবার শক্তি ছিল না; চলৎশক্তিহীন অবস্থায় তাঁহাকে মাটীতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বোম্বেটেরা তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্ত টানাটানি করিতেছিল; কিন্তু তাঁহাকে মাটী হইতে তুলিতে না পারিয়া তাহারা তাঁহার মস্তকে প্রস্তরের আঘাত করে, সেই আঘাতে তাঁহার মাথা ফাটিয়া রক্তপাত হইয়াছিল, তিনি অচেতন অবস্থায় সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন। সেই সময়ে পশ্চাতে সৈন্তদলের বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বোম্বেটের দল কাপ্তেনকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করে। যে সকল সৈন্ত বোম্বেটেদের অনুসরণ করিতেছিল, তাহারা কিছু কাল পরে সেই স্থানে আসিয়া রক্তস্রোতে তাঁহাকে ভাসিতে দেখিল এবং তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া হাঁসপাতালে রাখিয়া আসিল।

বোম্বেটেরা আমাকে লইয়া দ্রুতবেগে স্থানান্তরে পলায়ন করায় সৈন্তদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া আমাকে মুক্তিদান করিতে পারিল না। আমি সৈন্তদলের সাহায্যলাভের আশায় বোম্বেটেগুলার সঙ্গে যাইতে অসম্মত হইলে তাহারা আমাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিল। আমাকে জীবনে আর কখনও সেরূপ প্রহার সহ্য করিতে হয় নাই।

সৈন্তরা বোম্বেটেগুলাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত, কিন্তু কাপ্তেন হারল্যাণ্ডকে পথিমধ্যে রক্তাক্ত-দেহে অচেতন অবস্থায়

নিপতিত দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া হাঁসপাতালে পাঠাইবার জন্ম ব্যস্ত হইয়াছিল, আমাদের দিকে তখন তাহাদের লক্ষ্য ছিল না; সেই সুযোগে বোম্বেটেরা আমাকে সঙ্গে লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সৈন্যদল আমাদের অনুসরণে বিরত হইলে আমরা সারারাত্রি চলিয়া বহুদূরে প্রস্থান করিলাম। তাহার পর প্রত্যহ দিবাভাগে কোন স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া বোম্বেটেরা রাত্রিকালে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিত; এই ভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। কিন্তু অবশেষে দিবাভাগে আশ্রয় লাভ করা বোম্বেটেদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল, কারণ, যে সকল গ্রাম্য অধিবাসী তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিত, তাহারা শুনিতে পাইল, ম্যাজিস্ট্রেটের ফৌজ বোম্বেটের অনুসরণ করিয়াছে। এই সংবাদে গ্রামবাসীরা ভয় পাইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিতে অসম্মত হইল।

প্রাণপণ শক্তিতে পাথরখানা দস্যুর মুখ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলাম

এই ভাবে বিপন্ন হওয়ায় বোম্বেটেগুলা সকলে দল বাঁধিয়া একত্র পথভ্রমণ করা সঙ্গত মনে করিল না। তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইল; তিন জন বোম্বেটে আমাকে লইয়া চলিল; অন্য সকলে অদূরে থাকিয়া আমাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। যে তিন জন আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা ভয় পাইয়া এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিল; একজন মাত্র আমার সঙ্গে রহিল, আর দুই জন কিছু দূরে থাকিয়া আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিল।

অবশেষে এক দিন অপরাহ্ণে আমার একটু সুযোগ হইল। সেই সময় আমাকে একটি গুহায় লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। যে লোকটা আমার পাহারায় নিযুক্ত ছিল, সে আমার অপেক্ষা শীর্ণ ও খর্ব্বকায়। আমার ধারণা হইল, আমি দুর্ব্বল হইলেও তাহার সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিব।

সেই গুহাটি ক্ষুদ্র এবং এরূপ সঙ্কীর্ণ যে, তাহার ভিতর আমাদের দুই জনের সোজা হইয়া দাঁড়াইবার উপায় ছিল না। তাহার দেওয়াল ঘেঁসিয়া কয়েকখানি আ'গড়া বেঞ্চি রাখা হইয়াছিল। এক কোণে অপরিষ্কৃত শয্যা স্তূপাকারে সংস্থাপিত। মাথার উপর ছোট একটা ল্যাম্প ঝুলিতেছিল, তাহাতে তেল দিয়া আলো জ্বালিতে হইত।

বোম্বেটে প্রহরীটা আমার ঠিক সম্মুখে বসিয়া পাহারা দিতেছিল। সে একটি রাইফেল কোলে ফেলিয়া দ্বারের কাছে বসিয়াছিল। তাহার কোমরবন্ধে একটি পিস্তল ঝুলিতেছিল। পিস্তলটা মরিচা-ধরা, সুতরাং তাহা ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়াই আমার মনে হইল। আমি ভাবিলাম, যদি

আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারি, তাহা হইলে সন্ধ্যার অন্ধকারে পলায়ন করিতে পারিব, এবং প্রভাতের পূর্ব্বেই বহুদূরে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইব।

ক্রমে সূর্য্য অস্তমিত হইল। সন্ধ্যাসমাগমে অত্যন্ত শীত বোধ করিলাম। প্রহরী ল্যাম্পটি জ্বালিয়া দিল। আমি একখানি টুলের উপর বসিয়াছিলাম এবং প্রহরীটাকে কি ভাবে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিব, তাহাই চিন্তা করিতে

দস্যু আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল

ছিলাম। আমি পাশে চাহিতেই একখানি বড় পাথর দেখিতে পাইলাম। আমি পা বাড়াইয়া ধীরে ধীরে তাহা আমার টুলের নীচে ঠেলিয়া দিলাম। আমার আশা হইল, সেই পাথরখানির সাহায্যেই কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিব।

আমার ডান হাত সঙ্গীনের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, সেই হাতে যথেষ্ট আঘাতও সহ্য করিতে হইয়াছিল; এ জন্য সেই হাত দিয়া যথাসাধ্য বেগে পাথরটি নিক্ষেপ করিতে পারিব, এরূপ আশা করিতে পারিলাম না, অথচ বাঁ হাতের উপরও তেমন নির্ভর করিতে সাহস হইল না। কারণ, যদি আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না।

ইতিমধ্যে আর একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। প্রহরীটা জলের একটা আধার বাহির করিয়া তাহার ভিতর জল ঢালিতে লাগিল। সেই সময় সে উঠিয়া আমার দিকে পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই সুযোগে আমি পাথরটা হাতে লইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় অদূরে কাহারও কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। আমি তৎক্ষণাৎ পাথরখানা লুকাইয়া ফেলিলাম। মুহূর্ত্ত পরে দুই জন বোম্বেটে সেই গুহায় প্রবেশ করিয়া প্রহরীটার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিল। তাহারা কয়েক মিনিট পরে যখন প্রস্থান করিল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছিল।

সেই সময় তেলের ল্যাম্পটা দুই একবার দপ দপ শব্দ করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। তাহা দেখিয়া প্রহরীটা উঠিয়া তাহার পলিতাটি উস্কাইতে আসিল।

আমি ভাবিলাম, এই সুযোগ ত্যাগ করিলে এরূপ সুযোগ আর পাইব না। প্রহরী তখন রাইফেলটা পশ্চাতে রাখিয়া আমার ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে দুই হাতে প্রদীপ উস্কাইতে লাগিল।

আমি পাথরখানা তুলিয়া লইয়া, দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া, তাহা সেই প্রহরীটার কদাকার মুখ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলাম। পাঁচ হাত দূর হইতে তাহা তীরবেগে নিক্ষেপ করিয়াই আমি সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলাম। পাথরখানা প্রহরীটার মুখে লাগিতেই সে আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। তখন আমি তাহার নাকে মুখে কিল-ঘুসি মারিতে লাগিলাম।

কিন্তু সেই চীনাম্যানটা অত্যন্ত চতুর ও চটপটে। সে

আমার প্রহার সহ্য করিয়াও আমার টুঁটি চাপিয়া ধরিল এবং সজোরে চাপ দিয়া আমার কণ্ঠরোধের উপক্রম করিল। আমিও তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ভূতলশায়ী করিলাম। তাহার পর আমরা উভয়ে সেই গুহার ভিতর গড়াইতে গড়াইতে পরস্পরকে কিল, ঘুসি, চড় ও লাথি মারিতে লাগিলাম।

এই ভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে চতুর চীনা দস্যুটা হঠাৎ হাত বাড়াইয়া সেই পাথরখানা কুড়াইয়া লইল এবং তদ্দ্বারা সবেগে আমার মস্তকে আঘাত করিল। সেই আঘাতে আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম। মনে হইল, আমার মাথা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে! আমি সংজ্ঞাহীন হইলাম।

চেতনা লাভ করিয়া দেখিলাম, সেই গুহাটি বোম্বেটের দলে পূর্ণ হইয়াছে। তাহারা আমাকে সক্রোধে গালি দিতে লাগিল। আমার মাথা হইতে রক্তের ধারা বহিয়া মুখ ভাসাইতে লাগিল। মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম, মাথা ফুলিয়া উঠিয়াছে।

তখন প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতেছিল, আমি গুহা হইতে মাথা বাহির করিয়া বৃষ্টির জলে মাথা ও মুখ ধুইয়া ফেলিলাম। তাহার পর আমার সার্টের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া লইয়া আহত মস্তকে পটী বাঁধিলাম। অনন্তর গুহার ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া একটি পুরাতন জীর্ণ কোট দেখিতে পাইলাম, তাহার একটিও বোতাম ছিল না। শীত-নিবারণের জন্য সেই কোটটি দ্বারা দেহ আবৃত করিলাম।

সেই রাত্রিতে বোম্বেটেরা আমাকে লইয়া স্থানান্তরে যাত্রা করিল। কত পাহাড়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, ধান্যক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া প্রভাতে একটি বৃহৎ নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে একখানি নৌকা বোধ হয় আমাদের জন্যই রাখা হইয়াছিল; কিন্তু আমরা কোথায় আসিলাম, তাহা জানিতে পারিলাম না। আমি তখন মুক্তিলাভের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, যদি পুনর্ব্বার পলায়নের চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য; আর যদি দস্যুদের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হই, তাহা হইলে তাহারা আমাকে হত্যা করিবে।

নৌকাখানি আমাদিগকে লইয়া তিন দিন দিবারাত্রি চলিল। আমাকে কিঞ্চিৎ আহার দেওয়া হইল; ঘুমাইবার সুযোগ পাইলাম না। আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়ায় জড়বৎ পড়িয়া রহিলাম। অবশেষে এক দিন অপরাহ্ণে আমি হঠাৎ বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার মাথার ঊর্দ্ধে ডেকের উপর অনেকের পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম; মনে হইল, ডেকের উপর কাহারা দৌড়াইয়া বেড়াইতেছিল। তাহার পর নৌকাখানি বায়ুর প্রতিকূলে চলিতে আরম্ভ করিল। আমার অনুমান হইল, আর এক দল বোম্বেটে সেই নৌকাখানি তখন আক্রমণের চেষ্টা করিতেছিল।

আমার শত্রুরা নৌকা লইয়া পলায়ন করিলেও আমি কিছু কাল পর্য্যন্ত বন্দুকের শব্দ ও চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তাহার পর নৌকা নঙ্গর করা হইল; বন্দুকের আওয়াজও সেই সঙ্গে থামিয়া গেল।

সেই রাত্রিতে আমাকে নৌকা হইতে বাহির করিয়া নদীতীরে লইয়া যাওয়া হইল। নদীতীরে কিছু দূরে কয়েকখানি কুটীর দেখিতে পাইলাম। সেখানে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া পুনর্ব্বার আমাকে বোম্বেটের সঙ্গে চলিতে হইল। কতক্ষণ চলিলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই; কিন্তু চলিতে চলিতে হঠাৎ সম্মুখে বন্দুক-নির্ঘোষ শুনিতে পাইলাম। বোম্বেটেরাও গুলী চালাইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহাদের পরাজয়ের সম্ভাবনা প্রবল হইল, আমাদের আশে-পাশে গুলী পড়িতে লাগিল। বোম্বেটেরা ভয় পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। আমি আহত হইবার ভয়ে মাটীতে পড়িয়া হাতপা ছড়াইয়া দিলাম; সেই ভাবে আমাকে বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া দুই জন বোম্বেটে আমার পশ্চাতে মাটীতে পড়িয়া ঐ ভাবে আমার অনুসরণ করিতে লাগিল। সেই অন্ধকারে রাইফেলের মুখ-নিঃসৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিয়া, কোন্ দিক্ হইতে গুলী আসিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। অধিকাংশ বোম্বেটে প্রাণভয়ে নদীর দিকে পলায়ন করিয়াছিল, কেবল পূর্ব্বোক্ত দুই জনমাত্র বুকে হাঁটিয়া আমার অনুসরণ করিতেছিল এবং শত্রুদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমার পিঠের উপর দিয়া গুলী চালাইতেছিল।

এই সময় আমি সাহায্য-প্রার্থনায় প্রাণপণে চীৎকার করিলাম। আমার চীৎকার শুনিয়া একটা বোম্বেটে আমার পশ্চাতে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার রাইফেলের কুঁদা দিয়া আমাকে প্রহারের চেষ্টা করিল; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে অদূরে বন্দুক-নির্ঘোষ হইল, বোম্বেটের হাত হইতে রাইফেল খসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সে ধরাশায়ী হইল। দ্বিতীয় বোম্বেটে তাহাকে

জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা বিফল হইল।

সুযোগ বুঝিয়া আমি গুঁড়ি মারিয়া সেই স্থান হইতে কিছু দূরে পলায়ন করিলাম। দ্বিতীয় বোম্বেটে আমার অনুসরণ করিতেছিল কি না, দেখিবার জন্ম আমি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে বোধ হয় অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়াছিল।

আমি পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। আমার চীৎকার শুনিয়া গুলী-বর্ষণে বিরত হইয়া কয়েক জন যোদ্ধা আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের হাতে রাইফেল দেখিয়াও আমি ভীত হইলাম না, কারণ, তাহাদের পরিধানে সরকারের ফৌজের পরিচ্ছদ দেখিতে পাইলাম। তাহারা গান্‌পুর ম্যাজিষ্ট্রেটের ফৌজ। তাহারা সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; আমার অবস্থা দেখিয়া তাহাদের বিস্মিত হইবারই কথা!—আমার আহত মস্তকে ব্যাণ্ডেজ, দেহ কর্দ্দমাক্ত, বোতামহীন জীর্ণ ও বিবর্ণ কোট, ট্রাউজার-জোড়াটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, জুতার অভাবে খালি-পা ক্ষত-বিক্ষত; আমাকে দেখিয়া ভদ্রলোক বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না।

আমার দুর্গতির কাহিনী প্রায় শেষ হইয়া আসিল।—আমি একখানি চীনা 'গান্‌বোটে' অবিলম্বে আশ্রয় লাভ করিলাম। সেখানে আমার ক্ষতগুলির চিকিৎসা আরম্ভ হইল। বহুদিন পরে তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলাম। সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলাম। পরদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গে আমার মনে হইল,—আমি কোথায়? স্বপ্ন দেখিতেছি না কি?

এই ভাবে আমার একাদশ দিনব্যাপী জীবন-মরণের যুদ্ধের অবসান হইল, কিন্তু ইহার উপসংহারটিও মর্ম্মভেদী। আমি সেই জাহাজের ডেকে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলাম, সেই সময় এক দল সৈন্য আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে দুইটি শৃঙ্খলিত চীনাম্যান! আমি তাহাদিগকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম। যে বোম্বেটের দল আমাকে ধরিয়া আনিয়াছিল, ইহারা তাহাদেরই দলভুক্ত দস্যু, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সনাক্ত করিলাম।

সৈন্যদল আমাকে আর কোন কথা না বলিয়া সেই বোম্বেটেদ্বয়কে নদীতীরে লইয়া গেল। আমি জাহাজে বসিয়া দেখিলাম, তাহাদের দুই জনকে দূরে দূরে দাঁড় করাইয়া দুই জন সৈন্য পিস্তল লইয়া তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইল। তাহার পর একসঙ্গে দুইটি পিস্তলের আওয়াজ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বোম্বেটেদ্বয়ের ইহলীলার অবসান হইল।

অতঃপর আমি নৌকাযোগে হাকাউ বন্দরে প্রেরিত হইলাম; সেই স্থানে জাহাজে উঠিয়া আমি সাংহাই আসিলাম। সাংহাইএর হাঁসপাতালে কাপ্তেন হার্ল্যাণ্ডের সহিত আমার পুনর্মিলন হইল। আমার মত তাঁহারও মাথায় ব্যাণ্ডেজ এবং সর্ব্বাঙ্গে সঙ্গীনের ক্ষতচিহ্ন। সেখানে আট সপ্তাহ চিকিৎসার পর আমাদিগকে কার্য্যে যোগদানে উপযুক্ত বোধে মুক্তিদান করা হইল। মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া আমরা পুনর্ব্বার জীবনের রাজ্যে ফিরিয়া আসিলাম।—আর্থার ওয়েষ্টারহেম্।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জোয়ার-ভাটা

জীবন-নদীতে আসিয়া জোয়ার কূলে কূলে ভ'রে যায়,
তরঙ্গ উচ্ছল ভীম বেগ তার সহস্র দিকে ধায়।
ভাটার সময় পরক্ষণে তার মৃত্যু-জলধির টানে,
কিছু নাহি রয়, দাগটুকুমাত্র সবার দৃষ্টি আনে॥

শ্রীপশুপতি সরকার

জীবন-স্বপ্ন

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
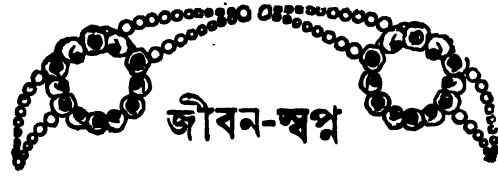
বিন্দুর বাসর

মানুষের বুক ব্যথা-বেদনায় ভাঙিয়া চূর্ণ হোক, তার সুখের সীমানা লুপ্ত হোক,...কলকজায় যত আঘাত লাগুক, পৃথিবী তার চলার পথে সমান চলে—সে-চলার তার বিরাম ঘটে না, সে চলার কোথাও তাহাতে এতটুকু বাধে না! নির্ম্মম বিধান!

দু'কথা চার কথায় বিন্দুর বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল। শঙ্কর ছেলেটি ভালো; অত পয়সার উপর বসিয়া থাকিলেও মা যেন মাটীর মানুষ! ছেলেটি রোগভোগ করিতেছে! তা রোগ মানুষের শরীরে কার না হয়? সারেও তো! জোয়ান বয়সে দু'দিন জ্বরে ভুগিতেছে...শুধু এই বিবাহের অপেক্ষাটুকু! তার পরই ছেলে-বৌ লইয়া মা যাইবে পশ্চিমের কোনো ভালো জায়গায়—হাওয়া যেখানে এমন যে, গায়ে পরশ দিবামাত্র রোগের সর্ব্ব জড় মরিবে; তা ছাড়া বড় বড় সাহেব-ডাক্তার আছে, এবং পয়সার যখন অভাব নাই ...!

পিশিমার বুক তবু কাঁপিয়া উঠিল। বিন্দু যে তাঁর চোখের তারা! সর্ব্বক্ষণ পাশে পাশে আছে...ভালো কথায়, ভৎ'সনার রূঢ় বাণীতে তার হাসি, তার চোখের দৃষ্টি... পিশিমার যেন তা জপের মন্ত্র! একবেলা তাকে না দেখিলে পিশিমা পৃথিবী শূন্য দেখেন। বিবাহ চুকিবামাত্র সেই বিন্দুকে চোখের অন্তরালে কত দূরে পাঠাইয়া দিতে হইবে! দিয়া কি লইয়া থাকিবেন! ঠাকুর-দেবতা, তীর্থ-ধর্ম্ম...এ-সবে তাঁর কোনো মায়া নাই! এ-সবের মোহ বিন্দুকে তাঁর মন হইতে একতিল দূরে সরাইতে পারে নাই। কত লোকে বিদ্রূপ করিয়া কত বলিয়াছে,—ভাইঝী, পেটের মেয়ে নয়! তাকে লইয়া বিধবা তুমি...এ বয়সেও সংসারে এত মমতা!

শঙ্কর মা দশভুজার মত দশ হাতে তুলি লইয়া ভবিষ্যতের কত রঙীন ছবি আঁকিয়া সাম্‌নে ধরিলেন...মেয়ের কি ছিলেই না হবে দিদি! গহনা, ঐশ্বর্য্য...অফুরন্ত! দূরে থাকবে? তা, পশ্চিমে তুমিও তো যেতে পারো দিদি, বৌ তাতে খুশী বৈ অখুশী হবে না!...

যোগমায়ার মন কিন্তু এ-বিবাহে সায় দিতে পারিতেছিল না। জানিয়া-শুনিয়া এমন রুগ্ন ছেলের হাতে...? না হয়, মেয়ের রাজভোগ নাই জুটিল,—হীরা-জহরতের জন্যই তো মেয়ে পণ করিয়া বসে নাই! স্বামী যদি রোগেই ভুগিল বারো মাস তো সুখ কোথায়? গরীবের ঘরে জোয়ান স্বামী, দু'বেলা দু'মুঠা ভাত, মোটা কাপড়...স্বাস্থ্যের হাওয়া... তার দাম যে ঢের বেশী! তার পর যদি টুক্ করিয়া প্রাণটুকু ঝরিয়া যায়? রোগের বাতাসে প্রাণের ও-দীপ মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছে...কতটুকুর ভর তার সহিবে?...হাতের লোহাগাছা বজায় থাকিলে মাটীর কুঁড়েয় বসিয়াও মেয়ে রাজ-রাণীর সুখে সুখী হয়!...

পিশিমা কেমন হক্‌চকিয়া গেলেন! বলাইয়ের মা'র কথায় মনটুকুকে বেশ বাঁধিয়া যেমনি তৈয়ার করিয়া তোলেন, অমনি ওধারে শঙ্কুর মা'র বচনের বেগে সে বাঁধ কোথায় টুটিয়া যায়! শঙ্কুর মা ইদানীং নিত্য আনা-যাওয়া করেন। শেষে বেশ জোর গলায় এক দিন তিনি বুঝাইলেন,—ভবিতব্য মানো তো দিদি! এয়োতির জোর ললাটের লিখন! মানুষের তাতে হাত নেই। সাবিত্রী জেনে-শুনেই সত্যবানের গলায় মালা দিয়েছিলেন...তাঁর এয়োতির জোর ছিল, বলেই না..। জোয়ান ছেলেও অমর নয় দিদি! ঐ যে আমাদের বাড়ীর কাছে গণেশ পালের বড় ছেলে,—কি জোয়ান...কুস্তি করতো— যেন লোহার ভাঁটা! কলেরা হলো, আর এক দিনেই সব শেষ হয়ে গেল! তবে? বরাত মেয়েছেলে জন্মের সঙ্গে নিয়ে আসে, সে কি মানুষে ওল্‌টাতে পারে?

অকাট্য যুক্তি! বিশেষ ঐ সাবিত্রীর কথা! পিশিমার গায়ে কাঁটা দিল। তিনিও বাঙালী ঘরের মেয়ে—দেবতাদের পানে চাহিয়া, শাস্ত্রের পানে চাহিয়া বুকে পাষাণ বাঁধিয়া তাঁর সব দুঃখ সহ্য করিবার কথা! সহ্যও করিয়াছেন; এবং ঐ শাস্ত্র-বাক্যেই বুকে সান্ত্বনা রচিয়া আসিয়াছেন চিরকাল! ঠিক কথা...মানুষ কবে নিজের ইচ্ছায় বিধির লিখন কাটিয়া বদলাইতে পারিয়াছে?

এমনি দ্বিধা-সংশয়ের মধ্য দিয়া বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল এবং শঙ্খরোলে পল্লীর আকাশ-বাতাস এক দিন সচকিত করিয়া বিন্দুর হাত শঙ্করের হাতে সঁপিয়া পিশিমা

অন্তরালে গিয়া চোখের জল মুছিলেন। আসন্ন বিরহের বেদনায় তাঁর বুকে একেবারে অশ্রুর সাগর উথলিয়া উঠিল!

শুভ বিবাহের ব্যাপার! বাসরে পুষ্প-শয়নের আয়োজন ছিল। পাড়ার মেয়েরা আসিয়া আসর জমাইয়া বসিলেন। গরীবের মেয়ে হইলেও বিবাহ-বাসরের আনন্দ বাদ পড়া চলে না। বিবাহের পর মেয়ে-জামাই বাসরে আসিল। শঙ্কর কহিল,—আমায় শুতে দিন্…

পাড়ার দয়া ঠাকুরাণী গ্রামের বাসরে চিরদিন আমোদ-প্রমোদ জোগাইয়া আসিতেছেন। তিনি পাহারাওয়ালা সাজেন, সাজিয়া বরকে শাসন করেন,—গ্রেফ্‌তার করিব, মেয়ে চুরি করিতে আসিয়াছ! খালি বোতল বগলে পূরিয়া মাতাল সাজেন, এবং বর-বধূর গায়ে ঢলিয়া পড়েন সেকেলে মাতালের গান গাহিয়া। এই বিচিত্র কৌতুক-রসের অবতারণায় গ্রামে তাঁর খ্যাতির সীমা নাই! এ বাসরেও তিনি আসিয়া জমিয়াছেন। কার একটা কোট জোগাড় করিয়াছেন, সেই সঙ্গে খানিকটা লাল শালু,…পাহারাওয়ালার পাগড়ী বানানো হইবে…

বরের শয়নের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি একটা বিশ্রী ভঙ্গী-সহকারে বিদ্যাসুন্দর পালার গানের এক কলি গাহিয়া উঠিলেন…শঙ্করের তখন জ্বর বেশ বাড়িয়াছে। দেওয়ালে গা ঠেশ দিয়া শঙ্কর চক্ষু মুদিল।…

যোগমায়া দেবী আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁর মলিন মূর্ত্তি…বুকে যে বেদনা, তার কালো রেখা আজও ঘোচে নাই! তিনি আসিয়া বলিলেন,—ঠাকুর-পিশি জামাইকে শুতে দাও মা,…ওর জ্বর!…

দয়া-ঠাকুরাণী কহিল—হোক জ্বর! জ্বর সারবে, কিন্তু এ-রাত তো আর ফিরবে না! বলে,—

রাঙা মুখের রাঙা হাসি,
সে যে প্রাণের বারাণসী!
ও যে সব তীথের সার—
এমন কোথায় পাবো আর?

যোগমায়া দেবী শান্ত স্বরে কহিলেন,—শরীর ভালো থাকলে আমোদ-আহ্লাদ চলে, মা!…সারাদিনের ধকলে জ্বরটা বেড়েছে…

বাহির হইতে বর-কর্ত্তার গলা শুনা গেল—ওকে ঘুমোতে দেবেন…সঙ্গে সঙ্গে সেই শম্ভু আসিয়া বাসরের দ্বারে দাঁড়াইল, কহিল,—আপনারা গোলমাল করবেন না। ওর জ্বর ১০২ ডিগ্রী…ওকে ঘুমোতে দিন…

দয়া ঠাকুরাণী কোমরে আঁচল জড়াইয়া শম্ভুর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কহিলেন,—

তুমি কে হে রসিক, দিক্‌বিদিকের নেই কি জ্ঞান?
এ মেয়ের রাজ্যে কোন্ সে কাযে এলে হতে অপমান?
তোমায় দেখচি ছোকরা—নও তো মেয়ে—
এ মেয়ে-মহলে কেন এলে ধেয়ে?
বুঝি মতলব-ফন্দী, বন্দী থাকো
এ বুকে…তোমার আন্দামান!

শম্ভু কৌতুক বোধ করিতেছিল—লাল-পাগড়ী মাথায় জড়ানো বুড়ীর অপরূপ নৃত্য-ভঙ্গী আর ঐ বিচিত্র গান…!

ঘরের এক প্রান্ত হইতে আর এক জন বর্ষীয়সী কহিল,—নিজের তৈরী ছড়া। দয়া-ঠাকরুণ বয়স-কালে ওর ঠাকুরের সঙ্গে তর্জ্জা গাইতো, বুঝলে দাদা…ওর কথার জবাব দাও দিকিনি অমনি ছড়ায়…তবে বুঝবো লেখাপড়া শিখেচো…

শম্ভু নিরুপায় চিত্তে কহিল,—বাবা আমায় পাঠালেন বলতে, ওকে আজ জিরুতে দিন…না হলে জ্বর খুব বেড়ে উঠতে পারে! ডাক্তার তো নেই এখানে!…

যোগমায়া দেবীর মন দারুণ উদ্বেগে ভরিয়া উঠিল। শুভ কর্ম্ম…তবু তার আগাগোড়া কেমন একটা বিশ্রী হাওয়া বহিতেছে! এই প্রবল জ্বর গায়ে লইয়া বিবাহ করিতে আসার কি প্রয়োজন ছিল? জ্বর সারিলেই নয়…বিবাহের দিন তো আর পলাইত না! তিনি বিন্দুর পানে চাহিলেন, ভারী ভারী বড় বড় একরাশ গহনার ভারে তাকে মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে…গহনা মেয়েদের মস্ত আরাধনার সামগ্রী, পুলকের মস্ত উপকরণ, তবু বিন্দুর মুখখানি ঝড়ে-ঝরা ফুলের মত মলিন, নির্জীব! বিবাহের আনন্দ…তার প্রাণটুকুকে স্পর্শও করে নাই! ভাবী অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া তাঁর বুকের মধ্যটা যেন হায়-হায় করিয়া উঠিল। ওদিকে দয়া ঠাকুরাণীর ছড়ার পর ছড়া চলিয়াছে উন্মত্ত হাসির রোলে গড়াইয়া…শম্ভু পরাজয় মাগিয়া রণে ভঙ্গ দিল।

দয়া ঠাকুরাণী তখন শঙ্করকে ডাকিয়া বলিল,—এ ভার বইতে হবে, ভাই। এখন থেকেই শিবের মত শুয়ে পড়লে চলবে কেন? মহাকালী এর পর বুকে দাঁড়িয়ে তা-থৈ তা-থৈ নৃত্য তো করবেই…তবু আজকের রাত, একবার উঠে বসো…

কনেকে কোলে তুলে নাও, দেখে আমরা চক্ষু সার্থক করি! ···বলে,—

মন বলচে এসো বঁধু, বসো আমার কোলে···
দু'হাতে গো আঁকড়ে ধরি তোমার চরণ-তলে!

আজ শুলে চলবে না, দাদা-ভাই···উঠে বসো···আয় তো লা বিন্দী···

দয়া-ঠাকুরাণী বিন্দুর দুই হাত ধরিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন; বিন্দু বিরক্তি-ভরে ঝট্‌কা দিয়া দয়া-ঠাকুরাণীর গ্রাস এড়াইয়া, ভঙ্গীতে সুদৃঢ় নিষেধ তুলিয়া, শয্যার উপর প্রাচীরের মত গট্ হইয়া বসিয়া রহিল।

অবশেষে বর-কর্ত্তাকে আসিতে হইল। বর-কর্ত্তা শম্ভুর পিতা। তিনি আসিয়া শঙ্করকে এক দাগ মিকশ্চার খাওয়াইলেন এবং তীব্র কঠিন স্বর-ভঙ্গীতে বাসরের ভিড় সরাইলেন। যোগমায়া দেবী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া শয্যা পাতিয়া দিলেন, দিয়া শঙ্করকে কহিলেন,—তুমি শোও বাবা···তার পর শম্ভুর বাপের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে জানাইলেন, নব বধূকে এ ঘর হইতে আজিকার রাত্রে অন্যত্র সরাইতে নাই···

শম্ভুর পিতা কহিলেন,—না, না, উনিও শুয়ে ঘুমোন ·· ছেলেমানুষ···ওঁরও তো সারাদিন ধকল গেছে। তবে আপনি একটু দেখবেন, যেন এঁরা ঐ বাসর-জাগা উপলক্ষ ক'রে উপদ্রব না তোলেন! ১০২ জ্বর···ভাবনার কথা!···

উপদেশাদি দিয়া শম্ভুর পিতা বিদায় লইলেন। যোগমায়া দেবী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন,—তোমরা জ্বালাতন করতে এসো না···ওদের ঘুমতে দাও···

নারীর দলে মহা অশান্তির সৃষ্টি হইল। একটা বাসর··· কত কামনার ফলে মিলে! তা যদি মিলিয়াছে তো···

এক জন নাক বাঁকাইয়া কহিলেন,—চ', চ'...বলে, মাথা কিনে রেখেচে···বড়-মানুষী ফলানো···

বিন্দুর গহনার রাশি দেখিয়া তাঁর বুকে এতক্ষণ একরাশ কাঁটা ফুটিতেছিল! ঘুঁটে-কুড়ুনির ঝি···তার অদৃষ্টে···

অদৃষ্ট সত্যই মন্দ!...একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পিশিমা যোগমায়া দেবীকে জড়াইয়া ধরিলেন, বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, —বৌ···এ কি হলো ভাই!

যোগমায়া দেবীর বুক এ কথায় একেবারে গলিয়া গেল! তাঁর মুখে কোনো কথা ফুটিল না। ছল-ছল নেত্রে তিনি পিশিমার পানে চাহিয়া রহিলেন···অনেকক্ষণ; তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকো ঠাকুরঝি···তিনি ওদের মঙ্গল করবেন।

পরের দিনও শঙ্করের জ্বর নামিল না। কোন মতে তাকে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া বিদায়-বরণের পালা সারিতে হইল।···

তার পর ফুলশয্যা! পিশিমা তাঁর যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছিলেন। দুপুর বেলা হঠাৎ কলিকাতা হইতে শম্ভু আসিয়া হাজির। শম্ভু কহিল,—কাল কুশণ্ডিকা হয়নি। বরের জ্বর খুব···আজ হবার কথা ছিল। আজো সে একেবারে বেহুঁশ। তাই মা পাঠিয়ে দিলে, জ্যাঠাইমা। বললে, কুশণ্ডিকাই যখন হলো না, তখন ফুলশয্যা তো হতেই পারে না। এখন এ-সব বন্ধ থাক্! শঙ্করকে নিয়ে বাড়ী-শুদ্ধ হুলস্থূল বেধেচে··· ডাক্তারের পর ডাক্তার আসচে। বিন্দু বেচারী একা মন-মরা একধারে প'ড়ে আছে। তুমি যদি বলো, তাকে এখানে রেখে যাই!···সেখানে খাঁচার পাখী হয়ে প'ড়ে আছে·· কে-বা তাকে দেখে! নতুন বৌ-মানুষ তো···

শম্ভু ভাবিল, ভারী দরদ করিয়াছে সে, ভারী মমতা দেখাইয়াছে! কথাটা বলিয়া সে দাঁত মেলিয়া মৃদু হাসিল।

পিশিমার বুকে যেন বজ্রাঘাত হইল! দুই চোখে তিনি অন্ধকার দেখিলেন; তাঁর মাথা অবধি ঘুরিয়া গেল। তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—তবে পাঠিয়ে দে, বাবা···তুই তাকে আজই রেখে যা···

শম্ভু কহিল,—দেখি, আজ, না হয়···কা'ল সকালে নিয়ে আসবো।···

পিশিমা আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া সখেদে কহিলেন,—কি যে তোরা করলি, বাবা! মেয়েটা খাচ্ছিল-দাচ্ছিল, সবাই আরামে ছিলুম, এ কোথা থেকে কি যে ওর ঘটালুম সকলে···এ কি শত্রুতা···!

পিশিমার চোখে হু-হু করিয়া জল ঝরিল। তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আগমনীর সুরে

শ্রাবণের শেষাশেষি সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে পাড়ার কে আসিয়া খবর দিয়া গেল, শেয়ালদার কাছে ট্রাম হইতে

নামিতে গিয়া বাসের ধাক্কা খাইয়া জীবন পা ভাঙিয়াছে। লোকজন আম্বুলান্স ডাকিয়া তাকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া গিয়াছে। জীবনের জ্ঞান হইয়াছে, তবে ভাঙা পা লইয়া হাসপাতালেই সে আছে।

যোগমায়া দেবী প্রমাদ গণিলেন। এ কি বিপদের পর নূতন বিপদ, ঠাকুর!

তিনি ডাকিলেন,—ও বাবা ভুবন···

ভুবন ঘণ্টাখানেক আগে কলেজ হইতে ফিরিয়াছে; ফিরিয়া ঢাকা-চাপা থালা বাহির করিয়া দশ-বারোখানা রুটীতে জলযোগ সারিয়া ফিলজফির বই খুলিয়া বসিয়াছে। তিল অবসর তার আলস্যে কাটে না!

মা'র আহ্বানে সে সাড়া দিল না। মা বার-বার তিন-বার ডাকিলেন···সামনে আসিয়া শেষে তার বইখানা টানিয়া ফেলিয়া তার গায়ে প্রবল ধাক্কা দিয়া তিনি কহিলেন,—ওরে, ও হতভাগা, শুনচিস্···

ভুবন মুখ তুলিয়া চাহিল। মা কহিলেন,—শুনেচিস্, কি সর্ব্বনাশ হয়েচে!

ভুবন বিরক্তি-ভরে কহিল,—কি?

মা কহিলেন,—বাস চাপা প'ড়ে যে উনি হাসপাতালে আছেন···

ভুবন কহিল,—তা আমি কি করবো?

মা অবাক্! কহিলেন,—কি করবি! এত বই পড়েচিস্, শিক্ষা হচ্ছে, সে শিক্ষার জন্ম ওরা জলপানি অবধি দিচ্ছে—এ-ক্ষেত্রে কি করতে হয়, সে-শিক্ষা কি ও-সব কেতাবে কোথাও পাস নে?

ভুবন দৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—না।

না! মা কহিলেন,—ওরে বেইমান, এত বড়টা হলি কার দৌলতে? ও জলপানি পেলি কার স্নেহে···কার বুকে ব'সে ···যা···দেখতে যা···খপর নে, জন্মের মত মানুষটা গেল, কি রইলো!

ভুবন কহিল,—আমি কোথায় গিয়ে খুঁজবো?

মা কহিলেন,—কেন, হাসপাতালে···

ভুবন কহিল,—হাসপাতাল কত বড় জায়গা! সেখানে কোথায় আছে!···কার কাছে যাবো, কিছুই জানি না। তা ছাড়া হাসপাতালে আছে, ভালোই তো। চিকিৎসার ত্রুটি হবে না।···তোমার এত ব্যস্ত হবার কি দরকার, তা বুঝচি না!···

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে মা ছেলের পানে চাহিয়া রহিলেন। তীব্র ভৎ'সনায় তাঁর চিত্ত ভরিয়া যেন কোন্ যজ্ঞের বিরাট আগুন জ্বালাইয়া তুলিল! সে-আগুনে, ইচ্ছা হইল···

কিন্তু না···মা! যোগমায়া দেবী যে মা! ভুবন যত দুর্ব্বৃত্ত হোক্, তাঁর সন্তান! পেটের সন্তান!···

বাহিরে রামুর কথা শুনা গেল। রামু ডাকিতেছিল কমলীকে···

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—যাক, রামু এসেচে!···

মা বাহিরে আসিলেন। রামু হাত-পা ধুইতেছিল। যোগমায়া দেবী কহিলেন,—হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খা, বাবা··· তার পর তোকে এখনি দৌড়ুতে হবে ··

যোগমায়া দেবীর কণ্ঠস্বরে বৈচিত্র্য ছিল; তাহা লক্ষ্য করিয়া রামু যেন আকাশ হইতে পড়িল! রামু কহিল—কোথায়, পিশিমা?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—তোমার পিসেমশায় এক কাণ্ড বাধিয়েচেন বাবা, বাসের ধাক্কায় পা ভেঙ্গে ক্যাম্বেল হাসপাতালে প'ড়ে আছেন।

তাঁর কথা শেষ হইল না। রামু কহিল—বলো কি! খাবার থাক, পিশিমা···আগে আমি যাই···

রামু গমনোদ্যত হইল। যোগমায়া দেবী তার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—কিছু মুখে দে বাবা আগে···

—না, না, পিশিমা, একটু দেরী হলে ট্রেণ পাবো না··· আমায় ছুটতে হবে···

রামু তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। যোগমায়া দেবী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সাতদিন পরে জীবন চক্রবর্ত্তীকে টানা-গাড়ীতে করিয়া গৃহে আনা হইল। পায়ে কাঠ বাঁধা। জ্বর নাই। রামুই তদ্বির করিল। এমন তো কিছু নয় জানিয়া ভুবন-সুবল ওদিকে মাথা ঘামানো উচিত মনে করিল না।···রামু তো দেখাশুনা করিতেছে···ঘটা করিবার মত কিছু নয়ও!

জীবনের কিন্তু দিন কাটানো ভার হইল! চব্বিশ ঘণ্টা নানা ফিকিরে সর্ব্বত্র যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তার পক্ষে ছোট ঘরে বিছানায় দিবারাত্র পড়িয়া থাকা! কোন কাজ নাই, সর্ব্বক্ষণ অলস অবসর! বাহিরে ভাদ্রের আকাশ মেঘে ভরিয়া ওঠে,—ঘন কালো মেঘ···সে মেঘে বৃষ্টিও প্রচুর ঝরে! আবার মুহূর্ত্তে বৃষ্টি থামিয়া সূর্য্যের আলোর চারিদিক

ঝলমলিয়া ওঠে! তার পর সন্ধ্যায় আঁধার নামে, সন্ধ্যার পর রাত্রি···কখনো জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল, কখনো অন্ধকারের গাঢ় কালো ছায়ার আড়ালে চরাচর বিলুপ্ত করিয়া দেয়!···

জীবন চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, আর তার মনে অতীত দিনের সহস্র স্মৃতি সদল-বলে যাতায়াত সুরু করিয়া দেয়! যেমন বিচিত্র তাদের মূর্ত্তি, তেমনি বিচিত্র তাদের পরশ!···

বলাইয়ের মুখখানাই সব-চেয়ে বেশী মনে জাগে বেচারী! বাপের কি কলঙ্ক মাথায় বহিয়া নিরপরাধ পুত্র জেলের বদ্ধ কক্ষে বসিয়া আছে! হয় তো ঐ কচি হাতে ঘানি ঠেলিতেছে, পাথর ভাঙ্গিতেছে। আর জীবন···?

বুক হা-হা করিয়া ওঠে! প্রাণ্ কড়া পাথর হইয়া গিয়াছে, তবু সে পাথর ঠেলিয়া রাজ্যের অশ্রু একেবারে ফাঁপিয়া ফুলিয়া বাহিরে আঝোর ধারে ঝরিয়া পড়িতে চায়!··· দীর্ঘনিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড় বহাইয়া ছুটাছুটি করে!··· এ যে কি দারুণ বেদনা···বুকে পাষাণ-ভার চাপিয়া রাখিয়াছে সর্ব্বক্ষণ!···

রাত তখন প্রায় বারোটা। জীবনের চোখে ঘুম আসিতেছিল না; বিছানায় এক পাশ ফিরিয়া পড়িয়া থাকা··· বাহিরের খোলা জানলা দিয়া বিদ্যুতের শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঘরে আলোর ঢেউ ছিটাইতেছিল! আকাশে ঘন মেঘ··· জলো হাওয়া আসিয়া গায়ে লাগিতেছিল···

সহসা কড়কড় শব্দে আকাশ চিরিয়া আগুন জ্বালিয়া কোথায় বাজ পড়িল।

যোগমায়া দেবী উঠিয়া জানলা বন্ধ করিয়া দিলেন। জীবন কহিল—বন্ধ করলে কেন গা?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—বড্ড জল আসচে, ঝড়ও সেই সঙ্গে···

জীবন কহিল—আসুক জল-ঝড়। জানলা খুলে দাও··· এ বদ্ধ ঘর আর ভালো লাগে না। প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। ঐ জলো হাওয়ায় কত খপর যে ভেসে আসচে···

জীবন একটা নিশ্বাস ফেলিল।

যোগমায়া দেবী কহিলেন—ঘুম ভেঙ্গে গেল বুঝি?

জীবন কহিল—ঘুম হচ্ছে না।

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো?

জীবন কহিল—দেবে···?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—দি···

জীবন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—দাও···কিন্তু তার আগে জানলা খুলে দাও।

যোগমায়া দেবী জানলা খুলিয়া স্বামীর শয্যায় জীবনের শিয়রে আসিয়া বসিলেন; এবং জীবনের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বাহিরে আলোর মশাল নাড়িয়া আলোর তুলি বুলাইয়া বাজ হাঁকিয়া গেল। জীবন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,— আলোয় আলো কত দূরে ছোট গাছ-পালা অবধি দেখা গেল, উঃ···

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—জানলা বন্ধ ক'রে দেবো?

—না, না। আমি ভাবচি,···ঐ অত দূর-দুরান্তের মাঠ নজরে পড়চে···এমন আলো আকাশে নেই যাতে ক'রে দেখি, আমার বলাই এখন কোথায়, কি করচে···?

যোগমায়া দেবীর দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল। তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

জীবন কহিল,—তুমি জানো না, কত বড় উঁচু মন তোমার ঐ ছেলের! অভাগার ঘরে জন্মেছিল···নেহাৎ অভাগা! জানো না তো···

যোগমায়া কহিলেন,—জানি···

জীবন কাঁপিয়া উঠিল, কহিল,—জানো? কি জানো?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—বলাইয়ের কত বড় উঁচু মন···কত মায়া, কি স্নেহ···

জীবন কহিল,—না, তুমি কিছুই জানো না। তবে বলি, শোনো···

জীবন বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে সব কথা খুলিয়া বলিল, বলাইয়ের মিথ্যা কলঙ্কের সত্য কাহিনী···কোথাও এতটুকু গোপনতা না রাখিয়া, আগাগোড়া সমস্ত কাহিনীটুকু!···জীবনের দুই চোখে অশ্রু।

কাহিনী শুনিয়া যোগমায়া দেবী কাঠ!···তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না! চেতনা অবধি যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল!···

তার পর একটি-একটি করিয়া দিন বহিয়া চলিল। ভাদ্র মাসের পর আশ্বিন আসিল···স্থলে-জলে আলোর দীপ্তি··· ফলে-ফুলে আনন্দশ্রী···ম্লান ধরণীর মুখে হাসি ফুটিল! বাতাসে আগমনীর সুর বাজিল।···

বেলা প্রায় দশটা···যোগমায়া দেবী রান্নাঘরে···জীবনের

পা সারিয়াছে, সে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, ভুবন ও সুবল বাড়ী নাই। হঠাৎ রোয়াকে কে ডাকিল,—মা…

মা ঝোল সাঁতলাইয়া কড়ায় ঢালিতেছিলেন, তাঁর হাত কাঁপিল, হাতের কাঁসী পড়িয়া গেল। কে ডাকে ও?…

মা ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন। এ কি… বলাই!…

যোগমায়া দেবীর মাথা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করিয়া উঠিল।… চোখের সামনে কতকগুলা শুধু আলোর ফুল! আর কিছু নাই ··তিনি টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন! কে ধরিল।

প্রায় এক মিনিট পরে চোখের সামনে আবার সব স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।…মা দেখেন, তাকে বুকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলাই…মলিন মুখ…তবু দুই চোখে হাসির কি উজ্জ্বল বিভা!

মা ডাকিলেন,—বলাই, বাবা…

মা'র বুকে মুখ গুঁজিয়া বলাই ডাকিল,—মা, মা, মা…

স্বর্গ যেন মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে! তার বিচিত্র রূপ-মাধুরী, তার পুলকের পূর্ণ পশরা বহিয়া!…

বুক হইতে ছেলেকে ছাড়িতে প্রাণ চায় না…চুমায়-চুমায় ছেলের শির ভরাইয়া মা বহুদিনের অদর্শনের বেদনা মুছিলেন, ছেলের যত অকল্যাণ মুছাইয়া দিলেন!…

ও-দিকে সহসা নারী-কণ্ঠে আর্ত্ত ক্রন্দন ভাসিয়া উঠিল। কে কাঁদে? বলাই মা'র বাহু-পাশ ছাড়াইয়া উৎকর্ণ দাঁড়াইল। আবার সেই আর্ত্ত ক্রন্দন!

বলাই কহিল,—বিন্দুদের বাড়ীর দিকে না?…

মা চমকিয়া উঠিলেন। তবে কি?…জামাইয়ের খুব অসুখ চলিয়াছে ক'দিন…

মা কহিলেন,—বিন্দুর তা হলে…

বলাই কহিল,—কি মা?

মা কহিলেন,—বিন্দুর যে বিয়ে হয়ে গেছে। জামাইয়ের খুব বেশী অসুখ চলেছে ক'দিন। দিন কাটে তো রাত কাটে না…এমন অবস্থা…

বলাই কহিল,—জামাই এখানে?

মা কহিলেন,—না। আলমোড়ায়।

—দেখি মা। বলিয়া বলাই ছুটিল।

মা'ও ছুটিলেন।

তাই! চিঠি আসিয়াছে কলিকাতা চাঁপাতলা হইতে… শম্ভু লিখিয়াছে, আজ আলমোড়া হইতে চিঠি আসিয়াছে। তিন দিন হইল, আলমোড়ায় আমাদের শঙ্করের ৺লাভ হইয়াছে।

চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়িয়া বলাই কহিল,—কাল লিখেচে…আজ তা হ'লে চারদিন…

ছোট্ট চিঠি…কিন্তু কি বাজের আগুন এই কালো কালির ক'টা ছত্রে!

সজল-চক্ষে যোগমায়া কহিলেন,—বিন্দু কোথায়?

ক্রন্দন-জড়িত স্বরে পিশিমা কহিলেন,—তাকে সিদ্ধেশ্বরী-তলায় পাঠিয়েচি…জামাইয়ের কল্যাণে ১০৮ বার মার নাম জপ করতে…রোজই জপ করছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বন্ধন

আমি পাপ-পবনে হেলে গেছি, প্রভু,
হয়ে গেছি আমি মোহের দাস!
তব করুণামৃত ভুলে আছি, তবু
তোমারই রাজ্যে করি গো বাস!

আঁখি আছে তবু আঁখি-হারা আজি,
গৃহ আছে তবু গৃহহীন সাজি',
মোহ-পিঞ্জরে প'ড়ে আছি বাঁধা,
মলিন-নিলয়ে করিছি বাস!

ভব-বন্ধন কেটে যদি দাও
মোহ-পিঞ্জর ভেঙ্গে চ'লে যাও,
শান্তি-নিলয়ে যেতে পারি স্বামি!—
কর, গো আমারে চির-ক্রীতদাস!

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

স্বরলিপি

বারোঁওয়া-মিশ্র—একতালা।

এখনো কেন কেন কেন গো তীরে বাঁধা তরণী।
ডুবিছে মলিন তপন ধীরে ছায়ায় ঢাকিছে ধরণী॥

শোন পরপারে,
উঠে বারে বারে,
আকুল বাঁশরী বাজি,

(বুঝি) কুঞ্জ-ভবনে
মধুর মিলনে
বিরহ টুটিবে আজি,

আনিছে মধুর মলয় মন্দ
নব নন্দন কুসুম গন্ধ
ওই চাহ ফিরে
আসে ধীরে ধীরে
যামিনী জোছনা-বরণী॥

ওগো ত্বরা করি,
ছেড়ে দাও তরী,
বয়ে যায় শুভ লগ্ন।

(তুমি) ক'রে অবহেলা
কাটাইলে বেলা
রহিলে স্বপন-মগ্ন।

এ বিজন তটিনী-পুলিনে একা
রয়েছ পাইতে যাহার দেখা
ওই হের তা'রি চরণপ্রান্তে
রঙ্গে লুটিছে তটিনী॥

আস্থায়ী—

০ | ১ | + | ৩
সা জ্ঞা রা সা সা রা | ন্া । সা রা জ্ঞা । | রা জ্ঞা মা পা মা জ্ঞা | সা রা । ন্া ন্া সা |
এ খ ন ও কে ন | কে ০ ন কে ন ০ | গো ০ ০ ০ তী রে | বাঁ ধা ০ ত র ণী |

০ | ১ | + | ৩
সা পা পা দা পা পা | মা পা মজ্ঞা রা । সা | সা মজ্ঞা । রা সা রা | ন্া । ন্া সা । । |||
ডু বি ছে ম লি ন | ত প ন ধী ০ রে | ছা য়া য় ঢা কি ছে | ধ ০ র ণী ০ ০ |||

সঞ্চারী—

০ | ১ | + | ৩
জ্ঞা সা জ্ঞা । মা মা | মা পা পা পা পা পা | মপা দা । পা দা পা | মা পা পদা । পা । |
শো ন প র পা রে | উ ঠে বা রে বা রে | আ কু ল বাঁ শ রী | বা ০ ০ ০ জি ০ |
ও গো ত্ব রা ক রি | ছে ড়ে দা ও ত রী | ব য়ে যা য় শু ভ | ল ০ ০ ০ গ্ন ০ |

০ | ১০ | + | ৩
ন্সা পা । পা দা পা | মা মা জ্ঞা জ্ঞা রা সা | সা মা জ্ঞা রা সা রা | ন্া । ন্া সা । । ||
(বুঝি) কু ঞ্জ ০ ভ ব নে | ম ধু র মি ল নে | বি র হ টু টি বে | আ ০ ০ জি ০ ০ ||
(তুমি) ক রে অ ব হে লা | কা টা ই লে বে লা | র হি লে স্ব প ন | ম ০ ০ গ্ন ০ ০ ||

০ | ১ | + | ৩
জ্ঞা সা জ্ঞা জ্ঞা মা মা | মা পা পা পা পা পা | মপা দা । পা দা পা | মা পা পদা । পা । ||
আ নি ছে ম ধু র | ম ল য় ম ন্ দ | ন ব ০ ন ন্দ ন | কু সু ম গ ন্ ধ ||
এ বিজ ন ত টি নী | পু লি নে এ ০ কা | র য়ে ছ পা ই তে | যা হা র দে ০ খা ||

০ | ১ | + | ৩
সা পা । পা দা পা | মা মা জ্ঞা জ্ঞা রা সা | সা মা জ্ঞা রা সা রা | ন্া । ন্া সা । । ||||
ও ই চা হ ফি রে | আ সে ধী রে ধী রে | যা মি নী জো ছ না | ব ০ র ণী ০ ০ ||||
ও ই হে র তা রি | চ র ণ প্রা ন্ তে | র ০ ঙ্গে লু টি ছে | ত ০ টি নী ০ ০ ||||

কথা ও সুর—শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, (বি-এল্)। স্বরলিপি—শ্রীমণিলাল সেন।

সংবাদপত্রের দুর্দ্দিন

একেই ত অর্ডিনান্স ও সিডিসান আইনের খাঁড়া সংবাদপত্রের মাথার উপর অহরহঃ ঝুলিতেছে, তাহার উপর সংবাদপত্রকে ভাতে মারিবারও চেষ্টা হইতেছে। ব্যবস্থা-পরিষদ হইতে একটি সরকারী হিসাব-পরীক্ষা কমিটী বসান হইয়াছে। এই কমিটীর প্রথম অধিবেশনের দিনে সরকারী তার ও ডাক বিভাগের বড় কর্ত্তা মিঃ স্তাম্‌স্ কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে অনেক সংবাদপত্রওয়ালাকেই যে পাততাড়ি গুটাইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন, "তার ও ডাক বিভাগে প্রতি বৎসর আয়ব্যয়ে যে ঘাঁটতি পড়িতেছে (বর্ত্তমানে ৪৮ লক্ষ টাকা), তাহা সংবাদপত্রের তার ও ডাক টিকিটের মূল্যের হার বৃদ্ধি করিয়া পূরণ করিলে সুবিধা হইতে পারে। ইহার ফলে তিনি তাঁহার বিভাগের অনেক উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন।"

কোন সদস্য জিজ্ঞাসা করেন, ইহা দ্বারা কি জ্ঞান ও শিক্ষা-প্রচারে বাধা দেওয়া হইবে না? শিক্ষার উপর কর বসান হইবে না? এ কথার উত্তর দেওয়া মিঃ স্তামসের কেন, কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। সংবাদপত্রের মারফতে জনসাধারণের মধ্যে সুলভে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রচার হয়, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। পরন্তু জনসাধারণ ইহার সাহায্যে মিথ্যা জনরবের দুষ্ট প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পায়। সুতরাং সংবাদপত্রের উপর গুরু করভার চাপাইলে জনসাধারণ এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। ইহা কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর? এখন হইতে সাংবাদিকগণ ও জনসাধারণ এ বিষয়ে সতর্ক হইতে পারেন।

ল্যাঙ্কাশায়ার

বিলাতের পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল,—ভারতে বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন আন্দোলনের ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের তন্তুবায়কুলের ক্ষতি হইয়াছে কি না? বাণিজ্য-সচিব মিঃ গ্রেহাম ইহার অতি চমৎকার জবাব দিয়াছেন। সে জবাবে বুঝিবার উপায় নাই, কিসে ল্যাঙ্কাশায়ারের ক্ষতি হইয়াছে। তিনি এইটুকুমাত্র স্বীকার করিয়াছেন যে, "ভারতের বর্জ্জন আন্দোলন ইংলণ্ডের বস্ত্র-ব্যবসারের প্রতিকূলে কার্য্য করিয়াছে, এ কথা সত্য, তবে এই ব্যবসায়ের উপর অন্যান্য প্রতিকূল কারণের প্রভাব হইতে বর্জ্জন আন্দোলনের প্রভাবকে বাছিয়া লওয়া যায় না।" ভাঙ্গি ত মচকাই না!

আমরা এলাহাবাদের পাইওনিয়ার পত্রে ১৪ই জুনে প্রকাশিত ম্যাঞ্চেষ্টারের মিঃ ফ্রেডারিক ট্যাটারস্যাল লিখিত নিবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, বর্জ্জন আন্দোলন ল্যাঙ্কাশায়ারের কোন ক্ষতি করিয়াছে কি না। নিবন্ধটি এই ভাবের:—

ল্যাঙ্কাশায়ারের কলওয়ালারা কিছুতেই অবস্থার উন্নতি করিতে পারিতেছে না। এখন সুতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন—দুই দিকেই বিস্তর কাষ কমাইয়া দিতে হইয়াছে, ভবিষ্যতে বোধ হয় আরও দিতে হইবে। ফলে প্রস্তুত পণ্যের উৎপাদন কমাইয়া দিতে হইতেছে। ব্যবসায়ের দিক হইতে ল্যাঙ্কাশায়ারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন আন্দোলনই ইহার মূল কারণ। ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইতে হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে যে সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে চিন্তার কারণ আরও বৃদ্ধি হইতেছে। ভারতবর্ষের বড় বড় বাজার-গঞ্জের সহিত কার-কারবার একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইহার উপর মন্তব্যের প্রয়োজন হইবে কি?

শিক্ষাবিভাগে আবার কার্লাইল্ সার্কুলার

আসামের শিক্ষানিয়ামক মিঃ কানিংহাম স্থানীয় স্কুল-সমূহের ছাত্রগণের অভিভাবক ও পিতার উপর হুকুম জারী করিয়াছেন যে, সকল স্কুলের প্রথম চারি শ্রেণীর ছাত্রগণের জন্য তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, তাঁহারা তাঁহাদের পোষ্যগণকে রাজনীতির সম্পর্কে থাকিতে দিবেন না, থাকিলে তাঁহাদিগকে দায়ী হইতে হইবে। ইহাতে বঙ্গভঙ্গ যুগের কার্লাইল সার্কুলারের গন্ধ পাওয়া যায়।

মাদ্রাজের কোন এক সহরে নারীরা তকলি বা টেকো লইয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্বামীদিগকে দায়ী করিয়া নোটিশ দিয়াছেন, সংবাদপত্রে এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহাও কি অনেকটা এই প্রকৃতির আদেশ নহে? ছাত্রগণের অপরাধের জন্ম অভিভাবকরা দায়ী থাকিবেন,—ইহা কথামালার মেষশাবকের পিতার জল ঘোলা করারই মত!

আবার বাঙ্গালা সরকার আসামের দেখাদেখি এই ভাবের এক নোটিশ বাঙ্গালার শিক্ষা-নিয়ামকের উপর জারী করিয়াছেন। নোটিশটা বাহির হইয়াছে বাঙ্গালার শিক্ষা-সচিবের তরফ হইতে। ইহাতে নির্দ্দেশ করা হইতেছে:—

(১) অতঃপর ছাত্রগণের মধ্যে শৃঙ্খলারক্ষার কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিতে হইবে। (২) সরকারী বা সরকারের সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলগৃহে বা প্রাঙ্গণে রাজনীতিক সভা বা আন্দোলন করিতে দেওয়া হইবে না। (৩) ছাত্রগণকে হরতালে, ধর্ম্মঘটে, শোভা-যাত্রায় অথবা পিকেটিংএ যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে অপরাধীদিগের কঠিন শাস্তি হইবে।

সে কিরূপ? অভিভাবকগণকে কি বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইবে, না 'নীল ডাউন' করিতে বলা হইবে?

কার্লাইল সার্কুলারের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এমন দুর্ব্বুদ্ধি যাঁহাদের হয়, তাঁহাদের রাজনীতিকতার প্রশংসা করা যায় না।

স্বদেশিসেবা

স্বদেশিসেবা আমাদের ধর্ম্ম, উহা আমাদের জপ-তপ-ধ্যান-ধারণার মত না হইলে জন্মভূমির দুর্গতি-মোচনের কোন সম্ভাবনা নাই। তবে লোকদেখান বাহিরের ভড়ং কোন কালেই আমাদিগকে জাতি হিসাবে বড় করিতে পারিবে না। কেহ কেহ খদ্দরের পরিচ্ছদ 'পোষাকী' করিয়া রাখেন, লোকের সম্মুখে অথবা সভা-সমিতিতে যাইতে হইলে উহা ব্যবহার করেন। কেহ বা ধরা পড়িলেই বলেন, "পুরাতন মাল, ফেলি কি করিয়া!" এই মনো-বৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইবে, মনে-প্রাণে স্বদেশী হইতে হইবে। তবে ত দেশের দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা ঘুচিবে।

আমরা শুনিয়াছি, মহারাণী মেরী বিলাতে প্রস্তুত পরিচ্ছদ ব্যতীত অন্ত পরিচ্ছদ পরিধান করেন না, এমন কি, তিনি স্বদেশের পণ্য-প্রসারে উৎসাহ-দানের উদ্দেশ্যে নানারূপ প্রদর্শনী ও বাজার গঠনে এই পরিণত বয়সেও আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন।

এখানে কোন ইংরাজ বণিক তাঁহার বড়বাবুর মারফত একটি পুরাতনগামী ছাতা মেরামত করিতে দিয়াছিলেন। বাবু সেইটি দেশী কারখানায় সস্তায় সারাইয়া আনিয়াছিলেন। ইংরাজ মনিব ক্যাশ-মেমো দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মেরামতী কাযটা ছুরি দিয়া কাটিয়া দিয়া বলেন, কোন ইংরাজ দোকানদারের নিকটে উহা যেন মেরামত করাইয়া আনা হয়।

কোন এক মার্কিণ ব্যবসাদার মনিবের প্যাণ্টালুনের অংশ ছিন্ন দেখিয়া বাঙ্গালী কর্ম্মচারী উহার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, সহরে বিস্তর সাহেবী দোকানে প্যাণ্টালুন পাওয়া যায়, বলেন ত আনিয়া দিই। মার্কিণ মনিব হাসিয়া বলেন, না, তাহার প্রয়োজন হইবে না, তিনি ৫।৭টা সুটের জন্ম নিউ ইয়র্কের দোকানে অর্ডার দিয়াছেন, শীঘ্রই মাল আসিয়া পৌছিবে।

এমন স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম না হইলে জাতি স্বাধীনতার দাবী করিতে পারে না। মনে দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, দেশে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাইব, ততক্ষণ কণামাত্রও বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব না, উহা ব্যবহার করা পাপ। শুভলক্ষণ, বর্ত্তমানে এই ভাবটা যেন জনগণের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। ইহা সরকারের ধর্ষণ-নীতির ফলেই হউক, বা আর যাহাতেই হউক, স্থায়ী হইলেই মঙ্গল। ইহার ফলে দেশ হইতে সিগারেটের ব্যবহার একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এখন পথে-ঘাটে, ট্রামে-ট্রেণে প্রায় সকলেরই হাতে টেকো বা তকলি ও তুলা দেখিতে পাওয়া যায়। ডেলি প্যাসেঞ্জারকে পূর্ব্বে গাড়ীতে তাস পিটিয়া বা গান গাহিয়া বেঞ্চ চাপড়াইয়া সময় অতিবাহিত করিতে দেখা গিয়াছে, এখন সকলেই সুতা কাটেন।

এখন প্রায় সকলেরই অঙ্গে খদ্দর বা দেশী মিলের কাপড়, জামা; ধূমপায়ী মাত্রেরই মুখে বিড়ি। এ সকল খুবই আনন্দের কথা। এই প্রবৃত্তি স্থায়ী হয়, ইহাই প্রার্থনা।

কংগ্রেস বে-আইনী

প্রথমে মাদ্রাজ, তাহার পর পাঞ্জাব ও বোম্বাই, শেষে যুক্ত-প্রদেশ। একে একে প্রাদেশিক সরকারগুলি কংগ্রেস কমিটী ও ওয়ার কাউন্সিলগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। শেষে যুক্তপ্রদেশের সরকার ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে খোদ নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীকেও বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং উহার প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত মতিলাল ও সেক্রেটারী ডাক্তার সৈয়দ মামুদকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। কংগ্রেস দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। সেই কংগ্রেস যদি বে-আইনী বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে প্রায় তাবৎ জাতিটাই ত বে-আইনী, কেন না, ভারতের অসংখ্য লোক

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু

প্রকাশ্যে কংগ্রেসের সদস্য না হইলেও মনে মনে কংগ্রেসের পোষক। সরকার কি ইহার পরে সমগ্র ভারতকেই বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবেন ?

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য

বাঙ্গালার সরকার ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, ঐ বৎসর বাঙ্গালায় ১১ লক্ষ ৮৯ হাজারেরও অধিক নরনারী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গালার লোকসংখ্যা চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল বাদ দিলে ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ২২ হাজারের কিছু বেশী। সুতরাং বুঝা যায়, বাঙ্গালায় ঐ বৎসর হাজারকরা ২৫ জনের কিছু অধিক লোক মরিয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পূর্ব্ব-বৎসরে ইহার অপেক্ষা ৩ শত ৫৫ জন লোক অধিক মরিয়াছিল। কিন্তু সে যাহা হউক, গড়পড়তায় বাঙ্গালায় ৪০ ভাগের এক ভাগ লোক প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহা এই প্রদেশের বাৎসরিক সরকারী স্বাস্থ্যতত্ত্ব পাঠ করিলে জানা যায়। পরন্তু সরকারের রিপোর্ট অনেক সময় নিখুঁত, এমন কথা বোধ হয় সরকারও স্বীকার করিবেন না। যাহার তথ্য-সংগ্রহের ভার অশিক্ষিত চৌকীদার-দফাদারের উপর ন্যস্ত এবং যে দেশের লোক সকল সময়ে জন্মমৃত্যু রেজেষ্ট্রী করে না, সেই দেশের স্বাস্থ্যতত্ত্ব যে ঠিকমত সংগৃহীত হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য।

তবেই বুঝিতে হয়, এই বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্য কেমন সুন্দর! অন্য কোন সভ্য দেশ হইলে এই ভয়াবহ মৃত্যুর হারের বিপক্ষে জনগণ কি আন্দোলনই না করিত। তবে একটা সুবিধা আছে। এ দেশের লোক অদৃষ্টবাদী, অদৃষ্টের বা বিধাতৃপুরুষের উপর সকল দোষের বোঝা চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত। তাই এমন ব্যাপার এ দেশে সম্ভব হইতেছে।

আর একটা বিষয় আমাদের দেশবাসীর বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। বাঙ্গালায় নারী অপেক্ষা পুরুষ অধিক মরে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পুরুষ মরিয়াছিল ৬ লক্ষ ১৪ হাজারের উপর, নারী ৫ লক্ষ ৭৪ হাজারের উপর। ১৯২৮ খৃঃ পুরুষের মৃত্যুসংখ্যা হইয়াছে ৬ লক্ষ ১৩ হাজারের উপর আর নারী মরিয়াছে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজারের উপর। বাঙ্গালায় ইহা ছাড়া আরও একটা কথা লক্ষ্য করিবার আছে। এই প্রদেশে গড়পড়তায় জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক, আর ম্যালেরিয়াই ইহার প্রধান কারণ। ম্যালেরিয়ায় যাহারা মরে, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাহারা জীবন্মৃত হইয়া থাকে, তাহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে এই ভাবের জীর্ণ কঙ্কালসার প্লীহা-রোগাক্রান্ত লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা কোনরূপে বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু সংসারের সাহায্য বা ভোগ-আহ্লাদ কিছুই করিতে পারে না। মৃত্যুর হার কোন কোন ক্ষেত্রে হাজারকরা ৩৫ জনেরও অধিক। য়ুরোপের দেশ-সমূহের মৃত্যুর হার অপেক্ষা ইহা দ্বিগুণেরও অধিক। ইহা কি ভীষণ কথা নহে? অথচ ম্যালেরিয়া আদি রোগ এখন সভ্য জগতে দুরারোগ্য বলিয়া স্বীকৃত নহে! ইহা সুসভ্য বৃটিশ শাসকের পক্ষে সুনামের কথা নহে।

ঢাকা

ঢাকার হাঙ্গামা সম্পর্কে আমরা যে সকল চিঠিপত্র পাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলে জনসাধারণ ভয়ে, বিস্ময়ে, ক্রোধে, ঘৃণায় অভিভূত হইবেন সন্দেহ নাই। এমন বীভৎস, পৈশাচিক, নারকীয় কাণ্ড সভ্য বৃটিশ সরকারের পুলিস ও ফৌজ-রক্ষিত

অন্যতম রাজধানীতে সংঘটিত হইতে পারে, তাহা কল্পনারও অতীত ছিল। কেবল রাত্রিকালে নহে, প্রকাশ্য দিবালোকে সহরের বুকের মধ্যে লুণ্ঠন, হত্যা, গৃহদাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ এমনও পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, শান্তিরক্ষকদের অনুপস্থিতি ইহার কারণ ছিল না।

আমরা সে সকল ভীষণ লোমহর্ষণ কথা এখন প্রকাশ করিব না। কারণ, ঢাকায় সম্প্রতি দুইটি তদন্তকমিটী বসিয়াছে, একটি সরকারী ও একটি বে-সরকারী। ইঁহাদের সম্মুখে বিস্তর লোক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। সে সকল সাক্ষ্যে পুলিসের বিপক্ষে যে সকল ভীষণ অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইতেছে, তাহা সত্য হইলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে কলঙ্কের কথা। "স্বরাজ লেও," "গন্ধীকা পাশ যাও", "কংগ্রেসকা পাশ যাও,"—ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক উক্তি বিপন্ন আশ্রয়-প্রার্থী লোককে শুনিতে হইয়াছে। কোন এক সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, ৩।৪ শত মুসলমান গুণ্ডার সঙ্গে এক মুসলমান ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিসকে থাকিতে দেখা গিয়াছে। কোন কোন সাক্ষীর বর্ণনায় জানা যায়, সময়ে পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। সরকারী নারী শিক্ষয়িত্রী-দিগের ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষয়িত্রী কুমারী পি হালদারের সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে যে,তিনি স্কুলের সান্নিধ্যে মুসলমানদিগকে দোকান লুঠ করিতে দেখিয়াছেন, অধিকন্তু তিনি কয়েক জন পুলিসকে দোকানে প্রবেশ করিয়া পকেটে জিনিষ পূরিতে দেখিয়াছেন! ঢাকা জন-সমিতির প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত তাপসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসাক, অবসরপ্রাপ্ত পুলিস ইনস্পেক্টর রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কুমারী অনিন্দ্যবালা ও অমিয়বালা নন্দী প্রমুখ সম্ভ্রান্ত-ভদ্রবংশীয় নরনারীর সাক্ষ্যে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে আমরা কুমারী অনিন্দ্যবালা ও অমিয়বালার সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া পারিতেছি না। তাঁহারা ঢাকার কায়েত-টুলীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার নন্দীর কন্যা। তাঁহাদের ভ্রাতা ভবেশচন্দ্র ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্ডিনান্সের কবলে পতিত হইয়া পুলিসের দ্বারা স্থানান্তরিত হন। এই ভবেশচন্দ্রের ভয়ে পূর্ব্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় গুণ্ডারা কায়েতটুলীতে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই, এইরূপ শুনা যায়। ভবেশচন্দ্রের পিতাও ঘটনার সময় গৃহে ছিলেন না। গৃহে তখন কেবল কয়টি নারী ও প্রসন্ন বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। প্রায় ৩ শত মুসলমান গুণ্ডার আক্রমণ হইতে এই দুইটি অল্পবয়স্কা বালিকা প্রায় ৪৫ মিনিট-কাল গৃহকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এক জন মুসলমান গুণ্ডার লোষ্ট্রাঘাতে আহত ও অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে মুসলমানরা ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া অন্য গৃহ আক্রমণ করিতে চলিয়া যায় বলিয়া তাঁহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই বাঙ্গালী বালিকা দুইটি যে সাহস ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কেবল তাঁহারা পিতৃ-পিতামহের মুখ উজ্জ্বল করেন নাই, সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের সদৃষ্টান্ত বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অনুসৃত হউক, ইহাই কামনা। ইহাতে বাঙ্গালার নারীধর্ষণের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইতে পারে।

এই বালিকা দুইটির সাক্ষ্যেও পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

অবশ্য সাক্ষ্যের সকল কথাই যে সত্য, আমরা এমন কথা কখনও বলি না। সে বিচারের ভার কমিটীর উপর। এই হেতু আমরা বলিতেছি যে, কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা সমীচীন নহে।

গন্ধী টুপী ও খদ্দর আতঙ্ক

সঙ্কটকালে মস্তিষ্ক স্থির রাখা বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ রাজনীতিকের কর্ত্তব্য। উহা তাহার লক্ষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধুনা আমাদের দেশে কোন কোন প্রাদেশিক সরকার আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে এত অধিক বিচলিত হইয়াছেন যে, উহার দমনার্থে তাঁহারা মাঝে মাঝে এমন এক একটা উপায় অবলম্বন করিতেছেন, যাহাতে তাঁহাদের স্থিরমস্তিষ্কতায় সন্দেহ হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—

(১) শ্রীযুক্ত রামদাস পন্তলু মাদ্রাজ প্রাদেশিক যৌথ সমিতি-সমূহের প্রেসিডেণ্ট। তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রের মারফতে দেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়াছিলেন যে, খদ্দর ও সর্ব্ববিধ স্বদেশী প্রচারের জন্য রীতিমত চেষ্টা করা হইবে, এ বিষয়ে জনসাধারণের সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়। মাদ্রাজ সরকার ইহার উপরে কটাক্ষপাত করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া-ছেন বলিয়া এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিয়াছেন। ঘোষণাপত্রে বলা হইয়াছে, এই প্রকার কার্য্যের উদ্দেশ্য মূলতঃ দেশের আর্থিক সমস্যার সমাধান নহে, বরং ইহার উদ্দেশ্য রাজনীতিক এবং ইহার সহিত বর্ত্তমান আইন অমান্য আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইহা দ্বারা উক্ত আন্দোলনের মত সরকারকে ভয়প্রদর্শন করা হইয়াছে, যাহাতে সরকার জাতীয় দলের আবদার পূর্ণ করেন। এই হেতু সরকার এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদিগকে জানাইতেছেন যে, তাঁহারা যৌথসমিতির প্রেসিডেণ্টের এই

কার্য্য সমর্থন করিতে পারেন না এবং তাঁহাদের সাধ্যমত তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে বাধা প্রদান করিবেন।

ইহাতে কি বলা যায়? স্বদেশী প্রচার প্রত্যেক সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য। এ দেশে তাহার বিপরীত কেন? প্রত্যেক ঝোপে বাঘ দেখার মত সরকারের এই আতঙ্ক হাস্যকর!

(২) মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানীয় জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবার পরই বোর্ড-গৃহের উপর হইতে জাতীয় পতাকা নামাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে য়ুনিয়ন জ্যাক পতাকা উড়াইয়াছেন।

শোলাপুরে জাতীয় পতাকার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ দৈনিক পত্র-সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌএ এখনও জাতীয় পতাকার সম্পর্কে হাঙ্গামা চলিতেছে।

(৩) মাদ্রাজের গণ্টুর নামক স্থানের ম্যাজিষ্ট্রেট গন্ধী টুপী পরিধান করা বে-আইনী বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন।

(৪) ঢাকার সাবান-কারখানার মালিক জাপানী ভদ্রলোক মিঃ ট্যাকেডা গত ২৮শে মে তারিখে ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জে ভ্রমণকালে এক ষ্টেশনে দেখিয়াছিলেন, দুইটা য়ুরোপীয় তাঁহার ভৃত্যের মাথার গন্ধী টুপী ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, অধিকন্তু বলিয়াছিল, "গন্ধীরাজ এখনও আসে নাই।" এই য়ুরোপীয় দুইটা ঢাকার হাঙ্গামাকালে স্পেশাল কনষ্টেবল হইয়াছিল।

(৫) গত ১৬ই জুন তারিখে মাদ্রাজের রাজামাহিন্দ্রী সহরে পুলিসের এক জন ডেপুটী সুপারিণ্টেডেন্ট কয়েক জন গোরা সার্জ্জেণ্ট ও পাহারাওয়ালাকে লইয়া বাজারে লাঠির ও বেটনের বহর দেখাইয়া ও সিঁড়ি লাগাইয়া ঘরের ছাদ হইতে জাতীয় পতাকাগুলি টানিয়া ফেলিয়াছিল এবং পথে লোকের মাথা হইতে গন্ধীটুপী কাড়িয়া লইয়াছিল। ১৪৪ ধারা অনুসারে এই সহরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা বে-আইনী বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

এ দেশে জুতাতঙ্ক, ছাতাতঙ্ক প্রভৃতি অনেক আতঙ্কের কথা শুনা গিয়াছে। কিন্তু টুপী বা পতাকার আতঙ্ক এই নূতন। যে মনোভাবের ফলে জাতীয় পতাকা বা গন্ধী টুপীর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে, পতাকা ও টুপী কাড়িয়া ফেলিয়া দিলে সেই মনোভাবের উচ্ছেদ কিরূপে সম্ভবপর হইবে? নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ!

দেশপ্রেম

এক শ্রেণীর বিজাতি বিধর্ম্মী সমালোচক ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে কোন কিছু ভাল দেখিতে পান না, তাঁহাদের দৃষ্টিতে ইহার সবটাই রাজদ্রোহের বিষমাখা! লর্ড রদারমিয়ার বা লর্ড সিডেনহাম ও সার মাইকেল ওডয়ার শ্রেণীর লোক ভারতবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম বলিয়া জিনিষটার অস্তিত্বই খুঁজিয়া পান না। তাঁহাদের ধারণা, ভারতের মূক জনসাধারণ ঘুমাইতেছে। তাহাদের সহিত শিক্ষিত জনসাধারণের কোন সহানুভূতি বা ভাবের আদান-প্রদান নাই, তাহারা Pax Britannicaর আশ্রয়ে বাস করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে কাল কাটাইতেছে, তাহারা রাজনীতির ধার ধারে না।

এই শ্রেণীর সাম্রাজ্যগর্ব্বী ইংরাজ ভারতকে ইংরাজের খাস জমীদারী বলিয়া মনে করেন। লর্ড রদারমিয়ার বিলাতের 'ডেলি মেল' পত্রে এক প্রবন্ধে ভারতের কথাপ্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কয়েকটি রত্ন উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

(1) The evacuation of India would be the end of Britain as a Great Power.

(2) The loss of India would bring immediate economic ruin to this country (England).

(3) Instead of close upon two millions unemployed we should have four or five.

(4) India—the largest consumer of British goods. India—our best market.

(5) At least four shillings in the pound of the income of every man and woman in Great Britain is drawn directly or indirectly from India.

(6) To amputate India from Britain would have the same paralysing effect as the loss of the Austrian provinces has had upon Vienna.

(7) The grant of Home Rule, for which the Indian Nationalists are clamouring, would mean the immediate transfer to India control over her relations with foreign countries .... the entry of British goods into India would be barred by a prohibitive Tariff.

(8) India is our all in all.

কিন্তু সকল ইংরাজই এই ভাবের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দৃষ্টিতে ভারতকে অথবা ভারতীয় জাতীয় দলের দেশপ্রেমকে দেখেন না। ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন বলিয়াছিলেন, "আমরা বৃটিশ বন্দুক-বেয়নেটের দ্বারা—ভারতীয় কৃষককে এক পয়সার বিলাতী

পণ্য ক্রয় করাইতে পারি না, উহা তাহাদের ইচ্ছাধীন।" মিঃ বেন ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনে ভারতবাসীর প্রবল দেশ-প্রেমের ও আত্মানুভূতির পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি এই আন্দোলনকে রাজনীতিক আন্দোলনকারীর চালবাজী বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই এবং ভারতকে বিলাতের বেকার পুষিবার জমীদারী বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই।

সে দিন য়ুরোপীয় এসোসিয়েশনের সভায় সাইমন রিপোর্ট সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া মিঃ চ্যাপম্যান মর্টিমার বলিয়াছেন,—

"Another side of the Indian picture is the passionate Nationalism which has acquired a tremendous hold over all sections of the people; for it would be idle to delude ourselves into thinking that some Indians are Swarajists and some are not. Every Indian at heart is a Swarajist; where they differ in thier ideas is as to what Swaraj means."

মিঃ উইলিয়াম গ্রেহাম বৃটেনের বাণিজ্য-সচিব। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী গ্রেহাম বৃটিশ নারী-বৈঠকের সভানেত্রীরূপে বলিয়াছেন,—

আমরা স্বীকার করি, ভারতের মুক্তি ভারতেই সাধিত হইবে। বর্ত্তমানে ভারতবাসী জাগিয়াছে—মুক্তির জন্য দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। অথচ আমরা ইংলণ্ডের নারীরা ভারতবাসীর এই মুক্তি-সাধনার কথা কিছুতেই শুনিতে পাই না। যাহা শুনি, তাহা আমাদের শাসনের সম্বন্ধে সুখ্যাতির কথায় পূর্ণ। আমাদের সাইমন রিপোর্টও এই শ্রেণীর সুখ্যাতিপত্র! আমরা ইংলণ্ডের নারীরা এখন হইতে ভারতের মুক্তি ও সমানের আসন লাভে আমাদের সমস্ত প্রভাবের ভার নিযুক্ত করিব। আমরা যদি এইরূপ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা ভারতের বন্ধুত্বলাভে সমর্থ হইব। আমাদের জাতীয় জীবনে নারীর অংশ বড় সামান্য নহে। ইহার জন্য আমাদের দায়িত্বও গুরু। এই হেতু যাহাতে ভারতের প্রতি আপোষ-রফার নীতি অবলম্বিত হয় এবং ভারতকে আমাদের সমান আসন দেওয়া হয়, আমাদের সেইরূপ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের উপর চাপ দেওয়া উচিত।

সকলেই যে সত্যাগ্রহীদের মাথা ফাটিতে দেখিলে ও ভারতের উপর আমলাতন্ত্র-পাষাণ-চাপ দৃঢ়ভাবে কাটিয়া বসিলে সন্তুষ্ট হন, তাহা নহে। দুই চারি জন ধর্ম্মভীরু সত্যবাদী ইংরাজ নরনারীও আছেন। সংখ্যায় তাঁহারা এখন অল্প, এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব সমাজের উপর সামান্য নহে।

কথা ও কায

কথা ও কাযের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা বড়ই দুষ্কর। আধুনিক রাজনীতিকগণ এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা গুরু অপরাধী বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা প্রকাশ্যে গুরুগম্ভীরভাবে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেন অথবা কথা ঘোষণা করেন, তাহার মধ্যে কয়টা কার্য্যে পরিণত হয়?

সাম্রাজ্যিক সাংবাদিক বৈঠকে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড এমন সব কথা বলিয়াছেন, যাহার মূল্য সমধিক, অথচ ভারতশাসন ব্যাপারের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে সে সমস্ত কথার অনুরূপ কার্য্যের লক্ষণ সুপ্রকাশ হইতে দেখা যায় না।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের দুই একটি মূল্যবান্ কথা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "জাতীয় স্বাধীনতার সহিত কমনওয়েলথের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বাধ্যবাধকতার সামঞ্জস্যবিধান করাই এখন সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রধান সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

সত্যই কি এই সমস্যাসমাধান করা এত কঠিন? কেন কঠিন, তাহা মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের আর একটি কথায় সুস্পষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "পরকে শাসন করিবার যে প্রবল স্পৃহা সাম্রাজ্যবাদীর মনে অনুক্ষণ জাগরূক থাকে, তাহার সহিত কমনওয়েলথের পাঁচ জন সদস্যের মধ্যে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবার প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য ঘটান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহাই এখন প্রধান সমস্যা।"

সত্যই তাই; মিঃ ম্যাকডোনাল্ড আপনার কথায় আপনারই ভ্রমপ্রমাদ ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করিয়াছেন। এই Imperious অথবা Imperial spirit of rule অথবা সাম্রাজ্যবাদীর পরকে শাসন করিবার প্রবল স্পৃহাই কি সমস্যার সুসমাধানের পক্ষে প্রবল অন্তরায় নহে? মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের মত গণতন্ত্র-বাদী শ্রমিক রাজনীতিকের পক্ষে এই সাম্রাজ্যবাদীর প্রবৃত্তি বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করা কি কর্ত্তব্য নহে?

এ যাবৎ বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যস্থ যে সকল উপনিবেশ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, কোন ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য-বাদী তাহার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে নাই, উপনিবেশ-সমূহ জোর করিয়া তাহাদের অধিকার আদায় করিয়া লইয়াছে। কানাডা, দক্ষিণ-আফরিকা, আয়ার্ল্যাণ্ড ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতকেও যে 'জোর করিয়া' এই অধিকার আদায় করিয়া লইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সেই 'জোর' অবশ্য হিংসামূলক নহে,

উহা অহিংসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যখনই শুনা যায়, বলডুইন, লয়েড জর্জ্জ, চার্চ্চিল, রদারমিয়ার, সিডেনহাম, লয়েড ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিবে, তখনই হাসি পায়। যখনই শুনি, মহাত্মা গন্ধী ও তাঁহার সত্যাগ্রহী মন্ত্রশিষ্যরা তাঁহাদের গৃহীত ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করিলেই অমনই গোল-টেবল বৈঠকে সমস্তার সমাধান হইয়া যাইবে, তখনই মন সংশয়াচ্ছন্ন হয়। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কারণ কথা ও কাযে সামঞ্জস্যের অভাব। এ ক্ষেত্রে চাই 'হৃদয়ের পরিবর্ত্তন', 'দৃষ্টির গতির পরিবর্ত্তন।' সাম্রাজ্যবাদীর শাসনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে না পারিলে অবস্থার পরিবর্ত্তন অসম্ভব হইবে।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড যখন শাসনপাটে বসেন নাই, তখন তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ এক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন,—"ভারতের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট শক্তিশালী জনমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া টিকিতে পারে না। ভারত সরকারের মনে সদিচ্ছা থাকিতে পারে, কিন্তু সেই সরকার কখনও জনমত মানিয়া (obedient) চলিতে পারে না। জনসাধারণ যদি স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া আন্দোলন করে, তাহা হইলে সরকার সাধ্যমত তাহাতে বাধা প্রদান করিবেনই। এই স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে যতক্ষণ বক্তৃতা ও তর্কবিতর্ক চলিয়া থাকে, ততক্ষণ সরকার তাহাতে উদ্বিগ্ন হন না. কিন্তু আন্দোলন, বক্তৃতা ও তর্ক-বিতর্কের কোঠা ছাড়াইয়া গেলেই রাজদ্রোহরূপে গণ্য হইবে।"

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড যখন এ কথা লিখিয়াছিলেন, তখন মনেও ভাবেন নাই যে, এক দিন এই কথাগুলি তাঁহারই শ্রমিক সরকারের প্রতি প্রযোজ্য হইবে। বর্ত্তমানে ভারতে কি এই অবস্থার উদ্ভব হয় নাই এবং ম্যাকডোনাল্ডের সরকার কি সাধ্যমত বাধা প্রদান করিতেছেন না? ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড শ্রমিক দলপতি হইয়াও—গণতন্ত্রবাদী হইয়াও অন্তরে সাম্রাজ্যবাদী। ইংরাজ রাজনীতিক রক্ষণশীলই হউক, উদারনীতিকই হউক বা শ্রমিকই হউক, প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে তাহারা সকলেই সাম্রাজ্যবাদী। এই জন্যই মিঃ ওয়েজউড বেন মুখে "Force is no remedy" বলিলেও কার্য্যে সাম্রাজ্য-বাদীরই মত বলপ্রকাশের দ্বারা ভারতীয় আন্দোলন দমনের চেষ্টা করিতেছেন!

তবে কথা ও কাযে সামঞ্জস্য হইতে পারে—যদি শ্রমিক সরকার সাম্রাজ্যবাদীর প্রবল প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন। 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রের বিশিষ্ট সংবাদদাতা মিঃ স্লোকোম্বের মারফতে মহাত্মা গন্ধী জেল হইতে এবং পণ্ডিত মতিলাল জেলের বাহির হইতে যে শান্তির প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা যদি শ্রমিক সরকার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ভারত মুহূর্ত্তে শান্ত হইবে। বেশী কিছু নহে, 'স্বাধীনতার কায়া',—এইটুকুর প্রতিশ্রুতি দান এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্বোধনযজ্ঞ আরম্ভ হইলেই ভারতে ও বিলাতে বন্ধুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কথাটা বৃটিশ রাজনীতিকরা ভাবিয়া দেখিলে পারেন।

মহাত্মা গন্ধী

মহাত্মা গন্ধীকে বৃটিশ সরকার ভারতে আইন ও শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী এবং অশান্তি-উপদ্রবের মূল কারণ বলিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছেন। এক হিসাবে তিনি নিশ্চিতই আইন-ভঙ্গকারী। কেন না, তিনিই আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবর্ত্তয়িতা ও নেতা, ভারতে তিনিই প্রথমে সরকারের আইন ভঙ্গ করিয়া জনগণকে আইন ভঙ্গ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাব এত বিরাট ও এত দূরবিসারী যে, আজ ভারতের দিকে দিকে

মহাত্মা গন্ধী

জনগণ আইনভঙ্গ করিতেছে এবং হাসিমুখে কারাবরণ করিতেছে। ইহার অপেক্ষা আরও লক্ষ্য করিবার এই যে, লোক আইন ভঙ্গ করিয়া অম্লানবদনে পুলিসের লাঠি ও বেটন মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেছে, দলে দলে আহত হইতেছে, আবার দলে দলে লাঠি ও বেটন গ্রহণ করিতে সাগ্রহে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতেও মহাত্মা গন্ধীর অহিংসা মন্ত্রের প্রভাব সুপরিব্যক্ত।

পদ্মরাজ জৈন

এই প্রভাব এত দূর দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, মহাত্মা গন্ধীর মন্ত্রে দীক্ষিত সত্যাগ্রহী আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছে না, বিনা আপত্তিতে জেলে যাইতেছে। ইংরাজের আইনে আছে, পুলিসের সাক্ষ্য অন্ত প্রমাণ অভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু সত্যাগ্রহীর বিচারে পুলিসের সাক্ষ্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেছে; কেন না, সেই সাক্ষ্যের বিপক্ষেও সত্যাগ্রহীরা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছে না। এই ত্যাগস্বীকার বড় সামান্ত নহে। কিন্তু ত্যাগস্বীকার করিলেও ত্যাগীরা আইনভঙ্গ অপরাধে অপরাধী, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মহাত্মা গন্ধীর প্রভাব এত অসাধারণ যে, কোমলমতি কিশোর সত্যাগ্রহী প্রকাশ্য আদালতে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতেছে,—আমার নাম সত্যাগ্রহী, মহাত্মা গন্ধী আমার পিতা, সত্যাগ্রহ আমার পেশা! ভারতের অতীত ইতিহাসে ইহার তুলনা খুঁজিয়া পাই না। আর এক দিক দিয়া মহাত্মা গন্ধীর প্রভাব পূর্ণমূর্ত্তিতে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের দিকে দিকে নারীজাগরণের যে সাড়া পাওয়া যাইতেছে, তাহারও তুলনা অতীত ইতিহাসে নাই। অসূর্য্যম্পশ্যা পুরনারী এখন আর কক্ষপ্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছেন না, তাঁহারাও পরম উৎসাহে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিতে ঘরের বাহিরে পদার্পণ করিতেছেন। এখন সহরে মফঃস্বলে সর্ব্বত্র নারীদিগের জাতীয় পতাকা হস্তে শোভাযাত্রা, সভা, পিকেটিং, আইনভঙ্গকরণ এবং কারাবরণ ত নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। জাতির জননী, ভগিনী, জায়া, কন্যা,—সবাই মহাত্মার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত, এ দৃশ্য ত কখনও দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয় নাই! ধরসানায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং বোম্বাইএ শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় যে দিন হইতে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, সেই দিন হইতে দেশে নারীশক্তি জাগ্রত হইয়াছে। বাঙ্গালায় শ্রীমতী ইন্দুমতী গোয়েঙ্কার গ্রেপ্তার ও জেলের পর হইতে শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী, কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ঘরের নারীরা হাসিমুখে কারাবরণ করিতেছেন।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ রেড্ডি গত ১৫ই জুন তারিখে পুনায় ভারতীয় নারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কনভোকেশনে "মহাত্মা গন্ধী ও বর্ত্তমান নারীজাগরণ সম্বন্ধে" বলিয়াছেন :—

শ্রীমতী ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা

"সামাজিক এবং রাজনীতিক অনাচারের কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অহিংস যুদ্ধের প্রবর্ত্তন ইতিহাসে নূতন। এই যুদ্ধ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক। ইহার তুলনা জগতে নাই।"

মহাত্মা গন্ধীর আন্দোলন অভিনব, এ কথা শাসকজাতিও অস্বীকার করিবেন না। তাঁহারা এই আন্দোলনের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, কেন না, তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্নমুখ। তাঁহারা বস্তুতন্ত্র লইয়া নাড়া-চাড়া করেন, এই সূক্ষ্ম আত্মিক যুদ্ধের সত্য বুঝিবেন কিরূপে?

ডাক্তার রবার্ট ব্রিজেস (ইংলণ্ডের রাজকবি) লিখিয়া গিয়াছেন যে, বর্ত্তমান আইন ভঙ্গ করিয়া উচ্চাঙ্গের জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করার অধিকার একমাত্র বিচারশক্তিসম্পন্ন মানুষেরই আছে, অন্য জীবের নাই। মহাত্মা গন্ধী যে উচ্চাঙ্গের জীবনের আস্বাদ পাইবার উদ্দেশে আইন ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহা বস্তুতান্ত্রিক রাজকর্ম্মচারী বুঝিবেন না। তিনি যে রবার্ট ব্রিজেসের অপেক্ষা আরও উচ্চ নৈতিক জগতে বিচরণ করিতেছেন, তাহাও তাঁহারা ধারণা করিতে পারিবেন না। মহাত্মা গন্ধী রবার্ট ব্রিজেসের আইনভঙ্গের সহিত অহিংসা কথাটা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে উহা কত মহান্, কত উচ্চ হইয়াছে!

সমস্ত ইতিহাসের নজীর নাকচ করিয়া মহাত্মা গন্ধী ভারতের রুদ্ধ নারীশক্তির এরূপ আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছেন, যাহা অলৌকিক ঘটনা (miracle) বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে।

"আমরা মহাত্মা গন্ধীর মতামত সমর্থন করি বা না করি, তাহাতে আসিয়া যায় না; কিন্তু জাতীয় চরিত্রগঠনের দিক হইতে দেখিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাত্মা গন্ধী আমাদের জাতীয় চরিত্রে যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন এবং জাতীয় চরিত্রকে যে ভাবে অল্পসময়ের মধ্যে উন্নীত করিয়াছেন, তাহা বহুকাল ধরিয়াও আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ শিক্ষাদান করিয়া করিতে পারেন নাই।

"অতীতে আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা বক্তৃতা, তর্ক ও আবেদন-নিবেদন লইয়া থাকিতেন। মহাত্মা গন্ধীর আদর্শ ভিন্নরূপ। এখন রাজনীতি জনগণের মধ্যে বিস্তৃত এবং তর্ক এখন কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া বুঝাইতেছি। মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের বিখ্যাত পত্র "New York World" লিখিয়াছেন :—

"It would be difficult to imagine a more tragic dilemma than that which India now presents to the Macdonald Government. The resistance to British authority led by Gandhi is of a kind with which the Western mind is peculiary unfit to deal. Were Gandhi leading an armed insurrection, were he attempting to seize the power of Government, there would be ample precedents as to how to meet him. But Gandhi, renouncing the weapons of war has made it infinitely difficult for the British to use those weapons. In so far as he has rmed his own followers he has in a very

large degree morally disarmed the British. It is impossible to strike hard and with conviction at men who refuse to either to parry the blow or to return it. While the descipline and courage hold out, the followers of Gandhi cannot be successfully coerced."

এইখানেই সমস্যা। মহাত্মা গন্ধী উচ্চাঙ্গের জীবনের আস্বাদ গ্রহণের জন্য আইন ভঙ্গ করিয়াছেন। বস্তুতান্ত্রিক ইংরাজ শাসকের পক্ষে উহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। তাই মহাত্মা গন্ধীকে বর্ত্তমান অশান্তি-উপদ্রবের মূল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, মানুষ আইনের জন্য তৈয়ার হয় নাই। মহাত্মা গন্ধীর সম্বন্ধেও খৃষ্টের এ কথাটা শাসকজাতির ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ইংরাজদের মধ্যে কোয়েকাররা কিরূপ সত্যাগ্রহী ও ধর্ম্মভীরু, তাহা ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন। মিঃ রেজিনাল্ড রোনাল্ডস এই কোয়েকার-বংশীয় যুবক। তিনি কয়েক মাস মহাত্মা গন্ধীর আশ্রমে বসবাস করিয়া তাঁহার মধুর চরিত্রে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি মহাত্মাকে গুরুর ন্যায়,—পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তিনি তাঁহাকে true, noble, generous soul বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার judgment, courage,

শ্রীমতী মোহিনী দেবী

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী

হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মহাত্মার মত বন্ধু বৃটিশ সাম্রাজ্যের ও জাতির নাই—তিনি হিংসামূলক সশস্ত্র বিদ্রোহবাদী অথবা গুপ্ত চক্রান্তকারী বিপ্লববাদীর এবং বৃটিশ শক্তির মধ্যে বিরাট ব্যবধান-স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহার মত বন্ধুর সহিত সন্ধি করিলে ইংরাজের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই।

ইহা কি কল্পনাও করা যায়, মহাত্মা গন্ধী 'ঝড়ের পাখী' হইলে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বা আব্বাস তায়েবজীর মত নরনারী তাঁহাকে আদর্শপুরুষ জ্ঞানে অনুসরণ করিতেন, এবং আইনভঙ্গ করিয়া জেলে যাইতেন ?

যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন, "আইন" মানুষের জন্য তৈয়ার

integrity র কথায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। কুমারী শ্লেড বা মীরা সম্ভ্রান্ত ইংরাজকন্যা,—তিনিও তাঁহার গুণমুগ্ধ। যে মানুষের চরিত্রগুণ এত অধিক, তিনি কি কাহারও শত্রু হইতে পারেন—বিশেষতঃ তিনি যখন কায়মনোবাক্যে অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ?

—

মিলনের আশা

অভিনয়ে climax কথাটা ব্যবহৃত হয়। মানুষের সামাজিক বা রাজনীতিক জীবনেও এক একটা সময় আসে, তাহাকে climax বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনে

এইরূপ একটা climax অথবা চরম অবস্থা আসিয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। কেন না, প্রজাপক্ষ আইনের ভয় পরিত্যাগ করিয়াছে, আইন ভঙ্গ করিতেছে, এবং দ্বিধাবোধ না করিয়া—আত্মপক্ষসমর্থন না করিয়া দণ্ড গ্রহণ করিতেছে। সরকার পক্ষও অর্ডিনান্স, মার্শাল ল, ১৪৪ ইত্যাদি ধর্ষণমূলক নীতি অবলম্বন করিয়া দেশ শাসন করিতেছেন। কেহই নরম হইতেছেন না। উভয়েই আপন আপন নীতি পরিহার করিতে চাহিতেছেন না। ফলে দেশের হাওয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। অবস্থা এমনই সঙ্কটসঙ্কুল যে, ব্যবসায়ী মহাজনরাও ব্যবসায়ের ক্ষতি সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যোগদান বা সাহায্য দান করিতেছেন।

যখন অবস্থা চরমে চড়িয়াছিল এবং দেশের হাওয়া এইরূপ আগুন হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে প্রকাশ পায় যে, বড়লাট লর্ড আরউইন ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনের দিনে আর একটি ঘোষণা করিবেন। ঠিক সেই সময়েই বিলাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডও পার্লামেণ্টে একটি ঘোষণা করিবেন। উভয় ঘোষণাই করা হইবে ভারতের ভবিষ্যৎসম্পর্কে—গোল-টেবল বৈঠক-সম্পর্কে। ঠিক কি ভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে ঘোষণা করা হইবে, তাহা প্রকাশ না পাইলেও অনেকে আশা করিয়াছিল যে, কি ভাবের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে, কবে দেওয়া হইবে, সেই সম্বন্ধে বৈঠকে পরামর্শ হইবে, আর এই পরামর্শ-সভায় ভারতের সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করা হইবে; এতদর্থে যে সকল রাজনৈতিক বন্দী হিংসামূলক অপরাধ করে নাই, কেবল তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং মুক্তি পাইয়া মহাত্মা গন্ধী প্রমুখ জাতীয় নেতৃবর্গ গোল-টেবলে যোগদান করিতে যাইবেন, সরকার অর্ডিনান্স আদি ধর্ষণনীতিমূলক আইন উঠাইয়া লইবেন।

এ সংবাদে লোকের আশান্বিত হইবার কথা। কিন্তু আশা সফল হয় নাই। বিলাত হইতে কোন ঘোষণার সংবাদই আসে নাই। শুনা যায়, প্রধান মন্ত্রী লেবর গভর্ণমেণ্টের পরাজয়ের আশঙ্কায় কোন ঘোষণা করেন নাই। তাঁহার সহিত টোরী দলপতির এবং লিবারল দলপতির গুপ্ত পরামর্শ হইয়াছিল—সে পরামর্শ-সভায় লর্ড রেডিংও উপস্থিত ছিলেন। শুনা যায়, লর্ড রেডিংই কোনরূপ উদার ঘোষণা গোল-টেবলের পূর্ব্বে করিবার বিষম বিরুদ্ধ ছিলেন। মিঃ বলড্‌ইন ও মিঃ লয়েড জর্জ্জের নিকট কোনরূপ সমর্থনের আশা না পাইয়া মিঃ ম্যাকডোনাল্ড কোন ঘোষণা করিতে সাহসী হন নাই। লর্ড বার্কেণহেড ত স্পষ্টই হুকুম দিয়াছেন যে, সাইমন রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া যেন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ গোল-টেবলে সলাপরামর্শ করেন।

বড়লাট ব্যবস্থা-পরিষদে যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে আপোষের বা মিলনের আশা অন্তর্হিত হইয়াছে। তাঁহার ঘোষণার মোটামুটি এই কয়টি কথা লক্ষ্য করিবার আছে :—

(১) যে গোল-টেবল বৈঠক বসিবে, তাহা কোনও রূপ বাধা বা বিধিনিষেধ দ্বারা ভারাক্রান্ত না হইয়া ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে বিচার-আলোচনা ও পরীক্ষা করিতে পারিবে।

(২) এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত যে কেবল বিচারবিতর্কেই পর্য্যবসিত হইবে, তাহা নহে।

(৩) এ যাবৎ কতক পরিমাণ ভারতবাসী যে ভাবেই ব্যবহার করিয়া থাকুন না, সরকার তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগকে গোল-টেবল বৈঠকে মিলিত হইতে আহ্বান করিতেছেন এবং সকলকেই ভারতের ভবিষ্যৎগঠন-কার্য্যে সহায়তা করিতে বলিতেছেন।

(৪) ভারতের জাতীয়তা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার গতিও অত্যন্ত দ্রুত। এই ক্রমোন্নতি বৃটিশ শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজনীতিক সংস্রব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাকে অবহেলা করা চলে না। যাঁহারা ইহার প্রভাবকে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা ধারণ করেন না। ভারতবাসীরা বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিতে চাহে, কিন্তু নিকৃষ্টরূপে নহে, সমানে সমানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া। এই কথাটা ভাবিয়া বৃটিশ জাতিকে ভারতের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে।

(৫) সাইমন রিপোর্টখানিকে অগ্রাহ্য করা হইবে না, অন্যান্য রিপোর্ট বা পরামর্শ উপদেশের মত ইহার কথাও বিচার করা হইবে।

(৬) বৈঠকে বৃটেন ও ভারতের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকিয়া স্বাধীনভাবে যে সকল পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, তাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টের সকাশে নিবেদন করিবেন।

(৭) আইন অমান্য আন্দোলন দেশের অনিষ্টকারক ও উন্নতির হন্তারক। ইহার দ্বারা জনসাধারণকে আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের আইন ভঙ্গ করিতে এবং সরকারকে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করিতে শিখান হইতেছে। এই হেতু এই আন্দোলনকে আইনবিরুদ্ধ এবং সমাজের শৃঙ্খলাভঙ্গকারী ভয়ঙ্কর শত্রু বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। যত দিন আন্দোলনের নেতারা এই আন্দোলন তুলিয়া না লইবেন, তত দিন অহিংস রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করা হইবে না অথবা ধর্ষণনীতিমূলক আইন উঠাইয়া লওয়া হইবে না।

(৮) দুইটি পথ আছে;—মিলনের পথ, ধ্বংসের পথ।

বড় লাট আশা করেন, ভারতবর্ষ প্রথমোক্ত পথ গ্রহণ করিয়া গ্রেট বৃটেন ও ভারতের মধ্যে চিরসৌহার্দ্দ প্রতিষ্ঠিত করিবে।

ইহার মধ্যে কোথাও এমন কথা নাই—যাহাতে গোলটেবলে ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন কি প্রকৃতির হইবে, তাহা স্থির হইবে বলিয়া বুঝা যায়। অর্থাৎ মহাত্মা গন্ধী 'ডেলি মেলের' প্রতিনিধি মিঃ শ্লোকোম্বের নিকট যে "স্বাধীনতার কায়া" চাহিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা এই ঘোষণায় নাই। এই সর্ত্তে মহাত্মা গন্ধী ও কংগ্রেসের গোল-টেবলে যাওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আইন অমান্য আন্দোলন না উঠিয়া গেলে রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে গোল-টেবলে কংগ্রেসকর্ম্মী বা মহাত্মা গন্ধী যোগ দিবেন কিরূপে?

আসল ব্যথা যেখানে, সেখানে হাত পড়ে নাই। যাহাদের সহিত আপোষ কথা কহিলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহারা জেলে থাকিতে আর কাহারও সহিত গোল-টেবলে পরামর্শ করিয়া ভারত-সমস্যার সমাধান হইবে না।

ব্যারিষ্টারের লোকান্তর

গত ১৫ই জুন রবিবার কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। উকীল-ব্যারিষ্টার অনেক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও লোকান্তর হইতেছে, কিন্তু কয় জন তাহার সন্ধান রাখা প্রয়োজন মনে করে? কিন্তু বটকৃষ্ণের মধ্যে এমন একটা জিনিষ ছিল, যে জন্য হাইকোর্টের বিচারপতি ও ব্যবহারাজীব মণ্ডলে তাঁহার অভাব অনুভূত হইতেছে এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তনে হাইকোর্ট মুখরিত হইয়াছে।

বটকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, নানা পদক ও পারিতোষিক লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি অতঃপর ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। বলিতে গেলে অধুনা মাত্র ২।৩ জন ছাড়া হাইকোর্টে তাঁহার মত আইনজ্ঞানসম্পন্ন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ ব্যবহারাজীব ছিল কি না সন্দেহ। সাধু, সরল, পণ্ডিত, নিষ্কলঙ্কচরিত্র ব্যারিষ্টার বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞান যেমন অসাধারণ অথচ গুপ্ত ছিল, তিনি যেমন বিদ্যার পরিচয় জাহির করিতে ভালবাসিতেন না, তেমনই তাঁহার অন্তরের দয়াদাক্ষিণ্যের মাধুর্য্যও গুপ্ত থাকিত। কলিকাতায় এমন কোন দাতব্য অনুষ্ঠান ছিল না, যেখানে তাঁহার গুপ্ত দান প্রেরিত হইত না। যাদবপুরের যক্ষ্মারোগাশ্রমে তিনি তাঁহার হৃদয়ের শক্তি নিযুক্ত করিয়া উহার উন্নতিবিধানে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর কলেজ ও মেট্রোপলিটান

স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ ঘোষ

ইন্‌ষ্টিটিউসনের অন্যতম পরিচালকরূপে এই দুইটি প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বহু উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি রামমোহন লাইব্রেরীর কার্য্যকরী সমিতির এক জন সদস্য ছিলেন।

মৃত্যু অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে উন্নতির মুখে তিনি আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া এক দিনমাত্র রোগ ভোগ করিয়া পরলোক-প্রয়াণ করিয়াছেন।

আজ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব, ভাবিয়া পাই না। ভগবান্ তাঁহাদিগের মনে শান্তি দিন।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মিলন-পূর্ণিমা

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীমনীষা দে ।

৯ম বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৭ [৪র্থ সংখ্যা

পারমার্থিক রস

১০

শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে প্রধানভাবে পুরাণ-শাস্ত্রকেই অবলম্বন করিতে হয়, ইহাই আস্তিক-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। জড়, জীব ও পরমেশ্বর এই ত্রিবিধ বস্তুর মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদই যে শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ, তাহা অতি স্পষ্ট-ভাবেই পুরাণশাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়া থাকে; এই প্রসঙ্গে তাহাই দেখান হইতেছে।

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে লিখিত হইয়াছে—

"বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।
ইতিহাসপুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুবা॥
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥"

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি বেদের ন্যায় পুরাণের অর্থকে প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া থাকি। সকল বেদই পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। অল্পবিদ্য লোক হইতে 'এ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে' এই ভাবিয়া বেদ ভীত হইয়া থাকে, ইতিহাস ও পুরাণসমূহের দ্বারা বেদের প্রামাণ্য দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, বেদ-সমূহে যাহা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয় না, তাহা স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহে স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। বেদে ও স্মৃতিতে যাহা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয় নাই, তাহা সকলই পুরাণসমূহের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥"

হে বরাননে! আমি পুরাণার্থকে বেদার্থ হইতেও অধিক বলিয়া মানিয়া থাকি, সকল বেদ পুরাণের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা যখন স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় না, তখন পুরাণের সাহায্যই সর্ব্বাগ্রে অবলম্বনীয়। ইহাই হইল অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত শিষ্ট-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। নব নব উদ্ভাবিত যুক্তি দ্বারা সন্দিগ্ধার্থ—বেদের তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত কি দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা মতের দ্বারা বেদের প্রকৃত অর্থবিষয়ে বহু স্থলেই শিষ্টজনগণের বুদ্ধিকে আকুল করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত ঐকান্তিক ভক্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কিন্তু শ্রীভগবত্তত্ত্ববিষয়ে প্রমাণস্বরূপ বেদবচন-সমূহের তাৎপর্য্য কি, তাহার নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া পুরাণশাস্ত্রেরই সাহায্য প্রধানভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই হইল গৌড়ীয়

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়ে অধিক অনুসন্ধানে যাঁহার প্রবৃত্তি আছে, তিনি শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর ভাগবত-সন্দর্ভনামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের তত্ত্বসন্দর্ভাংশের পর্য্যালোচনা করিবেন।

শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই যে পুরাণশাস্ত্রানুমোদিত, সে বিষয়ে কোন বিবেচক ব্যক্তির মতদ্বৈধ হইতে পারে না, তাহাই এক্ষণে দেখান যাইতেছে।

পরমেশ্বর সগুণ কি নির্গুণ? সগুণ হইলে নির্গুণ শ্রুতির প্রামাণ্য থাকে না, আবার নির্গুণ হইলে সগুণ শ্রুতি বাধিত হয়, এই প্রকার সংশয় নিরাকরণের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ নির্গুণ শ্রুতি-সমূহের পারমার্থিক প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। অন্য দিকে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সগুণ শ্রুতি-সমূহের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই; কিন্তু এ বিষয়ে পুরাণশাস্ত্র অতি স্পষ্টভাবে কিরূপ সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছে, তাহার প্রতি দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী কোন আচার্য্যই আস্থা স্থাপন করেন নাই।

বিষ্ণুপুরাণে এই সংশয়ের নিরাকরণার্থ কি উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে॥"

মৈত্রেয় প্রশ্ন করিলেন, যিনি নির্গুণ সুতরাং সকল প্রকার প্রমাণের অবিষয়, যিনি শুদ্ধ ও অমলস্বভাব, সেই ব্রহ্মের (সগুণ ধর্ম্ম) যে সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের কর্তৃত্ব, তাহা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি পরাশর বলিলেন—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।"

এই সংসারে মণি, মন্ত্র ও মহৌষধি প্রভৃতি বস্তুতে যে সকল শক্তি আছে, তাহা সকলই যুক্তিবিরুদ্ধ অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানে। এই কারণেই নির্গুণ ও অপ্রমেয় ব্রহ্মেও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অনুকূল স্বাভাবিক শক্তিসমূহ আছে, ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। বহ্নিতে উষ্ণতা যেমন স্বাভাবিক, এই শক্তি-সমূহও সেইরূপ স্বাভাবিকই জানিতে হইবে।

উল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণ-বচনের ব্যাখ্যা শ্রীধরস্বামী এইরূপ করিয়াছেন—

"তদেবং ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বমুক্তং, তত্র শঙ্কতে নির্গুণস্যেতি। সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য, 'অপ্রমেয়স্য' দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নস্য 'শুদ্ধস্য' অদেহস্য সহকারিশূন্যস্য ইতি বা, 'অমলাত্মনঃ' পুণ্যপাপসংস্কারশূন্যস্য, রাগাদিশূন্যস্য ইতি বা। এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বমিষ্যতে, এতদ্বিলক্ষণস্যৈব লোকে ঘটাদিষু কর্তৃত্বদর্শনাদিত্যর্থঃ। পরিহরতি শক্তয় ইতি সার্দ্ধেন। লোকে হি সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ, অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্‌জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্বা অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবং অতো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ শক্তয়ঃ সর্গাদিহেতুভূতা ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবভূতাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ। অতো গুণাদিহীনস্যাপি অচিন্ত্যশক্তিমত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনং তু মহেশ্বরম্"।

যদ্বা ইয়ং যোজনা সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্য উষ্ণতাদিশক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইতি শ্রুতেঃ। অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্নৌষ্ণ্যবন্ন কেনচিদ্ বিহন্তুং শক্যন্তে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশমৈশ্বর্য্যম্। তথাচ শ্রুতিঃ—

"স বা অয়মস্য সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ। ইত্যাদি। যত এবং অতো ব্রহ্মণো হেতোঃ সর্গাদ্যা ভবন্তি, নাত্র কাচিদনুপপত্তিঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এইপ্রকারে ব্রহ্মের যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্তৃত্ব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে শঙ্কা করা হইতেছে—"নির্গুণস্য" (ইত্যাদি শ্লোকটির দ্বারা); নির্গুণ শব্দের অর্থ সত্ত্বাদিগুণরহিত, অপ্রমেয় শব্দের অর্থ দেশ ও

কাল প্রভৃতির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ শব্দের অর্থ অশরীরী অথবা সহকারিরহিত, অমলাত্ম এই শব্দটির অর্থ পুণ্য ও পাপরূপ সংস্কারশূন্য অথবা রাগদ্বেষাদি-দোষরহিত, এইরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহার সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ত্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভবপর? এইপ্রকার যাহার স্বভাব নহে, লোকে ঘট প্রভৃতি কার্য্যের সৃষ্টি প্রভৃতির কর্ত্তৃত্ব সেই ব্যক্তিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইপ্রকার শঙ্কার নিরাকরণ করিবার জন্য "শক্তয়ঃ" ইত্যাদি সার্দ্ধশ্লোকটি রচিত হইয়াছে, (এই উত্তরবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে) লোকে মণিমন্ত্র প্রভৃতি বস্তুর যে সকল শক্তি প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর; অচিন্ত্য শব্দের অর্থ যাহা যুক্তিসহ নহে অর্থাৎ 'ইহা স্বীকার না করিলে অন্য কোন প্রকারেই এইরূপ কার্য্য হইতে পারে না,' এইরূপ যে অর্থাপত্তি-প্রমাণ, তাহা দ্বারা উৎপন্ন হয় যে জ্ঞান, তাহাকেই 'অচিন্ত্য জ্ঞান' বলা যায়। অথবা ইহা ভিন্ন কিম্বা ইহা অভিন্ন, এইরূপে বিকল্পের দ্বারা যাহার চিন্তাই হইতে পারে না—কিন্তু কেবল অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তাদৃশ জ্ঞানই অচিন্ত্যজ্ঞান, এতাদৃশ অচিন্ত্যজ্ঞানের যাহা বিষয়ীভূত, তাহাকেই 'অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর' বলা যায়। যেহেতু মণি-মন্ত্রাদিস্থলে প্রসিদ্ধ শক্তি-সমূহের এইপ্রকারই স্বভাব হইয়া থাকে, সেই হেতুই ব্রহ্মে যে সকল শক্তি আছে, তাহাদেরও এইরূপ স্বভাবই হইবে। (অর্থাৎ ঐ সকল শক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন, এই চিন্তা দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না; কিন্তু ঐরূপ শক্তি অঙ্গীকার না করিলে শুদ্ধ নির্গুণ সহকারি-বিরহিত ব্রহ্ম হইতে এই পরিদৃশ্যমান সংসার সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ যে শ্রুতিপ্রমাণ, তাহার অন্য কোন প্রকারে প্রামাণ্য সম্ভবপর হয় না, এইরূপ অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মে তাহা হইতে ভিন্নাভিন্নত্ববিচারাসহ সৃষ্টি প্রভৃতির অনুকূল শক্তিসমূহ যে আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই শক্তি শক্তিযুক্ত সেই ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিকভাবে ভিন্ন, ইহা বলা যায় না, আবার তাহা যে ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিকভাবে অভিন্ন, তাহাও বলা যায় না; সুতরাং তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে) এইপ্রকার অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর যে সকল শক্তি ব্রহ্মে আছে, তাহা সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু অথচ তাহা সকলই ব্রহ্মের স্বভাবভূত (অর্থাৎ অগ্নিতে যেমন দাহশক্তি অগ্নির স্বভাবভূত, কল্পিত বা আগন্তুক নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের শক্তি-সমূহও ব্রহ্মের স্বভাবভূত, তাহা কল্পিত বা আগন্তুক অথবা মিথ্যাভূত, ইহা বলিতে পারা যায় না) এই কারণে গুণাদিবিরহিত হইলেও অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত বলিয়া ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি করিয়া থাকেন, ইহাই শ্রুতিরূপ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতিই বলিয়া থাকে, "তাহা হইতে পৃথক্ কোন কার্য্যও নাই, কোন কারণও নাই, এ সংসারে তাহার তুল্যও কেহ নাই, তাহা হইতে অধিকও কেহ দৃষ্ট হয় না অথচ সেই ব্রহ্মের নানা প্রকার স্বভাবভূত শক্তিসমূহ বিদ্যমান আছে, ইহা শ্রুতিই বলিয়া দিতেছে। সেই ব্রহ্মের জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তি স্বাভাবিক (অর্থাৎ মায়িক বা কল্পিত নহে)।"

শ্রুতি আরও বলিতেছে—

"ব্রহ্মের প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া বুঝিতে হইবে, সেই মায়ীই মহেশ্বর।"

অথবা এই ভাবে উক্ত সার্দ্ধশ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে, সকল বস্তুরই বহ্নির উষ্ণতাদি শক্তির ন্যায় অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর শক্তি-সমূহ বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মের কিন্তু যে সকল শক্তি আছে, তাহা সমস্তই তাঁহার স্বভাবভূত অর্থাৎ ঐ সকল শক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। 'তাঁহার নানাপ্রকার পরা শক্তি শ্রুত হইয়া থাকে' এইরূপ শ্রুতিতে 'পরা' এই বিশেষণটির দ্বারা ঐ শক্তি-সমূহ যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এই হেতু ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যেমন মণিমন্ত্রাদির প্রভাবে অগ্নি প্রভৃতির উষ্ণতাদি শক্তিকে বিনষ্ট করা যায় না, সেই ব্রহ্মেরও ঐ সকল শক্তি কোন উপায় দ্বারা বিনাশিত হইতে পারে না। এই হেতু ব্রহ্মের যে ঐশ্বর্য্য, তাহা সর্ব্বদাই নিরঙ্কুশ অর্থাৎ অপ্রতিহত। এই জন্যই শ্রুতিও বলিতেছে—"সেই এই পরমাত্মা সকল বস্তুকে আপনার বশীভূত করিয়া রহিয়াছেন। কারণ, তিনি সকলেরই ঈশ্বর, তিনি সকলেরই অধিপতি।"

ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণপর শ্রুতি-সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিবার জন্য যে পথ জ্ঞানী ও ভক্ত মহর্ষিগণের একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহাই বিষ্ণুপুরাণের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা সুস্পষ্ট-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বামিপাদে শ্রীধরাচার্য্যও সেই পথ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বিষ্ণুপুরাণের উপর নির্ভর করিয়া জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের পরস্পর সম্বন্ধ যে অচিন্ত্যভেদাভেদ, তাহাও নিঃসন্দিগ্ধভাবে উদ্ধৃত টীকাংশে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এইরূপ পথই ব্রহ্মতত্ত্বপর শ্রুতি-সমূহের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের

ঐকান্তিক অনুকূল, তাহা পক্ষপাতরহিত বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি-মাত্রেরই স্বীকার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ পথ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদনপর শ্রুতিসমূহের মধ্যে কতকগুলি শ্রুতির পারমার্থিক প্রামাণ্য আর কতকগুলি শ্রুতির ব্যাবহারিক প্রামাণ্য এইরূপ যে অনার্ষকল্পনা, তাহাও করিতে হয় না, কি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী কোন আচার্য্যই আনার্ষকল্পনারূপ দোষ হইতে মুক্ত নহেন, ইহা পূর্ব্বে বিস্তৃত-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কারণে এ স্থলে আর তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে না।

পরমার্থরসবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই পুরাণসম্মত আর্ষপদ্ধতিকেই অবলম্বন করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই হইল 'অচিন্ত্যভেদাভেদ।' এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-রহস্য সম্যক্প্রকারে অবগত না হইতে পারিলে কেহ পরমার্থরস বা প্রেমভক্তির আস্বাদনে অধিকারী হইতে পারে না, শ্রুতিপ্রামাণ্যের প্রতি অবিচলিত দৃঢ়বিশ্বাসই এই পারমার্থিক রসাস্বাদনের অধিকার সম্পাদন করিয়া দেয়, তাই চরিতামৃতকার শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"বিশ্বাসে লভয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর"

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"এ অমৃত অনুক্ষণ সাধুমহান্ত-মেঘগণ
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ,
তাতে ফলে প্রেম-ফল ভক্ত খায় নিরন্তর
তার শেষে জীয়ে জগজন।
এ অমৃত কর পান যাহা সম নাহি আন
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস,
না পড় কুতর্কগর্ত্তে অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে
যাতে পড়িলে (জীবের) হয় সর্ব্বনাশ।"

অগাধ পাণ্ডিত্য বা তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তার উপর একমাত্র নির্ভর করিলে পরমেশ্বরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেহ পরমার্থরসাস্বাদনে মনুষ্যজন্ম সফল করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। দীপাবলি জ্বালিয়া, দিগ্‌দিগন্তোদ্ভাসী বৈদ্যুতিক আলোকপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়া, তাহার সাহায্যে এ সংসারে কেহই সূর্য্য দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু আপনার রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া সেই সূর্য্য যখন আপনাকে দেখাইবার উপায় করিয়া দেন, তখন সেই সূর্য্যালোকের সাহায্যেই লোক সূর্য্যদর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত কোটি কোটি সূর্য্য যাঁহার লীলাশক্তির ক্ষণিক বিকাশ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে, সেই সচ্চিদানন্দঘন জ্যোতির্ম্ময় রসবিগ্রহ শ্রীভগবান্ আপনার স্বরূপপ্রকাশের দ্বারা আত্মভূত পারমার্থিক রসাস্বাদনে আত্মাংশ পুণ্যবান্ জীবনিবহকে ধন্য করিবার আত্মস্বরূপ-প্রকাশক কিরণকল্প শ্রুতিসমূহকে আপনা হইতে আবির্ভূত করিয়াছেন। সেই শ্রুতিসমূহের সাহায্যগ্রহণ ব্যতিরেকে পরমাত্মদর্শনের অন্য কোন প্রকৃষ্ট সাধন নাই, সেই শ্রুতির মধ্যে কোনটি প্রমাণ, আবার কোনটি অপ্রমাণ, এইরূপ কল্পনা করিয়া যাঁহারা পরমেশতত্ত্বের নিরূপণ করিতে প্রয়াস করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে যে ভগবদ্‌বাক্য বলিয়া শ্রুতিপ্রামাণ্যের উপর দৃঢ়বিশ্বাস আছে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের দৃঢ়-বিশ্বাসই পারমার্থিক রসাস্বাদনের প্রকৃষ্ট পন্থা, তাহাই উদ্ধৃত পদ কয়টির দ্বারা চরিতামৃতকার অতি সুন্দরভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

মহাদেব

কমলা তোমার আপন কন্যা কুবের তোমার দাস,
তবু, গৃহহীন তুমি ভিখারী অনাথ শ্মশানে তোমার বাস।

মন্দারে তব বন্দনা করে নন্দনবনবাসী,
কর্ণে পরিলে শঙ্কর তুমি ধুস্তুরে ভালবাসি।
ঈশান তুমি বাজিয়ে বিষাণ মশানে করিছ কেলি,
তুচ্ছ বৃষভ করিলে বাহন ঐরাবতেরে ফেলি।
মন্থন-দিনে সুধার ভাণ্ড সুরগণে করি দান,
নীলকণ্ঠ কণ্ঠ ভরিয়া করিলে গরল পান।

চন্দনে তুমি মন্দ মানিয়া অঙ্গে মাখিলে ছাই,
সঙ্গে রঙ্গে ভীম ভুজঙ্গ ফিরিছে সকল ঠাঁই।
দেবের দেবতা তুমি মহাদেব সেজেছ পাগ্‌লা ভোলা,
উচ্চ নিম্ন নরনারী তরে মন্দির তব খোলা।
তোমার স্বরূপ বুঝিব কেমনে এ দীন মানব কবি,
মুগ্ধ মানসে মোহিছে কেবল ও মহামহিম ছবি।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

তুষানল

১

"এ কি, হিরণ-দা, বিলেত থেকে ফিরলে কবে? আন্দাজে এসে খুব ধরেছি ত!" উচ্ছ্বসিতযৌবনা অনুপা কথাটা বলিয়া আনত নয়ন দুইটি হিরণের মুখের উপর স্থাপিত করিল। অনুপার পিতা ততক্ষণ সোপান অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে আরোহণ করিতেছিলেন।

হিরণকুমার আরাম-কেদারা ছাড়িয়া তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাত হইতে সংবাদপত্রখানা পড়িয়া গেল—মুখে চোখে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল, ক্ষণেক বিহ্বলের মত সে অনুপার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র, অনুপার তিরস্কারব্যঞ্জক খর দৃষ্টির সম্মুখে সে মুখ নামাইয়া লইতে পথ পাইল না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে লাঠির উপর ভর করিয়া, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, রাজনারায়ণ বাবু হিরণকে দেখিয়া অতিকষ্টে বলিলেন,—"এই যে বাবাজী, ঘরেই আছ। বেশ, জিরুই আগে, তার পর কথা।"

হিরণ আরাম-কেদারাখানা তাড়াতাড়ি সরাইয়া দিল। রাজনারায়ণ বাবু পরিশ্রান্ত দেহ তাহার উপর এলাইয়া দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

হিরণ ততক্ষণ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। সে বলিল, "আপনারা কবে এলেন, কাকাবাবু? আমাদের ত কোনও কিছু জানান নি আগে? সেই যে প্রথম দু'চারখানা চিঠি পেয়েছিলুম, তার পর দু'বছরের ওপর কেটে গেল—"

অনুপা চেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্রখানার উপর চোখ বুলাইতেছিল; কিন্তু কাগজের অন্তরাল হইতে তাহার নয়নের প্রশংসমান দৃষ্টি যে হিরণের উপর নিপতিত হইতেছিল, সম্ভবতঃ তাহা বৃদ্ধেরও অগোচর রহিয়া গেল। সে কাগজখানা টেবলের উপর ফেলিয়া দিয়া মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "বা রে! দোষটা বুঝি আমাদের হ'ল!—বাবা ত এক যায়গায় স্থিরধীর হয়ে বসতে পান্‌নি—ধরতে গেলে ইন্দোর-রাজ্যটা টহল্ দিয়ে বেড়িয়েছেন। তোমরা কি করেছিলে?"

রাজনারায়ণ বাবুও হাসিয়া বলিলেন, "কি করি বল, সিবিলিয়ানি চাকরী—হুকুমের গোলাম।"

হিরণ বৃদ্ধের এ কৈফিয়তে মনোযোগ দিয়াছিল কি না, বুঝা গেল না। অনুপার দিকেই কি তাহার সকল আগ্রহ নিবদ্ধ ছিল? সে তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আর তুমি?"

অনুপা বলিল, "আমি! আমি মাউ ছাউনীতেই জোরোয়াষ্ট্রীয়ান গার্ল ইনষ্টিটিউশনের বোর্ডিংএ থাকতুম। বেশ যা হোক্, হিরণদা—অতিথিরা কি নিজেই বলবে, চা দাও?"

হিরণের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। তার পর সহসা উত্তেজিতভাবে ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিল। রাজনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, "না, না, তোমার অত ব্যস্ত হ'তে হবে না, হিরণ। ওর স্বভাব জান ত—চিরকালই ঐ রকম ক'রে বেড়াতে ভালবাসে।"

অনুপা বলিল, "হিরণ-দা, কলিং বেলটা কোথায় গেল? আগে ত অমন হাঁকডাক করতে না।"

হিরণ গম্ভীর হইয়া বলিল, "ও সব বিদিশী ঢং আমাদের মত পরাধীন জাতের পক্ষে শোভা পায় না।"

অনুপা বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। রাজনারায়ণ বাবু তখন চা-বিস্কুটের সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন। চায়ের কাপ অনুপার হাতেই রহিয়া গেল। তাহার পর সে ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "কি শোভা পায় না বললে, হিরণ-দা?"

হিরণ বলিল, "কিছুই না। তুমি কি তা হ'লে এ দু'বছরে আই, এস, সি পাশ দিয়ে এসেছ?"

রাজনারায়ণ বাবু সরেশ সন্দেশের আধখানা ভাঙ্গিয়া মুখে তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "হাঁ, একজামিন্ দিয়ে এসেছে, ফল বেরোয়নি—তবে পাশ হবে খুব সম্ভব।"

অনুপা বলিল, "আর তুমি কি করছো, হিরণ-দা! এম্-এ পাশ দিয়ে কেবল বাড়ীতেই ব'সে রয়েছ! ভালও লাগে তোমার এমন কুঁড়েমির জীবন—"

রাজনারায়ণ বাবু হিরণের ম্লান মুখ দেখিয়া অনুপাকে ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, "বাঃ, ওর কোনও হিস্‌ট্রি শুন্‌লিনি—

আগে থেকেই গাল দিতে সুরু করলি? নিশ্চয় কোন বাধা-টাধা পড়েছে, না হ'লে বিশু বেঁচে থাকতেই ত ঠিক হয়েছিল, এম, এ পাশ করেই বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টারী দেবে। আহা, ছেলেবেলাই মা-হারা, তার ওপর বিশুও আমাদের ছেড়ে গেল—"

প্রগল্‌ভা তরুণী সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা ব'লে হিরণদার নিজেকে দেখবার মত বয়েস নিশ্চয়ই হয়েছে। বাপ-মা চিরদিন কারু থাকে না—তা ব'লে নিজের ভবিষ্যৎ এমন ক'রে ব'সে ব'সে মাটী করবার কি কারণ আছে? তা হ'লে আসবার আগে যা শুনে এসেছি, তার কতকটা সত্যি বটে।"

হিরণ বলিল, "কি শুনেছ?"

"তুমি বিলেত যাওনি—কি সব ছাই-পাঁশ আইডিয়া নিয়ে ঘরে ব'সে আছ।"

"হুঁ, তা যাইনি বটে, আর যাবও না। দেশের লোক হাসতে হাসতে জেলে যাচ্ছে—সারা দেশময় আগুনের হাওয়া বইছে, আসুরিক অত্যাচারে আমার ভায়েদের রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, এ সময়ে আমাদের কি বিদেশ যাওয়া সাজে—বিশেষ সখের পড়ার জন্য?"

ভৃত্য বহু দিনের অব্যবহৃত গুড়গুড়িটা সাফ করিয়া তামাক সাজিয়া দিয়া গিয়াছিল, রাজনারায়ণ বাবু তাহাতেই মসগুল্‌ হইয়াছিলেন। হঠাৎ হিরণের কথাটা তীরের মত বুকে বিঁধিল। তিনি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অনুপা একবারে বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া বসিয়া আছে।

রাজনারায়ণ বাবু ঈষৎ রুষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার মানে? এত লেখাপড়া শিখে এই মতলব ভাল ব'লে ঠাওরেছ?"

হিরণ গম্ভীর স্বরেই জবাব দিল, "সে আপনি বুঝবেন না। যে আবেষ্টনের মধ্যে আপনারা বেড়িয়েছেন—"

অনুপার চমক ভাঙ্গিল। সে-ও সমান ওজনে বলিল, "কি আবেষ্টন? স্বাধীন রাজার ষ্টেটে প্রজা শাসন ক'রে এসেছেন, এটা খুব নিন্দের কথা, না? চল বাবা, বাড়ী যাওয়া যাক্‌—" অনুপা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুন্দর আনন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, নয়নে তীব্র দীপ্তি।

হিরণ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা করুন, কাকাবাবু, ঝোঁকের মাথায় কি বলেছি—আমি ত যেতে দেবো না—কবে এসেছেন এত দিন পরে বিদেশে থেকে—"

রাজনারায়ণ বাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, অনুপা বাধা দিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "থাক, আমাদের সংস্রবে থাকলে আদর্শ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এস বাবা—"

তাহার স্বর তখনও ক্রোধ-কম্পিত। তাহাতে অভিমানের কিছু রেশ দেখা দিয়াছিল কি?

অনুপা আর দাঁড়াইল না, হন্‌হন্‌ করিয়া সোপান বাহিয়া নামিয়া গেল, রাজনারায়ণ বাবু যথাসাধ্য দ্রুত অনুসরণ করিলেন।

হিরণ নির্ব্বাক্‌ নিস্পন্দ অবস্থায় তথায় একাকী দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে তখন ভাব-সমুদ্রের কি তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে।

২

হিরণদের সঙ্গে রাজনারায়ণ বাবুদের অনেক দিনের আলাপ-পরিচয়, একটা দূর-সম্পর্কের কুটুম্বিতাও আছে। হিরণের বাপ রাজনারায়ণ বাবুর প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, উভয়ে সতীর্থও বটে। উভয়েই একসঙ্গে বিলাতযাত্রা করেন। রাজনারায়ণ বাবু সিভিল সার্ভিস পাশ দিয়া আসেন। শেষা-শেষি চাকুরীর সময় ইন্দোর ষ্টেটের অনুরোধে সরকার তাঁহাকেই উক্ত ষ্টেটের কার্য্যে পাঠাইয়াছিলেন। তদবধি তিনি ইন্দোরেই ডেরা-ডাণ্ডা উঠাইয়া লইয়া যান। হিরণের পিতা ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টেই প্র্যাক্‌টিস্‌ করেন। রাজনারায়ণ বাবু হিল্লী-দিল্লী সিবিলিয়ানি করিয়া কলিকাতায় অল্পসময়ই থাকিতেন। হিরণের পিতা যখন প্রভূত অর্থোর্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন, তখন লেক রোডের নিকটে জমী কিনিয়া তথায় রাজপ্রাসাদ তুল্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন। রাজনারায়ণ বাবুর কোথাও স্থিত-ভিত ছিল না বলিয়া তিনি তাঁহার কালীঘাটের পুরাতন পৈতৃক বাটীতেই প্রয়োজন হইলে পুত্র-পরিবারকে রাখিয়া যাইতেন, প্রয়োজন না হইলে বাটী ভাড়া দিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। ভাগলপুরে সিবিলিয়ানি করিবার সময় তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল। তাঁহার পত্নী একটি পুত্র ও একটি কন্যাকে লইয়া কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং অকস্মাৎ তাঁহাকে অকূল-পাথারে

ভাসাইয়া পরপারে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কন্যা অনুপাকে কে দেখিবে শুনিবে, এ কথা একবারও ভাবিলেন না। তিনি প্রায় পাগলের মত হইলেন। পুত্রটি প্রায় মানুষ হইয়া উঠিয়াছিল, সে প্রায় হিরণের সমবয়স্ক। যে কন্যাটি জননীর সঙ্গে চলিয়া গেল, সে সর্ব্বকনিষ্ঠা, মাত্র দুই বৎসরের। যে রহিল, সে তখন ছয় বৎসরের। সেই ঘোর বিপদের দিনে হিরণের পিতা যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিলেন। পিতার মত—ভ্রাতার মত তিনি এই বিপন্ন পরিবারের সাহায্যার্থ ভাগলপুরে ছুটিয়া গেলেন এবং সেখানে কিছু দিন থাকিয়া শোকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়া ছুটী করাইয়া সকন্যা বন্ধুকে আপনার লেক রোডের ভবনে আনয়ন করিলেন। তখন হইতে অনুপা তাঁহার গৃহে কন্যার মত লালিত-পালিত হইতে লাগিল। রাজনারায়ণ বাবু প্রকৃতিস্থ হইলে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। তখন হইতে তাঁহার বন্ধু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কন্যার পিতার স্থান অধিকার করিলেন, আর হিরণ তাঁহার কন্যার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শিক্ষক, খেলার সাথী, যাহা কিছু সবই হইল।

হিরণ তখন ষোড়শ বৎসর-বয়স্ক কিশোর।

চারি বৎসর এই ভাবেই কাটিল। উহার মধ্যে হিরণের পিতাই জিদ করিয়া রাজনারায়ণ বাবুর কালীঘাটের পৈতৃক জীর্ণ গৃহখানিকে প্রাসাদে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকেও সংসারের সুখভোগ করিতে হইল না। হঠাৎ হৃদ্‌রোগে তাঁহাকে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল।

দুই বন্ধুর কত কল্পনার—কত আশার স্বর্ণ-সৌধের দৃঢ় ভিত্তি খসিয়া পড়িল। দুই বন্ধুতে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, উভয়ের পুত্র-কন্যার মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান করিয়া সৌহার্দ্দ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করিবেন। হিরণ এম, এ পাশ করিলেই তাহাকে বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে পাঠাইবেন। ফিরিয়া আসিলেই অনুপা ও হিরণের চারিহস্ত এক করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু মানুষ ভাবে, বিধাতা ভাঙ্গে। কোথা হইতে কালের অমোঘ দণ্ডাঘাতে তাঁহাদের সুখ-কল্পনার সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িল!

হিরণের এম, এ পাশের খবর বাহির হইয়াছে, খুব ঘটা করিয়া প্রীতি-ভোজের ব্যবস্থা হইতেছে, বাঁকুড়া হইতে রাজনারায়ণ বাবুকে ছুটী করাইয়া আনা হইয়াছে,—এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত নিষ্ঠুর কালের দণ্ড সকল আনন্দের মেরুদণ্ডের উপর নিপতিত হইল। হিরণ যত না মুহ্যমান হইল, অনুপা তদপেক্ষা অনেক অধিকই হইয়া পড়িল। কেন না, সে যেমন তাহার জ্যেঠামণির স্নেহে সেই অল্পবয়সেও একবারে তাঁহার মাতৃস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তেমনই তিনিও তাহার কোমল নারী-হৃদয়ের নিভৃত মাতৃত্বের অঙ্কে তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

ঠিক সেই সময়ে ইন্দোর ষ্টেটে রাজনারায়ণ বাবুর চাকুরী হইল। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে বোর্ডিংএ দিয়া ইন্দোর চলিয়া গেলেন। ইহার এক বৎসর পরে যখন অনুপা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন তিনি তাহাকে লইয়া কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় স্থির হইল, হিরণ সেই বৎসরেই বিলাতযাত্রা করিবে।

প্রথম প্রথম উভয় পক্ষে পত্রের আদান-প্রদান চলিতে লাগিল। রাজনারায়ণ বাবু সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, সময়াভাবে এবং বয়সোচিত আলস্য হেতু তাঁহার প্রায় পত্র লেখা ঘটিয়া উঠিত না, সে কার্য্যের ভারটা সম্পূর্ণরূপে অনুপার উপরই পড়িয়াছিল। এক বৎসর যাবৎ উভয় পক্ষে সংবাদ আদান-প্রদান চলিয়াছিল, কিন্তু অনুপা যখন প্রতি পত্রেই সংবাদ পাইতে লাগিল যে, বিলাতযাত্রার কোন উদ্যোগ হইতেছে না, তখন তাহার মন হিরণের উপরে তিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজনারায়ণ বাবু সেই দূরদেশে থাকিয়াও শুনিলেন, হিরণ লেখাপড়া চর্চ্চা করার সংকল্প ত্যাগ করিয়া কি এক স্বদেশী সমিতিতে যোগদান করিয়াছে। এ সংবাদ শুনিবার পর হইতে অনুপার মন তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে আবাল্য যে ধাতুতে গঠিত এবং তাহার সিবিলিয়ান পিতা ও ব্যারিষ্টার জ্যেঠামণি তাহাকে যে ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে এরূপ না হওয়াই অসঙ্গত। সে বিস্তর অনুযোগের পরও যখন হিরণ-দার মন ফিরাইতে পারিল না, তখন পত্র লেখা বন্ধ করিয়া দিল। আরও এক কারণে তাহার পক্ষে পত্র লেখা অসম্ভব হইয়াছিল। সে এই সময়ে যে বোর্ডিংএ ভর্ত্তি হইয়াছিল, তাহাতে নিতান্ত আত্মীয়কে মাত্র মাসে দুই একবার ভিন্ন পত্র লিখিবার নিয়ম ছিল না। এইরূপে অভিমান ও ক্রোধের ব্যবধান তাহাদের আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতাকে পরস্পর দূরান্তরে থাকিবার পক্ষে প্রশস্ত করিয়া

দিয়াছিল। রাজনারায়ণ বাবু কর্মস্থান হইতে হিরণের বিষয়ে অনেক কিছু শুনিয়াছিলেন। প্রথমে তাহাতে বিশ্বাস করেন নাই; কিন্তু যখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে হিরণ নিজেই তাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া দিল—যখন সে লিখিল, সে মহাত্মা গন্ধীর আন্দোলনে যোগদান করিয়া, মায়ের ডাকে সাড়া দিয়া, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, তখন তিনি একবারে স্তম্ভিত হইলেন এবং অনেক বুঝাইয়া ভ্রান্ত পথ হইতে তাহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বিষম মর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ; তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়ায় হিরণকুমারের সহিত পত্রের আদান-প্রদান তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কন্যাকেও সে বিষয়ে কঠিন আদেশ প্রদান করিলেন।

কিন্তু মা-হারা কন্যার মাতা পিতা উভয়ই তিনি—কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহার চিত্তের কঠিনতা ক্রমে কোমল হইয়া আসিতে লাগিল এবং শেষে যখন কন্যা আই, এস, সি পরীক্ষা দিয়া বোর্ডিং হইতে চলিয়া আসিল, তখন তিনিও একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য ছুটী লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পত্রে যাহা না হয়, সাক্ষাতে তাহার অপেক্ষা অনেক কিছু হইতে পারে। গণা দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, এ সময়ে প্রাণসমা কন্যাকে একটা স্থিতভিত করিয়া দিয়া যাইতে পারিলে পরপারে পাড়ি দিতে কষ্ট অনুভব করিতে হইবে না। যাহাই সে করুক, এমন সুপাত্র বাজারে একটি মিলা ভার!

যাহাদের লইয়া বুড়াদের মধ্যে এমন বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহারা কিন্তু সেই বন্দোবস্তের বিন্দুবিসর্গও জানিত না। যত দিন উভয়ে ছোট ছিল ও পঠদ্দশা অতিক্রম করিতেছিল, তত দিন হিরণ অনুপাকে সহোদরা কনিষ্ঠা ভগিনীরই ন্যায় মনে করিত, আর অনুপাও তাহাকে শিক্ষক, পরামর্শদাতা, স্নেহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানিত। ছাড়াছাড়ির পর দূরত্বের ব্যবধান তাহাদের মধ্যে এই বন্ধন দৃঢ় কি শিথিল করিয়াছিল, তাহা তাহারাই বলিতে পারে!

সম্বন্ধ মধুর—স্নেহপ্রীতির, সুতরাং যতই ব্যবধান থাকুক, আকর্ষণ হ্রাস হয় না। তাই যখন রাজনারায়ণ বাবু অন্তরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুরকে পল্লবিত বৃক্ষে পরিণত করিবার বাসনা লইয়া সকন্যা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাঁহার বিলক্ষণ আশা ছিল যে, হয় ত তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া হিরণের মন পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। আশা কুহকিনীই বটে।

তাই যখন প্রথম সাক্ষাতেই হিরণ ভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় দিল, তখন তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। ইহারই জন্য কি তিনি সাত সমুদ্র পার হইয়া তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়াছেন? এতই কি তাহার নির্বন্ধ যে, এত কালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বন্ধন ছেদন করিতেও সে কুণ্ঠিত হইল না? দূর হউক, উহার সহিত সম্বন্ধ না রাখাই ত ভাল। কতকগুলা ভবঘুরে নিষ্কর্মা হতভাগার সহিত টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে যদি দেশের কায করা হইত, তাহা হইলে অনেক বেকার ছেলেই ত দেশসেবকের খেতাবে বিভূষিত হইতে পারিত!

কিন্তু তিনি সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলে কি হয়, বিধাতৃপুরুষ অলক্ষ্যে তাঁহাদের ভাগ্যসূত্র এই নির্বন্ধপরায়ণ যুবকের ভাগ্যের সহিত গ্রথিত করিতেছিলেন। তিনি হিরণকে স্বভাব-পরিবর্তন না করিলে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিতে বা তাঁহাদের সহিত কোনওরূপ সংস্রব রাখিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, এ কথা সত্য; কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও হিরণ একাধিকবার তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিতে অথবা তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয়ের চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। কি নির্লজ্জ! এক দিন হিরণ অনুপাকে একান্তে পাইয়া করুণ-কাতরস্বরে বলিয়াছিল, "মতের মিল সব যায়গাতেই হয় না, তা ব'লে মুখ-দেখাদেখি থাকবে না কেন?" অনুপাও মুখ ভার করিয়া জবাব দিয়াছিল, "যাদের থাকে, তাদের থাকুক, আমাদের থাকে না। এ সব বাঁদরামি করবার বয়েস তোমার নেই তা ব'লে!" হিরণ ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিয়াছিল, বাঁদরামিটা কি হ'ল? যাঁকে জগৎশুদ্ধ লোক মহাত্মা ব'লে পূজো করছে, তাঁর মতে চললে কি বাঁদরামি করা হয়?" অনুপা দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিল, "নিশ্চয়ই হয়। একটা পাগলের কথা তুমি লেখাপড়া শিখে মানছ, তোমাকেই ত লোকে পাগল বলবে।" ইহার পর ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে হিরণের আর বাক্‌স্ফূর্তি হয় নাই। সে তদবধি তাহার কাকাবাবুর বাড়ী যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

কয়েক দিন উভয় পক্ষই ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের তত্ত্ব লওয়াও আবশ্যক বলিয়া মনে করিল না। তাহার পর এক দিন সন্ধ্যার পর গুরুচরণ আসিয়া উপস্থিত।

শুরুচরণ হিরণদের বাড়ীর বহুকালের পুরাতন ভৃত্য, হিরণকে একরূপ মানুষ করিয়াছে বলিলেও হয়। তখন রাজনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে তাহার দিদিমণি ছাড়া কেহ ছিল না। কর্ত্তা কার্য্যান্তরে অপরাহ্ন হইতেই বাহিরে গিয়াছেন।

শুরুচরণের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত। অনুপাকে দেখিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়াই অস্থির! ব্যাপার কি? অনুপা বহু কষ্টে তাহার রোদনরুদ্ধ স্বর-বিজড়িত কথা-স্রোতের মধ্য হইতে এইটুকু মাত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল যে, তাহার প্রভু কোথা হইতে শিরোদেশে গুরুতর আহত হইয়া এইমাত্র গৃহে আনীত হইয়াছেন, ডাক্তার বাবুকে খবর দেওয়া হইয়াছিল, তিনি মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহার দাদাবাবু জ্বরে বেহুঁস। একবার কর্ত্তাবাবু আর দিদিমণি যদি যান। আর ত কেহ তাঁহার নাই।

অনুপার মুখখানিতে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। মুহূর্ত্ত-কাল বাক্‌রুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিবার পর শুরুচরণকে সে প্রশ্নের উপর প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

"অনু, কাকে এনেছি, দেখ", কথাটা বলিয়া এই সময়ে রাজনারায়ণ বাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত এ দেশীয় একটি ভদ্রলোক।

অনুপা একবার সম্মুখে দেখিয়া, "ওঃ, হরেন বাবু, নমস্কার!" বলিয়া ললাটে যুক্ত দুইটি কর স্পর্শ করিল। তাহার স্বরে উৎসাহ বা আগ্রহের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। তাহার গম্ভীর ও উদ্বেগকাতর মুখখানি দেখিয়া রাজনারায়ণ বাবুর জিজ্ঞাসু নেত্র তাহার মুখের উপর নিপতিত হইল। হরেন বাবু নামে সম্বোধিত বাবুটি আসনগ্রহণান্তে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এদ্দিনের পর দেখা, অভ্যর্থনাটা হ'ল বেশ। আমি ভেবেছিলুম, একেবারে 'সারপ্রাইজ' ক'রে দেবো!"

রাজনারায়ণ বাবু অনুপার মুখ-চক্ষুর ভাব দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, তাহার উপর শুরুচরণকে তদবস্থায় দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, কি একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে। কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন মন্দ খবর আছে না কি?"

অনুপার ইঙ্গিতে শুরুচরণ তাহার কথার পুনরাবৃত্তি করিল। রাজনারায়ণ বাবু সমস্ত শুনিয়া উদ্বেগকাতর স্বরে অতিথিকে বলিলেন, "সব শুনলে ত। আমার বাল্যবন্ধুর সন্তান—আপনার বলতে কেউ নেই। তুমি বিশ্রাম কর, আমরা এলুম ব'লে।"

হরেন বাবু মিনতির সুরে বলিলেন, "আপনাদের এত আত্মীয়, তার এত বড় একটা একসিডেণ্ট—আমি চুপ ক'রে একলা ব'সে থাকবো, এটা হ'তে পারে না। আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমিও না হয় গিয়ে দেখে আসতাম।"

অনুপার কৃতজ্ঞ নয়ন নীরবে অতিথির প্রশংসা করিল। হরেন বাবু চক্ষুষ্মান্, যাত্রার পূর্ব্বে সেই দৃষ্টি আর যাহাকেই হউক, হরেন বাবুকে এড়াইল না। তাঁহার মুখখানা হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

৩

সে দিন হরিশপার্কে ছেলেরা নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ ও অবৈধ জনতা করিয়া লাঠিপ্রহারটা বেশ ভাল করিয়াই ভোগ করিয়াছিল। দলের পাণ্ডা ছিল হিরণকুমার। তাহার আঘাতটা হইয়াছিল গুরু রকমের। ভাগ্যে তাহার দুই চারি জন বন্ধু তাহাকে অজ্ঞাতে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছিল, না হইলে তাহাকে জেলে যাইতেই হইত।

লাঠির আঘাতটা ঠিক মাথার উপরেই পড়িয়াছিল। কাযেই মস্তিষ্কের বিকৃতি ও জ্বর একই সঙ্গে প্রবলভাবে দর্শন দিল। রাজনারায়ণ বাবু স্বয়ং থাকিয়া চিকিৎসা-সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার অতিথি রায় সাহেব হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এই অবসরে অনুপার নিকট হইতে আহত গৃহস্বামীর সমস্ত পরিচয় জানিয়া লইলেন। শেষে তিনি এক গাল সিগারের ধোঁয়া ছাড়িয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বাই জোভ! এ স্বদেশীওয়ালা!"

হিরণের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। রাজনারায়ণ বাবু কন্যাকে লইয়া একাধিকবার তাহার তত্ত্ব লইয়া যাইতে লাগিলেন। এ দিকে তাঁহার অতিথি রায় সাহেবটিও বেশ কায়েম-মোকাম হইয়া তাঁহার আলয়ে অধিষ্ঠান করিলেন। তিনি বিলাতের এঞ্জিনিয়ারিং পাশ। বর্ত্তমানে ইন্দোরের এসিষ্টাণ্ট ষ্টেট এঞ্জিনিয়ার, ষ্টেট বিলডিংএর জন্য নিজে দেখিয়া শুনিয়া মাল খরিদ করিতে আসিয়াছেন। ইন্দোরেই তাঁহার সহিত অনুপাদের আলাপ-পরিচয়। হরেন বাবু নিজের

কৃতিত্বে অল্পবয়সেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রায় সাহেব উপাধিটিও গত বৎসর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হিরণকুমারের কঠিন রোগের সংবাদ পাইয়া তাহার বিস্তর 'স্বদেশীওয়ালা' বন্ধু-বান্ধব ও জ্ঞাতি-কুটুম্ব উহাকে দেখিতে আসিত। তাহাদের মধ্যে নারী স্বেচ্ছাসেবিকাও দুই চারি জন ছিলেন।

অনুপা একাধিক দিন দেখিয়াছিল, স্বেচ্ছাসেবিকাদের মধ্যে একটি মেয়ে সকলের অপেক্ষা অধিকক্ষণ হিরণের রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত, কাতর-ব্যথাভরা নয়নে হিরণের দিকে চাহিয়া থাকিত, সময়ে সময়ে সে সেই দৃষ্টিতে তাহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতে দেখিত। কে এই মেয়েটি? পরিচয়ে অপরের নিকট শুনিয়াছিল, সে দরিদ্র স্কুল-মাষ্টারের মেয়ে, লেখাপড়ায় বড় ভাল। আর একটা কথা মেয়েদের নানা কথাবার্ত্তার মধ্য হইতে ছানিয়া বাহির করিয়াছিল, মেয়েটি—তাহার নাম করুণা—প্রাণ দিয়া হিরণ-কুমারকে ভালবাসে। হিরণকুমার যে মাটী দিয়া চলিয়া যায়, সেই মাটীও সে পূজা করে। উহার বাপ হিরণের হস্তে কন্তাদানের জন্ত চেষ্টা করিতেছে। কথাটা শুনিয়া অনুপা মুখখানা বিকৃত করিয়াছিল, তাহার পর হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর কিছু দিন অনুপার আননে একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যকরুণ ছায়া ঘনায়িত হইয়া রহিল।

৪

মাউ ছাউনী সত্যই স্বাস্থ্যপ্রদ। হিরণকুমার মাসখানেকের মধ্যেই নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। রাজনারায়ণ বাবু কোন কথা শুনিতে চাহেন নাই, তিনি একরূপ জোর করিয়াই তাহাকে লইয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্ণেই মাউ ছাউনীতে একখানি বাংলো ভাড়া করা হইয়াছিল। সেখানে তাহার সেবা-পরিচর্য্যার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তিনি কন্তাকে লইয়া ইন্দোরে চলিয়া গেলেন। মাঝে মাঝে তাঁহারা হিরণকুমারকে দেখিয়া যাইতেন—যদিও তখন আর তাহাকে দেখিবার বিশেষ আবশ্যক ছিল না।

আর একটা সুবিধা হইয়াছিল। রায় সাহেব হরেন বাবু মাউ ছাউনীতেই একরূপ কায়েম-মোকাম হইয়া বসিয়াছিলেন। এইখানে দরবারের কয়টা বড় বড় ইমারতের কার্য্য হইতেছিল, ইহারই মাল-মশালা দেখিয়া শুনিয়া অর্ডার দিবার জন্ত তিনি স্বয়ং কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তাঁহার বাংলোর কাছেই হিরণের জন্ত বাংলো ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এ জন্ত অবসরকালে তিনি হিরণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় করিবার সুযোগ পাইতেন। দুই চারি দিনের মধ্যেই তাঁহাদের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। হিরণের মত গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষও তাঁহার ন্যায় পরিহাসরসিক মজলিসী পুরুষের সংসর্গে আসিয়া রঙ্গরহস্য বা হাসি-তামাসা হইতে অব্যাহত রহিল না। রায় সাহেবের কল্যাণে তাঁহার পরিচিত দুই চারি জন স্থানীয় অধিবাসীর নিকট হিরণ তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইয়া গেল। রায় সাহেব প্রায় প্রত্যহ মোটরযোগে একবার ইন্দোর বেড়াইয়া আসিতেন; এক এক দিন হিরণকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

ক্রমে হিরণ অতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহার যে এখানে আর মন টিকিতেছে না, তাহা পিতা পুত্রী বেশ বুঝিতে পারিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর আশাতরু অঙ্কুরেই বুঝি বিনষ্ট হয়। হিরণ যেরূপ স্বেচ্ছাচালিত নির্ব্বন্ধপরায়ণ পুরুষ, তাহাতে যে কোনও দিন সে এ স্থান ত্যাগ করিতে পারে, এ কথা তিনি ও তাঁহার কন্তা বিলক্ষণ জানিতেন। তবে কোন্ প্রবল আকর্ষণ তাহাকে এখনও ধরিয়া রাখিয়াছে? প্রথম কথাটা মনে জাগিয়া উঠিবার পর তিনি হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু কয়েক দিন পর তাঁহার অন্ধকারময় মনে হঠাৎ এক দিন ক্ষীণ আলোকরশ্মি জ্বলিয়া উঠিল। ভগবান্ কি তবে মুখ তুলিয়া চাহিলেন? ইদানীং হিরণকুমার অনুপার কথায় বড় একটা উপেক্ষা করিতে পারিত না। পুরুষমানুষ—হইলই বা অবস্থাপন্ন—বাপের পয়সা থাকিলে কি পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে নাই? অনুপা এইরূপ অনুযোগ করিলে হিরণ বলিত, "সে কথা পাঁচশোবার মানি, কিন্তু কায কোথায়, করি কি?" অনুপা বলিত, কাযের অভাব আছে না কি, আসল অকর্ম্মণ্যরাই ঐ কথা বলিয়া থাকে। তাহার ত পয়সার অভাব নাই, সেই পয়সা কারবারে খাটাইলে পারে ত। মাউ ছাউনীতেই ত দরবারের কায হইতেছে, এঞ্জিনিয়ার হরেন বাবু! তাঁহার কাছে ঠিকাদারী করিলে ত পারে।

হিরণ ঠিকাদারীই আরম্ভ করিল। তাহার অর্থের অভাব ত ছিলই না, তাহার উপর বিদ্যাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা,

একাগ্রতা—সে অল্পদিনের মধ্যে ঠিকাদারীতে আশাতীত উন্নতিলাভ করিল। মাঝে মাঝে অবসরকালে সে হরেন বাবুর সহিত শিকারে যাইত; কখনও কখনও অনুপাদের সহিত আশে-পাশে দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া আসিত, মাঝে মাঝে পিক্‌নিক্ বা বনভোজনে যোগ দিত। কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু লক্ষ্য করিতেন, মাঝে মাঝে সে কেমন অন্যমনস্ক হইত অথবা সকল বিষয়ে বিতৃষ্ণার ভাব তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিত। অনুপার দৃষ্টিও যে এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা নহে।

এক দিন কথায় কথায় অনুপা ঈষৎ বিরক্তির সুরে বলিল, "যাই হোক, এমন একগুঁয়ে কাউকে দেখিনি, বাবা। এত সাধ্যসাধনা করলে শিবের মাথারও ফুল পড়ে, কিন্তু এর যেন সবই বিপরীত। ভাবলুম, ভুলে গেছে। তা নয়। কালও বলছিল, ধারসানার কথা—বল্‌তে বল্‌তে চোখ দুটো কেমন জ্বল্-জ্বল্ ক'রে উঠলো। আমি বললুম, 'তুমি যাবে না কি?' জবাব দিলে, 'সৌভাগ্য কি করেছি? শুনেছি, কামাখ্যায় গেলে ভেড়া হয়, আমি ত এইখানেই ভেড়া বনে রয়েছি, বেশ ভেড়ার মত দানাপানি খাচ্ছি, আর হো হো ক'রে বেড়াচ্ছি।' এমন অকৃতজ্ঞ মানুষ হয়? আমার ত ঘেন্না ধ'রে গেছে। আমি বলি কি, একে দেশেই ফিরে যেতে দাও না কেন?"

রাজনারায়ণ বাবুর বুকের মধ্যস্থলটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল। তিনি কি জবাব দিবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া কেবল কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই সময়ে হরেন বাবু বলিলেন, "কথা পাড়লে যদি, তবে বলি। লোকটা বড় ছোটলোক-ঘেঁসা। শিকারে যাই, নেওরার ধারে, তা সেখানে গিয়েও ভাঙ্গিদের সঙ্গে গিয়ে বসে, হাসে, আলাপ করে। আমি বারণ করলে হাসে, বলে, ওরাও ত মানুষ—আমাদেরই ভাই।"

রাজনারায়ণ বাবু বলিলেন, "নেওরার ধারে ভাঙ্গিরা বাস ক'রে না কি?"

হরেন বাবু বলিলেন, "ভাঙ্গি না দোসাদ, যাই হোক্, ছোটলোক ত বটে। ওরা চুপড়ী বোনে।"

রাজনারায়ণ বাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে যাইবার সময় বিষাদজড়িত স্বরে বলিলেন, "এমন লোকের ছেলে যে এমনধারা হ'তে পারে, তা আমার ধারণা ছিল না। যা ইচ্ছে করুক গিয়ে, আমি আর ওতে নেই।"

রাজনারায়ণ বাবু বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইবার ভাব দেখাইয়া বাহিরের কাযে চলিয়া গেলেন।

অনুপা বলিল, "না, ইনকারিজিবল্। ভেবেছিলুম, আমাদের সোসাইটীতে মিলেমিশে মানুষ হ'তে পারে। যাক্—ও দুশ্চিন্তা—"

হরেন বাবু উৎসাহভরে বলিলেন, "তবে সবটাই খুলে বলি, এ লোকটার মধ্যে অনেষ্টি ব'লে জিনিষটের খুবই অভাব। যাকে বলে 'ফেয়ার ডিল্', তা ও কত্তেই জানে না বোধ হয়। কল্‌কেতায় শুনে এসেছিলুম, ভেনাস ইন্‌ষ্টিটিউশানের হেড মাষ্টার কে সতীশ বাবু না কি এক ভদ্রলোকের মেয়ে করুণার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ও না কি কথা ঠিক রাখেনি। আহা, বৃদ্ধ গরীব ভদ্রলোক একবারে মুষড়ে পড়েছিল। মানুষ মানুষের প্রতি এমন ব্যবহার করতে পারে? হাঁ, ভাল কথা, এই চিঠিখানা ওর ফাইল খুঁজতে গিয়ে পেয়েছিলুম।"

এ কি, প্রেমপত্র? কাহার? অনুপা অসম্ভব গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। করুণা?—সেই মেয়েটি—যে রোগশয্যায় উহার প্রতি হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি-ভক্তি ঢালিয়া দিয়াছিল; উঃ, কি হৃদয়হীন! এত নীচ! দূর হউক,—উহার সহিত সম্পর্ক কি? যাহা কিছু আছে, ভাঙ্গিয়া দিলেই হইবে।—

রায় সাহেব হঠাৎ হাতের রিষ্ট ওয়াচটা দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাই জোভ! এগারোটা? এখন আসি! ও বেলা দেখা কোরবো; হাঁ দেখ, আমার কথাটা—আমি—আমি ওয়েট করতে রাজী আছি—তা আন্‌টিল্ ডুম্‌স্ ডে। সো লং!"

রায় সাহেব সিগারের ধূম্ররাশিতে ঘরখানি প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

অনুপা তন্ময় হইয়া কত কি ভাবিতেছিল। কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিল, তাহা বলিতে পারে না।

"অনুপা!"

অনুপা চমকিয়া উঠিল। তাহার মুখচক্ষুর উপর দিয়া এক ঝলক রক্তের স্রোত বহিয়া গেল। যাহার বিষয়ে ভাবা যায়, হঠাৎ সে সম্মুখে উপস্থিত হইলে বুঝি এমনই হয়? হিরণকুমার হাসিমুখে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অনুপার

মুখচক্ষুর ভাব দেখিয়া তাহারও মুখের ভাব গম্ভীর হইল। সে বলিল, "ব্যস্ত আছ বোধ হয়? তা, আর এক সময়—"

অনুপা একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিল, "বস।"

হিরণ বিস্মিত হইল, এমন ত সে অনুপাকে কখনও দেখে নাই! সে আসন গ্রহণ করিয়া টেবলের এটা-সেটা নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, "বলতে এসেছিলুম একটা কথা। তা থাক্—"

অনুপা বাধা দিয়া বলিল, "স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পার। জিজ্ঞাসা করি, এমনই ক'রে কি কাটাবে? বাবা বলছিলেন, যে মানুষ হবে না, তাকে মানুষ করবার চেষ্টা মিথ্যে—"

হিরণও কথাটা শেষ করিতে দিল না, বলিল, "তাই ত ভাবছি, দেশেই ফিরে যাই, কি বল?"

"আমি কি বলব? তোমার যাওয়া না যাওয়ার সঙ্গে আমার মতামতের কি সম্পর্ক আছে?"

"খুব আছে। দেশে ফিরে যাওয়া না যাওয়া তোমার মতামতের উপর খুব নির্ভর করছে। এত দিন বলি নি, কিন্তু একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাওয়ার সময় আর চুপ ক'রে থাকতে পারছি না।"

"আমার মতামত?"

"হাঁ, তোমারই।"

"কি, বল।"

হিরণের আয়ত নয়ন দুইটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইল। সে বলিল, "বেশী কিছু বলবার নেই। তুমি যদি আশা দাও—যদি আমায় থাকতে বল—"

ঘৃণা ও ক্রোধজড়িত উত্তেজিত স্বরে অনুপা বলিল, "দেখ, হেঁয়ালির কথাগুলো আমি মোটেই পছন্দ করি না। শুনেছি, আর কলকাতায় যাওয়া থেকে এস্তক নাগাদ যা দেখে এসেছি, তাতে মনে করি, আমাদের সোসাইটীর সঙ্গে তোমার মিশ খাবার কোন সম্ভাবনা নেই, তোমার কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভাল।"

হিরণের মুখখানা অসম্ভব ম্লান হইয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "ঠিক বলেছ, স্পর্দ্ধাটা আমার খুবই বেশী। যাক্, তা হ'লে ত গোল চুকেই গেল, আমিও ছুটী পেলুম। কি বল?" হিরণ জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিল।

অনুপার মনটা হঠাৎ বেদনায় টন-টন করিয়া উঠিল। সে কাতরস্বরে হিরণের হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, "হিরণদা, ফেরা কি যায় না? তুমি ত পুরুষমানুষ—এ জোর কি তোমার নেই?—তোমার আদরের বোন্ তোমায় অনুরোধ করছে।" অনুপার নয়ন-পল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

আঘাতের উপর আঘাত! সন্তর্পণে নিজের হাত দুইখানা বন্ধনমুক্ত করিয়া হিরণ বলিল, "কিসের থেকে ফিরতে বলছ—কোথায়ই বা ফিরতে বলছ—তা ত বুঝতে পারছি না। যদি তোমাদের মোটর-চড়া বিজাতি বাবুয়ানার জগতের কথা মনে ক'রে ব'লে থাক—"

অনুপার নয়ন দুইটি ধক্-ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, সে তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া সগর্ব্বে উন্নত-মস্তকে বলিল, "নয় ত কি তোমার মত, গান্ধীওয়ালাদের মত হতচ্ছাড়াদের দলে মিশে মুণ তৈরী ক'রে দেশ স্বাধীন করতে যেতে হবে? যত হয়েছে ভবঘুরের দল—"

হিরণের চক্ষু দুইটি জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার নাসারন্ধ্র কম্পিত হইতে লাগিল, সমস্ত অঙ্গ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, কণ্ঠ তাহার প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া ধীর, গম্ভীর, কম্পিত স্বরে সে বলিল, "তুমি নারী, তার উপর ছোট বোন্। তোমায় এর জবাব কি দেবো? আমি চল্লুম, যার সংসর্গে থেকে তোমার এ পরিবর্ত্তন হয়েছে, আশা করি, সে সংসর্গ মধুময় হোক।"

হিরণ দাঁড়াইল না, দীর্ঘ পাদবিন্যাস করিয়া মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আর অনুপা? সে নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

৫

দুর্জ্জয় অভিমান ও ক্রোধ মানুষকে পাগল করিয়া দেয়। সেই দিনই হিরণ রায় সাহেবের মুখে শুনিল, অনুপার সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গিয়াছে, আগামী সপ্তাহের প্রথম মুখেই বিবাহ। কথাটা বলিবার সময় তাঁহার হাসি অন্তর ছাপাইয়া বাহিরে গড়াইয়া পড়িল, আর—আর হিরণ লক্ষ্য করিল কি না, বুঝা গেল না, সেই হাসির সঙ্গে একটু শ্লেষ ও ব্যঙ্গের ঝাঁজও প্রচ্ছন্ন ছিল।

হিরণ এ জন্য প্রস্তুত ছিল, কেন না, সেই সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বেও সে শুনিয়াছিল। তথাপি নিঃসংশয় হইবার নিমিত্ত

একবার অনুপার অন্তর জানিতে গিয়াছিল। সে জানিত, অনুপা স্বীকৃত না হইলে জগতে তাহাকে কেহ সম্মত করাইতে পারিবে না।

সময় অল্প, তবে জাঁকজমক নাই, আড়ম্বর নাই, কাযেই রাজনারায়ণ বাবু বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না। তথাপি ইন্দোরে একটা ধূম পড়িয়া গেল। জজ সাহেবের কন্যার বিবাহ, এ কি একটা ছোট-খাটো কথা! এই কয় দিন ধরিয়া হিরণকুমার রায় সাহেবের মুখে অনবরত তাঁহার ও অনুপার ভালবাসার ইতিহাস একাধিকবার শুনিয়াছিল। অসীম ধৈর্য্যের সহিত সে এই আলোচনায় নীরব শ্রোতার কার্য্য করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, রায় সাহেবের বিবাহের আয়োজনে তাহার সাহায্যের যতটুকু প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা সে অকুণ্ঠিত ভাবেই করিয়াছিল।

বিবাহের দিন অনুপা সকলকেই দেখিল, কেবল দেখিল না হিরণকে। শুধু একটা কাণাঘুষায় শুনিল, মাউ ছাউনীর কুলীদের সহিত তাহার কি একটা অশোভন ব্যাপার লইয়া ঝগড়া, মারামারি হইয়াছে। তাহার মন এ সংবাদে দারুণ ঘৃণায় ও ক্ষোভে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এত নীচ! এত ইতর মন তাহার! অনুপা শুনিয়াছিল, আর দুই চারি দিনের মধ্যেই হিরণ কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। হয় ত ইহ-জীবনে আর দেখা হইবে না। তবু যাত্রার পূর্ব্বে তাহার এই জঘন্য ব্যবহার! ছিঃ ছিঃ!

বিবাহের দুই তিন দিন পরে একটা কথা বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া তাহাকে প্রায় পাগলের মত করিয়া দিল। সে দাস-দাসীদের মধ্যে কথাবার্ত্তায় আভাস পাইল, কুলীদের সহিত হাঙ্গামায় বাঙ্গালী ঠিকাদার বাবুর কি একটা হইয়াছে!—কি হইয়াছে? খুন-জখম—যাহা হয়, এই রকম একটা কিছু। অনুপার মাথায় কে যেন লাঠির আঘাত করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তার পর সে পাগলের মত ছুটা-ছুটি করিয়া বেড়াইল। কে তাহাকে সঠিক খবর দিবে? স্বামী মাউ ছাউনীতে। পিতা দরবারের বিশেষ কার্য্যে বাহিরে গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন, জানা নাই। তাহার ইচ্ছা হইল, তখনই মোটরে মাউ ছাউনীতে চলিয়া যায়। কিন্তু—

সন্ধ্যার পর যখন স্বামী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন অনুপা একরূপ পাগলেরই মত ছুটিয়া তাঁহার নিকট হিরণ-কুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিল। স্বামীর মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন,—"বলছি সব। কিন্তু এ কথা তোমায় জানালে কে? আমরা ত সব চেপেই রেখেছিলুম—"

অনুপা কাঠ হইয়া বসিয়া শুনিতেছিল। প্রায় রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "বল।"

হরেন বাবু আরাম-কেদারায় দেহ এলাইয়া দিয়া বলিলেন, "বলছি, কিন্তু শুনলে কেবল কষ্ট পাবে বৈ ত নয়—"

অনুপা পুনরপি দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল, "বল।"

হরেন বাবু সিগারটা ধরাইয়া বলিলেন, "সেই যে আগে বলেছিলুম, ও লোকটা ছোটলোক-ঘেঁসা। ঐ কুলী লাইনে যেতো, ওদের মদ খেতে—তাড়ি খেতে বারণ করত, হাটের মোটা কাপড় কিনতে বলত। আর শুনেছো, ওদের ঝি-বৌগুলোকে নিয়ে চরকার স্কুল খুলেছিল। আস্ত ইডিয়ট!"

অনুপা বলিল, "হুঁ, তার পর?"

এক রাশি ধূম উড়াইয়া—হরেন বাবু বলিলেন,—"তার পর আর কি? কুলীদের মাগীগুলোকে নিয়ে কি একটা ঝগড়া হয়েছিল। জান ত ওরা কি রকম একগুঁয়ে—জেতে ভীল কি না, একবারে জঙ্গলী। এক দিন চড়াও হয়ে তারা তাকে আক্রমণ করলে। উঃ, সে কি মার—দেহখানা চেনাই যায় না। হাঁসপাতালে এনে রাখা হলো। বিয়ের দিনেই শেষ হয়ে গেছে। লোকটার চরিত্র ভাল থাকলে এমন ক'রে বিঘোরে মারা যেতে হ'ত না।"

অনুপার তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল কি না, বুঝা গেল না। তাহার বুকের ও মাথার মধ্যে কি হইতেছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। অনুপা আপনাকে সামলাইয়া চলিল, তাহার পর সহজভাবে হাসিয়া বলিল, "তা, আমায় বলনি কেন?"

"বিলক্ষণ! তোমার দাদা; বিশেষ কর্ত্তা বারণ করে-ছিলেন, বিয়ের সময় কি ও কথা বলতে আছে তোমায়?"

অনুপা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "দাদা! ছিঃ ছিঃ, ঘেন্না করে ও কথা মনে করতে।"

"কোয়াইট ট্রু! এমন কদর্য্য স্বভাব—এত লেখাপড়া শিখে—"

*　　*　　*　　*

রাজনারায়ণ বাবু ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন—রায়

বাহাদুর (রায় সাহেব রায় বাহাদুর হইয়াছেন) হরেন্দ্রনাথ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন, চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া সপরিবারে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতেছেন। হতভাগা হিরণের কথা প্রায় সকলেই বিস্মৃত হইয়াছেন। তাহার শোচনীয় মৃত্যুর পর ছয় মাসকাল রাজনারায়ণ বাবু জীবিত ছিলেন। তাঁহার জীবিতকালে তিনিই কেবল মাঝে মাঝে হতভাগা হিরণের জন্ম দুই একটা নিশ্বাস ফেলিতেন। তাহার পর প্রায় বৎসরাধিককাল অতীত হইয়াছে। কলিকাতায় স্থায়িভাবে বাস করিবার পর হইতে অনুপার বিবাহিত জীবনের খাতে একটানা আমোদ-আহ্লাদের স্রোতঃ বহিয়া আসিয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে সে কখনও কদাচিৎ সেই আমোদ-আহ্লাদের মাঝেও কেমন অন্যমনস্ক হইয়া যাইত,—যেন অতীতের অন্ধকারের অন্তরাল হইতে এক ক্ষুদ্র আলোকরশ্মি দেখা দিতেছে, আর সেই দিকেই সে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে। সে সময়ে কেহ তাহার মনকে শান্ত করিতে পারিত না।

এক দিন এক বন্ধুর বাড়ীর নিমন্ত্রণ ও থিয়েটারের অভিনয় দর্শনের মাঝখানে অনুপা অধিক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিল। সে রাত্রিতে তাহার বাড়ী ফিরিবার কথা ছিল না। বন্ধুর ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে বাড়ীতেই থিয়েটার। কাযেই সেইখানেই রাত্রিবাসের কথা ছিল। কিন্তু অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অভিনয় দেখিবার পর তাহার আর ভাল লাগিল না; সে বন্ধুর গাড়ীতেই বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

স্বামীকে বিস্মিত করিবার উদ্দেশ্যে সে ভৃত্য-পরিজনকে কোন গোলযোগ করিতে নিষেধ করিয়া দ্বিতলের বৈঠকখানার দিকে নিঃশব্দপদসঞ্চারে অগ্রসর হইল। তখনও তথায় বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিতেছিল, আর অনুপা শুনিল, সেই গভীর রাত্রিতেও তাহার স্বামী আর কাহার সহিত রসালাপ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সে বোতল ও গেলাসের ঠুন-ঠুন শব্দ শুনিতে পাইল। অমনই সে বারান্দায় থমকিয়া দাঁড়াইল।

ইদানীং তাহার স্বামীর এক অন্তরঙ্গ ইয়ার জুটিয়াছিল। লোকটার নাম ব্রজেশ্বর, সে কালীঘাটের এক জন নামজাদা জুয়াড়ী—রেস খেলায় সিদ্ধহস্ত।

অনুপার মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। ইহারই সংসর্গে পড়িয়া তাহার স্বামী মদ্যপ ও জুয়াড়ী হইয়াছেন!

প্রথম কথাটা কাণে যাইতেই তাহার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া গেল। কে যেন একখানা আগুনের মত গরম করাত তাহার পঞ্জরের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া গেল! সে শুনিল, স্বামী বলিতেছেন, "টাকাটা কি বাবা ছাপ্পর ফুড়ে আসে? সত্যিই ওর জন্তে কত কেরামতি করতে হয়েছিল, তবে রাজনারায়ণ মিত্তিরের ষোল আনা রাজত্ব আর রাজকন্তা লাভ হয়েছিল। হাঃ হাঃ! হিরণ ঘোষ শালা ছিল আস্ত ইডিয়ট, কেমন সাফ বুঝিয়েছিলুম, রাজকন্তে তাকে চায় না—"

অনুপার পদদ্বয় কম্পিত হইতেছিল, সে বারান্দার রেলিং ধরিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

ব্রজেশ্বর থিয়েটারী ঢঙ্গে সুর করিয়া বলিল, "কি আর বলিব তোরে! বাঃ বাঃ, এমন না হ'লে কাপ্তেন!"

হরেন্দ্রনাথের কথা জড়াইয়া আসিতেছিল। তিনি যে তখন বেশ মাতাল হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে অনুপার বিলম্ব হইল না। তিনি জড়ান সুরে গোঙ্গাইতে গোঙ্গাইতে বলিলেন, "পাঁচশোবার বাবা! কি কলই টিপেছিলুম—বুদ্ধি থাকলে সব হয়। কোথায় লাগে লর্ড রবার্টস! ওটাকে বোঝালুম, ওটা ছোট লোক, কোল-ভীলদের মেয়েছেলে নিয়ে টানাটানি করে। ব্যস! লেডী স্মিথ দখল। বুঝেছো ব্রজলাল, ছোঁড়াটা সত্যিই অনুপাকে ভালবাসত। স্পর্দ্ধা দেখ না একবার! সে রোমান্স কত! তার জন্তে শেষে জীবনটাই দিলে।"

অনুপার বুকের মধ্য হইতে আর্ত্তনাদ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল; সে বসনাঞ্চল মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

ব্রজেশ্বর বলিল, "তার মানে?"

হরেন্দ্রনাথ আর এক গেলাস পান করিয়া বলিলেন, "সে ফার্ষ্ট ক্লাস রোমান্স রে ভাই। ছোটলোকটা কুলী-ঘেঁসা ছিল, আমি কিন্তু ওগুলোকে প্যাক অফ ডগস্ মনে করতুম। ফাইনটা-আসটা, চড়টা-চাপড়টা—এ সব প্রায়ই ছিল। বিয়ের দিন একবারে চরম। মর্‌ঁয়া না কি ঐ রকম নামের এক বেটা কুলী আমার হুকুম শুনতে চায়নি। তাকে জোরে একটা লাথি মেরেছিলুম। ড্যাম নিগারস্! এই আর যায় কোথায়—শালারা রুখে আমায় মারতে এল। ওঃ, প্রায় তিন চারশ' হবে! ঐ ছোঁড়াটাই আগে থেকে ওদের কাছে কম্যুনিজম্ প্রিচ করতো। প্রাণটা গিয়েছিল আর কি!"

ব্রজেশ্বর বলিল, "তার পর?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছোঁড়াটা আফিসেই ছিল। বাঘের মত লাফিয়ে আমার আগ্‌লে দাঁড়াল। দরজাটা চেপে ধ'রে বল্লে, 'পালান ঐ পেছন দিয়ে।' বলবার পূর্ব্বেই আমি পগার পার। তার পর কি হয়েছিল, জানিনি। যখন আমরা ফিরে এলুম, তখন তার প্রাণটা শুধু ধুক্-ধুক্ করছিল। চেহারা চেনা যায় না। সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত! ওঃ, সে কি ভীষণ দৃশ্য! নির্ব্বোধটা সত্যিই অনুপাকে ভালবাসত—সেই জন্তেই আমায় বাঁচাতে এসেছিল! হাঃ হাঃ, ইডিয়ট্!"

অনুপার দৃষ্টিপথ হইতে পৃথিবীর সমস্ত আলোক সহসা যেন ম্লান হইয়া গেল। ইহাই কি প্রলয়ের অন্ধকার? অনুপা দুই হস্তে বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া সেইখানেই পাষাণ-মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। সেই বুকে যে তুষানল ধিকি-ধিকি জলিয়া উঠিল, সপ্ত সমুদ্রের জলেও তাহা কখন নির্ব্বাপিত হইবে কি?

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

গজপুরী-গিরিসঙ্কটে

আফজল-সুত ফজলের আজ জলেছে কোপ,
করিবে আজি সে শিবাজীর সব দর্প লোপ।
না ধরি তাঁহারে আজি ফিরিবে না,
ঘিরেছে দুর্গ বিজাপুরী সেনা
গিরি-শির হ'তে কুপিত ফজল ছাড়িছে তোপ,
পিতৃবধের প্রতিহিংসায় জলেছে কোপ।

পবনদুর্গে মারাঠা-সিংহ পড়েছে ফাঁদে,
নাই যে রক্ষা, মারাঠার রাজলক্ষ্মী কাঁদে।
সুড়ঙের পথে পালায় শিবাজী,
চক্রীর কে বা বুঝে কারসাজি?
মাওয়ালীর গিরিপ্রপাত-ধারায় কে হায় বাঁধে?
মারাঠা-সিংহে বিজাপুরী কেন্ন ধরিবে ফাঁদে?

সুড়ঙের মুখে সলাবৎ খাঁর সেনা-শিবির,
রুধিবারে পথ এল জোহর হাবশী বীর,
কি কথা হইল নয়নে নয়নে
বুঝিল না কেউ, থাকিল গোপনে,
হ'ল তার সেনা মাওয়ালীস্রোতের দুইটি তীর,
ছুটিল শিবাজী ভেদি বিজাপুরী সেনাশিবির।

ছুটিল শিবাজী নিশার আঁধারে শৈলবনে
হাজারখানেক বাছা বাছা বীর তাহার সনে।
ফজল যখন পেল এ খবর,
বিগত তখন রাত্রি দুপর,
দশগুণ সেনা সাথে লয়ে পিছু ছুটিল রণে,
ছুটেছে শিবাজী পরিচিত পথে শৈলবনে।

বন পর্ব্বত দুর্গম পথ আঁধার ঘোর,
গজপুর-গিরিসঙ্কটে হ'ল রাত্রি ভোর।
ক্লান্ত অবশ সবার শরীর
অশ্বের মুখে ফেনিল রুধির
হাঁকিল শিবাজী "ফেলে দাও জিন লাগাম ডোর,
বেশী পথ নাই ছুটাও অশ্ব—ছুটাও জোর।"

এখনো বিশাল দুর্গের পথ দশটি ক্রোশ,
পিছনে ছুটিছে মশালে জলিয়া ফজলী রোষ।
শুনা যায় দূরে সেনা-কোলাহল,
দিবালোকে হবে সকলি বিফল,
বিশাল গড়ের এত কাছে আসি কি আফশোষ,
এখনো হায় রে পথ সম্মুখে দশটি ক্রোশ।

হেথা গজপুরী সর্দ্দার এসে কহিল—"প্রভু,
প্রাণ দিবে দাস তোমারে ধরিতে দিবে না তবু।
ভয় কি, এ দেহে থাকিতে পরাণ,
কজলের সেনা হবে আগুয়ান ?
প্রভুর কার্য্য সাধিতে মাওয়ালী পিছ-পা কভু ?"
করযোড় করি কহিল তখন বাজীপ্রভু।

বুকে ধরি তায় কহিল শিবাজী—"তোমার ঋণ,
অপরিশোধ্য। শোধ হ'তে পারে শুধু সে দিন
যে দিন এ ব্রত হইবে পূর্ণ,
অরাতি-দর্প করিয়া চূর্ণ
এ দেশ আবার স্বীয় গৌরবে হবে স্বাধীন,
চলিনু বন্ধু বুকে ধরি তব শোণিত-ঋণ।"

ছুটিল শিবাজী আবার নূতন অশ্বে উঠি,
ডঙ্কা শুনিয়া গজপুরী সেনা আসিল ছুটি,
বাজীপ্রভুর লস্কর যত
সে আর কজই ? হবে পাঁচ শত
গিরিসঙ্কটে পরাণ সঁপিতে পড়িল জুটি।
শপথ করিয়া গজপুরী বীর বাঁধিল ঝুঁটি।

হাঁকে সর্দ্দার—"চল, বীরগণ সমরে সাজি,
ভবানী দেবীর পুত্রের তরে মরিব আজি।
বৈরিদর্প করিয়া চূর্ণ,
মোদের আশা যে করিবে পূর্ণ,
তাহার লাগিয়া সঁপিব জীবন,—জয় শিবাজী,
গর্জ্জিয়া চল গিরিসঙ্কটে মরিতে আজি।"

হাঁকে সর্দ্দার—"বিজাপুরী সেনা ক্ষণেক রহ,
শিবাজীরে চাও ? আগে আমাদের জীবন লহ।
তোমাদের পথ করিতে পিছল,
রুধির ঢালিবে গজপুরী-দল।"
গিরিসঙ্কটে বাধিল সমর শঙ্কাবহ
হাঁকে সর্দ্দার "বিজাপুরী সেনা, ক্ষণেক রহ।"

বৃথাই করিল কজল মারাঠা কেল্লা ফতে
বৃথাই বিশাল বিজাপুরী সেনা এ গিরিপথে।
দুই দুই জন যেমন আগায়
মরে গজপুরী বর্শার ঘায়
দুর্গম পথ আরো দুর্গম আহত হতে,
দশ সহস্রে রুধিল কেবল পঞ্চশতে।

পঞ্চশতের দুই শত আছে মরেছে বাকী,
সর্দ্দার হাতে বক্ষের ক্ষত রেখেছে ঢাকি।
নয়নে জাগিছে স্বর্গের রথ
"এখনো কজলে ছাড়িও না পথ
এখনো শুনিনি তোপের শব্দ"—কহিল হাঁকি,
বিশাল গড়ের দিকে কাণ খাড়া করিয়া রাখি।

দুপুরে হইল তোপের শব্দ কর্ণগত,
সর্দ্দার শুনি মুক্ত করিল বুকের ক্ষত।
হাঁকিল,—'আর কি পলাও এবার,
সময় হয়েছে বিদায় নেবার।'
দলি দেহ তার ছুটে গেল বিজাপুরীরা যত,
শিবাজী তখন বিশাল দুর্গে বিরাম-রত।

শ্রীকালিদাস রায়।

সাইরেনাইকা

গাযালো মরু-উদ্যান

উত্তর-আফ্রিকার লিবীয় মরুভূমির উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী এই ভূভাগটি অধুনা ইটালীর অধিকারভুক্ত। বিগত অষ্টাদশ বর্ষ ধরিয়া ইটালীয় পতাকা এই স্থানে উড্ডীন রহিয়াছে। ইটালীয় সভ্যতার প্রভাবে আসিলেও সাইরেনাইকা তাহার পূর্ব্ব-সভ্যতাকে বর্জ্জন করে নাই। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী কোনও প্রদেশের অধিবাসীরা এমন ভাবে বিদেশীয় সভ্যতার আক্রমণকে ব্যর্থ করিতে পারে নাই। খৃষ্ট-জন্মগ্রহণের বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সাইরেনাইকা মক্কা তীর্থের ন্যায়—পবিত্র তীর্থভূমির ন্যায় লোকের কাছে পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিত।

বেঙ্গাসী নগর সাইরেনাইকার রাজধানী। লেথি নদী এইখানে প্রবাহিতা। গ্রীক পুরাণে যে হেস্পেরাইডিস উদ্যানের কথা বর্ণিত আছে, সেই উদ্যান এই লেথি নদীর তীরে বিদ্যমান ছিল বলিয়া কথিত আছে। এইখানেই গ্রীক নগরী সাইরিনীর উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এক দিন এই নগরী সেই যুগের শাসকদিগকে অজস্র অর্থ ও শক্তি প্রদান করিয়াছিল।

উষ্ট্রপৃষ্ঠে বেদুইন-দম্পতি

প্রাচীনা নগরী সাইরিনীর ধ্বংস-স্তূপ হইতে রোম নগরের যাদুঘরে বহু মূল্যবান্ মূর্ত্তি প্রেরিত হইয়াছিল। সাইরিনীর ভিনস্-মূর্ত্তি মেলসের ভিনস্-মূর্ত্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বহু কলাবিদের অভিমত।

বেঙ্গাসী নগরের একাংশ অনেকটা য়ুরোপীয় ধরণে গঠিত হইলেও অট্টালিকাগুলির স্থপতিশিল্পে

আফ্রিকার স্থপতিশিল্পের প্রভাব সমধিক। কয়েকটি বৃক্ষবীথি-বহুল রাজপথ ও প্রমোদোদ্যানও নগরে বিদ্যমান। নগরের দেশীয় অংশে মসজেদ ও গম্বুজের বাহুল্য—স্থানে স্থানে খর্জ্জুর-কুঞ্জের শ্যামশোভা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সহরের যে অংশে দেশীয়গণের বাস, তথায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া সমুদয় গৃহ ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাহার ফলে সহরটি নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আরব-পল্লীগুলি এজন্য অধুনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

বেঙ্গাসীর বিশেষ বন্ধু প্রতিবেশী আফ্রিকাবাসীরা নহে—সিসিলীয়গণই তাহার হিতৈষী বন্ধু। সপ্তাহে একবার করিয়া ষ্টীমার সিরাকিউজ হইতে বেঙ্গাসীতে আসে এবং বেঙ্গাসী হইতে তথায় গমন করিয়া থাকে।

সাইরেনাইকার উত্তরপ্রান্তে মার্সসুসা নামক নগণ্য বন্দর বিদ্যমান। পূর্ব্বে এই বন্দর আপোলোনিয়া নামে এককালে বিখ্যাত ছিল। পূর্ব্বকালে গ্রীস, এসিয়া-মাইনর এবং ক্রীট-দ্বীপ হইতে বহু অর্ণবপোত এই বন্দরে গমনাগমন করিত।

২৬ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত সাইরিনী নগরের ধ্বংসস্তূপ

সাইরেনাইকার মধ্যে বেঙ্গাসী শুধু রাজধানী বলিয়া নহে, আয়তনেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর। সাইরেনাইকা লিবীয়ার অন্তর্গত। ইটালীয় লিবীয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণভাগে ফরাসী অধিকৃত প্রদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে আংগ্লোমিশরীয় সুদান এবং পূর্ব্বদিকে খাস মিশর। বালভূমি ও মরুপ্রান্তর লিবীয়ার মধ্যে প্রচুর ও দিগন্তব্যাপী। আফ্রিকার এই অংশের অনেক স্থান এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াই গিয়াছে।

সমগ্র ইটালী বলিতে যে পরিমাণ ভূভাগ মানচিত্রে দৃষ্ট হয়, লিবীয়ার ইটালীর অধিকৃত স্থানের পরিমাণ অন্ততঃ তাহার ৭ গুণ অধিক। সাইরেনাইকা এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

শুধু তাহাই নহে, ইজিয়ান সমুদ্র, কৃষ্ণসাগর, দক্ষিণ-ইটালী, সিসিলি এবং ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম তীর হইতে অনেক বাণিজ্য-জাহাজ এখানে সমবেত হইত।

পৌরাণিক যুগের ইতিহাসে সাইরিনীর ধনসম্পদের বহু বিচিত্র কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও ধ্বংসস্তূপের প্রস্তর-ফলক প্রভৃতিতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে গ্রীকগণের পর মিশরীয়গণ আগমন করিয়াছিল। তাহাদের পরে রোমকগণ এই দেশে আপতিত হয়। রোমকগণের পর বাইজানটীয়গণও সাইরিনীর ঐশ্বর্য্যপ্রবাদে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আগমন করে। যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের সাড়ে ৬ শত বৎসর পরে আরবগণ এখানে উপস্থিত হয়। তখন

সাইরিনীর আবিষ্কৃত মূর্ত্তিসমূহ

পণ্যদ্রব্য সহ বেদুইন সার্থবাহ

গ্রীকো-লিবীয় নগরের অধঃপতনের যুগ। তুর্কগণ সাইরেনাইকা পরিত্যাগ করিবার সময়ে বারবেরির জনগণও এই ঝটিকা-বিতাড়িত তীরভূমিতে তাহাদের লীলাখেলার অভিনয় করিয়াছিল।

মৌলিক লিবীয়গণ বহু জাতির সংস্রবে আসিয়া, বহু প্রকার রক্তধারার সহিত মিশ্রিত হইয়া এখন অভিনব জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের দেহে য়ুরোপ, এসিয়া, মিশর ও নিগ্রোজাতির শোণিত-প্রবাহের ধারা বহিতেছে।

গ্রীক ধীবরগণ পূর্ব্বের ন্যায় এখনও এখানে স্পঞ্জ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ

কোন কোন শিকারী আবিষ্কার করিয়াছেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই লেথি নদীর বর্ণনা ষ্ট্রাবো ও প্লিনির রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়।

বেঙ্গাসী নগর বিমানপোতের একটা বড় আড্ডা। এখানে বৃটিশ, ফরাসী ও ইটালীয় বিমানপোত-সমূহ অবতরণ করিয়া থাকে। বিমানপোতাশ্রয় বেশ প্রশস্ত।

প্রতি শুক্রবারে বেঙ্গাসীর মুসলমান দোকানগুলি বন্ধ থাকে। ইস্রেলাইট দোকানগুলি শনিবারে বিশ্রাম উপভোগ করিয়া থাকে। নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৩২ হাজার। তন্মধ্যে মিশ্রজাতীয় মুসলমানের সংখ্যা ২০ হাজার, ইটালীয় খৃষ্টান ৮ হাজার এবং ৩ হাজার ইস্রেলীয়। সমগ্র সাইরেনাইকার লোকসংখ্যা ২ লক্ষ।

বাজারে সাইরেনাইকার ভৃত্যবর্গ

সার্থবাহগণের অবস্থান জন্য সহরে একটা প্রাচীরবেষ্টিত পান্থশালা আছে। উহা নগরের মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত। এইখানে উষ্ট্রযূথ আসিয়া বিশ্রাম করে এবং তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে পণ্যসমূহ নামাইয়া লওয়া হয়।

হইয়া পড়ে—রাত্রি ৮টায় নৈশ ভোজের সময় নির্দ্দিষ্ট। তখন পানালয়-সমূহ এবং প্রমোদোদ্যানের পথ জনহীন হইয়া পড়ে।

এতদঞ্চলের শরৎকাল গ্রীষ্মঋতুর ন্যায়ই উষ্ণতা-প্রকাশক। তখন উত্তরদিক হইতে বায়ু-প্রবাহ একবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং মরুভূমির দিক হইতে বাতাস বহিতে থাকে।

সাইরেনাইকায় কোনও পর্ব্বতমালা নাই। এ জন্য এখানে ভেড়ার সংখ্যা অল্প, কিন্তু লিবীয় মরুভূমিতে ভেড়ার দল দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে।

গ্রীক পুরাণে যে লেথি নদীর বর্ণনা আছে, সে নদী অধুনা অদৃশ্য হইয়াছে বলিলেই হয়। তবে বেঙ্গাসীর কয়েক মাইল পশ্চাতে একটা ভূগর্ভস্থ গহ্বরের মধ্য দিয়া এই নদীর প্রবাহ

উষ্ট্রপালকগণের জন্য এখানে কাফিখানা প্রভৃতি আছে। বেদুইন উষ্ট্রপরিচালকগণও এখানে আসিয়া বিশ্রাম লইয়া থাকে। মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তাহারা বিভিন্ন পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য নগরে আনয়ন করে।

বহুশত বৎসর ধরিয়া লিবীয় মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সার্থবাহগণ সমুদ্রোপকূলে উটপক্ষীর পালক, হস্তিদন্ত এবং স্বর্ণচূর্ণ বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিত। এখন সুদান হইতে তাহারা উল্লিখিত দ্রব্য আর আনয়ন করে না।

খর্জ্জুর ও পশুচর্ম্ম পূর্ব্বেও সার্থবাহগণ লইয়া আসিত, এখনও সে সকল পণ্য বেঙ্গাসীতে আনীত হইয়া থাকে। তবে অধিকাংশ পণ্য এখন সেনিগাল বা অপার নীলনদের পথে ইটালী ও আমেরিকায় প্রেরিত হইয়া থাকে।

সাইরেনাইকা ভেদ করিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে যে দিগন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তর বিদ্যমান, তাহার স্থানে স্থানে মরু-উদ্যান এবং তৎসংলগ্ন মৃৎপ্রাচীর-বেষ্টিত গ্রামসমূহ বিদ্যমান। এই সকল উদ্যানে খর্জ্জুরকুঞ্জ ও কূপ আছে।

এই মরু-উদ্যানগুলির মধ্যে অগিলা ও গায়ালো প্রসিদ্ধ। হেরোডোটস এই অগিলা মরু-উদ্যান সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এখানে এখনও বহু বিশুদ্ধ বারবারকে দেখিতে পাওয়া যায়। গায়ালো মরু-উদ্যান হইতে প্রাচীনকালের বাণিজ্যপথ কুফরা মরু-উদ্যান পর্য্যন্ত প্রসৃত। এই মরু-উদ্যানের কাছে খর্জ্জুরবীথিবহুল বহু পল্লী পরিদৃষ্ট হইবে।

লিবীয় মরুভূমির তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে;—একাংশ পাহাড়-বহুল, দ্বিতীয়াংশ উপলখণ্ড-বন্ধুর, তৃতীয়াংশ বালুকাপূর্ণ। বালুকাপূর্ণ মরুভূমি মিশরের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলে বৃক্ষলতার সংস্রব নাই বলিলেই চলে। মরুভূমির এই অংশ পূর্ব্বপশ্চিমে অতিক্রম করা অসাধ্য। সুদক্ষ দেশীয়গণের পক্ষেও দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে চোরা-বালিও আছে।

কাফিখানায় সমবেত আরব গৃহস্থ

কুফরা সেনুসীদিগের দ্বারা অধিকৃত। ইটালীয়দিগের সহিত তাহাদের তেমন সদ্ভাব নাই। এই সেনুসীরা একটা জাতি নহে। এই সম্প্রদায় অত্যন্ত ধর্ম্মান্ধ এবং একই রাষ্ট্র-নৈতিক মতবাদে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহিত সৌভ্রাত্রবন্ধনে আবদ্ধ। এই মতবাদ হজরৎ মহম্মদের জনৈক বংশধর দ্বারা প্রবর্ত্তিত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আলজিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রচারিত মতবাদ মরক্কো হইতে আরব এবং তার পর সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। গারাবাব মরু-উদ্যানে উক্ত মতের প্রতিষ্ঠাতা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। যেখানে তিনি দেহরক্ষা করেন, সেই স্থান সেনুসীদিগের একটা বিরাট তীর্থস্থান হইয়াছে। এখানে একটি মসজেদ আছে। সেই মসজেদ-প্রাঙ্গণে প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র বিদ্যমান।

সমগ্র সাইরেনাইকায় ৪০টি সেনুসী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে পথযাত্রী প্রত্যেক মুসলমানকে তিন দিন বিনাব্যয়ে বিশ্রামস্থান ও আহার্য্য প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক গ্রামে এক জন করিয়া সেনুসী নেতার প্রতিনিধি অবস্থান করে। প্রত্যেক নেতা কুফরায় বাস করিয়া থাকে।

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্প্রদায়কে পরিচালিত করিতে যে সকল নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত কঠোর। অনুচরবর্গের প্রতি তাঁহার এই কঠোর আদেশ

আছে যে, খৃষ্টান বা ইহুদী-দিগের সহিত তাহাদের কাহারও কোনও সংস্রব থাকিবে না। কোনও প্রকার বিলাসব্যসন, যথা,—ধূমপান, নস্তগ্রহণ, কফিপান এবং কোনও প্রকার মাদক-দ্রব্য সেবন করিবার কাহারও অধিকার থাকিবে না। এই কারণে এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই অত্যধিক চা-পান করিয়া থাকে।

নৃত্য এই সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনও প্রকার ইন্দ্রজালের আশ্রয় গ্রহণ কোনমতেই চলিবে না। স্বর্ণ ও মণিমাণিক্য শুধু নারীর আভরণ; পুরুষ উহা অঙ্গে ধারণ করিতে পারিবে না। সম্প্রদায়ের কেহ যদি এই সকল নিষেধাজ্ঞার একটিও লঙ্ঘন করে, তবে তাহার অদৃষ্টে গুরু দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত জিয়স্-মূর্ত্তি
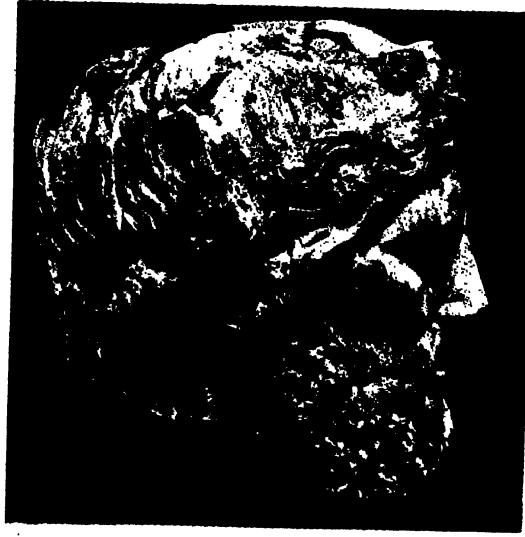
সাইরেনাইকায় ইটালীয়গণ যখন প্রথম আপতিত হয়, তখন সেন্নুসীসম্প্রদায়ের সহিত ইটালীয় সেনাবাহিনীর ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল। তাহারা মরুভূমির বাণিজ্যপথ সর্ব্বপ্রযত্নে ইটালীয় সেনার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, লিবিয়া জয় করিতে ইটালীর এক লক্ষ সৈনিককে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল এবং বহুশতকোটি মুদ্রা এজন্য ইটালী সরকারকে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সেন্নুসী নেতার সহিত বৃটিশ ও ইটালীয় সামরিক কর্ম্মচারীদিগের এক সন্ধি হয়।

আরব অশ্বারোহী

দেশীয় নরসুন্দর ক্ষৌরকার্য্যে নিরত

তাহাতে স্থির হয়, কর্ত্তৃপক্ষ সেনুসীদলের নেতাকে বার্ষিক একটা নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবেন, মরুভূমির মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সেনুসী নেতারা রক্ষা করিবেন। ইহাতে বৃটিশ ও ইটালীয়গণকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা বা সভ্যতা সেনুসী সম্প্রদায়ের উপর কোনও প্রকারে আরোপ করিবার চেষ্টা করা হইবে না। এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সেনুসী সর্দ্দার বৃটিশ ও ইটালীয় থানাসমূহের শান্তি অব্যাহত রাখিবেন এবং বাণিজ্যের কোন বিঘ্ন সম্পাদন করিবেন না।

সাইরেনাইকার কন্যা উষ্ট্রপৃষ্ঠস্থ শিবিকায় স্বামিগৃহে যাইতেছে

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেনুসীদিগের সহিত ইটালীয় কর্ত্তৃপক্ষের মনোমালিন্য ঘটে, তাহার ফলে সাইরেনাইকার ইটালীয়গণ অগিলা ও গায়রাবাক্ মরু-উদ্যানের সীমান্তে কোনও সেনাদল পাঠাইতে সাহস করিতেছেন না। শত্রুপক্ষের অধিকৃত স্থানে সাহস করিয়া কোনও শিকারীও যাইতে সম্মত নহেন।

অবগুণ্ঠনাবৃত তুয়ারেগগণ মরুভূমির মালিক। ইহাদের পুরুষগণ অবগুণ্ঠন ধারণ করে। নারীদিগের ও বালাই নাই।

সাইরেনাইকায় উষ্ট্রের প্রাধান্যই অধিক। উষ্ট্র-দুগ্ধই
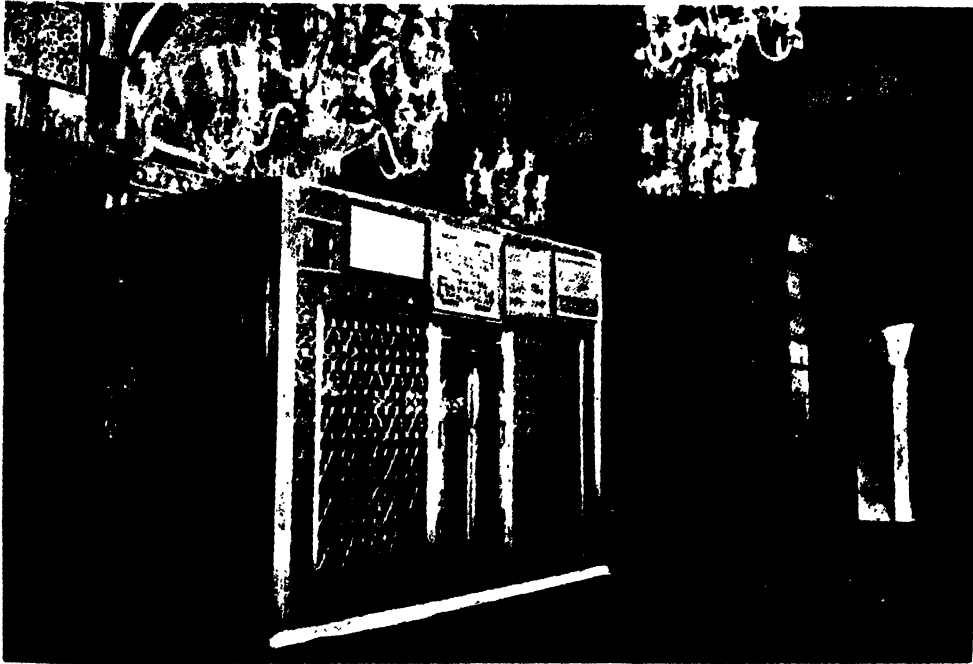
মরু-উদ্যানে সেনুসী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নেতার স্মৃতিসৌধ

বেঙ্গাসী নগরের দৃশ্য

বৃদ্ধা আরব-রমণী শস্য পরিষ্কারে নিরত

রজ্জু, ব্যাগ এবং পরিচ্ছদেও উষ্ট্রলোমের প্রচুর ব্যবহার আছে। বেদুইন যুবক-যুবতী উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অবসর-যাপনের জন্য নগরে আগমন করিয়া থাকে। বেদুইন সুন্দরীরা মরু অতিক্রম-কালে কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া রাখে। উহাতে সূর্য্যতাপ অধিক কষ্ট দিতে পারে না। এই সকল বেদুইন নারী বাতাসের ন্যায় মুক্ত ও স্বাধীন।

সাইরেনাইকার উত্তরাংশ অত্যন্ত উর্ব্বর। ইটালী সরকার এখানকার কৃষিকার্য্যের উন্নতির বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বার্লি
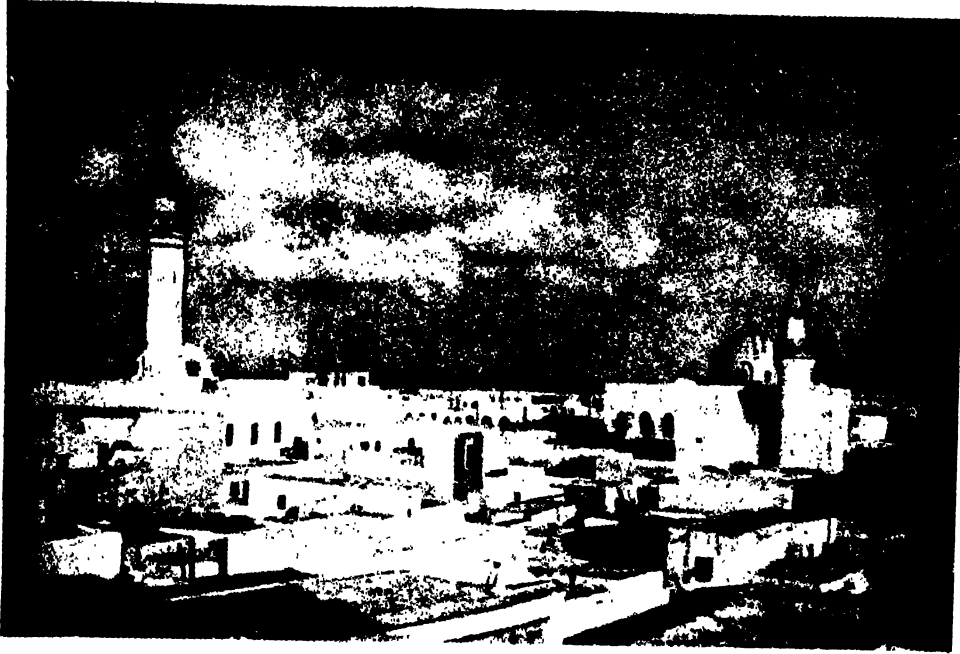
এ দেশে প্রচলিত। ভেড়ার মাংসের অভাব হইলে উষ্ট্র-মাংস দেশবাসীরা ব্যবহার করিয়া থাকে। উষ্ট্রের বিষ্ঠায় ঘুটে হয়। উষ্ট্রলোম বস্ত্রাবাসের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এখানকার প্রধান শস্য। স্কটল্যাণ্ডে এখান হইতে বার্লি প্রেরিত হয়। বার্লি হইতে উৎকৃষ্ট সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। জলপাই এতদঞ্চলে প্রচুরপরিমাণে উৎপাদিত হয়। সাইরেনাইকার

এক প্রকার তৃণ জন্মে। উহা কাগজের প্রকৃষ্ট উপাদান। বার্শা সহরটির উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত অধিক। বার্লির পর স্পঞ্জ এতদঞ্চলে প্রচুর-পরিমাণে উৎপাদিত হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই স্পঞ্জের ব্যবসা এখানে প্রচলিত। গ্রীক যোদ্ধারা শিরস্ত্রাণের নিম্নে স্পঞ্জ ব্যবহার করিত। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বভাগে—টিউনিস্ হইতে মিশরের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত স্থানে স্পঞ্জ-উপনিবেশগুলি প্রতিষ্ঠিত। এপ্রিল্ হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত গ্রীকরা এই শ্রমশিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। এই স্থানের স্পঞ্জ সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে
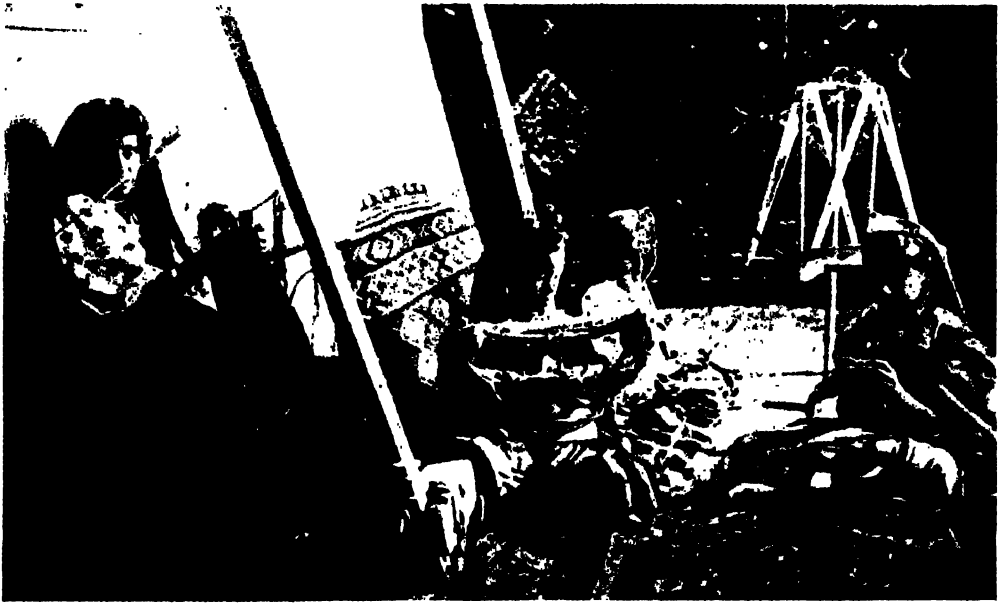
বেঙ্গাসীর রাজপথ

সাইরেনাইকার নারীরা কম্বল প্রস্তুত করিতেছে

সমুদ্রগর্ভ হইতে ডুবুরীরা স্পঞ্জ তুলিয়া আনে। একখানি ভারী পাথর হাতে লইয়া ডুবুরী জলের মধ্যে নামিয়া যায়। স্পঞ্জ তুলিয়া, পাথর ফেলিয়া দিয়া, জলের উপর ভাসিয়া উঠে। এই উপায়েই স্পঞ্জ সংগৃহীত হয়। কিন্তু ৪০ বৎসরের অধিককাল অল্পসংখ্যক ডুবুরীই বাঁচিয়া থাকে।

প্রাচীন বার্শা নগরের অধিবাসীরা প্রসিদ্ধ রথচালক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। এক সময়ে এখানে রথের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। যে সব প্রাচীন পথ বার্শা নগরে

আছে, তাহাতে এখনও রথ-চক্রের চিহ্ন বিদ্যমান আছে বলিয়া কয়েক জন মার্কিণ পরিব্রাজক তাঁহাদের রচনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রাম্য পাঠশালা

আধুনিক লিবীয়ায় দুই প্রকার বিচিত্র ডাকটিকিট দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর টিকিটে প্রাচীন গ্রীকদেবী আইসিসের মূর্ত্তি অঙ্কিত। মরু-উদ্যানের চিত্রের পার্শ্বে এই দেবীর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এক শ্রেণীর টিকিটের গাত্রে লিবীয় বন্দরের সম্মুখবর্ত্তী রোমক অপরাধীদিগের কর্ম্মভূমি

বার্শা নগর হইতে প্রাচীন সাইরেনীর ধ্বংসস্তূপে যাইতে হইলে মোটরযোগে এক দিন লাগে। বন্ধুর পার্ব্বত্যপথের মধ্য দিয়া গাড়ী অগ্রসর হইয়া থাকে। এই স্থানটি অরণ্য-বেষ্টিত এবং বসন্তকালে কমলালেবুর গাছে অজস্র ফল ও ফুল সমগ্র স্থানটিকে রমণীয় ও লোভনীয় করিয়া তুলে। গোলাপ ও অন্যান্য নানাজাতীয় মধুপুষ্পের প্রাচুর্য্য এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সাইরিনীর কাহিনী খৃষ্ট-জন্মের ৬ শত ৩১ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই

মরুভূমির কৃষক-পরিবার

প্রচলিত। থাইরা দ্বীপে (ইহার বর্ত্তমান নাম সান্‌টোরিন্) যখন বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইয়াছিল, সেই সময় উক্ত দ্বীপের অন্যতম নেতা আরিষ্টটল্‌স্ ডেল্‌ফির প্রত্যাদেশের জন্য দ্বীপ হইতে প্রেরিত হন। তিনি প্রত্যাদেশ পান, "তোমার বিশ্বস্ত অনুচরবর্গসহ দক্ষিণদিকে যাত্রা কর। আফ্রিকায় একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিবে।"

ক্রীট দ্বীপে উপনীত হইয়া তিনি পথিপ্রদর্শকের অনুসন্ধান করেন। তত্রত্য অধিবাসীরা আফ্রিকার সহিত পরিচিত ছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন ৫০ জন নাবিক-বাহিত দুইখানি অর্ণবপোতকে পথ দেখাইয়া লিবীয়ার তীরভূমিতে উপনীত হয়। বত্তা উপসাগরের একটি দ্বীপে আরিষ্টটল্‌স প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। লিবীয়ার অধিবাসীদিগের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তিনি ক্রমশঃ উত্তর-আফ্রিকার সমুদ্রতীর হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে নগর-স্থাপনের সংকল্প করেন। এখানে একটি পাহাড় হইতে ঝরণা নামিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে উহার নাম আপোলো উৎস বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সহরের নাম হইল সাইরিনী। স্থানীয় বনদেবতার নামেই এই নামকরণ হয়।

আরিষ্টটল্‌স্ এখানকার রাজা হইয়া "বাট্টস্" উপাধি লাভ করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত নগরের চারিদিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। ঔপনিবেশিকরা লিবীয়

উষ্ট্র ও বেদুইন সার্থবাহ

সাইরেনাইকার দেশীয় সেনাদল প্রার্থনায় নিযুক্ত

নারীদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইহার ফলে গ্রীক ও লিবীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়। সে সভ্যতা তদানীন্তন যুগে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

আপোলোনিয়া বন্দরে তখন বহু বাণিজ্য-জাহাজ আগমন করিত; সুতরাং সাইরিনী সহর পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময়ে এখানে অনেক প্রকার লতা-গুল্ম জন্মিত, তদ্দ্বারা নানাবিধ উৎকট রোগ আরোগ্য হইত। এই সকল ভেষজ গুণের প্রভাব রোম সাম্রাজ্যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বিষাক্ত সর্পের প্রতিষেধক ঔষধও সাইরিনীতে পাওয়া যাইত, সমস্তই ওষধিজাত। রোমক-প্রভাবের সময় এই ওষধির জন্য প্রচুর করভার সাইরিনীর জনসাধারণের উপর অর্পিত হয়। তখন অধিবাসীরা উক্ত বনলতা ধ্বংস করিয়া ফেলে। কালক্রমে সর্পবিষের এই তরুলতা আর এখানে উৎপন্ন হইত না।

সাইরেনাইকার মিষ্টান্ন-বিক্রেতা

সাইরিনী প্রাচীন যুগে গ্রীক উপনিবেশ-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, চিকিৎসা-জগতেও সাইরিনীর খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল। বহু শ্রেষ্ঠ বৈদ্য, কবি ও দার্শনিক সাইরিনীর বক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই নগরের যশঃ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। রাজবংশের এক জন যুবক দলবলসহ বার্শ্বা নগর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সাইরিনীর গৌরব হ্রাস পাইতে থাকে। রোমকদিগের রাজত্বকালে সাইরেনাইকার জন-সংখ্যা বর্ত্তমান জনসংখ্যার তিন গুণ ছিল।
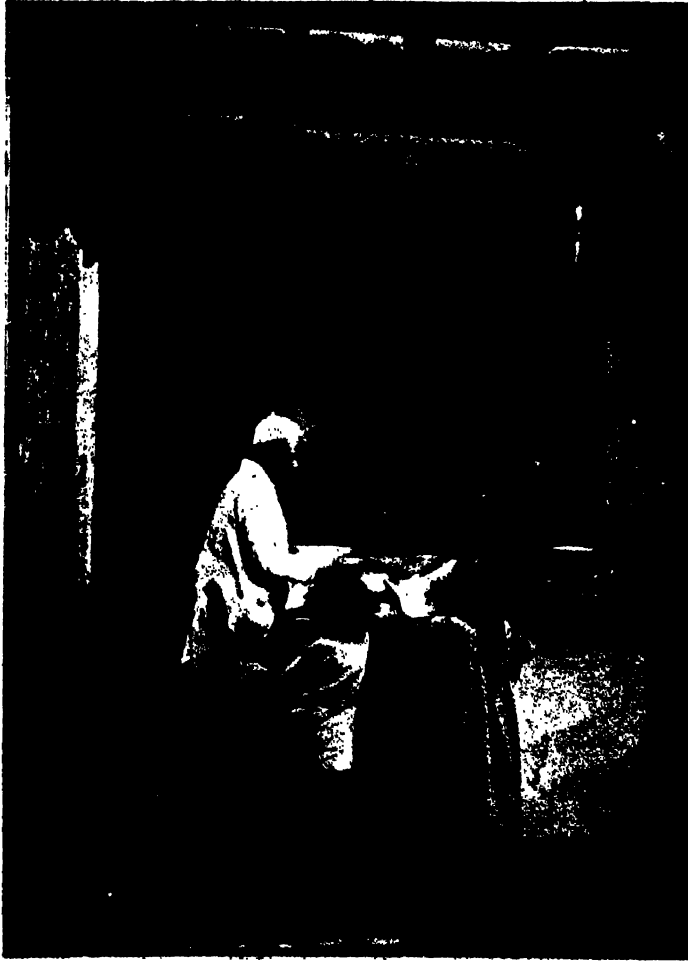
ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, এখানে অনেকবার ইহুদীদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। দিন দিন ইহুদীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিতে থাকায় তাহারা সম্রাট ট্রাজানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। সেই সময়ে বহু সহস্র রোমক ও লিবীয় নিহত হয়। এই সকল ঘটনার পর হইতে সাইরিনার পতন আরব্ধ হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবগণ যখন এখানে আসিয়াছিল, তখন সাইরিনী প্রায় ধ্বংসাবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

তুর্কীরা যখন এখানে আধিপত্য বিস্তার করে, সেই সময় অনেকগুলি বৈদেশিক প্রত্নতাত্ত্বিক এ দেশে পুনঃ পুনঃ আগমন করেন। তাঁহারা বহু ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্ম্মাণীতে লইয়া যান। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মার্কিণ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সাইরিনী খনন করিয়াছিলেন। তুরস্ক সরকার খননের আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় অধিবাসীরা মার্কিণদিগের কার্য্যে বাধা জন্মাইয়াছিল। জনৈক প্রসিদ্ধ মার্কিণ প্রত্নতাত্ত্বিককে তাহারা হত্যাও করে। ইদানীং ইটালীর কর্তৃত্বাধীনে অন্য কোনও বৈদেশিক প্রত্নতাত্ত্বিকদলকে খনন-কার্য্যের অনুমতি প্রদত্ত হয় না। শুধু ইটালীয় প্রত্নতাত্ত্বিকরাই সে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

সাইরিনীর বিরাট ভগ্নস্তূপের অধিকাংশই ভূগর্ভে সমাহিত। নগরের চারি মাইলব্যাপী প্রাচীর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরের পার্শ্বে খণ্ডশৈলসমূহ বিদ্যমান। প্রত্যেকের উপর বহু সমাধি-সৌধ। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই সকল পার্ব্বত্য সমাধি-সৌধ বিরাজমান। তাহাদের বর্ণানুলেপ এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। অবশ্য দস্যু-তস্কর রত্নলোভে এই সকল সমাধি আক্রমণ করিয়া আসিয়াছে—অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি লুণ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তিগুলি এখনও নষ্ট হয় নাই।

সাইরিনী ও বেন্‌গাসীতে যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত আছে। সমাহৃত মূর্ত্তিগুলি তন্মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। সাইরিনীর প্রসিদ্ধ ভিনস-মূর্ত্তির আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি ভীষণ ঝটিকা সমুত্থিত হয়। বারিপাতের ফলে এক স্থানের অনেকটা মাটী ধুইয়া যায়। তিন দিন পরে আকাশ পরিষ্কার হইলে প্রাতঃকালে জনৈক প্রত্নতাত্ত্বিক একটা প্রাচীন হামাম বা প্রসাধনাগারের একাংশ আবিষ্কার করেন। এত দিন উহা মাটীর নীচে চাপা পড়িয়া ছিল। অনুসন্ধানফলে ভিনসের রমণীয় মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। দেহের অন্যান্য অংশ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। শুধু মস্তক নাই।

সাইরিনীর ভগ্নস্তূপ হইতে কালে বহু অত্যাশ্চর্য্য মর্ম্মর-মূর্ত্তির আবিষ্কার অসম্ভব নহে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ আশা করিতেছেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন নগরী ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইলে, তাহার পথ, বাড়ী, স্নানাগার প্রভৃতি নানা কৌতূহলপ্রদ পদার্থ নরলোকের দৃষ্টিগোচর হইবে।

প্রাচীন নগরের সন্নিকটে একটি গ্রাম আছে। সেখানে এক জন সিসিলীয় রমণী একটি হোটেল খুলিয়াছেন। এখানকার জল-বায়ু সারা বৎসর পরম রমণীয়।

সাইরিনীর পূর্ব্বভাগে ডেরণা বন্দর অবস্থিত। এখানকার উদ্যানে নানা জাতীয় ফল ও ফুল পাওয়া যায়।

সাইরেনাইকার সীমান্ত সোলম উপসাগরের প্রান্তে শেষ হইয়াছে। সাইরেনাইকার সীমান্তপ্রদেশ দিয়া দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার সিউয়া মরু-উদ্যানে জুপিটার আমনের প্রত্যাদেশ জানিবার জন্য সসৈন্যে অভিযান করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি দেবতার পুত্র। সিউয়ার মন্দিরে উপনীত হইয়া তিনি প্রত্যাদেশে জানিতে পারেন যে, প্রকৃতই তিনি জুয়সের পুত্র। খৃষ্টজন্মের ৩ শত ৩১ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এসিয়া-জয়ের জন্য বহির্গত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর সাইরেনাইকায় মিশরীয় টলেমির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টজন্মের ৯৬ বৎসর পূর্ব্বে টলেমি-বংশের শেষ নৃপতি সাইরেনাইকার শাসনভার রোমান সেনেটের হস্তে অর্পণ করেন। বিগত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সাইরিনী খননকালে একটা অনুশাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাতে উল্লিখিত সংবাদ ক্ষোদিত আছে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

স্বপ্ন-মায়া

সুন্দর তাই ছুটে আসি হায়
আপনা পাসরি' আমি,
স্বরগ হইতে মূর্ত্ত অমৃত—
কে যেন আসিল নামি'।

মাধুরী-মাখানো সুমধুর হাসি,
উছলি' পড়িছে জ্যোতি উদ্ভাসি'
এক সাথে যেন মিলেছে আসিয়া
দিবা ও জ্যোৎস্না-যামী।

ফুলের রাণী কি ফুল-সম্ভারে
গোপনে আসিয়া দাঁড়ায় দুয়ারে,
কি ভাষা তাহার বুকের মাঝারে
জানে অন্তর্য্যামী।

কোন্ সে শিল্পী লঘু-তুলিকায়
ফুটালো ও রূপ-রাগ তনুকায়,
উদাসী হাওয়া যাক্ দেখে যাক্
হেথায় বারেক থামি'।

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

প্রতিশোধ

১

"গলায় দড়ি, আমার গলায় দড়ি! কেন মত্তে আমি সেখানে গিয়েছিলুম?"

জ্ঞানদার তীব্রকণ্ঠে হরেন্দ্রনাথ চক্ষু চাহিয়া বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিল।

জ্ঞানদা বলিয়া যাইতে লাগিল—"শুধু তোমার কথাতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে এই অপমানটা হয়ে এলুম।"

অকাল-নিদ্রোত্থিত হরেন্দ্রনাথ একটা হাই তুলিয়া বলিল, "বলি, ব্যাপারটা কি? যত ঝাল শেষটা আমার ওপরেই মেটাচ্ছ দেখছি। তুমি গেলে বড়লোকের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে, লুচি, সন্দেশ, দই, ক্ষীর—"

ঝঙ্কার দিয়া জ্ঞানদা বলিল, "পোড়া কপাল লুচি-সন্দেশ খাওয়ার! লুচি ত কখন খাইনি! আজই না হয় কিছুই নেই—কিন্তু তুমি ত জান, এই সে দিনও এই দু'খানা হাত লুচি তৈরী ক'রে ঝি-চাকরকেও খাইয়েছে। আজ কি না ক্ষ্যান্ত পিসী বলে—'আমার পোড়া কপাল, আমি মত্তে খেতে গিয়েছিলুম!'

হরেন্দ্র বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া প্রচ্ছন্ন হাস্যের সহিত বলিল, "বলি, ব্যাপারটা কি, তাই না হয় ছাই খুলেই বল।"

জ্ঞানদা ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "বলব কি আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমি খেতে বসেছি, এমন সময় ও-পাড়ার ব্রজমোহন বাবুর পরিবার এল খেতে—বড়মানুষের বৌ এসেছে, আর কি রক্ষে আছে! সকলে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ল। দেখতে পাচ্ছ ত এই রোগা ছেলেটাকে ঘরে রেখে গিয়েছি, কাযেই তাড়াতাড়ি কচ্ছি। সেই জন্যে ক্ষ্যান্ত পিসীকে বল্লুম যে, আমার ছেলেটার অসুখ, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আর যায় কোথা! সে ব'লে বসল, 'ওরে বাবা রে, কি হাঘরে! একটু তর সয় না—লুচি কখন চোখে দেখেনি কি না!' এই কথা না শুনে আমি আর কোনো দিকে না চেয়ে সটান বাড়ী চ'লে এসেছি।"

মুহূর্ত্তমাত্র হরেন্দ্রনাথের চোখে যেন একটা তীব্র ক্ষোভের ও বিরক্তির চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল। পর-মুহূর্ত্তে ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, "বীর বটে! তা তুমি যে চ'লে এলে, কেউ কিছু বল্লে না?"

"এসেছিল গিন্নী একবার—তা আমি ছেলের অসুখের কথা বলেই চ'লে এসেছি, আর দাঁড়াই নি। তা এতে আমার অপরাধটা কি, তাই বল।"

হরেন্দ্র মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, "আমি ত' দেখছি তোমারই অন্যায়।"

রাগে একবারে ছিটকাইয়া পড়িয়া জ্ঞানদা বলিল, "আমারই অন্যায়?"

"শুধু অন্যায়—মস্ত অপরাধ।"

"অপরাধ—আমার? কি অপরাধ, তাই না হয় শুনি।"

"অপরাধ আবার একটা নয়—একাধিক।"

"ও সব পণ্ডিতী কথা ছেড়ে দিয়ে আমার কি অন্যায়, সেইটে সোজা কথায় বল।"

"প্রথম ও প্রধান অপরাধ হচ্ছে—তোমার ওই চটা-ওঠা রুলি দু'গাছা হাতে দিয়ে যাওয়া। তোমার গায়ে সাবেকের মত যদি সব গয়না থাকত, তা হ'লে ক্ষ্যান্ত পিসী কেন—ঐ ব্রজমোহন বাবুর পরিবারই কি তোমাকে অগ্রাহ্য করতে পারত? দ্বিতীয় অপরাধ এই—ওই রকম অবস্থাতে তোমার উচিত ছিল—চুপচাপ ব'সে দয়া ক'রে যখন যা দেয়, তাই খাওয়া। তা নয়, তুমি কি না, খাবার জন্যে তাড়া দিয়েছ—আবার তা-ও কি না, যখন তারা বড়মানুষের বো'র খাতির করছে—তখন! এ সব তোমার অপরাধ নয়?"

জ্ঞানদা গলায় আঁচল দিয়া করযোড়ে বলিল, "আমি অপরাধ স্বীকার করছি; কিন্তু এর দণ্ড দিতেও ত' তারা ছাড়ে নি।"

হরেন্দ্র বলিল, "তা কি কেউ ছেড়ে থাকে?"

জ্ঞানদা অভিযোগের সুরে বলিল, "দেখ, এই রকম ঘরে-বাইরে লাঞ্ছনা আর সহ্য হয় না। এর একটা বিহিত কর। বাইরে আজ যা হয়েছে, ঘরে এর চতুর্গুণ হবে, তা আমি তোমায় ব'লে রাখছি। এ সুযোগ দিদি ছাড়বে না—যিনি অপরাধে যা করে, তার ত' কথাই নেই—আজ আবার ছুতো পেয়েছে।"

এমন সময় বাহিরে বড় বৌএর খন্‌খনে আওয়াজ শোনা গেল—"এমন বেহায়া বৌ বাপু বাপের জন্মে দেখিনি! তেজ কি—যেন সেরাজুদ্দোলা! ঐ তেজেই ত সব গেছে। এখনও হয়েছে কি! ও যদি তাতে হাত দিতে—"

জ্ঞানদা ঘরের বাহির হইয়া বাধা দিয়া বলিল, "দেখ দিদি, এমনি যা খুসী বল, কিন্তু আকথা-কুকথাগুলো ব'ল না।"

"কেন, ভয় কি? তোকে ভয় ক'রে আমায় এ বাড়ীতে থাকতে হবে?—আ লো!"

"ভয় তুমি দুনিয়ায় কাকেও কর না, সে গাঁ-শুদ্ধ সব্বাই জানে, আমি সে কথা তোমায় বলিনি। আমি শুধু এই কথা বলছি যে, গালমন্দ দিও না।"

"কেন, তোর খাই—না, পরি যে, তোর কথা শুনতে হবে?"

"তোমাকে কথা যে শোনাতে পারবে, সে এখনও মা'র গর্ভে আছে।"

"বটে! আমি বড় মন্দ, আর তুই বড় সাধু, না? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!"

এতক্ষণ ক্ষ্যান্ত পিসী এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এখন অগ্রসর হইয়া বলিল, "এ কথাটা তোমার ভাল হয় নি, ছোট-বৌ, হাজার হোক বড় যা—গুরুনোক।"

বড়বৌ গালে হাত দিয়া বলিল, "অবাক্ কল্লে তুমি পিসী! ভাসুরকেই বড় গ্রাহ্যি করে, তা আমি কোন্ দাসী-বাঁদী!"

ক্ষ্যান্ত পিসী হাত নাড়িয়া বলিল, "হরেন বাড়ী এলে তাকে ব'লে দিও, সে তার মাগকে শাসন করুক।"

"ওই ত মেনীমুখো মিন্‌ষে ঘরে ব'সে রয়েছে। দিক না এসে মাগের মুখখানা পাঁশের ওপর ঘষড়ে। কাণের মাথা ত খায়নি যে, শুনতে পাচ্ছে না?"

হরেন্দ্রের গৃহাবস্থানের কথা শুনিয়া পিসীর কণ্ঠ একবারে নীরব হইল। কেন না, এই সে দিনও—হরেন্দ্রের এই দারুণ দুঃসময়েও সে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে; পড়ো ঘর ছাইয়া দেওয়া, আরও কত কি—অতীতের সে সব কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল।

ক্ষ্যান্ত পিসীর মনোভাব বুঝিতে বড়বৌ মন্দাকিনীর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। সে তীব্র শ্লেষের সহিত বলিল, "কি গো পিসী, একেবারে যে বাক্যি হ'রে গেল?"

"তা নয় বাছা, ঘরের দরজা ভুলে খুলে রেখে এসেছি। আ আমার পোড়াকপাল!" বলিয়া বোধ করি বা সেই পোড়া-কপাল শোধরাইবার জন্যই পিসী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

বড়বৌ, জ্ঞানদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা। কবে তোরা এখান থেকে যাবি?"

ছোট-বৌ জবাব দিল, "কেন যাব? বাড়ী তোমার একলার? আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি—না?"

"বাড়ী আমার কি না, আদালতে তা লেখা আছে—জানিস্ নি?"

"জানি, কিন্তু এটাও জানি যে, সেটা কেবল তোমারই কৌশলে তোমার নামে বেনামী।"

"তবে রে হারামজাদী! বেনামী! দূর হ—দূর হ—দূর হ! আজ রাত্তির 'পেরভাতের' সঙ্গে সঙ্গে যদি না দূর হবি ত তোর বেটার মাথা খাবি।"

ছোট-বৌ দুই হাতে কাণ দুইটা চাপিয়া ধরিয়া ঝড়ের মত ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই স্বামীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল, "আর এক দিন যদি আমাকে এখানে থাকতে হয় ত আমি এমনি ক'রে তোমার পায়ের গোড়ায় মাথা খুঁড়ে মরব।" বলিয়া পা ছাড়িয়া মাটীতে মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

জ্ঞানদাকে সস্নেহে দুই হাতে তুলিয়া হরেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

২

হরেন্দ্র জ্ঞানদাকে আশ্বাস দিল বটে, কিন্তু কি উপায়ে যে তাহা সম্ভব হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। বর্ত্তমানে তাহার অবস্থা যেরূপ, তাহাতে কলিকাতায় যাইয়া ভদ্রভাবে বাস করা এক প্রকার অসম্ভব; অথচ এ ভাবে এ স্থানে বাস করাও যায় না। নিজ পৈতৃক বাটীতে 'পরবাসী' হইয়া থাকা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা সে হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছিল। নিজে সে দিনের অধিকাংশ সময় বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া দিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানদার ও উপায় নাই, সুতরাং তাহাকে অহরহঃ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। বিশেষ হরেন্দ্র যখন বাড়ীতে না থাকে, তখনই আক্রমণটা পূর্ণমাত্রায় চলে।

হরেন্দ্র নগেন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র হইলেও তাহাকে সহোদরাধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত এবং এত দিন তাহারা এক সংসারেই বাস করিত। তাহাদের বাটী কলিকাতা হইতে মাইল পনেরো পশ্চিমে রাইপুর গ্রামে। নগেন্দ্র সেই প্রকৃতির লোক—যাহারা যে কোন উপায়ে হউক, শান্তি উপভোগ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয় এবং তজ্জন্য যদি সাময়িক অসঙ্গত ব্যবহারও করিতে হয়, তাহাতেও তাহাদিগের আপত্তি হয় না। কিন্তু সেটা তাহার প্রখরা স্ত্রীকে শান্ত করিবার মৌখিক প্রচেষ্টা মাত্র। নহিলে আসলে নগেন্দ্র লোক ভাল। সময়ে সময়ে সে এ দুর্ব্বলতাকে পরিহার করিবার চেষ্টা যে না করিত, তাহা নহে; কিন্তু স্বার্থপরায়ণা স্ত্রীর প্রচণ্ড বাক্যস্রোতে শান্তিপ্রিয় নগেন্দ্রের সে সঙ্কল্প ভাসিয়া যাইত। হরেন্দ্র যখন রীতিমত উপার্জ্জন করিত, তখন কোনও গোল ছিল না; বড়-বৌ মন্দাকিনীর মনে মনে যাহাই থাকুক, মুখে সে আত্মীয়তা দেখাইতে ত্রুটি করিত না। কেন না, হরেন্দ্রের পয়সাতেই সংসার নির্ব্বিবাদে চলিয়া যাইত। স্বামীর সমস্ত অর্জ্জনই তাহার তহবিলজাত হইত। কিন্তু যখন হইতে হরেন্দ্রের আয় একবারে কমিয়া গিয়াছে, তখন হইতেই বড়-বৌ নিজমূর্ত্তি ধরিয়াছে। এখন স্বামীর সামান্য অর্জ্জন সঞ্চিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে সঙ্কুলান হওয়াও দুর্ঘট; ইহা স্বার্থসর্ব্বস্ব বড়-বৌ মন্দাকিনীর অসহ্য হইল। ফলে সংসারে এই অশান্তি।

হরেন্দ্র পূর্ব্বে দালালী করিত এবং তাহাতে তাহার বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন হইত। যখন কলিকাতায় বাড়ীর দর উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, সেই সময় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া একখানা বাড়ী কিছু সুবিধা দরে সে নিজের নামে বায়না করে। তাহার মতলব ছিল, কিছু দিন বাদে দাঁও বুঝিয়া সেই বাড়ীখানা বেচিয়া মোটা রকম লাভ করিবে। তাহার পরই কিন্তু বাড়ীর দর না বাড়িয়া কিছু নামিয়া পড়ে। তখন অনেকে তাহাকে তখনই বাড়ীখানি বেচিয়া ফেলিতে পরামর্শ দেয়, কিন্তু হরেন্দ্র সে কথায় কর্ণপাত করিল না। এই সময় মন্দাকিনী তাহার কোনও আত্মীয়ের পরামর্শানুসারে প্রস্তাব করিল যে, এই সময় হরেন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তি বেনামী করাই উচিত; কেন না, যদিই বায়না-করা বাড়ীর জন্য দায়ে পড়িতে হয়, তাহা হইলে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাহাকে কেহই উচ্ছেদ করিতে পারিবে না। এ পরামর্শ হরেন্দ্রের মনোমত না হইলেও সকলের মতানুসারে সে সম্মত হইল এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীয় সম্পত্তি বড়বধূ মন্দাকিনীর নামে বেনামী করিয়া দিল।

ইহার কিছু দিন পরেই বাড়ীর অধিকারী হরেন্দ্রকে বাকী টাকা মিটাইয়া বাড়ী রেজেষ্ট্রী করিয়া লইবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিলেন। অথচ বাড়ীর দর তখন একবারে পড়িয়া গিয়াছে। হরেন্দ্রের এমন টাকা নাই যে, বাড়ীটি কিনিয়া লয়। বাড়ীর অধিকারী শিবশঙ্কর বাবুর নানাবিধ ব্যবসায়ের মধ্যে বাড়ী-বেচা-কেনাও একটি। হরেন্দ্র তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলিল। শিবশঙ্কর বাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, বায়নার সময়কার দর ও এখনকার দরে প্রায় বিশ হাজার টাকা তফাৎ। তিনি হরেন্দ্রের অবস্থা এবং সত্য-প্রিয়তা দেখিয়া মাত্র ১০ হাজার টাকা লইয়া তাহাকে দায়মুক্ত করিতে সম্মত হইলেন। এই ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করিতে হরেন্দ্রের সঞ্চিত টাকা ও জ্ঞানদার যাবতীয় অলঙ্কার নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া গেল। এখন ৪০ টাকার কেরাণীগিরি মাত্র তাহার সম্বল।

এই ঘটনার পর হইতেই বড়বধূ ভাবিতেছে, এখন যদি কোনও উপায়ে ইহাদিগকে তাড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলেই নির্ব্বিবাদে সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করা সম্ভব হইবে।

সে দিন সন্ধ্যার পর হরেন্দ্র কলিকাতা হইতে ফিরিতেই জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ী ঠিক ক'রে এলে?"

হরেন্দ্র উৎসাহহীনভাবে বলিল, "ঠিক ত ক'রে এলুম, কিন্তু সেখানে তুমি থাকতে পারবে কি? বড় কষ্ট হবে তোমার।"

জ্ঞানদা কহিল, "দেখ, একটা কথা আছে,—'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল,' এ কথাটা খুব সত্যি।"

হরেন্দ্র বলিল, "কথাটা শুনতেও বেশ—বলতেও ভাল, কিন্তু কাযে করা বড় কঠিন।"

জ্ঞানদা বলিল, "কিছু কঠিন নয়। এখানের এ বাক্য-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

হরেন্দ্র ক্ষোভের সহিত বলিল, "আমি তখন বেনামী করতে রাজী হই নি, কিন্তু তোমরা সবাই মিলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কাযটা করালে। এখন সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত করতে হবে। টাকা, গয়না সবই গেল—সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তিও গেল। পরকে ফাঁকি দেবার মতলব করলেই এই

ফল হয়।" ব'লতে বলিতেই হরেন্দ্রের একটা প্রবল দীর্ঘ-শ্বাস পড়িল।

জ্ঞানদা লজ্জায় একবারে মরিয়া গেল। সে হাত যোড় করিয়া কহিল, "আমার সে অপরাধ একশোবার স্বীকার করছি আর তার ফলও ভোগ করচি। কিন্তু এখানে আর না, যত কষ্টই হোক, এখান থেকে যেতেই হবে।"

হরেন্দ্র বলিল, "কিন্তু চলবে কি ক'রে? মাইনে ত এই মোটে ৪০ টাকা, তাতে ঘরভাড়াই বা দেব কি, আর নিজেরা খাবই বা কি?"

জ্ঞানদা হাসিয়া বলিল, "এখানেই বা কোন্ তোমার জমীদারীর আয় আছে যে, চলছে? দিদি ত আঁশ ধুয়ে আঁশের জলও দেয় না।"

হরেন্দ্র বলিল, "তা বটে, তবে কি জান, যতই কষ্ট হোক, জন্মভূমি, তার ত একটা মায়া আছে।"

জ্ঞানদা কহিল, "জন্মভূমি ত আমরা একেবারে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছিনে। অবস্থা ফিরলেই আবার আমরা দেশে আসব।"

হরেন্দ্র হতাশভাবে বলিল, "আর অবস্থা ফিরেছে!"

জ্ঞানদা দৃঢ়স্বরে কহিল, "কেন ফিরবে না? তুমি ত আর বুড়ো হওনি। কিন্তু এভাবে 'ডেলি প্যাসেঞ্জারী' করলে কোন দিনই অবস্থা ফিরবে না, বরঞ্চ কলকাতাতে থাকলে সকালে বিকালে যে সময় পাবে, সেই সময় দালালী করলে নিশ্চয়ই কিছু পাবে, বিশেষ এ কায যখন তুমি জান।"

হরেন্দ্র এ কথায় প্রথমটা কিছু উৎসাহিত হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে সে বলিল, "এ কায আমি জানি, তা খুবই সত্যি, চেষ্টা করলে চাই কি কিছু পেতেও পারি, কিন্তু সেই ব্যাপারের পর আর পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা করতে মাথা কাটা যায়।"

জ্ঞানদা উত্তেজিতভাবে কহিল, "মাথা কাটা যাবে কেন, তুমি ত কাকেও ফাঁকি দাওনি—বরঞ্চ নিজেই সর্ব্বস্বান্ত হয়েছ। তুমি যদি তাকে টাকা না দিতে, তা হ'লে না হয় লজ্জার কারণ থাকত।"

হরেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা তুমি বলছ মন্দ নয়। বেশ, তোমার কথাই—কি বলে 'শিরোধার্য্য'!"

জ্ঞানদা হাসিয়া বলিল, "যাও, ঠাট্টা করতে হবে না। ঘরভাড়া কত লাগবে?"

"আট টাকা।"

"তা দেখ, তোমাকে মাসে ত' প্রায় ছটাকা গাড়ী ভাড়া দিতে হয়, তা ছাড়া মাঝে মাঝে ট্রামভাড়াও আছে। তবে আর এমন বেশী কি?"

"বেশী অবশ্যই নয়; কিন্তু সেখানে বাস করতে পারবে কি না, সেইটেই ভাবনার কথা।"

"আমি ঠিক পারব গো, ঠিক পারব, তুমি দেখে নিও।"

হরেন্দ্র ইহার কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন হরেন্দ্র যখন মোট-ঘাট বাঁধিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন নগেন্দ্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি?"

হরেন্দ্র লজ্জিতভাবে উত্তর করিল, "কলকাতায় বাসা করলাম।"

নগেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

হরেন্দ্র উত্তর দিল, "যাতায়াত করা বড় কষ্টকর, আর পেরে উঠছিনে।"

নগেন্দ্র কি বুঝিল, বলা যায় না, কেবল সনিশ্বাসে "বেশ" বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

তাহারা যখন বাটীর বাহিরে পা দিয়াছে, সেই সময় বড়বৌ আসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "কি গো, বড়মানুষের মেয়ে; কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

ছোটবৌ প্রণাম করিয়া বলিল, "হাওয়া খেতে।"

বড়বৌ শ্লেষের সহিত বলিল, "কবে ফেরা হবে?"

ছোটবৌ ধীরভাবে বলিল, "যে দিন প্রতিশোধ নিতে পারব।"

"কি প্রতিশোধ নিবি লো তুই, নে না"—তীব্রস্বরে এই কথা বলিয়া বড়বৌ দুই হাত দুই কোমরে রাখিয়া ঈষৎ নীচু হইয়া মুখ বাড়াইয়া দিল।

"যদি কোন দিন নিতে পারি ত দেখতে পাবে।" বলিয়া ছোটবৌ ধীরে ধীরে গাড়ীতে যাইয়া উঠিল। বড়বৌ গতিশীল গাড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, "দূর হ—দূর হ! নিপাত যা—নিপাত যা!"

৩

বৌবাজারের এক অপ্রশস্ত গলী। এই গলীর ততোধিক অপ্রশস্ত এক উপ-গলীর ভিতর একটি দ্বিতল বাটী। বাটীটির একটি মস্ত গুণ এই যে, তাহার অধিবাসীদিগকে সূর্য্যতাপ সহ্য

করিতে হয় না, ফলে অযথা সূর্য্যালোকে চক্ষুঃপীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। দিবসের অধিকাংশ সময়ই হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া বড় মজাতেই তাহারা বাস করিয়া থাকে!

বাড়ীটির উপর-নীচে বারোখানি ঘর। উপরের চারিখানি ঘরের দুইখানি ঘরে বাড়ীওয়ালা স্বয়ং সপরিবারে বাস করে এবং বাকী দুইখানিতে দুই জন ভাড়াটিয়া। নীচের আটখানি ঘরে আট জন ভাড়াটিয়া। প্রত্যেক ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দা দরমা দিয়া ঘেরা। সেই স্থানেই রন্ধন করিতে হয়। সেই অপ্রশস্ত রন্ধনস্থানের পার্শ্বে কোন ভাড়াটিয়ার ভাঙ্গা ঝুড়িতে, কাহারও বা কেরোসিনের টিনে, কোন হিসাবী লোকের বা লোহার ছোট পিপায় কিছু কিছু কয়লা ও ঘুঁটে আছে, এবং প্রত্যেকেরই এক এক বাল্‌তি জল রক্ষিত। সেই স্থানে রাঁধিতে বসিলেই দেহের অর্দ্ধাংশ বাহির হইয়া থাকে। নীচের প্রত্যেক ঘরের ভাড়া ৮ টাকা ২ আনা, উপরের ঘরের প্রত্যেকটির ভাড়া ১২ টাকা ৩ আনা।

বাড়ীটিতে দুইটি কল, দুইটি চৌবাচ্ছা, দুইটি পায়খানা; তাহার মধ্যে একটি পায়খানা উপরে, তাহা বাড়ীওয়ালার নিজস্ব —অপরের ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। একটি কল ও তৎসংলগ্ন চৌবাচ্ছাকে দরমা দিয়া ঘিরিয়া 'বাথরুমে' পরিণত করা হইয়াছে। ঘর-ভাড়া লইতে গেলে বাড়ীওয়ালা অতি বিনীতভাবে এই 'বাথরুম', কল ও চৌবাচ্ছা দেখাইয়া দিয়া বলে, "মশায়, আমার এখানে কোনও অসুবিধাই নেই—সব পৃথক্ বন্দোবস্ত, আপনার কোনও কষ্টই হবে না—ঠিক নিজের বাড়ীর মত।" কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায়, সেই 'বাথরুমে' কাহারও প্রবেশাধিকার নাই; কারণ, গৃহিণীর ভাষা এমনই শ্রুতিমধুর যে, তাহার সম্মুখে অতি বড় মুখরারও স্থান হয় না। শুধু ইহাই নহে, তিনি 'বাথরুমে' প্রবেশ করিলেই অপর কলটি খোলা নিষেধ; কারণ, তাহাতে তাঁহার অসুবিধা হয়। যদি কেহ তাড়াতাড়ির জন্য দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ খোলেন, তাহা হইলে গৃহিণীর "কে র‍্যা?" শুনিবামাত্র তাঁহার সেই দুঃসাহস সহসা অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাহা ছাড়া, বাড়ীওয়ালার সম্পর্কিত যে কেহ সেই 'বাথরুমে' প্রবেশ করিলেই "কল বন্ধ কর—কল বন্ধ কর" রব। তাহার উপর বাড়ীখানিতে সর্ব্বজাতিসমন্বয়।

বাড়ীতে পা দিয়াই জ্ঞানদা শিহরিয়া উঠিল। তাহার পর সে যখন নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার মুখ একবারে ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। দুই হাতে দুই সন্তানকে আঁকড়িয়া ধরিয়া স্তব্ধভাবে সে দাঁড়াইয়া রহিল। পীড়নের তাড়নায় এ সে কি করিয়া বসিয়াছে! স্বাস্থ্যকর দ্বিতল গৃহ হইতে তাহার সন্তানদিগকে সে এ কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে!

গাড়ী হইতে জিনিষ-পত্র নামাইয়া হরেন্দ্রের দৃষ্টি যখন জ্ঞানদার উপর পড়িল, তখন তাহার দুই চোখ জলে পূরিয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সামলাইয়া লইয়া মুখে হাস্যরেখা আনিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া সে বলিল, "ওগো, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলে ত চলবে না; সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে; ছটায় সময় কলের জল চ'লে যাবে, আর এক ফোঁটাও পাবার উপায় থাকবে না।"

জ্ঞানদা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "এর চেয়ে কি একটু ভাল বাড়ী পাওয়া যায় না?"

হরেন্দ্র উত্তর দিল, "অভাব কি? বিশ, পঞ্চাশ, একশ, দু'শ, হাজার, দু'হাজার, যত ভাড়া দিতে পারবে, ততই ভাল বাড়ী পাবে।"

এত দুঃখেও জ্ঞানদার মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "কি যে বল, তার ঠিক নেই। আমি কি তাই বলছি? আমি বলছি যে, এই রকম ভাড়ায় উন্নির মধ্যে একটু দেখে শুনে—"

হরেন্দ্র বলিল, "তা ত দেখে নিতেই হবে। নইলে এখানে যে তুমি থাকতে পারবে না, তা জানি। তবে তুমি বড্ড তাড়া দিলে কি না, তাইতে ভাল ক'রে খোঁজবার ত অবসর পেলুম না।"

জ্ঞানদা কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "কিন্তু দেখ, আজ আর রান্না হয়ে উঠবে না। একটু দুধ এনে দাও, আর কিছু খাবার নিয়ে এস।" এই বলিয়া সে গৃহস্থালী পাতিতে মনঃসংযোগ করিল।

৪

"অত দ্রুতপদবিক্ষেপে কোথায় হে?"—রাস্তায় হরেন্দ্রের এক বন্ধু প্রশ্ন করিল।

হরেন্দ্র উত্তর দিল, "সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে।"

"সে আবার কোথায়?"

"এই যাকে সোজা কথায় কলেজ স্কোয়ার বলে।"

"সে আবার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় হ'ল কি ক'রে ?"

"এটুকুও লক্ষ্য ক'রে দেখনি ? তবে তোমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দি। আচ্ছা, মৃজাপুর ষ্ট্রীট দিয়ে কলেজ স্কোয়ারে পড়তেই প্রথমেই ব্যাপটিষ্ট মিশন, তার পর বুদ্ধিষ্ট টেম্পল, তার পরই 'সঞ্জীবনী" অফিস—এটা ব্রাহ্ম সমাজের একটা অঙ্গ; তার গায়েই মসজিদ, তার ওপিঠে শিবের মন্দির; সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় কি না, মিলিয়ে নাও।"

শুনিয়া বন্ধুটি হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "বলেছ মন্দ নয়। আমাদের দৃষ্টি কিন্তু এ দিকে যায় না।"

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তা না যাক, কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায় ?"

"তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

"আমার কাছে ? কি ভাগ্য ! দরকারটা কি শুনি ?"

"শিবশঙ্কর বাবু তোমাকে একবার ডেকেছেন, বিশেষ দরকার আছে।"

"শিবশঙ্কর বাবু আমাকে ডেকেছেন ? কেন ? আমি ত তাঁর সব দাবীই মিটিয়ে এখন রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, তবে আর ডাকা কেন ?"

"তা ত বলতে পারিনে। তবে তাঁর বিশেষ অনুরোধ, তুমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর।"

"কবে যেতে হবে ?"

"যত শীগ্‌গির হয়।"

"আচ্ছা, তুমি ব'লে দিও, আজই সন্ধ্যার পর যাব।"

"বেশ, ভাল কথা; আমি তাঁকে তাই বলব।"—বলিয়া বন্ধুটি চলিয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার পরই হরেন্দ্র শিবশঙ্কর বাবুর বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। হরেন্দ্র তাহার আগমন-সংবাদ জানাইতেই এক জন বেয়ারা তাহাকে শিবশঙ্কর বাবুর সম্মুখে পৌছাইয়া দিল। তিনি মহাসমাদরের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিলেন।

শিবশঙ্কর বাবুর মানুষ চিনিবার শক্তি ছিল অসাধারণ। হরেন্দ্র যখন তাহার অবস্থা সমস্তই তাঁহাকে খুলিয়া বলিয়াছিল, তখনই তিনি হরেন্দ্রের সততায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হইয়া পড়েন এবং বুঝিয়াছিলেন, হরেন্দ্র প্রকৃতই এক জন 'মানুষ।' তিনি আরও জানিতেন, হরেন্দ্র কর্ম্মদক্ষ, উৎসাহী ও পরিশ্রমী। তিনি কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই বলিলেন, "দেখুন হরেন্দ্র বাবু, আমি সম্প্রতি একটা বড় কোলিয়ারী কিনেছি; কিন্তু তার ব্যবস্থা এমনই বিশৃঙ্খল যে, কোনও উপযুক্ত লোক যদি সেখানে না থাকে, তা হ'লে সেটাতে আমাকে লোকসান খেতে হবে।"

হরেন্দ্র কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। শিবশঙ্কর বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এখন সেই লোকসান যাতে না হয়, সে জন্ম আমাকে এক জন উপযুক্ত লোক সেখানে রাখতে হবে। এ বিষয়ে আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন।"

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি ? আমি কি সাহায্য করতে পারি ?"

শিব বাবু বলিলেন, "আমার ইচ্ছা যে, আপনি জেনারেল ম্যানেজার হয়ে সেখানে যান। আমি আপনাকে আমার কর্ম্মচারী হয়ে যেতে বলছি নে। ওয়ার্কিং পার্টনার হয়ে সেখানে যাবেন। সেখানে থাকবার উৎকৃষ্ট ফ্যামিলি কোয়ার্টার আছে; চাকর, দরোয়ান—এ সবই আছে। আপনার কোনও অসুবিধা হবে না। কেবল রাঁধুনী এক জন আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। আপনি এখন মাসে মাসে দেড়শ' টাকা খরচ করবেন। তার পর সব ঠিক হয়ে গেলে লাভের দশ আনা আমার, ছ'আনা আপনার।"

হরেন্দ্র একবারে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িল। এ কি সম্ভব ? কোথায় মাসিক ৪০ টাকার কেরাণী—আর কোথায় বড় একটা কোলিয়ারীর ম্যানেজারী ! মাসিক দেড় শত টাকা হাত-খরচ—চাকর, দরোয়ান—স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ—ভবিষ্যতের বিপুল আশা !

হরেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া শিবশঙ্কর বাবু বলিলেন, "কি ভাবছেন, হরেন্দ্র বাবু ?"

হরেন্দ্র সংবিৎ পাইয়া বলিল, "আমার দ্বারা কি এ কায সম্ভব ?"

শিবশঙ্কর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "সম্ভব না হ'লে আমি আপনাকে এ কাযের ভার দিতাম না। আমি বৃথায় এত দিন মানুষ চরিয়ে আসিনি হরেন্দ্র বাবু। তবে যদি সর্ত্তের ভিতর কোনখানে আপনার মতের অমিল হয়, তাও বলুন।"

হরেন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "না—না, আপনার ন্যায় বিবেচকের কোনও ব্যবস্থাই অসম্পূর্ণ নয়। আমি আপনার ন্যস্ত বিশ্বাস রক্ষা করতে পারব কি না, তাই ভাবছি।"

শিবশঙ্কর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "সে ঠিক হয়ে যাবে। তা হ'লে আপনি কবে যাচ্ছেন ?"

"যে দিন আপনি বলেন।"

"শুভস্য শীঘ্রম্! তা হ'লে বিলম্বে কায কি ? পরশু দিন সন্ধ্যায় ট্রেণে আপনি রওনা হ'ন।"

হরেন্দ্র কিছু বিপন্নভাবে ব'লিল, "কিন্তু—"

"ওঃ" বলিয়া শিবশঙ্কর বাবু ড্রয়ার খুলিয়া কতকগুলি নোট বাহির করিয়া তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই হাজার টাকা আপনি এখন নিয়ে যান। এতে আবশ্যক জিনিষপত্র সব ঠিক ক'রে নিন।" তার পর হাসিয়া বলিলেন, "অবশ্য এ টাকাটা আপনাকে এডভান্স দেওয়া হচ্ছে, পরে আপনার লাভের অংশ থেকে দিয়ে দেবেন। সুতরাং এতে কিন্তু হবার কিছু নেই। একটা সেকেণ্ডক্লাশ গাড়ী রিজার্ভ করতে ব'লে দিচ্ছি. অবশ্য খরচটা কোলিয়ারীর একাউণ্টে। মনে রাখবেন, আপনি এখন এস, চ্যাটার্জ্জীর পার্টনার, আপনাকে সেই রকম ভাবে চলতে হবে। আর আমি সেখানকার কোলিয়ারী ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম ক'রে দেব, তিনি ষ্টেশনে লোক আর মোটর পাঠাবেন।"

কৃতজ্ঞচিত্তে বিদায় লইতে উদ্যত হইলে শিব বাবু বলিলেন, "যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন। কতকগুলি আবশ্যক বিষয় আপনাকে বুঝিয়ে দেব।"

হরেন্দ্র সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

তিন দিন পরে হরেন্দ্র যখন সপরিবারে ঝরিয়ায় যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে আর চিনিবার উপায় নাই। নিজের ও ছেলে-মেয়ে প্রভৃতির পোষাক-পরিচ্ছদ সবই এস, চাটার্জ্জীর পার্টনারের উপযুক্ত। ষ্টেশনে কোলিয়ারীর ম্যানেজার স্বয়ং উপস্থিত। দরোয়ান সসম্ভ্রমে মোটরের দ্বার খুলিয়া দিল, হরেন্দ্র সপরিবারে স্বাস্থ্যকর সুসজ্জিত প্রাসাদতুল্য বাসগৃহে নীত হইল।

৫

নগেন্দ্র গ্রামের জমীদারের অধীনে কায করিত। হরেন্দ্র কলিকাতায় যাইবার এক বৎসর পরে জমীদারীতে একটা চুরি ধরা পড়ে। নগেন্দ্র নিরপরাধ হইলেও নিস্তার পাইল না, তাহাকে অনেক টাকা দিয়া তবে অব্যাহতি পাইতে হইল। ফলে নগেন্দ্র সর্ব্বস্বান্ত হইল, এমন কি, হরেন্দ্রের বেনামী সম্পত্তিও রক্ষা পাইল না। মন্দাকিনীর এই নিজ নামীয় সম্পত্তি নষ্ট করিবার ইচ্ছা একবারে ছিল না; কিন্তু নগেন্দ্রকে ভবিষ্যতের অনেক প্রলোভন দেখাইয়া মন্দাকিনীকে সম্মত করাইতে হইয়াছিল। এই সম্পত্তি নষ্ট করিতে নগেন্দ্রও প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিল; শেষে নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, হরেন্দ্রও এই অবস্থায় ঠিক এই কাযই করিত। সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল, ভবিষ্যতে অনুরূপ সম্পত্তি বা টাকা হরেন্দ্রকে দিলেই চলিবে।

তাহার পর নগেন্দ্র যখন কায-কর্ম্মের চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় সে বিষম বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। আয় কিছুমাত্র নাই—ব্যয় সবই আছে, অধিকন্তু রোগের খরচ। নিরুপায় হইয়া মন্দাকিনী নিজের গোপন সঞ্চয় হইতে কিছু কিছু লইয়া খরচ করিতে লাগিল, কিন্তু নগেন্দ্রকে জানাইত যে, সে অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়াছে। যতই মন্দাকিনীর সঞ্চয় ক্ষয় পাইতে লাগিল, ততই তাহার রুক্ষ মেজাজ তর—তম অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইয়া যে পৌছিল, তাহা বলা দুর্ঘট। মাস কয়েকের মধ্যে নিজের সঞ্চয় ত ফুরাইলই, অধিকন্তু তাহার অলঙ্কারেও টান ধরিল। তখন মন্দাকিনীর কণ্ঠ হইতে যে বিষ উদগীর্ণ হইতে লাগিল, তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া নগেন্দ্র বোধ করি বা নীলকণ্ঠ হইয়া পড়িল। না হয় তাহার মৃত্যু—না হয় রোগের উপশম। বহুদিন হরেন্দ্রের কোনও সংবাদ নাই, সে যে কোথায় গিয়াছে, সে সংবাদ নগেন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও পায় নাই; সে বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না, তবে সে কলিকাতায় যে নাই, ইহা ঠিক। এই সব ভাবিতেছে, এমন সময় মন্দাকিনী আসিয়া স্বভাবসিদ্ধ তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আজ উপোস, ঘরে এমন কিছু নেই যে, বাঁধা দিয়ে বা বিক্রী ক'রে কিছু আসবে।"

নিরুপায় নগেন্দ্রের চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিল। একটা কথা তাহার মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু সে অতি কষ্টে তাহা চাপিয়া গেল।

নগেন্দ্রের চোখে জল দেখিয়া মন্দাকিনী আরও জলিয়া উঠিল। বলিল, "ও ঢং আমি সব বুঝি গো বুঝি! ভাইয়ের জন্ত শোকসাগর উথলে উঠেছে। আহা!"

নগেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, "কিন্তু সে যদি আজ থাকত, তা হ'লে—"

মন্দাকিনী সজোরে বাধা দিয়া বলিল, "থাকলেই হ'ত তাইকে নিয়ে। আমার যেমন পোড়াকপাল, তাইতে নিজের সব ঘুচিয়ে এই মুখনাড়া সহ্য করছি।" বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নগেন্দ্র নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "ছিঃ, কাঁদ কেন? আমি কি তোমাকে মুখনাড়া দিচ্ছি? শুধু—"

"আর থাক, তোমার আর আদিখ্যেতায় কায নেই। বুঝি গো, আমি সব বুঝি। তোমার প্রাণ যে কোথায় প'ড়ে আছে, তা আমি এত দিন তোমার সঙ্গে ঘর ক'রেও কি বুঝিনি মনে করেছ?"

"প্রাণ আমার ঠিক তোমার ওপরই প'ড়ে আছে, এ যে তুমি না জান, তা-ও ত নয়।"

মন্দাকিনীর তীব্র ভাবটা যেন কিছু নরম হইয়া আসিল। বলিল, "ওরে বাবা, আবার কাব্যিও আছে! তা সে চুলোয় যাক। এখন ছেলে-পুলেই বা খাবে কি, আর তোমার মুখেই বা দেব কি?"

"কোনও উপায় কি নেই?"

"ওগো, আমি যতই মন্দ হই, তবুও বড় গলা ক'রে বলতে পারি, কোন বেটা-বেটী এ কথা বলতে পারে না যে, আমার হাতে পয়সা থাকতে সোয়ামী-পুত্তুরকে না খেতে দিয়ে রেখেছি।"

নগেন্দ্রকে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইল; কিন্তু সেই আহার্য্যের সঙ্গে যে বাক্যবিষ মিশ্রিত ছিল, তাহা পরিপাক করিবার শক্তি নগেন্দ্র ছাড়া অতি বড় ধৈর্য্যশীলের পক্ষেও সম্ভব ছিল না।

নগেন্দ্র মর্ম্মান্তিক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা হ'লে মৃত্যুই অবধারিত। আমি ত মরতেই বসেছি—আর ক'দিন? তবে তোমরা—আমি কি করব—আমি নিরুপায়! আমি যদি আগে মরতুম, তা হ'লে তোমাদের অনাহারে মৃত্যু হ'ত না।"

মন্দাকিনী বলিল, "খোকার ভাতের বড় কাঁসার থালাখানা এত দিন প্রাণ ধ'রে বেচতে পারি নি, তাই বেচে আজ ত চলুক।"

নগেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিল, "আজ আর না হয় কালও চলল, কিন্তু তার পর? পরশু কোথা থেকে আসবে? তুমি বেরোবে রাঁধুনীগিরি করতে, আর ছেলে বেরোবে ভিক্ষায়! বাঃ বাঃ!"

মন্দাকিনী ধীরে ধীরে বলিল, "আমি বলি কি, বাড়ীখানা বেচে ফেল। বেচে বাড়ীবন্ধকী টাকা শোধ ক'রে যে টাকা থাকবে, তাইতে আমাদের কিছু দিন ত যাবে। তার মধ্যে তুমি উঠে রোজগার করতে পারবে। আমি খোকাকে দিয়ে থালাখানা বেচতে পাঠাই গে।" বলিয়া যেমন সে ঘরের বাহিরে পা দিতে যাইবে, অমনই পল্লী-পিয়নের পরিচিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "ঠাকুরদা, মণি অর্ডার।"

মণি অর্ডার! এ কি সম্ভব? মণি অর্ডার কে করিবে? নগেন্দ্রের উঠিবার শক্তি নাই, সুতরাং পিয়নকে ঘরের মধ্যেই আসিতে হইল। মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকার মণি অর্ডার, হরেকেষ্ট?"

পিয়ন হরেকৃষ্ণ উত্তর দিল, "পঞ্চাশ টাকার, দিদি-ঠাকরুণ।"

পঞ্চাশ টাকা! নগেন্দ্র বিস্মিতভাবে বলিল, "তোমার ভুল হয়নি ত, হরেকেষ্ট? আমার মণি অর্ডারই ত বটে?"

হরেকৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর দিল, "আমার ভুল হ'লে চলবে কেন, ঠাকুর-দা! এই আপনি দেখুন না।" বলিয়া মণি অর্ডারের ফরমখানি নগেন্দ্রের হাতে দিল।

নগেন্দ্র ভাল করিয়া দেখিল, মণি অর্ডার তাহারই বটে। কুপনে লেখা আছে—

"শ্রীচরণেষু,

আপনি সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিমাসে ৫০ টাকা করিয়া পাঠাইব। আপনার চিকিৎসার ত্রুটি করিবেন না।

প্রণত—শ্রীমণীন্দ্রনাথ।"

মণীন্দ্র! কৈ, মণীন্দ্র বলিয়া ত তাহার পরিচিত কেহ নাই। পোষ্টাফিসের নামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্র দেখিল, তাহাতে বৌবাজার পোষ্টাফিসের ছাপ। প্রেরক যিনিই হউন, ইহা ভগবানের দান মনে করিয়া নগেন্দ্র যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করাইল। মন্দাকিনীর চিররুক্ষ মুখেও যেন প্রসন্নতার হাসি দেখা দিল।

৬

সবে মাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কয়লার খনির ছন আনার মালিক হরেন্দ্র কবিরাজ মনোরম বাসভবন-সংলগ্ন উদ্যানমধ্যস্থ প্রশস্ত সরোবর-সোপানে বসিয়া অতীত ও বর্ত্তমানের নানা কথা ভাবিতেছে। কিছু দিন হইতে দেশে যাইবার

জন্ত সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এমন কতকগুলা প্রয়োজনীয় কায হাতে ছিল যে, সে সকলের সুবন্দোবস্ত না করিয়া তাহার এ স্থান ত্যাগ করিবার উপায় ছিল না। আজ সে সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়াছে। এইবার কবে দেশে যাওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্ত জ্ঞানদার অপেক্ষা করিতেছিল। এই সময় উদ্যান-ফটকের ভিতর একখানা বহুমূল্য মোটর আসিয়া প্রবেশ করিল। পুত্র ও কন্তার সহিত মোটর হইতে অবতরণ করিয়া জ্ঞানদা সহাস্তমুখে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি গো, বড়লোক, হাওয়া খাচ্ছ না কি ?"

হরেন্দ্র উত্তর দিল, "বড়লোক কে? যে মোটর চ'ড়ে সান্ধ্য সমীরণে বেড়িয়ে এল, সে—না, যে সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে রাজ্যের কুলীর সঙ্গে বকাবকি ক'রে এল, সে ?"

জ্ঞানদা হাসিয়া উত্তর দিল, "বড়লোকের লক্ষণই ত ঐ। তা এখন দেশে যাবে, না—এখান থেকে আর নড়বে না ?"

হরেন্দ্র উত্তর দিল, "দেশে ত যেতেই হবে। অন্ততঃ মেয়ের বিয়ের জন্তেও ত যেতে হবে।"

জ্ঞানদা বলিল, "তবু ভাল যে, মেয়ের বিয়ের কথাটা তোমার মুখ দিয়ে বেরুল। হ্যাঁ গা, তোমার কায সব মিটেছে ?"

"হ্যাঁ, আজ সবই মিটিয়ে ফেলেছি। এখন যে দিন হুকুম হবে, সেই দিনই তামিল করতে প্রস্তুত।"

"তা হ'লে হুকুম শোন, কা'ল দিন ভাল, আমি পাঁজি দেখিয়েছি। সন্ধ্যার পর এখান থেকে বেরুতে হবে।"

"এ অধীন প্রস্তুত, কিন্তু মহাশয়া কি এর মধ্যে প্রস্তুত হ'তে পারবেন ?"

"মহাশয়ের যদি সাংসারিক কাযের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকত, তা হ'লে দেখতে পেতেন যে, আমার সবই প্রস্তুত, কেবল আপনার আদেশের—শ্রীবিষ্ণু, কেবল আমার হুকুম জারী করতে যেটুকু বাকী।"

"যথা আজ্ঞা, আপনার আদেশ পালনের জন্ত প্রস্তুত হই।"

"ও কি, কোথায় যাও ?"

"গাড়ী রিজার্ভ করতে।"

"তার জন্তে তোমার যাবার দরকার কি ?"

"না, আমি যাচ্ছিনে, ড্রাইভারকে দিয়ে খবর দিচ্ছি।"

হরেন্দ্র ড্রাইভারকে ডাকিয়া গাড়ী রিজার্ভ করিবার জন্ত এক জন কর্মচারীকে উপদেশ দিল।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ মোটরখানা যাইবে ? হরেন্দ্র তাহাকে জানাইল যে, সে আদেশ তাহাকে পরে দেওয়া যাইবে। সেলাম করিয়া ড্রাইভার চলিয়া গেল।

* * * *

রাইপুর গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের নূতন জমীদার আজ প্রথম এখানে পদার্পণ করিবেন। তিন বৎসর হইল, এই জমীদারী তিনি কিনিয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত গ্রামের কেহই তাঁহাকে দেখে নাই। এই জমীদারের আমলে পূর্ব্বের জমীদারের অত্যাচারের মত কিছুই না থাকায় প্রজারা সকলেই ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, আর সেই জন্তই তাঁহাকে দেখিবার জন্ত লোকের এত আগ্রহ। তিনি কলিকাতা হইতে সরাসরি মোটরে আসিবেন, এ কথা গ্রামে রাষ্ট্র।

সকলেই এ সংবাদে সন্তুষ্ট, কেবল মন্দাকিনী গর্জ্জাইতেছে এবং চিরাভ্যস্ত কটুবাক্য অদৃষ্টপূর্ব্ব জমীদারের উদ্দেশে বর্ষণ করিতেছে; কেন না, জমীদারের নায়েব নোটিশ দিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে গৃহত্যাগ করিতে হইবে; কারণ, এই স্থানে জমীদার একখানি নূতন বাটী প্রস্তুত করিবেন। নগেন্দ্রের দেনার দায়ে এই বাটীটি জমীদার নীলামে খরিদ করিয়াছেন। নগেন্দ্রের বর্ত্তমানে সংসার-নির্ব্বাহের কোনও কষ্ট নাই, মাসিক পঞ্চাশ টাকা যথানিয়মেই আসিতেছে, সেই দারুণ ব্যাধি যদিও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহার চিহ্নস্বরূপ নগেন্দ্রের একখানি পা অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার রোজগার করিবার সামর্থ্য নাই। মন্দাকিনীর জ্বালার উপর জ্বালা—পার্শ্বের পতিত বাটীখানি মেরামত করিয়া বাসোপযোগী করা হইতেছে। নিজের আশ্রয় ঘুচিয়া যাইতেছে, আর অপরে তাহারই সম্মুখে সুসংস্কৃত বাটীতে বাস করিতে আসিবে! অসহ্য!

বেলা প্রায় ১০টা। একখানি বহুমূল্য মোটর ধীরে ধীরে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। সবাই বুঝিল, এই মোটরে জমীদার আসিতেছেন। কিন্তু তাহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে, মোটরখানা জমীদার-ভবনের দিকে না গিয়া একটা অপ্রশস্ত গলীর মুখে দাঁড়াইল। গাড়ীখানা দাঁড়াইতেই একটি মহিলা ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সুসজ্জিতা, নানালঙ্কারশোভিতা, অপরূপ-রূপলাবণ্যবতী এক কিশোরী ও একটি প্রিয়দর্শন বালকও নামিয়া পড়িল। আর তাহাদের পশ্চাতে একটা ক্যাশবাক্স হস্তে এক

পরিচারিকা। সঙ্গে অপর লোকজন কেহই নাই, মাত্র চালকের পার্শ্বে জমকালো পোষাকপরা এক জন অস্ত্রধারী রক্ষী। মহিলাটির পরিধানে চওড়া লালপাড় শাড়ী, দুই হাতে দুইগাছা শাঁখা এবং একগাছি করিয়া চটা-ওঠা সোনার রুলী, অন্য কোনও অলঙ্কার নাই। সকলে ভাবিয়া পাইল না যে, ইনি কে? তাহারা সিদ্ধান্ত করিল, ইনি নিশ্চয়ই জমীদার-গৃহিণী নন; কেন না, জমীদার-গৃহিণীর লক্ষণ ইঁহাতে কিছুই নাই। মহিলাটি কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া যেন চির-পরিচিত পথে অগ্রসর হইলেন; তাঁহার সহযাত্রীরাও তাঁহার অনুসরণ করিল।

মন্দাকিনী সকাল হইতে জমীদারের উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণ করিয়া সবে মাত্র রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় মহিলাটি আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বালক ও কিশোরী তাঁহার ইঙ্গিতমত একটু তফাতে দাঁড়াইয়া ছিল। মন্দাকিনী মহিলাটির দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া একবারে জলিয়া উঠিল। তীব্র স্বরে বলিল, "কি লো, ছোটবউ, কোন্ মুখ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিস্? যাবার সময় ব'লে গিয়েছিলি না, প্রতিশোধ নিতে পারি ত আসব!"

জ্ঞানদা ধীরে ধীরে বলিল, "প্রতিশোধ নিতেই ত এসেছি।"

মন্দাকিনী মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, "প্রতিশোধ নিতেই ত এসেছি! কি প্রতিশোধ নিবি তুই? আমি যদি জল খাই ভাঁড়ে ত তুই খাস ঘাটে! প্রতিশোধ নিবি!"

জ্ঞানদা ধীরস্বরে বলিল, "প্রতিশোধ নিয়েছি, নেব।"

মন্দাকিনী অবজ্ঞার সহিত "কি প্রতিশোধ নিয়েছিস, তাই না হয় শুনি।" বলিয়া একটা উপহাসের হাসি হাসিল।

জ্ঞানদা এক তাড়া মণি অর্ডারের কুপন তাহার দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এগুলো চিনতে পার?"

মুহূর্ত্তমাত্র মন্দাকিনীর মুখে কে যেন ছাই মাড়িয়া দিল, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই বলিল, "ও ত মণীন্দ্র বাবু আমাদের দয়া ক'রে যা দিচ্ছেন, তার রসিদ। সেগুলো কোন রকমে বাগিয়ে এনে তুই আমাকে দেখাতে চাস যে, তুই আমাদের দিয়েছিস! ওরে আমার হিতৈষী রে!"

জ্ঞানদা শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "মণীন্দ্রকে কখনও দেখেছ?"

মন্দাকিনী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না।"

"দেখবে তাকে?"

মন্দাকিনীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল; তবে কি—তবে কি—? তার পর জ্ঞানদার পোষাকের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে আশঙ্কা দূরে সরিয়া গেল।

মন্দাকিনী আবার নিপুণভাবে তাহাকে দেখিয়া শ্লেষের সহিত বলিল, "কোথায় তোর মণীন্দ্র বাবু, দেখা না?"

জ্ঞানদা "মণ্টু" বলিয়া ডাকিতেই সেই প্রিয়দর্শন বালক আসিয়া মাতার কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। জ্ঞানদা মন্দাকিনীকে দেখাইয়া বলিল, "এই তোমার জ্যেঠাইমা, প্রণাম কর।" তার পর মন্দাকিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই মণীন্দ্র বাবু, যে তোমাকে এত দিন মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে দিয়েছে।"

মন্দাকিনীর আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সে দুই হাত বাড়াইয়া মণ্টুকে কোলে লইয়া চুম্বন করিল। তার পর জ্ঞানদাকে বলিল, "এই তোর প্রতিশোধ?"

"হ্যাঁ, এই আমার প্রথম প্রতিশোধ—যা নিয়েছি। এখনও বাকী আছে।"

তখন চারিদিকে প্রতিবেশিনীরা সব সমবেত হইয়াছে। জ্ঞানদা কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "তোমার দেওর রাইপুর জমীদারীটা সবই কিনেছেন। তার মধ্যে এই রাইপুর গ্রামখানা তোমাকে প্রতিশোধ দেবার জন্য আমি দান করলুম।" বলিয়া পিছনদিকে চাহিতেই সেই কিশোরী একখানা কাগজ তাহার হাতে দিল। সেই কাগজখানা মন্দাকিনীর হাতে দিয়া জ্ঞানদা বলিতে লাগিল, "এই নাও রেজেষ্ট্রী করা দানপত্র। আরও শোন, ঐ সামনের বাড়ীটায় তোমরা কিছু দিন থাকবে বলেই ওটা মেরামত হয়েছে—কেন না, এখানে তোমাদের জন্য একটা বড় বাড়ী তৈরী হবে; পরে সামনের বাড়ীটা কাছারী করতে পার।" তার পর হাসিয়া জ্ঞানদা বলিল, "জমীদার-গৃহিণীর ত শাঁখা হাতে দেওয়া সাজে না।" বলিয়া ইঙ্গিত করিতেই পরিচারিকা সেই ক্যাশবাক্সটা খুলিয়া সম্মুখে ধরিয়া দিতেই তাহার অভ্যন্তরস্থ অলঙ্কাররাজি যেন হাসিয়া উঠিয়া মন্দাকিনীর মুখে নিজেদের বর্ণ প্রতিফলিত করিল। মন্দাকিনী জ্ঞানদাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। জ্ঞানদা ধীরে ধীরে মন্দাকিনীর অঙ্গে কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার পরাইয়া দিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

শ্রীসতীপতি বিদ্যাভূষণ।

সপ্তম অধ্যায়

বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষায় ন্যায়দর্শনে গৌতমের কথা

শিষ্য। আপনার ব্যাখ্যানুসারে বুঝিয়াছি যে, কণাদের মতে সকলভুবনপতি নিত্যসর্ব্বজ্ঞ জগৎকর্ত্তা মহেশ্বরই বেদের কর্ত্তা, বেদ পৌরুষেয় বাক্য, কিন্তু উক্ত বিষয়ে গৌতমের মত কি এবং তিনি তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন কি না?

গুরু। মহর্ষি গৌতমের মতেও বেদ পৌরুষেয়। তিনি ন্যায়দর্শনে পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া যুক্তির দ্বারা বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। আমি প্রথমে সেই পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার উত্তরের ব্যাখ্যা করিব এবং পরে গৌতমের বেদ-প্রামাণ্য-সাধক যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের কথা বলিব। তাহা হইলে তুমি উক্ত বিষয়ে গৌতমের মত বুঝিতে পারিবে।

ন্যায়দর্শনে বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষা করিতে মহর্ষি গৌতম প্রথমে নাস্তিকমতানুসারে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র বলিয়াছেন—

তদপ্রামাণ্যমনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্তদোষেভ্যঃ ॥ ২।১।৫৭ ॥

উক্ত সূত্রের প্রথমে "তৎ" শব্দের দ্বারা বেদই গৃহীত হইয়াছে। 'তস্য বেদস্য অপ্রামাণ্যং' "তদপ্রামাণ্যং"। অর্থাৎ বেদবিরোধী নাস্তিকের মত এই যে, বেদের প্রামাণ্য নাই, বেদ প্রমাণ হইতে পারে না। হেতু কি? তাই বলিয়াছেন —"অনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্তদোষেভ্যঃ"। অর্থাৎ যে হেতু বেদে "অনৃত" "ব্যাঘাত"ও "পুনরুক্ত" দোষ আছে, অতএব বেদ প্রমাণ নহে। বেদে কোথায় ঐ সমস্ত দোষ আছে, তাহা গৌতম বলেন নাই। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন নাস্তিকের কথানুসারে প্রথমে অনৃত দোষের উদাহরণ বলিয়াছেন যে, বেদে আছে—"পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যা যজেত"। অর্থাৎ পুত্রার্থী পুত্রেষ্টি যাগ করিবেন। পুত্রেষ্টি যাগ করিলে পুত্র জন্মে। কিন্তু কত স্থানে কত ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াও পুত্র লাভ করেন না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপ বেদে আছে—"কারীরী" যাগ করিলে বৃষ্টি হয়। কিন্তু বহু স্থানে "কারীরী" যাগ করিলেও বৃষ্টি হয় না, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপ আরও বহু বহু বেদোক্ত কর্ম্মের কোন ফলই হয় না, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ঐ সমস্ত বৈদিক বিধিবাক্য মিথ্যা। উহাতে "অনৃত" দোষ। "অনৃত" শব্দের অর্থ মিথ্যা।

পূর্ব্বপক্ষবাদী নাস্তিকের কথা এই যে, বেদোক্ত "পুত্রেষ্টি" ও "কারীরী" প্রভৃতি যাগের ফল হইলে ইহকালেই তাহা হইবে। এ জন্য ঐ সমস্ত বেদবাক্য দৃষ্টার্থ বেদবাক্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" এবং "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ"—ইত্যাদি বহু বহু বৈদিক বিধিবাক্য অদৃষ্টার্থ বেদবাক্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। কারণ, অশ্বমেধযাগ ও অগ্নিহোত্র প্রভৃতির যে স্বর্গফল কথিত হইয়াছে, তাহা কাহারও ইহলোকে হয় না। উহা দৃষ্টফল নহে। সুতরাং ঐ সমস্ত বৈদিক বিধিবাক্য অদৃষ্টার্থ বাক্য। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টার্থক বেদবাক্য যখন মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন ঐ দৃষ্টান্তে অদৃষ্টার্থক সমস্ত বেদবাক্যও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কারণ, যাহার দৃষ্টার্থক বাক্যও মিথ্যা, সেই ব্যক্তি যে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় অজ্ঞ ও মিথ্যাবাদী, সুতরাং অনাপ্ত, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। অতএব ঐরূপ ব্যক্তির কোন বাক্যই প্রমাণ হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষবাদী নাস্তিকের দ্বিতীয় হেতু "ব্যাঘাতদোষ।" অর্থাৎ "ব্যাঘাত" দোষ প্রযুক্তও বেদ অপ্রমাণ। "ব্যাঘাত" বলিতে পরস্পর বিরোধ। ভাষ্যকার নাস্তিকের কথানুসারে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, বেদে আছে—অগ্নিহোত্রী "উদিত"কালে হোম করিবেন, "অনুদিত"কালে হোম করিবেন, "সময়াধ্যুষিত"কালে হোম করিবেন। সূর্য্যোদয়ের পরবর্ত্তী কালের নাম "উদিত"কাল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণকিরণ ও অল্প নক্ষত্রবিশিষ্ট কালের নাম "অনুদিত"কাল। সূর্য্য ও নক্ষত্রশূন্যকালের নাম "সময়াধ্যুষিত" কাল। কিন্তু বেদে উক্ত কালত্রয়ে হোমের বিধান করিয়া পরেই আবার অন্য বাক্যের দ্বারা উক্ত কালত্রয়েই হোমের নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং সেই নিন্দার দ্বারা উক্ত কালত্রয়েই হোম যে অকর্ত্তব্য, ইহাই বুঝা যায়। অতএব উক্ত স্থলে প্রথমোক্ত বিধিবাক্য এবং শেষোক্ত নিন্দার্থবাদবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ। কারণ, প্রথমোক্ত ঐ সমস্ত বিধিবাক্যের

দ্বারা বলা হইয়াছে যে, উক্ত কালত্রয়ে হোম কর্ত্তব্য এবং শেষোক্ত ঐ সমস্ত বাক্যের দ্বারা বলা হইয়াছে যে, উক্ত কালত্রয়ে হোম অকর্ত্তব্য। সুতরাং উক্তরূপ ব্যাঘাত বা বিরোধ বশতঃ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বেদবাক্যই অপ্রমাণ এবং ঐ দৃষ্টান্তে অন্যান্য সমস্ত বেদবাক্যও অপ্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কারণ, যে ব্যক্তি ঐরূপ বিরুদ্ধার্থবাদী, সে ত উন্মত্ত, সুতরাং তাহার কোন বাক্যই প্রমাণ হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষবাদী নাস্তিকের তৃতীয় হেতু "পুনরুক্ত" দোষ। অর্থাৎ পুনরুক্ত দোষ প্রযুক্তও বেদ অপ্রমাণ। ভাষ্যকার নাস্তিকের কথানুসারে ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বেদে আছে "ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং"। (শতপথব্রাহ্মণ ১।৩।৫) উক্ত বাক্যের দ্বারা একাদশ "সামিধেনী"র মধ্যে প্রথমা ঋক্ এবং উত্তমা ঋক্‌কে তিনবার পাঠ করিবে, ইহা কথিত হইয়াছে। সুতরাং পুনরুক্তদোষ অনিবার্য্য।

তাৎপর্য্য এই যে, যে মন্ত্রের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন করিতে হইবে, তাহার নাম "সামিধেনী" ঋক্। বেদে (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—৩।৫) একাদশটি "সামিধেনী" কথিত হইয়াছে এবং উহার পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাও আছে। তন্মধ্যে "প্রবোবাজা" ইত্যাদি ঋক্‌টি প্রথমা, এবং উহার নাম "প্রবতী", এবং সর্ব্বশেষোক্ত "আজুহোতাদুবস্তত"—ইত্যাদি ঋক্‌টির নাম "উত্তমা।" "বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ" প্রভৃতিতে উক্ত একাদশটি ঋকের মধ্যে প্রথমাকে তিনবার এবং শেষোক্ত "উত্তমা"কে তিনবার পাঠ করিবে, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু যে অর্থ প্রকাশ করিতে যে-বাক্য বক্তব্য, তাহা একবার বলিলেই তাহার ফলসিদ্ধি হওয়ায় পুনর্ব্বার তাহা বলিলে পুনরুক্তদোষ হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত একই মন্ত্রের তিনবার পাঠ করিলে পুনরুক্তদোষ অবশ্যই হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে উক্তরূপ পুনরুক্তদোষপ্রযুক্ত বেদ অপ্রমাণ। যদিও বেদের সর্ব্বত্রই ঐরূপ পুনরুক্তদোষ নাই, কিন্তু যে অংশে ঐ দোষ আছে, তদ্দৃষ্টান্তে বেদের অন্যান্য সমস্ত অংশও অপ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, যে বক্তা ঐরূপ পুনরুক্তদোষও বুঝেন না, তিনি অজ্ঞ বা ভ্রান্ত। সুতরাং তাঁহার কোন বাক্যই আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়া পরে যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত দোষত্রয়ের খণ্ডন দ্বারা উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে নিম্নলিখিত তিনটি সূত্র বলিয়াছেন—

ন কর্ম্ম-কর্তৃ-সাধন-বৈগুণ্যাৎ ॥ ২।১।৫৮ ॥

অভ্যুপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ ॥ ২।১।৫৯ ॥

অনুবাদোপপত্তেশ্চ ॥ ২।১।৬০ ॥

প্রথম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের বিধায়ক বেদবাক্যে অনৃতদোষ নাই। কারণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও ঐ কর্ম্মের সাধন বা উপকরণের বৈগুণ্যবশতঃও ফলাভাব হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, কোনস্থলে পুত্রেষ্টি যাগের ফলাভাব দেখিয়া ঐ হেতুর দ্বারা "পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যা যজেত"—এই বিধিবাক্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। কারণ, কেবল পুত্রেষ্টি যাগজন্য অদৃষ্টবিশেষই পুত্রজন্মের কারণ নহে। বেদের উক্ত বিধিবাক্যের দ্বারা তাহাই কথিত হয় নাই। কিন্তু মাতা ও পিতার উপযুক্ত সংযোগাদি দৃষ্টকারণও পুত্রজন্মের কারণ। সেই সমস্ত দৃষ্টকারণের সহিত মিলিত হইয়া পুত্রেষ্টি যাগজন্য অদৃষ্ট পুত্রজন্মের কারণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্যেরও ইহাই তাৎপর্য্য। সুতরাং যেখানে অত্যাবশ্যক কোন দৃষ্টকারণ নাই,—সেখানে পুত্রেষ্টি যাগজন্য অদৃষ্ট জন্মিলেও তাহা পুত্রজন্মের কারণ হয় না। আর ঐ পুত্রেষ্টি যাগও যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হইলে উহা সেই অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করে না। পুত্রেষ্টি যাগে অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গযাগাদির অনুষ্ঠান না করিলে তাহা সেখানে কর্ম্ম-বৈগুণ্য, এবং ঐ যাগকর্ত্তা পুরোহিত প্রভৃতি অবিদ্বান্ অথবা পাতিত্যাদি কোন দোষে ঐ কর্ম্মে অনধিকারী হইলে তাহা সেখানে কর্তৃ-বৈগুণ্য; এবং ঐ যাগের সাধন দ্রব্যাদি অথবা মন্ত্র ও দক্ষিণার কোন দোষ হইলে উহা সেখানে সাধন-বৈগুণ্য। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম-বৈগুণ্য, কর্তৃ-বৈগুণ্য এবং সাধন-বৈগুণ্য অথবা উহার মধ্যে যে কোন প্রকার বৈগুণ্যবশতঃ পুত্রেষ্টি যাগ নিষ্ফল হইয়া থাকে। সুতরাং কোন স্থলে পুত্রেষ্টি যাগের ফল না হওয়ায় তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই যে চিকিৎসাশাস্ত্রে যে রোগ-নিবৃত্তির জন্য যে সকল উপকরণের দ্বারা যেরূপে যে ঔষধ প্রস্তুত করার বিধি আছে এবং রোগীর পক্ষে যেরূপ নিয়মে সেই ঔষধ সেবনের বিধি আছে, চিকিৎসক যদি সেই বিধি অনুসারে সেই ঔষধ প্রস্তুত না করেন, তাহা হইলে সেখানে সেই ঔষধসেবন তাহার পক্ষে নিষ্ফল হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই চিকিৎসাশাস্ত্রকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ করা যায়?—তাহা কখনই করা যায় না। কারণ, অনেক স্থলে

সেই চিকিৎসাশাস্ত্রের সত্যার্থতা এখনও বুঝা যাইতেছে। এখনও বহু রোগী সেই চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে ঔষধসেবন করিয়া নিরাময় হইতেছেন। এইরূপ পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করিয়াও বহু ব্যক্তি পুত্রলাভ করিয়াছেন এবং কারীরী যাগের পরেই অনেক স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে, ইহা মিথ্যা বলিবার কোন প্রমাণ নাই।

বেদবিরোধী বৌদ্ধ সম্প্রদায় পরে গৌতমের পূর্ব্বোক্ত উত্তরের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যেখানে পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের ফল হয় না, সেখানে ঐ ফলাভাব যে, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও সাধনের বৈগুণ্য প্রযুক্ত অথবা ঐ সমস্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত, ইহা কিরূপে বুঝিব? আমরা বলিব যে, উহা বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব প্রযুক্তই। কদাচিৎ কোন স্থলে পুত্রেষ্টি যাগের পরে কাকতালীয়ন্যায়ে কাহারও পুত্র জন্মিলেও উহা সেখানে সেই পুত্রেষ্টি যাগের ফল নহে। এতদুত্তরে তৎকালে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিবাদী মহানৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর "ন্যায়বার্ত্তিক" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, পুত্রেষ্টিযাগকারীর ফলাভাব যে কর্ম্ম, কর্ত্তা অথবা সাধনের বৈগুণ্য প্রযুক্তই নহে, ইহাই বা কিরূপে বুঝিব? আমরা বলিব, উহা সেখানে কর্ম্মাদির বৈগুণ্য প্রযুক্তই। যদি বল যে, পূর্ব্বোক্ত বৈদিক বিধিবাক্যের মিথ্যাত্ববশতঃও যখন ঐ ফলাভাবের উপপত্তি হয়, তখন কর্ম্মাদির বৈগুণ্য প্রযুক্তই যে সেখানে ফল হয় নাই, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করা যায়; সুতরাং উহা সন্দিগ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহা বলিলে তোমাদিগের সিদ্ধান্তহানি হইবে। কারণ, তোমরা পূর্ব্বে বলিয়াছ, বেদ মিথ্যাবাক্য বলিয়া অপ্রমাণ,—এখন বলিতেছ, বেদের মিথ্যাত্ব সন্দিগ্ধ বলিয়া উহার প্রামাণ্য সন্দিগ্ধ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধসম্প্রদায় পরে বলিয়াছেন যে, উক্তরূপ সন্দেহ ত উভয় পক্ষেই সমান। পুত্রেষ্টি যাগের নিষ্ফলত্ব কি কর্ম্মাদির বৈগুণ্য প্রযুক্ত অথবা বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য প্রযুক্ত? ইহা ত উভয় পক্ষেই সন্দিগ্ধ। কারণ, কর্ম্মাদির বৈগুণ্য বশতঃই যে পুত্রেষ্টি যাগ নিষ্ফল হয়, ইহা নিশ্চয় করিবার ত কোন উপায় নাই। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, আমরা এখানে বেদবাক্য যে প্রমাণ, তাহা সিদ্ধ করিতেছি না; কিন্তু তোমরা যে, বেদবাক্য অপ্রমাণ, ইহা সিদ্ধ করিতে প্রথমে উহা মিথ্যা, ইহা বলিয়াছ, আমরা তোমাদিগের গৃহীত ঐ মিথ্যাত্ব হেতুকে অসিদ্ধ বলিয়া উহা যে ঐ বেদবাক্যের অপ্রামাণ্যের সাধক হয় না, ইহাই এখানে বলিতেছি। কিন্তু তোমরা যদি শেষে তোমাদিগের গৃহীত ঐ মিথ্যাত্ব হেতুকে সন্দিগ্ধ বলিয়াও স্বীকার কর, তাহা হইলেও উহা বেদের অপ্রামাণ্যের সাধক হইতে পারে না। কারণ, যেহেতু সন্দিগ্ধ, তাহাও প্রকৃত হেতুই নহে। তাহা "সন্দিগ্ধাসিদ্ধ" নামে হেত্বাভাস, ইহা তোমাদিগেরও স্বীকৃত। তবে আমরা প্রমাণ দ্বারা যখন বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিব, তখন আর সে বিষয়ে সন্দেহও থাকিবে না। সে প্রমাণ গৌতম পরে প্রদর্শন করিয়াছেন।

বেদে পূর্ব্বোক্ত "ব্যাঘাত" দোষও নাই, ইহা বুঝাইতে গৌতম দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন,—"অভ্যুপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ।" অর্থাৎ বেদে "উদিতে হোতব্যম্"—ইত্যাদি বিধিবাক্যত্রয়ের দ্বারা "উদিত" "অনুদিত" ও "সময়াধ্যুষিত" নামক কালত্রয়ে হোমের বিধান করিয়া পরেই যে আবার উক্ত কালত্রয়েই হোমের নিন্দা করা হইয়াছে, তাহাতে ঐ সমস্ত পূর্ব্বাপর বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধরূপ ব্যাঘাত দোষ নাই। কারণ, শেষোক্ত ঐ সমস্ত নিন্দার্থবাদের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি অগ্ন্যাধানকালে উদিতকালেই হোম করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন, সেই অগ্নিহোত্রী সেই পূর্ব্বস্বীকৃত কালকে ত্যাগ করিয়া "অনুদিত" অথবা "সময়াধ্যুষিত" নামক কালে হোম করিলে উহা নিন্দিত। এইরূপ "অনুদিত" অথবা "সময়াধ্যুষিত" নামক কালে হোমের সংকল্প করিয়া কালান্তরে হোম করিলে সেই হোমও নিন্দিত অর্থাৎ অগ্নিহোত্রী প্রথমে তাঁহার গৃহীত কালবিশেষেই যাবজ্জীবন হোম করিবেন। কখনও কালান্তরে হোম করিলে উহা সিদ্ধ হইবে না।

ফল কথা, বেদের পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্য ও নিন্দার্থবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়াই নাস্তিক ঐ সমস্ত বেদবাক্যে পূর্ব্বাপর বিরোধরূপ ব্যাঘাত দোষ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বেদে "উদিতে হোতব্যং" "অনুদিতে হোতব্যং" এবং "সময়াধ্যুষিতে হোতব্যং"—এই তিনটি বিধিবাক্যের দ্বারা কালত্রয়ে অগ্নিহোত্র হোমে উক্ত কালত্রয়ের বিধান হইয়াছে। অর্থাৎ সমস্ত অগ্নিহোত্রীই উক্ত কালত্রয়েই হোম করিবেন, ইহা ঐ সমস্ত বিধিবাক্যের অর্থ নহে। কিন্তু উহার দ্বারা "বিকল্প"ই অভিপ্রেত। অর্থাৎ উক্ত কালত্রয়ের মধ্যে আত্ম-তুষ্টি অনুসারে যাঁহার যে কালে হোম করিতে ইচ্ছা,

তিনি সেই কালেই হোম করিবেন। ব্যক্তিভেদে উক্ত কালত্রয়ে হোমই উক্ত স্থলে কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থিত। যে স্থলে দ্বিবিধ শ্রুতি আছে, অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা দ্বিবিধ ধর্ম্মই বিহিত হইয়াছে, সেখানে সেই উভয়ই ধর্ম্ম, ইহা বলিয়া ভগবান্ মনুও পূর্ব্বোক্ত উদিতাদি কালত্রয়ে হোমকে ইহার উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন (১)। সংহিতাকার মহর্ষি গৌতম স্পষ্ট বলিয়াছেন—"তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ।" অর্থাৎ তুল্যবল অনেক বিধিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে সেখানে বিকল্পই অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বিরোধ না থাকায় সেই সমস্ত বিধিবাক্যের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। যেমন বেদে বিধিবাক্য আছে—"ব্রীহিভির্ব্বা যজেত, যবৈর্ব্বা যজেত।" অর্থাৎ যাগবিশেষে ব্রীহির দ্বারা যাগ করিবে, অথবা যবের দ্বারা যাগ করিবে। অর্থাৎ ব্রীহির দ্বারা যাগ ও যবের দ্বারা যাগ উভয়ই তুল্যফল। সুতরাং আত্মতুষ্টি অনুসারে যাঁহার যে কল্পে ইচ্ছা, তিনি সেই কল্পই গ্রহণ করিবেন। ভগবান্ মনুও পূর্ব্বোক্তরূপ বিকল্পস্থলেই আত্মতুষ্টিকে ধর্ম্মের নির্ণায়ক বলিয়াছেন। তিনি সর্ব্বত্রই আত্মতুষ্টি অনুসারে ধর্ম্মনির্ণয় কর্ত্তব্য বলেন নাই। কিন্তু যে স্থলে শ্রুতি, স্মৃতি অথবা সদাচারের দ্বারা দ্বিবিধ বা বহুবিধ ধর্ম্ম বুঝা যায়, সেখানে ধর্ম্মের নির্ণায়ক কি? তাই মনু পরে বলিয়াছেন—"আত্মনস্তুষ্টিরেব চ" (২।৬)।

বেদে পূর্ব্বোক্ত পুনরুক্ত দোষও নাই, ইহা বুঝাইতে গৌতম পরে তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—"অনুবাদোপপত্তেশ্চ।" অর্থাৎ বেদে "ত্রিঃপ্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং"—এইরূপ উক্তি থাকিলেও তাহাতে পুনরুক্ত দোষ হয় না। কারণ, উহা "অনুবাদ।" অনর্থক পুনরুক্তিই পুনরুক্ত দোষ। কিন্তু সার্থক পুনরুক্তির নাম অনুবাদ। লৌকিক বাক্যেও ঐরূপ অনুবাদ আছে, উহা দোষ নহে। কারণ, উহার প্রয়োজন আছে। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইতে বেদের একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত একাদশ "সামিধেনী"র পঞ্চদশত্ব শ্রুত হয়। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে? তাই বেদে কথিত হইয়াছে, "ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত একাদশটি সামিধেনীর মধ্যে প্রথমাকে তিনবার এবং "উত্তমা" অর্থাৎ শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবে। তাহা হইলে প্রথমটির দুইবার ও শেষটির দুইবার অধিক পাঠ হওয়ায় ঐ একাদশ সামিধেনীর উক্তরূপে পাঠ দ্বারা পঞ্চদশ মন্ত্র সম্ভব হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত একাদশ মন্ত্রের মধ্যে প্রথমটির তিনবার ও শেষটির তিনবার পাঠ হইলে সেই পাঠভেদে মন্ত্রভেদ বশতঃ ছয় মন্ত্র এবং মধ্যবর্ত্তী নয় মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পঞ্চদশ মন্ত্র বুঝিতে হইবে। উক্তরূপে পূর্ব্বোক্ত একাদশ মন্ত্রের পঞ্চদশত্ব-সম্পাদনের জন্যই বেদে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি বিহিত হইয়াছে। সুতরাং উহা পুনরুক্ত দোষ নহে। ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ঐরূপ পুনরাবৃত্তি ব্যতীত শেষোক্ত পঞ্চদশত্ব-বোধক মন্ত্রের অর্থ-সঙ্গতি হয় না। সুতরাং সেই মন্ত্র পাঠ করা যায় না। কিন্তু সেই যাগবিশেষে উহা অবশ্য পাঠ্য, নচেৎ তাহার ফলসিদ্ধি হয় না। অতএব যাগের ফল-সিদ্ধির জন্য উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি অবশ্য-কর্ত্তব্য। তাহাতে পুনরুক্ত দোষ হয় না। কারণ, উহা সপ্রয়োজন বলিয়া উহাকে বলে "অনুবাদ।"

মহর্ষি গৌতম পরে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে যে, (১) বিধি, (২) অর্থবাদ ও (৩) অনুবাদ নামে ত্রিবিধ বাক্যবিভাগ আছে—ইহা বলিয়া উক্ত বিধি প্রভৃতির লক্ষণ এবং "অর্থ-বাদ" ও "অনুবাদে"র প্রকারভেদও বলিয়াছেন এবং পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া অনুবাদ ও পুনরুক্তের যে বিশেষ আছে, ইহাও পরে সমর্থন করিয়াছেন। লৌকিক বাক্যের ন্যায় বেদেও পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্য, অর্থবাদবাক্য ও অনুবাদবাক্যরূপ বাক্য-বিভাগ থাকায় লৌকিক বাক্যের ন্যায় বেদের প্রামাণ্য যে সম্ভাবিত এবং উহার বাধক কিছুই নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া গৌতম পরে উহার সাধক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন—

মন্ত্রায়ুর্ব্বেদ-প্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ ॥২।১।৬৮॥

অর্থাৎ মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্যের ন্যায় আপ্ত-পুরুষের প্রামাণ্য প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ বেদ প্রমাণ, যেহেতু বেদ আপ্তপুরুষবিশেষের বাক্য, যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ, এইরূপে অনুমান-প্রমাণের

---

(১) শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।
উভাবপি হি তৌ ধর্ম্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ॥
উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥ মনুসংহিতা ২।১৪।১৫।

দ্বারা বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। উক্ত অনুমানে পরীক্ষিত প্রামাণ মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে।

তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবর্ত্তক অনেক মন্ত্র আছে, যাহার যথাবিধি প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা বিষাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। সুপ্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও নিঃসন্দেহে ঐ পরীক্ষিত সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ সুপ্রাচীন কাল হইতেই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সত্যার্থতা পরীক্ষিত। মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের যথোক্ত সত্যার্থতাই উহার প্রামাণ্য। কিন্তু ঐ প্রামাণ্যের হেতু কি? ইহা বিচার করিতে গেলে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের বক্তা সেই সমস্ততত্ত্বদর্শী আপ্তপুরুষ। অর্থাৎ সেই আপ্তপুরুষের প্রামাণ্যই মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্যের হেতু। এইরূপ ঋগ্বেদ প্রভৃতি চতুর্ব্বেদেও যে সমস্ত অলৌকিক তত্ত্বের বর্ণন হইয়াছে, তাহাও সেই সমস্ততত্ত্বদর্শী ব্যতীত আর কাহারও জ্ঞানের গোচরই হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সমস্ত অলৌকিক তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি যে সর্ব্বজ্ঞ, ইহা স্বীকার্য্য এবং তিনি যে জীবের মঙ্গলবিধান ও দুঃখবিমোচনে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার যথাদৃষ্ট তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন, ইহাও স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বদর্শিতা এবং জীবে দয়া প্রভৃতিই তাঁহার আপ্তত্ব, তাই তিনি প্রমাণপুরুষ। সুতরাং তাঁহার তত্ত্বদর্শিতারূপ প্রামাণ্যপ্রযুক্ত বেদ প্রমাণ। যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ প্রমাণ। বস্তুতঃ অথর্ব্ববেদেও বহুবিধ ব্যাধির নাশক অব্যর্থ ঔষধ ও মন্ত্র কথিত হইয়াছে; এবং ঋগ্বেদেও নবম ও দশম মণ্ডলে নানা রোগনিবারণার্থ অনেক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

শিষ্য। গৌতমের ঐ সূত্রোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদও কি বেদের অন্তর্গতই নহে?

গুরু। ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং আরও কেহ কেহ সেইরূপই বলিয়াছেন বটে; কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঐ মন্ত্রও আয়ুর্ব্বেদকে বেদ হইতে ভিন্ন বলিয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে মূল বেদ হইতে ভিন্নই বলিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অথর্ব্ববেদমূলক হইলেও উহা মূল বেদ নহে। সুশ্রুত-সংহিতার প্রথম অধ্যায়েও আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ, ইহাই কথিত হইয়াছে এবং "আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে অনেন বা আয়ুর্ব্বিন্দতী-ত্যায়ুর্ব্বেদঃ"—এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা "আয়ুর্ব্বেদ" শব্দের অন্তর্গত "বেদ," শব্দের অর্থ যে শ্রুতি নহে, কিন্তু যে শাস্ত্রে আয়ু বিদ্যমান আছে অথবা যদ্দ্বারা আয়ুঃ লাভ করা যায়, এই অর্থে সেই শাস্ত্রের নাম আয়ুর্ব্বেদ, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও অষ্টাদশ বিদ্যার উল্লেখ করিতে চতুর্ব্বেদ হইতে আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি চতুর্ব্বিদ্যার পৃথক্ উল্লেখই হইয়াছে (১)। কিন্তু তাহা হইলেও বেদের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদও সর্ব্বজ্ঞ আপ্তপুরুষের বাক্য, ইহা গৌতমেরও সম্মত, ইহা তাঁহার ঐ দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের দ্বারা বুঝা যায়। স্বয়ম্ভূই প্রথমে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, ইহা সুশ্রুতও বলিয়াছেন (২) গরুড়পুরাণেও (পূর্ব্বখণ্ড ১৪৯ অঃ) কথিত হইয়াছে যে, স্বয়ং পরমেশ্বরই ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বামিত্রতনয় সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছিলেন। মূল কথা, বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ গৌতমের পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় আয়ুর্ব্বেদকে মূল বেদ হইতে ভিন্ন বলিয়াই উহার দৃষ্টান্তত্ব সমর্থন করিয়াছেন।

কিন্তু বাৎস্যায়ন পরে মূল বেদের অন্তর্গত দৃষ্টার্থক বেদ-বাক্যকেও অদৃষ্টার্থক বেদবাক্যের প্রামাণ্যসাধনে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বেদে বিধিবাক্য আছে—"গ্রামকামো যজেত।" অর্থাৎ গ্রামার্থী যাগ করিবে। গ্রামার্থী অধিকারীর পক্ষে "সাংগ্রহণী" নামক যাগ বেদে বিহিত হইয়াছে এবং উহার ইতিকর্ত্তব্যতাও বেদে কথিত হইয়াছে। যথাবিধি ঐ যাগের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে গ্রামলাভ হয় অর্থাৎ কোন গ্রামের অধিপতি হওয়া যায়। সুতরাং উহা ঐহিক ফল বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যকে বলে দৃষ্টার্থ বেদবাক্য। উক্ত বেদবাক্যের প্রামাণ্য ইহলোকেই পরীক্ষিত। কারণ, অনেক ব্যক্তিই যথাবিধি "সাংগ্রহণী" যাগ করিয়া গ্রামলাভ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বকালে অনেকেই দেখিয়াছেন। "ন্যায়-মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে বলিয়া গিয়াছেন

(১) অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু॥—বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ৬।

(২) ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ। ততোঽল্পায়ুষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োঽষ্টধা প্রণীতবান্। সুশ্রুত-সংহিতা—১ম অঃ।

যে, আমার পিতামহ কল্যাণ স্বামীই "সাংগ্রহণী" যাগ করিয়া "গৌরমূলক" নামক গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐ যাগানুষ্ঠানের পরেই কোন ভূস্বামী তাঁহাকে উক্ত গ্রাম দান করেন। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যের ন্যায় "স্বর্গকামো যজেত"—ইত্যাদি সমস্ত অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যেরও প্রামাণ্য স্বীকার্য্য। কারণ, যিনি পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যের অর্থদ্রষ্টা ও বক্তা, তিনিই ত ঐ সমস্ত অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যেরও অর্থদ্রষ্টা ও বক্তা। অবশ্য বক্তা এক হইলেও তাঁহার কোন বাক্য প্রমাণ ও কোন বাক্য অপ্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু বেদবক্তা আপ্তপুরুষের পক্ষে ঐরূপ আশঙ্কা অমূলক। কারণ, বেদের "স্বর্গকামো যজেত"—ইত্যাদি অদৃষ্টার্থ বাক্যসমূহ যে প্রমাণ নহে, ইহা কোন প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হয় নাই। পরন্তু—"গ্রামকামো যজেত"—ইত্যাদি অনেক দৃষ্টার্থ বেদবাক্যের প্রামাণ্য নিশ্চিত। কারণ, অনেক স্থলে ঐ সমস্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যের ফল পরীক্ষিত। সুতরাং ঐ সমস্ত বাক্যের বক্তা আপ্তপুরুষ যে সর্ব্বজ্ঞ, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত ঐ সমস্ত বিষয়ে ঐরূপ সত্যার্থ বাক্য আর কেহই প্রথমে বলিতে পারেন না। সুতরাং ঐ সমস্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যের বক্তা আপ্তপুরুষ যখন সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অভ্রান্ত, তখন তাঁহার অন্যান্য সমস্ত বাক্যই ঐ সমস্ত বাক্যের ন্যায় প্রমাণ, তাঁহার কোন বাক্যই অপ্রমাণ হইতে পারে না—ইহাই বাৎস্যায়নের পূর্ব্বোক্ত কথার তাৎপর্য্য।

এখন এখানে বুঝা আবশ্যক যে, মহর্ষি গৌতম বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে পূর্ব্বোক্ত সূত্রে—"আপ্তপ্রামাণ্যাৎ"—এই কথা বলায় বেদ যে আপ্তপুরুষের বাক্য, সুতরাং আপ্তবাক্যত্বই বেদের প্রামাণ্য-সাধনে তাঁহার অভিমত হেতু, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং তাঁহার মতে বেদের প্রামাণ্য যে স্বতোগ্রাহ্য নহে, কিন্তু উক্ত হেতুর দ্বারা অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ, ইহাও বুঝা যায়। পরন্তু তিনি শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদ খণ্ডন করায় এবং বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্বমত খণ্ডন-করিয়া অনিত্যত্বমতের সমর্থন করায় তাঁহার মতে বেদ যে পৌরুষেয় অনিত্য, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার মতে বেদকর্ত্তা পুরুষ কে? তিনি পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "আপ্তপ্রামাণ্যাৎ"—এই বাক্যে "আপ্ত" শব্দের দ্বারা কাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার কোন সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও এখানে তাহা স্পষ্ট বলেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, আপ্তগণই বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা, এবং যে সমস্ত আপ্ত বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাঁহারাই আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতিরও দ্রষ্টা ও বক্তা। সুতরাং কোন এক আপ্ত ব্যক্তিই যে, সমস্ত বেদের বক্তা, ইহাও ভাষ্যকারের মত বুঝা যায় না। "ন্যায়বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকরও—বেদকর্ত্তা আপ্তপুরুষ কে? উক্ত সূত্রে মহর্ষি গৌতম "আপ্ত" শব্দের দ্বারা কাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বলেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, "পুরুষবিশেষাভিহিতত্বং হেতুঃ"। অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য-সাধনে পুরুষ বিশেষ কর্ত্তৃক উক্তত্বই হেতু। যিনি পূর্ব্বোক্ত আপ্তের লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ, তিনিই উদ্দ্যোতকরের অভিমত পুরুষবিশেষ। বেদ সেই পুরুষবিশেষ কর্ত্তৃক উক্ত, অতএব বেদ প্রমাণ।

কিন্তু উদ্দ্যোতকরের অনেক পরে তাঁহার "ন্যায়বার্ত্তিকে"র টীকা করিয়া তাঁহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেও শ্রীমদ্‌বাচস্পতিমিশ্র বেদকে পরমেশ্বরপ্রণীত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও পরমকারুণিক। সুতরাং তিনি সৃষ্টির পরেই মানবগণের হিতার্থে নানা উপদেশ অবশ্যই করিয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত প্রথম উপদেশই বেদ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থাপক সেই বেদই সকল শাস্ত্রের আদি ও মূল এবং উহাই ঋষি মহর্ষি মহাজনদিগের পরিগৃহীত। মন্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদও ঈশ্বর কর্ত্তৃক উক্ত, এবং উহার প্রামাণ্য ইহলোকেই পরীক্ষিত। সুতরাং মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বেদের প্রামাণ্যও স্বীকার্য্য। পরন্তু যে আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য সর্ব্বসম্মত, সেই আয়ুর্ব্বেদেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, আয়ুর্ব্বেদে বেদোক্ত শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং রসায়নাদি ক্রিয়ারম্ভে বেদবিহিত চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের কর্ত্তব্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং যাহা সর্ব্বসম্মত প্রমাণ, সেই আয়ুর্ব্বেদের দ্বারাও বেদের প্রামাণ্য ও মহাজনপরিগ্রহ নিশ্চয় করা যায়।

শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র যোগদর্শন-ভাষ্যের টীকাতেও (১।২৪) বলিয়াছেন যে, মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। কারণ, সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই ঐ সমস্ত অব্যর্থফল মন্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিতে পারে না। এইরূপ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপদেশক বেদসমূহও সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর-প্রণীত। কারণ, আর কেহই প্রথমে ঐ সমস্ত অলৌকিক

তত্ত্বের উপদেশ করিতেই পারেন না। সেই পরমেশ্বরের নিত্য সর্ব্বজ্ঞতাই শাস্ত্রের মূল। সুতরাং সেই পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা বশতঃ যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ প্রমাণ, তদ্রূপ, ঐ দৃষ্টান্তে পরমেশ্বর প্রণীত বলিয়া বেদেরও প্রামাণ্য অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়।

বাচস্পতি মিশ্রের পরে উদয়নাচার্য্য, জয়ন্ত ভট্ট এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণও বহু বিচার পূর্ব্বক বেদ যে ঈশ্বর-প্রণীত, এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, বিশ্বসৃষ্টিসমর্থ, অণিমাদি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত আর কেহই ঐরূপ বহু বহু অলৌকিক তত্ত্বের প্রতিপাদক বেদ রচনা করিতেই পারে না। উদয়নাচার্য্য পরে ইহা বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন।

বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্যের ঐ সমস্ত কথার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, তাঁহাদিগের মতে গৌতমের পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "আপ্তপ্রামাণ্যাৎ" এই বাক্যে বেদের সম্বন্ধে নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই "আপ্ত" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছেন। সেই পরমেশ্বরের প্রামাণ্য প্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র চতুর্থ স্তবকে উদয়নাচার্য্য বিচার পূর্ব্বক সেই পরমেশ্বরের প্রামাণ্যও সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গৌতমের মতে পরমেশ্বরের যে সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ক প্রমাবত্তা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানবত্তা, তাহাই তাঁহার প্রামাণ্য বা প্রমাণত্ব (১)। অর্থাৎ কখনও তাহাতে সেই সর্ব্ববিষয়ক প্রমার অভাব নাই; তিনি সর্ব্বদাই প্রমাতা, সুতরাং প্রমাণপুরুষ। কিন্তু তিনি কাহারও কোন প্রমাজ্ঞানের কারণ নহেন, তাঁহার নিজের জ্ঞান নিত্য, সুতরাং প্রমার করণ এই অর্থে পরমেশ্বরকে প্রমাণ বলা যায় না। তাই গৌতম তাঁহার প্রথমোক্ত "প্রমাণ" পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু প্রমাতা অর্থেও "প্রমাণ" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। তাই সেই নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে উক্তরূপ অর্থে "প্রমাণ" বলা হইয়াছে। তিনি নিত্যসর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রমাণ পুরুষ। সুতরাং তাঁহার সমস্ত বাক্যও প্রমাণ। প্রমাণ পুরুষের বাক্য কখনই অপ্রমাণ হইতে পারে না।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

---

(১) "মিতিঃ সম্যক্ পরিচ্ছিত্তিস্তদ্বত্তা চ প্রমাতৃতা।
তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে"।
কুসুমাঞ্জলি। ৪।৫।

ধারা-শ্রাবণ

গগনের শ্যাম তপোবনে, সাম
গাহিছে ব্রহ্মচারী—
পিঙ্গল ঘন-জটাজাল, ধারা-
যজ্ঞোপবীত-ধারী।

কৃষ্ণ অজিন—তপের আসন,
শমী-বল্কল—সাধন-বসন,
তিমির-ধূম্রকুণ্ডলী-ফাঁকে
হোমকুণ্ডের শিখা
ঝলকিয়া উঠে—হব্য-আহুত
জ্বল-বিদ্যুৎলিখা।

হেথা বসুমতী বৈষ্ণবী শ্যামা
বসি' গিরিসানু-পরে
নিভৃতে, ঘুরায় শতেক নদীর
জপমালা ক্রত-করে।

গৈরিক স্রোত-অঞ্চল তার
বায়ুবেগে কাঁপে চঞ্চল, আর
কালো এলো চুল এলাইয়া পড়ে,
সুদূর বনানী ঘিরে';—
খতলে ভূতলে ধ্বনিছে মন্ত্র
গভীর মন্দ্র-মীড়ে।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

প্রেমের মূল্য

১

বাদল মেঘের ধূপ-ছায়ায় গোধূলি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। প্রসাধন শেষ করিয়া নীলিমা নীলাম্বরী শাড়ীখানি পরিয়া স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

স্বামী জিতেশ উপনিষদের পাতার মধ্যে ডুবিয়া বিশ্ব-জগৎ ভুলিতে বসিয়াছিলেন। পত্নীর জুতার মস্‌মস্‌ শব্দে চকিত হইয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন—"বা, কি অপরূপ সজ্জাই হয়েছে! চণ্ডীদাসের সুরে সুর মিলায়ে বলতে ইচ্ছে হয়,—

'চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর'।"

নীলিমা পুলকিত হইয়া উত্তর দিল, "যাও, দুষ্টুমী করো না, আমি বেড়াতে চল্লুম। ললিতা'দির বাড়ীতে নারী-সমিতির অধিবেশন, ফিরতে রাত হবে। ৯টা বাজলে ভজুয়াকে লণ্ঠন নিয়ে পাঠিয়ে দিও।"

জিতেশ হাস্য-কৌতুক-কণ্ঠে বলিল, "যাক্‌, বাঁচা গেল, এমন ভুবনমোহন বেশে কারও মনোহরণ করতে চলেছ ব'লে ভয় হয়েছিল, সে সম্বন্ধে স্বস্তির নিশ্বাস নেওয়া যাবে। নারী-সমিতি এবার কি আলোচনা করছেন, দেখি? পুরুষদের হাত হ'তে রাজ্যভার কেড়ে নেওয়ার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা হবে কি?"

নীলিমা কুপিত কণ্ঠে বলিল, "যাও, অনধিকারচর্চ্চা করো না। তোমাদের বিষ্ণুশর্ম্মা অব্যাপারে ব্যাপার করলে কি নিগ্রহ হয় বলেছেন, তা জান ত?"

জিতেশের হাস্য-বিভাত গণ্ডদেশে রক্তিমাভার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণচ্ছায়া ঘনায়িত হইয়া উঠিল কি? আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "আচ্ছা, অপরাধ মার্জ্জনা কর। রাত ৯টার সময় যদি ভুলে না যাই, ভজুয়াকে পাঠিয়ে দেবো'খন।"

"বেশ স্বার্থপরের মত উত্তরটা হয়েছে। তুমি এ দিকে ভাবে মসগুল হয়ে থাক, আর আমি ও দিকে আটকে প'ড়ে থাকি। যাও, একটু বেড়িয়ে এস, তার পরে ঘড়ীর দিকে নজর রেখো। আর তোমার ঐ সব বাজে বই না প'ড়ে, দু'চার-খানা আইন-বইয়ের পাতা উল্‌টিও, তা হ'লে ভুলবে না।"

জিতেশ বলিল, "বেশ, তাই হবে।"

নীলিমা সুগন্ধি সুবাস ছড়াইয়া বেড়াইতে চলিল। জিতেশ কঠোপনিষদের পাতা খুলিয়া, মৃত্যু-সাগর-তিতীর্ষু সাধক কেমন করিয়া ইহলোকেই অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, তাহার সন্ধানেই নিযুক্ত হইল।

স্বামী ও স্ত্রী আর কয়েকটি পরিচারক-পরিচারিকা লইয়া সংসার। স্বামী ওকালতী করেন। কিন্তু ওকালতীর নথির পরিবর্ত্তে পুথির স্পর্শ তাঁহার প্রিয়তর। পিতৃ-ত্যক্ত কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইয়া পারমার্থিক রসে ডুবিয়া আছেন। পত্নী নীলিমা সুরূপা ও সুশিক্ষিতা। তরুণ ও তরুণী, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রেমের বন্ধন সুনিবিড় হইয়াছিল কি?

সখী সুলেখার কাছে একখানি পত্রে নীলিমা নিজেদের দাম্পত্য-সম্বন্ধের একটি ছবি আঁকিয়াছিল। তাহাতে সে লিখিয়াছিল, তাহার স্বামী বহু গুণে গুণী, কিন্তু তবুও এখনও পর্য্যন্ত নীলিমা তাঁহার নাগাল পায় নাই। তিনি যেন ভাদ্রের ভরা নদী, কূলপ্লাবী জলে শান্ত সমাহিত হইয়া আছেন, চঞ্চলতার ঢেউ তাঁহার বক্ষকে আন্দোলিত করে না। তাঁহার প্রেমের গভীরতার সম্বন্ধে সে সন্দিহান নহে, কিন্তু তিনি সে শ্রেণীর রসিক নন—যাহার জন্য বিদ্যাপতির রাধার মত সে বলিতে পারে—"কৈছে গোঙাব হরি বিনে দিন রাতিয়া।" তাহার মনে বিলাসিতা ও চপলতা আছে, সে তাহা অস্বীকার করে না। স্বামী উহা পছন্দ করেন না বলিয়াই তাহার বিশ্বাস, কিন্তু নিজের প্রেমের জোরে তিনি তাহার লঘুতাকে দূর করিবেন, এ জোরও তাঁহার নাই। তিনি সত্যাগ্রহীর মত নীরবে সহিয়া জিতিতে চান। এ নীরবতাকে সে সহ্য

করিতে পারে না। সে চাহে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ—যাহার অবসানে উভয়ের মধ্যে উভয়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। কিন্তু তাঁহার উচ্ছ্বাস নাই, তর্ক নাই, প্রশান্ত সাগরের মত প্রশান্ত হৃদয় লইয়া তিনি দূরে মহত্বের শিখরে বসিয়া, যেখানে সে পৌঁছিতে পারে না। আর সে যেখানে, সেখানেও তিনি নামিয়া আসেন না। তাহার অন্তরে আধুনিকতার স্পর্শ এমন প্রবলভাবে অনুভূত হইয়াছে যে, দাসীপণা করাকে সে সতীত্বের ও প্রেমের কষ্টিপাথর বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। তাহার স্বতন্ত্রতাকে, ব্যক্তিত্বকে সে প্রকাশ করিতে চাহে। তাহার স্বামীর জীবন একবারে নিয়ম-গড়া, কোথাও ছন্দের গণ্ডি-ভঙ্গ হইবার উপায় নাই; তাঁহার জীবনে মানুষের মনুষ্য প্রবল হইতে পারে নাই। তাই তিনি পুস্তকের রাশিকে প্রিয় সখা করিয়া তুলিয়াছেন। সে কিন্তু এই ধরিত্রীর মানুষের কলকোলাহলকে বেশী ভালবাসে। স্বামীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাহার আছে, কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রেম এক নহে।

তাহাদের পাশের বাড়ীতে এক মুন্সেফ থাকেন। তাঁহার পত্নীপ্রীতি সম্বন্ধে সে উচ্ছ্বসিতভাবে লিখিয়াছে—ছেলেমানুষের মত এই দম্পতি মান-অভিমানের হাজার লীলা অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন, দেখিলে হিংসা হয়। কখনও সন্ধ্যার উভয়ে হাত-ধরাধরি করিয়া পাশের মেরু-পাহাড়ে বেড়াইতে যান, কখনও জ্যোৎস্না-রাত্রিতে তাঁহাদের বাংলোর ইউক্যালিপ্টাস গাছের ছায়ায় স্বামী বাঁশী বাজাইয়া থাকেন, স্ত্রী জানুতে মাথা দিয়া শ্রবণ করেন। কখনও স্ত্রী পিয়ানো বাজান, আর স্বামী সব কায ভুলিয়া পত্নীর চারুমুখের কম্পনরেখার পানে আত্মবিহ্বল হইয়া চাহিয়া থাকেন। পত্নীব্রত ও স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহার দুর্নাম আছে, কিন্তু নীলিমার এই দম্পতিকে খুব ভাল লাগে।

পত্রের শেষভাগে সে লিখিয়াছিল, প্রেমকে সে তুচ্ছ করিয়া তুলিতে প্রস্তুত নহে। যে অবজ্ঞাভরে উহা চাহে, তাহার চরণে সে সব ঢালিয়া দিতে পারিবে না। তাহার প্রেমকে জয় করিয়া লইতে হইবে। বীর্য্যকে সে প্রণতি জানায়, কাপুরুষতাকে তুচ্ছ মনে করে। তবে সে সম্পূর্ণ আশা ছাড়ে নাই। এক শুভ মুহূর্ত্তের বাতাসে হয় ত দুর্দিনের মেঘ অন্তর্হিত হইবে। যে স্বাতন্ত্র্য তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, সমন্বয়ের মধুরতায় তাহা পূর্ণ ও সার্থক হইয়া উঠিবে।

২

বিস্তৃত তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া গৈরিক-রাঙ্গা পথ। পশ্চিমবাঙ্গালার কঙ্কর মৃত্তিকায় গুল্ম ও আগাছা জন্মাইয়া কুঞ্জটিকে বিরূপ করিয়া তুলে নাই। বাগানের অপর পাশেই ললিতা-দিদির বাড়ী। তিনি পেন্সনভোগী শিক্ষয়িত্রী—সহরের সকল নারীরই দিদি। ললিতা-দিদি চিরকুমারী এবং নারী-সমিতির সম্পাদিকা। তাঁহার নিরুপদ্রব গৃহে প্রতিদিনই মেয়েদের মজলিস বসে, আর মাসে একবার করিয়া নারী-সমিতির অধিবেশন হয়। নারী-সমিতির চর্চ্চার ফল কিছু হইয়াছে কি না, তাহা প্রকাশ নাই, কিন্তু কর্ম্মীদের উৎসাহ ও আড়ম্বরের অবধি ছিল না। পুরবধূগণের নিত্য নূতন সাজ, ফ্যাসনের বিবর্ত্তন আর যানাদির ব্যয়ে পুরবাসিগণ যে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই ছিল না।

নীলিমা বয়সে তরুণী হইলেও, প্রায় একাকীই বাগানের পথ দিয়া ললিতা-দিদির বাড়ীতে যাইত। সে নির্জ্জন পথে কাহারও সহিত কখনও দেখা হইত না বলিয়া সে নিঃশঙ্কচিত্তে গমনাগমন করিত।

দেরী হইয়া গিয়াছিল বলিয়া নীলিমা জোরে চলিতেছিল। হঠাৎ বাঁশীর সুর শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল। শব্দ-ত্রস্ত হরিণীর ন্যায় সে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

বাঁশীর সুর-ঝঙ্কার লক্ষ্য করিয়া দেখিল, একটি যুবক আম্রবৃক্ষের ছায়ায় তৃণাসনে বসিয়া আপনমনে বাঁশী বাজাইতেছে। যুবকের মস্তকে একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল, গায় ঢিলা পাঞ্জাবী, চোখে চশমা। রূপবান্ বলা চলে না, তবে যৌবনোচিত একটি কান্তির অভাব নাই।

আজকালকার তরুণ-দলের কাহারও কাহারও মধ্যে যে মেয়েলী-ভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেই মেয়েলী-পনার কোমলতায় যুবকটিকে তরুণী বলিয়া ভ্রম করিলে কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না।

যুবকটি তরুণীর শাড়ীর খস্‌খস্ ও পায়ে-চলার শব্দে নীলিমার উপস্থিতি অনুভব করিল। বাঁশী থামাইয়া চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে অপূর্ব্ব সুন্দরী। সজ্জায় ও প্রসাধনে চিত্তহারা অপ্সরার মত সহসা যেন সে দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হইয়াছে। চলার ক্লান্তিজাত স্বেদজাল

মুক্তাবিন্দুর মত তাহার কপোলের সিন্দুরবিন্দুকে ঘিরিয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য রচনা করিয়াছিল।

পলকের জন্ম দৃষ্টি-বিনিময় হইল। তাহার পর নীলিমা দ্রুতপদেই চলিয়া গেল, আর অপরিচিত যুবা বাঁশী তুলিয়া লইল। নীলিমা নব্যা নারীর মতে চলিয়া পুরুষের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে কুণ্ঠিত নহে; কিন্তু পরিচয়ের পর সামাজিক নিয়ম-কানুনের মাঝে আলাপ ও সঙ্গ এক, আর নির্জ্জন পথে দেখা স্বতন্ত্র কথা, কাযেই নীলিমা অপ্রতিভ ও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া সহজাত সংস্কার দুরতিক্রমণীয়। বক্তৃতাকালে আস্ফালন আর কার্য্যকালে তাহার প্রয়োগ, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ নাই কি?

নীলিমার পুথি-পড়া সমস্ত সাহস পরাভূত হইয়া লজ্জার শরণ লইল। অপ্রস্তুতভাবে অন্যমনে চলিতে চলিতে সহসা তাহার মাথার সোনার ফুল, তরু-শাখায় বাধিয়া পড়িয়া গেল। নীলিমা তাহা অনুভব করিতে পারিল না।

যুবা অজ্ঞতার অনুরোধে বাঁশীতে সুর দিতেছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে নীলিমার গমন-সুন্দর মূর্ত্তির দিকে লুকোচুরি করিয়া চাহিতেছিল। তাহার মনে কি হইতেছিল, কে জানে, তবে দৃষ্টির আকুলতা দেখিলে মনে হয়, সে যেন মনে মনে বলিতেছিল,

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল
মেঘমালা সঙ্গে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

যুবকটি দেখিল, নীলিমার মাথার ফুল মাটীতে পড়িয়া গেল। সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি ফুলটি কুড়াইয়া গাছের ফাঁক দিয়া চলিয়া নীলিমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

নীলিমা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। যুবক সম্ভ্রম-নত মৃদু-ভাবে বলিল, "আমায় মাপ করবেন, আপনার মাথার ফুলটি প'ড়ে গিয়েছিল, এই নিন।"

নীলিমা কম্পিত-হস্ত বাড়াইয়া ফুল লইল, তার পর মনের জোর সংগ্রহ করিয়া বলিল, "আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানবেন। এটি আমার স্বামীর প্রথম উপহার—অর্থে ইহার মূল্যের নিশ্চয়তা করা চলে না। আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাবো—"

যুবকটি কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "না, এর জন্ম আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, কৃতজ্ঞতার কোনই প্রয়োজন নেই, আপনি বরং আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা করবেন, আপনার সঙ্গে এ ভাবে আলাপ করা হয় ত আপনার অপ্রীতিকর হয়ে উঠছে—আমায় ক্ষমা করবেন—"

নীলিমা উত্তর দিল, "না, না, আপনার কোন অন্যায়ই হয়নি। আচ্ছা, এখন আসি। নমস্কার।"

পল্লবদল-কোমল সুগৌর হাত দুইটি তুলিয়া নীলিমা নমস্কার জানাইল। যুবক হয় ত আলাপের সেখানেই সমাপ্তির আশা করে নাই। তাই কি বলিবে, হঠাৎ যেন খুঁজিয়া পাইতেছিল না। পথ ছাড়িয়া দিয়া সে-ও বলিল, "নমস্কার।"

নীলিমা বিভ্রান্ত-মনে ললিতা-দিদির বাড়ীতে চলিল। সারাপথ সে আপনার আনাড়ী-পনার জন্ম নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে চলিল। বহুবার কল্পনায় সে বিপদে পড়িলে কেমন দুঃসাহসিকতার কায করিয়া নারী-জাতির মুখোজ্জ্বল করিবে, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। কিন্তু কল্পনা যে কেমন করিয়া রূঢ় প্রতিঘাত পাইতে পারে, আজিকার সামান্য ঘটনায় তাহা বুঝিতে পারিয়া নীলিমার স্বস্তি ছিল না।

সমস্ত ব্যাপারটির পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিয়া নিজের অকৌশল ও অপ্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথা বুঝিতে পারিয়া গ্লানিতে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল।

অকারণে সে যুবকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। নির্জ্জন কুঞ্জে বসিয়া বাঁশী বাজাইবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল?

এ দুশ্চিন্তা আর অগ্রসর হইতে না হইতে নীলিমা ললিতা-দিদির বাড়ী পৌঁছিল।

৩

বারান্দায় পা দিতেই ভিতরের হল-ঘর হইতে সুস্বর-লহরী ভাসিয়া আসিল। পল্লীসহরের সেরা গায়িকা মেখলা গাহিতেছিল। কণ্ঠও যেমন মধুর, কলাশিক্ষার নিপুণতাও তেমনই সমধিক। সুরের কম্পনে সমস্ত গৃহ, ভবন যেন পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল। মেখলা গাহিতেছিল,—

"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি
দিন আগত ঐ,
ভারত-'নারী' কই।

সে কি রহিল আজি লুপ্ত সব জন-পশ্চাতে?
লউক বিশ্ব-কর্ম্ম-ভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে
জাগ্রত ভগবান্ হে।"

নীলিমা চাহিয়া দেখিল, বেলাশেষের মেঘে আকাশে কি অনবদ্য সজ্জাসম্ভার। আত্মগ্লানি ভুলিয়া প্রত্যুদ্গমনকারিণী গৃহকর্ত্রীকে সম্বোধন করিল, "ললিতা-দি! আমার কি দেরী হয়ে গেছে?"

ললিতা-দিদি যেমন বিপুল-কলেবরা, তেমনই গম্ভীরা। তিনি উত্তর দিলেন, "না, সবাই এখনও পৌঁছে নি।"

ঘরে প্রজাপতির মেলা বসিয়াছিল বলিলেই হয়;—বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, তরুণী, কিশোরী ও বালিকারা দল পাকাইয়া মজলিস করিয়া বসিয়াছিল। তাহাদের কত বিচিত্র সাজ, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে "বাঁশবনে ডোম কাণা" হইতে হইবে।

নীলিমাকে দেখিয়া বসু-জায়া চশমা খুলিয়া স্মিত-হাস্যে বলিলেন, "দেখ্ বোন্, আমার বক্তব্য তোকে সমর্থন করতে হবে।"

তরুণী একটি বধূ পাশে বসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার কি প্রস্তাব উপস্থিত করছেন, দিদি?"

বসু-গিন্নী বলিলেন, "হিন্দু-সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলন হওয়া উচিত।"

রেখা বেথুনে বি, এ পড়ে, ছুটীতে আসিয়াছে। সে কৌতুকোচ্ছল স্বরে চুপে চুপে পার্শ্বস্থ বৌদিদিকে বলিল, "বিচ্ছেদ না হোক, বিবাহ ব্যবচ্ছেদ এবার থেকে সুরু হবে বোধ হয়।"

বোধ হয়, সে এখনও তেমন নব্যা হইতে পারে নাই।

নীলিমা মনে মনে এ প্রস্তাব সমর্থন করিবার সাড়া পাইল না। কারণ, নিজের স্বামীর কাছে বহুবার একনিষ্ঠ প্রেমের মহত্ত্বের কথা শুনিয়া চলিত বিবাহ-প্রথাকে মঙ্গলময় বলিয়া সে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তাহা ছাড়া পিতা-মাতার আদর্শকে সে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি উপরোধ এড়াইলে সকলে তাহাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করিবে, এই দুর্ব্বলতার মোহ এড়াইতে না পারিয়া সে সায় দিল।

সভানেত্রীর বক্তৃতায় পুরুষ-জাতির অনাচার ও উৎপীড়নের কথা এরূপ জ্বলন্তভাবে আলোচিত হইল যে, অনভিজ্ঞ লোক হয় ত মনে করিতে পারিত যে, নারী ... পুরুষের দ্বন্দ্ব যেন নিত্যদিন সর্ব্বত্রই চলিতেছে। বক্তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বেশী নহে, কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি চিরকুমারী. তবে তিনি পরের মতের বৃহৎ বোঝাটিকে অবলীলাক্রমে স্কন্ধে লইয়া চলিয়াছেন।

তাহার পর নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে নানা প্রস্তাব পেশ ও মঞ্জুর হইল এবং কৌতুকাবহ বহু বক্তৃতায় তাহা উত্থাপিত ও সমর্থিত হইল।

অবশেষে বসু-গিন্নী উঠিয়া বলিলেন, "বান্ধবীগণ! আমি আপনাদের মুক্তির বার্ত্তা, স্বাধীনতার বাণী শোনাতে চাই। হিন্দু-নারী যুগ-সঞ্চিত আবর্জ্জনায় চাপা পড়েছে—তার উদ্ধারের মন্ত্র ও অস্ত্র আপনাদের হাতে। আপনারা উঠুন ও জাগুন! ভারতবর্ষের বিবাহ প্রেমহীন বিবাহ। সে বিবাহ-পদ্ধতির সংস্কার চাই। যে বিবাহ প্রেমের পাঞ্চজন্য-শঙ্খে সম্বর্দ্ধিত হয় নি, তার কি মূল্য? অতএব আমি বলতে চাই, স্বামী ও স্ত্রী যেখানে প্রেমে যুক্ত হন নি, সেখানে বিবাহ হয় নি। অতএব হিন্দু-সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথার প্রবর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

সভায় গোপন হাসি ও চোরা চাহনি এক দিকে চলিতেছিল, অন্য দিকে কতিপয় কুমারী ও তরুণী বধূ বসুজায়ার বক্তৃতার জয়গান করিবার জন্য করতালি প্রদান করিলেন।

নীলিমার মনে হইতেছিল, সে একবার বলে, সে এ প্রস্তাব সমর্থন করে না; কিন্তু ভারগ্রহণ করিয়া অসম্মত হওয়া তাহার কাছে অভদ্র ও অশোভন বলিয়া মনে হইল।

সে বলিতে লাগিল, "ভারতবর্ষে যে প্রেম নাই, বক্তার এ কথা সত্য নহে। আমাদের দেশের প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত—তাহার বাহ্যচ্ছটা নাই, কিন্তু গভীরতা আছে। অবশ্য একনিষ্ঠ প্রেমই বিবাহের লক্ষ্য; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যেখানে নিত্য বিরোধ ও কলহ, সেখানে বিচ্ছেদ হওয়া আমি অন্যায় মনে করি না।"

নীলিমার বলিবার ধরণ ও তাহার সুগভীর আত্ম-বিশ্বাস সকলকে মুগ্ধ করিল। সভায় তাহার সংশোধিত প্রস্তাবমত বিবাহ-বিচ্ছেদ মন্তব্য গৃহীত হইল। তাহার পর জলযোগ ও যথেষ্ট পরচর্চ্চার শেষে মোটরে, ঘোড়ার গাড়ীতে ও পদব্রজে একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন।

ভক্তুমাকে অনুপস্থিত দেখিয়া নীলিমা স্বামীর উপর চটিয়া গেল। তাহাদের বাড়ীর এ অমনোযোগ ললিতা-দিদির জানা

ছিল। তিনি বলিলেন, "একটু বসো বোন্, আমার চাকরটা কায সেরেই তোমায় দিয়ে আস্‌ছে।"

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া খোসগল্প চলিতে লাগিল। কথায় কথায় নীলিমা বলিল, "দেখ ললিতা-দি, আমাদের বাগানের পথটি তার নির্জ্জনতা হারাতে বসেছে। আজ যখন আসছি, দেখি, একটি ফাজিল ছোকরা ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছে—"

"কেমন দেখতে?"

"ছিপছিপে গড়ন, লম্বা, চোখে চশমা—"

বাধা দিয়া ললিতা-দিদি বলিলেন, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না, ও আমার বোন্‌পো, অপূর্ব্ব। অপূর্ব্বের নাম শুনিস্ নি? আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যের এক জন দিক্‌পাল হয়ে পড়েছে। ওর বেপরোয়া লেখার প্রশংসা সবাই করছে—ভয় নেই, ভয় নেই, ও যেন মুক্ত পাখী—প্রাণের অজস্র ও অবাধ প্রাচুর্য্যে ও লিখে চলেছে।"

নীলিমা বলিল, "হাঁ, নাম শুনেছি বটে, কিন্তু উনি এ সব নব্য-সাহিত্য পছন্দ করেন না, কাযেই অপূর্ব্ব বাবুর লেখা একখানি দু'খানি চেয়ে চিন্তে পড়েছি—"

ললিতা-দিদি বলিলেন, "ও এখানে ওর গল্পের মসলা খুঁজতে এসেছে। আমায় বলছিল যে, এমন একটা বই এবার লিখবে—যা এ দেশে যুগপরিবর্ত্তন ক'রে দেবে।"

"কোথায় উঠেছেন উনি?"

"ওর এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠেছে, আমার এখানে প্রায়ই আসে। ওকে বলেছি যে, আমাদের সমিতিতে একটা প্রবন্ধ পড়তে হবে। রাজী হয়েছে।"

ললিতা-দিদির চাকর লণ্ঠন লইয়া উপস্থিত হইল।

নীলিমা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "সে বেশ হবে, দিদি! অপূর্ব্ব বাবুর লেখার কদর আছে। তাতে ওঁর বক্তৃতা সবাইকে প্রভাবিত করিবে। আচ্ছা, এখন আসি দিদি, রাত্রি হয়ে গেল, নমস্কার।"

৪

বাড়ীতে ফিরিয়া নীলিমা দেখিল, স্বামীর পাঠ-কক্ষ অন্ধকার। প্রতিদিনের মত সেখানে বাতি জ্বলিতেছে না। অপ্রস্তুত-ভাবে গৃহে ফিরিবার জন্য, অধ্যয়ন-মগ্ন স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইবার সঙ্কল্প লইয়া সে গৃহে ফিরিয়াছিল।

অন্ধকার গৃহ তাহার মনে আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিল। কথায় বলে, স্নেহ অশুভ-শঙ্কী। প্রিয়পাত্রের বিপদ্‌কেই মানুষ সহসা অনুমান করিয়া লইয়া থাকে। শঙ্কাকাতর কম্পমান স্বরে সে ভজুয়াকে ডাকিল। বালক ভৃত্য আলোক দেখাইয়া নমস্কার জানাইয়া বলিল, "মাইজী!"

"বাবুর অসুখ করেছে কি? মাথা টিপছিস না কেন? একটা আলো দেওয়ার বুদ্ধি কি তোদের নাই? অমন গাফিলি করলে তোকে ছাড়িয়ে দেবো বলছি। চল্, বাবুর ঘরে চল্।"

এক নিশ্বাসে সে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিল। ভৃত্যের পক্ষে ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভবপর ছিল কি না, তাহা বিচার করিবার মত মানসিক অবস্থা নীলিমার ছিল না।

বালক আলো লইয়া পুরোগামিনী গৃহস্বামিনীকে নম্রস্বরে বলিল, "মাইজী, বাবু বাসায় নেই।"

ভৃত্যের কথায় নীলিমা অপ্রতিভ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার কল্পনা সত্য না হইলেই তাহার পক্ষে শুভ; কিন্তু সে মীমাংসা না করিয়াই প্রতিহত-চিত্তবৃত্তি নীলিমা স্বামীর উপর অকারণে বিরূপ হইয়া উঠিল। স্বামীর পাঠ-গৃহে পৌঁছিয়া দেখিল, টেবলের উপর বইগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অগোছাল স্বামীর সমস্ত কার্য্যেই বিশৃঙ্খলা। অভিধানে একটি শব্দ বাহির করিবার জন্য হয় ত উহা খুলিয়াছিলেন, সেটা খোলাই রহিয়াছে। শাঙ্কর ভাষ্য আর কঠোপনিষদ মিলাইয়া পড়িতেছিলেন, দুইখানি পুস্তকই খোলা রহিয়াছে, দোয়াত-দানীর কলম ও পেন্সিলগুলি ছড়ানো রহিয়াছে।

সমস্ত জিনিষ সুশৃঙ্খল করিতে করিতে সে ভজুয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায় গেছেন রে?"

বালক বলিল, "জানি না, মাইজী। এক লম্বা বাবু এসে-ছিলেন, ওঁর সাথে চ'লে গেছেন।"

নীলিমা ভাবিয়া পাইল না, স্বামী এত রাত্রি কোথায় কাটাইতেছেন? তাহার স্বামী লোককোলাহল ভাল-বাসেন না। তিনি পুস্তকের মধ্যে অপরূপ আনন্দ লাভ করেন। কত দিন তর্কপরায়ণ পত্নীকে বলিয়াছেন, "দেখ নীলি! আমায় মানুষের সঙ্গ পীড়া দেয়, কারণ, সেখানে মানুষ তাহার [illegible] নিয়ে বাস করে, পুস্তকের রাজ্য

মানুষের ঐশ্বর্য্যের রাজ্য, সেখানে মানুষ খণ্ডজীবনে ভূমার প্রকাশকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।”

নীলিমা স্বামীর কথা সমর্থন করে না। মানুষকে সে ভালবাসে। চণ্ডীদাসের মত তারও মনে হয়—

“সবার উপর মানুষ সত্য,
তাহার উপর নাই।”

মানুষ তার তুচ্ছতা ও নীচতা লইয়াও মানুষ। তাহাকে ঘৃণা করিয়া দূরে বাস করিলে মানুষ-জীবনের সার্থকতা থাকে না।

সেই একান্ত পাঠ-তন্ময় স্বামী কেন ও কোথায় গিয়াছেন ভাবিয়া নীলিমা কূল কিনারা পাইল না। অস্বস্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

বর্ষারাতের অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় একটা বিচিত্র মাধুর্য্য ছিল। তরুশ্রেণীর ফাঁকে রাস্তাটি নীলিমাদের বাড়ীর সম্মুখে প্রশস্ত ও খোলা বলিয়া বড় সুন্দর দেখাইত। সহসা বাঁশীর সুর শুনিয়া নীলিমা পথের দিকে চাহিল। বাঁশীতে কি বাজিতেছিল, কে জানে? নীলিমার মনে হইল, যেন ঐ পথিক অপূর্ব্ব। বাঁশী বাজাইবার ভঙ্গীটি উদাস-করা। নীলিমা আপন মনে গড়িয়া তুলিল, যেন বাঁশী বলিতেছে,—

“আমি পথ-ভোলা এক পথিক এসেছি
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো
সকালবেলার মল্লিকা!
তোমরা আমায় চেনো কি?”

স্বামীর অনুপস্থিতি, বাঁশীর সুর আর সে দিনের সমস্ত উত্তেজনা একত্র মিলিয়া নীলিমাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। সে ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, “আমি আজ আর ভাত খাব না। বাবু আসলে যত্ন ক'রে খাইয়ে দিবে, আর ভজুয়া যেন লণ্ঠন নিয়ে বাইরে ব'সে থাকে। ঘুমিয়ে পড়লে বকুনি খাবে। বুঝেছ ঠাকুর?”

“হাঁ মা!”

ঠাকুর চলিয়া গেলে নীলিমা শয়নকক্ষে যাইয়া শয্যাগ্রহণ করিল।. নানা দুশ্চিন্তায় তাহার নিদ্রা আসিতে চাহিতেছিল না, কিন্তু অবশেষে অবসাদ সকলকে পরাজিত করিল। নিদ্রার সুশীতল ক্রোড়ে সে আত্মসমর্পণ করিল।

অর্দ্ধরাত্রিতে ঘুম ভাঙিতেই নীলিমা [illegible] স্বামী পাশে শুইয়া আছেন। আলিঙ্গন-ব্যাকুল তাঁহার সবল হস্ত নীলিমার দেহের উপর এলাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বাহিরে মেঘ কাটিয়া জ্যোৎস্নায় বিশ্ব প্লাবিত। জানালার ফাঁকে চাহিয়া নিশীথ রাত্রির মৌনমাধুরী সে সমস্ত অন্তর দিয়া উপভোগ করিল।

স্বামী আসিয়া তাহাকে ডাকেন নাই। নিজের মনের কথা স্বামীকে বলিয়া নির্ভয় প্রফুল্লতায় মনকে শান্ত করিতে না পারিয়া নীলিমার হৃদয় অভিমানে ফুলিয়া উঠিল। স্বামীর কাল্পনিক অনাদরের তালিকা সাজাইয়া সে পুনরায় আত্মাকে পীড়িত করিয়া তুলিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, নীলিমার আর ঘুম আসে না। বাহিরের প্রকৃতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া লীলা করিতেছিলেন, নীলিমার সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। অপ্রিয় কল্পনায় তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াই চলিল।

ভোরের দিকে ঠাণ্ডা হাওয়ায় নীলিমা ক্লান্তিতে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু ভাল ঘুম তাহার হইল না। ঘুমের একটি যাদুকরী শক্তি আছে। সুগভীর সুষুপ্তির পর মানুষ পরম প্রসন্নতায় জাগিয়া উঠে। কিন্তু পরদিন নিদ্রাহীন নীলিমা অপ্রসন্ন ও বিরক্ত-চিত্তে উঠিল। কাযেই স্বামীর সহিত বোঝাপড়া হইয়া সে আপনাকে স্বামীর অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিল না।

জিতেশ অপ্রস্তুতভাবে পত্নীকে জানাইল, “কাল তুমি বেরিয়ে গেলে, আর অমনি নরনারায়ণ এল। নরনারায়ণ আর আমি একসাথে কলেজে পড়েছি—সে এখানে ডেপুটী হয়ে এসেছে। যাওয়ার সময় যে ভজুয়াকে ব'লে যাই, এ সময়ও দিলে না। তার পর ওকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ওর বাসায় যখন ফিরলাম, তখন প্রায় ১০টা বাজে। ওর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। বৌটি খুব লক্ষ্মী, আমায় না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লে না, তাই রাত হয়ে গেল।”

নীলিমা অন্য প্রসঙ্গের বিন্দুমাত্র অবতারণা না করিয়া নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “বাসায় ব'লে গেলে না কেন?”

কুণ্ঠিতভাবে জিতেশ বলিল, “নরনারায়ণ যে মোটেই সময় দিলে না। ওর বৌ বলেছে, তোমার সঙ্গে আজ দেখা করতে আসবে। ওর ভাল নামটা নরনাথ, কিন্তু একবার নর-নারায়ণের পার্ট এমন অভিনয় করে যে, সেই থেকে ওকে আমরা নরনারায়ণ ব'লে ডাকি।”

"বেশ!"—বলিয়া নীলিমা অন্যত্র চলিয়া গেল। স্বামীর বন্ধু-পত্নীর খুঁটিনাটি খবর জানিবার ঔৎসুক্য নারীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু স্বভাবের সেই অদম্য কৌতূহল যখন নীলিমা জোরের সহিত সংবরণ করিল, জিতেশ বুঝিল, পত্নীর অভিমান হইয়াছে। কিন্তু বেচারী কৃষ্ণলীলাও শোনে নাই, বা চলচ্চিত্রে জয়দেবও দেখে নাই, কাজেই মানভঞ্জনের আইন-কানুন তাহার জানা ছিল না। ফাঁপরে পড়িয়া সে অগতির গতি নিজের পাঠকক্ষের শরণ লইল।

৫

কয়েক দিন পরের ঘটনা। ললিতা-দিদির আগ্রহাতিশয্যে নীলিমা নারী-সমিতির সম্পাদিকার পদ গ্রহণ করিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই তাহাকে সেখানে যাইতে হয়। নীলিমা দেখিল, স্বামী কয়েক দিন ধরিয়া তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর দেখাইতেছেন; কিন্তু তাহাতেও কি উভয়ের মনের ব্যবধান ঘোচে নাই? নীলিমা তাই কি আপন ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই ললিতা-দিদির ওখানে সকালে বিকালে যাইতেছে?

কয়েক দিন প্রচুর বর্ষাপাতের পর সে দিন রৌদ্র অমল বিভায় জগৎ পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। জিতেশ নীলিমাকে বলিল, "যাবে নীলি! ঐ পাহাড়টার ধারে বেড়িয়ে আসব'খন?"

স্বামীর কাছ হইতে এ প্রশ্ন অপ্রত্যাশিত। নীলিমার অন্তরে আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠিল, কিন্তু কৃত্রিম ভাবগাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া সে নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল, "আমায় মাপ করো, আমার ললিতা-দিদির ওখানে একটু কায আছে।"

অপ্রতিভ না হইয়া জিতেশ বলিল, "বেশ, তা হ'লে আমি একাই বেড়িয়ে আসি। অনুমতি করছ ত?"

জিতেশের স্নেহোচ্ছ্বসিত স্বরে নীলিমা মুগ্ধ হইয়া উঠিল। সহজ ও মোলায়েম করিয়া বলিল, "যাও, আমার পরে রাগ করছ না ত?"

জিতেশ হাস্য ও গাম্ভীর্য্য মিশাইয়া বলিল, "না লক্ষ্মি! তোমার আমার সম্বন্ধ ত রাগের নয়। সেই যে বলেছিলাম—'যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম,' সেই ঐক্যতান ত জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে।"

নীলিমা কথা বলিল না, গভীর শ্রদ্ধায় স্বামীর একান্ত নির্ভর প্রেমকে অনুভব করিল। একবার মনে হইল, তাহার সমস্ত সংস্কার, সমস্ত নব্য আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ভুলিয়া বলিয়া ফেলে—

"বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ!
দেহ মন আদি   তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান।"

কিন্তু শুভ ইচ্ছা হইলেই মানুষ তাহা সকল সময়ে পূর্ণ করিতে পারে না। নীলিমার মনে "নোরার" বিদ্রোহী মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। সে নিজেকে সামলাইয়া ললিতা-দিদির ওখানে চলিল।

ললিতা-দিদির ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, অপূর্ব্ব বসিয়া চা খাইতেছে। ললিতা-দিদি বলিলেন, "নীলিমা, এই আমার বোন্‌পো অপূর্ব্ব রায়, একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক।" আর অপূর্ব্বকে দেখাইয়া বলিল, "ইনি হচ্ছেন নীলিমা সেন—নারী-সমিতির কর্ম্মী সম্পাদিকা আর পরম বাগ্মী।"

অপূর্ব্ব হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, পরে মাসীমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মাসীমা! ওঁর জন্য এক কাপ চা আন্‌তে দিন।"

নীলিমা প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা করবেন, আমি চা খাই না।"

"সে কি! বিংশ শতাব্দীতে যে মধ্যযুগের কৃচ্ছ্রসাধন আনতে বসলেন? কারণ কি?"

নীলিমা লজ্জাসুন্দর কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমাদের বাড়ীতে চায়ের রেওয়াজ নাই। আমার স্বামী চা খাওয়া অপছন্দ করেন—"

অপূর্ব্ব টেবলের বদলে টিপয় চাপড়াইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "দেখুন!—এইটে আমার ভয়ানক অসহ্য—মানুষের আত্মাকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার চেয়ে পাপ কিছুই নেই—মুক্তির পতাকা আপনারা বইছেন—আপনাদের মধ্যে এ দুর্ব্বলতা ও দাসীপণা দেখবো ব'লে আশাই করিনি। সকলের চেয়ে বড়কথা—আপনাকে জানুন। স্বামী কি বলেছেন, কি চেয়েছেন, কি ভালবেসেছেন, সেটাই কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের মাপকাঠি নয়। আপনি কি চান, কি ভালবাসেন, সেইটাই আপনার স্বকীয় ধর্ম্ম, আপনার 'ডিউটি'। আপনার সতীত্ব—আপনার মহত্ব—মানুষের মুক্ত মনের এই যে বিরাট দাসত্ব, এই আমার ভীষণ পীড়া দেয়। আমার সাহিত্যে তাই সকল সংস্কারকে

ভেঙ্গে গুড়ো ক'রে, নয় স্বাধীনতার বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়েছি।"

এক নিশ্বাসে কথাগুলি শেষ করিয়া অপূর্ব্ব দৃঢ় বিশ্বাসের অগাধ জোরে নীলিমার ব্রীড়াভিরাম মুখমণ্ডলের প্রতি সতেজ দৃষ্টিতে চাহিল। নীলিমা ধীরে ধীরে অপরাধীর মত জড়িত-ভাবে বলিল, "শুধু স্বামীর ইচ্ছা নয়, আমি নিজের ইচ্ছায় খাই না।"

অপূর্ব্ব বক্তৃতার ছন্দে বলিল, "না, ঐখানে আপনার ভুল হচ্ছে—চিরন্তন সংস্কার আপনার কামনাকে রুদ্ধ ক'রে রেখেছে—আপনি অজ্ঞাতে আত্মপীড়া করছেন, কিছুতেই তা আপনি বুঝছেন না। আমার মতে এই বন্ধনের ব্যাধি থেকে দেশ উদ্ধার করাই সাহিত্যিক ও সংস্কারকের কর্ত্তব্য। শাস্ত্র, দেশাচার, মিথ্যা ভয়ের নাগপাশে দেশ মরতে বসেছে—এই জুজু থেকে সবাইকে বাঁচাতে হবে। আমার লেখায় আমি পুনঃ পুনঃ এই বাণী প্রচার করেছি যে, জড় দাসত্বের চেয়ে বিশৃঙ্খলতা স্বেচ্ছাচারও ভাল। মানুষ যতই গণ্ডী এঁকে নিজেকে বাঁধে, ততই সে মরে। যাক্, আপনার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। মাসীমা, তবে কিছু খাবার দিন।"

প্রথম পরিচয়ের আরম্ভেই অপূর্ব্বর এইরূপ বক্তৃতা ও মন্তব্য কি নীলিমা শোভন বলিয়া মনে করিয়াছিল?

মাসীমা খাবার আনিতে গেলেন। অপূর্ব্ব বলিয়া চলিল, "আমার 'নবযুগে' আমি এই কথা বলেছি যে, খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেই মানুষের বন্ধুতা ও পরিচয় জন্মেছে, হিন্দুজাতি যে মরেছে, তার এক কারণ তাদের ছত্রিশ রকম অন্নবিভাগ। আমাদের দেশে কোন দিনই সংঘবদ্ধ কায করতে পারিনি, তার কারণ, এক মানুষ আর মানুষের সাথে কখনও প্রাণের যোগে মিশতে পারে নি। ছোট ছোট দল গ'ড়ে এরা আত্মহত্যাই করেছে। মনে করুন, হিন্দুর এক সৈন্যদল গড়তে হবে—তাতে যুদ্ধাস্ত্রের যত বোঝা হক না হক, বোঝাদের হাঁড়ীর বোঝা তার বেশী হবে।"

মাসীমা তিন প্লেটে করিয়া ল্যাংড়া আম কাটিয়া আনিলেন। মাসীমার অনুরোধে নীলিমা অপূর্ব্বর সাক্ষাতে আম্র খাইবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিল না।

মাসীমা বলিলেন, "নীলিমা, অপূর্ব্ব তার প্রবন্ধ শেষ করেছে, এবার একটা বড় সভা করতে হবে। সামনের ঝুলন-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় করলে খুব তা

নীলিমা সোৎসাহে বলিল. "তা বেশ হবে, তা হ'লে নিমন্ত্রণপত্র ছেপে ফেলি। এবার একটু জাঁকালো ধরণের সভা করতে হবে, শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষদেরও ডাকতে হবে। তাঁদের কাছে আমাদের সমিতির বার্ত্তা বহন করতে হবে।"

ললিতা-দিদি বহু অভিঘাতে সংসারের পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, "এতটা কি পেরে ওঠা যাবে?"

নীলিমা নূতন সম্পাদিকার নূতন উৎসাহে জানাইল, "আলবৎ হবে—ইচ্ছা করলেই সব সিদ্ধি লাভ করা যায়।"

অপূর্ব্ব প্রশংসমান স্বরে উত্তর করিল, "আপনার কথা শুনে আমার বিশেষ আনন্দ হচ্ছে। মেয়েদের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু আপনি যদি ধৃষ্টতা না মনে করেন, তবে বলি, আপনার মত মহীয়সী নারী আমার চোখে পড়ে নি।"

কথার মধ্যে অত্যুক্তি ছিল কি না, নীলিমা ধরিতে পারিল না। কারণ, কোনও ভক্তের প্রশংসা শুনিতে মনে সংশয়ের আবির্ভাব সহসা হয় না। তার পর নীলিমার নিজের আত্মা-ভিমান যথেষ্ট ছিল। তাহার মত রূপসী ও বিদুষী বাঙ্গালীর ঘরে দুর্লভ, এ কথা অসত্য নহে। নীলিমার চিত্ত অপূর্ব্বের প্রতি প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

কিন্তু আলাপ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ভজুয়া দেখা দিল, "মাইজী, বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন।"

ভৃত্যের কণ্ঠে স্বামীর আহ্বান যেন আদেশবার্ত্তার মত শুনাইল। স্বাধীনতার মূর্ত্ত বিগ্রহ অপূর্ব্বের কাছে উহা ব্যক্ত হওয়ায় নীলিমার অন্তর বিরস হইয়া উঠিল। সে তাচ্ছীল্য-ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে?"

"ডিপ্‌টী বাবু আর উন্‌কো মাইজী এসেছেন।"

নীলিমা বুঝিল, নরনাথ সস্ত্রীক আসিয়াছেন। পেলব কর-পল্লব তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া সে বলিল, "আজ তবে আসি।"

মাসীমা বলিলেন, "এ শিকার যেন হাত-ছাড়া না হয়, সভ্যতালিকার খাতা দিয়ে দেবো কি?"

নীলিমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "না, আজ থাক্।"

৬

নরনাথের মোটর বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। পৌঁছিতেই একটি তরুণী হাস্যবিভাত-মুখে সংবর্দ্ধনা করিয়া বলিল, "আসুন দিদি, আপনার ঘরে আপনাকে অভ্যর্থনা করছি।"

তার পর গড় হইয়া নীলিমার চরণ-ধূলি লইয়া প্রণাম করিল। নীলিমা আদরে তরুণীকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ও কি করছ বোন্, তোমার আত্মাকে হেয় ও লঘু করো না। চিরকাল মাথা নোয়াইয়া আমাদের মাথায় যথেষ্ট ধূলি জমে গেছে, সেগুলি এখন একদম ঝেড়ে ফেলতে হবে।"

তরুণী দেবহূতি নরনাথের স্ত্রী। ক্ষণিক বিস্ময়ে ও কৌতূহলে সে নীলিমার সুষমাদীপ্ত মুখের পানে চাহিল, পরে বলিল, "না দিদি! আমি ভাগবত-পড়া বাপের মেয়ে. তোমার এ কথায় সায় দিতে পারছি না। বাবা নরোত্তমের পদাবলী গাইতেন, তার এক যায়গায় আছে,...

'আর কবে হেন দশা হব
শ্রীব্রজের ধূলা ভূষণ করিব।'

ধূলাকে ত হীন ব'লে আমরা দেখতে শিখিনি।"

নীলিমা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু আলোচনা বেশী অগ্রসর হইল না। হল-ঘরে পৌঁছিতেই দেখিল, দুই বন্ধু ফূর্ত্তিতে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছেন। নীলিমাকে দেখিয়া নরনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "নমস্কার, বৌদি! দাদাকে অন্ধকার কূপে ফেলে সকালে কোথায় গিয়েছিলেন?"

"এই পাশের বাড়ীতে, আমাদের নারী-সমিতির একটা বিশেষ অধিবেশন হবে, বাঙ্গালার প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক অপূর্ব্ব রায় একটি প্রবন্ধ পড়বেন, তার সব ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।"

"কোন্ অপূর্ব্ব রায়? যিনি 'নবযুগ', 'বিদ্রোহ', 'মহামুক্তির ডাক' এই সব বই লিখেছেন ত?"

"হাঁ! বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান যুগে অমন লেখা আর কারও কলমে বেরোয় নি শুনেছি। আনকোরা সব নতুন ভাব দিয়ে ইনি দেশকে মাতিয়ে তুলেছেন।"

"না বৌদি, আপনার মত হয় ত আমি সাহিত্যের জহরী নই, কিন্তু ওদের লেখা প'ড়ে মনে হয়, এরা সব ভয়ঙ্কর জীব—নারী-মহলে এদের আনা ঠিক নয়, বৌদি।"

"কি বলছেন আপনি, বাঙ্গালার মনীষীরা এঁকে জয়মাল্য দিয়ে উৎসাহিত করেছেন।"

নরনাথ কৌতুকের সহিত বলিল, "মনীষীরা করতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয়, এরা বিধ্বংসার যে লেলিহান শিখা জ্বালছেন, তাতে বাঙ্গালার ঘর ঘর আগুন জ্বলবে।"

জিতেশ বাধা দিয়া বলিল, "ও তর্ক এখন থাক ভাই। নীলিমা! যাও ত, ওঁদের কিছু মিষ্টমুখের ব্যবস্থা কর গে।"

"কেন, ঠাকুরকে এতক্ষণ খাবার করতে বলনি?"

জিতেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "বলেছি।"

দেবহূতি পাশ হইতে বলিল, "ঠাকুর-চাকরের দ্বারা কি কিছু হয়? চল দিদি, দেখি, ওরা কি করছে।"

নীলিমা দেবহূতির সহিত ভিতরে চলিল। তার পর বলিল, "তোর নামটি কি, বোন্?"

"বাবা একটা সংস্কৃত নাম রেখেছেন দেবহূতি, সেটা শুধু পেঁটরা-ঢাকা কাশ্মীরী শাল, তার থাকার গৌরব লয়েই মুগ্ধ। আটপৌরে ব্যবহারের জন্য সবাই ডাকে দেবী ব'লে। আর উনি আদর ক'রে ডাকেন চেরী ব'লে।"

নীলিমা দেবীকে প্রসন্ন বিস্ময়ের সহিত দেখিতেছিল। বড় ঘরের মেয়ে আর বড়লোকের ঘরণী, অথচ সজ্জায় তাহার যাদুকরী মোহ দেখাইবার চেষ্টা নাই। নীলিমা উঁচু হিল-দেওয়া জুতা মসমস করিয়া চলিয়াছিল। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখিল, দেবী খালি পায়ে চলিয়াছে, গহনার বাহুল্য নাই, হাতে চারিগাছি করিয়া হাতীর দাঁতের বাঁধান কারুকার্য্যময় শাঁখা, পরনে একখানি দামী শান্তিপুরে ধুতি। সীমন্তের উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। মেয়েরা আজকাল প্রায় সিন্দুর পরা ছাড়িয়াছে বলিলেই হয়। দেবীর সীঁথির চওড়া সিন্দুর-রেখা যেন তাহাদের তীব্র প্রতিবাদ। নীলিমার একবার মনে হইল, হয় ত গেঁয়ো ভূত, সহরে নূতন তদ্বিষৎ কিছুই জানে না। কিন্তু তাহার অনুমান সত্য নহে। তরুণীর চালচলনের মধ্যে এমন একটি মাধুর্য্য ও এমন সাবলীল গতি আছে, যাহা ভদ্রসমাজের সহবৎ হইতে জাত। নীলিমা অনুমান করিল, ভাগবত-পড়া পিতার কন্যা, প্রাচীন রীতির প্রতি শ্রদ্ধা পিতা হইতে পাইয়াছে. আর নূতনের হাব-ভাব স্বামীর কাছে শিখিয়াছে। সে যাহা হউক, দেবহূতির বৈশিষ্ট্য নীলিমাকে মুগ্ধ ও প্রীত করিয়া তুলিল।

রান্নাঘরে যাইয়া দেখা গেল, সিঙ্গেড়ার পূরের জন্য যে আলু কোটা হইয়াছে, তাহা ধোয়া সত্ত্বেও একরাশ ধূলা-ভরা, আর ময়দার লেচিগুলি এমন একখানি ময়লা তাওয়ার উপর রাখিয়াছে যে, দেখিলে বমির উদ্রেক হয়। রান্নাঘরটি ঝুল-কালীতে ভরা, হাঁড়ী লেখা এমন অপরিষ্কার যে, নীলিমারই মনে লজ্জার সঞ্চার [illegible] পূর্ব্বে অবশ্য নীলিমা রান্নাঘরের

তদারক করিত, কিন্তু বর্ত্তমানে নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। রান্নাঘরের এই শোচনীয় মলিনতা আজ সর্ব্বপ্রথম নীলিমার গণ্ডদেশকে আরক্ত করিয়া তুলিল।

দেবী তাহার অনুপম স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "দিদি বুঝি হেঁসেল দেখতে সময় পান না?"

নীলিমা আমতা আমতা করিয়া বলিল, "হাঁ বোন্, কত কায করতে হয়।"

দেবী তর্কের দিক্‌টা এড়াইয়া জানাইল, "যদি কিছু মনে না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, আপন হাতে রেঁধে ও তদারক ক'রে স্বামীকে না খাইয়ে আপনি কেমন ক'রে তৃপ্তি পান? আমি ত পারি না।"

নীলিমা উত্তর দিল না। ঠাকুরকে সরাইয়া নিজেই সিঙ্গাড়া করিতে বসিল। দেবী পাশে বসিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। ক্ষিপ্র হস্তে কায করিয়া যখন এক কাপ চা ও দুই-খানি প্লেটে করিয়া সিঙ্গাড়া আনিয়া হল-ঘরে পৌঁছিল, তখন নীলিমা শুনিতে পাইল, নরনাথ বলিতেছে, "না ভাই, প্রেম-সাধন সহজ নয়। কৃচ্ছ্রসাধন চাই, কেবল উপনিষদের পাতায় মসগুল থেকে নারীর চিত্ত জয় করা যায় না, চেষ্টা ও প্রযত্নের দ্বারা প্রেম জয় করতে হয়।"

ভাগ্যে দেবী সঙ্গে আসে নাই! সে তখন ঠাকুরকে বকিয়া-ঝকিয়া হেঁসেল-রক্ষার বক্তৃতা করিতেছিল। আত্ম-সংবরণ করিয়া নীলিমা চা লইয়া প্রবেশ করিল।

জিতেশ নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌঠাকরুণ কৈ? তাঁর খাবার এখানে দিতে বল্লে না কেন?"

নীলিমার কথা বলিবার পূর্ব্বেই নরনাথ বলিল, "সে গুড়ে বালি। সাধ্যসাধনা করেও তাঁকে সঙ্গে ব'সে খাওয়াতে পারি নি। দেখুন বৌদি, ওকে যদি বুঝিয়ে আপনার সমান অধি-কারের বাণী শিখিয়ে দিতে পারেন।"

নীলিমা বুঝিল, ইহা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গমাত্র। পত্নী-গৌরবের জয়োল্লাসের দর্পে গর্ব্বিত স্বামীর উক্তি। বৃশ্চিক-দংশনের মত জ্বালা অনুভব করিয়া নীলিমা ক্রুদ্ধ-কৌতুকে বলিল, "না ঠাকুরপো! আপনার প্রাণের দেবী আমাদের সংস্পর্শে কলুষিত হয়ে যাবেন, সে কি আপনি সহ্য করতে পারবেন?"

নিজের কথার ঝাঁঝ নিজেই অনুভব করিয়া নীলিমা কথা ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "তবে বোনটিকে দিন, আমাদের সমিতির সভ্যা ক'রে নি।"

নরনাথ আঘাতকে উপেক্ষা করিয়া বলিল, "আমার মতের চেয়ে বোধ হয় আপনার বোনের 'স্বাধীন মত' লওয়াই শ্রেয়ঃ। কারণ, আপনাদের মতে আমরা ত আর এখন মালিক নই, তবে আমার অনুমান, উনি ভীতা হরিণীর মত আপনাদের সমিতিকে ব্যাঘ্র ব'লে ভয় পেয়ে যাবেন।"

নীলিমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনার রসজ্ঞতা প্রশংসনীয়।"

নরনাথ প্রত্যুত্তর দিল, "আপনি যদি তারিফ করেন, তবে একটা শিরোপা দিয়ে দিন। জানেন কি বৌদি! দাদার মত উপনিষদের অমৃতরসে মসগুল হ'তে পারিনি, কাছারীর নরক গুলজার থেকে ঘরে ফিরে ফষ্টিনষ্টি করেই দিন কেটে যায়। তবে "ভাগবত-পড়া বাপের মেয়ের" দৌরাত্ম্যে বকাটে মেরে যাইনি। কাযেই 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' করেই দিন চ'লে যাচ্ছে। একটা কথা কি জানেন, বৌদি! উনি আমার সবে-ধন নীলমণি, সভাসমিতিতে ছেড়ে দিতে একটু শঙ্কাই হয়।"

নীলিমা বুঝিল, নরনাথের সহিত কথায় আঁটিয়া উঠা তাহার পক্ষে অসাধ্য, কাযেই সে চুপ করিয়া রহিল।

দেবী ঘরে আসিল। নীলিমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেরী হয়ে গেল, দিদি! আজ আসি এখন।"

"এর মধ্যেই যাবি, বোন্?"

"হাঁ দিদি, উপায় নেই, তোমায় ত বলেছি, বাসায় ফিরে 'রাঁধুনীগিরি' করতে হবে।"

মোটরে পৌঁছাইয়া দিয়া জিতেশ বলিল, "মাঝে মাঝে আসবেন, বউঠাকরুণ।"

জিতেশের আহ্বানের কাতরতা তাহার অন্তরের উদাস রিক্ততাকে প্রকাশ করিয়া তুলিল। নরনাথ মুখ ফিরাইয়া লইল। নীলিমাও বলিল, "অবসর পেলেই আসবি, বোন্। তোদের বাসা যে দূরে, আমি ত আর রোজ রোজ যেতে পারবো না।"

দেবহূতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সময় পেলেই আস্‌বো দিদি, নিশ্চয়।"

মোটর চলিয়া গেল। জিতেশ ও নীলিমা বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মনে তখন যে ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছিল, তাহাতে পার্থক্য ছিল কি?

৭

ঝুলন-পূর্ণিমার সভাকে পূর্ণায়ত ও সর্ব্বাঙ্গশোভন করিবার জন্য নীলিমা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। ছোট সহরে রীতিমত হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। প্রাচীনপন্থীরা ব্যাপারটি বাড়াবাড়ি মনে করিয়া নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তরুণের দল আর সহজপন্থী নিরুপদ্রব জীবন-যাপনকারীরা সভার উৎসবকে আনন্দ ও উল্লাসের সহিত গ্রহণ করিল।

ইতিমধ্যে অপূর্ব্ব ও নীলিমার মধ্যে ললিতা-দিদির বাড়ী অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। অপূর্ব্বের উত্তেজনা প্রদ অভিনব মতবাদ সর্ব্বান্তঃকরণে সে সমর্থন করিতে না পারিলেও, মন্ত্রমুগ্ধের মত সে তাহার বক্তব্য শুনিয়া যায়।

মিশনারী টমসনের পত্নী মিসেস্ টমসন সভানেত্রীর কায করিতে স্বীকৃত হওয়ায় সভায় বহু লোকজনসমাগম হইল। পত্র-পুষ্প-শোভিত মণ্ডপে সহরের মহিলারা ও বিশিষ্ট ভদ্র মহাজনগণ সমবেত হইলেন।

ললিতা-দিদি প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণ করিয়া নীলিমাকে সভার ইতিহাস পড়িতে বলিলেন। নীলিমার সরল সহজ সুন্দর রূপ সকলকে মুগ্ধ করিল। তাহার পর তাহার বলিবার ভঙ্গীটিও বিচিত্র। সকলেই আগ্রহভরে তাহার পঠিত কার্য্য-বিবরণী শুনিল।

নীলিমার বলা শেষ হইলে অপূর্ব্ব উঠিল। অপূর্ব্বের সজ্জা সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। তাহার মাথায় বিবেকানন্দী পাগড়ী, গায়ে গরদের মিরজাই, পায়ে দিল্লীর নাগরা—চোখে 'Tortoise-shell'এর চশমা।

অপূর্ব্বের ভাষায় কিছু ন্যাকামী আর মোলায়েম মেয়েলী ভাব থাকিলেও তাহার গলার জোরে সমস্ত বক্তৃতাটি ভাস্বর হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিল, "আমি একেবারে নতুন কথা বলতে চাই। সতীত্বের যে পচা আদর্শ আমাদের মনকে পঙ্গু করেছে, সেটাকে ভাঙতে হবে। একপতিত্বের যে সংস্কার বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে, সেটা একটা অন্ধ বিশ্বাস। মা হওয়াই আঁর দাসীপণা করাই নারীত্বের জয়বার্ত্তা নয়। মানুষ হওয়াই আর জীবনের আনন্দকে পাওয়াই তার সাধনা। পৃথিবীতে আজ এই মহাসাম্যের বাণী শোনাতে হবে। পুরুষ যদি এখনও সাবধান না হয়, তবে নারীর জাগ্রতশক্তি তাকে পিষে মেরে ফেলবে—নারীর ভবিষ্যৎ আশার উজ্জ্বল এক দিন আসছে—যে দিন নারীর অবদান মানুষের কৃষ্টিকে সফল ক'রে তুলবে। তাই ভাবী যুগের নবী হয়ে বর্ত্তমানের নারীকে আমি বলতে চাই—মোহ-কারা ভাঙুন—আত্মপ্রতিষ্ঠ হন, সমস্ত বন্ধনের বেড়া সবলে ভেঙে মুক্ত স্বাধীনতার মুক্ত আকাশতলে বেরিয়ে পড়ুন—নারীর পতি-সেবাই বড় নয়, নারীর সতীত্বই শ্রেয়ঃ নয়, নারীর মাতৃত্বই তার কাম্য নয়, নারীর আত্মার স্ফুরণ চাই—ব্যক্তিগত জীবনে আনন্দের উদ্বোধন চাই—"

অপূর্ব্বের সমস্ত বক্তৃতার উহাই সারাংশ। বক্তার নির্ভীক মতবাদ সকলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। প্রবীণগণ ব্যতিব্যস্ত হইলেন, বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এবার হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে গেল।" তরুণ ও তরুণীদিগের এক দল ঘন ঘন হাততালি দিয়া বক্তাকে অভিনন্দিত করিয়া তুলিল।

বুড়া উকীল পরেশ বাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন, "স্বৈরাচার যে পৌরুষ নয়, এ কথা বক্তা ভুলেছেন—নারীর আত্মা প্রেমের ও মাতৃত্বের মধ্যেই স্ফুর্ত্ত হয়—আত্মার স্ফুরণ ব'লে বক্তার যে লম্ফঝম্প, তাহা আকাশকুসুম, এ কথা সবাই যেন মনে রাখেন!"

বক্তৃতা কিন্তু বেশী দূর চলিল না—চারিদিকে সমালোচনা, বিদ্রূপ জাঁকাল হইয়া উঠিল। কেহ বিড়াল ডাকিল, কেহ শিয়াল ডাকিল, কেহ চেয়ার উল্টাইল, কেহ টেবল চাপড়াইল।

মিসেস্ টমসন উঠিলে গোল থামিল। কিন্তু বহুলোক তখন সভাস্থলকে কেচ্ছা মনে করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মিসেস্ টমসন ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আজ এখানে যেরূপ রীতি দেখিতেছি, তাহাতে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ভাল বলিয়া মনে হয় না। বাগ্মী ভাল বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁর মত যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁহার মত বাঙ্গালী-সমাজে বিষের কায করিতে পারে। বাঙ্গালাদেশের সতীত্বের আদর্শ মহান্। বর্ত্তমান সমিতি সেই প্রাচীন সংস্কৃতি অবলম্বন করুন। আমি আপনাদের শুভকামনা করি। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

সভা ভাঙ্গিয়া গেলে যে যাহার স্থানে ফিরিয়া চলিল।

৮

ললিতা ও নীলিমা প্রথমে মনে করিয়াছিল, হয় ত তাহারা একটা বড় কায করিয়াছে; কিন্তু যখন দলে দলে অনেক সভ্য নাম কাটাইতে বুঝিল, তখন তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

অপূর্ব হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই মাসীমা, নূতন বাণীর বার্ত্তা যারা বয়, ভয়-ডর তাদের নেই, সেই অভয়-মন্ত্র মনে থাকলে লক্ষ পরাজয়েও দমবেন না।"

ললিতার মনে খুব বেশী শান্তি হয় না। শিক্ষয়িত্রী তিনি, বুড়া বয়সের দিনগুলি হৈ-চৈ করিয়া কাটাইবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ বিজয়ীর বেশে পরাজয় দেখা দিল। তরুণীদের কাহারও কাহারও উৎসাহ ও উল্লাস থাকিলেই ত সমিতি চলে না; কর্ত্তাদের অর্থ সদরে হউক কি মফঃস্বলে হউক, এক গিন্নি-বান্নী মানুষেই দিতে পারে, কাযেই ললিতা নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলেন।

নীলিমার মন উত্তেজনার পর অবসাদে আর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু অপূর্ব্ব তাহাকে ছাড়ে না, দেবদূতির চরিত্র-মাধুর্য্য নীলিমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সে তাহার মত করিয়া, স্বামীর চিত্ত-রাজ্য জয় করিয়া রাজ-রাজেশ্বরী হইবে, এ সদিচ্ছা জাগিয়াছিল, কিন্তু সুযোগ জুটে না। সময়ে ও অসময়ে ললিতা-দিদি ডাকিয়া পাঠান, নিজের নৈরাশ্যের নিরাকরণ জন্য, আর অপূর্ব্বের অনুরোধে।

অপূর্ব্ব বলে, "দেখুন, আপনার সাথে আমার পরিচয় হয় ত জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফল। আমি এসেছিলুম কল্পনার মসলা খুঁজতে, পেয়ে গেলুম মনের মানসী। আপনার বন্ধুত্ব আমার দিব্য চোখ খুলে দিয়েছে। আপনার অনুমতি হ'লে আমার ভাবী কাব্য-সাধনা আপনাকে উৎসর্গ ক'রে ধন্য হবো।"

নীলিমা অপূর্ব্বের দৃষ্টিতে শঙ্কিত হইয়া উঠে। প্রতিদিনই ভাবে, আর যাইবে না, কিন্তু এ যেন কুহকীর কুহক-আকর্ষণ, বশীকরণের মন্ত্রে যেন টানিয়া লয়।

নীলিমার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে একান্ত নির্ভর প্রেম আর ব্যক্তিত্বের গর্ব্ব ও অভিমানে যে বিদ্রোহ চলিতেছিল, তাহার সুমধুর প্রকাশ রূপদক্ষ অপূর্ব্বকে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।

কেবল রূপসী ও শিক্ষিতা হইলেই হয় ত এত মোহ জন্মিত না, নীলিমার মধ্যে অসাধারণত্ব দেখিয়া অপূর্ব্ব পোকার মত আলোশিখার উপর ঝাঁপ দিতেছিল।

অপূর্ব্ব বন্ধুত্ব ভাবিয়া অগ্রসর হয়। নীলিমার মনোমোহন রূপ, রসজ্ঞ আলাপ আর সর্ব্বোপরি অবিচল সাহস ও কুণ্ঠাহীন আত্মপ্রকাশের ভাব অপূর্ব্বকে এক নূতন রসের ও এক নূতন লোকের সন্ধান দিয়াছিল।

কিন্তু মানুষের মনে কখন্ যে রং ধরিয়া যায়, কে জানে? অপূর্ব্বও হয় ত জানিল না যে, তাহার দাবী বন্ধুতা ছাড়াইয়া, অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

অপূর্ব্ব এক দিন স্বেচ্ছায় জিতেশের সহিত দেখা করিল। জিতেশ তাহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। কথায় কথায় জিতেশ বলিল, "আপনার নাম যথেষ্ট শুনেছি, কিন্তু কথা-সাহিত্য আমার মনের মাঝে কোন ছাপ দেয় না, তাই ওগুলি পড়তে পারি না।"

অপূর্ব্ব সোৎসাহে বলিল, "কিন্তু কথা-সাহিত্য বর্ত্তমানের যুগ-সাহিত্য, কাব্য ও নাটকের যুগ চ'লে গেছে, এখন আপনার যুগবার্ত্তা উপন্যাসের মাঝেই লোকের দ্বারে পৌঁছে—"

"হবে হয় ত! সংসারের গতি-চক্রের পিছনে প'ড়ে মহা মুস্কিল হয়েছে, অপূর্ব্ব বাবু! আমার স্ত্রী চলেছেন ভাবী পঞ্চবিংশ শতাব্দীর ভাব ও আশা নিয়ে আর আমি হয় ত' চলেছি পঞ্চদশ শতাব্দীর স্থিতি নিয়ে। তাই সময় সময় ভাবি যে, একবার সমসাময়িক মানুষের মনের খবর লই। আপনার দু'একখান বই এবার প'ড়ে দেখবো।"

"আপনার স্ত্রী-সৌভাগ্য অসীম। বাঙ্গালাদেশে ত কম ঘুরিনি। সাহিত্যের উপাদানের জন্য কত যায়গায় গিয়েছি; কিন্তু আপনার স্ত্রীর মত এমন জীবন্ত নারী দেখিনি—"

জিতেশ জিজ্ঞাসুর মত বলিল, "নীলিমার সাথে আপনার আলাপ হয়েছে? ওঃ, তাই বলুন। ভজুয়া! ভজুয়া! তোর মাইজীকে বল্, অপূর্ব্ব বাবু এসেছেন।"

অপূর্ব্বের মনে হইল যে, তাহাদের পরিচয় কেতাদুরস্ত হয় নাই, তাই বলিল, "পরিচয় হয়েছে বল্লে ভুল হবে, তবে মাসীমার ওখানে ওঁকে বহুবার দেখেছি। নারী-সমিতির সম্পাদিকা হিসাবে ওঁর কায দেখবার সুযোগ হয়েছে। আশ্চর্য্য শক্তি ওঁর!"

"আপনার কুণ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমার স্ত্রী পর্দ্দাকে মানেন না। সুতরাং পূর্ব্বে পরিচয় হওয়ার ক্ষোভের কারণ নাই।"

জিতেশ অপূর্ব্বের কথিত পত্নীর গুণ-গ্রাম শুনিয়া পুলকিত হইল কি? কোন্ স্বামীই বা না হন? জিতেশ নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল—"হায়, জগতের সকলেই নীলিমার প্রশংসা করে, আর সেই শুধু তাহাকে অবহেলা করে।"

নীলিমা আসিল। গরদের শাড়ী পরিয়া সে মহিম্নস্তোত্র পড়িয়া মনকে শান্ত করিতে যাইতেছিল। অপূর্ব্বের আগমন তাহাকে খুশী করিল না। নীলিমা আসিতেই জিতেশ সোৎসাহে বলিল, "দেখ, ওঁর দু'একখান বই আমার পড়তে দিও ত। ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে বড়ই আপ্যায়িত হয়েছি।"

নীলিমাকে উত্তর দিতে না দিয়া অপূর্ব্ব বলিল, "সে জন্ত আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, আজই আমার প্রকাশককে লিখছি, আমার এক সেট বই আপনাকে পাঠিয়ে দেবে।"

"ধন্তবাদ, কিন্তু—"

"না জিতেশ বাবু, এতে কিন্তু করবেন না। স্বল্প পরিচয়ই মানুষকে দূর করে না। আপনার মধুরতা আপনাকে আমার নিকট ক'রে তুলেছে।"

নীলিমা জিতেশকে বলিল, "কিন্তু ওঁর বই তোমার ভাল লাগবে না। বিদ্রোহের বজ্রবাণী শুনে তুমি চমকে উঠবে। থাক না কেন—"

জিতেশ পত্নীর সম্মতির আশায় বলিল, "আমি মনে করছি যে, দু'চারখান প'ড়ে দেখি। যে যুগে বাস করছি, তার মনোভাব জানাও ত দরকার। সত্য অবশ্য শাশ্বত; কিন্তু যুগভেদে তার প্রকাশ ত বিভিন্ন হয়ে দেখা দেয়।"

"তবে পড়ো, কিন্তু এ সব বই পড়লে তুমি অসুস্থ ও অসুখী হবে।"

পতি ও পত্নীর দ্বন্দ্বতা অপূর্ব্বকে হাঁপাইয়া তুলিল। কিন্তু নীলিমার কথাগুলির সদর্থ সে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তাই সংশয়াকুল-চিত্তে আত্মপক্ষসমর্থনের জন্ত সে বলিল, "শুনুন জিতেশ বাবু, আপনার যথেষ্ট পড়াশুনা আছে। এমন এক দিন ছিল, যখন পথে ঘাটে মানুষ ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠত, পুষ্প-নৈবেদ্যে ভূতপূজা কোরতো। আজ ভূত নেই বল্লে, কেউ মারবে না, কিন্তু সে যুগে যদি কেউ বলতো, তবে তাকে হয় ত জীবন্তে গোর দেওয়া হ'ত। আজ স্থিতির সমাজে আমাদের বাণী হয় ত বিপ্লবের ও বিশৃঙ্খলার দ্যোতক ব'লে ভুল হ'তে পারে, কিন্তু মহাকাল অতন্দ্র জেগে আছেন, আমাদের বার্ত্তা হয় ত এক দিন মানুষ মেনে নেবে।"

জিতেশ বলিল, "ঠিকই ত, বেদের কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে যদি মানুষ ব'সে থাকতো, তা হ'লে কি আর উপনিষদের তত্ত্ব জাগতো? ক্রম-বিবর্ত্তন হচ্ছেই ত।"

অপূর্ব্ব বলিল, "বাঃ! আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, আপনি যুগসাহিত্য না প'ড়ে যুগের মর্ম্মবাণীটি অধিকার ক'রে নিয়েছেন।"

জিতেশ বলিল, "নীলিমা, ঠাকুরকে চা দিতে বলো।"

নীলিমা বলিল, "তোমরা গল্প করো, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমার একটু কায আছে।"

অপূর্ব্ব জানাইল, "ক্ষমা করবেন, জিতেশ বাবু! আপনারা ত কেউই চা খান না, চায়ের দরকার নেই। সন্ধ্যা হয়েও এলো, আজ উঠি, নমস্কার।"

জিতেশ প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, "অবসর পেলেই আসবেন।"

৯

কয়েক দিন ধরিয়া আকাশে অনবরত জল ঝরিতেছিল। মহুয়া ও শালবনের কালো তরুরাজি কালো মেঘে শ্যামতমাল-কুঞ্জ বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল। জিতেশ বাহিরপানে চাহিয়া দেখিল, বাড়ীর সম্মুখে মাঠের পর মাঠ চলিয়াছে, তাহাতে ধানের কচি শিশুগুলিরা মাথা তুলিয়া আনন্দ জানাইতেছে। বর্ষার দিনে প্রিয়জনের সঙ্গ মানুষের প্রিয়তম হইয়া উঠে, কিন্তু কয়েক দিন ধরিয়া নীলিমার ভারাক্রান্ত মন দেখিয়া বেচারী তাহার হদিস পাইতেছিল না। কাজেই উদাস আলস্যে সে মেঘের ক্রীড়া দেখিতে লাগিল।

বাড়ীর ভিতর নীলিমা আপন বিছানায় শুইয়া ছিল। তাহার মনে একটা দুশ্চিন্তা নানাভাবে ঘোরাফেরা করিতেছিল। অপূর্ব্ব তাহার জন্ত যে আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নীলিমা বুঝিতে পারিয়াছে। যৌবনের ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষা এই যুবকের চোখে মুখে দেখিয়া সে সংকল্প করিয়াছে যে, আর নহে, এইবার স্বামীকে বলিয়া অপূর্ব্বকে দূর করিয়া দিবে। কিন্তু পারে নাই। প্রথমতঃ স্বামী ও স্ত্রীর যে সুনিবিড় ঐক্য উভয়কে একান্ত আপন ও একাত্ম করিয়া তুলে, তাহাদের তাহা ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, নীলিমার দৃঢ় সংস্কার, নারীকে পুরুষের সঙ্গে অবাধভাবে মিশিয়া নারীর অধিকার সপ্রমাণ করিতে হইবে।

নীলিম[illegible] ও কোন দাগ পড়ে নাই, কিন্তু অপূর্ব্বের [illegible] এক যাদু আছে—যাহা নীলিমাকে

বিমোহিত করিয়া ফেলে। নীলিমা তাই ভাবিয়া কূলকিনারা পাইতেছিল না।

ভোঁ ভোঁ শব্দে মোটর বারান্দার ধারে থামিল। নরনাথ সস্ত্রীক আসিয়া পৌঁছিল। জিতেশ আগু বাড়াইয়া বলিল, "আসুন বৌঠাকরুণ, ভাল আছেন ত?"

দেবহূতি সসম্ভ্রমে বলিল, "হাঁ, দিদি কোথায়? বাড়ীর ভেতর আছেন, না বেড়াতে গেছেন?"

জিতেশ ম্লানকণ্ঠে উত্তর দিল, "না, ভিতরেই আছেন।"

দেবহূতি বক্তার বেদনার্দ্র স্বরে ব্যথিত হইয়া উঠিল। পতির বন্ধুর এই অনর্থক মানসিক দুঃখ কিছু দূর করা যায় কি না, তাই ভাবিতে ভাবিতে অনুকম্পার আবেগে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনারা গল্প করুন, আমি দিদির কাছেই যাই।"

নরনাথ বসিয়া পড়িয়া বলিল, "যা ফ্যাসাদে পড়া গেছলো ভাই, দশ দশটা Bad livelihood কেস করবার জন্ম এ কয় দিন মফঃস্বলে ঘুরে ঘুরে প্রাণ হয়রাণ হয়ে গেছে।"

জিতেশ বলিল, "কৈ? আমি ত কিছুই জানি নে, তা বৌঠাকরুণ কি একলা বাসায় ছিলেন?"

নরনাথ হাসিয়া বলিল, "না, সে কি হবার যো আছে। চোখের আড়াল হলেই যদি মনের আড়াল হয়ে যাই, এই ভয়ে উনি কি আর ছেড়ে দেন? এ কি যেমন তেমন গিয়ো—"

জিতেশ গম্ভীর হইয়া উঠিল। এই দম্পতির জীবনের সুখচিত্রের সহিত নিজেদের পারিবারিক ঔদাসীন্যের তুলনা করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। নরনাথ কথা বলিয়া চলিল, "ছোটবেলায় এক কীর্ত্তনীয়া গান গেয়েছিল,—

'না বল না বল সই না বল এমনে
পরাণ বাঁধিয়া আছি সে বঁধুর সনে।'

কিন্তু এমন বর্ষার দিনে গরমগরম ফুলুরী না হ'লে আর মৌতাত হচ্ছে না। কোথায় গেল তোর চাকরটা। ওরে ভজুয়া, যা, মাইজীকে ফুলুরী ভাজবার হুকুম দিয়ে আয়।"

জিতেশ বলিল, "বেশ আছিস ভাই, কেমন করলে তোদের মতন অমন স্ফূর্তির জীবন পাই, বল ত? আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে, কিছুই আর ভাল লাগি'ছ না!"

"বলিস কি ভাই, এর মধ্যেই বৈরী এক নূতন সুরে কেন্নি যে? কেন, ব্যাপার কি? অভিমানের প[illegible] নাকি? তাল কথা, সহরে এসে শুনছি যে, সেই অপূর্ব্ব ছোঁড়াটার সঙ্গে বৌদির খুব ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে। এ কিন্তু ভাল নয়।"

জিতেশ বলিল, "অপূর্ব্ব আমার সাথে এসে আলাপ করেছে, ওকে ত বেশ রসজ্ঞ স্রষ্টা ব'লে বোধ হয়।"

নরনাথ সোজা হইয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার সরল মনে ধূলি দেওয়া মোটেই কঠিন কায নয়, বন্ধু। আমি বলছি না কোন কিছু খারাপ হয়েছে, কিন্তু যারা নিজেরা রিরংসার সাহিত্য রচনা করছে, তাদের কাছ থেকে কি মহত্ব আশা করা যায়? আর কেউ করে করুক, আমি করি না।"

জিতেশ বলিল, "ওর বইগুলি আমায় উপহার দিয়েছে। বাঙ্গালা সাহিত্য ত ভাই আমি পড়ি না, কাযেই এগুলো আমার কাছে একেবারে আশ্চর্য্য লাগছে। এরা কেবল ভাঙ্গতে চাচ্ছে, গড়বার মতলব নেই। যৌন-লালসার যে কলুষ এই লেখার পাতায় পাতায় বিষের মতন ছড়ানো, তাতে মানুষের দম আটকে যায়। প্রাচীন সাহিত্যে অশ্লীলতা আছে, কিন্তু তার মধ্যে এত বিষ ছিল না। তবে ছেলেটির লেখার জোর আছে, ভাই।"

"ঐ ত খারাপ করেছে। যে কামনার জ্বালা এদের শক্তিশালী লেখা জ্বালছে, সংযমের কোনও শান্তিবারিতে তা নিভবে না—এই সব ছাগ-সাহিত্য মানুষকে ছাগ ক'রেই তুলবে।"

ওদিকে দেবী যাইয়া দেখিল, নীলিমা বিছানায় অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছে। দেবী হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি দিদি, আজ যে যোগিনী-বেশ? অন্তরে কি আজ রাধার ব্যথা জেগেছে নাকি? কেন, শ্যামরায় ত ঘরেই আছেন। বাতায়নের ফাঁকে মেঘের ধ্যান করবার দরকার কি?"

নীলিমা উঠিয়া বলিল, "ঐ ইজিচেয়ারটায় বস, বোন্, আজ শরীরটা তত ভাল নেই, তাই শুয়েছিলাম।"

দেবহূতি নীলিমার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, যদি রাগ না কর ত একটা কথা বলি?"

নীলিমা চকিত ও বিস্মিত হইয়া বলিল, "বল্ না, বোন্।"

"আচ্ছা, এ তোমাদের কেমন ব্যাভার? তোমার অসুখ হয়েছে অথচ উনি কিছু জানেন না ব'লে মনে হ'ল; সত্যি কি তোমাদের মনের মিল হয় নি?"

নীলিমার চক্ষু হইতে উত্তপ্ত অশ্রু উদগত হইল। কিন্তু

সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "অমিল নেই, তবে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। আমি চাইনে যে, আমার স্বাধীন অস্তিত্ব, আমার মৌলিকতা বিনষ্ট হয়ে যাক। তোমাদের মতন আত্মসমর্পণ করাকে আমি হেয় ও দাসীপনা মনে করি। বর্ত্তমানের নারী শুধু করঙ্কবাহিনী হয়ে তৃপ্ত হবে না। সে তার লুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে বিশ্ব-প্রগতিকে সফল ও সুন্দর ক'রে তুলবে!"

দেবহূতি সস্মিত-মুখে বলিল, "না দিদি, আমার ভয় হয়, এ তোমার অন্তরের কথা নয়। শেখা বুলি দিয়ে তুমি আপন আত্মাকে রিক্ত ও কাঙ্গাল ক'রে রেখো না। সৃষ্টি যত দিন থাকবে, তত দিন পুরুষ ও নারীর মিল্‌তে হবে। এ মিলন যাতে সুন্দর ও কৃতার্থ হয়ে ওঠে, তারই জন্য সমাজের রীতি ও নীতির সৃষ্টি। দুই জনের প্রেমে অদ্বৈত হয়ে যাওয়াই আদর্শ। কাযেই স্বাতন্ত্র্য নিয়ে, দিদি, তুমি মিথ্যা চীৎকার করছ?"

নীলিমা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কিন্তু তুমি কি বলবে না যে, আমাদের দেশের নর-পশুরা নারীর আত্মাকে জুতার তলায় পিষে মেরেছে?"

"স্বীকার করবো না কেন, পৃথিবীতে মিথ্যা ও অমঙ্গল আছে, কুৎসিত ও অসুন্দর আছে; তা নারীরও আছে, নরেরও আছে।"

"কিন্তু বোন্, তুমি যদি চোখ খুলেও অন্ধ হও, তা হ'লে আর কি করব! আমাদের সমাজ-বিধি কি নারীর সমস্ত হৃদয়, মন, বুদ্ধি, সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়ে নারীকে ব্যভিচারের পুতুল ক'রে রাখে নি?"

দেবী বলিল, "দিদি, তোমার মত বেশী পড়া-শুনা হয় ত করি নি। পশ্চিমের খবর ভাল জানিনে, কিন্তু আমাদের সমাজের যে দুর্ব্বলতা, তা জাতির দুর্ব্বলতায় হয়েছে। তবে কাযের যায়গায় গরমিল ও ফাঁকি অনেক পেলেও, আদর্শকে ফাঁকি বলবে কি ক'রে? আমাদের দেশের ঘরে ঘরে এখন যে উজ্জ্বলমধুর দাম্পত্য-প্রেম আছে, পৃথিবীতে তার তুলনা আছে? উনি সে দিন একখানি বই প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন। তাতে বাইরের যে খবর শুনি, তাতে গা শিউরে ওঠে। কিন্তু বেশী তর্ক করতে চাই না, তর্কে তোমায় হারাবো, সে ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দিদি! এই Amazon সেজে কি তৃপ্তি পেয়েছ? কর্ত্তার মুখের কালো মেঘ দেখে মনে হয়, তিনি ত পাননি; আমি জানতে চাই, তুমি পেয়েছ কি না?"

নীলিমা ফাঁপড়ে পড়িল। যে প্রেমানন্দে দেবী বিভোর ছিল, তাহার কণাংশও তাহার লাভ হয় নাই। স্বামীর হৃদয়-ভরা অগাধ প্রেম, অথচ সে ক্ষুব্ধ ও তৃষিত। দোষ যে তাহার একার, তাহা নহে; জিতেশও প্রেমের প্রকাশরীতি জানিত না। তথাপি যে গভীর পরিপূর্ণতায় দেবীর সারা চোখে-মুখে আনন্দ-দ্যুতি জ্বলিতেছিল, তাহা সে অপূর্ব্ব বিস্ময়ে দেখিতেছিল। নীলিমা দৃষ্টি নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

দেবহূতি জয়োল্লাসে অধীর হইয়া বলিল, "জানি দিদি, তুমি অসত্য বলবে না। তুমি অতৃপ্ত ও অশান্ত হয়ে ছুটেছ মিথ্যা বুলির মরীচিকার পিছনে। ছুটেছ ব'লেই দিনে দিনে ক্লান্ত হয়ে উঠছ।"

"তুই বোন্ কি সুখী হয়েছিস্?"

দেবহূতি দৃপ্ত গৌরবে বলিল, "অসুখী হয়েছি বল্‌লে যে তোমার ঠাকুরপোর ভয়ানক অপমান করা হবে। আমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি, কিন্তু দিদি! কৈ, দাসী ব'লে ত নিজের পরে অবজ্ঞা হয় না।"

নীলিমা বলিল, "তোদের প্রেমের কথা শুনলে আমার হিংসে হয়—"

"হিংসে ক'রে কি হবে, দিদি! তোমার ঘরেই ত তোমার প্রিয়তম অতিথি হয়ে রয়েছেন। তুমি যে হেলা ক'রে অচল সৌভাগ্যকে দূর করেছ, তার জন্য কে দায়ী হবে বলো?"

নীলিমা নীরবে রহিল। দেবহূতি বলিয়া চলিল, "বাবা কবীরের একটা দোঁহা প্রায়ই গাইতেন, শুনে শুনে আমিও শিখে ফেলেছি। সেই গানটার কথা আজ তোমায় বলছি—

'জীব মহলমেঁ শিব পহুনরা
কহাঁ কর ত উনমাদ রে।
পইঁছা দেয়া করিলে সেয়া
রৈল চলী আব তরে॥
জুগন জুগন করৈ পতীছন
সাহবকা দিল লাগা রে।
সুখত নাহী পরম সুখ সোগর
বিনা প্রেম বৈরাগ রে॥
সুনো ভাই সাধো
পায়া অচল সোহাগ রে॥'

প্রিয়জন যখন ঘরে পৌঁছেছে, তখন সেবা ক'রে নে, এমন সৌভাগ্য বহু প্রতীক্ষার মিলেছে। না দিদি! তুমি আত্মবঞ্চনা ক'রে থেকো না।"

ভজুয়া আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিয়া বলিল, "মাইজী, বাবুলোক ফুলুরী চাইছেন।"

অন্য দিনের মত নীলিমা বলিল না, "যা, ঠাকুরকে ভাজতে বল গে।"

আজ নীলিমাই নিজে ফুলুরী ভাজিতে চলিল। তাহার মনের তারে আজ এক অবর্ণনীয় বেদনার সুর রহিয়া রহিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল।

১০

স্বামীকে ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দে নীলিমা পুলকিত ও মুগ্ধ হইয়া উঠিল। নববধূর সরম-চকিত যে সমস্ত ভাবধারা অতীতের স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, কয়েক দিন জোর করিয়া সে সেই হারানো বসন্তের মধুস্মৃতি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছিল।

স্ত্রীর এই উন্মাদনাময় নবানুরাগ জিতেশকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। রাত্রিতে ফুলের মালায় ফুলশয্যা করিয়া নীলিমা কখনও অবাক্ করিয়া দেয়, কখনও পিছন হইতে পাঠনিরত স্বামীর চোখ দুটি ধরিয়া থাকে। জিতেশ দুষ্টামী করিয়া বলে, "ভজুয়া? কে, নরনাথ না কি?"

নীলিমা খিল খিল করিয়া হাসে। স্বামীর হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া বলে, "পড়তে পাবে না।"

অকাল-বন্যায় কূল ভাসিয়া যায়। জিতেশ ভয়ে ভয়ে ভাবে, এ স্রোত স্থায়ী হইবে ত? না অকস্মাৎ দমকা হাওয়ার উজান ফিরিবে?

ললিতা-দিদির ওখানে জলসা হইবে। অপূর্ব্ব বাঁশী বাজাইবে, মেখলা গান গাহিবে। বেলা, যূথিকা আরও অনেকের গান হইবে। পশ্চিমের এক জন কালোয়াৎ ধ্রুপদের খেলা দেখাইবে। নীলিমার আমন্ত্রণ হইয়াছে, তাহাকেও গাহিতে হইবে।

নীলিমা একখানা ছোট চিঠিতে ললিতা-দিদিকে জানাইল, নারী-সমিতির সম্পাদিকা সে আর [illegible] পারিবে না। জলসায়ও সে যোগ দিতে যাইবে না। এক [illegible] প্রকার অসুবিধা আছে।

অপূর্ব্ব আসিয়া জিতেশকে জানাইল যে, সব ঠিক, এমন সময়ে নীলিমা এমন করিলে তাহাদিগকে ভয়ানক লজ্জায় পড়িতে হইবে। জিতেশ বলিল, "যাও না, নীলি। এত দিন যত্ন ক'রে যাকে গ'ড়ে তুললে, আজ হঠাৎ তাকে এমন ভাবে বিসর্জ্জন করা কি ঠিক হবে?"

নীলিমা বলিল, "না, তুমি আমায় পাঠিও না, তোমার কাছে তুমি আমায় বেঁধে রাখো।"

"এ কি পাগলামীর কথা তুমি বলছ? নেহাৎ ছেড়ে দেবে, পরে দিও, আজ না গেলে ভাল দেখাবে না।"

সরল বিশ্বাসী জিতেশ নরনাথের কথা শুনিয়াও কিছু বুঝে না। পত্নীর অনিচ্ছায়ও তাহার সন্দেহ জাগে না। যাহাদের মন উচ্চ চিন্তায় ভরপুর থাকে, তাহারা হয় ত জগতের কালো দিক্ দেখিতে পায় না।

নীলিমা বলি. বলি করিয়াও অপূর্ব্বের কথা স্বামীকে বলিতে পারে নাই। আর বলিবার মত কিছুই ত ছিল না। অপূর্ব্বের বাহিরের আচরণে যে সুকুমার শালীনতা ছিল, তাহা তাহার অন্তরের দাহকে কখনও অশোভন করিয়া দেখায় নাই। কাযেই অভিযোগ করিবার কিছুই ছিল না। অপূর্ব্বের মনের জোরের যে মোহ ঐন্দ্রজালিকের বশীকরণের অপেক্ষা সম্মোহনক, তাহা অনুভব করিবার, দেখাইবার বা বলিবার নহে।

নীলিমাকে কাযেই জলসায় যোগ দিতে হইল। জলসার আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও প্রাণারাম হইয়াছিল। কেবলমাত্র গীত-রসিক জনের মজলিস—গানের ফোয়ারায় যেন মর্ত্ত্যে স্বর্গ গড়িয়া উঠিল।

অপূর্ব্বের বাঁশী আজ অপূর্ব্ব রসোন্মাদনায় বাজিতেছিল। গায়ক যেন অতীন্দ্রিয় জগতের স্পর্শ পাইয়া গাহিতেছিল, সে সুরে কি বেদনা, কি ব্যথা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল!

পশ্চিমা কালোয়াৎ তৃপ্তি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া বাজনার তারিফ করিতেছিল, আর মাঝে মাঝে সুর ভাঁজিতেছিল, "বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা।"

বাঁশীর সুর সুর-সপ্তকের পর্দায় পর্দায় কি দোল দিয়া ওঠানামা করিতেছিল! কত রাগ-রাগিণীর হাসি-কান্নার সুর-কম্পন মিশাইয়া অপূর্ব্ব কি যে বাজাইতেছিল, কে জানে? কিন্তু সুস্বর-লহরী সকলকে মুগ্ধ করিয়া যেন অশ্রুসার্দ্র করিয়া তুলিল।

নীলিমা বিমুগ্ধ-চিত্তে বাঁশী শুনিতেছিল। বাঁশী কি বলিতেছিল?—"ওরে, আমার বুকে অমৃতরস উথলে হয়ে উঠেছে— নির্ম্মল সুধায় ভরা সাগর—কূল নেই, কিনারা নেই! সজনি! তুই কি সেই পরমানন্দ-রস পান করবি না? আমার দিন কি দুঃখের জ্বালায় জ্বলবে? বিরহের অগ্নিতাপে কি কোমল নলিনীদল মূর্চ্ছা যাবে? ওগো দরদী, এস, তোমার জন্য সুরভিফুলে শয়ন পেতেছি, সুগন্ধি ব্যজন রেখেছি—ওগো মরমী, তুমি এস এস!—"

সকলেই বাহবা দিল। গীতরসিকগণ বলিলেন, "হাঁ, শিক্ষার মত শিক্ষা বটে!"

জলসা ভাঙ্গিয়া গেলে সকলেই যখন চলিয়া যায়, অপূর্ব্ব নীলিমাকে একান্তে ডাকিয়া বলিল, "আপনাকে আমার একটা কথা বলার ছিল, কিন্তু এত রাত্রে তার সময় হবে না, আমার কথা এই চিঠিতে লেখা আছে, দয়া ক'রে প'ড়ে দেখবেন।"

নীলিমা কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। বলিবার মত জ্ঞান হয় ত তাহার তখন ছিল না। সে নীরবে হাত বাড়াইয়া দিল, অপূর্ব্ব তাহার হাতে সোনালী খামে এসেন্স-সুবাসিত একখানি ভারী চিঠি দিল। হাতে দিবার সময় ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, অপূর্ব্বের হাত নীলিমার হাতে লাগিয়া গেল।

সে হাত উত্তেজনার আবেগে কাঁপিতেছিল। নীলিমার বোধ হইল, যেন তাহার স্পর্শে সর্ব্বশরীরে তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া গেল।

পথে আসিয়া নীলিমা দেখিল, তারায় তারায় আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। বিধাতার অনন্ত প্রেমের বার্ত্তা যেন জ্যোতিষ্কের অক্ষরগুলিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু বিশ্বনাথের দূত বোধ হয় তাহার প্রেমের দৌত্য জানাইতে পারিল না। নীলিমার মনে কি কেবল অপূর্ব্বের সেই যাদুকরী বাঁশীর সুর জাগিতেছিল?

কতবার মনে হইল, চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলে। কিন্তু ছিঁড়ি ছিঁড়ি করিয়াও ছিঁড়িতে পারিল না। বাহিরের জগতে বিশ্বপ্রকৃতি অক্ষয় ঐশ্বর্য্য-সম্ভার মেলিয়া বিশ্বজগৎ পরিপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু নীলিমার অন্তরে তাহার সাড়া ক্ষণেকের জন্যও জাগিল কি? সে বিভ্রান্ত-মনে বাড়ী ফিরিল।

১১

নীলিমা ঘরে ফিরিতেই জিতেশ অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন জলসা হলো?"

পরে আলোকে নীলিমার শুষ্ক ও বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কি! তোমার কি অসুখ করেছে, নীলি?"

নীলিমা শান্তস্বরে জানাইল, "না, তবে শরীরটা ভাল লাগছে না। যে মানুষের ভিড় ও গুমট, প্রাণ একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে।"

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া জিতেশ ক্লান্ত পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিল; কিন্তু নীলিমার কাছে আজ প্রণয়-নিবেদন ভাল লাগিল না। পত্নীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া জিতেশ নিরস্ত হইল।

জিতেশ ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু ক্লান্তিহরা নিদ্রা নীলিমার চোখে তাহার কুহকদণ্ড বুলাইতে পারিল না। অপূর্ব্বের দেওয়া চিঠি তখনও অপঠিত রহিয়া গিয়াছে। পত্রের মূক আবেদন থাকিয়া থাকিয়া যেন নীলিমাকে ডাকিতেছিল।

স্বামীকে নির্ভর-নিদ্রাযুক্ত দেখিয়া নীলিমা উঠিয়া পড়িল। স্বামীর শয়নকক্ষের বাহিরে যাইয়া বাতি জ্বালিয়া, সে অপূর্ব্বের চিঠি পড়িতে বসিল। সে লিপিকা নহে, সে যেন সাহিত্যিক রচনা। পড়িতে পড়িতে নীলিমার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল কেন?

"নীলিমা! আপনি ব'লে সম্বোধন ক'রে তোমায় দূর করিতে চাইনে, তুমি আমার অন্তরের অন্তরতম ধন হয়ে উঠেছ, তোমায় যে কোন্ ভাষায় ডাকবো, ভেবেই পাই না। আমার বই লেখায় যে কাল্পনিক প্রেমের ছবি আঁকি, তার বর্ণনায় রস আসে, ভাব আসে, কারণ, সেটা ফাঁকা, আর আজ যা বলতে যাচ্ছি, তা এত গভীর যে, ভাষাই হয় ত বিদ্রূপ ক'রে তুলবে—

"আমি তোমায় ভালবাসি—অন্তরের সমস্ত তীব্রতা দিয়ে, যৌবনের কূলপ্লাবী সমস্ত আকুলতা দিয়ে, কবির সমস্ত কল্পনা ও মাধুর্য্য দিয়ে—

চ'রে উঠছ কি? কিন্তু হে আমার
স্থির হয়ে ভেবে দেখবে, এতে

হৃদয়ের অর্ঘ্যভার—তায় যে

অসীম ব্যাকুলতা, তুমি কি তা বুঝতে পারবে? তার মর্ম জেনে সমাদর করবে?

"ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, কারণ, জগতে প্রেমই একমাত্র সত্য। তোমাদের স্বামী ও স্ত্রীতে প্রেম হয় নি, এ আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি। প্রেমহীন ঐ হেয় জীবন যাপন ক'রে কি তুমি তোমার রস-ধারা শুকিয়ে ফেলবে? তোমার মুকুলিত যৌবন-বসন্ত কি অকালে ফুরিয়ে যাবে? তোমার যে ক্ষুধিত আত্মা অজ্ঞাতে কেঁদে কেঁদে হয়রাণ হচ্ছে, তার খবর কি তুমি নেবে না?

"তুমি ভাবছ—অন্যায় ও পাপ। অন্যায় ও পাপ মানুষের গড়া জিনিষ—মানুষ শিকল গ'ড়ে গ'ড়ে নিজেকে বেঁধে ফেলেছে—মিথ্যা সংস্কার নিয়ে তুমি নিজেকে ভুলিয়ে রেখো না—

"সংসারে মানুষ প্রেমকে ভয় করে অথচ সাহিত্যে সে এই প্রেমের মাহাত্ম্যই গেয়েছে। তোমার শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মিলনকাহিনী যতই মধুর হোক, লোকের চোখে সেটি অন্যায় সম্বন্ধ—অথচ এই নিয়ে ভারতবর্ষে কত যে ধর্ম্ম, কত যে সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে, কে জানে?

"চণ্ডীদাসের যুগের বড় ও ছোট সব মানুষকে মানুষ ভুলেছে। যে রামী রজকিনী চণ্ডীদাসকে ভালবেসেছিল, সেই ও তার প্রেম বেঁচে আছে—দান্তে বিয়াত্রিসের প্রেমে মসগুল ছিলেন, শেলী এমিলিয়া ভিবিয়ানীকে ভালবাসতেন—

"এই সব মহাপুরুষদের প্রেমকে কি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বলবে? তুমি ভাবছ, ভগবান্ এ প্রেমকে অভিশপ্ত করবেন—

"কিন্তু সত্যিই ভগবান্ নেই। ভীতু মানুষ তার আত্মরক্ষার উপায়ের জন্য একটা কল্পনাকে খাড়া ক'রে তুলেছে—আসলে ওটা একটা জুজু। দয়ালু তোমাদের ভগবান্ যদি থাকতেন, তবে জগতে এত বৈষম্য কেন? ভুয়ো কথায় তুমি শঙ্কিত হয়ো না—মানুষ তার বলের দ্বারাই জগৎ জয় করেছে—যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হচ্ছেই হচ্ছে—

"আমিও অগাধ প্রেমের জোরে তোমায় ডাকছি—জানি, তুমি কিছুতেই আমায় দূর করতে [illegible] এও ফাঁকি নয়—কৃষ্ণের বাঁশীর মত আ[illegible] তুমি উপেক্ষা করতে পারবে না—তোম[illegible]ছে—বাতাসে তার সুর শুনছি—বলছে, তুমি কলঙ্কী হবে—সোনা যখন আগুনে তাতে, তখন সে ভাবে, আমি পুড়েই মলাম, কিন্তু সে আগুন থেকে বেরিয়ে দেখে, আপন স্বরূপে অপূর্ব্ব কান্তি সে পেয়েছে। প্রেমের অগ্নিজ্বালা দেখে তুমি ভরিও না—

"সতীত্ব? বাজে কাহিনী—প্রেম কি কখনও খাঁচায় থাকে? সে যে খাঁচা ভেঙ্গে আকাশে ওঠে—দৈহিক যে পবিত্রতার তুমি জয়গান করছ—সে ত একটা সংস্কার বৈ নয়। কত জাতির মধ্যে দেখ, নারী দু'তিনবার বিয়ে করেছে—প্রতি নূতন পতির সহিত তাহাদের সম্বন্ধকে তারা সতীত্ব নাম দিয়ে বড়াই করছে—

"ন্যাকামি আমি দেখতে পারি না—যদি মন অশান্ত হয়ে ব'লে ওঠে—আমায় ছেড়ে দাও, মুক্তি দাও, তখন দেহেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নিয়েই কি তুমি সতী হয়ে রইবে?

"সে নয় নীলিমা! সংসারে খোলা কথা বল্লে লোকে চটে, অথচ অন্তরে তাকে ভজে। জগৎ খুঁজে বেড়াও, দেখবে, এক জন মানুষও সতী নয়, কারণ, মানুষ বৈচিত্র্যকে খুঁজছে—বাঁধন দিয়ে যখনই সে নিজেকে বেঁধেছে, হোক না সে সোনার বাঁধন, তখনই সে নিজেকে মৃত্যুর পথে দাঁড় করিয়েছে—

"আমি আমার বুক-ভরা প্রেমে তোমায় ডাকছি, তুমি কি আমায় উপেক্ষা করবে? প্রেমের যে নৈবেদ্য তোমার পায়ে ধরছি, তার সৌরভ জগৎকে জয়যুক্ত করবে, এ আমি অন্তর হ'তে বিশ্বাস করি।

"আমি জীবনে যা চেয়েছি, তা পেয়েছি। কারণ, চাইতে জান্‌লেই পাওয়া যায়। দ্রাক্ষার পেয়ালা দেখে যে কাতর, সে কখনও তার সুধার পরশ পায় না, যে জোর ক'রে কেড়ে নেয়, সেই ম'জে যায়। আমি তোমায় চাই-ই চাই। তুমি হাসছ, ভাবছ তোমার নয় প্রেম আছে, আমি যে প্রেম দেই নি—

"তা হ'তেই পারে না। প্রেম পরশমণি—ওর ছোঁয়াচ লাগলেই প্রেম জাগবে—কম আর বেশী। তুমি আমার প্রেমে মজবে। কারণ, আমি জানি, যে জিততে চায়, সেই জেতে। জীবনে কখনও পরাজয় হয় নি—এবারও হবে না—

"পুষ্পমালা, ফুলের গুঞ্জন, কোকিল-কূজন দিয়ে তোমার চোখে ধূলা দিতে চাই না; অনাবৃত সত্য সবার চেয়ে সুন্দর। তুমি আমায় ভালবাসো, আমি তোমায় ভালবাসি—এই আমার

বশীকরণ মন্ত্র। সে শুভদিনের রক্তরাগ সমুখে ঝলমল করছে, যে দিন তুমি প্রিয়তম ব'লে আমায় ডাকবে—

"আমায় নির্লজ্জ ও বেহায়া ব'লে গালি দিও না, কারণ, প্রেম লজ্জাকে মানে না।

"শুধু বার বার ক'রে বলতে চাই, আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে যে গোলাপ ফুটবে, সে তুমি—সে তুমি—তোমায় আমার চাই-ই চাই। ইতি

তোমারই

অপূর্ব্ব"

নীলিমার হাত কাঁপিতে লাগিল। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে ইজিচেয়ারে বসিয়া, বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলিকে একত্র করিয়া আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই তাহার মন স্বস্তি পাইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, যেন ভূমিকম্পের কম্পনে পৃথিবী দুলিতেছে।

কতক্ষণ পরে সে ঘরে ফিরিল। স্বামী অঘোরে নিদ্রা যাইতেছেন। বাতায়নে মেঘভাঙা চাঁদের আলো আসিয়া জিতেশের সুপ্ত মুখমণ্ডলকে বিভাত করিয়া দিল। নীলিমা চাহিয়া দেখিল, কি অলোকসুন্দর রূপ, কি সুনিবিড় তৃপ্তি! পরম প্রেমবান্ এই বিশ্বাসী স্বামীর সে অবিশ্বাসিনী স্ত্রী? পরপুরুষ তাহার প্রেমে সন্দিহান হইয়া তাহার প্রেম যাচ্ঞা করিয়াছে? কি ক্ষোভের,—কি গ্লানির কথা! নীলিমার মনে হইল, সে মরিবে, কলুষ জীবন আর রাখিবে না। কিন্তু বইপড়া মৃত্যুর একটা ঔষধও তাহার সঙ্গে নাই। গলায় দড়ি দিয়া মরিতে জানে না, আর অত সাহসও তাহার নাই।

বাহিরে পলের পর পল ত্রিযামা রাত্রি বহিয়া চলিয়াছে। নীলিমা তন্দ্রাহীন-নয়নে তাহাদের গতি দেখিতে লাগিল। কখন বা তন্দ্রার আবেশে সে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। জিতেশ ঘুমঘোরেই বলিল, "ভয় পেয়েছ নীলি?" বলিয়াই আবার ঘুমাইয়া পড়িল। নীলিমা জাগিয়া আকাশের তারাপ্রহরীদের সতীক্ষ্ণ দৃষ্টির আঘাতে যেন কাতর হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন দিব্যালোকের এই চিরসতর্ক চরগণ নীলিমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছে, "ওরে ব্যভিচারিণি! সাবধান হ'।"

দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ত্রস্ত জিতেশ জাগিয়া দেখিল, নীলিমা পাশে নাই। ভোরের মৃদু আলোয় পৃথিবী জাগিয়া উঠিতেছে। সে ব্যাকুলস্বরে ডাকিল, "নীলি! নীলি!"

স্নান করিয়া পূজারিণীর বেশে নীলিমা ঘরে ঢুকিয়াই স্বামীর চরণে প্রণাম করিল। জিতেশ সহাস্যে পত্নীকে কোলে টানিয়া বলিল, "বা, আজ যে এত ভক্তি?" পরে তাহার রুক্ষ ও পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "নীলিমা, ব্যাপার কি? কি হয়েছে তোমার?"

নীলিমা কথা বলিতে পারিল না, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। জিতেশ অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। কতক পরে থামিয়া বলিল, "আমায় তুমি বাঁচাও!"

"কি হয়েছে লক্ষ্মি! তোমার দুঃখ আমায় বলবে না, রাণু?"

নীলিমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমায় দূর ক'রে দাও, আমি তোমার যোগ্য নই।"

"বলছ কি তুমি, আজ তোমার মাথা খারাপ হয়েছে কি?"

"বল! আমায় পায়ে ঠেলবে না ত, আমি বড় অপরাধিনী—"

বিস্ময়ে জিতেশ অবাক্ হইয়া রহিল। পরে সংযত হইয়া উত্তর দিল, "ভয় নেই, নীলিমা! যতই ছোট হও না কেন, তুমি যে আমার। সুখে-দুঃখে, শোকে-তাপে, তোমার মহত্ত্বে ও নীচতায়, তোমার প্রেমে ও ঘৃণায় তুমি যে আমার অভিন্ন আত্মা।"

নীলিমা কথা বলিতে পারিল না। দেরাজ হইতে অপূর্ব্বের চিঠি বাহির করিয়া স্বামীর পায়ে ছুড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

৭২

পত্র পড়িয়া জিতেশ প্রথমে কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। প্রথমে বিস্ময়, পরে ভয়, পরে সংশয় ক্রমান্বয়ে তাহার চিত্তকে মথিত করিয়া তুলিল।

সংসারের সহিত তাহার পরিচয় যথেষ্ট নহে। মানুষের কথা তাহার বই-পড়া বিদ্যার মাঝেই গুপ্ত, কেবল দুই চারি জন বন্ধুর সংস্পর্শে সে আসিয়াছে। তাহাদের জীবনের সমস্ত কথাও সে জানে না। তাহার দুটি সংসারের ছোট কাহিনী

এড়াইয়া　　লইয়া মসগুল ছিল, সে-কি

করিবে,

কাব্য　　ষ্ক, তাহাদের মধ্যে নারীভাব

জাগিয়া উ　　াশিত না হইলে পুরুষ দুর্জ্জের

নারীচরিত্রের মর্ম্ম জানিতে পারে না। এই অভাবের জন্যই ত জিতেশ সুখী প্রেমিক হইতে পারে নাই।

বিদুষী পত্নীর লাবণ্য-ললাম অঙ্গবৈভব তাহাকে কেবল মুগ্ধ করে নাই, পত্নীর চঞ্চল প্রাচুর্য্যের সৌন্দর্য্যরূপও তাহাকে বিহ্বল করিয়াছে। সেই পত্নী কি আজ তাহার নিকট হইতে মুক্তি চাহে? পত্নীর লীলাচঞ্চল ব্যক্তিত্বকে সে কখনও খারাপ চোখে দেখে নাই, পত্নীকে কেবল Muslin gil বলিয়া সে ভাবে নাই।

অপূর্ব্ব লিখিয়াছে, নীলিমাও তাহাকে ভালবাসে। এ কথা কি সত্য? কখনই নহে। এ অপূর্ব্বের ধাপ্পাবাজী। কিন্তু তবু সংশয় জাগিয়া উঠে। সংসারের পথ পিচ্ছিল, অপূর্ব্বের বাক্যের যাদু হয় ত নীলিমাকে ভুলাইয়াছে।

কয়েক দিন জিতেশ চ্ছন্নমতি হইয়া বেড়াইল। স্বামীর মুখ দেখিয়া নীলিমা ভীত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, আপনার মনের কোণে কালিমা হয় ত লাগিয়াছে। কুমারী-বয়সের শেখা নারায়ণ-পূজা লইয়া সে বসিল। নীলিমার ধর্ম্ম-প্রীতি জিতেশকে আরও ভাবিত করিয়া তুলিল, তাহার সন্দেহ একবার জাগে, একবার নেভে।

পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া সে নর-নারায়ণকে ডাকিয়া পাঠাইল। বন্ধুর নিকট সে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। হৃদয়ের বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা প্রতিবেদনে অনেক প্রশমিত হইল।

সব শুনিয়া নরনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "তুই একটা আস্ত রাস্কেল, তোর উপনিষদ্‌গুলি এবার না পোড়ালে চলবে না বলছি।"

বন্ধুর হাসির হল্লায় অপ্রতিভ হইয়া জিতেশ নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ভাই?"

"ওরে বোকারাম! তুই যে ওথেলো হয়ে উঠলি। এক জন মানুষের সঙ্গে একত্র এত দিন বাস ক'রে যদি তাকে তুই চিনতে না পারিস, তবে আর কার দোষ বল ত? আমি ত অল্পপরিচয়েই বলছি যে, বৌদি নিষ্পাপ ও শিউলি-ফুলের মত অকলঙ্ক ও পবিত্র।"

অনিশ্চিত সন্দেহের নাগপাশে জিতেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। বন্ধুর কাছে সমা[illegible] অমুভব করিল। আশঙ্কার পশ্চা[illegible] পারিবে হইয়া পড়িয়াছিল, অন্ধকারে পথহারা [illegible] আলোকে যেন পথ পাইয়া বাঁচিল।

গভীর আত্মপ্রসাদে সে বলিল, "আমি তা হ'লে নেহাৎ বোকা ভাই, এ দু'দিন যে কি গভীর যাতনা ভোগ করেছি, নরক-যাতনাও বোধ হয় এর চেয়ে তীব্র নয়।"

"বোকা ব'লে বোকা, লেখার ধাঁচ দেখেও ত মানুষ চেনা যায়। বর্ণনার যে অপরূপ ভঙ্গিমা, এতেই বুঝা যাচ্ছে যে, ব্যাপারটা উভয়তঃ নয়। তবে ভগবান্ যা করেন, সব মঙ্গলের জন্য, এ গভীর আঘাত তোদের পাওয়া দরকার ছিল, নৈলে তোদের প্রেম পূর্ণতা লাভ করত না।"

জিতেশ খানিক অধোমুখে বসিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে কহিল, "তা হ'লে ত ভাই আমার ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে, অমূলক সন্দেহে ত তোর বৌদির প্রতি আমি ভয়ানক দুর্ব্যবহার করেছি।"

নরনাথ হাসিয়া কহিল, "যা হয়েছে, তার ত চারা নেই, তবে এখন গলবস্ত্রে যেয়ে বল্, 'শশিমুখি!

'ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্'।"

দুঃখের মধ্যেও জিতেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পুনরায় নরনাথ বলিল, "সে যা হয় হবে, মানভঞ্জনের বহু মন্ত্র তোকে শিখিয়ে দিতে পারবো; কিন্তু ভাই, 'নায়ক-চূড়ামণি'কে, রীতিমত শাস্তি দিতে না পারলে ত আর তার শিক্ষা হবে না।"

জিতেশ প্রসন্ন-চিত্তে কহিল, "না ভাই, যা হবার হয়েছে, বেচারীকে ক্ষমা কর। আমি না হয় চিঠি লিখে ওকে সহর ছেড়ে যেতে বলবো।"

নরনাথ বলিল, "ও সব দুর্ব্বলতায় রসের নাগর কি সায়েস্তা হবেন, প্রচণ্ড আলিঙ্গন দিলেই তার পরাণ শীতল হবে।"

"তা হ'লে কি করতে বলিস্?"

এই রবিবারে ওকে চায়ের নিমন্ত্রণ কর। আমিও আসবো'খন, তার পর যা করবার, সে আমিই করবো, তার জন্য তোর ভাবনা নেই। আচ্ছা, আজ এখন তবে আসি।"

জিতেশ বলিল, "আর বৌদির সঙ্গে দেখা করবি নে?"

"না, আজ থাক, তিনি নিশ্চয়ই লজ্জা পাবেন। সতীর কলঙ্ক-ভঞ্জন ক'রে তবে সতীর সাথে আলাপ করবো।"

মনের অজস্র আনন্দে জিতেশ পত্নীর সন্ধানে চলিল। বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া নীলিমা মেঘের খেলা দেখিতেছিল।

মানুষের শত পরিবর্ত্তন হউক, প্রকৃতি তাহার রস-মাধুরী সর্ব্বদা বিকশিত করিয়া রাখিয়াছেন।

জিতেশ আসিয়া ডাকিল, "নীলিমা!"

নীলিমা কথা কহিল না; অধোমুখে বসিয়া রহিল। জিতেশ পত্নীকে সবল বাহুবন্ধনে পিষ্ট করিয়া বলিল, "আমার পরে রাগ করেছ, রাণি?"

নীলিমার চোখ ফাটিয়া জল ছুটিল। মুক্তার মত অশ্রুদল তাহার রক্তিম গণ্ডে পড়িয়া রক্তারবিন্দে শিশিরদলের মত শোভা পাইতেছিল। জিতেশ সহর্ষে বলিল, "আমায় ক্ষমা করো, নীলি! আমার প্রেম যে কূর্ম্মের মত আত্মগোপন ক'রে রয়েছে, প্রকাশ হয়ে অমঙ্গল ও অকল্যাণকে দূর করেনি, সে আমারই দোষ। হয় ত এ দুঃখের অভিঘাত আমাদের প্রয়োজন ছিল, দুঃখের বেশে এসেছে ব'লে আজ যেন এর অবজ্ঞা না করি।"

নীলিমা কথা কহিল না। আনন্দাতিশয্যে স্বামীর বুকে সে এলাইয়া পড়িল।

১৩

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া অপূর্ব্ব বলিল, "এ কথা ঠিক নরনাথ বাবু, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের পায়ে আমরা মানুষের আত্মাকে বলি দিচ্ছি।"

"তা না দিয়ে উপায় কি? মানুষের মন স্বার্থমুখী হ'লেই তা অসংযত ও অরূপ হবেই।"

"না, ঐটে আপনার ভুল। জিতেশ বাবু, আপনি ত উপনিষদ পড়েন, কোন্ উপনিষদে আছে না যে, বিত্ত, প্রিয়া, পরিজন, ব্রাহ্মণ, দেবতা আত্মার প্রীতির জন্যই প্রয়োজন? আত্মার প্রেয় বলিয়াই তাহাদের প্রয়োজন?"

জিতেশ বলিল, "হাঁ, বৃহদারণ্যক এ কথা বলেছেন।"

"তবেই দেখুন, আত্মবিকাশের পথরোধ করায় আত্মহত্যা।"

নরনাথ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, "তা হ'লে কি আপনি চান যে আত্মবিকাশের নামে মানুষ স্বৈরাচার করবে?"

অপূর্ব্ব বলিল, "ঐ ব্যবস্থাই নিয়ে ত গণ্ডগোল। আজ আপনি যাকে স্বৈরাচার বলছেন, কাল মানুষ তাকে ন্যায্য বলবে। বেদের যুগে গার্গী ব্রহ্মবিদ্যা জানালেন, আর পুরাণের যুগে তিনি বেদ পড়লে পাতকী হলেন, এই ত আপনার মানুষের বিচার।"

"তা হ'লে কি আপনি বলতে চান যে, সংসারে যার যাহা খুসী করুক, তাই চলবে?"

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল, "চালাতে জান্‌লেই চলবে।"

খানিক পরে নরনাথ পুনরায় প্রশ্ন করিল, "দেখুন, আপনার লেখা প'ড়ে আমি বুঝতে পারি না। বাঙ্গালা দেশের মানুষ, বাঙ্গালা ভাষা এত দিন ধ'রে পড়ছি, কিন্তু না পারি বুঝতে আপনাদের নূতন লেখার Idom, না পারি ধরতে তার পদবিন্যাস-পদ্ধতি।"

"ওর জন্য দুঃখ ক'রে কি করবেন বলুন। প্রতিভা ফরমায়েসী জিনিষ গড়ে না, স্রষ্টার সৃষ্টি যেরূপ অচিন্তনীয়, তার প্রকাশও তেমনি অদৃষ্টপূর্ব্ব।"

নরনাথ পুনরায় বলিল, "বেশ, আপনি নারীর সতীত্বকে যে এত তুচ্ছ ক'রে তুলেছেন, সতী নারীর সঙ্গ কি জীবনে আপনার হয়েছে?"

"হোক আর না হোক, কবির কল্পনা নিরঙ্কুশ। আমি আমার চিন্তায় সাধনায় যা বুঝেছি, তাই প্রচার করেছি। আমার মনে হয়েছে, মানুষের দেহের শুচিতা ও পবিত্রতা থাকলেই সে শুচি হয় না, রসের ও রূপের আহ্বান মানুষকে পলে পলে বুভুক্ষু ক'রে তুলে, কাযেই মানুষ জোর ক'রে আত্মনিপীড়ন ক'রে ছাড়া সতীত্বপণা করতে পারে না।"

"এটা আপনার ভয়ানক ভুল ধারণা, অপূর্ব্ব বাবু। আপনি যে বিচার করছেন, তা আপনার অন্তর দিয়ে। একনিষ্ঠ অন্তর্মুখ প্রেম নারীর বিশেষত্ব; বহুগামিতা ও লালসার উগ্রজালা পুরুষেরই বেশী, এ কথা কেবল আমার কথা নয়, বড় বড় যৌনতত্ত্ববিদ পণ্ডিতরাও বলেছেন। পুরুষ Polygamy চায়, আর নারী monogamy চায়।"

অপূর্ব্ব নরনাথের যুক্তিমধুর কথায় বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল। সে আত্মরক্ষার জন্য সাধারণ যুক্তির সহায়তা না লইয়া বিশেষ দৃষ্টান্তের ও ব্যক্তিত্বের জোরে নরনাথকে দাবাইতে চাহিল— "ও কথা মোটেই ঠিক নয়। কি নর, কি নারী, উভয়েই বাঞ্ছিতকে [illegible] উদগ্র হয়ে উঠে। নারীর মধ্যে বহুচা[illegible]রণ, পদে পদে সমাজ তায় বাধা শৃঙ্খল[illegible]অস্ত্রের বদলে নারীর আত্মাকে তারা [illegible] করেছে, কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতির

আবেদন কি কত রূপে, কত রসে, কত গন্ধে, কত স্পর্শে, কত শব্দে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়ে উঠছে না? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বলেছেন, রাবণের যদি শক্তি থাকতো, তবে সীতার মত সতীও সতীত্ব রাবণের পায়ে ঢেলে দিত। কথা হচ্ছে, শক্তি চাই, শক্তি থাকলে সমস্ত নারীই পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে—"

সহসা এক অবাক্ কাণ্ড ঘটিয়া গেল। নরনাথ সবেগে অপূর্ব্বের মুখে এক ঘুসি লাগাইল, আর জোরে জোরে বলিল, "বেকুফ, এ কথা বলতে তোর জিভ খ'সে পড়লো না? আমি ভেবেছিলুম, তোর মধ্যে হয় ত কিছু শক্তি আছে; কিন্তু দেখছি, একেবারে গোবর—"

কথা শেষ হইতে না হইতে অপূর্ব্ব সেই প্রবল ধাক্কায় মাটীতে গড়াইয়া পড়িল, নাক দিয়া ঝর-ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, চেয়ার উল্টিয়া তাহার পিঠের উপর পড়িল, চোখের Tortoise shell চশমা শতধা চূর্ণ হইয়া মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িল।

অপূর্ব্ব বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিল, "Scoundrel!"

চেয়ার-পতনের শব্দ আর নরনাথের গলাবাজি শুনিয়া নীলিমা ও দেবহুতি ছুটিয়া আসিল।

জিতেশ অপূর্ব্বকে অপমানিত দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নরনাথ যে এক জন ভদ্রলোককে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া ঘুসি মারিবে, এ কথা সে কিছুতেই ভাবিতে পারে নাই। স্নেহশীল তাহার চিত্ত অনুশোচনায় অপূর্ব্বের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হইয়া উঠিল। সে ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "না ভাই, ওকে ছেড়ে দে, পৃথিবীতে কে নিষ্পাপ? পাপী হয়ে পাপের শাস্তি দেওয়ার ভার নেওয়া ঠিক নয়, ভাই।"

নরনাথ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "নরাধম, পাষণ্ড! ওর শাস্তির হয়েছে কি? ভদ্রমহিলাকে যারা অপমান করতে পারে, তাদের জীয়ন্তে গোর দেওয়া উচিত।"

অপূর্ব্ব নেতাইয়া পড়িয়াছিল। খানিক পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "জিতেশ বাবু, এ কি ভদ্রতা আপনার? ভদ্রলোককে বাড়ীর পরে ডেকে এনে অপমান, এ আপনাদের কোন্ দেশী ভদ্রতা?"

জিতেশ লজ্জায় নিরুত্তর হইয়া জবাব দিল, "চুপ কর্, নরপিশাচ! বন্ধ গলা রয়েছে; সহজ শিক্ষার হবে

এই বলিয়া পকেট হইতে অপূর্ব্বের লেখা লেফাফাখানা ধূলি-শয়ান অপূর্ব্বের সম্মুখে ফেলিয়া বলিল, "এখন বল্, পাজি, কি জবাবদিহি তোর আছে?"

সম্মুখে উদ্যতফণ সর্প দেখিলে মানুষ যেমন শিহরিয়া উঠে, লেফাফাখানি দেখিয়া অপূর্ব্ব তেমনই অভিভূত হইয়া পড়িল। সে কি বলিবে, ভাবিয়া না পাইয়া কাতর-নয়নে নীলিমার মুখের দিকে চাহিল।

নীলিমার মুখ লজ্জায় ও শঙ্কায় সাদা হইয়া উঠিল। বিচারকের সম্মুখে, উৎসুক জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপরাধী যেমন ভয়ে ও আতঙ্কে কাঁপিতে থাকে, নীলিমাও তেমনই লতার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

গৃহের সমস্ত প্রাণী যেন এক অভিনয় দেখিতে স্তব্ধ হইয়াছিল। নরনাথ বলদৃপ্ত-স্বরে প্রশ্ন করিল, "বল্ কুলাঙ্গার, যে কুললক্ষ্মীর অপমান তুই করেছিস, তিনি নিষ্পাপ—"

অপূর্ব্ব অধোবদনে নিরুত্তর রহিল। সে যে কি করিবে, কি বলিবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। নরনাথ ব্যাঘ্রের মত অপূর্ব্বের উপর পড়িয়া তাহার ঘাড়ের ঝুঁটি সজোরে ধরিয়া বলিল, "তবে রে সয়তান! এখনও সয়তানী? বল্, এখনও সত্যি কথা বল্—"

সেই সবল করস্পর্শ প্রেমের রোমাঞ্চকর অঙ্গস্পর্শ বলিয়া ভুল করিবার হেতু ছিল না। হতবুদ্ধি অপূর্ব্ব আত্মরক্ষার যে আদিমতম সংস্কার জীবে রহিয়াছে, তাহারই প্রভাবে বুদ্ধি ফিরিয়া পাইল। তাহার পর করুণ-কণ্ঠে বলিল, "উনি দেবপূজার নির্ম্মাল্যের মতন শুচি ও নিষ্পাপ, আমিই অপরাধী—"

নীলিমার গণ্ডে রক্ত-লোহিত ঝলক দিয়া গেল। জিতেশ একান্তপ্রাণে ভগবান্‌কে কৃতজ্ঞতা জানাইল। অবিশ্বাসের কর্তিত যে তমমূল তাহার মনের কোণে গোপন আড়াল দিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তাহার অন্তরও শুভ্র ও পুলকিত হইয়া উঠিল। নরনাথ তবু বে-পরোয়া। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই তাহার ব্যবসা। কাযেই শাস্তির উপকারিতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস। নরনাথ উগ্রস্বরে বলিল, "তবে বাছা! ছিনালী-পনায় শাস্তি দিতে হবে। যাও, এখান থেকে নাকে খত দিয়া বৌদির পা পর্য্যন্ত যাও, তার পর পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে বল—'মা! আমায় ক্ষমা করো'।"

তৃপ্ত-চিত্ত জিতেশ বলিল, "আর কেন, ভাই! যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।"

নরনাথ বন্ধুর কথায় কর্ণপাত করিল না; অটল ও অবিচল আত্মবিশ্বাসে শুধু বলিল, "যে সব হতভাগারা এমন চিঠি লিখে কুলবধূর অপমান করতে পারে, সীতার মত সতীরাণীর চরিত্রে এমন দুষ্কলঙ্ক দিতে পারে, তাদের ফাঁসী দিলেও উচিত শাস্তি হয় না—তাদের জন্য প্রাচীন বর্ব্বর-প্রথায় শাস্তি বিধেয়।"

দেবহূতি নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। সে-ও করুণার্দ্রচিত্তে বলিল, "থাক্, আর বাড়াবাড়ি করো না।"

কিন্তু নরনাথ দৃঢ়। বাধ্য হইয়া অপূর্ব্বকে নরনাথের কথামত নাকে খত দিয়া সমস্তই বলিতে হইল। বেচারীর নাকের রক্ত পুনরায় পড়িতে লাগিল।

নীলিমা সদয়-কণ্ঠে বলিল, "ভাই, ভগবানের কাছে আশীর্ব্বাদ কামনা করি, তোমার সুমতি হোক। বাঙ্গালা দেশ তোমাদের কাছে অনেক আশা করে, কিন্তু এমন মনোবৃত্তি আর দেখিও না।"

জিতেশও স্নেহ-মধুর স্বরে বলিল, "অপূর্ব্ব বাবু, লালসা কখনও কল্যাণ-সুন্দর হ'তে পারে না। যে প্রেম মানুষকে মহীয়ান্ ক'রে তুলে, সেই প্রেমায়ন রচনা করুন, কামায়নের অগ্নিজ্বালায় লোককে আর ভুলাবেন না।"

অপূর্ব্ব কথা কহিল না। বিপাকে পড়িয়া যে দুর্ভোগ তাহাকে সহ্য করিতে হইল, কল্পনায় কোন দিনই তাহা ত আসে নাই। মনের মধ্যে যে সব তর্ক জটলা করিতেছিল, বর্ত্তমানে তাহা বলিয়া অধিক লাঞ্ছনা ভোগ করা সমীচীন মনে হইল না।

দুঃখে ও অভিমানে, ক্রোধে ও দ্বেষে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল। কিন্তু স্থান ও কাল বাদী, গৃহের অনুভবনীয় মৌনতায় যে আরও বিকল হইয়া পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে চশমার ফ্রেমটি কুড়াইয়া লইয়া, নীলিমার দিকে ম্লান বিষণ্ণ ভর্ৎসনাভরা দৃষ্টি ফেলিয়া পাশের দরজা দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ঘরে বহুক্ষণ কেহ কোনও কথা কহিল না। নরনাথও চেয়ারে নীরবে বসিয়া নিজের কৃত কর্ম্মের যৌক্তিকতার আলোচনা করিতেছিল। চিন্তাভারকে দূর করিবার জন্য সে জোর করিয়া হাসিল, তার পর বলিল, "সব চেয়ে দুঃখ ভাই, ওর রসবোধের একান্ত অভাব। হা! হা! হা!" কিন্তু নরনাথের উচ্চহাস্যে তখন কেহ যোগ দিতে পারিল না। ব্যাপারটির আকস্মিকতায় ও অদ্ভুত পরিসমাপ্তিতে সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

১৪

এক মাস পরের কথা। ভাদ্রের ভরা-প্লাবনে নদী কূলে কূলে বিপুল জলোচ্ছ্বাসে প্রণয় নিবেদন করিয়া যায়। মাঠে মাঠে ধানের পাতায় পূর্ণতার গান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে।

ঘেরা-টোপ বারান্দায় ইজিচেয়ারে মেঘদূত হাতে লইয়া জিতেশ বসিয়াছিল। নীলিমা বসিয়া অর্গানে সুর ভাজিতেছিল।

এই দম্পতির জীবনে একটি মহা বিবর্ত্তন আসিয়াছে।

জিতেশ তাহার উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী আলমারিতে ভরিয়া গীতাঞ্জলি ও মেঘদূত লইয়া মসগুল হইয়াছে। নীলিমা তাহার সমান অধিকারের বক্তৃতা ভুলিয়া সেবায় ও আদরে পতিকে একবারে আপন করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

অপ্রাপ্য যখন ঘরে আসে, মানুষ জানে না, কেমন করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিবে, কেমন করিয়া তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইবে। জিতেশ যৌবনের যে আশাবেদনা-উচ্ছল দিনগুলিকে পুঁথির পাতায় ঢাকিয়া নিজেকে বঞ্চিত করিতেছিল, তাহারা প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইল।

নীলিমা আজ তাহার সকল স্বপ্ন, সকল ধ্যান, সকল জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছে। ভোগবাসনাকে শুধু দর্পে প্রতিহত করিলেই ত সে মরিয়া যায় না, আঘাত-বেদনায় সে বরং চারিদিকে বিষ-বাষ্প ছড়াইয়া দেয়। শাস্ত্র হয় ত তাই ভোগের দ্বারাই ত্যাগ করিতে বলিয়াছে।

নবোপলব্ধ আপনার তরুণ মনকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। পত্নীর জন্য ৯ শত টাকা ব্যয় করিয়া সে একটি ভাল অর্গান কিনিয়াছে, তাহাতে এমন [illegible] ও নীলিমার ফটো বসানো যে, যে দিক্ [illegible] যাইবে, নীলিমার হাসিমুখ দেখিতে [illegible]

নরন[illegible] দিয়া বলে, "দাদা, সুখের দিনে মিলন-[illegible] ভুলেছ।"

জিতেশ ও নীলিমা মধুর হাসি হাসিয়া তাহার উত্তর দেয়।

পত্নির দিকে চাহিয়া নীলিমা বলিল, "তুমি পড়বে, না আমি গান গাইবো ?"

গানের কাছে কি কবিতা ? তুমি গাও, রাণি !"

"অমন করলে বলছি, গাইব না।"

"তাই না কি, তবে গলায় কাপড় দিয়ে বলছি, 'এ ধনি মানিনি ! মান নিবার'।"

নীলিমা কথা কহিল না, অর্গানের সুর চড়াইল। বাদ্য-যন্ত্রটি যেমন সুন্দর, নীলিমার গলাও তেমন মধুর। নীলিমার গান যেন জগৎ প্লাবিয়া দ্যুলোকে ভাসিয়া যাইতেছিল, আর সেখান হইতে পারিজাত-সৌরভ আনিয়া মর্ত্ত্যকে ত্রিদিব করিয়া তুলিতেছিল।

নীলিমা গাহিতেছিল—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল।
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই।
শীতের ওড়নী পিয়া গিরীষের বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।
নিধন বলিয়া পিয়া না কর্‌লুঁ যতন
এবে হাম জানল পিয়া বড় ধন।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি
নাগর সঙ্গে কর রস পরিহারি।"

গাহিতে গাহিতে নীলিমা ভাব-বিভোর হইয়া পড়িল, কবির বাণী যেন তাহারই অন্তরের বাণী হইয়া বিশ্বকে আর্দ্র করিয়া তুলিয়াছে।

হঠাৎ নীলিমা দেখিল, জিতেশ মেঘদূত খুলিয়া কি পড়িতেছে। গান থামাইয়া বলিল, "বা ! এই বুঝি তোমার গান শোনা ? যাও,—আর যদি কখনও গান গাই।"

জিতেশ সহাস্যে বলিল, "'মুঞ্চ মানং মানময়ি রাধে'। দিব্যি কর্‌লে কিন্তু পরে পস্তাতে হবে। তোমার গানের সাথে সাথে কালিদাসের একটা শ্লোক মনে প'ড়ে গেল, আজ মাহ ভাদরে—ভরা বাদরে কালিদাসের সেই গীতিকা আমায় উন্মনা ক'রে তুলেছে।"

নীলিমা বলিল, "শ্লোকটি কি, প'ড়ে শুনাও না।"

জিতেশ বলিল, "বাঙ্গালা অনুবাদ ক'রে তোমায় শোনাচ্ছি, শোন—

'প্রণয়িনীর কণ্ঠ কোমল জড়ায়ে ধ'রে বুকে
বাদল-ঝরা মেঘের দিনে না জানি কোন্ সুখে
প্রিয় যে জন সুখে মগন উদাসী চিতে চায়,
প্রিয়-হারা বিরহী জন কত-না দুঃখী হায়'।"

নীলিমা স্বামীর কবিতা শুনিবার জন্য স্বামীর নিকট আসিয়াছিল, স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া স্বামীর ভাবমধুর মুখের পানে বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কার কথা মনে পড়ছে ?"

জিতেশ কৌতূহলভরে বলিল, "জানি না।" তাহার পর পত্নীর রক্তপদ্মললাম ওষ্ঠপুট আদরে ভরিয়া দিয়া প্রসারিত ভুজদ্বয়ের মধ্যে পত্নীকে টানিয়া লইল। নীলিমার নিকট বাক্যের প্রয়োজন দিল না, তাহার সমস্ত অন্তর যেন মধুরতায় আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বাহিরে বিপুলা পৃথ্বী তাহার বিপুল গতিবেগে স্পন্দিত হইতেছে। নিরবধি কাল পলে পলে নূতনকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। শুধু মুগ্ধ দম্পতির অন্তরে পরিপূর্ণতার সুনিবিড় শান্তি সমস্ত কোলাহলকে থামাইয়া নূতন এক প্রেমময় জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে।

শ্রীমতিলাল দাস (এম্, এ, বি, এল)।

বোম্বাই ও এলিফাণ্টা

২

ইতিহাস

আগ্রা-দিল্লীর মোগল বাদশাহদের আমলে ভারতের পশ্চিমাংশে সুরাটই প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর বলিয়া খ্যাত ছিল। তখনকার দিনে সুরাটের ধনসম্পদের কথা এত বিশ্ববিশ্রুত ছিল যে, এই সহর প্রায়শঃ জল ও স্থলদস্যুর দ্বারা লুণ্ঠিত হইত। অবশ্য বর্ত্তমানের বাণিজ্যকেন্দ্র কলিকাতার তুলনায় উহার আমদানী-রপ্তানী অকিঞ্চিৎকর ছিল, এ কথা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাহা হইলেও সুরাটে তখন যে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত, তাহার তুলনায় বোম্বাই তখন কি ছিল? খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাপ্তী নদীর মোহানার মুখে এই সুরাটে জগতের কত জাতিরই না বাণিজ্যপোত যাতায়াত করিত! সে সময়ে বোম্বায়ের নামও কেহ শুনিয়াছে কি না সন্দেহ। এই সুরাট হইতে ভারতীয় বাণিজ্যপোতে যখন ভারতের রেশম, তুলা, কার্পাসবস্ত্র, সোরা, মরিচ, নীল, ভেষজদ্রব্য, স্বর্ণ প্রভৃতি পণ্য দেশদেশান্তরের বাজারে বিক্রীত হইবার নিমিত্ত প্রেরিত হইত, তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল কি যে, এক দিন এক ক্ষুদ্র ধীবর-অধ্যুষিত দ্বীপ সুরাটের সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া পশ্চিম-ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে দণ্ডায়মান হইবে?

এই দ্বীপ অস্পৃশ্য অন্ত্যজ পারিয়ার মত সর্ব্বজনপরিত্যক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। প্রথম পোর্টুগীজরাই ইহাকে আবিষ্কার করেন। পরে ইংরাজরা ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পোর্টুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা আফরিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তৎপূর্ব্বে পারস্য ও আরব দিয়া জলপথে ভারতের সহিত য়ুরোপ ও আমেরিকার বাণিজ্য চলিত। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কালিকট নামক বন্দর ও রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজ্যেশ্বর জামোরিণ নামে পরিচিত। পোর্টুগীজরা ক্রমে মালাবারের কালিকট, গোয়া প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন তাঁহারাই প্রাচ্যে একমাত্র শক্তিশালী য়ুরোপীয় জাতি।

১৫৩২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পোর্টুগীজরা বোম্বাই দ্বীপ দখল করেন। এক শতাব্দী যাবৎ বোম্বাই পোর্টুগীজদের শাসনাধীনে রহিল। কিন্তু পোর্টুগীজদের শাসনে এ-দেশীয়রা সন্তুষ্ট ছিল না, কেন না, তাহারা অত্যন্ত ধর্ম্মান্ধ জাতি ছিল,—তাহাদের এক হস্তে তরবারি ও অন্য হস্তে থাকিত বাইবেল। তাই পোর্টুগীজ-শাসন বহুদিন সুপ্রতিষ্ঠ থাকে নাই। ওলন্দাজ ও ইংরাজরা ক্রমে তাহাদের স্থান অধিকার করে। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজরা বোম্বাই দ্বীপটি পোর্টুগীজদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে; কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়। তৎপূর্ব্বে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদশাহ জাঁহাগীরের নিকট ফারমান লইয়া সুরাটে কুঠী প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার অধিকার লাভ করে। সে সময়ে এ দেশে ইংরাজ কতটুকু!

বোম্বাই দ্বীপের সুন্দর অবস্থানস্থান দেখিয়া ইংরাজদেরও ইহার উপর লোভ পড়ে। ইংরাজও পোর্টুগীজদের নিকট দুই একবার দ্বীপটি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে সময়ে পোর্টুগীজ শক্তিকে রণে পরাস্ত করা ইংরাজের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বীপটি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু পোর্টুগীজরা সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। কিন্তু ভারতের ভাগ্যবিধাতা এই ক্ষুদ্র বণিক-জাতির উপর সুপ্রসন্ন। এমন যোগাযোগ উপস্থিত হইল—যাহাতে বোম্বাই দ্বীপ ইংরাজের অঙ্কগত হইল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ষ্টুয়ার্টবংশীয় রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সহিত পোর্টুগীজ রাজকন্যা ক্যাথারিন অফ ব্রাগাঞ্জার বিবাহ উপলক্ষে ইংলণ্ড-রাজ বোম্বাই দ্বীপ যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। কোথায় কোন্ ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে এক লোণা ধীবরপল্লী,—ইহা আবার একটা যৌতুক! ঘৃণায় হয় ত সে সময়ে ইংরাজ জাতি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিল, কিন্তু এই যৌতুকই যে কালে তাহাদের প্রাচ্যে বৃহৎ সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিবে, তাহা তখন কে বুঝিতে পারিয়াছিল?

ইংরাজ দ্বীপ পাইয়াও কিন্তু দ্বীপটি প্রথম প্রথম দখল করিতে পারে নাই। পূর্ণ দখল করিতে তাহাদের ৪।৫ বৎসর লাগিয়াছি [illegible] বিবাহের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] নকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। শাসন-কর্ত্তা কা [illegible] দ্বীপ দখল করিতে গেলেন, পোর্টুগী [illegible] মাত্র বোম্বাই দ্বীপটা ছাড়িয়া

দিলেন, কিন্তু সালসেট ও ঠানা দিলেন না। ইংরাজ সামান্ত বণিক, কাবেই ঐটুকু লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। ইংলণ্ডের রাজা ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১০ পাউণ্ড বাৎসরিক খাজনা লইয়া দ্বীপটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ইজারা দিলেন।

ইহার পর ভারতের ইতিহাসে পোর্টুগীজ, মারাঠা, কাফ্রী, মোগল ইত্যাদির মধ্যে বহুকাল শক্তি-পরীক্ষা হইল। শেষ অবশিষ্ট রহিল মারাঠা শক্তি : কালে ইংরাজ ও মারাঠায় ভারতের প্রাধান্ত লইয়া শক্তি-পরীক্ষা হইল। ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজের প্রতি সুপ্রসন্ন; ইংরাজই শেষে জয়ী হইয়া বোম্বাইকে তাহাদের প্রাচ্য-রাজ্যের প্রধান কেন্দ্ররূপে ঘোষণা করিল।

ইহাই বোম্বাইএর ক্ষুদ্র ইতিহাস। ইংরাজের প্রাচ্যে রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সকল ইতিহাসই প্রায় ইহার অনুরূপ। কলিকাতা ও মাদ্রাজেও ঠিক এই ভাবে সামান্ত ধীবরপল্লী অথবা জলা-জঙ্গল হইতে উহা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজের একটি গুণ ছিল, তাহারা কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত না। এই জন্তই তাহারা সহজে লোকের মন জয় করিতে পারিত। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বোম্বাইয়ের ইংরাজ শাসনকর্ত্তা অজিয়ারের আমলে ডিউ হইতে হিন্দু বণিকরা বোম্বাইএ উঠিয়া আসে। অজিয়ার তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাহারা অবাধে ব্যাক্‌বের তটে শবদাহ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে। ইহা ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের কথা। অদ্যাবধি হিন্দুরা ব্যাক্‌বের তটে তাহাদের শবদাহ করিয়া থাকে। আর তাহাদের সুশাসনের গুণে চুরি, ডাকাতি বা লুঠতরাজ হইতে পারিত না। তখনকার অরাজকতার দিনে উহা কি কম আকর্ষণ ছিল? তাই গৃহস্থ ও ব্যবসাদার বোম্বাইকে একটা দৃঢ় আশ্রয়স্থল বলিয়া মনে করিয়া ঐ স্থানে বসবাস ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে আসিত। ইহা হইতেই ক্রমশঃ বোম্বাইএর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

বোম্বাইএর নরনারী

বোম্বাইএ প্রথম পদার্পণ করিলেই নজরে পড়ে—সহরের পথে চিত্রবিচিত্র-পরিচ্ছদ-পরিহিত নানা রকমের নরনারী, আর নানা ধর্ম্মের নানা রকম ধর্ম্মম[illegible] এ জন্ত Cosmopolitan সহর বলা য[illegible] smo-politan, তবে যেন মনে হয়, ে[illegible] নানা ধর্ম্মের লোক কলিকাতা হইতেও [illegible] ইলেই দেখিতে পাই, নানা ঢঙের শিরস্ত্রাণ, এক এক জাতির এক এক ধর্ম্মীর এক এক রকম পাগ্‌ড়ী বা টুপী।

মোগলাই শামলা বা পাগড়ী প্রায় হরিদ্বর্ণের এবং জরীদার হয়। ধনী মুসলমানরা এই পাগড়ী বা শামলা এবং আচকান-চাপকান আঁটিয়া, জরীর জুতা পরিয়া, পথ জমকাইয়া চলা-ফিরা করেন। তুর্কী ফেজ, লুঙ্গি, কোমরবন্ধ,—এ সবও আছে, তবে তাহা নিম্নশ্রেণীর বলিয়া মনে হয়। মারাঠীরা প্রায় সাদা বা লাল রঙের প্রকাণ্ড রথচক্রাকৃতি শিরস্ত্রাণ পরিয়া শুঁড়ওয়ালা চটী পায়ে দিয়া পথ চলেন। গুজরাটী ভাটিয়া বণিকদের মাথায় দেখিবেন রাঙ্গা রঙের গজমুণ্ডের আকারের শিরস্ত্রাণ। পার্শীদের মাথায় কালো বা কটা রঙের প্রকাণ্ড ধুচুনীর মত টুপী।

আবার হিন্দুদের মধ্যে ললাটের তিলকসেবা তাহাদের জাতি বা ধর্ম্ম ধরিয়া দেয়। উর্দ্ধপুণ্ড ও ত্রিপুণ্ড্র শৈব ও বৈষ্ণবকে চিনাইয়া দেয়।

হাবসী, আরব, খোজা, মেমন, বোরা, কচ্ছী, সিন্ধী,—নানা রকমের মুসলমান বোম্বাই সহরে দেখা যায়।

তেমনই হিন্দু ও জৈনদের মধ্যে গুজরাটী, মারাঠী, সিন্ধী, কচ্ছী, মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী, শিখ, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, নেপালী,—অনেক জাতির মানুষ পথ-চলাচল করে।

পথে চলিতে চলিতে কোথাও মসজিদ, কোথাও বা মন্দির, আবার ইহা ছাড়া, গির্জ্জা, পার্শীদের অগ্নিস্থান, ইহুদীদের সিনাগগ, ব্রাহ্মদের উপাসনামন্দির,—সব রকমের ধর্ম্মস্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় বোম্বাইএর নারী। কলিকাতায় এখন অনেক মাদ্রাজী, মারাঠী বসবাস করিয়াছে, অনেক মাড়োয়ারী, ভাটিয়া কলিকাতার বাসিন্দাই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও ভাটিয়া, গুজরাটী বা মারাঠীকে তাঁহাদের খাস মুলুকে বসবাস ও চলাফিরা করিতে দেখায় একটা নূতনত্ব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কলিকাতায় মারাঠী, ভাটিয়া বা মাদ্রাজী নারীকে অবগুণ্ঠনরহিতা হইয়া আত্মীয়স্বজন সঙ্গে পথে ভ্রমণ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু একাকিনী ট্রামে-বাসে চাপিতে বা বাজার-হাট করিতে দেখা যায় না। কিন্তু বোম্বাইএর পথে নামিয়াই দেখিলাম, মারাঠী বা ভাটিয়া গৃহিণী চটিজুতা পরিয়া কটর-কটর করিতে করিতে বাজার করিতে যাইতেছেন, ভৃত্য ধামা বা থলিয়া লইয়া

পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছে। অথবা দেখিয়াছি, কেবল গৃহিণী নহেন, স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীরা অথবা অন্যান্য বালিকা ও যুবতী সম্পূর্ণ পুরুষের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত অবস্থায় পুরুষেরই মত গাড়ীর সাইনবোর্ড দেখিয়া ট্রাম বা বাস গাড়ীতে উঠিতেছেন, অথবা ঠিক গন্তব্য স্থানে আসিয়া নামিতেছেন।

পার্শী মহিলারাও স্বাধীনা, তাঁহাদিগকে দেখিলে যেন কতকটা 'এদেশ-ছাড়া' বলিয়া মনে হয়, যদিও তাঁহাদের বেশভূষা গুজরাটী ভাটিয়াদের কতকটা অনুরূপ, রঙীন রেশমী শাটী উভয়েই পরিধান করিয়া থাকেন। তবে গুজরাটীদের

বোরী-বন্দর ষ্টেশন

কাঁচুলী, পার্শীদের বডিস ব্লাউস; গুজরাটীদের মাথায় কিছুই থাকে না, থাকে কবরী বেষ্টন করিয়া ফুলের মালা—মারাঠীদেরও তাই, পার্শীদের থাকে রেশমী রুমাল। আর গুজরাটী ভাটিয়াদের পায়ে থাকে জরীর অথবা সাদাসিধা ধরণের জুতা, পার্শীরা মেমদের মত উচ্চ হিলওয়ালা লেডিস্ সু পরিয়া থাকেন। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যায়, পার্শীরা ইংরাজের পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণপ্রিয়—অনেক পার্শী কেবল মাথায় 'ধুচুনি' রাখিয়া সমস্ত শরীরে কোট-প্যান্ট আঁটেন, কেহ কেহ একবারে হ্যাট চড়াইয়া গ্যাড-ম্যাড করিয়া বেড়ায়। গুজরাটী মহিলারা বর্ত্তমান আন্দোলনের দিনে আবার একবারে বিলাসিতা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কোটিপতি ধনকুবেরের গৃহিণী, কন্যা বা জননী ভগিনী, অথচ তাঁহারা শুভ্র খদ্দরমণ্ডিতা—রেশমীর সংস্রব তাঁহারা বিষবৎ বর্জ্জন করিয়াছেন। অতি সামান্য বেশে বোম্বাইএর পথে পথে তাঁহারা জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া, জাতীয় পতাকা ধারণ করিয়া শোভাযাত্রা করিতেছেন এবং সর্ব্ববিধ জাতীয় কার্য্যে পরম উৎসাহভরে যোগদান করিতেছেন।

দেখিবার জিনিষ

যাউক সে কথা, বোম্বাইএর নরনারীর সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার আছে, উহা পরে নিবেদন করিব। আপাততঃ বোম্বাই সহরে নামিয়া কোথায় কি দেখিবার জিনিষ আছে এবং সে সকল সম্বন্ধে আমার ধারণা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় দিব।

বোম্বাই সহরের প্রথম শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইয়াছিল গভর্ণর এলফিনষ্টোনের আমলে। তিনি মারাঠা যুদ্ধে যশস্বী হইয়াছিলেন, তাহার পর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইএর গভর্ণর হইয়া আসেন। তাঁহার শাসনকালে বোম্বাইএর পথ-ঘাট—গৃহ, মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদ, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, আইন, সেবা, চিকিৎসা,—সমস্ত জিনিষেরই পুষ্টিসাধন হইয়াছিল। তাঁহার নাম এখনও 'এলফিনষ্টোন কলেজে'র সম্পর্কে চির স্মরণীয় হই[illegible] এলফিনষ্টোন হাইস্কুল ও এল ফিনষ্টো[illegible] ও তাঁহার নাম চিরজাগরূক রাখিয়া[illegible] ইতিহাস লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছে[illegible]

মুম্বাদেবী

এলফিনষ্টোনের সময় হইতে বোম্বাইএর শোভাসৌন্দর্য্য ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সে সকলের বর্ণনা করা সময়-সাপেক্ষ। তবে তন্মধ্য হইতে যথাসম্ভব বাছিয়া লইয়া কয়েকটি দেখিবার জিনিষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া সম্ভব। আমরা হিন্দু, সুতরাং প্রথমেই বোম্বাইএর দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে হিন্দুর ও জৈনদের মন্দিরের কথা বলিব।

মুম্বাতালাওএর সম্মুখেই তামা ও কাঁসার বাজার। ঐ স্থান হইতে গিরগাম পল্লী পর্য্যন্ত যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়,

ক্রফোর্ড মার্কেট
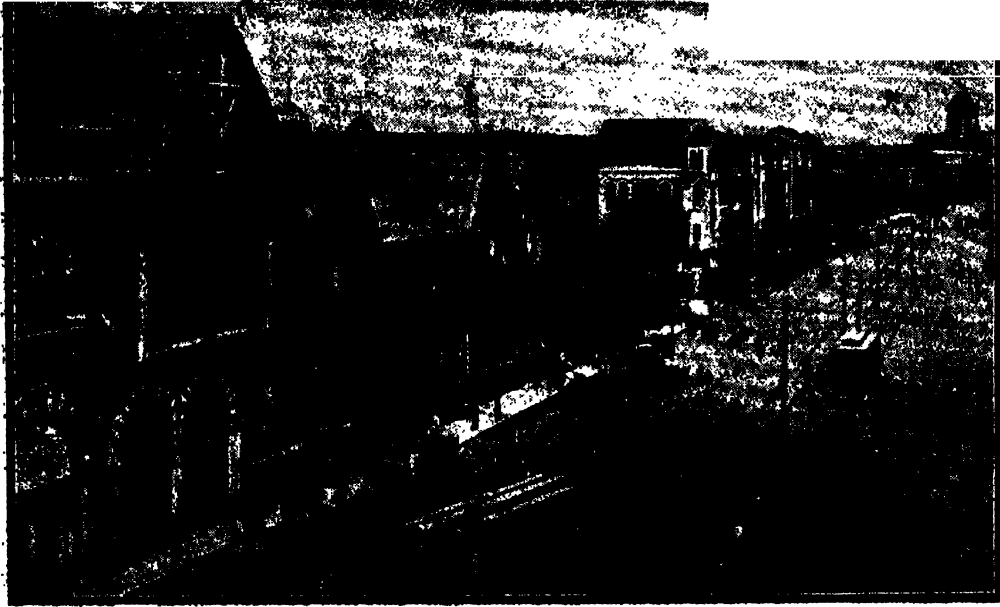
উভয় পার্শ্বে মাঝে মাঝে হিন্দু ও জৈনমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই সহরে যে সকল হিন্দু মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বালুকেশ্বর, মহালক্ষ্মী, মুম্বাদেবী, নাগদেবী ও ব্যাবুলনাথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুম্বাদেবীর মন্দির সহরের বুকের মাঝে অবস্থিত, এই হেতু হিন্দুমাত্রেই প্রথমে এই মন্দির দেখিয়া থাকেন।

কাঁসার বাজারের পার্শ্বেই এই বাজারে পদার্পণ করিলেই মন্দির পাওয়া যায়। কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে উভয় পার্শ্বে যেমন ডালির দোকান দেখা যায়, এখানেও ঠিক সেইরূপ। পশ্চিমা হালুইকরের দোকানের মধ্য দিয়া যে মন্দিরকটকটি দেখা যায়, তাহার পরেই থামের উভয় পার্শ্বে সারি সারি ডালির দোকান, সেখানে পুষ্পমাল্যাদি পাওয়া যায়।

সম্মুখেই অঙ্গন, তন্মধ্যে জলাশয়। চারিদিকে বাঁধা ঘাট, জলের মধ্যস্থলে রক্তপতাকা, জলাশয়ের চারিদিকে যাত্রীদের বিশ্রাম-চত্বর। অঙ্গনে একটি শমীবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

জলাশয়ের এক পার্শ্বে খাস মন্দিরদ্বার। দ্বার অতিক্রম করিলেই দেখা যায়, একটি শ্বেত মর্ম্মরের চত্বর শোভা পাইতেছে, তাহারই অন্তরালে মুম্বাদেবীর পীঠস্থান।

পীঠস্থানের দুইটি প্রকোষ্ঠ—একটির মধ্যে রৌপ্যনির্ম্মিত সিংহাসনের উপর পীতবরণী অষ্টভুজা প্রতিষ্ঠিতা, অপর প্রকোষ্ঠে পাতাল মধ্যে মুম্বাদেবী; তিনি পাষাণ-নির্ম্মিতা, কিন্তু তাঁহার কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই।

চত্বর, প্রাচীর-গাত্র মর্ম্মর-নির্ম্মিত, চত্বরের উপর মর্ম্মর-নির্ম্মিত সিংহ, বোধ হয়, দেবীর বাহন।

চত্বরের নিম্নে হোমের স্থান ও বলির স্থান।

অলিন্দগুলির মধ্যে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে।

বালুকেশ্বর

এখান হইতে গিরগাম পল্লীর মধ্যে জীবনলালের বল্লভাচার্য্য মন্দির, মাড়োয়ারীদের বালাজী ও জগন্নাথ মন্দির, স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের ভজনালয়, নানকপন্থীদের ও কবীর-পন্থীদের মন্দির, রামানুজ সম্প্রদায়ের মন্দির, মাধবাচারী মন্দির প্রভৃতি নানা উপাসক-সম্প্রদায়ের মন্দির দেখা যায়।

কিন্তু এ সকল মন্দির মুম্বাদেবীর মত প্রাচীন নহে, এই ভাবের মন্দির ও ভজনালয় কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বালুকেশ্বরের মন্দিরও বহু প্রাচীন। আমরা যে মালাবার হিলে ছিলাম, তাহার পশ্চিম সীমানায় এই মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটির দেখিবার মত কিছু নাই, তবে ইহার মাহাত্ম্য নাকি বড় অধিক। প্রবাদ—রামচন্দ্র সীতাদেবীর অন্বেষণ করিতে পঞ্চবটী হইতে এই স্থানেও এক দিন আসিয়াছিলেন। যে

মন্দিরের পার্শ্বে একটি শাণ-বাঁধান পুষ্করিণী আছে, উহা বাণতীর্থ বলিয়া অভিহিত। রামচন্দ্র তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ভূগর্ভে বাণাঘাত করিলে ভোগবতী তথায় আবির্ভূত হন। এই হেতু নাম—বাণতীর্থ। এই তীর্থের চারিপার্শ্বে অনেক দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে। সমুদ্রতটে পাহাড়ের গায়ে একটি গহ্বর আছে। প্রবাদ—উহার মধ্য দিয়া গলিয়া গেলে পাপনাশ হয়। কথিত আছে, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ইহার মধ্য দিয়া গলিয়া গিয়াছিলেন।

বালুকেশ্বর

রাত্রি তিনি এই স্থানে যাপন করেন, সেই রাত্রি লক্ষ্মণ তাঁহার জন্য শিবলিঙ্গ আনিয়া দিতে পারেন নাই; প্রত্যহ লক্ষ্মণ বারাণসী হইতে তাঁহার পূজার জন্য শিবলিঙ্গ আনিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিবলিঙ্গ না পাইয়া রামচন্দ্র সমুদ্রসৈকত হইতে বালুকা সংগ্রহ করিয়া শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন। ইহা হইতেই নাম বালুকেশ্বর। এখনও প্রবাদ আছে যে, ম্লেচ্ছ পোর্টুগীজদের আগমনে শিবলিঙ্গ সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যে লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা হয়, তাহা কাশী হইতে আনীত।

মহালক্ষ্মী-মন্দির

মহালক্ষ্মী আর একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির। খাম্বালা হিলের শীর্ষে নারিকেলকুঞ্জমধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত। প্রবাদ—এক কারিগরজাতীয় লোক এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

... ত বোম্বাই পর্য্যন্ত বাঁধ নির্ম্মিত হয়,
তৎ ... র্য্য পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন।
বাঁধ ... া ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, শেষে
এই ... বাঁধের পার্শ্বস্থ খাঁড়ির মধ্য হইতে

মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি পাইয়া প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সরকার তাঁহাকে খাম্বালা পাহাড়ের উপর বিনা করে স্থান দিয়া উপকৃত করিয়াছিলেন।

মন্দিরে মহালক্ষ্মী, মহাকালী প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তি আছে। ইহা ছাড়া 'ডাকোজী' মন্দিরটিও দেখিবার জিনিষ, অবশ্য প্রাচীনতা হিসাবে নহে, সৌন্দর্য্য হিসাবে। 'প্রভু' বলিয়া এক জাতি আছে। এই জাতীয় ডাকোজী দাদাজী নামক ধনকুবের প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরটির কারুকার্য্য অতি চমৎকার। ইহা মহালক্ষ্মী-মন্দিরের নিকটে অবস্থিত।

মহালক্ষ্মী

মসজিদ

এই সঙ্গে ভিন্ন-ধর্ম্মীর দুই একটি ভজনালয়ের কথা বলা কর্ত্তব্য। কোলাবা বোম্বাইএর দক্ষিণ সীমানা, আর মাহিমকে উত্তর সীমানা বলা যায়। কোলাবা হইতে মাহিম পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের মধ্যে মুসলমানদের ন্যূনাধিক [illegible] আছে। ইহার মধ্যে সবগুলিই যে প্রাচীন [illegible] তাহা বলি না, তবে এক একটা যে [illegible] আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এখানেও অন্যান্য মুসলমান সহরের মত জুম্মা মসজিদ প্রধান। তাহার পর খোজাদের মসজিদ, বোরাদের মসজিদ, মেমনদের মসজিদ, মোগলদের মসজিদ,—এইরূপ অনেক মসজিদ আছে।

জুম্মা মসজিদটি প্রাচীন; ইহার বার্ষিক আয় ৩০ হাজার টাকা। ইহা কাপড়া বাজারের নিকট অবস্থিত। মহম্মদ আলি নামক ধনী মুসলমান ব্যবসায়ী ইহার জীর্ণ-সংস্কারের জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

পার্শী অগ্নিমন্দির

পার্শীরা অগ্নি-উপাসক, তাহা সকলেই জানেন। মুসলমান বিজেতার ভয়ে পার্শীরা ইরাণ ছাড়িয়া ভারতের গুজরাটে বাস করিতে আসিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহারা—সঙ্গে তাঁহাদের অগ্নি-উপাসনাও আনয়ন করিয়াছেন, কেন না, তাঁহারা সাগ্নিক আর্য্য।

সারা বোম্বাই সহরে মোটের উপর ৩০।৪০টি অগ্নি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এগুলি পার্শী জনসাধারণের অগম্য নহে। কিন্তু ইহা ছাড়া যে কয়টি (৮।১০টি) অগ্নিমন্দির আছে,

উহা কয়েকটি ধনী পার্শী গৃহস্থের নিজস্ব সম্পত্তি, উহাতে অন্যের প্রবেশাধিকার নাই।

পার্শী অগ্নিমন্দিরগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত;—(১) আতস বেহরাম, (২) আতস আদারণ, (৩) আতস দাদগা। মন্দিরের কারুকার্য্য বা নির্ম্মাণকৌশল কিছুই নাই।

মন্দিরের মধ্য-প্রকোষ্ঠে পূত অগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকে, তাহার সংরক্ষণে এক জন পুরোহিত নিযুক্ত থাকেন। তিনি অনুক্ষণ চন্দনাদি কাষ্ঠ দিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রাখেন।

অগ্নিপ্রতিষ্ঠার নিয়ম কৌতূহলপ্রদ। যেখানে অগ্নির জন্ম, সেই স্থান হইতেই অগ্নি সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। বিদ্যুৎ হইতে যে অগ্নির উদ্ভব হয়, তাহার পবিত্রতা সর্ব্বাধিক। হোর্মসজি ওয়াডিয়া নামক আতস বেহরাণ অগ্নিমন্দিরের বিদ্যুতাগ্নি কলিকাতা হইতে বহু কষ্টে বহু অর্থ ব্যয়ে আনীত হইয়াছিল। কলিকাতার নিকটে কোন স্থানে একটি বিশেষ বৃক্ষে বজ্রপতন হইয়াছিল। প্রথমতঃ বিদ্যুতে ঝলসিত উহার এক শাখা সংগ্রহ করা হয়। অগ্নি ইন্ধন যোগান দিয়া সংরক্ষিত করা হয় ও পরে উহা বহু যত্নে বোম্বাইয়ে প্রেরিত হয়।

অগ্নি কেবল যে বিদ্যুৎ হইতে জাত হইবে, এমন কোন কথা নাই, নানা জাতীয় অগ্নিরই উপাসনা-পূজা হয়। এইরূপ নানা জাতীয় অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রক্ষিত হইলে পর উহাকে সংস্কৃত ও সংশোধিত করা হয়। অগ্নির উপর একটি দণ্ডসমন্বিত সচ্ছিদ্র চ্যাপটা ধাতুনির্ম্মিত পাত্র রক্ষা করা হয়। পাত্রস্থিত চন্দনাদি কাষ্ঠ, নিম্নস্থ অগ্নির সংস্পর্শে দগ্ধ হয় এবং উহা হইতে নূতন সংস্কৃত অগ্নির উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় অগ্নি হইতে তৃতীয়, তৃতীয় হইতে চতুর্থ, এইরূপ পর পর নয়টি নবাগ্নি উদ্ভূত হইলে পর শেষ অগ্নিকে পূতাগ্নি বলা হয়।

রাজাবাই ক্লক টাওয়ার
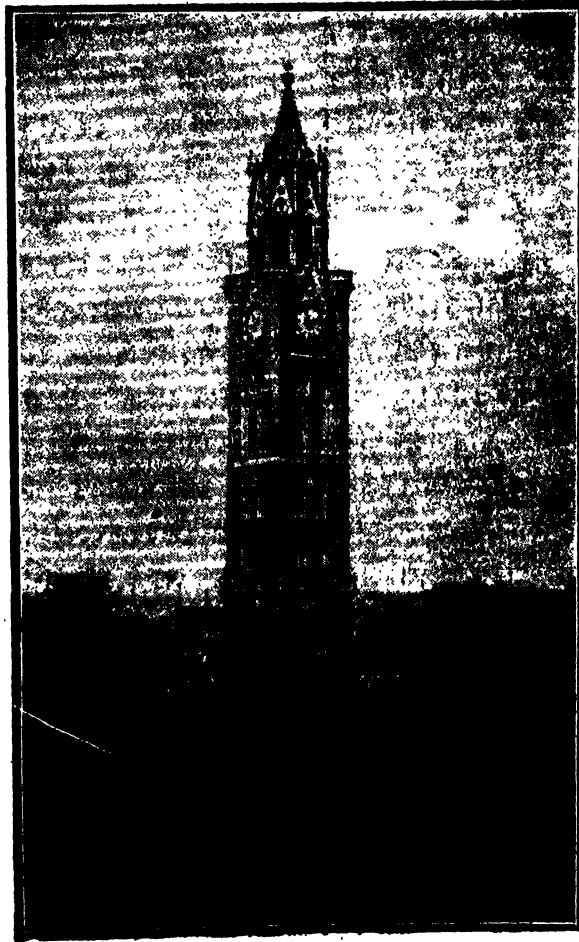
হ্যাংইং গার্ডেন

দেবস্থানসমূহের পর এইবার একে একে বোম্বাই-এর অন্যান্য দেখিবার স্থানের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। বোম্বাই-এর অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন তাহার হারবার ও ব্যাকবে, তেমনই মানুষের হাতে গড়া সম্পদ হ্যাংইং গার্ডেন বা আকাশ-উদ্যান। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে পড়িয়াছিলাম, ব্যাবিলনের হ্যাংইং গার্ডেন একটি, কিন্তু উহা দেখিবার ভাগ্য হয় নাই। কাশ্মীরের হ্যাংইং গার্ডেন ও লাহোরের শালিমার উদ্যানের মত বোম্বাইএর এটিও অবশ্য দেখিবার জিনিষ।

এটি মালাবার হিল পল্লীতে অবস্থিত। আকাশ-উদ্যান বলিতে কেহ যেন না বুঝেন, সত্য সত্যই উদ্যানটি শূন্যে অবস্থিত। বস্তুতঃ লাহোরের শালিমার উদ্যানের মত এই উদ্যানটি উচ্চ-ভূমির উপর অবস্থিত. তবে শালিমার যেমন স্তরের পর স্তর ... ই বাগানটি তেমন নহে,—ইহার একটি ... । মহারাণার প্রাসাদের একাংশে একা ... আকাশ-উদ্যান দেখিয়াছিলাম। প্রকা ... উপর প্রকাণ্ড উদ্যান—বড় বড়

বৃক্ষ, তাহার এক একটা কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়।

মালাবার হিলটি স্বতঃই সহরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা উচ্চ; কাযেই ইহার একাংশে জমী চৌরস করিয়া তাহার উপর পরমরমণীয় বাগান তৈয়ার করার কল্পনা সহজেই দেখা দিতে পারে। বিশেষতঃ বোম্বাই সহরময় কলের জল সরবরাহ করিতে হইলে উচ্চ স্থানে একটা বড় চৌবাচ্ছা বা রিজার্ভয়ারের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। বোম্বাই সহর হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ দূরে আটগাঁও ষ্টেশন। ইহার কাছে একটি হ্রদ আছে। আর সালসেট দ্বীপে বিহার ও তুলসী হ্রদ আছে। বোম্বাইএর পানীয় জল এই তিনটি জলাশয় হইতে সংগৃহীত। এই জল পূর্ব্বোক্ত রিজার্ভয়ার বা চৌবাচ্ছায় ধরিয়া রাখা হয় এবং উহা হইতে সহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারটি যে প্রকৃতির, এটিও সেই প্রকৃতির। অবশ্য টালার প্রকাণ্ড Overhead Reservoir নির্ম্মিত হইবার পর হইতে কলিকাতার পানীয় জলের নিম্নভূমিস্থ চৌবাচ্ছাগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। এখন উহার উপর বেড়াইবার বাগান আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলিবার গ্রাউণ্ড করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাইএর হ্যাংইং গার্ডেনও এই প্রকৃতির। এটির পেটের মধ্যে যে বোম্বাইএর মত প্রকাণ্ড সহরের পানীয় জল পোরা থাকে, তাহা বাহির হইতে দেখিয়া বা উহার উপর বায়ুসেবন করিয়া বুঝিবার উপায় নাই। এই বাগানটির একটি ইতিহাস আছে। বাগানটি যখন প্রস্তুত হয়, তখন যুরোপীয়দের জন্য উহা সংরক্ষিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু এখানকার ধনকুবের দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের চেষ্টায় তাহা হইতে পারে নাই। তাঁহারা এই উদ্যানটি সর্ব্বসাধারণের জন্য রক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া ভারতবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

এইখানে একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলিকাতায় যেমন যুরোপীয়দের প্রাধান্য, তাঁহাদের জন্য গড়ের মাঠ, উৎকৃষ্ট পল্লী, উৎকৃষ্ট খেলার ম[illegible] [illegible]প্যাল সেবা (ময়লা সাফ করা, কলের জল। [illegible] [illegible]রে), তাঁহাদের জন্য ব্যবসায়ের বাজার [illegible] [illegible]জী, তাঁহাদের কথায় কর্ত্তৃপক্ষরা উঠেন [illegible] ঠিক তাহার বিপরীত। সেখানে দেশীয় ভাটিয়া, পার্শী, কচ্ছী, মেমন ব্যবসায়ীরাই সর্ব্বেসর্ব্বা—সহরের কর্ত্তা, যুরোপীয়রা কিছুই নহেন,—তাঁহাদিগকে দেশীয় ব্যবসায়ীদের মুখ চাহিয়া চলিতে হয়। বোম্বাইএ যুরোপীয়দের চৌরঙ্গীর মত স্বতন্ত্র পল্লী নাই। সেখানে মালাবার হিলের মত উৎকৃষ্ট পল্লীতেও দেশীয় ও যুরোপীয় পাশাপাশি বাস করে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের কথায় বাজার খোলা বা বন্ধ হয়। বোম্বাইএর ব্যবসায়ীদের গুণে এখানে দেশীয়ের আত্মসম্মান সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে। বর্ত্তমান আন্দোলনে বোম্বাইএর ব্যবসায়ীরা কি অদ্ভুত ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

বাগানটির কথা এইবারে বলা যাউক। ফ্রি প্রেসের শ্রীযুক্ত সদানন্দ তাঁহার মোটরে আমাদের তিন জনকে বাগান দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার জরুরী কাজ থাকায় তিনি সঙ্গী হইতে পারেন নাই। 'অমৃতবাজারের' মালিক-সম্পাদক শ্রীমান্ তুষারকান্তি ঘোষ এবং 'এডভান্সের' সম্পাদক শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। মোটর বাগানের গেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে দেখিলাম, সেখানে আমাদের দেশের চীনাবাদাম-চানাচুরওয়ালার মত ভাজী-ওয়ালা, গাণ্ডেরীওয়ালা, সরবৎওয়ালা হাঁকিয়া খরিদ্দার যোগাড় করিতেছে, কত মারাঠী ভাটিয়া নরনারী আহ্বানে সাড়া দিয়া তাহাদের আহার্য্য-পানীয়ের সদ্ব্যবহার করিতেছে।

কিন্তু সম্মুখের সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলে যে পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইব, আমরা কেহই তখন কল্পনায় ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। সত্যই সে কি সুন্দর দৃশ্য! কবির কল্পনার নন্দন-কানন কি কতকটা এই ভাবের? উপরে উঠিয়াই যখন আমরা বাগানের শ্যামল-শষ্পাচ্ছাদিত নানা আকৃতির ময়দান, ফলে-ফুলে লতায়-পাতায় সজ্জিত শ্যামল সুন্দর বৃক্ষরাজি, ভ্রমণের সুসজ্জিত পথ, বসিবার আসন ও চত্বর, সুন্দর কুঞ্জবন ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম, তখন মন যথার্থই আনন্দরসে ভরিয়া উঠিল। আমার তরুণ বন্ধু দুইটির মুখে একাধিকবার প্রশংসাবাদ শুনিলাম—তাঁহারা কেন, যে কেহ এই রমণীয় উদ্যান দেখিবেন, তিনিই যে মুগ্ধ হইবেন, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।

কত চিত্রবিচিত্র-পরিচ্ছদধারী নরনারী সান্ধ্য ভ্রমণে উদ্যানে সমবেত হইয়াছেন। কত বালক-বালিকা সেই গোধূলির আলো-আঁধারে তথায় আনন্দে কলহাস্যের তান তুলিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদের সঙ্গে পার্শী যুবতীরাও সে আনন্দে যোগদান করিয়াছে। হাস্যোৎফুল্ল-নয়না সেই সমস্ত পার্শী, ভাটিয়া ও মারাঠী স্বাধীনা মহিলার মধ্যে দুই একটি বোরখা-ঢাকা মুসলমান-নারীকেও দেখিলাম। বোম্বাই আসিলে স্বাধীনা ও পর্দ্দানশীনাদের পাশাপাশি যেমন দেখিতে পাওয়া যায় এবং তুলনার কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়া উঠে, এমন আর কোথাও নহে।

এই নন্দনের উপর হইতে নিম্নে বোম্বাই-নগরীকে কি সুন্দর দেখাইতেছে! যেন মনে হইতেছে, সুনিপুণ চিত্রকর তুলিকাপাতে চিত্রপটে এই দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। দিনমণি অস্তমিতপ্রায়—এখনও তাঁহার রাঙা আভায় আকাশ রঞ্জিত। নিম্নে যেন পাতালগর্ভে এক পার্শ্বে ব্রিচকাণ্ডি পল্লীর পাদমূলে অনন্তনীল ফেনিল আরব সাগর আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছে, অপর পার্শ্বে ব্যাকবের অনন্ত জলরাশি কোলাবা পয়েন্ট পর্য্যন্ত বোম্বাই নগরীকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। গোধূলির রক্ত আভায় সমুদ্রবারিও যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে—আর তরঙ্গের উপর তরঙ্গভঙ্গে যেন শত সহস্র হীরকচূর্ণ ঝকমক করিয়া উঠিতেছে। ঐ পাইলভরে গর্ব্বিতা হংসীর মত দেশীয় নৌকার শ্রেণী সমুদ্রবক্ষে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। দূরে কঙ্কণের ঘাটপর্ব্বতমালা ধূম্রধূসর মেঘের মতই প্রতীয়মান হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে তপনদেব রক্তবর্ণ গোলকের মত কাঁপিতে কাঁপিতে ঘুরিতে ঘুরিতে সমুদ্রগর্ভে লুকাইয়া গেলেন—তখনও ক্ষণকাল আকাশ ও বারি রক্ত আভায় রঞ্জিত হইয়া রহিল, আর সেই আভার প্রতিচ্ছবি লইয়া সমস্ত বস্তুই রঞ্জিত বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল।

ক্রমে তিমিরাবগুণ্ঠিতা সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সহরের অঙ্গে তারামালার মত বৈদ্যুতিক আলোকমালা ফুটিয়া উঠিল। এ দিকে আকাশেও তারানাথ তারার মালা পরিয়া রজতধারায় জলস্থল স্নাত প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাকবের ট্র্যাণ্ডস্থিত বিরাট হর্ম্ম্যরাজির অঙ্গে এবং পথের উপরে বৈদ্যুতিক আলোকগুলি একটি একটি করিয়া জলিয়া উঠিল।

কি শোভা! ইহার ত বর্ণনা করা যায় না, ইহা উপভোগের জিনিষ। বোম্বাইএ আসিয়া যে হ্যাংইং গার্ডেন হইতে গোধূলির আলো-আঁধারে ব্রিচকাণ্ডি ও ব্যাকবের দৃশ্য উপভোগ না করিয়াছে, তাহার জীবনের আস্বাদ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

বর্ষাগমে

মেঘাবৃত দিগন্তর, ছায়াচ্ছন্ন ধরা,
শীতল-সমীর-স্পর্শে কাঁপে তরুশাখা—
সরসীর তীর এবে দাদুরী-মুখরা
ক্ষীণা কুমুদের মুখে আশাদীপ্তি আঁকা।

গুরু গুরু ডাকে মেঘ কোথা বারি-ধারা?
সাগ্রহে আকাশপানে চাহে ধরাবাসী,
এস বর্ষা, এস মেঘ, বাধাবন্ধ-হারা
বর্ষণে ধরার তাপ নাশ কর আসি।

সহসা বিদ্যুৎ-দীপ্তি কড়-কড় নাদ,
ভাঙ্গিল আকাশ বুঝি ভীম-বজ্রাঘাতে
প্রবল পবন আসে তাহার পশ্চাৎ
বৃষ্টি-ধারা লয়ে তার সাথে।

নববর্ষাগমে ধরা আনন্দ-
কাননে নাচিছে শিখী?

শ্রীবারীন্দ্রনাথ ঘোষ

পুরাণ-প্রসঙ্গ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ব্রহ্মপুরাণ

অষ্টাদশ মহাপুরাণ গণনায় সকলের মতেই ব্রহ্মপুরাণ প্রথম। এই পুরাণের ২খানি হস্তলিখিত ও ২খানি মুদ্রিত পুস্তক পাইয়াছিলাম। হস্তলিখিত পুস্তকদ্বয় কাশীরাজ লাইব্রেরী ১৮৩১ ও ১৮৬১ সম্বতে লিখিত বিশুদ্ধ মুদ্রিত পুস্তকদ্বয়মধ্যে একখানি বাম্বা জিলা হইতে ১৯৪৮ সম্বতে মুদ্রিত, অপরখানি বঙ্গবাসীর। এই পুস্তক-চতুষ্টয়ের পাঠাদিতে বিশেষ ব্যতিক্রম নাই। ১৮৩১ সম্বতে অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ব্রহ্মপুরাণের মঙ্গলাচরণের ১ম শ্লোকটি অন্য পুস্তকত্রয়ে দেখিতে পাই নাই। উক্ত শ্লোকটি এই—

"জয়তি জলভারগর্ভিত-নীলনীরদ-সবর্ণঃ।
মন্দরগিরিপরিবর্ত্তন-বিষমশিলালাঞ্ছনো বিষ্ণুঃ।"

এই পুরাণের বক্তা ব্রহ্মার নামানুসারে পুরাণের নাম 'ব্রহ্মপুরাণ' হইয়াছে। এইরূপ অনেক পুরাণেরই নামকরণ বক্তা বা প্রতিপাদ্যের নামানুসারে হইয়াছে। পদ্মপুরাণ কল্পানুসারে এইরূপ বিভিন্ন অর্থেও দুই একখানির নামকরণ হইয়াছে, এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা লইয়া বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মত দেখা যায়। মৎস্যপুরাণে ইহার শ্লোকসংখ্যা ৩০ হাজার বলা হইয়াছে (মৎস্য, ৫৩ অধ্যায়), অগ্নিপুরাণমতে ২৫ হাজার (অগ্নি, ২৭২ অধ্যায়), নারদীয় পুরাণমতে ১০ হাজার (নারদীয় পুরাণ, ৪র্থ পাদ, ৯২ অধ্যায়), বর্ত্তমান পুস্তকের শ্লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১৩ হাজার। বক্তা-শ্রোতা-নিরূপণমধ্যেও মতভেদ আছে। নারদীয় পুরাণমতে ব্যাস বক্তা, পরে সূত বক্তা, শৌনক শ্রোতা। নারদীয় পুরাণে প্রত্যেক পুরাণের সূচী দেওয়া আছে। বর্ত্তমান সময়ে উপলভ্যমান পুরাণ সকল উক্ত পুরাণের লিখিত সূচীর সহিত অনেকাংশেই মিলিয়া যায়। ব্রহ্মপুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়মধ্যে নূতন কথা বড় নাই। অন্যান্য পুরাণে এই সকল কথাই আছে।

নারদীয় পুরাণমতে ব্রহ্মপুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমার্দ্ধে দেব, অসুর, প্রজাপতিগণের উৎপ[illegible] ...[illegible]বংশ-কীর্ত্তন, শ্রীরামাবতারকথা, সোমবংশকীর্ত্তন, [illegible], বর্ষ, পাতাল, স্বর্গ-বর্ণন, সূর্য্যস্তুতি প্রভৃ[illegible] জন্ম, বিবাহ, দক্ষাখ্যান, একাম্রবর্ণন। [illegible] বর্ণন, তীর্থযাত্রা, বিস্তৃত কৃষ্ণচরিত্র, যম[illegible]বিধি, বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন, বিষ্ণুধর্ম্ম-যুগাখ্যান, প্রলয়, যোগ, সাংখ্য, ব্রহ্মবাদ ও পুরাণশাসনবর্ণন। বর্ত্তমানে যে সকল পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতে নারদীয় পুরাণানুসারে ৩ হাজার শ্লোক অধিক আছে, সুতরাং উহা প্রক্ষিপ্ত। মৎস্য বা অগ্নিপুরাণমতে যাহা আছে, তাহা অর্দ্ধাপেক্ষাও কম, অনুক্রমণিকোক্ত রামচরিত্রের উল্লেখই নাই, কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায় রামচরিত্র যে বিস্তৃত ছিল না, ইহা বলা যায় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুরাণ ১খানিই ছিল, উহা বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া অষ্টাদশ পুরাণাকারে পরিণত হইয়াছে। ইহা কূর্ম্মপুরাণের প্রথমেই বলা হইয়াছে। ঐ একমাত্র পুরাণের নাম ছিল ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বর্ত্তমানে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের যে কলেবর দেখিতে পাওয়া যায়, উহা বায়ুপুরাণ হইতে অভিন্ন। সকল পুরাণই যে এক ছিল, তাহা বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত এক একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলেই বেশ উপলব্ধি হয়। ব্রহ্মপুরাণে নূতন বিষয় নাই—নূতন সংস্কৃতও নাই, উহা অধিক স্থানে বিষ্ণুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণের সহিত অভিন্ন। কয়েকটি স্থান নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ব্রহ্মপুরাণ—১মাধ্যায় ৩৭-৪১ শ্লোক, মনুসংহিতায় ১মাধ্যায় ৬-১৩ শ্লোকের সহিত অভিন্ন। ১মাধ্যায়ের ২১-৩০, বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১-৮ শ্লোকের সহিত অভিন্ন, ১৮১ অধ্যায়ের ২১ শ্লোক হইতে ২১২ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরাণের সমগ্র পঞ্চমাংশের সহিত অভিন্ন—এই ৩৮শাধ্যায়ের মধ্যে কদাচিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে এবং বিষ্ণুপুরাণে কোন কোন স্থানে কিঞ্চিদধিক আছে। ৯মাধ্যায়ের ১-১২-১৩-১৬ শ্লোকের সহিত কাশীখণ্ডের ১মাধ্যায়ের ১৫-২৫, ২৯-৩২ শ্লোকের কোন প্রভেদ নাই। এইরূপ ১৩ হাজার শ্লোকের মিল দেখাইবার এ স্থান নহে। কৃষ্ণচরিত্র ও পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যাদি বিষ্ণু ও স্কন্দের সহিত অভিন্ন। সৃষ্টি, ভূগোল, বংশ, বংশানুচরিত, প্রলয় ও মন্বন্তরাদির কথাতেও কোন বৈশিষ্ট্য নাই। এই ১ম পুরাণখানির শ্লোকসংখ্যাদি লইয়া বহুদিন হইতেই মতভেদ হইয়া আসিতেছে। ইহার রামচরিতাদি অংশ যেমন নাই, সেইরূপ বহু অপ্রস্তাবিত কথাও যুক্ত হইয়াছে। ইহার প্রকৃতাংশ নির্ণয় করাই সুকঠিন। এই পুরাণের বহু শ্লোক বহু নিবন্ধকার নিজ নিজ গ্রন্থে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে নির্ণয়সিন্ধুকারের পিতামহ রামেশ্বর ভট্ট প্রায় ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে 'ত্রিস্থলীসেতু' নামক গ্রন্থে প্রয়াগ-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে

ব্রহ্মপুরাণের বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পুরাণে ত্রিবেণীকে প্রণব বলা হইয়াছে, সরস্বতী, যমুনা ও গঙ্গা অ, উ, মস্বরূপা। কেবল প্রয়াগ প্রকরণেই শতাধিক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কাশী-প্রকরণেও ব্রহ্ম ও মৎস্যপুরাণের অভিন্ন কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কাশীর বীরেশ্বরের নিকটবর্ত্তিনী বিকটাদেবীর সম্বন্ধেও ঐ পুরাণ হইতে বহুবচন উল্লিখিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ

পুরাণ-পর্য্যায় গণনায় পদ্মপুরাণ দ্বিতীয়স্থলাভিষিক্ত। নারদীয়, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণমতে শ্লোকসংখ্যা ৫৫ হাজার। কেবল অগ্নিপুরাণমতে ১২ হাজার। এই পুরাণখানি ৫ খণ্ডে বিভক্ত। যথা—সৃষ্টি, ভূমি, স্বর্গ, পাতাল ও উত্তরখণ্ড। এই কথা সৃষ্টিখণ্ডের অনুক্রমণিকায় ও নারদীয় পুরাণে আছে—

"প্রবক্ষ্যামি মহাপুণ্যং পুরাণং পদ্মসংজ্ঞিতম্।
সহস্রং পঞ্চপঞ্চাশৎ পঞ্চখণ্ডৈঃ সমন্বিতম্।"

সৃষ্টিখণ্ড।

"যথা পঞ্চেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বঃ শরীরীতি নিগদ্যতে।
তথেদং পঞ্চভিঃ খণ্ডৈরুদিতং পাপনাশনম্।"

নারদীয় পুরাণ।

মুদ্রিত পুস্তকে এতদতিরিক্ত ব্রহ্মখণ্ড ও ক্রিয়াযোগখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লোকসংখ্যাও অনেক বেশী। এই পুরাণ হরিদ্বারে পুলস্ত্য ভীষ্মকে বলিয়াছিলেন। অনুক্রমণিকায় অনুক্ত অনেক কথা অপ্রাসঙ্গিকরূপে পুরাণমধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে এবং বহু দিন হইতে এইরূপ প্রক্ষেপব্যাপার চলিয়া আসায় পরবর্ত্তী কালে বিশিষ্ট গ্রন্থকাররাও সেই সকল প্রক্ষিপ্ত কথা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। যেমন শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ অশাস্ত্রীয় ও দৈত্যমোহনার্থ, এইরূপ অর্থপ্রতিপাদক কয়েকটি শ্লোক উক্ত পুরাণমধ্যে পাওয়া যায়। উহা বিজ্ঞানভিক্ষু উদ্ধৃত করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে হেয় করিবার জন্য মাধ্ব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্যের জন্ম ও আচার যে অতি কলুষিত ছিল, তাহা বলা হইয়াছে; অথচ ইঁহার প্রণীত অত্যুপাদেয় ন্যায়তরঙ্গিণী নামক অদ্বৈতবাদখণ্ডনাত্মক গ্রন্থখানিকে খণ্ডন করিবার জন্যই বঙ্গের মুকুটমণি দার্শনিকশ্রেষ্ঠ মধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সৃষ্টিখণ্ডে ও অনুক্রমণিকায় অনুক্ত বহু কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টিখণ্ড বলিলে যেমন সকল সৃষ্টির কথা আছে বুঝা যায়, কিন্তু পুস্তক পাঠ করিলে সে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়। পাদ্মকল্পের ঘটনা লইয়া কথিত, এই জন্যই এই পুরাণের 'পদ্মপুরাণ' নাম হইয়াছে।

পদ্মপুরাণের বহু বচন বহু নিবন্ধকারগণ প্রমাণরূপে নিজ নিজ নিবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন। পার্জিটার বলেন, খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর বহু তাম্রশাসনে ভূমিদানের প্রশংসা ও ফলশ্রুতিমূলক বহুতর পদ্মপুরাণের শ্লোক উৎকীর্ণ হইয়াছে। যে সকল পুরাণ বহু খণ্ডে বিভক্ত বা বৃহদায়তন, ঐ সকল পুরাণের মধ্যে বহু প্রক্ষিপ্তাংশ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। মুদ্রাকরগণ বিভিন্ন দেশীয় বহু পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া ঐ পুস্তক সকল মুদ্রিত করিলে বহু গলদই নষ্ট হইতে পারিত। যতদূর জানা যায়, তাহাতে এই মুদ্রণকারিগণ প্রথম মুদ্রিত পুস্তকমাত্র অবলম্বন করিয়াই হয় ত নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া থাকেন। ১২৫শাধ্যায়াত্মক যে ভূমিখণ্ড ছাপা হইয়াছে, উহার অতিরিক্ত ১২৬-১৩১শ অধ্যায় পর্য্যন্তের উল্লেখ 'শব্দকল্পদ্রুমে' আছে। এই ভূমিখণ্ডের মধ্যেও প্রকৃতাংশ অতি অল্পই পাওয়া যায়। স্বর্গখণ্ডের আর একটি বিপদ এই যে, উহাকে আদিখণ্ড বলা হইয়াছে। অনুক্রমণিকায় অনুক্ত ব্রহ্মখণ্ডও উহার সহিত যোজিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার আলোচনায় বিরত থাকাই ভাল। স্বর্গখণ্ডে খগোল-গ্রহনক্ষত্রাদির আলোচনার আশা করা যায়, কিন্তু তাহা নাই। শব্দকল্পদ্রুমে প্রলয় শব্দের অর্থ-বর্ণনার প্রমাণরূপে স্বর্গখণ্ডের ৩৯শাধ্যায়ের যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা মুদ্রিত স্বর্গখণ্ডের কুত্রাপি নাই। অনুক্রমণিকায় উক্ত হইয়াছে—

"সম্ভবান্তে চ সংহারঃ সংহারান্তে চ সম্ভবঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ।"

এই সকল বিষয় উহাতে থাকা উচিত ছিল।

ব্রহ্মখণ্ডে বৈষ্ণবলক্ষণ, হরিমন্দিরমার্জ্জনাদির ফল, নামমাহাত্ম্য, নামাপরাধ প্রভৃতি কথা ২৫শাধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ৪র্থ পাতালখণ্ডে প্রাণিগণের কথা ও সপ্তলোকের বর্ণনা থাকিবার কথা অনুক্রমণিকায় আছে এবং রৌরবাদি নরককথা কীর্ত্তিত হইবে, এ কথাও বলা হইয়াছে। যথা—

"ভূতানাঞ্চাপি লোকানাং সপ্তানামনুবর্ণনম্।
সংকীর্ত্ত্যন্তে ময়া চাত্র পাপানাং রৌরবাদয়ঃ।"

সপ্তলোকপদেও সপ্তপাতলই অভিপ্রেত অথচ মুদ্রিত পাতাল-খণ্ডে পাতালের নামও নাই, সপ্তপাতাল-বর্ণন ত দূরের কথা। উহাতে আছে—রামায়ণ, লবকুশের যুদ্ধ, কৃষ্ণমাহাত্ম্যাদি। এই সকল ব[illegible] নারদীয় পুরাণের প্রদত্ত সূচীর মিল আ[illegible] শব্দে লেখা আছে, যথা—

'বধং ক্রূর্ব্বন্তি বৈ মৃধা।
[illegible] খাড়স্তে রুরুভির্বিতঃ।"

পাদ্মে পাতালখণ্ডে ৪৮ অধ্যায়ের শ্লোক এটি। অথচ এই শ্লোকটি মুদ্রিত পাতালখণ্ডে নাই, থাকিবারও কথা নহে। কারণ, পাতালখণ্ডের পরিবর্ত্তে ভূমিখণ্ডের অংশবিশেষ হয় ত মুদ্রিত হইয়াছে। পাতালখণ্ডের বর্ণিত বিষয়াবলম্বনে ভবভূতির উত্তররামচরিতের অংশবিশেষ রচিত হইয়াছে, রঘুবংশের ২য় সর্গের বর্ণিত বিষয়, অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও পাতালখণ্ডের বর্ণিত বিষয়াবলম্বনে লিখিত বলিয়া মনে হয়, কোন কোন শ্লোক অভিন্ন আছে।

ইহার পর অতি বৃহৎকায় উত্তরখণ্ড। অনুক্রমণিকোক্ত "পঞ্চমে মোক্ষতত্ত্বঞ্চ সর্ব্বতত্ত্বং নিগদ্যতে" এই মোক্ষতত্ত্বের কথা উত্তরখণ্ডে নাই। পরন্তু মুক্তির কথাও পাপজনক, এই ভাবের গোঁড়া বৈরাগীদিগের কথা আছে এবং তুলসীমাল্যধারণের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য আছে। তুলসীকাষ্ঠমাল্যধারণে মুক্তি হয়, নামোচ্চারণে মুক্তি হয়, এই ভাবে ভক্তির কথা আছে ও মুক্তি অতি অল্পমূল্যেই সাধারণলভ্য দেখান হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে—"সর্ব্বেবাঞ্চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।" এই নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বর্ণসংজ্ঞাহীনকেও বর্ণ বলিয়া বড় রকমের ভুল করা হইয়াছে। এই সকল অতি অপরিপক্ক হস্তের লেখা বলিয়া বোধ হয়। অনায়াসে মুক্তিলাভের উপায় বর্ণিত আছে, কিন্তু দার্শনিক বা পৌরাণিক সিদ্ধান্তানুসারে মোক্ষকথা থাকা উচিত ছিল। এই উত্তরখণ্ডে গীতার প্রত্যেকাধ্যায়ের ফলশ্রুতি ও তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এক একটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ভগবত-মাহাত্ম্যও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অথচ এইরূপ সর্ব্বপুরাণ নির্ম্মাণ করিয়া অতৃপ্ত ব্যাস নারদোপদেশে ভাগবত নির্ম্মাণ করেন, এ কথার উল্লেখ আছে। পুরাণে কাল-ত্রয়ের কথা থাকে, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই।

সমগ্র উপলভ্যমান মুদ্রিত পদ্মপুরাণের পৌর্ব্বাপর্য্য দেখিলে বুঝা যায়, উহাতে পরস্পর কোন সঙ্গতি নাই এবং এ যাবৎকাল ইহার সংশোধনের জন্য কোনও চেষ্টাও হয় নাই, ইহাই পরম পরিতাপের বিষয়। এখন বিপুল অর্থব্যয় ও আত্যন্তিক যত্ন করিলে পুরাণ সকলের বিশুদ্ধ কলেবর দেখা যাইতে পারে।

ক্রিয়াযোগসার যে পদ্মপুরাণের অঙ্গ নহে, এ কথা বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের উল্লিখিত উপপুরাণ সকল মধ্যে ক্রিয়াযোগসারের নাম দৃষ্টে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বপুরাণসম্মত তৃতীয় প... নৈ মহর্ষি পরাশরবিরচিত, এই কথা বৃহদ্ধর্ম্মপু... "ততো বিষ্ণুপুরাণস্য কর্ত্তা ভাবী পরাশরঃ।" পূর্ব্বখণ্ড—২১শাধ্যায়। পরীক্ষিতের রাজত্বকালে মহর্ষি পরাশর মৈত্রেয় ঋষির নিকটে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন, এই কথা উক্ত পুরাণের ৪র্থ অংশের বিংশাধ্যায়ের শেষে কথিত হইয়াছে—"পরীক্ষিজ্জন্মে, যোঽয়ং সাম্প্রতমেতদ্ভূমণ্ডলমখণ্ডিতায়তি ধর্ম্মেণ পালয়তি।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিষ্ণুপুরাণের সংগ্রহকর্ত্তা। বিষ্ণুপুরাণ সকল পুরাণাপেক্ষায় অধিক প্রামাণিক ও অকৃত্রিম, এই পুরাণখানির উপরে শ্রীধরস্বামী, রত্নগর্ভ প্রভৃতির টীকা আছে। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পড়িলে বিষ্ণুপুরাণ সূত্র, ভাগবত বৃত্তি বা ব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হইবে। ভাগবত মহাপুরাণ কি না, এই সম্বন্ধে প্রবল সংশয় আছে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ নির্ব্বিবাদ। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রে কোন কোন স্থানে কিছু প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। ভাগবতাপেক্ষায় বিষ্ণুপুরাণের সৌভরি-চরিত্র উজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী, আমূল উপদেশ-পূর্ণ এবং কয়েকটি অতিরিক্ত বিষয়ও আছে। বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকসংখ্যা মৎস্য, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, দেবীভাগবত ও স্কন্দপুরাণের মতে ২৩ হাজার, মুদ্রিত পুস্তকে ৫ হাজার ৫ শত সংখ্যার অধিক শ্লোক পাওয়া যায় না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের ১৭ হাজার শ্লোক এই পুরাণের অন্তর্গত ধরিলে বিষ্ণুপুরাণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরই বিষ্ণুপুরাণের অবয়ব, ইহাই বহু পণ্ডিতের মত। নারদীয় পুরাণের ৪র্থ পাদের ৯৪ অধ্যায়ে বিষ্ণু-পুরাণের ৬টি অংশের প্রত্যেকটির সূচীপত্র আছে এবং উহা মুদ্রিত পুস্তকেও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ভাগই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর নামক, উহাতে নানাবিধ ধর্ম্মকথা, ব্রত, নিয়ম, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বেদান্ত, জ্যোতিষ, বংশাখ্যান, স্তোত্র, মনুগণের বিভাশ্রয় কথা আছে। কোন কোন সমালোচক এই নারদীয় পুরাণের সূচী না দেখিয়া বিষ্ণুপুরাণের ৪ ভাগের প্রায় তিন ভাগই পাওয়া যায় না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্যাদি না পড়িয়াও যদি কেহ বিষ্ণুপুরাণ অধ্যয়ন করে, তবে তাহার শব্দশাস্ত্রে অধিকার হয়। বিষ্ণু-পুরাণখানি অভ্যাস করিলে স্মার্ত্ত, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের অভিজ্ঞ হইতে পারা যায় এবং ইহার অধ্যেতৃ-বর্গের হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদয় হইয়া থাকে। সকল নিবন্ধ-কারই বিষ্ণুপুরাণের বাক্য নিজ নিজ নিবন্ধে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে ভবিষ্য রাজগণেরও একটি তালিকা আছে, উহার সহিত মৎস্য ও বায়ুপুরাণে উল্লিখিত ভবিষ্য রাজগণের নাম স্থানে স্থানে অমিল দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, বিষ্ণুপুরাণের প্রদত্ত নামাবলীই অধিকাংশ স্থলে ঠিক।

লিঙ্গপুরাণের ৬৪ অধ্যায়ের ১২০-১২১ শ্লোকে আছে যে, "পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠের অনুগ্রহে পরাশর বিষ্ণুপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন, উহা ৬টি অংশে বিভক্ত ও উহার শ্লোকসংখ্যা ৬ হাজার।" লিঙ্গপুরাণে বিষ্ণুপুরাণের প্রথম ভাগের কথাই বলা হইয়াছে।

শিবপুরাণ

শিবপুরাণ পুরাণপর্য্যায়ে ৪র্থ। ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৪ হাজার। বর্ত্তমান মুদ্রিত পুস্তকে কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ১৯শ হাজার দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বরাহ, কূর্ম্ম, বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয়াদি পুরাণমতে ও মধুসূদন সরস্বতীর মতে শিবপুরাণই ৪র্থ মহাপুরাণ। নারদীয়, মৎস্য, লিঙ্গপুরাণাদির মতে বায়ুপুরাণই মহাপুরাণমধ্যে অষ্টাদশ-স্থানীয় মহাপুরাণ; উহার শ্লোকসংখ্যাও ২৪ হাজার এবং কাহার কাহার মতে উহাই ৪র্থ স্থানীয়। ব্রহ্মাণ্ডের পৃথগস্তিত্ব নাই, মধুসূদন ব্রহ্মাণ্ডকে অষ্টাদশস্থানীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—বায়ু নামই নাই। এই সকল দেখিয়া পুরাণ-সমূহের মধ্যে পরস্পর মতভেদ বেশ উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু নন্দীপুরাণে এই সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, উহাই সমীচীন বোধ হয়,—

"নির্গতং ব্রহ্মণো বক্ত্রাদ্ ব্রাহ্মং পাদ্মঞ্চ বৈষ্ণবম্।
শৈবং ভাগবতঞ্চৈব ভবিষ্যং নারদীয়কম্।
মার্কণ্ডেয়মথাগ্নেয়ং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ।
লৈঙ্গং তথা চ বারাহং স্কান্দং বামনমেব চ।
কৌর্ম্মং মাৎস্যং গারুড়ঞ্চ বায়বীয়মনন্তরম্।
অষ্টাদশ সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বপাতকনাশনম্।
একমেব পুরা হ্যাসীদ্ ব্রহ্মাণ্ডং শতকোটিধা।
ততোঽষ্টাদশধা কৃত্বা বেদব্যাসো যুগে যুগে।
প্রখ্যাপয়তি লোকেঽস্মিন্ ব্যাসো নারায়ণাংশজঃ।"

ব্রহ্মা প্রথমে বহু বিস্তৃত একখানি পুরাণ নির্ম্মাণ করেন, উহার নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। পরে ব্যাস উহাকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১৮খানি পুরাণ নির্ম্মাণ করেন। ঐ পুরাণগুলির সম্পর্কে সামান্য মতভেদের সামঞ্জস্যও হয়। ব্রহ্মাণ্ড বা বায়ু অষ্টাদশস্থানীয়, পরন্তু উহার অবয়ব একই—শ্লোকগুলি অভিন্ন। সুতরাং নাম-মাত্রেই বিবাদ, সম্ভবতঃ ব্রহ্মাণ্ড স্থলে বায়ু নাম হওয়াই উচিত। কূর্ম্মপুরাণও তাহাই বলিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ড নামে পৃথক্ কোন পুরাণ হইতে পারে না, যেহেতু, সেই পুরাণখানিই সকল পুরাণের উপাদান।

শিবপুরাণে—জ্ঞান, বিদ্যেশ্বর, কৈলাস, সনৎকুমার, বায়ু ও ধর্ম্মসংহিতা নামে ছয়টি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন পুস্তকে পরের তিনটি সংহিতা দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তত্তৎস্থানে অন্য তিনখানি সংহিতা আছে। কাশীরাজের সরস্বতী-ভবনের হস্তলিখিত পুস্তকে সাধ্যসাধনসংহিতা নামে একটি অতিরিক্ত অংশ দেখিয়াছি, বায়ু-সংহিতার আরম্ভে শিবপুরাণে দ্বাদশ-সংহিতা ও লক্ষশ্লোক ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে, নারদীয় পুরাণে শিব স্থানে বায়ু, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বায়ু স্থানে শিবপুরাণই অষ্টাদশ মহাপুরাণের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কোন কোন পুস্তকে শিবপুরাণে ৭খানি সংহিতা ও ২৫ হাজার শ্লোকসংখ্যা বলা হইয়াছে।

বিদ্যেশ্বর সংহিতার ১ম ২য়াধ্যায়ের বর্ণিত বিষয় বোম্বে মুদ্রিত পুস্তকে যাহা আছে, উহা বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকে বা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের হস্তলিখিত পুস্তকে দেখিতে পাই নাই। অপর সকল বিষয়ে ঐক্য আছে। এই অধ্যায় দুইটি অতিরিক্ত, ইহার বর্ণিত উপোদ্‌ঘাত ৩য়াধ্যায়ে পুনরায় উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং উহা গ্রন্থের অবয়ব নহে। "বেদান্তসারসর্ব্বস্বং পুরাণং শ্রাবয়াশু নঃ" ইত্যাদি ৩য়াধ্যায়ই ১মাধ্যায় হইবে এবং ঐ স্থানেই গ্রন্থারম্ভ বুঝিতে হইবে। শিবপুরাণে দ্বাদশ সংহিতা, যথা—বিদ্যেশ্বর, রৌদ্র, বৈনায়ক, ঔম, মাতৃপুরাণ, রুদ্রৈকাদশ, কৈলাস, শতরুদ্র, কোটিরুদ্র, সহস্রকোটিরুদ্র, বায়বীয় ও ধর্ম্মসংহিতা। পূর্ব্বাঞ্চলের পুস্তকে বিদ্যেশ্বর, কৈলাস, বায়বীয় ও ধর্ম্ম এই চারি সংহিতা ব্যতীত মূলোক্ত নামে পরিচিত কোন সংহিতা নাই। পরন্তু সনৎকুমার, জ্ঞান, সাধ্যসাধনাদি নামে অন্য সংহিতা এই পুরাণের অন্তর্গত দেখা যায়। বোম্বে মুদ্রিত পুস্তকে ঔম ও কোটিরুদ্র সংহিতাদ্বয়, জ্ঞান ও সনৎকুমার সংহিতারই সংস্করণ মাত্র বলিয়া বোধ হয়। বিদ্যেশ্বর-সংহিতার প্রারম্ভে ঋষিগণ বেদান্তসারসর্ব্বস্ব শুনিতে চাহিয়াছেন, উহা একমাত্র শিবপুরাণেই বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এই পুরাণে অধ্যাত্মসম্বন্ধে বহু উচ্চ কথা ও উপনিষদ্বাক্য কথিত হইয়াছে।

ঔম-সংহিতায় ৫১ অধ্যায়ে শৈব রথযাত্রা বর্ণিত আছে, এই পুরাণে শিবসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য প্রায় সকল কথাই আছে, মহিম্ন-স্তোত্রে যেমন শিবসম্বন্ধীয় প্রায় সকল ঘটনাবলীর ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত বর্ণিত আছে, সেইরূপ উক্ত পুরাণেও প্রায় সকল কথাই আছে। 'ত্রিস্থলীসেতু' নামক নিবন্ধগ্রন্থের বহু স্থানে সনৎকুমার-সংহিতার অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সনৎকুমার-সংহিতারও দুইটি ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, এক ভাগে কাশীমাহাত্ম্য, অপরাংশে [illegible] ত্ম্য আছে। কাশীখণ্ড ও শিবপুরাণে দণ্ডপা[illegible] আছে। শিবরাত্রির কথা ও শিব-বিবা[illegible] বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণে নকু[illegible] নর বর্ণিত মত দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পুরাণ হইতেই সম্ভবতঃ ঐ দর্শনের উপাদান গৃহীত হইয়া থাকিবে।

ভাগবত

ভাগবত পুরাণ গণনায় ৫ম স্থানীয়। নারদীয় পুরাণের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত নামে প্রচলিত বিষ্ণুভাগবতই মহাপুরাণের অন্তর্গত বুঝা যায়। উহা দ্বাদশ স্কন্ধে ও অষ্টাদশ শ্লোকসহস্রে গ্রথিত। বর্ণিত বিষয় সকল অন্যান্য পুরাণাপেক্ষায় কিছু নূতন। এই পুরাণখানি ভক্তিশাস্ত্র নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, ইহার রচনা-প্রণালী সকল পুরাণাপেক্ষায় বিলক্ষণ, বহু স্থানে মহাভারতের বর্ণনার সহিত ইহার বিরোধ আছে। ঐতিহাসিক ঘটনারও বহু বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, এমন সুন্দর উপক্রম-উপসংহারযুক্ত অন্য কোন পুরাণ দেখা যায় না। বিষ্ণু ও ব্রহ্মপুরাণ সূত্রস্থানীয়, এই পুরাণ উহাদের ভাষ্য বা বৃত্তিস্থানীয় বলা যায়। ঐ পুরাণদ্বয়ে কৃষ্ণচরিত্র যাহা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভাবে ঘটনাপরম্পরা ভাগবতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের সহিতও কৃষ্ণচরিত্রবিষয়ে মিল আছে। এই পুরাণ-বর্ণিত কোন কোন ঘটনা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ভিন্ন অন্য পুরাণে নাই। এই পুরাণখানি বৈষ্ণবগণের অত্যুপাদেয় গ্রন্থ। ইহার উপরে যত টীকা আছে, এত অধিক টীকা কোন পুরাণের ভাগ্যে ঘটে নাই। তবে অধিকাংশ টীকাই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর তাঁহারই প্রভাবে রচিত হইয়াছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন টীকাকার শ্রীধর স্বামী। ভাগবতের প্রমাণ স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দনের নিবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে, শ্রীধর স্বামীর সময়েও ভাগবত পদে কোন্ ভাগবত, ইহা লইয়া মতভেদ প্রচলিত ছিল। তিনি সেই সকল মতখণ্ডন করিয়া বিষ্ণুভাগবত বা শ্রীমদ্ভাগবতকেই ভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, দেবীভাগবতই ভাগবত, ইহা ব্যতীত শিবভাগবত ও মহাভাগবত নামে দুইখানি ভাগবতও আছে। শ্রীমদ্ভাগবতকে যাঁহারা মহাপুরাণান্তর্গত বলিতে চাহেন না, তাঁহারা সেই মতসমর্থনের জন্য নিম্নোক্ত কারণ সকল দেখাইয়া থাকেন।

১। অন্যান্য পুরাণের সহিত ও মহাভারতের সহিত ঐতিহাসিক বিরোধ।

২। সুপ্রসিদ্ধ ভারত-টীকাকার [illegible] রতকেই ভাগবত বলেন।

৩। ইহার ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা বির [illegible]

৪। মৎস্যপুরাণে ভাগবত পুস্তক [illegible] সেহ দানের বিধি থাকায় দেবীভাগবতই ভাগবত, যেহেতু, দেবীর বাহন সিংহ।

৫। ভাগবতে আছে, সর্ব্বপুরাণ নির্ম্মাণ করিয়াও অতৃপ্ত বেদব্যাস নারদোপদেশে ভাগবত নির্ম্মাণ করেন, অথচ ভাগবত সর্ব্বপুরাণমতেই ৫ম স্থানীয়।

৬। জনশ্রুতি আছে, মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেবই ভাগবতনির্ম্মাতা।

৭। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় দৈবপরীক্ষা দ্বারা একটি বালিকা ভূমিতে এই শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন যে,—

"পদে পদে কঠিনতা নৈষা রীতির্মহাত্মনঃ।
কান্যকুব্জপ্রদেশে তু কৃতো ব্যাসসমেন বৈ।"

৮। নীলকণ্ঠের বিচারেও দেবীভাগবতই ভাগবত প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৯। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কেহই ভাগবতের প্রমাণ ধরেন নাই, অথচ মধুসূদন সরস্বতী উহার প্রথমের ৩টি শ্লোকের ব্যাখ্যা ও ১০মের প্রথমে উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, সুতরাং শঙ্করের পরবর্ত্তী কালে ভাগবত নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই সকল মতবাদ খণ্ডিত হইতে পারে।

১। কল্পভেদে ঘটনার বৈচিত্র্য হয়, সুতরাং বিরোধ নাই। অথবা ভাগবতে ভক্তিপ্রদর্শনই মুখ্য উদ্দেশ্য, ইতিহাসাংশে তাৎপর্য্য নাই, আচার্য্য শঙ্করও উপনিষদের উপাখ্যান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেন নাই, আখ্যায়িকা প্রবৃত্ত্যর্থা এইরূপই লিখিয়াছেন।

২। ভারত-টীকাকার নীলকণ্ঠ ভাগবত-টীকাকার নহেন।

৩। দার্শনিক বিষয় ও অন্য বিষয়ভেদে ভাষার তারতম্য হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা ভিন্ন কর্ত্তা বলা যায় না। মহাভারতের সনৎসুজাতপর্ব্ব, অনুগীতাপর্ব্ব, ভৃগুভরদ্বাজসংবাদ প্রভৃতি ভারতের অন্য বিষয় হইতে বিলক্ষণ ভাষায় গ্রথিত।

৪। সিংহ দেবীর বাহন বলিয়াই দেবীভাগবত কেন হইবে? বিষ্ণুমূর্ত্তির নিকটও সিংহ রাখিবার কথা মৎস্যপুরাণে আছে। শ্রীধর স্বামী বলেন, স্বর্ণসিংহাসনযুক্ত ভাগবতপুরাণ দান করিবে।

৫। একই পুরাণকে বেদের ন্যায় বিভাগ করিয়া অষ্টাদশ সংখ্যা হইয়াছে। উহার একখানি রচিত হইবার পর অপরখানি রচিত হইবার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না, সুতরাং উহার অগ্র-পশ্চাৎ নির্ণয় করা সুকঠিন।

৬। বোপদেব দাক্ষিণাত্যে হেমাদ্রির রাজার পণ্ডিত ছিলেন। রাজা পরমবৈষ্ণব ছিলেন, তাই তাঁহার প্রার্থনায় নিত্যপাঠের সুবিধার জন্য বোপদেব ভাগবতের কতকগুলি শ্লোক একত্র

গ্রথিত করিয়া দিয়াছিলেন, এই জন্তই উঁহাকে অনেকে ভাগবত-কার বলে। উদয়ন ভাদুরি মিথিলা হইতে বঙ্গদেশে প্রথম কুসুমাঞ্জলি লইয়া যাওয়ায় তাঁহার বংশধরগণ উদয়কে ন্যায়-কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন।

৭। এই সন্দেহের মত ভাগবতের ২য় শ্লোকে লিখিত 'মহামুনিকৃতে' এই পদটিও সংশয়কারক। কারণ, ঐরূপ পদ অন্য পুরাণে নাই, পরন্তু 'অষ্টাদশপুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ' ইত্যাদি লিপি আছে।

৮। শ্রীধরের বিচারেও শ্রীমদ্ভাগবতই মহাপুরাণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

৯। শঙ্করাচার্য্য কোন পুরাণই উদ্ধৃত করেন নাই, অথচ তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বাণভট্ট হর্ষচরিতে বায়ুপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই উল্লেখ বা অনুল্লেখ দ্বারা পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত হয় না।

ভাগবত পদে শ্রীমদ্ভাগবত কি না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বিচার করিলে কতকগুলি সন্দেহের মূলোচ্ছেদ হয় না, বাদী নিরাশ হইতে পারে। ভাষাবৈষম্য, মহামুনিকৃতে বলা, মহাভারতের সহিত বিরোধ থাকা এবং বহু অপ্রচলিত শব্দ থাকা সন্দেহকে সর্ব্বদা জাগরূক রাখে। জনশ্রুতি আছে, ব্যাসতুল্যেন কেনচিৎ। বোধ হয়, মুগ্ধবোধের ভাষাগত কাঠিন্য ও উদাহরণাদিতে পরম বৈষ্ণব থাকায় বোপদেবকে লোক ভাগবতকার মনে করে।

বিদুরের ভারতযুদ্ধকালে দুর্য্যোধনবাক্যে গৃহত্যাগ-পথে উদ্ধবসহ সাক্ষাৎকার, যদুবংশধ্বংস শ্রবণ, মৈত্রেয়ের নিকট বহু কথা শ্রবণ, হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি, দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানে না যাইয়া গৃহেই হরিচিন্তায় দেহত্যাগ করেন, পরীক্ষিতের কৃতকর্ম্ম জন্য অনুতাপ, আত্মমৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া, শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে শুকদেবের নির্ব্বাণ-মুক্তির কথা বলিয়াছেন, উহার ৬০ বৎসর পরে শুকদেবের ১৬শ বর্ষ-বয়স্ক হইয়া পরীক্ষিৎকে ভাগবত শুনাইবার জন্য আগমন প্রভৃতি বহু বিষয়েই ঐতিহাসিক বিরোধ হয়। পক্ষান্তরে, ঐ সকল বিষয় দেবীভাগবতে সুসম্বদ্ধ ভাষাও অন্য পুরাণের ন্যায়, দেবীভাগবতে উহাকে দৌর্গপুরাণ বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা উহার ভাগবতত্ব খণ্ডিত হয় না। ভাগবত অন্য পুরাণের ন্যায় পঞ্চলক্ষণসম্পন্ন নহে, উহা দশলক্ষণ যুক্ত, ভাগবতে উরুগায়, উরুক্রম, অজিত, বিঘনস প্রভৃতি বহু শব্দ এমন আছে, যাহা অন্য পুরাণে ব্যবহৃত হয় নাই। এই পুরাণের স্তবের ভাষাও অদ্ভুত রকমের, ব্রহ্মস্তুতি, বেদস্তুতি প্রভৃতি দেখিলেই তাহা বেশ উপলব্ধি হয়।

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ প্রসিদ্ধ এবং উহার পঠন-পাঠনরীতি দেখা যায়, তাহাতে উহাকে মহাপুরাণ না বলিলে প্রত্যবায় হয় বলিতে হইবে।

দেবীভাগবত শ্রীমদ্ভাগবতের পরিবর্ত্তে মহাপুরাণ বলিয়া শাক্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিগৃহীত। ইহাও ভাগবতের ন্যায় দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক। এই পুস্তকে শক্তির প্রাধান্যদান ও বিষ্ণুকে অতিশয় খাটো করা হইয়াছে এবং পরীক্ষিৎকে অত্যন্ত হীন করা হইয়াছে। দুইখানি ভাগবত দেখিলে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষ এবং তাহাদের বাগ্‌যুদ্ধ, কে বড় কে ছোট, তাহার কারণ নির্দ্দেশ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভাব উপলব্ধি করা যায়। দেবীভাগবতেও পঞ্চলক্ষণানুরূপ বর্ণনা এবং ঐতিহাসিক ঘটনা মহাভারতের অনুসারে বর্ণিত হইয়াছে এবং অন্যান্য পুরাণ-বিরোধ কথাপ্রসঙ্গে পরিহার করা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের রাধাকৃষ্ণ-চরিত্রের সহিত দেবীভাগবতের রাধাকৃষ্ণ-চরিত্রের বেশ মিল আছে। এই পুরাণখানিতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, ইহার ভাষা অন্যান্য পুরাণের অনুরূপ, ইহাতে চণ্ডকৌশিক নাটকের বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতই আছে। বিষ্ণুকে এই পুরাণে সকল দেবতাপেক্ষায় প্রধান বলিলেও শিব-শক্তির অপেক্ষায় বহু নিম্নস্তরে এবং তাঁহাদের অধীন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দেবীভাগবতে গঙ্গা ও পদ্মাকে পৃথক্ নদী বলা হইয়াছে, মহাপীঠস্থানগুলিও এই পুরাণে বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। এই পুরাণের উপক্রম উপসংহার অতি সুন্দর-ভাবে নিবদ্ধ আছে। শিবভাগবত পুস্তক দেখিতে পাই নাই, সম্ভবতঃ নন্দীপুরাণই শিবভাগবত হইবে। উহার একটি অধ্যায়-সমাপ্তিতে শিবভাগবতে এইরূপ নির্দ্দেশ দেখিয়াছি। মহা-ভাগবত উপপুরাণমধ্যে গণ্য।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন (কাশীরাজ-সভাপণ্ডিত)।

আমার পূর্ব্বস্মৃতি

১০

ভণ্ডামীর প্রাদুর্ভাব

বর্ত্তমান যুগে আসল অপেক্ষা নকলের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। জিনিষ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্য্যন্ত এমনই মেকির প্রভাবপুষ্ট যে, খাঁটি জিনিষ বা মানুষের সন্ধান পাওয়াই কঠিন। আমার জীবনে অনেক মেকির সংস্রব ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

এক জন মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ আমার এক বন্ধুর মনিব। আমার বন্ধুটি ঐ মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণের আফিসেই কাম করিতেন। এক দিন তিনি ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে করিয়া আমার বাড়ীতে আসিলেন ও পরিচয় করাইয়া দিলেন। বলিলেন, "আপাততঃ আমি এঁর আফিসেই দালালি করিতেছি, ইনি অতি মহাশয় লোক, অতিশয় ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মপ্রাণযুক্ত। ইনি ধর্ম্ম-কর্ম্মেই জীবন যাপন করেন, পূজাপাঠ লইয়াই থাকেন, বৃথা সময় নষ্ট করেন না।"

লোকটি দেখিতে সুপুরুষ, মাড়োয়ারীর বেশ-ভূষা ছাড়িয়া এখন তিনি বাঙ্গালীর বেশভূষা গ্রহণ করিয়াছেন। এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির নাম রামলোগন। আজকালকার বৃথা নামের দিনে তিনি যথানামের লোক, অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যই শ্রীরামচন্দ্রে অর্পিত। আমি প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন মানুষের উপর অবিশ্বাস ঘনীভূত হয় নাই। কাযেই যখন আমার বন্ধু রমেশ রামলোগনের এ... দিলেন, তখন আমি এরূপ ধর্ম্মপ্রাণ ব্য... হইয়া সত্যই আপনাকে ধন্য মনে করিল...
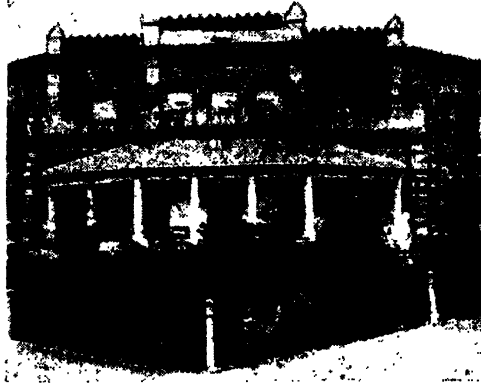
বন্ধুটি আমাকে জানাইয়া ... বাবু তিন চার দিনের জন্ত তোমার মধুপুরস্থ সাধুসঙ্ঘের বাটীতে যে অতিথি-আশ্রম আছে (Guest house), সেইখানে থাকিবেন।" আমি লোকটির পরিচয় পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

"সাধু-সঙ্ঘ"—মধুপুরের বাটী

সেই সময় কিসের একটা ছুটী ছিল, আমিও মধুপুর গিয়া উপস্থিত হইলাম। নব-পরিচিত মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির আদর-আপ্যায়নে আমি কোনও ত্রুটি ঘটিতে দিলাম না। ভদ্রলোকটি মলত্যাগের জন্য নদীর তীরে যাইতেন।

রামলোগন বাবু নদীর ধারে মলত্যাগ করিয়া সেইখানেই বালি খুঁড়িয়া জল বাহির করিয়া মুখ হাত ধুইতেন। বলিতেন, এই ফল্গু নদীর ন্যায় বালুকাময় নদীর অন্তরস্থিত জল অতি পবিত্র ও ব্যবহারের উপযুক্ত। এক দিন গিয়া দেখি, তিনি হাত দুটিতে বালুকা মাখাইয়া জল দ্বারা ধৌত করিতেছেন। এক হাত পুরু বালি, দুই হাতের নখের মুড়ি হইতে কনুই পর্য্যন্ত চাপাইয়া তার পর মুখ, হাত, পা ধুইয়া প্রায় এক মাইল শুধু পায়ে হাঁটিয়া তিনি সাধুসঙ্ঘে উপস্থিত হইতেন, এবং সেখানে আসিয়া একটা মাটীর তাল লইয়া নখের মুড়ি হইতে হাতের কনুই পর্য্যন্ত বেশ করিয়া মাখাইতেন। এই মাটীর ডেলাটি গঙ্গামৃত্তিকা। তিনি মধুপুর যাইবার সময় কলিকাতা হইতে উহা লইয়া গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার এই ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে ভাবিতাম, আমাদের এই সব আচারে বিশ্বাস না থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তির তাহা আছে, তাহাকে আমাদের অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে। আমি হয় ত মনে করি, হাতে গঙ্গামৃত্তিকা দিয়া আধ ঘণ্টা থাকিলে চিত্তটি পবিত্র ও শুচি হয় না, কিন্তু যাহার ও বিষয়ে বিশ্বাস আছে, তাহাকে অবিশ্বাস

করিবার অধিকার আমার নাই। কাযেই যে তিন চারি দিন তিনি আমার অতিথি ছিলেন, যত দূর সম্ভব আমি তাঁহার সেবা করিয়াছি এবং মনে মনে ভাবিয়াছি, এই ভদ্রলোকের চিত্ত খুব শুচি ও শুদ্ধ। তিনি আচার-ব্যবহারে নিজের চিত্তকে এমনই করিয়া লইয়াছেন, যাহাতে কোনরূপে তাঁহার চিত্ত অশুদ্ধ হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।

সাধুসঙ্ঘ স্থানটি অতি মনোরম। বাস্তবিক ইহার চতুষ্পার্শ্ব এরূপ ভাবে ফল ও পুষ্পে সজ্জিত যে, সেখানে স্বতঃই ভগবানের দিকে প্রাণ যায়। ভণ্ডামীর স্থান সেটা একবারেই নয়।

রামলোগন বাবু মধুপুর সাধুসঙ্ঘ হইতে কয়েক দিন পরে গেলেন। তত্রত্য সকলেই তাঁহাকে ধর্ম্মানুরাগী, সাধুপ্রকৃতি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। আমিও অনেক সময় তাঁহার কথা চিন্তা করিতাম। তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তি দর্শনে সত্যই অনেক সময় আমি মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিতাম। ভাবিতাম, অনেক সৌভাগ্যবলে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ঘটিয়াছে।

উক্ত ঘটনার ৮ বৎসর পরে এক দিন আমার ৯নং মদন চাটার্জ্জীর লেনস্থ কলিকাতার বাটীতে আফিস-ঘরে কায করিতেছি, এমন সময় রামলোগন বাবু সহসা আসিয়া উপস্থিত। বেশ-ভূষার পারিপাট্য সেইরূপই আছে, একটি চুল আর একটি চুলের উপর পড়ে নাই, পোষাক হইতে আতরের গন্ধ নির্গত হইতেছে। আফিস-ঘরে ঢুকিতেই আমি উঠিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিলাম এবং বসিতে বলিলাম।

দুই তিন মিনিট অন্যান্য কথার পর তিনি আমার হাতে একখানি সমন দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, রামলোগন বাবু ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আসামীস্বলাভিষিক্ত হইয়া সমন পাইয়াছেন। মেহেরুন্নিসা নামে একটি স্ত্রীলোক তাহার কন্যার খোরাকীর জন্য রামলোগন বাবুর নামে নালিশ করিয়াছে।

আমি সমন পড়িয়াই একবারে মর্ম্মাহত হইলাম। অনেক দিনের যে বিশ্বাসকে ভাল বলিয়া আঁকড়াইয়া আছি, সহসা যদি সেই বিশ্বাস এক আঘাতে চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাতে হৃদয়ে যে কি ব্যথা বাজে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। ক্রোধে আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল। ভাবিলাম, এই নীচ [illegible]কে এত দিন ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম। আর এই ব্যক্তিও হাতে মাটী মাখিয়া, কপালে সিঁদূরের টিপ লাগাইয়া, পরনে গেরুয়া ধরিয়া বেশ চালাইয়া আসিয়াছে এবং আমাকেও প্রতারণা করিয়াছে। যদি আত্মসংযম করিবার ক্ষমতা না থাকিত, তাহা হইলে হয় ত কিছু অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিতাম—হয় ত বা পায়ের চটিজুতার হাতও পড়িত।

সেই লোকটা ইহার জন্য কোনও গ্লানি অনুভব করিল না; বেশ সহজভাবে কথা কহিতে লাগিল। সে যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আদৌ বুঝা গেল না। অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণের পর কথাবার্ত্তার দ্বারা জানিলাম, কলিকাতার মুসলমান গুণ্ডাদের মাঝখানে এক মাঠকোঠায় ঐ মেহেরুন্নিসা বিবি বাস করিতেন। গত ১৫ বৎসর পূর্ব্বে লোকটি ঐ (হ্যারিসন ষ্ট্রীটে) কলাবাগান বস্তীর মাঠকোঠায় মেহেরুন্নিসার সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে খোরাকীর জন্য এই সমন। গত ১৫ বৎসর যেরূপভাবে কাটিয়াছিল, এখন আর সেরূপভাবে কাটিল না, কাযেই মামলা-মোকদ্দমা সুরু হইয়া গেল।

আর একটা ঘটনার কথা বলি। এক দিন আমার এক জন বন্ধু পার্শী ভদ্রলোকের বাটীতে নূতন খাতার উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে গিয়া অনেক বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা হইল। তাঁহাদের মধ্যে এক জন "আগরওয়ালা" ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহার নাম "রামনিরঞ্জন আগরওয়ালা।" তিনি যে বাটীতে বাস করিতেন, তাহার পাশেই এক বাঙ্গালীর বাড়ী। বাঙ্গালীরা মাছ খায়, এ সম্বন্ধে রামনিরঞ্জন বাবু দুএকবার কটাক্ষ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, তাঁহার দরোয়ান, চাকর ও অন্যান্য লোকের মাছের গন্ধে বিশেষ অসুবিধা হয়। আমি মনে করিতাম, রামনিরঞ্জন বাবু খাঁটি লোক। তিনি যে মাছের গন্ধের কথা বলিতেছেন, তাহাতে হয় ত তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইত।

যাহা হউক, [illegible] গল্পগুজব চলিতেছে, এমন সময় বান্ধব [illegible] যে, এক জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক [illegible]ক টেবলে খাইবেন, তাহাতে কোন [illegible]? আমরা সকলেই সমস্বরে বলিয়া [illegible]কার-পরিচ্ছন্ন পোষাকে ভূষিত

হয়, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। খানিকক্ষণ বাদ যখন খাওয়া প্রস্তুত, তখন দেখি, রামনিরঞ্জন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল, কোন প্রকার মাংসেই তাঁহার অরুচি নাই। বরং পক্ষিমাংসের প্রতি তাঁহার সমধিক স্পৃহাই প্রকাশ পাইল।

আমি জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছাত্র। সেই স্কুলেই ফিপ্থ ক্লাস হইতে আরম্ভ করিয়া ফিপ্থ ইয়ার পর্য্যন্ত পাঠ করি। যখন আমি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি, তখন "লিসার আওয়ার ক্লাব" নামে একটি ক্লাব ছিল, আমি তাহার সেক্রেটারী ছিলাম। এখন যেটি স্কটিশ চার্চ্চেশ কলেজ নামে অভিহিত আছে, ঐ স্থানটিতেই পূর্ব্বে জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউশন ছিল। জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউশন বিল্ডিংএতেই বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চেশ কলেজ প্রতিষ্ঠিত। ঐ কলেজটির দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে আমাদের বি-এ ইতিহাসের ক্লাশ ছিল—অনার্স ও পাশ উভয়ই। ঠিক তাহার উপরেই রেভারেণ্ড হ্যামিলটন বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল জর্জ্জিয়া (Georgia)। তাঁহার মৃত্যুর পর হ্যামিল্‌টন সাহেব একটি ক্লাব স্থাপন করেন। সেই ক্লাবের নাম ছিল "জর্জ্জিয়ান্ ক্লাব"। উহার অধিবেশন হইত হ্যামিলটন্ সাহেবের ঘরেই। আমাকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন। বিশেষতঃ আমি "লিসার আওয়ার ক্লাবের" সেক্রেটারী, সেই হিসাবে তিনি আমাকে বিশেষ খাতির করিতেন।

সেই সময়ে রমেন্দ্রসুন্দর সান্যাল আমাদের সমপাঠী ছিল। সর্ব্ববিষয়ে সে একটা নূতনত্বের পক্ষপাতী। কথিত আছে যে, যে বৎসরে সে বি, এ ফেল হইল, সেই বছরেই সে বি-এ অনার্সের নোট ছাপাইয়াছিল। বি, এ পড়িবার সময় প্রেসিডেন্সীতে পড়িত। বি, এ, অনার্স পড়িবার সময় মুটে করিয়া কলেজে বই লইয়া যাইত। সে যে শ্রীরামপুরের গোঁসাইদের আত্মীয়, এ গর্ব্ব সকল সময়েই তাহার ছিল। জর্জ্জিয়ান ক্লাবের বাৎসরিক অধিবেশনে সকলেই উপস্থিত। অধ্যাপক হ্যামিল্‌টন ছাত্রবৃন্দের ভোজনের ব্যবস্থা দেখিতেছিলেন। ভোজ[illegible] ভোজন মহে, সন্ধ্যার সময় সামান্য জল[illegible] । লম্বা দাড়ি-শোভিত, নিখুঁত ও পরিপা[illegible] . দুইটি [illegible] খাবার লইয়া ঘুরিতেছে, [illegible] খাইতে লাগিলাম। রমেন্দ্র আমার পাশেই বসিয়াছিল, সে সন্দেশ খাইল না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন হে রমেন্দ্র, খাইবে না?" সে জিব্ কাটিয়া বলিয়া উঠিল, "মা গো, দাড়ি!" আমি বুঝিলাম যে, সে লম্বা দাড়ি-শোভিত ব্যক্তির হস্তে খাইবে না। কিয়ৎকাল পরে যখন অধ্যাপক হ্যামিল্‌টন্ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলে খাইতেছে?" আমি বলিলাম, "রমেন্দ্র খাইতেছে না। কারণ, মুসলমানের হস্তে সে খাইবে না। তবে আপনি প্রফেসার, আপনি হাতে দিলে সে খাইতে পারে।" মুসলমান পরিবেষকদিগের দাড়ির অপেক্ষা অধ্যাপকের শ্মশ্রু ৪ ইঞ্চি লম্বা। তিনি সন্দেশের থালা হাতে লইয়া সন্দেশ তুলিয়া তাহার হাতে দিলেন। আমি রমেন্দ্রের কাণে কাণে বলিলাম, "প্রফেসার সন্দেশ দিতেছেন, অমান্য করিও না, গুরুর দান গ্রহণ কর।" সে একটির পর আর একটি করিয়া দুইটিই গলাধঃকরণ করিল। আমি সাহেবকে বলিলাম, "Now it is all right" (নাউ ইট্ ইস অল্ রাইট।) প্রফেসার চলিয়া গেলেন। আমি রমেন্দ্রকে বলিলাম, "ব্রাহ্মণের ছেলে ত্রুগণ্ডুষ জল খাও, আর পার ত পূর্ব্বপুরুষদেরও দাও; কেমন, হ্যামিল্‌টন সাহেবের দাড়ি মুসলমানের দাড়ির অপেক্ষা কিছু লম্বা আছে ত?" যাহারা উপস্থিত ছিল, সকলেই হাসিয়া উঠিল। এইখানে এই পর্ব্বের সমাধান হইল।

আর এক শ্রেণীর ভণ্ডের সম্বন্ধে ৪ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ভাবিয়াছিলাম, তাহাও এই সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম।

ভৈরবচাঁদ কলিকাতা ত্যাগ করিবার কয়েক দিন পরেই রাজীবলোচন ভৈরবচাঁদের কলিকাতা-ত্যাগ ও হরেকচাঁদের শোধরাইবার চেষ্টার কথা শুনিয়া ভাবিল, এই উপযুক্ত সময়; হয় ত একটু চেষ্টা করিলে এই পরিবারটিকে রক্ষা করিতে পারা যায়। যদি কোন রকমে হরেকচাঁদকে তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সাঙ্গোপাঙ্গের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। আমার উপর ভগবানের অগাধ দয়া, তিনি আমাকে নানা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমার মতি-গতির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিব। ভগবানের দয়া হইলেই অবশ্য কৃতকার্য্য হইব।

রাজীবলোচন এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার

পূর্ব্বপরিচিত রামময় আর গেরুয়া-পরা অপর এক জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। রামময় আসিয়া বলিল, "নমস্কার রাজীবদাদা, কেমন আছ? অনেক দিন তোমার সহিত দেখা হয় নাই, আজ একবার দেখা কর্‌তে এলাম। আমার এই বন্ধুটি সঙ্গে আসিয়াছেন, ইঁহার পূর্ব্বনাম ছিল কৃষ্ণকিশোর, এখনকার নাম অলসানন্দ। ইনি মহা সাধুপুরুষ, শ্রমক্লিষ্টদেবের শিষ্য।"

শ্রমক্লিষ্টবাবা সংসারে অনেক ঠেকিয়াছেন, দেখিয়াছেন ও শিখিয়াছেন; নিজের ও অপরের সুখের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ইনি যোগী পুরুষ, অনেক সময় যোগে অতিবাহিত করিয়াছেন, পরিশ্রমে ও কষ্টে তাঁহার সমস্ত মাংসপেশী শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যখন সংসারে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিয়াও নিজের ও অপরের সুখসম্পদ আয়ত্ত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ধ্যানে দেখিলেন, এ সংসারে এরূপ ভাবে বৃথা পরিশ্রম করিয়া জীবনপাত করা অজ্ঞতা ও মূর্খতার চিহ্ন। সেই জন্য তিনি স্থির করিয়াছেন, ভগবানের আরাধনাই মানুষের একমাত্র উন্নতির উপায়; তজ্জন্য তিনি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবদারাধনায় নিজের জীবন অর্পণ করিয়াছেন। এইরূপ করিয়া দুই বৎসর ধরিয়া কর্ম্মত্যাগের পর তিনি শান্তি লাভ করিয়াছেন। আর যে অমৃতময় সত্যটি তিনি পাইয়াছেন, তাহা একা ভোগ করা স্বার্থপরতা হইবে; সেই জন্য তাঁহার নিজ আবিষ্কৃত সুখের সন্ধানটি সকলকেই সমানভাবে বাঁটোয়ারা করিয়া দিতে চান। ঠিক চার্ব্বাকমুনির মতের মত তাঁহার মত নহে। তবে কতকটা সেইরূপ। তাঁহার ভগবানে অগাধ বিশ্বাস, তিনি বলেন, "ভগবানের আরাধনা কর, অন্য কোন আরাধনা করিবার প্রয়োজন নাই।" এই পথে আসিয়া তাঁহার নাম বাবা শ্রমক্লিষ্ট। তিনি বলেন, যেমন ক'রে পার, ভাল খাও, ভাল স্থানে বাস কর, ঈশ্বরদত্ত শরীরকে কোন কষ্ট দিও না, প্রত্যহ খানিকক্ষণ করিয়া ভগবানের নাম কর, সংসারে সুখে থাকিবে আর অবশেষে মুক্তিও পাইবে। ইনি সেই বাবা শ্রমক্লিষ্টের প্রধান শিষ্য, ভ্রাতা অলসানন্দ।

রাজীবলোচন পরিচয় পাইয়া বলিল, "আমার আজ সুপ্রভাত, অলসানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল, দয়া ক'রে এ গরীবের গৃহে পদধূলি দেওয়াতে আপ্যায়িত হইলাম।"

রামময় বলিল, "দেখ, তুমি জানো, ছেলেবেলা থেকেই আমার ধর্ম্মের দিকে একটু টান আছে, চিরকালই সাধু, সন্ন্যাসী, ফকীর, পরমহংসের খবর নিয়ে থাকি। তাঁহাদের সংসর্গে আমার বিপুল আনন্দ, তাঁহাদের সঙ্গে প্রাণ ভ'রে ষরিতানন্দ উপভোগ ক'রে থাকি।"

অলসানন্দ বলিল, "তা রাম বাবু, তুমি যদি আমাদের দলে বেশী দিন থাকো, হয় ত গুরুজী সন্তুষ্ট হয়ে তোমার নাম বিপুলানন্দ দিবেন, তোমার বুদ্ধি আছে, সদিচ্ছা আছে; পরের উপকার করিবার স্পৃহাও আছে।"

রামময় বলিল, "ভ্রাতা অলসানন্দ হচ্ছেন আমার একমাত্র ভরসা, ধর্ম্মের সোপান। তবে আজকালকার লোকগুলো ধর্ম্মের মান জানে না, খালি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে চীৎকার করে। ছেলেবেলা থেকেই পরের উপকারে আমার অগাধ স্পৃহা, সুবিধা পাইলেই তাহা করিয়া থাকি। ছেলেবেলায় পাড়ার বারোয়ারীতলায় কালীপূজার সময় আমি কাঙ্গালীভোজনে পরিবেষণ করিয়াছি, একটু বড় হ'লে স্কুলে স্পোর্টিং ক্লাব এবং বার্ষিক উৎসবের দিনে খাবার-ঘরের জিম্মায় থাকিতাম, তার চেয়ে একটু বড় হ'লে পাড়ার হরিসভায় সিন্নি বিলাইতাম, আর কোথাও হরিসভা হ'লে মালসা-ভোগের প্রসাদ পাইতাম, আমাকে অনেকে তখন থেকে ভোজনানন্দ বলিয়া ডাকিত। দুই এক জন গুণগ্রাহী লোক আমাকে চিনিয়াছিল; কিন্তু বেশীর ভাগ লোক আমাকে চিনিতে পারিল না, এত দিন গুরু খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু মনের মত সাধুপুরুষের দর্শন পাই নাই। শেষে ভ্রাতা অলসানন্দের সহিত আলাপ, আর তাঁহার চেষ্টায় বাবা শ্রমক্লিষ্টের দর্শনলাভ। বাবা শ্রমক্লিষ্ট যথেষ্ট দয়া করেন, তাঁহার সম্প্রদায়ে ঢুকিতে হইলে অন্ততঃ ২৫টি লোককে তাঁহার সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে যেতে হবে, অন্ততঃ ২৫টি লোকের কাছে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে হইবে; তাঁহার প্রেমে সেই ২৫টি লোককে মজাইতে হইবে। আমি তোমাকে এক জন মেধাবী পুরুষ বলিয়া জানি, আর যাহা কিছু ভাল, তৎপ্রতি তোমার অনুরাগ আছে। তুমি ভাই, বাবা শ্রমক্লিষ্টের সম্প্রদায়ের আয়তন-বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি লোককে বাবার [illegible] তাঁর ভক্ত কর; ইহাতে আমাদের ও [illegible] ও পারত্রিক দুই জীবনেরই উন্নতি [illegible] তোমাকে দয়া করিবেন, তখন তোমা[illegible] [illegible]ধি থাকিবে না।"

রাজীবলোচন বলিল, "তা ত বুঝলাম, তবে আমার উপর এত সুনজর কেন?"

রামময় বলিল, "বুঝলে না, এ সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য সুখ-বিস্তার, সম্প্রদায়ের নাম ও সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের অল্প আয়াসে সুখ-বৃদ্ধি, তাহাতে অর্থের প্রয়োজন। গোড়ায় অর্থ বিনা কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় না,—তোমার অনেক বড় বড় যায়গা জানাশুনা আছে, কতকগুলি বড় বড় শিষ্য ক'রে দাও।"

অলসানন্দ বলিল, "কি জানেন? আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের ভাল খেতে ভাল পরতে হবে, ভাল থাক্‌তে হবে। এ সব করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন, অথচ গুরুদেব চান না যে, আমাদের সম্প্রদায়ের লোক বেশী ক'রে পরিশ্রম করবে; সেই জন্য তিনি চান, তাঁহার দলে কতকগুলি ধনী শিষ্য যোগদান করেন। তাহাদের নিজের সুখের জন্য যাহা প্রয়োজন, তদপেক্ষা তাহাদের অধিক সম্পত্তি আছে। আর বাবার অনেক শিষ্য আছেন, যাহাদের অধিক সুবিধা কিছুই নাই। সেই জন্য কতকগুলি বিশেষ ধনী শিষ্য হ'লে, তাঁহার সকল শিষ্য একত্র হয়ে সুখে ও আরামে একভাবে ঈশ্বর আরাধনা করতে পারবেন; তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ। বাবা, তুমি ধন্য।" এই বলিয়া উদ্দেশে সে যোড় বাহু তুলিয়া দণ্ডবৎ করিল।

রাজীবলোচন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের সম্প্রদায়ের মঠ কোথায়?"

অলসানন্দ বলিল, "আজ্ঞে, আপাততঃ আমাদের সম্প্রদায়ের আদি ও অকৃত্রিম মঠ হচ্ছে নবদ্বীপে। প্রত্যহ সেখানে রাশি রাশি চিনি প্রস্তুত হচ্ছে তারই মধ্যে। তিনি বলেন, চিনিও মিষ্ট, আমাদের ধর্ম্মটিও মিষ্ট। দুটি পাশাপাশি এক ডালে যোড়া ফুলের ন্যায় প্রস্ফুটিত, কিন্তু সেখানে লোক কোথা? যারা আছে, তারা ত মজুর-শ্রেণী। তাদের নিয়ে আমাদের সম্প্রদায় চলতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদের বাবার উদ্দেশ্য—যারা ধনমদে মত্ত, তাদেরি উদ্ধার করতে হবে। তাঁদের অর্থ আছে সত্য, তাঁরা যদি বাবার শিষ্য হন, তখন তাঁরা বুঝতে পারবেন, অর্থের সদ্ব্যবহার কি। তাই বাবা চান, তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদা[illegible] ব্যয়িত হউক। তাঁদের অর্থের সদ্ব্যব[illegible] আমাদের সম্প্রদায়ও সংবর্দ্ধিত হবে। [illegible] জন কর্ত্তার প্রয়োজন, সে কেবল প্রথ[illegible] প্রথম খানিকটা চালিয়ে দিলে, এ সম্প্রদায় আপনি চ'লে যাবে। আর আজকালকার জনসমাজে লোকের যেরূপ মতিগতি, অল্পায়াসে বিপুল আনন্দ, সেটা তুমি কেবল আমাদের সম্প্রদায়েই পাবে। আমাদের গুরুদেব যা প্রচার করেছেন, আজকালকার লোক তাই চায়। ইহা সময়োপযোগী ধর্ম্ম, তবে লোকদের ভাল ক'রে জানান চাই, ভাল ক'রে বুঝান চাই। তা হ'লে আর কিছুরই অভাব থাকবে না। অর্থাৎ কি জান? প্রচার চাই, প্রচার চাই, আজকালকার দিনে প্রচার ভিন্ন কিছুই চলে না।"

রামময় বলিল, "রাজীবদাদা, গুরুদেব দয়া ক'রে এখন কলকাতায় বাস কচ্ছেন; তাঁর ইচ্ছাক্রমে প্রধান মঠ কলকাতা সহরেই স্থাপন করা। এখানে অনেক লোকের বাস, তিনি অনেক লোকের উপকার করতে পারবেন। তুমি আমাদের বাবাকে দেখে থাকবে, খুব প্রাতঃকালে কি কখন ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়াছ? যদি গিয়ে থাকো, তা হ'লে দেখে থাকবে, তিনি অতি প্রত্যুষে বাবুর ঘাটে গঙ্গাস্নান করেন, তাল বেনারসী ধুতি পরেন, হাতে রূপাবাঁধানো ছড়ি, হাণ্ডলটি সোনা দিয়ে বাঁধানো। মুসলমান ফকীরদের বাঁকানো লাঠি দেখেছ? ঠিক সেই রকমটি। তাঁর মাথায় জটা দোদুল্যমান; তবে সেগুলি তৈলাভাবে রুক্ষ নয়। বরং তৈল ও পমেটমের আধিক্যে পিচ্ছিল ও মসৃণ। তা থেকে সুগন্ধ বেরুচ্ছে। পায়ে হরিণচর্ম্মের পাদুকা, গায়ে বেনারসী উত্তরীয়, হাতে স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত কমণ্ডলু, মুখে গোল্ডেন ইজিপ্সিয়ান সিগারেট। কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল আর এক সোনার থালায় গঙ্গামৃত্তিকা। বাবা সিগারেট টানতে টানতে শিষ্যসহ একখানি ফেটিং গাড়ীতে প্রত্যহ পশ্চিম হ'তে পূর্ব্বদিকে যান। ভারতবর্ষে সম্প্রদায় আছে সত্য, কিন্তু আমি জোর গলায় বলতে পারি, এ রকম সম্প্রদায় আর নাই। রৌপ্যনির্ম্মিত বাক্সে সিগারেট ভরিয়া লইয়া এক জন শিষ্য সদাই তাঁহার পার্শ্বচর। প্রাতে শিষ্যবাড়ী এসেই চা-পান। সেটি দার্জ্জিলিং 'রোজ টি', কোন দিন বা কোকো, তার সঙ্গে কেক্, বিস্কুট, রুটী, মাখন, ভাল সন্দেশ, আর ১১টার মধ্যে অন্ন চাই; ৪টার সময় নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ও উপাদেয় মিষ্টান্ন; রাত্রি ৮টার সময় ভোগ। সে ভোগে কেবল চিনি বা বাতাসা নেই—রাবড়ি, ছানার পায়েস, জনায়ের মনোহরা, বাগবাজারের স্পঞ্জ রসগোল্লা, কৃষ্ণনগরের সরভাজা ইত্যাদি

ইত্যাদি। তিনি বলেন, ভোজন, ৬টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত, এই যথেষ্ট। তিনি বলেন, ঈশ্বরের ভজনা করতে হ'লে ঈশ্বরের দেওয়া শরীরকে যতদূর সম্ভব সুখ-শান্তিতে রাখতে হবে।' ভোজন ভাল না হ'লে ভজন ভাল জমে না। রাজীবদা, তুমি এক দিন চল, আমাদের গুরুদেবকে দর্শন ক'রে আত্মার উন্নতি করবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রসাদ পেয়ে জীবন সার্থক হবে, রসনার তৃপ্তি হবে।"

রাজীবলোচন বলিল, "আচ্ছা, আজ নয়, আজ আমার একটু কায আছে, তুমি দিন কয়েক বাদে এস। আচ্ছা, তোমাদের মঠ কোথা?"

অলসানন্দ বলিল, "গুরুদেব যখন যে শিষ্যবাড়ী অধিষ্ঠান করেন, আমরা তাকেই মঠ বলি।"

রামময় বলিল, "ভ্রাতঃ অলসানন্দ, তুমি তবে যাও, আমি খানিকক্ষণ বাদে মঠে যাব। অনেক দিন বাদে রাজীবদার সঙ্গে দেখা, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে ও দিকে যাবো। গুরু সত্য, গুরু সত্য, গুরু সত্য।"

অলসানন্দ চলিয়া গেলে রামময় বসিয়া রহিল।

রাজীবলোচন বলিল, "রামময়, এ আবার তোমার কি বুজরুকি, তুমি আবার এ সম্প্রদায়ে জুটলে কোথা থেকে?"

রামময় হাসিয়া বলিল, "রাজীবদাদা, মুখ বদলাচ্ছি, মুখ বদলাতে যাচ্ছি, না হ'লে চিরকাল কি পান্তা খাবো? পোলাও, কালিয়া কি খেতে ইচ্ছে হয় না?"

রাজীবলোচন বলিল, "কে বল্লে নয়, দেখ, রামময়, বলতে কি, তোমার কথা আমি সকালে মনে করেছিলাম। এত দিন অনেক সুকর্ম্ম ক'রে এসেছ, আজ না হয় একটু কুকর্ম্মই করলে; একটা নিরীহ লোক আমাদের সৎসঙ্গের গুণে সটান জাহান্নমের মুখে চলেছিল। পাহাড়ের উপর থেকে পদস্খলন ক'রে, গড় গড় ক'রে নেমে যাচ্ছিল, মাঝে এক যায়গায় একটু আটকেছে, বাঁচবার জন্য চেষ্টা করছে, আর অধিক অধঃপতন না হয়, আমি তাকে দাঁড় করাবার জন্য একটু চেষ্টা করব; তোমার মত একটা জহুরীর সাহায্য চাই; তুমি ত এখন প্রবঞ্চিতদের দলে মিশেছ, তোমাদের দলের নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রে, না হয় একটু কষ্টই করলে?"

রামময় বলিল, "রাজীবদাদার চিরকালটা একরকমেই গেল। বেশ স্ফূর্ত্তিতে কাটালে; বাবার এতটা পয়সা খোয়ালে, এখনও বেশ আনন্দে আছ।" রাজীব বলিল, "রামময়, চিরকাল নিজের সুখের জন্য ঘুরেছি, সেই সুখ পাবার জন্য যথাসাধ্য কষ্ট করেছি, যথেষ্ট অর্থব্যয় ক'রে মনে করলাম, এইবার সুখ পেলাম, সুখের কাছে এগিয়ে এলুম। যেমন তাকে ছুঁই ছুঁই, অমনি সে পেছিয়ে গেল, সুখকে আর ধরতে পারলাম না। এই রকম ক'রে প্রায় অর্দ্ধেক জীবনটা কেটে গেল, বাকি অর্দ্ধেকটা, এখন অন্য রকম ক'রে দেখি, নিজের সুখের আশা ছেড়ে এখন পরকে যাতে সুখী করতে পারি, সেই দিকে মন দিয়েছি, কিছু করতে পারিনি, কেবল একটু চেষ্টা করছি।"

রামময় বলিল, "রাজীবদা, আমি এত হেঁয়ালি-কেঁয়ালি বুঝি না, তবে চিরকালটা তোমার প্রাণটা সাদা, ছক্কা-পাঞ্জার ধার ধার না, তুমি যা বলবে, তা করতে রাজি আছি; তুমি আমাকে ফাঁসিয়ে নিজের স্বার্থ কখনই চাইবে না। রাজীবদা, আজকালকার দিনে বাবা, আনন্দ, পরমহংস, মহারাজ দলের ত অভাব নেই; অলিতে-গলিতে অবতার, আনন্দ, পরমহংস, আর বাবার অভ্যুদয়। তুমি একটা এই রকম সম্প্রদায়ের চাঁই হয়ে পড় না কেন? তোমার নেতৃত্বে হয় ত দশটা লোকের ভাল হ'তে পারে। আজকাল যে সব দেখছ—উপগুরু ও উপ-অবতারের ছড়াছড়ি, তারাই দেশটাকে খেলে। সবাই ঘটাচোরের দল, সবাই পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে কোয়া খেতে চায়।"

রাজীব বলিল, "দেখ, আমি এখন বটতলা ষ্ট্রীটে হরেকচাঁদের বাড়ীতে যাচ্ছি, তুমি ত হরেকচাঁদকে চেন?"

রামময় বলিল, "তাকে আর চিনিনে? হরেকচাঁদ জহুরীর ছেলে ত?"

রাজীব বলিল, "হাঁ, হাঁ, খুবলাল বেটাই তার মাথাটা খেলে, এখন সে পালাবার চেষ্টা করেছে; খুবলাল, পাঁচী আর তার আত্মীয়রা তাকে জোঁকের মত ধ'রে ব'সে আছে। এস দিকি ভাই, যদি তাকে ছিনিয়ে আনতে পারি। তোমার কষ্টটা বৃথা যাবে না। হরেকচাঁদ পয়সাওয়ালা বাপের বেটা। আমি তোমার একটা গতি ক'রে দেব; তবে পয়সাটা খরচ করবে, আমার বীজমন্ত্র অনুযায়ী, অর্থাৎ অপরের সুখের জন্য। [illegible]থা, চল একবার আমার সঙ্গে।"

এই [illegible] হরেকচাঁদের বাটীর উদ্দেশে বাহির হইল।

[ক্রমশঃ।

[illegible]তারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

ভ্রান্তি

১

বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশে চতুর্দ্দশীর চন্দ্রকরলেখা যে মায়াজাল রচনা করিয়াছে, সুদূর সাগরপারে তাহার বিচিত্র মাধুর্য্য এমনই ভাবে আকাশে কি আত্মপ্রকাশ করে না?

ত্রিতল অট্টালিকার সুসজ্জিত একটি কক্ষের মধ্যে বাতায়ন-সন্নিধানে বসিয়া তরুণী কমলা কি একাগ্রমনে উহাই চিন্তা করিতেছিল? শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নালোকিত মধুময়ী রজনীর বিচিত্র শোভা, পুষ্পগন্ধব্যাকুল বাতাসের স্নিগ্ধ শিহরণ কি তাহার অশান্ত চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই?

তরুণীর আননে যে রেখা [illegible] যৌবনের দীপ্তিকে ম্লান করিয়া জ্যোৎস্নালোকে [illegible] উঠিয়াছিল, হৃদয়ের বেদনার কি তাহাই অভিব্যক্তি?

সুদীর্ঘ ৩ বৎসরের পূর্ব্বের স্মৃতি কি আজ তরুণী কমলার চিন্তার ধারায় অশ্রু-সিক্ত বিষণ্ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে? বিবাহ-রজনীর আলোক-উজ্জ্বল, উৎসব-মুখর আনন্দ-কলরবের সঙ্গে সঙ্গে যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল, কিছু দিন তাহার পুষ্পাবৃত পথে তাহারা রহস্যময় জগতের নব নব রসের সন্ধান পায় নাই কি? তার পর যে দিন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ তাহার স্বামী নরেন্দ্রনাথ অধিকতর জ্ঞানলাভের বাসনায় বিলাত-যাত্রার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন আসন্ন বিরহের ব্যথায় বিষণ্ণ শঙ্কা-ব্যাকুলা কমলা গভীর আবেগে স্বামীর বিশাল হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে দিনের অশ্রু-বন্যা স্বামীর নয়নকেও আর্দ্র করিয়া দিয়াছিল, আজ সে দিনের সেই করুণ চিত্র দ্বিগুণ উজ্জ্বলভাবে কমলার উদাস দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

অজস্র আদরে স্বামী বুঝাইয়াছিলেন, ৩ বৎসর ৩ দিনের মত চলিয়া যাইবে। অবশ্য দৈহিক বিচ্ছেদ তাঁহাকেও যন্ত্রণা দিবে সত্য, কিন্তু কমলার স্মৃ[illegible] দিবে, পথ দেখাইবে, তাহারই কথা স্ম[illegible] [illegible]ত্রার পথে উৎসাহ পাইবেন, প্রেরণা [illegible] [illegible]লার প্রতি স্বতঃ উৎসারিত অনুরক্ত [illegible] [illegible]ত্যার সমস্ত বিপদ ও প্রলোভনের মধ্যে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অশ্রুধারার মধ্যে তাহাদের যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, আজও মিলনের বাঁশীর রব সে দুঃখকে দূরীভূত করিবার সুযোগ প্রদান করে নাই।

প্রতি মেলে নরেন্দ্রের দীর্ঘ পত্র কমলা পাইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক পত্রের প্রতি ছত্রে কি গভীর একনিষ্ঠ প্রেম ও বিশ্বাসের অভিব্যক্তি! দীর্ঘ বৎসরের ব্যবধান সেই প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের আবেগ চঞ্চলতাকে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই।

কিন্তু আজ কয়েক মাস নরেন্দ্রের কোনও সংবাদই আসিতেছে না কেন? অকস্মাৎ এই নীরবতার কারণ কি? শ্বশুর মহাশয় ব্যস্ত হইয়া পত্র এবং অবশেষে তার পর্য্যন্ত প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু নরেন্দ্রকুমার তথাপি নীরব কেন? পরম্পরায় এইটুকু সংবাদ জানা গিয়াছিল, নরেন্দ্রকুমারের শারীরিক কোন অকল্যাণ ঘটে নাই। অবশ্য প্রামাণ্য সংবাদ কেহ দিতে পারে নাই, তথাপি এটুকু জানা গিয়াছিল, নরেন্দ্র বাঁচিয়া আছে।

আত্মীয়-স্বজন স্বামীর সম্বন্ধে কমলার অলক্ষ্যে কি যেন কাণাকাণি করে, তাহাকে দেখিলে আলোচনা থামাইয়া দেয়, এই প্রকার ব্যবহার সে কিছু দিন হইতে দেখিয়া আসিতেছে।

জ্যোৎস্না-বিলসিত শারদ সন্ধ্যায় এই সকল অবাঞ্ছনীয় চিন্তায় কমলার চিত্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। অবসাদ যেন তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল।

"মা!"

শ্বশুরের আহ্বানে চমকিত হইয়া কমলা মুখ ফিরাইল। বৃদ্ধ জমীদার রাধাকিশোর বাবু পুত্রবধূ কমলাকে কাছে টানিয়া সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, "কি রে পাগ্‌লী, আজ আমায় খেতে দিবি নে?"

কমলা লজ্জিতমুখে কহিল, "চলুন বাবা, দেরী হয়ে গেছে। আমার একটুও খেয়াল ছিল না। দেখুন বাবা, চাঁদের আলোতে বাগানটাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে।"

চাঁদের আলোতে বাগানের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিই যেন তাহার অন্তমনস্কতার একমাত্র হেতু, ইহাই যেন সে শশুরকে বুঝাইতে চাহিল। বুদ্ধিমান্ জমীদার কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন। মুহূর্তমাত্র পুত্রবধূর আননে উজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তিনি কি ভাবিলেন। তার পর রাধাকিশোর বাবু কহিলেন, "হ্যাঁ, আজকের সন্ধ্যাটা চমৎকার বটে, কিন্তু চল মা, রাত হয়ে গেল।"

পাশাপাশি দুইখানি আসন পাতা দেখিয়া কমলা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "এ কি বাবা, আজ অতিথি কেউ আছেন না কি?"

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তা হ'লে কি আর অন্নপূর্ণা মা আমার জানতে পারতেন না? তা নয় মা, এখন থেকে রাত্রিতে তোকে আমার সঙ্গে ব'সে খেতে হবে। না, না, সে হবে না, আমি কোন আপত্তিই শুনবো না। সদু ঝি বলছিল, তুমি না কি আজকাল রাত্রির আহার একেবারে ছেড়ে দিয়েছ?"

শশুরের তীক্ষ্ণ স্নেহপ্রবণ দৃষ্টিতে যে কিছুই এড়ায় না, তাহা কমলা বুঝিল। বুঝিয়া তাহার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সদুর এই অযাচিত সহৃদয়তায় কমলা মনে মনে বিরক্ত হইল। কে তাহাকে অনধিকারচর্চ্চা করিতে বলিয়াছিল? কিন্তু প্রকাশ্যে সে অস্বীকার করিতে পারিল না, নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাধাকিশোর বাবু বিষাদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বুড়ো-বয়সে ছেলেকে কষ্ট দেবে, এইটিই তোমার মনোগত ইচ্ছা কি, মা?"

কমলা তথাপি নিরুত্তর রহিল।

২

ঘন-পল্লবাচ্ছাদিত নব-মুকুলিত আম্রবৃক্ষের স্নিগ্ধ মনোরম ছায়ায় কমলা একখানি বই হাতে লইয়া স্থাণুর মত বসিয়াছিল। বৃক্ষপত্রের উদাস মর্ম্মরধ্বনি তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে কি একই সুর ধ্বনিয়া তুলিতেছিল?

"ও মা, তুই এখানে কমল? আর তোকে আমি সেই থেকে খুঁজে মরছি।" বলিতে বলিতে কমলার সখী রমা আসিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিল।

কমলা হাসিবার চেষ্টা করিয়া, কণ্ঠে জোর দিয়া কহিল, "তুই কখন্ এসেছিস্, রমা?"

সে প্রচেষ্টা রমার দৃষ্টি এড়াইল না। সে ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, "তবু ভাল, জিজ্ঞেস করার ফুরসুৎ হলো।"

কমলা মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেন, তোকে কি আমি কিছুই বলিনে?"

"কিছুই বলবিনে কেন? কিন্তু তুই যেন অন্য রকম হয়ে গেছিস্, ভাই! মুখে হাসি নেই, কথা নেই। কেন তোর এমন হলো, কমল?"

"হবে আবার কি?"

রমা সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত সখীর বিষণ্ন মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। জনশ্রুতি তাহার রণুদার সম্বন্ধে যে সকল অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে, তাহার তিক্ততায় সে নিজেই অধীর হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শৈশব-সহচরী সহোদরা-তুল্য, পরম স্নেহাস্পদা কমলাকে সে কথা শুনাইয়া তাহার বেদনাতুর হৃদয়কে ব্যথিত করিতে সে চাহে না। সে শুনিয়াছিল, সাগরপারে সর্ব্বদা যে প্রলোভনের ফাঁদ অপরিণতবুদ্ধি তরুণদিগকে আকৃষ্ট করে, তাহার মায়াজালে বহু দৃঢ়চেতা পুরুষ আত্মসমর্পণ করিয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। তাহার রণুদার পক্ষেও যে পদস্খলন অসম্ভব, তাহা মনে করিতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। মৃদু নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রমা অবশেষে কহিল, "তুই মন খারাপ করিস নে, বোন্। পুরুষের চঞ্চল মন—"

"রমা!"—কমলার ব্যথিত ভৎর্সনাপূর্ণ স্বরে রমা চমকিত হইল। কমলা দৃঢ়স্বরে কহিল, "তোমাদের যা বিশ্বাস, তা আশ্রয় কোরে তোমরা থাক, আমি তার প্রতিবাদ করতে চাই নে; কিন্তু আমার মনে সন্দেহ জাগাবার চেষ্টা কোরো না।"

রমা ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, "আমাকে তুই ভুল বুঝেছিস, কমল! স্ত্রীর মনে স্বামীর বিরুদ্ধে সন্দেহ জাগিয়ে তুলব, এত নীচ আমি নই। আমি শুধু তোকে বলতে চেয়েছিলুম, যদি বা পুরুষের চঞ্চল মন. ভুল-ভ্রান্তি ক'রে ফেলে, তা মনে ক'রে অধীর

...লিয়া উঠিল, "আমি তাঁকে জানি,

আমি ...তে পারছি; কোন অসঙ্গত কায

কখন ... যাবার সময় তিনি ব'লে গেছেন,

'যে যাই বলুক কমল, তুমি যেন আমায় ভুল বুঝো না।' সে বিশ্বাস যেন আমার অটল থাকে।"

বলিতে বলিতে কমলার আয়ত নয়নযুগল শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আবেগের আতিশয্যে ছল্-ছল্ করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরে বন্যার ধারার ন্যায় নিরুদ্ধ অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রমা মহা অপ্রস্তুত হইয়া, কমলার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিল, "রাগ কর্‌লি, ভাই? ও সব দেশের সম্বন্ধে আমার ধারণাই বা কতটুকু? পাঁচ জনে বলে, তাই—"

কমলা বাধা দিয়া কহিল, "পাঁচ জনে যা বলে, তাই তুই কি ব'লে সত্যি ব'লে মেনে নিলি, রমা? তুই ত তাঁকে জানিস্?"

হাঁ, রমা তাহার রণুদার সব কথাই জানে। এমন চরিত্রবান্ ঈশ্বরনিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ যুবক বর্ত্তমান যুগে সে অল্পই দেখিয়াছে। স্বল্পভাষী যুবক নারীসঙ্গকে এমন ভাবে এড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছে যে, তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না; কিন্তু মহা তপস্বীরও ত তপস্যাভঙ্গের কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নহে।

কিন্তু থাক্, তাহার মনের প্রান্তে যে সন্দেহ জাগিয়াছে, তাহার অন্ধকার ছায়া এই সরলা বিশ্বস্তহৃদয়া তরুণী পত্নীর অন্তরে ছড়াইয়া দিয়া তাহার শান্তিকে বিদ্রূপ করিবার ইচ্ছা এবং অধিকার তাহার নাই।

রমা সখীর নিকটে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। কমলা শ্রান্ত আঁখি-যুগল তুলিয়া পল্লবিত বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। আশা ও সান্ত্বনার মর্ম্মর ধ্বনি আন্দোলিত শাখার স্তিমিত শব্দে সে কি শুনিতে পাইতেছিল?

৩

"বাবা—"

অপরাহ্নে শ্বশুর মহাশয়ের জলযোগ করিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া কমলা স্বয়ং তাহার সন্ধানে আসিয়াছিল। কিন্তু সে সবিস্ময়ে দেখিল, বৃদ্ধ নীরবে, নিমীলিত-নয়নে শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয় [illegible] তাহার নয়নে কোন দিনও পড়ে নাই। র [illegible] যপরা- [illegible] দারা জমীদার-নন্দন হইয়াও দিবা [illegible] লন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর তিনি প্র [illegible] াপন করিতেন; সুতরাং তাঁহাকে অসময়ে নিদ্রিত দেখিয়া কমলা বিস্মিত হইল। কিন্তু তখন তাঁহাকে না ডাকিয়া সে নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করিল।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন পরিচারিকা আসিয়া জানাইয়া গেল, কর্ত্তাবাবু একই ভাবে শয্যায় শুইয়া আছেন, তখন কমলা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। দ্রুত অথচ লঘুপদ-ক্ষেপে সে শ্বশুরের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল;—দেখিল, তখনও তিনি একইভাবে ললাটের উপর বামহস্ত রাখিয়া শুইয়া আছেন।

শঙ্কিতভাবে সে শয্যার সম্মুখীন হইল। দেখিল, তাঁহার বক্ষোদেশ থামিয়া থামিয়া আন্দোলিত হইতেছে, মুখ বিবর্ণ ও নিমীলিত নয়নকোণে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

শঙ্কার শিহরণ অকস্মাৎ কমলার সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত হইল। নিশ্চয়ই কোনও দুর্ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে, নহিলে স্থিরবুদ্ধি, সংযমী রাধাকিশোর কখনই এমন নিস্পন্দ-ভাবে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না।

কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া কমলা উদ্বেগব্যাকুল-কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!—বাবা!—"

রাধাকিশোর বাবু পুত্রবধূর সে স্নেহ ও উৎকণ্ঠাব্যাকুল কণ্ঠস্বরে নয়ন উন্মীলিত করিলেন। কমলা দেখিল, বৃদ্ধের নয়নযুগল শুধু আরক্ত নহে, তাহাতে প্রগাঢ় নৈরাশ্যের অন্ধকার ছায়া যেন ঘনাইয়া আসিয়াছে!

সে স্পন্দিত-হৃদয়ে, স্খলিতকণ্ঠে বলিল, "কি হয়েছে, বাবা?"

সুগভীর নিরাশভরা স্বরে শ্বশুর কহিলেন, "এ যে আমার জীবনে চরম দুর্ঘটনা ঘটলো, মা! তোকে আমি—না না, আমি এ কি কর্‌ছি? ও কিছু নয় মা, কাল রাত্রিতে ভাল ঘুম হয়নি।"

"আমায় লুকোবেন না, বাবা।"

"লুকোবার মত ঘটনা ত এ নয়, মা! কিন্তু এও ভাবি, সুখেই হোক্, দুঃখেই হোক্, আজ আমি জীবনের সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। অনেক ঝড়, জল এই মাথার ওপোর দিয়ে গেছে। ঢের সয়েছি, আরও ঢের সইতে হবে, কিন্তু—"

বৃদ্ধ জমীদার বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। যে সংবাদ আজ তিনি পাইয়াছেন, ইহা শুনিবার পূর্ব্বে তাঁহার

মৃত্যু হইল না কেন? তাঁহার বড় সাধের ও গর্ব্বের ধন রণেন্দ্র, তাঁহার বংশের দুলাল, আশা ও আনন্দের একমাত্র অবলম্বন, তাঁহার বুকে যে শেলাঘাত করিয়াছে, তাহার বেদনা অসহ্য। এই পুত্রের মুখ চাহিয়া, পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর পবিত্র স্মৃতি তিনি উদ্যাপিত করিয়া আসিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে সন্তানকে স্বহস্তে লালন-পালন করিয়া আসিয়াছেন, পৃথিবীর কোনও সুখভোগের দিকে তিনি ফিরিয়া চাহেন নাই। শুধু রণেন্দ্র উন্নত-মস্তকে, সগর্ব্বে তাঁহার বংশমর্য্যাদা পবিত্র রাখিবে, উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে, এই কামনায় তিনি তাহাকে সযত্নে সকল প্রকারে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তিনি সমুদ্রনীরে একমাত্র সন্তানকে যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

যাহাকে তিনি ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়ব্রত, পুষ্পের ন্যায় পবিত্র, শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় পিতৃভক্ত মনে করিতেন, সে আজ কেমন করিয়া স্বর্গ হইতে নরকের দ্বারে অভিযান করিল? ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, দেবতা, অগ্নি সাক্ষী করিয়া সরলা, স্নেহপ্রবণা যে তরুণীকে সে সহধর্ম্মিণীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কেমন করিয়া স্বামিগতপ্রাণা সেই পত্নীর কথা বিস্মৃত হইয়া লোভ ও মোহের মায়ায় সে আত্মহত্যা-নীতির শরণ লইল?

কিন্তু এই বিশ্বস্তহৃদয়া, জননীতুল্যা কন্যাকে এই নিদারুণ সংবাদ তিনি কেমন করিয়া জানাইবেন? তীব্র আঘাতে—এই মর্ম্মভেদী সংবাদের কঠোর আঘাতে, শোভাময়ী লতিকা শুকাইয়া যাইবে যে! অসহ্য! অসহ্য!

কমলা শ্বশুরের বিরলকেশ মস্তকে কোমল করচালনা করিতে করিতে বলিল, "বাবা, আমাকে সব কথা খুলে বলুন। মেয়ের কাছে বাপের মনের ব্যথা প্রকাশ করা উচিত নয় কি?"

উপধানের নিম্নপ্রদেশ হইতে রাধাকিশোর বাবু একখানা পত্র লইয়া কম্পিত হস্তে কমলার হাতে দিয়া বলিলেন, "মুখে আমি বলতে পারব না, মা। তুমি প'ড়ে দেখ।"

কমলার দেহ ও মন অজ্ঞাত আশঙ্কায় কম্পিত হইতেছিল। দৃঢ়বলে শরীর ও মনকে আয়ত্ত করিয়া পত্রখানি লইয়া সে বাতায়নের ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

পড়িতে পড়িতে কমলার মুখমণ্ডল ক্ষণে আরক্ত, পরক্ষণে বিবর্ণ হইতে লাগিল। হস্ত কম্পিত হইতেছিল, কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে শ্বশুরের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া বলিল, "বাবা, এ কথা বিশ্বাস করেন?"

নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে বৃদ্ধ পুত্রবধূর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন। এমন প্রমাণ সত্ত্বেও কমলার মনে সন্দেহ জাগিয়াছে!

রাধাকিশোর বাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন, "হিরন্ময় রণেনের বন্ধু। সে মাত্র মাস-তিনেক লণ্ডনে গেছে। তাকে আমি সকল কথা জেনে সংবাদ দিতে লিখেছিলুম। হিরন্ময় মিথ্যে কথা লিখবে কেন?"

কমলার মনে পড়িল, তাহার বাল্যসহচরী রমার কথা। এই রমা হিরন্ময়ের সহোদরা। তবে, তবে কি সত্যই তিনি শ্বেতাঙ্গী নারীর মোহে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন? আজ দুই মাস তাঁহার কোন পত্র নাই। হিরন্ময় তাঁহার সন্ধানে গিয়া দেখা পায় নাই। মিসেস্ উডের বাড়ী তিনি ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। মিসেস্ উডের একমাত্র কন্যা মিস্ উডের সংবাদ হিরন্ময় সংগ্রহ করিয়াছেন।

মাতা ও পুত্রী আজ দুই মাসাধিককাল ইংলণ্ডে নাই, এই সংবাদও হিরন্ময় বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়াছেন। রণেন্দ্র ঘন ঘন মিসেস্ উডের ভবনে যাতায়াত করিতেন বলিয়া লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রমহলে একটা অপ্রীতিকর গুঞ্জন-ধ্বনিও উত্থিত হইয়াছিল, সে সংবাদও হিরন্ময়ের পত্রে স্থান পাইয়াছে। রণেন্দ্র জমীদার-সন্তান, প্রভূত অর্থের মালিক, এ সংবাদ লণ্ডনের ছাত্রসমাজে সুবিদিত। মিসেস্ উডের যুবতী সুন্দরী কন্যা এরূপ ক্ষেত্রে রণেন্দ্রের পক্ষপাতিনী হইবে এবং তাহার জননীও তাহাতে অনুমোদন করিবেন, ইহা অসম্ভব ব্যাপার নহে। তবে হিরন্ময় এটুকু সন্ধান লইয়া জানিয়াছেন, ইংলণ্ডের কোনও গির্জ্জায় রণেন্দ্রের সহিত মিস্ উডের বিবাহ সম্পাদিত হয় নাই। যাহারা রণেন্দ্রের সহিত পরিচিত, তাহাদের ধারণা, সম্ভবতঃ আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া গোপনে এই বিবাহ হইয়া থাকিবে।

কম[illegible] প্রতিমূর্ত্তির মত অনেকক্ষণ নীরবে [illegible]র অন্তরে যে প্রচণ্ড ঝটিকা বহিতে[illegible]র কোনও আভাস দিল না। ন[illegible]হার জীবনে চরম দুর্দ্দিন আসিয়া

থাকে, তবে তাহার কাছে সে আত্মসমর্পণ করিবে না। বালিকার স্থায় রোদন করিয়া অপরের সহানুভূতির উদ্রেক করার মত শিক্ষা সে জীবনে পায় নাই। দুঃখ আসিলে তাহাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে হইবে, তাহার পিতা ও মাতার জীবনাদর্শে সে এই শিক্ষাই পাইয়াছে। হৃদয় তাহার বিদীর্ণ হউক, কিন্তু মানুষের কাছে বিদীর্ণ হৃদয়ের সে চিত্র সে কখনই প্রকাশ করিবে না। এ দীনতা অসহ্য। শান্তকণ্ঠে কমলা বলিল, "আপনার খাবার এনে দিই, বাবা! আপনি উঠুন।"

রাধাকিশোর বাবু তরুণীর এই ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন। এমন ভীষণ সংবাদ শুনিবার পরও সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া যে তাঁহার ধারণারও অতীত।

তাঁহার হৃদয় মথিত করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। কমলা তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কেন আপনি কষ্ট কচ্ছেন? আপনি আমার সুখের কামনাই করেছিলেন, কিন্তু বিধিলিপি ত কেউ খণ্ডাতে পারে না, বাবা!"

কমলা মন্থরচরণে শ্বশুরের জন্য জলখাবার আনিতে চলিয়া গেল।

৪

"মা কমলা!"

"আমাকে ডাকছেন বাবা?"

"হ্যাঁ, এ দিকে এসো।"

শ্বশুরের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া কমলা দেখিল, বৃদ্ধ টেবলের উপর কতকগুলি কাগজ ছড়াইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহার ললাট রেখাঙ্কিত, আননে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার ছায়া। কমলা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই রাধাকিশোর বাবু তাহাকে অদূরবর্ত্তী আসনে বসিতে [illegible]লেন।

"মা আমার, গোণা দিন শেষ হয়ে আসছে। কবে ডাক আসবে, জানিনে। তাই বি[illegible] [illegible]বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছি।"

কমলা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে শ্ব[illegible] [illegible]হিল। তিনি বলিলেন, "রণেন্দ্রকে অ[illegible] আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তোমার নামে রেজেষ্ট্রী ক'রে দেব। উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দলিল তৈরী হয়েছে।"

কমলার আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "আমি আপনার সন্তান—বুদ্ধিহীনা। কিন্তু এ আপনি কি করছেন বাবা?"

বৃদ্ধের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "ঠিক করেছি, মা। যে বংশের সে অপমান করেছে, সহধর্ম্মিণীর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমার পুত্র হলেও তার সে মহা অপরাধের মার্জ্জনা নেই। রাধাকিশোর সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দিতে পারে না। আমার সম্পত্তির এক কপর্দ্দক সে পাবে না।"

কমলার আননে যে অন্ধকার ছায়া ঘনাইয়া আসিল, তাহা কি তাহার তীব্র মর্ম্মবেদনার অভিব্যক্তি?

মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া কমলা বলিল, "কিন্তু বাবা, তিনি আপনারই সন্তান। সন্তান যদি ভুল করে, তবে তাকে কি ক্ষমা করা যায় না? তিনি যে ইংরেজ-কন্যাকে বিয়ে করেছেন, ভবিষ্যতে তাঁর সন্তান হ'তে পারে। তারা ত আপনারই বংশধর। তারা যে কষ্ট পাবে, সেটা কি সহ্য করতে পারবেন, বাবা? আমি সামান্য মেয়েমানুষ, এত বড় সম্পত্তি নিয়ে আমিই বা কি করবো?"

রাধাকিশোর বাবু স্তব্ধভাবে পুত্রবধূর নৈরাশ্যম্লান মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া দুইখানি পত্র দিয়া গেল। সে দিন বিলাতী মেল আসিবার কথা।

পত্র দুইখানির মধ্যে একখানি তাঁহার নামে, অপর-খানি কমলার।

পত্রপ্রেরক রণেন্দ্রকুমার। অবজ্ঞাভরে নিজের নামের পত্রখানি খুলিয়া ফেলিয়া রাধাকিশোর বাবু উহা পাঠ করিলেন। পত্রখানি সংক্ষিপ্ত। রণেন্দ্র লিখিয়াছে যে, অনিবার্য্য কারণে সে প্রায় তিন মাস লণ্ডন হইতে অন্যত্র গিয়াছিল এবং অনিবার্য্য কারণ বশতঃ এত দিন সে তাঁহাদিগকে পত্র লিখিতে পারে নাই। তাহার এ অপরাধ মার্জ্জনীয়। মাসখানেকের মধ্যেই সে দেশে ফিরিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিবে।

বৃদ্ধ জমীদারের মুখ আরও গম্ভীর ও কঠোরভাব ধারণ করিল। পুত্রবধূর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে নতনেত্রে খোলা পত্রখানি হাতে লইয়া বসিয়া আছে। ক্রোধে, ক্ষোভে তাঁহার অন্তর জলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "অনিবার্য্য কারণে সে ৬ মাস অন্তত্র ছিল এবং অনিবার্য্য কারণে পত্র লিখতে পারেনি, এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হ'তে পারবে, মা ?"

কমলা কোনও উত্তর করিল না। এ কয় দিন সে সযত্নে আত্মসংবরণ করিয়া আসিতেছিল, আজ আর কোনমতেও সে প্রবহমান অশ্রুধারাকে রোধ করিতে পারিল না।

বৃদ্ধ কাগজ-কলম লইয়া তাড়াতাড়ি কি লিখিতে লাগিলেন। ১০ মিনিট পরে তিনি ডাকিলেন, "কমলা !"

সে রুক্ষ কণ্ঠস্বরে পুত্রবধূ শিহরিয়া উঠিল। রাধাকিশোর বলিলেন, "আমি লিখে দিলাম, তুমি ত্যাজ্যপুত্র। তোমার অশোভন ব্যবহারেও মর্ম্মাহত পিতার অভিসম্পাত আজ স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু আজ হইতে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। এ বাড়ীতে তোমার স্থান নাই। লুব্ধ অকৃতজ্ঞ সন্তানকে পিতা ক্ষমা করিতে পারে না। আমার পুত্রবধূ বিধবা হইয়াছে মনে করিয়া আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিলাম।"

রাধাকিশোর দ্রুত আসন ত্যাগ করিয়া পত্র-হস্তে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কমলা নিস্পন্দভাবে আসনেই বসিয়া রহিল।

৫

জমীদার-বাটীর গাড়ীবারান্দায় একখানি সুদৃশ্য মোটর আসিয়া থামিবামাত্র কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। গাড়ীর দরজা খুলিয়া শুভ্রকেশা বর্ষীয়সী এক য়ুরোপীয় মহিলা অবতরণ করিলেন।

পরিষ্কার হিন্দীতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, জমীদার রাধাকিশোর বাবু বাড়ী আছেন কি না ?

নায়েব তাঁহাকে সুসজ্জিত বৈঠকখানা-ঘরে লইয়া গেলেন। সংবাদ পাইয়া রাধাকিশোর বাবু নীচে নামিয়া আসিলেন।

ইংরাজ-মহিলা মৃদু হাসিয়া সহজকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি রাধাকিশোর বাবু ? আমি মিসেস্ উড।"

বৃদ্ধ জমীদার চমকিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু শিষ্টাচারের মাত্রা লঙ্ঘন করা হইবে ভাবিয়া তিনি ভদ্রভাবে অপরিচিতা বৃদ্ধা ইংরাজ-মহিলাকে বসিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। তাঁহার বক্ষস্পন্দন তখনও থামে নাই।

বৃদ্ধা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই ; কিন্তু আপনার ছেলে রণেনকে আমি জানি। সে আমার পুত্রাধিক স্নেহের পাত্র।"

মিসেস্ উড্ প্রসন্নভাবে হাসিতে লাগিলেন।

রাধাকিশোর বাবু প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মিসেস্ উড্ বলিলেন, "আমার স্বামী ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে অনেক দিন ছিলেন ; আমিও দীর্ঘকাল এ দেশে ছিলাম। ভারতবাসীকে আমি বড় ভালবাসি ; কিন্তু রণেনের মত এমন মহৎ ছেলে আমি দেখিনি।"

রাধাকিশোর বাবু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন।

মিসেস্ উড্ বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, এমন ছেলে হাজারে একটা পাওয়া যায় না। প্রায় দুবছর হ'তে চললো, তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। কেমন ক'রে জানেন ? প্রায় আড়াই বছর আগে আমার একটিমাত্র মেয়ে আইভি মারা যায়—"

রাধাকিশোর বাবু চমকিয়া উঠিলেন। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "আপনার মেয়ে বেঁচে নেই ?"

মিসেস্ উড বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, আপনারা যে মহাভ্রমে পড়েছেন, সে কথাটা জানাবার জন্তেই আমি হাজার হাজার মাইল দূর থেকে ভারতবর্ষে এসেছি। শুনুন, আমি 'প্লাইমাউথে' ষ্টীমারে আসছিলাম। কন্যা-বিয়োগের শোকে রেলিংএর ধারে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার সময়, একটা রেলিং খুলে গিয়ে আমি জলে পড়ে যাই। আর ঠিক্ সময়ে রণেন জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আমাকে সলিলগর্ভ থেকে উদ্ধার করে। সেই দিন থেকে আমি তার মা, সে আমার ছেলে।"

বৃদ্ধার নয়নে অশ্রু ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল।

রাধাকি[illegible] [illegible]ত্তেজনার আতিশয্যে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইে[illegible] [illegible]দিতে তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে [illegible]

"মা [illegible] রণেন্দ্রের হঠাৎ প্রত্যহ জর হ'তে

আরম্ভ করে। কঠোর অধ্যয়নের ফলে তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। আমি প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জানতে পারি, এ সময়ে যদি সুইজারল্যাণ্ডে না নিয়ে যাওয়া যায়, পরে হয় ত যক্ষার আক্রমণ ঘট্তে পারে।"

রাধাকিশোর বাবু আশঙ্কায় অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধের দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বৃদ্ধা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "রণেন্দ্র কথাটা বুঝতে পার্লে। আমার আদেশ অবহেলা করা সে ভাল মনে করেনি। কাযেই তাকে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে যখন গেলাম, তখন তার প্রবল জ্বর। পরামর্শ ক'রে স্থির হলো, এ সংবাদ আপনাদের জানান হবে না। কয়েক মাস অজ্ঞাতবাস বরং ভাল। অসুখের খবর পেয়ে আপনারা ব্যস্ত হতেন, সেটা রণেন চায়নি। আমারও তাতে সায় ছিল। ডাক্তারও সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন।"

রাধাকিশোর বাবু ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় সে, আমার ছেলে কোথায়, ম্যাডাম?"

মিসেস্ উড্ ধীরভাবে বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না, সবই বল্ছি। সুইজারল্যাণ্ডের জল-হাওয়ার গুণে রণেন্দ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো। তবে সময় কিছু বেশী লাগ্লো। ডাক্তারের পরামর্শে ও সাধারণ যুক্তির দোহাই দিয়ে তখনও সে আপনাদের কাছে পত্র লিখলে না। ডাক্তারের বিশেষ নিষেধও ছিল। হঠাৎ সুইজারল্যাণ্ডে অসুস্থ হয়ে এসেছে, এ সংবাদ জানতে পার্লে ব্যস্ত হয়ে হয় ত আপনারা ছুটে যেতেন। সেটা কিন্তু বাঞ্ছনীয় এবং যুক্তিসঙ্গত কায হতো না।"

রাধাকিশোর বাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আঃ!"

বৃদ্ধা বোধ হয় এই সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তিতে পিতৃহৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতার উপশান্তি অনুভব করিলেন।

"তার পরে লণ্ডনে ফিরে এসে সে আপনাকে পত্র লিখেছিল, তার জবাব পেয়ে সে শুধু স্তম্ভিত নয়, মর্ম্মাহত হয়ে গেল। পরীক্ষায় সে ডাক্তার উপাধি লাভ করেছিল, উচ্চ প্রশংসায় লণ্ডনের 'কাগজ' পূর্ণ হয়েছিল; কিন্তু জন্মদাতা পিতা বিনাদোষে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, এ আঘাতে সে অধীর হয়ে পড়েছিল।"

রাধাকিশোর বাবু সহসা ক্ষমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "তার পর অনুসন্ধানে জানা গেল, তার কি অপরাধে সে তাহার পিতৃক্রোড় হ'তে বঞ্চিত হয়েছে। এত বড় পরিহাস বোধ হয় জগতে খুব কমই ঘটে। আমার যে কন্যার সঙ্গে তার জীবনে কখনও দেখা হয়নি, তার সম্বন্ধে জনরব চমৎকার উপন্যাস রচনা করেছিল। আর সেই কল্পিত অপরাধে সে তার সমস্ত পরিজনের সংস্রব থেকে বিচ্যুত।"

সহসা জমীদার বৃদ্ধার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, "আমার ছেলে কোথায় বলুন, ম্যাডাম্!"

ম্যাডাম হাসিয়া বলিলেন, "আপনি তাকে সম্পত্তি থেকে বিচ্যুত করেছেন, সে জন্য তার কোনও দুঃখ হতো না। সে আমার পুত্রেরও অধিক প্রিয়, আমার সঞ্চিত ৭৫ হাজার পাউণ্ডের সে উত্তরাধিকারী। কিন্তু সে জন্যে নয়—"

অধীরভাবে রাধাকিশোর বাবু কহিলেন, "সে কোথায় আছে, অনুগ্রহ ক'রে ব'লে আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন।"

মিসেস্ উড বলিলেন, "তাকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে রেখে আমি আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছি। কিন্তু তার আগে আপনার ও আমার মালক্ষ্মীকে একবার ডাকুন। কমলার কথা রণেন্দ্রের কাছে এতবার এমন ভাবে শুনেছি যে, তাকে না দেখে আমি যেতে পারছি না।"

রাধাকিশোর বাবু নায়েব-গোমস্তাকে ডাকিয়া গ্র্যাণ্ড হোটেলে মোটর লইয়া যাইতে আদেশ দিয়া বলিলেন, "আমিও পরে আসছি।"

* * * *

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় তাহাদের সেই পুরাতন সুখস্মৃতি-বিজড়িত কক্ষে স্বামি-স্ত্রীর নির্জ্জন সাক্ষাৎ ঘটিল। কমলা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। রণেন্দ্র সাদরে কহিল, "কেন কাঁদ্ছো, কমল?"

কমলা স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল, "আমায় মাপ কর। আমি তোমায় অবিশ্বাস করেছিলুম।"

রণেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ভেবেছিলে, হয় ত যে, তুমি এখানে ব'সে আমার চিন্তা ক'রে দিন কাটাচ্ছ আর আমি সেখানে মেমসাহেবের ছবি বুকে ক'রে স্ফূর্তি করছি,—নয়?"

কমলা স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া কহিল, "কতকটা তাই বটে।"

"কতকটা না কমল, সত্যই তাই। যার ছবি বুকে ক'রে দিনের পর দিন কাটিয়েছি, তাকে দেখবে? এই দেখ।" বলিয়া রণেন্দ্র জামার পকেট হইতে বিবাহের অল্পদিন পরেই তোলা কমলার একটি ছোট ফটো বাহির করিয়া কহিল, "কেমন, আমার পছন্দ সুন্দর নয়? মেম সাহেবটি কেমন দেখতে?"

গভীর প্রেমে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কমলা কহিল, "যাও, তা বৈ কি। কিন্তু মিসেস্ উডের মত এমন চমৎকার মেম সাহেব আমি কখনও দেখিনি।"

ধরা গলায় রণেন্দ্র বলিল, "মাকে ছেলেবেলা হারিয়েছি। মা'র স্নেহ পাইনি। ওঁর কাছে আমার সে অভাব মিটেছে। সত্যি উনি আমার মা।"

কমলাও মনে মনে সহস্রবার সে কথা স্বীকার করিল।

শ্রীমতী চারুবালা গুহ।

রাঙামাটী

ওইখানে ছিল পাল বাবুদের গোলাবাড়ী গদিঘর,
আজ সেইখানে আত্রেয়ী-বুকে ধূ ধূ করে বালুচর।
কপোত-কপোতী হাঁটিয়া গিয়াছে রয়েছে পায়ের দাগ,
কিছু দূরে তা'র সরিষার ক্ষেতে লেগেছে হলুদ রাগ।
হাড়ে হাড়ে শুধু খটখটি বাজে—হাসিছে মাথার খুলি,
—ওইখানে সব মজুরেরা মিলি উড়াত ধানের ধূলি।
'আত্রেয়ী' সেও সরিয়া গিয়াছে কোনমতে আছে বেঁচে,
নাই আর তার সে দিনের তেজ, আর নাহি চলে নেচে।
সে দিনের সেই তরুণী আজিকে হয়ে গেছে কত বুড়ী,
কোনমতে চলে আঁকিয়া বাঁকিয়া বালি-কাঁথা দিয়ে মুড়ি।
বুড়াশিব আর বুড়ামা কালীর জাগ্রত দু'টি ঘর,
আজো রহিয়াছে পূব কূলে ও'র নীচ দিয়া গেছে চর।
কত মণ চা'ল কত শত মাঝি জীবন দিয়াছে বলি,
সেই 'দহে' আজ মহিষ তাড়ায়ে রাখাল যেতেছে চলি।
ওইখানে ছিল ভীমা সাঁওতাল "দাড়িকা দীঘির" পার,
যমের মতন দুষমন ভারী, ভয় নাহি ছিল তা'র।
দু'হাতে দু'গাছি কাঁসার বলয় মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
দু'কাণে দুইটি কাণের গহনা চুলে গোঁজা কত ফুল;
এক হাতে ছিল বাঁশের বাঁশীটি আর হাতে ধনু তীর,
কোমলে কঠোর ভীমা সাঁওতাল কভু রাগী কভু ধীর।
দুই পার ঘিরি ছোট ছোট ঘর মাটীর দেয়ালে ঘেরা,
লাল মাটী দিয়ে আলপনা দেয়া উহাদের সব বেড়া।
ছেলে মেয়ে নিয়ে নিতি সন্ধ্যায় মাদল বাজায়ে গান,
মিটে গেছে আজ সে দিনের সেই হাসি-মাখা কলতান।
ওইখানে ছিল "রামা বাগ্‌দীর" ছোট-খাট দুটি ঘর,
বাগ্‌দীর বউ মিসি-ঘষা দাঁত, উল্‌কি কপাল'পর।
ছোট ছোট তা'র ছেলে-মেয়েগুলি শান্তির নিকেতন,
গত সুখ আজ মরম-মাঝারে দেয় দুখ অনুখন!
"দুধপুকুরের" চার পাড় ঘিরি হাড়িদের ঘন বাস।
তাল-তরু আর বাঁশবন সেথা ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।
"পলাশপুকুরে" সকাল সাঁঝেতে নাহি কলসের ঢেউ,
কাদাখোঁচা আর মাছরাঙা ছাড়া নাহি সেথা আর কেউ।
শেওলার দলে ফুল ফুটিয়াছে বেদনার মূক ভাষ
জানায় নীরবে দুনিয়ার কোলে—নাই কোন উল্লাস।
"সাহা বাবু"দের "বড় বাসা" ওই ভাগ হয়ে গেছে কত,
পাল ভরা গরু দশ জোড়া মোষ নাই আজ আর অত।
"কুণ্ডু বাবু"দের অত বড় বাসা নাই কোন মানবক,
যত ভিড় ছিল মিটিয়া গিয়াছে আজ শুধু পলাতক।
"কালা ফকিরে"র দরগার পাশে আগাছা জন্মেছে কত,
"মরকা'কালীর" আসন ঘেরিয়া জোনাক জ্বলিছে শত।
দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত নিশাসে কাঁপি উঠে তালীবন,
পলাশ শিমুলে ব্যথার শোণিমা করি গেছে বিলেপন।
কবরের বাঁশে গজায়েছে ঝাউ বাসা রচিয়াছে কাক,
"ছাটানী পাড়া"র যত ঢেঁকি আজ একেবারে নিরবাক্।
বাপ-মরা ছেলে বুকেতে লুকায়ে অনাথা জননী তা'র,
ওইখানে বসি' কমায়েছে যত জীবনের দুখভার।
কত না তপ্ত বুক-ভাঙা শ্বাস বাতাসে রয়েছে মিশি,
শেষ হয়ে গেছে দিন কোলাহল এসেছে তামসী নিশি।
অতীতের শুধু স্মৃতি বেদনার নীরবে জ্বলিছে আজ,
দিন [illegible] ভাঙিয়াছে না আসিছে কালসাঁঝ।
[illegible] াণিতে মাটী হয়ে গেছে লাল,
[illegible] রাঙা মাটী শুধু কাঁদিয়া কাটায় কাল।

শ্রীগোপেশ্বর সাহা।

শ্রীগৌরাঙ্গতীর্থে দুই দিন

সঙ্কল্প ছিল, এবার পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, মৈমনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যাইব, কিন্তু অকস্মাৎ ঢাকা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাদ ও তাহার ভয়াবহ পরিণাম উপস্থিত হওয়ায়, এ সময় সখ করিয়া তথায় বেড়াইতে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক মনে হইল না। সুতরাং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের স্থান, মহারাষ্ট্র-বর্গীদের প্রধান কেন্দ্র, বৃটিশ বিজয়-স্মৃতি-বিজড়িত বাঙ্গালার বৈষ্ণবতীর্থ, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কাটোয়া এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সুপ্রাচীন গ্রামগুলি দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা হইল।

বেলা প্রায় ২টার সময় ট্রেণে উঠিয়া প্রায় ৬টার সময় কাটোয়া পৌছিলাম। আষাঢ়ের বেলা, তখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব আছে। আমরা * একখানি ঠিকা গাড়ীতে শ্রীযুক্ত দেবীদাস বাবুর ধর্ম্মশালায় পৌছিলাম উহা একবারে গঙ্গার উপর অবস্থিত, ছোট-খাট হইলেও বেশ আলো-বাতাসপূর্ণ দ্বিতল বাটীটি, ভিতরে একটি ছোট নাটমন্দিরের সম্মুখে আড়ম্বরহীন মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীকালিকা দেবী প্রতিষ্ঠিত। বাটীতে পূজারী ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিলাম না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া উপরে উঠিলাম।

বাহির হইতে বাটীটি দেখিয়াই গঙ্গার দিকের খোলা ছাদের সম্মুখের ঘরটির উপর লোভ পড়িয়াছিল, কিন্তু উপরে উঠিয়া বুঝিলাম, সেটি এই ধর্ম্মশালা-প্রতিষ্ঠাতারই একটি স্বতন্ত্র ভাড়াটিয়া বাটী। গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত দেবীদাস বাবু পথের অপর পার্শ্বের একখানি সুবৃহৎ চালাঘরের বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া কি কায করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে আমাদের ইচ্ছার কথা জ্ঞাপন করায় তিনি সেই বাটীতে লইয়া গিয়া আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সঙ্গের জিনিষপত্র রাখিয়া তখনই একবার বাহির হইলাম। কল্পনায় কাটোয়ার যে ছবিটা মনের মধ্যে আঁকা ছিল, সেটা একটা পুরাতন সহরের ছবি। ষ্টেশন হইতে আসিতে স্কুল, আদালত, মিউনিসিপ্যাল্ অফিস, অন্যান্য দোকানপত্রের সঙ্গে একখানির পর এ দোকান দেখিতে দেখিতে যাইলাম, বাস্তবে কল্পনার সঙ্গে তেমন মিল্ পাইলাম না। মনে করিয়াছিলাম, কালনার মত এখানে সেখানে না জানি উচ্চচূড় কত পুরাতন মন্দির মাথা তুলিয়া আছে, দেখিতে পাইব, তাহাতেও হতাশ হইলাম। তবে একটা বিষয়—যাহা তেমন মনের মধ্যে আইসে নাই, বেড়াইতে বাহির হইয়া বাজারের কাছে কর্ম্মী যুবকদিগের এবং বহু ভদ্র সাধারণের আগ্রহ-উৎসাহ দেখিয়া ভবিষ্যতের ভগবদিঙ্গিত মনে করিয়া একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। শুনিলাম, কয় দিন আগে একটিকে ধরিয়াছিল, আবার সেই দিন একটি বালককে পিকেটিং করার জন্য ধরিয়াছে, সেই জন্য সন্ধ্যার পর এক সাধারণ জনসভার অধিবেশন হইবে। এ বিষয়টিতে লোকের উদ্যোগ-উৎসাহ কোন অগ্রগামী সহরের অপেক্ষা একটুও কম দেখিলাম না। মনে হইতে লাগিল, সেই এক ক্ষীণকায় কৌপীনধারীর ইঙ্গিতে জগতে অজ্ঞাত এ কি অভিনব নীরব সংগ্রাম! এ কি ভগবানের অমোঘ নির্দ্দেশ নহে?

বাসায় ফিরিয়া গঙ্গার দিকের সেই খোলা ছাদে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম। অনতিদূরে গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থান জ্যোৎস্নালোকে খুব সামান্যই দেখা যাইতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া সেই নিমাইয়ের গৃহত্যাগ, সন্ন্যাস-গ্রহণ, আলিবর্দ্দী খাঁর মহারাষ্ট্রদের নিকট পরাজয় ও জয় হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতে বৃটিশ বিজয় পর্য্যন্ত কত কথাই মনে হইতে লাগিল; কিন্তু সব কথা ছাড়িয়া শুধু বার বার ইহাই মাথার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল,—ক্লাইবের এই কাটোয়ায় আগমন, দুর্গ আক্রমণ এবং পলাশী-প্রাঙ্গণে যুদ্ধের পূর্ব্বরজনী পর্য্যন্ত কাটোয়ার দুর্গে বসিয়া নবাবের সহিত যুদ্ধের চিন্তা, ইংরাজ সৈন্যের বলাবল স্থিরীকরণ, সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করিবার কৌশল উদ্ভাবন, গোপন ষড়্যন্ত্র ও যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন। ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্যকে চির-অস্তমিত করিবার জন্য যাহা কিছু করিবার আবশ্যক হইয়াছিল, তাহার অনেক কিছুই এই কাটোয়াতে এই গঙ্গা-অজয়ের পরপারে শাঁখাই গ্রামে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই সব কথা মনে করিতে করিতে নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম। ঠিক করিয়া রাখিলাম,

---

* আমি, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচ[illegible] [illegible]লজের শিক্ষক কটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী

পরদিন প্রভাতে প্রথমে শাঁখাই গ্রামে দুর্গ-চিহ্ন প্রভৃতি দেখিতে যাওয়া হইবে।

ভাগীরথী ও অজয়ের মধ্যে শাঁখাই গ্রাম

শাঁখাই গ্রাম ভাগীরথী ও অজয়ের মধ্যে এক অনতি-প্রশস্ত উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত। গঙ্গার সহিত অজয় যেখানে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই স্থানে অজয় পার হইয়া তথায় যাইতে হয়। প্রভাতে উঠিয়াই তদভিমুখে অগ্রসর হইলাম। তীরের কাছে দুই একখানি পান্সী বাঁধা থাকিলেও দেখিলাম, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে। আমরাও হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া পাদুকা হাতে লইয়া পার হইলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইলে কাশ ও আগাছা-আচ্ছন্ন উঁচু-নীচু ভূমির মাঝে মাঝে বাবলাগাছ-পূর্ণ সেই জনহীন ভূমিখণ্ডের উপর হইতে এক পার্শ্বে বহু বিস্তৃত সাদা বালির চড়ার মধ্যে গঙ্গা, পর-পার্শ্বে একবারে গভীর খাদের নীচে অজয়। জেলেরা মাছ ধরিতেছে। পশ্চাতে ভাজনের উপর কাটোয়া গ্রাম। এ দৃশ্য একটা গভীর নৈরাশ্যের উদ্দীপক হইলেও উপভোগ্য। আমরা অগ্রসর হইতেছি, মাঝে মাঝে দুই একটি কাটোয়া-যাত্রীর সহিত দেখা হইতে লাগিল।

[illegible]—দক্ষিণে শাঁখাই গ্রাম.

এখানে দুর্গ কোথায় ছিল, জিজ্ঞাসা করায় কেহই বিশেষভাবে কিছুই বলিতে পারিল না। অজয়ের ধারে একটি অত্যুচ্চ টিলা দেখিয়া আমরা কাঁটাপূর্ণ বৈঁচি-গাছের বন ভেদ করিয়া তাহার উপর উঠিয়া কোথাও ইষ্টকস্তূপ বা কোন কিছুর সন্ধান পাইলাম না। দেখিলাম, অদূরে এই প্রকার আর একটি স্তূপ রহিয়াছে। গাছপালার মাঝে মাঝে কয়েকখানি খোড়ো ঘর, আর নিম্নে এক পার্শ্বে সমতল ভূমিতে আবাদের আয়োজন হইতেছে।

গ্রামের ভিতর যদি কোন বৃদ্ধ লোককে পাওয়া যায়, এই মনে করিয়া সন্ধান করিলাম। চাষি-মহিলারা বলিল, সকলেই মাঠে কাম করিতে গিয়াছে। আমরা মাঠের দিকেই অগ্রসর হইলাম। সেখানে কতিপয় লোকের নিকট হইতে জানিলাম, এই স্তূপগুলিই পুরাকালের সেই মাটীর কেল্লার শেষ পরিণতি। এইরূপ ছয়টি স্তূপ আছে;—তিনটি ভাগী-রথীর দিকে, অন্য তিনটি অজয়ের দিকে। এগুলির মধ্যে দেখিবার কিছুই না থাকিলেও সবগুলিই একে একে দেখিয়া আসিলাম। এভিশ নামে এক শ্বেতাঙ্গের এখানে যে প্রকাণ্ড

নীলকুঠী ছিল বলিয়া শুনা যায়, তাহাও বনপূর্ণ এক বিস্তৃত স্তূপে পরিণত হইয়াছে। দেখিলাম, অনেকটা যায়গা জুড়িয়া স্থানে স্থানে সেই সব অট্টালিকা ও হৌজ প্রভৃতির ধ্বংসচিহ্ন রহিয়াছে। এখনও এ স্থানটাকে লোক কুঠীপাড়া বলিয়া থাকে।

শাঁখাই হইতে কাটোয়ার এক অংশের দৃশ্য—লোক হাঁটিয়া পার হইতেছে

এই সব স্থান পরিভ্রমণকালে এক কৃষক-বালার নিকট শুনিলাম, অদূরে এক বনের মধ্যে লোহার রেলিং দ্বারা ঘেরা একটা স্থান আছে। আমরা জঙ্গল ভেদ করিয়া অতি কষ্টে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি প্রায় দশ বারো ফুট চতুষ্কোণ স্থান মোটা মোটা চৌপল লোহার গরাদের দ্বারা ঘেরা রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে অশ্বত্থ, বট ও একটি বৃহৎ ছাতিম-গাছ রেলিঙের লোহাগুলিতে এমন অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া উঠিয়াছে যে, উহাকে বৃক্ষ-পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। এই স্থানটিকে এরূপ ঘিরিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য জানা না যাইলেও, ইহা যে বহু পুরাতন; তাহা বেশ বুঝা যায়। অনুমান হইল, ইহা কাহারও সমাধিস্থান। পরে গ্রামবাসী কাহারও কাহারও নিকট শুনিলাম, উহা সুদে[illegible] সাহেবের বিবির সমাধি। সে বিবি যে কে, তাহার কো[illegible] সন্ধান করিতে পারিলাম না। অজ্ঞাত সমাধি-নির্দ্দিষ্ট স্থানটি[illegible] একখানি ফটোগ্রাফ লইয়া অনেকক্ষণ তরুচ্ছায়ায় বসিয়[illegible] ক্লান্তি দূর করিতে করিতে সেই ক্লাইব, সেই মীরজাফর আ[illegible] সেই পলাশীর সমরাভিনয়ের কথা মনে হইতে লাগিল। চর্ম্ম চক্ষুতে দৃষ্ট বন-জঙ্গলের মধ্যেই যেন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের সেই দুর্দ্দিনের ছবি কল্পনা-নেত্রের সমক্ষে একে একে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সৌভাগ্যবান্ বৃটিশ বণিকের ভারতে সেই প্রথম যুগে সাম্রাজ্য-স্বপ্ন হয় ত তখনও তাহাকে বিভোর করে নাই। সেই সময় এখানকার মাটীর কেল্লা অধিকার করিয়া তাঁহারা যে সুপ্রচুর শস্যসম্ভার ও যুদ্ধোপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সময় স্বল্পবল, সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান-হৃদয় ইংরাজ-প্রধানদের মনে কত বল, কত উত্তেজনা আনিয়া দিয়াছিল, তাহাই বারংবার মনে হইতে লাগিল। বেলা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা

এই স্থানে নবাবের কেল্লা ছিল, এক্ষণে মা[illegible] স্তূপে পরিণত হইয়াছে

এডিশ্‌ সাহেবের নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ

পবিত্র বলিয়া বিবেচিত; কিন্তু কালপ্রভাবে ইহা এখন একটি পল্লী নামেরও যোগ্য নহে! ইহার পর উদ্ধানপুর নামে একটি পল্লী আছে। বর্গীর অত্যাচার-সংক্রান্ত এখানে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এখানে প্রতি-বৎসর শীতকালে একটি মেলা হইয়া থাকে।

শাঁখাই হইতে ফিরিয়া এই গৌরাঙ্গতীর্থের মধ্যমণি শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের লীলা-বিজড়িত পীঠস্থানে তাঁহার নৃত্যরত লীলাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে যাইলাম। নদীয়ার চাঁদ নিমাই নবদ্বীপ হইতে গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া যে উন্মত্ত আবেগে কেশব ভার-তীর আবাসে সারারাত্রি নৃত্যরত থাকিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ইহা সেই শ্রীমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভক্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে আজি কত দিন হইয়া গেল, সে ভক্তপ্রধান আজ কোন্ লোকে বিরাজ করিতেছেন, কে জানে! কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-দর্শন-লাভের জন্ত আজিও কত শত শত ভক্ত দূরদেশ হইতে আসিয়া তাহা

আর অপেক্ষা না করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শাঁখাই গ্রামের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে সেইখানেই একটি কিম্বদন্তী শুনিলাম। পূর্ব্বকালে একদা মা গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া কোন শাঁখারীর নিকট হইতে শাঁখা গ্রহণ করেন এবং তাহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে শাঁখার মূল্য আছে বলিয়া দিয়া অন্ত-র্হিতা হন এবং পরে জলের ভিতর হইতে হস্তোত্তোলন করিয়া শাঁখা-শোভিত হস্তযুগল দেখাইয়াছিলেন। তদবধি এই স্থানটি শাঁখাই নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। গ্রামবাসী-দের মধ্যে এরূপ ধারণাও আছে যে, কোথাও নিকটে কোন ফুলের গাছ না থাকিলেও এখনও সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ এখানে নানারূপ ফুলের সৌরভে স্থানটি বিমোহিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোথা হইতে যে সে অপূর্ব্ব সুরভি আইসে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থানে অবস্থিত থাকায় স্থানটি

অজ্ঞাত-না[illegible] প্রাচীন সমাধিস্থান

দর্শনলাভ দ্বারা তাঁহাদের তৃষিত—তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছেন।

কথিত আছে, আড়িয়াদহনিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব গদাধর দাস এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নিত্যানন্দের মূর্ত্তিটি পরবর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠিত। কেহ কেহ বলেন, বাসু ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ইহার প্রতিষ্ঠাতা। গদাধর চৌষট্টি মোহন্তের মধ্যে এক জন ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে তাঁহার পরিচয় আছে। গদাধর দাস তাঁহার প্রিয়শিষ্য যদুনন্দন ঠাকুরকেই শ্রীগৌরাঙ্গের সেবার ভার দিয়া যান। এই যদুনন্দন ঠাকুরই 'প্রেমবিলাস', 'কর্ণানন্দ' প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থ-রচয়িতা। ইঁহার বংশধরগণই এতাবৎ প্রভুর সেবা করিয়া আসিতেছেন।

এখানে বিগ্রহ-সেবার জন্য দেবত্র বা তেমন বাঁধা ব্যবস্থা কিছুই নাই। সে জন্য ভেটের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হয়। বর্ত্তমানে যে মন্দির, নাটমন্দির, ভোগমন্দির প্রভৃতি দেখা যায়, উহা প্রাচীন মন্দির সংস্কার করিয়া ক্রমে ক্রমে সাধারণের অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার জন্য একমাত্র তড়াশের রাজা ভক্তপ্রবর বনমালী রায়ের নাটমন্দির নির্ম্মাণার্থ ছয় শত টাকা দানই উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের

নৃত্যরত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব

শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তকমুণ্ডনের স্থান
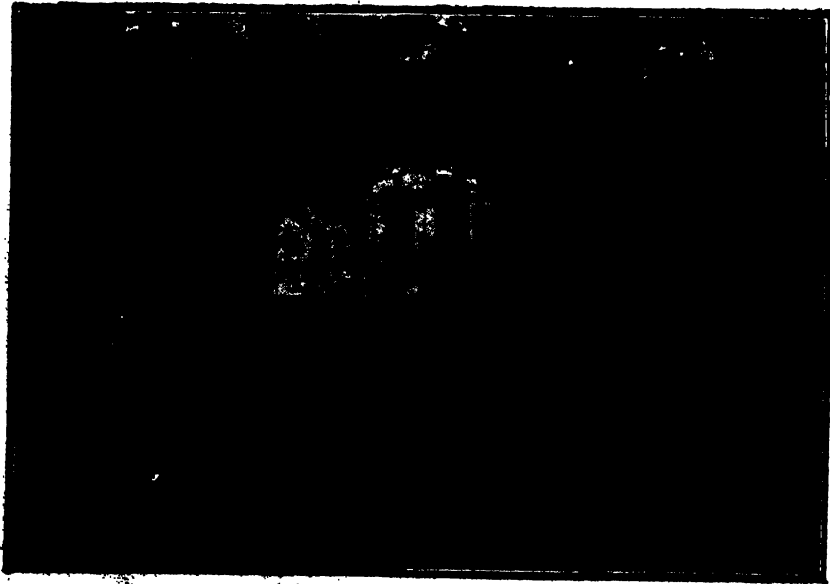
তোরণ-পার্শ্বে রেলিংএ ঘেরা যে স্থানটি দেখা যায়, কথিত আছে, নিমাই সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে এই স্থানেই মস্তক মুণ্ডন করিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইখানে অশ্বত্থমূলে এখনও অনেক বৈষ্ণব মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন। এই মুণ্ডনস্থানের পূর্ব্ব-দিকে মহাপ্রভুর কেশ-সমাধি ও গদাধর দাসের সমাধি আছে। ইহার নিকটেই ঘেরা প্রাচীরমধ্যে কেশব ভারতীর সাধনা ও সিদ্ধিস্থান। উহাকে কেশব ভারতীর আশ্রমও বলে; কেহ
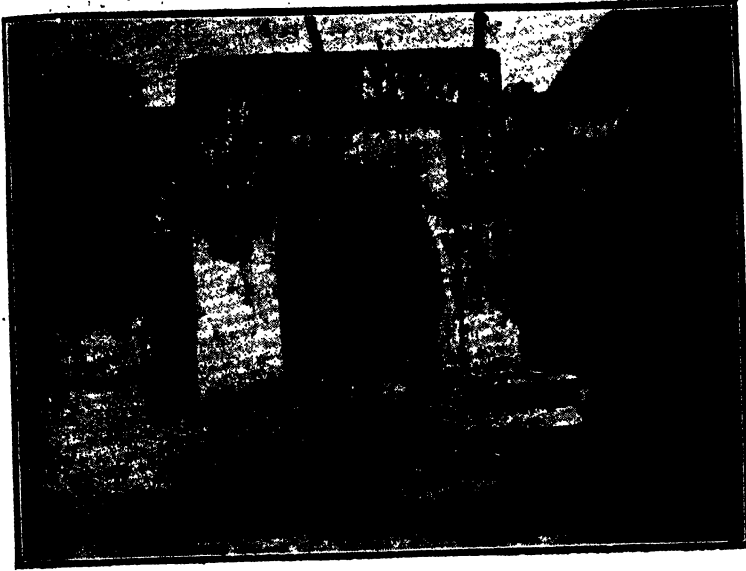
কেশব ভারতীর আশ্রম—মহাপ্রভুর দীক্ষার আসন ও গুরু-শিষ্যের পদচিহ্ন

কেহ সমাধিও বলে। এই স্থানে মহাপ্রভুর দীক্ষার আসন, গুরুশিষ্যের পদচিহ্ন ও সম্মুখে মধু নাপিতের সমাধি আছে। নিমাই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের পর এই স্থানেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রাপ্ত হন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব হইতেই কাটোয়ার প্রধান প্রসিদ্ধি। যত দিন বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, তত দিন ইহা পবিত্র তীর্থরূপেই পরিগণিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও, এ স্থানের ঐতিহাসিক মূল্যও কম নহে। এ বেলার মত দেখা-শুনা শেষ করা গেল। সঙ্গী বন্ধুদ্বয় মধ্যাহ্নের ব্যবস্থার জন্য বাজারে যাইলেন, আমি বাসায় ফিরিলাম। গঙ্গাস্নানাদি শেষ করিয়া বাজার হইতে আনীত ফল-মূল, চিঁড়া, মিষ্টান্ন ও বাড়ী হইতে আনীত আম্রসহযোগে ফলাহার পূর্ণমাত্রায় বলিতে না পারিলেও কতকটা সাত্ত্বিকভাবেই সম্পন্ন হইল। পূর্ণমাত্রায় বলিতে পারিতেছি না, কারণ, বন্ধুদ্বয় বাজারে তিন আনা সের চিংড়ি-মৎস্য আর পাঁচ ছয় আনা সের সুন্দর ডিম-ভরা রাইচারি বাটা মৎস্য—যাহাকে সেখানে রাই-খয়রা বলে—যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কথা ভুলিতে পারিতেছিলেন না। এই প্রসঙ্গে বলি, এখানে শুধু মাছ নহে, তরিতরকারীও অপেক্ষাকৃত সস্তা। ভাল দুধ টাকায় পাঁচ ছয় সের। ভাল সন্দেশ কেবল এক টাকা সের, তদ্ভিন্ন মিষ্ট সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া প্রভৃতি অন্য সমস্ত মিষ্টান্নই আট আনা সের পাওয়া যায়। দেড় পয়সায় একটি সুন্দর খরমুজা আনিয়াছিলেন—যাহা আমাদের তিন জনের পক্ষে পর্য্যাপ্তই হইয়াছিল। অন্নাভাব ঘটিলেও উদরপূর্ত্তির কোন অভাব ঘটে নাই, বরং কিছু আধিক্যই হইল।

কাটোয়ার বিশিষ্ট দ্রষ্টব্যের মধ্যে বাকী ছিল গঙ্গামুরশিদপুরস্থিত প্রাচীন মসজেদ ও জগাই-মাধাইয়ের সাধনস্থান মাধাইতলা ও মাধাইয়ের সমাধিস্থান। বৈকালে একখানি গাড়ী লইয়া এই স্থান দেখিতে বাহির হইলাম। মসজেদটি আমাদের
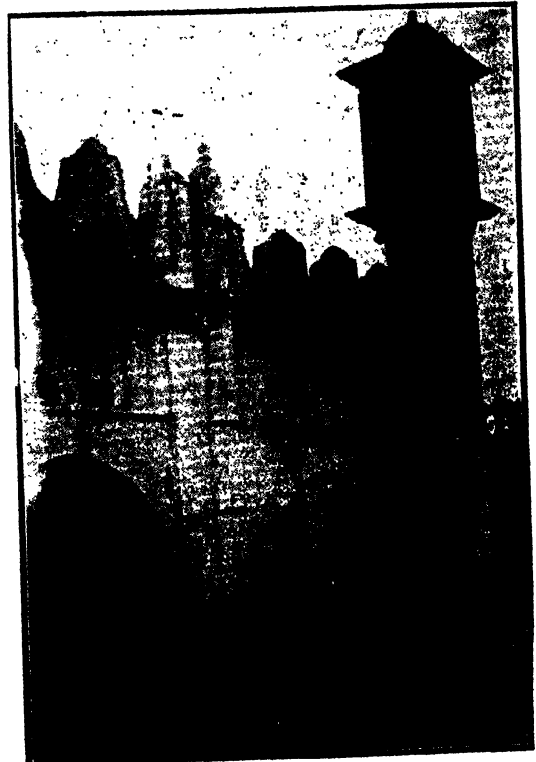
প্রাচীন মসজেদের কিয়দংশ

সৈয়দ শাহ আলম্ খাঁর বাটীর তোরণ-স্তম্ভ

বাসা হইতে বেশী দূরে নহে। উহা দেখিয়াই পুরাতন বলিয়া মনে হয়, আকারেও এতদঞ্চলের মধ্যে বৃহৎ। মসজেদ-সংলগ্ন একখানি প্রস্তর-ফলকের আরবী ভাষায় লিখিত লিপি হইতে জানা যায়, মহম্মদ ফররোখ শেয়র ১১২৭ হিজরি সালে যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সৈয়দ শাহ আলম খাঁ নামক ফররোখ শেয়রের বিরুদ্ধপক্ষাবলম্বী সৈয়দ শাহ আলম্ খাঁ নামক জাহন্দর শাহের জনৈক উজীর যখন দিল্লীতে বাস বিপজ্জনক মনে করিলেন, তখন নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে কাটোয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মাচরণে জীবনের অবশিষ্ট কাল এখানে কাটাইবার উপযোগী মনে করিয়া তিনি জঙ্গলপূর্ণ এই জনহীন স্থানটি নির্ব্বাচন করিয়া আবাদ দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া এই মসজেদ নির্ম্মাণ করিলেন। মুর্শীদকুলি জাফর খাঁ সে সময় সুবে বাঙ্গালার নবাব নাজিম্ ছিলেন। তিনি সম্রাট্-সমীপে সৈয়দ শাহের কথা গোচর করেন। সম্রাট্ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া আনন্দিত হন এবং মসজেদের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ১৭ হাজার টাকা মুনফার একটি মৌজাভুক্ত লাখরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন।

সৈয়দ্ শাহ মস্‌জেদের তিন দিকে যে গড় কাটাইয়াছিলেন, তাহার এক দিকের কিছু অংশ এখনও দেখা যায়, তদ্ভিন্ন সমস্ত ভরাট হইয়া বাড়ীঘর নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে। এই মস্‌জেদ ভিন্ন তিনি হুজরা, ভাগীরথী-তীরে একটি পাথরের বাঁধাঘাট এবং তথায় পৌঁছিবার জন্ম মৃত্তিকাভ্যন্তরে এক সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শাহ আলম্ খাঁর উত্তরাধিকারীরাই এতাবৎ ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কাল-ক্রমে সম্রাট্‌প্রদত্ত মস্‌জেদের সম্পত্তির অধিকাংশই এক্ষণে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। মসজেদের অনতিদূরে সৈয়দ শাহ আলম্ খাঁর সমাধি দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহার অনতিদূরে অপ্রশস্ত ক্ষুদ্রগলি-প্রান্তে এখনও প্রস্তরফলক-সংলগ্ন খাঁ সাহেবের বাটীর তোরণের উপরকার খিলান ও পার্শ্বের অনতি-উচ্চ স্তম্ভদ্বয় চেষ্টা করিয়া দেখা যায়।

কাটোয়ার এই প্রাচীন প্রসিদ্ধ মস্‌জেদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এখানকার স্বল্প-গবাক্ষবিশিষ্ট অনুচ্চ ইষ্টকালয়গুলি আজিও মুসলমান-প্রভাব প্রতিপন্ন করিতেছে। গঙ্গ-মুরশিদপুর নামটিও ইহার পরিচায়ক। নবাব মুর্শীদকুলি জাফর খাঁর সময় ইহা একটি অতি প্রসিদ্ধ ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। যখন মুর্শিদাবাদ রাজধানী ছিল, তখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার জন্ম কাটোয়ায় সৈন্য-সংস্থাপনের আবশ্যকতা হইয়াছিল। তখন এ স্থান মুর্শিদাবাদের দ্বার নামে অভিহিত হইত।

এখান হইতে দাঁইহাটের পথে বরাবর মাধাইতলায় যাইলাম। ইহা ঘোষঘাটের অন্তর্গত। কেহ কেহ ইহাকে জগাই-মাধাইতলাও বলিয়া থাকে। জনশ্রুতি এইরূপ,—শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণমানসে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া যখন কণ্টকনগরে উপস্থিত হন, তাহার কিছু দিন পরে শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর নিত্যপরিকর মাধাই প্রভুর বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কণ্টকনগরে উপস্থিত হন। এখানে আসিয়া যখন সেই পরম-ভক্তপ্রবর শুনিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সন্ন্যাস-আশ্রম পবিত্র করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ অসম্ভব ভাবিয়া তৎকালীন ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী এই নির্জ্জন অরণ্যে আশ্রয় লইয়া একান্তে তাঁহার স্মরণ-মননে দিনপাত করিতে লাগিলেন এবং এই স্থানেই সাধন-ভজন করিতে করিতে অবশেষে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। তদবধি এই স্থানকে লোক মাধাইতলা বলিয়া আসিতেছে।

এখানে একটি জীর্ণ মন্দিরমধ্যে একটি বিগ্রহমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে অসংস্কৃত জীর্ণ নাটমন্দিরের এক পার্শ্বে মাধাইয়ের ক্ষুদ্র সমাধিমন্দির বিরাজিত। প্রাঙ্গণমধ্যে বৃত্তাকার বেদীর মধ্যস্থলে একটি সুপ্রাচীন মালতীলতা ও প্রবেশদ্বারপার্শ্বে একটি চম্পকবৃক্ষ দেখা যায়। জনৈকা মন্দিরপরিচারিকা আমাদিগকে বলিলেন, উহা একাদশ পুরুষ ধরিয়া এই ভাবেই আছে। বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে এইরূপ কিম্বদন্তী,—মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় ১ শত বৎসর পরে মথুরাবাসী জনৈক

মাধাইয়ের সমাধি-মন্দির

বৈষ্ণব পরমভাগবত গোপীচরণ দাস বাবাজী বহু তীর্থ পর্য্যটনানন্তর দিনাজপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার নিত্য-সেবার জন্ত নিতাই-গৌরাঙ্গ বিগ্রহদ্বয় ও ১ শত ৮ শালগ্রাম সঙ্গে থাকিত এবং তাঁহার ১ শত ৮ জন শিষ্য সঙ্গে থাকিয়া সেবা করিতেন। ঐ সিদ্ধ মহাপুরুষ প্রভুর নিকট আদিষ্ট হইয়া মাধবীতলায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার সাধের নিতাই-গৌরাঙ্গ বিগ্রহদ্বয় মাধাইয়ের সমাজমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ সিদ্ধ ঐশ্বর্য্যবলে মাধাইতলা, অজারপুর গ্রামের বিশ্রাম-তলা ও বাহিরী নামক স্থানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তদেব সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর শ্রীবৃন্দাবনগমনকালে প্রথম যে তিনটি স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তথায় বৎসরে চারি মাস ধরিয়া প্রভুর সেবার উপযোগী শ্রীমন্দির ও বিষয়-সম্পত্তি দিয়া যান। আজ বহুকাল যাবৎ এই বিগ্রহদ্বয় বৎসরের চারি মাস ধরিয়া এইরূপ ভ্রমণ করিয়া ভক্তবৃন্দের পূজা গ্রহণানন্তর তাঁহাদের ধন্ত করিয়া আসিতেছেন। কথিত আছে, উল্লিখিত গোপীচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ই মাধাইয়ের সমাধিস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। ডাহাপাড়ার রাজাধিকারীদিগের প্রদত্ত ভূমির উপস্বত্ব দ্বারাও এখানকার বিগ্রহের সেবার অনেক সহায়তা হইয়া থাকে। এখানকার মন্দিরের নিকটেই আনন্দমঠ নামক যে মঠ দৃষ্ট হয়, তথায় সাধু বাবার মহোৎসবের সময় শ্রীগৌর-নিতাইকে লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে।

এখানে এই নির্জ্জন কাননাভ্যন্তরে দর্শনাদি করিয়া আমরা ফিরিলাম। পথে আসিবার সময় 'কেরি সাহেবের বাগান' নামক উদ্যানমধ্যে শ্রীরামপুরের সুবিখ্যাত মিশনারী উইলিয়ম্ কেরি সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র উইলিয়ম্ কেরির সমাধি দেখিলাম। এ স্থান এখন জনহীন, পরিত্যক্ত পল্লী। এক সময় এই উদ্যান যে বেশ মনোরম ছিল, তাহা এখানকার অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, পুষ্করিণী ও বৃক্ষাদি দেখিয়া প্রতীয়মান হয়। বাসায় যখন ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। কাটোয়ায় বেড়াইবার সময় সর্ব্বত্রই দেখিলাম, পুন্নাগ-চাঁপার গাছ। এ গাছ এত আর কোথাও দেখি নাই। আর গঙ্গাতীরে জল হইতে বহু দূরে কতকগুলি বৃহদাকার পুরাতন ঘাট ত আছেই, সহরের এখানে ওখানে বহু স্বল্পসলিল বা জলহীন পুষ্করিণী দেখিলাম, তাহাতেও খুব বড় বড় ঘাট রহিয়াছে। পুষ্করিণীর আকারের তুলনায় ঘাটগুলি প্রায়ই বৃহদায়তন।

বর্ত্তমান কাটোয়ার সাধারণের দর্শনীয় বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-বিজড়িত স্থানগুলি ও প্রভুর মূর্ত্তি ভিন্ন এমন বিশেষ যে কিছু আছে, যাহার জন্ত একটা দেখিবার লোভ হয়, তাহা নহে; কিন্তু ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণবদের কাছে ইহা যেমন একটি পবিত্র তীর্থ, ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতেও ইহা তেমনই আকর্ষণীয়। পূর্ব্বে এই স্থানে পাট, তামাক, চাউল, দাউল, চিনি, লবণ, কার্পাস, গুড়, কাপড় প্রভৃতির আমদানী-রপ্তানী যথেষ্ট হইত। দুইটি প্রধান নদীর মিলনস্থান বলিয়াও কতকটা ইহা এতদঞ্চলের মধ্যে একটি প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। ইহা তখন একটি

বন্দর ছিল। পূর্ব্বকালে দূরদেশ হইতে বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া এখানে সমুদ্রপোত সকল আসিত।

অধুনালুপ্ত কাটোয়ার একটি পুরাতন ঘাট

কাটোয়ার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, কণ্টকনগর হইতে কাটোয়া নামের উৎপত্তি। ইহার প্রাচীন নাম ছিল চম্পকনগর। নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার মাতা শচী দেবী জীবনের ধন নিমাইকে সংসার হইতে হারাইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, চম্পকনগর তাঁহার পক্ষে কণ্টকনগর হইল। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। কারণ, কোন গ্রন্থে এ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবগ্রন্থে কণ্টকনগর বা কাটোভাই লিখিত আছে। চৈতন্য-ভাগবতেও এই নাম দেখা যায়। যথা,—

"গঙ্গায় হইয়া পার শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিন আইলেন কণ্টকনগর॥"

অন্যত্র—

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোভা নামে গ্রাম।
তথা আছেন কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম॥"

ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহল-যাত্রার বর্ণনায় গঙ্গাপার্শ্বস্থ ইন্দ্রাণী নামক দেশের নাম পাওয়া যায়। কাটোয়া এই ইন্দ্রাণী পরগণারই অন্তর্গত। কাশীরাম দাসের মহাভারতেও ইন্দ্রাণীর নামোল্লেখ আছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক আরিয়ান বলিয়াছেন, কাঁটাদীয়া বা কণ্টক দ্বীপের অপভ্রংশ কাঁটিছুপা নামে এ স্থান পরিচিত ছিল।

নিমাইয়ের সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় এ স্থানের প্রসিদ্ধি তত অধিক হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে চৈতন্যসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত ইহার নাম চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ভাগীরথীর অনেক দূর সরিয়া যাওয়ার সহিত নগরেরও বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বের কীর্ত্তি-সকলের অধিকাংশই এখন গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভশায়ী। প্রাচীন গৌরাঙ্গঘাট—যেখানে কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল, তাহা বহুদিন গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এই স্থানের সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া নদীয়া-বিজয়ের পরই মুসলমানরা এখানে আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং তাহারই ফলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাদি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে ক্রমে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কালে এখানে যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের আশ্রম ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। পূর্ব্বে এ স্থানে 'কাঁটাদীয়া' নামে যে একটি ব্রাহ্মণের প্রধান সমাজ ছিল, মুসলমান-বিপ্লবে সে সমাজ লুপ্ত হয়।

ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলমানদিগের সহিত এই কাটোয়ার সম্বন্ধ কম ছিল না। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাষ্ট্ররাজ রঘুজী ভোঁশলার জনৈক সেনাপতি ভাস্কররাও পণ্ডিত বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, তখন নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় মেদিনীপুর হইতে সাত দিন হাঁটিয়া আসিয়া কাটোয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মুর্শিদাবাদ হইতে খাদ্য ও বস্ত্রাদি আনাইয়া মরণোন্মুখ সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সংবৎসরব্যাপী বহু যুদ্ধের পর এই কাটোয়ার দুর্গ হইতেই ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাষ্ট্রাদিগকে পরাজিত করেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময় কাটোয়া যে মহারাষ্ট্রাদিগের প্রবল আড্ডা ছিল, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকদের নিকট তাহা অবিদিত নাই।

পলাশী-যুদ্ধের কয়েক দিন পূর্ব্বে নবাবপক্ষীয় কাটোয়া-দুর্গের কেল্লাদার ও ক্লাইবের অধীনস্থ মেজর কুটের সহিত এক কৃত্রিম যুদ্ধ হয়। চন্দননগরের যুদ্ধের পর তথা হইতে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রার কালেই ক্লাইব বুঝিয়াছিলেন যে, কাটোয়ায় এক যুদ্ধ ঘটিবে এবং সে জন্য এখানকার কেল্লা-দারকে হস্তগত করায় সামান্য কৃত্রিম যুদ্ধের পর তিনি দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন মেজর আয়ার কুট ২ শত য়ুরোপীয় এবং ৫ শত সিপাহী সৈন্য ও একটি বড় ও একটি ছোট কামান সহ রাত্রি দ্বিপ্রহরে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগরবাসীরা নগররক্ষার্থ কোন ব্যবস্থা না করিয়াই ভয়ে স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায় কুট নির্ব্বিবাদে নগর অধিকার করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। এখানে ১৪টি কামান, বারুদ, গুলী, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি অনেক যুদ্ধোপকরণ এবং আনুমানিক অন্ততঃ ১০ সহস্র লোকের এক বৎসরের উপযোগী সঞ্চিত শস্যসম্ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে কাটোয়া-যুদ্ধের কথা যাহা জানা যায়, তাহা ইহাই।

কাটোয়ার দুর্গ ইংরাজের হস্তগত হইল। ১ হাজার য়ুরোপীয় ও ২ হাজার এতদ্দেশীয় সৈন্য লইয়া নবাবপক্ষীয় পঞ্চত্রিংশ সহস্র পদাতি ও পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত পলাশী-ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে ক্লাইব এই স্থানে বসিয়াই প্রথম সন্দিহান হইয়াছিলেন। আবার এই স্থানে বসিয়াই ক্লাইব মীরজাফরের গোপন পত্র প্রাপ্তে সাহসে ভর করিয়া ২২শে জুন সৈন্যগণকে ভাগীরথী-পারের অনুমতি দিয়াছিলেন। তাহারই পরদিন নামমাত্র যুদ্ধ করিয়া, মীরজাফর প্রভৃতির বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারত-স্বাধীনতা হরণের প্রথম সূত্র ধরিয়াছিলেন। ইহাকে যুদ্ধই বলি আর কৌশল, ষড়যন্ত্র যাহাই বলি, পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত এই স্থানেই সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং কাটোয়ার সহিত ভারতের বর্ত্তমান ইতিহাসের সম্বন্ধ কতটা, ভারতীয়দের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সম্পর্ক কাটোয়ার সহিত কত ঘনিষ্ঠ, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কাটোয়ার ও নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহ সেকালে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকগণের প্রধান ক্রিয়াস্থল ছিল। এই কাটোয়ার নিকট বীরহাট গ্রামে রায় রামানন্দ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে শ্রীখণ্ড গ্রামে নরহরি ঠাকুরের নিবাস ছিল। তাঁহার শিষ্য, চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা লোচনানন্দ দাসের নিবাস ছিল শ্রীখণ্ডের নিকটবর্ত্তী কোগ্রামে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিবাস ছিল চাখুন্দী গ্রামে। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস ছিল কাটোয়ার নিকটস্থ ঝামটপুর গ্রামে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কি ইতিহাস, কি ধর্ম্ম, সকল দিক দিয়াই কাটোয়ার প্রসিদ্ধির সহিত তুলনা হইতে পারে, বাঙ্গালায় এমন সহর কমই ছিল।*

শ্রীহরিহর শেঠ।

---

* এই প্রবন্ধে কোন কোন বিষয় নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছি।

(১) A comprehensive History of India—Beveridge.
(২) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।—২২শ বর্ষ।
(৩) District Gazetter—Burdwan.
(৪) জন্মভূমি—৪র্থ ভাগ।
(৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal.

ভয়ঙ্করী

নিস্তব্ধ নিশ্চল সুপ্ত ক্ষুদ্র গ্রামখানি,
দুর্ভেদ্য আঁধার তাহারে চাপিয়া ধরে
প্রচণ্ড দৈত্যের মত। ক্ষণে ক্ষণে হানি'
মৃত্যু-বিভীষিকা জাগে দিগন্তের পরে
সুতীব্র বিদ্যুৎ—কৃতান্ত-মশাল সম।
হা হা করি' ছুটে আসে কঠোর নির্ম্মম
উন্মত্ত পবনোচ্ছ্বাস। দীর্ঘ তরুশিরে
ঝাঁকড়ি' নাচিয়া উঠে বৃষ্টিবিন্দু সাথে
সে তীব্র বাতাস। আজি নিখিলেরে ঘিরে
এ কি নিশা ভয়ঙ্করী মৃত্যু সম মাতে
দয়াহীনা! বক্ষে মম দুরু-দুরু বাজে
প্রলয়ের প্রবল স্পন্দন!

বিশ্ব-মাঝে
প্রচণ্ড ভৈরব নৃত্য জাগিছে বিরাট—
আমারে জিনিয়া লহ, হে মৃত্যু-সম্রাট্!

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

চিকিৎসার ফল

১

চন্দননগরের শিবতলায়, শিবের মন্দিরের সংলগ্ন যে ঘর দুইখানি পড়িয়াছিল, ৬ মাস হইল, তাহাতে এক সিদ্ধ সাধুপুরুষ আসিয়া বাস করিতেছেন। সাধু হইলেও তিনি সন্ন্যাসী নহেন, তিনি সংসারী অর্থাৎ তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান। তিনি সর্ব্বপ্রকার জাগতিক বিষয়ে নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত হইয়া সস্ত্রীক এই ক্ষুদ্র সহরের একাংশে আসিয়া নীরবে ধর্ম্ম ও কর্ম্মসাধনায় রত ছিলেন।

সর্ব্বপ্রকার গোলমাল হইতে দূরে নির্জ্জনে থাকিবার তাঁহার অভিলাষ থাকিলেও, লোক-কোলাহলের হাত হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্ণে দুই-দশটি করিয়া ভক্ত-সমাগম তথায় নিত্যই হইত। কেহ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া আসিতেন, কেহ পারমার্থিক আলোচনার দ্বারা নিজেকে উন্নত করিতে আসিতেন, কেহ সাধুপুরুষের কৃপালাভ করিয়া আপন মঙ্গলকামনায় আসিতেন। ইহা ছাড়া অনেকে ভবিষ্যৎ জানিতে এবং ব্যাধির ঔষধাদিলাভের আশায়ও আসিতেন। ঘোড়-দৌড়ের খেলায় জিতিবার জন্য ঘোড়ার নাম জানিবার উদ্দেশ্যেও কোন কোন লোককে আসিতে দেখা যাইত।

সম্মুখের ঘরখানিতে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। আসন হইতে তিনি বড় একটা উঠিতেন না, অন্ততঃ কেহ তাঁহাকে উঠিতে দেখিতেন না। তাঁহার আসনের বামপার্শ্বের শূন্য আসনখানি কখন কখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী 'দেবী-মা'র দ্বারা অধিকৃত থাকিত। সপ্তাহের অন্য দিন অপেক্ষা রবিবারেই ভক্ত-সমাগম কিছু অধিক হইত এবং সেই দিন 'ঠাকুর বাবা'র পার্শ্বে 'দেবী-মা' আসন পরিগ্রহ করিয়া এক দিকে ভক্তবৃন্দের মনোরথ যেমন পূর্ণ করিতেন, অপর দিকে ভক্তরাও গুরু-সিদ্ধ যুগলরূপ দর্শনে মোক্ষের পথে নিজেদের অনেকটা অগ্রসর মনে করিয়া ধন্য হইতেন।

নিত্য এইরূপ লোক-সমাগমের জন্য তাঁহার কার্য্যের যদিও যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিত, কিন্তু 'ঠাকুর বাবা'র সাধুহৃদয় তিতিক্ষা ও দয়ায় পূর্ণ, তাই তিনি কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না, কাহাকেও ফিরাইতে পারিতেন না, শুধু একটু হাসিয়া বলিতেন,—"আনন্দময়ের পথে সহযাত্রী যত বেশী হয়, ততই আনন্দ—ততই আনন্দ।"

সে দিন বৈকালে চন্দননগরের কোন সম্ভ্রান্ত সুবর্ণ-বণিক্-গৃহের দুই চারি জন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল। তাহারা 'ঠাকুর বাবা'র পার্শ্বে 'দেবী-মা'কে বসাইয়া, তাঁহার সীথায় সিন্দুর ও পায়ে আলতা পরাইয়া দিয়া একখানি গিনি প্রণামী দিল। টাকা, পয়সা বা কোন কিছু তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া দেওয়া দেবী-মা মোটেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার মুখে বিরক্তির একটু চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, ঠাকুর বাবা তাঁহার উদ্দেশে কহিলেন,—"ভক্তাৎ দাপ্যাং আনন্দমপি গৃহ্নেৎ,—ভক্তকে নিরাশ করতে নেই, দেবি! শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলেছেন—ভক্তের ভক্তিস্বরূপ দান আনন্দের সহিত গ্রহণ করবে।" তাহার পর স্ত্রীলোকগুলির দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগই সাধকের ধর্ম্ম বটে, কারণ, সাধনায় এই দুই দ্রব্য বিঘ্ন উৎপাদন করে। কিন্তু আমার দৃঢ় মনকে ও-ভয়ে ভীত করতে পারে না, তাই সহধর্ম্মিণী নিয়েই আমি ধর্ম্মসাধনায় রত। আর কাঞ্চনে আমার আবশ্যক ও আসক্তি না থাকলেও, ভক্তের উপহার আমি মাথায় ক'রে নি; তার পর সেই পরম আনন্দময়ের উদ্দেশে, তাঁরই কাছে আবার তা নিবেদন ক'রে দি।"

দেবী-মা কহিলেন,—"বাছা, স্বামীতে যেন অচলা ভক্তি থাকে। স্বামীতে যে সর্ব্বস্ব নিবেদন করতে পারে, মহা-স্বামীর করুণা পেতে তার বাকী থাকে না।"

মহিলারা ঠাকুর বাবার ও দেবী-মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। দেবীমার ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। তিনি মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঠাকুর বাবা প্রকাশ্যে আশীর্ব্বচন জানাইয়া কহিলেন,—"আত্মবৎ সর্ব্বলোষ্ট্রেষু—অর্থাৎ নিজের কামিনী ভিন্ন আর সকল রমণীই মাতৃস্বরূপং, সুতরাং তোমরা সকলেই আমার মা-জননী। আশীর্ব্বাদ কি আর করব মা, স্বামি-সন্তান নিয়ে আনন্দময়ের আনন্দের আস্বাদ পাও। ধর্ম্মে মতি রেখো, সাধুসঙ্গ কোরো, দেব-দ্বিজের পূজা কোরো।" তার পর পার্শ্বের কুলুঙ্গী হইতে গুটি দুই-চারি শুষ্ক ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া প্রথমে নিজের মুণ্ডিত মস্তক-শীর্ষে স্পর্শ করাইলেন এবং পরে মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সকলের হাতে দিয়া কহিলেন,—"মাদুলীতে ভ'রে ধারণ কোরো মা, আনন্দ পাবে, মঙ্গল হবে।"

সকলে পরম যত্নের সহিত মন্ত্রোচ্চারিত প্রসাদী বিল্বপত্র

নিজ নিজ বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইল এবং আর একদফা দেবী-মা ও ঠাকুর বাবার পায়ের ধুলা লইয়া, রাস্তার উপর দণ্ডায়মান তাহাদের গাড়ীখানির মধ্যে আসিয়া বসিল। তখন মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে, ফিস্-ফিস্ করিয়া দেবী-মা কহিলেন,—"বেশী ঢং কত্তে যেও না, কবে কোন্ দিন সব বিদ্যে বেরিয়ে পড়বে! চা করব না কি? ছোট ডিম কিন্তু আর একটিও নেই, সব ফুরিয়ে গিয়েছে।"

আনন্দের আতিশয্যে একটি হাত কোমরে ও অপরটি মুণ্ডিত মস্তকোপরি রাখিয়া, দক্ষিণে ও বামে অঙ্গ দোলাইতে দোলাইতে ঠাকুর বাবা মৃদু চাপা গলায় যে গান গাহিয়া উঠিলেন, তাহাতে স্থানবিশেষের মাহাত্ম্যও যে অনেক সময় স্তিমিত হইয়া পড়ে, ইহা হলপ করিয়া বলিতে পারা যায়।

২

শীতকালের একপ্রহর রাত্রি। ভিতরের দিকের ঘরখানিতে—যেখানে সকলে জানিত যে, গভীর রাত্রিতে ঠাকুর বাবা যোগসাধনা করিয়া থাকেন, সেই ঘরের মধ্যে তিনি নিত্যকার মহাসাধনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ব্যাপৃত ছিলেন, অর্থাৎ উষারাণী ছোট একটি তোলা উনুনে কড়া চাপাইয়া ছ্যাক্-ছোঁক্ করিয়া ছোট ছোট ফুলকো লুচি ভাজিয়া দিতেছিল আর তিনি হৃষ্টচিত্তে একখানির পর একখানি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া যাইতেছিলেন। এই সুন্দর সময়ে উভয়ের মধ্যে যে বিষয়ের আলোচনা চলিতেছিল, তাহাও কি অনুরূপ সুন্দর?

উষা কহিল,—"চিরকাল ধ'রে তোমার স্বভাব দেখে আসছি ত!"

রজনী কহিল,—"তা দেখবে না কেন? আজ বারো বছরের ওপর হ'ল, সাতপাক ঘুরিয়ে তোমায় এনেছি। চিরকালটাই ত ছিনে জোঁকের মত লেগেই আছ, এক দিনও ত বাপের বাড়ী, মামার বাড়ী গিয়েও রেহাই দাও নি। ন মাতা—ন পিতা—"

ফোঁস্ করিয়া বাধা দিয়া উষা কহিল,—"সেইটাই হয়েছে বড় গায়ের জ্বালা; বুঝতে ত সবই পারি। কিন্তু বিয়ে যখন করেছিলে, তখনই সেটা বোঝা উচিত ছিল না?"

দুই চারিখানা লুচি পাতে ফেলিয়া দিয়া উষা পুনরায় কহিল,—"এ কি বদ্ স্বভাব! পরের ঝি বৌয়ের ওপর নজর দেওয়া, এ অভ্যেসটা আর কিছুতেই গেল না! আর তা ছাড়া সাধু সেজে এই যে সকলকে সব ফাঁকি দেবার ব্যবসা, এটা কি জঘন্য! এতে মনে মনে আমার এক এক সময় এত ঘৃণা হয়! তোমার ঘর করতে এসে শেষে তোমার সঙ্গে আমাকেও জোচ্চোর সাজতে হ'ল! না হয় না-ই খেতে পাব, গাছ-তলায় রাত কাটাব, তা ব'লে এই রকম জুচ্চুরী—"

বাধা দিয়া রজনী কহিল,—"কারো কাছে ত বাড়ী বয়ে জুচ্চুরী কত্তে যাই না, আসে কেন, না এলেই পারে। কারুর হাত ধ'রে ত আর টেনে আনি না?"

"টেনেই আন। এ দেশের লোকের স্বভাবই এই যে, মাথা নেড়া কিংবা জটার সঙ্গে গেরুয়া দেখলেই একেবারে গ'লে যায়,—বিশেষ মেয়েমানুষগুলো। এতে চিরকাল ধ'রে তারা ঠ'কে আসছে, তবু ঠকার আর বিরাম নেই। তাদেরও বলি, নিজের হিত করবি, নিজেরা সেই হিসেবে কায কর্, ধর্ম্ম কর্, পুণ্যি কর্, কর্ত্তব্য কর্, ভগবান্‌কে নিত্যি স্মরণ কর্, অন্যায় অধর্ম্ম ছেড়ে দে,—সে-সব কিছু না ক'রে গেরুয়ার মারফতে সস্তায় এরা মঙ্গল কুড়ুতে আসে। যাই হোক্, তারা আসেই যদি, তুমি তাদের ঠকাবে কেন? এতে জীবনের খাতায় তোমারও ত লোকসান জ'মে উঠছে! কেন, পয়সা উপায়ের আর কি কোন ভাল পথ নেই?"

"থাকবে না কেন? পথ হাজার হাজার। কেরাণীগিরী, দোকানদারী, উকীলী, দালালী, ডাক্তারী, মোক্তারী। আর সব চেয়ে ভাল পথ যদি ধর, তা হ'লে মাষ্টারী, ছেলেপড়ান। এ পথ যেমন বৃহৎ, তেমনি উদার, তেমনি পুণ্যময়, তেমনি অন্নহীন,—অর্থাৎ গুষ্টীশুদ্ধ অনাহারে থেকেও বিদ্যাদান ক'রে ক'রে কঙ্কালসার। তার পর হঠাৎ এক শুভ সময়ে হার্টফেল ক'রে মাষ্টার মহাশয়ের মরণ, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী-পুত্রাদির গাছতলায় দাঁড়ানং!"

"তা হোক্ দাঁড়ানং। সৎপথে থেকে, না খেয়ে গাছতলাতে থেকেও সুখ।—আর দু'খানা লুচি দি?"

"দুখানা কি দিতে আছে? দাও না খান পাঁচ সাত। কখন্ সেই দুপুরে চারিটি খেয়েছি, তার পর ত আর পেটে কিছু পড়ে নি! সাধুগিরিতে দেহপাত হয়ে গেল বাবা! সারাদিনের পর তোমার শ্রীহস্তের ভজন কতক গরম গরম লুচি খাওয়া, এইটেই ত হচ্ছে আমার বর্ত্তমান সাধু-জীবনের

শ্রেষ্ঠ সুখ, ঊষা !" তার পর একটু থামিয়া, খাইতে খাইতে আবার রজনী কহিল,—"তা হ'লে এ সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে মাষ্টারীই করা যাক, কি বল ?"

"কর।"

"করি ?"

"কর।"

"বুঝে বোলো। সাধু পথ কিন্তু দু'বেলা খাওয়া জোটাবে না, সেটা জেনে রেখো।"

"না জোটাক, এক বেলা ত জোটাবে ? এক বেলা খেয়েই থাকবো। আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঐ বদ্ অভ্যেসগুলো ছাড়তে হবে, ঐ বৌ-ঝির ওপর নজর—"

ফোঁস্ করিয়া রজনী বলিয়া উঠিল, "কি মুস্কিল ! ও সব এখন আর আমার নেই ; যখন ছিল তখন ছিল, সত্যি বলছি। কে তোমায় লাগায় বল ত—গৌরীর মা—নয় ?"

"সে বেচারার ওপর ঝাল ঝাড় কেন ? আজ বারো বছর ধ'রে তোমার স্বভাব দেখে আসছি, এ কি আর কাউকে ব'লে দিতে হয় ?"

রজনী মুহূর্ত্তখানেক ঊষার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া আবার আহারে মনোনিবেশ করিল ; কহিল—"তোমার সঙ্গে আর আমি পারব না। এই অন্ন ছুঁয়ে বললুম, তবু বিশ্বাস হ'ল না ?"

ঊষা কহিল,—"তোমার মত জোচ্চোর অন্ন ছেড়ে অন্নপূর্ণা ছুঁয়ে বললেও বিশ্বাস হয় না", বলিয়া ঊষা তাহার কার্য্যে বেশী করিয়া মনোযোগ দিল এবং রজনীও আর কিছু না বলিয়া নীরবে খাইয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন সকালে গৌরীর মা ঝি উঠান হইতে পিতলের ঘড়াটি তুলিয়া লইয়া বাহির হইতে জল আনিতে যাইতেছিল। সেই সময় তাহার বস্ত্রাঞ্চলের শিথিল বন্ধন হইতে ভাঁজ করা ছোট একটু কাগজ পড়িয়া গেল। সে ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। ঊষা তাহার অলক্ষ্যে তাহা কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিল। তাহাতে লেখা ছিল—

"সুন্দরি,—

তোমায় সে দিন দেখে অবধি রাধা-প্রেমে আমার অন্তর ভ'রে উঠেছে। প্রাণের বাঁশী দিন-রাত তোমারই নাম ধ'রে বাজছে। এক দিন, যমুনার তীরে তোমায় নিয়ে যে প্রেমের লীলা করেছিলাম, আজ তারই স্বপ্ন সুমত্ত অন্তরে ভেসে উঠছে। এস প্রাণাধিকে, এস, তোমারই আশায়, তোমারই পথ চেয়ে ব'সে আছি—উত্তর দিও, মাথা খাও।

তোমারই প্রেমে কৃষ্ণ-
প্রেমে ভোলা—প্রেমিক সন্ন্যাসী।"

সেই দিন দ্বিপ্রহরে ঠাকুর বাবার আসন টলিয়া গেল। অত্যধিক দৃঢ়তার সহিত এবং সহজ কণ্ঠে ঊষা রজনীকে কহিল—"কালই এখান থেকে কোলকাতা চ'লে যেতে হবে, আর এক দিনও আমি তোমাকে এখানে থেকে এ ব্যবসা করতে দেবো না। কোলকাতা গিয়ে মাষ্টারী-টাষ্টারী যা হোক কিছু একটা করবে চল।"

রজনী হাঁ করিয়া শুধু ঊষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একটু ঝাঁজ ও শ্লেষের সহিত ঊষা কহিল—"দিব্যি ক'রে কাল রাত্রিকার সত্যবাদিতা প্রকাশ করবার পর এখনও চব্বিশ ঘণ্টা কাটে নি, সাধুমশাই," বলিয়া সেই ভাঁজ করা চিঠিটুকু রজনীর কোলের উপর সজোরে ফেলিয়া দিয়া ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিল।

৩

দিন পাঁচ সাত পরে এক দিন অপরাহ্ণকালে শ্যামবাজারের কোন একটি গলীর মধ্যবর্ত্তী একখানা বাটীর বাহিরের ঘরে বসিয়া দুই ব্যক্তিতে কথোপকথন হইতেছিল। ইহাদের মধ্যে এক জন—যিনি বহুকালের একখানি ছিন্ন বিবর্ণ বিলাতী র‍্যাগ গায়ে জড়াইয়া তক্তপোষের উপর বসিয়াছিলেন, তিনি এই গৃহের গৃহস্বামী ; পার্শ্বের বেঞ্চিতে উপবিষ্ট অপর জন—আগন্তুক। উভয়েরই সম্মুখে একটি করিয়া চায়ের কাপ ছিল। গৃহস্বামীর কাপটি সম্প্রতি শূন্য হইয়া এক্ষণে ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল, আগন্তুকের সমুখস্থ ভরা কাপটি হইতে তখনও অল্প অল্প ধোঁয়া উঠিতেছিল। লৌহনির্ম্মিত শূন্য কাপটিকে পার্শ্বের দিকে একটু সরাইয়া রাখিতে রাখিতে গৃহস্বামী কহিলেন,—"ভারী মজবুত এই কাপগুলো। আজ সতেরটি বছর সমানে কায দিচ্ছে, অথচ কিছুই এর হয় নি, খালি ওপরকার সাদা এনামেলগুলো সব উঠে গিয়ে এখন ঠিক যেন কাল পাথর-বাটির মত দেখায়। দুটো বাটি পৌনে পাঁচ আনায় তখন কিনেছিলুম। উনিশ পয়সায় ১৭ বছর ; আর এর চেয়ে কি হবে বলুন ? আরও কোন্ মা—আমার

জীবনটা এইতেই কেটে যাবে?—ও কি! চা যে আপনার ঠাণ্ডা হয়ে গেল! খেয়ে ফেলুন—খেয়ে ফেলুন।"

আগন্তুক কাপটি তুলিয়া লইয়া অল্প অল্প চুমুক দিতে সুরু করিলেন। গৃহস্বামী হেম বাবু কহিলেন,—"মুখটা সিঁটকুচ্ছেন, —একটু তিত-তিত লাগছে বোধ হয় আপনার, না? অভ্যেস নেই কি না, একটু তিত লাগবে; তা লাগুক্—খেয়ে ফেলুন, উবগার হবে। চায়ে, মাষ্টারমশাই, দুধ দিয়ে আমি কখনই খাই না, তা'তে অম্বল হয়; আর তা ছাড়া, খালি চা দিয়ে ত আমার চা তৈরী হয় না। শুকনো পেঁপে-পাতার গুঁড়ো ছ'আনা আর চা দশ আনা, এই দিয়ে আমার চা হয়। এতে লিভারটা খুব ভাল থাকে, ট্যানিক্‌য়্যাসিড টার দোষ কেটে যায়।—ও কি! তলার ও-টুকু আবার ফেলে রাখলেন কেন? ওইটুকুই ত উপকারী।"

কাপের আড়ালে বিকৃত মুখ করিয়া আগন্তুক নিঃশেষে সেই তলার চা-টুকু গলাধঃকরণ করিয়া সন্তর্পণে কাপটি দেওয়ালের পার্শ্বে নামাইয়া রাখিলেন।

শীতাধিক্যের জন্ত র‍্যাগখানি ভাল করিয়া গায়ে টানিয়া-টুনিয়া দিয়া হেম বাবু আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"এই শীতে মাথা নেড়া করেছেন কেন?"

আগন্তুক অত্যন্ত বিনম্র-বচনে কহিল—"দেশে এক খুড়ী ছিলেন, সম্প্রতি তাঁর স্বর্গলাভ হয়েছে। খুড়ী মাতৃস্থানীয়, সুতরাং মাতৃশ্রাদ্ধে যে ভাবে কায করতে হয়, সেই হিসেবেই সব করলুম। আমি মশাই একটু বেশী মাত্রায় ধর্ম্মভীরু। বন্ধু-বান্ধবরা, এমন কি, বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত এর জন্তে ছ'একটা কথা ঠারে-ঠোরে আমায় ব'লেও থাকেন, কিন্তু মশাই, কি করব বলুন,—ধর্ম্মটাকে ত তা' ব'লে ফেলে দিতে পারি না;—অসারে খলু সংসারে স্বধর্ম্মপালন আর সাধুসঙ্গ—"

বাধা দিয়া হেম বাবু কহিলেন,—"এক গোছা চুল থেকে খানিকটা কপ্‌চে দিলেই হোত। সে-ও আপনার নেহাৎ অশাস্ত্রিক হ'ত না। নেড়া করতে নাপতে ব্যাটা বোধ হয় পুরো এক আনাই নিয়েছিল?"

"আজ্ঞে, ক্ষুর ধরলেই ত আজকাল এক আনা। ছ'আনার কমে কি আর মাথা নেড়া করে কেউ?"

"চারিদিকেই খরচ—চারিদিকেই খরচ, খরচ ছাড়া আর কথাটি নেই। মশাই গো, কোন যায়গায় বড় একটা যাই নি, দিন-রাত্ত বাড়ীটির মধ্যেই থাকি, তবু চারিদিক্ থেকে খরচগুলো যেন হাঁ ক'রে ঝাঁকড়ে এসে ধরে। এই যে ছেলে-মেয়েগুলোকে পড়াবার জন্তে আপনাকে রাখছি, এটা এক-বারেই শুধু শুধু। মশাই, আমাদের সময়ে মাষ্টার-কাষ্টারের হাঙ্গামাই ছিল না, নিজেরাই ত মানের বই দেখে দেখে পড়া-গুলো করিছি। সেই জন্তেই ত আপনাকে অত ক'রে বলছিলুম যে, এই পাঁচটা ক'রে টাকা দেওয়া শুধু যে একটা অন্যায় ব্যয়, তা নয়, দেওরাও আমার ক্ষমতার অসাধ্য। যাক্, পাঁচ টাকায় তা হ'লে রাজী আছেন ত?"

"একটু আর বিবেচনা—"

"ক্ষমতা নেই। আপনি নিরীহ প্রকৃতির ভাল লোক, ধর্ম্মভীরু, সেই জন্তে পাঁচ টাকা দিয়েও আপনাকে রাখতে চাচ্ছি, নইলে—আর, ধরতে গেলে কায আপনার কিছুই নয়। গুণ্তিতে ওই পাঁচ জন বললুম বটে, কিন্তু কেউ পড়ে প্রথম ভাগ, কেউ দ্বিতীয় ভাগ, কেউ বি, এল, এ,-ব্লে, কেউ সি, এল, এ,-ক্লে।"

"পাচটি ছেলে-মেয়েকেই পড়াতে হবে ত?"

"হ্যাঁ। পড়ানে মানে, সকাল-সন্ধ্যায় ঘণ্টা দুই-আড়াই ক'রে আট্‌কে রাখা। তবে আমার দু'টি নাত্‌নী এই মাসেই এখানে আসবে, তাদের এই শ্যামবাজারের মেয়ে-স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেবো, তাদের পড়া-টড়াগুলো একটু ভাল ক'রে দেখবেন। গান-টান কিছু জানা আছে না কি?"

"আজ্ঞে, যৎসামান্তই।"

"বেশ, বেশ; ভাল ঠাকুর-দেবতার গান নিশ্চয়ই দেবেন মেয়ে দুটোকে একটু-আধটু শিখিয়ে।"

"তা হ'লে অন্ততঃ গোটা আষ্টেক ক'রে টাকা যদি—"

"ক্ষমতা নেই। এ বছরটা পাঁচ টাকাতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকুন, আসচে বছর আমি বরং আর আট আনা ক'রে বাড়াতে দিতে পারি, তার চেষ্টা করব," বলিয়া ছেঁড়া র‍্যাগ্‌খানি আর একবার ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া হেম বাবু একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন।

আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, কাল থেকে তা হ'লে আসবো। দেখুন মুখুয্যে মশাই, টাকা-কড়ির দিকে ঝোঁক দিতে পারি নি, ও জিনিষটার ওপর এম্‌নি আমার আস্থা কম। আপনি ব্রাহ্মণ, বর্ণের গুরু, বিশেষতঃ আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আশীর্ব্বাদ করুন, শ্রীহরির পাদপদ্মেই যেন মরবার দিন পর্য্যন্ত মতি থাকে। লোকে সেই মহা-মাণিকের টাকা

ফেলে সামান্য রূপোর টাকার জন্যে যে কেন লালায়িত, বুঝতে পারি না।" মুহূর্ত্তখানেক থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, —"বাবা আমাদের তিনটি উপদেশ প্রায়ই দিতেন। তিনি বলতেন—'মিথ্যা কথা বোলো না, অর্থলোভ কোরো না, আর স্ত্রীলোকমাত্রেরই পায়ের দিকে চেয়ে কথা কইবে, কুচোখে কা'কেও দেখো না।' তা, শ্রীহরির আশীর্ব্বাদে, মুখুয্যে মশাই, এখনও পর্য্যন্ত তাঁর ওই তিনটি উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করেই আসছি।"

হেম বাবু ইহার আর কোন উত্তর না দিয়া, গভীর তৃপ্তিভরে শুধু কহিলেন,—"নারায়ণ—নারায়ণ." এবং পরক্ষণে আগন্তুকের নমস্কারে হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া, নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন।

আগন্তুক রজনীনাথ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গলীর পথে আসিয়া পড়িল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাহার গ্রে ষ্ট্রীটের নূতন বাসায় আসিয়া, নিদ্রিতা উষার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিতে টানিতে গানের সুরে গাহিতে লাগিল—

"অয়ি সুখময়ী উসে আর কত ঘুমাইবে ?
বালার্ক-সিন্দূর-ফোঁটা—বালিসে মুছিয়ে যাবে।"

উষা জাগিয়া উঠিলে রজনী তাহাকে তাহার নূতন কর্ম্মপ্রাপ্তির শুভ সংবাদ শুনাইয়া দিল। সমস্ত শুনিয়া উষা কহিল,—"এ রকম চশম-খোর লোক ত দেখি নি গো। তুমি কি ঐ পাঁচ টাকায় সত্যিই স্বীকার পেয়ে এলে না কি ?"

"এলুম বৈ কি।"

অবাক্ হইয়া উষা গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

৪

"গো টু বেড্—বিছানায় যাও, গো টু বেড্—বিছানায় যাও, জি, ও—গো, গো মানে বিছানায়,—আচ্ছা মাষ্টারমশাই, বোতলচুরের মাঞ্জা দিলে সুতো প'চে যায় ? সে দিন কেলোদের ঘুড়ির সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে গিয়ে—"

সকালবেলা তাহার নূতন ছাত্রদলকে লইয়া রজনী পড়াইতে বসিয়াছিল। চুণিলালকে একটা ধমক দিয়া বলিল, —"পড়বার সময় ও-সব কথা নয়, প'ড়ে যাও। পান্না, তুমি পড়ছ না যে ? বই খুলে হাঁ ক'রে বাইরের দিকে কি দেখছো ?" পান্নালাল তখন বাহিরের আকাশ হইতে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বিতীয় ভাগের পাতার উপর ফিরাইয়া আনিয়া, ঘাড় ও জিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল—"বাল্যকালে মন দিয়া লেখা-পড়া শিখিবে। লেখা-পড়া শিখিলে সকলে তোমায় ভালবাসিবে— বে—এ—এ—এ।" চুণিলাল ইতিমধ্যে 'গো টু বেড' হইতে এক লাফে একবারে সেই পাতার নীচে আসিয়া সুরু করিল,—"হেম ইজ ইল্, হেম মানে—" টপ্ করিয়া সেই সময় তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট শোভা জিভ্ কাটিয়া চুণির দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"মেজদা !"

রজনী শোভার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে ?"

শোভা একটু জড়সড় হইয়া, মুখের উপর তাহার খোলা প্রথমভাগখানি আড়াল করিয়া ধরিয়া কহিল,—"ও ত বাবার নাম, সকালবেলা যে মুখে আন্‌তে নেই। সকলে বলে যে, তা' হলে না কি ভাতের হাঁড়ি—"

রজনী শোভাকে একটা ধমক দিয়া পড়িয়া যাইতে বলিল। ধমক খাইয়া শোভা আবার তাহার প্রথম ভাগের ছবি দেখিতে লাগিল, পান্নাও তাহার—'বাল্যকালে মন দিয়া'র উপর বেশী করিয়া মনঃসংযোগ করিল, চুণিও পড়িয়া যাইতে লাগিল ; কিন্তু হঠাৎ সে থামিয়া গেল এবং রজনীর কাছে সরিয়া আসিয়া, তাহার পড়ার স্থানটিতে আঙুল দিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মাষ্টারমশাই, দেখুন ত একবার,—এটা ত—'এ ম্যাই ফক্স বেট্ এ হেন্', কিন্তু বড়দা' সেদিন বল্‌ছিল— 'দেশলাই বাক্স মাঠে আন্'। কোন্‌টা হবে মাষ্টারমশাই ?"

রজনী তখন নিরুপায় হইয়া চুণির পিঠে এক ঘা দুম্ করিয়া বসাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সামনের বাড়ীর কোন একটা ঘরের ঘড়ীতেও ঢং ঢং করিয়া নয় ঘা বাজিয়া গেল। রজনী তখন ছাত্রদের ছুটী দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ও-ধারের বড় ছেলেটির উদ্দেশে কহিল,—"হীরু, তোমার গুণটা এখনও হ'ল না ?" বলিয়া শ্লেটখানি তাহার হাত হইতে লইয়া দেখিল যে, গুণের পরিবর্ত্তে হীরালাল প্রকাণ্ড এক বেগুণ আঁকিয়া, তাহার তলায় বড় বড় করিয়া লিখিয়াছে—'পুড়িয়ে খাবো'।

এমন সময় হেম বাবু একখানা গামছা পরিয়া খালি গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে আসিয়া দর্শন দিলেন। রজনী যোড় হাত কপালে ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি কহিলেন,—"কল্যাণমোস্তু—কল্যাণমোস্তু. কি শীতটা পড়েছে, মাষ্টারমশাই ? এরি মধ্যেই উঠছেন না কি আটটা বাজলো না, ছেলে-মেয়ের এরি মধ্যে পড়া-টড়া সব হয়ে গেল ?"

"আজ্ঞে, ন'টা বেজে গিয়েছে। সাতটার সময় এদের নিয়ে বসেছিলুম। এইবার বাসায় যেতেই সাড়ে ন'টা হবে, তার পর স্নান ক'রে, পুজো আহ্নিক সেরে উঠতেই একটা বেজে যাবে। হয় না মুখুয্যেমশাই, সংসারের ভেতর থেকে ভগবান্‌কে ডাকবার সুবিধে হয় না। এ রকম ক'রে যে আর কত দিন—"

"তা সকাল সকালই যান, দরকার থাকলে এক আধ দিন সকাল সকালই চ'লে যাবেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আপনি ভগবদ্‌ভক্ত, সাধু ব্য—"

"আজ্ঞে, কিছুই না—কিছুই না। চন্দননগরে একটু সুবিধে ক'রে আনছিলুম বটে, কিন্তু মুখুয্যেমশাই, এ পথে বিঘ্ন ঢের! শেষকালে নিজের সহধর্ম্মিণীই বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়ালো। এম, এ, বি, এল, পাশ ক'রে যে দিন সার্টিফিকেট্‌গুলো এক-একখানা ক'রে ঠাকুরের পায়ের তলায় ছিঁড়ে ফেলে দিলুম—"

বাধা দিয়া হেম বাবু কহিলেন,—"আর বলবেন না—বলবেন না। নারায়ণ! নারায়ণ!—আর আপনাকে দেরী করাব না, একটি কায আপনাকে আজ ক'রে দিয়ে যেতে হবে; বেশী কিছু নয়, সামান্যই।"

"কি বলুন দেখি? সামান্য হোক্—অসামান্য হোক্, তাতে কি হয়েছে? কর্ম্মময় জগৎ, কর্ম্মই হচ্ছে নারায়ণ, কর্ম্মের জন্যই ভগবান্ কূর্ম্ম অবতার হয়েছিলেন। পূর্ব্বে বেনারসেই ছিলাম, কর্ম্মক্ষেত্র ওইখানেই মহান্। এখানে চন্দননগরে এসে গৌরীর মাকে ঝি রাখলুম, সেই শেষ-কালে ক্রিয়াকাণ্ড সব পণ্ড ক'রে দিলে! বলি, দুটি আহার আর নিদ্রা, সে ত পশুতেও করে। জগতের কর্ম্ম করা, পরহিত, শ্রীভগবানে—"

"নারায়ণ! নারায়ণ! আর তা হ'লে আপনার দেরী করাব না। হয়েছে কি জানেন? স্নান ক'রে উঠে বসতে গিয়ে, মাষ্টারমশাই, কাপড়খানা ফ্যাঁস্ ক'রে ফেঁসে গেল। অন্য কাপড়গুলো সব এখন তোরঙ্গে তোলা রয়েছে, আবার এখন বার করব! ছেলেদের একখানা পরতে গেলুম, হয় কি জানেন?—একটু মোটা-সোটা লোক কি না, ছেলেদের পাঁচহাতি কাপড়ে সব দিকটা ঠিক ঢাকা পড়ে না, একটু—"

"একটু এ হয়,—বুঝিছি। তা, তার জন্যে কি, আপনি পাঠিয়ে দিন, আমি সুন্দর ক'রে সেলাই ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। যান—আর শুধু গায়ে কাঁপবেন না, কাপড়খানা আর ছুঁচ-সুতো পাঠিয়ে দিন।"

মিনিট পাঁচেক পরে চুণিলাল কাপড় ও ছুঁচ-সুতা লইয়া লাফাইতে লাফাইতে নাচিতে নাচিতে আসিয়া রজনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টারমশাই, হাঁসের ডিমের মাঞ্জাই ভাল, না মাষ্টারমশাই?"

অতঃপর রজনী সেলাই করিতে করিতে চুণিলালের সহিত নিম্নোক্ত প্রকারের আলাপে প্রবৃত্ত হইল।

"আচ্ছা চুণি, খুব ভাল মাঞ্জা দেওয়া এক লাটাই সুতো তুমি নেবে?"

"কে দেবে, মাষ্টারমশাই?"

"আমি।"

"ওঃ! তা হ'লে—ঠিক দেবেন মাষ্টারমশাই?"

"ঠিক দেবো।—আচ্ছা, চুণি!"

"কি, মাষ্টারমশাই?"

"সামনের ওইটেই বুঝি তোমাদের রান্নাঘর?"

"হ্যাঁ, মাষ্টারমশাই।"

"যে রাঁধে, ও বুঝি তোমাদের রাঁধুনী? তোমার মা রাঁধে না?"

"মা'র যে অসুখ, মা ত রাঁধতে পারে না। রাজা মাসী রোজ সকালে এসে রাঁধে, সমস্ত দিন থাকে, তার পর সেই রাতে, আমাদের সব খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, তখন বাড়ী যায়।"

যাহার সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর হইতেছিল, চুণির সেই রাজা মাসী এই সময় এ দিকের জানালার সামনে আসিয়া পড়িয়াই রজনীকে দেখিয়া সরিয়া গেল।

"আচ্ছা, চুণি, লাটাই নেবে তা হ'লে?"

"হ্যাঁ, মাষ্টারমশাই।"

"আচ্ছা, আমার তা হ'লে একটা কায করতে পারবে? কিন্তু কাকেও বলবে না, খুব চুপি চুপি, কেউ যেন না টের পায়!"

"মাকেও বলব না? পান্নাকে?"

"কাকেও নয়। তা হ'লে কিন্তু লাটাই পাবে না।"

"আচ্ছা মাষ্টারমশাই। কি কায করতে হবে, বলুন।"

পকেট হইতে ছোট্ট একটু ভাঁজ করা কাগজ বাহির করিয়া চুণির হাতে দিয়া রজনী কহিল, "এইটে খুব লুকিয়ে নিয়ে

গিয়ে তোমার রান্না মাসীর হাতে দেবে। কেউ যদি দেখতে পায়, বা আর কা'কেও যদি বল, তা হ'লে কিন্তু লাটাই পাবে না।"

চুণিলাল ঘাড় নাড়িল এবং কাগজটুকু লইয়া বরাবর বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। রজনী রান্নাঘরের খোলা জানালা দিয়া চুণিকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেখিয়া, মনে মনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশের নাম স্মরণ করিতে করিতে বাটী হইতে বাহিরের গলীর পথে আসিয়া পড়িল।

৮

সেই দিন অপরাহ্নে উষা তাহার রাস্তার ধারের ঘরখানির জানালায় বসিয়া লোক-চলাচল দেখিতেছিল। রজনী বাসায় ছিল না। সেই সময় একটি ২৬।২৭ বৎসরের বিধবা স্ত্রীলোক ফুটপাত দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ উষাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া গেল এবং মিনিটখানেক উষার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবার পর জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাসা বুঝি ভাড়া নিয়েছেন?"

"উষা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে ত চিনতে পারলুম না, ভাই।"

স্ত্রীলোকটি কহিল, "সেই যে সে দিন গঙ্গার ঘাটে আলাপ হ'ল, এরি মধ্যে ভুলে গেলে, দিদি?"

উষা লজ্জিত হইয়া কহিল, "মুখে আগুন আমার! এস ভাই, এস, দোর খুলে দি, ঘরের ভেতর এস।"

স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে আসিলে উষা তাহাকে কহিল, "তোমার নামটি ভাই ভুলে গিয়েছি। গিরিবালা,—না?"

"চারুশীলা।"

"ঠিক্ ঠিক্, সেই কোন্ বাবুদের বাড়ীতেই ত কায কচ্ছ? না, কায ছেড়ে দিয়েছ?"

"না দিদি, ছাড়লে কি ক'রে চলবে বল। উনিশ বছর বয়সে কপাল পোড়বার পর থেকে ওদের আশ্রয়েই এক রকম কেটে যাচ্ছে। নইলে, বুড়ো শাশুড়ীকে নিয়ে কি কর্ত্তুম, দিদি! কেউই ত আর নেই।"

সমবেদনার ভাব মুখে আনিয়া উষা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ বেলা-বেলিই যে বাসায় চ'লে যাচ্ছ?"

"শরীরটে আজ ভাল নেই, দিদি। শরীরটেও ভাল নেই, মনটাও ভাল নেই।" মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া আবার চারু কহিল, "মেয়েমানুষের যে কত শত্রু, কত বিপদ, তা আর বলবার নয়।"

উষা ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দেখি?"

"আজ ৭।৮ বছর ধ'রে ঐ বাড়ীতে কায কচ্ছি দিদি, কোন দিনই কিছু ঘটে নি, নির্ভয়ে নির্ভাবনায় কায ক'রে আসছি। এক পোড়ারমুখো মাষ্টার আজ ক'দিন হ'ল কোত্থেকে ওদের বাড়ীতে এসেছে, তার কাণ্ড একবার দেখ দিদি! আজই কর্ত্তাকে জানিয়ে দিতুম, জানালুম না; কাল সকালে এসেই বোলব এখন।"

এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে এক টুকরা কাগজ খুলিয়া চারু উষার কোলের উপর ফেলিয়া দিল। উষা উহা দেখিয়া এবং পড়িয়া কিছুক্ষণের জন্য নীরবে বাম হস্তের উপর বাম গণ্ড স্থাপন করিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বাহির হইয়া গেল। তাহার এই হঠাৎ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া চারু জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছো, দিদি?"

উষা সোজা হইয়া বসিয়া কহিল,—"তোমার দেহ খারাপ, তুমি ঘরে যাও। তোমার বাসার ঠিকানাটা আমায় লিখে দিয়ে যাও ত ভাই। আমার বিশেষ একটু দরকার আছে, একটিবার সন্ধ্যার সময় আজ আমি তোমার কাছে যাব। এ ব্যাপার নিয়ে তুমি কিছু ভেব না, আর কারুকেই কিছু বলো না, এর সব ব্যবস্থাই আমি ক'রে দেবো এখন।"

চারু উষার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। উষা কহিল,—"একটু আশ্চর্য্য হচ্ছ, না? তা' হও, কিন্তু কিছু ভেবো না বোন্, কোন ভয় নেই। প্রেমিক পুরুষটাকে একটু প্রেম দিতে হবে, তোমার দ্বারা তা হবে না, আমিই তার ব্যবস্থা ক'রে দেবো," বলিয়া চিঠিখানার এক ধারে চারুর বাসার ঠিকানা লিখিয়া লইবার জন্য পেন্সিল আনিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

* * * * *

শীতের সন্ধ্যা এইমাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। চারুর টীনের ঘরের সম্মুখে ও ধারে যে শিবমন্দিরটি ছিল, তন্মধ্যে এখন আরতি হইতেছিল। আরতির বাদ্য থামিয়া গেলে চারু ও

ঊষা উভয়েই তাহাদের যোড়হাত মাথায় ঠেকাইল, তাহার পর ঊষা কহিল,—"যা ভাই, কাগজ, দোত, কলম নিয়ে আয় এইবার।"

চারু হাসিতে হাসিতে কহিল,—"না দিদি, ওসব আমি পারব না, আমার লজ্জা করে।"

তাহার পিঠে ছোট একটি কিল মারিয়া ঊষা কহিল,—"যা বলছি, নইলে গিয়ে বোলে দেবো এখন, এবার চিঠির বদলে নিজেই গিয়ে তোর রান্নাঘরে ঢুকবে। নে, ওঠ, যা বলি, তাই লেখ। আমিই লিখতুম, আমার হাতের লেখা যে ধরতে পারবে। এবারকার চিকিৎসা একটু ভাল ক'রে করতে হবে কি না।"

অগত্যা চারু দোয়াত, কলম, কাগজ লইয়া বসিল এবং ঊষা যেমন যেমন বলিয়া দিল, সেইরূপ লিখিল। সবটা লেখা হইলে ঊষা চারুকে পড়িতে বলিল। চারু চিঠিখানা ঊষার সামনে ফেলিয়া দিয়া কহিল,—"পড়তে-টড়তে আমি পারব না,—তুমি পড়।" সুতরাং ঊষাই উহা মনে মনে পাঠ করিল ঃ—

"প্রিয়তম,

তোমাকে দেখে পর্য্যন্ত কি হয়ে যে আছি, তা আর কি বলব, বলতেও বুক ফাটে, মাথার ভেতর গোলমাল হয়ে যায়। আসছে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর উপরের ঠিকানায় আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিও। বাড়ী ঢুকে সামনেই আমার ঘর, দরজায় খড়ি দিয়ে আমার নাম লেখা দেখবে। বেশী আর কি লিখবো, মেঘের আশায় চাতকিনী মৃতপ্রায়। মাথার দিব্বি এসো—এসো—এসো।

ইতি তোমারই"

চারু কহিল,—"না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, ও আমি দিতে পারব না।"

"তোর ঘাড় যে সে দেবে" বলিয়া ঊষা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া কহিল,—"ব'লে গেছে, আজ ফিরতে রাত হবে, তা হলেও যাই এইবার। যেমনভাবে আজ চিঠিখানা পেয়েছিস, ঠিক তেমনিভাবে সেই খোকাটিকে দিয়ে কাল দিবি।"

চারু কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঊষা তৎপূর্ব্বেই ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

৬

আজ মঙ্গলবার। বৈকালে পড়াইতে আসিয়া রজনী হেম বাবুর হস্তে দুইখানি দশ টাকার নোট দিয়া কহিল,—"যা বজুদি বকে এ দিয়েছেন, তা আর আপনাকে কি বলবো। গুরুদেব এ সব আর করতেই চান না, বলেন যে, সাধনার ব্যাঘাত হয়।"

প্রসন্নমুখে নোট দুইখানি নাড়িতে নাড়িতে হেম বাবু কহিলেন,—"অদ্ভুত ক্ষমতা বটে! আচ্ছা, তাঁর ঠিকানাটা আমায় বলেই দিন না, আমি কারুকে বোলব না।"

"মাপ করবেন, ঠিকানা বলতে তাঁর বিশেষ নিষেধ আছে। এই সবের জন্যে পাছে লোক বিরক্ত করে, সেই জন্যে অত্যন্ত গোপনেই তিনি থাকেন। এই টাকা বা নোট ডবল্ করা, এ, তিনি বলেন—যোগসাধনার প্রণবভাগ—'কর' 'খল'। এই সব নিয়ে থাকলে সাধনার উচ্চমার্গে যাওয়ার ব্যাঘাত হয়। গুরুদেবের ক্ষমতার কথা কি আর আপনাকে বোলবো, মুখুয্যেমশাই! টাকা-পয়সায় আমার লোভ নেই, ঘর-সংসার, স্ত্রীলোক, খাওয়া-পরা, কিছুতেই আর আমার আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু গুরুদেবের একটু কৃপা পাবার লোভেই তাঁর কাছে কাছেই আমার থাকা। হরি-হরি!"— রজনী তাহার গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া যুক্তকর কপালে স্পর্শ করিল।

তাহার পর কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরবে রহিল। অবশেষে হেম বাবু কহিলেন,—"মাষ্টারমশাই, আপনাকে আমি বাড়ীর মাষ্টার ব'লে ত ঠিক মনে করি না। ছোট ভাই বলেই মনে করি, নইলে পাঁচ টাকার যায়গায় ছ'টাকা দিতেই বা কি, আর দশ টাকা দিতেই বা কি। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক্,—বলছি কি, আর একটিবার কষ্ট একটু করতেই হবে। এবার খান পঞ্চাশেক নোট দেবো, এইটি ডবল ক'রে এনে দিতেই হবে। এতে 'না' বলতে আপনাকে কিছুতেই দেবো না।"

রজনী অস্বীকার করিয়া কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, হেম বাবু তাহা বলিতে না দিয়া কহিলেন,—"বড় ভাই হিসেবে যদি না-ও ধরেন, ব্রাহ্মণ হিসেবে এই অনুরোধটুকু আমার রাখবেন না, মাষ্টারমশাই? বলুন তা হ'লে, আপনার সামনে এই পৈতের গোছা ছিঁড়ে ফেলি!" বলিয়া হেম বাবু পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত হইলে, রজনী হা-হা করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং অবনতমুখে কহিল,—"আচ্ছা, নিয়ে আসুন, কিন্তু এর 'পর আর যেন কখনও আমার অনুরোধ করবেন না।"

হেম বাবু প্রফুল্লচিত্তে বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন এবং অল্পসময়ের মধ্যেই দশ টাকার হিসাবে পঞ্চাশখানা নোট আনিয়া রজনীর হাতে দিলেন। রজনী যেন মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইয়াই উহা গ্রহণ করিল।

সন্ধ্যার ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বিছানার উপর পাঁচ শত টাকার নোটের গোছা রাখিতে রাখিতে রজনী গুণ-গুণ স্বরে গান ধরিল—

"মরি হায়—হায় রে!

হায় রে, হায় রে, হায় রে, হায় রে, হায় রে, হায় রে,

—হায়-য়-য় য় রে।"

ঊষা জিজ্ঞাসা করিল,—"এত টাকা কার গো?"

রজনী সুরে উত্তর দিল—"মরি হায়—হায় রে!" তাহার পর বাসি-ধোয়া জামা-কাপড়ের পাট খুলিতে খুলিতে ঐ সুরের সঙ্গেই কহিল,—

"শরীরং বড্ডই খারাপং,

ফিরতে একটু রাতং হবে—

(রাই) একটু রাতং হবে—এ-এ-এ।"

রজনীর মুখের দিকে চাহিয়া ঊষা জিজ্ঞাসা করিল,—"তা, অসুখ-শরীর নিয়ে আবার বেরুচ্ছ কোথায়? আজ আর না বেরুলেই নয়?"

তাহারই শেষ কথা তিনটির প্রতিধ্বনি করিয়া রজনী কহিল,—"না বেরুলেই নয়।"

"না, আজ আর তুমি বেরুতে পারবে না। শেষকালে অসুখ-শরীরে ঠাণ্ডা লাগিয়ে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসবে! কোথাও আজ আর তোমার যাওয়া হবে না। চা খাবে, ক'রে দেবো এক কাপ?"

জামার বোতাম দিতে দিতে রজনী একটু বিরক্তির স্বরে কহিল,—"আঃ! বড্ড বিরক্ত কর তুমি! বলছি,—বিশেষ দরকারী একটা কায আছে!"

"কি এমন দরকারী কায যে, আজই যেতে হবে? দরকারী কায থাকে, কাল যেও, আজ এই ঠাণ্ডায় অসুখ-শরীর নিয়ে তোমার কিছুতেই বেরুতে দেবো না।"

বলিয়া ঊষা রজনীর জামা খুলিয়া ফেলিতে গেল। তাহার হাতখানাকে জোরে ঠেলিয়া দিয়া রজনী কহিল,—"আঃ! তুমি কিছু বোঝ না, শুধু শুধু জ্বালাতন কর। বাজ রকমের কি কায থাকে, তা তুমি বুঝবে কি ক'রে? হয় ত এতক্ষণ সব এসে আমার অপেক্ষায় ব'সে রয়েছে।"

"কোথায়—কারা?"

"ফিরিঙ্গীগড়ের মহারাজ, দইহাটার জমীদার, ক্যাপ্টেন কুট, মিসেস্ চেরি শীলান—ভয়ানক দরকারী কায, সন্ধ্যার পরই যাবার কথা।"

"তা, চা-টা খেয়েই না হয় যাও। সন্ধ্যের ত এখনও অনেক দেরী।"

"তুমি কিছুই বোঝ না। নতুন যায়গা, ঠিকানা খুঁজে বার কত্তেই হয় ত কত সময় যাবে। আর তা ছাড়া, ওখানে যাবার আগে আর এক যায়গায় একটা কায সেরে তবে যাব।"

ঊষা আর কোন কথা কহিল না, দেওয়াল ধরিয়া শুধু দাঁড়াইয়া রহিল।

৭

"প্রিয়ে চারুশীলে, মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্, কথা কও। চুপ ক'রে জড়সড় হয়ে ব'সে রইলে কেন? লজ্জাবতি, লজ্জা দূর কর।"

সন্ধ্যার পর চারুশীলার ঘরের তক্তপোষের উপর বসিয়া রজনী, দূরে মেজের এক ধারে উপবিষ্টা অবগুণ্ঠনবতীর উদ্দেশে উক্তরূপ নিবেদন জানাইতেছিল। অবগুণ্ঠনবতী তেমনই ভাবেই আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। রজনী কহিতে লাগিল,—"নয়নানন্দদায়িনি, পদ্মমুখ থেকে ঘোমটা খুলে ফেলে দিয়ে নয়নের আনন্দ দান কর, আমার তপ্ত প্রাণ শীতল কর।"

লজ্জাবতী তেমনই জড়সড় হইয়াই বসিয়া রহিল; না একটু নড়িল, না একটা কথা কহিল, না সরাইল তাহার পদ্মমুখের ঘোমটার আবরণ।

রজনী কহিয়া যাইতে লাগিল,—"নব প্রণয়ানুরাগের সময় এই রকম হয়, তা জানি। প্রণয়ীর উচিত, এই সময় নিজহাতে প্রণয়িনীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা। চন্দ্রমুখি, চকোরের পিপাসা মিটাও," বলিয়া রজনী উঠিয়া গিয়া চন্দ্রমুখীর চন্দ্রমুখ হইতে নিজহাতে আবরণ সরাইয়া ফেলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই একবারে চমকাইয়া উঠিয়া, হতভম্বের মত

সেইখানে সেই মেজের উপরেই টাল্ খাইয়া বসিয়া পড়িল; তাহার সমস্ত মুখখানা নিমেষে রক্তশূন্য হইয়া ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। ঊষা তাহার গায়ের চাদর খুলিয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং রজনীর হাত ধরিয়া বরাবর বাহিরে টানিয়া আনিয়া, যেখানে অন্ধকারের মধ্যে চারু একাকী চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সেইখানে জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া কহিল,—"পায়ের ধুলো মাথায় নাও, মা ব'লে ডাক, আর কায়মনোবাক্যে প্রতিজ্ঞা কর, আজ থেকে আমি ছাড়া আর সকল স্ত্রীলোককেই নিজের গর্ভধারিণী মা ব'লে মনে করবে।"

তাহাই হইল। মন্ত্রশক্তির দ্বারা যেন চালিত হইয়া রজনী ঊষার আদেশ পালন করিল, কিন্তু পরক্ষণেই সেই অন্ধকারের মধ্যে রজনী হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। দুই দিন ধরিয়া আর তাহার কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার সময় রজনী বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, ঊষা ও চারু দুই জনেই তাহার ঘরে বসিয়া রহিয়াছে। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রজনী চারুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মা, আজ থেকে এই ছেলের ওপরেই তোমার সকল ভার ফেলে দিতে হবে, ছেলের এই সংসারেই তোমার মায়ের আসন পাত্‌তে হবে।"

রজনীর চেহারায় ও কণ্ঠস্বরে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তনের ভাব পরিলক্ষিত হইল। যেন সত্যই সে এত দিন পরে জগতের নারীজাতিকে কায়মনোবাক্যেই মাতৃজ্ঞান করিতে পারিয়াছে। তাহার কলুষিত কুৎসিত জীবনের ধারা, এই দুইটি দিনের মধ্যেই যেন বদলাইয়া গিয়াছে। তাই, পরক্ষণেই ঊষার দিকে চাহিয়া কহিল, "এত দিনের পর ভগবান্ যদি ক্ষমা করতে পারলেন ত তুমিও কোরো, ঊষা। তার পর, প্রায়শ্চিত্ত যদি কিছু থাকে, সে-ও আমি করব, আর চির-জীবনের লোকসানের পর লাভ যদি কিছু তুলে নিতে পারি, তা-ও আমি ছাড়ব না।"

ঊষা ও চারু নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

সিংহের গান

পশুর রাজা পশুই আমি অধিক কিছু নই ত,
তাই মানুষের হাতে প'ড়ে এতই নাকাল সই ত।
চিরকালই লাফাই ঝাঁপাই,
গর্জ্জনেতে বনটা কাঁপাই,
হাঁকর এবং কামড় দিয়ে
লাভটাও বেশ হইত।

এ কি বাবা! মানুষ বলে, আমায় খেলা করতে,
ঘাড় নোয়াতে, দাঁত দেখাতে, ইচ্ছা করে মরতে।
মানুষ চড়ে আমার পিঠে
পেটে গুঁতা দেয় যে মিঠে,
দেখছি এবার মানে মানে
হবেই হবে সরতে।

ল্যাজে আমার দেয় যে বেঁধে ঝুমঝুমি আর ঘণ্টা,
হুঙ্কারে কেউ ভয় করে না, রাগেই বেরোয় প্রাণটা।
খেলেছিলাম অনেক খেলা
পাইনি কোথাও এমন ঠেলা,
শক্ত আমি রক্ত আমার
একেবারেই ঠাণ্ডা।

সিংহ আমি পশুর রাজা হায় রে হা হা হন্ত,
নিত্য গজমুক্তা তাজি মাজি শাণাই দন্ত,
মূর্ত্তি হেরি কাঁপত ধরা,
এই যে থাবা রক্ত-ঝরা,
সার্কাসে আজ কাজ ক'রে মোর
সকল সুখের অন্ত।

গভীর রাতে স্বপন দেখি চতুর্দ্দিকে চাই রে,
আমার হাড়ে এমন ক'রে ঘুণ ছিটালে তাই রে।
হিংসাতে আর নাইক রুচি,
একটুখানি আরাম খুঁজি,
চোখ মুদিলেই দেখছি হবে
মানুষরেই ঠাঁই রে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কৈলাস-যাত্রী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এই ধারচুলা তপোবন হইতে সকল কৈলাসযাত্রীরই এক-যোগে যাত্রা করিবার কথা হইয়াছিল। এখান হইতে আগে যাইয়া যে সকল গ্রাম বা বস্তি পড়িবে, সেখানে খাদ্যদ্রব্যাদির মধ্যে দুই এক স্থানে ঘৃত, আটা, গুড় বা মিছরী পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কৈলাস হইয়া পুনরায় ধারচুলা পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিতে মাসাধিককাল পথে খুটিনাটি অনেক কিছুরই আবশ্যক হইতে পারে, এই মনে করিয়া আমাদের মধ্যে প্রত্যেক যাত্রীই অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া লইলেন, কাহার কোন্ কোন্ জিনিষ লওয়া এখনও বাকী রহিয়াছে। আমরা একে গৃহী, তায় দুই দুই জন স্ত্রীলোক সঙ্গে, এই দুর্গম পথের পথিক হইয়া না জানি কতই না কষ্ট ভোগ করিব, এ ধারণা স্বতঃই আমাদের মনে উদয় হইতেছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া স্বামীজী পাঁচ জনেরও এ সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা যে কম চিন্তা ছিল, ইহা যেন পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ মনে না করেন। কেরোসিন তৈল হইতে, পথে পরিধানের কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার সাবান পর্য্যন্ত খরিদ করিয়া লওয়া হইল। তপোবনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দজীর নিকটে এ সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু উপদেশ পাইয়াছি, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক কৈলাসযাত্রীর কৈলাসযাত্রার পূর্ব্বে, পথে এই তপোবনে বিশ্রামলাভ করিয়া, উক্ত স্বামীজীর নিকট হইতে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জানিয়া তবে কৈলাস যাইবার ব্যবস্থা করিলে যাত্রিগণ পথের কষ্ট অনেকটা বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইবেন।

যাত্রিগণ যাঁহারা আমিষভক্ত অর্থাৎ মাংস-প্রিয়, তাঁহাদের এ পথে অগ্রসর হওয়া তাদৃশ কষ্টসাধ্য নহে। অল্পমূল্যে ক্রীত ছাগ বা ভেড়ার মাংসে একটু মশলা সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেই ওখানে সুলভ ঘৃত ও লবণসংযোগে তাঁহাদের এই মাসাধিককাল যাত্রার পথে, রসনার এক প্রকার উপাদেয় বস্তুই লাভ হইয়া থাকে। তাহাতে বিশেষ কিছু অরুচি ঘটিবার অবকাশ ঘটে না। অধিকন্তু দুর্গম শৈল-শিখরে চড়াই-উতরাই করিতে তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত হইতেই দেখা যায়। কিন্তু আমাদের মত নিরামিষাশীর পক্ষে এ পথে কোথায় আলু, কোথায় বড়ি (মশলাযুক্ত), কোথায় অরুচির মুখে তেঁতুল পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া রাখা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামীজীদের মধ্যে কালিকানন্দজী এবং গৃহস্থ যাত্রীর মধ্যে পাবনানিবাসী শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এবং উত্তর-পাড়ানিবাসী ঘোষ মহাশয় নিরামিষাশী ছিলেন। বাকী সকলেরই অর্থাৎ কলিকাতানিবাসী ডাক্তার কয় জন, অপরাপর স্বামীজীরা—শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ ও ভূপসিং—ইঁহাদের এ পথে মাংসের আস্বাদ খুবই তৃপ্তিকর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এ ব্যাপারে আমিষ-প্রিয় স্বামীজী, তথা ডাক্তারদের দলে শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ যোগদান করিয়া যেমন তাঁহাদের নিকট ক্রমশঃ প্রিয় হইয়া উঠিতেছিলেন, এ দিকে কালিকানন্দজীও আমাদের দলে ভিড়িয়া আমাদিগকে ততোধিক আনন্দ দান করিতে বিরত ছিলেন না। এইরূপে আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়া যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিলাম। এ কয় দিনে শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আমাদের সহযাত্রী ডাক্তারদিগের "এমিটিন্ ইন্‌জেক্‌সনে" (যদিও আমাদের সঙ্গে বেঙ্গল কেমিকেলের ঔষধাদির বাক্স ছিল) সে যাত্রায় অল্পেই রোগের নিবৃত্তি হইয়াছিল। জিনিষপত্র যাহার যাহা খরিদ করা বাকী ছিল, কালিকানন্দজীর দ্বারা এখানে ক্রমশঃ তাহা সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইল। দেখিলাম, বাজারদর মোটের উপর এখানে মন্দ নহে। যাহা এ পথে মূল খাদ্য বলা যায়, অর্থাৎ ঘৃত ও আটা এখানে উৎকৃষ্ট ও সুলভ। খাঁটি ঘৃত টাকায় তের ছটাক, আটা টাকায় নয় সের, মিছরি ও চিনি টাকায় দেড় সের; গুড় (ভেলি) বারো আনায় আড়াই সের, লবণ তিন আনায় এক সের হিসাবে যাত্রিগণ পাইতে পারেন। চাউল খুব পুরাতন না পাওয়া গেলেও নূতন পাওয়া যায়। তরকারীর মধ্যে আলু পাইলাম না। আলমোড়া হইতে ক্রীত আলুই আমাদের ভরসা ছিল। এখানে শুধু কাঁচা ও পাকা কলার রাজত্ব বলা যাইতে পারে। যাত্রিগণ ছয় গণ্ডা মাত্র পয়সা খরচ করিলেই এক কাঁদি কলা পাইতে পারেন। পথে আর যদি কোথায়ও আলু না পাওয়া যায়,

এই জন্যে, যে কয় দিন এখানে থাকা হইল, বাঙ্গালাদেশের মত "মোচার ঘণ্ট," "থোড়ের ছেঁচকি" এবং কাঁচকলার তরকারীই আমাদের প্রধান খাদ্য হইয়াছিল। এখান হইতে যাইবার সময়ে পর্য্যন্ত এক কাঁদি কাঁচকলাও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। 'অযাত্রা' বলিয়া যদিও ইহার একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে, তথাপি এই কাঁচকলা সঙ্গে ছিল বলিয়া শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের আমাশয় রোগে ইহা কিন্তু ধন্বন্তরির মত কার্য্য করিয়াছিল।

এই সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া লইতে ৩।৪ দিন বিলম্ব হইয়া গেল। পথে আসিতে সরযূতটে (শেরাঘাটে) এক দল

গার্ব্বিয়াং

পঞ্জাবযাত্রী কৈলাস উদ্দেশে আসিতেছিলেন দেখিয়া অবধি আমারা সকলেই তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহারা আসিয়া না পৌঁছায়, আর কেহই বিলম্ব করিতে চাহিলেন না; যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অগত্যা অচ্যুতানন্দজী এইবার "খেলা" নামক গ্রামের 'জুমা' হইতে কুলী সংগ্রহ করা আবশুক মনে করিলেন। গার্ব্বিয়াং প্রভৃতি স্থানে যাইতে গেলে সাধারণতঃ এখান হইতে কুলী ভাড়া করা হইয়া থাকে। এই কুলীদিগের সর্দার-শ্রেণীকে এ সকল দেশে 'প্রধান' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। প্রধানকে ডাকা হইলে, তদনুসারে প্রধান আসিয়া তপোবনে উপস্থিত হইল এবং যাত্রীর দল, তথা তাঁহাদের প্রত্যেকের লগেজের বহর দেখিয়া প্রথমটা সে এক গাল হাসি হাসিয়া, সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ ও ভাড়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল। যাত্রীদিগের মধ্যে দুই জন স্ত্রীলোক যাত্রী দেখিয়া, তাঁহারা কিরূপে যাইবেন, এ কথাটা প্রথমেই প্রশ্ন করায় স্বামীজী বলিলেন, ইঁহারা আলমোড়া হইতে বরাবর ডাণ্ডীতে আসিয়াছেন। গার্ব্বিয়াংও ডাণ্ডী সহযোগে তোমরা লইয়া যাইতে পারিবে কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে প্রধান একবারেই অস্বীকার করিল।

চড়াই-উতরাইএর সংকীর্ণ পথে ডাণ্ডী লইয়া যাওয়া একবারেই চলে না, এ কথা স্পষ্টতঃ জানাইয়া দিলে স্বামীজী অগত্যা এক অভিনব বাহনের ব্যবস্থা করিলেন। সে বাহনের ব্যবস্থা শুনিয়া আমরা সকলেই একযোগে হাসিয়া উঠিলাম। এ যাত্রার পাঠকবর্গ আপনারাও কিন্তু এই অভিনব বাহনের ব্যবস্থা শুনিয়া হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ; কারণ, এ বিষয় কল্পনা করিতে গেলে, একমাত্র মহাপ্রস্থানেরই চিন্তা আসিয়া মনে উদয় হইয়া থাকে। আর পাঠিকার মধ্যে যদি কাহারও কৈলাস-দর্শনের সাধ হইয়া থাকে, তবে যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহাকেও একবার এ বিষয় চিন্তা করিয়া লওয়া আবশুক।

কৈলাস মহাপ্রস্থানে যাইবার পথ বলিয়া, হয় ত সে পথে যাইবার ব্যবস্থা তাহারই অনুরূপভাবে তৈয়ারী হইয়া থাকিবে! ছয় সাত হাত লম্বা একটি বাঁশের দুই দিকে মজবুত দড়ির দ্বারা একটি মজবুত সতরঞ্চি বা কম্বলের দুই দিক বাঁধিয়া অল্প একটু ঝোলার মত তৈয়ার করিয়া সেই ঝোলায় পা ঝুলাইয়া বসিবে এবং সেই বাঁশেই বাম হাতের ভর রাখিয়া একটু কুব্জ হইয়া আগাগোড়া পথ অর্থাৎ গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ পঞ্চাশ মাইল এইভাবে যাইতে হইবে। অবশ্য

বাঁশটিও সেরূপ মজবুত হওয়া আবশ্যক। এ ব্যবস্থায় কথায় আমাদের সহযাত্রী স্ত্রীলোকদ্বয় উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া উপায়ান্তর না থাকায় অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এ যাবৎ ৯০ মাইল পথ তাঁহারা 'ডাণ্ডী'তে আসিয়াছিলেন। ইহাতে আসার একটা সুবিধা ছিল। ইহার অগ্রে ও পশ্চাতে দুই জন করিয়া চারি জন লোক বাহক থাকায় আরোহী "তম-জমে" যাইবার মত বসিয়া এক প্রকার আরামেই যাইতে পারেন। ইহাতে কেবল প্রশস্ত পথের আবশ্যক করে। গার্ব্বিয়াংএর মত সংকীর্ণতর অপ্রশস্ত পথে চড়াই-উতরাই অতিক্রম করিতে এইভাবে পাশাপাশি দুই জনে যাইবার উপায় না থাকায় এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ সে সময়ে অসুস্থ থাকায় তাঁহার সম্বন্ধেও যাইবার এই উপায়ই স্থির হইয়া গেল। তিন জনের তিনটি বাহনের জন্য তিনটি বাঁশ তিন টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া তাহাতে বাঁধিবার উপযোগী দড়ি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইল। প্রত্যেক বাহনের জন্য এই সুদীর্ঘ পথে চারিটি করিয়া কুলী নিযুক্ত করা আবশ্যক, এ কথা প্রধান জানাইল। প্রথম কুলীদ্বয় শ্রান্ত হইলে অন্য কুলীদ্বয় আবার বাহক হইবে, এই নিয়মে তিনটি বাহনে মোট ১২টি কুলীর আবশ্যক স্থলে প্রধান আরও একটি কুলী অতিরিক্ত লইয়া যাইবার পরামর্শ দিল। তাহার কারণ, পথে কেহ অসুস্থতা বোধ করিলে এই কুলী তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। তাহা ছাড়া এই কুলীর স্কন্ধে কুলীদিগের নিজ নিজ আসবাব ও খাভাদি রাখাও চলিতে পারে।

দুর্গম পার্ব্বত্যপথে অপ্রত্যাশিত বিপদ আসা অস্বাভাবিক নহে, তাই সব দিক্ বিবেচনা করিয়া আমরা প্রধানেরই কথায় সায় দিলাম। গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত যাইতে প্রত্যেক কুলীর ৬৲ ছয় টাকা হিসাবে মজুরী চুক্তি হইল। এই ১৩টি কুলী ছাড়া আমাদের বোঝা লইবার জন্য আরও ৭ জন কুলীর আবশ্যক হইবে, এ কথা প্রধান জানাইলে, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রতি কুলী কত ওজন আন্দাজ মাল লইতে পারিবে? উত্তরে ত্রিশ সের পর্য্যন্ত মাল লইয়া যাইতে পারিবে, এ কথা বলায়, আমাদের পাঁচ মণের অধিক মাল আছে, ইহা সে অনুমানে বুঝিয়া লইয়াছিল। বোঝা দেখিয়া তাহার ওজন সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্ম ধারণা তাহাদের কিরূপে হইয়াছে, ইহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। স্বামীজীর কথামত এই ২০ জন কুলীর প্রত্যেককে ১৲ এক টাকা হিসাবে ২০৲ টাকা বায়না দিবার কথা উঠিল, এবং কৈলাস হইতে ফিরিবার কালেও যাহাতে এই কুলীগণই এখান হইতে আবার গিয়া গার্ব্বিয়াং হইতে আমাদিগকে লইয়া আসে, তজ্জন্য স্বামীজী ৬৲ টাকা হিসাবেই মজুরী ঠিক করিয়া অগ্রিম ১৲ টাকা হিসাবে দিয়া রাখিবার পরামর্শ দিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময়ে খাদ্যদ্রব্যাদির মোট কিছু কমিয়া যাইবে বিবেচনায়, আমরা ফেরতকালীন সর্ব্বসমেত ১৮ জন কুলীর ব্যবস্থা রাখিয়া ৩৮ জনের যাতায়াতের মজুরী হিসাবে মোট ৩৮৲ টাকা অগ্রিম দিয়া প্রধানের টিপ-সহি লইয়া রাখিয়া দিলাম। গার্ব্বিয়াং হইতে কবে আমরা ধারচুলার দিকে ফিরিতে সমর্থ হইব, তাহা যথাসময়ে কুলীদিগকে জানাইবার ব্যবস্থা হইবে, এ কথা স্বামীজী বলিয়া রাখিলেন।

ফিরিবার সময়ের কুলীর ব্যবস্থা এত আগে হইতে কেন করা হইতেছে, এ কথা যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে তিনি বলিলেন, গার্ব্বিয়াং হইতে ফেরতকালে সেখান হইতে কুলী সংগ্রহে অনেক সময়ে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। বিশেষতঃ নীরপানির পুল ভাঙ্গিয়া গেলে গার্ব্বিয়াং-এর কুলীগণ এ পথে সহজে আসিতেই চাহে না। এমত অবস্থায় এ ব্যবস্থা করা তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়াই মনে করেন। সুতরাং প্রত্যেক যাত্রীরই ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, ধারচুলা হইতে গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত যাইবার কুলী ঠিক করিবার সময়ে উহাদের মজুরী একেবারে যাতায়াত হিসাবে চুক্তি করিয়া রাখিলে এক দিকে যেমন সময়ে আসিবার সুবিধা হইয়া থাকে, অন্য দিকে মজুরী সম্বন্ধেও দেখিতে গেলে আসিবার সময়ে সমান মজুরীতেই কুলীগণ ফিরিয়া আসিবার শ্রম স্বীকার করে। গার্ব্বিয়াং হইতে ধারচুলায় আমাদের ফেরত আসিবার সময়ে এই কুলীগণই আমাদিগকে আনয়ন করিয়াছিল। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে নীরপানির পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কুলীদিগকে কিছু অতিরিক্ত বখশিশ দিতে হইয়াছিল। পাঠকবর্গ এ বিষয় পরে জানিতে পারিবেন।

উত্তরপাড়া হইতে কয়েক জন কৈলাস-যাত্রী গত বৎসরে স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে আসিয়া এ সকল স্থানের কুলীদিগকে যথেষ্ট অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া কুলীদিগের মজুরী সম্বন্ধে বাজার (Rate) খারাপ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, এ কথা স্বামীজী এবং প্রধানের মুখেও ব্যক্ত হইয়া পড়িল। যাহা হউক, এইরূপে

সকল যাত্রীরই বোঝা অনুযায়ী মজুর ও মজুরী ঠিক হইয়া গেল। প্রত্যেক যাত্রীই প্রত্যেক কুলীর জন্ত অগ্রিম দিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যাত্রার পূর্ব্বদিনে পূর্ব্ব-পরিচিত পঞ্জাবী যাত্রীর দল হইতে জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত বিপদের সংবাদ জানাইলেন। তাঁহাদের যাত্রীর দলে প্রায় সকলেরই "হৈজোকা বিমারীর" (কলেরার) প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, এবং সকলেই বালুয়াকোটে নিরাশ্রয় অবস্থায় মৃতবৎ অপেক্ষা করিতেছেন! সেখানে সেবা-শুশ্রূষা-চিকিৎসাদির কিছুই ব্যবস্থা নাই! নিরুপায় হইয়া তিনি এখানে স্বামীজীকে সংবাদ দিবার জন্ত আগেই চলিয়া আসিয়াছেন।

এ দুর্গম তীর্থযাত্রার পথে যাত্রীর মুখে "হৈজোকা বিমারী"র কথা "কাগজে-কলমে" বহু দিন হইতেই শুনিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আজ চোখের সম্মুখে সহসা তাহার বাস্তব অবস্থা অনুভব করিয়া, আমাদের তপোবনের সকল যাত্রীই যুগপৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং বালুয়াকোটের সেই জঙ্গলের মাঝখানে দুর্গন্ধ-পরিপূর্ণ উন্মুক্ত ঘরে রোগীদের সে সময়ে কিরূপ অবস্থা হইতে পারে, মনে মনে কল্পনা করিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন। স্বামীজী উপস্থিত এ বিষয়ে কি সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহারই আলোচনা চলিতে লাগিল। অবশেষে রোগীদিগকে এখানে আনাই যুক্তিযুক্ত, ইহাই সাব্যস্ত হওয়ায়, স্বামীজী আমাদিগের কুলীর দলকে ডাকিয়া মজুরী স্থির করিয়া লইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিনব যানের দরুণ ক্রীত তিনটি বাঁশ এবং আমাদের সহযাত্রী স্ত্রীলোকটির ডাণ্ডীখানি লইয়া সেই সকল কুলী সমভিব্যাহারে বালুয়াকোট অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কোথায় সে দিন কৈলাস অভিমুখে অগ্রসর হইবার সুব্যবস্থা হইতেছিল, সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া যাত্রা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, তাহা না হইয়া, সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত বিপদ্। কৈলাসযাত্রার পথে সে দিন কৈলাসপতির মনের ইচ্ছা কি ছিল, তাহা তিনিই একমাত্র বলিয়া দিতে পারেন। স্বামীজীর কথামত আমাদের যাত্রা সে দিন স্থগিত রহিয়া গেল।

পরদিন পঞ্জাবী যাত্রী-রোগীর দল লইয়া স্বামীজী তপোবনে ফিরিলেন। দলের মধ্যে দলের কর্ত্তা "সিয়ারামজী" এক জন সাধকবিশেষ। তিনিই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহার ভক্ত শিষ্যমণ্ডলী অপরাপর কৈলাসযাত্রিগণের মধ্যে আরও দুই জন এই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদের আগমনে এখানকার হাঁসপাতালে সাড়া পড়িয়া গেল। স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত পালধি মহাশয় স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ বিচক্ষণতার সহিত রোগিগণের চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে তৎক্ষণাৎ তৎপর হইলেন। সেবাব্রতধারিণী রমা দেবীর তখন আবার দ্বিগুণ উদ্যমে সেবাকার্য্য চলিতে লাগিল। সে সময়ে তাঁহাদের অসাধারণ শিষ্টতা, ধৈর্য্য ও রোগীদিগের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করার তৎপরতা দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা সকলে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

পঞ্জাবী দলের রোগের সংবাদদাতা অর্থাৎ যিনি প্রথমে আসিয়া এখানে রোগের সংবাদ দিয়াছিলেন, পরিচয়ে জানা গেল, তিনি এক জন বাঙ্গালী সাধুবিশেষ, নাম বিবেকানন্দ স্বামী। তাঁহার সাধুজনোচিত অমায়িক ব্যবহারে এই পঞ্জাবী যাত্রীর দল সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল দেখিলাম। স্বয়ং সিয়ারামজী তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন। তিনিই এই সাধুটিকে স্নেহের আতিশয্যে এই সুদূর কৈলাস পর্য্যন্ত সঙ্গের সাথী করিয়া আনিয়াছেন, এ সংবাদে সে সময়ে আমরা বাঙ্গালী যাত্রীর দল সকলেই মনে মনে গৌরব অনুভব করিয়াছিলাম।

একে আমরা সংখ্যায় নিতান্ত কম নহি, তাহার উপর এই রোগীর দল তপোবনে ভর্ত্তি হওয়ায়, তপোবনের প্রায় সকল ঘরই যাত্রিপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে দিন কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইয়া দেওয়া হইল। পরদিন যাত্রা সাব্যস্ত হওয়ায়, আমাদের দল শীঘ্র শীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া কুলীদিগকে লইয়া তাহাদের হিসাবমত আপন আপন আসবাবপত্রাদি বাঁধিবার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পঞ্জাবী যাত্রীর দলের যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও, রোগীদের আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীজী তাঁহাদের এখানে হাঁসপাতালেই থাকিবার পরামর্শ দিলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত পালধি মহাশয়কে এই সকল রোগীর চিকিৎসা ও পথ্যাদি সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থার ভার দিয়া স্বামীজী নিজে আমাদেরই সঙ্গে যাইবেন, এইরূপ স্থির হইয়া গেল। যাত্রার পূর্ব্বে রমা দেবীর জন্ত আমরা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম, বিশেষতঃ দিদি এখানে আসিয়া অবধি তাঁহার প্রতিদিনের প্রতি কার্য্যের সাহচর্য্যে এতই অভিভূত ছিলেন যে, রমা

দেবীকেও কৈলাসে সঙ্গিনী করিবার মতলব আঁটিতেছিলেন। রমা দেবী যদিও বহুবার কৈলাসতীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি এ বয়সে আমাদের সহিত তাঁহাকে কৈলাসে লইয়া-যাওয়ার প্রস্তাবে, তাঁহাকে সে সময়ে যথেষ্ট উৎসাহিত ও আনন্দিত হইতে দেখিয়া মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু কৈলাসযাত্রার পথে তাঁহাকে সঙ্গিনীরূপে পাইয়া, তাঁহার প্রতি কেন এতদূর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন। পরোপকার-সেবাধর্ম্মে, জগতের মাঝে যাঁহারা এইরূপ প্রসন্নচিত্তে নিজের সুখ-দুঃখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে সমর্থ হয়েন, এ যুগে তাঁহারা মানবী হইয়াও দেবী। তাঁহাদের নিকট স্বতঃই আমাদের চিত্ত শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়ে। যাহা হউক,

কালী নদী—(বুধির নিকটে)

আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, শ্রীমদ্ অনুভবানন্দজী ও রমা দেবী উভয়ের একযোগে এই রোগীর দল ত্যাগ করিয়া কৈলাস যাওয়া কোনমতেই এ সময়ে সঙ্গতপর নহে।

৩রা জুলাই বুধবার বেলা ২টা আন্দাজ সময়ে আমরা সকলেই যাত্রা করিলাম। আমাদের সহিত পূর্ব্বপরিচিত আড়াই জন ডাক্তার (কারণ, এক জন ছাত্র ডাক্তার ছিলেন), উত্তরপাড়ার যাত্রী তিন জন, পাবনার ভদ্রলোকটি এবং পাঁচ জন স্বামীজী সহযাত্রী হইলেন। সকলেই নিজ নিজ আসবাবপত্রাদি প্রথমে কুলীদিগের পৃষ্ঠে বোঝাই দিলেন। তাহারা আপন আপন বোঝা লইয়া আগেই অগ্রসর হইয়া গেল। ইহাদিগের বোঝা লইয়া যাইবার রীতি দার্জ্জিলিঙ্গের কুলীদিগের অনুরূপ দেখা গেল। পৃষ্ঠদেশে বোঝা ঝুলাইয়া দড়ির দ্বারা বাঁধিয়া দড়িকে নিজ নিজ মস্তকের সহিত ললাটে সংলগ্ন রাখিয়া আগে চলিতে থাকে। পর্ব্বতের কঠিন চড়াই-উত্তরাইএর পথে এই ভাবে বোঝা লইয়া যাওয়া বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হইবে। তবে বোঝা লইয়া কুলীদিগের উপরে অবিশ্বাস করিবার (যেমন আমরা সচরাচর এ দেশে করিয়া থাকি) কোন কারণ এখানে নাই। বোঝা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে স্বচ্ছন্দে আপনি একা ছাড়িয়া দিতে পারেন। যথাসময়ে খুটনাটি জিনিষপত্র সমেত গন্তব্য স্থানে তাহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন। তাহা না হইলে এই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশে বোঝা দেখিয়া দেখিয়া কুলীদিগের সহিত পথে চলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। বোঝা লইয়া কুলীগণ চলিয়া গেলে স্ত্রীলোকদিগের ও শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের যাইবার তিনটি অভিনব যান প্রস্তুত হইল। তার পর সেই যানে আরোহিত্রয়কে যখন উঠাইবার কথা উঠিল, সে সময়ে তাঁহাদিগের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা একমাত্র তাঁহারাই বলিতে পারেন। তাঁহাদিগের এই বাঁশের দোলায় যাত্রা দেখিয়া সে সময়ে একটি বাউলের গান আমার কিন্তু মনে হইয়াছিল,—

"বাঁশের দোলাতে চ'ড়ে, কে হে বটে,
শ্মশানঘাটে যাচ্ছ চ'লে।"

ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব তখনকার যুগে সংসারের মায়া কাটাইয়া যে পথের পথিক হইয়াছিলেন, আজ সেই পথে এ যুগের সংসারাসক্ত ভ্রান্তমতি নগণ্য মনুষ্য—আমরা স্ত্রীলোক যাত্রী লইয়া অগ্রসর হইতে চলিলাম; জানি না, আগে যাইবার এই অজানা পথে, অতর্কিতে আমাদিগের অদৃষ্টে কতই না বিপদের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এইরূপ নানা চিন্তায় আমরা একবার কৈলাসপতির উদ্দেশে সে সময়ে সকলেই

"কৈলাসপতিকী জয়" রবে সমস্বরে প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিয়া লইলাম। ধারচুলার সম্মুখস্থিত প্রকাণ্ড পাহাড় হইতে তদুত্তরে তাহারই প্রতিধ্বনি যেন ফিরিয়া আসিল। এইরূপে আরোহিত্রয়কে তিনটি দোলায় তুলিয়া দিয়া আমরা আর আর সকলেই পদব্রজে রওনা হইলাম।

কালী নদীর ধারে ধারে পাহাড়ের পাশ দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। এ পারে বৃটিশ সীমায় পথের বাম দিকে মস্তকোপরি প্রকাণ্ড পাহাড়. মধ্যে কালী নদী প্রচণ্ডবিক্রমে অনন্তের উদ্দেশে বহিয়া যাইতেছেন আর ওপারে নেপালের সীমায় অভ্রভেদী পাহাড় চোখের সম্মুখে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাস্তা জন-মানবশূন্য, কেবল আমরা কয় জনই যাত্রী—কত দূরের যাত্রী, তাহা জানি না! দিবা দ্বিপ্রহরেও কেমন একটা আতঙ্ক আমাদের সকলের প্রাণ মুহুর্মুহুঃ মুচড়াইয়া ধরিতেছিল। নিঃশব্দপদসঞ্চারে সম্মুখের পথ ধরিয়া কখন্ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিব, তাহারই আকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়া একমনে অগ্রসর হইতেছিলাম। কচিৎ দুই একটি কালো বর্ণের পাখী অস্ফুট কাকলী-ধ্বনিতে এ পাহাড় হইতে ও পাহাড়ে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। এখন আর পাহাড়ের গায় সেরূপ ঘন ঘন চীর গাছের শ্রেণী দেখা যায় না। নানা জাতীয় ছোট ছোট পাহাড়ী গাছে কোন স্থান জঙ্গল, কোথায়ও বা ঝোপের মত করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও বা দুই একটি পাহাড়ী বৃক্ষ উন্নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া সেখানকার স্বাভাবিক নিস্তব্ধতা প্রচার করিতেছিল। মনে হইতেছিল, ভোগবিলাসবর্জ্জিত শিবের সমাধিক্ষেত্র কৈলাস দর্শন করিতে গেলে মনুষ্য-জীবনকে বুঝি বা এইরূপ নিস্তব্ধতার উপাসক হইয়াই অগ্রসর হইতে হয়! এইরূপ নানা চিন্তায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ইতিপূর্ব্বে ধারচুলা পর্য্যন্ত ৯০ মাইল পথ আমি অশ্বপৃষ্ঠেই আসিয়াছিলাম, এজন্য চড়াই-উতরাই পথে এ পর্য্যন্ত পদব্রজের ক্লেশ আমাকে ভোগ করিতে হয় নাই। সুখের বিষয়, আজিকার এই পাঁচ মাইল আন্দাজ পথ দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়া প্রথমটা বরাবর সমতলভাবেই গিয়াছে। তবে তাহার আশে-পাশে মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট "বিছুটি" জঙ্গল পড়িয়াছিল। হাতে-পায়ে অতর্কিতে ইহার জ্বালাময় স্পর্শ হইতে আমরা কেহই সে দিন নিষ্কৃতি পাই নাই। এই প্রথম পাঁচ মাইল পথ পদব্রজে যাইতে তেমন ক্লেশ না হইলেও, শেষের দিকে যখন সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ের চড়াই চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, তখন কিন্তু আমার পদদ্বয় আর একটুও অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। আর আর যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ সে সময়ে সেই চড়াইএর মাথার উপরে উঠিয়া গিয়াছেন, কেহ বা মাঝখান হইতে আমাদিগকে নীচে দেখিতে পাইয়া, মহোল্লাসে বিজয়ী বীরের মত সম্বোধন করিয়া অনুগমন করিবার সাহস দিয়া আগে উঠিতেছেন; কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি, প্রথম দিনে এই চড়াই উঠিবার ক্লেশ স্মরণ হইলে আজও আমার হৃদয় "ধুক-ধুক" করিয়া উঠে। তবে সে দিন সকলের পশ্চাতে কেবল একা আমিই ছিলাম না। উত্তরপাড়ানিবাসী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত গঙ্গাধর ঘোষ দুই জনই আমার সহিত সমান দুর্দশা ভোগ করিতেছিলেন। বিশেষতঃ চট্টোপাধ্যায়ের পায়ের 'চট্‌রাজ' (যাহাকে লইয়া তিনি কৈলাস পর্য্যন্ত যাইতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ) এ চড়াই উঠিতে কিন্তু কিছুতেই 'বাগ' মানিতেছিল না। আমাদের পূর্ব্ব-প্রেরিত কুলীর দল দেখি—বোঝা লইয়া এই চড়াইএর মাঝখানে এতক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বোঝা পৃষ্ঠে, ঘর্ম্মাক্তকলেবরে পরিশ্রান্ত ঘোড়ার মত তাহাদের সেই মুহুর্মুহুঃ দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আমাদিগকে আরও কাতর করিয়া তুলিতেছিল। যাহা হউক, এইরূপে ধারচুলা হইতে প্রায় ৮ মাইল অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা সকলেই 'খেলা'য় আসিয়া পৌঁছিলাম।

খেলায় ৮।১০ ঘর লোকের বসবাস আছে। পাহাড়ের গায় গায় ছোট ছোট কুঠারী আছে। গ্রামের আশপাশ দিয়া দুই একটি ঝরণা গ্রামবাসীদিগকে পানীয় জল সরবরাহ করিয়া থাকে। সরকারের একটি ডাকঘর। তৎসংলগ্ন পর্ব্বতগাত্রে আমাদের অন্যান্য সহযাত্রিগণ ইতিপূর্ব্বে আসিয়া কেহ কেহ পদদ্বয় ধৌত করিয়া সবেমাত্র বসিয়াছেন, কেহ বা একবারে লম্বমান হইয়া নির্জীবের মত শুইয়া পড়িয়াছেন, আবার শঙ্করনাথ স্বামীজীর মত কঠিন চড়াই-উতরাই-পথে অবাধ-ভ্রমণ-শীল ব্যক্তি এ পথ-ক্লেশে কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ না করিয়াই নিকটস্থ একটি ন্যাসপাতি-বৃক্ষের তলের উপরে স্থিরদৃষ্টিতে সেই সন্ধ্যাকালে ইহারই উপাসনা করিবার মতলব আঁটিতেছিলেন। এমন সময়ে আমাদের সেখানে আগমন দেখিয়া "কৈলাস-পতিকী জয়" ধ্বনি-প্রতিধ্বনি চলিল। দেখিলাম, বাঁশের দোলায় তিন জন যাত্রীই তৎপূর্ব্বে এখানে

'খেলার' নিকটবর্ত্তী ঝরণা

আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তবে ঝোলার আরোহী শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ অসহিষ্ণু হইয়া, শরীরকে সোজা রাখিবার নিমিত্ত পথিমধ্যে দুই তিনবার এই ঝোলা হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে সময়ে ইচ্ছা করিয়া দুই এক মাইল পথ পদব্রজে যাইবার তাঁহার বিশেষ চেষ্টাও হইয়াছিল। এইরূপে এই ঝোলার জন্য অতিরিক্ত ৪টি কুলীর ব্যয় একবারেই অকারণ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। যাহা হউক, আমরা এখানে আসিয়া কিছু দূরে আর একটি আশ্রয়-ঘর খুঁজিয়া লইতে বাধ্য হইলাম। কারণ, এ ডাকঘরে এতগুলি যাত্রীর এককালীন সমাবেশ বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হইল।

এ স্থলে পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সুদূর কৈলাসের মত কঠিন দুর্গম তীর্থে যাইতে গেলে যদি একসঙ্গে যাত্রীর দল কিছু বেশী থাকে, তবে পথের ক্লেশ অনেকটা কমিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে একের উৎসাহ বা সাহস কমিয়া গেলে হয় ত দলের উৎসাহ ও সাহস লইয়া তাহা পরিপূরণ করাও যাইতে পারে। তথাপি এ তীর্থের পথে, গ্রামবাসীদিগের দয়া ভিন্ন থাকিবার বাসোপযোগী সেরূপ ধর্ম্মশালা বা 'চটির' ব্যবস্থা না থাকায়, যেখানেই রাত্রিযাপনের আয়োজন হইয়া উঠে, একটু বেশী কষ্ট স্বীকার বা সহ্য করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ইহা প্রত্যেক যাত্রীরই বেশ স্মরণ রাখা উচিত। আলমোড়া হইতে ধারচুলা পর্য্যন্ত আসিতে আমরা প্রায় প্রত্যেক দিনই যেখানে রাত্রিকালে বিশ্রাম করিতে গিয়াছি, আমাদের দলের মধ্যে যাহারা গন্তব্যস্থান আগে পৌঁছিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই অপরাপর যাত্রী অপেক্ষা রাত্রিবাসের ঘর বা দুগ্ধাদি-সংগ্রহ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সুবিধা করিয়াই লইতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং দলে বেশী লোক থাকিলে বিভক্ত হইয়া পর পর দিনে যাইতে পারিলে যাত্রীর পক্ষে কষ্ট কম হইতে পারে। অবশ্য ধারচুলার "তপোবন"এর কথা স্বতন্ত্র। সেখানে সকল যাত্রীই সুখ-সুবিধা পাইয়াছিলেন। একে সেখানে ঘর যথেষ্ট, তায় স্বামীজীদের নিজের বাসস্থান বলিয়া সকল বিষয়ে আশানুরূপ সমাদর উপভোগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা একটি দ্বিতল কুঠীর নীচের কাঠাদি আবর্জ্জনা-পূর্ণ কুঠারীর সম্মুখভাগ পরিষ্কার করাইয়া তাহারই এক পার্শ্বে আসবাবাদি রাখিয়া দিয়া কোনপ্রকারে রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হইলাম। বিশ্রামান্তে স্টোভে প্রস্তুত খান কয়েক লুচি ও একটু হালুয়া রাত্রিতে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিল।

প্রভাত হইতে না হইতেই সকলেই গাত্রোত্থান করিলাম। রাত্রিতে পিশুর উপদ্রবে কাহারও আদৌ নিদ্রা হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা উঠিলেই কুলীগণ আপন আপন বোঝা ঠিক করিয়া লইয়া আগে চলিবার জন্য ব্যস্ত হইল। আমরা যথাসম্ভব সত্বর হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে আবার গন্তব্য পথে এক একে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এবারে প্রথমেই সম্মুখে দেড়মাইল আন্দাজ পথ উতরাই ছিল। এই উতরাই শেষ করিয়া ধৌলীগঙ্গা পার হইলাম। এই ধৌলীগঙ্গা কিছু দূরে গিয়া কালীনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। চোখের সম্মুখে এইবার একটি প্রকাণ্ড চড়াই আকাশ পর্য্যন্ত ঠেকিয়া রহিয়াছে মনে হইল। উহার পশ্চাতে কোন গ্রাম বা লোকালয় থাকিতে পারে, তাহা এ পাহাড় দেখিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিলাম না। এই চড়াইএর পরে 'পঙ্গু' গ্রাম আছে বলিয়া পাহাড়ীরা ইহাকে সাধারণতঃ পঙ্গুর পাহাড়ই বলিয়া থাকে। এই উচ্চ পাহাড়ে উঠিবার রাস্তাগুলি এমনভাবে আঁকিয়া-বাঁকিয়া উপরে গিয়াছে যে, নিম্ন হইতে ঠিক যেন সর্পের মত বোধ হইতেছিল—বক্রগতি রেখাগুলি অস্পষ্ট

গৌরী গঙ্গার পুল

উঠিল। সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা ৭ হাজার ফুটের কম নহে। এখানকার স্কুলবাড়ীটি দ্বিতল এবং অপেক্ষাকৃত সৌষ্ঠবসম্পন্ন। গ্রামখানি নিতান্ত ছোট নহে। ১৫।২০ ঘর লোকের বসতবাটী রহিয়াছে। আমরা পৌঁছিতেই গ্রামবাসীরা আমাদিগকে একবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। যেন তাহাদের নিকটে নূতন জীব হইয়া উদয় হইয়াছি। "কৈলাস-যাত্রী" এ সংবাদ শ্রবণে সেখানকার পাটোয়ারী আমাদিগকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়া দ্বিপ্রহরে স্নান-ভোজন এইখানেই শেষ করিয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন। কুলীরা ইতিপূর্ব্বে এখানে আসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিল। অবস্থা বুঝিয়া আমরা এখানে বিশ্রামান্তে নিকটস্থ একটি ঝরণায় স্নানাদি শেষ করিয়া ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলাম। নীচে ভয়ঙ্কর মাছির উপদ্রব দেখিয়া পাটোয়ারীর নির্দ্দেশমত স্কুলবাড়ীর দ্বিতলের কুঠারীতে একটা বা' হয় তরকারী ও ভাত রন্ধন শেষ করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইলাম।

আসিবার সময়ে ডাক্তার কয় জন ভান্‌সিং নামক এক ব্যক্তিকে আলমোড়া হইতে পাচক নিযুক্ত করিয়া বরাবর লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে যথেষ্ট শীতবোধ হওয়ায় ভান্‌সিং তাহার মালিকদিগের শরীর 'তাজা' রাখিবার নিমিত্ত একটা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। স্থানীয় এক জন পাহাড়ীর নিকট হইতে সে ১৲ টাকা মূল্যে একটি জীবন্ত "সীতাপতি-বিহঙ্গম" কিনিয়া আনিয়া লুকাইয়া তাহাকে 'জবাই' করিবার অবসর খুঁজিতেছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জনৈক পাহাড়ী দর্শক তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী বিধবা স্ত্রীলোকটি এ ব্যাপারে পাচককে লইয়া সে সময়ে হৈ-চৈ করিয়া উঠিলেন। ফলে মুরগীটি তাহার চিরপরিচিত মালিকের নিকটেই ফিরিয়া গেল। কিন্তু পাচকের দেওয়া টাকাটি, দুঃখের বিষয়, আর ফিরিয়া আসিল না। এই ব্যাপারে পাচককে

দেখা যাইতেছিল। এই ভীষণ চড়াইএর পথ মানুষ হইয়া কিরূপে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব, তাহা চিন্তা করিলে কখনই উপরে উঠিতে পারিতাম না। কৈলাসপতির নাম লইয়া দীর্ঘযষ্টি হস্তে, কম্পিতপদে একে একে সকলে পঙ্গুর মত ধীরে ধীরে স্বর্গের সিঁড়ি ধরিলাম। মনে হইতেছিল, কৈলাস যাইবার জন্ম এই সিঁড়ি ত্রেতাযুগে রাবণের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। নগণ্য মনুষ্যের দ্বারা ইহার নির্ম্মাণ কোন-মতেই সম্ভবপর নহে ইত্যাদি কতই না কল্পনা লইয়া মন আলোড়িত হইতেছিল। যতই উপরে উঠিতেছি, এই পর্ব্বত-গাত্রের এক এক স্থানের রাস্তা এতই সঙ্কীর্ণ ও ঢালু হইয়া রহিয়াছে যে, তদুপরি বিস্তৃত উপলখণ্ডে একবার যদি অসংলগ্ন-ভাবে পদদ্বয় পিছলাইয়া যায়, তাহা হইলে আর নিষ্কৃতি নাই। একবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় পাতালগর্ভে বিলীন হইতে হইবে। মনে হইতেছিল, কেনই বা আত্মীয়-স্বজন, সংসার, লোকালয় ত্যাগ করিয়া এই ভয়ঙ্কর পথের পথিক হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল!

যাহা হউক, প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল একাদিক্রমে চড়াই পথ উঠিতে উঠিতে দূরে পঙ্গু গ্রাম দেখা গেল। বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে এখানকার স্কুল-বাড়ীতে আমরা আসিয়া পৌঁছিলাম। পথক্লেশে সে সময়ে শরীর খুবই গরম ছিল। তথাপি এখানে আসিবামাত্র শীতের অনুভূতি যেন বাড়িয়া

লইয়া সে দিন যাত্রীদিগের মধ্যে একটু হাস্ত-পরিহাস চলিয়াছিল। বেলা ২টা আন্দাজ সময়ে আমরা পুনরায় রওনা হইলাম। পদু হইতে প্রথমেই এক মাইল আন্দাজ পথ উতরাইএ নামিয়া আবার একটি চড়াই সম্মুখে পাইলাম। সে চড়াইটি অতিক্রম করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। তথাপি সে চড়াই দুই মাইলের কম হইবে না, ইহা সে সময়ে বেশ বুঝা গিয়াছিল। কারণ, ৫টা আন্দাজ সময়ে এই চড়াইএর অতিক্রম শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে এবারে যখন উতরাই পথ নামিতে আরম্ভ করিলাম, তখন দূরে সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে তুষারবেষ্টিত এক অপরূপ পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যরাশি অপ্রত্যাশিতভাবে সকলের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে নয়ন-মনোহর দৃশ্যের সমস্ত মাধুরীই এক নিমেষে পান করিয়া যেন নিঃশেষ করিবার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের সে রক্তরাগরঞ্জিত কিরণমালা সেই গগনস্পর্শী পর্ব্বতের তুষারের গাত্রে গাত্রে 'বায়স্কোপের' মত প্রতিক্ষণে যেন নূতন চলচ্চিত্রের অভিনয়চাতুর্য্য দেখাইয়া আপনার অলক্ষ্যে আপন সৌন্দর্য্যে আপনিই বিমোহিত হইয়া পড়িতেছিল। দুঃখের বিষয়, এই অভিনয়চাতুরীর অনন্ত সৌন্দর্য্য নর-জগতের যাত্রীর জন্ম সৃষ্ট হয় নাই। অজানিতভাবে পর্ব্বতের আড়ালে সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানবের দৃষ্টি হইতে একবারে দূরে এইরূপে ছড়াইয়া রহিয়াছে। পাছে আমাদের এই পথশ্রান্ত অন্ধ নয়ন মোহান্ধকার হইতে চিরোজ্জল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে একবারে চির-নিবিষ্ট হইয়া যায়, তাই বুঝি স্রষ্টা যা কিছু সুন্দর, যা কিছু চির-মনোরম, সমস্তই কৌশল করিয়া এই চির-দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণীর মাঝখানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

শুনিলাম, এই পাহাড়ের নাম 'কালী।' ইহারই তলদেশে "সিরদাং।" উতরাইএর মুখে নীচে এই গ্রামখানি ছোট ছোট খেলনার মত পরিষ্কারভাবে কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে। পার্শ্বে বামদিকে উচ্চে পর্ব্বতগাত্রে এক স্থানে একটি "মিশনরী"দের আড্ডা হইতে ঢং ঢং করিয়া একটি বৃহৎ ঘণ্টা উচ্চরবে বাজিয়া উঠিল। মনে ভাবিলাম, স্থান বুঝিয়া ইহারা আসিয়া উপাসনা-মন্দির এবং ফাঁদ পাতিবার অপূর্ব্ব কৌশল করিয়া রাখিতে এখানেও বিস্মৃত হয় নাই। সন্ধ্যা ৬টা আন্দাজ সময়ে আমরা "সিরদাং"এ আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে আসিয়াই শীতে কাতর হইয়া পড়িলাম। পাটোয়ারীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া নিজেদের রাত্রিতে থাকিবার একটি বড় ঘরের বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। সে ঘরটি অন্যান্য স্থানের ঘরগুলি অপেক্ষা কিছু বড়। ঘরের এক পার্শ্বে আমাদের আপন আপন আসবাবপত্রাদি রাখিয়া দেওয়া হইল।

সিরদাংএর পথে পাহাড়ের দৃশ্য

উত্তরোত্তর আমরা যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই এ সকল গ্রামের ভুটিয়া অধিবাসীদিগের সাজ-সজ্জার বেশ একটু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। কার্পাস-বস্ত্রের পরিবর্ত্তে ইহারা এখানে প্রায়ই পশমী বস্ত্রই ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের আকৃতির রুক্ষতা এবং সাজ-সজ্জার অপরিচ্ছন্নতা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কোন কালে স্নান ইত্যাদি করার ইহাদের আদৌ অভ্যাস নাই। ফলে ইহাদের নিকটে গিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেই, একটা বিরাট দুর্গন্ধে নাসিকাময় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। আরক্ত চোখের কোণে

রাশীকৃত 'পিচুটি' সর্ব্বদাই যেন লাগিয়া রহিয়াছে। এই হস্তপদবিশিষ্ট মনুষ্যকে চোখের সম্মুখে দেখিলে, ইহাদের প্রকৃতি সাধারণ মনুষ্য-প্রকৃতি হইতে যে কিছু পৃথক্, তাহা সহজেই আমরা বুঝিয়া লইতে পারি। স্ত্রীলোকরা স্বভাবতঃ এখানে খুব কমই লজ্জাশীলা মনে হইল। ইহাদের সাজ-সজ্জা পুরুষদের অপেক্ষা কিছু পরিষ্কার, এবং স্নানাদি বিষয়ে ইহাদের লক্ষ্যও আছে। অন্যান্য যাত্রিগণ এখানে আসিবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই আমরা এ স্থানে আসিয়াছিলাম। অন্ধকার বুঝিয়া, লণ্ঠনের জন্য কেরোসিন তৈলের আবশ্যক, এ কথা পটোয়ারীকে জানাইলে তিনি ১ টাকা মূল্যে ১ বোতল কেরোসিন তৈল আনাইয়া দিলেন।

ধারচুলা হইতে স্বামীজীর কথামত আমরা একটি খালি পেট্রোলের টিন ভরিয়া কেরোসিন তৈল খরিদ করিয়া এ যাবৎ বরাবর কুলী-পৃষ্ঠে লইয়া আসিতেছিলাম। শেষের পথে কেরোসিন তৈলের একবারে অভাব পড়িতে পারে, এই বোধে এখনও পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহার বন্ধ রাখিয়াছিলাম। রাত্রিতে জলযোগের সময়ে একটু দুগ্ধও পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা আমাদের সের হিসাবে লইতে গেলে আট আনার কমে কোনমতেই পাওয়া গেল না। স্বামীজীরা অপরাপর যাত্রিগণসহ এখানে আসিয়া স্থানীয় স্কুল-বাড়ীতে সে দিন আশ্রয় লইয়াছিলেন।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় রাত্রিকালে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল। পরদিন প্রত্যুষেই হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া কুলীদিগকে আসবাবাদি বুঝাইয়া দিয়া আবার আগে চলিলাম। প্রথমে প্রায় আড়াই মাইল পথ উতরাই নামিয়া আসিয়া বেলা সাড়ে সাতটা আন্দাজ সময়ে একটি জঙ্গল-পরিপূর্ণ পাহাড়ের মধ্যে একটি চড়াইএর পথ ধরিয়া চলিতে হইল। নানাজাতীয় ঘন ঘন বৃহৎ পাহাড়ী বৃক্ষে সে পথ দিনের বেলা সাধারণতঃ অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। তাহা ছাড়া সে স্থানের হাওয়া এত আর্দ্র যে, পাহাড়ের গায় পথে সর্ব্বত্রই একপ্রকার শৈবাল জমিয়া পথগুলিকে খুবই পিচ্ছিল করিয়া তুলিয়াছে। আরও দেখিলাম, আর্দ্রতার আতিশয্যে বড় বড় বৃক্ষগুলির গুঁড়ি এবং প্রত্যেক শাখায় সেই 'শৈবাল' লাগিয়া সে স্থান হইতে পুনরায় ছোট ছোট আগাছা জন্মিয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় গাছের আসল স্বরূপ যেন ঢাকিয়া গিয়া কিস্তুতকিমাকার বোধ হইতেছিল।

এক স্থানে আসিয়া এই জঙ্গলের মাঝখানে, এই সকল বৃক্ষের উপরে, এত দিন পরে এক দল লাঙ্গুলধারীকে বেশ লম্ফ-ঝম্প করিতে দেখিতে পাইয়া এখানেও জীবজন্তুর অস্তিত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হইলাম। এই জন-মানব-শূন্য জঙ্গলাকীর্ণ অন্ধকার পথে, ইহারা বোধ হয়, বিংশ শতাব্দীর আলোক-প্রাপ্ত আমাদের মত সভ্য-ভব্য যাত্রীর দল কখনও দেখে নাই, তাই সে সময়ে আমাদের আগমনে স্বীয় স্বভাব-সুলভ দন্তবিকাশ করিয়া কতই না স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতে প্রবৃত্ত হইতেছিল। আমরা দীর্ঘ যষ্টিহস্তে নির্ভীকের মত (যদিও এ জঙ্গলে তাহাদের প্রভাবে মনে মনে ভীত হইতেছিলাম) সেই পিচ্ছিল পথে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। চলিবার কালে পায় এক প্রকার ছোট ছোট মশক একসঙ্গে অনেকগুলি কামড়াইয়া ধরিয়া, আমাদিগকে ত্যক্ত-বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল। আবার কখনও বা কোথা হইতে রক্ত-পিপাসু জলোকা জুতার উপর দিয়া নিঃশব্দে ষ্টকিং ভেদ করিয়া বিনা যুদ্ধেই রক্তপাত করিয়া আমাদের এ উদ্যমে কতই না অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল! এই সকল বাধা-বিপত্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমরা ধীরপাদবিক্ষেপে ২ মাইল আন্দাজ চড়াই শেষ করিয়া উতরাইএ পড়িলাম। এই উতরাইএর পথও অত্যন্ত পিচ্ছিল ছিল। সুতরাং সে দিন কতদূর দুর্দ্দশাভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা একমাত্র যাত্রিগণই বলিতে পারেন।

৩ মাইল আন্দাজ উতরাই নামিয়া আসিতে ২ ঘণ্টাকাল বিলম্ব করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। দীর্ঘ যষ্টিধারী হইয়াও 'চট্টরাজ'-পরিচিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত দীর্ঘ ব্যক্তিকেও দুই তিনবার পদস্খলিত হইয়া প্রস্তরালিঙ্গন করিতে দর্শন করিয়াছিলাম। যাহা হউক, বেলা ১২টা আন্দাজ সময়ে আমরা নীচে নামিয়া একটি প্রশস্ত ঝরণা দেখিতে পাইলাম। ঝরণার স্রোতের গতি খুব দ্রুত হইলেও ইহার দুই পার্শ্বের তীরে যথেষ্ট প্রস্তরখণ্ড সাজানো থাকায় বিশ্রাম করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। দেখিলাম, স্বামীজীরা অপরাপর যাত্রী সহ ঝরণার অতি নিকটে বসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন।

আমরা নিকটে আসিলে স্বামীজী বলিলেন, আজ উতরাই নামিতে সকলেরই কষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এইখানে এই ঝরণার পার্শ্বে স্নানাহার শেষ করিয়া বিশ্রামান্তে ২ মাইল

সামখেলার নিকটবর্ত্তী অরণ্যের দৃশ্য

দূরে "গালায়" গিয়া রাত্রিযাপন করা হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। এ স্থানের নাম "সামখেলা।" এমন প্রশস্ত ঝরণা সম্মুখে পাইয়া এখানে সকলেই আহারাদি শেষ করিয়া লইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেম। আমাদের এ ব্যবস্থা দেখিয়া অগত্যা কুলীগণও সকলেই এই মতের অনুমোদন করিল।

এইরূপে আহারাদি শেষ করিয়া বেলা ৪টা আন্দাজ সময়ে আবার সেখান হইতে যাত্রা করা হইল। এবারের পথ প্রায়ই চড়াই-উতরাই-হীন। সুতরাং এই ঝরণার পাশ দিয়া ২ মাইল আন্দাজ পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা "গালা"য় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এখানে ২।৩ ঘর মাত্র লোকের বাস। তাহাদের বাসার এক পার্শ্বে তৃণাচ্ছাদিত একটি বড় লম্বা ঘর—ডাক-হরকরার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই লম্বা ঘরই আমাদের সকলের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সে রাত্রিতে আমরা সকলেই সেই লম্বা ঘরটিতে প্রথম একসঙ্গে থাকিতে বাধ্য হইলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বীর-অভিষেক

আজি অভিষেক, আজি অভিষেক, বীর-অভিষেক আজি রে—
আন চন্দন কুঙ্কুম যব, ফুলে ভরি হেম-সাজি রে!
আজি এ মধুর মধুর প্রভাতে
উদয় দীর্ঘ—স্বর্ণ শিখাতে
নীল যমুনায় নীলমণি হায় তপন দিয়াছে মাজি রে!—
কল-কল জল পুণ্য শীতল,
ছায়া মায়া ঘন নব বনতল,
বল্লরী বীথি মুকুলে আকুল শাখা উঠে নাচি নাচি রে!

শ্যামলা ধরণী চুম্বন নত
নীল অম্বরে পুষ্পক শত
কম্বু ধবল অম্বুদ-মালা কিরণে কিরণে সাজি রে।
বহিছে পবন মন্দ মন্দ—
হের আলোকিত দিগ্‌ দিগন্ত
মধুর মধুর অধরে শঙ্খ উঠিতেছে বাজি বাজি রে!

চূত-পল্লবে তরুণ তোরণ—
বীর-মহিমারে করিতে বরণ
পথে পথে পথে লোকসমারোহ—চঞ্চল গজবাজী রে!
নূতন জীবন নব সংবিৎ
চল গেয়ে চল জয়-সঙ্গীত
উড়িছে বলাকা দুলিছে পতাকা রঞ্জিত পুর-প্রাচীরে!

মণ্ডপ-দ্বারে বাজে দুন্দুভি
পথ প্রান্তর পুণ্য সুরভি
উঠে বীরগান নেচে উঠে প্রাণ, উড়িছে পতাকা-রাজি রে
বীর-অভিষেক—বীর-অভিষেক, বীর অভিষেক আজি রে!

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

কৃষ্ণপ্রসাদ [illegible] কায়েতটুলী পাড়ায়। সে ইতিহাসের প্রত্নতত্ব [illegible]। নাদির-শা দিল্লী সহর জালিয়ে পুড়িয়ে নিরীহ নর-নারীর হত্যায় কি রকম দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, আর বাদশাহ ঔরংজীবের পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা ও সনাতন ইসলামধর্ম্মে নিষ্ঠা যে কত গভীর ছিল, এই বিষয়ে সে পরম অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। এর জন্ত তাকে ফার্সী ও ইংরেজী বহু কেতাব পড়্তে হয়, সংগৃহীত তথ্য বড় বড় খাতায় টুক্‌তে হয়, পারম্পর্য্যবিন্তাস ক'রে সাজাতে হয়। বেচারা বইয়ের উপর দিবা-রাত্রি ঝুঁকে ব'সে থাকে, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ফার্সী কেতাবে, আশে-পাশে তাকাবার তার অবসর হয় না।

কিন্তু তার পাশের একতলা বাড়ী থেকে ছুটি চোখ যখন-তখন উৎসুক-কৌতূহলে তাকে দেখে, আর সেই সুর্ম্মা-টানা চোখ ছুটির অধিকারিণী কমর্-উন্নেসা খাতুন মনে মনে ভাবে, লোকটা রাতদিন ঘাড় হেঁট ক'রে কি দেখে? কাগজের উপর হিজিবিজি কালীর আঁচড় ছাড়া আশে-পাশে দেখ্‌বার মতই কিছুই কি ছুনিয়ায় নেই? কৃষ্ণপ্রসাদ রাত্রিতে যখন সাম্‌নে কেরোসিন্ ল্যাম্প জেলে বইয়ের উপর ঝুঁকে ব'সে থাকে, তখন অন্ধকার উঠান দিয়ে এঘর-ওঘর যাতায়াত করতে করতে কমর্-উন্নেসা দেখে, বাতির দীপ্তি কৃষ্ণপ্রসাদের জ্ঞান-সন্ধানী চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। এক ঘুমের পর জেগে উঠে বাইরে এলেও সে দেখে, কৃষ্ণপ্রসাদ সেই একইভাবে ব'সে আছে আর আলো জ্বল্‌ছে! সে ভাবে, শুক্‌নো কাগজের উপর কালীর আঁচড়ের মধ্যে এমন কি মধু আছে— যা আহরণ কর্‌বার জন্ত এমন সর্ব্বত্যাগী দুঃসহ সাধনা দিনের পর দিন একই ভাবে চলেছে!

কৃষ্ণপ্রসাদের জ্ঞান-সাধনায় বাধা দিয়ে সহসা হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বেধে গেল এবং শত শত গুণ্ডা ধেয়ে এসে কায়েতটুলীর হিন্দু-বাড়ী আক্রমণ কর্‌লে। পাড়ার যারা জান্‌ত, কৃষ্ণপ্রসাদ একলা বাসায় থাকে, তারা দল বেঁধে হল্লা ক'রে ছুটে এল—মার, মার এই বেটাকে!

কৃষ্ণপ্রসাদ গোলমাল শুনেই বাড়ীর সব দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল এবং উপর থেকে ইট, চেয়ার, টুল, ল্যাম্প, বোতল, দোয়াত ছুড়ে ছুড়ে জিঘাংসু গুণ্ডাদের প্রতিহত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সে একা; তার একটা কিছু ছুড়ে আর একটা কিছু তুলে নেবার অবকাশে শতখানেক ইট-পাটকেল এসে তার বারান্দার উপর পড়ছে; আর বিশ-পঁচিশ জন লোক তার [illegible] তলায় আশ্রয় নিয়ে কুড়ুল-শাবল দিয়ে দমাদম ঘা মেরে দরজা ভাঙতে লেগে গেছে। বাড়ী থেকে পালাবার একমাত্র পথ গুণ্ডারা আগলে আছে; বাড়ীতে প্রবেশের বাধা আকাঠার কপাট কুড়ুল-শাবলের দুর্দ্দম [illegible] চূর্ণ হয়ে গেল ব'লে! কৃষ্ণপ্রসাদ নিরুপায় হয়ে [illegible] চারিদিকে চাইতেই দেখ্‌লে, পাশের একতলা বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে একটি তরুণী ভয়কাতর-মুখে ব্যগ্র ব্যস্ততায় তাকে হাত দিয়ে বারম্বার ইঙ্গিত কর্‌ছে, অবিলম্বে উপরতলা থেকে তাদের বাড়ীর উঠানে লাফিয়ে পড়্‌তে!

দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়্‌লে পঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনার ও না লাফিয়ে বাসাতেই থাক্‌লে মৃত্যুর সম্ভাবনার গুরুত্ব চকিতে একবার তুলনা ক'রে নিয়েই কৃষ্ণপ্রসাদ লাফ দিয়ে তরুণীদের বাড়ীর ছোট পাঁচীল ডিঙিয়ে উঠানে গিয়ে পড়্‌ল। সর্ব্বাঙ্গে একটা ঝাঁকি লাগা ও পা কেটে অল্প রক্ত বাহির হওয়া ছাড়া কৃষ্ণপ্রসাদের আর বেশী কিছু চোট লাগ্‌ল না; তথাপি সে পতনের ধাক্কা সাম্‌লে তখন-তখনই উঠে দাঁড়াতে পার্‌ল না।

কমর্-উন্নেসা কৃষ্ণপ্রসাদের হাত ধ'রে ত্রস্ত ত্বরিত স্বরে বল্‌লে—"উঠুন, উঠুন, চট ক'রে কাপড় ছেড়ে একটা লুঙ্গি পর্‌বেন চলুন।"

কৃষ্ণপ্রসাদকে টেনে তুলে ঘরে নিয়ে গিয়ে কমর্-উন্নেসা একটা লুঙ্গি দিলে এবং নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, গুণ্ডারা কোথায় কি কর্‌ছে। একটু ফাঁক পেলেই কৃষ্ণপ্রসাদকে কমর্-উন্নেসা বাহির ক'রে দেবে, বাড়ীর লোকরা বাড়ীতে এসে পড়লেও ত তাদের উভয়েরই বিপদ!

কমর্-উন্নেসা দেখলে, গুণ্ডারা কৃষ্ণপ্রসাদের সিঁড়ির দরজা ভেঙে উপরতলায় উঠে কোলাহল ক'রে জিনিষপত্র লুঠ কর্‌ছে এবং কৃষ্ণপ্রসাদকে দেখতে না পেয়ে লুণ্ঠনাবশেষ

সামগ্রীতে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলে। তারা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আস্‌তে আস্‌তে চেঁচিয়ে উঠল,—বেটা কোনো দিকে লাফিয়ে প'ড়ে পালিয়েছে! ধর বেটাকে, মার মার!—চল্ চল্ চারিদিকে দেখি।"

কমর্-উন্নেসা আর কৃষ্ণপ্রসাদ এই চীৎকার শুন্‌লে। কৃষ্ণপ্রসাদ লুঙ্গি প'রে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো—বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে গুণ্ডার দলে ভিড়ে লুকাবে, না বাড়ীর মধ্যেই থাক্‌বে, তা নিজে স্থির করতে না পেরে ভীত-ত্রস্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার জীবনরক্ষার জন্ত ব্যগ্র দয়াময়ী তরুণীর মুখের দিকে তাকাল।

কমর্-উন্নেসা দেখলে, কৃষ্ণপ্রসাদ লুঙ্গি প'রে মুসলমান-বেশ ধারণ করেছে, কিন্তু তার গলায় পৈতা খুলে ফেলে নি। কমর্-উন্নেসা ছুটে গিয়ে কৃষ্ণপ্রসাদের গলা থেকে পৈতার গোছা খুলে নিলে এবং কৃষ্ণপ্রসাদের পরিত্যক্ত ধুতি ও পৈতা তাড়াতাড়ি একটা বাক্সের মধ্যে বন্ধ ক'রে ফেললে।

এই সময়ে কয়েক জন গুণ্ডা ছুটে এসে হুড়মুড় ক'রে কমর্-উন্নেসার বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং সম্মুখে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় কৃষ্ণপ্রসাদকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে এক জন জিজ্ঞাসা কল্লে—"এই বাবু, তুমি হিন্দু না মুসলমান?"

কৃষ্ণপ্রসাদের ভয়-রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে কথা বাহির হবার আগেই কমর্-উন্নেসা চট্ ক'রে ঘর থেকে বাহির হয়ে এসে বললে,—"এ মুসলমানের বাড়ী, এখানে হিন্দু কেউ নেই—"

মুসলমানীকে দেখেও গুণ্ডারা তার কথায় প্রত্যয় কর্‌তে পারলে না, আবার তারা কৃষ্ণপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলে—"এই মিঞা, তুমি হিন্দু না মুসলমান?"

গুণ্ডারা কৃষ্ণপ্রসাদের দাড়ি-গোঁপ কামানো মুখের কমনীয় কোমল ভাব দেখে কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পারছিল না যে, সে হিন্দু নহে। অধিকন্তু তার মুখে ভয়ের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার পরনে লুঙ্গি দেখে আর মুসলমানী রমণীর সার্টিফিকেট শুনে তাদের কৃষ্ণপ্রসাদকে মুসলমান ব'লেই মানতে হচ্ছিল, অথচ তার চেহারাটা এমন নিরীহ ও কোমল যে, তাতে সন্দেহও ঘুচছিল না। তাই তারা কৃষ্ণপ্রসাদকে দেখে প্রথমেই বাবু ব'লে সম্বোধন করেছিল, এবং মুসলমানীর সাক্ষ্য শুনে তাকে পরে মিঞা ব'লে ডেকেও জিজ্ঞাসা করলে, সে হিন্দু না মুসলমান।

গুণ্ডাদের এই প্রশ্নের মধ্যে যে হাস্যরস প্রচ্ছন্ন হয়েছিল, তা উপভোগ করবার মতন মনের অবস্থা কৃষ্ণপ্রসাদের তখন ছিল না; সে কমর্-উন্নেসার চোখের ইসারা দেখে ভয়ে ও সঙ্কোচে কুণ্ঠিত ক্ষীণ স্বরে বল্‌লে—"আমি মুসলমান।"

আক্রমণকারী গুণ্ডারা হৈ-হৈ ক'রে কমর্-উন্নেসার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

এক মিনিট স্তব্ধ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কৃষ্ণপ্রসাদ দুই চোখে কৃতজ্ঞতা ভ'রে জীবনদায়িনী দয়াময়ী কমর্-উন্নেসার মুখের দিকে চাইলে এবং পরক্ষণেই ছুটে তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে পালাল।

কৃষ্ণপ্রসাদ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। এখন প্রাণে বেঁচে এসে তার মনের মধ্যে নিরন্তর এই সঙ্কোচ পীড়া দিচ্ছে যে, সে ভয় পেয়ে নিজের ধর্ম্মমতকে গোপন ক'রে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হয়েছে! জীবনে অনেক মিথ্যা বল্‌তে হয়, কিন্তু এই অপভাষণের মধ্যে পরাজয়ের ও হীনতার লজ্জা জড়িয়ে থাকাতে এর গ্লানি সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। কিন্তু তার এই গ্লানি থেকে-থেকে মুছে যাচ্ছে—যখনই তার মনে পড়ছে, এক জন অপরিচিতা মুসলমানরমণী নিজের বিপদ ও অপমানের আশঙ্কা উপেক্ষা ক'রে তাকে বাঁচিয়েছে। সে কৃতজ্ঞতা পাবারও কোনো প্রত্যাশা রাখে নি; কৃষ্ণপ্রসাদ কখনো গিয়ে তার অন্তরভরা কৃতজ্ঞতা তার জীবনদাত্রীকে নিবেদন করতে পারবে না, তাকে তার পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির কাছে অবিশ্বাসিনী প্রতিপন্ন ক'রে তাকে বিপদে ফেলতে পারবে না। এই রমণীর অন্তরের কোমলতা ও দয়ার মাধুর্য্য তাহাদের কাছে কোনো মর্য্যাদাই লাভ করবে না, হিন্দুর জীবন রক্ষা ক'রে তার স্বাভাবিক নারীধর্ম্ম দোষী বলেই গণ্য হবে। অস্বীকৃত কৃতজ্ঞতা দিয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ আজীবন এই অপরিচিতার স্মৃতির আরতি করবে।

আর কমর্-উন্নেসা তার বাক্‌সের তলায় অতি যত্নে একখানা ধুতি আর এক গোছা সূতা লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। তার সৎকার্য্যের স্মৃতিচিহ্ন ব'লে।

শ্রীসত্যবাণী গুপ্তা।

প্রাচীন কাহিনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২৬) তাজমহল (১)

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাজমহল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই :—

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে সাজাহানের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্যকালের নাম "কুমার খরম"। যখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা সম্রাট্ জাহাঙ্গীর, নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ-খাঁর কন্যা আর্জমন্দ-বানু-বেগমের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বানু-বেগমেরই অমর নাম তাজবিবি। (২) ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাজবিবির সহিত সাজাহানের বিবাহ হয়। তখন বরের বয়স্ ২০ বৎসর ৩ মাস, এবং কন্যার বয়স্ বরের বয়সের অপেক্ষা ১৪ মাস অল্প। বিবাহের পরবর্ত্তী ১৯ বৎসরের মধ্যে সাজাহানের সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টি পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ তাজমহল-সৌধ, তাজবিবির সমাধি-মন্দির। সুতরাং কোথায়, কোন্ সময়ে ও কিরূপে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা বলা উচিত। সাজাহানের ১৪টি সন্তানের মধ্যে ৪টি পুত্র ও ৪টি কন্যা তাজবিবির জীবদ্দশায় জীবিত ছিলেন। পুত্রগুলির নাম,—দারা শুকো, সুলতান সুজা, আওরঙ্গজেব ও মোরাদ বক্স্। কন্যাগুলির নাম,—আজমান-আরা, গাইতি-আরা, জাহান্-আরা ও দহর-আরা।

তাজবিবির মৃত্যু-সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প (৩) আছে। তাজবিবির শেষ কন্যা দহর-আরা। ইনি যখন গর্ভে ছিলেন, তখন তাজবিবি গর্ভমধ্যে রোদন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ইহা শুনিয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এবার আমার নিস্তার নাই। যখন গর্ভস্থ সন্তান কাঁদিয়া উঠিতেছে, তখন আমার নিশ্চিত মৃত্যু হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি সম্রাট্ সাজাহানকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। সম্রাট্ আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি কহিলেন, "এবার আমি বাঁচিব না, আমার গর্ভস্থ সন্তান কাঁদিয়া উঠিতেছে। যদি আমি আপনার নিকটে কোনরূপ অপরাধ করিয়া থাকি, আপনি কৃপা করিয়া তাহা মার্জ্জনা করুন। আপনার পিতার রাজত্বকালে আপনি যখন বন্দী হইয়াছিলেন, তখনও আমি আপনার সঙ্গিনী হইয়াছিলাম। আপনার নিকটে আমার দুইটি প্রার্থনা আছে, তাহা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে।" সাজাহান কহিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তাহা নিশ্চিত পূর্ণ করিব।" তাজবিবি কহিলেন, "আমার দুইটি প্রার্থনা এই :—প্রথমতঃ, ঈশ্বর আপনাকে ৪টি পুত্র ও ৪টি কন্যা দিয়াছেন। তাহারাই আপনার সুনাম ও বংশ রক্ষা করিবে। সুতরাং আপনি আর অন্য স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবেন না। কারণ, অন্য পুত্রগণ জন্মিলে সিংহাসন-লাভের জন্য আমার পুত্রদিগের সহিত বিবাদ-বিসংবাদ করিবে। দ্বিতীয়তঃ, আমার মৃত্যুর পরে আমার সমাধি-স্থানের উপরিভাগে এরূপ একটি সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে যে, তাহার মত দ্বিতীয় সমাধি-মন্দির যেন পৃথিবীতে আর নির্ম্মিত হইতে না পারে।" সাজাহান প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "তোমার দুইটি প্রার্থনাই পূর্ণ করিয়া দিব।" তাজবিবি ৩০ ঘণ্টা তীব্র প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া একটি কন্যা প্রসব করিলেন। ইঁহার নাম দহর-আরা বা গৌহার-আরা। প্রসব করিবার মুহূর্ত্ত-কাল পরেই তাজবিবি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে, ৭ই জুন,

---

(১) সুপ্রসিদ্ধ প্রত্ন-তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম-এ মহাশয়-কৃত Studies in Mughal India নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক অতি উপাদেয় ও গভীর গবেষণা-পূর্ণ। তাজমহল-সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন পারসী গ্রন্থ হইতে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া তিনি ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সরকার মহাশয় মোগল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস চর্ব্বণ, গলাধঃকরণ ও পরিপাক করিয়া রাখিয়াছেন। বন্ধুবর স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ও ১৩০৫ বঙ্গাব্দে "নব্যভারতে" তাজমহল সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই দুইটি প্রবন্ধের সাহায্যেই উক্ত প্রবন্ধ লিখিত হইল।—লেখক

(২) তাজবিবির অনেকগুলি নাম দেখিতে পাওয়া যায়,—আলিয়া বেগম, আর্জমন্দ বানু বেগম, জেহানর, তাজমহল, মমতাজ-মহল, দ্বিতীয় নূরজাহন।—লেখক

(৩) শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বহু অনুসন্ধান করিয়া বাঁকীপুরস্থ "খোদাবক্স লাইব্রেরী" হইতে ২খানি দুর্লভ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে এই গল্পটি উদ্ধৃত করিয়াছেন আগরা-নিবাসী স্বর্গত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরও মুখে বহুদিন পূর্ব্বে এই গল্পটি শুনিয়াছিলাম।—লেখক

মঙ্গলবার দিবসে (১) বুরহানপুর-নগরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন যে, সাজাহানের সাময়িক এক জন ঐতিহাসিক ছিলেন। ইঁহার নাম আবদুল হামিদ লাহোরী। ইনি পারসী ভাষায় একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ইহার নাম "পাদিসানামা"। লাহোরী-মহাশয়ের গ্রন্থে উক্ত গল্পটির উল্লেখ নাই। তবে তিনি তাজবিবির মৃত্যু-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"যখন তাজবিবি জানিতে পারিলেন যে, এবার তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য, তখন তিনি স্বীয় কন্যা জাহান-আরাকে দিয়া তৎক্ষণাৎ সম্রাট্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট্ অত্যন্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া তাজবিবির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাজবিবি সম্রাটের হস্তে স্বীয় পুত্র-কন্যার ভার সমর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।" বুরহানপুরের অপর-দিকে তাপ্তী-নদীর তীরে একখানি বাগান-বাটীতে প্রথমতঃ তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে, ৭ই জুন, মঙ্গলবার দিবসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাহার বয়স্ ৩৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই বৎসরেই ১ ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার মৃতদেহ মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া লইয়া আগরায় প্রেরিত হইয়াছিল। ২০ ডিসেম্বর তারিখে সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা আগরায় ফিরিয়া আসিয়া মাতার মৃতদেহের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাজবিবির শোকে সাজাহান ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বিচিত্র বসনভূষণ-পরিধান ও বিলাসিতা বর্জ্জন করিলেন। জন্মতিথি ও সিংহাসন-লাভের উপলক্ষে প্রত্যেক বৎসর যে মহাসমারোহ হইত, তাহাও তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। নর্ত্তক, নর্ত্তকী, গায়ক ও বাদকগণের সংস্রব ত্যাগ করিয়া সকল বিষয়েই ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। দুশ্চিন্তার আবেগে তাঁহার শ্মশ্রুরাজি শুভ্রবর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তাজবিবির সমাধিস্থল দর্শন করিতে গিয়া প্রচুর-পরিমাণে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে রূপীয়সী রমণীর রূপও তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিল না। তাজবিবি ব্যতীত সম্রাটের আরও দুইটি বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে এক জন মজফ্ফর হোসেন মির্জ্জার কন্যা। আর এক জন সাহ নওয়াজ্ খাঁর দুহিতা। তাজবিবির বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রথমা নারীকে ও ৫ বৎসর পরে দ্বিতীয়া নারীকে সাজাহান বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপার-বশতঃ তিনি এই দুইটি বিবাহ করেন। এই দুইটি পত্নীর প্রতি তাঁহার তত মায়া, মমতা ও প্রণয় ছিল না। একমাত্র তাজবিবিকেই তিনি হৃদয়ের অন্তর্দেশে স্থানদান করিয়াছিলেন।

তাজবিবির সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য স্থান অন্বেষণ করা হইতে লাগিল। যমুনার তীরে আগরা-নগরীর দক্ষিণ-দিকে একটি সুরম্য স্থান নির্ব্বাচিত হইল। এই স্থান মহারাজ মানসিংহের পৌত্র রাজা জয়সিংহের অধিকারে ছিল। সম্রাট্ সাজাহান মূল্য দিয়া তাঁহার নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়া লইলেন। তৎকালে এ দেশে যত বড় বড় এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, সম্রাট্ তাঁহাদিগকে এক একখানি প্ল্যান প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিলেন। অবশেষে সম্রাট্ যে প্ল্যানখানি মনোনীত করিলেন, কাঠ দিয়া তাহারই একটি আদর্শ নির্ম্মাণ করা হইল। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে তাজমহল নির্ম্মিত হইতে আরব্ধ হইয়া ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী-মাসে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মাক্যারাম খাঁ ও মির আবদুল করিম,—এই দুই জন এঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সরকার মহাশয় কহেন, "মান্‌তাখাব উল্‌লবাব ও পাদিসানামার" মতে তাজমহল নির্ম্মাণে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। "দেওয়ান্-ই-আফ্‌রিদীর" মতে ৯ ক্রোর ১৭ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। (১)

তাজমহল-নির্ম্মাণে যে সকল প্রধান প্রধান শিল্পী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং যে সকল মহামূল্য প্রস্তরাদির প্রয়োজন হইয়াছিল, দেওয়ান্-ই-আফরিদী সেই সকলের এইরূপ নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

---

(১) শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় "মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস" সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সূক্ষ্মরূপে সাল, মাস, তারিখ ও বার পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। ধন্য তাঁহার গবেষণা!—লেখক

(১) প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ট্যাভারনিয়ার-সাহেবের মতে ৩,১৭,৪৮,০২৬৲ তিন কোটি, সতর লক্ষ, আটচল্লিশ হাজার, চব্বিশ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। এখন কোন্ মত ঠিক, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।—লেখক

(ক) শিল্পিগণের নাম :—

(১) আমানৎ খাঁ সিরাজী (নিবাস কান্দাহার), (২) ওস্তাদ্ ইসা (রাজমিস্ত্রী—আগরা), (৩) ওস্তাদ্ পীরা (সূত্রধর —দিল্লী); (৪-৬) বান্হুহার, ঝাটমল, জোরা-ওয়ার (ভাস্কর—দিল্লী), (৭) ইস্মাইল খাঁ রুমী (গুম্বজ ও ভারা-নির্ম্মাতা), (৮) রাম-লাল (মালী—কাশ্মীর)।

(খ) মূল্যবান্ দ্রব্যাদির নাম :—

(১) কর্ণেলিয়ান্ (কান্দাহার), (২) ল্যাপিজ্ ল্যাজুলী (সিংহল), (৩) অনিক্স (স্বর্গ হইতে ?), (৪) পাতুঙ্গা (নীল-নদ), (৫) খাতু (যোধপুর-পর্ব্বত), (৬) আজুবা (কুমাউনের পার্ব্বত নদী), (৭) মার্ব্বল (ম্যাক্‌রাণা), (৮) স্বর্ণ (প্রস্তর ?) (বসোরা ও অর্মস্-সাগর), (৯) বেরিয়্যামা (বসোরা-নগর), (১০) বাদল্ প্রস্তর (বানাস নদী), (১১) যামিনী (ইমেন্), (১২) মাঙ্গা (আট্‌-ল্যান্টিক-মহাসাগর), (১৩) ঘোরী (ঘোর-ব্যাণ্ড), (১৪) তাম্বরা (গণ্ডক-নদী), (১৫) বেরিল (বাবাবুধন-পর্ব্বত), (১৬) মুসাই (সিনাই-পর্ব্বত), (১৭) গোয়ালিওরী (গোয়ালিয়র-নদী), (১৮) লাল পাথর (নানাস্থান), (১৯) জ্যাসপার্ (পারস্য), (২০) ডালচানা (আসান-নদী)।

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন তারিখে সম্রাট্ সাজাহান তাজবিবির কবর দেখিতে গিয়া আগরার অন্তর্গত ৩০খানি গ্রামের উপস্বত্ব এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কবরের নিকটবর্ত্তী সরাই, দোকান প্রভৃতির খাজনা হইতে আয়ের এক লক্ষ টাকাও প্রদান করিয়াছিলেন। তাজমহল রক্ষা করিবার জন্য ও তাহার অন্তর্গত সাধুগণের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত এই টাকা তিনি দান করিয়া গিয়াছেন।

বন্ধুবর স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন :—

তাজ-নির্ম্মাণ করিবার জন্য যে যে কারিকর নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও পরিচয় :—

সংখ্যা	কর্ম্মকর	পরিচয়	বাসস্থান	মাসিক বেতন
	নাম অজ্ঞাত (ক্রিশ্চান)	প্রধান শিল্পী	রোম	১ হাজার টাকা
	অমন্ত খাঁ	রাজকীয় উপাধি-লেখক	সেরাজ	১ হাজার টাকা
৩	মোহনলাল	——	লাহোর	৯ শত ৮০ টাকা
৪	মহম্মদ খাঁ	সুলেখক	বোগদাদ	৯ শত „
৫	মহম্মদ জাফর্ খাঁ	অধ্যক্ষ	——	৫ হাজার „
৬	মহম্মদ সরিফ (ক্রিশ্চান)	——	——	৫ শত „
৭	মোহনলাল			৫ শত „
৮	মনহরলাল	——	লাহোর	৫ শত „
৯	ইস্‌সেন খাঁ	ডোম-নির্ম্মাতা	——	৫ শত „
১০	খতম খাঁ	ঐ	লাহোর	২ শত „

উক্ত ১০ জনের বেতন সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক ৬৫৮০৲ টাকা। উক্ত তালিকা দেখিয়া নিম্ন-লিখিত কয়েকটি বিষয় জানিতে পারা যায় :—

প্রথমতঃ। কর্ম্মকর-গণের বেতন-বৈলক্ষণ্য।

(ক)	১ হাজার টাকায়	বেতনভোগী	২ জন
(খ)	৯ শত আশী টাকায়	ঐ	১ জন
(গ)	৯ শত টাকায়	ঐ	১ জন
(ঘ)	৫ শত টাকায়	ঐ	৫ জন
(ঙ)	২ শত টাকায়	ঐ	১ জন

দ্বিতীয়তঃ। কোন্ কোন্ জাতীয় কত লোক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাও আলোচ্য :—

(১) ক্রিশ্চান্ ২ জন, (২) হিন্দু ৩ জন, (৩) মুসলমান ৫ জন। এই দশ জন সর্ব্বপ্রধান স্থপতি। তাঁহাদের অধীনতায় স্বল্পবেতনে যে কত শত কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহা বলা যায় না।

তৃতীয়তঃ। কোন্ কোন্ স্থান হইতে মূল কারিকর-গণ আসিয়াছিলেন, তাহাও দ্রষ্টব্য :—

(ক) লাহোরের ৩ জন, (খ) রোমের ১ জন, (গ) সেরাজের ১ জন, (ঘ) বোগ্‌দাদের ১ জন, (ঙ) অজ্ঞাত স্থানের ৪ জন।

চতুর্থতঃ। দেখা গেল যে, ৬৫৮০৲ টাকা এই মূল ১০ জন কারিকরের মাসিক বেতন। তাজ-মহল নির্ম্মাণ করিতে ৩০ বৎসর কাল লাগিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা ৩০ বৎসরে ২৩ লক্ষ, ৬৮ হাজার, ৮ শত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পঞ্চমতঃ। মহম্মদ সরিফ ক্রিশ্চান ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব জাতীয় নাম পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

তাজমহল-নির্ম্মাণে যে সকল মহামূল্য প্রস্তরাদি লাগিয়াছিল, তাহাদের তালিকা :—

সংখ্যা	নাম		মণ	সংখ্যা	নাম		মণ
১	মার্ব্বল (প্রতি ঘনগজে)		৪০	১০	সুংখুট(প্রতি ঘনগজে)		৮৫
২	পোর্সিলেন	ঐ	৭৯	১১	লেপিস্ লজুলী	ঐ	৩১২
৩	ব্ল্যাক-ষ্টোন	ঐ	৪৮	১২	সলোমন-প্রস্তর	ঐ	২৪
৪	জ্যাস্পার ও এগেট	ঐ	৯৫	১৩	ফ্রেক্লড	ঐ	৪২
৫	লাল পাথর	ঐ	৩০	১৪	বালনী	ঐ	২৫
৬	পী-জহর	ঐ	৪৫	১৫	গোলাপী প্রস্তর	ঐ	৪৫
৭	ফ্লিণ্ট	ঐ	৫৭	১৬	ওপ্যাল	ঐ	৪৫
৮	অদ্ভুত প্রস্তর	ঐ	৪২	১৭	লালমণি	ঐ	৪৫
৯	স্ফটিক	ঐ	৮৫	১৮	এগেট্	ঐ	৪৫
				১৯	সঙ নথদ	ঐ	২২৫

তাজমহল-নির্ম্মাণে যে সকল মহামূল্য মণি-মাণিক্য লাগিয়াছিল, তাহাদেরও তালিকা এই :—

সংখ্যা	নাম	মণ	সংখ্যা	নাম	মণ
১	রুবি (চুণী)	৫৪	৭	গোয়ালিয়র মাণিক	৯৪৫
২	মরকত	৯৭	৮	রিফালজেণ্ট ষ্টোন	৭৫
৩	গ্রীন্ ষ্টোন্	১২৫	৯	ল্যাগু-ষ্টোন	৭৭
৪	নীলকান্তমণি	১৪৫	১০	ঝুটা মাণিক	১৭৫
৫	পর্ফিরি	১৭৪	১১	পিটোনী	৪৯
৬	টারকোইজ	৮৫৭	১২	কাশ্মীরী মার্ব্বল	৪৯

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রস্তরাদির নাম ও তাহাদের প্রাপ্তি-স্থান নিম্নে নির্দ্দেশ করা গেল :—

সংখ্যা	প্রস্তরাদির নাম	প্রাপ্তিস্থান	মণ
১	কর্ণিলিয়াস্	বোগদাদ	৯১০
২	কর্ণিলিয়াস্	আরব ফেলিক্স	২৪০
৩	টর্ক্ইস্	বড় তিব্বত	৫৪০
৪	লেপিজ্ লাজুলি	সিংহল	২৮০
৫	প্রবাল	মহাসমুদ্র	১১০
৬	এগেট ও অনিক্স	দক্ষিণ ভারতবর্ষ	৫৪০
৭	পোর্সিলেন	কানাড়া	অসংখ্য
৮	নম্মুনিয়া	নীলনদ	৯১৫
৯	ঝুটা রুবি	গঙ্গানদী	২৪৫
১০	সুবর্ণ-প্রস্তর	পার্ব্বত্য প্রদেশ	৯৭০
১১	পী-জহর	কুমাউন	১০১০
১২	গোয়ালিয়র প্রস্তর	গোয়ালিয়র	অসংখ্য
১৩	ব্যালব্যাষ্টার	সক্কানা	অসংখ্য
১৪	কৃষ্ণ প্রস্তর	হেহেরী	৫০১০

(২৭) দিল্লীর সম্রাট্ ও মহারাজ অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (১)

দিল্লীর সম্রাট্ বাহাদুর শাহ (দ্বিতীয়) শোভাবাজার-নিবাসী মহারাজ অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহাশয়কে সভাপণ্ডিত ও জীবন-চরিত-লেখক করিবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ এই,—"প্রিয় অপূর্ব্বকৃষ্ণ ! আপনি বিদ্যাচর্চ্চা ও মানসিক উন্নতি-সাধনে নিরন্তর নিযুক্ত আছেন বলিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। বহুদিন হইতে আমার ইচ্ছা আছে যে, আমি দিল্লীর দরবারে বসিয়া আপনাকে আমার হাতের কাছে রাখিয়া দিই। তবে আমার মনে হইতেছে যে, যদি আপনি আমার নিকটে কার্য্য গ্রহণ কর

(১) বাহাদুর সা (দ্বিতীয়) ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনিই ১৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গত সুকবি ও ঐতিহাসিক অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব বাহাদু মহাশয়কে দেওয়ানী পদ দিয়াছিলেন।

শোভাবাজার-নিবাসী মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের না শুনেন নাই, এরূপ লোক বাঙ্গালা-দেশে অতি বিরল। লর্ড ক্লাই ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। তি ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে, ২২শে নভে (১২০৪ বঙ্গাব্দে, ৯ অগ্রহায়ণ, বুধবার) দিবসে দেহত্যাগ করেন তিনি অপুত্রক থাকায় নবকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণী, তাঁহা (নবকৃষ্ণের) ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীমোহনকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৭৮ খৃষ্টাব্দে অন্য এক স্ত্রীর গর্ভে মহারাজ নবকৃষ্ণের একটি পুত্র জন্মে ইহার নাম রাজকৃষ্ণ। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করে ইনি অতি সুপুরুষ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দ ও পারসী ভাষায় তাঁহার সবিশেষ অধিকার ছিল। তাঁহার ৮ পুত্র জন্মে। ইহাদের নাম,—শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, দেবীকৃ অপূর্ব্বকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও যাদবকৃষ্ণ অপূর্ব্বকৃষ্ণ পিতার চতুর্থ পুত্র। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী পারসী ভাষায় বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও পার ভাষায় সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। তিনি ইংরাজী একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহার নাম "The Histo of the Conquerors of Ind." মার্স্‌ম্যান সাহেব দ্বারকা নাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি যেরূপ অনুরাগী ছিলেন, শোভাবাজা বংশের প্রতি সেইরূপ বিরাগী ছিলেন। মার্স্‌ম্যান, ১৮৫২ খৃষ্টা Friend of India নামক সংবাদ-পত্রে উক্ত পুস্তকখানি অপ্রীতিকর সমালোচনা করিয়াছিলেন। অপূর্ব্বকৃষ্ণ দিল্লীর সম্র দ্বিতীয় সাহালমের দেওয়ানী-পদ পাইলেন, ইহা মার্স্‌ম্যা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অপূর্ব্বকৃষ্ণের মৃ হয়।—লেখক

আপনার পদ-মর্য্যাদার হানি-জনক মনে করেন,তবে আপনাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিতে চাহি না। এইজন্য আমি আপনাকে এতদিন আনিতে পারি নাই। এখন আমার দেওয়ানের পদ খালি আছে। ইহার মাসিক বেতন ৪৫০০্ টাকা। আপনার অধীনতায় কয়েকটি লোক থাকিবে। এই টাকার ভিতর হইতে আপনাকে তাহাদের বেতন দিতে হইবে। আমার ইচ্ছা যে, আপনি এই পদ গ্রহণ করেন। যদি এই টাকা আপনি অল্প বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আপনি আমাকে জানাইলেই আমি আপনার বেতন-বৃদ্ধি করিয়া দিব। আপনি পাল্কী-ডাকে বা ষ্টীমারে আসিবেন, তাহা আমাকে জানাইবেন। যদি পাল্কী-ডাকে আসেন, তবে লিখিবেন, আমি কোন্ দিন কোন্ সময় আপনার জন্য পাল্কী-ডাকের বন্দোবস্ত করিব? যদি ষ্টীমারে আসেন, তবে কত খরচ-পত্র লাগিবে, তাহাও জানাইবেন। আপনার পিতামহ (মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর) দিল্লী-দরবারের বিশেষ সদস্য ছিলেন। এই হেতুই স্নেহবশতঃ আপনাকে পত্রখানি লিখিতেছি।" "মহারাজ অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহাশয় পরিশেষে উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।"—*The Citizen* quoted by *The Friend of India,* 18 Nov. and 14 Dec. 1852.

[ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, (কাব্যরত্ন, কবিভূষণ, উদ্ভটসাগর, বি-এ)।

"গোলোকের বেণু ভুলোকের বুকে ভুলে উঠেছিল বেজে—"

পিঁজরার পাখী উড়িয়া গিয়াছে, শূন্য খাঁচাটি দোলে!
পূর্ণিমা নিশা পোহায়ে গিয়াছে, ঘুমঘোরে চাঁদ ঢোলে!
নারিকেল-শাখা ভোরের বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া কা'রে
"বিদায়! বিদায়!" কহি ইঙ্গিতে পাতার আঙুল নাড়ে!
ফুলমালা হায় ধূলাতে লুটায়, দলিত হয়েছে দল
কুসুম-শূন্য মালার সূতায় কাহার চোখের জল!
হায় রে কখন্ ঘুমায়ে পড়েছি, জেগে দেখি খালি কোল!
আকাশে নেমেছে আলোর প্লাবন, পাখীরা তুলেছে রোল!

সে কি মোর পাশে এসেছিল কভু?—স্বপন নহে ত ইহা?
সুখ-স্বপনের মত তবে কেন গেল সে মিলাইয়া?
কভু কি তাহারে পেয়েছিনু বুকে?—মনে ত পড়ে না ভালো;
মোহের আঁধারে দেখিনি ত আমি শুধু আলেয়ার আলো?
আলেয়ার প্রায় কেন তবে হায় ক্ষণতরে দিয়ে দেখা
চির-বিরহের তমসার তীরে ফেলে রেখে গেল একা?

সে এত মধুর, সে এত সুখের, সে এত আশিসময়,
সত্য তাহারে পেয়েছিনু পাশে, ভাবিতেও করে ভয়!
মানুষ-প্রতিমা নহে সে আমার, মানসী প্রতিমা সে যে!
গোলোকের বেণু ভূলোকের বুকে ভুলে উঠেছিল বেজে!
তাই কি গো হায় সহিল না তাহা রজনীর অবসান,
পূর্ণিমা রাতি পোহাইয়া গেল, কুমুদিনী ম্রিয়মাণ!
তাই কি তাহারে নারিনু রাখিতে হেম-পিঞ্জরে বেঁধে
চরণ-নূপুর ফেলে রেখে প্রিয়া ফিরে গেল কেঁদে কেঁদে!

তারি আঁখিজল করে টলমল তরুশিরে, ফুলদলে,
তারি বিরহের অশ্রু-সায়রে তিনটি ভুবন টলে!
সে গিয়াছে চ'লে কিছু নাহি ব'লে ঘুম না ভাঙায়ে মোর,
সে গিয়াছে চ'লে নয়নের জলে ভিজায়ে মালার ডোর!
এখনো রয়েছে অঙ্গ সুরভি সুধা-কণ্ঠের সুর—
মনে হয় প্রিয়া পারে নি চলিয়া যাইতে অধিক দূর!
দিগ্বলয়ের কোলে কোলে ঐ জ্বলে যে আলোক-রেখা!
দৃষ্টি চলে না—নহিলে এখনো মিলিত প্রিয়ার দেখা!
বিশ্বপ্রকৃতি আজি এ প্রভাতে দুলিছে কিসের লাগি,
গাহি সারারাত এখনো কোকিল কেন বা রয়েছে জাগি?
আঁখিজল মত শুকায়ে গেল না কেন সে নিশার বায়,
কেন এ প্রকৃতি ডাকিতেছে কা'রে "ফিরে আয়! ফিরে আয়!"

কত না নিদয় আমার হৃদয়, কত না দিয়েছি ব্যথা
বিষ-নিশ্বাসে শুকায়ে গিয়াছে মনের দুলালী লতা!
বিদায়ের কালে তাই সে কিছুই কহেনি বিদায়-বাণী
নীরবে মুছিয়া নয়নের জল, চ'লে গেল অভিমানী!
চ'লে গেল প্রিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিলন-রজনী ভোরে
বিদায় নয়ন-সলিল-সায়রে অসহায় করি' মোরে!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

৩২
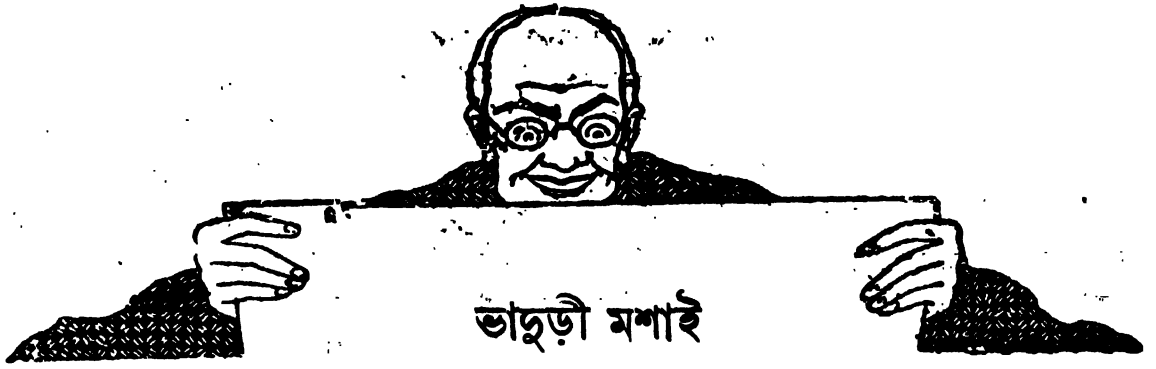
দুর্দ্দিনের দুশ্চিন্তা যখন মানুষকে কেবল দুর্ব্বল আর অবসন্নই করে—কূল দেয় না,—আশা যখন নিস্তেজ হয়ে নিবে যায়, তখন সেই চরম মুহূর্ত্তে তার মগ্ন-চৈতন্য একবার সজোরে সাড়া দেয়,—তার পৌরুষ জাগে। সহসা আর শক্তি ফিরে আসে, সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বলে,—"কি, হয়েছে কি?—এমন ক'রে থাকবো কেনো?—যা হবার হোক! চোরও নই, খুনও করি নি! হ্যাঁ—মিছে কথা বলেছি বটে—বেশ, তা স্বীকার ক'রে যাবো। এত ভয় কিসের?"

এই চরম মুহূর্ত্তেই মানুষের পরমপ্রাপ্তি ঘটে। আজ সেই প্রাপ্তি নিয়েই মাতঙ্গিনী দেবী শয্যা ত্যাগ করেছেন। যেন নূতন জগতে জেগেছেন। হতাশার বুক থেকেই এ আশার জন্ম। অকূলের মাঝ থেকেই এ কূল জেগে ওঠে।

কোন্ ভোরে উঠে আজ তাঁর বাসিপাট সারা হয়ে গেছে, বাড়ীতে সাড়া-সংবাদ প'ড়ে গেছে।—কি আছে, কি নেই, কি রান্না হবে, তার কুটনো পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

এ পূর্ব্বের সেই মাতঙ্গিনী।

স্নান-আহ্নিক সেরে, একরাশ কোঁকড়া ভিজে চুল—কাঁকুই টেনে পিঠময় ছড়িয়ে, টকটকে সিঁদুরের টিপ্ প'রে, একটা পাণ মুখে দিয়ে, প্রফুল্ল-মুখে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

স্টোভে চায়ের জল,—উনুনে কড়াইশুঁটির কচুরী চ'ড়ে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে সব প্রস্তুত।

মাতঙ্গিনী দেবী ভাদুড়ী মশাইকে তুলে দিয়ে, আচার্য্য আর নবনীকে তাড়া দিয়ে এসেছিলেন।

সকলেই বিস্মিত।

মাতঙ্গিনী দেবী সযত্নে একমনে তিনখানি ডিসে কচু সাজাচ্ছিলেন।

মন্দাকিনী দেবী দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে মু নেত্রে তাঁর রূপ দেখছিলেন,—"কি সুন্দর দেখাচ্ছে! আগে ত দেখেছি—এমনটি দেখি নি!"

—কথা কইলেন—সহাস্যে,—"আর একখানা চাই, তিনখানায় হবে না বোন্,—অতিথ জুটেছে।"

সহসা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মাতঙ্গিনী চম্‌কে চেয়ে—"ও কি ভাগ্যি!" বলেই উঠে মাথায় কাপড় টান্‌তে টান্ এসে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলেন। "বসুন" ব' নিজের চৌকিখানা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন,—"কত এসেছেন,—কিছু জান্‌তে পারি নি। মেয়েরা?"

"তাদের আর আনি নি,—বাড়ীতেই আছে, ওঁকে নি বেরিয়ে পড়েছি। শুনলুম, তোমার অসুখ·"

"কে বল্‌লে? হ্যাঃ—আমার আবার অসুখ! রোগ পুষে রোগ জড়িয়ে থাকে! আজ তাকে ধুয়ে মুছে দূর ক'রে দি বেঁচেছি;—আমাদের প'ড়ে থাকলে কি ভালো দেখায়···"

"তা খুব জানি। বিয়ের পরে যে আমাদের পাথ শরীর নিয়ে আসতে হয়! যাক্,—আজ না নাইলেই ভা করতে, বোন্!"

"ওতে কিছু হবে না দিদি,—কিছু হবে না। একখ ডিসের কথা যে বড় বললেন,—নিজের?"

এই ব'লে—দুখানা ডিস্ সাজাতে বসলেন।

দেখে, মন্দাকিনী দেবী বললেন—"আর তোমার?"

"রোগে ছাড়িয়েছে, দিদি।"

"তা হবে না,—আজ যখন নেয়েছ······"

বামুন ঠাকুর আসতেই ট্রে সাজিয়ে তাকে দিয়ে বাই পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

ফকির

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র খান্না

"চলুন—ঘরে চলুন।"

দু'এক কথার পর মন্দাকিনী দেবী বললেন—"বেশীক্ষণ বসতে পারব না বোন্, উনি আবার এক কাণ্ড ক'রে বসেছেন। পাশের বাংলোয় যে ছেলেক'টি আছে, তারা শীগ্‌গিরই চ'লে যাচ্ছে কি না, তাই তাদের আজ খাওয়াবার ইচ্ছে করেছেন। বললেন—'সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেবে না কি,—চলো চলো আগে ওবাড়ীতে ব'লে আসি। বউমাকেও আনা চাই,—কল্পবে কম্মাবে কে?"

—বললুম—"শুনেছি তাঁর অসুখ,—আমি ত আজ দেখতে যেতুমই।—"

—বললেন—"না না, ও তোমার শোনা কথা—তা কি হয়, তাঁর আসা চাই বৈ কি। শুনেছিলে ত বলনি কেন,—দু'দিন পরেই হোতো—"

—"তাই তাড়াতাড়ি নিয়ে এলেন। আমাকে ত দেখছো—কত কাযের লোক! আর মেয়ে দুটো ত ওই।—একটা মুখ বুজে থাকবে, আর একটা তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে,—দু'টোতে মাথামুণ্ডু ক'রে বসবে। তোমাকে যেতেই হবে ভাই—৯টার মধ্যেই হয়ে যাবে—বেশী রাত হবে না।—এখানে আবার লোক এ সব হাঙ্গাম করে?—না পাওয়া যায় কাশ্মীরী কেশর, না পাওয়া যায় শাজীরে······"

—"গিরিডিতে লোক পাঠিয়েছেন,—মেওয়া, মটন্, মিষ্টি যা পাওয়া যায় আনতে"······

শোনবার আগেই মাতঙ্গিনী দেবী এঁচে নিয়েছিলেন—কিছু একটা আছে। প্রস্তুতই ছিলেন, বললেন—"ও-বাসার বাবুদের কথা শুনেই আসছি। তাঁদের দেখবার এমন সুযোগ আর কবে পাবো?—আহা, আগে শুনলে সত্যিই আজ এত তাড়াতাড়ি নাইতুম না।—বোধ হয় কিছু হবে না।—তা হ'লে ওঁর সঙ্গে এক গাড়ীতেই যাব'খন।"

মন্দাকিনী বললেন—"নবনীকে কিন্তু ভাই নিয়েই যাওয়া চাই। বাবা আমার বড় লাজুক,—পাকা-দেখার পর থেকে একটি দিনও ও-দিক মাড়ান নি। একেবারেই আজকালের মত নয়।—ওই ত ভালো, উনিও ওই রকম ছিলেন"······

মাতঙ্গিনী বললেন,—"ও বরাবরই ওই রকম লাজুক, মেয়েদের দিকে কখনো মুখ তুলে চাইতে পারে না। ফুলমালা ওর মামাতো বোন্, একবয়েসী, একসঙ্গে তিন বছর খেলেছে, পড়েছে। সে-বছর এসেছিল,—ওর সঙ্গে দু'ঘণ্টা ধ'রে কত কথা, কত হাসি। চ'লে গেলে আমায় জিজ্ঞাসা করলে,—'মেয়েটি কে গা, দিদি!'—"

—"দেবতা দেবতা, বেঁচে থাকুন—"ব'লে মন্দাকিনী একটি নিশ্বাস ফেললেন। বললেন,—"আবার এঁর কথা যদি শোনো বোন্ ত বলবে জন্তু—জন্তু! চোখে ঠেক্‌লেই সে কাপড় কিনতেই হবে,—এ এক রোগ। অত কে পরে বল্‌ত ভাই,—ট্রাঙ্কে প'ড়ে প'ড়ে পচে। কখনো যদি তার একখানা পরি···অপর বাড়ীর কেউ বেড়াতে এসেছেন ভেবে অন্দরমহল মাড়ান না।"

মাতঙ্গিনী দেবী এ সব কথায় আর তেমন যোগ দেন না,—যেন কত সুদূর থেকে কিসের ব্যথা এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। ম্লান হাসি হাসেন, দু'একটি কথা কন। মন্দাকিনী ভাবেন—"আহা, সেই মানুষ—রোগে কি দুর্ব্বলই ক'রে দিয়েছে।—"

বললেন—"নবনীকে নিয়ে যাওয়া কিন্তু চাই-ই চাই, এ আর কেউ পারবে না,—এ ভারটি তোমার রইলো, ভাই।"

মাতঙ্গিনী হাসলেন, বললেন,—"ঠিক যাবে দিদি, ঠিক যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, মাটীর মানুষরাও মাটীর তয়েরি নয়!"

উভয়ের চোখে হাসি বদল হ'ল।

বাইরে থেকে ডাক পড়লো,—"বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

"তবে এখন আসি, বোন্—সত্যিই রাজ্যির কায প'ড়ে রয়েছে। যাওয়া কিন্তু চাই-ই—নবনীকে নিয়ে।"

মাতঙ্গিনী পেছনের পথ দিয়ে—তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

৩৩

নবনী এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে শেষ রান্নাঘরে এসে দিদিকে পেলে। মাছের কোরমার সুগন্ধে সে-দিক্‌টা আমোদ ক'রে রেখেছে। চাট্‌নি চড়েছে।

নবনীকে আসতে দেখে মাতঙ্গিনী দেবী হাসতে হাসতে বললেন,—"ও বেলা ত রান্না নেই, কেউ ত বাড়ীতে খাবে না—কুটুমবাড়ী নেমন্তন্ন। তোর শাশুড়ী অনেক ক'রে ব'লে গেল···"

"যাবে নাকি, দিদি?"

"বারণ কচ্ছিস নাকি? নেমন্তন্ন যে। না গেলে কি ভাল হয়? তাবী কুটুম…"

"তবে তুমি যেও।"

"আর তুমি?"

"ওখানে? ওইটি বোল না দিদি,—তা হ'লে আমি গিরিডি চল্লুম।"

"ছিঃ, পাগ্‌লামী করতে নেই,—তোর খাতিরেই ত…"

"সে সব আমি জানি না,—এর পরেও কি,…এ সব না মিটলে…"

মাতঙ্গিনী হাসতে হাসতে বললেন—"মিটবে আবার কি, তার সঙ্গে তোর কি? আমাকে কাল বাড়ী রেখে এলেই হবে। মীরার মত মেয়ে ঘরে আনলে সত্যিই সুখী হবি। আমরা চিনি…"

নবনীর নিশ্বাসটা খুব সাবধানে সরলো। বুকের বেদনা সামলে বললে,—"এ সব কি হচ্ছে, আমি ত,…তুমিই ত…"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই ত। সেখানেও আমিই আবার বরণ ক'রে বউ ঘরে তুলবো। আজই ত নয়,—সে ফাল্গুন মাসে। তোমার কিন্তু আজ নেমন্তন্ন রাখতে যাওয়া চাই ভাই,—আমি কথা দিয়েছি, নবনী…"

ফ্লানালের ফতুয়া গায়ে ভাদুড়ীমশাই এসে ঢুকলেন।—"এ কি! আগুনতাতে?—নেয়েছ যে দেখছি! এ সব কি, মাতু? ঠাকুর ত এসেছে।"

নবনী স'রে গেল।

মাতঙ্গিনী মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন—"ঠাকুর এসেছে ত হয়েছে কি? অধিকারটা ত আজো আমারই। ক'দিন শুয়েছিলাম,—এ কায ভুলে গেলে ত এখন আর চলবে না,…"

অনেক দিন পরে মাতঙ্গিনীর মুখে পূর্ব্বের মত হাসির রেখা দেখা দিয়ে ভাদুড়ীমশার সঙ্কোচের পাতলা পর্দাখানা সরিয়ে দিলে। কিন্তু কথাগুলোর গায়ে যে কাঁটা!—তাতে মনে মনে একটু বিরক্তও হলেন। অপরাধীর আসনে নেমে আসতে আর তাঁর মন চাইলে না। সে বিদ্রোহীর মত বলাতে চাইলে—আবশ্যক হ'লে লোক ছুটো যে করে না কি?……তার জন্যে……

পারলেন না। মাতঙ্গিনীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। যা ব'লে খোলসা হ'তে যাচ্ছিলেন, সেই বলাটাই বাইরে বেরুল না—মুখে চোখে তার রং চারিয়ে গেল।

তাঁর সে ভাবটা মাতঙ্গিনীর বুঝে নিতে বাকি রইল না,—স্বামীর সূক্ষ্ম ভাবান্তরও যে তাঁর সুপরিচিত।

সহজভাবেই বললেন—"আমাকে ক্ষমা কর—আমার মাথার ঠিক নেই, তুমিই আমার অধিকার বাড়িয়েছিলে। আর বলব না। তুমি যাতে ভালো থাকবে, তাই করো—কষ্ট পেয়ো না। আমি সকাল থেকে বেশ ছিলুম,—তুমি,…এ ছুটো দিন আমাকে……"

মাতঙ্গিনীর স্বরভঙ্গ হ'ল, চোখের জল সামালো না।

মাতঙ্গিনীর কাতর কথাগুলি সত্যের শক্তি নিয়ে অন্তর থেকে বেরিয়ে, ভাদুড়ী মহাশয়কে স্তম্ভিত, লজ্জিত ও ব্যথা-বিচলিত ক'রে দিলে। তিনি মাতঙ্গিনীর দিকে এক পা বাড়াতেই, বামুন ঠাকুর একটা কি নিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকলো।

মাতঙ্গিনী উনুনের দিকে ফিরে বসলেন,—ভাদুড়ীমশাই বেরিয়ে গেলেন।

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস! কি হোতো, কে জানে! ছু'জনেই সম্ভাবনার সন্দেহ, আর অনিশ্চিত আশার পীড়া বুকে ক'রে স'রে গেলেন। কেউ কারুকে বোঝবার অবকাশ পেলেন না।

মাতঙ্গিনী সকালে যে বলসঞ্চয় ক'রে শয্যাত্যাগ করেছিলেন,—চোখের জলে তা ভেসে গেল।

মাতঙ্গিনীকে যা বলতে এসেছিলেন, ভাদুড়ীমশার তা বলাই হ'ল না।

মনুষ্যত্বের চেতনায় জেগে উঠে, মুক্তির বাতাসে মাতঙ্গিনী যেন নব মাধুর্য্যে ফুটে উঠেছিলেন। তাঁর সেই বিষয়-নির্লিপ্ত শান্তভাব তাঁকে এমন এক অপূর্ব্ব রূপ দিয়েছিল, যা ভাদুড়ীমশাইকে মুগ্ধ ও বিস্মিত ক'রে দেয়। তিনি মাতঙ্গিনীর এত রূপ কোনো দিন লক্ষ্য করেন নি। সেই ত্যাগদীপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ সৌন্দর্য্য আজ তাঁর অন্তরের নীরব পূজা পেয়েছিল।

তার ওপর, মাতঙ্গিনীর শেষ মর্ম্মান্তিক আবেদন—তাঁর প্রাণে যে প্রকাশ-ব্যাকুল বিক্ষোভ এনেছিল,—পাচকের আকস্মিক আবির্ভাবে তা অনুচ্চারিত রয়ে গিয়ে তাঁকে অধীর

ক'রে দিলে। তিনি শয্যায় প'ড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন। মাতঙ্গিনীকে ডেকে পাঠাবার সাহস হ'ল না।

সে আবেগ-অধীর মুহূর্ত্ত স'রে গেল। লগ্ন ভ্রষ্ট···

তার পর নবনীর সঙ্গে তাঁকে কথা কইতে হয়েছে, আচার্য্যের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভাবকে আর কতক্ষণ ধ'রে রাখা যায়!—সে একটা মাকড়সার জালের স্পর্শ সইতে পারে না—স'রে যায়। ফেলে যায় কতকগুলো মোটা নীরস নীতি-কথা। তাতে মনটাই কেবল অস্বস্তিতে ভারি হয়ে থাকে। তাই হয়ে রইলো।

সময়ের মত সুচিকিৎসক নেই। মাঝখান থেকে মচকানো গাছেও সে ফুল ফোটায়, হরিৎ বাসে ক্ষত ঢেকে দেয়।

তিন ঘণ্টা পরে ভাদুড়ী, নবনী আর আচার্য্য খেতে বসলেন। মাতঙ্গিনী আজ নিজেই পরিবেষণ করছেন।

ভাদুড়ী মশাই কুণ্ঠিতভাবে বললেন—"ঠাকুর ত রয়েছে, সেই দিক না, তুমি······"

মাতঙ্গিনী হাসিমুখে বললেন,—"সে ত দেবেই, তার দেওয়া ত উঠে যাচ্ছে না গো, আমি······"

আচার্য্য মশার দিকে চেয়ে,—"এ কি, তুমি যে কিছু খাচ্ছো না, বাবা!"

আচার্য্য মশাই মাতঙ্গিনী দেবীর সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব আর হাসিমুখ দেখে বিস্মিত ও চিন্তিত হচ্ছিলেন। সত্যই তাঁর মুখে কিছু উঠছিল না।—"এ শক্তি কোথা থেকে পেলেন, এর পশ্চাতে······না এ ত অভিনয় নয়।"

বললেন,—"রাত্রে যে ডিপুটীবাড়ী নেমন্তন্ন আছে, মা।"

"ডিপুটীবাড়ীর খাওয়া ত এক দিনেই ফুরিয়ে যাচ্ছে না, বাবা,—ভালো ক'রে খাও।"

আচার্য্য মশায়ের একটা নিশ্বাস পোড়লো। ভাদুড়ী মশাই বললেন,—"নেমন্তন্ন ত সকলেরই আছে,—নিজেরা যখন এসেছিলেন, তোমাকেও যেতে হবে—"

মাতঙ্গিনী হাসতে হাসতে বললেন—"উচিত ত, এখন শরীর যদি······"

"তাই ত বলছি, ঠাকুর ত রয়েছে······"

"ওঃ, তাই বোলছো" ব'লে মাতঙ্গিনী আবার হাসলেন।

কথাটা আচার্য্যমশার আর নবনীর ভারি বিশ্রী লাগলো। ভাদুড়ী মশাইও ব'লে ফেলে ভুলটা বুঝেছিলেন। বললেন—"ছাখো, শরীরটা আগে, শরীর ভালো থাকলে তবে না আর সব, তুমি আজ যে রকম অনিয়ম"—

মাতঙ্গিনী বললেন—"আর যে আমি অসুখ নিয়ে থাকতে পারি না—তাকে ত আশা মিটিয়ে ভোগ ক'রে নিয়েছি, এখন বিদেয় করতে চাই। অসুখের কথা তুলে তুমি আর অসুখ এনে দিও না। তবে, শরীর যদি বয় ত যেতে চেষ্টা করবো।"

আচার্য্যমশাই সহসা একবার তাঁর দিকে চেয়েই মাথা হেঁট করলেন। সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন—"এ ত সামান্য পরিবর্ত্তন নয়। অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে মা কি খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে এলেন!—এ জাতকে চিনতে পারলুম না।"

ভাদুড়ীমশাই অবাক্ হয়ে মাতঙ্গিনীর দিকে চেয়েছিলেন—বোধ হয় তাঁর কথা শুনছিলেন। সে-দিনকার সে-রূপ ছিল তাঁর স্বতঃপূর্ণ—নির্লিপ্ত পদ্মের মত কোথাও কোন বাহ্য সংস্পর্শের সংস্রব ছিল না। প্রকোষ্ঠে কয়গাছা চুড়ি, কণ্ঠে সামান্য এক ছড়া হার,—দুই-ই বাপের বাড়ীর,—আজকাল বে-রেওয়াজের, আর কপালে সিন্দুরের টিপ মাত্র। তাঁর আজকের অপূর্ব্ব রূপ-দীপ্তিতে সে সব ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিল,—কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

হঠাৎ তাতে ভাদুড়ী মশার নজর পড়ায়,—তিনি যেন কি বলতে গিয়ে সামলালেন। মনটা যেন বলতে চেয়েছিল,—'ও-সাজে আমাকে অপমান করতে যেতে হবে না।' বিরক্তির ভাবটা তাঁর মুখখানা ছুঁয়ে গেল। বোধ হয়, আচার্য্যমশাই থাকায় কোন কথা হ'ল না। খাওয়া শেষ হয়েছিল,—সবাই উঠে পড়লেন।

[ক্রমশঃ ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিত্য আহার্য্য উদ্ভিদ

শরীরের স্বাস্থ্য ও কার্য্যকরী শক্তির উপরই সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সফলতা নির্ভর করে; আবার স্বাস্থ্য ও বলের সহিত আহারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেই জন্য পৃথিবীময় সমস্ত সভ্যদেশেই প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহার্য্য সাধারণের পক্ষে সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করা একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল এতদ্দেশে, যেখানে এরূপ আলোচনা অতীব প্রয়োজনীয়, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আন্দোলন দেখা যায় না। প্রত্যেক বৎসর নিবারণ-সাধ্য রোগ-সমূহে যে সহস্র সহস্র লোক মরিতেছে, বাঙ্গালী যে ক্রমশঃ অল্পায়ু হইতেছে, এবং কায়িক পরিশ্রম-সংশ্লিষ্ট অনেক কার্য্যে বাঙ্গালী যে দিন দিন হটিয়া যাইতেছে—তাহার মুখ্য কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও সামঞ্জস্য-বিরহিত আহার্য্যের অধিকতর প্রচলন। মাছ, মাংস, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি এত দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে যে, এগুলি সখের খাদ্যে পরিণত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের ন্যায় আমাদিগকেও শরীররক্ষার জন্য অতিমাত্রায় উদ্ভিজ্জ খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারে প্রত্যেকের অংশে যে পরিমাণ দুধ ও মাছ পড়ে, তাহার পরিমাণ এত সামান্য যে, শরীর-পোষণে তাহার প্রভাব নগণ্য বলিলেও চলে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সাধারণতঃ নিরামিষ আহারের অন্তর্ভুক্ত হয় বলিয়াই নিরামিষাহারী নিজ দেহ সুস্থ ও সবল রাখিতে পারেন; কিন্তু যদি সর্ব্বপ্রকার প্রাণীজ দ্রব্য বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ নিরামিষাহারের পুষ্টিকর মূল্য অনেক কমিয়া যায়। তথাপি ইহাও সত্য যে, উদ্ভিজ্জ খাদ্য উপযুক্তরূপে নির্ব্বাচিত ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যবহৃত হইলে, ঐ সমুদয় হইতেও যথেষ্ট বলাধান হইয়া থাকে। আমাদিগের দৈনন্দিন খাদ্য যখন প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আহার্য্য উদ্ভিদগুলি সম্বন্ধে সাধারণের কিছু বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। তাহাতে সামান্য শাক, পাতা, ফলমূলেরও অধিকতর সদ্ব্যবহার হইতে পারে।

আহার্য্যের প্রকৃতি

আমিষ অথবা নিরামিষ, যে কোন প্রকার খাদ্য শরীর-পোষণের সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে হইলে, উহাতে চারি শ্রেণীর উপাদান যথাযথ মাত্রায় থাকা আবশ্যক। সেগুলির স্বরূপ নিম্নরূপ—(১) প্রটীন—ইহা সোরাজান-মূলক ও আমিষ খাদ্যে সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে থাকে ও আমিষ-প্রটীন অপেক্ষাকৃত সহজপাচ্য। শরীরে মাংস গঠন করাই ইহার প্রধান কার্য্য। (২) বসা—ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। আহার্য্যে প্রয়োজনাধিক যেটুকু বসা থাকে, তাহা শরীরে সঞ্চিত হয় এবং অপর সময়ে খাদ্যাভাব হইলে উক্ত সঞ্চিত বসাই শক্তি ও উত্তাপ প্রদান করিয়া জীবন-ধারণের সহায়তা করে। বসার উত্তাপ দিবার ক্ষমতা প্রটীন, (৩) শ্বেতসার, শর্করা ও তজ্জাতীয় দ্রব্য; ইহাদের শরীর-গঠনের ক্ষমতা নাই, কিন্তু নানাবিধ পরিশ্রমের কার্য্য করিতে ও দেহের উত্তাপ রক্ষা করিতে যে তেজ আবশ্যক হয়, তাহা এই শ্রেণীর দ্রব্য হইতে পাওয়া যায়। আবশ্য-কাতিরিক্ত শ্বেতসার ও শর্করা বসায় পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীরের মেদোবৃদ্ধি করত লোককে অলসস্বভাব করে। (৪) লবণ-সমূহ:—আমাদিগের সাধারণ আহার্য্যে যে পরিমাণ লবণ থাকে, তাহাই প্রায় শরীরপোষণের জন্য যথেষ্ট। লবণ-সমূহ দ্বারা অস্থি গঠিত হয় এবং তৎসমুদয়ের অভাব হইলে, শরীর, বিশেষতঃ শিশুগণের দেহ রুগ্ন ও অপুষ্ট হয়। জল ব্যতীত কোন দ্রব্য পরিপাক হয় না, কিন্তু সকল খাদ্যেই অল্পবিস্তর পরিমাণে জল স্বভাবতঃ বিদ্যমান; মানব-শরীরের চারি ভাগের মধ্যে প্রায় তিন ভাগ জল; এতদ্ভিন্ন যে পরিমাণ জল আবশ্যক হয়, তাহা মানুষ সহজ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পান করিয়া থাকে।

কিন্তু এ স্থলে একটি বিশেষ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে খাদ্য শুধু মুখরোচক ও উৎকৃষ্টভাবে প্রস্তুত হইলেই হইল না;

অতি সূক্ষ্মপরিমাণে হইলেও উহাতে এমন একটি পদার্থ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, যাহার অবস্থিতি হেতু খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান-সমূহ শরীরপোষণের কার্য্যে আইসে এবং যাহার অভাবে পুষ্টিকর খাদ্যও কোন ফল প্রদান করে না, পরিশেষে মৃত্যু অনিবার্য্য হয়। উক্ত সূক্ষ্ম উপাদানকে Vitamin অথবা খাদ্যপ্রাণ বলা হয়। পুরাকালে হিন্দুগণ খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্ব অবগত ছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে স্থানে স্থানে যেরূপ ভাবে খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, পরক্ষোভাবে তাঁহারা খাদ্যপ্রাণের উপকারিতা বুঝিতেন। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল : —

১। "ক" (A)—শূকরের চর্ব্বি ব্যতীত অন্য প্রাণিজ চর্ব্বিতে, দুগ্ধে, ডিম্বের কুসুমে, গমের ভূষি, ছানা, মাখন, কড্‌লিভার তৈল ইত্যাদিতে ইহা সুলভ; উদ্ভিজ্জ তৈলে ইহা থাকে না, সেই জন্য বিলাতী ঘৃত (Vegetable ghee) বর্জ্জনীয়। (ক) খাদ্যপ্রাণের অভাবে চক্ষুরোগ ও সহজে রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা জন্মিয়া থাকে। রন্ধনকালে ইহা কতক মাত্রায় নষ্ট হয়।

২। (খ) (B)—নানাবিধ শস্য, দাউল, দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতিতে ইহা বিদ্যমান; খাদ্য যতই স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রহণ করা যায়, ততই ইহা অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল ও জাঁতার আটায় ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও কলের ছাঁটা ও মাজা চাউল ও সাদা ময়দা খাদ্য-প্রাণ-বিরহিত এবং এই শেষোক্ত প্রকার খাদ্যের সহিত বেরিবেরি রোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উত্তাপ দ্বারা খ-খাদ্যপ্রাণও কতক পরিমাণ নষ্ট হয়।

৩। (গ) (C)—টাট্‌কা সব্জীতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণ থাকে। পাতি, কাগজী, গোঁড়া ও কমলা নেবু, বিলাতী বেগুণ, বাঁধা কপি, পালং শাক, কড়াইশুঁটি, অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগ প্রভৃতি গ-খাদ্যপ্রাণ-বহুল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুলা, গ্রন্থিতে বেদনা, নাক ও দাঁতের মাড়ি হইতে রক্তস্রাব ও মলিন বর্ণ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত স্কার্ভি রোগের ইহা প্রতিষেধক। অধিকক্ষণ ধরিয়া তরকারী সিদ্ধ করিলে তাহাতে গ-খাদ্যপ্রাণ থাকে না।

৪। (ঘ) (D) :—অনেক প্রাণিজ চর্ব্বিতে 'ক' খাদ্যপ্রাণের সহিত ইহাও অবস্থিতি করে; ইহা অস্থিবিকৃতি রোগের প্রতিষেধক; ইহার অভাবে পাথরিও হয়।

৫। (ঙ) (E) :—জাঁতার আটা ও ডিম্বের কুসুমে অন্য দ্রব্যাপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাকে। স্ত্রীলোকের খাদ্যে ইহা উপযুক্ত পরিমাণে না থাকিলে বন্ধ্যা-রোগ উপস্থিত হয়।

নিম্নে সাধারণ উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্য-সমূহের পোষণশক্তি-নির্ণায়ক যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহাতে প্রত্যেক খাদ্যে কোন্ শ্রেণীর উপাদান কি মাত্রায় আছে, তাহা দেখান হইয়াছে। আমাদিগের নিত্য আহার্য্য অনেক উদ্ভিদে খাদ্যপ্রাণের স্বরূপ ও মাত্রা এখনও নির্ণীত হয় নাই; সেরূপ স্থলে কিছুই লেখা হয় নাই।

খাদ্যের নাম	জল	প্রতীন	বসা	শর্করা শ্বেতসার ইঃ	লবণ	খাদ্যপ্রাণ
গোধূম (ভাঙ্গা)	১২	১১	১·৭	৭১·২	১·৯	ক, খ
চাউল ঢেঁকি-ছাঁটা	১১·০৬	৭·২	০-৬	৭৬·৮	১	ক, খ
ঐ কলে ছাঁটা	১২·৪	৬·৯	·৪	৭৯·৪	·৫	০
দাউল মুগ		২৪	২	৬৪·২	৩	
" মসূর		২৪	২	৫৮·২	৪·৫	ক,খ
" ছোলা		২২·৮	৪·২	৬৭·৭	২·৫	
" অরহর		২০	২·৭৫	১৩·১	৮·৫	
" মটর		২৫	·	৫৮	২	ক,খ
" কলাই		২২	২·২	৬৬·৮	৩	
" গড়ী কলাই	১১·০	৩৫·৩	১৮·৯	২৬·০	৮·৮	
কদলী পক্ক	৭৪·৮	১·২	·২	২৩·০	·৮৪	খ,গ
" অপক্ক	৬৪·৭	১·৩	·৪	৩২·৮	·৮	গ
নেবু কাগজী,পাতি	৮৬·০	·৮	·১	১২·৩	·৮	খ,গ
নারিকেল	৪৬·৬৪	৫·৪৯	৩৫·৯৩		০·৯৭	ক,খ,ঘ
পেঁপে	৮৮·৭	·৬	·১	১০·০	·৬২	ক,খ
আম	৮২·৪	·৭	·২	১৭·২	·৪৮	খ,গ
আলু	৭৬·৭	১·২	·১	১৯·১	·৯	ক,খ

খাদ্যের নাম	জল	প্রতীন	বসা	শর্করা শ্বেত-সার ইঃ	লবণ	খাদ্যপ্রাণ
পটল্		০·২১		০·৩৭		
লাউ		০·১৬	০·৭	০·২৭		ক
পিঁয়াজ	৮৯·১	১·৬	·৮	৪·৬	·৬১	গ
মূলা	৯০·৮	১·৪	·১	৪·৬	·৭	গ
বেগুণ		০·১৬	০·১	০·৫৭		
শসা	৯২·৮	·৬	·২	৫·৮	·৫৭	খ
পুঁই		১·৬				
নটে		০·২				
তিল		৩	৪২-৪৮			
সরিষা			৩৯-৪৬			
পোস্ত			৩৬·৩৮			
শঠী		৫·৬		৭২		
পানিফল		৮·৬		৭৪·৭		

বিভিন্ন শ্রেণীর আহার্য্য উদ্ভিদ

বঙ্গদেশে প্রায় এক শত জাতীয় উদ্ভিদ খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য যে, কতকগুলির চাষ অতি সামান্য, কেবলমাত্র সখের বাগানে আবদ্ধ। অন্য কতকগুলি উদ্ভিদ বৎসরের সব সময় পাওয়া যায় না। আমরা এ স্থলে শুদ্ধ সেইরূপ উদ্ভিদের আলোচনা করিতেছি—যেগুলি অথবা যাহাদের অংশবিশেষ বৎসরের অধিকাংশ সময় পাওয়া যায় এবং যাহাদের ব্যবহার সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে খুব সাধারণ। এই সমস্ত উদ্ভিদকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়, যথা—

শস্যবর্গ:—অবশ্য ধান্যই আমাদিগের অন্যতম ফসল। বাঙ্গালার প্রায় ৭ শত লক্ষ বিঘা জমীতে ধান-চাষ হয়, আর গোধুমের জমীর পরিমাণ ৫ লক্ষ বিঘার অধিক হইবে না। স্বভাবতঃ বাঙ্গালী ভাতের উপরই নির্ভর করে। চাউল ও গোধুম উভয়ই শ্বেতসারপ্রধান খাদ্য; কিন্তু আটায় প্রতীণের মাত্রা অধিক এবং তাহাই ক্ষীণকায় বাঙ্গালীর পক্ষে অধিক আবশ্যক। সেই জন্য ভদ্রলোকের পক্ষে এক বেলা ভাতের পরিবর্ত্তে রুটী খাওয়াই প্রশস্ত। আরও দেখা দরকার যে, ভাতের মাড় ফেলিয়া দিয়া আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক চাউলের সহজপাচ্য সারাংশ বাদ দিয়া থাকি। চাউল সিদ্ধ করিতে ঠিক আবশ্যকমত জল দেওয়া উচিত। ধান্যজাত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য—চিঁড়া, মুড়ি, খই ইত্যাদিরও যথেষ্ট উপকারিতা আছে এবং বাজারের খাদ্য খাওয়া অপেক্ষা ঐগুলি অনেকাংশে ভাল,—আমরা সে কথা কার্য্যত ভুলিয়া যাই। বেরি-বেরি রোগ কলের পালিশ-করা চাউলের ব্যবহারজনিত; এইরূপ চাউল খাইয়া রোগগ্রস্ত হইলে কুঁড়া-ভিজান জল খাওয়া দরকার হয়; তদপেক্ষা ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল, যাহাতে চাউলের লোহিতাভ ত্বক্ ঈষৎপরিমাণে বর্ত্তমান, তাহা আহার করিয়া রোগনিবারণ করাই শ্রেয়ঃ। ধান্য অনেক দিন গুদামজাত করিয়া অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়, কিন্তু চাউল অধিক দিন, বিশেষতঃ বর্ষাকালে ভাল থাকে না। আর্দ্র ও উষ্ণ গুদামে রক্ষিত চাউলে সময়ে সময়ে বিষক্রিয়াযুক্ত উৎসেচকের (Ferment) উৎপত্তি প্রমাণিত হইয়াছে।

পুষ্টিকর উদ্ভিজ্জ আহার্য্যের মধ্যে দাউলের স্থান খুব উচ্চে; যদিও মাংস অপেক্ষা দাউলের প্রতীন হজম করা অধিকতর কষ্টসাধ্য, তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে, ভাতের মাত্রা কমাইয়া বাঙ্গালীর খাদ্যে দাউলের মাত্রা বাড়াইলে উপকার ব্যতীত অপকার নাই। বঙ্গদেশে এক ছোলা ভিন্ন অন্য কোন দাউলের বহুবিস্তৃত চাষ হয় না। দাউল সাধারণতঃ বিহার অথবা যুক্তপ্রদেশ হইতে আসে এবং সেই জন্য মূল্য অধিক ও সাধারণ লোক বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারে না। এতদ্দেশে দাউল ফসলের প্রসারবৃদ্ধি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ স্থলে ধান্য অথবা গড়ী-কলাইয়ের উল্লেখ করিতে পারা যায়; তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, ইহাতে শতকরা ৩৫ ভাগ প্রতীন রহিয়াছে। বস্তুতঃ পুষ্টিকর গুণে ইহা মাছ-মাংস অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর। এই দাউল চীন ও জাপানের আদিম অধিবাসী এবং উক্ত দেশসমূহে যথেষ্ট আদৃত হয়। মাঞ্চুরিয়া হইতে আজকাল প্রভূত পরিমাণে গড়ী-কলাই য়ুরোপে রপ্তানী হইতেছে। ভারতে ইহা বিগত শতাব্দী হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; ইহার বন্য ও কর্ষিত উভয় প্রকার জাতিই আছে এবং আসাম অঞ্চলে তৎসমুদয় বেশ ভাল জন্মে। বাঙ্গালার অনেক জিলাতেও ইহার চাষ হইতে পারে। ভবিষ্যতে সাধারণের অবহিত হওয়া আবশ্যক। সিদ্ধ করিয়া ভাতের সঙ্গে খাওয়া ব্যতীত, দাউল অন্যরূপেও ব্যবহৃত হয়, যথা—

ছাতু ও মিষ্টান্ন হিসাবে; মুগের বরফি, ছোলার লাড্ডু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য;—যদিও সভ্য সমাজে ইহাদের চলন কমিয়া গিয়াছে। অঙ্কুরিত মুগ ও ছোলা পূর্ব্বে আমাদিগের প্রাতঃকালীন জলখাবার ছিল; তাহা ত্যাগ করিয়া আমরা বিশেষ কিছু লাভ করি নাই, বরং স্বাস্থ্যহানিই হইয়াছে। অঙ্কুরিত অবস্থায় দাউল সহজপাচ্য আহার্য্য।

ফলবর্গ:—ফল আজকাল অনেকটা সখের খাওয়ায় গণ্য হইয়াছে; আবার অনেকে ফল বলিতে শুষ্ক অথবা আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি মেওয়া ফলই বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাহা ভ্রম। বঙ্গদেশে ক্ষুদ্র ও অর্দ্ধবন্য ফলের অভাব নাই; তদ্ভিন্ন কদলী, নারিকেল, আম, পেঁপে প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফলও এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু দৈনন্দিন আহার্য্যের ফলও যে একটা উপাদান, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। পক্ব কদলী যদিও গুরুপাক, তথাপি উপযুক্ত মাত্রায় আহার করিলে ইহা যথেষ্ট পুষ্টিকর। নারিকেল পূর্ব্বে নানারূপে ব্যবহৃত হইত এবং তাহা করিবার প্রচুর কারণ ছিল। মুসলমানগণের মধ্যে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, নারিকেলের মধ্যে খোদা রুটী ও জল উভয়ই দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক সত্য। শুষ্ক নারিকেল খাইয়া যে বহু বৎসর ব্যাপিয়া সুস্থ ও সবল থাকা যায়, তাহা Engelhardt নামক জনৈক অষ্ট্রীয়াবাসী নিজ জীবনে প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিকারী, নারিকেল উৎপাদন তাঁহার পেশা এবং ১৫ বৎসর যাবৎ নারিকেলের শাঁস ও জল ব্যতীত অন্য কোন আহার্য্য তিনি গ্রহণ করেন নাই। কাগজী, পাতি ও গোঁড়া নেবুর অন্যান্য গুণ ভিন্ন স্কার্ভি-রোগ-নাশক গুণও আছে এবং সেই জন্য সমুদ্রগামী পোতমাত্রেই নেবুর রস সঞ্চিত থাকে। আমচুরেও উক্ত গুণ বর্ত্তমান। পুরাকালে হিন্দু নাবিকরা সমুদ্রযাত্রার সময় যথেষ্ট পরিমাণে আমচুর সঙ্গে লইয়া যাইত। পেঁপের চাষ আরও অধিক পরিমাণে হওয়া আবশ্যক। পক্ব ও অপক্ব, উভয় অবস্থাতেই ইহা উত্তম খাদ্য।

সবজীবর্গ:—শাক-ভাত পূর্ব্বে দরিদ্রেরই আহার ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেক ভদ্র মধ্যবিত্ত ব্যক্তিও তদপেক্ষা অধিক কিছু খাইতে পান না। শাকসব্জী প্রভৃতি কতক পরিমাণে স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যক, কারণ,এই সমুদয় দাস্ত সাফ থাকার সহায়তা করে। কিন্তু ওজন হিসাবে ইহাদের সার পদার্থ কম, অর্থাৎ অধিক না খাইলে আবশ্যক পরিমাণ শরীর-পোষণোপযোগী উপাদান পাওয়া যায় না। যাহারা যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদিগের পক্ষে এরূপ গুরু আয়তনের খাদ্যে তত অপকার হয় না। কিন্তু কায়িক পরিশ্রম-বিমুখ মস্তিষ্কজীবী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ খাদ্য দরকার—যাহা আয়তনে কম হইবে, অথচ যাহাতে শরীরপোষণ-উপাদান অধিক মাত্রায় থাকিবে। সেরূপ হিসাবে আলু উৎকৃষ্ট খাদ্য, কিন্তু সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ইহার খোসা ছাড়ান আদৌ ঠিক নহে। অধিক সিদ্ধ করিলেও ইহার গুণ নষ্ট হয়। বেগুণ বৎসরের সব সময়েই পাওয়া যায়; অবশ্য শীতের বেগুণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তপ্ত ছাইয়ের মধ্যে বেগুণ পোড়াইয়া লইলে তাহার খাদ্য-প্রাণ প্রায় সমানই থাকে। বেগুণ দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়; অধিকক্ষণ বেগুণ সিদ্ধ করা অনুচিত। পটল আলুর ন্যায় পুষ্টিকর না হইলেও ইহা সুখাদ্য। লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি সব্জীতে জলের মাত্রা খুবই অধিক; যতদূর সম্ভব কম জল দিয়া ইহাদের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলে তাহার পুষ্টিকর গুণের লাঘব হয় না। পিঁয়াজ ও মূলা উভয়ই পুষ্টিকর খাদ্য এবং উভয়েই যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ আছে, কিন্তু সামান্য পরিমাণ কাঁচা মূলা খাওয়া অধিক উপকারজনক। যাহারা কলিকাতায় প্রধান বাজার-সমূহে সকালে আমদানী শাকসব্জী বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য জানেন যে, আজকাল কর্ষিত ভিন্ন অনেক অকর্ষিত অর্দ্ধবন্য উদ্ভিদও বাজারে শাকরূপে বিক্রয় হয় এবং লোক আগ্রহের সহিত লইয়া থাকে। শাকের মধ্যে অবশ্য ডেঙ্গো ডাঁটা, নটে, পুঁই প্রভৃতিই অধিকাংশ সময় বাজারে পাওয়া যায় এবং উহাদের পুষ্টিকর গুণও নিতান্ত সামান্য নহে। গন্ধার ও রামদানা নামক ডেঙ্গো পার্ব্বত্য অঞ্চলে উৎপাদিত হয় এবং ইহাদের বীজ ভাতের ন্যায় রন্ধন করিয়া খাওয়া হইয়া থাকে। রামদানা-বীজের ন্যায় সামঞ্জস্য-সমন্বিত খাদ্য বিরল। নটেশাকে খাদ্যপ্রাণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকায় ইহা দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের পক্ষে উপকারক। বিলাতী স্পাইশাক উৎকৃষ্ট সব্জী; আমাদিগের পুঁই তাহারই সমকক্ষ; সেই জন্য ইহাকে ভারতীয় স্পাইশাক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

তৈলবর্গ:—উদ্ভিজ্জ তৈলে খাদ্যপ্রাণ থাকে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কয়েকটি তৈলবীজ আহার্য্যরূপেও ব্যবহৃত হয়, যথা—সরিষা, পোস্ত ও তিল।

তিলে কিয়ৎপরিমাণে প্রতীন আছে, সেই জন্ম তিলকুটো ও তিলের মেঠাই তৈয়ারী করিবার প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তিল, তিসি ও পোস্তদানার মিষ্টান্ন প্রস্তুতের এখনও চলন রহিয়াছে। ইহা যে বিজ্ঞানসম্মত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্বেতসারবর্গ:—রোগী অথবা শিশুপথ্যের পক্ষে উপযুক্তরূপে প্রস্তুত শঠী, তিক্সুর অথবা পানিফলের পালো যে অনেক ভাল, তাহা বর্ত্তমান সময়ে প্রমাণিত হইয়াছে। বিলাতী সাগু অথবা বার্লিতে কেবল শ্বেতসার ভিন্ন আর কিছুই থাকে না; খাদ্যপ্রাণও নাই। পক্ষান্তরে, ঢেঁকিতে প্রস্তুত পালোতে অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান থাকে এবং উহা একবারে খাদ্যপ্রাণবিবর্জ্জিত হয় না।

আমরা এ স্থলে খুব সাধারণ কতিপয় উদ্ভিদের উল্লেখ করিলাম মাত্র। আমাদিগের নিত্য আহার্য্য উদ্ভিদ-বিষয়ক অনুসন্ধান অতি অল্পদিনমাত্রই আরম্ভ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সমধিক ও ধারাবাহিক গবেষণা হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে, আয়ুর্ব্বেদে পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই বিজ্ঞানসম্মত। বর্ত্তমান যুগোপযোগী উহাদের পরিবর্ত্তন করিয়া আহার্য্যের একটি সাধারণ Standard নির্দ্ধারিত করা ব্যতীত জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির কোন উপায় নাই।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

মেঘদূতের উদ্ভিদাবলী

উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ সুলেখক শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয় গত আষাঢ়ের "মাসিক বসুমতী" পত্রিকায়, "মেঘদূতের উদ্ভিদাবলীর" বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমূলক পরিচয় দিয়া প্রভূত গবেষণার ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করা যায় এবং তজ্জন্য 'বসুমতী'র, তথা 'মেঘদূতে'র, অনেক পাঠকই তাঁহার নিকটে ঋণী। প্রবন্ধগত ২।১টি বিষয়ে আমাদিগের কিঞ্চিৎ সংশয় উপস্থিত হওয়ায়, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

কুটজ, ককুভ।—কুড়চী ও অর্জ্জুন, এই দুই বৃক্ষ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তদ্বিষয়ে মতভেদের অবসর নাই। বৈদ্যক শাস্ত্রমতে উহাদিগের ত্বকের গুণও পৃথক্। প্রথমটি আমাশয়-প্রতিষেধক দ্বিতীয়টি হৃদ্রোগ-নিবারক। কিন্তু যে সকল স্থলে অনবধানতা বশতঃ এই দুইটিকে সমানার্থবাচকরূপে গৃহীত হইয়াছে, সে অনবধানতার মূল স্বয়ং সূরি মল্লিনাথ ও তাঁহার অবিলম্বিত কোষগ্রন্থ 'শব্দার্ণব'। মেঘদূতের 'সঞ্জীবনী' টীকায় মল্লিনাথ 'ককুভৈঃ' পদের প্রতিশব্দ দিয়াছেন 'কুটজকুসুমৈঃ', আর তাহার প্রমাণকল্পে উল্লেখ করিয়াছেন—"ককুভঃ কুটজোঽর্জ্জুন ইতি শব্দার্ণবঃ।" ইহা হইতে সন্দেহ জন্মে—সম্ভবতঃ ককুভার্থে কুড়চী ও অর্জ্জুন দুই-ই বুঝায়, অথবা ককুভের ন্যায় কুটজও (কুড়চী ব্যতীত) অর্জ্জুনের নামান্তর। শব্দার্ণবের সূত্রানুসারে দেশপ্রচলিত 'অর্জ্জুন', ককুভের ন্যায়, সংস্কৃত শব্দ; কিন্তু কুড়চীর পক্ষে সংস্কৃতে 'কুটজ' ভিন্ন নামান্তর জানা নাই। অন্যতম কোষকার হলায়ুধের মতানুসারে মল্লিনাথ কুটজকে 'গিরিমল্লিকা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এখন "গিরিগাত্রে প্রচুর পরিমাণে ফুটিয়া থাকে বলিয়া" কুড়চী ফুলই গিরিমল্লিকা, অথবা বনমল্লিকার ন্যায় 'কুটজকুসুম' ও 'ককুভ' কোন পৃথক্ পার্ব্বত্য মল্লিকা *—ইহাই সন্দেহের বিষয়। যাহাই হউক, শব্দার্ণবপ্রণেতা ও মল্লিনাথ ঐ উভয় কুসুমকে অভিন্ন বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

নীপ, কদম্ব।—এই দুটি বৃক্ষকেও নিকুঞ্জ বাবু স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য করিয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা দ্বারা উহাদিগের সম্যক্ পরিচয় দিয়া স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সূত্রে তিনি লিখিয়াছেন,—"মল্লিনাথ এই দুইটিকে স্বতন্ত্র বৃক্ষ বিবেচনা করেন।" তাঁহার এরূপ উক্তির ভিত্তি নির্ণয় করিতে পারিলাম না। মল্লিনাথ-কৃত 'সঞ্জীবনী' টীকায় 'নীপং' শব্দের অর্থ পূর্ব্বমেঘের একবিংশ শ্লোকে "স্থলকদম্বকুসুমম্" এবং উত্তরমেঘের দ্বিতীয় শ্লোকে কেবল "কদম্বকুসুমম্" বলিয়া উক্ত হইয়াছে,—কেলিকদম্বাদি কোন সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয় নাই; এ স্থলেও 'শব্দার্ণব'-কেই তিনি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। পরন্তু স্থানান্তরে 'কদম্বৈঃ' শব্দের প্রতিবাক্যে 'নীপবৃক্ষৈঃ' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব মল্লিনাথের মতে নীপ ও কদম্ব অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। কালিদাস কদম্বকে 'প্রৌঢ়পুষ্প' বলিয়া বিশেষিত করার হেতু-নির্দ্ধারণকল্পে নিকুঞ্জ বাবু লিখিয়াছেন,—"বর্ষাকালে কদম্বফুলকে প্রৌঢ় বলার কারণ এই যে, উহা গ্রীষ্মের শেষভাগে ফুটিয়া

---

* মেঘদূতের অন্যতম ইংরেজী অনুবাদক রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকার, M. A. M. R. A. S. মহাশয় এইরূপই অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'কুটজ' is a species of jasmine growing on highlands, which flowers during the rains.

থাকে।" মল্লিনাথ এরূপ কোন উদ্ভাবনার চেষ্টা করেন নাই—তাঁহার মতে 'প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ' অর্থে 'প্রচুরকুসুমৈঃ।'

কাননোদুম্বর।—নিকুঞ্জ বাবু ইহাকে যজ্ঞডুমুর হইতে স্বতন্ত্র বৃক্ষ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যাঁহারা উহাকে "যজ্ঞডুমুর বলিয়া ধরিয়াছেন", তাঁহাদিগের বিশেষ দোষ দেখা যায় না। অমরকোষে "উদুম্বরো জন্তুফলো যজ্ঞাঙ্গো হেমদুগ্ধকঃ" একপর্য্যায়ভুক্ত থাকায় 'বনডুমুর' যজ্ঞাঙ্গ বলিয়াই অনেকের ধারণা। তবে, দেশ-কাল-জাতি পর্য্যালোচনায়, নিকুঞ্জ বাবুর সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ, প্রাচীন আভিধানিক অর্থের সহিত অধুনাতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সুসঙ্গতি-সাধন অনেক স্থলেই দুরূহ হইয়া উঠে।

মন্দার, কল্পতরু।—মন্দার যে সাধারণ পালতে-মাদার নহে, নিকুঞ্জ বাবু-প্রদর্শিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব্যতীত তাহার আর এক নিদর্শন পাওয়া যায়। কোষকার অমর হিমালয়স্থ পঞ্চবিধ দেবতরুর উল্লেখ করিয়াছেন—

"পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্।"

তন্মধ্যে মন্দার ও পারিজাত দুইটি স্বতন্ত্র বৃক্ষ। পারিজাত, বোধ হয়, নিঃসংশয়ভাবে পালতে মাদার,—সুতরাং মন্দার তদিতর বৃক্ষ। পারিজাতের পূর্ব্বগৌরব নষ্ট হওয়া সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী আছে,—"প্রেয়সী সত্যভামার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে জয় করিয়া এই বৃক্ষ পৃথিবীতে আনয়নপূর্ব্বক দ্বারকায় রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর ইহার অলৌকিক গন্ধাদি, সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।" হরিচন্দনের অপর নাম গোশীর্ষ; সুগন্ধি ও সুশীতল এই পার্ব্বত্য শ্বেতচন্দনকাষ্ঠ অদ্যাবধি হিন্দুর সমস্ত দেবকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পঞ্চ দেবতরুর মধ্যে এই তিনটি পরিচিত বৃক্ষ ব্যতীত অবশিষ্ট থাকে—সন্তান ও কল্পবৃক্ষ। 'সন্তান' বা 'সন্তানক'ও কি কল্পবৃক্ষের ন্যায় কাল্পনিক উদ্ভিদ? কোন কোন অভিধানকার বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুরও দেবতরুভুক্ত করিয়াছেন। এই তিনের মধ্যে কোনটা যদি 'সন্তান' হয়, বা উহার কোন বৈজ্ঞানিক জাতি বা বর্গ নির্ণীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাত্র 'কল্পবৃক্ষ'কেই কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষা করা সঙ্গত মনে হয় না। দেবতরুমাত্রই কবিকল্পপ্রসিদ্ধ কাল্পনিক বৃক্ষ হইলে তাহা সঙ্গত বোধ হইত; কিন্তু কোষকার যখন দেবতরু পাঁচটি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও তন্মধ্যে চারিটিকে বর্ত্তমান কালে চিনিয়া লওয়া যাইতেছে, তখন কোন বৃক্ষবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি পঞ্চমটিরও নামোল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। একাধারে অভীষ্টফলপ্রদ নানাগুণ বর্ত্তমান থাকা প্রযুক্তই উহার নাম কল্পতরু;—উত্তরমেঘের ত্রয়োদশ শ্লোকে সেই সমস্ত গুণের আভাস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান গুণ—"নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশ-দক্ষং মধু", উক্ত মেঘের পঞ্চম শ্লোকেও সেই একই কথা—"কল্পবৃক্ষপ্রসূতং রতিফলং মধু"। এই মধুপ্রসবী মহুয়া গাছই কবিকথিত 'কল্পবৃক্ষ' কি না—ইহা বিবেচনা ও পরীক্ষাসাপেক্ষ। ইহা হইতে "বিচিত্র বসন" বা "চরণকমলন্যাসযোগ্য লাক্ষারাগ" উৎপাদক কোন পদার্থ পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারি না; তবে উহার পুষ্পকিসলয় যে গ্রাম্য নারীগণের অঙ্গভূষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে। আর যদি মর্ত্তে আসিয়া পারিজাতের পূর্ব্বগৌরব নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে কল্পতরুরও কোন কোন গুণের বিনাশ ঘটা বিচিত্র নহে।

শ্যামা।—নিকুঞ্জ বাবু লিখিয়াছেন—"শ্যামা বৃত্তাকার তরু।" ইহা সমীচীন বোধ হয় না। শ্যামা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, আর উহার কোমলত্ব বশতঃ যক্ষ উহার সহিত আপন বনিতার অঙ্গ-সৌকুমার্য্যের তুলনা করিয়াছেন—"সুদৃশ্য অবয়বের জন্য" একটা প্রকাণ্ড মহীরুহের সহিত 'তন্বী' যক্ষবধূর তুলনা সঙ্গত মনে করিতে একটু সঙ্কোচ বোধ হয়। এরূপ স্থলে উহা, তরু না হইয়া, লতা হওয়াই সম্ভব। অমরকোষেও উহা লতা বলিয়াই উক্ত হইয়াছে,—"শ্যামা তু মহিলাহ্বয়া লতা গোবন্দনী গুন্দ্রা প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী ফলী।" মল্লিনাথও তদনুসারে "শ্যামাসু প্রিয়ঙ্গুলতাসু" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিকুঞ্জ বাবু-বর্ণিত পৃথক্ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ থাকিতে পারে, কিন্তু এ স্থলে প্রিয়ঙ্গুলতার অপর নাম গুড়ূচী—উহার বৈজ্ঞানিক নাম বোধ হয়, **Tinospora Cordifolia**, যাহা সচরাচর গুলঞ্চ নামে পরিচিত।

নিকুঞ্জ বাবুর প্রবন্ধে একটিমাত্র উদ্ভিদের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না—উত্তরমেঘের একাদশ শ্লোকোক্ত "পত্রচ্ছেদৈঃ।" মল্লিনাথ উহার অর্থ করিয়াছেন,—"পত্রলতানাং খণ্ডৈঃ।" উহা কি তবে **(Cassia leaf)** তেজপাত?

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

ফুটবল খেলার অভিনব ব্যবস্থা

নেব্রাস্কার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল খেলায় দক্ষতালাভের জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটা মোটরগাড়ীর চাকা

ফুটবল খেলায় লক্ষ্যভেদের বিচিত্র ব্যবস্থা

হইতে রবার-বেষ্টনী খুলিয়া লইয়া গোল পোষ্টের সহিত উহাকে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। ফুটবল-ক্রীড়কগণ উক্ত দোদুল্যমান চাকার মধ্য দিয়া বল প্রেরণ করিবার শিক্ষা অভ্যাস করিতেছেন। ক্রীড়া-ক্ষেত্রের নানা স্থান হইতে চরণ-তাড়িত বল কিরূপে লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে, তাহা শিক্ষা করিলে নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল-খেলোয়াড়গণ প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন মনে করিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। চিত্র দেখিলে ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

বিদ্যুৎ-চালিত ভাসমান 'পাম্প'

যে সকল স্থানে জলের চাপ দুষ্প্রাপ্য, অথচ জল আছে, তথায় বিদ্যুৎ ও ভাসমান পাম্পের সাহায্যে ৩০ফুট পর্য্যন্ত জল তুলিবার ব্যবস্থা জার্ম্মাণীতে হইয়াছে। এই পাম্প যত্র তত্র হাতে করিয়া অনায়াসে বহন করিয়া লওয়া যায়। ইহার তলদেশে একটি ২ ফুট উচ্চ আধার আছে। উক্ত আধারের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না। আধারের চারিপার্শ্বে বায়ু ভরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ জন্য আধারটি জলের উপর ভাসিয়া থাকে। উক্ত আধারটি
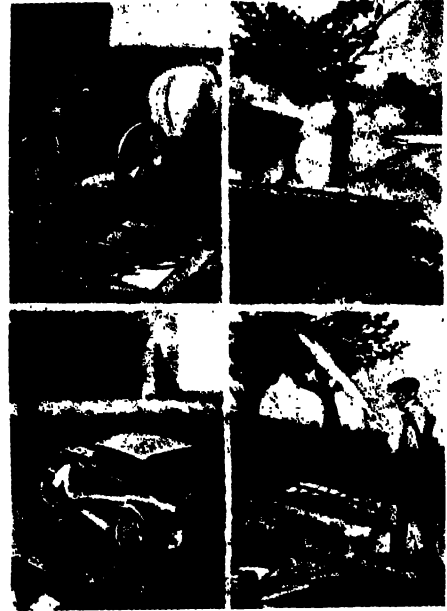
বিদ্যুৎ-চালিত ভাসমান পাম্প

কোনও কূপ বা জলাশয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাড়িত শক্তির সহিত উহার যোগসাধন করিতে পারিলেই প্রতি মিনিটে ৭৩ গ্যালন জল ৩০ ফুট পর্য্যন্ত উপরে তুলিতে পারা যাইবে। যেখানে বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবস্থা নাই, সেখানে কিন্তু এই পাম্পের দ্বারা কোনও কার্য্য হইবে না।

বেলুনসাহায্যে নৌকা-পরিচালন

মোটরযন্ত্রের পরিবর্ত্তে তিনটি গ্যাসপূর্ণ বেলুনের সাহায্যে জলের উপর দিয়া আরোহী সহ নৌকা-পরিচালনের ব্যবস্থা প্রতীচ্যদেশে

হইয়াছে। বায়ুপ্রবাহে তাড়িত হইয়া বেলুনগুলি ধাবিত হইতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে আরোহিপূর্ণ নৌকাও সেই দিকে চলিতে থাকে। সময়ে সময়ে বেলুনগুলি খুব দ্রুতবেগেই ধাবিত হইয়া

বেলুনসাহায্যে নৌকাপরিচালন

থাকে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে নৌকা পৌঁছিলে, একখানি মোটর-বোট বেলুনসহ যাত্রিপূর্ণ নৌকাকে ফিরাইয়া লইয়া আইসে।

দ্বিচক্রযানযুক্ত ডোঙ্গা

ডোঙ্গার সহিত দ্বিচক্রযান সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রতীচ্যদেশের সৌখীন ব্যক্তিরা জলভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভোগসর্ব্বস্ব আমে-

দ্বিচক্রযানযুক্ত ডোঙ্গা

রিকাতেই ইহার সমধিক প্রচলন। দ্বিচক্রযান যে প্রণালীতে চালিত হয়, ডোঙ্গার সহিত সন্নিবিষ্ট দ্বিচক্রযানও অনুরূপ ব্যবস্থায় চালিত হইয়া থাকে। চালক হাতল ধরিয়া ডোঙ্গাকে লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত করেন। পায়ের চাপে দ্বিচক্রযানের প্যাডেল তাড়িত হইয়া ডোঙ্গাকে গতিশক্তি প্রদান করিয়া থাকে।

চলমান দারু-অশ্ব

চলমান দারু-অশ্ব

ক্রীড়া অথবা গৃহমধ্যে অশ্বারোহণজনিত ব্যায়ামানন্দ উপভোগের জন্য দারু-নির্ম্মিত চলমান অশ্ব প্রতীচ্যদেশের বাজারে বাহির হইয়াছে। অশ্বটি এমনভাবে নির্ম্মিত এবং উহার দেহমধ্যে এমন কল-কব্জা সন্নিবিষ্ট আছে যে, আরোহী উহাতে আরোহণ করিয়া দেহ আন্দোলিত করিলেই ঘোড়াটি চলিতে আরম্ভ করিবে। অশ্বের প্রত্যেক চরণে স্বতন্ত্র যন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। সুতরাং আরোহীর দেহান্দোলনে অশ্বের চরণ-চতুষ্টয় স্বতন্ত্রভাবে, বিন্যাসগতিতে ধীরে ধীরে চলিতে থাকিবে। অশ্ব-বল্গার সাহায্যে ঘোড়াটিকে যে কোনও দিকে চালিত করা যায়। বালক এবং বয়স্ক লোক—প্রত্যেকেরই উপযোগী দারু-অশ্ব পাওয়া যায়।

ঘূর্ণ্যমান রেস্তোরাঁ

চিকাগো সহরে যে "বিশ্বমেলা" বসিবে, তাহাতে প্রদর্শনের জন্য কয়েক জন বিখ্যাত স্থপতি-শিল্পী ঘূর্ণ্যমান রেস্তোরাঁ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই রেস্তোরাঁর একটি নমুনা মেলা-কমিটীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। প্রদত্ত চিত্র দৃষ্টে বুঝা যাইবে যে, একটা অত্যুচ্চ স্তম্ভের উপরিভাগে আবর্ত্তাকারে বিরাট রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঘরের মধ্যে এবং প্রশস্ত চত্বরে বসিয়া যাহাতে নর-নারীরা ভোজন করিতে পারেন,
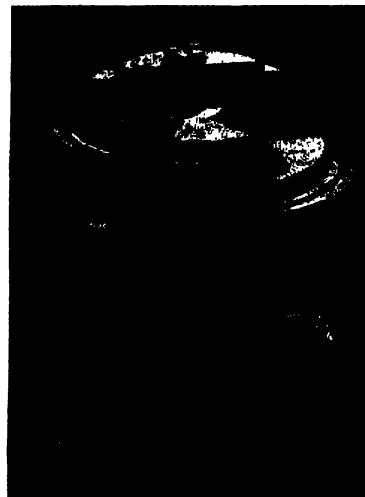
ঘূর্ণ্যমান রেস্তোরাঁ

তাহার বন্দোবস্ত এই নমুনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। রেস্তোরাঁ এমন কৌশলে নির্ম্মিত হইবে যে, প্রতি অর্দ্ধঘণ্টা পরে সমগ্র

রেস্তোর াঁ এবং স্তম্ভ আবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। ইহাতে ভোজনে সমাগত নর-নারীরা রেস্তোর াঁ-প্রাঙ্গণে ভোজন অথবা পরিক্রমণ-কালে আশে-পাশের দৃশ্যগুলি দেখিবার সুযোগ পাইবেন। স্তম্ভের ভিতর দিয়া উপরে আরোহণ করিবার বৈদ্যুতিক আরোহণী-অবরোহণীর ব্যবস্থা উক্ত নমুনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। স্তম্ভের পাদদেশে মোটর-গাড়ীগুলির অবস্থানের স্থানও থাকিবে।

অতিকায় হাঙ্গরের চোয়াল

আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী দক্ষিণ-করোলিনার কোন এক স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি হাঙ্গরের চোয়াল আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার দন্তগুলি মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া গিয়াছে।
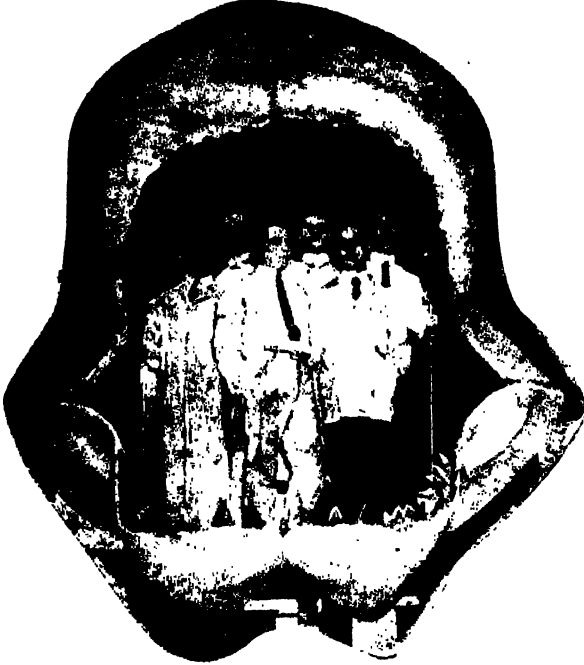
অতিকায় হাঙ্গরের চোয়াল

নিউইয়র্কের "মেরিণ মিউজিয়ামে" উক্ত চোয়াল রক্ষিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন, উক্ত সমুদ্র-রাক্ষসের দন্তগুলি ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল। তাঁহারা চোয়ালে দন্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চোয়ালটির ব্যাস এত দীর্ঘ যে, ছয় জন দীর্ঘকায় মার্কিণ চোয়ালের অবকাশ-স্থানে দাঁড়াইয়া ছবি তুলিয়াছেন। ইহা হইতে এই সমুদ্র-রাক্ষসের বিরাটদেহের কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন, উক্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাঙ্গর ৮০ ফুট দীর্ঘ ছিল।

ভ্রমণ-যষ্টির মধ্যস্থ বেহালা

স্কটল্যাণ্ডের গ্ল্যাসগোবাসী জনৈক ব্যবসায়ী একপ্রকার ভ্রমণ-যষ্টি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্রাকার বেহালা-যন্ত্র আছে। যষ্টির হাতলটির পেঁচ খুলিয়া ফেলিলে উহার অভ্যন্তরে বেহালার ছড়ি দেখিতে পাওয়া যাইবে। যষ্টির পার্শ্বস্থ একটি অংশ খুলিয়া ফেলিলেই বেহালা-যন্ত্র আবির্ভূত হইবে।

ভ্রমণ-যষ্টি-সংলগ্ন বেহালা

বেলুন সাহায্যে মল্লক্রীড়া

গ্যাসপূর্ণ বেলুনবল লইয়া জার্ম্মাণীতে ইদানীং মল্লক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে। দুই জন প্রতিযোগী পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মল্লক্রীড়ার অভিনয় করিতে থাকে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটা খড়ির দাগ প্রদত্ত হয়। বেলুনটি ঠিক দাগের উপর দোদুল্যমান থাকে। উভয় প্রতিযোগী বল-সংশ্লিষ্ট দুইটি রজ্জুর প্রান্ত হস্তে ধারণ করিয়া রাখে। এই খেলার কৌশল বিচিত্র। বেলুন-সংশ্লিষ্ট রজ্জুর আকর্ষণ-বিকর্ষণ-কৌশলের সাহায্যে বলের দ্বারা প্রতিযোগীকে আঘাত করিতে হইবে। যে যত কৌশলী, সে প্রতিযোগীর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাহাকে আঘাত করিবার চেষ্টায় থাকে।

বেলুন সাহায্যে মল্লক্রীড়া

কারাবন্দীর পলায়নে বৈজ্ঞানিক বাধা

কারাগার হইতে কোনও বন্দী যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে, এ জন্য কারাপ্রাচীরের নীচে সশস্ত্র প্রহরী সতর্কভাবে পাহারা দিয়া থাকে। জনৈক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন

বৈদ্যুতিক আলোকসম্পাতে বন্দীর প্রাচীর-লঙ্ঘনে বাধা

যে, প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টির পরিবর্ত্তে বিদ্যুতের অভ্রান্ত দৃষ্টির সহায়তা লইলে কোনও বন্দী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলাইতে পারিবে না। কারণ, বৈদ্যুতিক আলোক সমগ্র প্রাচীরটিকে আলোকিত করিয়া রাখে। কোনও বন্দী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে গেলেই সেই আলোক-রশ্মির অপ্রতিহত গতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে। অমনই আপনা হইতে বন্দুকের শব্দ হইয়া বিপদ্জ্ঞাপক সঙ্কেত চারিদিকে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। যেরূপ প্রণালীতে বৈদ্যুতিক আলোক প্রাচীরের উপরিভাগে রশ্মি বিকীর্ণ করিবে এবং বন্দুক আপনা হইতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বিপদ্জ্ঞাপক ঘণ্টা নিনাদিত করিবে, উক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই চিত্র হইতে ব্যাপারটা মোটের উপর বুঝিতে পারা যাইবে।

আলোকরশ্মি-সাহায্যে ট্রেনের গতিরোধ

আমেরিকায় জনৈক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে, আলোকরশ্মি-সাহায্যে ট্রেনের গতিরোধ করিতে পারা যায়। তিনি ক্ষুদ্রাকার এঞ্জিনসহ ট্রেণ নির্ম্মাণ করিয়া পণ্ডিত সমাজে এ বিষয়ের পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, একটি হাত-লণ্ঠন হইতে নির্গত আলোকরশ্মিধারা এঞ্জিনের সম্মুখবর্ত্তী আলোকগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ট্রেণ বাঁধিবার ব্রেকের উপর উহার ক্রিয়া হয়। তাহার ফলে এঞ্জিন থামিয়া যায়।

আলোকরশ্মিপাতে ট্রেণের গতিরোধ

এক বৃন্তে অলাবু চতুষ্টয়

প্রকৃতির খেয়ালে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। নিম্নে ১টি বোঁটায় ৪টি লাউয়ের চিত্র প্রদর্শিত হইল।

এক বৃন্তে চারিটি লাউ

ছট্‌ফট্‌ সিংহ

(ঐতিহাসিক মহানাটক)
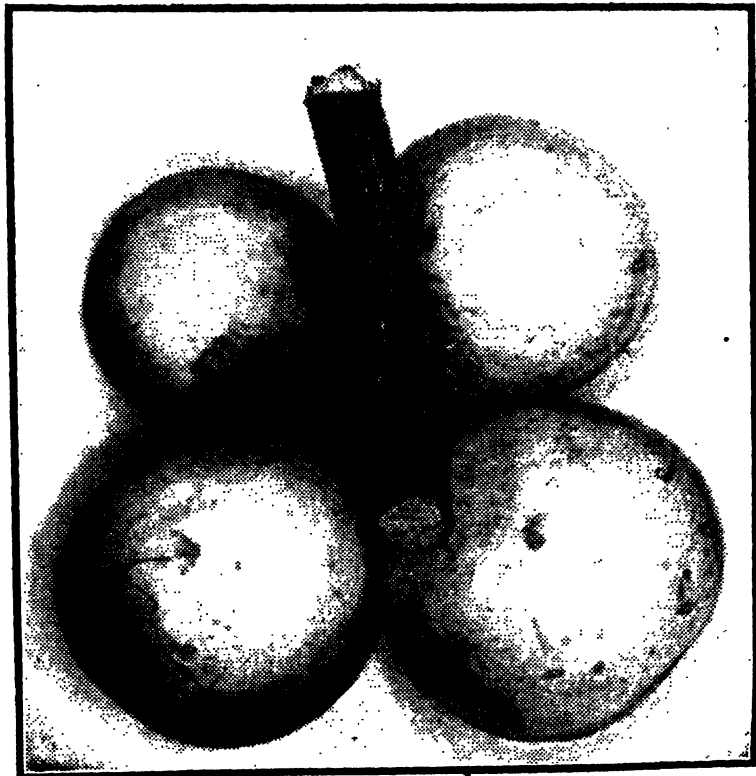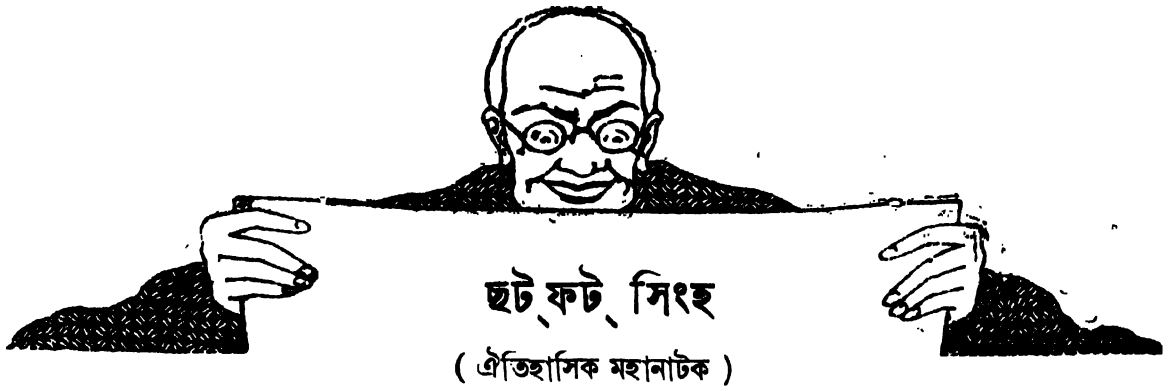
মহা-নাটকের ভূমিকা

ছট্‌ফট্‌ সিংহ মহা-নাটক-রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহ হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য লইয়াছি।

(১) Bag-Bejaria প্রণীত Cannabis Indica. Vol II.

(২) সাধু ধুম্‌শীলাল রচিত কড়চা, সপ্তম পর্ব্ব ;

(৩) শ্রীযুক্ত বিরূপাক্ষ সাঁতরা রচিত "উনপঞ্চাশ বায়ু" কাব্য ;

(৪) 'গবেষণা' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিত সন্দর্ভ, 'গো-জাতি ও ঘটোৎকচ' ;

(৫) সদু মুদির দোকানের ঠোঙা-ছেঁড়া কাগজ একগাদা।

ব্যাকাশ থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন রক্ষিত মহাশয় তাঁহার রঙ্গমঞ্চে এ নাটকের অভিনয় করাইয়া এবং দৃশ্য-রচনায় বহু উপদেশ ও সুপরামর্শ দিয়া আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন পাকড়াশী মহাশয় ফর্ক'র উদ্দৌলার বাক্যগুলি ; ও বন্ধুবর শ্রীপঞ্চানন কোলে মহাশয় রাণী পলিতার বজ্রগম্ভীর বাক্যগুলি রচনা করিয়া ; তদুপরি ডোম্‌পাড়া সাহিত্য-সভার মহা-পরিচিত 'ধুচুনি'-সম্পাদক বিখ্যাত কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার-সমালোচক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বলীবর্দ্দ দীর্ঘাঙ্গী মহাশয় এই নাটকের গানগুলি রচনা করিয়া দিয়া আমায় এমন মহা-মহা-মহা-ঋণ-জালে জড়িত করিয়াছেন যে, প্রতি রাত্রে ইঁহাদের প্রত্যেককে হোটেলে ভোজ্য-পানীয়ে তৃপ্ত করিলেও আমার সে মহা-মহাঋণ শোধ হইবার নয়।

পরিশেষে বক্তব্য, ঘণ্টাকর্ণ প্রিন্‌টিং ওয়ার্কসের কম্পোজিটরগণ শ্রীযুক্ত গরীবদাস পাঁজা, নবকান্ত শিকদার পুঁটীরাম গুঁই ও গন্ধমাদন পোদ্দার মহাশয়গণ এই নাটকের অক্ষর কম্পোজ করিয়া ; বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নটবর পট্টনায়ক ও শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ পাণ্ডে প্রুফ সংশোধন করিয়া ; প্রেশ্‌ম্যান্ সেখ ককরুদ্দিন মিয়া বই ছাপিয়া ; এবং দপ্তরী মিয়াজান বই বাঁধিয়া দিয়া আমার সবিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

একটা জিনিষ পাঠক এ-মহানাটকে 'লক্ষ্য করি-বেন,—বাঙালীর war-cry নাই ; অন্ততঃ কোনো বাঙলা নাটকে পড়ি নাই। বাঙালী সব দেবতাকে মানে, তাই এ নাটকে কোন বাঙলা war-cryএ সর্ব্ব-দেবতার সমন্বয় ঘটাইয়াছি। সম্প্রদায়ের চটিবার কারণ ঘটিবে না। ইতি

শ্রীমহাবীর নাট্যকার।

নাট্যোক্ত নর-নারী

পুরুষগণ

গম্ভীরদাস	...	ত্রিকালজ্ঞ গুরুজী
ছট্‌ফট্‌ সিংহ	...	কোদালপাড়ার রাজা
ফর্ক'র উদ্দৌলা	...	ফকিরাবাদের নবাব
ভ্যাবাকান্ত	...	ফকিরাবাদের সভা-কবি
মর্মর বেগ	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ

বর্কন্দাজ ; চৈ-চৈ খাঁ···ওমরাহগণ ; উজীর প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ

রাণী পলিতা	...	ছট্‌ফট্‌ সিংহের রাণী
খাণ্ডারজান্	...	ফর্ক'র উদ্দৌলার বেগম

সঙ্গিনীগণ, রণরঙ্গিণীগণ, নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি

প্রথম অঙ্ক

ফকিরাবাদ—প্রাসাদ-কক্ষ

নবাব ফর্ক্‌র উদ্দৌলা

ফর্ক্‌র। বান্দা…

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। খোদাবন্দ্‌, জাঁহাপনা…

ফর্ক্‌র। নর্ত্তকী লে আও…

বান্দা। যো হুকুম! [প্রস্থান।

ফর্ক্‌র। এই ঠিক সময়, নবাব-বাদশা নৃত্যগীতে প্রমোদ যদি না করলো তো ধিক তার বাদশাহীতে!

(ইয়ারগণ ও নর্ত্তকীগণ প্রবেশ করিল)

জল্‌দি নাচ-গান সুরু করো। দেরী করলে কি হবে, জানো?

ইয়ার। কি, জাঁহাপনা?

ফর্ক্‌র। কত্‌ল্‌।

ইয়ার। কত্‌ল্‌?

ফর্ক্‌র। হাঁ, কত্‌ল্‌। এত বিলম্বের কারণ কি?

ইয়ার। ঘুঙুর পাওয়া যাচ্ছিল না, জাঁহাপনা। উজীর বললেন, ঘুঙুর বেচে ফৌজের রসদ গেছে সমরাঙ্গনে।

ফর্ক্‌র। বটে! বিচক্ষণ এই উজীর। ঘুঙুরের বুলিতে মাথা গুলিয়ে যেতো। সেগুলোর সুব্যবস্থা ক'রে বাদশাহী তোষাখানার ইজ্জৎ রক্ষা করেচেন। চৈ-চৈ খাঁ…

চৈ-চৈ। জাঁহাপনা…

ফর্ক্‌র। সত্বর উজীর সাহেবের মক্কা-যাত্রার ব্যবস্থা করো। আমার নফর-অনুচর সকলে জানুক, আমার যে মঙ্গল-সাধন করে, তার বখশিশ্‌ দিতে আমি জানি!

চৈ-চৈ। যো হুকুম।

ফর্ক্‌র। এবার গান হোক্‌…নাচও সেই সঙ্গে। সেই বিশুদ্ধ প্রাচ্য নৃত্য…অজন্তার সেই ছবির ধরণে। ভ্যাবাকান্ত…

ভ্যাবাকান্ত। শাহান্‌শাহ…

ফর্ক্‌র। নর্ত্তকীদের নৃত্য-শিক্ষা দেবার জন্ত তোমায় রাখা। তা'হলে বাদশা-মহলে কুঁপোর অভাব নেই, যার মধ্যে বাদশাহী সিরাজি ঢালতে পারি।

ভ্যাবাকান্ত। সে-সিরাজির মান আমি রেখেচি, শাহান-শাহ। নর্ত্তকীদের জন্ত গান রচনা করেচি, তাতে সুর দিয়েচি, এবং নৃত্য-যোজনাও আমার কপোল-কল্পিত!…

ফর্ক্‌র। বেশক্‌…এই আমি চাই। কালের ধাক্কায় সেকেলে মোসাহেব-ভাঁড় ভেঙ্গে গেছে; তার স্থান অধিকার করেচে এখন সিরাজি-বাজী প্রিয়বন্ধু, বয়স্ত, সভা-কবিরা! এবার গান হোক্‌…

ভ্যাবাকান্ত। গাও সকলে…

ফর্ক্‌র। একটু পরে। বর্কন্দাজ শেখ…

বর্কন্দাজ। বাদশা…

ফর্ক্‌র। রণক্ষেত্রে দূত পাঠিয়েচো?

বর্কন্দাজ। পাঠিয়েচি।

ফর্ক্‌র। ব্যস—এবার আমোদ। কর্ত্তব্য আগে, বাদশার কর্ত্তব্য। ইতিহাস জানবে, ফর্ক্‌র উদ্দৌলা চৌথস্‌ বাদশা ছিল। গাও নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণ। (নৃত্য-গীত)

বুক-পুকুরের তীরে কে লো এলো ছিপ-হাতে!
মুখের বচনে তার চার; কেঁচোর টোপ্‌?
চাউনি চোখের পাতে!
টোপে মন-কাৎলা মোর মাৎলা হলো, ভাই,—
বুকের অতল-তলে মারচে দৌবল ঘাই!
ঐ বঁড়শী বিঁধে যেতে সে চায় শুক্‌নো ডাঙ্গাতে!

ফর্ক্‌র। চমৎকার! ভ্যাবাকান্ত, রাজ-কবির যোগ্য রচনাই হয়েচে! সাবাশ্‌!

(নেপথ্যে কামানের শব্দ)

ব্যস্‌…পালাও। আর নয়! শত্রুর কামান! না, না, ভুলে গেছলুম…তোমরা বীর-নারী। ও-শব্দে ভয় পাবে না, জানি। ঐ কামানের শব্দে তোমাদের কণ্ঠের সুর মিলিয়ে দাও। রাজ-কবি, ওদের বলো, তোমার রচিত সেই মহা-জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে ওরা মহিলা-শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হোক…

ভ্যাবা। নর্ত্তকীগণ, বাদশার আদেশ পালন করো।

নর্ত্তকীগণ। আল্লা-হো অকবর্‌!…

ফর্হর। না, বলো হিন্দু-মুসলমান ভারত-মাতার দুই সন্তান ...যমজ সন্তান। ফর্হর উদ্দৌলা চিরদিন তাদের সমান চক্ষে দেখে! কোনো ভেদ করে না! তবু বুঝি না, হায়, কেন এ বিদ্বেষ-বহ্নি!

বর্কন্দাজ। নসীব, খোদাবন্দ! নয়, ইতিহাসের দস্তুর!

ফর্হর। অশিব নসীব আর ইতিহাসের মুণ্ডচ্ছেদ চাই। ধরো নর্ত্তকীগণ, তোমাদের জাতীয় মহা-সঙ্গীত...

ভ্যাবাকান্ত। সেই গান...যা এক দিন অদূর-ভবিষ্যতে চাষের মাঠে, ফকিরাবাদের ঘাটে-বাটে, ধনীর প্রাসাদে, গরীবের কুঁড়েয় দামামা-নাদ করবে।

নর্ত্তকীগণ। (গীত)

ছাতির ভিতরে জ্বেলেচি আগুন,
আগুনে জ্বালাবো পোড়াবো দেশ!
মহা-তাণ্ডবে ঘন-সঙ্গীতে
নর-নারী পুড়ে হবে গো শেষ।
ধবক্-ধবক্-ধবক্ জ্বলিবে আগুন—
লেলিহান তারি রক্ত-শিখা
ধুঁয়ায়ে ধুঁয়ায়ে চিত্তে জাগাবে
স্বদেশ-প্রীতির কি গন্ধিকা!
নাটকের পাতে ছাপার হরফে
শক্ররে হেন পাড়িব গাল,
ঝন্‌ঝনে তার বচনে অরাতি
গন্‌গনে-রাগে হবে রে লাল!
অরাতি-মুণ্ডে গেণ্ডুয়া খেলি,
তাথৈয়া-থিয়া রক্ত-ঢেউ!
ঝলকে ঝলকে মূর্চ্ছনা ফোটে,
হেন সঙ্গীত লেখেনি কেউ!
ঝক্-ঝক্-ঝক্ কারবালা-তীরে
বহ্নি-নিশান উড়াও, বীর,
ঘূর্ণির বেগে চূর্ণিত করো
ফটাফট্ লোটো শক্র-শির!
কলমের মুখে ক্যারসা লিখেচি—
বলো, এই গান খুব সরেশ!
ওঠো জাগো সবে, মানুষ তোমরা,
নহ তো কুকুর-বিড়াল-মেষ!

ফর্হর। বাঃ, চমৎকার! বিরাট মহান্ কোটনা, স্বর্গীয় মূর্চ্ছনার লোটনায় অপূর্ব্ব! যাও মা-নর্ত্তকীগণ, আমার সেলাম নিয়ে কুর্নিশ নিয়ে সব গৃহে যাও...

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

[নেপথ্যে—হর-হর-শঙ্কর, জয় মা-কালী,
ওঁ বিষ্ট বিষ্টু শ্যাম-নটবর-সুন্দর]

এ কি শক্রর রণ-হুঙ্কার! এত কাছে! বর্কন্দাজ...কোথায় যাও? দাঁড়াও...

বর্কন্দাজ। শাহান্‌শাহ...

ফর্হর। (বর্কন্দাজের ঝুঁটি পাকড়াইয়া) পাজী, রাস্কেল! বাতাসে আমি অভিসন্ধির গন্ধ পাচ্ছি! তুমি বন্দী। ঘর্ঘর বেগ...

(ঘর্ঘর বেগের প্রবেশ)

বন্দী করো এই বিশ্বাসঘাতক অমাত্যকে...

বর্কন্দাজ। আমায়, জাঁহাপনা...? (বন্দী হইল)

ফর্হর। হাঁ, তোমায়! চুপ কর্ ইষ্টুপিট্। তোর ঐ ছল-ভরা রসনার অগ্রভাগটুকু নাপিত ডাকিয়ে এখনি ছেদন করাবো। অন্তরের গরল-হ্রদ সুধা-রসে সিঞ্চিত ক'রে দুনিয়ায় প্লাবন বহাতে পারবি না কখনো।

বর্কন্দাজ। কিন্তু গোলাম নিরপরাধ, জাঁহাপনা!

ফর্হর। পরীক্ষা দাও!...প্রহরী...

(প্রহরীর প্রবেশ)

কৈ সে বিষের পাত্র? (প্রহরী বিষ-পাত্র দিল) বর্কন্দাজ, তুমি বিশ্বাসঘাতক নও?

বর্কন্দাজ। না, জাঁহাপনা। জাঁহাপনার চরণ আমার জীবন-মরণ।

ফর্হর। বটে! তোমার জাঁহাপনার তৃপ্তির জন্য তাঁর সকল আদেশ পালন করতে পারো? চক্ষু মুদে?

বর্কন্দাজ। হাঃ হাঃ হাঃ! কি বলচেন, জাঁহাপনা! আপনি আদেশ দিন, আমি সমুদ্র গিলবো, আগুন চিবুবো। এই ফকিরাবাদ...ফুলে-ফলে-ভরা তার এই বাগ-বাগিচা, তার এই ডোবা-পুকুরিকা, তার এই পাথরের দুর্গ-প্রাসাদ, তার বাদশা-বেগম বান্দা-বাঁদী ঝমঝম্ সব টুপ্ ক'রে নিমেষে গলাধঃকরণ ক'রে ফেলি! আমি

দানা হতে পারি জঁাহাপনা, আপনার আদেশে…আবার পরক্ষণে এতটুকু মুর্গীর ছানা হয়েও পিট্‌পিট্‌ ক'রে চাইতে পারি !

ফর্ফর। বটে! আচ্ছা, দেখি। আপাততঃ তোমার জঁাহাপনার তৃপ্তির জন্ত এই বিষের পাত্র অধরে ধরো… নিঃশেষে পান করো বীর এই উগ্র বিষ…

বর্কন্দাজ। জঁাহাপনার অবিশ্বাসের চেয়ে মৃত্যু আমার অধিকতর শ্লাঘ্য! দিন বিষ-পাত্র। (বিষপাত্র লইয়া পান করিল) দেখুন জঁাহাপনা, নিঃশেষে পান করেচি। ওঃ, আমার রসনায় গলিত-উন্মাদ উল্কার ঢেউ বয়ে চলেছে…শিরায়-শিরায় বিদ্যুতের ঝলসিত ধারা! আমার সর্ব্বাঙ্গ ঝিমিয়ে আসচে…চক্ষে নিবিড় ঘন-ঘোর অন্ধকার! জঁাহাপনা, আমার খোদা…(টলিয়া পড়িতেছিল)

ফর্ফর। (সবলে বর্কন্দাজকে ধাক্কা দিয়া)…অভিনয় রাখো, বীর! চালাকি ছাড়ো। জাগো বর্কন্দাজ, তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েচো। ও বিষ নয়—হাঃ হাঃ হাঃ…মিশরের নীল সিরাজি…পরীক্ষা করছিলুম…হঁা, তুমি বিশ্বাসী প্রভুভক্ত অমাত্য বটে! বাদশার পাশে তোমার স্থান।

বর্কন্দাজ। জঁাহাপনা—গোলাম বলেচে তো, ও চরণ-ছাড়া তার আর গতি নাই!

ফর্ফর। সাবাস! তোমায় পাঁচহাজারী মন্‌শবদার করলুম এই দণ্ডে…রাত্রির এই ছায়াবৃত্তাস্থিত অন্ধকারের মধ্যেই! উজীর, আজ থেকে আমার প্রধান অমাত্য এই বর্কন্দাজ খাঁ…পাঁচহাজারী মন্‌শবদার! মনে রেখো সকলে।

বর্কন্দাজ। জঁাহাপনার জয় হোক্!

(নেপথ্যে—হর হর শঙ্কর, জয় মা কালী দুর্গা ছিন্নমস্তা, ব্যোম বাবা বৈদ্যনাথ)

এ কি, এ যে আরো কাছে!…আদেশ দিন জঁাহাপনা, একটি তোপে ওদের কণ্ঠ লোপ ক'রে দি!

ফর্ফর। বিচলিত হয়ো না, বর্কন্দাজ। তোমার বাদশা তৈরী না হয়ে আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিল না। আমি এ জানতুম। শত্রুর অভ্যর্থনার যোগ্য আয়োজনও তাই ক'রে রেখেচি…

বর্কন্দাজ। বুঝতে পারচি না, জঁাহাপনা…এ আমি কোথায়? বেহেস্তে? না, লোহার গরাদে-ঘেরা পিঁজরের মধ্যে? আমি আকাশে, না, বাতাসে? ভুজঙ্গের ফণায়, না, গাছের মগ্‌-ডালে? পাতালে, না, চাতালে? এমন নিরাপদ নিজেকে কখনো ভাবিনি তো! জঁাহাপনার কথায় যে শক্তি পেলুম, হকিমের দাওয়াইয়ে তা কখনো পাইনি।…

ফর্ফর। স্থির হয়ে থাকো…এখনি বুঝবে বর্কন্দাজ! ঐ, ঐ শোনো…

[নেপথ্যে আর্ত্তনাদ। ওঃ গেলুম, গেলুম,
জ্বলে মলুম, পুড়ে মলুম]

(বেগে দূতের প্রবেশ)

দূত। শত্রু-সৈন্ত ছত্রভঙ্গ হয়েচে, জঁাহাপনা! দারুণ বহ্নিদাহে দগ্ধ হয়ে জ্বালায় অস্থির আর্ত্তনাদ তুলে সব পালিয়েচে।

ফর্ফর। যাও দূত! (দূতের প্রস্থান) এ আমি জানতুম!…

বর্কন্দাজ। আমায় কিন্তু বিস্মিত করেচেন, জঁাহাপনা…

ফর্ফর। শোনো বর্কন্দাজ…এ আমার নব আবিষ্কার… এই তীক্ষ্ণ নব অস্ত্র…

বর্কন্দাজ। এ, কি অস্ত্র জঁাহাপনা?

ফর্ফর। হারেমের তরুণী রূপসীগণ গবাক্ষ থেকে নয়ন-বাণ হেনে ওদের বিধ্বস্ত করেচে…তাদের কটাক্ষের অগ্নি-বাণে শত্রু হঠেচে।

বর্কন্দাজ। বলেন কি, জঁাহাপনা?

ফর্ফর। তাই। নব যুগের এ অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। কাব্য প'ড়ে এ অস্ত্রের সন্ধান পেয়েচি। তাই রূপসীদের গবাক্ষ-পথে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলুম। তারা নয়নে কটাক্ষ-শর ভরে প্রস্তুত ছিল। ঐ শোনো, বিজয়িনী রণরঙ্গিণীগণের নব যুগের রণ-সঙ্গীত…

(গাহিতে গাহিতে বিজয়িনী রণরঙ্গিণীগণের প্রবেশ)

(গান)

গন্‌গনে চন্‌চনে শন্‌শনে ধাঁ…ছোটে কটাক্ষ-বাণ!
দুর্দ্ধর্ষ সব শত্রু-সৈন্তে বাণে কেটে করি খান্ খান্!
বাঁকা ভুরু আমাদের তুণ,
বাণ ছোটে—যেন জেঁাকের মুখে নুণ!
রাঙা গালে মরীচিকা যেমন দেখা—শত্রু অক্কা পান্।
আঁখির কালো তারা দোলে, দোলে,
কামান নিয়ে সব পড়ে ভারী গোলে!
কেমন অস্ত্র করেচি বাপ্ বাবা, সব্বার হায়রাণ জান্!

ফর্ক্কর। শাহেনে ভেজ···

উজীর। হুজুর।

ফর্ক্কর। বিশগড়ার কালী-মন্দির ভেঙে গেছে, খপর এসেছিল, তার সংস্কারের জন্ত মিস্ত্রী পাঠিয়েচো?

উজীর। পাঠিয়েচি জাঁহাপনা···

ফর্ক্কর। বেশ করেচো। জেনো, হিন্দু-মুসলমান মার পেটের ভাই, দুজনকে সমান-সমান দেখতে হবে। বলো, ভাই সব, জয় আল্লা-আল্লা শিব-শম্ভু!

সকলে। জয় আল্লা-আল্লা শিব-শম্ভু।

ফর্ক্কর। আজ রাত্রের মত তা হলে নিশ্চিন্ত, কি বলো? এখন অন্দরে যাওয়া যাক।

উজীর। যদি আবার দুশমণ হানা দেয়? নিশীথের সুপ্তির অবকাশে?···

ফর্ক্কর। (হাসিয়া) পাগল হয়েচো উজীর! খবর নাও গে। যে-অস্ত্র ছেড়েচি, শত্রুসৈন্ত এতক্ষণে বাসায় গিয়ে ম'রে আছে। রঙ্গিণীগণ, গাহো তোমাদের সেই উন্মাদক নব-রণ-সঙ্গীত।

উজীর। একটা প্রশ্ন মনে জাগচে, জাঁহাপনা···

ফর্ক্কর। কি প্রশ্ন?

উজীর। এ অপূর্ব্ব রণ-সঙ্গীত কার রচনা?

ফর্ক্কর। তোমাদের বাদশার। ভ্যাবাকান্ত-কবির সংস্পর্শে থেকে রচনায় আমার অপূর্ব্ব শক্তি জন্মেচে।

উজীর। বাঃ, খাশা!···

ফর্ক্কর। এ গানে সুর দিয়েচেন বেগম। বেগম সাহেব, স্বদেশ-প্রেমের ইতিহাসে তোমার নামও আমি সোনার অক্ষরে লিখে রেখে যাবো।

বেগম। বাঁদীর প্রতি জাঁহাপনার অসীম করুণা!

ফর্ক্কর। বাঁদী! তুমি বাঁদী! তুমি আমার এ স্বদেশ-প্রেমযজ্ঞে···লেলিহান অগ্নি-শিখা! চলো বেগম অন্দরে···তোমার রূপসী সেনাদলকে বলো, এই গান গেয়ে ফকিরাবাদের পথ-ঘাট তারা তোলপাড় ক'রে তুলুক! পথের কুকুরের মতন এই নিস্তব্ধ রাত্রি ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠুক ও-গানের সুরে···

বেগম। রূপসী সেনাগণ, ঐ গান গেয়ে তোমাদের নিশীথ-অভিযান সুরু করো···

রূপসীগণ (গান)

গন্‌গনে চন্‌চনে শন্‌শনে ধ। ইত্যাদি—

ফর্ক্কর। ইয়া আল্লা! এ কি বেহেস্ত নেমে এলো ফকিরাবাদের প্রাসাদে!···না, ফকিরাবাদের প্রাসাদ চ'ড়ে বসলো ওই আশ্‌মানের মাচায়! পাতাল নেমে গেল সাগরের তলায়, না, সাগর তেড়ে লাফিয়ে উঠলো পাতালের ঘাড়ে! কিছু বুঝচি না! কিছু না···ঔরং···না, না, মরদ! না, না, সিরাজি···তা'ও না! বেগম, বেগম, আমি উন্মাদ হয়েচি! বহুৎ খুব!···ছটফট সিংহ···এ গান তোমার কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশে তোমার রাত্রির নীরব জাগরণকে ছটফটিয়ে দিক্। তুমি তখন···হাঃ হাঃ হাঃ (উচ্চহাস্য)

[নব-রণ-সঙ্গীতের তালে তালে পা ফেলিয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

কোটালপাড়া রাজোদ্যান

[রাজা ছটফট্ সিংহ একখণ্ড পাথরের উপর দাঁড়াইয়া রাজ্যের মঙ্গল-চিন্তা করিতেছেন। আকাশে কুমড়ার-ফালি চাঁদ। মলয়-বাতাস বহিতেছে; পাথরের অদূরে একরাশ নুড়ি-পাথর জমানো ও তার পাশে ক'টা শড়কী, বর্শা, ঢাল, তলোয়ার জড়ো করা]

(গাহিতে গাহিতে রাণী পলিতার প্রবেশ)

(গান)

আমি পাৎলা ঠোঁটের মাৎলা হাসি
হাৎলা ছোঁয়ায় গড়িয়ে পড়ি।
আমি রাতের চোখের তারা,
আমি নেড়ের পারের কড়ি।

ফুল-সায়রের ঘুম-পরীটি,

নয়নে মোর সপ্তকাণ্ড

রামায়ণের অশোক-স্মৃতি!

কম্‌লা-পুরীর সুধা-ভাণ্ড!

ঘোমটা-খোলা রূপসী গো,

ষোড়শী চাঁদ স্বপন-ছড়ি!

এই যে...আঃ, প্রাণ বাঁচলো! এই মলয় হাওয়ায় আপনাকে খুঁজে খুজে আমি হায়রাণ। বলি মহারাজ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনি ঘুমোচ্ছেন না কি? (ধাক্কা দিল)

ছট্‌ফট্। ছি রাণী পলিতা! আমি রাজ্যের মঙ্গল-চিন্তায় কাতর হয়ে বিচিত্র স্বপ্ন দেখছিলুম, এক মহাসমুদ্র,... তরঙ্গের পর তরঙ্গ-ভঙ্গ...সে-তরঙ্গে কোটালপাড়ার তরণী ভেসে চলেচে কোন্ সীমাহীন অসীমের কূল লক্ষ্য ক'রে... জননী ভারত-লক্ষ্মী লীলা-কমল হাতে জলরাশি ভেদ ক'রে উঠে দাঁড়িয়েচেন, আমায় কি বলবেন...এমন শুভলগ্নে হায় রাণী, লঘু কৌতুকে তুমি আমার সে অমল-কমল-স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে!

পলিতা। কি ক'রে জানবো, মহারাজ, যে আপনার এ-রকম জেগে ঘুমোনো অভ্যাস! তা, যুদ্ধ তো চুকে গেছে... এখন রাত হয়েচে। বন-বাদাড়ে অন্ধকার। এখন তো বিশ্রাম।

ছট্‌ফট। যোদ্ধার বিশ্রাম নাই, রাণী।

পলিতা। রাত্রেও নেই? ঘুমোবেন না? কাল সকালে যুদ্ধক্ষেত্রে না হলে ঢুলবেন যে!...

ছট্‌ফট। গভীর আবেগ যখন বক্ষ আন্দোলিত ক'রে তোলে, ঘুম কি তখন চক্ষের ধারে ঘেঁষতে পারে? না। ঘুম পক্ষ-হীন শকুন-পক্ষীর মত ভুঁয়ে গড়াগড়ি যায়। হায় নারী, তুমি কি বুঝবে, কি গভীর আবেগ আমার বুকে! রণ-জয়ের কি উন্মাদ কল্পনা আমার মস্তিষ্কে ঝঞ্ঝনা জাগিয়ে দিয়েচে!

পলিতা। কি, কি বললে! আমি নারী, তাই আমায় হেয়-জ্ঞান! দেশের ভাবনা তুমি একাই ভাবচো! আমি ভাবচি না? তুমি রাজা, আর আমি এ-রাজ্যের রাণী! সাত হাজার সৈন্যের বাহবা তুমি একা নেবে? আর আমি তা নিতে জানি না? হায় পুরুষ, নারীর প্রতি তোমার এই অজ্ঞানই তোমার সর্ব্বনাশ ঘটাবে...

ছট্‌ফট্। রাণী, রাণী...এ কি বলচো তুমি! আমি যে চারিদিকে অন্ধকার দেখছিলুম!.. তুমি সে অন্ধকারে কি বিদ্যুৎবিন্দু ফুটিয়ে তুললে!...রাণী পলিতা, নারী...

পলিতা। হাঁ, পলিতা! এই পলিতায় আগুন দিলে সে বিশাল মশাল হয়ে ওঠে! সে মশালে ঘর-বাড়ী রাজ্য, মাঠ...সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায়! পলিতার শক্তি সামান্য নয়, রাজা!

ছট্‌ফট। বলো, তাই বলো, মহারাণী...আমায় প্রাণ দাও, আমার নিরাশ চিত্তে আশার সঞ্চার করো...

পলিতা। শোনো তবে মহারাজ ছট্‌ফট্ সিংহ, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্ত থেকে কি অস্ত্রবুদ্বুদ আমি সংগ্রহ করেচি। এ অনুকম্পা জাগানো নয়...বজ্রের মত নির্ম্মম কর্ম্মস্রোতে বর্ম্ম ঠাশা নয়। আমি এমন রণ-সঙ্গীত রচনা করেচি, যার সুরে শুধু আগুনের আর্ত্তনাদ! সে আগুনের পরশ-মণি ছোঁয়ামাত্র শত্রু মিত্র হয়, রাজ্য শ্মশানে ছোটে, শ্মশানে নন্দন জাগে! শোনো সে গান, মহারাজ... শুধু দীপকের বজ্রজ্বালা...বাক্য-হীন সুরের আর্ত্ত আস্ফালন...

(গীত)

জ্বলে ধ্বক্-ধ্বক্ লক্-লক্,
দিকে দিকে ঝক্-ঝক্!
লাল শিখা, লাল শিখা,
নীল ফিকা, নীল ফিকা...
লালে-নীলে চক্‌চক্!
ধাঁ-ধাঁ চোখ ঝলসে,—
খুলে রাখে চোখ, বল কে?
মাথা ফাটে ঠুকে ঠক্-ঠক্!

জেনো মহারাজ, নারী খেলার পুতুল নয়। সে মহা-মার্ত্তণ্ড! নারী গান গায়, নারী ঝঞ্ঝায় ঝন্‌ঝনায়! নারী বাহুর মালা গলায় পরায়, আবার সে বাহুকে গহনায় ভরায়! নারী ফুল, নারী আগুন! নারী পরী, নারী প্রেতিনী! নারী মমতা, নারী হিংসা? নারী দেবী, নারী কবি! নারী রাঁধে, আবার নারী চুলও বাঁধে! নারীর শক্তি মহা-নারী...তুমি কাপুরুষ পুরুষ, রাজা হয়েও তা বোঝো না!

ছট্‌ফট্‌। মাপ, মাপ করো মহারাণী। আমার অপরাধের বোঝা আর ভারী ক'রে তুলো না। আমি তা বইতে পারবো না, পারবো না, পারবো না ··

(নেপথ্যে কামান-ধ্বনি···রাজা কাঁপিয়া উঠিল)

এ কি! দুর্বৃত্ত পাঠান রাত্রে ঘুমোতে দেবে না! এ কি বর্ব্বরতা!

পলিতা। ভয় নেই, মহারাজ···মহারাণী পলিতা নিশ্চিন্ত হয়ে প্রমোদ-বনে বিরাম-সুখ উপভোগ করতে আসেনি! মহারাণী কি করেচে, তা এখনি জানতে পারবে!···

ছট্‌ফট্‌। (উদ্‌ভ্রান্তের মত পলিতার পানে চাহিয়া রহিল; নেপথ্যে কামান-ধ্বনি)···ঐ আবার! আমার সেনাপতি এ কি ঘুম ঘুমোচ্ছে!···এ কি কাল-নিদ্রা? কিন্তু কোথা থেকে কামান ছুড়চে, তাও বুঝচি না! কোন্ দিকে যাবো, কি যে করবো···(রাজা চঞ্চল হইল)।

পলিতা। স্থির হও, রাজা। তুমি নারীর কটাক্ষই দেখেচো, তার নয়নে বহ্নি-চক্র ছাখোনি! নারীর মর্ম্মর-বাহু দেখেচো, সে-বাহুতে রাহু-শক্তি ছাখোনি! নারীর মাথায় দোদুল বেণীর বাহারই দেখেচো···সে মাথায় বুদ্ধির বহর ছাখোনি!

ছট্‌ফট্‌। না, দেখিনি। অপরাধ করেচি, মহারাণী···আমায় ক্ষমা করো।

পলিতা। (হাস্য করিল, রাজার হাত ধরিয়া তুলিল) ভয় নেই। ক্ষমা করেচি মহারাজ···বলবার আগেই তোমায় ক্ষমা করেচি। ক্ষমা না ক'রে যে উপায় নেই। তোমরা পুরুষ, অতি গোবেচারা! বাল্যে নারী-মাতার স্নেহচঞ্চু পুটে তোমাদের আশ্রয়, যৌবনে-বার্দ্ধক্যে নারী-জায়ার অঞ্চল-ছায়ায় তোমাদের নির্ঝঞ্ঝাট আস্তানা! পুরুষকে নারী ক্ষমা করবে বৈ কি!

ছট্‌ফট্‌। মহারাণী তুমি কি, আমি বুঝচি না! প্রহেলিকা, না কুহেলিকা? মালবিকা, না, শেফালিকা? প্রিয়দর্শিকা, না, বিভীষিকা?···(আবার কামান-ধ্বনি)···আবার···ঐ আবার···আমি পাগল হয়ে যাবো রে বাবা!···

পলিতা। ছি মহারাজ, এই তোমার বীরত্ব! এই বীরত্ব নিয়ে তুমি রাজ্য শাসন করো! সাবধান, শত্রু যেন না জানতে পারে!···তবে ভয় নেই···এই ছাখো চিত্র···(দুটা পাথর ঘষিয়া চকমকির আগুন জালিল) আলোয় ছাখো! চেয়ে···রণস্থলের নক্সা! এই হলো ভাঙ্গা ভবানী-মন্দির ···ভবানী-মন্দিরের পাশে এই যে খাদ দেখচো···এই খাদের ওপার থেকে শত্রু কামান দাগচে···আর ভবানী-মন্দিরের এ-পাশে এই যে ঘনঘটপট বটবৃক্ষ···এই বৃক্ষের শাখায় আমার সাতশো সঙ্গিনী রণরঙ্গিণী সেজে ব'সে আছে। তাদের হাতে সাতশো পট্‌কা···আঁচলে রাজবন্দীদের হাতে-ভাঙ্গা পাথরের কুচি। খাদের ধারে শত্রু এসে পৌছুলেই এই সাতশো পট্‌কা একসঙ্গে ছিট্‌কে উঠবে!···আর সে লোষ্ট্ররাশি সবলে নিক্ষিপ্ত হবে!

ছট্‌ফট্‌। এঁ্যা! বলো কি, মহারাণী! তুমি এমন কৌশলী···গোপনে এমন আয়োজন গড়ে তুলেচো! এ রাজ্য এবার থেকে তুমিই তবে শাসন করো, পালন করো। আমি তোমার পাশে ছত্রধর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

পলিতা। সে তো নূতন কথা নয়, মহারাজ! চেয়ে ছাখো ঐ বিশাল ভূমণ্ডলের পানে···ঘরে ঘরে নারী শাসন-পালনের ব্রত ধারণ করেচে, পুরুষ জুজুবুড়ী হয়ে তার পাশে ব'সে আছে! সংসার কে দেখে? নারী! দাসী-চাকরকে কে শাসনে রাখে···? নারী···! রন্ধন-দুর্গশালা কার তাঁবে? নারীর! দুর্দ্ধর্ষ বৃষের মত দামাল স্বামীর আস্ফালন কার দৃষ্টির শরাঘাতে তৃণগুচ্ছের মত ছিঁড়ে উড়ে যায়? এই নারীর।

(নেপথ্যে কামান-ধ্বনি···সঙ্গে সঙ্গে অজস্র পট্‌কার শব্দ, পরে রণসঙ্গীত শুনা গেল,—

জ্বলে ধবক্-ধবক্ লকলক্,
দিকে দিকে ঝক্-ঝক্! ·)

ঐ শোনো মহারাজ, আমার রণরঙ্গিণীদলের বিজয়-সঙ্গীত!···

(নেপথ্যে নারী-কণ্ঠে—কাম্ ফতে। লুঠ লিয়া···দুশমণ ভাগা···হর-হর শঙ্কর, জয় ব্যোম বাবা বৈদ্যনাথ!)

ব্যস্, এসো মহারাজ···

ছট্‌ফট্‌। দাঁড়াও, তার আগে···হে পত্নীরূপিণী মহানারী, আমার এ দগ্ধ-মুগ্ধ হৃদয়ের প্রণতি গ্রহণ করো।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)।

তৃতীয় অঙ্ক

নবাবের দরবার

নবাব ফর্ক'র উদ্দৌলা ও অমাত্যগণ

ফর্ক'র। ঘোর শয়তানী…এ বেইমানী! না হ'লে নিশীথ-অভিযান ব্যর্থ হয়!…ঘর্ঘর বেগ, তুমি সেনাপতি! এমন দীনহীন মতি নিয়ে যুদ্ধজয়ের আশা রেখেছিলে।

ঘর্ঘর। শাহান্‌শাহ…

ফর্ক'র। চুপ রও বেয়াদব! তোমার কত্‌ল্ হবে। বেগম খাণ্ডারজান্…

(বেগম আসিলেন)

তুমি স্বহস্তে বিষের পাত্র এই বেতমিজের মুখে ধরবে।

বেগম। (কম্পিত হইলেন) না, না, আমি নারী…

ফর্ক'র। দুর্বৃত্ত নারী! তোমাদের অভিসন্ধি আমি জানি।…ভেবেছিলে, আমার শত্রুর হাতে দিয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি করবে! তার পর এই ঘর্ঘর বেগ বসবে মস্‌নদে, আর তুমি তার বামে বেগম হয়ে!

ঘর্ঘর বেগ। (কাঁপিয়া উঠিল) এ কি জাঁহাপনা! তুমি মানুষ, না, দানা…মনের অতি গূঢ় ফন্দী এমন গণ্ডীতে বন্দী করো!

বেগম। (কম্পিত কণ্ঠে) জাঁহাপনা…

ফর্ক'র। চুপ্… এই পত্র…তোমার বাঁদী মরজিনার হাতে শত্রু-সেনাপতির কাছে পাঠিয়েছিলে। সে বাঁদী আমার ঘোড়ার পায়ের চোট্ খেয়ে পাথরে প'ড়ে প্রাণ দেছে। আমি এ চিঠি হস্তগত করেচি।…আমি অভিসন্ধির গন্ধ পাচ্ছি। বর্কন্দাজ খাঁ…তোমার বাদশাকে তুমি ভক্তি করো?

বর্কন্দাজ। খোদার চেয়েও, জাঁহাপনা।

ফর্ক'র। বেশ, তুমি তা হ'লে এই দুর্বৃত্ত নারীকে ক্ষিপ্ত হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করো…যৌন-সমস্যা ধূলিস্যাৎ হোক্!

বেগম। তাই করো, বাদশা…কিন্তু তার আগে…না, না, (ফুঁপিতে লাগিল) আমি মারা গেলে এই আমার ওড়নীর খুঁটে বাঁধা পত্রখণ্ড পড়ো। তা হ'লে বুঝবে, কি বেগম-রত্নকে তুমি বানরের মত খুইয়েচো! হাঁ, বানর! শোনো অমাত্যগণ, এই ফকিরাবাদে এক বাদশা ছিল… লিখে রাখো…ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠা কালি-লিপ্ত ক'রে দাও! সে বাদশার বুদ্ধি ছিল বানরের মত। তার যে বেগম ছিল, সে নারীকুল-রত্ন। কিন্তু না! ওঃ! ওঃ!…

রাণী পলিতা, প্রিয় সখী…এরা নারীর মূল্য জানে না! ওঃ! শাহান্‌শাহ, বাদশার বাদশা, এ কি আদেশ করেচো! ক্ষিপ্ত হস্তিপদতল কি! তোমার নির্মম বাক্য-বজ্রেই অবলার প্রাণ তুমি জ্বালিয়ে দিয়েচো! ওঃ… ওঃ…ওঃ… (মৃত্যু)

বর্কন্দাজ। হকিম ডাকো…হকিম…জল্‌দি…

ফর্ক'র। না, হকিম কি করবে! দরবারে হকিম ডাকার দস্তুরও নেই! দেখচো না, বেগম গতায়ু! ঘর্ঘর বেগ, তোমায় ভার দিচ্ছি, বেগমের ওড়নী থেকে পত্র বার করো!

(ঘর্ঘরের কথাবৎ কার্য্য; ফর্ক'র পত্র পাঠ করিলেন; তাঁর চোখ বিস্ফারিত, পরে সজল; এবং শেষে 'ওঃ' বলিয়া ফর্ক'র বেগমের দেহের উপর পতিত হইলেন)

বর্কন্দাজ। কবি ভ্যাবাকান্ত…

ভ্যাবাকান্ত। চুপ…আমার ভাব আসচে। শোক-সঙ্গীত-রচনা করবো। বেগমের মৃত্যু-উপলক্ষে…

ফর্ক'র। (ধীরে ধীরে উঠিল) শোনো সকলে, অমাত্যগণ… বেগম ঠিক বলেচেন, ফকিরাবাদের বাদশা বানর। বানরের মশনদ সাজে না। অতএব, আমি ফকিরী নেবো, স্থির করলুম। কিন্তু তার আগে,…হাঁ, এ পত্রে কি লেখা আছে, শোনো। বেগম লিখেচেন…রাণী পলিতাকে। "প্রিয় সখী রাণী পলিতা, আমার স্বামীর মশনদের পাশে এক বিশ্বাসঘাতক বেইমান সেনাপতি ঘর্ঘর বেগ। সমস্ত ফৌজ তার তাঁবে। সে আমার প্রতি লালসা পোষণ করে। এই অস্ত্রেই তাকে সরাইতে চাই। আমি গোপনে তাকে আশা দিয়াছি…যে, আমি তাকে ভজিব। নিশীথ-অভিযানের ভার তার হাতে। সে ঐ ফাঁকে বাদশাকে সরাইতে চায়। আমি নিরুপায়। পাছে আমার বাদশার প্রাণের হানি হয়, এই ভয়ে আমি কাতর। তুমি তোমার সজিনীর সাহায্যে আমাদের ফৌজকে সাবাড় করো। ঘর্ঘর বেগ তখন হীনবল হইবে। আমি বাদশাকে তখন সকল কথা বলিব।"…শুনলে? এখন বলো, ঘর্ঘর বেগের শাস্তি কি?

বর্কন্দাজ। (ঘর্ঘরের গালে সবলে চপেটাঘাত করিল) ছুঁচো ব্যাটা!…জাঁহাপনা, ওকে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়ান!…

ঘর্ঘর। (ভুয়ে পড়িয়া) এ্যায় খোদা, খোদা…না, না, বাদশা, তার চেয়ে ঘচাৎ ক'রে এই গলাটা কেটে ফেলুন।

ডালকুত্তো ? কুকুরকে আমি বড় ভয় করি। তার একটা কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ হয়! আর সেই কুকুরের হাজার কামড়…

ফর্কর। হাঃ হাঃ হাঃ! ঠিক হবে…সেই…সেই তোর যোগ্য শাস্তি। বলে, জলাতঙ্ক! তার অবসরও মিলবে না রে, মূর্খ! বর্কন্দাজ, একে নিয়ে যাও। আজ থেকে তুমি আমার সেনাপতি…

(বেগে রাণী পলিতার প্রবেশ)

পলিতা। কোথায়? কোথায়? এই যে বেগম খাণ্ডারজান্! বহিন…এ কি দেখচি! বাদশা, বাদশা, এ তুমি কি করেচো!

ফর্কর। সব জেনেচি মহারাণী পলিতা, কিন্তু ভগ্নী…অনেক বিলম্বে!

পলিতা। শোনো সকলে…এই বেগম খাণ্ডারজান্ আর আমি…এক মৌলবীর কাছে ফার্সী পড়তুম…আলেফ্ বে…তে…। দিল্লীতে আমার পিতা ছিলেন বাদশার সভা-কবি; আর বেগমের বাপ দুর্গ-দ্বারে মতি বেচতেন। তার পর জীবনে কি পরিবর্ত্তন এলো! শেষে এই সংগ্রাম…ভাই-হিন্দু ভাই-মুসলমানের বুক ভাগ্ ক'রে অস্ত্র ছোড়ে! আমরা গোপনে পণ করলুম, এ বিরোধ ভাঙ্গবো। সেই সাধু ব্রত শিরে ধ'রে আমরা অগ্রসর হয়েছিলুম। কিন্তু সব ভেস্তে গেল! মহা-ভারতের অত-বড় স্বপ্ন আমাদের…ফেঁশে গেল!

ফর্কর। না, ফাঁশেনি, ফাঁশবে না। অমাত্যগণ এসো, এই বেগমের সামনে, এসো হিন্দু-মুসলমান, বক্ষে-বক্ষে আমরা মিলিত হই। কিন্তু এমন শুভক্ষণে রাজা ছটফট সিংহ… তিনি কোথায়?

(ছট্‌ফট্ সিংহের প্রবেশ)

ছট্‌ফট্। এই যে ভাই; আমি। সব শুনেচি অন্তরাল থেকে। কিন্তু…কিন্তু…আপনি ক্ষণ্ ক'রে বৈরাগ্যের সঙ্কল্প…

ফর্কর। কি করবো? আমার বেগমকে আমি হারিয়েচি যে, ভাই… (বক্ষে-বক্ষে সম্মিলিত)

ভ্যাবাকান্ত। এই আমার শোক-সঙ্গীত…

বেগম আমার, বেগম আমার নারী-কুলের রত্ন—
রান্না-বান্না স্বামীর সেবায় কতই ছিল যত্ন!

[নেপথ্যে সঙ্গীত-ধ্বনি]

ফর্কর। চুপ করো কবি ভ্যাবাকান্ত…

(নেপথ্যে গান)

মৃত্যু নাই রে মৃত্যু নাই সুখের ভব-নাট্যশালে;
চট্ ক'রে এ ওষুধটুকু ঢেলে দে রে মড়ার গালে!

ছট্‌ফট্। এ কি, গুরুদেব! অন্তর্য্যামী দেবতা আমার…

(গম্ভীরদাস বাবাজীর প্রবেশ)

গম্ভীরদাস। (গান)

জরতী? ও তার অর্থ ঢেকে রাখো অভিধানের পাতে;
জয় জয় জয় জয় জয়! খড়্গা ধর্ মা তোর দু'হাতে।
মৃত্যুর শির কেটে ফ্যাল্ কালী, দানব-দলনী মা,
হিমাচল তোর পদ-ভরে কাঁপে, কেউ থামাবে না!
মহা-মানব আর মহা-দানব কে রাখিস্ কত শক্তি?
এই বেগমের প্রাণ বাঁচিয়ে তোল্—ঢেলে স্বদেশ-ভক্তি!

(কমণ্ডলু হইতে জল ছিটাইলেন; নেপথ্যে শঙ্খ-নাদ)

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত…

বেগম। (উঠিয়া বসিলেন) এ কি! আমি কোথায়? আমি কোথায়?…

ফর্কর। আমার বক্ষে বেগম…আমার সলিল-ভরা এ দুই চক্ষে প্রিয়তমে…

বেগম। এ কি…ভগ্নী পলিতা! জাঁহাপনা, এই আমার প্রিয়-সখী…

ফর্কর। আর এই আমার প্রিয়-সখা ছট্‌ফট্ সিংহ!

বেগম। শোনো তবে মহারাজ ছট্‌ফট্ সিংহ, আর নবাব ফর্কর উদ্দৌলা…বিদ্বেষ ভুলে তোমরা আজ মিলিত হও এক মহা-মানবের মহা-সাগরের মহা-ভারতের মহা-পতাকা-তলে! গাহো সকলে সেই মহা-জাতীয় মহা-সঙ্গীত

(সকলের সমবেত সঙ্গীত)

ভারী মজা রে! মিল্ মা হিন্দু-মুসলমান!
মিল্ মা ঠাকুর-বাবুর্চি, মিল্ মা শ্রীমতী দেবী-জান্ জান্।
মুর্গী দিয়ে রাঁধো শুক্তো,
প্যাঁজে করো হবিষ্যি-ভুক্তো।
দাড়িতে টিকি বাঁধো…লুঙ্গিতে কাছা ছাঁদো।
জয় জয় খোদা-ভগবান!
কেন বাপ কাটাকাটি? রক্তারক্তি?
পাশাপাশি দুই ভাই বাড়িবে শক্তি!
কোর্ম্মা-কাবাব খাও, নিমঝোল-পোলাও—
চাও যদি সুখে রবে প্রাণ!

হবুচন্দ্রিকা

মহাবীর নাট্যকার।

শ্রাবণের ছবি

'আউট্‌রাম ঘাট' হইতে শ্রাবণের আকাশ] [শ্রীমান্‌ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উদ্যমে গৃহীত ফটোচিত্র হইতে

শ্রাবণ-সন্ধ্যা, মেঘ জমিয়াছে কালো কালো এক রাশি !
বসুধার বুক হইতে মুছিয়া লয়েছে রবির হাসি !

স্থির নদীজল করে ছলছল আঁধারে তরণী ভাসে !
নিভিবার আগে প্রদীপের মত গগন ঈষৎ হাসে !

[শ্রীমান রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উদ্যম
মেঘলা দিনের শেষে, খেয়াপারের যাত্রী নিয়ে পান্‌সী চলে ভেসে

চলিয়াছে ম্লান-মুখে দিবাকর।
কালো মেঘ ভাসে ধরণীর লাগে ডর !

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল [শ্রীমান্‌ অজিতকুমার মিত্র কর্ত্তৃক গৃহীত।

সে হাসি হেরিয়া চারিদিক দিয়া মেঘ-শিশু উঁকি মারে,
জলদের খেলা এ বাদল-বেলা জমেছে গগন-পারে !

নিয়ে ধরণী কাঁপে হিম-বায়ে তরণী খেতেছে দোল—
দু'য়ের মধ্যে নেমেছে শ্রাবণ ভরিয়া নদীর কোল !

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

রহস্যের খাসমহল

চতুর্ব্বিংশ প্রবাহ
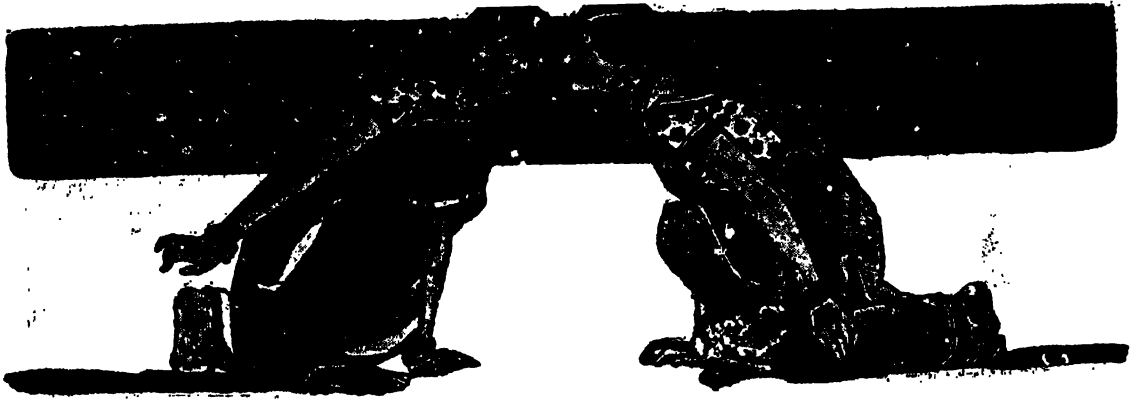
আর একটি গুপ্ত রহস্য

আমরা তিন জনে আগ্রহভরে সেই কক্ষের সকল অংশ পরীক্ষা করিলাম। অবশেষে আমি সেই কক্ষের এক কোণ হইতে একখানি বৃহৎ আরাম-কেদারা টানিয়া আনিতেই সেই চেয়ারের উপর হইতে কি একটা কালো জিনিষ মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

আমি তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই জিনিষটি তুলিয়া লইলাম। তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, নীলচর্ম্মনির্ম্মিত নারীর কণ্ঠবেষ্টনী। তাহা দেখিয়া মনে হইল, এই কক্ষে কি কোন রমণীর সমাগম হইয়াছিল? কে জানে, সেই রমণী এই কক্ষে নিহত হইবার পর তাহার কণ্ঠবেষ্টনী তাহার প্রতি উৎপীড়নের মূক সাক্ষিস্বরূপ ঐ চেয়ারে পড়িয়াছিল কি না? হয় ত সেই নিরাশ্রয়া বিপন্না নারীর হত্যাকারী ইহা দেখিতে পায় নাই।

ডেনম্যান তাহা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইহার উপর অধিক ধূলা জমে নাই, এ জন্য মনে হইতেছে, ইহা দীর্ঘকাল ওখানে পড়িয়াছিল না।"

তিনি তাহা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছিলেন, হঠাৎ তাহার ভাঁজের ভিতর হইতে কি একটা জিনিষ মেঝের উপর পড়িয়া গেল। ক্রেশ তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইয়া আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল; দেখিলাম, তাহা লোহিত-চর্ম্মনির্ম্মিত ক্ষুদ্র 'মণিব্যাগ।' ডেনম্যান তৎক্ষণাৎ তাহা হাতে লইয়া ব্যগ্রভাবে খুলিয়া ফেলিলেন।

সেই ব্যাগের ভিতর চারিখানি গিনি এবং দশ শিলিং মূল্যের খুচরা রৌপ্য-মুদ্রা ছিল।

ডেনম্যান্ হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "দেখিয়াছ, ইহার মধ্যে আরও কি সঞ্চিত আছে?"—তিনি সেই জিনিষগুলি টানিয়া বাহির করিলে দেখিলাম, পাঁচ ছয়খানি "ভিজিটিং কার্ড!" সকল কার্ডেই একটি নাম মুদ্রিত দেখিলাম। সেই নামটি মিস্ ইথেল কার্ক্‌হার। ঠিকানা 'আম্বারলে'। স্থানটি যে 'উইমবল্‌ডন কমনে', তাহাও লেখা ছিল।

আমি কুণ্ঠিতভাবে বলিলাম, "ওখানে যে রক্ত দেখিলাম, তাহা কি এই যুবতীরই হৃদয়শোণিত?"

ডেনম্যান অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "হইতেও পারে, অসম্ভব কি?"—তাহার পর তিনি ক্লীবকে বলিলেন, "টেলিফোনটা কোন্ দিকে আছে, বলিবে কি?"

সে বলিল, "হলঘরে আছে।" মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা খবর পাঠাইব। আমি মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া আসিতেছি।" জার্ম্মাণটাকে সঙ্গে লইয়া তিনি টেলিফোনের কলের কাছে চলিলেন।

ক্রেশ বলিল, "ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; ঐখানে যাহার রক্ত দেখিলাম, এ জিনিষ তাহার হইতেও পারে, না হইতেও পারে।"

আমি বলিলাম, "তুমি কি ঠিক বলিতে পার, উহা রক্তেরই দাগ?"

ক্রেশ বলিল, "আমাদের ইয়ার্ডে মিঃ ডেনম্যান অপেক্ষা বিজ্ঞতর ডিটেক্‌টিভ কেহই নাই, তাঁহার মন্তব্য শুনিয়াছেন ত? এই কুঠুরী সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত, আপনি কি ইহার কারণ বলিতে পারেন?"

ক্রেশ সেই কক্ষ পরীক্ষা করিয়া দুইটি গাঢ় বাদামী রঙের 'হেয়ার পিন' আবিষ্কার করিল। তাহার পর ডেনম্যান সেই

কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু তিনি কি করিয়া আসিলেন, তাহা বলিলেন না। তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোন জিনিষ পাওয়া গিয়াছে কি ?"

আমি সেই পিন দুইটি তাঁহাকে দেখাইলে তিনি বলিলেন, "ইহা বোধ হয়, সেই স্ত্রীলোকটির চুল হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল।" তিনি সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বারপ্রান্তে একটি ঝিনুকের বোতাম দেখিতে পাওয়ায় তাহা কুড়াইয়া লইলেন। স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত দস্তানায় ঐরূপ বোতাম দেখিতে পাওয়া যায়।

ডেনম্যান বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, কিছু কাল পূর্ব্বে কোন স্ত্রীলোক এই কক্ষে আসিয়াছিল। তাহারই নাম বোধ হয় ইথেল কার্ক্‌হার। আমরা এই কক্ষে যে কণ্ঠবেষ্টনী ও মণিব্যাগ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা দেখিয়া অনুমান হয়, তাহার বয়স অধিক নহে। সে যখন এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহার হাত দস্তানায় আবৃত ছিল, তাহার পর দস্তানা খুলিবার সময় ঐ বোতামটি তাহা হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে খসিয়া পড়িয়াছিল। টেবলের ধূলার উপর তাহার হাতের যে দাগ পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তাহার হাত ছোট। সেই সময় এই কক্ষে দুই জন পুরুষও ছিল। ধূলায় তাহাদেরও হাতের দাগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাহারা স্ত্রীলোকটির সহিত আলাপ করিবার সময় ঐ টেবলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ইহা অল্পদিন পূর্ব্বের ঘটনা।"

অনন্তর তিনি কয়েক মিনিট নিস্তব্ধভাবে সেই টেবলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এখানে কয়েকটি চিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু ইহার কারণ স্থির করিতে পারিতেছি না। আঙ্গুলের দাগের সম্মুখে আধ ইঞ্চি কয়েকটি দাগ দেখা যাইতেছে। এই দাগগুলি সূক্ষ্ম। এই দাগগুলি অদ্ভুত বটে! ক্রেগ, তুমি ঐ দাগগুলি কি দেখিতে পাও নাই? ঐ রকম দাগ আমি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।"

আমি ও ক্রেগ মহাশয় টেবলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, সেই দাগগুলি দেখিতে লাগিলাম; আমরা তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই। আঙ্গুলের দাগের মাথার কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নগুলি অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইল। আঙ্গুলের দাগের ও সেই চিহ্নগুলির ব্যবধান অতি অল্প।

ক্রেগ মিঃ ডেনম্যানের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, এ দাগগুলি অদ্ভুত বটে।"

ডেনম্যান বলিলেন, "আঙ্গুলে বড় বড় নখ থাকিলে ঐরূপ দাগ বসিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।"

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি যেন অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে, উহা কুপের হাতের নখের দাগ। আমি জানি, তাহার আঙ্গুলে বড় বড় নখ আছে, সেই নখগুলির ডগা সূচল করিয়া কাটা।"

ডেনম্যান আমার কথা শুনিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "তবে ত আমরা কুপের বাড়ীতেই আসিয়া পড়িয়াছি।" তাহার পর তিনি জার্ম্মাণটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি যে মিঃ থরন্ডের কথা বলিলে, তিনি কোথায়? তুমি মনে করিও না, ধাপ্পা দিয়া আমাদিগকে ভুলাইতে পারিবে; আর তুমি আমাদের কাছে তাহার কথা গোপন করিতে পারিতেছ না। আমরা জানি, তোমার সেই মনিবটি লণ্ডনেই আছেন। যদি তুমি আমাদের সঙ্গে চালাকী করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করিব।"

জার্ম্মাণটা সভয়ে বলিল, "না মহাশয়, আমায় অবিশ্বাস করিবেন না। আমি সত্যই বলিতেছি, তিনি গত নভেম্বর মাসে ভেনিসে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নামে চিঠিপত্র আসিলে আমি সেখানেই পাঠাইয়া থাকি, আমার সত্য কথা আপনারা অবিশ্বাস করিলে তাহা আমার দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারি?"

ডেনম্যান বলিলেন, "তাঁহার নামে চিঠিপত্র আসিলে তাঁহাকে পাঠাও? আজ কোন পত্র আসিয়াছে কি?"

জার্ম্মাণ বলিল, "হাঁ, আজ একখানা চিঠি আসিয়াছিল; কিন্তু বৈকালেই তাহার ঠিকানা বদল করিয়া ডাকের বাক্সে ফেলিয়া আসিয়াছি।"

তাহার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। থরন্ড কি সত্যই কুপ? কিন্তু নরহন্তা সমাজদ্রোহী কুপের প্রকৃতি কখন কখন পরিবর্ত্তিত হয়, সে ভদ্রলোক হইতে পারে, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মিঃ ডেনম্যান সেই জার্ম্মাণ যুবককে নানাভাবে জেরা করিতে লাগিলেন; সে তাঁহার তর্জ্জন-গর্জ্জনে ভয় পাইলেও তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, কুপের গুপ্ত রহস্য তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে কুপ রাত্রিকালে গোপনে প্রবেশ করিয়া কি কার্য্যে রত থাকিত, তাহা এই

ভৃত্যটি কোন দিন জানিতে পারে নাই। কিন্তু অতি অল্পদিন পূর্ব্বে সে সেই কক্ষে একটি যুবতীসহ প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম।

হঠাৎ টেলিফোনের ঝন্‌ঝনি শুনিয়া মিঃ ডেনম্যান টেলিফোনের উত্তর দিতে চলিয়া গেলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

তিনি আমাদিগকে বলিলেন, "একটা বিষয় কতকটা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমি ইয়ার্ডে যে সকল কথা জানাইয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া তাঁহারা নথিপত্র দেখিয়াছেন। ফারকুহার নামক এক জন ভদ্রলোক 'উইম্‌বলডন কমন্‌সে' বাস করেন; আট দিন পূর্ব্বে তিনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আসিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহার আঠার বৎসরের মেয়ে ইথেল এক দিন অপরাহ্নে ওয়েষ্টবোর্ণ-গ্রোভে বাজার করিতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর সে বাড়ীতে ফিরিয়া যায় নাই। তাহার পর চারি দিন অতীত হইয়াছিল, সেই চারি দিন তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবের গৃহে এবং অন্যান্য বহুস্থানে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাহার সংবাদ বলিতে পারে নাই। তিনি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, ইথেল সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কুইন্‌স রোডের এক জন মণিকারের দোকানে গিয়া একটি রূপার পেন্সিল ক্রয় করিয়াছিল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মিঃ ডেনম্যান পূর্ব্বোক্ত মণিব্যাগ হইতে কাগজ-জড়ান একটি জিনিষ বাহির করিয়া বলিলেন, "এই দেখুন তাহার সেই পেন্সিল-কেস। মণিকার ইথেলকে চিনিত, তাহার নিকট জানিতে পারা গিয়াছে—ইথেল সন্ধ্যা ৬টার পূর্ব্বে তাহার দোকানে সেই জিনিষটি কিনিয়াছিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ম্মচারীরা তাহার সন্ধান লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; সে নিহত হইয়াছে, এ সন্দেহও কাহারও মনে স্থান পায় নাই, কিন্তু এখানে আসিয়া আমরা তাহার শোচনীয় পরিণাম জানিতে পারিলাম।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, এই রহস্যের মূল আবিষ্কৃত হইয়াছে; অন্যান্য নরনারীর ন্যায় ইথেলও কোন কৌশলে এখানে আনীত হইয়াছিল।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "তাহার পর ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া নিহত হয় নাই; সেই নরপিশাচ কুপ তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, সে ছলনা করিয়া সেই যুবতীকে এখানে ভুলাইয়া আনিয়াছিল; কিন্তু এই কক্ষেই ছুরিকাঘাতে তাহাকে নিহত করিবার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। হয় ত কুপ তাহার অবাধ্যতায় হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া ক্রোধ দমন করিতে পারে নাই, সেই সময় তাহার নরহত্যার প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছিল, প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য।"

মিঃ ডেনম্যান গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হাঁ, তাহা অনুমান করা সত্যই আমাদের অসাধ্য। যাহা হউক, চলুন, এখন আমরা এই অট্টালিকার দোতলায় যাই।"

অনন্তর তিনি জার্ম্মাণটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যদি তোমার বিপদে পড়িবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তুমি এই বাড়ীর বাসেন্দা ও তাহার বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধে যাহা কিছু জান, আমার নিকট প্রকাশ কর।"

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি আর কিছুই জানি না, মহাশয়! যাহা জানিতাম, তাহা সমস্তই বলিয়াছি, তথাপি যদি আমাকে বিপদে পড়িতে হয়, সে আমার ভাগ্যের দোষ।"

মিঃ ডেনম্যান সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হুঁ! সকল কথাই তুমি আমাদের কাছে বলিয়াছ! কিন্তু আর একটা সোজা কথা বল। এই মিঃ থরল্ড লোকটি দেখিতে কিরূপ? তিনি বৃদ্ধ না যুবা? তাঁহার চেহারা কেমন?"

জার্ম্মাণ যুবক বলিল, "তিনি যুবক নহেন, বৃদ্ধ, বয়স বোধ হয় ষাটের কাছাকাছি। চুল, দাড়ি, গোঁফ পাকা; কিন্তু তাঁহার চক্ষুর তারা কালো। সে রকম চক্ষু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।"

চাকরটার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে যাহার কথা বলিল, সে কুপ ভিন্ন অন্য লোক নহে। কুপের চেহারা ঠিক ঐ রকমই বটে। আমি সোৎসাহে বলিলাম, "বুঝিলাম, সেই লোকটাই কুপ। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

ডেনম্যান ভৃত্যকে বলিলেন, "আর তাহার কন্যা মিস্ বোয়ানের চেহারা কিরূপ?"

চাকরটা বলিল, "কাহার মেয়ের কথা বলিতেছেন ?"

মিঃ ডেনম্যান।—থরন্ডের মেয়ে ? আর কাহার কথা জিজ্ঞাসা করিব ?

চাকর বলিল, "না, তাঁহার কোন মেয়ে নাই। তাঁহার একটি ভাইঝি আছে, তাহার নাম মিস্ রোজানি।"

আমি বলিলাম, "তবে কি তুমি মিস্ যোয়ানকে কোন দিন দেখ নাই ? তাহাকে চেন না ?"

জার্ম্মাণটা বলিল, "না মহাশয়, আমি তাঁহাকে চিনি না; কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হয় না, তবে বার্ণেস বোধ হয় তাঁহাকে জানেন।"

আমি বলিলাম, "যোয়ান কোন দিন এখানে আসে নাই, এ কথা তুমি জোর করিয়া বলিতে পার ?"

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার বয়স কত ?"

আমি বলিলাম, "প্রায় উনিশ বৎসর, তাহার মাথার চুলগুলি সোনালী রঙ্গের, চক্ষু নীল। তোমার মনিবের মেয়ে, তুমি তাহাকে চেন বৈ কি !"

জার্ম্মাণ যুবক বলিল, "না মহাশয়, আমি তাঁহাকে কোন দিন দেখি নাই।"

আমরা সেই কক্ষের বাহিরে আসিলে জার্ম্মাণ-ভৃত্য দ্বার রুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, তাহা দেখিয়া মিঃ ডেনম্যান তাহাকে বলিলেন, "দেখ ক্লীন, তুমি পুনর্ব্বার এই কামরায় প্রবেশ করিও না, অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিও না; আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ ?"

ভৃত্য বলিল, "হাঁ মহাশয় !"

মিঃ ডেনম্যান।—এখন আমাদিগকে দোতলায় লইয়া চল, দোতলায় যাহা কিছু আছে, সমস্তই আমাদিগকে দেখাইবে। যদি কোন রকম চালাকী কর, তাহা হইলে বিপদে পড়িবে। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিব কি না, তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। এই বাড়ীতে গোপনে নরহত্যা হইয়াছে, এইরূপ সন্দেহের কারণ আছে, অথচ তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও এখানে দেখিতে পাইলাম না !

ভৃত্য বলিল, "নরহত্যা ? কি সর্ব্বনাশ ! না মহাশয় ! আমি কোন খুন-খারাপির খবর জানি না, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

মিঃ ডেনম্যান।—তুমি বলিলে, তোমার মনিব কেনিসে আছেন, সেখান হইতে তিনি কোন দিন তোমাকে চিঠিপত্র লিখিয়াছেন ?

ভৃত্য।—তিনি কখন চিঠিপত্র লেখেন না, যখন এখানে আসেন, পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ আসেন।

আমরা সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিতে লাগিলাম, কিন্তু সিঁড়িতে উঠিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলাম, কারণ, সেই সিঁড়ি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হইল। অথচ নীচের ঘরে যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশই আমার পূর্ব্বদৃষ্ট। ইহা কুপের সেই বাড়ী কি না, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। মনে খট্‌কা বাধিল। ডেনম্যান গালিচার উপর যে দাগ দেখিয়াছিলেন, তাহা রক্তের দাগ না হইতেও পারে; কিন্তু মিস্ ফারকুহারের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের সংবাদটি ত মিথ্যা নহে।

যাহা হউক, আমরা দোতলায় একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম। জার্ম্মাণ ভৃত্য সেই কক্ষের সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিলে দেখিলাম, তাহা একটি সুপ্রশস্ত 'ড্রয়িংরুম'। তাহাতে তিনটি জানালা ছিল, জানালাগুলি পর্দা-ঢাকা। সেই কক্ষটি সেই অট্টালিকার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। সেই কক্ষের আসবাবপত্রগুলি ধূলিনিবারক আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিত। এ জন্য আমি সেই কক্ষের কোন জিনিষ চিনিতে না পারায় পূর্ব্বে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার স্মরণ হইল, পূর্ব্বে দোতলায় যে 'ড্রয়িংরুমে' প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার কোন কোন আসবাব সবুজ সাটিন দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, এবং সেই কক্ষের অগ্নিকুণ্ডের নিকট একখানি শ্বেত-ভল্লূকচর্ম্ম প্রসারিত ছিল। আমি অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া সেই ভল্লূকচর্ম্মখানি দেখিতে পাইলাম বটে, কিন্তু তাহা অগ্নিকুণ্ডের এক পাশে জড়াইয়া রাখা হইয়াছিল।

আমি একটি টেবলের আবরণ অপসারিত করিয়া তাহার নীচে সবুজ সাটিনের খোল দেখিতে পাইলাম। আমি পূর্ব্বে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেওয়ালে কোন ছবি দেখিতে পাই নাই, কিন্তু এবার চতুর্দ্দিকের দেওয়ালে কয়েকখানি মূল্যবান্ তৈল-চিত্র দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর কোন বিখ্যাত চিত্রকরের অঙ্কিত একটি যুবতীর চিত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। যুবতীর অঙ্গে সেই সময়ের প্রচলিত পরিচ্ছদ ছিল।

হাঁ, ইহা সেই কক্ষই বটে, তবে সিঁড়িতে পূর্ব্বে যে পুরু তুর্কি গালিচা প্রসারিত দেখিয়াছিলাম, এবার তাহার পরিবর্ত্তে 'একস্‌মিনস্টার' কার্পেট সংস্থাপিত দেখিলাম। পূর্ব্ববার কতকগুলি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সজ্জিত দেখিয়াছিলাম, এবার তাহা দেখিতে পাইলাম না। আমার মনে হইল, সেগুলি সেই কক্ষ হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

কিন্তু আমি যে কক্ষে বন্দী হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলাম, জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই কক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। নরনারীর মৃত্যু-যন্ত্রণার চিত্র পটে অঙ্কিত করিবার জন্য সেই উন্মত্ত শিল্পীর যে পৈশাচিক আগ্রহের পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হওয়ায় আমি শিহরিয়া উঠিলাম, আমার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল। মনে হইল, এবার কি সেই সকল চিত্র দেখিতে পাইব।

যদি লণ্ডনের আধ আনা মূল্যের হুজুগে কাগজগুলিতে কুপের ভীষণ অপরাধের কাহিনীগুলি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে লণ্ডনের সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে কিরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইবে এবং তাহা জনসমাজে কিরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি করিবে, এই চিন্তায় আমি ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইলাম। লণ্ডনে উন্মাদ-রোগীর সংখ্যা অল্প নহে, অনেক পাগল অজ্ঞান অবস্থায় বহু অপরাধজনক কায করিয়া থাকে; কিন্তু কুপ ক্ষেপিয়া উঠিয়া যে সকল পৈশাচিক কার্য্যে রত ছিল, তাহার তুলনা নাই. এবং আমার বিশ্বাস, তাহা প্রকাশিত করিয়া জনসাধারণের মনে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার করা নিষ্প্রয়োজন। সুখের বিষয়, পুলিস জানে, কোন্ কোন্ ঘটনার বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে, এই জন্যই লণ্ডনের অনেক লোমাঞ্চকর রহস্যের কাহিনী সংবাদপত্রের পাঠকগণের অজ্ঞাত থাকিয়া যায়, তাহা সমাজকে চঞ্চল ও আতঙ্কাভিভূত করিতে পারে না।

আমি ডিটেক্‌টিভদ্বয়ের অনুসরণ করিয়া ড্রয়িংরুমের পশ্চাতের কক্ষে উপস্থিত হইলাম। তাহা শয়নকক্ষ, কক্ষটি বিলক্ষণ প্রশস্ত। আমার ধারণা হইল, গৃহস্বামীরই তাহা শয়ন-কক্ষ। কারণ, সেই কক্ষে মূল্যবান্ খট্টা ও তাহার উপর সুকোমল শুভ্র শয্যা প্রসারিত দেখিলাম। তাহার পাশে আরও চারিটি কক্ষ ছিল, সেগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং সেগুলি শয়ন-কক্ষ হইলেও তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, সেই সকল কক্ষে কেহ শয়ন করে না।

এই সকল কক্ষ অতিক্রম করিয়া, আমরা অয়েলক্লথ-মোড়া সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া তেতলায় উঠিলাম। হঠাৎ আমি বলিয়া উঠিলাম, "এবার ঠিক চিনিতে পারিয়াছি; বাঁ দিকের ঐ দরজা।" আমি বুঝিতে পারিলাম, সেই দ্বার দিয়া যে কক্ষে প্রবেশ করিতে হইবে, সেই কক্ষে এক স্মরণীয় রাত্রিতে আমাকে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ওঃ, আমার জীবনের সে কি ভীষণ দুর্দ্দিন!"

মিঃ ডেনম্যান আমার সম্মুখে ছিলেন, আমার কথা শুনিয়া তিনি সেই কক্ষের দ্বারের হাতল ধরিয়া ঘুরাইলেন, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ ছিল, তাহা খুলিল না।

মিঃ ডেনম্যান জার্ম্মাণ চাকরটাকে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই কক্ষের চাবি কোথায়?"—আমার মনে হইল, সে হয় ত চাবির সন্ধান জানে না বলিবে; কিন্তু শাস্তির ভয়ে সে মিথ্যা বলিতে সাহস করিল না, চাবি তাহার কাছেই ছিল, তাহা সে মিঃ ডেনম্যানের হস্তে অর্পণ করিল।

মিঃ ডেনম্যান চাবি দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। আমি দ্বার-প্রান্তে রুদ্ধ-নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া, সেই কক্ষের ভিতর কি দৃশ্য দেখিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমার বক্ষঃস্থল সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

দ্বার উন্মুক্ত হইলে আমি সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে মিঃ ডেনম্যানের অনুসরণ করিয়া বৈদ্যুতিক দীপের 'সুইচ' খুঁজিতে লাগিলাম। অধিক চেষ্টা করিতে হইল না, দ্বারপ্রান্তেই 'সুইচ' ছিল—জানিতাম, অন্ধকারেই তাহা হাতে ঠেকিবামাত্র আমি 'সুইচ' টিপিয়া আলো জ্বালিলাম।

উজ্জ্বল দীপালোকে সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা দেখিয়া চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না! দেখিলাম, যে কক্ষে এক দিন আমার জীবন-মরণের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সুদীর্ঘ কক্ষটি সম্পূর্ণ খালি! তাহার প্রত্যেক দেওয়ালে যে সকল ভীষণদর্শন নরনারীর মৃত্যুযন্ত্রণার চিত্র ঝুলিতে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের একখানিও দেখিতে পাইলাম না; সকল চিত্রই অপসারিত হইয়াছিল। কুপ কি খানাতল্লাসীর ভয়ে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল? তাহার অপরাধের নিদর্শনস্বরূপ সেই ছবিগুলি সরাইয়া ফেলিয়াছিল?

আমি হতবুদ্ধি হইয়া মিঃ ডেনম্যানকে বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য! সেই সকল ছবির একখানিও ত এই কক্ষে দেখিতেছি না।

ক্রেগ চিন্তাকুলচিত্তে আমাকে বলিল, "ইহা ঠিক সেই কক্ষই ত? আপনার ভুল হয় নাই?"

আমি সেই কক্ষের জানালাগুলি খুলিয়া ফেলিলাম, একটি জানালা দিয়া ল্যাঙ্গেল্ স্ট্রীটের অট্টালিকাশ্রেণী দেখা যাইতেছিল, আমি পূর্ব্বেও তাহা দেখিয়াছিলাম। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, "না, আমার ভুল হয় নাই, ইহা সেই কক্ষ সন্দেহ নাই।" আমি সে কথা বলিলাম বটে, কিন্তু সেই কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রিতে আমি সেই কক্ষের বাহিরে ছায়ার মত যে দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলাম, এবং আজ যাহা আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, তাহা যে সম্পূর্ণ অভিন্ন দৃশ্য—ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিবার উপায় ছিল না। এই কক্ষ হইতে কেবল যে সেই চিত্রগুলিই অপসারিত হইয়াছিল, এরূপ নহে; সেই কক্ষে যে ধূসরবর্ণ গালিচাখানি প্রসারিত ছিল, আমি সেখানে যে সকল আসবাবপত্র দেখিয়াছিলাম, তাহাও দেখিতে পাইলাম না। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমরা পথে দাঁড়াইয়া এই কক্ষ হইতেই মোর্সের সাঙ্কেতিক ভাষার অনুকরণে বৈদ্যুতিক আলোকস্ফুরণ দ্বারা সংবাদ প্রেরিত হইতে দেখিয়াছিলাম। মিঃ ডেনম্যান সেই আলোকস্ফুরণ দেখিয়া তাহার অর্থও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কাহাকে সতর্ক করিবার জন্য সেই সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরিত হইতেছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই; হয় ত কুপকেই ঐ ভাবে সতর্ক করা হইতেছিল; কিন্তু এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমরা পথের দিকের জানালার নিকট সেই আলোক দেখিতে পাইলাম না। আমরা যখন এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন কক্ষদ্বার উন্মুক্ত ছিল না, মিঃ ডেনম্যান জার্ম্মাণ চাকরটার নিকট চাবি লইয়া দ্বার খুলিয়াছিলেন, এ অবস্থায় কেহ সেই কক্ষে লুকাইয়া থাকিয়া বৈদ্যুতিক আলোক-স্ফুরণে সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরণ করিতেছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। আমরা সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কি সেই জার্ম্মাণ চাকরটা সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গিয়াছিল?—সকল ব্যাপারই রহস্যপূর্ণ।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমরা সেই কক্ষের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই কক্ষ হইতে বৈদ্যুতিক আলোকস্ফুরণে সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে সেখানে কোন বৈদ্যুতিক কল সংস্থাপিত থাকাই স্বাভাবিক, অন্ততঃ বেতারের কোন কল সন্নিবিষ্ট থাকা উচিত; তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক, এবং গোপনে যেখানেই তাহা খাটাইয়া রাখা হউক, আমরা চেষ্টা করিলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব, এই আশায় সেই কক্ষের সর্ব্বস্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাহা এরূপ সুকৌশলে সেই কক্ষের কোন গোপনীয় স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। আমাদের উৎসাহ এবং চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম সকলই বিফল হইল।

হঠাৎ সেই গুপ্ত প্রকোষ্ঠের কথা আমার স্মরণ হইল। সেই কক্ষের দেওয়াল-সংলগ্ন একখানি বৃহৎ চিত্রপট দ্বারা সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের দ্বার আচ্ছাদিত ছিল, আমার হাতের ধাকায় সেই ছবিখানি স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় তাহার পশ্চাৎস্থিত ফুকরটির সন্ধান পাইয়াছিলাম। আমি অন্ধকারে সেই ফুকরের ভিতর হাত বাড়াইতেই মৃত যুবতীর শীতল মুখে আমার হাত ঠেকিয়াছিল। সেই কক্ষে গুষ্টেভ রামু—এই কল্পিত নামধারী চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রগুলি সংরক্ষিত হইয়াছিল এবং আমি যে চিত্রখানি সরাইয়া দেওয়াল-সংলগ্ন সেই ফুকরটি আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহা আমার সম্মুখস্থ দেওয়ালের বামপার্শ্বে সন্নিবিষ্ট ছিল—ইহাও আমার স্মরণ হইল।

যে স্থানে আমি অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যুতিক বোতামটি স্পর্শ করিয়াছিলাম, এবং যাহার সূচিবৎ সূক্ষ্ম অগ্রভাগ আমার অঙ্গুলীতে বিদ্ধ হওয়ায় নিম্নস্থিত পিচকিরীর বিষ আমার রক্তের সহিত মিশিয়া আমার চেতনা বিলুপ্ত করিয়াছিল, সেই বোতাম ও তাহার নিম্নস্থিত বিষপূর্ণ পিচকিরীটি আবিষ্কার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাও সেই স্থান হইতে অপসারিত হওয়ায় তাহা সেই কক্ষে দেখিতে পাইলাম না। অতঃপর আমি সেই গুপ্ত প্রকোষ্ঠটি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য দেওয়ালের প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেওয়ালে যে পর্দ্দা ছিল, তাহার উপর আমরা তিন জনেই মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, কোন্ স্থানটি ফাঁপা, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোন স্থানেই ঢপ-ঢপ শব্দ শুনিতে পাইলাম না। দেওয়ালের কোন্ অংশ শূন্যগর্ভ, ইহা নির্ণয় করিতে না পারায় দেওয়াল-স্থিত সেই গুপ্ত প্রকোষ্ঠ আবিষ্কারের চেষ্টাও বিফল হইল। কোন্ গুপ্ত গহ্বরে হাত প্রবেশ করাইয়া মৃতদেহ স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহার সন্ধান হইল না। তখন আমার

ধারণা হইল, এই কক্ষের কোন দেওয়ালে সেই গুপ্ত গহ্বরের অস্তিত্ব বর্ত্তমান নাই। কিন্তু কুপ কি কৌশলে সেই গহ্বরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিল? আমরা তাহার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াও তাহার ভীষণ অপরাধের কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না! কুপের চাতুর্য্য, সতর্কতা ও তৎপরতার পরিচয় পাইয়া আমি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অতঃপর সেই কক্ষটি পরীক্ষা করিয়া আমার ধারণা হইল, যে দিন আমি এই স্থানে নীত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিলাম, সেই দিন কক্ষটি যত বড় দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর দেখাইতেছে। সে সময় কক্ষটি নানা দ্রব্য-সামগ্রীতে পূর্ণ ছিল, আর আজ ইহা সম্পূর্ণ খালি, এই জন্যই ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর দেখাইতেছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মনের ধাঁধা দূর করিবার চেষ্টা করিলাম। ছবিগুলি এবং আসবাবপত্রগুলি অপসারিত হইলেও এবং আমি দেওয়াল-সংলগ্ন গুপ্ত প্রকোষ্ঠটির সন্ধান না পাইলেও এই কক্ষেই যে আমাকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছিল, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রহিল না। তথাপি আমি দৃঢ়তার সহিত স্বীকার করিতে পারিলাম না যে, আমরা যে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি, তাহাই 'রহস্যের খাসমহল।'

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অতীত স্মৃতি

সেই অনেক দিনের আগে,
খেলাধুলার সুখের স্মৃতি—
হৃদয়-মাঝে কতই জাগে।

ছেলেবেলায় মায়ের কোলে—
আদর পেয়ে ছিলাম ভুলে,
সরলতার স্নিগ্ধ ছায়ায়
হয় নি মলিন তপ্ত-রাগে।
অমল যেন ফুলের কলি—
ফুটলো ধীরে জুটলো অলি,
যৌবনে সেই ভরা গাঙে
ভাসছু নবীন অনুরাগে।
আমিই বড় আমিই জ্ঞানী,
মুকুরে মুখ রূপের খনি,
হেরে নয়ন আপন-হারা
প্রবাদ-প্রসূন অঙ্গরাগে।
সেই তুফানে স্রোতের সাথে
ভাব-রাগিণীর মূর্চ্ছনাতে,
সপ্ত সুরের মোহন বাঁশী
বাজিয়েছিল প্রেম-সোহাগে।

সে এক যেন নূতন ধারা,
সেই সময়ের সঙ্গী যারা,
তারাও মিলে খেয়ালগানে
রাঙিয়ে দিল হোলির ফাগে।
এমনি উন্মাদনার পরে
জীবন-তপন বেলায় ধীরে,
ডুব দিতে চায় অস্তাচলে,
আঁধার ঘেরা বিদায় সুরে।
ফোটা ফুলের নাই সে বাঁধন,
পড়ছে ঝ'রে পাপড়ী এখন;
কোন্ দিনে সে পড়বে ঢ'লে
মরণ-কোলে নদীর তীরে।
অতীত স্মৃতির বোঝা লয়ে
কি কাষ বল পিছন চেয়ে,
মায়ার মোহে, পরম নিধি
হারাই কেন শেষের ভাগে!

পান্নালাল চক্রবর্ত্তী।

জীবন-স্বপ্ন

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুঃখের বরষা

ছাদের উপর বলাই গুম্ হইয়া বসিয়াছিল ; মা আসিয়া বলিলেন,—ও বাবা, বেলা যে একটা বেজে গেছে···আয় খাবি, আয়···

প্রচণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলাই কহিল,—খাবার প্রবৃত্তি নেই, মা।

মা বলিলেন,—ছি, বাবা, ও-কথা কি বলতে আছে ? ·আয়।

ছেলের মাথায় চুলগুলার মধ্যে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে মা কহিলেন,—এখনো চান্ করিস নে! ··আয়, মাথায় তেল মাখিয়ে দি···তেল মেখে চট্ করে চান্ করে ন। তার পর আমার সঙ্গে বসে খাবি···আয়।

বলাই উঠিয়া দাঁড়াইল···অদূরে বিন্দুদের বাড়ীর পানে চোখের দৃষ্টি সঞ্চারিত করিয়া কহিল,—এর মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে, মা! বিন্দুর বিয়ে, বিন্দুর···

কথা বাধিয়া গেল। বিন্দুর কি হইয়াছে, বাঙালী-ঘরের ছেলে, সে তা বেশ বুঝিয়াছে! বিন্দু বিধবা, থান কাপড় পরিবে, একাদশীর দিন উপবাস করিবে, মাছ খাইবে না··· অর্থাৎ খেলা-ধুলার সে আর তার সঙ্গিনী হইবে না—বার-ব্রত পুজা-উপবাস লইয়াই মগ্ন থাকিবে! জীবনের এই বাল্য-বয়স এক নিশ্বাসে উত্তীর্ণ হইয়া সে একেবারে ওই বৃদ্ধাদের দলে গিয়া পড়িয়াছে!

তার বিস্ময় বোধ হইতেছিল···পৃথিবীর চেহারাখানা এই ক'মাসে এমন বদলাইয়া গিয়াছে! সঙ্গীদের কাছে মুখ দেখাইতে লজ্জা হইতেছে। তারা ঘৃণা করিবে! সে যে জেলে গিয়াছিল!···জেল!···কলঙ্কের এত কালি, দুর্নামের এ বিভীষিকা ঐ জেলের আড়ালে!···জেলে বসিয়া সে শুধু ভাবিয়াছে, এই বিন্দুর কথা। বিন্দুর উপর তার জুলুম আর অত্যাচারের কোনো দিন বিরাম ছিল না—অথচ বিন্দু নীরবে সে-সব সহ্য করিয়াছে! নালিশ কি করে নাই? করিয়াছে; তারে বলাই যখন রাগের আগুনে তাকে দগ্ধ করিবে ভাবিয়া তার পানে তাকাইয়াছে···তখনি বিন্দুর চোখের দৃষ্টিতে কি মায়া, কি বেদনাই সে লক্ষ্য করিয়াছে!···

সেই বিন্দু!···বলাই নিশ্বাস ফেলিয়া মা'র পানে চাহিল।

মা কহিলেন,—আয় বাবা···

বলাই কহিল,—বিন্দুকে ঘাটে নিয়ে যাবে এখন ?

মা কহিলেন,—কেন ?

বলাই কহিল,—সেই যে খামু পিশিকে সব নিয়ে গেছলো···পিসে মশায় মারা গেলে···

মা কহিলেন,—হিঁদুর ঘরের নিয়ম যা, তা পালন করা চাই তো! তবু আমি ঠাকুরঝিকে বলে এসেছি, এক ফোঁটা মেয়ে, ভারী বিয়ে! ওর আর অত নিয়ম-পালনে কাজ নেই!···

বলাই কোন কথা কহিল না,—বিন্দুদের গৃহের পানে ব্যথা-ভরা উদাস একটা দৃষ্টি হানিয়া মা'র সঙ্গে নামিয়া আসিল।···

ভুবন একখানা বই লইয়া সাজিয়া-গুজিয়া কোথায় বাহির হইতেছিল ; মা কহিলেন,—তোদের তো ছুটী···কোথায় যাচ্ছিস ?···

ভুবন কহিল,—কলকাতায়। কলেজের এক ছেলের বাড়ীতে···একসঙ্গে আমরা পড়বো।

মা কহিলেন,—কেন, ঘরে বসে পড়া হয় না ?···বলা এলো···

ভুবন কহিল,—তা আমায় সেজন্য শঙ্খধ্বনি করতে হবে না কি ?···

ভুবন চলিয়া গেল।

মা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ; বলাইও চুপ!···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মা কহিলেন,—পণ্ডিত ছেলে! কখনো দরদ করে কারো মুখের পানে চাইতে জানলো না!···

বলাই মা'র কথায় স্নান করিতে গেল।···স্নান করিয়া আসিলে মা আসন পাতিয়া দিলেন, কমলা ভাত দিয়া গেল। বলাই কহিল,—কমলী, তুই খেয়েচিস ?

কমলা কহিল,—খেয়েচি।

বলাই কহিল,—মা'র ভাতটাও অমনি দে'না ভাই। মার সঙ্গে খাবো।

মা কহিলেন,—দে মা···আমি চট্ করে ঠাকুর-নমস্কার সেরে আসি। তুই ভাত বেড়ে হাঁড়ি-কুঁড়ি তুলে ফ্যাল্।

বলাই কহিল,—ঠাকুমা পিসিমা···সব কোথায় গেল? কমলী যে সব করচে?

মা কহিলেন,—তাঁরা দু'জনে বিন্দুদের ওখানে গেছে। কি করতে হবে, না করতে হবে···ওর পিসি তো ঐ শোকে হতজ্ঞান হয়ে রয়েচে।

বলাই কহিল,—পুণ্য-কর্ম্ম করতে গেছেন তা হলে, বলো! ওঃ!

মা কহিলেন,—তুই থাম্ বাপু···সকলের উপর কথা কোস্ নে, মাণিক—কে কখন কি-ভাবে নিশ্বাস ফেলে—আমার কেমন আতঙ্ক ধরে!...আমি আর সহ্য করতে পারি না, বাবা।··

আহারাদি সারিয়া বলাই বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। গাছ-পালার ছায়ায়-ছায়ায় পথ-অপথ না বাছিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। বাড়ী তার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। আগে এমন অবস্থা ঘটলে ছিপ লইয়া এ-ডোবা ও-ডোবার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত, সঙ্গে থাকিত বিন্দু। আজ তা করিবার উপায় নাই! অথচ···ঐ বিন্দুদের বাড়ী আবার কান্নার রোল ওঠে!···ও শব্দে তার বুকখানা কি যে করিতে থাকে···

বিন্দুকে দেখিবার সাধ মনে খুবই জাগিতেছিল। কিন্তু তার জেল, বিন্দুর জীবনে অত বড় ঘটনা···কে জানে, এখন আগেকার মত দেখা হইবে কি না! বিন্দুর সাম্‌নে দাঁড়াইবার কথা মনে হইলে সারা অঙ্গ কেমন কাঁপিয়া ওঠে! তাই সে যতদূরে পারে, সরিয়া পলাইয়া থাকিতে চায়!···

অনেকখানি পথ আসিয়া একটা জলার ধারে সে পৌঁছিল। কতকগুলা ছোট ছেলে ছেঁড়া গামছা লইয়া মাছ ধরিতেছে···বলাই আসিয়া জলার অদূরে একটা গাছ-তলায় বসিল,—বসিয়া ভাবিল, এমনি খেলা তাদেরো ছিল এক দিন। তখন ছোট ছিল। এই ক'মাসে সে ডাগর হইয়াছে,··· বিন্দুও। এখন সে কি করিবে? কি করিয়া দিন কাটাইবে! বাড়ীতে মার স্নেহ···তা ছাড়া আশ্রয়ের আর ঠাঁই নাই! ছিল বিন্দু ··সে'ও আজ···

স্কুলের এখন ছুটী। স্কুল খুলিলে সেখানে আর যাওয়া চলিবে কি? সে চোর—চুরি করিয়া জেলে গিয়াছিল। ঘৃণায় সকলে মুখ ফিরাইবে! অথচ প্রতাপে যেখানে রীতিমত রাজার আসন পাতিয়া বসিয়াছিল...সেখানে আর সে প্রতাপ খাটিবে না! তা ছাড়া তারা স্কুলে ঢুকিতে দিবে না, বোধ হয়। দিলেও তার ঢুকিবার মুখ নাই। কি তবে করা যায়···?

ছায়ায় ঢাকা গাছের ডালে একটা পাখী ডাকিতেছিল··· মাঠের প্রান্তে ঐ গ্রামের রেখা··ওদিক হইতে পূজার বাজনার শব্দ ভাসিয়া আসে! আগমনীর রাগিণী ·· ও রাগিণীতে কি মোহ, কি মায়া মিশানো! প্রাণে কি উল্লাস জাগিয়া উঠিত! আজ তা হয় না! প্রাণ আজ মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করিতেছে···ঐ পাখীর গান, ঐ আগমনীর সুর··· সেখানে কোন মায়া রচিয়া তোলে না!···

জেলের সঙ্গীদের কথা মনে পড়িল। শয়তানীর ফৌজ! একসঙ্গে কাজ করা···বেতের চেয়ার তৈরী করা, সতরঞ্চ বোনা···কাজের মধ্যে সংসার ভুলিয়া মন্দ ছিল না। মার কথা আর বিন্দুর কথাই থাকিয়া থাকিয়া মন আকুল করিয়া তুলিত! কেবলই ভাবিত, ছাড়া পাইলে আর কোথাও নয়···মার কোলে, বিন্দুর কাছে ছুটিয়া আসিবে! কিন্তু আসিয়া কি দেখিল! তার আশ্রয়ের আরাম-নীড়টুকু কি বাজের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে!

বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিল। দিকে দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার চরাচরের বুকে যেন কালো পেন্সিল ঘষিয়া দিতেছিল। বলাই উঠিল···আন-মনে চলিতে চলিতে আসিয়া দাঁড়াইল এক অতি-প্রাচীন কালের ভাঙ্গা শিব-মন্দিরের সাম্‌নে। মন্দিরের ভাঙ্গা দেওয়ালের গা ফুঁড়িয়া বট-অশথের অজস্র চারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে!···একটা শীর্ণ গো-বৎস খোঁড়া পা লইয়া অতি দীন নয়নে তার পানে চাহিয়া ছিল ··বলাইয়ের প্রাণ মমতায় দুলিল। কতকগুলা কচি ঘাস ছিঁড়িয়া বলাই তার মুখে ধরিল···গো-বৎস আনন্দে সেগুলায় মুখ দিল।···

সহসা মৃদু কণ্ঠে কে ডাকিল,—বলাই-দা···

বলাই চমকিয়া উঠিল এ স্বর···! তার বড় জানা! কিন্তু সে? না, না···চাহিয়া দেখে. বিন্দুই।' মলিন মুখ··· যেন বিষাদের মলিন রেখাটুকু!···

বলাই বিন্দুর পানে চাহিল…তার প্রাণ মমতায় এমন গলিয়া গেল যে, মনে হইল, বিন্দুকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলে,—আমি…আমি আছি, বিন্দু, আমি। তোমার দুঃখে চিরদিন আমি তোমার পাশে দাঁড়াইব, তোমার কোনো ভয় নাই, বোন্…

কিন্তু মুখে তার কোন কথা ফুটিল না।

বিন্দু বলিল—ছুটি মিলতে তোমাদের বাড়ী গেছলুম,… জ্যাঠাইমা বললে, খেয়ে সেই যে বেরিয়েচো…কোনো উদ্দেশ নেই!…

বলাই অবিচল দৃষ্টিতে বিন্দুর পানে চাহিয়া রহিল। গো-বৎস তৃণগুচ্ছ শেষ করিয়া বলাইয়ের গা ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

বিন্দু কহিল—তেমন রোগা হও নি তো…

বলাই একটা নিশ্বাস ফেলিল; কহিল,—না, মন্দ ছিলুম না। কাজকর্ম্ম করতুম…খেতুম, দেতুম…

বিন্দু হাসিল; কহিল—এমন ভাবনায় সব ছিলুম!… শুনেচি, পাথর ভাঙ্গায়, ঘানি ঘুরুতে দেয়…

বলাই কহিল—সে সব করতে হয়নি। আমি বেতের জিনিস, সতরঞ্চি…এই সব তৈরী করতুম।

বিন্দু কহিল—বসবে? ঐ সিঁড়িটায় বসি, চলো…

বলাই বসিল। বিন্দু দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। মন্দিরের পিছনে ঝাঁকড়া অশথ গাছের ডালে বাদুড়ের পাখা ঝাড়ার শব্দ! বলাই কহিল,— তুমি বসবে না, বিন্দু?

বিন্দু হাসিল, কহিল,—এই যে বলাই-দা, তোমার বেশ পরিবর্ত্তন হয়েচে, দেখচি। আমায় 'তুমি' বলতে সুরু করেচো! পোড়ারমুখী বিন্দী এবার শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী হবেন বোধ হয়, না?

বলাই অপ্রতিভ ভাবে কহিল,—তা নয়…

—তবে?

বলাই বিন্দুকে বেশ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিল— কি শুষ্ক মূর্ত্তি…রুক্ষ চুল পিঠ বহিয়া ঝুলিতেছে—বলাইয়ের বুকটা হু-হু করিয়া উঠিল! বলাই ডাকিল,—বিন্দু…

বিন্দু কহিল,—কেন বলাই-দা?…

কামিনী গাছের একটা ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া তার পাতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বিন্দু উৎসুক দৃষ্টিতে বলাইয়ের পানে চাহিল।

বলাই কহিল,—এ কি হলো ভাই বিন্দু?…

—কিসের কি, বলাই-দা? বিন্দুর স্বরে একরাশ বিস্ময়!

বলাই অবাক! বিন্দু এ বলে কি! কোনো মতে জোর করিয়া কণ্ঠে স্বর জাগাইয়া বলাই কহিল,—এই যে কাণ্ড হয়ে গেল! আমি এখানে ছিলুম না, এর মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে…আর আসবা মাত্র শুনলুম…

কথার শেষাংশ তার মুখ দিয়া বাহির হইল না। এত বড় নির্ম্মম কথা…ভাবিতে বলাই কাঁপিয়া ওঠে!

বিন্দু মৃদু হাসিল, কহিল,—পিশিমা কাঁদচে সারাদিন… জ্যাঠাইমা কাঁদছিল…পাড়ার যে আসে, সেই আমায় ধরে কাঁদতে বসে। কেন এ কান্না, তা তো বুঝি না।… বিয়ে হয়েছিল; বিধবাও হয়েচি না কি!…আমার তো মনে ভাই, না সুখ, না দুঃখ! যখন বিয়ে হয়, তখনো খুশী হইনি, আর এখন অসুখী হবার কি-বা ঘটলো, তাও বুঝ্‌চি না।…

বলাইয়ের চোখ ছল্‌ছল্ করিতেছিল। বিন্দুর পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলাই কহিল,—একাদশী করতে হবে, মাছ খেতে পাবে না…

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—একাদশী মানে তো উপোস! মনে নেই বলাইদা, তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করে একদিন সেই ময়রাদের তক্তাপোষের তলায় সেঁধিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম… অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গে…তোমরা চারিধারে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ…সেদিন যে জলটুকু অবধি মুখে দিই নি! উপোস আমার গা-সওয়া! আর মাছ? মাছ আমি বড় ভালোবাসি কি না…

বিন্দুর কথা যত শুনিতেছিল, বলাই ততই অবাক হইয়া উঠিতেছিল। সে চোখে দেখিয়াছে, মেয়ে-মানুষের স্বামী মরিয়া গেলে কি আর্ত্ত চীৎকারেই না সে দুনিয়াকে কাঁপাইয়া তোলে…মলিন মুখে এক ধারে পড়িয়া থাকে…ডাকিলে জবাব দেয় না! আর বিন্দু?

বিন্দু কহিল,—তোমার জন্তে এমন কষ্ট হতো ভাই বলাই-দা। তুমি চুরি করো নি, অথচ…

বলাই কহিল,—চুরি না করলে কি জেল হয়?

বিন্দু কহিল,—তুমি বলতে চাও যে তুমি চোর?

বলাই কহিল,—আমার বলা না বলায় তো কিছু এসে

যাবে না, বিন্দু। পুলিস বললে, আমি চোর ; হাকিম বললে, আমি চোর ;…সে জন্ত জেল অবধি হয়ে গেল…

বিন্দু কহিল,—সত্যি, কি হয়েছিল, বলাই-দা ?

বলাই কহিল,—থাক্ সে কথা ! যা হবার, তা হয়েচে… কিন্তু এ কি হলো, ভেবে যে আমি অস্থির হচ্ছি।…

বিন্দু বলাইয়ের পানে চাহিল।

বলাই কহিল,—আমি আসতে আমার দুই পূজনীয় দাদা মার কাছে নোটিশ দেছে,—যে আমি জেল-ফেরত দাগী… আমার সঙ্গে এক-বাড়ীতে থাকলে, কলেজে তাদের ভারী দুর্নাম হবে। মুখ দেখানো দায় তো হবেই ! তা ছাড়া তাদের সমস্ত ভবিষ্যৎও না কি মাটী হয়ে যাবে।

বিন্দু কহিল,—জ্যাঠাইমা কি বললে ?

বলাই কহিল,—মা মা'র যোগ্য কথাই বলেচে। কিন্তু আমার মহা-ভাবনা হয়েচে, বিন্দু…আমি তো একটা হত-ভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে…তার উপর দাগী চোর। সত্যি, আমার জন্ত আমার দাদাদের উন্নতির পথ বন্ধ হবে ? তাই আমি ভাবছিলুম…

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া বিন্দু কহিল,—কি ভাবছিলে ?

বলাই কহিল,—বলতে পারি। কিন্তু এই মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করো, কারো কাছে সে কথা প্রকাশ করে বলবে না…

বিন্দুর ভয় হইল। বিন্দু কহিল,—না ভাই, অত বড় দিব্বি নয়—তবে আমি বলবো না…

বলাই কহিল,—জেলে বসে অনেক কথাই ভাবতুম। জেলের সে পাঁচিল দেখে মনে হতো, ঐ গণ্ডীটুকুর বাইরে পা দেবার এক্তার নেই, কিন্তু আকাশে যত-খুশী মনকে ছেড়ে দিতুম…ভাবতুম, জেলের পাঁচিলের বাইরে এবার যেতে পারলে এই মস্ত দুনিয়ায় একবার বেরিয়ে পড়বো। ছোটখাট গণ্ডীর বাইরে গিয়ে দেখতে চাই, মানুষের ছোট মনের ছোট দ্বেষহিংসা পার হতে পারি কি না…

বিন্দু কহিল—সত্যি, মার পেটের ভাই…তাদের মুখে এই কথা !

বলাই কহিল—তার জন্ত আমার কোনো দুঃখ নেই, বিন্দু। তবে মা…মার মন কেমন করবে, কষ্ট হবে…তাই। কিন্তু জেলের চেয়ে তো ভালো !…মা জানবে, আমি জেলে নেই, আরামে আছি…

একটা নিশ্বাস চাপিয়া বিন্দু কহিল—কোথায় যাবে ?

বলাই কহিল—তা ঠিক জানি না। তবে আরব্য উপন্যাস পড়েচো তো বিন্দু ? সেই সিন্ধবাদ নাবিক, মনে পড়ে ? দুনিয়ার কোথায় না সে গিয়েছিল ! ঘরের খুঁটি ধরে বসে থাকার জন্ত এ জীবনের সৃষ্টি হয়নি। একবার স্বাধীন বেপরোয়া হয়ে সব বাঁধন কেটে আমি বেরিয়ে পড়তে চাই…

বিন্দু কহিল—জ্যাঠাইমার কষ্ট হবে ?…

বলাই কহিল—মাকে বুঝিয়ে বলবো, বাড়ীতে দাদারা যদি অসুবিধা বোধ করে…কেন ত্যক্ত করি ? তা ছাড়া বড়দার না কি খুব ভালো এক বিয়ের সম্বন্ধ এসেচে…ওদের কলেজের প্রোফেসারের মেয়ে…তারা বেশ বড়লোক। আমার জন্ত কি সে-সম্বন্ধ নষ্ট হবে…?

বিন্দু কোনো কথা কহিল না। বলাই নিজের মনে অনেক কথা বকিয়া চলিল। ছোটখাট যে সব কথা আগে অতি তুচ্ছ মনে হইত, আজ সেগুলো ঘনাইয়া বেশ অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে !…

হঠাৎ কাঁশরের শব্দ শুনা গেল। বলাই কহিল—চলো বিন্দু, রাত হয়ে গেছে…দেখ্‌চি !

—চলো।

দুজনে উঠিয়া মাঠ ভাঙিয়া গৃহের পানে ফিরিল।

মোড়ের তেঁতুল গাছটার কাছে পৌছিয়া বিন্দু বলিল—বাড়ীতে যেতে ইচ্ছে করচে না। পিশিমার সেই কান্না ! থামতে বললুম তা আমায় গাল দিয়ে উঠলো।

বলাই কহিল—আমাদের বাড়ী যাবে ?

বিন্দু কহিল—গেলে হয়। কিন্তু…পিশিমাকে আগে একবার দেখে আসি। তার পর নয় যাবো…

—বেশ, এসো। বলাইকে বিদায় দিয়া বিন্দু চলিয়া গেল।

বলাই বাড়ীর দিকে আসিতে পথে দেখে, সেই শম্ভু। বলাই অবাক হইল…এ-ব্যক্তি আবার কোথা হইতে আসিয়া উদয় হইল !

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

দূরদর্শিতা

যাহারা এক হাত দূরের জিনিষ দেখিয়া চলাফিরা করে, তাহাদিগকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বলা যায় না। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও যাঁহারা আপাততঃ শান্তিপ্রদ ব্যবস্থা করিয়া মনে ভাবেন, ব্যাপারের চিরতরে মীমাংসা হইয়া গেল, তাঁহারা অন্য যাহা কিছু হইতে পারেন, কিন্তু পৃথিবীর লোক তাঁহাদিগকে দূরদর্শী বিচক্ষণ রাজনৈতিক বলিয়া স্বীকার করিবে না।

দার্শনিক কোমতের একটা কথা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উদ্ধৃত হয়,—

The only association among nations, as among individuals, which can be expected to be permanent, is free, voluntary association.

বস্তুতঃ জাতির সহিত অন্য জাতির প্রকৃত মনোমিলন ও বন্ধুত্ব হইতে পারে তখনই, যখন তাহাদের মধ্যে মিলামিশা স্বাধীনভাবে এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক হইয়া থাকে। কিন্তু লর্ড রদারমিয়ারের মত— 'India is our all in all' অর্থাৎ 'ভারত আমাদের কামধেনু' ধারণা যত দিন থাকিবে, তত দিন সহযোগ ও সহানুভূতির আশা করা বৃথা। সার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাসব্যাণ্ড বিলাতের 'স্পেক্‌টেটর' পত্রে বলিয়াছেন—

India's real desire is to raise her izzat in the world...........India will only remain within the Empire at her own desire.

সম্প্রতি "টাইমস্" পত্রে তিনি এই ভাবেরই কথা বলিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞ বিচক্ষণ সৈনিক পুরুষ—বহু দিন ভারত-সীমান্তে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণে যুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে এ ভাবের কথায় বহু অদূরদর্শী সাম্রাজ্যবাদীর কিন্তু গাত্রদাহ হইয়াছে। হইবারই কথা, কেন না, সিডেনহ্যাম, ওডয়ার, লর্ড লয়েড, বার্কেণহেড অথবা লর্ড রদারমিয়ার, লর্ড বার্ণহামের দলই ত বেশী। মিঃ চার্চ্চহিল কিছুদিন পূর্ব্বে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "গোল টেবলে ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কথা স্থির হইয়া যাইবে, এ কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। আমাদের জীবিতকালের মধ্যে এ আশা সফল হইবার নহে। অতএব মোলায়েম কথায় ভারতবাসীকে বৃথা আশায় প্রলুব্ধ করায় সার্থকতা কি ?"

চার্চ্চহিল বা রদারমিয়ার হয় ত মনে ভাবেন, তাঁহারা মস্ত রাজনৈতিক; কিন্তু তাঁহারা এক হাত দূরের জিনিষ দেখিয়া সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ কিরূপ বিপৎসঙ্কুল করিয়া রাখিতেছেন, তাহা তাঁহারা এখন না, ও তাঁহাদের ভবিষ্য বংশীয়রা বুঝিবে—হয় ত তাঁহারাও বুঝিয়া যাইবেন। মার্কিণ মুল্লুকের নিউইয়র্ক 'নেশান' পত্র সে দিন লিখিয়াছেন,—

"The combined effect of British ignorance and seven hundred million pounds sterling of British investments in India is inevitably conservative."

ইংরাজরা ভারতের বিষয়ে অনভিজ্ঞ ; পরন্তু তাহারা ভারতে প্রায় ৯ শত কোটি টাকা কারকারবারে ফেলিয়াছে। এই জন্য ইংরাজ ভারতের বিষয়ে এত রক্ষণশীল। বস্তুতঃ ভারতের বিষয়ে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর দূরদর্শী রাজনীতিক হইবার উপায় নাই—কেন নাই, তাহা লর্ড রদারমিয়রই এক কথায় বলিয়া দিয়াছেন,—"ভারত আমাদের সর্ব্বস্ব।"

সর্ব্বস্ব ! এ বিষয়ে যে জগতের অন্যান্য জাতিরও সন্দেহ নাই, তাহা মার্কিণ দেশের "Fleets' Review" নামক মার্কিণ ব্যবসায়-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্র সে দিন লিখিয়াছেন,—

"India, to put it plainly, is England's bread and butter." লেখক কথাটা ব্যাখ্যা করিয়াও দিয়াছেন,—ইংলণ্ডের প্রয়োজন হইলে সে ভারত হইতে তাহার গম, তুলা ইত্যাদি কাঁচা মাল লইয়া আসে, আর তাহার কলের মাল কাটাইবার জন্য ভারত রহিয়াছে। কাঁচা মাল তুলা ভারত হইতে আনিয়া সে নিজের কারখানায় কাপড় তৈয়ার করে আর ভারতে চালান দেয়। যে সকল জিনিষ পাইলে সৌন্দর্য্য ও আনন্দ বৃদ্ধি পায়, সে সকল জিনিষ ভারত হইতে গিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়।

বিদেশীর এই স্পষ্ট কথায় কিন্তু অধিকাংশ ইংরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষক মিঃ টমসন মার্কিণ পত্রের এই কথায় তিড়বিড় করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তিনি তাই ইহার প্রতিবাদে বিলাতের কাগজে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছেন। কিন্তু তিনি এক হাত দূরের জিনিষ দেখিবার মানুষ—সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বুঝিবার মত দূরদৃষ্টি তাঁহার নাই। নতুবা মার্কিণ কাগজের কথায় ধৈর্য্যহারা হইতেন না। তাঁহার নিজের দেশের চার্চ্চহিল, রদারমিয়র থাকিতে ভাবনা কি ? লর্ড ব্রেণ্টফোর্ডের উক্তিটাই তিনি স্মরণ করুন না,—

"Few people realise the enormous importance to this country of the Indian market and of our control of India." ইহা হইতে স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে ?

সভ্যতার নিদর্শন

লণ্ডনের 'নাইট ক্লাবসের' কথা অনেকে শুনিয়াছেন। এই সকল বীভৎস রুচিবিরুদ্ধ অশ্লীলতার পোষক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে

লণ্ডন পুলিসকে বাধ্য হইয়া অভিযান করিতে হইয়াছে। অথচ এই সকল প্রতিষ্ঠান প্রতীচ্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি লণ্ডনের নরনারীর দ্বারাই পরিচালিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে! মার্কিণের যুক্তরাজ্যও এ বিষয়ে বৃটেনের পশ্চাৎপদ নহে। সেখানে নিউইয়র্ক সহরের পুলিস ৯টি অর্দ্ধ-উলঙ্গ থিয়েটারের নর্ত্তকীকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে ১ শত পাউণ্ড জামীন লওয়া হইয়াছে। আরল ক্যারল নামক দৃশ্যনাট্যের রচয়িতাকেও গ্রেপ্তার করিবার কথা ছিল, তাঁহার এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই উলঙ্গ অভিনয় চলিতেছিল; কিন্তু তিনি সে সময়ে সহরে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন।

গ্রন্থখানির অভিনয়ের একটু পরিচয় দিই। যে দৃশ্যের অভিনয় লইয়া অভিযোগের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, সেই দৃশ্যে অভিনেত্রী নর্ত্তকীরা মোমের পুতুলের সাজে সজ্জিত হইয়া নৃত্যগীত করে। এক জন পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় রঙ্গমঞ্চে নাচিয়া চলিয়া যায়, তাহার হাতে থাকে একটি উটপক্ষীর পালক—জগতের অন্য কোন অঙ্গাবরণের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকে না।

৩ বৎসর পূর্ব্বে এই দৃশ্যনাট্যের রচয়িতা আরল ক্যারল একবার অশ্লীলতার প্রশ্রয় দানের অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। কতকগুলি দর্শকের সমক্ষে এক দল নগ্ন নর্ত্তকী সরাপের চৌবাচ্ছায় স্নান করিয়াছিল এবং তিনি ঐ বীভৎস কাণ্ডে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, ইহাই অভিযোগ। দুঃখের কথা, এই ধরণের সভ্যতা এ দেশে আমদানী করিবারও চেষ্টা হয়!

অশ্রু-অর্ঘ

পরলোকে রায় বাহাদুর চুণিলাল বসু

সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাসায়নিক, সাহিত্যিক রায় বাহাদুর চুণিলাল বসু ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে যেমন তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল, অধ্যাত্ম জীবনের প্রতিও তেমনই তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। ধর্ম্মজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের ফলে তিনি প্রথম জীবনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সংস্রবে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি যথার্থ বৈষ্ণবোচিত গুণে পরিপূর্ণ ছিল। মানুষের প্রতি করুণা, জীবনের প্রতি মমত্ববোধ তাঁহার মধুর প্রকৃতিকে কোমলতর করিয়াছিল। দানের বিশিষ্ট ভক্ত বলিয়া চুণিলাল প্রকাশ্যে ও গোপনে অজস্র দান করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁহারাই শুধু মাঝে মাঝে চুণিলালের দানের কিছু কিছু পরিচয় পাইতেন। ধর্ম্মবিষয়ে রক্ষণশীল হইলেও ডাক্তার চুণিলাল সামাজিক অনেক বিষয়ে উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তবে ভাঙ্গা অপেক্ষা গঠনের দিকেই তাঁহার সমধিক দৃষ্টি ছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা ও রচনায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধ ও গ্রন্থরচনা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। বিজ্ঞানের সহায়তায় দেশবাসীর স্বাস্থ্যের যাহাতে উন্নতি ঘটে, ভেজাল বিষে দেশের নরনারী ধ্বংসের পথে চলিয়াছে দেখিয়া, যাহাতে সেই বিষক্রিয়ার অগ্রগতির প্রতিরোধ করা যায়, তাহার ব্যবস্থাকল্পে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। দেশের ছাত্র-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রীতি ছিল। তাহাদের কল্যাণসাধনের জন্য তিনি ভেষজ-সংক্রান্ত অনেক রচনা মুদ্রিত করিয়া-

চুণিলাল বসু

বিপ্লব-বিভীষিকা

গত ১২ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভারত সরকার শিমলা শৈল হইতে ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, "আইন অমান্য আন্দোলন পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। কোন কোন স্থানে আন্দোলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার অন্যান্য স্থানে আন্দোলনের আগ্রহ কমিয়া আসিতেছে। কয়েকটি সহরে স্কুল-কালেজ খুলিয়াছে বলিয়া ছাত্ররা উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই জন্য আন্দোলন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের প্রধান কার্য্য হইতেছে—সরকারী স্কুল-কালেজে ছাত্রগণকে যোগদান করিতে বাধা প্রদান করা। এ জন্য তাহারা প্রায় সর্ব্বত্র পিকেটিং করিতেছে।

"বাঙ্গালাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে; কিন্তু হিংসার দিকে আন্দোলন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে, যাহাতে মনে হয়, বিপ্লববাদী এনার্কিষ্টরা শীঘ্রই আবার মাথা নাড়া দিবে।"

সরকারী মন্তব্যের কথাগুলি সত্য-মিথ্যা-বিজড়িত। কোন স্থানে আইন অমান্য আন্দোলন কমিয়া যাইতেছে বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেন না, লোক যাহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছে, তাহা ত আর অবিশ্বাস করিতে পারে না। নিত্য ধর-পাকড়, নিত্য খানাতল্লাসী, নিত্য গুপ্ত বিচার ও দণ্ড, নিত্য পুলিসের হানা, লাঠি ও বেটন,—এ সব ত আর ম্যাকবেথের দৃষ্ট ছোরার ন্যায় অথবা ম্যাক্বোর ভূতের মত উড়াইয়া দিবার নহে। যতই কংগ্রেস আফিসে খানাতল্লাস ও ধর-পাকড়, জেল হইতেছে, ততই ত দেখা যাইতেছে, কংগ্রেস-কর্ত্তা নিত্য নূতন তৈয়ার হইতেছে আর নিত্য নূতন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া যোগদান করিতেছে।

বিপ্লবী এনার্কিষ্টদের সম্বন্ধে সরকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া মনে করা বিচিত্র নহে। দেশের লোক সরকারকে বার বার সতর্ক করিয়া দিয়াছিল যে, বে-পরোয়া ধর্ষণনীতি চালাইলে এমন হইবার খুবই সম্ভাবনা। কেন না, মনের অসন্তোষ অভিব্যক্তির উপায় না পাইয়া মনের মধ্যেই গুমরিয়া উঠে, তাহা হইলে উহা গুপ্ত পথ দিয়া ছুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিবেই। সরকার যখন স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন যে, এনার্কিষ্টদের দেখা দিবার সম্ভাবনা, তখন ত আর কথাই নাই। তাই বলিতে হয়, সরকার জানিয়া শুনিয়া অন্ধের মত তাঁহাদের হিতকারী বন্ধুকেই জেলে দিয়াছেন। মহাত্মা গন্ধী বিপ্লববাদীদের মতবাদের পরম শত্রু—তিনি এত দিন এ দেশবাসীকে অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শান্ত সংযত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সরকার মহাত্মাকে চিনিতে পারেন নাই, তাহাতেই এই অশান্তি ও অত্যাচার!

স্বাবলম্বন

মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে পার্লামেন্টে শ্রমিক দলের অন্যতম প্রতিনিধি। ভারতের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি যথেষ্ট, উহা আন্তরিক বলিয়াই মনে হয়। শ্রমিক দলের দুইটি শাখা আছে, একটিকে বলে Right wing আর একটি Left wing, যাঁহারা এখন শাসনপাটে বসিয়াছেন, তাঁহারা সংখ্যায় অধিক এবং প্রথমোক্ত শাখার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শাখা সংখ্যায় অল্প। তাঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ ভারতের জন্মগত অধিকার এখনই দিবার পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁহাদের কথা টিকে না, তাঁহাদিগকে বিলাতের লোক Political cranks অথবা পাগ্‌লা রাজনীতিক আখ্যা দিয়া থাকেন। মিঃ ব্রকওয়ে এই শাখার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তিনি যে কয় দিন পূর্ব্বে কমন্সসভায় ভারতের আলোচনার জন্য ভারত-সচিব মিঃ বেনকে বিশেষ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তাঁহার সেই চেষ্টার কি ফল হইয়াছিল, তাহা অনেকেই শুনিয়াছেন। ভারতের কথা আলোচনার জন্য পীড়াপীড়ি, অথচ তখন ভারতসচিব সে আলোচনায় সম্মত নহেন, কাযেই তাঁহার কথা গ্রাহ্য হয় নাই, পরন্তু তাঁহাকে স্পীকারের আদেশ অমান্য করিয়া পার্লামেন্টের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করার অপরাধে পাঁচ দিনের জন্য সাসপেণ্ড হইতে হইয়াছিল। তাঁহার মত মিঃ বেকেট নামক আর এক জন সংখ্যার শ্রমিক দলের প্রতিনিধিকে পার্লামেন্টে রাজদণ্ডের নিদর্শন Mace বা গদা স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টার দরুণ সস্পেণ্ড হইতে হইয়াছিল।

এই শ্রেণীর শ্রমিক প্রতিনিধি ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। সাইমন রিপোর্টখানাকে গোলটেবলে স্থান দিবার চেষ্টা হইয়াছিল; স্বয়ং সার জন সাইমনকেও গোলটেবলে বসাইবার জন্য খুবই তদ্বির হইয়াছিল। অথচ এই সাইমন

রিপোর্টের বিরুদ্ধে ভারতবাসীরা কিরূপ তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাহা বিলাতী বা এদেশী কর্ত্তারা যে জানেন না বা শুনেন নাই, এমনও নহে। এ বিষয়ে মিঃ ব্রকওয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহার কথা এই :—

"সাইমন কমিশনের রিপোর্টে ভারতবাসীরা আশাহত হইবে না, কারণ, তাহারা সাইমন কমিশনের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু ভারতবাসীদের পক্ষে সাইমন কমিশনের সার্থকতা কোন্‌খানে, তাহা বুঝা উচিত। কমিশনে ৭ জন ইংরাজ সদস্য ছিলেন, তাঁহারা বিলাতের তিনটি রাজনীতিক দল হইতেই নির্ব্বাচিত। কেবল শ্রমিক দলের Left wing হইতে কোনও সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। কমিশনের কার্য্যের যতই নিন্দা করা হউক, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সদস্যরা তাঁহাদের বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবেই বুঝা উচিত যে, যদি বৃটিশ রাজনীতিক ও দলের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সম্বন্ধে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, তাহা হইলে বৃটেনের নিকট ভারতের মুক্তি পাইবার কোন আশা নাই। মুক্তির জন্য তাহাদিগকে আপনার চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে হইবে।" কথাটা ভারতের সর্ব্বত্র স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করার যোগ্য নহে কি?

বর্ত্তমান আন্দোলন ও খৃষ্টান জগৎ

আগ্রার কয়টি খৃষ্টান কলেজের বৃটিশজাতীয় পাদরী অধ্যক্ষ ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা দেখিয়া সরকারকে ও জাতীয় দলকে শান্তিসংস্থাপনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের আবেদন সংবাদপত্রের মারফতে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার পর ভারতের কয়টি উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত বৃটিশ পাদরী বিলাতের ও এ দেশের বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী পূরণ করিয়া ভারতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করেন। এ দেশের ও বিলাতের কয়খানি বৃটিশ-চালিত কাগজ এ জন্য পাদরীদিগকে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের কশাঘাতের পর উপদেশ দিয়াছিলেন, পাদরীরা নিজের চরকায় তৈল প্রদান করিলেই পারে, এ সকল রাজনীতিক ব্যাপারের মধ্যে আসিতে চাহে কেন!

কিন্তু মুখ চাপা দিয়া রাখিবে কাহার? 'ক্যাথলিক হেরাল্ড' খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অন্যতম শক্তিশালী পত্র। এই পত্র সে দিন লিখিয়াছেন,—"ভাল বিদেশী শাসন অপেক্ষা মন্দ দেশীয় শাসন শ্রেয়ঃ। দেশীয়রা যদি শাসনে দোষ করে, তবে সে দায়িত্বের ফলভোগ তাহারাই করিবে।" ভারতের দেশীয় খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের একটি সমিতি আছে। এই সমিতি সম্প্রতি ভারতের বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন,—"মহাত্মা গন্ধীর প্রবর্ত্তিত আন্দোলন এখন কংগ্রেস-দলীয় লোক ব্যতীত দেশের সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে বিসর্পিত হইয়াছে। যাহারা অন্য দলের বা কোন দলেরও নহে, তাহারাও ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। এ আন্দোলনকে এখন আর কংগ্রেসের আন্দোলন বলা যায় না। ইহা এখন নিখিল ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। আমাদের মতে অর্ডিনান্স ও অসাধারণ আইন জারী করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, বরং উহার ফলে অবস্থা আরও সঙ্কটসঙ্কুল ও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টান সভ্যতার উচ্চাদর্শের মাপকাঠিতে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত, যদি কোন সরকার তাহা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। সরকার যত শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবেন, নিন্দার পরিমাণও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলও হয় বিরূপ। ভারতের জাতীয় আন্দোলন ইহার ফলে শক্তিশালী হইয়াছে ও বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ এখন বৃটিশ সংস্রবের প্রতি এমন এক নির্দ্দিষ্ট ও দৃঢ় ভাব ধারণ করিয়াছে—যাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোনরূপে ভারতবর্ষ সেই ভাব হইতে পশ্চাৎপদ হইবে না। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, গত ৩ মাসে ভারতের লোক প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছে যে, অচিরে বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ভারতবর্ষকে বৃটিশ উপনিবেশের মত স্থান করিয়া দিতেই হইবে। কষ্ট-বিপদ সহিয়া—বহু ত্যাগস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষ ইহা বুঝাইয়া দিয়াছে।"

যথার্থ যাঁহারা খৃষ্টের ভক্ত, তাঁহারা খৃষ্টান শক্তিগণের পরের উপর প্রভুত্ব-প্রয়াস অথবা পরধনলিপ্সা কখনও সমর্থন করিতে পারেন না।

সরকারী রিপোর্ট ও জনসাধারণের অভিমত

এ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে একটা রিপোর্ট ভারত সরকার বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের সকাশে পেশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কয়েকটি রিপোর্টে প্রায়ই বলা হইতেছে যে, অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। ইহার উপর ১২শে জুলাই তারিখে এইরূপ সংবাদ বিলাতে প্রেরিত হইয়াছে,—"আইন [illegible] আন্দোলনের ফলে

দেশে এই আন্দোলন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়েও বে-আইনী কাষ করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইতেছে। বাঙ্গালার অনেক গ্রামে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, অধমর্ণরা উত্তমর্ণদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। দ্বাদশ জন মানুষ নিহত হইয়াছে এবং বিস্তর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে।"

কি চমৎকার যোগাযোগ! ব্যাপারটি যে কিশোরগঞ্জের, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেখানে উত্তেজিত মুসলমান গুণ্ডারা কিরূপে জমীদার ও মহাজন কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে এবং তাঁহার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল, তাহার কথা সকলেই শুনিয়াছেন। এই লুণ্ঠন ও নরহত্যার সহিত আইন অমান্য আন্দোলনের সম্পর্ক কি, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? ইংরাজীতে কথায় বলে, কুকুরকে বদনাম দিয়া তাহার পর ফাঁসীতে ঝুলাইয়া দেওয়া। ইহাও কতকটা সেইরূপ নহে কি? স্বয়ং ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘোষণায় আছে;—"ঢাকা ও ভাওয়াল হইতে মোল্লা-মৌলভী আসিয়া কিশোরগঞ্জের অজ্ঞ মুসলমানগণকে মহাজনদিগের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়াছিল, বলিয়াছিল, তাহাদের খৎ-পত্র দলীল-আদি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেও সরকারের পুলিস কিছু বলিবে না।" ইহার পূর্ব্বে ঢাকায় ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছিল। সেখানেও ঢাকা, ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দুর উপর কি নির্য্যাতন করিয়াছিল, তাহা এখন সকলে জানিতে পারিয়াছেন। সেই সকল গুণ্ডা যে অন্যত্রও হিন্দুদের বিপক্ষে তাহাদের স্বধর্ম্মীদিগকে উত্তেজিত করিয়া হাঙ্গামা বাধাইয়া লুঠতরাজের সুবিধা পাইবে, ইহা স্বাভাবিক। ঢাকাতেও যে ভাবে অবাধে লুণ্ঠন-কার্য্য চলিয়াছিল এবং অন্য পক্ষের আত্মরক্ষার চেষ্টায় বাধা পড়িয়াছিল, তাহাতে লোকের মনে সন্দেহ হওয়া বিচিত্র ছিল না যে, মুসলমান গুণ্ডারা যথেচ্ছাচার করিলেও দণ্ডিত হইবে না।

নিরক্ষর গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকের যদি এই ধারণা থাকে এবং তাহার উপর যদি বাহিরের মোল্লা-মৌলভী আসিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করে, তাহা হইলে তাহারা কি করে? কেবল নিছক আইন অমান্য আন্দোলনের ঘাড়ে দোষ চাপাইলে চলিবে কেন? আইন ভঙ্গের প্রবৃত্তি এই আন্দোলনের জন্য হয় নাই; হইয়াছে 'সরকার কিছু বলিবেন না', এই স্তোকবাক্যের ফলে। নিরক্ষর গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক যদি আশ্বাস পায় যে, সে অপরাধ করিলেও পুলিস তাহাকে কিছু বলিবে না, তাহা হইলে সে কি করে?

এই গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকরা প্রত্যহ দেখিতেছে যে, আইন অমান্য আন্দোলনকারীরা আইন ভঙ্গ করিয়া পুলিসের নিকট মার খাইতেছে [illegible] যাইতেছে। সুতরাং আইন ভঙ্গ করিলে দণ্ড হয়, এ কথা তাহারা জানে। তবে তাহাদের আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে আইনভঙ্গের প্রবৃত্তি জাগিবে কেন? বরং তাহারা যদি এরূপ আশ্বাস পায় যে, আইন ভঙ্গ আন্দোলনকারীদের অধিকাংশই হিন্দু, অতএব হিন্দুদিগকে মার-পিঠ করিলে বা তাহাদের সম্পত্তি লুঠ করিলে কোন শাস্তি হইবে না, তবেই তাহারা আইন ভঙ্গ করিতে সাহসী হয়। তাহার উপর মস্ত প্রলোভন—মহাজনের খৎ কাড়িয়া লইয়া পোড়াইয়া ফেলিতে পারিলে সকল যন্ত্রণার অবসান! যেন সোনায় সোহাগা! এ সুযোগ কি কেহ ছাড়িতে পারে?

তাহার পর আর একটা কথা। সরকারী রিপোর্ট বলিতেছে, আন্দোলন কমিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে নিত্য সংবাদপত্রে শত শত পিকেটিং, ধরপাকড়, খানাতল্লাসী ও দণ্ডের খবর প্রকাশিত হয় কেন? সংবাদপত্র খুলিলেই প্রথমতঃ দৃষ্টি পড়ে, এই সকল কাণ্ডের উপর। তাহা ছাড়া, সরকারই বা দিনের পর দিন অর্ডিনান্সের উপর অর্ডিনান্স জারী করিতেছেন কেন, এক অঞ্চলের পর অন্য অঞ্চলকে বে-আইনী আইনের বেড়াজালে ঘিরিতেছেন কেন?

অন্য পরে কা কথা, আমরা এ বিষয়ে এমন লোকের সাক্ষ্য উপস্থিত করিব, যাহার এ সম্বন্ধে মিথ্যা বলিবার কোন সার্থকতা নাই। বিকানীরের মহারাজার নাম সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার ন্যায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের ও জাতির বন্ধু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যখনই সুবিধা পান, তখনই বৃটিশ রাজের গুণগান করিয়া থাকেন। তিনিই সম্প্রতি এক সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছেন,—"দেশের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কট-সঙ্কুল হইয়াছে। দেশে বহুদূরবিসারী জাতীয় জাগরণের শক্তি ও পরিমাণ বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে। এ দিকে গ্রেটবৃটেনের দৃষ্টি নিপতিত হওয়া আশু কর্ত্তব্য। যদিও গ্রেটবৃটেন পরিণামে এই আন্দোলনকে পিষ্ট করিতে পারেন অথবা সাময়িকভাবে উহাকে আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেও বহুদিন পর্য্যন্ত ঘটনা শান্তিপূর্ণ থাকিবে না। বরং তৎপরিবর্ত্তে তিক্ততা ও ঘৃণার ভাব দেশবাসীর মধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে। রাজন্যগণের রাজ্যেও এই দমননীতি সফল হইতে পারে না। অথচ রাজন্যরা স্বেচ্ছাচারী, পরন্তু রাজন্য-রাজ্যের প্রজারা বৃটিশ প্রজার মত উন্নত নহে। তবে বৃটিশ ভারতে এই নীতি কিরূপে সফল হইবে?"

ইহাতে কি বুঝা যায় না, দেশের অবস্থা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে? বিকানীরের মহারাজার মত বৃটিশ রাজ্যের পরম বন্ধুর কেন এমন ধারণা হইল, তাহা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখিলে পারেন।

দেশের অবস্থা

শ্রমিক সরকারের বাণিজ্য-সচিব মিঃ উইলিয়াম গ্রেহাম কিছু দিন পূর্ব্বে কমন্সসভায় স্বীকার করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের বস্ত্রব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার কালে বলিয়াছেন যে, সুদূর প্রাচ্য ও চীনদেশের বর্ত্তমান অবস্থা ইহার মূলে আছে বটে, তবে ভারতের বর্জ্জন আন্দোলনও অনেকটা ক্ষতি করিয়াছে। ভাঙ্গি ত মচকাই না! সুদূর প্রাচ্য ও চীনের অবস্থা ত বহুদিন হইতেই সমভাবাপন্ন হইয়া আছে। তবে মাত্র ৩ মাসের মধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ারের এমন শোচনীয় অবস্থা ঘটিল কেন? এক রিপোর্টে জানা গিয়াছে, ল্যাঙ্কাশায়ার বরোর একা ব্ল্যাক্‌বার্ণ সহরেরই ১ শতটা কাপড়ের কল এই সময়ের মধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ন্যূনাধিক ৩০ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়াছে।

বাণিজ্য-সচিব মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী গ্রেহামই ইহার পূর্ব্বে বিলাতের নারীসমিতির সভার অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণে ভারতের অবস্থাটা বিলাতী-মহিলাগণকে বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে এমন সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি এই অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার দেশবাসীকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, বিশেষতঃ ভারতের নারীকর্ম্মীদিগের আত্মোৎসর্গের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বিলাতের মহিলাদিগকে তাঁহাদের দেশসেবার কার্য্যে উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বাণিজ্য-সচিবের পত্নীর মুখে এমন কথা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু তাঁহার মত দুই চারি জন বিলাতের নর-নারী ভারতের অবস্থার কথা বুঝিলেও জনসাধারণ এখনও সে বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। করিলে ভারতে ধর্ষণনীতি এমন অবিচ্ছিন্নভাবে এত দিন চলিত কি?

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। ভারতবর্ষে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বর্ত্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সে বিষয়ে সঠিক সংবাদ বিলাতের লোক সম্যক্ অবগত নহে। এমনও শুনা গিয়াছে যে, অনেক সংবাদ চাপিয়া যাওয়া হইতেছে এবং অনেক সংবাদ কাটিয়া ছাঁটিয়া বিলাতে পাঠান হইতেছে। অথচ দিন দিন এ দেশের হাওয়া আগুন হইয়া উঠিতেছে। এক পক্ষে আইন অমান্য আন্দোলন, অপর পক্ষে বেপরোয়া ধর্ষণ। সংঘর্ষের কি কারণে উদ্ভব হইয়াছে, সে কথা এখানে বলিব না। তবে অবস্থা যে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মাত্র তিন চারি মাসের মধ্যে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পরস্পরের মনের ভাব অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সরকার পক্ষ নানা ঘোষণায় বলিতেছেন, আইন ভঙ্গ করিলে কোন সরকারই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না, উহা যথাশক্তি দমন করিবেনই, তবে যতটুকু কম শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন, ততটুকুই করা হইতেছে। জাতীয় দল বলিতেছেন, আইনে যতটুকু বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা আছে, তাহা অপেক্ষা বহুল পরিমাণে এবং নির্দ্দয় নিষ্ঠুরভাবে বলপ্রয়োগ করা হইতেছে। এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় পরিষদে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলিয়া স্বীকৃত।

কোন্ পক্ষের কথা কতটা গ্রহণীয়, তাহাও এখানে নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন নাই। কথা এই যে, যখন উভয়পক্ষের মধ্যে মনের ভাব বিসদৃশ হইয়া দাঁড়ায়, তখন কি নূতন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে? যে পক্ষ নিরস্ত্র, দুর্ব্বল এবং পরাধীন, তাহার পক্ষে প্রবল, অস্ত্রে-শস্ত্রে বলীয়ান্, স্বাধীন শাসকজাতির মনের পরিবর্ত্তন ঘটাইবার একমাত্র উপায় আছে,—তাঁহাদের স্বার্থে আঘাত করিয়া তাঁহাদের অভাবের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই হেতুই ভারতবাসী বর্জ্জন আন্দোলন গ্রহণ করিয়াছে। মাত্র ৩ মাসের বর্জ্জন আন্দোলনের ফল কি হইয়াছে, তাহার একটু পরিচয় স্বয়ং বিলাতের বাণিজ্য-সচিবই প্রদান করিয়াছেন। আমরা ইহার উপর আরও কিছু দিতেছি।

সকলেই জানেন, কলিকাতা প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র হইলেও সেখানে ব্যবসা প্রধানতঃ য়ুরোপীয় বণিকের হস্তগত। কিন্তু বোম্বাইএ তাহার ঠিক বিপরীত, সেখানে দেশীয় ভাটিয়া, গুজরাটী, খোজা, বোহরা মেমন, কচ্ছী প্রভৃতি ব্যবসায়ীরাই ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে দেশীয়দের প্রায় দেড়শত Chamber of Commerce অথবা বণিক-সমিতি আছে। য়ুরোপীয় বণিকসমিতি ইহাদের মুখাপেক্ষী। বোম্বাইএ কয়েক দিন পূর্ব্বেই একটি গাড়োয়ালী দিবস অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিন তথায় ন্যূনাধিক ৬ শত ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক ও দর্শক আহত হয়। ফলে সেই দিন হইতে বোম্বাইএ হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্যবসায়ী সমিতিরা আপনাদের সমূহ বিপদ বুঝিয়াও একযোগে উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে সরকারের ও য়ুরোপীয় বণিকসমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর বোম্বাইএ একটি 'পিকেটিং সপ্তাহ' অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সপ্তাহে স্বেচ্ছাসেবকরা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের

নিকট বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করাইয়া লয়, পরন্তু ৮৬ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে। বণিকরা সমস্ত কাম-কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিয়া জাতীয় আন্দোলন সফল করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতি অনির্দ্দিষ্টকাল কারবার বন্ধ রাখিবেন বলিয়া মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, যত দিন সরকার জাতীয় দাবী পূর্ণ না করিবেন, তত দিন তাঁহারা এই হরতাল পূর্ণভাবে পালন করিবেন। এই বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতির সদস্য-সংখ্যা ৫ শত এবং ইহারা বৎসরে ২০ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিয়া থাকেন।

সুতরাং এ সব ব্যাপার উপেক্ষণীয় নহে। যদি যথার্থই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বোম্বাইএর এই একটিমাত্র ব্যবসায়ই বন্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহার ফল কি হইতে পারে, সরকার নিশ্চিতই ভাবিয়া দেখিয়াছেন। প্রকাশ, বোম্বাই বন্দরে জাহাজে ৯০ হাজার গাঁইট বিদেশী কাপড় আসিয়া জমায়েৎ হইয়া রহিয়াছে, মাল খালাস হইতেছে না। ইহার উপর যদি অন্যান্য ব্যবসায়ী সমিতিও কাম-কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া আন্দোলনে যোগদান করেন, তাহা হইলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে? পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, সাসুনদের কাপড়ের কলগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, উহাতে ১০ হাজার শ্রমিক বেকার বসিয়া আছে। আবার শুনা যাইতেছে, ১৫ই আগষ্ট হইতে আরও ১৭টা কল বন্ধ হইবে। ফলে বেকার মজুরের অসম্ভব সংখ্যা-বৃদ্ধি হইবে। তাহার পরিণাম কি?

বোম্বাইএর ব্যবসায়ী বণিকরা হরতাল করিয়া এবং বর্ত্তমান আন্দোলনে যোগ দিয়া গত ১ মাসে ১৫ কোটি টাকা ব্যবসায়ে লোকসান দিয়াছেন; জুলাই মাসের সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই; কিন্তু এ মাসে যে তাঁহারা আরও অধিক টাকা লোকসান দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিসের জন্য আজ বণিকজাতি এই ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন? বণিকরা সহজে টাকা লোকসান দিবার লোক নহেন। তাঁহাদের এই প্রবৃত্তি কি সরকারের ধর্ষণ-নীতির ফল নহে? বোম্বাইএর এক পুলিস কোর্টে এক জন গণ্যমান্য সেয়ার মার্কেটের দালালের বিচার হইতেছিল, তিনি পিকেট করিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি এ কাযে নামিলেন কেন?" তখন দালাল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "যেহেতু আমি পথ চলিতে চলিতে পুলিসের লাঠি খাইয়াছি।" এই ভাবে কত লোক যে কংগ্রেস মতের সমর্থন না করিয়াও ধর্ষণনীতির ফলে কংগ্রেসের মতানুবর্ত্তী হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

এই ধর্ষণ-নীতির ফলে বিদেশিবর্জ্জন কিরূপ জোর তেজে চলিয়াছে, তাহার পরিচয় সরকারী বিবরণ হইতেই দিতেছি। গত জুন মাসে পূর্ব্ব-বৎসরের জুন মাস অপেক্ষা ভারতের খাদ্য, পানীয় ও তামাকুর আমদানীর মূল্য ৩৮ লক্ষ টাকা কমিয়াছে, কাঁচা মালের কমিয়াছে ৪৬ লক্ষ এবং কারখানায় প্রস্তুত পণ্যের কমিয়াছে ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। অবশ্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিট-চিনি ছাড়া অন্য বিদেশী চিনির আমদানী পরিমাণে ৬ হাজার টন বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু মূল্যে প্রায় ১ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। বিট-চিনির আমদানী পূর্ব্ব [illegible] তুলনায় নগণ্য। গমের আমদানী নামিয়াছে ৩৬ লক্ষ হইতে ১৬ লক্ষ টাকায়। কাঁচা মালের মধ্যে কেরোসিনের আমদানী নামিয়াছে ৬৮ লক্ষ হইতে ৩৩ লক্ষ টাকায়। পেট্রোলের আমদানী কমিয়াছে ৮ লক্ষ টাকা। এ দিকে তুলার আমদানী বাড়িয়াছে পরিমাণে ২ হাজার টন এবং মূল্যে ২৭ লক্ষ টাকা। কলকারখানায় প্রস্তুত পণ্যের মধ্যে সূতা ও বস্ত্রের আমদানীর মূল্য কমিয়াছে ৯৪ লক্ষ টাকা। সূতা ও পাকানো সূতার আমদানী কমিয়াছে পরিমাণে ৭ লক্ষ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধসের), আর মূল্যে ১৮ লক্ষ টাকা। বস্ত্রের আমদানী পরিমাণে কমিয়াছে ১ কোটি ২০ লক্ষ গজ, আর মূল্যে ৭৭ লক্ষ টাকা। তাহার পর লৌহ ও ইস্পাতজাত পণ্য। ইহাতেও আমদানীর মূল্য কমিয়াছে ৩৫ লক্ষ টাকা। কলকব্জা ও মোটরগাড়ীর খাতেও আমদানীর মূল্য কমিয়াছে,—কলকব্জায় ২৬ লক্ষ টাকা, মোটরগাড়ীতে ১৯ লক্ষ টাকা, ছুরিকাঁচি ইত্যাদিতে ১০ লক্ষ টাকা এবং কাচ ও বেলোয়ারী জিনিষে ৯ লক্ষ টাকা।

বর্জ্জন আন্দোলনের প্রভাব এত ভীষণ হইয়াছিল যে, দিল্লীর বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমার্সের অর্থাৎ বণিক-সমিতির সম্পাদককে লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "মহাশয়, আমি আপনার ৯ই জুলাই তারিখের তার পাইয়াছি। ঐ তারে আপনি লিখিয়াছেন, 'তার পাইয়াছি। যাহা তারে লিখিয়াছেন, তাহাতে আমরা সম্মত নহি। ক্রেতারা অসহায় নহে (অর্থাৎ সরকারের শান্তিরক্ষকরা তাহাদিগকে সাহায্য করিবে)। অবস্থার প্রতীকার করা এখনও মনুষ্যের সাধ্যের অতীত নহে। যাহারা জাহাজে মাল পাঠাইয়াছে, তাহারা চুক্তি-মত কার্য্য করিবার জন্য আপনাদিগকে আইন অনুসারে বাধ্য করিবে।' আমি আপনার এই তারের মর্ম্ম বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতির কমিটীর নিকটে পেশ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আপনার এই যুক্তিহীন এবং সহানুভূতিবর্জ্জিত তার পাইয়া অত্যন্ত আশাহত হইয়াছেন। ক্রেতারা অসহায় নহে, এ সংবাদ আপনারা কোথায় পাইলেন? যে এ সংবাদ দিয়াছে, সে মিথ্যা বলিয়াছে। বৃটিশ ভারতের কুত্রাপি এক গজ বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় হইতেছে না। দিল্লীর হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ী সমিতির মত আমরা অর্ডার নামঞ্জুর করিবার মন্তব্য গ্রহণ করি নাই, বরং এ যাবৎ দৃঢ়ভাবে চুক্তি মান্য করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমানে যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কোন মানুষের পক্ষে চুক্তি অনুসারে কার্য্য করা সম্ভব নহে। কাপড় ত আমরা এক গজও বিক্রয় করিতে পারি না। পরন্তু ব্যাঙ্কের মারফতে অন্যত্র মাল চালান দিতেও পারিতেছি না, কেন না, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এমন পিকেটিং হইতেছে যে, মাল কোথাও দিয়া চালান দিবার উপায় নাই।"

অবস্থা কিরূপ ভীষণ হইয়াছে, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়। 'মর্ণিং পোষ্ট' পত্র ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতায় 'ডেলি মেল' ও 'টাইমসের' দোসর। এই পত্রই জুলাই মাসের শেষাশেষি বিলাতের ব্যবসায়ের অবস্থার কথায় বলিয়াছেন,—"ভারতে জুন মাসে বিলাতের রপ্তানী পণ্যের পরিমাণ শতকরা ৩০ কমিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, এখন যে সকল পণ্য জাহাজে বাহিত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বের অর্ডার অনুসারে পাঠান হইতেছে। ভারতের বর্জ্জন আন্দোলন তাহার পর আরম্ভ হইয়াছে। মাত্র এপ্রেল ও মে মাসেই বর্জ্জন আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ

করিয়াছে। সুতরাং সেপ্টেম্বর অক্টোবর না আসিলে বর্জ্জনের প্রভাবের পরিমাণ বুঝা যাইবে না। এখনই ল্যাঙ্কাশায়ারের বেকারের পরিমাণ দেখিয়া এবং সূতা কাটা ও কাপড় বোনার বিস্তর কল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বর্জ্জন আন্দোলনের কতক আভাস পাওয়া গিয়াছে। পরে কি হইবে, তাহা ভবিষ্যৎই বলিয়া দিবে।"

আমেদাবাদের কোন কলের এজেণ্টকে ল্যাঙ্কাশায়ারের এক খ্যাতনামা মিল এজেণ্ট বর্জ্জন আন্দোলন সম্পর্কে এক পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্রখানি ফ্রি প্রেসের মারফতে "বোম্বাই ক্রণিকল" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ :—

"তোমাদের বর্জ্জন আন্দোলন ম্যাঞ্চেষ্টারের কি ক্ষতি করিয়াছে, তোমরা জান কি? এই আন্দোলন ম্যাঞ্চেষ্টারকে দেউলিয়া হইবার পথে প্রেরণ করিতেছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের আজ তিন বৎসর যাবৎ দুঃসময় যাইতেছে, কোনরূপে সে বাঁচিয়া ছিল,— তোমাদের আন্দোলন ল্যাঙ্কাশায়ারের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা শেষ করিয়া দিয়াছে। যে কয়টা কল চলিতেছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কলই ব্যাঙ্কের হাতে বাঁধা পড়িয়াছে, কলগুলি সপ্তাহে সপ্তাহে ভাঙ্গাচোরা লোহার দরে বিক্রয় হইতেছে!

"যাহারা পুরাতন ব্যবহৃত জিনিষ খরিদ করে, তাহাদিগের কাছে মিলগুলি সত্য সত্যই মাটীর দরে বিকাইয়া যাইতেছে, একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত সপ্তাহে একটা কল বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কলটার ৩০ হাজার মাকু ও ১ হাজার ১ শত তাঁত ছিল; ইহা ছাড়া নিজস্ব জমী ও ইমারত ছিল। এত বড় একটা বিরাট ব্যাপার মায় কলকব্জা প্রায় ৩১ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে! ইহা কি মাটীর দর নহে?

"ব্যাপার শোচনীয়—হৃদয়-বিদারক। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই কল কখনও শতকরা ১০ টাকার কমে ডিভিডেণ্ট দেয় নাই। ইহার মূলধনই ছিল ২ লক্ষ ৩১ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা! ল্যাঙ্কাশায়ারে এমন শত শত দৃষ্টান্ত ঘটিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা কোটিপতি কলওয়ালা ছিলেন, তাঁহারা আজ সর্ব্বস্বান্ত। প্রতিদিনই প্রায় আত্মহত্যার কথা শুনা যাইতেছে!

"ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।"

কি ভীষণ অবস্থা ভাবুন দেখি! যাহা পত্রে বর্ণিত হইয়াছে, হয় ত তাহার সমস্তটা সত্য না হইলেও পারে, কিন্তু তথাপি যদি ইহার সামান্য অংশও সত্য হয়, তাহা হইলেও ত ভাবিবার কথা। এ অবস্থার আশু প্রতীকার না হইলে কেবল এ দেশের নহে, বিলাতেরও সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

কথা এই, সরকারের ধর্ষণ-নীতির ফলে লোকের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে কি না, তাহা সরকার বুঝিতে পারেন। বিস্তর ব্যবসায়ী সমিতি সরকারকে এ কথা নানারূপে জানাইয়াছেন। অবশ্য ধর্ষণ-নীতি চিরদিন অনুসৃত হইবে না, হইতে পারে না। সপক্ষ-জয়াকরের দৌত্যের ফলে হয় ত শীঘ্রই শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তখন কি আর ব্যবসায়ের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে?

বাঙ্গালার রাজনীতি

বাঙ্গালার রাজনীতি-ক্ষেত্রে অধুনা যে ভূতের নৃত্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালীকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হইয়াছে। একেই ত দেশবন্ধু দাশের অকালে লোকান্তরের পর হইতে নিখিল ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ আসন হারাইয়াছে, তাহার উপর কলিকাতা করপোরেশানে মেয়র ও অলডারম্যান নির্ব্বাচন উপলক্ষে যে দক্ষযজ্ঞের অভিনয় একাধিক দিন অভিনীত হইয়াছে, তাহার তুলনা বোধ হয় বাঙ্গালা ছাড়া আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

যে স্বেচ্ছাচার ও পরমত-অসহিষ্ণুতার জন্য আমরা ব্যুরোক্রেশীকে দায়ী করিয়া গালি পাড়ি, তাহাই অধুনা বাঙ্গালীর স্বরাজ্যরাজনীতির প্রধান অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। প্রায় লাহোর কংগ্রেসের সময় হইতে স্বরাজ্য-দলে দলপতিদের মধ্যে এই দোষ দেখা দিয়াছে, তাহারই ফলে বাঙ্গালা কংগ্রেসে দলাদলি। আর সেই হেতু স্বরাজ্য-দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। যদি কেহ দেশের ও জাতির মঙ্গলকামনায় ঘর সামলাইয়া একতা-প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ-উপরোধ করিয়াছে, তখনই তাহাকে কংগ্রেসের শত্রু বলিয়া গালি পাড়া হইয়াছে, পরন্তু 'তরুণ রাজনীতিক' বিজ্ঞের মত বুঝাইয়াছেন যে, গতানুগতিক শান্তি ও আরামের জীবন জীবনই নহে, উহা মৃত্যুরই লক্ষণ, বিবাদ-বিতণ্ডাই জীবন। কিন্তু এ জীবন যে পরাধীন পরমুখাপেক্ষী জাতির পক্ষে কাম্য নহে, তাহাদের মধ্যে একতাই যে ব্রহ্মাস্ত্র, এ কথা বুঝাইয়া বলিলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই!

পরমত-অসিষ্ণুতা এমন সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে যে, এখন আর কেহ কাহারও কথা শুনিতে সম্মত নহে, সকলেই নেতা, সকলেই কর্ত্তা। 'ব্যক্তিগত স্বাধীন মত' ব্যক্ত করাই এখন স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন ঘরে বাহিরে—সর্ব্বত্রই স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারের তাণ্ডবলীলা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যে দিন বাঙ্গালার সংবাদপত্রসেবীদের সভায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুর উপরে 'স্বাধীনতাকামী' তরুণ লেখকের আক্রমণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম, ইহার পরিণাম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে! অদৃষ্টের পরিহাসের মত সেই অস্ত্র আজ ফিরিয়া আসিয়া অস্ত্র-আবিষ্কারকারীদের অঙ্গেই নিপতিত হইয়াছে!

ইহাতে অবশ্য দুঃখ হইবার কথা, লজ্জা হইবার কথা! কেন না, কোন পক্ষেই এই স্বেচ্ছাচারিতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা এবং গুণ্ডামী কোন ভদ্রলোকই সমর্থন করিতে পারেন না। ডেপুটী মেয়রের প্রতি জুতা নিক্ষেপ, ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে অপমান ও প্রহার—এমন গুণ্ডামী আমাদের রাজনীতিক জীবনক্ষেত্রকে কলঙ্কিত করিতেছে। ইহার জন্য বাঙ্গালীকে এক দিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেই!

কিন্তু কেন এমন হয়? আজ দেশে জাতির জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত। এ সময়ে এই আত্ম-কলহ? ইহা কি নেতৃস্থানীয়দিগের অযোগ্যতা ও অকর্ম্মণ্যতারই পরিচায়ক নহে? এই প্রভুত্বকামনা এবং স্বার্থসাধনার উৎকট বীভৎসতার পরিণাম কোথায়? এই জঘন্য মানসিক বৃত্তির উৎস কোথায়, তাহা

আমাদের তথাকথিত নেতাদের ধীর-চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে কি? এই অনাচারকে, এই ধর্ম্মহীন নীতিহীন 'স্বাধীনতা' বা স্বেচ্ছাচারকে আর কতটা বাড়িবার স্থান দেওয়া হইবে? এখনও কি 'তিষ্ঠ' বলিবার সময় আসে নাই? আজ দেশের ভাগ্য-নির্ণয়ের কথায় সপ্ত জয়াকরের নাম উঠে, মহাত্মা গন্ধী এবং পণ্ডিত পিতাপুত্রের দিকে সকলে তাকাইয়া থাকে,—আর বাঙ্গালী তুমি ভাবিয়া দেখ, আজ তুমি কোথায়! এক দিন তুমিই ভারতকে ইঙ্গিতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়াছিলে, আজ তোমায় ত কেহ ডাকে না!

তিলক-স্মৃতি-রক্ষা ও নেতৃবর্গের কারাদণ্ড

লোকমান্য তিলকের স্মৃতি-বাসর উপলক্ষে গত ১লা আগষ্ট তারিখে বোম্বাইএর সত্যাগ্রহ কমিটী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ঐ দিন তাঁহারা বোম্বাই সহরের চৌপাট্টি পল্লী হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির করিয়া কয়েকটি পথ দিয়া গমন করিবেন এবং আজাদ ময়দানে সমবেত হইয়া লোকমান্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন। নিখিল ভারতীয় নেতৃবর্গ তাঁহাদের শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া আজাদ ময়দানে মহামতি তিলকের গুণগান করিবেন, ইহাও স্থির হইয়াছিল।

বোম্বাইএর পুলিস কমিশনার মিঃ হিলি এই সংবাদ পাইয়া বোম্বাই 'ওয়ার কাউন্সিলের' প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী হংস মেহতাকে একখানি পত্র লিখিয়া ঐ শোভাযাত্রাকে ক্রুকস্যাঙ্ক রোড পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া আজাদ ময়দানের দিকে যাইতে বলেন, যেন ইহা কোন মতে ফোর্টপল্লীর হর্ণবি রোডের দিকে না যায়, এইরূপ আদেশ করেন। শোভাযাত্রা-নিষেধ-মূলক পত্র শ্রীমতী মেহতার হস্তগত হয় ২রা আগষ্ট শনিবার বেলা ১০টার সময় অথচ শোভাযাত্রা যাইবার কথা ১লা আগষ্ট শুক্রবার। পত্র সরকারীভাবে লিখিত হয় নাই, কেন না [illegible]তে ছিল,—Dear Madam এবং I beg to inform you, ইত্যাদি। মামলার সময় এ কথা উঠিয়াছিল। সরকার-পক্ষ জবাব দিয়াছিলেন যে, সম্ভ্রান্ত মহিলার সম্মানরক্ষার্থে এরূপ সম্বোধন বা অনুরোধ ভদ্রতারই পরিচায়ক, তবে উহাতে যে সরকারী আদেশেরই অনুরূপ অনুজ্ঞার ইঙ্গিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, বিচারকও তাহা মানিয়া লন।

শ্রীমতী হংস মেহতা

বোম্বাই সহরে মালাবার হিলের পাদমূলে চৌপাট্টি পল্লী অবস্থিত: ইহারই সান্নিধ্যে ব্যাক-বে সমুদ্রাংশের সৈকতে হিন্দুর শ্মশানক্ষেত্র অবস্থিত। ঐ স্থানেই লোকমান্য তিলকের নশ্বর দেহের সংকার হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। শোভাযাত্রা সেই চৌপাট্টি পল্লী হইতে শুক্রবার বেলা সাড়ে ৪টায় বাহির লইয়া ১ ঘণ্টা বাদে ক্রুকস্যাঙ্ক রোডে উপস্থিত হয়।

এই স্থানে পুলিস তাহাদিকে বাধা প্রদান করে। যাহাতে শোভাযাত্রা ফোর্টপল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে না পারে, এইভাবে শোভাযাত্রার সম্মুখে পুলিস বেড়াজালের মত পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়ায়। এমন কি, সাধারণ পথিকেরাও ঐ বেড়াজাল ভেদ করিয়া গন্তব্যস্থানে যাইতে বেগ পাইয়াছিল। কোন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারীর দয়া হইলে অতি-কষ্টে পথিক বেড়াজাল ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যদি কোন পথিক সাধারণের যাতায়াতের পথ রোধ করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ ও ঝগড়া করিতে গিয়াছিল, অমনই তাহার অর্দ্ধচন্দ্র-লাভ অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল।

শুক্রবার রাত্রি ১০টার সময় লাঠি দিয়া একবার ভিড় ভাঙ্গাইবার চেষ্টা হয়। তাহার পর আর ৫ বার ঐরূপ করা হইয়াছিল। ফলে ১৩ জন লোক আহত হয়। রাত্রি দেড়টার সময় পুলিস কমিশনার হিলি অধিকাংশ পুলিসকে লইয়া চলিয়া যান। কয়েক জন সার্জ্জেণ্ট ও পাহারাওয়ালা বেড়াজাল পাতিয়া সারারাত্রি বসিয়া থাকে। রাত্রি দেড়টা হইতে শনিবার ভোর সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত কেহ কোন অসদ্ব্যবহার করে নাই, কেবল পুলিস বা ফৌজের দুই এক জন লোক একটু আধটু উৎপাত করিয়াছিল। ফ্রি প্রেসের প্রতিনিধি স্বয়ং দেখিয়াছেন, জি আই পি রেলের কয়টা ফিরিঙ্গী ছোকরা টিকিট-কলেক্টর লোকের মাথা হইতে গন্ধী টুপী কাড়িয়া লইয়া পকেটে পুরিয়াছিল। আর একটা মাতাল সার্জ্জেণ্ট পিস্তল দেখাইয়া

লোককে ভয় দেখাইতেছিল। এক পার্শী পথিক তাহার নিকট হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী পুলিস কর্ম্মচারীর জিম্মা করিয়া দিয়াছিল। আর একটা ক্ষীণকায় দীর্ঘদেহ ইংরাজ চাবুক লইয়া গন্ধীটুপীওয়ালাদিগকে তাড়া করিয়াছিল। তাহার অঙ্গে সামরিক পরিচ্ছদ না থাকিলেও তাহাকে সৈনিক পুরুষ বলিয়া বুঝা যাইতেছিল। পুলিসের বেড়াজালের জন্ম পথে গমনাগমন একরূপ নিরুদ্ধ হইয়াই গিয়াছিল।

ভোর সাড়ে ৬টার সময় বোম্বাইএর স্বরাষ্ট্র-সচিব সার আর্নেষ্ট হটসন পুনা হইতে ঘটনাস্থলে আগমন করেন এবং ভিক্টোরিয়া টার্ম্মিনাস ষ্টেশনের বারান্দায় বসিয়া দৃশ্য উপভোগ করিতে থাকেন। মিঃ হিলি ও অন্যান্য পুলিস কর্ম্মচারীরাও আসিয়া উপস্থিত হন। বেলা ৭টার সময় মিঃ হিলি ও নেতৃবর্গের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়। তাহার পর নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার হন,—কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরাম, মিঃ শেরওয়ানি, ডাক্তার হার্দ্দিকর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কয় জন, বুলেটিন লেখক এক জন ৪৩ জন মহিলাকর্ম্মীর সহিত গ্রেপ্তার হন। ঠিক সেই সময়ে শ্রীমতী কমলা নেহরু,লালা দুনীচাঁদ ও মওলানা আবুল কালাম আজাদ স্বেচ্ছাসেবকগণ ব্যতীত আর সকলকে স্থান ত্যাগ করিতে বলিয়া যান। তখন জনতার অধিকাংশ স্থান ত্যাগ করে। তিন দিকে পুলিসের বেড়াজাল, এক দিকে আজাদ ময়দান। সেই ময়দান দিয়া জনতা চলিয়া যায়, তাহারা লাঠির ভয়ে এরূপ করে নাই, যেহেতু, কংগ্রেস নেতার আদেশ,—সেই হেতু তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়াছিল।
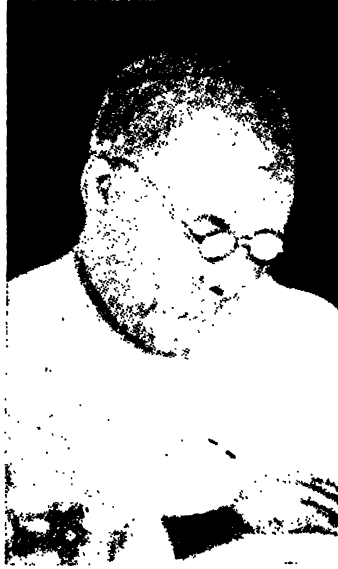
বল্লভভাই পেটেল

তাহার পর পুলিসের লাঠি! প্রথমে স্বেচ্ছাসেবকগণকে স্থান ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছিল। যখন তাহারা নিষেধ শুনিল না, তখন প্রথমে সার্জ্জেণ্টরা, পরে পাহারাওয়ালারা ভীমবিক্রমে নিরস্ত্র অহিংস সত্যাগ্রহীদিগকে আক্রমণ করিল। প্রথমেই বসিয়াছিল শিখ তরুণরা, তাহার পর সেবাদল ও ন্যাশান্যাল মিলিসিয়া। ১৫ মিনিটকাল লাঠির আক্রমণ চলিয়াছিল, তাহারই ফলে ন্যূনাধিক ৪ শত স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছিল। ১ শত জনের সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হয়। ২ শত ৪৪ জন কংগ্রেস হাঁসপাতালে নীত হয়, তন্মধ্যে ১ শত ৩০ জনকে হাঁসপাতালে রাখা হয়। ৬ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়াছিল। ৮৫ জনকে অন্যান্য হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে ১০ জনের আঘাত গুরুতর রকমের হইয়াছিল।

মিঃ শেরওয়ানি

ডাঃ হার্দ্দিকর

জয়রামদাস দৌলতরাম

শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া ধৃত হন নাই। ধৃত নেতৃবর্গকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত নারায়ণ আয়ার

বোম্বাইএর প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে চার হইয়াছিল। সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল কংগ্রেস নেতৃবর্গ

আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। কেবল পণ্ডিত মদনমোহন করিয়াছিলেন। তবে তিনি বলিয়াছিলেন, দণ্ডের ভয়ে তিনি ঐরূপ করেন নাই, অধুনা কি ভাবে রাজনীতিক মামলার বিচার-কার্য্য চলে এবং সত্যাগ্রহী কংগ্রেস-কর্ম্মীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হয়, সেই দিকে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ম তিনি এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিচারকালে পণ্ডিত মদনমোহনের জেরার ফলে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হোমের মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, তিনি এই প্রথম এই পথে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইতে দেখিয়াছেন, নতুবা মহাত্মা গন্ধীকে গ্রেপ্তার করিবার অব্যবহিত পরেও হরণবি রোড দিয়া শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল এবং পর পর আরও শোভাযাত্রা ঐ স্থান দিয়া বিনা বাধায় গমন করিয়াছিল। পুলিস কমিশনার

আবুলকালাম আজাদ

[illegible] স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন সর্দ্দার পেটেলকে শোভাযাত্রা ভঙ্গ করিতে বলেন, তখন সর্দ্দার বলিয়াছিলেন যে, তিনি ২ জন বা ৩ জন করিয়া সারি দিয়া হরণবি রোড দিয়া শোভাযাত্রা লইয়া যাইতে সম্মত আছেন। তিনি কিন্তু উহাতে [illegible] হন নাই। অর্থাৎ কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পুলিস তাহাতেও [illegible] নাই। এ ক্ষেত্রে জিদ কোন্ পক্ষে ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়।

[illegible] পুলিস কমিশনারের আদেশ অমান্য করার অপরাধে [illegible] আসামীদের দণ্ড দেওয়া ব্যতীত উপায় দেখিতে পান [illegible] তিনি দণ্ড না দিয়া পারেন না। কিন্তু একই অপরাধে [illegible] প্রকার দণ্ড কেন হইল—পণ্ডিত মদনমোহন ও নারীদের [illegible] এবং কংগ্রেস-কর্ম্মী সর্দ্দার বল্লভভাই প্রভৃতির ৩ মাস [illegible] কেন [illegible]

বিচারক রায়ে বলিয়াছেন, যেহেতু (১) মদনমোহন বৃদ্ধ, (২) যেহেতু মদনমোহন আদেশ অমান্য করিবার মত তেজ দেখান নাই, সেই হেতু তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তবে নারী কর্ম্মীদিগের প্রতিই বা লঘুদণ্ড দেওয়া হইল কেন? তাঁহারাও ত পুরুষের সঙ্গে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে একই কর্ম্মক্ষেত্রে একই অনুপ্রেরণায় সমবেত হইয়াছিলেন!

ইহার মধ্যে লক্ষ্য রাখিবার একটি বিষয় আছে। সত্যাগ্রহীরা সারারাত্রি ও তৎপরদিন রৌদ্রবৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া

মদনমোহন মালব্য

অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহনক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাও ছিলেন। বিশেষতঃ যখন পুলিস বলপূর্ব্বক শোভাযাত্রা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল, তখনও তাঁহারা আহত হইয়াও বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই। মানুষ এত সহ্যগুণ দেখাইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে কল্পনাতীত ছিল। ইহা কি মহাত্মা গন্ধীর আশ্চর্য্য শিক্ষার পরিচায়ক নহে?

ন্যূনতম বলপ্রয়োগ

সরকার পক্ষ এখানে এবং বিলাতে সকলকে বুঝাইয়া থাকেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন দমন করিবার জন্য পুলিস ও ফৌজ ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। অথচ বলপ্রয়োগ কি

বোম্বাইয়ে একটি নিষিদ্ধ শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে কিরূপ বল-প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং কয়েক জন শিখ কিরূপ নির্ভীকভাবে প্রহার সহ্য করিয়াছিল, তাহার বিবরণ মিঃ স্লোকোম্ব ও অন্য এক জন মার্কিণ সাংবাদিক দিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই সে দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে জ্ঞানহারা হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনায় লিখিয়াছেন।

সে দিন পঞ্জাব প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ দিন মহম্মদ বলিয়াছেন,—"যদি কেহ সরকারের প্রতি জনসঙ্ঘের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিবার কারণ হইয়া থাকে, তবে সে পুলিস। পুলিস কেবল লোকের মাথা ভাঙ্গিতেছে না, তাহারা লোকের মনও ভাঙ্গিয়া দিতেছে।" পুলিসের কার্য্যে দোষারোপ করিয়া যে মন্তব্য ঐ কাউন্সিলে উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা গৃহীত হইয়াছে।

ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম সদস্য আমাদের বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বাঙ্গালায় পুলিসের ব্যবহার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার মধ্যেও "ন্যূনতম বলপ্রয়োগের" পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "এই বর্ণনার জন্য যদি আমার বিপক্ষে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, আমি তজ্জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তথাপি আমি নিজে বাঙ্গালায় পুলিসের যে অনাচার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার বর্ণনা না করিয়া পারিতেছি না।" দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি কাঁথির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি ও অপর কয় জন মডারেট নেতা কাঁথিতে অনাচার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করিতে যান। দলপতি স্বয়ং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু। তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশানের প্রেসিডেণ্ট, এককালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। মডারেট দলপতি বলিয়া সরকার তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করিয়া থাকেন। অন্যান্য সদস্যরাও কংগ্রেস-দলীয় নহেন, বা আইন অমান্য আন্দোলনের সহিত তাঁহাদের কোন সহানুভূতি বা সংস্রব নাই। সুতরাং কাঁথির "স্বদেশী গুণ্ডাওয়ালাদের" সহিত যে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল না, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এহেন নিরপেক্ষ তদন্ত-কারীদিগকেও পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বক্তৃতায় এ কথা বলিয়াছেন। সরকারের সহিত সহযোগকামী মডারেট ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট-দলীয় নেতাদেরও যখন পুলিসের হস্তে এই অবস্থা, তখন অন্য পরে কা কথা!

সে যাহা হউক, নিয়োগী মহাশয় অতঃপর গ্রামবাসীদের প্রতি অনাচারের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হৃদয়দ্রাবী—অর্ডিনান্সের ভয়ে তাহা বোধ হয় পরিষদের রেকর্ডভুক্ত হইয়া থাকা ব্যতীত অন্য আকারে প্রকাশিত হইবে না। বোধ হয়, তাহার বর্ণনা স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ হেগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছিল, তাই তিনি বলেন, "বাঙ্গালা সরকারের ঘোষণায় এ সকল ঘটনা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।" এক জন সদস্য তৎক্ষণাৎ বলেন,—"ঘোষণার কথা মিথ্যা।" ক্ষিতীশচন্দ্র বলেন, "বাঙ্গালা সরকারের দপ্তরের মিথ্যার কারখানার উহা রচিত হইয়াছে।" অন্য এক সদস্য জিজ্ঞাসা করেন, "কাহার প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঘোষণা লিখিত হইয়াছে?" মিঃ হেগ বলেন,—"বাঙ্গালা সরকারের এই ঘোষণার কথা ছাড়া আমার বলিবার আর কিছু নাই।"

যদি ইহাই সরকারের চূড়ান্ত জবাব হয়, তাহা হইলে "ন্যূনতম বল-প্রয়োগ" করা হইতেছে, বলা হইতেছে কেন? হয় প্রমাণ করা হউক, শ্রীযুক্ত নিয়োগীর ও নিরপেক্ষ-তদন্ত কমিটীর কথা মিথ্যা, অতএব তাঁহাদের বিপক্ষে অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে,—না হয় স্বীকার করা হউক যে, সাধারণের মধ্যে এ সম্বন্ধে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে।

স্বর্গীয় হরিদাস বিদ্যাবিনোদ

বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা সাহিত্য-সেবায় আত্মনিবেদন করেন, বীণাপাণির কমল বনে যাঁহারা সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন, ইন্দিরা কদাচিৎ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। হরিদাস বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও ইন্দিরার সপত্নী-পুত্র ছিলেন; দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্য রচনা ও আলোচনা করিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সুধী পাঠকসমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। "বসুমতী"র সম্পাদক বিভাগের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন-সম্পাদিত "ব্রহ্মবিদ্যা" নামক সাময়িক পত্রে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বহু সুচিন্তিত সামাজিক ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। স্বামী অভেদানন্দের রচিত পনেরখানা ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের ভার বিদ্যাবিনোদ

হরিদাস বিদ্যাবিনোদ

মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। তিনি উহা সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন, তবে এখনও অনূদিত গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হয় নাই। 'পরলোক' গ্রন্থ-রচনায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিগত ফাল্গুন মাসে ৫৭ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক-প্রয়াণ করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বেও তিনি অক্লান্তভাবে সাহিত্য-সেবায় অবহিত ছিলেন। কয়েকটি শিশুসন্তান ও সহধর্ম্মিণীকে কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে ফেলিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 'বসুমতী'র তিনি হিতকামী বন্ধু ও লেখক ছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ভগবান্ সান্ত্বনা দান করুন, ইহাই কামনা করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

এই মশলা-বিভ্রাট ব্যাপারে রামজীবন বাবু একটু অপ্রতিভ হইলেন। মনে মনে একটু রাগও হইল। এটা বোস সাহেবের কি প্রয়োজন ছিল ধরিয়া লইবার, যে চা পানান্তে পাণ কিংবা মশলা চর্ব্বণ করিতে না পাইলে তিনি অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিবেন? কেন, তিনিও কি এক জন বিলাত-ফেরত নহেন? যখন বিলাতে ছিলেন, বাড়ী হইতে পাণের খিলি কি প্রতি সপ্তাহে তাঁহাকে পার্শেল-যোগে প্রেরিত হইত?

বয় চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া গেলে বোস সাহেব বলিলেন, "এবার এঁদের দুই একটা গান শুনিয়ে দাও, মা!"

পিতার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া সুমতি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উঠিল। পিয়ানোয় বসিয়া, এক একটি করিয়া আধুনিক রুচি-সম্মত তিনটি গান সে গাহিল। তাহার গান শুনিয়া, আগন্তুকগণ সকলেই মুগ্ধ হইলেন। রামজীবন বাবু বলিলেন, "বাঃ—সুন্দর! সুন্দর! গলাটি মা'র আমার ভারি মিষ্টি। মেয়েকে সার্থক আপনি গান শিখিয়েছিলেন, মিষ্টার বোস।"

কর্ত্তা-গৃহিণী কন্যার এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পুলকিত হইলেন। ইঁহাদের প্রতি সুমতির মনের বিরুদ্ধ ভাবও কতকটা লঘু হইয়া গেল।

রামজীবন বাবু বলিলেন, "মেয়ে ত আপনার খাসা মেয়ে, মিষ্টার বোস। আমার ছেলেটিকে আপনাদের পছন্দ হ'লেই হয়। কবে আমার ছেলেকে দেখ্‌তে আস্‌বেন বলুন।"

বোস সাহেব পত্নীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "কি গো?"

গৃহিণী বলিলেন, "তুমিই বল না।"

রামজীবন বাবু কৌতূহলী হইয়া উভয়ের মুখপানে চাহিলেন। বোস সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ব্যাপার কি হয়েছে জানেন, মিষ্টার ঘোষ। গিন্নী আমায় বলেন, তুমি ত ছেলে দেখে আস্‌বে,আমি কি রকম ক'রে দেখবো?—তাই ওঁর ইচ্ছে, আপনি এক দিন আপনার ছেলেকে নিয়ে এখানে এসে আমাদের সঙ্গে ডিনার খান।"

রামজীবন বাবু বলিলেন, "বেশ ত, এ ত ভাল কথা।"

"আগামী শনিবার, আপনাদের কোনও অসুবিধে নেই ত?"

"শনিবারে? না, অসুবিধা আর কি?"

"তবে, ঐ দিন অনুগ্রহ ক'রে, ছেলেকে নিয়ে আপনি আসবেন, আর আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবেন।"

বসু-গৃহিণী বলিলেন, "মিসেস ঘোষ কি আসতে রাজি হবেন না? তাঁকেও যদি আনতে পারেন, তবে আমরা বড়ই সুখী হই।"

"তিনি ত টেবিলে খান না।"

"নাই বা টেবিলে খেলেন। তাঁকে আসন পেতে, ফল-টল, সন্দেশ-টন্দেশ দিলে, তাঁর কি আপত্তি হবে?"

"তা বোধ হয় হবে না। আচ্ছা, তাঁকেও আনবো। অর্থাৎ আনতে চেষ্টা করবোই। এখন আমরা তা হ'লে আসি। নমস্কার।"—বলিয়া তাঁহারা বিদায় লইলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অভয়

মরণে 'মরণ' ভাবি যখনি আশঙ্কা জাগে,
আকুল হৃদয় মোর তোমার স্মরণ মাগে॥
তখনি কাণের কাছে কে যেন গুঞ্জরি কয়—
মরণ অমৃতরূপী মৃত্যু তো মরণ নয়!

৺ইন্দিরা দেবী

ভুবনমোহন

১

জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ ঘটে, তখন মোটা-সোটা সুন্দর ছেলেটিকে পিসীমা লইয়া গিয়া মানুষ করিতে থাকেন। গোল দুখানি হাতে গিনি সোনার নিরেট বালা দুটি যেন মিশিয়া থাকিত। সেই দু'খানি হাত ঘুরাইয়া, মাথা হেলাইয়া, শিশু যখন চাঁদকে আহ্বান করিয়া আধ আধ কণ্ঠে ডাকিত—আয়, আয়, আয়, তখন পিসীমার স্নেহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তিনি তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, চুমার উপর চুমা দিয়া, আর কিছুতেই যেন নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না! অবশেষে মুখ হইতে সোহাগের উচ্ছ্বাস বাহির হইয়া আসিত, ভুবনমোহন! আমাদের ভুবনমোহন!

মুনির মুখ হইতে এক দিন বাণীও এমনি করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া অমর হইয়া রহিল। তাহাই জগতের আদি কাব্য। রামের জন্মের বহুপূর্ব্বে যে গীত মুনি গাহিলেন, তাহাই সত্য হইল উত্তরকালে রামচন্দ্রের জীবনে—অক্ষরে অক্ষরে!

এই শিশুটিকে যে দেখিত, সেই মোহিত হইত এবং যখন শুনিত তাহার নাম ভুবনমোহন, তখন মনে মনে, যিনি ঐ নামটি তাহাকে দিয়াছেন, তাঁহার তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিত না।

ভুবনমোহন অপূর্ব্ব রূপ লইয়া যখন বড় হইয়া উঠিল, তখন পিসীমাই বোধ করি প্রথম উপলব্ধি করিলেন যে, রূপের দিক দিয়া কামনা করিবার কিছু আর না থাকিলেও মনের দিকে তাহার বহু ত্রুটি ছিল।

এই মনের দিকের ত্রুটি পূরণ করিবার ব্যবস্থা কিন্তু মনুষ্য-সমাজে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। হাপরে লোহা তাতাইয়া কামার যেমন কাস্তেকে বঁটি গড়ে, আবার প্রয়োজন বোধ করিলে সেই বঁটিকে দা বানাইয়া দিতে তাহার কিছুমাত্র দেরি লাগে না, তেমনই পাঠশালার গুরু মহাশয়রাও এক-একটি যেন বাজিকর।

সেই আশায় পিসীমা এক দিন ভুবনমোহনের হাত ধরিয়া নবীন গুরুর পাঠশালে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

নবীন গুরু লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত না হইলেও শিশু-চরিত্রে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল! এক এক জন গোয়ালা যেমন গরু দেখিয়াই বলিতে পারে যে, কত দুধ দিবে, তেমনই গুরু মহাশয় দেখিবামাত্রই চিনিয়াছিলেন যে ভুবনমোহন—তাঁহারই কবিতায়, তাঁহার মনের ভাবটি প্রকাশ করিয়া বলিলে বলিতে হয়—

(ছোঁড়া) হাড় খাবে,
মাস খাবে
চামড়া নিয়ে, ডুগ্‌ডুগি বাজাবে!

গুরুর অপ্রসন্ন কটাক্ষ দেখিয়া পিসীমা বলিলেন, "ভুবন আমাদের গিয়ে, একটু মাঠো বুদ্ধির—গিয়ে, মা-বাপ-মরা ছেলে। তা' এই সবে ছয়ে পা দিয়েছে, গিয়ে—"

নবীন গুরু পিসীমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনারাই ত হচ্ছেন ছেলেদের কাল, আদর দিয়ে দিয়ে একবারে বাঁদর তৈরী ক'রে আমাদের হাতে ছেড়ে দেন,—তার পর আমাদের গাধা পিটে ঘোড়া তৈরী করতে করতে হয়রান হয়ে যেতে হয়!"

পিসীমা বলিলেন, "তা ত বটেই বাবা, তোমরা হ'লে পণ্ডিত মানুষ, এই কাযেই হাড় পেকে গেল। তা বাবা, দরকার হ'লে দু'-এক ঘা ত দিতেই হবে। তবে বলছিলাম, মাওড়া কি না—একটু ওরি মধ্যে—"

গুরু জানিতেন, ভুবনের পিসীর অবস্থা ভালই;—তাই তিনি একটু বক্র হাস্য করিয়া বলিলেন, "যান, আপনি নিশ্চিন্তমনে বাড়ী যান।—মার-ধোর যে নবীন গুরু করে, সে ত ওদেরই ভালর জন্যে—সত্যি ক'রে নবীন ত আর কসাই চামার নয়? তারও ত দুটো ছেলেপুলে আছে!"

"বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক"—বলিতে বলিতে পিসীমা চিন্তাজড়িত-ভয়-সঙ্কুল-চিত্তে গৃহে ফিরিলেন।

২

নবীন গুরুর পৃথিবীর সকল শোভা-সম্পদ, কোমল মাধুরীর সহিত যেন জাতশত্রুতা ছিল। নিজের গভীর

মধ্যে বসিয়া শিশু-রাজ্যে তাঁহার অখণ্ড প্রতাপ যেমন চলিত, এমন বোধ হয় কোন দিন কোন রাজারই এই দুনিয়ার ইতিহাসে চলে নাই!

নবীন স্থিরনিশ্চয় করিয়া জানিতেন, শিশুকে আদর দেওয়া, সযত্নে লালন-পালন করাটা কেবলমাত্র মনুষ্য-চরিত্রের দুর্ব্বলতা। স্ত্রীজাতির হাতে যদি এই শিশুপালনের ভার না থাকিত, তাহা হইলে হয় ত পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়া যাইত।

সৃষ্টিকর্ত্তা কিন্তু পরিহাসরসিক! নবীন গুরু মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিতেন, কি যে তোমার মতলব, মুনি-ঋষিরাই বুঝতে পারলেন না! তা আমি কোন্ ছার! কিন্তু সব কথার সার এই যে, কুকুরকে নাই দিয়েছ কি চ'ড়ে বসেছে একেবারে মাথার ওপর!

চারিদিকে কলরব উঠিলে, নবীন জলচৌকির উপর বেতখানি আছড়াইলেই যেন বিশ্বের আদিম স্তব্ধতা ফিরিয়া আসে! পড়ুয়ার মন একলম্ফে ধারাপাতের নিষ্ঠুর নিগড়ে ধরা দিয়া তারস্বরে "গণ্ডায় এণ্ডা" দিতে থাকে!

নবীন বসিয়া বসিয়া হাসেন, বেত যদি না থাক্‌তো ত মা-সরস্বতী এত দিন কালা-পানি উত্তীর্ণ হইয়া আণ্ডামানে নারিকেল-দড়ি পাকাইয়া দুই কর রক্তাক্ত করিয়া মারা যাইতেন।

নবীন ভুবনমোহনের নূতন নামকরণ করিলেন, রাঙ্গা মূলো—দুইটি কথার মধ্যে ভাব-সমুদ্র যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে!

ভুবন প্রথম দিনেই বুঝিয়াছিল যে, এটি একটি অন্য রাজ্য! পিসীমার কোমল শয্যা হইতে একবারে কণ্টক-শয়নে নামিয়া আসিয়া সে দিশাহারা হইল; তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার মনের মধ্যে বজ্র-কাঠিন্য আহরণ করিয়া এক জন বিদ্রোহী বীর মাথা তুলিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল; —তাহার কাছে বেতের শব্দ? সে ত কিছুই না! বেতকে সে যেন চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিল!

বেত মারিতে গেলেই ভুবন দুহাতে বেত ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িত; তার পর সে দাঁত দিয়া টুক্‌রা টুকরা করিয়া বেতখানাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাগে ফুঁসিতে থাকিত।

নবীন গুরু চীৎকার করিয়া বলিতেন, "শয়তানের হাড়! পাজির পা-ঝাড়া! দেখছি তোকে এইবার!"

পাঠশালে ভুবনকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার আড়ম্বরের গল্প মুখে-মুখে এবং কাণে-কাণে বড় হইয়া উঠিয়া এক দিন পিসীমার কাণে আসিয়া পৌছাইল। তিনি শুনিলেন যে, তাহার হাত-পা বাঁধিয়া মটকায় ঝুলাইয়া নবীন গুরু এক দিন জল-বিছুটির মাহাত্ম্য পড়ুয়াদিগকে দেখাইবেন।

পড়ুয়ারা সেই আনন্দে দিন গণিতে লাগিল। ছয় সাত বৎসরের বালক ভুবন, তাহারও যেন আনন্দ, কি একটা হইবে, সে ভারি মজার ব্যাপার। ব্যাপারখানা যে সবই তাহার উপর দিয়া হইবে—নিজের সঙ্গে সমস্ত ঘটনার কোথায় যে একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র আছে—সেটি সে সম্যক্ উপলব্ধি করিত না। এইখানে তাহার বুদ্ধি খেই হারাইয়া ফেলিত। বুদ্ধিমানরা এটিকে তাহার অমানুষিক বদমাইসি মনে করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক ভুবন ততখানি মরীয়া হইয়া উঠে নাই।

কথাটা এমনই ঘন-ঘন কাণে আসিতে লাগিল যে, পিসীমা আর ঘরে শান্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এক দিন নবীনের পাঠশালায় তাঁহাকে রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে দেখা গেল!

নবীনও সহজে দমিবার পাত্র নহেন। চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "অমন ছেলেরে আঁস-বঁটি দিয়ে দু'খান ক'রে দিতে হয়।"

পিসীমা বলিলেন, "সে সখ মিটোতে হয় ত নিজের ছেলেদের উপর দিয়ে কে মানা করেছে?—পাঠশাল ত আর কসাইখানা নয়"—বলিয়া তিনি ভুবনের হাত ধরিয়া চলিয়া আসিলেন—"কায নেই তোর লেখা-পড়া ক'রে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম—ও কি গুরু? খাণ্ডাৎ খুনে!"

পাঠশালার ছাত্ররা জানিত, এ পৃথিবীতে গুরু-মহাশয়ের চেয়ে প্রবলপরাক্রান্ত আর কেহ নাই। সেই তাহাদের গুরুমহাশয়ের এত বড় অপমান!

সকলেই মনে মনে ভুবন এবং তাহার পিসীর উপর চটিয়া গেল।

৩

ভুবনমোহনের পিসীমার বাড়ীতে কিছুতেই মন টিকে না। পাঠশালার অনেক বিপদ ছিল সত্য, তবুও সেখানকার বৈচিত্র্য বালকের মনকে আকর্ষণ করিত। কিন্তু সেখানে

তাহার বিরুদ্ধে ছেলেরা প্রায় খড়্গ-হস্ত। আমাদের গুরু মশাইকে যার পিসী অপমান করেছে—তাকে আর কিছুতেই ঢুকতে দেব না—এই কথাই একজোট্ হইয়া ছেলেরা বলিল।

ভুবন দেখিতে ভাল ছিল বলিয়া প্রত্যেকেরই তাহার প্রতি টান ছিল; কিন্তু প্রত্যেকেই মনের কোথা দিয়া যেন বুঝিত যে, সেই রকম ভালবাসা হয় ত বা মনুষ্য-প্রকৃতির দুর্ব্বলতা। তাই প্রকাশ্যে একযোগে সকলেই দেখাইত যে, ভুবনকে কেহই ভালবাসে না, বরং তাহার উপর তাহাদের বিজাতীয় রাগ!

হয় ত এই একই কারণে নবীন গুরুও ভুবনের প্রতি অতখানি বিরক্তি দেখাইতেন।

মনের গভীর স্তরে যে-বাসনা, যে-কামনা লুকাইয়া বাসা বাঁধিয়া থাকে, তাহাদেরই গোপনটানে মানুষ না জানিয়াই হয় ত আত্ম-প্রতারণা করিতে থাকে!

পিসীমার বাড়ীকে নিজের বাড়ী মনে করিতেও তাহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিত। কিন্তু পিসে মহাশয় কি পিসীমা এক দিনের জন্যও তাহার সহিত পরের মত ব্যবহার করিতেন না। দোষ করিলে বকিবার অধিকার ত তাঁহাদের ছিল; কিন্তু বকুনি খাইয়া ভুবনমোহন মনে করিত, আজ যদি মা-বাবা থাকিতেন, হয় ত তাহাকে একটুও বকিতেন না। সকল আদর-যত্নের মধ্যে তাহার পিতামাতার অভাবের কথা কাঁটার মত উঁচু হইয়া থাকিয়া তাহাকে নিরন্তর অস্বস্তি দিত। মনে ত তাহার কোন শান্তিই ছিল না। উপরন্তু মন সর্ব্বদাই উড়্ উড়্ করিত। মনে হইত, ইহার চেয়ে পৃথিবীতে অন্য যে কোন স্থানই সুখের হইবে।

পড়া-শুনায় মন লাগে না। যে মাষ্টার বাড়ীতে আসিয়া পড়াইয়া যান, তাঁহার দাঁত-কিড়ি-মিড়িটুকুই ভুবনের কাণে পৌঁছিত; বাকি কথা এক কাণে ঢুকিয়া অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইত। মনে কোন দাগ রাখিতে পারিত না।

শুধু এক দিকে তাহার মন অপরিমিত বেগে ধাবিত হইত। গাছে পাখীটি বসিয়া গান করিলে ভুবনের মন উদাস হইয়া যাইত।

খঞ্জনী বাজাইয়া বষ্টুমী যখন গান ধরিত, তখন সে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইত—কাণে যেন কে মধুবর্ষণ করিতেছে! ভুবনের মনে হইত, যদি সে একটা গুপীযন্ত্র পায়, আর এক জন বষ্টুমী! তাহা হইলে আর কি! গানের পর গান গাহিয়া সে শুধু পথে পথে ঘুরিয়াই দিন অবসান করিতে পারে!

এমনই করিয়া কবে, কখন্, কেমন করিয়া সে জানে না, ও পাড়ার যাত্রাদলে গিয়া আশ্রয় লইল।

যাত্রাদলের লোকরা এমন একটি ছেলে পাইলে বাঁচিয়া যায়। আবার দেখিতে দেখিতে ভুবনের গলায় সুর খেলিতে সুরু করিল। তাহারা আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, আর ভুবনেরও একটা মনের মত আশ্রয় জুটিল।

কিন্তু বিষম বাধা পিসীমা-পিসামহাশয়। সময়ে অসময়ে পিসা মহাশয় তাকে কাণ ধরিয়া বাড়ী আনিতে লাগিলেন। পিসীমা কত উপদেশ দেন, কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।

হরিচরণ ন্যায়বাগীশ তাহার কোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন, রাহুর দৃষ্টি পড়িয়াছে। উপনয়ন দিলেই এই পাপগ্রহ জব্দ হইবে।

ধূমধাম করিয়া উপনয়ন হইল। দিন কতক ভুবন ওঁ শন্ন ওঁ শন্ন করিয়া ধর্ম্মে মন বসাইবার চেষ্টাও করিয়াছিল; কিন্তু বেদ-মন্ত্রের চেয়ে তাহার "নিঠুর কেন হে বঁধু প্রিয়জনের" সুরই ভাল লাগিল।

অবশেষে এক দিন তাহার দেবতা তাহার মধ্যে জাগিয়া তাহাকে চাহিলেন:—

"আমার দেবতা আমারে চাহিলে
কে মোর আত্মপর।"

যাত্রার দলের আরও গোটা দুই সঙ্গীর সহিত এক দিন ভুবন কোথায় চলিয়া গেল।

পিসীমা কাঁদিয়া চক্ষু প্রায় অন্ধ করিয়া ফেলিলেন। পিসামহাশয় ও পাড়ার যাত্রার দলের অধিকারীকে পুলিসে দিবার ভয় দেখাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভুবনমোহনের কোন সন্ধান আর পাওয়া গেল না। শত্রু হাসিল। বন্ধুজন আসিয়া সমবেদনা জানাইয়া গেলেন। কিন্তু সে যেন নিজের পরম প্রিয়ের সন্ধানে কোথায় উধাও হইয়া গেল!

৪

ভুবন যে যাত্রার দলে গিয়া জুটিয়াছিল, তাহারা সে বৎসর পূজার সময় গাওনা করিবার জন্য বিরামপুরের জমীদার-বাড়ী হইতে বায়না পাইয়াছিল।

কৃষ্ণ পালায় ভুবন বলরাম সাজিয়া সকালে একটি ললিত গাহিলে চতুর্দ্দিকের লোক কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত। সে সেদিন যখন লাঙ্গল কাঁধে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দর্শকদের মনে হইল, যেন অন্ধকার ভেদ করিয়া নব-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে।

জমীদার বাবু নিজের তাকিয়ার উপর ঝিমাইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আসরে সাড়া পড়িতেই অলস চক্ষু খুলিয়াই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "বাঃ, বাঃ, ছোকরার দাঁড়াবার কি ভঙ্গিমে! কেয়াবাৎ!"

অধিকারী আসিয়া পিছনে বেহালা লইয়া দাঁড়াইলেন। ভুবন গান সুরু করিল।

মনে হইল, শান্ত-স্তব্ধতার পাছে কোন পীড়া হয়, তাই প্রকৃতি কোমলতম কণ্ঠে কোমলতার বন্দনা করিতেছেন। সেখানে আবেগ নাই, উন্মাদনা নাই, আছে কেবল একটি জাগ্রত কণ্ঠে সুসংযত আনন্দের মধুর বেদনা!

শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রায় আছেন। সদা-জাগ্রতের আবার নিদ্রা! সে ত লীলাময়ের লীলা! কিন্তু লীলার মধ্যেও বিশ্ব-বিধানের নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়—তাই বলরাম ডাকিতেছেন, উঠ! উঠ!

শ্রোতার মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ সবার চিত্তে বিরাজমান; তবুও তাঁহাকে নিত্য আহ্বান করিতে হয়; নিত্য-পূজা করিতে হয়। সে ত তাঁহার জন্য নহে—সে যে সেবকের নিজের জন্যই!

পালা শেষ হইলে জমীদার অধিকারীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এ দিক ও দিক কথার পর বলিলেন, "ঐ ছেলেটি কোথায় পেলেন আপনি? খাসা চেহারা, চমৎকার গলা আর সেই সঙ্গে আপনার বেহালা—মনে হ'লো ইন্দ্র-পুরীতে অপ্সরার গান শুন্‌ছি।—"

"কি জাত ছেলেটির?" জমীদার জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ব্রাহ্মণ; কুলীনের ছেলে, মা-বাপ নেই, পিসের কাছে মানুষ—কষ্ট পেয়েছে! তবে ছেলেটি ভাল, এখনো ত্রিসন্ধ্যা করে, গায়ত্রী-মন্ত্র রোজ হাজারবার ক'রে জপ করে।"

জমীদার "বটে! বটে!" বলিয়া দুলিয়া দুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, "তাই ত বলি, বামুনের ছেলে নৈলে—সে কথা গিন্নীকে বল্‌ছিলুম।"

অধিকারী প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "উত্তরা-অভিমন্যুর পালা, আমার নিজের লেখা। ভুবনের শরীর ভাল থাক্‌লে—নিজের মুখে কিছু বলতে চাইনে! গরীবের উপর দয়া রাখবেন। বড় আশা ক'রে রাজ-দরবারে এসেছি!"

জমীদার বাবুর সাম্‌নের দুটি দাঁত ছিল না। তাই অনবরতই সুপারি চিবানর মত মুখ নাড়িতেন। অধিকারীর কথা শুনিতে শুনিতে দুই চক্ষু ছোট করিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন; মুখ নাড়াও থামিয়া গেল।

অধিকারী ধীরে ধীরে পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

উত্তরা-অভিমন্যুর পালা শুনিয়া জমীদার-গৃহিণী বলিলেন, "ওই ছেলের সঙ্গেই আমার পান্নার বিয়ে দিতে হবে।"

পান্না জমীদারের একমাত্র কন্যা; একটি পুত্রও ছিল; বয়স তিন বৎসর; পান্না তাহার চেয়ে মাত্র পাঁচ বৎসরের বড়।

জমীদার বাবুরও যে এ কথা মনে হয় নাই, তাহা নহে। ভুবনমোহনের যৌবনের প্রাক্কালে রূপ ক্রমেই কন্দর্পনিন্দিত হইয়া উঠিতেছিল। সে রূপ দেখিলে সকলেরই ঐ কথা মনে হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের নহে।

কিন্তু জমীদার বাবু বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিলেন, "আঃ, কি যে বল গিন্নী তুমি? লোকে বল্‌বে কি? যে, একটা যাত্রা-দলের ছোঁড়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বস্‌লো বুড়ো! ভীমরতি হয়েছে।"

গৃহিণী দ্বিতীয় পক্ষের ছিলেন। অতএব জমীদার বাবু একটু বেশী করিয়াই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। বহু কান্না-কাটির পর, জমীদার বলিলেন, "তবে আজ দুপুরে ওকে নিমন্ত্রণ কর। কথাবার্ত্তা ক'য়ে দেখ, ছেলেটি কেমন।"

ইতিপূর্ব্বেও অনেক রাজবাড়ীর অন্দর হইতে ভুবনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বহু অর্থ, বহু মূল্যবান্ বস্ত্র-সামগ্রী সে লইয়া আসিয়াছে। অধিকারী কতকটা বিস্মিত হইতেছিলেন যে, এবার কেন বা ফাঁক যায়।

খাইতে আসিয়া ভুবন বেশী কথা-বার্ত্তা কহিল না। অনেক করিয়া জমীদার-গৃহিণী পিসীমার কথা জিজ্ঞাসা

করিলে সে শুধু বলিল, "যাত্রার দলে আসা তাঁদের মত নয়, তাই চিঠি-পত্র দেইনে।"

তাঁদের অবস্থা কেমন ?

"ভালই", বলিয়া সে ঘাড় হেঁট করিয়া খাইতে লাগিল।

ভুবন খালি হাতে দলে ফিরিল। অধিকারী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "টাকা-কড়ি, কাপড়-চোপড় কিছুই না! বলিস্ কি রে?"

কিন্তু বেশীক্ষণ সন্দেহ-বিস্ময়ের আবছায়ায় তাঁহাকে থাকিতে হইল না।

জমীদার বাবুর শরীর একটু খারাপ বলিয়া নিজে আসিতে পারেন নাই, দেওয়ানকে পাঠাইয়াছেন। রাত্রিতে অধিকারী মহাশয়ের নিমন্ত্রণ, রাণী-মা নিজে রান্না করিয়া খাওয়াইবেন এবং পরের দিন সমস্ত দলের পাঁঠা-পোলাওয়ের নিমন্ত্রণ।

রাত্রির খাওয়া-দাওয়ার পর দেওয়ানজী প্রস্তাব করিলেন যে, ভুবনমোহনকে জমীদার বাবু রাখিতে চান।

প্রস্তাব শুনিয়া অধিকারীর দুই চক্ষু আয়ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "সর্ব্বনাশ, তবে ত এ বছরের জন্যে দল খোঁড়া হয়ে গেল, সাম্‌নের কালী-পূজোতে মহেশপুরের বায়না ন'ছে ব'সে আছি।—সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!"

অধিকারী হাত যোড় করিতে লাগিলেন, "দেওয়ানজী, এ হ'তেই পারে না, রাজাবাবুকে বুঝিয়ে বলুন। আমি কথা দিচ্ছি যে, অঘ্রাণ মাসে আমি নিজে এসে ভুবনকে দিয়ে যাব—কথার নড়চড় এক তিল হবে না।"

দেওয়ানজী বলিলেন,"বড় লোকের খেয়াল, বিশেষ ক'রে এর মধ্যে যখন রাণী-মা আছেন, কারুর কথা চল্‌বে না।—আপনাদের ত টাকা নিয়ে কথা? পাঁচশ, সাতশ, হাজার, দু'হাজার দিতে কিছু এঁদের গায়ে লাগবে না।"

অন্যদিকে রাজাবাবু ভুবনকে ভুলাইতেছিলেন, "তোমাকে বড় বড় ওস্তাদ রেখে গান শেখাবো, কল্‌কেতায় পাঠিয়ে বি, এ এম, এ পাশ করিয়ে আন্‌ব,—আর, জমীদারীর চার আনা লিখে দেব।"

ভুবন চার আনা কি বুঝে না, বি, এ, এম, এতে তাহার বিজাতীয় ভয়; শুধু ওস্তাদের কথায় তাহার মন এক একবার নাচিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার বেহালা বাজাইবার মহা সখ; সে অবশেষে একটা ভাল বেহালা পাইবে শুনিয়া নিম-রাজি হইল।

জমীদার বাবু বলিলেন, "কালই তোমার বেহালার কথা লিখে দিচ্ছি, দিন চারেকের মধ্যে এসে পড়বে; তেমন বেহালা তোমার অধিকারী জন্মে দেখেনি!"

৩

অধিকারী একুনে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া, মুখ বিরস করিয়া বিদায় লইলেন। মনে মনে বলিলেন, "ও বনের হরিণ, ওকে কে বাঁধবে? এক দিন ঠিক ও গিয়ে হাজির হবে।"

মহেশপুরে বৎসর বৎসর আহ্বান হইত। বনেদী ঘর, বায়না তাঁহারা দিতেন না, অধিকারীও কোন দিন দাবী করেন নাই। তবে ঐরূপ কথা-বার্ত্তা না কহিলে কি কোন ব্যবসা চলে?

ভুবনের বেহালা আসিল, বাঁশী আসিল, বড় হার-মোনিয়ম ত ঘরেই ছিল এবং নবগ্রামের রাসবিহারীকেও চিঠি লেখা হইল যে, অবিলম্বে আসিয়া রাজা বাহাদুরের সখের দলের অধিকারীর পদ গ্রহণ করে।

ভুবন এত উদ্যোগ আড়ম্বরের সার বুঝিয়াছিল যে, রাজা বাবু একটি সখের যাত্রার দল খুলিতে চাহেন, তাই তাহাকে এমন করিয়া আবদ্ধ করিয়াছেন। যাত্রার দলে অভিমন্যুর অভিনয় করিতে তাহার সবচেয়ে বেশী ভাল লাগিত। কিন্তু এ ভুল তাহার বেশী দিন রহিল না। চতুর্দ্দিক হইতে সকলেই বলে, রাজকন্যা পান্নার সহিত বিবাহ দিবার উদ্দেশ্যেই যাত্রার দলের কৌশলটি রচিত হইয়াছে। এত মূর্খ জমীদার নহেন যে, চিরদিন যাত্রার দল চালাইবেন।

রাণীমা এ দিকে পান্নাকে মোটা করিবার ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। আট বৎসরের কন্যা হঠাৎ পূর্ণ-যৌবনা হইয়া উঠিতে পারে না, তবুও কে কোথায় কবে চেষ্টার ত্রুটি করিয়াছে?

পান্না যে এক দিন মোটা হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে রাণী-মার কোন সন্দেহ ছিল না; কিন্তু অপর বিষয়ের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার শরীরের রক্ত জল হইয়া আসিত।

পান্না প্রকৃতপক্ষে ছিল নীলকান্ত মণি !

তাই মানুষের শক্তির অধিক যে দৈবশক্তি, তাহারই উপর মন দিয়াছিলেন রাণীমাতা।

দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ পান্নার কোষ্ঠী দেখিয়া বলিল, এই বিবাহ হইবে, তবে কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ ; তবে গ্রহ প্রসন্ন হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। তাহারই একান্ত আবশ্যক।

গ্রহাচার্য্য বসিলেন বিধিমত গ্রহ-শান্তির জন্য। দুইটি নীলার আংটী আসিল। নিবেদন করিয়া পণ্ডিত বলিলেন, একটি কন্যা ধারণ করিবে, অপরটি পাত্র ; এবং পরস্পরের হাতে পরাইয়া দিলে ফল অবশ্যম্ভাবী !

রাণীমা'র মনে ছিল ঐখানেই বিষম খটকা। ভুবন যদি পান্নাকে দেখিয়া একবার 'না' বলিয়া বসে, তখন কি হইবে ?

অঙ্গুরী-বিনিময়ের ব্যাপারটি রাণীকে মহা চিন্তা-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। কি উপায়ে পান্না ভুবনের হাতে তাহা পরাইয়া দিবে ; আর ভুবন কি পান্নার হাতে পরাইয়া দিতে রাজী হইবে ?

দৈবজ্ঞ আবার ছক পাতিয়া বসিলেন। বহু হিসাব, বহু তর্ক-বিতর্কের পর তিনি বলিলেন, শনিবার-যুক্ত অমাবস্যার রাত্রিতে এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে শুভ ফল হাতে হাতে লাভ হইবে ; এবং সেই শুভদিন আগামী কালী-পূজার রাত্রেই পড়িয়াছে।

দেওয়ানজীর বুদ্ধির উপর রাণীমার ছিল অগাধ বিশ্বাস ; যদি তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা উপায় করিয়া দেন।

তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমাকে তিন দিনের সময় দিতে হবে ; মনে হয়, একটা উপায় বার করতে পারবো।"

দেওয়ানজীর ক্ষুর-ধার বুদ্ধিতে অঙ্গুরী-বিনিময়ের ব্যাপার কালীপূজার রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। সিদ্ধির কচুরী খাইয়া ভুবন যখন প্রায় হতচৈতন্য, তখন অন্ধকার ঘরে আসিয়া পান্না তাহার হাতে আংটী পরাইয়া দিল ; এবং বহু অনুনয় বিনয়ে ভুবনও পান্নার হাতে নীলার আংটীটি অবশেষে পরাইয়া দিল।

দৈবকে প্রসন্ন করিয়া রাণীর মন হাল্কা হইল। এখন কেবল বাকি রহিল পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা-বাসি। সে কার্য্য ত বিবাহের পরেও হইতে পারে।

মাঘ মাসে বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে তাহার উদ্যোগ-আয়োজনের আড়ম্বরের আর শেষ নাই। রাসবিহারী পূরাদমে উত্তরা-অভিমন্যুর আখড়া দিতে লাগিলেন। ভুবনের আনন্দের সীমা নাই।

তাহার সঙ্গীরা বলে, "তোর ভাই ভারি মজা, নিজের বিয়ের দিনে নিজেই করবি যাত্রা ! বাসর জাগবে কে ?"

সে বলিত, "দূৎ, তাই কি হয় ? সে দিন বিয়ে হবে না।"

"তবে ? তবে ?"

"পরের দিনে বিয়ে হবে।"

এই সকল বলার মধ্যে তাহার ছিল একটা অসামান্য নির্লিপ্ততা ; যেন তাহার বিবাহ নহে ; যেন অপর কাহারও সহিত জমীদার-কন্যার বিবাহ হইবে। সে শুধু মজা করিবার মালিক।

৬

শিশুর যেমন একটা ভোলানাথ-ভাব থাকে, আত্মপর সমান জ্ঞান ; যে যাহা বলে, তাহাকেই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় ; ভুবনমোহন যৌবনে পা দিবার উপক্রম করিলেও তাহার মনটি ছিল কিন্তু তেমনই অপরিণত। সে লোকের ঠাট্টাকে ঠাট্টা বলিয়া ধরিতে পারিত না। এমন কি, নিজের বিবাহের ব্যাপারখানাও সে সকল দিক দিয়া সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কেন যে তাহাকে যাত্রার দল হইতে ছাড়ান হইল, কেনই বা তাহার বিবাহ-ব্যাপারে অন্য লোকের এত উৎসাহ, এত আনন্দ, সে ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু এই অপরিণতির মধ্যে একটি গুণ তাহার আশ্চর্য্য রকম জন্মিয়াছিল ; সেটি নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে গোপন করিবার অসাধারণ ক্ষমতা। দেখিতে ছিল সে অতিশয় সুশ্রী। ঘটে বুদ্ধি না থাকিলেও চোখে এমন জ্যোতি ছিল যে, হাসিলে লোক মনে করিত, প্রতিভা ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছে।

লোক মনে করিত, বুদ্ধি হয় ত বা আছে, কিন্তু তাহাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে হৃদয়ের সরসতা। তাই সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। ঠাট্টা-বিদ্রূপকে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে। কলহ করিবার যাহার প্রবৃত্তিও নাই, শক্তিও নাই, তাহাকে ভোলানাথ বলিয়া মানুষ সহজেই স্নেহ করে, ভালবাসে।

সুন্দর দেহখানির অন্তরালে মনের দৈন্য এমনই করিয়া ঢাকিয়া গিয়াছিল যে, বন্ধুর দলও তাহাকে আর আঘাত করিয়া কথা কহিত না। তাহার উপর তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা সে নিজে সম্যক্ উপলব্ধি না করিলেও, আশ-পাশের লোক ভাল করিয়া জানিত যে, ভুবনমোহনের সহিত বন্ধুত্ব এক দিনে বিশেষ কাযে লাগিতে পারে।

মানুষ আর একটি গুণে মানুষের প্রতি আসক্ত হয়; ভুবনের সেই গুণটি ছিল পরিপূর্ণ মাত্রায়—তাহার কণ্ঠস্বর ছিল কোকিলবিনিন্দিত। একবার গান করিতে বসিলে সে সকল কথা ভুলিয়া যাইত; সহজ সরল সঙ্গীত তাহার কণ্ঠ দিয়া পাখীর গানের মত, নির্ঝরের পূত জলের মত স্বতই উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিত!

নিজের বিবাহের রাত্রিতে সে ত অভিনয় করিবে, কিন্তু তাহার পরিণীতা সে রাত্রি কি করিয়া কাটাইবে, এই চিন্তা তাহার শিশুমনের মধ্যে আলো-ছায়ার মত খেলা করিয়া যাইত। হঠাৎ একদিন তাহার মনে আসিল, পান্না যদি উত্তরা সাজে, তাহাতে ক্ষতি কি?

বিবাহের রাত্রিতে বধূ যাত্রা করিবে, এত বড় একটা পাগলের মত কথার অসঙ্গতি সে কিছুতেই ধরিতে পারিল না। শুধু অভিনয়ের উৎসাহ এবং মনোহারিত্ব তাহার মনকে জুড়িয়া বসিল।

সেই দিন খাইতে বসিয়া সে রাণীমাকে নিজের মনের সাধ ব্যক্ত করিয়া কহিল।

তিনি হাসিলেন; বলিলেন, "আমার পাগলা বেটা! তাই কি হয়, ভুবন! লোকে কি বলবে?"

ভুবন আবদার করিল, "উ—যা বলে বলুক—অন্য লোককে না ডাক্‌লেই হ'লো, অন্দরমহলে আমরা দুজনে তোমাদের শুনাব।"

রাণীমা বলিলেন, "তাতে আর আপত্তি কি? তা হ'লে তুমি রোজ রোজ ওকে কিছু কিছু ক'রে শেখাও।"

ভুবন বলিল, "তা আমি পারি, বেশ পারবো মা, আজ দুপুরে এক ঘণ্টা রিহার্শেল দেব!"

রাণীমা অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিলেন। এমনি করিয়া যাত্রা-অভিনয়ের অছিলায় যদি ভুবন পান্নাকে ভালবাসিয়া ফেলে, তাহা হইলে ত আর কোন ভাবনা নাই। তিনি বুঝিলেন যে, দৈবজ্ঞের গ্রহার্চ্চনার সুফল ফলিয়াছে। তাহা না হইলে, ভুবন সাধিয়া এই কথা বলে? যাহাকে কোন লোভ, কোন আসক্তির বস্তু দ্বারা কিছুতেই টানিয়া আনা যাইত না, সেই ভুবনের এ কি পরিবর্ত্তন! ধন্য দেবতার অপার দয়া তাঁহাদের উপর!

পান্নাকে ভুবন এতদিন ভাল করিয়া দেখে নাই। স্ত্রীজাতিকে কামনার দৃষ্টিতে অবলোকন করিবার প্রবৃত্তিও তাহার মধ্যে জাগ্রত হয় নাই। পান্নাও তাহাকে লজ্জা করিয়া—দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া লুকাইত।

কিন্তু দুপুরের রিহার্শেলে পান্নার পলাইলে চলে না। তাহাকে কাছে আসিয়া বসিতে হইল।

সেই ছোট্ট, কাল, কুরূপা মেয়েটিকে দেখিয়া ভুবনের সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের যে আকর্ষণ, তাহা যেন জন্মের পূর্ব্বে গভীর বৈরাগ্যের তলায় তলাইয়া গেল। ক্ষণেকের জন্য ভুবন দিশাহারা হইয়া বসিয়া থাকিয়া এক দৌড় মারিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

রাণীমা মনে করিলেন, তাহার লজ্জা হইয়াছে।

কিন্তু ভুবনকে আর কোথাও পাওয়া গেল না। তখন দেওয়ানজীর মাথার টনক নড়িল। অতগুলি টাকা, এতবড় জোগাড়যন্ত্র সব ব্যর্থ করিয়া দিবে ঐ একটা বৎসর পনর ষোলর 'ছোঁড়া'!

দিকে দিকে লোক ছুটিল, বিশ-ক্রোশ পথ উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ত রেল ধরিবার উপায় নাই!

গ্রামে গ্রামে ঢোল দেওয়া হইল, যে ভুবনকে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ রাজা এক শত টাকা বকশিস্ দিবেন। তাই দেখিতে দেখিতে গ্রামে গ্রামে সাজ সাজ রব উঠিল। ধরা চাই। নৈলে রাজা আমাদের কি বলবে?

লোক আসিয়া সংবাদ দিল, ইষ্টিশানের পথে সে যায় নাই।

তবে? দেওয়ানজী মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, তবে সে গেল কোথায়? পাওয়া যাবেই যাবে, আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু—

জমীদার দেওয়ানজীর বুদ্ধি দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মন হইতে না পাওয়া যাইবার সংশয়ের অন্ধকার এক তিলও কমিল না।

রাণীমা গ্রহাচার্য্য পণ্ডিতকে সংবাদ দিলেন। ত্রিপুণ্ড্র মিশ্র টিকিতে ফুল বাঁধিয়া আসিয়া বলিলেন, "রাণীমা, এটা আমি অনুমান করেছিলাম। শনির শেষ! প্রাণ নিয়ে টানা-টানি। ফিরে সে আসবেই এক দিন, যদি প্রাণে বেঁচে থাকে!"

রাণীমা বলিলেন, "আপনি জিনিষ হারালে ব'লে দিতে পারেন; ছক্ পেতে বলুন, সে গেছে কোন্ দিকে—মনে করলে কি না পারেন আপনি?"

ত্রিপুণ্ড্র মিশ্র হাসিলেন, "সে কথা সত্য মা; কিন্তু এ যে ঘোর কলি, সে বিবেচনাও ত করতে হবে?"

ত্রিপুণ্ড্র মিশ্র গণনা করিয়া বলিলেন, "প্রথমে সে উত্তরে গেছে, তাহার পর পূর্ব্বে—দক্ষিণাবর্ত্তেই এখন স্বয়ং মা কালীর আশ্রয় নিয়েছে, যত দিন সেখানে, তত দিন কে তাকে পায় মা? তবে পশ্চিমমুখে ফিরলেই তাকে এ দিকে আসতেই হবে! এই সময় থেকে, দু'দণ্ড, দু'দিন, দু'মাস, দু'বৎসরের মধ্যে মা কালীর ইচ্ছা হ'লেই তাকে পাওয়া যাবে—"

রাণীমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু জিনিষ হারালে ত আপনি ব'লে দেন, কোথায় আছে—তবে?"

বক্র হাসি হাসিয়া মিশ্র বলিলেন, "এ কি জিনিষ, মা? এ যে সারের সার মানুষ! শুক্র আছে ও ঐরাবত বর্গে, বেঁচে থাকলে সঙ্গীত-বিস্তায় হবে দ্বিতীয় তান্‌সেন! মা কালীকে প্রসন্ন করুন, সমারোহ ক'রে তাঁর পুজো দিলেই—"

বাকি কথা শেষ না করিয়া মিশ্র দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটি স্নিগ্ধ-মধুর হাস্য করিলেন।

দুই তিন দিন পরে ভুবনকে রাজ-সরকারের লোক বাঁধিয়া আনিল। সে সকলের সহিত মার-ধোর করিয়াছে এবং যখন তাহার হাত-পা বাঁধা হইল, তখন সে নিজের চুল ছিঁড়িয়াছে, নিজের হাত কামড়াইয়াছে—সে জমাদারের পিঠে এমন এক কামড় দিয়াছে যে, তাহার পিঠ ফুলিয়া ঢাক!

এই অবস্থায় তাহাকে দোয়ে তালা দিয়া রাখা ভিন্ন উপায় কি? দেওয়ানজী বলিলেন, "কিন্তু এ সব খবর বাইরে যাওয়া ভাল নয়, অন্দর মহলের একটা ঘরেই আটক ক'রে রাখা উচিত। তাকে যে তালা-চাবি বন্ধ ক'রে রাখা হচ্ছে, সে খবর বাইরের লোক না জানাই ভাল। বিয়ে হয়ে গেলে ও নিজের লোক হয়ে যেত; কিন্তু তার আগে"—দেওয়ান মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "মহারাজ, আইন বড় কঠিন পাল্লা; ও উকীলদের ভাষ্যি মত—সাদা দেখতে দেখতে কালো হয়ে যায়; আবার এক পলকে কালো সাদা হয়—আমার কোন বিশ্বাস নেই—"

ভুবন পাগল হইয়াছে, এ রটনা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাহার মাথা ঠিক ছিল; কিন্তু এক দিন যেমন নবীন গুরুর উপর তাহার জিদ্ চড়িয়াছিল, তেমনি এবার সে বিবাহ করিবে না, এই তাহার ছিল অটল প্রতিজ্ঞা।

রাণীমা কাছে যাইতে সাহস করিতেন না; কারণ, প্রথম দর্শনে সে এমন একটা ভীষণ চীৎকার করিয়াছিল, যাহাতে সকলেই বুঝিয়াছিল যে, কাছে পাইলে তাঁহার মাথা চিবাইয়া খাওয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের নহে!

৮

শুধু বিম্‌লীর উপর ছিল সে সন্তুষ্ট। তাহাকে ডাকিয়া বলিত, "কত দিন রাখবে আটক ক'রে এরা? যদি মা কালীর মর্জ্জি হয় ত ঐ দোরে শেকল দেওয়াই থাকবে—খাঁচা থেকে পাখী উড়বে। জানিস্ বিম্‌লী, মা আমার বাজি জানে!"

রাণী-মা দৈবজ্ঞ মিশ্রের কথা মনে করিয়া বলিতেন, "ঠিক ত' কথা খেটেছে! সত্যিই কি ভুবন তবে মা কালীর আশ্রয় পেয়েছে?"

বিম্‌লী দাসী কিন্তু ও-সব কিছুই মানিত না। সে চুপি চুপি রাণীমার কাণে কাণে কহিল, "মা, ঠিক এমনিটি হয়েছিল আমাকে নিয়ে আমার সোয়ামীর। আমার মাসী কিন্তু কোত্থেকে এক ওষুধ শিখে এলো; খাইয়ে দিতেই কি একেবারে সব বদ্‌লে গেল!"

রাণী-মা চক্ষু বড় বড় করিয়া বলিলেন, "তুই জানিস্?"

বিম্‌লী হাসিল, "জানব না আমি? নিজে গিয়ে সেই গাছের শিকড় তুলে এনে তেরটা গোলমরিচের সঙ্গে শিলে বেটে, মিছরীর পানার সঙ্গে তেঁতুল গুলে খাইয়ে দিলেই হলো!—তুমি দেখো মা! মানুষ কি বদলে যায়! শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাকে চোখের আড়াল করতে পারতো না।"

বলিতে বলিতে দীর্ঘ দিনের স্বামীর শোক, বিম্‌লী দাসীর নূতন করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

রাণী-মা তাহার সহিত সহানুভূতি করিয়া বলিলেন,—"আহা, ম'রে যাই!" তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"মেয়েমানুষের কপাল!"

মঙ্গলবার সকালে পান্নাকে সঙ্গে করিয়া বিম্‌লী গিয়া রাজবাড়ীর ফুলবাগান হইতে সেই শিকড় তুলিয়া আনিয়া এলো চুলে শিলায় তেরটি গোলমরিচের সহিত বাটাইয়া মিছরীর পানা করিয়া তাহাতে তেঁতুল মিশাইল। তাহার পর সে ভুবনের ঘরের দিকে গেল।

ভুবন তখনও উঠে নাই। সে দোর খুলিতেই ভুবন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

বিম্‌লী ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বলিল, "রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় নি?"

ভুবন মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

"বলছি বাবু—" বিম্‌লী ভারি মোলায়েম কণ্ঠে অনুনয় করিয়া কহিল—"তা ত শুনবে না?"

ভুবন বলিল, "কৈ, আমি ত না বলিনি, কি বলছিস্, বল্ না?"

"এক দিন খেয়ে দেখ," সে বলিল, "এলো চুলে এলো কাপড়ে কুমারী মেয়ে হওয়া চাই কি না! তা বাপু, এ বাড়ীতে পান্না ছাড়া আর কুমারী কে আছে? এক গেলাস সরবৎ দিলে ত তোমার জাত যাবে না? আর তোমার রং কালো হয়ে যাবে না।—তুমি পুরুষ, যদি জোর ক'রে বল যে, বে' করবো না—ত কে তোমাকে ধ'রে ভদ্দর ঘটাবে?—ও তোমার মিছে ভয়।"

ভুবন সব শুনিয়া বলিল, "আমি কি বলেছি যে, ওর হাতে খাব না? খুসী আমি এখন বিয়ে করব না; ওরা জোর করবে কেন?"

বিম্‌লী বলিল, "এই ত কথা বাপু! আচ্ছা, তুমি খেয়ে দেখ, রাত্তিরে তোমার কি সুন্দর ঘুম হয়—আন্‌ব তৈরী ক'রে?"

"নিয়ে আয়"—ভুবন বলিল।

বিম্‌লী বলিল, "দেখো, বিছানা ছেড়ে উঠতে নেই; আমি যাব, আর দিদিমণিকে সঙ্গে ক'রে আন্‌বো—সব ঠিকঠাক্ আছে।"

"কিছুক্ষণ পরে, পান্না বিম্‌লীর সহিত অতিশয় ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকিল, হাতে তাহার প্রকাণ্ড কালো পাথরের এক গ্লাস সরবৎ।

ভুবন কোন কথা না কহিয়া তাহা চোঁ-চোঁ শব্দে খাইয়া—বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার নাক ডাকিয়া উঠিল।

বিমলী আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিতে ছুটিতে রাণীমা'র কাছে গিয়া বলিল, "মা, মা, দেখ্‌বে আসুন!—ওষুধ ধ'রে গেছে,—নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে!—"

রাণীমা বিম্‌লীর কৃতিত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন।

৯

ভুবন যখন তিন দিন পরে উঠিল, তখন আর সে-মানুষ সে নাই। সম্পূর্ণ ভেড়া বনিয়া গিয়াছে।

বিম্‌লী তাহাকে ভাল ভাল খাবার আনিয়া দিল; সে তাহা গো-গ্রাসে খাইল। তাহার পর বিম্‌লী বলিল, "যাও না, একটু বাইরে বেড়িয়ে এস—ঐ গোলাপ-বাগানে—"

ভুবন বলিল, "তুই সঙ্গে চল্—"

"ছিঃ, অমন কথা কি বলতে আছে? আমি কেন যাব?"

সকল-বিস্ময়তের মত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ভুবন বলিল, "তবে কে যাবে?"

বিম্‌লী হাসিয়া বলিল, "তুমিই বল।"

ভুবন বলিল, "পা, পা পান্না?"

"এই ত, এই ত"—বলিয়া বিম্‌লী হাসিয়া উঠিল।

সে চুপি-চুপি পান্নাকে ডাকিয়া ভুবনের সঙ্গে গোলাপ-বাগানে বেড়াইতে দিয়া আসিল।

ভুবন বাগানের এক যায়গায় ব্যোম-ভোলানাথের মত দাঁড়াইয়া আছে—আর পান্না তাহার হাতে গোলাপের তোড়া বাঁধিয়া দিতেছে!

ছাদ হইতে রাণীমা আর রাজা বাবু এই দৃশ্য দেখিয়া কিছুতেই আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

সেই দণ্ডে বিম্‌লী এক শত টাকার পুরস্কার পাইল।

* * * *

দেখিতে দেখিতে ভুবনমোহন পূর্ণ ভোলানাথত্ব প্রাপ্ত হইল। ভুবন সম্পূর্ণ ক্ষেপিয়া গেল। কিন্তু সে শান্ত-সমাহিত;

কাহারও উপর রাগ নাই, দ্বেষ নাই; শুধু দুশ্চিন্তা-কাতর মুখে বলে, "ওগো, আমাকে যে সপ্তরথীতে ঘিরেছে, আমি যে পথ জানিনে, তোমরা কি? তোমরা কি? তোমরা কি?"

"ভুবন, কি ব'লছ?" সকলে জিজ্ঞাসা করে।

সে সর্ব্ব-বিস্মৃতের মত দুই চক্ষু বড় বড় করিয়া কহে;— "পথ দেখিয়ে দিতে পার?"

*   *   *   *

কত মাঘ মাস আসিল, গেল। এখনও ভুবনমোহন বিরামপুরের রাজবাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাহাকে পায়, জিজ্ঞাসা করে;—"তোমরা কি? তোমরা কি? তোমরা কি?—পথ দেখিয়ে দিতে পার?"

সে রূপ নাই, সে যৌবন নাই,—শুধু কণ্ঠটি আছে অক্ষুণ্ণ! —সেই কণ্ঠে আজো সে ভোরের বেলায় তাহার শ্রীকৃষ্ণকে ডাকে।

"উঠ উঠ হে কানাই!"

ভুবনমোহনের কপালে কানাই কি আর জাগিবেন!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাবুর পূজা

রায় নগরের রায়,—
এক দিন যার প্রবল প্রতাপে কাঁপিত মানুষ হায়!
লক্ষ টাকার ছিল জমীদারী
পরিজনে ভরা সুবিশাল বাড়ী,
কত সমারোহ পূজা-পার্ব্বণ,
অতিথি-সেবার নিতি আয়োজন —
সব গেল মামলায়,
ঠাট্‌ঠানি তার রক্ষা করা যে আজিকে হয়েছে দায়!
গেছে দাস-দাসী যত পরিজন,
সুখ উৎসব কল-গুঞ্জন,
সে বিশাল পুরী বিষাদ-মলিন
খ'সে ধ'সে প'ড়ে হয়েছে শ্রীহীন!
আজিকার জমীদার,—
মরমে মরিয়া আছে মৃতপ্রায় এক কোণে প'ড়ে তার।
কোনমতে পূজা হ'ল গতবার
তাও সম্ভব হবে না এবার,
বেদনা-মলিন বাবুর বদন
মুখে হায় তাঁর না সরে বচন,
চেয়ে মণ্ডপ-পানে,—
ছল-ছল করে নয়ন গত কথা জাগে প্রাণে!

"পূজার বাকী যে আর দশ দিন—"
বাবু ভেবে ভেবে শয্যায় লীন,
মনে ওঠে তাঁর শুধু বার বার—
"আমি কলঙ্ক বংশে আমার,
রায়দের সম্মান,—
আমারি হস্তে চিরতরে আজ হয়ে যাবে অবসান।"

বৃদ্ধ সে এক জন,
হেনকালে আসি বাবুর নিকটে ধীরে করে নিবেদন।

"তব গোষ্ঠীর মোরা সরকার,
গঠিত এ দেহ অন্নে তোমার—
হস্তে অর্থ থাকিতে আমার
হবে না বন্ধ বাবুর পূজার,
এই লও টাকা—কর পূজা মা'র
আসিলে সুদিন শুধিও আবার।"—
ঝরিল রে অবিরল
চারিটি নয়ন নির্ঝর সম—ঝর্ঝর আঁখিজল!

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

জাগরণ

১

সবে মাত্র স্নান সারিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার রাংচিতার বেড়াঘেরা উঠানটিতে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল, "বাড়ী আছেন, ঠাকুর মশায় ?"

স্বর চির-পরিচিত শ্রীনাথ মুদীর। কাযেই ভট্টাচার্য্য উত্তর দিতে একটু ইতস্তত করিতেছিলেন। পত্নী ভাঙ্গা দাওয়া হইতে নামিয়া আসিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিলেন, "মুখপোড়া ভোর-বেলায় একবার এসেছিল। চট ক'রে ঘরে এসে ঢোক, ডেকে ডেকে আপনিই চ'লে যাবে'খন।"

ভট্টাচার্য্য বিহ্বলনেত্রে বেড়ার পানে চাহিয়া দাওয়ায় উঠিতে-ছিলেন, শ্রীনাথ বেড়ার ফাঁক হইতে দেখিতে পাইয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "বলি, উত্তরটা দিতে ঠাকুর মশায়ের 'ছেরোম' হয় না কি ? —আমি ব্যাটা মরছি সকাল থেকে ডেকে ডেকে।—ওগো!— ঠাকুর,—ঘরে ঢ'কো'খন, আগে একবার হেথায় এস।"

অগত্যা ভট্টাচার্য্য ফিরিয়া আসিয়া বেড়ার আগড়টা ঠেলিয়া শ্রীনাথের সম্মুখে মুখখানি চূণ করিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীনাথ বলিল,—"চাল-ডালের দাম চুলোয় যাক্,—ষষ্ঠী-মনসা-পূজোটার উবগারও কি তোমার দিয়ে হবে না ? আর ছ'মাসের পাওনাটা আমার কত হয়েছে—একবার দেখ দেখি—" বলিয়া একখানা চিরকুট বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল।

ভট্টাচার্য্য কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "দেখতেই ত পাচ্ছ বাবা,— চালে খড় নেই—পরনে কালো ত্যাকড়া—"

শ্রীনাথ বলিল, "তা ত দেখছি—চিরকাল ঐ এক ভাব। তা যাক্,—আজ ষষ্ঠী-পূজোটা ক'রে দেবে এস,—বৌ উপোস দিয়ে আছে।"

ভট্টাচার্য্য কাতর স্বরে বলিলেন, "পূজো করতে হ'লে যে বড্ড দেরী হয়ে যাবে।—বেলা তিনপর হ'লে পাঠশালা বসাব কখন্ রে!"

শ্রীনাথ হাসিয়া বলিল, "পূজোর দিনে পাঠশালায় ছুটী দিতে পার না, ঠাকুর ? তুমি যেমন বোকা,—দেয় ত মোটে ৫টি টাকা মাইনে—তারি জন্তে এত।"

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন, "হেঁ—হেঁ—হেঁ—যা বলেছিস বাবা। কি করি বল—জমীদার ত ন মাসে ছ মাসে একবার বাড়ী আসে! বাঁধা বরাদ্দ মাইনেটা—হেঁ—হেঁ—হেঁ। আচ্ছা চল,—তোর বাড়ীর পূজোটাই আগে সেরে দিই।" বলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পত্নী বলিলেন, "পূজো ক'রে ফিরতে সেই ত বেলা আর থাকবে না,—এই বেলা চারটি পান্তাভাত খেয়ে যাও।"

ভট্টাচার্য্য কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "দূর পাগল— তা কি হয় ?"

পত্নী বলিলেন, "উঃ, ভারি আমার পণ্ডিত রে! শুদ্দুরের বাড়ী আবার পূজো ? জান না,—ঠাকুর ওদের বাড়ী পা ধুতেন না ?"

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন "পা না ধুলে—পেট চলে কৈ ? কাল রাত্তিরেই ত বলছিলে—চালার উত্তুর ধারটা দিয়ে জল পড়ছে।—দু আঁটি খড় দিয়ে ওখানটা যে ছাইয়ে নেব—সে পয়সাও নেই। খুকী কদিন থেকে বায়না ধরেছে—একটা জামা চাই। শ্রীনাথের ধারটাও হিসেব করলে—থই পাওয়া যায় না।"

পত্নী বলিলেন, "দেখ, জাতও যায়—পেটও ভরে না—অমন কায করার চেয়ে উপোস দিয়ে মরা ভাল।"

ভট্টাচার্য্য তাঁহার ক্রীড়ারত কন্তার পানে চাহিয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, "সে না হয় তুমি আমি বুঝি,—কিন্তু ও অবুঝটা ত বোঝে না।"

পাঁচ বৎসরের কন্যা লীলা ইট দিয়া খেলাঘর বাঁধিয়া—ভাঙ্গা খুরি-মুচি সাজাইয়া উঠানের এক প্রান্তে খেলা করিতেছিল। চকিতের জন্ম পিছন ফিরিয়া দেখিল,—পিতা তাহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। চক্ষু দুইটি তাঁহার জলভারে টলটল করিতেছে। বালিকা কি বুঝিল, জানি না,—ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কাঁদছিস কেন, বাবা! আমার রংওলা জামা চাই না।"

গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "দিলি—দিলি ছুঁয়ে ? মুখপুড়ী কোথাকার। দাঁড়াও, একটু গঙ্গাজল মাথায় ছিটিয়ে দিই। যত জ্বালা হয়েছে আমার—" বলিতে বলিতে তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভট্টাচার্য্য কন্তার মাথায় হাত রাখিয়া সস্নেহে কহিলেন, "যাও মা, খেলা কর গে। আজ নৈবিদ্যির চালকলা এনে দেব'খন।"

মায়ের তাড়নায় লীলার মুখখানি ভার হইয়াছিল, পিতার আদরে আবার চক্ষু দুটাই আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নাচিতে নাচিতে সে খেলাঘরের মধ্যে গিয়া বসিল।

মাথায় গঙ্গাজল ছিটাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "কত দক্ষিণে নেবে ?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"যা দেয়।"

হাত নাড়িয়া গৃহিণী বলিলেন, "যেমন ভাল মানুষ তুমি, তেমনি সবাই তোমায় ঠকায়। ন'খুড়ো কি দক্ষিণে নেয়, জান? লক্ষ্মীপুজোর ছ আনা; ষষ্ঠীর চার পয়সা,—সত্যনারায়ণের চার আনা, মনসা-পুজোর ছ পয়সা,—শিব-রাত্তিরের—"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ওরা আমায় ছ পয়সা হিসেবে দেয়।"

গৃহিণী কি বলিবার উপক্রম করিতেই ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আজ কিন্তু চার পয়সার কম নিচ্ছি না। হেঁ—হেঁ—"

গৃহিণী বলিলেন, "এই নাও গামছা, চালকলা বেঁধে এনো। আর দেখ, পুজো সংক্ষেপে সেরে সকাল-সকাল বাড়ী এসো।"

"আচ্ছা" বলিয়া ভট্টাচার্য্য বাহির হইয়া গেলেন।

জমীদারবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন,—বৈঠকখানার জানালাগুলি খোলা—জন কয়েক লোক ঘর-বারান্দা পরিষ্কার করিতেছে। কৌতূহলী ভট্টাচার্য্য উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন—বাড়ীর উঠানটিও পরিষ্কৃত হইয়াছে—জনমজুরগুলা লিচু-গাছের ছায়ায় বসিয়া তামাকু সেবনের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া তাহারা হাত তুলিয়া প্রণাম করিল।

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু বাড়ী এসেছেন নাকি?"

এক ব্যক্তি বলিল,—"না ঠাকুর,—আজ আসবেন।"

ভট্টাচার্য্যের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। মনে মনে বলিলেন,—'এখুনি সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি! যাই পুজোটা চট্ ক'রে সেরে পাঠশালা বসাই গে,—নৈলে পাঁচ টাকার দফা রফা।"

২

এই পল্লীতে একটি ছোটখাট মেয়ে-পাঠশালা ছিল। পুরুষানুক্রমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা ছিলেন তাহার একমাত্র পণ্ডিত। তা বিদ্যা তাঁহাদের যাহাই থাকুক না কেন,—পণ্ডিত ছিলেন সকলেই। মাহিনা ছিল জমীদারের বরাদ্দ পাঁচটি টাকা; তাহার সঙ্গে যোগ হইত মেয়েদের পূজা-পার্ব্বণে আনিটা দুয়ানিটা দক্ষিণা ও কিছু কলামূলা। বাজার 'মাগ্যি-গণ্ডার' ছিল না, সুতরাং খড়োচালায় মাথা গুঁজিয়া—পেটের ভাত ও পরনের কাপড় কখানির সংস্থানের জন্য মাথা ঘামাইতে হইত না। ভট্টাচার্য্যের সংসারে একমাত্র কন্যা ও গৃহিণী ব্যতীত আর কেহই ছিল না।

কিন্তু উপস্থিত দিনকাল খারাপ পড়িয়াছে অর্থাৎ যাহাদের হাতে কিছু পয়সা জমিয়াছে, তাহারা পুত্র-পরিবার লইয়া সেই যে সহরমুখো হইত, আর বৎসরান্তে হয় ত একবারও এই বন-জঙ্গলে পদার্পণ করিতে চাহিত না। নিতান্ত কেহ বা মেয়েদের তাড়ায় অনিচ্ছাসত্ত্বে আম-কাঁঠালের তত্ত্ব লইতে এক একবার গ্রীষ্মকালে বাড়ী আসিত ও সেই সময়ে পল্লী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া পল্লীবাসীদের অজ্ঞতা-নিবারণকল্পে প্রাণপণে সহায়তা করিত। পল্লীবাসের উপকারিতা ও সহরের নানাবিধ অসুবিধার কথাও হয় ত দুঃখচ্ছলে বলিত;—কিন্তু বর্ষার বারিধারা ঝরিয়া পড়িবার মুহূর্ত্তেই সভয়ে পানাভরা পুকুরের পানে চাহিয়া—বনজঙ্গলের পাশ কাটাইয়া—ভগ্নপ্রায় দুয়ারে তালা লাগাইয়া—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া সহসা এক দিন অন্তর্দ্ধান হইয়া যাইত। পল্লীবাসীরা বাবুদের এই দুঃখকে মৌখিক বিলাস ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। কিন্তু যাহার বিলাস, তাহার থাকিলে দুঃখ কিসের ছিল? এ বিলাস যে পুড়াইয়া মারিত তাহাদেরই—যাহাদের ম্যালেরিয়া, মশকদংশন অম্লানবদনে সহ্য করা ছাড়া পথ নাই, যাহাদের গ্রামপ্রান্তের বনলতা-ঘেরা ভগ্ন কুটীরখানি ও কয়েক বিঘা জমী ছাড়া অন্য কোন সমস্যার সমাধান ছিল না এবং যাহাদের আধিব্যাধি-ক্লিষ্ট অর্দ্ধমৃত জরাজীর্ণ দেহগুলি শীতে, শোকে, গ্রীষ্ম-বর্ষায় অর্দ্ধাশনে অনশনে অর্থাভাবে দিন দিন মৃত্যুপথের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাবুরা গ্রাম ছাড়িয়াছেন;—গ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে ভাঙ্গিয়া খসিয়া মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছে। পাঠশালা আছে—চালে খড় নাই; ছাত্রী আছে—বেতন যোগাইতে পারে না। যাহারা যোগাইতে পারে—তাহারা সহরে। পাড়ায় পাড়ায় বড় বড় পুষ্করিণী পানা-জঙ্গলে ভরিয়া মজিয়া উঠিতেছে। বড় বড় অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া দেবলপুরীর বিশালস্তূপের মত কোন্ ভবিষ্যদ্বংশীয়দের প্রত্নতত্ত্বকে অপরূপ রূপ দিয়া ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করিবে, কে জানে? যাহারা আছে, গ্রামের মমতা তাহাদের বাঁধিয়া রাখে নাই; বাঁধিয়া রাখিয়াছে উদর পূরণের ও মাথা গুঁজিবার সমস্যা।

তা যাহাই হউক, ক্ষুদ্র পাঠশালাটি চলিতেছিল। কয়েকখানি আধভাঙ্গা বেঞ্চিতে গুটি ১০।১২ জীর্ণ-শীর্ণ মেয়ে ছেঁড়া বই বগলে করিয়া প্রত্যহ আসিয়া বসে। ভাঙ্গা টেবলটার উপর গুরু মহাশয়ের টাটকা নোনা-আতার বেতগাছিও সময়ে সময়ে আস্ফালন করিয়া অদ্ভুত শব্দ করিতে থাকে। পাঠশালার পাশে সে সময়ে ভগ্ন পুষ্করিণী-সোপানে বাসন মাজিতে মাজিতে কোন পল্লীনারী হয় ত চমকিয়া জলের পানা সরাইয়া দিতে দিতে অস্ফুটস্বরে বলে, "মুখপোড়ার বেতের শব্দ বুঝি?" তার পর আপনমনে বাসনগুলি ধুইতে থাকে।

সে দিন এই বেতের শব্দে তিন চার জন কৌতূহলী দর্শক হুড়মুড় করিয়া পাঠশালার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

গুরুমহাশয় নিমীলিত-নয়নে অভ্যাস বশতঃ টেবলটার উপর বেত্রাস্ফালন করিতেছিলেন। সম্মুখের বেঞ্চে দুইটি মেয়ে বসিয়া শ্লেটে কি হিজি-বিজি কাটিতেছিল, তাহাদের পশ্চাতের বেঞ্চিতে চার জনে মিলিয়া ঘাটের সোপান হইতে সদ্য আহরিত বকুল-ফুল লইয়া নিঃশব্দে কাড়াকাড়ি করিতেছিল এবং সর্ব্বপশ্চাতের বেঞ্চের কয়জন আগাডুম-বাগাডুম খেলিতেছিল।

উপরের চালার স্থানে স্থানে ছিদ্রময়। তাহারই এক স্থান হইতে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের একটি তীক্ষ্ণ কিরণ-রেখা তির্য্যক্‌গতিতে গুরুমহাশয়ের টেবলটার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মৃদু বাতাসে চালার খড়কুটা এখানে ওখানে উড়িতেছে।

আগন্তুকরা সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, বালিকারা ভীত হইয়া ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিল।

ইহারই মধ্যে সুপুষ্ট নধর দেহকান্তি যাঁহার, তাঁহার হাসিটা যেন আর থামিতে চাহে না।—স্তম্ভিত নির্ব্বাক্ পণ্ডিতের পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "বাঃ, বাঃ—তোফা! পিতাঠাকুর মহাশয় কি সুন্দর ব্যবস্থাই ক'রে গেছেন!—কি বল, ভট্‌চায!"

'ভট্‌চায' ত তখন একবারে নাই।

তিনি পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "চালা ত দেখছি শতছিদ্র, বর্ষাকালে কি ক'রে পাঠশালা বসে?"

এতক্ষণে পণ্ডিতের মনে হইল, সম্মুখের প্রশ্নকর্ত্তা তাঁহার প্রভু অন্নদাতা। ইঁহার পদার্পণে আজ পাঠশালা-গৃহ ধন্য হইয়াছে।

কিন্তু উপযুক্ত সম্মান ত দেখান হয় নাই।

পণ্ডিত আর কালবিলম্ব করিলেন না। তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও ইংরাজী ধরণে সেলাম করিতে গিয়া উঁহাদের হাসির মাত্রাটা অকারণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। মেয়েগুলি কিন্তু উঠিল না, আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

অপ্রতিভ পণ্ডিত আপন ত্রুটি সারিয়া লইয়া, সরোষে বেত্র তুলিয়া হাঁকিলেন,—"এই ও—এস্‌ট্যাণ্ড অপ্।"

মেয়েগুলি উঠিল।

পণ্ডিত আবার হাঁকিলেন, "বল—'হে বিভু তোমারে নমি জুড়ি দুই কর'।"

অমনই গ্রামোফনে দম দেওয়ার মত মেয়েগুলি বিচিত্রসুরে আবৃত্তি করিল,—'হে বিভু তোমারে নমি জুড়ি দুই কর।'

জমীদার হাসিতে হাসিতে তাহাদের থামাইয়া পণ্ডিতকে কহিলেন, "থাক, থাক, খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। কৈ, বললে না ত—বর্ষাকালে কি ক'রে পাঠশালা বসে?"

পণ্ডিত বলিলেন, "আজ্ঞে, পাঠশালা ত বসে না।"

"—বসে না? কেন?"

পণ্ডিত পূর্ব্ববৎ বিনীত হাস্যে কহিলেন, "যে 'ম্যালোয়ারী', বসবে কোত্থেকে?"

"—আপনার চলে কি ক'রে?"

"—চলে কি আর—চালিয়ে নিতে হয় কোন রকমে।"

জমীদার তাঁহার অনেক পার্শ্বচরের পানে চাহিয়া কহিলেন, "বেশ Retort দিচ্ছে ত! একে আমাদের পরিষদে স্থান দিলে বেশ মজা হয়, কি বল?"

সে বলিল, "ভারী সরেশ লোক,—যাকে বলে বাঘমার্কা যোয়ান ট্যাবলেট।"

জমীদার হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ পণ্ডিত, তোমার পাঠশালা দেখে বড় খুসী হয়েছি। ওবেলা আমার ওখানে যেও। বুঝলে?"

পণ্ডিত খুসী হইয়া ঘাড় দোলাইয়া কহিলেন, "নিশ্চয় যাব, নিশ্চয় যাব।" পরে মেয়েদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "যা সব, বাড়ী যা, আজ তোদের ছুটী। কালও ছুটী রৈল,—জমীদার বাবু এসেছেন ব'লে, বুঝলি?"

মেয়েরা কোলাহল করিতে করিতে চলিয়া গেল।

৩

সন্ধ্যাবেলা বাহিরের বৈঠকখানায় পুরাদমে মজলিস বসিয়াছে। একটা হারমোনিয়ম বহুক্ষণ হইতে এলোমেলো সুরে বাজিতেছে, তবলায় চাঁটি পড়িতেছে তেমনই এলো-পাথাড়ি, আর উচ্চ হাস্য-ধ্বনিতে ঘরখানি মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ভট্টাচার্য্য আসিয়া কক্ষদ্বারে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভিতরে ঢুকিতে সাহস হইল না।

মোটা তাকিয়া ঠেস্ দিয়া স্ফীতোদর কয়েক জন তাস খেলিতে-ছিলেন। তাঁহাদেরই অট্টহাসি মাঝে মাঝে কক্ষ বিদীর্ণ করিতে-ছিল। জমীদার এক প্রান্তে একটা বালিসের উপর কাত হইয়া কাচের গ্লাসে লোহিতবর্ণ ফেনপুষ্পিত পানীয় লইয়া চক্ষু মুদিয়া পরম আরামে পান করিতেছিলেন। তাঁহার পাশে একটা রোগা গোছের লোক নানা বিকৃত মুখভঙ্গী সহকারে তবলাটায় প্রাণ-পণে চাঁটি মারিতেছিল।

জমীদার বাবুর সম্মুখে থালা-ভরা—লম্বা গোল কি সব জিনিষ সাজান রহিয়াছে, দূর হইতে ঠিক

গেলাস শেষ করিয়া জমীদার চক্ষু চাহিলেন। দ্বারপ্রান্তে সঙ্কুচিত ভট্টাচার্য্যের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিলেন, "আরে—এস—এস ভট্চাষ, দাঁড়িয়ে কেন, ব'স।"

তথাপি ভট্টাচার্য্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। খালি পায়ে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন—পায়ে ধূলাও জমিয়াছে প্রচুর।

জমীদার পুনরায় ভক্তিভরে আহ্বান করিলেন। অমনই চতুর্দ্দিক হইতে 'আসুন! আসুন' রবে বিকট চীৎকার উত্থিত হইল।

ভট্টাচার্য্য ফরাসের এক প্রান্তে পা মুছিতেছিলেন; দেখিতে পাইয়া সমবেত লোকগুলা তেমনই বিকট চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল ও তাঁহার পায় হাত দিয়া খাবলাইতে খাবলাইতে সেই ধূলাটুকু নিঃশেষে মুছিয়া লইয়া আপনাদের সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিল।

ভট্টাচার্য্যের হাতে একটি ক্ষুদ্র শালপাতার ঠোঙ্গা। তিনি ইহাদের হুড়াহুড়ি হইতে সেটাকে বাঁচাইবার জন্ম হাতটি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিলেন।

জমীদার হাসিয়া বলিলেন, "দূর শা—সব ধূলো চেটে মেরে দিলি! এই জগাই মাধাই উদ্ধার হবে কিসে?"

পারিষদদল আপন আপন যায়গায় গিয়া বসিল। ভট্টাচার্য্য তাঁহার উর্দ্ধোত্থিত হাতটি জমীদারের সম্মুখে আনিয়া নামাইলেন ও হাসিয়া বলিলেন, "আপনার জন্মে গিরিধারীর কিছু প্রসাদ এনেছি, বাবু।"

জমীদার ভক্তিগদগদ চক্ষু কপালে তুলিয়া করুণকণ্ঠে কহিলেন, "এনেছ, এনেছ প্রভু? দাও—" বলিয়া হাত পাতিতেই ভট্টাচার্য্য ঠোঙ্গাটি জমীদারের হাতে দিয়া আর একবার হাসিলেন।

ঠোঙ্গার স্পর্শে জমীদারের ভক্তিভাব কাটিয়া গেল। কহিলেন, "এ কি ভট্চাষ, বেলে সন্দেশ?"

ভট্টাচার্য্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ্ঞে বাবুজি, ওই সন্দেশই ত ঠাকুরের ভোগে দেওয়া হয়।"

জমীদার কহিলেন, "কেন, ঠাকুর ব্যাটা বুঝি ভাল সন্দেশ খেতে জানে না? বাঃ বাঃ, বেশ বিধান তো! মানুষ খাবে ভাল সন্দেশ, আর ঠাকুর খাবেন চিনির ডেলা! এ বিধান শাস্ত্রে আছে ত ভট্চাষ?"

ভট্টাচার্য্য প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আছে বৈ কি।"

জমীদার কহিলেন, "ঠাকুর এতে রাগ করে না?"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "আজ্ঞে না।"

জমীদার খুসী হইয়া হাসিয়া উঠিলেন, "ঠিক—ঠিক—ও সব ছোট জিনিষ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কি বল হে তিনু, তোমার সেই রাবড়ীর গল্পটা একবার ভট্চাষকে শুনিয়ে দাও না!—খাসা গল্প।"

তিনকড়ি অগ্রসর হইয়া গল্প ফাঁদিবার উপক্রম করিতেই জমীদার তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "তুই থাম। মাল টেনে বুঁদ হয়ে আছিস,—তুই আবার বলবি গল্প। আচ্ছা ভট্চাষ, শাস্তরে আছে, দেবতারা খেতেন সুধা,—মুনিরা সোমরস। ও দুটো জিনিষ একই,—কি বল?"

ভট্টাচার্য্য উত্তর দিলেন, "এক বৈ কি—একই ত। আপনি অন্তর্য্যামিনী—সবই জানেন।"

"আচ্ছা—আচ্ছা" বলিয়া হাসিতে হাসিতে একটি বোতল তুলিয়া লইয়া আপনার নাকের সম্মুখে দোলাইতে দোলাইতে বলিলেন, "আর মর্ত্ত্যের এই—এও এক, কি বল?"

বোতল দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের উৎসাহ সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, এক বৈ কি।"

জমীদার বোতল উঁচু করিয়া সমবেত লোকগুলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওরে শুনছিস? ভট্চাষ বিধান দিয়েছে—এক—এক। তোমার ওই স্বর্গেরই বল, তপোবনেরই বল, আর মামার দোকানেরই বল—সব এক।"

সমবেতকণ্ঠে বিকট চীৎকার উঠিল,—"এক—এক।"

তিনকড়ি দেখিল—তাহার অত সাধের রাবড়ীর গল্পটা বুঝি মাঠে মারা যায়। সে মোরিয়া হইয়া করুণকণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে, সেই রাবড়ীর গল্পটা—আমিই বলবো কি?"

জমীদার সে দিকে রক্তচক্ষু ফিরাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "কি, আমি থাকতে তুই? জ্যোচ্ছনার কাছে জোনাকী?"

তিনকড়ি শশব্যস্তে গ্লাসে খানিক তরল পদার্থ ঢালিয়া জমীদারের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "আজ্ঞে, তবে গলাটা ভিজিয়ে নিতে অনুমতি হোক।"

জমীদারের দৃষ্টি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। এক নিশ্বাসে গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া কহিলেন, "যাঃ, তোকে আজ মাপ করলুম।"

ভট্টাচার্য্যের অন্তরে আশঙ্কা ঘনাইয়া উঠিতেছিল। তিনি করযোড়ে কহিলেন, "আজ্ঞে, যদি অনুমতি হয় ত এখন উঠি।"

জমীদার তাঁহার হাত ধরিয়া হাসিয়া কহিলেন, "আরে, সে কি কথা। আসতে না আসতেই যাই যাই। ব'স—ব'স—ভট্চাষ—আমার রাবড়ীর গল্পটা শুনে যাও। সে ভারী মজার।"

আবার রাবড়ীর গল্প! ভট্টাচার্য্যের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। কিন্তু প্রভু অন্নদাতা,—রাবড়ী কেন, তাঁহার মুখে বস্তুবিশেষের গল্পও মিষ্ট লাগিবার কথা।

এবার জমীদার সত্য সত্যই আরম্ভ করিলেন।

"বুঝলে ভটচায, এই মাসখানেক আগে—আমার কলকাতার বাড়ীতে গুরু এসেছিল। বাইরের বৈঠকখানায় ব'সে আছি—প্রেত-পিশাচ নিয়ে। তিনি ত গট্-গট্ ক'রে এসে হাজির। হাজার হোক গুরু, চক্ষুলজ্জা হ'ল—কেমন যেন ভক্তিও হ'ল—খুব ক'সে জমাট ক'রে—এক প্রণাম। গুরুর ত একগাল হাসি। কি রে তিনু, কথা কচ্ছিস না যে?"

তিনকড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

মুখ বিকৃত করিয়া জমীদার কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ কি? ঘাড় নাড়বি, তুমিও ঘাড় নেড়ো ভট্‌চায—নৈলে আমার গল্প জমবে না।"

অগত্যা পুনরায় গল্প সুরু হইতেই তিনু এবং ভট্টাচার্য্য প্রাণপণে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

জমীদার বলিলেন, "ব্যাটার পেয়েছিল জলতেষ্টা, বলতেই, টিনে ভর্ত্তি ছিল বিলাতী চিনি—চাকরটা এক মুঠো বার ক'রে এক গ্লাস জল দিলে। গুরুদেব নাক-মুখ সিঁটকে বল্লেন,—ও বিলিতী চিনি ত আমি খাই না, বাবা। তিনকড়ি বল্লে,—আজ্ঞে দেবতা, যদি অনুমতি হয় ত এক পো রাবড়ী আনিয়ে দিই। আহ্লাদে দু-পাটি দাঁত বার ক'রে গুরুদেব অনুমতি দিলেন। রাবড়ী এলো,—ভাঁড়টুকু চেটেপুটে খেয়ে—ব্যাটা ঢকঢক্ ক'রে অত বড় গেলাসটার এক গ্লাস জল সব খেয়ে ফেললে! উঃ! তার পর কি হ'ল বল দেখি?"

ভট্টাচার্য্য টপ্ করিয়া জবাব দিলেন, "পেট ফুলে জয়ঢাক বুঝি?"

হাসিয়া জমীদার বলিলেন, "আরে—না—না, বামন জাত-টাকে তুমি অত খেলো মনে ক'রো না,—ভট্‌চায। ও জাতটা চিরকাল হ্যাংলা—পেটুক,—দু' এক গ্লাস জলে কি ওদের পেট ফাটে? শোননি—অগস্ত্য এক গণ্ডূষে অত বড় নোণা সমুদ্দুরটা চো-চো ক'রে শুষে নিয়েছিল? আচ্ছা তিনকড়ি, ব্যাটার তখন নির্য্যস খোঁয়াড়ীর সময় ছিল, কি বল?"

উভয়েই হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

এইবার জমীদার গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এই যে গল্পটা বল্লুম, এর থেকে কি বুঝলে, ভট্‌চায! এর মধ্যে মস্ত বড় একটা শাস্তর লুকানো।"

ভট্টাচার্য্য মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে, আমরা মুখ্যু মানুষ, কিছুই ত বুঝতে পারলাম না। তবে রাবড়ী খেতে মন্দ নয়।"

জমীদার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরে গম্ভীর-ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তবে শোন। যদি কখনো শাস্তর লেখো ত আমার নামটা তাতে বসিয়ে দিও। এ বাবা খাঁটি অকৃত্রিম আবিষ্কার—যাকে বলে জেনুইন। ছেলেবেলায় আলেক-জাণ্ডার ও রবারের গল্প পড়েছ ত? রবার মানে দস্যু—ডাকাত। সে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সাম্নে দাঁড়িয়ে বলেছিল,—তোমাতে আমাতে কোন তফাৎ নাই। তুমি কর রাজ্য লুট,—আমি ছোট গ্রাম। তফাৎ এইটুকু, নৈলে হত্যা, রক্তপাত, ঘর জ্বালানো,—অত্যাচার আমাদের দুজনেরই কায। যাক্,—তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই,—ছোট-খাট চিনিতে হ'ল দোষ; আর রাবড়ী একটু উঁচু কি না—এই আলেকজাণ্ডারের জাত—কাযেই বিলিতী চিনি মিশানো থাকলেও—সে হ'ল খাঁটি। বুঝলে ভট্‌চায,—এই মাল—আমি খেলেই হ'ল সখের,—আর নিধে ব্যাটা খেলেই হ'ল উচ্ছন্ন যাবার হেতু। মোদ্দাৎ যাই কর না কেন, ছোটকে ছোট ক'রে জানতে দিও না। বড়র সঙ্গে এক কেলাসে দাঁড় করিও;—লোকে ভক্তি করবে—বাহবা দেবে।"

ভট্টাচার্য্য করযোড়ে কহিলেন, "আজ্ঞে, ঠিক বলেছেন।"

জমীদার কহিলেন, "তা হ'লে তোমার পেসাদ প'ড়ে থাক, এখন এস, এই কাটলেটগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক। মাল তোমার সইবে না,—ও লিগু প্যাটার্ণ চেহারা দেখেই বুঝেছি। বরফ এক গ্লাস ভিম্‌টো বরফ দিয়ে খাও। তিনকড়ি, ভিম্‌টো একটা।"

একখানা প্লেটে গুটি ১০।১২ চপ-কাটলেট তুলিয়া জমীদার প্রসন্ন হাস্যে কহিলেন, "তা হ'লে ভোগ আরম্ভ হোক, ভট্‌চায।"

ভট্টাচার্য্যের কোটরগ্রস্ত লোভার্ত্ত চক্ষু দুইটি মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু ম্লানমুখে কহিলেন, "আজ্ঞে, কাটলেট কখনও খাইনি।"

"—খাওনি? মাংস খেয়েছ কখনও?"

"—আজ্ঞে।"

"তবে আর কি! ও মাংস দিয়ে তৈরী। ওরে তিনু, তোর সেই কাটলেটের গানটা—সেই যে ধনধান্যে পুষ্পে ভরার প্যারোডী গা না রে—আচ্ছা থাক—থাক। খাও ভট্‌চায খাও; আচ্ছা এই নাও, তোমার পেসাদ একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি—পবিত্র হয়ে যাক।"

ভট্টাচার্য্য ততক্ষণ কাটলেটে কামড় দিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, কায নাই ঠাকুরের প্রসাদে। এ চলিতেছে বেশ।

দেখিতে দেখিতে ১০।১২ খানা শেষ হইয়া গেল।

জমীদার হাঁকিলেন, "ওরে, আরও নিয়ে আয়।"

ভট্টাচার্য্য একটু কুন্ঠিত হাস্তে কহিলেন, "না, না—তা হ'লে রাত্তিরে মোটেই খেতে পারবো না।"

জমীদার বলিলেন, "ভাত খাবার দরকার কি? কিছু মিষ্টি খেয়ে একেবারে গুরুদক্ষিণা নিয়ে—ও ল্যাঠা চুকিয়ে দাও।"

অগত্যা ভট্টাচার্য্য পরমানন্দে সম্মতি দিলেন।

আহার-শেষে জমীদার একটি টাকা দিয়া বলিলেন, "তোমায় দেখে বড় খুসী হয়েছি, ভট্‌চায—এই ধর এক টাকা প্রণামী। কাল কলকাতা চ'লে যাব—সেখানে যে দিন বাগান বসবে—খবর পাঠালে যেও কিন্তু। তুমি কিন্তু ভারী মাই ডিয়ার লোক। লোক পাঠালে যাবে ত?"

আনন্দে ঘাড় নাড়িয়া ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, নিশ্চয়ই যাব।"

জমীদার কহিলেন, "তা তোমায় একটা কাযও দেব। বাগানবাড়ীর খরচের হিসেব-নিকেশ রাখবে। আর দেখ,—আমার ক্যারেক্টার নিয়ে একটা ধর্ম্মগ্রন্থ লিখবে। বেশ ভাল শ্লোক দিয়ে,—কেমন, পারবে না?"

"আজ্ঞে খুব।"

জমীদার হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ—বেশ। অনেক রাত হয়েছে। এখন তবে এস।"

ভট্টাচার্য্য উঠিলেন। ইচ্ছা হইল, সদাশয় জমীদারের পায় একটা প্রণাম ঠুকিয়া আসেন, কিন্তু লোকাচারে বাধে বলিয়া নিরস্ত হইলেন। দুঃসময়ে শুধুই এক পেট চপ-কাটলেট সন্দেশ খাওয়াইল, তাহা নহে, ভোজন-দক্ষিণা দিল এক টাকা।

স্থতার একটা রংচঙে জামা, না, এখন থাক। বরং গিন্নীর কাচের চুড়ি কয়েকগাছা—এবং নিজের একটা হুঁকার নল কালই কিনিতে হইবে। আহা! এমন জমীদার যদি গ্রামে গ্রামে জন্মায় ত কিসের দুঃখ পাড়াগাঁয়ের।

ইচ্ছা ছিল—পরদিন প্রাতঃকালে আর একবার জমীদার-দর্শনে যাইবেন, কিন্তু রাত্রিশেষে অতগুলি চপ-কাটলেট ভীষণ কলরবে উদরমধ্যে ঐক্যতান জুড়িয়া দিয়াছিল!

অতি প্রত্যূষে তিনি মাঠের পানে একবার ছুটিলেন।

আধঘন্টা পরে আর একবার। তার পর ঘন ঘন। অবশেষে শয্যার উপরেই—

গৃহিণী কুপিত কণ্ঠে কহিলেন, "কাল রাত্তিরে কোত্থেকে কি ছাই-ভস্ম গিলে-কুটে এসেছ?"

ভট্টাচার্য্য চিঁ চিঁ করিয়া কহিলেন, "ওরে, ছাই-ভস্ম নয় রে—ছাই-ভস্ম নয়,—ক্যা—ট—লেট।"

গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"অ্যাঁ—ক্যা—ট-লেট! ও ছাই-ভস্ম; এখন ঠেলা সামলায় কে?"

ঠেলা উভয়কেই সামলাইতে হইল। সন্ধ্যাবেলা এক বাটি বার্লি—লেবুর রস দিয়া সেবন করিতে করিতে ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "দেখ, যদি সময়টা ফিরিয়ে নিতে পারি, ইচ্ছে আছে, চালার বদলে একটা পাকা ইমেরৎ তুলবো।"

গৃহিণী আশান্বিত হইয়া কহিলেন, "এখন 'হিহরি' মুখ তুলে চাইলেই হয়। আমি পাঁচ পয়সার হরির্লুট দেব। কিন্তু ও ছাই ক্যা—ট—লেট আর খেয়ো না। আমাকেই শেষে ভুগতে হয়।"

ভট্টাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলেন, দুই চারখানির বেশী ও-জিনিষ তিনি স্পর্শই করিবেন না।

ইহার পর—কয়েকবার কলিকাতা হইতে ডাক আসিয়াছিল, ভট্টাচার্য্য গিয়াছিলেন। প্রত্যেকবারে কিছু না কিছু নূতন জিনিষ লইয়া হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন চপ-কাটলেট তিনি অপরিমিত আহার করেন না। কারণ, আরও উচ্চতর জিনিষের মূল্য তিনি বুঝিয়াছেন।

৪

সহরের উপকণ্ঠস্থিত প্রকাণ্ড উদ্যানে বিশেষ সমারোহ, সাজসজ্জা চলিয়াছে। প্রসিদ্ধা গায়িকা কুসুমের শুভাগমনে জমীদারের প্রমোদ-ভবন চরিতার্থ হইবে।

ভট্টাচার্য্য একমনে খাতা-কলম লইয়া আঁক কষিতেছেন এবং দ্রব্যবিশেষপূর্ণ পিপাগুলি গণিয়া, খাঁচায় আবদ্ধ পক্ষিবিশেষের তারস্বরে চীৎকার শুনিয়া, হয় ত বা মাঝে মাঝে আদর্শ ভূস্বামীর পুণ্য-চরিতের মাল-মশলা সংগ্রহ করিতেছেন।

সহসা জমীদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ভট্‌চায, তোমার পাপ-পুণ্যের খতিয়ান কতদূর হলো?"

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন, "আপনাদের আবার পাপ-পুণ্য?"

"সে কি হে, আমাদের পাপও নেই, পুণ্যও নেই? তবে কি বাবা—ত্রিশঙ্কু। মাঝপথে থাকলে মন্দ হয় না,—কি বল হে?" কক্ষ ভরিয়া অট্টহাস্যধ্বনি উঠিল।

জমীদার সুপুষ্ট দেহখানি তাকিয়ায় লুটাইয়া দিয়া খুব এক-চোট হাসিয়া লইলেন। পরে হাসি থামাইয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন, "ওরে ভোলা!"

সবিস্ময়ে কহিলেন, "কাঁদ কেন ?"

কুসুম ধরা গলায় বলিল, "কাঁদি কেন,—আপনি বুঝতে পারবেন না। যে টাকার জন্ম আপনি পাগল হয়েছেন, সেই টাকা আমায়ও পাগল করেছে। তফাৎ, আমার আছে, আপনার নেই। তবু এ যে কি বিষ! আমি ত সর্বস্ব বিনিময় করেছি, কিন্তু আপনার অবস্থা? না, থাক। আপনি যান, আমি কিছু দিতে পারব না। আমি বেশ্যা, আমার দান নিয়ে আপনি কেন পাতকগ্রস্ত হবেন? যান।"

ভট্টাচার্য্যের কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। কুসুম পাগল না কি? এই হাসি—এই কান্না! দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া পরমুহূর্ত্তে অস্বীকার! নাঃ, সত্যই কুহকিনী!

তথাপি একবার শেষ চেষ্টাস্বরূপ কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "যা দোষ-পাপ হয়, আমারই হবে, তুমি দাও। আমি বড় গরীব, আমায় দিলে তোমার পুণ্যি হবে।"

খিল খিল করিয়া কুসুম হাসিয়া উঠিল; কহিল, "পুণ্যি—পুণ্যি! পুণ্যি করতে ত বাগানে আসিনি, ঠাকুর। ওই বাবুদের দেখ, আমায়ও দেখ। এসে অবধি কটা সত্যি কথা বলেছি? হয় ত তুমি ইচ্ছা করলে মুখে-মুখেই বলতে পারবে, আঙ্গুল গোণবার দরকার হবে না। না, তুমি যাও। আমারই ভুল! তোমায় হয় ত ভুল চোখে দেখে থাকব। গরীব হলেই—মানুষ হয় না—যাও।—"

সশব্দে দুয়ার বন্ধ হইল।

ভট্টাচার্য্য সেই নিস্তব্ধ নারিকেলকুঞ্জপথে ফিরিয়া যাইতে যাইতে এক একবার যেন চমকিত হইয়া উঠিলেন।

কুসুমের কি ব্যথা, তাহা তিনি বুঝিলেন না, নিজের হীনতাও ঠিক হয় ত ধরিতে পারিলেন না; তবু যেন কি একটা অস্বস্তি, একটা অনমুভূত পীড়া মনের মাঝখানে জাগিয়া সারা দেহটাকে অকারণে নিপীড়িত করিতে লাগিল।

সে রাত্রিতে রসনা-তৃপ্তিকর উপাদেয় ভোজ্য সকল তেমনই অস্পৃষ্ট হইয়া অনাদরে এক পাশে পড়িয়া রহিল।

ভট্টাচার্য্য নীচের একটা ঘরে তক্তপোষের উপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন।

৫

ঘুম ভাঙ্গিল অনেক বেলায়। তাঁহার তক্তপোষের অপর প্রান্তে দুই জন লোক অনুচ্চ স্বরে কি বলাবলি করিতেছিল। তাহারা বাবুর খাস মোসাহেবের দল।

ভট্টাচার্য্য চক্ষু চাহিলেন, তাহারা এ দিকে পিছন ফিরিয়াছিল বলিয়া দেখিতে পাইল না।

এক জন তখন বলিতেছিল, "যাই বল বাবা, বাহাদুর ছেলে! ও দিকে বাড়ী ঘর দোর দেনার দায়ে নীলেমে উঠেছে, এ দিকে বাবু বাগানবাড়ীতে বাই নিয়ে ফূর্ত্তি করছেন। উঃ—! এমন বুকের পাটা ক'ব্যাটার আছে!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "চাক ত ভাঙ্গলো,—আর এখানে কেন?"

প্রথম কহিল, "নাঃ—আজকেই খতম। আচ্ছা, এ ব্যাটা ত এখানে শুয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে।"

দ্বিতীয় কহিল, "ব্যাটা নেলাক্ষেপা-গোছ। মদ খায় না, ইয়ারকী দেয় না। বড় গরীব ব'লে জমীদারের পাছু পাছু হ্যাং হ্যাং ক'রে ঘোরে।"

প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই একটা বিশেষ তন্ত্রী আছে। তাহাতে ঘা দিতে পারিলে যে স্বর বাহির হয়, তাহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই অপ্রত্যাশিত। কাল রাত্রিতে কুসুমের তীব্র ভর্ৎসনা মুহূর্ত্তের জন্ম ভট্টাচার্য্যের মনে ঢেউ তুলিয়া হৃদয়ের প্রান্ত-সীমায় মিলাইয়া গিয়াছিল, এবং পরমুহূর্ত্তে বেশ্যা জানিয়াও তাহার দান লইবার জন্ম তিনি ব্যগ্র দুই বাহু প্রসারিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কারণ, অর্থ কুসুমকে যে সম্মান দিয়াছিল, তাহাতে তাহার মুখের তীব্র ভর্ৎসনা মর্ম্মভেদ করিতে পারে নাই। আজ যাহারা গরীব বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতেছে, ভট্টাচার্য্য ভাল রকমেই জানেন, তাহাদের অবস্থা তাঁহার অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নহে। ভট্টাচার্য্য যে জন্ম এখানে পড়িয়া আছেন, তাহারাও সেই প্রসাদ-কণিকা-লাভে যত্নশীল। ভট্টাচার্য্য 'হাঁ' ও 'না'র মধ্য দিয়া যেমন জমীদারের প্রত্যেক উচিত অনুচিত কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধনে সতত সচেষ্ট থাকেন, উহারাও তাহাই করিয়া থাকে।

সেইজন্ম উহাদের মুখের কথাটা তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মত ভট্টাচার্য্যের অন্তরে আসিয়া আঘাত করিল। তিনি সবেগে শয্যা হইতে উঠিয়া ক্রোধসমুচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "আর তোমরা বুঝি খুব বড় লোক! তাই এঁটো পাতা চেটে দিনরাত কেঁউ কেঁউ ক'রে ল্যাজ নাড়তে থাক।"

তাহারা সভয়ে সবিস্ময়ে সে দিকে চাহিয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "আরে ম'লো, এটা বলে কি?"

ভট্টাচার্য্য বিষম রাগিয়াছিলেন। মুখ ভ্যাংচাইয়া উত্তর দিলেন, "এটা বলে কি? যা বলে, এখনি টের পাবে। বলছি গিয়ে বাবুকে তোমাদের গুণের কথা, আমি সব শুনেছি।"

বলিয়া তক্তপোষ হইতে নামিয়া দাঁড়াইলেন ও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিতে লাগিলেন।

লোক দুইটা পরস্পরের পানে চাহিয়া একবার মৃদু হাসিল; তার পর গেট পার হইয়া বাগানের বাহিরে চলিয়া গেল।

উপরের ঘরের দুয়ারটা বোধ হয় ভেজান ছিল; ভট্টাচার্য্য ক্রোধভরে জোরে ঠেলা দিতেই সেটা সশব্দে খুলিয়া গেল। কিন্তু ভিতরের ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। পা দুইটা আড়ষ্ট হইয়া কখন্ এক সময়ে বিষম কাঁপিতে সুরু করিয়াছে—এবং চক্ষুর বিস্ফারিত পলকশূন্য তারকা ভিতরের সে দৃশ্য দর্শনে—বারম্বার—অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন।

কার্পেট-বিছানো মেঝের উপর অচৈতন্ত কুসুম পড়িয়া আছে। এক যমদূতাকৃতি ব্যক্তি তাহার অতি সন্নিকটে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সারাদেহে কি যেন অন্বেষণ করিতেছে। নিকটেই একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া জমীদার অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটায় মাঝে মাঝে টান দিতেছেন এবং পার্শ্বের টেবলে রক্ষিত রাশীকৃত অলঙ্কারের পানে সতৃষ্ণ নেত্রে চাহিয়া দণ্ডায়মান এক ব্যক্তির সঙ্গে মৃদুস্বরে কি কথা কহিতেছেন।

সহসা দুয়ার খুলিয়া যাইতেই সকলে সবিস্ময়ে ভট্টাচার্য্যের পানে চাহিলেন। এক মুহূর্ত্ত কেহ কোন কথা কহিল না।—সহসা টেবলের পার্শ্বে দণ্ডায়মান লোকটি অসহ্য ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মুষ্টিবদ্ধ কর আস্ফালন করিতে করিতে ভট্টাচার্য্যের দিকে ছুটিয়া আসিল। ভট্টাচার্য্য সভয়ে চক্ষু মুদিলেন।

কিন্তু উদ্যত মুষ্টি তাঁহার পৃষ্ঠে পড়িল না; হয় ত জমীদার ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়াছেন। লোকটি ধীরে ধীরে ভট্টাচার্য্যের পিছনে আসিয়া দুয়ার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল এবং ভট্টাচার্য্যের হাতে একটা টান দিয়া চাপা গলায় কহিল, "বাবু ডাকছেন।"

ভট্টাচার্য্য আসিয়া টেবলের নিকট দাঁড়াইলেন।

টেবলের উপর রাশি রাশি অলঙ্কার,—অচৈতন্ত কুসুমের দেহ হইতে এই মাত্র আহরিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অপর লোকটা তখনও কাণের অলঙ্কার খুলিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে। কুসুম নিমীলিত-নয়নে নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছে; দেহে প্রাণ আছে কি নাই। আতঙ্কে ভট্টাচার্য্য কাঁপিয়া ঘামিয়া আড়ষ্ট চক্ষু মেলিয়া জমীদারের পানে চাহিলেন।

জমীদার চুরুটের ধোঁয়া বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভয় কি,—মরেনি। তবে হাঁ, বেচারাকে আমরা গহনার নাগপাশ থেকে মুক্তি দিচ্ছি। এটা পাপ, না পুণ্য, ভট্চায?" বলিয়া শব্দহীন হাসি হাসিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য রুদ্ধ নিশ্বাসে আর একবার কুসুমের পানে চাহিলেন। চক্ষু মুদ্রিত, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে যে দৃষ্টি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, গত কাল রাত্রিতে রহস্যময় হইয়া তাঁহার কন্তা লীলার দৃষ্টিকেই স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। আজ সে দৃষ্টি মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরে তাহার ছায়াটুকু নিঃশেষে মুছিয়া লইতে পারে নাই।

ভট্টাচার্য্য জমীদারের হাসিতে যোগ দিতে পারিলেন না, এক-দৃষ্টে কুসুমের পানে চাহিয়া রহিলেন।

জমীদার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ ক'রে কি চেয়ে দেখছো, ভট্চায! আমার পুণ্য জীবনচরিতে এ নূতন অধ্যায়টা জুড়ে দেবে কি না, ভাবছ বুঝি?"

ভট্টাচার্য্য বিমূঢ়ের মত জমীদারের পানে চাহিলেন। জমীদার হাসি থামাইয়া সহসা গম্ভীর হইলেন ও বলিলেন, "আমার মতে ওটা আর লিখে কায নেই। তুমি এটা ভুলে যেয়ো, ভট্চায।" বলিয়া পকেট হইতে একখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। পরে মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "বোধ হয়, ভুলতে পারবে, কেমন?"

নোটখানা যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ভট্টাচার্য্যের করতল দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "না, না।" জমীদার মুখে তর্জ্জনী রাখিয়া বলিলেন, "আস্তে। অমন ক'রে উঠছো কেন? কি, না?—"

ভট্টাচার্য্য নীরব।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া জমীদার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ভেবেছিলুম, বইখানা লেখা হয়ে গেলে—তোমায় থোক-থাক কিছু দেব। তা আর বইয়ে কায নেই। টাকাটা নিয়ে ঘরের চালাখানা মেরামত কর গে। আর দেখ—আসছে মাস থেকে পাঠশালার মাইনেটা বাড়িয়ে ১০৲ টাকা ক'রে দেব ভাবছি—কেমন, চলবে না তাতে?"

ভট্টাচার্য্য নোটখানা হাতে করিয়া তখনও বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়াছিলেন। এ যে অন্যায়, তাহা প্রবলবেগে তাঁহার কণ্ঠে আসিয়া বাজিতেছিল, মুখে ভাষা ছিল না প্রতিবাদ করেন। নিতান্ত ভীরু অক্ষম বুকে সেটুকু সাহসও হয় ত ছিল না।

ভট্টাচার্য্য কত বিনিদ্র রজনী এই মোটা পাওনার কথা লইয়া গৃহিণীর সহিত ভবিষ্যতে উন্নতির আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। জমীদারের অসাধুসঙ্গও তাঁহার বিষবৎ বলিয়া মনে হয় নাই। সামান্ত একটু আমোদের ফলে যদি উদর-পূরণের সমস্তাটুকু আপনা আপনি সমাধান হইয়া যায় ত মন্দ কি?

কুসুমকে পতিতা জানিয়াও তাহার নিকট হাত পাতিতে লজ্জা বোধ হয় নাই। কারণ, সে অর্থে পাপের পঙ্কিলতা কিছু মাখান ছিল কি না, তাহা তিনি দেখেন নাই এবং পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্ম ধারণাও তাঁহার স্থূল বুদ্ধির কোন অংশে বিশেষরূপে আশ্রয় লাভ করিয়া বিপর্য্যয় বাধায় নাই।

কিন্তু আজ এই অর্থের পশ্চাতে পাপ যেন নগ্নমূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। এই অচৈতন্য দেহ,—অপহৃত অলঙ্কার—লুণ্ঠননিরত দস্যু—কতবড় বীভৎস পাপকেই না সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছে! উৎকোচস্বরূপ নোটখানা যেন অগ্নিময় হইয়া তাঁহার করতল উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সম্মুখে জমীদার ও তাঁহার যমদূতাকৃতি দুই অনুচর।—এই উৎকোচ অস্বীকার করিবার প্রতিফল কি, তাহা ভট্টাচার্য্য ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন।

অকস্মাৎ তিনি কাঁদিয়া জমীদারের পায়ের সন্নিকটে বসিয়া পড়িলেন। হাত বাড়াইয়া তাঁহার একখানা পা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আমায় রক্ষে করুন, রক্ষে করুন।"

জমীদার হাসিলেন।—বিস্মিত হইয়া বলিলেন,"ও কি ভট্‌চায, মেয়েমানুষের মত—এ কি রোগ তোমার? ওঠ—বুঝেছি—" বলিয়া আপন মনে ঘাড় নাড়িয়া পকেটে পুনর্ব্বার হাত পুরিয়া দিলেন এবং দুইখানি নোট বাহির করিয়া টেবলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "তোমায় তামাসা করেছি বৈ ত না, এতে কান্না কেন? এই নাও আর দুশো। ব্যস্,—মুখটি জন্মের মত বন্ধ ক'রে রাখবে। দেশে ফিরে খাও দাও—বেড়িয়ে বেড়াও—কিন্তু ভুলেও এখানকার গল্প ক'রো না। আর তোমার এখানে আসতেও হবে না। কিন্তু যদি এ কথা প্রকাশ পায় ত মনে থাকে যেন,—ঐ জিভ জন্মের মত সাঁড়াশী দিয়ে উপড়ে আনবো। পণ্ডিতি বিছে আমরাও কিছু কিছু জানি।"

ভট্টাচার্য্যের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল।

সেই সময় এক ব্যক্তি বলিল, "গহনা সব খোলা হয়ে গেছে, এখন মাগীকে রেখে আসবো কি?"

জমীদার বলিলেন, "হাঁ, তফাৎ। চাদর মুড়ি দিয়ে সেই বাগানের কোণের ঘরে।'

তাহারা দুয়ার খুলিয়া সাবধানে চারিদিক দেখিয়া আসিল ও অচৈতন্য কুসুমকে বহিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য ক্রন্দন ভুলিয়া তীব্রবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও মিনতিভরা কণ্ঠে জমীদারকে বলিলেন, "দোহাই বাবু, ওকে মেরে ফেলবেন না।"

জমীদার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "চোপরাও ষ্টুপিড! আমরা মানুষ খুন ক'রে থাকি, নয়?"

পরে ঈষৎ নম্রকণ্ঠে কহিলেন, "নোট কখানা তুলে নিয়ে চলে যাও। আর এখানে এসো না।"

নোটের পানে চাহিয়া ভটাচার্য্যের অন্তর আবার অগ্নিময় হইয়া উঠিল। তিনি গরীব বলিয়া তাই এই প্রলোভন! কুসুম বলিয়াছিল, গরীব হইলেও মানুষ, মানুষ। মানুষ হইয়া ইহা সহ্য করা উচিত নহে। তাঁহার দুইটি চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তার পর' যে কার্য্য করিয়া বসিলেন, তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই ভয়াবহ।

ভ্রূকুটি, প্রহার, নির্য্যাতন, এমন কি, মৃত্যুর বিভীষিকা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া তিনি সবেগে হাতের নোটখানা টেবলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া উচ্চ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না, এ আমি কিছুতেই নেব না।"

জমীদার অতি বিস্ময়ে কহিলেন, "টাকা তুমি নেবে না?"

"না।" স্বর স্থির অবিচলিত।

"এ সব কথা যেখানে সেখানে ব'লে বেড়াবে?"

"না। কিন্তু যদি আদালতে সাক্ষী দিতে হয়, সত্য কথাই বলবো।"

"বটে। ভারী সত্যবাদী ত তুমি।" বলিয়া জমীদার অসহ্য রোষে হাঁকিলেন, "নেপালী!"

ভীমকান্তি নেপালী আসিয়া কক্ষদ্বারে দাঁড়াইল।

জমীদার অগ্নিময় দৃষ্টিতে ভটাচার্য্যের পানে চাহিয়া বলিলেন, "এখনও বল, এ সব ভুলে যাবে কি না? নৈলে দেখছো নেপালীকে, ওর হাতের বেত?"

ভটাচার্য্য নেপালীর পেশীস্ফীত বাহুর পানে চাহিলেন। অন্তর মুহূর্ত্তের জন্য আতঙ্কে দুলিয়া উঠিল কি না, কে জানে। কিন্তু সে বুকে বোধ হয় তখন রুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছিল। অচৈতন্য কুসুমের মলিন পাংশু মুখখানি তাঁহার নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, অমনই যেন আশঙ্কার সমস্ত জঞ্জাল বিদ্যুৎ-মণ্ডিত বক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

দৃঢ় ভয়লেশহীন অবিচলিত কণ্ঠে তিনি জানাইলেন, কিছু-তেই অসত্যের আশ্রয় লইবেন না।

তার পর মুহূর্ত্তমাত্র। নেপালী তাঁহার পিঠের দিকে আসিয়া দাঁড়াইল ও দৃঢ়মুষ্টিতে সুকঠিন বেত্রদণ্ড উত্তোলন করিল।

ভটাচার্য্য আর চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না, চক্ষু মুদিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।

সবেগে বেত পড়িল, পিঠের খানিকটা চামড়া কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি একবারমাত্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তার পর উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহটা সংজ্ঞাহীন হইয়া লুটাইতে লাগিল। তথাপি তাঁহার মুখ হইতে 'হাঁ' শব্দ উচ্চারিত হইল না।

* * * *

জ্ঞান হইলে তিনি চোখ মেলিয়া দেখিলেন—শয্যার উপর শুইয়া

আছেন, শিয়রে বসিয়া কে যেন মৃদু বাতাস করিতেছে। কুসুম বুঝি ?

জানালা দিয়া একফালি আলো শয্যার এক প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া অনুমান করা যায় না বেলা কতখানি। উঠিতে গেলেন, পারিলেন না ; সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা। ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "আমি কোথায় ?"

গৃহিণী বলিলেন, "চুপ ক'রে শুয়ে থাক, ন'ড়ো না। একেবারে অধঃপাতে গেছ— ; নৈলে মদ খেয়ে এমন ঢলাঢলিও মানুষে করে।"

ভট্টাচার্য্য বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। গৃহিণী সরিয়া আসিয়া তাঁহার বিস্ময়স্ফীত দুই চক্ষুর সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ সইবে কেন ? ও আমি সেই কালেই জানি। ভাগ্যি বাষ্ট দয়ার সাগর জমীদার ছিল, তাই গাড়ী ক'রে বাড়ী বয়ে দিয়ে গেল ! মা গো মা, পিঠময় রক্ত, গাময় মদের দুর্গন্ধ ! কোন্ মাগীর বাড়ী নাকি খুনোখুনি কাটাকাটি ক'রে মরেছিলে ? ছি ছি !" ঘৃণায় ক্রোধে তাঁহার মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ভট্টাচার্য্য চক্ষু মুদিলেন।

গৃহিণী মাথায় বাতাস দিতে দিতে পুনরায় কহিলেন, "আহা, রাজা জমীদার বেঁচে থাক। তিনখানা নোট দিয়ে ব'লে গেল, কর্ত্তা ভাল হ'লে আর ওমুখো হ'তে দিয়ো না। আবার ! এবার ওমুখো হ'লে সাত ঝাঁটায় গোকুল অন্ধকার দেখিয়ে দেব না।" বলিয়া গৃহপ্রান্তে নিপতিত খর্ব্বকায় সম্মার্জ্জনীর পানে একবার চাহিলেন।

ভট্টাচার্য্য আবার চক্ষু চাহিয়া ক্ষীণ আগ্রহোত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "নোট ! কৈ সে নোট ?"

"আমি তুলে রেখেছি।"

"একবার—একবার দেখি।"

তাঁহার উত্তেজনা ও আগ্রহ দেখিয়া গৃহিণীকে নোট কয়খানি আনিতে হইল। সেগুলি ভট্টাচার্য্যের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দেখ, দেখে বুক ঠাণ্ডা হোক।"

ভট্টাচার্য্য নোট তিনখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। সেই নোট ! লেখাগুলা যেন রক্ত অক্ষরে অগ্নিময় হইয়া জ্বলিতেছে ! রাজার মূর্ত্তিটা চোখ রাঙ্গাইয়া তাঁহার পানে চাহিতেছে, কিন্তু ওই চক্ষু দুইটি কাহার ? রাজার ত নহে ! সেই অত্যাচারিতার নিমীলিত নয়নের কৃষ্ণপক্ষ্ম ভেদ করিয়া ওই যে মর্ম্মস্পর্শী সুকোমল দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহা কুসুমের এবং ওই দৃষ্টির অন্তরালে পাপের সেই জঘন্য মূর্ত্তিটা তখনই যেন সব আবরণ সরাইয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত সম্মুখে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে !

না না, সে ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অতি পঙ্কিল ক্লেদার্দ্র সেই পাপমূর্ত্তি সর্পিল গতিতে হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুনের ফণা তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছে। ইহাকে প্রতিরোধ করিবার উপায় কি ?

উত্তেজনায় তাঁহার হাত দুইখানি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া ভট্টাচার্য্য নোট তিনখানি কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিলেন, "হাঁ হাঁ, কর কি ?"

অবসাদে তখন মুষ্টি শিথিল হইয়া গিয়াছে। শ্রান্ত মাথাটি বালিশে এলাইয়া দিয়া মুদ্রিত নয়নে ক্ষীণকণ্ঠে ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "পায়ের কাছে কেমন আলো জ্বলছে, বড়বৌ !"

গৃহিণী ছুটিয়া গিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিলেন, "তোমার মাথা।"

ভট্টাচার্য্যের মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে মিষ্ট স্বরে তিনি বলিলেন, "পায়ের আলো যেন বুকের মধ্যে এসে জ্ব'লে উঠলো। জানালা বন্ধ ক'রে আর ত তাকে তাড়াতে পারবে না, বড়বৌ। আঃ !"

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

বিড়াল-দুত

মেঘমালা মা-বাপের এক সন্তান, কাজেই বাড়ীর সকলেরই আদুরে মেয়ে। মেঘমালা কল্‌কাতার ডায়োসিসান কলেজ থেকে বি-এ পাশ ক'রে এখন কল্‌কাতা ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজীতে এম-এ পড়ে; এক মেমের কাছে পিয়ানো আর বেহালা বাজাতে শেখে; আর সঙ্গীত-সঙ্ঘে গান, সেতার, এস্রাজ শিখ্‌তে যায়; চিত্রকর চারু রায়ের কাছে ছবি আঁকারও চর্চ্চা করে। মেঘমালা যেন মূর্ত্তিমতী সরস্বতী, সর্ব্ববিদ্যায় তার আগ্রহ ও অধিকার অসাধারণ, তার বুদ্ধি প্রখর, ধারণাশক্তি অপরিমেয়। কিন্তু এত বিষয় শিক্ষায় ব্যাপৃত থেকেও তার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ আছে; সে তন্বী, সুন্দরী, তার দেহ সুঠাম, সুবলয়িত, অনিন্দ্য। সে যেন লক্ষ্মী-সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ-মূর্ত্তি! তার স্বভাব মধুর; কিন্তু এত গুণের আধার ব'লে বাড়ীর লোকের অত্যধিক আদরে ও প্রশ্রয়ে একটু চঞ্চল, একটু রঙ্গপ্রিয়।

তার সকল প্রকার আব্দার-উপদ্রব বাড়ীর লোকে আনন্দ পেতেই সহ্য করে। তার ঠাকুরমা তার ঠাট্টা-বিদ্রূপের জ্বালায় সারাদিন বিব্রত থাকেন।

মেঘমালা যত নানা বিদ্যায় বিভূষিত হয়ে উঠছিল, বাড়ীর লোকের আনন্দ ও সহনশীলতা তত বেড়ে চলেছিল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তাও তাঁদের উদ্বিগ্ন ক'রে তুলছিল যে, এমন সুন্দরী গুণবতী মেয়ের উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে? মেঘমালার পিতা-মাতা প্রায়ই গোপনে এই বিষয় আলোচনা কর্‌তেন এবং দুজনেই স্নেহের টানে স্বীকার কর্‌তেন যে, আমরা জাত মানব না, জাতি দেখব না, যে-কোনো দেশের যে-কোনো জাতের ছেলে মেঘমালার উপযুক্ত অথবা তার মনোনীত হবে, তার হাতেই আমরা মেয়ে সম্প্রদান করব—আমাদের ঐ এক সন্তান, সে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকলেই হবে, কেবল জাত আর সমাজ নিয়ে আমরা করব কি?

এহেন সর্ব্বপ্রিয় মেঘমালার একটি আচরণ কিন্তু বাড়ীর সকলের অসহ্য হয়ে গেল—যে দিন সে তার শিক্ষয়িত্রী মেম সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে একটা লোমশ কটা রঙের বিড়াল-ছানা নিজের বাড়ীতে নিয়ে এল। মেঘমালার বাড়ীর কেউ বিড়াল দেখতে পারে না। মেঘমালার মা শুনেছেন যে, বিড়ালের ছোঁয়াচ থেকে ডিপথিরিয়া রোগ হয়, বিড়ালের লোম পেটে গেলে যক্ষ্মা হয়। মেঘমালার ঠাকুরমার সদাই আশঙ্কা, লোভী বিড়াল কখন বা তাঁর ছেলের খাবারে মুখে দেবে, আর কখন বা ঠাকুরের নৈবেদ্যই উচ্ছিষ্ট ক'রে রাখবে। মেঘমালার পিতার বিড়ালটার উপর রাগ এইজন্য যে, হতভাগা বিড়ালটা তাঁর ঘরের বনাতঢাকা টেবলটার উপর রাত্রে শুয়ে থাকে আর টেবলটাকে লোমে লোমাকীর্ণ ক'রে রাখে, ঘরে অন্য অনেকগুলো গদীমোড়া চেয়ার থাক্‌তেও বিড়ালটা ঠিক তাঁরই বসবার চেয়ারটা দখল ক'রে দিব্য কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রা যায় এবং প্রত্যহ তাঁকে সেই বিড়াল তাড়িয়ে চেয়ারে বস্‌তে হয় এবং বিড়ালের বসা জায়গায় বস্‌তে গা ঘিন-ঘিন করে। অন্য চেয়ারগুলিতে কালেভদ্রে কোনো আগন্তুক এসে বসে, কিন্তু মেঘমালার বাবার চেয়ারটি নিত্য উপবেশনে বেশ গরম হয়ে থাকে ব'লে বিড়ালের তারই প্রতি বিশেষ পক্ষপাত হয়, কিন্তু এটা গৃহস্বামী বরদাস্ত কর্‌তে পারেন না। একে বিড়াল, তাতে এটার যা না চেহারার ছিরি—কটা!—যেন ছাইমাখা সন্ন্যাসী!

বিড়ালটি কিন্তু মেঘমালার বড় আদরের—বাড়ীর সকলের হতশ্রদ্ধার পাত্র ব'লে তাকে মেঘমালা পরের বাড়ীতে আশ্রিত গলগ্রহ মাতার দুরন্ত সন্তানের মতন সর্ব্বদাই আগ্‌লে আগ্‌লে রাখে; বাড়ীর লোকে যত দূরছাই করে, তার স্নেহ তত বিড়ালটিকে শতপাকে পরিবেষ্টন কর্‌তে থাকে। মেঘমালা দেখেছে, বিড়ালটা আদর পাবার আশায় তার মায়ের পায়ে গা ঘষ্‌তে গেছে, মা তাকে পা দিয়ে লাথি মেরে দূরে ফেলে দিয়েছেন; বাবার পায়ে গা ঘষেছে, বাবা চুপ ক'রে ব'সে থেকেছেন, তাঁর প্রফুল্ল মুখ ও উজ্জ্বল চোখ দেখে মনে হয়েছে, মূক পশুর স্নেহপ্রার্থনা তাঁর মন্দ লাগছে না, কিন্তু তার স্পর্দ্ধা বেড়ে যাবার আশঙ্কায় তিনি আড়ষ্ট হয়ে ব'সে থেকে তাকে উপেক্ষা করেছেন; আর ঠাকুরমার ত্রিসীমানায় ত বিড়ালের যাবার উপায় নেই—অশুচি জীব শৌচাচার কিছু জানে না, তাকে স্পর্শ করলে তো নাইতে হয়, ষষ্ঠীর বাহন না হ'লে এই পাঁশমুখোকে ঝাঁটা মেরে তিনি বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দিতেন। মেঘমালার

মন সকলের অনাদরের ক্ষতিপূরণ করবার জন্য বিড়ালটির প্রতি মমতায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। আর থাক্‌বেই বা না কেন? এ ত আর যে-সে দেশী বিড়াল নয়, এ একেবারে Persian Cat, মেম-সাহেবের কাছ থেকে আনা!

এক দিন মেঘমালা ইউনিভার্সিটি থেকে এসে তার বিড়ালকে বাড়ীতে দেখতে পেলে না। সে তার আদরের বিড়ালের নাম রেখেছে রুস্তমজী—পারস্যের বিড়ালের নামটা পার্সী হওয়া ত চাই। মেঘমালা রুস্তমজীকে খোঁজবার জন্য ছাদে গিয়ে দেখলে—পাশের বাড়ীর একটি যুবকের কোলে তার রুস্তমজী দিব্য আরামে বিরাজ কর্‌ছে! এই যুবকটিকে সে পাশের বাড়ীতে অনেকবার দেখেছে, ইউ-নিভার্সিটিতেও দেখেছে মনে হচ্ছে, কিন্তু তাকে কোন দিন দেখেও দেখে নি। আজ তার কোলে রুস্তমজীকে দেখেই মেঘমালার মন প্রসন্ন হয়ে উঠল, সে আনন্দোজ্জ্বল চোখে তার দিকে চাইতেই তাকে একেবারে দেখার মত দেখা হয়ে গেল—যাকে বলে শুভদৃষ্টি। মেঘমালা ভাবলে, আমার রুস্তমজীকে উনি আদর করেন, ভালবাসেন,—নিশ্চয় উনি লোক খুব খাসা! যুবকটি রুস্তমজীকে কোলে ক'রে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ছাদে পায়চারী করছিল। মেঘমালা তার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখেই সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার দিকে চেয়েই মেঘমালার ঠোঁটের উপর প্রতিপদের চন্দ্রলেখার মতন একটি হাসির রেখা বুলিয়ে গেল আর সেই হাসির আভা যুবকের মুখের উপর প্রতিফলিত হলো। মেঘমালা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল আর যুবকটি আগের মতন ছাদে পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে অধিকতর আদরে রুস্তমজীর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দিতে লাগল।

মেঘমালা কলেজের কাপড়-জামা বদ্‌লে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বস্‌ল। রোজ তার খাবার সময় রুস্তমজী হাজির থাকে এবং তার খাবারের ভাগ নিয়ে তবে তার কাছ ছাড়ে। আজ সে গরহাজির। অন্য দিন ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ীতে ফিরে রুস্তমজীকে কোলে ক'রে নিয়ে না এসে সে খেতে বস্‌ত না; কোন দিন রুস্তমজী অনু-পস্থিত থাক্‌লে মেঘমালা ব্যস্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠত। কিন্তু আজ সে প্রসন্নমনে প্রফুল্ল-বদনে ব'সে একলাই খাবার খাচ্ছে দেখে তার ঠাকুরমা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ লো মালা, তোর সোহাগের হনুমানজী আজ কোথায় আছেন? আজ যে বড় আদর কাড়াতে আসেন নি এখনো?

মেঘমালা হেসে বল্‌লে—বাবু সাহেব কোথায় হাওয়া খেতে গেছেন, আমি আর রোজ রোজ খোঁজ খোঁজ ক'রে বেড়াতে পারিনে।

ঠাকুরমা নাতনীর মুখে এই নূতন কথা আর নিরুদ্বিগ্ন প্রসন্নতা দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন।

মেঘমালা নিজের খাবারের অবশিষ্ট খানিকটা রুস্তমজীর জন্য ঢেকে রেখে দিলে।

তাই দেখে মা বল্‌লেন—ওটুকুন তুই খেয়ে ফেল্, হতুম-থুমো বেড়িয়ে ফির্‌লে তখন তাকে অন্য কিছু খেতে দিস্।

মেঘমালা হেসে বল্‌লে—না মা, আর আমি খাব না, সেই এসে খাবে।

সন্ধ্যার একটু আগে রুস্তমজী বাড়ীতে ফিরে মেঘমালাকে গম্ভীর স্বরে ডাক্‌লে—ম্যাওও!

মেঘমালা সেই ডাক শুনেই চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি হাতের সেলাই ফেলে রুস্তমজীকে কোলে তুলে নিলে এবং কৌতুকপ্রফুল্ল স্নেহার্দ্র অনুযোগের স্বরে বল্‌লে—বাঁদর, কেবল আদর খেয়েই কি পেট ভর্‌বে? কিছু খেতে হবে মনে থাকে না?

রুস্তমজী তখন পরম সুখে মেঘমালার কোলের মধ্যে ঘড়র-ঘড়র ক'রে নাক ডাকাচ্ছিল, সে তার মাতার আদরে খুসী হয়ে আবার ডাক্‌লে—ম্যাওও!

মেঘমালা রুস্তমজীকে কোলে ক'রে নিয়ে গিয়ে খাবারের কাছে ছেড়ে দিলে এবং খাবারের ঢাকা খুলে দিলে। রুস্তমজী একবার খাবারটা শুঁকে গোঁফ ঝাড়া দিলে এবং খাবার ছেড়ে ল্যাজ উঁচু ক'রে মেঘমালার পায়ে গা ঘ'ষে ঘ'ষে তাকে প্রদক্ষিণ কর্‌তে লাগ্‌ল।

মেঘমালা হেসে বল্‌লে—হুঁ, নেমন্তন্ন খেয়ে আসা হয়েছে দেখছি! গণ্ডেপিণ্ডে গিলে আর ক্ষিদে নেই! আমি নিজে না খেয়ে মুখের গ্রাস তোর জন্যে রাখ্‌লাম, তোকে খেতেই হবে, খা বল্‌ছি।

মেঘমালা রুস্তমকে ধ'রে আবার খাবারের থালার উপর মুখ গুঁজে দিলে। রুস্তম এবার খাবারের উপরটা একটু চেটে গোঁফ ঝাড়া দিয়ে প্রচণ্ড আপত্তি জানালে—ম্যাওঁওঁ!

মেঘমালা হেসে রুস্তমকে লুফে কোলে তুলে নিয়ে চঞ্চল লীলাভরে নিজের ঘরে চ'লে গেল। একটা লোক অন্ততঃ আমার রুস্তমকে ভালো বাসে, এই ভেবে তার মন খুশীতে ভ'রে উঠেছিল।

সেই দিন থেকে মেঘমালার মন সেই অপরিচিত যুবকটির দিকে আকৃষ্ট হলো। আগেও সে অনেকবার তাকে দেখেছে, কিন্তু এখন তাকে দেখলেই বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন স্বচ্ছসলিল সরোবরের মতন মেঘমালার চোখ ছুটির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, সেই যুবকের চেহারা ও চালচলনের অনেক খুঁটি-নাটি এখন তার নজরে পড়ে, তার সঙ্গে চোখোচোখি হ'লে মেঘমালার মুখের উপর এখন ব্রীড়া ক্রীড়া করে। ইউনি-ভার্সিটিতে গিয়ে এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে যাবার পথে মেঘমালার দৃষ্টি যুবকের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে; কোনো দিন দেখা হয়ে গেলে পরিচয়-স্বীকারের হ্রী তার মুখখানিকে মাধুর্য্যমণ্ডিত ক'রে দিয়ে যায়। এখন মেঘমালা দেখে, যুবক রোজ ভোরে উঠে ছাদে ডাম্বেল মুগুর নিয়ে ঝাড়া এক ঘণ্টা ব্যায়াম করে; তার পর স্নান ক'রে সি ড়ির উপর চিলের ঘরে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে পূজা-পাঠ করে; তার পর তার চাকর ছোলা, আদা আর এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসে, তাই খায়—চা খায় না। দশটার সময় ভাত, বিকালে ফল, ছানা, ক্ষীর, সন্দেশ, আর রাত্রে লুচিমাংস আহার করে। লোকটার খাওয়ার পরিপাটী আছে, সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর খেতেও পারে খুব। তার প্রত্যেকবার খাওয়ার সময় রুস্তমজী গিয়ে জোটে, আর খাবারের ভাগ আদায় ক'রে নিয়ে আসে।

এক দিন গভীর রাত্রে মেঘমালা চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল—ভারি মিঠা চড়া গলায় কে গান গাচ্ছে আর তার সঙ্গে অতি মিষ্টি এস্রাজের সুর মিশে আস্‌ছে। মেঘমালার মনে হলো, পাশের ঐ বাড়ী থেকেই গান ভেসে আস্‌ছে। অল্পক্ষণ কানপেতে শুনে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, ধীরে ধীরে ছাদে চল্‌ল। এত দিন ঐ বাড়ীতে সেই অনামা যুবক আর তার বামুন, চাকর, দরোয়ান ছাড়া আর কোনো লোককে তো মেঘমালা দেখে নি; কোনো স্ত্রীলোক সে বাড়ীতে থাক্‌লে তো মেঘমালা তার সঙ্গে কবে আলাপ কর্‌ত; আজ এই গভীর রাত্রে সেই বাড়ীতে রমণীকণ্ঠের গান এল কোথা থেকে? জান্‌বার জন্য কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠাতে মেঘমালা ছাদে গেল। যদিও সে দিন কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি, তথাপি তখন চাঁদ উঠেছে আর খণ্ড চাঁদের ভাঙা বুকের জ্যোৎস্নার উচ্ছ্বাসে আকাশে পৃথিবীতে গলা রূপার প্লাবন খেলা কর্‌ছে। সেই জ্যোৎস্নায় ছাদের উপর একখানি জাপানী মাদুর পেতে ব'সে সেই যুবক তন্ময় হয়ে গান গাচ্ছে! আহা, পুরুষমানুষের এমন মিঠা মিহি গলা! যেন বীণার তার থেকে ঝঙ্কার বেরুচ্ছে, সব কথাগুলি সুস্পষ্ট, গানের কোনো বাক্য আর-এক শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে না, অথচ একটি শব্দের সুর অপর শব্দের সুরের দিকে গড়িয়ে চলেছে উর্ম্মি-লহরীর বিচিত্র লীলায়। মেঘমালা মুগ্ধ হয়ে যুবকের গান শুন্‌তে লাগ্‌ল। সে গাচ্ছে—

"যব-সে লাগী তেরি আঁখিয়াঁ।
দিল্‌ হো গেয়া দিবানা!
তুম্‌ লয়লা হো—মৈঁ মজনু,
তুম্‌ শিরী হো—মৈঁ খস্‌রু,
তুম্‌ গুল্‌ হো—মৈঁ বুল্‌বুল,
তুম্‌ শামা হো—মৈঁ পর্‌বানা!"

যুবকের গান থেমে গেল। সে কোলের উপর এস্‌রাজ-টিকে শুইয়ে রেখে চুপ ক'রে ব'সে ব'সে চাঁদের উপর দিয়ে পাতলা মেঘ ভেসে যাওয়া দেখতে লাগ্‌ল। মেঘমালা গানের সুরে ও কথায় মন ভ'রে নিয়ে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে নীচে নেমে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

এই যুবকটির নাম ও পরিচয় জান্‌বার জন্য মেঘমালার মন উৎসুক হয়ে উঠ্‌ল; কিন্তু উপায় কৈ—উপায় কৈ?

এর পর যখনই সেই যুবকের উপর মেঘমালার চোখ পড়ে, তখনই তাকে দেখার মতন দেখা হয়ে যায়—সে নরুন পাড়ের খদ্দর কাপড় পরে, কাপড় চাকর কুঁচিয়ে দেয়, কোঁচার চুনট-করা ফুল বার্ণিশ-করা চটি জুতার উপর দোল খায়; ফর্সা কপালের এক পাশে একটা তিল আছে, হাতের কব্জীতে একটা কাটা দাগ…

একদিন বিকাল-বেলা ছাদে গিয়ে মেঘমালা দেখ্‌লে, সেই যুবক মালকোঁচা মেরে আর এক জন অল্পবয়সী ছোকরার সঙ্গে খুব ধুম ক'রে ছোরা খেলছে—দুজনেরই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা, অসামান্য চাতুর্য্য। তখন মেঘমালা বুঝ্‌তে পারলে যে, হাতের কব্জীতে ঐ কাটা দাগটা কেন। মেঘমালা মুগ্ধ প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাদের খেলা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। যুবক

কেবল বলিষ্ঠ সুপুরুষ নয়, সে গুণী গায়ক, আবার বীরও। মেঘমালার মন যুবকের প্রতি শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠ্‌ল।

তার পর থেকে রোজই দেখে, বিকালে সেই কিশোর ছেলেটি আসে, আর যুবার সঙ্গে ছোরা, লাঠি, তরোয়াল খেলে, বক্‌সিং করে, কিংবা জিউজুৎসুর প্যাঁচ লড়ে। দুচার দিন দেখেই মেঘমালা বুঝ্‌লে, যুবক শিক্ষক আর কিশোর তার কাছে শিক্ষার্থী।

সে দিন বিকালে মেঘমালার বাবা বাড়ীতে ছিলেন না। মেঘমালা বাইরের ঘরে গিয়ে বস্‌ল—তার মনে যেন আজ কি একটা দুষ্কর সঙ্কল্প রয়েছে—সে আজ অসাধ্যসাধন একটা কিছু ক'রে ফেল্‌বে।

উৎসুক অপেক্ষায় অনেকক্ষণ ব'সে থাকার পর পিয়ন চিঠি বিলি কর্‌তে এল। মেঘমালার মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল—এই পিয়নের আগমনই সে অপেক্ষা কর্‌ছিল। সে জান্‌ত, আজ তার চিঠি আস্‌বেই—সে আজ কদিন হ'লো, তার চেনা জানা যে যেখানে আছে, সবাইকে চিঠি লিখেছিল, তাদের কেউ না কেউ জবাব দেবেই, আর সেই চিঠি দিতে পিয়ন তাদের বাড়ীতে আস্‌বেই।

পিয়ন পাঁচ-ছখানা চিঠি মেঘমালার হাতে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। মেঘমালা একটা ঢোক গিলে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আচ্ছা পিয়ন, এই পাশের ৪৬ নম্বর বাড়ীতে কে থাকেন?

এই প্রশ্নটার কথা কয়টা বেরিয়ে যেতে যেন মেঘমালার গলায় বেধে গেল, সে মুখ ফিরিয়ে একবার কাশ্‌লে, আর এই বিষম খেয়ে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল।

পিয়ন বল্‌লে—ও বাড়ীতে শুধু এক বাবু থাকেন, তাঁর নাম ফাল্গুনী চৌধুরী, রাজসাহীর এক জমিদারের ছেলে, এখানে পড়েন, তাই বাসা ক'রে আছেন।

মেঘমালা উদাসীনতার ভাণ ক'রে বল্‌লে—ও!

পিয়ন চ'লে গেল।

মেঘমালার মুখ লজ্জারুণ হয়ে উঠ্‌ল, পরক্ষণেই খুশীর আভায় উজ্জল হলো। সে ভাব্‌লে—যাক নামটা পাওয়া গেল। খাসা নতুন নাম—ফাল্গুনী! ফল্গু—ফাগুন—আগুন—গুণ সবই সে তার নামে ধ'রে রেখেছে! বাঃ!

মেঘমালা যতই ভেবে ভেবে ফাল্গুনীর নাম বিশ্লেষণ কর্‌ছিল, ততই অর্থমাধুর্য্যে তার মন ভ'রে উঠ্‌ছিল'।—সে ফাল্গুনী অর্জ্জুনের মতন বীর, সব্যসাচী; সে কবি যুবা, ফাগুন বসন্ত তো তার সখা; ফল্গুধারার মতন কত গুণ তার অন্তরে লুকিয়ে আছে; আর সে উজ্জ্বল পাবক আগুন—আমার মন-পতঙ্গের?

এই কথা মনে হতেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল আর তার অন্তরে ফাল্গুনীর মুখ থেকে শোনা সুরের গুঞ্জরণ জাগ্‌ল—

"তুম্ শামা হো—মৈঁ পরবানা?"

মেঘমালা ফাল্গুনীর নামের মাধুর্য্যরসে এমন নিমগ্ন হয়ে গেল যে, সে-সব চিঠির প্রত্যাশায় সে বাইরের ঘরে এসে বসেছিল, সেই-সব চিঠি তার কোলের উপর উপেক্ষিত হয়ে পড়েই রইল', খুলে পড়্‌বার কথা তার মনেও পড়্‌ল না। তার মনের মধ্যে এই কথাই বারম্বার গুঞ্জরণ ক'রে ফির্‌ছিল—খাসা নাম! খাসা নাম! বেশ নামটি!

সঙ্গে সঙ্গে তার মন জুড়ে এই গানটি ঘুরে ঘুরে নেচে ফির্‌তে লাগল—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ!
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতি-ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে চাই মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী-কুল-নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

মেঘমালা রসাবিষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ ব'সে ছিল, হঠাৎ সে কার স্পর্শ পেয়ে চম্‌কে উঠ্‌ল—কুস্তমজী তার পায়ে গা ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে ডাক্‌লে—মাওঁওঁ!

মেঘমালার ধ্যানভঙ্গ হ'লো, সে স্মিতমুখ নত ক'রে স্নেহক্ষরিত দৃষ্টিতে কুস্তমজীর দিকে তাকিয়েই হাস্‌তে হাস্‌তে

বল্লে—বা রে রসিকচাঁদ, আবার গহনা পরা হয়েছে! দেখি, দেখি……

মেঘমালা হেঁট হয়ে রুস্তমজীকে কোলে তুলে নিলে, রুস্তমজীর গলা অমনি আনন্দের রসস্রোতে ঘড়ঘড় করতে লাগল।

মেঘমালা দেখলে—রুস্তমজীর গলায় রূপার একছড়া বিছাহারের সঙ্গে এক থোলো রূপার ঘুঙুর কে পরিয়ে দিয়েছে! কে আর পরিয়ে দেবে?—যে দেবার, সেই দিয়েছে! অমনি মেঘমালা হেসে ফেল্লে যেই তার মনে হলো—Love me and love my cat!

মেঘমালা রুস্তমজীর গলার ঘুঙুরগুলি নাড়াচাড়া করছিল আর ভাবছিল। সে দেখ্‌লে, ঘুঙুরগুলি একটি বড় মাদুলীর গা ঘিরে লাগানো। মাদুলীটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘমালা দেখ্‌তে পেলে, তার এক মুখের চাক্‌তির এক পাশে একটা ছোট কব্জা আছে। কব্জা যখন আছে, তখন ওটা নিশ্চয় খোলা যায়। ঢাক্‌নি খোল্‌বার উপায় অনুসন্ধান করতে মনোযোগ দিতেই দেখ্‌লে, কব্জার উল্টা দিকে একটা ছোট্ট টেপা ক্লিপ আছে। সেই ক্লিপে টিপ দিতেই স্প্রিং-দেওয়া ঢাক্‌নি ছিট্‌কে খুলে গেল। মাদুলীটা ফাঁপা। তার মধ্যে একটা সরু কাগজ কুণ্ডলী পাকিয়ে গুটানো আছে। সেই কাগজকুণ্ডলী বার ক'রে পাক খুলে মেঘমালা দেখলে—সরু কলম দিয়ে কাগজের উপর লেখা আছে—

"প্রপন্নার্ত্তি-হরে দেবি প্রসীদ ময়ি শঙ্করি!" *

ঐ লেখাটি পড়েই মেঘমালার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সে রুস্তমকে বল্লে—খাসা রক্ষাকবচ পেয়েছিস! তোর সকল রিষ্টি কেটে গেল! এত আদরও তোর কপালে ছিল? আমি ভাবতাম, তুই বুঝি কেবল লোকের চক্ষুশূল!

মেঘমালা রুস্তমজীকে কোলে তুলে হাসি-মুখে উপর-তলায় যেতেই ঠাকুরমা তাদের দেখে বল্লেন—বাঃ! ছেলের গলায় আবার গহনা গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে!

কত সাধ যায় লো চিতে—
মলের আগায় চুট্‌কি দিতে!

মেঘমালা হেসে বল্লে—তা ঠাকুরমা, হিংসে কোরো না,

* হে দেবি, তুমি আগত দুঃখ হরণ করতে সমর্থ, তুমি শুভকরী, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

তোমার নাতজামাই যখন আসবে, তখন তাকে বল্‌ব, তোমার পায়ে ঘুঙুর দেওয়া নূপুর পরিয়ে দেবে আর তুমি চন্দ্রাবলী হয়ে আহ্লাদে নৃত্য করবে, সে গান ধর্‌বে—

রুমঝুম, রুমঝুম কে এলে
নূপুর পায়!
ফুটিল শাখে মুকুল
ও-রাঙা চরণ-ঘায়!

মেঘমালা সুর ক'রে গান ধরেছিল। তার ঠাকুরমার সঙ্গে রসিকতার কথা শুনেই তার মা ও বাবা দুজনে পাশের ঘর থেকে হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে এলেন। মেঘমালা তাঁদের দেখেই লজ্জা পেলে এবং জিভ কেটে গান থামিয়ে ফেলে হাস্‌তে লাগল।

ঠাকুরমা মেঘমালার গানের উত্তরে বল্লেন—দেখা যাবে লো দেখা যাবে! তোর পায়ে নূপুর পরিয়েই তোর বর অবসর পাবে না, তা আবার আমায় পরাবে।……

মেঘমালা বাপ-মার সাম্‌নে আর কোনো জবাব দিল না, কাযেই ঠাকুরমার রসিকতাও আর জম্‌ল না।

মেঘমালার মা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—এই জন্যেই বুঝি সে দিন আমার কাছ থেকে স্কলারশিপের টাকাগুলো চেয়ে নিলি? তা বেশ হয়েছে, ঐ গহনার লোভে রুসোকে সুদ্ধ কেউ চুরি ক'রে নিয়ে যাবে, আপদ যাবে।

মেঘমালার মন আজ খুশীতে ভ'রে উঠেছিল, কাজেই মায়ের কথা শুনেও তার মুখ ম্লান হলো না—সে হাস্‌তেই লাগল।

তার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের সেকরা ত কৈ আসে নি? এ গহনা কে গড়িয়ে দিলে?

মেঘমালা মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ ক'রে বল্লে—"আমার এক বন্ধু।" এই কথা বলেই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঠাকুরমা বল্লেন—শিগ্‌গির শিগ্‌গির একটা বিয়ে কর। তোর খোকা হ'লে তাকে সাজাস। ও-মুখপোড়াকে সাজিয়ে কি হবে?

ঠাকুরমার কথায় লজ্জা পেয়ে মেঘমালা সেখান থেকে পলায়ন করল। সে নিজের ঘরে গিয়ে রুস্তমজীকে কোলে নিয়ে বসল এবং এক টুক্‌রা কাগজে লিখ্‌লে—

প্রসন্নোঽস্মি রে ভক্ত, বরং বৃণু। *

তার পর রুস্তমজীর গলার মাদুলী থেকে ফাল্গুনীর লেখা কাগজের কুণ্ডলীটা বাহির ক'রে নিয়ে তার নিজের লেখা কাগজটুকু কুণ্ডলী পাকিয়ে মাদুলীর মধ্যে বন্ধ ক'রে দিলে।

মেঘমালা রুস্তমজীকে কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে হাসিমুখে আদর ক'রে বল্‌লে—রুস্থ, যাও, একটু বেড়িয়ে এসো গে।

রুস্তমজী আদর পেয়ে মেঘমালার পায়ে গা ঘষতে ঘষতে ডাক্‌তে লাগল, সে তাকে ছেড়ে যেতে চায় না।

মেঘমালা আদরভরা এক চাপড় মেরে রুস্তমকে বল্‌লে—যাও না দস্যি, নড়ো না……

রুস্তম আদরের চাপড়ে কৃতার্থ হয়ে ডাক্‌লে—"ম্যাঁও।" তার পর তার লেজ তুলে ঘুরে ফিরে মেঘমালার পায়ে গা ঘষা চল্‌তে লাগল।

রুস্তম স্বেচ্ছায় নড়ে না দেখে মেঘমালা তাকে কোলে ক'রে ছাদে নিয়ে গেল এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে ছাদের আল্‌সে ডিঙিয়ে রুস্তমকে পাশের বাড়ীর ছাদে ফেলে দিলে।

রুস্তম তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে পার হয়ে ফিরে এসে মেঘমালার পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লে—ম্যাঁও!

রুস্তমের অবুঝ অবাধ্যতা দেখে মেঘমালার মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠল এবং সে নিজের অপ্রসন্নতায় কৌতুক অনুভব ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে নীচে চ'লে গেল আর রুস্তমও তার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এল।

মেঘমালা বুঝলে যে, তার গরজ যতই প্রবল থাক্, রুস্তমের মর্জির উপরই তাকে নির্ভর ক'রে থাক্‌তে হবে। সে রুস্তমকে চোখে চোখে রেখে ফির্‌তে লাগল এবং একান্ত-মনে কামনা করতে লাগল যে, রুস্তম পাশের বাড়ীতে বেড়াতে যাক……যাক। কিন্তু রুস্তম আর তার সঙ্গ ছেড়ে নড়ে না।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় পাশের বাড়ীতে পিঁড়ি পাতার শব্দ শোন্‌বামাত্রই রুস্তমজী এক ছুট দিয়ে চ'লে গেল।

রুস্তম যে-বাড়ীর প্রতিপালিত, সে-বাড়ীর খাবার জায়গার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না, অন্ত্যজ অস্পৃশ্যের মতন তাকে একলা একধারে খেতে হয়। কিন্তু পাশের বাড়ীতে সে ভোক্তার সঙ্গে সমান হয়ে ব'সে খাবারের তুল্য ভাগ পায়, তাই তার পাশের বাড়ীতে খেতে যেতে এত আগ্রহ। পিঁড়ি পাতার কি জলের গ্লাস রাখার শব্দ কানে গেলেই শ্যামের বংশীরবে আকৃষ্ট শ্যামলী-ধবলীর মতন পুচ্ছ তুলে রুস্তমজী দৌড় মারে।

রুস্তমজীর ছোটা দেখে মেঘমালার মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং রুস্তমের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় তার মন উৎসুক হয়ে রইল।

রুস্তমজী নটার পরে বাড়ী ফির্‌ল।

তাকে দেখেই মেঘমালা লুফে কোলে তুলে নিলে এবং তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চ'লে গেল। সেখানে গোপনে রুস্তমজীর মাদুলী খুলে কাগজ বা'র ক'রে দেখ্‌লে, জবাব এসেছে—

আয়ুর্ নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং
যাতি ক্ষয়ং যৌবনং,
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ ন দিবসাঃ
কালো জগদ্‌ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্ তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা
বিদ্যুচ্চলং জীবনং,
তস্মান্ মাং শরণাগতং শিবকরি
ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥
অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বম্ এব শরণং মম।
তস্মাৎ করুণভাবেন রক্ষ রক্ষ শুভঙ্করি॥ *

মেঘমালা পরম কৌতুক অনুভব ক'রে তখনই উত্তর লিখলে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বক্ষোভেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ †

---

* রে ভক্ত, আমি তোর স্তবে পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা কর্।

* দেখ, প্রতিদিন আয়ু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যৌবন ক্ষয় পাচ্ছে, বিগত দিবস পুনর্ব্বার ফিরে আসে না, কাল হচ্ছে জগদ্‌ভক্ষক, লক্ষ্মী জলতরঙ্গভঙ্গের ন্যায় চপলা, জীবন বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; অতএব হে কল্যাণকারিণি, শরণাগত আমাকে তুমি সম্প্রতি রক্ষা করো, রক্ষা করো। আমার আর কেউ আশ্রয়দাতা নেই, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, অতএব হে শুভকারিণি, করুণা ক'রে আমাকে রক্ষা করো, রক্ষা করো।

† সব কিছু ত্যাগ করে কেবলমাত্র আমারই শরণাপন্ন যদি হও, তবে আমি তোমাকে সকল ক্ষোভ থেকে উদ্ধার করব, আক্ষেপ কোরো না।

এবং সেই কাগজটুকু পাকিয়ে রুস্তমের গলার মাদুলীতে ভ'রে রাখলে—কখন্ সে পাশের বাড়ীতে বেড়াতে যাবে, তা তো বলা যায় না। আর রুস্তমজী তো এ বাড়ীর সকলের অস্পৃশ্য, কাজেই এই রক্ষাকবচের মন্ত্র কারও কাছে ধরা পড়বার সম্ভাবনা নেই। মেঘমালা এই এক কৌতুককর খেলায় মেতে উঠেছিল, তার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল, রুস্তম আজই রাত্রে আবার পাশের বাড়ীতে যাক্, এবং আর একটা কিছু উত্তর নিয়ে আসুক। কিন্তু জগতে সকল ইচ্ছাই তো পূর্ণ হয় না।

পরদিন প্রভাতে সে দেখলে, রুস্তমজী দুধের ভাগ পাবার লোভে আগে থাকতেই ফাল্গুনীর পূজার আসনের পাশে গুটিসুটি হয়ে ব'সে আছে। ফাল্গুনী তাকে দুধ খাইয়ে কোলে ক'রে নিয়ে নীচে নেমে গেল। সিঁড়ির উপর আলো আসবার একটা ঘুলঘুলি দিয়ে ঐ ব্যাপার দেখে মেঘমালার বুকের মধ্যে হৃদয়টি ধক্‌ধক্ করতে লাগল।

রুস্তম ফিরে আস্‌তেই মেঘমালা তাকে সিঁড়িতেই গ্রেপ্তার কর্‌লে এবং নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে মাদুলী খুলে পড়লে—

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে,
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ ত্বাং সংযাচে শুভদে, জননং যাতু মম বৈ
দেবী মেঘমালা জয় জয় জয়স্থিতি জপতঃ॥ *

এই প্রার্থনা পাঠ ক'রে এবং প্রার্থনার ত্বাং সংযাচে (তোমায় যাচ্ঞা করি) কথা দুটির নীচে লাল-কালীর যুগল রেখা টানা দেখে মেঘমালার মন লজ্জায় ও আনন্দে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যে, সে আর এ লেখার খেলা চালাতে পার্‌লে না; সে একটু কাগজ ছিঁড়ে তার উপর কেবল লিখলে—

তথাস্তু! *

সে দিন ইউনিভার্সিটিতে যাবার আগে মেঘমালা কিছুতেই রুস্তমজীকে পাশের বাড়ীতে পাঠাতে পারলে না। সে উদ্বিগ্নচিত্তে ইউনিভার্সিটিতে চ'লে গেল এবং তার মন বন্দী হয়ে রইল রুস্তমজীর গলার মাদুলীর মধ্যে।

সে বাড়ীতে ফিরে এসেই দেখলে, মাদুলীর মধ্যে তার এক-শাব্দিক পত্রের উত্তর একটি শব্দে ফিরে এসেছে—

স্বস্তি! †

মেঘমালা ঐ কাগজটুকু রুস্তমজীর মাদুলীর মধ্যেই রেখে দিলে—আর তার লেখবার কিছু নেই।

মেঘমালা বিকাল-বেলা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে ফাল্গুনী এসে তাদের বাড়ীতে ঢুক্‌ল। তাদের ভৃত্য ফাল্গুনীকে দেখেই তাড়াতাড়ি তার কাছে গেল। ভৃত্যের তটস্থ সম্ভ্রমের ভাব দেখে মেঘমালার মনে হলো, ফাল্গুনী তার কাছে অপরিচিত নয়, সে হয় তো ফাল্গুনীর ভৃত্য ও পাচকের সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে বাবুরও পরিচয় পেয়ে রেখেছে।

ফাল্গুনী একটু অপ্রতিভভাবে স্মিতমুখে ভৃত্যকে বল্‌লে—তোমার বাবুকে বলো, পাশের বাড়ীর বাবু দেখা কর্‌তে এসেছেন।

ভৃত্য এসে কর্ত্তাকে খবর দিলে।

মেঘমালার পিতা নীচে নেমে গিয়ে বৈঠকখানায় যেতে যেতে স্মিতমুখে দূর থেকেই অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা ক'রে বল্‌লেন—আসুন, আসুন, এই ঘরে আসুন……

ফাল্গুনী প্রথম পরিচয়ের লজ্জার সঙ্কোচের সহিত অগ্রসর হয়ে মেঘমালার পিতাকে প্রণাম কর্‌লে এবং নম্রস্বরে বল্‌লে—আমি আপনার ছেলের মতন, আমাকে আপনি 'আপনি' বল্‌বেন না।

মেঘমালার পিতা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, তুমি অভয় দিলে 'তুমি' বল্‌তে পারি।……

তাঁরা ঘরের ভিতর প্রবেশ কর্‌লেন।

উপর থেকে নীচে নাম্‌বার সিঁড়ির ঠিক পাশেই বৈঠকখানা, আর তার পাশেই বাড়ী থেকে বাইরে পথে বেরোবার দরজা; বৈঠকখানার পাশে কোনো ঘর নেই; কাজেই ফাল্গুনীর সঙ্গে পিতার কি কথাবার্ত্তা হচ্ছে জান্‌বার কৌতূহল

---

* আমার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নেই, ঐশ্বর্য্য-সম্পদও চাই না আমি; হে শশিমুখি, বিশেষ জ্ঞান ও বিদ্যার অপেক্ষাও নেই, সুখের ইচ্ছাও নেই; এইজন্য আমি কেবল হে শুভদাত্রি, তোমাকে যাচ্ঞা করছি, যাতে আমার অবশিষ্ট জীবন দেবী মেঘমালার জয় জয় জয় হোক এই মন্ত্র জপ করতে করতে যাপন করতে পারি।

* তাই হোক।

† শুভ হোক; আশ্বাস পেলাম।

মেঘমালার মনে প্রবল হ'লেও তাকে তা দমন ক'রে থাকৃতে হলো; তার যদিও বৈঠকখানার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে কথাবার্ত্তা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছিল, তথাপি চাকর-দাসীদের কাছে ধরা পড়বার লজ্জায় সে কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে রইল।

অনেকক্ষণ পরে মেঘমালা দেখলে, ফাল্গুনী প্রফুল্লমুখে বেরিয়ে গেল এবং যাবার সময় তার উৎসুক দৃষ্টি একবার চারিদিকে বুলিয়ে কাকে যেন দেখ্তে পাওয়ার বাসনা প্রকাশ ক'রে গেল।

মেঘমালা তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার উল্টা দিকের বারান্দার থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে তার মায়ের কাছে গিয়ে বস্‌ল হাতে একটা সেলাই নিয়ে।

মেঘমালা যা প্রত্যাশা করেছিল, তাই ঘট্‌ল, তার বাবা হাসিমুখে সেখানেই এসে উপস্থিত হলেন এবং কন্যাকে বল্‌লেন—বুড়ী, এই পাশের বাড়ীতে যে ছেলেটি থাকে, সে এসেছিল আমার সঙ্গে আলাপ করতে। তুই তাকে চিনিস ?……

পিতার এই প্রশ্নে মেঘমালার মুখ লজ্জায় রাঙা টকটকে হয়ে উঠল, তার মনে হ'লো—বাবার এ প্রশ্নের মানে কি, ফাল্গুনী কি বাবার কাছে আমার কথা কিছু ব'লে গেল না কি ?

মেঘমালা কি উত্তর দেবে, এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ ক'রে স্থির করবার পূর্ব্বেই তার বাবা নিজের কথার উপসংহার করলেন—ইউনিভার্সিটিতে সেও এম-এ পড়ে, সংস্কৃতে ··

মেঘমালা সেলাইয়ের ফোঁড় তুল্‌তে তুল্‌তে নত নেত্রে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—না।

তার এই লজ্জা ও কুণ্ঠা যে অশোভন হচ্ছে, তা সে বুঝ্‌তেই পারছিল না।

তার বাবা বল্‌তে লাগলেন—অদ্ভুত রকমের ছেলেটি; বি-এস-সি পাশ ক'রে বোমার মামলা আর স্বদেশী ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে দু বচ্ছর ইন্টার্ণড হয়েছিল। সেই সময় ইংরেজী সংস্কৃত ফিলজফী ইত্যাদি খুব পড়ে। তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ না থাকাতে খালাস পায়। তখন আবার বি-এ পাশ করে। এখন সংস্কৃতে এম-এ পড়ছে।

মেঘমালার মন ফাল্গুনীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠল। তার বাবাকে সহস্র প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু কেন যে তার এত লজ্জা, তাই সে ভালো বুঝে উঠতে পারছিল না।

তার মা প্রশ্ন করলেন—ছেলেটিকে তো আমি দেখেছি, দিব্যি দেখতে, সভ্যভব্য। ওদের বাড়ী কোথায় ?

মেঘমালার বাবা বল্‌লেন—রাজসাহীতে। আমাদেরই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। জমিদার। বাপ-মা ভাই-বোন কেউ নেই। একা—নিজেই নিজের মালিক। সে বল্‌লে—সে যখন গভর্ণমেণ্টের সুনজরে একবার পড়েছে, তখন তার থাকা-না-থাকার স্থিরতা তো কিছু নেই, কাজেই এর মধ্যেই সম্পত্তির উইল ক'রে রেখেছে; যদি অবিবাহিত অবস্থায় বা বিবাহের পর অপুত্রক অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তা হ'লে সমস্ত সম্পত্তি তার গ্রামের ডিস্‌পেন্সারী, ছেলে-মেয়ের স্কুল আর দেশের অন্য অন্য কাজের সাহায্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে; বিধবা স্ত্রী থাক্‌লে তিনি একটা অংশ পাবেন।

মেঘমালার মুখ ম্লান হয়ে উঠ্‌ল।

তার মা বল্‌লে—বালাই, ষাট! ছেলেটা ক্ষেপা না কি ? ছেলেমানুষ, বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হবার আগেই মরার ভাবনা কেন ?

মেঘমালার বাবা বল্‌লেন—এতে তো তার দূরদর্শিতা আর বিচক্ষণবুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। যে দিন-কাল পড়েছে! ছেলেটিকে তো আমার খুবই ভালো লাগ্‌ল।… বুড়ী, তুই ওর সঙ্গে আলাপ করবি ? …আমি ওকে রবিবার রাত্রে আমাদের সঙ্গে খেতে নেমন্তন্ন করেছি।

মেঘমালার মাথাটা কোলের উপর ঝুঁকে পড়ল—সে সেলাইয়ে কি একটা ভুল ক'রে বসেছে, সূচ দিয়ে সে সেলাই করা সূতার ফোঁড় খুল্‌তে ব্যস্ত।

মেঘমালার বাবা কন্যার অবস্থা দেখে তার মনের ভাব অনুভব ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—ফাল্গুনী এসেছিলেন সুভদ্রা-হরণের উদ্দেশে; বল্‌লে—আপনি আমার দেশে আর প্রোফেসারদের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখুন, আমি নেহাৎ অপাত্র ব'লে প্রতিপন্ন হবো না; জীবনে তামাক কি অন্য কোনো নেশা করি নি; সর্দ্দি না হ'লে চা খাই না; বারো বৎসরের মধ্যে একটিমাত্র পাণ খেয়েছি মনে পড়ে। আমার পিতামহ আর মাতামহ উভয় বংশই নীরোগ বলিষ্ঠ ব'লে বিখ্যাত। আমাদের বংশের একটা ব্যসন আছে শিকার করা—ছুটির সময় আমিও দেশে গিয়ে শিকার করি।

মেঘমালা পিতার কথায় লজ্জা পেয়ে সেখান থেকে উঠে চ'লে যাচ্ছিল।

তাকে পলায়নোদ্যত দেখে তার পিতা বল্লেন—আর ফাল্গুনী বল্ছিল—আপনার কন্যার অসম্মতি হবে না ভরসাতেই আমি নিজে এই প্রস্তাব করতে এসেছি, আর আমার কেউ অভিভাবক নেই ব'লে আমাকে নিজেই আস্তে হয়েছে।

মেঘমালা পলায়ন ক'রে নিজের ঘরে গিয়ে লুকাল, তার মন তখন শ্রদ্ধায়, অনুরাগে ও সুখের মোহে আবিষ্ট আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল।

কতক্ষণ সে এইরকম ভাবে যে ব'সে ছিল তার খেয়ালই ছিল না। তার ঠাকুরমা এসে তার ধ্যান ভঙ্গ করলেন—কি লো, তুই নাকি স্বয়ম্বরা হয়েছিস?

মেঘমালা হেসে বল্লে—হিংসে কোরো না ঠাকুরমা, তোমাকেও সতীন ক'রে নেবো।

ঠাকুরমা তার চিবুক স্পর্শ ক'রে চুম্বন ক'রে বল্লেন—বালাই ষাট, হিংসে করব কেন ভাই, তুই রাজরাণী হ, স্বামিসোহাগিনি হ, সতীন তোর শত্রুর হোক।

মেঘমালা হেসে বল্লে—বিনা স্বার্থে কি আমি তোমাকে সতীন করতে চাইছি, ঠাকুরমা? একে তোমার বয়সটা নিরাপদ, তাতে তোমার মতন যত্ন তো আমি করতে পারব না? তুমি আমাদের যত্ন-আদর করবে, আর আমরা পরম সুখে ঘরকন্না করব।

ঠাকুরমা ছলছল চোখে বল্লেন—শিগ্গির মালাবদল ক'রে নে ভাই, তোর কোলে একটি সোনার চাঁদ ছেলে দেখে আমি তবে সুখে মরতে পারব।

মেঘমালা কোপ প্রকাশ ক'রে বল্লে—যাও ঠাকুরমা, ও-কথা মুখে আন্লে তোমার সঙ্গে আড়ি।

ঠাকুরমা নাতনীর স্নেহের পরিচয়ে সুখী হয়ে ঘর থেকে চ'লে যেতে যেতে হেসে ব'লে গেলেন—এই দেখ ভাই, ভয় পেয়ে আগে থাক্তেই আড়ি ক'রে রাখছিস্।

* * * *

রবিবার রাত্রে ফাল্গুনী মেঘমালার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এল। আজ সমস্ত দিন ধ'রে মেঘমালার ঠাকুরমা আর মা নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করেছেন, তারই সৌরভে সমস্ত বাড়ীর বাতাস পূর্ণ হয়ে আছে। ফাল্গুনী নিজের বাসা থেকে বিবিধ খাদ্য রন্ধনের গন্ধ সমস্ত দিন পেয়েছে; এখন নিমন্ত্রণের বাড়ীতে এসে সেই গন্ধ তার আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। কিন্তু আজ সমস্ত দিন সে মেঘমালাকে একবারও দেখতে পায় নি; মেঘমালার বাড়ীতে এসে তার চক্ষু চঞ্চল হয়ে উঠল।

মেঘমালার বাবা বাইরের ঘরেই ব'সে ছিলেন। ফাল্গুনীর পদশব্দ শুনেই তিনি বৈঠকখানার দরজার কাছে এসে প্রফুল্লমুখে বল্লেন—এস বাবা, এস। চলো একেবারে ওপরে গিয়ে বসি।

এই ব'লে তিনি অগ্রসর হয়ে উপরে যাবার সিঁড়ির দিকে চল্লেন; ফাল্গুনী তাঁর অনুসরণ ক'রে চল্লো। মেঘমালার পিতা যে তাকে মেঘমালার কাছ থেকে দূরে রেখে গল্প জুড়ে দিলেন না, এতে ফাল্গুনীর মন বিশেষ সন্তোষ লাভ করল এবং উপরে গেলে যে অবিলম্বে মেঘমালার দর্শনলাভ ঘটবে, সেই আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

উপরে উঠেই ফাল্গুনী দেখলে, একজন প্রৌঢ়া বিধবা ও একজন সধবা বধূ দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁদের ফাল্গুনী চিন্ত—মেঘমালার ঠাকুরমা ও মা; কিন্তু সেখানে মেঘমালা নেই।

মেঘমালার পিতা ফাল্গুনীর দিকে তাকিয়ে বল্লেন—ফাল্গুনী, ইনি আমার মা, আর উনি মেঘমালার মা।

ফাল্গুনী অগ্রসর হয়ে তাঁদের প্রণাম করতে করতে ভাবলে—তা তো হলো, কিন্তু আসল জন কই?

ফাল্গুনী প্রণাম ক'রে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করলে, তা দেখে মেঘমালার ঠাকুরমা বললেন—এস ভাই এস,—ফাল্গুনী এসেছ সুভদ্রা-হরণ করতে—তোমার মন ভাজা-মাছের গন্ধে বেরালের মতন যার জন্যে ছোঁক-ছোঁক করছে, তার সঙ্গে দেখা করবে এস—সে ছুঁড়িকে কিছুতেই এখানে আন্তে পারলাম না।

ঠাকুরমা ফাল্গুনীর হাত ধ'রে টান্তে টান্তে বারান্দার অপর প্রান্তের ঘরের দিকে নিয়ে চল্লেন।

ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছ থেকে একটু দূরে গিয়েই ফাল্গুনী হেসে বল্লে—ঠাকুরমা, প্রথমে তো আপনার পাণিগ্রহণ হয়ে গেল! আজকালকার কালে বহুবিবাহ কি চল্বে?

তখন তারা ঘরের সাম্নে গিয়ে পৌঁছেছে। ফাল্গুনী দেখলে, মেঘমালা সুখলজ্জায় আরক্তিম স্মিত মুখ নত ক'রে কোলের উপর উপবিষ্ট কস্তুরীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, সবুজ ঘোমটা দেওয়া একটা ইলেক্ট্রিক ল্যাম্পের আলো

তার কপাল থেকে নাকের ডগা পর্য্যন্ত উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে ও তার মুখ ও চিবুক আবছায়ায়।

ঠাকুরমা ফাল্গুনীর মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে কথায় হাসি মাখিয়ে বল্লেন—তা ভাই, বহু বিবাহে যদি অরুচি থাকে তো এখান থেকেই ফিরি।

ঠাকুরমার হাসি-মাখা কথা শুনে মেঘমালা মুখ ঈষৎ তুলে ফাল্গুনীকে দেখেই কোল থেকে রুস্তমকে তাড়াতাড়ি বিছানায় নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং ফাল্গুনীকে একেবারে তার ঘরের সাম্‌নে উপস্থিত দেখে ও ঠাকুরমার রসিকতা শুনে তার মুখ সুখের লজ্জায় আরো লাল হয়ে উঠল।

ফাল্গুনী মেঘমালাকে অনুরাগমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে ঠাকুরমাকে হাসিমুখে বল্লে—ঠাকুরমা, আমি গডাচর চণ্ডের মত সুবোধ ছেলে—আমি ডুডও খাই টামাকও খাই!

ঠাকুরমা ফাল্গুনীকে নিয়ে ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে বল্লেন—না ভাই, তোমার আর দু-নৌকোয় পা রেখে কাজ নেই।

তার পর তিনি মেঘমালার ডান হাতখানি ধ'রে তার উপর ফাল্গুনীর ডান হাত রেখে দিয়ে বল্লেন—এই নে মালা, আমার এই প'ড়ে পাওয়া অস্থাবর সম্পত্তিটি আমি তোকে স্বচ্ছন্দ-চিত্তে সুস্থ-শরীরে নিঃস্বত্ব হয়ে একেবারে দান ক'রে দিচ্ছি, এতে অপর কেহ যদি দাবী-দাওয়া বা আপত্তি করে তবে তাহা নামঞ্জুর হয়।

মেঘমালা হাস্যোৎফুল্ল মুখে একবার ফাল্গুনী ও ঠাকুরমার মুখের দিকে চেয়ে লজ্জায় মুখ নত কর্‌ল'! ফাল্গুনী সেই ব্রীড়াময়ীর মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ঠাকুরমা তাদের ভাববিহ্বল ভাব দেখে সুখী হয়ে বল্লেন—তোমরা ভাই পরস্পরকে এখন যাচাই ক'রে নাও, আমি তোমাদের খাবার দেবার ব্যবস্থা করি গে।

ঠাকুরমা বেরিয়ে চ'লে গেলেন। ফাল্গুনী ও মেঘমালা সুখাবেশে আবিষ্ট হয়ে নির্ব্বাক্ দাঁড়িয়ে রইল।

এমন সময় রুস্তমজী ফাল্গুনী ও মেঘমালার পা পরিবেষ্টন কর্‌তে কর্‌তে ডাক্‌লে—ম্যাঁওঁও!

মেঘমালার সম্রমশিথিল হাত থেকে ফাল্গুনীর হাত খ'সে পড়ছিল। সে সুখস্বর্গ থেকে স্খলিত হাত দিয়ে রুস্তমজীকে কোলে তুলে নিয়ে হাসিমুখে মেঘমালার দিকে ফিরিয়ে বল্লে—আমাদের ঘটক ঠাকুর! একে ঘটক-বিদায় খুব ভালো রকম কিছু দিতে হবে।

মেঘমালা হেসে বল্লে—ঘটক-বিদায় তো ও আগেই পেয়ে গেছে রূপোর হার।

ফাল্গুনী একটু গম্ভীর হয়ে বল্লে—কিন্তু যিনি রূপের হার, তাঁকে ঠাকুরমা যে তুচ্ছ উপহার দিয়ে গেলেন, সেটা কি তাঁর গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হলো?

মেঘমালা একটু হেসে লজ্জাজড়িত স্বরে বল্লে, গ্রহণযোগ্য যদি না হতো, তা হ'লে কি অ-নিরুদ্ধ হয়ে উষার মন্দির পর্য্যন্ত পৌছাতে পার্‌তেন?

ফাল্গুনীর গম্ভীর মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রফুল্ল হলো না। সে গম্ভীরভাবেই বল্লে—কিন্তু আমার সম্পূর্ণ পরিচয় তো আপনি পান নি……

মেঘমালা একটু কুণ্ঠিত স্বরে বল্লে—আপনি যেখানে যেখানে খোঁজ নিতে বলেছিলেন, সেখানে সেখানে লোক পাঠিয়ে চিঠি লিখে টেলিগ্রাম ক'রে বাবা তো আপনার পরিচয় আনিয়েছেন……

ফাল্গুনী বল্লে—সে পরিচয় তো বাহিরের পরিচয়; আমি আপনাকে দু'একটা কথা বল্‌তে চাই…

মেঘমালাও ফাল্গুনীর গম্ভীর মুখ দেখে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল; সে বল্লে—আপনি বসুন…

ফাল্গুনী বস্‌ল; মেঘমালাও মাথা নত ক'রে বস্‌ল; কিন্তু ফাল্গুনীর কথা শোন্‌বার জন্য তার মন উদ্গ্রীব হয়ে রইল।

ফাল্গুনী বল্‌তে লাগ্‌ল—আজকাল আমাদের হতভাগা দেশের যে অবস্থা হয়েছে, তাতে দেশবাসী সকলকেই কিছু না কিছু দেশের কাজ কর্‌তে হবে। যখন ধনী, বিলাসী, জ্ঞানী, গুণী মান্য ব্যক্তিরা দলে দলে জেলে চলেছেন, তখন সমর্থ কারও নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকা শুধু কাপুরুষতা নয়, অধর্ম্ম।…

ফাল্গুনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঘমালার মুখের দিকে চাইল। মেঘমালা মুখ তুল্লে না দেখে, মুহূর্ত্তমাত্র থেমে সে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—আমার দেশের স্বাধিকার দাবী করবার চেষ্টায় যে ব্রতী হবে, তাকে প্রাণপণ করেই লাগ্‌তে হবে—কত লোক তো প্রাণপাত কর্‌ছে…

ফাল্গুনী আবার একটু থাম্‌ল। কিন্তু তখনও মেঘমালাকে নির্ব্বাক দেখে সে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—আমাদের বিবাহ-বন্ধন কি বন্ধন হবে?

এইবার মেঘমালা ক্ষীণস্বরে কথা বল্‌লে—আমি জানি, আপনি বীর; আমি বীরপত্নী হবার চেষ্টা করব·· আমি আপনার সহধর্ম্মিণী সহকর্ম্মিণী হব।

ফাল্গুনীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল; সে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমার যদি কিছু হয়? ··

ফাল্গুনীর প্রশ্নের মধ্যে তার প্রাণের আগ্রহ ফুটে উঠ্‌ল। সেই আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে মেঘমালা ব'লে ফেল্‌লে—তোমার আরব্ধ কাজ আমি তুলে নেবো।

ফাল্গুনী মেঘমালার উদ্দীপ্ত মুখ থেকে দৃঢ় বাক্য শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু তার চিত্ত আনন্দে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল' যে, সে আর কোনো কথাই বল্‌তে পার্‌ল' না, স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল।

দু'জনে নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, অথচ সামনাসামনি ব'সে আছে; এক অপরের ভাবনায় তন্ময় হয়ে উঠেছে।

কতক্ষণ তারা এমনি ভাবেই ব'সে ছিল, হঠাৎ ঠাকুরমার কথায় তাদের চমক হলো—

—বেশ লোকের কাছে তো অতিথিকে গচ্ছিত রেখে গেছি! দুজনে সেই থেকে চুপ মেরে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে আছ। যতই লেখাপড়া শেখো, ফুলশরের ঘা খেলে আর মুখে কথা সরে না! এসো, এখন খাবে এসো।

ফাল্গুনী ঠাকুরমার ঠাট্টা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল এবং মেঘমালা স্মিতমুখ নত ক'রে ব'সে রইল।

ফাল্গুনী তার ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে খেতে বস্‌ল। মেঘমালার মা পরিবেষণ কর্‌তে লাগলেন। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথায় কথায় উভয় পক্ষের অনেক পরিচয় আদান-প্রদান হলো এবং তাতে দুই পক্ষই সন্তুষ্ট হলো।

আঁচিয়ে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে ফাল্গুনী ঠাকুরমার কাছে গিয়ে মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—ঠাকুরমা, আমার তো আর কেউ নেই, আপনাকেই বরকর্ত্তা হতে হবে। আপনি কন্যাকর্ত্তাদের একটু জিজ্ঞাসা করুন, তাঁদের যদি পাত্র পছন্দ হয়ে থাকে, তবে আমি আজই পাকা দেখা ক'রে যেতে চাই।

ঠাকুরমা ফাল্গুনীর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে হেসে বল্‌লেন—দেখাটা পাকাপাকি হ'তে কি এখনো বাকী আছে ভাই? আচ্ছা, আমি যখন আজ থেকে বরপক্ষ, তখন কন্যাপক্ষের সম্মতি নিয়ে আসি।

ঠাকুরমা ভৃত্যকে ফাল্গুনীর জন্য মশলা আন্‌তে ব'লে তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর নিকটে চ'লে গেলেন।

ভৃত্য একটি রূপার ডিবায় ক'রে মশলা এনে ফাল্গুনীর সাম্‌নে ধর্‌লে। ফাল্গুনী বিলম্ব কর্‌বার ইচ্ছাতেই ভৃত্যের হস্তধৃত ডিবার খোল থেকে বেছে বেছে একটু একটু ক'রে নানাবিধ মশলা তুলে নিতে লাগ্‌ল।

অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুরমা হাসিমুখে ফিরে এসে বল্‌লেন—ঘটকী-বিদায় চাই ভাই, কন্যাপক্ষের হুকুম আদায় ক'রে এনেছি—চলো, পাকা দেখা কর্‌বে।

ঠাকুরমা ফাল্গুনীর হাত ধ'রে মেঘমালার ঘরের দিকে চল্‌তে উদ্যত হলেন।

ফাল্গুনী বল্‌লে—দাঁড়ান ঠাকুরমা, ঘটকালির দক্ষিণাটা নগদ চুকিয়ে দি।

ঠাকুরমা কৌতূহলী হয়ে হাসিমুখে ফিরে দাঁড়ালেন।

ফাল্গুনী তাঁকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলে!

ঠাকুরমা খুশী হয়ে ফাল্গুনীর চিবুক স্পর্শ ক'রে হাসিমুখে হস্ত চুম্বন ক'রে বল্‌লেন—এই বুঝি তোমার ঘটকালির পারিশ্রমিক!—দক্ষিণায় পূর্ণ হস্তে শূন্য ভক্তিদান।

ঠাকুরমা হাস্‌তে হাস্‌তে ফাল্গুনীকে সঙ্গে নিয়ে মেঘমালার ঘরে গিয়ে বল্‌লেন—ওগো রূপসী সুন্দরী, তোমাকে দেখার সাধ এখনো তোমার উমেদারটির মেটে নি; তাই আবার এসেছেন পাকা দেখা কর্‌তে। তোমরা পরিণয়-সূত্রটা পাকিয়ে শক্ত ক'রে দুজনে দুজনকে বন্ধন করো। আশীর্ব্বাদ করি, এই বন্ধন অক্ষয় হোক!

ঠাকুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলেন।

মেঘমালা দৃষ্টিতে কৌতূহল-ভরা প্রশ্ন নিয়ে ফাল্গুনীর দিকে চাইলে।

ফাল্গুনী বল্‌লে—আমি তোমার বাড়ীর সকলের অনুমতি নিয়ে এলাম; আজই আমি পাকা-দেখা ক'রে যেতে চাই; তুমিও অনুমতি দাও।

মেঘমালা চোখের দৃষ্টিতে লজ্জা আর আনন্দ এবং মুখের হাসিতে প্রণয়ের মধু মাখিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে—দেখা পাকা হ'তে কি এখনো বাকী আছে? যে দিন তোমার কোলে আমার রুস্তমজীকে দেখেছিলাম, সেই দিনই তো পাকা দেখা হয়ে গেছে।

ফাল্গুনী গায়ের খদ্দরের চাদর খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লে—

তুমি যে আমাকে গ্রহণ করেছ, তার কিছু চিহ্ন আমি তোমার কাছে রেখে যেতে চাই।

মেঘমালা অবাক্ হয়ে দেখ্‌তে লাগল, ফাল্গুনীর গলায় পৈতার মতন ক'রে একটা খদ্দরের থলী ঝুলানো আছে, তা থেকে সে বাহির করতে লাগল, একখানা খদ্দরের শাড়ী আর ব্লাউস, একটা গহনার কেস, একটা সুন্দর খাপে ভরা সুন্দর বাঁট দেওয়া ছোরা, আর তিনটি সোনার কৌটা।

ফাল্গুনী সামগ্রীগুলি একটি টেবিলের উপর রেখে একে একে তুলে তুলে মেঘমালার হাতে দিতে লাগল ও বল্‌তে লাগল—আমার নিজের হাতের চরকা-কাটা সুতো দিয়ে নিজের তাঁতে বোনা এই শাড়ী আর ব্লাউস; এই কৌটাটিতে আছে সবরমতীর মাটি; এই কৌটাটিতে আছে য়ারবাদা জেলের দরজার মাটি; এই কৌটাটিতে আছে গান্ধীজীর হাতে তৈরী সুতা; আর এইটি আমার সঙ্গী, আজ থেকে তোমার সঙ্গী হয়ে থাকবে। স্বাবলম্বন, স্বদেশের দুঃখবোধ আর দুঃখ দূর করবার জন্য দুঃখবরণ, ন্যায্য অধিকার জোর ক'রে দাবী করবার সাহস ও শক্তি, আর আর্ত্তত্রাণ ও আত্মরক্ষার প্রতীক হলো এই জিনিসগুলি;—এগুলি তুমি গ্রহণ করো······

ফাল্গুনী সেইগুলি তুলে মেঘমালার হাতে দিতে উদ্যত হলো। মেঘমালা তাড়াতাড়ি পায়ের চটি-জুতা খুলে ফেলে উঠে দাঁড়াল, এবং ফাল্গুনীর সাম্‌নে দুই হাত যুক্ত ক'রে অঞ্জলি পেতে দিলে। পবিত্র দেবনির্ম্মাল্য গ্রহণ করবার সময় ভক্তের মুখ যেমন হয়, মেঘমালার মুখে তেমনি একটি পবিত্র শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-ভক্তির ভাব ফুটে ওঠাতে তাকে শুদ্ধাচারিণী পূজারিণীর মত দেখতে হলো।

ফাল্গুনী সামগ্রীগুলি মেঘমালার হাতের উপর তুলে দিলে। তার পর গহনার কেসটি খুলে একজোড়া সুন্দর জড়োয়া ব্রেসলেট বাহির ক'রে বল্‌লে—আর এইটি আমাদের উভয়ের প্রণয়ের রাখীবন্ধন। এসো, তোমার হাতে পরিয়ে দিয়ে যাই।

মেঘমালা জিনিস-ভরা দুই হাত মাথায় ঠেকিয়ে জিনিসগুলি টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলে আর তার পর দুই হাত ফাল্গুনীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মধুর ক'রে হাস্‌লে।

ফাল্গুনী মেঘমালার দুই হাতে ব্রেস্‌লেট পরিয়ে দিয়ে বল্‌লে—তোমার কিছু চিহ্ন আমাকে দাও।

ফাল্গুনীর এই প্রার্থনায় মেঘমালা চঞ্চল হয়ে উঠল, তার কি আছে—যা সে ফাল্গুনীকে উপহার দিতে পারে। সে বিব্রত ব্যাকুল হয়ে ফাল্গুনীর দিকে চোখ তুলে চাইতেই দেখলে, ঘরের এক কোণে একটা তেকোণা তেপায়ার উপর ফ্রেমে তারই একখানা ফটোগ্রাফের দিকে ফাল্গুনী তাকিয়ে আছে। অমনি মেঘমালা সেই ছবিটা তুলে এনে ফাল্গুনীর হাতে দিল। ফাল্গুনী খুশীর হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত ক'রে বল্‌লে—আজ নকল নিয়ে চল্‌লাম। শীগ্‌গির এসে আসলটিকে নিয়ে যাব। আজ তবে আসি······

ফাল্গুনী ফটোগ্রাফটি গলার থলীর মধ্যে রেখে বেরিয়ে চলেছে। রুস্তমজী এসে তার পা ঘিরে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লে ম্যাঁও!

ফাল্গুনী হেসে নত হয়ে তাকে দেখে বল্‌লে—ঘটকের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম সিদ্ধির নেশায়! ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি? তোকে কিন্তু একেবারে ভুলি নি।

এই ব'লে ফাল্গুনী তার থলী থেকে একটা নীল কাগজের পুরিয়া বাহির করলে এবং তা থেকে সোনার হারে গাঁথা সোনার ঘুঙুরগুচ্ছ বাহির ক'রে রুস্তমজীর গলায় পরিয়ে দিলে। তার পর হাসিমুখে মেঘমালার দিকে একবার তাকিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তাকে বেরিয়ে আস্‌তে দেখে ঠাকুরমা বল্‌লেন—কি ভাই, দেখা পাক্‌ল? দেখা থেকে যে মধুর রস ঝ'রে পড়ছে দেখ্‌ছি!

সেখানে মেঘমালার পিতামাতাও ছিলেন। তাই ফাল্গুনী হাসিমুখ নত ক'রে নীরবে দাঁড়াল।

মেঘমালার পিতা বল্‌লেন—এস বস্‌বে এস।

ফাল্গুনী বল্‌লে—আর বস্‌ব না, এখন আমি যাই···

ঠাকুরমা বল্‌লেন—আর বস্‌বে কেন?

বামুন বাদল বান
দক্ষিণা পেলেই যান।

কিন্তু কাল থেকে রোজ আস্‌তে হবে—পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ নিয়ে দূরে থাক্‌লে আর ছাড়্‌ব না।

ফাল্গুনী হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেল।

ঠাকুরমা মেঘমালার ঘরে যেতে যেতে ডাক্‌লেন—কি লো, পাকা দেখা খেয়েই থাক্‌তে হবে, না আর কিছু খেতে হবে?

ঠাকুরমা গিয়ে দেখলেন, ছোট্ট একটি টেবিলের উপর ফাল্গুনীর উপহারের দ্রব্যগুলি সাজিয়ে রেখে তার সাম্‌নে মেঘমালা স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে।

মেঘমালা তখন ভাবছিল—বিবাহ তো শুধু আনন্দ-বিলাস নয়, এ যে দুষ্কর ব্রতে দীক্ষা!

* * * *

আজ মেঘমালার বিয়ের দিন। ভোর থেকে বর আর কনের বাড়ীতে নহবত বাজ্‌ছে। দুই বাড়ীই পুষ্পপল্লব, পতাকা ও আলোকে সুসজ্জিত হয়েছে। মেঘমালার মন আনন্দ ও আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে রয়েছে।

রাত্রি দশটার পর লগ্ন।

সন্ধ্যার পর থেকে বরের বাড়ীতে খুব ঘন ঘন মোটর-গাড়ী আনাগোনা করতে লাগল। একটা মোটর-লরীতে ক'রে বাড়ী থেকে বহু আস্‌বাবপত্র কোথায় রওনা হয়ে গেল।

লগ্ন উপস্থিত। বর তো এখনো এলো না।

কন্যার বাড়ী থেকে লোক গেল বরকে ত্বরা দিয়ে নিয়ে আসতে।

সেই লোক ফিরে এসে সংবাদ দিলে, বরের বাড়ীতে জন-মানব নেই, কোনো জিনিসপত্র নেই, শূন্য ঘরে ঘরে ইলেট্রিক আলোক জ্বলছে, আর বাড়ীর বাইরে পুষ্পপল্লব-শোভিত আলোকমালায় ভূষিত টঙের উপর ব'সে নহবত-ওয়ালারা সাহানা রাগিনী আলাপ করছে।

এ কি অভাবনীয় ব্যাপার!

মেঘমালার পিতা দূতের সংবাদ বিশ্বাস করতে পারলেন না; নিজে ছুটে গেলেন নিজের চোখে দেখ্‌তে। কেউ কোথাও নেই—ফাল্গুনী নেই, তার বৃদ্ধ ভৃত্য রাইচরণ নেই, তার পাচক যোগেশ ঠাকুর নেই, দ্বারবান শিউধর নেই।

নহবতওয়ালাদের জিজ্ঞাসা ও জেরা করেও কিছু জানা গেল না; তারা টঙের উপর ব'সে ব'সে দেখেছে, মোটরে ক'রে বিবাহ-বাড়ীতে অনেক বাবু আসা-যাওয়া করেছে, লরীতে ক'রে অনেক মালপত্র কোথায় রওনা হয়ে গেছে। বাজনাওয়ালার পারিশ্রমিক ও বক্‌শিশ সন্ধ্যাবেলাই চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলোর কন্ট্রাক্টারকেও তার পাওনা চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লোক ছুটল বাড়ীওয়ালার কাছে, তিনি যদি তাঁর ভাড়াটের কোনো খোঁজখবর দিতে পারেন।

বাড়ীওয়ালা বললে—ফাল্গুনী-বাবু মাসের প্রথম সপ্তাহেই বাড়ীভাড়া আগাম চুকিয়ে দেন; তাঁর কাছে কিছু পাওনা নেই। তিনি কোথায় গেছেন, আমরা তো জানি না। বাড়ীতে যদি কেউ না থাকে, তা হ'লে আজকে রাতে পাহারা দেবার জন্যে আমরা একজন দরোয়ান পাঠিয়ে দিচ্ছি; কাল সকালে সে বাড়ীতে তালা দিয়ে চ'লে আস্‌বে।

মেঘমালার পিতা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। বাড়ীতে নিরানন্দ গুমোট হয়ে উঠল। কেউ হাসে না, চেঁচিয়ে কথা বলে না। নহবত থেমে গেল; বাড়ীর বাহিরের আলোকমালা নিবিয়ে দেওয়া হলো। কন্যা-যাত্রীরা সব চুপচাপ ক'রে একে একে খেয়ে নিয়ে স'রে পড়তে লাগল; অনেকে না খেয়েই চ'লে গেল।

মেঘমালা টুক্‌রো-টাক্‌রা কাণাঘুষা কথা শুনে ব্যাপারটা জান্‌লে। সে স্তম্ভিত হয়ে ব'সে ব'সে ভাবছিল—এ ফাল্গুনীর দ্বারা কেমন ক'রে সম্ভব হলো। অমন স্পষ্ট খোলাখুলি যার বাক্য ও ব্যবহার, তার এই গোপন রহস্যময় অন্তর্দ্ধানের অর্থ কি!

রাত্রি যখন একটা, ফাল্গুনীর ফিরে আসার আশা যখন একেবারে ছেড়ে দিতেই হলো, তখন মেঘমালার ঠাকুরমা অবারণ চোখের জল গোপন করবার চেষ্টা করতে করতে এসে মেঘমালাকে বললে—ভাই মালা, একটু কিছু খেয়ে শুবি চল।

মেঘমালা স্থির-কণ্ঠেই বললে—আজ আর কিছু খাব না ঠাকুরমা। তুমি যাও, আমি গহনা-কাপড় ছেড়ে শুচ্ছি।

ঠাকুরমা চোখের জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন। তিনি যেতে যেতে ভাবলেন—হায় রে হতভাগী, এখনো আশা—যদি সে ফিরে আসে? উপোষ ক'রে সারা রাত সেই লক্ষ্মীছাড়াটার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হবে!

মেঘমালার মা ও বাবা তো মেঘমালার কাছেই আসতে পারলেন না, মেয়ের মলিন মুখ তাঁরা কেমন ক'রে দেখবেন, মেয়ের কাছে তাঁরাই বা কেমন ক'রে মুখ দেখাবেন?

ভোরবেলা ঠাকুরমা ধীরে ধীরে মেঘমালার ঘরের

দিকে চল্‌লেন—উপোষী মেয়েটার যদি ঘুম ভেঙে থাকে তো সকাল সকাল তাকে স্নান করিয়ে কিছু খাওয়াতে হবে।

ঠাকুরমা আস্তে দরজা ঠেলে উঁকি মেরে দেখলেন—মেঘমালা সেই বিয়ের সাজ পরেই তখনো ব'সে আছে।

ঠাকুরমা ঘরের মধ্যে গিয়ে মেঘমালার মাথায় হাত রেখে স্নেহার্দ্র স্বরে বল্‌লেন—এ'বার ওঠ ভাই, চল, চান ক'রে একটু কিছু মুখে দিবি।

মেঘমালা নীরবে উঠে দাঁড়াল এবং এক এক ক'রে গহনাগুলি খুলে খুলে বাক্‌সের মধ্যে তুলে রাখতে লাগল।

তার পিছনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরমা ক্রমাগত চোখ মুছেও অশ্রুস্রোত রোধ কর্‌তে পার্‌ছিলেন না। আর মেঘমালার মনের মধ্যে কান্নার সুরে গুঞ্জন কর্‌ছিল গানের একটি কলি—

"এত প্রেম-আশা এত ভালোবাসা
কেমনে সে গেল পাসরি।"

স্নান ক'রে মেঘমালা যখন খেতে বস্‌ল তখন সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ঠাকুরমা, রুস্তমজী কৈ?

তাই তো, কাল থেকে তো তার কথা কেউ ভাবে নি। কোথায় সে? তাকে কাল রাতে দেখা গেছে, এমনও তো মনে হয় না।

রুস্তমজীকে কাছে পেলে মেঘমালার মনটা একটু প্রফুল্ল অন্যমনস্ক হবে মনে ক'রে আজ ঠাকুরমাও রুস্তমজীর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চাকরদাসীদের বল্‌লেন, দেখ তো, রুসো কোথায় আছে।

সমস্ত বাড়ী খুঁজে রুস্তমজীকে কোথাও পাওয়া গেল না।

মেঘমালা এই সংবাদ শুনে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস চাপলে। কোলের ছেলে হারিয়ে যাওয়ার শূন্যতায় তার মনটা খাঁ-খাঁ কর্‌তে লাগল, কিন্তু মুখে একটি কথাও সে উচ্চারণ কর্‌লে না। তার মনে হলো, ফাল্গুনীর রহস্যময় অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে রুস্তমজীরও অন্তর্দ্ধান জড়িত আছে—হয় তো ফাল্গুনীই তাকে নিয়ে গেছে। কেন? মেঘমালার আদরের বিড়াল ব'লে কি তাকে কাছে রাখবার জন্যে ফাল্গুনী তাকে নিয়ে গেছে? কিন্তু মেঘমালার তো সবই গেল।

* * * *

দু'দিন কেটে গেছে। ফাল্গুনী বা রুস্তমজীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। মেঘমালার পিতা খবরের কাগজে রুস্তমজীকে খুঁজে দেওয়ার জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার স্বীকার ক'রে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। যে বিড়াল তাঁদের চক্ষুঃশূল ছিল, সে এখন ফিরে এলে তাঁরা তাকে সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছেন।

তার পরদিন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খবরে সমস্ত দেশ উচ্চকিত আশ্চর্য্য হয়ে উঠল। লোকে ভুলে গেল নিজেদের সুখ-দুঃখ, সকলে কয়েকজন মরণব্রতী যুবকের দুঃসাহসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলো।

তারও দুদিন পরে মেঘমালার পিতা একখানা চিঠি পেলেন—চট্টগ্রাম থেকে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁর বিজ্ঞাপন দেখে জানিয়েছে—আপনার বিজ্ঞাপনের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মেলে, এমন একটি বিড়াল আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে; তার গলায় রূপার মাদুলীর মধ্যে এককালি কাগজে লালকালী দিয়ে লেখা আছে—

বন্দে মাতরম্!

এই বিড়ালটি নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে কেউ চুরি ক'রে চট্টগ্রামে নিয়ে এসেছিল। এখন সে পালিয়ে আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। আপনারা তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর্‌বেন।

মেঘমালার পিতা মেঘমালাকে সুসংবাদ দেবার জন্য তার ঘরে এসে দেখলেন, সে যে কাঁচের আলমারীতে ফাল্গুনীর দেওয়া জিনিসগুলি সাজিয়ে রেখেছে, তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি কন্যার হাতে চট্টগ্রামের চিঠিখানি দিয়ে বল্‌লেন—ফাল্গুনী যে এমন ডাকাত, তা তো জান্‌তাম না! ভাগ্যিস তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যায় নি! ভগবান্ বাঁচিয়েছেন!

মেঘমালা পত্রখানি প'ড়ে নীরবে বাবার হাতে ফিরিয়ে দিলে। তিনি চ'লে গেলেন।

মা ও স্ত্রীর কাছে গিয়ে তিনি চট্টগ্রামের ব্যাপারই আলোচনা কর্‌ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা অবাক্ হয়ে দেখলেন, মেঘমালা সেখানেই আস্‌ছে, তার পরনে ফাল্গুনীর দেওয়া খদ্দরের জামা-কাপড় আর হাতে একটি ছোট পুঁটলি, সে ধীরে ধীরে তাঁদের কাছে এসে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বললে—আমি সবরমতী যাচ্ছি!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

দা'ঠাকুর

১

ভিন্ন গ্রামে অষ্টম প্রহরে পূর্ণ দিন-রাত্রিটা কাটাইয়া দিয়া ভোরের সময় শ্রীধর শ্রান্ত-চরণে ক্লান্ত-মনে বাড়ীতে ফিরিতেছিল।

কাল সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে বাড়ীর ভাবনা মুহূর্ত্তের জন্যও মনে জাগে নাই, কীর্ত্তনানন্দে সে বিভোর হইয়াছিল। আজ ভোরের সময় কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া যখন কুঞ্জভঙ্গ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন সকলেই তাহাকে আর খানিকটা থাকিয়া কুঞ্জভঙ্গ শুনিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীধর আর থাকিতে পারে নাই। পরশু বৈকালে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, পরশু রাত্রি, কাল দিন-রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে, আজ বাড়ী না গেলে মাসীমা আর আস্ত রাখিবেন না, সেই জন্য সে এত ভোরেই ফিরিতেছিল।

পথিমধ্যে নারাণদাস তাহার কলাবাগান হইতে হাঁকিল,—"কে যায়, দা'ঠাকুর না?"

শ্রীধর না ফিরিয়াই চলিতে চলিতে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমিই বটে।"

"একটু দাঁড়ান দা'ঠাকুর, সকালবেলায় বামুন বৈষ্ণবের যখন দেখা জুটে গেল, তখন পায়ের ধুলো না নিয়ে ছাড়ছি নে।"

একছড়া পাকাকলা হাতে সে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও কলাছড়াটি উপহার দিল—"এই কলাছড়াটা নিয়ে যান দা'ঠাকুর, নূতন কাঁদি পড়েছিল, তা চোরের জ্বালায় কি কোন জিনিস থাকবার যো আছে? এত কাঁদি কলা ফলেছিল, সে দিন দেখে গেলুম, আজ এসে দেখছি, মাত্র দুই কাঁদি আছে, আর সব কেটে নিয়ে গেছে। তা এই ছড়াটা নিয়ে যান দা'ঠাকুর, মাঠাকরুণের কাল উপোস গেছে, আজ দরকারে লাগবে'খন।"

"কাল উপোস গেছে" কথাটা শ্রীধরের বক্ষে আসিয়া তীক্ষ্ণ শলার মত বিঁধিল। সত্যই ত, কাল একাদশীর উপবাস গিয়াছে, মাসীমা কাল উপবাস করিয়া আজ যে তাতিয়া আগুন হইয়া আছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আর একটিমাত্র কথা না বলিয়া সে কলাছড়া হাতে লইয়া দ্রুত অগ্রসর হইল।

ডোমপাড়ার মধ্য দিয়া যাইতে একটা আর্ত্তনাদ তাহার কাণে ভাসিয়া আসিল—"মা গো—"

শ্রীধর থমকিয়া দাঁড়াইল। মনে পড়িল, কাজলার মায়ের কঠিন পীড়া ছিল। কয়দিন শ্রীধর দেখাশুনা করিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গীদের ও মাসীমার কথায় সে আর আসে নাই। বুড়ীটার সব শেষ হইয়া গেল না কি? যদি হইয়া গিয়া থাকে ভালই, বুড়ী এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু মেয়েটার উপায়?

বেড়ার ফাঁক দিয়া সে উঁকি দিয়া দেখিল, বারান্দায় মৃতদেহ পড়িয়া, আর তাহার কাছে বসিয়া আছে কাজলা। তাহার সম্মুখে মায়ের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। দেহসংকারের জন্য কোন চেষ্টার লক্ষণও তাহার মধ্যে নাই।

বিরক্তিতে শ্রীধরের মুখটা বিকৃত হইয়া উঠিল। সাধে কি লোক ছোটলোক বলে? মড়াটাকে আগলাইয়া বসিয়া থাকিয়া কি লাভ হইবে, বরং এতক্ষণ উহার সৎকারের চেষ্টা করিতে হয়।

দরজা ঠেলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি রে কাজলা, কি হ'ল?"

মেয়েটি শূন্য দৃষ্টিতে তাহার পানে খানিক তাকাইয়া রহিল। তাহার পর আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, "দা'ঠাকুর, আমার মা কাল সন্ধ্যেবেলায় মারা গেছে।"

বিরক্ত হইয়া শ্রীধর বলিল, "সেই কাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত এই মড়া আগলে নিয়ে বসে আছিস! লোকজনের চেষ্টা কর, এর পর মড়া যে পচে উঠবে, তখন দুর্গন্ধে গাঁয়ে লোকের টেঁকা মুস্কিল হবে।"

প্রবহমান চোখের জল মুছিতে মুছিতে কাজলা বলিল, "কাল সন্ধ্যে থেকে বাড়ী বাড়ী ঘুরেছি, দা'ঠাকুর আজও কত বাড়ী আবার ঘুরলুম, কেউ আসতে চায় না।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শ্রীধর বলিল, "কেন, আসতে না চাইবার কারণটা কি?"

কাজলা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ওরা এখন অনেক টাকা চায় দা'ঠাকুর। গরীব মানুষ আমি, অত টাকা পাব কোথায়?"

আকুলভাবে সে কাঁদিতে লাগিল, শ্রীধর রাগ করিয়া বলিল, "প্যান-প্যান ক'রে কাঁদিসনে বলছি, আমি লোক দেখছি চেষ্টা ক'রে।" কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কাজলার উপর সকলেরই একটা দারুণ বিদ্বেষ ছিল। কেন না, সে কাহারও হুকুম শুনিত না, নিজের খেয়ালে নিজে চলিত। অনেকে তাহাকে বিবাহের জন্য ব্যগ্র ছিল, কিন্তু সে সকলকেই অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহারা সুযোগ পাইয়া এই সময়ে সেই অপমানের শোধ তুলিতে চাহে।

ব্যর্থ হইয়া শ্রীধর যখন ফিরিল, ত ন কাজলা উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া বলিল, "কি হবে দা'ঠাকুর, বাসী মড়া—কেউ যে এল না।"

ধমক দিয়া শ্রীধর বলিল, "ফের কাঁদতে আরম্ভ করলি? চুপ ক'রে দেখ, আমি কি করি, তার পর কাঁদিস্।"

নিজেই সে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া একখানা বাঁশ কাটিয়া আনিয়া বলিল,—"কেউ না আসে, চল্, আমি আর তুই দুজনে মড়াটাকে বয়ে নিয়ে যাই—পারবি নে?"

কাজলা একবারে আকাশ হইতে পড়িল, "সে কি দা'ঠাকুর, ডোমের মড়া যে,—তুমি যে বামুন"

"আরে মড়া নারায়ণ, বামুন, বাগ্দী, ডোম মরলে সব এক হয়ে যায়। তুই ওঠ, পায়ের দিকটা ধর, আমি মাথার দিকটা ধরছি।"

ডোমপাড়ার সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, ব্রাহ্মণ-সন্তান শ্রীধর ও ডোমের কন্যা কাজলা ডোমনারীর মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।

সমস্ত দিন শ্মশানে কাটাইয়া শবদাহান্তে স্নান করিয়া শ্রীধর যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

২

মাসীমা কাত্যায়নীর এই ছেলেটাকে লইয়া দায় পোহাইতে হইত বড় কম নহে। এক একবার মনে করিতেন এবং মুখেও বলিতেন, সব ফেলিয়া রাখিয়া তিনি বৃন্দাবন বা কাশীধামে চলিয়া যাইবেন। কতবার উদ্যোগও করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহার জন্য সব ছাড়িয়া পলাইতে চান, সেই সঙ্গ নেয়, কাযেই কোথাও যাওয়া হয় না। এবারে ঠিক করিয়াছেন, ছেলেটার বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিয়া রাখিয়া তিনি চলিয়া যাইবেন। দক্ষিণপাড়ার রামেশ্বর চাটুয্যের মেয়েটিকে দেখিয়া শুনিয়া পছন্দও করিয়াছিলেন, কেবল আশীর্ব্বাদ করিলেই হয়।

কাল সমস্ত দিন একাদশী করিয়া থাকিয়া আজ দ্বাদশীতে ভাত খাইতে গিয়া তিনি তৃপ্তি পান নাই। হতভাগা ছেলেটা সেই পরশু বৈকালে কিছু না বলিয়া কহিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কাল খোঁজ পান নাই, আজ এত বেলায় ও-পাড়ার যদু হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিয়া গিয়াছে, শ্রীধর দা-ঠাকুর ডোমের মড়া পুড়াইতে গিয়াছে।

শুনিয়া কাত্যায়নীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গিয়াছে; যত পারিলেন, উদ্দেশে তাহাকে গালি দিলেন, তাহার পর পা ছড়াইয়া বসিয়া স্বর্গীয়া ভগিনীর নাম করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি একা বেশ ছিলেন, এ আপদ কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়া হাড় জ্বালাইয়া তুলিল যে! ভগিনী মৃত্যুকালে দ্বাদশ-বর্ষীয় বালকটির হাত ধরিয়া যখন তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, তখন তিনি 'না' বলিতে পারেন নাই।

সেও ত আজ এক যুগের কথা, গ্রামের দা'ঠাকুর তাঁহার শ্রীধর এখন চব্বিশ বৎসরের সবল যুবা, কিন্তু মনটা তাহার দেহের সঙ্গে পরিণত হইয়া উঠিতে পারিল কৈ?

সংসারের কাযে তাহার আসক্তি কোথায়? কাত্যায়নী ভাবিয়াছিলেন, স্বামীর পরিত্যক্ত যজনক্রিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন। গ্রামে আরও দুই চার ঘর পুরোহিত বাস করিলেও যজমানের সংখ্যা বেশী এবং তাঁহার স্বামীই সকল বাড়ীতে পুরোহিতের কায করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে রামেশ্বর চাটুর্য্যেকে ধরিয়া তিনি সব কায করাইতেন। ভাবিয়াছিলেন, ছেলেটাকে সব শিখাইয়া লইলে সে বাড়ীর নারায়ণের সেবা পূজা এবং গ্রামের যজমানদিগের বাড়ীতে পৌরোহিত্য করিতে পারিবে।

শ্রীধর পূজার্চ্চনা বেশই শিখিয়াছিল, কিন্তু দরকারের সময় তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়াই মুস্কিল হইত। সে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান হইত, তাহাকে তখন খুঁজিয়া পাইতে কাত্যায়নীকে ছুটাছুটি করিতে হইত।

বাহিরে শ্রীধরের কত কায; সে ছেলেদের জন্য ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিত, বুড়াদের লম্বা উপদেশ দিত, রোগের সেবা করিত, ঔষধপত্র আনিয়া দিত, ডাক্তার ডাকিয়া আনিত। তাহার নিকটে ঋণী ছিল না, এমন লোক গ্রামে ছিল না বলিতেও পারা যায়।

কিন্তু ঘরের নিত্যকার বাজারটা পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা সকল দিন হইয়া উঠিত না। ভোরবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া সে কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়া যাইত, তাহার ঠিক ছিল না। বেলা এগারটা বারোটার সময় একবারে স্নান করিয়া পূজার জন্য ফুল তুলিয়া পাতায় করিয়া হাতে লইয়া গুণ গুণ করিরা গান গাহিতে গাহিতে বাড়ী ঢুকিত। নিতান্ত রাগ করিয়াই কাত্যায়নী কথা বলিতেন না, মুখ ফিরাইয়া লইয়া বসিয়া থাকিতেন, ইহাতে বরং শ্রীধরের সুবিধাই হইয়া যাইত।

কোথাও কীর্ত্তন হইবে শুনিতে পাইলে সে সেই যে ডুব দিত, একদিন দুইদিন কাটিয়া গেলে বাড়ী ফিরিত। বাড়ীর বিগ্রহ লইয়া কাত্যায়নীকে বড় মুস্কিলে পড়িতে হইত, পাড়ায় পাড়ায় পূজার জন্য লোক খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত।

আজ সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেখাইয়া প্রণাম-শেষে

তিনি চুপ করিয়া সেখানেই বসিয়াছিলেন। এই সময় নিঃশব্দে শ্রীধর বাড়ী ঢুকিল। আজ তাহার মনটা নেহাৎ ভাল ছিল না। সারাদিনের নিরম্বু উপবাসে উদরের জ্বালাও প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্য আজ তাহার মুখে গান ছিল না।

তুলসীতলার স্তিমিত আলোকে সে মাসীমাকে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিল। আস্তে আস্তে সে বারান্দায় উঠিয়া ঘরের দরজা ঠেলিল, দরজায় চাবি বন্ধ।

ব্যাপার কি,তাহা সে কতকটা বুঝিলেও সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না। আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া সে বলিল, "বাঃ, দরজায় চাবি দিয়েছ যে, আমি ভিজে কাপড়ে রয়েছি– কাপড় ছাড়ব না ?"

কাত্যায়নী উত্তর দিলেন না। যেন তিনি শুনিতে পান নাই, এইরূপ ভাবে বসিয়া রহিলেন।

শ্রীধর নামিয়া আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল, গলার সুর আর এক পর্দ্দায় চড়াইয়া বলিল, "শুনছো মাসীমা, ভিজে কাপড়ে রয়েছি, ঘরের চাবি দাও, কাপড় নেব।"

"দূর হ দূর হ, আপদ, চাবি নিতে এসেছে, চাবি আমি দেব না। তোর যেখানে খুসি চ'লে যা, গাঁয়ের লোকের কাছ হ'তে ভিক্ষে ক'রে কাপড় নিয়ে পর গে যা, আমি তোকে আর কিছু দেব না, ঘরে দোরে উঠতে দেব না। আবাগীর বেটা ভূত, নিজের জাত-জন্ম সব খুইয়েছিস, আবার আমার জাত-জন্ম ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব খোয়াতে বসেছিস। ভগবান্ কি পাপে যে আমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন, বলতে পারি নে, নইলে এত লোক মরে, আমার মরণ হয় না ?"

শেষের দিকটায় তাঁহার কণ্ঠস্বর অশ্রুবাষ্পে ভিজিয়া গেল, শ্রীধরের অলক্ষ্যে কয়েক ফোটা জলও গড়াইয়া পড়িল। গোপনে সে জল মুছিয়া ফেলিয়া বিকৃত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এই মাসেই চ'লে যাব বৃন্দাবনে, তার পর তুই যা খুসি করিস, কেউ দেখতেও আসবে না, বলতেও আসবে না। আমার কি গেরোই হয়েছে, কেন রে বাপু, আমার এত দায় কিসের ? নিজের বলতে কেউ নেই, নিজের ছেলেপুলে নেই, পরের ভূত নিয়ে আমার প্রাণ যায়। কেন রে বাপু, আমার এত দায় কিসের রে—"

এতক্ষণে শ্রীধর কথা বলিবার মত ভাষা পাইল। হাসিয়া বলিল, "বৃন্দাবন যাবে, তা গেলেই ত পারতে, মাসীমা। আমারও বড় ইচ্ছে, একবার বৃন্দাবনে যাই, সত্যি···এ গাঁ আর ভাল লাগছে না। সেই ভাল মাসীমা, তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই, চল, বাড়ী-ঘর বিক্রী ক'রে ঠাকুরটাকে কাউকে দিয়ে দুই মাসী-বোনপো মিলে বৃন্দাবনে যাই।

বিস্মিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ফেলিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "তুই যাবি কি রে ভূত, তুই বুঝি ভেবেছিস যে, আবার সেখানে তোকে নিয়ে আমি এই রকম জ্বলব ? তোর জ্বালাতেই না আমি পালাচ্ছি দেশ ছেড়ে ?"

শ্রীধর হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ও একই কথা মাসীমা, তোমার জ্বালায় আমি পালাই, আমার জ্বালায় তুমি পালাও—মোট কথা, যেখানে তুমি, সেখানে আমি। আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল, আজ যদি তুমি চ'লে যাও, আমায় ভাত রেঁধেই বা দেবে কে, ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়েই বা দেবে কে, আবার দোষ করলে বকবেই বা কে ? আবার তুমি বৃন্দাবনে গিয়েও কি স্বস্তি পাবে ? সেখানে নারায়ণের মুখচন্দ্র আর চরণকমল দেখতে গিয়ে তোমার শ্রীধরচন্দ্রের মুখচন্দ্রই দেখে বসবে– এ আমি ঠিক বলছি। ওই যে একটা গল্প আছে না—একজন জগন্নাথ দেখতে গিয়ে পুঁইশাকের মাচা দেখেছিল _"

বলিতে বলিতে সে উচ্ছ্বসিতভাবে হাসিয়া উঠিল। কাত্যায়নী রাগে গর গর করিতে লাগিলেন, নিতান্ত রাগ করিয়াই তিনি আর কথা বলিলেন না।

শ্রীধর হাসি থামাইয়া বলিল, "এখনই ত যাচ্ছ না মাসীমা, তবে ঘরে চাবি বন্ধ করার মানে কি ? জানো, আমি স্নান না ক'রে বাড়ী আসিনে, কত অনাচার ছুঁয়ে আসতে হয়, বিধবা রয়েছে, নারায়ণ রয়েছে, স্নান না ক'রে দোরে উঠতে পারি ? সেই কখন্ হ'তে ভিজে কাপড়ে থেকে এদিকে শীত ধ'রে গেছে, সেটা কিন্তু একটু ভাবছ না। তুমি কিন্তু ভারি স্বার্থপর মাসীমা, এই কার্ত্তিক মাসের শেষ, কেমন ঠাণ্ডাটি পড়ছে, সামনে আলোটা রেখে নিজে বেশ গরম হয়ে বসে আছ, আর আমি বেচারা ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে কেঁপে মরছি। এর পর একটা শক্ত ব্যারাম ধরবে,—আমায় একেবারে শেষ ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বৃন্দাবনে চ'লে যেয়ো।"

গম্ভীরভাবে কাত্যায়নী বলিলেন, "বকিস নে, থাম। এই নে চাবি, কিন্তু ফের যদি কোনদিন এমন ধারা করিস, তা হলে—"

তিনি চাবিটা ফেলিয়া দিতেই শ্রীধর তাহা কুড়াইয়া লইল। "না, না, আর এরকম ধারা হবে না, আর যদিও কোন দিন হয়, তুমি তাতে কিছু মনে কর না, মাসীমা।"

সে বারান্দায় উঠিল।

৩

পূজা করিয়া ফিরিবার পথে কাজলা আসিয়া শ্রীধরের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার মুখ শুষ্ক।

শ্রীধরের হাতে নারায়ণ ছিল, ব্যস্ত হইয়া সে পিছনে সরিয়া দাঁড়াইল,—"এই, তফাতে স'রে দাঁড়া, তোর ছায়া এখনই নারায়ণের গায়ে লেগেছিল আর কি, তা হ'লে মাসীমা আর আমায়-আস্ত রাখত না।"

কাজলা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। ঠাকুরের গায়ে ডোমের ছায়া লাগিলেও ঠাকুর অস্পৃশ্য হন, আবার সেই খবর সে কি করিয়া মাসীমার কাণে গিয়া পৌছাইবে, ত তা শ্রীধরই জানে।

পথেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কাজলা বলিল, "আজ দুদিন খাওয়া হয় নি, ঠাকুর।"

তাচ্ছীল্যের ভাবে শ্রীধর বলিল, "খাওয়া হয় নি, তাতে আমার কি? আমি কি তোর কল্পতরু হয়েছি যে, যখন খুসী আমায় নাড়া দিয়ে পয়সা আদায় করবি? নিজের জাত রয়েছে, তাদের কাছে যা, বিয়ে-থাওয়া কর, সংসারী হ, তা করবি নে, তবে ওরা দেখ্‌বে কেন তোকে? আমার কাছে আর আসিস নে বলছি, ভাল হবে না। দু দিন দুটো টাকা মাসীমাকে লুকিয়ে তোকে দিয়েছি, আবার চাস? ছোটলোক আর কুকুর এক সমান, আস্পর্দ্ধা পেয়ে মাথায় উঠে বস্‌তে চায়।"

মেয়েটির মুখখানা কালো হইয়া গেল, তাহার চোখ দুইটা একবার জ্বলিয়া উঠিয়া তখনই সজল হইয়া আসিল। সে নিঃশব্দে শ্রীধরের পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

নারায়ণ-হস্তে শ্রীধর খানিকদূর চলিয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ঝুড়ি বুনতে পারিস নে? তোদের জাতের ব্যবসা যা, তা না করলে চলবে কেন? ওরা বলে, তোর নাকি জাতের ব্যবসা করতে লজ্জা করে, তুই নাকি নোংরা ডোম জাতকে বিয়ে করবি নে। বলি—তা হ'লে তোকে বসিয়ে খাওয়াবে কে, কোন্ ভদ্রলোকের ছেলে তোকে বিয়ে করবে শুনি?"

এই অপমানের কথাগুলি শুনিয়াও মেয়েটি কোন উত্তর দিল না। নিঃশব্দে সে শুধু মাটীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

ট্যাঁক হইতে সে দিনকার দক্ষিণার টাকাটা বাহির করিয়া, কাজলার সামনে ফেলিয়া দিয়া শ্রীধর বলিল, "নেহাৎ দুদিন খাসনি বললি, তাইতেই টাকাটা দিলুম। মাসীমা যদি জানতে পারে—আমায় আস্ত রাখবে না। আর দেখ, তোকে ব'লে রাখছি কাজলা, আর কোনদিন যদি আমার সামনে আসবি, যদি কিছু চাইবি, তা হ'লে তোর ভাল হবে না। দয়া ক'রে তোর মা'র সৎকারই না হয় ক'রে দিয়েছি, সে কেবল মড়াটা পচে দুর্গন্ধে গাঁয়ের লোকের অসুখ হবে ব'লে, তাই। তোর জন্যে যে করেছি, তা তুই মনেও করিস নে, কাজলা। জানিস ত তুই ডোম, আর আমি বামুন।"

কাজলা শুধু তাহার বড় বড় দুইটি চোখের দৃষ্টি শ্রীধরের মুখের উপর রাখিল। শ্রীধর দ্রুত চলিয়া গেল।

মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, ওরা দক্ষিণা কি দিলে?"

সিংহাসনে নারায়ণ স্থাপন করিতে করিতে মুখ বাঁকাইয়া শ্রীধর বলিল, "দিয়েছে কিছু।"

মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবু কি দিলে?"

শ্রীধর উত্তর দিল, "একটা টাকা দিয়েছে।"

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সন্দিগ্ধভাবে কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ সে টাকাটা, কাউকে আবার দিয়ে এলি নাকি?"

নারায়ণ রাখিয়া মুখভার করিয়া শ্রীধর বাহির হইয়া গেল, একটা উত্তরও দিয়া গেল না। কাত্যায়নী বিস্মিত চোখে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। আরও কয়দিন টাকার কথা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীধর উত্তর দেয় নাই, এমনইভাবে মুখভার করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। টাকা লইয়া সে যে কি করে, তাহাই তিনি খুঁজিয়া পান না।

যখন সে ভাত খাইতে আসিল, তখন কাত্যায়নী কোন কথাই বলিলেন না, মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিলেন।

মাসীমার গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইয়া শ্রীধরও শান্তি পাইতেছিল না, কথা কহিবার একটা অছিলা সে খুঁজিতেছিল।

এই সময়েই শ্রীধরের প্রিয় বিড়াল মেনি নিঃশব্দে আসিয়া, উনানের উপর কড়ায় যে দুধ ছিল, তাহাই খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার চক-চক শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া কাত্যায়নী ব্যাপারটা দেখিলেন এবং একটিমাত্র কথা না বলিয়া হাতের কাছে যে হাতাটা পড়িয়া ছিল, তাহাই নিমেষমধ্যে তুলিয়া লইয়া বিড়ালটার উপরে খুব এক ঘা বসাইয়া দিলেন, বিড়ালটা বিকট চীৎকার করিয়া পলাইয়া গেল।

শ্রীধর একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, একবারমাত্র বলিল, "আহা, কৃষ্ণের জীব, ওকে অমন ক'রে—"

মাসীমা আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "তোর ও সব কথা তুলে রাখ শ্রীধর, তোর মত দয়ালু ঢের দেখেছি—যাদের দয়ার চোটে শেষটায় ভিটে উচ্ছন্ন যায়। দুনিয়ার লোককে যে দয়া বিলিয়ে বেড়াচ্ছিস হতভাগা, এর পর তোর অসময় পড়লে তোকে দেখবে কে বল দেখি?"

শ্রীধর হাসিয়া উঠিল, "উঃ, তা হ'লে ত স্বয়ং গৌরাঙ্গ—দুনিয়ার লোককে দয়া বিলাতে গৌরাঙ্গই ত এসেছিলেন। কিন্তু আমি কি আর সত্যি ততটা করতে পারছি মাসীমা, সে রকম পারলে ত বাঁচতুম, মানুষ-জন্ম সার্থক হতো, আমি কতটুকু লোকের উপকার করতে পারি; বল দেখি? হয় ত নিজের

ক্ষমতায় যেটুকু কুলায় মাত্র, সেইটুকু করি, পয়সা দিয়ে কিছু করবার ক্ষমতা আর কৈ ?"

কাত্যায়নী রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "পয়সা দিয়ে করিস নে ত এই টাকাগুলো যাচ্ছে কোথায় ? আগে আরও কত দিনের দক্ষিণে, তার পর আজকের দক্ষিণের টাকাটা গেল কোথায় বল দেখি ?"

শ্রীধর মুখ অবনত করিল, বলিল, "সত্যি কথাই বলছি মাসীমা—কাজলা মোটে খেতে পাচ্ছিল না, তাই তাকে দিয়েছি।"

মাসীমা হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলেন, "শ্রীধর—"

শ্রীধর চমকাইয়া মুখ তুলিল।

কাত্যায়নী দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "তোর মনে আছে, তুই বামুন, সে ডোম।"

শ্রীধর মুখ নত করিল, একটা উত্তরও দিল না।

৪

তিন দিন পরে হারু সর্দ্দারের ব্যারাম হওয়ায় শ্রীধরকে আর বাড়ীর দিকে পাওয়া যায় না। কাত্যায়নী রাগিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইলেন, বারবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কোন দিন তাহার কথায় কাণ দিবেন না, এবার নিশ্চয়ই বাড়ী-ঘর বিক্রয় করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া যাইবেন।

গ্রামের মধ্যে মাতব্বর ধনী উমেশ চক্রবর্ত্তীর কাছে গিয়া তিনি পড়িলেন—"ঠাকুরপো, আমার একটা উপায় কর, আমার বৃন্দাবন যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া উমেশ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "সে কি বউদি, ঘর-সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনে যাবে কি ?"

বিকৃত-মুখে কাত্যায়নী বলিলেন, "ঝাঁটা মার ঘর-সংসারের মুখে, আমার আবার ঘর-সংসার কি—বলে হাতে নেই এক পয়সা-তার আবার চোর-বাটপাড়ের ভয়। আমার কে আছে, যার জন্যে ঘর-সংসার নতুন ক'রে পাতব ? নিজের দুটো ছেলে ছিল, কোন্‌কালে তারা চ'লে গেছে, আর আমার আছে কে ?"

ব্যাপারটা প্রায়ই এরূপ ঘটিত, শ্রীধরের সহিত মনান্তর ঘটিলেই কাত্যায়নী উমেশ চক্রবর্ত্তীর নিকট গিয়া পড়িতেন, দুদিন না যাইতেই বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা পর্য্যন্ত মনে থাকিত না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার প্রকৃতি বেশ ভাল জানিতেন বলিয়াই একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেউ নেই, এ কথাটি বলো না বউদি, শ্রীধর রয়েছে—তাকে নিয়ে—"

তীব্রকণ্ঠে কাত্যায়নী বলিলেন,"তবেই আর কি, শ্রীধর রয়েছে, ওর জন্যে আমায় সংসার পাততেই হবে। ও কি তেমনি ছেলে ঠাকুরপো যে, সংসার পেতে বসবে ? ওর বাপ ছিল অমনি, ওর মা—আমার দিদি কেঁদে কেঁদে জীবনপাত ক'রে গেছে, ও ত তারই ছেলে। ঘরে ঠাকুরের পূজো হয় না, বাজার হয় না, অসুখ হ'লে একবার চোখ দিয়ে দেখে না-পর্য্যন্ত, অথচ দেখ গিয়ে—গাঁয়ের মধ্যে কার অসুখ হ'ল—কে খেতে পাচ্ছে না—কার মড়া পোড়ান হচ্ছে না, এই সব তালে ঘুরছে। বলব আর কি ঠাকুরপো—সে দিন নাকি রেমো ডোমের বউকে ও পুড়িয়ে এসেছে। আর কোথায় হারু সর্দ্দার, কোথায় অছিমদ্দি মোড়ল, দেখ গিয়ে এই সব ছোটলোকের পাড়ায় ঘুরছে। ওর কি জাত-জন্ম আছে, না ও আমারই জাতজন্ম থাকতে দেবে ?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এতে রাগ কর কেন বউদি, ও যা কায করছে, তা করতে পারে কয়জন দেখাও দেখি ? শুধু যে ছোটলোকদের পাড়ায় ঘোরে, তা ত নয়, গাঁয়ে এমন কোন্ লোক আছে যে, ওর কাছে উপকার পায় নি, তাই বল দেখি ? সেবার আমার যখন অসুখ হয়েছিল, ও আমার এমন সেবা করলে, তেমনধারা আমার ছেলে পর্য্যন্ত করতে পারে না। সাধে সকলে দা'ঠাকুর বলতে হতজ্ঞান হয় বউদি, ওর যে অনেক গুণ।"

শ্রীধরের প্রশংসায় কাত্যায়নীর মনটা নরম হইয়া গেল, তথাপি মুখের জোর কমাইলেন না, বলিলেন, "তোমাদের আস্কারাতেই ত ও আরও ওই রকম বাঁদর হচ্ছে, ঠাকুরপো। এতটা বয়েস হ'ল, এখনও যদি নিজের ভাল মন্দ না বুঝতে শেখে, আর শিখবে কবে ?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "শিখবে—শিখবে—সব হবে, তুমি ওর বিয়েটা দিয়ে ফেল দেখি, সব ভাল হয়ে যাবে। যত দিন না বিয়ে হবে, তত দিন অমনি ক'রে বেড়াবে। বিশেষ একটা কারণে আমি একটু ভয় পাচ্ছি। পরের উপকার করে করুক, কিন্তু ওই ডোমের বাড়ীতে নাকি প্রায়ই যাওয়া আসা করে, সেই জন্যেই যা আমার ভয়। সেই জন্যেই বলি—বিয়েটা আগে দিয়ে ফেল, তার পর তুমি কেবল বৃন্দাবন কেন, কাশী গয়া মথুরা যেখানে খুসী সেখানে যাও। যখন ছেলেটাকে নিয়েছ, তখন তার ভবিষ্যৎটাও তোমায় দেখতে হবে ত, মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে গেলে তো চলবে না।"

কাত্যায়নী ফিরিয়া আসিলেন, মনে হইল কথাটা বাস্তবিকই সত্য, তাঁহাকে এখন উহার বিবাহ দিতে হইবে, তাহার পর তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারিবেন।

"দা'ঠাকুর কোথায় গো মা—"

বাড়ীতে পৌঁছিবামাত্র পাঁচু মণ্ডল আসিয়া ধরিল। দৃপ্তকণ্ঠে কাত্যায়নী বলিয়া উঠিলেন, "চুলোয় গেছে। তোদেরও বলি পাঁচু, ও ত পাগলা আছেই, তাতে তোরাও যদি ওকে অমনি ক'রে নাচিয়ে দিস—আমি যাই কোথায় বল্ দেখি, তোরা কি আমায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতেও দিবি নে, তোদের জ্বালায় আমি সব ফেলে পালাব না গলায় দড়ি দেব ?"

মুখখানা বিমর্ষ করিয়া পাঁচু আমতা আমতা করিতে লাগিল ; বলিল, "তা মাঠাকরুণ, দা'ঠাকুর নিজেই সেধে যান, আমরা তো—"

অর্দ্ধ সমাপ্ত কথা রাখিয়া সে পলাইল।

সেই দিন শ্রীধর বাড়ীতে আসিবামাত্র কাত্যায়নী কঠোর-ভাবে জানাইলেন, তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে।

শ্রীধর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "শোন কথা, আমার মত লোকের কি বিয়ে করা পোষায় ?"

কাত্যায়নী অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া বলিলেন, "পোষাবে না কেন শুনি ?"

শ্রীধর মাথা দুলাইয়া বলিল, "কি ক'রে পোষাবে ? আজ একলা আছি, কাল হব দুজন, পরশু হব তিন জন, তার পর মা ষষ্ঠীর কৃপায় ক্রমেই বেড়ে উঠব। আর তোমার তো যে মন মাসীমা, কোন্ দিন এতটুকু ত্রুটি হ'লে অমনি ছুটবে বৃন্দাবনে। আজকাল নেহাৎ একলা আছি ব'লেই ত পাচ্ছ না, জানছ—তুমি যেখানে যাবে, তোমার ভিক্ষের ঝুলি আমি সঙ্গে থাকবই। এর পরে তুমি যো পাবে ত মন্দ নয়, তখন ফেলে অনায়াসে পালাবে। তখন আমি হতভাগা সাত সমুদ্রের জল খেয়ে মরি আর কি। উঁহু, সেটি হচ্ছে না ত মাসীমা, আর যা করতে বল, তা করতে রাজি আছি, বিয়ে ক'রে দলে ভারি হ'তে পারব না।"

কথাগুলা বলিয়া সে অত্যন্ত খুসী-মনে হাসিতে লাগিল।

কাত্যায়নী নরম হইয়া গিয়া বলিলেন, "দূর বোকা, তা কখনও পালাতে পারি ? বউমা আসবে, ছেলেপুলে হবে, আমি তাদের ফেলে যাব কোথায় ? আমি এই মাসেই তোর বিয়ে দিতে চাই। রামেশ্বর চাটুয্যে মত দিয়েছে, এই সামনের বাইশে বিয়েটা ক'রে ফেল দেখি, আমি নিশ্চিন্ত হই।"

যেন চমকাইয়া উঠিয়া শ্রীধর বলিল, "ওরে বাবা, সেই পেত্নীর মত মেয়েটা ? উঁহু মাসীমা, ও পেত্নীটাকে বিয়ে করতে আমি পারব না।"

হঠাৎ অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "তবে কি কাজলার মত সুন্দরী মেয়ে খুঁজে এনে দিতে হবে, না ওই ডোমনীটাকেই বিয়ে ক'রে ঘরে আনবি ?"

হাসিতে হাসিতে শ্রীধর বলিল, "তা যাই বল মাসীমা, ও যেন গোবরে পদ্ম ফুটেছে, ডোমের ঘরে অমন মেয়ে···"

"দূর হ আমার সামনে থেকে হতভাগা, নইলে এই ঝাঁটার বাড়ীতে তোর পিঠ যদি না ভেঙ্গে দেই, আমার নাম কাত্যায়নী নয়।"

হাতের কাছেই ঝাঁটাগাছাটা পড়িয়াছিল, তিনি সেটা টানিয়া লইতেই শ্রীধর পলায়ন করিল।

কাজলার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সে কাজলাকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, এই বাইশে আমার বিয়ে হবে, এর আগে তুই যদি এ গাঁ ছেড়ে না যাস বা ভীমকে বিয়ে না করিস, তা হ'লে তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন। ভীমকে যদি বিয়ে করিস,তবে গাঁয়ে থাকতে পাবি, নইলে সোজা রাস্তা দেখ্‌বি।"

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া কাজলা বলিল, "কেন, আমি যদি বিয়ে না করি – যদি গাঁয়ে থাকি, তোমার তাতে কি হবে, দা'ঠাকুর ? আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি ?"

মাথাটা কাত করিয়া শ্রীধর বলিল, "ওই ত, সে কথা বুঝবে কে, বুঝতে চাইবেই বা কে ? জানিস ত গাঁয়ে কি রকম গোল উঠেছে, সকলে ওই একই কথা বলে, তোর জন্তে আমার মাথা কতখানি নীচু হচ্ছে, সেটা জানিস্ ? যদি ভদ্র-লোক হতিস, জানতে পারতিস, ছোট লোক কি না, বুঝতে পারবি আর কি ?"

কি একটা উত্তর কাজলার মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু সে সামলাইয়া গেল, শুধু বলিল, "আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি।"

উৎসাহিত হইয়া শ্রীধর বলিল, "হ্যাঁ, বিয়েটা ক'রে ফেল, গাঁয়ের মেয়ে গাঁ ছেড়ে আর যাবি কোথায় ? দিব্যি এখানে থাকবি, কাযকর্ম্ম করবি সংসারের, লোকে কেউ একটা কথাও বলতে পারবে না।"

কাজলার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া সে ফিরিল, কিন্তু নিজের বিষয়ে সে তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না, অথচ সাহস করিয়া মাসীমাকে কিছু বলারও ক্ষমতা নাই।

৫

গ্রামে সত্যই সকলে কাজলা ও শ্রীধরের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক কল্পনা করিয়া মাথা ঘামাইতেছিল। রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় স্পষ্টই কাত্যায়নীকে বলিলেন, "বুঝলেন কি না, বাবাজীকে একটু সাবধান ক'রে দেবেন—ওই ডোম-বাড়ীতে যাওয়া আসা,—ইয়ে, বুঝলেন কিনা; আমার আর পাঁচটা আত্মীয়স্বজন আছে ত, আমার তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত রাখা চাই।"

কাত্যায়নীর মুখখানা কালো হইয়া গেল, বাড়ীতে ফিরিয়াই তিনি শ্রীধরকে লইয়া পড়িলেন। সে বেচারা তখন মাসীমার রন্ধনের জন্ম কতকগুলা বাঁশ কাটিতেছিল। মনে করিয়াছিল—বাঁশ কাটিয়া দিয়া মাসীমাকে খুসী করিবে, হঠাৎ মাসীমা ঝড়ের বেগে আসিয়া পড়ায় সে থতমত খাইয়া তাকাইয়া রহিল।

একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মাসীমা, এই সকালবেলায় এত গালাগালি—"

কাত্যায়নী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুই দূর হয়ে যা আমার বাড়ী হ'তে, তোর জন্মে আমি কি সকলের কাছে হেয় হয়ে থাকব? আমি অমুক মুখুয্যের পুত্রবধূ, অমুক মুখুয্যের পরিবার, এমন কার বুকের পাটা আছে যে, আমায় একটা কথা বলতে সাহস করে? আজ তোর জন্মেই না আমার কথা শুনতে হ'ল, অপমানে মুখ কালো ক'রে ফিরতে হ'ল?"

হাতের দা ফেলিয়া, সদর্পে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শ্রীধর বলিল, "বটে, তোমার অপমান করেছে? কে কি বলেছে বল দেখি মাসীমা, আমি একবার দেখে নেই তাকে। তার ঘর জ্বালিয়ে দেব না, তার পা একেবারে খোঁড়া ক'রে দেব না? সে এখনও শ্রীধর ভশ্চাযকে চেনে নি—বটে?

রাগে সে দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া চাপিতে লাগিল।

মানুষটা থাকে বেশ, সব সময়ে সে হাসি-খুসি লইয়াই থাকে, কিন্তু যদি কোন কারণে কাহারও উপর রাগ হয়, তাহার সর্ব্বনাশ না করিয়া সে ছাড়ে না। সে লোকের উপকার করে, আবশ্যক হইলে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া প্রাণ বাঁচায়, কিন্তু অন্যায় দেখিলে যাহাকে বাঁচাইয়াছে, তাহারই প্রাণ লইতে কুণ্ঠিত হয় না, ইহা শুধু কাত্যায়নী কেন, গ্রামের ছোট বড় সকলেই জানিত, সেই জন্যই কাত্যায়নী তাহার রাগভাব দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সত্যিই কি কেউ আমায় অপমান করতে পারে রে? তোকে আর না চেনে কে—না জানে কে? তবু কেউ যদি তোর নামে মুখ কালো ক'রে একটা কথা বলে, সেটা আমার গায় কি রকম বাজে, বল দেখি? ওই ডোম-ছুঁড়ীটাকে নিয়ে গাঁয়ের সব লোক আড়ালে কথা বলে, হাসে, সেটা কি আমার সহ্যি হয়?"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে জল আসিল।

অস্থির হইয়া শ্রীধর বলিল, "বা রে, তার সঙ্গে আমার তো আর কোন সম্পর্কই নেই। কয়দিন খেতে পায়নি, তাই তাকে কয়টা টাকা দিয়েছিলুম বৈ ত নয়, এতে লোকের যে কেন এত মাথাব্যথা ধরে, আর তোমায় ছোট বড় সব কথা এসে জানায়, তা ত বলতে পারি নে।"

যাহাই হউক, অবশেষে বিবাহের ঠিক হইয়া গেল। গ্রামের ছোট বড় সকলেই এ কথা শুনিল এবং আনন্দিত হইল, কেন না, সকলেই শ্রীধরকে আন্তরিক ভালবাসিত।

বিবাহের দুইদিন আগে শ্রীধর কাজলাকে বলিয়া পাঠাইল, তাহার এখানে থাকা আর পোষাইবে না, যেহেতু, কেহ যে তাহার দিকে চাহিয়া শ্রীধরকে অন্ততঃ পক্ষে গোপনেও দুই এক কথা বলিবে, তাহা শ্রীধরের অসহ্য।

সে দিন সে ভিন্নগ্রাম হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, পথেই দেখা হইল কাজলার সহিত।

দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কাজলা উঠিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার কথাই রাখছি, দা'ঠাকুর। আমি এখান হ'তে চ'লে যাচ্ছি।"

"চ'লে যাচ্ছিস—?"

হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে কোন একটা অজানা যায়গায় কে আঘাত দিল, বিবর্ণমুখে শ্রীধর বলিল, "কোথায় চ'লে যাচ্ছিস—?"

কাজলা বলিল, "মনে করছি, কলকাতায় যাব।"

শ্রীধর জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ী ঘর?"

কাজলা হাতের মুঠি খুলিয়া নোট দেখাইল, বলিল, "ভীমকে বিক্রি ক'রে দিয়েছি বারো টাকায়। আর ত এখানে আসব না, বাড়ীঘরে আর আমার দরকার কি?"

শুষ্কমুখে শ্রীধর বলিল, "নিজের দেশ, বাড়ী-ঘর সব ছেড়ে চ'লে যা'বি, সেও ভাল, তবু এখানে ভীমকে, না হয় অন্য কাউকেও বিয়ে ক'রে থাকতে পারলি নে?"

কাজলা মাথা নাড়িল, হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ডোমের মেয়ে বিয়ে করুক বা নাই করুক, তাতে তোমাদের ভদ্দর লোকেদের এত মাথা ঘামানোর দরকার, কি দা'ঠাকুর। ছোটলোকের যা নিয়ম, সে তাই ক'রে যাবে, তাতে ভদ্দর লোকের কি?"

শ্রীধর খানিক চুপ করিয়া অন্যমনস্কভাবে এক দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর নরমসুরে বলিল, "আমার ওপর রাগ করেছিস বুঝি, কাজলা?"

কাজলা যেন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "কেন দা'ঠাকুর, বরং তুমি আমার যা উপকার করেছ, তা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। আমি ভদ্দর লোক ত নই যে, তোমার কাছ হ'তে উপকার পেয়েও তা ভুলে গিয়ে আবার তোমার নিন্দে করব? আমি যে ছোটলোক দা'ঠাকুর, কোনদিন কেউ যদি একটা কুটো

নেড়ে উপকার করে, সেইটুকুই আমার মনে চিরকাল জেগে থাকবে।"

ভদ্রলোক ও ছোটলোকের মধ্যে তুলনা করা শ্রীধরই তাহাকে শিখাইয়াছে। আজ বিপরীত জবাব পাইয়া সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কাজলা বলিল, "আমি আজই চ'লে যাব ঠিক করেছি, কিন্তু তোমায় একবার না জানিয়ে ত যেতে পারি নে, দা'ঠাকুর। সেই-জন্যে এখনও রয়েছি, নইলে সকালেই চ'লে যেতুম। না ব'লে গেলে এর পর মনে করতে—এমন কি মুখ ফুটে বলতে—ছোটলোকের মেয়ে কি না, তাই উপকারটাও মানলে না। কিন্তু যাওয়ার বেলায় ব'লে যাচ্ছি দা'ঠাকুর, ছোটলোক বরং তোমার ভদ্দর লোকের চেয়ে ভাল। ওই ত ভদ্দর লোকদেরও উপকার করে-ছিলে। যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তার ভাইকে তুমিই ত সেবা ক'রে বাঁচিয়েছিলে। সে উপকারের কথা ভুলে গিয়ে ওরাই যে তোমায় কত কথা বলেছে। যাকে বাঁচিয়েছিলে, তার বাপই না বলেছে—তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না। কিন্তু এই যে ছোটলোকরা—যারা তোমার কাছ হ'তে এতটুকু উপকার পেয়েছে, তারা কোন দিন, তুমি যদি তাদের হাজার অনিষ্ট কর, তবু একটি কথা বলবে না। তাই বলি দা'ঠাকুর, তুমি আর কাউকে কোন দিন ছোটলোক ব'লে ঘেন্না করো না।"

শ্রীধর আজ একটিও উত্তর দিতে পারিল না। চিরদিন সে ভদ্রলোকের মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছে। কোন দিন যে মুখ তুলিয়া তাহার কথার বিরুদ্ধে একটা কথা বলে নাই, আজ সে-ই শেষ বিদায়ের ক্ষণে তাহাকে অনেক কথাই শুনাইয়া দিল।

নিরুত্তর শ্রীধরের পায়ের কাছে আবার নত হইয়া চকিতে তাহাকে স্পর্শ করিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া, মাথায় দিয়া কাজলা উঠিয়া দাঁড়াইল। হাসি-মুখেই বলিল, "আজ যাওয়ার বেলায় ছুঁয়ে দিয়ে গেলুম ঠাকুর, বাড়ীতে যাওয়ার বেলায় চান ক'রে যেয়ো, আর পৈতেটাকে বদলে ফেলো।"

ধীরে ধীরে সে চলিয়া গেল। শ্রীধর নীরবে শুধু চাহিয়া রহিল। একটা কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

ইহারই কয়েক দিন পরে কাত্যায়নী নিশ্চিন্ত-মনে মহা ধূমধাম করিয়া শ্রীধরের বিবাহ দিয়া নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী (সরস্বতী)।

গাঁজা খাও

ক্ষণেক তরে দাঁড়াও হেথা
পথিক মহাশয়,
গাঁজা বারেক খেতেই হবে
শুনুন অনুনয়।
দেখুন গাঁজার রূপটা কত,
খেঁকশিয়ালের ল্যাজের মত,
এ পণ্যেরি পুণ্য কভু হবে নাক লয়,
পথিক মহাশয়।

এমন গাঁজার গুণের কথা
বলবো কত আর,
আপনি রসিক আপনি প্রেমিক
আপনি সমঝদার।
টাটকা সাজা গাঁজার টানে,
প্রেমের জোয়ার আসবে প্রাণে,
হবে মেজাজ তিরিক্ষি যে
মিথ্যা কথা নয়।

সকল টানের অতীত যাঁরা
বাউল দরবেশ,
কাটাননিক তাঁরা কভু
গাঁজার টানের রেশ।
শক্তি গাঁজার বলি হারি
মর্ত্তেতে দেয় স্বর্গে পাড়ি
স্বাদু কত সন্ত সাধু
জানেন পরিচয়।

গাঁজা খেলে অন্তিমে হয়
শিবলোকে স্থান,
গাঁজার ধোঁয়ায় নিত্য যে হয়
মন্দাকিনী-স্নান।
শাঁকচিরুণী শিবের চেড়া
হবে তোমার সঙ্গী সেবা
কাশী না হক কাসির ধুমে উঠবে জয় জয়!
পথিক মহাশয়।

কপিঞ্জল

বিংশ পরিচ্ছেদ

মন যখন বিহ্বলতার চরমে গিয়া পৌঁছিয়াছে, ঠিক এমনই সময়ে মলয়ার পত্র আসিল। মলয়া তাহাকে কোন দিনই বড় একটা চিঠিপত্র লেখে না। আজ এ সময়ে তার পত্রখানা হাতে পড়িতেই করবীর বুকটার মধ্যে ধক্ করিয়া উঠিল। মলু তাকে এত দিন পরে আজই যে পত্র লিখিয়া বসিল, তার অর্থ কি এই যে, সে এখন তার খুব নিকটতর আত্মীয়? তাই সম্ভব বটে! এ কি, সমস্যা যে ক্রমশই জটিলতর হইয়া উঠিতে চলিল! সে এমন অসহায় নিরুপায়ের মতই বা নিজেকে ভাগ্য-স্রোতে ভাসাইয়া দিতে সায় দিতেছে কেন? মনের সে বল তার আজ কোথায় গেল? এত দিন সে ত কৈ এমন দুর্ব্বল ছিল না? সে দিন হঠাৎ হিরণ্ময়ের সহিত দেখা-সাক্ষাতের পর হইতেই বা তার কি এমন দুর্দ্দশা ঘটিল যে, মনের মধ্যে একান্ত অস্থির অস্বস্থ হইয়া রহিয়াছে? মলয়া আবার গিন্নীপনা করিয়া কি লিখিল দেখা যাক।

করবীর সন্দেহই সত্য। মলু তাকে নূতন সম্পর্কেই দ্বিধা-হীনচিত্তে বরণ করিয়া লইয়াছে। সে লিখিয়াছে—

"ভাই বৌদি!—

তোমাকে আজ থেকে এই আদরের নামেই অভিহিত করলেম। আশা করি, তুমিও আমার পত্রোত্তরে ঠাকুরঝি ব'লে সম্বোধন করবে, যদি না করো, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হবো এবং তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবো, তা ব'লে রাখলুম। বুঝে শুঝে কায করো।

ভাই রুবি! একটি কথা তোমায় না ব'লে থাকতে পারছি না, তারই জন্যে এই চিঠি তোমায় আমি লিখছি। সত্যি ভাই, তোমায় বৌদি ব'লে চিঠি লিখতে লিখতে কত কথাই যে মনে আসছে! অতীতের কথা আমি মন থেকে জোর ক'রে বিদায় ক'রে দিচ্চি, দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করছি, বর্ত্তমান আর তার চাইতেও বেশী ক'রে আলোকোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি ভবিষ্যতের;— যে অদূর-ভবিষ্যতে তুমি আমার দেবতুল্য দাদামণির গৃহলক্ষ্মী হয়ে আমাদের ঘর আলো করতে এ ঘরে প্রবেশ করবে।

রুবি! আমি যে আমার দাদার পূর্ব্বে দেবতুল্য শব্দটা ব্যবহার করলুম, তুমি একবারও মনে করো না যে, ওটা একটা শব্দমাত্র বা অতিশয়োক্তি। না, স্নেহের আতিশয্য এর মধ্যে একটুও নেই। তুমি এখনও স্বপ্নেও জানো না যে, কতবড় মহৎ, কতখানি উদার এবং কি স্নেহময় পুরুষকে তুমি স্বামিরূপে লাভ করতে পারছো! সত্যি রুবি! আমি তাঁর সহোদরা বোন্ হলেও এ কথা আমি বলতে কুণ্ঠিত হব না যে, তোমার জন্মান্তরের তপস্যা খুব ভালই ছিল, না হ'লে এ সৌভাগ্য তুমি লাভ করতে পারতে না, আর এও এই সঙ্গে তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ যে, যে জিনিষ তুমি পেতে চলেছ, এখন থেকেই তার মূল্য বুঝে নিয়ে তাঁর উপযুক্ত হবার যোগ্যতা যাতে অর্জ্জন করতে পারো, সেই জন্য যত্ন নাও। নারীর সতীত্ব ও একচিত্ততাই তার সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ, এতে তুমি সন্দেহ করো না। বেশী আর কি লিখব। ভগবান্ তোমার মনের সুখে চিরসুখী করুন। ভালবাসা নিও। তোমারই মলু।"

চিঠিখানার অনেকখানিই হেঁয়ালির জাল বোনা। মলয়া এ সব কথা, অত কথা কেন লিখিয়াছে? সে কি তাকে কোনরূপ সন্দেহ করিয়াছে? শশাঙ্কের সম্বন্ধে কেহ কি কিছু বলিয়াছে? না, সে সম্ভব নয়! এ যেমন তার উপদেশ দানের আগ্রহ বরাবরই আছে, তেমনই।

রুবি মনে মনে ঈষৎ হাসিল। নিজের ভাইকে মলয়া একবারেই দেবতার আসন পাতিয়া বসাইয়াছে! নিজের জিনিষ, নিজের ত ভালই লাগিয়া থাকে, কার না লাগে? কিন্তু চকিতের মধ্যে তার মনের ভিতর বিদ্যুৎস্ফুরণের মতই সেদিনকার সেই হৃদয়ভারাবনত গভীরদৃষ্টির সহিত হিরণ্ময়ের মুখখানা উদিত হইয়া গেল। সে মুখ সে বেশীক্ষণও দেখে নাই, যাও দেখিয়াছে, ভাল করিয়া দেখে নাই। তবু যেটুকু দেখিয়াছিল সেটুকু যে ঠিক ভুলিয়া যাইবার মত নয়, সে কথাও তাহাকে তার মনের কাছে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। কি তার মধ্যে আছে, জানা নাই; কিন্তু কিছু একটু আছে, যার জন্য চেষ্টা করিলেও তাহাকে তুচ্ছ করা যায় না, প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য প্রাণ একান্ত ব্যাকুল অস্থির হইয়া উঠিতে থাকিলেও প্রত্যাখ্যান করিবার মত সাহস মনের মধ্যে ধরা দেয় না। কোন কিছু একটা দৃঢ় স্থির অচপল এবং অবিচল বস্তু এই স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যময় নম্র-মধুর দৃষ্টির মধ্যে গভীর

হইয়া রহিয়াছে। তাকে ছোট করিতে গেলে নিজেকেই যেন খেলো করা হয়। সে আপনার মহিমাতে আপনিই সুপ্রতিষ্ঠিত, আপনার মধ্যে আপনি সুসম্পন্ন, তার মধ্যে গভীরতা যেন অতলস্পর্শ, অথচ উপরে তার শান্ত শীতলতা।

রবির মনের হাসি মনেই মিলাইয়া আসিল, মুখে তা' ফুটিবার অবসর পাইল না। তবে কি শশাঙ্কের আশা সে ছাড়িয়া দিবে? হিরণ্ময়ের মা'র সঙ্গে তার মায়ের চুক্তি অনুসারে স্বায়তঃ সে হিরণ্ময়কেই বিবাহ করিতে বাধ্য। তাই যদি সে করে, সকল ঝঞ্ঝাট ত চুকিয়াই যায়? বিশেষতঃ হিরণ্ময়ের কাছেও সে দিন সে যাহা নিরাপত্তিতে স্বীকার করিয়া লইল, তাহার পর কোন ভদ্র-মহিলার পক্ষে হয় ত আর কোন পথ লওয়া সঙ্গত বলিয়াই কেহ মত দিবেন না? সে কেন সে দিন অত লোকারণ্যের মধ্যে হিরণ্ময়কে তার আঙুল হইতে খোলা আংটী নিজের হাতে তার আঙুলে পরাইয়া দিতে দিল? কেন সে আপত্তি জানাইল না? জানানো উচিত ছিল।

আবার সেই রাত্রিতেই সে সেই তাদের বাগ্‌দানের আংটী আর এক জনের সঙ্গে বদল করিয়াছে! সেই বা তার দাবী ছাড়িতে চাহিবে কেন?

আর করবী নিজে? সে কি শশাঙ্ককে ভুলিয়া হিরণ্ময়ের স্ত্রী হইয়াই সুখী হইতে পারিবে? পারিবে কি? একবার মনে হয়, হয় ত পারিবে, আবার মনে হয়, না।—শশাঙ্ককে মনে পড়িলেই মন কাঁদিতে থাকে।

শশাঙ্ককে যদি সে না দেখিত!

পরদিন মলয়াকে পত্র লিখিল—

"প্রিয়বরাসু, তোমার স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া সুখী হইলাম, কিন্তু তোমার কাছে নিবেদন এই যে, তুমি ত জানো, আমি তোমার দেবতুল্য ভাইএর ঠিক যোগ্য নই। আমায় ক্ষমা করো, তাঁকেও করতে বলো, আমি হয় ত তাঁকে কোন দিনই সুখী করতে পারবো না, তাই আমি ভয় পাচ্ছি। আশা করি, ভাল আছ। ভালবাসা নিও, মাসীমাকে প্রণাম দিও।

তোমার রবি।"

পত্র পড়িয়া মলয়ার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল, হিরণ্ময় কাছে আসিলে সে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বরে তাহাকে বলিল,—"আমার মনে হয়, রবি এ ভালই করেছে, তার মনে হয় ত কোন দ্বিধা আছে, তাই হয় ত সে তোমাকে বিয়ে করতে চাইছে না। যাক, নাই বা হলো, ও ভেঙেই যাক।"

হিরণ্ময় যেন ঈষৎ শুকাইয়া উঠিল। একটুখানি বিমনা হইয়া থাকিয়া ক্ষণপরে নিজেকে আশ্বস্ত করিয়া লইয়া একান্ত বিশ্বস্ত চিত্তে ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"ছেলেমানুষী দেখতে পাচ্ছো না তুমি, খুকি। মনে যদি তাঁর কোন দ্বিধাভাব থাকতো, তা হ'লে সে দিন আংটীটি পরতে অমত করতেন, শিক্ষিতা তিনি, নিশ্চয়ই জানেন, ওটা সম্পূর্ণ স্বীকৃতিদান। তুমি এক কায করো, খুকি! ওঁকে লিখে দাও, ওঁর আমার যোগ্য হবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, ভগবান্ আমাকেই যেন একটুখানি ওঁর যোগ্য করেন, জানো খুকি! এইটুকু লিখলেই বাকিটা উনি নিজেই অনুমান ক'রে নিতে পারবেন।"

হিরণ্ময় মনের প্রসন্নতায় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়া, সুমতি যেখানে সোফায় শুইয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, তাঁর মাথার কাছে বসিয়া পড়িল,"অনেক দিন তোমার মাথার পাকাচুল তোলা হয় নি, আজ ছুটী আছে, আজ অনেকগুলো তুলে দেব। আচ্ছা মা! যদি পঞ্চাশটা তুলে দিই, কত দেবে বল ত?"

সুমতি সংবাদপত্র নামাইয়া রাখিয়া ছেলের কথায় হাসিমুখে বলিলেন, "কেন, এক পয়সা—মজুরা যা পায়।"

হিরণ্ময় মা'র মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সহাস্য অনুযোগে কহিয়া উঠিল—"না মা, তাদের সঙ্গে আমি সমান নোব না, আমায় কিন্তু একটা টাকা দিতে হবে।"

সুমতি হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তাই নিস, টাকা দিয়ে কি করবি রে শুনি?"

ছেলের ছোটবেলায় এমনি করিয়াই তার কাছে এক পয়সারও হিসাব লইতেন, ছেলে আজও তাঁর সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিতে দিয়াছে।

হিরণ্ময় হাসিয়া বলিল, "টাকার আমার বড্ড দরকার, মা! একটা দাঙ্গা বাধবার জোগাড় হচ্ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গ্যাছে, তাই তোমার দেওয়া ঐ টাকাটায় হরিলুট দেবো।"

হিরণ্ময় তার মাহিনার টাকা সবই মাকে আনিয়া দিত।

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "হরিলুট দিবি? তা হ'লে এক টাকা কেন, পাঁচ টাকার সন্দেশ-বাতাসা আনিয়ে দোব'খন,

পাড়ার গরীবদের তুই খাওয়াতে ভালবাসিস—তাদের ডাকিয়ে এনে দিস।"

খুশী হইয়া হিরণ উত্তর করিল,—"আচ্ছা মা! তাই করো। আমার তাই ইচ্ছা ছিল, রোজ রোজ বল্লে তুমি যদি বিরক্ত হও, তাই বলিনি।"

সুমতি গভীর স্নেহে কৃতী পুত্রের আনন্দস্মিত মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"মুখে বলি ব'লে কি সত্যই রাগ করি রে? বরং তোর ছোটদের ওপোর দয়ামায়া দেখে কত যে মনে মনে খুসী হই। আশীর্ব্বাদ করি, এই মনটি তোমার যেন চিরদিন থাকে।"

হিরণ্ময় উঠিয়া আসিয়া জননীর পদধূলি লইয়া গাঢ় স্বরে কহিল—"আশীর্ব্বাদ করো মা!"

মলয়া রুবির পত্রের উত্তর দিল না। মনে মনে সে হিরণ্ময়ের উপরে একটুখানি অসন্তুষ্ট হইল। দাদা যে এক দিন রুবিকে দেখিয়াই ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা সে বুঝিয়াছিল, রুবির পত্র পড়িয়া তার মন সংশয়াচ্ছন্ন হইয়াছিল। বাহিরে সে এ লইয়া কোন কিছুই করিবার পথ দেখিতে না পাইলেও ভিতরে ভিতরে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

শশাঙ্কর নিকট হইতেও রুবি পত্র পাইল, সে লিখিয়াছে—

"অনেকগুলা কাগজ নষ্ট করিয়া অবশেষে তোমায় এই সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিতেছি। যাকে লিখিবার কথার শেষ নাই, সম্বোধনের ভাষা যার সম্বন্ধে অফুরন্ত, তাকে এমন ভাবে পত্র লিখিতে মন কি চায়? অথচ—

নাঃ, আর না রুবি! প্রিয়তমে! আমার রুবি, এইবার তুমি আমার হও। হবে কি? সমস্ত সংসার পৃথিবী এক দিকে আর তুমি এক দিকে, যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি, যুঝিতে ভয় করি না, যদি তোমায় পাই। বল—পাইব ত? আমি জানি, তোমার চিত্ত আমারই, কিন্তু তোমার দেহ? যদি অনুমতি দাও—দেখা করিয়া সব কথা বলিব, শুধু বলা নয়, যত শীঘ্র সম্ভব তোমায় পাইতে চাই, অনুমতি দাও, আমি ব্যবস্থা করি।

একান্ত তোমারই শশাঙ্ক।"

রুবি এ পত্র পড়িয়া প্রথমটা একটা অননুভূতপূর্ব্ব পুলকে ও বিস্ময়ে সমস্ত দেহ-মনে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তার শুভ্র সুন্দর মুখ নব-অনুরাগের দীপ্তিতে ও সলজ্জ আনন্দে যেন আবির-মাখান হইয়া গেল; তার বুকের মধ্যে একটা তীব্র আনন্দের দ্রুততাল চঞ্চল নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল, সেই পত্র সে তার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া, যেখানে শশাঙ্কের নাম লেখা ছিল, তাহারই উপর প্রগাঢ় প্রেমে চুম্বন করিল।

তার পর সহসা আগত একটা গভীরতর অবসাদে তাহার সেই হর্ষোৎফুল্ল দেহ-মন যেন এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই শিথিল ও অবসন্ন হইয়া আসিয়া তাহার শিথিলিত মুষ্টিমধ্য হইতে সেই ক্ষণপূর্ব্বের গভীরতর আদরের চিহ্নে চিহ্নিত পত্রখানা স্খলিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল, নিঝুম হইয়া গিয়া সেও সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ করিয়া বিছানাটার উপর হতাশ-ক্লান্ত-দেহে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অস্তোন্মুখ সূর্য্যের পানে মুখ করিয়া তার স্নিগ্ধোজ্জ্বল রক্ত-ধারার মধ্যে অবগাহন করিতে করিতে প্রতিমা একখানা নভেল পড়িতেছিল, শরদিন্দু ঘরে ঢুকিল।

বাহিরের আকাশ মেঘব্যাপ্তিশূন্য, নির্ম্মল ও নীল। সেই সমুজ্জ্বল ও সুবিস্তৃত নীলের মধ্যে নারায়ণের বক্ষে কৌস্তুভ-ভূষণের মতই সূর্য্য দীপ্তি পাইতেছেন। পৃথিবী মরকত-মণি-প্রভার সরক্ত রাগে রাগোজ্জ্বল হইয়া অভিনব সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিতেছে। এ শোভা চিরপুরাতন হইয়াও চিরনবীন এবং অনবদ্য।

শরদিন্দুর জুতার শব্দে পাঠনিরতা মুখ তুলিল। বই মুড়িয়া আঙুল দিয়া চিহ্ন করিয়া রাখিয়া নিজের অস্তালোকদীপ্ত মুখ সাগ্রহে ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, "কি হলো গো? মত করলে?"

ছেলের খেলা করিবার বলটা মাটীতে পড়িয়াছিল, শরদিন্দু সেটা পা দিয়া 'সুট' করিয়া দিয়া মুখটা ঈষৎ বিকৃত করিয়া উত্তর দিল,—"তেমনই ছেলে বটে! তোমায় যেমন খেয়ে-দেয়ে কায নেই, তাই ওর খোসামোদ করতে নিজে অপমান হয়েও হলো না, আমায় শুদ্ধু অপদস্থ হ'তে পাঠালে।"

শরদিন্দু কুঞ্চিত ললাটে ঘরের আর একটা দিকে চলিয়া গিয়া আল্না হইতে পুষ্পসারবাসিত পশমী পঞ্জাবী তুলিয়া লইল।

প্রতিমা ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানভরে কহিল, "আমার কি না খোসামোদ করতে বড্ডই সাধ! কি করি, বাবা-মাকে যে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তেই পারছিনে, ওঁদের কি যে ভয়ানক ঝোঁক পড়েছে, কিছুতেই আশা ছাড়তে পাচ্ছেন না। যেন ঐ একটি বৈ আর বাঙ্গালা-বেহার-উড়িষ্যার মধ্যে দ্বিতীয় আর একটা অমন ছেলে নেই! ও না বিয়ে করলে যেন ওঁদের মেয়ের আর এ জন্মে বিয়েই হবে না!"

শরদিন্দু দাঁড়াইয়া জামা পরিতেছিল, বিরক্তি-বিরসকণ্ঠে কহিল, "শাশুড়ী ঠাক্‌রুণকে আজই তুমি লিখে দাও, সে সব হবেটবে না, শশের জন্যে বিলেত-আমেরিকা থেকে ফরমাস দেওয়া ক'নে গড়তে গ্যাছে, গ'ড়ে আসবে। ওঁদের অতি সাধারণ মেয়ে আমার মত সাধারণের জন্যে চলে, অতবড় অসাধারণের জন্যে সে একবারেই অচল।"

প্রতিমা এ মন্তব্যে অপমানিত ও আহত হইয়া উঠিয়া সংক্ষেপে কহিল, "সাতজন্ম যদি বিয়ে নাও হয়, তবুও সুবোর বিয়ে আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে কোনমতেই দিতে দেব না। দরকার নেই ওঁর অত দয়া করবার।"

বলিয়া ব্যর্থ রোষে গুমরাইতে লাগিল। শরদিন্দু সাজ-সজ্জা সমাধা করিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

শশাঙ্কের পরীক্ষাদান এবং পরীক্ষার ফলও ঘটিয়াছিল, তথাপি সরযূর ঈপ্সিত পাত্রীর সহিত বিবাহের সম্মতি তার কাছে কিছুতেই আদায় হইয়া আসল না। সেবারের সেই বড় অসুখটার পর হইতে হরমোহনের স্বাস্থ্য বরাবরের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আজকাল এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, একসঙ্গে দশটা দিনও তাঁর ভাল যায় না। কচিছেলের মত কিছু না কিছু যেন লাগিয়াই আছে। বিন্দু বেশীর ভাগই এখন রুগ্ন বাপের সেবার ভার লইতে তাঁরই কাছে থাকে, বসন্তবাবুর বাড়ীতে তার ফলে চারিদিক হইতে অপচয় ও বিশৃঙ্খলার শেষ নাই। সামান্য দাসী-চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর কর্ত্তা পর্য্যন্ত এর ফল সমানভাবেই ভোগ করিতেছেন। সময়ে খাওয়া হয় না, স্নানের জল শীতের দিনে বেজায় ঠাণ্ডা থাকে, পরিবার ধুতি চাকররা কোঁচায় না, বামুনটা জঘন্য রাঁধে, চিরদিনের অনভ্যস্ত ক্লেশসহনে অসহিষ্ণু বসন্ত বাবু প্রথমার উপরকার অভিমানের জালা অক্ষম অসমর্থ সরযূর উপর দিয়াই মেটান। মধ্যে মধ্যে সে ঝাল বেশ তীব্র হইয়াই উঠে। সরযূ প্রতিবিধানের চেষ্টাও জানে না, কৌশলও বোঝে না, তার দ্বারা এতবড় বাড়ীর এতগুলা লোকজনকে শাসনে রাখা সম্ভবও হয় না, সে বকুনি খাইয়া অভিমানে কাঁদিয়া খুন হয়, উপবাস করিয়া মরে। মনে মনে বলে, সতীন যে এমন ক'রে সকল রকমে জ্বালায়, তা জানতুম না, কোথায় আপদ-বালাই স'রে গ্যাছে, জুড়িয়ে বাঁচবো, তা না হয়ে এ আবার উল্টো উৎপত্তি।

শোভা শ্বশুরবাড়ী, অল্পদিনের জন্য আসিলেও সে আসে বড়মার কাছে, তার বাপের বাড়ীতে। সরযূ ব্যর্থ ক্ষোভে জ্বলিতে থাকে। পেটের সন্তানরা যে আবার এমন পর হয়, এ যেন বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। শশাঙ্কর ত কথাই নাই। একজামিন দিয়া ছেলে সেখান হইতেই কাশ্মীর-ভ্রমণে গেলেন, পরীক্ষার ফল বাহির হইলে তথা হইতে ফিরিয়া বড়মার পদারবিন্দের সেবা করিতেছিলেন, অনেক লেখা-লিখির পর এক দিন আগে বাড়ী ফিরিয়াছেন, আসিয়াই নোটিশ জারি হইয়াছে, ভয়ানক দরকারী কায আর এক দিন পরেই কলিকাতায় যাইবেন।

এ দিকে সেই সরযূর বাপের দেশের জমীদার কন্যার অভিভাবকরা বসন্ত বাবু এবং তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী সরযূর বাপের কাছে ভরসা পাইয়া এ পর্য্যন্ত মেয়ে লইয়া বসিয়া আছে। ছেলের পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পরেও এ পক্ষকে নীরব দেখিয়া তাহাদের জমীদারী চিত্তের পিত্ত অবধি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বসন্ত বাবুকে সবিনয়-নিবেদনের মধ্যে যতখানি পারা যায়, কড়া চিঠি লিখিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, সরযূর পিতাকে ডাকাইয়া আনিয়া ছোটলোক, 'জুয়াচোর' পর্য্যন্ত জমীদারী-কায়দা-দোরস্ত অনেক ভাল ভাল কথাই শুনাইয়া দিয়াছেন। বসন্ত বাবুর শ্বশুর নাকে কাঁদিয়া সেই সব কথা তাঁর মেয়ে-জামাইকে জানাইয়াছেন, আর সনির্ব্বন্ধ অনুনয় করিয়া লিখিয়াছেন যে, যদি সত্য সত্যই কোন কারণে এ বিবাহ না দেওয়া তাঁহারা স্থির করিয়া থাকেন, তবে সে ইচ্ছা তাঁহারা ত্যাগ করুন। যদি নাই দিবেন, তবে এত দিন ধরিয়া ইঁহাদের এমন করিয়া ভুলাইয়া রাখিলেন কেন? ইঁহারাও বড় যে সে লোক নন, এদিনেও এঁদের নামে 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়' বলিয়া কথিত আছে। তাঁদের নাগাল না পাইয়া গরীব-বেচারা ইঁহারই উপর এঁরা সকল শোধ তুলিয়া লইবেন আর কি!

বিশেষ যখন এ দেরই জমীদারীর মধ্যে বাস করিতে হয়।

বসন্ত বাবু নিজেও ছেলের প্রতি যথেষ্ট চটিয়াছিলেন। শ্বশুরের এবং হবু বেহায়ের পত্রে, তার উপর স্ত্রীর কান্নায় এবার একটু বেশী রকমই চটিলেন, ছেলেকে রাগ করিয়াই পত্র লিখিলেন, যেন সে পত্র-পাঠ তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

পত্র পাইয়া শশাঙ্ক বড়মাকে আসিয়া বলিল, "চল্লুম বড়মা, যাত্রার উদ্যোগ ক'রে দাও।"

বিন্দুবাসিনী অবাক্ হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চল্লি আবার কোথায়? এই ত সে দিন এলি, আবার এখনই কোথায় যাবি?"

শশাঙ্ক হাসিয়া কহিল, "গঙ্গাযাত্রা করতে।"

বিন্দুবাসিনী শিহরিয়া উঠিয়া সতর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ শশে! ফের যদি ওরকম সব কথা বলবি—" একটুখানি থামিয়া বলিলেন, "আমি তোকে ধোরে মারবো, হতভাগা ছেলে বাহাদুরী দেখাবার আর যায়গা পায় না!" মনে মনে "ষাট ষাট" উচ্চারণ করিয়া মা-ষষ্ঠীর কাছে মাথা খুঁড়িয়া তাঁর অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিলেন।

শশাঙ্ক মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—"সত্যি বড়মা! তোমার ছোট সতীনটি বড় কম মেয়ে নন, বাবাটি আমার অত-শতয় থাকতে জানতেন না, উনিই ত ওঁকে পরামর্শ দিয়ে দিয়ে একেবারে ক্ষেপিয়ে তুল্লেন! এই দেখ না, আমার নামে শমন এসেছে! চব্বিশ ঘণ্টার নোটিস! কড়া হুকুম! যেতেই হবে।"

বিন্দুবাসিনী ভাল মানুষ সাজিয়া, যেন কিছুই বুঝেন নাই, এমনই ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কেন রে, হঠাৎ তোর বাপ তোকে এমন জোর তলব করলে? ভাল আছে ত সব?"

শশাঙ্ক কহিল, "নিশ্চয়ই আছে। কারু মাথা ধরলে বা পা কামড়ালে আমার বদলে তোমারই ডাক পড়তো। কারণ, তারা জানে, মাথায় জলপটী, কিম্বা পায়ে ফুটবাথ দিতে আমার চাইতে তুমি ঢের বেশী ভাল করেই পারবে, বুঝতে পারছো না? এ সেই আমার মায়ের বাপের বাড়ীর দেশের জমীদারদের জামাই হবার সেই সম্মানিত ব্যাপারটির জের! এবার ওঁরা দেখছি একটু উঠে প'ড়ে লেগেছেন। একটা হেস্ত-নেস্ত না ক'রে আর ছাড়ছেন না।"

বলিয়া শশাঙ্ক একটুখানি হাসিল।

বিন্দুবাসিনী শান্তভাবে কহিলেন, "আর ত তোমার ছুতো করবার কিছু নেই, এম-এ পাশ ত হয়েইছ, এইবার বিয়ে করেই ফেলো না কেন? অনর্থক আর দেরি ক'রে লাভই বা কি?"

শশাঙ্কও ভাল মানুষ সাজিয়া উত্তর দিল, "আমি কি কোন দিন তোমায় বলেছি, আমি ভীষ্মদেবের মতন কি কার্ত্তিক ঠাকুরের মতন আইবুড় থাকবো?"

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "না, তা তুই বলিস্‌নি। বেশ, তা হ'লে চল, আমিও না হয় তোর সঙ্গে যাই, এই মাসেই বিয়েটা হয়ে যাক, তোর মা'র বড্ড সাধ, ঐ মেয়েটিই বউ হয়, আর মেয়েও শুনেছি বেশ ভাল।"

শশাঙ্ক ধনুকের ছিলার মত ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া বাধা দিল,—"রক্ষা কর, বড়মা! মায়ের দেশের জমীদারকন্যার পক্ষে ঘটকালী আর তুমি শুরু করো না! তা হ'লে এবার আর কাশ্মীরও নয়, একেবারে অষ্ট্রেলিয়ায় পালাবো, আর আসবোও না।"

বিন্দু একবারে স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেলেন। শশাঙ্কর মনের বার্ত্তা তাঁহার ত অবিদিত নয়।

পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত গম্ভীরমুখে পিতা কহিলেন, "তোমার গর্ভধারিণীর সঙ্গে দেখা করেছ? না ক'রে থাকো, একবার করো, তার পর আমার যা বলবার আছে, বলবো।"

"আচ্ছা" বলিয়া শশাঙ্ক বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল, এবং তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে নয়, বেশ একটু গম্ভীরমুখে ও গম্ভীর চালে পা ফেলিয়া সে তার নিজের মায়ের উদ্দেশ্যে আসিল।

সরযূ ছেলের আসার খবর পাইয়াছিল, তার মনটা এ সংবাদে অত্যন্তই প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তবে হয় ত সে এইবার বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে? ছেলে ত অমন হয় না, সৎমায়ের পরামর্শেই না সে বিগড়াইতে বসিয়াছে!

শশাঙ্ক আসিয়া ঘরে ঢুকিল, চলনে উৎসাহ নাই, কণ্ঠে স্বর নাই, যেন সেই হাস্যপরিহাসপটু সদানন্দ সে শশাঙ্কই নয়, নিরুদ্যমভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমায় কি তুমিই আসতে লিখিয়েছ?"

সরযূ তার প্রশ্নের ধরণে ঈষৎ বিব্রত বোধ করিল, ক্ষণকাল

সে নীরব থাকিয়া ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমিই লিখিয়েছি।"

শশাঙ্ক পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সরযূর মুখখানা ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে একটা ঢোঁক গিলিল, আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। অথচ অনায়াসেই বলিতে পারিত, তুমি আমার ছেলে ব'লে, আমি তোমার মা ব'লে, তাই তোমায় আসতে লিখেছি! এ লেখবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে!

শশাঙ্ক বারেক মা'র মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তার পর বলিল, "যদি কোন কায না থাকে, আমায় কালই আবার ফিরতে হবে। দাদামশায়ের একটা ফোড়া দেখে এসেছি, ডাক্তার বলেছে, সেটা হয় ত কার্ব্বাঙ্কলে দাঁড়াতে পারে।"

এবার সরযূ মনে বল পাইল, ঈষৎ আরক্ত-মুখে মুখ তুলিয়া সে কিছু স্পষ্ট স্বরে কহিয়া উঠিল, "পাতানে দাদামশাই নিয়ে যেতে রইলে, আর এ দিকে তোমার জন্যে তোমার দাদামশাই বিপর্য্যস্ত অপদস্থ হ'তে লাগলেন! কুমীরের সঙ্গে বাদ ক'রে জলে বাস করা ত চলে না, ওরা তাঁকে যাচ্ছেতাই অপমান করছে। গরীব হলেও তিনিই তোমার নিজের মাতামহ! তোমার গায়ে তাঁরই রক্ত আছে।"

এই বলিয়া কোনমতে উদ্গত অশ্রু নিরোধপূর্ব্বক নিজের বাপের লেখা সেই চিঠি এবং তার পরের পাওয়া আরও একখানা সেই ধরণেরই চিঠি আনিয়া ছেলের পায়ের কাছে ছুড়িয়া দিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কোনমতে কহিল, "প'ড়ে দেখে যা ভাল হয় করো, তাঁকে ত ওরা দেশে টেঁকতে দিচ্ছে না, তোমরা ও রকম করবে জানলে, আমার গরীব বাপকে আমি ওর মধ্যে যেতে দিতুম না। কেমন ক'রে জানবো?" এই বলিয়া সে অনেকখানি দূরে চলিয়া গিয়া পিছন ফিরিয়া এটা সেটা করিতে লাগিল, ছেলের নির্লিপ্ত ধরণ-ধারণে মনের মধ্যটায় তার যেন জ্বালা ধরিয়া গিয়াছিল। একবারটি সে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াও কি কথা কহিতে পারিত না? বড়মা হইলে কত ডাকাডাকি, কত না আদর কাড়াকাড়ি হইত, সে কি সরযূর দেখা নাই?

শশাঙ্ক পত্র দু'খানা কুড়াইয়া লইয়া মনে মনে পাঠ করিল, তার পর চিঠি পড়া হইয়া গেলে, ডাকিয়া উঠিল, "মা!"

সরযূ চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। এই ডাকই না সে আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল! কিন্তু সে কি এই স্বরে?

শশাঙ্ক কহিল, "যারা এই রকম ছোট লোক, তাদের ঘরে যিনি আমার বিয়ে দিতে চান, তাঁকেই বলো আমার নিজের দাদামশায়? লোকতঃ সেটা সত্যি হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ থাকলেও আত্মার যোগ নেই! না, আমি ওদের মেয়ে বিয়ে করবো না, কিছুতেই না, কোনমতেই না।"

সরযূর মুখে খবর পাইয়া বসন্ত বাবু ছেলের উপর অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন ও তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সংবাদটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রতিমা এই সুযোগে নিজের বাপের আবেদনটাকে সফল করিয়া লইবার জন্য একদফা নিজে এবং আর এক দফায় স্বামীকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। ফল যা হইয়াছে, সে কথা পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। শশাঙ্ক বলিয়া দিয়াছে, সে জমীদারকন্যাকেও যেমন বিবাহ করিবে না, সুষমাকেও তেমনই বিবাহ করিবে না, এ মত তার অকাট্য! শরদিন্দু অবমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। যাবার সময় বলিয়া গিয়াছে, সুষোকে আনলে হয় ত ভাল করতে, ওদের জায়ে জায়ে মিলতো, আমাদেরও ভায়ে ভায়ে হয় ত জমীদারী ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে হতো না। তা যখন তোমার পছন্দ নয়, তখন থাক।"

শশাঙ্ক আসিয়া দাঁড়াইলে বসন্ত বাবু কহিলেন, "তোমার দাদামশাই যে সম্বন্ধ করেছেন, তাঁদের আমি পাকা কথা দিয়ে সাত মাস ধ'রে বসিয়ে রেখেছি, এখন তুমি বিয়ে করবে না বল্লে চলবে কেন?"

শশাঙ্ক বিনীত স্বরে উত্তর করিল, "প্রথম থেকেই ত এ বিয়েয় আমাদের সম্মতি ছিল না, সে কথা ত বড়মা আপনাদের অনেকবারই বলেছিলেন।"

বসন্ত বাবু কহিলেন, "বড়মার পরামর্শেই তোমার এমন মতিচ্ছন্ন ধরেছে, তা বুঝতে পারছি। বড়মাই তোমার একমাত্র আপনার? তোমার মা কেউ নয়?"

শশাঙ্ক নীরব রহিল।

বসন্ত বাবু বলিতে লাগিলেন, "আমি কেউ নই?"

শশাঙ্ক কথা কহিল না।

বসন্ত বাবু কহিলেন, "বেশ, না হয় আমরা কেউ নই, এ বিয়ে তোমায় করতেই হবে।"

শশাঙ্ক এবার কথা কহিল, "মাপ করবেন, এ বিয়ে আমি

কিছুতেই করতে পারবো না।" তাহার কণ্ঠে কঠোর প্রতিজ্ঞা নিহিত ছিল।

এত বড় স্পর্দ্ধা! বসন্ত বাবু আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া গিয়া চীৎকার-শব্দে বলিয়া উঠিলেন, "তোকে করতেই হবে। কেন করবি নে? আমাদের অপমান করবার মতলবে? আমার খাবি, আর আমাকেই অপমান করবি? লেখাপড়া শিখে এই তোর বিদ্যে হলো? এই শিক্ষা তোমার বড়মা তোমায় দিয়েছেন?"

শশাঙ্কের গৌর মুখ আভ্যন্তরিক তাপে উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি গলার স্বরে যতটুকু সম্ভব সে উষ্মতা সে ঢাকা দিয়া কথা কহিল; বলিল, "বড়মা আমায় যা শিক্ষা দিয়াছেন, সে হয় ত খুব মন্দ নয়; কিন্তু জন্মগত যেটা পাওয়া যায়, তাকে কেউ শিক্ষা দিয়ে নষ্ট করতে পারে না, ভিতরে সে থাকেই; আমায় যদি মাপ নাও করেন, তবুও আমি ও মেয়ে বা অন্য কোন মেয়েকে এখন বিয়ে করতে পারবো না, আর আমার কিছুই বলবার নেই।"

শশাঙ্ক যাইবার জন্য মুখ ফিরাইতেই, সরযূ মুখে আঁচল চাপা দিয়া বসিয়াছিল, ফুঁপাইয়া উঠিল। বসন্ত বাবু ডাকিলেন, "শশে!"

শশাঙ্ক মুখ না ফিরাইয়াই দাঁড়াইল।

"যাচ্ছো যাও, কিন্তু জেনে যেও, যদি এ মেয়েকে তুমি বিয়ে না করো, তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র। আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আমি একা শরদিন্দুর নামে দানপত্র ক'রে দিয়ে যাব। তোমার গর্ভধারিণী তাঁর জীবৎকাল পর্য্যন্ত অর্দ্ধাংশের উপস্বত্ব ভোগ করতে পারবেন, তাঁর মৃত্যুর পর তোমার নয়, শরদিন্দুকে তাঁর সম্পত্তি অর্শাবে। তুমি এক কপর্দ্দকও পাবে না।"

শশাঙ্ক এবার মুখ ফিরাইয়া মুখে ঈষৎ হাসি টানিয়া আনিয়া সহজ কণ্ঠেই কথা কহিল; বলিল, "তাতেই যদি আপনি আমার এ অবাধ্যতার ক্ষতিপূরণ হবে মনে করেন, তাই করবেন, সে জন্যে আমি খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবো মনে করবো না। জগতে সকলেই ধনী হয়ে জন্মায় না, আপনারই দয়ায় আমি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছি, আপনার আশীর্ব্বাদ যদি থাকে, ঐ'তেই আমি কিছু ক'রে খেতে পারবো। ভাগ্যে থাকলে হয় ত এই থেকেই এক দিন আবার চাই কি, ধনীও হ'তে পারি। দাদার পরে আমার একটুও হিংসে হবে না, তার টাকা বেশী দরকার।"

এই বলিয়া শশাঙ্ক বাপকে প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

কারুক

ধ্যানযোগে বসি', রহস্য-রসে মানসের রঙ গুলে'
ভাব-তুলি ধরে তুলিয়া স্বভাব-প্রকাশের অঙ্গুলে।
পরাণের পরিকল্পনা-টানে কায়া ধরে কল্পনা,—
তুলির সোপানে আসে অবতরি' অপূর্ব্ব আল্পনা।

আলোকের কোন্ অলখ আলোক মিলে তার দৃষ্টিতে,
অরূপের কোন্ অপরূপ নব-রূপ করে সৃষ্টি সে।
শত ছন্দের স্পন্দনে সে যে জড়ে করে প্রাণময়,—
মূক আলেখ্য-লেখা বেয়ে তার অনাহত গান বয়।

করবী-কুসুম কোরক নহেক, ও কার মণি-নোলক;
হিঙ্গল-ঝরার পথে পদাঙ্ক—রক্ত অলক্তক।
তমাল-তলের শ্যামল ছায়ায় ছাথে এলো চুল কার,
বন-মালতীর গুচ্ছি হয় মন-মহিনীর দুল তার!

মনে হয় কার নীল আঁখি-পুট উজ্জ্বল নীলাকাশ,—
গোধূলির গাঢ় লালিমায় ফোটে রূপসীর লীলা-হাস!
কারুব— কবি সে— বর্ণ কারুজ-রেখা আঁকে কবিতার,
ঘর-বা'র আর সীমা-অসীমার ছেদ নাই কবি তার!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

রণচণ্ডী

বসুমতী ব্লক-বিভাগ

[শিল্পী—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী (বি, এ) ।

লিমিটেড বাবা

১

"এক প্যাকেট স্যার, ওন্‌লি এক প্যাকেট", বালক স্মিত-মুখে কাগজের একটি ক্ষুদ্র মোড়ক ডেপুটী বাবুর হাতের দিকে বাড়াইয়া ধরিল, সমবেত জনতা মুখ টিপিয়া হাসিল। কাছারীর সম্মুখে নদীতটের ঝাউগাছের শ্রেণী কেবল হা হা করিয়া তান তুলিল, নতুবা স্থানটায় গুরুগম্ভীর নীরবতা বিরাজ করিত।

"পাজী র‍্যাস্কাল! বার ক'রে দিচ্ছি বজ্জাতি। চালাকী করবার যায়গা পাওনি আর?" ডেপুটী বাবুর রক্তবর্ণ চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণায়মান, হস্তের ছড়ি উদ্যত, ক্রোধকম্পিত স্বরে তিনি হাঁকিলেন, "চাপরাসী! চাপরাসী!"

বালকের হাসি হাসি মুখে তখনও ভয়ের বিন্দুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সে তেমনই স্মিতমুখে নম্র স্বরে বলিল, "কন্‌ট্র্যাব্যাণ্ড স্যার, কন্‌ট্র্যাব্যাণ্ড সল্ট, নিন এক প্যাকেট—চার পয়সা, স্যার!"

ততক্ষণ চাপরাসী, আরদালী, পাহারাওয়ালার দল ভিড় করিয়া আসিয়া বালককে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

"এই, ইস্কো কাণ পাকাড়কে হাজতমে লে যাও—" হুকুম দিয়া হাকিম মস্ মস্ করিয়া চলিয়া গেলেন, চাপরাসী-আরদালী তাঁহার অনুগমন করিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই এক জন পথের বালকের কোমল কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, 'বন্দে মাতরম্!' ডেপুটী বাবুর কর্ণ-কুহরে কে যেন এক ঝলক গলিত সীসক ঢালিয়া দিল! পৃথিবী কি রসাতলে যাইতেছে? এ কি ওলট-পালট! তিনি বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, "ড্যাম মুইস্যান্স!"

দূর হইতে সেই উৎকট ধ্বনি মাঝে মাঝে বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল, ডেপুটী বাবুর মেজাজও সঙ্গে সঙ্গে প্রথম-দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়-চতুর্থে চড়িতে লাগিল। র‍্যাঙ্ক সিডিশন! গভর্ণমেণ্ট এক দিনের জন্ম তাঁহার হস্তে ডিক্টেটোরিয়াল ক্ষমতাটা দিতে পারে—অন্ততঃ একটা দিন!

আবার চীৎকার! হাকিমের মেজাজ এইবার সপ্তমে চড়িয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দারোগা বাবু হন্ত-দন্ত হইয়া থানার দিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছেন—তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তাভা ধারণ করিয়াছে, সম্ভবতঃ চীৎকার তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। তিনি অভিবাদনান্তে সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গী পাহারাওয়ালারা মিলিটারী স্যালুট করিয়া তাঁহার পশ্চাতে অবস্থান করিল। হাকিম সাহেব কিন্তু সে সব আদৌ লক্ষ্য করেন নাই, তিনি সক্রোধে বলিলেন, "আপনার ডিউটি দেখে আপনার নামে একটা গুড রিপোর্ট ক'রে সদরে পাঠাতে ইচ্ছে হচ্ছে। শুনছেন চীৎকার! ড্যাম ইডিয়টস্!"

দারোগা বাবু থতমত খাইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, হুজুর—"

"শুনলুম, গেল হাটে মেয়েরা পিকেটিং করেছে, তার লিডার নাকি আপনার ভায়ের স্ত্রী?"—ডেপুটী বাবুর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, মুখ-চক্ষুর ভাবও গম্ভীর।

দারোগা বাবু বলিলেন,—"তাঁর উপর আমার ত কোন কন্‌ট্রোল নেই, হুজুর! দেখুন, ভাই কল্‌কাতায়—"

ডেপুটী বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পাঁচশোবার আছে। বাড়ীর ভেতরে কন্‌ট্রোল নেই পুরুষের? যাক, আমি তর্ক করতে চাইনে। আসছে হাটে শুনছি তারা আরও দলে ভারী হয়ে পিকেট করবে। আমি চাই যে, আমার এলাকায় এমন থিয়েটারী অ্যাক্‌টিং না হয়।"

দারোগা বাবু ইহার উত্তরে কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ডেপুটী বাবু তাঁহাকে সে অবসর না দিয়া মস্ মস্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

জামাজোড়া ছাড়িতে ছাড়িতে ডেপুটী বাবু হাঁকিলেন, "ওরে যেদো, হারামজাদা, থাকিস্ কোথায়—এঁরা সব গেলেন কোথায়?"

যেদো তখন বাবুর গড়গড়ায় জল বদলাইয়া নল টানিয়া দেখিতেছিল, ঠিক হইয়াছে কি না। সে একগাল ধূম নির্গত করিতে করিতে প্রায় বিষম খাইবার মত হইয়া কাসিতে কাসিতে বলিল, "আজ্ঞে, যাই বাবু!"

তাহার আগেই গৃহিণী উপস্থিত। তাঁহার পরিধানে একখানি গামছা, উপরের অঙ্গ আর একখানি গামছা দ্বারা কোনরূপে আচ্ছাদিত, হাতে এক ঘটী গঙ্গাজল! তিনি আসিয়াই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কি ও? ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? হচ্ছে, সবই হচ্ছে, একটু তর সয় না? এ কি তোমার কাছারী না কি?"

গৃহিণী কথাটা বলিবার সময় চারিদিকে গঙ্গাজল ছিটাইতেছিলেন। আলনা, দেয়াল, কড়ি-বরগা, বাবুর দেহ, কাপড়-চোপড়—কিছুই বাদ গেল না। হঠাৎ গৃহিণীর দৃষ্টি বাবুর পাদুকার উপর নিপতিত হইল। পথে যাইতে যাইতে মানুষ হঠাৎ ভীষণ বিষধর সর্প দেখিলে যেমন চমকিত হইয়া উঠে, গৃহিণী ততোধিক চমকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও মা! কি ঘেন্নার কথা গো! যেটি বারণ করবো, সেইটিই করবে! আমার মাথামুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে কচ্ছে!"

বাবু সভয়ে পাদমূলে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এ্যাঁ, কি বলছ, হয়েছে কিছু না কি? না।" ভয়ে কর্তার কণ্ঠতালু শুকাইয়া আসিয়াছিল। না জানি, কি অপরাধ করিয়াছেন!

"হলো আমার মাথা আর মুণ্ডু! জুতো শুদ্ধ ঘরে ঢুকলে কি ব'লে বল দিকি? ছিষ্টির নোংরা এনে ঘরে তুল্লে, বলে কি না, হলো কি!"

কর্তা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, মেজাজটাও কিছু রুক্ষ ছিল। সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "বেশ যা হোক্, তোমার ভয়ে ঘর-দুয়োর ত ছেড়েইছি—বারান্দায় কাপড়-চোপড় ছেড়ে গামছা প'রে ঘরে ঢুকছি, কশুর ত কিছুই কচ্ছি নি—তবুও—"

"তবুও! ভারী কশুর কচ্ছ না তুমি! ছেলেটাকে কল্লে ম্লেচ্ছ—দিলে ম্লেচ্ছোর দেশে পাঠিয়ে, মেয়েটাকেও ক'রে তুলেছ মেমসাহেব, দিলে এক বিলেত-ফেরত ম্লেচ্ছোর হাতে—"

"বড় মন্দ কাযই করেছি! না ক'রে যদি আশু ডাক্তারের ছেলেটার মত উচ্ছন্নোয় যেতে দিতুম, তা হ'লে খুব ভাল হ'ত, না?"

গৃহিণী অবাক্ হইয়া কর্তার মুখের দিকে ক্ষণেক তাকাইয়া বলিলেন, "কেন, কি অপরাধ কল্লে সে? সোনার চাঁদ ছেলে—জলপানি পাচ্ছে মুটো মুটো টাকা, দেশশুদ্ধ লোকের মুখে সুখ্যাতি ধরে না—"

কর্তা বিরক্তি ও ক্রোধ-মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, খুব বাহাদুর ছেলে বটে! আজ দিইছি হাজতে ঠেলে, এর পর জেলে দেবো, তখন ছেলের পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে এখন!"

"ও মা, বল কি গো! কাকে জেল দিচ্ছ তুমি? ডাক্তারের ছেলেকে? অমিয়কে? তোমার ভীমরতি হয়েছে না কি?"

দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া ডেপুটী বাবু বলিলেন, "ভীমরতি? ব্লাগার্ড ফুল! আমায় আসে কি না নুণ বেচতে! গ্রাহ্যিই করে না, আমি হাকিম; বাপের বয়িসী! যত হয়েছে হতভাগা ভবঘুরের দল, খেয়ে দেয়ে কায নেই, রাত-দিন হো হো টোটো ক'রে বেড়াচ্ছে, বাপ মানে না, গুরুপুরুত মানে না—"

"সে কি গো—আশু ডাক্তারের ছেলে—অমিয়?"

"হাঁ, হাঁ, অমে—ছুঁচোর গোলাম চামচিকে! হয়েছে কি এদের এখন! দেশের কায করছে! নুণ তৈরী ক'রে দেশের কায কচ্ছে! গুষ্টীর পিণ্ডি করছে! লেখাপড়া চুলোয় দিলে—মস্ত দেশের কায করছে! হতচ্ছাড়া বদমাইসের দল। চাবুক, ওদের জন্যে চাবুকই ওষুধ—রাজা মানে না, গভর্ণমেণ্ট মানে না, গুরুজন মানে না—এ সব হ'ল কি? সবাই কর্তা, সবাই লিডার। ওদের মতে যে মত না দেবে, সেই হবে ট্রেটার! আরে হারামজাদারা, ট্রেটার বানান্ করতে পারিস?"

"হুজুর, তার আয়া হ্যায়।"—দরজার বাহিরে আরদালী সেলাম করিয়া একখানা লাল লেফাফা-মোড়া পত্র লইয়া দাঁড়াইল।

"তার? এত রাত্রে? কৈ, দেখি? কি হ'ল আবার"—ডেপুটী বাবু হাত বাড়াইয়া তার লইলেন, আরদালী সেলাম করিয়া বাহিরে গেল।

তারখানি পড়িতে পড়িতে কর্তার আশ্চর্য্য ভাবান্তর হইল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, ঘন ঘন শ্বাস নির্গত হইতে লাগিল, ক্ষণপরে তিনি অতিকষ্টে দেয়াল ধরিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। গৃহিণী উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিলেও তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও উচ্চারিত হইল না। তার আসিয়াছে তাঁহার জামাতার কলিকাতার বাসা হইতে। তারে এই কয়টি কথা ছিল,—"শীঘ্র আসুন, আপনার কন্যা গ্রেপ্তার হইয়াছে!"

২

হেদুয়ার পার্শ্বস্থ রাজপথে অসম্ভব জনতা—বেথুন কলেজে পিকেটিং চলিতেছে। নারী কর্ম্ম-মন্দিরের সেবিকাসঙ্ঘ

কলেজের দ্বার আটক করিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের হাতে হাতে শিকল লাগান। কলেজের ছাত্রীরা গাড়ী হইতে নামিয়া কলেজে প্রবেশ করিতে গেলেই তাঁহারা তাহাদের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইতেছেন, আর কাকুতিমিনতি করিয়া তাহাদিগকে কলেজে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছেন। যে সকল ছাত্রী নিষেধ না মানিয়া কলেজে প্রবেশ করিবার জন্য দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছেন, অমনই তাঁহাদের পথে দুই একটি নারী কর্ম্মী শুইয়া পড়িতেছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকরা অনেক বুঝাইয়াছেন, বলিয়াছেন, এমন বাধা দেওয়াকে মহাত্মা গন্ধীর পীসফুল পিকেটিং বলা যায় না; কিন্তু তাঁহাদের এক কথা, দেশের এই সঙ্কটকালে দুই চারিদিন পড়া বন্ধ রাখিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে?

হেদুয়ার পুকুরের চারি পাড়ে এবং বাহিরে ফুটপাথের উপর দলে দলে কাতারে কাতারে লোক জমায়েৎ হইতেছে। সার্জ্জেণ্ট ও পাহারাওয়ালারা কলেজের পার্শ্বস্থ ফুটপাথে জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছিল।

ঠিক সেই সময়ে পথের মধ্যস্থলে একটি দুর্ঘটনা ঘটিতে ঘটিতে রহিয়া গেল। হ্যাটকোট-পরিহিত একটি সুপুরুষ বাঙ্গালী যুবক স্বয়ং মোটর হাঁকাইয়া দক্ষিণদিক হইতে বেথুন কলেজের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ পলায়মান জনসঙ্ঘের মধ্য হইতে একটি লোক একেবারে তাঁহার মোটরের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। বাঙ্গালী যুবকটি প্রাণপণে ব্রেক কষিয়া গাড়ীখানার বেগ একবারে মন্দীভূত করিয়া ফেলিল, কিন্তু যুবকটি সেই বেগ সামলাইতে না পারিয়া সম্মুখভাগে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। এক জন সার্জ্জেণ্ট দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য ধন্যবাদ!"

যুবকটি সোফার-সহিসের হেফাজতে গাড়ী রাখিয়া কলেজের গেটের দিকে অগ্রসর হইল—যাইবার পূর্ব্বে সার্জ্জেণ্টের উপরওয়ালার সহিত মুহূর্ত্তকাল তাহার কিছু কথা হইল।

ফটকে একটা গোলযোগ হইতেছিল। যে সকল নারী-কর্ম্মী জনতার দিকে সম্মুখ করিয়া ফটকের বাহিরে হাতে হাতে শিকল দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটির সহিত একটি পরিণতবয়স্ক পলিতমুণ্ড লোকের তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। তরুণী বলিতেছিলেন, "আমি আপনার মা—আপনি কেমন ক'রে আমার কথা ঠেলে কলেজে ঢুকবেন?"

বৃদ্ধটি করযোড়ে মিনতির সুরে বলিলেন, "না মা, আপনি আমার মা হ'তে যাবেন কেন, মা হওয়া কি সোজা কথা?—আপনি আমার নাতনী।"

বৃদ্ধের রসিকতায় নারীদের মুখ হাস্যরেখাঙ্কিত হইল না, এমন কথা বলা যায় না,—যদিও উহা প্রচ্ছন্নভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল।

তরুণীটি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তা যাই হোন আপনি—আপনি কলেজের প্রোফেসার ত? আমরা আপনার হাতে ধ'রে বিনয় ক'রে বলছি, আপনি কলেজে ঢুকবেন না।"

বৃদ্ধ অধ্যাপকও হাসিয়া জবাব দিলেন, "আমিও নাতনীদের পায়ে ধ'রে বলছি, গরীব বুড়োকে চাকরী বজায় রাখতে দিন তাঁরা।"

তরুণী বলিলেন, "সে হবে না, তা হ'লে আমরা ফটকে শুয়ে পড়ব—যান দিকি কেমন মাড়িয়ে যেতে পারেন?"

অধ্যাপক মহাশয় দন্তে রসনা কাটিয়া এক হাত পিছনে হটিয়া গিয়া বলিলেন, "ছি, মা জননীরা! তা কি পারি? তোমরা মাথায় তুলে রাখবার, পূজো করবার জিনিষ,—তোমাদের মাড়িয়ে যাব? যদি তা কর, তা হ'লে সটান বাসায় ফিরে যাব, তার পর চাকরীর ভাগ্যে যা থাকে থাক্। কিন্তু তা ব'লে তোমাদেরও মা এটা অন্যায় আবদার, লেখাপড়া বন্ধ ক'রে দেশের কি উপকার হবে?"

তরুণীদের পশ্চাতে একটি বর্ষীয়সী মহিলা দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে একখানি সাদা থান থাকিলেও পায়ে নাগরা জুতা, তিনি তকলিতে সূতা কাটিতেছিলেন। এতক্ষণে তিনি কথা কহিলেন, বলিলেন, "বল্‌ছেন, এরা আপনার নাতনী। বেশ ত, ওরা একটা আবদার ধরেছে, ঠাকুর্দ্দা না হয় আবদারটা রাখলেনই!"

বৃদ্ধ অধ্যাপক করযোড়ে বলিলেন, "আজ্ঞে, তাতে আমার কোনও আপত্তির কারণ নেই—তবে কি জানেন, বাসায় অনেকগুলো কুপোষ্য—"

বর্ষীয়সী মহিলা বাধা দিয়া বলিলেন, "ঐ, ঐ আপনারা একটা ওজর তোলেন বটে! পরনে বিলাতী কাপড় থাকলেই যেমন বলা হয়, পুরোণোগুলো কি ফেলে দেবো, তেমনই

পড়াশুনা বন্ধ করবার কথা তুললেই ব'লে থাকেন, কতকগুলো কুপোষ্যি আছে! দেশের জীবন-মরণ নিয়ে খেলা হচ্ছে, এ সময়ে কত ত্যাগ, কত কষ্ট সইতে হয়, না হ'লে পোলাও-কালিয়া খেয়ে নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে ভোরে উঠে দেখবেন কি, দেশ স্বরাজ পেয়েছে? জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইংরেজরা কি করেছিল? ওদের অক্সফোর্ড ক্যাম্‌ব্রিজের ছেলেরা কি করেছিল?"

এই সময়ে একটি উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী পুলিস-কর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "দেখুন, আপনারা জোর ক'রে এঁকে কলেজে যেতে বাধা দিতে পারেন না, ওঁকে বুঝিয়ে বল্‌তে পারেন মাত্র।"

একটি তরুণী বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত করা হচ্ছে, জোর ত কিছু করা হয় নি।"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "তবে গেট ছেড়ে দিন, ওঁর ইচ্ছে হয় ঢুকবেন, না হয় ফিরে যাবেন।"

নারী-কর্ম্মীরা হাতের শিকল আরও কষিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না, তা কখনই হবে না, আমরা কখনই ভেতরে যেতে দেবো না।"

কর্ম্মচারীও কিঞ্চিৎ পরুষকণ্ঠে বলিলেন, "মহাত্মার পীসফুল পিকেটিং মানে ত তা নয়। আপনারা এরকম ক'রে পরের অধিকারে জোর ক'রে বাধা দিলে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন করতে বাধ্য হব।"

বর্ষীয়সী মহিলাটি বলিলেন, "কি করবেন?"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "আপনাদের অ্যারেষ্ট করতে বাধ্য হব।"

মহিলা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তবে তাই করুন, আমরা রেডি।"

স্থানটায় একটা অসম্ভব গাম্ভীর্য্য দেখা দিল। যেন ভাদ্রের মেঘাচ্ছাদিত গুমোটের দিন উপস্থিত হইল! পুলিস-কর্ম্মচারীদের ইঙ্গিতে কনেষ্টবল ও সার্জ্জেণ্টরা বেড়াজালের মত কলেজ-ফটকটাকে ঘিরিয়া ফেলিল। পরমুহূর্ত্তে কি হয়,—এই ভাবনায় সকলেরই মন উৎসুক হইয়া উঠিল।

হাওয়াটা যখন আগুনের মত হইয়া উঠিয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত যুবকটি গেটের দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, "অপর্ণা!"

ডাকটি কর্ণকুহরে পৌঁছিবামাত্র একটি তরুণী চমকিত হইয়া যুবকের দিকে ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি অধিকতর আগ্রহের সহিত উভয় পার্শ্বস্থ সখীদের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার ও যুবকের উপর নিপতিত হইল। তরুণী অপূর্ব্ব সুন্দরী। সেই সুন্দরী-মহলেও তাঁহার ন্যায় রূপের জ্যোতি কাহারও ছিল না। যুবক আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "এস, বাড়ী যাই, অপর্ণা।"

তরুণীর দৃষ্টি তখনও ভয়চকিত, কিন্তু কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব দৃঢ় করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি যাব না।"

যুবক কোমল-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ, এর চেয়ে বড় ডিউটি তোমার রয়েছে অপর্ণা, এস, চ'লে এস। তোমার বাপ—"

তরুণী কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কখ্‌খন যাব না।"

যুবকও এইবার দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "যাবে না? যেতেই হবে তোমায়—না নিয়ে যেতে পারি ত আমার নাম সরল-কুমার নয়!" যুবক এইবার নারীব্যূহের একবারে সমীপস্থ হইয়া তরুণীর হস্তধারণ করিয়া বলিল, "এস, এক্ষুনি চ'লে এস—"

নারীমহলে একটা অস্ফুট বিরক্তিজ্ঞাপক গুণগুণ রব উঠিল—পুলিস-কর্ম্মচারীদের ও জনতার মধ্যে একটা উৎকট ঔৎসুক্যের ভাব জাগিয়া উঠিল—কি এ, ব্যাপার কি? সেই সময়ে তরুণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ও ছোড়দি, দেখুন না, আমায় জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে"—

বর্ষীয়সী মহিলাটিই বোধ হয় 'ছোড়দি', তিনিই বোধ হয় নারীব্যূহের সেনাপতি। তিনি অগ্রসর হইয়া তরুণীকে বাহুপুটে আশ্রয় দান করিয়া তর্জ্জনী হেলাইয়া পরুষকণ্ঠে বলিলেন,—"আপনার এ কিরূপ ভদ্রতা? হ'তে পারেন ইনি আপনার আত্মীয়া, তা ব'লে আপনি এঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন কি হিসেবে?"

যুবক সরলকুমার প্রথমটা থতমত খাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ধীর স্থির প্রশান্ত কণ্ঠে বলিল, "স্বামী আপনার পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে কোন্ শাস্ত্রে তাতে অভদ্রতা প্রকাশ পায়, তা ত বলতে পারি নি—আপনি যদি জানেন,—"

'ছোড়দি' নামে সম্বোধিতা মহিলা বলিলেন, "হলোই বা আপনি স্বামী। আপনার স্ত্রীর উপর আপনার অধিকার

থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর আপনার কোন অধিকার নেই, তাঁর নারীত্বের মর্য্যাদায় আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।"

সরলকুমার বেচারী ফাঁপরে পড়িল, কাতরকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, স্বীকার করছি, আমার সে অধিকার নেই। কিন্তু আমি ভিক্ষে চাচ্ছি—আপনি সম্ভ্রান্ত মহিলা, বোধ হয়, নারী কর্ম্মিসঙ্ঘের কোন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, আপনার কাছে ভিক্ষে চাচ্ছি, আমার পত্নীকে দিন, সে ছেলেমানুষ, এখনও ভাল-মন্দের বিচারশক্তি তার হয় নি—বিশেষতঃ আপনি জানেন না, সে সরকারের কর্ম্মচারী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যা—"

সুন্দরী তরুণী অপর্ণা 'ছোড়দিদিকে' আরও উত্তমরূপে জড়াইয়া ধরিল।

মহিলা বলিলেন, "আপনি কি এঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে নিয়ে যেতে চান? তা' হ'লে জানব, আপনি জেণ্টল্‌ম্যান্ নন, আপনার সিভ্যালরী ব'লে জিনিষের সম্বন্ধে কোন আইডিয়াই নেই।"

বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারীটি অপর সকলের সহিত এই দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি স্মিতমুখে মহিলা নেত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখুন, বেচারার মুখখানা একবার দেখুন, দয়া হচ্ছে না আপনার? আর সকল কেসকে আপনি রাখুন, কিন্তু এটাতে পিওর ডোমেষ্টিক ট্র্যাজিডি ঘটলেও ঘটতে পারে। সুতরাং এর প্রতি অবিচার করলে কি আপনার ক্রুয়েল্‌টি টু অ্যানিম্যল্‌স্ করা হবে না?"

চাপা হাসির একটা আওয়াজ বাতাসে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু মহিলা নেত্রীর সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। তিনি অতিমাত্র ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিলেন,—"আপনাদের পুলিসের লোকের বুদ্ধির মত কথাই বলেছেন। দেখুন, এটা হাসিতামাসার জিনিষ না। বিশেষ, যেখানে নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ে কথা। জানেন, সে দিন চিকাগোর বিবাহ-বিচ্ছেদের আদালতে ডিফেণ্ডেণ্ট মিসেস ডানকান জুরীদের বুঝিয়ে কি বলেছেন?"

সরলকুমার করযোড়ে মিনতির সুরে বলিল, "আজ্ঞে না, জানিনি, জানবার দরকারও নেই। তাঁরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির লোক, তাঁরা যা করেন, শোভা পায়—"

যুবকের কথায় বাধা দিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে মহিলা নেত্রী বলিলেন, "শুনলুম, আপনি অপর্ণার স্বামী, তা তিনি ত বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার। আপনি ব্যারিষ্টার, আপনার এমন সঙ্কীর্ণ আইডিয়া কেন, তা ত বুঝতে পারিনি।"

সরলকুমার বলিল, "দেখুন, আপনার সঙ্গে তর্ক করি, সে ক্ষমতা আমার নেই। আপনি দয়া ক'রে অপর্ণাকে আজকের মত ছুটী দিন।"

তাহার মুখে চোখে দারুণ কাতরতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তরুণী একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সেই দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল, কিন্তু একবার ভীতিবিহ্বল নয়নদ্বয় 'ছোড়-দিদির' মুখের উপর স্থাপিত করিবামাত্র সভয়ে পিছাইয়া গেল। মহিলানেত্রী সরলকুমারের দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এর পর আপনার কথা বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু আজ আপনাকে একলাই ফিরে যেতে হবে।"

সরলকুমার অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। পুলিস-কর্ম্মচারী মহাশয় এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি যাতে আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন—তার জন্যে সে সময়টুকু আমরা দিয়েছিলুম, কিন্তু আর না।" তাহার পর নারী-নেত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনারা মনে করতে পারেন যে, আপনারা অ্যারেষ্ট হয়েছেন। আসুন!"

কর্ম্মচারী সজ্জিত কয়েদীগাড়ীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। একে একে নারীকর্ম্মীরা গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিলেন। সরলকুমার পথের ল্যাম্পপোষ্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার দৃষ্টিতে এমন কি একটা ভাব ছিল, যাহা দেখিয়া একবার অপর্ণা তাহার দিকে ছুটিয়া আসিবার জন্য ঝুঁকিল, মুহূর্ত্ত পরে সে গাড়ীতে গিয়া আর সকলের সঙ্গে উঠিয়া বসিল। সরলকুমার ভূমি হইতে দৃষ্টি উত্তোলন করিতে না করিতে গাড়ী বায়ুবেগে অন্তর্হিত হইয়া গেল!

৩

কলিকাতা হইতে গৃহপ্রত্যাগমনকালে ডেপুটী বাবুর মনটা প্রফুল্ল ছিল না। বহু চেষ্টা ও তদ্বির করিয়াও তিনি কন্যা অপর্ণাকে কিছুতেই কারামুক্ত করিতে পারিলেন না; বেথুন কলেজে পিকেটিং করার জন্য অন্য ছয়টি মহিলা কর্ম্মীর সহিত অপর্ণারও দুই মাস কারাদণ্ড হইয়াছিল। কর্ত্তা স্বয়ং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সরকারের কর্ম্মচারী—পুলিস কমিশনার ও লাট-দপ্তরের সেক্রেটারীর বাড়ী ও আফিস হাঁটাহাঁটি করিয়া কয়দিন তিনি পায়ের জুতা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; কিন্তু

সরকার পক্ষের এক কথা, যদি তাঁহার কন্যা প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করে যে, ভবিষ্যতে আন্দোলনে যোগদান করিবে না, তাহা হইলে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে, অন্যথা নহে। কর্ত্তা জেলে একাধিকবার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কয়বার জামাতাকে লইয়া গেলেন, কিন্তু অপর্ণারও এক কথা,—কোনও রূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া সে কারামুক্ত হইতে চাহে না; তবে সে আর বাড়ীর বাহির হইবে না। কর্ত্তা বুঝাইতে ত্রুটি করিলেন না,—তাহার গর্ভধারিণীকে এখনও এ কথা জানান হয় নাই, ইহার মধ্যে তাহার কারামুক্তি হইলে তিনি কোন কথা জানিতেও পারিবেন না। কিন্তু এ সংবাদ পাইলেই তিনি হার্টফেল করিয়া মারা যাইবেন! পরন্তু তাহার ভ্রাতার কেরিয়ারও একদম নষ্ট হইয়া যাইবে, হয় ত তাঁহার নিজের চাকুরী লইয়াও টানাটানি পড়িবে। তাঁহার জামাতাও একান্তে দুই একবার পত্নীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অপর্ণা অন্য সকল বিষয়ে স্বামীর মতানু-গামিনী হইলেও এ বিষয়ে অটল রহিল, স্পষ্টই বলিল, নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে সে কাহাকেও অনধিকারপ্রবেশ করিতে দিবে না। হতাশ হইয়া কর্ত্তা কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিবার মুখেই তিনি দেখিলেন, তাঁহার ভৃত্য, পরিজন, এক একটা 'যার' লইয়া বাহিরে যাইতেছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানিলেন, সেগুলি আচারের 'যার', গৃহিণীর আদেশে তাহারা আচারগুলি রাস্তার আবর্জ্জনাস্তূপে ফেলিয়া দিতে যাইতেছে। তাঁহার মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সক্রোধে চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে আদেশ দিয়া দ্রুতপদে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার এত সাধের জিনিষ—এত পরি-শ্রমের ফল,—পনেরো ষোল টাকা মূল্যের আচার!—পথের জঞ্জালে ফেলা যাইবে? আশ্চর্য্য! গৃহিণীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিল না কি?

"বলি, হচ্ছে কি সব? এর মানে?"—কর্ত্তার আওয়াজ শুনিয়া গৃহিণী প্রথমে একটু অপ্রতিভ হইবার ভাব দেখাই-লেন—প্রায় নগ্ন গাত্রের উপর গামছার খুঁটটা টানিয়া দিলেন। তাঁহার হস্তে গোবর-ছড়ার হাঁড়ি,—সে মূর্ত্তি তখন অতি চমৎকার!

গৃহিণী চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "মরণ, মরণ! মরবার আর যায়গা পেলেন না—তাকের উপর গিয়ে উঠেছেন মরতে! সব অনাছিষ্টি, সব অনাছিষ্টি!"

"আরে কি হয়েছে ছাই, বল না!"

কর্ত্তার কথার উত্তরে গৃহিণী যাহা বলিলেন, তাহাতে কর্ত্তা এইটুকু বুঝিলেন যে, তাকের উপর আচারের বোতল, যার, হাঁড়ী সাজানো ছিল, মুখপোড়া চড়াই পাখী তাঁহার সকড়ি-পাতে মুখ দিয়া তাকের উপরে গিয়া বসিয়াছে, কাযেই—

কর্ত্তা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তাই ব'লে আচারগুলো নিয়ে গিয়ে আঁস্তাকুড়ে উজোড় ক'রে আসতে হবে? বাঃ রে! একে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, তার ওপর এই সব? গর্ভেও ধরেছ কি ঠিক তেমনই?"

তখন গৃহিণীর মুখ, চক্ষু ও সর্ব্ব-অবয়বের ভাব যে আকার ধারণ করিল, বুঝি অষ্টার্লিটজ যুদ্ধাভিযানের অব্যবহিত পূর্ব্বে নেপোলিয়ানেরও সেইরূপ হইয়াছিল কি না সন্দেহ। দুই হস্ত কটিদেশে ন্যস্ত করিয়া জিরাফের মত গলাটা বাড়াইয়া দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "কি? যা নয়, তাই ব'লে এসেছ ভেতর বয়ে ঝগড়া করতে? এ ত তোমার হাকিমি ফলাবার কাছারী-বাড়ী নয়! আমি গর্ভে যাই ধরি না কেন, কারুর তাতে কি বলবার আছে? রইল তোমার ঘর-সংসার। ওঃ, দাসী-বাঁদী পেয়েছে যেন—চলুম ঘরে আগুন দিয়ে—"

কথার সহিত হাতের অভিনয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট, কাযেই হাত-নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে গোবর-ছড়ার হাঁড়িটা মেঝের উপর পড়িয়া গেল, আর তাহার অভ্যন্তরস্থ মোলায়েম পদার্থের কতক অংশ ছিটকাইয়া কর্ত্তার অঙ্গলিপ্ত হইল, কতক পরিধেয় বস্ত্রাদিতে, অবশিষ্ট মুখে চোখে!

দপ করিয়া মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এমন কিন্তু সহজে হয় না, কেন না, কর্ত্তা বাহিরে হাকিম, ঘরে আসামী! তিনি বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "তাই যাও। মেয়ে গেছেন জেলে, মেয়ের মাও বেরুন পথে! যেমন মা, তেমনি মেয়ে! আদর দিয়ে গোল্লায় দিয়েছেন একবারে!"

কর্ত্তা আর দাঁড়াইলেন না, একবারে তীরের বেগে বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী কথাটা তলাইয়া বুঝিলেন কি না, তাহা বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না।

আজ রাগের পালা। স্নানাদি সমাপন করিয়া কর্ত্তা সদরেই আহার করিলেন। তাহার পর কাছারী চলিয়া

গেলেন। হাকিমের মেজাজ আজ বড়ই কড়া। চাপরাশী আরদালী তটস্থ—এত গম্ভীর, এত কঠোর মুখের ভাব তাহারা কখনও দেখে নাই।

প্রথমেই ডাক পড়িল ডাক্তারের ছেলের মামলার। উকীল-মোক্তারদের বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল—না জানি, এই মেজাজে আজ কি হয়! সিনিয়ার উকীল রমানাথ বাবু বলিলেন, "হুজুর, একটা দিন ফেলে—"

হাকিম গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কেন, সময় ত যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে—কেস এখনই চলবে। আজকেই দিন ছিল মামলার।"

কাহারও আপত্তি টিকিল না। বালক অমিয় কাঠ-গড়ায় হাজির হইল। সরকারী উকীল ও ইনস্পেক্টরের যথারীতি মামলা দায়ের করার পর হাকিম গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার নাম?"

বালক অমিয় হাসিমুখে বলিল, "লবণ-চোর।"

আদালত বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ! হাকিমের মুখ-মণ্ডল রক্ত-আভা ধারণ করিল।

হাকিম কঠোর স্বরে বলিলেন, "এটা আদালত—আড্ডা দেবার যায়গা নয়। কি নাম তোমার, সত্য ক'রে বল, না হ'লে গুরু দণ্ড হবে।"

আসামী অম্লান-বদনে বলিল, "লবণ-চোর সত্যাগ্রহী।"

হাকিমের মুখ অমাবস্যার আঁধারে ঘিরিয়া আসিল, তিনি সক্রোধে বলিলেন, "আদালতের মান রাখছ না, জান, তোমায় বেত দিতে পারি? তোমার বাপের নাম কি? তিনি কি করেন?"

অমিয় বলিল, "তাঁকে ত জানেন আপনি—আমাকেও জানেন। কি বলবো?"

হাকিম বলিলেন, "যা জান, তাই বলবে। তুমি তাঁর মতে এ কায ক'রে বেড়াচ্ছ, না কতকগুলো হতভাগা ভবঘুরে-দের বুদ্ধিতে চলছ ফিরছ? বল, তোমার বাপের নাম কি? তিনি তোমায় এ কায করতে বলেছেন কি?"

অমিয় বলিল, "আমার বাপুর নাম মহাত্মা গন্ধী—তিনি আমায় এ কায করতে বলেছেন।"

আদালতে একটা কলরব উঠিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আদালত খালি ক'রে দাও!" অমনই শান্তিরক্ষকরা জনতাকে তাড়া করিয়া আদালত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

ক্ষিপ্রতার সহিত মামলা চলিল। লবণ-আইন ভঙ্গের অপরাধে আসামীর ১ মাস জেল হইল, আর আদালত অব-মাননার মামলা এক জন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে স্থানান্তরিত হইল।

আদালতকক্ষে যেন একটা অসম্ভব গুমোট নামিয়া আসিল। পুলিস কয়েদীকে আদালতের বাহিরে লইয়া গেল। হাকিম অন্য মামলার বিচার করিতে লাগিলেন। কর্ত্তব্য-পালনে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। মানুষ যদি জানিয়া শুনিয়া সাপের মুখে হাত দেয়, তাহাতে মৃত্যু হইলে দায়ী কে হয়?

কাছারী হইতে ঘরে ফিরিয়া বিশ্রাম লইবার পূর্ব্বে তিনি বিলাতী মেলের চিঠি পাইলেন, বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের অবসরও পাইলেন না। পত্র লিখিয়াছে পুত্র অসীমকুমার। পত্রের ভিতরটা এইরূপ:—

"প্রিয় বাবা,

এ ম'সে ১৫ পাউণ্ড বেশী দিও, আমাদের 'ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লীগের' এবারকার ডিনারের খরচটা আমার ওপর পড়েছে—'কভার' ৮ শিলিংএর কমে হবে না। এ মাসে ঐ পর্য্যন্ত—তবে মাসের 'এণ্ডে' যা মনে কচ্ছি, তা যদি 'ফাইনালি সেটল্‌ড' হয়, তা হ'লে একটা 'লাম্পসাম্' দিতেই হবে। আমাদের 'ল্যাণ্ডলেডি' মিসেস ম্যাসন বড় চার্মিং লেডী—আমাদের ফ্ল্যাটখানাকে একবারে প্যারাডাইজের মত ক'রে রেখেছেন। সব চেয়ে 'চার্মিং' তাঁর মেয়ে লিজি। তার সঙ্গেই হচ্ছে কথা—তুমি ফাদার, সবটা 'ডিস্‌ক্লোজ' করতে পারি নে তোমার কাছে। তবে এইটুকু জেনো, আমি 'ডিটারমিণ্ড'। মাম্মা ডিয়া-রিকে বুঝিয়ে বলার ভার তোমার ওপর। এ সব বিষয়ে লিবার্টি দেওয়া এখনকার কালে সকল দেশের 'ফাদারের ডিউটি'। কারণ, ব্যক্তিগত মতের স্বাধীনতা নিয়েই হচ্ছে এখনকার মস্ত 'প্রব্‌লেম'। অবশ্য 'অ্যাজ এ ফাদার,' তোমারও রাইট কতকটা আছে, কিন্তু সেটা 'লিমিটেড্'। সে কথাটা আগেই তাই রিমাইণ্ড ক'রে দিয়ে 'স্যাংসান' চাচ্ছি। আশা করি, 'ডিস্যাপয়েণ্ট' করবে না,—'লাইক এ গুড বয়'!

মিসেস্ ডিয়ার অপর্ণা 'হ্যাপি হোম এন্‌জয়' করছে তার 'হাসব্যাণ্ডের' সঙ্গে নিশ্চয়! 'সো লং'!

অকপটে তোমার
এ, স্যানে।"

ডেপুটীবাবু পত্রখানি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আসনে বসিয়া পড়িলেন,—তাঁহার দৃষ্টিভ্রম হয় নাই ত? তাঁহার পুত্র, তাঁহার কন্যা—সকলের কাছেই কি তিনি 'লিমিটেড'?

খানসামা আসিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়া দিবার জন্য দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। আরদালী চুরুটের ট্রেখানা ধারণ করিয়া দাঁড়াইল। বাবুর্চ্চি রাত্রির ডিনারের অর্ডার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কন্‌ট্রোল ত সকলেরই উপরে আছে। কেবল ঘরে—

ডেপুটী বাবুর মাথাটা ঘুরিয়া গেল, তিনি কেদারায় হেলিয়া পড়িলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

তোমায় আমায় মিলে

তোমায় আমায় মিলে বাঁধব সেথা নীড়
সেই পাহাড়ের চূড়ে
যেথায় চারুশীলে, থাকবে না ক' ভিড়
জগৎ রবে দূরে।
গুহার মাঝে রচব মোরা ঘর,
শয়ন হবে চিকণ শিলাপর;
দুটি হৃদয় জুড়ে'
থাক্‌বে কেবল তৃপ্তি এবং খুশী
মোদের মায়াপুরে।

তোমায় আমায় মিলে সারা সকালবেলা
থাক্‌ব সেথা শুয়ে
যেথায় চারুশীলে, ঝর্‌ণা করে খেলা
উপল ধুয়ে ধুয়ে;
ইন্দ্রধনুর কিরীট জ্বলে শিরে,
হীরার আলো চম্‌কে ওঠে নীরে
সূর্য্য-কিরণ ছুঁয়ে;
তীরের লতা দেখে আপন ছায়া
জলের পানে নুয়ে।

তোমায় আমায় মিলে আকাশ পানে চেয়ে
র'ব দুপুরবেলা,
যেথায় চারুশীলে, চলবে মৃদু বেয়ে
হাল্কা মেঘের ভেলা।
ঈগল পাখী উড়বে কভু দূরে,
পাখ্‌না দুটি সোনার আলোর সুরে।
এলোমেলোর খেলা
খেয়ালী বায় খেল্‌বে অকারণে
অলস হেলাফেলা।

তোমায় আমায় মিলে সন্ধ্যা-সমাগমে
বসব গুহা-দ্বারে,
যেথায় চারুশীলে, সোনার আলো ক্রমে
মিশবে আঁধিয়ারে।
শিলার ফাঁকে লুকিয়ে ফোটা ফুল
তোমার কাণে পরিয়ে দেব দুল;
বাহুর গলহারে
কণ্ঠ আমার জড়িয়ে দেবে তুমি
রিক্ত অলঙ্কারে।

তোমায় আমায় মিলে আঁধার গুহা-মাঝে
রচ্‌ব বাসর-ঘর,
সেথায় চারুশীলে, অনুরাগের সাজে
সাজব বধূ-বর।
আঁধার-ঢালা গহন হবে রাতি,
তন্দ্রা রবে জাগরণের সাথী;
স্বপন নিরন্তর
গুঞ্জরিয়া ঘুরবে ঘিরে ঘিরে
লুব্ধ মধুকর।

তোমায় আমায় মিলে বাঁধব সুখ-নীড়
প্রেমের গিরিচূড়ে,
সেথায় চারুশীলে, থাক্‌বে নাক' ভিড়
জগৎ রবে দূরে।
থাক্‌বে শুধু তৃপ্তিভরা প্রাণ
পড়বে ভেঙ্গে মনের ব্যবধান।
দুটি হৃদয় জুড়ে'
থাক্‌বে কেবল তুমি এবং আমি
মোদের মায়াপুরে।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মামলার তারিখ পড়িয়াছিল একুশে; তাই দেশে চলিয়াছিলাম। কায-কর্ম্ম সারিয়া যখন ষ্টেশনে পৌছিলাম, তখন গার্ডের বাঁশী বাজিয়াছে, পতাকা দুলিয়াছে এবং ট্রেণ ছাড়িতে আর বিলম্ব নাই। তবু কোনমতে গাড়ীর দরজা ধরিয়া উঠিয়া পড়িলাম এবং নিজের অজ্ঞাতেই এক সময় ভিতরেও পৌছিয়া গেলাম। আমার এই অনধিকারপ্রবেশে সকলেই আপত্তি করিতেছিলেন—তাহাতে কাণ দিই নাই; কিন্তু কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিবার পর যে দৃশ্য চোখে পড়িল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিলাম, তাঁহাদের আপত্তি অন্যায় নহে। বস্তুতঃ গাড়ীর মধ্যে এতটুকু স্থান ছিল না।

আজ শনিবার, এ কথাটা আসিবার পূর্ব্বে একবার মনে হইলে আসিতাম কি না সন্দেহ, কিন্তু এখন তাহার জন্য অরণ্যে রোদন করিয়া লাভ কি? স্থান-সংগ্রহের জন্য বৃথাই চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম।

যাত্রীদের সকলেই প্রায় কেরাণী—হাতের ছোটবড় পুঁটুলীতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। কেহ ঝাড়নে বাঁধিয়া কতকগুলি আম ও লীচু, কেহ হ্যারিকেন লণ্ঠন, কেহ বা আর কিছু লইয়া বাড়ী চলিয়াছেন। সপ্তাহশেষে যে ছুটীটি মিলিয়াছে, তাহার জন্য একটি স্বস্তি ও তৃপ্তির হাসি প্রায় সকলের ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এক কোণে জন কয়েকে মিলিয়া তাস খেলিতেছিলেন। আরও কয়েক জন সকৌতুকে খেলার ফলাফল লক্ষ্য করিতেছেন। বৈশাখের অসহ্য গরমে 'সর্ব্বাঙ্গ' ভিজিয়া ঘাম বহিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাদের সে দিকে লক্ষ্যই নাই। কলিকাতার মেস ও বাড়ীর মধ্যের এই ব্যবধানটুকু কোনমতে কাটাইয়া ফেলিতে পারিলেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত।

আর এককোণে রাজনৈতিক আলোচনার কূট তর্ক একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গন্ধীকে লেনিনের সহিত তুলনা করা যায় কি না, ভারত স্বাধীন হইলে কোন্ নেতা কোন্ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশের শাসন-তরণী পরিচালনা করিবেন, তাহা লইয়া প্রচণ্ড বাগ্‌বিতণ্ডা সুরু হইয়া গিয়াছে।

কণ্ঠস্বরের উচ্চতা এবং দৃঢ়মুষ্টির ঘন ঘন আস্ফালন দেখিয়া মনে হইল, হাঁ, ইঁহারা স্বাধীন দেশের অধিবাসী হইবার উপযুক্ত বটে, ম্যাকেভেলী বা ডিসরেলী ইঁহাদের তুলনায় এমন কি বড় ছিলেন?

দেখিতে দেখিতে গোটা দুই ষ্টেশন পার হইয়া গেল। দুই জন নামিয়া গেলেন। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম! বসিবার মত স্থান যে কোন কালে পাওয়া যাইবে, সে আশা বড় একটা ছিল না, কিন্তু যখন পাওয়াই গেল, তখন অবহেলা করিয়া লাভ কি?

পাশের জানালাটা খুলিয়া দিলাম। খর-রৌদ্রালোকে সুবিস্তীর্ণ মাঠ জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত পড়িয়া আছে; দূরে ছোট একটা ডোবা—তাহার চারিদিকে কলাগাছ।

কঙ্কালসার কয়েকটা গরু এ দিক হইতে ও দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মাঠে একগাছি তৃণ-রেখা নাই। উহাদের লালায়িত মুখ কল্পনা করিয়া মনে মনে বেদনা অনুভব করিতেছিলাম,—ধীরে ধীরে চোখ মুদিয়া আসিল।

কতক্ষণ সেই অবস্থায় ছিলাম, কে জানে, হঠাৎ দুয়ার খুলিবার শব্দে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

কাঁধের দুই দিক দিয়া ঝুলান দুইটি প্রকাণ্ড থলে—অসম্ভব রকমের স্ফীত, হাতে গোটা কয়েক ঝাড়ন, হ্যারিকেনের পলিতা, মাথা-জোড়া প্রকাণ্ড টাক লইয়া এক ব্যক্তি ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। দেহটি এমনই ক্ষীণ যে, এতগুলি বস্তু কি করিয়া তাঁহার কাঁধে ভর করিয়া আছে, তাহা ভাবিয়া একটু বিস্মিত হইয়া গেলাম। চোখে মোটা পাথরের চশমা একটা ছিল, কিন্তু তাহাতে দেখিবার সুবিধা কিম্বা অসুবিধা কোন্‌টা বেশী হয়, সে কথা তিনিই বলিতে পারেন, তাহার একটা দিক আবার সুতা দিয়া কাণের সহিত বাঁধা—বোধ করি, পড়িয়া যাইবার ভয়ে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা—ধূলায় কাদায় প্রায় গৈরিক হইয়া উঠিয়াছে; পরিধানের বস্ত্রখানি লালপেড়ে এবং আট হাতের বেশী নহে! গায়ের টুইলের পাঞ্জাবীটির সমস্ত পিঠটা ঘর্ম্ম-অভিষেকে লালবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—একাধিক স্থানে তালি সেলাই।

দরজা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেণের দুই চারি জন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে ঘোষাল-দা, আসুন, আসুন!" এক জন একটু যায়গাও ছাড়িয়া দিলেন। ঘোষাল-দা তাঁহাদের কথার কোন উত্তর না দিয়া সেই যায়গাটুকুর উপর নিজের স্কন্ধের ভারগুলি একে একে নামাইয়া

যাঁহারা তাস খেলিতেছিলেন, তাঁহাদের এক জন বলিলেন, "ঘোষালদার খবর ভাল ?" তিনি থলিয়ার ভিতর দৃষ্টি রাখিয়া উত্তর দিলেন, "আর দাদা, তোমরা যেমন রেখেছ।"

তার পর একে একে সেই থলিয়া দুইটির ভিতর হইতে কত কি যে বাহির হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই।—সে যেন মনোহারীর দোকান আর কবিরাজী ঔষধালয় কম্বাইণ্ড।

কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি প্রথম দফাতেই আত্মপ্রকাশ করিল; তার পর দেখা দিল, কামারহাটীর সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রামহরি রায়ের 'বৃহৎ দন্তধাবন চূর্ণ'—এক পুরিয়া ব্যবহার করিলেই দাঁতের পোকা হইতে রক্ত পড়া, মুখের দুর্গন্ধ, সব কিছু দূর হইয়া যায়। তিন নম্বরে আসিলেন—অম্ল ও অজীর্ণের যম অম্লহরসুধা। বিষ্ণুপুরের তান্ত্রিক সন্ন্যাসী রাঘবপ্রসাদ কেমন করিয়া এক দিন ঘোর অমাবস্যার নিশীথে স্বপ্নযোগে এই অব্যর্থ মহৌষধের প্রক্রিয়া অবগত হইলেন, ঘোষাল মহাশয় তাহা সবিস্তার ও সালঙ্কার বর্ণনা করিয়া গেলেন। তাহার পর, সূচ, সূতার বাণ্ডিল, কাপড়কাচা ও গায়ে মাখিবার সাবান, তরল আলতা, কৃমিঘ্ন বটিকা, কাশীর সুবিখ্যাত বেগম-পেয়ার জরদা, তাম্বুল-বিহার—অনেক কিছুই বাহির হইল! সবগুলি মনেও নাই, মনে থাকিলেও পাঠকের ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার ঘটিবার সম্ভাবনা একটু বেশী।

দুই একটা জিনিষ যে বিক্রয় হইল না, এমন নহে, তবে বেশীর ভাগই অবিক্রীত রহিয়া গেল। এইবার ঘোষাল মহাশয় ভাণ্ডার-তুল্য থলিয়া দুইটি নীচে নামাইয়া নিজে বসিয়া পড়িলেন। তার পর বাহির হইল, 'অ্যান্টিসেপটিক পাণ' এবং 'মেন্থল-কুল বিড়ি'! পাণ এক পয়সায় দুই খিলি, কিন্তু একত্রে দুই পয়সার লইলে একটি বেশী দিতে ঘোষাল মহাশয়ের আদৌ আপত্তি নাই। 'দোক্তা' আবশ্যকমত সকলেই বিনা মূল্যে লইতে পারেন।

অ্যান্টিসেপটিক পাণটা গ্রীষ্মের দিনে রীতিমত বিক্রী হইয়া গেল, কিন্তু 'মেন্থল কুল' (Menthol Cool) বিড়িটা যে কি পদার্থ, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঐ বিশেষণের বিলাতী সিগারেট অনেকগুলি আছে শুনিয়াছি, আস্বাদনলাভের সুযোগ এখনও হয় নাই, কিন্তু ঘোষাল মহাশয়ের কথা সত্য হইলে বিড়ির ইণ্ডাষ্ট্রীতে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, ঘোষালদার রস-জ্ঞান যে প্রচুর, সে বিষয়ে মনের মধ্যে আর কণামাত্র সন্দেহ রহিল না।

আবার নিরুপদ্রবে চক্ষু মুদিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মনোনিবেশ করিব, হঠাৎ বাধিয়া গেল গোলযোগ।

ওধারের বেঞ্চীতে একটা বারো-আনা চারআনা চুলছাঁটা ছোকরা বসিয়া বসিয়া সিগারেট ধ্বংস করিতেছিল এবং বহুক্ষণ হইতে ঘোষাল মহাশয়ের প্রতি ব্যঙ্গ-দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। তিনি আরও দুই চারিবার 'অ্যান্টিসেপটিক পাণ' বলিয়া চীৎকার করিতেই ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "অ্যান্টিসেপটিক মানেটা কি, মশাই ?"

ঘোষাল মহাশয় একবার ছেলেটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পাণ নেবেন কি ?"

"না। মানেটা জানতে চাইছিলুম।"

বুঝা গেল, ঘোষাল মহাশয় প্রসন্ন হন নাই। সংক্ষেপে বলিলেন, "বাড়ী গিয়ে ডিক্সনারী দেখবেন।"

ছেলেটি কি ভাবিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু উত্তরটা যে ঠিক এইরূপ হইবে, তাহা সে আশা করে নাই। সামান্য একটা ট্রেণের ফেরিওয়ালা—

ছেলেটি রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ওর চেয়ে 'প্রিয়তমা খিলি' নাম দিলে আরও বিক্রী হ'ত! লোক ঠকাবার আর যায়গা পান নি!"

গাড়ীশুদ্ধ সবাই আশ্চর্য্য হইয়া গেল—ঘোষাল মহাশয়ও ঐটুকু একটা ছেলের কাছে এমন একটা বিশ্রী কথা প্রত্যাশা করেন নাই! ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "এই লাইনে আজ পাঁচ বৎসর এই কায ক'রে আসছি। ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা বেশী দিন চলে না, এই কথাটা মনে রেখ!"

কিন্তু মনে রাখিবে কে? ছেলেটির মাথার রক্ত তখন বোধ করি অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে; কহিল, "হুঃ! ভারি চোটের ব্যবসা!"

অসহ্য ঠেকিল! উঠিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিলাম, "দেখুন—এখনও যখন আপনি ওঁর কাছ থেকে এক পয়সার জিনিষও খরিদ করেন নি, তখন জাল-জুয়াচুরীর কথা তোলা খুব বেশী ভদ্রতার পরিচয় দেয় না! হয় নেমে গিয়ে আমাদের শান্তি দিন, নয় ত নিজে শান্ত হ'ন।"

গাড়ীর আরও দুই এক জন আমারই পক্ষ সমর্থন

করিলেন। ছেলেটি তাহার নিজের অপরাধ বুঝিল কি না, কে জানে, নিঃশব্দে ঘাড় ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

ইতিমধ্যে দুই তিনটি ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে এবং পুনরায় চলিতে সুরু করিয়াছে।

ঘোষাল মহাশয় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "ওটা বয়সের দোষ, আপনারা ওর প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। কিন্তু চিরকাল আমি এমনি ছিলুম না!"

যাঁহারা তাসের সাগরে ডুব দিয়াছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন—গাড়ীশুদ্ধ সবাই। এই শীর্ণকায় প্রৌঢ় মানুষটির আড়ালে কি কথা লুকান আছে, কে জানে? আমিও তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এক দিন আমিও এই গাড়ীর অনেকেরই মত চাকুরী-জীবী ছিলাম,—অধিকাংশ মধ্য-বিত্ত বাঙ্গালীই তাই। বিদ্যে-বুদ্ধি অবশ্য খুব বেশী রকম ছিল না, কিন্তু চাকরীটা নিতান্ত মন্দ জোটে নি! আমরা এই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ছেলেরা—ছোট বয়স থেকেই যে দু'টি জিনিষের জন্যে লালায়িত হয়ে থাকি, তার একটি হচ্ছে চাকুরী, আর একটি বিয়ে। অল্পবয়সে এই দুটি কামনাই পূর্ণ হওয়াতে যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছিলুম। এ দিকে বছর বছর মাইনের অঙ্কও যেমন অল্পে অল্পে বাড়ছিল, মা ষষ্ঠীর কৃপাও অনুপাতে কম ছিল না।

"সাহেবকে প্রত্যহ মনে মনে ধন্যবাদ দিতুম, আহা, তোমাদেরও ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হ'ক, তোমরা না থাকলে এমন নিরুপদ্রবে পাখার হাওয়া খেয়ে টাকা রোজগার করা যেত কোত্থেকে? এইভাবে বেশ কিছু দিন কাটবার পর, কোত্থেকে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। পুরানো সাহেব বয়েস হওয়ার দরুণ দেশে ফিরে গেলেন। তাঁর স্থান পূরণ করতে এলেন হুইটলী সাহেব। খাস ইংলণ্ড সহরে বাস, মেজাজটাও পুরোদস্তুর মিলিটারী। বিধি বৈরী, প্রথম থেকেই সাহেব একটু বাঁকা দৃষ্টি দিয়ে অধমের দিকে চাইলেন। তার পর—"

ঘোষাল মহাশয়ের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক জন বলিয়া উঠিলেন, "চাকরীটা গেল বুঝি?"

ঘোষাল মহাশয় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "সেটা অনুমান করা খুব বেশী গবেষণার কায নয়, নইলে আজ আর আপনাদের পাঁচ জনের কাছে দু'একটা মিষ্টি 'বুলি' শোনবার সৌভাগ্য হয় কোত্থেকে?—যাক ও কথা, কি ক'রে সেটা গেল, সেইটেই আপনাদের কাছে বলব।"

সবাই কয়েক মুহূর্ত্তের মত চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "মেয়েদের মাস কয়েকের জন্যে দেশে পাঠিয়েছিলাম—পৈতৃক বাড়ীটা দিনের পর দিন আগাছায় ভ'রে উঠছিল। কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই—পচা পুকুরের জলে ডুব দিয়ে দিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ছোট ছেলেটা গেল অসুখে প'ড়ে। ভেবেছিলাম, অল্পে অল্পেই আরোগ্য হবে। তার পর এক দিন এলো টেলিগ্রাম—আফিসের ঠিকানাতেই। 'যথাসম্ভব শীঘ্র যাওয়া দরকার। মণ্টুর অবস্থা খারাপ!' চোখের সামনে লেজার-বুকের অঙ্কগুলো সব ঝাপসা, একাকার হয়ে গেল—কলম ধরতে গিয়ে আঙ্গুলগুলি ঠকঠক ক'রে কাঁপতে সুরু করল। টেলিগ্রামখানা হাতে ক'রে বড় সাহেবের ঘরে ছুটলাম। সাহেব তখন টিফিন সাঙ্গ ক'রে রুমালে মুখ মুছেন—দেখে খুসী হলেন না। টেলিগ্রামখানা—সামনে মেলে ধরলাম। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'মণ্টু কে?'

"মণ্টুর পরিচয় দেবার পর বললেন, ব্যাকুল হবার কিছুই নেই, শনিবার দিন গেলেই যথেষ্ট হবে। মেয়েদের আমি জানি, তা'রা অতি অল্পেই মাথা খারাপ ক'রে ফেলে!

"মনে মনে বল্‌লাম, মাথা খারাপ!—তাই বটে। তোমার দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার হয় ত যথেষ্ট পরিচয় থাকতে পারে, তাঁ'রা হয় ত এই সব তুচ্ছ বিপদে মাথা খারাপ করা প্রয়োজন মনে করেন না, কিন্তু এই হতভাগা দেশের মাতৃহৃদয়ের সঙ্গে তোমার এতটুকু পরিচয় নেই; তারা মাটীর মত মূক, সহনশীলা—এ খবর তোমার অট্টালিকার ভিতরে পৌঁছায় নি!

"নিজেকে সংযত ক'রে বল্‌লাম, 'না সাহেব, আমি আজই যেতে চাই এবং এখনই।'

"সাহেব ধীরে সুস্থে একটা চুরুট ধরিয়ে জবাব দিলে, 'তা যেতে পার, কিন্তু ওই সঙ্গে এই ক'দিনের মাইনেটাও হিসেব ক'রে নিয়ে যেও।'

"ইঙ্গিতের অর্থ সুস্পষ্ট। মার্চেন্ট আপিসের চাকরী। এক মুহূর্ত্ত ভাবলাম। ভবিষ্যতে কি হবে, কে জানে—এক দিন কামাই করবার সাহসও কোন দিন হয় নি। ছেলেদের লেখাপড়া—মেয়ের বিয়ে—সব একে একে চোখের সামনে ভেসে ওঠে কি না।

"কিন্তু ক্ষণকালের জন্য!

"সাহেব টিফিন-রুম ত্যাগ করবার আগেই কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেললাম। ছেলে বাঁচলে তবে তার লেখাপড়া।

"ধন্যবাদ জানিয়ে বহুকালের পরিচিত আফিস ত্যাগ করলাম। সন্ধ্যের গাড়ীতেই দেশে। ট্রেণে ব'সে সমস্ত ব্যাপারটা অনুভব করবার চেষ্টা করেছিলাম। চাকরী নেই, মাসান্তে সংসারের খরচা জোগাবার সংস্থান আর নেই!—না থাক, মণ্টু হয় ত বেঁচে আছে, তাকে হয় ত দেখতে পাব।"

ঘোষাল মহাশয়ের কপাল ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে—গাড়ী শুদ্ধ লোকের সহিত আমিও সেই আসন্ন বার্দ্ধক্য-স্নেহাতুর পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটু দম লইয়া ঘোষাল বলিলেন, "সত্যিই মণ্টুকে দেখতে পেলাম। সে বেঁচে ছিল—আজও আছে। দিন কয়েক স্বামি-স্ত্রীতে মিলে অবিশ্রাম রাত্রি জাগবার পর, খোকা সেরে উঠল!

"সে কয়দিন চাকরী না থাকার কথা মনেও ছিল না।—আবার সমস্ত কথা দিনের আলোর মত চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু উপায় কি? দিন কতক ঘরে বসেই কাটল! "কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। ছেলেদের পড়ার খরচ, —রাত পোহালেই সংসারের খরচ,—পরনের এক একখানা কাপড়ও চাই!

"আবার সেই কলকাতায়। কিন্তু চাকরী আর জুটল না। বয়স নিতান্ত অল্প হয় নি—সেই জন্যেই আপিসগুলির দুয়োর থেকেই ফিরতে হ'ল।

"তার পর এই পথে।

"গৃহিণী বললেন, এতে লজ্জা নেই। মানুষের পরিশ্রমের দাম ভগবান্ দেবেনই। তিনিই নিলেন পাণ, তেলের মসলা, দোক্তা তৈরী করবার ভার;—তাঁর আগ্রহেই নামলাম কাযে। পরিশ্রমের দাম আছেই, এ কথা তিনি কোন্ বিশ্বাসে বলেছিলেন, জানি না—আজ তিনি নেই,—কিন্তু পুরস্কার আমি পাই নি। এই ছেঁড়া ময়লা পোষাক দেখে লোকগুলি কি ভাবে জানেন? ভাবে, জুয়াচোর—কেবল ঠকানই এদের উদ্দেশ্য। এ যুগে পরিশ্রমের দাম নেই—আছে চাকচিক্যের, সমারোহের। এই জিনিষগুলি নিয়ে কোন সহরের মাঝখানে চারটে আলো জ্বালিয়ে দোকান ক'রে বসলেই দ্বিগুণ মূল্যে জিনিষ কেনবার জন্যে খরিদ্দারের ভিড় লেগে যেত।"

ঘোষাল মহাশয় ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন—চোখ-মুখ অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।

বলিলাম, "থামুন, মানুষের বেদনা বুঝবার মত ক্ষমতা যদি সকলের থাকত, তা হ'লে পৃথিবীর অর্দ্ধেক দুঃখ ক'মে যেত!"

কোঁচার খুঁটে মুখখানা একবার মুছিয়া লইয়া—ঘোষাল বলিলেন, "এত দুর্ভাগ্যের মধ্যেও—আমি দুঃখ করি না। মা-মরা ছোট ছেলেমেয়েগুলি আমার ফেরবার প্রত্যাশায় পথ চেয়ে থাকে—রাত্রি দশটার পর বাড়ী ফিরে গিয়ে যখন তাদের মুখের দিকে তাকাই, তখন কোন কষ্টই আমার মনে থাকে না। আজও ওদের অন্নাভাব হয়নি ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিই। মায়ের পরিবর্ত্তে তারাই আজ পাণ সেজে, মসলা সাজিয়ে আমার বা'র হবার আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে রাখে। যে দিন বেশী কিছু উপার্জ্জন করতে পারি, সে দিন ওদের মুখে যেন শরৎকালের সকালের আলো খেলে যায়; যে দিন অত্যন্ত সামান্য কিছু নিয়ে ঘরে ফিরি, সে দিনও তারা দুঃখ করে না—দুঃখের অন্ন আহ্লাদ ক'রে খায়। আজকের মানুষের সকলের চেয়ে বড় অপরাধ কি জানেন? অবিশ্বাস আর অশ্রদ্ধা। মানুষকে অকারণে আঘাত দেবার মত বড় পাপ আর নেই—এ কথা যে দিন শিখবেন, সে দিন মানুষের দুঃখকে শ্রদ্ধা করবার শক্তিও ফিরে আসবে।"

মাথা নীচু করিয়া শুনিতেছিলাম; মুখ তুলিয়া দেখি, অজস্র অশ্রুধারায় লোকটির মাংসলেশহীন, চর্ম্মসার গণ্ড দুইটি ভাসিয়া গিয়াছে।

একটু পরেই একটা ষ্টেশন আসিল। ঘোষাল মহাশয়ের এতক্ষণে নামিবার কথা মনে হইল; তাঁহার জিনিষ কয়টা নীচে নামাইয়া দিলাম। আবার বাঁশী বাজিল, পতাকা দুলিল এবং আমাদের গাড়ী নড়িল।

প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া ঘোষাল হাত দুইটি যোড় করিয়া বলিলেন, "বড় দুঃখেই বিরক্ত করলাম আপনাদের—বুড়ার অপরাধ নেবেন না!"

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গাড়ী অনেকখানি দূরে চলিয়া আসিল, একটা কথাও তাঁহাকে বলা হইল না।

নিজের যায়গাটিতে আসিয়া যখন বসিলাম, মোকর্দ্দমার কথা তখন মনেই নাই। সমস্ত পথ কেবল সেই কর্ম্ম-কঠোর পুত্রগতপ্রাণ লোকটির কথা ভাবিলাম। মনে হইল, মানুষের বাহির দেখিয়া ভিতর যাচাই এবং বর্ত্তমান দেখিয়া অতীতকে বুঝিবার চেষ্টা করার মত অন্যায় বুঝি আর নাই।

শ্রীপাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

রহস্যের খাসমহল

পঞ্চবিংশ প্রবাহ

প্রেম-নিবেদন

আমরা যে অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা যে 'রহস্যের খাসমহল', ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমাদের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হইলেও, আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এই তদন্ত শেষ পর্য্যন্ত চলিলে আমার অবস্থাও অল্প সঙ্কট-জনক হইবে না; আমাকে মহা বিপদ্‌রাশির সম্মুখীন হইতে হইবে।

কুপ যখন বুঝিতে পারিবে, তাহার আর পরিত্রাণলাভের আশা নাই, তখন সে তাহার কন্যার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিবে। কুপকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিলে যোয়ানকেও আসামীর কাঠরায় দাঁড়াইতে হইবে!

কিন্তু রহস্যভেদে এখনও আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আমরা যে কক্ষে প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাস আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা যদি আমার পূর্ব্বপরিচিত 'রহস্যের খাসমহল' না হয়, তাহা হইলেও সেই কক্ষে কোন কোন রহস্যের আভাস বর্ত্তমান। এই কক্ষে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি সংস্থাপিত না থাকিলেও এই কক্ষ হইতে নীলাভ বৈদ্যুতিক আলোক-প্রভা স্ফুরিত হইবার কারণ কি?

আমরা তিন জনে সেই কক্ষের প্রত্যেক অংশ পুনর্ব্বার তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু কোথাও কোন বৈদ্যুতিক তার বা যন্ত্রাদির সন্ধান পাইলাম না। আমি সেই জানালার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার শার্শি তুলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা তুলিতে পারিলাম না; তাহা স্ক্রু দিয়া নীচে আঁটা ছিল বলিয়া মনে হইল। আমি যে রাত্রিতে এই কক্ষে আসিয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, সেই রাত্রিতেও ঠিক এইরূপই দেখিয়াছিলাম।

আমি যখন সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই শার্শি পরীক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময় হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল আলোকপ্রভা স্ফুরিত হইয়া চক্ষু ধাঁধিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর শব্দ শুনিয়া আমাদের বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইল। আমরা চারি জনেই স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। জর্ম্মাণ ভৃত্যটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়াভিভূত হইল।

ডেনম্যান তাহার এইরূপ অসাধারণ বিস্ময় লক্ষ্য করিলেন। তিনি সেই ভৃত্যটিকে বলিলেন, "ইহা কাহার কৌশল, তাহা আমি তোমার নিকট শুনিতে চাহি।"

ভৃত্য বলিল, "ইহা কাহারও কৌশল কি না, তাহা আমার অজ্ঞাত; আমি ইহা পূর্ব্বে দেখি নাই; এই কামরাতেও আমি আর কখন আসি নাই।"

আমি বলিলাম, "কত দিন হইতে তুমি এই বাড়ীতে আছ?"

জর্ম্মাণ ভৃত্য বলিল, "আমি? এখানে আমি খুব বেশী দিন আসি নাই; গত নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে এই বাড়ীতে চাকরী করিতেছি।"

আমি বলিলাম, "গত নভেম্বর হইতে? আমার মনে হইতেছিল, তুমি বহুকাল হইতেই এই বাড়ীতে চাকরী করিতেছ।"

ভৃত্য বলিল, "আমি সত্য কথাই বলিয়াছি, আপনি সে কথা বিশ্বাস না করিলে আর উপায় কি?"

সে এই বাড়ীতে অল্পদিন পূর্ব্বে পরিচারকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকিলে গুপ্ত রহস্যের সন্ধান জানিতে পারে নাই শুনিয়া বিস্ময়ের কোন কারণই ছিল না।

আর একটি অদ্ভুত ঘটনার কারণও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। গৃহস্বামী থরল্ড যদি কেনিসে থাকে, তাহা হইলে নীচের তলার সেই রুদ্ধ গৃহে কিরূপে ঐ প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিল? কিন্তু ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা তেমন কঠিন বলিয়া মনে হইল না। চাকরদের ধারণা ছিল, থরল্ড গৃহে অনুপস্থিত, কিন্তু সে রাত্রিকালে গোপনে চাকরদের অজ্ঞাত-সারে তাহার বাড়ীতে আসিতে পারিত না কি? হয় ত সে ঐভাবে বাড়ী আসিতে পারিত; কিন্তু বন্ধু-বান্ধব লইয়া সে বাড়ীতে প্রবেশ করিল, ঘরে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিল, অথচ চাকররা তাহা জানিতে পারিল না, তাহাদের কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাইল না—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন নহে কি?

আমি ডেনম্যানের কাণে কাণে এই কথাগুলি বলিলে, তিনি ভৃত্যটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে চাকরী লইবার পর কোনও রাত্রে কি এই বাড়ীতে অনুপস্থিত

ছিলে? বিশেষ কোন কারণে আমি এই কথা জানিতে চাহিতেছি, সত্য কথা বল।"

ভৃত্য বলিল, "আমি এখানে চাকরীতে ভর্ত্তি হইয়া কোন রাত্রে এখানে অনুপস্থিত ছিলাম না।"

ডেনম্যান দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "কোন রাত্রি বাহিরে কাটাইয়া আস নাই?"

ভৃত্য—"না মহাশয়, কোন রাত্রে এখানে অনুপস্থিত ছিলাম না।"

ডেনম্যান কঠোর স্বরে বলিলেন, "যদি তোমার এ কথা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমি তাহা জানিতে পারিব। তখন তোমাকে গ্রেপ্তার করিব, যদি বিপদে পড়িতে না চাও, তাহা হইলে এখনও সতর্ক হও, সত্য কথা বল।"

ভৃত্য বলিল, "আমি সত্য কথাই বলিতেছি। আমি এখানে চাকরী লইবার পর এক রাত্রির জন্যও এ বাড়ী ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাই নাই।"

ডেনম্যান বলিলেন, "কোন রাত্রে নীচের ঘরে কোন শব্দ শুনিয়াছিলে? লোকজনের কথা কহিবার বা নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইবার শব্দ?"

ভৃত্য বলিল, "না, আমি কোন শব্দ শুনিতে পাই নাই, কিন্তু বার্ণেস্ পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে এক রাত্রে নীচে শব্দ শুনিয়াছিল বটে! পরদিন সকালে সে বলিয়াছিল, পূর্ব্বরাত্রে সে কাহারও নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইবার শব্দ শুনিয়াছিল।"

ডেনম্যান বলিলেন, "ঐরূপ শব্দ শুনিয়া সে নীচে গিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিল না কেন?"

ভৃত্য বলিল, "কারণ, তাহার কুসংস্কার অত্যন্ত প্রবল। সে বলে, রাত্রিকালে সে অনেকবার নানাপ্রকার শব্দ শুনিতে পায়। তাহা পুরুষের কণ্ঠস্বর। একবার সে ভীষণ ও অস্বাভাবিক আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিল; কিন্তু পরদিন সকালে আমরা নীচের কোন কামরায় কোন জিনিষপত্র ওলটপালট্ বা বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখি নাই। এই সকল কারণে তাহার ধারণা হইয়াছে, এ বাড়ীতে ভূত আছে, ভূতে ঐ রকম হুটোপুটি ও চীৎকার করে। ভূতের ভয়ে সে নীচে গিয়া তদন্ত করিতে পারে নাই।"

আমি বলিলাম, "তাহার এত ভয়?"

ভৃত্য বলিল, "মিঃ থরল্ডই তাহাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন। তিনি এক দিন তাহাকে একটা ভয়ঙ্কর গল্প শুনাইয়াছিলেন। সেই গল্পটির মর্ম্ম এই যে, এই বাড়ীতে এক সময় এক জন লোক বাস করিত, লোকটির যে স্ত্রী ছিল, সে অল্পবয়স্কা ও সুন্দরী। সে তাহার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাহাকে খাইতে না দিয়া মারিয়া ফেলে।—আমরা মধ্যে মধ্যে সেই স্ত্রীলোকটির আর্ত্তনাদ শুনিতে পাই—মিঃ থরল্ড তাহাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন।"

আমি আমার সঙ্গিদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দৃষ্টিবিনিময় করিলাম। তাহার পর ভৃত্যকে বলিলাম, "তোমার ত ঐ রকম কুসংস্কার-টংস্কার নাই?"

ভৃত্য বলিল, "না, তা নাই বটে, কিন্তু রাত্রিকালে ঐ রকম শব্দ শুনিয়া তাহার কারণ জানিবার জন্য নীচে গিয়া তদন্ত করিব—সে রকম উৎসাহ বা কৌতূহল আমার নাই।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম, নীচের তলার সেই অপরিচ্ছন্ন উপেক্ষিত কক্ষটিতে পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনা পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল; তাহার পর মৃত-দেহটি সেই কক্ষ হইতে অপসারিত হইয়াছিল; কিন্তু কি উপায়ে কাহার দ্বারা তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছিল?

আমরা ক্লীনের নিকট যে সকল কথা শুনিতে পাইলাম, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যে সকল কথা সে প্রকাশ করিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমার ধারণা হইল, আমি দীর্ঘকাল হইতে যে গৃহের সন্ধান করিতেছিলাম—ইহা সেই গৃহই বটে! কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না।

আমরা সেই অট্টালিকার বনিয়াদ হইতে 'চীলঘর' পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানে অনুসন্ধান করিয়া সন্দেহজনক অন্য কোন সামগ্রী দেখিতে পাইলাম না। ক্লীন ও 'সোফেয়ার' বার্ণেসের শয়ন-কক্ষ ভিন্ন অন্যান্য শয়ন-কক্ষগুলি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, উপেক্ষিত এবং অব্যবহৃত বলিয়াই আমাদের ধারণা হইল। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতি-নিবন্ধন বাড়ী বন্ধ থাকায় তাহার ভিতর আলোক ও বাতাসের অবাধ গতির অভাবও সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইল। একতলায় যে ভোজন-কক্ষ ছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমরা পরামর্শ করিতে বসিলাম; তৎপূর্ব্বে চাকরটাকে বাহির করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করা হইল।

ডেনম্যান প্রথমেই বলিলেন, "ঐ জর্ম্মাণ চাকরটাকে কিরূপ অভিযোগে গ্রেপ্তার করা যাইবে, তাহা বুঝিতে পারি-তেছি না। না, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার উপায় নাই।

আমরা এই বাড়ীতে যে সকল গুপ্ত রহস্যের আভাস পাইলাম, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়াই মনে হইতেছে। থরল্ডের চেহারার যে বর্ণনা শুনিলাম, তাহার সহিত কুপের চেহারার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে—ইহাও বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু—"

আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "কিন্তু আর একটা কথা আপনি চিন্তা করিয়াছেন কি?—আমি যোয়ানের কথা বলিতেছি। চাকরটা বলিল, যোয়ানকে সে কোন দিন দেখিতে পায় নাই। যোয়ানকে সে চেনেও না।"

ক্রেণ বলিল, "ইহা অত্যন্ত বিচিত্র বটে, মিঃ কোলফাক্স! ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়!—কিন্তু চাকরটা যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, ইহাও আমার মনে হয় নাই।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "না, চাকরটাকে গ্রেপ্তার করিবার উপায় নাই, বিশেষতঃ এই বাড়ীই যে ঠিক সেই বাড়ী, ইহাও আপনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেছেন না, মিঃ কোলফাক্স! আপনি কি আমাকে নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন—যে বাড়ীতে আপনাকে কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিয়া মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, আপনি অচেতন অবস্থায় যে বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন—ইহাই সেই বাড়ী?"

আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না, দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলাম, "যদি সত্য কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে আমি বলিতে বাধ্য যে, এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আপনার অসুবিধা বুঝিতে পারিয়াছি। ইহাই সেই বাড়ী কি না, তাহা আপনি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই; এ অবস্থায় আমরা আমাদের ভ্রমের জন্য ক্রটি স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাই; ইহা ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর নাই। তবে এই বাড়ীর উপর আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কড়া পাহারারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপনি আগাগোড়াই ভুল করিয়া আসিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে আপনার সম্বন্ধে অবিচার করা হইবে, মিঃ কোলফাক্স!"

মিঃ ডেনম্যান আমাকে এই সকল কথা বলিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিলেন এবং সেই জর্ম্মাণ চাকরটিকে ডাকিয়া তাহাকে বলিলেন, তিনি ভ্রমক্রমে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের শান্তিভঙ্গ করিয়াছেন এবং নানাভাবে তাহাকে উত্ত্যক্ত করিয়াছেন, এজন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া ক্রটি স্বীকার করিতেছেন।—আমিও চাকরটাকে খুসী করিবার জন্য তাহার হাতে গিনির একটি আধুলি গুঁজিয়া দিলাম। মৌখিক ক্রটি-স্বীকার অপেক্ষা তাহার মূল্য অনেক অধিক, ইহা কোন ভৃত্যই অস্বীকার করিবে না।

অতঃপর চাকরটাকে একপাশে ডাকিয়া নিম্নস্বরে বলিলাম, "আমরা ভ্রমক্রমে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নীচে উপরে ঘোরাঘুরি করিয়াছি, এ কথা মিঃ থরল্ডকে লিখিয়া তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত ও বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই—ইহা তোমার মত বুদ্ধিমান্ ভৃত্য নিশ্চিতই বুঝিতে পারে।—তিনি এ সংবাদ পাইলে অত্যন্ত চিন্তিত হইবেন এবং আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিয়াছ শুনিয়া তোমার উপর হয় ত অত্যন্ত রাগ করিবেন। এই জন্যই আমার মনে হইতেছে, কথাটা তুমি চাপিয়া যাইলেই বুদ্ধিমানের মত কায করা হইবে।"

আমার শেষ কথাগুলি তাহার মনে লাগিল; সে তাহা সঙ্গত মনে করিয়া আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। সে অঙ্গীকার করিল, তাহার মনিবকে আমাদের অনধিকারপ্রবেশের সংবাদ জানাইবে না।"

আমরা রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া ডেভারো স্কোয়ারে প্রবেশ করিলাম। আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল ভাবিয়া আমার মন ক্ষোভে ও বিষাদে পূর্ণ হইল।

আমরা হাইড পার্কের দিকে অগ্রসর হইবার সময় নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলাম। মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আপনি ঐ বাড়ী ঠিক চিনিতে না পারিলেও উহা যে বহু রহস্যের আধার, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়া আসিয়াছি। এখন আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্কভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া কায করিতে হইবে। আমরা আর কিছু জানিতে পারি বা না পারি, অভাগিনী ইথেল ফারকুহারের শোচনীয় পরিণাম জানিতে পারিয়াছি। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি ঐ বাড়ী পাহারা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিব। যত দিন পর্য্যন্ত আমরা নির্ভরযোগ্য কোন সংবাদ জানিতে না পারিব, তত দিন দিবারাত্রি পাহারা চলিবে। আপনি বোধ হয় জার্মিণ ষ্ট্রীটে বাস করেন?"

আমি আমার নাম ও ঠিকানা-সম্বলিত কার্ড পকেট হইতে বাহির করিয়া পেন্সিল দিয়া তাহার উপর আমার টেলিফোনের নম্বরটি লিখিলাম এবং সেই কার্ডখানি তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি তাহা হাতে লইয়া বলিলেন, "যদি আমি কোন নূতন সংবাদ জানিতে পারি, তাহা হইলে আপনি তাহা 'ফোনে' জানিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস, আমরা শীঘ্রই কোন ভয়াবহ ঘটনাপূর্ণ লোমহর্ষণ গুপ্তরহস্যের সন্ধান পাইব।"

আমি বলিলাম, "আমারও সেইরূপ বিশ্বাস।"

যোয়ান কি ভাবে তাহার পিতার অপরাধ গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং তাহার পিতা তাহাকে একটি রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের সহিত বিজড়িত করিবার জন্য উৎসুক হইয়া কি ভাবে তাহাকে ভয়প্রদর্শন করিয়াছিল, বিশেষতঃ তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য সে কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা আমি ডেনম্যানের নিকট প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিলাম না।

আমি মার্ব্বেল আর্কের নিকট আসিয়া তাঁহাদের উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাঁহারা একখানি ট্যাক্সি লইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলিলেন; আমি আর একখানি ট্যাক্সি লইয়া যোয়ানের সন্ধানে পশ্চিমদিকে চলিলাম। যোয়ানকে আমার নূতন আবিষ্কারের সংবাদ জানাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম। ডেনম্যান সর্ব্বপ্রথমে সেই বাড়ীতে প্রহরী নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া নিরুদ্দিষ্টা মিস্ ইথের ফার্কুহারের পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্য 'উইম্বল্‌ডন কমানে' যাইবেন, এ কথা তিনি আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন।

আমার ট্যাক্সি গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলে আমি সকল কথাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমি যে যোয়ানকে ভালবাসিয়াছিলাম, সকল স্বার্থ ভুলিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, আমার গভীর প্রেমে আন্তরিকতার অভাব ছিল না, ইহা মনে-প্রাণে অনুভব করিলাম; মনের সঙ্গে আমি লুকোচুরি করিতে পারিলাম না। সে এড্‌ইন বার্ণোকে সত্যই হত্যা করিয়াছিল কি না, তাহা জানিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা সঙ্গত হইবে কি না, এরূপ চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে স্থান পায় নাই; সে পাপিষ্ঠা কি না, তাহা জানিয়া তাহাকে ভালবাসিব অথবা তাহার সংস্রব ত্যাগ করিব, এরূপ সঙ্কল্পও আমার মনকে বিচলিত করে নাই। বিভিন্ন বিপরীত ভাবাপন্ন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে আমার মনের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, যোয়ান দোষী কি নিরপরাধ, তাহা নির্দ্ধারণ করিবারও আমার শক্তি ছিল না। আমার একমাত্র আশঙ্কা ছিল—যোয়ান হয় ত আমার হৃদয়ভরা প্রেমের প্রতিদানে সম্মত হইবে না। নারী পুরুষের রূপে, গুণে ও ধনমানে আকৃষ্ট হয়; আমার এ সকল বিভব ছিল কি না, তাহা কোন দিন চিন্তা করি নাই, তাহার হৃদয় জয় করিবার সামর্থ্য ছিল কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখি নাই; কিন্তু আমার প্রতি তাহার বিমুখ হইবার কারণের অভাব ছিল না। তাহার সহিত বয়সের তুলনায় আমার বয়স অনেক অধিক হইয়াছিল; তাহার উপর আমি তাহার পিতার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; তাহাকে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম; সুতরাং সে আমাকে সন্দেহ করিবে, অবিশ্বাস করিবে, হয় ত অশ্রদ্ধা করিবে—ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু আমি যে আত্মহারা হইয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম!

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে আমি কেনসিংটন পল্লীতে উপস্থিত হইলাম এবং আবিংডন রোডের একখানি প্রাচীন ধরণের অট্টালিকার সম্মুখে ট্যাক্সি হইতে নামিলাম। যোয়ান আমাকে জানাইয়াছিল, সেই বাড়ীতে সে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল: আমি সেখানে তাহাকে দেখিতে পাইব কি না, তাহা বুঝিতে না পারায় আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, যোয়ান এক ঘণ্টা পূর্ব্বে স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে।

সেই বাড়ীর পরিচারিকা দ্বার খুলিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া এই সংবাদ জানাইলে, আমি ক্ষুব্ধভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

পরিচারিকা বলিল, "তিনি তাঁহার পোষাকের ব্যাগটি লইয়া গিয়াছেন। পুনর্ব্বার আসিবেন কি না, বলেন নাই; এখানে তিনি মধ্যে মধ্যে অল্পসময়ের জন্য আসিতেন।"

আমি বলিলাম, "কোথায় গিয়াছেন, তাহা কি বলিয়া যান নাই?"

পরিচারিকা।—না মহাশয়, তিনি কখন্ কোথায় যান, তাহা কাহাকেও বলেন না, কিন্তু—

পরিচারিকা হঠাৎ নীরব হইল। আমি বলিলাম, "কিন্তু কি?—তুমি কথাটা বলিতে বলিতে থামিলে কেন?"

পরিচারিকা বলিল, "সে কথা আপনাকে বলিব কি না, তাহাই ভাবিতেছিলাম; তাহা আপনাকে বলিবার ইচ্ছা নাই।"

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম, "ইচ্ছা নাই? কেন? ব্যাপার কি, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে বাধা নাই; আমি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

পরিচারিকা বলিল, "আমার বিশ্বাস, তিনি কোন কারণে ভয় পাইয়া পলায়ন করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "পলায়ন করিয়াছেন? কেন পলায়ন করিলেন?"

পরিচারিকা।—কারণ, পরশু এক জন অপরিচিত লোক আসিয়া মিসেস্ রেণ্ডেলের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। সে তাঁহাকে মিস্ যোয়ান সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহার প্রশ্নগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত! তাহার কথা শুনিয়া মিসেস্ রেণ্ডেলের ধারণা হইয়াছিল, লোকটা ডিটেক্টিভ বা পুলিসের কোন গুপ্তচর। সে মিসেস্ রেণ্ডেলকে জিজ্ঞাসা করিল—মিস্ যোয়ান কোথায় গিয়াছেন, কবে গিয়াছেন, কেন গিয়াছেন, কোন্ সময় ফিরিয়া আসিবেন? প্রশ্নগুলি অত্যন্ত বিরক্তিজনক মনে করিয়া মিসেস্ রেণ্ডেল তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

আমারও মনে হইল, লোকটা পুলিসের গোয়েন্দা। জিলরয়ই যোয়ানের কথা পুলিসের গোচর করিয়াছিল এবং তাহারই আগ্রহে ও উৎসাহে পুলিস যোয়ানের সন্ধানে আসিয়াছিল।

পরিচারিকা বলিল, "আমার মনিব ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে বাড়ী আসিয়া মিস্ কুপারকে সেই লোকটার কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া মিস্ কুপার অধীর হইয়াছিলেন; তিনি ব্যাগ লইয়া কয়েক মিনিট পরেই এই বাড়ী ছাড়িয়া চলিলেন। বোধ হয়, এখানে থাকিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। মিসেস্ রেণ্ডেলের নিকট সকল কথা শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। কর্ত্রীর বিশ্বাস, মিস্ কুপার কোন অন্যায় কায করিয়াছেন; পুলিস সেই সংবাদ জানিতে পারিয়াছে। আপনি ত মিস্ কুপারকে জানেন, আপনি তাঁহার বন্ধু; এ সকল সংবাদ কি আপনি জানেন না?"

আমি তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলাম, "তোমার মনিব বাড়ীতে আছেন কি?"

পরিচারিকা বলিল, "না মহাশয়, তিনি ফুলহামে তাঁহার ভগিনীর বাড়ীতে গিয়াছেন। তাঁহার ভগিনীর কঠিন পীড়া হইয়াছে।"

আমি তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া জার্ম্মিণ ষ্ট্রীটে চলিলাম। আমি আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আরাম-কেদারায় যোয়ানকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। যোয়ান আমাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইলাম। এত অল্পসময়ে মানুষের চেহারার কি এ রকম পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়!

আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সে আতঙ্ক বিহ্বল স্বরে বলিল, "সব শেষ হইয়া গিয়াছে, আর কোন আশা নাই। আমার চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার; মাথার উপর বিপদের মেঘ বজ্রনাদ করিতেছে।"

আমি বলিলাম, "আমি কিছুকাল পূর্ব্বে তোমার সন্ধানে আবিংডন রোডে গিয়াছিলাম। দাসীর নিকট সকল কথাই জানিতে পারিয়াছি। পুলিস তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল।"

যোয়ান বলিল, "কর্ত্রীর নিকট সেই সকল কথা শুনিবামাত্র আমি সেখান হইতে পলাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন কোথায় যাই? কোথায় পলাইয়া নিরাপদ হইব? আমার যে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই!"—সে হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। তাহার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া অশ্রুরাশি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

আমি কোমল স্বরে বলিলাম, "কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে হইবে। কিন্তু ও রকম ব্যাকুল হইয়া লাভ নাই, মন সংযত কর; আতঙ্কে অধীর হইও না।"

যোয়ান বলিল, "মিসেস্ ম্যাক্সওয়েলই পুলিসে খবর দিয়াছে। সে আমাকে ধরাইয়া না দিয়া ক্ষান্ত হইবে না। আমার সর্ব্বনাশের জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তোমাকে সে শত্রু মনে করে বটে; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তুমি যখন এইরূপ বিপজ্জালে

আচ্ছন্ন, সেই সময়েও তোমার পিতার অপকার্য্য বন্ধ করিবার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, সেই চেষ্টার সমর্থন করিতে তুমি অসম্মত! ফ্রিলয় তোমার বিরুদ্ধে তাহাকে সাহায্য করিতেছে। এ সময় কি তুমি তাহাদের উভয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে পার না?"

যোয়ান আবেগভরে মুখ তুলিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "অসম্ভব! আমার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

আমি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে লইলাম। সে অবনত-মস্তকে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হতাশভাবে বসিয়া রহিল। তাহার পর কাতরভাবে বলিল, "কি করিব বল? সমগ্র পৃথিবী যেন আমার শত্রুতাসাধনে উদ্যত! আমাকে বিধ্বস্ত, চূর্ণ করিবার জন্য সকলেই যেন কৃতসঙ্কল্প। এই দুর্দ্দিনে আমার কোন বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই, সকলেই আমার বিরুদ্ধে হাত তুলিয়াছে!"

আমি বলিলাম, "যোয়ান, আমি তোমার বন্ধু, কারণ, আমি তোমায় ভালবাসি। হাঁ, প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসি।"

যোয়ান অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া, বেদনাক্লিষ্ট কাতরতাপূর্ণ বিহ্বলদৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "তুমি আমাকে ভালবাস!— এ কথা উচ্চারণ করিতে তোমার মনে কি কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইতেছে না? যে নারীর চরিত্রের পবিত্রতায় সন্দেহ করিবার লোকের অভাব নাই, যে নারীর করতল নররক্তে কলুষিত হইয়াছে, এই অভিযোগে তাহার মস্তকের উপর শাণিত খড়্গ উদ্যত, তুমি সম্মানিত— সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হইয়া সেই নারীকে কি করিয়া অসঙ্কোচে বলিতেছ যে—"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "হাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি। প্রেম কেবল সম্পদের সঙ্গী নহে, ইহা বিপদেরও সহচর। কলঙ্কের ভগ্ন প্রাকারেও ইহার বিজয়-কেতন উড্ডীন হইতে থাকে। সুদিনে প্রেম ঐশ্বর্য্য, দুর্দ্দিনে প্রেম বিপন্নের রক্ষা-কবচ। প্রলয়ের বজ্র ইহার স্পর্শে চূর্ণ, ব্যর্থ হয়। না যোয়ান, তুমি আমার প্রেমে সন্দেহ করিও না। একমাত্র বিশ্বজয়ী প্রেমের বলে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। আমার হৃদয়, আত্মা সকলই তোমার। আমি তোমার বন্ধু, তুমি আমার উপর নির্ভর কর।"

যোয়ানের অস্ফুট রোদনধ্বনি শুনিলাম; সে কোন কথা বলিল না, মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতেও সাহস করিল না।

আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, "প্রিয়তমে, আমার উপর নির্ভর কর, আমার প্রেমে, আমার শক্তিতে, আমার আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হও। এই বিপদে আমি তোমাকে সাহায্য করিব। তোমার গ্রেপ্তারের আশঙ্কা দূর করিব।"

যোয়ান বিচলিত স্বরে বলিল, "কিন্তু কিরূপে? কি উপায়ে তুমি আমাকে সাহায্য করিবে? তুমি আমার পিতাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছ, সে জন্য আমাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে। আমার অপরাধ যে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমাকে গ্রেপ্তার করিবার সকল আয়োজন শেষ হইয়াছে; এই শেষ মুহূর্ত্তে কোন্ শক্তিতে তুমি আমাকে রক্ষা করিবে?"

সেই মুহূর্ত্তে টেলিফোনের ঘণ্টা ঝন্‌ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। আমি যোয়ানকে সেইখানে রাখিয়া কক্ষান্তরে টেলিফোনে সাড়া দিতে চলিলাম। আমি 'রিসিভার' তুলিয়া লইয়া দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিলাম; তাহার পর রুদ্ধ নিশ্বাসে আগ্রহভরে কুপ সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিলাম, তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম; কুপের অপরাধ সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহা অধিকতর জটিল-রহস্যপূর্ণ! আমি সেই দুর্ভেদ্য রহস্যের অন্ধকার-গর্ভে পড়িয়া যেন অকূলপাথারে তলাইয়া যাইতে লাগিলাম!

ষড়্‌বিংশ প্রবাহ

বিপদের পথে

আমি টেলিফোনের 'রিসিভার' নামাইয়া রাখিয়া যোয়ানের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম; বিচলিত স্বরে বলিলাম, "যোয়ান, তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই এই স্থান ত্যাগ করিতে হইবে।"

যোয়ান আমার কথা শুনিয়া লাফাইয়া উঠিল, উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি তাহা জানি। তোমার কাছে আমার না আসাই উচিত ছিল। তোমার আশ্রয়ে আসিয়া আমি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি। ইহা কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা আমার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারা উচিত ছিল। কিন্তু এখন বেলা এগারটা, এখন আমি কোথায় যাই? কোথায় গিয়া আশ্রয় পাইব?"

আমি দুই এক মিনিট চিন্তা করিলাম। ডেনম্যান টেলি-ফোনে আমাকে বলিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিবেন, তিনি যোয়ান কুপার সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য সেই রাত্রিতেই যোয়ানকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। পুলিস তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। পুলিস জানিতে পারিয়াছিল, আমি যোয়ানের বন্ধু, এইজন্য তাহারা আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিল।

আমি 'রেলওয়ে গাইড' খুলিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। তাহার পর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া যোয়ানকে বলিলাম, "তোমাকে রাত্রি সাড়ে এগারটার ট্রেণে কিংসক্রশ ষ্টেশন হইতে নিউকাসলে যাত্রা করিতে হইবে। কাল সকালে নয়টার সময় তুমি সেখানে নরউইজান ষ্টীমারে চাপিয়া বার্জেন যাত্রা করিবে। নিউকাস্‌লের বন্দরে পুলিসের কড়া পাহারার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য সেখানে তোমার বিপদের আশঙ্কা নাই। বার্জেনে পৌছিয়া তুমি ক্রিশ্চিয়ানার ষ্টীমারে চাপিবে এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া ছদ্মনামে 'গ্র্যাণ্ড' হোটেলে বাসা লইবে। আমি পরে সেখানে তোমার সঙ্গে যোগদান করিব। তুমি কোন্ ছদ্মনাম ব্যবহার করিবে, তাহা আমি জানিতে চাহি।"

যোয়ান ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি মেরী বেকেট বলিয়া নিজের পরিচয় দিব।"

আমি বলিলাম, "ভালই হইবে; কিন্তু তোমার লগেজ? এখন ত তোমার সঙ্গে একটা ব্যাগ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতেছি না।"

যোয়ান বলিল, "চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশনের পার্শেল আফিসে আমার একটা ট্রাঙ্ক আছে; তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি তাহা সেখানে রাখিয়া আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "আমরা তাহা প্রথমে সংগ্রহ করিয়া লইয়া কিংসক্রশ ষ্টেশনে যাইব।"

আমি কিংসক্রশের ষ্টেশন-মাষ্টারকে টেলিফোনে ডাকিয়া 'মিস্ বেকেটের' জন্য 'ঘুমাইবার গাড়ী'র ব্যবস্থা করিলাম। সন্ধ্যার পর একখানি ট্যাক্সি লইয়া যোয়ানের ট্রাঙ্ক আনিতে চলিলাম।

আমি গাড়ীতে যোয়ানের পাশে বসিয়া তাহার হাতখানি নিজের হাতের ভিতর লইয়া বলিলাম, "তোমার পক্ষে নরোয়ে এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদ্ স্থান। আশা করি, তুমি সেখানে নিরাপদে পৌছিতে পারিবে, আমার ভালবাসা যেন অক্ষয়-কবচের ন্যায় সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করিতে পারে। এই শীতকালে জাহাজে উত্তরসাগর পার হওয়া তোমার পক্ষে একটু কষ্টকর হইবে বটে, কিন্তু এ দেশ তুমি নিরাপদে ত্যাগ করিতে পারিবে, এই আশায় সেই কষ্টে তুমি কাতর হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। জিলরয় ও মিসেস্ ম্যাক্সওয়েল তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না বুঝিয়া আমি আশ্বস্ত হইয়াছি। অধিকাংশ লোক লণ্ডন হইতে গোপনে পলায়ন করিবার সময় দক্ষিণদিকেই গমন করে; ইহা তাহাদের প্রকাণ্ড ভ্রম! ইংলিস সাগর পার হইয়া পলায়ন করিতে গিয়া তাহারা পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু নরউইজান ষ্টীমারের আরোহি-গণের উপর পুলিসের লক্ষ্য থাকে না; ঐ সকল জাহাজের সাহায্যে দেশান্তরে পলায়ন করা অপেক্ষাকৃত সহজ।"

যোয়ান বলিল, "আমি তোমার পরামর্শই গ্রহণ করিব। আমি জানি, তোমার উপদেশে চলিলে ঠকিতে হয় না।"

আমি বলিলাম, "আমি তোমাকে সর্ব্বদা সদুপদেশই দিয়া আসিতেছি। আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার যাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে, সেরূপ কায করিতে পারি কি?"

যোয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। কয়েক মিনিট পরে আমরা চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া এক জন আর্দ্দালীকে যোয়ানের ট্রাঙ্কের রসীদ দিলে সে ট্রাঙ্কটি আনাইয়া দিল; আমরা তাহা গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া কিংসক্রশ ষ্টেশনে চলিলাম।

আমি যোয়ানকে বিদায় দান করিতে আন্তরিক কষ্ট বোধ করিলাম; কিন্তু তাহার মঙ্গলের জন্য তাহাকে একাকিনী ছাড়িয়া দিতে হইল। আমি স্থির করিলাম, সে ট্রেণ হইতে নামিয়া জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে জাহাজে তাহার একটি বার্থের জন্য ষ্টীমার আফিসে টেলিফোন করিব। সে জাহাজে চাপিয়া সমুদ্রে ভাসিলে পুলিস আর তাহার সন্ধান পাইবে না, সে নিরাপদ হইবে।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ম্মচারীরা চতুর ও কার্য্যদক্ষ হইলেও ফরাসী গোয়েন্দা পুলিস এবং ইটালীর ডিটেক্‌টিভ পুলিস অনেক বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপরাধীরা অন্ন

চেষ্টায় ফন্দী-ফিকিরের সাহায্যে সহজেই ইংলণ্ডের বাহিরে পলায়ন করিতে পারে, কিন্তু ফ্রান্স বা ইটালী হইতে পলায়ন করা তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। ইংলণ্ডে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার ও জনতার বাহুল্য ইহার কারণ হইতেও পারে।

আমি যোয়ানের নিকট বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আবেগকম্পিত স্বরে বলিলাম, "যোয়ান, তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার উপর নির্ভর করিতে পারিবে কি?"

যোয়ান আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পথের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু নিষ্প্রভ। আত্মনির্ভর, আশা, উদ্যম কিছুই যেন তাহার সম্বল ছিল না।

আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, "তুমি কি আমার উপর নির্ভর করিতে পারিবে না, যোয়ান? তুমি কি বিন্দুমাত্র আশার আলোক-সম্পাতে আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয় আলোকিত করিবে না? আমার এই তৃষিত শুষ্ক মরু হৃদয় কি তোমার প্রেম-মন্দাকিনীধারার বিন্দুমাত্র বর্ষণে সরস, শীতল হইবে না? তুমি ত জান, আমি তোমাকে কত ভালবাসি? আমার প্রেম কত গভীর?"

যোয়ান বলিল, "আমি তাহা জানি, কিন্তু তোমার আশা পূর্ণ হইবার নহে।"

আমি বলিলাম, "কেন যোয়ান? আমার আশা পূর্ণ না হইবার কারণ কি? আমি তোমাকে ভালবাসি; আমি স্বীকার করি, আজ বিপদের মেঘ তোমার মাথার উপর পুঞ্জীকৃত হইয়া তোমার সুখশান্তি আচ্ছন্ন করিয়াছে, তোমার নবীন জীবনের সকল আশা, সকল আলোক গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; কিন্তু এই মেঘরাশি দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হইবে এবং তুমি তোমার পিতার অত্যাচার হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করিবে।—সে আর তোমাকে উৎপীড়িত করিতে পারিবে না।"

যোয়ান হতাশভাবে বলিল, "হাঁ, সত্য প্রকাশিত হইবে; সে অতি কঠোর সত্য। না, সিড্‌নে, তুমি আমাকে ভালবাসিও না। আমি তোমার নিকট যে বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি, ইহাই চির-বিদায়, আমাকে চিরদিনের জন্য ভুলিয়া যাও, আমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাতের আশা ত্যাগ কর। ইহাতে আমাদের উভয়েরই মঙ্গল হইবে। বিদায়ের সময় মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ হইয়া অবশিষ্ট জীবনকে দুঃখময় করিও না।"

আমি আবেগভরে বলিলাম, "তুমি ও কি কথা বলিতেছ যোয়ান? তুমি কি মনে কর, আমি পূর্ব্বকথা ভুলিয়া গিয়াছি? তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে, মৃত্যু-মুখ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলে—এ কথা কি আমি ভুলিয়া যাইতে পারি? নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না।

যোয়ান বলিল, "সে সকল পূর্ব্বকথা, আমাদের অতীত জীবনের কাহিনী। তুমি এখন প্রেমের কথা বলিতেছ, কিন্তু কৃতজ্ঞতার সহিত প্রেমের কি সম্বন্ধ? কাহাকেও মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলেই কি তাহাকে ভালবাসিতে হইবে? যদি আমি তোমাকে ভালবাসি, তাহারই বা সার্থকতা কি? তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছ, সে কিরূপ অপদার্থ, তোমার প্রেমের কিরূপ অযোগ্য, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?"

আমি অধীরস্বরে বলিলাম, "আমার তাহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। আমি তোমাকে চাই; তোমাকে সুখী করিতে পারিলে, তোমার জীবন শান্তিপূর্ণ করিতে পারিলে আমার জীবনের ব্রত সফল হইবে; ইহাই আমার একমাত্র কামনীয়।"

যোয়ান বলিল, "তোমার এই কামনা পূর্ণ হইবে না; আমি এ জীবনে সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারিব না। আমাকে কঠোর দণ্ড-ভোগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমার সকল আশার অবসান হইয়াছে। জীবনের এই সঙ্কটকালে প্রেমের কথার আলোচনা বিদ্রূপ বলিয়াই আমার মনে হয়; তাহা অসহ্য।"

আমি বলিলাম, "তোমার অপরাধ যাহাই হউক, তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগই উত্থাপিত হউক, আমি জানি, তুমি স্বেচ্ছায় নর-শোণিতে তোমার হস্ত কলুষিত কর নাই। তুমি নরহত্যা করিয়াছ, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। এই ব্যাপার নিবিড় রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন। সেই রহস্যটি কি, তাহা জানিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইয়াছে। সেই সকল বৃত্তান্ত আমি জানিতে চাই; আমার অনুরোধ—আমার নিকট তাহা প্রকাশ কর। আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিও না।"

যোয়ান মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তোমার অনুমান সত্য, আমার সেই অপরাধ ইচ্ছাকৃত নহে।"

আমি আবেগভরে বলিলাম, "যদি তাহা ঘটনাক্রমে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার প্রতি নরহত্যা-জনিত অপরাধের আরোপ সঙ্গত নহে, তাহা হত্যাকাণ্ড বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। তাহা যে ঘটনাক্রমে ঘটিয়াছিল, ঐ কার্য্য তুমি স্বেচ্ছাক্রমে কর নাই, ইহা সপ্রমাণ করিতে পারিবে?"

যোয়ান ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল; কোন কথা বলিল না।

আমি বলিলাম, "যে অপরাধ তোমার স্বেচ্ছাকৃত নহে, সেই অপরাধে তোমার শাস্তি হওয়া উচিত নহে; সেই শাস্তি তুমি কেন বহন করিবে? না, আমি তোমাকে দণ্ডভোগ করিতে দিব না। তোমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যাহাতে অপসারিত হয়, সে জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিব না।"

যোয়ান বলিল, "কিন্তু তোমার চেষ্টা সফল হইবে কি? এ বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। জিলরয় আমার মহাশত্রু, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, ইহা সে জানিতে পারায় তাহার জিদ শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।"

তাহার কথা শুনিয়া আমি উৎসাহভরে বলিলাম, "এই ত তুমি স্বীকার করিলে, আমাকে ভালবাস? সত্য কখন গোপন থাকে না, যোয়ান।"

এ কথা বলিলাম বটে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আমার মনে হইল, আমি কি সত্যই ক্ষেপিয়াছি? যাহার বিরুদ্ধে নরহত্যা অভিযোগ উপস্থিত, যে ধরা পড়িবার ভয়ে দেশান্তরে পলায়ন করিতেছে, বিচারালয়ে যাহার অপরাধ প্রতিপন্ন হইবে এবং প্রণয়ীকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে বলিয়া সকল লোক যাহাকে ধিক্কার দিতে কুণ্ঠিত হইবে না—আমি তাহার প্রণয় লাভের জন্য ব্যাকুল? আমার জীবনের সুখ, শান্তি, আনন্দ ও কল্যাণ তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে উৎসুক! আমার ন্যায় মোহান্ধ জগতে কয়জন আছে? আমি তাহার যে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, পাগল হইয়াছি, সেই রূপ ত অচিরস্থায়ী, তবে আমার এরূপ দুর্ম্মতি কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য। সৃষ্টির আদি-যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হইবে না।

আমি যোয়ানকে উভয় বাহু দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আমাকে কোন কথা বলিল না, আমার বাহুপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্যও চেষ্টা করিল না, সে আমার সম্মুখে মর্ম্মর-মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কেবল মধ্যে মধ্যে তাহার বক্ষঃস্থল কম্পিত হইতে লাগিল। সে কোন দিন আমাকে প্রণয় জ্ঞাপন করে নাই, তাহার মনের ভাব বুঝিতে দেয় নাই, কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল! আমরা কেহ কোন কথা বলিতে পারিলাম না, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, ট্যাক্সি অন্ধকার ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট ও ইউষ্টন রোড অতিক্রম করিয়া চলিল।

অবশেষে আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "যোয়ান, তুমি আমাকে ভালবাস—এ কথা তোমার মুখে শুনিতে চাই।"

তাহার হাত আমার হাতের ভিতর ছিল; আমি তাহার ধমনীর দ্রুত স্পন্দন অনুভব করিলাম; তাহার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে একটিও শব্দ উচ্চারিত হইল না। সে নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ। সে মুদিত-নেত্রে বসিয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহার আরক্তিম গণ্ডে লজ্জার যে কোমল তুলিকার মধুর স্পর্শ অনুভব করিলাম, তাহা আমার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে এরূপ বিচলিত করিল যে, আমি স্থান-কাল বিস্মৃত হইয়া তাহার ওষ্ঠে আমার কম্পিত ওষ্ঠ স্পর্শ করিলাম! তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল। যেন তাহার শিরায় শিরায় তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম, যোয়ান আমাকে সত্যই ভালবাসে।

মুহূর্ত্তের জন্য আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিলাম; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আমার হৃদয় সুগভীর সংশয়-তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইল। মনে হইল, আমি অত্যন্ত অবিবেচনার কায করিলাম, আমি উন্মত্ত প্রায় হইয়া যে মোহের বশীভূত হইয়াছি, তাহার ফল কল্যাণপ্রদ হইবে না। আমি ত হিতাহিত জ্ঞানবর্জ্জিত অদূরদর্শী চঞ্চলমতি যুবক নহি; যে কোন সুন্দরী যুবতী দেখিয়া রূপজ মোহে অভিভূত হইব, তাহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া লুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিব এবং তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিব—এখন ত আমার সে বয়স নাই, মনের অবস্থাও সেরূপ নহে। আমি বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়াছি, বহু সুন্দরী যুবতীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি, তাহাদের হৃদয় জয় করিয়াছি; কতজনের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছি,

কতবার পদস্খলন হইয়াছে, পদে পদে ভ্রম করিয়াছি, তাহার পর সংযতভাবে কালযাপন করিতে শিখিয়াছি। এখন এই বয়সে আমার এইপ্রকার চাপল্য-প্রকাশ অত্যন্ত অশোভন বলিয়াই মনে হইল।

কিন্তু যোয়ানের সহিত সেই সকল সুন্দরীর যে তুলনা হয় না। যোয়ান সুন্দরী, বিনয়ী, নিরহঙ্কার এবং বহু গুণের অধিকারিণী। তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব ও দৃঢ়তার নিদর্শন-সূচক অনেক কথাই আমার স্মরণ হইল। আজ সে আশা-হীন, বন্ধুহীন, বিপজ্জালে জড়ীভূত। সে সত্যই আমাকে ভালবাসে, তথাপি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোন দূরদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইতেছে। পুনর্ব্বার কত দিন পরে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, ভবিষ্যতে কখন সাক্ষাৎ হইবে কি না তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। আমাদের উভয়েরই ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেই তিমির-রাশি ভেদ করিয়া আশার, আনন্দের ক্ষীণতম রশ্মিলেখা আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করিতে পারিল না। কিন্তু আজ আমি বুঝিতে পারিলাম—সে আমারই; তাহারই প্রতীক্ষায় আমাকে জীবন ধারণ করিতে হইবে।

আমি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম, "যোয়ান, আমি তোমাকে চিঠিপত্রাদি লিখিব না। কারণ, তাহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিব, তোমার বিপদের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, পুলিস তোমার সম্বন্ধে সকল আন্দোলন-আলোচনা বন্ধ করিয়াছে, তখন আমি তোমার সংবাদ জানিবার জন্ত তোমাকে টেলিগ্রাফ করিতে পারি, অথবা হঠাৎ এক দিন ক্রিষ্টিয়ানায় উপস্থিত হইয়া 'গ্র্যাণ্ড' হোটেলে তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করিতে পারি। কিন্তু তুমি আমাকে আমার ক্লাবের ঠিকানায় পত্র লিখিতে পার; সেই পত্রে তোমার নাম ও ঠিকানা লিখিবার প্রয়োজন নাই।— তোমার সংবাদ না পাইলে আমি কিরূপ ব্যাকুল হইব, তাহা তুমি হয় ত বুঝিতে পারিবে না; এইজন্তই ঐ ভাবে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিতেছি। তুমি কি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবে না, যোয়ান?"

যোয়ান বলিল, "তোমার অনুরোধ আমার স্মরণ থাকিবে।"

আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, "যদি তুমি আমাকে সত্যই ভাল-বাসিয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে অদর্শন নিবন্ধন ভুলিয়া যাইবে না:—ইহা তোমার নিকট বোধ হয় প্রত্যাশা করিতে পারি।"

যোয়ান বলিল, "তুমি আমার মনের ভাব অনেক দিন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছ বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল; তাহা কি মিথ্যা ধারণা?"

আমি বলিলাম, "আমি তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেও নানা কারণে আমি মুহূর্ত্তের জন্ত আশ্বস্ত হইতে পারি নাই; আমার মন অশান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু আজ তুমি আমার নিকট তোমার হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছ, আজ আমি সুখী হইয়াছি; কিন্তু তোমাকে বিপ-মুক্ত না দেখিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। আশায় মানুষ বাঁচিয়া থাকে, আমিও আশায় নির্ভর করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব। আমরা যেন পরস্পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। যেন কোন কার্য্যে আমাদের সতর্কতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অভাব না হয়। তোমার বিবেচনার সামান্ত ত্রুটিতে তোমাকে কারাবরণ করিতে হইতেও পারে, এ কথা স্মরণ রাখিও। তোমার শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া, তাহাদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার জন্ত আমাদের যতখানি চাতুর্য্য ও সতর্কতা অপরিহার্য্য, তাহার সহায়তা গ্রহণ করিতেই হইবে।"

যোয়ান বলিল, "আমার শত্রুগণের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিতে হইবে? কিরূপে তাহা সুসাধ্য হইবে?"

আমি তখনই তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না, কারণ, আমি সেজন্ত প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্ত বলিলাম, "তুমি ত ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিতেছ, কিন্তু আমি এখানে থাকিলাম, তোমার সাহায্যের জন্ত যাহা করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহা আমি করিতে পারিব। এখন আমাদের উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন।"

যোয়ান বলিল, "আমাদের উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন, ইহা কিরূপে স্বীকার করিব? তুমি আমার পিতাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছ, হয় ত তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু তিনি যতই অন্তায় কার্য্য করুন, তাঁহার মতিগতি যতই মন্দ হউক, তিনি আমার পিতা; সুতরাং যদি তুমি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার বা কারাগারে পাঠাইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে আমি তাহার সমর্থন করিব না; তাহা আমার অসাধ্য।"

আমি সহানুভূতিভরে বলিলাম, "আমি তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি, যোয়ান! বিশেষতঃ এই সকল ব্যাপার প্রকাশিত হইলে জনসাধারণের ভিতর কিরূপ ভীষণ আন্দোলন-আলোচনা আরম্ভ হইবে এবং তাহার ফল কিরূপ আতঙ্কজনক ও অনিষ্টকর হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি।"

যোয়ান আমার হাতখানি দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া অনুনয়ের সুরে বলিল, "যদি তাহা বুঝিতে পারিয়া থাক—তাহা হইলে এই লজ্জাজনক কলঙ্ক-কাহিনী যাহাতে প্রকাশিত না হয়, তাহার উপায় তোমাকে করিতেই হইবে। হাঁ, উহা চাপিয়া যাইতে হইবে। যদি তুমি সত্যই আমাকে ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে এই অপ্রীতিকর ব্যাপার চাপিয়া রাখিবার জন্য যতটুকু চেষ্টা করা উচিত, তাহা করিতে তুমি কুণ্ঠিত হইবে না—ইহা কি আশা করিতে পারি না?"

আমি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "অসম্ভব! তোমার এই অনুরোধ রক্ষা করা আমার অসাধ্য "

যোয়ান তীব্রদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "কি বলিলে? তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে না?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পার নাই; আমি এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিলেই কি তোমার পিতার অপরাধের বোঝা চাপা পড়িবে? পুলিস যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। তাহারা—"

যোয়ান বলিল, "তাহাদের চেষ্টায় কিছু যায় আসে না। তাহারা ত মাসের পর মাস ধরিয়া তাঁহার সন্ধান করিতেছে; কিন্তু তিনি তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী চতুর, তিনি এ পর্য্যন্ত তাহাদের চক্ষুতে ধূলা দিয়া আসিয়াছেন। বাবা সময়ে সময়ে ক্ষেপিয়া থাকেন, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়; কিন্তু তাঁহার উন্মত্ততা শৃঙ্খলাবর্জ্জিত নহে।"

আমি বলিলাম, "তোমার এ কথা আমি স্বীকার করি; কিন্তু এক জন লোক দীর্ঘকাল ধরিয়া একদল বহুদর্শী, চতুর ও কর্ম্মঠ লোকের অক্লান্ত চেষ্টা ও উদ্যম ব্যর্থ করিতে পারে না; তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আজ রাত্রিতে পুলিস তোমার পিতার সেই 'রহস্যের খাসমহলের' সন্ধান পাইয়াছে। তাহারা তোমার পিতার হেড্‌কোয়ার্টারের সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা আমাকেও সঙ্গে লইয়াছিল।"

যোয়ান শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি?—তুমি সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলে?"

আমি অবিচলিত স্বরে বলিলাম, "হাঁ, প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আমি সেখানে গিয়াছিলাম।"

যোয়ান আমার মুখের দিকে চাহিয়া মস্তক অবনত করিল, তাহার মুখ হইতে আর একটিও কথা বাহির হইল না। তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, তাহার চক্ষুতে ভয় ও দুশ্চিন্তা যেন ফুটিয়া বাহির হইল। তাহার মুখভাবের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম।

যোয়ান দুই এক মিনিট কি চিন্তা করিয়া বলিল, "পুলিস কিরূপে সেই বাড়ীর সন্ধান পাইল? কে সন্ধান করিয়াছিল? আমার ধারণা ছিল, পুলিস সহস্র চেষ্টা করিলেও বাবা তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারিবেন। তাঁহার শক্তি অদ্ভুত!"

দোতলার জানালা হইতে নীলাভ বৈদ্যুতিক আলোক-স্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করিয়া পুলিস কি কৌশলে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং আমি তাহাদের সঙ্গে গমন করিয়া কি দেখিয়াছিলাম, কি শুনিয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে যোয়ানের নিকট প্রকাশ করিলাম। সে গভীর মনোযোগের সহিত সকল কথা শ্রবণ করিল, দুই একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; কিন্তু আমাকে একটিও কথা বলিল না। সকল কথা শুনিয়া তাহার মুখ মৃতের মুখের মত বিবর্ণ হইল। সে স্তম্ভিতভাবে গাড়ীর ভিতর বসিয়া রহিল।

যোয়ান কিছুকাল পরে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি আমার যে বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলাম, এখন বুঝিলাম, সেই বিপদের পরিমাণ অনেক বেশী। পুলিস সেই বাড়ীর সন্ধান পাইয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই।"

আমি গম্ভীরস্বরে বলিলাম, "কিন্তু যেদী দুর্ঘটনার রাত্রিতে আমাকে যে বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল এবং যেখানে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ উহা সত্যই কি সেই বাড়ী?"

যোয়ান বলিল, "তুমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলে, ঘরে যে সকল আসবাবপত্র ছিল, তাহাও চিনিতে পারিয়াছিলে বলিলে, তবে আমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? যদি উহা সেই কোণের বাড়ী হয়, তাহা হইলে সেই বাড়ীই বটে। আমি বাবাকে সতর্ক করিব, তিনি যেন সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পুলিসের হাতে ধরা না পড়েন।"

আমি বিচলিত-স্বরে বলিলাম, "না, তুমি ঐ কায করিও না। তোমার বাবাকে সতর্ক করিও না।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের ট্যাক্সি কিংসক্রশ ষ্টেশনের টিকিট-ঘরের অদূরে আসিয়া থামিল। তখন 'স্কচ এক্‌সপ্রেস' ট্রেণ ছাড়িবার অধিক বিলম্ব ছিল না; ট্রেণখানি তাড়াতাড়ি চলিয়া না যায় এবং যোয়ান তাহাতে উঠিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আমি তাহার ট্রাঙ্ক ওজন করাইয়া তাহাতে লেবেল লাগাইবার ব্যবস্থা করিলাম। তাহার পর ট্রেণে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, যোয়ানের শয়নের জন্য শয়নের গাড়ী 'রিজার্ভ' করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

এই সকল কায শেষ করিয়া যখন যোয়ানের নিকট বিদায় লইতে চলিলাম, তখন ট্রেণ ছাড়িবার তিন মিনিটমাত্র বিলম্ব ছিল।

আমি রহস্যের খাসমহলের প্রসঙ্গে যোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ক্লীন নামক যে যুবকটিকে সেখানে দেখিলাম, সে কে? সে তোমাকে চেনে না বলিয়াছিল।"

যোয়ান বলিল, "সে সত্য কথাই বলিয়াছিল। যে দিন তুমি সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মৃতকল্প হইয়াছিলে, সেই দিন হইতে আমি সেই বাড়ীতে প্রবেশ করি নাই; তাহার ছায়াও মাড়াই নাই।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তাহার সকল কথা শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল—সে অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছিল।"

যোয়ান বলিল, "সে টাকা খাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া থাকিবে; অনেক চাকরেরই ঐরূপ অভ্যাস আছে। সম্ভবতঃ তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমরা আর একটা লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের সন্ধান পাইয়াছিলাম।"—নীচের ঘরে গালিচার উপর যে রক্তের দাগ দেখিয়াছিলাম এবং স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত যে সকল সামগ্রী সেই কক্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা যোয়ানকে বলিলাম।—ইবেন ফার্কুহারের নামের কার্ড পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে তাহার ঠিকানা ছিল, তাহাও যোয়ানের গোচর করিলাম।

আমার কথা শুনিয়া যোয়ান সবিস্ময়ে বলিল, "ইবেন ফার্কুহার!—সে-ও কি নিরুদ্দেশ?"

আমি বলিলাম, "তাহার নাম জানিতে পারিবার পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া শুনিতে পাওয়া গেল, তাহার পিতা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে তাহার নিরুদ্দেশের সংবাদ পূর্ব্বেই জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। গালিচার উপর যে দাগ দেখা গিয়াছিল, তাহা জমাট রক্তের দাগ! আমার বিশ্বাস, পুলিস সেই বাড়ীতে হানা দিয়াছে।"

আমার কথাগুলি যেন যোয়ানের কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে দুই তিনবার অস্ফুটস্বরে বলিল, "ইবেন ফার্কুহার!"

মুহূর্ত্ত পরে রেলের এক জন কর্ম্মচারী যোয়ানকে শয়নের কামরায় লইয়া গেল; আমি তাহার নিকট বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বেই ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল।

আমি প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ট্রেণ উত্তরদিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং শীঘ্রই তাহা প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে চলিয়া গেল। গার্ডের গাড়ীর পশ্চাৎ-স্থিত লোহিত আলোকের দিকে আমি চাহিয়া রহিলাম।

একটা কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িল। যোয়ান তাহার পিতাকে সতর্ক করিতে চাহিয়াছিল।—সে কি কুপকে আমার কথার মর্ম্ম জানাইয়া সতর্ক করিবার সুযোগ পাইয়াছিল? কুপ তখন কোথায় ছিল? যোয়ান কি তাহার গুপ্ত আড্ডার সন্ধান জানিত? সেই আড্ডাটি কোথায়? কুপ কি যোয়ানের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া কোন নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিবে?

কুপের চেষ্টা সফল হইবে কি না, বুঝিতে পারিলাম না। যোয়ান কি কৌশলে ষ্টেশন হইতে তাহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছিল—তাহাও জানিতে পারি নাই। আমার উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সংস্কার

বৈশাখ মাস। অক্ষয়-তৃতীয়া। পাঞ্জির পৃষ্ঠায় এমন পুণ্যাহ দিন আর নাই। ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলি এই তিথিতে সম্পন্ন কিম্বা সূচনা করিতে পারিলে তাহার পুণ্যফল নাকি কোন দিন ক্ষয় হইবে না।

কুমারী মীরা আজ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে। তাহার আয়োজনটা হইতেছে সেকালের রাজসূয় যজ্ঞকাণ্ডের মত বিরাট বিস্ময়কর। একটি বৎসর ধরিয়া অনেক ঈর্ষ্যাপীড়িত, উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির উপর ইহার আরম্ভ। কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্বেই, মৃগাঙ্কমোহনের বিবাহের পর হইতেই এই ব্যাপারের সূচনা হইয়াছিল। ফুল মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে হঠাৎ এক দিন ফুটন্ত হইয়া দেখা দিলেও, তাহার ফুটিবার আয়োজন অনেক দিন ধরিয়াই আরম্ভ হইয়া থাকে।

তাই উনিশ বৎসরের মেয়ে বিবাহের আলিপনা-পিঁড়িতে না বসিয়া ক্ষৌমবাসে মূর্ত্তিমতী সংযমের মত শান্তমুখে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছে। আত্মীয়-স্বজন কেহ বাধা দিতে পারিল না। এমন কি, পিতা মৃগাঙ্কমোহন পর্য্যন্ত হার মানিয়াছিলেন।

অতীতের সেই ইতিহাস এইরূপ :—

আহারে-বিহারে মৃগাঙ্কমোহন পুরাদস্তুর সাহেব হইলেও পত্নী সুধা ঠিক স্বামীর বিপরীত ছিলেন। কোনও দিনই তিনি স্বামীর মতাবলম্বিনী হইতে পারেন নাই; সে চেষ্টাও তাঁহার ছিল না। বোধ হয়, ইচ্ছারও অভাব ছিল। এ জন্য মৃগাঙ্ক জীবনের একটা প্রধান দিক্‌কে সম্পূর্ণ বিফল বলিয়া বোধ করিতেন। তাই জীবনের অসম্পূর্ণ দিকের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য তিনি কন্যা মীরাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। সে যেন মায়ের মত সঙ্কীর্ণ মন লইয়া, সঙ্কীর্ণ গৃহ-কোণে দীর্ঘ জীবনটা নিঃশব্দে কাটাইয়া দেওয়াই শ্রেয় বলিয়া বোধ না করে। বিশ্বনৃত্যের তালে তালে পা ফেলিবার জন্য কন্যার রক্তধারা যাহাতে পুলকে নাচিয়া উঠে, তাহারই প্রচেষ্টায় মৃগাঙ্কমোহন সদা সতর্ক থাকিতেন।

আর সুধা? জীবনে কোন দিন স্বামীকে আয়ত্তের মধ্যে না পাইয়া তাঁহার মৌন প্রার্থনা অন্তর্যামীর চরণে এই ভিক্ষাই চাহিত, মীরা যেন একান্ত তাঁহারই হইয়া ফুটিয়া উঠে। এ যে তাহারই গর্ভজাতা।

এমনই করিয়া স্বামী ও স্ত্রীর ভিন্নমুখী ইচ্ছার আকর্ষণ কন্যা মীরাকে নিজ নিজ দিকে সতত টানিয়া লইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। মীরার ষোলটা বৎসর এই দোটানায় পড়িয়া কাটিয়া গেল। সে ম্যাট্রিক পাশ করিল, মায়ের কাছে শিখিল,—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'; কিন্তু হঠাৎ সে দিন এমন একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল—যাহাতে নিত্য-নৈমিত্তিক রীতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইল।

সেটা ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। হিন্দু মেয়েদের সে একটা ঘটার পর্ব্বদিন। সুধা মেয়েকে শিবরাত্রির লোভনীয় ব্রতকথা, ফলমাহাত্ম্য অনেক কিছু শুনাইয়া, তাহাকে এই পুণ্যব্রত গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিলেন। কতকটা মায়ের প্রভাবে, কতকটা বা আপনার সাধে মেয়ে কথাটা শুনিল। মৃগাঙ্ক ইহার কিছুই জানিলেন না।

বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে মৃগাঙ্ক কন্যার শুষ্ক মুখ ও রুক্ষ কেশরাজির পানে চাহিয়া, মীরার ললাটে হাত দিয়া কহিলেন, "অসুখ করেছে, মা?"

মাথা নত করিয়া মুখ লুকাইয়া মেয়ে কহিল, "না।"

মৃগাঙ্ক কহিলেন, "দূর পাগলী, আমার কাছে লুকাতে হবে না। তোর মুখ দেখেই ধরেছি, অসুখ করেছে। ডাক্তার ঘোষকে ফোন্ করছি।

মীরা তাড়াতাড়ি বলিল,—"ও সব কিছু দরকার নেই, বাবা, আমার কিছু হয়নি।"

টেলিফোনের কাছ হইতে মৃগাঙ্ক সরিয়া আসিয়া কহিলেন, "তবে থাক। আয়, আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আস্‌বি। চুলগুলো আঁচড়ে নে, মা।"

মীরা বিপদ গণিল। আজ সে ব্রতচারিণী! কেমন করিয়া সে চুলে চিরুণী দিবে? কুণ্ঠিত-কণ্ঠে সে কহিল, "আজ থাক না, বাবা।"

মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"তবে থাক। তোমার যা ইচ্ছা।"

অনভ্যস্ত উপবাসের ক্লান্তিটুকু ফাল্গুনের ঈষদুষ্ণ বেলাশেষে মীরার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল; পিতার দৃষ্টি হইতে সেটা গোপন করিবার প্রয়াসে হাসিতে গিয়া দোষ-গোপন-প্রয়াসী বালকের বিশ্বাসঘাতক মুখের মত তাহার নিজের মুখখানা তাহাকে ধরাইয়া দিল।

সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"মীরা, তুমি আজ কিছু খাওনি?"

মিথ্যা কথা বলা মীরার অভ্যাস ছিল না। মাথা নত করিয়া সে নিঃশব্দে রহিল।

মনের অস্পষ্ট সন্দেহটা মীরার নীরবতায় আরও দৃঢ় হইল।

চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া মৃগাঙ্ক বলিলেন,—"তুমি উপোস ক'রে আছ, মীরা?"

অপরাধীর মত সসঙ্কোচে মীরা কহিল,—"হুঁ, বাবা।"

আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। এই মৃদু উচ্চারিত 'হুঁ' শব্দটাই মৃগাঙ্কের অন্তর-নিহিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান করিল। বিরক্তির কালো ছায়া তাঁহার প্রশস্ত ললাটে ফুটিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তা কারণটা তোমাদের কি?"

মৃদুকণ্ঠে উত্তর হইল,—"শিবরাত্রি।"

* * * *

চায়ের পেয়ালা মুখ হইতে নামাইয়া মৃগাঙ্ক ডাকিলেন,—"মীরা?"

কন্যা মুখ তুলিয়া চাহিল।

"তোমায় একটা কথা বলব।—ও কি, তুমি ডিম, রুটী নিচ্ছ না? আমার টেবলে ব'সে খেতে বুঝি ঘেন্না হয়?"

কথাটা মীরাকে উল্লেখ করিয়া বলা হইলেও শ্লেষটা যে অন্যের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হইল, তাহা মীরা বুঝিল। পিতার বুকের মাঝে একটা অভিমানের বিরাট পাহাড় হইতে মাঝে মাঝে উপল-খণ্ড এমনই বিদ্রূপের পথ ধরিয়া গড়াইয়া পড়ে, তাহা মীরা জানিত। তথাপি হঠাৎ আজ তাহার দুই চোখে বন্যা দেখা দিল। জড়িত-কণ্ঠে সে কহিল, "এই ত খাচ্ছি, বাবা।"

মৃগাঙ্ক অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। ত্বরিতে আপনার চেয়ার ছাড়িয়া অভিমানিনী কন্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনুতাপভরা কণ্ঠে বলিলেন, "মীরা, মা?" পিতার স্নেহস্পর্শ কন্যার চিত্তকে পুলকিত করিয়া তুলিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"তুইও আমায় ভুল বুঝলি, মা? তুই ছাড়া আমার কে আছে?"

পিতার এই অসহায় কণ্ঠস্বরে যে বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে মীরার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল। নয়নযুগলে অশ্রু টলমল করিয়া উঠিল। অঞ্চলে তাড়াতাড়ি মনের দুর্ব্বলতা-প্রকাশক অশ্রুধারা মুছিয়া লইয়া ঈষৎ আরক্ত-নেত্রে সে পিতার দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই মৃগাঙ্ক বলিয়া উঠিলেন, "আমার অনেক আশা যে তোর উপর নির্ভর কচ্ছে, মা। তাই যদি একটু কঠিন হই—"

কম্পিত কণ্ঠস্বর সহসা স্তব্ধ হইল। মীরা তাড়াতাড়ি পিতার দক্ষিণ করতল চাপিয়া ধরিয়া ধরাগলায় বলিল, "না বাবা, আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর চলব না।"

মেয়ের মাথার উপর আশীর্ব্বাদ-ভরা ডান্‌ হাতখানা রাখিয়া মৃগাঙ্ক কহিলেন, "আমি অনুক্ষণ প্রার্থনা করি, আমার মেয়ে যেন আমার গৌরবের কারণ হয়।"

প্রসঙ্গটার পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছায় মীরা কহিল,—"আমায় যে কি বলবে বল্লে, বাবা?"

"তাই ত বলছি, মা। তাই আমায় আজ একটু কঠিন হয়ে আমার নয়নমণিকে দূরে সরাতে হচ্ছে। মীরা, আমি তোমায় বোর্ডিংএ রাখবার ব্যবস্থা করেছি। এখন তোমার ইচ্ছার উপর সবই নির্ভর কচ্ছে, মা।"

মীরা কহিল, "তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, বাবা।"

"বেশ, তবে প্রস্তুত হও, মা।"

বিস্ময়ভরে মীরা কহিল, "আজই?" সে এতটা ভাবে নাই।

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "যখন যাওয়া স্থির, তখন আজ হ'লে তোমার ক্ষতি কি, মা?"

ক্ষতি অবশ্য কিছু ছিল। এখনও মার কাছে কথাটা বলা হয় নাই। কিন্তু সে কথা আর সে উচ্চারণ করিতে পারিল না। সে ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল,—"না, ক্ষতি আর কি?"

"আমিও তাই বলি। তুমি একটু তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নেও। কারণ, মোটর তোমায় কলেজে দিয়ে আমায় নিয়ে যাবে।"

মীরা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুধা শুনিলেন, মেয়ের অদ্য হইতে বোর্ডিংএ থাকার ব্যবস্থা হইয়া গেল। কেন হইল, তাহাও বুঝিলেন: কিন্তু ভাল মন্দ কোন কথাই তিনি বলিলেন না। চুপ করিয়া থাকাই তাঁহার স্বভাব।

কাপড়-চোপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া মীরা আসিয়া জননীর পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইল। অধুনা বিচ্ছিন্নপ্রায় স্বামি-স্ত্রীর অতীত জীবনের মীরাই একমাত্র মিলন-সাক্ষী। সুবৃহৎ প্রাসাদের মধ্যে সেই একমাত্র হাসির ঝরণা, আনন্দের আলো। তাহার দৃষ্টি, হাসি, কণ্ঠ-স্বর সকলের কাছেই তাহার জননীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই মেয়ে মাকে ছাড়িয়া বোর্ডিংএ বাসা বাঁধিতে চলিল। জননীর হৃদয় একবার হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে মনের সুগভীর উচ্ছ্বাসের বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পাইল না। সুধা ভাবিতেন, মুখ বুজিয়া সহিয়া থাকাই নারীর ধর্ম্ম। মীরার চিবুকে অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া সুধা উহা চুম্বন করিলেন। ক্ষিপ্র হস্তে প্রসাদী একটি নির্ম্মাল্য মীরার রুমালে বাঁধিয়া খোঁপার মাঝে একটুখানি সিদ্ধিগুঁড়া অর্পণ করিলেন। কপালে দধির ফোঁটা দিয়া তিনি কন্যাকে জলপূর্ণ ঘটটাকে প্রণাম করিতে বলিলেন। মায়ের বক্ষঃচ্যুত মেয়েটিকে এই শুভযাত্রাই যেন সর্ব্ববিঘ্ন হইতে রক্ষা করে।

যতদূর সাধ্য ক্ষিপ্রতার সহিত জননীর বিধিব্যবস্থাগুলা সারিয়া মীরা পিতৃ-সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইল।

আদালতে যাইবার পোষাক পরিয়া মৃগাঙ্ক কন্যার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মীরা আসিয়া প্রণাম করিতেই তাঁহার দুই চোখ সজল হইয়া আসিল। স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে মৃগাঙ্ক কহিলেন, "মীরা, তোকে ছাড়তে আমার যা কষ্ট হচ্ছে—"

কোর্ট হইতে ফিরিয়া যে বিশ্রামমুহূর্ত্তগুলি পবিত্র হইয়া উঠিত, বুঝি সেই স্মৃতি সহসা তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিল। মৃগাঙ্ক আত্মগতভাবেই বলিলেন, 'কি করি মা, বল? তোর ভবিষ্যৎটা চোখের উপর নষ্ট হ'তে দিতে পারি কি?"

মৃগাঙ্ক মেয়েকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। মোটর ছাড়িবার মুহূর্ত্তে মীরা ত্রিতলের বারান্দার পানে চোখ তুলিয়া চাহিল। মা ক্ষোদিত মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া ব্যথিত-মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে নৈরাশ্যের করুণ-ব্যঞ্জনা। চারিচোখে মিলিত হইতেই মীরা মুখখানি ফিরাইয়া লইল। একটা বেদনা-জড়িত সুগভীর নিশ্বাস পিতা-মাতার একান্ত আদরিণী মেয়েটির বুক হইতে উত্থিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

* * * *

গ্রীষ্মের ছুটী আসিল। মৃগাঙ্ক স্বয়ং কন্যাকে আনিতে গেলেন। দুইটা মাস মীরা বোর্ডিং-এ বাস করিতেছিল। ইহার মধ্যে মৃগাঙ্ক অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। মীরাকে বাড়ীতে আনিবার জন্য তাঁহার সমগ্র চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত; কিন্তু প্রাণপণ যত্নে মৃগাঙ্ক সে ইচ্ছাকে দমন করিতেন। বাড়ীতে প্রাচীন যুগের সংস্কারের ছোঁয়াচ লাগিয়া মীরার ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা। তিনি কন্যার জনক হইলেও, মীরার উপর জননীর প্রভাব অসামান্য, তাহা তিনি জানিতেন।

গাড়ীতে উঠিয়াই একমুখ হাসিয়া মীরা বাপের পায়ের ধূলা লইল।

মৃগাঙ্ক হাসিয়া কহিলেন,—"ও কাযটা কতবার ক'রে হবে বল্ দিকি, মা? তোর পায়ের ধূলা নেবার চোটে জুতার ত ধূলাই থাকে না। প্রতি শনিবার ত ওটা হচ্ছে।"

মীরা হাসিয়া কহিল, "বাঃ! তা ব'লে আমি প্রণাম করব না?"

—"আচ্ছা, করিস্ বাপু। এখন গরমের ছুটীটা কাটাবার প্রোগ্রামটা কি ঠিক করলি?"

মীরা কহিল,—"তা ত আমি কিছু ঠিক করিনি, বাবা!"

—"এই বোকা মেয়ে হেরে গেছ! আমি কিন্তু একটা লোভনীয় প্রোগ্রাম ঠিক ক'রে রেখেছি। আচ্ছা, আন্দাজ কর?"

মীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি পিতার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল,—"কি আন্দাজ করব, তুমিই বল না, বাবা?"

"কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা-সন্দর্শন।"

আনন্দে মীরার অন্তরটা লাফাইয়া উঠিল। উজ্জ্বল-মুখে কহিল, "দার্জ্জিলিং যাবে, বাবা?"

"হাঁ মা, কালই আমরা যাত্রা করব।"

ফুৎকার-নির্ব্বাপিত দীপের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে মীরার মুখের উজ্জ্বল দীপ্তিশিখা নিভিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল, দীর্ঘ দুইটি মাস সে মাকে ছাড়িয়া আছে। গ্রীষ্মাবকাশের প্রতীক্ষায় সে ধৈর্য্য ধরিয়া ছিল। কিন্তু তাহাও হইবে না। মা হয় ত এ বিষয় লইয়া মুখে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিবেন না; কিন্তু সে ত জানে, মীরা ব্যতীত তাহার ভগ্নহৃদয়া জননীর আর কেহ নাই!

মীরা অনুরোধভরা কণ্ঠে কহিল,—"সপ্তাহখানেক পরে গেলে হয় না, বাবা? বড্ড শীগ্‌গীর হচ্ছে না?"

রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃগাঙ্ক কহিলেন, "তুমি যা বলবে, তাই হবে, মীরা। কিন্তু এর পর আমায় দোষ দিতে পারবে না। ডাক্তার ঘোষ আমায় চেঞ্জে যাবার জন্যে একটা দিনও দেরী করতে বারণ করেছিলেন।"

মীরা চমকিয়া উঠিল,—ভীতকণ্ঠে কহিল,—"তোমার ব্লাড প্রেসারটা কি বেড়েছে, বাবা?"

ম্লানহাস্যে মৃগাঙ্ক বলিলেন,—"ডাক্তার ঘোষ তাই বলছেন। বিশ্রাম নেবার জন্যে পীড়াপীড়িই কচ্ছেন। তাঁরা ত বুঝেন না, মানুষ সব সময়ে টাকার জন্যে খাটে না।"

মীরার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল।

* * * *

চঞ্চলপদে মেয়ে আসিয়া যখন মাকে প্রণাম করিতে গেল, ত্বরিতে মা দুই পা পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—"ইস্কুলের কাপড়ে ছুঁস্‌নে, মা। কাপড় কাচা হয়ে গেছে।"

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাসটা বাধা পাইয়া বর্ষার আকাশের মত মীরার সারা মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে সে কহিল, "কাপড় কাচতেই যাই, মা।" বলিয়াই দ্রুতপদে মীরা চলিয়া গেল। ভাল মন্দ কোন কথা কহিবার অবকাশ সুধা পাইলেন না।

মনের ভিতর উত্তেজনা থাকিলেই হাত-পায়ের ক্রিয়ায় তাহা প্রকাশ পায়। সশব্দে কলঘরের দরজাটা রুদ্ধ হইল। অনেকটা সময় গা ধুইবার অছিলায় মীরা তাহার মধ্যে কাটাইয়া দিল।

মেয়ের প্রতীক্ষায় সুধা বারান্দার একটা পাশে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে ঘড়ীর কাঁটার পানে চোখ তুলিয়া যখন বুঝিলেন, দেরীটা ইচ্ছাকৃত, তখন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাহ্নিক সারিতে চলিয়া গেলেন। প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

এক সময় দরজা খুলিতেই হইল। মীরা বুঝিল, কাষটা তাহার অন্যায় হইয়া গিয়াছে,—মা কি ভাবিতেছেন? ছি! ছি! অনুতপ্তচিত্তে সঙ্কোচজড়িতচরণে অপরাধীর মত মৃদু গতিতে সে মাতৃসন্ধানে আসিয়া দেখিল, মা ঠাকুরঘরে বসিয়া সন্ধ্যাধ্যান করিতেছেন। মনটা তাহার ভাঙিয়া উঠিল। মাথাটা ঢুম করিয়া ঠাকুরঘরের চৌকাঠে ঠেকাইয়া সে উঠিয়া পড়িল। কাহার উদ্দেশ্যে এই বিরক্তিভরা একটা প্রণাম অতি সংক্ষেপে সে সারিয়া লইল, কে ইহা গ্রহণ করিবে, দেবতা না মানব, তাহার কিছুই মীরা নিজে চিন্তা করে নাই।

বাহির-বাড়ীতে পিতৃসন্নিধানে আসিয়া মীরা দেখিল, টেবলের উপর স্তূপীকৃত মোকর্দ্দমার কাগজপত্র ছড়াইয়া নিবিষ্টমনে পিতা তাহারই একখানা দেখিতেছেন। মীরাকে দেখিয়া তিনি মুখ তুলিয়া শুধু একটু হাসিলেন।

ক্ষণেক টেবলটা ধরিয়া মীরা দাঁড়াইয়া রহিল। মৃগাঙ্কমোহন তখন আইনের কূটনীতিজাল বিস্তার করিয়া শত্রুপক্ষকে পরাভব করিবার চিন্তায় মহা ব্যস্ত, মেয়ের সহিত কথা কহিবার অবসর নাই। ধীরপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া মীরা সম্মুখের একটা ছাদে আরাম-চেয়ার টানিয়া শুইয়া পড়িল।

তরুণ বয়সে চিত্ত একটুতেই অনেকখানি ব্যথা অনুভব করে, চঞ্চল হয়। ইহাই তাহার ধর্ম্ম। অকস্মাৎ বুকের মাঝে একটা প্রচণ্ড অভিমানের বিক্ষোভে মীরার দুই চোখে শ্রাবণের ধারা নামিয়া আসিল।

* * * *

আলস্যভরে অনেকক্ষণ বিছানায় গড়াইয়া অবশেষে মীরা যখন বাহিরে আসিল,—সম্মুখের বারান্দাটা তখন সকালের রৌদ্রে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই সোনালী আলোর রাশি মীরাকে অপ্রতিভ করিয়া তুলিল। ঝি আসিয়া জানাইল, বেহারা জানাইয়া গিয়াছে, চা প্রস্তুত, সাহেব অপেক্ষা করিতেছেন।

মিনিট কয়েকের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া মীরা বাহিরে যাইতেছিল, সুধা ডাকিলেন,—"মীরা, শুনে যা।"

"আসছি, মা" বলিয়া মীরা চলিয়া গেল।"

চায়ের টেবলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মীরা দেখিল,—পরিপূর্ণ পেয়ালা হইতে মৃদু সুগন্ধ লইয়া তপ্ত বাষ্প উঠিতেছে, ডিম, রুটী প্লেটে সাজান, পিতা তাহারই অপেক্ষায় সংবাদপত্রখানিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন।

মেয়ের পায়ের শব্দে মৃগাঙ্ক মুখ তুলিলেন, হাসিয়া কহিলেন, "ভেতরের ঘড়ীগুলা সারাতে দিস, মা।"

লজ্জিত-মুখে নিজের ত্রুটিটুকু স্বীকার করিয়া, পিতার মুখের পানে তাকাইয়া মীরা চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, দেহের অভ্যন্তরের দুর্ব্বলতা জনকের মুখের উপর অবসাদের চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে। মৃগাঙ্কের চোখে মুখে একটা ক্লান্তিচ্ছায়া জড়াইয়া আছে। চঞ্চলকণ্ঠে মীরা কহিল, "রাতে কি তোমার ঘুম হয় নি, বাবা?"

"ঘুম? তা অনেকটা রাত অবধি কাজ খাটতে হয়েছিল—আগরওয়ালার কেস্‌টা নিয়ে। আর রাতটা যে গরম।"

অনুযোগভরা কণ্ঠে মীরা কহিল, "কেন তুমি অত খাট, বাবা? তোমার শরীরটা মোটে ভাল নেই।"

মৃগাঙ্ক হাসিয়া ফেলিলেন; কহিলেন, "শরীরটাই কি সব, মা? এত বড় কেস্! জিততে পারলে বাবে হৈ হৈ প'ড়ে যাবে।"

মীরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল, পিতার হাসিতে একটা তাচ্ছীল্যের আভাস ফুটিয়া উঠিল। কি একটা বলিবার জন্য মীরা মুখ তুলিয়াই থামিয়া গেল। মৃগাঙ্ক কলহাস্যে কহিয়া উঠিলেন, "গুড্‌ মর্ণিং! এসো অসীম!"

পিতার দৃষ্টির অনুসরণ করিতে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া মীরা দেখিতে পাইল, স্বাস্থ্যে লাবণ্যে ভরা পূর্ণ-অবয়ব যুবা-মূর্ত্তিতে খদ্দর-সজ্জিত অসীম দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে। অকস্মাৎ মীরার ললাট হইতে কর্ণমূল অবধি আরক্তিম হইয়া উঠিল। অসীম মীরার পরিচিত হইলেও এ মূর্ত্তির সহিত মীরার পরিচয় ছিল না।

মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"অসীম, থামলে কেন? মীরা, অনেক দিন পরে অসীমকে দেখ্‌লে, না?"

মীরার ক্ষুদ্র নমস্কারে প্রতি-নমস্কার সারিয়া অসীম একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সহাস্যে কহিল, "গোটা পাঁচেক বছর হবে। কেমন নয়, মীরা?"

মীরা মনের একটা সঙ্কোচ তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। মৃদুকণ্ঠে কহিল, "হাঁ, আপনি ভাল আছেন?"

রহস্যভরে অসীম কহিল, "আমার শরীরটা কি তার প্রমাণ দিচ্ছে না? তুমি যে 'আপনি আপনি' আরম্ভ করলে, মীরা।"

মীরা একটু হাসিল মাত্র, কথা কহিল না।

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "আমাদের যাওয়া হবে না, অসীম।"

বিস্ময়-দৃষ্টিতে অসীম কহিল, "সে কি! আপনি যে গাড়ী রিজার্ভ কত্তে বলেছিলেন। আপনার আর বাবার নামে আমি যে দুটো কম্পার্টমেন্ট আজকের তারিখেই রিজার্ভ করেছি!"

"আমার ত সেই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মীরা—"

মৃগাঙ্ক আপনার ক্ষুদ্র দৃষ্টিটাকে খোলা জানালার দিকে মেলিয়া দিলেন।

পিতার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের সংবাদে মীরা মনে মনে বিচলিত হইয়াছিল; তাহার উপর আজ সকালে যখন মৃগাঙ্কের মুখখানা নিষ্প্রভ হইয়াই তাহার চোখে ধরা দিয়াছিল, তখন মীরার বুকের মাঝে একটা আতঙ্কই জাগিয়া উঠিয়াছিল। এখানে থাকিলে পিতাকে যে বিশ্রাম গ্রহণ করান একবারেই অসম্ভব, তাহা মীরা জানিত। ভয়গ্রস্ত অন্তর তাহার পিতাকে লইয়া সুদূরে পলাইবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ত্বরিত-কণ্ঠে সে কহিল,—"না না, আজই যাওয়ার ব্যবস্থা হোক্।"

মেয়ের পানে চাহিয়া উদাসীন-কণ্ঠে মৃগাঙ্ক বলিলেন,"তোমার অসুবিধা—"

বাধা দিয়া মীরা কহিল, "আমার আবার সুবিধা অসুবিধা কি, আমরা আজই ষ্টার্ট করব।"

*　　*　　*　　*

প্রবাস-যাত্রার জন্য মীরা যখন পিতার পাশে মোটরে বসিল, তখন সারা দিনের একটা অবরুদ্ধ ক্রন্দন তাহার মনের মাঝটা বড় নির্ম্মমভাবেই বিদীর্ণ করিতেছিল। মা'কে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ তাহার কিছুতেই চাহিতেছিল না। যদিও এ রকম যাওয়া তাহার পক্ষে আজ কিছু নূতন নহে, তথাপি আজ অনুক্ষণ মনে হইতেছিল, বিচ্ছিন্ন পিতামাতার দুঃখের ভোগগুলা আজ তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণা দিতেছে।

মীরা প্রত্যাশিত-নয়নে ত্রিতলের বারান্দার পানে দৃষ্টি তুলিল,—কিন্তু তৃপ্ত হইল না। সুধা বারান্দার একটা ঝিলিমিলির পাশে এমনভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার শাড়ীর একাংশ ছাড়া আর কিছু দৃষ্ট হয় না। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিটাকে ফিরাইয়া মীরা চকিতে একবার পিতার পানে চাহিয়া দেখিল। মৃগাঙ্ক তখন রাজপথের পার্শ্বস্থ একটা দোকানের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন।

*　　*　　*　　*

মৃগাঙ্কমোহনের সহিত সুধার যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন উভয় পক্ষ হইতেই যে একটা প্রবল আপত্তি না উঠিয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু ফললাভ হয় নাই। আপত্তি উঠিবার পক্ষেও যেমন একটা বিশেষ হেতু ছিল, আবার সেটা ফলবতী না হইবার পক্ষেও তেমনই বিশেষ একটা কারণ ছিল।

ভবানীপুরের মিত্রগোষ্ঠী যেমন শিক্ষা-সভ্যতায় আধুনিক কালের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তেমনই রাজপুরের উমাপদ বসুরও গোঁড়া বৈষ্ণব বলিয়া একটা অখ্যাতি ছিল। আর সেটা এমনই ভয়ানক যে, বর্ত্তমানের আবহাওয়ার মাঝেও তাঁহার শিখা, কাষ্ঠপাদুকা, মায় তুলসীমালা—সকলই নিরাপদে তাঁহার দেহের শোভাবর্দ্ধন করিত। কাযেই মিত্র-গোষ্ঠীর সমুজ্জ্বল রত্ন, সাগরপারে শিক্ষিত মৃগাঙ্কের সহিত উমাপদর পৌত্রীর বিবাহে আপত্তি উঠিবে, তাহাতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়?

কিন্তু মৃগাঙ্কের পিতা মহীতোষ অকস্মাৎ প্রচার করিলেন, তিনি বাহিরে যাহা খুসী খান বা করুন, অন্তরে অন্তরে তিনি না কি পরম নিষ্ঠাচারী হিন্দু। আর গৃহিণী-বিহীন সংসার বলিয়া যে অনাচার এত দিন ঘটিয়া আসিতেছে, তাহারই জন্য এমনই নিষ্ঠাপূর্ণ ঘরের মেয়ে তিনি খুঁজিতেছিলেন।

এমন মেয়ে যে তিনি খুঁজিতেছিলেন, সে কথাটা সত্য। সুন্দরী মেয়ের সহিত বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়টা ত আর মুখের কথা নহে। কাযেই বিবাহ হওয়াতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু ছিল না।

ফুলশয্যার দিন ফুলাভরণা সজ্জিতা চতুর্দ্দশী কিশোরীর পানে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া মৃগাঙ্কের চোখের দৃষ্টি আর ফিরিতে চাহে নাই। মনের মাঝে যে বিষাদের কালো মেঘখানি অশান্তির ঝড় তুলিবার প্রয়াস করিতেছিল, হঠাৎ শরতের লঘু মেঘের মত সেটা সরিয়া গিয়া শরতের চাঁদের মতই কিশোরী পত্নীর লাবণ্যময় মুখখানি তাঁহার মনের মাঝে একটা আনন্দের আলো ছড়াইয়া দিয়াছিল।

সুখের রঙ্গীন দিনগুলা ইন্দ্রধনুরই মত। ভালবাসার প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসটা যখন একটু প্রশমিত হইল, তখন সুধা মীরাকে কোলে পাইয়া মাতৃপদ লাভ করিয়াছেন। তখন তিনি আর লজ্জাশীলা বধূ নহেন, শাশুড়ী-বিহীন সংসারে নিপুণা গৃহিণী, স্বামীকে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া আপনার করিতে চাহেন। মৃগাঙ্কও দিনে দিনে পত্নীকে আপনার আদর্শ অনুযায়ী করিয়া পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিলেন। গোল বাধিল এইখানে। আজন্ম ভিন্নাচারে বর্দ্ধিত স্ত্রী-পুরুষের চোখে পরস্পরের আচরণগুলাই ক্রমে ক্রমে বিসদৃশ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শেষে অবস্থা এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন দাম্পত্য-জীবনে একটা বিচ্ছেদের প্রাচীর সৃষ্ট হইয়া উঠিল। অবশ্য তখন মহীতোষ বাবু পরলোকে।

সুধা এক দিন দেখিলেন, স্বামী ডুবিয়ার হাত হইতে গ্রেহাউণ্ড

কুকুরের চেনটা নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। বিরক্তিতে সুধার সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিল; জানালার নিকট হইতে তিনি সরিয়া আসিলেন।

হাস্যপ্রফুল্লমুখে সান্ধ্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মৃগাঙ্ক কুকুরটাকে সঙ্গে লইয়া কি একটা অন্বেষণে শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্রাসে এক দিকে সরিয়া গিয়া তীব্রকণ্ঠে সুধা কহিলেন, "তুমি কিছু ছুঁয়ো না। তুমি নোংরা।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া মৃগাঙ্ক পত্নীর পানে চাহিতেই,—সুধা তেমনই কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন,—"কুকুর ছুঁয়েছ।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা মৃগাঙ্ক বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"ওটা যে গঙ্গাচান্ করেছে, জান না বুঝি?"

নিদারুণ ক্রোধের রক্তোচ্ছ্বাসে সুধার সুন্দর মুখখানির সৌন্দর্য্য হঠাৎ মৃগাঙ্কের দৃষ্টিতে বাড়িয়া উঠিল। প্রস্থানোদ্যত হইয়াও পত্নীর দিকে তিনি দুই পা অগ্রসর হইয়া সহসা সুধার হাতখানা খপ করিয়া চাপিয়া ধরিলেন এবং নিজের হাসিভরা মুখখানা পত্নীর মুখের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

সাক্ষাৎ শনি বলিয়া সুধা জীবনে কোন দিন কুকুর স্পর্শ করেন নাই। তাহার উপর নল-রাজার কাহিনীটাও তাঁহার সবিশেষ জানা ছিল। আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সবেগে তিনি নিজের ধৃত হাতখানা স্বামীর হাতের মধ্য হইতে টানিয়া লইয়া ত্রস্তপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দোষটা ঠিক কি হইয়াছে বা তাহার পরিমাণ কতখানি, তাহা মৃগাঙ্ক বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও, অপরাধ যে তিনি একটা কিছু করিয়াছেন, ইহা বুঝিলেন এবং রুষ্টা পত্নীকে তুষ্টা করিবার ইচ্ছায় একখানা চেয়ারে সুধার প্রতীক্ষায় বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সুধা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সযত্নরচিত খোঁপার পরিবর্ত্তে আর্দ্র চুলের রাশি পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই পৌষের কন্‌কনে শীতের হাওয়ার মধ্যে সুধার স্নানের হেতুটা কেহ না বলিয়া দিলেও মৃগাঙ্কের তাহা অবিদিত রহিল না। সর্ব্বনাশা ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে মেঘে ঢাকা অন্ধকার প্রকৃতির স্তব্ধ মূর্ত্তির মত—মৃগাঙ্কের মৌন মুখের উপর মর্ম্মান্তিক বিরক্তির একটা কালো ছায়া গাঢ় হইয়া উঠিল। নিঃশব্দে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

তাহার পর দশটা বছর কাটিয়া গিয়াছে; মৃগাঙ্ককে অন্দর-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে বা ত্রিতলে সুধার নিকট যাইতে কেহ নিমেষের জন্যও দেখে নাই।

সুধা আপনার বারান্দা হইতে দেখিতে পাইতেন, স্বামীর অনাচারগুলা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। গাটা তাঁহার ঘৃণায় রি-রি করিয়া উঠিত।

কার্পেট-মোড়া কক্ষে মৃগাঙ্কের মুসলমান খানসামা, বয়, ভুরিয়া প্রভৃতি ঘুরিয়া বেড়াইত। প্রভুর কোলে থাবা পাতিয়া কুকুরগুলা আদর লইতেছে। নিদারুণ অভিমানে নিঃশব্দে সুধা মুখ ঘুরাইয়া লইত। সমস্ত বাড়ীর বায়ু অবধি তাঁহার কাছে অশুচি বলিয়া বোধ হইত। ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে ত্রিতলের মাঝে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া লইলেন।

* * * *

গ্রীষ্মের অবকাশটা পিতাকে লইয়া মীরা দার্জ্জিলিংএ কাটাইয়া যে দিন গৃহে ফিরিল, তাহার পরদিন কলেজ খুলিবার তারিখ।

মৃগাঙ্ক হাসিয়া কহিলেন, "বাড়ী এলেও আজ বাড়ী থাকা হবে না। অনাদির বাড়ী যেতে হবে।"

মনের ভিতর একটা গভীর বেদনা অনুভব করিয়া মীরা কহিল, "আজ নেমন্তন্নে না গেলে হয় না, বাবা?"

মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"হবে না কেন, মা! কিন্তু এটা যে ভুলে যাচ্ছ, মীরা, অনাদির জন্মদিনের নেমন্তন্ন। আসছে বছর এ সুযোগ আসবে কি না, ভগবানই জানেন।"

মীরা চুপ করিয়া রহিল। পিতৃবন্ধু অনাদি বাবুকে সে পিতার মতই সম্মান করিলেও তাহার মন এই নিমন্ত্রণ লইতে সম্মত হইতেছিল না।

গেটের মধ্যে পরিচিত হর্ণের শব্দে পিতাপুত্রী একই সঙ্গে চোখ ফিরাইল। অসীম প্রবেশ করিয়া নমস্কারান্তে কহিল, "বাবা পাঠিয়ে দিলেন। বিশেষ ক'রে ব'লে দিলেন, আপনার আজ পাহাড় হ'তে নামলেও যেতে হবে। কারণ, পরের বছর এ দিনটা আসার উপর তাঁর আস্থা নেই।"

মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"অসীম, অনাদির ও-সব কিছু বলবার দরকার নেই। তার সঙ্গে বন্ধুত্বটা আজকের নয়, ফোর্থ ক্লাস হ'তে একসঙ্গে আমরা এম-এ পাশ করেছি। মীরাকে সে মেয়ের মতই দেখে—"

আসন ত্যাগ করিয়া মীরা উঠিয়া দাঁড়াইল। নমিত-দৃষ্টিতে কহিল, "আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।"

আড়ম্বর-বিহীন নিপুণ সজ্জা সম্পন্ন করিবার সময় মীরার মনের মাঝে বাদলদিনের ধূসর মেঘের মত একটা অপ্রসন্নতার ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছিল। অনুক্ষণ পাশে রাখিবার জন্য পিতা যেমন করিয়া স্নেহের সহস্র বাহু তাহার পানে বাড়াইয়া থাকেন, মা তাহার কিছুই করেন না। তবু সেই স্বল্পভাষিণী—শান্তির

প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী মায়ের পাশটিতে থাকিবার জন্ম তাহার অন্তর অনুক্ষণ লালায়িত হইয়া উঠে।

মায়ের সন্ধানে আসিয়া মীরা শুনিল,—সুধা রান্নাঘরে। ললাট কুঞ্চিত হইয়া বিরক্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল। মা'র যেন সবই বাড়াবাড়ি। বাড়ীতে পরিবার বলিতে ত তাহারা তিনটি প্রাণী; তাহার মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার সব ব্যবস্থাই ত বাহিরে খানসামাদের হাতে। মনের অসন্তোষটা পায়ের শব্দে প্রকাশ করিতে করিতে মীরা রান্নাঘরের দ্বারদেশে আসিয়া শুনিতে পাইল, মা বলিতেছেন,—"ঠাকুর ও মাছের ঘণ্টটা তুমি আজ রেঁধ না, বাপু! ও সব আমি আজ নিজেই রাঁধব। বাছা আমার কটা মাস পরের হাতে খাচ্ছে।"

মীরার ললাট আরক্তিম হইয়া উঠিল। বুকভরা স্নেহ লইয়া নিজহাতে সন্তানকে রাঁধিয়া খাওয়াইবার জন্ম জননী ব্যস্ত। আর এমনই দুর্ভাগ্য তাহার, সে তৃপ্তিটুকু জননীকে দিতে সে অক্ষম! মনটা বাঁকিয়া বসিল,—না, নিমন্ত্রণে আজ কিছুতেই সে যাইবে না। দপ করিয়া মনে পড়িল, পিতা বলিয়াছেন, এ দিনটা আর নাও আসিতে পারে। অপরাধীর মত কুণ্ঠিতকণ্ঠে মীরা ডাকিল, "মা!"

"এই যে মা" বলিয়া সুধা বাহিরে আসিয়া কন্যার বেশ-ভূষার পানে তাকাইয়া বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন,—"কোথাও কি যাচ্ছিস?"

মীরা চোখ তুলিতে পারিল না। মৃদুকণ্ঠে কহিল, "অনাদি বাবুর বাড়ী নেমন্তন্ন। বাবার সঙ্গে।"

মুহূর্ত্ত সুধা নীরব রহিলেন। বোধ করি, অন্তরস্থিত একটা ক্ষুব্ধ অভিযোগ নিমেষের জন্ম বাহিরে আসিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু শান্তকণ্ঠে সুধা কহিলেন, "এ বেলা তবে ওখানেই খাবি?"

জড়িত-কণ্ঠে উত্তর হইল, "হ্যাঁ।"

* * *

অনাদিবাবুদের বাড়ী হাস্য-পরিহাসের মধ্যে সারাটা দিন কাটিলেও মীরার মনটা মায়ের কাছে যাইবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

তাহার এই অন্যমনস্কভাবটা অপরেরও চোখে ধরা পড়িয়া গেল।

রমা অনাদি বাবুর কন্যা মীরার সমবয়সী। বন্ধুত্বও উভয়ের প্রগাঢ়। কাযেই কোন কথা মুখে বাধে না। সে সুস্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মনটা কোথায় বাঁধা পড়েছে?"

আরক্তিম মুখ তুলিয়া কোপকটাক্ষে সখীর পানে চাহিতে গিয়া সে দেখিল,—সকৌতুক-হাস্যে অসীম তাহার পানে চাহিয়া আছে। কোন কিছু বলা আর হইল না। অপ্রতিভ ভঙ্গীতে মুখ ফিরাইতেই রমা প্রশ্ন করিল, "হলো কি?" তাহার মুখে দুষ্টামির হাসি।

"তোমরাই জান" বলিয়া মীরা উঠিতে গেল। রমা হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"আমরা? অর্থাৎ আমি একা নই। আর কেউ হয় ত জান্‌তে পারেন। আমি ত জানিনি, ভাই।"

আলোচনার প্রসঙ্গ বাড়িয়া যায়। রমা হয় ত সহজে নিষ্কৃতি দিবে না। মীরা নীরব রহিল,—শুধু তাহার ললাট হইতে কর্ণ-মূল অবধি বার বার বর্ণবিপর্য্যয় ঘটাইয়া নিকটস্থ আর এক জনের মুগ্ধ দৃষ্টিকে তৃপ্তি দিতেছিল।

মৃগাঙ্ক আসিয়া কহিলেন, "এইবার ফেরা যাক।"

মুহূর্ত্তে চারিদিকে একটা আপত্তির কোলাহল উঠিল। অনাদি বাবু নিজেই বলিলেন,—"আর খানিকটা মীরা থাক্ না, মৃগু। কত দিন পরে এসেছে। দুটো গান তার শুন্‌ব।"

* * * *

মেয়েকে লইয়া মৃগাঙ্ক যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। মৃগাঙ্ক হাসিয়া কহিলেন,—"অনেকটা রাত হয়ে গেল।"

রিষ্ট-ওয়াচটার পানে চাহিয়া মীরা একটু হাসিল। মৃগাঙ্ক বলিলেন,—"অসীম বেশ ছেলে, না মীরা?"

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে মীরা কহিল, "ওরা সকলেই চমৎকার লোক।"

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া মীরা ভাবিল, মা ঘুমাইতেছেন। নিঃশব্দে কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া বিছানার একটা পাশ সে দখল করিতেছিল,—সুধা কহিলেন, "কিছু খাবিনি?"

মীরা চমকিয়া উঠিল। এই এতখানি রাত অবধি মা তাহার জাগিয়া আছেন কি অসহনীয় নীরবতা লইয়া। এই জাগরণের ব্যথা যে কতখানি, তাহা ঐ সহিষ্ণুতাভরা বুকখানি ছাড়া বাহিরে এতটুকু জানিবার পথ নাই। তবু ব্যথা বাজে।

মীরা কহিল, "না মা! এ বেলাও ওঁরা খাইয়ে দিলেন।"

সুধা আর কিছু বলিলেন না; শুধু পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বোধ করি, বুক-জোড়া একটা নিশ্বাসকে চাপিবার জন্যই।

* * * *

ঘুম ভাঙ্গিতেই গত দিনের স্মৃতি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। রমার কৌতুক, অসীমের হাস্য, আপনার লজ্জা—সবগুলা মনের মাঝে একটা নূতন সুর সৃষ্টি করিতেছিল। গত রজনীতে মা'র সেই নিঃশব্দ জাগরণটাও মনে পড়িল। অন্তরে একটা বেদনার খোঁচা মীরা অনুভব করিল।

বারান্দায় আসিয়া এ পাশ ও পাশ চাহিয়া মীরা মাকে দেখিতে না পাইয়া ডাকিল, "মা !"

ঠাকুরঘর হইতে সুধা সাড়া দিলেন,—"কেন মা ?"

মীরা কহিল,—"আজ আমি তোমার কাছে চা খাব।"

হাত-মুখ ধুইয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া মীরা ঠাকুরঘরে প্রণামের জন্য আসিল। মেয়ের এই আচরণগুলা গত দিনের কার্য্যের প্রতিক্রিয়া কি ?

জননী মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিলেন। তার পর বলিলেন, "চা কিন্তু তোমায় নীচেই খেতে হবে, বাপু।"

সবিস্ময়ে মীরা মায়ের পানে তাকাইতেই সুধা বলিলেন, "তা না হ'লে হয় ত ওঁর চা খাওয়াই হবে না। তুমি নেমে যাও, বাছা।"

মীরা আর কোন কথা কহিল না। নামিয়া আসিয়া দেখিল, জননীর অনুমান ভ্রান্ত নহে। মৃগাঙ্ক শুধু এক কাপ চা লইয়া বাকী আহার্য্যগুলা ফিরাইয়া দিতেছেন। ইঙ্গিতে খানসামাকে নিষেধ করিয়া মীরা একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

ভোরের চাঁদের মত মৃগাঙ্কের মুখে একটা মলিন হাসি ফুটিয়া উঠিল।

উঠিবার বেলা মৃগাঙ্ক বলিলেন,—"একটু সকাল সকাল নিও, মা মণি ! একটু বাদেই আমি বেরুব।"

মেয়ের সাড়া পাইয়া সুধা গৃহে আসিয়া দেখিলেন, কাপড়-চোপড় পরা শেষ করিয়া মীরা সুটকেশে চাবি বন্ধ করিতেছে।

বিস্ময়াপন্ন হইয়া মাতা বলিলেন,—"এত সকাল সকাল ?"

মুখ না ফিরাইয়া অভিমানপূর্ণ স্বরে মীরা কহিল, "বাবা বল্লেন।"

"ঠাকুরকে তবে ভাত দিতে বলি।"

সহিষ্ণুতার বর্ম্মের অন্তরালে মায়ের যে স্নেহ-দুর্ব্বল অন্তর লুকাইয়া আছে, আজ তাহাকেই বার বার আঘাতে চঞ্চল করিয়া বাহিরে আনিবার জন্য মীরার কেমন একটা ইচ্ছা হইতেছিল। না-পাওয়া নিধির উপর মন বেশী লুব্ধ হয়। মীরার দেহ এবং মন আজ মায়ের কাছ হইতে একটুখানি আদরের উচ্ছ্বাস চাহিতেছিল।

মুখখানাকে ভার করিয়া মীরা কহিল, "তা বলো, মা। কিন্তু আমার ক্ষিদে হয় নি।"

"তবে থাক, বাছা। খেও না। আবার যদি অসুখ করে; চোখের আড়াল। একটু লেবুর রস খেয়ে যাও।"

যাইবার সময় মীরা পিতাকে বলিয়া গেল, শনিবারে সে আসিবে।

* * * *

প্রতীক্ষিত শনিবার আসিতে মীরার অন্তরটা আনন্দে নাচিয়া উঠিল,—একটা ক্ষমা-প্রার্থনার অবকাশ আজ সে পাইবে। ছয় দিন ধরিয়া তাহার মনটা একটা গুরু অপরাধভারে নিপীড়িত হইয়াছে। এবার কলেজে আসিবার সময়ে মোটরে উঠিয়া মীরার অভিমান-ক্ষুব্ধ অন্তর বিদ্রোহ করিয়া এমনই বাঁকিয়া বসিয়াছিল যে, ত্রিতলের বারান্দার পানে সে চাহিয়াও দেখে নাই।

নির্ব্বাপিত অগ্নির ভস্মের মত দীপ্ত ক্রোধের তেজ অন্তর্হিত হইলে যে অনুতাপ মীরার অন্তরে জাগিয়াছিল, তাহার তাড়নায় ক্ষমা-ভিক্ষার জন্য মীরা অধীর হইয়া পড়িল।

মোটরে উঠিতে গিয়া মীরা থমকিয়া দাঁড়াইল। শঙ্কিতকণ্ঠে সে কহিল, "আপনি ! বাবা ভাল আছেন ?"

হাসিয়া অসীম কহিল, "নিঃসন্দেহ। তিনি তোমাদের প্রিন্সিপ্যালকেও একখানি চিঠি দিয়েছেন।"

মীরা আর কোন কথা বলিল না, গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতেছিল। পথের পানে চোখ রাখিয়া মীরা বসিয়াছিল। অসীমের কণ্ঠস্বরে সে মুখ ফিরাইল। অসীম মীরার মুখের পানে চাহিয়াছিল। তাহার দৃষ্টির সহিত মীরার দৃষ্টি মিলিত হইল। অসীম কহিল,—"আমি যদি তোমায় কিছু বলি, মীরা ?"

অসীমের কোমল দৃষ্টি ও কণ্ঠের স্বরে মীরার ললাট ঘামিয়া উঠিল। মোটর মোড় ফিরিতেই পড়ন্ত বেলার রক্তালোক মীরার মুখখানিকে আবীর মাখাইয়া দিল। আপনার নামটা অসীমের মুখে উচ্চারিত হইয়া মীরার কাণে যেন মধু ঢালিয়া দিল। ছোট বেলায় অসীমের সহিত অসঙ্কোচে মেলা-মেশা থাকিলেও দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে পূর্ণ যুবকমূর্ত্তিতে সে যখন মীরার দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন একটা লজ্জা, একটা সঙ্কোচ মীরাকে পদে পদে ঘিরিয়া ধরিত। রমার হাস্য-কৌতুকগুলা তাহার তরুণী-চিত্তের উপর চৈত্রের উতলা বাতাসের পুলক-শিহরণ আনিয়া দিত।

মীরা অসীমের পানে প্রশ্নভরানেত্রে তাকাইতেই অসীম লজ্জারুণ-মুখে কহিল, "আমি কি তোমায় পাবার কামনা করতে পারি, মীরা ?"

মীরার সমগ্র আনন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ধীরকণ্ঠে সে কহিল, "এ সব কথা আমার সঙ্গে কেন ?"

অসীম কহিল, "তোমার বাবার ইচ্ছায়। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি তোমায় পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।"

মীরা কোন কথা কহিতে পারিল না। পিতার এই স্বাধীনতা দিবার কারণ সূর্য্যালোকের মতই স্বচ্ছ হইয়া মীরার চোখে ফুটিয়া উঠিল।

অসীম ডাকিল, "মীরা!"

মীরা আবার মুখ তুলিয়া চাহিল। কম্পিতকণ্ঠে অসীম কহিল, "তোমায় পাবার আশা—"

অসীমের দৃষ্টিতে মিনতি ভরিয়া উঠিল। মীরার দৃষ্টিতে অসীম বড় সুন্দর ঠেকিল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "এখন থাক।"

গাড়ী আসিয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃগাঙ্ক সহাস্যে আসিয়া কন্যাকে নামাইলেন। অসীমকে চা খাইতে অনুরোধ করিয়া, মীরাকে সিনেমা যাইবার জন্য ত্বরিতে প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

মা'র কক্ষে প্রবেশ করিয়া মীরা দেখিল,—সুধা ঘুমাইতেছেন। বেশীক্ষণ বসিতে পারিবে না ভাবিয়া তাঁহাকে জাগাইতেও সে সাহস করিল না। নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

সিনেমা হইতে পিতাপুত্রী যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। কাপড় ছাড়িয়া, হাত-পা ধুইয়া মীরা মায়ের পাশে আসিয়া ডাকিল, "মা!"

চমকিত হইয়া সুধা চক্ষু মেলিলেন। কহিলেন,—"অ্যাঁ মীরা! এলি মা? এত রাত্তিরে—?"

লজ্জিত-মুখে মীরা কহিল, "শনিবার ব'লে। বিকালে এসেছিলুম। তুমি যে ঘুমুচ্ছিলে।"

"ওঃ—তা হবে। কোথা গিছলে?"

"বায়স্কোপ! বাবা বল্লেন।"

"ওঁর সঙ্গে?"

"হ্যাঁ মা। অসীম বাবুও ছিলেন।"

মেয়ের মুখের পানে বিস্ফারিত-নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সুধা বলিলেন,—"কে অসীম?"

মায়ের সেই দৃষ্টির সম্মুখে মীরার মাথা নত হইয়া আসিল, কণ্ঠে স্বর জড়াইয়া গেল—অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে সে কহিল,—অনাদিবাবুর ছেলে। যিনি বিলাতে ছিলেন।"

"ওঃ, বুঝেছি। তা সে কেন তোমার সঙ্গে, মীরা?"

জননীর কণ্ঠের স্বরে পুঞ্জীভূত বেদনার সহিত একটা তীব্র বিরক্তি মীরার কর্ণে সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিল। মা এমন করিয়া কোন দিন কোন কথা কহেন না। প্রগাঢ় বিস্ময়ে মুখ তুলিতেই সুধার মুদিত-নেত্র মুখের উপর একটা যন্ত্রণার কালো ছায়া মীরার চোখে ধরা পড়িল। তাহার সারা দেহ কাঁপিয়া উঠিল।

পাশ ফিরিয়া বেদনা-ব্যঞ্জক স্বরে সুধা বলিলেন,—"আঃ!—"

ত্বরিতকণ্ঠে মীরা কহিল,—"অসুখ করেছে, মা?"

সুধার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মীরা মায়ের ললাটে হাত দিয়াই শিহরিয়া উঠিল। কহিল,—"এ কি! গা যে পুড়ে যাচ্ছে। থার্ম্মমিটার দাওনি, মা?"

"কি হবে!" বলিয়া সুধা একটুখানি হাসিলেন।

মায়ের তাচ্ছীল্যভরা উক্তি, ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসি দেখিয়া হঠাৎ মীরা কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল,—"কবে থেকে জ্বর হলো, মা?"

মেয়ের হাতখানা গভীর স্নেহে বুকে চাপিয়া সুধা কহিলেন, "রবিবার হ'তে।"

সভয়ে মীরা কহিল, "অ্যাঁ! এই সাত দিনের মধ্যে কাউকে তুমি জানাও নি!"

"কাকে বল্‌ব, বাছা। তুই ত ছিলি নি।"

ইহার উত্তর ছিল না। মীরা কহিল, "সোমবার আমায় বল নি কেন?"

"তুই যে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলি।"

* * * *

সুধার রোগের প্রথম অবস্থাটা কেহ জানিতে না পারিলেও যখন জানিল, তখন চিকিৎসার সে একটা সমারোহ পড়িয়া গেল।

অকৃতজ্ঞ ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিমোনিয়া কিন্তু একটা তীব্র পরিহাসের জন্যই বোধ করি চরমের পথে ছুটিয়া গেল।

ডাক্তার সাহেবের মুখের কথায় মৃগাঙ্ক বসিয়া পড়িলেন। যন্ত্রণা-ভরা কণ্ঠে কহিলেন, "কোন আশাই নেই?"

গভীর সহানুভূতিস্নিগ্ধ-কণ্ঠে উত্তর হইল, "শেষ নিশ্বাস অবধি আমরা আশা করি।"

মৃগাঙ্ক কপালে হাত দিলেন।

মীরা আসিয়া দাঁড়াইল। মাতৃহারা হইবার নিদারুণ আতঙ্ক তাহার আননের উপর আপনার দাগ ঢালিয়াছে; দুই চোখের দৃষ্টি তেমনই কাতরতা-মাখা। পাংশু ঠোঁট দুইখানি কাঁপিতেছে। প্রাণাধিকা দুহিতার পানে চাহিয়াও মৃগাঙ্কের ওষ্ঠ ভেদ করিয়া একটা আশার বাণী বাহির হইল না। মীরা কহিল, "ওপরে যাবে, বাবা?"

মৃগাঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দীর্ঘ দশটা বৎসর পরে নিজের পরিত্যক্ত শয়নকক্ষে কন্যার হাত ধরিয়া মৃগাঙ্ক কম্পিতপদে নতমস্তকে আজ প্রবেশ করিলেন।

বিছানার পাশের চেয়ারখানিতে মৃগাঙ্ক বসিতে যাইতেছিলেন, সুধা কাছে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। মৃগাঙ্ক একবারে পত্নীর পাশটিতে বসিলেন; দশ বৎসরের অধৃত হাতখানি তিনি গভীর স্নেহে নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলেন। মনে পড়িল, সুদূর-অতীতে এই হাতখানি মনের আবেগে কতবার চাপিয়া ধরিয়া

তবু তৃপ্তি হয় নাই। চোখের উপর জাগিয়া উঠিল—পৌষের সেই বিচ্ছেদের সন্ধ্যাটা। আজ কি তাহারই প্রায়শ্চিত্ত-কাল উপস্থিত? কিন্তু অতীতের যবনিকাকে অপসৃত করিয়া আর এক দিনের মধুর স্মৃতি মানসপটে জাগিয়া উঠিল। সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমা। সে দিন নাকি দেবতার ফুলদোল ছিল। এই খাটের উপর চতুর্দ্দশী সুধার ফুলাভরণে সজ্জিত অপ্সরী-মূর্ত্তিটি দেবতার শ্রেষ্ঠ দানের মত সাগ্রহে তিনি সে দিন আপনার বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

আজিকার রাত্রিটাও তেমনই জ্যোৎস্নাভরা—কিন্তু সে দিন এই নারীর বুকের মাঝে কত না আশা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছিল! আর আজ এই মরণমুখী নারীর বুকের মধ্যে শুধু জমিয়া আছে প্রচণ্ড অভিমান, তীব্র নৈরাশ্য, মর্ম্মান্তিক অবহেলার স্মৃতি!

মৃগাঙ্কের মাথা ঘুরিয়া উঠিল।—অবসন্ন দেহ সুধার দুর্ব্বল বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। পত্নীর যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখখানির অতি সন্নিকটে মৃগাঙ্কের মুখখানা নত হইয়া আসিল, মাথাটা সুধার বুকেই ঠেকিল। ক্রন্দন-কম্পিত-কণ্ঠে মৃগাঙ্ক ডাকিলেন, "সুধা, আমায় ক্ষমা কর।"

মৃত্যুপথযাত্রী রোগিণীর ওষ্ঠপ্রান্তে একটা ক্ষীণ হাসি কুয়াসা-ঢাকা জ্যোৎস্নালোকের মত ফুটিয়া উঠিল। চোখ হইতে পৃথিবীর আলো নিভিবার পূর্ব্বে বুঝি অতীত দিনের ইন্দ্রধনুর অপূর্ব্ব শোভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সুধা কহিলেন, "দোষ তুমি কর নি। রক্তসম্পর্কে পাওয়া সংস্কার যে ছাড়া যায় না। আমার মধ্য হইতেই তা বুঝতে পেরেছি।" সুধা থামিলেন; নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হইতেছিল।

মীরার হাত হইতে মৃগাঙ্ক নিজের হাতে অক্সিজেনের চোংটা লইলেন।

সুধা একটু হাসিয়া কহিলেন, "তোমার হাতের গঙ্গাজল আজ কিন্তু আমার সব চেয়ে শুচি।"

মনের মাঝের অবরুদ্ধ অনেক কথা আজ বাহির হইবার চেষ্টা করিল—কিন্তু রসনা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িল।

* * * *

মীরার মৌন-ব্যথা ও নীরব ক্রন্দনের মাঝে অশৌচের দিনগুলা অতিবাহিত হইতে লাগিল। সম্পূর্ণ নিষ্ঠাভরে মীরা শাস্ত্র ও আচারসঙ্গত ব্যবস্থা পালন করিয়া চলিয়াছিল। জননীর নিষ্ঠা ও সংযমের অনেক দৃষ্টান্তই যে মীরার চোখে জাগিয়া আছে! মৃগাঙ্ক এ বিষয় লইয়া বিন্দুমাত্র অনুযোগ তুলিতে পারিতেন না। পত্নীকে দশটা বৎসর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া আপনাকে একটা সীমার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই পত্নী যখন বিচ্ছেদের রেখা ইহজগতে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত তুলিয়া অসীমের পথে ছুটিয়া গেলেন, মৃগাঙ্ক তখন তাঁহাকে নিকটে পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন। বিচিত্র এই মানুষের মন! সেই পরলোকবাসিনীর আত্মাকে কি করিয়া একটু তৃপ্তি দিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টায় মৃগাঙ্ক সকল অনুষ্ঠানই বিনা প্রতিবাদে মানিয়া চলিতে লাগিলেন।

* * *

সময় কাহারও মুখ চাহিয়া এক পল দাঁড়াইয়া থাকে না। একটা বৎসর কাটিয়া গেল। মৃগাঙ্কের জীবনে যেন একটা যাদুমন্ত্রের প্রভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

সন্ধ্যার আকাশে নক্ষত্র-দীপগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সম্মুখের যে নক্ষত্রটা বেশী দপ্ দপ্ করিতেছিল, তাহারই পানে চাহিয়া মৃগাঙ্কের সুধাকে মনে পড়িতেছিল। কৈশোর, যৌবন—অতীতের সকল দিকই উঁকি মারিয়া যাইতেছিল। ধীরে ধীরে চিন্তার ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া মীরার কথাটা জাগিয়া উঠিল।

মানুষের থাকা না থাকার যখন কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই, তখন জীবনের কর্ত্তব্যগুলা যত শীঘ্র মিটাইয়া ফেলা যায়, ততই মঙ্গল। অসীম ত এই সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছে, তবু মৃগাঙ্ক কথাটা মীরার কাছে পাড়িতে পারেন নাই।

সন্ধ্যা-পূজা শেষ করিয়া মীরা আসিয়া মৃগাঙ্কের পাশে দাঁড়াইল। অসহিষ্ণুভাবে মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"এমন ক'রে আর পারা যায় না, মীরা।"

ধীরকণ্ঠে মীরা কহিল,—"আমারও তাই মনে হয়, বাবা। দিন যেন কাটে না।"

সে দিন আহারের আসনে বসিয়া মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"মীরা, তোমায় একটা কথা বলব, মা?"

এক দিন সুধার বড় সাধ ছিল—স্বামীকে আসনে বসাইয়া থালা, বাটি, রেকাবী, গেলাস এমনই করিয়া সাজাইয়া আহার করাইবেন। কিন্তু তাঁহার সাধ মিটে নাই—সেই অপূর্ণ সাধ বুকে লইয়াই তাঁহাকে মহাপ্রস্থান করিতে হইয়াছে। মৃগাঙ্ক সে দিন আপনার পূর্ণ তেজেই চলিয়াছিলেন; তাই তাহারই প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ আজ সুধার গর্ভজাতার কাছে মৃগাঙ্ক সকল বিষয়েই পরাভব মানিতে প্রস্তুত। মীরার অতি সামান্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিতে মৃগাঙ্ক শুধু সঙ্কোচ নহে, নিদারুণ ভয় করিতেন। জীবনের এই প্রৌঢ়-বেলায় অনুক্ষণ মনে হইত, এ আমার হইলেও অভিমানিনী মায়ের মেয়ে। আজ সুধা নাই,

আছে তাহার অমোঘ প্রভাব। মরণের পারে অদৃশ্য তর্জ্জনী হেলাইয়া তিনি যেন আপনারই জয়প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

মীরা বলিল, "কি কথা, বাবা?" সুধার মতই মীরার কণ্ঠস্বর শান্ত।

মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"থাকা না থাকা যখন স্থিরতা নেই, তখন তার কাযটা মেটানই ভাল।"

মীরা পিতার পানে চাহিল।

মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"অসীমের হাতে তোমাকে—" মৃগাঙ্ক থামিলেন।

মীরা দৃষ্টি নত করিল।—মা'র সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, বিরক্তিভরা কণ্ঠের বাণী,—'অসীম তোমার সঙ্গে কেন, মীরা।'—মীরার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"কি বলব তাকে?"

অসীমের অতিসুন্দর মূর্ত্তি এবং ওষ্ঠের মৃদু হাসি, চোখের মিনতিভরা দৃষ্টি, সবই মীরার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে মীরা কহিল,—"আমায় কি এ বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছেন?"

মৃগাঙ্ক কহিলেন, "হ্যাঁ মা, সম্পূর্ণরূপে।"

"তবে জানুন, এ হবার নয়।"

সর্পদষ্টের মত মৃগাঙ্ক চমকিয়া উঠিলেন। ভীতকণ্ঠে কহিলেন,—"কেন, মা?"

মীরা কহিল, "ওরা আমরা এক নই।"

মৃগাঙ্ক কহিলেন, "মানুষকে কি চাইতে হয়, মানুষের দেওয়া জাত দেখে, না ভগবানের দেওয়া শক্তি, বুদ্ধি, হৃদয় দেখে? তা ছাড়া আমি জানতুম, মীরা, অসীমকে তুমি একটু—আর এটা স্বাভাবিক।"

মীরার মুখখানি আরক্তিম হইয়া উঠিল। সহিষ্ণুতাভরা মা'র শান্ত মুখখানি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আচারপরায়ণা ধর্ম্মবিশ্বাসী জননী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবু আপনার বিশ্বাসে এতটুকু আঘাত করিতে দেন নাই। সেই মায়ের মেয়ে মীরার অন্তরে কি এতটুকু ত্যাগের শক্তি নাই?

দৃঢ়কণ্ঠে মীরা কহিল, "মানুষের জাত তার জন্মের উপর নির্ভর করে কি কর্ম্মের উপর নির্ভর করে, মা জীবিত থাকলে সে তর্ক উঠতে পারত! কিন্তু তা যখন নেই, তখন সে তর্কই উঠতে পারে না। তাঁর ইচ্ছাটাই শুধু কায করবে। বাবা, মা'র শান্তিতে আমি আর ব্যাঘাত ঘটাব না, ঘটতে দেব না।" মীরা কাঁদিয়া মুখে আঁচল চাপা দিল।

মৃগাঙ্ক কথা কহিতে পারিলেন না। আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া সুধা যে শক্তির উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে বিফল করিবার শক্তি মৃগাঙ্কের নাই।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

ঘরকন্না

তা'ঘরে এক ঘর বেঁধেছে রূপ-নগরীর প্রান্তভাগে,
ঘর-হারারি নূতন গৃহ দেখতে কেমন কেমন লাগে।
ঘরখানি তার খড়ের ছাওয়া,
আগেই আসে দখিণ হাওয়া
সাঁজের রবি সবার শেষে
তাদের কাছে বিদায় মাগে।

হেথায় শিরীষ-পরাগ মেখে ভ্রমর গায়ের ধূলা ঘুচায়,
পোষা কোকিল ঠোকর মারে টুকটুকে লাল 'তেলাকুচা'য়।
জীবন তাদের সোহাগ শুধু,
কেবল আলো কেবল মধু,
যুগল প্রাণের পৌর্ণমাসী
নিতুই রাঙ্গা দোলের ফাগে।

আনন্দেতে সঞ্চরিছে তার প্রিয়া তার নূতন ঘরে,
অঙ্গনেতে রূপলে রঙন আপন হাতে যতন করে।
দিবস দিবস বাড়ছে হেথা
মাটীর টানের মধুরতা
রঞ্জিত হায় কুটীরখানি
দুটি হিয়ার অনুরাগে।

গভীর রাতে নদীর পারে বাজে সুদূর মধুর বাঁশী,
বাঁশীর স্বরে ব্যাকুল করে পথিক জনের মন উদাসী।
বাঁধন-হারার জাগায় ব্যথা,
ভোলে মাটী অলকলতা,
খোপের কপোত-কপোতীদের
বনের কথা মনেই জাগে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

শিল্পী ও চিত্ররূপের আদর্শ

শিল্পী কে? যিনি সত্য-শিব-সুন্দরের সৃষ্টি করেন। কোনো রূপের সঠিক প্রতিচ্ছায়া দেওয়াকে শিল্পকলা বা আর্ট বলিয়া অভিহিত করা একবারেই রস-বিরুদ্ধ। শিল্পকলার ইতিহাস রসবেত্তাই চিরদিন উজ্জীবিত রাখেন। শিল্পীর কোনো সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ থাকিতে পারে, কিন্তু আপনার রচনাকে যথেচ্ছ রূপ দিবার স্বাধীনতা তাঁহার আছে; কারণ, তাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড রসবস্তুটি লইয়া কার্য্য করিতে হয়।

শিল্পী চিত্র-রূপের আদর্শ (মডেল) যেখান হইতেই সংগ্রহ করুন, তাঁহার রূপ-সৃষ্টির উৎস যে-বস্তু হইতেই উৎসারিত হউক্, অরূপ রসের প্রেরণায় শিল্পীর দান নূতন ভঙ্গিমা, নূতন আকৃতি ও প্রকৃতি পায়। রসের ঐশ্বর্য্য লইয়াই শিল্পী বিভবশালী, রসের পাত্র আপনার ইচ্ছামত প্রয়োজনীয় সুর মিলাইয়া তিনি রচনা করেন। বাস্তব-রূপকে রসের ছন্দে, অন্তরিত করিবার সত্য-অধিকার শিল্পীর আছে। রসের পূর্ণমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে রূপের পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে হয়। এই প্রকার বৃত্তি প্রকৃতির দৈনন্দিন বিবর্ত্তনে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাস্তব-রূপের নীতি বদ্‌লাইয়া যায়, জগতের রূপান্তরের সঙ্গে রসের প্রেরণা প্রবর্ত্তিত হয়। এই রস-জ্ঞানের দাবী যে শিল্পীর যত বেশী, তিনি ততোধিক শিবসুন্দরের সত্যস্রষ্টার মহিমায় মণ্ডিত হইবার যোগ্য।

শিল্পিগণ সাধারণতঃ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তাঁহাদের অভিমত, স্বকীয় মনীষা এবং শক্তির জোরেই শিল্প-সাধনায় তাঁহারা সাফল্যের পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু অনেক শিল্পী আজিকে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন শুধু আপনাদের শক্তির তেজে নয়; তাঁহাদের সৌভাগ্য-অর্জ্জিত চিত্র-রূপের আদর্শের (মডেল্) লাবণ্য বা সৌন্দর্য্য তাঁহাদের সাফল্যের প্রধান কারণ।

এই বৎসরের পূর্ব্বভাগে ইটালীর আর্ট যথেষ্ট জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। বত্তিচেল্লি, লিওনারদো, রাফেল্ এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রতিভা সম্পূর্ণ মানিয়া লইলেও যে সকল অনুপম সৌন্দর্য্যশালিনী লাবণ্যময়ী রমণী অঙ্গশোভার বিচিত্র ভঙ্গিমায় ইটালীর শিল্পীদের শিল্প-রচনার উৎস ছিলেন, শিল্পসাফল্যের জন্য শিল্পীরা তাঁহাদের কাছে অত্যধিক পরিমাণে ঋণী।

ইটালীর চিত্রের সহিত তুলনায় হল্যাণ্ড এবং ফ্লাণ্ডারস্‌দেশীয় চিত্রকলার কুমারী, তাপস এবং দেবদূত-মূর্ত্তি সরল এবং সহজ গরিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণ ইটালীর নন্দনকাননে বিচরণ করিতে পছন্দ করে এবং এই নন্দনের অধিষ্ঠাত্রী মানবগণের নিরুপম লাবণ্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য নয়ন দ্বারা উপভোগ করিতে অনেকে সেখানে সমবেত হয়। তথাপি কলা-নিপুণতার প্রত্যেক ব্যাপারে উত্তরদেশের চিত্রশিল্পীরা দক্ষিণ-বিভাগের শিল্পিগণ অপেক্ষা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন। ইটালীয় আর্টের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ সমালোচকের (শ্রীবারণহার্দবেরেণসন) অভিমত,—শিল্পকলার কঠিন-রীতি অনুসারে বিচার করিয়া ইটালীয়দের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র-সম্ভার হল্যাণ্ড-নিবাসী মনীষী শিল্পীদের ছবির পাশাপাশি রাখার কথা আর্টের প্রকৃত শিক্ষার্থীর মনে কখনও উদিত হয় না। কিন্তু শিল্প-রচনা-রীতির কথা ছাড়িয়া দিলে, হল্যাণ্ডের সমগ্র চিত্রশিল্পের মধ্যে এমন একটিও কান্তিমতী তরুণী চোখে পড়ে না, যাহার রূপ-লাবণ্য বেলিনি, লিপ্পি, রাফেল্ এবং ইটালীর অন্য শিল্পীদের অঙ্কিত জননী-রূপিণী কুমারী মেরীর (Madaonna) চিত্রের অপরূপ সৌন্দর্য্য-কান্তির পার্শ্বে ম্লান হইয়া না যায়!

যে সকল অঙ্কিত চিত্র এবং ভাস্কর্য্য সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীত হয় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে (ইটালীর অন্তর্গত) ফ্লোরেন্স নগর সর্ব্বোত্তমা সুন্দরী রমণীগণে এবং অতি সুকুমারদর্শন জনবর্গে অধ্যুষিত ছিল। ফ্লোরেন্সবাসীরা কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের উপাসনাই করিত না, তাহারা সৌন্দর্য্যের অধিকারীর সকল অন্যায় এবং সৌন্দর্য্য-বেত্তা রসিকদেরও অবৈধ সকল বিষয় মার্জ্জনা করিত।

কোন খ্রীষ্টসন্ন্যাসী যদি আপনার ধর্ম্মমন্দির পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সন্ন্যাসিনী-প্রণয়িনীকে পরিণয়-পাশে বাঁধিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত গোপনে পলায়ন করেন, তাহা হইলে এইরূপ বিসদৃশ আচরণ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রাণে আঘাত দেয়, তাহা নিঃসন্দেহ। ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়া ফ্রা লিপ্পো লিপির (Fra Lippo Lippi) কাহিনী কাব্য-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ফ্রা লিপ্পো লিপ্পির পত্নীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধুরী

সন্তানসহ কুমারী মেরী [ফ্রা লিপ্পো-লিপ্পি অঙ্কিত ।

অঙ্কিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতেও তাঁহারা কোন প্রকার মর্ম্মপীড়া বা অযৌক্তিকতার হেতু খুঁজিয়া পান নাই।—ইহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। অতুলন সৌন্দর্য্যই সকল দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া দিয়াছে। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবণ মন পত্নীর অনুপম-রূপ-মাধুরী উপলব্ধি করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই, বরং স্ত্রীর এই সৌন্দর্য্যের অনুপ্রেরণায় স্বামীর অঙ্কিত চিত্রাবলীর লাবণ্য তাঁহাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

এইরূপ মিলনের ফলে একটি কুমার জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম—ফিলিপ্পিনো লিপ্পি (Filippino Lippi)। সেই সন্তানও চিত্রশিল্পী হইয়া উঠেন। তিনি বিশেষভাবে চার্চ্চের জন্য ছবি আঁকিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ন্যাশানাল্ গ্যালারীতে প্রদর্শিত ফিলিপ্পিনো লিপ্পির অপূর্ব্ব চিত্র "অমর্ত্ত্যপূজা" (Angel Adoring) তাঁহার পিতার ন্যায় তাঁহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় দেয়।

ফ্রা লিপ্পো লিপ্পির শিল্পশালায় আর এক জন নূতন শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি তাঁহার গুরুর অপেক্ষা আরও যশস্বী হইবার জন্যই অমর-তুলি ধরিয়াছিলেন; তাঁহার পর হইতে এমন উন্নত সর্ব্বোত্তম সৌন্দর্য্যবোধ নিখিল জগতে অপরিদৃষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এই বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী—চির-যৌবনসম্পন্ন বতিচেল্লি (Botticelli)। তাঁহার শ্রেষ্ঠ ছবি "ভেনাসের জন্ম" ("The Birth of Vennus") ফ্লোরেন্স হইতে সম্প্রতি লণ্ডনে ইটালীয় আর্টের প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং সেই বিচিত্র চিত্রখানি অপরূপ সৌন্দর্য্যগুণে বিশ্বজনীনভাবে গৌরবান্বিত হইয়াছে।

স্বামি-অঙ্কিত কুমারী মেরীর জননীমূর্ত্তিতে চিরন্তনী লাস্যময়ীর রূপ-গৌরবে মহিমান্বিত। বড় বড় অভিজাতগণ এবং বৈষয়িক সওদাগররা এই ধর্ম্মাচারীর নিয়ম-লঙ্ঘন-দোষ সহজভাবেই অগ্রাহ্য করিতে পারেন, ইহা আশা করা যায়। কিন্তু ধর্ম্ম-যাজক-সম্প্রদায়ের প্রভূত সম্মানাস্পদ পুরোহিতবৃন্দ পূর্ব্ব-সন্ন্যাসীর সকল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের চার্চ্চের বেদী-শোভন চিত্র আঁকিবার জন্য তাহাকেই নিয়োজিত করিতে একটুও পশ্চাৎপদ হন নাই। এমন কি, এই সন্ন্যাস-ব্রত-ভঙ্গকারী চিত্রকর সেই পূর্ব্ব-উপাসিকাকে অমরার রাণীরূপে

বত্তিচেল্লি ডিউক্ গুলিআঁত' মেদিশি-র (Giuliancde Medici)—এক জন প্রিয়পাত্রীর অঙ্গে নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার যৌবনের কয়েক দিনমাত্র এই অল্পায়ু রূপসী সাইমনেতা-কে (Simonetta) দেখিবার সুযোগ পান; কিন্তু তবুও এই লাবণ্যাধার রমণীর মুখচ্ছবি এবং অবয়ব-গঠন শিল্পীর অন্তরপটে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল; রূপসীর মৃত্যুর পরেও তাঁহার রূপ-মূর্ত্তি কোনও দিন বত্তিচেল্লির মন হইতে একটুকুও মুছিয়া যায় নাই। সেই ছবি উত্তরোত্তর শশিকলার ন্যায় নব নব জ্যোৎস্নাময়ী কলা-যোগে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত পূর্ণোজ্জ্বল মহিমায় পরিবর্দ্ধমানা ছিল। সাইমনেতার ধ্যানমূর্ত্তি বত্তিচেল্লির চিত্রাঙ্কনে বারবার ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাইমনেতা ছিলেন রূপের অধিষ্ঠাত্রী রাণী, তিনি ফ্লোরেন্সের শিল্পিগণের চোখে কবিতার মোহ-অঞ্জন আঁকিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁহাদের ধ্যানের স্বরূপ। খ্রীষ্ট ১৪৭৫ অব্দের মেদিশির বিখ্যাত ক্রীড়া-সমর-উৎসবে সাইমনেতা শিল্পিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পরবৎসরের (১৪৭৬) এপ্রিল মাসে অকালমৃত্যুতে এই মোহিনী নারীর অনুপম লাবণ্যের স্মৃতিটুকু আরও মধুর, আরও অমৃতময় হইয়া উঠিয়াছিল।

"তন্বী মরালগ্রীবা"—সাইমনেতা বত্তিচেল্লির অঙ্কিত (১৪৭৫) "প্রাইমাভেরা" (Primavera) চিত্রে প্রথম প্রকাশিত হন। পূর্ব্বোক্ত চিত্রে প্রদত্ত তাহার ভঙ্গিমা কিঞ্চিৎ অন্যথা করিয়া এই রূপবতী শিল্পীর ধ্যানলোকের—"বসন্ত" এবং "ফ্লোরা ও ভেনাস্"—মূর্ত্তিকে চিত্রপটে রূপ দিবার প্রেরণা আনিয়া দেন।

খ্রীষ্ট ১৪৭৬ অব্দে বত্তিচেল্লি সাইমনেতার মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন। এই ছবিখানি এখন বার্লিনের কোনও এক ব্যক্তিগত সংগ্রহ-সম্পত্তির মধ্যে রহিয়াছে। ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পী সাইমনেতাকে মহিমময়ী জননী মেরী (The Madonna of the Magnificat) রূপে চিত্রিত করেন। ১৪৮৬-তে অঙ্কিত বত্তিচেল্লির "মার্স্ ও ভেনাস্"—চিত্রে—সাইমনেতা ভেনাস্ ও তাঁহার প্রণয়ী গুলিয়াঁ মার্সরূপে অঙ্কিত। এই মোহিনীর কলার সৌন্দর্য্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ইহার পরবৎসরে "ভেনাসের জন্ম" (Birth of Venus) চিত্রখানি প্রকাশ করেন। ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই নিরুপমার নগ্ন-তনুর লাবণ্যের প্রেরণায় "অখ্যাতির মূর্ত্তি" (The calumny)—ছবিতে "সত্য-রূপ" মূর্ত্তি [illegible] প্রয়াস পান। সাইমনেতা যে সকল চিত্রে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা সংখ্যায় অল্প হইলেও, বত্তিচেল্লির আঁকিত পূর্ব্বোক্ত ছবিগুলিই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়, বত্তিচেল্লি এই অনুপমা কামিনীর জীবদ্দশায় শুধু মাত্র মুখের ছবি নয়, তাঁহার অঙ্গ ও তনুর আকৃতি অগণিতবার অনুধ্যান করিয়াছিলেন।

বিগত বসন্তে রয়্যাল অ্যাকাডেমীর সুবৃহৎ গ্যালারীতে বত্তিচেল্লির "ভেনাস"—চিত্রটি সহস্রকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল। এই রমণীয় ছবিখানির সৌন্দর্য্য যাঁহাদের হৃদয়-স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই ইহার অন্তরলোকে কারুণ্য ও বিষাদের যে ক্ষীণ সুর উঠিতেছে, তাহা অনবিস্তর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

"সুন্দর অপেক্ষা সুন্দরতর বিষণ্ণতা"র এই অনুভাবনা অতি সহজেই বোধগম্য, এই কম-কান্তি ছবিখানি বিষাদ-গাথার সুরে রচিত। কবিপ্রাণ চিত্রকরের গোপন দেশে সাইমনেতার সৌন্দর্য্য, তাঁহার জীবন ও তাঁহার অদৃষ্টের যে বিষণ্ণ গীতা সৃষ্ট হইয়াছিল, সে সকলের রূপ মোহন তূলিকা-রঞ্জনে চিত্রপটে প্রকাশ পাইয়াছে।

সাইমনেতার জনক-জননী জেনোয়া-নিবাসী ছিলেন। সাইমনেতা সমুদ্রতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র পল্লী ভেনেয়াঁ বন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। এই বন্দরটি বর্ত্তমান স্পেৎসিয়ার নৌবিভাগের রাজকীয় অস্ত্রশালা হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নয়। পুরাণ-কাহিনী অনুসারে এই স্থানেই সাগরফেনপুঞ্জসম্ভূতা ভেনাস্ আফ্রোদাইত (Venes Aphrodite) প্রথম-তীরবর্ত্তিনী হন। সেই জন্য এই পল্লীর নাম "ভেনাস বন্দর" (Porto venere)।

শিল্পী সাইমনেতাকে "ভেনাসের জন্ম"-চিত্রে প্রধানা নায়িকারূপে উজ্জ্বল বর্ণে আঁকিয়াছেন, ইহার অপেক্ষা প্রিয়তমা আদর্শ-মূর্ত্তিকে রূপে-রসে ফুটাইয়া তোলার আর কি ন্যায়সিদ্ধ সহজাত সুন্দরতর ভাব ও চরিত্র থাকিতে পারে যে, শিল্পী কত অমিত-লাবণ্যধার চিত্রের স্রষ্টা, সেগুলিকে দূরে সরাইয়া এই একটিমাত্র রচনার এতখানি জয়জয়কার ঘোষণা করা বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু বত্তিচেল্লি

তাঁহার চিত্ররূপের আদর্শ সাইমনেতাকে অনমুকরণীয় অনবদ্য ভঙ্গীতে প্রতিষ্ঠান্বিত করিয়া গিয়াছেন,—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

বত্তিচেল্লি অন্যান্য সুন্দরী রমণীকে চিত্ররূপের আদর্শ করিয়া বহু আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। তন্মধ্যে লিউক্রেজিয়া তোরনাবুঁই (Lucrezia de Tornabuoni) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লুভ্‌র (Louvre) সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীর-গাত্রাঙ্কন-চিত্রগুলিতে এই ললিতার আবির্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সাইমনেতা বত্তিচেল্লির সারাজীবন ব্যাপিয়া কল্পনারাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী কলালক্ষ্মীরূপে চির-অম্লান বিরাজমানা ছিলেন, সেই হেতু তাঁহার অধিকাংশ অঙ্কনকার্য্যের সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে—

একখানি মুখ উঁকি মারে
তাঁর সব আলেখ্য হ'তে ;
একটি ললিতা মূর্ত্তির চলা-বসা-হেলা
নানামতে।

ইংরাজ-মহিলা-কবি ক্রীস্‌চিনা রসেটির এই পংক্তিগুলি হইতে মনে পড়ে যে, এক জন রমণী তাঁহার ভ্রাতা ড্যান্‌টে গাব্রিএল্ রসেটির চিত্রাঙ্কনে কত দূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল! তিনি এলীনের সিড্যালএর (Eleanor Siddal) অবয়বে নারী-সৌন্দর্য্যের প্রথম আদর্শ-সন্ধান পাইয়াছিলেন। পরে এই আদর্শ রূপসীকেই তিনি ভার্য্যারূপে বরণ করেন। কুমারী সিড্যাল শেফিল্‌ডের এক কর্ম্মকারের কন্যা ছিলেন ; তাঁহার পিতা উত্তরকালে নিউইংটন বাট্‌স্‌এ বাস করিতে আসেন। সেই সময় এই কুমারী সপ্তদশী রসেটির বন্ধু ওয়াল্‌টার ডেভেরেল-এর অঙ্কন-কার্য্যের সময় তন্বুলতার নানা ভঙ্গীতে বসিতে আরম্ভ করেন। শিল্পী ডেভেরেল কুমারীকে লিশেস্‌টার স্কয়ারের সন্নিহিত একটি স্ত্রীলোকের পোষাক-পরিচ্ছদ-প্রস্তুতকারীর দোকানে আবিষ্কার করেন।

সেক্সপীয়রের "দ্বাদশতম রজনী" (Twelfth Night) নাট্যগ্রন্থ হইতে ছবি আঁকিবার কালে তিনি "ভায়ওলা" (Viola) চরিত্রের রূপ পটে ফুটাইবার জন্য সিড্যালকে আমন্ত্রিত করেন। দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক রসেটি উক্ত চিত্রে ভাঁড়-চরিত্রের উপযোগী ভঙ্গী প্রদান করিয়াছিলেন। ডেভেরেলের চিত্রাগারে প্রেরণার উৎস এই দুই তরুণ-তরুণী পরস্পর প্রেমে বদ্ধ হন, ন্যূনাধিক এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা প্রণয়াবদ্ধ হইলেও, নবম বর্ষের পূর্ব্বে (১৮৬০) তাঁহাদের পরিণয় সম্পন্ন হয় নাই।

"বিবাহ-ভোজন-সভায় ড্যান্টের প্রণতি-অমান্যকারিণী বিএট্রিস্"—আখ্যাত রসেটির অঙ্কিত চিত্রে সিড্যালের প্রথম প্রকাশ ; এবং তাহার পর হইতে তাঁহাকে ড্যান্টে-সম্পর্কীয় সকল আলেখ্যে আদর্শ নায়িকারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহার "পেওলো ও ফ্রান্‌সেসকা" (Paolo & Francesca) খ্যাত ত্রিপত্র চিত্রফলকে ফ্রান্‌সেস্‌কা-মূর্ত্তি কুমারীর রূপ-লাবণ্যের অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। এই সুষমাময়ী তৎকালীন চিত্রাবলীতে সমস্ত প্রধান স্ত্রী-চরিত্রের আদর্শ-রূপিণী বলিয়া বরণীয়া হইয়াছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী এই প্রণয়-বন্ধনের পর রসেটি ও সিড্যালের বিবাহিত জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং বিষাদ-শোচনার পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। বিবাহের মাত্র দুই বৎসর পরেই (১৮৬২) স্বভাব-ভঙ্গুর-বপু এলীনর্ মৃত্যুমুখে পতিত হন। শোকাহত শিল্পী দুঃখের আতিশয্যে কিছু দিন তুলি ধরিতে পারেন নাই। প্রায় বৎসরাধিককাল পরে তিনি আপনার অন্তরের বেদনা প্রশমিত করিবার অভিপ্রায়ে তুলিকার রেখায়-রেখায় পূর্ব্বস্মৃতি "বিয়েটা বিয়েট্রিক্স" (Beata Beatrix) চিত্রে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। এই চিরস্মরণীয় আলেখ্য-কবিতাখানি টেট্ গ্যালারীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ইহা মূক, কিন্তু এই মূকচিত্রে কবি-চিত্রশিল্পীর অন্তরতমার বিয়োগ-ব্যথাতুর প্রাণের শত ভাষা নিগূঢ়তমভাবে অভিব্যক্ত।

রমণী যে কেবলমাত্র চিত্রকরকে রূপে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, তাহা নহে, এই নারীই সমগ্র দেশের বা যুগের আর্টের সম্পূর্ণ নূতন গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। রাজা পঞ্চদশ লুই-এর প্রিয়ভাগিনী যশস্বিনী মাদাম্ দ্য' পম্‌পাদর্ (Madame-de Pompadour) অপরাপর বিষয়ে কতিপয় ত্রুটি সত্ত্বেও অনিন্দ্যরুচি-সম্পন্না মহিলা ছিলেন। তাঁহার বরতনুর যেমন কমনীয় রূপ ছিল, তিনি তেমনই আপনার চারিধার সৌন্দর্য্য দিয়া ঘিরিয়া রাখিতেন। তিনি এতদূর বিলাসপ্রিয়া সৌখীনা ছিলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীদেশীয় আস্‌বাবপত্র এবং গৃহাভ্যন্তর-সজ্জার ক্রমোন্নতি প্রভূতভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া তোলেন।

কি রঙ্ কোন্‌খানে মানাইত, এ জ্ঞান তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল ; এবং সেই কারণেই তাঁহার ঘরের শয্যার এবং

বিয়েটা বিয়েটিক্স [রসেটির অঙ্কিত।

ফরাসী দেশে, তৎপরে সমগ্র য়ুরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

বুশে এক ক্ষুদ্র চিত্রকর ছিলেন; তাঁহার পৃষ্ঠপোষিকা (ওয়ালেস্ সংগৃহীত) "মাদাম্ দ্য' পম্পাদর্"-এর আলেখ্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি শুধু চিত্র-শিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রখ্যাতনামা গৃহ-মণ্ডনকারু-শিল্পী এবং উঁচু দরের পরিকল্পনাবিৎ। বহুবর্ষ যাবৎ তাঁহার উপর রাজকীয় বিভিন্ন চিত্র-সমন্বিত তিরস্করণী-রচনা-কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল; প্রথমে বোভেঁ (Beauvais) এবং পরিশেষে প্যারীর মধ্যবর্ত্তী গবেলিঁতে (Gobelins) (১৭৫৫-৬৫)। মাদম্ দ্য' পম্পাদরের সহানুভূতিতে সাহস ও উৎসাহ পাইয়া বুশে' রঞ্জক ও তন্তুবায়দের প্রাচীন প্রচলিত অতি সাধারণ নিম্ন-রুচির প্রগাঢ় রঙের কল্পনা ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিজের রঙদানীর নয়নানন্দন উচ্চ ধাঁচের পদ্ধতি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কার্য্যের অন্তরে অন্তরে নব-পথ-যাত্রীরা অত্যন্ত

প্রত্যেক পর্দ্দার ও আবরণের ঝালরে স্বীয় রুচিসঙ্গত বিচিত্র রঙের সমাবেশ ঘটাইতেন। রাজেন্দ্রাণীর ন্যায় সুন্দরী, রাজসভার সর্ব্বশক্তিশালিনী এই নারী যে কোনও অবস্থায় নির্ব্বিবাদে আপনার জিদ্ বজায় রাখিতেন। তিনি শুভাদৃষ্টক্রমে শিল্পী ফ্রাঁশোয়াবুশের (Froncois Boucher) মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পান। এই কলাবতী কামিনীর 'রঙে'র সম্বন্ধে চিন্তা-ধারার সহিত শিল্পীর ভাবনার মিলন ঘটিয়াছিল। এই প্রতিভাশালী শিল্পী সুন্দরীর স্বপ্ন-সাধ স্বচ্ছন্দলীলায় বাস্তবে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। বুশে এবং মাদাম্ দ্য' পম্পাদর-এর অন্তরেই অন্দর বিভূষিত করিবার জন্য নব নব পরিকল্পনা জাগ্রত হয়। এই অভূতপূর্ব্ব রুচির পরিবর্ত্তন সর্ব্বপ্রথমে

বাধা-বিপত্তি প্রাপ্ত হন। সে সকল নব আবিষ্কৃত বিচিত্র রঙ্ দিনের-দিন পরিম্লান হইয়া যাইবে—এইরূপ আশঙ্কাও জাগিয়াছিল। কয়েক জন দুর্বিনীত কারিগর বুশের নূতন অনুজ্ঞা অমান্য করিয়া কার্য্যশালা পরিত্যাগ করে। তবুও বুশে অটল। রাজসভা এবং জনসমাজ শিল্পীর নূতন ললিত রং ফলাইবার রীতি অনুমোদন করিতে দ্বিধা করে না; এবং সেই কারণে অল্প আয়াসেই এই নববিধান কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। রং লাগাইবার পুরাতন পদ্ধতি বিসর্জ্জন দিয়া অনেক শিল্পী নূতন রীতিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। এই নব-নীতির নাম—লা ডেকরেশিঁয়ো ক্লেয়ার (La Decoration Claira)—অর্থাৎ উজ্জ্বল চিত্র-ভূষা।

ভেনাসের জন্ম

বসুমতী ব্লক-বিভাগ। [সাঁদ্রো বাতিচেল্লি অঙ্কিত।

গোপ-রমণী

বসুমতী ব্লক-বিভাগ]   [জাঁ বাপতিস গ্রিয়ুজ অঙ্কিত।

এইরূপ গবেলি'র সুবিখ্যাত তিরস্করণী চিত্রে প্রথম-প্রচলিত কোমল নীল ও হরিৎ গোলাপী লাল এবং ঈষৎ গোলাপীবর্ণের উজ্জ্বল ধূসর-বর্ণ (Done grey) সর্ব্বসাধারণের নয়ন-মুগ্ধকর হইয়া উঠে। বুশে ইতঃপূর্ব্বে এই সকল বর্ণ-সম্পাতে বিচিত্র আলেখ্য এবং সমালঙ্কৃত চিত্র অঙ্কিত করেন। সকলেই বুশের আঁকা ছবিগুলির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেই সকল চিত্র ঘরের প্রাচীর-গাত্র-লগ্ন কিংবা চেয়ারের শোভা-আবরণরূপে ব্যবহার করিতে অভিলাষী হন। মাদাম্ দ্য' পম্পাদরের প্রিয় সমস্ত রং য়ুরোপ-ময় ছড়াইয়া পড়ে, কারণ, এই রংগুলির সহিত তৎকালীন প্রমোদোৎসব আড়ম্বর এবং সময়ের প্রকৃতির সুন্দর যোগ-সাধন ঘটিয়াছিল। উত্তর-বিভাগে ষ্টক্‌হলম্-এর সুইডেন্ রাজসভায় এবং ফরাসীদেশের অভিজাতদের নিকট রঙের নব-উদ্ভাবিত বিচিত্র উজ্জ্বলতা প্রীতির কারণ হইয়া উঠে। উত্তর-জার্ম্মাণী এবং সেণ্টপিটার্স-বার্গে, রাশিয়ার রাজসভাতে এই সকল রঙের প্রভাব বিস্তার-লাভ করিতে থাকে।

ইটালী-প্রত্যাগত সার যশুয়া রেণল্ডস্ ভেনিস-সম্পর্কিত চিত্রাঙ্কনে সুস্পষ্ট এবং গাঢ়তর রং প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ড সাধারণতঃ পম্পাদর্-প্রচলিত রং-গুলির প্রয়োগ-মায়া পরিবর্জ্জিত করিতে পারে নাই। তখনও পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্ টমাস্ গেন্স্‌বরো ফরাসী-দেশ-কাঙ্ক্ষিত ঈষৎ-রঞ্জন অথচ উজ্জ্বল রংগুলি অবিচলিতভাবে চালাইয়া আসিতেছিলেন।

যদি ক্ষমতাবান্ নৃপতি সহায় থাকেন, এবং প্রতিভাশালী শিল্পী যদি সৌখীন-মনের বিচিত্র অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে নারীর খেয়াল অবলম্বনে বহু বস্তু সৃষ্টি করা যায়। "মাদাম্ দ্য' পম্পাদরের আলেখ্য" ব্যতীত সুন্দর কোমল রঙে রঞ্জিত চিত্র-অলঙ্কার-সমন্বিত তিরস্করণী-কার্য্যের বহু দৃষ্টান্ত আছে, এবং সেগুলি বুশে-র পরিচালনায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। হার্‌ফোর্ড-সৌধে ওয়ালেস্ সংগ্রহে ইহাদের সন্ধান মিলিতে পারে।

বুশে আপনার উৎফুল্ল প্রকৃতি অনুসারে পঞ্চদশ লুই-এর রাজদরবারের বাহ্য আড়ম্বরকে ভাবমূর্ত্তি দান করেন; ইহাতে তাঁহার রুচি ও মনীষার অনুকূল পথ মিলিয়াছিল। তদনুরূপ আরও বিদ্রোহি-মতাবলম্বী তীব্রপ্রকৃতি স্পেনীয় চিত্রকর গোয়িয়া (Goya) পিরানিজ্-এর দক্ষিণে অবস্থিত পরবর্ত্তী বোর্‌বোঁদের (Bourbons) রাজসভায় সম্পূর্ণ অন্য ধরণের প্রেরণা পাইয়াছিলেন। সচরাচর দেখা যায়, শিল্পিগণ তাঁহাদের অন্তরের প্রিয়জন, বস্তু ও স্থান আঁকিবার সময় আপনার পূর্ণ-শক্তির বিকাশ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু এ প্রথারও ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন—কৌতুক-চিত্র-শিল্পী গোয়িয়া (Goya)। যাহা তিনি ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেন, যাহা তিনি অরুচিকর বলিয়া মনে করিতেন, মনে হয়—সেই সকল চিত্র আঁকিবার সময় তাঁহার প্রতিভার তেজোরশ্মি সর্ব্বোচ্চ সীমায় পৌছিয়াছিল।

গোয়িয়া সর্ব্বতোভাবে এক জন ব্যঙ্গ-রস-রসিক চিত্রকর ছিলেন। তাঁহার মর্ম্মন্তুদ বিদ্রূপ-রস-সিক্ত তুলির মুখে উপকরণ যোগাইয়াছিল—চতুর্থ চার্‌লস্ এবং তদীয় ঘৃণিতা সহচরীর মূর্ত্তি। গোয়িয়ার মত কোনও শিল্পী চিত্রের রেখায় এরূপ তীব্রস্বরে রাজশক্তির প্রতি আপনার ঘৃণা প্রকাশ করে নাই। তথাপি গোয়িয়ার এতদূর কৌশল ছিল, তাঁহার ছবির রঙের মাধুরী এমনই চিত্ত-বিমোহন ছিল, এবং তাঁহার কৌতুকাবহ বিদ্বেষ-পরায়ণতা এমন সূক্ষ্ম নিপুণ-সূত্রে গ্রথিত ছিল যে—তাঁহার চিত্রের আদর্শ-রূপে চতুর্থ চার্‌লস্ ও তাঁহার সহচরী অঙ্কন-কালে বসিলেও তাঁহারা কখনও শিল্পীর আকার-ব্যঙ্গের কোনও অভিব্যক্তি খুঁজিয়া পাইতেন না। নেপোলিয়নের যুগের সদাচারভ্রষ্ট ও অধঃপতিত স্পেনীয় রাজসভায় কাহারও কৌতুক-হাস্যের তীক্ষ্ণ তীরধার অনুভব করিবার মত-ও বুদ্ধি ছিল না। এই রাজদরবারের জনগণ অত্যধিক দাম্ভিক ছিলেন, তাঁহাদের শক্তি ও চরিত্র সম্বন্ধে কেহ কখনও মন্দ ধারণা পোষণ করিতে পারে,—এ বিষয় একবারেই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। গোয়িয়া রাজসভার এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য হাসিয়া খেলিয়া অত্যন্ত প্রমোদ-কৌতুকের সহিত অথচ সম্পূর্ণ নিরাপদে রাজ-চিত্রশিল্পিরূপে আপনার শক্তি কার্য্যকরী করিবার সুবর্ণ-সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি রাজা চতুর্থ চার্‌লসের জড় অক্ষমতা, রাণী মেরিয়া লুইসার নির্লজ্জ স্বৈরাচার, রাজপুত্রের নীচ পরশ্রী-কাতরতা ও কৃতঘ্নতা, এবং প্রধান মন্ত্রী গ'দয়ির (Godoy) হীন অযোগ্যতা প্রভৃতির চিত্রগুলি অনাগত যুগের জন্য তাঁহার নির্ম্মম-লেখ্য-নিচয়ে নিখুঁত তুলির টানে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গোয়িয়া রাজ-সভার গণ্ডীর ভিতর কোনও ব্যক্তিকে যে প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রদ্ধা করিতেন, এমন কথা বিশেষ সন্দেহজনক,

বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁহার চিত্রের সকল আদর্শ-রূপকেই বোধ হয় ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেন না। আল্‌ভার ডাচেস্ (Duchess of Alva) খুব মহীয়সী রমণী না হইলেও গোয়িয়ার মানিত প্রথার ব্যতিরেক, তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। গোয়িয়া অঙ্কিত ডাচেসের দুইখানি শোফায় শায়িত পূর্ণ প্রতিচিত্র "সুবেশা ডাচেস্" (The Duchess Draped) এবং "বিবেশা ডাচেস্" (The Duchess undraped) মাদ্রিদের রস-পিপাসু সৌখীন অভিজাতদের মনে বিষম কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিল। পূর্ব্বনাম্নী ছবিটিতে—ডাচেসের গাত্র-লগ্ন পোষাক-পরিচ্ছদ এতদূর পাতলা, এবং তাঁহার তনুর সহিত এই বেশ-ভূষার এমনই অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছিল যে, এই চিত্র-রূপের বাস্তব মূর্ত্তি (ডাচেস) বেশ-সত্বেও নগ্ন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। অপর চিত্রখানিতে ঐ একই ভঙ্গিমায় এই অপরূপা বরবর্ণিনীর উলঙ্গ তনুলতার কমনীয় সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইয়াছে। প্রথম আলেখ্য আল্‌ভার ডিউকের তাগিদে চিত্রিত হইয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয়টি শিল্পী ও চিত্ররূপ আদর্শের (ডাচেস্) মধ্যে গোপন কবিতার মত ছিল। কিম্বদন্তী—যখন ডাচেসের স্বামী সেই ডিউক্ গোয়িয়ার চিত্রাগারে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইতেন, সেই সময় এই ছবিখানি অতি সত্বর লুকাইয়া ফেলা হইত।

শিল্পী গোয়িয়া অসংখ্য অভিজাতা-রমণীদের সহিত মধুর সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন, এবং বর্ণিত ডাচেস্ ছিলেন সেই বহুর মধ্যে এক জন বিশেষ আদরের পাত্রী। তিনি অতিরিক্ত তীক্ষ্ণধী হইয়াও মাদ্রিদের কলুষিত সমাজ হইতে নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিতে চান নাই। তিনি তদানীন্তন প্রবহমান কালের সহিত গা' ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। গোয়িয়ার পূর্ব্বকথিত এই সকল সুনিপুণতার ছবি ব্যতীত সমর-সম্পর্কিত অনেক অঙ্কিত এবং ধাতুফলকে উৎকীর্ণ চিত্র তাঁহার যশঃসম্বন্ধে দৃঢ়তর প্রত্যয় আনিয়া দেয়। ফরাসী অভিযানের পর যৌন-বস্তু ভিন্ন তিনি সমধিক উচ্চবিষয়ের ছবি ও ফলকোৎকীর্ণ লেখ্য রচনা করিবার উপাদান পাইয়াছিলেন। এই কৌতুক-রস-শিল্পী কাগজে ও পর্দ্দার উপর অনুরাগ-রঞ্জিত-তুলিকাপাতে 'সমর-বিপ্লবে'র জন্য তাঁহার অশান্ত বিস্ময়ের অনুভাবনা ও বিরক্তি অমর-ছন্দে রেখাঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। যশস্বী শিল্পী গোয়িয়া পরিণত-বয়সে আপন কর্ম্মোপযোগী মনীষার যথারীতি বিকাশসাধন করিতে সমর্থ হন।

চিত্ররূপের আদর্শ (model) রূপসীরা বহু শিল্পীর আর্ট ও জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, সেই প্রভাব অনেক সময়ে শিল্পীর পক্ষে শুভকর হইয়া উঠে না। যদিচ জাঁ-বেপ্‌তিসৎ গ্রাজ (Jean Baptiste Greuze) শিল্পী হিসাবে খুব জনপ্রিয় হন, তথাপি ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না যে, তিনি যদি তাঁহার পরিশেষে পরিণীতা সুন্দরী তরুণীটির সাক্ষাৎ না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার শিল্প সাধনশক্তি অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারিত। কারণ, এই ছবিনীতা কামিনীর অর্থলোলুপতার পাকে পাকে তাঁহার পরিপূর্ণ ক্ষমতা নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "গোপ-রমণী" (The milk-maid) চিত্রের বিনম্রা, তরুণী, "উর্দ্ধদৃষ্টি বালা" (Girl looking up) চিত্রের দোষ-লেশহীনা মধুরিকা কিশোরী, "কপোত-হস্তা-বালিকা" (Girl with Doves) চিত্রের মোহিনীর সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে কোন্ জন তাঁহার মনের পঙ্কিলতার কাহিনী বিশ্বাস করিবে? যাঁহার রূপের আদর্শ লইয়া বাল্য-জীবনের অকৃত্রিম ছবি বিবিধ আলেখ্যে প্রোজ্জ্বল মহিমায় ঝল-মল,—যে নয়ননন্দিনীর অনুপ্রেরণায় এই সকল আদৃত সুন্দর চিত্র রচিত হইয়াছিল সেই অনুপমা নারীকে প্রচলিত ভাষায় স্বর্ণ-লোলুপা স্বৈরিণী ভিন্ন অন্য কোনও আখ্যায় অভিহিত করা যায় না।

কোয় দে অগাস্তিঁর (Quai des Augustius) এক জন পুরাতন গ্রন্থবিক্রেতার এই চঞ্চলমতি দুহিতাটি কিশোরী বয়সেই সেই অঞ্চলের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গ্রাজ (Greuze) রমণী-রঞ্জক নাগরিকবৃত্তি দ্বারা সাময়িক আবেগ-প্রণোদিত হইয়া উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরীর সুনাম রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নানারূপে নানাবেশে তিনি তাঁহার কান্তার অগণিত চিত্র প্রকাশ করেন। শিল্পীর মোহন তুলির স্পর্শের গুণে এই প্রিয়দর্শনা বনিতা সেই সময়ের সুন্দরী-প্রধানাদের মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ রূপসী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই শিল্পি-পত্নী অসতীত্বের জন্য তাঁহার স্বামীর অত্যন্ত মর্ম্মপীড়ার কারণ হইয়া উঠেন; এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার সঞ্চিত প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে নিঃস্ব নিঃসম্বল করিয়া তোলেন। গ্রাজ জীবদ্দশায় জনপ্রিয় ও যশস্বী হইয়াও এই দুষ্ট ললনার অশান্তিপূর্ণ প্রতিপত্তি ও জঘন্য প্রতারণায়

এম্যা হ্যামিলটন [জর্জ্জ রম্‌নি অঙ্কিত]

তিনি বহুবিধ কল্পনা-চিত্রের আদর্শরূপে এম্যা-কে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গের সুষমা ও অচ্ছেদ্য বরণীয় ব্যক্তিত্ব একসুরে বাঁধা ছিল; এবং এই কারণেই শিল্পী রম্‌নি এই আদর্শ রূপ গ্রহণ করিয়া অল্প-কালের মধ্যেই যশের শিখরে উঠিতে সমর্থ হন। তিনি দুর্ব্যবহারে জর্জ্জরিতা এম্যার অপ্রসিদ্ধির সময় হইতেই তাঁহার প্রতিরূপ আঁকিতে আরম্ভ করেন। কৃতজ্ঞতাপরায়ণা এম্যা (লেডী হ্যামিল্‌টন্ বলিয়া খ্যাত) যে সকল উন্নত সমাজে বিচরণ করিতেন, সমস্ত স্থানেই রম্‌নির সদুদ্দেশ্য ও স্বার্থ পূরাইবার জন্য সুবিধামত আয়াস-স্বীকার করিতে ত্রুটি করেন নাই।

শিল্পিগণের নীতি সম্বন্ধে চিরকাল মিথ্যা ও প্রায়শঃ ভিত্তি-হীন অভিযোগ শোনা যায়; কারণ, তাঁহাদের কার্য্য সদাসর্ব্বদা সুন্দরী তরুণীদের লইয়া; তাই অনেকেই এ অপবাদ দিতে সাহসী হন। কিন্তু চিত্রাঙ্কনের ইতিহাসে অনেক প্রথিতযশা শিল্পি-মনীষীর পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে,তাহা পাঠে জানা যায়, তাঁহারা পত্নীর রূপ-আদর্শে অনু-প্রাণিত হইয়া শিল্প-সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রেম্‌ব্রান্ত (Rembrandt) যে তরুণীদের ছবি তুলিকা-রঞ্জনে পটে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার প্রথমা ও দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন। শিল্পীর দ্বিতীয় ভার্য্যা হেনড্রিক্‌সে ষ্টফেল্‌স্ (Hendrickje Stoffels) নীচকুলোদ্ভবা হইলেও স্বামীর চিরসহচরীরূপে সহধর্ম্মিণীর অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, এবং রেম্‌ব্রান্তএর অঙ্কিত অতি মনোহর স্ত্রীগণের

ফলে হতভাগ্য শিল্পীকে নিতান্ত দারিদ্র্য-দুঃখে জীবনের শেষ যবনিকা টানিয়া দিতে হয়।

গ্রুজের ন্যায় রম্‌নিও (Romney) চিরদিন প্রকৃতরূপে একটিমাত্র আদর্শ হইতে অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। তাঁহার চিত্র-রূপের আদর্শ বরাঙ্গনা "এম্যা হ্যামিল্‌টন"এর (Emma Hamilton)। অতি বড় বৈরীরও অভিমত যে, এই রূপসী চিরদিন শিল্পীর সহায় ও সুখস্বরূপ হইয়াছিলেন। রম্‌নি তাঁহার কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন করেন। ইহা ছাড়া

শিল্পী ও তাঁহার কন্যা [ভিক্টি লোত্র' অঙ্কিত।

অলোকসামান্য প্রতিভা শুধুমাত্র গার্হস্থ্য-চিত্র অঙ্কনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী ইসাবেলা ব্রাণ্ট-এর চিত্ররূপ শিল্পীর পূর্ব্বরচনার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; এবং পরিণতবয়সে অঙ্কিত তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী হেলেন্ ফুর্‌মেন্ত এবং তাঁহার ভগিনী সুসানি ফুর্‌মেন্ত্-এর প্রতিকৃতি ছবিগুলি শিল্পীর দলের চির-গৌরবময় সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান যুগেও সার্ জন্ লেভারী (John Lavery R. A), সার্ উইলিয়াম্ অরপেন্ (William Orpen, R. A.), ওয়াল্টার রাসেল্ (Walter Russell R. A) প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের কান্তাদের রূপ আদর্শ করিয়া বহু সুন্দর আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলের মধ্যে জেরাল্‌ড্ কেলির (Gerald. Kelly, R. A.) গার্হস্থ্য-চিত্রখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। রাজকীয় ললিত-কলানুশীলন-সংসদের মধ্যে এই শিল্পী তাঁহার স্ত্রীকে আদর্শ করিয়া বিগত গ্রীষ্মকালের মধ্যে উনত্রিংশৎবার চিত্র রচনা করিয়াছেন। "উনত্রিংশত্তমা জেন্" (Jane XXIX) নামে ছবিখানি ১৯২৯এর রয়্যাল্ অ্যাকাডেমীতে প্রদর্শিত হয়, ইহা শিল্পীর শক্তির বহুমুখীনতা এবং অরুপণ-রস-নির্ঝর তুলির মহিমা ও তাঁহার আর্ট-রীতির প্রতিষ্ঠা প্রতিপাদিত করিয়া দিয়াছে।

প্রতিচিত্রগুলির প্রেরণার উৎস ছিল—এই মহতী নারী। ইটালীর কান্তাদের তুল্য রূপকান্তি বোধ হয় ইফেল্‌দ্-এর ছিল না। কিন্তু রেন্‌ব্রান্ত তাঁহার আলেখ্যে চারিত্র্য-গরিমা ফুটাইয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে তুলি ধরিয়াছিলেন! পৌরাণিক চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া কমনীয় অঙ্গশোভার পূর্ণ পরিপুষ্টি সাধন করা তাঁহার অভিলষিত ছিল না।

শিল্পী রুবেন্‌স্ও (Rubens) দুইবার পরিণীত হন। অজস্ররূপে বহুবিধ চিত্র রচনা করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অঙ্কবিষয়ক সুন্দরতর ও জন-উপভোগ্য ছবি আঁকিয়া প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা দূরে ঠেলিয়া তিনি তাঁহার

প্রায় সমস্ত শিল্পীই তাঁহাদের চিত্ররূপের আদর্শের নিকট হইতে প্রেরণা প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্পসংখ্যক শিল্পীই তাঁহাদের নির্ব্বাচিত আদর্শ মূর্ত্তিমতীকে প্রসিদ্ধির গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারেন। আধুনিক কালের শিল্পী অগাস্টাস্ জন্ (Augustus John) এবং জেকব এপ্‌ষ্টিন্ (Jacob

Apsten) উভয়েই তাঁহাদের চিত্ররূপের আদর্শ-প্রতিমাকে শিল্পসমাজে যশস্বিনী করিয়া তুলিয়াছেন। কুমারী লিলীয়্যান্ শেলী জন্ এবং এপষ্টীন, এমন কি, অন্যান্য শিল্পীও চিত্রাগারে আদর্শরূপে বসিয়াছিলেন। এই ললামকান্তি রূপবতীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি বর্ত্তমানকালে প্রত্যেক রসিক রূপস্রষ্টার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। "মেরী ব্রাগাণ্ট" উপন্যাস-রচয়িত্রী কুমারী শেলী মাত্র সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী নন, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। এখন শিল্পিসমাজে তাঁহার যশ-জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

নারী শিল্পীদের প্রায় অনেক সময়েই প্রেরণা দিবার মত আদর্শ মূর্ত্তি-নির্ব্বাচনে বহুশত অনিবার্য্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই অসম্পাদ্য সমস্যার অপূর্ব্ব সমাধান করিয়াছেন—এক জন মহিলা চিত্রশিল্পী। এই বিজয়িনী রমণী ছিলেন ফরাসী শিল্পী শ্রীমতী ভিজিল্যাব্রুঁ (Mme Vigle le Brun)। তিনি আপন দুহিতার প্রতি ভালবাসার অন্তরে তাঁহার শিল্পসাধনার আদর্শ-বস্তুর সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার অভিরাম দান—"শিল্পী ও তাঁহার কন্যা" (The Painter of Her Daughter) চিত্রখানি লুভেঁর (Louvre) সুবিখ্যাত জনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম। এই চিত্রটি দেখিলে রূপ-আদর্শের (model) মহিমা ও প্রয়োজনীয়তা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। চিত্রবিদ্যায় নিয়মিত শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু যে সৌন্দর্য্য শিল্পীর সাধনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে, যে মোহন রূপের মধ্যে শিল্পী সত্য ও শিবের সন্ধান পায়, যে রূপ-মহিমা তাঁহার চিরদিনের তপস্যাকে চিন্ময় মূর্ত্তিতে অমর করিয়া তুলিতে পারে, সেই শিল্পীর ধ্যানের চিরসুন্দর যে চির-আনন্দের সত্তা, এ কথা কোনও যুগে কোনও কালে কোনও দেশে অস্বীকৃত হয় নাই। শিল্পী আপনার সৃষ্টির 'পরে আপন ব্যক্তিত্ব চিরাঙ্কিত করিয়াছেন, এই সত্য প্রকাশের জন্যই প্রতি আর্টের রচনা ইহার স্রষ্টার মনোজগতের সম্পত্তি।

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

মায়ের খোকা

খোকা আমার! খোকা আমার মাণিক-দহের পদ্মকলি!
আমার হিয়ার পদ্মকোষে প্রভাত-আলোয় উঠ্‌লে জ্বলি'।
কোন স্বপনে সুপ্ত ছিলে অচিন্ মায়ের শীতল কোলে?
ঘুম ভাঙ্গা আজ নয়ন মেলে' দুলছ ধরার নাচের দোলে।

নিশীথ-রাতের ঝর্ণাধারা, আপন সুরে আত্মহারা,—
ব্যাকুল বেগে তেম্নি ধারা এলে ছুটে স্রোতের পারা।
মহাকালের মণ্ডপে নাচ্, ঐ যে বাজে ঋতুর ঘুঙুর।
তারই সুরে বাজে তোমার ছন্দ-ভরা পায়ের নূপুর।

অসীম কালের শিশু ওরে মায়ের স্নেহের কোমল ডোরে
ভালবাসার হাক্কা জোরে কেমন ক'রে বাঁধি তোরে?
তৃষিত মোর বুকের পরে, স্বর্গলোকের আমেজ খানিক্
পরশে তোর জাগে যেন স্বপন-পাওয়া ওরে মাণিক!

আমার মনের সৃষ্টি-পিয়াস্ তোমার মাঝে উঠ্‌লো ফুটি
তোমায় পেয়ে দৃষ্টি আমার অসীম লোকে যাচ্ছে লুটি।
ক্ষুদ্রকায়ার অন্ধকারে বদ্ধ ছিলেম অহঙ্কারে
তোমার মুখের পানে চেয়ে জাগনু আলোর পারাবারে।

খোকা আমার! খোকা আমার স্বর্গলোকের পুণ্যকেতন!
কণ্ঠে তোমার যুগের বাণী চিত্তে তোমার সৃষ্টি-চেতন।
আনন্দরস উতল-ধারা কে দিল আজ চিত্তে আনি!
তোমার পেয়ে নিলেম জানি বিশ্বলোকের মর্ম্মবাণী।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)।

আঁধারে আলো

এক

মাতৃসমা বৌদিদি কমলকে অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। সে আদেশ অবহেলা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। তাই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের বিচিত্র মাধুর্য্যও আর তাহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। সে শ্রীনগর হইতে মোটরযোগে রাওলপিণ্ডি আসিয়া একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বার্থ রিজার্ভ করিয়া বসিল। কমলের বাল্যাবস্থায় তাহার মাতার মৃত্যু হয়। সেই সময় কমলের বৌদিদি কোলে একটি শিশুপুত্র লইয়া বিধবা হন। সেই অবধি তাহার বৌদি পুত্রের মতই তাহার দেবরকে লালন-পালন করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। কমলও মায়ের মত তাহার বৌদিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত।

দীর্ঘ-প্রবাসের পর আশা, আনন্দ ও ব্যাকুলতায় আন্দোলিত মনের এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থা লইয়া সে বাড়ী ফিরিতেছে। ক্রমাগত দুই দিন আবদ্ধ থাকিয়া সে বড়ই শ্রান্তি ও বিরক্তি অনুভব করিতেছিল। তাই মাঝে মাঝে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসখানি পড়িতে যাইয়া দেখে, যে পৃষ্ঠা দশ মিনিট পূর্ব্বে উল্টাইয়াছিল, সেইখানেই তাহার উদাসীন দৃষ্টি এখনও নিবদ্ধ রহিয়াছে। বইখানি রাখিয়া দিয়া একটি চুরুট ধরাইয়া কমল শূন্য-দৃষ্টিতে বাহিরে চাহিয়া দেখিল। শূন্য প্রান্তর, কখনও বা অরণ্যানী কাঁপাইয়া ট্রেণ অপ্রতিহত-গতিতে বিরাট-দেহ দানবের মত ধাইয়া চলিয়াছে, যেন কোনই বাধা-বিপত্তি, ঝঞ্ঝা-ভ্রূকুটির ধারই সে ধারে না।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত ধরণী অসহ্য পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছে! সদ্যঃ অতিক্রান্ত কাশ্মীরের পর্ব্বতকান্তার, নদ-নদী মাঝে মাঝে ছায়াচিত্রের মত কমলের মনকে আকৃষ্ট করিতে-ছিল। মনে হইতেছিল, বনদেবী বুঝি দুই হস্তে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া, শ্রীনগরের উপর অজস্রধারায় বর্ষণ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রীযুক্তা মায়াপুরী সৃষ্টি করিয়াছেন। কত না কবি তাহাদের লেখনী হৃদয়ের শোণিতরাগে রঞ্জিত করিয়া কল্পনাকে রূপমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। হিমাচল শুভ্র তুষার-কিরীট পরিয়া কোন দেবাদিদেবের ধ্যানে নিমগ্ন আর সেই অচল অটল মহাতপস্বীর বুক চিরিয়া কত না যৌবনদৃপ্তা নির্ঝরিণী ধারায় ধারায় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া অনাদি সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কোন ঈপ্সিতের মিলন আশায় কম্পিত আগ্রহে নাচিয়া চলিতেছে!

কমলের মনে ধীরে ধীরে শ্রীনগরের ইতিকথা, কিম্বদন্তীর স্মৃতিগুলি উদিত হইতে লাগিল। এই শ্রীনগরেই এক দিন মোগল বাদশাহের গ্রীষ্মাবাসের বিহারভূমি রচিত হইয়াছিল। নিশাথ ও সেলিমার বাগে এক দিন কত না রূপসী নর্ত্তকী বাদশাহের অধরে হাসি ফুটাইবার জন্য লালসারঞ্জিত লাস্য প্রদর্শন করিয়াছিল। কত না মৃদঙ্গ, কত না নর্ত্তকীর প্রাণো-ন্মাদী সঙ্গীত ধীর ললিত মঞ্জীর-মুখর পাদবিক্ষেপের সঙ্গে মন্দ্রিত হইয়া সুললিত বংশীধ্বনির সহিত ঊর্দ্ধতন চির-রৌদ্রো-জ্জ্বল লোকের স্পর্শ লাভ করিয়াছিল!

চিন্তার ধারা সূক্ষ্মসূত্র বয়ন করিয়া ঊর্ণনাভের জাল রচনা করে। মন তাহারই আবর্ত্তে আত্মহারা হইয়া পড়ে। কমল সেই মায়ানগরীর ইতিহাস ও কিম্বদন্তী-বিলসিত উদ্যান-রাজ্যের শোভার মধ্যে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। অতীতযুগে সুরভিস্নিগ্ধ ধীর পবনে কত না কাশ্মীরী রূপসীর মধুর হাসি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। এখনও যেন প্রত্যেক বিকসিত কুঞ্জ ও পল্লব সেই রূপ, রস, গন্ধ ও হাসির কল-ঝঙ্কার বক্ষে ধরিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে! ডাল হ্রদ তাহার স্বচ্ছ কোমল অন্তরে কত না ফুল্ল নবশতদলকে হৃদয়াসন পাতিয়া দিয়া চির-পবিত্রতায় মহীয়ান্ হইয়া আছে। অজস্র রক্তকমল মর্ম্ম নিঙড়াইয়া সেই অতীত যুগের হাসিকে রূপ দিয়া সহাস্যে ফাটিয়া পড়িতেছে। যেন কত না বিরহগাথা—কত না মিলন-মধুরবাণী পরস্পরের কানে কানে কহিয়া চলিয়া পড়িতেছে। সমস্ত সরোবরের মূর্ত্ত হাসিরাশি কোন্ যুগ-যুগান্তের চরণে ঢলিয়া কোন্ নাম-না-জানা দয়িতের প্রেমতর্পণ করিতেছে!

জন্মজন্মান্তরের কোন্ এক বহু-পরিচিত স্বপ্নলোকের ইঙ্গিত কমলের হৃদয়-তন্ত্রীতে স্পন্দিত হইতেছিল; এমন সময়ে হঠাৎ মধ্যপথে ট্রেণ থামিয়া কমলের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল এবং ঠিক পাশের কামরা হইতে রমণীর আর্ত্ত চীৎকার বাতাসে ভাসিয়া আসিল।

সহযাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই সেই চিরন্তন প্রথানুযায়ী নিজের নিজের আসন ছাড়িয়া, কি ঘটিয়াছে দেখিবার জন্য জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল। কমল ক্ষিপ্রগতিতে নামিয়া একলম্ফে পাশের কামরায় উঠিয়া দেখিল, একটা বৃহদাকার য়ুরোপীয় কামরার একমাত্র আরোহিণী এক মহিলার দিকে অশোভনভাবে চাহিয়া হাসিতেছে।

কমল উক্ত অসভ্য শ্বেতকায়ের প্রতি মুহূর্ত্তমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহার কণ্ঠদেশ সজোরে চাপিয়া ধরিল ও গণ্ডদেশে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া দিল। কমল শুধু কাব্যচর্চ্চাই করে নাই; বাল্যকাল হইতে নানাবিধ ব্যায়াম-যুযুৎসু যত্নের সহিত আয়ত্ত করিয়াছিল। ইতিমধ্যে গার্ড ও অন্যান্য আরোহীও সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। কমল সংক্ষেপে সমস্ত কথাই গার্ডকে বলিয়া লোকটাকে ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তোমার মা-ভগিনী কি নাই? কোন্ সাহসে এক হিন্দু মহিলার প্রতি দুর্ব্যবহার করবার স্পর্দ্ধা কর?"

গার্ড বলিল, "বাবু, আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না, এর প্রতীকার আমিই করব।" এমন সময় লোকটা ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া তাহার বিরাট বপু লইয়া দৌড়াইতে লাগিল ও অল্পসময়ের মধ্যেই অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কমল চাহিয়া দেখিল, কামরার অধিকারিণী তরুণবয়স্কা। কিন্তু তাহাকে একাকিনী দেখিয়া সে মনে মনে একটু বিস্ময় বোধ করিল। তবে মুখে কিছু বলিল না।

তরুণী বলিল, "আগের ষ্টেশন হ'তে গাড়ী ছাড়বার সময় লোকটা এই কামরায় উঠে পড়ল। আমি তাহাকে লেডিজ কম্পার্টমেণ্ট বলায় সে বিশ্রীভাবে বিদ্রূপ ক'রে উঠল। তার ভাবভঙ্গী দেখেই শিকলটা—"

কমল বলিল, "থাক্, আর কোন ভয় নেই। আমি আপনার পাশের কামরাতেই আছি।"

রমণী সজল কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে কমলের প্রতি চাহিয়া কহিল, "আপনার উপকারের কথা ভুলে কৃতজ্ঞতা জানালে আপনাকে ছোট করা হবে, আপনি এখানে থাকলেই ভাল হয়।"

কমল আর বাক্যব্যয় না করিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি একাই আসছেন?"

তরুণী নতমস্তকে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, এই প্রথম একাই পথে বেরোতে হয়েছে। আর এই প্রথমেই যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, মনে হয়, সেটা না হ'লে ছিল ভাল। আপনি না থাকলে বাস্তবিকই আমাকে বড় বিপদে পড়তে হ'ত।"

কমল কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "থাক্, ও সব কথা তুলে লজ্জা দেবেন না। প্রত্যেক মানুষের যা কর্ত্তব্য, তাই করেছি মাত্র।"

কমল এবার ভাল করিয়া তরুণীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। মেয়েটির পরিধানে নীলরঙ্গের সাড়ী ও ব্লাউজ। তাহার মধুর ওষ্ঠের মৃদুহাসি চিত্তাকর্ষক। তাহার আয়ত নয়নের ভ্রমরকৃষ্ণ তারকাদ্বয়ে স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিদ্যুৎদীপ্তি, পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত ঘন কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদামের ললিত নৃত্য কমলকে মুগ্ধ করিল কি? তরুণীর পায়ে পাম্পসু, করপ্রকোষ্ঠে দুইগাছি করিয়া সোনার চুড়ী, কণ্ঠদেশে সরু একটি সোনার মালা, অঙ্গুলীতে একটি হীরক-অঙ্গুরীয়। তরুণীর সারা অঙ্গ ঘিরিয়া যৌবনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইয়া কমল একবার বাহিরের দিকে চাহিল। তার পর এই অপরিচিতা সুন্দরীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার কিন্তু এভাবে একা বাহির হওয়া সঙ্গত হয়নি।"

তরুণী বলিল, "এখন সে কথা বুঝেছি। কিন্তু তাড়াতাড়ি উপায় ছিল না।"

কমল বলিল, "আপনি কি কলকাতা পর্য্যন্তই যাবেন?"

"হ্যাঁ, তবে মোগলসরাইএ দাদা আমার সঙ্গে মিলিত হবেন। এইটুকু পথ একা যেতে পারব বলেই নমিতার নিষেধ শুনিনি।"

কমল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে সুন্দরীর দিকে চাহিল।

তরুণী বোধ হয় তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "নমিতা আমার সতীর্থ। এবার দুজনেই একসঙ্গে ম্যাট্রিক দিয়েছি। তার বাবার সঙ্গে আমার বাবার ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুত্ব। এবার পুজোর নমির মা'র বিশেষ অনুরোধে বাবা তাঁদের সঙ্গে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবার অজীর্ণ রোগ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে সংবাদ পেয়েই আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে। নমিতাও সঙ্গে আসত; কিন্তু হঠাৎ নমির মা'র প্রবল জ্বর হওয়ায় বাধা প'ড়ে গেল।"

কমল বলিল, "আপনার দাদা মোগলসরাইএ থাকেন না কি ?"

তরুণী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তিনি তাঁর বন্ধুর ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে মোগলসরাইএ নিমন্ত্রণে এসেছেন। তিনিও কাল টেলিগ্রাম করেছিলেন, মোগলসরাই থেকে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। দাদার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য জ্যেঠামশায়, নমির বাবা, তাঁর পুরোণো চাকর আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে অন্য গাড়ীতে আছে। আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'লে দাদা আপনাকে ছাড়তে চাইবেন না দেখবেন।"

কমল বলিল, "বেশ, তা হ'লে আপনার দাদার সঙ্গেও আমার আলাপ হবার সৌভাগ্য হবে।"

তরুণী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোত্থেকে আস্‌ছেন ?"

কমল বলিল, "দেখুন, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার একটু মিল হয়ে যাচ্ছে। আমারও অনেক দিন কাশ্মীর দেখবার সখ ছিল, তাই এম, এ পরীক্ষা দিয়ে শ্রীনগর বেড়াতে গিয়েছিলুম, সেখান হ'তেই বাড়ী ফিরছি।"

কমল একটু থামিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কি কম্বিনেশন্ নিয়েছেন ?"

তরুণী কহিল, "না, ঐ পর্য্যন্তই ; আমার আই, এস, সি পড়বার খুব ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু বাবা আর আমায় পড়াতে চান্ না।" বলিতে বলিতে সহসা লজ্জার অরুণরাগ তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

তরুণীর পার্শ্বস্থ আসনে একখানি নবপ্রকাশিত মাসিক পত্রিকা পড়িয়াছিল। কমল উহা তুলিয়া লইল। সে দেখিল, আশ্বিনসংখ্যা "বঙ্গলতিকা"। তাহারই রচিত "জীবন-সঙ্গীত"-শীর্ষক কবিতাটি এই শারদীয় সংখ্যাতেই বাহির হইয়াছিল।

তরুণী সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় যিনি অপমান থেকে রক্ষা করেছেন, তাঁর পরিচয় পেতে পারি কি ?"

কমল লজ্জিতভাবে বলিল, "আমার নাম শ্রীকৃষ্ণকমল চট্টোপাধ্যায়। তবে বাড়ীতে আমার সকলে কমল ব'লেই ডাকেন।"

সচকিতভাবে তরুণী বলিল, "আপনি কবি কৃষ্ণকমল নন্ ত ?"

কমল বিনীতভাবে বলিল, "কবিতা আমি লিখে থাকি বটে। কিন্তু—"

তরুণী হাসিয়া বলিল, "আমার হাতেই তার প্রমাণ রয়েছে। এই মাসেই আপনার 'জীবন-সঙ্গীত' পড়েছি। আপনি বেশ লেখেন, কমল বাবু।"

সুন্দরী তরুণীর মুখে প্রশংসা শুনিলে কোন্ তরুণ-হিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া না উঠে ? কমল যে ইহাতে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায় ? সস্মিত-মুখে সে বলিল, "আপনার ভাল লেগেছে জেনে ধন্য হলাম।"

জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কমল দেখিল, গাড়ী ক্রমেই মোগলসরাই ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। সে সহসা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অপরিচিতা তরুণীর নামটি সে এখনও জানিতে পারে নাই। যৌবনের ধর্ম্ম স্বভাবতঃ পুরুষকে উৎসাহী করিয়া তুলিলেও, একটা সংস্কারগত সঙ্কোচ তাহার প্রগল্ভতাকে পূর্ণ-মাত্রায় প্রকট করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না।

সহসা বংশীধ্বনি জানাইয়া দিল, ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী। সঙ্কোচ ও লজ্জার বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া কমল বলিয়া উঠিল, "এইবার আমরা এসে পড়েছি। আমার নামটা ত আপনি জেনে নিয়েছেন, কিন্তু আপনার—"

মৃদু হাসিয়া তরুণী বলিয়া উঠিল, "আমাকে বীণা ব'লেই ডাকবেন। আমার বাবা স্যার অমলকুমার মুখোপাধ্যায়।"

ট্রেণ আসিয়া মোগলসরাইএ থামিতেই বীণা মুখ বাড়াইল। অদূরে এক প্রিয়দর্শন যুবককে দেখিয়াই সে তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া বলিল, "এই যে দাদা, আমি এইখানে আছি।"

বীণার দাদা বিমল ব্যাগ লইয়া কামরায় উঠিয়াই বলিলেন, "কৈ রে বীণা, জ্যাঠামহাশয়, মাসীমা, নমী এঁরা সব কোথায় ?

বীণা কহিল, "মাসীমার কাল হঠাৎ জ্বর হওয়াতে তাঁরা আজ আসতে পারলেন না।"

বিমল মুহূর্ত্তমাত্র কমলের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিতেই সরলা বীণা অকপটে তাহার দাদার নিকট সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করিল।

এমন সময় একটি বৃদ্ধ ভৃত্য হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল।

বীণা হাসিয়া কহিল, "এ বৈ হ সিয়ার লোক, জ্যাঠামশা'র

আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন, যা হোক। পথে যে সাতকাণ্ড রামায়ণ হয়ে গেল, তা বুঝি জানতেও পারে নি।"

ভৃত্যটি অবাক্ হইয়া বীণার দিকে চাহিয়া রহিল।

বীণা কমলের দিকে ফিরিয়া কহিল, "ইনি আবার শোনেন কম।"

বীণা একটু উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যের কাণের কাছে মুখ লইয়া কহিল, "নমিকে বোলো, মাসীমা কেমন আছেন, তা যেন আমায় কালই পত্র লিখে জানান।"

ভৃত্য শশিকান্ত সম্মতি-সূচক মাথা দুলাইয়া ভক্তি সহকারে সকলের পদধূলি লইয়া নামিয়া পড়িল।

বিমল কমলকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া কহিল, "ভাষা হারিয়ে ফেলেছি, তোমায় কি ব'লে যে—দ্যাখ বীণা, তোর এত দিন একটা দাদাই ছিল, আজ হ'তে তুই দুটো পেলি।"

কমল লজ্জিত স্বরে বলিল, "আপনারা মহৎ, তাই আমাকে—"

বিমল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ ভাই কমল, আমাদের মধ্যে 'আপনি আজ্ঞা' এ সব চলবে না, তা আগে হ'তেই ব'লে রাখছি।"

এত অল্পসময়ের মধ্যে অপরকে এতটা আত্মীয় করিয়া লইতে ইতিপূর্ব্বে কমল আর কাহাকেও কখনও দেখে নাই, তাই সে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না।

বিমল একটু থামিয়াই বলিয়া উঠিল, "কাল কি পরশু সবাই মিলে গিয়ে বৌমার হাতের তৈরী এক কাপ চা খেয়ে আস্‌বো। আর তার পরদিনে তোমাকে আর বৌমাকে বীণা গিয়ে নিয়ে আস্‌বে, কি বল ভাই—এতে বোধ হয় গররাজি নও?"

কমল সহাস্যে বলিল, "সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, আমি কিন্তু অবিবাহিত। তবে চা খাওয়াবার লোকের অভাব হ'বে না।"

বিমল উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "তা জানি, বৌমার অভাব হ'লেও বাবুর্চ্চির অভাব হবে না। বেশ, তাই হবে।"

কমল সে সরল হাস্যে যোগ দিয়া বলিল, "আমাদের এখন গঙ্গাজলেও অন্ততঃ মুর্গীশাক না করলে সে খানাই শুদ্ধ হয় না, আর পবিত্রাকও হয়ে ওঠে না; কিন্তু সে বাবুর্চ্চি রাখবার আমাদের মোটেই উপায় নাই। বাবা ভয়ানক গোঁড়া হিন্দু, তিনি স্নানাহ্নিক না ক'রে কখনই জলগ্রহণ করেন না। আমি কলেজে প'ড়ে বিদেশী সভ্যতার চশমা প'রে আচার-ব্যবহারে নাস্তিক হয়ে উঠেছি, এই অভিযোগ প্রায়ই আমাকে বাবার কাছে শুনতে হয়। বাবা ছোটবেলা থেকে যে ভাবে আমায় শিখিয়েছেন, সেই ভাবেই অবশ্য যতদূর সম্ভব চ'লে আস্‌ছি। তবে প্রত্যেক বিষয়ে অত বাড়াবাড়িও ভাল লাগে না!"

বিমল বলিল, "আমারও ঠিক তাই মত। বাবা যখন হাইকোর্টের জজ ছিলেন, তখন সাহেবদের প্রায়ই খানা দিতেন। সে সময় নিষিদ্ধ পক্ষীর চীৎকারে বাড়ী থাকাই কঠিন হ'ত। এখন আর ততটা না থাক্‌লেও একটি রাম-পক্ষী অন্ততঃ তাঁর প্রত্যহ চাই—মা যত দিন বেঁচে ছিলেন, আমাদের কখন ঐ বস্তুটি খেতে দিতেন না। এখনও সে অভ্যাস আমরা ক'ভাই-বোন্ ছাড়তে পারি নি। তবে গোঁড়ামি নেই, ভাই। বাবা কেশব সেনের ভক্ত, কিন্তু দীক্ষিত নন।"

কমল হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আমার বাবা খাঁটি হিন্দু। তাঁর গোঁড়ামিটা একটু বেশী রকমের। তিনি ভয়ানক রাশভারী লোক, তাঁর সাম্‌নে আমরা মুখ তুলে কথাই বল্‌তে পারি না। বাবা পূজা-পার্ব্বণ দান-ধ্যানেই বেশী খরচ করেন। আর তা ছাড়া গোবিন্দজীউর বাড়ীতে প্রায় কীর্ত্তন লেগেই আছে। বাবা সর্ব্বদাই ব'সে ব'সে তাই শোনেন, আর মালা জপেন।"

বিমল কহিল, "কি বলিস্ বীণা, আমরাও একদিন তা হ'লে লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ ক'রে ব'সে কীর্ত্তন শোনার পর গোবিন্দজীউর প্রসাদ ভক্ষণ ক'রে আস্‌ব?"

বীণা মৃদু হাস্য করিল।

কমল আবেগে বিমলের হাত দুইটি চাপিয়া বলিল, "তোমাদের মত সরল মহৎপ্রাণ লোকের পায়ের ধুলো যদি আমাদের বাড়ীতে পড়ে, তা হ'লে সত্যই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

বিমল গম্ভীরভাবে বলিল, "না ভাই, ও সব কথা যাক্। তোমার যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, সেইটুকুই আমাদের কাছে যথেষ্ট। তোমাকে ভাই দয়া ক'রে রোজ আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে হবে। আমার ভয় হয়, আমাদের অত্যাচারে শেষে তোমায় হারিয়ে না ফেলি।"

বীণা হাসিয়া বলিল, "দেখুন কমল বাবু, আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছিলাম, আপনাকে পেলে দাদা আর ছাড়তে চাইবেন না। আমার কথাটা মিলেছে কি না দেখুন।"

কমল কহিল, "হবে না কেন? যে সংসারে ভগবানের আশীর্ব্বাদ এসে পড়ে, তার যে সবই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।"

ক্রমেই রাত্রি অধিক হইতেছিল। কমল বিদায় লইয়া নিজের কামরায় ফিরিয়া আসিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

দুই

স্যার অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, পুত্র বিমলের মুখে কমলের কথা শুনিয়া বিমলকে সঙ্গে লইয়া পরদিন বৈকালে আসিয়া নিজের মোটরে কমলকে তুলিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। যে তাঁহার দুলালী কন্যাকে অপমান হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার কোনও ভাষা আছে কি?

তাহার পর হইতে কমল থিয়েটার রোডে স্যার অমল মুখার্জ্জীর ভবনে প্রত্যহ বৈকালে বেড়াইতে যাইত। স্যার অমল কমলকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। কমলও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। স্যার অমল প্রায়ই বৈকালে বিমল, কমল, বীণা ও তাঁহার কনিষ্ঠ-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া থিয়েটার বা বায়স্কোপ দেখাইয়া আনিতেন। কখনও বা বোটানিক্যাল্ গার্ডেন, বালিগঞ্জ লেক্, ইডেন গার্ডেন, গঙ্গার ধার বা ষ্টীমারে আনন্দ-ভ্রমণ চলিত। এইরূপে নয় দশ মাস কাটিয়া গেল, মধ্যে বীণা টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। সে সময়ে কমল প্রত্যহ পীড়িতার শুশ্রূষা প্রভৃতি ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে কমল স্যার অমলের পরিবারে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সঙ্কোচের সকল ব্যবধান অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

যৌবনের ধর্ম্ম ভালবাসা। যাহাকে ভাল লাগে, তাহার সঙ্গ যদি সর্ব্বদা লাভ করা যায়, তাহা হইলে মন তাহার প্রতি দুর্দ্দমনীয় গতিতে অগ্রসর হইবেই। স্বভাব-ধর্ম্ম এখানেও তাহার কার্য্য করিয়া চলিল।

কমলের নিঃসঙ্গ চিত্ত বীণাকে অবলম্বন করিয়া পরিপূর্ণতার পথে ধাবিত হইল। কিন্তু আকার-ইঙ্গিতেও সে তাহা প্রকাশ পাইতে দিল না। বীণাও প্রত্যহ কমলের আসিবার সময় ব্যাকুল আগ্রহে পথের দিকে চাহিয়া থাকিত ও কমলকে আসিতে দেখিলেই আনন্দে অধীর হইয়া উঠিত।

আজ পাঁচটার সময় বীণাদের বাড়ীতে কমলের চা-পানের নিমন্ত্রণ। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়ান যায়, কিন্তু বীণার একটি ছোট অনুরোধ অবহেলা করাও এখন কমলের সাধ্যাতীত! প্রাচীরবিলম্বিত ঘড়ীর দিকে সে চাহিয়া দেখিল, মাত্র দুইটা বাজিয়াছে। দিন এত দীর্ঘ হইতে পারে? ঘড়ীর কাঁটা কি আজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত? অধীর আগ্রহে কমল কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। সহসা বাহিরে জুতার শব্দ শুনিয়া কমল চাহিয়া দেখিল, তাহারই আবাল্য অন্তরঙ্গ বন্ধু সুরেশ। কমল বলিয়া উঠিল, "আরে এসো ভাই এসো! আজ যে দেখ্‌ছি অকাল-বোধন, এ সময় তোমাকে যে বড় দেখতে পাওয়া যায় না।"

সুরেশ বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ টানিয়া চেয়ারে বসিয়া বলিল, "এখন আমার আসাটাও বুঝি তোর কাছে ভাল লাগে না? আজকে পিকচার-হাউসে ডাগ্‌লাসের একটা নূতন ছবি এসেছে। তাই তোকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি, এই দেখ্, আসবার সময় দুটো টিকিটও কিনে এনেছি—এই ম্যাটিনিতে যেতে হবে।"

কমল বলিল, "কিন্তু ভাই—"

সুরেশ বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু-টিন্তু শুন্‌বো না।"

"আজকে অমল বাবুর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে যেতেই হবে, না গেলে তাঁরা দুঃখিত হবেন।"

সুরেশ বলিল, "নিমন্ত্রণ ত রোজই রয়েছে। কোন দিনই ত বাদ পড়তে দেখি না। আর এক দিনও বৈকালে তোর টিকিটটাও দেখতে পাই না, আমাদের এম, এ পরীক্ষা দেওয়ার পর হ'তে তুমি যেন দূরে স'রে যাচ্ছ, আর সে প্রবল আকর্ষণ দেখতে পাইনে।"

কমল সুরেশের হাত ধরিয়া বলিল, "তোমাকে ত কিছুই গোপন রাখি নি, বন্ধু! সব কথাই খুলে বলেছি—বীণাকে ভালবাসার অপরাধে তুমিও যদি আমায় ভুল বোঝ, তা হ'লে সত্যই বড় কষ্ট হয়। সাজাহান মমতাজকে ভালবেসেছিল, তারই ফলে জগতের পরমাশ্চর্য্য তাজমহল

সৃষ্টি হয়েছে। রামি-রজকিনী, বিল্বমঙ্গল, কিউপিড, ভেনাসের ভালবাসার ইতিহাস কাব্য-জগতে অমর হয়ে আছে। নীরব ভালবাসার কি কোন মূল্য নাই, কোনই প্রতিদান নাই? আমার কোন নিদর্শন নেই বলেই যে তাদের চেয়ে কম ভালবাসি, তা আমি কখনই স্বীকার করব না। আমি বীণাকে মনে-প্রাণে ইহকাল পরকাল দিয়ে ভালবেসেছি।" কমল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

সুরেশের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "বাঃ! বাঃ! ক্যাপিট্যাল! এ সব থিয়েটারে শুনলে বেশ ভাল লাগত হে!"

কমল বলিল, "না ভাই, তুমি হেসে উড়িয়ে দিও না। আমি যা বলছি, এতে অত্যুক্তি নেই। এক এক সময় মনে হয়, ট্রেণের সহযাত্রী বৈ ত নয়। ঘটনাবিপর্য্যয়ে আলাপ হয়েছিল মাত্র। তার জন্যে কেনই বা প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে? কিন্তু সান্ধ্য-ভ্রমণে যাবার পূর্ব্বে সেখানে যাব না মনস্থ ক'রেও দেখি, থিয়েটার-রোডে স্যার অমল মুখার্জ্জির বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।"

সুরেশ চশমা মুছিতে মুছিতে তীব্র দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হ'লে ব্যাপারটা ক্রমশঃ নাটকে রূপান্তরিত হ'তে চলেছে বল? এত দিনে তোর কৃষ্ণকমল নাম সার্থক হয়েছে। আচ্ছা ভাই, কে তোর নাম রেখেছিল বল্ ত? তার বাহাদুরী আছে, বলতে হবে। সত্যই আমাদের কলির কৃষ্ণ, কমলের সন্ধানে প্রেম-সরোবরে পাড়ি দিয়েছেন। তুই যদি অনুমতি দিস্, তা হ'লে দূতীগিরিটা এখনই আরম্ভ ক'রে দিই, তার পর ঘটক বিদায় বাবদ কিছু না হয় ধ'রে দিস্।"

"যা, তোর ঐ ত দোষ। সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না," বলিয়া কমল মুখ ফিরাইয়া বসিল।

সুরেশ বলিল, "নাঃ, তোর মস্তিষ্কটা একেবারে চর্ব্বিতই হয়েছে। আর দেখছি কোন রকমেই উদ্ধারের আশা নাই!" বলিয়া দুইখানা টিকিট পকেট হইতে বাহির করিয়া সে ছিন্নভিন্ন করিয়া ছড়াইয়া দিল।

কমল ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "ও কি! টিকিটগুলো বৃথা নষ্ট করলি?"

সুরেশ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কমলের হাত চাপিয়া বলিল, "কানু ছাড়া গীত নেই; তুমিই যখন গেলে না, তখন আর আমি একা গিয়ে কি করব?" সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। কমল বন্ধুর প্রস্থান-পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

তিন

থিয়েটার রোডের ভবনে প্রবেশ করিয়া কমল দ্বারবান্-প্রমুখাৎ অবগত হইল, স্যার অমল, বিমলের সঙ্গে কিছু পূর্ব্বে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

অদূরবর্ত্তী দ্বিতলের কক্ষ হইতে অর্গানের সুরের সহিত কাহার বীণানিন্দিত কণ্ঠের সঙ্গীত-লহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। কাণ পাতিয়া শুনিয়া কমল বুঝিল, উহা তাহার আরাধ্যা দেবীরই কণ্ঠনিঃসৃত।

কমল আপনহারা হইয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে বীণার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুকণ্ঠী বীণা টেবল-হারমোনিয়ম বাজাইয়া গাহিতেছিল—

"আমার সকল চিত্ত প্রণয়ে বিকশি,
তোমার লাগিয়া উঠিছে উছসি,
কবে তুমি আসি অধর পরশি,
মুখপানে চেয়ে হাসিবে।
মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে কাণে
প্রিয়তম তুমি আসিবে॥"

সঙ্গীতের গমক, মীড় ও মূর্চ্ছনা আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া নীলাকাশের অন্তরালে মিশাইয়া গেল। কমলের চিত্ত যেন পাখা মেলিয়া কোন স্বপ্নোজ্জ্বল নীলিমায় বিচরণ করিতেছিল। সঙ্গীত স্তব্ধ হইতেই আবার বাস্তব-জগতে ফিরিয়া আসিল। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিয়া উঠিল, "কে সে ভাগ্যবান্, যার উদ্দেশ্যে তোমার এই সুমধুর সঙ্গীত?"

বীণা চমকাইয়া ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া লাজ-রক্তিম-মুখে, বলিল, "যাও, তুমি বড় দুষ্টু! লুকিয়ে লুকিয়ে বুঝি গান শোনা হচ্ছিল?"

বীণা এই প্রথম কমলকে 'তুমি' সম্বোধন করিল।

কমল আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার মুখে 'তুমি' কথাটা বড় মধুর লেগেছে, বল, বল আবার বল 'তুমি'।"

বীণার আননে সহসা কেহ যেন সিন্দুররাগ ছড়াইয়া দিল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত দৃষ্টি নত করিয়া রহিল। তার পর তাহার দীর্ঘায়ত নয়নযুগল তুলিয়া কমলের দিকে চাহিল।

কমল বলিল, "তোমার ও-রকম সরল দৃষ্টির আঘাতে আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি, আমার যা বক্তব্য, তা আর কোন দিন বলা হয় না, বীণা।"

বীণা সরল উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিল, "তোমার ভূমিকা দেখে সত্যই আমার ভয় করছে।"

কমল বলিল, "মনে পড়ে, সে দিন আমরা ম্যাডেন থিয়েটারে গিয়েছিলুম? সেই নায়ক এক রমণীকে ভালবেসেছিল, কিন্তু তাকে শেষ পর্য্যন্ত পেলে না। তার অন্য আর এক জনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। আমি সেই ছবিটা দেখে ব'লে উঠেছিলাম, যেন আমারই জীবনের প্রতিচ্ছবি। তুমি সেই কথা শুনে এ উক্তির কারণ জানতে খুব পীড়াপীড়ি করেছিলে, আমি কিন্তু তখন বলি নি, আজ সে কথা বল্‌ব।"

তরুণী সুন্দরীর আনন আবার আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার হৃদয় অকস্মাৎ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

মৃদুকণ্ঠে কমল বলিল, "বীণা, আমি যদি তোমায় ভালবেসে সুখী হই, তা হ'লে তোমার প্রতি কি বেশী অন্যায় করা হবে?"

বীণা নির্ব্বাক্ ছলছল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ও তাহার ললাট ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিল।

কমল বলিয়া চলিল, "তোমার দর্শন আমার কাছে স্বর্গ, তোমার অদর্শন আমার কাছে অভিশাপ মনে হয়, তুমি কি তা জান, বীণা? এটা কি আমার বড় বেশী প্রত্যাশা?"

আসামী যেমন বিচারকের রায় শুনিবার জন্য কম্পিত আগ্রহে প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ ভাবে কমল বীণার প্রতি কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বীণার সস্মিত দৃষ্টি, লজ্জারক্ত আনন, অঞ্চল-প্রান্তলগ্ন চম্পক-অঙ্গুলিগুলির চঞ্চল নৃত্য যাহা প্রকাশ করিল, কোন ভাষাই তাহার অপেক্ষা মুখর—যোগ্য প্রকাশক নহে।

পৃথিবী সহসা কমলের নিকট যেন সঙ্গীতে ভরিয়া গেল—শত বসন্ত যেন তাহাকে ঘিরিয়া উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিল, শত-সহস্র কোকিলের অশ্রান্ত গুঞ্জন একসঙ্গে কমলের বুকে জাগিয়া উঠিল। সে গদগদ-কণ্ঠে বলিল, "তুমি আমার জীবন ধন্য ক'রে দিলে, বীণা! আজই তোমার বাবার কাছে আমার প্রার্থনা জানিয়ে তাঁর অনুমতি ভিক্ষা করব।' বলিয়া সে নীচে যাইবার সময় আর একবার ঘুরিয়া বীণাকে দেখিয়া লইল।

* * * *

স্যার অমল বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া বিমলের সঙ্গে অন্য দিনের অপেক্ষা হৃষ্টমনে কথা বলিতেছিলেন। কমল প্রবেশ করিতেই তিনি বলিলেন, "এস কমল, তুমি কখন্ এলে? আমরা এইমাত্র ফিরলাম। যাও ত বিমল, বীণাকে একবার এখানে ডেকে আন। দেখ কমল, তুমি আমাদেরই মধ্যে এক জন, তোমায় কোন কথা না ব'লে আনন্দ পাই না। আমার স্ত্রী মৃত্যুর সময় ব'লে গিয়েছিলেন যে, তাঁর বড় আদরের বীণাকে গুণী ও ধনীর হাতে যেন সম্প্রদান করা হয়।" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ ভারী হইয়া আসিল। তাহার পর একটু থামিয়া কহিলেন, "মনোমত পাত্রই পেয়েছি। ছেলেটির অবশ্য বাপ-মা কেউ নেই, কেবল একটি ছোট ভাই আছে। তার মামার সঙ্গে আজ সব কথা ঠিক হয়ে গেল। সে তার বাবার আমল হ'তে বর্ম্মায় রাইসমিল্ বসিয়ে অনেক টাকা লাভ করেছে। ছেলেটির নাম 'করুণা চক্রবর্ত্তী', কারবারে যা খাটে, তা ছাড়াও হাতে নগদ অনেক টাকা মজুত আছে। যদিও দূরদেশ, তবে যেখানেই থাক্, মেয়েটি অন্ততঃ সুখে থাকলেই আমাদের আনন্দ।"

কন্যার জন্য মনোমত ধনী পাত্র নির্ব্বাচন-ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিয়া স্যার অমল এতই উৎফুল্ল হইয়াছিলেন যে, যাহাকে তিনি এই সংবাদ শুনাইতেছিলেন; তাহার মনের অবস্থা ইহাতে কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা জানিবার কৌতূহলও তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না।

কমল ক্ষোদিত প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ তাহার নিজের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিতেছিল।

বৃদ্ধ উৎসাহভরে বলিয়া চলিলেন, "এত অল্পসময়ের মধ্যে এমন সুপাত্র যে জুটে যাবে, তা ভাবি নি। ২রা আষাঢ় বিয়ের দিন। মাঝে আর মাত্র আঠারো দিন বাকী। এর মধ্যেই সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে হবে।"

দাদার সঙ্গে বীণা তখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। পিতার শেষ কথাগুলি কি তরুণীর শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হইয়াছিল?

কন্যার দিকে চাহিয়া পিতা বলিলেন, "এ কি মা? তোমার কোন অসুখ করেছে?"

নতনেত্রে বীণা বলিল, "না, বাবা, ভাল আছি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমার দাদার কাছে সব কথা শুনেছ বোধ হয়। তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমার মত ত জানা দরকার, মা।"

বাতায়নপথে বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বীণা নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। অমল বাবু আবার বলিলেন, "বল, লজ্জা কি? কমল ত ঘরেরই লোক।"

বীণা মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কি বলবো?" মুহূর্ত্ত স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া, নিস্তব্ধ কক্ষকে সচকিত করিয়া দিয়া বীণা বলিল, "তোমাদের চা পাঠিয়ে দিই, বাবা।"

ক্ষিপ্র-চরণে তরুণী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

স্যার অমল মনে মনে প্রসন্ন হইতে পারিলেন না। কন্যার নিকট হইতে তিনি এমন উত্তর শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া অবশেষে তিনি একটা চুরুট ধরাইয়া লইলেন। জোরে কয়েকবার টান দিয়া তিনি আপন মনেই কহিলেন, "বীণার কথাগুলো আমার ভাল লাগ্‌লো না। এ বিয়েটা যেন তার মনঃপূত নয়।"

কমল কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল, "আপনি যদি সাহস দেন, তা হ'লে একটা কথা নিবেদন করি।"

স্যার অমল কহিলেন, "কি বলবে, বাবা, বল।"

কমল মাথা নত করিয়া স্থির নিষ্কম্প স্বরে বলিল, "আপনার অনুমতি পেলে আমিই বীণাকে সানন্দে গ্রহণ করতে রাজি আছি।"

স্যার অমল অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটের ছাই ট্রেতে ঝাড়িয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে কমলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কারণ, কমল যে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিবে, সে ধারণা তিনি কখনই মনোমধ্যে পোষণ করিতে পারেন নাই।

বিমল নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "আমি যতদূর জানি, তাতে বীণার এ প্রস্তাবে মোটেই অমত হবে না বাবা! যাই, বীণাকে না হয় একবার জিজ্ঞাসা করেই আসি।"

স্যার মুখার্জ্জি সোৎসাহে কহিলেন, "তা' হ'লে ত খুবই ভাল হয়—চোখের সামনে মেয়েটা থাকবে, যখন ইচ্ছে হয়, দেখে আসবো, দুদিনের জন্যে নিয়েও আসতে পারব। কিন্তু তোমার বাবা যে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী, তিনি কি আমার মেয়ে নিতে রাজি হবেন? এখুনি আমরা তা হ'লে একবার নীলকান্ত বাবুর কাছে যাই; দেখি তিনি কি বলেন।"

কমল বলিল, "তিনি বোধ হয় রাজি হবেন না। আপনি যদি আমার মুখ চেয়ে আপনার কন্যাকে আমার হাতে তুলে দেন, তা হ'লে আমার এ ভরসা আছে যে, প্রফেসারি ক'রেও আমি জীবিকা অর্জ্জন করতে পারব।"

স্যার মুখার্জ্জি কহিলেন, "কিন্তু তোমার পিতার অসম্মতিতে তোমার হাতে কন্যাসম্প্রদান করা কি আমার উচিত হবে?"

বিমল উৎফুল্লভাবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "যা বলেছি, তাই, এ দিকে কোনই বাধা নেই।"

মোটর গেটে আসিয়া দাঁড়াইলে, স্যার মুখার্জ্জি কহিলেন, "চল কমল, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।"

কমল কহিল, "আমি এখন আপনাদের সঙ্গে যাব না। কাছেই এখানে এক বন্ধু থাকেন, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আবার এখানেই আসব।"

বন্ধুর বাড়ী হইতে শীঘ্রই কমল ফিরিয়া দেখিল, তখনও স্যার মুখার্জ্জি ও বিমল প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কমলের দুইটি অনুসন্ধিৎসু নয়ন তাহার বাঞ্ছিতাকে দেখিবার জন্য চারিদিকে ঘুরিতেছিল। এমন সময় সেই চিরপরিচিত মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। কমল ত্রস্তপদে অগ্রসর হইতেই দেখিল, স্যার মুখার্জ্জি পুত্রসহ গম্ভীরভাবে মোটর হইতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া কমলের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল।

স্যার মুখার্জ্জি কহিলেন, "দেখ কমল, আমি বুড়ো হ'তে চল্লাম, এ পর্য্যন্ত আমায় এরকম কেউ অপমান করেনি। তোমার বাবা বিয়ে দিতে যদি রাজি না হতেন, তা হ'লে তত ক্ষোভের কারণ ছিল না। আমার মেয়ের সমস্ত পরিচয় নিয়ে চ'টে গিয়ে বল্লেন, ওসব জুতোপরা পাসকরা মেয়েকে নিয়ে আমার পবিত্র ব্রাহ্মণবংশকে কলঙ্কিত

করতে চাই না। আরও যা বলেছেন, তা কোনও ভদ্রলোকের মুখে আজ পর্য্যন্ত শুনি নি। কমল, তোমার জন্যই আজ এ অপমান আমার সইতে হ'ল" বলিতে বলিতে ক্ষোভে অভিমানে তাঁহার বাক্‌রুদ্ধ হইল।

কমল বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

চার

ন্যায় মুখার্জ্জির ত্রিতল সৌধ বিজলীমালা কণ্ঠে পরিয়া অভিসারের প্রতীক্ষা করিতেছে।

বিবাহবাড়ীতে বহু নিমন্ত্রিতের সমাগম হইয়াছে। বীণার জীবন-দেবতা মিষ্টার চক্রবর্ত্তী মধ্যকার সুবৃহৎ ড্রয়িংরুমে সুসজ্জিত সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়াছেন। সেই ঘরে কেহ দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। কেহ বা প্রাচীন সাহিত্যের জন্মকথা লইয়া গভীর গবেষণাপরায়ণ আছেন; কেহ বা ভোলানাথের মত পঞ্চমুখে কন্যাকর্ত্তার অহেতুক প্রশংসায় রত; কেহ বা অলক্ষ্যে সিগারগুলি বেমালুম পকেটজাত করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিতেছেন; কেহ বা ইতিমধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া দুই এক পেগ্ পান করিবার উদ্দেশ্যে নিভৃত কক্ষের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত।

পুষ্পাভরণে সজ্জিতা, আলোকিতা অট্টালিকায় মহোৎসব চলিয়াছে। চারিদিকে কলরব, দেহি দেহি রব, চায়ের পেয়ালার ঠুন্ ঠুন্ শব্দ। বালকবালিকা কবিতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, এক আধুনিক ছোকরা বলিয়া উঠিল, "বেড়ে কবিতাটি লিখেছে—

'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে কাব্যের যদি কারণ হয়।
দ্বিতীয়দিবসে কিসের জন্য কেন তা নয় গো, কেন তা নয়' ॥"

আর এক জন বলিয়া উঠিল, "বাস্তবিকই ও কবিতায় রস আছে, আর সাজেষ্টিভ হয়েছে, কিন্তু এটির বিগিনিংও মন্দ হয় নি—

'আজ কাল্‌কার নিয়ম হ'ল লিখ্‌তেই হবে পদ্য।
' যদিও সেটা তৎক্ষণাৎ পকেটজাত হয় সদ্য' ॥"

কমল সমবেত নিমন্ত্রিতের গলায় অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত বেলফুলের মাল্য দিয়া সকলকেই মধুর-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেছিল এবং সুবিধা অসুবিধার কথা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যেকেরই মনোরঞ্জন করিয়া চলিয়াছে। যেন ছেদ নাই, শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই। এমন সময় বাইজী আসিতেই সেই বিদ্যুৎ-দীপ্ত প্রকোষ্ঠে তাহার জহরতের অলঙ্কারগুলি ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল।

প্রবীণ, নবীন সকলেই মাঝে মাঝে বক্রনয়নে, কেহ বা চশমার ফাঁক দিয়া তীব্রদৃষ্টিতে নর্ত্তকীর দিকে চাহিয়া নিম্নস্বরে কথা কহিতে লাগিল। সারঙ্গী আপন যন্ত্রের কর্ণগুলি বিমর্দ্দন করিয়া, মস্তকধৃত বৃহৎ পাগড়ী হেলাইয়া দুলাইয়া বাজাইতে সুরু করিল, তবলাবাদকও আপন কৃতিত্ব জাহির করিতে ছাড়িল না। সে-ও ঘন ঘন শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক দার্জ্জিলিং মেলের মত দ্রুত গতিতে চলিয়াছে, যেন আখড়ায় কুস্তির পূর্ব্বে পলোয়ানের মত তাল ঠুকিয়া, ডণ্ড, বৈঠক করিতেছে। এমন সময় বাইজী একটু কাৎ হইয়া তাহার চরণদ্বয়ে স্বহস্তে কিঙ্কিণীগুচ্ছ বাঁধিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দের মুখে একটা চাপা চাঞ্চল্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল। বাইজী সযত্নে সিল্কের রুমাল দিয়া তাহার এনামেল-করা মুখ মুছিল, ও তাম্বুলচর্ব্বিত অধরে মৃদুহাস্য করিয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে অভিবাদনান্তে অপরূপভঙ্গিমায় উঠিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিকে সুনিপুণ শিকারীর ন্যায় দৃষ্টিপাত করিয়া সে হিন্দিগান ধরিল।

এক দিকে সারঙ্গী, অপর দিকে তবলাবাদক উঠিয়া পড়িয়া বাইজীর গানের মধ্যেই 'আহা হা' 'বাহবা বেটী' আপন মনেই বলিয়া যাইতেছিল। আর বাইজীও ভ্রূনৃত্য সহকারে স্প্রিংএর মত কণ্ঠ দোলাইয়া তাহার কজ্জলপূরিত নিষ্প্রভ নয়নে বিদ্যুৎ হানিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিল। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের উপর বহুবিধ কটাক্ষ ইঙ্গিত বর্ষণ করিয়া সে 'ভাও বাৎলাইতে' লাগিল এবং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম নৃত্য করিয়া আবার স্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মাধুর্য্যধারা- বঙ্গবাসী শ্রোতাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছিল কি না, বোঝা গেল না, কিন্তু বোদ্ধা ও অনভিজ্ঞের নিকট হইতে গায়িকা সমান তালে বাহবা পাইতেছিল, বাইজীও সহাস্যে একটি ছোট সেলাম দিয়া সকলকেই প্রত্যভিবাদন করিতেছিল। এমন সময় 'বাহবা 'কেয়াবাৎ বহুত আচ্ছা'র মধ্যে গান থামিল। এক জনের প্রাণে বেশ একটু রঙ্গীন আমোদ আসিয়াছিল, সে রক্তচক্ষু

মেলিয়া বলিল, "সেঁইয়া, মেইয়া ছোড় বাবা, তুম্ একঠো বাঙ্গলা গান্ গাও, যা সোজাসুজি আমরা বুঝি।"

কমল কার্য্যান্তরে যাইতেছিল, তাহার কাণে বাইজীর আধ আধ ভাষায় একটি বাঙ্গলা গান ভাসিয়া আসিল—'যাও হে সুখ পাও যে ঠাঁই, আমার এ দুঃখ আমি দিতে ত পারি না।'. কমল ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সারঙ্গীর ছড়ের এক একটি সুকম্পিত আঘাতে সঙ্গীতের বাণী মূর্ত্ত হইয়া কক্ষমধ্যে কাঁদিয়া লুটাইতে লাগিল, আর সেই অশ্রু-নিহিত সঙ্গীতের তরঙ্গাঘাত তীরের মত আসিয়া কমলের বক্ষ বিদ্ধ করিতে লাগিল।

কমলের হৃদয়তন্ত্রী যখন ব্যথায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল, তাহার গণ্ড বাহিয়া দরবিগলিতধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেই, সে মুহূর্ত্তমধ্যে চক্ষু মুছিয়া অগ্রসর হইতে যাইবে, এমন সময় স্যার মুখার্জ্জি কমলকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই যে বাবা, কমল! বিয়ের লগ্ন উপস্থিত, জামাইকে ছাঁদনা-তলায় নিয়ে এসো।" নিয়তির এমনই বিধান যে, বীণার আরাধ্য দেবতাকে লইয়া আসার ভার তাহারই উপর ন্যস্ত হইল।

কমল অচঞ্চল বীরের মত অগ্রসর হইয়া কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া নবাগত অতিথি বরবেশী চক্রবর্ত্তীকে বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত করিল।

আকাশে বিদ্যুৎ-বিকাশ ও বজ্রের গর্জ্জনের সঙ্গে প্রবল-বেগে বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্ব-কার সহস্র আচার, নিষেধ ও বিধানের বজ্রবন্ধনী যদিও বীণাকে স্তম্ভিত ও ভীত করিয়া ফেলিয়াছে, তবুও কিন্তু একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ও তীব্র হাহাকার তাহাকে পীড়া দিতে-ছিল—তাহার প্রাণ গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। এত উৎসব-আয়োজন, এত শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি, সময় ও অসময়ে কাযে ও অকাযে এত স্নান, নব বস্ত্র পরিধান, সহচরীদের এত অর্থহীন প্রলাপ ও পরিহাস, শুভার্থিনী বয়স্কাদের এত গম্ভীর কথাবার্ত্তা এত ছুটাছুটি হাঁকডাক, কোলাহল, চীৎকার, অকারণে উল্লাস ও ততোধিক অকারণে কলহ ও আবার তেমনই অকারণে কলহক্ষান্তি এই সকলই অদ্ভুত, আবার এই সকলেরই কেন্দ্র কি না অভাগিনী "বীণা"!

বিবাহ আরম্ভ হইবার পর নিমন্ত্রিতদিগকে কমল আহারে বসাইয়া দিয়াছিল। সে আজ মুহূর্ত্তমাত্র আপনাকে অবকাশ দিতে প্রস্তুত ছিল না। কর্ম্মের নেশায় সে আজ আপনার অস্তিত্বকে ভুলিয়া যাইতে চাহে।

বরযাত্রীর মধ্যে একটি প্রগল্ভ যুবক বলিয়া উঠিল, "এই সেই গোল্লা, তার উপরেও কি না রস জড়িয়ে আছে, এর থেকেই বুঝি 'গোল্লায় যাক্' কথাটা সৃষ্টি হয়েছে! এই গোল্লায় যেন আমি জন্মজন্মান্তরেও যাই। এই যে গোকুল-পিঠে, আহা, যা গোকুলে ব'সে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চক্ষু মুদে ভক্ষণ করিতেন। এই যে অমৃতচক্র জেলাপীর জন্য আমাদের মত কতই না ক্ষুদ্র পিপীলিকার সমাগম হয়েছে। কত না ঔদরিকের রসনা—আর এই যে সরপুরিয়া জিহ্বাগ্রে ফেলিয়া দিলে, আহা"—বলিয়াই সে কয়েকটি সরপুরিয়া মুখগহ্বরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই আত্মা-পরমাত্মার দিকে চলিয়া যাউক।"

সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, বৃদ্ধরা গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিবার জন্য মনে মনে হাসিল। কমল পরিবেষণ করিতে-ছিল। শুধু তাহারই মুখে হাস্য একবারও ফুটিল না। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সেই সে কি সত্য সত্যই বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে?

বিবাহের কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, ক্লান্তবর্ষণ রজনীতে কমল ভগ্ন-হৃদয়ে ক্লান্ত, অবসন্নপদে আসিয়া গৃহসংলগ্ন ছাদের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া ত্রিতলকক্ষস্থিত বাসরঘরের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে।

ম্লান-পাণ্ডুর আকাশ চন্দ্রহীন, চাপল্যহীন, চিরন্তন জড়-তায় সমাচ্ছন্ন। উৎসবান্তে রজনীর আর্দ্র অলসতা যেন আবার পৃথিবী জুড়িয়া আসন বিছাইয়া লইয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া বাসরঘরের কৌতুক-হাস্যের এক একটি অকম্পিত তরঙ্গাঘাতে নিথর নিশ্চল অন্ধকার টুকরা টুকরা হইয়া যাই-তেছে। কেহ যেন আকাশের কৃষ্ণ-যবনিকা ছুরিকাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া এক একবার ঊর্দ্ধতন চির-রৌদ্রোজ্জ্বল লোকে পলাইতে চায়, বৃথা যেন কোন অজানা প্রভাতী পাখী দীপ্তিহীন পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া নিষ্ফল প্রতীক্ষায় পাখা ঝাপটাইয়া উঠে।

একা দাঁড়াইয়া এমনই একটি হাসির তরঙ্গে চমকাইয়া কমল ক্ষিপ্র পদচারণা করিতে লাগিল। বাহিরের বর্ষণার্দ্র আলস্যজড়িত তরল অন্ধকার যেন তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল—যেন তাহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বুকের তলে আশ্রয় লইল।

এক একবার ক্ষণিকের বিদ্যুদ্দাম, পরিহাস-হাস্য, অন্ধকার-পটের উপর যেন রুদ্ধ আক্রোশের অজানিত ব্যঙ্গের ছুরিকা-ঘাত! হঠাৎ একটা উচ্চারিত শব্দ কাণে গেল। বুঝি বাসরঘরের তীব্র হাস্যোৎসবে কমল চমকাইয়া উঠিতেই স্যার মুখার্জ্জির ছোটপুত্র আসিয়া কমলকে ধরিয়া বলিল, "এই যে কমলদা, তুমি এখানে একলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছ, বাবা যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, চল, খাবে চল।"

কমল কাতর-কণ্ঠে কহিল, "আমার ক্ষিধে নাই।" নিধু তাহাকে জড়াইয়া বলিল, "সেদিন চ'লে যাবার পর আর এখানে আস্‌তে না কেন, কমল দা?"

কমল বলিল, "অসুখ করেছিল, তাই আস্‌তে পারি নি, তুই এখনো ঘুমুসনি যে?"

"আজ বুঝি ঘুমুতে হয়! নমি দিদি, নীলা দিদি, আরও কত সব এসেছে, সবাই মিলে জামাই বাবুকে ঘিরে আমরা কত মজা করছিলাম।"

কমল বালকটিকে বক্ষে ধরিয়া বলিল, "আমি এ কয়দিন না আসাতে কেউ কিছু বলছিল না কি?"

সরল-মনে বালক উত্তর করিল, "তোমার জন্য দিদি রোজ কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করত। আমায় এক দিন ধ'রে বলেছিল, দরোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তোমায় চুপে চুপে ডেকে নিয়ে আসতে। সে দিন আমাদের 'সি'টিমের ফুটবলের ম্যাচ ছিল, তাই দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, তুমি আমার দিদিকে দুঃখু দিতে কেন, কমলদা?"

কমলের বক্ষ আলোড়িত করিয়া মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস কাঁপিতে কাঁপিতে উর্দ্ধে উঠিয়া আপনার ভারে বুঝি আবার মাটীতে পড়িয়া গেল।

এমন সময় স্যার মুখার্জ্জি কমলকে দেখিয়াই কহিলেন, "রাত্রি অনেক হয়েছে, তুমি এখনও খাওনি, চল, খাবে চল। তোমায় ওপর নীচে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।"

কমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার ক্ষিধে নেই, তা ছাড়া শরীরটাও একটু খারাপ মনে হচ্ছে।"

স্যার মুখার্জ্জি বলিলেন, "তা আর হবে না, কি ভীষণ পরিশ্রমই না করেছ—এত বড় কাযটা কেবল তোমার জন্যই জলের মত হয়ে গেল। আমাকে একটুও বিব্রত হ'তে হয় নি। এতটা পরিশ্রম যে করতে পার, তা আমার ধারণাই ছিল না। চল বাবা, একডোজ হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে শোবে চল। এর পর আবও রাত্রি জাগলে কি জানি যদি বেশী শরীর খারাপ হয়।"

এ ব্যাধির ঔষধ কোনও প্যাথির মধ্যে আছে কি?

পরদিন বর-কন্যার বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। ভেসে আসা সানাইয়ের করুণ তান বাতাসকে আরও যেন বিষাদভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। সকলের মুখেই একটা বিদায়ব্যথার মলিন ছায়া ঘনাইয়া উঠিল।

স্থির-ধীর-গম্ভীর-প্রকৃতি স্যার মুখার্জ্জি ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছিতেছিলেন। তাঁহার নয় বৎসরবয়স্ক ছোট পুত্র নিধু, তাহার দিদি চলিয়া যাইবে শুনিয়া কাঁদিয়া মাটীতে গড়াগড়ি যাইতেছে—বিমলেরও চোখ শুষ্ক নাই, দাস-দাসী, কর্ম্মচারিবর্গ সকলেরই নয়ন আর্দ্র।

বীণার সখী ও সহপাঠীদেরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কমল প্রস্তরমূর্ত্তির মত এক কোণে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

বীণা আসিয়া তাহার পিতার পদপ্রান্তে প্রণাম করিতেই কন্যার মস্তকে হাত দিয়া স্যার মুখার্জ্জির ওষ্ঠাগ্র কাঁপিয়া উঠিল। মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। তিনি উদগত অশ্রুবারি গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন।

বীণা তাহার ছোট ভাইকে কোলে লইয়া দাদার পদধূলি গ্রহণ করিল, তাহার পর কমলের পদধূলি লইতে গিয়া সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণা সে কি কমলের চরণে উজাড় করিয়া দিল? বীণা তাহার ব্যথানিবিড় সজল দৃষ্টি কমলের প্রতি নিক্ষেপ করিতেই—কমল মাথার উপর যেন পর্ব্বতভার লইয়া টলিতে টলিতে নীচে নামিয়া ফটক উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বীণা স্বামীর সহিত মোটরে আরোহণ করিল।

পাঁচ

সপ্তাহকাল হইল, কমল তাহার দ্বিতলের পাঠাগার হইতে নামে নাই। এক একটি দিন কমলের কাছে এক একটি যুগ বলিয়া মনে হয়। আহার-নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করার সামিল হইয়াছে। দিবা-রজনীর প্রায় অবচ্ছেদ আত্মীয়তা সাধন করিয়া আকাশ জুড়িয়া যে কালো নিথর মন্থর মেঘ বিরাজ করিতেছে, তাহা কাল-বৈশাখীর ঝড়ো

মাতাল উদ্দাম মেঘ নহে, তাহা যেন বর্ষার গতিহীন, ছিদ্র-শূন্য, নিবিড় ও নিকষকৃষ্ণ জলদজাল। নিতান্ত অর্থহীন দৃষ্টিতে কমল দেখিতে থাকে—পথে নগ্নপদে স্কুলের ছাত্র, আফিসের কেরাণী ও বাজারের ব্যাপারী যত দূর সম্ভব বস্ত্র সঙ্কোচ করিয়া চলিয়াছে।

এই আর্দ্র অলসতা, এই কর্ম্ম-কোলাহলহীন অবসর, আকাশ-বাতাস ও পৃথিবীর এমনই গা এলাইয়া চোখ মুদিয়া পড়িয়া থাকা, ইহা যেন কমলের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। এই সজল মন্থরতা, এই মেঘসমাচ্ছন্ন আকাশ, এই বর্ষার্দ্র পৃথিবীর সহিত কি তাহার অন্তরের যোগাযোগ সাধিত হইয়াছে?

বিবর্ণ-শুষ্কমুখে কমল মেঘগম্ভীর আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বিরহী যক্ষ এমনই করিয়াই বুঝি আকাশের দিকে চাহিয়া মেঘকে দূত করিয়া তাহার প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে পাঠাইত। কমলেরই অশ্রুবারি যেন আজ বাষ্পরূপে ঊর্দ্ধে উঠিয়া ধরণীর বক্ষে ক্ষোভে আছড়াইয়া পড়িতেছে! তাহার বক্ষের ভিতর সঞ্চিত বিরাট বিপুল ঘনী-ভূত অন্ধকার কি আজ রূপ লইয়া নীল অম্বরতলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে? আকাশের শতচ্ছিদ্র দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে—ছেদ নাই, শ্রান্তি নাই।

কদম্বের ডাল-পাতা বহিয়া জল পড়িতেছে, সেই এক-ঘেয়ে শব্দ পাতার উপরেও টপ্ টপ্ টপ্। মৃদু বাতাসে শাখা এক একবার এক একটু নড়িয়া উঠে, জলের একঘেয়ে শব্দ যেন ভাঙ্গিয়া যায়। দুই একটি করিয়া ফুলের কেশর ঝরিয়া পড়ে। কমল এই বৃষ্টির টপ্ টপ্ শব্দটাই কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যেই বুঝি একটা বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেক জলবিন্দুরই বুঝি কিছু নূতন বক্তব্য আছে। এক সময় মানুষ যখন নীড়-রচনা সুরু করে নাই, তখন মানুষ বোধ হয় ইহাদের ভাষা বুঝিত, ইহাদের অশ্রান্ত প্রেম-আলাপন তাহার প্রাণে গিয়া পৌঁছা-ইত। মানুষ যে দিন আপনার ভাষা পাইল, সেই দিনই বুঝি ইহাদের ভাষা বুঝিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিল। আবার কি সে শক্তি ফিরিয়া পাওয়া যায় না?

টপ্ টপ্ টপ্—সেই [illegible]হীন, অন্তহীন, বৈচিত্র্যহীন শব্দ! ঝর্—ঝর্, ঝর্‌ঝর্—অবিরল অবিরাম একই ধ্বনি! আকাশ চির-ম্লান, মনের জমাট অন্ধকার আরও জমিয়া বসে, ঘরের মধ্যেও যেন আর্দ্রতার ছোঁয়াচ লাগিতেছে। ছাতাধরা বইগুলি মাজিয়া ঘষিয়া পড়িতে বসিলেও যেন পড়া চলে না—বড় অন্ধকার, বইয়ের পাতাগুলিও যেন ভিজা ভিজা—বিদ্যার প্রদীপ্ত মহিমা যেন স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। কমলের বিষণ্ণমন যেন ক্লান্তিভরে এলাইয়া পড়িতেছে। বাহিরেও পা বাড়াইবার উপায় নাই, জুতা সপ্তাহকাল পূর্ব্বে অভিষেক লাভ করিয়াছে, এতক্ষণে তাহাতে উদ্ভিজ্জজাতির জন্ম সূচিত হইতেছে। বাহিরে বৃষ্টি—ভিতরেও ম্লান আলো, সঙ্গহীন অবসন্ন মন, কমলের উদাসীন দৃষ্টি সম্মুখবর্ত্তী গৃহসংলগ্ন উদ্যানের কদম্বগাছটার উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। সম্মুখে রোমাঞ্চিত কদম্ববৃক্ষ ফুলে ফুলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, কমলের শূন্য-দৃষ্টি তাহার সৌন্দর্য্যটুকুকেও স্বীকার করিতে চাহে না।

কমলের বৌদি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিলে বাঁচবে কি ক'রে? ওবেলা ত কিছুই খেতে পারনি। জলখাবার এনেছি, মুখে যা হোক্ কিছু দিয়ে নাও, চোখ-মুখ কি রকম হয়ে গেছে, একবার আয়নায় দেখেছ?"

তাঁহার স্নেহ-করুণ আহ্বান কমলের চেতন ও অচেতন লোকের রুদ্ধ বাতায়নটি খুলিয়া দিল। সে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বলিল, "কে, বৌদি? আমার ক্ষিধে নেই, আমি খাবো না।"

কমলের বৌদি দৃঢ়-কণ্ঠে কহিলেন, "তোমায় খেতেই হবে, ওরকম মুখ বুজে ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে না, বাঁচবে কি ক'রে?"

কমল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া করযোড়ে কহিল, "একলা ব'সে থাক্‌বার অধিকারটুকুও কি আমার নাই? বৌদি, তুমি দয়া ক'রে এখান থেকে যাও, আর আমায় বিরক্ত ক'র না।"

কমলের বৌদি কমলের মর্ম্মব্যথার সমস্ত ইতিহাসই জানিতেন। আর বেশী কথা বলা সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। গমনকালে একটা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার নাসাপথে নির্গত হইয়া গেল।

আষাঢ়ের অশ্রান্ত বৃষ্টিধারা একটু মন্দীভূত হইয়া আসিতেই কমল শুনিতে পাইল, পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ী হইতে কে এক জন গাহিতেছে—

"হেরিয়া সজল ঘন নীল গগনে,
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।"

গান শুনিবামাত্র কমল দুই হস্তে কর্ণদ্বয় চাপিয়া বন্ধ করিল। ক্ষণকাল পরে আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "নাঃ, আর পারি না। ঘর বাহির সব অসহ্য হয়ে উঠেছে।" সে উন্মত্তের ন্যায় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল ও একটি ওয়াটার-প্রুফ হস্তে লইয়া ছাতা-মাথায় পথে নামিয়া পড়িল।

গ্রে ষ্ট্রীটে সুরেশ থাকে। এত দিন পরে কমল তাহার কাছে যাইবার জন্য ব্যগ্রতা অনুভব করিল।

কমল চিৎপুর অতিক্রম করিবার সময় উপরে বাবুদের সুরাবিজড়িত কণ্ঠস্বর ও গানের মধ্যে অহেতুক চীৎকারের সঙ্গে বিকট হাস্যধ্বনি ও তালকাটা বাহবা শুনিতে পাইল। জনৈকা স্বৈরিণী গাহিতেছিল—

"সাধের সাগর জনমের মত শুকায়ে গেল গো আজি।"

যে কমল কখনও বারবনিতার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই, সেই আজ নীচের ফুটপাতে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া গান শুনিতে লাগিল।

গান থামিতেই এক জন বাবুর ইয়ার বলিয়া উঠিল, "আহা, ও কথা বোল না; বিবিজান। আমরা বেঁচে থাকতে তোমার 'সাধের সাগর' কিছুতেই শুকিয়ে যেতে দেব না। পুরোদম এক গেলাস টেনে নাও, দেখবে, সাধের সাগরে আবার উজান বইতে সুরু করেছে। এই দেখ না, আমার ছেলেকে তার মায়ের মৃত্যুর পর বারো বছর বুকে ক'রে মানুষ করেছিলাম—সে-ও আমাকে এক মাস হ'ল ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে। তার পর বাবুর মত মহাশয় লোকের আশ্রয়ে এসেছি, বাবুর জুতো ঝাড়ি আর হরদম মদ টানি। খোদা কি অমৃতই তৈরী করেছিল, সব দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। আরে ছাই, নেশাটা চ'টে যাচ্ছে,—দাও বিবিজান, তোমার শ্রীহস্তে একপাত্র শীগ্‌গীর ঢেলে দাও।"

সহসা একটি লোক কমলকে ঠেলা দিতেই সে চমকাইয়া বলিয়া উঠিল, "কি রকম তুমি লোক হে?"

আগন্তুক বলিল, "ভাল রকমেরই লোক, ভয় নেই। অমন ক'রে ফুটপাতের মাঝে ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁ ক'রে উপরের দিকে শুধু চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে আমাদের যে বড় অসুবিধা হয়। বলি, আমাদেরও ত পথ দিয়ে যেতে আস্‌তে হবে?"

কমল ত্রুটি স্বীকার করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি চলিয়া যাইবার পর কমলের মাথায় কেবলই ঘুরিতে লাগিল যে, সর্ব্বসন্তাপহারিণী সুরাই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল। যদিও কমল এইরূপ ধরণের কথা আরও কয়েকবার অনেকের কাছে, এমন কি, বন্ধুবর্গের কাছেও শুনিয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে কতই না তর্ক করিয়াছে, কিন্তু আজ এই কথা সত্য সত্যই কমলের মনে গাঁথিয়া গেল যে, সুরাই তাহার একমাত্র বন্ধু।

যে কমল কলেজে পড়িবার সময় মানুষের চরিত্র-গঠনের জন্য কতই না টেবল চাপড়াইয়া বক্তৃতা দিয়াছে, কতবার উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছে যে, "মানুষের অন্তরশুদ্ধি না হইলে কর্ম্ম-শুদ্ধি হয় না, যে মানুষের জীবনে সংযমের অভাব থাকে, যে মানুষের জীবন নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সে মানুষই নহে। মানুষ যত দিন মূর্ত্ত সত্যের পূজা না করিতে শিখিবে, তত দিন এই মূর্চ্ছাপন্ন দেশে আমাদের জাতীয় জীবনে কোন আশাই নাই", সেই সত্যের উপাসক কমল আজ সুরার দোকানে উপস্থিত হইয়া কম্পিত-কণ্ঠে মদ্য চাহিল।

সুরাপান করিবার পূর্ব্বে একবার কমলের বুক কাঁপিয়া উঠিল। ইহাই কি বিবেকের নিষেধাজ্ঞা? সে আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, এক নিশ্বাসে মুখ বিকৃত করিয়া পূর্ণপাত্র গরল গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। গেলাস উপুড় করিয়া রাখিয়া পুনরায় দ্বিতীয় পাত্র চাহিল। নিমেষমধ্যে ইহাও নিঃশেষ হইয়া গেল। মূল্য দিবার সময় কিঞ্চিৎ অর্থ কম হওয়ায় তাহার মূল্যবান্ ওয়াটার-প্রুফটি বন্ধক দিয়া গ্রে ষ্ট্রীট অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথ চলিবার সময় গুন্ গুন্ করিয়া বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় একটি গান সে ধরিল—

'ভুলিব বলিয়া গরল খেয়েছি।'

দুঃখের গান কি মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী!

যখন কমল সুরেশের বাড়ী পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুরেশ ব্যর্থ-প্রেমের করুণ কাহিনী 'দেবদাস' তন্ময় হইয়া পাঠ করিতেছিল। বহুদিন পরে তাহার প্রিয়বরকে দেখিয়া সুরেশ আনন্দাতিশয্যে কমলকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখে দুর্গন্ধ পাইয়া আবার পিছাইয়া গেল ও বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টি মুহূর্ত্ত কমলের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল, "এ কি! শেষে বিষ খেতে সুরু

মূলি ? এ থেকে কেউ যে কখনও সুখ পায়নি, তাও কি তামার মত মানুষকে নতুন ক'রে বল্‌তে হবে ? সুস্থ প্রাণকে ্যস্ত ক'রে লাভ কি ভাই ?"

কমলের ওষ্ঠপ্রান্তে একটা অতিদীন, শুষ্ক, ম্লান, প্রাণহীন ্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল। মর্ম্মভেদী অস্ফুট স্বর তাহার ক্ষকে মথিত করিয়া হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া কহিল, 'সুস্থ প্রাণ'। কমলের মস্তিষ্কে তখন রার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। সে বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'বিষস্য বিষমৌষধম্। হাঃ হাঃ হাঃ!"

সুরেশ কমলের সব খবরই রাখিত এবং ইহাও জানিত য, আজকাল কমলের বেদনা কত বড় দুঃসহ হইয়া তাহাকে উন্মত্ত করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে! তবুও বন্ধুর এই ভয়াবহ পরিবর্ত্তন সুরেশের নিকট স্বপ্নাতীত। সে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে কমলের প্রতি চাহিয়া রহিল। পর্ব্বত-মুখ ভেদ করিয়া উত্তপ্ত গৈরিকধারা যেমন প্রচণ্ডভাবে ছুটিয়া যাইতে থাকে, কমলের মুখ হইতে রুদ্ধ ভাবপ্রবাহ তেমনই ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

সে জড়িতকণ্ঠে বলিয়া চলিল, "কর্ত্তব্য বুকের রক্ত দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত পালন ক'রে এসেছি, ভাই। জীবনের গান ফুরিয়ে গেল। ধনীরা কি অভিশপ্ত, বন্ধু! তারা অন্যের চোখে দেখে, পরের কাণে শোনে। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি পত্তনী দিয়ে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করে। চুলোয় যাক্ আমার মরালিটি, দূর হয়ে যাক্ জাত্যভিমান; পৃথিবীর বুক থেকে ধুয়ে-মুছে যাক্ আভিজাত্য-গর্ব্ব!"

কমলের হৃদয়-সঞ্চিত গভীর ব্যথা বুঝি দ্রবীভূত হইয়া তাহার নয়নপ্রান্তে ভাসিয়া উঠিল। তাহার গণ্ড বাহিয়া তপ্ত অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। কমল মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বন্ধু, স্মৃতি বড় মধুর, আবার স্মৃতি বড়ই তিক্ত। আমার সব চাওয়া ফুরিয়ে গেছে, ভাই। বিস্মৃতি চাই, আমি ম'রে বাঁচতে চাই। দয়া ক'রে তুমি অন্ততঃ আমায় ঘৃণা করো না, আমায় ভুল বুঝো না, বন্ধু! তোমার পায়ে পড়ি।"

এইরূপ নিষ্ফল আক্রোশে কতকগুলি অনর্গল অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে বকিতে [illegible]া পড়িতেই সুরেশ কমলকে ধরিয়া তাহার দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল ও তাহার শিয়রে উপবেশন করিয়া উত্তপ্ত ললাটে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কমল গভীর নিদ্রাভিভূত হইল। সুরেশের নয়নপ্রান্ত হইতে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল।

দুই

কমল নিজের উপর, তাহার পিতার উপর, সমস্ত জগতের উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। মানুষ দেখিলেই সে দূরে সরিয়া যায়। কলিকাতায় বাস করা কমলের পক্ষে এখন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। তাই শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে মাস দুয়েকের জন্য সে পুরীতে আসিয়াছে। এখানে আসিয়া পিতাকে লুকাইয়া তাহাকে মদ্যপান করিতে হয় না। পুরীতে প্রায় এক মাস হইল, সমুদ্রের ধারে একটা নির্জ্জন বাড়ী ভাড়া লইয়া সে আছে। এক দিনের জন্যও সে বাহির হয় নাই। সুরাই এখন তাহার জীবনের একমাত্র সঙ্গী। অত্যধিক মদ্যপান হেতু শরীরও কৃশ হইয়া উঠিয়াছে—যতক্ষণ অসাড় না হইয়া যায়, ততক্ষণ কমল মদ্যপান করে। সে ধীরে ধীরে কি মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে? যাহাকে ভুলিবার জন্য সে আকণ্ঠ বিষ-পান করিয়া চলিয়াছে, সত্যই কি কমল তাহাকে ভুলিতে পারিয়াছিল?

কমল সদ্যঃ দিবানিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার বাড়ীর বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুইয়া সমুদ্রবক্ষে ঢেউগুলির উত্তাল গভীর মন্দ্র শুনিতেছিল। দিগন্ত তাহাকে যেন হাতছানি দিয়া আহ্বান করিতেছে। নীল বারি-রাশি ক্রমে গাঢ় নীল হইয়া অনন্ত নীলাকাশকে বাহুবেষ্টন করিয়া চুম্বন করিতেছে।

একটা পাখীর চীৎকারে কমলের সহসা চমক ভাঙ্গিল। তাহার কণ্ঠস্বরে যেন অনাদিকালের বিরহের আর্ত্তধ্বনি অনুরণিত হইয়া উঠিল।

কমল সবেমাত্র সুরা-পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া টেবলে রাখি-য়াছে, এমন সময় পিয়ন আসিয়া তাহার নামীয় একখানি পত্র দিয়া গেল। কমল তাহার বাড়ীর পত্র ভাবিয়া প্রথমতঃ উহা টেবলের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিল, কিন্তু তখনই তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, কল্যই সে বাড়ীতে পত্রোত্তর দিয়াছে। আবার এ কাহার চিঠি আসিল? সে পত্রখানি তুলিয়া দেখিল, না, ইহা ত বাড়ীর কাহারও নিকট হইতে আসে

নাই। হস্তাক্ষর যে তাহার পরিচিত। উদ্বেগ-ব্যাকুল-হৃদয়ে সে ক্ষিপ্র হস্তে পত্রখানি খুলিয়া ফেলিল। পত্রে লেখা ছিল—

"শ্রীচরণ-কমলেষু

দাদাকে আপনার বাড়ীতে পাঠিয়েছিলুম, তিনি এসে বল্লেন, এক মাস হ'ল, আপনি পুরী চ'লে গিয়েছেন। তার পর কোন রকমে ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে পত্র দিলুম। 'অভাগী যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়' কথাটা বুঝি আমার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল, বিয়ের পরদিন শ্বশুরবাড়ী পৌঁছবার পরেই আমার স্বামী একখানা জরুরী তার পান। পরদিনের রেঙ্গুন মেলে না গেলে ঠিক সময় পৌঁছান যাবে না। অনুপস্থিতিতে বহুলক্ষ টাকা লোকসান হয়ে যাবে। সুতরাং ফুলশয্যার উৎসব বন্ধ রেখে তিনি চ'লে গেলেন। তার পর তিন সপ্তাহের মধ্যে সব শেষ—মিঃ চক্রবর্ত্তী কলেরায় হঠাৎ মারা যান। আমি আবার পিতৃগৃহে ফিরে এসেছি। দাদা, বিশেষতঃ আমার বাবা শোকে বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন।

ভাগ্যহীনা—
বীণা।"

পত্র পড়িয়া কমল দুঃখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য অভিনীত না হইতেই—কোন সাধ না মিটিতেই বীণার জীবন-রঙ্গমঞ্চে অন্ধকার-যবনিকা তুলিয়া উঠিল! ভগবান্! এ কি হইল! কমল টেবলের উপর হইতে হুইস্কির বোতল, গেলাস, সোডার বোতল সব দূরে ছুড়িয়া ফেলিল। কঠিন মেঝের সংস্পর্শে সমস্তই ঝন্ ঝন্ করিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। শব্দ পাইয়া কমলের ভৃত্য তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিতেই কমল বলিল, "সব গুছিয়ে নে, আজই এখুনি বাড়ী যাব।" বাবুর হয় ত মদের খেয়াল ভাবিয়া ভৃত্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কমল টাইম-টেবল দেখিয়া বলিল, "বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাঁধুনীকে গিয়ে বল, আজ আর রান্না চড়াতে হবে না। গাড়ী ছাড়তে প্রায় এক ঘণ্টা সময় আছে, যা, তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে বেঁধে নে।"

পরদিন কমল তাহার পিতাকে আসিয়া প্রণাম করিতেই নীলকান্ত বাবুর হস্তস্থিত হরিনামের মালা জোরে ফিরিতে লাগিল।

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরে কাল যে সন্ধ্যার সময় তোমার পত্র পেয়েছি। পত্রে আরও এক মাস থাকবার কথা ছিল। যা হোক, এসেছ, ভালই হয়েছে, তোমার শরীর ভাল হওয়া দূরে থাকুক, আরও খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।"

কমল বলিল, "পুরী আমার সহ্য হ'ল না।"

নীলকান্ত বাবু পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "যাও একটু বিশ্রাম কর গে।" তিনি গোবিন্দজীউর বাড়ীতে নিয়মিত কীর্ত্তন শুনিতে চলিয়া গেলেন।

কমল স্নানাহার সমাপনান্তে ট্যাক্সি ডাকাইয়া বহু দিন পরে আজ প্রিয়জনের দর্শনাভিলাষে থিয়েটার রোডের দিকে চলিল।

কমল স্যার মুখার্জ্জির ভবনে প্রবেশ করিতেই দেখিল যে, স্বয়ং গৃহকর্ত্তা নীরবে গভীর চিন্তাক্লিষ্টভাবে বসিয়া আছেন। কমলকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই তিনি বালকের মত কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি যে সেই বিয়ের পর চলে গিয়েছ, তার পর আর এ দিকে আসনি।" কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "বীণার অদৃষ্টে বজ্রাঘাতের কথা তুমি বোধ হয় শুনেছ—মেয়েটার মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আমি মানুষের বিচার করেই অর্দ্ধেক জীবন কাটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমার প্রতি অবিচার করেই বুঝি আমাকে এই দারুণ আঘাত সইতে হ'ল।"

কমল বলিল, "বিমল, নিধু—এরা সব কোথায়?"

স্যার মুখার্জ্জি বলিলেন,—"তারা অনেকক্ষণ হ'ল বেরিয়ে গেছে, এখুনি ফিরে আসবে, তুমি ব'স, বাবা।"

বীণা ধীরপদবিক্ষেপে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পিতা ও কমলের চরণে প্রণত হইল।

বীণা যেন নীরব শোকের প্রতিমূর্ত্তি। জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দকে জীবনের মত জলাঞ্জলি দিয়া সে ব্রহ্মচারিণী সাজিয়াছে।

কমল বীণার দিকে চাহিয়াই, তাহার দৃষ্টি ভূমির দিকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। নিধু ও বিমল সেই সময় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকেই এরূপ অবস্থায় দেখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শোক মানুষকে বাক্যহীন করে। আঘাত যাহারা নীরবে সহ্য করে, বাহিরে তাহাদের শোকের বেদনার প্রকাশ

অল্পই দেখা যায়। বীণার হৃদয়ের শোকের বেদনা মুখে প্রকাশ পাইল না। সে তাহার ভাষাময় দৃষ্টি তুলিয়া একবার কমলের দিকে চাহিল। তার পর মৃদু কণ্ঠে বলিল, "এই ক'মাসে তোমার এ কি চেহারা হয়েছে, কমল-দা?"

ক্লিষ্ট হাসি কমলের ওষ্ঠপ্রান্তে ভাসিয়া উঠিল। নারী-হৃদয়ের কোমলতার তুলনা নাই। নারীর স্নেহদৃষ্টির নিকট কোন কিছুই গোপন রাখিবার উপায় নাই। বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই নারীজাতি।

স্যার অমল মুখার্জ্জি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই ত, এ কি চেহারা করেছ, কমল? তোমার কি খুব অসুখ করেছিল?"

কমল মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিল, "না, তেমন কোন অসুখ হয়নি। এমনি শরীরটা ভাল ছিল না।"

বৃদ্ধ নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পীড়া না হইলেও মানুষের শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, ইহার প্রমাণ তাঁহার কন্যার দিকে চাহিলেই পাওয়া যায় না কি? তাঁহার অবিবেচনার ফলেই আজ এই অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, ইহা কে স্বীকার করিতে পারে?

দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

* * * *

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেই শুক্লা নবমীর চাঁদের আলোক-প্রবাহ বারান্দায় আসিয়া পড়িল।

বীণার আননে জ্যোৎস্নাধারা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "ভবিষ্যতের সমস্ত দিকটা ভেবে দেখলে তোমাকে কি দুঃখ দেওয়া আমার সঙ্গত হবে?"

অধীরভাবে কমল বলিল, "আমি বাবার বিষয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছি। তিনি ত্যাজ্যপুত্র করবেন, তা জানি। কিন্তু তাতে আমি ভয় করি না। এই দেখ, কাশ্মীরের কলেজে ছ'শো টাকা মাইনের অধ্যাপক হবার আমন্ত্রণ এসেছে। তা ছাড়া থাকবার বাড়ীও পাব। এতে আমাদের সংসার চলবে না, বীণা?"

বীণা কিয়ৎকাল নীরবে কি চিন্তা করিল। তার পর স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "তোমায় দুঃখ দিয়ে আমার প্রাণে কি বিন্দুমাত্র সুখ থাকে? এত দিনেও আমায় কি বুঝতে পার নি?"

কত না অকথিত বাণী কমলের বুকের মধ্যে জটলা করিতেছিল। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে আমার চাই। একবার ইতস্ততঃ ক'রে তোমাকে হারিয়েছিলুম। এবার আমি কোন দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেব না। ঐশ্বর্য্য, ধন, দৌলত এক দিকে, তুমি আমার এক দিকে। আমার নিয়তিকে আমি পুরুষকার দিয়ে বেঁধে রাখব।"

বীণার কম্পিত দক্ষিণ করপুট কমল আপনার বলিষ্ঠ মুষ্টির মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

এ নীরব মৌন অনুমোদন কমল উপেক্ষা করিল না। এক সপ্তাহের মধ্যে সুরেশের বাড়ী হইতেই কমল বরবেশে স্যার মুখার্জ্জির গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। উৎসবের বিশেষ আয়োজন হইল না।

নীলকান্ত বাবু পুত্রের কীর্ত্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করিলেন। নাবালক পৌত্রের—প্রথম সন্তানের পুত্রের নামে সমস্ত বিষয় উইল করিয়া দিলেন।

বীণা গদগদকণ্ঠে বলিল, "কেন এ অভাগীর জন্য সব খোয়ালে?"

কমল বীণার চিবুক ধরিয়া কহিল, "কিছু খোয়াই নি বীণা, বরং সত্যই আজ আমার 'হারাণো রতন' খুঁজে পেয়েছি। জানো বীণা, তোমার অভাবে আমি কত দূর উচ্ছন্নের পথে চলেছিলাম, আমি বিবেকের অপমান করেছি—আমার নিজত্বকে হারাতে বসেছিলুম, সে কথা আজ থাক, আর এক দিন হবে।"

বীণার সুন্দর অধরে হাস্যের তরঙ্গ যেন উছলিয়া উঠিল। তাহার হৃদয়ের রক্তপ্রবাহ দ্রুততালে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে সহজ সরল তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর বুকে নিশ্চিন্ত আলস্যে মুখ লুকাইল। কমলের তৃষিত ব্যাকুল আত্মা তৃপ্ত হইল কি? কিছু দিন পূর্ব্বেও যে কমলের বিদ্রোহী অন্তর পৃথিবীর বিরুদ্ধে তিক্ততায় ও বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বিপুলা পৃথ্বী কি আজ নববধূর মত সুষমার ভাণ্ডার খুলিয়া কমলের নিকট অভিনব রঙ্গীন সাজে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে?

কমল বীণাকে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া কহিল, "বহু দিনের স্বপ্ন আজ সফল হ'ল। সেই ভূস্বর্গ কাশ্মীর হ'তে আস্বার পথে আমার এই নীলবসনা সুন্দরীর যে

পেয়েছিলুম, সেই পথেই আমরা আবার পরশু যাত্রা করব।"

বাহিরে জ্যোৎস্নাফুল্ল যামিনী হাসিতেছিল। বাতায়নের ফাঁক দিয়া মেঘমুক্ত চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যে অমৃতের স্রোত ঢালিয়া দিয়াছিল।

নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া এক অচেনা পথিক গাহিয়া চলিল—

"কত জনমের তপত তিয়াস,
কত রজনীর বৃথা হা-হুতাশ,
কি জানি কেমনে মরণ লভেছে কি বিপুল মহিমায়।
মিলনের আজি সঙ্গীত ফুটে নিখিলের বনছায়॥"

উভয়ের মনোবীণায় মিলন-মধুর গানের ছত্রগুলি বাজিয়া উঠিতেছিল কি?

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

বৈশ্বানর

বিশ্বনরের আত্মাস্বরূপ নমি তোমা দেব হব্যবহ,
সপ্তরসনা-অঞ্জলিপুটে মম বাঙ্ময় অর্ঘ্য লহ।
হে গূঢ় চেতনা, হও আজি মম ধ্যেয়ান-নেত্রে পরিস্ফুট,
মর্ম্মকোষের বাঁধন দহিয়া জীবনে আমার জ্বলিয়া উঠ।

জ্বলিতেছ তুমি ত্রিলোচন-ভালে স্মরমোহলীলা দগ্ধ করি'।
জ্বলিতেছ তুমি ভর্গেরে ঘেরি নিখিলের ঘোর ধ্বান্ত হরি'।
জ্বলিতেছ তুমি মেঘমণ্ডলে জ্বলিছ বৃত্র-হৃদয়ে পশি
জ্বলিতেছ তুমি ভুজগরাজের হাজার গরল-ফণায় শ্বসি'।

গৃহে তপোবনে স্থণ্ডিলভূমে জ্বলে উঠে নিতি অর্ঘ্য যাচো,
বিশ্বনরের জঠরে জঠরে শমীর কোটরে কোটরে আছ।
ঊর্দ্ধে জাগিছ সিন্ধুগুহায় দাবরূপে বনে বেড়াও ছুটি'
গলায়ে গিরির ধাতুশিলারাশি জ্বলিছ বক্ষ-কটাহ টুটি'।

মরুতে জ্বলিছ মৃগতৃষ্ণায় মেরুতে জ্বলিছ অরোরা-রূপে,
জাগিছ ধরার জরায়ুর মাঝে জ্বলিতেছ জ্বালামুখীর কূপে।
জ্বলিতেছ তুমি সমরকুণ্ডে রুধির-মজ্জা-সর্পি লভি,
জ্বলিতেছ তুমি সান্ধ্য চিতায় পশ্চিমমেঘে পিঙ্গছবি।

হিংসায় প্রতিহিংসায় তব লক-লক শিখা নিয়ত যুঝে,
কোপ-ঘূর্ণিত রক্তলোচনে ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলি আহুতি খুঁজে।
পাপীর পরাণে অনুশোচনার তুষানলে জ্বলি দগ্ধ কর,
বিরহকুণ্ডে ধিকি ধিকি জ্বলি প্রেম-কনকের শ্যামিকা হর'।

মম শীতজড় হৃদিশিলাতলে কত দিন আর রবে গো বল?
এ চিত্ত-অরণি অরণ্যমাঝে হিরণ্যরেতা জ্বল গো জ্বল'।

জ্বলিতেছ তুমি তরুর শাখায় অরুণ অশোক জবার বুকে,
জ্বলিতেছ তুমি আলেয়া-মালায় উল্কামুখীর ভয়াল মুখে।
ইহ-লক্ষ্মীর কর্ম্মবেদীতে গৃহলক্ষ্মীর সেবার যাগে,
খদ্যোতদীপ-ওষধিমালায় জ্বলিছ কুসুমশরের আগে।

ব্রাহ্মীর পাঁজর-সমিধে জ্বলিয়া জীবনযজ্ঞে বিতর শুভ,
ঋষির বচনে যোগীর নয়নে হে অনল, তব আসন ধ্রুব।
জ্বালাও তাতাও মাতাও আমায় কর দেব মোরে অর্চ্চিময়,
মম অবসাদ দৈন্য জড়তা কুণ্ঠা লজ্জা করিয়া ক্ষয়।

মর্ম্মকোষের নিভৃত নিবাসে কতকাল রবে হব্যবহ?
ফুটাও চিত্ত শিখাশতদলে অধ্রুব মোর সকলি দহ।
কর মোরে দেব বজ্রের মত কহাও আমারে বজ্রবাণী,
মশালের মত আগে আগে যেন দেখাই বিশ্বে পন্থাখানি।

নির্ভীক কর নির্ম্মল কর হে পাবক মোরে শুদ্ধ করি,
চিতা জ্বেলে রেখে সম্মুখে যেন জীবন-সমরে যুদ্ধ করি।
জীর্ণ দেহটি দগ্ধ করিয়া মুক্তি আমায় দিবে গো যবে
আপনার দেহ ভস্ম মাখিয়া আত্মা আমার বিরাগী হবে।
তাহারেও যদি কর গো দাহন হে [illegible] মোর শুভের লাগি
নির্ব্বাণ তরে হে চির-বুদ্ধ তবে আমি তব শরণ মাগি।

শ্রীকালিদাস রায়।

সোনার বাঁধন

(চরিত্র-চিত্র)

১

ফকিরচাঁদ বাবুর আহারাদি শেষ হইবার পরই বাড়ীর দ্বারে একখানি জুড়ি আসিয়া লাগিল। নিবেদিতা দুইটি পাণ আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, বাবা, জ্যেঠা এয়েছেন।

ফকির তাড়াতাড়ি দ্বারের নিকট আসিতেই গাড়ির ভিতর হইতে ধনেশ বলিলেন, বেরুতে হবে, বিশেষ কায আছে, কাপড় ছেড়ে এস।

গাড়ি চলিতে চলিতে ধনেশ বলিলেন, ফকির, এই নাও, তোমার এ মাসের সুদের টাকা। দশ কেতা দশ টাকার নোট গুণে নাও। আর এই বাক্সে ত্রিশ হাজার টাকার খুচরো নোট আছে। টাকাটা ইণ্ডিয়ান্ ব্যাঙ্কে তোমার নামে জমা ক'রে দিয়ে তুমি বাড়ি চ'লে এস। রাত্রে লোকজন সব চ'লে গেলে নিরিবিলি তোমায় ডেকে পাঠাব। এ টাকাটা কি হবে, তখন বল্ব। কিন্তু আমি না বল্লে তুমি এ টাকার কথা কারুর কাছে প্রকাশ কোর না। তোমার স্ত্রীর কাছেও না।

ধনেশ একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন।

ফকির বলিলেন, আজ কিছুদিন ধ'রে দেখছি, তুমি অত্যন্ত অন্যমনস্ক। রোগা ত হয়েইছ, তার উপর তোমার চোখে মুখে দেখছি বিষম দুশ্চিন্তার ছায়া—

ফকির কথা শেষ করিতে না করিতেই ধনেশ বলিলেন, রাত্রেই সব কথা হবে এখন।

ফকির নিজ নামে ব্যাঙ্কে ত্রিশ হাজার টাকা জমা দিয়া বাড়ি ফিরিলেন। আহারান্তে একটু দিবানিদ্রা অভ্যাস ছিল। বাড়ি আসিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না। বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার একটি ঘটনা কেবলই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। ফকির তখন শঙ্কর সা'র গদিতে পনের টাকা মাহিনায় মুহুরিগিরি করিতেন। যে বাটীখানি আজ তাঁহার নিজস্ব, তখন তিনি তাহারই একখানি ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতেন। নিবেদিতা তখন জন্মে নাই। পরিবার দেশে থাকিত। ঘর ভাড়া দিয়া এবং কলিকাতার খরচ চালাইয়া ফকির প্রতিমাসে পাঁচটি করিয়া টাকা গৃহিণীকে পাঠাইয়া দিতেন। দেশে খুড়া-খুড়ী ছাড়া আর কেহই ছিল না। গৃহিণী তাঁহাদেরই সংসারভুক্ত ছিলেন। কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, তাহারই আয়ে এবং এই পাঁচ টাকায় কায়ক্লেশে এক রকম চলিয়া যাইত। ফকির প্রতিদিন মধ্যাহ্নে বাসায় আসিয়া রাঁধিয়া খাইয়া তিনটার পর আবার গদিতে যাইতেন। এক দিন মধ্যাহ্নে বাসায় ফিরিয়া দেখেন, তাঁহারই ঘরের সামনে রোয়াকে তাঁহার সমবয়সী একটি যুবক অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার মুখে আসন্ন মৃত্যুচ্ছায়া যেন মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

ফকির যুবাকে আপনার ঘরে তুলিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহার শুশ্রূষায় যুবক প্রাণদান পাইল।

প্রথম চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যুবা দেখিল, এক অপরিচিত কক্ষে এক অপরিচিত ব্যক্তি উদ্বিগ্ন-দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। কলিকাতা সহর—শুনা ছিল, চোর, জুয়াচোর, গাঁটকাটার অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্র। যুবার মুখে সহসা আতঙ্কের ছায়া পড়িল। ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া আপনার কোঁচার খুঁট পরীক্ষা করিবামাত্র তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। ফকির তৎক্ষণাৎ বলিলেন, ভয় নাই। আপনার হার ত? এই দেখুন।

হার দেখিয়া যুবা আশ্বস্ত হইলে ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম?

ধনেশ রায়।

দেশে খবর দিব কি?

আবশ্যক নাই।

ক্রমে পরিচয়ে ফকির জানিলেন, আপনার বলিতে ধনেশের কেবল এক স্ত্রী আছেন। পিত্রালয়ে থাকেন। সম্প্রতি একটি পুত্র হইয়াছে। ধনেশও শ্বশুরালয়ে থাকিতেন। লাঞ্ছনা অবশ্য ছিল, কিন্তু পুত্র হইবার পর তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। স্বামি-স্ত্রীতে অনেক আলোচনা, কান্নাকাটির পর স্থির হইল, ধনেশ কলিকাতায় আসিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন। স্ত্রী সমস্ত অলঙ্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শ্বশুর-দত্ত অলঙ্কার ধনেশ স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার

মাতা যে হার-ছড়াটি দিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখিয়াছিলেন, কেবল সেইটি মাত্র সম্বল করিয়া ধনেশ কলিকাতায় আসিয়াছেন। প্রায় অনাহারে দুই দিন হাঁটিয়া আসিয়া ফকিরের রোয়াকে অচৈতন্ত হইয়া পড়েন।

ধনেশ বেশ সবল হইলে ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি করিবেন ?

কারবারের কোন সুবিধা হয় ভাল, না হয়, মোট বইব।

মূলধন ?

এই হার।

বিক্রি করবেন ?

না। এ হার আমার মায়ের; প্রথম বন্ধক রাখব। ডোবে, আমিও ডুবব।

যুবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক মুখ দেখিয়া ফকির আর কোন কথা কহিলেন না। শঙ্কর সা'র গদি হইতে হার বাঁধা রাখিয়া খুব কম সুদে একশত টাকা আনিয়া দিলেন। ফকিরের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয় বুঝিয়া ধনেশ চিকিৎসাখরচ প্রভৃতির জন্ত কিছু অর্থ দিতে চাহিলেন।

ফকির বলিলেন, তা হ'লে তুমিও যে এত দিন আমাকে রেঁধে খাওয়ালে, তার জন্ত মাইনে নিতে হবে।

ধনেশ হাসিয়া বলিলেন, তুমি আমার প্রাণদাতা, যদি কখন দিন পাই, তবেই কথা।

ধনেশ একটি বাসা ঠিক করিয়া স্থানান্তরিত হইলেন।

সত্য সত্যই ধনেশ মোট বহিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম মাথায় ঝাঁকা লইয়া আলু-পটল বিক্রয়। লোক ঠকে না, ঠিক দরে পায়, ক্রমে তাহার জন্ত ক্রেতা অপেক্ষা করিয়া থাকে। তার পর পৃষ্ঠে বোঝা বহিয়া কাপড়-বিক্রয়। ক্রমে একখানি ছোট-খাটো দোকান হইল। ধনেশ সাধুতার পুরস্কার পাইলেন। তাঁহার জীবনে সৌভাগ্যের বান ডাকিল।

ধনেশ ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে তাঁহার প্রাণরক্ষাকর্তা ফকিরকে দারিদ্র্য-দুঃখ হইতে রক্ষা করিবেন। অকৃত্রিম সুহৃদ, তাহারই ঐকান্তিক শুভ-কামনায় তাঁহার এই ঐশ্বর্য্য। দান গ্রহণ সে কদাচ করিবে না। চাকর-মনিব সম্বন্ধ ? ছি! অবশেষে স্থির করিলেন, ইহাকে ঠকাইতে হইবে।

এক দিন আসিয়া বলিলেন, ফকির, আমেরিকায় একটা ভারি লটারি হবে। দশ টাকা ক'রে টিকিট। তুমি একখানা নেবে ?

টাকা কোথায় পাব ?

আমি ধার দিচ্ছি।

ও ত লোকসান হবেই। তার পর শুধব কেমন ক'রে ?

আচ্ছা, এক কায কর। এস, বখরায় কিনি। তুমি অর্দ্ধেক, আমি অর্দ্ধেক। যদি প্রাইজ্ না ওঠে, পাঁচটা টাকা আর জীবনে শুধতে পারবে না ?

ফকির ভাবিলেন, এর এখন অদৃষ্ট প্রসন্ন। এর বরাতে যদি কিছু হয়। বলিলেন, যা বোঝ, কর ভাই। আমি কিন্তু পাঁচ টাকার বেশি দিতে পারব না, আর তাও কবে দেব, বলতে পারিনি। টিকিট্ তোমার নামে কিন্তে চাও ?

তাই হবে বলিয়া ধনেশ হাসি চাপিতে চাপিতে প্রস্থান করিলেন এবং চারি মাস পরে ফকিরকে সংবাদ দিলেন, যৌথ টিকিটে আশী হাজার টাকা প্রাইজ উঠিয়াছে।

ফকির বলিলেন, টাকা উঠেছে তোমার বরাতে। কিন্তু তোমার পাঁচ টাকা আগে কেটে নিয়ো।

কেন, তার জন্ত তোমার ঘুম হচ্ছে না না কি ? রোস, আগে টাকাটা পাওয়াই যাক্। শোন, আমি যা স্থির করেছি। এ বাড়ীটা বিক্রি আছে, আট হাজার দর দিয়েছে। এখানি আমার ভাগ্যের সূতিকাগার, তুমি কিনে রাখ। ত্রিশ হাজার টাকা আমায় ধার দাও, আমি চার পার্সেণ্ট্ সুদ দেব। বাকি টাকায় বৌমার কিছু গয়না গড়িয়ে দাও। কেমন, রাজি ?

ফকির বলিলেন, তা—

ধনেশ মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'তা' কি ? গোঁফে তা, না, ডিমে তা ? শোন, তা-টা নয়। বৌকে আর দেশে ফেলে রেখ না। কল্‌কেতায় নিয়ে এস।

কি যে বল! মোটে পনেরটি টাকা ত মাইনে—

কি বিপদ্! ত্রিশ হাজার টাকা আমায় ধার দিলে চার পার্সেণ্ট হিসাবে মাস মাস সুদই যে পাবে একশ টাকা! দুটি পেট, তাতে আর চলবে না ?

রাজার হালে। কিন্তু—

আবার কিন্তু কি ?

তোমার কাছ থেকে সুদ নেব কেমন ক'রে ?

বেশ। টাকাটা ধার পেলে আমার খুবই উপকার হ'ত। তাতে না সম্মত হও, একটা ব্যাঙ্কে রেখে দেব। বলিয়া ধনেশ কৃত্রিম কোপের ভাণ করিয়া অন্তদিকে মুখ ফিরাইলেন।

ফকির তাড়াতাড়ি বলিলেন, না না, রাগ কোর না। আমার একশ টাকায় দরকার কি? মাসে পঞ্চাশ টাকা হ'লে বেশ চ'লে যাবে। তুমি কেন ছুপার্সেণ্ট ক'রে দাও না।' কি বল?

বা রে! আপনার বেলায় আঁট-সাঁটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটি! সব ঝোলই যে নিজের পাতে টানছ! আমিই বা তোমাকে তোমার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করি কেমন ক'রে?

আহা, রাগ কর কেন? যা ভাল বোঝ, তাই কর।

বেশ। বাড়িখানা তা হ'লে আজই বায়না করি। তুমি দিন তিনেকের ছুটী নিয়ে বৌকে আন গে।

সেইরূপই স্থির হইল। উদারচেতা ধনেশ তাঁহার অকপট সুহৃদকে এইভাবে প্রতারিত করিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। মনে মনে ঠিক করিলেন, এই ভালমানুষটাকে আরও ঠকাইতে হইবে। কিছুকাল পরে কৌশলে এই ভুয়া ত্রিশ হাজার টাকায় ইহাকে আমার কারবারের অর্দ্ধেক অংশ বিক্রয় করিব। আমার কেবল স্ত্রী আর পুত্র, অর্দ্ধেক অংশে বেশ চলিয়া যাইবে।

বাড়ি ক্রয় করা হইল। ফকির কলিকাতায় সংসার পাতিলেন। ধনেশ যে দিন শুনিলেন, ফকিরের একটি কন্যা-সন্তান হইয়াছে, ভাবিলেন, হইল ভাল। কারবারের অর্দ্ধেক ভাগ দান করিবার জন্য ইহার সঙ্গে আর জুয়াচুরি করিতে হইবে না। ফকিরের এই কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিব। পাকে-প্রকারে বিষয়ের অর্দ্ধাংশ ইহারাই পাইবে। সেই দিনই প্রস্তাব করিলেন, ফকির, তোমার মেয়েটিকে আমায় ভিক্ষা দাও, আমি পুত্রবধূ করব। জন্মদিনেই অশ্বিনী-কুমারের সহিত নবজাত কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। ফকির মেয়েটির নাম রাখলেন নিবেদিতা।

এই ত গেল পূর্ব্বকথা।

২

ধনেশ যখন ফকিরকে গোপনে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে দিয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলেন, তখন উজ্জ্বল আলোকে ধরণী উদ্ভাসিত। যখন বাটী ফিরিলেন, তখন অন্ধকার, অতি ঘোর অন্ধকার। অন্ধকার মেদিনীবক্ষে, অন্ধকার অন্তরীক্ষে। অবকাশের মুখে মেঘের করাল ভ্রূকুটি। ধনেশ একবার আকাশপানে চাহিয়া গৃহ-প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী কাঁপাইয়া প্রবল ঝড় উঠিল।

ধনেশ কক্ষে প্রবেশ করিতে বৃদ্ধ কর্ম্মচারী কহিলেন, ভাগ্যে ভাগ্যে খুব এসে পড়েছেন! আমি উৎকণ্ঠিত—

কর্ম্মচারীর কথা শেষ না হইতে একটা বিশাল বৃক্ষ পতিত হইল। কর্ম্মচারী চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু ধনেশ স্থির।

বৃদ্ধ বলিলেন, উঃ! আমার জীবনে কালবৈশাখীর এমন প্রচণ্ড বেগ কখন দেখি নি!

ধনেশ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, কিন্তু দে-মশায়, যে ঝড় আজ আমার বুকের ভিতর বইছে, তার তুলনায় এ নগণ্য। আজ আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, যখন মাথায় ঝাঁকা নিয়ে বাড়ী বাড়ী আলু-পটল বেচেছি, পিঠে কাপড়ের বস্তা বয়ে কাঠ-ফাটা রোদে পথে পথে ঘুরেছি, তখন এর চেয়ে ঢের ঢের সুখী ছিলুম। সে আলু-পটলের ঝাঁকা, কাপড়ের বস্তা আশায় ভরা ছিল। সেই আশার আলোয় নিবিড় অমাবস্যাও ছিল আমার চোখে পূর্ণিমার রাত্রি। আর আজ দিনের আলোও আমার কাছে হতাশ, ত্রাস আর নিরাশাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকার, পথ খুঁজে পাচ্ছিনি।

দে-মশায় সহানুভূতিব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, পাবেন, পাবেন। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, অনেক দেখেছি। আশাশূন্য, মৃত্যুই একমাত্র পথ মনে ক'রে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, সেই সময় একখানি টেলিগ্রাম এসে তাকে আগেকার চেয়ে ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করলে।

ধনেশ বলিলেন, দে-মশায়, সেও ভাগ্য। আগে মনে করতুম, উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়, শ্রম সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করতে সমর্থ। অদৃষ্ট একটা কথার কথা, অলসের অছিলা—আত্মছলনা। এখন দেখছি, তা নয়। আমার আয়ত্তে কিছুই নাই। কে এক কুহকী আছে, সে আমার জীবন নিয়ে ভেল্‌কী করেছে। বাজীকর লাগ ভেল্‌কী, লাগ ভেল্‌কী ব'লে একমুঠো কয়লা তুলে নেয়, লোকে দেখে হীরে। এক দিন আমারও তাই হয়েছিল। এখনও সেই বাজীকর লাগ ভেলকী, লাগ ভেলকী করছে, কিন্তু সোনামুঠো হচ্ছে—ছাই! দে মশায়, এই বাড়ি, গাড়ী-জুড়ি, আসবাবপত্র, সব সেই বাজীকরের ভেল্‌কী। কর্পূরের মত কখন উবে যাবে। আমার কোষ্ঠীতেও আছে সর্ব্বস্বান্তযোগ।

দে-মশায় বলিলেন, আপনি বিজ্ঞ, আপনাকে আমি কি বোঝাব? জোয়ার-ভাটা স্বভাবের নিয়ম। আসে, যায়, আবার আসে। আপনি নির্ভরসা হবেন না।

ভরসা! এ অকূলে একমাত্র ভরসা, অশ্বিনীকুমার মানুষ হয়েছে।

বুদ্ধিমান্ ছেলে! মেডিকেল কলেজে এই যে ক'বছর পড়লে, ঘর থেকে তার জন্য কি খরচ করতে হয়েছে? জল-পানির টাকাতেই সব চালিয়েছে। তার উপর মেডেল, প্রশংসাপত্র। অশির মত বুদ্ধিমান্ কটা হয়!

ঈষৎ হাসিয়া ধনেশ বলিলেন, বুদ্ধি! ওটাও ভুয়ো—সেই লাগ ভেল্‌কী! দে-মশায়, আপনি হয় ত বিশ্বাস করবেন না। সেয়ারের কাযে একটা বড় রকম দাঁউ মারবার সুযোগ এসেছিল। আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধুকে সমস্ত হদিশ বাৎলে দিলুম। সে ডুবতে বসেছিল, হ'ল লক্ষপতি। আর সেই আমি, সেই বুদ্ধি, সেই কারবারে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ফকির হলুম!

দে-মশায় বলিলেন, সে ডুবছিল, উঠেছে। আপনিও যে আবার উঠবেন না, কে বলতে পারে!

দে-মশায়, আমার বুক ভেঙ্গে গিয়েছে। এখন আর কথায় চিঁড়ে ভেজে না। আপনিই না বলেছিলেন, কে এক জন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, একখানা টেলিগ্রাম পেয়ে তার জীবনের স্রোত ফিরে গেল। এখন আমারও জীবন-মরণ নির্ভর করছে একখানা টেলিগ্রামের উপর।

ঝড়ের বেগ কমিয়াছে, কিন্তু বাতাস এখনও প্রবল। শ্রী-ভ্রষ্ট ছিন্ন-ভিন্ন স্বভাব যেন থাকিয়া থাকিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। দু একটা নষ্ট-নীড় বিহঙ্গ মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে নিদারুণ করুণ সুরে। এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়িল, সাব, টেলিগ্রাম।

উত্তেজনাবশে ধনেশ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সহি লইয়া পিয়ন চলিয়া গেল। মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিয়া কম্পিত হস্তে ধনেশ টেলিগ্রাম খুলিলেন। দুইটি মাত্র কথা—আশা নাই (No hope)।

একবারমাত্র ধনেশ দুই হাত প্রসারিত করিয়া বায়ু আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার অচেতন শরীর নিপতিত হইল।

দে-মহাশয়ের চীৎকারে অশ্বিনীকুমার ছুটিয়া আসিয়া অবস্থামত ব্যবস্থা করিল এবং ডাক্তার আনিতে লোক পাঠাইল। সাহেব আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, অ্যাপো-প্লেক্সি—কয়েক মিনিট্ পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে।

কয়েক মিনিট্! কয়েক মিনিটে এই সর্ব্বনাশ! এখনও দেহ উষ্ণ রহিয়াছে। যে টেলিগ্রাম এই শোচনীয় দুর্ঘটনার অব্যবহিত কারণ, এখনও তাহা মৃতের হস্তচ্যুত হয় নাই!

মৃত্যুর বহু বিভীষিকাময় চিত্রে অশ্বিনীকুমার অভ্যস্ত, গুরু আঘাতেও বিচলিত হইল না। কিন্তু মাতার অবস্থা দর্শনে ভীত হইল। অন্নদা স্থিরদৃষ্টিতে পতির মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন। অশ্বিনী বলিল, মা, তুমি ত কাঁদ্‌ছ না।

অন্নদা কহিলেন, বাবা অশি, ভাল ক'রে দেখ, এ ত মূর্চ্ছা নয়?

অশ্বিনী চুপ করিয়া রহিল। এ কথার সে কি উত্তর দিবে।

অন্নদা বলিলেন, ইনি ত কখন মিছে কথা বলেন না। আপিস্ বেরুবার সময় আমাকে যে বলেছিলেন, ফিরে এসে তোমাকে একটা কথা বল্‌ব।

অশ্বিনী নানা কথায় মাকে কাঁদাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সদ্যোবিধবা অন্নদা বলিলেন, বাবা, আমার চোখে যে জল নাই।

৩

ধনেশের প্ররোচনায় ফকির গদির মুহুরিগিরি ছাড়িয়া দিয়াছেন। দিনমানে একটু গড়ানো অভ্যাস। তার পর অপরাহ্নে সুর করিয়া কৃত্তিবাস, কাশীদাস পাঠ। শ্রোতা তাঁহার পত্নী বিশ্বেশ্বরী এবং শিশু কন্যা নিবেদিতা।

আজ ব্যাঙ্কে নিজ নামে ত্রিশ হাজার টাকা জমা দিয়া আসিয়া অভ্যাসমত শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। যতবারই তন্দ্রা আসে, বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রোষাকে শায়িত ধনেশের সেই মৃত্যুম্লান মুখচ্ছবি স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠে। দুর্গা দুর্গা বলিয়া ফকির পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন। অপরাহ্নের আসরও তেমন জমিল না। ফকির উৎকণ্ঠিত-চিত্তে রাত্রি এবং ধনেশের আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি আসিল—তাঁহার পক্ষে কালরাত্রি। অশ্বিনী আসিয়া সংবাদ দিল, কাকা, বাবা আর নেই!

ফকির বসিয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করিলেন,

বাবা অশি, ধনেশ কি একেবারেই নাই ? মর্ম্মান্তিক প্রশ্ন ! মরিলে কি এমনি নিঃশেষে মরিতে হয় !

অশ্বিনী বলিল, আপনি শীঘ্র আসুন। গাড়ি এনেছি, কাকীমাকে মা'র কাছে পাঠিয়ে দিন।

তাঁর কি হ'ল, বাবা ?

সন্ন্যাস রোগ।

ফকির ভাবিতে লাগিলেন, সন্ন্যাস ! সংসার ত্যাগ ক'রে গেল, আর ফিরবে না ! কেন, কি দুঃখে ! এত যে অর্থ উপার্জ্জন করলে,শান্তিতে ব'সে এক দিন তা ভোগ করলে না। আমার কথা ছেড়েই দাও, বন্ধু বৈ ত নয় ! স্ত্রী, পুত্র, আশ্রিত-দের মুখ চাইলে না। অমনি চ'লে গেল ! তোমরা যেতে দিলে কেন ? তুমি তবে কি ছাই ডাক্তারি পড়ছ !

অশ্বিনী দেখিল, কাকা এখন বন্ধু-শোকে বিকল। কোন উত্তর করিল না।

এই আকস্মিক মৃত্যুঘটনা দুর্ব্বার অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় চারি-দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া সহরবাসীদিগকে চমকিয়া দিল। কেহ বলিল, ইন্দ্রপাত হইয়াছে ! কেহ বলিল, হ্যাঁ--তা বটে, কিন্তু কেহ সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা বক্ষ পরীক্ষা করাইয়া দ্বিপ্রহরের কাঠফাটা রৌদ্রে গলায় গলাবন্ধ জড়াইল ! অটুট স্বাস্থ্য, অপরিমিত দৈহিক ও মানসিক বল, অসাধারণ বুদ্ধি, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অক্ষুণ্ণ কৃপা, ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য, সব—সব ব্যর্থ। লোক ভীত, চকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ধনে-শের কর্ম্মস্থলের ম্যানেজার যখন প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার কারবারের অবস্থা অতীব শোচনীয়, তখন আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এতবড় কারবার, গাড়ি, জুড়ি, সব ফাঁকি। অথচ ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারে নাই ! কর্ম্মচারিগণ প্রতিমাসে পয়লা তারিখে নিয়মিতরূপে বেতন পাইয়াছে। দীন-দুঃখী যাহারা সাহায্য পাইত, সমভাবে সাহায্য পাইয়াছে। বাটীর আশ্রিতগণ নিশ্চিন্তভাবে ভরণপোষণ পাইয়াছে। আর এই সকলের চিন্তাভার ধনেশ একাই বহন করিয়াছেন। স্ত্রীপুত্রের নিকটেও একদিনের জন্য কোনরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন নাই, পাছে তাহারা ক্ষণিকও অসুখী হয় ! ফুল যেমন বুকের মাঝে কীটকে লুকাইয়া রাখিয়া সৌরভ বিতরণ করে, ধনেশও তেমনি অন্তরে আপনার বেদনা লুকাইয়া চারিদিকে আনন্দ বিতরণ করিতেন।

ম্যানেজার মনিবের অতীব বিশ্বাসের পাত্র ছিল। অন্নদা তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, কারবার-রক্ষার কোন উপায় আছে কি ?

কিছুমাত্র না।

তিনি কি কারবারের অবস্থা সব জান্‌তেন না ?

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জান্‌তেন।

কিসে এত লোকসান হ'ল ?

শেয়ার-কারবারে। এই কায যে রাতারাতি কত লোককে সর্ব্বস্বান্ত করেছে, তা বলা যায় না। সবই অদৃষ্টের খেলা।

তবে আপিস রেখেছিলেন কি ভরসায় ?

আমেরিকার এক দালাল তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ভরসা দিয়েছিলেন, আবশ্যক হ'লে তিনি টাকার জোগাড় ক'রে দেবেন।

তাঁকে জানান হয়েছিল ?

হয়েছিল—টেলিগ্রামে।

কি উত্তর এসেছিল ?

সে উত্তর ত তিনি হাতে করেই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন – কোন আশা নাই।

ফকির বলিলেন, তা হ'লে এখন লিকুইডেশন্ (liquidation) করতে হবে ?

অন্নদা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি ?

ম্যানেজার বলিলেন, প্রথম দেনা-পাওনা, বিষয়-সম্পত্তি ঠিক করা। যদি দেনার পরিমাণ বিষয়-সম্পত্তির চেয়ে বেশি হয়, তা হ'লে পাওনা আদায় ক'রে, বিষয়-সম্পত্তি বেচে পাওনাদারদের ভাগ ক'রে দেওয়া।

অশ্বিনীকুমারের প্রার্থনা অনুসারে আদালত দুই জন লিকুইডেটর্ নিযুক্ত করিলেন। ধনেশের যে ত্রিশ হাজার টাকা ফকিরের জিম্মায় ছিল, সে সম্বন্ধে আপাততঃ তিনি কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। ভাবিলেন, টাকাটা ওরূপ গোপনভাবে রাখার ধনেশের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। কি সে উদ্দেশ্য ? দেখা যাক, কারবারের কাগজপত্র হইতে যদি কোনরূপ আভাস পাওয়া যায়। আর আফিসের খাতায় ত তাঁহার নামে চার পার্সেণ্ট সুদে হাওলাত খাতে ত্রিশ হাজার টাকা জমা আছে। কিন্তু আফিসের কি বাড়ীর কোন হিসাবেই তাঁহার নামে ত্রিশ হাজার টাকা জমা খুঁজিয়া

নোট্‌বহিতে প্রতিমাসে লেখা আছে—ফকিরের সংসার-খরচ বাবদ্ ১০০৲। একখানিতে লেখা—ফকিরের বাড়ি ক্রয়—৮০০০৲। অন্ত একখানি বহিতে ফকিরের স্ত্রীর জন্ত অলঙ্কার ৩০০০৲। এইরূপ কাহারও কন্তার বিবাহের সাহায্যে, কাহারও বাড়ি কেনা, কাহারও ঋণ শোধ হিসাবে অনেকের নামে অনেক টাকা লেখা আছে। এ সকল বহি অতি গোপনে রক্ষিত হইত, কখনও ম্যানেজারের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কারবারের খরচবহিতে এই সমস্ত টাকা গুজরৎ খোদ বাবদ্ খরচ পড়িত। সদাশয়, সহৃদয়, উদারচেতা মনিব এত টাকা কিরূপে খরচ করিতেন, ম্যানেজার এত দিনে তাহা বুঝিলেন।

কারবারের সমস্ত দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখা গেল যে, ধনেশের এলবাৎ পোষাক, গাড়ি, জুড়ি, বাগান, বাড়ী সমস্ত বিক্রয় করিয়াও প্রায় পনের হাজার টাকা ঋণ অবশিষ্ট থাকে।

অশ্বিনী ও তাহার মাতাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া ম্যানেজার বলিল, মা, একটু সাম্‌লে চল্‌লে আজ তাঁর পরিবারবর্গকে পথে বস্‌তে হ'ত না। আজ প্রায় বছর দুই ধ'রে লাভের অঙ্কে শূন্ত। খরচ কমেনি।

অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু খরচ করতেন কি ক'রে?

ম্যানেজার বলিল, ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা ছিল, তাই দিয়ে খরচ চালিয়ে এসেছেন। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে নিঃশেষ হয়ে গেল। একটা বড় ভরসা ছিল ঐ দালাল বন্ধু—ঋণ জোগাড় ক'রে দেবে। তাঁর পরিবারবর্গের সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি রাখতে আমি অনেকবার বলেছিলুম। যখনই বলেছি, জবাব দিয়েছেন, ভগবান্ অনেকগুলি পরিবারের ভার আমার উপর দিয়েছেন, এক পরিবারের কথা ভেবে আর কি করছি। তিনি মানুষ ছিলেন না—দেবতা। কিন্তু, মা, সংসার যে মানুষের। একটু যদি বুঝে ব্যবস্থা করতেন!

অন্নদা অশ্বিনীকে তাঁহার গহনার বাক্স আনিতে বলিয়া বলিলেন, বাবা, তাঁর কার্য্যের বিচারক আমরা নই। তিনি যাঁর কাছে গিয়েছেন, তিনিই তাঁর বিচারকর্ত্তা।

অন্নদা বাক্স খুলিয়া একে একে সমস্ত অলঙ্কার ম্যানেজারের হাতে তুলিয়া দিয়া কেবল একছড়া সোনার হার আপনার কাছে রাখিলেন।

ফকির ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ও কি কর, বৌদিদি! এ সকল গয়না তোমার স্ত্রীধন, এতে কোন পাওনাদারের অধিকার নেই।

অন্নদা উত্তর দিলেন, পাওনাদারের অধিকার নেই, কিন্তু ধর্ম্মের অধিকার আছে। তিনি ঋণী থাকবেন আর আমি কোন্ মুখে এ গয়নার বোঝা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াব!

তার পর অশ্বিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, তিনি যে রত্ন আমায় দান ক'রে গিয়েছেন, আশীর্ব্বাদ কর, সেটি অক্ষয় অমর হয়ে বেঁচে থাক্, ঠাকুর-পো। এ সমস্তই তাঁর পাওনাদারের প্রাপ্য। কেবল এই হারছড়াটি আমি তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা ক'রে নেব। এটি আমার শ্বশুরদত্ত যৌতুক। এই হারছড়াটি আমাদের সমস্ত সৌভাগ্যের মূল। এই হার আমার লক্ষ্মী। সুখে দুঃখে চির-সম্বল। একে আমি ছাড়ব না। যত দিন তিনি ছিলেন, একে আমি বুকে ক'রে রেখেছিলুম। এখন এতে আর আমার অধিকার নেই। অশির যে বৌ আস্‌বে, সেই পর্‌বে।

ইহার কিছুদিন পরে ম্যানেজার আসিয়া বলিল, সমস্ত অলঙ্কারের মূল্য ন' হাজার টাকা ঠিক হয়েছে, সর্ব্বস্ব দিয়াও ছয় হাজার টাকা ঋণ থাকে।

অশ্বিনী পাওনাদার সকলকে একত্র করিয়া বলিল, আমাদের সর্ব্বস্ব দিয়েও আপনাদের সমস্ত ঋণ শোধ করতে পারলুম না। ছ'হাজার টাকা বাকি থাকে। আমি ডাক্তার হয়েছি। যদি মাথার উপর ধর্ম্ম থাকেন, চেষ্টা, অধ্যবসায় সফল হয়, আর আপনারা যদি দয়া ক'রে আমায় কিছু দিন সময় দেন, আপনাদের সমস্ত টাকা চুকিয়ে দিয়ে পিতাকে ঋণমুক্ত ক'রে আমি ধন্ত হব। আমি সকলকে একখানি ক'রে হাণ্ডনোট্ লিখে দিচ্ছি।

কেহ কেহ বলিল, হাণ্ডনোট্ আর কেন লিখতে হবে? আইনতঃ ত আমাদের কোন পাওনা থাকে না। তবে আপনি দেন, আপনার সৌজন্ত!

অশ্বিনী বলিল, কি জানেন, মন না মতি। বাঁধা পড়লে মুক্তির চেষ্টা থাকবে।

৪

ফকির যখন দেখিলেন, কারবারে বা বাক্তির কোন হিসাবেই তাঁহার নামে কোন টাকা জমা পাওয়া গেল না, তখন তিনি চোখে অন্ধকার দেখিলেন! বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ হইয়াছে।

দীর্ঘকাল আলস্যে শরীর শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িয়াছে। এখন দ্বারে দ্বারে উমেদারি করিয়া বেড়ানো এক প্রকার অসম্ভব। শঙ্কর সার গদিতে পনের টাকা বেতনে আমি কি অসুখী ছিলাম? ছিন্ন পাদুকায়, ভগ্ন ছত্রে, জীর্ণ বস্ত্রে পরের আবাসে আমার কি দিন যাইত না? আমেরিকা, লটারি, কত ছলই করলে! কি নিষ্ঠুর ছলনা! এ ছলনার কি আবশ্যক ছিল? কেন তুমি আমায় দয়া করেছিলে? আমি ত প্রত্যাশা করি নি। কাঙ্গালকে দিন কয়েকের জন্ত রাজসিংহাসনে বসাইয়া কেন এ সর্ব্বনাশ করিলে? এখন কে আমায় আশ্রয় দিবে? জন্মমাত্রে নিবেদিতাকে পুত্রবধূ করিবে বলিয়াছিলে বলিয়া অন্যত্র তাহার সম্বন্ধের নাম-গন্ধ করি নাই। নিঃস্ব দরিদ্রের কন্যাকে কি অশ্বিনী এখন আর বিবাহ করিবে? বাগদত্তা, বয়স্থা কন্যা, কেমন করিয়া বিবাহ দিব? ভরসা এই বাড়িখানি। কন্যার বিবাহে যদি যায়, স্ত্রীকে লইয়া কোথায় দাঁড়াইব? সর্ব্বনাশ, আমার সবদিকে সর্ব্বনাশ!

কেন, সর্ব্বনাশ কেন? ঐ ত ত্রিশ হাজার টাকা আমার নামে জমা রয়েছে। কিন্তু—

জীবনে কখন পরস্ব অপহরণ করি নাই। কেন, অপহরণ কেন? সে ত্রিশ হাজার টাকা কি আমাকেই দেওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল না? কিন্তু একটা মুখের কথা ত ব'লে যেতে পারত! অত গোপনের কি প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন যা-ই থাক্, ধনেশ যখন মুখে কিছু বলে নি, তখন এ টাকা আত্মসাৎ করিই বা কি ক'রে? আর যখন ধনেশের দেনা-পাওনা স্থির হ'ল, তখন ত কোন কথাই বলি নি। এ যে সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল। ছ-হাজার টাকার জন্ত অশি হ্যাণ্ডনোট্ লিখে দিলে। এ টাকা পেলে দেনা শোধ হয়ে ওরা বেশ স্বচ্ছল হয়। কিন্তু নিবেদিতার গতি কি হবে? সে দিন সোনার হারছড়া নিয়ে অশির মা বল্লে, অশ্বিনীর যে বৌ হবে, সেই পরবে, নিবেদিতার নামটাও একবার ঠোঁটের আগায় আন্লে না। কেন আন্বে? নিঃস্বের কন্যাকে কেন গলগ্রহ করবে? তৈরি ছেলে, এখন দরে বিকুবে। বড় মানুষ শ্বশুর হবে। শুধু শ্বশুর নয়—অভিভাবক। ওদের আবার সব বজায় হবে। কিন্তু আমার বাগদত্তা কন্যার কি হবে?

ফকির অন্যমনস্ক হইয়া [illegible]ল-পাথার ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় সদর-দরজায় ঘা পড়িল, ফকিরচাঁদ বাবু বাড়ী আছেন?

ফকির ভাবিলেন, ঐ রে, এরই মধ্যে তাগাদা আরম্ভ হ'ল! না হবে কেন? লোকে মনে করেছে, ধনেশের মাসহারার টাকা বন্ধ হয়েছে, এইবার জুয়াচুরি করবে।

আবার ডাক পড়িল, ফকিরচাঁদ বাবু?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, কে যে ডাক্‌ছে গো!

ফকির বলিলেন, হুঁ।

সাড়া দিচ্ছ না কেন?

কি বল্‌ব? বাড়ি নেই?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, তা কি হয়, কখন মিছে কথা বল নি।

তার মানে? কখনও বলি নি ব'লে কখন বল্‌ব না, এমন ত কারুর সঙ্গে লেখাপড়া ক'রে দিই নি।

বিশ্বেশ্বরী বিস্মিত-নেত্রে স্বামীর মুখ চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে চাকুরীর চেষ্টায় নিরন্তর ঘুরে ঘুরে, নৈরাশ্যের অবসাদে তাঁহার সদা-হাস্যময়, সদাশয় স্বামী এইরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছেন। আহারে বসেন মাত্র। অনাহারে, অনিদ্রায় এই কয়মাসেই শরীর শীর্ণ হইয়াছে, মুখে একটা কালো ছায়া পড়িয়াছে। বিশ্বেশ্বরীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। অতিকষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিলেন, চিরদিন ত আমাদের দুঃখেই কেটেছে। মাঝখানে এই ক'দিন মনে কর না একটা স্বপ্ন দেখেছ।

ফকির বলিলেন, স্বপ্ন নয়—দুঃস্বপ্ন।

সদরে আবার ডাক পড়িল, ফকির বাবু আছেন?

তুমি ত ভারি জেদি লোক হে! ডাকের ওপর ডাক—ফকির বাবু, ফকির বাবু। আমি আছি কি নেই, একটু ভেবে বলবার অবকাশ দিচ্ছ না!

সে কি মশায়! ঐ ত রয়েছেন।

কে বল্লে?

আমি বল্‌ছি।

তুমি ত বাপু ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নয়!

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, হ্যাঁগা তোমার, মেজাজ আজকাল অমন হয়েছে কেন?

অমন হয়েছে কেন? সামনে পুজ' আস্‌ছে জানো?

তা বেশ ত! বরাবর দিয়েছ, এবার না হয় কাউকে কিছু না-ই দিলে।

বেশ, তোমাকে আর মেয়েকে না হয় না-ই দিলুম, পাওনাদার ত ছাড়বে না।

ফকির বাবু—

তুমি দেখ্‌ছি ছিনে জোঁক!

ফকির বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সদর-দরজার সাম্‌নে একখানি প্রকাণ্ড জুড়ি আর দুই জন ভদ্রলোক দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। এক জন যেমন কালো, আর এক জন তেমনি ফরসা।

কৃষ্ণবর্ণ বলিল, আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, ঘরে চলুন, বল্‌ছি।

অগত্যা তাই।

ঘরে বসিয়া কৃষ্ণবর্ণ বলিল, আমার নাম—সদয়রাম।

বেশ, সদয় হ'ন! কি প্রয়োজন তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলুন।

শ্বেতবর্ণকে দেখাইয়া সদয় বলিল, এ'র একটি কন্যা আছে।

ফকির বলিলেন, আমারও আছে। তার পর বলুন।

গোলদারি, আড়তদারি ক'রে ইনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করেছেন। এখনও অনেকগুলি আড়ত আছে। একটি মেয়ে, এঁর যা কিছু আছে, সব সেই পাবে।

আড়তের কথা শুনিয়া ফকির একটু আশ্বস্ত হইলেন। ভাবিলেন, যদি একটা ছিলে লাগে। শ্বেতবর্ণকে প্রশ্ন করিলেন, মশায়ের নাম?

হাজার টাকা।

ঠাট্টা করতে এসেছেন?

সদয় বলিল, বিরক্ত হবেন না, মশায়। হৃদয়রাম বাবু একটু কালা। উনি মনে করেছেন, আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, কত দেবেন? তাই বললেন, হাজার টাকা।

ফকির বলিলেন, ওঁরও মেয়ে, আমারও মেয়ে। বে হবে কেমন ক'রে যে, দেনা-পাওনার কথা উঠছে?

তা নয়, মশায়, ওর ভেতর একটু তাৎপর্য্য আছে। উনি একটি পাত্র মনস্থ করেছেন, আপনাকে সেটি ঠিক ক'রে দিতে হবে!

কে পাত্র?

ধনেশ বাবুর পুত্র।

ফকির চমকিয়া উঠিলেন। আশা যে অন্তরের অন্তরে কোন্ গহন গহ্বরে লুকাইয়া থাকে, বলা যায় না। অশ্বিনীকে জামাতা করিবার আশা ফকির ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তবু নিজের হাতে ত্যাগপত্র লিখিয়া দেওয়া!

ফকিরকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সদয়রাম বলিল, শুনুন, ওঁদের দু'হাজার টাকা যা দেনা আছে, ইনি শোধ ক'রে দেবেন, তার ওপর আসবাবপত্র ও গহনায় দশ হাজার পাবেন, অধিকন্তু মেয়ের মাসহারা বন্দোবস্ত করবেন মাসিক দুই শত টাকা—

ফকিরের ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া পলাইয়া যা'ন, কিন্তু তাহা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। তার উপর এঁর এতগুলা গোলা আড়ত, একটা ছিলে লাগলেও লাগতে পারে। অধিকন্তু হাজার টাকা। কিন্তু আর এক দিকে আপন কন্যার সর্ব্বনাশ। এ যে উভয় সঙ্কট।

ওদিকে সদয় ভাবিবার অবসর দিতেছে না। বলিল, অবশ্য কাযটা পাকা ক'রে দিতে পারলেই আপনার প্রণামী হাজার।

ফকির বলিলেন, এ সব কথা আমাকে বল্‌ছেন কেন? পাত্রের মা রয়েছেন।

তাঁর কাছে এ প্রস্তাব করা হয়েছিল। তিনিই আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আমার কাছে!

হাঁ। ধনেশ বাবুর মৃত্যুর পর আপনাকেই তাঁরা অভিভাবক ব'লে মনে করেন।

ফকির ভাবিলেন, কি সয়তানী! আমারই মুখ দিয়ে ইহারা সম্বন্ধটা ভাঙ্গিতে চায়!

ফকিরকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সদয় বলিল, হাজারের ওপর আরও দু'শ-এক'শ চান্, তাতেও কর্ত্তা পেছপাও হবেন না।

ফকির বলিলেন, দেখুন, সব কথাই খুলে বলা ভাল। আমার একটি কন্যা আছে, ঐ একমাত্র কন্যা, সেটি একরকম বাগ্‌দত্তা, জন্মদিনেই অশ্বিনীর সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়।

সদয় বলিল, জানি, মেয়েটিও সুন্দরী। কিন্তু আমাদের মেয়ে পরমা সুন্দরী। তা না হ'লে বল্‌তুম না। সে-ও এক কথা। তার উপর দু'শ টাকা ক'রে মাসহারা, গয়না-আসবাবপত্রে দশ হাজার, দেনা শোধ ত আছেই।

তা হ'ক! আমার কাছে স্পষ্ট কথা। দু'শ এক'শ হবে না, হাজারের ওপর [illegible] পাঁচশ'খানি টাকা ধ'রে দিন। নিজের স্বার্থকে ছাড়তে বলুন। কিন্তু আপনাদের মেয়েকে অশ্বিনীর পছন্দ হওয়া চাই।

ফকির ভাবিলেন, একেবারে মেয়েটাকে ভাসিয়ে দেব! একটু পথ খোলা রাখি। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলা-দেলা করেছে, ওদের বাড়িতেই একরকম মানুষ হয়েছে বল্‌লে হয়। জ্যেঠাইমা-অন্ত প্রাণ!

ফকিরকে সাত-পাঁচ ভাবিতে দেখিয়া সদয় বলিল, বেশ ত! এক কায করা যাবে। মেয়েটিকে আপনার এখানে পাঠিয়ে দিলে দু'জনকেই একসঙ্গে দেখতে পাবে।

আমার এখানে?

তাতে ক্ষতি কি? আমি নিশ্চয় বলতে পারি, এর মেয়েকে দেখলে আর কোন মেয়েই নজরে ধরবে না।

ফকির বলিলেন, আর একটি অনুরোধ। আপনাদের বিস্তর আড়ত আছে—

আপনার একটা চাকরী ত? তার জন্যে আটকাবে না।

আটকাবে না নয়, ওটা বিশেষ দরকার।

বেশ ত! আপনি কাল থেকেই বসুন না। ওটা বে'র সর্ত্তের বাইরে। আপনি শঙ্কর সা'র প্রধান মুহুরি ছিলেন। আপনি এলে ত কর্ত্তার সৌভাগ্য।

কিন্তু দেড় হাজারের কথা পাকা ত?

একটু বেশী হ'ল। তা হ'ক! আপনি চার হাত এক ক'রে দিলেই—

একটা লেখাপড়া—

পরস্পরকে ঐ মর্ম্মে দু'খানা চিঠি হ'লেই হবে। কি বলেন?

কিন্তু—

আবার কিন্তু কি?

ফকির বলিলেন, একটা কথা বুঝতে পারছিনি।

কি?

আর কি পাত্র নেই?

আছে। কিন্তু যদি প্রকাশ না করেন ত খুলে বলি।

বলুন না।

সদয় এ দিক-ওদিক দেখিল। তাহার মনে হইল, কে যেন সরিয়া গেল। বলিল, কে গেল?

ফকির বলিলেন, ও কেউ নয়।

সদয় বলিল, কি জানেন, জ্যোতিষে যাকে বিষকন্যা বলে, মেয়েটি তাই।

ফকির চমকিয়া উঠিলেন।

সদয় বলিল, ভয় পাবেন না। তার কাটান আছে। অশ্বিনীর কোষ্ঠী, ঠিক তাই

অশ্বিনীর কোষ্ঠী পেলেন কোথা?

সে অনেক কথা। ওঁদেরই বাড়ীর গণককে ঘুষ দিয়ে।

৫

শান্তা আসিয়া একেবারে নিবেদিতাকে জড়াইয়া ধরিল। নিবেদিতা শিহরিয়া উঠিল। এই বিষকন্যা! কি সুন্দরী! তাহার মনে হইল, সে যেন এক অজগর সর্পের কবলে পড়িয়াছে। সে যত বলে—ছাড়ুন ছাড়ুন, শান্তা ততই হাসে ও গভীরতর আলিঙ্গন করে আর বলে, তুই কে, বাই?

অবশেষে যে ঝি সঙ্গে আসিয়াছিল, সে আসিতেই শান্তা ভয়ে ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, ঝি, এ কে?

ঝি বলিল, ও তোর সই। কিন্তু মনে মনে বলিল—সতীন।

বিশ্বেশ্বরী মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। এই রূপ! এর কাছে নিবু! ফকিরকে বলিলেন, এ কি সর্ব্বনাশ করলে!

সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ ত করছ, কিন্তু দেড় হাজার টাকা, তা খবর রাখ! তার ওপর চাকরী দেবে।

হ'ক টাকা, হ'ক চাকরী, তা' ব'লে পেটের মেয়ের সর্ব্বনাশ!

বুঝতে পারিনি! পেটের মেয়ে! এ দিকে পেট চলা বন্ধ হয় যে! বিশু, সাপে ডিম ফুটিয়ে সলুই খায়, জানো? আমি তাই। আমার মায়া নাই, মমতা নাই। চাই টাকা! যাকে আজীবন ঘৃণা করেছি।

ফকির ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, সোনাদানা লোকে করে অসময়ের জন্যেই ত?

তোমার গয়না বেচে খাবো? ভালো, আপাতত তা-ই যেন হ'ল। তার পর? কত দিন এখনও বাঁচতে হবে, তার ত ঠিক নেই।

বিশ্বেশ্বরী ব্যথিত হইয়া বলিলেন, ও-কথা কেন? তুমি বেশি ভেব না। গয়নার কথা বলছ? তোমার যখন হবে, আবার দিয়ো।

আবার দোব! তুমি হাসালে!

হাগো আর যা-ই কর, তুমি দাসী ছাড়িয়ে দাও, বামুন ছাড়িয়ে দাও। আমি বাসন মাজব, রাঁধব।

তার পর শরীর ক'দিন বইবে ?

সেই আশীর্ব্বাদ কর, যা'তে তোমার পায় মাথা রেখে চোখ বুজতে পারি।

ইতিমধ্যে অশ্বিনী আসিল, শান্তা ও নিবেদিতা তখন একটি কক্ষে অবস্থান করিতেছিল। অশ্বিনীর মনে হইল, যেন কোন অমেঘ-বাহিনী বিদ্যুৎ পথ হারাইয়া নিবেদিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। এ কি রূপ! চাহিতে চক্ষু ঠিকরিয়া পড়ে। ইহার সুকুমার অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া যৌবন আপনার ঐশ্বর্য্য বিকাশ করিতেছে। কে এ?

এমন সময় শান্তা প্রশ্ন করিল, ও কে, ছই ?

নিবেদিতা বলিল, ও তোর বর।

ও মা, বর! আমি বরি কে! এছো, বোছো!

অশ্বিনী শান্তাকে দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! ইহার দেহের উপর যৌবন আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছে, কিন্তু মনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বিধাতার এ কি বিসদৃশ লীলা! মস্তিষ্কে কোথায় কোন্ একটি শিরা বাঁকিয়া গিয়াছে, অথবা বিস্তার-পথ পায় নাই, এই সামান্য কারণে ইহার সারা জীবন ব্যর্থ! আহা!

অশ্বিনীর মুখ দিয়া শেষ কথাটি বাহির হইতেই নিবেদিতা মনে মনে প্রমাদ গণিল! বুঝি বা এত দিনের স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, এই রূপের জোয়ারে ভাসিয়া যায়! এই প্রেতিনী তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ কাড়িয়া লইবে! তা হউক। কিন্তু তাহার প্রিয়তমের যে জীবনসংশয়! এই সর্পিণী; ইহার নিশ্বাসের বিষে যে আয়ুঃক্ষয় হইবে! অশ্বিনী যে দিন দিন তিলে তিলে মরিবে, ইহা সে সহিবে কেমন করিয়া! কিন্তু নিবারণই বা হয় কিরূপে? পিতা অর্থলোভে জ্ঞান-শূন্য। একমাত্র উপায় অশ্বিনী। এও ত এই বিষকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া 'আহা' বলিতেছে।

মহারথী কর্ণের কবচকুণ্ডলের ন্যায় ছল নারীর সহজাত। নিবেদিতা শান্তাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'ও মা, তুই ব'সে রয়েছিস কি? যা, বরকে দু'ট পাণ সেজে এনে দে।

শান্তা চলিয়া গেল। অশ্বিনী প্রশ্ন করিল, ও কে, রাণি? জন্ম হইতেই সম্বন্ধবদ্ধ। এই জন্য ইহারা পরস্পরকে 'রাজা-রাণী' সম্বোধন করে।

নিবেদিতা বলিল, ও তোমার কনে। পছন্দ হয়?

মন্দ কি ?

না না, তামাসা নয়, সত্য বল। ওকে বে. করলে ওর বাপ তোমার সব দেনা শোধ ক'রে দেবে। তার পর আসবাব-পত্র গয়নায় দশ হাজার টাকা পাবে। তার ওপর মাসে দু'শ টাকা মাসোহারা।

তবে ত সোনায় সোহাগা।

তুমি ঠাট্টা করছ, আমার গা জ্ব'লে যাচ্ছে।

বেশ, শুয়ে পড়, আমি বাতাস দি।

দেখ, বলছি, আমার তামাসা ভাল লাগ্ছে না।

কোন্টা তামাসা ? দেনা শোধ, দশ হাজার টাকা, না, মাস মাস মাসোহারা? এগুল তুমি তামাসা মনে করতে পার, কিন্তু যাকে রোদে পুড়ে, বিষ্টিতে ভিজে টাকা রোজগার করতে হয়—

নিবেদিতা অধীর হইয়া বলিল, তা হ'ক! তুমি ও মেয়েকে বে' করতে পাবে না।

কেন বল দিকি ? রিষ ?

ইস্! তা বৈ কি! তুমি দশটা বে কর গে, আমি নিজে তাদের বরণ ক'রে নেব—

নিবেদিতার স্বর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। চোখের কোণে জল টল্টল্ করিতে লাগিল।

অশ্বিনী তথাপি ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, বরণ ক'রে নেবে? খুব উদারতা! ধন্যবাদ! কিন্তু তা হ'লে আর এক জনের উপায় কি হবে? সে ত বাগ্দত্তা।

তার উপায় সে ভেবেছে। তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না।

কি শুনি? কেরোসিন্ তেলে—

পোড়া কপাল!

তবে ?

তবে আবার কি? তুমি ও মেয়েকে বে করতে পাবে না।

কেন? তোমার হুকুম?

হুকুম নয়। তোমার পায় ধরছি।

নিবেদিতা সত্য সত্যই অশ্বিনীর পায় ধরিল। যখন উঠিল, তখন তার গণ্ডদেশ অশ্রুসিক্ত। কিন্তু অশ্বিনী তাহা দেখিয়াও দেখিল না। প্রেমাস্পদকে পীড়া দিয়াও সময় সময় আমোদ বোধ হয়। বলিল, এ কি তোমার অন্যায় জেদ!

জেদ নয়। তুমি এইটি আমায় ভিক্ষা দাও, ওকে বে' কোর না।

কেন? আমার এত লাভের পথ কেন বন্ধ করছ? কেন বল?

তা বলব না।

বলবে না? তবে শোন, আমি ঐ মেয়েকেই বে' করব।

ও বিষকন্যা।

সে আবার কি?

ওর নিশ্বাসে আয়ুঃক্ষয় হয়।

এই ভয়? ও বিষকন্যা নয়। তুমি ভুল শুনেছ। ও শিশুকন্যা। ওর নিশ্বাসে আয়ুঃক্ষয় হয় না। ওর কথায় প্রাণ অতিষ্ঠ হয়। তা হ'ক। ওকে এখানে আনলে কে? তোমার বাবা?

নিবেদিতা নীরবে কাঁদিতে লাগিল। অশ্বিনী বলিল, কৈ, তোমার কনে ত পাণ নিয়ে এল না। আমি চল্লুম।

আমাকে একটা কথা দিয়ে যাও। আর ভাবতে পারি নি।

কথা? রাণি, একালে আর দুট বে' কেউ করে না। বে' আমার হয়ে গিয়েছে।

এতক্ষণে নিবেদিতার মুখে হাসি ফুটিল। বলিল, সে বে' কথার কথা। রাজা, তুমি আমার কাছে সত্যি কর, বিষকন্যা বে' করবে না, আমি ভাল কনে এনে দেব।

তিন সত্য করতে হবে? আচ্ছা, তা-ই করছি—না—না—না। তুমি এবার সত্য কর, ভাল কনে এনে দেবে?

দেব—দেব—দেব। কিন্তু ভালো কনে চাও, না, টাকা চাও?

রাণি, যে সম্পদ্ আমি পেয়েছি, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পেলেও তা ছাড়ব না।

৬

ফকির অন্নদাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, দেনা-শোধ, দশ হাজার টাকা, মাস-মাস দু'শ টাকা মাসোহারা, ইত্যাদি।

অন্নদা বলিলেন, ঠাকুরপো, অশ্বি এখন বড় হয়েছে, ওর যা ইচ্ছা করুক।

অশ্বিনী বলিল, মা যা আদেশ করবেন, আমি তা পালন করতে বাধ্য।

ফকির বলিলেন, ইহারা দুইজনে ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে প্রতারণা করিতেছে। চাকরীর আশা গেল, নগদ দেড় হাজার টাকা, সব ভরসা নির্ভরসা।

অন্নদা জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, ঠাকুরপো, তারা অশ্বিনীর দিকে অত ক'রে ঝুঁকেছে কেন?

ফকির ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার মনে মনে সঙ্কল্প স্থির হইল, ধনেশ-প্রদত্ত ত্রিশ হাজার টাকা আমি কিছুতেই ফিরাইয়া দিব না। কেন দিব? ধনেশ আমার লটারির প্রাপ্ত টাকা খাতায় জমা না করিয়া আমার সঙ্গে শঠতা করিয়াছে। শঠে শাঠ্য। আমি অবশ্য এ টাকা কি তার সুদ স্পর্শ করব না। যেমন গহনা বেচিয়া চলিতেছে, চলুক। আমি আর কয় দিন? কিন্তু মৃত্যুর সময় সমস্ত কথা বিশুকে ব'লে যাব।

দারুণ দুশ্চিন্তায়, অনশনে, অনিদ্রায় ফকিরের কঠিন পীড়া জন্মিল। অশ্বিনী চিকিৎসা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্যাধির কোন উপশম হইল না।

সঙ্কল্প স্থির করিয়াও ফকির নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। পাপ তাঁহার অন্তর আশ্রয় করিয়া সহস্র বিভীষিকা সৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহলোকের ভয়, পরলোকের ভয়। সর্ব্বোপরি পাপ ব্যক্ত করিবার নিদারুণ লজ্জা। ফকির আপনার স্ত্রীর কাছেও সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না—কে যেন মুখ চাপিয়া ধরে। পতি-প্রাণা গৃহিণী স্বামীর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, তাঁহার ভিতরে কি ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছে। একদিন শয্যাপার্শ্বে বসিয়া গায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, যদি আমায় ফেলে নিতান্তই চ'লে যাবে মনে ক'রে থাক, আমায় ভাল ক'রে তোমার সেবা করতে দাও। আমি বুঝেছি, তোমার মনের ভিতর কোথায় কি কাঁটা লুকিয়ে আছে। তার বড় ব্যথা, তুমি সহ্য করতে পারছ না। আমায় বল।

ফকির বিস্ফারিত-নেত্রে বিশ্বেশ্বরীর মুখ চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, কাঁটা নয়—টাকা। গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, অর্থচিন্তায় স্বামীর দুর্ব্বল মনে বিকার উপস্থিত হইয়াছে।

ফকির ধীরে ধীরে বলিলেন, ধনেশের ত্রিশ হাজার টাকা আমার বেনামীতে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে।

এত দিন ফিরে দাওনি কেন ?

ফকির সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। ফিরে দেব ! কেন ?

দুখের ছেলে অশি বাপের দেনা শোধ করবার জন্ত, দুটি পেটের ভাতের জন্ত মুখে রক্ত উঠে খাটছে। ভাব দিকি, টাকাটা পেলে তাদের কি উপকার হ'ত !

উপকার ! আমার কি উপকার তারা করেছে ? বাগদত্তা কন্তা—তাকে পরিত্যাগ করেছে। যখন সব গয়না দিয়ে হারছড়া রাখলে, বল্লে, অশির বৌকে দেব। একবার নিবুর নামটা মুখে আন্‌লে না।

তা না আমুক—

শোনো, কথা কয়ো না ! ধনেশ আমার চাকরী ছাড়িয়েছে। আজ আমি দাঁড়াই কোথা ! আমার লটারীর টাকা ফাঁকি দিয়েছে। আমার ন্যায্য পাওনা সুদ দানের হিসাবে লিখে আমায় অপমানিত করেছে। ওরা আমার এই উপকার করেছে। টাকা ফিরে দেব ? কখন না, কখন না, কখন না।

বিস্মিত-নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, তুমি কি বল্‌ছ ! যাঁর সমস্ত খরচ পাতি পাতি ক'রে লেখা, তিনি কেবল তোমার টাকাই ছল ক'রে নিলেন, লিখলেন না ! ভালো, লটারীতে তাঁর বখরার টাকা খাতায় লেখা ছিল কি ? তিনি নিশ্চয় জানতেন, তুমি দান নিতে কুণ্ঠিত হবে, সাহায্য নেবে না। তা-ই সেই ভুয়ো লটারীর কৌশল করেছিলেন।

অ্যাঁ, কি বললে, জান্‌ত ? নিশ্চয় জান্‌ত ?

নিশ্চয়। তোমার নির্ম্মল মন, কেন এ ছায়া পড়ল ? আজীবন ধর্ম্মপথে থেকেছ। তোমারই মুখে শুনেছি, অধর্ম্মের টাকা কখন ভোগ হয় না। তুমি কার জন্ত এ অধর্ম্ম করছ ? আমার জন্ত ? আমার জন্ত তুমি পাপের বোঝা মাথায় ক'রে ডুববে ? ভাবছ, তুমি গেলে আমার কি উপায় হবে ? কে কার উপায় করে ? যিনি সকল উপায়ের উপায়, তিনিই আমার উপায় করবেন। তুমি কালই অশিকে সব কথা খুলে বল। তুমি না বল, আমি বল্‌ব।

অতি ক্ষীণস্বরে ফকির বলিলেন, কাল অশির মা আর অশিকে আস্‌তে বলো, আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

পরদিন উভয়ে আসিলে ফকির সব কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, কিন্তু বৌদি, সে টাকা, তার সুদ, একটি আধলাও আমি ছুঁইনি।

অন্নদা বলিলেন, ঠাকুরপো, মন না মতি ! কে বল্‌তে পারে, অন্তরে কখন পাপ ইচ্ছা, লোভ পোষণ করে নি। তা অকপটে ব্যক্ত করাই মহত্ত্ব।

ফকির বলিলেন, সে যা-ই হ'ক, বৌদি ! আমি অশির নামে অধিকারপত্র লিখে দিচ্ছি। আমি তোমাদের কাছে অনেক ঋণে ঋণী। তোমরা আমায় মুক্তি দাও।

তোমার ঋণমুক্তি শুধু টাকায় হবে না, ঠাকুরপো ! মনে ক'রে দেখ, তুমি তাঁর কাছে কি বাগ্‌দত্ত আছ ?

তুমি কি এ নিঃস্ব দরিদ্রের কন্তাকে গ্রহণ করবে, বৌদি ?

নিবেদিতার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া অন্নদা বলিলেন, তুমি নিঃস্ব, যার ঘরে এমন অমূল্য রত্ন !

তার পর নিবেদিতাকে তাঁর শ্বশুর-দত্ত সোনার হার-ছড়াটি পরাইয়া দিয়া বলিলেন, বেয়ান, আশীর্ব্বাদ কর, এ সোনার বাঁধন সার্থক হ'ক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

জ্ঞানলাভ

যাগ-যজ্ঞ ধুমধাম কিছু বাকী নাই,
তবু মিলিল না ব্রহ্ম, রহে অজানাই ;
'কেমনে জানিব তাঁরে', কাঁদে যত প্রাণী,
'আপনারে জান আগে,' কহে ব্রহ্মজ্ঞানী।

শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী

গ্রাম্য দুর্গোৎসব

১

শ্রীনিবাসপুরের প্রৌঢ় জমীদার দুর্লভ রায় এ বৎসরে নানা কারণে দুর্গোৎসব না করাই সঙ্গত বোধ করিয়াছেন,—প্রধান কারণ হইতেছে টাকার অনাটন। প্রাপ্য খাজনা আদায় হয় নাই বা তেজারতির ব্যাপার মন্দা পড়িয়াছে বলিয়া যে টাকার অনাটন, তাহা নহে, এ বৎসরে ব্যায়ের মাত্রাটা বড়ই বেশী, তাই এ টাকার অনাটন। জ্যেষ্ঠপুত্র বিলাতে বেড়াইতে গিয়াছেন, তাঁহাকে আরও কিছুকাল সেখানে থাকিতেই হইবে, সুতরাং আশ্বিনের মধ্যেই হাজার পাঁচেক রজত-মুদ্রা না পাঠাইলেই নয়। মধ্যম বাবাজীবন নবপরিণীতা বি এ পাস বিদুষীর সঙ্গে মসুরিতে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ অভিযানটাকে একান্ত আবশ্যক বলিয়াই ধার্য্য করিয়াছেন। তদুপলক্ষে অন্ততঃ চারি হাজার টাকা দিতেই হইবে, ইত্যাদি কতকগুলা অতর্কিত নৈমিত্তিক ব্যয় করিতেই হইবে, আর টাকা কোথায়? দুর্গোৎসবের জন্য ধার করা যুক্তিসিদ্ধও নহে, তাহাতে প্রেষ্টিজ অধঃপাতে যাইবার ভয়ও যে নাই, তাহাও বলা যায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অন্ততঃ এই বৎসর দুর্গোৎসব বন্ধ করিয়া সকল দিক সামলানই বুদ্ধিমানের কার্য্য, এই ভাবিয়া দুর্লভ রায় আবশ্যক কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং কতক পরিমাণে নিশ্চিন্তও হইয়াছেন।

কর্ত্তা ত নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, কিন্তু গৃহিণী শ্যামাসুন্দরীর মনে যে বিষম দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ জমিয়া বসিতেছে, তাহার শান্তির উপায় কি? শ্যামাসুন্দরী রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের হইলেও সে পক্ষের ধাতুগ্রস্ত ছিলেন না অর্থাৎ কর্ত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে তাঁহার সাহসও ছিল না, সত্যকথা বলিতে কি, ইচ্ছাও ছিল না। তিনি যখন গৃহিণীর ভার গ্রহণ করিয়া এ সংসারে নববধূবেশে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল ১৬ বৎসর—মৃতা সপত্নীর দুইটি নাবালক পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইচ্ছা-পূর্ব্বকই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বড়টির নাম শৈলেশ, ছোটটির নাম ভুবন। শৈলেশের বয়স ছিল ৮ বৎসর, ভুবনের ছিল ৬ বৎসর। এই দুইটি আদুরে অথচ কল্পনাতীতভাবে অবাধ্য বালক দুইটি অকালে জননী-হারা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যখন প্রথমে তাহাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছিল, সে ডাকের কাতর আহ্বানে তাহার অন্তরের নিভৃততম কক্ষে প্রসুপ্ত মাতৃত্ব শরতের মেঘনির্মুক্ত আকাশে নবোদিত সূর্য্যের [illegible]ত আলোকে মুকুলিত কমলের ন্যায় প্রবুদ্ধ হইয়া অপার্থিব সৌরভে তাঁহার প্রাণমন ও ইন্দ্রিয়-নিচয়কে সুবাসিত করিয়া দিয়াছিল। শ্যামাসুন্দরীর এই মাতৃত্বের জাগরণ বিফল হয় নাই, শৈলেশ ও ভুবন অপরের পক্ষে দুর্দ্দান্ত দুরন্ত হইলেও শ্যামাসুন্দরীর কাছে শান্তশিষ্ট বালকের ন্যায়ই ব্যবহার করিত, শ্যামাসুন্দরীর কোন আদেশ এখনও পর্য্যন্ত সাবালক হইয়াও তাহারা কখনও লঙ্ঘন করে নাই। শ্যামাসুন্দরীর একটিমাত্র কন্যা, সে এখন বারো বছরে পড়িয়াছে। তাহার নাম শৈলবালা। শৈলবালা রূপে গুণে ও স্বভাবে—সর্ব্বাংশেই শ্যামাসুন্দরীর অনুরূপ হইয়াছিল। সকলেই বলিত, শৈলবালার মত সুরূপা ও শান্ত মেয়ে সে অঞ্চলে দেখা যায় না।

জমীদারবাড়ী এবার দুর্গোৎসব হইবে না, এ সংবাদ প্রচার হইবার পরেই গ্রামে কেমন একটা বিষাদের ও অনুৎসাহের ভাব ফুটিয়া উঠিল, এক শত বৎসরের জাঁকালো দুর্গোৎসব এবারে হইবে না, গ্রামে আর কোন বাড়ীতেই দুর্গাপূজা হয় না, গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতার ইহাই সংবৎসরের সর্ব্বপ্রধান উৎসব, শুধু কি গ্রামের উৎসব, সেই অঞ্চলের অন্ততঃ আশপাশের ৩০।৩৫ খানি গ্রামের ইতর ভদ্র ছোট বড় স্ত্রীপুরুষ সকলেই সংবৎসর ধরিয়া এই দুর্গোৎসবের অপার আনন্দের প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া দিন কাটাইত, সেই মহোৎসবের তিন দিন সকলেই মায়ের চরণপঙ্কজে রক্তচন্দন-মিশ্রিত বিল্বপত্রের অঞ্জলি ভক্তিভরে অর্পণ করিয়া ধন্য হইত। ভাবিত, এই অঞ্জলির প্রভাবে তাহাদের আগামী বৎসর নিরাপদে কাটিয়া যাইবে। তাহার পর মায়ের অমৃতময় সুরভি প্রসাদে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া তাহারা ধন্য হইত। সে প্রসাদে থাকিত—খেচরান্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্য, মাংস, পুরী, কচুরী, নানা প্রকার গজা, জিলাপি, মতিচুর প্রভৃতি মিষ্টান্ন—যে যত পার, আহার কর, না পার, হাঁড়ি-সরা ভরিয়া বাড়ীতে লইয়া যাও। তাহার উপর যাত্রা গান থিয়েটার বায়স্কোপের ছড়াছড়ি, উৎসবের অন্ত নাই, আমোদের সীমা নাই, এ হেন রায়বাড়ীর দুর্গোৎসব অভাগ্যবশতঃ এবার হইবে না, এ সংবাদে শ্রীনিবাসপুর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রামনিচয় মর্ম্মাহত হইল, একটা মলিন দিগন্তব্যাপী অবসাদের ছায়ায় সবই যেন তিমিরাবৃত হইয়া উঠিল।

২

গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে একটা আন্দোলন বাড়িয়া চলিয়াছে, এ কথা শ্যামাসুন্দরীর নিকট যথাসময়েই পৌঁছিয়াছিল। জমীদার-পরিবার—ঋণভারগ্রস্ত নয়, সম্মুখে কোন বিপদের আশঙ্কাও কিছু শুনা যায় না—অথচ সর্ব্বসাধারণের সাধের দুর্গোৎসব কি না বন্ধ

হইতেছে, ইহা ভাবিয়া গ্রামশুদ্ধ লোক জমীদার দুর্ল্লভ রায়ের উপর বিলক্ষণ চটিয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া দুর্ল্লভ বাবুকে এই সংকল্প হইতে ফিরান যায়, তাহার জন্য গ্রামের মতব্বর ব্যক্তিগণের মধ্যে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পরামর্শসভার বৈঠকও মধ্যে মধ্যে হইতেছে, সহজভাবে জমীদারকে বুঝাইয়া এই অসং সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করাইতে না পারিলে তাঁহার প্রতি সামাজিক কঠোর শাসনযন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে কি না, সে বিষয়েও চুপি চুপি জল্পনা-কল্পনাও যে না হইতেছে, তাহাও নহে, এ সকল কথাই শ্যামাসুন্দরী ঝিদাসীদের মুখে প্রত্যহই শুনিতে পাইতেছেন ?

বাহিরের আন্দোলনের সঙ্গে অন্তঃপুরেও অশান্তির ভাব ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, রাঁধুনী ঝি-দাসী প্রভৃতি সকলেই শ্যামাসুন্দরীর নিকটে সুবিধা পাইলেই নানা উপায়ে তাহাদের অশান্ত মনোভাব জানাইতে আরম্ভ করিল। এখনও পূজার বিলম্ব আছে, এখনই যে ভাবে অশান্তি-বহ্নিকণা চারিদিকে ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, না জানি পূজার সময় তাহাতে কিরূপ দাবানল জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা ভাবিয়া শ্যামাসুন্দরী সর্ব্বদাই উদ্বেগ ও অশান্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তার কাছে কেহ কিছু জানাইতে সাহস করে না ; তিনিই যেন সকলের নিকট চোরের ন্যায় ধরা পড়িয়াছেন। কর্ত্তাকে তিনি যদি ভাল করিয়া ধরেন, একটু উগ্রমূর্ত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কর্ত্তার কি শক্তি আছে যে, তিনি সংবৎসরের এত বড় একটা মঙ্গলকর্ম্ম—পুরুষপরম্পরাগত এই দুর্গোৎসব বন্ধ করিতে পারেন ? চিরদিন কনে বউটির মত থাকিলে কি চলে ? সংসারের কিসে মঙ্গল হয়, কোন্ উপায়ে ভাবী অমঙ্গল নিবারিত হয়, তাহা নিজে বুঝিয়া সময়মত কর্ত্তাকে বুঝাইয়া সুব্যবস্থা করার ভার পাকা গিন্নীর উপরেই ত চিরদিন আছে, এই সকল কার্য্য না করিলে সংসার উৎসন্ন যাইবে, ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, বংশের গৌরব লুপ্ত হইবে, ছেলেপুলের ভয়ঙ্কর অকল্যাণ হইবে, লোকনিন্দার অবধি থাকিবে না, ইত্যাদি বহুবিধ অযাচিত উপদেশ ও পরামর্শের তীক্ষ্ণবাণের আঘাতে শ্যামাসুন্দরী জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। তিনি সকলই শুনিতেন, সকলই বুঝিতেন, কিন্তু কি করিলে এই সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহা ভাবিতে ভাবিতে কিছুই কূলকিনারা দেখিতে পাইতেছিলেন না, এক একবার মনে হইত, সকল কথা নিভৃতে দুর্ল্লভ রায়কে জানাইয়া তাঁহাকে এখনও এই সংকল্প হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করাই ভাল। আবার ভাবিতেন, তাহা কি ভাল, হয় ত তাহাতে তিনি দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন, জানিয়া শুনিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা—এ কি তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য ? জীবনে যাহা কখনও করি নাই, আজ তাহা কি করিয়া করিব ?—এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্যামাসুন্দরী যখন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিতেন, তখন নির্জ্জনে ঠাকুরঘরে যাইয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, তিনি গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া গৃহদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে করিতে বলিতেন, দয়াময় ঠাকুর, আর যে সইতে পারি না, তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে, আমার এ সংসারে মঙ্গলময় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, দেখো ঠাকুর, দাসী যেন ও চরণে বিশ্বাস না হারায়।

৩

দুর্ল্লভ রায়ের প্রধান কর্ম্মচারী—নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর বয়স পঁচাত্তর পার হইয়াছে। জমীদারী কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা ও উৎসাহ কিন্তু এখনও যুবার ন্যায়, তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ কর্ম্মচারীর উপর জমীদারীর সকল কার্য্যের ভার নিঃশঙ্কচিত্তে অর্পণ করিয়া দুর্ল্লভ রায় আজ বাঙ্গালায় জমীদারকুলের মধ্যে নিতান্ত কেওকেটা নহেন, অনেক বড় জমীদারই তাঁহার কাছে মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিবার দায়ে পড়িয়া ঋণের জন্য হাত পাতিয়া থাকেন। সকলেই জানে, দুর্ল্লভ রায়ের এত বড় সমৃদ্ধির একমাত্র মূল নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর বিশ্বস্ততা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নহে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কাছারীতে বসিয়া রায়পুরের বন্ধকী মহালটিকে যথাসম্ভব অল্পমূল্যে হস্তগত করিবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য উকীল রোহিণী বাবুর সহিত একাগ্রচিত্তে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন,এমন সময় শৈলবালা হাসিতে হাসিতে সেখানে দেখা দিল। তাহাকে অকস্মাৎ কাছারীগৃহে দেখিতে পাইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেন একটু চকিত হইলেন, পরক্ষণেই আদরের মধুর হাস্যে মুখের সে ভাব আচ্ছাদিত করিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "তাই ত শৈলদিদি, কি মনে ক'রে ?" শৈলবালা ছোট দুটি হাত জুড়িয়া প্রণাম করিল এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দাদা মহাশয়, মা আপনাকে প্রণাম জানাইয়াছেন আর বলেছেন, কাছারী হইতে ফিরিবার সময় যদি একবার মা'র সঙ্গে দেখা করেন, তবে মা'র বড় উপকার হয়।" "আচ্ছা দিদিমণি, তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া চক্রবর্ত্তী নথি উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ্‌বেন সেদিনকার ন্যায় যেন ভুলে যাবেন না" এই বলিয়া শৈলবালা অদৃশ্য হইল।

৪

চক্রবর্ত্তী মহাশয় শুধু যে দুর্ল্লভ রায়ের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহা নহে, শ্যামাসুন্দরীর মাসীমাতাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কারণে রায় মহাশয় শ্বশুর বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা

করিতেন, তাঁহারই বিশেষ যত্নে তাঁহার শ্যালিকা-কন্যা শ্যামাসুন্দরী দুর্লভ রায়ের দুর্লভ গৃহিণীপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। এই কারণে অন্তঃপুরে তাঁহার অবাধ গতিবিধি ছিল, তিনি কিন্তু প্রায়ই সে সুবিধায় উদাসীন থাকিতেন, বার বার আহ্বান ও বিশেষ কার্য্য না থাকিলে তিনি অন্তঃপুরে যাইতে চাহিতেন না। দুর্গোৎসব বন্ধ হওয়ায় অন্তঃপুরে তাঁহার ডাক যে অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, ইহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, তাহার পর এবার দাসী না পাঠাইয়া কন্যা দ্বারা শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, এ কারণে এ যাত্রার এই আহ্বান কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয় ভাবিয়া তিনি একটু তাড়াতাড়ি কাছারীর কার্য্য শেষ করিলেন এবং অনতি-বিলম্বে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন।

শ্যামাসুন্দরী তাঁহার বসিবার গৃহেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, মেসোমহাশয়কে দেখিতে পাইয়াই তিনি সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ পূর্ব্বক ভূমিতে মাথা নোয়াইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। 'সাবিত্রীসমানা ভব' বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং শ্যামাসুন্দরীর প্রার্থনানুসারে সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, "মা জননি! অকস্মাৎ এই বৃদ্ধ সন্তানকে লইয়া এত টানাটানি কেন?"

"আশ্বিন আগতপ্রায়, জননীর পিত্রালয়ে যাইতে হইবে, সিদ্ধিদাতা গণেশ না হ'লে যাইবার ব্যবস্থা আর কে করিবে", এই বলিয়া গম্ভীরভাবে শ্যামাসুন্দরী মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই অতর্কিত রহস্যজড়িত উত্তর শুনিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—

'তাই ত মা, ব্যাপারটা একটু বেশী গড়াইয়াছে দেখিতেছি। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, জননীর এই সংকল্প কি ভোলানাথের অনুমত হইয়াছে?'

"এখনও তাঁহাকে কিছু বলি নাই। আমাকে পূজার সময় বাপের বাড়ী এবার যাইতেই হইবে, এই যাওয়া আপনাদের ভোলানাথের ইচ্ছানুসারে হইবে কি না, তাহা বিধাতাই জানেন, তবে আমি তাঁহাকে ইহা জানাইব, জানাইবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে আপনার কি মত, তাহাই বুঝিবার জন্য আপনাকে এতটা ক্লেশ দিলাম। দুঃখিনী কন্যার এই অন্যায় আবদার ক্ষমা করিতে বোধ হয় আপনি কুণ্ঠিত হবেন না।"

"মা, সবই বুঝিতেছি, জানিই ত তোমার স্বামী কিরূপ একগুঁয়ে, দুর্গোৎসব বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া অভিমানভরে তুমি পিত্রালয়ে যাইবে, ইহা যে তাঁহার অভিমত হইবে, সে বিশ্বাস কিন্তু আমার নাই। তাঁহার অনভিপ্রায়ে তুমি বাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তাহাও ত ভাল হইবে না—তার চেয়ে যাবার কথা না তুলিয়া দুর্গোৎসব বিষয়ে তাঁহার মত-পরিবর্ত্তনের জন্য তোমার নিজেই তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে ভাল হয় না কি?"

"বেশ! তার পর যদি তিনি মত-পরিবর্ত্তন না করেন, তখন আমার পক্ষে কি কর্ত্তব্য?"

"তখন বাপের বাড়ী যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইবে।"

"যদি তাহাতে সম্মতি না দেন, তখন কি করিব?"

"তখন আমি বলি, যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করাই উচিত হইবে।"

চক্রবর্ত্তীর শেষ উত্তরটি শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী একটি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন—

"বুঝিলাম আপনার কি-মত। একটা কথা এখনও বলা হয় নাই, তাহা এই, এবার পূজা করিলে সত্য সত্যই কি আমাদিকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে?"

"আমার ত মনে হয়, কিছুই ধার করিতে হইবে না—তবে রায়পুরের মহলটি খরিদ করা হয় ত ছয় মাসের জন্য পিছাইয়া যাইবে। বাবাজীর ইচ্ছা, আশ্বিন মাসের মধ্যেই তাহা হস্তগত করেন।"

"পূজা হইলে আশ্বিনের মধ্যেই ঐ বিষয় খরিদ করিবার যদি প্রয়োজন হয়, তবে কত টাকা আর যোগাড় করিতে হইবে?"

"অন্ততঃ দশ হাজার টাকা।"

"ঐ টাকা যদি আমি কোনরূপে দিতে পারি, তাহা হইলে আপনি বুঝাইয়া শুঝাইয়া এখন তাঁহার মতপরিবর্ত্তন করিতে পারেন কি?"

শ্যামাসুন্দরীর শেষ কথাটি শুনিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে মনে ভাবিলেন, এ ত দেখছি, দুর্লভবাবাজীর কেবল শাস্তস্বভাবা, আত্মহারা পত্নী নহে, বিষয়বুদ্ধি ত কম নহে, এ যে সাক্ষাৎ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "শুনিতেছি—কর্ত্তা যদি পূজা না করেন—তাহা হইলে গ্রামের লোক সকল মিলিত হইয়া বাজারে চাঁদা উঠাইয়া বারোয়ারী-দুর্গাপূজা করিবে।"

"আমিও শুনিয়াছি—কিন্তু তাহা হইলে আমাদের বড়ই অপমান হইবে।"

"প্রতীকারের উপায় কিছু ভাবিয়াছেন কি?"

"প্রতীকারের পথ বাবাজীর শীঘ্র মতপরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই দেখি নাই, তাই মা বলিতেছিলাম, তুমি একবার চেষ্টা-চরিত্র করিয়া দেখ, যদি কোনরূপে বাবাজীর এই দারুণ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাটি উল্টাইয়া দিতে পার।"

চক্রবর্ত্তীর এই কথা শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি সাহায্য করিবেন—দেখা যাক্" এই বলিয়া তিনি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পূর্ব্বের ন্যায় পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে বিদায় করিয়া একখানি গামছা কাঁধে লইয়া স্নানের জন্য খিড়কির পথ দিয়া পুষ্করিণীর দিকে যাত্রা করিলেন।

৫

শ্রীনিবাসপুরে গোপাল চট্টরাজ এক জন নামজাদা বাহাদুর পুরুষ। রায়-বাড়ীতে দুর্গোৎসব বন্ধ হইল, এ সংবাদ প্রচার হইবামাত্র তাঁহার মাথায় একটা মৎলব ঢুকিয়া বসিয়াছে যে, গ্রামে এবার বারোয়ারী-দুর্গোৎসব করিতে হইবে। রায়বাড়ীতে দুর্গোৎসব হয়, দেশশুদ্ধ লোক পেট ভরিয়া প্রসাদ পায়, যাত্রা পাঁচালী থিয়েটারে আমোদ-আহ্লাদ করে সত্য, তাহাতে চট্টরাজ বাহাদুরের লাভ কি, তিন দিন দুইবেলা রসনার পরিতৃপ্তি, সে ত সকলের ভাগ্যেই সমান—চট্টরাজের যে অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তাহা প্রকাশের ত কোন সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। দুর্লভ বাবুর উপর টেক্কা দিয়া গ্রামের লোকের চাঁদায় সেই ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের এমন সুযোগ আর কি ফিরিয়া পাওয়া যাইবে? কখনই না chance never repeats itself; সুতরাং এই সুবর্ণসুযোগ কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে; তাই চট্টরাজ মহাশয় তাঁহার মৎলব অনুসারে তালগোল পাকাইবার জন্য আদা-মুণ খাইয়া লাগিয়া গেলেন।

অনেক নিষ্কর্ম্মা বিদ্যাদিগ্‌গজও সঙ্গী জুটিল—ভয়েই হউক বা ভদ্রতার সঙ্কোচেই হউক কিম্বা স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির বাহানাতেই হউক, অনেকে চাঁদার খাতায় মোটা টাকার প্রতিশ্রুতির সহিত নাম দস্তখত করিতে তখন পশ্চাৎপদ হইল না, সুতরাং আর বিলম্বে কি ফল, ঢেঁড়া পিটাইয়া শ্রীনিবাসপুরে ও আশপাশের গ্রামসমূহে বিজ্ঞাপন জাহির হইল—আগামী কল্য অপরাহ্ণ চারিটায় সময় চট্টরাজ মহাশয়ের বৈঠকখানায় ভদ্রমহোদয়গণের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইবে, আলোচ্য বিষয়—শ্রীনিবাসপুরে বারোয়ারী-দুর্গোৎসব। কাল সভার অধিবেশন হইবে, আজ তাই সায়ংকালে গোপাল চট্টর গৃহে ভাবী অধিবেশনের কার্য্যপদ্ধতি কিরূপ হইবে, কে সভাপতি হইবেন, সম্পাদকের গৌরবাবহ পদে কে বসিবেন, সহকারী সম্পাদক কে কে হইবেন, উপসভাপতি কয়জন ও কে কে হইবেন, কাহার কাহার উপর চাঁদা আদায়ের ভার অর্পিত হইবে, ধনাধ্যক্ষের গুরুভার কোন্ ভাগ্যবানের স্কন্ধে চাপিবে, কে পূজা-বিভাগের কর্ত্তা হইবেন, ভদ্রলোকদের আদর-আপ্যায়ন কে করিবেন, হিসাব-পরীক্ষক কে বা কাহারা হইবেন ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য একটি স্বয়ং নির্ব্বাচিত কার্য্যকরী সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল, চট্টরাজ মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অনেক প্রবীণ ব্যক্তিই এ অধিবেশনে যোগ দিলেন। সমবেত ভদ্রলোকদিগের আদর-আপ্যায়ন, পান-তামাক, চুরুট ও নস্য প্রভৃতি যোগানের ভার একাই গ্রহণ করিয়া চট্টরাজ নিঃস্বার্থ দেশসেবার একটা জাজ্বল্যমান আদর্শ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে সভার কার্য্যারম্ভ হইল, চট্টরাজ মহাশয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষিপ্রকারিতা, অদম্য সাহসিকতার প্রভাবে ৪।৫ ঘণ্টাকাল-ব্যাপী তর্কবিতর্কের পর ভাবী সভার কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ হইয়া গেল। প্রকাণ্ড তালিকায় মূল সভাপতি হইতে, প্রতিমা-বিসর্জ্জনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত প্রত্যেক কর্ম্মকর্ত্তার নাম সন্নিবেশিত হইল। কল্যকার সাধারণ সভায় চরম নির্ব্বাচনমাত্র বাকী রহিল।

দুর্লভ রায় শয়নকক্ষে শুইয়া আছেন। রাত্রি প্রায় দশটা, শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া শ্যামাসুন্দরী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। এ দৃশ্য সেকালের, সুতরাং নবশিক্ষিতা নবীনাদিগের হয় ত ইহা রুচিকর না হইতে পারে, কিন্তু কি নবীন, কি প্রবীণ, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, পাঠকগণের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ পঁচানব্বই জন যে ব্যক্তিগতভাবে মনে মনে এ দৃশ্যের পক্ষপাতী, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়। যাক্ সে কথা।

সুস্থকায়, শ্রমশীল, সুতরাং সুলভনিদ্র রায় মহাশয় প্রতিদিন শয়ন করিবার অল্পক্ষণ পরেই শ্যামাসুন্দরীর সেবাকুশল কমল-কোমল হস্তস্পর্শের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে জাগ্রৎ ও স্বপ্নরাজ্য অতিক্রম করিয়া সুষুপ্তির ব্রহ্মানন্দে প্রত্যহই নিমগ্ন হইয়া পড়েন, আজ কিন্তু তাহা হইল না। কেন এমন হইল? তেমনই কৌশলের সহিত তেমনই ধীরভাবে শ্যামাসুন্দরীর কুসুমকোমল পাণিদ্বয় তদীয় চরণতলে—চিরাভ্যস্ত ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলই, অথচ নিদ্রাদেবীর করুণা হইতেছিল না কেন? রায়মহাশয়ের বোধ হইল, যেন শ্যামাসুন্দরীর পাণিতলদ্বয় আজ কিছু অস্বাভাবিকভাবে উষ্ণ, তাড়াতাড়ি মুদ্রিত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া উঠিয়া বসিয়া তিনি তখন গৃহিণীর হাতখানি দুই হস্তে ধরিয়া বলিলেন, "এ কি? তোমার হাত গরম কেন? শরীর কি ভাল নাই?" কো[illegible] উত্তর না পাইয়া ব্যাকুলতার সহিত তিনি তখন গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিলেন। গৃহকোণস্থিত জুয়েল ল্যাম্পের মন্দীকৃত শিখার অনতিস্ফুট আলোকে তাঁহার মনে [illegible], শ্যামাসুন্দরীর মুখখানিতে বিষণ্ণতার ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু কি তাহাই—নত নয়নদ্বয়ের দুই কোণ ভরিয়া অতিযত্নে নিরুদ্ধ বাষ্পবারি নিবারণ [illegible]

মানিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া আরক্ত কপোলদ্বয়কে অভিষিক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

রায়মহাশয়ের মাথা ঘুরিয়া গেল, এ দৃশ্য তাঁহার এই দীর্ঘকালের দাম্পত্য-জীবনে একবারে নূতন। ক্ষিপ্রতার সহিত আরও উদ্বেগ-কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"এ কি! তুমি যে কাঁদিতেছ? কি হইয়াছে? বল, গোপন করিও না।" শ্যামাসুন্দরী কোন উত্তর দিলেন না। প্রত্যুত দুই নয়ন হইতে রুদ্ধ অশ্রুপ্রবাহ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া দরদরিত দুই গণ্ডস্থল ভাসাইতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ এইভাবেই কাটিয়া গেল, ব্যাপার কি, জানিবার জন্য রায়মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তখন শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,—"আমি অনেককাল মাকে দেখি নাই—কাল রাত্রে স্বপনে দেখিয়াছি, মা আমার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, 'শ্যামা' তুই কেন এত নিষ্ঠুর হলি? অন্ততঃ এক দিনের জন্য তোকে লইয়া যাইবার জন্য আমি কাহাকেও না বলিয়া তোর কাছে চলিয়া আসিয়াছি। দেরী করিস না, তুই আমার সঙ্গে চল্।' আমার সর্ব্বস্ব হৃদয়ের দেবতা! তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে অনুমতি দাও—আমি শৈলকে সঙ্গে করিয়া কয়েক দিনের জন্য আমার দুঃখিনী মাকে দেখিয়া আসি—তুমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও।"

"মাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ—ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু সে জন্য তোমাকে সেখানে যাইতে হইবে কেন? আমি কালই চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে শ্রীরামপুরে পাঠাইব—তিন দিনের মধ্যে মাকে লইয়া তিনি এখানে ফিরিয়া আসিবেন। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য তোমার চোখে জল!" এই বলিয়া আদর করিয়া রায় মহাশয় আবেগ-কম্পিত দুই হস্তের দ্বারা শ্যামাসুন্দরীর চোখের জল মুছাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আরও ধীরভাবে, আরও দৃঢ়তা সহকারে শ্যামাসুন্দরী তখন বলিলেন, "মা এখানে কখনও আসেন নাই, আমার ধনধান্যে উৎসবে আনন্দে ভরা সংসারের কথা শুনিয়া, এই সুখের অবস্থা নিজে আসিয়া দেখিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হওয়াও অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু তুমি ত এবার দুর্গোৎসব বন্ধ করিয়াছ, এখন হইতেই বাড়ীশুদ্ধ লোক হাহাকার আরম্ভ করিয়াছে, গ্রামের সকল লোকই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। পৈতৃক একশত বৎসরের দুর্গোৎসব যে বাড়ীতে হবে না, সেখানে নিরানন্দ-শূন্য-জীর্ণারণ্যপ্রায় ও ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কার ঝড়ে কম্পমান এই বাড়ীতে আসিয়া মা কি আমার সুখী হইবেন? বলি, তুমি আমাকে সেইখানেই তাঁহাকে দেখিয়া আসি। বঞ্চীর থাকিব কেমনে? তাই বলি, আমাকে ছুটী দাও, মা জগদম্বার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সৌভাগ্য এবার ঘটিল না; কিন্তু শ্রীরামপুরে মা আমার সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার চরণে পূজার তিন দিন যদি পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারি, তাহা হইলেও আমার জীবন সার্থক হইবে।"

স্তব্ধের ন্যায়, চকিতের ন্যায় দুর্লভ রায় এই কয়টি কথা শুনিলেন; কিছুক্ষণ ভাবিয়া গম্ভীর-স্বরে বলিলেন—"শ্যামাসুন্দরি! এখন সবই বুঝিলাম, জমীদারগিরি করিতে যাইয়া এমন শিক্ষা আর কখনও জীবনে পাই নাই। পূর্ব্বপুরুষগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে সংসারে শান্তি থাকে না, এই শিক্ষা আজ গুরুর ন্যায় তোমার কাছে প্রথম শিখিলাম। তোমার ইচ্ছা যে জগদম্বার ইচ্ছারই নিমিত্তমাত্র, তাহা বুঝিলাম। তুমি শান্ত হও, দুর্গোৎসব বন্ধ হইবে না, তোমার মাকে আসিয়া এবার ভোগের রান্না রাঁধিতে হইবে। তাহার ব্যবস্থাও করিব, তুমি এখন স্থির হও। কালিদাস সত্যই বলিয়াছেন—

'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ'।"

দুর্লভ বাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া মস্তকে চরণ স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন ও বলিলেন, "দাসীর প্রতি এত দয়ার কি পরিশোধ এ দাসী দিতে পারে? আশীর্ব্বাদ কর, যেন ঐ চরণে মাথা রাখিয়া আমার দেহান্ত হয়।" তাহার পর দুই জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল, অনেক পরামর্শ হইল, সে সকল কথা পাঠকের এখন না শুনিলেও চলে।

৬

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোপাল চট্টরাজের বাটীর সম্মুখে প্রশস্ত ভূখণ্ডে বিরাট জনসভার অধিবেশন, প্রায় ২৫খানা গ্রামের প্রতিনিধিবর্গ একত্র হইয়াছে। চট্টরাজের উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতা সকলকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছে। চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে, মুখুয্যে, গাঙ্গুলী, চক্রবর্ত্তি-কুলের বড় বড় মাতব্বরগণের সহিত মিলিত বৈদ্য কায়স্থ নবশাখকুলের ধুরন্ধর প্রতিনিধিবর্গ একযোগে গ্রামের সম্মান রাখিবার জন্য আজ বদ্ধপরিকর। তাহা ছাড়া হাড়ি, ডোম, চামার, মেথর, নমঃশূদ্র ও কৈবর্ত্তদলের প্রতিনিধিগণও কায়মনোবাক্যে সভার সাফল্যের জন্য পরিশ্রম করিতেছে। এতাদৃশ বিরাট সভার অধিবেশন শ্রীনিবাসপুরের অধিবাসিগণ কখনও দেখে নাই। এই সকল বিরাট আয়োজনের অধিনায়ক

শ্রীমান্ চট্টরাজ মহাশয়ের গুণগানে আজ সকলেই মুখর। তাঁহার ভিতরে এত শক্তি আছে, জনসাধারণ তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত হইবার জন্য এত ব্যগ্র, গর্ব্বিত রায়বংশের উদ্ধত জমীদার দুর্ল্লভ রায়ের মানসম্ভ্রম পদমর্য্যাদার সমুন্নত শিখর আজ তাঁহার বাগ্‌বজ্রের আঘাতে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ধূলায় লুটাইবে, এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি সুপুষ্ট ক্রুটির মত আহ্লাদে আটখানা হইবার উপক্রম করিতেছেন।

সভারম্ভের সূচক বিরাট দামামা বাজিয়া উঠিল। সভার সকল লোকই নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। এমন সময় ধীর গম্ভীরপদবিক্ষেপে কতকগুলি কাগজের তাড়া কক্ষে করিয়া চট্টরাজ মহাশয় সেই বিরাট জনসভার মধ্যে উদিত হইলেন। তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে অচিন্ত্যপুর গ্রামের বিশ্ববিদিত সাক্ষাৎ জলিত পাবকসদৃশ মূর্ত্তিমান ব্রহ্মণ্যদেব তর্কসিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয় বিপুল করতালির মধ্যে সভাপতির পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট উচ্চ আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহারই আদেশ অনুসারে চট্টরাজ মহাশয় সভাপতিরই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সভার উদ্দেশ্য বিবরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—"পূজ্যপাদ মহর্ষিপ্রতিম সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রগণ! আমাদের এই অঞ্চলবাসী সকল নরনারীর বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে, আমাদের বদান্য ভূম্যধিকারী মহাশয়ের বাটীতে এ বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব হইবে না। লোকপরম্পরায় শুনা যায়, নানাপ্রকার কারণে তাঁহার আর্থিক অবস্থা এ বৎসর সচ্ছল নহে, সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহার পৈতৃক দুর্গোৎসব বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীভগবানের চরণে আমাদের সমবেত প্রার্থনা এই যে, তাঁহার এই আর্থিক দুরবস্থা বিনষ্ট হউক, তিনি আগামী বৎসর হইতে আবার দুর্গোৎসব আরম্ভ করুন, এই সাধারণ সভার পক্ষ হইতে এই অঞ্চলনিবাসী হিন্দুমাত্রের তাঁহার এই আর্থিক অবসাদের জন্য আমি সমবেদনা ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। জমীদার মহাশয় বিপদে পড়িয়া দুর্গোৎসব বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া শ্রীনিবাসপুরে যে দুর্গোৎসব বন্ধ হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। দুর্গোৎসব সর্ব্বসাধারণের বার্ষিক মহোৎসব। ইহা দ্বারা আগামী বৎসরের ভাবী অমঙ্গল, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আপদেরও নিবৃত্তি হয়; সুতরাং প্রত্যেক হিন্দুরই আপনার শক্তি অনুসারে কায়িক, বাচিক, মানসিক ও আর্থিক সাহায্য দ্বারা এই মহোৎসবটি যাহাতে এ গ্রামে বন্ধ না হয়, তাহার চেষ্টা করা। আমরা সর্ব্বসাধারণের এইরূপ মনোভাব বুঝিতে পারিয়া এইবারের জন্য সাধারণ চাঁদার সাহায্যে যাহাতে বারোয়ারী-দুর্গোৎসব হয়, তাহারই জন্য এই সভার আহ্বান করিয়াছি। দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর জাতীয় প্রধানতম মহোৎসব। আজকাল দেশে জাতীয় ভাবের বন্যা বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই জাতীয় মহাভাবের বন্যায় যে না ভাসিয়াছে, তাহার এ সংসারে জীবন নিরর্থক। এই জাতীয় মহোৎসবকে আমরা সমবেত জাতির সংঘশক্তির উদ্বোধন দ্বারা যথার্থ জাতীয় উৎসবে পরিণত করিতে চাহি। আশা করি, আপনারা সকলেই এই বিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন। যদি আপনারা সম্মত হয়েন, তাহা হইলে আমরা কি ভাবে এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার বিবরণও প্রকাশ করিতে চাহি।" এই বলিয়া সভার চারিদিকে চাহিয়া চট্টরাজ মহাশয় সভার মত জানিবার জন্য চুপ করিয়া রহিলেন।

সভার এক প্রান্ত হইতে হঠাৎ একটা কোলাহল শ্রুত হইল। "মিথ্যাকথা অপমানকর, এইরূপ কথা শুনিতে নাই।" এই বলিয়া কতকগুলি লোক চীৎকার করিতেছে আর একদল লোক "থামো থামো, ভাল না লাগে, সভায় দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ কর, না হয় চলিয়া যাও" এই বলিয়া তাহাদিগকে থামাইতে যাইয়া—আরও হট্টগোল বাড়াইয়া তুলিতেছে। সভাপতি মহাশয় ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কম্পান্বিতকলেবর হইয়াছেন। এক ধার হইতে সকলেই বলিতেছে, থামো, থামো, কিন্তু কেহই নিজে থামিতেছে না। ক্রমে গণ্ডগোল বাড়িতেই লাগিল। চট্টরাজ মহাশয় প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিলেন।

৭

ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষের ন্যায় তুমুলভাবে আন্দোলিত কোলাহলময় সেই সভার প্রবেশপথে সহসা আজানুলম্বিত-দীর্ঘ-শুভ্র-শ্মশ্রু-গুম্ফবিরাজিত-মুখমণ্ডল দীর্ঘাকৃতি এক পুরুষের আবির্ভাব দেখিয়া সমবেত জন-সমূহ তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সম্মানের সহিত সভার মধ্যস্থলে সভাপতির আসনের নিকটে তাঁহার যাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে লাগিল। সেই পুরুষ অন্য কেহ নহেন, তিনি দুর্লভচন্দ্র রায় জমীদার মহাশয়ের প্রধান কর্ম্মচারী নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। সভার কেহ তাঁহাকে আহ্বান করে নাই—অথচ তিনি স্বয়ং সশরীরে সভার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইহা দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইল। আশঙ্কায় অনেকের বুক দপ্‌দপ্‌ করিতে লাগিল; লজ্জায় ও সঙ্কোচে অনেকের মাথা নীচু হইয়াই [illegible]হইল। সভাপতির আকৃতি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, তিনি [illegible] অনুসন্ধান [illegible]। সভার এতাদৃশ পরস্পরবিরুদ্ধ ভাববিবর্ত্তে

প্রতি ক্ষণকালের জন্য ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির ঠিক সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং সভাপতির নমনশীল ম্লান মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশ পাইলে এই সভায় আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।" থতমত খাইয়া সভাপতি মহাশয় বলিয়া ফেলিলেন, "আপনি যে কিছু বলিবেন, এ ত আমাদের সৌভাগ্য।" সভাপতির আদেশ পাইবামাত্র সভার দিকে ফিরিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিবাতনিষ্কম্প সমুদ্রকল্প সেই মহতী জনসভায় সমবেত লোকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"ভদ্রগণ! আমি এ সভায় অনাহূত বা রবাহূত হইয়া আসিয়াছি, ইহা বোধ করি, আপনারা সকলেই জানেন; তথাপি সভাপতি মহাশয়ের কৃপায় এই সভায় আমার আগমনের উদ্দেশ্য অতিসংক্ষেপে আপনাদিগকে জানাইবার অধিকার যে আমি পাইয়াছি, ইহার জন্য তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, আপনারা যে কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া এই সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে মিথ্যা। আমাদের মাননীয় ভূম্যধিকারী দুর্ল্লভচন্দ্র রায় মহাশয় এমন কোন বিপদে বা অর্থকৃচ্ছে পড়েন নাই—যাহার জন্য গ্রামবাসী জনসাধারণের বার্ষিক সেবা করিবার সৌভাগ্যফলস্বরূপ তাঁহার পৈতৃক দুর্গোৎসব এইবারে বন্ধ করিবার সম্ভাবনা কাহারও মনে উদিত হইতে পারে।"

এই কয়টি কথা বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৌনী হইলেন। অমনি বিপুল করতালির সঙ্গে সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত 'জয় জমীদার বাবুর জয়' এই ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ করিল। দীর্ঘকালব্যাপী এই জয়োল্লাসের বিরাট কোলাহল শান্ত হইলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"ভদ্রগণ, মিথ্যা হইলেও রায়পরিবারের অর্থকৃচ্ছ্রের সংবাদে আপনারা যে এই সভায় তাঁহার প্রতি সহানুভূতি ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া আপনাদের হিতৈষিতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য দুর্ল্লভ বাবুর পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাইতেছি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই বিদ্রূপে ভরা ব্যঙ্গোক্তিতে সভাস্থ সকলেই আপনাদের অতি অন্যায় ব্যবহার বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় অধোবদন হইল। এক প্রান্ত হইতে উচ্চস্বরে কেহ বলিয়া উঠিল—"চট্টরাজ মহাশয়ের এই অন্যায় প্রস্তাব উপস্থিত মাত্র, কিন্তু ইহা এখনও সভায় গৃহীত হয় নাই।"

"বেশ কথা, শুনিয়া সুখী হইলাম, আপনাকে ধন্যবাদ। যাহাই হউক, আমার বক্তব্য আর বেশী নাই, দুর্ল্লভ বাবু এই অমূলক সংবাদ প্রচারের জন্য দুঃখিত এবং ইহাতে আপনাদের যে উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার জন্য তিনি আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই কথা শুনিবামাত্র আবার সভাস্থ সকলেই "না না, তা কি হয়, তাঁহার কোন দোষ নাই—ইহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কোন কারণই উপস্থিত হয় নাই"—এই বলিয়া বিপুল আনন্দে আবার 'জয় জমীদার দুর্ল্লভ বাবুর জয়' ধ্বনি ও করতালিকায় সভাস্থল পরিপূরিত করিয়া তুলিল।

"আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি শ্রীনিবাসপুরের রায়-পরিবারের পক্ষ হইতে আগামী দুর্গোৎসবে আপনাদের সকলকে সাদরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় যোগদান পূর্ব্বক তাহার পূর্ণতা-সম্পাদনের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি। আর একটি নিবেদন এই যে, আপনারা যে বারোয়ারীর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা আপাততঃ দয়া করিয়া স্থগিত রাখুন। এই গ্রামে এইবার হইতে প্রতিবর্ষে বারোয়ারী শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা হইবে, তাহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য দুর্ল্লভ বাবু এক হাজার টাকা বার্ষিক চাঁদা দিবার প্রতিশ্রুতি জানাইতেছেন। আশা করি, এ প্রস্তাবে আপনাদের সকলের সম্মতি আছে।"

"আছে আছে, খুব আছে" এই বলিয়া সভাস্থ সকলেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন পূর্ব্বক আবার দুর্ল্লভ বাবুর জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে লাগিল।

বিপুল আনন্দ-কোলাহলের সহিত সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার পর সভাভঙ্গ হইল। প্রসন্নমুখে সকলকে মধুরভাষণে আপ্যায়িত করিয়া নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক জমীদার-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরীকে সকল কথা জানাইলেন এবং আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহিলেন, "মা, তোমার ন্যায় পতিব্রতা যে গৃহে বিরাজমান, সে গৃহে দুর্গোৎসব কখনই বন্ধ হইতে পারে না। সে গৃহে দুর্গোৎসব নিত্যই অনুষ্ঠিত হয়। তোমার শ্রীদুর্গাভক্তির এক কণাও যদি পাই, আমি ধন্য হইব। মহর্ষি ঠিক বলিয়াছেন—

> "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
> পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
> শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
> তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্"।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

অন্তরের বিক্ষোভকে আজ সুধীর কোনও মতেই শান্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহার দীর্ঘ দিনের পল্লবিতা আশালতার মূলে এ যে নিদারুণ আঘাত!

তাহার তরুণ মন, হৃদয়ে পুষ্পিত যৌবনের ব্যাকুল আগ্রহ। উদ্দাম কল্পনা পাখা মেলিয়া অপরিচিতা অথচ শাস্ত্রবিধান-মতে একান্ত আপন দয়িতার পানে উড়িয়া যাইবার জন্য স্পন্দিত অন্তরে প্রতিমুহূর্ত্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে থাকে। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া এমনই অভিনয় চলিয়াছে।

যে সর্ব্বাপেক্ষা আদরের পাত্রী—অগ্নি ও দেবতা সাক্ষী করিয়া, কৈশোরের স্বপ্নবিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া যাহাকে জীবন-সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণীর পদে বরণ করিয়া লইয়াছে, সেই এত-দিন তাহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতা! বালিকার সরল সুন্দর মুখের—চকিত চঞ্চল নয়নের মধুর ছবি দশদিন মাত্র দেখিবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল। তার পর এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উভয়কে উভয়ের দৃষ্টিপথ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে।

তাহাকে ভাল করিয়া জানিবার জন্য, সম্পূর্ণরূপে আপনার কাছে পাইবার নিমিত্ত আগ্রহ মধ্যে মধ্যে তাহাকে বিশেষ চঞ্চল করিয়া তুলিয়া থাকে; কিন্তু পিতার আদেশ, শ্বশুর মহাশয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়া—সে তাহার উদগ্র কামনাকে সংবরণ করিয়া আসিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে এমন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে হাস্যোদ্দীপক এবং সমর্থনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও সুধীর এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ কোনও দিনই করে নাই। সে তাহার সুশিক্ষিত ও মহাপ্রাণ পিতার অপর্য্যাপ্ত স্নেহের পরিচয়, পিতৃ-হৃদয়ের বাৎসল্য-রসের স্বাদ বাল্যকাল হইতে ভূরিপরিমাণে লাভ করিয়া আসিয়াছে। এমন পিতার জন্য সে শুধু গর্ব্বিত নহে, নিতান্ত সৌভাগ্যশালী বলিয়া আপনাকে মনে করিয়া থাকে। এমন উদার, গভীরহৃদয়, যুক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী পিতার বিচারক্ষমতার সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তি তাহার কখনও হয় নাই। সে বিশ্বাস করিত, সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিত, তাহার পিতা তাহার জন্য যে ব্যবস্থাই করুন না কেন, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র অকল্যাণের সম্ভাবনা থাকিতেই পারে না।

পিতার কথা মনে হইতেই তাহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া আসিল। তাঁহার হাস্য-প্রফুল্ল, সদানন্দ মুখশ্রী, প্রতিভাদীপ্ত, উজ্জ্বল নয়নযুগলের কোমল দৃষ্টির স্মৃতি—অপূর্ব্ব আনন্দ রসে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পিতা এক দিনের জন্যও গম্ভীর-মুখে তাহার অনিচ্ছাকৃত অথবা বাল্যসুলভ চপলতাজনিত ত্রুটির জন্য তাহাকে তিরস্কার করেন নাই। পরম স্নেহভরে শুভার্থী, অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় তাহার ভ্রমপ্রমাদ দেখাইয়া দিয়াছেন। অবকাশসময়ে তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইয়াছেন, জ্ঞাতব্য বিষয় সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন—এখনও সেই একই মূর্ত্তি সে দেখিতে পায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বহু সতীর্থের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে—পরিচিত বন্ধু-স্থানীয়ের সংখ্যাও বাড়িয়াছে; কিন্তু মন খুলিয়া সে এ পর্য্যন্ত আর কাহারও সহিত মিশিতে পারে নাই। তাহার পিতার মত এমন বন্ধু সে কোথায় পাইবে? না, তাঁহার তুলনা নাই!

কান্তবর্ষণ মেঘ আবার গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ষ্টীমার বংশীধ্বনি করিয়া আর একটা ষ্টেশন ছাড়াইয়া চলিল।

বালিকা বীণা না জানি এখন কত বড় হইয়াছে! দ্বিতীয়ার ক্ষীণ শশাঙ্ক পাঁচ বৎসরে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় ষোল-কলায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে নিশ্চয়। সে-ও কি এখন সুধীরের কথা চিন্তা করিয়া দীর্ঘ রজনীর নির্জ্জনতায় তাহারই মত অধীর হইয়া উঠে? সে জানে, বীণা নাগপুর হইতে এবার আই, এ ষ্ট্যাণ্ডার্ড পরীক্ষা দিয়াছে। কিন্তু তাহারা স্বামি-স্ত্রী হইলেও, এ পর্য্যন্ত কেহ কাহারও কাছে পত্র লিখে নাই। উভয় পক্ষ হইতেই পিতৃ-উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। বীণাও তাহারই ন্যায় পিতামাতার একমাত্র সন্তান। উভয়ের জনকের এই খেয়াল—বিবাহের পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরস্পর পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, এ ব্যাপারে মৌলিকতা যথেষ্ট আছে; কিন্তু তরুণ প্রাণের বিরহ-বেদনা কি কালি-দাসের যক্ষের দয়িত-বিরহের মত তীব্র নহে?

নিমন্ত্রিত হইয়া সে এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বহুবার শ্বশুর মহাশয়ের মধ্যপ্রদেশের নাগপুর-ভবনে গিয়াছে; কিন্তু এক-বারও তাহার স্ত্রী বীণার দেখা সে পায় নাই। সেখানে গিয়া সে আলোচনা-প্রসঙ্গে জানিয়াছে—তাহার অপরিচিতা পত্নী তখন এলাহাবাদে তাহার জনক-জননীর কাছে গিয়াছে। শ্বশুর-শাশুড়ী পরম যত্নে তাহার আনন্দবর্দ্ধনের চেষ্টা করিতেন,

তাহার কাছে বসিয়া শ্বশ্রূমাতা কত গল্প করিতেন। সে এই পূজনীয়া জননী-সদৃশা সদা হাস্যময়ী শ্বশ্রূমাতার আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হইত। হয় ত বা কল্পনার সাহায্যে মানসপটে সে আসন্নপ্রৌঢ়া শ্বশ্রূমাতার মুখের সহিত তাহার পত্নীর মুখের সাদৃশ্য অঙ্কিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। অধ্যয়নের অবকাশে তাহার শ্রান্ত মন পাখা মেলিয়া নাগপুর ও এলাহাবাদে সহস্রবার গতায়াত করিয়া থাকে—আজও ষ্টীমারের হুস্ হুস্ শব্দের মধ্যে মেঘমেদুর আকাশ-পথে তাহার মন অভিসারে চলিয়াছিল।

সহসা তীব্রস্বরে বাঁশীর ধ্বনি বাজিয়া উঠিতেই তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সে দেখিল, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কখন্ এক ইংরাজ-দম্পতি ষ্টীমারে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। তাহারা ধ্যানমগ্ন এই বাঙ্গালী যুবকের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়াই সে ঈষৎ অপ্রতিভ হইল। এই ইংরাজ-দম্পতি বোধ হয় তাহার সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে কোন আলোচনা করিয়া থাকিবে। সে যে আত্মবিস্মৃত হইয়া বহুক্ষণ একইভাবে বসিয়া রহিয়াছে, তাহাতে অন্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

রাজগঞ্জ হইয়া ষ্টীমার কখন্ সে চাঁদপাল ঘাটের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার কোনই খেয়াল ছিল না। ষ্টীমার ঘাটে লাগিতেই সে তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

৩

ছাত্রাবাসে ফিরিয়া সে নিজের ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইল, তাহার শিক্ষাগুরু এবং পিতৃবন্ধু রমেশ বাবু অধীরভাবে গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতেছেন।

"কোথায় গিয়েছিলে, সুধীর?"

সংক্ষেপে সে সকল কথা বর্ণনা করিল।

রমেশ বাবু কলিকাতার কোনও কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক। নিঃসন্তান ও বিপত্নীক রমেশ বাবু বাল্যবন্ধুর পুত্রের অভিভাবক হিসাবে কলিকাতায় অবস্থান করিতেন। সুধীর তাঁহারই কাছে থাকিয়া এ যাবৎ পড়াশুনা করিয়া আসিতেছে।

সুধীরের পিতা প্রবোধ বাবু বন্ধুর তত্ত্বাবধানে পুত্রকে রাখিয়া অনেকটা নিশ্চিন্তই থাকিতেন। এমন চরিত্রবান্ ও গুণশালী অধ্যাপক ও অভিভাবক অর্থবিনিময়ে দুর্লভ। ছাত্রাবাসের একটা অংশ সুধীর ও রমেশ বাবুর জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। ধনী প্রবোধচন্দ্র পুত্রের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন।

টেবলের উপর হইতে একখানি টেলিগ্রাম লইয়া রমেশ বাবু বলিলেন, "প্রবোধ লিখেছেন, অবিলম্বে তোমাকে এলাহাবাদ যেতে হবে।"

সুধীর নিবিষ্টচিত্তে পিতার তারের বার্ত্তা পাঠ করিয়া বলিল, "শেষ পরীক্ষা না দিয়েই?"

মৃদু হাসিয়া রমেশ বাবু বলিলেন, "অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে পরীক্ষা এখন হ'তে পারবে কি?"

সুধীর বাতায়নপথে একবার বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, তার পর বলিল, "মেসে আস্‌তেই শুনলুম, কাল বালিগঞ্জের দিকে আমাদের পরীক্ষাকেন্দ্র বস্‌বে। দেখা যাক্, সেখানে কোন বাধা হয় ত না ঘটতেও পারে।"

রমেশচন্দ্র পুত্রাধিক স্নেহভাজন ছাত্রের দিকে একবার নিবিষ্টচিত্তে চাহিলেন। শুধু বন্ধুপুত্র বলিয়া নহে, স্বভাবগুণে, চরিত্র-মাধুর্য্যে সুধীর তাঁহার সমগ্র অন্তর ব্যাপিয়া অবস্থান করিত। বি, এ পর্য্যন্ত সে তাঁহারই কলেজে, তাঁহারই শিক্ষাব্যবস্থার অধীন ছিল। এম, এ পরীক্ষাতেও তাঁহারই সহায়তায় সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের জন্যই রমেশচন্দ্র তাঁহার এই প্রিয়তম ছাত্রের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। এখনও সে সরলবুদ্ধি শিশুর ন্যায় নির্ব্বিচারে গুরুজনদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া কাষ করিয়া যায়, নিষ্পাপ পবিত্র পুষ্পের মত তাহার চিত্ত ও জীবন,—এই গুণের জন্যই তিনি তাহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া স্নেহ করিতেন। বিংশ শতাব্দীর তরুণ আন্দোলন সে নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহাকে রূঢ়ভাষী, অবিবেচক ও অপরিণামদর্শী করিতে পারে নাই। আন্দোলনের সার মর্ম্মটি সে তাঁহারই ইঙ্গিত, চরিত্রাদর্শ ও ব্যাখ্যার প্রভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। পিতৃবন্ধু হইলেও এখন তিনি তাহার পিতার ন্যায়ই প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখা অতিক্রম করেন নাই। অতীত ও বর্ত্তমানের যোগসূত্র তাঁহার মধ্যে বিশেষভাবেই বিদ্যমান ছিল।

সুধীরচন্দ্রের অন্তরের ছবি তাঁহার অভিজ্ঞ দৃষ্টির সম্মুখে সম্ভবতঃ গোপন রহিল না। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাহা ছাড়া কৈশোর হইতেই সুধীর তাঁহার সহিত বাস করিয়া আসিতেছে। তাহার সাংসারিক ও মানসিক সকল বিষয়ে ছোট বড় সংবাদই তাঁহার অধিগত ছিল।

মৃদু হাস্যরেখা অধ্যাপকের ওষ্ঠপ্রান্তে মুহূর্ত্তের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তার পর তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি প্রবোধকে ঐ রকমই সংবাদ পাঠাব।"

* * * *

আশা-স্পন্দিত হৃদয়ে সকাল সকাল সুধীরচন্দ্র অন্য পরীক্ষার্থীর সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌছিল। শ্রাবণের আকাশে আজ বর্ষণ ছিল না। সহরের এক প্রান্তে অবস্থিত পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আজ অবরোধের আশঙ্কা নাই মনে করিয়াই পরীক্ষার্থীরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু তাহাদের সে আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থই হইয়া গেল।

তাহারা স্পন্দিত অন্তরে দেখিল, প্রতিরোধকারীরা বহু সংখ্যায় তাহাদের বহু পূর্ব্বেই পরীক্ষা-মন্দিরের প্রত্যেক প্রবেশ-পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে। পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণীর কেহই সংখ্যায় ন্যূন নহে।

সুধীরচন্দ্রের বিরক্তি সত্যই আজ সীমারেখা অতিক্রম করিয়াছিল। যে পরীক্ষার প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল ধরিয়া সে তাহার অন্তরের কোমল ও মধুরতম ভাবগুলিকে চাপা দিয়া আসিয়াছে, প্রতিশ্রুত নির্দ্দিষ্ট পঞ্চবৎসর অতীতপ্রায়—জীবনের লোভনীয় পরম মুহূর্ত্ত যে পরীক্ষার অবসানের পর আবির্ভূত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, তাহার সার্থকতার পথে এ কি নিদারুণ বিঘ্ন!

বিরক্তির পুঞ্জীভূত বাষ্প অন্তর-মধ্যে সঞ্চিত হইলেও তাহার প্রকাশ-পথে সহস্র বাধা। সে ধীরে ধীরে দলের সহিত তথাপি অগ্রসর হইয়া প্রবেশপথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নারী অবরোধকারিণীরা অচল প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া যেন তরুণ পরীক্ষার্থীদিগকে নিঃশব্দে উপহাস করিতেছিল।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে একবার তাহাদের প্রতি চাহিতেই সুধীর সহসা চমকিয়া উঠিল। গত কল্য যে তরুণী নীরব অনুনয়ের ভঙ্গীতে তাহার গমন-পথে যোড়-হস্তে বাধা দিয়াছিল, আজ সে-ও সেই দলের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া আছে!

দলের মধ্যে সুধীরই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার। কাযেই তাহার দিকে দর্শকের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ আগ্রহের আতিশয্যে, পরীক্ষামন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য অধীর ব্যাকুলতায় সে সকলেরই পুরোবর্ত্তী হইয়াছিল।

অবরোধকারিণীদিগের অনেকেরই মুখে প্রশান্ত মৃদুহাস্য—তাহাদের যুক্তপাণির ললিতভঙ্গী পৌরুষ ও দৃঢ়তাকেও যেন নমনীয় করিয়া তুলে। সকলের মিলিত করুণ মিনতিভরা দৃষ্টি তাহার উপর কেন্দ্রীভূত হইল।

অন্তরের অবরুদ্ধ বাষ্পপুঞ্জ মহাশব্দে ফাটিয়া বাহির হইবারই মত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালের অন্ত কেহ কোন দিন আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সুধীর স্তব্ধভাবেই একবার প্রতিযোগিনীদিগের প্রতি চাহিয়া দেখিল। তরুণীদিগের সকলেই হিন্দু শুদ্ধান্তঃপুর-চারিণী না হইলেও তাহারা যে ভদ্র গৃহস্থ কন্যা ও বধূ, তাহা তাহাদের বিনম্র ব্যবহারে পরিস্ফুট। কয়েক জনের সীমন্ত ও ললাটদেশে সিন্দূরের উজ্জ্বল বর্ণরাগ।

সুধীর ক্রমশঃ দলের পুরোভাগ হইতে পশ্চাতের পরীক্ষার্থিগণের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল।

না,—সত্যই তাহাকে এবার পরীক্ষা-মন্দিরে প্রবেশের আশা ছাড়িতে হইল। পিতার কাছে আজই সে সংবাদ পাঠাইবে।

ভারাক্রান্ত-মনে সে বাসায় ফিরিতেই ভৃত্য আসিয়া তাহার হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিল। কম্পিত-হস্তে সে উহা খুলিয়া দেখিল, তাহার পিতাই উহা পাঠাইয়াছেন। গত কল্যকার তারের উল্লেখ করিয়া তিনি জানাইয়াছেন, তাহাকে পরীক্ষা না দিয়াই এলাহাবাদে অবশ্যই ফিরিতে হইবে। দারুণ গোলযোগের সময় তাহার কলিকাতায় থাকা তিনি আদৌ বাঞ্ছনীয় মনে করেন না।

সুধীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জবাব লিখিতে বসিল। আগামী পরশ্ব সে কলিকাতা ত্যাগ করিবে। পিতার আদেশ সে শিরোধার্য্য করিয়াছে। শুধু, এলাহাবাদের পথে এক দিন সে বারাণসীধামে নামিয়া বিশ্বনাথের আরতি দেখিয়া যাইবার অনুমোদন চাহে। প্রতিবার এলাহাবাদে যাইবার সময় সে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়া আসিয়াছে। পিতা তাহা জানেন। তাহার এই প্রিয় অভিলাষ—দেব-দর্শনের একান্ত আগ্রহ তাহার হৃদয়কে [illegible]

করিয়া তুলিয়াছে। এবারও সে সাধ যেন চরিতার্থ হইতে পারে।

চিঠি ডাকে দিয়া একখানি তার পাঠাইল, সে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য আগামী পরশ্ব মেলে যাত্রা করিবে।

৪

মোগলসরাই ষ্টেশনে গাড়ী আসিতেই সুধীর তাহার জিনিষপত্র কুলীর মাথায় দিয়া কামরা হইতে নামিল। ষ্টেশনের বিরাট প্লাটফরম তখন নানা যাত্রিসমাগমে পূর্ণ ও কোলাহলময়।

কাশীর গাড়ী ছাড়িতে তখনও বিলম্ব আছে। সে কাশী-গামী ট্রেণের মধ্য-শ্রেণীর একটি কামরায় জিনিষ-পত্র গুছাইয়া রাখিয়া প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্জাব-মেল তখনই ছাড়িয়া যাইবে। বিশ্বেশ্বর দর্শন করিবার একান্ত আগ্রহে সে যদি এখানে না নামিত, তাহা হইলে এই ট্রেণেই সে এলাহাবাদে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই পৌঁছিয়া জনক-জননীর চরণ-বন্দনা করিতে পারিত।

আজ প্রায় দুই মাস সে তাঁহাদের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত। কলিকাতার বাসায় থাকিয়াও এক দিনও তাঁহাদের স্মৃতি—অনবদ্য মধুর স্নেহ এবং সহস্র প্রকার আদরের কথা পুনঃ পুনঃ মনের মধ্যে আলোচনা না করিয়া সে তৃপ্তি পাইত না। এলাহাবাদে প্রথম যৌবনে ব্যবসায় উপলক্ষে তাহার পিতা বসবাস করিলেও জন্মভূমি বাঙ্গালার প্রতি তাঁহার ভক্তি ও প্রীতি পরিপূর্ণ-মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সেই জন্যই তিনি একমাত্র সন্তানকে মাতৃভূমির অঙ্কে রাখিয়া তাহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পিতার মুখ হইতে সুধীর এ কথা সহস্রবার শুনিয়াছে। পিতৃপিতামহের বাসভূমিতে বৎসরে তাহারা অন্ততঃ একবার করিয়া বেড়াইয়া আসিত। গ্রামের বাসভবন সুসংস্কৃত করিয়া গ্রামের উন্নতির জন্য তাহার পিতা বহু অর্থব্যয় করিতেন। সন্তানের অন্তরে জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ দৃঢ় ও স্থায়ী করিবার জন্য পিতার অক্লান্ত চেষ্টার কথা আজ পুনঃ পুনঃ তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

দেশের ও দেশবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা এবং দীর্ঘকালব্যাপী আলোড়ন ও আন্দোলনের কথা সুধীরের মনকে আজ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। পরীক্ষা-ব্যাপার উপলক্ষে এ কয়দিন সে যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহার স্মৃতিকে সে মন হইতে কোনও মতেই দূরীভূত করিতে পারিতেছিল না। নিঃসঙ্গ মনের মধ্যে আকস্মিক ব্যাপারের স্মৃতিই প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

পাদচারণা করিতে করিতে সে পঞ্জাবগামী ট্রেণের নিকটে আসিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সহসা বাঁশীর শব্দে সে বুঝিল, ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে। একবার গতিশীল ট্রেণের দিকে চাহিয়া নিজের গাড়ীর দিকে ফিরিবে, সহসা তাহার হৃৎপিণ্ড ধ্বক্ করিয়া উঠিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়ে-গাড়ীতে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া যে মেয়েটি বসিয়াছিল, সে কি আইন-পরীক্ষামন্দিরের সেই তরুণী নহে? হাঁ, সেই আয়ত নেত্র, সেই স্নিগ্ধকরুণ হাস্য-বিভাসিত আনন—ললাট ও সীমন্তে তেমনই উজ্জ্বল সিন্দূররাগ!

বিস্মিতভাবে চাহিতেই কামরাটি তাহার দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল। ট্রেণ তখন প্লাটফরম ছাড়াইয়া চলিয়াছে। মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধভাবে স্থাণুর মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। এই অপরিচিতা তরুণীকে দেখিয়া তাহার মনের প্রান্তে যে একটু দুর্ব্বলতা কয়দিন দেখা দিয়াছে, তাহা সে অস্বীকার করিতে পারে না। নহিলে সে কর্ত্তব্য-পথ হইতে পিছাইয়া আসিবে কেন?

দূরে বিলীয়মান ট্রেণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে সে মণিবন্ধের ঘড়ীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। না—তাহার ট্রেণ ছাড়িবারও আর অধিক বিলম্ব নাই। সে ধীরে ধীরে নিজের কামরায় গিয়া উঠিল। যাত্রীর ভিড় মন্দ ছিল না। সে ইচ্ছা করিয়াই মধ্য-শ্রেণীতে ভ্রমণ করিত, প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সুখসেব্য আসনের প্রতি কোনও দিনই তাহার লোভ ছিল না। পিতা এবং শিক্ষক মহাশয়ের জীবনাদর্শ হইতে সে ভোগবিলাসকে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিল। এলাহাবাদের মধ্যে তাহার পিতা অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহ-ব্যবসায়ী বলিয়া যুক্ত-প্রদেশে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ধনী বলিয়া তিনি পরিগণিত থাকিলেও তাঁহার চালচলন তদুপযোগী ছিল না, ইহা সে জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই দেখিয়া আসিয়াছে। অথচ তাঁহার দান, অনাড়ম্বর

জীবন-যাপন-প্রণালী সহরের মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠাকে স্থায়ী ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি শত শত কণ্ঠে নিনাদিত হইয়া সুধীরের অন্তরে একটা আনন্দের উত্তেজনার সঞ্চার করিল। বাল্যকাল হইতেই সে প্রত্যহ তাহার জননীকে বিল্বদলের দ্বারা মহাদেবের পূজা করিতে দেখিয়া আসিতেছে। দেবতার ধ্যানমন্ত্র তাহার কণ্ঠস্থ। সে বিশ্বেশ্বরের অর্চনা করিবার সুযোগ পাইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া থাকে। দেবতার এই রূপকল্পনা তাহার সমগ্র চিত্তকে অভিভূত করে।

সাধকের চিত্তে দেবাদিদেবের যে তুষার-শুভ্র অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দিগন্ত আলোকিত করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেই চিত্ত-বিমোহনকারী রূপজ্যোতিঃ ধ্যান করিতে করিতে সে তন্ময় হইয়া গেল। অপূর্ব্ব আনন্দ-শিহরণ তাহার দেহকে পুলকাঞ্চিত করিয়া তুলিল।

৫

এলাহাবাদ ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই সুধীর তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। পিতার হাস্যোজ্জ্বল, সদানন্দ মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াই সে দ্রুতপদে তাঁহার কাছে গিয়া চরণধূলি গ্রহণ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে পিতার বলিষ্ঠ বাহুর স্নেহব্যাকুল আলিঙ্গনে সুধীর আপনাকে সমর্পণ করিয়া যেন কৃতার্থ হইয়া গেল।

মোটরে আরোহণ করিবার পর পুত্রের মুখে স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পিতা সহাস্যে বলিলেন, "পরীক্ষা দিতে পারলে না ব'লে মনে বড় দুঃখ হচ্ছে, না বাবা ?"

যে ক্ষোভের অগ্নি সুধীরের মনে প্রচণ্ড তেজে কয়দিন জ্বালার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা সে অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু বিশ্বনাথের পূজায় আত্মনিবেদনের পর, তাঁহার আরতির অনবদ্য, অপূর্ব্ব মাধুর্য্যধ্বনির সহিত শত শত কণ্ঠোত্থিত বন্দনার গান শুনিবার পর তাহার ক্ষোভের জ্বালা প্রশমিত হইয়া গিয়াছে।

সে মৃদুস্বরে বলিল, "না বাবা, এখন কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

পুত্রের প্রতিভাদীপ্ত শান্ত আননে পিতার রহস্যময় দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য ন্যস্ত হইল।

মৃদু হাসিয়া পিতা বলিলেন, "আইন-পরীক্ষার শেষ প্রশংসাপত্র পেলেও আদালতে অর্থোপার্জ্জনের জন্য তোমার যাবার কোন প্রয়োজনই নেই। আমারও সে প্রশংসাপত্র আছে। কিন্তু তার সাহায্য কোন দিনই আমি নেই নি। তোমার জন্যে একটা নতুন কাজের ব্যবস্থা আমি ক'রে রেখেছি। তাতে তুমি খুসীই হবে।"

বিস্তৃত উদ্যানের বক্ষ চিরিয়া কঙ্কররচিত যে পথটি গাড়ী-বারান্দার নীচে আসিয়া মিশিয়াছিল, মোটর সেখানে থামিতেই পিতা-পুত্র গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন।

"তুমি দিনের বেলা ঘুমোও না, জানি। বিশ্রাম ও স্নানাহারের পর তোমাকে নিয়ে একবার আপিসের দিকে যাব, বাবা।"

পিতার আদেশ শ্রবণের পর পুত্র ত্রস্তচরণে জননীর কাছে চলিয়া গেল।

সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মত স্নেহময়ী জননীর চরণে নত হইয়া সুধীর বলিল, "পরীক্ষার মায়া কাটিয়ে চ'লে এলাম, মা।"

প্রসন্ন হাসিতে পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া মাতা বলিলেন, "বেশ করেছিস্।"

পুত্র প্রকাণ্ড অট্টালিকার দেহে প্রসাধনের সদ্যঃ চিহ্ন দেখিয়া বলিল, "এ সব কবে হ'ল, মা ?"

সন্তানের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়াই জননীর আননে স্নিগ্ধ হাস্যের অপূর্ব্ব দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "এই সবে হয়েছে—বাড়ীতে কি একটা বিষয়ে উনি ভোজ দেবেন, তাই।"

আহারাদির পর পিতার সঙ্গে সুধীর বাহির হইল। তাহাদের প্রকাণ্ড আপিস-বাড়ীর পার্শ্বেই একটা নূতন, বৃহৎ অট্টালিকায় সে প্রবেশ করিল। কয়েক মাস পূর্ব্বে সে যখন এলাহাবাদে আসিয়াছিল, তখন এই বাড়ীটি নির্ম্মিত হইতে সে দেখিয়াছিল বটে; কিন্তু কি জন্য উহা প্রস্তুত হইতেছে, তাহা জানিবার কৌতূহল তখন তাহার ছিল না।

পিতার সঙ্গে অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিতেই বিস্ময়ে তাহার অন্তর পূর্ণ হইল। প্রকাণ্ড হলঘরে পাশাপাশি বহুসংখ্যক তাঁত বসিয়াছে। তাহাতে বস্ত্রাদি বয়ন-ব্যাপার অবিশ্রান্ত চলিয়াছে।

পুত্রের দিকে ফিরিয়া প্রবোধ বাবু শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "এখানে যারা তাঁত বুনছে, তারা এখানে চাকরী করে না;

বাবা। তাঁত অবশ্য আমাদের। ওরা বাইরের লোকের চরকার দেশী সূতো দিয়ে কাপড় বোনে, পারিশ্রমিক ওদের। শুধু তাঁত প্রভৃতির জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট হারে ওরা আমাদের কিছু দেয়।"

পুত্র বুঝিল, ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্য গড়িয়া তুলিবার আয়োজন ইহাতে নাই। অর্থনীতি-শাস্ত্র ভাল করিয়া অধিগত করিবার ফলে সে অনায়াসে পিতার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিল। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাহার অন্তর পূর্ণ হইল। ধনকুবের পিতা, বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানবের কল্যাণকর উদ্দেশ্যকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আংশিকভাবে যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে সে এমন হৃদয়বান্ পিতার পুত্র বলিয়া আপনাকে সহস্রবার মনে মনে অভিনন্দিত করিল।

প্রবোধ বাবু বলিলেন, "কিন্তু এতে আমার পূর্ণ তৃপ্তি নেই। আমার জন্মভূমির লক্ষ লক্ষ লোকের বস্ত্রের অভাব দূর করবার জন্য বাঙ্গালী যদি চেষ্টা না করে, মহাপাতক হয় বলেই মনে করি। তোমাকে এখানে এই কাযের শিক্ষা ভাল ক'রে নিতে হবে। তার পর, বাবা, বাঙ্গালাদেশে একটা বড় তাঁতশালা খুলব। গরীব লোক ঘরে ব'সে সূতো কেটে দিয়ে যাবে, সামান্য পারিশ্রমিক নিয়ে তাঁতিরা কাপড় তৈরী ক'রে দেবে। তাতে তাঁতির অর্থাভাব থাকবে না, সস্তায় মানুষ কাপড় পরতেও পারবে। আমরাও কিছু পাব।"

পুলকিত অন্তরে সুধীর বলিল, "এর চেয়ে চমৎকার ব্যবস্থা নেই, বাবা।"

আত্মগতভাবে প্রবোধ বাবু বলিলেন, "আমার জীবনের এই সাধ তোমাকেই মেটাতে হবে।"

সুধীরচন্দ্র ঘরে ঘরে ঘুরিয়া পিতার কার্য্যপ্রণালী দেখিতে লাগিল। প্রবোধ বাবু বলিলেন, "তবে তুমি এখানে থাক। আমি একটা জরুরী কাযে যাচ্ছি।"

সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিতে পাইল, পিতৃবন্ধু, তাহার শিক্ষা-গুরু রমেশ বাবু একখানা আরাম-কেদারায় বসিয়া আছেন। সে সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি এখানে কখন্ এলেন, কাকা বাবু?"

"এই একটু আগে এসেছি।"

তাহার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া প্রবোধ বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন।

বৈদ্যুতিক আলোকমালা চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। আজ শ্রাবণ-বাতাসে ফুলের ঘন সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। পুত্রের আগমনে সমস্ত অট্টালিকা যেন আনন্দে উছলিয়া উঠিতেছে। একটা অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব আনন্দ-রস যেন আজ সুধীরের সমস্ত চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলিতে লাগিল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই সে জননীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। সহাস্য-মুখে তিনি বলিলেন, "ওরে খোকা, আজ তেতলার ঘরে তোর বিছানা পাতা হয়েছে। সেই পুরোনো ঘরে কিন্তু শুতে পাবিনি।"

সবিস্ময়ে পুত্র বলিল, "কেন, মা?"

"উনি বল্‌ছিলেন, তেতালার ঘরে আলো-বাতাস বেশী। চল্, দেখে আস্‌বি।"

মাতার পশ্চাতে পুত্র চলিল। বাঃ! আজ যেন ঘরগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে!

ত্রিতলে উঠিয়া বামে ফিরিতেই বিস্ময়ে সুধীর মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ছাদে সারি সারি ফুলের টব—তাহাতে ফুলের বিচিত্র শোভা। বিদ্যুতালোক পড়িয়া যেন স্বপ্ন রচনা করিতেছে! বারান্দায় পুষ্পমাল্য—প্রাচীর-গাত্রে বিবিধ নিসর্গচিত্র।

"মা!—"

"কি, বাবা?"

"এ সব কি? কে এমন ক'রে সাজালে?"

পুত্রের বিস্ময়-চকিত আননে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া মাতা বলিলেন, "উনি। নিজের হাতে সব করেছেন।"

"বাবা!—"

সুধীর সহসা আনন্দ ও লজ্জায় জননীর হাস্যস্ফুরিতাধরে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

"আজ যে আমার ঘরের লক্ষ্মী এসেছেন। ঘরের মধ্যে কেমন সাজান হয়েছে দেখবি আয়।"

সুধীরের সর্ব্বাঙ্গে যেন পুলকস্পন্দন মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিল। সে খোলা দরজার মধ্য দিয়া অপাঙ্গে ভিতরের দিকে চাহিল। কাহাকেও দেখা গেল না। তবে সমস্ত কক্ষটি যে অতি মনোরমভাবে সজ্জিত, পুষ্প-বাসরের মনোহর সজ্জাভারে স্বপ্ন-বিলাসীকেও বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, তাহা মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে সে বুঝিতে পারিল। গৃহের মধ্য হইতে একটা ঘন সুগন্ধ বাতাসে ভর করিয়া বাহিরে আসিতেছিল।

দারুণ লজ্জাভারে অভিভূত হইয়া সে দ্রুতপদে সোপান বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

মাতা তখন ডাকিতেছিলেন, "ওরে খোকা, লজ্জা কি, আয় না।"

খোকা তখন অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া একবারে বাহিরের উদ্যানমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

* * * *

আহারাদির পর পিতার নির্দ্দেশে নত মস্তকে সুধীর ত্রিতলের শয়নকক্ষে স্পন্দিত-হৃদয়ে প্রবেশ করিল। গৃহের মধ্যে তখন জনপ্রাণী নাই দেখিয়া তাহার বক্ষস্পন্দনের দ্রুততাল অপেক্ষাকৃত সংযত হইল।

আলোকিত কক্ষের আসবাবপত্রগুলি যেন নীরবে তাহাকে আহ্বান করিতেছিল—দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর ফুলের স্তূপ যেন হাসির বিদ্যুৎ বিকাশিত করিয়া সোহাগভরে তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছিল। প্রাচীর-বিলম্বিত চিত্রগুলি যেন আনন্দের আতিশয্যে নীরব দৃষ্টিতে তাহাদের শুভাশিস বর্ষণ করিতেছিল। চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া, পিতৃহৃদয়ের প্রচুর স্নেহের পরিচয় পাইয়া, সে মনে মনে তাঁহার চরণে প্রণাম নিবেদন করিতে লাগিল।

অবশেষে একটা সুদৃশ্য ও সজ্জিত টেবলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হইয়া গেল। একটি ফ্রেমে বাঁধান একখানি বৃহৎ আলোকচিত্র টেবলের মধ্যস্থানে স্থাপিত। সেই আলোকচিত্র-মধ্যে সে কাহার সাদৃশ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিল? এ চিত্রের জীবন্ত অধিকারিণীকে সে অল্পদিন পূর্ব্বেও দেখিয়াছে। কে ইনি?

সে নিবিষ্টভাবে, স্পন্দিত অন্তরে ভাল করিয়া চিত্রখানি দেখিতে লাগিল। চিত্রের নীচে নাম লেখা আছে দেখিতেছি—

দ্বার রুদ্ধ করিবার শব্দে সে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল।

না, না, আলোকচিত্র মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দ্বারপ্রান্তে সত্যই দণ্ডায়মান! তাহার সলজ্জ আরক্ত অধরে মৃদু হাস্য, ললাটে সীমন্তে সিন্দূররাগ!

উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল—অবাঞ্ছিত অবস্থায় উভয়ের প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি উভয়কে বোধ হয় সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সুধীর দ্রুতপদে কাছে আসিয়া পত্নীর হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইল।

"আশ্চর্য্য! কলকাতায় সে অবস্থায় আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, সত্যি অদ্ভুত নয় কি?"

সলজ্জ হাসিতে বীণার ওষ্ঠাধর রঞ্জিত হইয়া উঠিল। নতনেত্রে সে বলিল, "আমার ওপর রাগ হয় নি ত?"

"কিন্তু নাগপুর থেকে কল্‌কাতায়, এ যে সম্ভাবনারও অতীত ছিল।"

"আমার মাসতুত বোনের অনুরোধ এড়াতে না পেরে মা বাবা আমায় কল্‌কাতায় পাঠিয়েছিলেন। পড়াশুনা ছিল না ত। তার দলে প'ড়ে—"

সুধীর বাধা দিয়া বলিল, "মা, বাবা জান্‌তেন?"

"তাঁদের অনুমতি না পেলে কি বাবা আমায় পাঠাতেন?"

"তুমি এখানে কার সঙ্গে এলে, বীণা?"

"কাকা বাবু—রমেশ বাবু আমাকে নিয়ে এসেছেন। মা, বাবাও পরে এসেছেন। তাঁরা অন্য বাড়ীতে আছেন।"

"রমেশ বাবু, আমার শিক্ষক?—তিনি তোমার কাকা বাবু। কৈ, সে কথা ত কোন দিন শুনি নি!"

রহস্য যেন ক্রমেই নিবিড় হইয়া সমাধানের প্রতীক্ষা করিতেছে।

"আমিও জান্‌তুম না তিনি তোমাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ।"

বীণা একখানি মরক্কো-মণ্ডিত খাতা বস্ত্রান্তরাল হইতে বাহির করিল। রেশমী সূতা দ্বারা উহা আবদ্ধ। সীলমোহরের চিহ্ন তাহার গোপনতা প্রকটিত করিতেছিল।

বীণা বলিল, "বাবা এখানা আজই আমাদের পড়তে বলেছেন।"

সীলমোহর ভাঙ্গিয়া উভয়ে সাগ্রহে ভিতরের বস্তুর সন্ধান করিল।

বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—

"অপরিণত-বয়সে আমাদের বিবাহ হইয়াছিল। পরিণত যৌবনে পাশ্চাত্যদেশের কাব্য-উপন্যাস পাঠে মনে হইয়াছিল, বিবাহিত জীবনের রোমান্স না কি আমাদের দেশে হয় না। তিন বন্ধু অঙ্গীকার করিলাম, আমাদের সন্তানদিগের দ্বারা অভিনব উপায়ে ইহার পরীক্ষা করিব। কিন্তু উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ গোপন থাকিবে। রমেশ অল্পকাল পরেই বিপত্নীক হইল। সে সন্ন্যাসী মানুষ, আর বিবাহ করিল না।

সন্তানের পিতা হইয়া আমরা যৌবনের খেয়ালকে ভুলিলাম না। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। এক জন এলাহাবাদ, অপর জন নাগপুরে কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলাম। শুধু আমাদের সহধর্ম্মিণীরা আমাদের অভিপ্রায় জানিতেন। তাঁহারা অবশেষে আমাদের খেয়ালের চরিতার্থতা-সাধনে সহায় হইলেন। আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং সন্তানরাও আমাদের বন্ধুত্ব ও খেয়ালের সম্বন্ধে কোন অভাসই পাইলেন না।

পাঁচ বৎসর পরে, কিশোর-কিশোরী, যৌবনের সমস্ত আগ্রহ-কামনাকে, বিবাহের পবিত্র বন্ধনের স্মৃতি লইয়া, প্রথম পরিচয়ে কি বিচিত্র রসের অনুভূতি লাভ করে, তাহার পরীক্ষার জন্য, প্রাণাধিক পুত্র-কন্যার প্রতি আমাদের এই অত্যাচার। তাহারা যেন হৃদয়ের কল্যাণ-আশিষরূপেই ইহা গ্রহণ করে।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু।

শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ।

সাক্ষী—শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র।"

স্বামী ও স্ত্রী প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত্তে বিচিত্র অনুভূতি লইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর সুধীর পত্নীর কোমল করপল্লব গ্রহণ করিয়া বলিল, "এস, দাম্পত্য-জীবনের পবিত্র প্রাঙ্গণ-মধ্যে প্রবেশের পূর্ব্বেই আমাদের পূজনীয় মা-বাবার চরণের উদ্দেশে প্রণাম করি।"

ভক্তিপ্লুত-হৃদয়ে উভয়ে ভূমিতলে নত হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নয়ন নিমীলিত করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর উঠিয়া দাঁড়াইতেই বীণা স্বামীর চরণধূলি গ্রহণ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমার অপরাধ ক্ষমা—"

সুধীর পত্নীকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া তাহার রসনাকে সহসা আদরের আতিশয্যে স্তব্ধ করিয়া দিল। তার পর বলিল, "আমরা যেন ওঁদের উদ্দেশ্যকে সফল ক'রে তুলতে পারি। আজ শুধু দেবতার চরণে সেই ভিক্ষাই নিবেদন করি এস।"

বাতায়নপথে পুষ্পগন্ধব্যাকুল আর্দ্র বাতাস তাহাদের পুলক-স্পন্দিত দেহকে অভিষিক্ত করিয়া গেল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

শারদ প্রাতে

আজ পহেলা শারদ প্রাতে
কার এ সোনার তরী,
নীল আকাশের ঝরণা বেয়ে
সাত-রঙ্গা মেঘ-পরী—
পুবের ঘাটে বাঁধল আমার,
ঢেউ তুলিয়া প্রাণে;
আকুল হৃদয় রইতে নারে
আজ এ বাহির টানে!

গাং-ভরা জল টলমল,
নাচে কুমুদ শতদল,
রহস্য রং-মহালে ঐ বরুণ-বালা খেলে;
ভরা শ্যামল গাছের আগায়,
নূতন কচি পাতায় পাতায়,
চম্‌কা রূপের শ্বেত শেফালি পাপ্‌ড়ি-ঝালর মেলে;

মন যে সেথায় উধাও আজি,
বাঁধন নাহি মানে।
না জানি আজ ভাসব কোথায়
শরৎ আলোর বানে।
ফিরব যদি প্রাণে আশার—
সোনাতে দাও ভরি!
নয় ও মোহন-রূপ-সায়রে
ডুবেই যেন মরি॥

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী (বি-এল)।

প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থে হিন্দু দেব-দেবী-চিত্র

বৈদেশিক চিত্রকরদিগের কল্যাণে এখনও এমন অনেক কিছুর চিত্র আমাদের নয়নগোচর হয়—যাহার বাস্তবমূর্ত্তি এখন বিশ্ব হইতে চিরলুপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রাচীন ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের গ্রন্থে হিন্দু দেবদেবীর কথা বলিয়াছেন ও তাঁহাদের চিত্রাদি দিয়া গিয়াছেন। এমন অনেক দেবদেবীর ছবি দেখা যায়, যাহাদের মূর্ত্তি-কল্পনা একমাত্র তন্ত্রাদি গ্রন্থ ছাড়া অন্যত্র দুর্ল্লভ। কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মহাদেব প্রভৃতি নিতান্ত পরিচিত দেবদেবী মৃন্ময় মূর্ত্তিতে বা চিত্রে অনেকেই আজন্ম দেখিয়া আসিলেও, অগ্নি, রাহু, কেতু, শনি, কুবেরাদি

১। শ্রীশ্রীকালী

২। দ্বিভুজা-কালী

দেবদেবীর মূর্ত্তি-পরিচয় অনেকেরই অজ্ঞাত, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স, জোফানিয়া হলওয়েল হইতে হেভারিজ পর্য্যন্ত বহু খ্যাতনামা গ্রন্থকার তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে হিন্দু দেবদেবীর কথা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন ও তাঁহাদের চিত্রাদি দিয়াছেন*।

হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর কথা তুলিলে ইংরাজ পণ্ডিতদের বর্ণিত দেবতা-গ্রহ-নক্ষত্রাদির সংখ্যা অবশ্য কিছুই নহে, এ কথা অস্বীকার্য্য নহে। কিন্তু তাহা হইলেও সেগুলির মধ্যে বহুল ত্রুটি-বিচ্যুতি, এমন কি, হাস্যজনক ব্যাপার থাকা সত্ত্বেও তাহা মনোজ্ঞ ও দ্রষ্টব্য বিবেচনা করিয়া প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থ হইতে কতকগুলি ছবির এখানে প্রতিলিপি দিলাম।

এই চিত্রগুলি প্রধানতঃ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত The Mythology of the Hindus, ১৮৬৪ ও ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Hindu Pantheon এবং Wonders of Ellora ও স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের গ্রন্থ হইতে লইয়াছি।

এই সকল গ্রন্থ-প্রণেতা বৈদেশিক লেখকগণ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে ধ্যানোক্ত বর্ণনা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের দেশীয় চিত্রকর দ্বারা ঐ সকল চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছিলেন, কি এ দেশীয় হিন্দু চিত্রকরগণের ইহা পরিকল্পনা, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, ধ্যানের সহিত মিলাইয়া অনেক ক্ষেত্রে ভুল যথেষ্ট পাওয়া যাইলেও অধিকাংশ মূর্ত্তিই যে সুচিত্রিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী

৫। নাগপাশ

যে সকল গ্রন্থ হইতে এই সব চিত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে দেবদেবীর মূর্ত্তির সহিত অন্যান্য বর্ণনাও আছে। সেই সকল বর্ণনা ঠিক শাস্ত্রসম্মত কি না বা তাহার সহিত চিত্রের মিল আছে কি না, তাহা সব দেখিবার অবসর হয় নাই। তাহা

৪। কালীয় দমন

হইলেও এ কার্য্যে তাঁহাদের সাবধানতার বিষয়ে ত্রুটি বহু ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ছবিগুলির মধ্যে দুইখানি (১ম ও ২য়) শ্রীশ্রীকালিকা-দেবীর চিত্রমধ্যে হাস্যবদনা 'বালার্কমণ্ডলাকারলোচন-ত্রিতয়ান্বিতা' ভাব দৃষ্ট না হইলেও ধ্যানানুযায়ী প্রায় সবই বিদ্যমান আছে। দ্বিভুজা দিগম্বরী খড়্গ-খর্পর নরমুণ্ডমালা-বিহীনা নিরাভরণা সর্পভূষিতা এই ভীষণদর্শনা মূর্ত্তিটিও কালী

৬। শ্রীশ্রীদুর্গা

৭। শ্রীশ্রীমহিষমর্দ্দিনী

১১। শ্রীশ্রীসরস্বতী
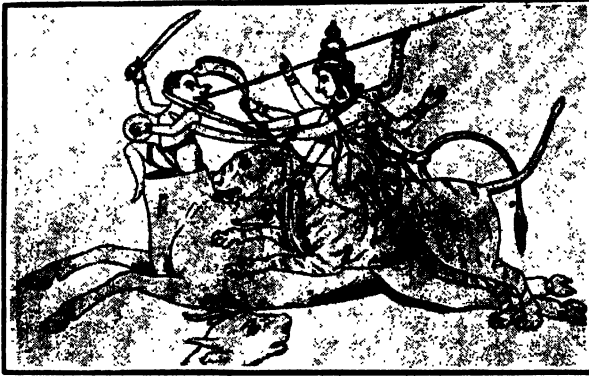
নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু ভদ্রকালী, গুহ-কালী, শ্মশানকালী, মহাকালী, কোন দেবীর ধ্যানের সহিত সাদৃশ্য পাওয়া যায় না।

লক্ষ্মীমূর্ত্তির ধ্যানে আছে—"হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-র্হস্তোৎক্ষিপ্ত-হিরণ্ময়ামৃতঘটৈ-রাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্", মস্তকে রত্নমুকুটশোভিতা, কিন্তু যে চিত্র (৩য়) এখানে প্রদত্ত হইল, তাহাতে মস্তকে কোন আভরণ নাই এবং চতুঃসংখ্যক স্থানে দুইটি হস্তী

৯। (১) কার্ত্তিকেয়, (২) মহাদেব, (৩) পার্ব্বতী

৮। শ্রীশ্রীমহাদেব ও পার্ব্বতী

আছে। শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন ও নাগপাশ (৪র্থ ও ৫ম) ছবি দুইখানিতে দেবভাবের বিকাশ কমই দেখা যায়। ৬ষ্ঠ চিত্রে দশভুজা শ্রীদুর্গার দক্ষিণে ও বামে লক্ষ্মী ও সরস্বতী নাই, আর সমগ্র প্রতিমার সিংহাসনব্যাপী বহু দেবদেবী-চিত্রিত চালচিত্রও নাই। মা দুর্গার ঠিক পশ্চাতে যেরূপ আছে, অধুনা কোন প্রতিমায় এরূপ, এমন

১০। পঞ্চমুখ-শিব, গণেশক্রোড়ে পার্ব্বতী ও নারদ

১২। শ্রীশ্রীসরস্বতী ও গণপতি
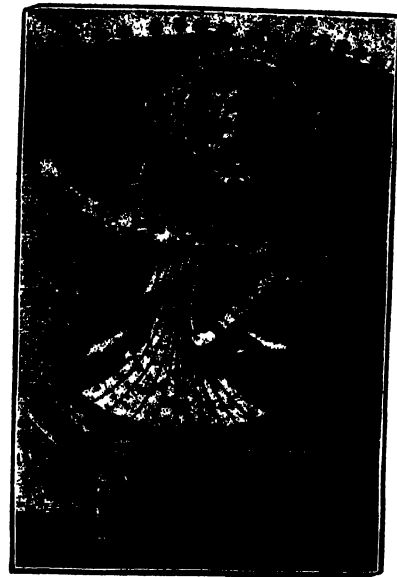
১৩। শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবী

১৪। শ্রীশ্রীকার্ত্তিকেয়

কি, কোন চিত্রেও দেখা যায় না। হলওয়েল্ সাহেবের গ্রন্থে (India Tracts) চালচিত্র সমেত দুর্গামূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। গণেশের বাহন মুষিকেরও অভাব দৃষ্ট হয়। যাঁহার যে

১৬। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ

১৫। দেবকীর স্তন্যদান

১৮। শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী
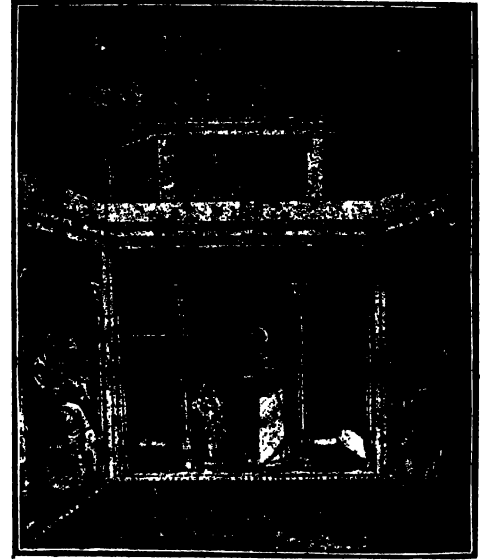
২২। শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা

২০। রাবণবধান্তে রাম-সীতা

২১। শ্রীরাম-সীতা-সমীপে হনুমান ও হনুমানের রাক্ষস-বধ

২৪। কামদেব

২৫। মৎস্য-অবতার

২৭। বরাহ-অবতার

হস্তে যে সকল আয়ুধাদি থাকা বিধেয়, তাহা ঠিকই আছে।

৭ম চিত্র মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি। অষ্টভুজা দেবীর অবয়বাদি ধ্যানের অনুরূপ, কেবল কোন কোন হস্তের অস্ত্র-শস্ত্রের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এ চিত্রের সিংহের মস্তকভাগ কিছু অস্বাভাবিক। ৮ম চিত্রের বিষয় অমৃত হস্তে পার্ব্বতী মহাদেব সনে উপবিষ্টা। এ চিত্রেও দেবভাব রক্ষিত হয় নাই। ৯ম চিত্রখানিতে চতুর্ভুজ মহাদেব, দ্বিভুজা পার্ব্বতী ও ষড়্‌ভুজ ষড়াননমূর্ত্তি সুচিত্রিত হইয়াছে। ১০ম চিত্রের বিষয় পঞ্চমুখ শিব, গণেশ ক্রোড়ে পার্ব্বতী ও
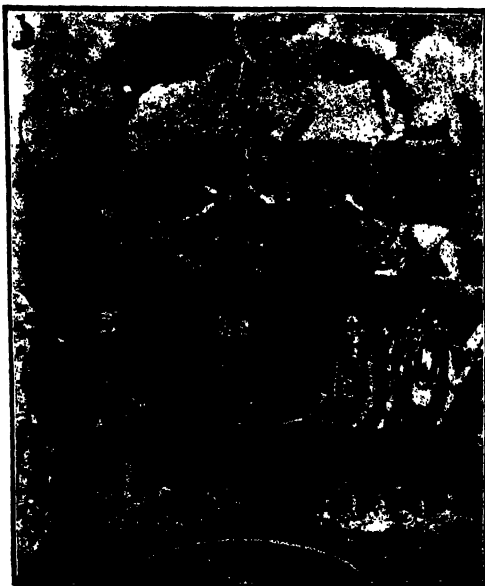
২৬। কূর্ম্ম-অবতার

২৮। নৃসিংহ-অবতার

২৯। বামন-অবতার

৩১। শ্রীরাম-অবতার

নারদ। ইহাও সুভাবযুক্ত। ১১শ চিত্রে ময়ূরারূঢ়া চতুর্ভুজা সরস্বতী-মূর্ত্তি। সম্মুখে ধ্বজ-পতাকা হস্তে মূর্ত্তিটি কাহার, তাহা বলা যায় না। ১২শ চিত্রে সরস্বতী ও গণপতি উভয়ই অতি সুন্দর হইয়াছে। ১৩শ চিত্রে সিংহাসনারূঢ়া শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবী মকরবাহনহীনা। ১৪শ চিত্রে কার্ত্তিকেয়ের দ্বিবিধ মূর্ত্তি;—একের হস্তে ধনুক আছে, অপরের নাই।
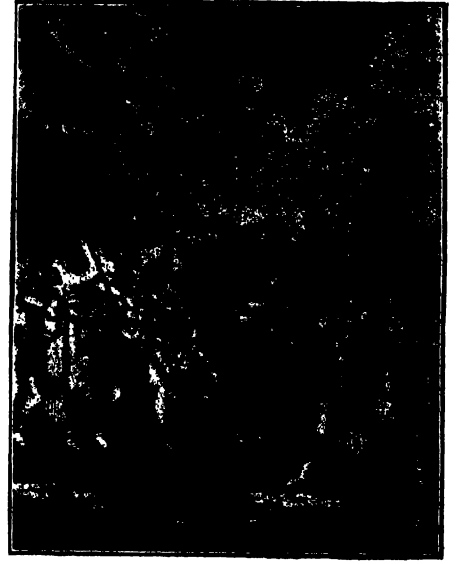
১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ এই তিনখানিই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক চিত্র। প্রথমখানি দেবকীর স্তন্যদান এবং শেষের খানি গোবর্দ্ধন-ধারণ। উভয়ই সুচিত্রিত, কিন্তু ১৬শ চিত্রের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ

৩০। পরশুরাম-অবতার

৩২। কৃষ্ণ-অবতার

৩৩। বুদ্ধ-অবতার

৩৪। কল্কি-অবতার

৩২। ইন্দ্রাণী

ও গোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণের পরিধানে নারীজনোচিত বস্ত্রের অর্থ বুঝা যায় না। ১৮শ চিত্রে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তিতে যে ভাবে কাপড় পরান আছে,

৩৫। হর-হরি

ইহাতেও প্রায় তদ্রূপ। শুনিয়াছি, তন্ত্রে জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তিতে হস্তীর কোন কথা নাই, কিন্তু এ দেশে সর্ব্বত্রই

২৩। শ্রীশ্রীব্রহ্মা

৪১। ইন্দ্র

দেখা যায়, হস্তীর উপর সিংহ, তদুপরি দেবী উপবিষ্টা। ইহা হইতে মনে হয়, এ চিত্র ঠিক তন্ত্রোক্ত ধ্যান হইতে অঙ্কিত নহে, ইহা প্রতিমা দেখিয়াই চিত্রিত। ১৯শ চিত্রে অশ্বত্থপত্রে জলোপরি ভাসমান নারায়ণ।

২০শ, ২১শ ও ২২শ চিত্র শ্রীরামচরিত্র হইতে অঙ্কিত। প্রথমখানি রাবণ-বধের পরের, দ্বিতীয়খানি রাম-সীতাসমীপে হনুমানের বর্ণনা ও রাক্ষসবধের ছবি, তৃতীয়খানি শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা, সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ২৩শ চিত্রে ব্রহ্মা ও ২৪শ চিত্রে কামদেবের ছবি দুইখানি এবং ২৫শ হইতে ৩৪শ সংখ্যাক পর্য্যন্ত দশখানি দশাবতারের চিত্রও সুন্দর। এই সকল চিত্রে প্রায় সকল দেবতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি দেবভাবমণ্ডিত। ৩৫শ চিত্রখানির নিম্নে হর-হরি লিখিত আছে, ইহা একবারেই ভ্রমাত্মক। ইহাতে হরগৌরী-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা অর্দ্ধনারীশ্বর শিবমূর্ত্তিও হইতে পারে। একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত পুথিতে অঙ্কিত এইরূপ একটি চিত্র দেখিয়াছিলাম।

৩৮। (১) বৃহস্পতি, (২) শুক্র, (৩) শনি, (৪) কেতু (৫) রাহু, (৬) (অজ্ঞাত)

৩৬শ চিত্রে কুবের, পবন, যম ও অগ্নির মূর্ত্তি এবং ৩৭শ ৩৮শ চিত্রে সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি,
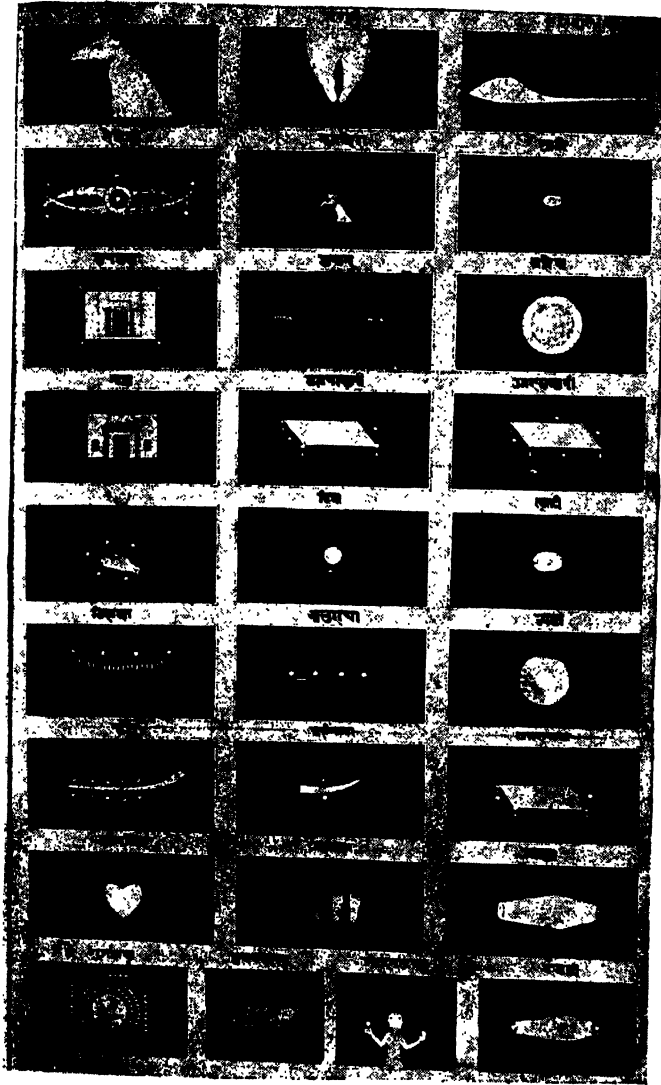
৩৯। নক্ষত্রগণ

শুক্র, শনি, কেতু, রাহু প্রভৃতির ছবি এবং ৩৯শ ও ৪০শ সংখ্যক চিত্রে নক্ষত্র ও রাশিচক্র অঙ্কিত আছে। ৪১শ ও ৪২শ সংখ্যক চিত্রে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর ছবি অঙ্কিত আছে। ইলোরার গুহামন্দির হইতে এ চিত্র গৃহীত। ইহার মধ্যেও মাধুর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

৩৬। (১) কুবের, (২) পবন,
(৩) যম, (৪) অগ্নি

১৯। শ্রীশ্রীনারায়ণ
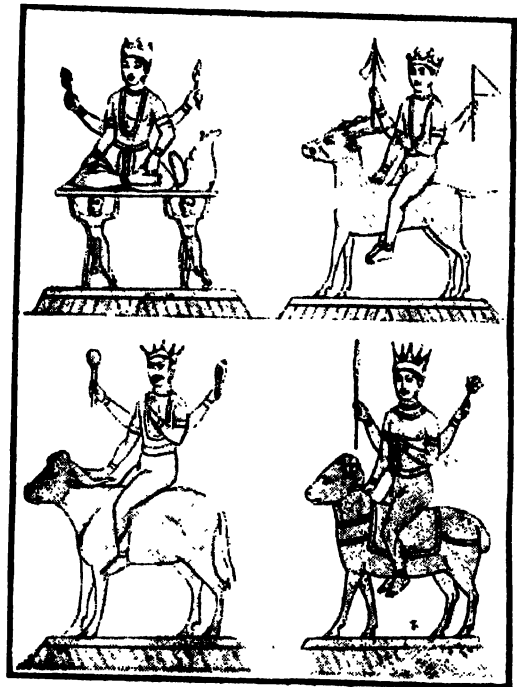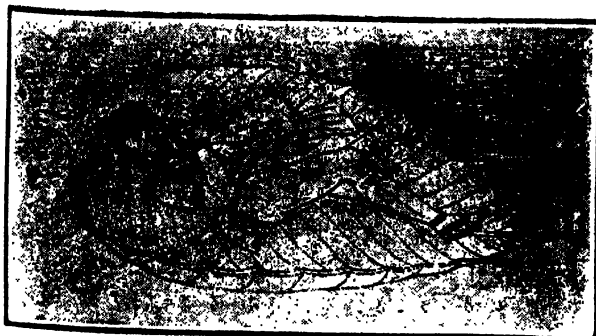
এখানে একে একে অনেকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। ইহার কোন কোন-গুলির মধ্যে ভুলচুক অনেক থাকিলেও ইংরাজ লেখকদের এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। কোন বাঙ্গালী গ্রন্থকারের হিন্দুদেবদেবীর ঠিক মূর্ত্তিগুলি প্রকা-শের আগ্রহ দেখা যায় না।
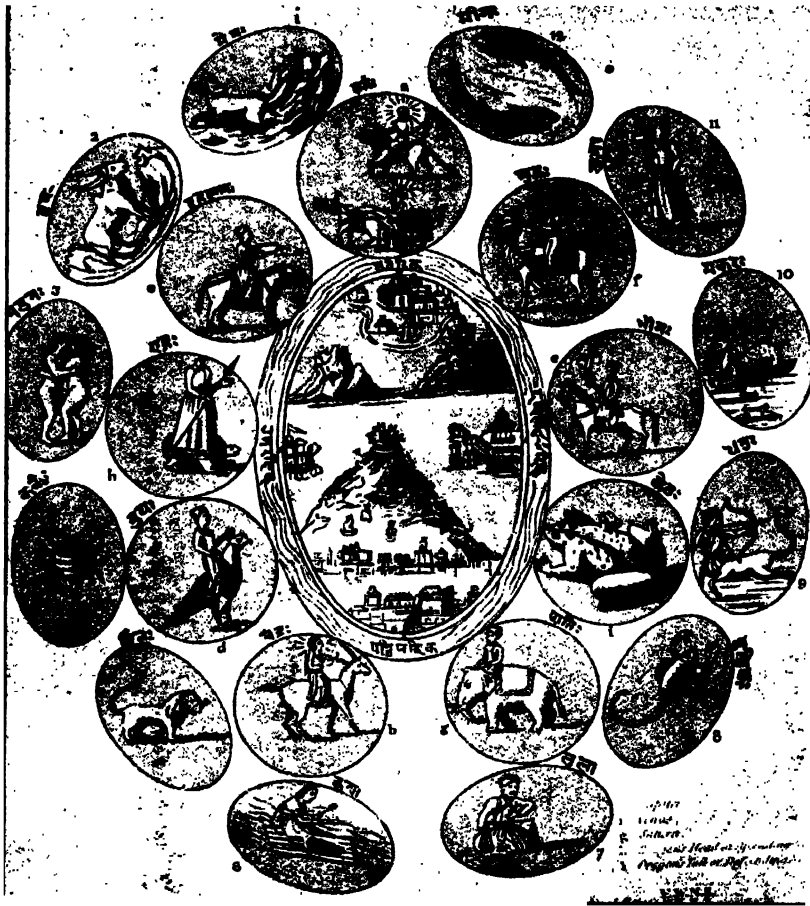
৪০। রাশি-চক্র শ্রীহরিহর শেঠ।

জয়যাত্রা

নগ্ন শরীর, মুণ্ডিত শির, পরিধানে কটিবাস,
কি মহামন্ত্রে ত্রিংশ কোটির ঘুচা'লে মরণ-ত্রাস,
অহিংসা আর অসহযোগের অমোঘ দীক্ষা বলে
লঙ্ঘিতে গিরি পঙ্গুও এল তোমার পতাকা-তলে
এল দলে দলে পতাকার তলে ভাঙিয়া মোহের কারা
ছিল যারা হায়, জাতু-বিচারে এত দিন দিশাহারা,
বদ্ধ ঘরের অন্ধ কোণের ক্ষুদ্র ছিদ্র-মুখে
এত দিন যারা হেরিত আকাশ ভীরু দুরু দুরু বুকে
তাহারাও আজ খুলিয়াছে আঁখি, তুলিয়াছে নত শির',
বৈরাগী-বীর, পরিধানে চীর জয় জয় গম্ভীর!

বিশ্ব-জগৎ বিস্ময়ে হেরে অপূর্ব্ব অভিযান,
নূতন করিয়া রচিতে হবে কি রাজনীতি অভিধান।
সত্ত্ব-রজের অদ্ভুত রণ দুর্ম্মদ তমঃ সাথে,
সংশয়হীন কে ওই যোদ্ধা অস্ত্র নাহিক হাতে?
সত্যাগ্রহের দুর্গম পথে শত নিগ্রহ সহি'
মুক্তি-তীর্থে এ জয়-যাত্রা গুরুভার শিরে বহি'

সঙ্গে চলিছে অযুত ভক্ত তুচ্ছ করিয়া প্রাণ
দাবানলে নয়—পূত হোমানলে আহুতি করিতে দান,
একাধারে যত ধর্ম্ম-কর্ম্ম-প্রেমের সমন্বয়
সেই ত্যাগ-বীর, সে সন্ন্যাসীর বল সবে জয় জয়!

বল জয় জয়, মরিবার নয় পুণ্য এ মহাদেশ,
কৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্যের ধারার হবে না শেষ,
কত বিপ্লব, খণ্ড-প্রলয়, মন্বন্তর কত
যুগে যুগে বুকে চিহ্ন এঁকেছে নির্য্যাতনের ক্ষত,
কত না বজ্র পড়িয়াছে শিরে, জ্বলিয়াছে কত চিতা,
কত সতী মৃতা, সীতা অপহৃতা, দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা;
পাপের প্রায়শ্চিত্তের বুঝি আর বেশী নাহি দেরী
সুধা বণ্টন সূচনায় তাই নীলকণ্ঠকে হেরি,
অম্বর ভরি ওঠে ঘোর রোল মন্থিত জলধির,
সুধা পেতে চাও, বিষ আগে খাও, বল জয় গম্ভীর।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন-বিভ্রাট

১

নবীন ব্যারিষ্টার নন্দলাল তাহার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র বাসাবাড়ীর সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল এবং সিগারের প্রভূত ধূমে ঘরটি প্রায় অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছিল। বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা, এমন সময় বন্ধু প্রমথনাথ ঘরে ঢুকিয়াই অতি কষ্টে কাসি চাপিতে চাপিতে বলিল, 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। তুমি ঘরে আছ, ধোঁয়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে। উঃ, ঘরটা এমন অগ্নিকুণ্ড ক'রে ব'সে আছ কি ক'রে?'

নন্দ হাতের কাগজখানা ফেলিয়া প্রফুল্লস্বরে কহিল, "আমি তোমার মত বিলেত ফেরত সন্ন্যাসী নই যে, চুরুটটা পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।"

প্রমথ একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বলিল,—'তুমিই সন্ন্যাসী নামের বেশী উপযুক্ত। গাঁজার মত চুরুটগুলো খেয়ে খেয়ে ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট করলে।'

নন্দ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—'রাগ করলে ভাই? আমি কিন্তু তোমাকে গাঁজাখোর সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করিনি।'

নন্দ এবং প্রমথর বন্ধুত্ব আশৈশব দীর্ঘ না হইলেও ঘটনাচক্রে পরস্পরের প্রতি গাঢ় স্নেহবন্ধন অটুট হইয়া পড়িয়াছিল। নন্দ দোহারা, খুব বলবান্, চোখে চশ্‌মা। রং ময়লা। মুখে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দৃঢ়তার এমন একটি সুন্দর সমাবেশ ছিল যে, খুব সুশ্রী না হইলেও তাহাকে সুপুরুষ বলিয়া বোধ হইত। প্রমথনাথ ফর্শা ছিপছিপে যুবক, মুখে লালিত্যের বেশ একটা দীপ্তি আছে। তার স্বভাবটি বড় নরম—দুর্ব্বল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাহারও কোনও অনুরোধে 'না' বলিবার ক্ষমতা তাহার একবারেই নাই।

বহু ধনদৌলতের একমাত্র উত্তরাধিকারী প্রমথ বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিয়াছে। বিলাত পৌঁছিয়া সে প্রথম বাঙ্গালীর মুখ দেখিছিল নন্দর। নন্দর বিলাত যাওয়ার ইতিহাসটা কিছু জটিল। সে গরীবের ছেলে। প্রবেশিকা-পরীক্ষা পাশ করিবার পর সে দেখিল, কলেজে পড়িবার মত সংস্থান তাহার নাই। আত্মীয়স্বজনের দ্বারস্থ হইবার প্রবৃত্তিও তাহার ছিল না। অথচ বিলাতে গিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের তীব্র অভিলাষ তাহার ছিল।

এই সময় এক দিন সে এক বিলাতযাত্রী জাহাজে খালাসী হইয়া বিলাত পলায়ন করিল। সেখানে পৌঁছিয়া পেটের দায়ে কুলীর কায আরম্ভ করিয়াছিল। ভাগ্যদেবী নবাগত প্রমথর মালগুলা নন্দর ঘাড়ে চাপাইতে গিয়া নন্দকেই প্রমথর ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন। প্রমথ ও নন্দ উভয়েই তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। নির্ব্বান্ধব বিদেশে পরস্পরকে পাইয়া তাহারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। প্রমথর টাকায় নন্দও আইন পড়িতে আরম্ভ করিল।

তার পর দুই জনে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছে। নন্দ ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে, বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জনও করিতেছে। প্রমথ প্রায় নিষ্কর্ম্মা; খবরের কাগজ পড়িয়া, দেশ-নীতি আলোচনা করিয়া এবং সময়ে অসময়ে বন্দুক ঘাড়ে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইয়া যৌবনকালটা অপব্যয় করিয়া ফেলিতেছিল।

প্রমথ আবার আরম্ভ করিল, "তুমি ঐ সিগার খাওয়া কবে ছাড়বে বল দিকি?"

নন্দ বলিল,—"যমরাজা বেশী জিদ করলে কি করব বলতে পারি না, তবে তার আগে ত নয়।"

প্রমথ বলিল, 'তার আগে ছাড় কি না দেখা যাবে। এক ব্যক্তির শুভাগমন হলেই তখন ছাড়তে পথ পাবে না।'

নন্দ বলিল,—"ইঙ্গিতটা বোধ হচ্ছে আমার ভবিষ্যৎ গৃহিণীর সম্বন্ধে। তা তিনি কি যমরাজের চেয়েও ভয়ঙ্কর হবেন না কি?"

প্রমথ বলিল,—'অন্ততঃ যমরাজের চেয়ে তাঁদের ক্ষমতা বেশী, তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে।'

নন্দ কহিল,—'সেইজন্যই ত আমি এই ক্ষমতাশালিনীদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে চাই। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করবার বাসনা মোটেই নেই।'

প্রমথ ভ্রূ তুলিয়া বলিল;—'অর্থাৎ বিয়ে কর্চ্ছ না?'

নন্দ উৎফুল্ল তাচ্ছীল্যের সহিত বলিল, 'নাঃ।'

প্রমথ কহিল, 'এটা ত নতুন শুনছি। কারণ জানতে পারি কি?'

নন্দ বলিল,—'বিয়ে জিনিষটা একদম পুরোনো হয়ে গেছে। ওতে আর রোমান্সের গন্ধটি পর্য্যন্ত নেই।' বলিয়া প্রসঙ্গটা উড়াইয়া দিবার মানসে খবরের কাগজখানা আবার তুলিয়া লইল।

প্রমথ বলিল,—'নন্দ ভাই, ওইখানেই তোমার সঙ্গে আমার গরমিল। বিয়েটাই এ পৃথিবীতে নববর্ষের পাঁজির মত একমাত্র নতুন জিনিষ—আর যা কিছু, সব দাগী, পুরোনো, বস্তাপচা।'

নন্দ প্রত্যুত্তরে কাগজখানা প্রমথর গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া

বলিল,—"তার প্রমাণ এই দেখ না। বিয়ে জিনিষটা এতই খেলো হয়ে গেছে যে, কাগজে পর্য্যন্ত তার বিজ্ঞাপন !"

প্রমথ নিক্ষিপ্ত কাগজখানা তুলিয়া লইয়া মনোনিবেশপূর্ব্বক পড়িতে লাগিল।

নন্দ বলিল, "তর্ক ক'রে হাঁপিয়ে উঠেছ, এক পেয়ালা চা খাও। এখনও আটটা বাজেনি। বাড়ী গিয়ে নাইতে খেতে তোমার ত সেই একটা।"

প্রমথ কোনও জবাব দিল না, নিবিষ্ট-মনে পড়িতে লাগিল। নন্দ বেয়ারাকে ডাকিয়া বলিল,—"দিদিকো দো পেয়ালা চা বানানে বোলো।"

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, প্রমথ পূর্ব্বে চা খাইত না, কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি অভিনব আকর্ষণে সে চা ধরিয়াছে।

খবরের কাগজখানা পড়িতে পড়িতে প্রমথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, তার পর সেখানা জানুর উপর পাতিয়া বলিল,—'ওহে শোনো একটা বিজ্ঞাপন,' বলিয়া পড়িতে লাগিল, 'Wanted a young Barrister bridegroom for a rich beautiful and accomplished Baidya girl. Girl's age Sixteen. Apply with photograph to Box 1526।' পাঠ শেষ করিয়া কাগজখানা দ্বারা নন্দর জানুর উপর আঘাত করিয়া বলিল, 'ব্যস, বুঝলে হে ব্যারিষ্টার ব্রাইড্‌গ্রুম, একটা দরখাস্ত ক'রে দাও, খুব রোমান্টিক হবে।'

নন্দ বলিল, আমি এখানে একমাত্র ব্রাইডগ্রুম নই। শ্রীমান্ প্রমথনাথ সেন মহাশয়ই এই ষোড়শীর উপযুক্ত পাত্র ব'লে মনে হচ্ছে।'

প্রমথ হাসিয়া প্রতিবাদ করিল, "কিছুতেই না। নন্দলাল সেনগুপ্ত থাকতে প্রমথনাথ সে দিকে কোনমতেই দৃষ্টিপাত করতে পারেন না।"

নন্দ একটা কপট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—'তবে থাক্, কারুর দৃষ্টিপাত ক'রে কায নেই। আর কোনও ভাগ্যবান্ ব্যারিষ্টার এই তরুণীকে লাভ করুক।'

প্রমথ জিদ ধরিয়া বলিল,—'না না, এসো না, একটু মজাই করা যাক। তার পর তোমার দরখাস্ত যে মঞ্জুর হবে, তারই বা ঠিক কি?'

নন্দ বলিল,—'বেশ, যদি দরখাস্ত করবারই ইচ্ছা হয়ে থাকে, নিজেই কর।'

প্রমথ একটু চকিত হইয়া বলিল, 'না, তা কি হয়? তুমি কর।'

নন্দ বলিল,—'বাঃ, এ ত তোমার বেশ বিচার! মজা করবে তুমি, আর ফ্যাসাদে পড়ব আমি?—আচ্ছা, এস, এক কায করা যাক—লটারি কর, যার নাম ওঠে।'

মজা করিবার ইচ্ছা আর প্রমথর বেশী ছিল না; কিন্তু সেই প্রথমে আগ্রহ দেখাইয়াছে, অতএব অনিচ্ছার সহিত সম্মত হইল। তখন দু'টুকরা কাগজে দু'জনের নাম লিখিয়া একটা হ্যাটের তলায় চাপা দেওয়া হইল। নন্দ হ্যাটের তলায় হাত ঢুকাইয়া একটা কাগজ বাহির করিয়া নাম পড়িয়াই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া সপদদাপে বলিল,—'ভাগ্যঃ ফলতি সর্ব্বত্রং ন বিদ্যাং ন চ পৌরুষং—হে ভাগ্যবান্, এই দেখ' বলিয়া কাগজখানা তুলিয়া ধরিয়া নামটা দেখাইল।

প্রথম বিকলভাবে একটু হাসিয়া বলিল,—'নিজের নাম না ওঠায় এতদূর বিমর্ষ হয়ে পড়েছ যে, সংস্কৃত ভাষাটার উপরও তোমার কিছুমাত্র মমতা নেই দেখছি।'

নন্দ উৎসাহের তাড়নায় কাগজ-কলম লইয়া বলিল, 'আর দেরী নয়, দরখাস্ত লিখে ফেলা যাক। বাঙ্গালায় না ইংরিজীতে?'

প্রমথর উদ্যম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সে ম্রিয়মাণ-ভাবে বলিল,—"আবার humble petition……Most respectfully Sheweth লিখে ফেলবে।'

নন্দ তাহার যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালার সাহায্যেই দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিল,—

'মহাশয়,

আমি ব্যারিষ্টার, বিজ্ঞাপনে বর্ণিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহি। ইতি।

শ্রীপ্রমথনাথ সেন।'

দরখাস্ত শুনিয়া প্রমথ বলিল,—'এক কায করলে হয় না? নামটা উপস্থিত বদলে দেখা যাক, তা হ'লে রোমান্স জমবে ভাল।' কোনও উপায়ে এই বিজ্ঞাপনের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে সে বাঁচে।

নন্দ রাজী হইয়া বলিল, 'বেশ, কি নাম বল!'

প্রমথ বলিল;—'ঐ অর্থেরই অন্য কোন নাম।'

নন্দ জিজ্ঞাসা করিল,—'প্রমথ কথাটার মানে কি হে?'

এমন সময় দুই হাতে দু'পেয়ালা চা সাবধানে ধরিয়া একটি পনেরো বোলো বছরের মেয়ে ঘরে ঢুকিল। পাতলা ছিপ্‌ছিপে, শ্রী সুগঠন দেহ; একবার দেখিলেই বেশ বোঝা যায়, নন্দর বোন্। নিতান্ত সাধারণ আটপৌরে শাড়ী-শেমিজ পরা—পায়ে জুতা নাই। অমিয়া এখনও অবিবাহিতা। নন্দ বিলাত হইতে ফিরিবার

অনতিকাল পরে তাহার বাপ-মা দুজনেই মারা গিয়াছিলেন—এখন অমিয়াই তাহার একমাত্র রক্তের বন্ধন।

উপস্থিত প্রসঙ্গটার মাঝখানে অমিয়া আসিয়া পড়ায় প্রমথ মনে মনে বিব্রত ও লজ্জিত হইয়া উঠিল। নন্দ পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করিল,—'প্রমথ কি প্রেমসংক্রান্ত কোনও কথা না কি?'

অমিয়া চায়ের পেয়ালাদুটি সবেমাত্র টেবলের উপর রাখিয়াছিল। ভাষা সম্বন্ধে দাদার প্রগাঢ় অজ্ঞতা দেখিয়া সে হাসি সামলাইতে পারিল না। কিন্তু হাসিয়া ফেলিয়াই অপ্রস্তুতভাবে বলিয়া উঠিল, 'বাঃ দাদা—'

নন্দ অর্ব্বাচীনের মত ভগিনীকে প্রশ্ন করিল,—'অমিয়, তুই জানিস, প্রমথ কথার মানে?'

অমিয়া আড়চোখে একবার প্রমথর মুখখানা দেখিয়া লইয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

প্রমথ লজ্জার সঙ্কটে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"প্রমথনাথের বদলে ভূতনাথ হ'তে পারে।"

শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিয়া নন্দ কিছুক্ষণ উচ্চরবে হাসিয়া লইল। তার পর দরখাস্ত হইতে প্রমথনাথ কাটিয়া ভূতনাথ বসাইয়া দিল।

ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া অমিয়া কৌতূহলের সহিত দরখাস্তখানা নিরীক্ষণ করিতেছিল। প্রমথ বেচারা এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, এক চুমুক গরম চা খাইয়া মুখ পুড়াইয়া 'উঃ' করিয়া উঠিল। চকিতে ফিরিয়া অমিয়া বলিল, "বড্ড গরম বুঝি—?"

অধিকতর লজ্জায় ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদস্বরূপ প্রমথ আর এক চুমুক চা খাইয়া ফেলিল এবং এবার মুখের দাহটাকে কোনও মতেই উর্দ্ধস্বরে প্রকাশ করিল না।

নন্দ বলিল,—'ফটোর কি করা যায়? তোমার ফটো একখানা আছে বটে আমার কাছে—' বলিয়া ঘরের কোণের একটি ছোট টিপাই'এর উপর হইতে অ্যালবাম খানা তুলিয়া লইল। অমিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং দরজা পার হইয়াই তাহার দ্রুত পলায়নের পদশব্দ ফটো-অনুসন্ধাননিরত নন্দর কাণে গেল না।

নন্দ অ্যালবাম ভাল করিয়া খুঁজিয়া বলিল,—'কৈ, তোমার ছবিখানা দেখ্‌তে পাচ্ছি না! গেল কোথায়?'

পলাতকার পদধ্বনি যে শুনিয়াছিল, সে আরক্ত কর্ণমূলে বলিল,—'আছে কোথাও—ওইখানেই—'

নন্দ বলিল,—'না হে, এই দেখ না, জায়গাটা খালি—' তার পর গলা চড়াইয়া ডাকিল,—'অমিয়—অমিয়—'

প্রমথ তাড়াতাড়ি ব্যাকুলভাবে বলিল,—'দরকার কি নন্দ তোমার একখানা ছবিই দিয়ে দাও না!'

নন্দ কিছুক্ষণ প্রমথর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া সহাস্যে বলিল,—'তোমার মৎলব কি বল ত? এ যে আগাগোড়াই জুচ্চুরী! শেষে আমার ঠ্যাংএ দড়ি পড়বে না ত?'

প্রমথ বলিল,—'না না, কোনও ভয় নেই। এখন ফটোখানা দিয়ে দাও, তার পর বিয়ে না হয় না কোরো।'

নন্দ নিজের একখানা ফটো খামের মধ্যে পূরিয়া বলিল,—'তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার, বরকর্ত্তার পদটা আমিই গ্রহণ করলুম। যা কিছু কথাবার্ত্তা আমিই করব।' বলিয়া চিঠিতে নিজের ঠিকানা দিয়া খাম বন্ধ করিয়া চা-পানে মনোনিবেশ করিল।

২

দিন পনেরো পরে প্রমথ নন্দর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

'কি হে, কি খবর?'

নন্দ একরাশি ধূম উদ্গিরণ করিয়া বলিল,—'খবর সব ভাল। অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে?'

প্রমথ বলিল,—'ময়ূরভঞ্জে গিছলুম ভাল্লুক শিকার করতে।'

নন্দ বলিল,—'আমাকে একটা খবর দিয়ে গেলেই ভাল করতে। তা সে যাক্, এদিকে সব ঠিক।'

প্রমথ জিজ্ঞাসা করিল,—'সব ঠিক? কিসের?'

নন্দ প্রমথর নির্দ্দোষ স্কন্ধের উপর এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিল,—'কিসের আবার? তোমার বিয়ের।'

প্রমথ আকাশ হইতে পড়িল,—'আমার বিয়ের? সে আবার কি?'

বস্তুতঃ সেদিনকার বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা প্রমথর বিন্দু-বিসর্গও মনে ছিল না। বিস্মৃতির আনন্দে সে এই কটা দিন ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে দিব্য নিশ্চিন্তমনে কাটাইয়া দিয়াছে। তাই নন্দ যখন নিতান্ত ভাবলেশহীন বৈজ্ঞানিকের মত তাহার মধ্যাকাশে মস্ত একটা ধূমকেতু দেখাইয়া দিল, তখন প্রমথ ভয়-ব্যাকুলের মত বসিয়া পড়িল। নন্দ স্বচ্ছন্দে বলিতে লাগিল,—'সবই ঠিক ক'রে ফেলা গেছে। মেয়ে দেখা, এমন কি, আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত। মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী হে; এবং শিক্ষিতা, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। মেয়ের বাপ বেশ আলোকপ্রাপ্ত লোক।

কোনও রকম কুসংস্কারের বালাই নেই। মেয়েটির নাম সুকুমারী।'

প্রমথ অস্থির হইয়া বলিল,—'আমি এই ক'দিন ছিলুম না, আর তুমি সব গোল পাকিয়ে ব'সে আছ ?'

নন্দ বলিল,—'তুমি না থাকায় বড় অসুবিধায় পড়া গিছল। অগত্যা তোমার হয়ে আশীর্ব্বাদটাও আমিই গ্রহণ করেছি। কন্যাপক্ষের এখনও ধারণা যে, আমিই বর। সে ভুল ভাঙ্গবে একেবারে বিয়ের রাত্রে।'

প্রমথ ব্যাকুলস্বরে বলিল,—'ভাই, সবই যখন তুমি করলে, তখন বিয়েটাও কর। আমায় রেহাই দাও।'

নন্দ ফিরিয়া বলিল,—'কি রকম ? তখন নিজে কথা দিয়ে এখন পিছুচ্ছ ? কিন্তু তা ত হ'তে পারে না। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে—এই ৭ই বিয়ের দিন।'

প্রমথ রাগ করিয়া বলিল,—'কেন তুমি আমায় না জানিয়ে সব ঠিক ক'রে বস্‌লে ?'

নন্দ বলিল,—'এ তোমার অন্যায় কথা। তখনই আমি তোমায় ব'লে দিছলুম।'

প্রমথ বলিল,—'বেশ, যা হয়ে গেছে যাক, এখন তুমিই বিয়ে কর।'

দৃঢ়স্বরে নন্দ বলিল,—'কখনই না। তোমার জন্যে পাত্রী স্থির ক'রে তাকে নিজে বিয়ে করা আমার দ্বারা অসম্ভব।'

প্রমথ বলিল,—'তা হ'লে আমিও নিরুপায়।'

নন্দ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ আমি এখন বিয়ে করতে পারব না।'

'তুমি চাও চুক্তিভঙ্গের অপরাধে আমি জেলে যাই ?'

প্রমথ রাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'জেলে যাওয়াই তোমার উচিত। তা হ'লে যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান হয়।' বলিয়া হন্‌-হন্‌ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নন্দ চেঁচাইয়া বলিল,—'মনে থাকে যেন, ৭ই বিয়ে—গোধূলি লগ্নে। নিমন্ত্রণপত্র আজই আমি ইস্যু ক'রে দিচ্ছি।'

প্রমথ যতই রাগ করিয়া চলিয়া আসুক না, দোষ যে নন্দর অপেক্ষা তাহারই বেশী, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল এবং এই গুরুতর দুর্ঘটনার জন্য নিজেকে অশেষভাবে লাঞ্ছিত করিতেও ত্রুটি করিল না। এক ধরণের লোক আছে—যদিও খুব বিরল—যাহারা নিজের দোষ সব চেয়ে বড় করিয়া দেখে এবং নিজের লঘু পাপের উপর এমন গুরুদণ্ড চাপাইয়া দেয়, যাহার হয় ত কোনই প্রয়োজন ছিল না। আত্মলাঞ্ছনা শেষ করিয়া প্রমথ নিজের উপর এই কঠিন দণ্ডবিধান করিল যে, মন তাহার এ বিবাহের যতই বিপক্ষে হউক না কেন, বিবাহ তাহাকে করিতেই হইবে। ইহাই তাহার মূঢ়তার উপযুক্ত দণ্ড। তা ছাড়া নন্দ যখন একটা কায করিয়া ফেলিয়াছে, তখন তাহাকে পাঁচ-জনের সম্মুখে অপদস্থ করা যাইতে পারে না। না—কোনও কারণেই নহে।

* * * *

বিবাহের দিন যথাসময় আসিতে বিলম্ব করিল না, এবং সে দিন সন্ধ্যাবেলা প্রমথকে বন্ধুবান্ধব দ্বারা পরিবৃত করিয়া বরকর্ত্তা নন্দলাল মোটর আরোহণে বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিল না। প্রমথ ইচ্ছা করিয়াই কোন রকম সাজসজ্জা করে নাই—মুখ ভারী করিয়া বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বর বলিয়া মনেই হয় না। বরং নন্দ বরকর্ত্তা বলিয়া বেশের বিশেষ পারিপাট্যসাধন করিয়া আসিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সেই বর বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

কন্যার পিতা ল্যাণ্ডস্‌ডাউন রোডে বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। সেইখানেই বিবাহ। বরপক্ষ সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। চীৎকার, হাঁকাহাঁকি, হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির মধ্যে কন্যাকর্ত্তা তাড়াতাড়ি বরকে নামাইয়া লইতে ছুটিয়া আসিলেন। নন্দ তখন নামিয়া পড়িয়াছে—প্রমথ গোঁজ হইয়া গাড়ীর মধ্যে বসিয়া আছে। সে মনে মনে ভাবিতেছে, যাঁহার কন্যাকে সে বিবাহ করিতেছে, তাঁহার নামটা পর্য্যন্ত সে জানে না—জানিবার দরকারও নাই। কোন রকমে এই পাপ-রাত্রি কাটিলে বাঁচা যায়। তার পর, পরের কথা পরে ভাবিলেই চলিবে।

হঠাৎ অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া প্রমথ তাকাইয়া দেখিল, তাহারই মাতুল প্রমদা বাবু সাদরে নন্দর বাহু ধরিয়া বলিতেছেন, 'এস বাবা, এস।'

প্রমথর মনের মধ্যে সন্দেহের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে চীৎকার করিয়া উঠিল ;—'এ কি মামা, তুমি ?'

প্রমদা বাবু ফিরিয়া প্রমথকে দেখিয়া বলিলেন,—'এ কি প্রমথ, তুইও বরযাত্রী না কি ? কোথায় ছিলি এত দিন ? খুঁজে খুঁজে হয়রান, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে চিঠি লিখে রেখে এলুম। চিঠি পেয়েছিলি ত ?'

প্রমথ উত্তেজিত স্বরে বলিল,—'কোন্ চিঠি ?'

'সুকুর বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠি।'

হায় হায়! ময়ূরভঞ্জ হইতে ফিরিবার পর প্রমথ একখানা চিঠিও খুলিয়া দেখে নাই।

প্রমদা বাবু নন্দর দিকে ফিরিয়া তাহার বাহু ধরিয়া বলিলেন,—'চল বাবা, ভিতরে চল।'

এই সময়টার জন্যই নন্দ অপেক্ষা করিতেছিল। সে সহাস্য-মুখে সকলের দিকে ফিরিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—'দেখুন, একটা ভুল গোড়া থেকেই হয়ে এসেছে, এখন তার সংশোধন হওয়া দরকার। আজ বিবাহের বর—'

প্রমথ মোটর হইতে লাফাইয়া নন্দর হাত সজোরে চাপিয়া ধরিল; বলিল,—'নন্দ, চুপ কর। একটা কথা আছে, শুনে যাও।' বলিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে অন্তরালে লইয়া গেল। কন্যা-পক্ষীয় এবং বরপক্ষীয় সকলেই অবাক্ হইয়া রহিল।

প্রমথ বলিল, 'তুমি একটি আস্ত গাধা। করেছ কি! সুকু যে আমার বোন্ হয়! প্রমদা বাবু আমার সাক্ষাৎ মামা।'

নন্দ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। প্রমথ হাসিয়া বলিল;—'হাঁ করলে কি হবে? এখন চল, ভগিনীকে উদ্ধার কর। কেলেঙ্কারী যা করবার, তা ত করেছ। এখন মামার জাতটাও মারবে?'

নন্দ এমনই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল যে, বিবাহ শেষ না হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত একটি কথাও বলিতে পারে নাই। সম্প্রদানের সময় বরের নাম লইয়া একটু গোলমাল হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সহজেই কাটিয়া গেল। প্রমথ বুঝাইয়া দিল যে, নন্দর ডাকনাম ভুতো।

বিবাহ চুকিয়া গেলে প্রমথ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল,—'কি হে, বিয়েটা রোমান্টিক বোধ হচ্ছে ত?'

নন্দ বলিল,—'হুঁ। কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত ক'রে ভাল করিনি, এখন বোধ হচ্ছে।'

'বটে—কেন?'

'কি জানি যদি পরে আবার দাবী ক'রে ব'স!'

প্রমথ কৃত্রিম কোপে ঘুষি তুলিয়া বলিল;—'চোপরও।'

নন্দ বলিল,—'সে যেন হ'ল। কিন্তু তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলুম। তোমার একটা হিল্লে ক'রে দিতে হবে ত।'

প্রমথ নিরীহ ভালমানুষের মত বলিল,—'হিল্লে ত তোমার হাতেই আছে।'

নন্দ বলিল,—'কি রকম?'

প্রমথ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল,—'থাক্ গে। নন্দ, আমাকে আজ ছুটী দাও ভাই—আমার একটু কায আছে।'

নন্দ বলিল—'কি কায, না বললে ছুটী পাচ্ছ না।'

'আমাকে একবার—একবার অমিয়কে খবর দিতে হবে।'

'অমিয়কে খবর কাল দিলেই হবে। এই রাত্রে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে আমার বিয়ের খবর দেবার দরকার নেই।'

'কিন্তু আমার পরিত্রাণের খবরটা ত দেওয়া দরকার।'

'তার মানে?'

'তার মানে, তুমি একটি গাধা, তার চেয়েও বড়—একটি উট। এখনও বুঝতে পারনি?'

সহসা প্রমথর আগা-গোড়া সমস্ত ব্যবহারটা স্মরণ করিয়া নন্দর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে প্রমথর হাতখানা ধরিয়া তিন চারবার জোরে ঝাঁকানি দিয়া বলিল,—'অ্যাঁ, অমিয় তোমার মাথাটি খেয়েছে? তাই বুঝি এ বিয়েতে এত আপত্তি? ওঃ, What a fool I have been! ফটোখানা তা হ'লে অমিয় হস্তগত করেছিল—আর আমি বেয়ারাটাকে মিছি মিছি বাপান্ত করলুম! কিন্তু এত কাণ্ড করবার কি দরকার ছিল? আমাকে একবার বললেই ত সব গোল চুকে যেত।'

প্রমথ লজ্জিত হইয়া বলিল,—'না না, বলবার মত কিছু হয় নি—শুধু মনে মনে—। তা হ'লে তোমার অমত নেই ত?'

নন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'প্রমথ ভাই, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের বন্ধুত্বের অপমান করতে চাইনে। কিন্তু অমিয়র যে এ ভাগ্য হবে, তা আমার আশার অতীত।'

প্রমথ তাড়াতাড়ি নন্দকে বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করিয়া বলিল,—'থাক্, হয়েছে হয়েছে। আমি তা হ'লে তাকে গিয়ে খবর দিয়ে আসি যে, আমার বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে।'

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষিপ্তজনতা-বিতাড়নের নূতন কৌশল

ার্মানির পুলিস বিভাগ ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত জনতার উপর গুলী, াঠি অথবা অন্যবিধ মারণাস্ত্র প্রয়োগ করা সভ্যতার পরিপন্থী

জনতা-বিতাড়নের নূতন ব্যবস্থা

মনে করিয়া একটি নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছে। কতক-গুলি মোটর-চালিত যানের উপর প্রকাণ্ড জলের আধার রাখিয়া, যেখানে জনতা অবাধ্য হয়, তথায় গমন করে। জলের আধারে নল আছে। এই নল ইচ্ছামত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জনতার উপর প্রবলবেগে জলধারা নিক্ষিপ্ত করা চলে। সে জলের ধারার আঘাতে জনতা স্থির হইয়া থাকিতে পারে না; মুহূর্ত্ত-মধ্যে প্রাণপণ বেগে পলায়ন করিতে থাকে। এই নির্দ্দোষ, নিরীহ এবং অমোঘ উপায়টি কি জন্য সভ্যদেশ অনুকরণ করিতে পারেন না?

বৈজ্ঞানিক কৌশল

প্রতীচ্যদেশে কায়িক পরিশ্রমকে বাতিল করিবার জন্য বিজ্ঞান নানা প্রকার সহজ পন্থার উদ্ভাবন করিতেছে। মোটর-গাড়ী 'গ্যারেজ' বা তাহার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ অথবা নির্গত হইবার সময় রুদ্ধদ্বার আপনা হইতে মুক্ত হইবে কিংবা আপনা হইতেই স্থানটিকে অবরুদ্ধ করিতে পারিবে, এমন ব্যবস্থা সুসভ্য দেশে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে পরিশ্রমের লাঘব
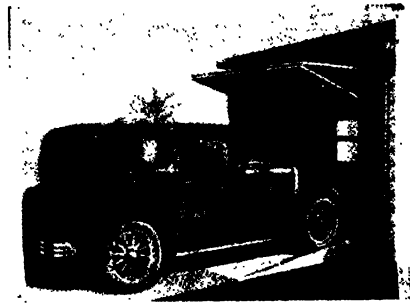
মোটর-গ্যারেজের দ্বার মোটরের চাপে আপনা হইতে মুক্ত

হয়, হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না, মোটর হইতে নামিয়া গ্যারেজের দ্বার খুলিবার প্রয়োজন হয় না। গ্যারেজের মধ্যে প্রবেশ করিবার যে প্লাটফরম আছে, তাহা সমতল নহে, কিছু উচ্চ। এই প্লাটফরমের উপর মোটর-গাড়ীর ভার পড়িবামাত্র গ্যারেজের দ্বার আপনা হইতে মুক্ত হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়। গাড়ী ভিতর হইতে বাহির করিবার সময়ও ঐভাবে কার্য্য হইয়া থাকে। কল-কব্জা গ্যারেজের ভিতর দিকে থাকায়, জল-বায়ুর প্রভাবে উহা নষ্ট হয় না। প্লাটফরমটি এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট যে, তুষারপাতেও ইহার কোন অনিষ্ট হয় না।

দুঃসাহসিক ক্রীড়া

জনৈক দক্ষ মোটরচালক দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিবার জ কোনও প্রদর্শনীতে দুঃসাহসিক কার্য্য করিতেছেন। একটি বিস্তৃত স্থানকে কাঠের বেড়ার দ্বারা ঘিরিয়া সেই দারু-প্রাচীরের উপর দিয়া মোটর-গাড়ী ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে তিনি চালা

থাকেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি একটি ৫ মাসের সিংহ-শাবককে মোটর-গাড়ীর পাশে মুক্ত অবস্থায় বসাইয়া রাখেন।
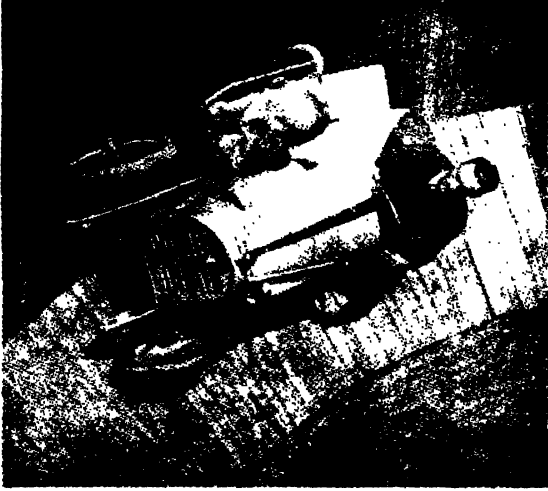
সিংহ-শিশুসহ দ্রুততরবেগে মোটর-চালনা

সিংহ-শাবক একটুও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া দেহ আন্দোলিত করে না। এই কাযটি অত্যন্ত কঠিন, দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রচণ্ডবেগে মোটর চালাইবার সময় যদি অবোধ পশু একটুও নড়া-চড়া করে, তাহা হইলে উভয়ের পক্ষেই মুহূর্ত্তমধ্যে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিয়া যাইতে পারে।

লঘুভার বায়ুপূর্ণ নৌকা

যাহারা বনে, প্রান্তরে প্রমোদযাত্রা করে, জলের উপর আনন্দ-ভ্রমণের জন্য নৌকা ক্রয় বা ভাড়া করার দায় হইতে তাহাদিগকে
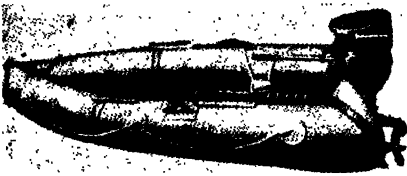
বায়ুপূর্ণ মোটরচালিত নৌকা

নিষ্কৃতি দিবার জন্য ইংলণ্ডে এক প্রকার বায়ুপূর্ণ নৌকার প্রচলন হইয়াছে। এই নৌকা অনায়াসে মোটর-গাড়ীতে দ্রব্য-সম্ভারের সঙ্গে লওয়া চলে। তিন মিনিটের মধ্যেই নৌকাখানিকে বায়ুপূর্ণ [করা] যায়। ইহা তিন জন আরোহীকে অনায়াসে বহন করিতে [পারে]। একটা সাধারণ স্যুটকেশের মধ্যে সাধারণ অবস্থায় ইহাকে ভরিয়া রাখা যায়। নৌকা চালাইবার জন্য একটি ছোট মোটর-যন্ত্র নৌকায় সন্নিবিষ্ট। ঘণ্টায় ১৫ মাইল গতিতে এই নৌকা জলরাশি অতিক্রম করে। বায়ুপূর্ণ অবস্থায় ইহাকে শয্যার ন্যায় ব্যবহার করাও চলে।

সুন্দরতম পক্ষী

আমেরিকায় 'ইগ্রেট' নামক একশ্রেণীর অপূর্ব্বদর্শন পক্ষী আছে। এমন সুন্দর পক্ষী নাকি পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। ইহার তুষার-ধবল কোমল পালক পাশ্চাত্য দেশের নারীজাতির দেহসজ্জার একটা বিশিষ্ট উপকরণ। এই জাতীয় স্ত্রী-পক্ষীর ডিম্ব-প্রসবকালে তাহাদের পালকগুলি আমেরিকায় সংগৃহীত হইত। অবশ্য সে জন্য পক্ষিকুলকে জীবনাহুতি দিতেই হইত। ইগ্রেট পক্ষীর পালক রমণীর ব্যবহৃত টুপীর

পৃথিবীর সুন্দরতম পক্ষী

শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। এক আউন্স পক্ষিপালকের মূল্য প্রায় দেড় শত মুদ্রা। একটি ইগ্রেট পক্ষীর দেহে দুই আউন্সের অধিক পালক থাকে না। সুতরাং একটি পক্ষিণীর জীবনত্যাগের ফলে চারি পাঁচটি শাবক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মেক্সিকো উপসাগর প্রদেশে এই ইগ্রেটপক্ষী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির অজুহাতে ক্রমশঃ তাহাদের বংশলোপ পাইতে থাকে। অবশেষে উপদ্রুত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পক্ষী লুইসিয়ানা ও ফ্লোরিডা অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানেও ব্যাধের দৃষ্টি পতিত হইবার পর, কোন কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি পক্ষিকুলকে নিজ নিজ সুবৃহৎ অরণ্যে আশ্রয়দান করেন। অবশেষে ফ্লোরিডা ও

কালিফোর্ণিয়ায় এই বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, অতঃপর এই পাখীকে কেহই হত্যা করিতে পারিবে না।

শিল্পীর চাতুর্য্য

ভিয়েনা সহরের জনৈক সূত্রধর দক্ষ শিল্পী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি কাঠের উপর এমন নক্সা করিয়া থাকেন,

ব্যঙ্গচিত্রে বার্ণার্ড শ ও পল্ হোয়াইটম্যান্

যাহাতে মনে হইবে, এমন বুঝি সহসা দেখা যায় না। সম্প্রতি তিনি জর্জ্জ বার্ণার্ড শ এবং পল্ হোয়াইটম্যানের আবক্ষোমূর্ত্তি কাঠের উপর ক্ষোদিত করিয়া তাঁহাদেরই রচিত উপন্যাসের কোন কোন নায়ক-চরিত্রের চমৎকার ব্যঙ্গচিত্র-প্রকাশ করিয়াছেন।

রেডিওর কীর্ত্তি

কলের জলের নল ভূগর্ভের কোন্ স্থানে অবস্থিত, ইহা জানিবার জন্য রাজপথ খুঁড়িয়া ফেলিতে হয়। সম্প্রতি রেডিও সাহায্যে এ অসুবিধাও দূরীভূত হইয়াছে। তারহীন বার্ত্তাবহের একটা

রেডিও যন্ত্র সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ জলের নল আবিষ্কার

সহজবহনযোগ্য যন্ত্র এবং একটি রেডিও ফ্রেম ব্যবহারেই নলের অস্তিত্ব নির্ণীত হয়। জমীর উপর যন্ত্র বসাইলে যখন একটা বজ্‌বজ্‌ শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে, তখনই বুঝা যাইবে, ঠিক সেই স্থানেই জলের নল বিদ্যমান।

বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র

চিকাগোর কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ফুলগাছের টব বাদ্যযন্ত্রে পরিণত করিয়া বিচিত্র আনন্দলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ফুলের টবের বাদ্যযন্ত্র

একটি কাঠের "র‍্যাকে" টবগুলিকে অধোমুখে ঝুলাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ভিন্ন ভিন্ন আকারের মোটা ও পাতলা টবগুলি এমন ভাবে বিন্যস্ত যে, তাহাদের উপর একটি তুলা-মণ্ডিত লঘুভার হাতুড়ির আঘাতে বিচিত্র স্বর নির্গত হইতে থাকে। টবগুলির আকার প্রভৃতির উপর সুরের তারতম্য নির্ভর করে।

অভিনব কলের বন্দুক

নূতনধরণের ব্রাউনিং কলের বন্দুক হইতে প্রতি মিনিটে ৬ শত হইতে ৮ শত গুলী নিক্ষেপ করা যায়। অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে

নূতন কলের বন্দুক

:২টি গুলী বাহির হইয়া থাকে। বিমানপোতে এই নূতন বন্দুকের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। এই বন্দুকের লক্ষ্যও অব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বায়ুর গতিবেগে যাহাতে বন্দুকের লক্ষ্য ব্যর্থ না হয়, বৈজ্ঞানিক মতে তাহার ব্যবস্থাও আছে।

বিচিত্র স্থপতি-শিল্প

বালটিমোরের কোন একটি দোকানে—বাহিরের প্রাচীরগাত্রে একটি অপূর্ব্ব-দৃশ্য বস্তু আছে। দর্শকগণ প্রথম দর্শনে মনে করে, দৃশ্যটি অবাস্তব নহে। স্থপতি-শিল্পী প্রাচীরগাত্রে একটি মার্জ্জারী ও

স্থপতি-শিল্পের বিচিত্র নমুনা

তাহার শাবকের মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছে। দেখিবামাত্রই মনে হইবে, মার্জ্জার-শিশু তাহার জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাচীর বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। এই ব্যবসায়ী নানারূপ জীব-জন্তুর মূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া থাকে। ক্রেতাকে আকৃষ্ট করিবার জন্তই এই প্রকার ব্যবস্থা।

উড্ডীয়মান দ্বিচক্রযান

মানুষের উড়িবার সখ চিরন্তন, তাই বিজ্ঞানের সহায়তায় দ্বিচক্রযানে চড়িয়াও মানুষ মাঝে মাঝে উড়িবার আনন্দ উপভোগ করিতে চাহে। জনৈক দ্বিচক্রযান-চালক তাঁহার যানের সম্মুখে ও পশ্চাতে ডানা বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গাড়ী যখন দ্রুত চলিতে থাকে, তখন সম্মুখ ও পশ্চাতের ডানার সাহায্যে গাড়ী ভূমি হইতে ঈষৎ উত্থিত হয়, শুধু পশ্চাতের চাকাখানা জমীতে লাগিয়া থাকে। ইহাতে উড়িবার আনন্দ আরোহী লাভ
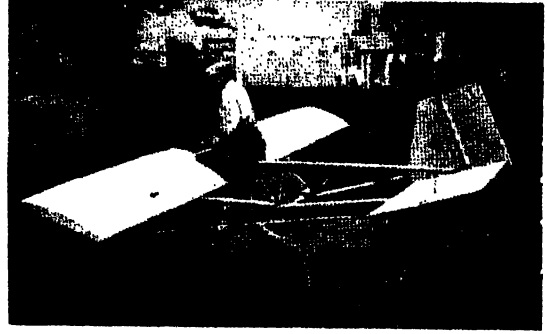
উড্ডীয়মান দ্বিচক্রযান

করিয়া থাকে। প্রয়োজনমত স্বল্প চেষ্টায় ডানাগুলি খুলিয়া ফেলা যায়।

ভাষাভাষী ঘড়ী

ফিলাডেলফিয়ার জনৈক বৈজ্ঞানিক শিল্পী বহু পরীক্ষার পর ঘটিকাযন্ত্রে মনুষ্যকণ্ঠের ভাষা সংযোজিত করিতে পারিয়াছেন।

ভাষাভাষী ঘটিকাযন্ত্র

ইহাতে রেডিও, ফনোগ্রাফ, প্রভৃতির সমবায় করিয়া বৈজ্ঞানিক এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ী বলিয়া উঠিবে, "নমস্কার—বেলা ৬টা" অথবা ঐরূপ ভাবের নানা প্রকার অভিনন্দন-সূচক মনুষ্যকণ্ঠ শোনা যাইবে।

ছ'আনার ইতিহাস

চিরকুমার ডাক্তার সুধন্য বসুকে সকলেই আন্তরিক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে 'ডাক্তার বসু' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। ছাত্রের দল ত তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে। তিনি যখন কোন একটি রোগী লইয়া তাহার রোগ সম্বন্ধে বুঝাইতে থাকেন, তখন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ছাত্ররা ছাড়াও অন্যান্য ছাত্র সাগ্রহে সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়।

অন্যান্য দিনের মত আজিও ছাত্র-বেষ্টিত ডাক্তার বসু তাঁহার ওয়ার্ডে ঘড়ীর কাঁটার মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। 'A' ward এ একটি রোগীকে দেখাইয়া তাহার রোগের সম্বন্ধে ছেলেদের বুঝাইয়া দিতেছেন। এই রোগীটির বিশেষত্ব এই যে, ইহার স্বাস্থ্য দেখিতে মন্দ নহে, ক্ষুধা প্রচুর—সমস্ত হাঁসপাতালের মধ্যে ভোজনে তাহার সমকক্ষ কেহ নহে; অথচ তাহার নিয়মমত দাস্ত হয় না, সময় সময় উদরে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং কিছুকাল এই ভাবে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক দিন শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে।

ডাক্তার বসু বলিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি, ইহার কি রোগ?"

ছেলের দল তৎক্ষণাৎ তাহাকে টিপিয়া ও বুকে পিঠে ষ্টেথিস্কোপ লাগাইতে সুরু করিয়া দিল।

এক জন বলিল, "সার, অতিরিক্ত আহারই এর রোগ। আহার কমালেই এর রোগ কম্‌বে।"

ডাক্তার বসু।—রোগীর বিবরণ প'ড়ে দেখ; এক মুঠা ভাত ওর diet থেকে কমালে রোগী একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে। Visiting physician থেকে কুলী পর্য্যন্ত সবার কাছে নালিশ করতে থাকে। পরদিন এক মুঠোর জায়গায় চার মুঠো ভাত বেশী পেলে তবে ওর ক্ষোভ যায়।

ছাত্র।—তা হ'লে সে সব যায় কোথায়, সার্?

ডাক্তার বসু।—সেই ত আমার প্রশ্ন। তোমরা আবার আমায় উল্টো প্রশ্ন করলে, কি ক'রে হবে, সার্?

ছাত্রের দল হাসিয়া উঠিল।

একটি ছাত্র বলিল, "তা হ'লে এটা হিষ্টিরিয়া, সার। শরীরে এর কোন অসুখ নেই, রোগ এর মনে।

ডাক্তার বসু।—চিকিৎসা কি হবে?

ছাত্র।—অনাহার। অসুখ হলেই এর খাওয়া বন্ধ হবে, এইটুকু এর ধারণা হলেই অসুখ এর মনে আসতে পারবে-না।

ডাক্তার বসু।—তার পর, পেটে যে অত্যন্ত বেদনা হয়, মাঝে মাঝে যে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে, তার কি?

ডাক্তার বসু তখন রোগীকে শোয়াইয়া তাহার সমস্ত অসুখের কেন্দ্র লিবার লইয়া পড়িলেন ও রোগের বিশেষত্ব ইত্যাদি বুঝাইতে লাগিলেন।

পাশের সিটে শুইয়া রঘুনাথ দে একমনে ভাবিতেছিল, আজ একবার সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

রঘুনাথ কলিকাতার আড়তে মনিবের দোকানের জিনিষ কিনিতে আসিয়া হঠাৎ অসুস্থ হইয়া একবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। আড়তদার 'উড়ো' আপদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাহাকে বেলগেছিয়া মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে পৌঁছাইয়া দেয়। রঘুনাথের রোগটা হৃদ্‌যন্ত্রের। ডাক্তার তাহার পূর্ণ-বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনটি ষ্ট্রীক্‌নিন (strychnine) ইন্‌জেক্‌শান দিয়াছেন। আর ১টি শীঘ্র দিবেন বলিয়াছেন। বাড়ীর জন্য তাহার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; সেই জন্য সে মনে মনে সংকল্প করিয়া রাখিল—যেরূপে হউক, চিকিৎসাটা শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিবার একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে।

ডাক্তার বসু আর একটু পরেই তাহার শয্যার কাছে আসিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, কেমন আছ?"

রঘুনাথ প্রতিদিন যেমন বলিত, তেমনই বলিল, "আজ্ঞে, একটু ভাল আছি।" তার পর একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "তবে একটা ইয়ে—একটা কথা ছিল।"

ডাক্তার বসু বলিলেন, "কি কথা, বল।"

রঘুনাথ তখন দক্ষিণ হস্তের তালুর মধ্যে সযত্নে রক্ষিত কি একটা দ্রব্য বাহির করিয়া একবারে ডাক্তার বসুর হাতের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু, সে ওষুধটা আজই আমায় ফুঁড়ে দিন দয়া ক'রে; তা হ'লে আমি আজই বাড়ী যাই।"

ডাক্তার বসু চাহিয়া দেখিলেন, হাতের মধ্যে একটি সিকি আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

ডাক্তার বসুর হাতে রোগীকে কিছু দিতে দেখিয়া ছাত্রগণ প্রথমটা বড়ই বিস্মিত হইয়াছিল। তাঁহার হাতের উপরকার সিকিটি দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তাহাদের মুখ হইতে

হাসির ঝড় বহিবে, এমন সময় ডাক্তার ইঙ্গিতে তাহাদের নিষেধ করিলেন। তিনি রোগীর দিকে চাহিয়া গম্ভীর-মুখে বলিলেন, "তা হ'লে চার আনায় ত হবে না বাপু, আরও চার আনা চাই।"

ডাক্তার বসু কথা কয়টি এমন স্বাভাবিকতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন যে, তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও ছাত্রদের হাস্য রোধ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িল। জন কয়েক মুখ ফিরাইয়া হাস্য দমন করিল, কাহারও কাহারও হাস্যরোধের চেষ্টায় মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। দুই এক জন হাস্যসম্বরণে অসমর্থ হইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে ছুটিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া হাসির খানিকটা উচ্ছ্বাস বাহির করিয়া দিয়া তবে বাঁচিল।

ডাক্তার বাবু বিস্মিত রঘুনাথের শয্যার উপর সিকিটি ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া পরবর্ত্তী রোগীর কাছে গেলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রঘুনাথ শয্যার উপর অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল।

২

ঘণ্টা দুই পরে ছাত্রদের উপর ভিন্ন ভিন্ন কাযের ভার দিয়া ডাক্তার বাবু আপনার আফিসে খানিক কায করিলেন; তার পর আফিস হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিবার জন্য সিঁড়ির কাছে আসিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবেন, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল, "ডাক্তার বাবু!"

"কি বাবা," বলিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলেন, সেই 'চারি আনার' রোগীটি দাঁড়াইয়া!

রঘুনাথ হাতযোড় করিয়া বলিল, "বাবু, আমি বড় গরীব।"

ডাক্তার ঈষৎ অসন্তোষের সুরে বলিলেন, "আমি ত তোমার কাছে কিছু চাইছি না, বাবা।"

বলিতেই হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, এইমাত্র তিনি এই রোগীটিরই কাছ হইতে একটি অতিরিক্ত সিকির দাবী করিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্চ হাস্যের সহিত বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, তোমার আর একটা সিকি দিতে হবে না; ঐ একটা সিকিতেই হবে।"

রঘুনাথ বসিয়া পড়িয়া ডাক্তারের পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাতর-কণ্ঠে বলিল, "ডাক্তার বাবু, আপনি দয়া ক'রে আমার কথাটা একটিবার শুনুন। আমি বড় অভাগা।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি পা ছেড়ে কি বলবে, বল।"

রঘুনাথ তখন কোঁচার খুঁট হইতে একটা টাকা, একটা আধুলি, একটা সিকি ও দুটা দুয়ানি বাহির করিয়া বলিল, "বাবু, আমার কাছে টাকাতে-রেজকিতে সবেমাত্র এই দুটো টাকা আছে। এক টাকা বাড়ী ফিরে যেতে ভাড়া লাগবে; বাড়ীতে তিন বছরের মা-মরা এক ছেলে আছে, তার জন্য আট আনার একটা জামা নিয়ে যাব, আর আট আনা বাকী থাকে,—আপনাকে তাই দিতে গেলে ছেলেটার জন্য আর কিছু মিষ্টি নিয়ে যাওয়া হয় না। তাই খাবারের জন্য দু'আনা রেখে এই ছ'আনা আপনাকে দিচ্ছি। আপনি এই নিয়ে আমার চিকিচ্ছেটা আজই শেষ ক'রে দিন।"

বলিয়া একটা সিকি ও একটা দুয়ানি ডাক্তারের পায়ের কাছে রাখিয়া আবার বলিল, "আমি, বাবু, কলকেতায় বড় একটা আসিনে। যে গস্ত করতে (জিনিস কিনিতে) আসে, তার অসুখ করায় আমি আসি। তা এসেই অসুখে পড়লাম, আড়তদার এখানে পাঠিয়ে দিলে। বাড়ীতে সেই তিন বছরের ছেলেটিকে নিয়ে দিদি একলাটি আছে। দেখতে দেখতে ১৫ দিন কেটে গেল। মাত্তোর একটা টাকা বাড়ীতে দিয়ে এসেছিলাম;—আর কি দেরী করতে পারি, ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তারের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কর?"

রঘুনাথ বলিল, "আজ্ঞে, পালেদের দোকানে কায করি। মুদিখানার দোকান; বিক্রি-সিক্রি করাই আমার কায।"

ডাক্তার।—তোমার বাড়ী কোথায়?

রঘুনাথ।—আজ্ঞে, কাপাসপুর;—যশোর জেলা।

ডাক্তার।—কত মাইনে পাও?

রঘুনাথ।—দশ টাকা।

ডাক্তার।—তাতে চলে?

রঘুনাথ।—আজ্ঞে, ভগবান্ যেমন চালান, সেই রকমই চলে। রোগে ভুগে গেল বছর আশ্বিন মাসে আমার পরিবার মারা গেল। লোকে বলেছিল, রোগ শক্ত, সহর থেকে ডাক্তার এনে দেখাও। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাব বলুন? একবার ডাক্তার আন্‌তে গেলে আট টাকা ভিজিট, আর পাল্কী ও রেল ভাড়াতে গোটা পাঁচেক টাকা, তার পর

ওষুধের দাম আছে। ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম, বাড়ীখানা বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে ডাক্তার আনি। মনিবের তেজারতি আছে। তাঁকে বল্‌তে তিনি বল্লেন, তোমার মেটে ঘর দু'খানা আর কাঠা কয়েক জমীর উঠান—তার দামই বা কত হবে? তার আবার বন্ধক! তা তুমি আমার গোমস্তা, লেখাপড়া ক'রে দাও, চল্লিশটে টাকা দেব'খন।

বাড়ীতে এসে সে কথা বল্‌তেই দিদি বল্লে, 'তুই পাগল হয়েছিস্! শেষকালে সবাইকে পথে বসাবি?' পরিবার সে কথা শুনে বল্লে. 'একবার বাড়ী বন্ধক দিলে কি আর খালাস করতে পারবে? শেষটা খোকা আমাদের পথে পথে বেড়াবে! তুমি দু'বেলা আমায় তুলসীতলার মাটী এনে দিও, তাতেই আমি সেরে উঠ্‌ব।'

সেই দিন থেকে সে তুলসীতলার মাটী একটু ক'রে মুখে দিত আর মাথায় মাখত। তাই বুঝি দুঃখ থেকে সে বেঁচে গেল—নারায়ণ তাকে চরণে ঠাঁই দিলেন। এখন ওই তিন বছরের ছেলেটিই আমার সম্বল। পনের দিন বাড়ীছাড়া, তাই বাবু, আর থাক্‌তে পাচ্ছি নে। গরীবের এই ছ'আনা পয়সা আপনি রাখুন, বাবু,—ভগবান্ আপনার মঙ্গল করবেন। আর আমার চিকিচ্ছেটা শীগ্‌গির শেষ ক'রে দিন।

বলিয়া রঘুনাথ সিকি আর দু'আনিটা সজল-নয়নে মেঝে হইতে তুলিয়া ডাক্তারের হাতে দিতে গেল।

মুহূর্ত্তে ডাক্তার বাবুর দৃষ্টিপথের সম্মুখে বাঙ্গালাদেশের ধ্বংসপ্রায় পল্লীর কঙ্কালসার বহু অভাগা অভাগিনীর ম্লান মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিল। তাহাদের ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার বারি নাই; রোগে ঔষধ, শোকে সান্ত্বনা তাহারা পায় না; শীতে বস্ত্র, বর্ষায় উপযুক্ত আচ্ছাদন পর্য্যন্ত তাহাদের জুটে না। দিনের পর দিন তাহারা মাত্র উপরের দিকে চাহিয়া ভীষণ অভাব ও দারুণ যন্ত্রণা মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া আসিতেছে। আর এই সব অকথিত দুঃখের বাণী, ক্লিষ্ট হৃদয়ের গোপন হাহাকার সহরের মুদ্রাযন্ত্রের সুজলা সুফলা পল্লীমায়ের বর্ণনা ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের লিখিত বাঙ্গালার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধুর ও মুখরোচক বিবরণের নীচে কোথায় তলাইয়া যাইতেছে!

ডাক্তারের নয়নের অভ্যন্তরভাগ তাঁহার অজ্ঞাতে আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি হাত পাতিয়া রঘুনাথের নিকট হইতে 'ছ'আনা' লইয়া পকেটে রাখিলেন। পরে অপর পকেট হইতে একটি থলি বাহির করিয়া তাহা হইতে পাঁচখানা দশ টাকার নোট্‌ও পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, তোমার কথা আমি শুনেছি, এবার আমার কথা তোমাকে শুন্‌তে হবে। এই নোট্‌ কথানা তোমার ছেলেকে আমি দিলাম—তার সময় অসময়ের জন্য রেখে দিও। আর খুচরো টাকাকটা দিয়ে তার জন্য এক জোড়া কাপড় আর গোটা কয়েক জামা আর কিছু মিষ্টি নিয়ে যেও। আর একটা কথা তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, তোমাদের কারও কোন অসুখ হ'লে তাকে নিয়ে আমার এখানে চ'লে এসে আমার খোঁজ করবে। আমি তোমাদের যাতায়াতের খরচ ও চিকিৎসার সব ভার নেব। কাল তোমার চিকিৎসা শেষ ক'রে তোমাকে ছেড়ে দেব। বাড়ী গিয়ে কিন্তু পনের দিন কোন কাযকর্ম্ম করবে না। এখন সপ্তাহখানেক হাঁটবে না। কাল আমি তোমাকে ষ্টেশনে পৌছে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দেব। জিনিষপত্র যা কিন্‌বে, তাও যাবার পথে কিনে নিও। তোমার পয়সা ছ'আনা কিন্তু আমি নিলাম। এ ছ'আনার ইতিহাস আমার চিরদিন মনে থাকবে।"

ডাক্তার বসু সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন। নীচে আসিয়া রুমালে চোখ দুটা একবার মুছিয়া ফেলিলেন।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

কাব্য-রোগ

১

কাব্য লিখিতে পারি না, কিন্তু যথেষ্ট পড়াশুনা করিয়া মন কাব্যরসে মসগুল হইয়া গিয়াছে। কাব্যের নায়ক-নায়িকা মনের পটে ছবি আঁকিয়া যায়, ভাবঘন চিত্তে স্বপ্নের ফুলঝুরি ঝরিয়া যায়।

মাতা লিখিলেন, "আমার সইয়ের মেয়ে রেবা এবার পনরয় পা দিয়েছে, এখন্ বিয়ে ঠিক করি।"

বিয়ে ত পুতুল-খেলা নহে। পুতুল-খেলার মেয়ে রেবাকে সঙ্গী করিয়া কবি-চিত্তকে মর্দ্দিত করা চলে কি?

বাহির হইয়া পড়িলাম। পকেটে সুইনবার্ণ আর হাতে কোডাক ক্যামেরা। দার্জ্জিলিং সহরে একা একা ঘোরা-ফেরা করি।

সংসারের লোক কবিতা চাহে না, তাই কবিদের বন্ধু নাই। কোডাক লইয়া নিত্য বনপথের ছবি তুলি, পাইন-গাছের বনে প্রেমিক-প্রেমিকার ছবি অলক্ষ্যে তুলিয়া লই। মুগ্ধ প্রণয়িযুগল জানিতে পায় না।

কাগজে যখন তাহাদের হাস্য-বিভাত মুখ দেখি, তখন মন হতাশায় ভরিয়া উঠে।

ভাবি, এ বিরাট দুনিয়ায় আমি একান্ত একেলা। আমার কেহ নাই, কেহ নাই!

প্রতিদিন মাসিকের পাতা উল্টাইয়া পড়ি। কত লোক কত প্রকারে প্রেমের পরশ-মণি কুড়াইয়া পায়। আমারই কি দগ্ধ অদৃষ্ট? যখন চিন্তা চিতার মত অসহ হইয়া পড়ে, সুইনবার্ণ খুলিয়া বসি।

২

সে দিন বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্রভাতের আলোয় কাঞ্চন-জঙ্ঘা ঝলমল করিতেছে। বনপত্রে শারদোৎসবের বীণা বাজিতেছে। দূরে পর্ব্বত-শৃঙ্গে একটি বিচিত্রপক্ষ বিহগ-দম্পতি বসিয়া শাল-মঞ্জরীর মধু পান করিতেছিল।

সুন্দর দৃশ্য। ছবি তুলিবার জন্য ক্যামেরা তুলিয়া লইলাম। "Finder"এ দৃশ্যের প্রতিরূপ নির্দ্দেশ করিতেছি। এমন সময়ে কল-হাস্যের ঝরণায় চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। ফিরিয়া দেখি, তন্বী যুবতী। অবাক্ হইয়া চাহিলাম। সুন্দরীকে অনুমানে সপ্তদশ বসন্তের অধিকারিণী বলিয়া মনে হইল। গায়ে পেঁয়াজ-রঙা ব্লাউজের জরির মাধুরী বেড়িয়া পেঁয়াজ-রঙা শাড়ী হিল্লোলিত। পায়ে উঁচু গোড়ালি-দেওয়া মেম-সাহেবী জুতা, চোখে চশমা। তরুণী একা। সহর হইতে দূরে কে এই বনবালা?

কালিদাসের ভাষায় মনে হইল—'স্বপ্নো নু মায়া নু মতি-ভ্রমো নু।"

তরুণী লজ্জা-সঙ্কোচ না করিয়া কোকিলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ছবি তুলছেন? আমার একটি ছবি তুলবেন কি?"

নায়িকা-সমাগমের কল্পনা কত করিয়াছি। দেখা হইলে পৃথিবীর সেরা কবিদের মর্ম্মবাণী শুনাইয়া আমার মানসীকে অভিনন্দন করিব। কিন্তু সময়-কালে কণ্ঠ হইতে বাণী নিঃসারিত হইল না। আমি কি বলিব, ভাবিয়া পাইলাম না। আমাকে বিব্রত ও ত্রস্ত দেখিয়া তরুণী আমাকে কি ভাবিল, জানি না।

তরুণী পুনরায় বলিল, "বা! আপনি চুপ ক'রে রইলেন যে? কি খাসা আপনার চেহারা! কিন্তু আপনার মন কি খুবই ছোট?"

লজ্জায় মাটীতে মিশিয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি বলিলাম, "ক্ষমা করবেন, আপনার যে কষ্যখন ইচ্ছা, ছবি তুলে নিচ্ছি।" মনে মনে বলিলাম, যদি ভাগ্যে হৃদয়-লক্ষ্মী দ্বারে দেখা দিয়াছে, তাহাকে কি অবজ্ঞা করিতে পারি? বিদ্যাপতির বচন মনে জাগিতে লাগিল:—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু প্রিয়মুখ-চন্দা।"

মনের সেই সুখ-স্ফূর্ত্তি অনির্ব্বচনীয়। কবিদের মঞ্জু শ্লোক যেন অস্পষ্ট ও অবোধ্য মনে হইতে লাগিল। কি নূতন অনুভূতি, কি বিচিত্র রস!

৩

তরুণী বলিল, "চলুন না, ঐ টিলাটায় বনমল্লিকার ফুলে আমার খোঁপা সাজিয়ে দাঁড়াব, আর আপনি আমার ছবি তুলবেন।"

সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়। এ কথা কি কাব্যের না জীবনের? আজ মনে হইল, ইহাই সত্যের চিরন্তন শাশ্বত রূপ।

নির্জ্জন বনপথে তরুণ ও তরুণী। মনে কত দ্বন্দ, কত ভাব খেলিয়া যায়। পাইন-গাছের ছায়ায় টিলাটি দেখিতে সুন্দর ও শোভন। তরুণী উঠিতে অপারগ হইয়া বলিল, "আমার হাত ধরুন না।"

নিরুপায় আমি তরুণীর শিরীষ-কোমল হাত ধরিলাম। সারা অঙ্গে তাড়িত-রেখা বহিয়া গেল।

এ যেন নর ও নারীর আকাঙ্ক্ষা-ব্যাকুল স্পর্শ। চিত্ত উন্মনা হইয়া উঠে। পাইন-গাছের পাশ বাহিয়া বনমল্লিকা উঠিয়াছিল। তরুণী সেই ফুল তুলিয়া খোঁপায় পরিল।

পাইন-গাছের ধারে যখন হেলান দিয়া সে দাঁড়াইল, তখন তাহার চারু ভঙ্গিমা আমাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল। রূপ-দক্ষের বাঞ্ছিত আকৃতি, তাহার উপর সেই সুমধুর ব্যঞ্জনা-ময়ী ভঙ্গী।

ছবি তোলা হইলে তরুণী বলিল, "আসুন, এখানে বসি। দেখছেন, কাঞ্চন-জঙ্ঘা কেমন সুন্দর! আচ্ছা, বলুন ত, আপনি কাকে ভালবাসেন?"

অপরিচিতা তরুণীর এ কি প্রশ্ন!

বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম। তরুণীর কেশ-সুরভি আমার চারিদিকে যেন এক মোহের জগৎ গড়িয়া তুলিতে চায়।

তরুণী অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "বলুন না? বলবেন না? বেশ, আমি আড়ি করবো বলছি?"

কি করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। বলিলাম, "আজও বিয়ে করিনি।"

"এ কি উত্তর আপনার? মানুষ কি কখনও বউকে ভালবাসতে পারে? আপনার স্বপন-লোকের প্রিয়া যিনি আপনার মনের মাঝে শুধু বিজলী-ঝলক দিয়ে যান, কে তিনি?"

এ কি প্রলাপ উক্তি?

তরুণীর নীলাভ আয়ত চক্ষু দুইটির উজ্জ্বলতা মুগ্ধ করিয়া তুলে। বুঝিতে পারি না—ইহা রহস্য না কৌতুক? ইহা প্রলাপ না মনের ভাষা?

সভয়ে বলিলাম, "এখনও কারও ভালবাসা পাইনি।"

"বলেন কি? আপনার মাঝে যে অনঙ্গ অঙ্গ ধরেছেন, রূপসীরা যে আপনার পায়ে রূপের অর্ঘ্য নিবেদ-করবে।"

ত্রাসে শিহরিয়া উঠিলাম। তরুণীর বাক্যের না[illegible] আমাকে উতলা করিয়া তুলে। কিন্তু বলি বলি করিয়া[illegible] বারণ করিতে পারি না।

"আমায় ভালবাসেন কি? আপনার পায় পড়ছি, হাসবেন না। আমি বড় দুঃখী। মা আমার অল্পবয়সে মারা গেছেন, বাবা আবার বিয়ে করেছেন, আমার মনের ব্যথা দেখবার কেউ নেই।"

সহানুভূতিতে চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল।

"আচ্ছা, আপনি ত অনেক বই পড়েছেন। নারীর দুঃখ কিন্তু কেউ বুঝলে না। পুরুষের কাছে নারী চিরদি[illegible] সম্পত্তি। পুরুষ নারীকে জয় করতে চায়, কিন্তু—"

তরুণী চুপ করিল। নারী-পুরুষের এই সমস্যার ক[illegible] পুরাতন ও বাসি হইয়া গিয়াছে। ভাল লাগে না, আর এ সব মতবাদ লইয়া মাথা ঘামাইতে আমি মোটেই রাজী নই।

আমার মুখের দিকে তৃষিত কাতর দৃষ্টি মেলিয়া তরুণী বলিল, "আপনাকে বিরক্ত করছি কি?"

আমি সসম্ভ্রমে উত্তর দিলাম, "না, বলুন!"

তরুণী সভয়ে চারিদিকে চাহিল। শাড়ীর ভিতর হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল, তার পর বলিল, "হাঁ, কি বলছিলাম? নারীর আত্মা আছে, এ কথা কি আপনি মানেন?"

তরুণীর মোহময় সঙ্গ ভাল লাগে, কিন্তু আবার অস্বস্তিতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। ভয় হয়, যদি কেহ আমাদের এরূপভাবে দেখিয়া ফেলে।

উত্তর না পাইয়া তরুণী বলিল, "জানবেন, নারীরও আত্মা আছে।"

"নিশ্চয়ই, এ কথা কে অস্বীকার করবে?"

"বলেন কি? আপনি কি এ জগতের মানুষ নন? এ জগতের সবাই বলেছে আর বলছে—নারীর আত্মা নেই।"

আমি বিস্ময়ে তরুণীর ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পাইন-তরুর ফাঁকে আলোর রশ্মি আসিয়া তরুণীর গৌর বর্ণকে আরও সুন্দরতর করিয়া তুলিল।

আমি ধীরস্বরে বলিলাম, "এ আপনি অন্যায় বলছেন, বর্ত্তমানের মানুষ নারীর কত সম্মান করে।"

তরুণী আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, "ভুল, আপনার একান্ত ভুল,—আপনি আমার কথা শুনুন, তা হ'লে বুঝতে পারবেন।"

অদূরে কোকিল-বধূ ডাকিয়া উঠিল। নির্জ্জন বনস্থলী কম্পিত হইয়া উঠিল।

তরুণী বলিল, "ঐ যে আর্ত্ত কোকিলা ডাকছে, ওর ভাষা কি আপনি কখনও পড়তে চেয়েছেন? বিরহিণী বধূর মত ঐ যে ও কাতর সুরে ডাকছে—ও যেন আমারই অন্তরের ডাক। আমার ব্যথা যেন ওর মুখে সুর হয়ে উঠছে!"

আমি ত্রস্ত হইয়া বলিলাম, "বলুন, আপনার কিসের দুঃখ?"

"বলছি, না ব'লে আমার মনে শান্তি হবে না, কিন্তু নিশ্চয়ই আপনার কষ্ট হচ্ছে।"

তরুণীর দৃষ্টি শূন্য, যেন কি এক চিন্তায় সে বিহ্বল হইয়া পড়িল। আমি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলাম, "না না, আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না, আমার এখন কোন কাযই নেই, আর আপনার কথা আমার খুব নূতনতর—মিষ্ট লাগছে।"

স্তোকবাক্য নহে, সত্যই এই অপূর্ব্ব তরুণীর অপূর্ব্ব কথোপকথন আমার হৃদয়ে নূতন এক ভাব জাগাইতেছিল।

খানিক পরে তরুণী যেন আত্মস্থ হইল, তার পর মেঘের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখছেন, কি সুন্দর! দেববালারা সব সুরধুনীর তীরে জলকেলি করছেন—কি নয়নবিমোহন ছবি!"

আমি মেঘের লঘু সঞ্চালন দেখিলাম, কিন্তু অন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বলিলাম, "কৈ, কিছুই দেখছি না।"

"দেখছেন না? না, তা দেখবেন বা কি ক'রে, দেখতে হ'লে যে শক্তি চাই, তা আপনাদের নেই, ওই দেববালারা ও ত নন্দনে পুষ্পমাল্য তুলেছে, আর—"

তরুণী থামিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

আমি তরুণীর সুগৌর আননমণ্ডলে নানা ভাববিবর্ত্তনের বিচিত্র লীলা দেখিতে লাগিলাম।

কতক সময় পরে তরুণী বলিল, "কি বলছিলাম? হাঁ, তাঁকে আমি খুবই ভালবেসেছিলাম, সারা মন-প্রাণ দিয়ে, যৌবনের উচ্ছ্বসিত আবেগ দিয়ে, সমস্ত ধ্যান দিয়ে, সমস্ত গান দিয়ে, সমস্ত কাব্য দিয়ে—"

বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কাকে ভালবেসেছিলেন?"

"ওঃ, বলিনি বুঝি? তাঁর নাম অজিত। আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকতেন। কি সুন্দর গঠন, অবিকল আপনার মত চেহারা। ভাল বাঁশী বাজাতেন। আমি জানালার পাশে ব'সে পড়তাম আর তিনি পাশ দিয়ে যেতেন। কি ভুবন-ভুলানো হাসি!"

তরুণী যেন কল্পনায় পুনরায় সেই হাসির স্পর্শ অনুভব করিল। পরে আরক্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "আমার সমস্ত নারী-প্রকৃতি জেগে উঠল। আমি মনে মনে বল্লুম, ওঁকে জয় করবো।"

"তার পর?"

"তার পর অনেক ঘটনা, মনে নেই, কিন্তু দিনে দিনে আমার ভালবাসা বেড়ে উঠল। আপনি শেলী পড়েছেন? অমন লেখা আর হয় না। শেলী যেন আমার মনের কথা জেনেই লিখে গেছেন। হাসবেন না, রাম না হ'তে রামায়ণ হয়েছিল। বলুন ত কোন্ শ্লোকটা?"

আমি শেলী যথেষ্ট পড়িয়াছি, কিন্তু তরুণী কোন্ কবিতার কথা বলিতেছেন, কেমন করিয়া বলিব?

যুবতী বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়া পদগুলি যেন খুঁজিয়া পাইল। উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাই বলিল, "হাঁ, মনে হয়েছে, সেই অমর চরণগুলি :—

The desire of the moth for the star, .
Of the night for the morrow.
The devotion to something afar.
From the sphere of our sorrow."

ইংরাজী যেন পোষাপাখীর মত তরুণীর কণ্ঠে নাচিতে লাগিল। উচ্চারণ কি সুন্দর! উল্লাসে তাহার সারা দেহ কাঁপিতে লাগিল। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এমনই ভাব হ'ল। তিনি যেন আকাশের প্রোজ্জ্বল তারা, আর আমি যেন অন্ধকার লণ্ঠনের গায়ে আলোপিয়াসী পতঙ্গ; তিনি যেন হাসি-রঙ্গে ভরা উষার আলো, আর আমি যেন ব্যথা-বেদনার মসীমাখা আঁধার রাত্রি। তাই আমার ভালবাসা কূলহারা হয়ে তাঁর দিকে ধেয়ে গেল।"

তরুণী চুপ করিল। পরে শান্ত হইয়া বলিল, "তিনি আমার ভালবাসায় সাড়া দিয়েছিলেন, আমি বাবাকে বল্লুম, ওঁকে বিয়ে করবো। সবাই হেসে উঠল, বললে, 'তুই কি পাগল হয়েছিস?' আচ্ছা, বলুন, এ ভালবাসা কি পাগলামী?"

আমি বলিলাম, "তার পর?"

"বা! এ কি আপনি গল্প পেয়েছেন যে, কেবলই তার পর জিজ্ঞাসা করছেন? আমার ব্যথার গভীরতা হৃদয় দিয়ে বুঝবেন না?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। খানিক পরে তরুণী কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "রাগ করলেন কি?"

"না।"

"রাগ করবেন না। আমি বড় দুঃখী, আত্মীয়-স্বজন কেউ আমার ব্যথা বুঝে না, সবাই শুধু বিধি-নিষেধের পাষাণ-কারায় বেঁধে রাখতে চায়। আপনি আমার ব্যথা বুঝছেন কি?"

বিপদের হাত এড়াইবার জন্য হয় ত বলিলাম, "হাঁ।"

"তিনি হতাশ হয়ে চ'লে গেলেন, বাবা আমায় বেথুন-কারাগারে পাঠালেন। কিন্তু আমার মন ছুটে যায়, ভারতসাগর পার হয়ে আরবদেশের খর্জ্জুর-বীথির মাঝে—"

"এখন তিনি কোথায় আছেন?"

তরুণী বিরক্ত হইয়া বলিল, "ঐ যে আকাশে আপনাকে দেখালুম, দেববালারা তাঁর পূজার জন্য মাল্য রচনা করছে।"

খানিকক্ষণ কেহ কথা কহিলাম না। বহুক্ষণ আলাপে তরুণী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সহসা তাহার মনের মধ্যে কি যেন প্রবল ভাব জাগিয়া উঠিল। সে সরিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আপনাকে তাঁর মত দেখতে, আপনি আমায় ভালবাসবেন কি, বলুন?"

তরুণীর অঙ্গস্পর্শ আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। সম্মুখে সুধার সমুদ্রের মত তরুণীর রক্তগোলাপ সম অধরোষ্ঠ। প্রলোভন সংবরণ করা দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল। তরুণীকে প্রণয় নিবেদন করিব কি না, তাহাই ভাবিতেছিলাম।

এমন সময়ে পাশে জুতার মস্‌মস্ শব্দ হইল। তরুণী গলা বাড়াইয়া দেখিল, কে আসিতেছে। সহসা তাহার সমস্ত মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ব্যাধভীতা হরিণীর ন্যায় সে ছুটিয়া পলায়ন করিল। আমিও ত্রস্ত-ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

৪

খানিক পরে দুই তিন জন ভৃত্যসহ একটি তরুণ যুবক আসিল। আকৃতি-সাদৃশ্যে তাহাকে তরুণীর ভাই বলিয়া মনে হইল।

যুবক প্রশ্ন করিল, "একটি মেয়েকে এ দিকে দেখেছেন কি?"

"হ্যাঁ, ব্যাপার কি, বলুন ত?"

"ওটি আমার ছোট বোন্ উৎপলা; বেথুনে বি-এ পড়ত, কলেজ-বই ছেড়ে কেবল বিদেশী উপন্যাস আর কাব্য পড়ত। বেশী পড়েই ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

তরুণীর গোপন আশ্রয়-স্থান ভৃত্যদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, "যা, তোরা ওকে বুঝিয়ে ডেকে নিয়ে আয়।"

পরে তরুণীর ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "কোনও Love episode আছে কি?"

যুবক বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া বলিল, "কৈ না, তেমন কিছুই জানি না।"

"অজিত ব'লে কোন ছোকরাকে কি জানেন?"

"হ্যাঁ, সে আমারই সহপাঠী।"

"তিনি যুদ্ধে মারা গেছেন কি?"

"না, সে লক্ষ্ণৌ কলেজে কায করছে।"

ভাবনায় পড়িলাম। তবু যাহা জানি, ভাইকে জানাইলাম:—"আপনার ভগ্নী কোনও অজিতকে ভাল-বাসেন, আর তাঁর ধারণা যে, তিনি যুদ্ধে মারা গেছেন। এই ভুল ধারণা যদি ভেঙ্গে যায়, তবে হয় ত তাঁর রোগ সেরে যেতে পারে।"

যুবক নম্রচিত্তে বলিল, "আপনার কথা শুনে বড়ই খুসী হলেম। অজিতকে হয় ত উৎপলা ভালবাসে। অজিতকে চিঠি লিখছি, সে এলে হয় ত উৎপলা ভাল হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা, নমস্কার।"

বাসায় ফিরিলাম। সারাদিন মনের কোণে কি যেন কি ভাব জাগিয়া উঠে। বুঝিলাম, কত দুর্ব্বলচিত্ত আমি। মাকে চিঠি লিখিলাম, রেবাকেই বিবাহ করিব।

পরদিন মেলেই কলিকাতা ফিরিলাম।

৫

উৎপলার আর খবর লই নাই।

সে দিনের স্মৃতি শুধু আমার মনে নহে, চিত্রে আপন ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। সুন্দর সেই আলেখ্যটি ব্রোমাইড এন-লার্জমেণ্ট করিয়া শয়নকক্ষে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছি।

রেবাকে সমস্ত বলিয়াছি। প্রিয়তমা পত্নীর নিকট হইতে জীবনের কোনও কাহিনী গোপন রাখিতে পারি না। তাঁহাকে সব বলিয়াছি।

মাঝে মাঝে কৌতুক করিয়া রেবা বলেন, "ঐ ত তোমার মানসী প্রিয়া?"

চপলা পত্নীকে বক্ষে ধরিয়া দুষ্টামীর প্রতিফল দিয়া বলি, "হাঁ, তাই বটে!"

কুপিত হইয়া প্রিয়তমা বলেন, "আমি তা হ'লে বাপের বাড়ী চ'লে যাই।"

আমি হাসিয়া বলি, "যাও!"

রাগ বাড়িয়া চলে, তখন স্বীকার করিতে হয়, "রেবাই আমার মানসী, রেবাই আমার ধ্যানের ছবি।"

রেবা খুসী হইয়া উঠে, পিয়ানোয় সুর দিয়া গান গাহিতে বসে।

রেবা গান গাহিতে জানে। সুরের ধারায় বিশ্ব প্লাবিত হয়, জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গান জাগিয়া উঠে।

নিমীলিত-নয়নে ভাবি—'উৎপলার সেই সঙ্গ আমার জীবনে কি রেখা রাখিয়া গিয়াছে?'

সুরের রণনে অব্যক্ত কি বেদনা চিত্তে রহিয়া রহিয়া খেলিয়া যায়। গান থামাইয়া রেবা জিজ্ঞাসা করে, "কি? তোমার ভাল লাগছে না?" কথা বলি না। রেবা চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে যেন আমার অলক্ষ্যে আদরের রেখা গণ্ডে রাখিয়া দেয়।

আমার মনে সেই পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া ওঠে। দার্জ্জিলিঙ্গের সেই নবমল্লিকাবল্লীজড়িত পাইন-গাছ—সেই সুন্দর প্রভাত, সেই বনমালার মত সরলা উৎপলা, সেই স্পর্শ-ব্যাকুলতা, চলচ্চিত্রের ছবির মত মনের আয়নায় ভাসিয়া যায়।

কি যেন কি উদাস সুর মনে জাগিয়া উঠে। ভয়ে রেবাকে আদর করিয়া কোলে টানিয়া লই।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম্, এ বি, এল)।

উপেক্ষিতা

হিন্দুর গৃহ প্রাঙ্গণে আমি অনামিকা ফুলবালা
এক কোণে রই দীনা কুণ্ঠিতা সহি ঘৃণা বহি জ্বালা,
সবাই যখন ফুটে গো আমার তখন ফুটিতে নাই,
সাঁজে ভোরে আমি নাহি ফুটি' দিন-দুপুরে ফুটি গো তাই।
হায়—আমি যে শবরীবালা,
আমাতে হয় না দেবতার পূজা, হয় না কবরীমালা।

আমি দিন যাপি পত্রলেখার নীরব বেদনা নিয়া
জীবনের এই খেয়া-নায়ে লুটে মীনগন্ধার হিয়া।
ভাব' কি মর্ম্ম হৃদয়ধর্ম্ম তোমাদেরি শুধু আছে?
করি হৃদিহীন বুঝি বিধি দীন শবরীকে গড়িয়াছে?
থাক্—সে কথা ব'লে কি ফল?
তাই বলি কেহ মুছিবে না হীন অশুচির আঁখিজল।

বৈকাল হ'তে সন্ধ্যামণিরা করে বারনারী-সাজ,
বালিকারা করে তাদেরো আদর হেরি আর পাই লাজ।
চামেলি গোলাপ লভে মর্য্যাদা কোন্ দেশী তারা শুনি?
পরদেশী ঐ হস্নুহানারে শুচি কয় কোন্ মুনি?
থাক্—সে কথা বলো কে কয়?
পাতাবাহারের গরবিণী মেয়ে মা-গোসাই তারা নয়।

আছে তাদের শ্রীমাধুরী আর শোভন গন্ধামোদ,
তাহাদের সনে তুলনা চলে না আছে এতটুকু বোধ।
তবু বলি, আমি কুরূপা হলেও আছে মোর ক্ষুধা-তৃষা,
নারীর ধর্ম্ম সকলি, আমারো আসে বাসন্তী নিশা।
হায়—হৃদয় কেহ না খুঁজে
অধমার হৃদি নহে প্রেমহীন, বুঝেও কেহ না বুঝে।

মানি অধিকার নাহিক আমার জানি আমি হেয় হীনা,
প্রেমের তত্ত্ব বুঝি না ভাবিয়া করো না অমন ঘৃণা।
বুঝি তোমাদের প্রেম আলাপন যদিও শ্রবণ রুধি
বুঝিতেও পারি চুমা-কাড়াকাড়ি যদিও নয়ন মুদি।
মোর—বলিবার কিছু নাই—
বলিতেছিলাম এ নহে আমার ফুটিবার ঠিক ঠাঁই।

শ্রীকালিদাস রায়।

আগমনী

১

সারা বরষ দেখিনি মা ও মা উমা তুই কেমন ধারা।
তারা-হারা হয়ে মা গো আমি হারায়েছি নয়ন-তারা॥

একটি বৃদ্ধ একতারা বাজাইয়া সজল-নয়নে এই গান গায়িতেছিল। দত্তবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ গান করিতেছিল। পাড়ার অনেক স্ত্রীলোক চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া জুটিয়াছেন। বর্ষীয়সী দুই এক জন অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

বৃদ্ধ একটি একটি করিয়া অনেকগুলি আগমনী গান করিল। শরৎকালের প্রভাত। নীলাকাশে সোনালি কিরণ ঢেউ খেলাইতেছিল। মা দশভুজার আবাহনগীতি পল্লীতে পল্লীতে ধ্বনিত হইতেছে। আর পল্লীর প্রাণ সেই গীতির ঝঙ্কারে আশা-আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

গান শেষ হইলে শ্রোতার দল ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। দত্তপরিবারের বধূ সরযূ নামিয়া আসিতে দেখিলেন, সিঁড়িতে একটি বালিকা বসিয়া আছে। তাহার বয়স সাত আট বৎসরের বেশী হইবে না। মেয়েটি শ্যামবর্ণা। কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য তাহার রঙ উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। মুখখানিও যেন ঢল-ঢল করিতেছে। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল,—কপালে কপোলে আসিয়া দুলিতেছে। পরিধানে একখানি লাল ডুরে। সরযূ তাহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না।

'ওগো মেয়েটি, তুমি চুপটি ক'রে ওখানে ব'সে কি করছো?'

মেয়েটি সপ্রতিভভাবে অঞ্চলের প্রান্তে অঙ্গুলি জড়াইতে জড়াইতে বলিল, 'আমায় কেন যেতে দিলে না?'

'ও মা! কোথায় যেতে দিলে না তোমাকে?'

'ঐ হোথা।' বলিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে মস্তক হেলাইল। সরযূ বুঝিলেন যে, বোধ হয়, মেয়েটি নীচজাতীয়া হইবে। তবুও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে তোমায় যেতে দিলে না, বল ত?'

'ঐ ওরা।—তুমি যেতে দিলে না!' বলিয়া মেয়েটি ঈষৎ ঠোঁট ফুলাইল।

সরযূ হাসিলেন; বলিলেন, 'কৈ, আমি ত তোমায় যেতে বারণ করি নি! আচ্ছা, তুমি আস্‌বে, এস।'

'নাঃ। আমি ত যাব না। তোমরা আমায় ত ডাক নি। আমি যাব না।'

মেয়েটি কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল। সরযূ কৌতুক অনুভব করিলেন; বলিলেন, 'আচ্ছা, এস ত, লক্ষ্মি, আমার সঙ্গে ভিতরে এস। কিছু খাবে এস।'

'না, আমি যাব না। ওপাড়ায় বামুনবাড়ীতে ঠাকুর গড়ছে, তারা আমায় কত খেতে দেয়। আমি সেখানে যাই।' বলিয়া মেয়েটি কপালের অলকগুচ্ছ সরাইতে সরাইতে চলিয়া গেল।

সরযূ অন্যমনস্কভাবে ভিতরে গেলেন। ওপাড়ায় বামুনদের বাড়ীতে ঠাকুর গড়া হইতেছে শুনিয়া তাঁহারও মনে একটু ব্যথা বাজিয়াছে। দত্তবাড়ীতে বহুকাল হইতে পূজা হইয়া আসিতেছে। এবারে কর্ত্তার হুকুমে পূজা বন্ধ হইয়াছে। আগমনী গান শুনিতে শুনিতে দুই একবার সরযূর চক্ষু ছল-ছল করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উপায়ও নাই। এবারে শাশুড়ী রাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছেন, সংসারে তিনি একা। পূজার ঝক্‌কি সামলানো তাঁহার কায নয়। এবারে পূজা হইতে পারে না।

সরযূ এ সকল চিন্তাকে বিদায় দিয়া গৃহ-কাযে মন দিয়াছেন। তাঁহার কন্যা উষা আসিয়া বলিল, 'মা, একটি ছোট মেয়েকে দেখেছ?'

'কে ছোট মেয়ে?'

'সেই যে, মণ্ডপের সিঁড়িতে ব'সে দুলে দুলে গান শুন্‌ছিল? একখানি লাল ডুরে পরা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল?'

'হ্যাঁ, ও, সেই মেয়েটি! তুমি কোথায় দেখলে তাকে?'

"আমি শান্তিকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলুম। ফিরে আসতে পথে তার সঙ্গে দেখা হ'ল। সে আমায় কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'তোর মা আমায় ভালবাসে না।' তুমি কি মা তাকে মেরেছ?"

'কৈ, না ত। আমি তাকে বরং খাবার দিতে চেয়েছিলাম।'

'সে তবে কাঁদলো কেন? আহা, খাসা মেয়েটি!'

'সে বললে, আমি তাকে মেরেছি?'

'না, তা বললে না। শুধু বললে, তোর মা আমাকে

ভালবাসে না, তোদের বাড়ীতে আমি আর যাব না। তোদের বাড়ীতে পূজো দেখতে আমি বছর বছর আসি, এবারে আর আস্‌ব না। আমায় কেউ ডাকে না।'

'আশ্চর্য্য! অতটুকু মেয়ে এই সব কথা বল্লে?'

'মা, আরও আশ্চর্য্য শুনবে? এই সব ব'লে মেয়েটি যে কোথায় গেল, তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। কে মা মেয়েটি?'

সরযূ কন্যার প্রশ্ন শুনিতে পাইলেন কি না, বুঝা গেল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বছর বছর বাড়ীতে পূজো দেখতে আসে, অথচ তিনি পূর্ব্বে কখনও মেয়েটিকে দেখেন নাই। সমস্ত দিন তাঁহার মনে সন্দেহ ধক্-ধক্ করিতে লাগিল।

২

বিকালে দীঘির ঘাটে অনেক প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা হইল। যাঁহারা সে দিন সকালে গান শুনিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রবীণা দেখিয়া দুই এক জনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা কেহ মেয়েটিকে চেনেন কি না।

কেহ বলিলেন, ওঃ, সে যে হরি কর্ম্মকারের মেয়ে, কেহ বলিলেন, না না, ও সে ঐ ওপাড়ার কৈবর্ত্তদের মেয়ে। আবার কেহ বলিলেন, না না, তাদের পাড়ায় অমন মেয়ে নেই, সে নিশ্চয়ই দীনবন্ধু গোয়ালার মেয়ে।

একটি বৃদ্ধা বলিলেন, 'ও মা, সেই লাল ডুরে পরা মেয়েটি?'

'হ্যাঁ।'

'ওঃ আমার কপাল! সে যে তিলক সা'র মেয়ে। আমি তাকে খুব চিনি। সে আমাদের বাড়ীতে তার মা'র সঙ্গে বেড়াতে আসে মাঝে মাঝে। সামনের দুটো দাঁত একটু উঁচু।'

'না মা, এ মেয়েটির ত দাঁত উঁচু নয়।'

'নিশ্চয়ই উঁচু। মাথায় একরাশ চুল। উকুনে ভরা—'

সরযূ বুঝিলেন, প্রতিবাদ বৃথা। তিনি আরও দুই এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন কোনও সন্ধান পাইলেন না, তখন সে চেষ্টায় বিরত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনে কেমন যেন একটু খটকা রহিয়া গেল।

উষা কিন্তু মেয়েটিকে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। সে শুনিয়াছিল যে, বামুনদের বাড়ীতে ঠাকুর গড়া হইতেছে, মেয়েটি সেখানে যাইবে বলিয়াছিল। অতি প্রত্যূষে সে সেখানে গিয়া জুটিল। অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা প্রতিমা-গঠন উৎসাহের সঙ্গে দেখিতেছে, কিন্তু উষার চক্ষু চারিদিকে কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। সে মেয়েটি কোথায় গেল? কাহাকেও সে জিজ্ঞাসা করে না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে কেবল ঐ প্রশ্নই জাগে, সে গেল কোথায়?

উষা সরযূর কন্যা নহে। উষার মাতা তাহাকে এক বৎসরের শিশুটি রাখিয়া চলিয়া যান। তাহার পিতা দুইটি মাস পার হইতে না হইতে সরযূকে গৃহে আনিলেন। সরযূকেই উষা মা বলিয়া জানে। নীলাদ্রির মাতা বাঁচিয়া আছেন। কিন্তু সংস্কারের নূতন বিধানে তিনি আপনাকে মোটেই মানাইয়া চলিতে পারিলেন না। রাস্তায় নূতন বিদ্যুতের আলো প্রবর্ত্তিত হইলে, পুরাতন গ্যাসের আলোর স্তম্ভগুলি যেমন ভাবে অনাবশ্যকতার অবজ্ঞা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনই এই দত্ত-পরিবারে গতপ্রয়োজনা মাতা বাঁচিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতেন, এ বাড়ীতে তিনি নহিলে এক দণ্ড চলে না, তিনি নহিলে উষার চলে না, লোক-জনের চলে না, পালপার্ব্বণ বন্ধ হয় ইত্যাদি। কিন্তু এই মত একা তাঁহারই; আর কেহ তাহা ভাবিত না।

উষার বয়স এগারো পার হইতে চলিয়াছে। ঠাকুরমার যত্ন-আদরেই সে এত বড়টি হইয়াছে। কিন্তু নীলাদ্রি ভাবিতেন অন্যরূপ। তাঁহার বিশ্বাস, মাতার যত্ন একটু কম হইলেই মেয়েটি মানুষ হইতে পারিত। তিনি কখনও কখনও বলিয়া ফেলিতেন, 'তোমার দায় কি, বাপু? যাদের মেয়ে, তারাই একটু দেখুক না দিন কতক!'

মা বলিতেন, 'বেশ ত! আমি ত তোমাদের উপর দিয়েই ব'সে আছি। তোমরাই দেখ।'

'হতভাগা মেয়েটা যে কিছুতেই বোঝে না। ও শুধু ঠাকুরমাকেই চেনে। বোঝে না যে, চিরদিন ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধ'রে থাকলে ওর পরকালটা খাওয়া যাবে।'

'তার দরকার কি? ওর ইহকাল, পরকাল যাতে ভাল হয়, তোমরা তাই কর। আমার ত মরণ নেই।'

সরযূ অন্য ঘর থেকে ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'ঐ এক কথা। মরণ নেই, মরণ নেই। আরে বাবু, মরণ ডাকলেই কি মরণ আসে?'—

'তা বউ-মা বলেই দেও না, কি করলে সেটা শীগ্‌গির আসে। তা হ'লে তোমরাও বেঁচে যাও, আমারও হাড় জুড়োয়।'

এমন কলহ এ বাড়ীতে মাঝে মাঝে প্রায়ই শুনা যাইত। আবার মিটিয়াও যাইত। কিন্তু এবার নীলাদ্রি কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। উষাকে তিনি কিছু দিন হইতে দেখিতে পারিতেন না। প্রায়ই বলিতেন, মেয়েটা অধঃপাতে গেল। শেষে এত দূর গড়াইল যে, সময়ে অসময়ে তিনি মেয়েটিকে প্রহার করিতেন। উষা যত বড় হইতে লাগিল, ততই যেন পিতার বিরক্তির মাত্রা বাড়িতে লাগিল। উপায়হীন ঠাকুরমা উপবাস করিয়া তাঁহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। কিন্তু একবার দিনান্তে যাহারা হবিষ্য করিয়া কোনমতে জীবন ধারণ করে, তাহারা উপবাস করিলে সংসারের এতটুকু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না।

৩

সংসারে অশান্তি যখন প্রবেশ করে, তখন তাহার গতি রোধ করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন। সরযূ দেখিলেন, স্বামীর ব্যবহার ক্রমেই রুক্ষ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ভাবিলেন, মেয়ের মঙ্গলের জন্য এটুকু নহিলে চলিবে কেন? তাহাকে ত স্বামীর ঘর করিতে হইবে। এখন হইতে সহবৎ না শিখিলে শ্বশুরবাড়ীতে লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না। নীলাদ্রি মনে করিতেন, সংসারের শৃঙ্খলা যখন তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে, তখন বিশৃঙ্খলা যাহারা ঘটাইবে, তাহাদের স্থান এ বাড়ীতে না হওয়াই ভাল। ফলে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে এক দিন মা বাড়ী ছাড়িলেন।

উষা অনেক কাঁদিল এবং যত কাঁদিল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী ভাবিল। তাহার তরুণ হৃদয়ে অশ্রুবাষ্প পুঞ্জীকৃত হইয়া সঞ্চিত হইল, কিন্তু মুখে ফুটিয়া সে কিছু বলিত না। ভাবিত, মা কি মনে করিবেন।

সরযূ অনেক কিছু মনে করিতেন। তাঁহার কোনও সন্তান নাই। তিনি উষাকে মায়ের ন্যায়ই যত্ন করিতেন। মাতৃহারা শিশুকে যতদূর সম্ভব তিনি আপনার স্নেহচ্ছায়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে চাহিতেন। কিন্তু সে চাহিত ঠাকুর-মা'র কোল। ঠাকুরমা তাহার কোনও উপকারই করিতে পারিতেন না। তাহাকে একটি ভাল জামা বা একটা ভাল ডলি পুতুল দিতে পারেন, এমন সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না। তথাপি তাহার বালিকা-হৃদয় এই উপেক্ষিতা, উপায়হীনা রমণীর অঞ্চলখানি আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে ভালবাসিত। সরযূর ইহা যে শুধু ভাল লাগিত না, তাহা নহে, তিনি কোনও মতেই এই পক্ষপাতিত্বে প্রশ্রয় দিতে পারিতেন না। কেন? সবই ত আমি করি। উষার যত ভাল কাপড় আছে, যত গহনা আছে, যে সব খেলনা আছে, সে সকল কে দিয়াছে? অকৃতজ্ঞ বালিকা তথাপি ঠাকুর-মার আঁচল ধরিয়া ঝুলিবে কেন? এই অবিচারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহার চিত্ত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিত। শেষটা সমস্ত রাগ গিয়া পড়িত তাহার শাশুড়ীর উপর। তিনিই ত আদর দিয়া দিয়া মেয়েটাকে মাটী করিতে বসিয়াছেন।

শাশুড়ী যখন রাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন, তখন সরযূ এক বিষয়ে একটু নিশ্চিন্ত হইবার সুযোগ পাইলেন। উষাকে লইয়া এখন আর তাঁহাকে সকালে সন্ধ্যায় বিব্রত হইতে হইবে না। অতঃপর তাহাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া লওয়া যাইবে।

উষার মনের মধ্যে যাহাই থাক্, সে মায়ের কথার অবাধ্য হইয়া চলিত না। সে বুঝিত যে, মায়ের যত্নের অবধি নাই। তাহার সঙ্গিনীদের মায়েরা যাহা করেন, তাহার মা তদপেক্ষা একটুও কম করেন না। মায়ের জন্য তাহাকে একটুও অভাব বোধ করিতে হয় না। সুতরাং মায়ের কথায় সে উঠিত, মায়ের কথায় বসিত। কিন্তু কোথা হইতে ঠাকুরমায়ের মুখখানি মনে পড়িয়া সব আঁধার করিয়া দিত। ঠাকুরমাকে সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না।

নীলাদ্রি জমীদারীতে গিয়াছেন। এই সময় প্রজারা খাজনা দেয় তাহাই আদায় করিবার জন্য তিনি মফঃস্বলে গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, এবারে পূজা হইবে না। মা নাই, পূজা করিবে কে? প্রয়োজন নাই পূজায়। পাল আসিল প্রতিমা গড়িতে। সরযূ বলিয়া দিলেন, এবারে পূজা হইবে না, বাবু বলিয়াছেন। পাল কিছু-ক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল, তার পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় একবার বাড়ীটার দিকে ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, ঠিক তেমনই দাঁড়াইয়া আছে। অথচ পূজা হইবে না, বলে কি? সে চলিয়া গেল। পটুয়া আসিল, গোমস্তার নিকট বাবুর আদেশ, গৃহিণীর আদেশ শুনিল।

সে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল। যে সাজ দেয়, সে আসিল। যে মালা দেয়, সে আসিল। সকলেই ঐ এক কথা শুনিয়া চলিয়া গেল।

সরযূ ভাবিলেন, পূজোর ক'টা দিন মা থাকিলে মন্দ হইত না। শরতের রোদ ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। আকাশে দুই এক খণ্ড মেঘ ধূনার ধোঁয়ার মত ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাতাস যেন চন্দনের গন্ধ ছড়াইতে লাগিল। কোথা হইতে আসে ধূনার ধোঁয়া? কোথা হইতে আসে চন্দনের গন্ধ? কে বলিবে?

৪

পূজার আর কয়েক দিন মাত্র বাকী। নীলাদ্রি জমীদারী হইতে টাকা-কড়ি ও দ্রব্যসম্ভার লইয়া আসিয়াছেন। পূজায় যে সমস্ত জিনিষের দরকার হইতে পারে, কর্ত্তারা প্রজাদের নিকট হইতে সেই সমস্ত জিনিষ লইয়া আসিতেন। মনিব-বাড়ীতে পূজা হইবে বলিয়া তাহারা সমস্ত গুছাইয়া দিত। এবারে পূজা হইবে না বলিয়া নীলাদ্রি স্থির করিয়াছিলেন যে, সে সমস্ত অনাবশ্যক জিনিষ প্রজাদের নিকট হইতে লইবেন না। কিন্তু বৃদ্ধ প্রজা নকুড় দুলে বলিল, 'হুজুর, তাও কি হয়! এ বছর পূজো না হয়, সামনের বছরে হবে। একবার পরবী উঠে গেলে আর কেউ দেবে না।' কাযেই তাঁহাকে সে সমস্ত বহিয়া আনিতে হইল।

সেবারে খাজনাও বেশ আদায় হইয়াছিল। নীলাদ্রি বাড়ীতে আসিয়া সরযূকে গহনা গড়িবার জন্য দুই শত টাকা দিলেন। বলিলেন, 'পূজোর খরচটা বেঁচে গেল যখন, তখন তোমার একটা কিছু জিনিষ হয়ে থাক্।'

সরযূর মনে নিমেষের জন্য একটু ধাক্কা লাগিলেও তিনি অত্যন্ত খুসী হইলেন। বলিলেন, 'আমার জন্যে তাড়াতাড়ি কি? খুকুকে একটা কিছু দাও। তা'র অসুখ, কিছু পাবে শুনলে তার আহ্লাদ হবে এখন।'

নীলাদ্রি সে জন্যও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আর ৫০টি টাকা সরযূর হাতে দিয়া বলিয়া দিলেন, 'তাকে একটা 'মফ্ চেন' ক'রে দিও।'

সরযূ এই সংবাদটুকু খুকুকে দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু সে জ্বর-ঘোরে অচেতন। তাহার আজ কয়েক দিন জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন, জ্বরও মাঝে মাঝে কমিয়া যায়, কিন্তু তাহার সব সময়ে সাড়া পাওয়া যায় না। আজ জ্বর কিছু বাড়িয়াছে। নীলাদ্রি তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাহার কপালে মথে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

'উষা, আমি কে বল ত! উষা!'

উষা 'বাবা' বলিয়া একবার ডাকিয়াই চোখ মুদ্রিত করিল। নীলাদ্রি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিলেন, 'মা'কে ডাকে?'

'কখনও কখনও। যখন ভুল বকে, তখন ডাকে। নয় ত আমাকেই ডাকে।'

সরযূ উষার কপাল ভিজাইয়া দিতে লাগিলেন। উষার অসুখ বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। সরযূ নীলাদ্রিকে ধরিলেন, 'মাকে আন্‌তে লোক পাঠাও।'

নীলাদ্রি উত্তর করিলেন, 'মা কি আসবেন? একে ত তিনি রেগে চ'লে গিয়েছেন। তার ওপর পূজো বন্ধ। তিনি কখখনো আসবেন না।'

আসল কথা, ছেলের অভিমান। যে মাকে এক দিন বিদায় ক'রে দিয়েছি, আজ আবার দায়ে প'ড়ে তাঁকে আনতে যাবো? তা কখনো হ'তে পারে না। উষা দু'-দিনেই ভাল হয়ে যাবে। চিন্তা কি?

সরযূ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ডাক্তারও নিশ্চিন্ত হইতে বলিতে পারেন নাই। সুতরাং সরযূ বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

মহালয়ার পরদিন হইতে বামুনদের বাড়ীতে নহবৎ বসিয়াছে। গভীর রাত্রিতে যখন নহবৎ-বাজিতেছিল, উষা চোখ মেলিয়া যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। সরযূ শিয়রেই বসিয়াছিলেন। বলিলেন, 'কি মা?'

উষা বলিল, 'বামুনদের বাড়ীতে পূজো হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, পূজো হবে। তুমি সেরে ওঠ, দেখতে যাবে।'

'আমি যাব মা, পুজো দেখতে। সে আসবে সেখানে?'

'কে আসবে রে? কার কথা বলছিস্?'

"সেই যে, সেই মেয়েটি—যে বছর বছর আমাদের বাড়ীতে পূজো দেখতে আসে? সেই লাল ডুরে পরা!"

সরযূ শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, সেই 'আগমনী' গীতি। সেই মণ্ডপের সিঁড়িতে যে লাল ডুরে পরা মেয়েটি বসিয়াছিল। তাহার সেই অভিমানভরে ঠোঁট

ঝুলানো—সবই মনে পড়িল। তিনি স্বামীকে কতক কতক বলিলেন, কিন্তু স্বামী সে কথায় একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন মাত্র। কোথাকার কে একটি মেয়ে বলিয়া গিয়াছে যে, সে আর এ বাড়ীতে আসিবে না, তাই মা ও মেয়ের ঘুম নাই। সে নিশ্চয়ই এই গাঁয়ের অথবা পাশের গাঁয়ের মেয়ে।

সরযূ আবার অনুরোধ করিলেন, 'মাকে এইবার আন।'

নীলাদ্রি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

৫

ষষ্ঠী আসিল। কিন্তু দত্তবাড়ীতে সব নিরানন্দ। উষার অসুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এক জনের স্থলে চারি জন ডাক্তার দেখিতেছেন; কিন্তু রোগের কোনও উপশম দেখা যাইতেছে না। নীলাদ্রির মাতা আসিয়াছেন। নীলাদ্রি অভিমানে লজ্জায় অন্দর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মাতা অনবরত চোখের জল ফেলিতেছেন। সে ধারার বিরাম নাই। উষার জন্য তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। শূন্য চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিলে তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে হাহাকার উঠিতেছিল।

উষার চোখ দিয়াও অবিশ্রান্ত জল পড়িতেছিল, সে কি তবে ঠাকুরমার প্রাণের ব্যথা বুঝিতে পারিয়াছে? তাহা বুঝা গেল না। ঠাকুরমা যে আসিয়াছেন, তাঁহাও সে বুঝিতে পারে নাই। একবারমাত্র দুটি হাত বাড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল। অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিল, 'এ বাড়ীতে কেউ তাকে ভালবাসে না, সে আর এ বাড়ীতে পূজো দেখতে আসবে না।'

তাহার ঠাকুরমা সরযূর দিকে চাহিলেন। সরযূ সংক্ষেপে সেই অজানা মেয়ের কথা বলিলেন। ঠাকুরমা কাঁপিয়া উঠিলেন। সরযূর চোখেও ধারা বহিল।

নীলাদ্রি সরযূকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খুকু এখন কেমন?'

'ভাল ত মোটেই নয়। মা যে কি লিখেছেন কপালে—'

তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাকে কে আনিয়েছে?'

'আমি।'

নীলাদ্রি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সে দিন উষার অসুখ বড়ই বাড়িয়া গেল। ডাক্তাররা বিষণ্ণ-মনে বাহিরে গিয়া বসিলেন। রোগীকে ঔষধ খাওয়ান যাইতেছে না। ঠাকুরমা মাটীতে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে রক্তপাত করিলেন। সরযূ চোখ মুছিতে মুছিতে মুখ-চোখ লাল করিয়া ফেলিল। নীলাদ্রি পাষাণের মত স্থির-গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি যেন আর কাটে না।

নিশীথ রাত্রি। রোগীর শয্যাপ্রান্তে সকলে নীরবে বসিয়া আছেন—নিশ্চিতের প্রতীক্ষায়। কাহারও মুখে কথা নাই। সকলেরই দৃষ্টি রোগীর মুখের দিকে। এমন সময় বাহিরে ও কিসের শব্দ? রোশনচৌকী আগমনী ধরিয়াছে।

নীলাদ্রি সরযূর দিকে চাহিলেন। সরযূ মাথার কাপড় টানিয়া দিল। তাহার শাশুড়ী নাকাড়ার শব্দে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। উষার নিশ্বাস দ্রুততর হইতেছিল।

নীলাদ্রি জিজ্ঞাসিলেন, 'ব্যাপার কি? রোশনচৌকী কে আসতে বল্‌লো?'

সরযূ বলিল, 'আমি।'

'বেশ, আমি। পূজো নেই, কিছু নেই, মাঝ থেকে রোশনচৌকী কি হবে শুনি?'

'কাল পূজো হবে।'

'পূজো হবে? পূজো হবে? বটে?'

'না, এই মাত্র প্রতিমা এল; তারই আগমনী বোধ হয় ঐ বাজছে।'

সরযূর শাশুড়ী মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। তিনি সেই মাটীতেই বুক চাপিয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার শ্বশুরের ভিটায় প্রতি বৎসর পূজা হয়, প্রতি বৎসর মা আসেন। এবারে কোন্ দুর্দৈব এই অঘটন ঘটাইয়াছিল? তিনি আসন্ন বিপদের কথা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেলেন।

অকস্মাৎ রোশনচৌকী থামিয়া গেল। সঙ্গীত কিছুক্ষণের জন্য রোগীর শয্যাপার্শ্বস্থগণের মনকে অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছিল। সঙ্গীতের শেষ রেশটুকু যখন মিলাইয়া গেল, তখন আবার তাঁহারা রোগীর মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, তখন দেখিলেন, রোগী ঘুমাইতেছে। তাহার দ্রুতশ্বাস স্বাভাবিক হইয়াছে। ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ভূলুণ্ঠিতা ঠাকুরমাকে বলিলেন, 'মা, এইবারে আপনি যান একটু শোন গে।'

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর)।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ॥"

—কুমারসম্ভবম্— [শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

বসুমতী চিত্র-বিভাগ]

৯ম বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩৭ [১ম সংখ্যা

জামাতা বাবাজী

(গল্প)

১

আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আজ প্রায় এক মাস হইতে চলিল, আমার একমাত্র জামাতাটি নিরুদ্দেশ, অথচ কারণ কিছুই জানা যায় নাই।

রাজসাহী জিলা-স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া বাবাজী (তখনও আমার জামাতা হন নাই) কলিকাতায় গিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন। দুই বৎসর তথায় পড়িয়া, আই-এ পরীক্ষা দিয়া বৈশাখ মাসে তিনি রাজসাহীতে পিতার নিকট ফিরিয়া আসেন। পিতা তাঁহার, রাজসাহীর প্রসিদ্ধ গভর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় শ্রীযুক্ত শশিশেখর দত্ত বাহাদুর। সেই সময় তাঁহার এই পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্রের সহিত আমার কন্যা লীলাবতীর বিবাহ-সম্বন্ধ হয়। ৮ই শ্রাবণ বিবাহ হইল—তখন সপ্তাহখানেক মাত্র গেজেট বাহির হইয়াছিল, বাবাজী দ্বিতীয় বিভাগে পাস হইয়াছিলেন। পূজার ছুটীতে বাবাজী রাজসাহী আসিলে, আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে আনিয়াছিলাম। এক সপ্তাহকাল বাবাজী আমার নিকট ছিলেন, কিন্তু তখন ত এ বিপত্তির কিছুমাত্র সূচনা আমি পাই নাই। কলেজ খুলিবার অব্যবহিতপূর্ব্বে বাবাজী আবার আসিয়া তিন দিন ছিলেন, বস্তুতঃ এখান হইতেই তিনি কলিকাতায় রওয়ানা হয়েন, তখনও ত আমাদিগকে এ বিষয়ের কিছুমাত্র আভাস তিনি দেন নাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া মাসখানেক বাবাজী যথারীতি পত্রাদি লিখিয়াছিলেন,—তার পর হইতে নিস্তব্ধ। বাবাজীকে পত্র লিখিয়া উত্তর পাই না। খুকী, পূর্ব্বে যে প্রতি সপ্তাহে তাঁহার পত্র পাইত, সে-ও কোনও পত্র পায় নাই। তিন সপ্তাহ এইরূপ ভাবে কাটিলে ব্যাকুল হইয়া বৈবাহিক মহাশয়কে রাজসাহীতে পত্র লিখিলাম, তাঁহার উত্তরে জানিলাম, তিনিও তিন সপ্তাহ পুত্রের কোনও পত্র পান নাই। পুত্রকে জবাবী টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ফেরৎ আসিবার পর, অনুসন্ধানার্থে নিজ মাতুলকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বাসার ছেলেরা বলিয়াছে, "কেন? পূর্ণ ত আজ তিন সপ্তাহ হ'ল, বাড়ী চ'লে গেছে।"—বাড়ী যায় নাই শুনিয়া বাসার ছেলেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। কোথায় সে গিয়াছে, তাহারাও অনুমান করিতে অসমর্থ। বৈবাহিক আরও লিখিয়াছেন, "ছেলের এরূপ ভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবার কারণ কি? শেষবার যখন আপনার ওখানে গিয়াছিল, সে সময়ে বউমার সহিত তাহার কোনও ঝগড়া-কলহ হইয়াছিল কি না, সন্ধান লইবেন ত!". কন্যার নিকট জানিয়া আসিয়া

গৃহিণী বলিলেন, "না, সে রকম কিছুই ত হয় নি।"—আমিও সেই মর্ম্মে বেহাই মহাশয়কে পত্র লিখিয়া দিলাম।

এই ত অবস্থা। আমি এখন কি করি বলুন দেখি? বেহাই মহাশয় ত বেশ নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় আছেন দেখিতেছি। তাঁর আর দুই পুত্র আছে, তিনি নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার যে ঐ একমাত্র কন্যা! শুধু তাহাই নহে, আমার পরলোকগতা প্রথমা পত্নীর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন—আমার বড় আদরের ধন। আমার খুকুরাণীর মুখে আর হাসি দেখিতে পাই না, সর্ব্বদাই মুখখানি তার বিষণ্ণ, চক্ষু দুইটি ছলছল করে। এখন আর নিতান্ত বালিকাটি নাই, চৌদ্দ বছরে পড়িয়াছে, জ্ঞান-বুদ্ধি হইয়াছে, সবই বুঝিতে পারে ত! তাহার বিষাদ-মলিন মুখখানি দেখিলে আমার বুকের ভিতরটা হাহাকার করিয়া উঠে।

ছেলেটি ভাল দেখিয়া, মহাশয়, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া ওখানে মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলাম। আমার মত অবস্থার লোকের, এক মেয়ের বিবাহে, পাঁচ হাজার টাকা খরচ করা কি সোজা কথা? কিন্তু তবু আমি করিয়াছিলাম—কেন? না মেয়েটি আমার সুখে থাকিবে, এই আশায়। কিন্তু দেখুন দেখি কি দৈব-বিড়ম্বনা!

আমার অবস্থাও বলি, শুনুন। আমার নিবাসও রাজসাহী জিলায়, ইছমাইলপুর গ্রামে, নাটোরের তিনটা ষ্টেশন পরে রঘুরামপুরে নামিয়া তিন ক্রোশ আসিতে হয়। ষ্টেশনে গরুর গাড়ী পাওয়া যায়, পাল্কীও পাওয়া যায়, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী নাই। আমার নাম শ্রীপ্রমথনাথ দেব—উত্তররাঢ়ী কায়স্থ আমরা। পিতার মৃত্যুতে আমি কিছু ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলাম, আর কিছু কোম্পানীর কাগজ। তা, কোম্পানীর কাগজগুলি মেয়ের বিবাহে ত প্রায় নিঃশেষই হইয়া গিয়াছে। ভূসম্পত্তি ছাড়া, আমার একটি সামান্য কারবারও আছে—গুড় প্রস্তুতের একটি কারখানা। কয়েকটি ইক্ষুমাড়াই কল আছে, সেই কলে ইক্ষু মাড়িয়া, রস জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করি। আমি অবশ্য নিজ হস্তে করি না, বেতনভোগী কারিগররা আছে। কতক ইক্ষু আমার নিজের চাষের, বাকীটা কিনিয়া আনি। আশে-পাশে পাঁচখানা গ্রামের ব্যাপারীরা আসিয়া সেই গুড় খরিদ করিয়া লইয়া যায়। ভূসম্পত্তির আয়ে এবং কারখানার মুনাফায় একরূপ ভদ্রভাবেই আমার দিন গুজরাণ হয়।

আমার প্রথমা পত্নী জীবিতা নাই, সে আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। খুকীকে চারি বৎসরের রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন। আমার বয়স তখন বত্রিশ বৎসর মাত্র। আত্মীয়-বন্ধুরা সকলেই আবার বিবাহ করিবার জন্য আমায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না—আমার এত সাধের—এত আদরের খুকীকে আমি বিমাতার হাতে তুলিয়া দিতে পারিব না। আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, তিনি বিধবা, নিজ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাকে আনাইয়া খুকীর লালন-পালনের ভার তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিলাম।

এ দিকে আত্মীয়-বন্ধুরা বিবিধ প্রকারে আমায় বুঝাইতে লাগিলেন।—"এই মোটে বত্রিশ বছর তোমার বয়স, সারাটা জীবন প'ড়ে রয়েছে, কি ক'রে তোমার কাটবে? তোমার দিদিই বা নিজের সংসার ছেড়ে কত দিন তোমার কাছে থাকতে পারবেন? বিমাতা হলেই যে একটা আস্ত রাক্ষসী হবে, এমনই বা কি কথা? সে রকম হয় কারা? যারা ছোটলোকের ঘরের মেয়ে। ভদ্রবংশের একটি ডাগর দেখে মেয়ে বিয়ে ক'রে আন, সে তোমার মেয়েকে নিজ সন্তানের মতই লালন-পালন করবে—তোমার সংসার বজায় রাখবে।"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাত আট মাস থাকিয়া, দিদিও ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন কি করি, অগত্যা বিবাহই করিয়া ফেলিলাম। দিদি নববধূকে সংসার বুঝাইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ যাঁহাকে ঘরে আনিলাম, তিনি মাতৃবৎ স্নেহাদরেই আমার খুকীকে বুকে তুলিয়া লইলেন। এ পক্ষেও আমার দুইটি কন্যা ও তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্র তিনটি আপনাদের আশীর্ব্বাদে জীবিতই আছে, কিন্তু কন্যা দুইটিকে তাহাদের শৈশবেই যমের মুখে তুলিয়া দিয়াছি।

২

এক মাস কাটিয়া গেল, জামাতার কোনও সংবাদ নাই। গত পূর্ণিমা-রাত্রিতে বাবা সত্যনারায়ণের সিন্নী দিয়াছি। গৃহিণী স্থানীয় কালী-মন্দিরে মানত করিয়াছেন, জামাতা ফিরিলেই যোড়া পাঁঠা দিয়া মা'র পূজা দিবেন। পাড়ার বর্ষীয়সী

জ্ঞানদা ঠাকুরাণী প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া গৃহিণী ও খুকীকে "নীলকুল বাসুদেবের কথা" শুনাইয়া যাইতেছেন—আমিও শুনিতেছি। ইহার ফলশ্রুতি এই প্রকার—"ধন না থাক্‌লে তার ধন হয়, পুত না থাক্‌লে তার পুত হয়, বন্দী থাক্‌লে ছাড়ান পায়, দূরের সুসমাচার নিকটে আসে।"—জ্ঞানদা ঠাকুরাণী বলিয়াছেন, ইহা একেবারে অব্যর্থ,—এই কথা শুনাইয়া, অনেক গৃহস্থকে তিনি চিঠি আনাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত করিয়াছেন,—তবে ভক্তি থাকা চাই।

কিছুতেই কিছু হইতেছে না দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তুমি নিজে একবার কলকাতায় গিয়ে সন্ধান কর। বাসার ছেলেরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় গেছে, বেয়াইয়ের মামার কাছে সে কথা তারা গোপন করেছে। তাদের বাপু-বাছা ব'লে খোসামোদ ক'রে কথা বের ক'রে নাও গে। মেয়েটার মুখপানে ত আর তাকানো যায় না!"

অদ্য আহারাদির পর কলিকাতা যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। গোরুর গাড়ীও বলিয়া রাখিয়াছি।

বেলা তখন ১১টা। স্নানের পূর্ব্বে বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, হঠাৎ নজর পড়িল, বাঁড়ুয্যেদের পোড়ো ভাঙ্গা বাড়ীর উঠান দিয়া, লাল পাগড়ী মাথায় ব্যাগ কাঁধে পিয়ন আসিতেছে। একদৃষ্টে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলাম—দেখি এই দিকেই আসে কি না। বুকটা দুরু দুরু করিতে লাগিল।

এই যে, এই দিকেই যে আসে!

পিয়ন আসিয়া প্রণাম করিল। তার পর হস্তস্থিত একগোছা চিঠির মধ্য হইতে বাছিয়া একখানি আমার হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। খামের চিঠি।

আমি তাড়াতাড়ি ভিতর হইতে চশমা আনিয়া চোখে দিয়া ঠিকানা পড়িলাম। জয় বাবা সত্যনারায়ণ! জয় বাবা নীলকুল বাসুদেব! খুকীর নামে চিঠি, জামাতার হস্তাক্ষর! কোথা হইতে লিখিল, জানিবার জন্য টিকিটের উপরকার ছাপটা পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু তেল-কালী এমন ধ্যাবড়াইয়া গিয়াছে যে, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, বাবাজী যে প্রাণগতিক ভাল আছেন, ইহাই আপাততঃ পরম লাভ মনে করিয়া, দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে ডাকিলাম। তিনি আসিলে হাসিমুখে বলিলাম, "বাবা সত্যনারাণ, বাবা নীলকুল বাসুদেব মুখ তুলে চেয়েছেন। এই নাও তোমার জামাইয়ের চিঠি, খুকীকে দাও গে। আর তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসে আমায় বল, জামাই কোথা আছেন, কেমন আছেন, কবে বাড়ী আসবেন; আমি ঘরে গিয়ে বসছি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহিণী চিঠি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন,—তাঁহার মুখখানি গম্ভীর, চোখ দুটি ছলছল করিতেছে, সে মূর্ত্তি দেখিয়া আমার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেকার সমস্ত আনন্দ উৎসাহ কোথায় উড়িয়া গেল। আমি ভীতভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

গৃহিণী চিঠি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

বলিলাম, "কেন? জামাই লিখেছেন মেয়েকে চিঠি, আমি পড়বো কেন?"

"পড়, দোষ নেই। আমিও পড়েছি। মেয়ে ত চিঠি পড়েই আছাড় খেয়ে পড়েছে। আমায় বল্লে, 'মা, চিঠি বাবাকে দেখাও, যা করতে হয়, তিনি করুন।"

কম্পিত হস্তে খাম হইতে চিঠি বাহির করিয়া পড়িলাম। পড়িয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, চোখে অন্ধকার দেখিলাম। চিঠিতে এইরূপ লেখা ছিল—

সাধ্বি,

আমি মাসখানেক নানা গুরুতর কার্য্যে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, তোমায় চিঠি লিখিবার তিলমাত্র অবসর পাই নাই।

আমরা কয়েক জন যুবক মিলিয়া সন্তানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। তুমি আনন্দমঠ পড়িয়াছ কি না, জানি না, যদি পড়িয়া থাক, তবে সন্তান কাহাকে বলে, তাহা নিশ্চয়ই অবগত আছ। জননী জন্মভূমিকে পরাধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করাই সন্তানের জীবন-ব্রত। কলিকাতা হইতে "যুগান্তর" নামে আমরা একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিতেছি, আমার অনুরোধ, বাবাকে বলিয়া তুমি তাহার গ্রাহক হইয়া নিয়মিতভাবে উহা পাঠ করিবে।

আমি দল গঠন করিয়া আপাততঃ গ্রামে গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিতে বাহির হইয়াছি। কবে কোথায় থাকি, কিছুরই স্থিরতা নাই। যে স্থান হইতে এই পত্র তোমায় লিখিতেছি, কল্যই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইব।

মা'র শৃঙ্খল যত দিন না ভগ্ন করিতে পারি, তত দিন

আমাদের গৃহ-সংসার নাই, পিতামাতা নাই, স্ত্রী-পুত্র নাই—কিছুই নাই। আছে কেবল দেশ। (আনন্দমঠ দেখ) এ জীবনে এ পবিত্র ব্রত যদি উদ্‌যাপন করিতে পারি, তবেই গৃহে ফিরিব, তোমার সঙ্গে আবার আমার মিলন হইবে, আবার আমি সংসারী হইব; নচেৎ এই শেষ। তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, আমার বিশ্বাস আছে যে, ধর্ম্মপথে তুমি আমার সহায় হইবে, বিঘ্নরূপিণী হইবে না। বিভুপদে সতত প্রার্থনা করিবে, যেন আমাদের উদ্যম সফল হয়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, ব্রত উদ্‌যাপনান্তে এক দিন গৃহে ফিরিতে পারি। ইতি—

দেশমাতার সন্তান
শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

পুনশ্চ। পত্রখানি পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে, কারণ, অদূর-ভবিষ্যতে বাড়ী খানাতল্লাসী হওয়া বিচিত্র নহে।

পত্র পড়িয়া গৃহিণীর হস্তে উহা ফেরত দিয়া, দুই হাতে দুই রগ্ টিপিয়া, বালিস বুকে দিয়া, কিছুক্ষণ আমি শয্যায় পড়িয়া রহিলাম। অগ্রহায়ণ মাসের শীতেও দেহ হইতে দর-দর করিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। "ও মা, কি বিপদ হ'ল গো! বিপত্তে মধুসূদন! বিপত্তে মধুসূদন!"—বলিতে বলিতে গৃহিণী আমায় পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

মিনিট পাঁচেকে আমি একটু সামলাইয়া উঠিলাম। গৃহিণীকে বলিলাম, "তুমি মেয়ের কাছে যাও, এখানে কি করছ? তাকে সামলাও গে।"

গৃহিণী চলিয়া গেলে আমি ভাবিতে লাগিলাম, এত দিন মনে মনে আশা ছিল, বেহাই মহাশয় সাহেবদের প্রিয়পাত্র অনুগত লোক,—ছেলেটা বি-এ, পাস করিলে সাহেবদের ধরিয়া তাহাকে তিনি একটা ডেপুটী করিয়া দিতে পারিবেন। অন্ততঃ পক্ষে আইন পাসের পর মুন্সেফী-পদ দেওয়াইতে পারিবেন, মেয়ে আমার হাকিমের পরিবার হইবে। সে সব আশা-ভরসা সমস্তই ফর্সা হইয়া গেল!

ক্রমে মনে মনে ক্রোধের সঞ্চারও হইল। তোর কি বাপু সমস্তই অদ্ভুত? স্বদেশী হয়ে একেবারে গৃহত্যাগ! কেন রে বাপু, এত বাড়াবাড়ি কেন? যা রয় বসে, তাই করলেই ত হয়! স্বদেশী হয়েছিস, বেশ ত! মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পর্, দেশী চিনি, করকচ-মুণ ব্যভার কর্, বিড়ি খা—কেউ ত মানা করছে না। একেবারে গৃহত্যাগ, পত্নীত্যাগ! তাই যদি তোর মনে ছিল, তবে এক ভদ্রকন্যাকে বিবাহ ক'রে তার সর্ব্বনাশ করলি কেন?

তখন মনে পড়িল না, বিবাহের সময় এরূপ মনোভাব তাহার ত ছিল না। স্বদেশীর ঢেউ ত পূর্ব্বাবধিই উঠিয়াছিল। বিবাহে, পূজার তত্ত্বে, বিলাতী জুতা, সিল্কের বিলাতী ছাতা, বিলাতী সাবান, এসেন্স প্রভৃতি প্রসাধন-দ্রব্য কত তাহাকে উপহার দিয়াছি, সে সব ত হাসিমুখেই সে গ্রহণ করিয়াছে ও ব্যবহার করিয়াছে দেখিয়াছি। তবে এবার কলিকাতায় ফিরিয়া সে এমন উৎকট স্বদেশী হইয়া উঠিল কি করিয়া?

এ অবস্থায় আমি আর কলিকাতায় গিয়া কি করিব? তার চেয়ে বরং রাজসাহী গিয়া, বৈবাহিকের সঙ্গে দেখা করিয়া, এ বিপদে কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করি। গৃহিণী ফিরিয়া আসিলে সেই কথাই তাঁহাকে ব'ললাম, তিনিও এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

গোরুর গাড়ী পূর্ব্বেই বলা ছিল। স্নানাহার সারিয়া, দুর্গা বলিয়া রাজসাহী যাত্রা করিলাম।

৩

যে দিনের কথা বলিতেছি, তখন ঈশ্বরদি হইতে রাজসাহী যাইবার রেল খুলে নাই। নাটোরে নামিয়া অশ্বযানে ৩২ মাইল অতিবাহন করিয়া রাজসাহী যাইতে হইত। রাজসাহীর উকীল বাবুরা একটা কোম্পানী গঠন করিয়া, যাতায়াতের জন্য কতকগুলি অশ্বযানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাঁচ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলের আড্ডা ছিল।

নাটোরে নামিয়া, অশ্বযানে আরোহণ করিয়া যখন রাজসাহী গিয়া পৌঁছিলাম, বেলা তখন চারিটা। বৈবাহিক মহাশয় তখনও কাছারী হইতে ফিরেন নাই। তাঁহার পুত্রেরা অতি সমাদরে আমার অভ্যর্থনা করিল। হাত-মুখ ধুইয়া, ডাব ও সরবৎ পান করিয়া, বৈঠকখানা-ঘরে আরাম-কেদারায় পড়িয়া আমি বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

সাড়ে পাঁচটায় বৈবাহিক মহাশয় বাড়ী ফিরিলেন আমি আসিয়াছি শুনিয়া কাছারীর বেশেই আমার নিকট

আসিয়া বসিলেন। অদ্য প্রভাতে প্রাপ্ত পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইলাম। পড়িয়া বলিলেন, তিনিও গত কল্য পুত্রের নিকট হইতে ঐ ধরণের একখানি চিঠি পাইয়াছেন। বলিলেন, "আচ্ছা ভাই, বোসো তুমি, আমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে এই ধড়াচূড়াগুলো ছেড়ে মুখে হাতে একটু জল দিয়ে আসি। অনেক কথা আছে।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি আমায় অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তেতলায় একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তিনি ধূমপান করিতেছিলেন, আমি সেইখানে গিয়া বসিলাম। তিনি আমার হাতে গুড়গুড়ির নলটি দিয়া বলিলেন, "আমার কি হয়েছে ভাই জানো? চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কাউকে আবার বলবারও উপায় নেই যে, ছেলে আমার সন্তান হয়েছে—গ্রামে গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করতে বেরিয়েছে। কথাটা প্রকাশ হলেই ক্রমে সাহেবদের কাণে গিয়ে উঠবে, তখন আমার চাকরী বজায় রাখাই হবে দায়।"

বলিলাম, "এখন কি উপায় হবে বেয়াই মশাই? কোথায় সে আছে, জানতে পারলে না হয় সেখানে গিয়ে কেঁদে কেটে পড়া যায়, তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা যায়।"

বেয়াই বলিলেন, "চিঠিখানা ত লিখেছে পাবনা জেলার চন্দ্রপুর পোষ্ট আপিস থেকে। অন্ততঃ, ছাপ থেকে যা বোঝা গেল।"

"ছাপ ত আমিও পরীক্ষা করেছিলাম, কালীর ধ্যাবড়া, কিছুই বুঝতে পারিনি।"

"আমার চিঠিতে ছাপটা অত অস্পষ্ট নয়।—দাঁড়াও, চিঠিখানা বের করি।"—বলিয়া বেয়াই লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। পত্র পড়িয়া দেখিলাম, আমার কন্যার পত্রে যে সব কথা ছিল, সেই সব কথাই আছে, কেবল ভাষার একটু এদিক ওদিক। ছাপ দেখিলাম, কয়েকটা মাত্র অক্ষর পড়া গেল—চন্দ্রপুর হইতে পারে।

এই সময় ভৃত্য দুই পেয়ালা চা আনিল। বেয়াই এক পেয়ালা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এখন কিছু খাবে, ভাই? দুই এক টুকরো ফল-টল, দুই একটা মিষ্টি-টিষ্টি?"

আমি বলিলাম, "না ব্যাই মশাই,—এই ত ঘণ্টাখানেক আগে জল খেয়েছি। এখন আর কিছু নয়। ছেলের সম্বন্ধে কি উপায় ঠাওরালেন?"

বলিলেন, "মাথা-মুণ্ড কি আর ঠাওরাব বল? চন্দ্রপুর কোথা, তাও জানিনে। কাল ঐ চিঠি পেয়ে, মামাকে পাবনা পাঠিয়ে দিয়েছি। পাবনায় গিয়ে প্রথমে সে খবর নেবে, চন্দ্রপুর কোথা। তার পর চন্দ্রপুরে গিয়ে সন্ধান নেবে, সেখান থেকে সেই দল কোথায় গেছে। এই রকম ক'রে যদি তাদের ধরতে পারে।"

"এই মামাটি কে? সেই, যাঁকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন? আপনার কি রকম মামা ইনি?"

"দূর-সম্পর্ক। সম্বন্ধে মামা হলেও, আমার চেয়ে অন্ততঃ বছর দশেকের ছোট। দেশে থাকতো, অবস্থা খারাপ, এখানে আমার কাছে আসে চাকরীর চেষ্টায়। চাকরী কিছু জুটিয়ে দিতে পারিনি, তবে জজ আদালতের নকল সেরেস্তায় ব'লে দিয়েছি, ঠিকেঠাকা কায ক'রে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে। বাকী সময় টাউটগিরি করে, উকীলদের কাছে মক্কেল ধ'রে নিয়ে যায়, ফীয়ের টাকা থেকে কিছু কিছু কমিশন পায়। লোকটা খুব চালাক-চতুর আছে।"

"তাঁর কথা কি ছেলে মানবে?"

"ছেলের গর্ভধারিণী অনেক কাঁদাকাটা ক'রে এক চিঠি লিখে দিয়েছেন, সেই চিঠি মামা নিয়ে গেছে। কিন্তু ধরতে পারলে তবে ত!"

সকল দিক চিন্তা করিয়া, মামা না ফেরা পর্য্যন্ত এইখানেই অপেক্ষা করিব স্থির করিলাম। পরদিন সকল কথা বর্ণনা করিয়া বাড়ীতে পত্র লিখিয়া দিলাম।

চারিদিন পরে মামা ফিরিয়া আসিলেন। ছেলের দেখা পান নাই, তবে এইমাত্র জানিতে পারিয়াছেন যে, ঐ পত্র লেখার তারিখ হইতে তিন দিন পরে, সেই স্বদেশীর দল রেলে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে গিয়া টিকিট আপিসেও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

বৈবাহিক বলিলেন, "যাক্, আর ভেবে কি হবে? অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। এখন বাবাজী যদি কেবলমাত্র স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করেই ক্ষান্ত হন, তা হলেও রক্ষে। কিন্তু ঐ যে লিখেছে, অদূর-ভবিষ্যতে বাড়ী সার্চ্চ হওয়া বিচিত্র নয়, —থেকে ভয় হয়, হয় ত স্বদেশী ডাকাতী-টাকাতি করারও

আছে। তা হ'লেই ধরাও পড়বেন, আর বছর চার পাঁচ শ্রীঘরে বাস। কয়েক স্থানেই ত স্বদেশী ডাকাতি হয়ে গেছে—ওঁরা ঐ রকম করেই ত দেশ উদ্ধার করার জন্তে অর্থ সংগ্রহ করেন কি না! আজকাল এ সব বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের খুব কড়া নজর। মহকুমায় মহকুমায়, থানায় থানায় সার্কুলার গেছে।"

ক্ষুণ্ণ-মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

বাবাজী গ্রেপ্তার হইলে সে কথা খবরের কাগজে বাহির হইবে। বাড়ী আসিয়াই তাই কলিকাতার একখানা প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রের গ্রাহক হইলাম। কাগজের ঠিকানা প্রভৃতি রাজসাগী হইতেই টুকিয়া আনিয়াছিলাম।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই স্বদেশীওয়ালাদের কর্তৃক খুন বা ডাকাতীর সংবাদ বাহির হয়। থানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার, বিচার ও কারাদণ্ডের কথার ত বিরাম নাই। খবরের কাগজের মোড়ক খুলিবার সময় আমার হাত কাঁপে—খুলিয়াই হয় ত দেখিব, খুন বা ডাকাতী অপরাধে আমার জামাই গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র কাটিল, বৈশাখ আসিয়া পড়িল। এক দিন এক ভীষণ সংবাদ পাঠ করিলাম। মজঃফরপুরের উকীল কেনেডি সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা, স্থানীয় জজ কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে রাত্রিতে ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, কে বা কাহারা সে গাড়ীতে বোমা মারিয়া কিংসফোর্ড সাহেব ভ্রমে মেমদ্বয়কে হত্যা করিয়া পলাইয়াছে—জোর পুলিস-তদন্ত চলিয়াছে। পড়িয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল। হা রে ভ্রান্ত নির্ব্বোধ পাষণ্ডগণ! এইরূপ মহাপাপ করিয়া তোরা দেশ উদ্ধার করিবি? সেই সত্যযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত, পাপের ফল কি কখনও শুভ হইয়াছে, না হইতে পারে?—পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল, আমার জামাই যদি এই দলে থাকে, তবেই ত সর্ব্বনাশ! ধরা পড়িলে ফাঁসী ত অনিবার্য্য! কাগজখানা আর বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলাম না, বৈঠকখানাতেই লুকাইয়া রাখিলাম, কি জানি, যদি স্ত্রী-কন্যার চোখে পড়ে।

ক্রমে জানিতে পারিলাম, দুই জন হত্যাকারী ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন নিজেকে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, ক্ষুদিরাম বসু নামক এক যুবকের, বিচারে ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরেই কাগজে দেখিলাম, কলিকাতার মুরারিপুকুর বাগানে পুলিস এক বোমার কারখানা আবিষ্কার করিয়াছে, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন যুবক এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে, ঐ ব্যাপারে দেশব্যাপী থানাতল্লাসী চলিতেছে, আরও কত লোক ধরা পড়িবে।—ঈশ্বর জানেন, আমার জামাইও সেই দলে ছিলেন কি না। দুশ্চিন্তায় আমার আহার-নিদ্রা একরূপ দূর হইল। খবরের কাগজ খুলিয়া প্রথমেই ধৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকা পাঠ করি। সে দলে আমার জামাই ছিল, পুলিস যদি ইহা জানিতে পারিয়া থাকে, তবে বৈবাহিকের বাড়ী ত তল্লাস হইবে নিশ্চয়, আমার বাড়ীও হইতে পারে।

দুর্গানাম জপ করিয়া দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। ধৃত ব্যক্তিদের তালিকায় আমার জামাতার নাম দেখিলাম না, আমার বাড়ীও তল্লাস হইল না। তখন কতকটা স্বস্তি অনুভব করিলাম।

৪

দ্বিতীয় পক্ষের আমার বিবাহ মৈমনসিংহ জিলায় হইয়াছিল। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে আমার শ্বশুরালয়। আমার শ্বশুর ৺কালীচরণ সরকার মহাশয় সেই গ্রামের এক জন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তিনি তিন পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশ বাবু গৃহে বসিয়া বিষয়সম্পত্তি দেখেন, মধ্যম আশুতোষ বাবু মৈমনসিংহ বারের এক জন প্রধান উকীল, কনিষ্ঠ হরেন্দ্র বাবু জামালপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিস ইন্‌স্পেক্টর।

আষাঢ় মাসে আমার মধ্যম শ্যালক আশু বাবুর নিকট হইতে এক নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম—৫ই শ্রাবণ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ। বিবাহ-কার্য্য পৈতৃক ভিটায় আসিয়া সম্পন্ন করিবেন। সপরিবারে যাইবার জন্ত আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন।

সাত আট বৎসর হইল, গৃহিণী পিত্রালয়ে যান নাই, সে কারণেও বটে, সকলেরই মন খারাপ, গোলেমালে আনন্দ-উৎসবে কয়েকদিন মনের ভার কিছু লঘু হইবে, সে আশাতেও বটে, এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়াই স্থির করিলাম।

আমার জ্যেষ্ঠপুত্র সদানন্দ, বাল্যকালে একবার মাতুলালয়ে গিয়াছিল, মধ্যম হাবু ও কনিষ্ঠ বাদল মামার বাড়ী কখনও দেখে নাই—মামার বাড়ী যাইবার আনন্দে তিন জনেই নৃত্য করিতে লাগিল। যথাদিনে আমরা যাত্রা করিলাম।

শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়া দেখিলাম, আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্বে গৃহখানি ভরিয়া গিয়াছে। পরদিন বিবাহ হইয়া গেল, তৎপরদিন জামাই-মেয়ে বিদায় করিয়া গৃহ বিষাদের ছায়ায় ডুবিল।

আহারান্তে কনিষ্ঠ শ্যালক হরেন্দ্র বাবুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, তাঁহার এলাকায় স্বদেশী হাঙ্গামা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। বলিলেন, "আমাদের হয়েছে দাদা, শাঁখের করাত। স্বদেশীওয়ালারা মনে করে, পুলিস তাদের পরম শত্রু। আবার গভর্ণমেণ্ট মনে করেন, আমরা তলে তলে স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে সহানুভূতি করি।"

এই প্রসঙ্গ যখন উঠিল, হরেনকে আমার জামাইয়ের সকল কথাই বলিলাম। আমরা কিরূপ উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতেছি, তাহাও জানাইলাম।

হরেন বলিল, "আপনার জামাইয়ের নামটি কি? সে রাজসাহীর গভর্ণমেণ্ট প্লীডারের ছেলে, না?"

উভয় প্রশ্নেরই উত্তর দিলাম। হরেন বলিল, "আমার এলাকায় ও নামের কোনও স্বদেশীওয়ালা ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না, থানায় গিয়ে লিষ্টিখানা দেখতে হবে। চারিদিকে পুলিসের গোয়েন্দা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি হপ্তায় প্রত্যেক থানা থেকে রিপোর্ট আসছে। গভর্ণমেণ্টের একেবারে কড়া হুকুম।"

হরেন মাত্র তিন দিনের ছুটী পাইয়াছিল। আগামী কল্যই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। বলিল, "দাদা, এক কায করুন না। বেরিয়েছেন যখন, একটু ভাল ক'রে বেড়িয়ে চেড়িয়ে নিন না। চলুন না জামালপুরে। আমার ওখানে হপ্তাখানেক থেকে, তার পর বাড়ী যাবেন।"

আমি সম্মত হইলাম। বিশেষ, জামালপুর মহকুমার লিষ্টিতে আমার জামাইয়ের নাম উঠিয়াছে কি না, তাহাও দেখিতে পাইব।

হরেন বলিল, "আমি ত ফিরবো ঘোড়ায়। আপনি দিদিকে নিয়ে, আপনার ছোট শালাজকে নিয়ে নৌকোয় আসুন। ঘুরে ঘুরে যেতে হবে, পৌঁছতে দেরী হবে বটে, কিন্তু জলপথে বেশ আনন্দ পাবেন।"

এ প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম।

পরদিন হরেন প্রস্থান করিল। আশু বাবু মৈমনসিং ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তাঁর স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদির সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। মেয়ে অষ্টমঙ্গলার পর যোড়ে ফিরিয়া আসিলে, জামাই ও মেয়ে লইয়া তিনি মৈমনসিংহ যাইবেন। তাঁহার অনুরোধে, আমরা আর দুই দিন গোবিন্দপুরের বাটীতে অবস্থান করিলাম।

গোবিন্দপুর গ্রামে নন্দিনী নাম্নী একটি ছোট নদীর তীরে অবস্থিত ঘাটে ভাউলে সর্ব্বদাই পাওয়া যায়; বজরাও দুই চারিখানা আছে; কিন্তু যাত্রার দিন বজরা একখানিও পাওয়া গেল না। বজরাগুলি বেশ বড় বড় হয়। তাহার ভিতর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কামরা সকল থাকে, অনেক লোক ধরে, বেশ আরামে যাওয়া যায়। অগত্যা দুইখানি ভাউলে ভাড়া করা গেল, কারণ, একখানিতে দুইটি পরিবারের সঙ্কুলান হইবে না। সকলে মিলিয়া একত্র বজরায় যাওয়াই ইচ্ছা ছিল, সে সুযোগ না হওয়াতে উভয় গিন্নী গজ্ গজ্ করিতে লাগিলেন।

এক দিন এক রাত্রি নন্দিনী বাহিয়া গিয়া, অবশেষে আমরা বংশজ নদীতে পড়িলাম। এই বংশজ নদী, মধুপুরের জঙ্গলের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এই নদী জামালপুর অবধি গিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

বংশজ নদী দিয়া কয়েক ঘণ্টা গিয়া, যে বন্দরে আমরা সন্ধ্যার মুখে পৌঁছিলাম, সেখানে গিয়া দেখিলাম, একটি বজরা খালি হইতেছে। এক মাড়োয়ারী মহাজন নদীপথে নানাস্থানে গিয়া, চাষীদের পাটের দাদন দিয়া বেড়াইতেছিল, জামালপুর অবধি তাহার যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কি কারণে জানি না, সেইখানে নামিয়া সে বজরা ছাড়িয়া দিল। জামালপুর তখনও এক রাত্রি ও অর্দ্ধ দিনের পথ। গৃহিণীদের আগ্রহে, সেইখানেই আমরা ভাউলে দুইখানির ভাড়া মিটাইয়া দিয়া সেই বজরা লইলাম। আকাশে মেঘ ছিল না, ত্রয়োদশীর চন্দ্র উজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিতেছিল, মাঝি সানন্দে বজরা ছাড়িয়া দিল।

৫

রাত্রি ১০টায় আহারাদি শেষ করিয়া নিদ্রার আয়োজন করা গেল। অনেক রাত্রিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, গরমে আর ঘুম আসিতে চাহে না। আমি বিছানা ছা বজরার ছাদে উঠিয়া বসিলাম।

উভয় তীরে ঘন জঙ্গল। চন্দ্রালোকে সেই জঙ্গলের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপে কাটিলে, সহসা জঙ্গল হইতে দুইবার বন্দুক ডাকিল—দুড়ুম্ দুড়ুম্।

জঙ্গলের কোলে অন্ধকারে দুইখানা ছিপ বাঁধা ছিল, সেই ছিপ দুখানা সন্‌সন্ করিয়া আমাদের বজরার দিকে আসিতে লাগিল। "ডাকাত পড়িছে কর্ত্তা"—বলিয়া মাল্লাগণ দাঁড় ফেলিয়া ঝুপঝাপ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল।

বিপদ গণিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। এক মিনিট পরেই ডাকাইতরা আসিয়া বজরায় উঠিল, শব্দে বুঝিতে পারিলাম। তাহারা দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "মাড়োয়ারী বাবু, এ মাড়োয়ারী বাবু, জলদি দরজা খোলো।"

মুহূর্ত্তে আমি বুঝিতে পারিলাম, পূর্ব্বের সেই যে ধনী মাড়োয়ারী বাবুই এ বজরায় এখনও আছে, এই ভ্রম করিয়া ইহারা বজরা আক্রমণ করিয়াছে।

তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "জলদি খোলো। কুছ ডর নেহি। রূপিয়া লেলেঙ্গে, জান ছোড় দেঙ্গে।"

সাহস সংগ্রহ করিয়া কম্পিত স্বরে আমি উত্তর করিলাম, "বাপ সকল, এ বজরায় মাড়োয়ারী ত কেউ নেই। আমরা সকলেই বাঙ্গালী, গরীব গেরস্ত মানুষ।"

তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "বলে কি রে? ভুল হ'ল না কি?"

এক ব্যক্তি বলিল, "না না, ভুল হয় নি, এই বজরাই বটে। কাল দুপুরবেলা থেকে আমি পিছু নিয়েছি। এ বেটা বোধ হয় সরকার-টরকার, মনিবকে বাঁচাবার জন্তে চালাকি করছে। দরজা ভেঙ্গে ফেল্।"

দরজার উপর কুড়ালির ঘা পড়িতে লাগিল, শব্দে ইহা বুঝিলাম। বলিলাম, "না না বাপু, তোমাদের ভুলই হয়েছে। কুড়ুল থামাও, দরজা খুলে দিচ্ছি, তোমরা ভিতরে এসে স্বচক্ষে দেখ।"

কুড়ুলের ঘা থামিল। দরজা খুলিয়া দিলাম। দুই তিনটা জলন্ত টর্চ্চলাইট হাতে করিয়া দশ বারো জন ডাকাত হুড়মুড় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, তাহারা সকলেই তরুণবয়স্ক—এই আঠারো উনিশ, বড়জোর বিশ বাইশ—ইহার বেশী নহে। তা ছাড়া চেহারা ও বেশবেশ কাহারও ডাকাইতের মত নয়, সকলেই ঠিক যেন ভদ্রসন্তান। ধুতি সকলেরই মালকোঁচা-মারা, কাহারও গায়ে কোট, কাহারও শার্ট, দুই তিন জনের চোখে সোনার চশমা। দুই জনের হাতে দুইটা পিস্তল। মনে মনে বুঝিলাম, ইহারা নিঃসন্দেহ স্বদেশী ডাকাইতের দল।

টর্চ্চলাইটের সাহায্যে সর্ব্বত্র তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। একধারে গিন্নীরা তাঁহাদের বালক-বালিকাগণকে বুকে আগলাইয়া গাদাগাদি করিয়া বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, এক জন ডাকাইত তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "মাগল্মী সকল, আপনারা ভয় পাবেন না। স্ত্রীলোকমাত্রেই আমাদের মা, তাঁদের গায়ে আমরা হাত দিইনে, আপনারা নির্ভয়ে থাকুন।"

এক ছোকরা আমাকে ধমক দিয়া বলিল, "তোমরা কারা? এ বজরায় যে মাড়োয়ারী মহাজন ছিল, সে কোথায় গেল?"

আমি বলিলাম, "আমরা মাত্র আজ সন্ধ্যেবেলা, ঘোল্লা-গঞ্জের ঘাটে এ বজরা ভাড়া নিয়েছি, বাবা। যে মাড়োয়ারী মহাজন এতে আস্‌ছিল, সেইখানেই সে নেমে গেল কি না। আমরা গরীব গৃহস্থ লোক, সঙ্গে টাকাকড়ি বেশী কিছুই নেই, পথ-খরচের মত সামান্য দশ বিশ টাকা আছে। এই চাবি নাও, বাক্স-তোরঙ্গ সব খুলে তোমরা দেখ বাবা!"

এক জন হাত বাড়াইয়া চাবির গোছা লইল। অপর এক ব্যক্তি বলিল, "ও ড্যাম্ ইট্! ফেলে দে চাবি। চল্ এখন স'রে পড়া যাক্।"

ঠিক এই সময় বাহিরে দুইবার সিটির আওয়াজ হইল,—সেই বাঁশীগুলা, ফুটবল খেলিবার সময় যাহা বাজায়,—ভিতরে মটর না কাঁকর কি থাকে, ফর্ ফর্ করিয়া বাজে।

এই আওয়াজ শুনিবামাত্র সকলের মুখে ভীতি-চিহ্ন দেখা দিল। বাহির হইতে এক জন কে বলিল, "পুলিস-বোট। যারা যারা সাঁতার জান, জলে লাফিয়ে পড়।"

এ কণ্ঠস্বরে আমি চমকিয়া উঠিলাম। ঠিক যেন আমার জামাতার কণ্ঠস্বর!

পর-মুহূর্ত্তে ঝুপঝাপ করিয়া কয়েক জনের জলে লাফাইয়া পড়িবার শব্দ হইল। আমি বাহিরে গিয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম, দুইটা পান্সীভর্ত্তি লাল পাগড়ী—একখানাতে স্বয়ং ইন্‌স্পেক্টর হরেন্দ্র বাবু। বজরার গায়ে পান্সী লাগিবামাত্র

তাহারা টপাটপ্ বজরায় উঠিয়া পড়িল। এক ব্যক্তি জলে লাফাইতে যাইতেছিল, হরেন্দ্র বাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। যাহারা ইতিপূর্ব্বে জলে পড়িয়াছিল, তাহাদের ধরিতে পুলিস কোনও চেষ্টা করিল না। এক জন সিপাহী বড় একটা টর্চ্চলাইট্ জ্বালিল, অপর সিপাহীরা এক এক জনে এক এক ডাকাইতকে সজোরে ঝাপ্টাইয়া ধরিল। তাহাদেরই আলোকে আমি সভয়ে দেখিলাম, হরেন বাবু যাহাকে ধরিয়াছেন, সে আর কেহ নহে, আমারই জামাতা শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র বাবাজী!

হরেন বাবু আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি? আপনি!"

আমি ইঙ্গিতে তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিলাম। ভিতরে কোনও রহস্য আছে বুঝিয়া তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ধৃত আসামীদের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।

তাঁহার আদেশে কনেষ্টবলরা প্রত্যেক আসামীকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল। এক এক জনকে বাঁধিয়া, ধরাধরি করিয়া পুলিসবোটে নামাইতে লাগিল।

আমি ইসারা করিয়া হরেন বাবুকে ভিতরে ডাকিলাম। ভিতরে গিয়াই তিনি বলিলেন, "আপনি দাদা এ বজরায় এলেন কি ক'রে?"

বলিলাম, "সে অনেক কথা, পরে সবই বল্‌বো। এখন উপস্থিত বিপদ থেকে বাঁচাও।"

"কেন? আর বিপদ্ কি?"

"ঐ যে ছোকরা জলে লাফিয়ে পড়ছিল, তুমি তাকে ধ'রে টেনে তুল্লে, সেই আমার জামাই।"

হরেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অ্যাঁ! তাই না কি? তা হ'লে ত বিপদই বটে।"

আমি তার হাত দুটি ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলাম, "তোমার ভাগ্নী-জামাইকে, যেমন ক'রে পার, বাঁচাও ভাই।"

হরেন বলিল, "আচ্ছা দাঁড়ান, কি করতে পারি দেখি।" বলিয়া সে বাহির হইল। আমিও তাহার পিছু পিছু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলাম।

তাহার আদেশ অনুসারে বাকী আসামীদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধা হইতে লাগিল। আমার জামাইকেও বাঁধিল। বাবাজী কাতর ভিক্ষা-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিতে লাগিল।

একে একে সব আসামীকে পুলিসবোটে নামানো হইল, শুধু বাকী রহিল পূর্ণ। হরেনের ইসারায় আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

পূর্ণকে লইতে দুই তিন জন কনেষ্টবল বজরায় আসিল। কোনও আসামী না দেখিয়া, শুধু হরেনকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহারা বোধ হয় স্থির করিল, অন্য কনেষ্টবলরা তাহাকে পুলিসবোটে স্থানান্তরিত করিয়া থাকিবে।

হরেন কহিল,—"সব আসামী ঠিক হ্যায়?"

উত্তর হইল, "হাঁ হুজুর, সবকোইকো শিকলি চড়ায়া।"

"গিনো, কয়ঠো হুয়া?"

তাহারা গণনা করিয়া বলিল, "আঠ আসামী হুজুর।"

"আচ্ছা, ঠিক হ্যায়।"—বলিয়া হরেন তাহাদিগকে আর আর কি সব আদেশ দিতে লাগিল।

ডাকাইতগণের ছিপ দুইখানিকে পশ্চাতে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, পুলিসের পান্সী দুইখানি খুলিয়া দিল।

আমাদের বজরার মাঝি-মাল্লারা বোধ হয় দূরে দূরে অন্ধকারে জলে ভাসিতে ভাসিতে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল। ভিজা বিড়ালটির মত একে একে তাহারা আসিয়া বজরায় উঠিতে লাগিল।

হরেন ভিতরে আসিয়া স্বহস্তে পূর্ণর হাতের বাঁধন খুলিতে খুলিতে বলিল, "কেমন হে ছোকরা, স্বদেশী করবার সখ মিটেছে ত এখন?"

আমি বলিলাম, "আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন?"

হরেন আমার পানে চাহিয়া চোখ টিপিয়া বলিল, "এখনি খাঁড়ার ঘা হয়েছে কি? আপনার জামাই ব'লে যে ছেড়ে কথা কইব, তা ভাববেন না। আমরা পুলিসের লোক, বাগে পেলে নিজের বাপকেও রেয়াৎ করিনে। থানায় নিয়ে গিয়ে প্রথম ত উত্তম-মধ্যম প্রহার। তার পর হাতে হাতকড়ি দিয়ে চালান দেবো—সাতটি বছর শ্রীঘর।"

মিনতির স্বরে বলিলাম, "ছেলেমানুষ, না বুঝে একটা কায ক'রে ফেলেছে, এবার ওকে মাপ করুন—ছেড়ে দিন। আর কখ্‌খনো এমন কায ও করবে না।"

"ছেড়ে দেবো?—ছেড়ে দিলেই ত আবার গিয়ে ঐ সব দলে মিশবে। এবার ডাকাতী করেছে—এর পরে বোমা ফেলবে—মানুষ খুন করবে।"

বলিলাম, "না না, তা আর ও করবে না।"

হরেন বলিল, "কি হে ছোকরা,—ছেড়ে দিলে আবার এই সব করবে ত?"

পূর্ণ মাথা নাড়িয়া জানাইল, আর করিবে না।

হরেন বলিল, "শুন্‌লাম, ইনি তোমার শ্বশুর। আচ্ছা, এঁর পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করতে পার?"

পূর্ণ ঝুঁকিয়া আমার পদস্পর্শ করিয়া হরেন বাবুর দিকে তাকাইয়া রহিল।

হরেন বলিল, "বল, স্বদেশীর দলে আর আমি কখনো মিশবো না।"

পূর্ণ শপথ করিল।

"বল, আবার কলেজে ভর্ত্তি হয়ে মন দিয়ে পড়াশুনো করবো।"

সে শপথও পূর্ণ করিল।

আমি তখন পূর্ণর পানে চাহিয়া বলিলাম, "বাবাজী, উনি তোমার মামাশ্বশুর হন,—তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণের সহোদর ভাই। ওঁকে প্রণাম ক'রে ওঁর পা ছুঁয়েও ঐ রকম দিব্যি কর।"

পূর্ণ তাহাই করিল।

পূর্ণর পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে হরেন বলিল, "সঙ্গে ত দুটো পিস্তল ছিল, কি ভাগ্যি খুন করনি কাউকে।"

পূর্ণ সলজ্জভাবে বলিল, "আজ্ঞে, গুলীর সাপ্লাই ফুরিয়ে গিয়েছিল। বারুদ ত আমরা নিজেরাই তৈরি করি।"

হরেন আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদা, দেখুন, মাঝি-মাল্লারা সব জুটেছে কি না। বজরা ছেড়ে দিতে বলুন।"

বজরা খুলিলে, আমি বলিলাম, "বাবাজীর এখন কি ব্যবস্থা করা যায় ভায়া?"

"তাই ত ভাবছি। কনেষ্টবলরা সবাই ওকে দেখেছে। জামালপুরে বজরা থেকে নেমে বাসায় যাবার সময় তারা যদি ওকে চিনে ফেলে, তা হ'লেই মুস্কিল। একখানা উড়ো চিঠির ওয়াস্তা। এক কায করা যাক না। বাবাজীকে মেয়ে সাজানো যাক। পুলিস-বোট দু'খানা আমাদের ঢের আগেই জামালপুরে পৌঁছে যাবে। ঘাটে দু'খানা ঘোড়ার গাড়ী রাখতে হুকুম দিয়েছি। একখানাতে মেয়েরা—দিদি, লীলা-টীলা যাবে এখন। সেই গাড়ীতে, বউ সেজে ঘোমটা দিয়ে জামাইও উঠ্‌বে। অপর গাড়ীখানায় আপনি, আমি, ছেলেরা।"

সেই পরামর্শই স্থির হইল।

তার পর হরেনের কাছে ব্যাপার সব শুনা গেল। গোবিন্দপুর হইতে থানায় ফিরিয়াই সে গোয়েন্দার মুখে সংবাদ পায়, এক জন ধনী মাড়োয়ারী অনেক টাকা লইয়া বজরা ভাড়া করিয়া নানাস্থানে চাষীদের পাটের দাদন দিয়া বেড়াইতেছে। স্বদেশীর একটা দল তাহার পিছু লইয়াছে—খুব সম্ভব, ডাকাতী করাই অভিপ্রায়। হরেন তাই প্রস্তুত হইয়া ছিল। তাহার এলাকায় বজরা প্রবেশ করার পর হইতেই বজরার পিছু পিছু তার পুলিস-বোট দু'খানি আসিতেছিল। মোল্লাগঞ্জ তার এলাকার বাহিরে। সেখানে আরোহী বদলের খবরটা সে পায় নাই এবং দেখা যাইতেছে, স্বদেশী ডাকাইতরাও পায় নাই।

পূর্ণ বলিল, "না, আমরাও পাইনি। আমাদের লোক মোল্লাগঞ্জের বাজারের ভিতর দিয়ে বাইসিক্লে চ'লে এসে-ছিল, ঘাটে ত সে যায় নি।"

হরেন বলিল, "সে মাড়োয়ারীটা বোধ হয় কি রকম ক'রে গন্ধ পেয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি মোল্লাগঞ্জে নেমে পড়েছে।"

৬

থানায় পৌঁছিয়া, হরেন আমার ও মাঝিমাল্লাগণের এজেহার লিখিয়া লইয়া, পরদিন সাক্ষিস্বরূপ আদালতে হাজির হইবার জন্য আমাদের সমন ধরাইল।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মোকর্দ্দমা উঠিলে, দশ দিনের জন্য উহা মুলতুবী হইয়া গেল।

আমি এই অবসরে স্ত্রী-পুত্রকন্যা ও বধূবেশী জামাতাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলাম। জামালপুর মহকুমার এলাকা পার হইবার পর, সুযোগ বুঝিয়া, বাবাজীকে বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করাইয়াছিলাম—তাহাই হরেনের পরামর্শ ছিল।

জামাতাকে নিজ বাটীতেই রাখিয়া, আমি নিজে গেলাম রাজসাহীতে বেহাইকে সুসংবাদটা দিতে। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর লোক ছাড়া এ কথা কি আর কেউ জানতে পেরেছে?"

বলিলাম, "না, কারুর কাছে এ কথা যাতে প্রকাশ না হয়, সেই রকম ব্যবস্থা করেছি।"

"ভাল করেছ। প্রকাশ হলে, ছেলেও যাবে, হরেন বাবুরও জেল অনিবার্য্য।"

"সে কথা সে আমায় আগেই বলেছে।"

অল্পক্ষণ চিন্তার পর বেহাই বলিলেন, "গ্রীষ্মের ছুটীতে পূর্ণ বাড়ী এল না কেন, কেউ কেউ এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলেছি, সে শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে গেছে হাওয়া খেতে।—কলেজও বোধ হয় এত দিন খুলে থাকবে।

"আচ্ছা, তুমি গিয়ে পূর্ণকে এখানে পাঠিয়ে দাও গে। কিংবা দাঁড়াও, কাল শনিবার আছে, কাছারীর পর আমিও তোমার সঙ্গে যাই চল। ছেলেকে, বউমাকেও সঙ্গে নিয়ে আসি। তার পর হপ্তাখানেক বাদে ছেলেকে কলকাতায় রেখে আসবো। একটা বছর নষ্ট হ'ল আর কি, তা কি আর করা যাবে!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু মেয়েকে ঘর-বসতে পাঠাবার কোনও আয়োজনই ত আমি করিনি।"

বেহাই ছল-ছল নেত্রে ভারি গলায় বলিলেন, "সে সব পরে হবে এখন। যা আয়োজন করেছ, তারই ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারবো না, ভাই।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গাঁজার কাণ্ড

প্রথম ছিলিম

১
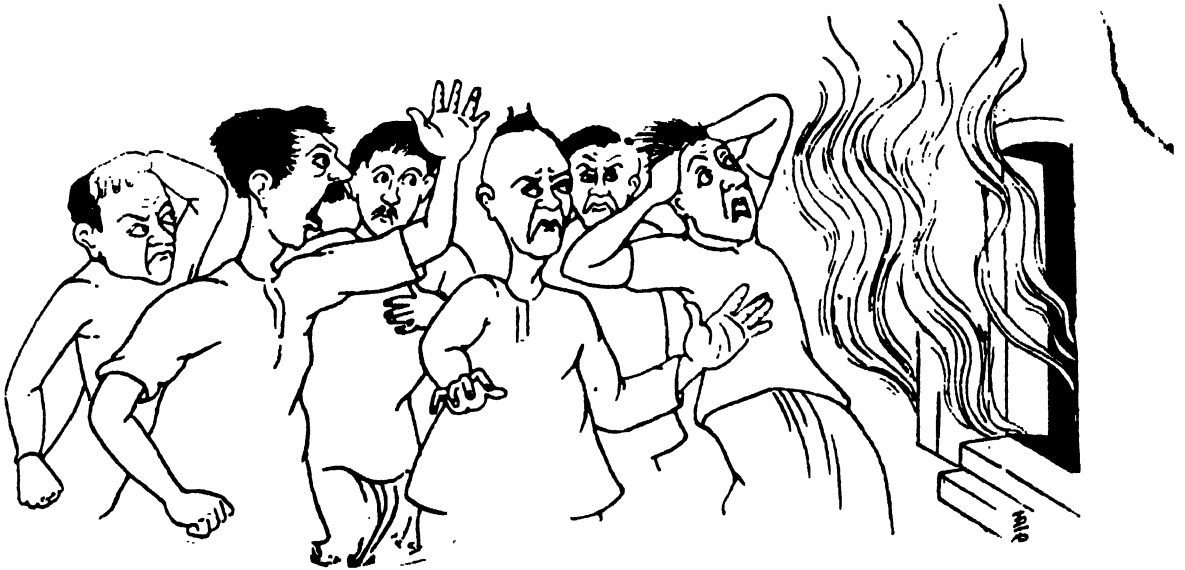
গাঁজার দোকানে আগুন লেগেছে সহরের মাঝখানে;
জানে নাক কেউ—কে আগুন দিল এমন পীঠস্থানে।
দারুণ বিপদে আজিকে প্রথম কাটিয়ে নেশার ঘোর,
এপাড়া ওপাড়া ঝেঁটিয়ে হাজির—যত ছিল গাঁজাখোর।

২

হায় হায় করে' সবাই চেঁচিয়ে তোলপাড় করে পাড়া—
ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগিলে ব্যাপার যেমন ধারা!
ফট্ ফট্ করে' যত-কিছু ফাটে, ব্যোম ব্যোম করে সবে;
চৌচির হয়ে ফাটিছে বিশ্ব যেন শিবতাণ্ডবে!

দ্বিতীয় ছিলিম

১

কেহ কেঁদে কয়—কি সর্ব্বনাশ—
বেঁচে আর কিবা ফল!
কেহ বলে, ভাই, মূলে ভুল হ'ল,
কি খেয়ে বাঁচ্‌বি বল্‌?

কেউ বলে, ওরে, কান্না মোদের
মিছে মাঠে মারা যায়,
আগুন নিবা'তে দোকানের পরে
একসাথে কাঁদি, আয়!

২

কেহ বলে, ভাই, তপ্ত খোলায়
গাঁজা যে ওদিকে ভাজা,—
চল না এগিয়ে, বিনা কল্‌কেয়
খেতে চাস্‌ যদি খাজা!
আর জন বলে, পঞ্জিকাখানা
ফেলে যে এসেছি ভাই;
গঞ্জিকাভাজা বন্ধুরে ফেলে'
একা কভু খেতে নাই!

তৃতীয় ছিলিম

একটি গেঁজেল নির্ব্বাক্ হয়ে
বসেছিল একধারে—
ভুরিতানন্দভস্মে চাহিয়া
ছাই ভেবে সংসারে!

সহসা কোথায় উঠে চলে' গেল
ছাড়িয়া গাঁজার ভিড়;
সকলে ভাবিল সংসার ত্যাগ
করিল ধর্ম্মবীর।

চেয়ে দেখি সেই কোথা হ'তে এল
পাটকাঠি এনে খুঁজে',
গাঁজার ভস্মে নলটা লাগিয়ে
ট্যানিছে চক্ষু বুজে!

তারি দেখাদেখি ছাড়ি' বকাবকি
শুধায় গাঁজার দল—
কোথা পেলি ভাই, বিনা পয়সায়
এমন মজার কল?

চতুর্থ ছিলিম

১

ওদিকে একটি বৃদ্ধ গেঁজেল চুপ করে' উঠে' গিয়ে
মাতালের দল আনিল ডাকিয়া উপরে খবর দিয়ে !
কি করে'যে তা'রা আগুন নিবাবে,নিজেরা রেগে আগুন—
জলপথে চলা অভ্যাস-ফলে বৈঠামারার গুণ !

২

ডানে বাঁয়ে তাই দু'হাতে চালায় বেপরোয়া হাতিয়ার,
ভ্রূক্ষেপ নাই—গাঁজার আগুনে পাড়া পুড়ে' ছারখার !
পাকা গেঁজেলেরও নেশা ছুটে' যায় মারের কাণ্ড দেখে' ;
গাঁজার আগুন বাড়ে বিশগুণ, ব্যাপার দাঁড়ায় বেঁকে !

পঞ্চম ছিলিম

১

ওদিকে স্বর্গে নেশার দেবতা ভোলানাথ জেগে উঠে ;
মর্ত্ত্যের এই মহাসোরগোলে নেশা তার যায় ছুটে' !
তিন চোখে চেয়ে ব্যাপার তবুও ঠিক বুঝিবারে নারে,—
গাঁজাগুলি তরে গোলাগুলি কেন, দুনিয়ার দরবারে !

২

ডমরুনাদে চমকিয়া চাঁদে
ইন্দ্রেরে ডেকে কয়—
গাঁজার দোকানে অগ্নির রোষ !
এ কেমন মহাশয় ?
নামাও বৃষ্টি বাঁচুক সৃষ্টি—
রেখে দাও জারিজুরি ;
স্বর্গের আজ নাই কোনো কাজ—
জানি সব গাঁজাখুরি !

শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি তাহারই লাভের জন্য প্রযত্ন করিবে, এ সংসারে উপরিতন লোকে বা অধস্তন লোকে ভ্রমণকারিগণ যাহা লাভ করে না, (যাহা পাইবার জন্য সাধারণতঃ সকলেই যত্ন করিয়া থাকে) সেই বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন সুখ দুঃখের ন্যায় অচিন্ত্যপ্রভাব কাল বশতই লব্ধ হইয়া থাকে।

এই শ্লোকে উপরিতন লোকে বা অধস্তন লোকে পরিভ্রমণকারী জীবগণের যাহা দুর্লভ, অর্থাৎ একমাত্র এই পৃথিবীতেই যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাকেই পাইবার জন্য মানুষের প্রযত্ন করা উচিত, ইহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই বস্তু যে কি, তাহা স্পষ্টভাবে কথিত হয় নাই। সে যে অভিলষিত প্রাপঞ্চিক বিষয়ভোগজনিত সুখ বা তৃপ্তি, তাহা নহে। কারণ, বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্ক হইতে উৎপন্ন সুখ বা তৃপ্তি. অচিন্ত্যশক্তি কালপ্রভাবেই অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখের ন্যায় পুরুষ-প্রযত্ন ব্যতিরেকেও লাভ করিতে পারা যায়, তাহা ত স্পষ্টভাবেই এই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে তাহা কি? এই শ্লোকে তাহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট না হইলেও শ্রীমদ্‌ভাগবতে অন্যত্র তাহা অতি স্পষ্টভাবেই কথিত হইয়াছে, যথা—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিং ত্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥

হে নাথ! দেহিগণের তোমার পাদপদ্মধ্যান হইতে অথবা (পাদপদ্মধ্যানের কথা দূরে দূরে থাকুক) তোমার প্রেমরসে আত্মহারা হইয়া যাহারা একবারে তোমারই মানুষ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের অলৌকিক রসময় কথার শ্রবণ হইতে অপ্রাকৃত সুখ হইয়া থাকে, সেই অপ্রাকৃত সুখ জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের চরমসীমায় উপনীত সত্যলোকপতি চতুরানন ব্রহ্মারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, মরণের তীক্ষ্ণধার খড়্গের আঘাতে বিপর্য্যস্ত ব্যোমযান হইতে পতন যাহাদিগের পক্ষে অনিবার্য্য, সেই ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের পক্ষে সেই সুখ যে একবারে অসম্ভাবনীয়, সে বিষয়ে আর অধিক বক্তব্য কি আছে?

এই শ্লোকে ভগবৎপাদারবিন্দধ্যানপ্রসূত ব্রহ্মাদিদেবগণেরও অতি দুর্লভ যে নির্বৃতি বা সুখের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই ভক্তিশাস্ত্রে পারমার্থিক রসশব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রাকৃত কাব্যনিচয়ের রচয়িতা কবিগণ বা আলোচক আলঙ্কারিকগণ অথবা আস্বাদয়িতা সহৃদয়গণ যে রসের সহিত পরিচিত, সে রস পারমার্থিক রস নহে, হইতেও পারে না। কারণ, তাহার আলম্বন, তাহার উদ্দীপন, তাহার অনুভাব এবং তাহার সঞ্চারিভাব এ সকলই প্রাকৃত, সুতরাং অশুদ্ধ; সেই সকল আলম্বন, উদ্দীপন ও সঞ্চারিভাব হইতে মানব-হৃদয়ে যে রতির অভিব্যক্তি হয়, তাহাও প্রাকৃত রতি, তাহার ঐকান্তিকী শুদ্ধি সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহা দেহাত্মভাব-রূপ অন্ধতমসাবৃত কামাদি-দোষ-কলুষিত স্বার্থপর চিত্তগহ্বরে প্রসুপ্ত হলাহলোদ্‌গারী কালভুজঙ্গমোপম বাসনাজালের ক্ষণিক পরিণতি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। এমন প্রাকৃত রতি প্রাকৃত আলম্বন ও উদ্দীপন প্রভৃতির প্রভাবে অভিব্যক্ত হইয়া আস্বাদ্যমান হইয়া রসরূপ ব্রহ্মাস্বাদের সদৃশ হইয়া যায়, লৌকিকরাজ্যের বাহিরে গিয়া দাঁড়ায়, অশুদ্ধ-চিত্তের স্পন্দনমাত্রের পরিণতি হইয়াও কাব্যসম্পদের প্রভাবে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবৎ সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ বুদ্ধস্বভাব হইয়া উঠে, ইহা প্রাকৃত রসিকগণের সিদ্ধান্ত হইতে পারে; কিন্তু সদ্‌ সদ্বিবেকী ব্যক্তিগণের নিকটে ক্ষণভঙ্গুর দুঃখবহুল সাংসারিক সুখের প্রতি একান্ত বিরক্ত পারমার্থিক-রসানুসন্ধিৎসু প্রকৃত সহৃদয় মনীষিগণের নিকটে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কখনই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না—ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রাণের কথা। তাঁহাদের এই কথার মধ্যে যে মধুর অথচ গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত আছে, এইক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

লৌকিক রসের ভিত্তিস্থানীয় যে রতি বা স্থায়িভাব তাহা কাহার মনোবৃত্তি, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন যে, নাটকে বা কাব্যে যে নায়ক বা নায়িকা বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহাদের মনোবৃত্তি যে রতি

তাহা সহৃদয়গণের রসাস্বাদের ভিত্তি হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না, তাহাই বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে যে—

পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ সান্তরায়তয়া তথা।
অনুকার্য্যস্য রত্যাদেরুদ্বোধো ন রসো ভবেৎ॥

দৃশ্যকাব্যস্থলে যাহার অনুকরণ নট করিয়া থাকে, সেই নায়ক বা নায়িকার যে রতি বা অনুরাগ, সহৃদয়গণের যে তদ্বিষয়ক আস্বাদ বা অনুভূতিবিশেষ, তাহা রস হইতে পারে না। কারণ, সেই নায়ক বা নায়িকার যে রতি, তাহা পরিমিত, লৌকিক এবং সান্তরায়।

আমরা রসাস্বাদের আকাঙ্ক্ষায় যখন কোন দৃশ্য-কাব্যের অভিনয় দেখিবার জন্য রঙ্গশালায় প্রবেশ করিয়া দেখি, কোন অভিনয়ক্রিয়াকুশল নট 'মৃণালিনী'র সুপ্রসিদ্ধ নায়ক হেমচন্দ্রের ভূমিকা পরিগ্রহ করিয়া অভিনয় করিতেছে, তখন হেমচন্দ্রের মৃণালিনীর প্রতি যে অনুরাগ আমাদের মানসনয়নে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহারই যে উদ্বোধ বা অনুভূতিবিশেষ, তাহাই কি রস বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়? বাস্তবপক্ষে তাহা রস হইতে পারে না। কারণ, হেমচন্দ্রের মৃণালিনীর প্রতি যে অনুরাগ বা রতি, তাহা পরিমিত অর্থাৎ সীমাবদ্ধ অর্থাৎ সেই রতিতে হেমচন্দ্রের অহমিকা বা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, অন্যের ব্যক্তিত্ব দ্বারা বিশেষিত যে মনোবৃত্তি, তাহা কোন কালেই অপরের প্রত্যক্ষাত্মক অনুভবের বিষয় হইতে পারে না, তাহা অপরের অনুমানের বিষয় হইতে পারে বা শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে; কিন্তু কিছুতেই তাহা অপরের স্বগত সুখদুঃখাদির ন্যায় মানস-প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া আস্বাদ্য হইতে পারে না—ইহা কে অস্বীকার করিবে? পরিমিতভাবে অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের সহিত সম্বদ্ধভাবে যাহা প্রতীত হইয়া থাকে, এই প্রকার যে অনুরাগ, তাহা যাহার মনোগত, সেই তাহার আস্বাদন বা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে, অপরের নিকট তাহা আস্বাদ্য হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। অভিনয়দর্শনকালে সামাজিকগণ কিন্তু রতি বা অনুরাগের মানস প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে এবং যখন এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ হয়, তখনই তাহারা রসাস্বাদন করিয়া থাকে, ইহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং অভিনয়দর্শনকালে হেমচন্দ্রের মৃণালিনীর প্রতি অনুরাগের অনুভূতি যে রসপদার্থ হইতে পারে না, ইহা অবশ্য অঙ্গীকার্য্য।

আর এক কথা এই যে, নায়ক বা নায়িকাগত যে অনুরাগ, তাহা লৌকিক রতি, সেই লৌকিক রতি যে আস্বাদনের বিষয় হয়, তাহা কখনও অলৌকিক আস্বাদন হইতে পারে না। রসাস্বাদ কিন্তু লৌকিক নহে, উহা লোকাতীত আস্বাদ, এই কারণে নায়কাদিগত লৌকিক রতির সামাজিকগণ কর্ত্তৃক যে আস্বাদ, তাহা অলৌকিক রসাস্বাদ হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। তাহার পর আরও দ্রষ্টব্য এই যে, নাটকে বা কাব্যে যাহাদের চরিত্র বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহাদের মনোগত যে অনুরাগ প্রভৃতি, তাহা নাট্যদর্শন বা কাব্যানুশীলনের পরিণতি নহে বা তাহার অনুকূল নহে, প্রত্যুত তাহা কাব্যানুশীলন বা নাট্যদর্শন হইতে যে প্রকার বৃত্তি মনে উদিত হয়, তাহার বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল। সুতরাং অভিনয়দর্শনে বা কাব্যানুশীলনে যে বৃত্তির স্ফুরণ হয়, তাহার সহিত ঐ সকল নায়ক-মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য বা সারূপ্য কখনই সম্ভবপর নহে। এই কারণে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, অভিনয়দর্শনকারী বা কাব্যানুশীলনকারী সহৃদয়গণ নায়ক বা নায়িকার হৃদয়গত অনুরাগাদি ভাবনিচয়ের যথাযথভাবে আস্বাদন করিতে পারেন না এবং তাহাদের ঐরূপ আস্বাদনকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রস বলিয়া অঙ্গীকার করাও কিছুতেই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং অনুকার্য্য নায়ক বা নায়িকার রতি রসাস্বাদনের বিষয় হইবে, ইহা বলা যায় না।

যে ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চে রাম, জানকী প্রভৃতির ভূমিকা পরিগ্রহ করিয়া অভিনয় করিয়া থাকে, তাহার মনোগত অনুরাগ বা রতির আস্বাদনই রস হইয়া থাকে, ইহাও সম্ভবপর নহে। কারণ, নট শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা প্রসূত যে নৈপুণ্য, তাহা দ্বারা তৎকালে রাম বা জানকী প্রভৃতি অনুকার্য্যগণের সমান বলিয়া সহৃদয়গণের নিকট প্রতীত হইয়া থাকে, এই মাত্র, তাই বলিয়া তাহার হৃদয়ে তৎকালে যে তাহার নিজের বা সামাজিকগণের রসাস্বাদনে অনুকূল কোন রতির আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা নহে, কাব্যসৌন্দর্য্যপ্রভাবে যদি তাহার হৃদয়ে ঐরূপ রতি আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে সে আর তখন নট-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, সে তখন অন্যান্য সামাজিক সহৃদয়গণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, এরূপ অবস্থায় সে নট থাকে না, অর্থাৎ রসাস্বাদকারী সভ্য হইয়া পড়ে। সভ্যগণের হৃদয়ে কি প্রকার রতির আবির্ভাব হয়, তাহারই অনুশীলন করা

যাইতেছে, সুতরাং ইহা স্থির হইল যে, নটগত রতি যে আস্বাদ্য হইয়া রসরূপে পরিণত হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। এই কথাই আলঙ্কারিক বলিয়া থাকেন, যথা—

শিক্ষাভ্যাসাদিমাত্রেণ রাঘবাদেঃ স্বরূপতাম্।
দর্শয়ন্নর্ত্তকো নৈব রসস্যাস্বাদকো ভবেৎ॥

রসাস্বাদনের প্রধানভাবে বিষয়ীভূত যে রতি, তাহা যদি নায়ক বা নায়িকার মনোবৃত্তি বা অভিনেতার মনোবৃত্তি না হইল, তবে তাহা কাহার মনোবৃত্তি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইয়া আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন যে, যে সকল সামাজিক রসাস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই মনোবৃত্তিরূপ যে রতি, তাহাই তাঁহাদের দ্বারা যখন আস্বাদিত হয়, তখনই উহা রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

আলঙ্কারিক আচার্য্যগণের এই সিদ্ধান্ত বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তিনিবহের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক; সুতরাং এক্ষণে তাহারই অবতারণা করিতে হইতেছে।

আপনার হৃদয়ে অনুরাগ প্রভৃতি ভাবনিচয়ের আস্বাদনই যদি রসাস্বাদন হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য রঙ্গালয়ে অর্থব্যয় করিয়া প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্ন সকলেরই মনে উদিত হইয়া থাকে। আত্মগত বৃত্তি যখনই উদিত হয়, তখনই আমরা তাহার আস্বাদন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকি, ইহা কে অস্বীকার করিবে? আমার পুত্রের প্রতি যে স্নেহ, পত্নীর প্রতি যে ভালবাসা, শত্রুর প্রতি যে বিদ্বেষ, তাহা সকলই আমার মানসপ্রত্যক্ষ-বেদ্য, ঐ সকল বৃত্তি যখনই উৎপন্ন হয়, তখনই আমরা তাহাদের মানসপ্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, এই ঘটনা আমাদের কি জাগরণ, কি স্বপ্ন, এই দুই অবস্থায় অনুক্ষণই হইয়া থাকে, কেবল সুষুপ্তি অবস্থাতেই ইহা হয় না। কারণ, সে সময়ে আমাদের কোনপ্রকার মনোবৃত্তিই উদিত হয় না, ফলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, নিজ নিজ কাম, ক্রোধ, অনুরাগ প্রভৃতি মনোবৃত্তির আস্বাদনই যদি রসাস্বাদন হয়, তাহা হইলে সে রসাস্বাদনের জন্য কাব্যানুশীলন বা অভিনয়দর্শন প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার কেন সহৃদয় মানবগণ করিয়া থাকে? এই প্রশ্নের সদুত্তর আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ যতক্ষণ না বুঝাইতে পারিবেন, ততক্ষণ তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সামাজিকগণের আত্মগত রতি প্রভৃতি ভাবের আস্বাদনই রসাস্বাদন, এইরূপ মত কিছুতেই মানিয়া লইতে পারা যায় না। এই জটিল প্রশ্নের কিরূপ উত্তর আলঙ্কারিকগণ দিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহাই দেখা যাক্। তাঁহারা বলেন, আত্মরতির আস্বাদনই যে রসাস্বাদন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই আস্বাদন সর্ব্বদা যে আমরা আস্বাদন করিয়া থাকি, তাহা নহে, কিন্তু তাহা অলৌকিক আস্বাদন, আমরা ব্যবহার-দশাতে বা স্বপ্নে যে আত্মগত রতি প্রভৃতি ভাবের আস্বাদন করিয়া থাকি, সে আস্বাদন লৌকিক আস্বাদন, এই কারণে ঐ লৌকিক আস্বাদনকে রসাস্বাদন বলা যায় না, কিন্তু কাব্য ও নাটকাদির অনুশীলনে বা দর্শনে আমরা আত্মগত রতি প্রভৃতি ভাবনিবহের আস্বাদন করিয়া থাকি, তাহা যেহেতু লৌকিক আস্বাদনের অন্তর্ভুক্ত নহে, এই কারণে তাহাই রসাস্বাদন বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইয়া থাকে, এ অলৌকিক শব্দের অর্থ কি? আমরা রসাস্বাদনের জন্য যখন রঙ্গশালায় প্রবেশ করি, তখন কি আমরা লৌকিকতা পরিহার করিয়া বসি? যে চক্ষুর দ্বারা আমরা রঙ্গশালার বাহিরের দৃশ্যবস্তু বিলোকন করিয়া থাকি, যে কর্ণের দ্বারা আমরা বাহিরের শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকি, সেই চক্ষু ও সেই কর্ণ বাহিরে রাখিয়া রঙ্গশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক আমরা নূতন চক্ষু বা নূতন কর্ণ লাভ করি না; বাহিরে যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতির তত্তদিন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিয়া থাকি, রঙ্গশালার অভ্যন্তরে সেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় ছাড়া স্বর্গরাজ্যের কোন অলৌকিক বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় না, আমরা বাহিরেও যে ভাবের মানুষ হইয়া ব্যবহার করিয়া থাকি, রঙ্গশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর সে ভাবের মানুষই ত আমরা থাকি, নিশ্চয়ই স্বর্গীয় মানব হইয়া উঠি না। বাহিরের আমি ও আমার সবই যদি লৌকিক হয়, তবে রঙ্গশালার অন্তর্গত আমি বা আমার যাহা কিছু, তাহা অলৌকিক হইয়া যাইবে, ইহাই যদি আলঙ্কারিকগণের বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কথার উপর আমরা কিরূপে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি? এইরূপ প্রশ্নের আলঙ্কারিকগণ কি উত্তর দিয়া থাকেন, এইবার তাহারই অবতারণা করা যাইতেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

অঙ্গুরী না অঙ্কুশ !

প্রথম পরিচ্ছেদ

বপ্রক্রীড়া

অল্প কয়েক মিনিট পরেই সূর্য্যোদয় হইবে। এমন সময়ে প্রৌঢ়-বয়স্ক দুই জন ভদ্রলোক একটা কাঁচা রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। রাস্তাটার দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক এক-চতুর্থ মাইল হইবে। ইহার উভয় দিকে বিল। তাহাতে নানাবিধ জলপুষ্প। পদ্মগুলি তখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই। ভাদ্রমাসের শেষ দিন—কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পথ এখনও পিচ্ছিল ছিল বলিয়া বন্ধুদ্বয়ের পথ-চলা সুখসাধ্য হইতেছিল না। কিন্তু আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হইয়াছিল এবং মধ্যগগনে চন্দ্র বিরাজ করিতেছিল বলিয়া চারিদিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহাদের চিত্তবিনোদন হইতেছিল। কুমুদ এবং স্ফুটনোন্মুখ পদ্মগুলি যেন প্রাতঃ-সমীরণে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে-ছিল। পথের পার্শ্বে জলের ধারে ধারে এক এক স্থানে দুই এক-খানি কুটীর। তাহাতে লাউ কুমড়ার গাছ উঠিয়া চাল এক-বারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেক কুটীরের অতি নিকটেই একটা বাঁশের খুঁটার উপরে একটা কালিমাখা হাঁড়ি উপুড় করিয়া বসান। তাহাতে খড়িমাটী বা চূণ দিয়া মানুষের মুখ আঁকা। লাউ-কুমড়া-গাছের ধারে এরূপ হাঁড়িমুখ বাঙ্গালীমাত্রেই দেখিয়া-ছেন! সুতরাং সেই অঙ্কিত মুখের চিত্র-সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

পথিকদ্বয়ের এক জন বলিলেন, "দেখেছেন হরিপদ বাবু, এ হাঁড়ি-মুখটা যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। যেন মনে মনে বলছে—'তোমরা লাউ চুরী করতে এসেছ, আমি থাকতে তা হবে না, সে চেষ্টা করো না—সোজা পথে চ'লে যাও'।"

হরিপদ বলিলেন, "তিন বাড়ীতেই তিনটে হাঁড়িমুখ। একটা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, আর দুটা যেন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কি বলাবলি করছে। আপনাকে কিন্তু সাবধান ক'রে দিচ্ছি, রমেশ বাবু, হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে যেন পা পিছলে প'ড়ে না যান। রাস্তার ছোট বড় গর্ত্তগুলো দেখে চল্‌বেন।"

হরিপদ। আর ত দু'তিন মিনিটের মধ্যেই কাদা-রাস্তা ছাড়াব। তার পর আর পাঁচ মিনিটের পথ গিয়েই হরকান্ত বাবুকে জাগাব।

এইরূপ আলাপ হইতে হইতে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, পশ্চাৎ হইতে কেহ তাঁহাদিগকে ডাকিতেছে। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের পুরাতন বন্ধু দেবকুমার বাবু আসিতেছেন। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায়, হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেব-কুমার বলিলেন, "কি, আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?"

পথ চলিতে চলিতে হরিপদ বলিলেন, "আপনিও যেখানে, আমরাও সেখানে। আপনি দেখ্‌ছি খালি পায়ে এসেছেন। মহাত্মার অনুকরণ না কি?"

দেবকুমার। তাতেই বা দোষ কি? বৃষ্টিতে রাস্তায় খুবই কাদা হবে ভেবে শুধু পায়ে এসেছি।

হরিপদ। আমি সেই ভয়ে এই ছেঁড়া জুতো এনেছি।

রমেশ। আর এইটুকু গেলে বাঁচা যায়। আমার জুতো একেবারে নূতন—পরশু কিনেছি। এইটুকু আসতেই এর দশা হয়েছে দেখুন।

দেবকুমার। আমি যাচ্ছি হরকান্ত বাবুর কাছে একটা পরা-মর্শ নিতে। আপনারাও কি সেখানে যাবেন? কি ক'রে জানলেন যে, আমিও সেখানে যাচ্ছি?

হরিপদ। আপনি যাচ্ছেন পরামর্শ নিতে—আমরা যাচ্ছি তাঁকে একটা পরামর্শ দিতে। আপনি যখন এত সকালে—ও কি? ছাগলছানা দাঁড়িয়ে আছে। ধাড়ীটে বোধ হয় কাদায় ব'সে গিয়েছে—উঠতে পারছে না।

নিকটে গিয়া তিন জনই দেখিলেন যে, বাস্তবিকই একটা ছাগীর পেট পর্য্যন্ত কাদায় বসিয়া গিয়াছে—উঠিতে পারিতেছে না। ছাগ-শিশু দুইটি তাহার কাছে দাঁড়াইয়া এক একবার কাতরস্বরে ডাকিতেছে। রাস্তার পার্শ্বেই নিম্নভূমিতে ক্ষুদ্র একটি কুটীর—লাউ-গাছে আচ্ছন্ন। নিকটে যথারীতি একটা হাঁড়িমুখ রহিয়াছে। তিনটি নিরীহ জীবের যে এইরূপে সমস্ত রাত্রি কষ্টে কাটিয়াছে, ইহাতে তিন বন্ধুই দুঃখ প্রকাশ করিয়া কুটীরের লোকদিগকে ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। অবশেষে ছাগীটাকে কর্দ্দমের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রত্যেকে পঞ্জাবীর হাত গুটাইয়া লইয়া ছাগীর পেটের নীচে হাত দিয়া এবং মাথা ধরিয়া সেটাকে টানিয়া তুলিলেন। এই প্রচেষ্টার ফলে কাদা ছিট্‌কাইয়া তাঁহাদের সমস্ত কাপড়ে ও মুখে লাগিল। ছাগীটিকে তুলিবামাত্র হরিপদ ও রমেশ পা পিছলাইয়া সেই গর্ত্তে পড়িয়া গেলেন—উভয়েরই প্রায় কটিদেশ পর্য্যন্ত কাদায় ডুবিয়া গেল। উভয়েই দেবকুমারকে ধরিয়া কষ্টে পা টানিয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু রমেশের নূতন জুতার এক পাটি কাদায় আটকিয়া সেই গর্ত্তের মধ্যেই রহিয়া গেল। একে একে

তিন জনই তাহা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কর্ণের রথ-চক্রের মত তাহা আর উঠিল না—লাভের মধ্যে তিন জনই আপাদমস্তক কর্দ্দমাক্ত হইয়া একবারে ভূত সাজিলেন। হরিপদ বলিলেন, "এখন দেখ্ছি দেবকুমার বাবু জুতো না এনে বুদ্ধির কাযই করেছেন। রমেশ বাবুর নূতন জুতা গেল, এইটেই পরিতাপের বিষয়। আপনারা দু'জনেই যখন রিক্তপদ হলেন, তখন আমিই বা এই ছেঁড়া জুতো টেনে মরি কেন?" এই বলিয়া তিনি স্বীয় জুতা রাস্তার উপর রাখিয়া দিলেন। রমেশ বলিলেন, "ছাগলটার কাদা ধুইয়ে দিতে হবে—না হ'লে বাচ্চা দুটো দুধ খাবে কি ক'রে?"

অন্য দুই জনও এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া জল আনিবার জন্য সেই বাঁশের খুঁটা হইতে হাঁড়িমুখ খুলিয়া লইয়া দেখিলেন যে, সেটা আস্ত হাঁড়ি বা কলস নহে। হরিপদ যখন সেটাকে জলে ডুবাইয়া তুলিলেন, তখন তাহা শতধা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিন বন্ধুতে মিলিয়া ছাগীটাকে জলে লইয়া গিয়া ধুইয়া দিলেন। নিজেদের কাদা কিন্তু যেমন তেমনই রহিল। তখন সূর্য্যোদয় হইয়া গিয়াছে। বিলম্ব হইলে লোক তাঁহাদের কাদামাখা রূপ দেখিবে, ইহা তাঁহাদের ইচ্ছা হইল না। শীঘ্র শীঘ্র গন্তব্য স্থানের দিকে যাইতে যাইতে আলাপ করিতে লাগিলেন।

দেবকুমার। আচ্ছা কাণ্ডটাই হয়ে গেল! যেন একটা অ্যাড্‌-ভেঞ্চর। এটাকে ভিত্তি ক'রে একটা গল্প লেখা যেতে পারে।"

হরিপদ। আমাদের যে সকল নভেল নাটক বেরোয়, তা আর পড়তে ইচ্ছা হয় না, একটা সাহসের কথা নাই, একটা বীর্য্যবত্তার কথা নাই। একটা প্লট নাই, কোনরূপ চমৎকারিত্ব নাই; আছে কেবল অবৈধ প্রণয়ের বর্ণনা, পারিবারিক নীচতা, নিষ্ঠুরতা, শঠতা, আর—"

দেবকুমার। থামুন থামুন। সাহিত্যে সমাজই প্রতিফলিত হয়। আমাদের সমাজে সাহস প্রভৃতির কি কাযটা আছে যে, সাহিত্যে সেগুলি দেখা যাবে?

হরিপদ। কেবল সমাজই যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে, এমন নহে। সাহিত্যও সমাজে প্রতিফলিত হয়। সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী সাহিত্যসেবীরা ভাল ক'রে গঠন করলেও তার প্রতিক্রিয়া হয়, দুষ্ট সাহিত্যের ফলে সমাজেও দোষ প্রবেশ করে। কিন্তু সে কথা যাক্। আমাদের আজকের ঘটনাটা দিয়ে রমেশ বাবু কি একটা নভেল বা গল্প খাড়া করতে পারেন না? রমেশ বাবু যে চুপ করেই রইলেন?

রমেশ। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। আপনারা কি বলাবলি করছিলেন, আমি তা শুনতে পাই নি।

হরিপদ। কি ভাবছিলেন বলুন দেখি গায়ে কাদা মেখে?

রমেশ। ভাবছিলাম এই যে, তিনটি প্রাণী সমস্ত রাত্রি এত কষ্ট পেলে, এমন কেন হ'ল? সৃষ্টিকর্ত্তা যদি এক জন থাকেন—যদি তিনি দয়াময় হন, সর্ব্বশক্তিমান্ হন, তা হ'লে বিনা অপরাধে সংসারে এত দুঃখ হয় কেন?

হরিপদ। পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফল।

রমেশ। জন্মান্তর মানা কিন্তু বড় কঠিন। শাস্তির উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত সংশোধন। সংশোধন করার জন্য যাকে শাস্তি দেওয়া হয়, তার মনে থাকা উচিত যে, কি অপরাধের জন্য তার শাস্তি হচ্ছে। দোষ বা অপরাধের কথা যদি শাস্তি পাবার সময়ে মনেই না থাকে, তা হ'লে সংশোধন অসম্ভব। ছাগশিশু দুটো কি জান্‌তো যে, তারা অমুক পাপ করেছিল ব'লে তাদের সমস্ত রাত্রি অনাহারে বৃষ্টিতে ভিজতে হচ্ছে?

দেবকুমার। মাতাল যখন মোটর চাপা প'ড়ে মারা যায়, তখন তার অপমৃত্যু যে, মদ খাওয়ার ফল, এটা তার মনে পড়ার ত সময় থাকে না। আমার হাতের এইখানটায় ক দিন খুব বেদনা হয়েছে—অবশ্যই একটা আঘাত লেগেছিল, কিন্তু কখন্ কোথায় কিরূপে সে আঘাতটা লাগলো, তা কিছুতেই মনে হচ্ছে না। আমরা যে কায করি, তার অধিকাংশই মনে থাকে না। কিন্তু তার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। শাস্তি কর্ম্মফল মাত্র—সংশোধন তার উদ্দেশ্য নয়।

হরিপদ। এখনকার মত আপনারা ও বিচারটা হাতে রাখুন, ঐ দেখুন, যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনিই আসছেন।

রমেশ। তাই ত; হরকান্ত বাবু! এতদূর থেকে কি আমাদের এই কাদামাখা মূর্ত্তি দেখে চিন্‌তে পেরেছেন?

হরিপদ। বয়স হয়েছে সত্তর, কিন্তু চক্ষু তার্ক্ষ্যতুল্য। নিশ্চয় চিন্‌তে পেরেছেন। না পারলেও সঙ্গের মেয়ে চিনিয়ে দেবে। অমন মেয়ে আর কখনও কোথাও দেখি নি। যেমন সুশ্রী, তেমনই বুদ্ধিমতী, তেমনই অন্য সর্ব্বপ্রকারে ভাল।

দেবকুমার। মেয়ে কিন্তু আমাকে অনেক বছর দেখে নাই আমাকে চিনিয়ে দিতে পারবে না।

এইরূপ আলাপ হইতে হইতে উভয় পক্ষই পরস্পর সমীপ-বর্ত্তী হইলেন। দেবকুমার একটু অগ্রসর হইয়া হরকান্ত বাবুকে নমস্কার করিলেন।

হরকান্ত বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি হে, তোমরা এমন কাদা মেখে ভূত হ'লে কি ক'রে?"

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন এবং হরকান্ত বাবুর গৃহাভিমুখে

চলিলেন। যাইতে যাইতে হরকান্ত বাবু যে তিন বন্ধুর বগ্র-ক্রীড়ার কথা শুনিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অতিথি-সেবা।

বন্ধুত্রয় স্নান করিয়া পরিষ্কৃত হইয়া ধুতী, পঞ্জাবী এবং জুতা পরিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলে হরকান্ত বাবু দেবকুমারকে দেখাইয়া কন্যাকে বলিলেন, "সুমতি, এঁকে প্রণাম কর। এঁকে তুমি ছেলেবেলায় দেখেছ—এখন মনে নেই। ইনি তোমার কাকা হন। এঁর নাম দেবকুমার রায়। দেবকুমার বাবু, এটি আমার কন্যা সুমতি।"

সুমতি পরে পরে তিন জনকে প্রণাম করিয়া শেষে পিতাকেও প্রণাম করিল।

রমেশ বাবু বলিলেন, "আমাদের গ্রামের ইস্কুলের পারিতোষিক বিতরণ হবে কাল। আপনাকেই সভাপতি করা স্থির হয়েছিল। আপনি যেন অন্য কোন স্থানে না যান, এই অনুরোধ করার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শুনলাম, আপনি আজই জামপুরে যাবেন। কথাটা ঠিক কি না, তাই আমরা জানতে এসেছি।

হরকান্ত বাবু। আমি আজই জামপুরে যাব বটে, কিন্তু আপনারা এ কথা শুনলেন কার মুখে ?

হরিপদ। আপনাকে সভাপতি করার কথা হ'তেই কে কে ব'লে উঠলেন, আপনি থাকবেন না। আরও শুনলাম, আপনি সুমতিকে সঙ্গে নেবেন। তা'তে কিছু উদ্বিগ্ন হয়েই আমরা এসেছি।

হরকান্ত বাবু সুমতিকে চা আনিতে কহিলেন। সুমতি বাহিরে গেলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদ্বেগের কারণ ?"

হরিপদ। আপনি ত এখান থেকে কমলগাঁ পর্য্যন্ত রেলে গিয়ে সেখান থেকে হেঁটে জামপুর যাবেন। সঙ্গে আর কেউ থাকবে না, সেইটেই উদ্বেগের কারণ।

হরকান্ত বাবু। উদ্বেগের কারণটা কি ?

হরিপদ। কমলগাঁয়ের পারঘাটায় সর্ব্বদাই বদমাইস্ লোকের জটলা হয়। গত তিন সপ্তাহের মধ্যে তিন জন স্ত্রীলোক সেখানে অপমানিত হয়েছে। যদি যেতেই হয়—বিশেষতঃ মেয়ে নিয়ে—তা হ'লে কয়েক জন লোক সঙ্গে থাকা ভাল। আমরা আপনাদের সঙ্গী হ'তে প্রস্তুত আছি।

হরকান্ত বাবু। ধন্যবাদ! কিন্তু আপনাদের সঙ্গে নিতে পারবো না। তা হ'লে সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। সেখানে পুনঃপুনঃ স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার হচ্ছে শুনেই আমার বন্ধু রাজগোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা করবার ছলে মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের অসহায় দেখে যদি বদমাইসরা আমাদের আক্রমণ করতে আসে, তা হ'লে তাদের কিছু শিক্ষা-বিধান করবো, এই আমার যাবার প্রধান উদ্দেশ্য। সঙ্গে লোক থাকলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। একটা আশঙ্কা ছিল যে, আমাদের যাবার কথা আগে না জানলে বদমাইসরা হয় ত এসে জুটবে না। কিন্তু আপনারা যখন জেনেছেন যে, আমরা যাব, তখন সে কথা খুব প্রকাশ পেয়েছে ব'লে আশা করা যায়। আর তা হ'লে শিক্ষা নেবার জন্য লোক আসবেই আসবে। আমি কেবল খানসামাকে আমাদের যাবার কথা বলেছিলাম। সে-ই নিশ্চয় অনেক লোককে কথাটা ব'লে দিয়েছে।

হরিপদ। তবে আমরা এখন বিদায়।

হরকান্ত বাবু। সে কি ? চা না খেয়েই ? এখন সাড়ে ৭টাও হয়নি। আপনারা ৮টা পর্য্যন্ত থাকলেও আমাদের যাবার উদ্যোগ করার ঢের সময় থাকবে। আপনারা যখন আমাদের সঙ্গেই যেতে চাচ্ছিলেন, তখন ত আপনাদের প্রচুর অবকাশ আছে। আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন।

সুমতি একখানা বড় থালায় করিয়া চা লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাতে চারিখানি রেকাবি, প্রত্যেকখানিতে অঙ্কুরোদ্গত কিছু ছোলা, কিছু মুগ, কয়েকখণ্ড আদা, একটু লবণ, কয়েকটা বাদাম ও পেস্তা, দুইখানা বিস্কুট এবং একখণ্ড পাতিলেবু ছিল। পৃথক্ দুইখানি রেকাবিতে মাখন ও চিনি। এগুলি তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া সুমতি বলিল, "পিতা, দুধও কি আনবো ?" আগন্তুকরা বলিলেন, আজ তাঁহারা লেবু দিয়াই চা খাইবেন। সুমতি চলিয়া গেল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ে কি আপনাকে পিতা ব'লে ডাকে ? বাবা বলে না ?"

হরকান্ত বাবু। পিতা ব'লে ডাকতেই শিখিয়েছি। পঞ্চাশ বৎসর আগে যখন চাকরীতে প্রবেশ করি, তখন একবার বঙ্কিম বাবুর সহিত দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে আরও কয়েক জন ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথায় কথায় বঙ্কিম বাবু এই মত প্রকাশ করলেন যে, বাবা না ব'লে পিতা বলাই ভাল। * কথাটা আমার ভাল লাগলো, তাই মেয়েকে পিতা ব'লে ডাকতে শিখিয়েছি।

---

* সত্য ঘটনা। এই কাল্পনিক হরগোবিন্দ নহেন, বর্ত্তমান লেখকই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, তাঁহাকে ঐরূপ উক্তি করিতে শুনিয়াছিলেন।—লেখক।

হরিপদ। আপনি যখন বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তিনি কি আপনাকে 'আপনি' ব'লে কথা কয়েছিলেন, না 'তুমি' ব'লে?

হরকান্ত বাবু। তুমি ব'লে। তিনি আমার অনেক বড়—বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স সব বিষয়েই। কেন বলুন দেখি সে কথা?

দেবকুমার। তবে আপনি কেন আমাদের আপনি বলেন? অন্তত আমাকে যখন আপনিও 'আপনি' বলেন, তখন আমার বড় লজ্জা বোধ হয়।

হরকান্ত বাবু। এখনকার ছেলেদের যে প্রকৃতি হয়েছে, তাতে আপনি না বল্লে তারা চ'টে যায়। সেই ভয়ে আমি আপনি বলি।

হরিপদ। আমরা ত আর ছেলে নই—আমার বয়স ৪৫—রমেশ বাবুর ৪৬, দেবকুমার বাবুর কত, জানি না।

দেবকুমার। প্রায় পঞ্চাশ।

রমেশ হাসিয়া বলিলেন, "তব বলবেন না যে, আপনি ঊনপঞ্চাশ।

হরকান্ত বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাতে আর দোষ কি? আমি বাহাত্তর।"

সকলেই হাসিলেন, আগন্তুকরা তাঁহাদের প্রতি তুমি শব্দ প্রয়োগ করিতে হরকান্ত বাবুকে অনুরোধ করিলেন। তিনি সম্মত হইলেন।

এইরূপ আরও অসংলগ্ন আলাপে আলাপে চা খাওয়া শেষ হইলে হরকান্ত বাবু বলিলেন, "ওহে, তোমরা ত তিন জনই স্নান করেছ। চারটি ভাত খেয়ে যাও না কেন? আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব তৈরী হবে। আমরা যাব ব'লে সকালেই সব আয়োজন হয়েছে।"

অতিথিগণ সবিনয়ে অসম্মতি জানাইয়া ক্ষমা চাহিলেন। হরগোবিন্দ বাবু পীড়াপীড়ি করিলেন না। চা-পানান্তে ইঁহারা তিন জনই বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্ধুদের দুশ্চিন্তা

বাড়ীর বাহির হইয়াই হরিপদ বলিলেন, "আমার বড়ই আশঙ্কা। আমি মনে করছি যে, পারঘাটে গিয়ে ব'সে থাকবো। যদি কোন গোলমাল হয়, তা ঘাটের কাছেই হবে, কেন না, সেখানেই গুণ্ডাদের জটলা হয়ে থাকে। আমি যদি ঘাটে থাকি, তা হ'লে হয় ত কিছু সাহায্যও করতে পারবো, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে আমি কিছু সাহায্য করলে হরকান্ত বাবু অসন্তুষ্ট হবেন। তিনি যে অ্যাড্‌ভেঞ্চরই খুঁজে বেড়ান। অথচ বয়স হয়েছে বাহাত্তর।"

রমেশ। আমিও যাব। সেখানে গিয়ে লুকিয়ে ব'সে থাকব। শেষে ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।

সে অঞ্চলে মৌলভী গোলাম রসুল নামক এক বৃদ্ধ মুসলমান বাস করিতেন, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উঠিল। হরিপদ বলিলেন, "মৌলভী বাস্তবিকই লোক ভাল। টাকা-কড়িও বিস্তর আছে—হিন্দু-বিদ্বেষীও নন। হরকান্ত বাবুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সদ্ভাব আছে। দু'জনে একসঙ্গে আহার করেন। মৌলভী কিন্তু হিন্দুর বলি আর মুসলমানের জবাই-করা মাংস খান না—বলেন, ও-রূপ করায় পশুপক্ষীকে বড় যন্ত্রণা দেওয়া হয়। শরিয়তে নাকি ব্যবস্থা আছে যে, হন্তব্য জীবের গলার অর্দ্ধেক অর্থাৎ কেরোটিট আর্টারি পর্য্যন্ত এক আঘাতে কাটতে হবে; নেপালীরা যে টানাটানি না ক'রে পাঠা কাটে, তা খেতে মৌলভীর আপত্তি নেই।"

রমেশ। বলেন কি? দেবদেবীর কাছে বলি দেওয়া মাংস খান?

হরিপদ। মৌলভী বলেন, দেবদেবী ব'লে কোন পদার্থই নেই, সুতরাং তাতে তিনি আপত্তি করেন না।

দেবকুমার। তা হ'লে চলুন, আমরা তিন জনই এই সাড়ে ৯টার ট্রেণে যাই। হরকান্ত বাবুরা যাবেন সাড়ে ১১টার ট্রেণে। ঢের সময় আছে। এই সময়ের মধ্যে তিন জন মাথা ঠোকাঠুকি করলে হয় ত একটা ভাল উপায়ও বেরুতে পারে। আমি মনে করছি কি যে, সোজাসুজি গিয়ে বসারৎ দারোগাকে নিয়ে আসব।

হরিপদ। মুসলমান দারোগা এসে এইরূপ ঘটনায় হিন্দুর সাহায্য করবেন ব'লে আপনি বিশ্বাস করেন?

দেবকুমার। আপনি বসারৎ আলিকে চেনেন না। বড় ভাল লোক! কর্ত্তব্য কাযের সময়ে তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ নেই। তাঁর সঙ্গে স্কুলে পড়েছি। কোন রকম গোঁড়ামী নেই। কত দিন আমাদের বাড়ীতে গিয়ে পূজায় বলি দেওয়া মাংস খেয়েছেন।

হরিপদ। তা হ'লে দারোগাটি দ্বিতীয় হরকান্ত বাবু?

দেবকুমার। হতেন তাঁরই মতন—যদি তেমন লেখাপড়া জানতেন। হরকান্ত বাবু যেমন নানা বিদ্যায় পারদর্শী, তেমনই তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর অসাধারণ সাহস। কুমিল্লায় হাঙ্গামার সময়ে, কলিকাতার হাঙ্গামার সময়ে তিনি একা একখানা লাঠি নিয়ে কত গুণ্ডাকে ঘা'ল করেছিলেন, দয়া-মায়াও খুব আছে।

তিন বন্ধু.ত এইরূপে নানা বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে কমলগাঁ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের বাসায় মধ্যাহ্ন-ভোজন করিলেন। হরকান্ত বাবুর ট্রেন সেখানে পৌঁছিবার ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে তাঁহারা কমলগাঁ পারঘাট অভিমুখে বাহির হইলেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ পথে পথেই হইয়া গিয়াছিল। তদনুসারে দেবকুমার ঘাটে অপেক্ষা না করিয়া সোজা পথে চলিয়া গেলেন।

হরিপদ পারঘাটার মাঝিকে শুনাইয়া রমেশকে বলিলেন, "আপনার যখন হঠাৎ পেটে বেদনা হয়েছে, তখন আপনি এখানেই বিশ্রাম করুন। আমি ও-পারে গিয়ে দেখি, পাল্কী বেহারা জোগাড় করতে পারি কি না। পাই না পাই, দু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব।"

মাঝি হরিপদকে পার করিয়া দিল। এই সময়ে রমেশ দেখিলেন যে, মাঝির ঘরে সাত আট জন লোক যেন গোপনে বসিয়াছে। মাঝি ফিরিয়া আসিয়া রমেশকে বলিল, "আপনি যাবেন কোথা? হয় পার হোন, নয় রাস্তা ধ'রে চলুন। এখানে থাকবার হুকুম নেই।"

রমেশ বলিলেন, "আমার এ রকম অসুখ হয়ে থাকে। এখনই একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়বো। ঘণ্টা দুই পরে ভাল হয়ে যাবে।"

মাঝি বলিল, "আপনি তা হ'লে ঐ সরাই-ঘরে থাকুন গিয়ে শুয়ে। সেখানে খাটিয়া আছে।"

রমেশ সম্মত হইলেন এবং পঞ্চাশ ষাট হাত দূরবর্ত্তী সেই ঘরে যেন অতি কষ্টে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গেলেন। গিয়াই ঘরের মধ্যে একখানা খাটিয়াতে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন। মাঝি দরজার শিকল তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ ও অভিনয়

এ দিকে হরকান্ত বাবু কন্যাকে লইয়া যাত্রা করিলেন। বাহির হইবার সময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আংটী ত আটটাই ঠিক আছে?" সুমতি বলিল, "হাঁ পিতা।"

পিতা-পুত্রী রেলে কমলপুর পর্য্যন্ত গিয়া সেখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। ষ্টেশনমাষ্টার জানাইলেন যে, তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সেই দিন আসিবেন। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ যেন একটু সন্তুষ্ট হইলেন।

তাঁহারা ষ্টেশন-মাষ্টারের বাসা হইতে রাস্তায় উঠিয়াই দেখিলেন যে, এক জন লোক একখানা লাঠির অগ্রভাগে একখানা কাপড় বাঁধিয়া তুলিয়া ধরিয়া আছে। ষ্টেশনমাষ্টারও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া সেই লোকটাকে বলিলেন, "কি হে মবারক, কি করছ?" লোকটা অমনই ষ্টেশন হইতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

ঘাট হইতে তাঁহারা যখন সিকি মাইল দূরে, তখন ঘাটমাঝির ঘর হইতে আট দশ জন লোক বাহির হইয়া তাঁহাদের দিকে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে ছিল এক জন মাতাল—অথবা সে মাতালের অভিনয় করিতেছিল। তাহার হাতে ছিল একটা বোতল। সে টলিতে টলিতে একটা কদর্য্য গান করিতেছিল এবং অন্য সকলে উচ্চহাস্য করিতেছিল। উভয় দল পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইলে এক জন বলিল, "কি বড়ো কর্ত্তা, বাইজীকে নিয়ে কোথা যাওয়া হচ্ছে?"

হরকান্ত বাবু বলিলেন, "এটি আমার মেয়ে। আমরা ওখানে পার হব।"

এক জন বলিল, "মেয়ে? ভদ্দর লোকের মেয়ের পায়ে জুতো, আবার ছাতা মাথায়! ও চালাকি হবে না। তোমাদের আটক করবো। পুলিস এখানেই আছে।" এই বলিতে বলিতে দুই জন লোক দৌড়িয়া হরকান্ত বাবুর বামদিকে গেল, দুই জন সুমতির ডানদিকে গেল, আর তিন জন পিতাপুত্রীর মধ্যস্থান দিয়া যাইবার চেষ্টা করিল—যেন পিতা-পুত্রীকে পৃথক্ করা তাহাদের অভিপ্রায়।

হরকান্ত বাবু বামদিকের দুই জনকে এমন এক ধাক্কা দিলেন যে, তাহারা একবারে রাস্তার ঢালু দিয়া গড়াইয়া জলের ধারে গিয়া পড়িল। বৃদ্ধ তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়াই বিদ্যুতের মত ঘুরিয়া দুই জনের মুখে দুই চপেটাঘাত করিয়া তৃতীয় লোকটার গলা ধরিয়া রাস্তার নীচে প্রথম দুই জনের দিকে ধাক্কা দিয়া ফেলিলেন। সুমতির ডানদিকে যে দুই জন ছিল, তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল। সুমতি যে কখন্ কিরূপে তাহাদিগকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা বুঝাই গেল না। আঘাতপ্রাপ্ত সাত জনেরই মুখ, নাক, মাথা দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। পিতা-পুত্রীর হাতেও রক্ত দেখা গেল। তাঁহারা উভয়ে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। অবশিষ্ট যে দুই তিন জন আঘাত পায় নাই, হরকান্ত বাবু তাহাদিগকে আহত লোকদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, "তোমরা এদের মুখে চোখে জল দাও।" তাহাদের মধ্যে এক জন বড়ই উত্তেজিত হইয়াছিল। সে হরকান্ত বাবুকে ধরিতে উদ্যত হইয়াই তাঁহার চপেটাঘাতে পড়িয়া গেল। তাহারও মাথা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। যে লোকটা মাতাল সাজিয়াছিল, সে হাতের বোতলটা ফেলিয়া দিয়া গ্রামের দিকে দৌড়

দিল। অবশিষ্ট দুই জনকে হরকান্ত বাবু আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমরা এদের মুখে চোখে জল দাও। ততক্ষণ গ্রামের লোকও এসে পৌঁছবে। গ্রামের লোক না এলে আমরা যাব না।"

তাহার পর দেখা গেল, এক জনই বিশেষ আঘাত পাইয়াছে—সে ঘাট-মাঝি। অন্য কয়েক জনের আঘাত গুরুতর না হইলেও সামান্য নহে। কেহই যে হাঁটিয়া বাড়ী যাইবে, সে সম্ভাবনা ছিল না।

পিতা-পুত্রী তখন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মাঝির ঘরের সম্মুখে একখানা বেঞ্চে বসিয়া দেখিলেন, গ্রাম হইতে দুই দল লোক দৌড়িয়া আসিতেছে। আট দশ জন লোকের এক দল আহতদের দিকে গেল। তাহাদের সকলের হাতে লাঠী ছিল। আর এক দলে পাঁচ ছয় জন। তাহাদেরও হাতে লাঠী ছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন বীরাকৃতি মধ্যবয়স্ক লোক ছিল। সে হরকান্ত বাবুর সম্মুখে গিয়া বলিল, "সেলাম বুড়ো কর্ত্তা, আপনারা এই বজ্জাৎদের খুব শিক্ষা দিয়েছেন। ওদের বজ্জাতির জন্যে আমাদের মান-ইজ্জৎ সব গেল—মুসলমান জাতের একটা কলঙ্ক হলো। বেটারা বজ্জাতি ক'রে মার খেয়েছে—মাথা ফাটিয়েছে—আবার তাদেরই পক্ষ হয়ে আরও কয়েক বেটা এসেছে আপনাকে মারতে। তা কর্ত্তা, আমরা এই ক'জন থাকতে আপনার কেউ কিছু করতে পারবে না। মাঝি বেটা ত ঘাল হয়ে পড়েছে। চলুন কর্ত্তা, আমি আপনাদের পার ক'রে দিচ্ছি।"

হরকান্ত বাবু। আহা, ওরা আসছে আমাকে মারবে ব'লে আশা ক'রে। তুমি আমাকে এখনই পার ক'রে দিলে ওরা যে বড় হতাশ হবে। ওরা আসুক, ওদের সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করি। তার পর আমাদের দু'জনকে পার ক'রে দিও।"

ইহা শুনিয়া লোকটি বলিল, "কর্ত্তা, আপনাকে বহুৎ বহুৎ সেলাম। ধন্য আপনার হিম্মৎ। কিন্তু কর্ত্তা, আপনার গায়ে যতই জোর থাকুক, ওদের এক জনের হাতে সড়কি আছে—সেটা যদি তফাৎ থেকে আপনাকে তাক ক'রে ছোড়ে, তা হ'লে ত আপনার গায়ের জোরে কিছু ফল হবে না। আসুন আপনাকে পার ক'রে দিই।"

এমন সময় দেখা গেল, দ্বিতীয় দল প্রায় কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। বড়মিঞা তৎক্ষণাৎ আগন্তুকদের দিকে ফিরিয়া চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে বলিল, "তোদের কেউ যদি বুড়া বাবুর গা ছুঁতে চেষ্টা করে, আমি তাকে একেবারে যাতে ছমাসের দানাপানি বন্ধ হয়, তা করবো ব'লে দিচ্ছি।"

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই এক জন সড়কি তুলিল। সে ছুড়িতে যাইবে, এমন সময়ে বড়মিঞা লাঠী দিয়া তাহার হাতে এমন আঘাত করিল যে, তাহার হাত ভাঙ্গিয়া গেল এবং সড়কি মাটীতে পড়িল।

দলের মধ্যে একটু চঞ্চলতা ও ক্রোধভাব দেখা গেল। কিন্তু বড়মিঞা "খবরদার" বলিয়া ধমক দিল এবং সকলকে লাঠী ফেলিতে বলিল। তাহার আদেশ প্রতিপালিত হইলে সে সকলকে হরকান্ত বাবুর কাছে লইয়া গেল এবং বলিল, "বুড়া কর্ত্তাকে সেলাম কর।" তাহার পর হরকান্ত বাবুকে বলিল, "চলুন কর্ত্তা, আপনাদের পার ক'রে দি।"

ঠিক এই সময়ে সরাইঘর হইতে দারোগা বসারৎ আলি, কয়েক জন কনষ্টেবল এবং রমেশ ও দেবকুমার বাহির হইলেন। পরস্পর অভিবাদন-বিনিময়ের পর বসারৎ আলি প্রথমেই জানাইলেন যে, হরকান্ত বাবু একাকীই দুষ্টদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ঘাটের কাছেই লুকাইয়াছিলেন। মাঝির ঘরে কাহাকেও না দেখিয়া সরাই ঘরে গিয়া রমেশকে দেখিলেন এবং সকলে সেই ঘরের জানালা দিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন।

বসারৎ আলি আরও বলিলেন, "এই দুষ্ট বদমাইসদের ছাড়া হবে না। সকলকেই চালান দেবো।" পরে হরকান্ত বাবুকে বলিলেন, "আপনি এদের প্রত্যেককে সেনাক্ত ক'রে বলুন কে কি করেছে।"

হরকান্ত বাবু প্রথমেই এক জনকে দেখাইয়া বলিলেন, "এর নাম মবারক—ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে শুনেছি। আমরা যে ঘাটের দিকে আসছি, তা এই লোকটি একখানা কাপড় উড়িয়ে এখানকার লোকদের জানাচ্ছিল।" পরে তিনি সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন।

দারোগা তাহা টুকিয়া লইয়া সকলকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং হরকান্ত বাবুর দলের লোকদিগকে তাঁহাদের গন্তব্যস্থানে যাইতে বলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অঙ্গুরী-পরিচয়

রাজগোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে পৌঁছিবার পর আগন্তুকরা সকলেই ক্লান্ত ছিলেন বলিয়া শিষ্টাচারের বিনিময়ের অল্প পরেই তাঁহাদের আহারের ও শয়নের ব্যবস্থা হইল। রমেশ ও হরিপদ এক কক্ষে এবং হরকান্ত বাবু ও দেবকুমার অপর কক্ষে শয়ন করিলেন। হরিপদ শয়ন করিয়াই বলিলেন, "দুই বৃদ্ধেরই কি বিশালি গোঁফ, লক্ষ্য করেছেন হরিপদ বাবু? প্রত্যেকেই যেন ক্লেমেন্সো!

বাপ্ রে বাপ্। বাঙ্গালীর এত বড় গোঁফ আর দেখেছি ব'লে মনে পড়ছে না।"

রমেশ। আপনি ভুলে যাচ্ছেন। সার্ আশুতোষ আর বহরমপুরের বৈকুণ্ঠ বাবুর গোঁফের কথা কি মনে নেই ?

হরিপদ। ঠিক বলেছেন। ভুলেই গিয়েছিলেম। আচ্ছা, বলুন দেখি, গোঁফ বড় হ'লেই বড় লোক হয়, না বড় লোক হলেই গোঁফ বড় হয় ?

রমেশ। একটা সমস্যা বটে। গবেষণার বিষয়।

পরদিন প্রাতঃকালে চা খাইবার সময়ে হরিপদ ও হরকান্ত বাবু রমেশকে পূর্ব্বদিনের ঘটনাটা লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন।

রমেশ। আচ্ছা, তা হ'লে আজই ব'সে কাল্‌কের ঘটনাটা লিখবো। কিন্তু একটা কথা আপনাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে থাকতে পাচ্ছি না। আপনি আর সুমতি যাকে যাকে চড় মেরেছিলেন, তাদের মাথা রক্তারক্তি হ'ল কি ক'রে ? তাদের মাথায় মুখে তিন চারটে গর্ত্ত হয়ে গিয়েছে।

হরকান্ত বাবু হাসিতে হাসিতে পকেট হইতে কয়েকটা অঙ্গুরী বাহির করিলেন। সেগুলি খুলিয়া একবারে লম্বা করা যায়। এক একটা এক ইঞ্চের অষ্টমভাগ প্রস্থে এবং ন্যূনাধিক চারি অঙ্গুলী দৈর্ঘ্যে। কয়েকটা তামার, কয়েকটা পিতলের, কিন্তু বেশী-গুলিই লোহার। প্রত্যেকটির মধ্যস্থানে কুলের আঁটির মত একটা ঢিবি, অঙ্গুরীগুলি সরু মোটা সকল আঙ্গুলেই জড়াইয়া দেওয়া যায়। হরকান্ত বাবু সেগুলির ব্যাখ্যা করিয়া রাজগোবিন্দ বাবু এবং উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "প্রত্যেক নরনারীই, বিশেষতঃ প্রত্যেক স্ত্রীলোকের এক একটা ধারণ করা উচিত। যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রত্যেক হাতের চারি আঙ্গুলে চারিটা এই রকম আংটী থাকে, তাহা হইলে সে অতি বলবান্ পুরুষকেও মারাত্মকভাবে আঘাত করিয়া পরাস্ত করিতে পারে। একটা চড় খাইলেই যে কোন আক্রমণকারী নিরস্ত হইবে। দুই একটা আংটীও যে নারীর আঙ্গুলে থাকিবে, দুর্ব্বৃত্তের হাতে তাহার বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে স্ত্রীলোকরা যে লোহার বালা পরিত, তাহারও বোধ হয় এই উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব্বে নিশ্চয়ই তাহা স্থূল ছিল, কিন্তু এখন তাহা আমাদের বুদ্ধির মত সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে।"—এই বলিয়া হরকান্ত বাবু তাঁহার কল্পনার অনুরূপ একটা লৌহবলয়ও বাহির করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, তিনি ইহার নাম রাখিয়াছেন বলয়-কুলিশ। তাহার তিনটা পল; প্রত্যেক পলের বিস্তৃতি এক-চতুর্থ ইঞ্চ। বলয়ের ওজন এক ছটাক হইবে।

হরকান্ত বাবু বলিতে লাগিলেন, "এই বালার দাম বড় বেশী হয় ত চারি আনা আর আংটির দাম চারি পয়সা। স্ত্রীলোকের উপর যে রকম অত্যাচার হচ্ছে, তারা যদি এমন আংটা একটাও হাতে রাখে, তা হ'লে আত্মরক্ষা করতে পারে।"

হরকান্ত বাবুর কথা শুনিয়া এবং আংটী ও বালা দেখিয়া সকলেই প্রীত হইলেন। সকলেরই মনে হইল, ইহার প্রচার হইলে দেশে আর নারীর প্রতি অত্যাচার থাকিবে না।

অন্যান্য কথার পর রাজগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "আচ্ছা হরকান্ত বাবু, এই কল্পনাটা আপনার মনে উঠ্‌লো কি আপনা আপনি, না কোনরকম ইঙ্গিত পেয়েছিলেন ?"

হরকান্ত বাবু। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হ'ল কাশীতে গোপাল-মন্দিরের একটা খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, এক জন লোক প'ড়ে আছে, তার মাথা ফেটে গিয়েছে, রক্তে সমস্তটা স্থান প্লাবিত হয়েছে। শুনলাম, সে একটি স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়েছিল—স্ত্রীলোকটির হাতে ছিল দুই তিন সেরী এক কঙ্কণ, তাই দিয়ে সে লোকটাকে আঘাত করেছিল। আমাদের দেশের স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ মহিলারা সে রকম ভারী অলঙ্কার কখনই পরবে না।

দেবকুমার। অলঙ্কার যদি অত ভারী হয়, তা হ'লে ত আর অলঙ্কারত্বই থাকে না।

এইরূপ আলাপে চা খাওয়া শেষ হইলে হরিপদ বলিলেন, "আমরা কাল আসার পর আর এখন যে চা খেলাম, এমন চা ত আর কোথাও খাইনি। কেমন সুগন্ধ। এ চা আপনি পান কোথা ?"

রাজগোবিন্দ বাবু। আমার আর হরকান্ত বাবুর চা একই রকম, যেমন জর্ম্মান রূপায় একটুও রূপা নেই। যেমন সোডা-ওয়াটারে এক গ্রেণও সোডা নেই, তেমনই আমাদের চায়েও চা নেই। কিছু অনন্তমূলের সঙ্গে কয়েকটা তেজপাতা, আর একটু কমলা লেবুর শুক্‌নো খোসা।

হরকান্ত বাবু। আমি কিন্তু কখন কখন সত্য চাও খাই।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

কৈলাস-যাত্রী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আমাদের সমস্ত যাত্রীর আসবাবাদি লইয়া যাইবার জন্য পাহাড় হইতে কালো রংএর বাইশটি ভীষণাকার ঝব্বু আসিয়া স্কুল-সমক্ষে উপস্থিত হইল। তাহাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টার এককালীন ঝুণ্-ঝুণু শব্দ আমাদিগকে সে দিন কোন্ এক অজানা দুর্গম পথের যাত্রা সূচিত করিয়া দিতেছিল। আমরা আপন আপন আসবাবাদি (যায় তাঁবু পর্য্যন্ত) তাহাদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিলাম। আহারান্তে বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে একে একে যাত্রা করা হইল।

দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী ঝব্বুর উপরে এই প্রথম সওয়ার হইলেন। ঝব্বুর পৃষ্ঠদেশে প্রথমে কয়েকটি কম্বল বিছাইয়া মধ্যস্থলে জিনের মত কাঠের একটি আধার (যাহার উপরে বসিতে হইবে) স্থাপিত হইল, পরে তাহার উপরে আরও দুই একখানি কম্বল ঢাকা দিয়া একটু গদির মত হইলে মজবুত দড়ির দ্বারা দুই দিকে দুইটি 'রেকাব' প্রস্তুত করিয়া ঝব্বুর মালিক যখন এই দুই জন নারী-যাত্রীকে তৎপৃষ্ঠে উঠিয়া বসিতে বলিল, তখন বলিতে কি, ইঁহাদের এক দফা গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিল। রঞ্জনের সাহায্যে ইঁহাদিগকে বসাইয়া, প্রত্যেকেরই কটিদেশে একটি কাপড়ের বেড় ঝব্বুর পৃষ্ঠদেশের সহিত সংলগ্ন রাখা হইল।

এই সকল ঝব্বু অতি ভীষণকায় জন্তু। আরোহিগণ উঠিবার কালে ইহারা প্রথমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুবই সঞ্চালন করিয়া বাধা দিয়া থাকে। একবার চড়িয়া তাহাদের নাকের সহিত সংলগ্ন দড়িটি—লাগাম ধরিতে পারিলেই আরোহী কতকটা নিশ্চিন্ত মনে করে। ঝব্বু ছাড়া ৪টি ঘোড়া পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ, ভূপসিং, গঙ্গাধর ঘোষ এবং আমি এই চারি জনে তাহাতে সওয়ার হইলাম। আর আর সকলেই পদব্রজে গেলেন। গার্ব্বিয়াং হইতে তাকলাকোট পর্য্যন্ত এই ঝব্বু বা ঘোড়ার ভাড়া প্রত্যেকটি সাড়ে চারি টাকা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছিল। তাহা ছাড়া সওয়ার ঝব্বু দুইটি ধরিয়া লইয়া যাইতে দুই জন চালক প্রত্যেককে আড়াই টাকা হিসাবে এবং ২০টি ভারবাহী ঝব্বুর ৫ জন চালক প্রত্যেককে দুই টাকা হিসাবে ভাড়া চুক্তি ছিল।

আলমোড়া হইতে ধারচুলা পর্য্যন্ত পথকে আমরা যাত্রার প্রথম পর্ব্ব বলিতে পারি। ধারচুলা হইতে গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত পথটিই যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব্ব, তার পর এই গার্ব্বিয়াং হইতে তাকলাকোট পর্য্যন্ত পথটিকে যাত্রার তৃতীয় পর্ব্ব বলিয়াই সাধারণতঃ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এখান হইতে আগে যাইতে যে সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সেখানে কাষ্ঠ পাওয়া দুর্ঘট জানিয়া যাত্রিগণের মধ্যে স্বামীজীর ৩।৪ জন রঞ্জনকে সঙ্গে করিয়া, আগের পথে এক স্থান হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বেই রওনা হইয়াছিলেন। এজন্য রঞ্জন একটি কুঠার (টাঙ্গি) সঙ্গে লইয়াছিল। যাত্রার পথে এখানে সকলেই অস্ত্র সঙ্গে রাখে। আমাদের ঝব্বু-চালক প্রত্যেকেরই কটিদেশে একটি করিয়া তীক্ষ্ণধার ভোজালী শোভা পাইতেছিল! কালী নদীর তীরে তীরে কখনও এপারে কখনও বা ওপারে অর্থাৎ নেপাল-সীমানা দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে পাহাড়ী গাছ (দেবদারুর মত) এবং ছোট ছোট জঙ্গলী গাছের ঝোপ অতিক্রম করিতে হইল। এক স্থানে একটি ঝরণা পার হইয়া, সম্মুখে খাড়া উঁচু রাস্তা পড়িল। ঝব্বুরা বোঝা লইয়া সে রাস্তা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। মহিষাকৃতি এই সকল জানোয়ারের পৃষ্ঠে স্ত্রীলোক দেখিয়া তখন মনে হইতেছিল, বুঝি বা মায়ের জাতি মহিষমর্দ্দিনীরূপে এই দুর্গম শৈল-শিখরে কৈলাস-পতি সন্দর্শনে চলিয়াছেন। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। রাস্তায় জীবজন্তু পাখী কাহারও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছিল না। শুধুই পাহাড়ের পর পাহাড় দুর্গের মত চারিদিকে আড়াল করিয়া দিয়াছে। তাহাদের মাথার উপরের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলি সৌরকিরণপাতে উজ্জ্বলতর হইয়া চোখের সমক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছিল, ঠিক যেন মহাদেবের রজতশুভ্র অট্টহাসিরই মত!

ঘোড়া লইয়া আমরা এই উঁচু রাস্তা উঠিবার সময়ে, হঠাৎ ভূপসিং ঘোড়ার সাজ সমেত লেজের দিক্ দিয়া নীচে গড়াইয়া পড়িল। রণে ক্ষান্ত না দিয়া "সিংহ-প্রবর" সে সময়ে বোধ করি লেজ ধরিয়াই স্বর্গে যাইবার কল্পনা

মানিয়াছিলেন। তাই যে মুহূর্ত্তে লেজটি ধরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গলাভের উপক্রম অর্থাৎ ছিট্‌কাইয়া একবারে পাশের দিকে শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের ঘোড়ার পায়ের উপর পড়িয়া গেলেন! এ ব্যাপারে সে নিজে ত যথেষ্ট আঘাত পাইল-ই, অধিকন্ত শ্রীমানের ঘোড়াও এই অতর্কিত আঘাতে লাফাইয়া রাস্তার একদম কিনারে আসিয়া পৌঁছিল। সুখের বিষয়, শ্রীমান্ তাহার ঘোড়াটির রাশ খুবই সংযতভাবে ধরিয়াছিল, নতুবা ঘোড়া সমেত নীচে নদীগর্ভে পড়িতে বাধ্য হইত। এই সব অপ্রত্যাশিত বিপদের সূচনা দেখিয়া, আমি মনে মনে ভগবান্‌কে স্মরণ করিলাম। আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্ম আমি নিজেই ঘোড়া হইতে নামিয়া পদব্রজে যাওয়াই স্থির করিয়া লইলাম। চালকের বহু পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও

কালাপানির ভুটিয়া ব্যবসায়ী

আর আমি সে যাত্রায় ঘোড়ায় উঠি নাই। ভূপসিং (বেচারী) আঘাত পাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল, পরক্ষণে আবার হাসিমুখেই ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল।

বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে পথের পার্শ্বে একটা জঙ্গলের মাঝে স্বামীজীদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইতিমধ্যেই তাঁহারা অনেকগুলি কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত্যেক ঝব্বুর বোঝার সহিত ২।৪টি করিয়া মোটা মোটা কাঠ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আমার ঘোড়াটি—আমার পরিবর্ত্তে কাঠ বহিয়াই লইয়া চলিল। কালী নদীর ধার দিয়া বরাবর আমরা এইরূপে সন্ধ্যা নাগাইদ "কালাপানি"তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

"কালাপানি" নাম শুনিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল, বুঝি বা জলের রং এখানে কালো হইবে (অবশ্য আন্দামানের কালাপানি ভাবি নাই!) কিন্তু এখানে আসিয়া সে ভ্রম দূর হইল। যেখানে আমাদের তাঁবু পড়িল, তাহার পার্শ্বেই একটি ঝরণা বহিয়া যাইতেছিল। ঝরণাটির জল একবারে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার, তার তুষারবৎ শীতল। নীচে কালী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানে দুই এক ঘর পথে লোকের বাস। এখানকার উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে ১২ হইয়াই, ফুট হইবে। শীতে এখানে অনেকেরই ঠোঁট কাটিল। উৎসাহ হইয়াছিল। যে সকল কাষ্ঠ সঙ্গে করিয়া আনে হইতেছিল। তাহা হইতে কতক কতক কাষ্ঠ চিরিয়া লই তাহা নহে, বরং যোগাড় করিয়া দিল। কেহ চা খাইলেন, কে সুপ্রশস্ত; সুতরাং বা লুচি-হালুয়া তৈয়ার চলিতে প্রত্যেক একাহারী পাবনা-নিশ্বাসের কাতর শব্দ মহাশয়ের মত লোক ন অসহ্য শীত, তার রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা আসিয়া যাত্রার বিষয়ে তাঁহার সহিষ্ণুতা অ বিলক্ষণ বাধা করিয়া এ পর্য্যন্ত তিনি বরা-হৃদয়ে চলি-নগ্ন পদেই (যদিও একজোড়া মাঝখানে তাঁহার সঙ্গে ছিল) চলিয়া সকলেই ছেন। অসম্ভব না হইলে পায়ে পদে ব্যবহার করিবেন না, আবার পদব্রজে দল যাওয়া ছাড়া ঝব্বু বা ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠিয়া তাহাদিগকে কষ্টও দিবেন না। তীর্থযাত্রায় তাঁহার মনের ইহাই সঙ্কল্প ছিল।

গার্ব্বিয়াং হইতে আজ আমরা প্রায় ১১ মাইল পথ আসিয়াছি। পরদিন অর্থাৎ ইং ১৪ই জুলাই বা ৩০শে আষাঢ় রবিবার আহারাদি শেষ করিয়া বেলা ১০টা আন্দাজ সময়ে কালাপানি হইতে যাত্রা করি। এখনও পর্য্যন্ত পথের ধার দিয়া সেই কালী নদীই বহিয়া আসিতেছে। তবে পাহাড়ের অঙ্গ বনস্পতি-হীন অর্থাৎ একবারে অনাবৃত। মস্তকের উপরে কেবল তুষারের শুভ্র সৌন্দর্য্য পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সূর্য্য-কিরণে উজ্জ্বলতর হইয়া সে সৌন্দর্য্য স্থানে স্থানে উথলিয়া পাহাড়ের কোল দিয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে। রাস্তার আশে পাশে তৃণশোভিত নাতিপ্রশস্ত

পর্ব্বতের জমার উপরে কোথাও বা 'ধরগুনী' ফুল চিত্র-বিচিত্র-রূপে আমাদের উৎসুক নয়ন মোহিত করিতেছিল। সে ফুলগুলি অনেকটা আষ্টার জাতীয়। তবে তাহার সৌন্দর্য্য আমাদের কৃত্রিম উপায়ে অবলম্বিত গাছের ফুল অপেক্ষা আরও মধুর ও উজ্জ্বল। নানারূপ নূতন কল্পনা লইয়া আমরা এই পথে বেলা ১।টা আন্দাজ সময়ে একটি
অজা ... সম্মুখে পাইলাম। ঝরণাটির প্রশস্ত ধারা পশ্চিম-
আপন অ... হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া কালী নদীর সহিত
পৃষ্ঠে বোঝাই ...গছে। এ ঝরণা আমাদিগকে অতিক্রম করিতে
আন্দাজ সময়ে এ
দিদি ও তাঁহা
সওয়ার হইলেন।
বিছাইয়া মধ্যস্থলে
(যাহার উপরে বসি
উপরে আরও দুই
মত হইলে মজু
করিয়া ঝব্বু রু
উঠিয়া বসিলে
গলদ্‌ঘর্ম্ম উ
বসাইয়
পৃষ্ঠে
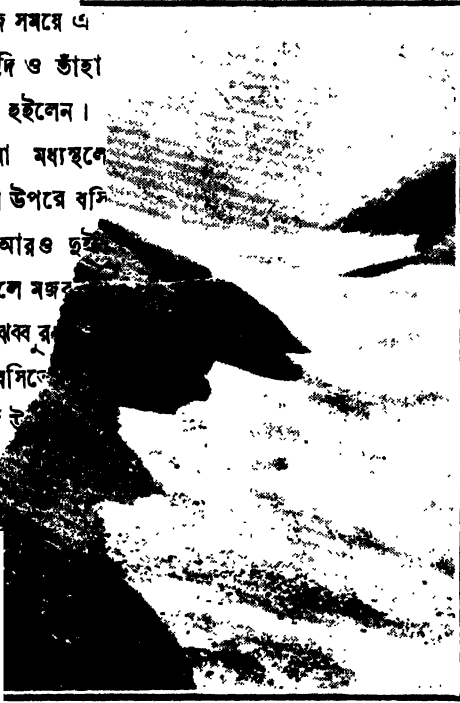
লিপুলেক

হয় নাই। ঝরণার পরপারেই একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বত। তুষারমালায় তাহার সমস্ত গাত্রটি প্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এখান হইতে কালী নদী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ মনে হইয়া থাকে। কারণ, এই ঝরণা ও কালী নদীর সঙ্গমস্থলে এ পার হইতে যতদূর দেখা যাইতেছিল, তাহাতে ঐ তুষার-ধবল পাহাড়ের গা দিয়াই এই নদী-প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে, ইহা স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে।

এইবার আমরা কালীনদীকে পশ্চাতে রাখিয়া ঝরণাটির ধারে ধারে অগ্রসর হইব। এখান হইতে সম্মুখের পাহাড়টির দৃশ্য এতই নয়নরঞ্জক যে, দেখিবার জন্য আমরা সকলেই সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। জটাজূটধারী যোগি-শ্রেষ্ঠের নির্ব্বাণের প্রতিমূর্ত্তি সজীব হইয়া সে দিন যেন নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। রজত-প্রভা-সমন্বিত এই সকল হিমগিরির নির্জ্জন প্রদেশে হিমালয়-পতির চিরবিশ্রামের আবাস-স্থল মনে করিয়া ক্ষণেকের জন্য এই বিচিত্র শৈলমালার তুষারের মাঝখানে আমাদের মন একবারে হারাইয়া গিয়াছিল। উদ্‌ভ্রান্তের মত সে দিন আমরা এই দৃশ্য বিহ্বল-নেত্রে দর্শন করিয়াছি। যতই অগ্রসর হইতেছি, প্রকৃতির সুরম্য নিকেতনে ততই নিত্য নূতন দৃশ্য দেখিয়া পিপাসিত নয়ন চরিতার্থ হইতেছে। ঝরণাটির পাশে পাশে কিছু দূর গিয়া বেলা ১৷৷০টা আন্দাজ সময়ে আমরা "সঙ্গচিং"এ আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পথিমধ্যে বামদিকের পাহাড় হইতে নামিয়া-আসা ২।৩টি ঝরণার অতিক্রমসময়ে ইহার তুষার-শীতল ধারায় প্রত্যেক যাত্রীই পায়ের অস্তিত্ব প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

সঙ্গচিংএর উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১৫ হাজার ফুট হইবে। এখানে ঘর-বাড়ী কিছুই দেখিলাম না। সম্মুখেই চির-দুর্গম "লিপুলেক" পাহাড়। নীচে ঝরণার ধারেই একটু সমতল ক্ষেত্রের উপরে তাঁবু খাটাইবার ব্যবস্থা হইল।

এত বড় দলের মধ্যে তাঁবু বড় কম ছিল না। স্বামীজীদের একটি বড় তাঁবু (তাহাতে ডাক্তারের দলও শয়ন করিতেন), উত্তরপাড়া দলের একটি তাঁবু, রায় মহাশয়ের একটি তাঁবু, আমাদের তিনটি তাঁবু ও রন্ধন ও চাকর ব্রাহ্মণদের লইয়া একটি তাঁবু—মোট ৭টি তাঁবু একস্থানে গোলভাবে খাটান হইল। তাহা ছাড়া ঝব্বু-চালকদিগেরও ছোট ছোট দুইটি কম্বলের 'ঘেরাও' তাঁবুর আকারে শোভা পাইতেছিল। প্রতিদিন পার্ব্বত্য পথের এক এক স্থানে এতগুলি তাঁবুর ক্রমিক পত্তন, আবার পরদিনেই তাহা উঠাইয়া লইয়া 'ঝটিতি যাত্রা—এ একটা আমাদের বিরাট অভিযান! স্বেচ্ছাসেবকদের মত প্রতিদিন এ বাহিনী স্বেচ্ছায় কোন্ এক মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া নির্ভীকচিত্তে চলিয়াছে, তাহা যেন একমাত্র কৈলাসপতিই—এ প্রদেশের অধিপতি প্রীতমনে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

অত্যন্ত শীতবোধ হওয়ায় এই সকল তাঁবুর মধ্যভাগে বড় বড় কাঠ আনিয়া রন্ধন আগুন জ্বালিল। ঝরণার জলে

হস্ত-পদাদি কোনরূপে ধৌত করিয়া এই আগুনের পাশেই সকলে বসিয়া যাত্রার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডাক্তার কৌশিক ও তাঁহার সহযাত্রী দুই জন এখানে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিলেন। স্থির হইল, অন্ধকার রাত্রিতে খুব শীঘ্র শয্যাত্যাগ করিয়া, প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে 'লিপুলেক' অতিক্রম করিতে হইবে। বিস্তৃত তুষার-রাশির উপর দিয়াই ইহার পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যে তুষার গলিতে আরম্ভ হয়; তাই রৌদ্র নামিবার পূর্ব্বেই লিপুলেক পার হইতে পারিলে পথিকদের সেরূপ কষ্টের কারণ থাকে না। এই সব পরামর্শের পরে আমরা যত শীঘ্র সম্ভব জলযোগ শেষ করিয়া শয্যার আশ্রয় লইলাম। কালাপানি হইতে সঙ্গচিং ৫ মাইল আন্দাজ হইবে।

লিপুলেকের নিকট তুষার-শৃঙ্গ

অত্যধিক শীতে রাত্রিকালে কাহারও নিদ্রা হয় নাই। বিশেষ, রাত্রি ৩টা হইতেই ভুটিয়া ব্যবসাদারেরা ভেড়ার দল হাঁকাইয়া আগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের হাঁক-ডাক—মুহুর্মুহু চীৎকার শব্দ তাঁবু ভেদ করিয়া কর্ণপটহে বিদ্ধ হইতেছিল। রাত্রি ৪টা আন্দাজ সময়ে তাঁবুর বাহিরে আসিয়া আমাদের শঙ্করনাথ স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া সকলকে জাগাইয়া দিলেন। শয্যাত্যাগ করিয়া প্রতিদিনের মত আবার আসবাবাদি ঠিক করিয়া ঝব্বু-চালকদিগের নিকট দেওয়া সুরু হইল। হস্তমুখ-প্রক্ষালনান্তে এ দিন সকলেই ভোর ৫টা আন্দাজ সময়ে ভগবানের নাম লইয়া যাত্রা করিলেন।

লিপুলেক পর্ব্বতের উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১৬ হাজার ৭ শত ৮০ ফুট হইবে। ইহা পার হইতে পারিলেই তিব্বতরাজ্য আরম্ভ হইবে। এত দিনে হিমগিরির দুর্লঙ্ঘ্য শিখরগুলি এ পথে অতিক্রম করা এক প্রকার শেষ হইয়া গেল। গর্ব্বিত-চিত্তে ক্রমশঃই আমরা চড়াইয়ের পথে উঠিতে লাগিলাম। প্রায় ২ মাইল আন্দাজ অগ্রসর হইয়াই, এ দিন আমাদের পদদ্বয় অবশ হইয়া আসিল। উৎসাহ থাকিলেও চলিতে শরীর নিতান্ত ভারাক্রান্ত মনে হইতেছিল। রাস্তার চড়াই যে খুব উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে, বরং আসা-পথের তুলনায় এ পথ অনেকটা সুপ্রশস্ত; সুতরাং যাতায়াতপক্ষে সুবিধাজনক, তথাপি আগে চলিতে প্রত্যেক যাত্রীরই দ্রুতগতি শ্বাস-প্রশ্বাসের কাতর শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। অসহ্য শীত, তায় চারিধারের তুষার-স্পর্শী বায়ু আসিয়া যাত্রার পথে আমাদিগকে সে সময়ে বিলক্ষণ বাধা দিতে লাগিল। নিঃশব্দে অবসন্ন-হৃদয়ে চলিতেছি, সম্মুখেই এবার তুষারের মাঝখানে প্রায় ১ ফর্লং-ব্যাপী রাস্তা দেখিয়া সকলেই প্রমাদ গণিলেন। রায় মহাশয়ের নগ্ন পদে এতক্ষণে ষ্টকিং সহ জুতা দৃষ্ট হইল। ঝব্বুর দল বোঝা সমেত তুষারের পথে নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন ধরিয়া চলিয়া গেল। আমরা দীর্ঘ যষ্টি-ভর দিয়া সেই পথটুকু ধীরে ধীরে পার হইলাম। তার পর আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই পুনর্ব্বার তুষারের রাস্তা দেখিতে পাইলাম। এবারের এ পথটি ক্রমশঃই উচ্চে উঠিয়া কিছু দূরে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে গিয়া শেষ হইয়াছে। এখানে দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী ঝব্বু হইতে নামিতে বাধ্য হইলেন। ভারবাহী ঝব্বুদল বোঝা লইয়া এ পথটুকু বহু ক্লেশে পার হইয়াছিল। দুই জন ঝব্বুচালক দিদি ও সহযাত্রিণীকে ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। লাঠি ভর দিয়া আমরা আর আর সকলে এ তুষার অতিক্রম-কালে, উত্তরপাড়ার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন। 'চট্টরাজের' পরিবর্ত্তে তাঁহার পায়ে নূতন 'ক্রেপশু' উঠিলেও তাঁহার পা দুইখানি ৩।৪ বার হাঁটু-প্রমাণ গলিত বরফের মধ্যে বসিয়া গিয়াছিল।

এই তুষার-কিরীটী শৃঙ্গের নিকটে দেখিলাম, একটি শুষ্ক বৃক্ষদণ্ড শাখাসমেত খাড়া রহিয়াছে। দণ্ডটির মূলাংশ কতকগুলি সজ্জিত প্রস্তরখণ্ডে বেষ্টিত এবং তাহার শাখা-প্রশাখায় নানা বর্ণের কতকগুলি ছিন্ন বস্ত্র-খণ্ড বাঁধা ছিল। এই পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিলেই চড়াইএর শেষ হইল, ইহা যাত্রীদিগকে জানাইবার জন্যই তিব্বতীরা এইরূপে জয়-যাত্রার সূচনা করিয়া দিয়াছে। শুনিলাম, এই বস্ত্র-খণ্ড বাঁধিবার সময়ে ইহারা ঠাকুরের নামে মানসিক করিয়া থাকে।

লিপুর শেষ স্তরে উঠিয়া এইবার আমরা ওপারে তিব্বত পানে একবার চাহিয়া দেখিলাম। কি মনোরম দৃশ্য! চোখের সম্মুখেই (যদিও তাহা কিছু দূরে রহিয়াছে) প্রভাতের রবি-করোজ্জ্বল তুষার-শুভ্র "গুরেলা মান্ধাতা" * চিত্রপটের মত সুবিস্তৃত। তুষারের ঢেউ দিয়া দিয়া পাহাড়টি যেন কৈলাস-পতির চরণ বন্দনা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ভারতের শেষপ্রান্তে গিয়া আজ একবার সেই নিপুণ চিত্রকরকে অভিভূত-চিত্তে প্রণাম করিয়া লইলাম। সম্মুখেই উতরাইএর পথে আবার তুষার পড়িল। পথটি বিলক্ষণ পিচ্ছিল। একটু অসাবধান হইলেই নীচে গড়াইয়া পড়িবার যথেষ্ট আশঙ্কা। যাত্রিগণ ধীরে ধীরে প্রত্যেকেই লাঠি ও গোড়ালির ভর রাখিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। এত সাবধানতা সত্ত্বেও কালিকানন্দজী এই বরফে পা পিছলাইয়া প্রায় ৮।১০ হাত নীচে পড়িয়া গেলেন। ডাক্তার-দলের মধ্যে এক জন (নলিন বাবু) সে সময়ে তাঁহাকে না ধরিলে তিনি বিশেষ আঘাত পাইতেন। আমেদাবাদ-নিবাসী "ডাক্তার কৌশিকের"ও ঐ দশা! পা পিছলাইয়া বসিয়া বসিয়া ২০ হাত নীচে গড়াইয়া পড়িলেন। অন্তর ধুক্-ধুক্ করিলেও মুখে তাঁহার বীরত্বের হাসি ফুটিয়া উঠিল।. বলিলেন, ইচ্ছা করিয়াই তিনি বসিয়া নীচে নামিলেন। দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী দুই জনকেই দুই জন করিয়া খচ্চর চালক হাত ধরিয়া নীচে নামাইয়া লইয়া চলিল। তাঁহাদের অবস্থা এখানে কিরূপ বিপজ্জনক হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপে এ উতরাই শেষ করিয়া বেলা ৮টা আন্দাজ সময়ে একটি সমতল ক্ষেত্রে সকলেই উপস্থিত হইলাম। অত্যধিক পরিশ্রান্ত হওয়ায় এখানে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করা হইল। পার্শ্বেই তুষারগলিত ঝরণা বহিয়া যাইতেছিল। কিছু জলযোগান্তে সকলেই সে ধারা আকণ্ঠ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

লিপুলেকের পরে রাস্তা হইতে সম্মুখ-দৃশ্য

বেলা ১০টা আন্দাজ সময়ে ঝরণার ধারে ধারে এইবার আমরা তিব্বতের রাস্তায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। এপারকার রাস্তা কতকটা সমতল, কতকটা বা ক্রমশঃ নিম্নমুখী। সুতরাং কাহাকেও কষ্ট পাইতে হয় নাই। তবে ইচ্ছা থাকিলেও দ্রুত অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। কারণ রৌদ্র ও বাতাস দুইটিই আমাদের এ ইচ্ছায় প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। এরূপ প্রখর রৌদ্র বা প্রবল বাতাস উপভোগ করা—ইহাই আমাদের প্রথম! রৌদ্রের তেজে চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতেছিল। এইজন্যই এ পথে রৌদ্র-নিবারক চশমার (sun gogles) আবশ্যক করে।

পাহাড়ের দৃশ্যও এখান হইতে অন্যরূপ। এখানকার পাহাড়ে সেরূপ আকাশচুম্বী ভীষণকায় উচ্চতা কোথাও দেখিতে পাইবেন না। একটু যেন খর্ব্বাকৃতি। হিমালয়ের চিরতুষার ইহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াই দিয়াছে। পর্ব্বত

* ইহার উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে ২৫ হাজার ফুট উর্দ্ধে শুনিয়াছি।

কুঠারীগুলি বোধ হইতেছিল ঠিক যেন কপোত রাখা কাঠের খোপের মত। বেলা ২টা আন্দাজ সময়ে প্রথমে তৃণশোভিত প্রশস্ত ময়দান, তার পর শ্যাম-শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র পার হইলাম। মধ্যে মধ্যে কৃষকদিগের দুই একখানি কুটীর, নিকটেই গ্রামের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিতেছিল। সবুজ কড়াইশুঁটির ক্ষেতে প্রথমেই নজর পড়িল। দুঃখের বিষয়, গাছে তখন ফল ধরে নাই, শুধু ফুলই ফুটি-য়াছে। যব ও গমের ক্ষেতে শীষ সবেমাত্র বাহির হইতেছে। এ সময়ে আমাদের দেশে এ সকল রবিশস্য ফলে না, তবে শীতের দেশে ইহাই সময়। কৃষকরা ঝরণার প্রবাহ-ধারা বাঁধিয়া এমনভাবে ক্ষেতের মাঝে লইয়া গিয়াছে যে, সহজেই পর্য্যাপ্ত জল-সেচনের যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে।

লিপুলেক গিরিবর্ত্ম
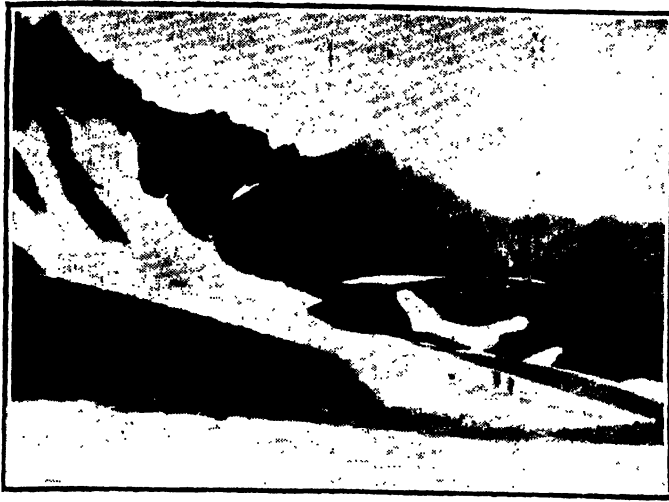
মানিয়া লজ্জায় ইহাদের রং যেন অন্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে। কোনটি হল্‌দে, কোনটি গৈরিক, আবার কোনটি বা "কারবলিক সাবাং"এর মত রংএ পর্ব্বতগুলি সুশোভিত। মাথার উপরে প্রায়ই জমাট তুষার—সাদা-কালোর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। এ দৃশ্য দেখিতে নূতন ও বিচিত্র। আবার কোন কোন স্থানে পাহাড় অস্থিকঙ্কালসার হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ঝরণার ধারে ধারে তাহাদের 'ধস'-ভাঙ্গা প্রস্তর-খণ্ডের স্তূপের মধ্য দিয়া রাস্তা অতিক্রম করিতে আমরা বিলক্ষণ ধৈর্য্য হারাইয়াছি। ঝরণার ও পারের রাস্তা ধরিতে উহার জল কোন স্থানে উরু প্রমাণ দেখিয়া রক্ষনের পৃষ্ঠদেশে উঠিয়া আমরা একে একে পার হইলাম। এইরূপে প্রায় ৪ মাইল আন্দাজ পথ গিয়া "পালায়" উপস্থিত হই। এখানে একখানিমাত্র পাথরের ঘর। ঝরণার ধারে ধারে কিছুদূর প্রশস্ত তৃণভূমি ছিল। ঝব্বুর দল ও ঘোড়া কয়টি এখানে কিছুক্ষণ তৃণ-চর্ব্বণের সুযোগ পাইয়াছিল। যাত্রীরাও কেহ কেহ বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

এখান হইতে ৩, সাড়ে ৩ মাইল আগে গেলেই "তাকলাকোট"। এই ঝরণার ধারাই ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়া সে গ্রাম পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছে। দূর হইতে তাকলাকোটের এ দৃশ্য খুবই মনোরম। পাহাড়ের গায় গায় ছোট ছোট

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই গ্রামে পড়িলাম। নূতন লোক দেখিয়া এখানকার গ্রাম্য কুকুরগুলি চীৎকার করিয়া উঠিল। ব্যাঘ্রাকৃতি ইহারা যেমন ভীষণ-দর্শন, ইহাদের চীৎকারও তেমনই গুরুগম্ভীর। গ্রামবাসীদের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি ভেদ করিয়া আমরা ধীরে ধীরে "কর্ণালী" নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, গ্রামটি নদীর দুই দিকেই উচ্চ পাড়ের উপর অবস্থিত। নদী গভীর ও প্রশস্ত না হইলেও ইহার জলে যথেষ্ট বেগ রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে ইহার

তাকলাকোট

গতি ভিন্নমুখী হইয়া একই দিকে দুই তিনটি ঝরণার আকারে প্রবাহিত। মধ্যে কেবল পাথরের 'নুড়ি' বিস্তৃত রহিয়াছে। গ্রামবাসীদের পারাপারের জন্য স্থানে স্থানে কাঠের পুল থাকায়, আমরা এ নদী পার হইয়া পাড়ের উপর একটু বিস্তৃত খালি যায়গায় আসিয়া পৌঁছিলাম। এই পাড়ে উঠিতে মধ্যস্থলে রাস্তার এক পার্শ্বে একটি ঝরণা সরু ধারায় বহিয়া যাইতেছিল। জলের সুবিধা হইবে মনে করিয়া রঞ্জনের কথামত ইহার উপরের খালি যায়গাতেই তাঁবু খাটাইবার স্থান মনোনীত হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঝব্বুর দলসহ অপরাপর যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সঙ্গচিং হইতে এই তাকলাকোট প্রায় ১১ মাইল পথ হইবে। সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা ১৫ হাজার ফুট। ইহার তিব্বতী নাম "পুরাং"। চারিদিকেই তুষারমণ্ডিত পাহাড়গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে গ্রামটিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদিগকে "জাস্কর-রেঞ্জ" (zadskar range) বলা হয়। মাথার উপরে সম্মুখেই একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটি বৃহৎ মঠ ও এখানকার গভর্ণরের (Governor) দুর্গ-প্রাসাদ শোভা পাইতেছিল। গভর্ণরকে এখানে "জুম্পান পুন্দো" নামে অভিহিত করা হয়। এই জুম্পান পুন্দো অনুমতি দিলে তবেই বাহিরের যাত্রীরা তিব্বত-প্রবেশ করিতে অনুমতি পায়, ইহা পূর্ব্ব হইতেই শুনা ছিল। সাহেবী টুপির উপর তাঁহার কড়া নজর। দুঃখের বিষয়, শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের মস্তকে এইরূপ একটি টুপি আগাগোড়া চলিয়া আসিতেছিল। আজ রঞ্জনের কথামত তাহা খুলিয়া লুকাইয়া রাখা হইল। তীর্থযাত্রী কৈলাস দর্শন করিতে আসিতেছে কেবল পুণ্যের জন্য, রাজ্য-জয়ের উদ্দেশ্যে নহে!

তাঁবু খাটাইতে গিয়া বড়ই বিব্রত হইতে হইল। প্রথমতঃ প্রবল ঝড়ে উহাদিগকে যথাস্থানে খাড়া করিয়া ধরিতে প্রায় ৭।৮ জন লোক লাগিল, তার পর তাঁবুর দড়ির খোঁটা বা লম্বা পেরেকগুলি এই উপত্যকার ছোট ছোট নুড়ির মধ্যে বসাইবার শত চেষ্টা করিলেও, মাটী খুব কম থাকায়, বসিতে আদৌ বাগ মানিল না। অগত্যা আশপাশ হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড আনিয়া দড়িতে জড়াইয়া বহু কষ্টে তাঁবুগুলি খাড়া করা হইল। এখান হইতে ২ ফর্লং আন্দাজ জমী আগে গেলে এখানকার 'মণ্ডি' বা বাজার সুরু হয়। পথিশ্রান্ত হওয়ায়, এ দিন আর কেহ সেখানে যাওয়া আবশ্যক মনে করি নাই। সন্ধ্যাকালে মুলতান হইতে তিন জন নবাগত যাত্রী আমাদের দলে আসিয়া মিশিলেন। ইঁহাদিগের এক জনের নাম যজ্ঞদত্ত নাগপাল। আমাদের বৃহৎ দল দেখিয়া তাঁহারা আমাদের সহিতই কৈলাস যাওয়া স্থির করিলেন। নানা প্রকার গল্পগুজবে সে দিন সুখে রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাতে আমরা আপন আপন ঝব্বু ও ঘোড়াওয়ালাদিগের ভাড়া ও মজুরী প্রত্যেককেই মিটাইয়া দিলাম। সওয়ার দুইটি ঝব্বু ও দুইটি ঘোড়ার (যদিও একটি ঘোড়া কাষ্ঠ বহিয়া আনিয়াছিল) ভাড়া প্রত্যেকটি সাড়ে ৪ টাকা হিসাবে ১৮৲ টাকা ও ৬টি ভারবাহী ঝব্বুর ভাড়া প্রত্যেকটি সাড়ে ৪ হিসাবে (একই ভাড়া) ২৭৲ টাকা মোট ৪৫৲ টাকা দেওয়া হইল। তাহা ছাড়া সওয়ার ঝব্বুচালক দুই জন প্রত্যেককে ২৷৹ টাকা হিসাবে ৫৲ টাকা এবং ২০টি ভারবাহী ঝব্বুর ৫ জন ঝব্বুচালক প্রত্যেককে ২৲ হিসাবে ১০৲ টাকার মধ্যে, ⅓ অংশে (তিন দলের খরচায়) ৩৲/৫, মোট ৮৲/৫ অতিরিক্ত খরচ পড়িয়াছিল। চালকদিগকে সঙ্গে আনার দরুণ মজুরী হিসাবে ইহা স্বীকারমত দিতে হইল। আপন আপন প্রাপ্য গণ্ডা লইয়া ইহারা বিদায় লইল।

এইবার আমরা মণ্ডির দিকে বেড়াইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম, মণ্ডির এক একটি ঘরে, পাথর ও মাটী-মিশ্রিত গাঁথুনীর দ্বারা চারিদিকেই দেয়াল এবং মাথার উপরে পালের মত মোটা কাপড়ের আচ্ছাদন দেওয়া আছে। এ সকল প্রদেশে বৃষ্টি খুব গভীরভাবে হয় না, তাই এই কাপড় আচ্ছাদনেই সহজেই বৃষ্টির জল নিবারিত হইয়া থাকে। দোকানে কাপড়, উলের কম্বল, উলের টুপী, ছাগলের চামড়া হইতে চাউল, মসুর দাল, আটা, ছাতু, বড় এলাচদানা, মিছরি (ওলার আকারে), কিসমিস প্রভৃতি কয়েকপ্রকার শুষ্ক খাদ্য আর কিছু কিছু মনোহারী দ্রব্য পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আমাদের দেশের তুলনায় এখানে এ সকল জিনিষের দর অনেক বেশী, দুই একটি জিনিষ এখানে উৎকৃষ্ট ও সুলভে মিলিতে পারে। বড় বড় লোমযুক্ত কোমল ছাগচর্ম্ম আপনি এক টাকা মূল্যে ক্রয় করুন। "থুলমা" * (উলের অতি মোলায়েম কম্বল)

* এখানে এরূপ 'থুলমা' সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আলমোড়া অঞ্চলে এরূপ থুলমার দর প্রায় ৩০।৩২৲ টাকা।

প্রমাণ বহর ১০।১২ টাকায় পাইতে পারিবেন। তবে এ জিনিষ শীতের দেশেই ভাল থাকে। বাঙ্গালাদেশে ইহা কীট-দষ্ট হইয়া নষ্ট হইবে। দোকানের সংখ্যা বড় কম নহে, প্রায় ১৪।১৫টি হইবে। দোকানদারগণ কেহ গার্ব্বিয়াং অঞ্চল হইতে, কেহ বা তিব্বতের আশ-পাশ হইতে আসিয়া দোকান সাজাইয়াছে; এই কয়মাস মাল বিক্রয় করিয়া শীতের পূর্ব্বে আবার বাটী ফিরিয়া যাইবে। আমাদের যাত্রীর মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু কিসমিস, মিছরি, আবার কেহ বা কয়েকখানি ছাগ-চর্ম্ম খরিদ করিলেন।

ডাক্তার কৌশিক, মিতথুবাবা ও আলমোড়ার পেস্কার সাহেব এই মস্তির মধ্যে কোন এক দোকানদারের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। দেখা হইলে তাঁহারা বলিলেন যে, অদ্যই তাঁহারা কৈলাস উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেছেন। শীঘ্র আল-মোড়ায় ফিরিবার জন্য বাধ্য হইয়া আমাদিগের সঙ্গ তাঁহা-দিগকে পরিত্যাগ করিতে হইল, এই বলিয়া তাঁহারা যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

ইহাদের নজর বেশী। ভূপসিং এক দিন তাঁবুর বাহিরে ভাত খাইতে বসিয়াছিল। আচম্বিতে এই বুভুক্ষিত জীব, সকলের সমক্ষেই তাহার থালা হইতে দুই গ্রাস অন্ন তুলিয়া মুখে দিল।

ইহাদের গায় শততালিবিশিষ্ট 'আল্‌-খাল্লা'। মাথার কেশ খাড়া ও অসম্ভব রুক্ষ। ঠিক যেন দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মনুষ্যরক্ত-পিপাসু দৈত্য!

এখানকার লামাদিগের সম্বন্ধে আমরা মনে মনে অনেক উচ্চ ধারণা আনিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেরূপ শান্তচিত্ত, সদাচারপরায়ণ, উদার, অহিংসপ্রকৃতি বৌদ্ধলামার দর্শন-সৌভাগ্য আমাদের অদৃষ্টে এক দিনও ঘটে নাই! রক্ত-বস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিতকেশ লামা যেখানেই দেখিয়াছি, হাতে মুদ্রাযন্ত্র * ঘুরিতেছে, মুখে অস্পষ্ট সুরে মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, কিন্তু লাল-পানির প্রভাবে তাঁহাদের লাল অলস চক্ষুর ঢলঢল চাহনিটুকু যেন বিলক্ষণ হিংসাযুক্ত। শিকার অন্বেষণে ইহারা খুবই পটু। এক কথায়, তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডা-

তিব্বতী মুদ্রা—"তঙ্কা"

অর্দ্ধ তঙ্কা

সিকি তঙ্কা

তিব্বত স্বাধীন দেশ, তাই সেখানে স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রচলিত আছে। আমরা পথ-খরচের জন্য এখান হইতে টাকার পরিবর্ত্তে কিছু কিছু স্থানীয় মুদ্রা সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইলাম। এই মুদ্রাকে ইহারা 'তঙ্কা' বলে। তঙ্কাগুলি দেখিতে অনেকটা আধুলির মত, তবে দস্তা-নির্ম্মিত বলিয়াই মনে হয়। প্রতি টাকায় ৭টি করিয়া তঙ্কা পাওয়া গেল। এইরূপে আবার ভিন্নাকারে অর্দ্ধ তঙ্কা সিকি তঙ্কা প্রভৃতি থাকায়, সকল প্রকার মুদ্রাই কিছু কিছু সঙ্গে রাখা হইল। কারণ, দরিদ্রনারায়ণদিগের আতিশয্য এখানে যথেষ্ট। এই সকল জীববিশেষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইহা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয়, সরিষার তৈল গায় মাখিতে গেলে ইহারা হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখে। দাঁতের মাজন লইয়া স্ত্রীলোকরা হাসি-ঠাট্টা করে। খাদ্যদ্রব্যের উঃ

দিগেরই মত। শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে এ রাজ্যে লামারাই প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছেন।

এক সময়ে যেখানকার আকাশ-বাতাস অহিংসার বীজমন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, নিদর্শনস্বরূপ আজও যেখানে গোম্বা বা মঠগুলি সেই অতীতের চির-পুরাতন ধর্ম্ম-যুগেরই সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া আসিতেছে, এক্ষণে সেই সকল প্রদেশ তৎপরিবর্ত্তে কেবল হিংসামূলক ছাগ-মেষরক্তেই বিলক্ষণ রঞ্জিত! অপেয়পান, দস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠতরাজ প্রভৃতি হিংস্র উপায়ে জনসাধারণ সেখানে বিশেষরূপে অভ্যস্ত। অশ্বপৃষ্ঠে বন্দুক স্কন্ধে দস্যুর মত ইহারা পাহাড়ে পাহাড়ে

* চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিয়া ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার জন্য যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের আবর্ত্তনের সহিত মনে মনে জপ করা হয়।

ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রয়োজন বুঝিলে যাত্রীদিগের পৃষ্ঠে সহজেই ছোরা বসাইতে অণুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।

যাত্রার তৃতীয় পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। শেষের পর্ব্বে এই-বার যাত্রার জন্য আবার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে লাগিল। এবারকার যাত্রায় কৈলাসদর্শন ঘটিবে জানিতে পারিয়া, সকলেই নবীন উৎসাহে যাত্রার দিন গণিতে লাগিলেন। আমাদের কৈলাস-দূত রঞ্জন ও অনুভবানন্দজী এজন্য খুবই ব্যস্ত। মণ্ডির মধ্যে গিয়া কিরূপে ঝব্বু ও ঘোড়া প্রভৃতি সত্বর পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ তদ্‌বির করিতেছিলেন। ২রা শ্রাবণ ইং ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার

তাকলাকোট মণ্ডি হইতে যাত্রারম্ভ

প্রভাতে এখান হইতে যাত্রার দিন স্থির হইল। মধ্যে একটি দিন কেবল বসিয়া না থাকিয়া এই অবসরে সকলেই "খোজরনাথ" দর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কৈলাসযাত্রীদের ইহাও একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এখান হইতে খোজরনাথ প্রায় ১০।১১ মাইল পথ হইবে। এ পথ কৈলাসের দিকে নহে, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে এতটা পথ পদব্রজে গিয়া আবার সেই দিনেই ফিরিয়া আসা অসম্ভব, তাই সেখানে যাইতে গেলে ঘোড়ার আবশ্যক করে, কিন্তু এত অল্পসময়ের মধ্যে এতগুলি যাত্রীর প্রত্যেকেরই ঘোড়ার ব্যবস্থা করা সহজ-সাধ্য নহে। কারণ, এ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝব্বু বা ঘোড়া কেহই মালিকদের কাছে থাকে না, ... পাহাড়ে সর্ব্বদাই চরিয়া বেড়ায়। ভাড়া করিবার ... হইলে পূর্ব্ব হইতে মালিকগণকে না জানাইলে পাহাড় হইতে ইহাদিগকে খুঁজিয়া আনিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে। যাহা হউক, রঞ্জনের চেষ্টায় পরদিন অতিকষ্টে ৯টি মাত্র ঘোড়া সংগ্রহ হইল।

বেলা সাড়ে ৮ আন্দাজ সময়ে উত্তরপাড়ার দল, ডাক্তার-দলের দুই জন, আমি, শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ এবং দুই জন নারী-যাত্রী সকলে মিলিয়া নয় জনে নয়টি ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইলাম। স্বামীজীর দল বা অপরাপর যাত্রী ঘোড়া অভাবে সে দিন বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন। নারী-সওয়ারের ঘোড়া দুইটি ধরিয়া লইয়া যাইতে দুই জন তিব্বতী (ঘোড়া-ওয়ালা) সঙ্গে চলিল। এই ঘোড়াওয়ালাদিগের মধ্যে এক জন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দী ভাষায় কথা কহিতে জানিত। রঞ্জনের পরিবর্ত্তে সে দিন এই লোকটিই পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

মণ্ডি অতিক্রম করিয়া কিছু দূর যাইতেই প্রথমে একটু উতরাই নামিয়া আসা হইল। কর্ণালী নদী পার হইবার এখানে একটা কাঠের পুল থাকায় সকলেই আপন আপন ঘোড়া হইতে নামিয়া এই পুল দিয়া পারে আসিলেন। পাড়ের উপরে এখানেও ভেড়ার লোমের ক্রয়-বিক্রয় খুব চলিতেছিল। দুই চারিটি ব্যবসাদারের তাঁবু এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদিগের হুড়াহুড়ির মধ্যে তাহাদিগের উৎসুক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া আমরা কর্ণালী নদীকে এইবার দক্ষিণে রাখিলাম। তার পর ক্রমশঃই প্রশস্ত ও সমতল রাস্তার উপরে আসিয়া পড়ায় ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া সকলেই সহজ মনে করিলেন।

গল্প করিতে করিতে পরস্পর ৩।৪ মাইল অতিক্রম করিয়া আসা হইল। রাস্তার দুই ধারেই শুধু বিস্তীর্ণ শস্য-ভূমি। ঘন-সন্নিবিষ্ট কড়াইশুঁটি, যব, সরিষা প্রভৃতি গাছ-গুলিতে তখন সবেমাত্র ফুল বা শীষ ধরিয়াছে। আশ-পাশের ঝরণা হইতে সেই সকল ক্ষেত্রভূমিতে জলসেচনের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটি গ্রামও দৃষ্টি-পথে পতিত হইল। কচিৎ দুই একটি নাতি-বৃহৎ পাহাড়ী ... "সবে-ধন নীলমণির" মত একা দাঁড়াইয়া আপনার অস্তিত্ব

প্রয়াণ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে রাস্তার মাঝখানে গৈরিক-বর্ণে রঞ্জিত কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড স্তূপীকৃত দেখা গেল। তাহার মধ্যে অধিকাংশ প্রস্তরখণ্ডের গায়ে "ওঁ মণিপদ্মে হুং ক্রীং" মন্ত্রটি লেখা রহিয়াছে। ভাষা অন্যরূপ হইলেও একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই-রূপে গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র ছাড়িয়া আসিয়া কখনও ঝরণা, কখনও বা লম্বা ময়দান দেখিতে পাওয়া গেল। এই সকল পথ একবারেই লোকালয়হীন। দিনের বেলা চলিয়া যাইতেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কচিৎ দুই একটি মেষপালককে কেবলমাত্র মেষ তাড়াইয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। এই ভাবে ৬।৭ মাইল পথ অগ্রসর হইয়া আমরা সকলেই খোজরনাথের মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলাম।

মন্দিরের পূজারী এক জন দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, মুণ্ডিত-কেশ লামা। ইঁহার মুখখানি গোল, পরনে গৈরিক বস্ত্র, তবে চক্ষু দুইটি ঈষৎ রক্তাভ। এতগুলি নূতন যাত্রী দেখিয়া তীর্থ-ক্ষেত্রের পাণ্ডার মত ইনি প্রথমেই দরজা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। হস্ত প্রসারণ করিয়া কিছু দিবার ইঙ্গিত করিতে ভুলিলেন না। আমরা ৯ জনে ৯টি 'তঙ্কা' তাঁহার হাতে ভরিয়া দিলেও অনিচ্ছায় (যেন একবারে সন্তুষ্ট নহেন!) এবার দরজা উন্মুক্ত হইল। মন্দিরমধ্যে সম্মুখেই একটু নাট-মন্দিরের মত অল্প প্রশস্ত অঙ্গন। তাহাতে লামাদিগের বসিবার জন্য উচ্চাসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। পার্শ্বে দেয়ালের গায় কাষ্ঠনির্ম্মিত আল্‌নার থাকে থাকে পুথির আকারে পালিভাষায় লিখিত অনেকগুলি পুস্তক সাজানো ছিল। শুনিলাম, ধর্ম্ম-পুস্তকের ইহা একটি লাইব্রেরীবিশেষ। অঙ্গন হইতে একটু ভিতরদিকে গিয়া বেদীর উপরে সম্মুখেই তিনটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি শোভা পাইতেছিল। অন্ধকারে মূর্ত্তি-গুলি প্রথমতঃ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল না। সুখের বিষয়, শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের হস্তে একটি বৃহৎ টর্চ্চলাইট্ ছিল। তাহা জ্বলিয়া উঠিতেই সকলেরই দৃষ্টি একসঙ্গে মূর্ত্তির প্রতি ধাবিত হইল। দেখিলাম, মূর্ত্তিগুলি অতি উৎকৃষ্ট ধাতুনির্ম্মিত। আকারে বিশাল (প্রায় ৪॥০ হাত) হইলেও শোভনীয়। মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি, এবং তাঁহার দক্ষিণে বামে আকার-অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবধানে লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিমা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে বিরাজিতা।* গায়ে স্বর্ণাভা প্রত্যেক মূর্ত্তিরই মস্তকে অলঙ্কারশোভিত মুকুট। বিংশ-শতাব্দীর শিল্প, ধাতু বা অলঙ্কার সবই যেন সে যুগের শিল্প, অলঙ্কার প্রভৃতির নিকট একবারে পরাস্ত, মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া মনে হইল। রূপের ছটায় প্রতিমাত্রয় যেন আপন আপন দেবরূপ ধরিয়াই সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছেন! বহুস্থানের দেবমূর্ত্তি চোখে পড়িয়াছে, এরূপ উৎকৃষ্ট ধাতুনির্ম্মিত বিগ্রহ কখনও দেখিয়াছি বলিয়া আমাদের মনে হইল না। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ব হইতেই হয় ত মূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। তিনটি শতদল পদ্মের উপরে বিরাজিত এই মূর্ত্তি-ত্রয়ের নিম্নে "শ্রীহরির অনন্ত শয্যা" ও পাশে মহাকাল ও তাঁহার মূর্ত্তি প্রভৃতিও দেখা গেল। এক সময়ে তিব্বত-প্রদেশে সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই পূর্ণ বিকাশ ছিল। কালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সে ধর্ম্মের রূপান্তরে বুদ্ধ-মূর্ত্তিরই প্রসার বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে।

এখানে ধূপ-দীপ জ্বালিয়াই সাধারণতঃ পূজা, আরতি, বন্দনা প্রভৃতি করা হয়। লামা মহাশয় যাত্রিগণের নিকট হইতে বাতি দিবার জন্য কিছু কিছু দক্ষিণা আদায় করিয়া লইলেন।

টর্চ্চলাইট্ ধরিয়া আমরা যতক্ষণ মূর্ত্তিগুলি দেখিতে নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলাম, পূজারী মহাশয়ের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ততক্ষণ কেবল এই বৈদ্যুতিক আলোর উপরেই ন্যস্ত ছিল। মূর্ত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার নিকট কোন উত্তর পাওয়া গেল না। বিশেষতঃ আকার-ইঙ্গিত ব্যতীত তাঁহার ভাষা বুঝিবার আমাদের কাহারও সামর্থ্য ছিল না। হতভম্বের মত তিনি আলোকের বিদ্যুৎগতিই নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অবশেষে টর্চ্চলাইটটি হস্ত প্রসারণ করিয়া চাহিয়া লইলেন এবং দুই একবার ইহার কল টিপিবার স্থানটি কোথায়, পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, মন্দিরের অপর দিকগুলি দেখাইতে আমাদিগকে

---

* শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় [illegible] শ্রীযুক্ত প্রমোদ বাবু খোজরন[illegible] [illegible] মন্দিরের প্রধান মূর্ত্তিত্রয়কে "রাম-লক্ষ্মণ-সীতার" মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রমোদ বাবু উক্ত মন্দিরের লামাকে এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তদুত্তরে তিব্বতে আসিয়া সীতাদেবী কিরূপে 'পার্ব্বতী' হইয়া পড়িলেন, এ বিষয়ে নিজে একটু আশ্চর্য্যান্বিতও হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জানা যায়। টর্চ্চলাইট [illegible]মরা কিন্তু মূর্ত্তিগুলি যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া [illegible]হাতে তাঁহাদের এ উক্তির সাহিত একমত হইতে

লইয়া চলিলেন। এইরূপে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা মন্দিরসংলগ্ন অন্ধকার গলি ও সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া আবার অন্য ঘরে প্রবেশ করিলাম। কেবল বড় বড় বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিবার ছিল না। লামা মহাশয় প্রত্যেক মূর্ত্তি পিছু তঙ্কা লইবার মতলব আঁটিয়াছিলেন, তাই মন্দিরের আশেপাশে প্রত্যেক অন্ধকার গৃহেই যাত্রিগণকে লইয়া যাইতে ব্যস্ত; যাত্রিগণ কিন্তু এ অন্ধকারে আর থাকিতে চাহিলেন না; আলোকের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আকার-ইঙ্গিতে অসম্মতি জানাইয়া বহু কষ্টে আমরা মন্দিরের বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম। লামার সুদৃঢ় করতলগত টর্চ্চলাইটটি ফিরাইয়া লইতে শ্রীমান্ সে দিন যথেষ্ট বেগ পাইয়াছিলেন।

মন্দিরের আশেপাশে ৫।৭ ঘর লোকের বসবাস দেখা গেল। তন্মধ্যে ভিখারীর সংখ্যাই প্রবল। প্রভাতে যাত্রাকালে সকলেই আখরোট, মিছরী, কিসমিস প্রভৃতি কিছু কিছু শুষ্ক খাদ্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন। নদীর ধারে গিয়া তাহা লইয়া কিছু কিছু জলযোগ শেষ করা হইল এবং কতক বা ভিখারীর কাকুতি-পূর্ণ প্রার্থনায় হাতে তুলিয়া দিয়া সকলেই আপন আপন ঘোড়ায় উঠিয়া বসিলেন।

দেব-দর্শন করিয়া বাহিরে আসিতে প্রায় ২॥০টা বাজিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার মধ্যেই আবার ১১ মাইল পথ ফিরিবার কথা। অন্ধকারে নির্জ্জন পার্ব্বত্য পথে আমাদের মত অনভ্যস্ত ঘোড়-সওয়ার (তায় নারীযাত্রী সঙ্গে রহিয়াছে) পদে পদে বিপদ্-ভোগের আশঙ্কাই করিয়া থাকে, তাই উদ্বিগ্ন-চিত্তে সকলেই ঘোড়া হাঁকাইয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিতেছিলাম। একটা চলিত-কথা সে সময়ে মনে হইতেছিল—"যেখানেতে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।" কথাটা মিথ্যা নহে। আমরা এই নির্জ্জন পথে ৩।৪ মাইল অতিক্রম করিবার পর সম্মুখে দুই জন তিব্বতী ঘোড়-সওয়ারকে আগে আগে যাইতে দেখিতে পাইলাম। তাহাদিগকে প্রথমে সাধারণ যাত্রী বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে উহাদের প্রতি সকলেরই নজর ছিল। হঠাৎ দেখা গেল, সওয়ার অবস্থায় উহারা পরস্পর পরস্পরের গলদেশে বাহুবেষ্টন করিয়াই আগে চলিয়াছে এবং উহারা যে মাতাল অবস্থায় যাইতেছে, এ বিষয়ে কাহারও [illegible] রহিল না।

শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের পকেটে 'রিভলভার' (Revolver) ছিল। ভয়ের কারণ না থাকিলেও, এখনও অনেকটা পথ যাইতে হইবে মনে করিয়া আমরা উহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আগে যাইবার মতলব আঁটিতেছিলাম। মাতাল দুইটির কাছাকাছি উপস্থিত হইলে আমরাও তাহাদের লক্ষ্যের বিষয় হইলাম। নয় জন যাত্রী প্রত্যেকেই একটু একটু তফাৎ ভাবে চলিয়া আসিতেছি এবং আমার ঘোড়াই সর্ব্বাগ্রে রহিয়াছে। এমত অবস্থায় যখন একটু প্রশস্ত রাস্তা চোখে পড়িল, পাশ কাটাইবার সুবিধা মনে করিয়া আমিই ইহাদের আগে যাইবার প্রথম চেষ্টা করিতে, উহাদের মধ্যে এক জন আমার দিকে বেশ একটু রুক্ষ ও 'কট-মট'ভাবে চাহিয়া 'কিচিমিচি' ভাষায় বোধ হয় গালিই বকিয়া উঠিল, এবং আমার ঘোড়ার গা 'ঘেঁস' দিয়া তাহার ঘোড়াকে সমানভাবে লইয়া চলিল। আমি একটু দ্রুতই চলিলাম, কিন্তু সম্মুখে একটু নালার মত ঢালু সঙ্কীর্ণ রাস্তায় আসিয়া পড়ায়, ঘোড়ার রাশ (আনাড়ী আমি!) সংযত করিয়া লইলাম। এ ব্যাপারে পশ্চাৎ হইতে আর আর যাত্রিগণ বোধ হয় রঙ্গই দেখিতেছিলেন। দেখিলাম, মাতাল দুইটির বয়স নিতান্ত কম নহে, প্রৌঢ়াবস্থা। লালপানির প্রভাবে প্রত্যেকেরই চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ এবং প্রতি মিনিটেই তাহারা ঘোড়ার উপরে ঢলিয়া পড়িতেছিল। ঘোড়া দুইটি বিলক্ষণ মজবুত হইলেও এ অবস্থায় তাহাদিগের ঘোড়া হইতে পড়িবার আশঙ্কা আদৌ দেখা গেল না (পড়িলে নিশ্চিন্ত হইতাম)। আমি ঘোড়ার রাশ সংযত করিলে, সুখের বিষয়, মাতালটি কিন্তু নেশার ঘোরে রাশ আল্গা রাখিয়াই নালার রাস্তা পার হইয়া গেল।

ততক্ষণে আমাদের আর আর যাত্রিগণ সকলেই আমার নিকটে পৌঁছিলেন। খানিক দূর গিয়া আবার সেই মাতাল দুইটির কাছে পড়িলাম। সকলে কাছে থাকায়, আমার সাহস এবারে কিছু বেশী ছিল এবং মনে মনে ভয় ছাড়া একটু ক্রোধও হইয়াছিল। তিব্বতী 'গাইড্' মহাশয়কে সম্মুখে দিয়া এইবার আবার মাতাল দুইটির পাশ কাটাইবার সময়ে, পূর্ব্বোক্ত মাতালটির সহিত গাইডের কি একটা কথা-বার্ত্তা হইল। পরক্ষণেই (আমাদিগকে পাশ কাটাইয়া আগে লইয়া যাওয়া দূরের কথা) গাইড্ মহাশয় দেখি, সেই মাতালটির পশ্চাদ্ভাগে একই ঘোড়ার উপরে চড়িতে

গেল। ঘোড়া কিন্তু "ডবল-সওয়ার" লওয়া আদৌ পছন্দ না করিয়া খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাইড নীচে পড়িয়া বেশ আছাড় খাইল। ব্যাপার দেখিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলাম এবং মনে মনে সন্তুষ্টও হইলাম যে, আমাদের গাইড্ আমাদের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, স্বজাতি-মাতালের কথায় কি জন্য তাহার ঘোড়ায় একসঙ্গে উঠিতে গেল! ঠিক সেই অবসরে আমি কিন্তু বুদ্ধিমানের মত সেই মাতালটির লাফাইয়া উঠা ঘোড়াটিকে পশ্চাৎ হইতে সজোরে একটিবার চাবুক কসাইয়া দিলাম।

চাবুক খাইয়া তিব্বতী-ঘোড়া মাতাল-মালিককে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। দেখা-দেখি সঙ্গী মহাশয়ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘোড়া ছুটাইলেন। এইরূপে সে যাত্রায় আমরা সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তার পর প্রায় মাইল-খানেক পথ অগ্রসর হইয়া এই মাতাল দুইটিকে একটি ঝরণার ধারে শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। সে সময়ে ঘোড়া দুইটি ছাড়া ছিল। আমরা এই ঝরণাটি পার হইবার সময়ে বলা বাহুল্য, সকলেই দ্রুত চলিয়া আসিয়া-ছিলাম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার সেই গ্রাম ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের কাছে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম, নির্জ্জনতার ভয় তখন দূরে চলিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে তাকলাকোটে আবার ফিরিয়া আসিলাম। তাঁবুতে আসিয়া রঞ্জনের কথামত খোজরনাথ যাতায়াত দরুণ ঘোড়ার ভাড়া প্রত্যেকটি ১৲ টাকা হিসাবে এবং দুই জন ঘোড়াওয়ালার মজুরী প্রত্যেককে ৷৵০ হিসাবে চুক্তি করিয়া দেওয়া হইল।

সেই দিন হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, রঞ্জন ভিন্ন অজানা গাইড্ লইয়া আর কখনও কোথাও যাইব না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পরশ-মণি

হৃদয় আমার চির-আয়স-
কলঙ্কে ভরপূর
ছিল চিরদিন; তুমি এসে শুধু
সে কালী করেছ দূর।

এ জগত-মাঝে চিনিত না কেহ,
জানিত না কেহ মোরে;
ছিলাম পড়িয়া সকলের নীচে
অজ্ঞান মোহ-ঘোরে।

আপনার মাঝে আপনার সুখে
মত্ত দিবস-যামী।
(আমি) ভুলেও কখন ভাবিনি তোমায়,
ভুলেও ডাকিনি স্বামি

তুমিই আপনি এসেছ হৃদয়ে;
তোমারি পরশ-ভাতি
(আজ) উঠেছে ফুটিয়া আঁধার হৃদয়ে;
ফুরায়েছে মোহরাতি।

তুমিই করেছ উজল কিরণে
আঁধিয়ার অবসান;
তুমিই দিয়েছ নীরব কণ্ঠে
নিখিল মাতানো গান;

তুমি ফুটায়েছ মলিন পঙ্কে
সুন্দর শতদল;
তুমি ছুটায়েছ রুদ্ধ ভুবনে
পবন সুনির্ম্মল;

(আমি) চির-অজ্ঞাত; তুমিই আমারে
করেছ সবার চেনা;
তোমারি পরশ, পরশমণি,
আমারে করেছে সোনা।

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য

সাগর-সৈকতে

১

.রু যেন সহসা তাহার সুগৌর আননে আবীর মাখাইয়া দিল।

ঠিক্ সেই সময়েই রেবা বোর্ডিং-বাটীর দোতলায় বন্ধুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধুর আরক্ত মুখ লক্ষ্য করিয়া, তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া, রাস্তার দিকে তাকাইতেই চাপা হাসিতে রেবার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কহিল, "কি হচ্ছে, মিলি?"

বন্ধুর কণ্ঠস্বরে মিলি চমকিত হইল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিল, "কৈ, কিছু না ত? তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়?"

"আমি? আমি ত এইমাত্র ছোড়্দার সঙ্গে দেখা ক'রে এলুম।"

"ছোড়দা কে?"

"আমার মাস্তুতো ভাই। মাস দুই হলো বিলাত থেকে এসেছেন। আচ্ছা মিলি?"

"কি রে?"

"তোকে প্রতি রোববারেই এখানে দাঁড়িয়ে থাক্তে দেখি কেন?"

মিলির শুভ্র সুন্দর মুখখানিতে রক্তিমাভা দেখা দিল; কহিল, "রাস্তার কোলাহল-মুখরিত জনস্রোত দেখতে আমার বেশ লাগে, ভাই।"

"ওঃ, তাই? তবে রোববারে জনস্রোতের কোলাহলের মধ্যে বেশ একটু অভিনবত্বের গন্ধ পাওয়া যায়, না?"

মিলির মুখে লজ্জার ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে নতমুখে মৌন হইয়া রহিল।

দুই বন্ধুর স্বভাবের কিছুমাত্র ঐক্য দেখা যাইত না। মিলি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও চাপা। তাহার হৃদয়ের গভীর ভাবপ্রবণতা ভিতরেই রুদ্ধ থাকিয়া কল্পনা-শক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করিত। বাহিরের কোন ব্যবহারে তাহার এতটুকু আভাস খুঁজিয়া পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ।

আর রেবা? দুষ্টামীভরা চোখ দুইটিতে হাসিটুকু যেন লাগিয়াই থাকিত। সদা সপ্রতিভ ভাব, অকারণ হাসি, চঞ্চলা হরিণীর মত অপূর্ব্ব লীলায়িত গতি—সবগুলিই যেন তাহার মনের সরলতা ও চঞ্চলতার পরিচয় দিত। অথচ দুই বন্ধুর মধ্যে ভালবাসার গভীরতার যেন পরিসীমা ছিল না।

বন্ধুকে নীরব দেখিয়া রেবা অভিমানে [illegible] কহিল, "বল্‌বিনে ত? থাক্, কেনই বা বল্‌বি?" [illegible]

মিলি মৃদু হাসিয়া কহিল, "তোকে নিয়ে আর পেরে উঠিনে, রেবা। এত অভিমানও কর্‌তে জানিস্।"

রেবা সেইভাবেই জবাব দিল, "কেন করবো না? তোমার মত ত আর নয় যে, সব ভালবাসা সঞ্চিত কোরে রাখবো কোন এক অনাগতের উদ্দেশ্যে? তোকে ভালবাসি, তাই অভিমান করি। তাও যদি জান্‌তুম, তুই তার কিছুমাত্র মূল্য বুঝিস্।"

মিলি সাদরে তাহার চিবুক নাড়িয়া কহিল, "কি বল্‌বো ভাই? তুই এ সব বুঝবিনে। আচ্ছা রেবা, চোখের দেখায় ভালবাসা—তোর কেমন মনে হয়?"

রেবা উচ্ছ্বসিত হাসি দমন করিয়া কহিল, "ওঃ, তাই বল. তবু চোখের দেখা হয়েছে? চোখে না দেখে বাঁশী শুনেই মন-প্রাণ সঁপে দিসনি ত?"

মিলি সলজ্জ কণ্ঠে কহিল, "ঠাট্টা করছিস্?"

"না ভাই, সত্যিই ঠাট্টা নয়। তবে জানিস্ ত, এ সব জটিল ব্যাপার আমার হৃদয়ঙ্গম করা একটু কঠিন।"

রেবা সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল। মিলি বিরক্ত হইয়া কহিল, "হলো কি? হেসেই মরছিস্ যে?"

"আচ্ছা, হাস্‌বো না। কিন্তু মিলি, চোখের দৃষ্টির ভিতর দিয়ে কে তোর হৃদয়ের অতল তলে প্রেমের ফোয়ারার সন্ধান খুঁজে পেল, আমায় বলবিনে? কে সে ভাগ্যবান্?"

মিলি মৃদু হাসিল।

রেবা অধীর হইয়া কহিল, "না মিলি, হাসি নয়। চোখে দেখেই কার প্রেমে পড়্‌লি, তা বল্‌তেই হবে।"

প্রায় পাঁচ মিনিটকাল প্রতীক্ষার পরেও মিলিকে নীরব দেখিয়া নারীসুলভ কৌতূহলপ্রাচুর্য্যে অস্থির হইয়া রেবা কহিল, "বল্ না ছাই। মা গো, তুই এতও হজম করতে পারিস্।"

মিলি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বলছি. কিন্তু তোকে আমার বড় ভয় করে। তুই যা মেয়ে, এক্ষুনি ঢাক পিটিয়ে বেড়াবি।"

"তুই পাগল হয়েছিস্, মিলি? আমি যাব এই কথা নিয়ে রঙ্গ করতে?"

মিলি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "কিছু ত বলবার নেই, রেবা! আমি ত তাঁর পরিচয় জানিনে যে, তোকে সব বলবো! তবে প্রতি সপ্তাহেই এই সময় একবার ক'রে দেখতে পাই।"

"ওঃ, তাই বল্। তবে সাহেববেশী একটি যুবককে আমি একটু আগে দেখলুম, তিনিই না কি?"—রেবার চোখে দুষ্টামীর হাসি ফুটিয়া উঠিল।

মিলি সবিস্ময়ে কহিল, "তুই দেখেছিস্ তাঁকে? হ্যাঁ, তিনিই।"

রেবার সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল। হাসি গোপন করিয়া রেবা কহিল, "চেহারা ত মন্দ নয়; প্রেমে পড়ার অযোগ্য নয়—তবে জানিস্ ত, প্রেম জিনিষটাই হচ্ছে অন্ধ। রূপগুণের অপেক্ষা রাখে না। ঐ যে একটা গান আছে—

'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে?'

তবু বল্‌ছি, পেটে বিদ্যে আছে কি না, সে পরিচয় কিছু পেয়েছিস্ কি? বুঝতেই পারিস্, রূপই পুরুষের প্রধান সৌন্দর্য্য নয়।"

মিলি ম্লানমুখে কহিল, "না ভাই, কোন পরিচয়ই পাইনি।"

রেবা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "বেশ।"

২

"ওরে মিলি, কবির কল্পনা ছাড়্। পড়াশুনা ত প্রায় ছেড়েছিস্। এখন যা সব রকম দেখছি, একটা অসুখ না বাধিয়ে ছাড়্‌বি না।"

মিলির উদাস আয়ত নয়নযুগলে হাসির বিজলী খেলিয়া গেল। সে কহিল, "রঙ্গ রাখ্ ভাই। দেখ্ ত কি সুন্দর!"

রেবা জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। শ্রাবণ-গগন ভেদ করিয়া কি অবিশ্রান্ত বারিপাত। মাঝে মাঝে কালো মেঘের বুক চিরিয়া বিজলী-প্রভা ঝলসিয়া উঠিতেছিল।

রেবা মুহূর্ত্তকাল আকাশের দিকে তাকাইয়া, কণ্ঠস্বরে ঘোর বিরক্তি ঢালিয়া দিয়া কহিল, "মা গো, ছাই! রাতদিন ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্। কাণ একেবারে ঝালিয়ে খেলো। না পারি বাইরে বেরোতে, না পারি কিছু করতে।"

মিলি সকৌতুকে কহিল, "সে কি রে? শ্রাবণ-আকাশের ক্ষণেক্ষণে নব নব বৈচিত্র্য অকবিকেও যে কবি ক'রে তোলে?"

গম্ভীর অবজ্ঞায় রেবা কহিল, "ওঃ, রেখে দে তোর কবিত্ব। তোদের কথা আলাদা। ঝম্‌ঝম্ বারিপাতে তোরা অনাগতের চরণধ্বনি শুনতে পাস্। আমার ত আর তাই নয়।"

মিলির ভাবমুগ্ধ হৃদয়ে এ সব বিদ্রূপের রেখাপাত হইল না। কতকটা আত্মগতভাবে সে কহিল, "বাঃ, কি সুন্দর! আ্ কেবলই মনে পড়ে কালিদাসের মেঘদূতের কথা। কি চমৎকা এঁকেছেন। কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি হচ্ছে এই মেঘদূত। বিরহি-চিত্তের সমগ্র ব্যাকুলতা আকুলতা যেন মূর্ত্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রাবণের ছিদ্রহীন অশ্রান্ত বারিপাতের সঙ্গে তাই বুঝি বিরহীর আকুল ক্রন্দন বাজে। সত্যি নয়, রেবা?"

মিলির কণ্ঠস্বর ঈষৎ আর্দ্র। বোধ হয়, মুখের কথাগুলিই তাহার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি হইয়া বাজিতেছিল।

রেবা ঠাট্টার সুরে কহিল, "বাপ রে, ম'রে যাই! তুই একেবারে উচ্চতার কোন্ স্তরে গিয়ে উঠ্‌লি? শেষকালটা নাগাল পাব ত?"

"চেষ্টা কর্‌লেই পার্‌বি।"

"থাক্ বাবা, আমার অসাধ্যসাধনে কায নেই; কিন্তু তুই কি আমাকেও ঠাণ্ডা লাগিয়ে ছাড়্‌বি না কি? উঃ, কি কন্‌কনে বাতাস আসছে।"

রেবা শাড়ীর অঞ্চলপ্রান্ত ভাল করিয়া গায় জড়াইয়া দিল।

হঠাৎ কি মনে পড়িতেই রেবা কহিল, "জানিস্, মিলি, এবার ছাত্রীসঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে তোকে গান গাইতে হবে?"

মিলি সজোরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না না, আমি পার্‌বো না।"

রেবা হাসিয়া কহিল, "না পার্‌লে তোমায় ছাড়্‌ছে কে? সবাই বলেছেন, তোমাকে গাইতেই হবে।"

মিলি আর প্রতিবাদ করিল না।

৩

আজ ছাত্রীসঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন। বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছাড়াও তাহাদের আত্মীয় বহু যুবক-যুবতী নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। ফুল, লতা-পাতার বিচিত্র শোভায় সভাগৃহ উজ্জ্বল ও মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল। সভাস্থ নিমন্ত্রিত তরুণ-তরুণীদিগের সাজের পারিপাট্য ও কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য অসাধারণ চেষ্টারও অভাব ছিল না।

উৎসব আরম্ভ হইল। মিলির সুকণ্ঠ-নিঃসৃত অপূর্ব্ব সঙ্গীতই প্রথমে নিমন্ত্রিত নরনারীদের হৃদয় স্পর্শ করিল।

মিলি গাহিতেছিল,—

"এ কি আকুলতা ভুবনে,—
এ কি চঞ্চলতা পবনে—"

সুরের মূর্চ্ছনা, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য, গানের অপূর্ব্বভঙ্গী, ভাবের তরুণ-তরুণীদিগকে মুগ্ধ, অভিভূত করিয়া দিল। মিলির উপর পতিত হইল। তাহার আয়ত,

কৃষ্ণতার নয়নযুগলে যেন বিশ্বের সমস্ত লজ্জা জড় হইয়াছিল। তাহার লজ্জানম্র সুগৌর আনন ভাবাবেশে ক্ষণে ক্ষণে রক্তিম হইয়া তাহার অসাধারণ সৌন্দর্য্যকে কি অধিকতর প্রশংসনীয় ও লোভনীয় করিয়া তোলে নাই ?

দর্শকদিগের মধ্যে এক জন সুবেশ ও সুন্দর যুবক মুগ্ধনেত্রে কিছুক্ষণ মিলির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, পরক্ষণেই দৃষ্টি সংযত করিয়া, পার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধুকে কহিল, "দেখছো বিমল, কি সুন্দর মেয়েটি! যেমন মিষ্ট কণ্ঠস্বর, তেমনই গানের ওস্তাদি! বাঃ, ভারী চমৎকার!"

বিমল মৃদু হাসিয়া কহিল, "উঃ, একেবারেই যে মুগ্ধ হয়ে গেছ দেখ্‌ছি।"

যুবক লজ্জিত হইয়া কহিল, "মুগ্ধ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য কি? বিমল, বল্‌তে পার, মেয়েটি কে?"

"জানি। কিন্তু কেন বল ত? প্রেমে প'ড়ে গেলে নাকি, অসিত?"

অসিত সহাস্যে কহিল, "এখনও অতদূর যেতে পারিনি, ভাই। প্রেমে পড়া কি এতই সহজ? তবে মুগ্ধ হয়েছি, সে কথা অস্বীকার করবো না।"

বিমল উপহাসভরে কহিল, "কেন? সহজ নয় কেন? প্রেমে পড়া ত পিছলপথে আছাড় খাওয়ার মতই সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে তরুণ-তরুণীর সাক্ষাৎ, সেখানেই প্রেমে পড়া। এর চেয়ে সহজ ব্যাপার আর কি কিছু আছে? তার পর সাম্যবাদের ধুয়া ধ'রে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ অনেকটা সহজ সরল ক'রে নিয়ে আসবার চেষ্টা চলেছে। তা ত মান তুমি?"

"নিশ্চয়ই মানি এবং সবটাই যে মন্দ, তাও স্বীকার করিনে। দেখ বিমল, তুমি ঠাট্টা করেই বলছো, তা আমার অগোচর নেই; কিন্তু তুমিই ভেবে দেখ, সব জিনিসেরই ভাল মন্দ দুটো দিক্‌ই আছে। যে সাম্যবাদ নিয়ে তুমি ঠাট্টা করলে, তাতে যে গরল উঠেছে, সেটাই তুমি দেখছো, আর তা মিথ্যাও নয়। কিন্তু কিছু অমৃতও কি ওঠেনি? বাঙ্গালার নারীরা এ যুগে কত অগ্রসর হয়েছেন, সেটা কি আশার কথা নয়? অবশ্য, যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অনবদ্য ও শ্রেষ্ঠ ব'লে জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন, তাঁদের দিয়ে তুমি বাঙ্গালার সব নারীকে বিচার ক'র না, বিমল। যাক্ সে সব কথা। তর্কে তর্কে কোথায় এসে গেলুম। এখন বল ত কে এই মেয়েটি?"

"কেন বল ত? ঘটকালী করবো না কি? আমি রাজী আছি।"

অসিত সলজ্জ হাস্যে কহিল, "কে, তা কিছুই জানিনে; নাম-ধাম সবই অজানা—"

বাধা দিয়া বিমল কহিল, "ও সবের জন্যে তোমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। তোমরা দুজনই যখন আমার পরিচিত, তখন সে সমস্যার সমাধান ত হয়েই গেল; কিন্তু তুমি রাজী হবে ত?"

অসিতের মুখে নবোঢ়া বধূর লজ্জার অরুণ দ্যুতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তোমার ফাজলামি চিরকালই সমানভাবে থাক্‌বে?"

বিমল হাসিতে হাসিতে বলিল, "সত্যি ফাজলামি নয়। মেয়েটিকে বাইরে থেকে যদি মনে ধ'রে থাকে, তবে আমি আশ্বাস দিচ্ছি, গুণের দিক্ দিয়েও তুমি ঠক্‌বে না। যদি রাজি থাক ত বল, আমি ঘটকালী করি।"

অসিতের হাস্যোজ্জ্বল আনন ও সলজ্জ দৃষ্টি কি তাহার অন্তরের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করিল?

৪

"রেবা?"

"কি রে?" রেবা হাসিয়া বন্ধুর দিকে মুখ ফিরাইল। মিলির কথা বলিবার ধরণ দেখিয়াই রেবা প্রশ্নটা অনুমান করিয়া লইল।

মিলি লজ্জাজড়িত-কণ্ঠে কহিল, "বার্ষিক অধিবেশনের দিন দেখলুম, তুই একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিস। সে মেয়ে কে রে?"

"কেন বল্ ত?"

মিলির মুখে আর কথা যোগাইল না। সে স্বভাবতই লাজুক—কথাবার্ত্তা কমই বলে।

তাহাদের বার্ষিক অধিবেশনের দিন কে তাহার আকাঙ্ক্ষিতের রূপ ধরিয়া আসিল? সভাভঙ্গ হইবার পরে যখন সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ব্যস্ত, তখন কাহাকে সে দ্রুতপদে মোটরে উঠিতে দেখিল? মোটরে উঠিবার পরে তাহার প্রশংসমান দৃষ্টি একবার মিলির সলজ্জ দৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়াছিল। পরক্ষণেই মিলি চোখ নত করিয়াছিল, কিন্তু সেই দৃষ্টিতে অপবিত্রতার কোন ছাপ ছিল না। মিলি সে দৃষ্টি দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই, ইহা সে কখনই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

রেবা মিলিকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "কোন্ মেয়েটির কথা তুই জিজ্ঞেস করছিস? যে নীলাম্বরী প'রে মোটরের

পাশে দাঁড়িয়েছিল ? ওঃ—সে আমার মাসতুতো বোন্। আর সঙ্গের বাঙ্গালী সাহেবটি—”

হঠাৎ রেবা থামিয়া গেল। মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া সে কহিল, “ওহো, মিলি, তোকে বল্‌তে ভুলেই গেলাম। সঙ্গের সাহেবটিই ত তোর সেই লোকটি, না রে ? আমার কি ছাই মনে থাকে ? জানিনে বাপু, আমার বোনের সে আবার কি সম্পর্ক হয়। এক মোটরেই ত উঠলো দেখলুম। কি জানি, তোমার আবার প্রতিদ্বন্দ্বী জুটলো কি না।”

মিলি মৃদুকণ্ঠে বলিল, “তুই যে কি বলিস্ ?”—কিন্তু তাহার মুখের কথায় তাহার অন্তর সায় দিয়াছিল কি না, কে বলিবে ?

রেবা অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিল; কহিল, “মিলি, কোথায় যাবি ভাই পূজার ছুটীতে ?”

মিলি উদাস দৃষ্টি বাহিরের দিকে নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল, “ঠিক জানিনে। তবে বোধ হয়, পুরী যাওয়া হবে। মা’র চিঠিতে ত এরকমই বোঝা গেল।”

রেবা উচ্ছল আনন্দে অধীর হইয়া কহিল, “তাই না কি ? ভারী মজা ত ? তা হ’লে ভাই, আমিও যাব। মাসীমাদের পুরী যাওয়া ঠিক্ হয়েছে কি না ? আমার বোন্ আমাকে সে দিন কত সেধেছে। আমি রাজী হইনি; তখন ত জানতুম না যে, তোরাও যাবি।”—রেবা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

মিলি কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিল, “হাসছিস্ যে ?”

রেবা কহিল, “পুরী যাওয়ার কথা মনে প’ড়ে হাস্‌লুম। জানিস্ মিলি, মাসীমাদের পুরী যাওয়া সম্পর্কে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। মাসীমা পুরী যাচ্ছেন ছোড়্‌দার বিয়ের ঠিক্ কর্‌তে। মেয়ের বাবাও সেখানে যাবেন। এই বিয়েতে রীতিমত এক রোমান্সের সৃষ্টি হচ্ছে। বুঝতেই পার্‌ছিস্, সাগরসৈকতে মুক্ত উদার আকাশতলে আরও সব তোদের কবির ভাষায় কত কি বলে, শারদ প্রভাতে অথবা শারদ সন্ধ্যায় দুজনের দৃষ্টির মিলন হ’ল। কি সুন্দর না রে ?”

মিলির মনে কি ভাবের উদয় হইল, কে জানে ? নিশীথ-রাত্রিতে শয্যায় শুইয়া সে ভাবিতে লাগিল, তাহার তরুণ অন্তরে যে নামগোত্রহীন অপরিচিত যুবকের স্মৃতি একটা মাধুর্য্য-রস সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার চিত্তকে তাঁহার চিন্তায় ব্যাপৃত রাখিয়াছে, ইহাই কি প্রেম ? প্রথম-দর্শনে প্রেমের কথা সে কাব্য উপন্যাসে পড়িয়াছে। তাহার বাস্তব জীবনে আজ যে অনুরাগের উদয় হইয়াছে, ইহাও কি তাহারই সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে ? কিন্তু কেন এমন হয় ? এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে ? একের চিত্ত অপর চিত্তের প্রতি পরিচয়ের ঘনিষ্ঠ স্মৃতির বলে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে পরিচয়ের বালাই নাই, সেখানেও দেহকে কেন্দ্র করিয়া এই যে মনের আকর্ষণ, ইহার তত্ত্ব নিরূপণ করিবে কে ? ইহা কি জন্মজন্মান্তরের সংস্কারের ফল—জন্মজন্মান্তরের পরিচয়ের অভিব্যক্তি ?

সে উৎসব-রজনীতে তাঁহার নয়নে যে দৃষ্টি দেখিয়াছিল, তাহাতে কি সেই জন্মান্তরের পরিচয়ের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল ?

মিলি উপধানে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বারবার শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহার অন্তরতম প্রদেশে সেই অপরিচিত যুবকের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তাহার পক্ষে সে মূর্ত্তিকে অন্তর হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করা অসম্ভব। গভীর বেদনাভরে মিলি আবার শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

৫

শান্ত মধুর শরৎপ্রভাতে সুদীর্ঘ অবসরের প্রারম্ভেই মিলি পুরী আসিয়া পৌঁছিল। সেই কত দিন পরে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর সহিত মিলনানন্দের শুভসুযোগ! প্রিয়-পরিজনের মাঝখানে হাসিঠাট্টা, ফূর্ত্তির উচ্ছল আনন্দে মিলির ভাবপ্রবণ গভীর হৃদয়ও যেন লঘু মেঘের মত ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সে দিন সন্ধ্যায় রান্নাঘরের দিকে যাইবার সময় মাতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। হাঁ, বারান্দায় দাদার সঙ্গেই মা তাহারই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন!

মিলি নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া শুনিল, মা বলিতেছেন, “মিলির ভাগ্যি, যদি এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়। আমি ত আশাই কর্‌তে পারিনে যে, এমন হীরের টুক্‌রো ছেলেকে জামাই কর্‌তে পার্‌বো।”

মিলির দাদা বলিলেন, “আর দেখ মা, শুধু যে এঞ্জিনিয়ার হয়ে এসেছে, তা ত নয়। ওর বাপের কত টাকা, সবই ত তুমি জান।”

মাতার আনন্দিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “জানি বৈ কি বাবা, সবই জানি।”

পরদিবস নিয়মিত ভ্রমণের পর বাড়ী ফিরিবার সময় হঠাৎ মিলির দাদা কহিলেন, “জানিস্, মিলি, তোর বিয়ের ঠিক্। আস্‌ছে ফাল্গুনে তোর ম্যাট্রিক পরীক্ষা। কিন্তু ওঁরা অগ্রহায়ণ মাসেই ...বা, মা’র খুবই মত।”

মিলির মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তাহার মুখমণ্ডলের ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহার দাদা বলিলেন, "ও কি, মিলি, তুই অমন কচ্ছিস্ কেন ?"

মিলি সযত্নে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "ও কিছু না।"

দাদা মিলির দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ছেলেটি বড় ভাল রে, তুই সুখী হ'তে পারবি।"

মিলি তাহার দাদাকে ভাল করিয়াই চিনিত। তিনি যে তাহার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট, তাহা সে বুঝিত। কিন্তু তাহার বিবাহ-বিষয়ে তাঁহাকে এতটা আগ্রহশীল দেখিয়া সে খুসী হইতে পারিল না। সে ক্লান্তকণ্ঠে বলিল, "তোমার আর কোন কায নেই, দাদা ?"

দাদার মুখে মৃদু হাস্যের তরঙ্গ তেমনই ভাবে লীলায়িত হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "এর চেয়ে আবার বড় কায কি আছে রে, মিলি ? তোকে সৎপাত্রে অর্পণ করা তোর দাদার বড় কায নয় ?"

মিলি প্রায় ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি কি তোমাদের এমনই গলগ্রহ হয়ে উঠেছি যে, আমাকে তাড়াতে পারলে তোমরা বাঁচ ? আমি বিয়ে করব না।"

দ্রুতপদে সে বাসার দিকে চলিয়া গেল। তাহার দাদার মুখের হাসি কিন্তু বিলুপ্ত হইল না।

বাড়ী আসিয়া মিলি সোজা নিজের ঘরে গিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

স্নেহময়ী জননী কন্যাকে এমন ভাবে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে, মিলি ?"

মিলি স্খলিত-কণ্ঠে বলিল, "তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই বাঁচ।"

ব্যাপার অনুমান করিয়া মা'র মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এই কথা। তা মা, বিয়ে সবাই করে !"

প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া মিলি বলিল, "আমি বিয়ে চাই না।"

মাতা একবার কন্যার বিরস মুখের দিকে চাহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাত্রিতে ছেলেকে ডাকিয়া মাতা কহিলেন, "শুন্‌ছিস্ ত, মিলি কি বলে ? সে বিয়ে নাকি করবে না।"

ছেলে হাসিয়া মাতার কাণে কাণে কি বলিল। জননীরও মুখে মৃদু শান্ত হাস্যের দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না।

সপ্তাহখানেক পরের কথা। সে দিন শারদ পূর্ণিমার শুভ জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যার আকাশে মেঘের ঘন[illegible] ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মিলি একা ছাদের কোণে দাঁড়াই[illegible] সীমাহীন সমুদ্র যেন কালান্তক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দূরে কালো কালো অজগরের মত ঢেউগুলির কি বিপুল ভীষণ গর্জ্জন ! ফেনপুষ্পিত বিরাট তরঙ্গগুলি বেলাতটে আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। তাহাদের গর্জ্জন যেন মিলির কাণে তীব্র আর্ত্তনাদের মতই ধ্বনিত হইতেছিল।

হঠাৎ সিঁড়িতে চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরে মিলি চমকিত হইল।

"মিলি ! মিলি !"

"রেবা !" মিলি সানন্দে বন্ধুর গলা জড়াইয়া ধরিল। "তোদের আসতে এত দেরী হ'ল কেন ?"

রেবা সে কথার জবাব এড়াইয়া গিয়া কহিল, "তা তুই একলাটি এখানে কেন ?"

মিলি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বাঁচালি রেবা। কি বিপদেই প'ড়ে গেছি, ভাই। বাবা, মা বিয়ের ঠিক ক'রে ব'সে আছেন, আর আমার আপত্তির কারণ ত তোর অজানা নেই। তুই ভাই লক্ষ্মীটি যদি মাকে বুঝিয়ে বলিস্।"

হাসি গোপন করিয়া রেবা কহিল, "তোর এ সব ঢং আমার ভাল লাগে না, মিলি। কোথায় কাকে দেখেছিস্। সেই চোখের মোহকে ভালবাসা মনে ক'রে তুই কি ক'রে বাবা-মা'র মনে কষ্ট দিচ্ছিস্ ?"

মিলির স্নিগ্ধ কালো আয়ত চোখ দুইটিতে যেন স্বপ্নাবেশ-বিহ্বলতা ! সে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা ভাই, তুই কি সত্যই বিশ্বাস করিসনে যে, চোখের দৃষ্টিতেও প্রেমের আলো জ্ব'লে ওঠে ? সেই অক্ষয় প্রেমের আলোতে এ জন্মের সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয়ে যায় ?"

রেবা হাসিয়া কহিল, "থাক্ ভাই। ও সব কবিত্বপূর্ণ প্রেমে আমার তত আস্থা নেই; কিন্তু আপাততঃ তোকে যখন সত্যিই রোগে ধরেছে, তখন তার কি ব্যবস্থা করতে পারি, বল্ ?"

কি যে ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা মিলিও ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে রেবা বিদায় লইল।

৬

রেবার ব্যস্ততা দেখিয়া মিলি হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "এত তাড়া কেন বল্ ত ?"

রেবা দ্রুত নিশ্বাসে কহিল, "এমন সুন্দর সূর্য্যাস্ত দেরী করলে দেখতেই পাবিনে। তোর কবিপ্রাণ, কাযেই তোরই আপশোষ বেশী। নে, শীগ্‌গীর চুল্।"

মিলি তাড়াতাড়ি প্রসাধন শেষ করিয়া কহিল, "চল্।"

উভয়ে সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়াইয়া শারদ-সন্ধ্যার অনবদ্য, অপরূপ শোভা দেখিতে লাগিল।

মিলি উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "কি সুন্দর!"

অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিমচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া জল, স্থল, আকাশ আজ অপরূপ রঙ্গে রাঙ্গাইয়া তুলিয়াছিল।

রেবা মুগ্ধনেত্রে মিলির দিকে তাকাইয়াছিল। রক্তাম্বর-পরিহিতা মিলিকে আজ শারদ-লক্ষ্মীর মতই শোভাময়ী দেখাইতেছিল।

"মিলি, একটা গান কর্ না, ভাই।"

রেবার অনুরোধে মিলি গান ধরিল,—

"আনন্দ আজ সেজে এলো, এলো রে লাল চেলীর ওই সাজে"

সমুদ্র-সৈকতে কিন্নরীকণ্ঠী মিলির অপূর্ব্ব সঙ্গীততরঙ্গ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল। সত্যই আনন্দ যেন অপরূপ সাজে সজ্জিত হইয়া মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। গানটি সমাপ্ত হইলে মিলি অনন্যমনে প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিল। হঠাৎ রেবার উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর মিলির ধ্যানভঙ্গ করিল।

"এই যে, ছোড়্দা। কি ক'রে জান্লে যে, আমরা এখানে? এসো, এসো।"

মিলির দৃষ্টি তখনও বিচিত্র সৌন্দর্য্যের আধার সমুদ্রের পানে নিবদ্ধ। সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সে অন্যমনে কহিল, "এখানে আবার কে তোর ছোড়্দা?"

রেবা সকৌতুকে কহিল, "বা রে, তোকে বলিনি আমার ছোড়্দার কথা? আমার মাসতুতো ভাই?"—রেবা সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

মিলি সেই অহেতুক হাসির শব্দে মুখ ফিরাইল। কে? কে ইনি? অসহ্য আনন্দের আবেগে কি তাহার গোলাপী গণ্ডে সিন্দূরচূর্ণ ছড়াইয়া পড়িল? তাঁহার পার্শ্বে ও কে? তাহার দাদা না?

দাদার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি লাগিয়াছিল।

অসিত হাসিয়া বলিল, "বিমল, চল, আমরা ও দিকে যাই। তোমার বোন্ অত্যন্ত—"

কথাটার শেষভাগ প্রবল বাতাসে ভাসিয়া গেল। রেবা আবার মধুরভাবে হাসিয়া উঠিল। মাথা নত করিয়া মিলি ভাবিল, তাহার দাদা এতও জানেন!

মুক্ত উদার আকাশতলে, সাগর সৈকতে রক্তরাঙ্গা শারদ-গোধূলিতে দুইটি তরুণ-তরুণীর চকিত দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য মিলিত হইল।

রেবার কবিকল্পনা মিথ্যা হইয়াছিল কি?

শ্রীমতী চারুবালা গুহ।

সুন্দর

রূপ-লিপিতে ধরব তোমায়
কেমন ক'রে!—
রূপ যে তোমার লক্ষ ধারায়
পড়ছে ঝ'রে!

তাই ত আমার গানের মাঝে
ব্যর্থ তারি বেদন বাজে,
কেঁদে মরি অপরূপ ও
রূপের তরে!

হে রূপময় কৃপা ক'রে
শুধু আমার ক্ষণিকতরে
দাও ধুয়ে সব মলিনতা
ও রূপ-নিঝরে—

এই যে হেয় তুচ্ছ জীবন
ফুটে ওঠে ফুলের মতন,
তোমার চরণকমলপরে

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

ভাদুড়ী মশাই

৩৪
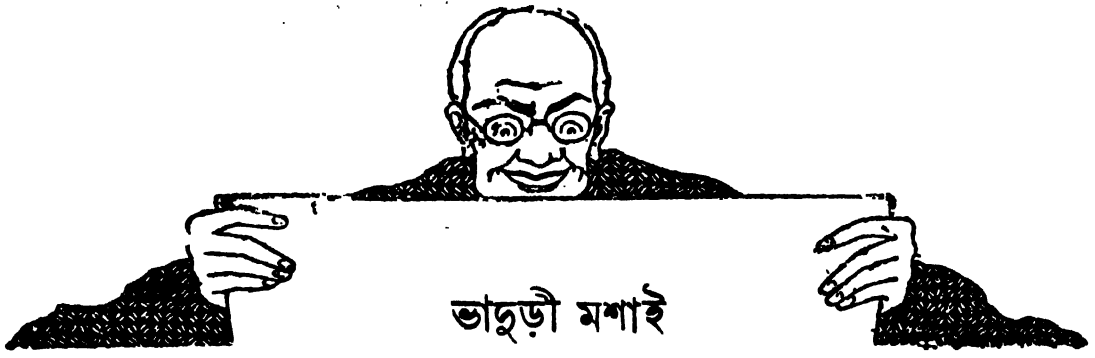
সপ্তর্ষিমণ্ডলের সদস্যরা শীঘ্রই কক্ষচ্যুত হয়ে পড়বেন, তাই আজ সুবর্ণ বাবুর বাসায় তাঁদের বিদায়-ভোজের আয়োজন হয়েছে। সেই সূত্রে ভাদুড়ী-পরিবারেরও আহ্বান।

ডিপুটীবাবুর বৈঠকখানায় আজ টেবল-চেয়ারের ভিড় নেই, গালচের ওপর ধপধপে ফরাস, মাঝে মাঝে রূপার ডিস-ভরা টাটকা গোলাপ। ঘরটি গন্ধমদির, আলোকোজ্জ্বল, যৌবনচ্ছন্দোচ্ছল,—হাস্যমুখর।

'মণ্ডলের' মেম্বাররা পূর্ব্বাহ্ণেই এসে গিয়েছিলেন, অপেক্ষাটা ছিল ভাদুড়ী-পার্টির ;—বিশেষ ক'রে আচার্য্য মশায়ের। আর মন্দাকিনী দেবী হাঁস্‌ফাঁস্ করছিলেন নবনীর জন্তে।

মাতুল গোপীনাথ কালই এসে হাজির হয়েছেন। মোটরের শব্দ পেতেই হারিকেন হাতে ক'রে তিনিই এগিয়ে গেলেন,—পেছনে সুবর্ণ বাবু।

বাগানের দিকের দোরে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। দোর থেকে হঠাৎ যেন সন্ধ্যাতারা বেরিয়ে এসেই থেমে গেল,—আঁচলে টান পড়লো।

"খবরদার পোড়ারমুখো মেয়ে—বাজাসনি," বলতে বলতে মন্দাকিনী দেবী ইরাণীর হাত থেকে শাঁখটা কেড়ে নিলেন! নবনীকে মোটর থেকে নাম্‌তে দেখে—"তোর মাসীকে নামিয়ে নিয়ে আয়,—বুঝলি,—আমি কাবাবগুলো—"

"সে এতক্ষণ জবাব দিলে।"

দেবী আর দাঁড়ালেন না—বাড়ীর মধ্যে দ্রুত ফিরে গেলেন।

শাঁখ বাজাতে না পেয়ে ইরার অনেকখানি উৎসাহ উপে গিয়েছিল। উত্তেজনার একটা কিছু নিয়ে থাকা তার স্বভাব। এমন সময় আচার্য্য মশাইকে দেখতে পেয়ে—সে ছুটে গিয়ে পথেই তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। পশ্চাতেই —"ইস্, মশায়ের কি দয়া!" ব'লেই ভাদু গলায় দিয়ে—'আসুন—আসুন!' ব'লেই অর্দ্ধনত নমস্কার।—"মাসীমা?"

আচার্য্য মশাই-ই কথা কইলেন,—"যাকে বোলো, তিনি মাথার যন্ত্রণায় যতটা না কষ্ট পাচ্ছেন,—এখানে আসতে পেলেন না ব'লে তার চেয়ে বেশী মনঃপীড়া সইচেন। এলে থাকতে পারতেন না, দেখা ক'রেই চ'লে যেতে হ'ত,—আমিই নিষেধ করলুম। সে আসায় কারো সুখ থাকতো না।"

কথাটা মিথ্যা নয়। মাতঙ্গিনী মাথার যন্ত্রণা কা'কেও জানতে দেন নি। সকালের সেই বেশেই তিনি আসতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, ভাদুড়ী মশাই বাধা দিয়ে অলঙ্কারের কথা তোলেন। মাতঙ্গিনী দেবী বলেন,—"ও সব ত অনেক দিন বয়েছি,—এ অবস্থায় আর ও ভার বইতে ব'ল না। সর্ব্বাঙ্গে বিদ্রূপের মত জড়িয়ে থাকবে আর বিঁধবে। অসুখের ওপর সুখের অভিনয় কেন? সত্যের চেয়ে সহজ আর কি আছে। এমনিই যাই না!"

ভাদুড়ী মশাই বিরক্ত হয়ে রুষ্ট-কণ্ঠেই বলেন—"এখন থেকে তবে নিজের নিজের ইচ্ছাই চলুক। আমাকে অপমান করতে চাও—যেতে পারো, আমি আর বাধা দেবো না।"

মাতঙ্গিনী দেবী কাতরভাবে ক্ষমা চেয়ে বলেন—"তুমি রাগ কোরো না, ক্ষুণ্ণও হয়ো না, যে রকম মাথার যন্ত্রণা বেড়েছে, চোখ চাইতেই পার্'চ না। মাথার ঠিকও নেই। একবার না গেলে ভাল দেখায় না বলেই যাচ্ছিলুম। দেখা ক'রেই ফিরে আসতুম। অভ্যাস-দোষ—তাই। আমাকে এখন কেউ ভাল বল্লেও যা—মন্দ বল্লেও তাই। সে ভাবনাই বা কেন? তোমরা যাও। এতে তোমাকে অপমান করা হবে কেন! সে কথা একবারও আমার মনে আসে নি। সে জন্যে ভিক্ষে চাচ্ছি,—আজকের দিনটে আর রাগ কোরো না।"

এই অবস্থায় মাতঙ্গি

গোপীনাথের সঙ্গে ভাদুড়ী মশাইকে আসতে দেখে ইরাণী ছুটে পালালো।

"তুমি খুব লোক ত—সেই গেলে…"

গোপী বললে—"আজ্ঞে, কলের বড় সাহেবের একখানা জরুরী টেলিগ্রাম…"

"একখানা পত্রও ত দিতে হয়!—হ্যাঁ—কে ওই ছুটে গেল?"

"ইরাই হবে,…সব শুনবেন'খন"…

"আচার্য্যর সঙ্গে যে দেখচি"……

"হ্যাঁ, ওঁকে যে খুব শ্রদ্ধা করে।"

"বটে! তা ত জানতুম না!"

সকলে বৈঠকখানায় এসে উপস্থিত হলেন। 'আসুন আসুন' রব প'ড়ে গেল। আসর জমকে উঠলো।—এতক্ষণে জমায়েৎটাও বেফাঁক্ দাঁড়ালো।

শীতের সময় হলেও সিল্কের মোজা আর সিল্কের সার্টেই ভাদুড়ী মশাই ঘেমে উঠ্‌লেন। সম্ভ্রব সম্মান ভাদুড়ীর ভাগে বেশী পড়লেও খাতিরটা আচার্য্য মশায়ের, আর আদরটা নবনীর ভাগেই বেশী ঝুঁকলো।

সুবর্ণ বাবু ভাদুড়ী মশায়ের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন। সুদূর সম্পর্ক যত বেরিয়ে আসতে লাগলো, ভাদুড়ীও সোৎসাহে তত আপনার জন দাঁড়াতে লাগলেন। সাঁতরাগাছির ভাদুড়ী, শ্রীরামপুরের লাহিড়ী চলতে লাগলো। শেষ—এ কোয়ার্টারের গেজেটে হাকিমদের আবির্ভাব-তিরোভাবের কথা, নববর্ষে বাহাদুরীর অধিকারী কে কে হবেন ইত্যাদি—ইত্যাদি প্রিয় ও প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ জ'মে উঠলো।

অপরপক্ষে আচার্য্য আর নবনীকে নিয়ে সপ্তর্ষি কিছু শোনবার সাগ্রহ প্রতীক্ষাপন্ন ছিলেন। অক্ষয় বাবুকে অস্থির দেখে, আচার্য্য মশাই বললেন,—

"আপনাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে, জানি না। এতগুলি গুণী লোকের একত্র সমাবেশ বহু ভাগ্যে ঘটে। আপনারা এক এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ—মামুলি কথাবার্ত্তা ত নিত্যই আছে—আপনারা কিছু বলুন শুনি। এটা বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রিয়ভূমি—তীর্থবিশেষ। চিন্তাশীলদের চিত্তস্ফুরণ এখানে সহজেই সম্ভব। এমন সুবর্ণ-সুযোগ আমাদের ভাগ্যে আর কবে মিলবে।"

অক্ষয় বাবু মুকিয়েই ছিলেন। মাথা চুলকে দুবার গলার ঘড়ঘড়ি ভেঙে নিলেন! তিনি প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক, বড় বড় ভরাল মরাল নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। ছোট বিষয় নূতন ব্রতীদের হাত পাকবার জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। বাজারে গেলে বড় বড় দেখে সওদা করেন—ছোট কিছু দেখতে পারেন না। সাঁওতাল কথাটি 'একগাল' ব'লে তাঁর বড় পছন্দ। চিরদিনই তিনি 'গালভরতি' কথার পক্ষপাতী;—'ডসটয়ভেস্কি' যে মস্ত বড় লেখক, তাঁর বই না প'ড়েই তিনি স্থির করেছিলেন। স্থানের মধ্যে 'ভেলাডিভষ্টক্' 'স্কাণ্ডিনেভিয়া' তাঁর কাছে মহাপীঠ। যদি ছেলে হয় ত—'এণ্টনি লরেন্স লেভিসিয়ার' 'এবারক্রম্বী' এই সব নাম তিনি বেছে রেখেছেন,—এবং দীর্ঘ একাদশ বর্ষ সেজন্য অপেক্ষা করছেন। ব্যবহারে বহু বাধা—কেবল মেয়েই জন্মাচ্ছে!

তিনি সবিনয়ে বললেন—"আপনাদের বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি,—গত শুভ আশ্বিনের কোজাগরী পূর্ণিমা—আমার জীবনে যে অনির্ব্বচনীয় চিত্র উদ্‌ঘাটিত ক'রে আমাকে উন্মাদ ক'রে রেখেছে, ভাষায় তা প্রকাশের পথ পাচ্ছি না। উদধি-মেখলা মেদিনীর মধ্যস্থিত এই শালবন-পরিশোভিত ভল্লুক-বিহরিত নিভৃত মহুয়া-মদির জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সাঁওতাল ভূমে বোধ করি ভূমার সংশ্লিষ্ট সংস্পর্শ আমি অনুভব করেছি, কিন্তু তাঁর দর্শন বিনা আমার তৃপ্তি নাই। সেই দৈন্য বর্দ্ধিত হয়ে সর্ব্বক্ষণ আমার মস্তিষ্ক মর্দ্দিত করছে। সেই অব্যাকৃত, অবেদ্য, নিরুপাখ্য পুরুষের সাক্ষাৎকারার্থে আমার অসৃক্‌বেগ দেহাধারে বিদ্রোহী হয়ে বীতিহোত্র-প্রদাহ উপস্থিত করেছে। পুণ্যভাক্ বিপশ্চিৎগণ যোগৈশ্বর্য্য লাভান্তে প্রকাশ করেছেন—পরমপুরুষার্থ লাভ করাই মনুজ-জন্মের সার্থকতা। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্যমধ্যে প্রণিহিত সাঁওতালভূমে—আজিও আমি বঞ্চিত হয়ে রয়েছি,—মৎসদৃশ হতভাগ্য মূঢ়ের কাছে আপনারা আর কি শুনবেন।"

অক্ষয় বাবু এই পর্য্যন্ত ব'লে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করলেন।

শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন রয়েছে—উপস্থিত থাকলে শ্রীসত্যনারায়ণের কথা ভক্তি সহকারে শুনতেই হয়। এতক্ষণ সকলে যেন তাই শুনলেন—কিন্তু হিব্রুতে। শেষ সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।—জীবনের সাড়া পাওয়া গেল।

…স্তাব করেছিলেন,—তাঁকেই বাহবা দিতে

"অক্ষয় বাবু আজ যা শোনালেন—দেহক্ষয়েও তা যেন আমরা স্মরণ রাখ্‌তে পারি এবং তা স্মরণ থাকবে বলেই আশা করি। শ্রুতি-স্মৃতির মধ্যে বহু দুর্ব্বোধ কঠিন শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু অক্ষয় বাবু সেই দুরূহ শ্রুতি-স্মৃতিকে রসগোল্লা-অমৃতির মত উপভোগ্য ক'রে আমাদের তৃপ্তি দিয়েছেন। তা ছাড়া এরূপ সরল ভাষায় স্বীকারোক্তি অধুনা বিরল। এখন গোবর্দ্ধন-গোত্রজ একটি গুরুর দরকার মাত্র। সকলেই শুনে আস্‌ছেন,—চোখ দিয়ে দেখ্‌তে হয়। আমাদের কিংশুক বাবুও রংছোড়জির রংটুকু মাত্র দেখেছিলেন; চোখ দিলে সবটুকুই পেতেন। তিনি চোখ বাঁচিয়ে কাঁচিয়ে ফেললেন।"

পাশের ঘরে খুঁক্ ক'রে একটি শব্দ হ'ল।

আচার্য্য ব'লে চললেন,—"নিরাকার দর্শনের একমাত্র সহজ উপায় অন্ধ হওয়া অর্থাৎ চোখ দিয়ে তবে দেখা। এ সব গোপন সত্য প্রকাশ করবার নয়, তবে অব্যভিচারী সাধক দেখ্‌লে বল্‌তে হয়।"

"ছি ছি, সহজ কথাগুলোয় কোন দিন কাণ না দিয়ে কি ক্ষতিই করেছি। চক্ষু দিয়ে দেখ্‌তে হয়, ঠিকই ত।" এই ব'লে অক্ষয় বাবু আচার্য্য মশায়ের পায়ের ধূলো নিলেন, আর ঠিকানাটা চাইলেন।

আচার্য্য মশাই বল্‌লেন—"নিমতলায় সন্ধান নিলেই পাবেন,—আসন সেইখানেই।" চা আসতে দেখে—"এই যে পতিত-পাবনী এসে গেছেন! আগে সভক্তি সব সেবা করুন, (নিম্ন কণ্ঠে) ভগীরথটিকে চিনলুম না যে!"

গোপীনাথ ট্রে সাজিয়ে সধূম চা এনে হাজির, আর মন্দাকিনী দেবীর home-made (উটজ) পাঁপর ভাজা।

—"আসুন আসুন, বাঙ্গালীর পলিচাপা সগরবংশ চাঙ্গা হোক্। বাঃ, অমৃত একেই বলে, আর এক কাপ্ ঢালতে হবে। প্রথম কাপ্‌টা কর্জ্জন সাহেবের মৃত আত্মার তৃপ্ত্যর্থে বিসর্জ্জন করলুম। তাঁর উর্ব্বর মস্তিষ্কই বর্ব্বরদের ঘরে ঘরে এই সুধাবিতরণের সদুপদেশ দিয়ে তার সুব্যবস্থার পন্থা নির্দ্দেশ করেছিলেন। বীজ মরুভূমে পড়ে নি,—মহীরুহে দাঁড়িয়ে গেছে!"

অক্ষয় বাবু বললেন—"এটা আপনার অযথা উৎপ্রাস। চা'টা আমাদের একটা লাক্‌সরি নয় কি?"

ওইরূপ অজ্ঞতা নিয়ে সে সময় ব'লে ফেলেছিলুম,—দেশটা ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে, মুসেনকুলোদ্বহ কোট্যাধীশরা যদি গরীব দুঃখীদের পল্লীগৃহে প্রত্যহ এক কাপ্ তয়েরি পাচন পাবার উপায় ক'রে দেন, এই ধ্বংসোন্মুখ দেশটা বাঁচে। তাঁদেরও ধর্ম্ম অর্থ দুই লাভ হয়।"

তখন বোধ করি তাঁদের গায়ে বীরবাতাস লেগেছিল, তাঁরা লাক্‌সারির জবাব লাক্‌সারি দিয়ে দিলেন। চরক নিংড়ে তরো-বেতরো তেল বার করতে লেগে গেলেন। ইংরাজ দিলেন পেটে গরম জিনিষ, এঁরা ঢাললেন মাথায় ঠাণ্ডা তেল। রসায়ন কেশায়নে দাঁড়ালো,—লক্ষ্মীর ঘরে ঢোল বেজে উঠলো। অগ্নিবাণের ওপর বরুণ-বাণ ঝাড়া হ'ল। বুদ্ধির্যস্য স জীবতি। কেমন জবাব!—

—"চুলোয় যাক্ পাচন! মানুষ ত মরবার তরেই জন্মায়। মাথাটা ত বাঁচুক। বাংলা দেশের আজো ওই সম্পত্তিটুকুই আছে। নিন্, এখন ভারতের ধর্ম্মরক্ষা ত আগে করুন—চা চালান,—পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ…" (চুমুক্ চললো।)

চা খাওয়া সকলেরই শেষ হয়েছিল, আচার্য্যমশার কথাটা সকলেই সাগ্রহে শুনছিলেন।

গবেষক অব্যক্ত বাবু আপনা আপনিই বললেন—"উঃ, চিন্তা করবার কত জিনিষই রয়েছে! কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা ধরি?"

কথাটা আচার্য্যমশার কাণে গেল, একটু মুখ মুচকে বললেন—'বল্‌ব'খন, ব্যস্ত হবেন না।' পরে বললেন—"এমন আনন্দ-মিলনে আজ আধ্যাত্মিক আলোচনা আর নয়। কোরক বাবু একটু কাব্যরসাস্বাদ করান। নিশ্চয়ই অনেক জ'মে থাকবে।"

কবি কোরক রায় কাণঢাকা কেশরাশি মৃদু অঙ্গুলীস্পর্শে ঈষৎ সরিয়ে ভাববিহ্বল শিবনেত্রে বংশীরবে বললেন—"আমি আর নূতন কি শোনাবো, কবিতা আর সবিতা বড় একঘেয়ে পথ ধ'রে চলেছে…"

আচার্য্য বললেন—"রোগ ঠিকই ধরেছেন—দু'সতেই ঘাম বার ক'রে ছাড়ে। তবে রোগ যখন ধরেছেন, তখন ভাবনা কি?"

"তা বটে, তবে চেষ্টা ক'রেও ভাবটা বেশ ধোঁয়াটে, অর্থটা তেমন জটিল ক'রে তুলতে পারছি না; অক্ষরও

"হবে হবে; তাও হবে, চেষ্টা থাকলেই দাঁড়াবে; ওর জন্যে ভাববেন না। সমঝদার লোক জগতে কম,—উদ্দেশ্য আপনিই সফল হবে।"

"তবে শুনুন" ব'লে, কবি কোরক রায় চক্ষু মুদে সুরু করলেন—

ভাদ্র যবে যৌবনের

আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রলম্ব হস্তে তর্জ্জনী সঞ্চালন করতেই,—কিংশুক হুমড়ি খেয়ে গলা বাড়িয়ে শুনছিল,—আঙুলটা তার চোখে লাগায়—'উহু' ক'রে চিতিয়ে পড়লো।

আচার্য্য ব'লে উঠলেন—"আহা হা, খোঁড়ার পাই খানায় প'ড়ে,—'রংছোড়' না ছাড়তেই—"

নেপথ্যে মৃদুহাস্য শোনা গেল।

—"কবিতা চিরদিনই গতিশীলা। একটু স'রে সামলে বসতে হয়। নিন্—এইবার অবাধে আবৃত্তি চলুক,—"

কোরক বাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন।

"ও কিছু না, আমার ভাইপো প্রবোধের আবৃত্তির ইতিহাস যদি শোনেন, অবাক্ হবেন। বেগ না থাকলে কবিতা!"

কোরক আরম্ভ করলেন!

"ভাদ্র যবে যৌবনের প্রান্তে ক্লান্ত হয়ে
আর্দ্র চোখে, ঐশ্বর্য্যের দিন গেল ভাবে,
গরিষ্ঠ আশ্বিন আসে হাসি
অরিষ্ট গরবে স্ফীত দেহ;—
ব্রীড়া তার বিভব বিস্তারি সারা মুখে
ক্রীড়া কোরে ফেরে কৌমুদীপ্লাবিত রাতে;—
তপ্ত আলিম্পন ছায়াপথে
মুগ্ধ আঁখি মেলি হেরি মোরা।
বঙ্গে ফোটে আনন্দের মুখর উল্লাস,
অঙ্গে ওঠে নানা বেশ বালিকা বধুর!
বুড়ো মালী সেফালি কুড়ায়।
কুঁড়োজালি গলে বাঁধি দাসী,—
ঝাঁটা হাতে 'মঙ্গলায়' তাড়া করি ধায়
কাঁটা-বন ভাঙি, মুড়ায়ে খেয়েছে ক্ষেত,
দুষ্টা।
পুষ্টা মোর লাউডগা খেয়ে;—
মাচা ভেঙে, এ বুকের খাঁচা মড়মড়ি।
শ্রীহরি শ্রীহরি, ছি ছি থু থু!
কি করিনু! ছোটে গঙ্গাস্নানে।"

কবি থামলেন।

বাহবা প'ড়ে গেল। ভাদুড়ী মশাই ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে হাসলেন।

আচার্য্য মশাই সবিস্ময়ে বললেন—"অ্যাঁ সে কি,—থামলেন না কি! এ বেগ সংবরণ করলেন কি ক'রে?"

কোরক বললেন,—"আমি উপায়হীন, আমার মাথাই আছে—হাত নেই—"

আচার্য্য বললেন,—"ওটি ভারতের নিজস্ব এবং বৈশিষ্ট্যও বটে,—আমাদের বড় দেবতারও নেই—"

কোরক বললেন—"সম্পাদক মশায়রা যে কবিতাকে প্রথম স্থান দিয়ে সম্মানিত করেন, সে ত পাতা উল্‌টে পড়বার জিনিষ নয়। ভাবসঙ্কোচের জন্যেই তার মর্য্যাদা।"

আচার্য্য।—তা বটে—তাঁরা ঠিকই করেন,—আয়না কি আর লোকে উল্টে দেখে! বাঃ, আপনার এটিও যেন চোখের তারায় ছবি এঁকেছেন। এক ফোঁটা হলেও ভাইলুসন খুব হায়ার!

কবি বললেন—"আর কিছু লক্ষ্য করলেন কি,—আগে মিল, তার পর কথা—"

"তা আর করি নি! কবি হ'লে কি হবে, ব্যাস-বাল্মীকি সে বয়সে ও কাসটিতে হাত দিয়েছিলেন, তখন মিলনের মধ্যে তাঁদের এক নিরাকারের খোঁজ ছিল,—তাই তাঁদের কাব্যে মিলনের ঝোঁক নেই। তার পর কাব্য বোধ হয় মেয়েদের মুখের ছড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়,—তাঁদের কাছে মিলগুলোও তাই দক্ষিণাবর্ত্ত ধরে—যা স্বাভাবিক এবং শাস্ত্রসম্মত।"

—"কিন্তু পুরুষরা কি ব'লে যে এত দিন ধ'রে এই অশাস্ত্রীয় ভুলটা ক'রে আসছেন, তা বুঝতে পারি না। যাক্—আপনি আজ সেটা শুধরে দিলেন, পুরুষোচিত কার্য্যই করলেন। মিলটাকে যথাস্থানে বামে এনে দিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হলেন।"

অক্ষয় বাবু এতক্ষণ হাঁ ক'রে শুনছিলেন,—হঠাৎ আবার জানতে চাইলেন—"আপনাকে তা হ'লে নিমতলাতেই পাবো?"

"না পাবার ত কারণ দেখি না।"

কোরক রায় জিজ্ঞাসা করলেন,—"ছন্দটার নামকরণ…"

—'অগ্রদানী' কি 'বামাচারী' নাম দিতে আপত্তি না হয় 'কোরকী'—"

"না না, ওটা যে বড় স্পর্দ্ধার কথা হয়। এখন তা বড় তা বড় সব বেরুচ্ছেন! —"

ভাদুড়ী মশাই জয়েন করবার জন্ম উন্মুখ হয়েছিলেন, যেহেতু দু'একটা কথা না বললে খাটো হ'তে হয়, বললেন—

"বামাচারী'ই খুব appropriate—সার্থক।"

সকলেই সমর্থন করলেন।

কিংশুক প্রথম লাইনেই জখম্ হয়ে এক পাশে স'রে ব'সে তখন কোঁচার খুঁটে 'হা' দিয়ে চোখ সেঁক্‌ছিলেন।

কবি জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাবসঙ্কোচটা ঠিক্ হয়েছে কি?"

আচার্য্য বললেন,—"আবার কি চাই? অতটুকুর মধ্যে ভাদ্র থেকে সুরু ক'রে মাসীর গঙ্গাস্নান পর্য্যন্ত দেখিয়ে দেওয়া কি সহজ কথা। অবশ্য এখনও এগুবার আয় আছে বৈ কি,—ক্রমে তা এসে যাবে। ঋষিরা সকল শাস্ত্র নিংড়ে এক ওঁ-এর মধ্যে গুটিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। তাতে ব্রহ্ম বস্তুটি সমজদারদের বুদ্ধিগম্য হ'তে কি বাধে? একেবারেই নয়।—সব কথা কি খুলে লিখতে হয়?"

—"ও চিন্তা রাখবেন না,—সিম্বলই এখন সম্বল। ও দিকে বিদ্যাপীঠেরও প্রবল নজর পড়েছে। ছেলেদের আর বোঝানো-পড়ান নেই, যার গরজ, সে নিজে বুঝে নিক্—কেবল লাইনেটা দিক আর খেলাধূলো করুক। দেখবেন faculty বাড়াবার এই কলটি দিয়েই হুড় হুড় ক'রে সমজদার বেরিয়ে আসবে।"

সুবর্ণ বাবু প্রভৃতি অনেকেই হেসে উঠলেন।

"হাসবেন না,—Original thinking ওই পথ ধরেই আসে। দুর্ভাবনা চাই বৈ কি!"

কোরকের প্রতি,—"আপনি লিখে যান, ছাড়বেন না, সমজদার বহুৎ মিলবে।"

কোরক নীরবে প্রস্ফুটিত!

নানা কথা চলতে লাগলো। অক্ষয় বাবু অবাক্ হয়ে আচার্য্য মশাইকে দেখছিলেন,—অস্ফুট আওয়াজ দিলেন—A Socratis।

চিত্রশিল্পী আলেখ্য বাবুর হাতে একখানি সুন্দর এলবম্ ছিল। নবনী জিজ্ঞাসা করলে—"কিছু আছে না কি?"

"ও কিছু না—এত দিন সাঁওতালদের দেশে রইলুম, রেখাপাতে তার একটা ইঙ্গিত রাখবার ব্যর্থ চে

আচার্য্য ঔৎসুক্যে ব'লে উঠলেন—"কি বি

ইঙ্গিত না কি? তাই ত—এই সময় কিংশুক বাবুর চোখ অকর্ম্মণ্য হয়ে রইলো……"

—"আলেখ্য বাবুর দেখাতে আপত্তি আছে কি?"

"না, আপত্তি আর কি, তবে চেষ্টা মাত্র, তাই……"

"চেষ্টাই ত আগে গো, চেষ্টা থাকলে না তেষ্টা মেটে। কৈ দেখি।"

এলবাম ছাড়তেই—সব ঝুঁকে পড়লেন।—পাহাড়ের কোলে শাল আর মহুয়া-বনের এক প্রান্তে এক জনের ভ্রমর-কৃষ্ণ বলিষ্ঠ বাম হস্তে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ ধনুক, দক্ষিণ হস্তে আক[illegible] শরসন্ধান। পেশী সুপুষ্ট—স্ফীত। আর কিছু না, ঐটুকু মাত্র। লোকটি জঙ্গলমধ্যে লুপ্ত।

সলজ্জ বিনম্রস্বভাব কিংশুককে সহসা "বাঃ কি সুন্দর!" ব'লে উঠতে দেখে অনেকেই অবাক্।

চিত্র দেখে আচার্য্য মশাই মুগ্ধ। অক্ষয় বাবু বিশেষ কিছু বুঝলেন না—শালবনই দেখলেন! বললেন—"ঘন-বিন্যস্ত নিবিড় বনানী!"

আলেখ্য বাবু বললেন—"কিন্তু…"

আচার্য্য বললেন—"আবার কিন্তু কি,—খুব ভাবব্যঞ্জক—Suggestive হয়েছে—"

"কিন্তু যেখানে এত দিন রইলুম, সেই মধুপুরকে একটি স্বতন্ত্র সার্থক shape (মূর্ত্তি) দেবার বড় ইচ্ছা ছিল……"

আচার্য্য বললেন—"সে কি! সবই ত ক'রে রেখেছেন।—ডিজাইন্ ওই থাক, কেবল টান্‌গুলো মোলায়েম হাতে একটু শিথিল ক'রে দিন। আর ধনুকে মহুয়া-ফুলের মালা জড়িয়ে তীরের ফলায় একটি রজনীগন্ধা লাগিয়ে দিন না।—আর কিছু করতে হবে না।"

আলেখ্য সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন—"A master mind! তবে…"

"হ্যাঁ, বুঝেছি,—ওটা আপনাদের স্থিতি-কালের স্মৃতি-রক্ষক হবে মাত্র,—সর্ব্বকালের নয়, তা হতেও পারে না। Cape of Good hope (কেপ অফ গুড্ হোপ) আ[illegible]কের idea দেয় কি? সে উত্তমাশা এখন বিলিতি বাতা[illegible] নয় কি!"

সহসা নবনী কিংশুকের দিকে চেয়ে ফেললে। [illegible]দেখে, [illegible]শুকও তার দিকে চেয়ে! উভয়েরই ঠোঁটে চা[illegible] আর [illegible]খের কোণে হাসির টান্

ভাদুড়ী মশাই মাথা হেঁট করলেন।

মাতুল গোপীনাথ এসে সবিনয়ে সকলকে উঠতে বললেন,—"এইবার একটু কষ্ট করতে হবে,—ঠাঁই হয়েছে।"

"জগতে যদি কোনও প্রার্থনীয় কষ্ট থাকে ত এই সুমিষ্ট ডাকটি শুনে উঠে পড়াটি। এ কষ্ট স্বীকার করতে আমরা চির-অভ্যস্ত,—এই উঠলুম;—আপনি বৃথা কুণ্ঠিত হবেন না।"

সকলে উঠে পড়লেন।

মাঝের বড় ঘরটিতে স্থান হয়েছিল, এবং ফলমূল হ'তে মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সাজিয়ে দিয়ে সকলকে ডাকা হয়েছিল।

আচার্য্য মশাই একবার চেয়ে দেখেই সুবর্ণ বাবুর দিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—"এ কি! শিল্পপ্রদর্শনী যে,—টিকিট আছে না কি!"

সুবর্ণ বাবু সহাস বিনয়ে "এখানে আর কিই বা পাওয়া যায়! তবে আমার আজকের পাওয়াটা ত তুচ্ছ নয়"—ব'লে সকলকে বসতে অনুরোধ করলেন। ভাদুড়ী মহাশয়ের পাশে তিনি নিজে বসলেন।

প্রথম ঝোঁক্ সামলে সকলে মাথা তুলতেই একটা জিনিষ তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।—নির্ব্বাচনের স্বাভাবিক শ্রেণী-বিভাগ ধরেই হোক্ বা আকস্মিকভাবেই হোক অথবা মগ্ন চৈতন্যের চতুর পরিহাসেই হোক্, নবনী আর কিংশুক পাশাপাশি ব'সে পড়েছে। দেখাচ্ছেও সুন্দর।

আচার্য্য বলিলেন,—"বাঃ, কি যোগাযোগ!"

ভাদুড়ীমশাই বিস্ফারিত-নেত্রে সেই দিকেই দেখতে লাগলেন। যেন "এ ছোকরাটি কে!" এই ভাব।

কোরক যেন স্বপ্নভঙ্গে ব'লে উঠলেন,—"হ্যা, সেই যে কার কবিতা আবৃত্তির কথা বলছিলেন, তাঁর ভাবটা যদি ..."

আচার্য্য বললেন,—"সে আর কি শুনবেন—আপনার মত;—তবে কিছু ওজস্, কিঞ্চিৎ টঙ্কার-প্রবল, একটু ভীতিপ্রদও..."

"ভীতিপ্রদ!"

"তাই ত প্রবোধের বিবাহ দিতে সাহস পাচ্ছি না,—কি জানি...। আবৃত্তির সময় বেগ ধরলে হঠাৎ উঠে পোড়ে ঘরের একোণ থেকে ওকোণ পাইচারি করে—উর্দ্ধমুখে ভাবা, থিকো তর্জ্জনীতে টান ধরে—কখনো তীর, কখনো বঁড়শী, কখনো শিবাজীর পাঞ্জা, কখনো ট্যাড়চা, কখনো মুষ্টিবদ্ধ! বলে,—আমি কিছুই করি না, করতে হয়ও না, ও সব আপসে হয়,—ভাবের ইলেক্‌ট্রিক্ করেণ্ট আসে কি না! জ্যান্তো কবিতার যাচাই ত ওইতেই। এ কি তোমার 'ওঠো শিশু মুখ ধোও' না—'দিন যায় রাত্তি আসে!' এ যে হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত বিঝঙ্কৃত অনাহত ভেরী .."

ছোট ভাই সুবোধ এসে বলে—'দাদা, চরকাটা একবার...'

"চরকা!—ঝরকা বল্?"

সুবোধ সোৎসাহে বলে—"না না, একটা এনেছি যে, এর মধ্যেই দেখুন না কতটা সুতো..."

"খবরদার, ও সব ঘেনঘেনানি ঘরে ঢোকানো চলবে না, এখনি খিড়কির পুকুরে...। কেউ দেখেনি ত? শুনছিস্... এক্ষুনি,—আগে..."

চরকা বিসর্জ্জন স্বহস্তে দিয়েছে, কিন্তু ভাবের ঘরে ত চুরি চলে না। এখন আপনা আপনি গ্রীবাভঙ্গী আর ট্যাড়চা তর্জ্জনী-সঞ্চালন চলেছে! এ অবস্থায় বে দিয়ে কার মেয়ের জ্যান্তো বৈধব্য ঘটাবো!

গবেষক অব্যক্তকুমার বললেন,—"কার মধ্যে কি আছে, কিছুই বলা যায় না,—এ সম্বন্ধে বুঝি না বুঝি, সহানুভূতি দরকার। এক দিন প্রমাণ হয়ে যেতে পারে—এঁরাই দেশের রত্ন। সবই গবেষণা-সাপেক্ষ।"

অক্ষয় বাবু পাঁটার একটা আস্তো মুড়ির মর্য্যাদা রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। বললেন—"উনপঞ্চাশের মধ্যেই ওদের স্থান,—বৃথা ক্রমস্বীকার মাত্র, উচ্ছিলীন্ধ্রের মত দুদিনের উচ্ছ্বাস, সমাজের কোনো উপকারে আসে না,—অনুখড়।"

কোরক তাঁর দিকে একবার সরোষ কটাক্ষ হানলে। পাশের লোক শুনলে—'অতিকায় প্রস্তর!'

গোপীনাথ মতিচুর নিয়ে উপস্থিত হতেই—অক্ষয় বাবু দুঃখের সুরে বললেন,—"ও আর দুটোর বেশী দেবেন না। এসে পর্য্যন্ত কি যেন কিসের একটা সুডহর অভাব অনুভব করছিলুম। আপনি সহসা সেই সুমিষ্ট বস্তুর প্রতীক হস্তে উপস্থিত হয়ে স্মৃতিকে সাহায্য করলেন। আপনাকে ধন্যবাদ।"

হবাক্ হয়ে অক্ষয় বাবুর দিকে চাইলেন। স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কিছু না

বুঝে শেষ "তবে আর দুটো নিন" বলেই পাতে দিয়ে ফেল্‌লে।

অক্ষয় বাবু মুখ তুলে গোপীনাথকে বললেন,—"অমন একটি মানুষ দেখেন নি, তাই বুঝতে পারছেন না। তাঁর সেই প্রথম দিনের কথা কেবলি মনে পড়ছে!—মতি বাবু কি কষ্টস্বীকারটা ক'রে আমাদের ৭ জনের মালপত্রগুলি নিজ হস্তে খুলে এক একটি ক'রে ঝেড়ে ঝুড়ে গুছিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন দেখতে, তেমনি ভদ্র, তেমনি পরোপকারী। আজ তিনি উপস্থিত থাকলে কি আনন্দই হোতো। আর দেবেন না—দেবেন না, ফেলে রেখে তাঁর অপমান করতে পারবো না।"

আচার্য্য মশাই বললেন, "উনি যা করেছেন করেছেন, আপনি আবার এ কি করলেন অক্ষয় বাবু—আমাদের সকলকেই যে সন্তপ্ত ক'রে দিলেন! এ আনন্দ-সম্মিলনে তাঁর মত মানুষের অভাব যে সত্যই কষ্টকর। সুবর্ণ বাবুর বোধ হয়, তাঁকে বলতে ভুল হয়ে গেছে।"

সুবর্ণ বাবু অপ্রতিভের মত কুণ্ঠিতভাবে বললেন,—"তিনি কি এখানে আছেন? বহুদিন ত তাঁর সাক্ষাৎ পাইনি! তা হ'লে ত কতই ··"

আচার্য্য বললেন—"ঠিক জানি না, তবে ৪।৫ দিন আগে হঠাৎ এক দিন পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

অক্ষয় বাবু উত্তেজিতভাবে বললেন,—"বলেন কি! এইখানে? এত বড় ভুল··"

সকলে উৎকর্ণ। গোপীনাথ নমলো। সে সুবর্ণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে—"কে মতি বাবু?"

"মতিলাল লাহিড়ী গো, আমাদেরই স্বঘর। বড় চাকরে।"

আচার্য্য বললেন,—"নিখুৎ লোক, আপনি তাঁকে কি ক'রে চিনবেন? একবার দেখলে আর ভুলতে পারতেন না।"

গোপীনাথ বল্‌লে—"আমার ত এক বন্ধু মতি লাহিড়ী আছেন, সাঁতরাগাছিতে বাড়ী। তিনি বড় চাকরে ত নন,—টাকা চল্লিশ পান, তবে তাঁর নানা উপায়ের রোজগার আছে বটে! দেখতেও খুব সুপুরুষ, ওখানকার থিয়েটরে লেডী ম্যাকবেথ সাজতেন;—সে অনেক দিনের কথা।"

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন,—"লোকটি কালা কি?"

"না, তবে নয়" ব'লে গোপী সকলকে ··· লাগ্‌লেন।

অক্ষয় বাবু "কালা কি?" শুনে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলেন, যেহেতু "অল্প বধির" বলতে কি হয়েছিল, ভদ্রলোক সম্বন্ধে আলোচনায় ভদ্র ভাষার ব্যবহারই বিধি।

ফেরবার সময় গোপীনাথ "তবে আর দুটো খান" ব'লে আবার দুটো তাঁর পাতে ফেলে দিলেন। অক্ষয় বাবুর তখন বিরক্তির মুখ, সুতরাং দ্বিরুক্তি করলেন না।

চ'লে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে গোপী বললেন—"হুঁ, তা আশ্চর্য্য নয়, আপনাদের কাছে হুঁ, তা হ'তে পারে, সে যে নকল করতে খুব পারে। একবার অন্ধ সেজে এক মাস ছিল, ওই তার সখ কি না, পেসাও হ্যাঁ—তা হ'লে সেই-ই। তবে এখানে সে আসবে কেন? এই সাত দিন আগে তার সঙ্গে জোড়াবাগানের মোড়ে দেখা। বললে, 'গোয়ালন্দ যাচ্ছি, একটা ভারি দাঁও আছে,—ভীষণ ষড়যন্ত্র,—তান্ত্রিকী ব্যাপার! দেখি কি হয়।' ব'লে গেলো, এসে দেখা করবে। বিবাহসম্বন্ধে কি কথা আছে, আমার সাহায্য চায়। সে এখানে আসবে কেন? আমার বাল্যবন্ধু আমার কাছে কোন কথা গোপন করে না।"

আচার্য্য নবনীর দিকে চেয়ে দেখেন—তার মুখ ফ্যাকাসে মেরেছে, চোখে বিস্ময়ের ছোপ্!

আচার্য্য বললেন—"বাঃ, আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে থাকতেই ভালোবাসেন,—বেশ লোক ত! অমন পরোপকারী লোক—কালা হতেই পারেন না, আমার বরাবরই এই ধারণা,—এখন শুনে ভারি আনন্দ হ'ল। আমি বলিনি—ও রোগ সেরে যাবে?"

অনেকেই ব'লে উঠলেন—"আপনি বলেছিলেন বটে।"

নবনী চুপ!—তাহার আহার থেমে গিয়েছিল, মুখে আর কিছু উঠলো না।

উঠছিলো কেবল অক্ষয় বাবুর,—তিনি বললেন—"এক জন ভদ্রলোক সম্বন্ধে,—দেবতা বললে হয়, এ সব কথা আমি বিশ্বাস করি না। শুনলে অস্থিরা উষ্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের মতি বাবুর ওরূপ অন্ধ বা বধির সাজবার সখ সম্ভবই নয়!—বিশেষ সজ্জন-বন্ধু-সকাশে। এ সব সৌভিক বৃত্তি তাঁর মত ভদ্রলোকের পক্ষে অসম্ভব। কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না,

গোপীনাথ বললেন,—"অকারণ হবে কেনো মশাই, আপনি ত সব কথা জানেন না। আর একটু দই খান, বৈদ্যনাথের দই প্রসিদ্ধ…"

অক্ষয় বাবু বাধা না দিয়ে, মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'অলীক বিপাদিকা ’

আচার্য্য মশাই ধীরকণ্ঠে বললেন—"অক্ষয় বাবু ঠিক ধরেছেন,—অমন চেহারা, ওরূপ পরহিত-ব্রতী, ট্রাঙ্ক খুলে খুলে জিনিষ গুছিয়ে দেন, বিশেষ ভদ্র ভিন্ন কার মাথাব্যথা এত! আবার এক জনের নয়—সাত সাত জনের! অপরিচিতের সঙ্গে এরূপ সদ্ব্যবহার কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখবার জিনিষ। মাইকেলের এটা ওটা মিশে বোধ হয় মাথা ঘোলাটে মেরে গিয়েছিল, তাই লিখে ফেলেছেন—

'যে বিদ্যুৎ রঙ্গে আঁখি
মরে নর তাহারি পরশে'

—আর তালগাছ বুঝি মরে না? হুঁঃ, ও কথাই নয়। বাজে কথা মতি বাবু কাণে নেন না—এ হ'তে পারে। এটা ত বিচক্ষণতারই লক্ষণ। একটা উচ্চ অভীষ্ট আছে, এই বয়সেই সাধনা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। ত্যাগাৎ সিদ্ধি, কাণ থেকেই সুরু ক'রে থাকবেন।—শব্দ গ্রহণ করেন না।"

অক্ষয় বাবু খুসী হয়েছিলেন, বললেন—"হাঁ, এ হ'তে পারে, আমারও তাই মনে হয়। আমার জন্মটা বৃথাই গেল"—

রসগোল্লাটা মুখে ফেলে দিয়েই, একটা নিশ্বাস ফেললেন।

আচার্য্যমশাই বললেন,—"আকাঙ্ক্ষা না থাকলে আক্ষেপ আসে না। এখনও ত দিন যায় নি, হবে। বয়স কত হোলো…"

"আর কবে হবে মশাই—সাঁইত্রিশ যায়।"

বল্লেবে আবার দুঃখ কি, কাছিয়েছেন ত—আর তিনটে চর্কাও ত নয়।"

যে কিতি পারলুম না,—কেন, তা হ'লে কি হবে?"

উপাধি না নির্ব্বন্ধে একমন হবেন। এইটিই নিয়ম। আমার মন হওয়া যে চাই।"

আসিয়ানে হ'ল না, আর তিন বছরে …"

প্রবে, শাস্ত্র মিথ্যা হয় না। চল্লিশ না সারলে ভারতে হবে? চল্লিশ সেরেই না একমন হয়, তার গ হওয়া ত নিয়ম নয়। গোজা মিল দিয়ে আগেও —পরীক্ষায় টাঁাকে না।"

অক্ষয় বাবু নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে দুবার আবৃত্তি করলেন 'চল্লিশ সেরে একমন।' "তাই ত বটে। উঃ, কোন কথাই মানে বুঝে শেখা হয় নি। বিপশ্চিৎ মনীষীরা এক ধারাপাতের মধ্যে সারা কথা রেখে গেছেন দেখছি। নাঃ, আবার সট্‌কে থেকে দেখতে হয়েছে। আপনাকে ওই…"

"হ্যাঁ—ওই নিমতলায়।"

সকলের খাওয়া শেষ হয়েছিল, কেবল কথা-শেষের অপেক্ষা ছিল। সুবর্ণ বাবু ভাদুড়ী মশাইকে নূতন নূতন caseএর (কেসের) কথা শোনাচ্ছিলেন। ভাদুড়ীও অন্য-মনস্কে রাবড়ীর হাঁড়ী খালি ক'রে চলেছিলেন। আর সকলে কমলা লেবু চালাচ্ছিলেন।

কিংশুকের কথা শেষ হয় না,— মৃদু সহাস। শ্রোতা নবনী গম্ভীর-মুখে অন্যমনস্ক। শুনছিল কি না, বলা যায় না,—হুঁ-হাঁ দিচ্ছিল মাত্র।

অক্ষয় বাবুর মাথায় তখন ধারাপাত ঢুকেছে,—তিনি রসগোল্লা অবলম্বনে গণ্ডা'কে কণ্ঠস্থ করছিলেন।

আচার্য্য মশাই রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আরম্ভ করলেন, —সকলেই তাতে যোগ দিলেন।

স্বরলিপিকার বেলোয়ারী বাবু বিমর্ষ। দধিটা ছোঁননি।

আচার্য্য মশাই বললেন—"বেলোয়ারী বাবুর গানটা শোনবার বড়ই ইচ্ছা ছিল, এ দিকে ডাক পড়ায়, ওদিকটের বাদ প'ড়ে গেল, কাল কিন্তু শুনতেই হবে।"

শুনে বেলোয়ারী বাবু কিঞ্চিৎ কোমল লাগিয়ে আসোয়ারী সুরে বললেন—"আমার গান আর কি শুনবেন, তবে নতুন একটা ত্রোটকীয় অভিনব স্বরলিপি সায়েস্তা করেছি, সেইটেই তবে শোনাবো।"

আচার্য্য বললেন,—"থাক্—মনটা বড় অসুখ ভোগ করছিল, এতক্ষণে তৃপ্তি পেলুম।"

বেলোয়ারী বাবু সোজা হয়ে বসলেন।

অক্ষয় বাবুর রসগোল্লার ক্ষয়কার্য্য শেষ হতেই সকলে উঠে পড়লেন।

সুবর্ণ বাবু দাঁড়িয়ে উঠে সকলকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—"আপনারা কিংশুকের শুভকামী বন্ধু। আপনাদের যত্ন ও সাহায্যেই প্রথম প্রার্থনীয় আর আকাঙ্ক্ষিত আত্মীয়রূপে কিংশু- আজ আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা াচ্ছি না। আপনাদের কাছে আজ তাই

আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—আবার যেন আপনাদেরই দেওয়া পরম বাঞ্ছিত শুভকার্য্যে আপনাদের পায়ের ধুলো পাই। আপনারা উপস্থিত থেকে যেন সেই কার্য্য সম্পন্ন করান।"

সকলে সানন্দে সম্মত হলেন।

কিংশুক নত ও নীরব। পাশের ঘরে শাঁখ বেজে উঠলো।

নবনী চঞ্চলভাবে ভাদুড়ী মশাইকে বললে,—"আপনাদের বিলম্ব হ'তে পারে—আমি হেঁটেই যাই,—দিদিকে বড়ই অসুস্থ দেখে চ'লে এসেছি। তিনি জেদ না করলে আমি আসতুম না, এত দেরী হবে জানলেও আসতুম না, খুবই খারাপ কায করা হয়েছে। তাঁর আবার কাল যাবার কথা…"

ভাদুড়ী মশায় চঞ্চল দৃষ্টি তখন গোপীকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনি নবনীর দিকে না চেয়েই বললেন, "অ্যাঁ, অসুস্থ, কে? কেন?—এই যে গুপীকে…সে কোথায় গেল…"

নবনী আর উত্তর না দিয়ে, যাবার জন্যে দু'পা এগুতেই…

ভাদুড়ী ব্যস্ত হয়ে বললেন,—"গুপীকে একবার ত্যাখো দেখি—"

নবনী বললে,—"আমি আর দেরী করবো না, অনেক দেরী হয়ে গেছে, গোপী বাবু আচার্য্য মশাইকে অন্দরে ডেকে নিয়ে গেছেন"…

"কেন?"

"তা আমি জানি না, মেয়েরা বোধ হয় ডেকেছেন।"

নবনী আর দাঁড়ালো না; বেরিয়ে পড়লো। তার মনের অবস্থা এখন সাতানব্বুয়ের নীচে।

মিনিট পাঁচেক পরে আচার্য্য এসে দেখেন—ভাদুড়ী মশাই অন্দরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবলেন—তাঁরই প্রতীক্ষা করচেন।

"চলুন, আমার দেরী হয়ে গেল। নবনী?"

"গুপীকে একটা কথা—"

"একা এই খাটুনি খেটে তিনি বেজায় মাথা ধরিয়ে শুয়ে পড়েছেন। কাল বিকেলে আমাদের বাসায় যেতে পারেন।"

"রাসকেল একবার দেখা করেও যেতে পারলে না,—চলুন" ব'লে ভাদুড়ী মশাই রোষভরে গিয়ে মোটরে বসলেন।

আচার্য্য বললেন,—"নবনী?"

"তাঁর আর দেরী সইল না,—তিনি তাঁর দিদির জন্যে…"

"রাস্তায় তুলে নিলেই হবে,—অসুস্থ দেখে এসেছে কি না। ছেলে ছোকরা—মন অত্যন্ত কোমল…"

ভাদুড়ী মশাই সে কথায় কাণ না দিয়ে বললেন—"সুবর্ণ বাবু কি সব বললেন, বুঝতে পারলুম না,—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিসের জন্যে? শুভকার্য্যটা কি?"

আচার্য্য বললেন,—"কিংশুকের বিবাহ ওঁদেরই বাড়ীর কোন মেয়ের সঙ্গে স্থির হয়েছে, সেই জন্যেই বোধ হয় শাঁখ বাজলো, শুনলেন না?"

ভাদুড়ীর মাথায় যেন হাতুড়ি পড়লো। বসা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কার মেয়ে,—সুবর্ণ বাবুর?"

"তা হ'তে পারে,—তাঁর ভায়ের মেয়েও হ'তে পারে; সে কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি।"

পথে নবনীকে দেখতে পেয়ে—"এই যে—নবনী না? এসো এসো, হেঁটে কেন?"

নবনীকে তুলে নেওয়া হ'ল। সব চুপচাপ। মোটর এসে বাসার বারান্দায় যেন মাল খালাস করলে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গবেষণা

মাননীয় শ্রীযুক্ত বসুমতী-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনারা তবু স্থাণুবৎ! কিন্তু আমিও ছাড়িবার পাত্র নই! লেখার ভারে এমন কাবু করিব যে, ছ'মাস শেষে শয্যা লইতে না হয়।

আমার প্রতিভার বিচিত্র বিকাশ দেখিয়া মনে মনে তারিফ করিতেছেন খুবই—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সব্যসাচীর বাণের মত লেখনীর এ অজস্র ও অব্যর্থ মর্ম্মঘাতিতায় শঙ্কিত হইবারও যে যথেষ্ট আশঙ্কা রাখেন, তাও আমি বুঝি! যাক্, আমি সে অমর কবিতার ছত্রও পড়িয়াছি। সেই Try, Try, Try Again. বহু আঘাতে পেরেক দেওয়ালে বসে। আমার প্রতিভাও তেমনি বহু আঘাতে আপনার মর্ম্মে বিদ্ধ হইবে। সে বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমি হল দ্বারা বসুমতী-কর্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আমায় খেদানো সম্ভব হইবে না, এ কথাটুকু আপনার নোট্-বুকে লাল পেন্সিলে টুকিয়া রাখিতে পারেন।

বাঙলার সাহিত্য-গগনে আমার উদয় একেবারে ধূমকেতুর মত! প্রতিভার লেলিহান অগ্নিরেখায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া এই যে আমার অভ্যুদয়, ইহাতে হয় বাঙলার সাহিত্য জ্বলিয়া ছাই হইবে, নয় আমি নিজে আমার এ প্রতিভা-অগ্নির বিরাট দাহে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইব! অ-রাম নয় অ-রাবণ হইবে মেদিনী!

কাজের কথা পাড়ি। আপনারা হয় ত ভাবিয়াছেন, লঘু সাহিত্য লইয়াই আমার বেশাতি। কিন্তু তা নয়। আমার মাথা—একেবারে আর্ম্মি-নেভি ষ্টোর্শ। এনসাইক্লোপিডীয়া বলিতেও পারেন। একটা মানুষের মাথায় ভাবের এত চর্কাও ঘোরে! আমি নিজেই বিস্মিত হই, আর আপনারা যে বিস্মিত হইবেন, এ আর এমন কি কথা! সাধে আমার উপাধি হইবে "এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী!" গবেষণায় আমার কীদৃশ শক্তি, তাহারই প্রত্যক্ষ পরিচয় আজ দিতে আসিয়াছি।

প্রথমতঃ ধরি, মহাভারত। কারণ, কথায় বলে, যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে! মহাভারত হইতে বহু গবেষণাযুক্ত প্রবন্ধ আমি লিখিয়াছি। দু' একটি নিদর্শ স্বরূপ পাঠাইতেছি।

১। বেদব্যাসের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি-জ্ঞান

মহাভারতে ভারতের মর্ম্ম-কথার যেমন ব্যঞ্জনা পাই, এমন আর কোথাও নয়! ভাইয়ের বাড়া শত্রু নাই—মহাভারত এই সত্য শিক্ষাই দিতেছে। ভাই বিষয়ের ভাগীদার স্নেহ-আদরের ভাগীদার। কুরু-পাণ্ডব—চিরকাল যুদ্ধ-কলহ করিয়া আসিয়াছে। তার পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু। পাণ্ডু ছিল এনিমিক, ডিসপেপ টিক লোক; ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য লইয়া বসিল। পাণ্ডু মরিলে ধৃতরাষ্ট্র ভাইপোদের কিছু জমী-জমা দিয়া ঠাণ্ডা রাখিবার প্রয়াস পান্; কিন্তু দুর্য্যোধন তুখোড় ছেলে, সে জমী ছাড়িবে কেন! বলিয়া দিল, বিনা-যুদ্ধে সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমি দিবে না! দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। আত্মীয়-কুটুম্বগণের মধ্যে কতক দাঁড়াইল এ পক্ষে, কতক গেল ও পক্ষে। কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে ভারী যুদ্ধ চলিল। শেষে দুর্য্যোধনের দল ফর্শা হইলে পাণ্ডবেরা আসিয়া রাজ্য দখল করিল, অর্থাৎ Possession লইল।

বেদব্যাস যে কূট আইনজ্ঞ, এই কাহিনী তাহারই পরিচয় দিতেছে। কুরু-পাণ্ডব হইল ভারতের চির-সনাতন ভাই-ভাই। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন হইল আদালত-কাছারী। শকুনি-গৃধিনী যে উকীল-পেয়াদা-মুহুরির দল—এ কথা খুলিয়া না বলিলেও চলে। তারা চিরদিন রুধির পাইলেই খুশী। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শকুনি, কৃপাচার্য্য,—এঁরা এক পক্ষের সাক্ষী। শুধু কলহ উস্কাইয়া দিতে তৎপর। যতক্ষণ কলহ বা মামলা চলে, সাক্ষীদের যোল পোয়া আরাম। পাণ্ডব-পক্ষে দাঁড়াইলেন চক্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণ হুঁশিয়ার চৌখস ছোকরা, মামলার কায়দা-কানুনে সবিশেষ পোক্ত; ছল-চাতুরী সে মাথায় বেশী খেলে। মামলার তদ্বিরে এমনি মাথাই পরিপক্ব। কাযেই শ্রীকৃষ্ণ যখন তদ্বির-কারক, তখন পাণ্ডবগণ ত জিতিবেনই। এতাবৎ তাই ঘটিতেছে। চাহিয়া দেখুন ঐ এটর্ণীপাড়ার দিকে—যে এটর্ণী যত চক্রী, তাঁর মক্কেলের জয় তত সুনিশ্চিত।

অতএব, মহাভারতে এই সত্য আমরা উপলব্ধি করি—
দণ্ডে বিষয় লইয়া কেবল মামলা-কলহ চালাও,
এক দিকে নয় অপর দিকে দাঁড়াইয়া পড়ো!

যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের মানে বোঝেন ? অর্থাৎ কিছু কাল রাজ্য চালাইবার পর পাওনাদারেরা যখন বিব্রত করিয়া তুলিল, এটর্ণির বিল যখন আর দাবিয়া রাখা চলে না, তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন,— যাক্, আমাদের যথেষ্ট রাজত্ব করা হইয়াছে —এইবার মহাপ্রস্থান অর্থাৎ পিট্টান দেওয়া যাক ! তার পর পরীক্ষিৎ, জন্মেজয় প্রভৃতির রাজত্ব বিশেষত্বহীন···মানে বিষয় তখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে—তাই বেদব্যাস ও কাহিনীর বিশদ বর্ণনায় ক্ষান্ত রহিয়াছেন। এই ব্যাখ্যার সহিত হালের ব্যাপার মিলাইয়া দেখুন,—মহাভারত অজরামরবৎকাল ভারতের মর্ম্ম-কথা উদ্‌ঘাটিত রাখিয়াছে।

২। রামায়ণের Sex-তত্ত্ব

রামায়ণেও ঐ কথা ! তবে ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ মহাভারতে আছে। তাই বাল্মীকি Originality রক্ষা করে ও-কথা না পাড়িয়া Sex-problem ফাঁদিয়াছেন। কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের পক্ষপাতিতায় Sex-সমস্যা প্রথম জাগিয়াছে। (দশরথ-কৈকেয়ীর আদর্শই আরও আধুনিক-চিত্তে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিজয়-বসন্তের গল্প-রচনায় প্রথম প্রতিভা উদ্বুদ্ধ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।) তবে দশরথ নেহাৎ বুড়া, তাই ওটুকু সংক্ষেপে সারিয়া বাল্মীকি এক নব ছবি গড়িলেন,— সূর্পণখা। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের দুর্ভাগ্য, আজো 'সূর্পণখা'র দুঃখে গলিয়া কোনো তরুণ নাট্যকার নাটক বা গীতিনাটক ফাঁদেন নাই। তবে যে-ভাবে এ যুগের দৃষ্টি ফুটিতেছে, তাহাতে 'সূর্পণখা' কাব্যে উপেক্ষিতা হইয়া অশ্রু-সলিল-সিক্ত-বসনা থাকিবে না বলিয়া অনুমান হয়। আর কেহ না উদ্যোগী হন আমাকেই অগত্যা সে চেষ্টা দেখিতে হইবে।

অবান্তর কথা যাক্ ! সূর্পণখা রাম-লক্ষ্মণের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। স্থান নির্জ্জন বনতল, কাল গোধূলি-বেলা—আহা, অস্তগামী রবিকরচ্ছটাতে কানন-ছবি রক্তিমাভ ! সূর্পণখা আসিয়াই যৌবন দান করিতে চাহিল। সীতার পানে চাহিয়া রাম সখেদে নিশ্বাস ফেলিলেন··· পরকীয়া উপযাচিকা···বয়স তাঁর তরুণ ! কিন্তু পাশে সীতা রহিয়াছেন। নারীর সব সয়···প্রিয়জনের প্রীতির বিরাগ সয় না···তাই তিনি লক্ষ্মণকে দেখাইয়া কহিলেন—করিল। তার পর ঐ নাক-কাণ কাটা···ওটা বর্ব্বর যুগের বর্ব্বরতার পরিচয়। সূর্পণখা প্রণয়-নিবেদনে বাধা পাইয়া দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত কহিল—নারীকে উপেক্ষা ! নারীর শক্তি ভাখো তবে !···

তার পর রাবণ আসিল। এ লোকটি sex-মন্ত্রের পূজারী ·· নারী দেখিলেই তাকে আয়ত্ত করিতে চায় (বাল্মীকির কাব্যেই এ পরিচয় পাই) এ-যুগের কথা-সাহিত্যের শক্তিমান্ হীরোর মত। রাবণ কহিল,—হাম্ সীতা লেঙ্গা···যে কথা সেই কাজ। সীতা-হরণ···বাস্, তার পর যুদ্ধ···এখানে আইনের কথাই পাই। অর্থাৎ Abduction এবং Wrongful Confinement etc, etc, অর্থাৎ Section 367 of the Indian Penal Code একেবারে দায়রার কেশ্। সীতা-হরণের ফলে বিষম যুদ্ধ—কি না ভীষণ মামলা-মকর্দ্দমা। রাবণের সবংশে নিধনের আধ্যাত্মিক মর্ম্ম,—সমারোহে মামলা লড়িয়া রাবণ ফতুর হইল। ফতুর ত হইবেই ··বিভীষণ ছিল ঘর-শত্রু। ঘরের সব কথা বিপক্ষ জানিতে পারিলে জেরার তার বল বাড়ে চতুর্গুণ। অতএব, এ ক্ষেত্রে এই শিক্ষাই পাই যে, মামলা করিতে হইলে, বিপক্ষকে পাড়িতে চাহিলে তার পক্ষীয় কাহাকেও দল-ভুক্ত করা চাই। জেরায় বিপক্ষের সাক্ষীকে তাহা হইলে ফাঁসিতেই হইবে।

রামায়ণে যে sex-psychologyর অঙ্কুর পাই, সে পরিচয় আরো সুপরিস্ফুট হইয়াছে রাধাকৃষ্ণ-লীলায়। আধুনিক যুগে যে sex-psychology লইয়া বঙ্গসাহিত্যে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে, ক'জন চট্টরাজ ঝাঁকড়া-কেশ কোটর-গত-চক্ষু প্রতিভাধর যে psychologyকে নিজেদের আমদানিকৃত বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, পরকীয়া-প্রীতি তাঁদের কপোল-কল্পিত বলিয়া গর্ব্বে দিশা হারা হইতেছেন, আমি প্রমাণ করিয়া দিব, সে sex-psyhology রাধাকৃষ্ণ লীলায় পূর্ণ-বিকশিত হইয়াছিল এবং আধুনিক বাঙলা-সাহিত্য কন্‌টিনেন্টের কাছে ঋণ স্বীকার করিলেও রাধাকৃষ্ণের কবির কাছেও সে কম ঋণী নয়।

প্রথমেই দেখি, কৃষ্ণের জন্ম হইল কংসের কারাগারে। কংস তাঁর মাতুল। মাতুল গৃহ-পালিত ভগ্নীপতির পুত্রে ভার লইতে নারাজ ; কে লয় ? কাজেই কৃষ্ণ বিতাড়িত হইলেন।

শ্রীনন্দ গোপ-রাজ। কৃষ্ণ সেই গোয়ালার ঘরে মানুষ হইতে লাগিলেন। সঙ্গী জুটিল যত democrat বস্তীবাসী গোয়ালার ছেলে! তাদের সঙ্গে কৃষ্ণ আড্ডা দিয়া বেড়ান...গাছ-তলায়, নদীর ধারে। ক্রমে গোপিনীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ঘটিল। তাদের দুধের ভাঁড় ভাঙ্গায় flirtationএর সূত্রপাত দেখি। সে রঙ্গ কারো ভাল লাগে—কারো লাগে না। যাদের ভাল লাগে, তারা ভাঁড় হইতে ক্ষীর-ননী ঢালিয়া কৃষ্ণকে দেয়, গান গাহিয়া শুনায়, বনফুলের মালাও কৃষ্ণের গলায় পরাইয়া দেয়! এই ব্যাপারের সঙ্গে আধুনিক ঝাঁকড়া-চুল কবিদের কবিত্ব-কাকলীর ছবিটুকু মিলাইয়া লউন!

তার পর কৃষ্ণ বাঁশী ধরিলেন। সে বাঁশী বাজানো হয় যমুনা-কূলে!

ইহার মধ্যে একটু সুগভীর অর্থ আছে। বাঁশী বাজানো আর মাসিক-পত্রে কবিতা ছাপানো ব্যাপার প্রায় এক। বাঁশীর সুরের তুলনায় মাসিকের কবিতার প্রসার বেশী। কারণ, মাসিকের কবিতার প্রচার চলে দূর দেশান্তরেও। বাঁশীর সুরের গতি ঐ গোয়ালা-বস্তীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যমুনা-তীরে কদমতলা ইহার সঙ্গে মাসিকপত্রের কার্য্যালয় খাপ খায়। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইলেন...সে বাঁশীর সুরে মজিল রাধা এবং তাঁর সখীবৃন্দ। মাসিক পত্রে কবি কবিতা ছাপিলেন, সে কবিতা প্রাণ বিঁধিল তরুণী প্রতিবেশিনীর। [বাস্তব জগতে যথার্থ এমন ঘটে কি না, জানি না। তবে মাসিকে কবিতা ছাপাইয়া কবি তুষ্ট হন কিসে? যত দূরেই তাব চালান যাক্ না কেন, তিনি তুষ্ট হন প্রতিবেশিনীর হাতে সেই সংখ্যা মাসিকপত্র দেখিলে। "মেশের কক্ষে উঁকি-ঝুঁকি" নাটকের প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে এমন ঘটনার কথা পড়িয়াছি। মেশের বহু কবির জীবন-স্মৃতিতেও ঈদৃশ মহাসত্যের সঙ্কেত পাই] শ্রীরাধা পরস্ত্রী—তবু কৃষ্ণ তাকে বাঁশী শুনাইতে আকুল, চঞ্চল! শ্রীরাধাও যোগ্যা নায়িকা .. জল ফেলিয়া কুম্ভ-কক্ষে জল আনিতে যাওয়া...এবং কৃষ্ণকে কুঞ্জে আনা...how daring! how bold! মাসিক সাহিত্যের যুগেও রচনায় এতটা বুকের পাটা মুষ্টিমেয় কয়জন প্রতিভাধর ছাড়া আর কে দেখাইতে পারিয়াছে?

তার পর কৃষ্ণের কালী-মূর্ত্তি ধরা...কি সুনিপুণ ইঙ্গিত! ছদ্মবেশে গোপনতার আভাস ইহাতে পাই। অমৃতলাল কি ধার-করা আইডিয়ায় "চোরের উপর বাটপাড়ি" লিখিয়াছিলেন?

বেচারা আয়ান—গরু তাড়াইয়া পূজাপাট লইয়া উন্মাদ! ওদিকে...কিন্তু আয়ান ছিল বুড়া...পত্নী রাধা তরুণী... [চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর চরিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র কি এই কাহিনীরই ছায়া লন্ নাই?] কাজেই রাধা sex-psychologyর অব্যর্থ নিয়মে কৃষ্ণে মজিবেন, এ তো বিচিত্র নয়! তারপর জটিলা-কুটিলা...এ দুটো চরিত্রের অর্থ, জীর্ণ গলিত পচা সামাজিক সংস্কারের এরা প্রতিচ্ছবি!...ঐ প্রণয়ে বিদ্বেষ-জাগানোর অপর অর্থ থাকিতেও পারে না! তার উপর psychologyতে jealousy বলিয়া একটা কথা আছে... রাধার প্রতি কৃষ্ণের পক্ষপাতিতায় কুটিলা যদি jealous হয়, তো বেচারীর দোষ কি? সেও তো তরুণী। তার উপর ভর্ত্তৃ-বিয়োগ-ব্যথায় কাতরা, যৌবনে যোগিনী। বুড়া আয়ান তরুণী রূপসী স্ত্রীর রূপে মশগুল—তাই যখনি স্ত্রীর নামে জটিলা-কুটিলা তার কাছে কুৎসা তুলিয়াছে, তখনি সে লাঠি তুলিয়া তাদের মারিতে উদ্যত হইয়াছে। শাশ্বত সত্যই এ ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে।...

গবেষণার তোড় দেখিলেন? আরো চাই? ধ্রুব-প্রহ্লাদের গল্প আছে। তারো ব্যাখ্যা কি গভীর গবেষণায় বাহির করিয়াছি...নমুনা দেখুন।

ধ্রুব দুওরাণী সুনীতির ছেলে—থাকে মা'র সঙ্গে রাজ-পুরীর বাহিরে এক বিজন বনে। আর সুওরাণী সুরুচি থাকেন অন্তঃপুরে রাজার মহিষী সাজিয়া। রাজার নাম উত্তানপাদ অর্থাৎ যার পা উঠিয়াছে...খাটের দিকে। আধুনিক ভাষায় যার মরিবার পালখ উঠিয়াছে!

রূপসী রাণীতে মজিয়া রাজা একচোখোমি করিলেন, ধ্রুবকে তাড়াইলেন। সে ধ্রুব—সে গেল বনে তপস্যায় অর্থাৎ শক্তি-সংগ্রহে। ধ্রুব হরিকে ডাকিল—হে হরি, কি করি? বাপের রাজ্য হরি! তাকে বিভীষিকা দেখাইতে আসিল, রাক্ষস, দৈত্য, অপ্সরী, বাঘ, সিংহ, সাপ। তার অর্থ ধ্রুব বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে বাপ সৈন্য পাঠাইল তাকে দমন করিতে। তাহাতে সফল হইতে না পারিয়া অপ্সরী ছাড়িলেন, অর্থাৎ কাপ্তেন ছেলের মাথা খাইতে বাইজী যেমন পাঠানো হয়, তেমনি! ধ্রুব কাজের ছেলে। সে এ ক্ষণিকের মোহে ভুলিল না। কাজেই একদিন তার ভাগ্যে রাজ্য মিলিল।

লেখক উত্তানপাদের পরাভবের কথা না বলিয়া ঐ হরিকে আড়াল করিয়া Democratic Government-এর পত্তনের কথা বলিয়াছেন।

প্রহ্লাদের গল্প কি? সংক্ষেপে বলি। হিরণ্যকশিপু দৈত্য অর্থাৎ মূর্খ গোঁয়ার; ছেলে প্রহ্লাদকে লেখাপড়া শিখাইতে দিল গুরুর কাছে। ছেলে পণ্ডিত হইয়া বাপকে হঠাইল। ইহা হইতে আমরা এটুকু বুঝিতে পারি যে, মূর্খ লোকের উচিত, ছেলেকে মূর্খ করিয়া রাখা—পণ্ডিত হইলেই বাপের পক্ষে ইজ্জৎ রক্ষা করা দায়, ছেলের হাতে বাপের মার তখন অবশ্যম্ভাবী।

আজ এই অবধি থাক্। আপনি বেদ-বেদান্ত চান? কালিদাসের জন্মভূমির আবিষ্কার লইয়া দুর্বোধ বাক্‌বিতণ্ডা? অর্থাৎ ফুটনোট-কণ্টকিত মহা-প্রবন্ধ? যাহা মনুষ্য-সমাজের কোনো কাজে লাগে না, অথচ মাসিকপত্রকে ভরাট ভারী গম্ভীর করিয়া তোলে, এমনি গিরি-গোবর্দ্ধন-গবেষণাত্মক বা ঢক্কা-ঢোল-নিনাদতুল্য প্রবন্ধ? অর্ডার দিবেন। আমার কাছে সর্ব্বপ্রকার প্রবন্ধ মজুত আছে। অর্ডার পাইবামাত্র আপনার কাছে পাঠাইব। কিন্তু সেই সঙ্গে নিয়োগ-পত্রখানি পাঠাইতে ভুলিবেন না।

শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত।

শিশু-ভগবান

অমরার আলোদীপ, মর্ত্ত্যের অঙ্গনে
দীপ্ত মনোরম;
এলে তুমি অকস্মাৎ জ্যোতির সাজনে
স্নিগ্ধ অনুপম।
উষার আশিস সম আলোর উন্মেষ
একান্ত মোহন;
কে তুমি অতিথি গেহে, কি তব উদ্দেশ
অজানা গোপন?
উদয়-তটের সীমা পিছনে তোমার
অন্ধকার তীর,
সমুখে তরঙ্গ-রঙ্গ বিশাল ভুমার
চঞ্চল অস্থির।
আমারি কুটীর-দ্বারে কি জানি কি কহি,
পোহাল রজনী?
মোর ঘাট হ'তে আজ কোন্ আশা বহি'
বাহিবে তরণী?
কত যুগ-যুগান্তর কত লীলা তব
ধরণীর বুকে;
লাবণ্য-ললিত স্মৃতি হেরি অভিনব
ওই চন্দ্রমুখে।
কত সুকঠোর তপ, কত না সাধনা,
পেল আজ রূপ,
সুরভি জনমে যেন দহিয়া আপনা
কত আশা-ধূপ।
আমারি দুয়ারে এলে প্রিয় জানি মোরে
শিশু-ভগবান্।
অপার বিশাল স্নিগ্ধ কি অমৃত,
বাঁধি সারা প্রাণ।

পথযাত্রী! পথ তব আঁকিয়া বাঁকিয়া
চলে দিকে দেশে,
যেথা নীল আকাশের নীলিমা মাখিয়া
নীল ধরা মেশে,
শেষ নাই শেষ নাই অনন্ত প্রগতি
অমৃতের লাগি,
যত চল, তত চল নাহিক বিরতি
পন্থা রহে জাগি।
পথের পাথেয় তব পারিব কি দিতে
হে নিত্য পথিক?
ধূলি-ভরা মোর ঘরে আনন্দিত চিতে
রবে কি ক্ষণিক?
চলেছ যে সুধা লাগি অজানার পানে
বিরাম-বিহীন,
করিব কি কভু তোমা কণা তারি দানে
আনন্দে বিলীন?
বসন্তের স্পর্শ যথা বনের অঞ্চলে
শিহরণ তোলে,
আবির্ভাবে তব বিশ্ব আবেগে চঞ্চলে
নব ভাবে দোলে!
মধুগন্ধি পবনের মধুর বিলাস,
মধুর সকলি।
পুষ্পে ধরা হাস্য-ভরা আনন্দ উল্লাস
উঠিছে উতলি।
তোমার উৎসব-যাত্রা আরম্ভের দিনে
শিশু-ভগবান্।
সেই আমন্ত্রণ আজ মোর ভাঙ্গা বীণে
আবাহন গান।

(এম-এ বি-এল)।

ভাগ্য-ফল

(গল্প)

১

সোনামুখীর নন্দ গরাই পাঠশালায় শুভঙ্করী শিখিয়াছিল। পণ্ডিত হরেরাম ভট্টাচার্য্য বলিতেন, "নন্দ! তুই আমার নাম রাখতে পারবি।"

কালে তাহাই হইল। প্রাপ্তবয়সে বিধাকালি করিতে হইলে নন্দকেই লোক ডাকিত। নির্ভুল গণনার জন্য লোক তাহার সমাদর করিত। চাষ-বাস করিয়াও পয়সা জমিয়াছিল, কাযেই গ্রামে নন্দ যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ছিল।

বেশী বয়সে নন্দের ছেলে হইল। ধুমধাম ও উৎসবের সীমা রহিল না। জন্মের নবম দিনে গ্রহাচার্য্য আসিয়া বলিলেন, নন্দের পুত্রের রাজযোগ আছে। নন্দ উল্লসিত হইয়া উঠিল। গ্রহাচার্য্যকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া কোষ্ঠী রচনা করিয়া দিতে অনুরোধ জানাইল।

তিন মাস পরে গণক কোষ্ঠী আনয়ন করিল। রাশি-চক্রের গ্রহসংস্থান হইতে দৈবজ্ঞ যখন সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়িয়া শুনাইল, আনন্দে নন্দের চক্ষু দুইটি ছল-ছল করিতে লাগিল। নন্দ তুলট-কাগজে লগ্নকুণ্ডলী তুলিয়া লইল। যখনই যে গৃহে আসিত, তাহাকে তাহা দেখাইয়া পুত্রের ভাবী সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করিয়া বলিত।

তুলট-কাগজে রাশি-চক্র এইরূপ লেখা ছিল :—

দৈবজ্ঞ সংস্কৃত বিকৃত করিয়া বলিত :—

যদা চ সৌরিঃ সুররাজমন্ত্রী পরস্পরং পশ্যতি পূর্ণদৃষ্ট্যা।
তদা সমগ্রাং বসুধামুপৈতি কিং বাধমেনাল্পগুণেন কিংবা॥

একখানি মনোরম আনন্দ-চিত্র রচনা করিত। আশা কুহকিনী, তাহার মায়াজাল অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া প্রতীয়-মান করে। দুঃখদুর্ব্বহ দিনগুলি এই আশার মোহে কাটা-ইয়া হঠাৎ এক দিন নন্দ পরলোকে চিত্রগুপ্তের নিকট জবাব-দিহি করিতে চলিল।

পুত্র রাজেন্দ্র তখন ষোল বৎসর বয়সেও পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। পিতার মৃত্যুতে রাজেন্দ্র চোখে সর্ষে-ফুল দেখিল। বাল্যকাল হইতে নিজের ভাবী ঐশ্বর্য্যবার্ত্তা শুনিয়া শুনিয়া রাজেন্দ্র রাজকীয় চাল যত আয়ত্ত করিয়াছিল, বিদ্যা তত আয়ত্ত করে নাই। পিতা নন্দও ব্যবসায়কর্ম্মে ঢিল দিয়া পুত্রের জন্য বিশেষ সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারে নাই।

পিতার মৃত্যুর পর চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে যখন রাজেন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিল, তখন নিজের বয়সের তারতম্য সহপাঠীদের সহিত তাহার প্রীতির কারক না হইয়া বিরাগ ও বিরোধের কারণ হইয়া উঠিল। বুদ্ধিমান শিক্ষক-প্রিয় ছাত্র তারক যে দিন তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "বুড়ো ধাঙড়! শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢুকতে তোর লজ্জা করে না?" সে দিন রাজেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিল না। কচি ছেলের পাকামী তাহার অসহ মনে হওয়ায় বিরাশী সিক্কা ওজনের এক চড় মারিয়া সে ক্লাশ হইতে যে বাহির হইল, সেই চিরকালের জন্য বাহির হইয়া পড়িল।

আত্মীয়-স্বজন আসিয়া বলিল, "এবার বে-থা কর্, ঘর-গৃহস্থালী পাতিয়ে মনের সুখে থাক্।" কিন্তু নিজের ভাগ্যের প্রাপ্য রাজকন্যা ও অর্দ্ধরাজ্যের লোভ তাহার গোপন মনে কায করিয়া চলে। তাহার উপর নভেল পড়া, কুন্দ-কলিকা নব-নলিনীদের সহিত তাহার ভাবী কনে'দের কাহারও মেলে না। পুঁটি, ফুটি, পাঁচী, রাঙী, শ্যামীদের যেমন কালো কুচকুচে চেহারা, তেমনই কথা বলিবার ভঙ্গী। কাযেই রাজেন্দ্র বিবাহে সম্মত হইল না। কলিকাতার কথা শুনিয়া রাজেন্দ্র মনে করিত, সেখানে গেলেই বোধ হয় সোনা ফলিতে পারে। কত লোক পথের ভিখারী হইতে লক্ষপতি হইয়াছে, কথা মুগ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বীর মত নিত্য শুনিয়া

অবশেষে ২৪ বর্ষ বয়সে রাজেন্দ্র পিতার সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক দিয়া হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া কর্ম্ম-ব্যপদেশে কলিকাতায় যাত্রা করিল। প্রথমে কলিকাতার বিলাসের দিকে রাজেন্দ্রের দৃষ্টি পতিত হইল, দিন কয়েক খুব স্ফুর্ত্তি করিয়া লইল। পরে নানাজনের পরামর্শে রাজা হওয়ার খুব সোজা সোজা সকল পথ পরখ করিয়া দেখিল; কিন্তু গ্রহ-চক্রের ফল কোথাও ফলে না। এক মাড়োয়ারী রাজেন্দ্রের কোষ্ঠীর ফলাফল পড়িয়া তাহাকে অংশীদার করিয়া লইল। কিন্তু ছয় মাস না যাইতেই সে কারবারের মালিককে গণেশ উল্টাইতে হইল।

দিন কতক Exchange market, Share market প্রভৃতি স্থানে নিয়মমত পায়চারী করিয়াও কোন সুবিধা জুটাইতে পারিল না। কয়েক মাস কয়েক জনের অধীনে কায করিল বটে, কিন্তু তাহাতেও তাহার কোনও সুফল ফলিল না। তুলট-কাগজের কোষ্ঠী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, আর বসিয়া বসিয়া ভাবে।

এমনই করিয়া নিরাশার তমসাবৃত অন্ধকারে রাজেন্দ্র ডুবিতে লাগিল। হাতের টাকাও ফুরাইয়া গেল। বাড়ী হইতে প্রাচীন বই যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা একটি পেঁটরায় বাঁধা ছিল। নাড়িতে নাড়িতে দেখা গেল, তাহার ভিতর কতিপয় প্রাচীন পুথি রহিয়াছে।

পুথিগুলি জ্যোতিষের। জ্যোতিষের উপর অগাধ বিশ্বাস থাকায় বাল্যকাল হইতে রাজেন্দ্র জ্যোতিষ কিছু কিছু শিখিয়াছিল। হরেরাম ভট্টাচার্য্যের পুথিগুলি প্রিয়শিষ্য নন্দ গরাই পাইয়াছিল, কালচক্রে বিপদের দিনে তাহা রাজেন্দ্রের হাতে পড়িল।

রাজেন্দ্র অভিনিবেশ সহকারে পুথিগুলি পড়িয়া চলিল। হরেরাম ভট্টাচার্য্যের সঙ্কেত ও ইঙ্গিত মিলাইয়া জিনিষ কতকটা বুঝিয়া লইল।

নূতন একটা মতলব মাথায় ঢুকিয়া পড়িল। রাজেন্দ্র মনে করিল, জ্যোতিষগণনা করিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিবে। পুঁজির কয়েকটি টাকা খরচ করিয়া এসপ্লানেডে সে একটি ছোট কামরা ভাড়া লইল, তাহাকে সুদৃশ্য ও সুরম্য করিয়া সাজাইল। পরে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় Sign-board টাঙ্গা[ইতে] আরম্ভ করিল।

২

বন্ধু পরেশ আসিয়া বলিল, "ভাই, বিজ্ঞাপনের যুগ, বিজ্ঞাপন চাই।" রাজেন্দ্র উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তাই ত! কিন্তু বেশী টাকা খরচ করতে পারছি না, ভাই।"

পরেশ উত্তর দিল, "সে জন্ম বেশী ভাবনা নেই, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি, কিন্তু আজকাল সাহেবী চাল না হ'লে, ভাই, চলে না। তুই ত বেশ ইংরাজী বলতে পারিস, বিজ্ঞাপনের জোরে সাহেব-সুবোও হয় ত আসতে পারে।"

"পারে বৈ কি, নিশ্চিতই আসবে, জানিস, আমার রাজযোগ আছে?"

"সে জানি বলেই ত বলছি? কিন্তু বখরায় সিকি আমার, বুঝলে ভাই?"

"না, তা কি হয়, তোকে এক আনা দিতে পারি।"

"আচ্ছা, তা হ'লে দু আনা দিস?"

"বেশ, তাই হবে।"

পরের দিন কলিকাতার সমস্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইল। রঙ-বেরঙে ছাপা, ছবিতে নয়ন-ভুলানো। লোকে আশ্চর্য্য হইয়া পড়িল!

স্বপ্ন না বাস্তব? বাস্তব না স্বপ্ন?

সত্যই যুগান্তর!

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী

মিঃ আর গুহরে

ভূত ও ভবিষ্যৎকে আপনার নিকট প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিবেন।

আমেরিকা, জাপান, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশ হইতে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ আসিতেছে।

শত শত লোকের অনুরোধে মাত্র কয়েক দিনের জন্ম কলিকাতায় থাকিবেন।

আসুন, বিলম্বে হতাশ হইবেন!

বিজ্ঞাপন বাহির হইল। তাহার পর হইতে প্রত্যহ দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। কিন্তু বাঙ্গালী চতুর জাতি, পয়সা বেশী দিতে চাহে না। যে দু'এক জন মাড়োয়ারী ও সাহেব আসিল, তাহারা কিছু কিছু মনোমত

ব্যবসায়ের রূপ ধরিতে পারিয়া রাজেন্দ্র ইংরাজী ও হিন্দী কাগজে পুনরায় চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন দিল।

মানুষ নিজের হাতে নিজের ভাগ্য গড়ে, কিন্তু তাহাতে সে তৃপ্ত নহে। অনিশ্চিতকে জানিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা কম নয়। কাযেই মানুষ বিপদের সময় সাহস সঞ্চয় করিবার জন্য, দ্বন্দ্বের সময় সংশয়-নিরসনের জন্য জ্যোতিষীর কাছে যায়।

রাজেন্দ্র দেখিল, অনিশ্চিত জানিবার জন্য আগ্রহ কোন জাতিরই কম নহে। কলিকাতায় পৃথিবীর নানা দেশদেশান্তর হইতে প্রত্যহ লোক আসিতেছে ও যাইতেছে। কত বিচিত্র তাহাদের মনোভাব। ইহাদের সকলের মনোরঞ্জন করিবার জন্য রাজেন্দ্র স্যুট্ কিনিয়া আপনাকে সুবেশে সজ্জিত করিল। কলিকাতার বিভিন্ন সমাজে ঘোরা-ফেরা করিয়া চলন-সই ইংরাজী বলিতে শিখিয়াছিল। পাঠ ও কথোপকথনের দ্বারা দিন দিন তাহার বৃদ্ধি হইল। কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার হইতেই রাজেন্দ্র চৌরঙ্গীতে একটি বড় ঘর ভাড়া লইল। তাহা বৈদ্যুতিক দীপমালায় ও আসবাবপত্রে সুসজ্জিত করিয়া সে নিজের ভাগ্যলক্ষ্মীর আবির্ভাবের আশায় উন্মুখ হইয়া রহিল।

৩

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। এসপ্লানেডের সম্মুখে ফাঁকা আকাশে প্রকৃতি বর্ণসজ্জার আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু কর্ম্ম-ব্যাকুল মানুষের সে দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর কোথায়? সমস্ত দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

একখানি 'অষ্টিন-কার' রাজেন্দ্রের ভাগ্য-গণনালয়ে আসিয়া থামিল। প্রায় পঞ্চবিংশবর্ষবর্ষীয়া সুন্দরী তরুণী আসিয়া দ্বারপ্রান্তবর্ত্তী দরোয়ানকে আপনার কার্ড দিল।

রাজেন্দ্র কার্ড পাইয়া চকিত হইয়া উঠিল। আয়নায় নিজেকে দেখিয়া বিশৃঙ্খল কেশকে সুবিন্যস্ত করিয়া লইল। মুখে পাউডার ঘষিয়া লইল। কলিকাতার এক জন বড় সওদাগরের কন্যা মিস্ এডিথ ব্রাউন। ভয়ে ও শঙ্কায় তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

তরুণী ভিতরে ঢুকিয়া সুন্দরভঙ্গীতে বলিল, "নমস্কার মিঃ গুরুে।"

পরে আপন সুন্দর হস্ত বাড়াইয়া দিল। রাজেন্দ্র প্রতি-নমস্কার জানাইয়া কর-কম্পন করিল।

তরুণী বসিয়া বলিল, "দেখুন মিঃ গুরুে, ভারতবর্ষের বিরাট সভ্যতার প্রতি আমার একটি অন্তরের টান আছে। কি অপূর্ব্ব দেশ! কি বিচিত্র সভ্যতা!"

ভাবাবেগে তরুণীর হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিল।

রাজেন্দ্র উত্তর দিল, "যা বলেছেন, মিস্ এডিথ। সেই গৌরবময় সভ্যতা অস্তাচলে গেছে—আমরা অযোগ্য বংশধর, পূর্ব্বপুরুষের বিজয়-গরিমা কিছুই বাঁচাতে পারিনি।"

"আপনার বিনয় প্রশংসনীয়, কিন্তু শুনেছি, আপনি প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষের উদ্ধারে মনোনিবেশ করেছেন—"

কথা কাড়িয়া লইয়া রাজেন্দ্র বলিল, "আমি কি-ই বা জানি। কালিদাসের নাম শুনেছেন ত কুমারী! কালিদাস যেমন বলেছেন, ভেলায় চ'ড়ে সাগর পার হ'তে যাওয়ার মত এ মন্দবুদ্ধির প্রয়াস!"

"আচ্ছা, আপনি কি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করেন?"

অদ্ভুত প্রশ্ন। যে জ্যোতিষের ব্যবসায় লইয়াছে, সে কেমন করিয়া জ্যোতিষের নিন্দা করিবে?

উৎসাহে শ্লোক আওড়াইয়া সে জবাব দিল, "জানেন মিস! আমাদের শাস্ত্র বলেছেন :—

'বিফলং সফলং শাস্ত্রং বিবাদস্তত্র কেবলম্।

সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ'।।"

মিস এডিথ সংস্কৃত ভাল বুঝে না। কিন্তু বক্তার বলিবার ভঙ্গীটি তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল।

রাজেন্দ্র মিস এডিথের লাবণ্য-লালিম মুখের উপর দৃষ্টি-পাত করিয়া বলিল, "আপনার সময় এখন খুব খারাপ যাচ্ছে; মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিপ্লব—"

"হাঁ, যা বলেছেন, আমি ভয়ানক দোটানায় পড়েছি।"

"সে আর বলতে হবে না। আচ্ছা, মনে মনে একটা ফুলের নাম করুন। করেছেন? বেশ, এইবার এই অক্ষর চক্রে হাত দিন ত।"

মিস এডিথ হাত দিলেন। খানিক যোগ-বিয়োগ করিয়া বহু মাথা ঘামাইয়া রাজেন্দ্র যেন বহু গবেষণায় উত্তর দিল,

Rose নয় কি? ঠিকই গোলাপ-ফুলের নাম ...নি

মিস এডিথ বিশ্বাসে ও উল্লাসে ফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, "ঠিকই ত ?"

"গোলাপ সৌন্দর্য্যের কারক, রক্তবর্ণ, প্রণয়-দ্যোতক—ভাবী গৌরবের সূচনা করছে। আপনি নিশ্চয়ই কোন প্রণয়-সমস্তায় পড়েছেন। নয় কি ?"

তরুণীর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। গভীর শ্রদ্ধায় তাহার মন নত হইয়া পড়িল।

রাজেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তরুণীর হাতে বিবাহের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কোন আংটী নাই, বড়লোকের মেয়ে, প্রণয়-সমস্তা ব্যতীত তাহার অন্য কোন সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না।

রাজেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, এইবারে একটা ফলের নাম করুন। বেশ। করেছেন, বলুন, শীতকালের ফল না গ্রীষ্মের ?"

তরুণী উত্তর দিলেন, "শীতকালের।"

"বেশ, এইবার অক্ষর-চক্রে হাত দিন।"

তরুণী হাত দিল। রাজেন্দ্র পুনরায় মস্তক-সঞ্চালন করিল, অঙ্কমালা লইয়া যোগ-বিয়োগ করিল, পরে জিজ্ঞাসুর ব্যগ্রতায় বলিল, Orange নয় কি ?"

তরুণী বলিল, "হাঁ, আপনি কেমন ক'রে মনের কথা ধ'রে ফেলেন ?"

"সে রহস্য আপনি বুঝবেন না, মিস !"

"তা ঠিক, তবু কৌতূহল হয়।"

"অনাবশ্যক কৌতূহল ভাল নয়, এখন শুনুন। কমলালেবু রসের প্রাচুর্য্যে সৌভাগ্যের পরিচায়ক, প্রিয়-সম্প্রাপ্তির দ্যোতক, মিলনের কারক। অতএব বুঝছেন, আপনার কোন ভয় নেই। এখন নিশ্চিন্ত-মনে আপনার মনের কথা বলতে পারেন।"

৪

তরুণীর মনে যে লজ্জা, সঙ্কোচ ও দ্বিধা ছিল, দূর হইয়া গেল। গভীর বিশ্বাসে তরুণী আপনার মনের দ্বন্দ্ব-কথা বলিতে লাগিল।

"দেখুন, আমার মা নেই। মা থাকলে যে সুবিধা হয়, আমার তা নেই। পুরুষের প্রণয়-নিবেদনকে আমার তাই বড়ই মুস্কিল হচ্ছে। আপনাদের দে[শে] আমি খুব সৌভাগ্যবতী মনে করি। পিতামাতা তাঁদের যাঁকে পছন্দ ক'রে দেন, কন্যা অবলীলাক্রমে তাঁকে মেনে নেয়। একবার আমার মনে হয়, এটা একটা abstract idea মাত্র। বস্তুজগতে এই বাষ্পময় ভাবধারার কখনও দেখা হয় না। আবার যখন সুখী ভারতীয় দম্পতি দেখি, তখন ভাবি, না, নিশ্চয়ই আইডিয়া নয়, এর পিছনে প্রচণ্ড একটি সত্য নিশ্চয়ই কায করছে।"

রাজেন্দ্র ভারতীয় সভ্যতার প্রতি মমতাময়ী তরুণীর কথায় প্রসন্ন হইল। তৃপ্তচিত্তে তাই জানাইল, "মিস এডিথ, আপনার দৃষ্টি খুলেছে, আপনি ভারতীয় জীবনের মর্ম্মকথাটি জেনেছেন। দেখুন। আইডিয়া আগে, কায পরে। ভারতবর্ষ তার সারা জীবন ভাবের পিছনে ছুটে ভাবকে করতলগত ক'রে নেয়।"

মিস এডিথ বলিল, "আমার প্রেমের দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী। জোকে আমি কিশোরকাল থেকেই জানি। বড় বড় দুটি আয়ত চোখ যেন কোন অজানার পানে চেয়ে রয়েছে। তার সুন্দর মুখ যেন কল্পলোকের কি এক মোহে ভাস্বর হয়ে উঠেছে. কিন্তু কল্পনাপ্রিয় ব'লে বাবা জোকে আমল দিতে চান না। জোর প্রকৃতি আর আমার প্রকৃতি বিভিন্ন। বাপের কাছ থেকে আমি সাদাসিদে ভাব আর বিষয়বুদ্ধি পেয়েছি, কিন্তু আমার মা আইরিশ মেয়ে, তাই হয় ত আইরিশ যুবক জোর মোহ আমি ছাড়িয়ে উঠতে পারি না। ও যেন আমায় কাচপোকার মত টানে।

"বাবা চান, আমি পলকে বিয়ে করি। পল অবশ্য সুপুরুষ—খাঁটি ইংলিসম্যান। ওর জীবনে ভাবালুতার কোন ছায়া পড়ে না। জোকে ভাল না বাসলে হয় ত পলকে স্বামিরূপে বরণ করতে আমার আপত্তি হ'ত না, কিন্তু আমি দোটানায় পড়েছি।"

বাধা দিয়া রাজেন্দ্র বলিল, "হাঁ, আর বলতে হবে না। আপনার মাতৃগ্রহ আর পিতৃগ্রহ পরস্পর শত্রু, আপনার মনের মধ্যে যে আইরিশ কল্পনা-প্রিয়তা, তা আপনার পিতৃগ্রহের বিরুদ্ধদৃষ্টিতে প্রতিপদে আহত হচ্ছে।"

তরুণী সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, "Exactly so।" পরে থামিয়া রাজেন্দ্রের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। [স্ব]জাতীয় লোক, তাই অন্তরে বিশেষ লজ্জা জাগিল না। [কুমা]রী এডিথ বলিল, "কিন্তু জো আমায় বিশেষ ধ'রে পড়েছে,

কাল জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়াচ্ছিলাম। জো কেঁদে বলেছে, 'আমায় না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।' আমার প্রেমকে মহীয়ান্ করবার জন্য সে একখানি কাব্য লিখছে। আমি যদি পলকে বিয়ে করি, তা হ'লে জোর জীবন মরু হয়ে যাবে।"

বিভিন্ন ভাষাভাষী দুই ব্যক্তি, তাই জীবনের নিগূঢ় কথা বলা চলিতেছিল।

"আমি উত্তর দিয়েছি, 'বাবার আমার মত কিছুতেই হবে না। তখন জো বলেছে যে, সে বড়লোক হবে, কিন্তু সোজাসুজি বড় লোক হওয়া যায় কি ক'রে, ভেবে পাই না।"

তরুণী আবার নীরব হইল। পরে বলিতে লাগিল, "ডার্বি ঘোড়দৌড়ের কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন। ঘোড়ার নাম দিলে কোন্ ঘোড়া জিতবে, তা কি আপনি বল্‌তে পারেন?"

রাজেন্দ্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "খুব পারি।"

মানুষের মন এইখানে অতি দুর্ব্বল! বাঞ্ছিতকে পাওয়ার জন্য দিবারাত্রি আমরা আকাশকুসুম রচনা করিতে থাকি।

অন্ধ বিশ্বাসের দোলায় এডিথের মন দুলিতেছিল। সে ক্ষণিকের জন্য ভাবিল না যে, যদি জ্যোতিষী গণিয়া ঘোড়া ঠিক করিতে পারিবে, তাহা হইলে সামান্য দোকানদারি করিবার তাহার প্রয়োজন কি?

মিস্ এডিথ বলিল, "আমায় মাপ করবেন, মিঃ গুরুরে। মা-হারা মেয়ের পরামর্শের লোক নেই, আপনাকে তাই বিরক্ত করছি।"

"কুণ্ঠিত হবেন না, মিস্! আমরা মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য রয়েছি। গ্রহগণ নীল আকাশের অসীম ছাপিয়ে যে বাণী পাঠায়, মানুষের মঙ্গলের জন্য আমরা তাই প্রচার করি। এর ভিতর বুজরুকী নেই। বলবেন, সব সময়ে ফল মেলে না, তার ভূরি ভূরি কারণ আছে। অনন্ত আকাশ অ... কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশে হাস্যোজ্জ্বল; ঐ দূর শ...স্থল হ'তে মানুষের জীবনকে ওরা পরিচালনা করছে, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি সামান্য—গণনার সময় কোথাও সামান্য ভুলে সমস্তই ফেঁসে যায়।"

মিস্ এডিথ পকেট হইতে একখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "আপনার উপকার মূল্যে অশোধ্য...

রাজেন্দ্র বৈরাগ্যের ভাণ করিয়া বলিল, "না, ওর জন্য ভাববেন না মিস্, আপনার মিষ্ট কথাই যথেষ্ট পুরস্কার, তবে সংসার-যাত্রা আছে, এই যা—"

কুমারী কর বাড়াইয়া দিল। পরে নমস্কার করিয়া বলিল, "কাল এই সময়েই আবার আসব। আপনার Engagement নাই ত?"

রাজেন্দ্র যেন মহা ভাবনায় পড়িল। পরে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "তাই ত! কাল যে টিকারীর মহারাজ-কুমার আসবেন বলেছেন, তা ছাড়া দৌলতরাম ঘনশ্যাম আসবেন—"

তরুণী বলিল, "আপনি চিঠি লিখে ও সব বরখাস্ত করুন। আপনার সময়ের মূল্য আপনি পাবেন।"

৫

তরুণী চলিয়া গেলে রাজেন্দ্র মহা ভাবনায় পড়িল।

আস্ফালন যথেষ্ট করিয়াছে, কিন্তু কার্য্যকালে কি হইবে, ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইল না।

পরেশ বলিল, "ভয় কি দাদা, জৈমিনি পরাশর আউড়ে বেচারীকে ঘায়েল করবে।"

রাজেন্দ্র কথা কহিল না। বিদেশিনী এই সুরূপা সুন্দরীর করস্পর্শের অনুভূতি তখনও তাহার সারা অঙ্গে পুলক জাগাইতেছিল। তাহাকে ফাঁকি দিতে তাহার মন সরিতেছিল না।

এমন সময় রিং-রিং করিয়া 'কলিং বেল' বাজিয়া উঠিল। পরেশ আসিয়া কার্ড হাতে দিল। "পল এডমণ্ড, মার্চেন্ট।"

লম্বা-চওড়া যোয়ান পুরুষ। একটু কাঠ-খোট্টা গোছের ভাব।

পল আসিয়া সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কোনও অভিনন্দন করিল না। পরে বলিল, "দেখুন, আপনিই মিঃ গুরুরে?"

জ্যোতিষী ঘাড় নাড়িয়া প্রশ্নোত্তর দিল।

"আমি সোজা কথাই ভালবাসি। জ্যোতিষবিদ্যা একটা বুজরুকী বৈ ত নয়, ও সবে আমার মোটেই বিশ্বাস নেই। কিন্তু আগে যে মেয়েটি এসেছিল, ওকে আমার বিয়ে করতেই হবে, বিশেষ প্রয়োজন।"

বিবাহে প্রয়োজনকে প্রেমের চেয়ে উচ্চাসন

রাজেন্দ্র বহু কাব্যে ও উপন্যাসে পড়িয়াছে। কাবেই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

তাহার বিস্মিত দৃষ্টির মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া পল বলিল, "দেখুন মিঃ গুররে, প্রেম একটা মস্ত ফাঁকি, নভেল লিখতে ওর প্রয়োজন, কাযের জগতে দরকারই সব চেয়ে মাপ-কাঠি। মিস্ এডিথকে আমার চাই-ই চাই। ওর ভিতর যে ভারতীয় ন্যাকামি আছে, যে স্বপ্ন-বিভোর পাগলামি আছে, তা আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না, কিন্তু তা হ'লেও ওকে বিয়ে করতেই হবে।"

রাজেন্দ্র সোৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তার কি করব ?"

"বলছি, ব্যস্ত হবেন না। দেখুন, আমরা ব্যবসায়ী জাত, চুক্তির ভক্ত আমরা। আপনি যদি কায হাসিল করতে পারেন, দশ হাজার টাকা আপনার দক্ষিণা পাবেন।"

দশ হাজার! পুলকে রাজেন্দ্রের শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে প্রশ্ন করিল, "আমি কি করতে পারি ?"

"শুনুন, কাযটা খুবই সহজ। ওকে আপনি স্বাভাবিক ভড়ং ক'রে বলবেন যে, তোমাকে যে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে, তার ছবি তুমি দেখতে চাইলে দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই মিস্ তখন কৌতূহলী হয়ে উঠবেন।"

"তখন ?"

"তখন তাকে কৌশলে আমার ছবি দেখিয়ে দেবেন।"

"কি ক'রে দেখাব ? আমি ত আর নখদর্পণ জানি না। আমাদের যে সব গুণী নখদর্পণ, পাণ-দর্পণ করতে জানেন, তাঁরা ওসব পারেন।"

"আপনার ওসব গল্প শুনতে চাই না। এটা বিজ্ঞানের যুগ, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে আপনার কায সম্পন্ন হবে। এই আংটীটা নিন। এর সামনে একটি উজ্জ্বল শক্তিসম্পন্ন কাচ বসান আছে দেখছেন, আর নীচেই দেখুন একটা স্প্রিং। স্প্রিংটা টিপলেই আমার ছোট একটি ছবি কাচের নীচে চ'লে আসবে, আর কাচের মধ্যে বেশ বড় দেখা যাবে।"

রাজেন্দ্র আংটীটা দু'চারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার। ছবি আসিলে পলের একটি সুন্দর মনোরম প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্র এই দুষ্টামির মধ্যে লিপ্ত থাকিতে প্রেরণা পাইতেছি ধীরে ধীরে বলিল. "আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখব

"চেষ্টা কি ? এ ত খুব সহজই। এ আপনি নিশ্চয়ই পারবেন। দশ হাজার টাকা সোজা জিনিষ নয়, আপনার সারা জীবনের আয়। ভেবে কায করবেন।"

লোভ ও অসাধ্যসাধনের পিপাসা মনের মাঝে ভাবের তোলপাড় আরম্ভ করিয়া দেয়। জোর করিয়া রাজেন্দ্র বলিল, "খুব সম্ভব পারব।"

পল বিরক্ত হইয়া বলিল, "সম্ভব নয়, একে সত্য করতে হবে। ব্যাপার কিন্তু বিশেষ গোপন রাখবেন।"

পল উঠিয়া বলিল, "গুড্ নাইট।"

প্রত্যুত্তরে রাজেন্দ্র বলিল, "গুড্ নাইট।"

৬

পরদিন সারাক্ষণ রাজেন্দ্র মনের ভিতর ভয়ানক অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। কি করিবে না করিবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। তরুণীর কমনীয় লাবণ্য সময় সময় হৃদয়ের কোমল তারে বাঁশী বাজাইয়া তুলে, আবার লোভ আসিয়া থামাইয়া দেয়।

পরেশ বলিল, "ভাই, ঘাবড়ে যেয়ো না। মারি ত হাতী, লুটি ত ভাণ্ডার।"

রাজেন্দ্র মিথ্যা জোর লইয়া উত্তর করিল, "সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সন্ধ্যার সময় মিস এডিথ আসিল।

সমস্ত ঘরখানি তাহার কলহাস্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তরুণী একখানি কাগজে ঘোড়ার নাম লিখিয়া আনিয়াছিল। "দেখুন, রিকার্ডো আর বছর প্রথম হয়েছিল, কিন্তু লোকে বলছে, এ বছর 'এনা' ব'লে একটি নূতন ঘোড়া নামছে, তার জিতবার খুব আশা আছে।"

তরুণীর কথায় বাধা দিয়া রাজেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, ও সব পরে শুনছি, আপনাকে তার আগে একটা অপূর্ব্ব জিনিষ দেখাতে চাই। কে আপনাকে সব চেয়ে ভালবাসে, মন্ত্রবলে তার ছবি আপনাকে দেখাতে পারি।"

মিস এডিথ উল্লসিত হইয়া বলিল, "বেশ, আগে তাই দেখান।"

রাজেন্দ্র বলিল, "বেশ, আপনি চোখ বুজে মনে মনে গভীরভাবে চিন্তা করুন। যে আপনার সকলের চেয়ে প্রিয়, সেই আপনাকে দেখা দেবে।"

কুমারী বিশ্বস্তচিত্তে ধ্যানমগ্ন রহিল। মিনিট দশেক পরে

রাজেন্দ্র বলিল, "বেশ, এইবার চেয়ে দেখুন, আংটীর কাচে কিছু দেখতে পারছেন কি?"

মিস এডিথ বলিল, "Sorry, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"বেশ, আবার ভাবুন, এইবার আমি মন্ত্রসঞ্চালন করছি।" এই বলিয়া নানা ভঙ্গীতে রাজেন্দ্র হাত নাড়িতে লাগিল। খানিক পরে বলিল, "আচ্ছা, এইবার দেখুন, ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন।"

তরুণী আগ্রহ ব্যাকুল চিত্তে চাহিল, দেখিল, আংটীর কাচে পলের সুন্দর সুদৃশ্য আলেখ্য। ব্যথায় ও হতাশায় তাহার সারা মন এলাইয়া পড়িল। আর্ত্তকণ্ঠে সে বলিল, "Oh God, Oh God!"

মিস এডিথ বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সোফায় মাথা রাখিয়া সে চোখ বুজিয়া পড়িল।

গভীর বিশ্বাসে সে জোর মূর্ত্তি চিন্তা করিয়াছিল। ভাবনায় মানুষ সব সময় চায় যে, ঈপ্সিত বস্তুই দেখা দিবে। আংটীতে পলের মূর্ত্তি দেখিয়া এডিথের মনঃকষ্টের সীমা রহিল না! তাহার বোধ হইল যেন তাহার মাথা ঘুরিতেছে।

সে কাতর স্বরে বলিল, "মিঃ গুরে, আপনার স্মেলিং শল্ট কিংবা অডিকলন আছে কি?"

রাজেন্দ্র পিছনের টিপয় হইতে স্মেলিং শল্ট বাহির করিয়া দিল। আঘ্রাণ লইয়া তরুণী যেন স্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। পরে ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, "মিঃ গুরে, ভগবান্ বিরূপ! আপনার দোষ নাই।—আমার ভাগ্য।" পরে নিজ মনেই যেন বলিল, "My fate is sealed. My fate is sealed." তরুণী উঠিতে গেল, কিন্তু আবার সোফায় বসিয়া পড়িল। তাহার চারিদিকে পৃথিবী যেন নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাজেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, তরুণীর সুগৌর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হইয়া উঠিয়াছে। চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "যা, দৌড়ে একটা অডিকলন নিয়ে আয়।" রাজেন্দ্র নিজেকে আর থামাইতে পারিল না। বিহ্বল তরুণীর বেদনার্ত্ত মুখ তাহার সমস্ত লোভকে জয় করিতে চাহিতেছিল। সে মনোবল সঞ্চয় করিয়া বলিল, "মিস, আমায় ক্ষমা করবেন, আপনাকে আমি ফাঁকি দিয়াছি।"

তরুণী উত্তর দিল না। তাহার মন তখন ভাবী অপ্রিয়ের সহিত একটা রফা করিবার জন্য যেন দূরে চলিয়া গিয়াছিল।

রাজেন্দ্র আপনার কথা পুনরাবৃত্তি করিল। মিস এডিথ চমকিত হইয়া বলিল, "না মিঃ গুরে, আমায় ভুলাবেন না। আমি জানি, বহু জীবনে এই ঘ'টে থাকে। আমি নিজেকে তৈরী ক'রে নেবো। তবে প্রথমটা বড় আঘাত লাগে। আপনি আমার দুর্ব্বলতা ক্ষমা করবেন।"

রাজেন্দ্র বলিল, "কুমারী! মিথ্যা নয়, সত্যই আমি মহা পাষণ্ড অর্থের লোভে আপনার প্রেমকে বলি দিতে যাচ্ছিলাম।"

বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া তরুণী ফিরিয়া চাহিল।

রাজেন্দ্র তখন আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্ব-সন্ধ্যার কাহিনী বলিয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া কুমারী সব শুনিল। তবু যেন ভয় ছাড়িতে চায় না।

রাজেন্দ্র তখন আংটীটা মিস এডিথের হাতে দিল। পর্য্যবেক্ষণের পর তরুণী চিনিতে পারিল, এই আংটীই সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে। রাজেন্দ্রের প্রতি তাহার ক্ষোভ বা ক্রোধ হইল না। মুক্তির বিপুল আনন্দে সে জ্যোতিষীর লোভকে ক্ষমা করিতে পারিল।

রাজেন্দ্র তখন বলিল, "মিস, আমায় যদি বিশ্বাস এখনও করেন, তবে আপনার ও জোর জন্মতারিখ দিন, আমি আপনাদের যোটক বিচার ক'রে দিচ্ছি।"

মিস এডিথ বলিল, "আপনি মহাশয় লোক, লোভকে যে জয় করেন, তিনি মহাত্মা।"

রাজেন্দ্র উভয়ের জন্ম-তারিখ হইতে রাশি, নক্ষত্র, গণ ও বর্ণ বাহির করিয়া লইল। পরে পুস্তক নাড়িয়া বলিল, "মিস, আপনার ও জোর রাজযোটক, আপনারা খুব সুখী হবেন।"

কুমারী উঠিবার সময় নোট বাহির করিয়া দিতে যাইতেছিল। রাজেন্দ্র বলিল, "আমায় ক্ষমা করবেন, আমি কিছু নিতে পারবো না। ভগবান্ আপনাদের সুখী করুন।"

তরুণী কথা কহিল না। নীরবে বিদায়-সূচক হাত বাড়াইয়া দিল। কর-কম্পন করিবার সময় রাজেন্দ্র বুঝিল, যেন তরুণীর চিত্ত কৃতজ্ঞতায় আকুল হইয়া রহিয়াছে।

৭

সেক্সপীয়ার লিখিয়াছেন, জীবনের শুভলগ্ন একবারমাত্র আসে, তাহাকে হারাইলে সারা জীবন অনুতাপ করিতে হয়।

পরেশ রাজেন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "তোমার সাথে বন্‌বে না। অত কোমল-চিত্ত নিয়ে সংসারে

রাজেন্দ্র নিরুত্তর রহিল।

তাহার মনে প্রভাতী আকাশের অরুণিমার মত মাধুর্য্যময় একখানি মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিল।

পরেশ চলিয়া গেল। কোন অজ্ঞাত শত্রুর জন্ত এস্‌প্লানেডের বাসাও ছাড়িতে হইল। ধর্ম্মতলায় ছোট একখানি ঘর লইয়া রাজেন্দ্র জ্যোতিষের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিল। লোককে সে আর ফাঁকি দেয় না। শাস্ত্র যাহা বলে, তাহাই বলিয়া দেয়। আর বলিবার সময় শ্রোতাকে সমঝাইয়া দেয় যে, বিচারে বহু ভুল থাকিতে পারে। মেকির বাজারে সত্য চলে না। খাঁটি মালের গ্রাহক নাই, কাষেই রাজেন্দ্র দিন দিন বিপন্ন হইয়া উঠিতেছিল।

যখন অভাবের পীড়া অসহ্য হইয়া উঠে, রাজেন্দ্র মিস্ এডিথের ভাবাবেগমধুর করস্পর্শের কথা চিন্তা করিয়া সান্ত্বনা লইতে চাহে।

ইংরাজী খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে রাজেন্দ্র এক দিন দেখিল, মিস্ এডিথ ও জো রিশারের বিবাহ হইয়াছে। কাগজে ইঙ্গিত ছিল যে, এ বিবাহে মিঃ ব্রাউন খুসী হন নাই।

সময় চলিয়া যায়। রাজেন্দ্রের দৈন্যদশা তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। নিরুপায় রাজেন্দ্রের মনে হইল, "সংসারে সত্যের পথ জীবনযাত্রার পথ নয়। যারা ফাঁকিবাজ, তারাই দুনিয়ায় জয়মাল্য কেড়ে নেয়। পিতার সযত্ন-রক্ষিত তুলট-কাগজে নিজের রাশিচক্র দেখিতে দেখিতে তাহার মন বেদনার্ত্ত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, "এই মিথ্যা প্রলোভনই আমার সারা জীবনটা মাটী ক'রে দিয়েছে।"

দুঃখে ও ক্ষোভে সে তুলট-কাগজ কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সে সঙ্কল্প করিল যে, নিজের আসবাব-পত্র বেচিয়া ফেলিয়া পশ্চিমে কোন তীর্থস্থানে যাইয়া জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাইবে।

পুরাতন পুস্তক-বিক্রেতার কাছে জ্যোতিষের বইগুলি বিক্রয় করিয়া যখন সে নিজের ঘরে ফিরিল, দেখিল, দরজায় পিয়ন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কালে-ভদ্রে তাহার চিঠি আসে। সে তাই তাচ্ছীল্য সহকারে বলিল, "কাকে খুঁজছ হে?"

"আপনাকেই বাবু! আপনার একটি রেজিষ্টারী খাম আছে।"

রসিদ দিয়া রাজেন্দ্র চিঠি খুলিল; দেখিল, ভিতরে এক-খানি খোলা চিঠি আর একখানি খাম রহিয়াছে। মিস্ এডিথ চিঠি লিখিয়াছে:—

"কার্সিয়ং, রোজভিলা,
৫ই জুন।

প্রিয় মিঃ গুরে!

তাড়াতাড়িতে বিয়ে হয়েছিল ব'লে আপনাকে জানাতে পারিনি। এখানে আমরা Honey-moon করতে এসেছি। জো আর আমি খুব সুখী হয়েছি। জোকে আপনার কথা বলেছি। সে-ও আপনাকে প্রীতি জানাচ্ছে।

বাবা প্রথমটা বড় চ'টে গিয়েছিলেন। আমাকে ত ত্যাজ্য করবেন ব'লে সঙ্কল্প করেছিলেন। পরে জানতে পেরেছেন যে, পল ভারী লম্পট ও জুয়াচোর লোক। তার অনেক টাকা দেনা রয়েছে।

পরশুদিন বাবা আশীর্ব্বাদ করতে এসেছিলেন। তাঁকে সব কথা বললে তিনি আপনার প্রতি এত খুসী হয়েছেন যে, আপনার মহানুভবতার পুরস্কার না দিয়ে ক্ষান্ত হ'তে পারছেন না।

আপনি আমাদের যে বিপদ্ থেকে রক্ষা করেছেন, তার তুলনায় এ প্রতিদান কিছুই নয়। গ্রহণ ক'রে অনুগৃহীত করবেন।

সঙ্গের চিঠিখানা নিয়ে বাবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি আপনাকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একলাখ টাকার একখানি চেক দেবেন।

নমস্কার জানিবেন। ইতি

স্নেহ-প্রার্থিনী
মিসেস্ এডিথ রিশার।"

পত্র পড়িয়া রাজেন্দ্র অবাক্ হইয়া গেল। ভাগ্যের এ কি অদ্ভুত পরিহাস! যখন ফকির হইয়া বাহির হইবে বলিয়া সে পথে যাত্রা করিতেছিল, তখনই দৈবের এ কি অঘটন!

সামান্য নহে। লক্ষ মুদ্রা! কল্পনা করিতেও ভয় হয়। রাজেন্দ্র হাসিবে কি কাঁদিবে, ভাবিয়া পাইল না।
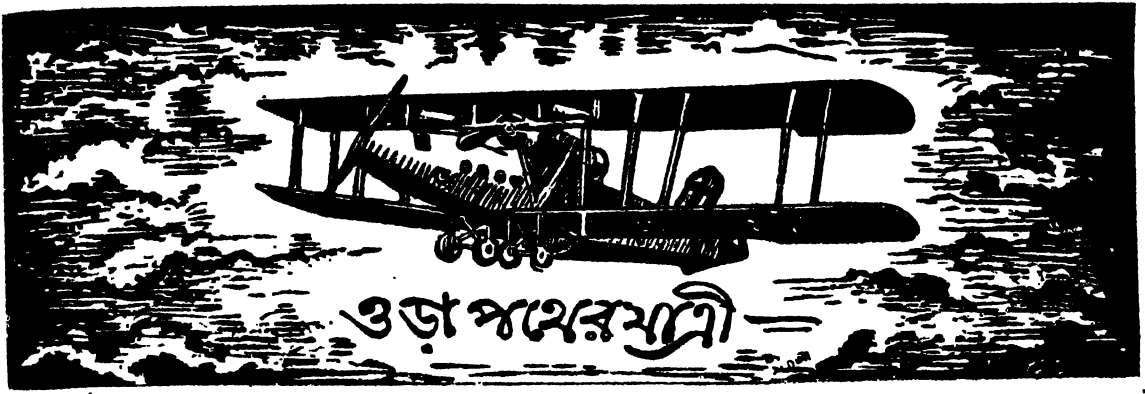
আকাশ-পথে

এরোপ্লেনের গাড়ি এখন এমন সহজ ও নিরাপদ হয়ে উঠেচে যে, খুব nervous লোককেও এ পথের পথিক হবার জন্য আমরা আশ্বাস দিতে পারি।

অনেকে প্রশ্ন করেন, বলেন,—ওড়া পথে এত কিসের আনন্দ হে বাপু? এ কথার জবাবে বলি,—সুখাদ্যের স্বাদ, বা সুদৃশ্য উপভোগের নিখুঁত আনন্দটুকু বর্ণনার কৌশলে ঠিক বুঝিয়ে দেওয়া যেমন সম্ভব নয়, ওড়া পথের আনন্দও তেমনি ভাষায় জানানো অসম্ভব! রসগোল্লা যে খেয়েচে, সেই তার স্বাদ জেনেচে—না হলে রসগোল্লার স্বাদ বর্ণনায় বোঝাতে পারেন, এমন শক্তিধর কবির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি পরম সন্দিহান!

ওড়া পথে অতি নিমেষে বহু দূর পথ অতিক্রম করা চলে। দুর্গম পর্ব্বত-শিখর বা দুস্তর সাগর অতিক্রম করতে এমন নিরাপদ যান আর নাই। তা ছাড়া দৃশ্য-বৈচিত্র্য উপভোগের আনন্দ আকাশ-পথে যেমন, স্থল বা জল-পথে তেমন নয়। কত সুদূর-বিস্তৃত প্রান্তর-প্রদেশ, সুদীর্ঘ মরু-ভূমি, সাগর-বক্ষের বিপুল বিস্তার—আর কোথাও কি এমন এক ঝলকে দেখা চলে! এ সংখ্যায় প্রকাশিত নানা দেশের বিচিত্র চিত্রগুলি থেকে পাঠক-পাঠিকা সে সৌন্দর্য্য-সুখের কতক আভাস পাবেন।

নিরাপদ পথের কথা তুলেছিলুম। আকাশ-পথ এখন এমন নির্ব্বিঘ্ন যে, ঘোড়-দৌড়ের বাজীর মত এরোপ্লেনে ওড়ার বাজীও নানা দেশে প্রচলিত হয়েচে। বিলাতে এ বাজী প্রায় চলছে। তাতে ওড়ার কত কৌশলই যে কত ছাঁদে দেখানো হচ্ছে, তার ছবি দেখলেও প্রাণ শিউরে ওঠে! এ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে দমদমার এরো-ক্লাবের প্রথম বার্ষিক উৎসবে এরোপ্লেনে যে-সব ক্রীড়া-কৌশল দেখানো হয়েছে, তা দেখে অনেকেই প্রচুর বিস্ময় বোধ করেচেন। বেলুন ফাটানো, বিচিত্র ভঙ্গিমায় এরোপ্লেন চালানো, (ফর্ম্মেশন ফ্লাইট) সার দিয়ে ওড়া···সে সব কৌশল দেখানো যে সম্ভব, তা দেখার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও কল্পনা করিনি। এ দেশে এরোপ্লেন-প্রচেষ্টার এই তো সবে পত্তন! সে খেলায় বাঙালীর মধ্যে বন্ধু শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার দাস মহাশয়ও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বাঙালীর পক্ষে গৌরবের কথা, সন্দেহ নাই!

তার পর এরোপ্লেনের গতির বেগ সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে যে, এত বেগে গাড়ি স্থলে-জলে সম্ভব নয়। ছয় দণ্ডে চলে যায় ছদিনের পথ! ছেলেবেলায় পদ্যপাঠে পড়েছিলুম—এ কথা রেল-গাড়ীর সম্বন্ধে লেখা। এরোপ্লেনের বেলায় বলতে পারি, ছয় দণ্ডে চ'লে যায় ছ'মাসের পথ! তার উপর যত বেগেই এরোপ্লেন চালাও, কারো ক্ষতি বা আশঙ্কার কারণ ঘটে না। প্লেন-যাত্রায় অস্বাচ্ছন্দ্য মোটে নাই। পাইলট্ খুশী-মত এরোপ্লেনে ব'সে লেখাপড়া, পানাহার সবই করতে পারেন—গতি নিয়ন্ত্রিত ক'রে চক্ষু মুদে নিদ্রা যান—কোনো ভয় নাই। এ কথা পথের মোটর, বা জলের ষ্টীমার সম্বন্ধে মোটেই খাটে না।

এরোপ্লেনে চ'ড়ে কত দীর্ঘ পথ কি অল্প সময়ে অতিক্রম করার চেষ্টা চলেছে, তা আমরা সকলেই জানি। এই সেদিন এমি জনশন কি কীর্ত্তিই করলেন! ম্যাথুশ আর হুক বেচারাদের প্রাণ-হানি ঘটলো—সে অবশ্য আকাশ-পথের ···প্লেনের জন্য নয়। তাঁদের বিচার-বুদ্ধিই এ ···নার জন্য দায়ী।

কলিকাতা—রেশ-কোর্স
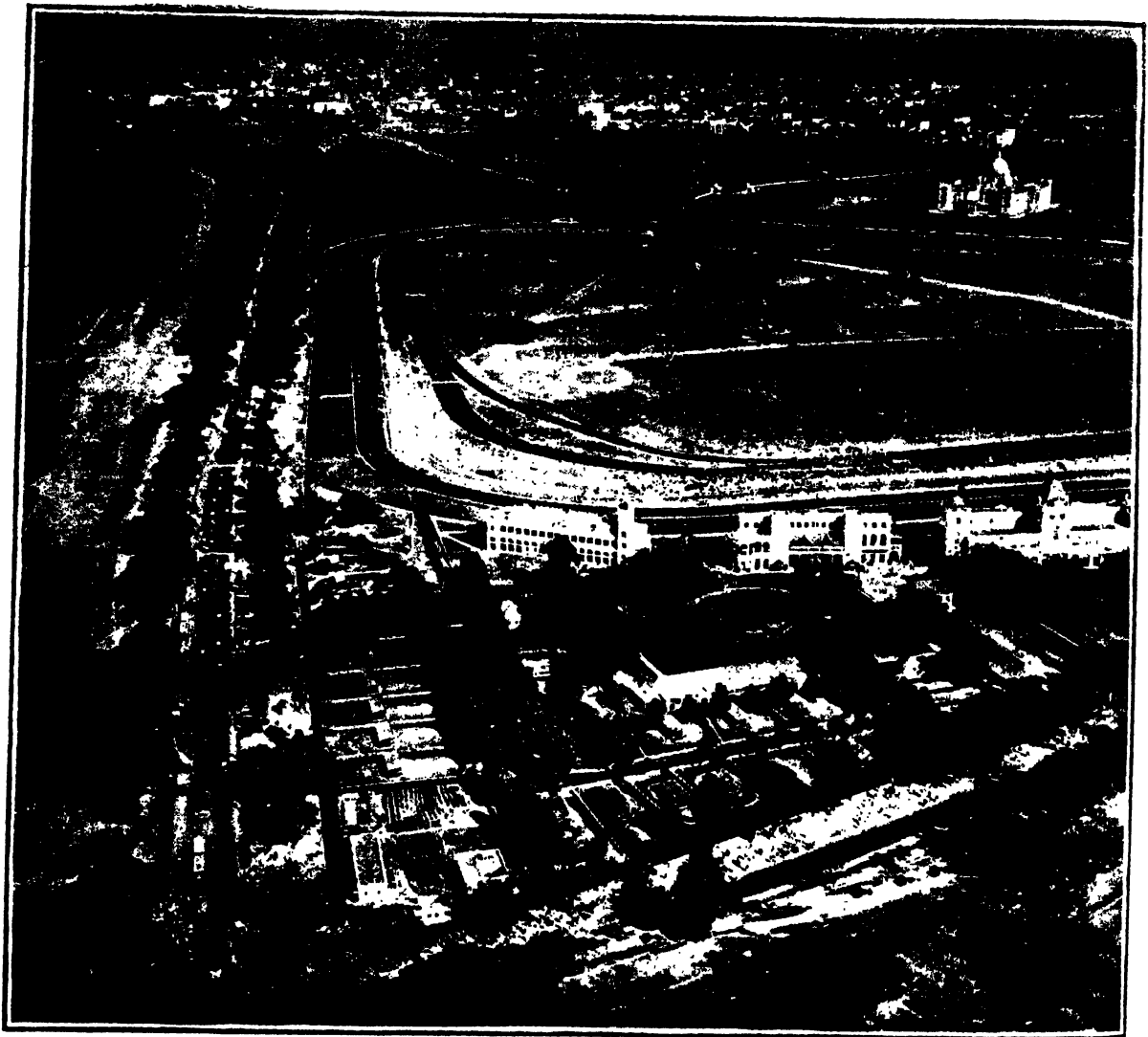
গোঁয়ার্ত্তুমিই বিপদের কারণ। সেই যে প্রবাদ আছে, অতি-দর্পে হতা লঙ্কা,—অতি-লোভে চ কৌরবাঃ॥ সে বচন এরোপ্লেন-যাত্রার ব্যাপারে হুবহু খাটে। আমরা বার বার বলেছি এবং এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ওড়া-পথে বিপদ যা ঘটে, তা ঐ অতি-বিশ্বাস, বা গোঁয়ার্ত্তুমির ফলে। এ পর্য্যন্ত ওড়া-পথে যতগুলি দুর্ঘটনা ঘটেচে, তার কারণ সম্বন্ধে প্রচুর তদারক আর আলোচনা হয়েচে। দু'জন পাইলটে একবার তর্ক ওঠে, কে বেশী দিয়ে উড়তে চললেন—ভারী রেষারেষি। এক জন উঁচে ওঠেন তো আর-এক জন তাঁকে টক্কর দিয়ে আরো উঁচে! শেষে তার ফলে দু'খানি রথে শূন্যপথে সংঘর্ষ। কিন্তু এমন ঘটনা বিরল।

দুর্ঘটনার অন্য কারণ যা নির্ণীত হয়েচে, তা এই— Bad technic ; bad judgment আর carelessness.

Bad technic—শিক্ষার অসম্পূর্ণতার ফল। প্লেন শূন্যপথে তোলবার পূর্ব্বে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
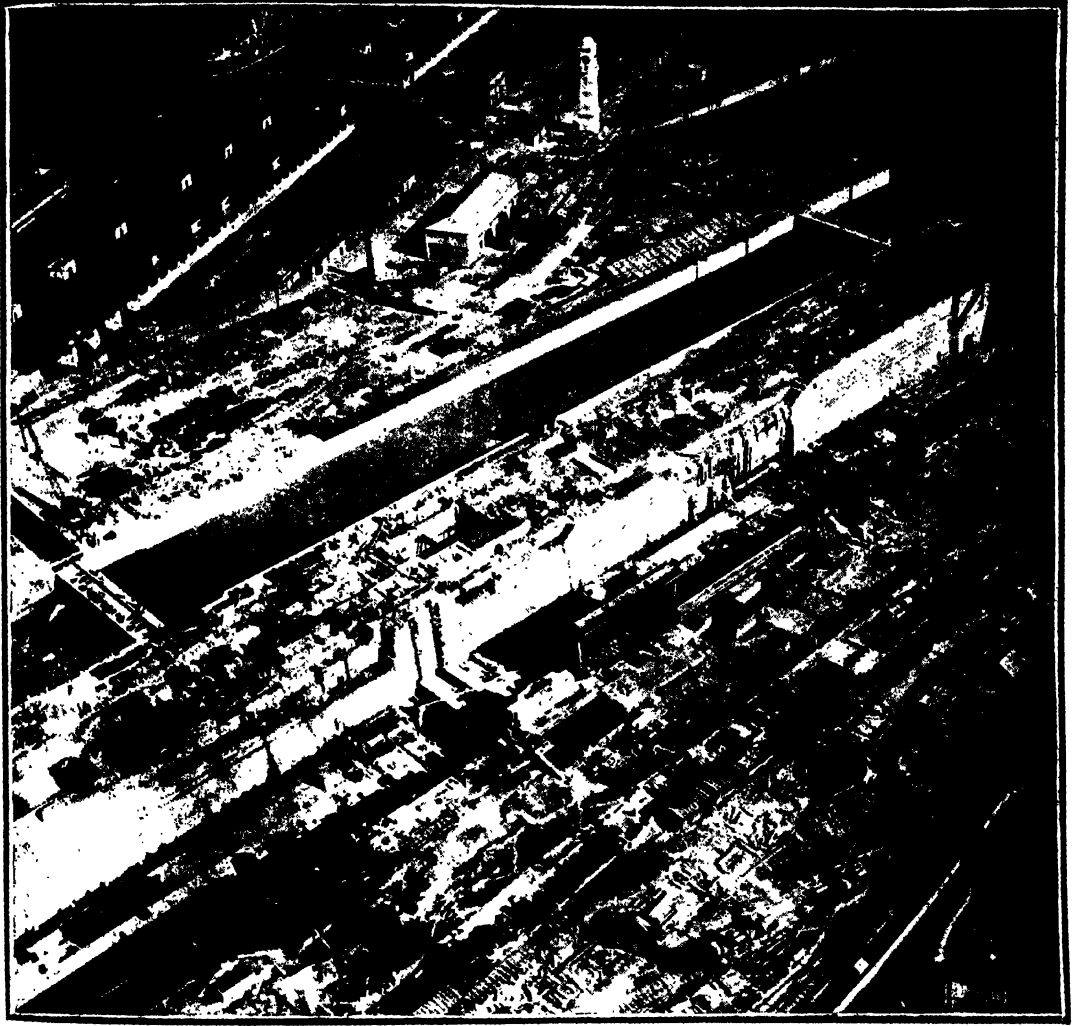
কলিকাতা—কিং জর্জ্জ ডক্

কি না, পেট্রোল কেমন ভরা আছে—সে-সব দেখা। এ একেবারে গোড়ার কথা। পেট্রোল না হলে রথ চলবে না, কাজেই এ দিক্‌টায় হুঁসিয়ার হওয়া সহজ কথা। যন্ত্রপাতির খুঁটী-নাটী দেখে নেওয়া সম্বন্ধে এতটুকু গাফিলি মহা-অনর্থপাত ঘটাতে পারে! অতএব ওদিকে শৈথিল্য না ঘটে। যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান থাকাও দরকার।

যন্ত্রপাতির কথা বলতে একটা কথা মনে পড়লো। একদিন অপরাহ্ণে দম্‌দমা থেকে পাড়ি দিয়েছিলুম বালির দিকে। কাশীপুরের কাছে আসতে হঠাৎ বুঝলুম কোথায় কি বাধচে। পাখার চলাচলে একটু যেন টান। চারিদিকে লক্ষ্য করলুম—দেখি, কার ঘুড়ি বুঝি কেটে যাচ্ছিল, তার প্রায় মাইল খানেক সুতা পাচ সাত ফেরতা ঘুরে দুদিককার পাখনা-ছুটোয় টাইট্‌ভাবে জড়িয়ে গেছে। শূন্যপথে সে সুতা কাটবার চেষ্টা ব্যর্থ হলো, কাজেই দম্‌দমায় এরোড্রোমে ফিরে এলুম; এবং সুতা টেনে দেখি, এক-লাটাই বোম্বাই সুতা—পাঁচ ...লো সে সুতা খুলতে!

তুচ্ছ ব্যাপার—হয় তো সুতার টানে কোনো

বক্‌বক্‌

এসেচেন। তিনি করাচি থেকে বিলাতে গেছলেন। তাঁর সে পাড়ির বিবরণ দিয়ে আজকার পালা শেষ করি।

গত ৩রা মার্চ্চ তারিখে মিষ্টার চৌলা করাচি এরোড্রোম ত্যাগ করেন বেলা পৌনে ৮টায়। তাঁর সহযাত্রী ছিলেন মিষ্টার এঞ্জিনিয়ার। করাচি ছেড়ে চার ঘণ্টায় তাঁরা আসেন গদরে। গদরে পেট্রোল নেন। এক ঘণ্টা পরে গদর ছেড়ে তাঁরা যাস্কের পথে পাড়ি দেন। যাস্ক থেকে ১ শত মাইল দূরে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির মুখে পড়েন। তাতে গতির বেগ মন্থর হয়—আর কোনো উপা... সে দিনকার মত যাস্কে বিশ্রাম।

৪ঠা মার্চ্চ তারিখে বেলা ৬-৩০ মিনিটে যাস্ক ছেড়ে তাঁরা বসরার অভিমুখে যাত্রা সুরু করেন। বুশায়ারের কাছে আবার খুব ঝড়ের সঙ্গে দেখা। সন্ধ্যায় এসে পৌছুলেন বসরায়। পরদিন বসরা থেকে বাগদাদ। এর পর মরু-প্রান্তর পার হতে হবে। সে জন্ত যথারীতি ব্যবস্থাও করা হলো।

৭ই মার্চ্চ তারিখে বেলা ৯টায় গাজার পথে পাড়ি। ডেড-সীর উপর প্রচণ্ড মেঘে দিগ্‌দিগন্ত আঁধারে আচ্ছন্ন ... এলো—চোখে কিছু দেখা যায় না। ম্যাপের সাহায্যে ... নির্দ্দেশ ক'রে তাঁরা

কলিকাতা—প্রিন্সেপ-ঘাট ও ফোর্ট উইলিয়ম

পাহাড় ছিল ; পাহাড়ের গায়ে অন্ধকারে পাছে ধাক্কা লাগে, এজন্য ৬ হাজার ফুট উর্দ্ধে তাঁরা ওঠেন। অত উর্দ্ধে ওঠার দরুণ শীতে হাত-পা কাঁপতে থাকে। জেরুশালেম পর্য্যন্ত এই ঘন মেঘের অবিচ্ছিন্ন বিস্তার। তার পর পাহাড় অদৃশ্য হয়, এবং মেঘও কাটে—এবং তাঁরা গাজায় এসে পৌছান। গাজায় পেট্রোল ভরে অবিলম্বে আবার পাড়ি সুরু হয়। সুয়েজ কেনালে বিশেষ কিছু ঘটে নি। তার পর তাঁরা সন্ধ্যায় আসেন হেলিওপোলিতে। এখান থেকে মার্শা মৎরূহুট হয়ে উত্তর-আফ্রি[illegible] অঞ্চলের সোলাম ; সোলাম থেকে বেঙ্গাজি। বেঙ্গাজিতে এসে কথা কওয়া দায় ঘটে। কেউ ইংরাজী জানে না। ইতালীয় কন্সল দোভাষী আনান এবং সেই দোভাষীর মারফৎ তখন আলাপ-পরিচয় হয়।
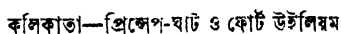
১০ই মার্চ্চ প্রাতে বেঙ্গাজি ছেড়ে তাঁরা আসেন সার্ত্তেক ; সার্ত্তেকের পর হোম্‌স্ ; হোম্‌সএর কাছে ভীষণ শিলা-বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাতের দেখা পান। এরোপ্লেন নিয়ে ঝড়ের তাণ্ডব খেলা চলে। ফলে কল চালানোয় বিঘ্ন ঘটে। চৌলা বলেন, [illegible] ছিল, পাখা পাছে ভাঙ্গে, কল পাছে থামে ! [illegible] সমতল ভূমির সন্ধান করেন। ভূমি মেলে—

গঙ্গার তীর

ঘন খেজুর-বনের ফাঁকে খানিকটা মাত্র জায়গা। সেখানে রাজ্যের ভেড়া চরছে। যেন ভেড়া-ক্ষেত্র! নিরুপায় হয়ে সেই মেষচারণ-ভূমির এক কোণে তাঁরা প্লেন নামালেন। নামাবামাত্র চারিদিক থেকে আরবের দল এসে তাঁদের ঘিরে দাঁড়ালো। সর্ব্বনাশ! এরা বন্ধু, না, শত্রু—কে জানে! তবু বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ—ব'লে সেই যে কথা আছে, তারি উপর নির্ভর ক'রে সেলাম ঠুকে চৌলা বললেন—সেলাম আলেকম্! তারা আরবী ভাষায় প্রশ্ন করলে—চৌলা মোশলেম্ কি না? চৌলা বললেন, তিনি মোশলেম্। তখন আরবের দল কাছে এলো, এসে পরম বন্ধুভাবে তাঁদের গ্রহণ করলো। অমনি আতিথ্যের ধুম বাধলো! কেউ আনলো দুধ, কেহ আনলো ৫ নিয়ে এলো ডিম। এঞ্জিনীয়ারের চার্জে প্লেন

চললেন ইতালীয় কর্ত্তৃপক্ষের কাছে—প্লেনের মেরামতী প্রভৃতি করা চাই! কেন না, এইবার ভূমধ্য সাগরের উপর দিয়ে পাড়ি। ১০ মাইল দূরে এক অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সুতরাং সাহায্য মিললো।

তার পরদিন ভূমধ্যসাগর লক্ষ্য ক'রে পাড়ি। এ পথেও মেঘ আর ঝড়, ঝড় আর মেঘ···বহুকষ্টে মাল্টায় এসে তারা নামেন। ঝড়ের বেগ এমন প্রখর ছিল যে, চৌলা বলেন, প্লেনের পিছনে ল্যাজে বুঝি-বা কি ফ্যাশাদ বাধে! ঝড়ের দরুণ মাল্টায় দুদিন থাকতে হয়।

১৩ই মাঘ মাল্টা থেকে নেপল্‌স্। এখানেও ঝড়-জলের বিঘ্ন-মূর্ত্তি! ১৫ই মার্চ্চ চৌলা রোমে আসেন; পরের দিন রোম থেকে মার্শেল্‌স্। এ-যাত্রায় ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময় লাগে। এ পথটুকু ৫০ ফুট উর্দ্ধপথে পাড়ি

দিয়েছিলেন। মিষ্টার এঞ্জিনীয়ার পথের একঘেয়েমি কাটাবার উদ্দেশ্যে নভেলের মধ্যে মগ্ন ছিলেন। মার্শেলস্ থেকে লায়ন্স—তার পর লায়ন্স থেকে পারি। পারির কাছে কুয়াশার বাষ্পে চারিদিক এমন আচ্ছন্ন ছিল যে, বিখ্যাত এফিল-টাওয়ার অবধি লক্ষ্য হয় নি। সেখানে শিলাবৃষ্টির অত্যাচারও ছিল। ক্যালে থেকে ইংলিশ-চ্যানেল দেখতে পান—তখন আসেন ডোভারে। এখানে এক ডুবন্ত ষ্টীমারের সঙ্গে দেখা হয়; এবং পথ হারিয়ে নর্থ শী ধ'রে তাঁরা চলেন। কাছে ম্যাপ ছিল না; ব্যাপার হয়ে উঠেচে। মোটরে চ'ড়ে দেশ-ভ্রমণে বিদ্যুতের ঝাপটার মত বিচিত্র দৃশ্য-মাধুরী চোখের সামনে ফুটে ওঠে—নিমেষের জন্য। ঘর-বাড়ী, বন-জঙ্গল, পাহাড়-নদীর বাধা আছে—এরোপ্লেন-যাত্রায় এ বাধা ঘটে না। মোটর-ভ্রমণে নব নব দৃশ্য-মাধুরীর অংশমাত্র আমরা চোখে দেখি—এরোপ্লেন থেকে এই মাধুরীর সমগ্র বিশালতাটুকু আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেখানে খুশী নামা যায় না, এইটুকুই যা অসুবিধা। কিন্তু চট্ ক'রে নামবার ইচ্ছাও হয় না। কত দূর-দূরান্তরের আদরা ছবি চোখের উপর ভাসতে থাকে, তার আকর্ষণ বড় অল্প নয়!
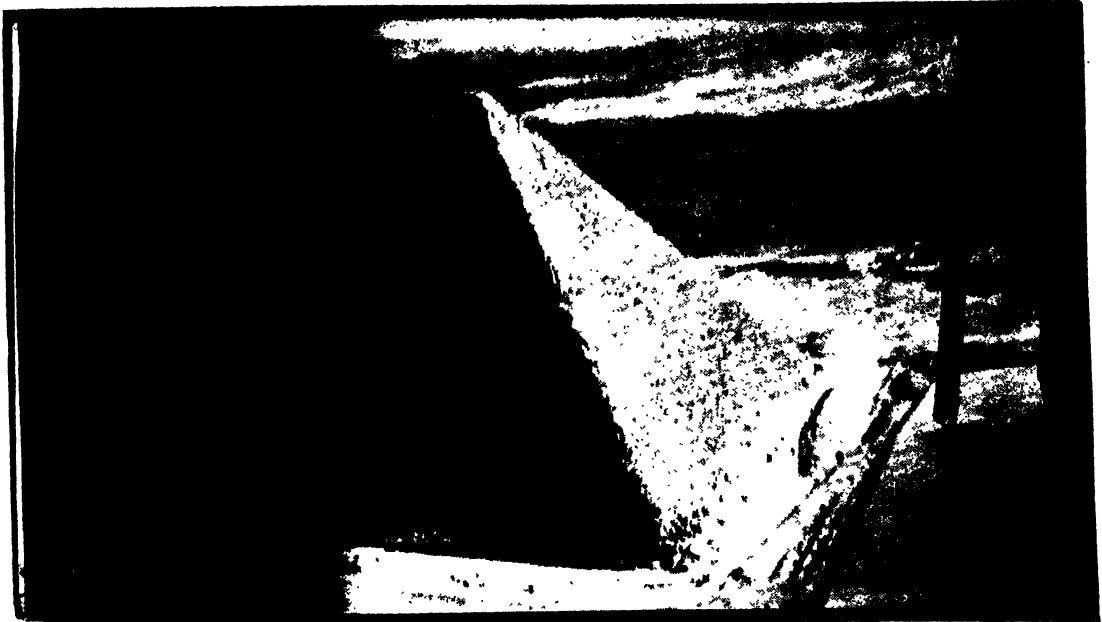
এরোপ্লেন হইতে পিরামিডের দৃশ্য

ক্রয়ডনে নামার বাসনা ছিল। কিন্তু ম্যাপ না থাকায় দিক্‌বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে অবশেষে তাঁরা এসে নামেন মাগুফোর্ড নামে এক গ্রামে। তার পরদিন ম্যাপের মারফৎ দিক্ ঠিক ক'রে কুয়াশা ঠেলে ক্রয়ডনে পৌঁছান। মাগুফোর্ড থেকে ক্রয়ডন ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত।

চৌলার কাহিনী পড়লে ওড়াপথে ভ্রমণের বাসনা প্রবল হয়। বাসনা আছে, মেঘের ঘোর কাটলে ভারত-প্রদক্ষিণে বার হবো। উত্তরে দার্জ্জিলিং—পশ্চিমে পাটনা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী—দক্ষিণে মাদ্রাজ বোম্বাই…

এরোপ্লেনে চ'ড়ে দেশ-দেশান্তরে বিচরণ য়ুরোপে নিত্যকার

স্থলপথের মায়া কাটিয়ে জলপথের উপর দিয়ে ওড়ায় আনন্দ আরো বেশী। মাথার উপর অসীম অনন্ত আকাশ, নীচে বিপুল-পাথার জলরাশি…তা ছাড়া হাওয়া-পথে 'বাম্প' (ধাক্কা) এতটুকু পাওয়া যায় না। স্থলপথে বায়ু-তরঙ্গ একটানা স্রোতে বয় না—পাহাড়, ঘন গাছপালা প্রভৃতি থাকার দরুণ বাতাস কোথাও ঘনতরের, কোথাও বা একটু হালকা। দু'রকম বাতাস যেখানে মিশেচে, সেখানে এরোপ্লেন এলে একটু ধাক্কা লাগে। পথে মোটরে যেতে 'খানা-খোন্দলে' যেমন ধাক্কা লাগে, এ 'বাম্প'ও তেমনি!

[illegible] Air Surveys কর্ম্মাধ্যক্ষ মিষ্টার রেনহাম্

মরুভূমির উপর মেঘ এবং ছায়া

বিসুবিয়স্ আগ্নেয়-পর্ব্বত
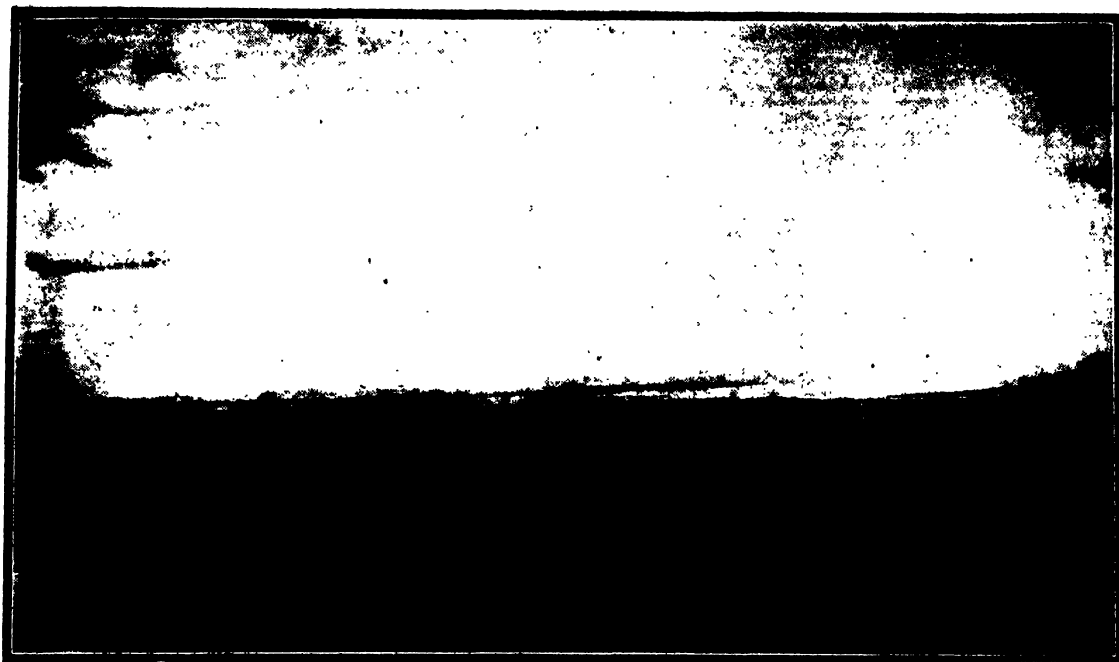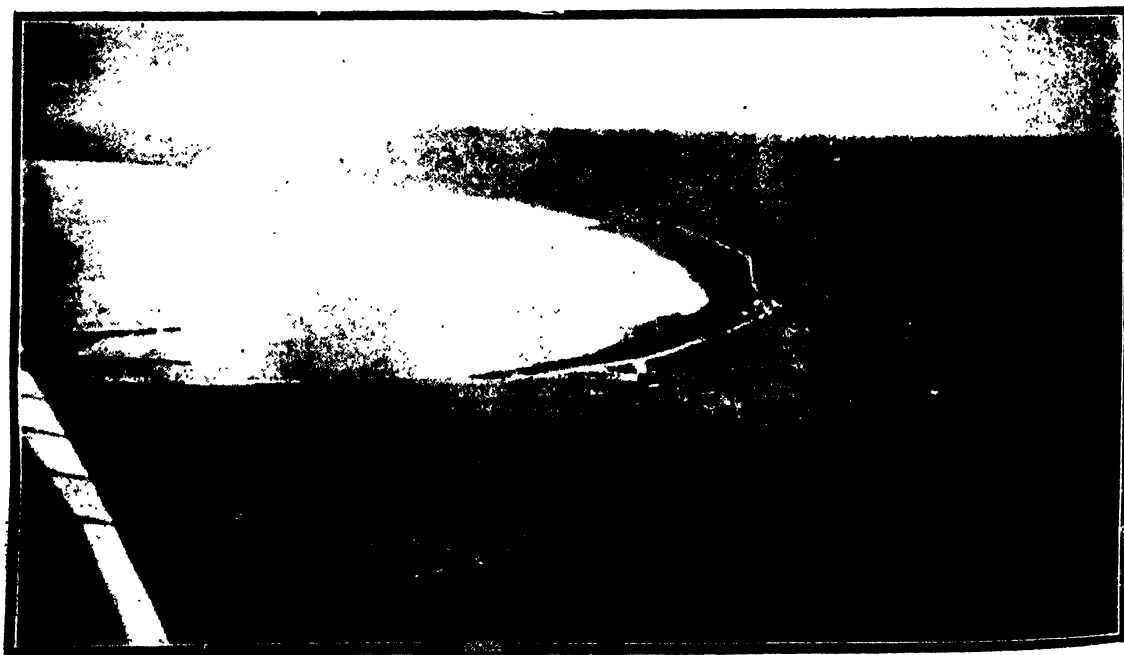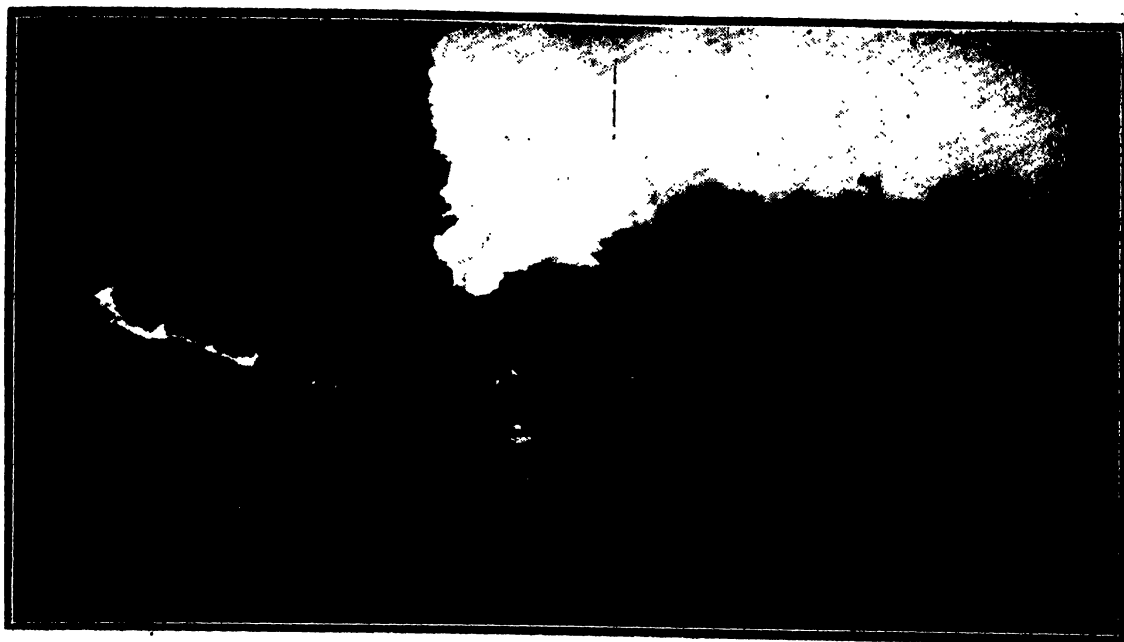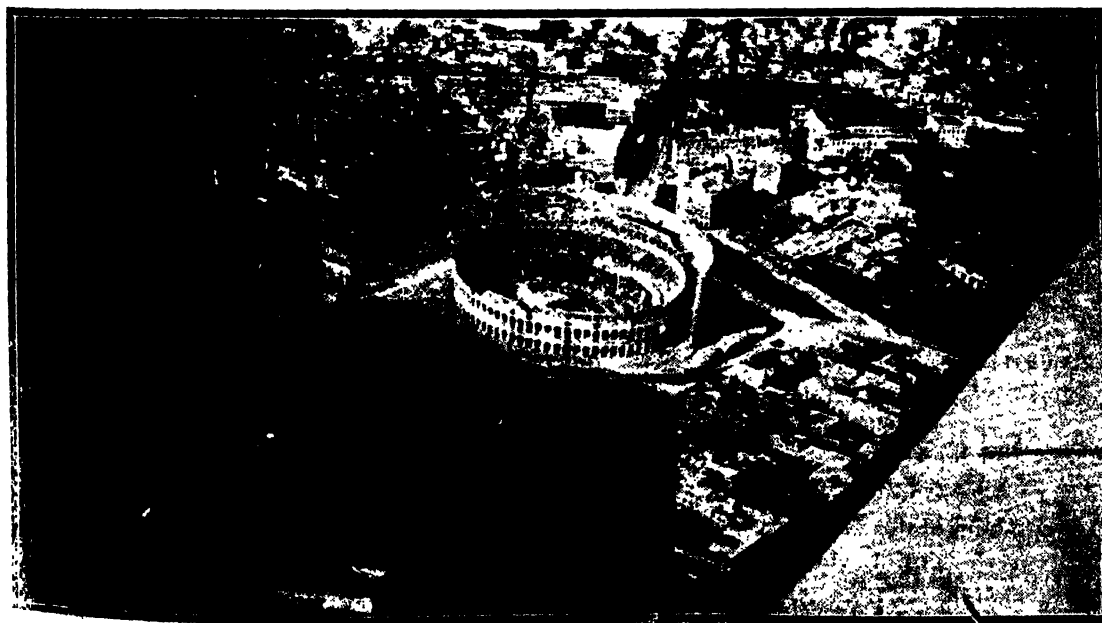
এরোপ্লেন থেকে নেওয়া ভারতের ক'খানি ছবি ছাপবার অনুমতি দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

একটি ইতালীয় গ্রামের দৃশ্য

দমদমার শিক্ষাগুরু মিষ্টার ওয়ার্ণার ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডন থেকে কায়রোয় উড়ে গিয়েছিলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি লণ্ডন ছাড়েন এবং কায়রোয় গিয়ে নামেন ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। যে দৃশ্য-মাধুরী তিনি এ-পথে উপভোগ করেছিলেন, ফটোর সাহায্যে অপরকে তা উপভোগ করাবার বাসনাও তাঁর দুর্দ্দম হয়ে জেগেছিল। তাঁরি তোলা ভারতের বাহিরের ক'টি ছবি আমরা এই সঙ্গে ছাপলুম—এ ছবিগুলি সাদরে তিনি ছাপতে দিয়েচেন, এ জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করচি। এ পথে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ক'জন বান্ধব আর বান্ধবী। পাঠক-পাঠিকা এ ছবিগুলি দেখে বুঝবেন, আকাশ-চারীর চোখে পৃথিবী আরো কত সুন্দর সজ্জিত ঠেকে!

এ-সব ছবি দেখে চর্ম্মচক্ষে সে দৃশ্য-মাধুরী উপভোগের বাসনা কার না মনে জাগে? বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নদ-নদী, নগর-গ্রাম—চোখের সামনে ভারত-মাতার অঞ্চলে বিছানো ঐ শোভা-সম্ভার—এ-শোভায় দেবতারও মন টলে! ভারতের এ বিচিত্র শোভা আকাশ-পথে উঠে দেখার সৌভাগ্য যদি ঘটে, তুলির লেখায় তার আভাস যথাশক্তি দেবার প্রয়াস পাবো।

শ্রীভবদেব মুখোপাধ্যায়।

শিউলীর ব্যথা

অভিমানে চোখ তোলনি দিনের আলোয় কওনি কথা,
কুঁড়ির ভেতর গুমরে ছিলে বোঝেনি কেউ তোমার ব্যথা।

চন্দ্র যখন উঠ্‌লো হেসে
তুমি আবার নূতন বেশে,
উঠ্‌লে জেগে কুঁড়ির ভেতর
চাইলে তুমি অধীর চাওয়া,
জ্যোৎস্নারাতে কার মিলনে
গানটি তোমার হ'ল গাওয়া।

কার পরশে মেল্‌লে আঁখি
দেখ্‌লে কাকে আকাশ পানে?
বাতাস কাহার গোপন ব্যথা
বল্‌লো তোমার কাণে কাণে?
তাঁর ব্যথাটি চোখের কোণে,
উঠ্‌লো ভেসে সঙ্গোপনে,

হাস্‌লে তুমি ব্যথার হাসি
অমনি মধুর জ্যোৎস্নারাতে,
শিউলীরাণি! ব্যথার ছবি
উঠ্‌লো ফুটে ধরার গাতে।

কাট্‌লো তোমার সারারাতি
চাঁদের আলোয়, পাখীর গানে,
ক্ষণিক মিলন তাইতে বুঝি
চাইলে তুমি আকাশ পানে।

কিন্তু তোমায় একলা ফেলে,
কোথায় তারা গেল চ'লে,
বিরহে তার শিউলীরাণী
তাইতে বুঝি এমনি ভোরে,
ধরার বুকে আপন মনে
অধীর হয়ে পড়্‌লে ঝ'রে

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ [illegible]।

শয়তানের শৃঙ্খল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২) পশ্চিম-হুগলী জিলা—আরামবাগ, ঘাঁটাল, তমলুক মহকুমা

এই অঞ্চলকে একটা বাটি অথবা "পিরিচ" (Sauer)এর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। ইহার চারিদিকে উঁচু জমী এবং ভিতর অংশ অপেক্ষাকৃত নীচু। ইহাতে যে কয়েকটি নদী আছে, তাহা বর্ষাকালে সময় সময় অতিভীষণ হয় এবং গ্রীষ্মকালে অতি ক্ষীণকায়া ও জলশূন্য হয়। কতকগুলি নদী ও খাল পূর্ব্বে প্রবহমান ছিল, এখন তাহা শুকাইয়া "ভরাট" নিম্ন জমী হইয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলে দুই রকম বাঁধ (Embankment) আছে—[১] গবর্ণমেণ্টএর পূর্ত্ত বিভাগ দ্বারা সংরক্ষিত বাঁধ এবং [২] "জমীদারী"—অথবা ভেড়ীর বাঁধ। ভাগীরথী নদী সম্বৎসর প্রবহমান থাকে এবং অন্য নদীগুলি হয় ভাগীরথী হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাহাতে পড়িয়াছে কিম্বা ছোট-নাগপুর পাহাড়শ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। হাওড়া-ব্যাণ্ডেল রেল-লাইনের পশ্চিমদিকে যদি যাওয়া যায়, তবে যে সব নদী ও খাল শুষ্ক ও ক্ষীণপ্রাণ অবস্থায় এখন বর্ত্তমান আছে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে সরস্বতী, বেহুলা, কাণা নদী, কৌশিকী, কুন্তী (মগ্‌রার খাল), বৈঞ্চবাটিখাল, শ্রীরামপুর খাল, ঘিয়া, বালিখাল, রণভেন্দি প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। সরস্বতী নদী ত্রিবেণীর নিকট উৎপন্ন হইয়া হাওড়া জেলার সাঁকরাইল নামক স্থানের কাছে পুনরায় ভাগীরথীতে পড়িয়াছে ; ইহা যেন স্থানে স্থানে শুষ্ক ও লুপ্ত হইয়াছে। এই কয়েকটি নদীতে বর্ষার সময় এখন এমন বেশী জল যায় না এবং জল বেশী হইলেও তাহা স্থানে স্থানে এমন আবদ্ধ অবস্থায় থাকে—যাহাতে ভাগীরথীতে বেশী জল প্রবাহিত হয় বলা যায় না। হুগলী জেলার অনেক স্থানে নদীকে "কাণা নদী" বলা হয়। সব "কাণা নদী" এক নয়, যেমন "কাণা দামোদর, কাণা সরস্বতী, কাণা দ্বারকেশ্বর" ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন, "কাণা" কথাটির অর্থ "অন্ধ" অথবা আবদ্ধ নহে (ভরাট হইয়া [illegible]), বরঞ্চ তাহা "কাওনা" অথবা "কহনা" (কৃত্রিম উপায়ে [illegible]) কথার অপভ্রংশ। জমীদারী বাঁধের কথা বিবেচনা করিলে এরূপ অর্থ করা অসঙ্গত হইবে না। তারকেশ্বরের পশ্চিমে যে সব বড় নদী আছে, তাহার মধ্যে দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, [illegible]কেশোর অথবা ধলকমার, সাঁকরা, ঝমঝমি, রূপনারায়ণ, শিলাবতী, কশাই, আমোদর প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। ইহা ভিন্ন কতকগুলি শাখা নদী ও খাল আছে, তাহাদের কথাও বাদ দেওয়া যায় না। যেমন বেগুয়ার হানা, বলরামপুর খাল, কবচিয়াখাল, ভারাজুলী খাল, হুড়হুড়িয়া, পানশিউলী ইত্যাদি।

এই প্রদেশে নদী ও খাল এবং জমীর গড়ান কোন্ দিকে কিরূপ, তাহা বলিতে গেলে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় যে, ভাগীরথী (হুগলী) নদীর fall প্রতি মাইলে ৩ হইতে ৩৷৹ ইঞ্চি, দামোদর নদীর গড়ান প্রতি মাইলে ১ ফুট (১০ হইতে ১২ ইঞ্চি) এবং দ্বারকেশ্বর নদীর fall প্রতি মাইলে প্রায় ১৷৹ ফুট কিম্বা ১৷৹ ফুট করিয়া। বৈদ্যবাটী হইতে গড়বেতা পর্য্যন্ত যদি একটা রেখা টানা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, বৈদ্যবাটী হইতে তারকেশ্বর ৬ ফুট উঁচু, চাঁপাডাঙ্গা ৮ ফুট উঁচু, মায়াপুর ১২ ফুট, আরামবাগ ২২৷৹ ফুট, বদনগঞ্জ ও গড়বেতা প্রায় ৩০ ফুট উঁচু। (বৈদ্যবাটী হইতে গড়বেতা প্রায় ৬০ মাইল দূর হইবে)। ছোট-নাগপুরের পাহাড়শ্রেণী হইতে জলস্রোত পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে পূর্ব্বদক্ষিণদিকে গিয়াছে এবং তাহা ক্রমশঃ পশ্চিমদক্ষিণদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। উত্তর-দক্ষিণে জমীর সাধারণ slope বা ঢাল এবং levelএর অবস্থা অনেকটা এই প্রকারের ধরা যায়। গবর্ণমেণ্টের জল-সেচ ও পূর্ত্ত বিভাগ হইতে দামোদর, ঝুমঝুমি, সাঁকরা, শিলাবতী এবং কশাই ও রূপনারায়ণের ধারে ধারে বাঁধ (Embankment) দেওয়া হইয়াছে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হইতেছে। ইহা ভিন্ন অনেক স্থানে অসংখ্য ছোট বড় ভেড়ীর বাঁধ দেওয়া আছে। দামোদর নদে বর্ষাকালে যত অধিক পরিমাণে জল প্রবাহিত হয়, তাহা অনুমান করার জন্য বলা যাইতে পারে যে, বর্দ্ধমান সহরের নীচে (দক্ষিণে ও পশ্চিমে) প্রতি সেকেণ্ডে ৬ লক্ষ কিউবিক ফুট জল প্রবাহিত হয়। সেলালপুরের নিকট তাহা ১৬৩, ৬৮১ ফুট (কিউবিক) পরিমাণ "নিকাশ" পায় এবং আম্‌তার নিকট ৭৬, ৯১৫ কিউবিক ফুট জল যাইতে পারে। দ্বারকেশ্বর ও অন্যান্য নদী সম্বন্ধে এরূপ সংখ্যাগুলি অনুমান করা যাইতে পারে। বাঁধ দেওয়ার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে বর্দ্ধমানের নীচে দামোদর নদে যত অধিক পরিমাণে জল আসে, তাহা সহজে বাহির হইতে পারে না বলিয়া বর্দ্ধমানের নিকটে এবং শিলিমাবাদ খানপুরের নিকট একটি খাল (Eden canal) কাটিয়া দেওয়া হয় এবং আরও কতকগুলি নাতিবৃহৎ

খাল কাটানোর বন্দোবস্ত ও আয়োজন চলিতেছে। প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বেগুয়া নামক স্থানে দামোদরের পশ্চিম ধারের বাঁধ (প্রায় ২০ মাইল ও পরে ১০ মাইল) কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে "বেগুয়ার হানা" নামক একটি নদী বাহির হইয়া আরামবাগ মহকুমার প্রায় ৩।৪ ভাগ ভূমির উপর প্রতিবৎসর বন্যার সৃষ্টি করিতেছে। এই সমগ্র অঞ্চলের বন্যা-প্রপীড়িত স্থানের বিস্তৃতি প্রায় ৭ হাজার বর্গ-মাইল এবং তাহার লোক-সংখ্যা বহু লক্ষ।

দামোদর নদে কবে প্রথম বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না; পূর্ব্বে কি রকম বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কোন বিবরণও জানা যায় না। পূর্ব্বে নদীর দুই ধারেই বাঁধ ছিল, এখন পশ্চিম পাড়ের বাঁধ গবর্ণমেণ্ট আর রক্ষণাবেক্ষণ করেন না। কেহ কেহ অনুমান করেন, ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মাণ করা হয়। সরকারী বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে দামোদর নদের বাঁধ নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য বর্দ্ধমান-রাজ সরকারকে সদর রাজস্ব হইতে ৬০,০০১৲ (সিক্কা) টাকা "মহকুপ' ও রেহাই" দেওয়া হয়। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট দামোদরের বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ করার ভার নিজ হস্তে লন এবং তজ্জন্য পুনরায় বর্দ্ধমান-রাজ-সরকারকে সদর রাজস্বের উপর ৮০,০০১৲ সিক্কা টাকা বেশী কর দিতে হয়। কয়েক বৎসর পর মণ্ডলঘাট ও চেতুয়া পরগণা বর্দ্ধমানরাজ হইতে হস্তান্তরিত হয়, কিন্তু এখনও বর্দ্ধমানরাজকে ৫৭,৩২০।০ টাকা রাজস্ববাদে কর দিতে হইতেছে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে একটি বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, সে সময় এই অঞ্চলে বাৎসরিক বন্যাপ্লাবন, মর্ত্তামারী, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের ভয় আদৌ ছিল না এবং ইহা "শস্যপূর্ণা বসুন্ধরায়" একটি বড় মনোরম "ধনভাণ্ডার" ছিল। (মোগল বাদশাহদের সময় এখানে অনেক প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল—"গড়মান্দারণ" এখন জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থাতে তাহা প্রমাণ করিতেছে)। তখন এত রকম "ভেড়ীর" বাঁধের প্রচলন ছিল না এবং দামোদরের বাঁধও নিশ্চয় অন্য প্রকারের ছিল (মহানদ নামক স্থানের "জামাই জাঙ্গাল" বাঁধ এবং মুর্শীদাবাদের বাদশাহী বাঁধ তুলনা করা যাইতে পারে)। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বড়রাস্তা Grand Trunk Road এবং East Indian Railway কোম্পানীর রাস্তা ও কলিকাতা বন্দরের James and Mary নামক চর (shoal) প্রভৃতি রক্ষা করার জন্য দামোদর নদের জল কম করার প্রস্তাব হয় ও বেগুয়ার নিকট ২০ মাইল বাঁধ কাটিয়া দেওয়া হয়। প্রবল জলস্রোতে কয়েকটি নদীর সৃষ্টি হয় ও তাহা মুণ্ডেশ্বরী ও কাণা দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া পানশিউলী খাল দ্বারা রূপনারায়ণে জল প্রবাহিত করিয়া দেয়। ইহাতেও যথেষ্ট জল নির্গত হয় না এবং বন্যাতে সমস্ত দেশ (আরামবাগ মহকুমা) ভাসিয়া যায়। বাক্শীতে আর একটি খাল কাটিয়া দামোদরের জল রূপনারায়ণে লওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। এই খালও ক্রমশঃ ভরাট হইয়া আসিতেছে এবং পানশিউলীর সঙ্গে যে "হুড়হুড়িয়া খাল" মিলিত আছে, তাহাও ভরিয়া উঠিতেছে। "রড়ার খাল"ও এখন ক্রমশঃ ভরিয়া আসিয়াছে। জল নিকাশ হইতে গিয়া এখন সব জমী ডুবাইয়া ফেলিতেছে ও জমীও স্রোতের বেগে "তেজে" নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে "বর্দ্ধমান জ্বর" (Burdwan fever)-এর প্রাদুর্ভাব ও প্রকোপ বেশী হয় এবং গত ৭০ বৎসরের মধ্যে তাহা বিশেষ কমে নাই—সমস্ত গ্রাম ক্রমশঃ 'উজাড়' হইয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বকালের নক্সাতে ও ইতিবৃত্তে এরূপ বাঁধের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে পুরাতন "বেণারস রোড" যাহা "অহল্যাবাই" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে এবং এত বৎসরের "ঝড়-ঝাপটা" বন্যাপ্লাবন সত্ত্বেও তাহাতে বড় বড় সেতুর যে স ভগ্নস্তূপ পড়িয়া আছে দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, তখন য এই অঞ্চলে এতটা বন্যা ও প্লাবনের ভয় সামান্যমাত্রও থাকি তবে তিনি (অহল্যাবাই) কখনও কাশীধামে যাওয়ার জ এই রাস্তা পছন্দ করিয়া নির্ম্মাণ করিতেন না। সরকা বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, ১৭৮১—১৭৯১ খৃষ্টাব্দে Captai Rankin এই রাস্তা প্রথম নির্ম্মাণ করেন এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বন্যাতে ইহা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু Estate papers ইহা "অহল্যাবাই রাস্তা" নামেই পরিচিত। এখন আমাদে সেই অতীত গৌরবকাহিনীর কথা মনে করিয়া দীর্ঘ নিশ্বা ফেলাই সম্বল হইয়াছে।

(৩) দক্ষিণ-পূর্ব্ব মৈমনসিংহ জেলা—শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা

এই অঞ্চলের উত্তরে গারো পাহাড়, খাসিয়া ও নাগা পাহাড় পূর্ব্বে স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্যের পর্ব্বতশ্রেণী, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র যমুনা নদী এবং দক্ষিণে মেঘনা নদী। বঙ্গদেশের মধ্যে (বো হয়, পৃথিবীর মধ্যে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) এই অঞ্চ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বৃষ্টিপতন হয়। পাহাড়ের পাশ বাহিয়া এই জ সুরমা, গুমতি, ঘোড়াউতরা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র (মৈমনসিংহে

পূর্ব্বে) ও কংস নদীতে পড়ে। মেঘনা নদী গভীর ও দীর্ঘায়তনের হইলেও এত অধিক জল সহজে "নিকাশ" করিতে পারে না এবং নদীর দু'কূল "ছাপিয়া" উঠে ও সমস্ত স্থান জলে ডুবিয়া যায়। পশ্চিমদিক হইতে আবার ব্রহ্মপুত্র ও যমুনায় অধিক জল আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইয়াও সহজে বাহির হইতে পারে না। (জোয়ার ও ভাটার জন্যও কিছু জল উপরে আবদ্ধ থাকে)। ইহা ভিন্ন কমলাসাগর, "ধর্ম্মসাগর" "সাগরদীঘি" প্রভৃতি কতকগুলি প্রকাণ্ড জলাশয় আছে (Spill reservoir), তাহাতেও কতক জল আবদ্ধ থাকে। কুমিল্লা সহরকে রক্ষা করার জন্য গুমতি নদীর এক ধারে একটি বাঁধ আছে। জলের বেগ অনেক সময় তাহাও সহ্য করিতে পারে না। বন্যার ভয়ে লোকরা সশঙ্ক থাকে। আসাম-বেঙ্গল রেললাইন এই "হাওড়" অঞ্চলের উভয় পার্শ্বে বড় বাঁধের মত অবস্থিত। তাহার পার্ব্বত্য অংশ (hill section) প্রতি বৎসর কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জল নামিয়া গেলে এই অঞ্চলে গরু-মহিষের "বাথান" হয় ও মাছের "খলা" প্রভৃতি বড় বড় কারবার স্থাপিত হয়। ঢাকার পনীর (Dacca cheese) নামক পদার্থ এই স্থানে তখন বেশী তৈয়ারী হয়। বর্ষার সময় লোকরা অন্যত্র "আওলা" বাস করে এবং বর্ষার পর ইহা নূতন একপ্রকার কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া উঠে। 'আমন' ও 'বোরো' ধানের জন্য "হাওড়" অঞ্চল প্রসিদ্ধ।

(৪) রাজসাহী বিভাগের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অংশ

নদী ও খাল সাধারণতঃ যে দিকে যে ভাবে প্রবাহিত হয়, তাহা হইতে সমগ্র ভূমিখণ্ডের সাধারণ গড়ান (slope) অনেকটা অনুমান করা যায়। এই অঞ্চলে "চলন বিল" নামে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় আছে। (দুঃখের বিষয়, তাহাও ক্রমশঃ ভরাট হইয়া উঠিতেছে)। হিমালয় পর্ব্বতের তলদেশ হইতে যে সব নদী প্রবাহিত হইয়া এই স্থানের দিকে আসিয়াছে, তাহাদের অবস্থিতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, তাহা প্রথমে দক্ষিণ অভিমুখে আসিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ব অভিমুখে আসিয়াছে। আত্রাই নদী পদ্মা হইতে [illegible] হইয়া চলনবিলে আসিয়াছে এবং নওগাঁ, নাটোর, বগুড়া [illegible] গড়ান অনেকটা যেন এই দিকেই। মালদহ হইতে [illegible]জগঞ্জ পর্য্যন্ত একটি রেখা টানিলে দেখা যাইবে, নওগাঁ (তাহার) মালদহ হইতে প্রায় ২০ ফুট নীচু এবং সিরাজগঞ্জ [illegible] হইতে প্রায় ৪ ফুট উঁচু হইবে। ঈশ্বরদি—শিলিগুড়ি রেল-[illegible] পশ্চিম দিকের গড়ান (slope) যেন পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে [illegible] সিরাজগঞ্জ রেখার সমান্তরাল হইবে)। এই গড়ান ভাব পূর্ব্বদিকে কিছু বক্র হইয়া গিয়াছে এবং শান্তাহার বগুড়া রেললাইন যেন অনেকটা তাহার আড়াআড়ি ভাবে (crosswise) অবস্থিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবনে ভীষণ অবস্থা হইয়াছিল, তখন অনুসন্ধান করার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি "কমিটী" সংগঠিত করেন। তাঁহারা ঈশ্বরদি-সিরাজগঞ্জ রেললাইনকে সাধারণ গড়ানের বিরুদ্ধে আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত বাঁধ বলিয়া গণ্য করেন। বঙ্গদেশের একটি নক্সা (ম্যাপ) পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, এই অঞ্চলের সাধারণ গড়ান কি ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে।

উপরে চারিটি অঞ্চলের সামান্য সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বর্ণনা দিলাম। বাহুল্যভয়ে বিশদভাবে কিছু উল্লেখ করিলাম না। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করিতে পারিবেন, "শয়তানের শৃঙ্খল" কি রকম জিনিষ। বর্ষাকালে জলস্রোত ও প্লাবনের মধ্যে এই প্রদেশে "শয়তানের" যে উদ্দাম তাণ্ডব-নৃত্য হইতে থাকে, তাহা যিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। "শয়তান" কাহারও ক্ষমতার অধীনে নহে। সে যেন লীলাময়ী প্রকৃতি দেবীর "পাগলা" ও "আহ্লাদে" ছেলে। কিন্তু তাহার যে শৃঙ্খল—ইহা যে মানুষেরই হাতে গড়া—মানুষেরই নিজের তৈয়ারী—বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের "বুকে পিঠে" তাহা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দোষ কাহার? দায়ী কে? এ সব প্রশ্নের উত্তর একমাত্র ভগবানই দিতে পারেন। আমরা শুধু দীন-নয়নে চাহিয়া আছি ও সে "শৃঙ্খলের" শক্তি ও অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতেছি।

জমীর উপর এবং নদীতে জলপ্রবাহ যে ভাবে হয়, সে সম্বন্ধে এমন কতকগুলি সাধারণ বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে—যাহার কয়েকটিমাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা সঙ্গত মনে করি।

(১) নদীর জলের উপরিভাগে গড়ান (fall) যে নদীর যত বেশী, তাহাতে তত শীঘ্র বন্যা হইবে এবং অতি সত্বর তাহাতে জল বাহির হইয়া যাইবে। এই জন্য নদী যত বেশী বক্র (meandering) হইবে, তাহাতে গড়ান (fall) কম হইবে এবং জলও বেশী দিন থাকিবে, বন্যার প্রকোপও কম হইবে ভাগীরথীর মোহানার বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য।

(২) কোন নদীর সম্পূর্ণ বিস্তৃতি (total length) স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে ও কৃত্রিম উপায়ে ইচ্ছা করিয়া বৃদ্ধি করান অথবা কম করান যায় না। তাহা চেষ্টা করিয়া করিতে গেলেই কতকগুলি অনর্থ, আশঙ্কা ও ক্ষতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। হয় ত কোন স্থানে ভাঙ্গিয়া নূতন নদীর সৃষ্টি হয় অথবা তাহা

পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহার স্বাভাবিক গড়ান (slope) সে স্থির করিয়া লইবে। স্বাভাবিক গড়ান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্দ্ধারণ করা Canal Irrigation-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে।

(৩) নদীর দুই ধারে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া যদি তাহার দৈর্ঘ্য স্থির রাখা যায়, তবে ক্রমশঃ বালি ও কাদা পড়িয়া তাহার তলদেশ উঁচু হইবে এবং নদী ক্রমশঃ গভীরতা ত্যাগ করিয়া উপরিভাগে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হওয়ার চেষ্টা করিবে। অনেকে বলেন যে, কোন নদীর দুই ধার যদি বাঁধ দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তবে সীমাবদ্ধ পরিখার মধ্যে জল বেশী বেগে প্রবেশ করিয়া নদীকে আপনিই গভীরতর করিয়া দিবে। সাময়িক ফলাফল এইরূপ সামান্য হইলেও শেষ পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যতঃ খুব কমই দেখা যায়। বহরমপুর ও ছারঘাটির নিকট বৎসর বৎসর Corrugated Iron দ্বারা যে Bandalling করা হয়, তাহা অনেকটা এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই গবর্ণমেণ্টএর কর্ম্মচারিগণ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহারই ফলে ভাগীরথীর মুখ এখন ক্রমশঃ বেশী উঁচু হইয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয় বলা যায়। কারণ, দেখা গিয়াছে যে, ওরূপ ভাবে Bandalling না করিলেই যেন নদীতে বেশ একটু জল থাকে। নদীর জলের গতি ও বেগের সঙ্গে পলি-মাটী ও বালি জমিয়া যাওয়ার একটা যেন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। তাহা অস্বীকার করা হয় ত যুক্তিযুক্ত হইবে না। আবার প্রবহমান জলের (পার্শ্ব হইতে) চাপে বালির চরও যেন আপনা আপনি কিছু উঁচু হইয়া উঠে। সে জন্য দেখা যায় যে, নদীতে বাঁধ দিলে অথবা Bandalling করিলে তাহা যেন সীঁড়ির ধাপের মত (step) পরপর উঁচু ও নীচু অবস্থা ধারণ করে। বাঁধের নিকট মাটীও ক্রমশঃ উঁচু হইতে থাকে, নদীও ক্ষীণ আকার ধারণ করে।

(৪) নদীর কোন কূলেই যদি বাঁধ না থাকে, তবে ক্রমশঃ পলি ও বালি পড়িয়া দুকূলই কিছু উঁচু হয় এবং নদীর দুই পাশ ক্রমশঃ ঢালু (sloping outwards) হইয়া যায়। তাহাতে বন্যার সময় জল সহজে নামিয়া যায়। Nile নদে এই উপায়ে Irrigation করা হয়। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ঘাঁটাল মহকুমাতে দুইটি বাঁধ কাটিয়া দেওয়াতে দেখা গিয়াছে যে, জমীর গড়ান (fall) বেশী হইয়াছে এবং বন্যার জল সহজে নামিয়া গিয়াছে ও তাহাতে জলের উপরিভাগ বোধ হয় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা ২।৩ ফুট কম হইয়াছে। জমীও সে অনুপাতে কিছু যেন উঁচু হইয়াছে।

(৫) নদীর এক দিকে যদি বাঁধ দেওয়া হয়, তবে স্রোত বাঁধের নিকটে প্রতিবিম্বিত (reflected) হইয়া অন্য কূলে অনিষ্টসাধন করিতে পারে। "Back water" আসিলে স্থান-বিশেষে উপকারও যথেষ্ট হইতে পারে।

(৬) নদীর পাড় অথবা কূল স্রোতের বেগে সময় সময় ভাঙ্গিয়া যায় এবং স্থানবিশেষে ইহা বেশী হয়। বোধ হয়, মাটীর আভ্যন্তরীণ মালমশলার (Ingredients) উপর ইহা নির্ভর করে। পাড় ভাঙ্গিয়া গেলে ক্রমশঃ "চানা" অথবা খালের সৃষ্টি হয় ও নিম্ন জমীতে বন্যা হয়। যে সব স্থানে নদীর পাড় জলের উপরিভাগের সঙ্গে ৬০° অথবা তাহার কম ঢালু (inclined), তাহা যেন সহজে ভাঙ্গিয়া যায় না।

(৭) যে নদীর স্রোত এত বেশী যে, পা'ড় ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে বাঁধ দেওয়া চলে না। Boulders এবং abutment ও Revat system করিয়া বাঁধা চলে। কিন্তু যে নদীতে পাড় ভাঙ্গে না, তাহাতে বাঁধ না দিলেও চলে—আপনিই তাহার কূল উঁচু হইয়া Embankment এর সৃষ্টি হয়। বাঁধ দিলেই অনিষ্ট যেন বেশী হয়। ভূমি রক্ষা করার জন্য অবশ্য বাঁধ দরকার হয়।

এরূপ আরও অনেক তথ্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, এবং তাহাদের বিশেষ কারণ ও প্রমাণ এখানে আবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। দামোদর নদ প্রভৃতিতে এখন যে ভাবে বাঁধ বর্ত্তমান আছে, তাহাতে হয় ত E. I. Ry, Company এবং Calcutta Port এর ভয় ও আশঙ্কা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক স্থানে চাষী গৃহস্থদের যে কি প্রভূত সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। E. I. Ry এবং Calcutta Port রক্ষা করাও যে দেশের পক্ষে নিতান্ত দরকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থানীয় লোকদের যে সর্ব্বনাশ হইতেছে ও হইয়াছে, তাহা হয় ত Lesser of the two evils অনেকে বলিতে পারেন। কিন্তু তাহা বিবেচনা করিতে গিয়া যে স্থায়ী অপকার করিতে হইবে, ইহা কখনও কেহ আশা করিতে পারে না। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য শুধু ক্ষতিকর ও অনিষ্টকারী শক্তিপুঞ্জকে অথবা অবস্থাকে মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী করিয়া লওয়া। পৃথিবীর অন্যত্র যে তাহা না হয়, তাহা নহে; সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়, প্রণালী উপকার করিতে পারে আর বঙ্গদেশেই কি তাহারা কিছু করিতে পারে না?

পূর্ব্বে দেশে যে সব "বাদশাহী" অথবা "ভেড়ীর" বাঁধ ছিল, তাহা জমীর সাধারণ গড়ান লক্ষ্য করিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সাধারণতঃ নদীর এক ধারেই তাহা দেওয়া হইয়াছিল—যাহাতে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান অথবা অঞ্চলকে বন্যার স্রোত ও প্লাবন হইতে রক্ষা করা যায়। নদীর জল কখনও সোজা সরল রেখা অনুসারে প্রবাহিত হয় না। বাঁধও সে জন্য সরল রেখার মত সোজা করা হইত না। তাহা আবার "ছাড়া ছাড়া" ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা করা হইত—যাহাতে জল নিকাশের সহজ স্বাভাবিক পথগুলিতে "বাড়্তি" জল অবাধে যাইতে পারিত। এইরূপ অনুমান করার যথেষ্ট কারণ ও প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন যে সব বাঁধ নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইতেছে, তাহাতে এই বিষয়গুলি রক্ষা ও লক্ষ্য করা হয় বলিয়া মনে হয় না। নদীর স্রোতের আঁকা-বাঁকা গতি দেখিয়া যদি বাঁধও আঁকা-বাঁকা করা হইত, তবে তাহাতে স্রোতের আঘাত কম হইত এবং তাহা স্থায়ী অক্ষত থাকার সম্ভাবনা বেশী হইত। সোজা সরল রেখার মত বাঁধ করার ফলে তাহা প্রত্যেক বৎসর কোন না কোন স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার উপক্রম হয় এবং এক স্থানে ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার ফলাফল যে কতদূর পর্য্যন্ত কি ভাবে দেখা দেয়, তাহা পূর্ব্বে অনুমান করা যায় না। নদী সাগর অভিমুখে অথবা অন্য একটি বড় নদীর দিকে যত অগ্রসর হয়, ততই তাহার দৈর্ঘ্য বেশী হয়। কারণ, অধিক বেশী পরিমাণে জল টানিয়া লওয়ার প্রয়োজন হয়। নদীর দুই ধারে বাঁধ দিয়া তাহার দৈর্ঘ্য কম করিয়া রাখিলে সময় সময় বাঁধ "ছাপিয়া" অথবা ভাঙ্গিয়া জলপ্রবাহ হইতে থাকে অথবা অন্য একটি নদী অথবা খাল সৃষ্টি করিয়া লয়। দামোদর নদে বাঁধ করার সময় এই বিষয়টি লক্ষ্য করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বর্দ্ধমানের নীচে যে ৬ লক্ষ কিউবিক ফুট জল প্রবাহিত হয়, তাহা ৫৩ মাইল দূরে আমতার নিকটে আসিয়া মাত্র ৭৬,৯১৫ কিঃ ফুট জল যাওয়ার পরিসর পায়। বাকি ৫,২৩,০৮৫ কিঃ ফুট জল দেশ প্লাবিত করিয়া যাইতে বাধ্য হয়। কৃত্রিম উপায়ে দামোদর নদকে আবদ্ধ করার জন্য এখন বিভিন্ন উপায়ে তাহার জল রূপনারায়ণে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিতেই হইতেছে। ইহা মানুষের "হাতে গড়া" শৃঙ্খল ভিন্ন আর কি বলা যায়?

"১৯০১ খৃষ্টাব্দে Mr. D. B. Horn, Superinterding Engineer দামোদরের বন্যা সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত হন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি রিপোর্ট করেন যে, বেগুয়ার খালকে স্থানে স্থানে খুঁড়িয়া কেগুলি (পানশিউলি) গ্রামের নিকট রূপনারায়ণ নদের সঙ্গে মিলিত করিয়া দিলে সব দুঃখ-কষ্ট দূর হইবে। কিন্তু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনেক তর্ক-বিতর্ক করার পর এই রিপোর্ট এক ধারে ফেলিয়া রাখা হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণার পর গবর্ণমেণ্ট স্থির করেন যে, বেগুয়ার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং বাড়তি জল রাখার জন্য তাহার দুই পাশে দুইটি প্রকাণ্ড দীঘি (শাণ-বাঁধান Reservoir) নির্ম্মাণ করা হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট তাহার সম্পূর্ণ খরচ বহন করিবেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মীমাংসা অনুসারে কোন কাজই করা হয় নাই। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন করা হয় এবং তাহার ফলে Mr. Adams Williams এ বিষয়ে পুনরায় তদন্ত করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, ছোটনাগপুর পাহাড়-শ্রেণীর সমতল ক্ষেত্রের (Plateau) নিকট একটি প্রকাণ্ড Reservoir নির্ম্মাণ না করিলে আর কোন উপায় নাই, কিন্তু তাহা অত্যধিক ব্যয়-সাপেক্ষ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের বন্যাতে যখন পুনরায় সমস্ত প্রদেশ নষ্ট হইয়া যায়, তখন পুনরায় আর এক জন কর্ম্মচারী তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত হন। তিনি স্থির করেন যে, দামোদর নদের জলে একটা Dam (আড়াআড়ি বাঁধ) দিয়া ও বড় বড় খাল কাটিয়া উত্তর ও পূর্ব্বমুখে অজয় নদের সঙ্গে জল যাওয়ার পথ করিয়া দিলে দক্ষিণে আর বন্যার আশঙ্কা থাকিবে না। বুদ্‌বুদ্ (পানাগড় ও মানকর ষ্টেশনের দক্ষিণে) নামক স্থানের সন্নিকটে এরূপ একটি বাঁধ ও খাল কাটার বন্দোবস্ত চলিতেছে। শেষ ফল কি হইবে না হইবে, তাহা এখন কিছু বলা যায় না।

উপরে বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারিগণের যে সব মতামত ও সিদ্ধান্তের কথা বলিলাম, তাহা যে ভ্রান্তিপূর্ণ ও "অকেজো" এবং "বাজে", তাহা বলার কোন ধৃষ্টতাই আমাদের থাকিতে পারে না। তবে গত ৩০ বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে যে একটা কোন স্থির-সিদ্ধান্ত হইল না এবং আদৌ তাহা হইবে কি না, ইহাই আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, ভাগীরথীর মোহানা এবং লুপ্ত নদী, খাল প্রভৃতি পুনরায় খনন করিয়া গভীর না করিয়া দিলে কোন উপকারই হইবে না। ইহার বিরুদ্ধ মতও পাওয়া যায় যে, অত অধিক খরচ কে করিবে আর খরচ করিলেও পুনরায় ৫।৭ বৎসর পর ইহা ভরাট হইয়া যাইবে ও এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। বড় দীঘি অথবা Reservoir করা সম্বন্ধেও এরূপ আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়। বালি ও পলি পড়িয়া তাহা অল্পদিনেই বন্ধ হইবে ও অর্থব্যয় নষ্ট ও পণ্ডশ্রম হইবে। নূতন খাল কাটিয়া জল লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলে তাহার মুখ (সংযোগস্থল) বালি চাপা পড়িয়া বন্ধ হইবে এবং জমীর সাধারণ গড়ানের বিরুদ্ধে জলকে জোর করিয়া uphill প্রবাহিত করাইলে তাহাতে অনেক প্রকার অনর্থ-সৃষ্টি হইবে। বর্ষার সময় নিম্নগামী জলস্রোত আসিবে এবং ক্রমশঃ তাহা

ভরাট হইয়া উঠিবে। নূতন নূতন বাঁধ করিতে গেলেও আবার স্থানবিশেষে বন্যার প্রকোপ বেশী হইবে। প্রত্যেক মত-অভিমতের বিরুদ্ধে এরূপ অনেক প্রকার বিরুদ্ধ যুক্তিতর্ক করা হইতেছে এবং তাহার শেষ ফল এই হইয়াছে যে, শুধু একটা গভীর নিরুৎসাহ, নৈরাশ্য, নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্টভাব ক্রমশঃ সকলের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। লোকসাধারণ সম্বন্ধে যেমন এই কথা বলা যায়, গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধেও যেন তাহা সমান প্রয়োগ করা যায়—অন্ততঃ এরূপ একটা উদাসীন অনন্যোপায় ও নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকারভাব যে আসিয়াছে, তাহা সর্ব্বত্রই সকলের মুখে দেখা যাইবে। দেশের লোকরা একমত ও সমবেত হইয়া কিছু করে না—করিতেও পারে না এবং এমন কিছু একটা করিবার তাহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, সাধ্য, অর্থ, ক্ষমতা, চেষ্টা এবং ইচ্ছা এক রকম নাই। যদি কেহ কিছু করিতে পারে (পৃথিবীর সর্ব্বত্র করিতেছে), তাহা একমাত্র গবর্ণমেণ্টই। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে কাউন্সিলে প্রশ্নের উত্তরে গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন ও এক প্রকার "সাফ ঝাড়া জবাব" দিয়াছেন যে, তাঁহারা এখন যেটুকু যাহা করিতেছেন, তাহার বেশী আর কিছু করার উপায় দেখেন না। বাহিরের লোকরা হয় ত অনুমান করিতে পারেন না —এই "শৃঙ্খল" কাহাকে কি ভাবে, কতটুকু পীড়ন করিতেছে। স্থানীয় লোকরা হতাশ ও মরণোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের কাতর ক্রন্দন ও মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদে আর কাহাকেও যেন সামান্যমাত্র বিচলিত করে না। বন্যার পর দুঃস্থ লোকদের জন্য বিভিন্ন স্থানে সাহায্য-ভিক্ষার যে আয়োজন হয়, তাহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, "We are turning into a nation of Beggers!" এটা "বঙ্গদেশ" না হইয়া যদি অন্য দেশ হইত, তবে কি হইত, বলা যায় না। কারণ, পৃথিবীর অন্যস্থানে এবং ভারতবর্ষের মধ্যেই লোকদের জন্য কত যে অদ্ভুত বৃহৎ জনহিতকর কায হইতেছে, তাহার তুলনায় বঙ্গদেশের এই সমস্যা বাস্তবিকই অতি তুচ্ছ এবং সামান্য। (vide Report of Irrigation Department Committee, para 34-37)। তবে কে তাহা করিবে এবং মীমাংসা করিতে পারিবে, তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। "শৃঙ্খল"ও ক্রমশঃ যেন দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। ইহাই শৃঙ্খলের বাঁধ(ন) বন্ধন—প্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে বলা হয় 'শয়তানের মার'।

পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গে সম্বৎসর যতখানি বৃষ্টি পড়িত, এখন তাহা কমিয়া গিয়াছে (৮২ ইঞ্চি হইতে ৫০ ইঞ্চি)। পূর্ব্বে ভাগীরথী, পদ্মা ও অন্যান্য নদীতে যত জল প্রবাহিত হইত, এখন সব বৎসর আর তত জল আসে না। বেহার ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে খাল কাটিয়া জল লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থাও হইয়াছে। শতাব্দী পরিমাণ সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার ফলে এ দেশে যেখানে যে রকম গড়ান—Slope ও level ছিল, এখন তাহার অনেক স্থানে অনেক রকম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য নৈসর্গিক কারণে জমীও স্থানে স্থানে 'ওলটপালট' হইয়া গিয়াছে। খনিজ পদার্থ উত্তোলন, রেল-লাইন ও সহর নির্ম্মাণ, বড় বড় কারখানা-ঘর-বাড়ী নূতন তৈয়ারী হওয়ার ফলে মাটীর উপরে চাপ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। ভূতত্ত্ব বিবেচনা করিলে আরও অনেক প্রকার ক্রিয়াশক্তির অল্পবিস্তর ফলাফল দেখা যাইবে। তার পর যে সব স্থানে নদী ও বিল ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং ভরাট হইতে চলিতেছে, সে সব স্থান জমীদারগণ "পত্তন" দিয়া কতকগুলি দুরধিগম্য গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছেন। Eden Canal নির্ম্মাণ করার পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের জমীদার-সমিতি যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে অনেকেই আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইবেন। আপাত-লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ভবিষ্যতের অধিক ক্ষতিটাকে তুচ্ছ ও সামান্য মনে করিয়াছিলেন। আবার লোভের বশবর্ত্তী হইয়া স্থানে স্থানে এমন ভাবে কতকগুলি "ভেড়ীর বাঁধ" দিয়াছিলেন—যাহা এখন রক্ষণাবেক্ষণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না এবং তাহাতে নিজের 'মহালে' জমী "উঠিত" হইয়া কিছু সুবিধা হইলেও অন্য পার্শ্ববর্ত্তী মহাল (অন্য জমীদারের) হয় ত 'হাজিয়া' নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিম্বা যাইতেছে, তাহা রক্ষা করার কোন উপায় কেহ এখন পায় না। প্রজারা খাল কাটিবে অথবা বাঁধ দিবে, তাহাতে জমীদারের এবং গবর্ণমেণ্টের আপত্তি, আবার জমীদার অথবা গবর্ণমেণ্ট যদি কিছু করিতে যান, তবে গবর্ণমেণ্ট অথবা জমীদারের আপত্তি দেখা দেয়। কোন স্থানে লোকরা বলিতেছে, নদীকে Trained করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করা হউক; কেহ আবার বলিতেছে, বাঁধ (Embankment) দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করা হউক। কেহ আবেদন করিতেছে, খাল কাটিয়া জল নিকাশ করার বন্দোবস্ত করা হউক, আবার কেহ বলিতেছে, খাল কাটিয়া জল আনার উপায় করা নিতান্ত দরকার। সব যায়গায় স্থানীয় দাবী সমান হইতে পারে না; কিন্তু একই স্থানে অথবা অঞ্চলে যে বিভিন্ন দাবী ও এরূপ বিভিন্ন আবেদন হইয়া থাকে, ইহাই 'শৃঙ্খলের' রূপান্তরমাত্র বলা যায়।

কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Reader হইয়া আসিয়া ভুবনবিখ্যাত নীল নদের প্রধান Engineer, Sir William Wilcocks এই শয়তানের শৃঙ্খল সম্বন্ধে কয়েকটি

বক্তৃতা দেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা আমাদিগকে এখন এই 'শৃঙ্খলাবদ্ধ' অবস্থা হইতে কতখানি কি ভাবে উদ্ধার করিতে পারে, তাহার একটু আভাস দেন। তাঁহার বিশ্বাস, পূর্ব্বে যে এ দেশ এত ধন-ধান্যে সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহার প্রধান কারণ এই ছিল যে, 'প্রকৃতি দেবী'কে তখন এ সব হাতে গড়া শৃঙ্খল পরাইয়া আবদ্ধ করা হয় নাই। বৃষ্টির জল ও বন্যার জল একত্র হইয়া জমীর সাধারণ গড়ান মত স্বচ্ছন্দ গতিতে অবাধে প্রবাহিত হইত এবং দেশের সব দোষ, ময়লা, জঞ্জাল দূর করিয়া প্রতিবৎসর নূতন পরিষ্কৃত কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া দিত। এখন বৃষ্টির জলের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং বন্যার জলকে যেন জোর করিয়া আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা হইয়াছে। পূর্ব্বে বন্যার জলে মাছের ডিম ও পোনা প্রচুর জন্মাইত ও প্রবাহিত জলে সর্ব্বত্র সুবিধামত আশ্রয় লইত। এখনও ইহার ব্যবসা নিতান্ত কম নহে, তবে তাহারা আর সেরূপ খাল, বিল, নদী, পুষ্করিণীতে আশ্রয় লইতে পায় না এবং দূষিত পোকা এবং ডিম (larvae) নষ্ট করিতে পারে না। কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে গেলে জমী ও বাতাসের বাষ্প (Moisture) নিতান্ত দরকার। তাহা এখন ততটা সহজে থাকিতে পায় না। আমাদের পূর্ব্বকার সমৃদ্ধিশালী অবস্থা কেমন ছিল না ছিল, সে সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতামত শুনিতে পাওয়া যায় এবং সে অবস্থা আর কোন দিন আমাদের আসিবে, সে আশা যেন ক্রমশঃ বৃথাই হইতেছে। বন্যা ও জল-প্লাবন যে মধ্যে মধ্যে হইবে না, তাহা কেহ মনে করিতে পারে না—তবে বন্যাপীড়িত স্থানের অধিবাসীরা শুধু চাহে যে, বন্যার অনিষ্টসাধন করার যে বাৎসরিক প্রকোপ হয় ও তাহারা অনুভব করে, তাহা যেন না হয় এবং বন্যা সত্ত্বেও তাহারা যেন অবাধে কৃষিকার্য্য করিয়া 'খাটিয়া' খাইতে পায়। এটা যে তাহাদের পক্ষে কোন অসম্ভব দাবী, তাহা বোধ হয় কেহ মনে করিবেন না। "বাঁচিবার শুধু অধিকার" তাহারা সকলের সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে সমানই দাবী করিতে পারে। বিজ্ঞান বলে, পরিমার্জ্জিত জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তিকে কাযে লাগাইয়া আমরা কি সামান্য কিছুও আশা করিতে পারি না?

Sir William Wilcocksএর বক্তৃতা দেওয়ার পর এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়। দুঃখের বিষয়, স্থানীয় অভিজ্ঞ Engineerগণ তাঁহাকে বড় একটা আমল দিতে চাহেন না। তাঁহার মতামত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, তাহা আমরা সাধারণ অশিক্ষিত লোক বুঝিতে বা জানিতে পারি না; তবে বিশেষজ্ঞ অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী এবং Engineerদের মধ্যে যে একটা ঈর্ষ্যা-দ্বেষ থাকিতে পারে, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হয়।

এক জন বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞের মত অন্য এক জন নষ্ট ও "অকেযো" ও "বাতিল" করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদের মতামত অনুসারে গবর্ণমেণ্টও কাযে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। টাকার মজুত তহবিল দেখাইয়াও গবর্ণ-মেণ্টকে নিরস্ত থাকিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞদের মত অনুসারে লোকরা যেরূপ উপকার আশা করে, সেরূপ কোন কাযে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। অভিজ্ঞগণ এবং কর্ম্মচারীরা সাধারণ লোকের মত ভুল-ভ্রান্তি যে করেন না ও করিতে পারেন না, তাহা নহে। গবর্ণমেণ্ট হয় ত "ভাল বুঝিয়া" তাঁহাদের পরামর্শমতই কায করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলাফলের জন্য দায়ী নন। এখন যেরূপ বিজ্ঞানের উন্নতি ও উৎকর্ষ হইয়াছে, পূর্ব্বে বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীদের সেরূপ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল না, তাহা হয় ত অসম্ভব নহে। কিন্তু এত দিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা যে এখন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট তুচ্ছ ও হেয় মনে হইবে, ইহার কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না।

Sir William Wilcocks যে দুইটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখার কথা বলিয়াছেন (প্রথম extensive canal system এবং দ্বিতীয় Stengthening of the Head), তাহা বঙ্গ-দেশের পক্ষে যে অপ্রযুজ্য, তাহা গবর্ণমেণ্টের সুগঠিত সেচের খাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ (Expert Committee of Irrigation Department) অস্বীকার করেন নাই। এক আধটা ছোট-খাটো খাল কাটাইলে যে কিছু হইবে না, তাহা এখন Eden canalএর দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়। একসঙ্গে অনেক-গুলি সুশাসিত ও সুনিয়ন্ত্রিত খাল কাটিয়া দিলে যে বন্যার জল সহজে বাহির হইয়া যাইবে, তাহা অনেক স্থানের অভিজ্ঞতা হইতে সকলে অনুমান করিতে পারিবেন। হয় ত খরচের "বহর" দেখাইয়া অনেকে নিরাশ হওয়ার পরামর্শ দিবেন; কিন্তু খরচের আধিক্যের জন্য কোন্ দেশে কোন্ এমন জন-হিতকর নাতিবৃহৎ কায এ পর্য্যন্ত পড়িয়া আছে? অন্যান্য দেশে যাহা সম্ভব, বঙ্গদেশেই কি তাহা অসম্ভব? যত টাকাই খরচ হউক না কেন, দেশের লোক অতি অল্পদিনের মধ্যে নিজেদের উন্নতি হইতে সুদ সমেত ফেরত দিবেই। এখন আমরা বন্যা-প্রপীড়িত স্থানে যে সব দুঃখ, কষ্ট অনুভব করিতেছি, এবং কুফল দেখিতেছি, তাহা হয় ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এবং পূর্ব্ব অনভিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারিগণের বিচ-ক্ষণতা ও ভবিষ্যৎদৃষ্টির অভাবের দরুণই অথবা তাঁহাদের ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ "ত্যক্ত সম্পত্তি" (legacy); কিন্তু তাহার

প্রতীকার করার ইচ্ছা ও সাহস থাকিলে কি আর প্রতীকার করা যায় না ?

অনেকের ধারণা যে, "এ সব জলা ও বন্যা-প্রপীড়িত স্থানের উপকার করিয়াই বা কি হইবে, আর তেমন উন্নতি করিয়াই বা এমন কি হইবে ? যেমন চলিতেছে, বেশ, তাহাই চলুক না কেন ? তাহাতেই বা কি এমন আসিতেছে ও যাইতেছে ?" এমন একটা নিশ্চেষ্ট ও ঔদাসীন্যভাব সর্ব্বত্র যে না আসিয়াছে, তাহা নহে। তবে দুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত রোগ-শোক-ব্যথিত এই দরিদ্র বঙ্গদেশে "দুমুঠো ভাতের" জন্য "কাঙ্গাল"—এমন লোকের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা দেখিতেছি ও বুঝিতেছি, এই "কাঙ্গাল" অবস্থা দূর করার জন্য পৃথিবীর অন্যত্র কত রকম আয়োজন, চেষ্টা ও যত্ন হইতেছে। তাহা বঙ্গদেশেই বা হইবে না অথবা হইতে পারে না কেন ? বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য অনেক, তবে প্রধান দুর্ভাগ্য এই যে, নিজের "হাতে গড়া শৃঙ্খল" এত নিবিড়ভাবে আমাদিগকে বেষ্টিত করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যাহা হইতে সহজে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন সহজ উপায় ও আশা আমরা এখন খুঁজিয়া পাই না ; আর সামান্য একটু কৃপা, দয়া, সহানুভূতি ভিক্ষার জন্য যাঁহাদের দ্বারেই সাহায্যের জন্য উপস্থিত হওয়া যায় না কেন, তিনিই এখন যেন 'ঈর্ষ্যা দ্বেষমূলক ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে, কথাবার্ত্তার হুকুমে, আভাস-ইঙ্গিতে আমাদিগকে বিতাড়িত করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

শ্রীকালিদাস চৌধুরী (এম্, এস্-সি)।

পারের পথের পথিক পাখী

সে দিন রাত্রে ভীষণ গ্রীষ্ম মশকের উৎপাত !
মনে মনে ভাবি,—পাখা হাঁকাইয়া কাটাইয়া দিব রাত ;
মশারি খাটা'লে গ্রীষ্মের গোসা উষ্মায় পরিণত—
হয় কি না তাই, মানে মানে ভাই, তাহাতে না হই রত

আঁধার থাকিতে শয্যা ছাড়িয়া সংসার-অকূপার,
গুণ টেনে টেনে রাত বারটার তরণীতে হই পার।
নীড়খানি থাকে তখনো মুখর 'টেমটেমি জয়ঢাকে',
খোকাখুকু তার মানে তাহাদের প্রসূতির হাঁকডাকে ;

তবু রাত কাটে, শব সম পড়ি' মহাসুখে যাই নিদ্ !
পরাণে সে দিন কেন রে বিলাস কেন হেন বিপরীত ?
নীচে মৎকুণ, উপরে মশক, মাঝখানে "মহাশয়"—
পড়িয়া পড়িয়া খায় খাবি আর সহে 'ভাগ্যের জয় !'

কোথা হ'তে পিক গাহিল সহসা অতি সুমধুর স্বর !
স্মৃতির কুহেলী মনোরম মায়া রচিল নয়ন'পর ;
সারা তনু-মন বিবশ হইল, মুদিয়া আসিল আঁখি,
সাহারায় ঢালে সুধার সাগর সেই সুদূরের পাখী !

শেষ রাতে ভীম প্রলয়ের রোলে ঝড়জলে নামে বান,
পশিয়া গৃহেতে করিল সিক্ত কত মূল্যবান্ !
রাবণের মেজ ভাইয়ের নিদ্রা গৃহিণীর গর্জ্জনে—
টুটিলে, সে হ'ল অতি তৎপর গৃহটিরে বর্জ্জনে !

'ঘরছাড়া' তার ঘর বাঁচাইতে চলে বেঘোরের পানে,
সহসা চমকি' দাঁড়ায় থমকি' স্বরের করুণ গানে।
ঝটিকা-জলের মাতামাতি আর তামাসায় গড়াগড়ি—
দিয়ে পিক এক হ'ল প্রাণহীন, পথ-কর্দ্দমে পড়ি !

তাহারে বেড়িয়া আর এক পাখী ঘুরে উড়ে, কাঁদে ঘোরে,
নীড়জের দুখে মনুজের বুক যাবে নাকি ভেঙে চুরে ?
কাল রাতে চোখে সোনালী নিদালী আঁকি দিল সেই পাখী,
সাথীরে কাঁদায়ে সেই কি চলিল সুদূরে, মুদিয়া আঁখি ?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম্, এ)।

যাবে কোন্ পথে ?

আজকালকার কতকগুলি নব্যশিক্ষিতের নিকট "অন্দরমহল" কথাটা স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যাচারের নামান্তর বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের মতে অন্দরমহল বা অন্তঃপুরের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নাই। অন্দরমহল বলিলেই তাঁহারা বুঝেন, বাড়ীর মধ্যে গারোদ-ঘরের মত একটি স্থান, যেখানে স্ত্রীলোকদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। স্ত্রীলোক যেন অন্দরমহলে আবদ্ধ বিহঙ্গিনী। জেলে যেমন কয়েদীদিগকে রাখা হয়, স্ত্রীলোকদিগকে সেইরূপ অন্দরমহলে রাখা জেলখানার মধ্যে আবদ্ধ রাখার ন্যায়। তাঁহাদের মতে স্ত্রীলোকরাও সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে জগতে বিচরণ করিবার অধিকারিণী। এইরূপ কতকগুলি পোকা মাথায় লইয়া তাঁহারা অন্তঃপুর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। তাঁহাদের মতে অন্দরমহল ভাঙ্গিতে পারিলেই ভারত স্বাধীন হইবে। আর যত দিন অন্তঃপুর-প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকিবে, তত দিন ভারতের স্বাধীনতা কোনরূপেই আসিতে পারে না। আমাদের অন্দরমহলগুলি ভারতের স্বাধীনতার ব্যবধান। যেন অন্দরমহলরূপ পাহাড়গুলি ভারতের স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়াছে। অন্দরমহল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দাও। স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করিতে দাও, সকলরূপ সমাজবন্ধন হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দাও, দেখিবে, ভারত স্বাধীন হইতে কয় ঘণ্টার বেশী সময় লাগিবে না।

তাঁহাদের মতে, আমাদের পূর্ব্বকালের রমণীরা অতিশয় কষ্টে ও দুঃখে সময় অতিবাহিত করিয়াছে। এই কালাপাহাড়রা কথায় কথায় বলেন ও লেখেন, আমাদের পূর্ব্বতন স্ত্রীলোকরা খালি সন্তান প্রসব করিবার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহারা চিরজীবন স্বামীর সেবা ও দাসীবৃত্তি করিয়াছে: স্বাধীনতার যাদ একবারেই জানিত না। তাহারা সংসারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছে এবং স্বামীর বংশবৃদ্ধি করিয়াছে। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই উপভোগ করে নাই। অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিয়াছে—ক্রূর পুরুষের জুলুমে। অন্দরমহল ভাঙ্গিতে হইলে তাহাদের পূর্ণ-স্বাধীনতা দিতে হইবে, তাহাদের উপর স্বামীদের কোনরূপ শাসন ও প্রভুত্ব থাকিবে না ও খাটিবে না। নীল আকাশের তলে পক্ষিগণ যেমন মনের স্ফূর্ত্তিতে উড়িয়া বেড়ায়, অধুনাতন স্ত্রীলোকদিগকেও সেইরূপ মনের সুখে যথা ইচ্ছা বিচরণ করিবার ক্ষমতা দিতে হইবে। না দিলে তাহাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়, কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, স্বাধীনতা আর যথেচ্ছাচারিতা দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ, একটি অপরটির নামান্তরমাত্র নহে।

শিক্ষার উপরেই স্ত্রীলোকদিগের উপযোগিতা নির্ভর করে। শিক্ষার অর্থ ভাষাশিক্ষা বা পুস্তকপাঠ নহে। শিক্ষার মানে সকল তত্ত্বের জ্ঞাপন, যেগুলি জানিলে মানুষের মনোবৃত্তির বিকাশ হয়। এম্, এ, বি, এ, পাশ করিলেও অনেক সময়ে স্ত্রীলোকরা সুশিক্ষা পায় না; অথচ মুখে মুখে শিখিয়া বা দেখিয়া শিখিয়া অনেক সময় যথেষ্ট সুশিক্ষা পায়। গত এক শত বৎসরের মধ্যে যে সব রমণী তাঁহাদের পুত্র-কন্যার দ্বারা সংসারের মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে ভাষাবিদ্ বা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের পুত্র-কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের নিজের ও তাঁহাদের পুত্র-কন্যার গুণে সমাজের অনেক মঙ্গলসাধন হইয়াছে। যে সব গুণের দরুণ এই সব সুফল হইয়াছে, সতীত্বের প্রতি অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধাই ইহার সর্ব্বপ্রথম কারণ। তাঁহারা জানিতেন, সতীত্বধর্ম্ম অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই। সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই ভগবানের আশীর্ব্বাদপ্রাপ্তি সুনিশ্চয়। স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি, ভগবানে অগাধ বিশ্বাস, তাঁহার ন্যায়-বিচারের উপর অগাধ প্রেম—তাঁহারা শিখিয়াছিলেন; সতীত্ব-রত্ন রক্ষা করিতে পারিলে অনায়াসেই ভগবানের দয়া লাভ করিতে পারা যায়। আমাদের হিন্দুধর্ম্মে পতির স্থান সর্ব্বদেবতার উপর। অতিথি-সৎকার স্ত্রীলোকদের একটি প্রধান ধর্ম্ম। স্বামীর সেবা তাহার অনেক উর্দ্ধে।

আমাদের মধ্যে বিশ্বাস, জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ, এই তিনটি ঘটনার উপর মানুষের কোন হাত নাই। এ তিনটিরই ঘটন অঘটন সমস্তই ভগবানের উপর ন্যস্ত। আজকালকার দিনে পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী আমেরিকার আদালত একটি মামলার রায় দিতে বলিয়াছেন, "জন্মের উপর মানুষের হাত নাই।"

মোকর্দ্দমাটি এই :—এক জন বিখ্যাত নটী গর্ভাবস্থায় ছিলেন। একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় হইবে, এমন দিনে এক সন্তান প্রসব করিলেন। অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। নট-নটীরা ম্যানেজারের নামে নালিশ করিল যে, তাহাদের সে রাত্রিতে অভিনয় বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও বেতন পাওয়া উচিত। বিচারক স্থির করিলেন, এই সন্তান-প্রসব মানুষের হাতের মধ্যে নহে, ইহা ভগবানের ভবিতব্য (Act of God). কাযেই ম্যানেজার

বেতন দিতে বাধ্য নহে। বিবাহও যে ভগবানের ভবিতব্য, তাহা য়ুরোপের ও আমেরিকার লোক বিশ্বাস করেন না।

যে সব সমাজের অনুকরণ করিয়া আমাদের কালাপাহাড়রা অন্দরমহলটি ধ্বংস করিতে চান, সেই সকল সমাজে বিবাহ একটি Civil Contract ছাড়া আর কিছুই নহে। দুই পক্ষ রাজী হইলে ইহা সমাধা হয়, আর এক পক্ষ গররাজী হইলে ইহার ব্যবচ্ছেদ হয়। প্রত্যহ যেমন অনেকগুলি করিয়া বিবাহ হইতেছে, সেইরূপ সেখানে অনেকগুলি করিয়া অতিরিক্ত আদালত বসিয়া বিবাহ নাকচ করিয়া দিতেছে। আমেরিকায় বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য শুধু আদালত বসান হইয়াছে, তাহা নহে, অতিরিক্ত সময় ব্যাপিয়া সেই সব আদালতের কার্য্য করিতে হইতেছে। আর আমাদের সমাজে বিবাহ ভগবানের দান, একবার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলে তাহার আর বিচ্ছেদ হইবার উপায় নাই। বিবাহ অবিচ্ছিন্ন (Indissoluble)। পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে আমাদের কয়েকটি ধুরন্ধর আমাদের সমাজটিকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চান, তাঁহারা এই কয়টি কথা একবারেই ভুলিয়া যান, প্রথম—ভগবান্ নারায়ণ ও চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী করিয়া অগ্নির সম্মুখে মন্ত্র পাঠ করিয়া যে বিবাহ হয়, সেই হিন্দুর বিবাহ অবিচ্ছিন্ন। যত দিন স্ত্রী পুরুষ দুইটি বাঁচিয়া থাকিবে, তত দিন তাহারা উভয়ে একমন ও একপ্রাণে কার্য্য করিবে, কোনরূপ পার্থক্য হইতে পারে না। দ্বিতীয়—সমাজে বিধবাবিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই; অতএব স্বামীর মৃত্যু হইলে পত্যন্তর-গ্রহণের ব্যবস্থা নাই। তৃতীয়—আমাদের দেশের শিক্ষা ত্যাগের শিক্ষা, ভোগের নহে। চতুর্থ—একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা যদিও মুমূর্ষু অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তথাপি এখনও তাহার মৃত্যু হয় নাই, সম্ভব ইহার সংশোধিত সংস্করণ সমাজে গ্রহণীয় হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে একটি রাখিয়া আর একটি ভাঙ্গিলেই সমাজের সরলভাবে পরিচালন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সমাজের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকল (Links) ভাঙ্গিয়া দিলে সমাজের গতি স্থগিত হইয়া যাইবে। আমাদের অন্দরমহলের ভিত্তি এই সমাজশাসনগুলির উপর স্থাপিত। আমাদের সমাজ সমাজসংস্কারক ধুরন্ধররা সমাজ-গঠনের উৎকৃষ্টতা না বুঝিয়াই একবারে সমাজ-গঠনটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চান। তাঁহারা সমাজের গ্রন্থিগুলির দিকে নজর রাখেন না, একটি বা দুইটি গ্রন্থির কাটছাঁট করিয়াই সমাজ-সংস্কারের অগাধ ক্ষুধা মিটাইতে চান। অতি অল্পদিন হইল, বিলাতে এক বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরে বাধ্যতা স্বীকার করিবে, এটুকু পর্য্যন্ত তাহাদের বিবাহের মন্ত্রমধ্যে ছিল না। অথচ আমাদের বিবাহ-মন্ত্র এইরূপ :—

'ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।'

হে বধু—তোমার হৃদয় যেরূপ, আমার হৃদয়ও তদ্রূপ হউক, আবার আমারও হৃদয় যেরূপ, তোমারও হৃদয় তদ্রূপ হউক।

আবার সপ্তপদী-গমনের পর বরকে বলিতে হয়—

সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যন্তে মা যোষাঃ সখ্যন্তে মাযোষ্ঠ্যাঃ।

হে কন্যা, তুমি আমার সখা হও; তুমি আমার সহচারিণী হও; আমাকে তোমার সখা কর; অন্য রমণী কর্ত্তৃক যেন আমাদের সখ্য বিনষ্ট না হয়। সুলক্ষণা সাধ্বী স্ত্রীগণেরই সহিত তোমার বন্ধুত্ব হউক।

এবং সম্প্রদানের সময় সম্প্রদাতা বরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—

"ওঁ ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ন ব্যভিচারিতব্যা ত্বয়েয়ম্।"

কি ধর্ম্ম, কি অর্থ, কি কাম জন্য তুমি কখন ব্যভিচারী হইতে পারিবে না।

এবং বরও ধর্ম্ম ও বিষ্ণুশিলাকে সাক্ষ্য রাখিয়া বলেন—

"ওঁ বাঢ়ম্।"

হাঁ, আমিও তাহাই অঙ্গীকার করিতেছি।

সাধারণতঃ লোক বলে যে, বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর দাসী হইল। কিন্তু বেশ করিয়া বিবাহের মন্ত্রগুলি অনুধ্যান করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের বিভিন্ন অস্তিত্ব শেষ হইয়া গিয়া উভয়েই একমন একপ্রাণ হইয়া গেল। দাস্যভাব না থাকিয়া সখ্যভাব দুই জনের মধ্যে স্থাপিত হইল। এ বিবাহ-বন্ধন মানুষের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। আমাদের দেশের শিক্ষার উপাদান পাশ্চাত্যদেশের শিক্ষার উপাদানের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাদের শিক্ষা ত্যাগের শিক্ষা, ভোগের নহে; সংসারে থাকিবে অথচ ত্যাগীও হইবে। সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইবে না। এইরূপ সংসারী হইয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবে, তাহা নিজে ভোগ করিবে না, তাহা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমভাবে ভোগ্য। হিন্দুর আরও উচ্চ শিক্ষায় বলিয়াছে, তুমি পুণ্যসঞ্চয়ের দিকে একবারেই লক্ষ্য করিবে না, যে পুণ্য অর্জ্জন করিবে, তাহা শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিবে। আমাদের দেশে ধর্ম্মই প্রধান। ভগবানের কৃপাভিক্ষাই সর্ব্বকর্ম্মে মুখ্য উদ্দেশ্য। বালিকা যখনই পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইল, সেই সময় হইতে তাহার ত্যাগের শিক্ষা আরম্ভ হইল। তাহাকে বারব্রত শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। অমাবস্যার ব্রত, পুণ্যপুকুর, হরির চরণ, ইত্যাদি ছোট ছোট ব্রত করিয়া পরবর্ত্তী

হইতেই শিক্ষা পাইতে লাগিল, পতি পরম গুরু। অল্পবয়স হইতেই অল্প বা বেশী সময়ের জন্য ক্ষুধা-পিপাসার উপর সংযম শিক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপ শিক্ষা পাইলেই তবে ভবিষ্যতে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবার সে উপযুক্তা হয়। জন্মাবধি ভোগ-শিক্ষা করিলে ১২ বৎসর বা ১৪ বৎসর বয়সে সে ত্যাগ শিক্ষা করিতে পারে না। সে বাল্যকাল হইতে একটু একটু করিয়া ত্যাগ শিক্ষা করিলে তবে হিন্দু-সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্তা হয়। পাশ্চাত্য স্ত্রীশিক্ষার সহিত হিন্দু বালিকার শিক্ষা কখন কোন-রূপেই সমঞ্জসীভূত হইতে পারে না। বিবাহ-বিচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ, সতীত্বধর্ম্ম খালি একটা কথার কথা, উহার কোন ধর্ম্মভিত্তি নাই ইত্যাদি মনোভাব লইয়া হিন্দু রমণী সংসারে অবতীর্ণ হইলে সে সংসার বেশী দিন টিকিতে পারে না। Judge Ben B. Lindsay, "Revolt of Modern Youth" নামক এক পুস্তকে ১৮৪ ও ১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"We place a superstitious meaning and importance on what we call chastity, particularly in women. The idea is commonly accepted without question or debate that sex experience, if it takes place out of wedlock, changes a woman in some mysterious way; that the effect on her, for example, is quite different if she should have such an experience to-day while unmarried than if she should have it to-morrow after marriage. If she should have it to-day, and the man should die before her marriage to him to-morrow, she should be impure and unfit for marriage with another man. But if she should have it to-morrow, after marriage, and her husband should die the next day, she would then be a widow, and entirely eligible for marriage—a perfectly pure woman."

"সতীত্ব-ধর্ম্ম অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সতীত্ব শব্দটিকে আমরা সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহার করি, তাহা নিতান্তই কুসংস্কার-পূর্ণ। এ অর্থটি সাধারণতঃ বিনা তর্কে বা বিনা আপত্তিতে গৃহীত হইয়া থাকে, সে অর্থ অনুসারে স্ত্রীলোকের যৌন-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা যদি বিবাহিত অবস্থায় না ঘটে, তাহা হইলে এরূপ স্ত্রীলোক লোক-লোচনে নিতান্ত অদ্ভুতরূপে 'পরিবর্ত্তিত' বলিয়া প্রতীত হয়। এমন কি, বিবাহের পূর্ব্বদিবসও এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও লোকসমাজে সে স্ত্রীলোক 'পরিবর্ত্তিত' বলিয়াই গণ্য হয়। যে লোকের সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছে, তাহার সহায়তায় যদি বিবাহের পূর্ব্বদিবস কোনও স্ত্রীলোক যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং পরদিবস বিবাহ ঘটিবার পূর্ব্বেই যদি সে ব্যক্তি ঘটনা-ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে ঐ স্ত্রীলোক লোকসমাজে নিতান্তই অপবিত্র এবং অন্য পুরুষের সহিত বিবাহের অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। পক্ষান্তরে, যদি বিবাহের অব্যবহিত পরেই স্বামি-সহবাসে কোন স্ত্রীলোক যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং যদি তৎপরদিবস তাহার স্বামীর মৃত্যু ঘটে, তখন আর সে অপবিত্র হইল না। সে খালি বিধবা মাত্র এবং পুরুষান্তরের সহিত বিবাহের সম্পূর্ণ যোগ্য। সে বাস্তবিকই পবিত্র, যে হেতু, তাহার সতীত্ব-ধর্ম্ম বজায় আছে।"

সতীত্ব সম্বন্ধে যাহাদের এইরূপ মত, তাহাদের পুস্তক পড়িয়া এবং তাহাদের সমাজশাসনের কথা শুনিয়া চলিতে গেলে আমাদের হিন্দু বালিকার সর্ব্বনাশ !

জজ লিণ্ডসে তাঁহার উল্লিখিত পুস্তকে সপ্তম পরিচ্ছেদে ৭৮ পৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার কার্য্য-সূত্রে জানিয়াছিলেন যে, ৭ শত ৬৯টি বালিকা, যাঁহারা উচ্চ-বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতেছিলেন, তাঁহারা শিশুর জননী হন, অবশ্য অবিবাহিতা অবস্থায়। তিনি আরও বলেন,—

"We found that 265 of the 313 had come to physical maturity at 11 and 12 years, more of them maturing at 11 than at 12. Dividing the 313 girls into two groups, we found that 285 of them matured at the ages of 11, 12 and 13; and that only 23 of them matured at 14, 15 and 16."

"আমরা এইটুকু দেখিয়াছি যে, ৩ শত ১৩ জনের ভিতর ১১ আর ১২ বৎসর বয়সেই ২ শত ৬৫ জন শারীরিক পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তার মধ্যে বেশীর ভাগই মাত্র ১১তেই। ঐ ৩ শত ১৩ জন মেয়েকে দুই দলে ভাগ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাদের মধ্যে ২ শত ৮৫ জন ১১, ১২ এবং ১৩ বৎসর বয়সেই, আর মাত্র ২৮ জন একটু দেরীতে অর্থাৎ ১৪, ১৫, ১৬ বৎসর বয়সেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল।"

ইহাই হইল আমেরিকার সমাজ। এই সমাজের অনুকরণে আমরা আমাদের সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাই। ফল কি হইবে, তাহা বুঝিয়া লউন।

আমি নিজে বর্ত্তমান আমেরিকান সমাজের সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া :—

"The Raven on the Sky-scraper—a study of modern America by Veronica and Paul King এর পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"American citizenesses are trading on the reputation of the women of the past, companions of the pioneers, who really were wonderful characters, and had no superiors and few equals on earth as home makers. A certain chapter in the Book of Proverbs described these wives and mothers: 'Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.'

According to the eulogy that followed she was strong, healthy, and thoroughly practical, and the summing up was that her children called her blessed and her husband praised her. "Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates."

And what about her successors? as a rule, not her descendants, be it noted. To begin with, they are living under greatly altered conditions for some of which they are not personally responsible, and under which they suffer. It does not any longer seem necessary for them to work so hard. "Our grand mothers," said an American, "kept house, got the meals, did the baking, the washing and ironing, skimmed the milk, and made the butter, spun the wool and flax, wove the cloth, and made it up into the family clothing, did the mending—and a hundred and one other little things besides dipping candles, boiling soaps, and making quilts and carpets, on the top of this they bore and raised from six to a dozen children and lived to a ripe old age.

"The woman in the modern home does very few of these things............ The man has to go out and earn the money to have these things done. More and more the economic burden of the family, formerly borne equally by the man and the woman, is being thrown upon the man alone, while the woman gives her time to new tasks of her own creating, that minister in small degree if at all to the home. And in spie of all that, families of more than two or three are a rarity, and many women—more and more as the years go by—are physical wrecks at forty."

"অতীত দিনের আমেরিকার স্ত্রীলোক—যাঁহারা প্রথম প্রবর্ত্তকের সঙ্গিনী, যাঁহারা বাস্তবিকই চরিত্রে সুমহান্, যাঁহাদের অপেক্ষা সৎ ও শ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে মেলা ভার এবং সংসারগঠনে যাঁহাদের তুল্য লোক অতি দুর্লভ, তাঁহাদের সুযশের উপর নির্ভর করিয়া আমেরিকার আধুনিক স্ত্রীলোকরা কাল কাটাইতেছেন। 'প্রবাদ কেতাবে' একটা পরিচ্ছেদ এই সব মা ও স্ত্রীলোকের বর্ণনা করিয়াছে—কে খাঁটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছে? কারণ, তার দাম চুনির চেয়েও অনেক বেশী। খ্যাতির হিসাবে বলা হইয়াছে, তাহারা বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবতী এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উপযোগী এবং তাহাকে তাহার ছেলেরা ভাগ্যবতী বলিত, আর তার স্বামী খুব সুখ্যাতি করিত। তাহার হস্তনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি তাহার কার্য্যের ফল আর তাহার নিজ কার্য্যই, তিনি যে কি করিতে পারেন, তাহা দেখাইয়া দিতেছেন।"

এই ত গেল পূর্ব্বতন স্ত্রীলোকদের কথা, আধুনিক স্ত্রীলোকদের অবস্থাটা কি? আধুনিক স্ত্রীলোকরা পূর্ব্বতন স্ত্রীলোকদিগের বংশধর নহে, তবে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা পূর্ব্বতন স্ত্রীলোকদিগের স্থান অধিকার করিতেছেন। বাস্তবিক বলিতে গেলে বর্ত্তমান যুগের স্ত্রীলোকরা অনেক পরিবর্ত্তনের মধ্যে বাস করিতেছেন। এই পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহারা যে দায়ী, তাহা নহে, বরং যুগ-পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের অনেক অসুবিধাও আছে। বর্ত্তমান যুগে এই স্ত্রীলোকদিগের কঠোর পরিশ্রম করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এক জন আমেরিকান বলিয়াছেন, আমাদের ঠাকুরমাদের ও দিদিমাদের গৃহরক্ষা করিতে হইত, খাবার করিতে হইত, রুটী সেঁকিতে হইত, কাপড় কাচিতে হইত, ইস্ত্রি করিতেও হইত, দুধ হইতে সর তুলিয়া, তাহা হইতে মাখন তুলিতে হইত। তাঁহারা পশম বুনিতেন, সূতা কাটিতেন, কাপড় বুনিতেন, এবং সংসারের কাযে লাগিতেন, খুঁটি-নাটি দেখিতেন, বাতি তৈরি, সাবান গলান, লেপ, তোষক ইত্যাদি বানান, এ সব ছাড়াও আরও নানাবিধ ছোটখাটো কায করিতে হইত, তার উপর তাঁহারা ছয়টা হইতে বারোটা সন্তানের মা হইয়া পাকা চুলে ঘর-সংসার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেন।

আর আজকালকার মেয়েরা এ সবের ভিতর খুব কম কাযই করেন। এ সব জিনিসের জন্য আজকাল পুরুষমানুষকে বাহিরে ছুটিতে হয়—টাকা রোজগার করিতে। আগে যেমন পুরুষ ও স্ত্রী দুই জনের কাঁধেই সংসারের (যা কিছু) বোঝা পড়িত, দুজনকেই সমানভাবে উহা বহিতে হইত, আজকাল কিন্তু এ বোঝাটা শুধু পুরুষমানুষের মাথায় পড়িয়াছে আর মেয়েরা তাঁহাদের নিজের নিজের নূতন নূতন তৈরি সখের জিনিসের দিকেই সময় দেন, সংসারের সুখ-দুঃখের কাযে-কর্ম্মে তাঁহাদের দৃষ্টি খুবই কম, একরকম নাই বলিলেই হয়। আর এ সব সত্ত্বেও দুইটা কিংবা তিনটা সন্তানের মা হওয়া তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশেতেই বুড়ী ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছেন।"

*এই গ্রন্থকারই ১০৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"Some are religious and some are scientific, and they tend to produce their opposites, the immoral cranks: who are as pestilential in a different way. The moralities want to suppress ordinary human instincts and stop harmless amusements, so the decadents retaliate by demanding that all wholesome restraints must be scrapped at once, and agitate for unlimited opportunities to indulge general vileness. Most of these persons are not filthy-minded lunatics, but crafty exploiters of obscenity for gain under the attractive suggestions of "preserving personal liberty," and "aiding in the development of art."

These attempts to slacken moral fibres are presented to women, in and out of clubs, with a top-dressing of science and psychology. The blessed word "Freudian"—does as a veil, and psycho-analysis is used to help along the movment of laxity with bodily exposure at one end, and mental wreckage at the other. These so-called psychologists teach their eager pupils of all ages that there are two supreme causes of unhappiness in life, namely, Ignorance and Repression. It is necessary to know all the terrible, primitive elemented bestial impulses we have inherited, and to welcome this knowledge and "humanize it," avoiding any efforts at self-discipline. 'We treat ourselves wrongly,' said one exponent of these ideas. 'For there is a new way of dealing with the beast and the criminal and the demon in ourselves. It is to bring them into the light, understand them, and learn how to harness up the power of that side of our natures. It is the way of psycho analysis.' "

"ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় যে সকল উক্তি বা উদাহরণ পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই বিপরীত ফল প্রসব করে। তাহাকে কুরীতিপূর্ণ উক্তি বলা যায় এবং তাহাদের ফল অন্য দিক হইতে দেখিতে গেলে নিতান্ত অশুভজনক। এক দিকে নীতিবিদ্‌গণ মনুষ্য-হৃদয়ের সাধারণ নির্দ্দোষ প্রেরণাগুলিকে, এমন কি, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদকেও বন্ধ করিতে ব্যগ্র, অন্য দিকে আর এক দল উক্ত নীতিবিদ্‌গণের এই চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছেন। তাঁহারা সকলপ্রকার নির্দ্দোষ কার্য্যের বাধা ও বিঘ্ন সরাইয়া দিয়া সকল প্রকার কলুষিত কার্য্যের অপ্রতিহত সুযোগ পাইবার জন্য সচেষ্ট হইতেছেন। ইঁহারা সকলেই কিন্তু নীচমনা বা উন্মাদ-রোগগ্রস্ত নহেন। তাঁহারা অতিশয় সুচতুর—'ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষণ' কিংবা 'শিল্পকলার উন্নতির সহায়তা' প্রভৃতির সাধারণের চিত্তাকর্ষক বিষয়ে বক্তৃতা দিবার ছলে কেবল অশ্লীলতার প্রচার করিয়া নিজেদের আর্থিক উন্নতিসাধন করেন।

নৈতিক গ্রন্থিগুলিকে শিথিল করিবার এইরূপ চেষ্টার চিত্র সাধারণতঃ বিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্বের আবরণের ভিতর দিয়া ক্লাব-গৃহের মধ্যে এবং বাহিরে স্ত্রীলোকদের সম্মুখে ধরা হয়। নারী-দের নানা অঙ্গের প্রদর্শনের যে আন্দোলন বা মানসিক অবনতির দরুণ যে নৈতিক শৈথিল্যের আন্দোলন চলিতেছে, সেই আন্দোলনের সপক্ষে "Freudian" প্রভৃতি সাধু শব্দের আবরণের ভিতর মনস্তত্ত্বের কুরীতিপূর্ণ বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হই-তেছে। এইরূপ ভণ্ড মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাদের আবালবৃদ্ধবনিতা সকল শিষ্য-শিষ্যাকে এই শিক্ষাই দিতেছেন যে, মনুষ্য-জীবনে দুঃখের প্রধান কারণ দুইটি ;—একটি তাহাদের নিজেদের অজ্ঞতা, দ্বিতীয় সামাজিক দমন। যতপ্রকার বীভৎস পাশবিক প্রবৃত্তি প্রাণিমাত্রের মধ্যে নিহিত আছে, চিত্তসংযমের কোন চেষ্টা না করিয়া সে সকল প্রবৃত্তির সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া সেই সকল প্রবৃত্তিকে লোকসমাজের অনুরূপ করিয়া লইবার চেষ্টা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ নীতিবাদের এক জন বিশিষ্ট প্রচারক বলিয়াছেন,—"আমরা নিজেদের প্রতি যথেষ্ট অন্যায় করিতেছি, কেন না, আমাদিগের মধ্যে যে সকল পশুপ্রবৃত্তি এবং দানবপ্রবৃত্তি নিহিত আছে, সেগুলিকে দমন করিবার একটি নূতন উপায় আছে। সে উপায়টি এই যে, ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে বিকশিত হইতে দেওয়া এবং তাহাদিগকে সম্যক্ উপলব্ধি করা, তৎপরে সেই প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে শিক্ষা করা—ইহাই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ।"

"যখনই আমরা আত্মদমনে বিরত হয়, যখনই আমরা নিজেদের কাম ও অন্যান্য নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া নিজের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করি, তখনই আমরা অন্যান্য সকলের সঙ্গে সেই প্রকার সখ্যস্থাপনে সফল হই।" ভাষান্তরে বলিতে গেলে ইঁহাদের মতে আত্মদমনই পাপ এবং অপরাধের মূল কারণ এবং এই প্রকার পবিত্রতাপজনক অবস্থার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইলে আমাদিগের অন্তর্নিহিত সকল প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায়, সেই জ্ঞানের সাহায্যে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। যৌন-বিষয়ক সকল ব্যাপারেই এই মতটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।"

পূর্ব্বকথিত পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

"Home life is rapidly decaying, for a number of reasons large and small, but the most serious cause of this is generally conceded to be too facile divorce.

As everyone knows, the law varies somewhat in the different States of the Union, but with few exceptions the marriage tie is easily broken and divorce is granted for trivial, even frivolous reasons. This is a great and growing evil that threatens the very foundations of their whole social fabric.

Whether marriage should be absolutely indissoluble is one question, but most people—even while opposing too rigid an enforcement of monogamy—do not consider that the only alternative is to allow divorce for a tiff or an hystorical whim. A few examples will show how wedded couples in the United States

regard their solemn vows, and how the law assists them to free themselves from obligations into which the entered voluntarily.

One divorce was granted to a Los Angeles man because his wife was too fond—not of another man, but of San Fransisco. "Mrs. Page was a San Fransisco girl when she married Mr. Page of Los Angeles," said the report. "One day she went to San Fransisco on a visit, and upon her return she boasted the Bay City to the detriment of the Angel City. She wanted Mr. Page to live in San Fransisco, but he said he had his business and his relatives here could not afford to leave. She packed up and departed and he sued for divorce after failing to induce her to return."

Another divorce was given to an injured lady whose husband wanted her to live in a caravan. This was followed by a case where a poor girl had to go before the sympathetic judge and free herself from a husband who trod on her toes both literally and metaphorically, "Mrs. Nichols said she knew before her marriage that her husband couldn't dance very well, but never realized his awkwardness completely until after they were husband and wife. She said he not only stepped on her toes, but was angry when she complained. At one time she said he treated her rudely when she preferred to dance with a girl friend."

This terrible conduct by itself would have been enough, but she added that she once went a motor drive with this "impossible" man and began discussing moving picture stars. He told her to stop, but she persisted and he "dragged her from the machine in an ungentlemanly manner." She won her divorce on these grounds!

Cases like these could be multiplied indefinitely, with sometimes the husband, but far more often the wife, suing for divorce. Americans themselves are beginning to call this sort of thing "Mushroom Marriage," and even in the tolerant West it is more or less reported. "In the local divorce courts," said a pressman, "three cases of mushroom marriage were heard in one day. In these cases love's dream came and was over in the space of a few hours. When marriage is a one-day affair it cannot be said to be a beautiful thing. In one instance the husband disappeared on the morning following the wedding, and has not ben seen since. In another, the young couple met on Friday, courted on Saturdady, were wed on Sunday, and parted on Monday.

"In another case the wife fled from the minister's house right after the wedding, and never even kissed the new husband good-bye. Almost every day there are similar cases. Marriage seems to be a good deal like getting vaccinated. About half the time it dosen't take. It seems to be a case of easy come, easy go. With the divorce courts working overtime, getting unhitched is the most popular of indoor sports."

"নানা কারণে গার্হস্থ্য জীবন অতি দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তন্মধ্যে বিনাকারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিয়া পরিগণিত।

ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রদেশের আইনের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিবাহ-বিচ্ছেদ সর্ব্বত্র সামান্য কারণে কিম্বা বিনাকারণে ঘটিয়া থাকে। এই মহা দোষ বাড়িয়াই চলিয়াছে, এবং সমস্ত সামাজিক বন্ধনের ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিতেছে।

বিবাহবন্ধন একেবারে অবিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত কি না, তাহা কঠিন সমস্যা; কিন্তু অধিকাংশ লোক,—তাঁহাদের মতে একাধিক বিবাহ অসঙ্গত না হইলেও,—বিনা কারণে কিম্বা খামখেয়ালির বশে বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহে। যুক্তরাজ্যের অধিবাসিগণ যে তাঁহাদিগের বিবাহবন্ধনের অঙ্গীকারকে কি ভাবে দেখেন এবং কত সহজে তাঁহাদের দেশে প্রচলিত আইনের বলে ঐ অঙ্গীকার হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

লস্ এঞ্জেলেসবাসী এক ব্যক্তির বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল—অতি সামান্য কারণে। কারণটি এই—তাহার পত্নী পরপুরুষে আসক্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোকে বড় ভালবাসিতেন। মোকর্দ্দমার বিবরণীতে এইরূপে লেখা আছে—"লস্ এঞ্জেলসবাসী মিষ্টার পেজের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে মিসেস্ পেজ সান্‌ফ্রানসিস্কোর অধিবাসিনী ছিলেন। একবার তিনি সান্‌ফ্রানসিস্কো যান এবং ফিরিয়া আসিয়া লস্ এঞ্জেলেসএর তুলনায় সান্‌ফ্রানসিস্কোর অনেক সুখ্যাতি করেন, এমন কি, তিনি তাঁহার স্বামীকে সান্‌ফ্রানসিস্কোতে বাস করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁহার স্বামী রাজি হন নাই, হেতু, তাঁহার ব্যবসায়ক্ষেত্র এবং আত্মীয়স্বজন সবই লস্ এঞ্জেলসএ অবস্থিত। তিনি তাহা ছাড়িয়া যাইতে পারেন না, সে কারণে উক্ত মহিলা লস্ এঞ্জেলেস্ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তাহাতে তাঁহার স্বামী এই মর্ম্মে আদালতে আবেদন করেন যে, তাঁহার পত্নীকে ফিরাইয়া আনা হউক, নতুবা বিবাহ-বিচ্ছেদ হউক।"

কোন একটি আহত স্ত্রীলোককে তাঁহার স্বামী কে শকট-বিশেষে আরোহণ করিতে অনুরোধ করায় তাঁহার বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়। ইহার পরেই একটি "হতভাগ্য" বালিকা সহৃদয় বিচারকের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার স্বামী তাঁহার পায়ের

অঙ্গুলি পদদলিত করিয়াছেন বলিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করেন। "মিসেস্ নিকোলাস্ বলেন যে, তিনি বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, তাঁহার স্বামী নৃত্যকলায় মোটেই পারদর্শী নহেন, কিন্তু তাঁহার এই অপরাধের গুরুত্ব তিনি এই বিবাহের পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বামী তাঁহার পায়ের অঙ্গুলি পদদলিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এ বিষয়ে তাঁহার স্বামীকে অনুযোগ করাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, একবার এই কারণে তিনি তাঁহার কোন বালিকা বন্ধুর সহিত নৃত্য করিবার ইচ্ছা করায় তাঁহার স্বামী তাঁহার সহিত অভদ্র ব্যবহার করেন।"

তাঁহার স্বামীর এইরূপ "ভয়ানক চরিত্র" বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষে যথেষ্ট। তথাপি তিনি আরও বলেন যে, একবার এই-প্রকার "অসম্ভব" (অদ্ভুত) ব্যক্তির সহিত তিনি বায়ু-সেবনার্থ বাহির হইয়াছিলেন এবং যাইতে যাইতে চলচ্চিত্রের কয়েকটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করাতে ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে থামিতে বলে, তিনি থামিতে অস্বীকার করিলে, ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে অভদ্রভাবে গাড়ী হইতে নামাইয়া গৃহে লইয়া যায়, এই সকল কারণে ঐ বালিকাটির বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়।

এইরূপ অসংখ্য উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে কখন কখন স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করেন, অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীই আবেদন করিয়া থাকেন। আমেরিকা-বাসিগণ এই প্রকার বিবাহকে "Mushroom marriage" অথবা অন্তঃসারবিহীন এবং ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বলিয়া অভিহিত করেন, এবং সর্ব্বংসহ পাশ্চাত্যদেশও এই প্রকার বিবাহকে ভাল চোখে দেখিতে পারে না। কোন একটি লেখক বলিয়া-ছেন, "স্থানীয় বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতে এক দিনে এইরূপ তিনটি অন্তঃসারবিহীন ও ক্ষণস্থায়ী বিবাহের মামলার শুনানী হয়। এই সকল মামলায় প্রেমের স্বপ্ন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায়। দিনমাত্রস্থায়ী বিবাহকে কেহই ভাল বলিতে পারে না। এক স্থলে বিবাহের পরদিবস প্রত্যুষেই বর নিরুদ্দেশ, আর তাহার কোন খবর পাওয়া যায় না। আর একটি স্থলে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায় যে, শুক্রবার দিন উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, শনিবারে বিবাহের প্রস্তাব, রবিবারে বিবাহ এবং সোমবারেই তাহাদের ছাড়াছাড়ি।

"আর একটি মোকর্দ্দমার কথা জানিতে পারা যায় যে, বিবাহের অব্যবহিত পরেই ধর্ম্মযাজকের গৃহ হইতে কন্যা পলায়ন করে, এমন কি, বিবাহের পর একটিমাত্র চুম্বনে নূতন স্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণের অবসরও তাহার হয় নাই, এ সমস্ত স্থলে বিবাহ এবং রোগ-নিবারণের জন্য টীকা লওয়া, উভয় ব্যাপারই এক প্রকার বলিয়া মনে হয়। অধিকাংশ স্থলেই ইহা সফল হয় না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা 'যে জিনিষ সহজে আসিয়াছে, তাহা সহজেই যাইবে' এই উক্তির উদাহরণ মাত্র। বিবাহ-বিচ্ছেদের আদালত নির্দ্দিষ্ট সময়ের অধিক কার্য্য করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদকে বন্ধগৃহে যত ক্রীড়াকৌতুক চলিতে পারে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।"

আজকালকার এক শ্রেণীর গ্রন্থকার হইয়াছেন, তাঁহাদের নজর সর্ব্বদাই Bath Room ও নর্দ্দামার দিকে। সর্ব্বদাই নর্দ্দামার পঙ্ক পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার দিতে ব্যস্ত। তাঁহারা নীতিপূর্ণ কথা প্রচার করিতে একবারেই রাজী নহেন। তাঁহারা বলিতে চান, নীতিকথা মনোবিজ্ঞানের কথা নহে। মনোবিজ্ঞানে যাহা বলে, কলঙ্কিত মানুষ-চরিত্র যে দিকে তোমাকে টানিয়া লইয়া যায়, তুমি সেই দিকে গা ভাসাইয়া দাও, তাহাই স্বাভাবিক। রিপু-দমনের চেষ্টা করিও না, রিপুর সহিত যুদ্ধ করিও না, রিপু যে পথে লইয়া যায়, সে পথে যাও, তবেই মনস্তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ হইবে। রিপু জয় করিবার চেষ্টা অতিশয় কষ্টসাধ্য ও পীড়াদায়ক। সে পথে যাইবার প্রয়োজনই বা কি ? তাঁহাদের মতে চন্দন কপালে না দিয়া কপালে পঙ্ক দাও, তাহা হইলে তুমি পঙ্কতিলক হইবে।

১৮০৬ খৃঃ নেপোলিয়ন যখন Institute এর সুধীমণ্ডলের সাহায্যে Code Nepolean প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন স্ত্রীলোকদের বিবাহের বয়স অন্যূন ত্রয়োদশ বর্ষ নির্দ্ধারিত ছিল, পুরুষদের অষ্টাদশ বর্ষ। তিনি Code Nepolean এ স্ত্রীলোকদের বয়স পঞ্চদশ করিলেন, আর পুরুষদের অন্যূন একবিংশতি করিলেন। তাঁহার মতে বিবাহ একটি থাকা চাই, তবে স্ত্রীলোকদের সতীত্বে তাঁহার একবারেই আস্থা ছিল না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী যোসেফিনের ব্যবহারে তিনি সতীত্ব সম্বন্ধে এইরূপ মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। তিনি যখন মিশর-জয়ে যাত্রা করেন, যোসেফিনকে প্যারিসেই রাখিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন, যোসেফিন নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিতে তাঁহার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন না এবং এরূপভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ন দেশে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এমন কি, যোসেফিনের জিনিষপত্রগুলি দরোয়ানের ঘরে নামাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতারা এবং অপরাপর আত্মীয়েরা বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যোসেফিন

অবিশ্বাসিনী, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে সুবিধা হইবার আশায় তিনি যোসেফিনকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সেই সময় এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের সতীত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন :

We know that adultery is not a rare occurrence, but an ordinary one; that it can happen on any convenient sofa............Some sort of restraint must be imposed upon these women who commit adultery for trinkets or verses, for Apollo and the nine Muses."—Napolen, the man of destiny by Emil Ludwing, P. 171.

অনেক সময়েই আমরা স্ত্রীলোকদিগের ব্যভিচার দেখিতে পাই। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ব্যভিচার অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। বৈঠকখানার যে কোন সোফায় এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে—একটি সামান্য দ্রব্যের জন্য অথবা একটি সুমধুর সঙ্গীতের জন্য কিম্বা পুরুষের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহারা আত্মবিক্রয় করে—যে সকল স্ত্রীলোক সামান্য কারণে ব্যভিচারিণী হয়, তাহাদের এরূপ কার্য্যে বাধা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আমাদের সমাজের গঠনের সহিত পাশ্চাত্য সমাজের কখন মিল খাইতে পারে না। কতকটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খাপ খাওয়ান অসম্ভব। সেই কারণে, হয় আমাদের সমাজবন্ধন একবারে ভাঙ্গিয়া ফেল, আর পাশ্চাত্য সমাজের গঠন অনুকরণ কর, আর না হয়, আমাদের যাহা আছে, তাহারই কিছু ইতরবিশেষ করিয়া বর্ত্তমান সমাজ গঠন কর। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, দেশ-কাল পাত্র পরিবর্ত্তনের সহিত, হাজার বৎসর পূর্ব্বে সমাজের যেরূপ গঠন ছিল, এখন সেরূপ থাকিতে পারে। হাজার বৎসর পূর্ব্বের সমাজ-গঠন লইয়া এখন সমাজবন্ধন থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিয়া কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের সহিত বর্ত্তমান সমাজ আমাদের উপযোগী হইবে না, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণ করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ স্থিরনিশ্চয়। আমেরিকা সর্ব্বাপেক্ষা স্ত্রীপুরুষের সমান স্বাধীনতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। অগ্রসর হইয়া কি ফল ফলিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি আমার নিজের কথা বলি নাই, আমেরিকা ও য়ুরোপের সুধীমণ্ডলী যাহা বলিতেছেন, আমি তাঁহাদের বচনগুলিই তুলিয়া দিয়াছি। ফলে তাঁহাদের আর Home বলিয়া কোন জিনিষ নাই।

স্বামী স্ত্রী অধিকাংশ সময়ে এক স্থানে বাস করে না, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্য নাই, সকলেই নিজ নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়া ব্যস্ত। দুজনেই সমান, এ কথাটি খালি পুস্তকেই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামী সাংসারিক গাধা (Household donkey) রূপে ব্যবহৃত হয়। তাই বলি, এখন যা সময় আসিয়াছে, তাহাতে আমাদের বিশেষ ভাবিবার কথা, আমরা পাশ্চাত্যসমাজবন্ধনী অনুকরণ করিব, না আমাদের সমাজ-গঠন রাখিয়া দিব? সময় আসিয়াছে, যখন আমাদিগকে বলিতে হইবে, থাম, আর অগ্রসর হইও না। আর অগ্রসর হইলে গভীর গর্ত্তে পড়িতে হইবে। উদ্ধারের কোন উপায় থাকিবে না। তাই বলি, আমাদের অন্দরমহল যাহা আছে, তাহারই সংস্কার করিয়া রাখিয়া দাও, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে যাইও না। সে পথে শান্তি পাইবে না। য়ুরোপবাসীরা যখন বলে, ভারতবাসী হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারি। মিস্ মেয়ো আমাদের মাতা-ভগিনীদিগের কলঙ্ক কীর্ত্তন করে, তাহাও আমি বুঝিতে পারি। কারণ, তাহারা আমাদের সমাজ বিষয়ে অতিশয় অজ্ঞ। খুব বুঝি বলিয়া, তাহাদের বিশেষ অহঙ্কার আছে, এবং সেই অহঙ্কার-প্রণোদিত হইয়াই আমাদের সম্বন্ধে যাহা তাহা বলে। তাহাদের কথা শুনিলেই বা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা আমাদের সমাজ সম্বন্ধে কিছুই বোঝে না। কিন্তু যখন আমরা শুনি, এক জন ভারতবাসী সমাজসংস্কারের ভাণ করিয়া সমাজগঠন ভাঙ্গিতে বিশেষ ব্যস্ত, খাল কাটিয়া কুমীর আনিতে বিশেষ উদ্যোগী, তাঁহারা যখন বলেন, আমাদের স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা নাই, তখন সময়ে সময়ে হাসি পায়,—তাঁহাদের এই গভীর অজ্ঞতা দেখিয়া, আর সময়ে সময়ে কান্না পায় দুঃখে ও অভিমানে যে, তাঁহারা আমাদের দেশবাসী হইলেও আমাদের সমাজের কিছুই জানেন না, তাঁহারা ঘোর মূর্খ।

য়ুরোপের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা না বলিয়া এখানে এই কথাটি শেষ করিতে পারিলাম না। এক য়ুরোপীয় পরিবারের স্বামীর শরীর অসুস্থ, কাযেই তিনি বাড়ীর বাহির হইতে পারেন নাই, স্ত্রী একটি danceএ (নাচে) গিয়াছিলেন, প্রত্যূষে তিনি একটি অপর যুবা পুরুষকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আসিয়া দেখিলেন, স্বামী চা খাইতেছেন, তখনও স্ত্রীলোকটি নাচের পোষাক ছাড়েন নাই, স্বামী তাঁহাকে চা খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "এই যুবাপুরুষটি গত রাত্রিতে আমার নৃত্যের সঙ্গী (Dancing partner) ছিলেন।" স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"জন, তুমি একে এক কাপ্ চা দিবে না?"

আজকালকার দিনে য়ুরোপের শিক্ষার সাফল্য হেতু অনেক রকম সঙ্গী দেখা যায়,—নাচের সঙ্গী, সাঁতারের সঙ্গী, থিয়েটারের সঙ্গী, হাজার হাজার সঙ্গী। অবশ্য স্বামী সমস্ত [illegible] খরচ যোগাইতে বাধ্য। আমি এইখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার

কথা বলিতেছি। স্বামী স্ত্রী দুই জনেই য়ুরোপীয়, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বয়স হইলে তবে বিবাহিত। নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছে, মা বাপ বিবাহের বন্দোবস্ত করেন নাই। স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসিত না, ইহা বলা যাইতে পারে না, তবে স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার বহরে মর্ম্মান্তিকভাবে উৎপীড়িত। স্ত্রী চায় যে, "প্রিয়া বিনে অন্যপানে চাইতে পাবে না," কিন্তু স্বামী ত মানুষ, তিনি ২৪ ঘণ্টাই স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া থাকিতে নারাজ। স্বামী তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় কায করিতেছেন, স্ত্রীও সঙ্গে আছেন। স্বামী বলিলেন, "আমি ক্লাবে যাইতেছি, সেখানে একটি Special dinner আছে, তুমি আমার dress suitটি পাঠাইয়া দিবে।" স্ত্রীর ইচ্ছা নহে যে, স্বামী সে রাত্রিতে ক্লাবে যায়। তবে মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু স্বামীর ক্লাবে যাইবার পর ডিনারের কয় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে dress suitটি ক্লাবে পাঠাইয়া দিল। হিং দিয়া সমস্ত dress suitটি লেপিয়া দিল, ফলে স্বামী যখন dress suit পরিয়া খানার টেবলে বসিলেন, তাঁহার শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতে লাগিল, তিনি খানার টেবল ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। পাশের ঘরে গিয়া কিঞ্চিৎ আহার্য্য উদরস্থ করিলেন, কিন্তু ক্ষোভে, দুঃখে ও রাগে ভাল করিয়া খাওয়া হইল না। তিনি এক ঘণ্টা বাদ বাটী আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন, স্ত্রী আহারের পর শুইয়াছে। তিনি অতি সন্তর্পণে বিছানায় গিয়া শুইলেন। এই ঘটনাটির সময় শীতকাল। তখন সে স্থানে অত্যন্ত শীত। খানিকক্ষণ বাদ স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শীতে কাঁপিতে লাগিলেন। নিদ্রাভঙ্গের কারণ, তাঁহার স্ত্রী দুই বালতি ঠাণ্ডা জল উপর্য্যুপরি তাঁহার গায়ে ঢালিয়া দিয়াছে। খানিকক্ষণ বাদ তিনি বেশপরিবর্ত্তন করিয়া বিছানায় আসিয়া শুইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন, পাখা খুব জোরে চলিতেছে, আর কতকগুলি বরফের চাঁই বিছানার উপর দেওয়া আছে। কাযেই তিনি সে বিছানা ছাড়িয়া রাত্রির অবশিষ্টাংশ রাত্রির অন্য এক ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কাটাইলেন।

অনেক দিন বাদ তাঁহার শ্যালিকা বোম্বাই সহরে একটি খানা দিয়াছিলেন। অনেক লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটির নিমন্ত্রণ হয় নাই। টেবলে চাদর দেওয়া হইয়াছে, স্তরে স্তূপাকারভাবে টেবলের উপর খাদ্যদ্রব্য শোভা পাইতেছে, এমন সময় দুই ভগিনীতে বচসা আরম্ভ হইল। উক্ত কথিত ভদ্রলোকটির স্ত্রী তাহার ভগিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কি কারণে তাঁহার স্বামীর এই ভোজে নিমন্ত্রণ হয় নাই? আসল কারণ, ভগিনী ও ভগিনীপতির মধ্যে বিশেষ বনিবনা না থাকায় তিনি ভগিনীপতিকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। কিন্তু এই নিছক সত্যটুকু তিনি ভগিনীকে বলিতে ইতস্ততঃ করিতে-ছিলেন। ভগিনীর কোন জবাব না পাইয়া, অপর ভগিনী টেবলের চাদরের এক কোণ দুই হস্তে ধরিয়া টানিয়া এই কথা বলিলেন, "যদি এই টেবলে আমার স্বামী না খান, তবে অন্য কেহই খাইবেন না।" এই বলিয়া টেবলের চাদরটি সজোরে টানিয়া দিলেন। ফলে টেবলস্থিত সমস্ত কাচের পাত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল এবং খাদ্যদ্রব্যগুলি ভূমে পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেল। সেগুলি সে রাত্রিতে কোন মানুষ খাইল না, তবে কুকুরদের একটি ভাল ভোজ হইল। গল্পের হিসাবে আমরা বলিব, এই স্ত্রীলোকটির নাম মিসেস রিচমণ্ড। দুই তিন বৎসর পর মিঃ রিচমণ্ড কলিকাতায় আসিয়া এক হোটেলে বাস করিতে লাগিলেন। মিঃ রিচমণ্ড তাঁহার নিজের কায করেন আর মিসেস রিচমণ্ড একটি ব্যবসাদারী অফিসের Canvasser। যদিও এক হোটেলে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের দুই জনেরই পরস্পরের উপর কোনরূপ ভালবাসা রহিল না। কিছুদিন বাদে মিসেস রিচমণ্ড তাঁহার আয়াকে ফরিয়াদী করিয়া মিষ্টার রিচমণ্ডের নামে এক ফৌজদারী নালিশ করিলেন যে, মিঃ রিচমণ্ড তাঁহার এক আয়ার উপর অযথা অন্যায় ব্যবহার করিয়া-ছেন। মিসেস রিচমণ্ড প্রথমে থানায় গিয়া এজাহার দিলেন, আয়াও থানায় গিয়া এজাহার দিল, ফলে মিঃ রিচমণ্ড গ্রেপ্তার হইলেন। আমি সেই মকর্দ্দমায় মিঃ রিচমণ্ডের তরফ হইতে উকীল নিযুক্ত হইলাম। নালিশের কাহিনী যে, রিচমণ্ড সাহেব তাঁহার আয়ার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করিয়াছেন, প্রধান সাক্ষী মিসেস রিচমণ্ড। পাঠক-পাঠিকা অল্প চেষ্টাতেই অনুমান করিতে পারেন যে, এরূপ মকর্দ্দমায় উকীলের কি অবস্থা! স্বামীর বিরুদ্ধে এক জন শিক্ষিতা স্ত্রী সাক্ষী দিতেছেন। আমি এই মকর্দ্দমাটি মিটাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলাম। ফৌজদারী মামলায় আসামীর পক্ষে মামলা চালাইতে আমি বড়ই নারাজ। কারণ, ফৌজদারী মামলার শেষ কিরূপ হইবে, ইহা কেহই বলিতে পারে না—উকীল নয়, সাক্ষী নয়, হাকিম নিজেও নয়। আর ইহা যদি জুরির বিচার হয়, তাহার শেষ ফল বলা বিশেষ কঠিন। খুব বেশী প্রমাণ থাকিলেও জুরিপুঙ্গবরা আসামীকে খালাস দেন, আর খুব সামান্য প্রমাণবলে আসামীকে ঝুলাইয়া দেন। তাহা ছাড়া অধিকাংশ সময়ে হাকিমদের নিজের নিজের খেয়ালের উপর মামলার রায় হয়। একজনকার বিষয়সম্পত্তি লইয়া মামলা লড়া একরকম, আর ফৌজদারী মামলা, যেখানে আসামীর জেল বা ফাঁসী হইবার সম্ভাবনা, সেরূপ মামলা চালান অতিশয় দায়িত্ব-পূর্ণ। অনেক সময়েই এরূপ মামলার ফল অনিশ্চিত। সেই

কারণে যতদূর সম্ভব ফৌজদারী মামলা মিটিয়া যাইলেই ভাল। যাহাই হউক, অনেক চেষ্টা করিয়া আমি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হই-লাম না, স্ত্রী সব সময় স্বামীর দোষ দিতে লাগিল, স্বামীও অনেক সময় স্ত্রীর দোষ দিতে লাগিলেন। কিন্তু মোটের উপর যাহা বুঝি-লাম, তাহাতে সচরাচর অবস্থায় যাহা ঘটে, তাহাই হইয়াছিল। অর্থাৎ জবরদস্ত স্ত্রীকে কম জবরদস্ত স্বামী আঁটিতে পারিলেন না।

মামলা চলিল। ফরিয়াদী তরফের সব সাক্ষীর এজাহার হইয়া গেল। আমার মক্কেলের নামে Charge গঠিত হইল। আমি জেরা সুরু করিয়া দিলাম। কয়দিন অতি সন্তর্পণে জেরা করিবার পর, আমি আমার মক্কেলকে খালাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যে কয়দিন জেরা করিতে হইয়াছিল, সেই কয়দিন আমি ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া জেরা সুরু করিতাম। প্রায় তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিতাম—নারায়ণ, আমি জানি, আমার আসামী নির্দ্দোষ। সে অন্য বিষয়ে যতই দোষী হউক না কেন, এ মামলায় সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। দেখো প্রভু, নির্দ্দোষ হওয়া সত্ত্বেও আমার দোষে সে যেন দোষী সাব্যস্ত না হয়। ভগবান্ আমার করুণ প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। আমি আসামীকে খালাস করিতে পারিয়াছিলাম। যখন আমি মিসেস রিচমণ্ডকে জেরা করিতেছিলাম, তখন একটি ঘটনা ঘটে, তাহা আমি এখানে বিবৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

আমি :—মিসেস রিচমণ্ড, আপনার বয়স কত?

মিসেস্ রি :—আমি সে কথা আপনাকে বলিব না।

আমি :—আপনি সাক্ষী, আমি আসামীর উকীল। এরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার আমার আছে।

মিসেস্ রি :—আপনার অধিকার আছে কি না, জানি না, তবে এরূপ অধিকার আপনার থাকা উচিত নয়।

এইরূপ খানিক খিটিমিটির পর আমি আদালতকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম—"হুজুর, আপনি এই সাক্ষীকে বলিয়া দিন, তিনি আমার কথার জবাব দিতে বাধ্য।"

হাকিম এরূপ বলা সত্ত্বেও তখনও রমণীটি এই প্রশ্নের জবাব দিতে বিশেষ অনিচ্ছুক। কিন্তু আমি ও হাকিম উভয়ে অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি হইলেন। কিন্তু যে জবাব দিলেন, সে জবাব আমি পূর্ব্বে কখন আশাও করি নাই, কখন ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারি নাই।

প্রশ্ন :—আপনার বয়স কত?

উত্তর :—Baptismally I am 42, but medically I am 32. (জন্মতিথি হিসাবে আমার বয়স ৪২ বৎসর, কিন্তু শারীরিক অবস্থা ও অঙ্গসৌষ্ঠব হিসাবে আমার বয়স ৩২)।

পাঠক-পাঠিকা, আপনারা এই উত্তর কি পছন্দ করেন?

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)

চিরন্তনী

চিরদিনই জীবন মরণ রইবে পাশাপাশি,
সৃষ্টি-নাশই মর্জ্জি বিধাতার;
দুখের পিছু রয় যে ক্ষণিক শান্তি সুখের হাসি,—
সুখে দুখেই শান্তি দুনিয়ার।

কর্ম্মফলের কাঁদন হাসি ভাগ্য চিরদিন
মানতে হবে,—নাইক' অবসান;
সূর্য্য-শশীর আলোক রবে দীপ্ত অমলিন,—
গাইবে কবি-চিরন্তনের গান!

মর্ম্ম-তুলার ওজন বুঝে চলবে দুখী দীন,
চিরন্তনেই মিলবে সুখের স্বাদ;
বিশ্বপতির মর্জ্জি খেয়াল বলবে যে গো হীন,
হীন সে নিজেই—মিথ্যা অপবাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ

পুরাণ-প্রসঙ্গ

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

নারদীয় পুরাণ

ষষ্ঠ পর্য্যায়ভুক্ত, ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৫ হাজার। এই পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে ৪টি পাদ আছে। ১ম পাদে সংক্ষেপে সৃষ্টি ও নানা ধর্ম্মকথা সনক নারদকে বলিয়াছেন, এই সৃষ্টি মহাভারতের শান্তিপর্ব্বীয় ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে বর্ণিত সৃষ্টির ন্যায় এবং বৃক্ষের প্রাণ থাকার কথাও আছে। ঐ শ্লোকগুলি প্রায় অভিন্ন। ২য় পাদে মোক্ষধর্ম্ম ও মোক্ষোপায়-বর্ণন বিষ্ণুপুরাণের ৬ষ্ঠাংশের খাণ্ডিক্য কথার সহিত অভিন্ন। ৬টি বেদাঙ্গের বিস্তৃতভাবে বর্ণন এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বীয় শুকোৎপত্তি, জনক-শুকসংবাদ ও শুকের মহাপ্রস্থানবং শুকচরিত্র বিস্তৃতভাবে সনন্দন নারদকে বলিয়াছেন। ৩য় পাদে পশুপাশ-বিমোক্ষণ, মন্ত্রশোধন, দীক্ষা, মন্ত্রোদ্ধার, পূজাপ্রয়োগ, কবচ, সহস্রনামস্তোত্র, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তির পর পর আছে। ৪র্থ পাদে পুরাণলক্ষণপ্রমাণ দানপ্রণালী আছে, উহা সনাতন নারদকে বলিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণগুলির যেমন বক্তার নামানুসারে নামকরণ হইয়াছে, এখানির নাম হইয়াছে শ্রোতার নামানুসারে। কারণ, এই পুরাণের বক্তা বহু জন। শ্রোতা এক।

উত্তর ভাগে একাদশী-ব্রতের প্রসঙ্গানুসারে বশিষ্ঠ-মান্ধাতৃ-সংবাদাত্মক ৩৯শাধ্যায়ে বর্ণিত। ইহার ১ম শ্লোক—

> পান্তু বো জলদশ্যামাঃ শার্ঙ্গজ্যাঘাতকর্কশাঃ।
> ত্রৈলোক্যরক্ষণস্তম্ভাশ্চত্বারো হরিবাহবঃ॥

এই শ্লোকটি রূপকালঙ্কারের উদাহরণরূপে সাহিত্য-দর্পণকার লিখিয়াছেন, উহাতে পুস্তকের নাম নাই।

রুক্মাঙ্গদকথা, মোহিন্যুৎপত্তি, বসুশাপ, গয়া, গঙ্গা, কাশী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, পুরুষোত্তম, হরিদ্বার, বদরী, কামাখ্যা, প্রভাস, গোকর্ণ প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য ও যাত্রাদির কথা আছে। বসুর [illegible]র নিকট গমন, মোহিনীর চরিত্র বর্ণন এই পর্য্যন্তই নারদীয় পুরাণ। কোন কোন হস্তলিখিত পুস্তকে বৃহন্নারদীয়ও নারদীয় পুরাণের একাংশরূপে নিবদ্ধ দেখা যায়।

নারদীয় পুরাণের বর্ণিত বিষয় প্রায়ই অন্য পুরাণের, কেবল তন্ত্রাংশ অন্য মহাপুরাণে দেখা যায় না, ইহাকে পুরাণকার নিজেই তন্ত্রও বলিয়াছেন,—

> যে তু সামান্যতঃ প্রোক্তং তন্ত্রেঽস্মিন্ মনবো দ্বিজ।
> শিবসান্নিধ্যদং প্রোক্তং সর্ব্বতন্ত্রপ্রকাশকম্।
> এতত্তু সুমহত্তন্ত্রং সর্ব্বদেবপ্রকাশকম্।

ইত্যাদি এবং ইতি পাদে নিত্যাপটলকমলঃ নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ, এই লেখার দ্বারা কেহ কেহ ইহাকে অতিশয় আধুনিক মনে করেন। আমরা উহার সমর্থন করি না, কারণ, তন্ত্রও বেদবৎ পূজ্য ও অনাদি।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণ

এই পুরাণখানি ৭ম, ৮ম কোন মতে দ্বদেশ পর্য্যায়ভুক্ত। সকল মতেই ইহার শ্লোক-সংখ্যা ৯ হাজার, মুদ্রিত পুস্তকে কিঞ্চিদধিক ৬ হাজার শ্লোক দেখা যায়, সুতরাং ইহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই নাই। এই পুরাণে অতি বিশদভাবে মন্বন্তরকথা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ অন্য পুরাণে নাই। মহাভারতশ্রবণে সন্দিগ্ধ ব্যাসশিষ্য জৈমিনি সংশয়নিবারণের জন্য মার্কণ্ডেয় ঋষির নিকট প্রশ্ন করিলে তাঁহার আদেশে অভিশপ্ত পক্ষ ঋষিপুত্র উত্তর দান করেন। তাঁহারা বক্তা, জৈমিনি শ্রোতা। নারদীয় পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, মার্কণ্ডেয়-জৈমিনি-সংবাদ পক্ষীদিগের পূর্ব্বজন্ম-কথা, (জন্মকথা) ইন্দ্রের বিক্রিয়া। বলদেবের তীর্থযাত্রা, হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের বৃত্তান্ত, আড়ীবকযুদ্ধ, পিতা-পুত্রের উপাখ্যান, দত্তাত্রেয়-কথা, বৃহৎ হৈহয়চরিত্র, অলর্কচরিত সহিত মদালসা-চরিত, নয় প্রকার সৃষ্টিকীর্ত্তন, কল্পান্তকাল নির্দ্দেশ, দক্ষসৃষ্টি, রুদ্রসৃষ্টি, দ্বীপবর্ষাদি কথন,

মনুদিগের কথা, তন্মধ্যে দুর্গামাহাত্ম্যকথা, প্রণবোৎপত্তি, সূর্য্যকথা ও তন্মাহাত্ম্য, বিবস্বত-চরিত, বৎসপ্রীচরিত্র [বৎসপ্রী স্থানে বৎসশ্রী পাঠও আছে], খনিত্রচরিত, অবীক্ষিৎ-চরিত, কিমিচ্ছকব্রত, নরিষ্যন্তচরিত, ইক্ষ্বাকুচরিত, তুলসীচরিত, রামকথা, কুশবংশকথন, সোমবংশ-কীর্ত্তন, পুরোরবার কথা, নহুষের কথা, যদুবংশানুকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত, মাথুরচরিত, দ্বারকা-চরিত এবং সকল অবতারের কথা, সাংখ্যমত, প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব কীর্ত্তন, মার্কণ্ডেয়-চরিত, পুরাণশ্রবণফল, এই প্রশস্ত সূচীপত্রমধ্যে ইক্ষ্বাকুচরিত্র হইতে মার্কণ্ডেয়চরিত্র পর্য্যন্ত কথাভাগ মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায় না।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে পুরাণের অন্তরঙ্গ সর্গাদি ব্যতীত বহিরঙ্গ কথা অতি অল্পই আছে। এই পুরাণের যতটা অংশ পাওয়া যায়, উহা অতি প্রাচীন বৌদ্ধ-বিপ্লবেও অবিপর্য্যস্ত বলিয়া বোধ হয়।

অগ্নিপুরাণ

৮ম বা নবম পর্য্যায়ে অবস্থিত। এই পুরাণখানি সর্ব্ববাদিসম্মত মহাপুরাণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা নারদীয় পুরাণের মতে ১৫ হাজার, মৎস্যমতে ১৬ হাজার, বর্ত্তমান বঙ্গবাসী-মুদ্রিত অগ্নিপুরাণে কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ১০ হাজার ৪ শত শ্লোক পাওয়া যায়। সৃষ্টির সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পুরাণের সৃষ্টিপ্রক্রিয়াও নিজস্ব মত আছে। উহা ঠিক সেশ্বর সাংখ্য বা বৈদান্তিক মত নহে, পৌরাণিক ঈশ্বর সগুণ ও নির্গুণ, সাকার ও নিরাকার, ইনি ভক্তদের কল্পিত রূপে প্রকটিত হয়েন ও তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই ভাবেই মহিম্ন স্তোত্রে 'পদে ত্বর্ব্বাচীনে' এই কথা বলা হইয়াছে। যোগদর্শনের মতের সঙ্গে অধিকাংশই মিলিয়া গিয়াছে।

মৎস্যপুরাণের ন্যায় এই পুরাণেও সর্ব্বপ্রথমে মৎস্য অবতার ও তৎসংক্রান্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এই ঘটনাটি শতপথ-ব্রাহ্মণের ১ম ভাগের ১ম কাণ্ডের ৮মাধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—"এক দিন প্রাতঃকালে পরিচারকবর্গ মনুর হস্ত ধৌত করিবার জল আহরণ করিয়াছিল এবং হস্ত ধৌত করিবার সময়ে একটি মৎস্য মনুর হস্ততলে আসিয়াছিল।

সেই মৎস্য মনুকে বলিল, আমাকে পোষণ কর, তোমাকে আমি পার করিব। মনু বলিলেন, আমাকে কোথা হইতে পার করিবে ? মৎস্য বলিল, জলসমূহ (জলপ্লাবন) এই সকল প্রজাবর্গকে দেশান্তরে লইয়া যাইবে, তার পর তোমাকে পার করিব। মনু বলিলেন, কিরূপে তোমারভরণ হইবে ? মৎস্য বলিল, আমি যে পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র থাকিব, সে পর্য্যন্ত অনেকেই বিনাশ করিতে পারে, মৎস্যই মৎস্যকে বিনাশ করে, সুতরাং আমাকে কলসীর মধ্যে পোষণ কর। তার পর আমি যখন বড় হইব, উহাতে আমার স্থান হইবে না, তখন আমাকে সমুদ্রে রাখিয়া দিও, সেই স্থানে ১০।১২ দিনের মধ্যে জলপ্লাবন আসিবে, তখন আমাকে নৌকা কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবে এবং নৌকায় আরোহণ করিও, আর আমি তোমাকে পার করিব।" ইহার পর মনু মৎস্যের বাক্যানুসারে তাহাকে রাখিয়া সমুদ্রে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

সে যে সময়ের কথা বলিয়াছিল, সেই সময়ে নৌকা লইয়া মনু মৎস্যের অপেক্ষায় ছিলেন, এমন সময়ে জলপ্লাবন আরম্ভ হইলে মনু নৌকায় উঠিলেন। তখন সেই মৎস্য রাজার নিকটে নৌকার নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার শৃঙ্গে নৌকা রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিলে মৎস্য উত্তর-পর্ব্বতের দিকে গমন করিয়াছিল। মৎস্য বলিল, আমি তোমায় পার করিলাম, বৃক্ষে নৌকা বন্ধন কর। তুমি ও আমি পর্ব্বতে থাকিতে থাকিতে যেন জল নামিয়া না যায়। যেমন জল নিম্নে গমন করিবে, তখন আমিও নামিয়া যাইব। সেই মৎস্য সেইরূপ ভাবেই নামিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেই উত্তর-গিরিতে মনু অবতরণ করিয়াছিলেন, এবং জলপ্লাবনে প্রজা সকল নষ্ট হইয়াছিল, মনুই মাত্র একা অবশিষ্ট ছিলেন।

পুরাণে এই ঘটনাটি সামান্যমাত্র বিকৃত হইয়াছে, প্রতিপাদ্য বিষয় সকল একরূপই আছে।

ইহার পরে কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরামাবতার পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়া রামচরিত্র ৭কাণ্ড বিভাগে বলা হইয়াছে। ইহার পরে হরিবংশ ও সমগ্র মহাভারত ও তৎপরে বুদ্ধাবতারের কথা বলা হইয়াছে। বিষ্ণু দৈত্যমোহনার্থ শুদ্ধোদনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিজ মত প্রচার করিয়া লোক-সমূহকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন, এবং তিনি আর্হত হয়েন। ইহার পরে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণ-গৃহে কল্কি অবতীর্ণ হইবেন, জয়দেব-বর্ণিত বিষ্ণুর দশাবতার-কথা এই স্থানে পাওয়া যায়। ইহার পরে তত্ত্বসৃষ্টি, রূপসর্গ, জগৎসৃষ্টি, কশ্যপাদিসৃষ্টিরূপ প্রতিসর্গ বর্ণিত হইয়াছে। এখানে প্রতিসর্গপদে ব্রহ্মাদিঋষিসৃষ্টি। ইহার পরে স্নান, পূজা, অগ্নিকার্য্য-মন্ত্র, মুদ্রা, দীক্ষা, অভিষেক, মণ্ডলরক্ষাবিধান, সংস্কার, পবিত্রারোপণ, দেবালয়মাহাত্ম্য, প্রতিষ্ঠা, শান্তি, প্রতিমালক্ষণ, শালগ্রামলক্ষণ ও পূজা, প্রাসাদ বাস্তু শিবাদি প্রতিষ্ঠা, স্বায়ম্ভুব মনুসর্গ, ভূগোল, তীর্থ-মাহাত্ম্য, জ্যোতিঃশাস্ত্রসার, মন্বন্তর, আচার, দ্রব্যশুদ্ধি, অশৌচ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, ব্রত, দান, রাজধর্ম্ম, শাকুন, স্বপ্ন, ধনুর্ব্বেদব্যবহার, দান, পুরাণসংখ্যা ও উহার শ্লোকসংখ্যা, সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, যদুবংশ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই

বংশবর্ণনমধ্যে ভবিষ্য রাজগণের নাম নাই, নবিষ্যানের পুত্র শকগণ, কিন্তু এই বংশের রাজগণের সম্পূর্ণ নাম নাই এবং যাহা আছে, তাহারও পৌর্ব্বাপর্য্য ঠিক নাই, সকল বংশ-তালিকাতেই এইরূপ ভ্রম পরিলক্ষিত হয়।

দেবাসুরগণের মধ্যে যে চিরন্তন বিবাদ ছিল, এ কথা শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে এবং তদুপলক্ষে বামনাবতারের কথাও সে স্থানে আছে। অগ্নিপুরাণে—ঐ দেবাসুরসংগ্রাম দ্বাদশবার হইয়াছিল বলা হইয়াছে। উহার নাম ১ম নারসিংহ, ২য় বামন, ৩য় বারাহ, ৪র্থ অমৃতমন্থন, ৫ম তারকাময়, ৬ষ্ঠ আড়ীবক, ৭ম ত্রৈপুর, ৮ম অন্ধকবধ, ৯ম বৃত্রঘাতক, ১০ম জিৎ, ১১শ হালাহল, ১২শ ঘোর কোলাহল। নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপুবধ, বামনাবতারে বলিকে ছলনা করিয়া ইন্দ্রকে রাজ্যদান, বরাহাবতারে হিরণ্যাক্ষ-বধ ও পৃথিবীর উদ্ধার, অমৃতমন্থনে কূর্ম্মাবতার ও দেবাসুরসংগ্রাম, তারকাময় সংগ্রামে দেবগণকে রক্ষা করা, ৬ষ্ঠে বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের সংগ্রাম, ৭মে ও ৮মে শিবকর্ত্তৃক ত্রিপুর-ধ্বংস ও অন্ধক-বধ, ৯মে ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রবধ, ১০মে পরশুরাম কর্ত্তৃক দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করা, ১১শে হালাহল দৈত্যকে নাশ করা, ১২শে কোলাহলকে পরাজয় করা। ইহার পরে আয়ুর্ব্বেদ, ব্রহ্মায়ুর্ব্বেদ, পশুচিকিৎসা, ছন্দঃ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, চতুর্ব্বিধ প্রলয়, শরীরাবয়ব, অষ্টাঙ্গযোগ, ব্রহ্মজ্ঞান, গীতাসার, পুরাণসমাপ্তি।

বর্ত্তমান অগ্নিপুরাণের সর্ব্বাবয়ব আমরা দেখিতে পাই নাই। এই পুরাণমতে ইহার শ্লোকসংখ্যা ১২ হাজার। মুদ্রিত পুস্তকে ১৬ শতের অধিক শ্লোক কম আছে, মধ্যে মধ্যে যেরূপ ক্রমভঙ্গ দেখা যায় ও পুরাণের স্বরূপনির্ব্বাহক অঙ্গের অভাব পরিলক্ষিত হয়, উহাতে মনে হয় যে, পুরাণের সর্ব্বাবয়ব পাইলে এই গোলযোগ ঘটিত না।

এই পুরাণে সৃষ্টি, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, বংশানুচরিতাংশ একেবারেই নাই। এই পুরাণখানি অধ্যয়ন করিলে একপ্রকার অষ্টাদশ বিদ্যার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পুরাণের বক্তা অগ্নি, শ্রোতা বশিষ্ঠ ঋষি, অথচ ইহাতে ভারত, রামায়ণ, রামপ্রোক্ত নীতিকথা প্রভৃতি অর্ব্বাচীন কালের কথা আছে, এতদ্বিষয়ের সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

স্মার্ত্তগ্রন্থে সর্ব্ববর্ণের ও সকল অধিকারীর পক্ষে অশৌচকাল-মধ্যে যে পূরক-পিণ্ডদানের কথা আছে, উহা দশসংখ্যক, কিন্তু অগ্নিপুরাণে আছে যে,—

> ব্রাহ্মণে দশ পিণ্ডাঃ স্যুঃ ক্ষত্রিয়ে দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
> বৈশ্যে পঞ্চদশ প্রোক্তাঃ শূদ্রে ত্রিংশৎ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
>
> ১৫৮ অধ্যায়।

এইরূপ অনেক নূতন বিষয় এই পুরাণে আছে। বাস্তুতত্ত্ব, রাজধর্ম্ম, ব্যবহার, জ্যোতিষ প্রভৃতির ন্যায় ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদিও আছে, এই সকল বিষয় গরুড়পুরাণে ও নারদীয় পুরাণেও আছে।

ত্রিস্থলীসেতু গ্রন্থের গয়াপ্রকরণে প্রায় শতাধিক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, ১১৪—১১৬ এই তিন অধ্যায়েরই শ্লোক উহাতে আছে।

ভবিষ্যপুরাণ

পুরাণসংখ্যাপর্য্যায়ে ৯ম, কোথাও ৬ষ্ঠ বা ৭ম পর্য্যায়ে দেখা যায়। এই পুরাণের বহুতর শ্লোক স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, আপস্তম্বকৃত ধর্ম্মসূত্রে ভবিষ্যপুরাণের কথা আছে। ভবিষ্যপুরাণ শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্বের কথা লইয়া আরব্ধ হইয়াছে। এই পুরাণখানির বক্তা ব্রহ্মা, স্বায়ম্ভুব মনু শ্রোতা। ব্যাস যখন পুরাণ বিভাগ করেন, তখন উহা পঞ্চভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম পর্ব্বের নাম ব্রাহ্ম্য। উহার উপক্রমে সূত-শৌনক-সংবাদ, পুরাণপ্রশ্নক্রম, আদিত্যচরিত্র উপাখ্যান সহিত, শাস্ত্রস্বরূপ পুস্তকলেখকের লক্ষণ, সপ্ততিথিকল্প। দ্বিতীয় বিষ্ণুপর্ব্বে অষ্টম্যাদি কল্প বর্ণিত হইয়াছে। শৈব ও সৌরপর্ব্বে অন্ত্যকথা আছে। পঞ্চম পর্ব্ব প্রতিসর্গ; ইহাতে নানা উপাখ্যান ও পুরাণের উপসংহার বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম পর্ব্বে ব্রহ্মার, দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থে বিষ্ণু শিব ও সূর্য্যের মাহাত্ম্য ও ধর্ম্ম, কাম, মোক্ষ কথা আছে। প্রতিসর্গ পর্ব্বে সকল কথা ও ভবিষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পুরাণে ১৪ হাজার শ্লোক আছে। সকল দেবতার সাম্য এই পুরাণেই আছে। এই সব কথা নারদীয় পুরাণ পাঠে জানা যায়। ভবিষ্যপুরাণের প্রথম চারি খণ্ড ধর্ম্মতত্ত্বালোচনায় পূর্ণ, ইহার মধ্য হইতেই বহু শ্লোক নিবন্ধকারেরা উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রতিসর্গ পর্ব্বে কোন আখ্যান বা বাকি ভবিষ্যকথা আছে, তাহা কেহই উল্লেখ করেন নাই। আমরা যে কয়েকখানি হস্তলিখিত ভবিষ্যপুরাণ দেখিয়াছি এবং যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে প্রতিসর্গ পর্ব্বের কোন সন্ধানই পাই নাই; কেবল বোম্বে হইতে মুদ্রিত ভবিষ্যপুরাণে বিস্তৃত প্রতিসর্গ পর্ব্ব দেখা যায়, এবং তাহাতেই জানা যায়, ভবিষ্যপুরাণে ৫০ হাজার শ্লোক, কিন্তু যত স্থানে ভবিষ্যপুরাণের শ্লোক-সংখ্যা নির্দ্দেশ আছে, সর্ব্বত্রই ১৪ হাজারের কথা দেখিতে পাই। মৎস্যপুরাণের ৫৩ অধ্যায়ে আছে, অঘোরকল্পপ্রসঙ্গে ব্রহ্মা সূর্য্য-মাহাত্ম্যাবলম্বনে জগতের স্থিতি মনুকে বলিয়াছেন। ভবিষ্য-চরিত্রবহুল ১৪ হাজার ৫ শত শ্লোকাত্মক ভবিষ্যপুরাণ।

মুদ্রিত পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে আছে, 'ভবিষ্যমেতদৃষিণা লক্ষার্দ্ধং সংখ্যয়া কৃতং' এই শ্লোকার্দ্ধ হস্তলিখিত পুস্তকে পাই নাই। অথচ অন্যান্য পুরাণের প্রদত্ত হিসাবে ১৪ হাজারই পাওয়া যায়। প্রথমে যেমন শ্লোকসংখ্যার গোল, সেইরূপ পাঁচটি পর্ব্ব পৃথক্ পৃথক্‌ও দেখা যায় না, এবং অঘোর কল্পের পরিবর্ত্তে বারাহকল্পের কথা দেখা যায় এবং সূতশৌনক-সংবাদের পরিবর্ত্তে সুমন্তু-শতানীক-সংবাদ দেখা যায়।

প্রতিসর্গ পর্ব্বেও উপসংহার নাই। এই প্রতিসর্গ পর্ব্ব দৃষ্টেই ভিন্সেণ্ট স্মিথ ইহাকে ভেজালপূর্ণ পুস্তক বলিয়াছেন।

ইহার বর্ণিত বিষয়গুলি এত ভ্রমপ্রমাদপরিপূর্ণ যে, কোনরূপেই তাহা বিশ্বাস করা যায় না। মুসলমান ও ইংরেজ রাজ্যকালের ঘটনার কোন কথাই প্রায় মিল হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইহার মতে পূর্ণাবতার। অথচ চৈতন্যাবতারবাদীরা এমন সুন্দর প্রমাণ সত্ত্বেও ইহার একটি শ্লোকও গ্রহণ করেন নাই।

মধ্যম তন্ত্র বা বিষ্ণুপর্ব্বে বাগান, ক্ষেত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণের ও রক্ষার প্রণালী, মণ্ডপ-প্রতিমা-কুণ্ডাদির কথা অতি বিস্তৃতভাবে আছে। মুদ্রিত পুস্তকাপেক্ষা হস্তলিখিত পুস্তকই অনেক শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ পাইয়াছিলাম।

কালবিবেক-কৃত্যমহার্ণব, তিথিতত্ত্বাদি গ্রন্থে ও ত্রিস্থলীসেতু নামক গ্রন্থে ভবিষ্যপুরাণের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে, শাম্বপুরাণ ভবিষ্যপুরাণের ১ম ভাগ, বরাহপুরাণে ১৭৭, ৩৪, ৪৯, ৫১ শ্লোকে ভবিষ্যপুরাণের শাম্বের কথা আছে। মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ুপুরাণে জানা যায়, তৎপুরাণবর্ণিত ভবিষ্যাংশ, ভবিষ্যপুরাণের, তাহাদের নিজস্ব নহে। কিন্তু বর্ত্তমান মুদ্রিত ভবিষ্যপুরাণে উহা নাই এবং ভবিষ্য বলিয়া যাহা আছে, উহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ভবিষ্যপুরাণের ভবিষ্যাংশ মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। ভবিষ্যকথন বর্ত্তমান কালের সভ্যগণ বিশ্বাস করেন না, কিন্তু মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বনপর্ব্বে ১৯০ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে বলিয়াছেন, "হে রাজন্, আমি যাহা শুনিয়াছি, দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর।" ইহা দ্বারাও আমাদের পূর্ব্বকথিত আর্ষ-বিজ্ঞান বা যোগপ্রভাব প্রমাণিত হয়।

ভবিষ্য—কিরূপে পুরাণ হয় ? এই প্রশ্নের উত্তর এই বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, এই স্থানে পুরাণশব্দে একজাতীয় পুস্তকমাত্রকে বুঝাইয়া দেয়—ভবিষ্যবিষয়ক পুরাণগ্রন্থ, ইহাই উহার অর্থ। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩ শতাব্দীতেও আপস্তম্বসূত্রে পুরাণকে পুরাতন অর্থে ব্যবহার না করিয়া ইতিহাস—প্রাচীন ঘটনাবলীযুক্ত পুস্তক বুঝাইত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

সর্ব্বমতেই দশম সংখ্যক ও শ্লোকসংখ্যা ১৮ হাজার। এই পুরাণখানি ৪ খণ্ডে বিভক্ত, যথা—ব্রহ্ম, প্রকৃতি, গণেশ ও শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ব্রহ্মখণ্ডের অনুক্রমণিকার সহিত নারদীয় পুরাণের প্রদত্ত বিষয়সূচীর মিল নাই, এবং সেইরূপ ভাবে লিখিতও হয় নাই। ইহার ভাষা সরল এবং অনেকে অর্ব্বাচীন কালের বলিয়া অনুমান করেন। এই পুরাণের বহু প্রমাণ ত্রিস্থলীসেতু গ্রন্থে ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-কৃত স্মৃতিনিবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। কাশীমাহাত্ম্য নামক একখানি ২৬শ অধ্যায়ের অতি প্রাচীন গ্রন্থ এই পুরাণের তৃতীয় বিভাগান্তর্গত বলিয়া বিখ্যাত, এবং ইহারই পরিশিষ্টান্তর্গত কাশীকেদারমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থও কম দিনের নয়, উহা পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়। এই পুরাণে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় নিবদ্ধ আছে। গীতগোবিন্দের ১ম শ্লোক 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং' ইত্যাদি ঠিক ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেরই ঘটনাবিশেষ অবলম্বনে লিখিত। ঐরূপ ঘটনা অন্য কোন পুরাণে নাই। এই পুরাণ সম্বন্ধে বহু কথাই প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে 'পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে খণ্ডত্রয়মমূলক,' ইত্যাদি। অবশ্য এই সকল কথা বৈষ্ণববিরোধী দলের হইবে। সুপ্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমবাবুও শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রামাণ্য খণ্ডন করিয়াছেন এবং ইহা অতি অর্ব্বাচীন কালের লিপি বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ইহা তত অর্ব্বাচীন নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের তৃতীয় বিভাগান্তর্গত যে কাশী-মাহাত্ম্যের কথা বলা হইয়াছে, উহাও খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বকার লেখা বলিয়া বুঝিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

উক্ত কাশী-মাহাত্ম্যে কাশীরাজ মহাসেন রাজার কথা বর্ণিত আছে। ঐ রাজার ভগিনী, স্থাণ্বীশ্বররাজ প্রভাকর বর্দ্ধনের মাতা হর্ষের পিতামহী, ইঁহারা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও ৫ম শতাব্দীর শেষ পাদে বর্ত্তমান ছিলেন। যে গ্রন্থে ঐ কাশীমাহাত্ম্যের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাও প্রায় ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। জয়দেব যে ভাব লইয়া গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক লিখিয়াছেন, সেই অর্ব্বাচীনাংশও ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া বুঝিবার পক্ষে বিশেষ যুক্তিপ্রমাণ আছে। তবে মধ্যে মধ্যে বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক কিছু কিছু প্রক্ষিপ্তাংশ যোজিত হইয়াছে, ইহা এই পুরাণপাঠমাত্রেই বুঝা যায়। এই পুরাণ বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও ভাগবতের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করিবার পক্ষে বঙ্কিমবাবু যথেষ্ট কারণ দেখাইয়াছেন। এই পুরাণে কৃষ্ণের দেহ এবং চূড়া ও বাঁশীটি পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত বা নিত্য বলা হইয়াছে এবং বৃন্দাবন মথুরা দ্বারকা নিত্য, লীলা নিত্য, পার্ষদগণ নিত্য,

সম্বন্ধে অনিত্য কিছুই নহে। পরন্ত কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ৮৭ অধ্যায়ে এক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ভূভার হরিবার জন্ত অবতীর্ণ, আপনাকে আর কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা কি করিব ?" ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "শরীরে প্রাকৃতে নাথ কৃতকং শুভাশুভম্। নিত্যদেহে ক্ষেমবীজে জীবপ্রশ্নমনর্থকম্। যো বিগ্রহধারী চ স স প্রাকৃতিকঃ স্মৃতঃ। দেহো ন বিদ্যতে প্রভু তাং নিত্যাং প্রকৃতিং বিনা। সাম্প্রতং বাসুদেবোঽহং রক্তধ্যাশ্রিতং বপুঃ। কথং ন প্রাকৃতং বিপ্র শিবপ্রশ্নমভীপ্সিতম্।'' কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৭ অধ্যায়। এখন ইহা দ্বারা কি বুঝিব ?

লিঙ্গপুরাণ

একাদশসংখ্যক ও শ্লোকসংখ্যা ১১ হাজার। ইহা সর্ব্বপুরাণসম্মত। লিঙ্গপুরাণের ২য়াধ্যায়ে আছে, ঈশানকল্পের বৃত্তান্ত লইয়া লিঙ্গপুরাণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত হয়। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১১ হাজার এবং পুরাণ ১১দশ সংখ্যক। মুদ্রিত পুস্তকে প্রায় ১৫শত শ্লোক কম থাকিলেও উত্তরার্দ্ধে ৯টি অধ্যায় অধিক আছে। এই পুরাণের মধ্যে আছে—'অষ্টোত্তরশতাধ্যায়মাদিমাংশমতঃপরম্। ষট্চত্বারিংশদধ্যায়ং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্।'' এই পুরাণের দ্বিতীয় ভাগে ঐ অতিরিক্ত অধ্যায় কয়টা কোন্ স্থান হইতে ধরিতে হইবে, তাহা বলা কঠিন। নারদীয় পুরাণে বলা হইয়াছে, ইহা অগ্নিকল্পের উপাখ্যানে কথিত হইয়াছে, অথচ এই পুরাণমধ্যে 'ঈশানকল্পবৃত্তান্তমধিকৃত্য' এইরূপ কথিত হইয়াছে, এই পুরাণখানি সর্ব্বপুরাণসার বলা হইয়াছে। ইহাতে শিবের সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ উপাখ্যানাবলী প্রায়ই আছে এবং শিবমাহাত্ম্য-পরিপূর্ণ। এই পুরাণ মধ্যে অনেক বিষয় নূতন জানা যায়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন (কাশীরাজ সভাপণ্ডিত)।

আয়ুর্ব্বেদে জ্যোতিষের প্রভাব

জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমরা যেরূপ গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান, জগতের প্রাকৃতিক অবস্থা, সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ধর্ম্মকার্য্যাদির নিমিত্ত শুভ মুহূর্ত্ত, অশুভ মুহূর্ত্ত প্রভৃতি বিষয় অবগত হইতে পারি, সেইরূপ গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতু, অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিবিশেষে মানব-শরীরের অবস্থা জাতকচক্রে গ্রহ-নক্ষত্রের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিবন্ধন বিভিন্ন মানব-প্রকৃতির বিষয় অবগত হইতে পারি। আয়ুর্ব্বেদের সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় চিকিৎসকগণ চিকিৎসা ও জ্যোতিষ উভয় শাস্ত্রেরই একত্র অনুশীলন করিতেন। চরক এবং সুশ্রুত উভয়েই সুনিপুণ জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের চিকিৎসকগণ চিকিৎসার সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকার করিতেন। সুবিখ্যাত চিকিৎসক Galen সুনিপুণ জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। Hippocrates বলিতেন, জ্যোতিষশাস্ত্র-শিক্ষা ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা অসম্ভব ও অসম্পূর্ণ। বড় বেশী দিনের কথা নহে, মুর্শিদাবাদের ঋষিকল্প কবিরাজ স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরত্ন মহাশয় বৈদ্যক জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক চিকিৎসাজ্ঞানের মূলে তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা বিরাজমান ছিল। বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্রের সহিত আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ত্রিদোষ-বিজ্ঞানের উপর সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি ধাতু লইয়া মানব-শরীর গঠিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই তিনটি ধাতু স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানব-শরীর সুস্থ থাকে। উক্ত তিন ধাতুর মধ্যে যে কোন একটি ধাতু বিকৃত হইলে মানব-দেহ বিকৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রমতে মানব-শরীর সাধারণতঃ দ্বিধাতু-প্রধান হইয়া থাকে। সুতরাং মানব-শরীর হয় বায়ু-পিত্ত-প্রধান, অথবা বায়ু-শ্লেষ্মা-প্রধান অথবা পিত্ত-শ্লেষ্মা-প্রধান হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে লিখিত আছে :—

"ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ।
এতদ্ বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ।"

প্রথমতঃ রোগের তত্ত্বনিরূপণ, তৎপরে যথাবিধি ঔষধাদি-প্রয়োগ দ্বারা রোগের নিরাকরণ আবশ্যক। রোগের তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে হইলে রোগ কি, তাহা জানা আবশ্যক। রোগ কি, তাহা অবগত হইতে হইলে রোগীর শরীর কোন্ ধাতুপ্রধান, তাহা জানা আবশ্যক। জ্যোতিষশাস্ত্র অভ্যাস করিলে আমরা অতি সহজে ব্যক্তিগত ধাতু ও প্রকৃতি অবগত হইতে পারি।

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রমতে সমগ্র আকাশমণ্ডল, পৃথিবী এবং মানব-দেহকে মেষাদি দ্বাদশটি রাশিতে ভাগ করা হইয়াছে। এই দ্বাদশ রাশিকে অগ্নি, পৃথ্বী, বায়ু ও জল এই চারিটি সংজ্ঞায় বিভাগ করা হইয়াছে। এই নিয়মানুসারে মেষ রাশি অগ্নি-সংজ্ঞক, বৃষ পৃথ্বী, মিথুন বায়ু ও কর্কট রাশি জলসংজ্ঞক। এ রূপ সিংহ

অগ্নিরাশি, কন্যা পৃথ্বী, তুলা বায়ুরাশি, বৃশ্চিক জলরাশি, ধনু অগ্নিরাশি, মকর পৃথ্বীরাশি; কুম্ভ বায়ুরাশি ও জলরাশি। মেষ, অগ্নিরাশি। চন্দ্র মেষরাশিতে অবস্থানকালে কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিলে তাহার বায়ুপিত্ত-প্রধান শরীর হইবে। এইরূপ বৃষ বায়ু-শ্লেষ্মাপ্রধান, সিংহ বায়ুপিত্তপ্রধান, কন্যা বায়ু-শ্লেষ্মাপ্রধান, বৃশ্চিক বায়ুশ্লেষ্মাপ্রধান, ধনু বায়ুপিত্তপ্রধান, মকর বায়ুশ্লেষ্মাপ্রধান, কুম্ভ পিত্তশ্লেষ্মাপ্রধান এবং মীন রাশি বায়ুশ্লেষ্মাপ্রধান শরীরবিশিষ্ট হইবে। ফলিতজ্যোতিষশাস্ত্রমতে চন্দ্র, বুধ, শুক্র ও বৃহস্পতি জলগ্রহ নামে, রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতু শুষ্কগ্রহ নামে অভিহিত হয়। রবি পিত্তধাতুর, চন্দ্র বাতশ্লৈষ্মিক ধাতুর, মঙ্গল পিত্তের, বুধ বাত পিত্ত কফ ত্রিদোষের, বৃহস্পতি ও শুক্র কফের, শনি বাতশ্লৈষ্মিক ধাতুর ও রাহু বায়ুপ্রধান ধাতুর কারক। কোন ব্যক্তির লগ্নে পিত্তকারক গ্রহ থাকিলে জাত ব্যক্তি শ্লেষ্মপ্রধান হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্যোতিষীরা দ্বাদশ রাশিতে মানবের অঙ্গ বিভাগ করিয়াছেন। লগ্নরাশি জাতকের মস্তক; তাহা হইতে দ্বিতীয় রাশি জাতকের মুখ ও গলা; তৃতীয় রাশি বক্ষঃস্থল; চতুর্থ রাশি হৃদয়; পঞ্চম রাশি ক্রোড়; ষষ্ঠ রাশি কাঁকাল; অষ্টম রাশি গুহ্ন ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ; নবম রাশি উরু; দশম রাশি জানু; একাদশ রাশি জঙ্ঘা ও দ্বাদশ রাশি পদ। লগ্ন হইতে গণনায় ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশের অধিপতি যে রাশিতে পড়িবে, অথবা যে রাশির অধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশিগত হইবে বা অস্তগত ও বিশেষ দুর্ব্বল হইবে, সেই রাশি যে অঙ্গ-সূচনা করে, সেই অঙ্গ আশ্রয় করিয়া তাহার কোন স্থায়ী পীড়া হইবে। রবি পীড়াকর হইলে পিত্তজ পীড়া, চন্দ্র পীড়াকর হইলে বাতশ্লৈষ্মিক পীড়া, মঙ্গল হইলে পিত্তজ পীড়া, বুধ হইলে ত্রিদোষজ পীড়া, বৃহস্পতি ও শুক্র পীড়াকারক হইলে কফজ, শনি হইলে বাতশ্লৈষ্মিক ও রাহু পীড়াকারক হইলে বায়ুজনিত পীড়া হইয়া থাকে। পীড়াকারক গ্রহ পৃথ্বী ও জলরাশিতে থাকিলে শ্লেষ্মা, অগ্নি ও বায়ু রাশিতে থাকিলে পিত্ত ও বায়ুর বিকৃতি বশতঃ পীড়া হইয়া থাকে। অগ্নি ও বায়ু রাশিতে পীড়াকারক গ্রহ থাকিলে কোন যন্ত্রে রক্তাধিক্য বশতঃ পীড়া হইয়া থাকে। এইগুলি বিচার করিয়া ঠিক করিলে কোন্ অঙ্গে কোন্ ধাতুর বিকৃতি হইয়া পীড়া হইবে, তাহা সহজেই ঠিক করা যায়। অভ্যাস হইলে যে অঙ্গে স্থায়ী পীড়া হইবে, তাহা ত অনায়াসেই স্থির করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। গ্রহ প্রতিকূল হইলে নানাবিধ পীড়া জন্মিয়া থাকে। সূর্য্য মস্তকে ও বদনে রক্তপিত্তজ পীড়া জন্মাইয়া থাকেন। চন্দ্র বক্ষঃস্থলে ও গলদেশে কফজ পীড়া, মঙ্গল পৃষ্ঠে ও উদরে পিত্তজনিত পীড়া ও ব্রণাদি রক্তপীড়া এবং বুধ চরণে ও হস্তে ত্রিদোষজ পীড়া প্রদান করেন। বৃহস্পতি কটিতে ও নিতম্বে বাতপিত্তজ পীড়া, শুক্র গুহ্যস্থলে কফ-বায়ুজ পীড়া, শনি জানু ও উরুদেশে বায়ুজনিত পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহ ও নক্ষত্র কর্ত্তৃক মানবদেহ বিভাগ করা হইয়াছে: রবি মস্তকের অধিপতি, চন্দ্র দক্ষিণ বাহুর, মঙ্গল উৎপাদনস্থানের, বুধ দক্ষিণ-পাদের, বৃহস্পতি উদরের ও তলপেটের, শুক্র বাম বাহুর এবং শনি বামপাদের অধিপতি। নক্ষত্রগণ কর্ত্তৃকও এরূপভাবে মানবদেহ ভাগ করা হইয়াছে। গ্রহ ও নক্ষত্রগণ প্রতিকূল হইলে গ্রহ ও নক্ষত্রগণ-নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ ও ধাতুকে আশ্রয় করিয়া মানব-শরীরে পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্রে এরূপ বহুপ্রকার সঙ্কেত লিখিত আছে। এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায় লিখিত হইল না।

প্রত্যেক রাশি, নক্ষত্র ও গ্রহভেদে রোগের বিবরণ জানা থাকিলে চিকিৎসকগণের রোগ নির্ণয় করিবার ও চিকিৎসার বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতুর স্বাভাবিক অবস্থার নাম স্বাস্থ্য ও উহাদের বিকৃতির নাম অস্বাস্থ্য। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে আমাদের আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কারণ, আমরা খাদ্যরূপে যাহা গ্রহণ করি, তাহাই আমাদের শরীরকে রক্ষা করে। আমরা জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জানিতে পারি যে, ঋষিগণ তিথি-বিশেষে কোন কোন দ্রব্যভক্ষণ নিষেধ বলিয়া নির্ণয় করিয়া অনেক প্রকার শপথবাক্য প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রকার নিষেধ করিবার কারণ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রমতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে আমাদের চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের পরস্পর অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে ধারণা বদ্ধমূল হইবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমা তিথিতে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কেন না, জ্যোতিষশাস্ত্রমতে চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই ভক্ষণ করিলে অতিসারাদি উদররোগ এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় মাংস ভক্ষণ করিলে শ্লৈষ্মিক পীড়া হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশীতে অপান বায়ু ঊর্দ্ধগামী হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধ হয় এবং উদর স্তম্ভিত হয়। মাষকলাই গুরুপাক, মলবর্দ্ধক এবং অতিসারাদি উদররোগোৎপাদক। সুতরাং চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই ভক্ষণে মলাধারে পূর্ব্বসঞ্চিত মল দূষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং উহা হইতে শেষে অতিসারাদি উদররোগ উপস্থিত হয়

বলিয়া চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই-ভক্ষণ নিষিদ্ধ। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই দুই তিথিতে মানব-শরীরে শ্লেষ্মাধিক্য হয়।* শ্লেষ্মা সঞ্চারিত হইলে পাচিকা শক্তিও দুর্ব্বল হয়, শরীর উষ্ণ হয় এবং জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মাংস গুরুপাক ও কফপিত্তবৃদ্ধিকারী; এই তিথিদ্বয়ে প্রবলভাবে কফের সঞ্চার হয়, সেই সময়ে মাংস-ভোজন দ্বারা উক্ত নাড়ীস্থিত কফ মাংসের কফ, পিত্ত রস, মিশ্রণে অতিশয় কুপিত হইয়া পিত্ত ও শ্লৈষ্মিক পীড়া উৎপন্ন করে বলিয়া ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ উক্ত তিথিদ্বয়ে মাংসভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক তিথিবিশেষে নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি ভোজনে রোগোৎপত্তির কারণ অনুভব করা যায়।

জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে, অশুভ নক্ষত্রে জ্বরাদি পীড়া হইলে রোগী অনেক দিন ধরিয়া কষ্ট পায় এবং শুভ নক্ষত্রে কোন পীড়া হইলে অতি অল্পভোগে রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। আমরা কার্য্যক্ষেত্রে ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জ্যোতিষশাস্ত্রে কোন্ গ্রহের পীড়ায় কোন্ উদ্ভিজ্জাত দ্রব্যের দ্বারা এবং কোন্ খনিজ ও ধাতব পদার্থের দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগের চিকিৎসা করিতে হয়, তাহা বিশদভাবে লিখিত আছে। রবি-গ্রহজনিত পীড়ায় স্বর্ণ ও বৈদূর্য্য মণির দ্বারা, চন্দ্রগ্রহজনিত পীড়ায় রৌপ্য ও শঙ্খ দ্বারা, মঙ্গলগ্রহজনিত পীড়ায় লৌহ, গন্ধক, প্রবাল ও মনঃশিলা দ্বারা, বুধগ্রহজনিত পীড়ায় পারদ দ্বারা, বৃহস্পতি-গ্রহজনিত পীড়ায় গন্ধক ও হরিতাল দ্বারা, শুক্রগ্রহজনিত পীড়ায় তাম্র, বঙ্গ ও রৌপ্য দ্বারা এবং শনিগ্রহজনিত পীড়ায় সীসার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিলে তদ্দ্বারা অতি সহজেই ব্যাধি আরোগ্য হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্রপারদর্শী চিকিৎসক অরিষ্টলক্ষণ, আয়ুর্বিজ্ঞান অর্থাৎ দীর্ঘায়ু মধ্যায়ু ও স্বল্পায়ু-লক্ষণ-বিচার, দূত, শকুন, স্বপ্ন ও নিদর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বৈদ্যক জ্যোতিষের বিষয় আয়ত্ত করিয়া রোগের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন এবং রোগীর ও রোগের নিদান বলিতে পারিবেন। আমাদের সমুদ্র সদৃশ চিকিৎসা জ্যোতিষশাস্ত্রে রোগনির্দ্ধারণের এবং প্রতীকারের নানা প্রকার উপায় লিখিত আছে। চিকিৎসকগণ বিশেষ যত্ন সহকারে জ্যোতিষশাস্ত্রের এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিলে অতি সহজেই রোগিগণকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন।

শ্রীভাস্কর চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, জ্যোতির্ভূষণ ভিষগাচার্য্য।

হর্ষচরিত সমালোচনার আলোচনা

গত ভাদ্র-সংখ্যার "মাসিক বসুমতী"তে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী হর্ষচরিত সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। নীরস ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রমথ বাবুর অসামান্য লিপিকুশলতার ফলে অতি সরস এবং সুখপাঠ্য হয়েছে সত্য, কিন্তু কয়েকটা বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ আছে, সেই কারণেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রমথ বাবুর মতে "ভারতবর্ষের ইতিহাসে নিজ বাহুবলে দিগ্বিজয়ী স্বদেশীয় একরাটের দর্শন বড় বেশী মিলে না। প্রথম ছিলেন অশোক, দ্বিতীয় হচ্ছেন সমুদ্রগুপ্ত, আর শেষ হচ্ছেন হর্ষবর্দ্ধন—আর যদি কেউ থাকেন ত তিনি ইতিহাসের বহির্ভূত।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই তিন জন ব্যতীত আরও বহুতর একরাটের সন্ধান ভারববর্ষের ইতিহাসে পাওয়া যায়। আমি অতি সংক্ষেপে এই সকল একরাটের মধ্যে কতকগুলির পরিচয় দিব এবং পাঠকগণের সহানুভূতি পাইলে ভবিষ্যতে ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিব।—

নিজ বাহুবলে দিগ্বিজয়ী একরাটগণের নির্ঘণ্ট করতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে যাঁর নামটা মনে আসে, তিনি হচ্ছেন (১) মহাপদ্ম নন্দ। মৌর্য্যবংশ-স্থাপয়িতা চন্দ্রগুপ্ত এঁরই শূদ্রাণী দাসীর গর্ভজাত। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩৫০ অব্দে মহাপদ্ম নন্দ ভারতের তাবৎ ক্ষত্রিয়কুল নিহত ক'রে ভারতে সর্ব্বপ্রথম একরাট হন।—অশোকের পর উত্তর-ভারতের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করেন (২) পুষ্পমিত্র। মৌর্য্য-বংশের শেষ নরপতি বৃহদ্রথকে নিহত ক'রে আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৮৩ অব্দে পুষ্পমিত্র (বা পুষ্যমিত্র) পাটলীপুত্রের সিংহাসনে সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় গ্রীক বাক্ত্রিয়রাজ মিনান্দার উত্তরভারতের রাজ্যগুলি অধিকার ক'রে

---

(১) মহানন্দিসুতশ্চাপি শূদ্রায়াং কলিকাংশজঃ।
উৎপৎস্যতে মহাপদ্মঃ সর্ব্বক্ষত্রান্তকো নৃপঃ।
ততঃ প্রভৃতি রাজানো ভবিষ্যাঃ শূদ্রযোনয়ঃ।
একরাট্ স মহাপদ্ম একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি।
—মৎস্য, বায়ু ও ভবিষ্য পুরাণ।

অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের মতে মহাপদ্ম নন্দের পূর্ব্বে ভারতের কেহ একরাট হন নাই—সবুজ পত্র ১ম বর্ষ পৃঃ ৮০৩

The Purana Text of the Dynasties of Kali age—F. E. Pargiter Page 25.

(২) Early History of India—V. A. Smith 2nd Edition page 190.

দ্রুতগতিতে মগধের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকলে খৃঃ পূঃ ১৪১ অব্দে অযোধ্যার সন্নিহিত সাকেত নগরীতে পুষ্পমিত্র মিনান্দারের সম্মুখীন হন। ফলে মিনান্দারের বিশালবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয় ও মিনান্দার স্বয়ং নির্ব্বাণমূলক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পুষ্পমিত্র উত্তরভারতের রাজন্যবর্গকে পরাজিত ক'রে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন।—আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১২১ অব্দে কলিঙ্গাধিপতি চেতবংশোদ্ভব (১) খারবেল মগধাধিপতি বৃহস্পতিমিত্রকে পরাজিত করেন ও সমগ্র উত্তরভারত জয় করেন।—* আনুমানিক ৩০০ খৃঃ অব্দে সিংহবর্ম্মার পুত্র পুষ্করণাধিপতি (২) চন্দ্রবর্ম্মা বাহলীক হ'তে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিজয় ক'রে সমগ্র উত্তর-ভারতে আপনার একাধিপত্য স্থাপন করেন।

আনুমানিক ৫৩২ অব্দে উজ্জয়িনীপতি (৩) যশোধর্ম্মদেব তোরামনের পুত্র হুনরাজ মিহিরকুলকে নিহত ক'রে হুনশক্তি নির্ম্মূল করেন এবং তুহিনশিখর হিমাচল হইতে মহেন্দ্রপর্ব্বত এবং লৌহিত্যোপকণ্ঠ হইতে পশ্চিম-সমুদ্র পর্য্যন্ত অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ইনি কাশ্মীর জয় ক'রে তদ্দেশের আধিপত্য স্বীয় বয়স্য মাতৃগুপ্তকে প্রদান করেন এবং কাশ্মীরের অপূর্ব্ব রত্নসিংহাসন নিজ রাজধানী উজ্জয়িনীতে আনয়ন করেন। যশোধর্ম্মদেবের পর + আনুমানিক ৫৫৭ খৃঃ অব্দে মগধেশ্বরের তৃতীয় কুমারগুপ্তের পুত্র (১) দামোদরগুপ্ত হুনবিজয়ী মৌখরী-গণকে বিধ্বস্ত করেন এবং সমগ্র উত্তরাপথে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করেন। প্রভাকরবর্দ্ধন এই দামোদরগুপ্তের কন্যা মহাসেনগুপ্তার পুত্র। মগধসম্রাট্‌দুহিতার পাণিগ্রহণ-সৌভাগ্য লাভ ক'রে ক্ষুদ্র আদিত্যবর্ম্মা যে শক্তির সূচনা মাত্র করেন, সেই শক্তিই অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণবিকশিত হয়ে প্রভাকরবর্দ্ধনকে দিগ্বিজয়ী সম্রাটে পরিণত করে। হর্ষবর্দ্ধনের পর যে সকল দিগ্বিজয়ী বীর নিজ বাহুবলে উত্তরাপথে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে করিতে পারিলাম না, বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।—ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ তিন জনের নাম সাধারণ ইতিহাসের পাঠকগণেরও সুপরিচিত। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা, গুর্জ্জরপতি বৎসরাজ এবং গৌড়েশ্বর দেবপাল।

প্রমথ বাবু বলেন, "হর্ষবর্দ্ধন নিজ বাহুবলে দিগ্বিজয় ক'রে উত্তরাপথের সম্রাট্ হয়েছিলেন।" কিন্তু বাস্তবপক্ষে হর্ষবর্দ্ধনের বাহুবল অর্থাৎ রণনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। আমি দেখাইবার চেষ্টা করিব, ইতিহাস বরং এ সম্বন্ধে বিপরীত সাক্ষ্যই প্রদান করে।

বাণভট্টের রচনাতেই পাই যে, বিশ্বাসঘাতকতায় জ্যেষ্ঠের নিধনবার্ত্তা শুনে হর্ষবর্দ্ধন অচিরাৎ ধরিত্রী নির্গৌড় করবার প্রতিজ্ঞা ক'রে ভণ্ডিকে চতুরঙ্গবাহিনী সমেত গৌড়াভিমুখে যাবার আদেশ দিয়ে স্বয়ং ভগিনী রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধানে বহির্গত হলেন। এই যে চতুরঙ্গবাহিনী, এর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ৫ সহস্র শিক্ষিত রণহস্তী, ২০ সহস্র অশ্বারোহী এবং ৫০ সহস্র সুদক্ষ পদাতিক সৈন্যে এই বাহিনী গঠিত ছিল। তারও উপর ছিল কামরূপপতি ভগদত্ত-বংশীয় ভাস্কর-বর্ম্মার অযাচিত সাহায্য। (ক) বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হর্ষবর্দ্ধনের তুলনায় গৌড়াধিপ অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি। হর্ষ নিজেও সেটা বিলক্ষণ বুঝ্‌তেন, তাই ঘৃণাভরে বলেছিলেন, "কেবলম-যশসক্তিতঃ গৌড়াধমেন," সেই কারণেই তিনি সদম্ভে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "ভ্রাতৃহন্তা জীবিত থাকতে দক্ষিণ হস্তে আহার্য্য তুলে মুখে দিব না।" (খ) হর্ষবর্দ্ধনের সেনাপতিগণেরও ... উরকমই

(১) Journal of the Bihar and Orissa Research Society Decr. 1918.

* শকসূর্য্য কনিষ্ক ও অন্ধ্রুরাজ পুলুমায়ী উভয়েই উত্তর-ভারতের স্বদেশীয় নহেন বলিয়া তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইল না। ইঁহারাও দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন।

(২) শুশুনিয়ার শিলালিপি—প্রবাসী ১৩২০ পৃঃ ৪১৭

Meherouli Pillar Inscription—Fleet vol : III : p: 141.

Epigraphia Indica—Vol: XII p: 315.

Early History of India—V. A. Smith 3rd Edition p: 290 Note I.

(৩) আলৌহিত্যোপকণ্ঠাত্তালবনগহনোপত্যকামহেন্দ্রাদা-গঙ্গাশ্লিষ্টসানোস্তুহিনশিখরিণঃ পশ্চিমাদাপয়োধেঃ।

সামন্তৈর্যস্য বাহুদ্রবিণহৃতমদৈঃ পাদয়োরানমদ্ভিশ্চূড়া-রত্নাংশুরাজিব্যতিকরশবলা ভূমিভাগাঃ ক্রিয়ন্তে।

—Corpus Inscriptonum Indicarum Vol III page 146.

+ মৌখরীরাজ ঈশানবর্ম্মা মগধবিজয়ে ব্যর্থকাম হইয়া-ছিলেন বলিয়া একরাট্‌গণের তালিকায় তাঁহার নাম উল্লিখিত হইল না।—তিনিও দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন।

(১) Fleet's Corpus Inscriptionum Vol III p: 203.

(ক) হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাস।

(খ) Beal's Buddhist Records of the Western World,—Vol : I, p: 213.

ধারণা ছিল। তাই শশাঙ্ক কর্ত্তৃক রাজ্যবর্দ্ধনের নিধন ভুজঙ্গ-দংশনের সহিত উপমিত হয়েছিল। (গ) প্রমথ বাবুর প্রবন্ধতেই পাই, প্রভাকরবর্দ্ধনের বৃদ্ধ সেনাপতি বল্‌ছেন—"কিং গৌড়াধিপেনৈকেন..."।—কিন্তু এই তুচ্ছ গৌড়াধিপ শশাঙ্ককে দমন করা হর্ষবর্দ্ধনের ক্ষমতায় কুলায় নাই।

অবশ্য গৌড়াভিযানের প্রারম্ভে ভণ্ডি অনায়াসেই কান্যকুব্জরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তাতে হর্ষের বীরত্বপ্রমাণ কিছুই নাই, এমন কি, ভণ্ডিরও নাই। কারণ, শশাঙ্ক কর্ত্তৃক রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হ'লে 'হেলায় যারা মালব অনীকিনী নির্জ্জিত করেছিল' (ঘ) এমন যে রণজয়ী সুদক্ষ দশ সহস্র অশ্বসেনার অধিনায়ক ভণ্ডি, তিনি প্রতিশোধ নিতে ত পারেনই নাই, উপরন্ত প্রমথ বাবুর প্রবন্ধেই দেখতে পাই, সর্ব্বাঙ্গশস্ত্রশল্যক্ষতকলেবরে জীর্ণবস্ত্রপরিধানে 'একেনৈব বাজিনা * * রাজদ্বারমাজগাম (একমাত্র অশ্ব সম্বলে স্থাণ্বীশ্বরপ্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন)। শশাঙ্ক কর্ত্তৃক কান্যকুব্জের সিংহাসনে স্থাপিত পরপুষ্ট প্রতিনিধির শশাঙ্কের বীর্য্য ও তেজ না থাকাই সম্ভব। বিশেষ কান্যকুব্জ হ'তে গৌড় বহুদূর এবং স্থাণ্বীশ্বর অতি নিকট। শশাঙ্ক কর্ত্তৃক শীঘ্র সাহায্য-প্রেরণের কোনই উপায় নাই। সে ক্ষেত্রে কান্যকুব্জ পুনরধিকারে কোনই বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। শত সামন্তরাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত প্রভাকরবর্দ্ধনের শতযুদ্ধজয়ী সেনানী ও সৈনিকগণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট বিরাট বাহিনী-সজ্জার একমাত্র উদ্দেশ্য—গৌড়-ভুজঙ্গ শশাঙ্ককে শাস্তিদান। কিন্তু দীর্ঘকাল অক্লান্ত চেষ্টায়ও হর্ষবর্দ্ধনের সে উদ্দেশ্য সফল হইল না। বস্তুতঃ শশাঙ্ক আদৌ পায়ে পিষে ফেলার মত ভুজঙ্গ-জাতীয় জীব ছিলেন না। নিজ বাহুবলে "পূর্ব্বদিকে লৌহিত্যনদের উপকণ্ঠ হইতে গহন-তাল-বনাচ্ছাদিত মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ বশীভূত করিয়া তিনি গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।" (ঙ) তাঁহার সাম্রাজ্যসীমা গঞ্জাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (চ) এই শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্দ্ধন যে সুদীর্ঘ ছয় বৎসরব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাহার মধ্যে হস্তীর পৃষ্ঠের হাওদা নামিল না, (ছ) সৈনিকের শিরস্ত্রাণ খসিল না, কিন্তু সম্পূর্ণ বঙ্গজয় ঘটিল না। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক তবুও 'চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরি-পত্তনবতী' বসুন্ধরার অধীশ্বররূপেই কলিঙ্গের মহাসামন্ত মাধব-রাজের ৬১৯ খৃঃ অব্দের শাসনে আখ্যাত হইলেন। (জ) * * গৌড়াধিপ জীবিত থাকিতে হর্ষবর্দ্ধন কিছুতেই বঙ্গজয় করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা বাক্যমাত্রেই রহিয়া গেল।" (ঝ) যেটুকু বীরত্বগর্ব্ব হর্ষের অবশিষ্ট ছিল, তাও চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে সমূলে নির্ম্মূল হয়। (ঞ)

প্রমথ বাবু বলেন, "প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরই মালবরাজ কান্যকুব্জ আক্রমণ ক'রে গ্রহবর্ম্মাকে বধ করেন। এ মালবরাজ যে কে, হর্ষচরিতে তাঁহার নাম নাই—ভণ্ডি বলেছেন, 'গুপ্তনাম্না', ওর বেশী কিছু নয়।" কিন্তু 'গুপ্তনাম্না' এ কথা ভণ্ডি গ্রহবর্ম্মা-নিহন্তা মালবরাজ সম্বন্ধে প্রয়োগ করেন নাই—করেছিলেন রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হয়ে দেবলোকে প্রয়াণ কর্‌লে যে ব্যক্তির দ্বারা কুশস্থল অর্থাৎ কান্যকুব্জ অধিকৃত হয় তাঁর সম্বন্ধে। মূল সংস্কৃতে ভণ্ডির উক্তিটি (ট) বিশ্লেষণ কর্‌লেই এ কথাটা বুঝা যায়। বিশেষ, চরিত্রগত বৈলক্ষণ্য থেকেও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গ্রহবর্ম্মা-নিহন্তা মালবরাজ আর ভণ্ডির কথিত গুপ্তনামক ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি।

গ্রহবর্ম্মা-নিহন্তা মালবরাজ রাজ্যশ্রীকে "পায়ে বেড়ী পরিয়ে কান্যকুব্জের কারাগারে" নিক্ষেপ করেন এবং অল্পকাল পরেই রাজ্যবর্দ্ধন ও ভণ্ডির হস্তে সমুচিত শাস্তি পান আর "গুপ্তনাম্না" ব্যক্তি কর্ত্তৃক কুশস্থল গৃহীত হলে রাজ্যশ্রী সসম্মানে কারামুক্তা হন। যাই হউক, গ্রহবর্ম্মানিহন্তা মালবরাজের নাম যে গুপ্ত, এ কথা অন্ততঃ ভণ্ডি বলেন নাই, তাহাই আমার বক্তব্য।

(খ) "দেবভূয়ং গতে নরেন্দ্রে দুষ্টগৌড়ভুজঙ্গজগ্ধজীবিতে চ রাজ্যবর্দ্ধনে * * *" —হর্ষচরিত পৃঃ ১৬১।

(ঘ) 'হেলানির্জ্জিতমালবানীকমপি' ইত্যাদি—হর্ষচরিত ষষ্ঠ-উচ্ছ্বাস পৃঃ ১৬১

(ঙ) গৌড়রাজমালা—বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতি পৃঃ ৭

(চ) Epigraphia Indica—Vol : VI pp : 144—145.

(ছ) Early History of India—V. A. Smith, 2nd Edition p: 313.

(জ) Epigraphia Indica—Vol: VI p: 143.

(ঝ) বাঙ্গালীর বল—রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য পৃঃ ৫১।

(ঞ) "অপরিমিত-বিভূতিস্ফীতসামন্তসেনা
মুকুটমণিময়ূখাক্রান্তপদারবিন্দঃ।
যুধি পতিতগজেন্দ্রানীকবীভৎসভূতো
ভয়বিগলিতহর্ষো যেন চাকারি হর্ষঃ।"
Epigraphia Indica Vol VI p: 6
Early History of India—V. A. Smith 3rd Edition p: 340.

(ট) "দেবভূয়ং গতে দেবে রাজ্যবর্দ্ধনে গুপ্তনাম্না চ গৃহীতে কুশস্থলে।"—হর্ষচরিত পৃঃ ১৯৯।

প্রমথ বাবুর জিজ্ঞাসা, "এখন এই ভণ্ডি নামক ব্যক্তিটা কে? রাধাকুমুদ বাবুর মতে ভণ্ডি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যশোধর্ম্মদেবের পৌত্র। প্রমথ বাবু তাহা স্বীকার করেন না। কারণ, তিনি বলেন "রাধাকুমুদ বাবু যা বলেছেন, তা হ'তে পারে, কিন্তু তা আঁকে মেলে না। বিশেষ যশোধর্ম্মদেবের পুত্র শিলাদিত্যই নাকি ভণ্ডির পিতা—যে রাজার বিরুদ্ধে ল'ড়ে ভণ্ডি ও রাজ্যবর্দ্ধন জয়লাভ করেন।" ভণ্ডির সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস যদিও প্রমথ বাবুরই অনুরূপ, কিন্তু প্রমথ বাবু তাঁর বিশ্বাসের পোষকতায় যে দুটা যুক্তির অবতারণা করেছেন, তারা উভয়েই ভিত্তিহীন। আমি সংক্ষেপে প্রমথ বাবুর যুক্তি দুটির অসারত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করব।

যশোধর্ম্মদেব দিগ্বিজয়ী সম্রাট্। প্রমথ বাবুর প্রবন্ধেই তার পরিচয় আছে। ইহার নবরত্ন-সভা কালিদাস-প্রমুখ নবরত্নের প্রভায় উজ্জ্বল থাকত। এই সভার অন্যতম রত্নের নাম বররুচি। বররুচির ভাগিনেয় সুবন্ধু (ঠ) বাসবদত্তা নামক কাব্য রচনা করেন। পণ্ডিতপ্রবর হল্ এই গ্রন্থের ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। (ড) ভূমিকায় হল্ সাহেব বলেছেন, সুবন্ধু ষষ্ঠ শতাব্দের শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন। হর্ষচরিত্তের প্রারম্ভের সাতটা শ্লোকে সমসাময়িক কবিগণের নামোল্লেখকালে বাণভট্টও এই সুবন্ধুর উল্লেখ করেছেন। বররুচির ভাগিনেয় সুবন্ধুর জীবনের শেষার্দ্ধ যদি ভণ্ডির জীবনের পূর্ব্বার্দ্ধের সমসাময়িক হয়, তা হ'লে ভণ্ডিকে যশোধর্ম্মদেবের পৌত্র অনুমান করা আঁকে যে মেলে না, তা নয়, বরং আঁকে বেশই মেলে।

প্রভাকরবর্দ্ধনের দ্বিতীয় উক্তি যে, শিলাদিত্যের বিরুদ্ধে ল'ড়ে ভণ্ডি ও রাজ্যবর্দ্ধন জয়লাভ করেছিলেন, তার মূলে কোন ভিত্তিই নাই। এ কথা প্রমথ বাবু যে কোথায় পেলেন, তা প্রমথ বাবুই বলতে পারেন। প্রভাকরবর্দ্ধন যখন মালব আক্রমণ করেন, তার পূর্ব্বেই মালবে শিলাদিত্যের শাসনের অবসান হয়ে মগধের গুপ্তবংশের এক শাখা-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। প্রভাকরবর্দ্ধন এই বিজিত মালবরাজের কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামক পুত্রদ্বয়কে স্থাণ্বীশ্বরে এনে নিজ পুত্রদ্বয়ের ক্রীড়াসঙ্গী ক'রে দেন। (ঢ) প্রমথ বাবুর প্রবন্ধেও তাহার উল্লেখ আছে। যে মালবরাজের বিরুদ্ধে ল'ড়ে ভণ্ডি ও রাজ্যবর্দ্ধন জয়লাভ করেন, তাঁর নাম শিলাদিত্য নয়, তাঁর নাম দেবগুপ্ত। (ণ) প্রমথ বাবুর প্রবন্ধেই পাওয়া যায় যে, তিনি কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্তের ভ্রাতা। তিনি অন্ততঃ শিলাদিত্য কিছুতেই হ'তে পারেন না।

প্রমথ বাবু বলেন, "যবনদের হাত হ'তে দেশ রক্ষা করবার জন্য মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা। শকদের কবল থেকে পশ্চিম-ভারত উদ্ধার করবার ফলেই গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা এবং হূণ-হরিণ-কেশরী বলেই হর্ষ দেশের পরমেশ্বর হয়েছিলেন।" প্রমথ বাবুর এ তিনটি যুক্তিই বিচারসহ নহে।

অবিচার ও অত্যাচারপরায়ণ নন্দবংশের বিলোপসাধন ক'রে মুরার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন—যবনদের হাত হ'তে দেশ রক্ষা ক'রে নয়। আলেকজান্দারের ভারতে গ্রীক্ সাম্রাজ্য-স্থাপনের স্বপ্ন আলেকজান্দারের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয়। (ত) চন্দ্রগুপ্তের সাহায্য তাতে কোন আবশ্যক হয় নি। সেলুকাসের আক্রমণ চন্দ্রগুপ্তকে প্রতিরোধ করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য নয়—প্রতিষ্ঠা রক্ষা করবার জন্য। বিশেষ মৌর্য্যবংশের প্রধান তিন জন অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার এবং অশোক বাৎসরিক করপ্রদানে স্বীকৃত হয়ে যবনদের সঙ্গে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। প্রমথ বাবু বলেন, "গ্রীক্ সম্রাট আলেকজান্দারের ভারতবর্ষের ব্যর্থ আক্রমণের অব্যবহিত পরেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।" কিন্তু এ কথার মধ্যে "যবনদের হাত থেকে দেশ রক্ষা করবার জন্য মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা" এ উক্তির যুক্তি যে কোথায়, তা বুঝতে পারলাম না। কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি, আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ ব্যর্থ করতে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের এতটুকু সাহায্যেরও আবশ্যক হয় নি। তক্ষশিলার রাজপ্রতিনিধি দেশদ্রোহী অম্ভির মত তিনি বরং আলেকজান্দারের সঙ্গে যোগই দিয়েছিলেন এবং ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন যে, তিনি পুনঃ পুনঃ আলেকজান্দারকে মগধ আক্রমণ করতে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করেছিলেন—স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্বদেশের মাটীতে বিদেশীকে আহ্বান করতে তাঁর বিবেকে একটুও বাধে নি।

শকদের কবল থেকে পশ্চিম-ভারত উদ্ধার করবার ফলে গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠা নয়। বৌদ্ধরাজন্যবর্গ কর্তৃক নিগৃহীত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আশ্রয়স্থল হয়ে সামান্য ভূস্বামী ঘটোৎকচগুপ্তের

(ঠ) "বাসবদত্তায়" উপসংহারে এই চিত্রটি দেখা যায়—
"ইতি শ্রীবররুচি-ভাগিনেয়-সুবন্ধু-বিরচিতা বাসবদত্তা আখ্যায়িকা সমাপ্তা।"

(ড) "Vasapadatta"—Trans: by Fits Edward Hall.

(ঢ) হর্ষচরিত—৪র্থ উচ্ছ্বাস—পৃঃ ১০০

(ণ) "Harsa Charita of Bana"—Translated by Caswell and Thomas page xii No. 1.

(ত) Early History of India—V. Smith 2nd Edition p: 110.

পুত্র চন্দ্রগুপ্ত যে দিন তদানীন্তন ভারতের সমগ্র শক্তির রোষ-রক্তিম নয়নের সম্মুখে নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন, সেই দিনই ভারতে গুপ্তসাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়। তার দ্বিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে অন্ধ্রাজ পুলুমায়ীর হস্তে শকশক্তি নির্জ্জিত হয়। গুপ্তবংশ স্থাপিত হবার শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেই শকজাতি ভারতের ক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে বিলুপ্ত হয়—বৈদেশিক একটা শক্তি বা জাতি হিসাবে তাদের আর স্বতন্ত্র সত্তাই কিছু ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে এ কথার উল্লেখে দোষ নাই যে, কেবল যে পশ্চিম-ভারত শকদের কবলগত হয়েছিল, তা নয়, শকসম্রাট্ কনিষ্কের রাজ্যসীমা "উত্তরে সাই-বিরিয়া হ'তে দক্ষিণে নর্ম্মদাতীর এবং পূর্ব্বে প্রাচীন চীনসাম্রাজ্যের পশ্চিমসীমা হ'তে পশ্চিমে প্রাচীন পারদ-সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (খ) প্রমথ বাবুর যুক্তি এই যে,"সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত শকারি বিক্রমাদিত্য।" কিন্তু 'শকারি' উপাধি সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নয়—'শকারি' উপাধি উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য যশোধর্ম্মদেবের। হুনকুল নির্ম্মূল ক'রে যশোধর্ম্মদেব "শকারি বিক্রমাদিত্য" ও উত্তরভারত জয় ক'রে "রাজাধিরাজ পরমেশ্বর" উপাধি ধারণ করেন।" (দ)

"হুন-হরিণ-কেশরী" বলেই হর্ষ দেশের পরমেশ্বর হয়েছিলেন" প্রমথ বাবুর এ কথারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় আনুমানিক ৫৩৪ অব্দে মগধনাথ বালাদিত্য ও উজ্জয়িনীপতি যশোধর্ম্মদেব ভারতে হুনশক্তির উচ্ছেদসাধন করেন। বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত হুনগণ আর মস্তক উত্তোলন করতে পারে নাই। যেটুকু ফুলিঙ্গও অবশিষ্ট ছিল, তাও কান্যকুব্জরাজ ঈশানবর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ব্বাপিত হয়। ভারতের সমৃদ্ধ জনপদসমূহ হ'তে বিতাড়িত হয়ে হুনগণ পর্ব্বত ও অরণ্যসংকুল হিমাচলের পাদমূলে এবং মরুমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করে। হর্ষকেশরী কোন দিন সেই হুন-হরিণগণের বিচরণভূমিতে যান নাই। যাইলে নিরীহ হরিণগণ কেশরিগর্জ্জনে ভীত হয়ে পলায়নপর হ'ত, না শৃঙ্গসঞ্চালনে কেশরীই পশ্চাদ্ধাবন কর্‌ত, তাহা রীতিমত চিন্তার বিষয়। বাণভট্টের গ্রন্থে প্রভাকরবর্দ্ধন হুনবিজয়ী ব'লে কীর্ত্তিত হয়েছেন, রাজ্যবর্দ্ধনও বরং কিছু দিন হুনপশুদের বধ করবার জন্য পর্ব্বতারণ্যানীসমাকীর্ণ দুর্গম উত্তরাপথে গিয়েছিলেন; কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন যে কিরূপে "হুন-হরিণ-কেশরী" হলেন, তা দুর্ব্বোধ্য। তবে যদি বাণভট্টের দেওয়া পিতার উপাধিটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকেন, তা হ'লে স্বতন্ত্র কথা।

প্রমথ বাবুর এ কথাটা খুবই সত্য যে, "হুনদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভারতবাসীদের পক্ষে একটা মারাত্মক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হবার স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। যে ব্যক্তি ভারত-বর্ষকে এ রোগের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাঁকে যে দেশের লোক মহাপুরুষ ব'লে গণ্য করবে, তাতে আশ্চর্য্য কি ?" কিন্তু সে মহাপুরুষ হুন-হরিণ-কেশরী হর্ষবর্দ্ধন নন—সে মহাপুরুষ রাজাধিরাজ পরমেশ্বর যশোধর্ম্মদেব বিক্রমাদিত্য। তাই আজও শত কিম্বদন্তী তাঁকে ঘিরে তাঁর পায়ে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে—তাই আজও শত আখ্যায়িকার নায়করূপে তাঁকে ভারতবাসী আবাল বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

বাণভট্ট ও হর্ষবর্দ্ধনের পিতৃপিতামহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে আমি এই অপ্রীতিকর দীর্ঘ সমালোচনার উপসংহার করব :—বাণভট্টের পিতার নাম চিত্রবাহু, পিতামহের নাম অর্থপতি এবং প্রপিতামহের নাম কুবের আর মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের পিতার নাম প্রভাকরবর্দ্ধন, পিতামহের নাম আদিত্যবর্দ্ধা। হর্ষবর্দ্ধন প্রথম-জীবনে বিষ্ণুর উপাসক, মধ্যম-জীবনে সদ্ধর্ম্মের সেবক এবং শেষ-জীবনে শৈব ছিলেন। অর্জ্জুন বা অর্জ্জুনাশ্ব নামক জনৈক অমাত্য হর্ষবর্দ্ধনকে হত্যা ক'রে তাঁর সিংহাসন অধিকার করে।

শ্রীঅপূর্ব্বনাথ রায়।

(খ) বাঙ্গালার ইতিহাস রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম খণ্ড: পৃঃ ৩৬।

(দ) এ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে এবং বহুবৎসর যাবৎ বিরুদ্ধ তর্ক প্রভৃতি চলিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন অখণ্ডনীয় বিরুদ্ধ প্রমাণ প্রযুক্ত না হওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অভিমত গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। আমি সেই কারণেই পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তই অবলম্বন করিয়াছি।
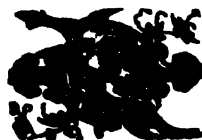
অমিতাভ

(জাতিস্মরের স্বপ্ন)

[যত অসম্ভব কথাই বলি না কেন, যদি এক জন বড় পণ্ডিতের নাম সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিতে পারি, তবে আর কথাটা কেহ অবিশ্বাস করে না। আমি যদি বলি, আজ রাত্রিতে অন্ধকার পথে একলা আসিতে আসিতে একটা ভূত দেখিয়াছি, সকলে তৎক্ষণাৎ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। বলিবে—বেটা গাঁজাখোর, ভেবেছে, আমরাও গাঁজা খাই। কিন্তু স্যর অলিভার্ লজ্ যখন কাগজে-কলমে লিখিলেন, একটা নয়, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভূত দিবারাত্রি পৃথিবীময় কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে, তখন সকলেই সেটা খুব আগ্রহ সহকারে পড়িল এবং গাঁজার কথাটা একবারও উচ্চারণ করিল না।

এটা অবিশ্বাসের যুগ—অথচ মানুষকে একটা কথা বিশ্বাস করানো কত না সহজ! শুধু একটি পণ্ডিতের নাম—সেকেলে হইলে চলিবে না এবং দেশী হইলে ত সবই মাটি!

তাই ভাবিতেছি, আমি যে জাতিস্মর, এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করাইব? কোন বিদেশী বৈজ্ঞানিকের নাম করিয়া সন্দেহ—দ্বিধা ভঞ্জন করিব? আমি রেলের কেরাণী, বিদ্যা এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত। তের বৎসর একাদিক্রমে চাকরী করিবার পর আজ ৭৬ টাকা মাসিক বেতন পাইতেছি—আমি জাতিস্মর! হাসির কথা নয় কি?

রেলের পাশ পাইয়া যে বৎসর আমি রাজগীরে ভগ্নাবশেষ দেখিতে যাই—ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন ইষ্টকস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া সে দিন প্রথম আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে কালের যবনিকা সরিয়া গিয়াছিল। যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা কত দিনের কথা? দু'হাজার বৎসর না তিন হাজার বৎসর? ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হয়, পৃথিবী বোধ হয় তখন আরও তরুণ ছিল, আকাশ আরও নীল ছিল, শষ্প আরও শ্যাম ছিল।

আমি জাতিস্মর! ৭৬ টাকা মাহিনার রেলের কেরাণী—জাতিস্মর! উপহাসের কথা—অবিশ্বাসের কথা! কিন্তু তবু আমি বারবার—বোধ হয়, বহু শতবার এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনও দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট্ হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি। শত মহিষী, সহস্র বন্দিনী, আমার সেবা করিয়াছে। বিদ্যুৎশিখার মত, অনন্ত বহ্নির মত রূপ লইয়া আজ সেই নারীকুল কোথায় গেল? সে রূপ পৃথিবীতে আর নাই—সে নারীজাতিও আর নাই। ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন যাহারা আছে, তাহারা তেলাপোকার মত অন্ধকারে বাঁচিয়া আছে। তখন নারী ছিল অহির মত তীব্র দুর্জ্জয়। আরণ্য অশ্বিনীর মত তাহাদিগকে বশ করিতে হইত।

আর পুরুষ? আরসীতে নিজের মুখ দেখি আর হাসি পায়। সেই আমি শূরসেন রাজের দুই কন্যাকে দুই বাহুতে লইয়া দুর্গ-প্রাচীর হইতে পরিখার জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণে যমুনা পার হইয়াছিলাম। তার পর—কিন্তু যাক্ সে কথা। কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেবল হাসিবে। আমিও হাসি—আফিসে কলম পিষিতে পিষিতে হঠাৎ অট্টহাসি হাসিয়া উঠি।

কিন্তু কথাটা সত্য। এমন বহুবার ঘটিয়াছে। রাজগীরের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া মনে হইয়াছিল, এ স্থান আমার চিরপরিচিত; একবার নহে—শত সহস্রবার আমি এইখানে দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু তখন এ স্থান জঙ্গল ও ইষ্টকস্তূপে সমাহিত ছিল না। ঠিক যেখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি, তাহার বাঁ দিক দিয়া এক সঙ্কীর্ণ দীর্ঘ পথ গিয়াছিল। পথের দুই পাশে ব্যবহারীদের গৃহ ছিল। দূরে ঐ স্থানে মহাবণিক সুবর্ণদত্তের দারু-নির্ম্মিত প্রাসাদ ছিল। যে দিন রাজগৃহে আগুন লাগে, সে দিন সুবর্ণদত্ত আসবপানে বিবশ হইয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। তাহার সঙ্গে ছিল চারি জন রূপাজীবা নগরকামিনী। নগর ভস্মীভূত হইবার পর পৌরজন তাহাদের মৃতদেহ কক্ষ হইতে বাহির করিল। দেখা গেল, শ্রেষ্ঠী মরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দেহ দগ্ধ হয় নাই—সুসিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। কিছুকাল পূর্ব্বে সে বলীদ্বীপ হইতে এক অষ্টোত্তরসহস্র নীল ইন্দ্রচ্ছন্দা মালা আনিয়াছিল। সেরূপ মুক্তাহার মগধে আর ছিল না। সকলে দেখিল, বণিকের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে সেই ইন্দ্রচ্ছন্দার মুক্তাভস্ম।

কিন্তু ক্রমেই আমি অসংযত হইয়া পড়িতেছি। শূরসেনের সহিত মগধ, অগ্নিদাহের সহিত রাজকন্যা-হরণ মিশাইয়া ফেলিতেছি। এমন করিলে ত চলিবে না।

আসল কথাটা আর একবার বলিয়া লই—আমি জাতিস্মর! মিউজিয়ামে রক্ষিত এক শিলাশিল্প দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠে, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া যায়। এ শিল্প ত আমার রচনা। আসমুদ্র করগ্রাহী সম্রাট, কণিষ্কের সময় যখন সদ্ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, তখন বিহারের

গাত্রশোভার জন্ত এ নবপত্রিকা আমি গড়িয়াছিলাম। তখন আমার নাম ছিল পুণ্ডরীক। আমি ছিলাম প্রধান শিল্পী—রাজভাস্কর। সেই পুণ্ডরীক-জীবনের প্রত্যেক ঘটনা যে আমার স্মরণে মুদ্রিত আছে। এই যে নবপত্রিকার মধ্যবর্ত্তী বিনম্রা যক্ষিণী-মূর্ত্তি দেখিতেছেন, তাহার আদর্শ কে ছিল জানেন? সিতাংশুকা—তক্ষশিলার সর্ব্বপ্রধানা রূপোপজীবিনী বারমুখ্যা। সকলেই জানিত, সিতাংশুকা রাজ-ঔরসজাতা। সেই সিতাংশুকাকে নিরংশুকা করিয়া, সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, বজ্রসূচী দিয়া পাষাণ কাটিয়া কাটিয়া এই যক্ষিণীমূর্ত্তি গড়িয়াছিলাম। পুণ্ডরীক ভিন্ন এ মূর্ত্তি আর কে গড়িতে পারিত? কিন্তু তবু মনে হয়, সে অপার্থিব লাবণ্য কঠিন প্রস্তরে ফুটে নাই। আজও এই কেরাণী জীবনেও সেই অলৌকিক রূপৈশ্বর্য্য আমার মস্তিষ্কের মধ্যে অঙ্কিত আছে।

আবার কেমন করিয়া বিষ-ধূম দিয়া সিতাংশুকা আমার প্রাণসংহার করিল, সে কথাও ভুলি নাই। সুরম্য কক্ষ, চতুষ্কোণে স্ফটিক-গোলকের মধ্যে পুন্নাগচম্পক-তৈলের সুগন্ধি দীপ জ্বলিতেছে, কেন্দ্রস্থলে বিচিত্র চীনাংশুকে আবৃত পালঙ্ক-শয্যা। শিয়রে ধূপ জ্বলিতেছে। সেই ধূপশলার গন্ধে ধীরে ধীরে দেহ অবশ হইয়া আসিতেছে। বহুদূর হইতে বাদ্যের করুণ নিক্কণ ইন্দ্রিয়সকলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছে। তার পর মোহনিদ্রা—সে নিদ্রা সে জন্মে আর ভাঙ্গিল না।

এমনই কত জীবনের কত বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কত অসমাপ্ত কাহিনী স্মৃতির মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সেই সুদূর অতীতে এমন অনেক জিনিষ ছিল—যাহা সেকালের সম্পূর্ণ নিজস্ব, একালের সহিত তাহার সম্বন্ধমাত্র নাই। অতিকায় হস্তীর মত তাহারা সব লোপ পাইয়াছে। মনে হয় যেন, তখন মানুষ বেশী নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড় একটা মূল্য ছিল না। অতি তুচ্ছ কারণে এক জন আর এক জনকে হত্যা করিত এবং সেই জন্যই বোধ করি, মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল। আবার মানুষের মধ্যে ক্রূরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না। এ কালের মানুষ যেন সব দিক দিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয়ধর্ম্মের সে প্রসার আর নাই। যেন মানুষ তখন তরুণ ছিল, এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আর একটা কথা, এ কালের মত স্বাধীনতা কথাটাকে তখন কেহ এত বড় করিয়া দেখিত না। মাছ যেমন জলে বাস করে, মানুষ তেমনই স্বাধীনতার আবহাওয়ায় বাস করিত। স্বাধীনতায় ব্যাঘাত পড়িলে লড়াই করিত, মরিত; বাঘের মত পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও পোষ মানিত না। যুগান্তরব্যাপী অধীনতার শৃঙ্খল তখনও মানুষের পায়ে কাটিয়া কাটিয়া বসে নাই, মনের দাসবৃত্তি ছিল না। রাজা ও প্রজার মধ্যে প্রভেদও এত বেশী ছিল না। নির্ভয়ে দীন প্রজা চক্রবর্ত্তী সম্রাটের নিকট আপনার নালিশ জানাইত, অধিকার দাবী করিত। ভয় করিত না।

* * * *

ঘরের কোণে বসিয়া বসিয়া লিখিতেছি আর ধূম্রকুণ্ডলীর মত বর্ত্তমান জগৎ আমার সম্মুখ হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। আর একটি মায়াময় জগৎ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের এক স্বপ্ন দেখিতেছি। এক পুরুষ—ভারত আজ তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে—তাঁহার কোটিচন্দ্রস্নিগ্ধ মুখপ্রভা এই দুই নশ্বর নয়নে দেখিতেছি আর অন্তরের অন্তস্তল হইতে আপনি উৎসারিত হইতেছে—

'অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়—'

সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে এক দিন দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াছিলাম—তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম—আজ সেই কথা জন্মান্তরের স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিব।]

১

উত্তরে মাতুলবংশ লিচ্ছবি ও পশ্চিমে মাতুলবংশ কোশল মগধেশ্বর পরমবৈষ্ণব শ্রীমন্মহারাজ অজাতশত্রুকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বতন মহারাজ বিম্বিসার শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন, তাই লিচ্ছবি ও কোশলের সহিত বিবাদ না করিয়া তাহাদের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু কিন্তু সে ধাতুর লোক নহেন—বিবাহ করা অপেক্ষা যুদ্ধ করাকে তিনি বেশী পছন্দ করেন। তা ছাড়া ইচ্ছা থাকিলেও মাতুলবংশে বিবাহ করা সম্ভব নহে। তাই অজাতশত্রু পিতার অপঘাত-মৃত্যুর পর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিন্তু অসুবিধা এই যে, শত্রু দুই দিকে;—উত্তরে এবং পশ্চিমে। উত্তরের শত্রু তাড়াইতে গেলে পশ্চিমের শত্রু রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। কোশলকে কাশীর পরপারে খেদাইয়া দিয়া ফিরিবার পথে দেখেন, লিচ্ছবিরা রাজগৃহে ঢুকিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। মগধরাজ্যের অন্তপাল সামন্ত-রাজারা সীমানা রক্ষা করিতে না পারিয়া, কেহ রাজধানীতে পলাইয়া আসিতেছে, কেহ বা শত্রুর সহিত মিশিয়া যাইতেছে। রাজ্যে অশান্তির শেষ নাই। প্রজারা কেহই অজাতশত্রুর

উপর সন্তুষ্ট নহে ;—তাহাদের মতে রাজা বীর বটে, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি অধিক নাই, শীঘ্র ইহাকে সিংহাসন হইতে না সরাইলে রাজ্য ছারেখারে যাইবে।

প্রজারা কিন্তু ভুল বুঝিয়াছিল। অজাতশত্রু নির্বোধ মোটেই ছিলেন না। তাঁহার অসির এবং বুদ্ধির ধার তীক্ষ্ণ।

এক দিন বর্ষাকালের আরম্ভে যুদ্ধ স্থগিত আছে—অজাতশত্রু রাজ্যের মহামাত্য বর্ষকারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। নগরের নির্জ্জন স্থানে বেণুবন নামে এক উদ্যান আছে; বিম্বিসার ইহা বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন এবং অজাতশত্রু আবার উহা কাড়িয়া লয়েন। সেই উদ্যানে প্রাচীন মন্ত্রী ও নবীন মহারাজের মধ্যে অতি গোপনে কি কথাবার্ত্তা হইল। সে সময় গুপ্তচরের ভয় বড় বেশী; সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, জ্যোতিষী, বারবনিতা, নট, কুশীলব ইহাদের মধ্যে কে গুপ্তচর, কে নহে, অনুমান করা অতিশয় কঠিন। সম্প্রতি নগরে বৈশালী হইতে জঘনচপলা নাম্নী এক বারাঙ্গনা আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সমস্ত নাগরিক ত ভুলিয়াছেই, এমন কি, স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু জঘনচপলা কোশল কিম্বা বৃজির গুপ্তচর কি না, নিশ্চিতরূপে না জানা পর্য্যন্ত অজাতশত্রু নিজেকে কঠিন শাসনে রাখিয়াছেন। এইরূপ চর সর্ব্বত্রই ঘুরিতেছে; তাই গূঢ়তম মন্ত্রণা খুব সাবধান হইয়াই করিতে হয়। এমন কি, সকল সময় অন্যান্য অমাত্যদের পর্য্যন্ত সকল কথা জানানো হয় না।

নিভৃতে বহুক্ষণ আলাপের পর মহামন্ত্রী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। উদ্যানের প্রতিহারী দেখিল, বৃদ্ধের শুষ্ক নীরস মুখে হাসি এবং নির্ব্বাপিত চক্ষুতে জ্যোতি ফুটিয়াছে।

২

প্রহর রাত্রি অতীত হইবার পর আহারান্তে শয়ন করিয়াছিলাম, ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণও হইয়াছিল। এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—'পরিব্রাজিকা সাক্ষাৎ চান।'

তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। চকিতে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'পরিব্রাজিকা ? এত রাত্রে ?'

এই রাজ-সম্মানিতা মহাশক্তিশালিনী নারী কি প্রয়োজনে এরূপ সময়ে আমার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী, জানিবার জন্য ত্বরিতপদে দ্বারে উপস্থিত হইলাম। সসম্ভ্রমে তাঁহাকে গৃহের ভিতর আনিয়া আসনে বসাইয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম,—"দেবি, কি জন্য দাসের প্রতি কৃপা হইয়াছে ?"

পরিব্রাজিকার যৌবন উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু মুখশ্রী এখনও সুন্দর ও সম্ভ্রম-উৎপাদক। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র, ললাটে কুঙ্কুমতিলক, হস্তে একটি সনাল পদ্মকোরক। সহাস্যে বলিলেন,—'বৎস, অদ্য সন্ধ্যার পর কমলকোরক দিয়া কুমারীর পূজা করিতেছিলাম, সহসা এই কোরকটি কুমারীর চরণ হইতে আমার ক্রোড়ে পতিত হইল।"

কথার উদ্দেশ্য কিছুই না বুঝিতে পারিয়া আমি শুধু বলিলাম,—'তার পর ?'

পরিব্রাজিকা বলিলেন,—'কুমারীর আদেশ বুঝিতে না পারিয়া আবার ধ্যানস্থ হইলাম। তখন দেবী আমার কর্ণে বলিলেন—'এই নির্ম্মাল্য শ্রেণি-নায়ক কুমারদত্তকে দিবে। ইহার বলে সে সর্ব্বত্র গতিলাভ করিবে'।'

আমি হতবুদ্ধির মত পরিব্রাজিকার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম।

তিনি কক্ষের চতুর্দ্দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,—'এই কোরক লও, ইহাতেই উপদেশ আছে। কার্য্যসিদ্ধি হইলে ইহার বিনাশ করিও। মনে রাখিও, ইহার বলে রাজমন্দিরেও তোমার গতি অব্যাহত হইবে।'

এই বলিয়া পদ্মকলিটি আমার হস্তে দিয়া পরিব্রাজিকা বিদায় লইলেন। আমি নির্ব্বোধের মত বসিয়া রহিলাম, তাঁহাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেলাম।

আমি সামান্য ব্যক্তি—কুলী-মজুর খাটাইয়া খাই, রাজগৃহের স্থপতি-সূত্রধার-সম্প্রদায়ের শ্রেণি-নায়ক। আমার উপর রাজা-রাজড়ার দৃষ্টি পড়িল কেন ? যদি বা পড়িল, তবে এমন রহস্যময় ভাবে পড়িল কেন ? রাজ-অবরোধের পরিব্রাজিকা আমার মত দীনের কুটীরে পদধূলি দিলেন কি জন্য ? কুমারী কুমারদত্তের উপর সদয় হইয়া তাহার সর্ব্বত্র গতিবিধির ব্যবস্থাই বা করিয়া দিলেন কেন ? এখন এই পদ্মকলি লইয়া কি করিব ? কার্য্যসিদ্ধি হইলে ইহাকে বিনষ্ট করিতেই বা হইবে কেন ? আমি পূর্ব্বে কখনও রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত হই নাই। তাই নানা চিন্তায় মন একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিল। দাসী দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহার বোধ করি, আজ কোথাও অভিসার আছে। কারণ, বেশ-ভূষায় একটু শিল্প-চাতুর্য্য। কবরীতে জাতিপুষ্পের শোভা, কঞ্চুকী দৃঢ়বদ্ধ

দাসী দেখিতে মন্দ নহে, চোখ দুটি বড় বড়, মুখে মিষ্ট হাসি, তার উপর ভরা যৌবন। আমি তাহাকে বলিলাম, 'বনলতিকে, তুমি গৃহে যাও, রাত্রি অধিক হইয়াছে।' সে হাসিমুখে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

পদ্মকোরক হস্তে শয়ন-মন্দিরে গেলাম; বর্ত্তিকার সম্মুখে ধরিয়া বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলাম। কোরকটি মুদিত হইয়া আছে, ধীরে ধীরে পলাশগুলি উন্মোচন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে নাভির সমীপবর্ত্তী কোমল পল্লবে অস্পষ্ট চিহ্ন সকল চক্ষুতে পড়িল। সযত্নে পল্লবটি ছিঁড়িয়া দেখিলাম, কজ্জলমসী দিয়া লিখিত লিপি—

'অদ্য মধ্যরাত্রে একাকী মহামন্ত্রীর দ্বারে উপস্থিত হইবে। সঙ্কেত-মন্ত্র—কুট্‌মল।'

লিপির নিম্নে মগধেশ্বরের মুদ্রা।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইল। পরিব্রাজিকার নিগূঢ় কথাবার্ত্তা, কুমারীর পূজা সমস্তই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। গোপনে মহামাত্যের নিকট আমার তলব হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ডাকিয়া পাঠাইলেই ত হইত? আকাশপাতাল ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি এক জন অতি সামান্য নাগরিক, আমাকে লইয়া রাজ্যের মহামাত্য কি করিবেন? বুড়া অত্যন্ত খিটখিটে, কি জানি, যদি না জানিয়া কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, তবে হয় ত শূলে চড়াইয়া দিবে। কিম্বা কে বলিতে পারে, হয় ত গোপনে কোথাও মন্ত্রাগার নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাই এই সতর্ক আহ্বান।

উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং উত্তেজনায় আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু রাজাদেশ উপেক্ষা করিবার উপায় নাই,—স্বেচ্ছায় না যাইলে হয় ত বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। তাই অবশেষে একটি উত্তরীয় লইয়া পথে বাহির হইলাম।

আমার গৃহ নগরের উত্তরে, মহামন্ত্রীর প্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থলে। পথ জনহীন, পথের উভয়পার্শ্বস্থ গৃহগুলিও নির্ব্বাপিত-দীপ, নিদ্রিত। দূরে দূরে সঙ্কীর্ণ পথিপার্শ্বে পাষাণ-বনদেবীর হস্তে স্ফটিকের দীপ জ্বলিতেছে। তাহাতে মধ্যরাত্রের গাঢ় অন্ধকার ঈষৎ আলোকিত।

মহামাত্যের বৃহৎ প্রাসাদ-সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাহিরে অন্ধকার, প্রহরীও নাই; কিন্তু বহির্দ্বার উন্মুক্ত। একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সাহসে ভর করিয়া প্রবেশ করিতে গেলাম—অমনি তীক্ষ্ণ ভল্লের অগ্রভাগ কণ্ঠে ফুটিল; অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিয়া ভল্লের অন্যপ্রান্ত হইতে কে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল,—'তুমি কে?'

অকস্মাৎ এরূপভাবে আক্রান্ত হইয়া বাক্‌রোধ হইয়া গেল। বর্শার ফলা কণ্ঠ স্পর্শ করিয়া আছে, একটু চাপ দিলেই সর্ব্বনাশ! আমি মূর্ত্তির মত ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে সেই সনাল পদ্মকলি তুলিয়া ধরিয়া দেখাইলাম।

আততায়ী জিজ্ঞাসা করিল,—'উহা কি, নাম বল?'

বলিলাম,—'সনাল উৎপল।'

সন্দিগ্ধকণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন হইল, 'কি নাম বলিলে?'

বুঝিলাম, এ প্রহরী। লিপিতে যে সঙ্কেত-মন্ত্র ছিল তাহা স্মরণ হইল, বলিলাম,—'কুট্‌মল।'

বর্শা কণ্ঠ হইতে অপসৃত হইল। অন্ধকারে প্রহরী আমার হাত ধরিয়া প্রাসাদের মধ্যে লইয়া চলিল।

সূচিভেদ্য অন্ধকারে কিছু দূর পর্যন্ত সে আমাকে লইয়া গেল। তার পর আর এক জন আসিয়া হাত ধরিল। সে আরও কিছু দূর লইয়া গিয়া অন্য এক জনের হস্তে সমর্পণ করিল। এইরূপে পাঁচ ছয় জন দ্বারী, প্রহরী, প্রতিহারীর হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া অবশেষে এক আলোকিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলাম।

সেই কক্ষের মধ্যস্থলে অজিনাসনে বসিয়া একস্তূপ ভূর্জ্জ-পত্র-তালপত্র সম্মুখে লইয়া বৃদ্ধ মহামন্ত্রী নিবিষ্টমনে পাঠ করিতেছেন। কক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। মহামাত্য সম্মুখে আসন নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'উপবিষ্ট হও।'

আমি উপবেশন করিলাম।

মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পরিব্রাজিকার হস্তে যে লিপি পাইয়াছিলে, উহা কোথায়?'

পদ্মদল বাহির করিয়া মহামাত্যকে দিলাম। তিনি সেটার উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ভক্ষণ কর।'

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের প্রতি মূঢ়বৎ তাকাইয়া রহিলাম। ভক্ষণ করিব আবার কি?

মহামন্ত্রী আবার বলিলেন, 'এই লিপি ভক্ষণ কর।'

মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ডাকাইয়া পাঠাইয়া তার পর অকারণে লিপি ভক্ষণ করিতে বলা,

এ কিরূপ ব্যবহার? হউন না তিনি রাজমন্ত্রী—তাই বলিয়া—

মন্ত্রীর ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা গেল। আবার অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন,—'চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে—তাই এ সতর্কতা। লিপি সুস্বাদু বলিয়া তোমাকে উহা খাইতে বলি নাই।'

'সেই কোমল পদ্মপল্লবটি' খাইয়া ফেলিলাম।

তার পর কিছুক্ষণ সমস্ত নীরব। মহামাত্যের শীর্ণ মুখ ভাবলেশহীন। প্রদীপের শিখা নিষ্কম্পভাবে জ্বলিতেছে। আমি উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, এবার কি হইবে?

হঠাৎ প্রশ্ন হইল,—'তুমি জঘনচপলার গৃহে গতায়াত কর?'

অতর্কিত প্রশ্নে ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম। জঘনচপলা বেশ্যা, তাহার গৃহে যাই কি না, সে সংবাদে রাজমন্ত্রীর কি প্রয়োজন? কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই, বুড়া খোঁজ না লইয়া জিজ্ঞাসা করিবার পাত্র নহে। কুণ্ঠিতস্বরে কহিলাম,—'একবারমাত্র গিয়াছিলাম। কিন্তু সে স্থান আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির নয়। তাই আর যাই নাই।'

মন্ত্রী বলিলেন,—'ভাল করিয়াছ। সে লিচ্ছবির গুপ্তচর।'

আবার কিছুক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ। মহামাত্য ধ্যানমগ্নের মত বসিয়া আছেন; আমি আর একটি প্রশ্নের বজ্রাঘাত প্রতীক্ষা করিতেছি।

'তোমার অধীনে কত কর্ম্মিক আছে?'

'সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১০ সহস্র।'

'স্থপতি কত?'

'৬ হাজার।'

'সূত্রধার?'

'৩ হাজারের কিছু উপর।'

'তক্ষক ও ভাস্কর?'

'তক্ষক-ভাস্করের সংখ্যা কম—পাঁচ শত'র অধিক নহে।'

দেখিতে দেখিতে মহামন্ত্রীর নির্জ্জীব শুষ্ক দেহ যেন মন্ত্রবলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। নিষ্প্রভ চক্ষুতে যৌবনের জ্যোতি সঞ্চারিত হইল। তিনি আমার দিকে তর্জ্জনী তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'শুন। এখন বর্ষাকাল। শরৎকাল আসিলে পথঘাট শুকাইলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। দুই দিক হইতে শত্রুর আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এবার যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে ভাগীরথীর ও হিরণ্যবাহুর সঙ্গমে এক ঔদক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এমন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হইবে—যাহাতে ৫০ হাজার যোদ্ধা নিত্য বাস করিতে পারে। মধ্যে মাত্র তিন মাস সময়। এই তিন মাসের মধ্যে দুর্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। এবার শরৎকালে কোশল ও বৃজি যখন নদী পার হইতে আসিবে, তখন সম্মুখে যেন মগধের গগনলেহী দুর্গচূড় দেখিতে পায়।'

জলের মৎস্য ধীবরের জাল হইতে জলে ফিরিয়া আসিলে যেরূপ আনন্দিত হয়, আমারও সেইরূপ আনন্দ হইল। এই সকল কথা আমি বুঝি। বলিলাম, '১০ হাজার লোক দিয়া তিন মাসের মধ্যে এরূপ দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিতে পারি। কিন্তু এই বর্ষাকালে পথ অতিশয় দুর্গম। মালমশলা সংগ্রহ হইবে না।'

মন্ত্রী বলিলেন,—'সে ভার তোমার নয়। তুমি শুধু দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিবে। উপাদান সংগ্রহ আমি করিব। রাজ্যের সমস্ত রণহস্তী পাষাণাদি বহন করিয়া দিবে। সে জন্য তোমার চিন্তা নাই।'

আমি বলিলাম,—'তবে তিন মাসের মধ্যে দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিব।'

মন্ত্রী বলিলেন,—'যদি না পার?'

'আমার মুণ্ড সর্ত্ত রহিল। কবে কার্য্য আরম্ভ করিব?'

মন্ত্রী ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'এখনও রবি স্থির রাশিতে আছেন; আজ হইতে চতুর্থ দিবসে গুরুবাসরে চন্দ্রও স্বাতীনক্ষত্রে গমন করিবেন। অতএব সেই দিনই কার্য্যের পত্তন হওয়া চাই।'

'যথা আজ্ঞা,—তাহাই হইবে।'

কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া মহামাত্য বলিতে লাগিলেন,—'এখন যাহা বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শুন। তোমার উপর অত্যন্ত গূঢ় কার্য্যের ভার অর্পিত হইতেছে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে, শত্রুরাজ্যে দুর্গ-নির্ম্মাণের সংবাদ পৌঁছিলে তাহারা কিছুতেই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে দিবে না, পদে পদে বাধা দিবে। চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে, তাহারা যদি একবার মগধের উদ্দেশ্য জানিতে পারে, সপ্তাহকালমধ্যে কোশলের মহারাজ ও লিচ্ছবির কুলপতিগণ এ সংবাদ বিদিত হইবে। সুতরাং নিরতিশয় সতর্কতার প্রয়োজন। তুমি তোমার দশ সহস্র কর্ম্মিক লইয়া কাল গঙ্গাশোণ সঙ্গমে যাত্রা করিবে। এমন ভাবে যাত্রা করিবে—যাহাতে কাহার সন্দেহ উদ্রিক্ত না হয়। একবার যথাস্থানে পৌঁছিতে

"পর' শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ—" —কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ।

বসুমতী ব্লক-বিভাগ]

• শিল্পী—শ্রী[illegible]চন্দ্র

পারিলে আর কোনও ভয় নাই। কারণ, সে স্থান জঙ্গল-পূর্ণ, প্রায় জনহীন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে পথে যদি কোনও ব্যক্তিকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিতে দ্বিধা করিবে না। কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইয়া মগধের মুদ্রাঙ্কিত পত্রের প্রতীক্ষা করিবে। সেই পত্রে দুর্গ-নির্ম্মাণের নির্দ্দেশ ও চিত্র লিপিবদ্ধ থাকিবে। যথাসময় চিত্রানুরূপ দুর্গের শুভারম্ভ করিবে। স্মরণ রাখিও তুমি এ কার্য্যের নিয়ামক, কোনও বিঘ্ন ঘটিলে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার।'

আমি বলিলাম,—'যথা আজ্ঞা। কিন্তু এই ১০ সহস্র লোকের রসদ কোথায় পাইব ?'

মন্ত্রী বলিলেন,—'গঙ্গা-শোণ-সঙ্গমের নিকট পাটলি নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এক সন্ধ্যার জন্য সেই গ্রামে আতিথ্য স্বীকার করিবে। দ্বিতীয় দিনে আমি তোমাদের উপযুক্ত আহার্য্য পাঠাইব।'

তার পর উষাকাল সমাগত দেখিয়া মহামাত্য আমাকে বিদায় দিলেন। বিদায়কালে বলিলেন,—'শুনিয়া থাকিবে, সম্প্রতি বৌদ্ধ নামে এক নাস্তিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধগণ অতি চতুর ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিরোধী। শাক্যবংশের এক রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ ইহাদের নায়ক। এই যুবরাজ অতিশয় ধূর্ত্ত, কপটী ও পরস্বলুব্ধ। মায়াজাল বিস্তার করিয়া গতায়ু মগধেশ্বর বিম্বিসারকে বশীভূত করিয়া মগধে স্বীয় প্রভাব-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল; অধুনা অজাতশত্রু কর্ত্তৃক মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। এই বৌদ্ধদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, ইহারা মগধের ঘোর শত্রু। দুর্গসন্নিধানে যদি ইহাদের দেখিতে পাও, নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিও।'

* * *

আড়াই হাজার বৎসর পরে আজ পাটলিপুত্র-রচয়িতা মগধের মহাপরাক্রান্ত মহামন্ত্রী বর্ষকারের নাম কেহ শুনিয়াছে কি? কিন্তু সেই শাক্যবংশের রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ? আজ অর্দ্ধেক এসিয়া তাঁহার নাম জপ করিতেছে। সসাগরা পৃথ্বীকে যাহারা বারবনিতার ন্যায় উপভোগ করিয়াছিল, তাহাদের নাম সেই ভুক্তা ধরিত্রীর ধূলিকণার সহিত মিশাইয়া গিয়াছে। আর যে নিঃসম্বল রাজ-ভিখারীর একমাত্র সম্বল ছিল নির্ব্বাণ, সেই শাক্যসিংহের নাম অনির্ব্বাণ শিখার ন্যায় তমসান্ধ মানবকে জ্যোতির পথ নির্দ্দেশ করিতেছে।

৩

বর্ষাকালে স্থপতি-সূত্রধার-সম্প্রদায় প্রায়শঃ বসিয়া থাকে। তাই আমার শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকদিগকে সংগ্রহ করিতে বড় বিলম্ব হইল না। যথাসময় আমার ১০ হাজার শিল্পী নগরের ভিন্ন ভিন্ন তোরণ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কোনও পথে দুই শত, কোনও পথে চারি শত বাহির হইল—যাহাতে নাগরিক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। বেলা প্রায় তিন প্রহর-কালে নগরের উত্তরে ৩ ক্রোশ দূরে সকলে সমবেত হইল।

এখান হইতে গঙ্গাশোণসঙ্গম প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ, ন্যূনাধিক এক দিনের পথ। পরামর্শের পর স্থির হইল যে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যতদূর সম্ভব যাইব, তার পর পথিপার্শ্বে রাত্রি কাটাইয়া পরাহে' অতিপ্রত্যূষে আবার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিব। তাহা হইলে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে পাটলিগ্রামে পৌঁছিতে পারা যাইবে।

তখন সকলে যুদ্ধগামী পদাতিক সৈন্যের মত শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। আকাশে প্রবল মেঘাড়ম্বর, শীতল বায়ু খরভাবে বহিতেছে; রাত্রিতে নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। কিন্তু সে জন্য কাহারও উদ্বেগ নাই। আসন্ন কর্ম্মের উল্লাসে সকলে মহানন্দে গান গাহিতে গাহিতে চলিল।

মগধরাজ্যের স্থানীয় বলিয়া তখন রাজগৃহ হইতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন রাজ্যে যাইবার পথ ছিল। তদ্ভিন্ন নগর হইতে নগরান্তরে যাইবার পথও ছিল। রাজকোষ হইতে পথের জন্য প্রভূত অর্থ-ব্যয় হইত। আবশ্যক হিসাবে পথের উপর প্রস্তরখণ্ড বিছাইয়া পথ পাকা করা হইত, পথিকের সুবিধার জন্য পথের ধারে ধারে কূপ খনন করান হইত, ছায়া করিবার জন্য দুই ধারে বট, অশ্বত্থ, শাল্মলী বৃক্ষ রোপিত হইত। মধ্যে নদী পড়িলে সেতু বা খেয়ার বন্দোবস্ত থাকিত।

এই সকল পথে দলবদ্ধ বৈদেশিক বণিক্‌গণ অশ্ব, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে মহার্ঘ পণ্যভার বহন করিয়া নগরে নগরে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বেড়াইত; নট-কুশীলব-সম্প্রদায় আপন আপন কলা-নৈপুণ্য দেখাইয়া ফিরিত। রাজদূত দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া বায়ুবেগে গোপন-বার্ত্তা বহন করিয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত হইত। কদাচ রাত্রিকালে এই সকল পথে দস্যু-তস্করের ভয়ও শুনা যাইত। বন্য আটবিক জাতিরা এইরূপ উৎপাত করিত। কিন্তু তাহা কচিৎ কালে-ভদ্রে।

পথের পাশে সৈনিকের গুল্ম থাকায় তস্করগণ অধিক অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। রাজপথ যথাসম্ভব নিরাপদ ছিল। উত্তরে ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত মগধের সীমা—সেই পর্য্যন্ত পথ গিয়াছে। আমরা সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, বায়ু স্তব্ধ এবং আকাশে মেঘপুঞ্জ বর্ষণোন্মুখ হইয়া রহিল। আমরা রাত্রির মত পথ-সন্নিকটে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আশ্রয় লইলাম।

প্রত্যেকের সহিত একসন্ধ্যার আহার্য্য ছিল। কিন্তু বর্ষাকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে রন্ধনের সুবিধা নাই। কষ্টে যদি বা অগ্নি জ্বালা যায়, বৃষ্টি পড়িলেই নিভিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তথাপি অনেকে একটা মৃত বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া যব-গোধূমচূর্ণ ও শক্তু আনিয়া পিষ্টক-পুরোডাশ তৈয়ার করিতে লাগিল। আবার যাহারা অতটা পরিশ্রম স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা চিপিটক জলে সিক্ত করিয়া দধি শর্করা সহযোগে ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল।

চারিদিক হইতে ১০ হাজার লোকের কলরব, গুঞ্জন, গান, চীৎকার, গালিগালাজ আসিতেছে। দূরে দূরে ধুনীর ন্যায় অগ্নি জ্বলিতেছে। অন্ধকারে তাহারই আশেপাশে মানুষের ছায়ামূর্ত্তি ঘুরিতেছে। কচিৎ অগ্নিতে তৈল বা ঘৃত প্রদানের ফলে অগ্নি অত্যুজ্জ্বল শিখা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। সেই আলোকে চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট মানুষের মুখ ক্ষণকালের জন্য স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এ যেন সহসা বিজন প্রান্তরমধ্যে এক ভৌতিক উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

আমার সহিত কদলী, কপিত্থ, রসাল ইত্যাদি ফল, কিঞ্চিৎ মৃগমাংস এবং এক দ্রোণ লোধ্ররেণু চিত্রকাদির দ্বারা সুরভিত হিঙ্গুল-রঞ্জিত অতি উৎকৃষ্ট আসব ছিল। আমি তদ্দ্বারা আমার নৈশ আহার সুসম্পন্ন করিলাম।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে চলিল। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে মৃত্তিকার উপর আস্তরণ পাতিয়া আমি শয়নের উপক্রম করিতেছি, এমন সময় অন্ধকারে দুই জন লোক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কে?'

এক জন উত্তর দিল, 'নায়ক, আমি এই ছাউনীর রক্ষী। অপরিচিত এক ব্যক্তি কূপের নিকট বসিয়াছিল, তাই আদেশমত ধরিয়া আনিয়াছি।'

আমি বলিলাম —'মশাল জ্বাল।'

মশাল জ্বলিলে দেখিলাম, প্রহরীর সঙ্গে এক দীর্ঘাকৃতি প্রায়নগ্ন অতিশয় শ্মশ্রুগুম্ফজটাবহুল পুরুষ। শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্র নাসা, চক্ষু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কূপ-সন্নিকটে কি করিতেছিলে?'

সে ব্যক্তি স্থির-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'তুমি রাষ্ট্রপতি হইবে। তোমার ললাটে রাজদণ্ড দেখিতেছি।'

কৈতববাদে ভুলিবার বয়স আমার নাই। উপরন্তু মহামাত্য যে সন্দেহ আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, এই অপরিচিত জটিল সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র তাহা জাগরূক হইয়া উঠিল। বলিলাম,—'আপনি দেখিতেছি জ্যোতির্ব্বিদ। আসন পরিগ্রহ করুন।'

আসনগ্রহণ করিয়া জটাধারী কহিলেন,—'আমি শৈব সন্ন্যাসী। রুদ্রের কৃপায় আমার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে। ত্রিকাল আমার নখ-দর্পণে প্রকট হয়। আমি দেখিতেছি, তুমি অদূর-ভবিষ্যতে মহা লোকপালরূপে রাজদণ্ড ধারণ করিবে। তোমার যশোদীপ্তিতে ভূতপূর্ব্ব রাজন্যগণের কীর্ত্তিপ্রভা ম্লান হইয়া যাইবে।'

সন্ন্যাসীকে বুঝিয়া লইলাম। অত্যন্ত শ্রদ্ধাপ্লুতকণ্ঠে কহিলাম,—'আপনি মহা জ্ঞানী। আমি অতি দুষ্কর কার্য্যে যাইতেছি; কার্য্যে সফল হইব কি না, আজ্ঞা করুন।'

ত্রিকালদর্শী ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ নিমীলিত-নেত্রে রহিলেন, তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কোথায় যাইতেছ?'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'আপনিই বলুন।'

সন্ন্যাসী তখন মৃত্তিকার উপর এক খণ্ড প্রস্তর দিয়া রাশি-চক্র আঁকিলেন। আমি মৃদু হাস্যে প্রশ্ন করিলাম,—'এ কি, আপনার নখ-দর্পণ কোথায় গেল?'

সন্ন্যাসী আমার প্রতি সন্দেহপ্রখর এক দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন,—'সূক্ষ্ম গণনা নখ-দর্পণে হয় না। তুমি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, এ সকল বুঝিবে না।'

আমি বিনীতভাবে নীরব রহিলাম। সন্ন্যাসী গভীর মনঃসংযোগে রাশিচক্রে আঁক কষিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অঙ্কপাত করিবার পর মুখ তুলিয়া কহিলেন, 'তুমি কোনও গুপ্ত রাজকার্য্যে পররাজ্যে যাইতেছ। শনি ও মঙ্গল দৃষ্টি-বিনিময় করিতেছে, এজন্য মনে হয়, তুমি যুদ্ধসংক্রান্ত কোনও গূঢ় কার্য্যে ব্যাপৃত আছ।' এই বলিয়া সপ্রশ্ননেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আমি চমৎকৃত হইয়া বলিলাম, 'আপনি সত্যই ভবিষ্যদর্শী, আপনার অগোচর কিছুই নাই। আমি রাজামুত্তার লিচ্ছবি দেশে যাইতেছি. কি উদ্দেশ্যে যাইতেছি, তাহা অবশ্যই আপনার ন্যায় জ্ঞানীর অবিদিত নাই। এখন কৃপা করিয়া আমার এক সুহৃদের ভাগ্যগণনা করিয়া দিতে হইবে। প্রহরি, কুলিক মিহিরমিত্র কন্থু-বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাকে ডাক।'

কুলিক মিহিরমিত্র আমার অধীনে প্রধান শিল্পী এবং আমার প্রাণোপম বন্ধু। ভাস্কর্য্যে তাহার যেরূপ অধিকার, জ্যোতিষশাস্ত্রেও সেইরূপ পারদর্শিতা। ভৃগু, পরাশর, জৈমিনি তাহার কণ্ঠাগ্রে।

মিহিরমিত্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলে আমি সন্ন্যাসীকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলাম,—'ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, তোমার ভাগ্য গণনা করিবেন।'

মিহিরমিত্র সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া বসিল। তাঁহার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া নিজ করতল প্রসারিত করিয়া বলিল, 'কোন্ লগ্নে আমার জন্ম?'

সন্ন্যাসীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঈষৎ চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠার লক্ষণ দেখা দিল। সে করতলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই বলিল,—'তোমার অকালমৃত্যু ঘটিবে।'

মিহিরমিত্র বলিল, —'ঘটুক, কোন্ লগ্নে আমার জন্ম?'

সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—'বৃষ লগ্নে।'

'বৃষ লগ্নে!' মিহিরমিত্র হাসিল; 'উত্তম। চন্দ্র কোথায়?'

'তুলা রাশিতে।'

'তুলা রাশিতে? ভাল। কোন্ নক্ষত্রে?'

সন্ন্যাসী নীরব। ব্যাকুল-নেত্রে একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল, কিন্তু পলায়নের পথ নাই। জ্যোতিষীর নাম শুনিয়া উৎসুক কর্ম্মিগণ একে একে আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মিহিরমিত্র কঠোর-কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল,—'চন্দ্র কোন্ নক্ষত্রে?'

জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠাধর লেহন করিয়া স্খলিতকণ্ঠে সন্ন্যাসী কহিল,—"চন্দ্র মৃগশিরা নক্ষত্রে।"

মিহিরমিত্র আমার দিকে ফিরিয়া অল্প হাস্য করিয়া বলিল, —"এ ব্যক্তি শঠ। জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছুই জানে না।"

তখন সন্ন্যাসী দ্রুত উঠিয়া সেই শ্রমিক-ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী অসাধারণ বলিষ্ঠ—কিন্তু বিশ জনের বিরুদ্ধে একা কি করিবে? অল্পকালের মধ্যেই সকলে ধরিয়া তাহাকে ভূমিতে নিপাতিত করিল। রজ্জু দ্বারা তাহার হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিবার পর সন্ন্যাসী বলিল,— 'মহাশয়, আমাকে বৃথা বন্ধন করিতেছেন। আমি দীন ভিক্ষুক মাত্র, জ্যোতিষীর ভাণ করিয়া কিছু বেশী উপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনারা জ্ঞানী—আমার কপটতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। এখন দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমার যথেষ্ট দণ্ডভোগ হইয়াছে।'

আমি বলিলাম,—"ভণ্ড সন্ন্যাসী, তুমি কোশল অথবা বৃজির গুপ্তচর। আমাকে ভুলাইয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলে।"

সন্ন্যাসী ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,— "কুমারীর শপথ, জয়ন্তের শপথ, আমি গুপ্তচর নহি। আমি ভিক্ষুক। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আর কখনও এমন কায করিব না;—উঃ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত—একটু জল—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

আমি এক জন প্রহরীকে আদেশ করিলাম,—"কূপ হইতে এক পাত্র জল আনিয়া ইহাকে দাও।"

জল আনীত হইলে সন্ন্যাসীর মুখের কাছে জলপাত্র ধরা হইল। কিন্তু সন্ন্যাসী নিশ্চেষ্ট, জলপানের কোনও আগ্রহ নাই।

প্রহরী বলিল,—"জল আনিয়াছি—পান কর।"

সন্ন্যাসী নীরব নিস্পন্দ-ভাবে পড়িয়া রহিল, কথা কহিল না। আমি তখন তাহার নিকটে গিয়া বলিলাম,—"তৃষ্ণার্ত্ত বলিতেছিলে, জল পান করিতেছ না কেন?"

সন্ন্যাসী তখন ক্ষীণ-স্বরে কহিল,—"আমি জলপান করিব না।"

সহসা যে প্রহরী জল আনিয়াছিল, সে জলপাত্র ফেলিয়া দিয়া কাতোরোক্তি করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। 'কি হইল, কি হইল' বলিয়া সকলে তাহাকে ধরিয়া তুলিল। দেখা গেল, এই অল্পকালের মধ্যে তাহার মুখের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মুখ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ক্রমে সৃক্কণী বহিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল। বাক্য একবারে রোধ হইয়া গিয়াছে। 'কি হইয়াছে' 'কেন এরূপ করিতেছ' এইপ্রকার বহু প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল ভূপতিত জলপাত্রটি অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইতে লাগিল।

তার পর অর্দ্ধ-দণ্ডের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণায় হস্ত-পদ উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে উৎকট মুখভঙ্গী করিয়া প্রহরী ইহলোক ত্যাগ করিল। তাহার বিষ-বিধ্বস্ত দেহ মৃত্যুর করস্পর্শে শান্ত হইলে পর, সমবেত সকলের দৃষ্টি সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর উপর গিয়াপড়িল। ক্রোধান্ধ জনতার সেই জিঘাংসু নিষ্ঠুর দৃষ্টির অগ্নিতে সন্ন্যাসী যেন পুড়িয়া কুঁকড়াইয়া গেল।

আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে বোধ করি, সেই ক্ষিপ্ত কর্ম্মিকদল সন্ন্যাসীর দেহ শত খণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিত, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে শ্রমিকব্যূহ ঠেলিয়া কর্ম্মিকজ্যেষ্ঠ বিশালকায় দিঙ্‌নাগ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভূশায়িত সন্ন্যাসীর জটা ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইয়া, সকলের দিকে ফিরিয়া, পরুষ-কণ্ঠে কহিল, 'ভাই সব, এই ভণ্ড তপস্বী শত্রুর চর; আমাদের প্রাণনাশের জন্য কূপের জল বিষ-মিশ্রিত করিয়াছে। ইহার একমাত্র উচিত শাস্তি মৃত্যু; অতএব সে শাস্তি আমরা ইহাকে দিব। কিন্তু এখন নয়। তোমরা সকলেই জান, যে কার্য্যে আমরা যাইতেছি, তাহাতে নর-বলির প্রয়োজন। ভৈরবের তুষ্টিসাধন না করিলে আমাদের কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না। সুতরাং এখন কেহ ইহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিও না। যথাসময় গঙ্গার উপকূলে আমরা ইহাকে জীবন্ত সমাধি দিব। এই পাপাত্মার প্রেতমূর্ত্তি অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের দুর্গ পাহারা দিবে।'

দিঙ্‌নাগের কথায় সকলে ক্ষান্ত হইল।

তার পর মৃত প্রহরীর দেহ সকলে মিলিয়া কূপ সন্নিকটে এক বৃক্ষতলে সমাধিস্থ করিল, এবং সন্ন্যাসীকে সেই বৃক্ষ-শাখায় হস্তপদ বাঁধিয়া ভাণ্ডবৎ ঝুলাইয়া রাখিল।

৪

পরদিন প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া আমরা প্রায় বেলা তৃতীয় প্রহরে পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার উপকূলে জঙ্গলে পরিবৃত অতি ক্ষুদ্র একটি জনপদ—সর্ব্বসাকুল্যে বোধ করি পঞ্চাশটি দরিদ্র পরিবারের বাস। গ্রামবাসীরা অধিকাংশই নিষাদ কিম্বা জালিক—বনে পশু শিকার করিয়া এবং নদীতে মৎস্য ধরিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। মাঝে মাঝে বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষাদি কাটিয়া, ক্ষেত্র সমতল করিয়া, যব, গোধূম, চণক ইত্যাদিও উৎপন্ন করে। আমরা সদলবলে উপস্থিত হইলে গ্রামিকরা আমাদের আততায়ী মনে করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা অনেক আশ্বাস দিলাম, কিন্তু কেহ শুনিল না, কিরাতভীত মৃগযূথের মত গভীর বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তখন আমরা অনাহূত যেখানে যাহা পাইলাম, তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। গ্রামের সম্বৎসরের সঞ্চিত খাদ্য এক সন্ধ্যার আহারে প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল।

সে দিন আর কোনও কায হইল না। শ্রান্ত কর্ম্মিকদল যে যেখানে পাইল, ঘুমাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে কাযের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। রণ-হস্তীর পৃষ্ঠে স্তূপীকৃত খাদ্য, বস্ত্রাবাস প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্তু আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। ছাউনী ফেলিতে, প্রস্তরাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে সমস্ত দিন কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ রহিল না।

দূতহস্তে মহামন্ত্রী দুর্গের নক্সা পাঠাইয়াছেন, তাহা লইয়া মিহিরমিত্র ও দিঙ্‌নাগকে সঙ্গে করিয়া আমি দুর্গের স্থান নির্ণয়ের জন্য নদীসঙ্গমে গেলাম। বর্ষার কূলপ্লাবী দুই মহানদী স্ফীত তরঙ্গায়িত হইয়া ঘোররবে ছুটিয়াছে। গঙ্গা ধূসর, শোণ স্বর্ণাভ। দুই স্রোত যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেখানে আবর্ত্তিত জলরাশি ফেনপুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সঙ্গমের দক্ষিণ উপকূলে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে, শোণ এবং সংযুক্ত প্রবাহের সন্ধিস্থলে এক বিশাল ত্রিভুজের সৃষ্টি হইয়াছে—মনে হয় যেন, দুই নদী বাহু বিস্তার করিয়া দক্ষিণের তটভূমিকে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস করিতেছে। বহু পর্য্যবেক্ষণ ও বিচারের পর স্থির করিলাম যে, এই ত্রিভুজের মধ্যেই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কারণ, তাহা হইলে দুর্গের দুই দিক্ নদীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিবে, পরিখা-খননের প্রয়োজন হইবে না।

তার পর সেই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কৃত করিবার জন্য লোক লাগিয়া গেল। বড় বড় পুরাতন বৃক্ষ কাটিয়া ভূমি সমতল করা হইতে লাগিল। হস্তী সকল ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ড টানিয়া বাহিরে লইয়া ফেলিতে লাগিল। বৃক্ষপতনের মড়-মড় শব্দে, মানুষের কোলাহলে, হস্তী ও অশ্বের নিনাদে দিক্‌প্রান্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। যেন বহুযুগব্যাপী নিদ্রার পর অরণ্যানী কোন দৈত্যের বিজয়নাদে চমকিয়া উঠিল।

সমস্ত দিন এইরূপ পরিশ্রমের পর রাত্রিতে আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দিঙ্‌নাগ আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল,—"নায়ক, রাত্রি দ্বিপ্রহর

সমাগত। আজ দুর্গারম্ভের পূর্ব্বে দৈবকার্য্য করিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিরূপ দৈবকার্য্য ?"

দিঙ্‌নাগ বলিল,—"ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গেলেন ? সেই ভণ্ড তপস্বী—আজ তাহাকে জীবন্ত পুতিয়া ফেলিতে হইবে।"

তখন সকল কথা স্মরণ হইল। বলিলাম,—"ঠিক কথা, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তা বেশ, তাহাকে যখন বধ করিতেই হইবে, তখন এক কার্য্যে দুই ফল হোক। শত্রু নিপাত ও দেবতুষ্টি একসঙ্গেই হইবে। কিন্তু এই সকল দৈব কার্য্যের কি কি অনুষ্ঠান, তাহা কি তোমাদের জানা আছে ?'

দিঙ্‌নাগ বলিল, 'অনুষ্ঠান কিছুই নহে। বলিকে সুরাপান করাইয়া যখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, তখন তাহার কাণে কাণে বলিতে হইবে—তুমি চিরদিন প্রেতদেহে এই দুর্গ রক্ষা করিতে থাক। এই বলিয়া তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় পুতিয়া ফেলিতে হইবে।'

আমি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি এত বিধিব্যবস্থা জানিলে কোথা হইতে ?"

দিঙ্‌নাগ হাসিয়া বলিল,—'এ কার্য্য আমি পূর্ব্বে করিয়াছি। ধনশ্রী শ্রেষ্ঠী যখন গুপ্ত রত্নাগার মাটীর নীচে তৈয়ার করে, তখন আমিই কুলিক ছিলাম। সেই সময় অরণ্য হইতে এক শবর ধরিয়া আনিয়া শ্রেষ্ঠী এই নর-যাগ সম্পন্ন করে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।'

আমি বলিলাম,—'তবে এ কার্য্যও তুমিই কর।'

দিঙ্‌নাগ বলিল,—'করিব। কিন্তু নায়ক, কার্য্যকালে আপনাকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে। ইহাই বিধি।'

'বেশ, থাকিব।'

দিঙ্‌নাগ চলিয়া যাইবার পর নানা চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময় সে ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—'নায়ক, সর্ব্বনাশ ! সন্ন্যাসী আমাদের ফাঁকি দিয়াছে।'

'ফাঁকি দিয়াছে ?'

'বিষপান করিয়াছে। তাহার কবচের মধ্যে বিষ লুকান ছিল, জীবন্ত সমাধির ভয়ে তাহাই খাইয়া মরিয়াছে। এখন উপায় ?'

'কিসের উপায় ?'

'মানস করিয়াছি, বলি না দিলে যে সর্ব্বনাশ হইবে। কুপিত হইবেন।' দিঙ্‌নাগ মাটীতে বসিয়া পড়িল।

চিন্তার কথা বটে। অর্ব্বাচীন সন্ন্যাসীটা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিল না ! পাছে আমাদের একটু উপকার হয়, তাই তাড়াতাড়ি বিষপান করিয়া বসিল। এ দিকে আমন্ত্রিত দেবতা প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। অন্য বলি কোথায় পাওয়া যায় ?

বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িয়াছি, এরূপ সময় শিবিরের এক প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল,—'কতকগুলা মুণ্ডিত-মস্তক ভিখারী ছাউনীতে আশ্রয় খুঁজিতেছিল, ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছি। আজ্ঞা হয় ত লইয়া আসি।'

দিঙ্‌নাগ লাফাইয়া উঠিয়া মহানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'জয় রুদ্রেশ্বর, জয় ভৈরব ! নায়ক, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন।'

এত সহজে যে বলি-সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে, তাহা ভাবি নাই। ভিখারী অপেক্ষা উত্তম বলি আর কোথায় পাওয়া যাইবে ? দিঙ্‌নাগ ঠিকই বলিয়াছে, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন।

*　　*　　*　　*

সর্ব্বশুদ্ধ চারি পাঁচটি ভিখারী। মস্তক ও মুখ মুণ্ডিত, পরিধানে কৌপীন সঙ্ঘাট ও উত্তরীয়, হস্তে ভিক্ষাপাত্র, আমার সম্মুখে তাহারা আনীত হইল। ভিক্ষুকগণ সকলেই বয়স্ক—কেবল একটি বৃদ্ধ, বয়স বোধ করি সত্তর অতিক্রম করিয়াছে।

বৃদ্ধ স্মিত হাস্যে বলিলেন,—'মঙ্গল হোক।'

এই বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। আমি কে, কোথায় আছি, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। কেবল বুকের মধ্যে এক অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস আলোড়িত হইয়া উঠিল। কে ইনি ? এত সুন্দর, এত মধুর, এত করুণাসিক্ত মুখকান্তি ত মানুষের কখনও দেখি নাই ! দেবতার মুখে যে জ্যোতির্ম্মণ্ডল কল্পনা করিয়াছি, আজ এই বৃদ্ধের মুখে তাহা প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম। এই জ্যোতির স্ফুরণ বাহিরে অতি অল্প, কিন্তু চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টি করিলেই মনে হয়, ভিতরে অমিতদ্যুতি স্থির সৌদামিনী জ্বলিতেছে। কিন্তু সে সৌদামিনীতে জ্বালা নাই, তাহা অতি স্নিগ্ধ, অতি শীতল, যেন হিম-নির্ঝরিণীর শীকর নিসিক্ত।

সে মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটি শব্দ কেবল রণিত হইতে লাগিল,'অমিতাভ ! অমিতাভ !'

আমি বাক্‌রহিত হইয়া বসিয়া আছি দেখিয়া তিনি আবার হাসিলেন। অপূর্ব্ব প্রভায় সে মুখ আবার সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন,—'বৎস, আমি যাযাবর ভিক্ষু, কুশী-নগর যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছি। অগ্য রাত্রির জন্য তোমার আশ্রয়ভিক্ষা করি।'

অবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনি কে ?'

তাঁহার এক জন সহচর উত্তর করিলেন,—'শাক্যসিংহ গৌতমের নাম কখনও শুন নাই ?'

শাক্যসিংহ ? ইনিই তবে সেই শাক্যবংশের রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ ! মহামন্ত্রী বর্ষকারের কথা মনে পড়িল। ইহারই উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছিলেন,—ধূর্ত্ত কপটী পরস্বলুব্ধ ! মরি মরি, কে ধূর্ত্ত কপটী ? মনে হইল, মানুষ ত অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু আজ এই প্রথম মানুষ দেখিলাম। হায়, মহামন্ত্রী বর্ষকার, তুমি এই পুরুষসিংহকে দেখ নাই কিম্বা দেখিয়াও আত্মাভিমানে অন্ধ ছিলে। নহিলে এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতে না।

বুকের মধ্যে প্রবল রোদনের উচ্ছ্বাস সমস্ত দেহকে কম্পিত করিতে লাগিল। আমার অতিবাহিত জীবনের অপরিমেয় শূন্যতা, অশেষ দৈন্য, যেন এককালে মূর্ত্তি ধরিয়া আমার সম্মুখে দেখা দিল। কি পাইয়া এত দিন ভুলিয়া ছিলাম !

আমি উঠিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলাম,—'অমিতাভ, আমি অন্ধ, আমাকে চক্ষু দাও, আমাকে আলোকের পথ দেখাইয়া দাও।'

অমিতাভ আমাকে ধরিয়া তুলিলেন। মস্তকে করার্পণ করিয়া বলিলেন,—'পুত্র, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার অন্তরের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইবে, আপনিই আলোকের পথ দেখিতে পাইবে।'

আমি আবার তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিলাম,—'না শ্রীমন্, আমার হৃদয় অন্ধকার। আজ প্রথম তোমার মুখে দিব্যজ্যোতি দেখিয়াছি। ঐ জ্যোতির কণামাত্র আমাকে দান কর।'

এক জন ভিক্ষু বলিলেন,—'শাস্তা, আপনি ইহাকে ত্রিশরণ দান করুন।'

শাক্যসিংহ কহিলেন,—'আনন্দ, তাহাই হোক।' আমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া বলিলেন,—'পুত্র, তুমি ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়া গৃহস্থের অষ্টশীল পালন কর। আশীর্ব্বাদ করি, যেন বাসনামুক্ত হইতে পার।'

তখন বুদ্ধের চরণতলে বসিয়া তদ্গতকণ্ঠে তিনবার ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করিলাম।

অদূরে দাঁড়াইয়া দিঙ্‌নাগ—দুর্দ্ধর্ষ, নিষ্করুণ, অসুর-প্রকৃতি দিঙ্‌নাগ গলদশ্রু হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার বিকৃত কণ্ঠ হইতে কি কথা বাহির হইতে লাগিল বুঝা গেল না।

এ যেন কয়েক পলের মধ্যে এক মহা ভূমিকম্পে আমাদের অতীত জীবন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কীট ছিলাম, এক মুহূর্ত্তে মানুষ হইয়া গেলাম।

* * * * *

পরদিন উষাকালে তথাগত কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হিরণ্যবাহুর স্বুবর্ণ-সৈকতে দাঁড়াইয়া আমার হস্তধারণ করিয়া তিনি কহিলেন,—'পুত্র, আমি চলিলাম। হিংসায় হিংসার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়—এ কথা স্মরণ রাখিও।'

বাষ্পাকুল-স্বরে কহিলাম,—'শাস্তা, আবার কত দিনে সাক্ষাৎ পাইব ?'

সেই হিমবিদ্যুতের ন্যায় হাসি তাঁহার ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল, বলিলেন,—'আমি কুশীনগর যাইতেছি, আর ফিরিব না।'

তার পর বহুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে গঙ্গা-শোণ-সঙ্গমে দুর্গভূমির প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। শেষে স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন,—'আমি দেখিতেছি, তোমার এই কীর্ত্তি বহু সহস্রবর্ষ-স্থায়ী হইবে। এই ক্ষুদ্র পাটলিগ্রাম ও তোমার নির্ম্মিত এই দুর্গ এক মহীয়সী নগরীতে পরিণত হইবে। বাণিজ্যে, ঐশ্বর্য্যে, শিল্পে, কারুকলায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে। সদ্ধর্ম্ম এইস্থানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। তোমার কীর্ত্তি অবিনশ্বর হোক।'

এই বলিয়া, পুনর্ব্বার আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দিব্যদর্শী পরিনির্ব্বাণের পথে যাত্রা করিলেন।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদবিষয়ে আচার্য্য শঙ্করের মত

শিষ্য। আপনি বেদের নিত্যত্ব-বোধক শাস্ত্রবাক্যের অন্তরূপ তাৎপর্য্য বলিতেছেন, কিন্তু জৈমিনির ন্যায় বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণও ত বেদকে নিত্যই বলিয়াছেন। তিনি পরে সেখানে "অতএব চ নিত্যত্বং" (১।৩।২৯) এই সূত্র দ্বারা বেদের নিত্যত্ব-সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার শঙ্করও সেখানে প্রমাণ দ্বারা উহাই সমর্থন করিয়াছেন এবং বেদ যে অপৌরুষেয়, ইহাও তিনি অনেক স্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন।

গুরু। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতেই যে বেদের উদ্ভব হইয়াছে, ইহাও ত তিনি পূর্ব্বে স্পষ্ট বলিয়াছেন। সে কথাও আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি বেদান্তদর্শনের তৃতীয় সূত্রের ভাষ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদের "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে বলিয়াছেন যে, ঋগ্‌বেদ প্রভৃতি সমস্ত বেদ সেই পরমেশ্বরের নিঃশ্বসিত, অর্থাৎ তাঁহা হইতেই নিঃশ্বাসের ন্যায় অপ্রযত্নে বা ঈষৎ প্রযত্নে উদ্ভূত। সুতরাং তিনিই বেদের কর্ত্তা। "ভামতী" টীকাকার শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে শঙ্করের ঐ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে স্পষ্ট বলিয়াছেন—"অপ্রযত্নেনাস্য বেদকর্ত্তৃত্বে শ্রুতিরুক্তা,"—"অস্য মহতো ভূতস্য" ইতি। তাহা হইলে আচার্য্য শঙ্কর পরে আবার বেদকে নিত্য বলিবেন কিরূপে? ইহাও ত তোমার চিন্তা করা আবশ্যক। আর আচার্য্য শঙ্কর যে বেদকে পরব্রহ্মের ন্যায় নিত্য বলিতে পারেন না, ইহাও তোমার প্রণিধান করা আবশ্যক। কারণ, তাহা বলিলে তাঁহার অদ্বৈত-সিদ্ধান্তেরই ভঙ্গ হইয়া যায়। শঙ্করের অদ্বৈতবাদে পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নিত্য নহে। আর সমস্তই রজ্জুতে সর্পের ন্যায় সেই পরব্রহ্মে কল্পিত মিথ্যা, সুতরাং অনিত্য।

বস্তুতঃ আচার্য্য শঙ্কর ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের ন্যায় শব্দকে [illegible]নিক অনিত্য না বলিলেও কর্ম্মমীমাংসক সম্প্রদায়ের ন্যায় [illegible]ৎপত্তিবিনাশশূন্য নিত্যও বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার মতে [illegible] খ গ ইত্যাদি বর্ণাত্মক শব্দের ন্যায় বাক্যরূপ বেদও সৃষ্টির [illegible]মে পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হয় এবং মহাপ্রলয়ে পরব্রহ্মেই [illegible]বার সমস্ত বেদের লয় বা বিনাশ হয়। ইহার মধ্যে [illegible]রণভেদে শব্দ বা বেদের ভেদ বা পুনরুৎপত্তি হয় না এবং [illegible]শও হয় না। মহাপ্রলয়েও উপাদান-কারণরূপে বেদের সত্তা থাকে। সৃষ্টির প্রথমে পরমেশ্বর হইতে কার্য্যরূপে আবার বেদের আবির্ভাব হয়, উহাই বেদের উৎপত্তি। সুতরাং উৎপত্তিমত্ত্ব বশতঃ বেদ নিত্য হইতে পারে না। কিন্তু বেদের উৎপত্তি হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সেই উৎপন্ন বেদের নাশ না হওয়ায় এবং মহা-প্রলয়েও উপাদানকারণরূপে উহার সত্তা থাকায় আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তসূত্রানুসারে পরে বেদকে নিত্য বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতেও বেদ উৎপত্তিবিনাশশূন্য নিত্য নহে। "বেদান্ত পরিভাষা"কার অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক-চূড়ামণি ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র নৈয়ায়িক, কর্ম্মমীমাংসক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মতভেদ প্রকাশ করিয়া উক্ত বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন (১)।

বেদ পুরুষকৃত হইলেও অপৌরুষেয়, ইহা কিরূপে বলা যায়? এতদুত্তরে ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলিয়াছেন যে, (২) সজাতীয় উচ্চারণকে অপেক্ষা না করিয়া যে বাক্য উচ্চারিত হয়, তাহাকেই বলে পৌরুষেয় বাক্য। যেমন স্মৃতি ও মহা-ভারতাদির পূর্ব্বে উহার সজাতীয় অর্থাৎ যথাক্রমে ঐরূপ বর্ণযোজনার দ্বারা রচিত ঐরূপ বাক্য না থাকায় স্মৃতি ও মহাভারতাদি সজাতীয় উচ্চারণকে অপেক্ষা না করিয়াই উচ্চারিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সমস্ত পৌরুষেয় বাক্য—

---

(১) "তত্র বেদানাং নিত্যসর্ব্বজ্ঞপরমেশ্বরপ্রণীতত্বেন প্রামাণ্যমিতি নৈয়ায়িকাঃ। বেদানাং নিত্যত্বেন নিরস্তসমস্ত-পুংদূষণতয়া প্রামাণ্যমিত্যধ্বরমীমাংসকাঃ। অস্মাকন্তু মতে বেদো ন নিত্যঃ, উৎপত্তিমত্ত্বাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বঞ্চ "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ব-বেদঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। নাপি বেদানাং ত্রিক্ষণাবস্থায়িত্বং, "য এব বেদো দেবদত্তেনাধীতঃ, স এব ময়াপী"ত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা-বিরোধাৎ। অতএব গকারাদিবর্ণানামপি ন ক্ষণিকত্বং, সোঽয়ং গকার ইতি প্রত্যভিজ্ঞাবিরোধাৎ। তথাচ বর্ণপদবাক্যসমু-দায়স্য বেদস্য বিয়দাদিবৎ সৃষ্টিকালীনোৎপত্তিকত্বং প্রলয়কালীন-ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বঞ্চ। ন তু মধ্যে বর্ণানামুৎপত্তিবিনাশৌ, অনন্তগকারকল্পনায়াং গৌরবাৎ"—ইত্যাদি। বেদান্তপরিভাষা।

(২) কিন্তু সজাতীয়োচ্চারণানপেক্ষোচ্চারণবিষয়ত্বং পৌরুষেয়ত্বং। তথা চ সর্গাদ্যকালে পরমেশ্বরঃ পূর্ব্বসিদ্ধবেদানু-পূর্ব্বীসমানানুপূর্ব্বীকং বেদং বিরচিতবান্ ন তু তদ্বিজাতীয়-মিতি তস্য সজাতীয়োচ্চারণাপেক্ষোচ্চারণবিষয়ত্বাদপৌরুষেয়ত্বং। ভারতাদীনান্তু সজাতীয়োচ্চারণমনপেক্ষ্যৈবোচ্চারণমিতি তেষাং পৌরুষেয়ত্বং।—বেদান্ত পরিভাষা।

কিন্তু পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে পূর্ব্বসিদ্ধ বেদবাক্যের সজাতীয় বেদবাক্যই উচ্চারণ করেন। অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বসৃষ্টিতে প্রথমে যেরূপ স্বরবর্ণ-বিশিষ্ট বেদবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, পরসৃষ্টিতেও সেইরূপ স্বরবর্ণবিশিষ্ট বেদবাক্যই উচ্চারণ করিয়াছেন এবং তৎপরসৃষ্টিতেও তিনি তাহাই করিবেন। সুতরাং বেদ সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকৃত হইলেও অপৌরুষেয় বলিয়া কথিত হয়।

আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সমর্থন করিতে "ভামতী" টীকায় (১।১।৩) শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন যে, বেদ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ-প্রণীত হইলেও বেদরচনায় সেই পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নাই। কারণ, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ পরমেশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির প্রারম্ভে যেরূপ স্বরবর্ণাদিবিশিষ্ট বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন, পর পর সৃষ্টির প্রারম্ভেও সেইরূপ বেদবাক্যই তিনি রচনা করিয়াছেন ও করিবেন। পূর্ব্বসৃষ্টিতে বৈদিকবিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ-যাগ যেমন স্বর্গের কারণ হইয়াছে, পরসৃষ্টিতেও তাহাই হইয়াছে ও হইবে। এইরূপ পূর্ব্বসৃষ্টিতে যেমন ব্রহ্মহত্যা-জন্ম নরক হইয়াছে, পরসৃষ্টিতেও তাহাই হইয়াছে ও হইবে। কখনও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই ও হইবে না। কোন সৃষ্টিতেই ব্রহ্মহত্যাজন্ম স্বর্গ এবং অশ্বমেধযাগজন্ম নরক হয় নাই ও হইবে না। এইরূপ বেদোক্ত কোন সিদ্ধান্তেরই কোনকালে ব্যতিক্রম হয় না। অর্থাৎ বেদবাক্যের স্বরবর্ণাদি বা বেদোক্ত কোন সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তনাদি কার্য্যে বেদকর্ত্তা পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য নাই। সুতরাং বেদ স্বতন্ত্র পুরুষপ্রণীত না হওয়ায় বেদ পৌরুষেয় নহে। কারণ, যে বাক্য স্বতন্ত্র পুরুষ-প্রণীত, তাহাকেই বলে পৌরুষেয় বাক্য।

কিন্তু বেদকর্ত্তা পুরুষের যে একেবারেই স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহা বিবাদগ্রস্ত। শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রও উক্ত বিষয়ে বিবাদের কথা লিখিয়াছেন। ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় উহা স্বীকার করেন নাই এবং তাঁহারা "পৌরুষেয়" শব্দের উক্তরূপ অর্থব্যাখ্যাও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে বাক্য হইলেই তাহা পৌরুষেয়। তাই তাঁহারা "বেদঃ পৌরুষেয়ো বাক্যত্বাৎ ভারতাদিবৎ"—এইরূপে বাক্যত্ব হেতুর দ্বারাও বেদের পৌরুষেয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহাদিগের মতে শব্দ ও বেদবাক্য যে সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হইয়া মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, ইহাও অসম্ভব। তাঁহাদিগের মতে প্রথমে কোন শব্দের উৎপত্তি হইলে তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের ন্যায় সেই শব্দ হইতে অপর শব্দ এবং সেই শব্দ হইতে অপর শব্দ এইরূপে শব্দপরম্পরার উৎপত্তি হয় এবং দ্বিতীয় শব্দ প্রথম শব্দকে এবং তৃতীয় শব্দ দ্বিতীয় শব্দকে অর্থাৎ পরজাত শব্দ তৎপূর্ব্বজাত শব্দকে বিনষ্ট করে। যে শব্দের পরে আর শব্দ জন্মে না, সেই চরম শব্দও সেই কালনাশ্য। কোন শব্দই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তবে কারণ উপস্থিত হইলে সেই শব্দের সজাতীয় অপর শব্দেরই পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্তরূপে শব্দের উৎপত্তির তৃতীয়ক্ষণে (মতান্তরে চতুর্থক্ষণে) শব্দের বিনাশ হওয়ায় উক্তরূপ অর্থে শব্দ "ক্ষণিক" বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্তমত-সমর্থনে ন্যায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের বহু সূক্ষ্ম বিচার আছে। সংক্ষেপে তাহার কিছুই বলা যায় না।

সে যাহা হউক, মূল কথা, আচার্য্য শঙ্করের মতেও পূর্ব্বোক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারে সেই বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বরই বেদের কর্ত্তা। সুতরাং বেদ কোন জীববিশেষের কৃত নহে, এই অর্থে বেদকে অপৌরুষেয় বলিলে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ও তাহা বলিতে পারেন। কিন্তু "ঋগ্‌বেদসংহিতা"র উপোদ্‌ঘাতভাষ্যে মহামনীষী সায়ণাচার্য্য উক্ত বিষয়ে বহুবিচার করিতে বলিয়াছেন যে, (১) কর্ম্মফলরূপ শরীরধারী কোন জীব বেদ নির্ম্মাণ করেন নাই, এই অর্থেও বেদকে অপৌরুষেয় বলা যায় না। কারণ, অগ্নি হইতে ঋগ্‌বেদ এবং বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। ঐ অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য জীববিশেষ। তাহা হইলে তাঁহারা কিরূপে বেদ নির্ম্মাণ করিবেন? এজন্য সায়ণাচার্য্য পরেই বলিয়াছেন—"ঈশ্বরস্য অগ্ন্যাদিপ্রেরকত্বেন নির্ম্মাতৃত্বং দ্রষ্টব্যং।" কিন্তু তাহা হইলে সেই অগ্নি প্রভৃতির প্রেরক পরমেশ্বরই বস্তুতঃ বেদকর্ত্তা, ইহাই স্বীকার্য্য। পরমেশ্বর যে অনেক ঋষির শরীরে আবিষ্ট হইয়া বেদের অনেক শাখা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।—

ঋষিগণই বেদের আদিকর্ত্তা নহেন

শিষ্য। অনেকে বলেন যে, ঋষিগণই বেদের কর্ত্তা। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিই ক্রমশঃ বেদের ভিন্ন ভিন্ন সূক্ত, মন্ত্র এবং আরণ্যক প্রভৃতি রচনা করিয়াছে। কিন্তু কোন পূর্ব্বাচার্য্য কি ঐরূপ কথা বলিয়াছেন?

---

(১) কর্ম্ম-ফলরূপ-শরীরধারি-জীব-নির্ম্মিতত্বাভাবমাত্রেণাপৌরুষেয়ত্বং বিবক্ষিতমিতি চেন্ন, জীববিশেষৈরগ্নিবায়্বাদিত্যৈর্ব্বেদানামুৎপাদিতত্বাৎ, "ঋগ্‌বেদ এবাগ্নেরজায়ত, যজুর্ব্বেদো বায়োঃ সামবেদ আদিত্যা"দিতি শ্রুতেঃ। ঈশ্বরস্যাগ্ন্যাদিপ্রেরকত্বেন নির্ম্মাতৃত্বং দ্রষ্টব্যং।—সায়ণভাষ্য।

গুরু। পাণিনির "তেন প্রোক্তং"—এই সূত্রের ভাষ্যে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, (১) যদিও অর্থ নিত্য, কিন্তু বর্ণের যে আনুপূর্ব্বী, অর্থাৎ যথাক্রমে সংযোজিত বর্ণাত্মক শব্দসমষ্টি, তাহা অনিত্য। মহাভাষ্যের টীকাকার কৈয়ট সেখানে বলিয়াছেন যে, মহাপ্রলয়াদিকালে বেদের বর্ণানুপূর্ব্বীর বিনাশ হওয়ায় ঋষিগণ পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইয়া সংস্কারের উৎকর্ষবশতঃ বেদার্থ স্মরণ করিয়া শব্দ রচনা করেন। সুতরাং "কঠ" প্রভৃতি নামক ঋষিগণ, বেদের বর্ণানুপূর্ব্বীর কর্ত্তাই, তাঁহারা পূর্ব্বস্থিত বর্ণানুপূর্ব্বীরই বক্তা নহেন। কারণ, মহাপ্রলয়ে সেই বর্ণানুপূর্ব্বীর সম্পূর্ণ বিনাশ হইয়া যায়।

এখানে জানা আবশ্যক যে, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতে ক খ গ ইত্যাদি বর্ণাত্মক শব্দ অনিত্য।—কিন্তু উহা হইতে ভিন্ন "স্ফোট" নামে যে শব্দ আছে, তাহা নিত্য। ঐ "স্ফোট" নামক শব্দের অভিব্যক্তি হইলেই তদ্দ্বারাই অর্থের বোধ হইয়া থাকে। তাই যদ্দ্বারা অর্থ স্ফুটিত বা প্রতীত হয়, এই অর্থে উহা "স্ফোট" নামে কথিত হইয়াছে। বর্ণ, পদ ও বাক্য ঐ "স্ফোট"রূপ নিত্য শব্দের ব্যঞ্জক। "বর্ণস্ফোট" "পদস্ফোট" এবং "বাক্যস্ফোট" এই ত্রিবিধ স্ফোটের মধ্যে বাক্যস্ফোটই মুখ্য। কারণ, উহাই ব্যক্যার্থের বোধক। বেদবাক্য-ব্যঙ্গ্য যে "বাক্যস্ফোট", তাহা নিত্য বলিয়া সেই স্ফোটরূপে বেদ নিত্য এবং সেই স্ফোটের সহিত অর্থের নিত্যসম্বন্ধ বশতঃ অর্থও নিত্য বলিয়া স্বীকার্য্য। নিত্য আকৃতি বা জাতিই শব্দার্থ। কিরূপে তাহার নিত্যত্ব সম্ভব হয়, এ বিষয়ে অনেক বিচার আছে। সংক্ষেপে সহজে তাহা বুঝান যায় না। উক্ত "স্ফোটবাদ"ও সুপ্রতিষ্ঠিত মত। বৈয়াকরণ সম্প্রদায় উহা সমর্থন করিতে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন।

কিন্তু মীমাংসক প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায় উহার প্রতিবাদ করিয়া বর্ণ হইতে ভিন্ন স্ফোট নামে কোন শব্দ নাই, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্ উপবর্ষ মুনিও বর্ণসমূহকেই শব্দ বলিয়াছেন। শারীরক ভাষ্যে (১।৩।২৮) আচার্য্য শঙ্কর কোন প্রসঙ্গে প্রথমে "স্ফোটবাদের ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিয়াছেন—"বর্ণা এব তু শব্দ" ইতি ভগবানুপবর্ষঃ।" পরে তিনি উপবর্ষের মতেরই সমর্থন পূর্ব্বক "স্ফোটবাদে" দোষপ্রদর্শন করিয়া উক্ত মতে তাঁহার অসম্মতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পাণিনিও স্ফোটবাদের উল্লেখ করেন নাই। উপবর্ষ পাণিনির গুরু ছিলেন, ইহা সত্য হইলে পাণিনিও যে তাঁহার নিকটে "স্ফোটবাদের" বিরুদ্ধবাদই শ্রবণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক, মূল কথা, স্ফোটবাদী পতঞ্জলির মতে মহাপ্রলয়ে নিত্য স্ফোটরূপ বেদের নাশ না হইলেও, সেই স্ফোটের ব্যঞ্জক যে বেদবাক্যের আনুপূর্ব্বী, তাহার সম্পূর্ণ বিনাশই হয়। কিন্তু পুনঃ সৃষ্টিতে পূর্ব্বকল্পসিদ্ধ জীবন্মুক্ত মহর্ষিগণ পুনর্ব্বার দেহবিশেষ ধারণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বকল্পে অধিগত সেই সমস্ত বেদার্থ স্মরণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ বেদবাক্য রচনা করিয়া উহার প্রচার করেন, ইহাই টীকাকার কৈয়টের কথানুসারে আমরা বুঝিতে পারি। "সুশ্রুতসংহিতার" সূত্রস্থানেও (৪০শ অঃ) দেখা যায়—"ঋষিবচনাচ্চ, ঋষিবচনং বেদঃ"। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও বেদকে ঋষিবাক্য বলিয়াছেন, ইহা অনেক স্থলে তাঁহার কথার দ্বারা বুঝা যায় (১)। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও আর্ষ জ্ঞানের লক্ষণ বলিতে স্পষ্ট বলিয়াছেন—"আম্নায়-বিধাতৃণামৃষীণাং"। "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর ভট্টও সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"আম্নায়স্য বেদস্য বিধাতারঃ কর্ত্তারো যে ঋষয়ঃ"। সুতরাং ঋষিগণ বেদের কর্ত্তা, বেদ ঋষিবাক্য, ইহা আধুনিক নূতন কথা নহে।

কিন্তু ঋষিগণই বেদের কর্ত্তা, ইহা বলিতে গেলে তাঁহারা কি নিজ বুদ্ধির দ্বারাই বেদার্থ বুঝিয়া বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন অথবা কাহারও উপদেশে বেদার্থ বুঝিয়া বেদবাক্য বা বেদের বর্ণানুপূর্ব্বী রচনা করিয়াছেন, ইহা বলিতে হইবে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত আর কেহই বহু বহু অলৌকিক অতীন্দ্রিয় অর্থের প্রতিপাদক বেদবাক্য রচনা করিতে পারেন না। সুতরাং যিনি বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন, তিনি যে সেই সমস্ত বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য অলৌকিক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের দ্রষ্টা, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা ত নিত্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বহুজন্মের সাধনার ফলে যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই সমস্ত সাধনাও ত বেদোপদিষ্ট। বেদের

(১) "যদ্যপ্যর্থো নিত্যঃ, যা ত্বসৌ বর্ণানুপূর্ব্বী সা অনিত্যা"—ইত্যাদি মহাভাষ্য। "মহাপ্রলয়াদিষু বর্ণানুপূর্ব্বীবিনাশে পুনরুৎপন্ন ঋষয়ঃ সংস্কারাতিশয়াদ্বেদার্থং স্মৃত্বা শব্দরচনাং বিদধতীত্যর্থঃ"। ততশ্চ কঠাদয়ো বেদানুপূর্ব্ব্যাঃ কর্ত্তার এব" ইত্যাদি কৈয়টটীকা।

(১) ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ৭ম, ৮ম ও ৩৯শ সূত্র এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষ সূত্র এবং চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের "প্রধানশব্দানুপপত্তেঃ" ইত্যাদি (৫৯ম) সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সাহায্য ব্যতীত কোন সাধনাই হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীতও সর্ব্বজ্ঞতা-লাভ হইতে পারে না। কিন্তু যিনি বেদবিৎ নহেন, যিনি সেই ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদক বেদের নিকটে প্রথমে কোন জন্মেই ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন নাই, তিনি কখনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। তাই শ্রুতি নিজেই বলিয়াছেন—"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং"। সুতরাং ঋষিগণ কিরূপে বেদ লাভ করিয়াছেন? বেদের প্রথম উপদেষ্টা আদিগুরু কে? ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে এবং তাহা বলিতে গেলেই সেই অনাদি সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বরকেই সকলের আদিগুরু বলিতে হইবে। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও তাহাই স্পষ্ট বলিয়াছেন "পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" (১।২৬) অর্থাৎ সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর ব্রহ্মাদিরও গুরু। কারণ, তিনি কোন কালবিশেষাবচ্ছিন্ন নহেন; তিনি অনাদি অনন্ত।

বস্তুতঃ শ্রুতিও বলিয়াছেন—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৮)। অর্থাৎ সেই মহেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া প্রথমে তাহাতে সর্ব্বলোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাকে মনের দ্বারাই সমস্ত বেদের উপদেশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেও কথিত হইয়াছে—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে।" সেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই প্রথমে বেদের প্রচার করায় তিনি আদিকবি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কূর্ম্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে—"বেদপ্রচারণার্থায় ব্রহ্মা জাতশ্চতুর্ম্মুখঃ।" কিরূপে সেই ব্রহ্মা হইতে প্রথমে বেদের উৎপত্তি ও ক্রমশঃ প্রচার হয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে কথিত হইয়াছে—

"তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্ব্বদনৈর্বিভুঃ।
সব্যাহৃতিকাংশ্চ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া॥ ৪৪॥
পুত্রানধ্যাপয়ৎ তাংস্ত ব্রহ্মর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্।
তে তু ধর্ম্মোপদেষ্টারঃ স্বপুত্রেভ্যঃ সমাদিশন্॥ ৪৫॥
তে পরম্পরয়া প্রাপ্তাস্তত্তচ্ছিষ্যৈর্ধৃতব্রতৈঃ।
চতুর্যুগেষথ ব্যস্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ॥ ৪৬॥
ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্ত্বান্ দুর্ম্মেধান্ বীক্ষ্য কালতঃ।
বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ॥ ৪৭॥
অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান্ লোকভাবনঃ।
ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্ম্মগুপ্তয়ে॥ ৪৮॥
পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগ বেদং চক্রে চতুর্ব্বিধং॥ ৪৯॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১২।৬।

উদ্ধৃত শ্লোকগুলির দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই পরমেশ্বর হইতে সমস্ত বেদ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তাঁহার মানস পুত্র ব্রহ্মর্ষিগণকে অধ্যাপনা করেন। পরে ধর্ম্মোপদেষ্টা সেই ব্রহ্মর্ষিগণ নিজ পুত্রগণকে সেই সমস্ত বেদের উপদেশ করেন। এইরূপে তাঁহাদিগের শিষ্যপ্রশিষ্যাদিপরম্পরার দ্বারা বেদের প্রচার হয় এবং ব্রহ্মর্ষিগণ হৃদয়স্থ পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বেদের বিভাগও করেন। পরে কালবিশেষে ধর্ম্মসংস্থাপন আবশ্যক হওয়ায় তখন লোকপালগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ নারায়ণ পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া বেদকে আবার চতুর্ভাগে বিভক্ত করেন। পরে কথিত হইয়াছে যে, সেই পরাশরনন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রথমে তাঁহার শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদসংহিতা এবং বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদসংহিতা এবং জৈমিনিকে সামবেদসংহিতা এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদসংহিতা দান করেন। পরে সেই পৈল প্রভৃতি শিষ্যচতুষ্টয় অন্যান্য শিষ্যকে ঐ সমস্ত সংহিতার অধ্যাপনা করেন। এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহাদিগের শিষ্যপ্রশিষ্যাদিপরম্পরা বেদের প্রচার করেন। বিষ্ণুপুরাণেও ঐ সমস্ত বার্ত্তা বর্ণিত হইয়াছে। মুণ্ডক উপনিষদের প্রারম্ভেও প্রথমে ব্রহ্মা হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তক সম্প্রদায়ের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে ইহাই বুঝা যায় যে, মহাপ্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টিতে নিত্য সর্ব্বজ্ঞ জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকেই সমগ্র বেদের উপদেশ করেন। পরে সেই ব্রহ্মা হইতেই ক্রমশঃ বেদের প্রচার হয়। সেই ব্রহ্মার নামই হিরণ্যগর্ভ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেও (২২১ সূক্তে) প্রথমে কথিত হইয়াছে—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাত পতিরেক আসীৎ।"

"লঘুভাগবতামৃত" গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীস্বরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, "হিরণ্যগর্ভ" ও "বৈরাজ" নামে ব্রহ্মা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে থাকিয়াই ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। "বৈরাজ" ব্রহ্মাই প্রায়শঃ পরমেশ্বরের আদেশে প্রজা সৃষ্টি ও বেদ প্রচার করেন। কোন কোন মহাকল্পে পরমেশ্বর ভগবান্ মহাবিষ্ণু নিজেই ব্রহ্মা হইয়া ঐ সমস্ত সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। অতএব যেমন বহুকল্পে পূর্ব্বকল্পসিদ্ধ অনেক মহর্ষি ব্রহ্মার পদপ্রাপ্ত ব্রহ্মা, তদ্রূপ কোন কোন কল্পে, স্বয়ং পরমেশ্বরই ব্রহ্মা। পরমেশ্বর নিজেই ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্ট্যাদি করেন, এ বিষয়ে বহু শাস্ত্রবাক্য আছে। পূর্ব্বকল্পসিদ্ধ অনেক মহর্ষি ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন, এ বিষয়েও শাস্ত্রবাক্য আছে। শ্রীরূপ গোস্বামী উক্তরূপে দ্বিবিধ শাস্ত্রবাক্যের সমন্বয় করিয়াছেন এবং সেখানে

উক্ত বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পদ্মপুরাণের বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন। (১)

কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তা ঈশ্বরগণের মধ্যে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বকল্পে তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের মধ্যে প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত না হওয়ায় যাঁহাদিগের নির্ব্বাণমুক্তি হয় না, তাঁহারা অনেকে পরকল্পে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি ঈশ্বরপদ লাভ করিয়া তাঁহারই আদেশে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় সমস্ত সৃষ্টি করেন। মহাপ্রলয়কালে পূর্ব্বকল্পীয় সমস্ত ব্যবহারের উচ্ছেদ হইলেও পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহাদিগের পূর্ব্বকল্পীয় সমস্ত ব্যবহারের স্মরণ হওয়ায় পরকল্পে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বকল্পের ন্যায়ই সমস্ত সৃষ্টি করিতে পারেন। তাই শারীরক ভাষ্যে (১।৩।৩০) আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—"সত্যপি সর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদিনি মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরানুগ্রহাদীশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং কল্পান্তর-ব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তেঃ।" সেই সমস্ত পূর্ব্বকল্পপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণ পরকল্পের প্রথমে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যে সমস্ত অধিকারে নিযুক্ত হন, সেই সমস্ত অধিকার পর্য্যন্ত তাঁহারা সেইরূপেই অবস্থিতি করেন। পরে সেই অধিকারের অবসান হইলেই তাঁহাদিগের সমস্ত প্রারব্ধকর্ম্মফলভোগ সমাপ্ত হওয়ায় তাঁহাদিগের নির্ব্বাণমুক্তি হয়। বেদান্তদর্শনে ঐ সমস্ত পূর্ব্বকল্পসিদ্ধ এবং পরমেশ্বর কর্ত্তৃক কোন অধিকারে নিযুক্ত মহাপুরুষগণই "আধিকারিক" পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছেন (২)। আচার্য্য শঙ্করের মতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বেদপ্রবর্ত্তনাদি কার্য্যে নিযুক্ত "আধিকারিক" পুরুষ। পূর্ব্বকল্পসিদ্ধ অপান্তরতমা নামে কোন বেদাচার্য্য পুরাণ ঋষিই কলি ও দ্বাপরের সন্ধিতে মহাবিষ্ণুর আদেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইয়াছিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে নারায়ণের অবতারবিশেষ, ইহাই পুরাণে কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত শেষ শ্লোকেও তাহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়েও অবতার-বর্ণনায় কথিত হইয়াছে—"ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ" ।২১। কালবিশেষে দ্বিজগণকে অল্পমেধা ও অল্পশক্তি দেখিয়া ভগবান্ নারায়ণ পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া বেদরূপ তরুর বহু শাখা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহাই উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামীও "লঘুভাগবতামৃত" গ্রন্থে অবতার-বর্ণনায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের অবতারত্ব সমর্থন করিতে প্রথমে শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবশ্য অবতার অনেক প্রকার। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিরূপ অবতার, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তিনি অংশাবতার। কেহ কেহ বলেন, তিনি নারায়ণের অংশের অংশ কলাবতার। কেহ কেহ বলেন, তিনি সনকাদির ন্যায় নারায়ণের আবেশ অবতার। "লঘুভাগবতামৃত" গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামীও উক্ত বিষয়ে মতান্তর প্রকাশ করিতে পরে বলিয়াছেন—

> "শ্রূয়তেঽপান্তরতমা দ্বৈপায়নত্বমগাদিতি।
> কিংসাযুজ্যং গতঃ সোঽত্র বিষ্ণ্বংশঃ সোঽপি বা ভবেৎ।
> তস্মাদাবেশ এবায়মিতি কেচিদ্বদন্তি চ"।

এখন যদি সেই অপান্তরতমা নামে সিদ্ধ মহর্ষিকে নারায়ণের আবেশ অবতারই বলা যায়, তাহা হইলে বস্তুতঃ পরমেশ্বরই সেই কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের শরীরে আবিষ্ট হইয়া পরে আবার বেদ বিভাগ করিয়াছেন। পরন্তু সর্ব্বজীবের হৃদয়স্থ সেই পরমেশ্বরই অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বকার্য্যের প্রেরক, ইহা সিদ্ধান্ত থাকিলেও শ্রীমদ্‌ভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত ৪৭শ শ্লোকে বিশেষ করিয়া "হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ"—এই বিশেষণ পদের প্রয়োগ হইয়াছে কেন? ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক। টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী উক্ত স্থলে ঐ বিশেষণ প্রয়োগের কারণ ব্যক্ত করিতে লিখিয়াছেন,—"তর্হি পুরুষবুদ্ধিপ্রভবত্বাদনাদরণীয়ত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ হৃদিস্থেতি।" অর্থাৎ পূর্ব্বতন ব্রহ্মর্ষিগণ নিজ বুদ্ধির দ্বারা বেদের বিভাগ করেন নাই, তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ পরমেশ্বরই ঐ কার্য্যে প্রেরক। তাহা হইলে পরমেশ্বর যে তখন তাঁহাদিগের শরীরে অবিষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাও অবশ্য বলিতে পারি। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারাও তাঁহারও উক্তরূপ মত বুঝা যায়। "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও

---

(১) তথাচ পাদ্মে—

> "ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ।
> ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥"—

লঘুভাগবতামৃত।

(২) "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাং।" বেদান্তদর্শন ৩।৩।৩২ সূত্র। "তেষামপান্তরতমঃপ্রভৃতীনাং বেদপ্রবর্ত্তনাদিষু লোকস্থিতিহেতুষ্বধিকারেষু নিযুক্তানামধিকারতন্ত্রত্বাৎ স্থিতেঃ"। "যথাচ বর্ত্তমানা ব্রহ্মবিদ আরব্ধভোগক্ষয়ে কৈবল্যমনুভবন্তি, "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সংপৎস্য" ইতি (ছান্দোগ্য) শ্রুতেঃ, এবমপান্তরতমঃপ্রভৃতয়োঽপীশ্বরাঃ পরমেশ্বরেণ তেষু তেষ্বধিকারেষু নিযুক্তাঃ সন্তঃ সত্যপি সম্যগ্‌দর্শনে কৈবল্যহেতাবক্ষীণকর্ম্মাণো যাবদধিকারমবতিষ্ঠন্তে"—ইত্যাদি শারীরক ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পরমেশ্বরের অনেক ব্যক্তিতে ভূতাবেশের ন্যায় আবেশ হয়, ইহা বলিয়াছেন। কিরূপে তাঁহার আবেশ হয় এবং আবেশ অবতার কিরূপ ও কত প্রকার, এ বিষয়ে বহু বক্তব্য ও মতভেদ আছে। সে সকল কথা বলিবার এখন সময় নাই।

মূল কথা, ব্রহ্মা হইতে অনেক ঋষি পর্য্যন্ত বেদার্থের দ্রষ্টা, স্মর্ত্তা ও বেদবাক্যের বক্তা। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি অনেকে সেই সমস্ত ঋষিগণকে গ্রহণ করিয়া বেদকে ঋষিবাক্য বলিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের আপ্তত্ব সমর্থন করিয়াই বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, পরে যাঁহারা বেদের বক্তা প্রচারক, তাঁহারা আপ্তপুরুষ না হইলেও তাঁহাদিগের উচ্চারিত বেদবাক্য আপ্তবাক্য হয় না। শব্দের অনিত্যত্বমতের সমর্থক বাৎস্যায়ন প্রভৃতির মতে উচ্চারণভেদে শব্দ ও বাক্যের ভেদবশতঃও ঋষিগণের উচ্চারিত বেদবাক্য ঋষিবাক্য, এবং সেই সমস্ত ঋষি সেই সমস্ত বেদবাক্যের বক্তা বলিয়া কর্ত্তা। কিন্তু যিনি বেদের আদি বক্তা, তিনিই বেদের আদিকর্ত্তা। কারণ, যিনি প্রথমে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার দেহাদি সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকেই প্রথমে সমস্ত বেদের উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহা হইতেই প্রথম বেদোৎপত্তি হইয়াছে, এবং তিনিই ব্রহ্মাদিরও গুরু। আর তিনিই ত চরাচর বিশ্বের পিতা, মাতা ও পিতামহ। তাই তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ" (গীতা—৯।১৭)। আর তিনি সেই সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারও পিতা। তাই তিনি প্রপিতামহ বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। তাই অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ" (১১।৩৯)। সুতরাং যিনি ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা, অর্জ্জুন যাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে" (১১।৩৭), তিনিই যে বেদেরও আদিকর্ত্তা, এ বিষয়ে সন্দেহ কি আছে?

সেই পরমেশ্বর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। সুতরাং ব্রহ্মাও অসংখ্য এবং তাঁহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ঈশ্বর। আর সেই পরমেশ্বর সেই সমস্ত ঈশ্বরেরও ঈশ্বর বলিয়া তিনি মহেশ্বর এবং তিনি সেই সমস্ত ব্রহ্মা ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেরই পতি বলিয়া তিনি সমস্ত পতির পরমপতি এবং সমস্ত দেবতার পরমদেবতা এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি ও সকলভুবনপতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাই শ্রুতি তাঁহাকে বুঝিয়া বলিয়াছেন—

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।"—শ্বেতাশ্বতর উপ ৬।৭।

সেই মহেশ্বর অনাদিকাল হইতে যে অসংখ্য চতুরানন ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাপ্রলয়ে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার আদিও নাই, অবসানও নাই। তাই ভক্ত কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—

"কত চতুরানন, মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত সাগরলহরসমানা"।

সেই মহেশ্বরের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে বেদকেই আশ্রয় করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার কৃপা ব্যতীত বেদ কি এবং বেদার্থ কি, তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং বেদের স্বরূপ ও বেদার্থ বুঝিতে হইলে সেই মহেশ্বরের নিকটেই প্রশ্ন করিতে হইবে। অর্জ্জুনের ন্যায় তাঁহাকেই বলিতে হইবে—

"ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াং" (গীতা ৩।২)

কিন্তু আমরা ত তাঁহার নিকটে প্রশ্ন করিতে পারি না। তাই আমরা নানামতভেদের গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারিয়া নানারূপ তর্ক করি। কিন্তু সেই মহেশ্বরের শরণাপন্ন না হইলেও তিনি বলিলেও তাঁহার তত্ত্ব বুঝা যায় না। বহু জন্মের বহু সাধনা ব্যতীতও তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া যায় না। যিনি বহু সাধনার ফলে প্রকৃত মুমুক্ষু হইয়াছেন, তিনি তাঁহারই উপদেশ বুঝিয়া বলেন—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্ম-বুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।"—শ্বেতাশ্বতর উপ ৬।১৮।

আর কি বলিব। মনে রাখিও, শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহং।" আর বলিয়াছেন—"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং" (গীতা ১৮।৬২)। পরে আবার বলিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু" (১৮।৬৫)। কিন্তু আমরা ত তাঁহাকে নমস্কার করিতেও পারি না। তথাপি বলি, হে করুণাময়! তোমাকে নমস্কার, হে বিশ্বরূপ!

বায়ুর্যমোঽগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।
গীতা ১১।৩৯।৪০।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিভিন্ন দৃশ্য
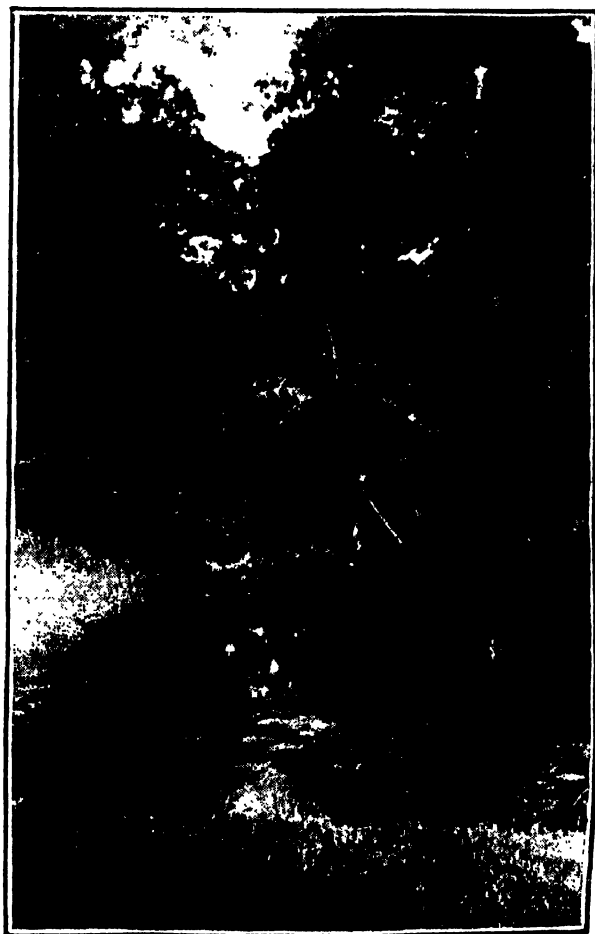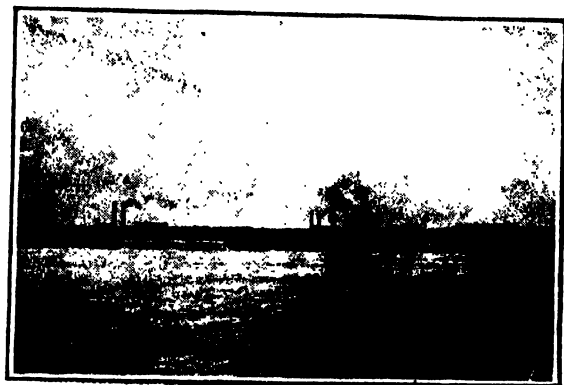
[শ্রীমান্ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় উদ্যমে গৃহীত ফটো-চিত্র হইতে

রহস্যের খাসমহল

সপ্তবিংশ প্রবাহ

ধূসর শকটের পুনরাবির্ভাব

দুই এক দিন করিয়া ক্রমশঃ তিন সপ্তাহ অতীত হইল। খৃষ্টের জন্মোৎসবও শেষ হইল। যোয়ান তখন দেশান্তরে নিরাপদ্। আমি তাহার কয়খানি পত্রও পাইলাম বটে, কিন্তু পুলিস সমান উৎসাহে কুপের বাড়ী পাহারা দিতে লাগিল। তাহারা রহস্যভেদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না। কুপ কোথায়, কে জানে?

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমাংশে কুপের কোন সন্ধান হইল না, যেন পৃথিবী মুখব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল! থরল্ড নামক যে ভদ্রলোকটি কেনিসে বাস করিতেছিল, পুলিস তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইল না। মিঃ ডেনম্যানের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আমার দেখা হইত, তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, এরূপ রহস্যপূর্ণ তদন্তের ভার পাইয়াও দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আসামীর অপরাধ সপ্রমাণ করিতে পারিলেন না! এরূপ লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার কদাচিৎ পাওয়া যায়; রহস্য ভেদ করিতে পারিলে তাঁহার শ্রম সফল হইত; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল।

আমার সন্দেহ হইল, যোয়ান তাহার পিতাকে কোন কৌশলে সতর্ক করিয়াছিল। আমি তাহার প্রকৃত মনের ভাব কোন দিন বুঝিতে পারিলাম না। তাহার প্রকৃতি রহস্যাবৃত। জিলরয় তাহার শত্রুতা-সাধন করিতেছিল, মিসেস্ ম্যাক্সওয়েল পুলিসের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল, তাহারা উভয়েই তাহাকে পুলিসের হস্তে অর্পণের চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা তাহার পিতার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু আমার ধারণা হইল, পুলিস যাহাতে তাহার পিতাকে গ্রেপ্তার করিতে না পারে, সে তাহারই ব্যবস্থা করিতেছিল; কুপকে বাঁচাইবার জন্য সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

সে আমাকে আন্তরিক ভালবাসিত, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম; আমি তাহার প্রণয়ে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি কুপকে গ্রেপ্তার করিয়া নগরবাসিগণকে নিরাপদ্ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। আমি জানিতাম, ইহাই যোয়ানের সহিত আমার মিলনের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়; কিন্তু এই বিঘ্ন অপসারিত করা আমার অসাধ্য। পিশাচের কবল হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করাই আমার প্রথম কর্ত্তব্য।

এই সময় বালিকা যেসির কথা মধ্যে মধ্যে আমার স্মরণ হইত; সে হয় ত এখনও সরলতার ভাণ করিয়া কুপের জন্য শিকার সংগ্রহ করে। কিন্তু আমি তাহার সম্বন্ধে আর কোন কথা জানিতে পারিলাম না।

ইব্রাহিমই বা কোথায়? ডেনম্যান আমাকে বলিয়াছিলেন, এসবরটনের পুলিস লণ্ডন হইতে আদেশ পাইয়া নিউটন এবট্ রোডের হাঁসপাতালে ইব্রাহিমের সন্ধান লইতে গিয়াছিল; কিন্তু পুলিস সেখানে উপস্থিত হইবার ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে ইব্রাহিম হাঁসপাতাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সর্ব্বপ্রথমে যে ট্রেণ পাইয়াছিল, সেই ট্রেণেই স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিল। কার্ল কুপের ন্যায় তাহাকেও আর হাতে পাইবার উপায় নাই। আমি গোপনে ইহাদের সকলেরই অনুসন্ধানে

প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু কে কোথায় আছে, তাহা জানিতে পারিলাম না।

প্রথমে নিহত যুবক এডুইনের ভগিনী মিস্ বার্লোর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল। সে কোথায় আছে, জানিবার জন্য এক দিন অপরাহ্ণে ডেভেরিও স্কোয়ারের কোণের সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত জার্ম্মাণ যুবককে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

জার্ম্মাণটা বলিল, "আমি মিস্ বার্লোর সংবাদ জানি না, তাহার কথাও অনেক দিন শুনিতে পাই নাই; তবে আমি বার্ণেসকে ডাকিয়া আনিতে পারি, সে হয় ত আপনাকে মিস্ বার্লোর সংবাদ বলিতে পারিবে।"

আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বার্ণেসের জন্য ভোজন-কক্ষে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুকাল পরে সোফেয়ার বার্ণেস সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে মিস্ বার্লোর কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমি মিস্ বার্লোকে অনেক দিন দেখিতে পাই নাই। তাহার সম্বন্ধে কোন কথাও কাহারও নিকট শুনি নাই, মিস্ রোজের এখন কোন 'গবর্ণেস্ নাই'।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তাহার ইষ্টবোর্ণে যাইবার পূর্ব্বে ত এক জন 'গবর্ণেস' ছিল। তুমি এখানে কত দিন আছ?"

বার্ণেস বলিল, "আমি এখানে প্রায় চারি মাস আছি।"

আমি বলিলাম, "তুমি যখন মিঃ থরন্ডের সোফেয়ার, তখন তুমি নিশ্চিতই তাঁহার সেই ধূসরবর্ণের গাড়ী চালাইয়াছ; তাঁহাকে লইয়া তুমি ত তাঁহার সেই গাড়ীই চালাইতে? এক দিন তুমি ক্রেডেনহিলের এক বাড়ীতে গিয়াছিলে, এ কথা আমার স্মরণ আছে।"

আমি অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলাম। আমি এই সোফেয়ারকে পূর্ব্বে কোন দিন দেখি নাই; বার্ণেসই ক্রেডেনহিলের সেই বাড়ীতে গাড়ী লইয়া গিয়াছিল কি না, তাহাও জানিতাম না।

সোফেয়ার বলিল, "হয় ত সেখানে গিয়াছিলাম, কিন্তু সে কথা আমার স্মরণ নাই, মহাশয়!"

আমি বলিলাম, "তবে তুমি মিস্ বার্লো সম্বন্ধে কোন কথা জান না? বৈঠকখানার পরিচারিকা স্মিথের সন্ধান জান কি?"

সোফেয়ার বলিল, "আমি মিঃ থরন্ডের চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া একটিমাত্র পরিচারিকাকে দেখিয়াছি, কিন্তু সে গ্লচেষ্টারে তাহার বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। তাহার নাম জোল্যাণ্ড।"

অতঃপর আমি তাহাদের উভয়কেই লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "তোমরা বলিয়াছিলে, তোমাদের মনিব মিঃ থরন্ড কেনিসের হোটলে বাস করিতেছেন; কিন্তু তিনি সেই হোটেলে নাই, এবং সেখানে কোন দিন ছিলেন না, এ কথা শুনিয়া তোমরা কি আশ্চর্য্য বোধ করিবে না?"

জার্ম্মাণ ভৃত্য ক্লীন মাথা নাড়িয়া অবিশ্বাসভরে বলিল, "ও কথা সত্য নহে। মহাশয়, আমি তাঁহার চিঠিপত্র সপ্তাহে তিন দিন তাঁহার ঐ ঠিকানাতেই পাঠাই, আর আপনি বলিতেছেন, সেখানে তাঁহার সন্ধান নাই! এ কি কথার মত কথা?"

আমি বলিলাম, "তুমি সেই হোটেলের ঠিকানায় রাশি রাশি চিঠি পাঠাইতে পার; কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কোন চিঠিপত্র পাইয়াছ কি?"

ক্লীন বলিল, "তাঁহার চিঠি পাই নাই, ইহা কিরূপে জানিলেন? আজ সকালেই ত তাঁহার একখানা পত্র পাইয়াছি।"—সে পকেটে হাত পুরিয়া একখানি লেফাপা বাহির করিল।

আমি লেফাপাখানি দেখিয়া আগ্রহভরে বলিলাম, "আমার হাতে দিতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

ক্লীন প্রচণ্ডবেগে মস্তক আন্দোলিত করিয়া লেফাপাখানি আমার হাতে দিল। আমি তাহা হাতে লইয়াই ডাকের মোহরটি পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু লেফাপার উপর ডাকের যে মোহর অঙ্কিত দেখিলাম, তাহা কেনিসের ডাকঘরের মোহর নহে, এডিগ্‌নেনের ডাকঘরের মোহর! লেফাপার ভিতর হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া পাঠ করিলাম। সংক্ষিপ্ত পত্র। ক্লীনের বেতনের জন্য যে ফরাসী ব্যাঙ্কনোট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারই উল্লেখ ভিন্ন পত্রে অন্য কোন কথা লেখা ছিল না।

এডিগ্‌নেন্! এই ক্ষুদ্র প্রাচীন নগর আমার অপরিচিত নহে। অন্যান্য বহু প্রাচীন নগরের ন্যায় এই নগরটিও প্রাচীরবেষ্টিত। এডিগ্‌নেনের প্রধান হোটেলের নাম 'ইয়রোপ', সেকেলে ধরণের হোটেল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি নিউস্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া ডেনম্যানের আফিসে প্রবেশ করিলাম। আমার নিকট সকল কথা শুনিয়া তিনি মিঃ থরল্ডের সন্ধান লইবার জন্য এডিগ্‌ননের পুলিসের অধ্যক্ষকে টেলিগ্রাম করিলেন। টেলিগ্রামখানি তিনি ফরাসী ভাষায় লিখিলেন।

অতঃপর আমি বাসায় ফিরিলাম। রাত্রি ১০টার সময় আমার টেলিফোনের ঝনঝনি শুনিয়া টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া সাড়া দিলাম। ডেনম্যান বলিলেন, "মিঃ কোলফাক্স, আমি আমার টেলিগ্রামের উত্তর পাইয়াছি। এডিগ্‌ননের 'ইয়ুরোপ' হোটেলে গত তিন দিন হইতে একটি লোক বাস করিতেছিল, কুপের চেহারার সহিত তাহার চেহারার সামঞ্জস্য আছে। লোকটা মোটর-গাড়ীতে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কাল সকালে সে সেই হোটেল হইতে প্রস্থান করিয়াছে। একটা কৃষ্ণকায় অনুচর তাহার সঙ্গে ছিল।"

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "সেই কালা আদমীটা তাহার নিউবিয়ান ভৃত্য ইব্রাহিম। যাহা হউক, প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারা গিয়াছে। কুপ ও থরল্ড একই লোক!"

ডেনম্যান বলিলেন, "আপনার এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু অসুবিধা এই যে, যদি তাহারা ঐ ভাবে মোটর-কারে য়ুরোপের সকল দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। আজই আমরা ফ্রান্স, ইটালী ও জার্ম্মাণীর পুলিসের নিকট তাহাদের হুলিয়া পাঠাইতেছি। কিন্তু তাহাদের 'ফটো' পাঠাইতে না পারিলে কেবল চেহারার বর্ণনা দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের আশা নাই। বিশেষতঃ ফরাসী পুলিস কেবল সন্দেহের বশে কোন বিদেশীকে গ্রেপ্তার করিতে সম্মত হইবে না—এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি।"

ক্রেডেন হলে আমি কুপের ফটো দেখিয়াছিলাম, এ কথা আমার স্মরণ হইল। আমি টেলিফোনের 'রিসিভার' কাণের কাছে ধরিয়া বলিলাম, "সকল কথা ত শুনিলেন, এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

ডেনম্যান বলিলেন, "আমার অভিমত?—আমি এখনও নিরাশ হই নাই, মিঃ কোলফাক্স! আপনার বান্ধবী—এ—এ—মিস্ কুপার এখন কোথায়? আপনি তাহার সন্ধান জানেন কি?"

ডেনম্যানের প্রশ্ন শুনিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুলিস য়োয়ানকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, এ সংবাদ কি তিনি জানিতেন না? মিসেস্ ম্যাক্সওয়েল তাহার বিরুদ্ধে যে ভীষণ অভিযোগ করিয়াছিল, তাহাও কি ডেনম্যানের অজ্ঞাত?

সত্য কথা বলিলে কি তাহার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই? আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম, অবশেষে অতিকষ্টে বলিয়া ফেলিলাম, "সে এখন কোথায় আছে, তাহা আমার—এ—এ—অজ্ঞাত। মাসখানেক পূর্ব্বে সে দেশান্তরে গিয়াছে—এ সংবাদ আমার জানা আছে বটে।"

ডেনম্যান ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "দেশান্তরে গিয়াছে! সে আপনাকে কোন চিঠিপত্র লিখে নাই কি?"

কি বিপদ! এবার খাঁটী মিথ্যা কথা বলিতে হইল। পুলিসের জেরায় মিথ্যা কথা না বলিয়া উপায় কি? নীতিবিদ্‌রা যাহাই বলুন, মিথ্যাকে কখন কখন রক্ষাকবচরূপে ব্যবহার না করিলে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। আমিও দায়ে পড়িয়া বলিলাম, "হাঁ, প্যারিস হইতে একবার তাহার একখান পত্র পাইয়াছিলাম।"

ডেনম্যান আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে সে তাহার বাপের সঙ্গে জুটিয়া পড়িয়াছে! কিন্তু এ বিষয়ে আমাদিগকে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে; কাল কখন্ আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হইতে পারে, মিঃ কোলফাক্স?"

আমি বলিলাম, "কাল বেলা ১১টার সময় দেখা করিবার অসুবিধা হইবে না; আপনি আমার বাসায় আসিবেন?"

"হাঁ, আমিই যাইব।" বলিয়া তিনি কল ছাড়িয়া দিলেন।

তিনি এডিগ্‌ননে টেলিগ্রাম করিয়া আশানুরূপ ফল না পাইলেও একটি বিষয় নিঃসন্দেহে জানিতে পারা গিয়াছিল। থরল্ডই যে কার্ল কুপ, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাহার কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গী যে তাহার বিশ্বস্ত অনুচর ইব্রাহিম—ইহাও বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছিল। আমি আরও বুঝিতে পারিলাম, পুলিসের হাতে ধরা পড়িবার ভয়েই তাহারা মোটরে চাপিয়া ওভাবে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কুপ বোর্ণমাউথ পরিত্যাগের পর প্রাণভয়ে দূরে পলায়ন করিয়াছিল, ইহা বোধ হয়, তাহারও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। সে কখন সাধু পুরুষ, কখন নরহন্তা পিশাচ, একাধারে তাহার দুই প্রকার প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। আমি না দেখিলে তাহার চরিত্রের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। ইব্রাহিমও ইহা জানিত, এবং সুযোগ বুঝিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিত।

যোয়ান লণ্ডন ত্যাগ করিলে আমার স্মরণ হইল, তাহার নিকট অধিক টাকা নাই। এই জন্য আমি টেলিগ্রাফের সাহায্যে ক্রিষ্টিয়ানায় তাহাকে কিছু টাকা পাঠাইয়াছিলাম। সে টাকাগুলি পাইয়া পত্রযোগে আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল। পত্রখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও সেই পত্র পাঠে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, 'গ্র্যাণ্ড' হোটেলে বাস করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহা অত্যন্ত নির্জ্জন ও বৈচিত্র্যহীন মনে করিতেছিল। এই জন্য সে ক্রিষ্টিয়ানা হইতে ষ্টকহলমে গিয়াছিল; কিন্তু সেখানেও শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া সে ফিন্‌ল্যাণ্ডের কয়েকটি নগর পরিভ্রমণ করিতেছিল। আমি হেল্‌সিংফরস্‌ হইতে তাহার কয়েকখানি পত্র পাইয়াছিলাম। তাহার পর সেণ্টপিটার্সবর্গের 'রেজিনা' হোটেল হইতে তাহার এক পত্র পাই। সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে সে কোপেনহেগেনে যাত্রা করিয়াছিল এবং সেখানে 'এংলিটেরা' হোটেলে বাস-কালে আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিল। সেই পত্র লিখিবার কিছু দিন পরে সে আমাকে বার্লিনের 'এস্‌প্লেনেড্‌' হোটেল হইতে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহাই তাহার শেষ পত্র। সে কোন স্থানে অধিক দিন বাস না করিয়া অস্থিরভাবে বিভিন্ন দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এই সকল বহু দূরবর্ত্তী বিদেশে সে একাকী ভ্রমণ করিতেছিল—ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। তবে কি তাহার পিতা তাহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল ?

পরদিন মধ্যাহ্নকালে ডেনম্যান আমার বাসায় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া যোয়ানের গতিবিধি সম্বন্ধে আমাকে নানা ভাবে জেরা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রশ্নবর্ষণে আমি বিব্রত হইয়া উঠিলাম,—অবশেষে বলিলাম,"দেখুন ডেনম্যান, পুলিস তাহার সন্ধান জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এ সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে। এ কথা আপনি পূর্ব্বেই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন তাহা স্মরণ হইতেছে। সুতরাং আপনি তাহার ঠিকানা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমি বিস্মিত হই নাই; কিন্তু আপনার মতলবটি কি, তাহা আমাকে দয়া করিয়া বলিবেন কি ?"

ডেনম্যান আমার মুখের উপর কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, "আমার মতলব ? আমার মতলব শুনিয়া আপনি সুখী হইতে পারিবেন ? আমার মতলব—পিতা ও পুত্রীকে একসঙ্গে গ্রেপ্তার করিব। কাল রাত্রিতে আমরা হামবার্গ হইতে সংবাদ পাইয়াছি, তাহারা পিতাপুত্রী দু'জনে হামবার্গের প্যালেস হোটেলে বাস করিতেছে, এবং সেই নিউবিয়ান চাকরটা তাহাদের সঙ্গে আছে।"

আমারও সন্দেহ হইয়াছিল, কুপ প্রবাসে তাহার কন্যার সহিত যোগদান করিয়াছে। ডেনম্যানের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমার সন্দেহ অমূলক নহে। কিন্তু এই সংবাদে আমি খুসী হইতে পারিলাম না। কুপের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, সে যোয়ানের পিতা, কন্যার নিকট পিতার সহস্র অপরাধও মার্জ্জনীয়; কিন্তু ইব্রাহিম আমার প্রতি কিরূপ পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছিল—তাহা সে জানিত, ইব্রাহিমকে সে আন্তরিক ঘৃণা করিত। যোয়ান তাহার সহিত এক হোটেলে বাস করিতেছে! তাহার মুখদর্শন করিতে সে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না! নারী-হৃদয়ের রহস্য ভেদ করা কি কঠিন!

আমি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ডেনম্যানকে বলিলাম, "তাহাদের সন্ধান ত পাইয়াছেন, এখন কি করিবেন স্থির করিয়াছেন ?"

"ডেনম্যান হাসিয়া বলিলেন, "এখন তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। গ্রেপ্তারের পর বিচার, তাহাদের বিচার দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম, আন্দোলন, আলোচনা, উদ্দীপনা; তাহার পর জজের রায়, কঠোর দণ্ডের আদেশ. পর পর যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিবে।"

আমি উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলাম, "তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছেন ?"

ডেনম্যান বলিলেন, হাঁ, কাল রাত্রিতেই তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য টেলিগ্রাম গিয়াছে, সুতরাং আশা করি, আজ এখন তাহারা জার্ম্মাণ পুলিসের হেফাজতে আছে। আশা

করি, দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই টেলিগ্রামে সকল সংবাদ জানিতে পারিব।"

আমি তাঁহার কথায় মর্ম্মাহত হইয়া বলিলাম, "আপনি অসঙ্কোচে—অকুণ্ঠিতচিত্তে এই সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ করিলেন; যোয়ানকে আমি কিরূপ ভালবাসি, তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে, আপনার কথা শুনিয়া আমি হৃদয়ে কিরূপ আঘাত পাইব, ইহা জানিয়াও কথাগুলি আমাকে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন না?"

ডেনম্যান বলিলেন, "হাঁ, আমি জানি, আপনি সেই যুবতীর প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু আপনারও জানা উচিত, কর্ত্তব্য যতই কঠিন হউক, তাহা পালন করিতে আমি কুণ্ঠিত নহি। প্রয়োজন হইলে আমি আপনাকেও গ্রেপ্তার করিতে প্রস্তুত। কর্ত্তব্যের নিকট আমার ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন কেহই কেহ নহে।"

আমি নীরস-স্বরে বলিলাম, "কর্ত্তব্য! জানিতাম না, নিরপরাধকে গ্রেপ্তার করাও আপনার কর্ত্তব্যের একটা অঙ্গ! যোয়ান নিরপরাধ; বিশেষতঃ সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল।"

ডেনম্যান আমার কথা শুনিয়া কঠোর-স্বরে বলিলেন, "সে আপনার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, এ কথা সত্য হইতেও পারে, কিন্তু সে আর এক জনের প্রাণবধ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই অভিযোগ সত্য। আপনার প্রণয়িনী বলিয়া এই অভিযোগের বিচার হইবে না? আপনার এই আব্দার কি সমর্থনযোগ্য?"

তাঁহার এই বিদ্রূপে আমি অন্তরে আঘাত পাইয়া বলিলাম, "তাহার বিরুদ্ধে ঐরূপ অভিযোগ হইয়াছে, ইহা আমার অজ্ঞাত নহে; কিন্তু এই অভিযোগ মিথ্যা; সে নরহত্যা করে নাই, এ কথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। তাহার পিতার অপরাধের গুরুত্বের বিষয় চিন্তা করিয়া জনসমাজের কল্যাণের জন্য আমি তাহার গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিয়াছিলাম, আপনাকে সাহায্য করিতেও ত্রুটি করি নাই। আমার সাহায্যেই আপনি এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন; এ অবস্থায় আমাকে মর্ম্মাহত করা পুলিসের যোগ্য কায হইলেও বন্ধুর কার্য্য নহে।"

ডেনম্যান বলিলেন, "মিস কুপারের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সত্য কি না, তাহা বিচারালয়ে সপ্রমাণ হওয়া প্রয়োজন, সুতরাং ন্যায়ের অনুরোধে আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য।"

এই কথা বলিয়া তিনি আমার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। আমার মন উৎকণ্ঠায় ও আতঙ্কে পূর্ণ হইল। পূর্ব্বদিন আমি হামবার্গ হইতে আমার প্রিয়তমার পত্র পাইয়াছিলাম; কিন্তু সেই পত্রে সে তাহার পিতার প্রসঙ্গে কোন কথা আমার গোচর করে নাই। আমি পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলাম বটে, কুপ মোটরে চাপিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অবশেষে সে তাহার কন্যার স্কন্ধে ভর করিয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু যোয়ান কি স্বেচ্ছায় তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিল, না ইহা কুপেরই কারসাজি? ডেনম্যান পূর্ব্ব হইতেই কুপের উপর য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের পুলিসের দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু যোয়ানও যে পুলিসের হাতে পড়িবে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

আমি অনেক চিন্তার পর সেই দিন বেলা পাঁচটার সময় হামবার্গে প্যালেস হোটেলের ম্যানেজারকে টেলিগ্রামে জানাইলাম, মিস্ বেকেট তাঁহার হোটেলে আছে কি না, অবিলম্বে জানিতে চাই।

রাত্রি ১০টার সময় আমি ক্লাবের ধূমপানের কক্ষে বসিয়া নানা কথা চিন্তা করিতেছিলাম, সেই সময় ডেভিস আমাকে টেলিফোন করিয়া জানাইল, আমার নামে একখানি টেলিগ্রাম আসিয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ বাসায় না ফিরিয়া তাহাকে বলিলাম, "টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখ।"

ক্ষণকাল পরে ডেভিস্ বলিল, "টেলিগ্রামে লেখা আছে, মিস বেকেট হোটেল হইতে প্রস্থান করিয়াছে—প্যালেস, হামবার্গ।"

টেলিগ্রামের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না; পুলিস যোয়ানকে গ্রেপ্তার করায় সে হোটেল ত্যাগ করিয়াছে—এরূপও ত হইতে পারে। আমার ভয় ও উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল, যোয়ান পুলিসের সঙ্গে হোটেল ত্যাগ করে নাই, ইহা কিরূপে বুঝিব? বিশেষতঃ হোটেলের কোন ভাড়াটে পুলিসের হাতে ধরা পড়িলে হোটেলওয়ালা সে সংবাদ বাহিরের কোন লোকের নিকট প্রকাশ করে না, কারণ, তাহাতে হোটেলের পসার নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে।

অতঃপর আমি ডেনম্যানকে টেলিফোন করাই সঙ্গত মনে করিলাম ; কিন্তু তিনি তখন বাহিরে যাওয়ায় টেলিফোনে তাঁহার সাড়া পাইলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তিনি আফিসে ফিরিয়া আমাকে টেলিফোনে ডাকিলেন।

আমি সাড়া দিয়া বলিলাম, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনাকে ডাকিয়াছিলাম। আপনি কি হামবার্গ হইতে আমার বন্ধুদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়াছেন ?"

ডেনম্যান বলিলেন, "না, কাতলা জালে পড়ে নাই ; পুলিস প্যালেস হোটেলে উপস্থিত হইবার তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহারা হোটেল হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল।"

আমি মানসিক আনন্দ গোপন করিয়া সংযত স্বরে বলিলাম, "তবে কি তাহারা পুনর্ব্বার পলায়ন করিয়াছে ?"

ডেনম্যান বলিলেন, "হাঁ, কিছু কালের জন্য বটে, কিন্তু তাহারা কতদূর পলায়ন করিবে ? তাহারা হোটেল হইতে সরিয়া পড়িয়াছে শুনিয়া জার্ম্মাণ পুলিস তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে ; আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই তাহাদিগকে ধরা পড়িতে হইবে। কিন্তু আমি এ কথাও স্বীকার করি যে, কুপ নিতান্ত সাধারণ লোক নহে, সে পাকা খেলোয়াড়, পুলিসের চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিতে তাহার মত ওস্তাদ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।"

আমি বলিলাম, "এই সংবাদটি জানিবার জন্যই আপনাকে কষ্ট দিলাম ; আমার আর কোন কথা বলিবার নাই।"

ডেনম্যান বলিলেন, "বুঝিয়াছি, আপনি আপনার বান্ধবীর গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন ; সুসংবাদ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন কি ? আমি সংবাদ পাইয়াছি, গত বৃহস্পতিবার মিস্ কুপার তাহার পিতার আবির্ভাবের এক ঘণ্টা পরে হামবার্গ হইতে প্রস্থান করিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তাহার পিতার সঙ্গে একযোগে কি ?"

ডেনম্যান বলিলেন, "বোধ হয়। যাহাই হউক, আমরা জার্ম্মাণ পুলিসের কার্য্যতৎপরতায় নির্ভর করিতে পারি।"

ডেনম্যান নীরব হইলেন। যোয়ান কোথায় গিয়াছে, বুঝিতে না পারিয়া আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম।

সেই রাত্রিতে চেয়ারিং ক্রশের হাঁসপাতালে গমন করিয়া ডাক্তার হেনসার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল। আমি জানিতাম, রাত্রিকালে তাঁহার হাতে কোন কাম থাকে না ; বিশেষতঃ আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার অঙ্গীকার করিয়া, এত দিন সেই অঙ্গীকার পালন করিতে পারি নাই ; এজন্যও তাঁহার সঙ্গে দেখা করা কর্ত্তব্য মনে হইল।

তিনি আমাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মত কাযের লোক আমার জন্য সময় নষ্ট করিতে পারিবেন, ইহা আমি আশা করিতে পারি নাই।

আমি হাঁসপাতালে উপস্থিত হইয়া দোতলায় তাঁহার বসিবার ঘরে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। তিনি তখন ধূমপান করিতেছিলেন, তাঁহার আফিসের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনেরও অবসর হয় নাই। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি উঠিয়া আমার অভ্যর্থনা করিলেন। আমি তাঁহার পাশে বসিয়া, তাঁহার সহিত শেষবার সাক্ষাতের পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল—তাহা সংক্ষেপে তাঁহার গোচর করিলাম।

সকল কথা শুনিয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "অদ্ভুত, অতি অসাধারণ ব্যাপার ! আপনার কি হইল, তাহা জানিতে না পারায় আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার জন্য কতবার আমার আগ্রহ হইয়াছিল ; কিন্তু অবসরের অভাবে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই। হপি নামক সেই লোকটার কথা আপনার স্মরণ আছে কি ? আজ সন্ধ্যার সময় তাহাকে এখানে দেখিয়া আপনার কথা মনে পড়িয়াছিল। হপি বাঁধের উপর একটি স্ত্রীলোককে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল—ইহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে।"

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "হপি ! কোথায় সে ?" 'হপি' হপ্‌কিনসনের ডাকনাম।

ডাক্তার বলিলেন, "নীচে, হাঁসপাতালের একটা কুঠরীতে পড়িয়া আছে। পুলিস তাহাকে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া হাঁসপাতালে রাখিয়া গিয়াছে। এখন সে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে ; আজ রাত্রিতেই তাহাকে বিদায় করিব।"

আমি বলিলাম, "আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিব। কোন বিষয়ে তাহার সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হইতে পারে।"

ডাক্তার বলিলেন, "সে আপনাকে সাহায্য করিতে পারিলে আমি আনন্দিত হইব। সে এখন কেমন আছে, তাহা জানিতে অধিক বিলম্ব হইবে না, চলুন, নীচে যাই।"

আমি ডাক্তারের সহিত হাঁসপাতালে প্রবেশ করিলাম, তখন সেখানে রোগীর ভীড় ছিল না; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ ও গম্ভীর; অতবড় হাঁসপাতাল যেন নির্জ্জন।

আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বহুদিন পূর্ব্বে হাঁসপাতালের যে কক্ষে নীত হইয়াছিলাম, ঠিক সেই কক্ষেই প্রবেশ করিয়া একখানি জীর্ণ খাটিয়ার উপর হপিকে শায়িত দেখিলাম। তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল; তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়াই মনে হইল।

ডাক্তার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ বুড়া, আমি আমার একটি বন্ধুকে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আনিয়াছি। তুমি ইহাকে চিনিতে পারিবে; ইনি মিঃ কোলফাক্স।"

বৃদ্ধ হপি আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমাকে চিনিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর বলিল, "হাঁ মহাশয়, আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি; অনেক দিন পরে দেখিলাম কি না, প্রথমে চিনিতে কষ্ট হইতেছিল। যে ভদ্রলোককে বাঁধের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, আপনিই ত সেই ব্যক্তি? আমি সেই সময় আপনাকে বলি নাই কি, মাসখানেক আগে একখানি গাড়ী আসিয়া একটি মেয়েকে সেই বাঁধের উপর ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহা আমি নিজের চোখে দেখিয়াছিলাম?"

আমি বলিলাম, "হাঁ হপি, সে কথা আমার মনে আছে। তোমার অসুখের কথা শুনিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছিলাম।"

হপি পা নাড়িয়া প্রফুল্লভাবে বলিল, "কিন্তু এখন আমি অনেকটা সুস্থ হইয়াছি। মধ্যে মধ্যে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি, এ আমার বহুদিনের রোগ। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছিলাম; ইচ্ছা থাকিলেও আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই; ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিতে যাই, আমার সে রকম পোষাক নাই।"

আমি বলিলাম, "আমার সঙ্গে দেখা করিতে কি জন্য তোমার আগ্রহ হইয়াছিল, তাহা এখানে বলিতে বাধা আছে কি?"

হপি বলিল, "প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে সেই গাড়ীখানাকেই আমি পুনর্ব্বার বাঁধের উপর আসিতে দেখিয়াছিলাম। হাঁ, ঠিক সেই গাড়ী।"

আমি কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কাহাকেও কি সেই গাড়ীতে সেখানে লইয়া আসিতে দেখিয়াছিলে? তুমি ত বাঁধের ধারে বসিয়াই রাত্রি কাটাও, কেহ সেখানে আসিয়া পড়িলে সে তোমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।"

হপি বলিল, "সেই গাড়ীতেও একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ ছিল।"

আমি বলিলাম, "পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে?"

হপি দৃঢ়তার সহিত বলিল, "হাঁ, ঠিক পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বের কথা।"

আমি ভাবিলাম, তবে কি তাহা ইথেল ফার্কুহারের মৃতদেহ? রহস্যের খাসমহলের একটি কক্ষে আমরা যাহার মুদ্রাধার ও অন্যান্য সামগ্রী আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহারই মৃতদেহ কি গাড়ীতে তুলিয়া বাঁধের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল?

আমি স্তম্ভিতভাবে বৃদ্ধ হপ্‌কিন্‌সনের শয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মুক্তি দাও

(সার্ব্বিয়ার দেশপ্রেম-গাথা)

হে বিধাতা, তুমি কত শত যুগে রক্ষা করেছ আমার দেশ;
হে করুণানিধান, ভূপতি মহান্, শোন হে আজিকে মোদের ক্লেশ;
মাগি হে কাতরে স্বদেশের তরে দাও হে মুক্তি, ক্লেশের শেষ।
লয়ে যাও আগে, লয়ে যাও দূরে, মুক্তির পথে লইয়া যাও;
দেশের রাজ্য জাহাজ সমান বন্দর মাঝে বাঁধিয়া দাও;
তব শক্তি ও করুণার গুণে ঘোর তম হ'তে আলোকে নাও।
উজ্জ্বল অতি সে আলোক-মাঝে যতেক শত্রু হউক লোপ,
রাখ হে রাজ্য, রাখ এ দেশেরে, দাও হে মুক্তি, ঘুচাও ক্ষোভ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগু

সামরিক টুপীর বৈশিষ্ট্য

মস্কো সহরে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নাগরিকগণকে সামরিক বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সম্প্রতি একটা অভিনব

সামরিক শিবিরে সামরিক টুপী

[illegible]শা হইয়াছিল। যে বিস্তৃত প্রান্তরে এই সামরিক ক্রীড়া [illegible]র্শিত হইয়াছিল, তাহার প্রবেশপথের সন্নিকটে একটি উচ্চ [illegible]ম্ভের উপর একটি বিরাট আকারের সামরিক টুপী রক্ষিত [illegible]ছিল। এই কাষ্ঠস্তম্ভের চারি পার্শ্বে সাধারণ কাঠের [illegible]; জনৈক সৈনিক টুপীর পাহারায় নিযুক্ত। এই [illegible]-শিবিরে নাগরিকগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া কুচকাওয়াজ [illegible]ছিল।

—

ভাঁজকরা তাসখেলার টেবল

একটি পায়া খোলা বা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই টেবলটি খুলিয়া যাইবে বা ভাঁজ করা হইবে। ইহাতে কোনও গোলযোগ নাই। সহজ সরল পদ্ধতি অনুসারে কাষ হয়। কল বিগড়াইয়া যাইবে, এমন
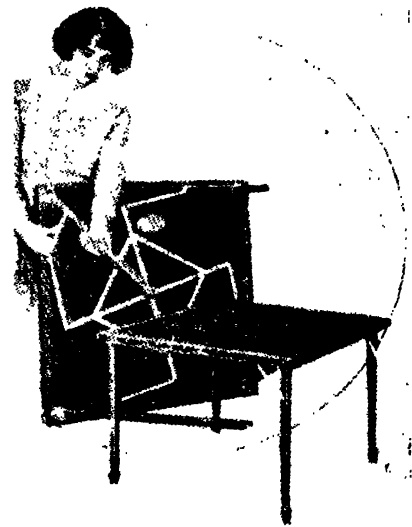
ভাঁজ-করা তাস-খেলার টেবল

কোনও সম্ভাবনা নাই। যাহারা ক্রীড়াসক্ত, মোটরে বেড়াইতে যাইবার সময় এই প্রকার ভাঁজ-করা টেবল সঙ্গে লইয়া যায়।

—

মাইক্রোফোনযোগে বিপদ-জ্ঞাপন

চিকাগোর কোনও ব্যাঙ্কভবনের অভ্যন্তরে, উর্দ্ধদেশে মাইক্রোফোন্ যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। উহার সহিত পুলিস-থানার সংযোগও আছে। এই মাইক্রোফোন্ যন্ত্র খুবই ক্ষুদ্রাকার, কিন্তু সামান্য শব্দেই ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে। ঘটনাক্রমে কোনও ব্যক্তি যদি সকলের অজ্ঞাতসারে ব্যাঙ্ক-ভবনে অবরুদ্ধ

হইয়া থাকে, তাহা হইলে সামান্ত চীৎকার করিলেই উক্ত মাইক্রোফোন যন্ত্র সেই শব্দ পুলিস-থানায় বহন করিবে, সুতরাং

মাইক্রোফোন যন্ত্রযোগে বিপদ-জ্ঞাপন

তাহার মুক্তিলাভ সম্বন্ধে কোনও আশঙ্কা থাকিবে না। কেহ ব্যাঙ্ক লুঠ করিতে আসিলেও তাহাদের কার্য্যে পুলিস যথাসময়ে বাধা দিতে পারিবে।

অতিকায় কূর্ম্ম

প্রশান্ত মহাসমুদ্রে একটি বিরাট কচ্ছপ ধৃত হইয়াছে। ইহার শরীরের ওজন ৯ মণ। দড়ির সাহায্যেই পোতের নাবিকগণ ইহাকে জাহাজের উপর তুলিয়াছিল। এত বড় কূর্ম্ম সাধারণতঃ

অতিকায় কূর্ম্ম

কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার মুখবিবরের পরিধি কম নহে।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

বার্লিনের সহরতলীর কোনও অট্টালিকার ছাদে সম্প্রতি একটা বিরাট "লাউড্ স্পিকার" যন্ত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বেতার
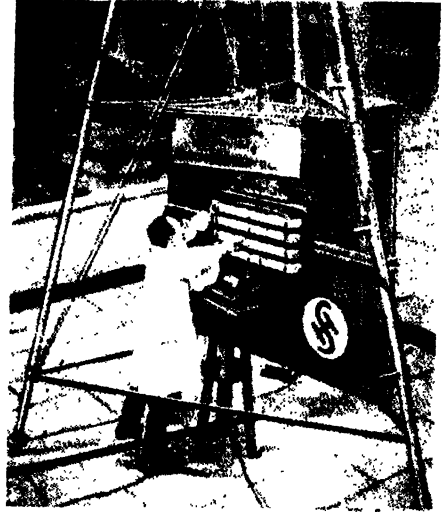
বিজ্ঞানের বাহাদুরী

বার্ত্তাবহ যে সকল বক্তৃতা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিতরণ করিবে, এই স্পিকারের সাহায্যে তাহা ২০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের জনগণেরও শ্রুতিগোচর হইবে। ২ হাজার গায়ক সম্মিলিত কণ্ঠে গান করিলে যে প্রচণ্ড শব্দ-তরঙ্গ উত্থিত হয়, এই স্পিকার হইতে তদ্রূপ শব্দশক্তির উদ্ভব হইবে।

গুলী-প্রয়োগে নিদ্রা—মৃত্যু নহে

জীবিত অবস্থায় কোনও আরণ্য পশুকে শিকার করিবার জন্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছেন। হাইপোডারমিক্ সূচের সাহায্যে জীবদেহে ঔষধ-প্রয়োগের যে ব্যবস্থা আছে, সেই উপায়ে এই গুলী বন্দুক হইতে নিক্ষিপ্ত হয়। এই গুলীর মধ্যে এমন ঔষধ থাকে যে, দূর হইতে কোনও জীবের উপর এই ঔষধপূর্ণ গুলী নিক্ষিপ্ত হইলে, অনতিবিলম্বে সেই পশু নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া

সম্মোহন গুলী

পড়িবে। দুই মিনিটের মধ্যেই ঔষধের ক্রিয়া প্রচণ্ডবেগে আরম্ভ হয়। উহার প্রভাব এক ঘণ্টাকাল থাকে। তার পর আবার সেই প্রাণী পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই গুলীর নাম "মাসি। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিতেছেন যে, অতঃপর অরণ্যের হিংস্র জন্তুগণকে আর ফাঁদ পাতিয়া ধরিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সম্মোহন গুলীর সাহায্যে তাহাদিগকে ধৃত করা যাইবে।

স্বয়ং-চালিত যানে গৃহসুখের ব্যবস্থা

ভ্রমণকারীর দল মোটর-গাড়ীর সঙ্গে একখানা করিয়া স্বয়ং-চালিত গুদাম-গাড়ী লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই গুদামগাড়ী এমনই ভাবে নির্ম্মিত যে, উহার অংশগুলি বিস্তৃত করিলে, ভোজনাগার, শয়নকক্ষ, রন্ধনশালা—এক কথায় গৃহসুখের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়। পথ চলিবার সময় গুদাম-গাড়ীর আয়তন সাধারণ গাড়ীর ন্যায়; কিন্তু যখন যাত্রা বন্ধ করিয়া আহার ও শয়নের প্রয়োজন ঘটে, তখন স্বল্পকালের মধ্যেই গুদামগাড়ী যেন ইন্দ্রজালস্পর্শে রূপান্তরিত হইয়া যায়। প্রদত্ত চিত্র হইতে বিভিন্ন কক্ষের দৃশ্য দ্রষ্টব্য। গাড়ীর উভয় পার্শ্বে দুই জনের শয়নের উপযোগী শয্যা আছে। গুদাম-গাড়ীর মধ্যে ধূলা প্রবেশ করিবার কোনও উপায় নাই—অবশ্য যখন বন্ধ থাকে। এক মিনিটের মধ্যেই রূপান্তরক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

মোটর-চালিত গুদাম-গাড়ীতে গৃহসুখ

লতাগুল্মের বৈঠকখানা

জনৈক সৌখীন ইংরাজ উদ্যানপাল বিলাতে উদ্যানমধ্যে লতাগুল্মের সাহায্যে একটি বৈঠকখানা-ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চেয়ার, টেবল, সোফা, এমন কি, অগ্নি জালিবার উনান পর্য্যন্ত লতাগুল্মের দ্বারা রচনা করিয়াছেন। ঘরের প্রাচীরও লতাগুল্ম দ্বারা নির্ম্মিত। অর্থ, সখ ও অবকাশ থাকিলে মানুষ কত প্রকারে তাহার খেয়াল চরিতার্থ করিতে পারে, ইহা তাহার একটি নিদর্শন মাত্র।

লতাগুল্মরচিত বৈঠকখানা

দীপশলাকা-নির্ম্মিত বেহালা

ওয়াশিংটনের কোনও উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র দীপশলাকার সাহায্যে একটি পূর্ণায়তন বেহালা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এজন্য ২ হাজার ৫ শত দীপশলাকা ব্যবহৃত হইয়াছে। ছাত্রটি ৬ সপ্তাহ ধরিয়া কাঠিগুলি

শিরীষের দ্বারা জুড়িয়াছিল। বেহালা-যন্ত্রের কুত্রাপি কোন

দীপশলাকা-নির্ম্মিত বেহালা

প্রকার অসঙ্গতি ছিল না। উহার ধ্বনিও আসল বেহালার ন্যায় সুমিষ্ট।

তুলা-নির্ম্মিত ডিস্

জনৈক বৃটিশ বৈজ্ঞানিক কয়েক বৎসর ধরিয়া গবেষণা ও পরীক্ষার পর তুলার দ্বারা ভোজনপাত্র নির্ম্মাণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কাচ বা পোর্সিলেনের পাত্র ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু তুলা-

তুলার ভোজন-পাত্র

নির্ম্মিত ভোজনপাত্র সম্বন্ধে সে আশঙ্কা আদৌ নাই। তাহা ছাড়া পাত্রগুলি অত্যন্ত লঘুভার। তুলার ভোজনপাত্র বাজারে বাহির হইলে উহার যে চাহিদা অধিক হইবে, তাহাও অসম্ভব নহে।
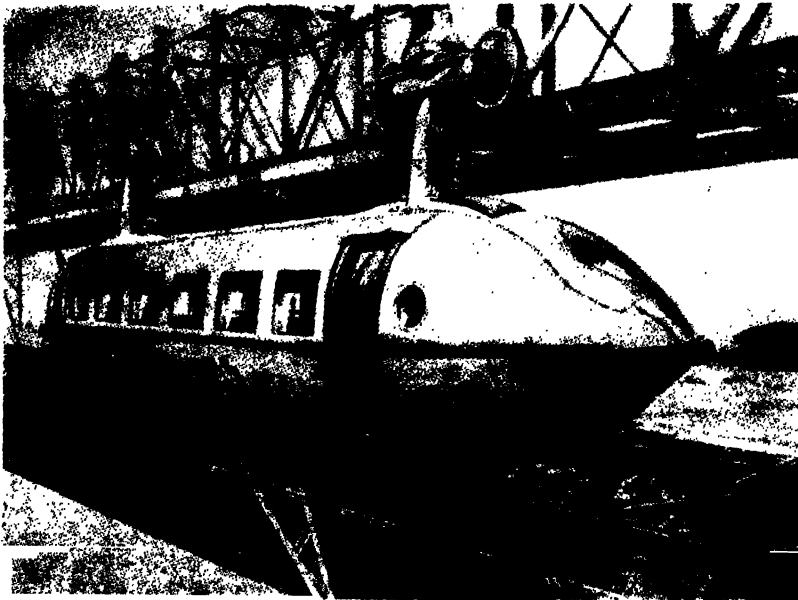
অভিনব রেল-পোত

স্কটল্যাণ্ডে বৈজ্ঞানিকগণ রেলপোত চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এখন এঞ্জিনের সাহায্যে রেল-গাড়ী চলে; স্কটল্যাণ্ডের পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে ভবিষ্যতে এঞ্জিনের প্রয়োজন হয় ত থাকিবে না। দ্রুতগামী যাত্রী রেলপোত বিমান-পোতের পদ্ধতিতেই রেল-লাইনের উপর দিয়া চলিতে থাকিবে। যাত্রী-গাড়ীগুলি ইস্পাত-নির্ম্মিত সুদৃঢ় গার্ডারের দ্বারা বিলম্বিত। প্রদত্ত ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। স্কটল্যাণ্ডে যে রেল-পথ বিদ্যমান আছে, তাহার পার্শ্বেই এই নবনির্ম্মিত রেল-পোতের জন্য পথ প্রস্তুত হইবে। সুতরাং পথ-নির্ম্মাণের জন্য অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

অভিনব রেল-পোত

শঙ্কিতা সচকিতা গৃহিণী

(গল্প)

১

রমার মনে এক তিল স্বস্তি নাই। যত দুর্ভাবনা তার স্বামী হরেন্দ্রকে লইয়া। একেই তো রোগের বিভীষিকা দুনিয়া-আক্রমণের জন্য থাবা মেলিয়া আছে, তার উপর বন্ধু-বান্ধব, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, মাছ ধরা প্রভৃতির নানা প্রলোভন চারিদিকে জাল পাতিয়া রাখিয়াছে! উপদ্রবের সীমা নাই!

তোমরা ভাবিতেছ, রমা মূর্খ? কুরূপা? সে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে? তা নয়। রমা ম্যাট্রিক অবধি পড়িয়াছে। সে তরুণী, রূপসী; তা ছাড়া এই সহরেই সে জন্মিয়াছে এবং সহরেই মানুষ হইয়াছে। তবে কি হরেন অরসিক? দুশ্চরিত্র? কাঠগোঁয়ার? তাও নয়।

হরেন সুশ্রী। তার বয়স সাতাশ-আটাশ বছর; বাপের বেশ পয়সা আছে; বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রবল; এবং রমাকে সে যেমন ভালোবাসে, তেমন ভালোবাসার কথা কোনো উপন্যাস-গল্পেও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না! তার কোনো দোষ নাই, তবে একটা খেয়াল আছে—সে খেয়াল, বন্ধু-বান্ধবের আহ্বান সে এড়াইতে পারে না, তা সে বাদার ধারে স্নাইপ-মারার আহ্বান আসুক বা কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান অবধি পদব্রজে পাড়ি দিবারই ডাক পড়ুক! সকল দিকে হরেনের সমান উৎসাহ!

কাজেই রমার দুর্ভাবনা। তথাপি গোড়ার ব্যাপার আর একটু খোলশা করিয়া বলা দরকার।

রমা যখন খুব ছোট, তার বাপ-মা ইহলোকের মায়া কাটাইয়া যান। রমা মানুষ হইয়াছে মাতামহ-মাতামহীর কাছে। মাতামহ বেশ পয়সাওয়ালা লোক এবং তিনি সৌখীন। রমার আদরের কোনো সীমা ছিল না। ছেলে-বেলা হইতেই রমা কর্ত্রীত্ব করিতে ভালোবাসে; সে-কাজে বাধাও কখনো পায় নাই। সব বিষয়ে তার কড়া নিষেধ-শাসন ছিল। বসা-দাঁড়ানো প্রত্যেক ব্যাপারে মাতামহ-মাতামহী রমার কথা শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেন।

রমা তখন ফোর্থ ক্লাশে পড়ে; 'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে' লেখা ছিল, দুনিয়ার বাতাস রোগের বীজাণুতে ভরা। তার মন অমনি দুশ্চিন্তায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এই বীজাণুর আক্রমণ বাঁচাইয়া চলিতে তার স্কুলের 'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে' যে-কয়টি উপদেশ ছাপা ছিল, তার সবগুলিই সে প্রাণপণে মানিয়া চলিতে সুরু করিল। দাসী-চাকরের উপর কড়া নজর রাখিল—বাসন-মাজা প্রভৃতি কাজেও তার নজর বাঁচাইয়া চলা তাদের পক্ষে সুকঠিন হইল। চাকর-দাসীর ছেঁড়া মশারিতে তালি পড়িল এবং ময়লা দুর্গন্ধ কাপড় পরিলে রমার শাসন এমন মূর্ত্তি ধরিত যে, তখনি সে ভৃত্যকে বাড়ী হইতে বিদায় দিতে তার মন কিছুমাত্র কাতর হইত না।

দিদিমা বলিলেন,—তোর জ্বালায় লোকজন আর এ বাড়ীতে চাকরি করতে আসবে না, দেখছি।

ধমক দিয়া রমা কহিল,—তা ব'লে গুষ্ঠীশুদ্ধ মারবে ঐ নোংরা কাপড়ের ব্যাসিলিতে!...

দিদিমা কহিলেন,—নিজের হাতে তবে কর সব।

রমা কহিল,—তা করতে রাজী আছি। তা ব'লে স্বাস্থ্যের বিধি-নিয়ম মেনে চলবে না!

ছোটখাট ব্যাপারে রমার এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অটুট রহিয়া গেল। বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া রমা দেখে, শ্বশুর-শাশুড়ী নাই—হরেন একা, এবং বাড়ীতে এলাহি কাণ্ড! বিছানার উপর খপরের কাগজ, প্রুফ, মাসিক-পত্র ডাঁই হইয়া আছে। শুইবার ঘরে টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালা পড়িয়া আছে তো পড়িয়াই আছে—চাকর-বাকরের তা সরাইবার নাম নাই! পেয়ালায় রাজ্যের মাছি বাসা বাঁধিবার উদ্যোগে ব্যস্ত!

মাছি! সর্ব্বরোগের এমন বাহন আর কোথায় আছে! গা তার নিশ্‌পিশ্‌ করিয়া উঠিল। কিন্তু নূতন জায়গা, নূতন বৌ...কাজেই গায়ের ঝাল তারই অঙ্গে লঙ্কা-বাটা লেপিতে লাগিল।

ফুলশয্যায় আলাপের মুখে সাহিত্য-রসিক হরেনের সোহাগ-বাণীর অন্তরালে রমা ফশ্‌ করিয়া বলিয়া উঠিল,—তোমরা এত নোংরা কেন?

নোংরা! হরেন অবাক্! সে যে অতি-সৌখীন, বন্ধুরাও এ কথা বলে, যখন-তখন! প্রিয়ার মুখে এত বড় অপবাদ

শুনিয়া হরেন থ হইয়া গেল। তার মুখে চট্ করিয়া কোনো কথা জোগাইল না।

রমা কহিল—ঐ টেবিলের উপর অত বই—অগোছালো প'ড়ে আছে—ধুলোয় ধুলো! ধুলোয় কত রোগের বীজ থাকে! ধুলো কি, জানো?

হরেন অবাক্! তাকে উত্তরের অবসর না দিয়া রমা কহিল,—নবগৌরাঙ্গ পাকড়াশীর স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে আছে, ধুলো হলো যত নোংরা জিনিষের গুঁড়ো! তার ওপর ঐ চায়ের পেয়ালাটা প'ড়ে আছে দেখচি, সেই সকাল থেকে। ধুয়ে তোলার চাড় কারো নেই।

হরেন কহিল—কাল সকালে চা দেবার আগে ধুয়ে-মেজে তবে চা দেবে, নিশ্চয়। ওতেই দেবে না!

শিহরিয়া রমা কহিল—সেই কাল সকালে ধোবে? আর ওতে যত রাজ্যের মাছি এসে বসচে!…ঘরের মধ্যে মাছি জড়ো হতে দেওয়া ঠিক নয়। সর্ব্বরোগের বাহন মাছি।

হরেন কহিল—চাকরগুলো ভারী কুড়ে…আমি পারি না। এবার তোমার হাতেই তো চার্জ্জ পড়লো—তুমি দেখে-শুনে সব ঠিক ক'রে দিয়ো…

—হুঁ। বলিয়া রমা উদাস নেত্রে একদিকে চাহিয়া রহিল। হরেন কহিল,—রবিবাবুর সেই কবিতাটি পড়বো, রমা? সেই—

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শত বার—
জনমে-জনমে যুগে যুগে অনিবার!

আমারো মনে হয়…

কথা শেষ হইল না। রমার যে এমন চমৎকার ছত্রগুলার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ নাই, হরেন সেটুকু লক্ষ্য করিল। সে কেমন অপ্রতিভ হইল, কহিল—কিছু ভাবচো রমা?

—হ্যাঁ। বলিয়া রমা খাট হইতে নামিল। দৃষ্টি তার খাটের ছত্রীর দিকে; এবং সে দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ!

হরেন কহিল—কি দেখচো?

সে ভাবিয়াছিল, রমা অলক্ষ্যে বুঝি ভূত দেখিয়াছে—তার মুখের ভাবখানা অন্ততঃ তেমনি!

রমা কহিল—মশা। বলিয়াই সে দু'হাত শূন্তে তুলিয়া তালি দিল। তার পর দুই করতল দেখাইয়া কহিল—দুটো মরেছে। রক্ত দেখচো?

হরেন কহিল,—হু!

তার মনের কোণে কোথায় যেন একটা লোহার গোলা ঠেলিয়া উঠিতেছিল। রমা কি! অমন রূপ, এই বয়স… ম্যাট্রিক অবধি পড়িয়াছে…তবু ঐ মশা লইয়া বিব্রত!

রমা কহিল,—মশারি ফ্যালো না তোমরা?

হরেন সভয়ে কহিল—না। মশারির মধ্যে আমি শুতে পারি না। শুলে হাঁফ্ ধরে।

রমা কহিল—মশার কামড় সহ্য করো! মশায় ম্যালেরিয়া রোগ আনে। সব মশা অবশ্য নয়—এ্যানোফিলিস মশায় আনে। তা, সে মশা বাছাই করে কে? আমরা পড়েচি, এই মশা ম্যালেরিয়ার বীজ বয়ে বেড়ায়—সুস্থ মানুষকে কামড়ালে তার শুঁড় থেকে সেই বীজ সুস্থ মানুষের দেহে সে চালিয়ে দেয়। তাতেই ম্যালেরিয়া রোগের উৎপত্তি!

হরেন একেবারে কাঠ! ফুলশয্যার রাত্রে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের আলোচনা—এ যে কোনো কবি, কোনো গল্প-লিখিয়ে কল্পনাও করেন নাই কখনো! রবীন্দ্রনাথের কল্পনা পুঁথি মেনিকে লইয়াই খুশী হইয়া গিয়াছে! রমা কহিল—মশারি না ফ্যালো যদি, ফ্লিট দিতে পারো না? তা ছাড়া সেই জিলিপির মত আছে ক্যাটল…মশ্‌কুইটো-ডেষ্ট্রয়ার—তাও জ্বালাতে পারো! ধুনোয় মশা যায় না। ক্যাটল কিন্তু অব্যর্থ। আমাদের বাড়াতে ব্যবহার করি।

হরেন কহিল—কাল সকালেই আমি ফ্লিট আর তোমার ঐ ক্যাটল কিনে আনবো।

রমা কহিল,—এনো।

তোমরা ভাবিতেছ, আমি অতিরঞ্জন করিতেছি? তা নয়। যা সত্য ঘটিয়াছিল, হুবহু তাহাই হুবহু লিপিবদ্ধ করিতেছি। কাহারো যৌবন-কাহিনীর সঙ্গে যদি না মেলে, আমি কি করিব?

হরেন কিন্তু একটা কারণে খুশী হইল। প্রিয়া যে সেকেলে বৌয়ের মত ঘোমটা-ঢাকা আড়ষ্ট জীব নয়—বেশ সপ্রতিভ, আলাপে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন—এটুকুতে তার প্রাণ আরাম পাইয়া বাঁচিল!

কিন্তু হরেনের এত চিন্তার হেতু দেখি না। যেহেতু একাল সেকাল নয়। সেকালের ঘোমটা-পরা নির্ব্বাক বধূ আজ সভ্য সমাজে বিরল! সামাজিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজ তাঁর স্থান। তা ছাড়া রমা লেখাপড়া শিখিয়াছে, সে বড় ঘরে

মেয়ে, অতি আদরে লালিতা, তার উপর ষোড়শী। এ-বয়সের বধূ নিপুণ হাতে সংসার তরীর হাল ধরিতে পারে। কাজেই নব বধূর সম্বন্ধে হরেনের উক্ত ধারণা নারী-চরিত্র-সম্বন্ধে তার অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়—তা হোক্ সে সাহিত্যিক!

২

রমা একদিন হরেনকে বলিল,—যাহোক একটা কাজ করো… কুড়ের মত ব'সে কবিতা-গল্প লেখা, বা বন্ধুদের দলে মিশে মাছ ধরতে যাওয়া—এ কি ঠিক?

কবিতা লেখা, গল্প লেখা, মাছ ধরা কুড়ের কাজ! হরেন অবাক হইল।

রমা কহিল,—দাদামশায়ের টাকার অভাব ছিল না কোনো দিন। তবু দাদামশায় একটা কারবার খুলেছিলেন। তাতে পয়সাও আসে। তা ছাড়া কাজে লেগে থাকার দরুণ দাদামশায়ের স্বাস্থ্য ভালো আছে।

রমা দাদামশায়ের বাড়ী গিয়াছিল; দু'দিন সেখানে থাকিয়া আজ সন্ধ্যায় ফিরিয়াছে। এ-কথা যখন হইল, রাত তখন ন'টা বাজে। হরেন দোতলায় নিজের ঘরে বসিয়া একটা গল্প লিখিতেছিল। পূজা আসন্ন, তিন-চারিখানা মাসিকের তরফ হইতে লেখার তাগিদ আসিয়াছে।

হরেন কেমন লেখে,—এ প্রশ্ন হয় তো তোমাদের মনে জাগিতেছে! জাগিবার কথা। এ-সম্বন্ধে সাফ্ জবাব দেওয়া কঠিন—বিশেষ গল্প সম্বন্ধে অভিমত! আমরা তার লেখা গল্প পড়ি নাই; তবে দু'চারিটা মাসিকে তার গল্প ছাপা হয়, দেখিয়াছি। মাসিকের গল্প ক'জন পড়ে, জানি না। আমরা পড়ি না; সময়ের অভাব। তবে কতকগুলা গল্প না ছাপিলে মাসিকের মাসিকত্ব থাকে না, তাই গল্প ছাপা হয়, জানি। হয় তো সেই কারণেই হরেনের গল্পের আদর। তা ছাড়া হরেনের পয়সা আছে; সে সৌখীন; এই দ্বিবিধ সার্টিফিকেটের জোরে তার গল্প যদি মাসিকের হাটে বিকায় তো তাহাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ দেখি না।

রমা কহিল,—দাদামশায় বলছিল, পুরুষ-মানুষের এ বয়সে চুপ ক'রে ব'সে থাকা ঠিক নয়…ব্যাধিকের সৃষ্টি হয়!…

হরেনের অভিমান হইল। হরেন কহিল,—তুমি কি বলচো, রমা! গল্প লেখা, কবিতা লেখা—এ সব কুড়ের কাজ? রবীন্দ্রনাথ…

রমা কহিল,—থাক্, বিশাল বঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক-জন মাত্র।

হরেন কহিল—এ যে সাধনা, সাহিত্য-সাধনা!

রমা কহিল—কার কি উপকারে লাগে? কুড়ে যখন সময় কাটাবার আর কিছু পায় না, তখন মাসিক কাগজ খুলে গল্প পড়ে, কবিতা পড়ে। আমাদের দেশ কুড়ের আড্ডা হয়ে উঠেচে। লেখকদের দ্বীপান্তরে পাঠানো উচিত। তুমি আর ধূনোর গন্ধে মনসাকে মাতিয়ো না। গল্প লিখে, কবিতা লিখে কুড়েমির প্রশ্রয় দিয়ো না। হাঁ, যদি নতুন কিছু লিখতে পারতে, তা হলে নয় বুঝতুম!

হরেন কহিল—বেশ, আজ থেকে ও-সবে ইস্তফা দিচ্ছি। যদি লিখি, কাল থেকে গম-তিসি-যব-পাটের বাজার-দর লিখবো…

রমা হাসিল। হাসিয়া কহিল—তা লিখো। তাতে বণিকসমাজের তবু কিছু উপকার হবে…

হরেন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রমা কহিল,—দাদামশায়ের আপিসে বেরুবে? দাদামশায় তাই বলছিল। দাদামশায়ের বয়স হয়েচে…সত্যি, আমারো ভালো লাগবে খুব। সকালে নেয়ে খেয়ে তুমি বেশ আপিসে বেরুবে, আমি এসে কাছে দাঁড়াবো। তুমি আপিসে যাবে, সারা দিন আমি সংসার দেখবো। তার পর পাঁচটা বাজলে গা' ধুয়ে চুল বেঁধে তোমার পথ চেয়ে থাকবো—তুমি আপিস থেকে ফিরবে, আমি তোমার পোষাক ছাড়িয়ে দেবো। তুমি মুখ-হাত ধুয়ে ঐ বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসবে, আমি জলখাবার এনে দেবো। তার পর জলখাবার খেয়ে আমায় নিয়ে তুমি মাঠে হাওয়া খেতে বেরুবে…জীবনে কেমন বৈচিত্র্য হবে! আজো দাদামশায়ের আপিস যাবার সময়টিতে দিদিমা সব কাজ ফেলে তাঁর কাছে এসে বসে, তার পর আপিস থেকে ফেরার সময় দিদিমার আর কোনো দিকে জ্ঞান থাকে না! দু'দিন দেখে তা আমার এমন ভালো লাগছিল। আগেও কি দেখিনি? দেখেচি। তবে এ দু'দিন ঐ যাওয়া-আসার মধ্যে বেশ একটু মাধুর্য্য দেখলুম…

রমার আঁকা ছবিটুকু হরেনের মন্দ লাগিল না। এখন অহরহ এই রমার সঙ্গে ছোট-বড় সংসারের কথা সুরু

হইয়াছে! কাব্য-কূজন কাজের কথার কলরবে গা ঢাকিয়া লুকাইতে চায়! দুপুর বেলাটায় সে গল্পের প্লট হাতড়াইয়া ফেরে, রমার উদ্দেশে কবিতা লিখিতে বসিলে ভাব-ভাষা-ছন্দের জন্য দুনিয়া ওলট্-পালট করিতে হয়! অফিসের বৈচিত্র্যে একটু রোমান্সের আমেজ যদি ..

হয় তো অফিসে প্রিয়ার চোখের চকিত চাহনির লোভে মন একটু আকুল হইবে,—সে যখন ইনভয়েস লইয়া মাথা ঘামাইতেছে, ঘরে রমা তখন কি করিতেছে, তারি কল্পনায় মনকে অধীর আবেগে ছন্দলোকের পথে উড়াইয়া দিবে··· তাছাড়া ঐ ফেরার বেলায় রমার প্রতীক্ষা· ·সে বেশ হইবে!

হরেন কহিল—বেশ রমা, তাই হবে। তুমি দাদামশায়কে ব'লে ঠিক ক'রে দাও। কাজেই বেরুনো যাক্!···জীবনে বৈচিত্র্য আসবে তাতে, সত্যি!···

তাই হইল। দাদামশায়ের অফিসে হরেন যাতায়াত সুরু করিল। ..

কিন্তু মুস্কিল যে না বাধিল, এমন নয়।

সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইবে, বন্ধুরা আসিয়া হাজির। 'মরমী' কাগজখানা ভারী জোর চলিয়াছে, তাদের বড় সাধের 'গরজস্তি' বুঝি পিছাইয়া পড়ে! লেখার অভাবে, পয়সার অভাবে···

হরেন কহিল,—বসো। বেড়িয়ে আসি। তার পর কথা-বার্ত্তা কবো।

সে দিন বেশীক্ষণ বেড়ানো হইল না। নেপেন, সত্য, নন্দ—তারি পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। সাহিত্য-জগতে নূতন কি খবর আছে, জানিবার জন্য মন তার অধীর হইয়া উঠিল।

বাড়ী ফিরিয়া দেখে, নন্দ একা শুইয়া আছে; নেপেন-সত্য চলিয়া গিয়াছে।

নন্দ কহিল,—অনেক দিন কিছু লেখোনি হে! এবার একটা গল্প দাও···এ-বারে চাইই তোমার লেখা।

নন্দ গরজস্তির সম্পাদক। বেচারা আর দু'খানা বাঙ্‌লা দৈনিকে খবর তর্জ্জমা করিয়া কোনো মতে সংসার চালায়।

নন্দ কহিল,—তোমার ভরসাতেই কাগজ বার করা। তুমি স'রে দাঁড়ালে কাগজ নিয়ে আমি যে মারা যাই!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরেন কহিল—কিন্তু আমার অবসর কৈ?

নন্দ ক'হল—দু'চার জন ভালো লেখক পাকড়াবো, সে সামর্থ্য নেই! এমন পাষণ্ড হয়েচে এই লেখকগুলো যে, পয়সা না দিলে এক লাইন লেখা দেবে না! কাগজখানা তুলেই দেবো, ভাবচি।

নন্দ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তাও কি হয়! এই কাগজের সঙ্গে কত কল্পনা-জল্পনা, কীর্ত্তি-গৌরবের কতখানি সম্ভাবনা গড়িয়া তোলা··· হরেনের বুক দুলিয়া উঠিল। সে কহিল—তুলে দিয়ো না। নিজেদের হাতে একখানা কাগজ থাকা ভালো হে! বেশ, কাল সকালে এসে পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে যেয়ো···

নন্দ খুশী-মনে কহিল—মাসে পঞ্চাশটা ক'রে টাকা দিতে পারো যদি, তা হলে মাথা তুলে দাঁড়াই। দেখি, কে রোখে! বড় hard competitionএর বাজার পড়েচে!

হরেন কহিল—হ্যাঁ।···

তার পর সে কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল—তাই দেবো। তবে একটা কথা···

—কি?

হরেন কহিল,—কথাটা গোপন রেখো! আমার স্ত্রী আমায় ওদিকে ঘেঁসতে দিতে নারাজ। আমায় কাজের লোক ক'রে তুলবেন। তিনি না জানতে পারেন···

নন্দ কহিল—তা গোপন থাকবে। তুমি আর আমি—এ ছাড়া আর কেউ এ কথা জানবে না!···বোঙ্গা, তোমার স্ত্রী শিক্ষিতা হয়েও সাহিত্য-সম্বন্ধে এতখানি উদাসীন···

হরেন কহিল—কে জানে, ভাই! সে বলে, বাঙলা সাহিত্য আজকাল ছাই হচ্ছে। ও ছাইয়ে ছাই মিশিয়ে তুমি আর ছাইয়ের পাহাড় গ'ড়ে তুলতে পাবে না!···

নন্দ কিছুক্ষণ হরেনের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া একটা বড় নিশ্বাস ফেলিল; ফেলিয়া কহিল—Strange!

হরেন কহিল,—তাই আমায় একেবারে নজর-বন্দী ক'রে রেখেচেন। গল্প আর কবিতা-লেখা নিষেধ।

নন্দ আবার কহিল—আশ্চর্য্য!

ইহার বেশী আর কোনো কথা সে বলিতে পারিল না। বলিবার শক্তি নাই। হরেন পেট্রন; তা না হইলে বলিত, তোমার স্ত্রীর মাথা খারাপ; চিকিৎসা করাও। বাঙলা সাহিত্যে যে বিপুল বিশাল প্রাণের সাড়া উঠিয়াছে, তা স্বীকার করা পরের কথা—তার পরিচয় লইবারও যার আগ্রহ নাই··

সে ভাবিল, এ ঔদাসীন্য লইয়া কোনো ফাঁকে একটা সাধারণ টিপ্পনী 'গরজন্তি'তে ছাপাইয়া দিবে—এ মাসে নয়, দু'চার মাস পরে, নিশ্চয়। নর-নারীকে সাহিত্য-বিষয়ে সচেতন করিয়া তোলা মাসিকের সম্পাদক-হিসাবে তার কর্ত্তব্যও!

৩

সে দিন অফিস সারিয়া হরেন বাড়ী ফিরিতেছিল ট্যাক্সিতে। ঘরের গাড়ী বিগড়াইয়াছিল, তাকে মিস্ত্রীখানায় পাঠানো হইয়াছে।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের কাছে দু'খানা বাস গতি-বেগ লইয়া বাজী চালাইয়াছিল। মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে বাসের এ ঔদাসীন্য বিচিত্র নয়—কিন্তু ট্র্যাফিক্-পুলিশের চোখের উপর এতখানি তেজ...পথিকের দল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ফুটপাথে পলাইয়া যাইতেছিল। ট্যাক্সির ড্রাইভারও ছিল শিখ... তারো ধমনীতে বীর-রক্ত! কারো তেজ সহিবার পাত্রই সে নয়! সেও বাসের বাজী-সমারোহে ট্যাক্সি ছুটাইয়া দিয়া-ছিল। মেছুয়াবাজারের মোড়ের কাছে টিক ফস্কাইল এবং সবুজ রঙের বাসখানা ট্যাক্সিকে সজোরে ধাক্কা দিল। ট্যাক্সির একদিক তুব্‌ড়াইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে হরেন সীট্ হইতে গড়াইয়া পড়িল। তার মাথায় চোট্!

পলকের কাণ্ড! তখনি হৈ-হৈ করিয়া চারিদিক হইতে লোক আসিয়া জমিল। মুখে মার্ মার্ শব্দ। বাসের ড্রাইভার নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া একদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। ট্যাক্সির কর্ত্তার সিং ছিট্‌কাইয়া পথে পড়িয়াছে। উঠিয়া দাঁড়া হইবার পূর্ব্বেই দণ্ডোদ্যত পাবলিক্ তাকে মুষ্ট্যাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া দিল। পুলিশ আসিল এবং হরেনকে লইয়া হাসপাতালে যাইবে বলিয়া ধস্তাধস্তি বাধাইল। হরেন শুনিল না, আর একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে চড়িয়া গৃহে ফিরিল।

তার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। কোটেও রক্ত। গায়ে ধুলো...বিশৃঙ্খল মূর্ত্তি!

গৃহে রমা সে-মূর্ত্তি দেখিয়া দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল। কি হইয়াছে?

ইজিচেয়ারে বসিয়া হরেন কহিল—Motor accident!

—কি ক'রে হলো?...ওরে রঘু...শীগ্‌গির জল আন্! আর তুলো। আমার টেবিলের বাঁ-দিককার টানায় নীল কাগজে মোড়া...মোড়াশুদ্ধ আনবি।

রমা পরিচর্য্যায় লাগিল। হরেনের কোট খুলিয়া, জলে আইডিন দিয়া সেই জলে তুলা ভিজাইয়া কপালের রক্তের দাগ তুলিল—রগ বেশ কাটিয়া গিয়াছে!

হরেনকে কহিল—তুলোটা টিপে বসো...আমি আসচি। ওরে রঘু, শীগ্‌গির ষ্টোভ্ জেলে ঐ কেট্‌লি ক'রে জল চড়িয়ে দে। শীগ্‌গির...ভালো জল আনবি কল থেকে ধরে—হাত ধো সাবান দিয়ে...বলিয়া সে গিয়া টেলিফোন ধরিয়া কহিল,—হ্যালো...হ্যালো...yes, Burrabazar 3044...yes, 3044...কে? 3044? ও:—ডক্টর চ্যাটার্জ্জী আছেন? আছেন! তাঁকে একবার ডেকে দিন...শীগ্‌গির। accident case...ডক্টর চ্যাটার্জ্জী · হ্যাঁ, আমি Mrs. Sen, শীগ্‌গির্ আসতে হবে...accident—হাঁ, ওঁর motor accident...ট্যাক্সিতেই আসুন...দেরী করবেন না। আমি ভারী nervous হয়ে পড়েচি। বাড়ীতে আর কেউ তো নেই। আইডিন...হ্যাঁ, আইডিন আর গরম জল মিশিয়ে ধুয়ে দিয়েচি। ইন্‌জেক্‌শন দরকার হবে, বোধ হয়—পথের ধুলো কি না। আচ্ছা, দশ মিনিটের মধ্যেই আসবেন! নিশ্চয়! দেরী করবেন না।

রিসিভার রাখিয়া রমা হরেনের কাছে ফিরিয়া আসিল; কহিল—ডক্টর চ্যাটার্জ্জীকে পেয়েচি। তিনি আসচেন।

হরেন কহিল,—তুমি পাগল হয়েচো, রমা। আইডিন লেপে দিলে চলতো...তা না একেবারে তিলে তাল ক'রে তুললে!

রমার মনে দুর্ভাবনার পাহাড় জমিয়া উঠিয়াছিল। রমা কহিল,—পথের ধুলো লেগেচে কাটা ঘায়ে। আমার এমন ভয় হচ্ছে...

হাসিয়া হরেন কহিল...পাছে টিটেনাস্ হয়?

রমা কহিল,—চুপ করো, বাপু। ভালো লাগে না আমার রসিকতা।

হরেন কহিল—খুব বেঁচে গেছি, রমা। যদি দুটো গাড়ীর চাপে পিষে যেতুম!...

রমার চোখ ছলছলিয়া উঠিল। সে ভীষণ দৃশ্য-কল্পনা করিয়া সে শিহরিয়া কহিল,—শিখ ড্রাইভার ছিল ট্যাক্সিতে?

—হ্যাঁ।

রমা কহিল—তোমার না বারণ ক'রে দিয়েচি, শিখ ট্যাক্সি-ড্রাইভারের ট্যাক্সিতে চড়বে না। তারা ভারী গোঁয়ার···

হরেন কহিল,—চুপ! ওতে defamation হয়, রমা! একজন গোঁয়ার হয়েচে বলে···

রমা তার কপালে তুলা বুলাইতে লাগিল। রঘু কহিল,—জল গরম হয়েচে।

রমা কহিল—ঐ এনামেলের বড় বাটিটা সাবান দিয়ে ধুয়ে মুছে ওটায় একটু স্পিরিট ঢাল্—ঢেলে সেটা জেলে দে··· disinfect হবে।

রঘু তাই করিল। হরেন কহিল—তোমার উচিত ছিল হাসপাতালে নার্শ হওয়া···

রমা কহিল,—আচ্ছা, যে কাজের যা দস্তর, তা করতে হবে তো!

হরেন কহিল,—এতও জানো! আমি হলে উঠান থেকে একরাশ দুর্ব্বোঘাস তুলে ছেঁচে কপালের কাটা ঘায়ে টিপে দিতুম ··হাঙ্গাম চুকে যেতো। এই দুঃখেই হাসপাতালে গেলুম না···কনষ্টেবলটার কি জুলুম!

রমা কহিল—তা না গেলে আমায় সুখী করা হবে না যে! কি ক'রে হলো এ কাণ্ড, শুনি

হরেন কহিল—বলবার জন্ম আমি আকুল হয়ে আছি, তুমি বলতে দিচ্ছ কৈ!

যা ঘটিয়াছিল, সেটুকুতে প্রচুর রং ফলাইয়া হরেন বেশ একটি কাহিনী গড়িয়া বলিল।

শুনিতে শুনিতে রমা আকাশের যত ঠাকুরকে ডাকিয়া মানত করিতেছিল, হে মা কালী, হে মা দুর্গা, হে হরি, হে নারায়ণ, হে···

বাহিরের দ্বারে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল—সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর চ্যাটার্জ্জীর স্বর—ওরে রঘু···

রমা কহিল,—যা, যা, যা রে রঘু, আগে যা ··ডাক্তার বাবু এসেচেন···

রঘু ছুটিল; এবং অচিরে কক্ষে ডক্টর চ্যাটার্জ্জীর প্রবেশ।

রমা কহিল,—ভালো ক'রে দেখুন। আর, হ্যাঁ, এ্যাণ্টি-টিটানিক ইঞ্জেকশন দিতেই হবে। না হলে আমি স্থির হতে পারবো না।···

ডক্টর চ্যাটার্জ্জী হাসিলেন, কহিলেন,—আগে দেখি···

রমা কহিল,—না, না, না···পথের ধূলো। আপনারা তো বলেন, কাটা ঘায়ে পথের ধূলো মহা অনর্থ ঘটাতে পারে।

হরেন কহিল,—আপনি ব্যবস্থা ক'রে দিন ডক্টর চ্যাটার্জ্জী···গৃহিণী কাল থেকে মেডিকেল কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হোন্···

মুখে ম্লান হাসি···রমা কহিল,—তুমি থামো।

৪

সেবার ইনফ্লুয়েঞ্জার ভারী ধুম। একটু সর্দ্দি···তার পর দেখিতে দেখিতে প্রবল জ্বর, এবং চক্ষের পলক পালটিতে একেবারে নিউমোনিয়া···

রমা অস্থির হইয়া উঠিল, হরেনকে কহিল,—আপিসে ছুটী নাও, বরং। কোথা থেকে শেষে···

হরেন কহিল,—দাদামশায় রোজ আপিসে আসচেন।

রমা কহিল—এই ধূলোই···

হরেন কহিল,—তোমার এই দুশ্চিন্তাই রোগকে আগে ডেকে আনবে।

রমা শিহরিয়া উঠিল। ডক্টর চ্যাটার্জ্জী বলিতেছিলেন বটে, এ-সময় মন হাল্কা রাখিবে, রোগকে ভয় বা রোগের সম্বন্ধে চিন্তা করিবে না···

কিন্তু কি বলিয়া মানুষ দুশ্চিন্তা দাবিয়া রাখিবে, তার হদিশ কে দিবে?···

বাড়ীর পাশে সন্ধ্যার পর সহসা কান্নার রোল উঠিল। রঘু আসিয়া কহিল,—ওদের একটি ছেলে মারা গেল, মা···

বিস্ফারিত-চক্ষে রমা কহিল—কি হয়েছিল?

রঘু কহিল,—ইনফুলজা। দু'বুক একেবারে ভরে গেছলো, মা ··নিশেস টান্তে পারলে না ব'লে ম'রে গেল।

রমা ভয়ে কাঠ! রঘু কহিল,—বেরামটা জোর হচ্ছে··· ছুটকু যে-বাড়ীতে কাজ করে, সে বাড়ীর জামাই বাবু মারা গেছে দু'দিনের জ্বরে।

রমার পায়ের তলায় সারা দুনিয়া দুলিয়া উঠিল। সে যেন চক্ষে দেখিল, আকাশ কাটিয়া গিয়াছে, আর তার মধ্য হইতে একটা প্রকাণ্ড রাক্ষসী দুই হাত বাড়াইয়া দুনিয়ার দিকে তীব্র

বেগে নামিয়া আসিতেছে! কালো কালির মত তার বর্ণ, বিকট হাঁ···ভয়ে রমা চক্ষু মুদিল।

হরেন ডাকিল—কারা এসেচে, ছাখো···

রমা ভাবিল. সেই রাক্ষসীটাই তবে···

হরেনের কাছে সে সরিয়া আসিল।

হরেন কহিল,—একটা ট্যাক্সি থেকে কে নামলেন—মেয়ে আর পুরুষ - চিন্‌তে পারলুম না···

—কে? বলিয়া রমা বারান্দায় ছুটিল। হরেন ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

রমা তখনি ফিরিল; ফিরিয়া কহিল—কাকাবাবু কাকিমা, দেখচি। তুমি বেরিয়ে এসো। দুজনে একসঙ্গে ওঁদের নিয়ে আসি।

দুই জনে গিয়া তাঁদের প্রণাম করিল। কাকাবাবু কাকিমা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কাকিমা বলিলেন,—ভুমুর বিয়ে, মা···হঠাৎ ঠিক হলো। এই সামনের রবিবারে বিয়ে। পরশু গায়ে হলুদ। তোমার না গেলে নয়।

কাকাবাবু কহিলেন,—এর আগে আসবার সময়ও পেলুম না। কাল সকালে কথা ঠিক হলো। কালই দু'পক্ষের আশীর্ব্বাদ সারা গেছে। তার উপর বাজার-টাজার করচি···

কাকিমা বলিলেন,—এই আমার শেষ কাজ। জামাই না গেলে আমার মনে ক্ষোভ থেকে যাবে।

কাকাবাবু কহিলেন,—তোমাদের কাজ। তোমাদেরই সব দেখে-শুনে করতে হবে।

রমা কহিল,—কি দিচ্ছে তারা?

কাকিমা কহিলেন,—আমরা কিছু চাইনি। মেয়েটি চমৎকার। বাপ গরীব, কেরাণীগিরি করে। দেড়শোটি টাকা মাইনে পায়। তোমার কাকাবাবু তো ব'লে দেছেন, মেয়ের হাতে শুধু শাঁখা। ব্যস্। তা ছাড়া আর কিছু দিলে ভারী রাগ করবেন। তারা বলেছিল, বিশ ভরি সোনা, বরের ঘড়ি, ঘড়ির চেন, আংটি, বেনারসী—তা উনি বলেচেন, না, ও-সব কিছু নয়··খবর্দ্দার।

রমা কহিল, - এ কিন্তু অন্যায়। তোমরা তো চাইছো না, বাপু। তারা যদি দেয়? সামর্থ্য-মত দেবার তাদের যদি সখ হয়?

কাকাবাবু কহিলেন,—না রে, বেচারার আর-একটি মেয়ে আছে। সকলেই তো ছেড়ে কথা কবে না। আমি ব'লে দিছি, ও সোনা-দানা রেখে দিন, ছোট মেয়ের বিয়ের দিয়ে সাধ মেটাবেন। বরযাত্রী খাওয়ানোর খরচ আছে তো। সে খরচ এখন এমন হয়েচে যে, তাতে একটা বিয়ে দেওয়া চলে। কুমড়োর ছক্কা, মাছের কালিয়ায় বরযাত্রীর আর মন ওঠে না—তাঁরা চান্ এখন ভেট্‌কি মাছের ফ্রাই, কাটলেট্, চপ, ওম্‌লেট্···নামও অত জানি না, বাপু, তোদের একালের খানার।

হাসিয়া রমা কহিল,—সবাই চায় ভালো খাওয়াতে, কাকাবাবু। বৌয়ের গহনা কি এখানে এলে দেবেন? দান করবেন তাঁরা নিরাভরণা···?

কাকিমা কহিলেন,—আমি বলেছিলুম, আমাদের এখান থেকে গহনা কিছু পাঠিয়ে দাও···

বাধা দিয়া কাকাবাবু কহিলেন,—না, না। তাতে গরীবকে উপহাস করা হয়, ব্যথা দেওয়া হয়, অপমান করা হয়। তিনি দিলেন না, তাই আমি দানের ঘটায় তাক্ লাগিয়ে তাঁকে যেন কৃতার্থ ক'রে দিচ্ছি।

রমা কহিল,—তোমরা কি দিচ্ছ গায়ে-হলুদে?

কাকিমা কহিলেন,—কেবল কতকগুলো পুতুলই দেবো না, খাবার জিনিষ আমি বেশী করেই দেবো। কাপড়-চোপড়, এয়ো-সজ্জা ভালোই যাবে। আর ঘী-তেল, আনাজ-তরকারী—এগুলো বেশী দি···বরযাত্রী তো অল্প যাবে না। এতে যতখানি তাঁদের খরচের সুসার করতে পারি!···

আরো আলাপ চলিল। কাকাবাবু সহসা উঠিলেন, কহিলেন,—রমা, আজ-কাল যেতে না পারিস্ তো পরশু ভোরেই যাস্। তোর না গেলে নয়। তুই গিয়ে গায়ে হলুদের জোগাড় করবি। বাড়ীর মেয়ে···বেলা নটায় গায়ে-হলুদ।

হরেনের দিকে চাহিয়া কাকাবাবু কহিলেন,—তুমিও যাবে, বাবাজী···তোমাদেরই কাজ।

কাকিমা কহিলেন,—যেয়ো বাবা। তোমরা না দাঁড়ালে আমি মহা-ফাঁপরে পড়বো। দু'দিন থাকলেই ভালো হয়। তোমার যদি থাকার সুবিধা না হয়, রমাকে যেন রাখতে পারি। অমত করো না।

কাকাবাবু কাকিমা আর বসিতে পারিলেন না—বহু জায়গায় এখনো যাইতে হইবে। তাঁরা উঠিলেন।

তাঁরা চলিয়া গেলে রমা কহিল,—যেতে হবে, সত্যি। না গেলে ওঁরা মনে ভারী দুঃখ করবেন।

হরেন কহিল,—হুঁ…কিন্তু আমি যাবো সেই বিয়ের দিন…

রমা কহিল,—পরশু আমি যাচ্ছি। সকালেই যাবো। অবশ্য তোমার সব ঠিক-ঠাক ক'রে…কোনো অসুবিধা না হয়!

হরেন কহিল,—কাল কিন্তু কি বলেছিলে, মনে আছে?

রমার মনে পড়িল না। রমা কহিল,—কি?

হরেন কহিল,—নলুদের নেমন্তন্ন করেচো এই রবিবারে।

রমার দুই চোখ যেন ঠিকরিয়া পড়িবে—এমন দৃষ্টিতে সে স্বামীর পানে চাহিল।

রমা কহিল,—লক্ষ্মীট, কাল তুমি সেখানে গিয়ে ব্যাপার বুঝিয়ে নেমন্তন্ন বন্ধ ক'রে এসো। ওদের বিয়ে চুকে যাক, তার পর আনবো। আপিস থেকে ফেরার মুখে যেয়ো! কেমন?

হরেন কহিল,—আচ্ছা।

রমা কহিল,—কালই যেয়ো, ভুলো না।…তাই তো… ভুতুদার জন্য ভালো ধুতি-উড়ানি চাই…আইবুড়ো-ভাতের তত্ত্ব। তা ছাড়া বৌ দেখবো কি দিয়ে? একখানা গহনা, কিংবা শাড়ী…

হরেন কহিল,—গহনাই ভালো। লালবাজারে কিম্বা রাধাবাজারে, নয় তো পার্ক ষ্ট্রীটে ঢের দোকান আছে। কিনো একটা…

রমা কহিল—কি দি, বলো তো?

হরেন কহিল—আমায় ও প্রশ্ন করো না। ও দিকে আমার মূঢ়তার সীমা নেই!

রমা কহিল—আমায় সঙ্গে নিয়ে যেয়ো কালই আপিসের পর বাড়ী এসে…কি বলো? না হলে একেবারে শিরে-সংক্রান্তি ক'রে কোনো কাজ ঠিক নয়।

হরেন কহিল—তাই হবে গো, তাই…

৫

পরের দিন অফিস হইতে হরেন সোজা গৃহে ফিরিল… বৌভাতের জন্য গহনা কিনিতে হইবে। অফিসে বাহির হইবার সময় রমা বলিয়া দিয়াছিল, রাত্রে জিনিষের জৌলুষ চেনা যায় না, তাই বেলা থাকিতে…

রমা সাজিয়া বসিয়াছিল। হরেন আসিতে জলখাবার ধরিয়া দিয়া কহিল,—খেয়ে নাও…দেরী করো না।

হরেন কহিল—কার্ত্তিক এসে ব'সে আছে বাহিরের ঘরে…

কার্ত্তিক বন্ধু। বহুকাল পরে দেখা।

রমা কহিল—এখন বন্ধু নিয়ে বসলে আজ আর জিনিষ কেনা হবে না।

হরেন কহিল,—জিনিষটা না হয় শনিবারেই কিনো। সেদিন সকাল সকাল আপিস থেকে ফিরবো তো…

রমা কহিল—না, না। ও রকম মাথায় মাথায় কাজ আমি কোনো কালে ভালোবাসি না। তা ছাড়া নানা ঘটনা ঘটতে পারে। হয় তো কাকিমা সেদিনও যেতে বলবেন, তা ছাড়া বিঘ্নও ঘটতে পারে।

হরেন কহিল—অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!

রমা কহিল—তাই। আমার মত গৃহিণী পেয়ে বর্ত্তে গেছ! তোমায় হাতের তেলোয় রেখেচি। কোনো দিকে কিছু দেখতে হয় কখনো? সত্যি ক'রে বলো…

—না, তা হয় না। সেজন্য কৃতজ্ঞতার কি আমার সীমা আছে!

—ভারী খোসামুদির কথা জানো! সাহিত্য-সেবা করতে কি না!

বন্ধুবর কার্ত্তিককে ঘুরিয়া আসিতে বলিয়া হরেন রমাকে লইয়া গহনা কিনিতে বাহির হইল…

একটা দামী নেকলেশ কিনিয়া বাড়ী ফিরিল, রাত তখন আটটা বাজিয়াছে।

কার্ত্তিক বাহিরের ঘরে বসিয়াছিল। হরেন কহিল— বেচারী আবার এসেচে গো। টক্ ক'রে একবার শুনে আসি…

রমার কিন্তু প্ল্যান ছিল, কাল সকালেই নিমন্ত্রণে যাইবে, কি সাজে সাজিবে, কোন্ শাড়ীখানা পরিবে, কি গহনা… তারি বিশদ আলোচনা জুড়িয়া দিবে। সে আলোচনায় কত মান-অভিমান—সেই সঙ্গে স্বামীর মুখের সেই কথা… কেন গা, ঐ লাল শাড়ীটা তুমি কেন পরবে না? লাল শাড়ীতে তোমায় যে খাশা মানায়…

স্বামীর মুখে রূপের এই স্তুতিটুকুর জন্য মন তার আজো তেমনি কাঙাল রহিয়া গিয়াছে!

হরেন বাহিরের ঘরে যাইতেছিল, রমা কহিল—নলুদের বাড়ী যাওনি ?

বিবর্ণ মুখে হরেন কহিল,—ঐ যাঃ ! সে যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে ! কহিল,—তা ছাড়া কখন্ যাবো, বলো ? আপিস থেকে সটান বাড়ী ফিরতে বলেছিলে, ফিরেই নেকলেশ কিন্‌তে…

অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া রমা কহিল—তুমি না বলেছিলে, ও ভারটুকু নেবে ! আমি কি লোক পাঠাতে পারতুম না ?

হরেন কহিল—যাবো, ভেবেছিলুম ! কিন্তু তোমার গহনার জন্যই না ..

রমা কহিল—বেশ,…তারা এসে ফিরে যাবে…আমি ব্যাভ্রম হবো !

হরেন কহিল,—আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি…

রমা কহিল—এখনি যাবে কি ক'রে ? তোমার কে বন্ধু এসে ব'সে আছেন…

হরেন বুঝিয়াছিল। এইখানেই রমার যত ভ্রূকুটি ! বন্ধুরা মাতাল, না কি, যে তাদের সংসর্গে হরেন সময় কাটাইবে, রমা কেন যে তা বরদাস্ত করিতে পারে না… হরেন কিছু বোঝে না ! অথচ তারা দুজনে মুখোমুখি বসিয়াও সময় কাটায় না !…

হরেন ভাবিল, নারী-চরিত্র রহস্যময়ই বটে ! সে কহিল—আমি নলুদের ওখানেই তা হলে চললুম গো…ওদের খপর দেওয়া উচিত।

রমা কহিল—বেশী রাত করো না যেন। আজ ঠাকুর আবার ছুটী চেয়েছিল…একটু সকাল-সকাল যাবে। ওর দেশের কে এসেচে, কালই চ'লে যাচ্ছে…

—আচ্ছা। বলিয়া হরেন নামিয়া গেল।

কার্ত্তিক কহিল—ব্যাপার কি হে ? আমি এসে ব'সে আছি কখন্ থেকে ! বহু সাধনার ধন হয়ে উঠেচো, আজ-কাল ! দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব…

হরেন কহিল—কাজের ঝঞ্ঝাট ভাই, লোক-লৌকিকতা রক্ষা। এসো…একবার যাবো এখন সেই গড়পারের দিকে…

ড্রাইভার গাড়ী আনিল। হরেন কার্ত্তিককে লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক কহিল—আমাদের নতুন বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে। গৃহপ্রবেশও হয়েচে। সেজন্য একটা পিক্‌নিক্ হচ্ছে কাল,… সারাদিন আমোদ-প্রমোদ, খাওয়া-দাওয়া…পুরোনো বন্ধু-বান্ধব মিলে আমাদের বাগানেই পিক্‌নিক্…

হরেন কহিল—সেই পাতিপুকুরে…?

—হ্যাঁ।

পূর্ব্বস্মৃতি হরেনের মনে উথলিয়া উঠিল, তার বিপুল সৌন্দর্য্যে, অপরূপ মাধুর্য্যে ! মাছ ধরা, গান-বাজনা, গাছে চড়া, খাওয়া-দাওয়া, রঙ্গ-রহস্য…জীবনের সে কি মুক্ত অবাধ ধারা !

কার্ত্তিক কহিল—তোমার যাওয়া চাই, নিশ্চয়।

হরেন কহিল,—আমার যে আপিস…

—দাদাশ্বশুরের আপিস্ তো…ছুটী নিয়ো। একদিন বৈ তো নয়।

হরেন ভাবিল, একদিন একটু ছুটী ! ঠিক ! সুবিধাও আছে…রমা যাইবে তার কাকাবাবুর বাড়ী। সে জানিবে না…অফিস-কামাই রমা সহিতে পারে না। ভারী কড়া তার গৃহিণীপনা ! ..

নলুর বাড়ী গড়পারে। নলু হরেনের মাসতুতো বোন্; গড়পারে শ্বশুর-বাড়ী। হরেনের মেসো থাকেন হাজারিবাগে। মাসখানেক হইল নলু সেখান হইতে শ্বশুর-গৃহে আসিয়াছে। হরেন ও রমাকে নলু ভারী ভালোবাসে !

কার্ত্তিক কহিল,—আমি তা হলে গড়পারে গিয়ে কি করবো ? আমায় ওই সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে নামিয়ে দিয়ো…

হরেন কহিল—বসো না, ব্রাদার। সেখানে আমার পাঁচ মিনিট মাত্র সময় লাগবে। তার পর একটু মাঠের দিকে যাবো'খন · কতদিন পরে মুক্তি !

—বেশ।

কার্ত্তিকের নামা হইল না।

গড়পারে হরেন কথা ঠিক রাখিল, পাঁচ মিনিটেই ফিরিল। ফিরিয়া ড্রাইভারকে কহিল—ময়দান চলো…

সোজা আসিয়া কর্পোরেশন ষ্ট্রীট গাড়ী বাঁকিল।…এই পথ দিয়া সিধা একেবারে ময়দান…

বায়োস্কোপের সামনে ভারী ভিড়। গাড়ীতে গাড়ীতে পথ প্রায় বন্ধ।

কার্ত্তিক কহিল,—ওঃ, কত দিন যে বায়োস্কোপে যাইনি ! কি ফিল্ম হচ্ছে ? এত ভিড় ?…

হরেন কহিল—টকি দেখেচো ? খুড়ি, শুনেচো ?

—না। কেমন ?

—খাশা। আমি একবার গিয়েছিলুম।

কার্ত্তিক কহিল,—আজ আছে ?

হরেন কহিল—দেখি···ড্রাইভারকে কহিল,—এম্পায়ারমে চলো।

এম্পায়ারের সামনে ঐ যে মস্ত প্লাকার্ড···শো-বোট্!

হরেন কহিল,—যাবে ? শো-বোট, না, গানের নৌকো। splendid!

কার্ত্তিক কহিল—চলো···

উৎসাহের আতিশয্যে হরেনের মন হইতে ছুনিয়া, ঘর, সংসার, রমা, বামুন-ঠাকুর সব অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। বহু দিন পরে পুরানো বন্ধুর সঙ্গ···পুরানো স্মৃতির উগ্র বিহ্বল নেশা জাগিয়াছিল! ··

টকির পূর্ব্বে ছোট একটা ফিল্মে ঘর-সংসারের ছবি ছিল। নিজের ঘরেরই যেন ছোট একটু ফটো! সে ছবি দেখিয়া হরেনের সহসা খেয়াল হইল, রমা বলিয়াছিল, শীঘ্র ফিরিতে···বামুন-ঠাকুর ছুটী চাহিয়াছে!

কিন্তু কি বলিয়া এখন ওঠে?···রমা রাগ করিবে! অভিমানিনী রমা! হরেনও নিরুপায়! আর এক ঘণ্টা, নয় দেড় ঘণ্টা বড় জোর! দেরী যা হইবার, তা তো হইয়াছেই! ··

ফিল্ম দেখিয়া কার্ত্তিককে সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে নামাইয়া হরেন গৃহে ফিরিল। স্তব্ধ গৃহ···যেন রমার অভিমানের স্পর্শে গৃহও অভিমানে গুম্ হইয়া আছে!

হরেন বিমূঢ়ের মত ঘরে আসিয়া ঢুকিল। রমা বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, খাটের পাশে সেই মশা-মারী ক্যাটলের ধোঁয়া! রমার বুকের উপর একখানা বাঙলা নভেল। রমাকে জাগাইতে হরেনের সাহস হইল না। ঘরের মেঝেয় আসন পাতা ছিল, ঢাকা-চাপা খাবার। মুখ-হাত ধুইয়া সে আসনে বসিল। এ কি···এ যে ছুজনের খাবার! রমা তবে খায় নাই? মুস্কিল বাধিল।

হরেন নিজের ভাগটুকু শেষ করিয়া উঠিল; উঠিয়া মুখ-হাত ধুইল; তার পর রমার অধরপুটে ধীরে ধীরে ··

চমকিয়া রমা জাগিয়া উঠিল,—কহিল,—আঃ...

হরেন কহিল,—খাও গো। অনেক রাত হয়েচে যে। না খেয়ে ঘুমোয় এমন···

রমা স্থির দৃষ্টিতে হরেনের পানে চাহিল, কহিল—তোমার খাওয়া হয়েচে ?

—হয়েচে।

রমা পাশ ফিরিয়া শুইল। হরেন অপরাধ-কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—খাবে না ?

—না।

—রাগ করেচো? কি করবো, বলো ? নলুরা কিছুতে ছাড়ে না ·· কত গল্প! খেতে বলেছিল, তা খাইনি। বললুম, না, তুমি ব'সে আছো। কাল সকালেই আবার বেরুতে হবে···

রমার গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হইল। রমা কহিল—কোনো কৈফিয়ৎ তো আমি চাইনি। কেন শুধু-শুধু এত মিথ্যা কথা বলচো···

—মিথ্যা কথা! হরেন গর্জ্জিয়া উঠিল!

রমা কহিল—নয়? নলুরা এখানে এসেছিল তোমার ওখান থেকে চ'লে আসবার পরেই। তুমি সেই নেকলেশটা ওখানে ফেলে এসেছিলে · সেটা নিয়ে···

নেকলেশ? ওঃ, ঠিক! সেটা হরেনের পকেটে ছিল। নেকলেশের কথা সেখানে উঠিয়াছিল, নলু দেখে; তার পর তার শাশুড়ীকে দেখাইতে যায়, অবশেষে তাড়ার মুখে নেকলেশের কথা ভুলিয়া জামাইয়ের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে হরেন আসিয়া মোটরে চড়ে। এবং এম্পায়ারে···

সেই নেকলেশ ··! লজ্জায় হরেন একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

কোনো কথা না বলিয়া নিঃশব্দে সে বিছানায় শুইয়া চক্ষু মুদিল।

৬

পরের দিন সকাল-বেলা। সাতটা বাজিয়াছে···হরেন তখনো বিছানায় পড়িয়া। রমার ব্যস্ততার সীমা নাই। এ-দিককার ব্যবস্থা পাকা করিয়া তাকে এখনি ছুটিতে হইবে কাকাবাবুর বাড়ী। তাকেই গিয়া গায়ে হলুদের তত্ত্ব সাজাইতে হইবে।

বেশভূষা করিবার জন্ম রমা আসিয়া ঘরে ঢুকিল; হরেনকে বিছানায় দেখিয়া কহিল—ব্যাপার কি! আজ আর উঠতে হবে না?

হরেনের মনে একটা অভিসন্ধি তাল পাকাইতেছিল—কার্ত্তিকের বাগানে পিক্‌নিক্‌…বন্ধুর দল…অফিসে ছুটাটা কি করিয়া…

রমা একে রাগ করিয়া আছে! কাল রাত্রে ঐ অপরাধ, তার উপর আজ অফিস কামাই করিলে…দাদামশায়ের আদর্শ রমার মনে এমন গাঁথিয়া আছে যে, তার এতটুকু এদিক-ওদিক হইবার জো নাই! স্ত্রৈণ হওয়ায় আনন্দ থাকিলেও বিপদও বড় অল্প নয়!…স্বাধীনতাকে এতখানি সে খর্ব্ব করিয়াছে…এ তার খেয়ালও ছিল না!

রমা কহিল—কাল থিয়েটার দেখা হয়েছিল, বুঝি?

হরেন কহিল,—থিয়েটার! তুমিই বলো…বাঙলা থিয়েটারে আমি কখনো যাই!

রমা কহিল—বায়োস্কোপ গো, বায়োস্কোপ!…

হরেন কি বলিতে যাইতেছিল। রমা কহিল—ভোরেই একটা মিথ্যা কথা ব'লে দিনটাকে কালি-মাখা ক'রে তুলো না।

হরেন থামিল, পরে কহিল—শরীরটা কেমন ম্যাজ-ম্যাজ করচে! গলায় এমন ব্যথা · কফ জমে রয়েচে। গলার সে পেণ্টটা আছে? মাথাও একটু ধরেচে…দেখচি। হুঁ!

মাথা ধরা, গলায় ব্যথা…রমা প্রমাদ গণিল। রমার সাহস দুর্জ্জয়, রমা তা জানে। ঘরে চোর-ডাকাত, বা পথে গোরা, মাতাল দেখিলেও ভয়ে তার বুক দমিতে জানে না…কিন্তু রোগ, বিশেষ হরেনের…তার সূচনা জাগিলেই শঙ্কায় তার বুক একেবারে ভরিয়া ওঠে। রমা আসিয়া হরেনের কপালে হাত দিল। কহিল—কৈ, গা তো গরম নয়।

—না। ভিতর কিন্তু যেন পুড়ে যাচ্ছে। মুখটাও কেমন বিস্বাদ! গলাটা ছাখো তো…

রমা একেবারে বসিয়া পড়িল, কহিল—ডক্টর চ্যাটার্জীকে খপর দি…

হরেন কহিল—নাঃ। পাগল হয়েচো তুমি। জেনাস্প্রিণ খাও…আর ঐ স্প্রে আর গলার পেণ্ট!

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে রমা হরেনের পানে চাহিয়া রহিল; পরে কহিল—গায়ে-হাতে ব্যথা আছে?

গা মুড়িয়া ভাঙিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া হরেন কহিল—একটু যেন কেমন ব্যথা বোধ করচি—তবে সামান্তই।

রমার মন অশ্রুর বাষ্পে ভরিয়া উঠিল। সে কহিল—বিচিত্র নয়…রাতে ঠাণ্ডা লাগিয়েচো। এই চারিদিকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে…নাঃ, তোমার জন্তে মাথামুড় খুঁড়ে মরবো আমি। এত সাবধানে রাখি…

কবে সেই বায়োস্কোপে-দেখা হাসপাতালের এক করুণ দৃশ্য রমার চোখের সামনে জল্‌ জল্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। রমা একটা নিশ্বাস ফেলিল। হতাশ্বাসে সে খাটে শয্যা-প্রান্তে বসিয়া পড়িল।

হরেন কহিল—বসলে যে…যাবে না?

—কি ক'রে যাই? এমন শত্রুতা সেধে বসলে…

হরেন কহিল,—এ কিছু নয়। তুমি যাও। আমি সাবধানে থাকবো'খন…অফিসে নয় যাবো না…

রমা স্বামীর পানে চাহিয়া কহিল—তাই করো। আপিস যেয়ো না—সেই ভালো। স্প্রেটা দি। নাও…জেনাস্প্রিণ খাও। আর একটু চা। খুব বেশী খিদে হলে ওভাল্‌টিন্‌ খেয়ো। আর কিছু নয়। আমি রঘুকে ব'লে দিয়ে যাই।…কি করবো? একবার যেতেই হবে—না গেলে নয়, তাই! তা যত শীগ্‌গির পারি, ফিরে আসবো। লক্ষ্মীটি, বিছানা ছেড়ে উঠো না…আমি তোমার মুখ ধোবার বন্দোবস্ত ক'রে দি। তার পর চা খাইয়ে তবে যাবো…

তাই হইল। রমা বারবার নিষেধ করিল,—অফিসে যেয়ো না আজ। আর বিছানা থেকে নড়ো না…লক্ষ্মীটি…আমার কথা রাখবে? বলো—

—তাই হবে।—হরেন আশ্বাস দিল,—বিছানা ছেড়ে উঠবো না…

ভৃত্য-পরিজনকে খুব হুঁশিয়ার সচেতন করিয়া রমা নিমন্ত্রণে বাহির হইল। ঘড়িতে তখন আটটা বাজিতেছে।…

ন'টা বাজিলে হরেন সাজিয়া বাহির হইল। রঘু অবাক! হরেন কহিল,—বড্ড কাজ আছে রে…একবার বেরুতে হবে। ডাক্তার বাবুর ওখানে যাবো। একটা ট্যাক্সি ডেকে দে চট্‌ ক'রে…

ট্যাক্সি আসিলে সেই ট্যাক্সিতে চড়িয়া হরেন বাহির হইয়া গেল।

রমা কিন্তু সেখানে প্রমাদ গণিতেছিল। কেন, খুলিয়া বলি।

গায়ে হলুদের উৎসবে আত্মীয়-কুটুম্ব জমিয়াছিল অনেক-গুলি। তবু চলিয়া গেলে তাঁদের গল্প জমিল এই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা লইয়া…যেমন ভয়ঙ্কর রোগ, তেমনি তার নানা উপসর্গ…

বলাইবাবুর গৃহিণী বলিতেছিলেন,—সেবারে যখন ঐ রোগ এলো…আমরা তখন পাটনায়। কি কাণ্ড, বাব্বাঃ! আমার চোখের সামনে যা ঘটলো! আমাদের পাশের বাড়ীতে গদাধর বাবুরা থাকতো…তা, কর্ত্তার হলো ঐ অসুখ। বিছানায় থাকবে না…ঘরে নয়…বাইরে যেতে চাইবে। পাহারার কড়াকড় পড়লো। বিকারের ঝোঁক আর কি! শেষে রাত্রে সকলে যখন ঘুমে অচেতন, তখন কর্ত্তা সেই রোগের ঝোঁকে ওপর থেকে নেমে গিয়ে রান্নাবাড়ীর কাছে যে পাৎকো-তলা, তারই সামনে প'ড়ে আছে। প্রাণটুকু কখন্ বেরিয়ে গেছে, কেউ জানেও না! ডাক্তার এসে বল্লে, এ রোগে ভেতর যেন জ্বলে যেতে থাকে…সেই জ্বালার চোটে আর কি…সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

হাবুর মা কহিলেন—যা বলেচো, দিদি! আমাদের পাড়ায় ঐ হালদারদের ছেলেটার কি হলো? জোয়ান বয়েস …এই পোড়া রোগে ধরলো। গায়ের জ্বলুনির চোটে বাড়ী ছেড়ে পাড়া ছেড়ে ছেলে হেদোর জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো…দিনে দুপুরে! আহা! দিন-রাত পাখা চালিয়ে চালিয়ে মা-মাগীর সবে একটু তন্দ্রা এসেছিল…

কথাগুলা রমার কাণেও প্রবেশ করিতেছিল। রমার মন একেবারে আকুল হইয়া উঠিল। এমন লক্ষণ! হরেনও যে বলিতেছিল, গায়ের ভিতর যেন জ্বলিয়া যাইতেছে! যদি ঐ জ্বালার চোটে…?

সে উঠিয়া পড়িল। তার গৃহে কি ঘটিতেছে, কে জানে! অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল! কাকিমার কাছে গিয়া সে কহিল—আমি এখনি বাড়ী যাবো কাকিমা…ওঁর অসুখ দেখে এসেচি।

কাকিমা কহিলেন—সে কি মা…নেমন্তন্নর মেয়েরা সব আসচে! তুমি বাড়ীর মেয়ে…

রমা কহিল—আমার মন সুস্থ হচ্ছে না…আমি বাড়ী যাই। যদি দেখি, ভালো আছেন, তা হলে ত সেই ওবেলায় আবার আসবো…

—তাই তো মা—জামাইয়ের অসুখ…জোর ক'রে থাকতে বলতেও পারচি না। তবে আসিস্ মা ঠিক…না এলে আমার মরা মুখ দেখবি ..

—তাই, তাই, তাই হবে, কাকিমা…

রমা বাহির হইয়া পড়িল। সারা গাড়ী বুকের ধুকপুকানির অন্ত নাই! সে শুধু ডাকিতে লাগিল—হে মা কালী, হে হরি…গিয়ে যেন দেখতে পাই…

এত ডাকা সত্ত্বেও কিন্তু হরি বা কালী মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। গৃহে ফিরিয়া রমা দেখে, সর্ব্বনাশ! হরেন গৃহে নাই। কোথায় রে? রঘু কহিল, ডাক্তার বাবুর বাড়ী যাইতেছেন বলিয়া বাহির হইয়াছেন ..

বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে…এখনো ডাক্তার বাবুর বাড়ী? বলিস কি রে হতভাগা? রমা কাঁদিয়া ফেলিল। রঘুকে বলিল,—যা, যা, গাড়ী নিয়ে ছোট্ সব বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী। তারা কেউ আসে নি?

—না মা। কেউ আসে নি।

—কিসে বেরুলেন?

—ট্যাক্সি ডেকে দিতে বললেন আমায়। আমি ডেকে দিলুম। সেই ট্যাক্সি ক'রে…

রমার চোখ কপালে উঠিল! আর্ত্ত স্বরে সে কহিল,—ওরে যা, যা, যা, যা—চারদিকে সন্ধান কর্…বাবুর খোঁজ যে নিয়ে আসবে, তাকে এই গলার হার বকশিস দেবো…

রমা গলার হার দেখাইল। আপিস? না। আপিসে যাইবেন না বলিয়া তো সে নিজেই দাদামশায়কে ফোন্ করিয়া দিয়াছে। তবে? কোথায়? কোথায় গেলেন?

ওগো, রাগ করিয়া গেছ? লুকাইয়া জব্দ করিবে? কালিকার সেই রূঢ়তার পাপে? না, না,…এসো, ফিরিয়া এসো গো, তোমার দুই পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিতেছি।

রমা গিয়া ঠাকুর-ঘরে পড়িল, রাধা-কৃষ্ণের একখানি ছবি দেওয়ালে ঝুলিতেছিল। সেই ছবি মাথায় ঠেকাইয়া বুকে ছোঁয়াইয়া আকুল আর্ত্ত স্বরে রমা ডাকিল,—হে হরি, আমার সর্ব্বনাশ করো না…রক্ষা করো…তাঁকে এনে দাও, এনে দাও, ঠাকুর…আমি তাঁর দাসী, দাসীর মত তাঁর পায়ের তলায় মিশে থাকবো!…

লোক-জন ওদিকে হিমসিম খাইয়া গেল…দাদামশায় আসিলেন, দিদিমা আসিলেন; কাছাকাছি হরেনের যে ক'জন বন্ধু ছিল, তারাও আসিল। সন্ধান চলিল বিষম বেগে। শেষে থানায় অবধি খবর গেল। থানা হইতে হাসপাতালে-হাসপাতালে টেলিফোন, লোক ছোটা…তবু হরেনের কোনো পাত্তা নাই!

রমা কাঁদিয়া দাদামশায়ের পায়ে পড়িল—দাদামশায় ··

দিনের আলো নিবাইয়া সন্ধ্যা আসিয়া ক্রমে নীরবে ধরণীর দ্বারে দাঁড়াইল। স্তব্ধ গৃহ ভীষণ অমঙ্গলের কথা ভাবিয়া যেন শিহরিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে! দাসী চাকরের দল নীরব। বহু সন্ধানেও হরেনের কোনো পাত্তা নাই! হাল ছাড়িয়া আবার হাল ধরার উদ্যোগ চলিয়াছে! সকলে অবাক্! মানুষ কখনো এমন-ভাবে উবিয়া যায়!

রমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বাড়ীময় মহা সোরগোল ·· দ্বারে ডক্টর চাটার্জ্জীর মোটর অবধি আসিয়া উপস্থিত!···

হঠাৎ একখানা ট্যাক্সি ..ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া হরেন গাড়ী হইতে নামিল, ডাকিল,—রোঘো! ··

অন্দরে রঘু এ-ডাক শুনিল, শুনিয়া পাগলের মত ছুটিয়া বাহিরে আসিল।

হরেন কহিল,—গাড়ী থেকে ঐ মাছটা নামিয়ে নে···

মস্ত একটা কাৎলা মাছ ··মাছ ও বাবুকে দেখিয়া রঘুর চক্ষুস্থির! হরেন কহিল,—নে মাছ···এই যে ডক্টর চ্যাটার্জ্জীর গাড়ী! বাঃ! ভালোই হলো। ওঁকে মুড়োটা দিবি। উনি কাৎলা-মাছের মুড়ো ভারী ভালোবাসেন। কিন্তু ব্যাপার কি রে? বাইরে আলো জ্বলে নি ··তোর মাঠাকরুণ ফেরেনি এখনো?···

রঘু কোনো কথা কহিল না। হরেন অন্দরে প্রবেশ করিল—একতলায় জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই!

সে দোতলায় উঠিল, পিছনে রঘু। রঘুর হাতে কাৎলা মাছ! তার ঘরের সামনে বারান্দায় লোকারণ্য! দিদিমা বারান্দায় আসিতেছিলেন, হরেনকে দেখিয়া কহিলেন—এই যে হরেন ··

হরেন কহিল—ব্যাপার কি দিদিমা?

আর ব্যাপার! হরেন ঘরের সামনে আসিল। ঐ যে ডক্টর চাটার্জ্জী···

হরেন কহিল—ডাক্তার বাবু, আপনার পয়ে আজ কত বড় কাৎলা গেঁথেছি, দেখুন! সারা দিন ছিপ নিয়ে কম কশরৎ করেচি ··কার্ত্তিকদের পুকুরে। ওঃ! · কিন্তু···

ডাক্তারের মুখে হাসি! হরেন ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে, সোফায় বসিয়া রমা···অবসন্ন মূর্ত্তি! আর তার পাশে দাঁড়াইয়া দাদামশায়···

দাদামশায় কহিলেন—ঐ ছাখ্ রমা···

রমা চাহিয়া দেখিল—দুনিয়া আবার ধীরে ধীরে আঁধারের পর্দ্দা ঠেলিয়া তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছিল। সেই সঙ্গে হরেনের মুখও···

রঘুর হাত হইতে মাছটা লইয়া হরেন তুলিয়া ধরিল, কহিল—দেখেচো রমা, কত বড় কাৎলা গেঁথেছি আজ··· ছিপে, একলা!

এমন বিপদ! তবু ঘরের মধ্যে হাসির রোল উঠিল। হরেন সে হাসির অর্থ বুঝিল না; কাৎলা মাছ হাতে বিস্ময়-বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নদী-তীরে

কালকে সাঁঝে দাঁড়িয়ে আমি
একূলা স্রোতস্বতীর তীরে
দেখ্‌ছি উধাও উর্ম্মি-লীলা
আত্মহারা অথির-নীরে;
দেখ্‌ছি—সে এক ব্যাকুল টানে
বাড়িয়ে বাহু কূলের পানে,
চাইছে নদী মূল ভেঙে তার
আনতে উতল বুকের তলে;—
কূলের ব্যথায় কালকে তখন
ভেসেছিলাম চোখের জলে।

রাত্রি-শেষে আজ দেখি সে
কূলের ভাঙনখানি
মিশিয়ে নেছে কোন্ অতলে
নদী কখন্ টানি'।
আজকে ত কৈ হয় না ব্যথা?
জাগ্‌ছে কেবল একটি কথা—
মরণ-প্রিয়া, তুমিও যেন
অম্‌নি আমায় মিলিয়ে নিয়ো,
বাজে ব্যথা বাজ্‌বে বুকে,—
ঐ তিমিরে তলিয়ে দিয়ো!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

কালিদাস ও সমুদ্রগুপ্ত (খ)

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এলাহাবাদ-দুর্গের মধ্যে অশোক-স্তম্ভের গাত্রে, দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের বিজিত দেশ-সমূহের যে নামাবলী ক্ষোদিত আছে, তাহার কতকগুলির সহিত কালিদাসের দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ রঘুর বিজিত দেশাবলীর নাম হু-বহু মিলিয়া যায়; অথচ যে মহাকাব্যকে উপজীব্য করিয়া কালিদাসের রঘুবংশ রচিত, সেই রামায়ণে রঘু-দিগ্বিজয়ের নামগন্ধও নাই। এই রহস্য বুঝিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে, কালিদাসের আবির্ভাবকাল এবং ভারতের তদানীন্তন প্রধানতম সম্রাট্গণের পরিচয় আবশ্যক। তখন ছোট-খাটো রাজা-মহারাজরাও সম্রাট্ উপাধি ধারণপূর্ব্বক গৌরব অনুভব করিতেন। এই কারণেই "প্রধানতম সম্রাট্" বলিতে হইল। নতুবা 'ভারত-সম্রাট্' বলিতে একাধিক নৃপতিকে এক সময়ে কদাচ বুঝায় না।

ঐতিহাসিকগণের মতে অবিসংবাদিত-ভাবে কালিদাসের কাল এখনও নির্ণীত হয় নাই। হইবে কি না, জানি না। তবে উক্ত মহাকবির কাব্যাবলীর আভ্যন্তরীণ বর্ণনার এবং ঘটনার সমাবেশ-গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কালে, হয় ত আরও হইবে। কেন না, অদ্যাবধি কালিদাস গ্রন্থাবলীর বিশিষ্ট আলোচনা বা গবেষণা হয় নাই। উহা বিপুল পরিশ্রমসাধ্য। তবুও যতটা পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

কালিদাসের কাল-সম্বন্ধে চারিটি প্রধান মত প্রচলিত:—
১ম—খৃষ্ট-জন্মের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে। ২য়—খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক। ৩য়—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক। ৪র্থ—খৃষ্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতক। ইহার মধ্যে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতকই প্রমাণ-বাহুল্যে অধিকতর বলিষ্ঠ, এবং এই উভয়ের মধ্যে আবার পঞ্চমশতক আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে মুখ্যতম। এখন দেখা দরকার যে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে কাঁহারা ভারত-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন? কালিদাসের সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন।

প্রধানতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে সার্দ্ধ ষষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত গুপ্ত-রাজগণ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে আবার চতুর্থ এবং পঞ্চম শতকই ভারতের উল্লেখযোগ্য সর্ব্ববিধ উন্নতির কাল। গুপ্ত-গণ নামতঃ রাজা থাকিলেও, চতুর্থ শতকের প্রথমাংশে, তদ্বংশীয় এক জন শক্তিশালী নৃপতি, প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত লিচ্ছবি-বংশের কুমারদেবী-নাম্নী এক রাজ-কুমারীর পাণিপীড়ন পূর্ব্বক, বহু সহায়-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, চন্দ্রগুপ্ত নাম গ্রহণ করেন এবং মগধে বিপুল আধিপত্যস্থাপনে সমর্থ হন। ইতিহাসে ইনিই 'প্রথম চন্দ্রগুপ্ত' নামে অভিহিত। এক হিসাবে ইনিই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা। লিচ্ছবি-রাজকুমারীর বৈবাহিক সম্বন্ধ যে সমস্ত অভ্যুদয়ের একমাত্র হেতু, ইহা সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত অতি শ্লাঘার সহিত খ্যাপন করিয়া পরম গৌরব অনুভব করিতেন। এমন কি, তাঁহার রাজকীয় মুদ্রাদিতে কুমারদেবীর প্রতিমূর্ত্তির সহিত নিজ মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়াছিলেন।

উক্ত চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর, খৃষ্টীয় ৩৩০ অব্দে তদীয় পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। অশোক এবং হর্ষবর্দ্ধন ব্যতিরেকে সমুদ্রগুপ্তের মত শক্তিশালী সম্রাট্ ভারতে অতি কমই জন্মিয়াছিলেন। যুবরাজ সমুদ্রগুপ্ত পিতৃসিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই কিছুকালমধ্যে, মগধ-সাম্রাজ্যের উপান্তবর্ত্তী নৃপতিগণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া লন, এবং পরে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতের বহির্ভূত রাজ্য-সমূহেরও অধিকাংশ জয় করেন। খৃষ্টীয় ৩৩০ অব্দ হইতে ৩৮০ অব্দ পর্য্যন্ত সমুদ্রগুপ্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার তিরোধানের পর তদীয় পুত্র, পিতামহের ন্যায় চন্দ্রগুপ্ত নাম ধারণ পূর্ব্বক ৩৮০ অব্দে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন এবং বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন। ইতিহাসে ইনিই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। ইঁহার মৃত্যুর পর, ৪১৫ শতকে পুত্র কুমারগুপ্ত রাজা হন। দক্ষতার সহিত সাম্রাজ্যশাসন পূর্ব্বক, ৪৫৫ শতকের প্রথমাংশে কুমারগুপ্ত গতায়ু হইলে, তদীয় পুত্র স্কন্দগুপ্ত সম্রাট্ হন, এবং বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন। এক হিসাবে ইনিই গুপ্ত-রাজ-বংশের উল্লেখযোগ্য শেষ সম্রাট্। কেন না, পরে যদিও কতিপয় গুপ্ত-ভূপতি পর্য্যায়ক্রমে সিংহাসনে বসিয়াছিলে

বটে, কিন্তু সে সকল নামতঃ মাত্র। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি শক্তিশালী রাজন্তবর্গ বিপুল আয়াসে যে বিরাট্ গুপ্তসাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, স্কন্দগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের শেষ সময় হইতেই তাহাতে ভাঙ্গন ধরে, এবং পরবর্ত্তী কতিপয় সম্রাট্-নাম-ভূষিত গুপ্ত-ভূপতির সময়ে ধীরে ধীরে তাহা একবারে ভূমিসাৎ হয়। স্কন্দগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য ৪৮০ শতক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে পঞ্চম শতকের শেষ-ভাগ পর্য্যন্তই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সুদিন। স্কন্দগুপ্ত নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তাঁহার পর তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরগুপ্ত ৪৮৫ শতক পর্য্যন্ত, এবং পরে পুরগুপ্ততনয় নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য ৫৩৫ শতক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে নরসিংহ-তনয় দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।—এই স্থানেই প্রথম চন্দ্রগুপ্তের বংশধারার বিলোপ ঘটে। পরে, মগধে যদিও আর এক গুপ্তবংশের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গুপ্ত-রাজবংশের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বোক্ত ঐ গুপ্ত-সম্রাট্-দিগের সময়ে জ্ঞানের চর্চ্চায়, কলার চর্চ্চায়, সর্ব্বাংশে ভারত তখন শিক্ষা-দীক্ষার চরম চূড়ায় আরূঢ়। পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকের কালিদাস, শূদ্রক, চতুর্থ শতকের বিশাখদত্ত, পঞ্চম শতকের শেষভাগের ভুবন-বিখ্যাত আর্য্যভট্ট, পঞ্চমের প্রথমাংশের বরাহমিহির প্রভৃতি মনীষিগণ এই গুপ্ত-ভূপতিগণের রাজত্ব-কালেই ভারতবর্ষ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে গুপ্ত-রাজত্বের প্রথমভাগে, বর্ত্তমান আকারে মনুসংহিতা নিবদ্ধ, এবং পুরাণনামা গ্রন্থরাজির মধ্যে অবিসংবাদে প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকৃত বায়ুপুরাণ নির্ম্মিত। এখন ক্রমে যে সমুদয় হর্ম্ম্যের সন্ধান মিলিতেছে, তাহাতে মনে হয়, স্থাপত্য-শিল্পেও ভারত তখন চরম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হায়দ্রাবাদের অজন্তার পাষাণ-বক্ষে ক্ষোদিত অপূর্ব্ব চিত্রাবলী, ঐতিহাসিকগণের মতে খৃঃ পূঃ দুই শতক হইতে খৃষ্টীয় ছয় শতক পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে নির্ম্মিত। গুপ্ত-সম্রাট্গণের উৎসাহদান ও অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষকতার ফলে তখন ভারতবর্ষ সর্ব্ববিষয়েই—"বর্ত্তি সর্ব্বোপরি"। এমনই মাহেন্দ্রক্ষণে, ভারতের এমনই সর্ব্বতোমুখী উন্নতির যুগে মহাকবি কালিদাসের জন্ম হয়। তাঁহাকে অনেকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের লোক বলিয়া থাকেন; কিন্তু বর্ত্তমানে বহু গবেষণার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কালিদাস পঞ্চম শতকে জন্মিয়া গুপ্তগণের মালবরাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী উজ্জয়িনীর রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য ৩৮০ শতকে গুপ্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া উজ্জয়িনী জয় করেন। উজ্জয়িনী স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষের এক অতি প্রধান স্থান। যিনি সম্রাট্ হইতেন, তাঁহার প্রথম এবং প্রখর দৃষ্টি পড়িত উজ্জয়িনীর উপর। বিশ্বনাথের কৃপায় বারাণসীর ন্যায়, মহাকালের কৃপায় উজ্জয়িনী চিরদিনই হিন্দুমাত্রের পরম পবিত্র তীর্থস্থান ও অপরিহার্য্য আকর্ষণক্ষেত্র। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্যও উজ্জয়িনী উত্তরভারতের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সুতরাং হিন্দু-সম্রাট্মাত্রেই, উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপন করিতে পারিলে, নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন।

চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী বিজয় করিয়া বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। খৃষ্টীয় ৪১৩ অব্দে তাঁহার কাল হয় এবং তদীয় পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ৪ শত ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কালিদাস চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের শেষাংশ, অর্থাৎ চারিশত তিন, চারি বা পাঁচ সাত অব্দ হইতে কুমারগুপ্তের সমগ্র রাজত্বকাল অর্থাৎ ৪৫৫ অব্দ পর্য্যন্ত, এবং হয় ত বা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বেরও কিছুকাল পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীর রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ৪৫৫ অব্দ হইতে ৪৮০ অব্দ পর্য্যন্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্কন্দগুপ্ত ও তদীয় পিতামহ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কালিদাসের ভাগ্যে উজ্জয়িনীর রাজ-তক্তে দুই জন বিক্রমাদিত্যের বিভূতিদর্শন ঘটিয়াছিল, এবং কালিদাস তিন জন গুপ্ত-সম্রাট্ সন্দর্শন করিয়াছিলেন;— চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য। এক কথায়, সম্রাট্ অশোকের পর ভারতে যাহার অধিক গর্ব্বের দিন আর আসে নাই, কালিদাস সেই সময়ে শ্রেষ্ঠ সম্রাট্দিগের রাজসভার অলঙ্কাররূপে বিরাজমান ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়া, তদীয় পৌত্র স্কন্দগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কালের অধিকাংশ সময় পর্য্যন্ত কালিদাস যে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা কবির গ্রন্থাবলী হইতেও সপ্রমাণ হয়।

চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পিতা দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের অবদান-পরম্পরায় কালিদাস স্বীয় রঘুবংশের দিগ্বিজয়ী রাজা রঘুকে যেমন সাজাইয়াছেন, তেমনই চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্তের জন্ম এবং নানা প্রশস্তি-গাথায় বিমণ্ডিত করিয়া, ব্যাজচ্ছলে তিনি কুমারসম্ভব কাব্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শৌর্য্য-বীর্য্যের অপ্রতিম অধিষ্ঠান গুপ্ত-সম্রাট্‌দিগের কুলদেবতা ছিলেন দেব-সেনাপতি স্কন্দ। এই কুলদেবতার নামানুসারেই গুপ্ত-রাজ-পুত্রগণের কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি নামকরণ হয়। কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতির সময়ের রাজকীয় মুদ্রাদিতেও স্কন্দদেবের বাহন ময়ূর ক্ষোদিত থাকিত। উঁহাদের রাজ-সভার প্রধান কবি কালিদাসও ঐ রাজবংশ এবং তাহার গৃহদেবতার বহু প্রশস্তিই যে স্বীয় কাব্যমধ্যে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি দেখিলেই বুঝা যায়। অথবা শুধু কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের উল্লেখ এবং স্তুতি করিয়াই তিনি বিরত হন নাই, চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পিতা দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তেরও তিনি প্রচুর সুখ্যাতি করিয়াছেন। তবে তাহা বাচ্যভাবে নহে, ব্যঙ্গভাবে। বাচ্যাতিশায়ী ব্যঙ্গ-ভাবের জন্যই কালিদাসের কাব্যাবলী সর্ব্বোত্তম। চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পিতা সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়া ঐশ্বর্য্যের চরম নিকষোপল অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কালিদাসের রাজা রঘুও দিগ্বিজয়ান্তে "বিশ্বজিৎ" যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বীয় চক্রবর্ত্তিত্ব খ্যাপন করিয়াছিলেন। গুপ্ত কুলের প্রথম সম্রাট্ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত; কালিদাস-বর্ণিত সূর্য্যবংশের প্রথম সম্রাট্ দিলীপের পুত্র সম্রাট্ রঘু। দুই জনেই দিগ্বিজয়ী এবং সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। সমুদ্রগুপ্তের বিজিত দেশাবলীর অধিকাংশই রঘুর বিজিত দেশের সহিত মিলিয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্ত, কুলদেবতা কুমার কার্ত্তিকেয়ের নামানুসারে তাঁহার নামকরণ হয়। রঘুর পুত্রও "কুমারকল্প" কার্ত্তিকেয়ের অনুরূপ, তথা রাজপুত্র কুমারগুপ্তের অনুরূপ। "কুমারকল্পং সুষুবে কুমারম্" এই এক কথায়, কালিদাস, গুপ্ত-রাজ-পুত্রের প্রশস্তি রঘু-পুত্রের জন্মবর্ণনচ্ছলে কীর্ত্তন করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য-তনয় কুমারগুপ্ত যে সর্ব্বাংশে পিতার অনুরূপ হইয়াছিলেন, রঘুতনয়ের সম্বন্ধে "ন কারণাৎ স্বাদ্ বিভিদে কুমারঃ"—এই উক্তিতে তাহাই সূচিত হইয়াছে। শস্য-পালিকা কৃষকপত্নীরা ক্ষেত্রের উপান্তে ইক্ষু-বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া শস্য রক্ষা করিত এবং মুক্তকণ্ঠে গুপ্তভূপতি চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের অশেষ গুণগাথা ও সেই সঙ্গে তদীয় নবকুমার কুমারগুপ্তের কত কীর্ত্তির কথা যে গান করিত, তাহা

ইক্ষুচ্ছায়-নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তু র্গুণোদয়ম্।

আকুমার-কথোদ্‌ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ ॥—(৪র্থ ২০)

কবিতায়, সম্রাট্ রঘুর গুণবর্ণনচ্ছলে, ব্যঞ্জনা-কঞ্চুকে আবৃত করিয়া কবি প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাস যেমন চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত—এই তিন জনের রাজত্বকালে রাজ-কবি ছিলেন, তেমনই তিনি, উক্ত তিন জন সম্রাটেরই নানাপ্রকারে নানা অবদান-পরম্পরার উল্লেখ পূর্ব্বক স্বীয় কাব্যের বস্তু-নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। অথবা শুধু তাহাই নহে, যাঁহার রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার অভ্যুদয়ের সূত্রপাত, সেই চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পিতা সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় এবং অশ্বমেধাদি বড় বড় কীর্ত্তির বর্ণন কালিদাস স্বীয় কাব্যে নিবদ্ধ করিয়া গুপ্তবংশের প্রশস্তি খ্যাপন করিয়াছেন। কালিদাস কর্ত্তৃক রঘুর প্রতি প্রযুক্ত সেই বাচ্যার্থ গুপ্ত-ভূপালগণের পক্ষে বাচ্যাতিশায়ী ব্যঙ্গার্থরূপে প্রযুক্ত হওয়ায় কাব্যের উৎকর্ষ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহার রঘুবংশের—"আসমুদ্র-ক্ষিতীশানাং," "সাগরাম্বরা মহীর অধিপতি" উক্তির লক্ষ্য সসাগরা ধরণীর অপরাজেয় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত। তাঁহার—

"তমুপ্রকাশেন বিচেয়-তারকা
প্রভাত-কল্পা শশিনেব শর্ব্বরী" (৩—২)

উক্তি যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকেই বুঝাইতেছে, ইহা সহজেই বোধগম্য। তাঁহার—

"তস্মৈ সভ্যাঃ স-ভার্য্যায় গোপ্ত্রে গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ (১—৫৫)

এবং "অন্যাস্য গোপ্তা গৃহিণীসহায়ঃ" (২—২৪)

প্রভৃতি নির্দ্দেশে গুপ্ত রাজবংশই বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়। রঘুবংশাদিতে এই প্রকার আরও বহুস্থল পরিদৃষ্ট হয়। নিপুণ-দৃষ্টি পাঠক একটু প্রণিধান করিলেই ধরিতে পারিবেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

বাল্যবিবাহ

য়ুরোপ ও মার্কিণদেশে অবিবাহিতা প্রৌঢ়া-বৃদ্ধার কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু তথায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই বলিয়া ঐ দুই দেশের সভ্যতার খাতার শীর্ষদেশে নাম লেখা আছে; অন্ততঃ প্রতীচ্যের লোকের হিসাবে ইহাই জগতের লোককে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সেখানে যুবক-যুবতীর বিবাহ প্রচলিত, এ দেশে প্রতীচ্যবাসী সংস্কারকামীরা ইহা প্রচার করিয়া থাকেন এবং এ দেশ ঐ পরিমাণে সভ্য ও উন্নত হয় নাই বলিয়া এ দেশ এখনও স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হয় নাই বলিয়া ফতোয়া দিয়া থাকেন।

কিন্তু ইহা যে নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা এবং স্বার্থপর প্রচারকরা যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের উদ্দেশ্যে এই ভাবের মিথ্যা প্রচার দ্বারা ভারতবাসীকে জগতের দৃষ্টিতে হীন ও অসভ্য প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। রয়টার সম্প্রতি নিউইয়র্ক সহর হইতে স্কুল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বার্ষিক বিবরণ সম্বন্ধে জগতে যে সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, গত বৎসর স্কুল-সমূহের ৪ শত ৮৩টি বালক-বালিকা বিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া রেজিষ্টার-বহি হইতে তাহাদের নাম উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। স্কুলের বিবাহিত বালকবালিকাদের মধ্যে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তন্মধ্যে ১টি ১২ বৎসরের, ১টি ১৩ বৎসরের, ২০টি বালকবালিকা ১৪ বৎসরের এবং ৮৩টি ১৫ বৎসরের আছে।

চমৎকার! মহাত্মা গন্ধী যাঁহাকে ভারতের নর্দ্দামাতদারক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই মিস মেয়ো তাঁহার জন্মভূমির এই অবস্থা দেখিয়া চোখে সাঁতার পানি বহান নাই কেন, ভারতবাসী তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে কি? কাচের ঘরে বাস করিয়া অপরের অঙ্গে ঢিল মারিবার সাহস হয় কাহার? যাহার লজ্জা, ভয়, মান নাই—যে কোন গূঢ় স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হয়, তাহারই পক্ষে এমন সাহসিক কার্য্য সম্ভব হয়। প্রয়াগের "পাইওনিয়ার" পত্র মার্কিণের এই বাল্যবিবাহের কথায় বলিয়াছেন, "কোনও জাতিই জগতে নিষ্কলঙ্ক নহে, সকলের সামাজিক সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। এই হেতু মার্কিণ দেশের মিস মেয়ো ভারতকে গালি পাড়িতে পারেন না। মোটের উপর বলা যায়, কেবল মার্কিণ দেশে নহে, বিলাতেও শতকরা ৫০টি বিবাহ অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক-বালিকার মধ্যেই সংঘটিত হইয়া থাকে।" অথচ মিস মেয়ো ভারতের বাল্য-বিবাহকে কি গালিই না দিয়াছেন!

অতুলনীয় প্রতীচ্য

শুনা যায়, নিত্য নূতন sensation অথবা রোমাঞ্চকর ঘটনা না হইলে প্রতীচ্য বাঁচিতে পারে না। জীবনটাই প্রতীচ্যে কেবল দৌড়ঝাঁপ, শান্তি-বিশ্রামের কথা প্রতীচ্যের খাতায় নাই বলিলেও চলে। স্থিত-ভিত ও সংসারী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সেখানে hum-drum life,—সে জীবনের মূল্যই নাই। এই হেতু বিবাহেও বোধ হয় রোমাঞ্চ চাই, নূতনত্ব চাই, একঘেয়ে কোন পুরাতন মামুলি আচার-ব্যবহার নাকি সমাজের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে!

সুতরাং প্রতীচ্যে প্রতিদিনই যে 'রোমাঞ্চ' চাই, না হইলে প্রাণ বাঁচে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই বোধ হয়, সম্প্রতি লণ্ডনের কোন সংবাদপত্রে এই ভাবের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে,—"Ghosts, suites and rooms with board and attendance available in haunted houses. Excellent food. Splendid environment for seances." যখন যে খেয়াল উঠে, তাহাই ফ্যাসান হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহা চরিতার্থ করিতে হাজার হাজার লোক উন্মত্ত হয়। এখন Spiritualism বা প্রেততত্ত্বের আলোচনা বিলাতের লোকের খেয়াল হইয়াছে। বিখ্যাত গোয়েন্দা-কাহিনী-লেখক ডাক্তার কোনান ডয়েলই এই মোহে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং এরূপ বিজ্ঞাপনে বিশেষত্ব নাই।

কানাডার স্বায়ত্তশাসন

কানাডা, দক্ষিণ-আফরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ার্ল্যাণ্ড বৃটিশ উপনিবেশ, ইহাদের মধ্যে সকলেই স্বায়ত্তশাসনাধিকার

উপভোগ করে। বৃটিশ পক্ষ বলিয়া থাকেন, এ সকল দেশ শিক্ষিত ও উন্নত এবং এ সকল দেশে এক জাতি এক ধর্ম্ম আছে বলিয়া ইহা সম্ভবপর হইয়াছে, ভারতে তাহা নাই বলিয়া ভারতকে শীঘ্র স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া সম্ভবপর নহে।

কথাটা কতদূর সত্য, আলোচনা করা যাউক। লর্ড ডারহাম যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই কানাডাকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছিল। অথচ তাঁহার রিপোর্টেই আছে যে, কানাডার অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত ছিল, পরন্তু তাহাদের মধ্যে জাতি ও ধর্ম্মগত বিরোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিন্তু এজন্য লর্ড ডারহাম কানাডাকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিবার প্রস্তাব করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই!

জাপানে শিশুশিক্ষা

এল্লা ডার্লিংটন নাম্নী লেখিকা "ইণ্টার্ণ্যাশান্তাল থিওজফিষ্ট" পত্রের আগষ্ট সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—"চাবুক, বেত, চড় মারিয়া, কাণমলা দিয়া, এমন কি, রূঢ় কথা বলিয়া শিশু ও বালককে শাসন করা জাপানে একবারেই 'চল্' নহে। দৈহিক শাস্তি দেওয়া জাপানী পিতা, মাতা, শিক্ষক বা অন্য অভিভাবকের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ইহা দ্বারা জাপানীরা যে অসাধারণ আত্ম-সংযমের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা জগতে দুর্ল্লভ।"

সত্যই তাই। এমন কোন জাতি নাই, যে জাতির মধ্যে নরনারী শিশুশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া কখনও না কখনও দারুণ অদম্য ক্রোধের বশীভূত না হন। কিন্তু এই ক্রোধকে দমন করাই মনুষ্যত্ব। মিষ্ট কথায়, নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা, সৎ-শিক্ষা দ্বারা শিশুকে প্রথমাবধি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে অল্প-সময়ে যে ফল হয়, তাহা অন্য পথে হয় না। ইহার প্রমাণ পদে পদে ব্যবহারিক জীবনে পাওয়া যায়। জাপ জাতির মত পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত, রাজভক্ত, দেশপ্রেমিক জাতি জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কর্ত্তব্যবোধ হইলে জাপ নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিয়া থাকে। যদি বেতের শাসনের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া জাপরা এমন শ্রেষ্ঠ জাতির আসনে উন্নত হইতে পারিয়া থাকে, তবে সে শাসনের প্রয়োজন কি? Spare the rod and spoil the child, এ যুগের কথা কি না,সমস্যার বিষয়। অথচ আমাদের দেশের সরকারের ব্যবস্থায় জেলে বেত্রদণ্ডের নিয়ম আছে! মধ্য-ভারতের রামটেক নামক স্থানে দুই জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বন-আইন ভঙ্গ করিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাদের প্রত্যেকের ২৫ ঘা বেতের আদেশ হইয়াছিল। আর করাচীর এক কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক মাদক দ্রব্য পিকেটিং করিতে গিয়া একটা মদের বোতল কাড়িয়া লইয়াছিল বলিয়া ১২ ঘা বেত পাইয়াছিল। আইন ভঙ্গ করা যে অবস্থাতেই হউক, অপরাধ কি না, তাহার বিচার এখানে করিবার প্রয়োজন নাই। এখানে দেখিতে হইবে, দৈহিক শাস্তি মানুষকে পশুর পদবীতে নামাইয়া লইয়া যায় কি না? বরং চোর, ডাকাত বা খুনী জুয়াচোর অপরাধীর পক্ষে দৈহিক শাস্তি সমর্থনযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক? তাহারা যে স্তরের লোক এবং যে নীতির অনুসরণ করিয়া জেলে যাই-তেছে, তাহাতে তাহাদের আত্মাকে এইভাবে অপমানিত লাঞ্ছিত করা কি সমাজের পক্ষে শুভকর হইবে? ইহাই সমস্যা।

কাবুলে রাজ্যাভিষেক

গত ১১ই ও ১২ই অক্টোবর হইতে মহা সমারোহে কাবুলের রাজা জেনারেল নাদীর শাহের রাজ্যাভিষেক-উৎসব আরম্ভ হইবার কথা ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে উৎসব স্থগিত রাখা হইয়াছিল। ভারত হইতে যে সকল গায়ক, বাদক, সজ্জাসরবরাহকারক আদির কাবুলে যাইবার কথা ছিল, তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। যে সকল দ্রব্য ভারত হইতে প্রেরিত হইবার কথা ছিল, তাহাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

ইহাতে নানা জনে নানা কথা রটাইয়াছিল। কেহ বলিয়া-ছিল, রাজা নাদীর বাজে কথা বা বাজে আমোদ-প্রমোদের পক্ষ-পাতী নহেন, তাই অনাড়ম্বরে অভিষেকোৎসব সম্পন্ন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। অপরে বলিয়াছিল, আফগানিস্থানের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে বলিয়া মিতব্যয়িতার হিসাবে এইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল। আর এক পক্ষ রটাইয়াছিল যে, আফগানিস্থানে এখনও পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে নাই, কোহিদামানে বাচ্চা-ই-সাকাওএর দল আবার গোলযোগ করি-তেছে। গজনীর দিকেও বিদ্রোহের চেষ্টা হইতেছে। এই হেতু রাজা নাদীর পূর্ব্বে তাহাদিগের দমনে মন দিয়াছেন।

এইরূপ নানা জনরব রটিয়াছিল। পরে কিন্তু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রাজা নাদীরের যোড়শবর্ষবয়স্ক একমাত্র পুত্র প্যারিসে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন, তাঁহারই প্রতীক্ষায় উৎসব স্থগিত রাখা হইয়াছিল। তিনি বোম্বাই হইয়া ২০শে অক্টোবর তারিখে কাবুলে পৌঁছিয়াছেন। তাহার পর রাজ্যাভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তবে এই ব্যাপারে বিশেষ আড়ম্বর করা হয় নাই।

রাজকুমারকে প্যারিস হইতে আনয়ন করিবার আরও এক

বিশেষ কারণ আছে। নাদীর শাহ রাজবংশীয় হইলেও আমানুল্লার মত বংশানুক্রমে সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই, তরবারি হস্তে তিনি নিজের ভাগ্যপথ পরিষ্কার করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন, তাঁহাকে আফগান জিরগা রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। সুতরাং পুত্র বংশানুক্রমে সিংহাসনের অধিকারী এখনও হইতে পারেন নাই। তাই সম্ভবতঃ প্রজাবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য রাজা নাদীর তাঁহাকে কাবুলে আনাইয়াছেন।

—

আয়ার্ল্যাণ্ডের তুলনা

ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার কথায় স্বতঃই আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা আসিয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তির ইতিহাস আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৯১৯-২১ খৃষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডের অবস্থা ভারতের অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছিল, ইতিহাসপাঠকমাত্রেই এ কথা জানেন। পাঁচ বৎসর যাবৎ আয়ার্ল্যাণ্ড ইংলণ্ডের বিপক্ষে বিদ্রোহধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় দল দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডে সাধারণতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ডি ভ্যালেরাকে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিলেন। দুই বৎসরের উপর আয়ার্ল্যাণ্ডে পাশাপাশি দুইটি সরকারের শাসন চলিল। সোজা কথায় তখন আয়ার্ল্যাণ্ডে কোন শাসনই ছিল না, অরাজকতাই দেখা দিয়াছিল এবং সর্ব্বত্র গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমাগত উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হইতে লাগিল, রক্তস্রোতে আয়ার্ল্যাণ্ড ভাসিয়া গেল, দেশ হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা লুপ্ত হইল। এমন কি, সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইল।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ইহার পরে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে দেশের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, দেশ শান্তি, শৃঙ্খলা, সুখ ও তৃপ্তির মুখ দেখিল, আইরিশ জাতি স্বাধীনতা লাভ করিল। এই অঘটন কিরূপে সংঘটিত হইল? কিছুই নহে, কেবলমাত্র মিঃ লয়েড জর্জ্জের একটি কথায় এই আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল। তখন বিলাতে Coalition government প্রতিষ্ঠিত, আর মিঃ লয়েড জর্জ্জ প্রধান মন্ত্রী। তখন লয়েড জর্জ্জ অবস্থা দেখিয়া ডি ভ্যালেরাকে এক পত্রে জানাইলেন যে, ইংলণ্ড আপোষ-বন্দোবস্তে সম্মত আছেন। এই একটিমাত্র রাজনীতিক চালে সাম্রাজ্যের ঘোর বিপদ দূর হইল, আয়ার্ল্যাণ্ড শান্ত হইল। উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ডে (আলষ্টারে) পার্লামেণ্টের উদ্বোধনকালে রাজার বক্তৃতা পঠিত হইল, এই পার্লামেণ্ট ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে গঠিত হইয়াছিল। মিঃ লয়েড জর্জ্জ যে এই বক্তৃতার উৎসস্বরূপ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন তারিখে লয়েড জর্জ্জ, ডি ভ্যালেরাকে যে পত্র দিয়াছিলেন, উহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার পর কয়েকটি আপোষ-বৈঠক বসিল। বৃটিশ সরকার আইরিশ নেতা গ্রিফিথ ও ম্যাকনিলকে কারামুক্ত করিলেন। ৮ই জুলাই তারিখে ডি ভ্যালেরা, লয়েড জর্জ্জের গোলটেবল বৈঠকের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

সুতরাং বুঝা যায়, যদি সত্যই অকপটে এক জাতি অপর জাতিকে বন্ধুত্বের ও মমতার হস্ত প্রসারণ করে, তাহা হইলে অপর জাতি উহা কখনই প্রত্যাখ্যান করে না।

—

সাম্রাজ্য-বৈঠক

লণ্ডনে সাম্রাজ্য-বৈঠক বসিয়াছিল। এই বৈঠকে বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহের মন্ত্রীরা প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকিয়া বিলাতের প্রতিনিধিদের সহিত সাম্রাজ্যসম্পর্কে সলা-পরামর্শ করিতেছিলেন। এখন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কাগজপত্র তৈয়ার হইতেছে।

এই বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা বিধান করা। কিন্তু কানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ বেনেট স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কানাডা বৃটেন ও অন্যান্য উপনিবেশ হইতে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত পণ্য ক্রয় করিতে সম্মত আছে বটে, কিন্তু কানাডার ক্ষতি করিয়া নহে। অন্যান্য উপনিবেশের প্রতিনিধিরাও প্রায় এই ভাবের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং বৃটেনের সংরক্ষণনীতি-গ্রহণে যে বিশেষ ফলোদয় হইবে, তাহা ত মনে হয় না।

তাহার পর সাম্রাজ্য হইতে উপনিবেশ-সমূহের সরিয়া যাওয়ার যদৃচ্ছা অধিকার সম্বন্ধেও উপনিবেশসমূহের মনের ভাব বৃটেনের অনুকূল নহে বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই অধিকার ব্যবহার না করিলেও রাখিতে চাহেন। অথচ বৃটেন উপনিবেশ-সমূহকে নিজের নৌশক্তির দ্বারা রক্ষা করিবার ভার লইয়াও এই অধিকার হইতে উপনিবেশ-সমূহকে বঞ্চিত করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। শেষ পর্য্যন্ত কি হয়, দেখিবার বিষয়।

আশুতোষ-স্মৃতি

মানব-মনের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য মহাপুরুষ-চরিত আলোচনায় সর্ব্বকালে আগ্রহপ্রকাশ। যে সকল গুণে তাঁহারা অনন্য-সাধারণ, যে সকল অবদান-পরম্পরায় তাঁহারা জগতে প্রখ্যাত, তাঁহাদের চরিত্রের যে মহনীয় আদর্শ লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের পুনঃ পুনঃ আলোচনায় ও মননে, তাঁহাদিগকে হৃদ্গত করিয়া লইবার ঐকান্তিক আগ্রহে ও যত্নে, সমাজের অশেষ কল্যাণ ও মহোপকার সাধিত হয়। কেমন করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্যে ও অনুষ্ঠিত কর্ম্মে, ঐকান্তিকতায় ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তায়, দূরদর্শিতায় ও জনহিতকামনায় অসাধারণত্ব প্রদর্শন করেন, মানুষ তাহাই পর্য্যালোচনা করিতে ভালবাসে। বহু সুখদুঃখ, বাধাবিঘ্ন ও কৃতকার্য্যতার অবশ্যম্ভাবী ঘাতপ্রতিঘাতে মনুষ্য-জীবন। ইহাকে নিরবচ্ছিন্ন সুখের স্রোতে পরিচালিত করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সেই জন্যই যাহা অপরিহার্য্য, সেই সকল অসুবিধা ও বিপৎপাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া কেমন ধীরস্থির-চিত্তে তাঁহারা বিঘ্ন-বিপত্তি সহ্য ও উপেক্ষা করিয়া অবিচলিত-পদবিক্ষেপে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছেন ও পরিশেষে কীর্ত্তি-মন্দিরের স্বর্ণচূড়ায় আপনাদের গৌরবমণ্ডিত বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া লোকসমাজের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া-ছেন, তাহা চিন্তা করিতে করিতে প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, ক্রমে কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি জন্মে। অসাফল্যের দুঃখ তাহাকে মুহ্যমান ও ধরাশায়ী না করিয়া বরং দ্বিগুণবলে কর্ম্মক্ষেত্রে ধাবমান হইতে উৎসাহিত করে। পুরাণ-ইতিহাস এই বার্ত্তা বহন করিয়া অমর, কাব্যনাটকাদি উজ্জ্বলবর্ণে এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া আদৃত।

বিদ্যায় ও বিদ্যোৎসাহে, কর্ম্মশক্তিতে ও গুণগ্রাহিতায়, আত্মসম্মানজ্ঞানে ও দেশাত্মবোধে—সকল বিষয়েই স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় এক জন যুগন্ধর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা, তাঁহার কর্ত্তব্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও দূর-দর্শিতা বাঙ্গালী জাতিকে জগতের সমক্ষে সম্মানিত করিয়া দিয়াছে। যে যুগে সকলেরই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিই প্রধান কাম্য, এমন সময়েও তাঁহার আশ্রিতবাৎসল্য অতুলনীয়। বিপন্ন ব্যক্তি কাতর হইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, তাহাকে বিমুখ হইয়া ফিরিতে হইত না। তাঁহার গৃহের দ্বার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য-প্রার্থীর জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। যাঁহারা বৈদেশিক বিদ্যায় সুপণ্ডিত ও তৎসহ কমলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত, তাঁহাদিগকে প্রায়শঃই পাশ্চাত্ত্য আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশুতোষ আহারে-বিহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে, কথাবার্ত্তায়, সর্ব্ববিধ লোকাচারে চিরদিন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন; বাঙ্গালী জীবনের প্রত্যেক জিনিষটিকে তিনি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা লইয়া গৌরব করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না।

প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন যুগপৎ কাব্যে, নাটকে, বৈষ্ণব কবিতার ঝঙ্কারে, বৈষ্ণব দর্শনের ও ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যায়, কীর্ত্তনের সুমধুর সুরে ও খোল-করতালের ধ্বনিতে বঙ্গদেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনই মহা-মনস্বী আশুতোষের আবির্ভাবেও বাঙ্গালী-জীবনের দিকে দিকে আলোকরশ্মি পতিত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, আমাদের কি ছিল, কি হারাইয়া ফেলি-য়াছি, জাতীয় জীবনে আমাদের সেই প্রণষ্ট গৌরব কেমন করিয়া পুনঃ প্রাপ্ত হইব—এই সকল চিন্তা একণে এ দেশবাসীর মন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সেই জন্যই কোন বিরাট প্রতিভাবান্ পুরুষ যখন যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হন, সেই সময় সে জাতির পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বা অতীব সুসময় বলা হয়। উহা সেই মহা-পুরুষের ভাবে, চিন্তাশক্তিতে ও কর্ম্মপ্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অত্যল্পসময়মধ্যে উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া যায় এবং অচিরে অন্যান্য জাতির দৃষ্টি ও লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়ায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন সামাজিক, আর্থিক ও তৎসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নীতির নিদারুণ নিষ্পেষণে বিদ্যার্থী যুবকগণ বিষম নৈরাশ্যে মগ্ন হইয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে-ছিলেন, সেই দুঃসময়ে বুক-ভরা বল ও হৃদয়ভরা সহানুভূতি লইয়া মহাপ্রাণ আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররূপে দেখা দিয়াছিলেন। অল্পদিনমধ্যেই যেন ঐন্দ্রজালিকের করস্পর্শে কিশোর ও যুবকের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, বহু গ্রাম ও পল্লীতে, সহরে ও মহকুমায় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এ দেশবাসিগণের জ্ঞানবিস্তারের অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিল। কত দানবীর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা আশুতোষের হস্তে অর্পণ করিয়া দেশবাসীর উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিলেন। যাঁহারা দেশের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল, তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার এমন প্রচেষ্টা, এমন জীবনব্যাপী প্রাণপাত শ্রম আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। ছাত্রগণের সম্মুখে তাঁহার প্রাণের দ্বার খুলিয়া যাইত। তাহাদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণে ও তাহার ব্যবস্থা করিতে তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। তাঁহারা মানুষ হইবেন, তাঁহাদের জ্ঞানের বিমল প্রভায় দিগন্ত আলোকিত

হইবে, তাঁহাদের যশের সৌরভ দেশবিদেশে পরিব্যাপ্ত হইবে—এই ছিল আশুতোষের জীবনের এক শ্রেষ্ঠ কল্পনা। বাস্তবিক, ছাত্র-সম্প্রদায় আশুতোষের ন্যায় এমন নিয়ত হিতকামী সুহৃদ আর কখনও পাইবেন কি না জানি না।

প্রত্যেক দেশেই কালসহকারে ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হয়। যিনি স্বীয় শক্তিবলে সেই তরঙ্গের উদ্দামগতি সংযত করিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন, তিনি অসাধারণ পুরুষ সন্দেহ নাই। আশুতোষ, তাঁহার বাল্যের স্বপ্ন, যৌবনের আকাঙ্ক্ষা ও পরিণত বয়সের কর্ম্মক্ষেত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক নীতির পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতে অনুসন্ধিৎসা ও মৌলিক গবেষণার অভিনব ভাবধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যাহা নিজস্ব, সেই দার্শনিক চিন্তা।

স্থাপত্য ও কলাবিদ্যা, ভারতীয় জ্যোতিষ, প্রাচীন গণিত, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও চিন্তার ধারা এবং এতৎসম্পৃক্ত বিষয়-নিচয়ের সম্বন্ধে শেষ কথাটি তিনি কোন ভিন্নদেশীয়ের মুখ হইতে শুনিতে চাহেন নাই। তাঁহার আশা ছিল, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যার আদর্শ কেন্দ্ররূপে গঠিত করিবেন, তাঁহার পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের অধ্যাপকগণের মৌলিক গবেষণা পৃথিবীর জ্ঞানবৃদ্ধির হেতুভূত হইবে, এবং দেশবিদেশ হইতে বিদ্যার্থিবৃন্দ নব নব জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করিবে ও অধ্যয়ন করিয়া চরিতার্থ বোধ করিবে। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সে কল্পনা অর্থাভাবে বাস্তবে পরিণত হইল না।

যে সকল যুবকের কখনও নিজের অর্থে বা চেষ্টায় য়ুরোপ বা আমেরিকা যাইবার সম্ভাবনা ছিল না, তিনি তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিয়া,অর্থ-সাহায্য করিয়া তাঁহার চিরপোষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত মানুষ করিয়া আনিয়াছিলেন। যাঁহার ১২ বৎসর বয়সের লেখা মৌলিক গবেষণা-সম্বলিত প্রবন্ধগুলি কেম্ব্রিজের বিখ্যাত পত্রিকা Messenger of Mathematicsএ প্রকাশিত হইয়াছিল, যিনি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীকে অনেক নূতন তথ্য ও জ্ঞান দিয়া চির-যশস্বী হইতে পারিতেন, যাঁহার যৌবনের প্রবন্ধমধ্যে কয়েকটি আজিও গণিতশাস্ত্রের প্রধান স্থান কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি সেই গৌরবময় পথে এ দেশের শিক্ষিত যুবকদিগকে ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং পশ্চাৎ হইতে তাঁহাদিগকে আশা, সাহস ও অর্থ দিয়া ঐ পথে অগ্রসর হইতে অবিশ্রান্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার তরুণগণের নিমিত্ত এ মহান্ স্বার্থত্যাগ আশুতোষকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

আশুতোষের স্বদেশপ্রীতি ও বঙ্গভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বদেশের ধূলি তাঁহার দৃষ্টিতে স্বর্ণরেণুবৎ প্রতীয়মান হইত। ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বাঙ্গালা ভাষার লেখকগণ তাঁহার নিকট নানাপ্রকার উপদেশ, উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। আশুতোষ যখন ২৬ বৎসরের যুবকমাত্র, তখনই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স হইতে এম, এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষা প্রচলন করাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ দেশের বহু বড় বড় লোকের বিরুদ্ধতায় তৎকালে সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়। কিন্তু কোনও বিষয়ে নিরুৎসাহ বা ভগ্নোদ্যম হওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। যুবক আশুতোষ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, বঙ্গভাষার যে দৈন্যের নিমিত্ত তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় প্রবর্ত্তিত না হইলে তাহার সে দৈন্য ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, জগৎকে দূরে রাখিয়া বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া ঊর্ণনাভের ন্যায় স্বনির্ম্মিত কল্পনাজালের উপর অবস্থিত হইয়া মুদিতনেত্রে সুখ বা উন্নতির আশা করা বাতুলতা মাত্র। জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত, মনুষ্যত্বের মহিমায় মণ্ডিত, অন্যান্য জাতির অভ্যুদয় দেখিয়া স্বজাতির তদ্রূপ উন্নতি দেখিবার জন্য আশুতোষের চিত্ত চিরদিন লালায়িত ছিল। কি স্বদেশে কি বিদেশে কোন ছাত্রের কৃতিত্বের সংবাদ পাইলে তিনি আনন্দে অধীর হইতেন। তাহাকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া, তাহার সহিত আলাপ করিয়া, তাহার কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া তবে স্থির হইতেন। অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তিপ্রভাবে আশুতোষ বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক কৃতী ছাত্রকে চিনিতেন। শুনিতে পাই, স্পর্শমণির সংস্পর্শে ধাতুই স্বর্ণে পরিণত হয়, চক্ষুতে দেখিয়াছি, আশুতোষ তাঁহার সংস্রবে আনিয়া বহু বিভিন্ন ধাতুকে সোনা করিয়া গিয়াছেন।

আশুতোষকে কর্ম্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি ২৪ বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন, ৪০ বৎসর বয়সে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন, ৪২ বৎসর বয়সে প্রথমবার Vice-chancellor নিযুক্ত হন। কি স্কুলে পড়ার সময়, কি কলেজে অধ্যয়নকালে, কি হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিয়া, কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ব্যক্তিরূপে তিনি যত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার তালিকা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বর্ত্তমান লেখকের প্রশ্নের উত্তরে আশুতোষ বলিয়াছিলেন, '১৬ ঘণ্টা দৈনিক পরিশ্রম না করিলে আশুতোষ মুখার্জ্জি হওয়া যায় না, ১৬ ঘণ্টা তার পর

দৈনিক পরিশ্রম না করিলে সেই সম্মানিত স্থান রক্ষা করাও যায় না। অতৃপ্ত জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহায় প্রণোদিত হইয়া আশুতোষ মৃত্যু-কালে স্বগৃহে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যে সংগৃহীত বিশাল গ্রন্থাগার রাখিয়া গিয়াছেন।

সতত নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও আশুতোষ বাঙ্গালা ভাষাকে ভুলিয়া যান নাই। তিনি অনুকূল মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহু বৎসর পরে যখন সেই শুভমুহূর্ত্ত সত্য-সত্যই উপস্থিত হইল, তখন প্রবেশিকা হইতে এম-এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার পরীক্ষা গৃহীত হইবে, এই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার ফলে অনতিকালমধ্যেই বিবিধ বিষয়ে বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গ-ভারতীর পাদপীঠ সমুজ্জ্বল রত্নরাজিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

আশুতোষের চরিত্রালোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা চোখে পড়ে। সাধক যেমন জগতের সমস্ত পদার্থ হইতে ইন্দ্রিয়-সমূহকে নিরোধ পূর্ব্বক মনকে একলক্ষ্যে পরিচালিত করিয়া ঈপ্সিত ফল লাভ করেন, আশুতোষও তেমনই একান্ত আগ্রহে, অত্যন্ত যত্নে ও অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে সঙ্কল্পিত বিষয়ের সাধনা করিতেন।

বৃথা চিন্তা কিংবা অযথা ভয় তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে রেখামাত্র বিচলিত করিতে পারিত না। ব্যষ্টি কিম্বা সমষ্টি যে ভাবেই হউক, কোনরূপ প্রতিকূলতাই তাঁহাকে কখনও কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। আশুতোষ কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির গৌরবান্বিত আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ বিদ্যার অধিকারী হইয়া তাহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে বহুকাল উচ্চশিক্ষাতরণী সুপরিচালিত করিয়া গিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন বহু সোসাইটী, কমিটী, সভাসমিতির কর্ণধাররূপে তাহাদিগের প্রকৃত উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। হাইকোর্ট কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়, তিনি যখন যে স্থানে যাইতেন, তাঁহার আগমনে সেই স্থান বহুকর্ম্মচঞ্চল হইয়া উঠিত। কি পারিবারিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য, শিষ্টাচার, সদয় ও সুমিষ্ট ব্যবহার বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

শক্তিমানের সম্পর্কিত না হইলে কোন্ বস্তুর কি শক্তি, তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। যে মন্ত্র আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঋষির মুখে সজীব, সেই মন্ত্রই এক জন সাধারণ লোকের মুখে উচ্চারিত হইয়া কোনই ফলপ্রসূ হয় না। আশুতোষের মুখে উচ্চারিত হইলে শব্দের কত শক্তি—শব্দই ব্রহ্ম—বুঝিতে পারা যাইত। সিনেট সভায় তাঁহার মুখোচ্চারিত একটি শব্দ-প্রভাবে কত বক্তা বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তন্মুহূর্ত্তে বসিয়া পড়িতেন। তাঁহার একটি বাণীতে ব্যথিতের, উৎপীড়িতের ও উপায়বিহীনের হৃদয়ে নিরাশার মেঘে আশার বিজলী খেলিত।

কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রাঙ্গণে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন,—

"যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।"

গীতা, ১০ম অধ্যায়, ৪১ শ্লোক।

অর্থাৎ যাহা কিছু শ্রীমান্, যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা তেজোময়, তাহার সমস্তই আমার অংশ হইতে উৎপন্ন হই-য়াছে বলিয়া বুঝিবে। ক্রমাগতই মনে হয়, ভগবানের বিশেষ কৃপা ব্যতীত এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্নতা, এরূপ ঐশ্বর্য্য, তেজ ও জ্যোতির একত্র সমাবেশ ও প্রকাশ কি সম্ভবপর? এমন বিরাট শৌর্য্য ও ধৈর্য্য, এমন তেজোদৃপ্ত বিক্রান্ত মূর্ত্তি, এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ, এমন সার্ব্বজনীন সমভাব, এমন নিরালস্য ও নিরহঙ্কার, এরূপ পরদুঃখে কাতরতা ও তন্নিবারণে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস জগতের ইতিহাসে বিরল। এই মহৎ গুণসমূহ আশুতোষকে চিরদিন বাঙ্গালী জাতির আদর্শপুরুষ করিয়া রাখিবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক (এম, এ)।

বিদায়-বাণী

(উপন্যাস)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাগবাজারে

আজ শনিবার, গৃহিণী রাজী হইয়াছেন, সুতরাং রামজীবন বাবু আজ সন্ধ্যায় স্ত্রী-পুত্র সহ বালিগঞ্জে বোস সাহেবের গৃহে ডিনারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন।

বাগবাজার হরকান্ত মুন্সীর লেনে অবস্থিত এই দ্বিতল গৃহখানি রামজীবন বাবুর নিজস্ব—ইহা তাঁহার পিতামহ নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সদর-দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণে ও বামে দুইখানি সুপরিসর বৈঠকখানা-ঘর, তার পর তিন দিকে টানা বারান্দাযুক্ত বিস্তৃত অঙ্গন, অঙ্গন-শেষে ঠাকুর-দালান। ঠাকুর-দালানের পশ্চাতে অন্তঃপুর-মহল। পিতামহ মহাশয় শক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। প্রতি বৎসর ৺দুর্গা ও ৺কালীপূজা করিতেন। মাথাভরা চুল ও মুখভরা দাড়ী, গলায় রুদ্রাক্ষমাল্য, রক্তাম্বর-পরিহিত, স্থূল-কলেবর পিতামহ মহাশয়ের সেই মূৰ্ত্তি—প্রতিমার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া করযোড়ে গলদশ্রুলোচনে "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন—সে দৃশ্য রামজীবন বাবুর আজিও বেশ মনে পড়ে। তাঁহার জন্মের পর পিতামহ ছয় সাত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। পিতার আমলেও কয়েক বৎসর দুর্গাপূজা চলিয়াছিল; কিন্তু মাঝে কয়েক বৎসর রামজীবন বাবুর পিতার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া যাওয়াতে পূজাটি বন্ধ হইয়া যায়।

রামজীবন বাবুর আপিস শনিবারে বেলা দুইটায় বন্ধ হয়। আজ আড়াইটার সময় আপিস হইতে ফিরিয়া, ধড়া-চূড়া ছাড়িয়া, একগ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করিয়া, গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া রামজীবন বাবু শয্যায় শয়ন করিলেন। খাটের উপর বিদ্যুৎ-পাখা মৃদুবেগে ঘুরিতেছে, তামাক খাইতে খাইতে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল, নলটি হাত হইতে পড়িয়া মেঝের উপর লুটাইল।

রামজীবন বাবু সগর্জ্জনে দেড় ঘণ্টাকাল নিদ্রা-সুখ উপভোগ করিলেন। ঘুম ভাঙ্গিলে দেওয়ালে ঘড়ীর পানে চাহিয়া দেখিলেন, বেলা প্রায় সাড়ে চারিটা হইয়াছে। শয্যা হইতে নামিয়া মুখ-হাত ধুইবার অভিপ্রায়ে বাহির হইয়া দেখিলেন, কলঘরের বাহিরে বারান্দার প্রান্তে গৃহিণী মাথার কাপড় খুলিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, নাপিতানী জলের ঘটী লইয়া তাঁহার পায়ে ঝামা ঘষিতেছে। স্বামীর পদশব্দে চমকিয়া গৃহিণী সেই দিকে চাহিলেন এবং তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় তুলিয়া দিলেন। রামজীবন বাবু কলঘরে ঢুকিয়া মুখে চোখে জল দিয়া, ঝিকে তামাক সাজিতে বলিয়া পুনরায় শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

ইজি-চেয়ারে পড়িয়া রামজীবন বাবু ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় গৃহিণী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গৃহিণীর বয়স চল্লিশের উপর উঠিয়াছে, রংটি বেশ পরিষ্কার, দেহখানি স্বামীরই অনুরূপ স্থূলতা-প্রাপ্ত, অতিরিক্ত পাণ-দোক্তা সেবনে দাঁতের মাঝে মাঝে কালো ছোব ধরিয়াছে। গৃহিণী প্রবেশ করিতেই তাঁহার পদযুগলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রামজীবন বাবু বলিলেন, "হাঁ গা, তুমি আলতা পরলে যে?"

গৃহিণী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "পর্‌বো না? সধবা মানুষ, আলতা পর্‌বো না? ও কি অলুক্ষণে কথা তোমার?"

"আজ সন্ধ্যেবেলায় বালিগঞ্জে নেমন্তন্নে যেতে হবে, মনে নেই?"

"কেন মনে থাক্‌বে না? তাতে হয়েছে কি?"

"ওরা বিলেত-ফেরত কি না, দেখে যদি মনে মনে হাসে, তাই বল্‌ছিলাম।"

"মেমসাহেবরা যদি হাসেন ত হাসবেনই। তাতে আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে না গো!"

নীরবে গুড়গুড়িতে দুই চারি টান দিয়া রামজীবন বাবু বলিলেন, "তা আজ পরেছ, পরো। কিন্তু ছেলে চল্ল বিলেত, বউ আসছে বেথুনে পড়া, তায় আবার বিলেত-ফেরতের মেয়ে, ও সব বর্ব্বর প্রথা ক্রমে তোমাকে ছাড়তে হবে—বিশেষ, কোথাও যেতে আসতে হ'লে।"

গৃহিণী বলিলেন, "হোক বর্ব্বর প্রথা। বর্ব্বর প্রথাই আমার ভাল। ওগো, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, এই বর্ব্বরনী

যখন নিমতলায় যাবে, তখন দু'পায়ে খুব পুরু ক'রে আলতা পোরেই যেন যেতে পারে।"

রামজীবন বাবু সহাস্তে বলিলেন, "আর সীঁথেয় এক মুঠো সিঁদুর মেখে ত? আচ্ছা, সেই আশীর্ব্বাদই তোমায় করা গেল।"

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া, স্বামীর পদযুগল স্পর্শ করিয়া সেই হাত মাথায় বুলাইয়া বলিলেন, "দেখো, কথা যেন ঠিক থাকে।"

রামজীবন বাবু বলিলেন, "চেষ্টার কসুর হবে না। তুমি একবার নীচে গিয়ে, বামুন ঠাকুরকে চায়ের ব্যবস্থা করতে ব'লে এস। তার পর, একটু পরামর্শ করা যাক্।"

"কি বিষয়ে?"

"এই—ওখানে যাওয়া সম্বন্ধে।"

"আচ্ছা"—বলিয়া গৃহিণী নীচে চলিলেন। কর্ত্তা তামাক-ছিলিমটা শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে রামজীবন বাবু চা পান করিতে করিতে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি বোস্ সায়েবের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কইতে পারবে ত?"

গৃহিণী। তা কি আমি পারি? আমি ত আর স্বাধীন জেনানা নই যে, সবাইর সামনে বেরুব, সবাইকের সঙ্গে কথা কইব?

কর্ত্তা। তা হ'লে তোমায় কিন্তু তারা অসভ্য মনে করবে।

গৃ। কেন, তারা কি জানে না যে আমরা ব্রাহ্মও নই, খৃষ্টানও নই, আমরা হিন্দু ঘরের বউ? জেনে শুনেই ত মেয়ে দিচ্ছে।

ক। না, আমি কি বলছি যে, তুমি গিয়ে বোস্ সায়েবের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড ক'রে ফর্‌ফর্ ক'রে কথা কইবে, গল্ গল্ ক'রে হাসবে? শুধু মুখের ঘোমটা তুমি তুলে থাকবে, মাঝে মাঝে এক আধটা কথা কইবে, বাড়ীর ভিতরে আড়ালে না ব'সে, আমরা যেখানে থাকবো, তুমিও আমাদের কাছে ব'সে থাকবে। এটুকু আর পারবে না? এ আর শক্ত কি?

গৃ। সে কিন্তু আমার ভারি লজ্জা করবে। আমি ত তাদের বাড়ীর মেয়েদের মতন লিখুনে পড়ুনে নই—মুখ্যু মানুষ,—কি কথা কইব আমি তাদের সঙ্গে?

ক। মিসেস্ বোস্ অবশ্য বলেছেন যে, তোমাকে আলাদা আসন পেতে বসিয়ে ফলটল সন্দেশ-টন্দেশ খাইয়ে দেবেন। কিন্তু আলাদা না ব'সে, তুমি যদি ধর, আমাদের সঙ্গে টেবিলে বসেই ঐ ফলটল সন্দেশ-টন্দেশই খাও, তাতেই বা দোষ কি? বল্লেই হবে যে, মাংস-টাংস তুমি খাও না, তুমি ভেজিটেরিয়ান।

গৃ। আমি, ভেজি—কি?

ক। ভেজিটেরিয়ান,—শাকশব্জী খাও।

গৃ। আমি ঘাস খাই। মুসলমান বাবুর্চ্চির রান্না মুর্গী মটন তোমরা যে টেবিলে ব'সে খাবে, সেই টেবিলে ব'সে ফলটল সন্দেশ-টন্দেশই বা খেতে আমার প্রবৃত্তি হবে কেন? সে আমি পারবো না। আমি কি যেতাম, মোটেই যেতাম না। কেবল মেয়েটাকে নিজের চক্ষে দেখ্‌বো ব'লেই যাচ্ছি। আমি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বস্‌বো। মেয়েকে ডেকে পাঠিয়ে কাছে বসিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইব।

ক। মেয়ে, মেয়ের মাও কিন্তু আমাদের সঙ্গে টেবিলে খেতে যাবে।

গৃ। যায় যাবে, আমি ভিতর-বাড়ীতে একলাই থাক্‌বো। একটা বই-টই কি মাসিক পত্র-টত্র চেয়ে নিয়ে, তাই ব'সে ব'সে পড়বো। ক'টার সময় আমাদের বেরুতে হবে বল দেখি, তাই বুঝে আমি ব্যবস্থা করি।

ক। বিলেতে সাধারণতঃ লোকে ডিনার আরম্ভ করে কেউ বা সাতটায়, কেউ সাড়ে সাতটায়, কেউ আটটায়। এর বেশী নয়। কিন্তু এ দেশে শুনেছি, রাত ন'টার আগে নয়,—গরম দেশ কি না। তা, ন'টায় ডিনার আরম্ভ হলে, অন্ততঃ আটটায় সেখানে পৌছান চাই। তা হলেই ধর, সাড়ে সাতটায় বেরুনো দরকার।

গৃহিণী ঘড়ীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "এখন পাঁচটা। তা হ'লে যাই, জলটল খাবারের ব্যবস্থা করি গে। তোমার কাপড়-চোপড় কি বের ক'রে রেখে যাব? কোন্ সুটটা পোরে যাবে বল দেখি?"

রামজীবন বাবু বলিলেন, "সুট পোরে নয়, ধুতি-চাদর পোরে যাব। যে দিন মেয়ে দেখতে গেলাম, সে দিন ধুতি-চাদরে গেলাম, আর, আজ যাব ইংরেজি পোষাকে? সেটা ভাল দেখাবে না। ইংরেজি পরতে হ'লে ঈভ্‌নিং ড্রেস দরকার, তা ত আমার নেই।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি রকম পোষাক?"

বিশ্বজননী

[শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত।

রামজীবন বাবু বিজ্ঞভাবে, পার্ব্বতীর প্রতি হরের ন্যায়, ইংরেজি ঈভ্‌নিং ড্রেসের পরম রহস্য তাঁহার গৃহিণীকে বুঝাইতে লাগিলেন। শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "সে পোষাক তোমার যদি নেই, তবে বিলেতে থাক্‌তে কি পোরে তুমি খানা খেতে?"

কর্ত্তাকে স্বীকার করিতে হইল, "আমি ত আর সেখানকার কোনও অ্যারিষ্টোক্র্যাটক—অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে ব'সে ডিনার খেতাম না! আমি থাক্‌তাম একটা সস্তা বোর্ডিং হাউসে, সেখানে দিনের পোষাকেই রাত্রেও খানা খাওয়া চলে। শুধু সেখানে কেন? মধ্যবিত্ত পরিবারেও খানায় ডিনার সুট পরতে হয় না। জাহাজে ধর, যারা ফার্ষ্ট ক্লাসে যায়, সন্ধ্যার পর ঈভ্‌নিং ড্রেস না হ'লে তাদের অচল। কিন্তু যারা সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রা, তাদের ও সব ল্যাঠা নেই।"

"ল্যাঠা না ল্যাঠা!"—বলিয়া গৃহিণী অবজ্ঞাভরে ওষ্ঠ কুঞ্চন করিয়া জলযোগের আয়োজন করিতে নীচে নামিয়া গেলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে, বামুন ঠাকুর লুচি বেলিয়া দিতেছিল, গৃহিণী ভাজিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অনিল-কুমার আসিয়া প্রবেশ করিল। বালিগঞ্জে আজ সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণের কথা সে অবগত ছিল, বন্ধুর মুখে পাত্রীর উচ্ছ্বসিত রূপ-গুণের বর্ণনা শুনিয়া, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্য সে আগ্রহান্বিত ছিল। অপরাহ্ণে বাহির হইবার সময় জননী তাহাকে সকালে সকালে ফিরিতে বলিয়াছিলেন, মাতৃ-আজ্ঞা সে পালন করিয়াছে। ছেলেকে দেখিয়া মা ডাকিলেন—অনিল গিয়া রান্নাঘরের বাহিরে দাঁড়াইল। জননী তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন, "বাবা, আর যেন বাড়ী থেকে বেরিও না এখন। এবার পূজোর তোমার শান্তিপুরী ধুতিখানা, জরিপাড় চাদরটা বের ক'রে তোমার বিছানার উপর রেখে এসেছি, গোবিন্দাকে বলেছি, সেগুলো ভাল ক'রে কুঁচিয়ে রাখতে—দেখ গে, সে কুঁচিয়েছে কি না। আর, তোমার ভাল জুতো যোড়াটা, তাকে বেশ ক'রে বুরুষ ক'রে দিতে বল। এই লুচি ক'খানা ভাজা হলেই তরকারিটে চ'ড়িয়ে দিয়েই আসছি আমি উপরে।"

"আচ্ছা" বলিয়া অনিল চলিয়া গেল।

সকলের জলযোগ শেষ হইলে, গৃহিণী পুত্রকে লইয়া পড়িলেন। তাঁহার আদেশে বেচারা অনিলকুমারকে মুখে সাবান ঘষিয়া তাহাতে হেজলীন মাখিতে হইল। তাহাতেই কি নিস্তার আছে? স্বয়ং তিনি পাউডারের বাক্স বাহির করিয়া, পুত্রের মুখে, গলায় ও ঘাড়ে আচ্ছা করিয়া পাউডার মাখাইয়া, পাউডার-বুরুষ দিয়া ঝাড়িতে লাগিলেন। অনিল অবশ্য অনেক আপত্তি করিয়াছিল। বলিয়াছিল, "কেন আমায় এ সং সাজাচ্ছ, মা?" কিন্তু জননী বলিয়াছিলেন, "বেশী জ্যাঠামি করিসনে খর্দ্দার! ঠাঁই ক'রে লাগিয়ে দেবো এক চড়।"—সুতরাং শ্রীমান্ অনিলকুমার এম এ নিরুপায়।

পুত্রের সাজসজ্জা শেষ হইলে গৃহিণী স্বামীর সজ্জা তদারক করিতে গেলেন। তাঁহার উপর বিশেষ কোনও অত্যাচার করিলেন না—কেবল টাক যাহাতে ভাল করিয়া ঢাকা পড়ে, সেইরূপ কৌশলে চুলটা নিজ হাতে আঁচড়াইয়া দিলেন। তার পর নিজ সজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন। বেণারসী দুই তিন প্রস্থ যাহা ছিল, তাহা সেকেলে প্যাটানের (একালের সৌখীন বেণারসী তাঁহার কেনা হয় নাই), সুতরাং বেণারসী পরিয়া যাত্রাদলের রাণী মন্দোদরী সাজিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি ঢালা কালা পাড় কোলে জরি দেওয়া ফরাসডাঙ্গার শাড়ীই একখানি পরিধান করিলেন। কালো রেশমের পাড় বসানো, সাদা বুটিদার একটি হাফহাতা জ্যাকেট গায়ে দিলেন। অলঙ্কারের মধ্যে দুই হাতে আট-গাছি করিয়া ষোলগাছি কার্ণিশপ্যাটান চুড়ি, উপর হাতে কুকুরমুখো ডায়মনকাটা তাগা এবং গলায় একগাছি বিছাহার চা'র হালি করিয়া পরিলেন। উঁহাদের বাড়ীতে সে দিন পাণ-বিভ্রাটের কথা তিনি স্বামীর মুখে শুনিয়াছিলেন, সুতরাং একটি চৌকা বই-ডিবায় তিনি আন্দাজ বিশ খিলি পাণ, মায় ক্ষুদ্র চুণের কৌটা ও দোক্তার কৌটা ভরিয়া লইলেন। ডিবাটি স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, "তোমার পকেটে এটি রাখ যখন চাইব, তখন দিও।"

রামজীবন বাবু বলিলেন, "এবার বোধ হয় তারা পাণের ব্যবস্থা রাখবে। এটা আর মিছামিছি কেন—"

গৃহিণী বলিলেন, "তারা বোধ হয় দোকানের সাজা গুচ্ছার মিঠে খিলির দোনা আনিয়ে রাখবে—সে তোমরা খেও, আমার মুখে সে রুচবে না।"

রামজীবন বাবু ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "সেখানে আর কচর্ কচর্ ক'রে একরাশ পাণ নাই বা চিবুলে! এটা বাড়ী-তেই থাক্—এসেই খেও না হয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন, তাদের ভয় না কি? চিরকাল যা খাই, তা কার ভয়ে খাব না শুনি? আমি ত আর মেয়ের মা নই যে, হাত যোড় ক'রে থাকবো? আমি ছেলের মা! পকেটে রাখতে যদি তোমার ভারি বোধ হয় ত দাও, আমি হাতে করেই নিয়ে যাচ্ছি।" বলিয়া তিনি হাত বাড়াইলেন।

রামজীবন বাবু হতাশভাবে বলিলেন, "থাক, আমিই পকেটে নিচ্ছি।"—বলিয়া তিনি ডিবাটি কোটের পকেটে ফেলিলেন।

সাড়ে সাতটা বাজিল। গোবিন্দ ট্যাক্সি ডাকিতে বড় রাস্তায় গিয়াছে. এখনও ফেরে না কেন?—প্রায় পাঁচ মিনিট উৎকণ্ঠায় কাটিবার পর, গলিতে ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইবার শব্দ পাওয়া গেল। গৃহিণী তখন "দুর্গা দুর্গা দুর্গা" বলিয়া, স্বামি-পুত্রকে লইয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া স্বামী সহ ট্যাক্সিতে আরোহণ করিলেন, অনিলকুমার ড্রাইভারের পার্শ্বে বসিল।

ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বালিগঞ্জে

"ও মা, সাতটা বাজতে চল্ল, এখনও সুমি ফিরলো না! কখন্ গা-হাত ধোবে, কখন্ কাপড়-চোপড় পরবে, মেয়ের আক্কেল দেখ দেখি!"

বোস্ সাহেব পশ্চাতের বারান্দায় বেতের ইজিচেয়ারে পড়িয়া সিগারেট টানিতে টানিতে একটা বিলাতী মাসিকপত্র পড়িতেছিলেন, মিসেস বোস্ আসিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিতে তিনি মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "কোথায় গেছে সুমি?"

"সে গেছে প্রমীলা'দের বাড়ী। প্রমীলাকে আজ এখানে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে কি না।"

প্রমীলা বালিগঞ্জনিবাসী অন্য এক বিলাত-ফেরতের কন্যা, সুমতির সহপাঠিনী। দুই জনে খুব ভাব।

বোস্ সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ছেলের বন্ধু যেমন মেয়ে দেখতে আসে, মেয়ের বন্ধু তেমনি ছেলে দেখতে আসছে বুঝি?"

মিসেস বোস্ বলিলেন, "সে আমি জানিনে। কিন্তু এত দেরী করছেই বা কেন? লোক পাঠাব?"

বোস্ সাহেব বলিলেন, "এই ত মোটে সাতটা। আসবে এখনই, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? রামজীবন বাবুর স্ত্রীর জন্যে খাবার টাবার আনালে?"

"আন্‌তে গেছে।"

"কাকে পাঠিয়েছ?"

"উমাচরণকে।"

উমাচরণ, বোস্ সাহেবের কেরাণীর কর্ম্ম করিয়া থাকে।

"কি কি আনতে পাঠিয়েছ?"

নিকটে একখানা খালি চেয়ার ছিল, তাহাতে বসিয়া মিসেস বোস্ বলিলেন, "ভীম নাগের সন্দেশ. নবীনের রস-গোল্লা—মিষ্টি এই দু'রকম। তা ছাড়া মার্কেট থেকে ফল-টল আনবে।"

"পাণ আনতে ব'লে দিয়েছ ত?"

"হঁ্যা, সে কি ভুলি? উমাচরণ বল্লে, চিৎপুর রোডে কোথায় এক খোট্টার দোকানে, খুব ভাল তবকদার পাণের খিলি বিক্রী হয়। সেই খিলি এক টাকার আনতে বলেছি। আর একটা জিনিষ আনতে বলেছি, যা তুমি আমায় বলনি,—আমি নিজের মাথা খাটিয়ে আনতে দিয়েছি, এবং আমার মাথায় না এলে, যার অভাবে বিশেষ অপ্রস্তুত হ'তে হত।"

বোস্ সাহেব কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জিনিষ?"

মিসেস বোস গর্ব্বমিশ্রিত হাস্যের সহিত বলিলেন, "আসন। আসন ত আমাদের ঘরে নেই। কি পেতে বসিয়ে ছেলের মাকে খাওয়াতাম?"

বোস্ সাহেব বলিলেন, "ঠিক ঠিক। গিন্নী না হ'লে কি গৃহ চলে? গিন্নীই হলেন সংসার-নৌকার, কি বলে গিয়ে কর্ণধার। কিন্তু, এ সব ত হল। ওঁরা এলে, কি রকম ভাবে ব্যবহার করতে হবে, সুমিকে বেশ ক'রে শিখিয়ে টিখিয়ে দিয়েছ ত? ছেলের মা এলে, সুমি তাঁকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নেবে। মুখটি বুজে, বেশ বিনীতভাবে থাকবে, কথাবার্ত্তা খুব কম কইবে। 'মেয়েটা ভারি বাচাল ত!'—এ কথা যেন তিনি ভেবে না বসেন।"

মিসেস বোস্ বলিলেন, "শেখাতে পড়াতে ত আমি কসুর করিনি। এ ক'দিনই ত পাখী-পড়া ক'রে শেখাচ্ছি। সেও কোনও বিদ্রোহ করেনি। কিন্তু কার্য্যকালে কি হয়,

বলা যায় না।—আমি একবার যাই, দেখি, বাবুর্চ্চি কি করছে।”—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে তার সখীকে লইয়া সুমতি ফিরিয়া আসিল। উভয়েই সান্ধ্য-প্রসাধন সমাপন করিয়া আসিয়াছে। উভয়েরই অঙ্গে একই রঙের একই পাড়ের সিল্কশাড়ী ও ব্লাউজ। বলা বাহুল্য, সুমতিকে এ শাড়ী প্রমীলার জননীই পরাইয়া দিয়াছেন।

আটটা বাজিতেই বাগবাজারের দলও আসিয়া পৌছিলেন। আজ বসু-দম্পতি নিম্নতলে আপিস-কক্ষে বসিয়াই অপেক্ষা করিতেছিলেন। মোটর-গাড়ী দাঁড়াইবামাত্র, উভয়েই বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন। “আসুন—আসুন রামজীবন বাবু—অনিলকুমার, এস বাবা”—বলিয়া বোস্ সাহেব উভয়কে অভ্যর্থনা করিলেন। মিসেস্ বোস রামজীবন বাবুর স্ত্রীকে হাত ধরিয়া সমাদরে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইলেন। “ওগো, মিসেস্ ঘোষকে তুমি উপরে নিয়ে যাও, আমরা এখন নীচেই একটু বসি।”—স্ত্রীকে এই কথা বলিয়া, বোস্ সাহেব রামজীবন বাবু ও তাঁহার পুত্রকে লইয়া আপিস-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মিসেস বোস্ ঘোষ-গৃহিণীকে লইয়া ড্রয়িংরুমে না বসাইয়া, তাহার পশ্চাতে নিজেদের খাস কামরায় লইয়া গেলেন। পাখা খুলিয়া দিয়া, ঘোষ-গৃহিণীকে একটি সোফায় বসাইয়া, “মেয়েকে ডাকি”—বলিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণকাল পরে, প্রমীলা ও সুমতি উভয়েই তাঁহার সঙ্গে আসিয়া, উভয়েই ঘোষ-গৃহিণীকে প্রণাম করিল। “এ দুটিই আপনার মেয়ে না কি? না, আপনার আর এক মেয়ে ত অনেক ছোট, শুনেছি”—বলিয়া ঘোষ-গৃহিণী উভয়ের চিবুক-প্রান্ত স্পর্শ করিয়া নিজ হস্ত চুম্বন করিলেন। সোফার মাঝখানে সরিয়া বসিয়া দুই জনকে নিজের দুই দিকে বসাইয়া একবার ইহার প্রতি, একবার উহার প্রতি চাহিতে লাগিলেন।

মিসেস বোস্ একটি চেয়ার টানিয়া নিকটে বসিয়া বলিলেন, “আমি দুটিরই মা বটে। কিন্তু কোন্‌টির আমি গর্ভধারিণী মা, আমাদের চেহারা মিলিয়ে বলুন দেখি আপনি।”—বলিয়া মিসেস বোস্ ঘোষ-গৃহিণীর পানে সকৌতুকে চাহিয়া রহিলেন। বালিকারাও পরস্পরের পানে চাহিয়া, মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

“আমায় যে বিষম পরীক্ষায় ফেল্লেন আপনি!”—বলিয়া ঘোষ-গৃহিণী সতর্ক দৃষ্টিতে তিন জনের নাক, চোখ, ভুরু প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “এইটি আপনার মেয়ে।” —এবং ঠিকই অনুমান করিলেন।

“হাঁ, আপনি পরীক্ষায় পাস হয়েছেন।”—বলিয়া মিসেস বোস্ মৃদু হাস্য করিলেন।

মুখপাতে এই হাস্য-কৌতুকের অবতারণায়, প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচটা ঘোষ-গৃহিণীর মন হইতে দূরীভূত হওয়াতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন এবং লঘুচিত্তে সহজভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, মিসেস বোস্ বলিলেন, “খাবার তৈরী হতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী আছে, ততক্ষণ একপেয়ালা চা আপনাকে দেবো কি? না না— বাবুর্চ্চিখানার চা নয়,—উপরেই ষ্টোভ আছে—সুমতি আপনাকে এক পেয়ালা চা তৈরি ক'রে দিক্ না।”

ঘোষ-গৃহিণী বলিলেন, “না না, চা এখন খেতে পারবো না। তবে যদি অভয় দেন, একটা আব্দার করি।”

“কি আশ্চর্য্য, এর আর ভয় অভয় কি? কি দরকার, আপনি বলুন—এ আপনারই ঘরবাড়ী ব'লে মনে করছেন না কেন?”

“দয়া ক'রে একবার আপনার ঝি কিম্বা চাকরকে ডাকুন।”

গায়ে চাপকান, মাথায় পাগড়ী, বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইল। ঘোষ-গৃহিণী তাহাকে বলিলেন, “দেখ বাবা, তুমি একবার নীচে যাও। আমাদের বাবুকে বল, মা পাণের ডিবেটা চাইলেন।”

মিসেস বোস্ মনে করিলেন, সে দিন পাণ ছিল না বলিয়া রামজীবন বাবু এবার নিজেদের পাণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তাড়াতাড়ি বলিলেন, “না না, ডিবে আনতে যেতে হবে কেন? পাণ যে আমি আনিয়ে রেখেছি। এনে দিচ্ছি।”—বলিয়া তিনি দাঁড়াইতেই ঘোষ-গৃহিণী বলিলেন, “বসুন, বসুন, ব্যস্ত হবেন না। সে পাণ খাবার লোক আছে—উনি খাবেন, ছেলে খাবে। আমার পাণে একটু বিশেষত্ব আছে—সে পাণ আমি ছাড়া কেউ সাজতে পারে না। আমি দোক্তা খাই কি না। আপনি আমার অপরাধ নেবেন না।”—বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘোষগৃহিণী হাতযোড় করিলেন।

"ও কি করেন ? বেয়ারার গিয়ে দরকার নেই। আমি নিজেই যাচ্ছি। শুধু পাণ নয়, আপনার পাণওয়ালাকেও ধ'রে আনতে পারি কি না দেখি। বেয়ারা, তুম যাও।"

ঘোষ-গৃহিণী বলিলেন, "আহা, বেয়ারাই যাক না, আপনি নিজে কষ্ট করবেন কেন ? আমার পাণই দরকার—পাণ-ওয়ালাকে নয়।"

"কষ্ট কি ? কষ্ট কিছু নয়।"—বলিয়া মিসেস বোস ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান করিলেন।

নিম্নে অবতরণ করিয়া প্রথমে তিনি অভিযান করিলেন, বাবুর্চ্চিখানায়। দেখিলেন, পুডিং সিদ্ধ হইতেছে, আর সমস্তই প্রস্তুত। বলিলেন, "দেখো, পন্‌রো মিনিট বাদ খানা দেও।"—বয় সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া খানা-কামরায় আসিয়া বলিলেন, "দেখো, খালি তিন সাহেবকা ওয়াস্তে টেবিল লাগাও। হামারা, বাবালোগ্‌কা খানা উপরমে হোগা,—পিছে। সমঝা ?" তাহাকে অন্যান্য উপদেশাদি দিয়া, মিসেস বোস্ তাড়াতাড়ি আপিস-কক্ষের দিকে পা চালাইলেন।

আপিস-কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাস্যমুখে স্বামীকে বলিলেন, "হ্যাগা, তুমি ত বেশ লোক ! এঁদের উপরে নিয়ে যাবে না ? এইখানে বসেই জটলা করবে ?"

বোস সাহেব বলিলেন, "উপরে যাব আমরা ? বেশ ত, তুমি চল, একটু পরেই আমরা আসছি।"

রামজীবন বাবু বলিলেন, "এইটি আমার ছেলে, মিসেস্ বোস্।" পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, এঁকে প্রণাম কর।"

"এস বাবা, এস, চিরঞ্জীবী হও"—বলিয়া মিসেস্ বোস্ অনিলের প্রণাম গ্রহণ করিলেন।

রামজীবন বাবুর নিকট হইতে পাণের ডিবা চাহিয়া লইয়া মিসেস বোস্ "বেশী দেরী কোরো না।"—বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। বহুক্ষণ উপবাসের পর পাণ ও দোক্তা খাইয়া ঘোষ-গৃহিণীর প্রাণটা যেন বাঁচিল।

পুরুষরা ড্রয়িং-রুমে আসিয়া বসিলে, অনেকে চেষ্টা করিয়া মিসেস্ বোস্ ঘোষ-গৃহিণীকেও তথায় লইয়া গিয়া বসাইলেন, এবং নিজের চেয়ার তাঁহার খুব কাছটিতেই টানিয়া লইলেন।

কথাবার্ত্তা যাহা চলিল, তাহা রামজীবন বাবু ও বসু-দম্পতির মধ্যেই আবদ্ধ। মেয়ে দুটি মাঝে মাঝে দুই একটা কথা কহিল বটে, কিন্তু ঘোষ-গৃহিণী সম্পূর্ণ নীরবই রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিবার পরই সংবাদ আসিল, ডিনার প্রস্তুত।

মিসেস বোস্ সকলকেই সঙ্গে করিয়া নিম্নতলে খানা-কামরায় লইয়া গেলেন।

প্রবেশ করিয়া রামজীবন বাবু বলিলেন, "মোটে তিন জনের কেন ?"

মিসেস বোস্ বলিলেন, "আপনারা ত মোটে তিন জন।"

"আর আপনি, মেয়েরা ?"

"আমরা পুরুষদের সঙ্গে ব'সে খাব কেন ? আমাদের মেয়ের দলের আলাদা বন্দোবস্ত।"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

রামজীবন বাবু বলিলেন, "এখানেও দলাদলি ?"

বোস্ সাহেব অবশ্য এ বন্দোবস্তের কথা পূর্ব্বাবধিই অবগত ছিলেন। বস্তুতঃ ইহা তাঁহারই মস্তিষ্কপ্রসূত এবং তৎপত্নীকর্ত্তৃক সমর্থিত। হাসিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালী কি দলাদলি ভুলতে পারে ?"

একটা হাসি পড়িয়া গেল।

ইঁহাদের আহার আরম্ভ হইলে বোস্ সাহেব বলিলেন, "তোমরাও ব'স গে না, দেরী করছ কেন ?"

"তুমি এঁদের দেখো শুনো ভাল ক'রে।"—বলিয়া মিসেস্ বোস্ সদলবলে প্রস্থান করিলেন।

মেঝেয় মার্ব্বেল-বিছানো একটি ঘর হইতে কার্পেট প্রভৃতি তুলিয়া ফেলিয়া, উহা ধুইয়া মুছিয়া, মহিলাদের আহারের স্থান হইয়াছে। এক ধারে ঘোষ-গৃহিণীর জন্য আসন বিছানো, সম্মুখে পাথরের থালায় রেকাবীতে বাটিতে প্রচুর-পরিমাণে নানাবিধ ফল এবং কচুরী, সিঙ্গাড়া, নিমকী ও মিষ্টান্নাদি। অন্যধারে একখানি শতরঞ্চি ভাঁজ করিয়া লম্বা ভাবে পাতা হইয়াছে, সম্মুখে ছুরিকাঁটাযুক্ত চীনামাটীর প্লেট প্রভৃতি। মেয়ে দু'টিকে দু'পাশে লইয়া মিসেস বোস্ ইহাতে বসিলেন। বাবুর্চ্চিখানা হইতে আগত খাদ্যসামগ্রী-পূর্ণ ডিশগুলি এমন ভাবে স্থাপিত যে, যাহার আবশ্যক, সে নিজেই কাঁটা বা চামচের সাহায্যে খাদ্য তুলিয়া লইতে পারে।

হাসিগল্পের মধ্যে আহারকার্য্য সমাধা হইল।

অবশেষে সকলে গিয়া ড্রয়িংরুমে সমবেত হইলেন।

কিছুক্ষণ গল্প-গুজব চলিল—মেয়ে দুইটির গানও হইল। রাত্রি সাড়ে দশটায় স্ত্রী-পুত্র সহ রামজীবন বাবু বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

সুমতির শয়ন-কক্ষে প্রমীলারও শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। উভয় সখী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিল।

প্রমীলা বলিল, "কি সুমি, বর পছন্দ হয়েছে ত?"

সুমতি বলিল, "তোর কি রকম লাগলো, আগে তাই বল্।"

"আমি ত আর বিয়ে করবো না,—আমার পছন্দ অপছন্দে কি যায় আসে বল্।"

"তবু?"

"আমার ত মোটের উপর ভাই, ভালই লাগলো। বেশ ইণ্টেলিজেণ্ট ব'লে বোধ হ'ল।"

সুমতি বলিল, "কিন্তু ভাই, ধুতির উপর কোট প'রে এসেছে কেন? আবার, এই যে মাসের গরমে—পায়ে ফুল মোজা!"

প্রমীলা বলিল, "ইংরেজি-বাঙ্গলায় মিশুতে নেই, মিশুলে জিনিষটা অদ্ভুত হয়, সে সব কি ওদের জ্ঞান আছে? ওরা মনে করে, কোট পরা, ফুলমোজা পায়ে দেওয়া—এ সব সৌখীনতার পরিচায়ক।"

"আর ভাই, বলে, 'আজ্ঞে'—সেটা লক্ষ্য করেছিস? বাবা যখন ডাকলেন—'অনিল!'—অমনি—'আজ্ঞে।'—'তুমি গান গাইতে জান? জান যদি ত গাও না একখানা।'—অমনি উত্তর হ'ল—'আজ্ঞে না, আমি ত গান গাইতে জানিনে।'—এই আজ্ঞে আজ্ঞে শুনে আমার ভাই এমন হাসি পাচ্ছিল, সত্যি!"

প্রমীলা বলিল, "আমারও হাসি পাচ্ছিল।"

সুমতি বলিল, "এ দিকে ত শুনি এম-এ পাস করেছে। কিন্তু ইংরেজি কি বদ উচ্চারণ দেখেছিস? বল্লে 'প্রেস্‌টীজ' (prestige) জোরটা যেন শেষে!"

প্রমীলা বলিল, "আর বল্লে 'ভলক্যানো'!—অন্য এক সময় বল্লে—যীশুখৃষ্টের ছবিতে মাথার চারিদিকে যেমন একটা 'হ্যালো' এঁকে দেয়। প্রথমটা আমি বুঝতেই পারিনি। হ্যালো কি রে বাবা? তার পর বুঝলাম—ওঃ, 'হেলো' মীন্ করছে।"

সুমতি বলিল, "হঁ্যা, আমিও তা লক্ষ্য করেছি।"

প্রমীলা বলিল, "দ্যাখ্ ভাই, ওগুলো কিন্তু কোনও মারাত্মক দোষ নয়। বাঙ্গালী প্রোফেসারদের কাছে পড়ে কি না, ভুল উচ্চারণ শেখে। বিলেতে বছর কতক বাস ক'রে আসুক না! তখন ও-ই আবার আমাদের উচ্চারণে ভুল ধরবে। কিন্তু সে যা হোক্, ওর সঙ্গে যদি তোর বিয়েই হয়, ওর নামটি তোকে বদ্‌লে দিতে হবে।"

"কেন?"

"অনিলকুমার নাম চলবে না। অনিলকুমার মানে জানিস?"

"না, কি মানে?"

"অনিলকুমার মানে পবননন্দন—হনুমান্।"

সুমতি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাই না কি? অনিলকুমার মানে হনুমান্? বাঁদর? তা হলে, মা-বাপ ত খুব দূরদর্শী! ঠিক নামটিই ত রেখেছিলেন ভাই, ও নাম বদলানো কেন?"

"সে তোর ইচ্ছে। এখন শোয়া যাক চল্, রাত হয়েছে।"

তখন আলো নিবাইয়া দুই জনে শয়ন করিল বটে, কিন্তু হনুমান্-চরিত্র আলোচনা অনেকক্ষণ অবধিই চলিল। ঘোষ-গৃহিণীও রেহাই পাইলেন না—বিশেষ করিয়া তাঁহার তাম্বুল-প্রীতি ও উভয় মণিবন্ধে চুড়ির প্রাচুর্য্য নির্ম্মমভাবে সমালোচিত হইল। তবে উভয় সখীই স্বীকার করিল—"কিন্তু মানুষটি বেশ সরল—আর আমুদে।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
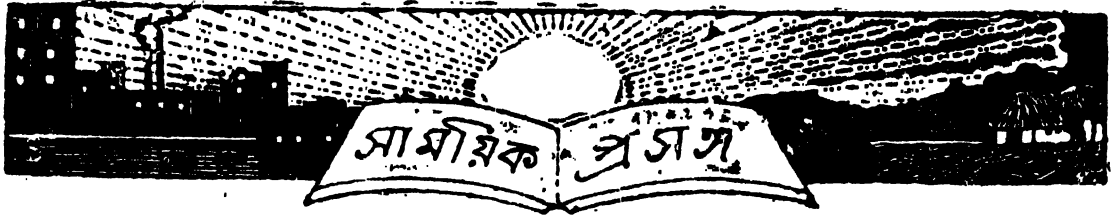
নবম অর্ডিনান্স

লর্ড আরউইনের শাসনকাল ইতিহাসে অর্ডিনান্সের যুগ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিবে সন্দেহ নাই। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে পর পর কয়টি অর্ডিনান্স জারী,—বাহাদুরীর কথা বটে! এ বাহাদুরী লর্ড কার্জ্জনও লাভ করিতে পারেন নাই। ইহাই যে শেষ, তাহাও কেহ বলিতে পারেন না। কারণ, লর্ড আরউইনের শাসনকালের আরও কিছু অবশিষ্ট আছে। কেহ কেহ রহস্য করিয়া বলিতেছেন, হয় ত খদ্দর ও গন্ধী টুপীর উপরেও অর্ডিনান্স জারী হইবে। কিন্তু এ রহস্য বাস্তবে যে পরিণত হইবে না, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না।

এই নবম অর্ডিনান্সটি মূলতঃ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিবার উদ্দেশেই জারী হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যে রচিতও হইয়াছিল। পূর্ব্বে ইংরাজের আইনে রাজনৈতিক অপরাধে সাধারণতঃ মানুষই দায়ী ও অপরাধী হইত, এখন মানুষের সম্পত্তিও হইতেছে। পূর্ব্বে রাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করার ফলে মানুষের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত এবং এখনও হয়, এ কথা শুনা যায়। কিন্তু নিরস্ত্র অহিংস যুদ্ধে লিপ্ত মানুষেরও এখন সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবার আইন জারী হইয়াছে। ইহাকে আইন বলা যায় না, কেন না, Ordinance মাত্রেই negation of law আইন অতিক্রম করিয়া শাসন করা।

নূতন অর্ডিনান্সে কেবল সত্যাগ্রহী কংগ্রেসকর্ম্মী নহে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসের সম্পত্তি অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতেছে। বোম্বাই বিভাগে এই নূতন অর্ডিনান্সের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও তাহার শাখা-উপশাখাগুলিকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। অন্যত্রও ইহার প্রকোপ অনুভূত হইতেছে। ইতিমধ্যেই বহু কংগ্রেস আফিসের তালাবদ্ধ হইয়াছে, পুলিস কংগ্রেস কার্য্যালয় হইতে জাতীয় পতাকা, খাতাপত্র, এমন কি, অর্থ ও সম্পত্তি লইয়া গিয়াছে। বোম্বাইএ এক কংগ্রেস কার্য্যালয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান দুইখানি মোটরগাড়ী পুলিস দখল করিয়াছে।

ইহার বিপক্ষে নালিশ নাই,* কেন না, যাহাদের সম্পত্তি এইভাবে দণ্ডিত হইতেছে, তাহারা সত্যাগ্রহী, আদালতের কোন সংস্রবে তাহারা থাকিতে চাহে না। সুতরাং ইহার প্রতীকার নাই, কংগ্রেসকে নীরবে ইহা সহ্য করিয়া যাইতে হইতেছে।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য, ইহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে ত? দেশের অশান্তি অসন্তোষ দূর হইতেছে ত? যে জনসাধারণের শান্তিভঙ্গ হয় বলিয়া এই সব ব্যবস্থা করা হইতেছে, তাহারা গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবহারে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে ত?

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের যুগে লর্ড মর্লের মনে সংশয় জন্মিয়াছিল,—ভারতের এই আন্দোলন সমুদ্রতরঙ্গের উপর ফেনোচ্ছ্বাস, না গভীর বারিধির অন্তরের প্রবাহ? বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টও এ সমস্যার কথা ভাবিতেছেন কি? যে কংগ্রেসকে তাঁহারা তুচ্ছ মনে করিয়া, দেশের লোকের প্রতিভূ নহে বলিয়া ঘোষণা করিয়া দলনের প্রয়াস পাইতেছেন, উহা কি সত্যই তাই, না কংগ্রেস জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ?

গুপ্ত-চক্রান্ত

শিমলা শৈলের পঞ্জাব-ভোজে বড় লাট লর্ড আরউইন বলিয়াছিলেন, "আমি ও আমার সরকার সকল প্রকার গুপ্ত রাজনৈতিক চালবাজীর (Secret diplomacy) বিরোধী।" ভাল কথা। বস্তুতঃ এ যুগে খোলাখুলি সোজা পথে প্রাণ খুলিয়া কথা কহেন, এমন সরকার দুর্লভ, বিশেষতঃ প্রতীচ্যে। সত্য কথা বলিতে কি, প্রতীচ্যের diplomacy কথাটার অর্থই হইতেছে মিথ্যা কথা বা কথার মারপ্যাঁচ। কথার চাতুরী করিয়া অপর পক্ষের স্কন্ধে অপরাধের বোঝা চাপাইয়া নিজে সাধু সাজার নামই diplomacy। লর্ড আরউইন ও তাঁহার সরকার যদি এই ব্যাপার হইতে মুক্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিতই প্রশংসার্হ।

কিন্তু কথাটা বলিবার সময় উহাতে একটু ঝাঁঝ ছিল, যেন কাহারও কথার মারপ্যাঁচকে লক্ষ্য করিয়া কথাটা বলা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ বড়লাটের সমস্ত বক্তৃতাটি পাঠ করিয়া মনে হয়, যেন কংগ্রেসের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই এ কথা বলা হইয়াছে। বাঙ্গালার অন্যতম রাজনৈতিক নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এই আন্দোলন সম্পর্কে তৃতীয়বার ধৃত হইবার

পূর্ব্বে কোন এক বক্তৃতায় বড়লাটের এই কথার জবাব দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যরূপে বলিতেছি যে, কংগ্রেস কোনপ্রকার গুপ্ত রাজনীতিক চালের পক্ষপাতী নহে। আমি বড়লাটকে প্রকাশ্যে দেশের প্রকৃত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত শান্তির কথা কহিতে আহ্বান করিতেছি। এই প্রতিষ্ঠানই কংগ্রেস। যদি বৃটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রদান করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে কংগ্রেস এখনও আপোষের চেষ্টায় সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে প্রস্তুত আছে।"

এই সরল প্রাণখোলা আহ্বানে কোন গুপ্ত চালবাজী আছে কি? এযাবৎ সরকারের সহিত সংঘর্ষে কংগ্রেস কোথাও গুপ্ত পথ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে কি? হয় ত কংগ্রেসের মূলনীতির মর্ম্ম না বুঝিয়া কংগ্রেসের কায করিতেছে বলিয়া মনে করিয়া কেহ কেহ ক্রোধ ও উত্তেজনা-বশে গুপ্ত চক্রান্ত করিয়াছে বা হিংসা আচরণ করিয়াছে, কিন্তু সে জন্য কংগ্রেস অপরাধী নহে। সকল দেশেই সকল আন্দোলনের সম্পর্কে এমন দুই চারিটা অনাচার ব্যভিচার আসিয়া পড়ে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা বলিয়া একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে সে জন্য দায়ী করা যায় না।

বর্ত্তমান আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গন্ধী লাহোর কংগ্রেসের পূর্ব্বে 'নতজানু' হইয়া লর্ড আরউইনকে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার দাবী পূর্ণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার কংগ্রেসের মূলনীতি ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে বড়লাটকে 'খোলা চিঠি' দিয়াও মহাত্মা গন্ধী যখন আশায় নিরাশ হন, তখনই কংগ্রেসে (লাহোরে) স্বাধীনতা মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল। ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায়, কংগ্রেস বরাবরই খোলা প্রাণে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলিয়া আসিয়াছে, গুপ্ত চক্রান্তে কখনও অভ্যস্ত ছিল না।

কংগ্রেস বার বার শাসক জাতির প্রতিশ্রুতিভঙ্গে আশাহত হইয়া সরকারের মনোভাব পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে গতানুগতিক ...মানুগ পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথ গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা ...; কিন্তু সে পথও সম্পূর্ণ খোলা পথ, সম্পূর্ণ হিংসাবর্জ্জিত, ...ঝঁনঝনারহিত, গুপ্ত-চক্রান্তশূন্য পথ। ইহাতে বোমা-...ভারের বা গুপ্ত পরামর্শের নাম-গন্ধও নাই, বরং উহারই ...দ্ধ। উত্তপ্তমস্তিষ্ক তরুণ বিপ্লবীদের দ্বারা পাছে দেশের ...রা প্রভাবিত হয়, এই আশঙ্কায় মহাত্মা গন্ধী এ দেশে ...স সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। বোমা-রি... ভারের পথ—গুপ্ত চক্রান্তের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য মহাত্মা গন্ধী পরিচালিত কংগ্রেস যত চেষ্টা করিয়াছে ও সফল হইয়াছে, এত আর কেহ নহে। কংগ্রেস কত ত্যাগস্বীকার করিয়া, কত বিপদ মাথায় করিয়া হিংসার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আন্দোলন করিয়াছে, তাহার প্রমাণ সরকারেরই ঘোষণায় পাওয়া যায়। বোম্বাই বিভাগের পানভেল পরগণার চিরনার গ্রামে কিছুদিন পূর্ব্বে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঐ স্থানে পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কতকগুলি পার্ব্বত্য গ্রামবাসীর বন-আইন ভঙ্গ-ব্যাপার সম্পর্কে ভীষণ সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, ফলে উভয় পক্ষে কতকগুলি লোক হতাহত হয়। প্রকাশ, এই ব্যাপারে পুলিস গুলীও চালাইয়াছিল। আরও প্রকাশ পায় যে, মিঃ যোশী নামক পুলিস-কর্ম্মচারী গুলীর আঘাতে নিহত হন। গুলী চলিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কে গুলী চালাইবার আদেশ দিল?" আরও এক সংবাদ এই যে, যখন ক্রুদ্ধ উন্মত্ত জনতা পুলিস ইনস্পেক্টর মিঃ পেটেলকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করে, তখন কংগ্রেস সত্যাগ্রহীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। এ বিষয়ে সরকারী বিবরণ বলিতেছে,—"কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের লোককে ঘিরিয়া পাহাড়ের পাদমূলে নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। পুলিস ইনস্পেক্টর যখন আক্রান্ত হন, তখন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁহাকে জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক ঝোপের পশ্চাতে লুকাইয়া রাখে।" এমন স্বীকারোক্তিতেও কি মনে হয় না যে, কংগ্রেসের কর্ম্মী প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া পরের উপকার করে,—বিশেষতঃ যে পর সরকাররূপে তাহাদের প্রত্যেক কর্য্যে বাধা দিতেছে? অন্ততঃ কংগ্রেস যে গুপ্ত চক্রান্ত করে না, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ।

বড়লাটের ডেসপ্যাচ

বড়লাট সাইমন রিপোর্ট সম্পর্কে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে একটি ডেসপ্যাচ পাঠাইয়াছিলেন। ইহার সম্পর্কে নানা জনরব উঠিয়াছিল। প্রথমে শুনা যায় যে, ইহা সাইমন রিপোর্টের পরামর্শের অনেক উপরে উদার পরামর্শ প্রদান করিয়াছে এবং বড়লাট তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যগণকে ও প্রাদেশিক সরকার-সমূহকে আনয়ন করিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত ডেসপ্যাচ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার পর শুনা যায় যে, ডেসপ্যাচের উদারমতের কথা ভিত্তিহীন, বরং সাইমন রিপোর্ট যে দ্বৈতশাসন তুলিয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন, ডেসপ্যাচে বড়লাট তাহাই কেন্দ্রীয় সরকারে প্রবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।" অবশ্য 'ডেলি হেরাল্ড' পত্র এ সংবাদ প্রকাশ করিবার পর, 'নিউজ ক্রনিকল' পত্র ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বলিয়াছেন, ভারত সরকারের ডেসপ্যাচ ব্যতীত অন্ত কোন ডেসপ্যাচ শ্রমিক সরকারের হস্তগত হয় নাই। ভারত সরকারের ডেসপ্যাচ আর বড়লাটের ডেসপ্যাচ এক নহে, ইহাই এ কথা বলিবার অর্থ। বড়লাট ডেসপ্যাচে যে কেন্দ্রীয় সরকারের আভাস দিয়াছেন, তাহাতে তিনি দুই এক জন ব্যবস্থাপরিষদের সদস্তকে তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে লইবেন বটে, এবং ঐ দুই এক জন মন্ত্রী তাঁহাদের স্ব স্ব দলের নেতা থাকিতে পারিবেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন না, দায়ী থাকিবেন ভারত-সচিবের নিকটে। যদি এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে লর্ড আরউইনের উদারতার মর্ম্ম উপলব্ধি করা কঠিন নহে। রাজন্তদের স্তুতিবাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও যে সকল মডারেট নেতা গোল টেবল তীর্থে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একাধিক জন শতমুখে বড়লাট লর্ড আরউইনের সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন, তিনি যথার্থ ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহার মত উদারপ্রকৃতির বড়লাট বহুদিন এ দেশে আসেন নাই। হয় ত অন্তরে বড়লাট লর্ড আরউইন তাহা হইতে পারেন, কিন্তু মনে ইচ্ছা থাকিলেও সিবিলিয়ান চক্রব্যূহ হইতে তাঁহারও যে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা ডেসপ্যাচের খবর পাইয়াই বুঝা যাইতেছে।

ভারত সম্বন্ধে মার্কিণ ও য়ুরোপ

ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে বৃটিশ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর হইতে এ যাবং সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীরা আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কালে, ওডয়ার, ক্রাডক, সিডেনহ্যাম, লয়েড, রিভারক্রক, র‍্যাদারমিয়ার, উইনষ্টন চার্চ্চহিল, লয়েড জর্জ্জ প্রভৃতির নাম এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাগজের মধ্যে বিলাতের টাইমস, ডেলিমেল, মর্ণিং পোষ্ট, সাণ্ডে টাইমস প্রভৃতি এ বিষয়ে অগ্রণী। কিন্তু সকলেই সিডেনহ্যাম, ওডয়ার বা মর্ণিং পোষ্ট, ডেলি মেল নহে। যে মহাত্মা গন্ধীকে এখন ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের নেতা ও বৃটিশ সরকারের শত্রু বলিয়া জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে, সেই মহাত্মা গন্ধী সম্বন্ধেই শাসন-সংস্কারের প্রবর্ত্তক মিঃ মন্টেগু তাঁহার রোজ-নামচায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"ভারতকে আমরা আমাদের পক্ষে রাখি, মিঃ গন্ধী ইহাই চাহেন। তিনি চাহেন, ভারতের কোটি কোটি লোক বৃটিশ রাজের পক্ষে অস্ত্রধারণ করে। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর ভারতীয় রাজনীতিকরা বিপ্লবী হউক বা না হউক, সিভিল সার্ভ্যাণ্টদের বিরুদ্ধবাদী হউক বা না হউক, উহাদের মধ্যে কেহই বৃটিশ সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না।" কেন এমন মতের পার্থক্য হয়?

এই ভাবের পার্থক্য বর্ত্তমানে যেরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে, এমন আর কোন কালে করে নাই। ইহার কারণ কি? ভারত যতই তাহার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ততই সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয় বিদায়ের ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছে বলিয়া কি? তাহারা জানে, শেষ বিদায় এক দিন লইতেই হইবে। তথাপি বিদায়ের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তাহাদের প্রাণ আকুলি-ব্যাকুলি করে না কি? কিন্তু যাঁহারা ধীরচিত্ত এবং ত্যাগে অভ্যস্ত, তাঁহারা আদৌ বিচলিত হন না। তাঁহারা জানেন, যখন ছাড়াছাড়ি হইবেই, তখন বন্ধুভাবে প্রীতির সহিত হওয়া ভাল। এখানে ক্ষমতার, ইজ্জতের ও একচেটিয়া অধিকারের সহিত ছাড়াছাড়িরই কথা হইতেছে, সম্বন্ধ বা প্রীতি ও বন্ধুত্বের ছাড়াছাড়ির কথা হইতেছে না।

মিঃ এসমিড বার্টলেটের শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদীরা ছাড়াছাড়ির কথা সহ্য করিতে পারে না, সে কথা উঠিলেই ক্রোধে ধৈর্য্যহারা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এই সংবাদ-লেখক ভারতবাসীকে তোষামোদ, বকসিস-প্রিয় ও ঘুষখোর বলিয়া গালি পাড়িয়াছে। ভারতীয়ের অপরাধ,—তাহারা তাহাদের জন্মগত অধিকার চাহিতেছে। তাই বার্টলেট বলিয়াছে, ভারতীয়দের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে—স্বরাজ আসিলে বৃটিশের অনুপস্থিতিতে দেশ তোষামোদ ও ঘুষে ভরিয়া যাইবে। শুনা যায়, বৃটিশ বণিকরা নবাবী আমলে এ দেশে আসিয়া উড়িষ্যার মুসলমানরাজের শাসন-প্রতিভূর চরণচুম্বন করিয়া বাণিজ্যের অধিকার চাহিয়াছিল। ভারতীয়রা কি ইহাদের দেখাদেখি তোষামোদে অভ্যস্ত হইয়াছে? পলাশীর যুদ্ধকালে এডমিরাল ওয়াটসনের নাম জাল হইয়াছিল এবং মিরজাফরকে তুষ্ট করিয়া নবাবের বিপক্ষে দাঁড় করান হইয়াছিল, ইংরাজের ইতিহাসে ইহা পাওয়া যায়। এই দুই বিদ্যাও কি এদেশীয়রা ঐ সূত্র হইতে শিক্ষা করিয়াছে? এ দেশের খানসামা-চাপরাশীরা তোষামোদে ও বক্‌সিসে অভ্যস্ত বলিয়া নানা ইংরাজের গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তখনকার আমলের 'শ্বেত নবাবদের' চাপরাশী-খানসামারা এই অভ্যাস পাইয়াছিল কি শ্বেত নবাবদের সহবাসে ও উৎসাহে?

মিঃ উইন্সটন চার্চ্চহিলও কম যান না। পাছে ভারতীয়রা মনে করে যে, গোল টেবল বৈঠকে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ করিবার সুযোগ দেওয়ায় তাহাদিগকে বৈঠক আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবে, এই জন্ত তিনি অযাচিতভাবে তাড়াতাড়ি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "গোল টেবল বৈঠক ঔপনিবেশিক

স্বায়ত্ত-শাসনের খসড়া প্রস্তুত করিবে, যদি ভারতীয়রা এ কথা মনে করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে। তাহাদের এ ধারণা দূর করিয়া দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এক পার্লামেণ্টই শাসননীতি বা শাসন-প্রণালীর খসড়া প্রস্তুত করিতে পারে।" তথাস্তু। তবে এ সহজ কথাটা বুঝাইবার জন্য এত খরচ করিয়া মহা আড়ম্বরে বৈঠক বসাইবার প্রয়োজন কি ছিল ?

লর্ড জেটল্যাণ্ড (লর্ড রোণাল্ডশে) বলিয়াছেন, "এখনই ভারতবাসীরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাদিকার পাইবার উপযুক্ত, ইহা স্বপ্নেও মনে করা যায় না। কারণ, তাহাদের অজ্ঞতা, সাম্প্রদায়িক বিরোধ, আত্মরক্ষার অক্ষমতা প্রভৃতি অন্তরায় যথেষ্ট।'' অথচ লর্ড ডারহাম যখন কানাডাকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া সম্ভবপর মনে করিয়াছিলেন, তখন কানাডাও নিরক্ষর ছিল এবং কানাডায় জাতিধর্ম্মগত বিরোধও প্রবল ছিল। কেবল কানাডা নহে, দক্ষিণ-আফরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতিরও বৃটিশ নৌবলের সাহায্য ব্যতিরেকে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু ভারত যে ভারত !

মিঃ লয়েড জর্জ্জই এক দিন আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য গোল টেবল বৈঠক বসাইয়া আপোষ-সন্ধি করিয়াছিলেন, অথচ তিনিই ভারতের সম্পর্কে বলিতেছেন, "যদি আমরা ভারতবর্ষকে হারাই, যদি আমরা কর্ণেল ম্যাথিয়াস দরগাইএর যুদ্ধে যে বৃটিশ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দেখাইতে না পারি, তাহা হইলে ভারতবর্ষ অরাজকতা ও অশান্তি উপদ্রবের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। অতএব এই প্রবৃত্তি আমাদিগকে দেখাইতে হইবে, তাহা হইলেই আমাদের সাম্রাজ্য আমরা রক্ষা করিতে পারিব।" পাইওনীয়ারও এক দিন ভারতবাসীকে 'ব্যাঘ্রপ্রকৃতি' দেখাইয়া ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর ভারতের য়ুরোপীয় বণিক ওয়াটসন স্মাইদ ভারতবাসীকে দাঁত দেখাইয়াছিলেন। মিঃ লয়েড জর্জ্জ মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব করিবার পর যে ক্রমে এই শ্রেণীর ঝুনা সাম্রাজ্যবাদীদেরও নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছেন, ইহা দুঃখের কথা। কিন্তু 'দরগাই প্রবৃত্তি' থাকিলে কি ভারতবর্ষকে ও তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে রাখা যাবে ?

বহু মনীষী ইংরাজ ও মার্কিণ ত তাহা বলেন না। বিলাতের সুবিখ্যাত উদারনীতিক সার হার্ব্বার্ট স্যামুয়েল লর্ড আরউইনের পর ভারতের শাসনকর্তা হইবেন, এমন কথা উঠিয়াছিল। তিনি 'কনটেম্পোরারি রিভিউ' পত্রে সে দিন লিখিয়াছেন, "আমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, সুতরাং আমরা অপর জাতিকে আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন হইতে দেখিলে তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করি। সাম্রাজ্যের সকল অংশে এই প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধন করিলে কেন্দ্রশক্তির মহিমাবৃদ্ধিই হইবে, খর্ব্ব হইবে না। যে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশ কেন্দ্রীয় শক্তির সহিত সমান বলিয়া আপনাকে মনে করিতে পারে, সেই সাম্রাজ্যই মহৎ।"

জিজ্ঞাস্য, লয়েড জর্জ্জও উদারনীতিক, সার হার্ব্বার্টও উদার-নীতিক, কিন্তু উভয়ের সাম্রাজ্যগঠনে ও রক্ষণে কে সমধিক অধিকারী ? লয়েড জর্জ্জ ভাঙ্গনে মজবুত বলিয়াই জার্ম্মাণ যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু শান্তির সময় তাঁহার বিদ্যা জাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মত লোক সাম্রাজ্যের অনিষ্টকারী শত্রু। পূর্ব্বে যে এসমিড বার্টলেটের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই বার্টলেটও এই শ্রেণীর লোক। এই লেখক 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রে ধারাবাহিক প্রবন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আমরা কি ভারতকে হারাইব ?" সার তেজ বাহাদুর ইহার চমৎকার জবাব দিয়াছেন, "হাঁ, যদি তোমার মত লোক সাম্রাজ্যের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার পায়, তুমি যদি বড়লাট হও, আর ক্রাডক ও ওডয়ার তোমার শাসন-পরিষদের সদস্য হয়, তাহা হইলে তোমাদের ভারত হারাইতে এক দিনও বিলম্ব হইবে না।"

সত্যই তাই। কিন্তু সার হার্ব্বার্ট সামুয়েলের মত উদার-নীতিক যদি সংখ্যায় অধিক হইতেন, তাহা হইলে ভারতে ও বিলাতে প্রীতির ও বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হইত। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন' পত্র উদারনীতিক মতাবলম্বী। মিঃ লয়েড জর্জ্জ 'দরগাইএর প্রবৃত্তি' দেখাইয়া ভারতকে দখলে রাখিবার আস্ফালন করিয়াছেন, কিন্তু এই পত্র লিখিয়াছেন,—"ইহা করিলেও আমরা বলপ্রয়োগ দ্বারা ভারত শাসন করিতে পারিব না। ভারত আমাদের কাছেই শিক্ষা পাইয়াছে যে, স্বাধীনতা বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন জাতির জন্মগত অধিকার। আমরাও এই অধিকারের সম্মান করিয়া থাকি এবং আমাদিগকেই সাহসে বুক বাঁধিয়া ভারতীয়কে সেই অধিকার দিতে হইবে। আমরা যদি বুঝিবার চেষ্টা করি যে, ভারতীয়রা আমাদের অধীন জাতি নহে—তাহারা দায়িত্বহীন ব্যবস্থাপক সভাসমূহকে স্বাধীনতার ছায়া বলিয়া বুঝিতেছে, তবেই আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইব।"

"স্পেক্‌টেটর" নামক বিখ্যাত পত্রও এ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছে, "শাস্ত্রীর বক্তৃতা পাঠে বুঝিতে পারি, ভারতীয় মধ্যপন্থীর দাবীর সহিত চরমপন্থীর দাবীর পার্থক্য নাই। আর বুঝিতে পারি, মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীর দাবীর বিরুদ্ধে চিরদিন ভারতশাসন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।"

কেবল বিলাত নহে, মার্কিণদেশীয়দের মধ্যেও অধুনা একাধিক মনীষীকে ভারতের সমস্যার বিষয়ে চিন্তা ও অভিমত প্রকাশ করিতে দেখা যাইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের অধিবাসীরা স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক এবং সকল দেশকেই স্বভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে দেখিতে অভিলাষী। জার্ম্মাণ মহাযুদ্ধের পর মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট উডরো উইলসনের শান্তির ১৪ পয়েণ্টের সর্ত্তের মধ্যে ইহাও একটি সর্ত্ত ছিল। মার্কিণ জাতিই আইরিশ-মুক্তি-যুদ্ধে আপনাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া আইরিশ জাতিকে সাহায্য করিয়াছিল। সেই মার্কিণ জাতির Fellowship of reconciliation নামে এক শান্তিকামী প্রসিদ্ধ সমিতি আছে। এই সমিতির মতে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে বর্ত্তমান বিরোধের মূল কারণ সাম্রাজ্যিকতা,—One of the causes in India, and elsewhere, is Imperialism—the rule of exploitation of one people by another. তাঁহারা মার্কিণ নাগরিকরূপে এজন্য দুঃখিত এবং মার্কিণ শক্তিও যে বলপ্রয়োগ ও সাম্রাজ্যিকতার সাহায্য গ্রহণ করিয়া অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব করে, এজন্যও তাঁহারা দুঃখিত। ফিলিপাইন, হেইটি ও নিকারাগুয়া প্রদেশে তাঁহাদের সরকার সাম্রাজ্যিকতার খুঁটি গাড়িয়াছেন, এজন্য তাঁহারা নিজের দেশের স্বনা সাম্রাজ্যিকদিগকেও তিরস্কার হইতে বাদ দেন নাই। তাঁহারা মন্তব্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

"আমরা জগতের সকল জাতির একত্বে ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করি। জাতিগত দাম্ভিকতাকে পাপ বলিয়া মনে করি। কোন জাতিরই অন্য কোন জাতিকে জয় করিয়া শোষণ করার অধিকার নাই। এই নীতি অনুসারে আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, ভারতীয়ের অনুমতি ব্যতীত ভারতকে অধীনে রাখিবার বৃটেনের কোন নীতিসম্মত অধিকার নাই।"

মার্কিণ জাতির মধ্যে এই শ্রেণীর ভাবুক অল্প নহে। মার্কিণ সেনেটে সেনেটার ব্লেন ভারতের প্রতি বৃটেনের ব্যবহার সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মন্তব্য পেশ করিয়াছিলেন; এ কথা সকলেই শুনিয়াছেন। সুতরাং সত্য কখনও অপ্রকাশ থাকে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মার্কিণে ভারতের বিপক্ষে প্রচারকার্য্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, এ জন্য তাহারা মুক্তহস্তে অর্থ-ব্যয় করিতেও কাতর হয় নাই। মিস্ মেয়ো, লর্ড রেডিং, লর্ড নর্থক্লিফ (পূর্ব্বে), লর্ড মেষ্টন, মিঃ রাসব্রুক উইলিয়াম্‌স্,—কত চতুর নর-নারীই না এতদর্থে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল কৌশলই ব্যর্থ হইয়াছে। অধ্যাপক রাসব্রুক উইলিয়াম্‌স্ সখেদে বলিয়াছেন, "হায়! ভারতের বর্ত্তমান আন্দোলন উপলক্ষে অধুনা মার্কিণ যুক্তরাজ্যে বৃটিশের বিপক্ষে ও ভারতীয়ের স্বপক্ষে মনোভাব যত প্রবল, এত আর কখনও হয় নাই। যুক্তরাজ্যের মধ্য ও পশ্চিম অংশে ভারতের 'বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি কেবল মুখের সহানুভূতি প্রদর্শন করা ছাড়া আরও কিছু দেখিতে পাওয়া যায়।"

অধ্যাপক উইলিয়ামস্ অবশ্য নিজের উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ভারতের জন্মগত অধিকারের নিরস্ত্র অহিংস আন্দোলনকে বিপ্লব নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু কোন নিরপেক্ষ জাতি এই জন্মগত ন্যায্য অধিকারের দাবীর প্রতি সহানুভূতিশূন্য হইতে পারে?

কেবল অধ্যাপক উইলিয়াম্‌স্ নহেন, লর্ড মেষ্টনও মার্কিণে ঘা খাইয়া আসিয়া বলিয়াছেন, "ভারতকে অচিরে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় বৃটেনের কোন কারণ নাই, মার্কিণ জাতির মধ্যে অতি দ্রুত এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে।"

সে ত ভাল কথা। সাম্রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই সাম্রাজ্যবাদীদের সংকীর্ণ স্বার্থ-চালিত মতে কখনই মত দিবেন না, তাঁহারা উভয় জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব-প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর করিবার জন্য ভারতকে তাহার জন্মগত অধিকার দান করিতে বলিবেন, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

মুখের মত

শ্রমিক দলের অন্যতম নেতা ডাক্তার ওয়াল্টার ওয়াল্‌স্ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে 'নিউ লীডার' পত্রের মারফতে একখানি খোলা চিঠি দিয়াছেন। সেখানি শ্রমিক দলপতির একটি 'মুখের মত' হইয়াছে যে, বোধ হয়, সেখানি ইতিহাসপ্রসিদ্ধই হইয়া যাইবে। চিঠিখানি এই ভাবের :—"মথুরার রাজ[illegible] বসিয়া ব্রজকে কি ভুলিলে ভাই? তুমি দেশের শাসনপাটে [illegible] পূর্ব্বতন মন্ত্রিমণ্ডলের বৈদেশিক নীতি অক্ষুণ্ণ রাখি[illegible] চেষ্টা করিয়া শ্রমিক দলের মূলনীতি বিসর্জ্জন দিয়াছ। [illegible]রত তোমার নিকট আত্ম-নিয়ন্ত্রণ চাহিয়াছিল, তুমি তাহা[illegible]কে দিয়াছ বে-পরোয়া ধর্ষণনীতি। শ্রমিকদল এ যাবৎ [illegible] যে সকল ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে তুমি [illegible] পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়াছ। পরন্তু ভারতকে যে সকল প্র[illegible]তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভঙ্গ করিয়াছ। অতএব তু[illegible] যদি পদত্যাগ করিতে না চাও, তাহা হইলে হয় তুমি প্রকৃ[illegible]র্তক

বসাইয়া কারারুদ্ধ ভারতীয় নেতৃগণের প্রধান পাঁচটি দাবীকে ভিত্তি করিয়া আপোষে সন্ধি কর, না হয়, ভারতে আরও ভয়াবহ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া এমন নাম রাখিয়া যাও, যাহাতে তোমাকে ভবিষ্যতের লোক অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিবে যে, এই প্রধান মন্ত্রীটা ভারতবর্ষ হারাইয়াছে।'

মাল দিবে কে?

আমাদের শাসক জাতি গোল টেবল বৈঠক বসাইয়া ভারতের অশান্তি দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভাল কথা। কিন্তু পূর্ব্বাপর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে উদ্দেশ্যে বৈঠক বসান হইয়াছে, সেই মূল উদ্দেশ্যই ইহাতে সাধিত হইবার উপায় নাই।

সাইমন কমিশনের নিয়োগে সরকার পক্ষ যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবাসী সন্তুষ্ট হয় নাই, তৎপরিবর্ত্তে কমিশন বর্জ্জন করিয়াছিল। কেন, তাহা এখন সর্ব্বজনবিদিত। ইহা সত্ত্বেও সাইমন কমিশন বসে ও উহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সে রিপোর্ট ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার এত বিরোধী যে, উহাও বর্জ্জিত হইয়াছিল। প্রকাশ পায়, স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদের মধ্যেও অনেকে ইহার সিদ্ধান্তকে সন্তোষজনক মনে করিতে পারেন নাই। দিল্লীতে বড়লাটের সহিত মহাত্মা গন্ধী ও অন্যান্য নেতার আপোষের কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পর হইতেই মহাত্মা গন্ধী বড়লাট লর্ড আরউইনকে খোলা চিঠি দিয়া সমস্ত কথা জানাইয়া আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন এবং তাহার ফলে ভারতে বর্ত্তমানে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হয়, যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। সরকার স্বয়ং ইহার প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। [illegible]শাসনে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, নারীজাগরণে, জনগণমধ্যে [illegible]ক্তির বাণীর প্রসারে যেন একটা নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। [illegible]ইনভঙ্গের প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে লেখকের প্রবৃত্তিও ভিন্ন আকার [illegible] করিল। সরকার যে ইহাতে প্রমাদ গণিবেন, তাহাতে [illegible]য়ের বিষয় কি আছে? বেশ নির্ব্বিবাদে নিশ্চিন্তমনে "লেখা-[illegible] কর," "গাড়ী-ঘোড়া চড়, ন্যায্য খাজনা দিয়া দাও"—কোন [illegible] নাই। কিন্তু এ কি? আইন দ্বারা রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা [illegible] হয়, সে আইন ভঙ্গ করিলে রাজ্য থাকে কি? কিন্তু [illegible] মুক্তিকামী প্রজা কি হেতু আইন ভঙ্গ করিতেছে, [illegible] দেখিবার যেন প্রয়োজন নাই!

শাসকজাতির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া অভিযোগের প্রতীকার করাই যে তাহাদের উদ্দেশ্য, তাহাও বোধ হয়, শাসক জাতি স্বীকার করিবেন না।

যাহা হউক, ইহা হইতেই বুঝা যায়, কেন গোল টেবল বৈঠক বসান হইয়াছে। আইনভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃবর্গের সহিত যদি একটা আপোষ-বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে দেশের অসন্তোষ অশান্তি দূর হইতে পারে, ইহাই কি কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল না? যদি তাহাই হয়, তবে গোল টেবলে তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই কেন? উত্তর হইবে, সপ্রু-জয়াকর যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও তাঁহাদিগকে মডারেট নেতারা নরম করিতে পারেন নাই।

কিন্তু ইহার উত্তরে কংগ্রেস নেতারাও ত বলিতে পারেন, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন তারিখে শ্রমিক দলের মিঃ স্লোকোম্ব আপোষের যে সকল সর্ত্ত রচনা করিয়া পণ্ডিত মতিলালকে দিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত জয়াকর, পণ্ডিত মতিলাল ও মিঃ স্লোকোম্বের মধ্যে যে পরামর্শ হয়, সেই পরামর্শকালে যাহা মতিলাল অনুমোদন করিয়াছিলেন, সরকার উহাও অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল সেই সময়ে এই কথা বলিয়াছিলেন,—

"বৃটিশ ও ভারত সরকার ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারেন না, গোল টেবল বৈঠক স্বাধীনভাবে কি সিদ্ধান্ত করিবেন, অথবা বৃটিশ পার্লামেণ্ট বৈঠকের পরামর্শ পাইবার পর কি ভাবে কায করেন, তাহাও বৃটিশ ও ভারত সরকার পূর্ব্বাহ্নে বলিতে পারেন না। এ কথা সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও যদি তাঁহারা গোপনে একটা প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁহারা ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবী সমর্থন করিবেন, তাহা হইলে কংগ্রেস নেতারা গোল টেবল বৈঠকে যাইতে পারেন। অবশ্য এই অধিকার দিবার পক্ষে যে সকল বিধিনিষেধ করা আবশ্যক, তাহা উভয় পক্ষের মতামত অনুসারে করা হইবে, কেবল ভারত দাবী করিলেই নহে।"

ঠিক এই কথা না হইলেও, এই ভাবেরই কথা পণ্ডিত মতিলাল, মিঃ স্লোকোম্ব ও শ্রীযুক্ত জয়াকরকে জানাইয়াছিলেন। ইহাতেও কি তিনি সন্তোষজনক উত্তর পাইয়াছিলেন? ইতিহাস ত সে কথা বলিবে না।

এইরূপে আপোষ-কথা ব্যর্থ হইয়া যাইবার পর সরকার ভারত হইতে মনোনয়ন করিয়া বৈঠকের প্রতিনিধি সংগ্রহ করিয়াছেন। আয়ার্ল্যাণ্ডে কিন্তু সদস্যনির্ব্বাচনের ভার দেশবাসীই পাইয়াছিল। তাহার পর যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহারা কাহারা? তাঁহারা ভারতের কয়জন লোকের প্রতিনিধি? তাঁহাদের সম্মতি বা সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবেই বা কে? অবশ্য

তাঁহাদের মধ্যে শাস্ত্রী সপরু প্রমুখ মনীষীরা পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার না পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন না বলিয়া বিলাতে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বিখ্যাত "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জেন", "স্পেক্টেটর" প্রমুখ বিলাতী পত্র ও এদেশের "পাইওনীয়ার" তাঁহার বক্তৃতার অশেষ সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন,—"এই দাবীর বিষয়ে মধ্যপন্থী চরমপন্থী নাই, ইহাতে সবাই একমত।" এমন কি, সার মহম্মদ সফি ও মিঃ মহম্মদ আলির মত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষীরাও বিলাতে এই দাবী করিয়াছেন। এ জন্ম শাসক জাতি নিশ্চিতই বুঝিবেন, ভারতের ব্যথা কোথায়। যাঁহাদিগকে মডারেট ও সহযোগকামী বলিয়া সদম্মানে সাগর-পারে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তাঁহারাও যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দাবী করেন !

কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা কাহারা ? বিলাতেরই এক পত্র পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, "গন্ধী না হইলে মাল দিবে কে ?" সত্যই তাই। মহাত্মা গন্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসকে বাদ দিয়া আপোষ-বৈঠক বসান সম্ভবপর হইতে পারে, এবং সেই বৈঠকের সিদ্ধান্তকে পার্লামেন্টে পেশ করিয়া ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতির খসড়াও প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু উহা মানিবে কে ? লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবশ্য বলপ্রয়োগ দ্বারা উহা চালান সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সে কত দিন ? এখন যেমন ধর্ষণ-নীতির দ্বারা অর্ডিনান্স ও লাঠি-বেটন দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা সফল হইতেছে, তখনও কি সেইরূপ হইবে না ? যাহারা মাল দিবার, তাহাদের সহিত আপোষ না করিলে, আপোষ করিবে কে ?

সত্য কথা

মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চহিলের শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেন, তাহা যে ভ্রান্ত, তাহা পদে পদে সপ্রমাণ। তিনি লর্ড আরউইন সরকারের দুর্ব্বলতাকেই বর্ত্তমানে যত অনিষ্টের মূল বলিয়া ধারণা করেন। তিনি বলেন, এই সরকার যদি কখনও নরম, কখনও গরম না হইয়া, বরাবর ন্যায়-বিচারের উপর নির্ভর করিয়া ধীরচিত্তে কায করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আজ সাম্রাজ্যের এই সঙ্কট দেখা দিত না। তাঁহার 'ধীর চিত্তে ন্যায়বিচারের' নমুনা এই,—"গন্ধী প্রভৃতি আন্দোলন-কারীদিগকে যদি দোষী বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে বিচার করিয়া দণ্ড দাও, জেলে রাখ। গোলযোগ অশান্তি আপনিই কমিয়া যাইবে। দেশের লোক যদি বুঝে, সরকার শাসন করিতেছেন, তাহা হইলে আর গোলযোগ করিতে সাহসী হইবে না। তাহা না করিয়া গন্ধীকে বিনা বিচারে জেলে রাখা হইল। ফলে লক্ষ লক্ষ লোক গন্ধীর পক্ষপাতী হইল। তাহার পর যদি জেলেই রাখিলে, তবে তাহার সহিত শান্তির জন্ম দূত পাঠাইলে কেন ? ইহাতে প্রাচ্যের লোক মনে করিবেই যে, সরকার গন্ধীকে ভয় করে। ইহাতেই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।"

এ ধারণা যে ভ্রান্ত, তাহা নিরপেক্ষমাত্রেই বলিবে। লর্ড বার্কেণহেডও এক দিন আয়ার্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে এমনই বলিয়াছিলেন, আবার লর্ড বার্কেণহেডই পরে আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিবার পথে অগ্রণী হইয়াছিলেন ! মিঃ চার্চ্চহিলও যে ভারতের বেলা তাহা হইবেন না, তাহা কে বলিতে পারে ?

অনেকে ভারতের ও ভারতের অধিবাসীদের সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাস জানেন না বলিয়া এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। মিঃ চার্চ্চহিল প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদীরা চিরদিন ইতিহাস পাঠ করিয়া আসিতেছেন ও লোকের মুখে শুনিয়া আসিতেছেন যে, ভারতের লোক গণতন্ত্র কাহাকে বলে জানিত না, উহা বিলাতের আমদানী। ভারতের লোক চিরদিন স্বেচ্ছাচারী একচ্ছত্রী শাসকের শাসনই ভালরূপ জানে। এই হেতু উহারা এখন স্বায়ত্তশাসন পাইবার উপযুক্ত নহে। আর সেই জন্ম যাহারা ভারতের পক্ষে স্বায়ত্তশাসনলাভের আন্দোলন করে, তাহারা বিপ্লবী বা বিদ্রোহী, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ড প্রদান করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

কিন্তু তাঁহারা যে গোড়ায় গলদ করিয়া বসেন, তাহাতেই ত যত অনর্থপাত হয় ! ভারতের লোক আজ নহে, হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে গণতন্ত্র-শাসনের সহিত সুপরিচিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রামের পঞ্চায়েৎ, মণ্ডল, মুখ্য, প্রধান, মন্ত্রিমণ্ডল, সভাসদ প্রভৃতি কথা তাহার পরিচয় প্রদান করে। ইংরাজরা মাত্র কয় শত বৎসর পূর্ব্বের 'উইটানগামটের' বা 'বিজ্ঞলোকের পরিষদের' বড়াই করে, কিন্তু তাহার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের রাজার "বিজ্ঞলোকের পরিষদ" ছিল।

সে পুরাতন যুগের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। ইংরাজ এদেশে আসিবার পর এদেশের কি অবস্থা ছিল, তাহা দুই জন মনীষী ইংরাজের রচনা হইতেই দেখাইতেছি। সার টমাস মনরোর মত ইংরাজ শাসক এদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত 'East India Papers' গ্রন্থে তাঁহার রচনায় এই কথা কয়টি আছে :—"Strong attachment of the Natives to trial by Punchayet." তাঁহার সময়েও এই পঞ্চায়েৎ বা গণতন্ত্র শাসনের বিশেষ প্রভাব ছিল। লর্ড এলফিনষ্টোন আর এক জন শ্রেষ্ঠ ইংরাজ শাসক। তিনিও

মহারাষ্ট্রে পঞ্চায়েতের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উহা ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের কথা।

মিঃ বার্ণার্ড হাউটন ব্রহ্মের ইংরাজ সিভিলিয়ান ছিলেন। ভারতেও তিনি বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাই বলিয়া গিয়াছেন, "In some respects, particularly in its village organisation, its (India's) civilisation is more democratic and better than ours." অর্থাৎ ভারতের গণতন্ত্রশাসন বৃটেনের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ছিল।

এই শাসনপ্রথা ভাঙ্গিয়া দিল কে ? পরলোকগত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার Economic History of India গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"The effacement of village self-government is one of the saddest results of British rule in India."—বৃটিশ-শাসনই ইহার ধ্বংসের কারণ।

তবে ? গণতন্ত্রশাসন তাহা হইলে ভারতের ধার করা নহে, নিজস্ব। অথচ বর্ত্তমানের সাম্রাজ্যবাদীরা অতীতের ইতিহাস উড়াইয়া দিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ভারতের এই শাসন ধাতুসহ নহে, সুতরাং উহা ভারতবাসীকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে ! বিড়ম্বনা আর কি !

লালবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়

"স্বর্ণলতা"-প্রণেতা পরলোকগত প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র রায় বাহাদুর ডাক্তার লালবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় গত ২৪শে [illegible] তারিখে তাঁহার কলিকাতার বাটীতে ৪৮ বৎসর বয়সে [illegible]ক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই মেধাবী [illegible] ছিলেন। এল, এম, এস কলেজে বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি [illegible] কলেজে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে প্রশংসার [illegible] শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়, বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতির সহপাঠী ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মেডেল ও পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। এম, বি, উপাধি লাভ করিবার পর তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে কলেরা ও বসন্ত রোগের চিকিৎসক এবং কলিকাতার সহরতলীর পুলিস সার্জ্জনের পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য সরকার তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। চিকিৎসাব্যবসায়ে তাঁহার বদান্যতার খ্যাতি ছিল। তিনি কালীঘাট অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া উক্ত অঞ্চলের কোন রোগীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা করিতেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সন্তানহীনা বিধবা পত্নীর ভরণপোষণের জন্য মাসিক ১ শত টাকার ব্যবস্থা করিয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে দান করিয়া গিয়াছেন। পরহিতে এই দান তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে তাঁহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

পরলোকে সতীশচন্দ্র মিত্র

লক্ষ্মী-বিলাস মুদ্রাযন্ত্রের অন্যতম স্বত্বাধিকারী, বহু উপন্যাস এবং বিভিন্ন মাসিকপত্রের প্রকাশক, বন্ধুবর সতীশচন্দ্র মিত্রের অকালে পরলোকগমন সংবাদে আমরা বিশেষ ব্যথিত—মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার সাহিত্যপ্রচারপ্রচেষ্টা বহুবার ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু তিনি ভগ্নোদ্যম না হইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে 'পুষ্পপাত্র' মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জ্ঞান-চক্ষু

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে বলাই ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখে, দালানে বিন্দুর পিসিমা বসিয়া যোগমায়া দেবীর সঙ্গে নিবিষ্ট-ভাবে কথা কহিতেছেন। বিন্দুর কথাই? রাত্রিকার সেই সুগভীর অভিসন্ধির ব্যাপার বলাইয়ের মনে পড়িল;—শম্ভু বাবু আসিয়াছেন, বৈষয়িক বন্দোবস্ত পাকা করিবার জন্য।

বলাই একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিসিমা কহিলেন,—ওকে সেখানে রেখে এক দণ্ড আমি সুস্থির থাকতে পারবো না এখানে।

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—না, না, তুমি সঙ্গ ছেড়ো না। যেতে যখন হবেই, তখন তুমিও সঙ্গে যাও।

বলাই কহিল,—কবে তোমরা ফিরবে পিসিমা?

পিসিমা কহিলেন,—পাঁচ-সাত দিন হবে, বাবা—কি বলো, বৌ?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—তা হবে বৈ কি।

বলাই আর কোনো কথা না বলিয়া নিঃশব্দে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। দুর্ভাবনায় বুক তার ভরিয়া উঠিয়াছিল। এ জীবনের মত বিন্দুর সব চুকিয়া গিয়াছে…চক্ষের পলকে! ঐ সম্পত্তি, সে এক মস্ত বল! সে বলটুকু ছিনাইয়া লইবার কি নিগূঢ় চক্রান্ত! এদিকে শান্তর বিবাহের জন্য বাবা ঐ ভূতের মত একটা পাত্র স্থির করিতেছেন! মাথার উপর অসীম আকাশ যেন ভারী পাথরের মত ঝুলিতেছে…কখন খসিয়া পড়ে! বলাই ভাবিল, কি করিয়া এ ঘটনাগুলার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাদের হঠাইবে!

চিন্তিত মনে ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া সে দাঁড়াইল একে-বারে বিন্দুদের গৃহের সামনে। গৃহ-মধ্যে শম্ভু বাবুর কণ্ঠ বেশ সরাগ। শম্ভু বলিতেছিল,—বিন্দুকে মা, এখানে আর আসতে দেওয়া হবে না। এই পাড়া—ছোটলোকের রাজ্যি…

মার জবাব শুনা গেল না।

রাগে বলাইয়ের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। হতভাগা মুরুব্বির মত কথা কয়, ত্যাখো! নিজের তো ভারী মুরোদ—মুখের কথা ওদিকে রাজ-চক্রবর্ত্তীর মত! একবার যদি হাতের নাগালে উহাকে পায়! তার হাত নিশ্‌পিশ্‌ করিয়া উঠিল।

একটা ফন্দী বাগাইয়া বলাই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, ডাকিল,—বিন্দু…

শম্ভু সামনের উঠানেই বেতের মোড়ায় বসিয়া চাকু ছুরি দিয়া একখানা বাঁখারি চাঁচিতেছিল। বিন্দু ছিল রান্নাঘরে, বলাইয়ের সাড়া পাইয়া কহিল,—কে? বলাইদা! আমি এই রান্নাঘরে।

শম্ভুর পানে তীব্র একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলাই রান্নাঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল: শম্ভুর গা একটু কাঁপিল, ভীত অথচ কুতূহলী দৃষ্টিতে সে বলাইয়ের পানে চাহিয়া নিমেষে দৃষ্টি ফিরাইল।

বলাই কহিল,—কি হচ্ছে?

বিন্দু কহিল,—চা তৈরী করবো বলে গরম জল চড়িয়েছি। দুধ নিয়ে এলুম মঙ্গলার কাছ থেকে…

বলাই কহিল,—ঐ পূজনীয় অতিথির সেবা হবে, বুঝি?

চোখের দৃষ্টিতে ভৎর্সনা ভরিয়া বিন্দু বলাইয়ের পানে চাহিল, কহিল,—আঃ, বলাইদা! তোমায় না বারণ করেচি…

হাসিয়া বলাই কহিল,—বসে আছে ত্যাখো না। ও বাঁখারি চাঁচা হচ্ছে কেন? সেনাপতির অস্ত্র-সংগ্রহ…আমার জন্যে না কি?

হাতের কায থামাইয়া শম্ভু এদিকে মনঃসংযোগ করিয়া-ছিল, বলাইয়ের কথাগুলা কাণে গেল। কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। বলাইয়ের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাতে যাচিয়া তার সঙ্গে কোনো তর্ক ফাঁদিবার সাহস হয় না! তবু রাগের সীমা ছিল না। মনের রাগ মনকেই শুধু তাতাইয়া তুলিল।

বলাই কহিল,—ওই দাও না…একটু রঙীন জল তো। দুধ মিশিয়ে থাক্‌।

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—তুমি যে কি বলো, বলাইদা!

—কথাগুলো কিন্তু বাজে নয়। কলকাতার ও কাপ্তেনী চাল আমার তো জানতে বাকী নেই।

শম্ভু নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পর বলাইয়ের পানে লক্ষ্য রাখিয়া ধীরে ধীরে গিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, কথাগুলা তার কাণে গিয়াছিল! সাধিয়া ও-হতভাগা কলহ বাধাইতে চায় নাকি! ঘরে ঢুকিয়া শম্ভু ডাকিল—মা

মা ঘরের একধারে আহ্নিকে বসিয়া ছিলেন; কহিলেন,—কেন?

শম্ভু স্বর ঈষৎ মৃদু করিয়া কহিল—সেই হতভাগা ছোঁড়াটা এসেচে—জেলে গেছলো সেই যে বলা…

মা সে কথা কাণে না তুলিয়া জপেই বসিয়া রহিলেন। শম্ভু কহিল,—কি ভাব বিন্দুর সঙ্গে দ্যাখো না! এসে কি রকম ঠাট্টা-তামাসা চলেছে! এ কি তোমাদের বাড়ীর চাল?

কথায় মনের সমস্ত ঝাল ঢালিয়া মার উত্তরের প্রতীক্ষায় শম্ভু মার পানে চাহিয়া রহিল। মা কোনো জবাব দিলেন না।

বাহিরে বলাই তখন বিন্দুকে বলিতেছিল, শান্তর বিবাহ-সম্বন্ধের কথা। সংক্ষিপ্ত রিপোর্টটুকু শেষ করিয়া বলাই কহিল,—এ বিয়ে আমি হতেই দেবো না। এর জন্যে লাঠালাঠি করতে হয় যদি তো তাতেও রাজী আছি।

বিন্দু ছুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল,—কার সঙ্গে লাঠালাঠি করবে, বলাইদা? জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে? গুরুজন, বাবা…

বলাই কহিল,—বাপ যদি এত বড় অত্যাচার করে তো তা সইতে হবে? বেচারী শান্ত!…সে কি দোষ করেচে যে…বলিতে বলিতে বিন্দুর অসহায় অবস্থার কথা তার মনে দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল—এই যে কটা শয়তান মিলে বিয়ের নামে তোমার উপর কি অত্যাচার না করলে! আমি যদি তখন থাকতুম, তা হলে কি এ কাণ্ড ঘটতে দিতুম…

সারা দুনিয়ার উপর নিমেষে বলাইয়ের রাগ ধরিয়া গেল।

বিন্দু চমকিয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ, এ সব কি কথা! যারা এ কাজের উদ্যোগী, তারা যে ঐ কাছেই বসিয়া রহিয়াছে। শুনিলে গঞ্জনার তার অন্ত থাকিবে না। কাল রাত্রেই পিসি দুঃখ করিতেছিল বলিয়া শম্ভুর মা তার অদৃষ্টকে কোথা হইতে টানিয়া আনিয়া তার ঘাড়েই এ অকল্যাণের যত দায় চাপাইতে একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া ছিলেন। অদৃষ্ট-দোষেই তার অমন জোয়ান স্বামী এই বয়সে প্রাণ হারাইল! রোগ মানুষের হয়—শঙ্করেরও হইয়াছিল; এ রোগে বাঁচিয়াও তো ছিল বরাবর; কিন্তু বিন্দু তার অদৃষ্ট লইয়া যেমন শঙ্করের জীবন-পথে আসিয়া দাঁড়াইল, তার প্রাণ কর্পূরের মত অমনি…!

সে কথা শুনিয়া অবধি ভয়ে লজ্জায় বিন্দু একেবারে কাঁটা হইয়া আছে। সে বলিল—ও-সব কথা এখন থাক বলাইদা। মানুষ মানুষের ভালো-মন্দ কিছুই করতে পারে না। এই দ্যাখো না, কোনো অপরাধ নেই, অথচ তোমার জীবনে কি না ঘটে গেল!

বলাই কহিল—তা নয়, বিন্দু। আমি ইচ্ছা করেই সে কলঙ্ক মাথায় নিয়েছিলুম। শুধু আমার ইচ্ছা—অপরকে বাঁচাবার জন্য…

বিন্দু কহিল—তা বুঝি, বলাইদা…তোমার যে কতখানি মহত্ব…

বাধা দিয়া বলাই কহিল,—মহত্ব-টহত্ব বুঝি না, বিন্দু। সামনে যা দেখেছিলুম, তাতে ও-ছাড়া উপায়ও ছিল না। তবে সকলকে ছেড়ে সেই নিরালা ক'দিনে জেলে বসে যে-শিক্ষা পেয়েচি, তাতে বুঝেচি, সত্য বা ন্যায় বলে' যা বুঝবো, তার পক্ষ নিয়ে দাঁড়াতে ভয়ে কোনো দিন টলবো না—এ বিশ্বাস আমার মনে পাকা করে গেঁথেচি।

কথাগুলা বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে এবং কি জানি এই সব আলোচনার ফলে বলাইদা যদি দুম্‌ করিয়া ঐ শম্ভুদা বা তার মাকে কোনো কঠিন রূঢ় কথা বলিয়া ফেলে, সেই ভয়ে একটা পাথর-বাটীতে চা ঢালিয়া তাহাতে দুধ ও চিনি মিশাইয়া বিন্দু কহিল,—চাটুকু দিয়ে আসি শম্ভুদাকে। তুমি বসবে?

—না, যাই। বলিয়া বলাই ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তার পর কহিল,—ভালো কথা, তোমরা আজই যাচ্ছো তা হলে?

করুণ দৃষ্টি মেলিয়া বিন্দু বলাইয়ের পানে চাহিল, কহিল, —তাই তো শুনেচি।

বলাই কহিল—পিসিমাও সঙ্গে যাবে?

বিন্দু কহিল—কি জানি! পিসিমা বলছিল…

বলাই কহিল—তাই করো। পিসিমাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো…এঁরা আপত্তি তুললেও। আর…

বিন্দু কহিল,—কি, বলাইদা?

বলাই কহিল—বেশী দিন সেখানে থেকো না। ওরা যদি কোনো কাগজ-পত্র সই করতে বলে, খবর্দ্দার তা করো না। এমনি একটা ব্যাপার আমি জানি কি না,—বলবো'খন। যদি পারো, আমাদের বাড়ী এসো…এখানে সে কথা বলবার সুবিধা হবে না। একজনের ভাই মারা গেলে, তার বৌকে ভুলিয়ে যথাসর্ব্বস্ব তার দ্যাওর কি-ফন্দীতে লিখিয়ে নিয়ে বেচারীকে শেষে ছেঁড়া জুতোর মত তুচ্ছ করে পথে ফেলে

দেয়! খুব সাবধান, বিন্দু...বেরুবার উপায় না পাও, আমায় চিঠি লিখো চুপি-চুপি। সে সব ঠিক করেচি কাল রাত্রে ভেবে।

ওদিক হইতে রুদ্র আদেশের স্বরে শম্ভু ডাকিল,—বিন্দু, চা হলো? বেলা কত বাড়লো, হুশ্ আছে কি?

বলাইয়ের চোখ বিস্ফারিত হইল। নিমেষের জন্য। তার পরই কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া সে কহিল,—ও বাবা! এখানেই রাজ-চক্রবর্ত্তীর মত হুকুমের এই চড়া সুর...নিজের এক্তারে পেলে এ যে হাতে মাথা কাটবে, দেখচি। আমি চললুম, বিন্দু। তুমি একবার সময় করে আমার সঙ্গে দেখা করো মোদ্দা, নিশ্চয়...যাবার আগে দেখা করতে ভুলো না।

বলাই বাহির হইয়া গেল। ঘরের সম্মুখে রোয়াকে দাঁড়াইয়া শম্ভু...পাথরে গড়া নিশ্চল মূর্ত্তির মত বলাইকে দেখিল।

বলাই চলিয়া গেলে শম্ভু হাঁকিল,—বিন্দু...

বিন্দু তখন কাছে আসিয়াছে, তার হাতে পাথর-বাটীতে গরম চা। সে কহিল—এই যে ভাই, চা এনেচি। এ পাট তো নেই এখানে। সরঞ্জামেরও অভাব।

ঘরের মধ্যে মা তখন ঠাকুর-প্রণাম সারিয়াছেন, ভূমি হইতে আনত শির তুলিয়া মা সহাস স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন,—তুই এখন ওকে বিন্দু বলে ডাকিস কি করে রে শম্ভু! ও যে তোর বড় ভাজ বৌদি...ওকে বৌদি বলবি। লজ্জা করে বুঝি?

শম্ভু কোনো কথা কহিল না—বিরস কঠিন দৃষ্টিতে বিন্দুর পানে চাহিয়া রহিল।

বিন্দু তার হাতে পাথর-বাটী তুলিয়া দিয়া কহিল—চা নাও, শম্ভুদা...আমি একবার পিসিমাকে দেখি।

তার কথা শেষ হইল না। শম্ভু কহিল—তাঁকে দেখবার কি দরকার?...

বিন্দু সে কথায় কাণ না দিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, শম্ভু ডাকিল...বিন্দু...

বিন্দু ফিরিল। শম্ভু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিল—ওই হতভাগা-টাকে এখনো তোমাদের এখানে আসতে দাও! শুনেচি, জেলফেরৎ দাগী...তোমাদের প্রাণে এতটুকু ভয়-ডর নেই!...

বিন্দুর বুক বিদ্রোহে ফুঁশিয়া উঠিল...কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া বিন্দু কহিল—চুপ করো, শম্ভুদা...কে কি মানুষ, তা তুমি চেনো না, আর কাকে কি বলতে হয়, তাও জানো না।

সুস্পষ্ট কণ্ঠে এইটুকু বলিয়া বিন্দু নিঃশব্দে গৃহের বাহির হইয়া গেল। পাথর-বাটী হাতে দাঁড়াইয়া শম্ভু রাগে জ্বলিতে লাগিল, হুঁ, এত বড় কথা! আচ্ছা, চলো একবার ওখানে...

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মেয়ে দেখা

আজ তিন দিন বিন্দু কলিকাতায় গিয়াছে। পিসিমাও সঙ্গে গিয়াছেন। পিসিমাকেও বলাই সতর্ক করিয়া দিতে ছাড়ে নাই—দেবর-নিগৃহীতা সেই কোন্ বিধবা হৃতসর্ব্বস্বার কাহিনী বেশ পল্লবিত করিয়াই তাঁর কাছে সে বর্ণনা করিয়াছে। বিন্দুর হাতে দু'খানা টিকিট-আঁটা খামও গুঁজিয়া দিয়াছে, যদি ফিরিবার পথে বাধা দেখে তো এই খামে ছোট একটু সংবাদ পুরিয়া কোন মতে ডাক-বাক্সে ফেলাইয়া দিবে। চিঠি পাইলে বলাই যেমন করিয়া পারে ইত্যাদি।

গুম্ হইয়া বলাই শুধু ভাবিতেছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দিল্লীর তখ্ত্ লইয়া বাদশাজাদাদের সেই সুগভীর অভিসন্ধি ও খুনাখুনির কত কাহিনী মুখস্থ করিতে হয়! সে সব কাহিনী পড়িতে প্রাণে কোনো দিন বিস্ময় জাগে নাই, ভয়েও কোন দিন শিহরিয়া ওঠে নাই—চোখের সামনে তেমন ব্যাপার দেখিবে, সে কল্পনাও করে নাই! অথচ তারি গৃহের পাশে দিল্লীর ইতিহাসে লেখা সেই বিশ্রী ইতর বিরোধ-দ্বন্দ্বের অনুরূপ অভিনয় চলিয়াছে। এখানেও গৃহে গৃহে তেমনি ফন্দী, তেমনি চক্রান্ত! এত দিনেও দুনিয়ার মন সে ক্ষুদ্রতা হইতে এতটুকু মুক্তিলাভ করে নাই, তেমনি বর্ব্বর রহিয়া গিয়াছে—আশ্চর্য্য!

বৈকালের দিকে মার কাছে বলাই আব্দার তুলিয়াছিল, একটা অফিসে ক'জন লোক চাহিতেছে, আসামের ওদিকে জঙ্গল আছে...চাকরি লইয়া সেই জঙ্গলে যাইতে হইবে। কাঠ কাটিয়া চালান দিবার কাজ। বলাই সে কাজ লইয়া আসামে যাইবে।

শুনিয়া মা শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—তোর কি এখন চাকরির বয়স হয়েচে, বাবা?...

বলাই কহিল,—কিছু করতে হবে তো! ইচ্ছে আমি

আর বাধো না। যে-কালি মেখেছি, তাতে কোনো ইস্কুলে আমায় আর নেবেও না···তবে ?

মা কাতর চক্ষে বলাইয়ের পানে চাহিলেন—বুক তাঁর মমতায় একেবারে বিগলিত হইয়া উঠিল।

মা কহিলেন,—বাড়ীতেই পড়্ না, বাবা।

বলাই কহিল,—না, মা। দিগ্‌গজ পণ্ডিত হবার বাসনা আমার নেই—সে শক্তিরও অভাব। তোমার আর দুই ছেলেকে দিয়ে তোমার পণ্ডিত ছেলের সাধ পূর্ণ করো। আমি পয়সা রোজগার করে তোমার সংসারের দুঃখ কতখানি দূর করতে পারি, সেই চেষ্টা দেখবো। বোনেদের বিয়েও দিতে হবে তো!

মা হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—শোনো ছেলের কথা! তোর রোজগারে বোনেদের বিয়ে দিতে হবে! কি তোর রোজগারের শক্তি হয়েচে···

বলাই কহিল,—এই দুই হাত···বলাই দুই হাত প্রসারিত করিয়া কহিল,—এই দুই হাতে যে শক্তি আছে, মা! গাছ কাটবো, মাটী খুঁড়বো, কল চালাবো···মগজের শক্তি না থাক্, ওকালতি, জজিয়তী করবার শক্তি ভগবান্ সকলকে দেন না—কিন্তু শরীরে শক্তি দিতে কার্পণ্য করেন না কখনো! এই শরীর যদি মানুষ খাটাতে পারে, তা হলে দারিদ্র্যের চাপেও শুকিয়ে মরে না!···তুমি অনুমতি দাও,মা···তা ছাড়া তোমরা চিরদিন কিছু সহায় হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে না .. সে দুর্দ্দিন আসবার আগে আমায় নিজের শক্তি-সামর্থ্যে দাঁড়াবার সুযোগ দাও। না হলে সে দুর্দ্দিন এলে আমার যে মাথা তুলে এক মিনিট দাঁড়াবারো উপায় থাকবে না!

মা কহিলেন,—তোর দাদারা রয়েচে···তারা মানুষ হলে···

বাধা দিয়া বলাই কহিল—তাদের গলগ্রহ হয়ে থাকবো! না, মা—জীবনে সে মস্ত অভিশাপ! তা হবে না।

মা কহিলেন—এইখানেই তোর শক্তি-মতই না হয় কিছু করবি...

বলাই কহিল – তুমি ক্ষেপেচো! এই লোকালয়ে? না। সবাই সারা জীবন ঘৃণার চোখে দেখবে, জেলফেরত চোর বলে···না মা, তা হয় না!

মা নিশ্বাস ফেলিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন··· আমায় ছেড়ে যাবি তো?···মা চুপ করিলেন, তাঁর কণ্ঠ বাষ্পে রুদ্ধ হইয়া উঠিল; গলা সাফ করিয়া মা কহিলেন,—আমায় ছেড়ে থাকতে পারবি? মন কেমন করবে না?

বলাই কহিল—তা করবে। কিন্তু তোমায় সুখী করবো একদিন, এই ভেবে মনের সে দুঃখ সহ্য করতে পারবো, মা, আমি।

মৃদু হাসিয়া মা কহিলেন,—আর যদি আমার খুব অসুখ হয় এখানে? যদি আমি মরে যাই?

বলাই কহিল—অত ভেবে কোনো কাজ করা চলে না, মা। তোমার অসুখ হয় যদি, তোমার আরো ছেলে-মেয়ে তো কাছে রইলো, তারা দেখবে। তা ছাড়া আমায় খপর দেবে, যত দূরে যে-কাজেই থাকি না, তোমার অসুখ শুনলে আমি ঠিক তোমার এই পায়ের তলায় এসে দাঁড়াবো, মা···

কথাগুলায় যেমন সরল আন্তরিকতা, স্নেহ-ভক্তিও তেমনি অপরিসীম!

বলাই কহিল—তার পর যখন অনেক...অনেক টাকা রোজগার করবো, তখন তোমায় আমার কাছে নিয়ে যাবো! কত নতুন দেশ দেখবে···অভাবের ভাবনা তোমার থাকবে না, চাকর-দাসী···তোমায় কি এমনি রাঁধতে দেবো, না, ঐ বাসনের গোছাই মাজতে দেবো তখন!

স্বপ্ন, স্বপ্ন, বড় মধুর স্বপ্ন! মা চক্ষু মুদিলেন। তাঁর মানস-নয়নের সামনে চমৎকার ছবি ফুটিল, অভাব-হীন অভিযোগ-হীন সংসার···প্রাচুর্য্যের সীমা নাই···তিনি কল্যাণময়ী গৃহিণীর মূর্ত্তিতে সে সংসার দেখিতেছেন, চারিপাশে মেয়ে-বৌ নাতি-নাতনী···কি বিচিত্র রঙে রঙীন স্বপ্ন-ছবি!

সহসা ব্যস্তভাবে জীবন আসিয়া ডাকিল—কোথায় গো? এই যে···

মার মনের সে স্বপ্ন-ছবি ছায়ার অন্তরালে মিলাইয়া গেল। যোগমায়া দেবী কহিলেন—কি গা?

জীবন কহিল—চট্ করে ছানুকে সাজিয়ে দাও দিকিনি। সেই পাত্র নিজে এসেচে ছানুকে দেখতে। নাও, নাও, ওঠো,···বলা, ওরে বলা···

বলাই বাপের পানে চাহিয়া ছিল। জীবন পকেট হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া কহিল—নে, চট্ করে ওই তিনুর দোকান থেকে চার আনার খাবার কিনে আন্ দিকিনি—দুটো সন্দেশ, দুটো রসগোল্লা, আর নিমকি-কচুরি কিছু। যা, যা, দাঁড়িয়ে থাকিস নে···ভদ্দর

লোক এসেচে। আমি দেখি, বিড়ি আছে কি না··· বলিয়া শিকিটা বলাইয়ের দিকে ছুড়িয়া জীবন চট্ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বলাই কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; বাপ চলিয়া গেলে মার পানে চাহিল। মৃদু কণ্ঠে মা কহিলেন,—যা,গোল করিস্ নে···

বলাই কহিল,—কিন্তু ··

মা কহিলেন - মেয়ে দেখালেই তো আর বিয়ে হচ্ছে না! ভদ্দর লোক···বাড়ীতে এসেচে, অতিথ্! খাবার আন্·· এখন আর গোল করিস্ নে···

মার কথায় শিকি কুড়াইয়া লইয়া বলাই চলিয়া গেল।

জীবন নিমেষে বাহির হইয়া আসিল,আসিয়া নিজের মনেই বলিল—আছে বিড়ি। এই দিই গে। মোদ্দা, তোমরা দেরী করো না গো · এখনি অন্ধকার হয়ে যাবে, মুস্কিল বাধবে তখন। বাহিরের ঘরের দেওয়াল-আলোর চিমনিটা আবার ভেঙ্গে গেছে ··একটা কিনে না আনলে চলবে না। তার আগেই, অর্থাৎ···

বকিতে বকিতে জীবন বহির্ব্বাটীর দিকে প্রস্থান করিল।

যোগমায়া দেবী শান্তাকে ডাকিয়া ভিজা গামছা দিয়া তার মুখখানাকে রগড়াইয়া দিলেন, তার পর তার চুল লইয়া বাঁধিতে বসিলেন। চুলের রাশি। তাঁর আজ প্রথম চোখে পড়িল,—তাঁর সেই এতটুকু শান্ত আজ কার অলক্ষ্য স্পর্শে লাবণ্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই সোনার বর্ণ···সংসারের দুঃখ-কষ্ট পরিচর্য্যা-পরিশ্রমে ম্লান! এত অবহেলা-অনাদরেও তবু সে ম্লানিমা ভেদ করিয়া এই কনক-শ্রী···

খাবারের ঠোঙা হাতে বলাই তখনি ফিরিল, ফিরিয়া কহিল —উনি বর! ঐ বকাসুরের মূর্ত্তি! ব্যাটার পাকা গোঁফ·· তবু বিয়ের সাধ ঘোচেনি! ওকে সাজাতে হবে না, মা···

মা কহিলেন—তুই চুপ কর্ বলা···

অভিমান-ভরা স্বরে বলাই কহিল,—তোমারো তা হলে এ পাত্রে অনিচ্ছা নেই···?

মা কহিলেন—চুপ্ কর্, বাবা। আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা তুলিস্ নে। কি মন নিয়ে যে সংসার করতে হয়— যখন বড় হয়ে সংসার পাতবি, তখন বুঝবি!

বলাই শান্তর পানে চাহিল। তার চোখের কোণে জলের রাশি যেন স্তম্ভিত হইয়া আছে!• করুণ মূর্ত্তি! বলাই কহিল,—লোকটার চেহারাখানা একবার যদি দেখতে···

মা কহিলেন,—দেখার দরকার নেই আমার। মনের মত পাত্র পাবার বরাত চাই, বাবা।

বলাই ফোঁশ্ করিয়া উঠিল,—বরাত আবার কি! তোমরা যদি পণ করো যে অপাত্রে মেয়ে দেবে না তো বরাতের কেমন সাধ্য হয়, দেখি, শানিকে অপাত্রের হাতে তুলে দিতে!

মা কহিলেন,—মনের মত পাত্র পেতে গেলে তেমনি অর্থ-বল চাই···

বলাই কহিল—সে বল না থাকে, পাত্র খুঁজো না। ও নয় বিয়ে করবে না।

মা হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন—মেয়েমানুষ বিয়ে করবে না কি রে!

বলাই কহিল—না, করবে না। এই যে মেমেরা··· কত মেম যে বিয়ে করে না।

মা কহিলেন—তার পর··?

বলাই কহিল—ইস্কুলে যেতে দেখি তো মা, কত মেম টাইপিষ্টের কাজ করচে; হাসপাতালে নার্শগিরি করচে, তা ছাড়া বিলিতি দোকানে জিনিষ বেচ্ছে। শানির যদি তেমন পাত্র না পাও,ও তা হলে বিয়ে না করে ঐ রকম একটা কাজ করবে। একটা পেট ওর, তাতে খুব মজাসে চলে যাবে।

মা কহিলেন—সেই ভালো। তাই করিস তুই। ওর একটি তেমনি চাকরিই খুঁজে দিস···

বলাই কহিল—না, ঠাট্টার কথা নয়। ঐ ত্যাখো না, ওদের বিন্দু···বিয়ে হলো ··বিয়ে হয়ে ওর কি হলো!

মা কহিলেন,—ও যে ভগবানের মার, বাবা। যদি জামাই বেঁচে থাকতো, তা হ'লে বিন্দু যে রাজরাণী হতো! ওর বরাতে নেই ··

বলাই কহিল,—আবার বলো বরাত! বরাতের কি দোষ! জেনে-শুনে একটা পুঁয়ে রোগা বর এনে দিলে, সে তো মরবেই। বিন্দুকে জেনে শুনেই তো ওরা···তেমনি এই বকাসুরটি ··বেটার বয়স হয়েচে—ঐ তো রোজগারের সামর্থ্য···নিজে কি খাবি,তার ঠিক নেই! একবার বিয়ে করে ছিলি ··আবার বিয়ে করবে? কি খাওয়াবে, শুনি? তোমরা জেনে-শুনে এই পাত্রের হাতে যদি শানিকে দাও, আর এর পর শানি যদি ছেলে-মেয়ের হাত ধরে পথে ভিক্ষে করে বেড়ায়, কি ঘুঁটে বেচতে বেরোয়, তা হলেও তোমরা বলবে, এ বিয়ের তোমাদের দোষ নেই, শানির বরাত মন্দ!

মা কি বলিতে যাইতেছিলেন, বলা হইল না। জীবন আসিয়া কহিল,—এই যে খাবার এসেচে। একটা ছোট রেকাবিতে করে, আর এক গ্লাস জল। চট্ করে—চট্ করে—দেরী নয়। ওর আবার তাড়া আছে। একটা বড় মামলার কি কাজ আছে: মক্কেলের বাড়ী যেতে হবে। শানি...ঐ যে, বেশ হয়েচে। মাথায় দুটো কাঁটা গুঁজে ছেড়ে দাও না। গেরস্তর বাড়ী, পটের বিবি সেজে তো থাকবে না—নাকটা কাণটা আছে কি না, এই দেখবে, ও বয়ও দোজবরে। নে, নে, তোরা...ও আবার তাড়া দিচ্ছে! ভালো কথা, দুটো পাণও অমনি পাঠিয়ে দিয়ো গো, বুঝলে!

জীবন চলিয়া গেল। আসিয়াছিল যেমন ঝড়ের মত, তেমনি ঝড়ের মতই গেল। বলাই অবাক! এ যেন অভিনয়! কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎ লইয়া? এ যে বড় সর্ব্বনেশে অভিনয়!

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—আশ্চয্যি মানুষ! নে, ওঠ্ মা...একটু সাবান মুখে দিয়ে সেই টিয়াপাখী রঙের শাড়ীখানা পর...

বলাই কহিল—তুই ভাবিস্ নে শানু। ও ব্যাটা এসেচে বলেই যে ওর সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, তা নয়। বাবা বলচে বেশ, চ' একবার...

শান্তকে লইয়া বলাই বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়ের পানে চাহিয়া জীবন কহিল—এই তক্তাপোষের এইখানটায় বসো...

শান্তা বসিল। জীবন কহিল,—মেয়ে আমার নিন্দের নয়, ভূধর বাবু। কাজে-কর্ম্মে খুব চটপটে।

ভূধর-পাত্র নয়ন ভরিয়া পাত্রী দেখিতেছিল; বলাই দাঁড়াইয়া ভূধরকে লক্ষ্য করিতেছিল।

ভূধর কহিল—তোমার নাম কি?

শান্তা লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া ছিল। এ প্রশ্নে তার লজ্জার ভার আরো বাড়িল। মাটীতে বুঝি মিশিয়া যাইবে, এমনিভাবে সে মাথা নামাইল।

জীবন কহিল—বোবা হয়ে বসে রইলো, ছাখো! নাম জিজ্ঞাসা করচে, নাম বল্ না!

শান্ত অস্ফুটে কহিল,—শান্তা।

জীবন কহিল—নাম শান্তা। এধারে বেশ শান্তই।... আচ্ছা, এবার যা...দেখা হয়েচে।

ভূধরের চোখ আর ফিরিতে চায় না। সে চোখ দেখিয়া বলাইয়ের প্রাণ রী-রী করিয়া উঠিল। সে কহিল—এসো শানু...বলিয়া সে শান্তর হাত ধরিল।

শানু উঠিল। ভূধরের দৃষ্টিও সেই সঙ্গে। কল্পনা-নেত্রে সে কি স্বর্গের ছবিই দেখিতেছিল!

শানু চলিয়া গেল। বলাইয়ের পানে চাহিয়া মা কহিলেন—কি রকম দেখলি রে বলা?

বলাই কহিল,—একেবারে কিষ্কিন্ধ্যা থেকে সদ্য এসে নেমেচে যেন!

যোগমায়া হাসিয়া কহিলেন,—তুই চুপ কর্, বাছা! যা মা শানু, ও কাপড় ছেড়ে তুলে রেখে দে...

জীবনের পিসি আসিয়া কহিলেন,—কি বললে রে বলু, মেয়ে দেখে?

বলাই কহিল—দেখা আর হলো কৈ! শানু গিয়ে বসতে পাত্র পকেট হাতড়াতে লাগলো, চশমার জন্যে। তা চশমা ফেলে এসেচে ঘরে। কাজেই দেখা আজ আর হলো না। আর এক দিন আসবে, চোখে চশমা এঁটে; এসে সেই দিন শান্তর ছ্যাড্যাং-ড্যাং...

পিসিমা কহিলেন,—সত্যি নাকি বৌ-মা!

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—ওর কথা শোনো কেন, পিসিমা...

পিসিমা কহিলেন,—তাই বলো! জীবন যে বললে, আমি ঐ দুব্বো তুলতে গেছলুম, বাইরের বাগানে—জীবন বলছিল, দোজবরে হলেও বয়স ত্রিশ-বত্রিশ বছর, পিসিমা!

বলাই কহিল,—হ্যাঁ, তাই। তবে দশ-পনেরো বছর আগে বয়স তাই ছিল বটে!

পিসিমা কহিলেন,—কি যে বলিস্! তাই ভাবি, বেঁচে থেকে নাৎজামাই দেখা আমার বরাতে ঘটবে কি...

দূর্ব্বার গোছা হাতে জীবনের পিসিমা নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

বলাই কহিল,—দেৎচো মা, আমার চাকরি নেবার কত দরকার! পয়সা থাকলে এই সব জরদ্গবগুলোর এমন আস্পর্দ্ধা কখনো হয়!...

জীবন আসিয়া কহিল,—গেছে। আমায় কিছু খেতে দাও গো! এ-বিয়ের অমত করো না। মেয়ে ওর খুব পছন্দ হয়েচে। চাই কি, বেনারসী শাড়ী না দিলেও পারি। তা ছাড়া

ও একজন ওস্তাদ মুহুরি···চার-পাঁচটা উকিলকে চরিয়ে বেড়ায়। ওর সঙ্গে বলা যদি আদালতে বেরোয় তো বলারও একটা হিল্লে হয়ে যায় জন্মের মত।

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—বলা! ওর কি হিল্লের খোঁজে বেরুবার সময় এখন? তুমিও এই কথা বলচো!

জীবন কহিল—ইস্কুলে পড়ে বিদ্যে যা হবার, তা খুব হয়েচে। মিছে পয়সা খরচ! বিশেষ এই বয়সে এত-বড় দাগ··

যোগমায়া দেবী রাগে জ্বলিয়া কহিলেন—চুপ করো। তোমার মুখে ও কথা সাজে না!

জীবন কহিল—যাক্, সে ঘরের কথা।···বিয়ের সম্বন্ধে তা হলে তোমরা যত করে ফ্যালো। এই অগ্রাণেই···

যোগমায়া দেবী বলাইয়ের পানে চাহিলেন, তার পর কহিলেন,—বলার তো পাত্র মোটে পছন্দ হয়নি!

—পছন্দ হয়নি! চোখে আগুন জ্বালিয়া জীবন বলাইয়ের পানে চাহিল, কহিল—কোন খানটায় অপছন্দ, বাপু? তুমি কি বোঝো পাত্রের তত্ত্ব?···

বলাই চুপ করিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল,—তত্ত্ব বুঝি, না বুঝি, এ মর্কট হতভাগার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে হতে দেবো না আমি। কিছুতে নয়···

এ যেন ঠিক বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত! জীবন স্তম্ভিত দৃষ্টিতে ক্ষণেক বলাইয়ের পানে চাহিল, তার পর সগর্জ্জনে কহিল—ওঃ, কথা শোনো একবার! বিয়ে হতে দেবো না! বিয়ে দেবার তুই মালিক কি না! দায় তোর···না? এত তেজ হয়ে থাকে যদি, বাপের উপর কথা কইতে আসো··· তা হলে চুরি-চামারি যা করে হয় বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করো। নবাব আসফউদ্দৌলার মেজাজ দেখাবার আগে হাঁড়ির পানে চেয়ো একবার!···ঐ তো ভুবন আছে, সুবল আছে···পণ্ডিত ছেলে, সুছেলে···তারা বললে, ও বিষয়ে আপনার যাতে সুবিধা বোধ করবেন, তাই হবে··· আমরা কি জানি? লেখাপড়া তো শিখলে না, সুবোধ হবে কোত্থেকে! যাক, বাগ্‌বিতণ্ডার দরকার নেই। তোমাদের মেয়ের বিয়ের ভার যদি আমার হাতে দাও তো আমি যে পাত্র স্থির করবো, তাকে নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তা না পারো তো ঐ খান্‌খানান্ ছেলের উপর নির্ভর করো। বলে-কয়ে আমি দায়ে খালাস!

যোগমায়া দেখিলেন, এ কি বিপত্তি! ছেলের কথায় একেবারে এমন আগুন হইয়া ওঠা! তিনি বলাইয়ের পানে চাহিলেন,—বলাই কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! তিনি স্বামীর হাত ধরিয়া কহিলেন,—তুমি এসো · সারাদিনের পরিশ্রম। মিছে যা-তা কথায় মাথা গরম করো না। বিয়ে তুমি বললেও হবে না, আর আমি না বললেও বন্ধ থাকবে না। ও ভবিতব্য··ওর বরাতে যে পাত্র আছে, সে আসবেই। তার আসা কেউ রোধ করতে পারবে না!

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাসিক বসুমতী

৯ম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩৩৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
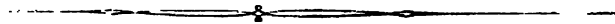
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
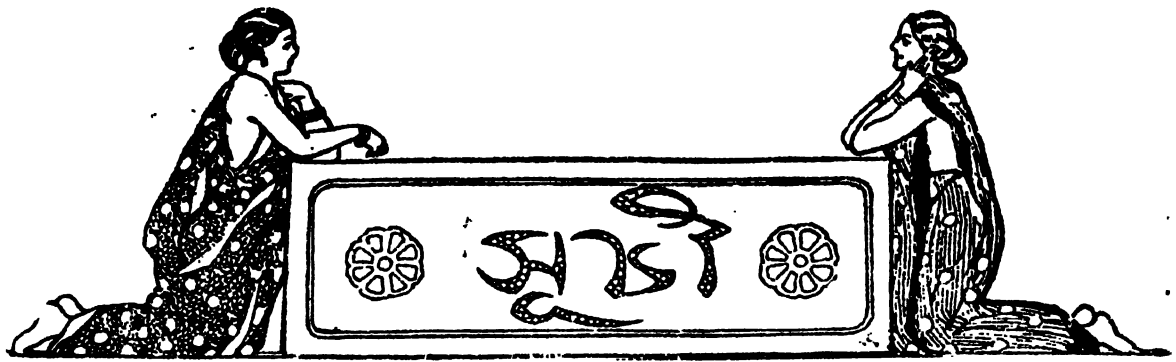
৯ম বর্ষ] ১৩৩৭ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

বিষয়ের নামানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী

চিত্রসূচী

নিশীথিনী

বসুমতী চিত্র-বিভাগ] [শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৯ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ [২য় সংখ্যা

পারমার্থিক রস

১৩

লৌকিক অনুভাব, বিভাব ও ব্যভিচারী ভাব—অভিনয়-দর্শন বা কাব্যানুশীলনের সময় সামাজিকগণের মানস-দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া রসাস্বাদ করাইয়া থাকে, ইহাই হইল আলঙ্কারিকগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে, কবির ভাষায় এমন একটি শক্তি নিহিত আছে, যাহার প্রভাবে সহৃদয়ের হৃদয়রাজ্যে এমন একটি অবস্থা আসিয়া পড়ে, যাহার যথাযথ বর্ণন বা প্রকাশ ভাষার সাহায্যে হইতে পারে না। প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির তাহা স্বানুভব-সংবেদ্য, লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহারিক অহং-মমকার তখন একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ব্যক্তিবিশ্রান্ত মনুষ্যত্ব তখন সমষ্টিবিশ্রান্ত বা বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের মধ্যে আত্মহারা হইয়া মিশিয়া যায়, সামাজিকগণের এই প্রকার মানসিক অবস্থাকেই আলঙ্কারিকগণ 'সত্ত্বোদ্রেক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই সত্ত্বোদ্রেক না হইলে রসাস্বাদ হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং এ সংসারে একমাত্র কবিভারতীই এই সত্ত্বোদ্রেককে সামাজিক হৃদয়ে সমুৎপন্ন করিতে পারে। অপরের ক্লেশ দেখিয়া, ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া সাধারণতঃ মানব-হৃদয়ে যে সমবেদনা হইয়া থাকে এবং তাহার সঙ্গে নয়নে অশ্রুপাত হয় বা করুণায় প্রাণ গলিয়া যায়, সে সমবেদনা কিন্তু সত্ত্বোদ্রেকের কার্য্য নহে। কারণ, তাহাতে আত্ম-পর ভাবের বিস্মৃতি হয় না, মানুষ নিজের বিলক্ষণ ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণতার হস্ত হইতে তখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না; কিন্তু কবিভারতীর কোমল স্পর্শে হৃদয়-রাজ্যের সকল অংশকে আলোড়িত করিয়া এই সত্ত্বোদ্রেকের মধুর অনুভূতি যখন পরিচ্ছিন্ন অহংভাবকে কিয়ৎকালের জন্য বিধ্বস্ত করিয়া সকল দেহে সকল ইন্দ্রিয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব নূতন প্রেরণা বা স্পন্দন জাগাইয়া দেয়, তখন এই মানুষই দিব্য মানুষ হইয়া পড়ে। শোক, দুঃখ, আধি, ব্যাধি, রাগ, দ্বেষ, আমিত্ব. তুমিত্ব প্রভৃতি চিরাভ্যস্ত লৌকিক ভাবনিচয়কে বিস্মৃতির গাঢ় আবরণে ঢাকিয়া ফেলে, তখনই মানব রসাস্বাদে অধিকারী হইয়া থাকে। তাই এই সত্ত্বোদ্রেকের পরিচয় প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন—

"পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥"

সামাজিকগণের তখন জ্ঞান থাকে না যে, ইহা পরের, অথবা ইহা পরের নহে, সে তখন ইহাও

বুঝে না—ইহা আমার, অথবা ইহা আমার নহে। অহন্তা মমতা পরকীয়তা বা মদীয়তা এই প্রকার পরিচ্ছিন্ন বিষয়গ্রাহী বোধ তাহার তখন বিলুপ্ত হইয়া যায়. সঙ্গে সঙ্গে তাহার তখন যে বোধের উদয় হয়, তাহার স্বরূপ কি, তাহার পরিচয় দিতে যাইয়া কাব্যপ্রকাশকার বলিতেছেন—

"রাম এবায়ং অয়মেব রাম ইতি, ন রামোঽয়ং ইত্যৌ-ত্তরকালিকে বাধে, রামোঽয়মিতি রামঃ স্যাদ্বা ন বায়মিতি রামসদৃশোঽয়মিতি চ সম্যঙ্‌মিথ্যাসংশয়-সাদৃশ্য-প্রতীতিভ্যো বিলক্ষণয়া চিত্রতুরগা-দিন্যায়েন রামোঽয়মিতি প্রতিপত্ত্যা গ্রাহ্যে নটে—"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অভিনয় দর্শন করিতে করিতে সহৃদয় সভ্যগণের অভিনয় নটের কায়িক, বাচিক প্রভৃতি অভিনয় হইতে তাহার প্রতি যে প্রকার মনোবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা এই ব্যক্তিই রাম, রামই ব্যক্তি এইরূপ যে যথার্থ প্রত্যয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। যাহার পরে বাধ-নিশ্চয় অর্থাৎ ইহা রজত নহে, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, এইরূপ যে শুক্তিকে অবলম্বন করিয়া 'ইহা রজত' এইরূপ ভ্রান্তি নিশ্চয় লোকের হইয়া থাকে, সামাজিক-গণের নটকে দেখিয়া, এই রাম. এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহা কিন্তু ঠিক উক্ত রজতভ্রান্তির ন্যায়ও হয় না। 'এ কি রাম বা অন্য কেহ' এইরূপ জ্ঞানও তখন হয় না অথবা এই ব্যক্তি ঠিক রামের ন্যায়, এরূপ বোধও তাহা নহে অর্থাৎ সামাজিকগণের তৎকালে নটদর্শনে যে 'এই রাম' এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহা যথার্থ জ্ঞান নহে, তাহাতে ভ্রান্তিজ্ঞানের সাধর্ম্ম্যও থাকে না, তাহা সংশয়ও নহে অথচ তাহা সাদৃশ্য-বুদ্ধিও নহে। তবে তাহা কি?—যেমন অসাধারণ শিল্পীর বিরচিত চিত্রতুরগকে হঠাৎ অতর্কিতভাবে দর্শন করিলে, ইহা তুরগ, এইরূপ বিস্ময়-বিমিশ্রিত বুদ্ধি আমাদিগের কোন সময়ে হয়, ইহা সেই জাতীয় এক প্রকার জ্ঞান, এ জ্ঞান যেমন বাধজ্ঞানের পূর্ব্বভাবী হইলেও এক অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের সহিত জড়িত সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও যেমন ইহাতে ক্ষণকালের জন্য সাদৃশ্যের অনুভূতি হয় না, ইহা তুরগ এই বোধ বিদ্যমান থাকিয়াও শিল্পপ্রভাবপ্রসূত সৌন্দর্য্য-বলে ইহার যথার্থরূপতার ভাব যেমন আপনা আপনিই ভাসিয়া উঠে, অভিনয়-দর্শনকালে শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিকা পরিগ্রহকারী নটের প্রতিও আমাদের রামবুদ্ধি, তাহাও এই জাতীয়ই হইয়া থাকে।

এইরূপ ভাবে যে মনোবৃত্তি, তাহাও পূর্ব্বকথিত সত্ত্বো-দ্রেকের পরিণতি। শুধু তাহাই নহে, এই ভাবে রামদর্শন করিতে করিতে সামাজিকের অন্তঃকরণে রামের সহিত সম্বদ্ধ যে সকল জড় বা চেতন বস্তু ইতিহাসে বা কবিতায় বর্ণিত আছে, সেই সকল বস্তুই তখন একে একে সামাজিকের সত্ত্বোদ্রেক-বিগলিত মানসপটে কবিকল্পনার প্রভাবসম্পন্ন শক্তিতুলিকার সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে অঙ্কিত হইতে আরম্ভ করে, তখন সহৃদয় সামাজিক যে স্থানে বিদ্যমান থাকে, সে স্থান অযোধ্যা, চিত্রকূট বা দণ্ডকারণ্য হইয়া উঠে। রামহৃদয়ের সৌজন্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃমাতৃভক্তি, দাম্পত্য প্রীতি, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগশীলতা, সাহস, ধৈর্য্য, ক্ষমা, করুণা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার মানস-নেত্রের সম্মুখে নানা বর্ণে রঞ্জিত চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। সে তখন আপ-নাকে ভুলিয়া যায়, আত্মীয়কে ভুলিয়া যায়, ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ সীমার সকল বন্ধন তাহার ছিন্ন হইয়া যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার নিকটে রাম ও রামসম্বন্ধী ভাবনিচয়ে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। স্বহৃদয়গত বৃত্তিনিচয়ের তাৎকালিক আস্বাদনও তাহার স্বগত বলিয়া আর মনে হয় না। তাহার নিকটে সে আস্বাদ যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কোন বস্তুই তাহা হইতে পৃথক্ নহে, তাহার আস্বাদই বিশ্বমানবের আস্বাদ, তাহাতে দেশগত, ব্যক্তিগত বা কালগত সকল প্রকার পরি-চ্ছেদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এক অখণ্ড চিদানন্দময় সত্তাই যেন আস্বাদের রূপ ধরিয়া, আস্বাদ্য কোটির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, এই জাতীয় আস্বাদ হইল রসাস্বাদ। ইহা সর্ব্বথা অলৌকিক, অলৌকিক কবিপ্রতিভার, ইহা সহৃদয়-জনবেদ্য অলৌকিক সুখময় পরিণতি, ইহাই মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য।

তাই আলঙ্কারিকশ্রেষ্ঠ ইহার স্বরূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়া-ছেন—"চর্ব্ব্যমাণৈকপ্রাণঃ বিভাবাদিজীবিতাবধিঃ পানকরস-ন্যায়েন চর্ব্ব্যমাণঃ পুর ইব পরিস্ফুরন্ হৃদয়মিব প্রবিশন্ সর্ব্বাঙ্গীণমিবালিঙ্গন্ অন্যৎ সর্ব্বমিব তিরোদধদ্ ব্রহ্মাস্বাদ-মিবানুভাবয়ন্ অলৌকিকচমৎকারকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ।"

শৃঙ্গার প্রভৃতি নববিধ রসের ইহাই হইল স্বরূপ যে, যে পর্য্যন্ত এই অলৌকিক আস্বাদ থাকে, ইহা সেই পর্য্যন্তই থাকে, এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই বিলক্ষণ

আস্বাদই ইহার একমাত্র প্রাণ, যদিও ইহাতে 'অনুভাব', 'বিভাব', 'সঞ্চারী' সাত্ত্বিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির ভাবসমূহ আস্বাদিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল বিলক্ষণ ভাব যে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আস্বাদিত হয়, তাহা নহে; প্রত্যুত সকল বিলক্ষণভাব যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া একই আস্বাদের বিষয় হইয়া থাকে। যেমন মিশ্রি, মধু, শর্করা, মরিচ, গোলাপজল, নেবুর রস, কর্পূর প্রভৃতি একসরবৎ হইয়া যায়, তাহার আস্বাদ যেমন সরবতের উপাদান মিশ্রি প্রভৃতি প্রত্যেক রসের আস্বাদ অথচ ঐ আস্বাদে মিশ্রি প্রভৃতির পৃথক্‌ভাবে আস্বাদ হয় না, সব মিশিয়া যেমন এক অখণ্ড বিচিত্র আনন্দময় আস্বাদে পরিণত হয়, সেইরূপই ইহাও নানাবিধ ভাবনিচয়ের এক অখণ্ড অনির্ব্বচনীয় আস্বাদই হইয়া থাকে। ইহা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাহিরে চক্ষুর সম্মুখে খেলা করিতে আরম্ভ করে। শুধু যে বাহিরেই খেলা করে, তাহা নহে, ইহা বাহিরে খেলা করে, আবার সেই সঙ্গে অন্তঃকরণেরও দুর্ভেদ্য অন্তরে জোর করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া নাচিতে আরম্ভ করে, আবার সেই সময়েই যেন ইহা নিজের সুধামাখা শীতল স্পর্শে সামাজিকের প্রত্যেক অঙ্গকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলে। বিশ্বের অন্য সকল পদার্থকে ইহা তৎকালে তিরোহিত করিয়া দেয়, সেই যোগিজনবেদ্য অখণ্ড ব্রহ্মানন্দকে ইহা যেন অনুভূতির বিষয় করিয়া তুলে, জীবনে পূর্ব্বে কখনও যাহা অনুভূত হয় নাই, এমন বচনাতীত অলৌকিক চমৎকার বা বিস্ময়কে ইহা প্রতিক্ষণে উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাই হইতেছে প্রকৃত রসের সহৃদয়জনভোগ্য অলৌকিক স্বভাব।

এই রসাস্বাদ বিশুদ্ধ। কারণ, ইহা রাগদ্বেষ বা অহমিকার স্পর্শরূপ অশুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিনির্ম্মুক্ত; সুতরাং মনুষ্যজীবনের ইহাই একমাত্র সেব্য ও নিঃসঙ্কোচে উপভোগ্য। ইহাই হইল আলঙ্কারিক আচার্য্যগণের রস বিষয়ে সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে পারমার্থিক রস বলিয়া আর পৃথক রসের অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা কি আছে? বৈষ্ণব ভক্তিবাদের আচার্য্যগণ এই আনন্দময় রস ব্যতিরেকে আর কোন নূতন রসের সন্ধান দিতে পারেন? আলঙ্কারিক রসতত্ত্ব-ব্যাখ্যাতৃগণের এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া প্রেমভক্তিরূপ পরমার্থ-রসের ব্যাখ্যাতা ভক্তিবাদের আচার্য্যগণ কি বলিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

সুকাব্যের অনুশীলনে মহাকবি-বিরচিত নাটকাদির সুকৌশলময় অভিনয় দর্শনে যে বিলক্ষণ সুখের আস্বাদ হয়, সে আস্বাদের সময় ক্ষুদ্র অহন্তা ও মমতার অচিরকালস্থায়ী তিরোভাবে মানব প্রসারিত অহন্তার আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়, ইহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এই আনন্দময় আস্বাদনই মানবের পরমার্থ, ইহা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ—শুধু বৈষ্ণবাচার্য্যগণই বা কেন, কোন দার্শনিক আচার্য্যও স্বীকার করেন না। তাঁহাদের এই অস্বীকার নিজমতের উপর যুক্তিনিরপেক্ষ শ্রদ্ধার উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা বলিতে পারা যায় না। পরন্তু তাহার মূলে যে সুপ্রতিষ্ঠিত যুক্তি ও শাস্ত্রীয় বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাহা বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই স্বীকার্য্য।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, এই যে কাব্যরসাত্মক আনন্দাস্বাদ, ইহা কোন্ জাতীয় আনন্দের আস্বাদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় আমরা তিন প্রকার সুখ বা আনন্দের পরিচয় পাইয়া থাকি। যথা—

"সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥"

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে ত্রিবিধ সুখের স্বরূপ আমার নিকট শ্রবণ কর। অভ্যাসবশতঃ যাহাতে আসক্তি জন্মিয়া থাকে, যাহার আস্বাদন লাভ করিলে সকল প্রকার দুঃখের প্রশমন হয়, প্রথমে যাহা বিষের ন্যায় প্রতীত হয়, পরিণামে যাহা অমৃত তুল্য হয়, আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, সেই সুখই সাত্ত্বিক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কামনার বিষয় ভোগ্য বস্তুনিচয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংপ্রযুক্ত হইলে যাহা আবির্ভূত হয়, প্রথমে যাহা অমৃত তুল্য বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু পরিণামে যাহা বিষোপম হইয়া উঠে, সেই সুখই রাজস সুখ। যাহার প্রথমে ও শেষে আত্মাতে

মূঢ়তার উদয় হয়, নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, সেই সুখ তামস হইয়া থাকে।

এই ত্রিবিধ সুখের মধ্যে কাব্যানুশীলনজনিত রসাত্মক যে সুখ, তাহা সাত্ত্বিক সুখের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কারণ, যাহা অগ্রে কোন সহৃদয়ের পক্ষেই বিষের ন্যায় প্রতীত হয় না, সে সুখের আস্বাদন করিবার জন্য দীর্ঘকালীন অভ্যাসের আবশ্যকতা, কিঞ্চিৎ দ্বারদক্ষিণা সংগ্রহ করিতে পারিলেই বা কোন প্রকারে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায়, তাহার পরে আরও দ্রষ্টব্য এই যে, এই উত্তেজনাবহুল কাব্য-রসাস্বাদের সহিত আত্মবুদ্ধির শান্তিময় প্রসাদের সহিত কোন সম্পর্কই পরিদৃষ্ট হয় না, এই সকল সুখ যে সাত্ত্বিক সুখ নহে, তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রমের আবশ্যকতা নাই।

ইহা নিদ্রালস্যপ্রমাদ হইতে উৎপন্ন নহে, এই কারণে ইহাকে তামস সুখও বলা যায় না। কিন্তু রাজস সুখের সকল প্রকার ধর্ম্মই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহা যে রাজস সুখ, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। ইহাতে অভীষ্টবিষয়-নিবহের ইন্দ্রিয়ের যোগ অপরিহার্য্য। এই সুখের আস্বাদন করিতে প্রবৃত্ত বহু ব্যক্তিই পরিণামে সংসারকে বিষময় বলিয়া বুঝিয়া থাকে, তাহা বর্ত্তমান ভারতীয় রঙ্গশালা-নিবহের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত অনেক ভদ্রলোকই বুঝিয়া থাকেন, এই সকল কারণে এই রসাস্বাদরূপ আনন্দ যে রাজস সুখ, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং এই সুখের রাজসত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য এখানে অধিক আর কিছু বলিবার অপেক্ষা আছে বলিয়া মনে হয় না।

রসাস্বাদরূপ সুখভোগে বৈচিত্র্য আছে, ইহা সত্য; কিন্তু সংসারীর পক্ষে, বিষয়াসক্ত মানবের পক্ষে কোন্ সুখের এই ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য নাই? বৈষয়িক সুখমাত্রেই উত্তেজনা আছে, চিত্তবিক্ষেপ আছে এবং অবসানে অবসাদও আছে—ইহা কে না বুঝে? রসাস্বাদরূপে আনন্দভোগে কারণবৈচিত্র্য আছে, উত্তেজনার আধিক্য আছে, আকর্ষণের বহুলতা আছে, ইহা কে অস্বীকার করিতেছে? কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য বা পরমপুরুষার্থ হইবে, তাহা বুঝিব কেমনে? ইহাতে নিরবধি প্রসাদ নাই, শাশ্বতী শান্তি নাই, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই; সুতরাং অন্যান্য বৈষয়িক সুখ হইতে যে বিলক্ষণ নহে, তাহাতে ত সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্যই এইরূপ লৌকিক কবিতা-সম্বন্ধ বা অভিনয়দর্শনপ্রসূত রস যে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য রস নহে, ইহা ব্যবহারিক রস হইলেও পারমার্থিক রসলক্ষণাক্রান্ত নহে, ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মনের কথা। এ কথা তাঁহাদের ভাবাবেশবিহ্বল মনের নিছক কল্পনা হইতে প্রসূত নহে, তত্ত্বদর্শী মহাভাগবত ভগবান্ বেদব্যাসও ইহাই শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

> ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
> জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
> তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
> ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়াঃ॥
> তদ্বাগ্‌বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
> যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
> নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
> শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥

যে বাক্যে রসভাব ও অলঙ্কারসমন্বিত সুন্দর পদনিচয় প্রযুক্ত হয় অথচ যাহা শ্রীভগবান্ হরির লীলাময় ত্রিভুবন-পাবন যশের প্রতিপাদক নহে, তাহা অমেধ্যসেবী কাক-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরই সেবিত হইবার যোগ্য তীর্থ সদৃশ হইয়া থাকে, ইহাই মহাজনগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কারণ, মানসসরোবিহারী হংসকুলের ন্যায় 'বিশুদ্ধ ব্রহ্মসংস্থ সাধু পুরুষগণের ঐরূপ বাক্যরূপ বায়সতীর্থ কখনই প্রীতিকর হয় না।

অপর পক্ষে যে কাব্যে ছন্দঃ নাই, অলঙ্কার নাই বা বিচিত্র পদবিন্যাসও নাই, অথচ যাহার প্রতিপদবিন্যাসে প্রতিশ্লোকে অবিনাশী অসীম ও সর্ব্বাত্মভূত শ্রীভগবানের বিচিত্র জগৎপাবন কীর্ত্তি-সমুদ্ভাসিত নাম-নিবহ বিরাজমান থাকে, সেই বাক্যই সকল প্রাণীর সর্ব্ববিধ পাপ ধ্বংস করিয়া থাকে; সাধুপুরুষগণ সেই কাব্যের ব্যাখ্যা করেন, তাহাই মুক্তকণ্ঠে উচ্চস্বরে গান করিয়া থাকেন এবং তাহাই আদরের সহিত শুনিয়া থাকেন।

ভক্তিরূপ পরমার্থরসের অন্য সকল প্রকার লৌকিক কাব্যসমুদ্ভূত রস হইতে যে পরমোৎকর্ষ আছে, তাহা যে কেবল ভক্তিবাদের আচার্য্যগণেরই সম্মত, তাহা নহে, অলঙ্কারশাস্ত্রের পরমাচার্য্য আনন্দবর্দ্ধনও তাহা স্বকৃত

ধ্বন্যালোক গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং ন বা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থ-বিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমনিশং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়ন ত্বদ্ভক্তিতুল্যং সুখম্॥"

শৃঙ্গার প্রভৃতি নয়প্রকার রসের আস্বাদন করাইবার সামর্থ্য যাহাতে আছে, কবিগণের এইরূপ যে নবনবোন্মেষশালিনী দৃষ্টি, অথবা পরমার্থ-ব্রহ্মতত্ত্বের সমুন্মেষসমর্থ যে বৈপশ্চিতী (তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণের) দৃষ্টি, সেই উভয়বিধ দৃষ্টির সাহায্যে বহুকাল ধরিয়া আমরা সংসারকে দেখিতেছি। হে সাগরশায়িন্ হরে! এইরূপ দেখিতে দেখিতে আমরা পথিশ্রান্ত হইয়াই পড়িয়াছি, কিন্তু এই দ্বিবিধ দৃষ্টির সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘজীবনব্যাপী অনুসন্ধান করিতে করিতে তোমার প্রতি ভক্তির ন্যায় সুখের উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

কবিদৃষ্টি বা পণ্ডিতদৃষ্টি এই দ্বিবিধ দৃষ্টির সাহায্যে যাহাকে পাওয়া যায় না, সেই পরমার্থরসরূপ ভক্তিসুখের আস্বাদনের জন্য কোনপ্রকার প্রাকৃত বিভাব, অনুভাব, উদ্দীপনভাব বা সঞ্চারীভাব যে পর্য্যাপ্ত নহে, তাহা এই শ্লোকটির দ্বারা আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

শিশুর হাসি

মর্ত্ত্যে কে গো সুধার লোভী অন্ধকারে মরিস ঘুরে
ঘরের দ্বারে নিভাঁজ খাঁটি
সাগর-ছেঁচা সুধার কণা স্বপন-জাগা মোহন সুরে
শিশুর হাসি দিচ্ছে বাটি।
অবিশ্বাসী! ভাবিস বুঝি মিথ্যা আমি বলছি তোরে
সন্দেহে তাই শির কি দোলে?
লক্ষ্মী যখন ধরায় এলেন দীপ্তি উজল অরুণ ভোরে
সুধার কলস নিয়ে কোলে;
অমিয়-মাখা হাত দুখানি শিশুর মুখে দিলেন মুছি
পদ্ম-কোমল পরশ দানে,
তাই ত ওরে শিশুর হাসি এমন শুভ্র স্নিগ্ধ-শুচি
এমন মধু জাগায় প্রাণে।
পূর্ণিমাতে জ্যোৎস্নাধারা বহে যখন স্রোতের পারা
ভাবিস তারি নাই উপমা;
ক্ষণিক তরে শিশুর পানে দেখ না চেয়ে আত্মহারা
বুঝবি তখন কি সুষমা।
চাঁদের আলোর চেয়ে মিঠে মিঠে এ যে মধুর চেয়ে
মৃত্যুলোকে আশিস্ এ যে!
উতল ধারা বিপুল বেগে মন্দাকিনীর সলিল বেয়ে
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে বেজে।
চাঁপার কলি মন-ভুলানো, ফাগুন বনের ব্যক্ত বাণী
ডুবিয়ে দিয়ে তারো শোভা,
খোকার উজল উছল হাসি আনন্দ-রস দিচ্ছে আনি
বিশ্বজনের মানস-লোভা।

সাগর-জলের নিতল বুকে বরুণ যেথা মনের সুখে
মুক্তাগুলি রাখছে তুলি
তাদের কিছু পালিয়ে বুঝি উঠে এল মর্ত্ত্য মুখে
শিশুর হাসির দোলে দুলি।
পারিজাতের গন্ধ লাগে স্বর্গে যেতে কে চাস ওরে,
মিথ্যে কেন করবি আয়াস?
শিশুর হাসির সুরভি ঐ দিকে দেশে কেবল ঘোরা
পূর্ণ করে ধরার বাতাস।
রূপের লাগি পাগল ওরে আসল রূপের চাস ঠিকানা?
সন্ধানে তার নাই ভাবনা—
চাস কি যেতে রূপের শেষে অরূপ যেথায় দিচ্ছে হানা?
শিশু পূরায় সে কামনা।
নীল আকাশের রূপ দেখেছ শরৎ-ঋতুর উজল প্রাতে
মধুর কি গো তারো চেয়ে?
'শিশুর হাসি' 'শিশুর হাসি' গান গেয়ে যায় মধুর রাতে
বসন্তেরি কানন ছেয়ে—
কে দেখেছে চাঁদনী রাতে রঙের খেলা স্রোতের জলে?
ঝলক দিয়ে কেমন জ্বলে।
তারো চেয়ে মোহন এ যে জাগছে গেহে পলে পলে
হাসি ফুলের দলে দলে।
মর্ত্ত্যভূমির নিন্দা করে তুচ্ছ করে কে ঐ ওরে,
ধন্য এ যে স্বরগ চেয়ে
শিশুর হাসির পরশ লাগি স্বরগ নামে মাটীর দোরে,
মর্ত্ত্য-ভূমির বিজয় গেয়ে।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম্-এ, বি-এল্)

পথের সাথী

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিন্দুবাসিনী ষ্টোভ জালিয়া বাপের জন্য পথ্য তৈয়ার করিতে-ছিল, হরমোহনের শরীরটা আবার একটু একটু অসুস্থ বোধ হইতেছে, তিনি আজ মেয়ের কাছে আসিয়া বসিতে পারেন নাই, নিকটেই তাঁর শোবার ঘরে শুইয়া আছেন, হয় ত সংবাদপত্র পড়িতেছেন, নতুবা কোন বৈদেশিক দর্শনতত্ত্ব কিম্বা ডাক্তারী শাস্ত্র কোন একটা কিছু ঘাঁটিতেছেন, এ বয়সে এবং এ শরীরেও তাঁর নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকা পোষায় না।

জুতার শব্দ হইতেই বিন্দু ইহার অধিকারীকে চিনিয়া ঈষৎ উৎসুক হইয়া আগমন-পথের দিকে তাকাইয়া রহিল, আসিল শশাঙ্ক।

কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি রে! আজই ফিরে এলি?"

শশাঙ্কের মুখখানা তার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে ঈষৎ ম্লান দেখাইতেছিল, কিন্তু কথা কহিল সে তার স্বাভাবিক প্রফুল্লকণ্ঠে; বলিল, "কায হয়ে গেল, শুধু শুধু ব'সে থেকে কি করবো, চ'লে এলুম।"

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কি কায রে?"

শশাঙ্ক জবাব দিল, "কেন, যে জন্য ডাক পড়েছিল।"

বিন্দু কহিল, "হ্যাঁ, তাই তো জিজ্ঞেস করচি, কি জন্যে ডাক পড়েছিল?"

শশাঙ্ক এবার হাসিয়া উত্তর করিল, "বুঝতে পার নি? সেই আমার মায়ের বাপের বাড়ীর দেশের জমীদারদের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে! আমি তাকে বিয়ে না করলে মায়ের বাবাকে যে তারা ভিটে ছাড়া করবে ব'লে ভয় দেখিয়েছে।"

বিন্দুর মনের মধ্যে যাই হোক, বাহিরে শান্ত ঔদাস্যে সে উত্তর করিল, "তা রাগ করতে পারে বৈ কি! অনেক দিন ধ'রে অপেক্ষা করছে কি না। জমীদার মানুষ, কারুর পথ চেয়ে ব'সে থাকা ওদের অভ্যাস ত নেই। যা হোক, তুই মত দিয়ে এলি, বেশ হলো। বিয়ের দিন কিছু স্থির হয়েছে? কবে হলো? আমার আবার এখানকার একটা ব্যবস্থা ক'রে রেখে ত যেতে হবে।"

শশাঙ্ক পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, "সে গুড়ে বালি! ঘটা ক'রে বাপের দেওয়া জংলা সাড়ী পরে যে জমীদার-কন্যা বৌ তুলবে, সে আর তোমার হচ্ছে না! ব'লে এলুম, আমার দ্বারা আরও পাঁচটা অকর্ম্ম হলেও হ'তে পারে, ওটি হবে না! যারা অন্যের অপরাধে নিরপরাধকে অপমান করতে পারে, তাদের মেয়ে আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না!"

বিন্দুর মনে মনে যাই থাক, এবারও প্রকাশ্যে সে মহা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"অবাক্ করেছে মা! বাপের মুখের উপর এই কথা ব'লে এলি? তবে যে বল্লি, 'কায' হয়ে গেল? ও মা! আমি কোথায় যাব? এই তোর কায হওয়া! তা' ও কথা যে বল্লি, ওরা বিরক্ত হলো না?"

শশাঙ্ক ইতিমধ্যে জুতা খুলিয়া ফেলিয়াছিল, বড়মার গায়ে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িয়া হাসিমুখে জবাব দিল, "বিরক্ত! ভয়ানক চটে গ্যাছে! বাবা বলেছে, আমায় ত্যাজ্যপুত্র করবে, সমস্ত সম্পত্তি দাদার নামে লিখে দেবে, আমার মা যত দিন বেঁচে থাকবে, বিষয়ের অর্দ্ধেক উপস্বত্ব ভোগ করবে, তার পর সব দাদার হয়ে যাবে।"

বিন্দু এবার মনে মনে ঈষৎ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া কহিয়া উঠিল, "কেন তবে অমত করলি, বাপু! তোর মায়ের যখন অতই সাধ, মেয়েটিও শুনছি দেখতে বেশ ভালই, কর না বাপু বিয়ে, কি দরকার মায়ের মনে দুঃখ দিয়ে?"

শশাঙ্ক কার্য্যনিরতা বিন্দুর হাতটা ঠেলিয়া সরাইয়া কোনমতে যায়গা করিয়া তার কোলের মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া সটান শুইয়া পড়িল, বলিল, "না, বিয়ে করবো না,—আমি জানি, আমার আসল মায়ের মত নেই।"

বিন্দুর চোখদুটা হঠাৎ ছলছল করিয়া উঠিল, মুখটা অন্য ফিরাইয়া ঈষৎ গাঢ়স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "কি যে বলিস্! আমি কি তোর আসল মা? আমি কি তোকে দশমাস পেটে ধরেছি? না না, খোকা! ছেলেমানুষী করিসনে বাবা! কথা শোন—"

শশাঙ্ক খপ করিয়া বিন্দুবাসিনীর মুখে হাতচাপা দিল, অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "না না, বড়মা! তুমি বলো না। পেটে কার কোথায় ছিলুম, সে ত দেখতে পাইনি; জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত যা দেখেছি, তাই আমি জানি। তুমিই আমার

না, তুমি মূর্খ জমীদারবাড়ীকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করো, সে ঘৃণা যতই চেপে রাখতে চাও, ততই তা' স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে, আমি তা' খুব ছোট থেকে মনে প্রাণে অনুভব ক'রে এসেছি, আর তা' এখন বদল হয় না। যে শ্রেণীর মধ্য থেকে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে, তোমার মত স্ত্রী বর্ত্তমানে, বিষয়ের মালিক হবার অজুহাতে তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় স্ত্রী আনতে হয়, দরিদ্র দেশের অসংখ্য অভাব মিটাবার জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করবার আদর্শ নেই; যারা মেয়ের বিয়ের জন্য ছেলের মাতামহকে প্রজা এবং গরীব ব'লে মর্ম্মান্তিক অপমান শুদ্ধ করতে পারে, আমি তাদের শ্রদ্ধা ক'রে তাদের জন্য কোন রকম ত্যাগ স্বীকার করতে চাই না, আমি এ বিয়ে করবো না।"

বিন্দু শশাঙ্ককে চেনে, আশা ছাড়িয়াই কিছু বিমর্ষ হইয়া কহিল, "কিন্তু তোর বাপ যদি সত্যিই তোকে বিষয়ে বঞ্চিত করে?"

শশাঙ্ক অনায়াসেই উত্তর করিল, "ভালই হবে, খেটে খাবো, হয় ত তোমার নন্দদুলাল মানুষ হয়ে জগতে সামান্য একটা পরিচয়ও রেখে যেতে পারে, কিছু বলা যায় কি, কি থেকে কি হয়? শুধু তুমি আমার উপর বিমুখ হয়ো না।"

বিন্দুর চোখ দিয়া টপটপ করিয়া দু'ফোঁটা জল শশাঙ্কের গায়ের উপর ঝরিয়া পড়িয়া গেল। শশাঙ্ক হাসিমুখে বিন্দুর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া বলিল, "যাই একবার দাদুকে সুখবরটা দিয়ে আসি গে।" চলিতে উদ্যত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবদারের সঙ্গে কহিল, "এইবার তা হ'লে করবী দেবীর সঙ্গে বিয়ের জোগাড় করো, বলেছিলে, ফার্ষ্ট ক্লাশ পাশ করলে বিদ্বান্ বউ ক'রে দেবে।"

বিন্দু তার অশ্রুধারার মধ্য দিয়া বিদ্যুচ্চমকের মত ঈষৎমাত্র হাসিয়া কহিতে গেল, "কিন্তু—"

শশাঙ্ক তাড়া দিয়া উঠিল, "বাঃ—কিন্তু কিন্তু জানি না, ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন', তুমি আমায় লোভ দেখিয়ে রেখেছ!"

বিন্দু কহিল, "রোস, দাঁড়া, আগে তোর বাপকে একটু তোসামোদ-টোসামোদ ক'রে ঠাণ্ডাঠুণ্ডি ক'রে আসি গে। এই একবার তিনি বেশ জিদালো হয়ে ওঠেন, দেখেছি কি না, হঠাৎ রাগের মাথায় খপ ক'রে কায করবার ঝোঁকটিও বেশ আছে! আমার দেখছি শীগ্‌গির করেই যেতে হবে।"

শশাঙ্কর সহাস্য মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল, অপ্রসন্ন নীরস কণ্ঠে সে কহিল,—"না বড়মা! বাবা যদি আমায় তাঁর বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে চান, তুমি তা'তে বাধা দিও না। না, সত্যি না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি, বিষয়ের উপর আমার লোভ একটুও নেই, আমি চাইনি।"

বিন্দু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন, "তোর নেই, আমার আছে। আমি বেঁচে থেকে তোকে যে বিষয়-বঞ্চিত ত্যাজ্যপুত্র দেখবো, সে আমি হ'তে দেব না, তোর যা' অপরাধ, তার মূল ত আমিই, আমায় এর ব্যবস্থা করতেই হবে, খোকা! এ যতক্ষণ না হচ্ছে, আমার মনে একটুও স্বস্তি থাকবে না, জেনে রাখিস্।"

ঘরের ভিতর হইতে দুর্ব্বল ক্ষীণ-কণ্ঠে আহ্বান আসিল, "বিন্দু!"

"বাবা!"

"কার সঙ্গে কথা কইছো? আমি যে আর একাকী থাকতে পারছিনে, তুমি এসো।"

অসহায় রুগ্ন বৃদ্ধ পিতার এই একান্ত হতাশার সুরের কয়টি কথাতে বিন্দু যেন তাঁর চেয়েও নিজেকে অধিকতর বিপন্ন ও অসহায় বোধ করিল। হায়! কেমন করিয়া সে ইঁহাকে একা ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? এই একান্ত অসময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে, যে সময়ের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থ কন্যা-পুত্রের কামনা করে, এ যে সেই বড় সঙ্কটময় দিন। না, একটু ভাল না দেখিয়া বিন্দু ত নড়িতে পারিবে না, অথচ—

তা' দুদশ দিন, বা দু একমাস বিলম্ব ঘটিলে, কি এমন মুস্কিল ঘটিবে? তা ছাড়া, মুখে বলিয়াছেন বলিয়াই কি আর সত্য সত্যই শশাঙ্কর পিতা শশাঙ্কর মত ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করিতে পারিবেন? বিশেষ তার নিজের মা ত তাঁর কাছেই আছে, যতই নির্ব্বোধ হোক, সেই কি এমন অনাসৃষ্টি ঘটিতে দিবে? আর বাধা দিতে নাই যদি পারে, উইল কি আর বদলান যায় না? বিন্দুবাসিনী গিয়া পড়িলে সব ঠিক করিয়া লইবে।

কিন্তু অলক্ষ্যে বসিয়া যিনি মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনি হয় ত এ কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিয়াছিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

হঠাৎ এক আরজেণ্ট টেলিগ্রামে বিন্দু যে সংবাদ পাইল, তাহার পর আর এক মুহূর্ত্তও তার রুগ্ন বাপের খাতিরেও দেরি করিতে পারিল না। আজমীরের রাজকুমার কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকের পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছিল, শশাঙ্ক সেখানে একটা দরখাস্ত করিয়া দিয়া কলিকাতায় রুবির সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে, এমন সময় টেলিগ্রামে খবর আসিল, বসন্ত বাবুর সামান্য সর্দ্দি-জ্বর গত রাত্রি হইতে ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, ডাক্তাররা ভয় দেখাইতেছেন।

বিন্দু ও শশাঙ্ক যখন বাড়ী ঢুকিল, সেখানের বিশৃঙ্খল, বিহ্বল ও ভয়ত্রস্ত অবস্থা দেখিয়া তাহাদের দুশ্চিন্তাপীড়িত ব্যাকুল চিত্ত ঘোরতর অমঙ্গল-কল্পনায় অস্থির হইয়া উঠিল। দ্বারে ডাক্তারদের গাড়ী ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ভিতরে লোকজন ছুটাছুটি করিতেছে, বিন্দু রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিল, সেখানেও লোকারণ্য। ডাক্তাররা তাঁদের শেষ কর্ত্তব্য অত্যন্ত গম্ভীর মুখেই সম্পন্ন করিতেছিলেন, মহান্ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বনিয়ন্তার অলঙ্ঘ্য অচ্ছেদ্য নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মানবের যত কিছু দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র চেষ্টা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকলই এই যাত্রাপথের শেষ সীমান্তবর্ত্তী অসহায় পথিকের পরিত্যক্তপ্রায় দেহকে অসংখ্য পীড়নে পীড়িত করিয়া তুলিয়া সম্পাদিত হইতেছিল। সকল বাধা পরিহারপূর্ব্বক বিন্দু আসিয়া স্বামীর ঠিক মুখের কাছে বসিয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদের মতই বুকফাটা স্বরে বলিয়া উঠিল—"আমি চ'লে গেছলুম বলে, এ কি আবার শাস্তি দিচ্ছো? এই তোমায় ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে বলছি, প্রাণ থাকতে আর আমি তোমায় ছেড়ে যাবো না,—তুমিও আমার কথা রাখো,—আমায় ছেড়ে পালিও না!"

বসন্ত বাবু অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র পূর্ণ বিস্তৃত করিয়া বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁর দুচোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অবসন্নপ্রায় হাতটি তিনি অতি কষ্টে তুলিয়া বিন্দুর হাতের উপর রাখিতে গেলেন, বিন্দু দুই হাতে সেই ঘর্ম্মশীতল শিথিল হস্ত সবেগে চাপিয়া ধরিয়া অবোধ বালিকার মত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল,—"না, না, না, যেও না গো! আমি তোমায় হারালে—ওঃ—পারবো না, সইতে পারবো না, আমি বেশ বুঝতে পারছি—আমি সইতে পারবো না—"

ডাক্তাররা ব্যস্ত হইয়া বারণ করিলেন। বলিলেন,—"ও রকম করলে রোগীকে আমরা ভাল করবো কি ক'রে?"

স্বামীর রাহুগ্রস্ত মুখের দিকে চাহিয়া সুদীর্ঘ দিনের অবমানিতা অভিমানিনী স্ত্রী তাঁহার সমস্ত অপমানের বেদনা বিস্মৃত হইয়া অভাগিনীর কান্না অজস্রধারেই নিঃশব্দে ঢালিতে ঢালিতে দেব-দেবীদের প্রাণপণে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। ডাক্তারদের মধ্যে দুচারিজন হতাশার কথা জানাইয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ' এই নীতি-সূত্রের অবলম্বনে কয়েক জন তখনও বর্ত্তমান থাকিয়া অক্সিজেন প্রভৃতির ব্যবহার চালাইতে লাগিলেন। রোগীর অবস্থা ক্রমেই অতি দ্রুতগতিতে মন্দের চেয়েও মন্দের দিকেই নামিয়া পড়িতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময় চাহিয়া বসন্ত বাবু চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া যেন কাহাকে খুজিতে লাগিলেন, সকলেই কাছে ছিল, ছিল না কেবল সরযূ। রোগের গতি একটু বাঁকাদিকে যখন হইতে ফিরিয়াছে, সে রোগীকে ছাড়িয়া তখন হইতেই বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে, আজ তিন দিন হইতে যায়, কেহই তাহাকে উঠাইতে বা খাওয়াইতে সমর্থ হয় নাই।

শশাঙ্ক কাছেই ছিল, বাপের দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ দেখিয়া সে কাছে সরিয়া আসিয়া তাঁর মুখের কাছে মাথা রাখিয়া বাষ্পরুদ্ধ গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল—"আপনার মনে কত কষ্ট দিয়েছি, আমার ক্ষমা ক'রে যান, না হ'লে—না হ'লে—আমি কখনও আর এ জীবনে সুখী হ'তে পারবো না—"

অতি ধীরে বহুক্ষণের অবশ নিশ্চল হাতখানি তুলিয়া রুদ্যমান পুত্রের মস্তকে তাহা স্থাপন করিয়া মুমূর্ষু বিন্দুর মুখের দিকে চাহিলেন, আবার অতি কষ্টে হাত তুলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী যুক্ত করিয়া কলম ধরার ইঙ্গিত করিলেন।

রোদন সম্বরণ করিয়া বিন্দু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—"উইল করতে চাও?"

বসন্ত বাবুর বাক্‌শক্তি বহু পূর্ব্বেই রোগের প্রথম দিনেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, চক্ষুতেই ইসারায় সম্মতি জানাইলে, বিন্দু শশাঙ্ক ও শরদিন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"শীঘ্গির উকিল ডাকাও—উনি উইল করতে চাইছেন।"

শশাঙ্ক কোন কথাই বলিল না, উঠিল না, নড়িল না, নিঃশব্দে বাপের প্রায়-অস্পন্দ বুকের পাশে মাথা দিয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনের মধ্যে তার তখন একটা তীব্র অনুশোচনা যেন একটা ধারালো ছুরীর মতই বিঁধিয়া উঠিতেছিল।

শরদিন্দু প্রথমবার কোন কথা কহিল না, তার পর বিন্দু পুনশ্চ জিদ করিয়া বলিলে, নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল, "উইলের দরকার নেই, সে বাবা ওর উপর রাগ ক'রে বলে-ছিলেন বলেই কি তাই ক'রে যেতে হবে ?"

মুমূর্ষু পুনশ্চ কিছু বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সকল চেষ্টার সময়ই তখন অতীত হইয়া গিয়াছে, সে চেষ্টার এমন কোন বাহ্য প্রকাশ পাওয়া গেল না—যাহাতে সহজে কাহারও ইহার অর্থ-পরিগ্রহ হয়।

দেখিতে দেখিতে ঘোরতর ক্রন্দনের রোলের সহিত সব শেষ হইয়া গেল। একটি জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব, সহিষ্ণুতা, ভালমন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গেল।

এই যে আকস্মিক ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, ইহাতে অনেক-গুলি জীবনের স্রোতকে একবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া গেল। সরযূর যাহা হইল, অধিকাংশ হিন্দু বিধবারই তাই হয়। তার শোক এবং সান্ত্বনা দুইই অপর্য্যাপ্তভাবেই হইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠিল, শয্যালীনা নব-বিধবাকে আত্মীয়ারা—দাসীরা ধরিয়া তুলে, স্নান করাইয়া দেয়, মুখে তার খাবার গুঁজিয়া দিয়া মাথার দিব্যের সহিত তাহাকে তাহা গলাধঃকরণ করায়। শোকে সে গা ঢালিয়া দিল, সকল সময় কাঁদিয়া কেবলই সে ক্ষীণকণ্ঠে বিলাপ করিয়া বলে, "আমার কি হলো !"

কিন্তু বিন্দু যে আঘাত খাইল, তাতে শোকও ছিল না, সান্ত্বনাও ছিল না। এই যে অকস্মাৎ অতর্কিতে পলাইয়া যাওয়া, তার বোধ হইল, এখন তার চলিয়া যাওয়াই পাল্টা দান, তার অপরাধের শাস্তি ! সে দূরে রহিয়া সকল সেবা, সকল পর্য্যবেক্ষণ ছাড়িয়া যে অবহেলা দেখাইয়াছে, তারই জন্যই না স্বাস্থ্যহানি হইয়া এতবড় রোগের উৎপত্তি হইতে পারিল। সে কাছে থাকিলে রোগের প্রথম সূত্রপাতকালেই সাবধান হইতে পারিত, উচিতমত চিকিৎসা করাইত, সেবা করিত—এ ত সে সব কিছুই যথাযথ হয় নাই, হইতে পারে নাই। নিদারুণ আত্মগ্লানিতে মন তার ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হইয়া মরিতে লাগিল, তাই বাহিরে তার চোখের কোলে স্ফীতি দেখা গেল না। অব্যক্ত রোদনে সারাচিত্ত দিনরাত কাটিতেছিল বলিয়া বাহিরে কোনই অভিব্যক্তি কাহাকেও সে জানিতে দিল না, সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত স্তব্ধ থাকিয়া নিঃশব্দে আসন্ন পারলৌকিক কাযের জন্য আয়োজনে ব্যাপৃত হইল। বড়গিন্নীর কঠোরচিত্ততা সর্ব্ববিদিত, কেহই বিস্মিত হইবার অবকাশ পাইল না।

বিন্দু কিন্তু নিজের মনের গোপন পরিচয়ে নিজেই ঈষৎ বিস্মিত হইয়াছিল; জীবনের প্রথমেই যাকে তার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া জীবনদেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই যখন ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছিল, তখন বিন্দু ভাবিয়াছিল, বাহ্যতঃ যাই থাকুক, ভিতরটা তার বুঝি এ জন্মের মতই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অবিশ্বাসী স্বামীর প্রতি তার সেই অম্লান পবিত্র প্রেম সে বুঝি ফিরাইয়া লইল। না, তা হয় না, তা হয় নাই, হিন্দুসতী তা পারে না, হিন্দুসতী দত্তাপহারী নয়। বিন্দু দেখিল, সে যে শুধু সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতার হিসাবেই স্বামীর ঘর করিয়া তার মাতৃসম্মান বজায় রাখিয়া গিয়াছে, তা নয়, এর মধ্যে প্রধান অংশটুকু তার পত্নীত্বই তাকে ইহা করিতে বাধ্য রাখিয়াছিল। অন্যপরায়ণ অন্যচিত্ত স্বামীর প্রতি তার বুঝি ভালবাসার অন্ত নাই। প্রৌঢ়া নারী বিবশা নবোঢ়ার মতই গোপন রোদনে নিশীথ-উপধান সিক্ত করিতে লাগিল। বুক যেন তার শূন্য—শূন্যতর হইয়া গিয়াছে।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেলে হঠাৎ এক দিন শশাঙ্ক আসিয়া বিন্দুর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, তার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি তা হ'লে আজকেই চলুম, বড়মা।"

বিন্দু বিগত সমারোহ-কার্য্যের বাকিবকেয়া যথাকর্ত্তব্য সকল সমাধা করিতে করিতে অপগত ব্যক্তির বিষয়েই সকরুণ বেদনায় চিন্তা করিতেছিল। চোখ দুটি তার আপনা হইতে জলভারাকুল হইয়া রহিয়াছে, শশাঙ্কর এই কথায় সহসা সম্বিৎপ্রাপ্তের ন্যায় উচ্চকিত হইয়া উঠিয়া সে সাগ্রহে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "কোথায় যাচ্ছিস রে, খোকা ?"

শশাঙ্ক ঈষৎ ম্লানভাবে হাসিল, হাসিয়াই বলিল, "দেখি কোথাও একটা কিছু করতে হবে ত? খুঁজে-টুঁজে নিই গে।"

এই উত্তরে বিন্দুবাসিনী বিশেষ প্রসন্ন হইল না, বরং কিছু নীরস কণ্ঠেই কহিয়া উঠিল, "দুটো দিন কি তুই স্থির-থীর হয়ে একটা যায়গায় বসতে পারিস নে, বাপু? না না, এখন কোথাও যেতে হবে না. এ ক' দিন কোথায় রইলি, কি খেলি, কষ্টের শেষ গেল, একুনি কি আবার টো-টো করতে বেরোয়, বাবা! লক্ষ্মী সোনা আমার! এখন কোথাও যেও না, বাড়ীতে থাকো।"

বড়মার এই সস্নেহ অনুযোগপূর্ণ কথায় শশাঙ্কর বুকের মধ্যটায় একটুখানি ব্যথার মোচড় লাগিলেও, সে তাহা প্রকাশ পাইতে দিল না। মুখের উপরকার স্বাভাবিকভাবে আগমনোন্মুখ ম্লানিমাকে জোর করিয়া পরিহার করিতে চাহিয়া হাসিমুখে উত্তর করিল, "এ বাড়ী ত আর আমার বাড়ী নেই, বড়মা! অনর্থক শুধু শুধু পরের গলগ্রহ হয়ে ব'সে থাকি কেন? আশীর্ব্বাদ করো যেন, খেটে খেতে পারি, আজই বেরিয়ে পড়া যাক, কাযকর্ম্ম ত সব চুকেই গেছে!"

বিন্দুবাসিনীর বোধ হইল, সে যেন আকাশ হইতেই বা খসিয়া পড়িল! অবাক্ আশ্চর্য্য হইয়া দুই বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া তার পর কোনমতে বাক্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া কহিয়া উঠিল, "এ আবার তোর কি রকম কথা রে, খোকা? এ বাড়ী আর তোর বাড়ী নেই? এ বাড়ীতে তুই অন্যের গলগ্রহ? তুই কি ক্ষেপে গেলি, শশাঙ্ক? এ বাড়ীতে তোর অধিকার কে অস্বীকার করতে ভরসা করে শুনি?"

শশাঙ্ক এবার সত্য সত্যই হাসিল; লোক-দেখান কৃত্রিম হাসি নয়, সত্যকারেরই বড় মর্ম্মঘাতী দুঃখের হাসি হাসিয়া সে বলিল, "যাঁর তা করবার অধিকার ছিল, তিনিই যখন সে ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, তখন অপর লোকেও সে অধিকারটাকে কাযে লাগাবার আগে ভাগেই কি স'রে পড়া ভাল নয়? শেষটুকু পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা ক'রে থেকে বাকি ইজ্জতটুকুকেও বিসর্জ্জন দিয়ে তার পর বেরুতে বলো কি? না বড়-মা! আর থাক, বাবা যখন আমার বিষয়-বঞ্চিত ক'রে সমস্তই আমার মাকে দিয়ে গেছেন, এবং উইলে লিখে গেছেন যে, যদি আমি আমার মায়ের মতানুবর্ত্তী হয়ে তাঁর নির্দ্দিষ্ট পাত্রীকে বিয়ে করি, তবেই আমার উত্তরাধিকার বজায় থাকবে, তা না হ'লে তাঁর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ আমার মায়ের এবং তার পর দাদাকে অর্শাবে। আমার কিছু নয়, তখন—বিশেষ আমি যখন আমার মায়ের পছন্দর সে মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে করবো না—তখন আমার বিষয়াধিকার নেই জেনেই আমাকে পথে বেরুতে হবে, এবং নিজের পথ খুঁজে নিতে হবে। তুমিই বলো, তা ছাড়া আর কিছু করবার আছে?"

বিন্দুবাসিনী কিছুক্ষণ কোন কিছুই বলিল না, তার পর যখন কহিল, তখন তার কণ্ঠে কোন প্রকার ক্ষোভ বা বিস্ময়ের রেসই ছিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "এ খবর তুমি পেলে কোথা?"

শশাঙ্ক কহিল, "আমাদের উকীল তুলসী বাবুর কাছে এ খবর আমি বাবা যাবার পরেই পেয়েছি, তোমায় এত দিন জানতে দিই নি।"

বিন্দু পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "শরদিন্দুও জানে বোধ হয়?"

শশাঙ্কর ঠোঁটের কোণে অল্প একটুখানি চাপা হাসি খেলা করিয়া গেল। মুহূর্ত্তে সংযত হইয়া উঠিয়া সে সহজ কণ্ঠেই জবাব দিল, "বোধ হয়।"

বিন্দু তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল, "ও উত্তরটা তোমার ঠিক হলো না, খোকা! 'জানে নিশ্চয়' বলাই উচিত ছিল, উইল তুমি দেখেছ?"

শশাঙ্ক কহিল, "দেখেছি।"

বিন্দু পুনশ্চ উত্তর করিল, "কে কে সাক্ষী আছে?"

শশাঙ্ক হাসিয়া কহিল, "জজের মেয়ে বটে! নাঃ, সে সব ঠিকই আছে গো, কোন ত্রুটি পাবে না, কায পাকাই হয়েছে, তবে ওর সঙ্গে একটা......আছে। তুলসী বাবুর কাছে শুনলুম, এটা দাদার অনুরোধেই হয়েছে যে, যদি ও মেয়েকে নিতান্তই বিয়ে না করি, তা হ'লে দাদার শালীকে বিয়ে করলেও মার অবর্ত্তমানে আমার অধিকার বজায় থাকবে, অবশ্য এটা গোপন কথা, তিনি আমায় গোপনেই ব'লে ফেলেছেন।"

বিন্দুবাসিনীর দুই নেত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে একটুক্ষণ নতমুখে কি চিন্তা করিয়া লইয়া ক্ষণপরে যেন নিঃশেষিতসংশয় হইয়া গিয়া প্রশান্ত স্বরে বলিল,—"তাই হোক, যখন তুমি ওদের দুজনকেই বিয়ে করতে

ইচ্ছুক নও, তখন তোমার পথ তুমি করেই নিও, অবশ্য মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ যদি করতে, আমি খুব খুসীই হতুম, এও তোমায় আমি বলছি।"

শশাঙ্ক কহিল, "এ কথা তুমি আমায় বলতে পারো না, বড়মা! আমি ত তোমার কাছে কোন কথাই লুকাইনি,—সবই ত বলেছি, করবীকে আমি কথা দিয়েছি, তার মন যতটুকু বুঝেছি, তা আমারই দিকে, এ অবস্থায় বিষয়ের লোভে এত বড় অন্যায় আমি করতে পারি কি ?"

বিন্দু এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না, কেবল চিন্তিতভাবে বলিল, "কিন্তু খোকা! সে যখন হয়েছিল, তখন তুমি ছিলে জমীদারের ছেলে, এখন তুমি গরীব নিঃস্ব, সে কি ম্যাজিষ্ট্রেট ছেড়ে তোমার ঘরে আসতে চাইবে ?"

শশাঙ্কর নিজের মনেও এ সন্দেহ যে দেখা দেয় নাই, তা' নয়। অনেকবারই এ কথাটা সে মনে মনে তোলাপাড়া করিয়া দেখিয়াছে। কখন এর অনুকূলে, কখনও প্রতিকূলে তার চিন্তা-ধারা তাহাকে সায় দিয়াছে। বড়মার সংশয়ের ছায়া তার নিজের সংশয়-মেঘকে আকর্ষণ করিল, ঈষৎ ম্লান হইয়া সে জবাব দিল, "সে কথা সেই বলবে।"

বিন্দু কহিল, "এইখানেই তার পরীক্ষা হয়ে যাবে যে, সে এতখানি দান পাবার যোগ্য কি না! যদি এ পরীক্ষাতে সে ফেল হয়, খোকা! তা হ'লে জানা যাবে, তুমি হীরে ব'লে কাচ খুঁজতে বৃথাই কয়লা মাখতে চাইছো।"

শশাঙ্ক বাক্স গুছাইয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেছে, এ সংবাদটা চাপা রহিল না, শোভার কাণেও এ কথাটা গেল। সে শুনিয়াই তার নিজের মায়ের কাছে ছুটিয়া গিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ডাকিয়া উঠিল, "মা!"

সরযূ খাটের বিছানাতেই শুইয়াছিল, তার দাসী তার ভিজা চুলে আঙুল দিয়া চুল ফুলাইয়া দিতে দিতে গল্প করিতে-ছিল, শোভার গলার স্বরে একটা কোন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বুঝিয়া দুর্ব্বলচিত্ত সরযূর বুকের মধ্যে ধড়াৎধড় করিয়া উঠিল, সে আশঙ্কান্বিত হইয়া মুখ তুলিল।

শোভা এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "মা! কি তুমি মা! ছোড়দার মতন ছেলেকে শুধু শুধু এমন ক'রে দুঃখ দিয়ে তোমার কি সুখটা হবে তুমি আশা করেছিলে মা? ও ত এখন বাড়ী ছেড়ে বিবাগী হয়ে চল্লো, মা হয়ে ওকে তুমি ঘর ছাড়া করলে মা!"

সরযূ মেয়ের তিরস্কারের আকস্মিকতায় প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গেলেও ক্ষণপরে ব্যাপারটা কতক কতক বুঝিয়া লইয়া আত্মসংবৃত হইল। স্বামী যে তাহাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের সম্পূর্ণ অধিকার দিয়া গিয়াছেন, আর বিন্দুকে কিছুই দেন নাই, ইহাতে তার চিরক্ষুব্ধ চিত্ত অনেকটাই প্রশান্ততা লাভ করিয়াছিল। বাহিরে সংসার বজায় রাখিতে বিন্দুর যতই প্রতিপত্তি থাক না কেন, ভিতরে যে সরযূই সমস্ত ছিল, এই কথাটা ভাবিয়া সে যত সুখী, ততই শোকাকুল হইয়াছিল। স্বামীর শোকে সে গা ঢালিয়া দিয়া এখনও নিরন্তর বিলাপ-পরিতাপেই দিনাতিপাত করে, দাসী ও আত্মীয়ারাই ধরিয়া তুলে, খাওয়ায় পরায়। শরদিন্দু এবং প্রতিমা ছোট মায়ের খোঁজ-খবর তত্ত্ব-তল্লাস খুব রীতিমতই করিতেছে। তা দেখিয়া শোভা নিশ্চিন্ত হইয়া বড় মায়ের কাযের সাহায্যেই লাগিয়াছিল। তার শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার মেয়াদের ত বেশী দিন বাকি নাই, যে কটা দিন আছে, বড় মা'র নিঃশব্দ নীরব বেদনায় ভরা কর্ম্মনিরত শান্ত মূর্ত্তিটিরই ছায়ার মত সে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে চায়।

সরযূ মেয়েকেও এর আগে বরাবর সমীহ করিয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু এবার যখন সরযূ জানিয়াছে, তার বড় সতীনের চেয়ে এ বাড়ীতে তার অধিকার আজ উচ্চে, তখনও সে আর অনর্থক নিজেকে নিজের পেটের মেয়ের কাছেও ঐ সতীনের ভয়েই অবনত রাখিতে সমর্থ হইল না। মনে মনে রাগিয়া ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে সে জবাব দিল, "আমি ত চিরদিন তোমাদের দুয়োরাণীই ক'রে কাটাচ্ছি! ছেলেকে দুঃখ দিয়ে মায়ের যে কত সুখ, এর পরে নিজের হলে তখন টের পাবে, বাছা! তোমার দাদাকে ঘর-ছাড়া নয়, ঘরবাসী করবার জন্তেই উনি ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, এতে তোমার রাগ করাই অন্যায়, শোভা!"

শোভা মা'র কথার খোঁটায় মনে মনে ঈষৎ লজ্জা পাইয়া ঈষৎ শান্ত স্বরেই কহিল, "কিন্তু মা! তোমরা যে কত বড় ভুল করেছ, তা' এখনও বুঝতে পাচ্ছো না। ছোড়দা যে রকম একরোখা, ও যে ঐতে ভুলে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করবে, এ ত আমার মনে হয় না, অনর্থক তাকে তুমি জন্মের মতন হারাবে, আর—"

শোভার সব কথা শেষ হইল না, সরযূ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "দেখ শোভা! মুখ সামলে কথা

কোস! জন্মের মতন তাকে আমি হারাবো, এই কথা তুই আমার মুখের উপর বল্লি!”

সরযূ বিছানায় পড়িয়া বালিসে মুখ গুঁজিল, শোভা পলাইয়া গেল।

এ দিকে শরদিন্দুকে ডাকাইয়া বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞাসা করিল, “উইলের কথা ত তুমি আগে থেকেই জানতে, তবে যখন তিনি শেষ সময় উইল বদলাতে চাইছিলেন, তখন তুমি না-জানার ভাণ করে তা'তে বাধা দিলে, শরু?”

শরদিন্দু বরাবর তার সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারক মাকে মনে মনে ভয় করিত। ঠাকুমা ও বাপের আদরে সে যথেষ্ট আত্মসুখী ও বিলাসী হইয়া গঠিত হইতেছিল বলিয়াই মা'র দিক হইতে তাহাকে অপর্য্যাপ্ত বাধা ঠেলিতে হইয়াছিল, আজও মধ্যে মধ্যে হয়। বাপের ব্যবস্থায় তার মায়ের কোন অধিকার না থাকায় এবং তার হাতেই সমস্ত উচ্চাধিকার ন্যস্ত হওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় সেও মনের ভিতর অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। সরযূকে হাতে রাখা কঠিন নয় এবং এই উপলক্ষে হয় শালীর সঙ্গে শশাঙ্কর বিবাহ, না হয় সমস্ত সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অধিকার একটা কিছু পাওয়ার আশায় সে উৎফুল্লচিত্তই ছিল, মা'র প্রশ্নে কিছু বিপন্ন বোধ করিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া জবাব দিল, “সে সময় সে রকম না বল্লে কি উপায় ছিল? যার বাক্‌রোধ হয়ে গ্যাছে, সে করবে উইল? মিথ্যে টানা-হ্যাঁচড়ার চোটে প্রাণটা আরও শীঘ্র বার ক'রে দেওয়া হবে, এই ভয়ই আমার হয়েছিল। তা ছাড়া সময়ই বা কতটুকু ছিল উকিল ডাকাডাকির?”

যুক্তিটা যদিও অকাট্য, তথাপি তাহাতে আস্থা স্থাপন করারও কিছু ছিল না, বিন্দু স্থির অথচ যুক্তিদৃঢ় কণ্ঠে পুত্রকে বলিল, “তুমি তখন যেন উইল হয় নি, এ ভাব প্রকাশ না করলে হয় ত এর কিছু প্রতীকার আমি ক'রে নিতে পারতুম, কিন্তু সে যা হবার, তা ত হয়েই চুকে গ্যাছে, এখন এর প্রতিবিধান ইচ্ছে করলে তুমিই করতে পারো। যেমন আমি জানি, তেমনই তুমিও জানো যে, স্বর্গীয় কর্ত্তা তাঁর শেষ সময়ে নতুন উইল কর্ত্তে চেয়েছিলেন, অথবা ঐ উইল নষ্ট করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন, তখন ঐ উইলখানি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে সকল ঝঞ্ঝাটই ত মিটে যেতে পারে। শশাঙ্ক যখন ও মেয়েদের বিয়ে করতে ইচ্ছুক নয়, এবং অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করতে স্থিরসঙ্কল্প হয়েছে, তখন অনর্থক ওকে পীড়ন ক'রে আর লাভটা কি?”

শরদিন্দু মায়ের প্রস্তাবে মনে মনে রাগিল, মুখেও তার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও একটুখানি রাগের আভাস যে না দেখা দিল, তাও বলা যায় না। তথাপি যথাসম্ভব সৌম্যভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সে জননীর প্রস্তাবের উত্তর দিল, কহিল,—“মা, তুমি ছোট মায়ের দিকটা একেবারেই ভেবে দেখে চলছো না; ও বেচারী একে ভালো মানুষ, চিরদিনই ও সবার পায়ের নীচে প'ড়ে আছে, স্বাধীন বিয়ের স্বাধীনা বউ এসেও যদি ওকে পায়ে পেঁতলায়, তা হ'লে ওর দশাটা হবে কি বল ত? তার চেয়ে বাবা এ ত খুবই ভাল ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। শসো ও মেয়ে যদি নেহাৎই না বিয়ে করতে চায়, তারও একটা উপায় রাখা হয়েছে! আমার শালীকেও ত ছোট মায়ের অপছন্দ নয়, ওঁরাও হাজার দশবারো প্রায় দেবেন বলছেন। ছোটমায়ের মত আমি করাবো, ওকেই না হয় বিয়ে করুক, ছবোনে মিলও থাকবে, সবদিকেই ত ভাল হবে মনে হয়,—তোমার কি হয় না?”

শেষ কথাটায় বিন্দুর উপর একটু খোঁচা থাকিলেও বিন্দু তাহাতে নজর দিল না, সে ঈষৎ বিমনা বিমর্ষ হইয়া থাকিয়া ক্ষণপরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, “ভালই হতো, হয় ত খুব ভালই হতো; কিন্তু সে ত আর এখন হয় না শরু। খোকা আমাকে সব কথাই ত বলেছে। সে যে আর একজনকে বিয়ে করবে কথা দিয়ে আংটী বদল ক'রে বসে আছে, মেয়েটিও তাকে কথা দিয়েছে।”

শরদিন্দু ঘোর অবজ্ঞার উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। উপহাসের সহিত সে কহিয়া উঠিল, “গন্ধর্ব্ব বিয়ে! বাঃ ভায়া আমার আছেন ভাল। উচ্চশিক্ষিত কি না, আমার মতন ত আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট নন! বাঃ! আচ্ছা মা! ও না হয় ক্ষেপতে পারে, তুমি ওকে এতে কেমন ক'রে প্রশ্রয় দিচ্ছো বল দেখি? নিজের ছেলে হলে বোধ হয় পারতে না; কিন্তু—না মা! ওসব সেণ্টিমেণ্ট হবে না, বাবার যা শেষ ইচ্ছা, তা হ'তে দিতে আমি বাধ্য। তুমি রাগ করবে হয় ত, কিন্তু উপায় নেই।”

বিন্দুবাসিনীর দুই চক্ষু অগ্নিদীপ্ত হইয়া উঠিল। তা শান্ত মুখশ্রী একটা অদ্ভুত ক্রূর হাস্যে যেন ভয়াল হইয়া উঠিল। উন্নতমুখে একমাত্র সন্তানের মুখের দিকে সেই বিদ্যুদ্দাম

তুল্য তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক কহিল, "শরদিন্দু! যখন তোমায় ডাকিয়ে এনেছিলুম, এর চেয়ে ভালকথা তোমার মুখ থেকে শুনতে পাবো, আশা ক'রে আমি তোমায় ডাকিনি। শুধু মায়ের শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করবার জন্তেই এ ডাক—এই ধর্ম্মের ডাক আমায় দিতে হয়েছিল। সরযু নির্ব্বোধ, কিন্তু তুমি, তুমি জেনেশুনে নিজের সম্পূর্ণ স্বার্থের জন্তেই এ উইল হতে দিয়েছ, থাকতে দিয়েছ, আজও দিলে। মূর্খ জমীদারের মেয়ে বিয়ে ক'রে ভবিষ্যৎ বংশকে মূর্খ করতে যদি ওর প্রবৃত্তি না হয়, রুগ্ন কালো মেয়ে যদি না ও বিয়ে করে, ওর পিতৃপিতামহের জন্মসূত্রে পাওয়া উত্তরাধিকার ওর নষ্ট হয়ে তোমাতে অর্শাবে, এই হলো বিচার? হোক তবে তাই। চায় না ও অমন দাস্যবৃত্তির অধিকার পেতে। যে মা নিজের সন্তানকে বড় হতে না দিয়ে ছোট করতে চায়, তার ভাগ্যে বিধাতা অনেক দুঃখ লিখে থাকেন। শোন শরদিন্দু! আমি তোমার মা, আমি তোমায় হুকুম করছি, নিরপরাধ ছোট ভাইয়ের বিষয়ে লোভ না রেখে কুপরামর্শর ফলে রাগ ক'রে লেখা, এবং শেষে অনুতপ্ত হয়ে শোধরাতে চাওয়া ওই অন্যায় উইলখানিকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলে দুভায়ে সমান হয়ে মনের মিলে সুখে থাকো। বউদের সাধ্য কি যে তোমাদের মায়েদের অযত্ন করে। না পারো, আর আমার কিছু বলবার নেই; আমি জানবো, বিধাতার ভুল হয়নি, তুমি সরযুর আর শশাঙ্ক আমার পেটেই জন্মেছ। কারণ, আমি জানি, এখন সরযুকে যত্ন করতে তোমার দিক থেকে কম পড়বে না।"

"এ তোমার অন্যায় রাগ করা, মা! চিরকালই তুমি আমায় শশকে হিংসে করতে দেখ, আর তার দিকেই তোমার চারপো টান। বেশ, তাই ভাল, আমি বাপের হুকুম মানতে বাধ্য।"

শরদিন্দু চলিয়া গেল।

বাড়ীর লোকরা জানিল, বিন্দুবাসিনী এখানের বাস উঠাইয়া বাপের বাড়ী যাইতেছেন। প্রতিমা একবার আসিয়া ভারি মুখে বলিল, "মা, এরই মধ্যে আমাদের ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন? কবে আসবেন?"

বিন্দু ক্ষীণভাবে হাসিয়া জবাব দিল, "কি জানি মা! বলতে ত পারি না, বাবার যে শরীর। দেখ বৌমা! এই কাপড় কখানা আর এই পাঁচখানা গহনা তোমায় দিলুম, তুমি পরো।"

শোভা অন্ধকারমুখে আসিয়া বলিল, "আমার শাশুড়ীর অসুখ, আমায় আজই যেতে হবে, বড়মা! সরকার দাদাকে বলেছি দিয়ে আসতে।"

বিন্দু তাহার হাতে তার এক-তৃতীয়াংশ মূল্যবান্ অলঙ্কারবস্ত্র দিয়া বলিল, "এগুলো পরে ফেলিস, শোভা! মধ্যে মধ্যে চিঠি দিস।"

দাসদাসী সকলেই কাতর হইয়া কাঁদিল, প্রসাদ-পুরস্কার লাভ করিল, শীঘ্র আসিবার জন্য অনুরোধ করিল; কিন্তু মনে মনে সকলেই বুঝিল, বড়মা আর শীঘ্র আসিবে না। বড়মার বাপের অসুখ, এ কথা সকলেই জানিত।

যাত্রাকালে শশাঙ্ক আসিয়া বলিল, "আমি ত তোমার সঙ্গে যাবো না, বড়মা! যত দিন না রোজগার ক'রে খেতে পারি, তত দিন দাদুর কাছে যাবার অধিকার আমার ত নেই। তবে তোমার থেকে আমায় গোটা কতকমাত্র টাকা দিও।"

বিন্দুবাসিনী তখন আর সহিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"তোর কোন কাযেই আমি বাধা দিয়ে তোকে নীচু করবো না, বাবা! যা তুই ভাল মনে করিস, তাই কর, শুধু আমায় চিঠি লিখে একটু খবর দিস, আর শরীরে যত্ন করিস, বাবা! ভুলে যাস্ নি, তুই ছাড়া আমার আর কিছুই রইল না।"

শশাঙ্ক তার উদগত অশ্রুকে সজোরে নিরোধ করিতে করিতে পিছন ফিরিয়া সরিয়া গেল।

তার পর কয়েক মুহূর্ত্তের ব্যবধানে দুজনেই দুদিকে যাত্রা করিল।

রোরুদ্যমানা সরযুকে শরদিন্দু ও প্রতিমা বুঝাইল যে, এতটা বিষয় না কি কেউ ছাড়ে? আবার ফিরে আসবে, তুমি ভয় পাচ্ছো কেন, ছোটমা! যদি না আসে, আমার নাম আমি বদলে ফেলবো।" [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

বৃক্ষকাণ্ডে শিল্পনৈপুণ্য

কেনসিংটন উদ্যানের কোনও প্রাচীন ওক-গাছের কাণ্ডে জনৈক স্কট শিল্পী কতিপয় পরীমূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়াছেন। বালক-বালিকাদিগের চিত্তবিনোদন এবং তাহাদিগের কল্পনাশক্তিকে

বৃক্ষকাণ্ডে শিল্প-নৈপুণ্য

উন্মেষশালিনী করিবার জন্যই তাঁহার এই প্রচেষ্টা। এই প্রকাণ্ড মহীরুহের কেন্দ্রস্থানে একটি বৃহৎ কোটর আছে। সেই কোটরটির মধ্যে বালকবালিকারা পক্ষী, পরী এবং শশক, বাদুড় প্রভৃতির ভোজনের উৎসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারে, এজন্য শিল্পী যথেষ্ট নৈপুণ্য ও পরিশ্রম প্রকাশ করিয়াছেন। বৃক্ষকাণ্ডে পরীরাজ্যের বহু প্রকার মূর্ত্তি অতি সুন্দরভাবে ক্ষোদিত হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক আলোক-বাক্স

জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক-সমূহে ইদানীং বৈদ্যুতিক শক্তি-চালিত আলোক-বাক্সের সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে। চেক এবং নোটগুলি এই আধারের আলোক-সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়, উহা নকল কি আসল। কৃত্রিমতা থাকিলেই তাহা ধরা পড়িবে। এই বৈজ্ঞানিক আধারের সাহায্যে বস্ত্রাদির পরীক্ষাও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

বৈদ্যুতিক আলোক-বাক্স

চোর ধরিবার কৌশল

প্রতীচ্য জগতে দস্যু-তস্কর অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলসম্পন্ন। তাহাদিগের অসাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য য়ুরোপ আমেরিকায় প্রতিদিনই নূতন নূতন উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সম্প্রতি জার্ম্মাণী এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে কোন লোক অসময়ে অসদভিপ্রায়ে প্রবেশ
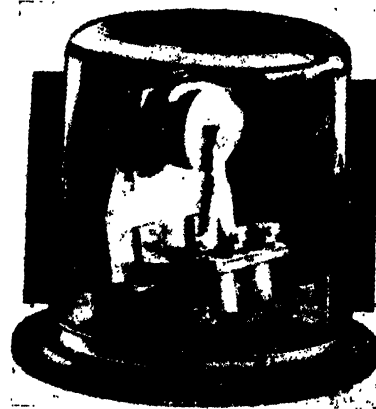
চোর ধরিবার কৌশল—যন্ত্রের চিত্র

করিলেই এই যন্ত্র হইতে একটা সতর্কতাসূচক আলোক ও শব্দ উৎপাদিত হয়। শুধু তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে লোকটির আলোক-চিত্রও সেই যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত হইয়া থাকে।

বিচিত্র বিশ্রামাগার

যাঁহারা আল্পস্ পর্ব্বতে আরোহণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। এজন্ত ইটালী সরকার তাঁহাদের বিশ্রাম

বিচিত্র বিশ্রামাগার

করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। কোনও অব্যবহার্য্য রেলগাড়ী কয়েকটি সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর স্থাপন করিয়া এই বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু দূর হইতে এই বিশ্রাম-ভবন পর্য্যটকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। প্রচুর তুষারপাত হইলেও এই বিশ্রামাগারের কোনও ক্ষতি হয় না। দীর্ঘ আরোহণীর সাহায্যে এই গৃহে প্রবেশ করা যায়।

ভেনিসের ভাসমান ক্লাবগৃহ

ভেনিসের রাজপথগুলি জলপূর্ণ, ইহা জগতে বিদিত। এইরূপ কোনও রাজপথের উপর নৈশক্লাবগৃহ দেখিতে পাওয়া যাইবে।
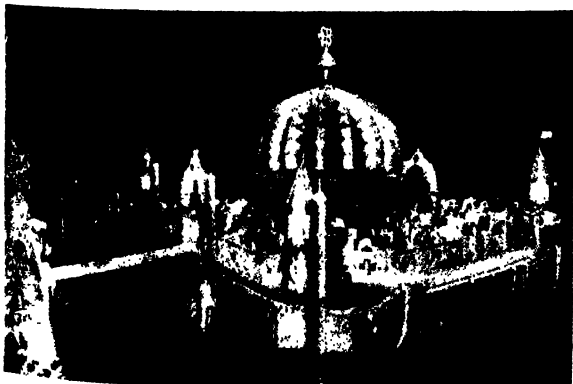
ভাসমান ক্লাবগৃহ

একখানি দারু-নির্ম্মিত ভাসমান নৌকার উপর ক্লাবগৃহ প্রতিষ্ঠিত। আলোকমালায় তাহা সমুজ্জ্বল থাকে। নৃত্য-গীত এবং পান-ভোজনের চমৎকার ব্যবস্থা এই ক্লাবগৃহে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বিরাট মোটর-চক্র

কোনও রবার কোম্পানী দ্বাদশফুট দীর্ঘ একটি মোটরগাড়ীর চাকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার বিস্তৃতি চারি ফুট। এই চাকাটির সম্পূর্ণ ওজন ৫৫ মণ। এই বিরাট চক্রের অনুপাতে

বিরাট মোটর-চক্র

যে মোটর-গাড়ী ভবিষ্যতে নির্ম্মিত হইবে, তাহা যে কিরূপ আকারের হইবে, তাহা কল্পনায় অনুমান করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অধুনা এই চক্রটি একটি বড় মোটর-গাড়ীর পশ্চাতে আবদ্ধ করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

অভিনব খাঁচা
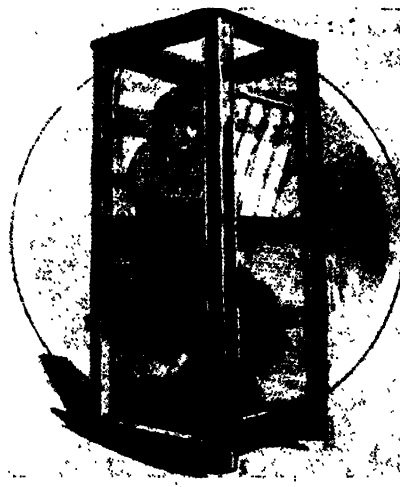
অভিনব খাঁচা

অনেক রোগী মুক্ত-বাতাসে, আকাশতলে কিছু কালের জন্ত শুইয়া বসিয়া কাটাইতে ভালবাসে। কিন্তু কীট-পতঙ্গাদির দৌরাত্ম্যে বাহিরে যাপন করা তাহাদিগের পক্ষে দুঃসহ হইয়া থাকে।

এই উপদ্রব হইতে যাহাতে রোগীরা মুক্তি পাইতে পারে, সে জন্ত এক প্রকার খাঁচা বাজারে বাহির হইয়াছে। ইহার মধ্যে দোলায়মান কেদারায় বসিয়া রোগীরা নিরাপদে মুক্ত আকাশ ও বাতাস উপভোগ করিতে পারে। কীটপতঙ্গাদির দৌরাত্ম্য ইহাতে নিবারিত হয়। এই খাঁচা স্বল্লায়াসে ভাঁজ করিয়া ঘরের কোণে রাখা চলে।

প্রসিদ্ধ শতদলের প্রসাধন

লক্ষ্যভেদ ও সন্তরণ

কালিফোর্ণিয়ার পুরুষ ও নারীরা ধনুর্ব্বাণের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ ও সন্তরণক্রীড়া একসঙ্গে চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সন্তরণের পূর্ব্বে লক্ষ্যভেদ

ইহাতে নাকি উত্তেজনা ও আনন্দ সমধিক। নির্দ্দিষ্ট জলাশয়ের উপর নির্ম্মিত মঞ্চ হইতে লম্ফপ্রদানকালে ধনুকে শর সন্ধান করিয়া সন্তরণকারী উহা নিক্ষেপ করে। একসঙ্গে উভয় কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

শতদলের প্রসাধন

লণ্ডনের কিউ উদ্যানের জলাশয়ে বিশ্ববিখ্যাত "ভিক্টোরিয়া রিজিয়া" নামক শতদল আছে। এই দুষ্প্রাপ্য পদ্মকে নিয়মিতভাবে প্রসাধিত করিবার ব্যবস্থা আছে। এই পদ্মের পত্রগুলি যেমন দীর্ঘ, তেমনই দৃঢ়। এক একটি পত্রের উপর মানুষের ভর পর্য্যন্ত সহে। এই শতদল প্রসাধিত না হইলে, ইহাতে নানা প্রকার আ-গাছা উৎপন্ন হইতে পারে।

কীট-পতঙ্গ-প্রতিপালন

কোনও বিলাতী কীটপতঙ্গ-ব্যবসায়ীর উদ্যানে প্রজাপতি ও কয়েকটি বিশিষ্ট জাতীয় কীটপতঙ্গের প্রজনন ও প্রতিপালন

কীটপতঙ্গাদি-প্রতিপালনের ব্যবস্থা

হইয়া থাকে। বড় বড় বস্ত্র দ্বারা বৃক্ষ ও লতাকুঞ্জসমূহ আবৃত করিয়া তন্মধ্যে উল্লিখিত কীটপতঙ্গাদি প্রতিপালিত হয়। পরিদর্শকগণ প্রত্যহ তাহাদিগের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

৫। ছাতনা-বাদ

(ক) ছাতনায় যাহা দেখিয়াছি

ছাতনা বাঁকুড়া সহরের পশ্চিমোত্তর কোণে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া পথের পাশে সহর হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ছাতনা বলিয়া কোন মৌজার নাম নাই, পরগণা ও থানার নাম ছাতনা। বি, এন, রেলওয়ের ছাতনা ষ্টেশনের অতি সন্নিকটেই আদি বাসলীস্থান ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীর-ঘেরা সমচতুষ্কোণ স্থান—সম্মুখে সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ এখন বেশ স্তূপ হইতে উচ্চতর এবং ইহার মেজে কৃষ্ণ-প্রস্তরে মণ্ডিত। ইহাকেই বাসলীর মন্দির বলিয়া অনুমান করি। অন্ত ভগ্ন-স্তূপটি প্রথমটির ঈশানকোণে—ইহার সম্মুখেই দুইটি প্রস্তরনির্ম্মিত যূপ, তাহার পর পূর্ব্বদিকে ছোট একটি প্রস্তর-দ্বার। ইহা এখনও অভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। পূর্ব্বদ্বারের সম্মুখেই বাসলী-পুকুর বা শাঁখা-পুকুর।

রাস্তার অপর পার্শ্বে ধোপা-পুকুর, ধোপা-পুকুরের পাশেই কিছু দূরে রামীর ভিটা ও অন্ত পার্শ্বে চণ্ডীদাসের সমাধিভূমি। প্রাচীন লীলার ভগ্নাবশেষ এই স্মৃতিস্তূপের মাঝে দাঁড়াইয়া
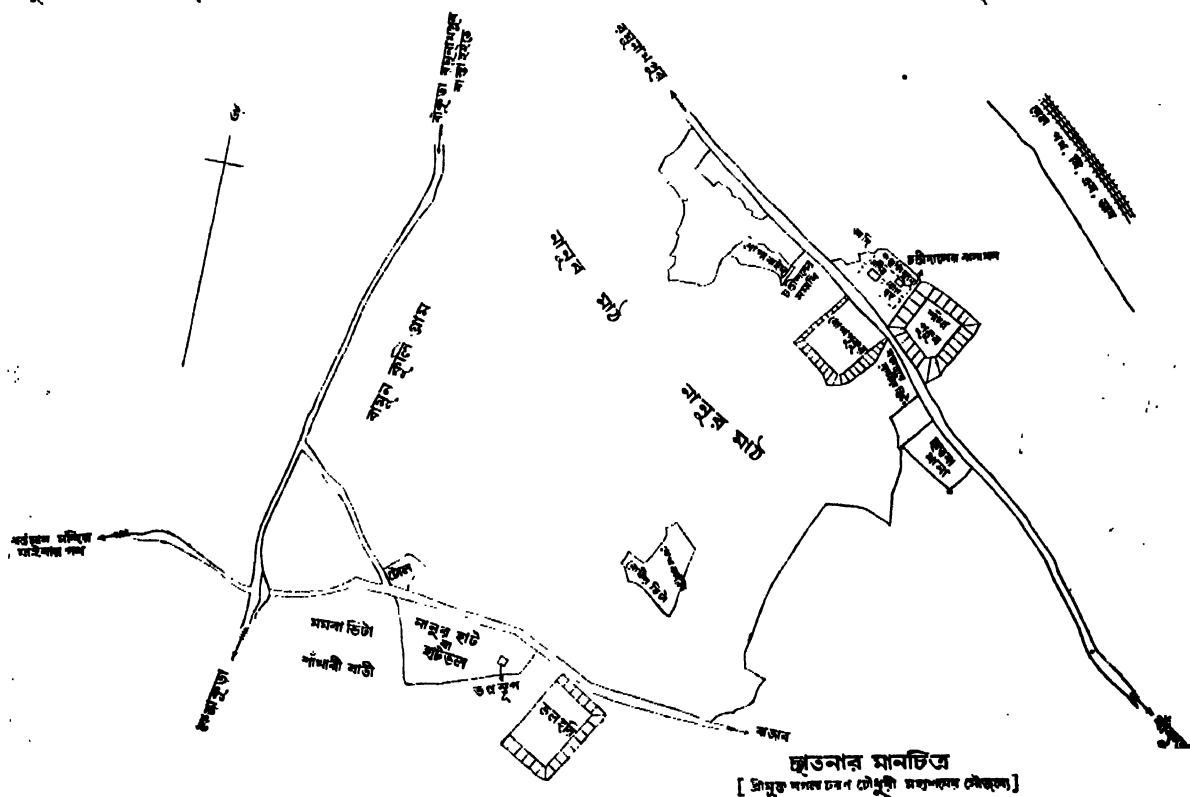
ছাতনার মানচিত্র

সুস্পষ্ট দেখা যায়। কারুকার্য্যখচিত মর্কট-প্রস্তরে নির্ম্মিত—ইহার কাছেই একটি ছোট ঘরের চিহ্ন—হয় ত প্রহরীর কক্ষ। তাহার অদূরেই হস্তী বাঁধিবার জন্ত দৃঢ়প্রোথিত স্তম্ভ। তাহার পর দেখিলাম, মধ্যে দুইটি ভগ্নস্তূপ রহিয়াছে। সদর-দরজার সম্মুখের স্তূপকে সাহানা মহাশয় নাটমন্দির বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। এই স্তূপের পোত অন্ত অতীতের কাহিনী যেন জীবন্ত হইয়া মনে ভাসিতে লাগিল।

সেখান হইতে বর্ত্তমান মন্দির দেখিতে যাই। এক প্রাচীরের মধ্যে দুইটি মন্দির। একটি জীর্ণদশায় কালের করাল আলিঙ্গনের জন্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, অপরটিতে বর্ত্তমানে দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। দ্বিতীয় মন্দিরটি আদি

আদি বাসলীস্থান

দেবী যেন নৃত্য করিতেছেন। দেবীর দুই পার্শ্বে দুই সহচরী।

দেবীমূর্ত্তির সহিত ধর্ম্মপূজা-বিধানের বাশুলীর ঐক্য আছে এবং উক্ত ধ্যানমন্ত্রেই ছাতনার বাসলী অর্চ্চিত হন। ধর্ম্মপূজা-বিধানে বাশুলী বানান দেখিতেছি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পুথিতে ও দুই শিলালেখের বানান বাসলী, বাঁকুড়ার লোক সর্ব্বত্রই বলে বাসলী। ছাতনা পরগণায় বাসলীস্থান ও গ্রাম্য-দেবী বাসলী যথেষ্ট আছেন। আমার মনে হয়, ধর্ম্মপূজাবিধানে প্রাচীন বানান রাখিবার কোন চেষ্টা হয় নাই বলিয়া সম্পাদক চলিত বানান জুড়িয়া দিয়াছেন।

বাসলীস্থানের মন্দির ধ্বংস হইলে পর ১৬৫৫ শকে বিবেক-নারায়ণ নামে সামন্তাধিপের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই মন্দির পঞ্চরত্ন-মন্দির এবং মর্কট-প্রস্তর-নির্ম্মিত। সূক্ষ্ম স্থাপত্যকলার বিশেষ কোন নিদর্শন দেখি নাই।

ইহার গাত্রে একটি প্রস্তর-ফলক আছে। বাঁকুড়ার উকীল শ্রীযুত কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে তাহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিয়াছি। ঐ প্রস্তরফলকলিপি এইরূপ :—

ব্রহ্মাশেষ-সুরেশ-বন্দ্যচরণ-শ্রীবাসলীপ্রীতয়ে
সর্ব্বাস্ত স্মরশায়কর্ত্তু শশভৃৎসংখ্যে শকাব্দে শুভে।
সামন্তান্বয়সাগরেন্দুররিদন্তীশাজি সৎ কেশরী
ভূভুগ বৃন্দবরো বিবেকনৃপতিঃ সৌধং দদৌ দার্শদম্॥

তৃতীয় মন্দিরের শিলালিপি এইরূপ :—

ব্রহ্মাদ্যাখিলদেববন্দ্যচরণ-শ্রীবাসলীপ্রীতয়ে
রামার্ক'র্ষ-হিমাংশু-সম্মিত-শকে সৌধং দদাবৈষ্টকম্।
নাম্নানন্দকুমারিকা সু নিরতা সামন্তরাজপ্রিয়া
শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সরোরুহে মধুকরীসানন্দজাতাদরা॥

ইষ্টকনির্ম্মিত বর্ত্তমান মন্দির রাণী আনন্দকুমারী ১৭৯৩ শকে নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরমধ্যে দেবী দক্ষিণ-মুখী। দ্বিভুজা, দক্ষিণে খড়্গধারিণী, বামে খর্পর, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, চরণদ্বয় নূপুর-শোভিত। পদতলে শয়ান অসুরের উপর দাঁড়াইয়া

বাসলী
শ্রীযুত সাগরচন্দ্র দে কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র হইতে

ধ্যানমন্ত্র এই :—

ওঁ আরাতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে,
সিন্দুরাক্তে বিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যবদনা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গাং পিব পিবরুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ।
"ধর্ম্মপূজাবিধান"—৩১ পৃষ্ঠা

ধর্ম্মপূজাবিধানের দুই খণ্ড আছে। প্রথম খণ্ডে কেবল বাশুলীকে আবরণ-দেবতা পাই, দ্বিতীয় খণ্ডে বাশুলী ও বিশালাক্ষী পাই। দ্বিতীয় খণ্ডের ধ্যানমন্ত্রে দ্বিতীয় চরণে কিছু পাঠান্তর আছে, যথা—

সিন্দুরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
১০২—পৃষ্ঠা

আবাহন-মন্ত্র হইতে দেবীর পূজা সম্বন্ধে জানি :—
অষ্টতণ্ডুলদূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেন্মঙ্গলকারিণীম্।

মুলুর হাটের ভগ্নস্তূপ—ছাতনা

নাথ দাসের হস্তলিখিত পুথিতে বাশুলী-বন্দনায় পাই :—
"অন্ত যদি না পারিবে অষ্টসের ভোগ দিবে
দুগ্ধ মৎস্য আদি যে কলাই।"

..র একখানি পুথির নকল পাইয়াছি। তাহার পরিচয়ের 'বাসলী-মঙ্গল' আখ্যা করিলাম। উহাতেও পূজাবিধি ..ইরূপ আছে।

..হা ছাড়া রাণী খোপানীর 'পাট' বলিয়া একখানি শিলাপট্ট ও হাটতলা, বেলস্পেথরিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। ইহা ছাড়া আদি বাসলীস্থানের মন্দিরে বেগলর সাহেব চতুর্ব্বিধ লেখ দেখিয়াছিলেন; বিদ্যানিধি মহাশয় ত্রিবিধ লেখ পাইয়াছেন। এই সব লেখের পাঠোদ্ধার হয় নাই। একটি লেখ সুস্পষ্ট, তাহা হইতে জানা যায়, "শ্রীশ্রীছাতনা নগরেশ শ্রীশ্রী উত্তর রায় শক ১৪৭৬"। ছাতনা-রাজবংশের সহিত চণ্ডীদাস-কাহিনীর কিছু সম্বন্ধ রহিয়াছে। পরে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

(খ) ছাতনায় যাহা পাওয়া গিয়াছে

ছাতনা হইতে বাসলীর মহিমাসূচক তিনখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম বাসলী-মাহাত্ম্য সংস্কৃতে লেখা। ১৩৩৩ ফাল্গুনের প্রবাসীতে ইহা সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণভক্তপ্রিয় বুধবর নিত্যনিরঞ্জন চণ্ডীদাসের পিতা, মাতা লক্ষ্মীস্বরূপা বিন্ধ্যবাসিনী, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দেবীদাস তাঁহার অগ্রজ এবং তিনি ভরদ্বাজকুলোদ্ভব।

শ্রীহামীর-উত্তর রাজা আপন পূজারী বংশ নির্ব্বংশ হইলে বিপদে পড়িয়া বাসলীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বাসলী-আদেশে দেবীদাস পূজারী নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি বাসলীর প্রসাদ খাইতে অস্বীকার করেন। বাসলী তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন। একবার দস্যুদল নগর আক্রমণ করিয়া রাজ্য ও রাজাকে অবরুদ্ধ করিলে, চণ্ডীদাস মায়ের স্তব করেন এবং বাসলী নিজে যুদ্ধ করিয়া রাজাকে মুক্ত করেন। ইহাতে বাসলীর শাখা পরিধানের ও বিষ্ণুপুরবাসী কোন তন্তুবায়ের বাসলীকে বস্ত্রপ্রদান প্রভৃতি কাহিনী আছে। এই পুস্তক ১৩৮৭ সালে পদ্মলোচন শর্ম্মা কর্ত্তৃক রচিত।

রাধানাথ দাসের বাসলী-বন্দনায় চণ্ডীদাসের উল্লেখ নাই, দেবীদাসের আছে। ইহাতে পাই, বাসলী শিলারূপে বণিকের সঙ্গে আগমন করেন এবং 'ব্রাহ্মণের কন্যা ছলে হামীর-উত্তর ভূপে' স্বপ্ন দেন। নৃপতি বণিকের নিকট হইতে শিলা কিনিয়া বাসলী স্থাপনা করেন। বাসলী-আদেশে রাজা বাহ্মণনগরের

নাম বদলাইয়া ছাতনা নগর রাখেন। বাসলীকৃপায় রাজা দিগ্বিজয় করেন। পরে একবার বরগী শমন্তালয় আক্রমণ করিলে দেবী নিজে যুদ্ধ করেন, সেই সময়ে তাঁহার কর্ণের বেশর পড়িয়া যায়। রাজা তাহা কুড়াইয়া বাসলীকে দেন।

কত দিন পরে কৌলিক পূজারী পুত্রশোকে সন্ন্যাসী হইয়া যান। সেই সময়ে দেবীদাস 'গোপাল' লইয়া পশ্চিমে যাইতেছিলেন। দেবীর আদেশে তিনি দেবীর পূজক নিযুক্ত হন। দেবীদাস প্রসাদ খাইতে অনিচ্ছুক হইলে দেবী তাঁহাকে পিতা সম্বোধন করেন। ইহা ছাড়া বাসলীর শঙ্খ-পরিধান, গোয়ালিনীর নিকট দুগ্ধপান, এবং ম্লেচ্ছ রাজার নিকট হইতে বাসলীকৃপায় অন্য রাজাদের উদ্ধারসাধন প্রভৃতি দেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী আছে।

তৃতীয় পুথির নকল পাইয়াছি, ইহার কোনও নাম নাই। আমি আলোচনার জন্য ইহাকে 'বাসলীমঙ্গল" বলিয়া অভিহিত করিব। ইহাতে রাজার প্রতি মাতার স্বপ্নাদেশ, কর্ম্মকার ডাকিয়া মূর্ত্তিগঠন, পূজাবিধি, ব্রাহ্মণ্য নগরের ছাতনা নামকরণ, কৌলিক পূজারীর উদাসী হওয়ার ঘটনা, দেবীদাস ও চণ্ডীদাসের শ্রীধর ও গোপাল লইয়া তীর্থে গমন ও পথে হামীর-উত্তর কর্ত্তৃক দেবীদাসের পূজারীরূপে নিয়োগ, চণ্ডীদাস ও রামীর প্রণয়োল্লেখ, দস্যুদমন, দিগ্বিজয়, গোয়ালিনীর প্রতি কৃপা, তন্তুবায় ও বস্ত্রের উপাখ্যান, শঙ্খবণিকের আখ্যায়িকা, দেবীদাসের বিবাহ, দেবীদাসের উদ্ধব ও পদ্মলোচন নামক দুই পুত্রের কথা, উন্মত্তভৈরবের কথা, ভৈরবের স্থিতিনির্ণয়, ব্রাহ্মণ রাজার কাহিনী, ব্রহ্মহত্যা করিয়া পুনরায় সামন্তদের রাজ্যাধিকার, রাজার আসন্নকাল, পূজার ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ভাষা আধুনিক। ইহাতে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

মহাত্মা দ্বিজবর   সঙ্গে গোপাল শ্রীধর
হরিহর আর গণপতি।
তীর্থযাত্রী সর্বত্যাগী   রাজ-দরশন লাগি
আসিবেন ভ্রাতার সংহতি।
মুখে সদা হরি বলে   চলিছে পশ্চিমাঞ্চলে
আজি শুভ মহাশুভযোগ,
দেখা হলে ঋষিগনে   আনিবে আমার স্থানে
পূজা হেতু করিব নিয়োগ।

* * * *

অকস্মাৎ দৈবাদেশ   শ্রবণে করে প্রবেশ
দেবীদাস! পড়িয়াছ ভ্রমে।
আমি সেই কাত্যায়নী   যাহারে পূজিলে তুমি
পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে।
কাশীধামে পূজা পেয়ে   পরম সন্তুষ্ট হয়ে
আসিয়াছি পূজা হেতু পুনঃ
প্রিয় ভক্ত তুমি মম   চণ্ডীদাস নিরুপম
দুটী ভাই কেহ নহে উন।

* * * *

দেবীদাস ভেবে সারা,   আমি পুত্র-পত্নী-হারা
ত্রিসংসারে কেহ মোর নাই,
আছে এক কুলাঙ্গার   জঘন্য আচার তার
চণ্ডীদাস নামে মাত্র ভাই।
আছে এক কলঙ্কিনী   রামী নামে রজকিনী
সেই তার তপ জপ জ্ঞান।
মানে না সমাজপ্রথা   শুনে না কাহার কথা
শুনি মুখে মাত্র রাধা নাম।

* * * *

এই কথার উত্তরে বাসলী বলিতেছেন :—

শুনো আরো গুহ্য কথা, নিত্য মুক্ত তব ভ্রাতা,
কার্য্যে তার বুঝিও না পাপ,
রাধা নাম সিদ্ধযোগী   না চিন্তহ তার লাগি
আশ্চর্য্য তার কার্য্যকলাপ।
আর রামী রজকিনী   সে ত আমারি সমানি
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী
চণ্ডী মম প্রিয় ভক্ত   ভাল জানে মম তত্ত্ব
কহিলাম সার এ ভারতী॥

অন্যত্র গোত্রের ও কুলের পরিচয় :—

সমুদ্র গৌড়সমাজ,   গোত্র-শ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ
ইড়েমিশ্র কুলের সন্তান।

দেবীদাসের পুত্রদের কথা :—

পুত্র হল দুই জন   উদ্ধব পদ্মলোচন
বংশ রক্ষা হল এইমতে,
বৃদ্ধ বিপ্র দেবীদাসে   বাঁধিলেন মায়াপাশে
দৈবমায়া কে পারে বুঝিতে?

(গ) বিচার

বাঁকুড়া যে পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্লাবনে প্লাবিত হইয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। শূন্য-পুরাণের রামাই পণ্ডিত ও ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্ট বাঁকুড়ার লোক। বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে এখনও ধর্ম্মপূজা চলে। বাঁকুড়ার বহু স্থানে বৌদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধকীর্ত্তি আছে।

বাসলী বৌদ্ধদেবতা ধর্ম্মের আবরণ-দেবতা। ছাতনায় সে বাসলী পাইতেছি। আদি বাসলীর লেখ ইষ্টকে পাইতেছি ১৪৭৬ শকে উত্তর রায় এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ছাতনার রাজবংশের সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায় না, কাযেই উত্তর রায়কে হাম্বীর উত্তর রায় বলিয়া এক করিয়া লইলে ভুল হইবে। আমার মনে হয়, হাম্বীর উত্তর রায় ও উত্তর রায় পৃথক্ ব্যক্তি। ছাতনা রাজবংশে এক নামের বহু রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বরূপনারায়ণ তিন জন ছিলেন, বিবেকনারায়ণ দুই জন ছিলেন, অতএব বিনা প্রমাণে হাম্বীর উত্তর রায় ও উত্তর রায়কে এক করিয়া লওয়া চলে না।

১৩৮৭ শকে রচিত সংস্কৃত পুথি বাসলী-মাহাত্ম্যে হাম্বীর উত্তর রায়ের নাম নাই। অতএব তিনি ১৩৮৭ শকের পূর্ব্বে ছিলেন। ওমালী সাহেব জনশ্রুতি শুনিয়া লিখিয়াছিলেন যে, ১৩২৫ শকে ছাতনা রাজবংশের অভ্যুদয়। ছাতনার বংশলতিকায় পাই হাম্বীর উত্তর রায় বংশের তৃতীয় পুরুষ; অতএব তিনি যে ১৪৭৬ শকে ছিলেন না, এ কথা নিশ্চিত।

ওমালীর লিখিত ১৩২৫ শক কৌতুকাবহ। কেমন করিয়া কোথা হইতে এই শক সংগৃহীত হইয়াছে, বুঝিতে পারি না। ছাতনা রাজবংশের হাম্বীর উত্তর রায়ই বাসলী-প্রতিষ্ঠার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। অতএব তাঁহার নামের সহিত জড়িত শক কোন প্রকারে প্রথম রাজার সহিত জড়িত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংজ্ঞাজ্ঞাপক পদটি যদি সত্য হয়, তবে ১৩২৫ শকে হাম্বীর উত্তর রায় হয় ত বাসলীর প্রথম মন্দির রচনা করেন, এবং সেই উপলক্ষে 'কবিশশধর' চণ্ডীদাস তাঁহার একখানি গীতি-কাব্য সমাপ্ত করেন। ইহা অনুমান মাত্র, কিন্তু বর্ত্তমান জ্ঞান লইয়া ইহার ব্যতিরেকী কল্পনা সম্ভবপর নহে।

ছাতনায় এখনও দেঘরিয়া বংশ আছেন। তাঁহারা নিজেদের চণ্ডীদাসের ভ্রাতা দেবীদাসের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহাদের কেহ কেহ উদ্ধবের বংশ বলেন, অপরে পদ্মলোচনের বংশ বলেন। বংশপরিচয়ের এই ধারা কল্পিত হইতে পারে না। দেঘরিয়া বংশসমুদ্র গৌড় সমাজ, ভরদ্বাজ গোত্র এবং এড়ু মিশ্রের সন্তান। এড়ু মিশ্র একাদশ শতাব্দীর এক জন বিখ্যাত কুলাচার্য্য। প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতে এড়ু মিশ্রের বংশ পাওয়া যায় কি না, তাহার সন্ধান হওয়া কর্ত্তব্য।

তিনখানি পুথি পাইতেছি। একখানি সংস্কৃত এবং দুইখানি বাঙ্গালা। এই পুথিগুলি জাল বলিয়া ধরিবার কোন হেতুই নাই। বাসলী-মায়ের মূর্ত্তির প্রতিরূপ লইবার সময় রাজবংশের শ্রীযুত রামকিঙ্কর সিংহ দেও মহাশয় প্রথমে আপত্তি করেন এবং বলেন, ছাতনায় চণ্ডীদাস থাকুন বা নাই থাকুন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।

পুথিগুলি জাল করিবার এক উদ্দেশ্য হইতে পারে যে, ছাতনার লোক চণ্ডীদাসের গৌরবে গৌরবান্বিত অনুভব করিবার জন্য জাল পুথি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু উপরি উক্ত ঘটনা অন্যরূপ বলে। অপরন্তু সেই অসদভিপ্রায় থাকিলে পুথির প্রচারের জন্য চেষ্টা হইত, কিন্তু তাহার কোন চেষ্টাই নাই। বহু আয়াসে এই পুথি তিনখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তাহার পর ছাতনায় হাটতলা পাইতেছি—লোক ইহাকে নুন্নুর বা নানোর হাট বলে এবং পার্শ্বের মাঠকে নান্নুর মাঠ বলে। রাজবাড়ীর উত্তরে একটি মৌজার নাম যুবরাজপুর, হয় ত কোনও যুবরাজের খোরপোষ জমী, তেমনই হয় ত নানোর হাট কোন কনিষ্ঠ কুমারের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমী। যে সব প্রাচীন ব্যক্তির নিকট এই নাম শুনিয়াছি, তাঁহাদের মিথ্যা বলিবার হেতু দেখি না। তাঁহারা চণ্ডীদাসের জন্মভূমি লইয়া বাদ-বিতণ্ডার কোন সংবাদই রাখেন না। রাজার ছোট ছেলেকে পূর্ব্বে নুনু বা নানু বলিত।

ছাতনার ঈশান কোণে শালতোড়া গ্রামে নিত্যা নামে এক ভগ্নদেবী আছেন। ঐ মৌজার মালিক বাঁকুড়ার উকীল শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র মোহান্তের গৃহীত বার্ত্তায় পাইতেছি যে, সেখানে 'নিত্যাময়া ধোপানী' নামে এক ভগ্ন মূর্ত্তি আছে, শ্রীযুত বিদ্যানিধি মহাশয় যে খবর দিয়াছেন, আমার সংবাদ তাহা হইতে ভিন্ন। পূজারী লিখিয়াছেন যে

হনুমানজী, নিত্যাবয়ী ধোপানী, মনসা, ক্ষেত্রপাল, পঞ্চানন ও বাঘরায় আছেন। গোবিন্দ বাবু বলেন যে, মূর্ত্তিগুলি তাঁহার বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। নিত্যার পূজা হয় না, কাযেই পূজারী মন্ত্র জানেন না, কিন্তু বিস্মৃতির মধ্যেও প্রাচীন নাম টিকিয়া রহিয়াছে।

বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলির সঙ্কলয়িতা শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ মহাশয় এখানে পঠিত এক প্রবন্ধে না কি বলিয়াছিলেন যে, বীরভূমের শাল নদীর তীরে কঙ্কালী পীঠের পাশে নিত্যার এক মন্দির আছে। সত্য মিথ্যা, জানি না। কারণ, কোনও পুস্তকে ইহা দেখিতে পাইতেছি না।

ছাতনার নিকট এক আনন্দপুর আছে, সেখানে দেঘরিয়াদের প্রাচীন বংশ আছে। ছাতনার লোক বলে যে, ইহাই

ইহাই যদি রামীর ভিটা হয়, তাহা হইলে তরুণী রমণীর পদের ভৌগোলিক সংস্থানের সহিত ছাতনার প্রাপ্ত মন্দির প্রভৃতির অবস্থানের সামঞ্জস্য হইতেছে। আমাদের অনুমিত আদি বাসলীস্থানের মন্দিরের ঈশান কোণেই ভোগগৃহ এবং ইহাই চণ্ডীদাসের বাসা-ঘর, এবং সেখান হইতেই এক পোয়া নিকটে রামী ধোপানীর গৃহ পাইতেছি। নক্সা দেখিলেই বিষয় ও বক্তব্য সকলে ভালভাবেই বুঝিতে পারিতাম।

অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে, বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাসের লীলাভূমির কিংবদন্তী আধুনিক, কিন্তু তাহা নহে। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বেগলার সাহেব তাঁহার Archeological Survey Vol, VIII, নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন :—

আদি বাসলী-স্থানের অনুমিত ভোগ-গৃহ

"Tradition identifies Chatna with Vasuli or Vahuli nagara At Daksha's Sacrifice, it is said, one of the limbs of Parvati foll here which thence derived its name of Vasuli Nagara a Bahulya Nagara, a name mentioned in the old Bengali Poet Chandidas."

অর্থাৎ ছাতনার প্রাচীন নাম বাশুলীনগর বা বাহুল্যা নগর—প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসে ইহার উল্লেখ আছে।

বোধ হয় অবন্তীপুর। শিবরতন বাবুর সংগৃহীত পুথিতে কি পাঠ আছে, তাহা মিলাইয়া ইহার আলোচনা প্রয়োজন।

রামীর ভিটা নিঃসংশয়িতভাবে কেহই দেখাইতে পারে নাই। ধোপাপুকুরের পশ্চিম পার্শ্বে ধোপাবাদ নামক জমী আছে, তাহার গায়েই চণ্ডীদাসের সমাধি এবং ধোপাপুকুরের পূর্ব্বদক্ষিণে ও নামুর হাটের উত্তরে একটি জমী ধোপাকানালি নামে পরিচিত। ধোপাকানালি জমীর বেশী ভাগ নীচু, কিন্তু এক স্থানে একটি ভিটা দেখিতে পাইতেছি। কেহ কেহ ইহাকে রামীর ভিটা বলিতে চাহেন।

রাধানাথ দাসের বাসলী-বন্দনায় অনুরূপ কথা পাই :—

বাহুল্য নগর ছাড়ি ছাতনা নগর বসি
এই নাম তুমি যে রাখিবে।

১৩০২ সালে ছাপা বিশ্বকোষেও ছাতনায় চণ্ডীদাসের কাহিনীর কথা দেখিতে পাই। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে ছাতনার বাসুলীর উল্লেখ আছে। শুনিয়াছি, কিন্তু দেখি নাই যে, ব্রহ্মখণ্ড নামক এক সংস্কৃত পুথিতে ছাতনার সংস্কৃত নাম ছত্রিনার উল্লেখ আছে।

কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাসের লীলাভূমি যদি ছাতনাই

হয়, তবে তাঁহার পদাবলী সেখানে পাই না কেন? এ কথার এক উত্তর—অনুসন্ধান হয় নাই। বাঁকুড়ার কোতলপুরে চতুর্দ্দশ পদাবলী পাওয়া গিয়াছে, বন-বিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পাওয়া গিয়াছে। ছাতনাবাসী শ্রীযুত কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ার উকীল। তিনি চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়েন নাই, চণ্ডীদাসের ইতিহাসের খবরও রাখেন না। পদাবলী কতকগুলি তাঁহাকে বলিতেই তিনি বলিলেন যে, এরূপ বহু গান তিনি ছোট বয়সে ছাতনার নিকটবর্ত্তী গোপালপুরগ্রামবাসী কীর্ত্তনীয়াদের নিকট শুনিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশে শ্রীযুত জীবনচন্দ্র দেঘরিয়া মহাশয় একটি চণ্ডীদাসের পদাবলী যোগাড় করিয়া পাঠাইয়া দেন। বালির কাগজে লেখা—ইহাতে চণ্ডীদাসের ১৫০টি পদ লেখা দেখিতে পাইতেছি—মাঝ হইতে অনেকগুলি পাতা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় ৫০।৬০টি পদ নাই, ৮০।৯০ পদ অবিকৃত আছে। ইহার প্রায় সবই ছাপা পুস্তকে পাওয়া যায়, কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটি পদ ছাপা হইয়াছে বলিয়া জানি না, এই জন্যই উদ্ধার করিয়া দিলাম।

১। কেমন শুনিলা কেমন মুরলী।
কি রূপ দেখিয়া পদে সব ভুলি ॥
কেমন দেখিলা তারে কিবা অভিলাষ?
শুনিঞা সকল তোর পুরাইব আশ ॥
হিন জন নহে সে বুঝিনু মন দিয়া।
উপায় করিয়া তোরে দিব মিলাইয়া ॥
থির হঞা শুভদিন কহ সব বাত।
কহ রে মাধুরী মোর শিরে ধর হাত ॥

পুথির ৫ম পদ।

ইহাতে চণ্ডীদাসের ভণিতা নাই।

২। বন্ধুর সঙ্গেতে আজু যাইতে নারিনু গো
পাপ ননদিনী হইল বাধা।
দুখেতে আপন ঘরে শুতিয়া রহিনু গো
বিহি পুরাইল মন-সাধা ॥
সজনী সে সুখ কি কহিব অনেক
পিয়া আসি যেন মোরে নিকুঞ্জ-কানন-ঘরে
স্বপনে হইনু পরতেক ॥
বুকে বুকে মুখে মুখে নিবিড় মদনসুখে
কত না আরতি সে না কথা।
ননদি জনিত দুঃখ জাগরণে যত দিল
ঘুমাইলে গেল সব ব্যথা ॥
কত না যতন কোরি, বেশ বনাইল গো
এ রাসবিলাস কৈল কত।
এক মুখে তোহে হাম তাহা কি কহিব গো
রভস কৌতুক যত যত ॥
হেন কালে নিদ টুটি জাগিয়া রহিনু গো
স্বপন নারিনু বুঝিবারে।
সেই হইতে প্রাণ মোর আনচান করে গো
বিন্দু পরবোধিবারে নারে ॥

৩৯নং পদ

৩। খণ্ডিত পদ বলিয়া মনে হয়:—
নিষেধ নিলাজ বনমালি রাখালে তজে কি চন্দ্রাবলী
হেমঘট দেখিয়ে অপার, চরায় মন সাত পাচ করে।
মাঝ হাতে নারিকেল খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাই বল
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে চাঁদ কি ধরিতে পারে ছলে ॥

১৫১নং পদ

৪। সখি হে বিরাট-তনয় দেহ দান বায়স, অজরব অন্তর
জর কিয়ে ভেল পাপ পরাণ।
বক্ত যার তিন দুন তাহার বাহন পুন
তাহার ভক্তের ভক্ষ্য নিজ সুতে
বাণ দুন শির যার পুরী নষ্ট কৈল তার
হেন দুঃখ প্রিয়া দিল মোকে
মুনি তিন গুণ করি বেদে দিশা ইহা করি
দেখ সখী একত্র করিয়ে
আমি কুলবতী বামা বিধি মোরে হৈলা বামা
গয়াশিব বাণ তেয়াগিয়ে।

১৫২নং পদ

সখি নিপট কঠিন মতি তোর।
হাতে হাত ধরি বাত শিখায়নু
না মানসি মোর।
অঙ্গুলিকো দোষে বাহু যদি কাটবি
তবিহি (?) সম্ভাবি রামা।
এক অবগুণ লাগি বহু গুণ তেজবি
সৈ (?) বোলবি গুণবতী রামা ॥

এক নলিনীমুখ মলিন করয়ে
তথি লাগি নিন্দসি চান্দে।
এক চম্পকদাম যদি নাহি (চুম্বে ?)
তথি লাগি নিন্দসি ভৃঙ্গে॥
সকল কুসুমগণ ক্ষণে মন তোষণ
নিশি রহু কমলিনী সহিতে।
দীপকজ্যোতি পরশি যদি নাশই
তথি লাগি নিন্দসি মারুতে॥
কাগজপত্র পরসে যদি না শই
তথি লাগি নিন্দ নিরে।
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখ সকল শরীরে।
পাঁচ পঞ্চগুণ দ্বিগুণ চৌগুণ
আট দ্বিগুণ সখী মাঝে।
ভূপতি সাথ আনি যব মিলায়ব
ঈষৎ মানসি লাজে॥
চণ্ডীদাস কহে শো বহু বলে
তুহুঁ যে আহিরীনি জাতি।
তাহা পিরিতে গুণ তুঁহু কিবা জানবি
তেঁহু হন অখিলের পতি॥

৭৩ নং পদ

গুরুজন বচনে পাঁজর ধসি গেল।
পাড়াপড়সীর জ্বালায় প্রাণ সরপ হৈল।
কত না সহিব আর সহিতে না পারি
কহিতে কহিতে দুঃখ কহিতেও নারি
এ দেশ ছাড়িয়া যাব রহিব কাননে
এ পাপ লোকের মুখ না দেখি যেখানে।

৭৪ নং পদ

এ কি পরমাদ আই।
লোকের বদনে, শুনিয়া শ্রবণে
তাহাই দেখিতে পাই
তোমার আমার বাপের কুলেতে
কখন কথাটি নাই।
তবে কেন তুমি কানু কানু করি
সদাই জপহ রাই।
কানু নাম শুনি চমকি উঠহ
পুলক তাহায় সখি
কালা রূপ দেখি ছল ছল আঁখি
যেকত এ সব দেখি
আমি ননদিনী সব রস জানি
পাসরি ত চৌপিঠ
কহে চণ্ডীদাসে বুঝিনু বিশেষে
তুমি সে বড়ই চিট॥

৭৫ নং পদ

ননদী লো! মিছাই লোকেরি কথা,
যদি কানু সঙ্গে পিরিতী করিত শপতি তোমারি মাথা।
নিজ পতি বিনে অন্য নাহি জানি সেই সে আমার ভাল।
কোন্ গুণে যাই রাখালে ভজিব যাহার বরণ কাল॥
মণি-মুকুতার নাহি আভরণ সাজনি বনেরি ফুলে
চূড়ার উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে তাহে কি রমণী ভুলে?
রাজা হঞা যারে দেখিতে না পারে, যারে বলে ননীচোরা
কহে চণ্ডীদাস রাধার কলঙ্ক মিছাই করিলি তোরা॥

৭৬ নং পদ।

উপরে যাহা আলোচিত হইয়াছে,তাহার সারমর্ম্ম দিতেছি। ছাতনায় বাশলী আছেন, ছাতনায় দেবীদাসের বংশ আছেন, ছাতনায় প্রাপ্ত তিনখানি পুঁথি ছাতনায় চণ্ডীদাস মন্তব্যের সমর্থন করে, ছাতনার কিংবদন্তী বহু প্রাচীন। ছাতনায় নানুর মাঠ পাই, পদাবলীতে নানুরের মাঠের কথাই আছে, নানুর গ্রামের কথা নহে। বিষ্ণুপুরের সাহিত্যিক শ্রীযুত সুজয়চন্দ্র দাস মহাশয় এক পত্রে ছাতনায় চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন, কিন্তু তিনিও লিখিতেছেন যে, "নুনুর মাঠ" ব'লে একটি মাঠ ছিল, আমি নিজেও ছাতনার গ্রাম-বৃদ্ধের নিকট হইতে এই নাম পাইয়াছি। ছাতনার সন্নিকটে শালতোড়ায় নিত্যা আছেন, ছাতনার মন্দিরাদির ভৌগোলিক সংস্থান তরুণীরমণের পদের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলে। বাঁকুড়ার চণ্ডীদাসের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, গায়েনরা এখনও তাহার পদাবলী কীর্ত্তন করেন, খুঁজিলে কিছু কিছু সন্ধান এখনও মিলিতে পারে।"

এই সমস্ত বিষয় একত্র করিলে ছাতনায় চণ্ডীদাসের লীলাভূমি ছিল, এই মতবাদই সমীচীন ও নির্ভর-যোগ্য বলিয়া

মনে হয়। ছাতনার প্রতিপক্ষের দিক আলোচনা করিলেই এ সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় বলিয়া মনে হইবে।

বীরভূমবাদ

বীরভূম দেখি নাই, সে জন্য যাহা পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহার উপর নির্ভর করিয়া লিখিতেছি। বীরভূমে বাসলী নাই। যে দেবী বিশালাক্ষী বলিয়া পূজিত হন, তাঁহার মন্দির অতিশয় নূতন। পূজকরা চণ্ডীদাসের বংশধর বলিয়া দাবী করে না। দেবীর মন্ত্র ও ধ্যান অর্ব্বাচীন কোনও অজ্ঞ ব্যক্তির রচিত বলিয়া মনে হয়, মূর্ত্তির সহিত বাসলীর কিংবা বিশালাক্ষীর সাদৃশ্য নাই।

বীরভূম নান্নুর নলনগর বা নলপুর ছিল বলিয়া প্রবাদ। কাযেই তাহার ধ্বংসাবশেষ নলরাজাদের কীর্ত্তি বলিয়া লওয়াই শ্রেয়। বীরভূমে নান্নুর মাঠ বলিয়া মাঠ নাই, এক গ্রাম আছে, তাহার প্রাচীন নাম নানোর। রেনেল সাহেব ১৭৬৭-১৭৭৪ সালে যে মানচিত্র করেন, তাহাতেও এই নাম পাইতেছি। রেনেল ইংরাজীতে লিখিয়াছেন Nanore। প্রাচীন দলীলপত্রাদি এই কথারই সাক্ষ্য দিতেছে।

নান্নুরের নক্সা, পূজারীদের বংশপরিচয় প্রভৃতির সন্ধান লইতে পারি নাই। ভবিষ্যতে পারিলে অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু এই সব প্রশ্ন ১৩৩৩ সালে আরম্ভ হইলেও যখন বীরভূমের পক্ষপাতী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কোনও উত্তর দেন নাই, তখন অনুমান করি যে, এ বিষয় আলোচনা করিয়াও বীরভূম মতবাদের সমর্থন চলিবে না। আমাদের যত দূর অনুসন্ধান, তাহাতে বাঙ্গালার নবজন্মের যুগে যখন বাঙ্গালী পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ ভুলিয়া নিজ সংস্কৃতির গৌরব ও অধিকার আলোচনা করিতে গিয়াছিল, তখনই বীরভূমে নান্নুর নাম দেখিয়াই চণ্ডীদাসের বাসস্থান স্থির করিয়া লইয়াছেন।

বাঁকুড়ার জনশ্রুতি দুই প্রকার ;—এক চণ্ডীদাস বিদেশ হইতে আসেন। সে মত মানিলে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান অন্যত্র খুঁজিতে হয়। অন্য মত—তিনি ছাতনার অধিবাসী ছিলেন, মাতার মৃত্যুশোকে দুই ভাই কাশীবাসী হন এবং [illegible] হইতে প্রত্যাগমনকালে বাসলীর পূজারী নিযুক্ত [illegible]। দ্বিতীয় কল্পনাকে অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কারণ, যে সব পুথি পাইয়াছি, তাহা পড়িলে চণ্ডীদাসকে বিদেশাগত অপরিচিত ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

বীরভূমে নান্নুরে তবে চণ্ডীদাস প্রবাদ কেন? তাহার দুই উত্তর হইতে পারে। এক নান্নুর চণ্ডীদাসের লীলাভূমি স্থির হইলে চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে লোকায়ত কাহিনী নান্নুরে সংহত হইয়াছে। ইহা যদি সত্য না হয়, তবে হয় ত নান্নুর চণ্ডীদাসের জন্মভূমি আর ছাতনা তাঁহার লীলাভূমি। কালের ব্যবধানে সমস্ত জিনিষ ওলটপালট হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু আমি যতদূর পর্য্যালোচনা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চণ্ডীদাস ছাতনা নগরেই তাঁহার অমৃত-মধুর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব কবিরা ইতিহাস-প্রিয় ছিলেন, চণ্ডীদাসকে তাঁহারা যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কোন বৈষ্ণব গ্রন্থেই চণ্ডীদাসের লীলাকাহিনী নাই। ভক্তমাল গ্রন্থে কত ইতিহাস জুটিয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের মনোরম আখ্যায়িকা তাহাতে নাই। ইহার কারণ কি?

হয় ত আমাদের স্বাভাবিক ভাবুকতায় নর-লোকের তুচ্ছ কাহিনী হইতে রস-লোক ও ভাবলোকের দিক দিয়া চণ্ডীদাস আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিদের আলোচ্য বিষয় হইয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য ভাব-ঘন মাধুর্য্যে ও রস-বিপুলতায় এত উর্দ্ধে ছিল যে, তাঁহার জীবনের জাগতিক ঘটনা অনর্থক ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিল। অথবা জঙ্গলদেশের বর্ব্বরভূমির বাসলী-পূজক বলিয়া চণ্ডীদাসের জীবনকথা বৈষ্ণব কবিদের প্রিয় ও আদরণীয় হয় নাই।

কি যে আসলে ঘটিয়াছিল, একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ কালই জানেন। প্রাচীন স্মৃতির রেখা-চিহ্ন কুড়াইয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে পুরাতনী বিবরণী যাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহাই লইয়া শান্ত হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। বৈষ্ণব-যুগ বাঙ্গালার এক মহাজাগরণের যুগ, নব যৌবনের চঞ্চলতায় ও প্রাচুর্য্যে চারিদিক তখন উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনন্তপার বৈষ্ণবশাস্ত্র তাহার প্রমাণ। এই শাস্ত্র-সমুদ্র এখনও যথাযথ আলোচিত, পঠিত ও সংগৃহীত হয় নাই। অনাবিষ্কৃত হস্ত-লিখিত পুথি হইতে হয় ত আরও নূতন আলোক পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু যত দিন অন্য সংবাদ না পাইতেছি, তত দিন ছাতনাকে চণ্ডীদাসের লীলাভূমি বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করি।

উপসংহার

মহাকবির জীবন ও রচনা ভূমার প্রকাশ, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাহা চিরন্তনী রসধারা বিলায়। সান্ত জীবনের খেলাঘরে অনন্ত রসমাধুর্য্যের আভাস ক্ষণে ক্ষণে জাগাইয়া দেয়। তাই কবির তুলনায় কাব্য বড়।

কিন্তু কাব্যের উৎসভূমি, দেশ, কাল ও আচার জানিলে কাব্যশাস্ত্রবিনোদন পরিপূর্ণ ও মধুর হইয়া উঠে। কবির লীলাভূমি অবলম্বন করিয়া কাব্য-পাঠের চেষ্টা হয় নাই। সময় ও সুযোগ হইলে বারান্তরে চণ্ডীদাসের কাব্যের উপর তাহার স্থান ও দেশের প্রভাব কিরূপ পড়িয়াছিল, তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

চণ্ডীদাস যে অতীন্দ্রিয় জগতের বৈতালিক, তাহার রসাস্বাদনের জন্য হয় ত এ সব বিষয় অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু মানুষের এষণা বহুমুখী। সকল দিক দিয়া, সকল রসের মাঝ দিয়া, সকল জ্ঞানের কষ্টিপাথরে কষিয়া কবিকে জানিতে হইবে।

বাঙ্গালার ভাবুক ও রসিক সমাজ বাঙ্গালার মরমী কবিকে বাঙ্গালার সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষার মাঝ দিয়া, বাঙ্গালার সমস্ত সাধনা ও কৃষ্টির পরখে পরখ করিয়া হৃদয়ের অমৃত-ধন করিয়া তুলুন। বাঙ্গালার সুধী ও রসবেত্তা পণ্ডিতমণ্ডলীকে চণ্ডীদাসের কাব্য, জীবন ও লীলাভূমির আলোচনার জন্য সাদর আহ্বান করিতেছি।

চণ্ডীদাস বাঙ্গালার আদি ও অদ্বিতীয় কবি। তাঁহার কবি-প্রতিভাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার মহিমা প্রচার করিবার জন্য বাঙ্গালীকে সাধনা করিতে হইবে। তাঁহার যথাযথ পূজা-মহোৎসবের জন্য বাঙ্গালীকে জ্ঞানের ও কলার তীর্থে তীর্থে মঙ্গলঘট ভরিয়া আনিয়া পূজার অর্ঘ্য সাজাইতে হইবে।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম্‌-এ, বি-এল)।

দেহাত্মবাদ

জ্ঞানের মর্য্যাদা বুঝি শৌর্য্যবীর্য্য-রূপের গৌরব
বুঝি ধর্ম্ম,—সত্যাদর্শ ;—কর্ম্মবল—মর্ম্মের বৈভব,
মানবের সভ্যতার উচ্চস্তরে ক্রম আরোহণ,
কিন্তু মনে হয় সবি মিথ্যা, ব্যর্থ, নিশার স্বপন,
যখনই ভাবিয়া দেখি সমস্তই করেছে আশ্রয়,
নরের নশ্বর দেহ—শত শত রোগের নিলয়
যে দেহ ভঙ্গুর পঙ্গু আজ আছে কাল নাই আর,
চারিদিকে ছিদ্র খুঁজে শত শত অরাতি যাহার,
নিসর্গ-বালার হাতে যেই দেহ খেলানার মত
দুঃখশোকে অবসন্ন ভীতিমূঢ় ত্রিতাপে বিক্ষত
সেই তুচ্ছ শক্তিহীন মৃত্যুভয়ে নিতান্ত কাতর
দেহেরে বা যুগে যুগে একমাত্র করেছে নির্ভর,
সে গৌরব স্পৃহণীয় হোক্ যত তার কি বা দাম,
যাহারে করিবে শুষ্ক এ দেহের দগ্ধ পরিণাম ?
এত বড় পরিহাস করি তুমি দেহের বিধাতা
তব পদে নোয়াইতে চাহ তুমি দেহীদের মাথা ?
এরি তরে কৃতজ্ঞতা পূজাভক্তি চাহ দেহাতীত,
দেহের অধীনে রাখি আমাদেরে করি প্রবঞ্চিত ?
যে কণ্ঠ টিপিয়া হাতে এক দিন হরিবে পরাণ
সেই কণ্ঠে শুনিবারে চাহ তুমি তব জয়-গান ?
যেই বক্ষ পদাঘাতে চূর্ণ তুমি করিবে হে বাম
সেই বক্ষে তব মূর্ত্তি ধ্যানলগ্ন র'বে অবিরাম ?
বৃন্ত ছিঁড়ি তীক্ষ্ণনখে যেই ফুল দলিবে চরণে
সেই ফুল মধুগন্ধে ও চরণ পূজিবে কেমনে ?
নিজে দেহমুক্ত রহি চিরদিন ভাঙি আর গড়ি
করিছ পুতুল-খেলা, হে নিষ্ঠুর তোমা নাহি ডরি।
বিদ্রোহীরে দণ্ড দিবে তাই দাও ওহে বজ্রপাণি,
কালি যা ভাঙিতে নিজে আজই তাহা ভাঙিবে [illegible]

শ্রীকালিদাস রায়
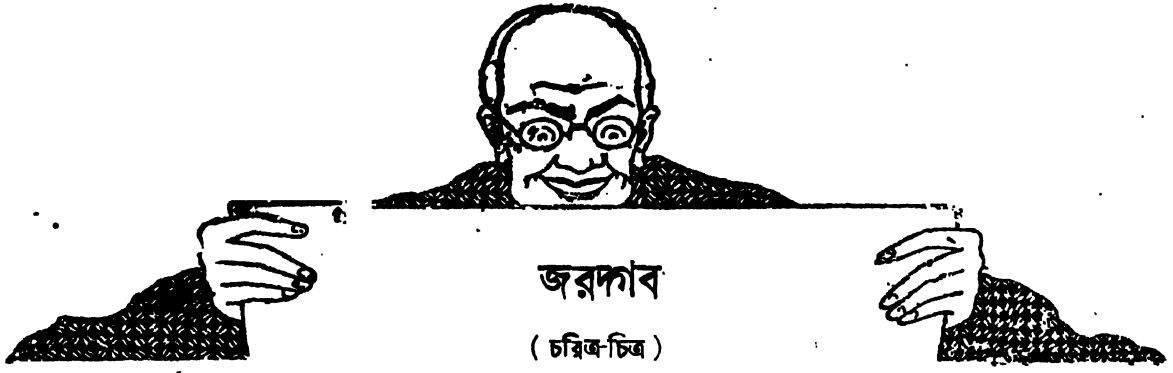
জরদ্গব

(চরিত্র-চিত্র)

রিবারের সহিত বচসা করিয়া জরদ্গব যে কোন্ সময় পার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় কলিকাতায় আসিয়া আমাদের সারভুক্ত হন, তাহা আমার মনে নাই। ইঁহার নাম ল যজ্ঞেশ্বর। আমরা ইঁহাকে বলিতাম 'যগাদাদা।' পাড়ার াকে কেহ বলিত 'যগা-খিচুড়ি', কেহ বলিত 'জরদ্গব।'

ইঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন, লা হিসাব-পত্র রাখ্‌তে পার?

যজ্ঞেশ্বর উত্তর দিলেন, আজ্ঞে হাঁ, পারি বৈ কি।

পড়া-শুনা কতদুর করেছিলে?

কল্‌কেতার লেখা-পড়া কিছু করিনি। তবে গেঁয়ো া-শুনা করা হয়েছে অনেক দূর।

কত দূর? দশ ক্রোশ?

আজ্ঞে, কেবল দশকুশী কি? পঞ্চমসোয়ারী, ধামার, পতাল, সব জানি।

সকলে যজ্ঞেশ্বরের মুখ চাহিয়া দেখিল, সে মুখে কৌতুক পরিহাসের চিহ্নমাত্র নাই।

এক সভাসদ্ জিজ্ঞাসা করিল, যাত্রার দলে ছিলে বুঝি?

আজ্ঞে, কতক কতক।

কতক কতক কি রকম? পুরোপুরি ছিলে না?

যগাদা আর কোন উত্তর দিল না। কেবল একটা ক গিলিল।

আর এক জন বলিল, গান করতে পার?

পারি।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইংরাজী কিছু জানো?

তা জানি।

সভাসদ্ বলিল, বাঃ! জান্‌তে আর কিছু বাকি নেই। কত দূর জানো? ফার্ষ্ট বুক পড়েছ?

যজ্ঞেশ্বর খুব জোর করিয়া বলিলেন, হ্যাঃ।

একটু বল দেখি।

এ ব্যাট্, এ ক্যাট্, বলিয়া যজ্ঞেশ্বর থামিলেন।

থাম্‌লে কেন? ব'লে যাও, ব'লে যাও, এ ব্যাট্, এ ক্যাট্, এ খ্যাট্—

যজ্ঞেশ্বর বিনীতভাবে বলিলেন, আজ্ঞে, অতদূর এগুইনি।

সে কি হে, খ্যাট্ জানো না? খ্যাটের যোগাড় করতেই ত কল্‌কেতায় আসা। কি বল?

যজ্ঞেশ্বর যেন মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সহর্ষে বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ, তা-ই ত, তা-ই ত!

কিন্তু তাঁহার অগ্নি-পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। সভাসদ্ জিজ্ঞাসা করিল, ক্যাট্ মানে জানো?

তা আর জানিনি! বেটা রোজ হাঁড়ি খেয়ে পালাত!

কে?

ঐ বেরাল।

বেরাল বানান্ করতে পার?

বে—রা আর 'ল'।

বাঃ বাঃ! কোন্ 'ল'?

কোন্ ল? কোন্ ল কি?

আহা, 'ল' ত অনেক রকম আছে হে! হ-য-ব-র-ল, ফাদার-ইন্-ল, মাদার-ইন্-ল, ব্রাদার-ইন্-ল, সিষ্টার-ইন্-ল। এ সব মানে জানো?

যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, জানি। শ্বশুর, শাশুড়ী, শালা, শালী।

বেশ, বেশ! সংস্কৃত জানো? মুগ্ধবোধ পড়েছ?

কি বল্লেন, দুগ্ধবোধ? তা আমাদের অনেকগুলি গাইগরু আছে—

সে তোমা হতেই বোঝা যাচ্ছে।

আজ্ঞে হাঁ। দুধের যোগান্ আছে কি না, সব হিসাব রাখ্‌তে হয়। কাযেই দুগ্ধবোধ আমাদের ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস।

কর্ত্তা বলিলেন, আচ্ছা, আমার এখানে থাক। চেষ্টা

ক'রে দেখে-শুনে চাকরী যোগাড় ক'রে দেব। শুভঙ্করী কিছু জানো? সের-কষা, মণ-কষা?

যগা-দা একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, আজ্ঞে, মন-কষা-কষি কারুর সঙ্গে নেই। স্বর্গীয় কর্ত্তাদের আমলে জ্ঞাতিদের সঙ্গে একটু হয়েছিল বটে, তা আমি হাতে-পায় ধ'রে মিটিয়ে ফেলেছি। আমি থাকতে থাকতে বুঝতে পারবেন, আমার স্বভাব তেমন নয়।

যজ্ঞেশ্বর এখন স্বর্গীয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাবের যে চিত্র দিয়া গিয়াছেন, অর্দ্ধশতাব্দী পরেও তাহা আমার মানস-পটে জল্‌জল্ করিতেছে।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সংসারে পোষ্য ক'টি?

যজ্ঞেশ্বর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বোধ করি, মনে মনে হিসাব করিতেছিলেন।

কি হে, চুপ ক'রে রইলে যে?

আজ্ঞে, তা অনেকগুলি। এই ধরুন না, আমি, আমার পরিবার, মাসীমা, এক জন কৃষাণ, দুট ছেলেগরু, তিনটে গাই, একটা সালিক, এক জোড়া লক্কা, দু'জোড়া পরপাঁউ, তিন জোড়া গেরোবাজ, চার জোড়া মুক্ষী, জোড়া কয়েক কেলে-গোলা—

সভাসদ বলিল, আর ইঁদুর, ছুঁচো, আরসোলা, ব্যাঙ, টিক্‌টিকি, মাছি, মশা এ সব নেই?

পুনঃ পুনঃ আঘাতে অতি নিরীহপ্রকৃতিও উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে। যগা-দা বলিল, মশায় মস্করা করছেন! এদের যে আহার যোগাতে হয়।

সভাসদ বলিল, মশার আহার যোগাতে হয় না বুঝি?

আজ্ঞে, কখন ত শুনিনি মশার জন্য কালিয়া, পোলাও রাঁধতে হয়।

সে ত ছিল ভাল। এরা যে শরীরের রক্ত খায়! আমার সম্বন্ধী একবার শ্বশুরবাড়ী যায়। বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল। ফিরে এল যেন ফড়িং। কেউ ধরতে পারলে না, কি রোগ! শেষ দুর্গাচরণ ডাক্তার ধরলে—কোথায় গিয়েছিলে? শ্বশুর-বাড়ী। ওঃ! ঐ তারাই রক্ত শুষে খেয়েছে। সম্বন্ধী বললে, তারা নয় মশায়, তাদের মোশা।

জরদগব কথাগুলি শুনিলেন কি না, বলা যায় না। খানিক পরে বলিলেন, আর ভুলে গিয়েছি, মশায়! মাসীমার একটা বেরাল আছে। তা তার আহার আমাদের যোগাতে হয় না।

কি রকম?

আজ্ঞে, সে পাড়ায় পাড়ায় হাঁড়ি খেয়েই কায সারে।

সে হাঁড়ি খায় আর তোমরা খাও গালাগাল।

যজ্ঞেশ্বর চুপ করিয়া রহিলেন।

ইনি আমাদের সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু দিন পরে কর্ত্তা এক দিন বলিলেন, যজ্ঞেশ্বর, তোমাকে একবার চীনেবাজার যেতে হবে যে।

যে আজ্ঞে বলিয়া যগা-দা চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে কর্ত্তা তাহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। কোথাও পাওয়া গেল না।

কর্ত্তা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কোথায় গেল? ভাত প'ড়ে রয়েছে। বললুম চীনেবাজার যেতে হবে! কোথায় দাবা খেলতে ব'সে গেছে বুঝি!

এই দাবা-খেলা ছিল জরদগবের একটি প্রবল বাতিক। একটু অবসর পাইলেই দাবার ছকটি ও বলগুলি লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজিয়া বেড়াইতেন, তা কে জানে সে পাঁচ বছরের বালক বা পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ। যে দিন কাহাকেও পাইতেন না, সে দিন আমাদের ঘরের কোণে একটা জালা বসানো ছিল, তার সঙ্গে খেলিতেন। সে এক বিচিত্র ব্যাপার! এক দিন দেখি, জালার সামনে ছক পাড়িয়া বল সাজাইয়া জরদগব খেলিতেছেন! বাম-হস্তে জালার বল চালিতেছেন, ডান-হস্তে আপনার। খেলিতে খেলিতে জালার গজ ধরা পড়িল। যজ্ঞেশ্বরের সে স্ফূর্ত্তি দেখে কে? মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, এইবার, জালাচাঁদ! গজ সামলাও! কিন্তু এ আর ফেরত হবে না, তা ব'লে দিচ্ছি। জালা-বেচারী নীরব হইয়া রহিল। তাহার গজ মারা গেল। কিন্তু হঠাৎ জরদগবের দৃষ্টি পড়িল, জালার গজ মারিতে গিয়া উটসায় তাঁহার দাবা ধরা পড়িয়াছে। বাঁ হাতে টকাস্ করিয়া নিজের দাবা মারিয়াই যজ্ঞেশ্বর কাকুতি মিনতি আরম্ভ করিলেন, না, ভাই, জালা ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, ওটা ফেরত দাও! জালা কোন কথা কহিল না। তবে আর খেলা হ'ল না বলিয়া জরদগব ছক্ উল্টাইয়া দিয়া দ্বিতীয় বাজির আয়োজন করিলেন। তাঁহার দাবা-খেলার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এ দিকে কর্ত্তা তাহাকে চীনেবাজার পাঠাইবার জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় বারোটা, তখনও

যজ্ঞেশ্বরের দেখা নাই। পাচক হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিয়া ভাত চাপা দিয়া রাখিল। বেলা যখন দুইটা বাজে, এমন সময় গলদ্‌ঘর্ম্মকায়, ধূলা-পায়, জরদ্গব আসিয়া উপস্থিত। কর্ত্তা বলিলেন, এই যে যজ্ঞেশ্বর! যাও, যাও, আগে খেয়ে নাও।

জরদ্গব আহার করিয়া আসিলে কর্ত্তা কহিলেন, তোমাকে যে ব'লে রাখ্‌লুম, চীনেবাজার যেতে হবে। কোথায় গেছলে?

আজ্ঞে, চীনেবাজার।

সে কি?

আজ্ঞে হাঁ, আপনি বল্‌বামাত্রই গেছি।

কি করতে?

তা ত, মশায়, কিছু বলেন নি।

আমি যেমন বল্‌লুম, তুমি অমনি চীনেবাজার চ'লে গেলে?

কর্ত্তা অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ জরদ্গবের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

যগা-দা জিজ্ঞাসা করিল, কিছু অন্যায় হয়েছে কি?

রামঃ! কিছুমাত্র না। এখন এক কায কর দিকি। ফর্দ্দ করতে জানো?

যজ্ঞেশ্বরের একটি গুণ ছিল, কোন কাযে 'না' বলিতেন না। বলিলেন, হাঁ, জানি।

আচ্ছা, কাগজ-কলম নিয়ে এস।

যজ্ঞেশ্বর কাগজ-কলম লইয়া আসিলেন।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, দোয়াত কৈ?

দোয়াত ত আপনি আন্‌তে বলেন নি।

ওঃ, তা যাও, দোয়াতটাও নিয়ে এস। কালী শুদ্ধ এনো। খালি দোয়াত এনো না।

দোয়াত আসিল। কর্ত্তা বলিলেন, লেখ, চাউল এক মণ, দাইল দশ সের, লবণ পাঁচ পোয়া, ময়দা আধ মণ, ঘৃত দশ সের। এমনি আরও কয়েক দফা। লেখা হইলে কর্ত্তা বলিলেন, কি লিখলে, দেখি দাও।

চা'ল, ডাল, লবণ, ময়দার পর ঘৃতের কাছে আসিয়া কর্ত্তা দুই তিনবার বেশ করিয়া দেখিলেন। তার পর চশমাখানি মুছিয়া আবার পড়িলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কি লিখেছ?

জরদ্গব চিরদিন সপ্রতিভ। বলিলেন, আপনি যা বলেছেন, তাই।

আরে, আমি ত ঘৃত লিখতে বলেছি।

আমিও তা-ই লিখেছি।

কি বানান্ করেছ?

আজ্ঞে, দেখুন না। ঐতে লেখা আছে।

জরদ্গব ঘৃত বানান্ করিয়াছেন—

র্ঘ্র্রৃীরিত

অর্থাৎ—'ঘ'এর নীচে 'র', তাতে রফলা, তার নীচে 'ঋফলা, তার মাথায় দীর্ঘ 'ঈ'কার, তাতে রেফ, তার পর 'র'এ হ্রস্ব'ই'কার, পরে 'ত'। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, যজ্ঞেশ্বর, এ বানান্ তুমি কোথায় পেলে?

আজ্ঞে, বিদ্যাসাগরমশায়ের 'সীতার বনবাস' পুস্তকে আছে।

কর্ত্তা অবাক্ হইয়া যজ্ঞেশ্বরকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি তিরস্কার করিবেন, কি হাসিবেন, কি যজ্ঞেশ্বরের জন্য ফোঁটা কয়েক চোখের জল ফেলিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না।

সপ্রতিভ যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু ভুল হয়েছে কি?

বাপ রে! একে বিদ্যাসাগর, তায় ঘৃত! ভুল হবার যো কি!

কৌতূহল মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি। আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সভাসদ যগা-দার সম্বন্ধে কর্ত্তাকে এক দিন প্রশ্ন করিলেন, কর্ত্তা, যজ্ঞেশ্বর এত দিন হ'ল এসেছে, কৈ, ওর দেশ থেকে না আসে চিঠি আর ও-ও না পাঠায় খবর। কি ব্যাপারটা বলুন ত?

আরে, ও যে পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছে।

তাই না কি?

এক দিন ঝিকে সেই কথা বল্‌ছিল, গিন্নী শুনেছেন।

এত লোক থাকতে ঝিকে বলছিল কেন?

কি জানো, যুবা বয়স, মনের কথা বলবার একটা লোক ত চাই।

তা যা-ই হ'ক, কর্ত্তা, এর একটা বিহিত করতে হবে।

বিহিত আর কি করব, না হয় ঝিটাকে বিদায় ক'রে দি। কিন্তু বেটী খুব খাটে।

কর্ত্তা, সে দিকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার ঝি যেমন খাটে, তেমনি খাঁটি। আমি ওকে ভাল রকম জানি। তা নয়, যজ্ঞেশ্বরের বিহিত আমরাই করব। আপনি কোন কথা কইবেন না ?

কর্ত্তা স্বীকৃত হইলেন।

সভাসদ বলিল, ভৈরবীকে তাড়াবেন না, কর্ত্তা। ওকে দলে নিতে হবে।

কেন ?

কায উদ্ধারের জন্য।

কর্ত্তা আর কিছু বলিলেন না।

ইহার কিছু দিন পরেই বগা-দার এক জ্ঞাতি-ভাই দেশ হইতে আসিয়া সংবাদ দিল, যজ্ঞেশ্বরের গৃহিণী পটলমণি পটল তুলিবার আয়োজন করিয়াছে।

শুনিয়া যজ্ঞেশ্বর বসিয়া পড়িলেন। তাহার একটু কারণ ছিল। পটল এক দিন তাঁহাকে শাসাইয়াছিল, ম'রে পেত্নী হয়ে তোর ঘাড় মট্‌কাবো—মট্‌কাবো—মট্‌কাবো—এই তিন সত্যি করলাম। প্রত্যুত্তরে যজ্ঞেশ্বরও বলিয়াছিলেন, আমিও ভূত হয়ে তোর ঘাড় ভাঙ্গব। দেখিস্—দেখিস্—দেখিস্!

পটল বলিল, সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু পতি-পত্নী কেহই এই ত্রি-সত্য বিস্মৃত হন নাই।

পত্নীর আসন্ন-মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া ভীত জরদ্গব মনকে আশ্বাস দিলেন, সেই বিপুল বপু লইয়া ছুটিয়া তাঁহার নাগাল পাইলে ত ঘাড় মট্‌কাবে। ততক্ষণে আমি গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে ফেল্‌ব।

জ্ঞাতি-ভ্রাতা বলিল, ভায়া, ছু'ট বাঘে খেতে পারে না, সেই শরীর একবারে পাত হয়ে গিয়েছে।

যজ্ঞেশ্বর চমকিয়া উঠিলেন। অ্যাঁ, বল কি ! কি পাত ?

কি পাত, কি বল্‌ছ, ভায়া !

আঃ, ন্যাকা আর কি ! কি পাত, কি পাত ? জিজ্ঞাসা করছি, কি পাত ? কলাপাত, না, শালপাত ?

তার মানে ?

মানে তোমার মুণ্ডু !

জ্ঞাতি-ভ্রাতা বলিল, আহা, চটো কেন, ভায়া ! পরিবার আর কার না মরে !

তার মানে ? দেশশুদ্ধ লোকের সব পরিবার মরছে ! কারুর আর খেয়ে-দেয়ে কায নেই, সব মরছে ! তার মতন ত বজ্জাত কেউ নয় !

তা যা-ই বল, ভায়া, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই নে। ডাক্তার বলেছে, শিশি কয়েক কড্-লিভার-অয়েল (Cod-liver Oil) খাওয়াতে পারলে শরীর আবার গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে।

যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, সে আবার কি ?

অয়েল্ জানো না ? তেল হে, তেল। কড্‌লিভার তেল।

ওঃ, তাই বল ! তা শিশি কেন, আমি জালা জালা খাওয়াতে রাজি আছি, যদি এমন মোটা হয় যে, দু'পা চল্‌লেই হাঁপিয়ে পড়বে। ছুটে কেমন আমার নাগাল পায় দেখি ! ঘাড় মট্‌কাবে !

জ্ঞাতি-ভ্রাতা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কার ঘাড় মট্‌কাবে ?

বগা-দা বলিল, তোমার।

জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভাবিল, এ ত দেখছি ক্ষেপবার উপক্রম ! তা হতেই পারে ! এই প্রথম স্ত্রী-বিয়োগ ! আমার মতন ত পরিবার মরার ব্যবসা ফাঁদেনি ! বাপ ! একেবারে সাড়ে সাত গণ্ডা ঘাল ! সৎকার করতে আমার তিন বিঘা এওল্ জমী বিক্রী হয়ে গেল।

জরদ্গব জিজ্ঞাসা করিলেন, ভায়া, তুমি ফিরবে কবে ?

জ্ঞাতি-ভাই বলিলেন, তোমার ঐ তেল না নিয়ে ফিরব না।

তার মানে ? আমি যদি ঐ তেল না কিনে দি, তাহ'লে আর তুমি দেশে ফিরবে না ?

না।

এ ত বড় বেজায় হ'ল দেখছি !

বগা-দা বসিয়া ছিল, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। জ্ঞাতি-ভ্রাতা দশ হাত পিছাইয়া গেল। কি জানি যদি কামড়ায় ! ইস্ ! পরিবারের জন্য কড্‌লিভার, আর সঙ্গে সঙ্গে এর জন্যও বুঝি বা মধ্যম-নারায়ণ ব্যবস্থা করতে হয় !

জরদ্গব বলিলেন, বেশ, কালই আমি এনে দেব।

তুমি আর কেন রোদে ঘুরবে, ভায়া ! আমাকেই দামটা দাও না, আমিই কিনে নিয়ে যাব।

বগা-দা জানিত, এটি একটি রাঘব বোয়াল। ইহার হাতে পয়সা দিলে তেল বা দাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ভায়ারও আর

দেখা পাওয়া যাইবে না। বলিল, না আমিই কিনে আনছি। বলিয়া এই অপ্রিয় আলোচনা বন্ধ করিবার নিমিত্ত যজ্ঞেশ্বর লেপ্ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

অতঃপর হতাশ হইয়া জ্ঞাতিভ্রাতা বলিলেন, এখুনি কিনে আনছি ব'লে শুলে যে?

যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, তোমার এত মাথাব্যথা কেন হে! এ যে বড় বেজায় হল দেখ্‌ছি! তোমার ফেরবার গাড়ীভাড়া কম পড়েছে বুঝি?

তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?

তাই বলছি।

জ্ঞাতিভ্রাতা নিষ্ক্রান্ত।

পরক্ষণেই এক অপরিচিতের প্রবেশ। ইনি একটু বধির। কর্ত্তার খোঁজে আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ত্তাবাবু কোথায়?

যজ্ঞেশ্বর কোন উত্তর করিলেন না। মুখের উপর লেপখানা ভাল করিয়া টানিয়া দিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, আপনার চেহারাটা যেন চেনাচেনা বোধ হচ্ছে।

যগা-দা বলিল, তারিফ! তবু ত লেপ মুড়ি দিয়ে আছি।

অপরিচিত কহিলেন, কর্ত্তা মুড়ি খাচ্ছেন বুঝি? তা বেশ! ততক্ষণ আপনার সঙ্গেই একটু পরিচয় করি।

জয়দগব বলিলেন, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, ততক্ষণ আর কারুর সঙ্গে পরিচয় করুন না?

কে সে কথা কাণে তোলে! অপরিচিত প্রশ্ন করিল, মশায়ের অসুখ বুঝি? তা আপনার নিবাস?

চুলোয়।

উত্তম স্থান! ডাক্তার বায়ুপরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করেছেন বুঝি? দেখছেন কে?

যম।

বদ্যি খুব ভাল! যেমন বিদ্যা, তেমনি হাত-যশ! পথ্যের ব্যবস্থা কি হয়েছে?

তোমার মাথা।

সুপথ্য। সহজে পরিপাক হবে।

যজ্ঞেশ্বর আর কোন উত্তর না দিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কড্‌লিভার অয়েল কিনিতে গেলেন। ডাক্তারখানায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঠবেরালীর তেল আছে? নাই।

এই 'নাই-নাই' শুনিতে শুনিতে যগা-দা কলিকাতা সহর চসিয়া ফেলিল। পরদিন জ্ঞাতিভ্রাতা আসিবামাত্র বলিল, পাওয়া গেল না।

জ্ঞাতি-ভ্রাতা বলিল, সে কি! তুমি আমায় পাঁচটা টাকা দাও, কেমন না পাওয়া যায় দেখি!

এই রে, খালি টাকা আদায়ের ফন্দি! যগা-দা বলিল, ভায়া, আমরা দুঃখী লোক, মিছি-মিছি অত পয়সা খরচ—

মিছি-মিছি! পরিবার মারা গেলে আর ফিরবে না, জানো?

যগা-দার ঘাড় মট্‌কাবার কথা মনে পড়িল। ত্রস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?

আমি জানিনি! বলে গণ্ডা গণ্ডা পার করলাম!

ঠিক বল্‌ছ?

তা—তা, ভাই, এক জন ফিরে এসে বলেছিল বটে, আমার সতীন যদি আনিস, তোর—

তোর কি?

তোর ঘাড় মট্‌কাব।

যগা-দা লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

ভায়া, শুলে যে! টাকাটা দাও, আমিই না হয় কিনে নে যাই।

জয়দগব লেপের ভিতর হইতে বলিলেন, ভায়া, এক কায কর। কলকেতায় ও জিনিষ মিলবে না। তুমি দেশে গিয়ে একটা কাঠবেরালী ধ'রে তেলে ফেলে কিছু দিন রাখো গে। এই যেমন আম-তেল করে আর কি।

জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভাবিলেন, এ ত দেখ্‌ছি উন্মাদ হয়েছে। আর মিছে বকাবকি কেন? তিনি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। কেবল তাহাই নহে, দেশে গিয়া রটাইয়া দিলেন, যজ্ঞেশ্বর ভায়া পাগল হইয়া গিয়াছে।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া পড়িল। এখন যেমন পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটার, তখন তেমনি সখের যাত্রা ছিল। স্বর্গীয় কর্ত্তারা আমাদের পল্লীর দলকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন। পূজায় পূজায় পাড়ায় পাড়ায় এই সকল সখের দলের অভিনয় হইত। সপ্তমীর দিন সিমলায় ঐ পাড়ার সখের দল গাহিয়াছিল। যজ্ঞেশ্বর শুনিতে গিয়া এক পাটি জুতা হারাইয়া ফেলিলেন। 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে

অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'—অবশেষে সকালবেলা বাটী ফিরিলেন সেই এক পাটি জুতা পরিয়া!

কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন, এ কি, যজ্ঞেশ্বর? আর এক পাটি জুত' কি হ'ল?

কোন্ বেটা খেয়ে ফেলেছে।

বেশ! সে খেতে লাগ্ল আর তুমি ব'সে ব'সে দে'তে লাগ্লে?

আজ্ঞে না। আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

ওঃ, তাই! তা যাত্রা কেমন শুনলে?

আজ্ঞে, আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

একটু কেন? বিলক্ষণই ঘুমিয়ে পড়েছিলে বল? ওঃ, তা হ'লে তোমার রাত জাগাই বৃথা হ'ল! তা যাও, আজই অমনি আর একজোড়া কিনে নিয়ে এস। কত দাম?

এক জোড়ার দাম সাড়ে তিন টাকা। তা এক পাটি ত আছে। আর এক পাটি কিনলেই হবে।

কর্ত্তা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

যগা-দা বলিল, আজ্ঞে, অনর্থক বাজে খরচ ক'রে মুচির পেট ভরানো কেন? একখানি ত নূতনই আছে।

নবমীর দিন আমাদের পাড়ার দল আমাদের বাড়ীতেই অভিনয় করিবে। মান-ভঞ্জনের পালা। এই প্রথম অভিনয়।

আসর সরগরম। বহু লোক-সমাগম হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে বলিতেছেন, প্যারী বিনা প্রাণ বাঁচে না গো বৃন্দে! আমার প্যারীকে এনে দাও।

বৃন্দা পিয়ারীকে আনিবার জন্য সাজঘরের অভিমুখে প্রস্থান করিল। কিন্তু যাইতে যাইতে বৃন্দারূপিণী স্বরূপের মনে পড়িল, তাহার ভগিনীর নাম পিয়ারী। পিয়ারীকে আনিয়া দিলে কাল ত আর পাড়ায় মুখ দেখান যাইবে না। স্বরূপ সরাসরি বাড়ীমুখো হইল। আর ফিরিল না। এখন উপায় কি? স্বরূপকে অনেক বুঝান হইল, এ যাত্রার পিয়ারী, তার ভগিনীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। স্বরূপ বলিল, তোমরা জান না, ঠাট্টার চোটে দেশে আর আমার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

অগত্যা তাহার সাজ খুলিয়া লইয়া দূতগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এ দিকে বৃন্দা নহিলে যাত্রা অগ্রসর হয় কিরূপে?

প্রম্‌টার বলিল, তার আর কি? বৃন্দার ভূমিকা আমিই দাঁড়িয়ে উঠে ব'লে যাব।

তা কি হয়!

এমন সময় সেই সভাসদের মনে পড়িল, যজ্ঞেশ্বর যাত্রা করিত। তাড়াতাড়ি যজ্ঞেশ্বরের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বলিল, গোঁফ ফেল!

যজ্ঞেশ্বর অতীব সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ভাবিল, পটলমণি পটল তুলিয়াছে। এইবার ত ঘাড় মটকাইবার পালা! তথাপি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল, গোঁফ কামাব কেন, মশাই?

আবার কথা-কাটাকাটি করে! এই পরামাণিক! বাবুর গোঁফ চট ক'রে কামিয়ে দাও।

কেন, মশাই? গোঁফ কি অপরাধ করলে? ওকে ফেল্‌ব কেন?

আরে শুনছ, বৃন্দা কৈ ব'লে কি হৈ-চৈ উঠেছে! তোমাকে বৃন্দা সাজতে হবে।

আমাকে! আমি যে ওর বিন্দুবাষ্প জানিনি।

প্রম্‌টার বলিল, সে ভার আমার। আমি কথা যুগিয়ে দেব।

আচ্ছা, মশায়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। গোঁফ ফেল্‌লে আমাকে কেউ চিনতে পারবে না?

তোমার আপনার স্ত্রী পর্য্যন্ত না।

যগা-দা দ্বিরুক্তি না করিয়া গোঁফ কামাইল।

যাত্রা চলিল। বৃন্দা-পরিবর্ত্তন দেখিয়া একটা জেঠাছেলে বলিয়া উঠিল, তুমি কে বট হে! ফস ক'রে রূপ বদ্‌লে এলে কি ক'রে?

এক জন পরম-বৈষ্ণব শ্রোতা ছিলেন, বলিলেন, প্রভুর ইচ্ছা!

যাহা হউক, প্রমটার যাহা যোগাইয়া দিতে লাগিল, যজ্ঞেশ্বর তাহাই আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

এইবার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দুর্জ্জয় মান ভঙ্গ করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি যতই সাধ্য-সাধনা করুন, কিশোরী সেই যে অবনত-মুখে বসিয়া রহিল, সে আর ঘাড় তুলিল না। কানাই অবশেষে বৃন্দাকে বলিলেন, বৃন্দে, এ বিপদে পার কর।

প্রম্‌টার বলিল, যগা-দা, এইবার তোমার কথা—চাঁদ-বদনী রাই, বদন তুলে একবার—

এই সময় প্রম্‌টার পার্শ্বস্থ অভিনেতাকে থেলো হুঁকাটি দিয়া বলিল—একটান গুড়ুক খাও।

যগা-দাও বলিল, গুড়ুক খাও।

চারিদিক হইতে হো-হো হাসি আর রব উঠিল, "রাই, একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও!"

ইহার পর আর যাত্রা জমায় কার সাধ্য!

পরদিন সভাসদ প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, যগা-দা, রাই একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও, বল্‌লে কি ব'লে?

কেন, কি দোষটা হয়েছে? রাধিকার জন্ম হয়েছিল পশ্চিমে ত? না তাও জানেন না? ও দেশে সব স্ত্রীলোকই গুড়ুক খায়।

রাধিকা তামাক খেতেন—এ কথা বইএ আছে?

নিশ্চয় আছে।

কখন না।

না? আচ্ছা, বেশ, বাজি ফেলুন।

বেশ! এ কথা তুমি কোথায় পেয়েছ?

সীতার বনবাসে।

কখন না।

বেশ ত, বাজি রাখুন না।

বাজি? বেশ! আমাদের ঐ পোড়ো মহলটায় তোমাকে ন্ধ্যা থেকে একরাত কাটিয়ে আস্‌তে হবে। কিন্তু এক প্তাহের ভিতর তোমাকে দেখাতে হবে।

তর্কের সময় যগা-দার জ্ঞান থাকিত না। বলিল, ওঃ, ই! বেশ, তাই হবে!

তিন সত্যি কর।

সত্যি, সত্যি, সত্যি।

সভাসদ সৈরভী ঝির মুখে শুনিয়াছিল যে, যগা-দা এবং টল মৃত্যুর পর পরস্পরের ঘাড় ভাঙ্গিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

যগা-দাকে ত্রিসত্য করাইয়া সভাসদ সৈরভীকে জিজ্ঞাসা রিল, হাঁরে, বৌএর সঙ্গে যগা-দার কি নিয়ে ঝগড়া য়েছে, জানিস্?

যগ-বাবু লঙ্কার ধোঁয়া সইতে পারে না। বৌ এক দিন রকারিতে বেশী ক'রে লঙ্কা দিয়েছিল। এই নিয়ে তুমুল গড়া। কথায় কথায় বৌ বল্‌লে, পেত্নী হয়ে ঘাড় মট্‌কাবে।

তার পর?

যগ-বাবুও বৌকে বল্‌লেন, আমিও ম'রে ভূত হয়ে তোর ড় ভাঙ্‌ব। কিন্তু উনি মুখসাপট যতই করুন, বৌএর য় কলকেতায় পালিয়ে এসেছেন।

কেন রে?

এটা সহর। অনেক লোকের বাস। চাই কি আর এক জনকে যগ-বাবু ব'লে ভুল ক'রে তার ঘাড় মটকাতে পারে। আর ভিড়ের ভিতর থাকলে হঠাৎ চিনতেও হয় ত পারবে না। কিন্তু আমি বাবু, পটলমণিকে জানি। লক্ষ লোকের ভিতর থাকলেও যগ-বাবুকে চিনে নেবে।

সভাসদ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, বেড়ে হয়েছে! সৈরভী, তুই এক কায করতে পারবি?

সব পারব, কিন্তু যগ-বাবুর বৌএর কাছে যেতে পারব না। বাবা, যে মুখের তোড়!

তাই যেতে হবে। শোন্, তোর বোন্ ভৈরবী দুদিন তোর কায করবে। আমি গিন্নীমাকে ব'লে সব ঠিক ক'রে দেব।

সৈরভী গাঁই-গুঁই করিতেছে দেখিয়া সভাসদ বলিল, কর্ত্তাবাবু দু'টাকা বখ্‌শিস দেবে রে।

তা কি করতে হবে, বল, পেটে খেলে পিঠে সয়।

শোন্, তুই পটলমণির কাছে গিয়ে বলবি, যগা-দা উন্মাদ হয়ে কোথায় চ'লে গিয়েছিল, তার পর খবর পাওয়া গেছে, ঠিক তার মত এক জন লোক রেলে কাটা পড়েছে! আজ দু'দিন হ'ল, এ বাড়ীতে এসে বড় উৎপাত করছে। রাত হলে ঘরে ঘরে কাকে খুঁজে বেড়ায়।

বাবু, এ যে জ্যান্ত মাছে পোকা পড়ানো! এই ব'লে পালিয়ে আসব?

সভাসদ বলিল, পালিয়ে আসবি কি রে! বৌকে সঙ্গে ক'রে কলকাতায় আন্‌বি।

সৈরভী বলিল, সে আসবে কেন?

খুব আস্‌বে। বলবি, কর্ত্তাবাবু বলেছে, গয়ায় পিণ্ডি দিতে হবে, আর যগা-দার যা' কিছু জিনিষপত্তর আছে, এসে নিয়ে যাবে।

যদি বলে যাব না, গেলে আমার ঘাড় ভাঙ্গবে?

বলিস্, ভয় নেই। আমরা তোমাকে এমন যায়গায় এমন ক'রে লুকিয়ে রেখে দেব যে, সে দেখ্‌তে পাবে না। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার! যগা-দা ঘুণাক্ষরে না জান্‌তে পারে।

সে বল্‌তে হবে না, বলিয়া সৈরভী যগা-দার দেশে গেল।

সংবাদ পাইয়া পটল বলিল, মরুক, তার ক্ষতি নাই। আমার ঘাড় শক্ত আছে, তবে মাছ-ভাত খাওয়া বন্ধ হ'ল।

কিন্তু পাড়ার এক ন্যায়রত্ন বিধান দিলেন যে, না, তা হবে না। তোমার সিঁদুর-লোয়াও বজায় থাকবে, মাছ খাওয়াও চলবে।

এই বিধানে এক স্মার্ত্ত বলিলেন, ভায়া, তুমি ন্যায়ের পণ্ডিত হয়ে এমন অন্যায় বিধান দিলে?

ন্যায়রত্ন বলিলেন, তর্ক কর।

এর আর তর্ক কি? সে ত মারা গেছে?

কখন না। তা হ'লে বল, স্বামী দেশ ছেড়ে বিদেশ গেলে স্ত্রী লোয়া-সিঁদুর ত্যাগ ক'রে মাছ খাওয়া বন্ধ করবে? ভায়া, মনু বিধান দিয়েছেন, 'মৃতে প্রব্রজিতে'—মৃত কি? না, প্রব্রজিত। অর্থাৎ দেশান্তরী হওয়া। এ ত গেল শাস্ত্রের বিধান। তার পর চাক্ষুষ কি দেখ্‌ছ? সে আনাগোনা, উপদ্রব, সবই করছে। এতেও যে বলে বৌকে লোহা, সিন্দুর, মাছ সব ত্যাগ করতে হবে, সে—সে—

স্মার্ত্ত চোখ পাকাইয়া বলিলেন, সে কি, ভট্‌চায?

সে গণ্ডমূর্খ।

আপাতত তোমার গণ্ডদেশে এই—চটাস্।

ন্যায়রত্ন ছিলেন বিষম ষণ্ডা, স্মার্ত্ত চড় মারিয়াই চোঁচা দৌড়।

ন্যায়রত্ন গণ্ডদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, আচ্ছা, তোমার দেখা পাবই। কিন্তু, বৌ, তুমি যদি লোহা সিঁদুর মাছ ত্যাগ কর, তা হ'লে প্রত্যবায় হবে।

বৌ বলিল, সে কি?

ধর্ম্মে পতিত হবে।

পরদিন পটল কলিকাতায় আসিল এবং আমাদের একটা পোড়ো মহল ছিল, সেইখানে আশ্রয় লইল।

সৈরভীকে রওনা করিয়া দিয়া সভাসদ বলিল, শুনেছ, বগা-দা?

কি?

কোন কথা শোননি?

কথা ত অনেক শুনেছি। তুমি কি বলছ?

আ-হা-হা—সভাসদ্ কাঁদিতে লাগিল।

আরে, কি হয়েছে, বল না।

পটল আর নেই! আ-হা-হা-হা—

নেই ত গেল কোথা?

যেখানে সব্বাই যায়।

কোথা? পাইখানায়?

আরে না—না। যমের বাড়ী! ও-হো-হো-হো-হো-হো।

অ্যাঁ বলিয়া জয়দ্রথ বসিয়া পড়িলেন এবং আপনার কণ্ঠ, গ্রীবা প্রভৃতি নাড়িয়া চাড়িয়া পুনঃপুন পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

গেল! তা যাক্! কিন্তু এমন মাছের ঝোল, মোচার ঘণ্ট কেউ রাঁধতে পারবে না। বগা-দার একদিক দিয়া যেমন জিহ্বায়, অন্য দিক দিয়া তেমনি চোখে জল ঝরিতে লাগিল।

সভাসদ বলিলেন, কি হ'ল, ঘাড়ে ব্যথা হয়েছে বুঝি?

আরে না, মশায়, ঘাড় বাঁচানো দায়, তার ব্যথা!

কেন?

বলেছিল, ঘাড় মট্‌কাবে।

কার?

আমার, আবার কার?

সে কি আর এখন তার মনে আছে?

মনে নেই? বাজি ফেলুন।

ওঃ, তাই বটে!

কি? সব স্পষ্ট ক'রে বলুন না, মশায়! তাই বটে কি?

তাই সব ঘর-দোর উট্‌কে-পাট্‌কে খুঁজে বেড়াচ্ছে। শুনেছে কি না, তুমি এখানে আছ। তাই রোজ রাত্রে—সে উপদ্রব দেখে কে! খালি বলে ঘাড় মট্‌কাব, ঘাড় মট্‌কাব।

যজ্ঞেশ্বর লেপ মুড়ি দিলেন।

কি হে, লেপ মুড়ি দিলে যে! লেপের ভিতর থেকে টেনে বার করতে পারবে না বুঝি? ওতে হবে না; তুমি এখান থেকে দুদিন স'রে থাক।

কোথায় যাব?

আমাদের ঐ পোড়ো মহলটায়।

একা?

একা কেন হে! ওখানে আজ একদল পূর্ব্বদেশবাসী এসে আশ্রয় নিয়েছে।

কেন?

তারা মেয়ে-মদ্দে গঙ্গাস্নান করতে এসেছে। যদি বাঁচতে চাও, আজ সন্ধ্যার সময় সেইখানে গিয়ে থেকো।

সেখানে যেতে পারবে না?

কেমন ক'রে যাবে? পথ চেনে না। এই মহলেই ঘুরছে।

ভয়ে মানুষকে অভিভূত করে। বিচারশক্তি থাকে না। বগা-দা ভাবিল, সেই ভাল। একা ত থাকতে হবে না, চার পাঁচ জন সঙ্গী পাওয়া যাবে।

কিন্তু সন্ধ্যার সময় পোড়ো মহলে প্রবেশ করিয়া বগা-দা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। একে ত ভাঙ্গা-চোরা পোড়ো মহল—গা ছম্‌ছম্ করে, তার উপর একটা ভাঙ্গা ছাদের কোণে পটলমণি—ছাদের পাশে একটা জামরুল-গাছ হইতে জামরুল পাড়িতেছে! তাহার হাতের টানে জামরুল-গাছটা সশব্দে নড়িয়া উঠিল। বগা-দা ভাবিল, গাছে উঠিতেছে। আমাকে দেখিতে পায় নাই। এই বেলা সট্ করিয়া সরিয়া পড়ি।

এ দিকে জামরুল-গাছটা সশব্দে নড়িতেই পটল ফিরিয়া চাহিল, কেহ দেখিতেছে কি না। ফিরিয়াই দেখিল, অবিকল তাহার স্বামীর মত কে হন্‌-হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। পটল দ্রুতপদে একটা ভাঙ্গা পাঁচীলের আড়ালে আশ্রয় লইল। এ দিকে জরদগবও একটা ভাঙ্গা দেয়ালের আড়ালে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া পড়িলেন।

অদূরে একটা ঘরে পূর্ব্বদেশবাসী ও বাসিনীগণের উচ্চ-কণ্ঠে কিলিকিলি।

এক পিতা পুত্রকে বলিতেছেন, মোচার ঘণ্টে দশ গণ্ডা লঙ্কা ডাও, নইলে মিষ্ট অইব ক্যান্?

পুত্র কহিল, আষ্ট গণ্ডা দিলেই অইব।

পিতা কহিলেন, দশ গণ্ডার স্থলে আষ্ট গণ্ডা! ত্রাহি বাম্নী-মোহন, তোমার আতে যদি পিণ্ড গ্রহণ করি ত সে বিষ্ঠা!

পুত্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দুই গণ্ডা লঙ্কা মোচার ঘণ্টে ফেলিয়া দিল।

যজ্ঞেশ্বর লঙ্কার উগ্র ধোঁয়া কখনই সহিতে পারিতেন না। এই সূত্রেই বধূর সহিত তাঁহার বচসা। লঙ্কার ধোঁয়া উগ্রতর হইতেই—হ্যাঁচ!

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আর একটা আধভাঙ্গা দেওয়াল হুড়-মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। নীচে গোয়ালে আমাদের তিনটা গরু বাঁধা ছিল, তারা দড়ি ছিঁড়িয়া লেজ তুলিয়া তিন লাফে উঠান পার!

কথায় বলে, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। পটল জানিত, কোন ভূতের বাপের সাধ্য নেই, এমন হাঁচি হাঁচে! সে যজ্ঞেশ্বরকে চিনিয়াই প্রথম হা হা করিয়া একটা বিকট হাস্য-রোল তুলিল। জরদগব কাণ এবং চোখ অঙ্গুলি দ্বারা দৃঢ়-বদ্ধ করিলেন।

ইতিমধ্যে ভাঙ্গা দেওয়ালের আড়াল হইতে পটলমণি নিষ্ক্রান্ত এবং বগা-দার কেশমুষ্টি ধারণ—তবে রে মিন্‌ষে! ভূত হয়ে আমার ঘাড় ভাঙ্‌বে! তোর তিনটে ঘাড় মটকাবো।

জরদগব এতক্ষণে নিঃসংশয়ে বুঝিলেন, ও পেত্নী নয়, পত্নী। তিনিও খাড়া হইয়া বলিলেন, আমিও তিনটে ঘাড় ভাঙ্‌ব!

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব-দেশবাসিগণ হাঁচির উৎকট শব্দেই চকিত হইয়াছিলেন। উপরে গণ্ডগোল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, দুই জন অস্পষ্টশরীরী স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর চুলের মুঠি ধরিয়া নৃত্য করিতেছে। পুরুষটা বলিতেছে, আমি তিনটের ঘাড় ভাঙ্‌বো। স্ত্রীলোকটা বলিতেছে, আমি তিনটের ঘাড় মটকাব। পূর্ব্বদেশীয়েরাও সংখ্যায় ছিলেন স্ত্রী-পুরুষে ছয় জন। মোচার ঘণ্ট হাঁড়ি-কুঁড়ি ফেলিয়া 'রাম রাম' বলিতে বলিতে তাঁহারাও দুদ্দাড় শব্দে গাত্রীগণের অনুসরণ করিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক চিত্র

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান 'ময়মনসিংহ' জেলার 'নেত্রকোণা' উপবিভাগের অন্তঃপাতী 'গোবিন্দপুর' গ্রামে কায়স্থ-ভৌমিক 'হরিশ্চন্দ্র' আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই একদা-সমৃদ্ধ পল্লীটি বর্ত্তমান 'ময়মনসিংহ' জেলার প্রধান নগর 'নসিরাবাদ' * হইতে সাড়ে ৩২ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সম্প্রতি ইহা এক প্রকার শ্রীভ্রষ্ট হইয়া তাহার অতীত গৌরবটি বিস্মৃতির কাল-গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া শুধু জীর্ণ কঙ্কালটি বহন করিতেছে।

'হরিশ্চন্দ্রে'র সময় এই অঞ্চলটি একটি বিশাল বনাকীর্ণ জলাভূমি ছিল,—মাঝে মাঝে ইহার ভিতর কোচ-গারো-হাজং দিগের শর-বন-বলয়িত উচ্চ মৃন্ময় স্তূপগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া মানুষের অস্তিত্ব ঘোষণা করিত।

কৈশোরে 'হরিশ্চন্দ্রে'র অন্তরে ৺কাশীধাম দর্শন করিবার একটি বলবতী আকাঙ্ক্ষা জাগিল। তজ্জন্য পথের দুর্গমতা, শ্বাপদের আক্রমণ ও দস্যুভীতি তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে তাঁহাকে ভ্রষ্ট করিতে পারিল না। তখন সাধকপ্রবর 'পূর্ণানন্দ' † তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ৺কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তথায় এই মহাপুরুষের সহিত 'হরিশ্চন্দ্রে'র সাক্ষাৎলাভ ঘটিল। অচিরে হরিশ্চন্দ্রের উপর তাঁহার কৃপা-কটাক্ষ পতিত হইল, সুতরাং তিনি এই সাধকের অনুগমন করিলেন। এই ভাবে তিনি ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া এক দিন প্রকাশ্যে পূর্ণানন্দের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তৎপর তাঁহার অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল, তজ্জন্য সংসারের ভোগ-বিলাস ক্রমশঃ তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিবেন, মনে স্থির করিলেন। কিন্তু ইষ্টদেব তাঁহার অন্তরের গূঢ় বাসনাটি ব্যর্থ করিলেন, তাঁহাকে আর বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিতে হইল না। অতঃপর তিনি ইষ্টদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া 'গোবিন্দপুরে' ফিরিয়া আসিলেন এবং দার-পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্রমশঃ চারিদিকের কোচ ইত্যাদি অসভ্য মানুষের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই ভাবে তিনি এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটি কতকটা স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ইষ্টদেবের নির্দ্দেশমত পুত্রদ্বয়ের যথাক্রমে 'সদানন্দ' ও 'শ্যামানন্দ' নামকরণ করিলেন। 'হরিশ্চন্দ্র' পূর্ব্বেই স্বীয় গুরুদেবের নিকট হইতে আভাস পাইয়াছিলেন যে, এই দুইটি পুত্রই নাকি উত্তর-কালে বংশের কুল-প্রদীপস্বরূপ হইয়া তাঁহার মুখোজ্জ্বল করিবে, তজ্জন্য তিনি ইঁহাদিগের শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিলেন।

কমলার বরপুত্রদিগের বাল্য-জীবনে একটি-না-একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, ইহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'সদানন্দ' ও 'শ্যামানন্দ' এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইলেন না। কথিত আছে যে, একদা বসন্তের এক রমণীয় প্রভাতে ভ্রাতৃদ্বয় বায়ু-সেবনার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া 'গণেশ হাওরে'র * অবাধ-প্রসারিত প্রান্তরের ভিতর আসিয়া পড়িলেন, তখন সবে মাত্র শ্যামল প্রান্তরটি নবোদিত সূর্য্যের কিরণ-ধারায় অবগাহন করিয়াছে। এমন সময় কোথা হইতে হঠাৎ একটি বিষধর সর্প আসিয়া, 'সদানন্দে'র কটিদেশ বেষ্টন করিল এবং তাঁহার মাথার উপর ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার দিকে পলকশূন্য নেত্রে চাহিয়া রহিল। জ্যেষ্ঠের এই আকস্মিক বিপদ সমুপস্থিত দেখিয়া কনিষ্ঠ 'শ্যামানন্দ' ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ক্রমে সেই স্থানটি লোকারণ্য হইয়া দাঁড়াইল, সকলেই সেই সর্পটিকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ইতিমধ্যে 'হরিশ্চন্দ্র' স্বয়ং আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে নিষেধ করিলেন। তখন এই অঞ্চলে সর্পের 'ওঝা'র অভাব ছিল না। ইহাদের মন্ত্রের নাকি এতটা প্রভাব ছিল যে,

---

* বর্ত্তমান 'নসিরাবাদ' নগর প্রাচীন 'নসরতাবাদ'। ইহা 'নসরৎ শাহে'র শাসনকালে সমগ্র 'নসরৎশাহী'র প্রধান নগর ছিল। "নসরৎশাহের একটি রৌপ্যমুদ্রা 'নসরতাবাদ' নামক স্থানের টাঁকশালে মুদ্রিত হইয়াছিল"—গৌড়ের ইতিহাস (রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য)

† 'হরিশ্চন্দ্র' সাধকপ্রবর পরমহংস পূর্ণানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। 'পূর্ণানন্দ' ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান 'ময়মনসিংহ' জেলার 'নেত্রকোণা' উপবিভাগের অন্তর্গত 'কাটিহালী' গ্রামে আবির্ভূত হন। ইনি 'শাক্তক্রম', 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি', 'শ্যামারহস্য', 'তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী', 'ষট্‌চক্রনিরূপণ' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার ১৪৪৮ শকাব্দে স্বহস্ত-লিখিত একখানা 'বিষ্ণুপুরাণ' গ্রন্থ নাকি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

* 'হাওর'—'সাগর' শব্দের অপভ্রংশ। ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব-ভাগের দিগন্ত-বিস্তৃত নিম্নভূমিগুলি 'হাওর' নামে অভিহিত হয়। বর্ষাগমে ইহারা জলপূর্ণ হইয়া অনেকটা সাগরের মত দেখায়। বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে ইহারা সুকোমল শ্যামল তৃণ এবং ধান্যক্ষেত্রের সারি বক্ষে ধারণ করিয়া এক অপরূপ শোভার সৃষ্টি করে।

ইহারা নাকি অপরাধী সর্পটিকে মন্ত্র-বলে আকর্ষণ করিয়া সর্প-দষ্ট ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিত, সাধারণের ভিতর এই বিশ্বাসটি প্রচলিত ছিল। তজ্জন্য সর্পকে প্রথমতঃ অনেকেই প্রাণে মারিতে চাহিত না, কারণ, সর্পদষ্ট ব্যক্তির চৈতন্য-সম্পাদন-ক্রিয়া সর্পের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিত। হরিশ্চন্দ্রের মুখ হইতে নিষেধাজ্ঞা বহির্গত হইবামাত্র সমবেত জনমণ্ডলী যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ে একটা তুমুল চীৎকার করিল। সর্পটি কি জানি কেন, তৎক্ষণাৎ সন্নিহিত একটি লতা-গুল্মের ঝোপে আশ্রয় গ্রহণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন 'সদানন্দ' ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র পুত্রকে অতি সন্তর্পণে বাহকের স্কন্ধে স্বীয় ভবনে মৃতকল্প অবস্থায় আনয়ন করাইলেন এবং ইষ্টদেবের চরণামৃত পুত্রের মুখ-বিবর ও বক্ষোদেশে সেচন করিয়া আকুল-প্রাণে ভগবানের নিকট তাহার আরোগ্য প্রার্থনা করিলেন। অগৌণে তাহার সংজ্ঞালাভ হইল এবং গৃহের ভিতর অকস্মাৎ যে বিষাদের ঘন ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল।

'হরিশ্চন্দ্র' গৌড়ের সুলতান 'হোসেন শাহ' ও তাঁহার পুত্র 'নসরৎ শাহে'র সমসাময়িক ছিলেন। 'হোসেন শাহে'র শাসনকালে বর্ত্তমান 'ময়মনসিংহে'র পূর্ব্বভাগটি 'গৌড়ের' আনুগত্য স্বীকার করিলেও ভৌমিক 'হরিশ্চন্দ্র' স্বীয় স্বাতন্ত্র্যটি রক্ষা করিবার উপযোগী যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন মনে হয়। কারণ, দূরবর্ত্তী নব-বিজিত প্রদেশ-সমূহের উপর প্রকৃতভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করা তদানীন্তন সুলতানদিগের পক্ষে একরকম অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তজ্জন্য এই সমস্ত সুদূর-প্রদেশের শাসনভার কখন বা সুলতানপ্রেরিত শাসনকর্ত্তা অথবা স্থানীয় কোন পরাক্রান্ত ভৌমিকের উপর ন্যস্ত হইত। শেষোক্ত শ্রেণীর ভৌমিকগণ স্ব স্ব 'এলাকা'র ভিতর নামে মাত্র সুলতানের আধিপত্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা একরকম স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। 'হরিশ্চন্দ্র' বোধ হয় এই সমস্ত ভৌমিকের অন্যতম ছিলেন। তখন 'নেত্রকোণা'র উত্তরাঞ্চলে 'সুসঙ্গে'র সম্মানিত মহারাজগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন।

আনুমানিক ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে 'হোসেন শাহ' স্বীয় প্রভুত্ব কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তার করিতে মনস্থ করিলেন। "তিনি বহুসংখ্যক পরাক্রান্ত পদাতিক সৈন্য ও নৌকাসহ আসাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং জয়শ্রী-পরিশোভিত হইয়া কামরূপ ও কামতা প্রভৃতি স্থান জয় করিলেন। এই সকল দেশের শাসনভার 'রূপনারায়ণ', 'মানকুমার', 'লক্ষ্মণ' ও 'লক্ষ্মী-নারায়ণ' প্রভৃতি প্রতাপশালী ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত ছিল। 'সুলতান হোসেন শাহ' এই সকল স্থান জয় করিয়া অসংখ্য ধনরত্ন হস্তগত করিলেন।

*   *   *   *

আসামের অধিপতি পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। সুলতান 'হোসেন শাহ' স্বীয় পুত্রকে বহুসংখ্যক সৈন্যসহ বিজিত স্থান বশীভূত করিবার জন্য নিযুক্ত রাখিয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।" * পক্ষান্তরে, কামরূপরাজ গৌড়ের অধীনতাপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। এ দিকে বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল,—চলাচলের রাস্তা-ঘাট এক রকম বন্ধ হইয়া গেল। এই সুযোগে কামরূপরাজ মুসলমানদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের বিপুল সৈন্যবল বিধ্বস্ত করিলেন, † বাঙ্গালী কায়স্থ-সেনাপতি 'গৌর মল্লিক' এই ভীষণ আক্রমণের মুখে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন মুসলমান-সেনার বহির্গমনের পথ রুদ্ধ হইল ও রসদ-সংগ্রহের কোন উপায় রহিল না। তজ্জন্য 'নসরৎ' উপায়ান্তর না দেখিয়া গৌড়ের দিকে স্বল্পসংখ্যক অনুচর সহ পলায়ন করিতে বাধ্য হন। "নসরৎ পলাইয়া গারো পাহাড় অতিক্রম করিয়া রক্ষা পাইলেন। তাঁহার সঙ্গীয় সৈন্য-সামন্তগণ অরণ্যে বিপদাপন্ন হইয়া জীবন হারাইল।" ‡ কথিত আছে যে, 'নসরৎ' এই ভাবে বিপন্ন হইয়া কতক অনাহারে এবং কতক স্বল্পাহারে ভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে হরিশ্চন্দ্রের আবাসভূমি 'গোবিন্দপুরে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে পরম সমাদরে অভিনন্দিত করিয়া এই রাজ-অতিথির প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। তখন তাঁহার গৃহে একটি বিবাহ-উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল ও চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় সামগ্রীর অভাব ছিল না। 'নসরৎ' এই স্থানে কতিপয় দিবস বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া 'গৌড়ের' দিকে যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে তিনি হরিশ্চন্দ্রকে অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন। কথিত আছে যে, নসরৎ—'মগরা' ও 'সাইঢুলী' § নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী একটি সুবিস্তৃত ভূখণ্ড

---

* রিয়াজ—উস—সালাতিন।—(৺রামপ্রাণ গুপ্ত)

† 'আসাম বুরুঞ্জী'র মতে এই ঘটনা ১৫২৭ খৃঃ ঘটে।

‡ ময়মনসিংহের ইতিহাস—(৺কেদারনাথ মজুমদার)

§ মগরা—মেঘনার অন্যতম উপনদী।

সাইঢুলী—'শাহী-ঢুলী' শব্দের রূপান্তরিত নাম বলিয়া বোধ হয়। নসরতের দানটি ঢোল পিটিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল বলিয়া নদীটি সম্ভবতঃ এই আখ্যা লাভ করিয়াছে।

অশ্বপৃষ্ঠে মণ্ডলী করিয়া তাহা তাঁহাকে দান করেন। তৎপর উভয়েই 'গৌড়ের' দিকে যাত্রা করিলেন।

'নসরৎ শাহ' আনুমানিক ১৫২৮ খৃঃ নসরৎ শাহীর * প্রধান ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্ত্তাস্বরূপ 'গৌড়' হইতে প্রেরিত হইলেন। বর্ত্তমান 'ময়মনসিংহ' জেলার প্রধান নগর 'নসিরাবাদে' তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। 'নসরতের' সঙ্গে এই সময় 'হরিশ্চন্দ্র' 'গৌড়' হইতে নসরতাবাদে উপনীত হইলেন। রাজ-অনুগ্রহে তিনি সমর-বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী হইলেন। শীঘ্রই 'নসরৎ' তাঁহার সমর-কুশলতার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। কথিত আছে যে, একবার কোন একটি অভিযানে 'নসরতের' স্বীয় জীবন বিপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। শুধু এই 'হরিশ্চন্দ্রের' অসামান্য বীরত্ব তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। 'নসরতাবাদে' প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি ইঁহাকে পুরস্কৃত করিতে মনস্থ করিলেন। এক দিন এই 'নসরৎ শাহ' অসহায় অবস্থায় অনশন-ক্লিষ্ট হইয়া 'হরিশ্চন্দ্রের' ভবনে পদার্পণ করিয়া রাজোচিত আতিথ্য লাভ করিয়াছিলেন, আজ আবার তিনিই তাঁহার (নসরতের) প্রাণরক্ষা করিলেন। 'নসরৎ' আজ অসময়ের আশ্রয়দাতা ও প্রাণরক্ষক 'হরিশ্চন্দ্রের' প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যে বিশাল জায়গীরটি প্রদান করেন, তাহা স্বীয় নামানুযায়ী 'নসরৎ' ও 'জিয়াল' † আখ্যায় অভিহিত করিলেন।

যখন 'নসরৎ শাহ' সমগ্র 'নসরৎশাহীর' প্রধান শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন বর্ত্তমান পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের 'নসিরুজিয়াল' পরগণার অন্তর্গত 'মোয়াজ্জমাবাদ' হইতে 'খোয়াজ খাঁ' ‡ 'ত্রিপুরা' 'লাউর' ইত্যাদি প্রদেশ-সমূহ শাসন করিতেন। 'নসরতাবাদ' ও 'মোয়াজ্জমাবাদে' তখন টাঁকশাল, দেওয়ান-খানা ও শাসনকর্ত্তার বাসস্থান ছিল। 'নসরৎ' যখন হরিশ্চন্দ্রকে জায়গীর দান করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বেই * সম্ভবতঃ 'খোয়াজের' মৃত্যু হইয়া থাকিবে।

পিতার মৃত্যুর পর 'নসরৎ' সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, 'হরিশ্চন্দ্রের' পূর্ব্বকৃত উপকারটি স্মরণ করিয়া তাঁহার পুত্র-দ্বয়কে † পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে ভূষিত করিয়া 'সরে-লস্কর' ‡ উপাধিসহ মোয়াজ্জমাবাদ টাঁকশালের কর্ত্তৃত্বভার প্রদান করিলেন।

গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে বাঙ্গালা দেশে নিম্নলিখিত টাঁকশালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়:—

(১) লক্ষ্মণাবতী (২) ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া) (৩) সাতগাঁ ও (৪) শা (অস্পষ্ট) (৫) গয়াসপুর (৬) সোণারগাঁও (৭) মোয়াজ্জমাবাদ (৮) ফতেবাদ (৯)—ফতাবাদ (১০) হুসেনাবাদ।

টাঁকশালের বিভাগানুযায়ী সমগ্র বাঙ্গালা দেশটিও তখন ঐ ভাবে বিভক্ত হইয়া থাকিবে এবং বর্ত্তমান পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ তখন (ইক্‌লিম) 'মোয়াজ্জমাবাদ' নামে অভিহিত হইত। এই 'মোয়াজ্জমাবাদের' পরিমাণ ও সীমা এখনও প্রকৃতভাবে নির্ণীত হয় নাই। 'গৌড়ের' ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়ের মতে ইহা 'মেঘনা'র তীর হইতে 'ময়মনসিংহের' উত্তরপূর্ব্বভাগ 'সুরমা' নদীর দক্ষিণতীর পর্য্যন্ত ও অধ্যাপক Blochman সাহেবের মতে পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্টের 'লাউর' পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ময়মনসিংহের ইতিহাস-প্রণেতা সুলেখক ৺কেদারনাথ মজুমদার বলেন যে, "বর্ত্তমান ময়মনসিংহের অন্তর্গত নসিরুজিয়াল পরগণার মধ্যে কোন স্থান মোয়াজ্জমাবাদ নামে পরিচিত ছিল এবং সেই স্থানে এতৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তার বাসস্থান ও টাঁকশাল স্থাপিত ছিল। কালের অচিন্তনীয় প্রভাবে সেই সকল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" § আমাদের 'গোবিন্দপুর'

* নসরৎশাহী—বর্ত্তমান 'ময়মনসিংহ' জেলা। প্রাচীন 'মমিনশাহী' নব পর্য্যায়ে 'ময়মনসিংহ' আকার ধারণ করিয়াছে। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে নসরতের অধীনে খোয়াজ খাঁ 'মোয়াজ্জমাবাদ' শাসন করিতে লাগিলেন।

† 'নসরৎ ও জিয়াল' বা "বর্ত্তমান নসিরুজিয়াল পরগণা। নসরৎ শাহ কামরূপের রাজা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে গারো পাহাড় অতিক্রম করিয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা হইতে এই পরগণা 'নসরৎ ও জিয়াল' নামে অভিহিত হইয়াছে।"—ময়মনসিংহের বিবরণ (৺কেদারনাথ মজুমদার)

‡ ১৫১৩ খৃঃ এর একখানা শিলা-লিপিতে খোয়াজ খাঁ নিজেকে Governor of the land of Tiparah and Vazir of the District in Muazzamabad বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

* "হোসেন শাহ ইঁহাকে (নসরৎ শাহকে) নিজের জীবদ্দশাতেই নিজের ন্যায় আধিপত্য করার অধিকার দিয়াছিলেন। নতুবা হোসেন শার জীবদ্দশায় ইঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা ও প্রস্তরলিপি পাওয়া যাইত না।"—গৌড়ের ইতিহাস (রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য)

† সদানন্দ ও শ্যামানন্দ।

‡ পরলোকগত অধ্যাপক Blochman সাহেবের মতে হোসেন শাহের রাজত্বকালে বাঙ্গালা দেশটি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহালে বিভক্ত হইয়াছিল এবং এই রকম কতকগুলি মহাল এক এক জন 'সরে-লস্কর' কর্ত্তৃক শাসিত হইত। প্রত্যেক সরে-লস্করের অধীনে একটি দেওয়ানখানা ছিল এবং শান্তিরক্ষা করিবার উপযোগী সৈন্যও তাঁহার অধীনে থাকিত।

§ ময়মনসিংহের ইতিহাস—(৺কেদারনাথ মজুমদার)

পল্লীটি বর্ত্তমান 'নসিরুজিয়াল' পরগণার ভিতর অবস্থিত। যদি প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর আস্থা স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে ইহাকে প্রাচীন 'মোয়াজ্জমাবাদ' বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ইষ্টদেব 'পূর্ণানন্দে'র আদেশে 'হরিশ্চন্দ্র' সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে বাধ্য হন। 'পূর্ণানন্দ' প্রায়ই তীর্থ-ভ্রমণে কালক্ষেপ করিতেন। কিন্তু প্রিয়তম শিষ্যের মনোবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত মাঝে মাঝে 'গোবিন্দপুরে' পদার্পণ করিতেন। বিভব ও ঐশ্বর্য্য হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার জন্ত 'গোবিন্দপুর' হইতে দেড় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত 'কাটিহালী' নামক স্থানে স্বীয় বিশ্রাম-স্থান নির্দ্দেশ করেন। তখন ঐ স্থানটি গভীর অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল, পূর্ণানন্দের পদ-রেণু বক্ষে ধারণ করিয়া ইহা অচিরে একটি সাধনা-ক্ষেত্রে পরিণত হইল। হরিশ্চন্দ্র পুত্রদ্বয়ের সহিত তথায় প্রত্যহ গুরু-দর্শনে গমন করিতেন। শেষ-জীবনে ইনি গুরুর সহিত তীর্থবাসী হইয়া পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন।

পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর 'সদানন্দ' ও 'শ্যামানন্দ' 'গণেশ হাওরে'র নিম্নভূমি পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে একটি সুরম্য জনপদ প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে নিজেদের নব-লব্ধ-উপাধি-অনুসারে 'লস্করপুর' আখ্যা প্রদান করিলেন। ইঁহারা পরম-শৈব ছিলেন, তজ্জন্ত তথায় বহু অর্থব্যয়ে একটি 'শিব-মন্দির' মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তখন তাঁহাদের ইষ্টদেব তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, লস্কর ভ্রাতৃদ্বয় 'গোবিন্দপুর' ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নব-গঠিত 'লস্করপুর' যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু 'পূর্ণানন্দ' —তাঁহাদিগকে গোলোকগত প্রিয়তম শিষ্য 'হরিশ্চন্দ্রে'র সৌভাগ্যের উন্মেষস্থান—'গোবিন্দপুর' ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় অবনত-মস্তকে ইষ্টদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন।

ভ্রাতৃদ্বয় স্বয়ং বঙ্গেশ্বর 'নসরৎ' শাহ কর্ত্তৃক 'সরে-লস্কর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন বলিয়া লোক তাঁহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত এবং 'চন্দ্র-সূর্য্যের * সহিত তুলনা করিয়া প্রকাশ্যান্তরে তাঁহাদিগের ক্ষমতা ঘোষণা করিত। তাঁহাদিগের উপর সমগ্র বিভাগের 'দেওয়ানী' ও 'ফৌজদারী'-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। এই অঞ্চলে শান্তিরক্ষা করিবার জন্ত যে সৈন্ত-দলটি নিয়োজিত ছিল, সম্ভবতঃ তাহাদিগের উপর আধিপত্য করিবার ক্ষমতাটি 'সরে-লস্কর'রূপে * তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা এরূপ প্রতাপশালী ছিলেন যে, তাঁহাদের পাইকগণ বাড়ী বাড়ী যাইয়া রাজস্ব আদায় করিত না, —গ্রামের একটি প্রকাশ্য স্থানে অথবা গ্রামের মণ্ডল বা কোন সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে 'সরকারী লাঠি' † পুতিয়া রাখিত এবং প্রজাদিগকে নিরূপিত দিবসে খাজানা আদায় দিতে বলিয়া যাইত।

প্রজাগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে স্ব স্ব রাজস্ব সহ সেই লাঠি সঙ্গে করিয়া নাকি 'গোবিন্দপুরে'র দেওয়ানখানায় উপস্থিত হইত।

প্রজাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লস্করদিগের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। তাঁহারা মাঝে মাঝে প্রজাদিগের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত 'মহালের' ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কথিত আছে যে, একবার সদানন্দ লস্কর শিবিকাযোগে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে কোন প্রয়োজন বশতঃ বাহকগণ পাল্কীটি ক্ষণকালের জন্ত নামাইয়া রাখিল। ইত্যবসরে তিনি দেখিলেন যে, কয়েক জন লোক ফাঁক ফাঁক করিয়া ধানের গাছ রোপণ করিতেছে। ‡ তিনি এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি ক্ষেতের সব যায়গার খাজানা দাও?—না শুধু যে যে স্থলে ধানগাছ রোপণ কর, সেই সেই ভূমিখণ্ডের খাজানা দাও?"

সে তদুত্তরে বলিল, "না মহারাজ!—ক্ষেতের সব যায়গার খাজানা দিতে হয়।"

লস্কর বলিলেন, "ইহা ত ভারী অন্যায়। ভবিষ্যতে যে যে স্থানে ধানগাছ থাকিবে, শুধু সেই সেই যায়গার খাজানা দিতে হইবে।" ইহার পর স্থির হইল যে, ভূমির পরিমাণ যাহা হইবে, তাহা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট হার অনুসারে নিরূপিত করিয়া যাহা দাঁড়াইবে, তাহার এক-চতুর্থাংশ করস্বরূপ দিতে হইবে,—এই 'আইন'টি তখন 'চকি-বাদ' § নামে কথিত আছে।

ইষ্টদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লস্কর ভ্রাতৃদ্বয় গোবিন্দপুরে রহিয়া গেলেন। অচিরে এই 'পল্লীটি' একটি সমৃদ্ধিপূর্ণ

---

* 'চান-সুরুষ'—দুই ভাই অর্থাৎ 'চান' (চন্দ্র) ও 'সুরুষ' (সূর্য্য) লস্কর।

* সরে-লস্কর—পারস্ত। 'সরে' শব্দটির অর্থ 'শির' (প্রধান) এবং 'লস্কর' অর্থ সেনা। এই উপাধিটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—সেনার 'শির' (প্রধান) অর্থাৎ সেনাপতি। অধ্যাপক Blochman ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ দিয়াছেন—A Military Commander.

† তখন ইহা 'লস্করের লাঠি' নামে সাধারণের ভিতর পরিচিত ছিল।

‡ পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের চলিত ভাষায়—'রোয়া লাগাইতেছে।'

§ 'চকিবাদ'—চকি (চৌক—এক-চতুর্থাংশ) বাদ (রেহাই)।

নগরে পরিণত হইল। ইঁহারা তাঁহাদের বিশাল ভবনটি সুরক্ষিত করিবার জন্ম ইহাকে একটি গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করিলেন,—ইহা আজিও বর্ত্তমান। তাঁহাদের 'সাগরদীঘি', 'মলদীঘি', 'জলটুঙ্গী' ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদিগের অতুল বৈভবের সাক্ষ্যদান করিতেছে! এক সময়ে এই অধুনা উপেক্ষিত পল্লীটি নাকি সমগ্র 'মোয়াজ্জমাবাদের' উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানে একটি টাঁকশালের অস্তিত্ব সম্ভবপর করিয়াছিল! আজ আবার সেই লস্কর ভ্রাতৃদ্বয়ের বড়সাধের 'গোবিন্দপুর' তাহার গৌরবের আসন হইতে বিচ্যুত হইয়া মহাকালের নির্ম্মম দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া অতীতের কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

নিম্নে লস্করদিগের বিলুপ্তপ্রায় কয়েকটি কীর্ত্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(১) লস্কর-বাড়ী

'গোবিন্দপুর' পল্লীতে 'সদানন্দ' ও 'শ্যামানন্দ' লস্করদ্বয়ের যে স্থানে বিরাট ভবন ছিল, তাহা আজিও 'লস্করবাড়ী' নামে পরিচিত। তাঁহাদের খনিত 'সাগর-দীঘি', 'মল-দীঘি', 'কোদাল-ধোয়া দীঘি' ও বৃহৎ 'পরিখাটি' আজিও বর্ত্তমান।

(ক) সাগর-দীঘি

লস্করদিগের 'বসত-বাটীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বপার অক্ষত অবস্থায় আছে। বিগত ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে এই 'সাগর-দীঘি' প্রায় মজিয়া গিয়াছে। লস্কর-বাড়ীতে অধুনা এক জন মুসলমান বাস করিতেছে এবং সাগর-দীঘি'র গর্ভে একটি নূতন জলাশয় খনিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম পারে ঐ মুসলমানের বাড়ী। দীঘিটি এখন পাট-ক্ষেতে আচ্ছন্ন হইয়াছে।

(খ) মল-দীঘি

বসতবাটীর পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এই জলাশয়ের ভিতর লস্করদিগের জল-বিহারের জন্ম একটি কাঠের 'জলটুঙ্গী' ছিল। আজিও নাকি চৈত্রমাসে ইহার বিশাল কাঠের চারিটি খুঁটি দেখা যায়। খুঁটিগুলি এখনও রক্তচন্দনের ন্যায় উজ্জ্বল। সম্মুখের দুইটি কাঠের উপর দুইটি সোনার চোখ বসান ছিল,—কালক্রমে ইহারা অপহৃত হইয়া শুধু দুইটি ক্ষোদিত চক্ষুর চিহ্নমাত্র রাখিয়া গিয়াছে। দীঘিটি বহুকাল 'তারা-দামে' আচ্ছন্ন ছিল এবং সাপ ও বাঘের ভয়ে তথায় কেহ যাইতে সাহস করিত না। বিগত ১৩১৩ সালের বন্যার সময় 'তারা' ইত্যাদি নিঃশেষ করা হইয়াছে। আজিও নাকি চৈত্রমাসে ঐ দীঘির মধ্যভাগে প্রায় দুই হাত জল থাকে,—ইহা কাক-চক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল।

(গ) কোদাল-ধোয়া দীঘি

ভদ্রাসন-বাটীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, উপরি-উক্ত জলাশয়গুলি খনন করিয়া খনকগণ তাহাদের কোদালগুলি পরিষ্কার করিবার মানসে প্রত্যেকেই এই স্থান হইতে এক-এক কোদাল মাটী কাটার দরুণ এই দীঘির সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা এক প্রকার পাটক্ষেতে পরিণত হইয়াছে, তবুও এখনও ইহার চারিটি পারের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। বিগত ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে ইহা মজিয়া গিয়াছে।

(২) লস্করপুরের শিববাড়ী

ইহাই 'সদানন্দ' ও 'শ্যামানন্দে'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দেবালয়ের বিগ্রহ-অর্চ্চনা অব্যাহতভাবে ছিল, কিন্তু উক্ত শতাব্দীর প্রথমভাগে 'ঈশা খাঁর পারিষদ 'মজলিশ জালাল' (মসজিদ জালাল) 'নসরৎ ও জিয়াল' পরগণার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া 'লস্করপুরের অদূরে রোয়াইল 'বাড়ী'তে একটি বিশাল ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করেন। এই প্রবল ক্ষমতাশালী মুসলমান শাসন-কর্ত্তার অত্যাচারে নাকি শিবলিঙ্গটি নিকটবর্ত্তী একটি জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়াছিল এবং ইহাকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য কেহ তখন অগ্রসর হয় নাই। কালক্রমে লস্করপুরে এক 'মহাপুরুষের' আবির্ভাব হইল। তিনি এই অঞ্চলে 'ভৈরব ব্রহ্মচারী' নামে সাধারণের ভিতর পরিচিত। ইনি উপনয়নের পর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া বাবা 'বিশ্বেশ্বরের' নিকট 'হত্যা' দেন। বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন, "তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও,—তোমাদের বাড়ীতে একটি পুকুর খনিত হইতেছে,—উহার গর্ভে আমার অংশ 'শিবলিঙ্গ' ও 'গৌরীপাট' আবিষ্কৃত হইবে, ইহা স্থাপন করিয়া আমার প্রত্যহ অর্চ্চনা করিলে, আমি সর্ব্বদাই তোমার নিকট থাকিব।" গৃহে ফিরিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সত্য সত্যই তাঁহার পিতা একটি পুকুর খনন করাইতেছেন। এক দিন হঠাৎ মৃত্তিকা-নিহিত 'গৌরীপাটের' উপর কোদালের আঘাত পড়িয়া ইহা সামান্য ক্ষত হইল। তৎক্ষণাৎ ঐ 'গৌরীপাট' ও 'শিবলিঙ্গ' অতি সন্তর্পণে উত্তোলন করা হইল এবং সেই পুকুরের তীরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

হইল। কালক্রমে অনেকে এখানে মানস করিয়া সিদ্ধকাম হইতে লাগিল, অচিরে এই দেবালয়ের মাহাত্ম্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

পূর্ব্বে এই শিববাড়ীতে ২০×২০ হস্ত পরিমিত একটি ক্ষুদ্র ইষ্টক-গৃহ ছিল, কালক্রমে ইহা জীর্ণ হইয়া ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। তৎপর 'ময়মনসিংহ রামগোপালপুরের' অন্যতম দানশীল ভূম্যধিকারী ৺কালীকিশোর রায় চৌধুরী সেই ইষ্টক-গৃহের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—বর্ত্তমান মঠটির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া এক দিকে ধর্ম্মপ্রাণতা ও অপর দিকে প্রাচীনকীর্ত্তি-সংরক্ষণের একটি প্রকৃষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন।

এই শিববাড়ীতে ১২৬৫ সালে একটি 'নরহত্যা' সংঘটিত হইয়াছিল। আমরা ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার লোভটি সংবরণ করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য ঐ হত্যাকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

বাহাত্তর বৎসর পূর্ব্বে 'জয়চন্দ্র বসু' নামধেয় জনৈক 'থাক-বিভাগের' 'ডেপুটী' ময়মনসিংহ হইতে কোন তদন্ত উপলক্ষে 'লস্করপুর' আগমন করেন। তখন এই শিব-বাড়ীতে একটি মুসলমান 'পাগল' বাস করিত। সে কাহারও কিছু অনিষ্ট করিত না। সকলেই তাহাকে ভালবাসিতেন এবং সেও সকলের প্রতি প্রীতির ভাব পোষণ করিত। সে ছোট ছেলে-মেয়েদিগকে কাঁধে করিয়া বেড়াইত এবং তাহার স্বভাবটি অনেকটা বালকের মত সরল ছিল। কেহ কিছু দিলে খাইত, কখনও সে চাহিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিত না। তাহার আহার্য্য ছিল শিববাড়ীর 'ফল' ও 'চাউল'। 'জয়চন্দ্র' বাবু একটা 'খেয়ালে'র বশবর্ত্তী হইয়া এই পাগলকে শিব-বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন, ফলে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং 'তাড়া খাইয়া' দেবালয়ের প্রাঙ্গণে 'যূপকাষ্ঠের' নিকট মৌনভাবে দাঁড়ায়। সেই সময় লস্করপুরবাসী শিববাড়ীর পশু-ঘাতক 'জগন্নাথ' দে যখন একটি পাঠার ভবলীলা সংবরণ করাইয়া অন্য একটিকে বাঁধিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন ঐ পাগল হঠাৎ যূপকাষ্ঠের নিকট রক্ষিত 'খড়্গ'খানা হাতে লইয়া জগন্নাথকে আক্রমণ করিল! 'জগন্নাথ' প্রাণভয়ে দৌড়িতে লাগিল,—পাগলটিও তাহার পিছু পিছু ছুটিল! অচিরে সে জগন্নাথের পিঠে খড়্গ দ্বারা একটা প্রচণ্ড আঘাত করিল। সৌভাগ্যের বিষয়, খড়্গের আঘাত একটা কাঠের খামে ঠেকিয়া গেল,—তবু ইহার (খড়্গের) অগ্রভাগ জগন্নাথের পিঠে বিঁধিয়া গেল এবং সে কোন প্রকারে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল! ইত্যবসরে উপস্থিত সকলেই পলায়ন করিতে লাগিল! 'জয়চন্দ্র' বাবু প্রাণভয়ে নিকটবর্ত্তী একটি 'কচুবনে' আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সেখানেও নিজেকে নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না,—অবশেষে শিববাড়ীর 'পূজারি' ঠাকুরের 'অন্তঃপুরে' পলায়ন করিয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করেন। এ দিকে পাগলটি শিববাড়ীর চতুর্দ্দিক খড়্গহস্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। তখন শিববাড়ীর 'পূজকঠাকুর' মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে কবাট বন্ধ করিলেন। কিন্তু কবাটে অর্গল ছিল না বলিয়া বাহির হইতে একটু 'ধাক্কা' দিলে কবাট খুলিয়া যাইত। সুতরাং তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে স্বকীয় প্রাণনাশের আশঙ্কা করিয়া মহাকালের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। এই সময় 'জয়চন্দ্র' বাবুর জনৈক মাঝি দেবালয়ের প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছিল। দৈবাৎ প্রাঙ্গণটি তখন পিচ্ছিল ছিল,—মাঝিটি হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে পাগলের খড়্গের প্রথম আঘাতে ভূপতিত মাঝির 'মুণ্ডপাত' ও দ্বিতীয় আঘাতে তাহার 'কোমরটি' খণ্ডিত হইল! এই হত্যাকাণ্ডের পর শিববাড়ীর প্রাঙ্গণে বহু লোক জড় হইল এবং অনেক চেষ্টার পর পাগলটি ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইল। বিচারে সে উন্মত্ত প্রতিপন্ন হইল এবং তদনুসারে তাহাকে কয়েক বৎসর পাগলা-গারোদে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল।

(৩) যাত্রা-বাড়ী

লস্করদিগের আবাসবাটী হইতে ২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কোন স্থানে গমন করিতে হইলে, তাঁহারা বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া এই স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। এই স্থানটি 'সাইচুলী' ও 'ঘরই' * খালের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত: লস্করদিগের সময় ঐ নদী ও খাল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল এবং বহুসংখ্যক বাণিজ্য-তরণী ঐ খাল ও নদী-পথে নানাস্থানে গমনাগমন করিত। দুইটি জীর্ণ বটবৃক্ষ 'যাত্রা-বাড়ীর বটগাছ' নামে পরিচিত হইয়া অতীতের একটু ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে!

(৪) পিল-খানা

লস্কর-বাড়ীর অদূরে তাঁহাদের একটি 'পিল-খানা' ছিল। তথায় ইঁহাদিগের হাতীগুলি বাঁধা থাকিত। 'পিল-খানা' অধুনা 'পাট রাক্ষসী'র কুক্ষিগত হইয়াছে! একটি শীর্ণ বটবৃক্ষ 'পিল-খানার বটগাছ' নাম ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানের অতীত স্মৃতি জাগাইয়া রাখিতেছে।

---

* ইহা ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা উপবিভাগের অন্যতম 'খাল।'

(৫) হাতী-বাঁধার জাঙ্গাল

লস্করদিগের হাতীগুলি পিলখানা হইতে যে পথে 'সাইঢুলী' নদীতে স্নান করিতে যাইত, সেই উচ্চ জাঙ্গালের শেষ চিহ্নটি কালকে যেন উপেক্ষা করিয়া আজিও বিদ্যমান। ইহা 'হাতী-বাঁধার জাঙ্গাল' নামে কথিত হয়। এখন বর্ধাগমে এই 'জাঙ্গালটি' জলমগ্ন হইয়া থাকে এবং কৃষকগণ ইহাকে যে ভাবে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, কালে ইহা লুপ্ত হইয়া যাইবে!

(৬) টেঙ্গায় আবিষ্কৃত মূর্ত্তি

বিগত ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পের কতিপয় দিবস পূর্ব্বে গোবিন্দ-পুরের সন্নিহিত 'টঙ্গাগ্রামে' 'হরিশীল' নামক এক ব্যক্তি তাহার পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিবার সময় একটি প্রস্তরমূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। এই মূর্ত্তিটি নাকি * রামেশ্বরপুরনিবাসী ৺বুধরাম চৌধুরীর শিব-মন্দিরে রক্ষিত আছে। কেহ বলেন—ইহা 'বিষ্ণু-মূর্ত্তি,'—আবার কেহ কেহ বলেন—ইহা 'বামন-মূর্ত্তি'। মূর্ত্তিটির উচ্চতা এক ফুট হইবে। ইহার হস্ত চারিটি—বামদিকের উপরের হাতে 'শঙ্খ', নীচের হাতে 'গদা' এবং ডানদিকের উপরের হাতে 'চক্র' ও নীচের হাতে 'পদ্ম' বিরাজমান। মূর্ত্তির পাদপীঠে একটি মৃত্তিকা-বৃত মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তির দক্ষিণপদ বর্ত্তমান, কিন্তু বামপদের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। বামপদমূল বা নাভিমূল হইতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর একটি পদ কোণাকোণিভাবে উর্দ্ধদিকে শোভা পাইতেছে। এই তৃতীয় পদের ২।২।০ ইঞ্চি নীচে 'তিনটি' মানব-মূর্ত্তি বিরাজ-মান। গলদেশ হইতে নিম্নদিকে উরুদেশ পর্য্যন্ত একটি ফুলের মালা শোভা পাইতেছে। আমাদের মনে হয়, পুকুর হইতে মূর্ত্তিটি উত্তোলন করিবার সময় কোদালের আঘাতে বামপদটি লুপ্ত হইয়া থাকিবে। নাভিমূল হইতে একটি তৃতীয় পদ দৃষ্ট হয়, ইহাতে কেহ কেহ ইহাকে 'বামন-মূর্ত্তি' বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু বহিরাকারে ইহা 'বামন' নহে, বরং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বনমালা-শোভিত একটি বিষ্ণু-মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়।

বলা বাহুল্য, এই মূর্ত্তিটি এক সময়ে লস্করদিগের দেবায়তনে প্রতিষ্ঠিত অন্যতম বিগ্রহ।

* রামেশ্বরপুর—ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা উপবিভাগের অন্তঃপাতী একটি প্রাচীন পল্লী।

শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী (বি, এ)।

লীলালোক

(দাদু)

যেখানে না-মরে না-জীয়ে কেহই
চল না সেখানে যাই,—
আগম-নিগম ভয় নাই যেথা,
শুধু এক-রস স্বাদু।

এক দেশ আমি দেখেছি—সে দেশ
ঋতু-আবর্ত্ত-হারা;
আমি দাদু সেই দেশের মানুষ—
সদা এক-রস-যোগ।

চন্দ্র-সূর্য্য—লুপ্ত-বিলীন, রাত্রি দিবস—সেথা গতি-হীন
'সহজ' রয়েছে স্বাভাবিক হয়ে—
সকলি সহজে পাই;
—চল যাই সেথা দাদু!

বেদ-কোরাণের অগম সে ঠাঁই
প্রবেশি' কি দেখি কেমনে বুঝাই,—
কি আশ্চর্য্য! অপরূপ সে যে!
বিস্ময়ে হই সারা;
—বিচিত্র লীলা-লোক।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

ভবিতব্যের খেলা

১

রামাপুরার বাগানওয়ালা বড় বাড়ীখানি শোভা ও সমৃদ্ধির দিক দিয়া কাশীর বাঙ্গালীটোলার গৌরবস্বরূপ হইলেও, বাঙ্গালীরা কিন্তু সকালে বা সন্ধ্যায় বাড়ীওয়ালার নামটি উচ্চারণ করিতে বিরত হন এই আশঙ্কায় যে, পাছে নামের গুণে কোন অজ্ঞাত অকল্যাণ অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করে!—আবার এই মহল্লারই শেষপ্রান্তে অবস্থিত আড়ম্বরহীন একখানি অতিক্ষুদ্র জীর্ণপ্রায় ত্রিতল বাড়ী দেখিলেই তাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া থাকেন,—"হোক্ গরীব, কিন্তু ত্যাগী, প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা!"

অথচ এই জীর্ণবাড়ীর পুণ্যাত্মা লোকটির সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রাসাদবাসী লোকটির বংশগত সম্পর্কের নৈকট্য এবং অবস্থা ও প্রকৃতিগত সম্বন্ধের পার্থক্য লইয়া আলোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

বড় বাড়ীর মেয়ে নির্ম্মলা যখন বাড়ীর প্রকাণ্ড জুড়ী-গাড়ী চড়িয়া রাস্তা কাঁপাইয়া সগর্ব্বে স্কুলে পড়িতে যাইত, পল্লীর সকলেই নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া বলাবলি করিত,—ছুঁড়ীর গুমর দেখ্ ছ!" আবার এই সময়টির একটু পরেই যখন সেই জীর্ণ বাড়ীর পুণ্যাত্মা অধ্যাপক শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা গীতাকে সঙ্গে লইয়া কুইন্স্ কলেজে এই পথ ধরিয়া যাইতেন, শ্রদ্ধাসম্ভ্রমে সকলেই সে দিকে চাহিয়া থাকিত, সহানুভূতির স্বরে বলিত,—"আহা! একই বংশ, কিন্তু অবস্থার ফেরটা দেখ!"

এই এক বংশের দুইটি পরিবারের অবস্থাগত এই ফের বা তারতম্যের একটু ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসটি অধ্যাপক শান্তশীল বাবুর অভূতপূর্ব্ব ত্যাগস্বীকারের অবদানে সমুজ্জ্বল।

ঐ বাগানওয়ালা প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ও তৎসহ প্রচুর সম্পত্তি যাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনি ছিলেন এই দরিদ্র অধ্যাপক শান্তশীলের পিতা জ্ঞানানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর আজ যিনি এই অতুল সম্পত্তির মালিক, তিনি ঐ জ্ঞানানন্দ বাবুর অন্নপুষ্ট আশ্রিত অনুজ, নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্ম্মলা ইঁহারই কন্যা।

শান্তশীলের পঠদ্দশাতেই জ্ঞানানন্দ বাবু সহসা সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইয়া কাশীলাভ করিলে, অনুজ নিত্যানন্দ বাবু সংসারের কর্ত্তা ও শান্তশীলের অভিভাবক হন। তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে শান্তশীল এলাহাবাদে শ্বশুরালয়ে আশ্রয় লইয়া কলেজে প্রবিষ্ট হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই জ্ঞানানন্দ বাবু একমাত্র পুত্রের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কালক্রমে আই, এ, বি, এ ও এম, এ, পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া শান্তশীল যখন সহধর্ম্মিণী গায়ত্রী ও কন্যা গীতার সহিত রামাপুরার পৈতৃক ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পল্লীবাসীরা তাঁহাদিগকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিলেও, বৃদ্ধ পিতৃব্য নিত্যানন্দ, পিতৃব্য-পত্নী যোগমায়া এবং পিতৃব্যপুত্র যজ্ঞেশ্বর যে ভাবে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, তাহা শান্তস্বভাব শান্তশীলের দৃষ্টি অতিক্রম করিলেও, তীক্ষ্ণদৃষ্টিময়ী পত্নী গায়ত্রী, এমন কি, বালিকা গীতার নিকট তাহা যেন কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। বালিকা গীতা একান্তে মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হাঁ মা, এরা আমাদের কি রকম আপনার লোক?" মা উত্তরে জবাব দিয়াছিলেন,—"আপনার লোক যেমন হয়!"

গীতা নির্ম্মলার সমবয়স্কা হইলেও, তাহাদের ভাব হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নির্ম্মলার গর্ব্ব ও গীতার আত্মাভিমান উভয়কেই উভয়ের প্রতি বিমুখ ও বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।

অপরাহ্ণে গাড়ী-বারান্দার নিম্নে জুড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধ বায়ুসেবনে বাহির হইবেন। সাজিয়া গুজিয়া পরীটির মত নির্ম্মলা ছুটিয়া আসিয়া দাদুর পাশে বসিয়া বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া সগর্ব্বে গীতার দিকে তাকাইল। গীতাও সাজিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৃদ্ধ গীতাকে দেখিয়াই গাড়ীতে উঠিবার জন্য ডাকিলেন। গীতা গাড়ীর পা-দানিতে পাটি দিবামাত্র নির্ম্মলা সম্মুখের আসন দেখাইয়া বলিল,—"তুই এখানে বোস্!" আর যায় কোথায়? মুখখানি লাল করিয়া, ঝঙ্কার দিয়া সে বলিয়া উঠিল—"আমি চাই না যেতে!"—সঙ্গে সঙ্গে সতেজে নামিয়া দৃপ্ত বিদ্যুল্লতাটির মত বালিকা বাড়ীর মধ্যে ছুটিল। বৃদ্ধ

স্তম্ভিত! নির্ম্মলা মুখ মচকাইয়া বলিল,—"তেজ দেখ্‌লে, দাদু?" গম্ভীর হইয়া বৃদ্ধ সহিসকে গাড়ী বাড়াইবার আদেশ দিলেন।

গায়ত্রী কন্যার কীর্ত্তি উপর হইতে দেখিয়াছিলেন। তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই যে গেলিনি ও গাড়ীতে?"

মেয়ে উত্তর দিল,—"ব'য়ে গেছে আমার অমন ক'রে যেতে! উনি যাবেন পাশে ব'সে, আর আমি যেন বাঁদী—সামনে ব'সে যাব, ওঁর কথায়!"

এইরূপ খুঁটিনাটি ব্যাপার প্রায়ই চলিতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বর ও তাঁহার পরিবারবর্গ বহুপূর্ব্ব হইতেই এই সংসারে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সর্ব্বত্রই এমন দৃঢ়ভাবে জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন যে, স্বল্পকালমাত্র সেখানে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলেও, শান্তশীলের শক্তিশালিনী সহধর্ম্মিণী গায়ত্রী ও আত্মাভিমানিনী কন্যা গীতার পক্ষে স্বত্ব-প্রতিষ্ঠার সমান দাবী সত্ত্বেও অধিকার-লাভের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কূটবুদ্ধি বৃদ্ধ নিত্যানন্দ বুঝিয়াছিলেন যে, উচ্চশিক্ষা মানুষকে জনসমাজে সম্মানিত করিতে পারে, অর্থও উপার্জ্জন করিবার উপায় প্রদান করে, কিন্তু সেই সম্মান ও উপার্জ্জিত অর্থ আয়ত্ত করিয়া রাখিবার কৌশল জানে একমাত্র কূট বিষয়বুদ্ধি। সেই জন্য তিনি পুত্র যজ্ঞেশ্বরকে প্রবেশিকার দ্বার হইতে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিতে দেখিয়া, তাহাকে সোৎসাহে মহাজনী খাতায় হাত-মক্স করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাই না আজ এই বিপুল সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ সমস্তই বিষয়বুদ্ধি-বিচক্ষণ পুত্র যজ্ঞেশ্বরের নখাগ্রে প্রতিফলিত। শান্তশীলের স্বভাব দেখিয়া বৃদ্ধ আশান্বিত হইয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে, এরূপ বিদ্বান্-মূর্খ হইতে বিষয়বুদ্ধিতে পরিপক্ব চতুর পুত্র যজ্ঞেশ্বরের স্বত্বহানির কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু শান্তশীলের পত্নী গায়ত্রী ও তাঁহার কন্যার প্রখর প্রকৃতি ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাদের পরামর্শে শান্তশীলের অতিশান্ত প্রকৃতিও যে অচিরেই অশান্ত হইয়া ভয়াবহ অশান্তির সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা অনুমান করিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। কাযেই তিনি অঙ্কুরেই ভবিষ্যৎ অশান্তির বীজ অপসারিত করিতে সচেষ্ট হইলেন।

সে দিন বিজয়া-দশমী। বিসর্জ্জনের পর শান্তশীল যখন সর্ব্বাগ্রে পূজ্যপাদ পিতৃব্যের চরণ-বন্দনা করিলেন, বৃদ্ধ তখন দুই হাতে স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া 'হাউ হাউ' করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মহাবিস্ময়ে শান্তশীল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে কাকা বাবু? কাঁদছেন কেন?"

এ প্রশ্নে বৃদ্ধের রোদন-বেগ আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সেই হৃদয়ভেদী রোদনের মধ্যে অপূর্ব্ব কৌশলে আবেগময় আর্ত্তস্বরে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন,—"বাবা শান্তশীল রে, এ কান্না কি আজকের বাবা? যে দিন তুই এম, এ, পাস ক'রে এ বাড়ীতে এসেছিস, সেই দিন থেকে কান্না সুরু করেছি! না কেঁদেই বা করি কি? পথে বসতে চলেছি যে বাবা আমরা! দাদা আমাকে বাড়ীর কর্ত্তা ক'রে যান মোটা দেনা মাথায় চাপিয়ে, তারই ভারে আজ নুইয়ে পড়েছি! নগদ যা ছিল, তোমাকে পড়িয়ে মানুষ করতে সব খুইয়েছি; নিজের ছেলের দিকে চাইনি বাবা, তাকে ভূত ক'রে রেখেছি। এখন সম্বল এই বাড়ী-খানি, এই আমার বুকের রক্ত; তুমি বিদ্বান্ হয়েছ, হাকিম-সুবো ইচ্ছে করলেই হবে; কিন্তু আমার যগুর কি হবে, বাবা? এ বাড়ী যদি চুলচেরা ভাগ করতে হয়, আমার বুক ফেটে যাবে রে বাবা, ফেটে যাবে—"

আবার বৃদ্ধ সেই ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। শান্তশীল সমস্ত শুনিয়া অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—"আমাকে এখন কি করতে বলেন, কাকা বাবু, স্বচ্ছন্দে বলুন; আপনার যা আদেশ, তা পালন করতে বোধ হয়, আমি কখনই কুণ্ঠিত হব না।"

সেই অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত আর্ত্তস্বরে অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—"তা কি জানি না রে বাবা, তুই যে বাঁড়ুয্যে-বংশের চূড়ো! বিদ্যের জাহাজ হয়ে কাশীতে ফিরেছ বাবা, তোমার ভাবনা কি বল? ভাবনা যত এই হতভাগা মুখ্যু যগুর!—আমার ইচ্ছা কি শুনবে বাবা,—সম্বলের মধ্যে এখন শুধু এই বাড়ীখানা,—এতে তোমার যে অংশ আছে, সেটা তুমি আমাকে ভিক্ষে দাও বাবা!"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধ আবেগভরে শান্তশীলের হাত দুইখানি জড়াইয়া ধরিলেন। শান্তশীল শিহরিয়া উঠিয়া সসঙ্কোচে বলিয়া উঠিলেন,—"এ আপনি কি করছেন, কাকা

বাবু? এর জন্ত আমার হাত ধরছেন আপনি, একে ভিক্ষা বলছেন? আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে স্বীকার ক'রে নিলেম, কাকা বাবু।" এই বলিয়া শান্তশীল নির্ব্বিকারভাবে সেই রোরুদ্যমান পিতৃব্যের পদতলে মস্তক নত করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

অশ্রুরাশির মধ্যেও বৃদ্ধের লুব্ধ নয়ন দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পরক্ষণে প্রণত ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—"বাবা, তুমি এতক্ষণে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলে। কিন্তু বাবা, আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে। তোমাকে আমি একবারে পথে দাঁড়াতে দেব না। জানি—তুমি এর চেয়ে বড় অট্টালিকা করবে, কিন্তু এখন আপাততঃ তোমাদের মাথা গোঁজবার স্থান ত একটা চাই,—গোধোলিয়ার মোড়ে আমার নিজের কেনা বাড়ী, সেই বাড়ী তোমার, এই তার চাবি নাও।"

চাবির সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়ে সুচতুর বৃদ্ধ শান্তশীলের নিকট হইতে পূর্ব্ব হইতে সম্পাদিত দলিলে স্বাক্ষর করাইয়া লইতে ভুলিলেন না। আর উচ্চশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শান্তশীল পিতৃব্যের কৃপা-প্রদত্ত বাড়ীখানির চাবিটি লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন—তৎসম্বন্ধে কোন দলিল পিতৃব্যের নিকট হইতে লইবার প্রসঙ্গও তুলিলেন না।

পত্নী ও কন্যাকে লইয়া গোধোলিয়ার ক্ষুদ্র বাড়ীখানিতে সংসার পাতিয়া শান্তশীল নিশ্চিন্ত হইলেও, গায়ত্রী ও গীতা এই ত্যাগস্বীকারটি কখনই পুরুষোচিত বলিয়া স্বীকার করিলেন না। কিন্তু শান্তশীল যখন আবেগের সহিত আর্ত্তস্বরে বলিলেন,—"আমার বাবার সঙ্গে এক দিনের জন্য কাকার মনোমালিন্য দেখি নি। বাবা তাঁকে ভালবাসতেন আমার চেয়েও কম নয়। সেই কাকার সাধ কি আমার অপূর্ণ রাখা উচিত, গায়ত্রি?"

ত্যাগশীল স্বামীর উন্নত হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া পতিগতপ্রাণা গায়ত্রী মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিলেন। আর গীতা নির্ম্মলার অহঙ্কার এবার পরিপূর্ণ হইল ভাবিয়া যেমন ক্ষুণ্ণ হইত, তেমনই তাহার মনেও এই অহঙ্কার জাগিয়া উঠিত যে, তাহার বাবা কাশীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিদ্বান্, সেও বিদ্যায় নির্ম্মলার চেয়ে বড় হইবে। কিন্তু যখন প্রত্যহ অপরাহ্ণে নির্ম্মলা জুড়ী চড়িয়া তাহাদেরই বাড়ীর দরজা দিয়া যাইবার সময় গাড়ীর দ্বার হইতে ঝুঁকিয়া গীতাকে ডাকিয়া বলিত—'বেড়াতে যাবি গীতা?' তখন রোষে অভিমানে আত্মহারা হইয়া বালিকা মাতার বক্ষে মুখখানি রাখিয়া সোচ্ছ্বাসে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিত—'মা!'

সম্বৎসরের মধ্যেই বৃদ্ধ নিত্যানন্দ কাশীলাভ করিলেন সহসা, অতর্কিতভাবে। যে সম্পত্তি তিনি অশ্রুবলে অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে ইহধামেই রাখিয়া যাইতে হইল, এবং বিশ্বনাথের এমনই মাহাত্ম্য যে, মৃত্যুকালে পুত্র যজ্ঞেশ্বর স্থানান্তরে থাকায়, ভ্রাতুষ্পুত্র শান্তশীলকেই পিতৃব্যের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইল।

যজ্ঞেশ্বর ব্যবসার ব্যপদেশে বাহিরে গিয়াছিলেন। পিতার বিয়োগবার্ত্তা শুনিয়াই কাশীতে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু তাহার দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া গিয়াছে। অগত্যা মহা সমারোহে দানসাগর শ্রাদ্ধের আয়োজন চলিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে শান্তশীল পিতৃব্যের মুখে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছিলেন, শ্রাদ্ধবাসরে তিনি বা তাঁহার পরিবারবর্গ আমন্ত্রিত হইলেন না। সভাস্থলে তাঁহাদের অনুপস্থিতি উপলক্ষ করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী আপত্তি তুলিয়াছিলেন। সমবেত সকলেই তাহাতে যোগদান করিয়া শ্রাদ্ধ পণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া, শান্তশীল তাঁহার এক অনুগত ছাত্রের দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি স্বয়ং অসুস্থ, যজ্ঞেশ্বরের কোন দোষ নাই, তাঁহারা যেন এই তুচ্ছ ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া কর্ম্ম পণ্ড না করেন।—প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা বুঝিয়াও, শান্তশীলের ব্যবহারে তাঁহারই উদ্দেশে সকলেই একবাক্যে সাধুবাদ দিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধের সপ্তাহ পরেই যজ্ঞেশ্বর এই মর্ম্মে শান্তশীলকে এক নোটিশ দিলেন যে, সাত দিনের মধ্যে তিনি যেন তাঁহার পৈতৃক বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র উঠিয়া যান। অন্যথায় তাঁহাকে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

কয়দিন হইতে গায়ত্রী প্রবল জ্বরে ভুগিতেছিলেন। জ্বরটি শেষে এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল যে, যিনি চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাঁহাকে বিশেষ চিন্তিত হইতে হইল। জ্বরের এই বাড়াবাড়ি অবস্থার সময় যজ্ঞেশ্বরের সাংঘাতিক নোটিশখানি শান্তশীলের হস্তগত হইল। নোটিশখানি দুইবার পড়িয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"বিশ্বনাথ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

গায়ত্রীর অসীম সৌভাগ্য যে, তাঁহাকে আর এই মর্ম্মভেদী

বাণের নিদারুণ আঘাতটি গ্রহণ করিতে হইল না, তৎপূর্ব্বেই শান্তিদায়িনী মৃত্যুদেবী তাঁহাকে পূর্ণ শান্তি প্রদান করিলেন। শোকমথিত হৃদয়ে শান্তশীল তেজোময়ী সাধ্বী পত্নীর প্রাণশূন্য দেহের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"বিশ্বনাথ! তুমি মঙ্গলময়। গায়ত্রীর লজ্জা তুমি রক্ষা করেছ, সহজাত আত্মমর্য্যাদা সঙ্গে করেও সে সগর্ব্বে চলেছে!"

সহধর্ম্মিণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর অশৌচ অবস্থাতেই শান্তশীল মাতৃহারা কন্যা গীতাকে লইয়া রামপুরার এক প্রান্তে এই ক্ষুদ্র বাড়ীখানি ভাড়া লইয়া উঠিয়া আসিলেন। সেই দিনই যজ্ঞেশ্বর বাড়ীর দরজায় তালা লাগাইয়া অধিকার পাকা করিয়া লইলেন। তাঁহার স্তাবক ও খাতক-সমাজে এ কথাও রাষ্ট্র করিতে তিনি দ্বিধা করিলেন না যে, মৃত্যুকালে বাবার শেষ কথাটি রক্ষা করার জন্যই দীর্ঘকালের ভাড়ার দায় হইতে তিনি শান্তশীলকে দয়া করিয়া রেহাই দিয়াছেন!

২

ইহার পর ছয়টি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। নিজেদের ভাগ্যপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পিতা-পুত্রীর মন দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইবার অবকাশ না পাইলেও, পল্লীবাসীদের মধ্যে কিন্তু এই অসাধারণ ব্যাপারটির ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে চর্চ্চার এখনও অবসান ঘটে নাই। পরচর্চ্চাপ্রিয় পল্লীসমাজকে'এ জন্য একমাত্র অপরাধী করা সমীচীন হয় না, কেন না, এক পক্ষ তাঁহাদের অতীত সম্বন্ধে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেও, অপর পক্ষ তাঁহাদের এই ঔদাসীন্যকেই দম্ভের প্রকারান্তর মনে করিয়া তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতে বরাবরই প্রয়াস পাইয়া আসিতেছিলেন এবং তাহাতেই বহুপূর্ব্বে সংঘটিত এই অসাধারণ ব্যাপারটি পল্লীর সর্ব্বসাধারণের নিকট অভ্রান্তরূপে আলোচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে এবং ইহাই অপর পক্ষের গাত্রদাহের কারণস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

ফলতঃ, এক শত টাকামাত্র মাহিনার অধ্যাপক শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার এই সামান্য অবস্থাকেই সানন্দে বরণ করিয়া লইয়া কাশীর সকল সমাজেই যখন প্রতিষ্ঠান্বিত হইলেন, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ, মহামান্য পণ্ডিতমণ্ডলী, উৎসাহশীল তরুণ ছাত্র-সমাজ, এমন কি, কাশীর যাবতীয় বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের মধ্যেও তাঁহার নাম যখন প্রশংসার সহিত গৃহীত হইতে লাগিল, তখন অতুল ঐশ্বর্য্যশালী যজ্ঞেশ্বর ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হইতেছিলেন। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে নিজের জুড়ী-গাড়ীতে গিয়া যজ্ঞেশ্বর যে সম্মান প্রাপ্ত হন, সাধারণ মানুষটির মত পদব্রজে সভাস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র অধ্যাপক শান্তশীল তাহার সহস্রগুণ অধিক সম্মানে সম্বর্দ্ধিত হন; তাঁহার সুদীর্ঘ দেহ, প্রশান্ত মূর্ত্তি, সদা হাস্যময় প্রফুল্ল বদন তাঁহার ব্যক্তিত্বকে এরূপ সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দেয় যে, অপরিচিতও তাঁহাকে দেখিবামাত্র সম্ভ্রমে মস্তক নত করিতে বাধ্য হন। আবার অন্তঃপুরে বহুমূল্য অলঙ্কার ও বেনারসী বস্ত্রে সুসজ্জিতা নির্ম্মলা নিরাভরণা গীতার অধিকতর সম্বর্দ্ধনা দেখিয়া মর্ম্মাহত পিতারই মত ঈর্ষ্যায় জ্বলিতে থাকে।

ইহার পরিণাম ক্রমশঃ এমনই দুর্নিবার হইয়া উঠিতে লাগিল যে, কারণে অকারণে শান্তশীল বাবু ও তাঁহার কন্যাকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য অপর পক্ষ হইতে একটা-না-একটা ছুতার আবির্ভাব প্রায়ই ঘটিল এবং পিতা-পুত্রী নির্ব্বিকার-চিত্তে তাহা এড়াইয়া গেলেও, সেই ছুতার সূত্র ধরিয়া ব্যাপারটি পাকাইয়া তুলিতে পল্লীবাসীদের অবকাশের অভাব হইল না।

শান্তশীল বাবু অধ্যাপনা করিয়া মাসিক ১ শত টাকা মাত্র বেতন পাইতেন এবং তাহাতেই তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারটি এই কয় বৎসর সচ্ছলভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। গীতাকে তিনি নিজে সঙ্গে করিয়া কলেজে লইয়া যাইতেন ও ছুটীর পর নিজেই সঙ্গে করিয়া আনিতেন। গীতা যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পায়, তখন বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী মেয়ের এই প্রথম প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বাঙ্গালী-জগৎ চমৎকৃত হইয়াছিল। তাহার পর এই বাঙ্গালী মেয়েটি যখন সঙ্কোচের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কলেজে প্রবেশ করিল, তখন কাশীর শিক্ষিত-সমাজ তাহাতে উৎসাহ প্রদান করিলেও, রক্ষণশীল সমাজ এ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই ছুতাটি আশ্রয় করিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবু এ সম্বন্ধে এমন ঘোঁট পাকাইয়া দেন যে, সহজে গীতার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পক্ষে তাহা বিষম পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সতের বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেও শান্তশীল বাবুকে

গীতার বিবাহ বিষয়ে উদাসীন দেখিয়া, প্রতিবেশীরা এ সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন ; কিন্তু তিনি হাসিয়া বলিতেন, "আপনারা ত জানেন, মেয়ের বিবাহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করবার মত সামর্থ্য আমার নাই, আর আমি এ বিষয়ে কাহারও নিকট কৃপাপ্রার্থী হ'তেও অনিচ্ছুক। তবে কোনও উপযুক্ত পাত্র যদি আমার মেয়ের গুণের পরিচয় পেয়ে তাকে প্রার্থনা করে, আমি তাকেই কন্যা দান করতে পারি।"

এই অপূর্ব্ব যুক্তি শুনিয়া তাঁহারা মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া যান। যজ্ঞেশ্বর মধ্যে মধ্যে চর লাগাইয়া সংবাদ লন, বিবাহের সম্বন্ধ কোথাও হইতেছে কি না। যে বৎসর গীতা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পায়, সেই বৎসর নির্ম্মলা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিবার সোপানে বাধা পাইয়া স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া বসে, তাহার ফলে সেই বৎসরই মহাসমারোহে এক ধনী ও নামী নবীন জমীদারের সহিত তাহার বিবাহ হয়। এই শুভ-বিবাহের অনুষ্ঠানটির মূলেও জ্ঞাতিবিরোধ বা জ্ঞাতির প্রতি বিষম ঈর্ষ্যার একটা কৌতূহলোদ্দীপক আখ্যান বিজড়িত।

পিতৃবিয়োগের পর পিতার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া পূর্ণিয়ার এই নবীন জমীদারটি তখন তাঁহার কাশীর বাড়ীতেই সপারিষদ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার নাম নরনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। গীতার খ্যাতি শুনিয়া ইনি তাহার পাণিপ্রার্থী হন। কাশীর এক ঘটক শান্তশীল বাবুর নিকট সম্বন্ধ আনেন। গীতার বিবাহব্যাপারে পিতার তখন বিশেষ উৎসাহ না থাকিলেও, ঘটক ঠাকুরের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া পাত্রপক্ষকে কন্যা দেখাইতে সম্মত হন। মহাসমারোহে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বয়ং পাত্র নরনারায়ণ ও তাঁহার চারি জন পারিষদ গীতাকে দেখিতে আসেন। শান্তশীল বাবু তাঁহাদিগকে তাঁহার বাহিরের পড়িবার ছোট ঘরখানিতে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বসাইয়া গীতাকে আনিতে গেলেন। গীতা অভিমানভরে পিতাকে বলিল,—'কি অপরাধে মেয়েকে আজ পরের হাতে তুলে দেবার জন্য এত ব্যগ্র হয়েছেন, বাবা ?'

শান্তশীল বাবু কন্যার মাথার উপর হাতখানি রাখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—'এর মালিক কি আমাকেই মনে কর মা ? শিক্ষার অভিমান যতটুকু থাকুক না কেন, ভবিতব্যের অমোঘ শক্তিকে এখনও বিশ্বাস করি। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবেই, আমাদের চেষ্টা বা ব্যগ্রতা কিছুই নয়।'

পিতার সহিত বাহিরের ঘরে আসিবামাত্র গীতা শিহরিয়া উঠিল। এসেন্স ও পাঁচটি প্রাণীর মুখবিবরনিঃসৃত সিগারেটের ধূমে ঘরখানি তখন ভরপুর। তাহার পিতার সম্মুখেও অপরিচিত আগন্তুকদের এরূপ অসঙ্কোচে ধূমপানের ঘটা দেখিয়া গীতার অন্তর ঘৃণা ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতার উপদেশ মনে পড়িয়া তাহাকে সংযত করিয়া দিল—গৃহে অভ্যাগত ব্যক্তির অপরাধ উপেক্ষা করাই উচিত। এই সময় এক জন একখানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া গীতার দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল,—'যদিও আমরা আপনার অতিথি, কিন্তু এখন এ ঘরে আমরাই আপনার অভ্যর্থনা করছি,—এই চেয়ারখানি গ্রহণ করতে হুকুম হোক্।' সঙ্গে সঙ্গে আর এক জন শান্তশীল বাবুর দিকে চাহিয়া সিগারেটের ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে বলিল,—"মিঃ ব্যানার্জ্জী, মাপ করবেন, আপনি একটু অন্তরালে গেলেই ভাল হয়, আমরা ততক্ষণ এঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়টা ক'রে নিই।"

শান্তশীল বাবুর সদাহাস্যময় মুখখানিও অন্ধকার হইয়া উঠিল, তিনি কি করিবেন, তাহাই হয় ত ভাবিতেছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় আরক্তমুখে দৃপ্তস্বরে গীতা তাঁহার হাতখানি ধরিয়া বলিল,—"চলুন বাবা, আমরা যাই। আর, এঁদের জানিয়ে দিন যে, আগে শিষ্টাচার ও ভদ্রতা শিক্ষা ক'রে, তার পর যেন এঁরা মিঃ ব্যানার্জ্জীর মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে আসেন।"

গীতার এই দুর্ব্বার প্রকৃতির তাড়নায় ভবিতব্য সভয়ে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই দিনই ঘটক-ঠাকুরের সহিত নির্ম্মলাদের প্রাসাদতুল্য ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলে সাতটি দিনের মধ্যেই মহা আড়ম্বরে পূর্ণিয়ার এই মহামান্য জমীদারের সহিত নির্ম্মলার শুভপরিণয় সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহের পর ঘটক-বিদায়ের সময় যজ্ঞেশ্বর বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই পাত্রকে নিয়ে তুমি গিয়েছিলে ঠাকুর 'অন্তভক্তো ধনুর্গুণঃ' শান্তশীলের মেয়ে শিকার করতে ? খুঁটেকুড়ুনীর মেয়ে, সে হবে জমীদারের বউ !" ঘটকও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়াছিল,—"আমার তাতে দোষ ছিল না হুজুর, ছুঁড়ীটা পাস করেছে শুনে,

আপনার জামাই বাবাজীই তাকে দেখতে চান, শেষে শর্ম্মাই এমন টান দিল যে, একবারে হুজুরের মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলো, একেই বলে ভবিতব্য।'

৩

যদিও বিবাহের সময় যজ্ঞেশ্বর বাবু ভাবিয়াছিলেন, নামী জমীদারের ঘরে নির্ম্মলার বিবাহ দিয়া তিনি খুবই জিতিয়াছেন, কিন্তু দুইটি বৎসরের মধ্যেই জামাতার চরিত্রগত সকল কীর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্যগত বিপুল ঋণের সন্ধান পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত মনে মনে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, শাস্ত্রীদের উপর টক্কর দিয়া তাড়াতাড়ি এই বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন করাতে তিনি রীতিমতভাবেই হারিয়াছেন, মোটেই কোন দিকেই জিতিতে পারেন নাই।

জমীদারের বধূরূপে নির্ম্মলাও নিজেকে অহঙ্কারের শীর্ষে তুলিয়াছিল, কিন্তু সেও শীঘ্রই বুঝিয়াছিল যে, স্বামীর হৃদয় সে ত পূর্ণমাত্রায় অধিকার করিতে পারে নাই, এবং তাহার স্বামীর ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও সে যাহা শুনিয়াছে, তাহাও যে কোন দিন তাসের প্রাসাদের মত ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এমন মানসিক অবস্থার মধ্যেও যদি কখনও তাহার সমবয়স্কা কোন মেয়ে বা তাহার আশৈশব প্রতিদ্বন্দ্বিনী গীতার সঙ্গে কোথাও দেখা হইত, তখন তাহার স্বামীর অতুল ঐশ্বর্য্য ও অপ্রতিহত প্রতিপত্তির পরিচয় তাহারই মুখ দিয়া এমন অতিরঞ্জিতরূপে বাহির হইত যে, অন্য সকলে অবাক্ হইয়া শুনিলেও প্রসঙ্গটির মোড় ফিরাইবার জন্য গীতাকেই হয় ত মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিতে হইত, 'ভাগ্যিস, আমি তাকে তখন ফিরিয়ে দিয়েছিলুম, তাই না তুই এই অতুল ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বেশ্বরী হয়েছিস্; আমার কিন্তু এখন হিংসে হচ্ছে, নির্ম্মলা!'

নির্ম্মলা তাহার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছিল, গীতা তাহাকে কিরূপ অভদ্রভাবে অপমান করে এবং সে জানে যে, সেই অপমান এখনও বিষের কাঁটার মত তাহার স্বামীর মনে কি ভাবে বিঁধিয়া আছে। সুতরাং রহস্যচ্ছলেও যে ইহা গীতার একটা তীব্র উপহাস, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় না। বাড়ীতে ফিরিয়া স্বামীকে গীতার কথা বলে, নর-নারায়ণের সুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে কত কি মতলব ভাঁজিতে থাকে।

যজ্ঞেশ্বরের উপদেশ অনুসারে নর-নারায়ণ পূর্ণিমার কাছারী কাশীতে তুলিয়া আনিয়াছিল। এখান হইতেই জমীদারীর কাযকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। জমীদারীর বার্ষিক আয় হাজার দশেক টাকা, কিন্তু ঋণের পরিমাণ আশী হাজারের উপর। আরও কুড়ি হাজার টাকা ঋণ করিয়া নর-নারায়ণ এক কারবার ফাঁদিবার চেষ্টায় ছিল। এলাহাবাদের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার প্রসিদ্ধ ধনী সত্যহরি গাঙ্গুলীর বিধবা মাতঙ্গিনী দেবীর নিকট সমস্ত জমীদারী বন্ধক রাখিয়া এক লক্ষ টাকা লইবার প্রস্তাব চলিতেছিল। নর-নারায়ণের উদ্দেশ্য, পুরাতন দেনা চুকাইয়া বাকি টাকায় রেশমের কারবার করা। মাতঙ্গিনী দেবী প্রস্তাবের উত্তরে জানাইলেন যে, তাঁহার তরফ হইতে কোন কর্ম্মচারী যাইতেছেন, কাগজপত্র দেখিয়া তিনি যদি সন্তুষ্ট হন, টাকা দিতে তাঁহার আপত্তি হইবে না।

মাতঙ্গিনী দেবীর প্রেরিত কর্ম্মচারীটিকে আয়ত্ত করিতে নর-নারায়ণকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইল না। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের পরম সুন্দর ও বলিষ্ঠ-দেহ যুবকটি যখন ছিন্নপ্রায় জুতা, অর্দ্ধ-মলিন কাপড় ও তালি-দেওয়া জীর্ণ কোটটির বাহার দিয়া আড়ম্বরপ্রিয় ভূস্বামী নরনারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে কর্ত্রীর পত্রখানি প্রদান করিল, নর-নারায়ণ প্রথমে আড়-নয়নে তাহাকে দেখিয়া পত্রে মনোনিবেশ করিল। পরক্ষণে মহা বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল,—'তুমি? তুমি মাতঙ্গিনী দেবীর এষ্টেটের সুপারভাইজার?'

মস্তক নত করিয়া বিনীতভাবে কর্ম্মচারী উত্তর দিল,—'আজ্ঞে, আমি ও সব কিছু নই, হুজুর,—হাঁ, তবে আমি এক জন সামান্য চাকর বটে!'

"কত মাইনে তুমি পাও?"

"আজ্ঞে, মা'র কাছেই খেতে পরতে পাই, দরকার হ'লে নগদও কিছু কিছু পাই। আর দরকার ত হয় না, আর ত আপনার বলতে কেউ নেই!"

"বিয়ে-থা করনি বুঝি?"

"আজ্ঞে না,—এ গরীবকে মেয়ে কে দেবে বলুন। এখন আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়, হুজুর?"

হুজুর বুঝিলেন যে, এরূপ দীন-দরিদ্র কর্ম্মচারীকে আয়ত্ত করিয়া ঋণের অনুকূলে উত্তম রিপোর্ট আদায় করিতে তাঁহাকে বিশেষ কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। একটু

চিন্তা করিয়া বলিল,—'তা হ'লে আমাদের কাগজপত্র তুমিই দেখবে ত?'

কর্ম্মচারী বলিল,—"অবশ্য, যদি হুজুরের আদেশ হয়।"

"জমীদারী কাগজ দেখা-শোনার অভ্যাস আছে ত?"

"তা একটু আধটু জানি বৈ কি হুজুর, মাও ইদানীং কখানি জমীদারী কিনেছেন কি না, তাই শিখতে হয়েছে।"

নরনারায়ণ সরকারকে ডাকিয়া নবাগত কর্ম্মচারীটির থাকিবার ও আহারাদির ব্যবস্থা করিবার অদেশ দিল। কিন্তু কর্ম্মচারীটি হাতযোড় করিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল,—"যখন এসেছি, হুজুরের অন্ন খাব বৈ কি; কিন্তু কর্ত্তামা'র একান্ত ইচ্ছা, যতক্ষণ তাঁর কায করব, ততক্ষণ কাশীতে যেন প্রতিগ্রহ না করি। তিনি আমার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, আমিও অন্যত্র বাসা নিয়েছি। আগে কার্য্য সমাধা হোক, তার পর হুজুরের কাছে অনুগ্রহ-প্রার্থী অবশ্যই হব।"

এই যুবা কর্ম্মচারীটির নাম মৃত্যুঞ্জয়। যে কর্ত্রীর পত্র আনিয়া সে নরনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিল, সেই কর্ত্রীর আর একখানি পত্র লইয়া সেই দিন সন্ধ্যার সময় সে শান্তশীল বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। শান্তশীল বাবু তখন বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। গীতা সে দিনের লীডার পড়িতেছিল, তিনি শুনিতেছিলেন। এমন সময় সেই কক্ষে মৃত্যুঞ্জয় প্রবেশ করিয়া প্রথমে একটু কুণ্ঠিত হইল, পরক্ষণে নতমস্তকে শান্তশীল বাবুর পদধূলি লইয়া বলিল,—"আমাকে বোধ হয় চিনতে পারছেন না, স্যর?"

বিস্ময়ের সহিত শান্তশীল বাবু বলিলেন,—"মনে ত পড়ছে না, কোথা থেকে আসছ বল ত?"

মৃত্যুঞ্জয় ঈষৎ হাসিয়া পত্রখান তাঁহার হাতে দিল। শান্তশীল বাবু সাগ্রহে পত্রখানি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই অবসরে মৃত্যুঞ্জয় প্রশংসমান নয়নে গীতার দিকে চাহিল, গীতাও এই অসাধারণ বলিষ্ঠ ও সুগঠিত-দেহ যুবাটির কুণ্ঠাশূন্য নির্ভীক মুখখানির দিকে চাহিয়াছিল,—উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইবামাত্র সে খবরের কাগজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, মৃত্যুঞ্জয় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"আপনিই কাগজ পড়ছিলেন না? আপনার উচ্চারণ ও পড়বার ক্ষমতা ত চমৎকার! আমরাও অমন সুন্দর ও সুস্পষ্ট ক'রে পড়তে পারি না বোধ হয়।"

চিঠি পড়িয়াই শান্তশীল বাবু সাদরে মৃত্যুঞ্জয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—"আরে, তুমি যে গীতার মামার বাড়ীর দেশের লোক হে! সত্য বাবু কি স্নেহটাই না করতেন আমাদের, মাতু দিদি ছিলেন গীতার মা'র 'মনের কথা!' সে সব অতীত স্মৃতি এখন স্বপ্ন! তুমি মাতু দিদির ষ্টেটে কায কর? বেশ, বেশ, যে কদিন কাশীতে থাকবার আবশ্যক, এখানেই থাকবে। আমি কিন্তু তোমাকে কখনো দেখেছি ব'লে ত মনে পড়ছে না।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল,—"এলাহাবাদে থাকতে দিনকতক আপনি কায়স্থ কলেজে অফিসিয়েটিং করেছিলেন, সেই সময়—"

শান্তশীল বাবু বলিলেন,—"হাঁ, হাঁ, মাসখানেক মাত্র সেখানে আমি হিষ্ট্রী পড়িয়েছিলুম—মিঃ বোসএর অনুপস্থিতিতে। তুমি মাতু দিদির ষ্টেটে শুধু কাযই কর, না আর কোন সম্পর্ক আছে তাঁর সঙ্গে?"

বিনীতভাবে মৃত্যুঞ্জয় উত্তর দিল,—"আমি তাঁরই আশ্রিত, ছেলের মতই তিনি আমাকে স্নেহ করেন। এম, এ পাস করেই আমি এই ষ্টেটের কায দেখছি।"—এখানকার কাযের কথা মাতঙ্গিনী দেবীর পত্রেই লেখা ছিল। শান্তশীল বাবু সাদরে এই নবাগত অতিথিকে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বরণ করিয়া লইলেন।

৪

সপ্তাহের মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয় তাহার সরল ব্যবহার, বিনয়নম্র সুস্পষ্ট কথা ও মধুর প্রকৃতির পরিচয় দিয়া শান্তশীল বাবুকে যেমন আপ্যায়িত করিয়া ফেলিল, অসাধারণ আত্মমর্য্যাদা-শালিনী মনস্বিনী গীতাকেও তেমনই তাহার প্রতি অনেকটা আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইল। দরিদ্রের সুখ-দুঃখ ও মনের মর্য্যাদার সম্মান দরিদ্রই ভাল বুঝে। কাযেই এই শিক্ষিত শিষ্টাচারী দরিদ্র যুবাটির কার্য্যকলাপ পিতাপুত্রীর প্রীতি-বর্দ্ধনই করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, জমীদার নরনারায়ণ বাবুর মৃত্যুঞ্জয়কে আয়ত্ত করিবার প্রচেষ্টা ও এই সূত্রে এই দরিদ্রের সম্মুখে বিবিধ প্রলোভনের বিকাশ এবং এই যুবার সসম্ভ্রমে তাহা সমস্তই প্রত্যাখ্যান, উদ্ধত জমীদারের সম্মান ক্ষুণ্ণ করিলেও প্রকাশ্যভাবে কিছু না বলিলেও, মনে মনে সে দগ্ধ হইতেছিল।

অল্পদিনের মধ্যেই কোন সূত্রে নরনারায়ণ অবগত হইল যে, মৃত্যুঞ্জয় শান্তশীলের বাড়ীতেই আশ্রয় লইয়াছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র শান্তশীলের নামের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কন্যা গীতার উপেক্ষা ও তাহার সেই তীব্র অবমাননার উক্তি স্মৃতিপথে উপস্থিত হইয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। মৃত্যুঞ্জয় জমীদার বাবুর খাস-কামরায় আহূত হইলে শান্তশীল ও তাহার কন্যার সম্বন্ধে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন উঠিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত করিয়া দিল। মৃত্যুঞ্জয় যখন বিনীতভাবে নরনারায়ণকে জানাইল যে, শান্তশীল বাবুর নিকট এক সময় সে অধ্যয়ন করিয়াছিল, সেই জন্যই গুরুগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন নরনারায়ণ উত্তেজিতভাবে তাহাকে বলিল,—"তুমি ওখানে উঠে খুবই অন্যায় করেছ। কেন না, আমি ওদের আমার পরম শত্রু বলেই মনে করি। শান্তশীলের মেয়ে আমাকে যে অপমান করেছে, আমি তা মনে গেঁথে রেখেছি, এর শোধ এক দিন নেবই—"

মৃত্যুঞ্জয় হাসিয়া বলিল,—"দেখুন হুজুর, আমি হচ্ছি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরদারী করবার স্পর্দ্ধা রাখি না; তবু মনে কৌতূহল হয় এ কথা জানতে যে, তাঁর মত নিরীহ প্রফেসরের মেয়ে আপনার মত শক্তিমান জমীদারকে কি ক'রে অপমান করতে সাহস করেন—"

রাত্রিকাল, কাযেই নরনারায়ণ বাবু চিরন্তন অভ্যাসানুসারে একটু অপ্রকৃতস্থই ছিলেন। সুতরাং গীতাকে দেখিতে গিয়া যে ভাবে তিনি অপমানিত হইয়াছিলেন, সমস্তই প্রকাশ করিলেন এবং এই অবমাননার প্রতিশোধ লইতে তিনি, তাঁহার স্ত্রী, এমন কি, তাঁহার শ্বশুর পর্য্যন্ত যে বৈধ অবৈধ যাবতীয় উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত, তাহাও জানাইয়া দিয়া শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন,—"ওর কুলে যদি আমি কালি দিতে না পারি, ঐ ছুঁড়ীকে যদি না বেইজ্জত করি, আমার নাম নরনারায়ণ মুখুয্যে নয়।"

মৃত্যুঞ্জয়ের মুখখানি মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আরক্ত হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল,—"হতে পারে তার অন্যায়, কিন্তু তার বাপের প্রতিষ্ঠা এখানে ত সামান্য নয়; তাঁর মেয়েকে—"

বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে নরনারায়ণ বলিল,—টাকায় কি না হয়। আমি কি স্থির করেছি জান, একটা পাস-করা বেকারকে পয়সা দিয়ে বাধ্য ক'রে ঐ ছুঁড়ীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়াব, তার পর—"

পরের কথা আর প্রকাশ করা হইল না, মদের ঝোঁকে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াই তাহার হুঁস হইল যে, কথাটা বলিতেছে কাহার কাছে, যে তাহাদেরই আস্তানায় আশ্রয় লইয়াছে!

মৃত্যুঞ্জয় বলিল,—"টাকার মারই মার, টাকাই প্রকৃত বল। হুজুরের টাকাও যেমন, বুদ্ধিও তেমন।"

হুজুর এবার মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন,—"বড়মানুষ হতে চাও, মৃত্যুঞ্জয়? দারিদ্র্য ঘুচে যাবে, যদি আমার কথা শোন।"

মৃত্যুঞ্জয়ের দুই চক্ষু যেন লোভের লালসায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু অবিচলিত স্বরে উত্তর দিল,—বড়মানুষ হবার সাধ আগে ছিল না, হুজুর; কিন্তু হুজুরের কথায় এখন সে সাধ হয়।"

"দশ হাজার টাকা তোমাকে নগদ দেব, আর মাসে একশ টাকা মাইনের পাকা চাকরী।"

উদ্বেলিত স্বরে মৃত্যুঞ্জয় বলিল,—"কিন্তু কি করতে হ[illegible] সেইটিই আগে শুনিয়ে দিন, হুজুর।"

হুজুর মৃত্যুঞ্জয়কে পার্শ্বে বসাইয়া কাণে কাণে অস্ফুটস্ব[illegible] কতকগুলি কথা শুনাইয়া দিলে, মৃত্যুঞ্জয় কষ্টে আত্মদ[illegible] করিয়া গাঢ়স্বরে বলিল,—"তার পর কে ম্যাও ধরবে, হুজুর আমি প্রার্থী হলে, আর আপনার দেওয়া দশ হাজার টাক[illegible] কোম্পানীর কাগজ দেখালে হয় ত শান্তশীল বাবুর মেয়ে[illegible] বিবাহ করতে পারি, কিন্তু তার পর—"

নরনারায়ণ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—"লেখাপ[illegible] শিখে দেখছি স্বাভাবিক বুদ্ধিও হারিয়ে বসেছ! আ[illegible] পাগল, তার পর আর তোমার ভাবনা কি? ম্যা[illegible] সামলাবে এই শর্ম্মা। তুমি তাকে নিয়ে আমার পূর্ণিয়া কাছারীতে চ'লে যাবে,—অবশ্য আমার নাম বরাবর গোপ[illegible] করেই যাবে। তার পর সেখানে গিয়ে আমি আমার ম[illegible] বুঝে নেব, সেখানে আমার সাত খুন মাপ, বুঝেছ?"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "বেশ, হুজুরের প্রস্তাবমতই কায করতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু তার আগে এদিককার কাযটা ত শে[illegible] করতে হবে।"

হুজুরের এতক্ষণে আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে হুঁস হই[illegible]

মৃত্যুঞ্জয়ের পিঠে সজোরে সাদর চাপড় দিয়া বলিল,—"বাহা-দুর ছেলে তুমি, আসল কাযের কথা ভোল নি। ঐখানেই যে সব। এই সপ্তাহেই মর্টগেজের কাযটা শেষ ক'রে ফেল,—কায শেষ হবামাত্রই দশ হাজার টাকার কাগজ তোমার নামে কিনে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেব।"

"হুজুরই প্রতিপালক!" বলিয়া সসম্ভ্রমে মস্তক নত করিয়া মৃত্যুঞ্জয় রাত্রি প্রায় ১০টার পর বিদায় গ্রহণ করিল।

নরনারায়ণ আর একটি পেগ্ লইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, -"গোড়াতে সব শালাই ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়, শেষে লোভের ঠেলায় নর্দ্দামায় নেতিয়ে পড়ে!"

৫

পরদিন প্রভাতেই অবসর বুঝিয়া মৃত্যুঞ্জয় গীতাকে ডাকিয়া অসঙ্কোচেই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিল। সে কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই সহজভাবেই বলিল,—"এই কয় দিনের ঘনিষ্ঠতায় তোমরা আমাকে নিতান্ত আপনার ক'রে নিয়েছ বলেই তোমাদের কাছেই কথাটা আগে তুলতে সাহস করছি। তোমাদের কাহিনী যতটুকু জেনেছি, তাতে শুধু ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর ক'রে আমি যদি তোমার পাণিপ্রার্থী হই, হ'লে বোধ হয় সে প্রার্থনা আমার পূর্ণ হওয়া অসম্ভব নয়?"

অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ হইতে এরূপ প্রস্তাব শুনিয়া, গীতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার মুখে আনন্দ ও বিষাদের কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। একটু পরে মৃত্যুঞ্জয়ের উজ্জ্বল চক্ষু দুইটির উপর নিজের পরিপূর্ণ দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য নিক্ষেপ করিয়া পরক্ষণে সে দৃষ্টি নত করিয়া গীতা বলিল,—"আমার বিবাহের প্রসঙ্গ উঠলেই বাবা ব'লে থাকেন, যদি কোনও উপযুক্ত পাত্র আমাকে তাঁর উপযুক্ত মনে করেই তাঁর কাছে প্রার্থী হন, তিনি তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। যদি আপনি নিজেকে উপযুক্ত মনে করেন, আমাকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে. আর আপনার উপযুক্ত হবার সামর্থ্য আমারও আছে কি না, সে বিষয়ে যদি আপনার ধারণা থাকে, আপনি বাবার কাছে প্রার্থনা ক'রে দেখতে পারেন।"

মৃত্যুঞ্জয় সোৎসাহে বলিল,—"তবু তোমার মুখেই তোমার নিজের যে ইচ্ছা এ সম্বন্ধে, সেটা জানবার সৌভাগ্য হতে আমাকে বঞ্চিত করো না গীতা, তোমার ইচ্ছাটাই যে আমার আগে জানা দরকার।"

গীতা হাসিয়া বলিল,—"আমার নিজের ইচ্ছাটা আরও সুস্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করতে হ'লে, শ্রোতা ও শ্রোত্রী উভয়কেই একসঙ্গে অনেক নীচে নেমে যেতে হয়, এ কথা বোধ হয় আপনি অস্বীকার করবেন না।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল,—"না, তা করি না। শিক্ষার যত অভিমান থাকুক না কেন, সংস্কারের মোহ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারি নি। তাই না আকাঙ্ক্ষণীয় জিনিষটি বার বার দেখবার স্পৃহা হয়, আশার কথা আরও স্পষ্ট ক'রে শোনবার লোভ হয়।"

গীতা সংক্ষেপে বলিল,—"বাবার আদেশই আমার কাছে বেদবাক্য।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল,—"কিন্তু আমি ত জানি না গীতা, তোমার বাবা তোমার উপযুক্ত পাত্রের যোগ্যতা নির্দ্ধারণের কি উপায় ভেবে রেখেছেন। আমার নিজের যোগ্যতা বলতে ইউনিভার্সিটির কয়েকটা ডিগ্রী, আর মাসিক আয় একশটি মাত্র মুদ্রা ত—"

গীতা বলিল,—"আমার বাবাও একশ টাকার উপর নির্ভর ক'রে পৈতৃক সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়েছিলেন। টাকার দিক দিয়ে যোগ্যতা যাচাই করা যদিও আজ সমাজের ফ্যাসান হয়েছে, কিন্তু আমার বাবার সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র।"

কথাটা অবশেষে মৃত্যুঞ্জয়কেই একটু সঙ্কোচের সহিত শান্তশীল বাবুর নিকট তুলিতে হইল। তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীর-ভাবে কি ভাবিলেন, তাহার পর মৃত্যুঞ্জয়ের উজ্জ্বল মুখের উপর নির্ম্মল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গীতা এ প্রস্তাব শুনেছে? তার কি মত?"

নত-মস্তকে মৃত্যুঞ্জয় বলিল,—"তাঁর ত নিজের কোন মত নেই, আপনার মতেই তাঁর মত; তবে কথাপ্রসঙ্গে এটুকু বুঝেছি, দরিদ্রের উপর তাঁর যেমন দ্বেষ নাই, ঐশ্বর্য্যের দিকেও তেমনই লালসা নাই, দরিদ্র যদি আপনার স্নেহানুগ্রহের অধিকারী হয়, সে দারিদ্র্যকে মহত্ত্ব দিয়ে বরণ করতে তিনি বিরূপ নন।"

গীতা বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। পিতা তাহাকে ভিতরে ডাকিলেন। গীতা আসিতেই শান্তশীল বাবু বলিলেন,—"আমি প্রস্তাবটি শুনেছি মৃত্যুঞ্জয়ের মুখে। তোমারও মুখ

দেখে মনে হচ্ছে, এতে তোমার উৎসাহের অভাব নেই। এক দিন তুমি ঐশ্বর্য্যের ঔদ্ধত্য দেখে তাকে যেমন ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিলে, আজ তেমনই দারিদ্র্যের মধ্যেও অমৃতের সন্ধান পেয়ে তাকে মহত্ব দিতে চেয়েছ জেনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা চিরসুখী হও, শান্তি পাও।"

গীতা তৎক্ষণাৎ গলায় আঁচলখানি টানিয়া দিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতাকে প্রণাম করিল। মৃত্যুঞ্জয়ও সেই পবিত্র সম্মান-লাভে বঞ্চিত হইল না।

সেই দিনই অপরাহ্ণে মৃত্যুঞ্জয় নরনারায়ণকে সংবাদ দিল যে, তাহার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে। এখন বিবাহের একটা দিনস্থির হইলেই হয়। নরনারায়ণ তখন তাহার খাস-কামরাতেই ছিল, সংবাদটি শুনিবামাত্র স্বহস্তে একটি পেগ্ লইয়া মৃত্যুঞ্জয়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—"তুমি যে শুভ-সংবাদ শুনিয়ে দিলে, এই তার পুরস্কার।"

মৃত্যুঞ্জয় দন্তে জিহ্বা কাটিয়া দুই পা পিছাইয়া বলিল,— "ও আদেশ এখন করবেন না হুজুর, ধাপে ধাপে উঠতে দিন। একেবারে এত উঁচুতে লাফিয়ে উঠতে হ'লে শেষে সবই পণ্ড ক'রে ফেলব।"

নরনারায়ণ বলিল,—"তোমার অনেক গুণ থাকলেও এমন দু একটা দোষ দেখি, যা সহজে বরদাস্ত করা যায় না। আমি তোমাকে নিজের হাতে পেগ্ দিতে গেলুম, তুমি তা নিলে না—"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল,—"হুজুরের হাত থেকে পেগ্ নেওয়া সামান্য বেয়াদপির কথা নয়!—যা হোক, অপরাধটা আপাততঃ মার্জ্জনা করতে আজ্ঞা হোক।—হাঁ, ভাল কথা, আমি আপনার সম্বন্ধে খুব ভাল রিপোর্টই এলাহাবাদে পাঠিয়েছি, তা বোধ হয় শোনেন নি?"

নরনারায়ণ বলিল,—"তাই না কি? তা আমি ত কিছু শুনিনি, আর তুমি বলও নি ত আমাকে।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল,—"কাল থেকে দলিলপত্র লিখবার হুকুম দিন, সপ্তাহের মধ্যেই কায হাঁসিল হয়ে যাবে জানবেন।"

এই আনন্দ-সংবাদ শুনিয়া হুজুর আনন্দে অগত্যা নিজেই পুনঃ পুনঃ পেগ্ চালাইতে আরম্ভ করিল,—গতিক দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় বাহির হইয়া আসিল।

৬

ইতিমধ্যে যজ্ঞেশ্বর বাবুর ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সংসারেও ঐশ্বর্য্যেশ্বরী কমলার আসন টলিয়াছিল। যজ্ঞেশ্বর এক দালালের পাল্লায় পড়িয়া সেয়ারের কাযে নামিয়াছিলেন। নগদ সমস্ত টাকা তুলিয়া এবং মহাজনদের নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা উচ্চ সুদে কর্জ্জ লইয়া সেয়ারের কারবার আরম্ভ করেন। এজন্য তাঁহাকে প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতে হইত। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে সেয়ারের বাজারের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া পড়িল যে, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও আনাড়ী যজ্ঞেশ্বরকে প্রমাদ গণিতে হইল। এই সময় তাঁহার আর এক নেশা জুটিয়াছিল—রেস্ খেলা। প্রথম প্রথম ইহাতে মোটা মুনফা পাইয়া, সেয়ারের বিজ্‌নেসে ন্যস্ত টাকা বহু লোকসান দিয়া তুলিয়া লইয়া রেসকোর্সে ভাগ্যপরীক্ষা করিতে নামিয়া পড়িলেন। ইহার পরিণাম, অধিকাংশেরই যাহা হয়, যজ্ঞেশ্বরের অদৃষ্টেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন তিনি কাশীতে ফিরিলেন, তখন হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখিলেন, বাড়ী কয়খানি ও ভূসম্পত্তি ব্যতীত নগদ টাকা আর কিছুই নাই, যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেনা করিয়াছিলেন, তাহা সুদের ভার মাথায় করিয়া ঠিক দাঁড়াইয়া আছে। সেয়ার ও রেসের মোহ তাঁহার চালানী কারবারকে পূর্ব্বে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। এখন মহাজনরা টাকার জন্য তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। এই সময় জামাতা নরনারায়ণের বন্ধকী দলিল প্রস্তুত হইতেছিল। সমস্ত অবগত হইয়া যজ্ঞেশ্বর এখন জামাতার মধ্যস্থতায় মৃত্যুঞ্জয়ের শরণাপন্ন হইলেন। কাশীর বাড়ী ও সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ষাট হাজার টাকা মাতঙ্গিনী দেবীর ষ্টেট হইতে দেওয়াইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ত চলিলই, উপরন্তু একটা মোটা রকমের টাকা মৃত্যুঞ্জয়কে উপহার দিবার প্রলোভন দেখাইতেও যজ্ঞেশ্বর কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। মৃত্যুঞ্জয় প্রস্তাব শুনিয়া হাসিয়া বলিল,—"ও সব কথা পরেই হবে, আগে ত আপনার কার্য্যটি উদ্ধার করবার চেষ্টা দেখি।"

এই দিনই কথায় কথায় প্রকাশ পাইল যে, মৃত্যুঞ্জয় শান্তশীলের কন্যাকে বিবাহ করিতেছে। কথাটা কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের নিকট শুভসূচক হইল না। যদিও মৃত্যুঞ্জয় অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী মাতঙ্গিনী দেবীর ষ্টেটের এক জন সাধারণ কর্ম্মচারী মাত্র, আজ যজ্ঞেশ্বর এই ষ্টেটেই ইহার

ঋণ-প্রার্থী হইতেছে, তাই, নতুবা এই নগণ্য নফরের তাহার ন্যায় বরেণ্য ব্যক্তির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবারও যোগ্যতা থাকিত না,—তত্রাচ অত বড় অর্থশালী ষ্টেটের সহিত যে সংসৃষ্ট এবং যাহার কথার এতটা মূল্য, সে লোক যে জ্ঞাতি-শত্রু—শান্তশীলের সংস্পর্শে যায়, ইহা কোনমতেই তাঁহার নিকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল না। তিনি এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য, নিজেই অযাচিতভাবে মৃত্যুঞ্জয়কে গীতার সম্বন্ধে এমন সব বিচিত্র কথা শুনাইয়া দিলেন, যাহা মৃত্যুঞ্জয় এখনও শুনে নাই বা এক জন প্রবীণ ভদ্রলোকের মুখ হইতে, বিশেষতঃ যে লোক তাহার পরমাত্মীয়, তাহার পক্ষ হইতে এমন সব ইতর তথ্য শুনিবার প্রত্যাশাও কোন দিন করে নাই।

বাড়ীতে ফিরিয়া সেই দিনই সে শান্তশীল ও গীতার সমক্ষে যজ্ঞেশ্বর বাবুর ঋণ-প্রার্থনার কথা প্রকাশ করিল এবং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কি মত, তাহাও জানিতে চাহিল। গীতা নিরুত্তরে পিতার মুখের দিকে চাহিল। শান্তশীল বাবু গভীর দুঃখের সহিত বলিলেন,—"বল কি, যজ্ঞেশ্বর এতটা বিপন্ন হয়ে পড়েছে? কিন্তু বাবা, এ সম্বন্ধে আমি কি বলতে পারি বল, আর তার মূল্যই বা কি? জীবনে ত কখনও ঐশ্বর্য্য নিয়ে খেলা করবার সুযোগ ঘটেনি, ও সম্বন্ধে আমি যে প্রকাণ্ড আনাড়ী। হাঁ, তবে এ কথা আমি মনের সঙ্গে জোর ক'রে বলছি, যদি আজ আমার টাকা থাকত, আমি তার অভাব মোচন করতে সকলের আগেই ছুটতেম। যদি তোমার এ সম্বন্ধে কোন ক্ষমতা থাকে, আর তাতে বৈষয়িক ব্যাপার অসঙ্গত বা ও পক্ষের স্বার্থ-হানি না হয়, তা হ'লে অবশ্যই তোমার যজ্ঞেশ্বরের অনুরোধ রক্ষা করা উচিত। যে লোক দশ জনকে প্রতিপালনের উপলক্ষ হয়, সে বিপন্ন হ'লে তাকে সাহায্য করা শক্তিমানের অবশ্য-কর্ত্তব্য।"

শান্তশীল বাবুর অনুরোধ ব্যর্থ হয় নাই। দশ বারো দিনের মধ্যেই একই দিনে দুইখানি দলিল সম্পন্ন হইয়া গেল। রেজিষ্টারীর দিন যজ্ঞেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে একখানি একশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিতে গেলেন, মৃত্যুঞ্জয় সসম্মানে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল,—"ওতে ত আমার পেট ভরবে না হুজুর, এখন ওটা রেখে দিন,—আমি এর পর এক দিন আপনার বাড়ীতে গিয়ে দেখা ক'রে আমার পাওনা বুঝে নেব।"

যজ্ঞেশ্বর মনে মনে রুষ্টভাবেই ভাবিলেন,—পাজীটার খাঁই ছোট না, আচ্ছা, কায ত হয়ে গেল, এর পর তোমাকে বিল্বিপত্র শোঁখাবো—

৭

সে দিন কলেজ হইতে ফিরিয়া ডাকের মধ্যে শান্তশীল বাবু মাতঙ্গিনী দেবীর একখানি পত্র পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। খামের উপরই তাঁহার নামযুক্ত মোহর ছাপা ছিল। কৌতূহলভরে চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়াই সহসা যেন মুসড়াইয়া পড়িলেন। চিঠিখানি একটু বড়ই ছিল, এলাহাবাদে শান্তশীলের শান্তিময় বিবাহিত জীবন, পত্নী গায়ত্রীর গুণাবলি প্রভৃতি উল্লেখের পর মাতঙ্গিনী দেবী যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, গায়ত্রীর নিকট তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাঁহার কন্যা গীতাকে তিনি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবেন। গীতার গুণের পরিচয় তিনি তাঁহার কর্ম্মচারী মৃত্যুঞ্জয়ের পত্রেই পাইয়াছেন। তাঁহার পুত্র জ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ও সর্ব্বাংশে গীতার উপযুক্ত। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া সম্মানিত হইয়াছে। এখন শান্তশীল বাবুর ইচ্ছা হইলেই শুভকর্ম্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা হয়।

শান্তশীল বাবু দুইবার চিঠিখানি পড়িলেন। তাহার পর মুদিত-নয়নে বিশ্বনাথের চরণ চিন্তা করিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন,—"বিশ্বনাথ! তুমি ত এ অন্তরের সঙ্গে অপরিচিত নও, প্রভু! তবে এ পরীক্ষা কেন?"

ঠিক সেই সময় গীতা কক্ষে প্রবেশ করিয়া পিতার ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। তাহাকে দেখিয়াই আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি মাতঙ্গিনীর পত্রখানি গীতার হস্তে দিলেন। গীতা উদ্বেলিত-হৃদয়ে পত্রের প্রতি ছত্রটি পড়িয়া চলিল, পিতার মৌনমুগ্ধ নির্ম্মল দৃষ্টি কন্যার মুখের উপর আবদ্ধ হইয়া রহিল।

গীতার পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল, পিতাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। গীতার দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর পড়িবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সম্বন্ধে তোমার কি মত, মা?"

গীতা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দৃপ্ত স্বরে উত্তর দিল,—"যিনি এক দিন অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে, অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন পরিত্যাগ ক'রে রাস্তায় এসে

দাঁড়িয়েছিলেন, আমি তাঁরই মেয়ে। এর বেশী আর কি উত্তর দেব, বাবা ?”

শান্তশীল বাবুর দুই চক্ষু অশ্রুভারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিতস্বরে তিনি বলিলেন,—“স্বেচ্ছায় তুমি যা বেছে নিয়েছ মা, আশীর্ব্বাদ করি—তাতেই সর্ব্বসুখী হও।”

সেই দিনই শান্তশীল বাবু সবিনয়ে মাতঙ্গিনী দেবীকে পত্রযোগে জানাইলেন যে, তাঁহার নিকট হইতে এহেন অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ-প্রস্তাব আসিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার সুযোগ্য কর্ম্মচারী মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত গীতার বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অবস্থা বিবেচনা করিয়া যেন তিনি তাঁহাকে মার্জ্জনা করেন।

বাড়ীতে ফিরিবার পর গীতা মাতঙ্গিনী দেবীর চিঠিখানি মৃত্যুঞ্জয়কে পড়িতে দিল। তাহার হাস্যোজ্জ্বল চক্ষুদুটি মৃত্যুঞ্জয়ের তৎকালীন মুখের উপর ক্রীড়া করিতে লাগিল। চিঠি পড়িয়াই মৃত্যুঞ্জয়ের মুখখানি একবারে অন্ধকার হইয়া গেল।

গীতা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“এখন উপায় ? ডুয়েল লড়াও অসম্ভব, কেন না, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুপুত্র ; কাযেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাও সম্ভবপর নয়।”

মৃত্যুঞ্জয় বলিল,—“নিশ্চয়ই ; সেই জন্য নির্ব্বিচারে আমি আমার পক্ষ থেকে এ সম্বন্ধে আমার যতটুকু স্বত্ব, সবই তাঁর অনুকূলে পরিত্যাগ করছি, গীতা—”

গীতা উত্তর দিল,—“অবস্থাটা কিন্তু এখন এমন স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, যাতে এ পক্ষের স্বত্বও যে একটু আছে, তা, বোধ হয়, অস্বীকার করতে পারবেন না। কাযেই আপনার এই ত্যাগস্বীকারটি শোনবার আগেই বাবা এঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এখন আর উপায় নেই।”

মৃত্যুঞ্জয় মহাবিস্ময়ে বলিল,—“বল কি ?”

গীতা হাস্যোচ্ছ্বসিতস্বরে উত্তর দিল,—“বাবার পত্র নিয়ে কাশীর ‘মেল’ এতক্ষণ মোগলসরায়ে গিয়ে পড়েছে।”

চতুর্থ দিনেই শান্তশীল বাবুর পত্রের উত্তর আসিল। মাতঙ্গিনী দেবী লিখিয়াছেন,—“ভবিতব্যই মূলাধার। তাহারই প্রভাবে মৃত্যুঞ্জয় কাশীতে কায করিতে গিয়া ক’নে যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক, ইহাতেও আমার আনন্দ প্রচুর। মৃত্যুঞ্জয় তাহার স্বভাবমধুর প্রকৃতির গুণে আমার প্রাণাধিক প্রিয়। আমি তাহাকে পুত্র তুল্যই দেখি। এক্ষণে আমার এই মাত্র অনুরোধ যে, আমার পুত্রের বিবাহ যেরূপ সমারোহে সম্পন্ন হওয়া উচিত, সেইরূপ সমারোহেই মৃত্যুঞ্জয়ের বিবাহ কাশীতে হইবে এবং তাহার যাবতীয় ভার বহন করিবার অনুমতিটুকু যেন অসঙ্কোচেই আমাকে প্রদান করা হয়।”

শান্তশীল বাবু মাতঙ্গিনী দেবীর এই অনুরোধের অনুকূলেই অভিমত প্রদান করিলে, বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। কাশীবাসী সকলেই শুনিল, মাতঙ্গিনী দেবীর এক কর্ম্মচারীর সহিত শান্তশীল বাবুর কন্যা গীতার বিবাহ হইতেছে, এবং এই বিবাহ উপলক্ষে মাতঙ্গিনী দেবী স্বয়ং কাশীতে আসিয়া এমন সমারোহ-ব্যাপার করিবেন যে, কাশীতে তাহা কখনও সংঘটিত হয় নাই।

ফলতঃ, এ জনরব যে সত্য, শীঘ্রই নানাপ্রকারে তাহার নিদর্শন পাওয়া গেল। বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদ এই শুভ বিবাহের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া সুসজ্জিত হইতেছিল। কাশীর যাবতীয় পাচক বিবাহ-বাটীতে পূর্ব্ব হইতেই নিয়োজিত হইল। মহাসমারোহে সামগ্রী-সমূহ সংগৃহীত হইতেছিল। কাশীতে একটা প্রবল আন্দোলন পড়িয়া গেল। যথাসময়ে আত্মীয়-স্বজন, কর্ম্মচারী ও অনুচরবর্গের সহিত মাতঙ্গিনী দেবী বিজয়নগরের বাটীতে শুভাগমন করিলেন।

ইতিমধ্যে নরনারায়ণ মৃত্যুঞ্জয়কে সংগোপনে বিশেষভাবেই বলিয়া দিয়াছিল যে, তাহার অঙ্গীকৃত দশটি হাজার টাকা তোলাই আছে। বিবাহের পর মাতঙ্গিনী দেবীর কার্য্যে ইস্তফা দিয়া, তাহার নিয়োগপত্র লইয়া সস্ত্রীক পূর্ণিয়ার যাইবামাত্র ঐ টাকা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু সামান্য এক কর্ম্মচারীর বিবাহে মাতঙ্গিনী দেবীর এত ঘনিষ্ঠতা ও সমারোহের ঘটা দেখিয়া নরনারায়ণের মনের মধ্যে সহসা কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়া গেল! বিবাহের সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই যেরূপ জাঁকজমকের ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল, তাহাতে এ বিবাহ যে একটা অসাধারণ ব্যাপার, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সামান্য এক কর্ম্মচারীর বিবাহে এত ঘটা! কেন? যাহার বিবাহ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ের কথা রটনা হইয়াছে, সে কি বিবাহের পর, দশটি হাজার টাকার লোভে—

ঠিক এই সময় মূল্যবান্ উর্দ্দীপরা এক দীর্ঘদেহ শিখ দ্বারবান্ একখানি পত্র লইয়া পরিচারকের নির্দ্দেশমত চিন্তামগ্ন নরনারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সামরিক প্রথায়

সেলাম ঠুকিয়া পত্রবাহক পত্রখানি জমীদার বাবুর হস্তে প্রদান করিল। নরনারায়ণ আড়নয়নে দেখিল, শিখ দ্বারবানের উজ্জ্বল তকমায় স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে—এষ্টেট-মাতঙ্গিনী দেবী, এলাহাবাদ।

চিঠিখানি পড়া সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহার হাত হইতে উহা স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। নরনারায়ণের তখন মাথা ঘুরিতেছিল, দুই চক্ষু জোরে বিস্ফারিত করিয়াও সমস্তই যেন ঝাপসা দেখিতেছিল। পরিচারক চিঠিখানি তুলিয়া প্রভুর হাতে দিল। নরনারায়ণ আবার পড়িতে লাগিল।—পত্রে লেখা ছিল,—

কল্যাণীয় শ্রীমান্ নরনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কল্যাণবরেষু। অত্র পত্রে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তুমিই কাশীধামে আমার ষ্টেটের প্রধান খাতক। তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে তোমাকেই এই পত্র লিখিতেছি। যে যুবক মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা নামে আমার প্রতিনিধিস্বরূপ তোমার সেরেস্তার কাগজপত্র তদারক করিতে আসিয়াছিল, ও যাহার অভিপ্রায় অনুসারে অনুচিত হইলেও তোমাকে লক্ষ মুদ্রা কর্জ্জ দেওয়া হয়, সেই যুবা আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। মৃত্যুঞ্জয় তাহার রাশিগত নাম। খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া ছদ্মভাবেই সে কাশীধামে আসিয়াছিল। আগামী ৭ই অগ্রহায়ণ অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কল্যাণী শ্রীমতী গীতাদেবীর সহিত তাহার শুভ বিবাহ হইবে। সুতরাং এ শুভ অনুষ্ঠানে সকল বিষয়েই তোমার সহযোগিতার আবশ্যক হইবে। তোমার বাড়ীর পরিজনরাও এই মঙ্গলানুষ্ঠানে যোগ দিয়া আমাদের সম্প্রীতিবর্দ্ধন করে, ইহাও আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আমি সে সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিব। সময়মত তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সুখী হইব। ইতি—

এই দিনই যজ্ঞেশ্বর বাবুও এই মর্ম্মের একখানি পত্র পাইয়া বজ্রাহতবৎ স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইলেন!

আর নির্ম্মলা.—সে যখন শুনিল, গীতার সহিত যাহার বিবাহ হইতেছে, সে মাতঙ্গিনী দেবীর ষ্টেটের এক জন নগণ্য কর্ম্মচারী নহে, তাঁহারই একমাত্র পুত্র এবং এই স্থানে তাহার স্বামীর ও পিতার সমস্ত সম্পত্তি ঋণের দায়ে আবদ্ধ,—তখন সে রুদ্ধ নিশ্বাসে শয্যায় আশ্রয় লইল। সে দিন নির্ম্মলাকে কেহই জল পর্য্যন্ত পান করাইতে পারে নাই।

প্রকৃত সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। মাতঙ্গিনী নিজে আসিয়া বৈবাহিকের নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। শান্তশীল বাবু অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—"গীতা দারিদ্র্যের মধ্যেই অমৃতের আবিষ্কার করে, এখন তারই ভাগ্যে তার সঙ্গে অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার প্রকাশ পেলে। এ বিশ্বনাথের দান। ভবিতব্যের খেলা।"

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেমন্তের গান

ক্ষেতের বুকে ধানের সোনা
করছে রে ঝলমল!
দোদুল দোদুল দুলছে তাহা
পাগলা ছেলের দল।

ক্ষেতভরা ঐ ফসল খাসা
করল সফল চাষীর আশা
খুসীর জোয়ার বইছে বুকে
পরাণ টলমল।

দুখীর ঘরে পড়বে এখন
লক্ষ্মী মায়ের পদ্মচরণ,
কালো মুখে আলোর ধারা
ঝরবে খল্ খল্।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

কৈলাস-যাত্রী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

খাদ্যের মধ্যে তাকলাকোটে দুগ্ধ পাওয়ার সুবিধা ছিল। আমাদের তাঁবুর কাছে আসিয়া তিব্বতী রমণীরা প্রত্যহই দুগ্ধের পরিবর্ত্তে তঙ্কা লইয়া যাইতে ছাড়িত না। তবে প্রধান অভাব কাষ্ঠের। এ অভাব পূর্ব্বেও বরাবর দৃষ্ট হইয়াছে। গার্ব্বিয়াংএর নিকট হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া না আনিলে ইহার জন্য আমাদিগকে যথেষ্ট দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত। ক্ষেতে আশে-পাশে মটরশুঁটির গাছ। তাহাতে শুঁটি না ধরিলেও অভাবে অন্ততঃ কিছু শাক যাহাতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য রন্ধনের দ্বারা চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অকৃতকার্য্য হইয়াছি। বলে, ক্ষেতের মালিক এখানকার লামাগণ; কৃষকরা নহে। হায় রে, বাঙ্গালী! বাঙ্গালা ছাড়িয়া আজ রুচি-পরিবর্ত্তনের জন্য শাকের কাঙ্গাল!

এতগুলি যাত্রীর মধ্যে কেবল আমাদের ভাণ্ডারে তখনও কিছু কিছু আলু মজুত ছিল। আর আর দলে আলু অভাবে তরকারীর জন্য মুশকিল হইয়া পড়িল। বিশেষ, নিরামিষাশী পাবনার রায় মহাশয়ের বা উত্তরপাড়ার গঙ্গাধর ঘোষের কষ্টের অবধি ছিল না। রায় মহাশয়ের একবারমাত্র আহার লুচি, তাহার তরকারী হইল শুধু 'সৈন্ধব'! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার সহিষ্ণুতা অসীম, এই আহারেই তিনি পদব্রজে কৈলাস পর্য্যটন করিয়া সুস্থ-শরীরে বাটী ফিরিয়াছেন। স্বামীজী এবং ডাক্তারদের মধ্যে এক জন ছাড়া সকলেই মাংসাশী, তাঁহাদের এ পথে অরুচির কোন কারণই উপস্থিত হয় নাই। সর্ব্বত্রই সুবিধা মূল্যে প্রিয় খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এ বিষয়ে তাঁহাদের আল্মোড়ার পাচক 'পানসিং' একবারে সিদ্ধ-হস্ত ছিল। যাহা হউক, রন্ধনের পরিচিত কোন ব্যবসাদার অনেক কষ্টে এক দিন কিছু শুষ্ক মটর (কাল রংএর) সংগ্রহ করায় সকল দলেই কিছু কিছু বিভাগ করিয়া লওয়া হইল। দুই চারিদিন তেল-সংযোগে 'ঘুঘ্‌নীর' মত করিয়া যাত্রিগণ রুচি পরিবর্ত্তন করিতে পাইয়াছিলেন।

২রা শ্রাবণ প্রভাতে ৯টার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া সকলেই যাত্রা করিলাম। এখান হইতে কৈলাস মাত্র ৪ দিনের পথ। পুরাণ আলোচনা করিলে জানা যায়, কৈলাস যাইবার পথপ্রসঙ্গে নন্দীপুরাণে* উক্ত হইয়াছে, কেদার হইতে কিছুদূর যাওয়ার পরে তিনটি রাস্তা গিয়াছে, একটি বিষ্ণুপুর (বদরিকা) একটি ব্রহ্মপুর ও অপরটি কৈলাস।

"একং বিষ্ণুপুরং যাতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মবেশ্মনি।
কৈলাসমার্গং তৃতীয়ং ত্রিধা মার্গস্য লক্ষণম্॥"

কেদারকল্পে, ৫।৬৪ শ্লোক

সে পথ বিপৎ-সঙ্কুল বলিয়া আজকালকার যুগে যাত্রীরা অধিকাংশই (যদিও কেহ কেহ গিয়া থাকেন) সে পথ দিয়া কৈলাস যাইতে সাহস করেন না। তখনকার কালে শুধু পথ কেন, যাত্রার সময়ও পৃথক্ ছিল।

"আশ্বিনে মাসে সংপ্রাপ্তে গন্তব্যং শঙ্করালয়ম্।" ৫।১০

যাহা হউক, তখনকার কৈলাসযাত্রী আর কলিযুগের কৈলাস-যাত্রীতে প্রভেদ কত, তাহার বিচার করিতে গেলে কৈলাসযাত্রার যে পথই নির্দ্দিষ্ট থাকুক না কেন, উভয় কালেই এ তীর্থদর্শন যে আদৌ সহজসাধ্য ছিল না, তাহা উক্ত গ্রন্থ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

"বিনা রুদ্রপ্রসাদেন ন লভন্তে মহাপথম্।" ১।১৮

যাত্রাপ্রসঙ্গে এ কথার উল্লেখ করিতে পুরাণও বিস্মৃত হয় নাই। বরং আমরা এই তাকলাকোট হইয়া কৈলাসযাত্রার পথকে সে যুগের পথ অপেক্ষা সহজসাধ্য বলিয়াই মনে করিব।

এখান হইতে আমাদের যাত্রার বাহন হইল ঘোড়া ও ঝব্বু। ৪টি ঘোড়া ও ১৮টি ঝব্বু আমাদের বোঝা ও সওয়ার

---

* ইহা একখানি অতি প্রাচীন পুরাণ। "রাজতরঙ্গিণীতে" জলৌক নামক কাশ্মীরের এক জন রাজা ব্যাস-শিষ্যের নিকট এই পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিলেন—

"শ্রুতনন্দীপুরাণঃ স ব্যাসান্তেবাসিনো নৃপঃ।"

রাজতরঙ্গিণী—১—১২৩

ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয় বসুমতীর পাঠকবর্গকে যথেষ্ট জানাইয়া থাকিবেন।

জন্য লওয়া হইয়াছিল। যাত্রী ছিলাম সর্ব্বসমেত ২৩ জন। তন্মধ্যে কতক পদব্রজে গিয়াছিলেন। ৭ জন ঝব্বু-ওয়ালা ও এক জন গাইড (রঞ্জন) সঙ্গে অতিরিক্ত ছিল। ছুইটি আগ্নেয়াস্ত্র (একটি রিভলভার, অপরটি বন্দুক) থাকিলেও রঞ্জন তাহার পরিচিত ব্যবসাদারের নিকট হইতে আর একটি সাদা বন্দুক* সংগ্রহ করিয়া লইল। এইরূপে কতক পদব্রজে, কতক ঝব্বুতে, কতক বা ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া মিলিটারী সৈন্যদের ন্যায় আমরা যখন তাকলাকোট হইতে অগ্রসর হইলাম, তখন এই নবাগত যাত্রীদিগের প্রতি সেখানকার আশে-পাশের প্রায় প্রত্যেক তিব্বতীই অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিয়াছিল। এই তাকলাকোট হইতে যাত্রা এবং পুনরায় তাক-লাকোট পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসা ঝব্বু বা ঘোড়া প্রত্যেকটির ভাড়া ১২৲ টাকা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছিল। মানসদর্শন ও কৈলাস পরিক্রম করিয়া তাকলা-কোটে ফিরিয়া আসিতে সাধা-রণতঃ ১০।১২ দিন লাগিয়া থাকে।

রঞ্জন (আমাদের গাইড)

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রথমে আমি সকলের আগ্রহে ভীতচিত্তে একবার ঝব্বুতেই উঠিয়া বসি। সে অপরূপ জীব আমার 'ধুকধুক' অবস্থা বোধ হয় (বুদ্ধিমানের মত!) বুঝিয়া লইয়াছিল, তাই বসিবামাত্র সে এমন একটা দৌড় মারিল যে, উচ্চ পাড়ের (যেখানে আমাদের তাঁবু ছিল) কিনারায় লইয়া গিয়া পাছে আমাকে নীচে ফেলিয়া দেয়, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়া সকলের কথামত তাহার নাকের দড়িটি সে সময়ে ঘন ঘন টানিয়া যাইতেছিলাম। ঝব্বু কিন্তু কিছুতেই বাগ মানিতেছিল না। ঝব্বুওয়ালা কোনরূপে তাহাকে ধরিয়া ফেলায়, সে যাত্রায় নিস্তার পাইলাম। ভাড়া গণিয়া হাঁটিয়াই আগে চলিব মনস্থ করায় স্বামীজী ৪টি ঘোড়ার মধ্যে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক একটি ঘোড়া আমাকে দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ, দুই জন নারী-যাত্রী ও আমি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলাম। ভূপসিং, উত্তরপাড়ার দলের দুই জন ও ডাক্তারদলের কেহ কেহ ঝব্বুর উপরেই সওয়ার হইয়া চলিতেছিলেন।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, আমাদের কৈলাস-যাত্রায় "জুম্পান পুংপো"র (Governor) অনুমতি লই-বার কোন আবশ্যক দেখি নাই। কর্ত্তৃপক্ষ বোধ হয় বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তীর্থযাত্রা ব্যতীত আমাদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল না।

বোঝা লইয়া বন্ধুগণকে কর্ণালী নদীর পুল পার করিতে ঝব্বু-ওয়ালারা অর্দ্ধঘণ্টাকাল ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতে লাগিল; কিন্তু বোঝা লইয়া ঝব্বুগণ কিছুতেই পুলের উপর উঠিল না। বোঝা নামাইয়া বহু কষ্টে তাহাদিগকে পারে আনিয়া পুনরায় বোঝা তুলিয়া দেওয়া হয়। কর্ণালী নদীকে বামে রাখিয়া চলিতে চলিতে প্রথমে কয়েকখানি ছোট ছোট গ্রাম ও তাহার আশে-পাশে যব ও মটরশুঁটির কিছু কিছু ক্ষেত্রভূমি পার হইলাম। পরক্ষণে একবারে প্রশস্ত ময়দানে আসিয়া পড়িলাম। তখনকার দৃশ্য অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। শস্যহীন শুষ্ক মাঠ। মাঠে কেবলই ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রস্তরখণ্ডের অস্থিকঙ্কাল বিছানো রহিয়াছে; কোথাও স্থানে স্থানে একপ্রকার কণ্টকযুক্ত তৃণ ঝোপের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এই সকল তৃণ অতি কঠিন, হাত দিলেই সূচের মত কণ্টকবিদ্ধ হয়। এ পথে ঝব্বুদিগের ইহাই একমাত্র আহার। মাঝে মাঝে এই সকল ময়দানের উপরে ধস্‌ভাঙ্গা নগ্ন পাহাড়ের বিস্তৃতি উচ্চ পাহাড়ের মত অপর দিকে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। স্থানে স্থানে তিব্বতীদের গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত প্রস্তরখণ্ড

* এখানকার বন্দুক সবই এইপ্রকার, মাটিতে গাদিয়া ছুড়িতে হয়।

তিব্বতীরা রন্ধনকার্য্যে রত

ভোগৈশ্বর্য্যবিহীন কৈলাসপতির চরণ-নিম্নে পৃথিবী দেবীও যেন আপনার সম্পদ-গরিমা সমস্তই ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন।

প্রায় ৫ মাইল আন্দাজ আসিয়া "বল্‌ড়কে" উপস্থিত হইলাম। সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা ১৫ হাজার ফুট, এখানেও একটি ঝরণা বহিয়া যাইতেছিল। রঞ্জনের কথামত সকলেই তাহা হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিয়া লইলেন। আগে আর ঝরণাদি পাওয়া যাইবে না; সে সময়ে ইহাই তাহার মুখে ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সেখান হইতে আরও ২ মাইল আগে আসিলে আবার একটি ঝরণা যখন সম্মুখে পড়িল, তখন রঞ্জন সে ঝরণাটি যে একবারেই নূতন উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা জানাইতে একটুও দ্বিধা বোধ করিল না।

যাত্রীদিগের পথ-নির্দ্দেশস্বরূপ সজ্জিত ছিল। চারিদিকেই চোখের সম্মুখে জাস্কর অদ্রিমালা (Zadskar Range) শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া ঠিক যেন মৌনী সাধকের দল। তাহাদের নগ্ন শিরোদেশে তুষারের বিভূতি উজ্জ্বল বিভূতির মত ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছিল। এইরূপ বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেলা সাড়ে ৪টা আন্দাজ সময়ে আমরা ৭ মাইল দূরে "রুংগাং" নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে গ্রাম বলিতে কিছুই দেখিলাম না, শুধু একটি প্রশস্ত ঝরণা। তাহারই এক পার্শ্বে আমাদের রাত্রিযাপনের স্থান মনোনীত হইল। বোঝা লইয়া ঝব্বুর দল সহ একে একে সকলেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রিকালে কাঠের অভাবে ষ্টোভই এখানে আহার্য্য প্রস্তুতের অবলম্বনস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। যতই অগ্রসর হইতেছি, শীতও উত্তরোত্তর বেশী বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে ৯টার মধ্যেই আহারাদি শেষ করা হইল। ঝব্বুগণ বোঝা ও সওয়ার লইয়া এখানকার প্রশস্ত ঝরণাটি পার হইয়া গেল। এই সকল ঝরণার স্রোত প্রবল, তবে গভীরতা কম। পার হইয়া আবার সেই প্রশস্ত ময়দানই পড়িল। যতদূর দৃষ্টিগোচর হইল, সেই তৃণবিহীন অস্থি-কঙ্কালসার ভূখণ্ডে সে সময়ে ইহাই মনে হইতেছিল,

"গুরেলা মান্ধাতার" তুষারশোভী পাহাড়টি আমাদের দক্ষিণ ভাগে চোখের সম্মুখে আবার উদ্ভাসিত হইল। এইরূপে আরও ৪ মাইল আন্দাজ আগে গিয়া দেখিলাম, সম্মুখে একটি পাহাড়ের চড়াই উঠিয়া গিয়াছে। এ চড়াইএর রাস্তা খুবই প্রশস্ত। আমাদের সব কয়টি ঝব্বু ও ঘোড়া এক সঙ্গে সমানভাবে যখন এই চড়াই অতিক্রম করিয়া চলিল সকলেই মনে করিয়াছিলেন, বুঝি বা আগে গিয়া এইবার কিছু নিম্নভূমি দৃষ্টিগোচর হইবে। অনুমান মিথ্যা ছিল না এই চড়াই শেষ হইবার মুখে সম্মুখভাগে একটু বাম কোণে
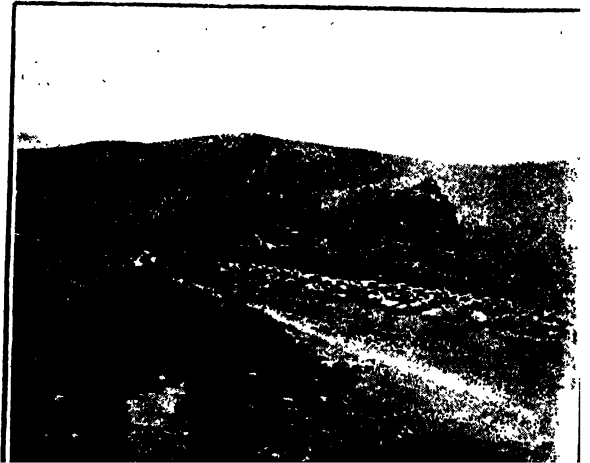
তিব্বতীদের মন্দির

দূর হইতে "রাবণ-হ্রদের" খানিকটা নীল জল প্রথম চোখে পড়িল।

গার্ব্বিয়াং হইতে এ যাবৎ কেবলই নগ্ন পাহাড়ের বিস্তৃতি আর উজ্জ্বল তুষারের শুভ্র দৃষ্টি চোখে লাগিয়া আসিয়াছে, তার পর তিব্বতে আসিয়া এই দৃশ্যের সহিত আবার দারুণ রৌদ্র মিশিয়া আমাদের চক্ষুগুলিকে এক প্রকার নিস্তেজ করিয়াই আনিয়াছিল, এমত অবস্থায় বহু দিন পরে এইরূপ একটা নীল স্বচ্ছ তরল পদার্থ হঠাৎ নয়নপথে পতিত হওয়ায় অস্থিরচিত্তে সকলেই সে সময়ে ইহার তটের সমীপবর্ত্তী হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। দূরে তাহারই ওপারে "কৈলাসে"র অপূর্ব্ব তুষার-শৃঙ্গ এখান হইতেই রঞ্জন অস্পষ্টভাবে (তাহা তখন কতকটা মেঘে আবৃত ছিল) দেখাইয়া দিল। তৃষিত নেত্রে কিছুক্ষণ সে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সকলেই বেলা ৪টা আন্দাজ সময়ে এই হ্রদের কতকটা সম্মুখীন হইলে ইহার দৃশ্য সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল। সে দৃশ্য কি সুন্দর ও স্নিগ্ধ!

গুরেলা মান্ধাতা

চিত্রকর! তোমার রূপ কখনও চোখে পড়ে নাই। কিন্তু এই চিত্রে তুমি নিশ্চয়ই আপনার প্রকৃত চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছ। অথবা, প্রকৃতির অনন্ত চিত্র-বৈচিত্র্যের মধ্যে এই চিত্রখানি তুমি আঁকিতে গিয়া নিজেই এত দূর মোহিত হইয়া পড়িয়াছ যে, আপনার অস্তিত্ব একবারে লুকাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছ! নতুবা এ দৃশ্যে তখন আমাদের সকলেরই চক্ষুতে ক্ষণেকের জন্য পলক পড়ে নাই কেন? নীলাকাশ অপেক্ষাও গাঢ় নীল ও স্বচ্ছ অথচ বিলক্ষণ প্রশস্ত এই জল-রাশি আঁকিয়া-বাঁকিয়া অনন্তের কোলে কেমন মিশিয়া রহিয়াছে! বায়ুভরে তাহা ঈষৎ তরঙ্গায়িত, যেন উচ্ছল-সৌন্দর্য্যে আপনিই উদ্বেল। আবার এই নীলজলের উপরে থর্ব্বাকৃতি দুইটি বিভিন্ন রংএর পাহাড়, দ্বীপের মত উঠিয়া মধ্যভাগে চলিয়া গিয়াছে। কে যেন বিচিত্র বর্ণশোভিত দুইখানি গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছে। একটি পাহাড় কতকটা সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত, অপরটি ব্যাঘ্রচর্ম্মের ন্যায় নীল-কান্তমণিপ্রভ, এই হ্রদে এই দুইটি বিচিত্র পর্ব্বতাসন, প্রকৃতির সুরম্য মন্দিরে কে বা কাহার জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছে, তাহা ঐ হ্রদেরই মত সুনির্ম্মল চিত্ত হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিতাম। অভিভূত-চিত্তে ক্ষণেকের জন্য তখন আমার মনে হইয়াছিল, ব্যাঘ্র-চর্ম্মের আসনে বিরাজ করিতে একমাত্র সেই "ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানম্" গৌরী-পতি হর এবং তাহারই পাশের সিঁদূরবর্ণে রঞ্জিত আসনে তাঁহারই অঙ্কলক্ষ্মী সিঁদূরবর্ণ-প্রভা গৌরীদেবী ভিন্ন, তাঁহাদের লীলাক্ষেত্র কৈলাসের পাশে এ মধুর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার আর ক্ষমতা কাহার! এই হ্রদকে রঞ্জন হিন্দীভাষায় "রাক্ষস-তাল" বলিয়া বুঝাইয়া দিল। অনুভবানন্দ স্বামীজী বলিলেন, এ সম্বন্ধে প্রবাদ—দুষ্টমতি রাবণ ক্রোধভরে যে সময়ে কৈলাস উত্তোলন করিতে গিয়াছিলেন, তৎকালীন তাঁহার ঘর্ম্মে এই অপরূপ হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ বলিতেছেন,—

"পুষ্পকস্য গতিশ্ছিন্না যৎকৃতে মম গচ্ছতঃ।
তমিমং শৈলমুন্মূলং করোমি তব গোপতে॥"

(উত্তরকাণ্ড, ষোড়শ সর্গ)।

কুবেরকে জয় করিয়া পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিতে রাবণের এই স্থানে গতি অবরুদ্ধ হইল। সে সময়ে রাবণ সম্মুখে নন্দীশ্বরকে দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি রাবণকে ইহাই বলিয়াছিলেন, "রাবণ, তুমি নিরস্ত হও। এই পর্ব্বতে এক্ষণে দেবাদিদেব শঙ্কর ক্রীড়ারত, এ সময়ে ঐ স্থানে যাইবার কাহারও অধিকার নাই।" এ কথায় ক্রোধোদ্দীপ্ত

রাবণ-হ্রদ

হইয়া দশমুখ রাবণ তাঁহার বিংশভুজের দ্বারা সমূল ঐ পর্ব্বত উত্তোলন করিতে গেলেন।

"এবমুক্ত্বা ততো রাম, ভুজান্ বিক্ষিপ্য পর্ব্বতে।
তোলয়ামাস তং শীঘ্রং স শৈলঃ সমকম্পত ॥"

এ ব্যাপারে প্রমথগণ ভীত হইয়া পড়েন। পার্ব্বতী দেবীও ভয়ে মহাদেবকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। তার পর মহাদেব স্বীয় পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা পর্ব্বতকে চাপ দিতেই রাবণের পীড়ন উপস্থিত হয়।

"ততো রাম মহাদেবো দেবানাং প্রবরো হরঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন তং শৈলং পীড়য়ামাস লীলয়া।
পীড়িতস্তু ততস্তস্য শৈলস্তঃস্তাপমাভুজা ॥"

এ সময়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত রাবণের শরীর হইতে ঘর্ম্ম বাহির হওয়া তখনকার যুগে আশ্চর্য্য না হইতে পারে। তবে রামায়ণে আরও কয়েকটি শ্লোক আগে পড়িয়া গেলে দেখা যায়, এ অবস্থায় রাবণ সেখানে সহস্র বৎসরকাল পর্য্যন্ত রোদন করিয়াছিলেন।

"সম্বৎসরসহস্রন্তু রুদতো রক্ষসো গতম্।"

পরে তপস্যায় রত হয়েন।

রাবণ-হ্রদের আয়তন ও স্বচ্ছতা হিসাবে দেখিতে গেলে যদি এই প্রবাদ রামায়ণমতে সত্য বলিয়া মানিতে হয়, তবে আমার মনে হয়, রাবণের ঘর্ম্মে এরূপ নির্ম্মল হ্রদের সৃষ্টি না হইয়া সহস্র বৎসর রোদনের ফলেও হইতে পারে, এরূপ মনে করা আশ্চর্য্য এবং অস্বাভাবিক নহে। অবশ্য রামায়ণে "রাবণ-হ্রদ" সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নাই।

যাহা হউক, এইরূপ অপরূপ হ্রদের পাশ দিয়া আমরা নীচে নামিয়া তট উপান্তে তাঁবু খাটাইবার সঙ্কল্প করিলাম। সেখান হইতে তট খুবই কাছে মনে হইল, কিন্তু কিনারায় পৌঁছিতে ঘোড়া লইয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল বিলম্ব

হইয়াছিল। বেলা সাড়ে ৫টা আন্দাজ সময়ে এই হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে আমরা উপস্থিত হইলাম। বলডক্ হইতে এই হ্রদের দূরত্ব ৬ মাইল আন্দাজ হইবে। এখানে আশে-পাশে কোথায়ও কোন ঝরণা না থাকায় আহারান্তে এই হ্রদের জলেই ক্ষুৎপিপাসা দূর করা হইল। জল শীতল ও লঘু।

সে দিন শুক্লা ত্রয়োদশী। সন্ধ্যার পর নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখা দিলেন। স্নিগ্ধকিরণে এই স্নিগ্ধ হ্রদের জল মিশিয়া গিয়া 'ঝিকিমিকি' খেলা করিতে লাগিল। দেখিবার মত দৃশ্য বটে। এত শীতে তাঁবুর বাহিরে আসিয়া আমরা প্রায় সকলেই রাত্রি সাড়ে ১০টা পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব শোভা নিস্পন্দ-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছি। চাঁদের আলোয় জলের গায়ে দুই চারিটি চঞ্চল সারস পক্ষী (এদেশেরই মত) উড়িয়া ছোট ছোট মৎস্য শিকার করিয়া বেড়াইতেছিল। এ পাশে 'গুরেলা মান্ধাতা'র তুষার-শোভী বিস্তৃত বপু জ্যোৎস্নালোকে শ্বেতবর্ণের ফেন-পুঞ্জের মত হ্রদের কোলে ঢলিয়া রহিয়াছে। মান্ধাতার অনন্ত-কালব্যাপী তপস্যার এখনও যেন শেষ হয় নাই। স্বপ্নপুরীর অমৃত-নির্ঝরের মত আমরা ইহার তটে নীল ধারাকে সে দিন আছাড়িয়া পড়িতে দেখিলাম। উচ্ছ্বাসে যাত্রী দলের কেহ কেহ সমস্বরে সুর তুলিলেন। কেহ কেহ শীতে কাতর হইয়া লম্বা পাড়ের উপরে বালকের মত দৌড়াইয়া লইলেন। তাঁবুর ভিতরে গেলে এ দৃশ্য যে চিরজীবনের মত অদৃশ্য হইয়া যায়! সকলেরই গায়ে সোয়েটার, মাথায় টুপীকম্ফর্টার, হাতে দস্তানা, পায়ে ষ্টকিং, জুতা প্রভৃতি আবরণ—এক কথায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা; কেবল চক্ষু দুইটি উদ্‌ভ্রান্তের মত সেই সুরম্য হ্রদের চারিদিকে দেখিয়া দেখিয়া যেন আশ মিটাইতে পারিল না। শ্রান্ত হইয়া অবশেষে তাঁবুর মধ্যে ফিরিতে বাধ্য হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া ঝব্বু ওয়ালারা প্রত্যহই ঝব্বু দিগকে চরিয়া খাইতে আশে-পাশে ছাড়িয়া দিত। পরদিন যাত্রার পূর্ব্বে আবার ধরিয়া আনা হইত। এখানে পৌঁছিয়াও যথা-রীতি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। শেষ রাত্রিতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। অত্যধিক ঠাণ্ডা হাওয়ায় পর-দিন প্রত্যুষেই সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

অদ্য মানস-সরোবর পৌঁছিবার কথা। শুদ্ধ-চিত্তে উপবাসী শরীরে সেখানে পৌঁছিয়া স্নানাদি শেষ করিয়া, তার পর আহারের আয়োজন করা হইবে, পূর্ব্বদিন সকলেই এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। তাই হাত-মুখ ধুইয়াই ঝব্বু-পৃষ্ঠ বোঝা তুলিয়া দিতে সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঘটনা-চক্রে সে দিন কিন্তু ঝব্বু দিগকে নিকটে কোথায়ও দেখিতে পাওয়া গেল না। ঝব্বু ওয়ালারা ২।৩ জন দুই তিন দিকে খুঁজিতে গেল। বেলা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। বোঝা ভিন্ন আমাদের আগে চলিবার উপায় নাই। মানস-সরোবর এখান হইতে মাত্র ৩ মাইল পথ। বেলা ১০টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যদি ঝব্বু পাওয়া যায়, তবে ১টার মধ্যে সেখানে পৌঁছিয়া যাইব, তাই সকলেই ঝব্বুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে শঙ্কর স্বামীজী প্রভৃতি কয়েক জন রাবণহ্রদে নামিয়া একদফা স্নান শেষ করিয়া লইলেন। জল যেমন স্বচ্ছ, ইহার তলদেশ তেমনই কর্দ্দমবিহীন। কেবলই নানা বর্ণের পাথরের 'নুড়ি' বিস্তৃত। কতক্ষণে (বেলা সাড়ে ১০টা আন্দাজ সময়ে) দূরবীণ ধরিয়া দেখা গেল, গুরেলা মান্ধাতার কোল দিয়া ঝব্বুর দল নামিয়া আসিতেছে। সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

এবারে রাবণহ্রদকে বামে রাখিয়া তীরে তীরে পূর্ব্বদিকে বরাবর যাইতে লাগিলাম। একটির পর আর একটি চড়াই ছাড়িয়া পর পর প্রায় ৩।৪টি চড়াইএর পথ অতিক্রম শেষ হইলে সম্মুখেই মানসের অনন্ত-বিস্তৃত জলরাশি দৃষ্টিগোচর হইল। তখন বেলা প্রায় সাড়ে ১২ হইবে। এই উচ্চ চড়াইএর কত নীচে যে এই হ্রদের তটদেশ, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। ঘোড়া লইয়া দ্রুত নামিয়া গেলাম। বেলা ১৷৹টা আন্দাজ সময়ে আমরা হ্রদের তীরে আসিয়া পৌঁছি।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হহু শব্দে বাতাস বহিয়া যাইতেছিল। কোনও ইংরাজ পরিব্রাজক ভ্রমণ করিতে আসিয়া এ স্থানকে "Play ground of storms" অর্থাৎ ঝড়ের লীলাক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কথাটা খুবই সত্য। ঝড়ের সহিত বারিধি সদৃশ এই সুমহান্ হ্রদের স্বচ্ছ সুনীল জলে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া একটা অনন্তের সুর বহিয়া আনিতেছিল। সে সুরে কেবল মিষ্টতা, শ্রুতি-মধুরতা ব্যতীত সমুদ্রের ন্যায় কঠোর গর্জ্জন নাই। তরঙ্গায়িত হৃদয়ে যেন ভারতের সকল তীর্থ-সম্পদ একত্র করিয়া পাপী তাপী যাত্রীদিগকে মৃদুস্বরে ডাকিয়া কহিতেছে, "ওরে সুদূরের যাত্রী! সংসারের ভোগাসক্তি ত্যাগ করিয়া, দুর্গম পথে যদি আমার তট পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিস, তবে আয়,

নেমে আয় একবার আমার এই চির-নির্ম্মল পুণ্য-সলিলে ! স্নান করা দূরের কথা, স্পর্শেই দেহ-মন পবিত্র হইয়া উঠিবে। পথশ্রান্ত ! শুধু পথের শ্রান্তি নহে, রোগ শোক তাপ প্রভৃতি মনের যা' কিছু ক্লেদ এক নিমেষে সবই হরণ করিয়া লইব।" কত যুগযুগান্ত ধরিয়া মানসের এই প্রবাহ একভাবে চলিয়া আসিতেছে! এই জলে কত নদ, কত নদীর উৎপত্তি। এই জলের গুণেই সেই সকল নদীর আশপাশ ভূমি পর্য্যন্ত তীর্থক্ষেত্রে পরিণত !

অভিভূত-চিত্তে মানুষ আমরা, সেই শুভ পুণ্যবাসরে (৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩৬) যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কুবের প্রভৃতি যেখানে নিরত স্নান করেন, ব্রহ্মার কৃত সেই মানস-হ্রদে সত্যই স্নান করিয়া তীরে উঠিলাম। জল খুবই শীতল। দুই তিনটি 'ডুব' দিতেই শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত চারিদিকে দেখিয়া লইলাম। শুধুই পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে তুষারের অপূর্ব্ব বিস্তার। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণে অনন্তকাল ধরিয়া সে তুষার গলিয়া শেষ করা যায় না। একে একে সে দিন সকলেই স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন। তটদেশে কোথাও গাছের চিহ্নমাত্র নাই, কেবল আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন কোন স্থানে অযত্ন-সম্ভূত কতকগুলি তিলের গাছ জন্মিয়া রহিয়াছে। সে সময়ে তাহাতে যথেষ্ট তিল বিদ্যমান ছিল। কবে কোন্ ঋষি সিদ্ধ-সেবিত এই মানস-হ্রদে তর্পণ করিতে আসিয়া তটদেশে তিল ছড়াইয়া দিয়াছিলেন —যাহার ফলে এই গাছগুলি এখনও তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। আমরা সেই সব বৃক্ষজাত তিল সংগ্রহ করিয়া পিতৃপুরুষ উদ্দেশে মানস-জলে তর্পণ সারিলাম। তার পর সকলেই কেহ ছাতু, কেহ আখরোট্-কিসমিস-মিছরী, কেহ বা ঘৃত, আটা ও চিনি-মিশ্রিত খাদ্য খাইয়াই দিন কাটাইলেন।

পুণ্যভূমি ভারতে তীর্থক্ষেত্রের আদৌ অভাব নাই। সুদূর বদরিকা-কেদারনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রতি তীর্থেই প্রতিবৎসর হাজার হাজার যাত্রী স্বচ্ছন্দচিত্তে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। কেবল এই হিমালয়-শীর্ষশোভী দুর্গম কৈলাস বা মানস তীর্থ-দর্শন আদৌ সহজ-সাধ্য নহে বলিয়া অন্যান্য তীর্থের তুলনায়, এ তীর্থে যাত্রি-সংখ্যা খুবই কম, তাই অধিকাংশ লোকের ইহা কেবলই কল্পনার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত হিসাবে ইহার অস্তিত্ব কোথায় এবং হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে কতটুকুই বা ইহার উল্লেখ দেখা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা কেহই আবশ্যক মনে করেন না। প্রথমতঃ বাল্মীকি রামায়ণে বিশ্বামিত্র ঋষি রামকে বলিয়াছিলেন—

"কৈলাসপর্ব্বতে রাম মনসা নির্ম্মিতং পরম্।
ব্রহ্মণা নরশার্দ্দূল ! তেনেদং মানসং সরঃ ॥"

বালকাণ্ড—২৪ সর্গঃ।

অর্থাৎ হে রাম, কৈলাস পর্ব্বতে ব্রহ্মা-দেবের মানস হইতে যে সরোবর উত্থিত হইয়াছে, তাহাই মানস-সরোবর নামে আখ্যাত। মানসের উৎপত্তি সম্বন্ধে রামায়ণে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারত পাঠে বুঝিতে পারা যায়, বদরিকাশ্রম হইতে দ্রৌপদীর প্রার্থনানুসারে সৌগন্ধিক (স্বর্ণবর্ণের বিশেষ সুগন্ধিযুক্ত পদ্ম) আহরণের নিমিত্ত ভীমসেন কুবেরের বাটীর নিকটে যে স্বভাবজাত সরোবরে অবগাহনাদি করিয়াছিলেন, উহাকে এই মানস-সরোবর ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিবার কারণ নাই।

"কৈলাসশিখরাভ্যাসে দদর্শ শুভকাননম্।
কুবেরভবনাভ্যাসে যাতাং পর্ব্বতনির্ঝরে।
তত্রামৃতরসং শীতং লঘু কুন্তীসুতঃ শুভম্।
দদর্শ বিমলং তোয়ং পিবংশ্চ বহু পাণ্ডব।"

বনপর্ব্ব ১৫২।১৫৩ অধ্যায়।

কুবেরের বাটীর নিকটে যে সরোবর, তাহা যে মানস, তাহা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করিলেও স্পষ্ট বুঝা যায়।

"হংসয়োর্দম্পতী পূর্ব্বং মানসাখ্যে সরোবরে।
স্থিতৌ পরস্পরং প্রেম্ণা বিহরন্তৌ নিরন্তরম্।
কুবেরস্তত্র বৈ নিত্যং বিহর্ত্তুং যাতি সাবলঃ।
চিরং বিহৃত্য সংস্নায় বটমূলে সমাশ্রয়ৎ"। ১১।

কেদারমাহাত্ম্য ২৬ অধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ মানস নামক সরোবরে হংসদম্পতি পরস্পর সুখে ও প্রেমে নিরন্তর বিহার করিত এবং সেখানে কুবের অবলাগণ সহ আসিয়া নিত্য স্নান-বিহারাদি করিয়া বটমূলে আশ্রয় লইতেন। অবশ্য কালের স্রোতে সে বটগাছ এক্ষণে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে।

মানস-তীর্থ সম্বন্ধে বায়ুপুরাণ ও মৎস্য পুরাণ স্পষ্টতঃ দিক্ নির্ণয় পর্য্যন্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

"কৈলাসাদ্দক্ষিণে পার্শ্বে ক্রুরসত্ত্বৌষধং গিরিম্।
রুদ্রকায়াৎ কিলোৎপন্নমঞ্জনং ত্রিককুৎ প্রতি।
সর্ব্বধাতুময়স্তত্র সুমহান্ বৈদ্যুতো গিরিঃ।
তস্য পাদে সরঃ পুণ্যং মানসং সিদ্ধ-সেবিতম্।"

বায়ুপুরাণ ৪৭ অধ্যায়ঃ।

মৎস্যপুরাণ ১২১ অধ্যায়।

অর্থাৎ এক কথায় এই মানস সরোবর কৈলাসের দক্ষিণ দেশে বৈদ্যুত নামক গিরির পাদদেশে অবস্থিত। বাস্তবিক কৈলাস পর্ব্বতের ঠিক দক্ষিণে একটি পর্ব্বত রহিয়াছে, তাহার পাদ-দেশেই এই মানস এবং তাহারই তটদেশে আজ আমাদের তাঁবু পড়িয়াছে। সুতরাং মানস-সরোবর সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা লইয়া সন্দেহ করিতে যাওয়া প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে। মহাকবি কালিদাসও তাঁহার "মেঘদূত" কাব্যে কুবেরালয়ের নিকটস্থ কৈলাস ও মানস সরোবরের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য মানসের ওপারে কোথায় কুবেরালয় লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের নাই। সে সৌভাগ্য থাকিলে তাঁহার বর্ণন সাদৃশ্যের সহিত সব কিছুই দেখিয়া লইতাম! "হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্য" অর্থাৎ স্বর্ণপদ্মের আকর মানস-সলিলে স্বর্ণপদ্ম দেখিতে পাইতাম। আবার কেহ কেহ মানসের নীলজলে নীলপদ্ম অন্বেষণ করিয়া থাকেন; তাহাও তাহা হইলে অপ্রাপ্য থাকিত না। এ ক্ষেত্রে একটি কথা বলা যাইতে পারে যে, কাশী স্বর্ণপুরী হইলেও কয়জনে ইহাকে স্বর্ণের মত উজ্জ্বল দেখিয়া থাকেন? এই মানস-সরোবর ও কৈলাস যে কেবল আমাদেরই প্রাচীন তীর্থ, তাহা নহে, তিব্বতীরাও এ স্থানগুলিকে আবহমানকাল হইতে পরম তীর্থক্ষেত্ররূপে মানিয়া আসিতেছে। মানস-সরোবরকে ইহারা "সো-মা-ভাং" (Tso-ma vang) বলিয়া থাকে। এই প্রশান্ত হ্রদের চতুর্দ্দিকে তিব্বতী ধর্ম্মগুরু অর্থাৎ লামাদিগের মোট ৮টি মঠ (Monastry) আছে। "য়্যাংগু" (Yangoo) "টোগু" (Tugu) "গোসল্" (Gossul) "জিউ" (Chiu) প্রভৃতি মঠ এই আটটি মঠেরই অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে টোগু মঠে যে প্রস্তর-লিপি (Inscription) ক্ষোদিত আছে, তাহার অনুবাদের কতকটা অংশ* এখানে প্রকাশ করিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, তিব্বতীরা এই হ্রদকে তীর্থ হিসাবে কতটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে।

"সোমাভাং" (মানস) পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র।" "এই হ্রদের কেন্দ্রস্থলে মনুষ্যের আকৃতিতে ভগবান্ সহস্র লামা-পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।" "সমস্ত লামা এক সুরে ইঁহার ভজন গাহিয়া থাকেন।" "এই হ্রদ হইতে কর্ণালী, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ও শতদ্রু এই চারিটি বড় নদী ও চারিটি ছোট নদী বাহির হইয়াছে।" "বড় নদীর প্রথমটির জল ঈষদুষ্ণ (warm), দ্বিতীয়টি অল্প ঠাণ্ডা (cool), তৃতীয়টি গরম (hot) এবং চতুর্থটি শীতল (cold)।" "যদি কেহ একবারমাত্র এই হ্রদে স্নান করেন, তবে তিনি পিতৃপুরুষগণসহ সমস্ত পাপ ও মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া সদগতি প্রাপ্ত হয়েন।" ইত্যাদি

এই প্রশান্ত নীলাভ হ্রদের পরিধি কত, তাহা লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে, তবে তিব্বতীরা ৫।৬ দিনে এই হ্রদের পরিক্রমা কার্য্য শেষ করিয়া থাকে। পরিক্রমার রাস্তা অতি-ক্রম করা সর্ব্বত্র সুসাধ্য নহে। কোন কোন স্থানে 'রশি' সংযোগেও পার হইতে হয়। এমত অবস্থায় আমাদের অনুমান, ইহার পরিধি ৬০ মাইলের বেশী বৈ কম হইবে না।

জগতের মাঝখানে যেখানে সৌন্দর্য্য, সেখানে মধুরতা। সেখানেই সকলের চক্ষু নিরন্তর আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাই লীলাস্বরূপ সেখানেই দেবতাগণের অস্তিত্ব পদে পদে বর্ণিত হইয়া থাকে। এ সৌন্দর্য্যের আকরে শুধু ভারত ও তিব্বত নহে, বিভিন্ন দেশবাসী য়ুরোপীয় পর্য্যটক সিউয়েন্ হেডিন্ মুগ্ধ হইয়া এক দিন লিখিয়া গিয়াছেন,—

"I could live and die on this heavenly lake without ever growing weary, of the wonderful spectacle always presenting fresh surprises."

নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করিয়া তিনি এই প্রশান্ত হ্রদের চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া মাসাধিককাল ক্যাম্বিস্-নির্ম্মিত নৌকা সহযোগে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, কোথায় শতদ্রু-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থল—কোথায় তিব্বতী লামা-দিগের কত গুম্ফা, কোথায় হ্রদে কত গভীরতা ইত্যাদি। এই হ্রদ সম্বন্ধে তিনি কতদূর মর্ম্মস্পর্শী হইয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রাণের উক্তি পাঠকবর্গকে এ স্থলে একটু না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না

* সিউয়েন হেডিনের অনুবাদ হইতে সংগৃহীত।

"Wonderful, attractive, enchanting lake! Theme of story and legend, playground of storms and changes of colour, apple of the eye of gods and men, goal of weary, yearning pilgrims, holiest of the holiest of all the lakes of the world, art thou, Tsomavang, lake of all lakes. Navel of old Asia, where four of the most famous rivers of the world, the Brahmaputra, the Indus, the Sutlej, and the Ganges, rise among gigantic peaks, surrounded by a world of mountains, among which is Kailas, the most famous in the world."—Trans Himalaya, Page 151, Vol. II.

আমরা বারান্তরে তাঁহার মানচিত্রের কতকটা অংশ (যাহা লইয়া আমাদের যাত্রার সম্বন্ধ রহিয়াছে) তুলিয়া দেখাইব। তাহাতে যাত্রিগণ মোটামুটি যাত্রার পথ বুঝিয়া লইতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪টি বড় নদীর উৎপত্তি এই হ্রদের কোন দিক দিয়া বাহির হইয়াছে, তাহাও দেখিয়া আনন্দলাভ করিবেন।

এই মানস-হ্রদ সমুদ্র-গর্ভ হইতে প্রায় ১৫ হাজার ৯৮ ফুট উচ্চে অবস্থিত এবং ইহার নিম্নতম গভীরতা প্রায় ২ শত ৬৮ ফুট হইবে। শীতকালে এই বিশাল হ্রদ প্রায় ২০ ইঞ্চি মোটা বরফে একবারে ঢাকা থাকে। এখন যেমন এই নীল জলে মেঘের পর মেঘের ছায়া পড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে নূতন রংএ প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিলাম, শীতকালের সে দৃশ্য কিন্তু মানুষের চর্ম্মচক্ষুর পরিতৃপ্তির জন্য সৃষ্ট হয় নাই, তাহা দেবগণেরই উপভোগ্য।

আমরা সকলেই এই নীল দর্পণ সদৃশ স্বচ্ছ হ্রদের তটদেশে বসিয়া যখন অন্যমনস্কভাবে চিন্তামগ্ন ছিলাম, হঠাৎ কোথা হইতে তিনটি তিব্বতী পুরুষ আমাদিগের নিকটে আসিতেই সকলেরই দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হইল। ইঙ্গিতে তাহারা তিন জনেই কিছু খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা চাহিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও নামে নাই। দেখিলাম, তাহাদের প্রত্যেকেরই গায়ে পশমের 'আল্‌খাল্লা' জামা, কটিদেশে তোজালি এবং পৃষ্ঠদেশে একটি করিয়া বন্দুক ঝুলান রহিয়াছে। আমাদের সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটি দয়াপরবশ হইয়া এই নূতন ধরণের ভিখারীদের জন্য কিছু শুষ্ক খাদ্যদ্রব্য আনিতে তাঁবুমধ্যে যাইতেছিলেন রঞ্জন (গাইড) ইঙ্গিতে তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিল ভূতের উপদ্রব ভূতেই বুঝিয়া লইতে অভ্যস্ত, বিশেষত মহাদেবের লীলাক্ষেত্র কৈলাসের আশে-পাশে নূতন যাত্রী দেখিয়া ভূত-প্রেত-পিশাচের মত এই সকল জীব মধ্যে মধ্যে ত্যক্ত-বিরক্ত করিয়াও থাকে। এটা কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে তাই শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ সে সময়ে একটু অধৈর্য্য হইলেন পকেট হইতে রিভল্‌ভারটি বাহির করিয়া অন্যমনস্কভাবে "বাম হাত হ'তে ডান হাতে লয়, ডান হাত হ'তে বামে' কবির এই উক্তির সহিত ইহার কোন সার্থকতা আছে কি না বুঝিবার জন্য যেন একটু তৎপর হইয়া পড়িলেন। ভূপসিং অবসর বুঝিয়া বন্দুক হস্তে তাঁবুর বাহিরে আসিয়া দুই চারি বার হাই তুলিতে ভুলিল না। অবশেষে 'কিচি‌মিচি'-ভাষায় রঞ্জন এই পাহাড়ীদিগকে দুই চারিটি কথা বুঝাইয়া দিতে তাহারা ক্ষুণ্ণমনে সেখান হইতে অদৃশ্য হইল।

সে রাত্রিতে সকলেই সজাগ ছিলেন, কাযেই ভূপসিং বেচারীর আদৌ নিদ্রা হয় নাই। প্রহরে প্রহরে ২।৪টা করিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিতে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল।

পরদিন প্রত্যুষেই নিদ্রাভঙ্গ হইল। মানসের জল তখন ধীর-স্থির দেখিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে যাত্রিগণ সকলেই আর একবার স্নান করিয়া লইলেন। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ে ইহার জল আলোড়িত হইলে তীরে বসিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ করার পক্ষে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তাহা ছাড়া অন্য যথাসম্ভব শীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া আগে যাইতেও হইবে। তাই সকলেই ব্যস্ত। এ পথ দিয়া ফিরিয়া আসা হইবে না শুনিয়া সকলেই আপন আপন পাত্রে* এই পুণ্য তীর্থের জল ভরিয়া লইলেন। এইরূপে আমরা সে দিন প্রায় বেলা ১১৷০টা আন্দাজ সময়ে পুনরায় যাত্রার পথে বহির্গত হইলাম। এ দিনকার একটি ঘটনা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি, পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ ঘটনাটি অবান্তর বলিয়া মনে করেন, তবে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আজকাল দুর্গম যাত্রায় যদি কিছু অলৌকিক

* এনামেলের ঢাকুনী সমেত হাল্কা জগ্ এ দুর্গম পথে জল ভরিয়া আনিবার পক্ষে সুবিধাজনক।

মানস-সরোবরের স্নানের দৃশ্য

ঘটনা বর্ণিত না হয়, তবে পাঠকের আদৌ মন উঠে না। আমি কিন্তু সে বিষয়ে পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করিবার আদৌ পক্ষপাতী নহি এবং সে সাহস বা সামর্থ্য আমার একবারেই নাই, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের আসবাব-পত্র সমস্ত সায় তাঁবু যখন ঝব্বু-পৃষ্ঠে উঠাইয়া দেওয়া হইল, সে সময়ে আমাদের তাঁবুর সন্নিহিত স্থানে কোন কিছু জিনিষ-পত্র পড়িয়া রহিল কি না, দেখিবার জন্য যাইতে গিয়া হঠাৎ সেই জমীর এক স্থানে একটি উজ্জ্বল সূক্ষ্ম বস্তুর উপরে দিদির নজর পড়িল। হাতে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, এ যে তাঁহারই কাণের একটি হীরার 'টাপ' (ফুল)। ৭।৮ মাস পূর্ব্বে লাভপুরের তাঁহার নিজ বাটীতে এই টাপ হারাইয়া গিয়াছে মনে করিয়া ইহার প্রাপ্তির আশা তিনি একবারেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একটি টাপ হাতে পাইতেই আশপাশ খুঁজিয়া দ্বিতীয়টিও বাহির হইয়া পড়িল। এই হীরার টাপ দুইটির মূল্য বড় কম নহে, প্রায় ২ শত ৬০৲ টাকা হইবে। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল মানস-যাত্রাকালে বাটী হইতে সে একটি এসেন্সের বাক্স সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। গত কল্য সেই বাক্সের মধ্যে এসেন্স রাখিবার সময়ে অতর্কিতে এক টুকরা কাগজের মোড়ক সে পাশে ফেলিয়া দিয়া থাকিবে। যাহা হউক, এতদিনে এই পুণ্য-হ্রদের তটে আসিয়া এই অপহৃত সূক্ষ্ম মূল্যবান্ বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি, লাভ ভিন্ন আর কি বলিয়া মনে করিতে পারি। আর এক মিনিট পূর্ব্বে আগের পথে যাত্রা করিলে এই সূক্ষ্ম পদার্থ চিরদিনের মতই অদৃশ্য হইয়া রহিত। আনন্দের আতিশয্যে সে সময়ে আর একবার মানসের জল স্পর্শ করিয়া সকলেই অগ্রসর হইলেন।

আমাদের দল (মানস-তীরে)

পশ্চাতে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণের নাম (দক্ষিণ হইতে বাম দিকে)

(১) জনৈক বাবাজী (২) ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী গুপ্ত (কলিকাতা) (৩) শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ("লেখক", কাশী) (৪) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) (৫) শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ঘোষ (উত্তরপাড়া) (৬) ভান সিং (পাচক, আলমোড়া) (৭) ভূপ সিং (দরোয়ান, লাভপুর) (৮) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় (পাবনা) (৯) পান সিং (চাকর, গার্ব্বিয়াং) (১০) শান্তিপ্রকাশ (ইয়েটা) (১১) রামনন্দন (ফরক্কাবাদ)

মধ্য স্তরে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম (দক্ষিণ হইতে বামে)

(১) শ্রীযুক্ত ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) (২) কালিকানন্দ গিরি (হৃষীকেশ) (৩) শ্রীযুক্ত নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর) (৪) শঙ্করনাথ স্বামী (হৃষীকেশ) (৫) অনুভবানন্দ স্বামী (ধারচুলা) (৬) বিশ্বনাথ স্বামী (হৃষীকেশ)

সম্মুখ স্তরে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম (দক্ষিণ হইতে বামে)

(১) শ্রীমতী হরিমতি দেবী (দিদির সহযাত্রিণী, উত্তরপাড়া) (২) শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী ("দিদি", লাভপুর) (৩) ডাক্তার শ্রীযুক্ত শীতাংশু সরকার (উলুবেড়িয়া) (৪) ডাক্তার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র রায় (কলিকাতা) (৫) দীনদয়াল উজীর (লাহোর)

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ঘোমটা-নিবারণী সভা

১

জটিল খুনী মামলার রায় লিখিতেছি। কি করিব ভাবিয়া পাই না, দ্বিধায় মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। আকাশ পানে চাহিয়া তাই তর্কের ও যুক্তির খেই ঠিক করিতেছিলাম।

পদ-শব্দের ছন্দ চিন্তাকে ওলট-পালট করিয়া দিল। মল-পরা উঠিয়া গিয়াছে, কাযেই এখন প্রিয়ার পায়ের চলার শব্দের সঙ্গীত মনে ধরিয়া রাখিতে হয়। মিথ্যা নহে, কবি দেবেন সেন, শ্যালী-যূথের মধ্য হইতে প্রিয়ার মলের ঝঙ্কার ধরিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, কাব্যামোদী পাঠকের তাহা বোধ হয় অজ্ঞাত নহে।

তবে আমরা পুরাতন কালের মানুষ, দেবেন সেনও পুরাতন কবি। যাক্, মহীপালের গীত গাহিয়া লাভ নাই।

ফিরিতেই দেখি, স্মিতাননা গৃহিণী মাথার ঘোমটা খুলিয়া শ্যাওলা-জড়িত-চরণা হইয়া স্মিতাননে ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। হাস্য-মুখী হাস্য করিয়া বলিলেন, "কি পোড়া রায় হয়েছে, মুখ যে শুকিয়ে গেছে, একটু সরবত এনে দেব কি?"

বুড়া বয়সের প্রেম অম্ল-মধুর, তবু বুঝিতে পারি, ইহাতে তরুণবয়সের আবদার জড়িত আছে। শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। গৃহিণীর আদর অনেক মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। হয় গহনা, নয় ভ্রমণ, নয় কাপড়, নয় বিলাস-দ্রব্য—এমন করিয়া যত্ন-সঞ্চিত ধন ভাণ্ড শূন্য হইয়া যায়, তাই ত্রস্ত হইয়া বলিলাম, না, তেষ্টা পায় নি।"

"ঐ দেখ, তোমায় কিছুতেই পারবার যো নেই, এক গ্লাস সরবত খেলে তোমার সঞ্চয় ফুরুবে না।"

ফুরাইবে না বুঝি, কিন্তু সরবতেই যদি শেষ হইত। নথির মধ্যে পাশবইটি ছিল, সযত্নে সেটাকে কাগজের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম।

দাম্পত্য-কলহে পুরুষ কখনও জেতে কি না, জানি না। বাহিরে সবাই বড়াই করেন, কিন্তু ভিতরে গেলে যে কেঁচো, খবর আমি ভালভাবেই জানি। অতএব সরবৎ আসিল।

সরবতের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বিদায়-পালা গাহিতেছি। বলিলাম, "তা দেখছ বড় একটা জটিল রায়—তার বাইরের ঘরে খালি মাথায়—"

বারুদে আগুন লাগিল। রণরঙ্গিণী স্বকীয়-স্নেহ-দুর্জ্জয় প্রেম-ভীম মূর্ত্তি ধরিলেন।—"বুড়ো হতে গেলাম, দু'ছেলের মা হয়েছি, তবু তোমার শাসন! শুনছ, তোমাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল আমরা ভাঙ্গছি।"

ভয় লাগিল, আজকালকার দিনে প্রাণ বজায় রাখাই মহা ফ্যাসাদ হইয়াছে। এ বলে কাটছি, ও বলে মারছি, কি যে করা যায়, ভাবিয়া পাই না। "সে কিরূপ, প্রকাশ করিয়া বলুন।"

সেকালের যাত্রা যাঁহারা দেখিয়াছেন, জানেন, কথা চলিতে চলিতে কোনও পাত্র বলিত, "প্রকাশ করিয়া বলুন।" বলামাত্র ১০।১২ জন জুড়িদার লাফাইয়া উঠিয়া তারস্বরে প্রকাশ করিয়া বলিত। জুড়িদার না থাকিলেও গৃহিণীর গলার যে জোর আছে, আমাদের পড়শীরা তাহার সাক্ষ্য নিশ্চয়ই দিবেন বলিয়া অনুমান করি।

"ঠাট্টা নয়, জান, লীলাদি এসে এখানে এক নারী-সমিতি করেছেন—?"

"লীলাদি কে?"

"কেবল রায় লিখবে, জীবনের কোন খবরই রাখবে না।"

পরস্ত্রীর খবর রাখি না, ইহাতে দোষের কি, ভাবিয়া পাইলাম না। নব্য রুচির কথা জানি না, কিন্তু আমাদের যুগে পরস্ত্রীর নামও অশ্রাব্য ছিল। গৃহিণী বলিয়া চলিলেন— "তোমাদের যে জজ পাটনা হাইকোর্ট থেকে এখানে এসে বাসা করেছেন, তাঁর স্ত্রী।"

"গুণময় দার পরিবার?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তাঁর কথা যদি শোন, তবে একবার তোমার চোখ ফুটবে।"

"এ বয়সে আর চোখ ফুটিয়ে কি লাভ হবে, গিন্নি?"

"যাও! তোমার সঙ্গে যদি আর পারবার জো থাকে। অমন বিশ্রী সেকেলে ভাবে ডাকলে, সইরা যদি কেউ শোনে, তা হ'লে আমার মাথা কাটা যাবে।"

ভাল রে ভাল, নিজের পরিবারকে সম্বোধন করিব, তাহাও আবার কেঁচে গণ্ডূষ করিয়া শিখিতে হইবে! ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "কেন, কি দোষ হয়েছে?"

"তা যদি বুঝতে, তা হ'লে আমার কপালে এ দুঃখু আর হ'ত না।"

গৃহিণীর কপালে কি দুঃখ, ভগবান্‌ই জানেন। গহনা, কাপড়, সেকেলে প্রেম, পুত্র, সংসার সবই তাঁহার জল্‌জ্বল্ করিতেছে, অথচ কিসের দুঃখ তাঁহার? অবশ্য বর্ত্তমানের প্রেম করিতে জানি না, কিন্তু গৃহিণীও সেকালের বউ।

"কেন, নাম ধ'রে ডাকলে ত পার। আমার কি একটি স্বাধীন সত্তা, স্বাধীন ব্যক্তিত্ব নেই?"

ভাবিতে হয়, আমাদের যুগে বি-এ ক্লাশে টেনিসনের Princess পড়ানো হইত, তখনই এই ধরণের কথা কিছু শুনিয়াছি। তার পর লোকমুখে শোনা যায়, এমনই কি কথা কোন নরওয়ের লেখক বলিয়াছে, কিন্তু আমাদের আগল-দেওয়া ঘরে এ কি অচেনা ভূতের উপদ্রব!

"কিন্তু এ বয়সে আবার কেমন ক'রে পারি—এত দিন ধ'রে ওগো, হ্যাগো, গিন্নী, শুনছ, ক'রে কাটিয়েছি, তোমার নাম পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছি, এখন—"

ঝঙ্কার দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আমরা কেমন ক'রে পারছি, এত দিন আমরা ঘোমটা প'রে বেড়িয়েছি, এখন কেমন ক'রে ঘোমটা খুলেছি।"

বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিলাম—"সে কি!"

"আকাশ থেকে পড়লে যে, ঘোমটা ত হিন্দু সভ্যতার জিনিষ নয়, ওটা মুসলমানী আমলের দাসমনোভাব থেকে হয়েছে"

গৃহিণী কবে যে গবেষক হইয়াছেন, জানি না। বলিলাম, "তা হ'লে যে জীবনের অর্দ্ধেক কাব্য মাঠে মারা যাবে। তোমাদের ওই আধ-দেখা আধ-না-দেখা রূপ নিয়ে এত দিন যে সব কবিতা-রচনা চলছিল, তার কি উপায় হবে?"

"ও সব ন্যাকামীর যুগ চ'লে গেছে, বর্ত্তমানের যুগ উড়ন্ত যুগ—মানুষের উড়ো জাহাজ চলেছে নীল আকাশের বুক চিরে, মানুষের মনও সব সংস্কার ভেঙ্গে ছুটেছে।"

গৃহিণীর এই সব কাব্য নিশ্চয়ই শেখা বুলি, নচেৎ অনুকরণ, তথাপি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম।

সুন্দর সুষ্ঠু করিয়া বলিলাম—"দোহাই প্রিয়ে! এখন আর নূতনত্ব করতে পারব না, তোমায় বারণ করছি, সং সেজো না। ঘোমটার একটা আর্ট আছে, একটা বিউটি আছে।"

"যে নিজে কাপড় পরতে জানে না, তার কাছে আমায় আর্ট শিখতে হবে না, ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। আমায় পাঁচটি টাকা দাও, ঘোমটা-নিবারণী সভায় চাঁদা দিতে হবে।"

যেখানেই বাঘের ভয়, সেইখানেই রাত্রি হয়। বক্তৃতা শোনা চলে, নেহাৎ খোলা-চুলে নিজের সম্মুখে দেখা চলে, কিন্তু টাকা? তবু দিতে হইল।

২

টাকার শোকে বৈকালে কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না। রাস্তায় চলিতে চলিতে দেখিলাম, সত্যই নূতনত্ব, মেয়েদের সোজা সীঁতি বাঁকা হইয়াছে, সীমন্তের সিন্দুর-রেখা জ্যামিতিক বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে ঘোমটার জন্য যে কাপড়ের বহর, তাহা কাঁচলীতে পরিণত হইয়াছে।

রোজ বৈকালে শিরীষ-ফুলের ছায়ায় বসি। আজও বসিলাম। সর্ব্বেশ্বর দাদা দেখা দিলেন। দাদাকে বলিলাম, "দাদা! কলিযুগ যে আসছে, এখন উপায়?"

"কি ভায়া! চিন্তাকুল হয়ো না, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হলেই গীতায় ভগবান্ বলছেন, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হবে।"

"না দাদা, তোমার রহস্য রাখ, আমার পাঁচ পাঁচটা নয়া টাকা বেরিয়ে গেছে।"

"তুই হাসালি নবীন, এ কথা আর কাউকে বলিস না। পাঁচটি টাকা বউ নিয়েছে, এতেই যেন তোর লাখ টাকা জলে গেছে।"

"কিন্তু দাদা, এ যে অপব্যয়, তার পর অনাচার, সমাজে বিশৃঙ্খলা, ভবিষ্যতে সমূহ বিপদ—"

"অবশ্য সেটা ভাববার বিষয়। আচ্ছা, এর খুব সহজ উপায় আছে, গুণময় দাদা যেরূপ নিরেট বুদ্ধির লোক, তাতে ভয়ের কারণ নেই, এমন ফন্দী খেলব যে, তোমার আতঙ্কও যাবে, অথচ কারও গায়ে আঁচড় লাগবে না।"

"এই ত চাই, দাদা।"

শিরীষ-ফুল ঝরিয়া পড়িল। উৎসাহিত চিত্তে বলিলাম—"চল দাদা, আমার ওখানে এক কাপ চা খেয়ে যাবে।"

চায়ের নিমন্ত্রণ নিত্য মিলে না, কাযেই সর্ব্বেশ্বর দাদার আপত্তির হেতু নাই।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সর্ব্বেশ্বর দাদা

বসুমতী প্রেস]

পল্লী-শ্রী

[শিল্পী—মিসেস্ হাসিনা খানম্ ।

বলিলেন, "লক্ষ্ণৌ কলেজে যে প্রিন্সিপাল হয়েছে, তার ছেলে না বিলাত থেকে Tripos নিয়েছে?"

"সুরেশের কথা বলছ, হাঁ, ছেলেটি সোনার চাঁদ, ওর বাপও কম বুদ্ধিমান্ নয়, আমাদের যুগে প্রেসিডেন্সীতে নরেশ রায়ের মত মেধাবী ছাত্র কেউ ছিল না।"

"নরেশের সঙ্গে তোমার জানা-শোনা আছে?"

"আছে ব'লে আছে। সে যে আমার আত্মীয়, আমার শ্যালীর ছোট মেয়ের শ্বশুরের পিসেমশায় যে, সেবার এক মাস বিনা খরচায় ওঁর ওখানে চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় করা গেল হে।"

"বেশ বেশ, তা হলেই হবে। কিন্তু ভাই, জান, কার্য্যে মন্ত্রগুপ্তি চাই, চাণক্যের মত জান ত ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ, অতএব যা বলছি, যা করছি, তা যেন কাউকে না, এমন কি, বৌদিকে পর্য্যন্ত বললে চলবে না।"

"ঐ যে ফাঁসাদে ফেল্লে ভাই, সারাদিন মনের ভিতর যে সব কথা ভাষা না পেয়ে ক্ষুধাতুর কুকুরের মত জিব বাড়িয়ে থাকে, গৃহিণীর দেখা পেলেই দৌড়ে চ'লে আসে।"

"তবেই হয়েছে।"

"আচ্ছা ভাই, আমি ভয়ানক চেষ্টা করব, এ কয়দিন না হয় অভিমান ক'রে থাকি, কি বল দাদা? রাগবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

"কারণ ত আছে, কিন্তু শেষকালে না পস্তাতে হয়, তুমি যে আবার ঘরে ঢুকলে সব ভুলে যাও, তখন যে অপরের কথায় ওঠ-বস কর।"

"না না দাদা, কোন্ শালা আমায় স্ত্রৈণ বলে, অবশ্য একটু একটু স্নেহ করি বৈ কি, তা না করলে চলে কি—হাজার হক নারী, সম্মান করতে হবে, তার পর আমরা শিক্ষিত, একটা ডিউটি বোধ আছে ত।"

বেশ, তা হ'লে কাল সকালে গুণময় দাদার বাসায় যেতে হবে, তুমি তৈরী হয়ে থেকো, সেখানে যা করতে হবে, সব শিখিয়ে নেবো, একটু সকাল ক'রে উঠো।"

'কিন্তু দাদা, কাল যে আমার রায় দিতে হবে।"

"কাল না দিয়ে দুদিন পরে দেবে, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, দুকুল রাখা চলে না ত।"

৩

গুণময় দাদা বলিলেন, "না ভাই, একটু মিষ্টি মুখ করতে হবে। আমার ত চায়ের ব্যবস্থা নেই।"

সর্ব্বেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, "বলেন কি দাদা, বৌদি বাংলাদেশে নবীনতার বাণী প্রচার করছেন, আর আপনি—"

হাসিয়া দাদা উত্তর দিলেন, "ওতে আমার জুরিসডিকসান নেই। আজকালকার দিনে অধিকার ভাগ হয়েছে—তিনি থাকেন তাঁর মতে, আমি আমার মতে। এতে কোনও দুঃখ নেই।"

দুঃখ নাই বলিলে কি হয়। দুঃখধারা বক্ষে উছল হইয়া উঠে—কথার ফাঁকি কি তাহা লুকাইতে পারে?

ভোজন ও কৌতুকালাপ শেষ হইলে সর্ব্বেশ্বর হঠাৎ বলিল, "দাদা, আপনার বড় মেয়ের বিয়ে দেবেন কি?"

"দিতে হবে বৈ কি, ওর মায়ের ইচ্ছায় এতকাল দেওয়া হয় নি, কিন্তু এখন প্রাপ্তবয়স্কা হয়েছে, এখন লীলার আপত্তি নেই।"

"তা হ'লে ভালই হয়েছে, লক্ষ্ণৌ বিদ্যাভবনের প্রিন্সিপাল নরেশ রায়ের সঙ্গে একটু হৃদ্যতা আছে, তাঁর ছেলেটি কেম্‌ব্রিজে কেমন নাম করেছে, খবরের কাগজে দেখেছেন হয় ত। নরেশ ছেলেটির জন্য একটি সুপাত্রী খুঁজছে, তা আপনার কন্যা ললিতার সঙ্গে বেশ মানাবে।"

গুণময় দাদা উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "তা আর জানি না, এ হলে ত আমার ভাগ্য বলতে হবে। তা এ বিষয়ে তোমার বৌদির মতামত—"

"তা নিতে হবে বৈ কি, তিনিই ত হলেন আসল।"

দাদা বলিলেন, "বেয়ারা! মেম সাহেবকে ডাক।"

দাদার নিজের সীমানায় বাহুল্য ও বিলাস নাই। পত্নীর গণ্ডী পড়িলেই বিলাতী কানুন, দোটানায় জীবন কেমন চলে কে জানে।

খানিক পরে বৌদি আসিলেন। উঁচু গোড়ালি দেওয়া জুতার মসমস ধ্বনি চকিত করিয়া তুলে। পরণে মাদ্রাজী নকশাকাটা শাড়ী, পশ্চিমাদের মত কাঁচলী করিয়া পরা, মস্তক অবগুণ্ঠন শূন্য, পিছনের খোঁপা জাপানী কি ফরাসী ধরণে বাঁধা, তাহা জানিতে হইলে গৃহিণীর সাহায্যের প্রয়োজন, কিন্তু তাঁহাকে এ লেখা দেখানো চলে না, অতএব বর্ণনা অসম্পূর্ণ রাখিতে হইল।

পরিণত বয়সেও রাজরাজেশ্বরীর মত রূপ, নূতন ঢঙেও বৌদিকে মহীয়সী দেখাইতেছিল। দাদা বলিলেন, "ললিতার একটি সম্বন্ধ এসেছে।"

"কিন্তু বি-এ পাশ করার পর বিয়ে দিলে মন্দ হ'ত না।"

"তা ভেবে দেখ, ভাল মন্দ সব সময় মিলে না।"

সর্ব্বেশ্বর দাদা ঘটকালিতে মজবুত। বাক্য-বিন্যাসে বরের ও বরকুলের এমন প্রশংসা আরম্ভ করিলেন যে, তাহাতে যে কোনও কন্যার পিতা বা মাতা আবদ্ধ না হইয়া পারে না। তখন পাত্র-বিনিময়ের সম্মতি লইয়া সর্ব্বেশ্বর বলিলেন, "চল ভাই।"

আমি প্রায় কাষ্ঠপুতুলের মত বসিয়াছিলাম। নমস্কার জানাইয়া উঠিলাম। দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সর্ব্বেশ্বর বলিল, "ভাল কথা, গোড়ায় গলদ হয়েছে, বৌদি আপনার ও আপনার কন্যার দুখানি ফটো না দিলে ত হচ্ছে না, শূন্যে ত আর প্রাসাদ গড়া চলবে না।"

গুণময় দাদা অবাক্ হইয়া বলিলেন, "তোমার বৌদির ফটো নিয়ে কি করবে ?"

সর্ব্বেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বৌদি যদি অভয় দেন ত বলি, কথায় বলে কি না, যেমন মা, তেমন ছা—এই জন্যে অনেকে শুধু মেয়ের ফটো দেখেই ভুলেন না, ভাবী বেয়াই ভাবী বেয়ানের রূপ-গুণের পরখ ক'রে নেন।"

সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। লীলা বৌদি রাগত-ভাবে বলিলেন, "এ কি ছেলেমি করছেন আপনি।"

"না বৌদি, মোটেই ফাজলিমি নয়, ঘটকালী ব্যবসাটা অনেক করতে হয়েছে, অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে খেয়ে অনেক শিক্ষা হয়েছে।"

"অবিশ্যি আমার আপত্তি নেই। আমি ত চাই নারী পুরুষের সমকক্ষ হয়ে জগতে দাঁড়াক, লজ্জা ও সরমের বাধা যেন তার অন্তরায় না হয়।"

সর্ব্বেশ্বর বলিল, "বৌদি, এ বক্তৃতা গিন্নীর কাছে করবেন, বক্তিমা আমি সইতে পারি না।"

গুণময় দাদার মুখে হাসির লহর খেলিয়া গেল। আমরা পুনরায় নমস্কার জানাইয়া বলিলাম, "আজ তবে আসি।"

দাদা প্রত্যুদগমন করিয়া দ্বারপ্রান্তে আসিলেন, তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই নবীন, তুমিও একটু মনোযোগ করো, তোমার ত আত্মীয়।"

আমি চলিতে চলিতে বলিলাম, "তা করব বৈ কি, নরেশ বাবু আমাকে বিশেষ ভালবাসেন।"

৪

পক্ষখানেক পরের কথা।

এবার বৌদির খাস-কামরায় মজলিস বসিল। ঘটকের সমাদর বাড়িয়া চলিয়াছে। চায়ের ও সঙ্গীতের আপ্যায়ন শেষে বৌদি বলিলেন, "তার পর চিঠি পেলেন ?"

সর্ব্বেশ্বর দাদা গুণময় দাদার দিকে একবার, বৌদির দিকে একবার চাহিয়া বলিল,—"ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব ?"

গুণময় দাদা ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"ব্যাপার কি ?"

কালোমুখ করিয়া সর্ব্বেশ্বর দুঃখিত-চিত্তে উত্তর দিলেন, "আমার বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে, আজ যত মিষ্টান্ন পেটে গিয়েছে, তার চেয়ে বেশী অভিসম্পাত বরাতে আছে।"

বৌদি এবার উষ্ণ হইয়া বলিলেন, "ভণিতা করবেন না, বলুন, কি হয়েছে।"

আমি বলিলাম, "চিঠিটা একটু অপ্রিয়, তাই সর্ব্বেশ্বর দাদা ইতস্ততঃ করছেন।"

বৌদি এবার সত্যই রাগিয়া বলিলেন, "প্রিয় হক আর অপ্রিয় হক, আপনাদের ত কোন দোষ নেই, বলুন না, কি উত্তর পেলেন ?"

সর্ব্বেশ্বর দাদা বলিলেন, "খবর যে ঠিক অনিশ্চিত, তা নয়, তবে কিছু কিন্তু আছে, আমি হয় ত সব ঠিক ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারব না, তার চেয়ে চিঠিটা পড়ি। কি বলেন ?"

শ্রোতাদের ধৈর্য্য সহিতেছিল না। গুণময় দাদা বলিলেন, "হাঁ, সেই ভাল, চিঠিটাই পড়িয়ে শোনান।"

সর্ব্বেশ্বর বলিলেন, "অবান্তর কুশলপ্রশ্ন ও মামুলি কথা বাদ দিয়েই পড়ি।"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, তাই পড়।"

সর্ব্বেশ্বর পড়িতে লাগিলেন। "ভাই সর্ব্বেশ্বর, তুমি যে সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করেছ, সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাহা যোগ্য ও শোভন মনে করি। কিন্তু কিছু বাধা আছে, তাহা তোমাকে না জানালে প্রত্যবায়গ্রস্ত হ'তে হবে। আমার পুত্র বিলাত গেলেও, তার শিক্ষা ও সহবতের মধ্যে আমাদের বাড়ীর শক্ত বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে। আজকালকার যুগে যে বিবিয়ানা আমাদের নিজস্ব সুরকে ঘুলিয়ে দিচ্ছে, সুরেশ তাকে কখনই বরদাস্ত করবে না। ভাবী বৈবাহিকা ঠাকুরাণীর কীর্ত্তিকলাপ কিছু কিছু কাগজে দেখেছি, তোমার

প্রেরিত ছবিতে তার পূর্ণ পরিচয় পেলাম। তাঁর আদর্শ ভাল ব'লে আমরা মনে করি না, ঘোমটা ত্যাগ করলেই যে নারী বিজয়িনী হবে, এ ধারণা আমার নেই, মনের কৃষ্টির দিকে নজর না দিয়ে বিলাস ও ব্যসনের সাজ ও সজ্জার চমক লাগাইলে নারীর গৌরব বাড়বে না।

আমার মা বেঁচে আছেন। তিনি আপন নাতবৌকে সেকালের বরবর্ণিনী বধূর মতই দেখতে চাইবেন। মায়ের প্রতি ভক্তি হয় ত আমাদের দৃষ্টিকে একটু সেকেলে করেছে। উজ্জ্বল সিন্দুররাগরঞ্জিত-সীমন্ত, শঙ্খবলয়-শোভিত দুখানি পদ্মহস্ত, অবগুণ্ঠন-মধুর নব বধূর সুষমাই আমাদের মনের কাছে পরম রমণীয় ব'লে মনে হয়। কাযেই ভাবী বৈবাহিকার বিবিয়ানার আবছায়ায় লালিত কন্যার সিন্দুর-শূন্য বাঁকা সীঁথি, শাঁখাহীন হাত, আর ঘোমটা-হীন বেহায়া চলন আমাদের পরিবারে মোটেই খাপ খাবে না। গুণময় বাবুর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে, তাঁর সহিত আত্মীয়তা হ'লে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ হ'ত, তা ভাষায় বলা চলে না। কিন্তু মন যেখানে মিশবে না, সেখানে মিলন যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব আমায় ক্ষমা করবে।"

বৌদি থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Hang your letter. বিংশ শতাব্দীতে থেকেও যারা মধ্যযুগের বর্ব্বরতা চায়, তাদের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাই না।"

গুণময় বাবু আপশোষ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু এমন সম্বন্ধ কি সহজে মিলবে?"

"না মিলে, মেয়ে আইবুড়ো থাকবে, মেয়েদের চলনকে যারা বেহায়া বলতে পারে, তাদের chivalry বুঝা যাচ্ছে।"

ঝঙ্কার থামিলে বলিলাম, "বৌদি! ও কথাটা ওখানে শ্লেষ হয়ে ব্যবহার হয়েছে। ওর সদর্থ ক'রে নিলে কোনই দূষ্য নেই।"

"কিন্তু তবু এমনই একটা ইতর কথা—"

সর্ব্বেশ্বর বাধা দিলেন, "বৌদি, মাফ করবেন। কিন্তু লেখাটা কেবল আমার উদ্দেশ্যেই, এটা যে আমি বেকুবি ক'রে আপনাদের মত উচ্চমনা শ্রদ্ধেয়া মহিলাদের সম্মুখে পাঠ করব, লেখক তা জানতেন না।"

"জানুন আর নাই জানুন, আমাদের দেশের বেইমান পুরুষদের শেখা উচিত, নারীদের সঙ্গে কেমন ক'রে কথা কইতে হয়। এবার সভায় আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রস্তাব করে Bengal Councilকে move করাচ্ছি।

আহতা সর্পিণীর বিষোদ্গারের পাশে থাকা শ্রেয় ও সুবিধার নহে বলিয়া আমরা উঠিয়া পড়িলাম।

সর্ব্বেশ্বর দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরিয়া বলিল, "কিন্তু দাদা, একবার বিবেচনা করবেন, এমন একটা পাত্র হাজারে মিলে না। বৌদিও শান্ত হয়ে ভেবে চিন্তে দেখুন।"

নিরাশচিত্তে হতাশ সুরে গুণময় দাদা উত্তর দিলেন, "সে ভাগ্য কি হবে আমার! তবে বিবেচনা করেই দেখব।"

বৌদির স্নেহ-সুকঠোর বেচারী দাদাকে একলা ফেলিয়া পলাইতে কেমন বাধ-বাধ লাগিতেছিল. কিন্তু গত্যন্তর নাই দেখিয়া চম্পট দিতে হইল।

৫

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া বহুক্ষণ কড়িকাঠ গুণিলাম। গৃহিণীর দেখা মিলে না, তাঁর মহিলা-সমিতির অধিবেশন। মটর ভাড়া ২ টাকা, একা একা আহার, দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা এতগুলি symptoms, হানিম্যান এর কোন সস্তা ঔষধ লেখে নাই।

কেমন করিয়াই বা লেখে, তখনকার যুগে হয় ত এ সব উপদ্রব ছিল না। কেবলমাত্র তন্দ্রা আসিয়াছে। কাণে ডাক লাগিল "ওগো, এর মধ্যেই ঘুমিয়েছ?"

চুপ করিয়া থাকিলাম। আমায় নিরুত্তর দেখিয়া গৃহিণীর পিত্ত জ্বলিল কি চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল, কে জানে। বলিলেন, "কি যে পোড়া ঘুম, কথা কইছ না যে?"

আমি বলিলাম, "'ওগো' ব'লে ডাকলে আমি কথা কইব না।"

"তবে কি বলতে হবে, প্রাণকান্ত নবীন?"

সত্যই রাগ হইল, পতিদেবতার এই অপমান ধরিত্রী কেমন করিয়া সহে? রামায়ণের যুগে দ্বিধা হওয়ার কথা কি নেহাৎ গল্প?

বলিলাম, "ডিয়ার কি ডার্লিং বলতেও ত পার।"

"হয়েছে, তোমার ঝগড়া রাখ, মজার খবর আছে, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে।"

সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, "কি হয়েছে?"

গৃহিণী ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "ঘোমটা-নিবারণী সভায় যবনিকা পড়েছে। লীলাদি আজ গভীর দুঃখে জানিয়েছেন যে, এই অকৃতজ্ঞ দেশে কোনও কায করবেন না, তিনি সভানেত্রীর পদ থেকে অবসর নিলেন।"

"তাতে আর কি হয়েছে, কোন পোড়া মেয়েরা কি তোমার যোগ্যতা চিনলে না? তুমি থাকতে—"

"নাও, নাও, আর রহস্য করতে হবে না। সভানেত্রীর শুধু যোগ্যতা থাকলেই চলে না, তাঁকেই সমস্ত খরচপত্র বহন করতে হয়, তুমি কি আমাকে তা দিতে?"

যাক, বাঁচা গেল, নিজের খনিত গর্ত্তেই নিজেই পড়িয়াছিলাম।

পরদিন সর্ব্বেশ্বর দাদাকে বলিলাম. "কৌতুক ত শেষ হয়েছে, এখন আসল ঘটকালিটা করতে হয়।"

"কুচ পরোয়া নাই, হামস্তি করেঙ্গা।"

দাদার নির্ভয়োক্তি প্রীত করিয়া তুলিল। দাদার বুদ্ধিটা শাণিত ছুরিকার মত. কোথাও তাহার আটকায় না। প্রলোভনের যে সব ফাতনা ফেলিয়া দাদা মৎস্য গাঁথিতে বসিলেন, তাহাতে কোন মৎস্যই না ভুলিয়া পারে না। নরেশ বড়শী গিলিল।

তার পর শুভদিনে শুভক্ষণে মহা সমারোহে পরিণয় হইয়া গেল। ধূমধাম ও আনন্দের বাহুল্য সকলকেই মুগ্ধ করিয়া তুলিল। পরিণয়শেষে নরেশ বাবু, গুণময় দাদা, সর্ব্বেশ্বর, আমি ও আরও কয়েকজন শেষ ভোজনে বসিয়াছিলাম।

গভীর তৃপ্তিতে গুণময় দাদা বলিলেন, "বলিহারি যাই, বেহাই! তোমার চিঠিটা যে কায করেছে, তা জীবনে ভুলবার নয়। মায়ের স্নেহ যে কত গভীর, তার পরিচয় পাওয়া গেছে, ভাই। কন্যার প্রতি গভীর মমতায় তোমার বেয়ান নিজের খেয়াল একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়েছেন।"

নরেশ বাবু বিস্মিত-দৃষ্টি মেলিয়া বলিলেন, "কি বলছেন বেয়াই!'

গুণময় দাদা বলিলেন, "আপনার সেই চিঠিটার কথা বলছি। ওটাকে সোণার জলে বাঁধিয়ে আমার ঘরে রাখতে হবে, বুড়া বয়সে ঝগড়া ক'রে কি পোষায় ভাই!'

নরেশ বাবু বলেন, "কৈ, আমি এমন কি চিঠি লিখলাম।"

সর্ব্বেশ্বর ভোজনে প্রমত্ত ছিলেন। দিস্তা খানেক লুচি. সের দুয়েক মাংস অন্যান্য উপকরণসহ উদর-দেবতায় দিলেও দাদার তৃপ্তি হয় নাই। দাদা এইবার মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আমায় ক্ষমা করতে হবে দাদা, চিঠিটাই একেবারে জাল।"

গুণময় দাদা হাসিয়া বলিলেন. "সে কি বলছ?"

সর্ব্বেশ্বর দাদা হাসিয়া উত্তর দিলেন, "ও নিয়ে আর তর্ক আলোচনা ক'রে লাভ নেই, ওটাকে সেক্সপীয়রের ভাষায় মনে করুন, না হয় 'নিদাঘ-নিশীথের স্বপন'।"

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল্)।

স্মৃতি

ধীরে ধীরে চ'লে যায় সঙ্গীতের সুর,
হৃদয়-মাঝারে বাজে শেষ রেশটুক্;
বৃন্ত হ'তে খ'সে পড়ে দল কুসুমের,
স্নেহের কাঁপনে কাঁপে পাদপের বুক।

আমারে কাঁদায়ে বঁধু দূরে যায় চ'লে,
মরমের মাঝে তবু ফিরে ফিরে চায়;
আমি দুখে বাঁধি বুক, স্মৃতি পলে পলে
অতীতেরে টানি' লয়ে ব্যথা দিয়ে যায়।

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পুরাণ প্রসঙ্গ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বরাহপুরাণ

দ্বাদশ সংখ্যক, শ্লোকসংখ্যা ২৪ হাজার, কেবল অগ্নিপুরাণমতে ১৪ হাজার। এই পুরাণখানি মানবকল্প প্রসঙ্গে বরাহদেব ধরণীকে বলিয়াছেন। মুদ্রিত পুস্তকে কিঞ্চিদধিক ৯ হাজার শ্লোক দেখা যায়। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত ও বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক। এই পুরাণের বহুলাংশ না থাকায়, যাহা আছে, তাহাও বেশ সুসঙ্গতভাবে নাই, তথাপি ইহাকে পূর্ণ-কলেবরের ন্যায় করিয়াই মুদ্রিত করা হইয়াছে। ইহাকে বৈষ্ণব পুরাণ ও বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক বলিলেও, ইহার অধিকাংশই শিবকথা ও তাঁহার পার্ষদ পরিবারবর্গের কথায় এবং তাহাদের মাহাত্ম্যাখ্যানে পূর্ণ, এবং অন্য পুরাণ বিলক্ষণে অনেক কথাও আছে। অগস্ত্য-গীতা, রুদ্রগীতা, শ্বেতোপাখ্যান প্রভৃতি উহার অন্তর্গত। বরাহপুরাণের বহু শ্লোক ত্রিস্থলী-সেতু ও স্মার্ত্ত নিবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্বেতরাজার উপাখ্যান বাল্মীকি রামায়ণেও আছে।

স্কন্দপুরাণ

ত্রয়োদশ পর্য্যায়, নারদপুরাণমতে ৮১ হাজার। মৎস্য ও অগ্নিপুরাণের কথায় জানা যায় ৮১—৮৪ হাজার শ্লোক ছিল, বর্ত্তমান মুদ্রিত পুস্তকেও প্রায় ঐরূপ সংখ্যাই পাওয়া যায়। এই স্কন্দপুরাণ বহুখণ্ডে বিভক্ত; সুতরাং অখণ্ড স্কন্দপুরাণরূপে প্রায়ই ইহার কলেবর ছিল না, এক একটি খণ্ডাকারে ছিল, তাহার মধ্যে আবার বহু উপখণ্ড আছে; সুতরাং ইহার দ্বারা মূল স্কন্দপুরাণ কিরূপ ছিল, তাহা স্থির করা সুকঠিন। ইহার বহুলাংশই অসম্বদ্ধ, অপ্রাসঙ্গিক, বক্তৃবোদ্ধব্যের স্থিরতাহীনরূপে নির্দ্দিষ্ট; সুতরাং তাহাকে মূল পুরাণ বলিয়া আদর করা যায় না। কতকগুলি অংশ যে নিতান্ত আধুনিক, তাহা বিবেচক পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারেন। ঐরূপ অংশ কাশীখণ্ড ব্যতীত সকল খণ্ডেই আছে, এই সকল নির্দ্দেশ করিয়া প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি না করিয়া, যাহাতে বিশুদ্ধ একখানি পুরাণও বাহির করা যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করাই সুসঙ্গত মনে করি। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয় বক্তা, কিন্তু ৫টি খণ্ডে তাহার বক্তৃত্ব নাই; কেবল কাশীখণ্ডের ২৫শাধ্যায়ের পর হইতে ও প্রভাসখণ্ডে তাঁহাকে বক্তারূপে দেখিতে পাই। স্কন্দপুরাণে কোন ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে নাই। তীর্থমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে যাহার যাহার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাই বলা হইয়াছে। এই খণ্ড কয়েকটির মধ্যে কাশীখণ্ডের লিপি, ভাব বক্তব্য, গম্ভীর ও বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ, সে জন্য এই পুস্তক বহুজনসমাদৃত এবং ইহার বচন-প্রমাণ রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ ধরিয়াছেন। ভাগবতের ন্যায় এই কাশীখণ্ড পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

ভবিষ্যপুরাণের ন্যায় স্কন্দপুরাণও বহু ব্রত ও তীর্থমাহাত্ম্যাদিতে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে দার্শনিক বা জ্যোতিষ-চিকিৎসাদি অন্য বিষয় পাওয়া যায় না, সুবৃহৎ কলেবর শুধু তীর্থমাহাত্ম্যাদিতে পূর্ণ হইয়াছে। পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যও পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত যোগানন্দ সরস্বতী মহাশয় 'তত্ত্বদর্শন' নামক পুস্তকে জগন্নাথ ও পুরীর সম্বন্ধে তীব্র ভাষায় বিনা প্রমাণে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্তই দুঃখকর ও সমাজের অনিষ্টকর। জগন্নাথকে বুদ্ধ দেবতা বলা এবং পাচকগণকে শবর-জাতি নির্দ্দেশ করা ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান শ্রীমন্দির ১১১৯ শকে বা ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়, তত্ত্বদর্শনকার মনে করেন, ঐ সময়ে একবার মন্দির-সংস্কার হইয়াছিল। উক্ত শ্লোকটি এই—

"শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদং কারয়মাসানঙ্গভীমেন ধীমতা।"

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে যবন-সেনাপতি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক জগন্নাথ-মূর্ত্তি অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে জগন্নাথ দেবের ৪ হাত ছিল। চৈতন্যদেবও সেই মূর্ত্তি দেখিয়াছেন।

বামনপুরাণ

১৪শ মহাপুরাণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা দশ সহস্র। এই পুরাণখানি যেরূপ আকারে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে কিঞ্চিন্ন্যূন ৫ হাজার ৮ শত শ্লোক দেখা যায়, তন্মধ্যে ২২শ অধ্যায়ের পর ৫০শ অধ্যায় পর্য্যন্ত নূতন যোজিত হইয়াছে। কারণ, এই ২৩শ অধ্যায় হইতে বর্ণিত বিষয় সকলের কথা নারদীয় পুরাণের প্রদত্ত সূচীতে পাওয়া যায় না। এই পুরাণের বহুতর শ্লোক প্রমাণরূপে রঘুনন্দন প্রভৃতি সংগ্রহকর্ত্তৃগণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই পুরাণখানি পুলস্ত্য নারদকে বলিয়াছেন। এই পুরাণোক্ত সতীদেহত্যাগবৃত্তান্ত নূতন ভাবে বর্ণিত। সতী শিবের দক্ষালয়ে নিমন্ত্রণ হয় নাই, এই কথা শুনিয়া কৈলাসেই দেহত্যাগ করেন, তিনি দক্ষালয়ে গমন করেন নাই। পরবর্ত্তী যজ্ঞধ্বংসব্যাপারে অন্য পুরাণের সহিত মিল আছে।

এই পুরাণের শেষ ৬ অধ্যায়ে বামনাবতার ও তাঁহার কার্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে ; এই বর্ণনও বেশ পরিপক্ব বলিয়া বোধ হয় না এবং তন্মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা আছে। শুক্রাচার্য্য বলিকে ব্রহ্মন্ বলিয়া সম্বোধন করিয়া কোশকারের প্রাচীন কথা শুনিতে চাহিতেছেন, এইরূপ বহুতর আছে। আমাদের এই সব দোষপ্রদর্শন করান উদ্দেশ্য নহে বলিয়া অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। অজ্ঞ ব্যবসায়ী দ্বারা পুরাণগ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় এবং তাহাদের ধর্ম্মভয় না থাকায় তাহারা একাধিক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াও দেখে নাই বলিয়া বোধ হয়। ২৩—৬১ অধ্যায়ে বলির উপাখ্যান ও পরে ১৮টি অধ্যায়ে নানা তীর্থ-কথা অতিরিক্ত বর্ণিত দেখা যায়। ৬৩—৬৬ অধ্যায়ে অরজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, এই উপাখ্যানটি বাল্মীকির রামায়ণেও আছে।

কূর্ম্মপুরাণ

মহাপুরাণ গণনায় ১৫শ। নারদীয় পুরাণে জানা যায়, কূর্ম্মরূপী নারায়ণ—ইন্দ্রদ্যুম্ন-কথা-প্রসঙ্গে ঋষিগণের নিকট লক্ষ্মী-কল্পানুযায়ী কথা বলিয়াছিলেন, সেই সপ্তদশ সহস্র শ্লোকযুক্ত পুরাণের নাম কূর্ম্মপুরাণ এবং ঐ পুরাণের ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী ও বৈষ্ণবী সংহিতা নামে চারিখানি সংহিতায় নানা ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণাদি জাতির আচার, বৃত্তি প্রভৃতি, কামার্থপ্রদ ষট্‌কর্ম্ম ও মোক্ষকথা কথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রিত কূর্ম্মপুরাণে কিঞ্চিদধিক ৫ হাজার ৮ শত শ্লোক আছে, কিঞ্চিদধিক ১১ হাজার শ্লোকই নাই। উত্তরভাগের উল্লিখিত চারিখানি সংহিতার মধ্যে মাত্র ব্রাহ্মী সংহিতা আছে—যাহা গীতাদ্বয় ও তীর্থমাহাত্ম্যপূর্ণ। অপর তিনখানি সংহিতা পাওয়া যায় না।

কূর্ম্মপুরাণের বাক্য বহু নিবন্ধকার উদ্ধৃত করিয়াছে[ন।] এই কূর্ম্মপুরাণেও সকল মহাপুরাণ ও উপপুরাণের নাম উল্লি[খিত] হইয়াছে। ব্রাহ্মী সংহিতায় ৬ হাজার শ্লোক ছিল, অ[পর] সংহিতা হইতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধে বা উৎকর্ষত্ব নিব[ন্ধন] কিম্বা ভগবানের ইচ্ছায় ব্রাহ্মী সংহিতাই কূর্ম্মপুরাণ ব[লিয়া] সকলের কণ্ঠগত ছিল, তাই এখনও তাহার অস্তিত্ব আ[ছে,] অপর ৩ খানি সংহিতা লুপ্ত হইয়াছে।

এই ব্রাহ্মী সংহিতায় সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশ[ানু]চরিত, পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণই বর্ণিত হইয়াছে। এই পুর[াণে] কাশী, প্রয়াগ, কপালমোচন, নর্ম্মদা প্রভৃতি তীর্থমাহাত্ম্য, শ্রা[দ্ধ]বিধি, অশৌচবিধি, ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণয় ও অগ্নিহোত্রাদি যাবত[ীয়] শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিয়ম সকল বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ ঈশ্বরগীতা মহাভারতের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুরূপ। কূর্ম্মপুরা[ণের] ব্রাহ্মী সংহিতা পূর্ব্বভাগ ও উত্তরভাগ নামে দুই ভাগে বিভ[ক্ত।] ১মাধ্যায়ে এই কথা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মী সংহিতার উত্তরভা[গে] ঈশ্বরগীতা কথিত হইয়াছে, ইহার বক্তা শিব, শ্রোতা ন[র-]নারায়ণ পরজন্মে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই গীতা স্ম[রণ] করিয়া অর্জ্জুনের নিকট ভগবদ্গীতা বলিয়াছিলেন। ব্যাস ঈশ্ব[র]গীতা সমাপ্ত করিয়া মুনিগণের প্রশ্নানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন। ব্যাসও এক জন সংহিতাকার।

অনেক পুরাণে দেখা যায়, নৈমিষীয় ঋষিগণ সহ বক্তা সূতে[র] যে সংবাদ হইয়াছিল, তাহাও পুরাণমধ্যে নিবিষ্ট রহিয়াছে, এ[বং] মধ্যে মধ্যে ঋষিগণ প্রশ্ন করিলে সূত তাহার উত্তর দিতেছেন, এ[ই] সকলাংশ পুরাণরচনার পরে যোজিত হইয়াছে, ইহাই অধিকাং[শ] ব্যক্তির মত। কেহ কেহ মনে করেন যে, বেদের আখ্যায়িকাংশে[র] ন্যায় বক্তব্য বিষয়ের সুসন্নিবেশের আশায় নৈমিষীয় ঋষিগ[ণ] শ্রোতা ও সূত বক্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সকল কথা[ই] পুরাণকারের লেখা।

মৎস্যপুরাণ

পুরাণপর্য্যায় গণনায় ষোড়শস্থানীয়। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৪ হাজার। বর্ত্তমান মুদ্রিত পুস্তকে প্রায় ১৩ হাজার শ্লোক পাওয়া যায়, সহস্র শ্লোক কম আছে। এই পুরাণের ৫৩ অধ্যায়ে আছে, সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মা হইতে পুরাণের সৃষ্টি হয় এবং ঐ পুরাণ এক ছিল, পরে বেদব্যাস উহাকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করেন।

মৎস্যপুরাণে সপ্ত কল্পের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এই পুরাণের বক্তা মৎস্য, শ্রোতা বৈবস্বত মনু। পুরাণের পঞ্চাঙ্গ ভিন্ন

এ অনেক বক্তব্য আছে, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা মৎস্যপুরাণে পাওয়া যায়।

"সর্গ-প্রতিসর্গাদি পুরাণের পঞ্চাঙ্গ আখ্যান নামে কথিত হয়, তদ্ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, রুদ্রের মাহাত্ম্য, ভুবনোৎপত্তি-সংহার, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই পঞ্চাঙ্গ সকল পুরাণে বর্ণিত হয় এবং তাহার বিরুদ্ধ ও ফল বর্ণিত হয়।" ৫৩ অধ্যায় মৎস্য—৬৪—৬৬ শ্লোক।

আমরা পুরাণলক্ষণবর্ণন প্রসঙ্গে এ কথার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই স্থানে একটি নূতন তত্ত্ব পাওয়া গেল যে, "পঞ্চাঙ্গানি পুরাণেষু আখ্যানকমিতি স্মৃতম্" পঞ্চাঙ্গের অতিরিক্তাংশ পুরাণ হইলেও তাহা আখ্যানক বা ইতিহাস নহে। এ কথা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না এবং হওয়াও অনুচিত।

মৎস্যপুরাণের বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে নারদীয় পুরাণে যে সূচি প্রদত্ত হইয়াছে, মুদ্রিত মৎস্যপুরাণে তাহা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ পুরাণের সূচিমধ্যে উহা সন্নিবিষ্ট হইবে।

মৎস্যপুরাণে যযাতি-চরিত্র ও মহাভারতের যযাতি-চরিত্র একরূপ বর্ণিত হইয়াছে। উহা অধ্যায়ে অধ্যায়ে অভিন্ন, কদাচিৎ এক দুইটি শ্লোক কম-বেশী আছে। মহাভারতের আদিপর্ব্ব ৭৪ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোক মৎস্যপুরাণের ২৪শাধ্যায়ের ৫৫ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৯৩ অধ্যায় ও মৎস্যপুরাণের ৪২ অধ্যায় পর্য্যন্ত দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ গ্রন্থ এক, ক্বচিৎ একটু ব্যতিক্রম আছে।

জনমেজয়ের প্রপৌত্র অধিসোমকৃষ্ণের রাজত্বকালে মৎস্য ও বায়ুপুরাণ কুরুক্ষেত্রে কথিত হইয়াছিল, ইহা উক্ত পুরাণদ্বয় হইতে অভিন্ন শ্লোকে জানা যায়।

"অধিসোমকৃষ্ণো ধর্ম্মাত্মা সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ। যস্মিন্ শাসতি রাষ্ট্রেস্থ যুষ্মাভিরিদমাহৃতম্। দুরাপং দীর্ঘসত্রন্ত ত্রীণি বর্ষাণি দুষ্করে। বর্ষদ্বয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বত্যাঃ দ্বিজোত্তমাঃ॥"—বায়ু ৯৯ অধ্যায়। ২৫৮—৫৯ মৎস্য—৫০ অধ্যায়—৬৬—৬৭। উক্ত অধ্যায়দ্বয়ের অপর শ্লোকগুলিও প্রায় একরূপ, একটু নিবিষ্টচিত্তে পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে মুখে মুখে একই গাথা প্রচলিত ছিল, উহা বিভিন্ন নামে পুরাণ বলিয়া প্রচার করিলেও ঐ শ্লোক অপরিবর্ত্তিতই আছে। সমগ্র পুরাণগুলির কলেবরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, উহার এক একখানিতে নূতন জিনিষ কিছু স্বল্পই আছে।

মৎস্যপুরাণ বঙ্গদেশেও বেশ প্রচলিত ছিল। এই দেশে যে কিছু তুলাপুরুষদান, নবগ্রহযাগ, তোরণ বৃষোৎসর্গ-অঙ্কুরারোপণ, ধ্বজপতাকাদিপ্রমাণ প্রচলিত, উহা সকলই মৎস্যপুরাণ হইতে গৃহীত এবং বৃহন্নন্দিকেশ্বর, কালিকা, দেবীপুরাণাদিমতে লিখিত দুর্গাপূজাতেও মৎস্যপুরাণোক্ত ধ্যানেই পূজা হয় এবং ঐ পুরাণের লিখিত মূর্ত্তিরই পূজা হইয়া থাকে।

মৎস্যপুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয় বহু এবং সংসারের বিশেষ উপযোগী। ইহার আরম্ভের—মৎস্য ও মনুর আখ্যায়িকা শতপথ ব্রাহ্মণে আছে; প্রতীচ্য জাতির ধর্ম্মগ্রন্থেও এই গল্পটি স্থান পাইয়াছে। আমরা ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকাংশ পূর্ব্বে দেখাইয়াছি!

এই পুরাণের বিশেষত্ব—কোন্ পুরাণ কোন্ কল্পে কাহার দ্বারা কথিত, তাহা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা অন্য পুরাণে নাই।

গরুড়পুরাণ

১৭শ সংখ্যক। ইহার শ্লোকসংখ্যা নারদীয় পুরাণমতে ১৯ হাজার, মৎস্যপুরাণমতে ১৮ হাজার, গরুড়পুরাণের ১ম অধ্যায়ে ৮ হাজার ৮ শত শ্লোকসংখ্যার উল্লেখ আছে, অগ্নিপুরাণমতে ৮ হাজার, মুদ্রিত পুস্তকে ৮ হাজার ২২ শত ৫ শ্লোক পাওয়া যায়। এই পুরাণে জনমেজয়ের পরবর্ত্তী রাজগণ ভবিষ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই পুরাণখানি পদ্মপুরাণের নির্দ্দেশানুসারে সাত্ত্বিক পুরাণ। ইহার বর্ণিতব্য বিষয় অনন্ত। তন্মধ্যে সাধারণ পুরাণ হইতে বিলক্ষণ—জ্যোতিষ, চিকিৎসা, ব্যাকরণ, প্রেততত্ত্ব প্রভৃতি। ইহাতে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ বিস্তৃতভাবে না থাকিলেও সংক্ষিপ্তভাবে আছে। চিকিৎসাশাস্ত্র অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সহিত অভিন্ন। নিদান স্থানের সম্পূর্ণ অভেদ। জ্যোতিষ বিস্তৃতভাবে আছে; ইহাতে প্রশ্নগণনাপ্রণালীও আছে। ১মাধ্যায়ে যে দ্বাবিংশ.বতারের কথা আছে, উহা ভাগবতের অবতারবর্ণনার শ্লোক কয়েকটির সহিত অভিন্ন। সপ্তর্ষিগণের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় যে কয়েকটি শ্লোক ৫মাধ্যায়ে আছে, উহা অতি বিশিষ্ট এবং বহুজ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ—যাহা অন্য পুরাণে জানা যায় না। ইহার মধ্যে সূর্য্য, বিষ্ণু প্রভৃতির পূজাবিধিও বিলক্ষণ ও বিস্তৃত। ফলিত-জ্যোতিষ, সামুদ্রিক, পঞ্চস্বরা প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আছে। মুক্তা-মণি-রত্নের উৎপত্তিভেদ, লক্ষণ ও মূল্য-নিরূপণ ও দোষগুণবর্ণন অতি বিশদ ও বিস্তৃতভাবে আছে। বাস্তুমান, প্রাসাদলক্ষণ, সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠা, প্রায়শ্চিত্ত, দান-ধর্ম্মদ্বীপ-নরকাদি বর্ণন, তীর্থমাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধ, আশ্রম, নীতিসার, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশবর্ণন,. হরির অবতারকথা, রামায়ণ, হরিবংশ, মহাভারত, প্রশ্নচূড়ামণি, আয়ুর্ব্বেদ, ধর্ম্মসার, যোগশাস্ত্র, বেদান্ত, গীতাসার, আত্মজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিষয় পূর্ব্বখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরখণ্ডে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের গতি, দানফল, ঊর্দ্ধদেহিকী ক্রিয়া, যমলোক ও যমমার্গ হইতে নিষ্কৃতিলাভ, ধর্ম্মরাজের বৈভব,

করিতে যত্নবান্ হন, তৎকালে পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ লভ্যাংশ ত্যাগে অনিচ্ছুক হইয়া সত্যপীরকে একবারে পৌরাণিক সত্যনারায়ণে পরিণত করেন। "ছড়ায়" সত্যপীরকে মাণিক পীরের সহোদর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মাণিক পীর তদীয় অনুজের ন্যায় সমগ্র বঙ্গে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। তাঁহার লীলাক্ষেত্র মধ্যবঙ্গে, বিশেষতঃ যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাহিত্য-রসিক দীনবন্ধু "জামাইবারিকে" যে "মাণিক পীর ভবনদী পারে যাবার না" গীত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, উহা যশোহর জেলারই নিজস্ব বস্তু। মনসা যেরূপ সর্পের দেবতা, দক্ষিণ রায় যেরূপ ব্যাঘ্রের দেবতা, মাণিক পীরও তদ্রূপ গোধনরক্ষক দেবতা বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে গ্রীক দেবতা Pan'এর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রতি বৎসর শীতকালে যখন পল্লীপ্রান্তর স্বর্ণকান্তি সুপক্ব ধান্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, ও স্তূপীকৃত ধান্যরাশি গৃহস্থের অঙ্গনে লক্ষ্মীর শুভ পদার্পণ সূচিত করে, তখনকার শুক্ল পক্ষের রজনীতে পল্লী-কৃষি-বালকগণ দলবদ্ধ হইয়া গ্রামস্থ প্রতি গৃহস্থের দ্বারে উপনীত হয় ও সমস্বরে কোন নিরক্ষর প্রাচীন পল্লী-কবি-রচিত মাণিক পীরের ছড়া গাহিয়া গৃহস্থের নিকট হইতে "চাউল," "কড়ি," "গুয়া" ভিক্ষা করিয়া লয় ও পরদিবস মহা সমারোহে মাণিক পীরের সির্ণী দেয়। এই সির্ণী দেওয়া একরূপ বনভোজন বা চড়িভাতীর রূপান্তর। ইহাতে পুরোহিত বা মৌলভীর প্রয়োজন হয় না। দরিদ্র পল্লী-বালকগণ মাণিক পীরের নাম লইয়া যাহা পায়, তাহাই রন্ধন করিয়া সকলে মহানন্দে ভোজন করে। কোন গৃহস্থই ইহাদিগকে বিমুখ করেন না বা করিতে পারেন না। কারণ, মাণিক পীর ক্রুদ্ধ হইলে গোধন-বংশ নির্ব্বংশ হইবে।

কেচ্ছা বা ছড়া হইতে জানা যায় যে, মাণিক পীর এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসী নহেন। তিনি "দরিয়া" পার হইয়া আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, ভিন্ন স্থানের বাসিন্দা হইলেও এখানে একরূপ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। নিজ মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য মাণিক পীর স্বীয় ভ্রাতা সত্য পীরকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে "কানু ঘোষ" নামক এক গোয়ালার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন ও "জিকির" ছাড়িলেন। তখন,

"কানু ঘোষের মা বলে নন্দ ঘোষের ঝি।
এসেছে মাণিকের ফকির ভিক্ষে দেব কি।" *

এ ফকির কিন্তু একটু অদ্ভুত ধরণের। সে অন্ন, বস্ত্র, অর্থ কিছুই চাহিল না, চাহিল একটু দুধ। কানু ঘোষের বৃদ্ধা জননীকে সে বলিল, "ওগো ভালমানুষের মেয়ে,—

ভিক্ষের ফকির নয় রে মোরা ভিক্ষে নারে নেব।
থোড়া দুগ্ধ পেলে কিঞ্চিৎ দোয়া দিয়ে যাব।"

কথাটা বৃদ্ধার মনঃপূত হইল না। সে শিশুকাল হইতে বহু ফকীর সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়াছে, তাহারা হয় অন্ন, না হয় বস্ত্র, না হয় অর্থ প্রার্থনা করে। কিন্তু এ নূতন ফকির সে সব কিছুই চাহে না, অবোধ শিশুর ন্যায় একটু দুধ খাইতে চাহে। বুড়ী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফকিরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাঁহার জানু পর্য্যন্ত কর্দ্দমের চিহ্ন, পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন ও মলিন, মাথার কেশ রুক্ষ;—অথচ সে বলিতেছে, একটু দুধ পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবে। যাহার নিজের এমন দুরবস্থা, তাহার আশীর্ব্বাদে আবার অন্যের কি ফললাভ হইবে? স্বতঃই বুড়ীর মনে অশ্রদ্ধার ভাব উদয় হইল, সে ফকিরকে ভণ্ড মনে করিয়া বলিল,—

"দোয়াগিরি ফকির তুমি এত দোয় জান।
রাত পোহালে কেন তুমি কাদা ভেঙ্গে মর।।"

এই বলিয়া বুদ্ধিহীনা গোপাঙ্গনা মাণিক পীরকে দুগ্ধ না দিয়াই বিমুখ করত ফিরাইয়া দিল। মাণিক পীর ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তিনি মুখে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু পীরকে নিরাশ করিবার যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহাই ফলিল। তখন,

"পাঁচশ মোলো তেলে গরু নশ মোলো গাই।
কইলে বাছুর মোলো কত লেখাজোখা নাই।"

কানু ঘোষের অর্দ্ধাঙ্গিনী ত এই সর্ব্বনাশ দেখিয়া একবারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। হায় হায়, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় এতগুলি দুগ্ধবতী গাভী, বলদ ও বৎস একদিনেই এমন করিয়া মরিয়া গেল! তাহাদের জীবিকা-সংস্থানই বা হইবে কিরূপে? স্বভাব-সরল-হৃদয়া গোপবনিতার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এর চেয়ে যদি তাহার কোলের ছেলে মরিয়া যাইত, তাহাও যে তাহার পক্ষে সহ্য হইত! কৃষি-প্রধান বাঙ্গালীর নিকট গোধন এমনই বস্তু! আর সেই বৃদ্ধা? সে যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহারই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে আজ এমন দশা ঘটিয়াছে, তখন ক্ষোভে অনুতাপে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

* এই কানু ঘোষ পদাবলীর কানু বা কৃষ্ণ নহেন। কানু নামক গোয়ালা মাত্র। এখানকার নন্দ ঘোষ কানু ঘোষের শ্বশুর। "নন্দ ঘোষের ঝি" সম্বোধনে কানুর স্ত্রীকে বুঝিতে হইবে। সেকালের গৃহিণীরা পুত্রবধূকে "অমুকের মেয়ে" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এ বিষয়ে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

"কানু ঘোষের মা কাঁদে হাতে লয়ে নড়ি।
বাথানেতে প'ড়ে আছে চোদ্দ বোঝা দড়ি।"

এইরূপে সপ্ত দিবস অতীত হইল, কিন্তু গোপগৃহে রোদনের আর বিরাম নাই। রমণীদ্বয়ের করুণ আর্ত্তনাদে মাণিক পীরের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। নির্ব্বোধ "গোয়ালার নারী" না বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছে, তজ্জন্য এমন কঠোর দণ্ড বুঝি না দিলেই হইত। তিনি তাহাদের দুঃখ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন,

"মাণিক পীর ডেকে বলেন সত্য পীর মোর ভাই।
মেরেছি বহিলের ধন চল গে বাঁচাই।"

এই বলিয়া বাথানের দিকে গমন করিলেন, সম্মুখে খড়, বিচালী প্রভৃতি অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, পার্শ্বে অসংখ্য গোধন মৃতবৎ পড়িয়া আছে। তখন,

"বিচ্‌মোল্যা বোলে মাণিক পিঠে দিলেন হাত।
সাত দিনের মরা গরু উঠে খেল ঘাস।
বিচ্‌মোল্যা বলে মাণিক পিঠে দিলেন বাড়ি।
সাত রোজের মরা গরু উঠে চল্ল বাড়ী।"

গোধনগণের পদশব্দ ও হম্বাধ্বনি শুনিয়া বুড়ী বাহিরে আসিয়া দেখিল তাহাদেরই মৃত গাভীগুলি কাহার কৃপায় পুনর্জীবন পাইয়া গৃহে ফিরিতেছে। সে যে কাহার কৃপা, তাহা বুঝিতে বুড়ীর আর বিলম্ব হইল না। সে ভক্তিভাবে পীরের উদ্দেশে পুনঃপুন প্রণাম করিল ও সেই হইতে নিত্য নিয়মিতরূপে "দই, দুগ্ধ, কলা" দিয়া পীরের সির্নী দিতে লাগিল। ইহাতে পীরের "দোয়ার" তাহাদের গোধন-বংশের উন্নতি হইতে লাগিল ও ক্ষেত্রে প্রচুর ফসল ফলিতে লাগিল। বৃদ্ধার প্রমুখাৎ অবগত হইয়া পল্লীবাসিগণও মাণিক পীরের সির্নী দিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে লোকসমাজে পীরের মাহাত্ম্য প্রকটিত হইল। আজও সমতটের প্রাচীন গণ্ডগ্রাম-সমূহে ষষ্ঠীতলা, মনসাতলা, কুলুইতলার ন্যায় মাণিক পীরতলা বা মাণিক পীরের অধিষ্ঠান-স্থানরূপে কল্পিত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও গৃহস্থগণ গাভীর প্রথম "বিয়োনের" দুধ প্রথমে মাণিকপীর-তলায় না দিয়া স্বয়ং গ্রহণ করে না। আজিও যশোহর খুলনার শত শত ফকির মাণিক পীরের নাম লইয়া ভিক্ষা করত জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোকসমাজে মাণিক পীর সুপরিচিত হইলেও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কোন কবি তাহার উপাখ্যান লইয়া কোন কাব্য বা পাঁচালি রচনা করেন নাই। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে, মাণিক পীর নিতান্ত আধুনিক কোন পীর মাত্র—স্বীয় প্রভাবে অল্পদিনমাত্র Canonised হইয়া সির্নী লাভ করিতেছেন। এই যুক্তিতে কিছু সত্য থাকিতেও পারে, কারণ, প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে কোথাও মাণিক পীরের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে আধুনিক হইলেও মাণিকপীর যে অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে। কারণ, পুরুষপরম্পরাক্রমে মাণিক পীরের ছড়া গান স্মরণাতীত দিন হইতে সমতট অঞ্চলে প্রচলিত আছে। প্রাচীন সাহিত্যে মাণিক পীর সম্বন্ধে কোন পাঁচালী প্রচলিত না থাকিবার অন্য একটি কারণ এই যে, মাণিক পীরের উপাখ্যান ভাগ অত্যন্ত সাধারণ ধরণের। এক গোপাঙ্গনার নির্বুদ্ধিতা, তজ্জন্য মাণিক পীর কর্ত্তৃক গোধনগণের প্রাণ হরণ ও পরে সদয় হইয়া তাহাদিগের পুনর্জীবন দান ইহাই আখ্যায়িকার বর্ণিতব্য বিষয়। এই উপাখ্যানভাগে বোধ হয় কাব্যোচিত Romance না থাকায় ইহা কোন প্রাচীন কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে মাণিক পীরের নাম সর্ব্বত্র জ্ঞাত ও খ্যাত হইলেও সুপ্রসিদ্ধ "বিশ্বকোষ অভিধানে" ও "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থদ্বয়ে ইহার উল্লেখমাত্র নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (এম, এ; ডি, লিট্)।

হর্ষচরিত-সমালোচনার আলোচনা

আমি বসুমতীতে "হর্ষচরিত" নামক প্রবন্ধটি একটু ভয়ে ভয়ে লিখি। প্রথমতঃ ঐ নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধটি পাঠক সম্প্রদায়ের মুখরোচক হবে কি না, আমার মনে এ সন্দেহ ত ছিলই, উপরন্তু, সাহিত্যিকের এরূপ অনধিকারচর্চ্চা ঐতিহাসিকদের মনঃপূত হবে কি না, সে ভয়ও আমার ছিল।

এই কারণে "হর্ষচরিত আলোচনার সমালোচনা" প'ড়ে মহা খুসী হয়েছি। উক্ত সমালোচনাই প্রমাণ যে, আমার প্রবন্ধটি একেবারে অপাঠ্য হয় নি; অন্ততঃ একটি পাঠক যে উক্ত প্রবন্ধটি পড়েছেন এবং মন দিয়েই পড়েছেন এবং তাঁর নাম শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বনাথ রায়। তিনি বলেছেন যে—"নীরস ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রমথ বাবুর অসামান্য লিপিকুশলতার ফলে অতি সরস এবং সুখপাঠ্য হয়েছে।" এ প্রশংসা শুনে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। আমার মত লেখক এর চাইতে আর বড় সার্টিফিকেট, কি পেতে পারে?

এর পর তিনি অবশ্য বলেছেন যে, "কয়েকটা বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ আছে" এবং সেই মতভেদ প্রকট করাই তাঁর সমালোচনার উদ্দেশ্য। এ মতান্তরের পরিচয় পেয়ে আমার লেখনী স[illegible]পায়নি। কারণ, তাঁর সমালোচনা প'ড়ে

দেখলুম যে, আমাদের পরস্পরের গরমিল, মতের নয়, factএর। আমার বর্ণিত কোন কোনও fact যদি ভুলক্রমে ভুলও হয়, তার জন্ম আমি বিশেষ লজ্জিত নই। কারণ, যে সব factএর আমি উল্লেখ করেছি, তার একটিও, অতীতের মাটী খুঁড়ে আমি আবিষ্কার করেনি, সবই ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি মাত্র। আর এও আমি জানি যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে হলে এত অজানা জিনিষ নিয়ে কারবার করতে হয় যে, ঐতিহাসিকদের অতীতের অন্ধকারে ঢিল ছোড়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ফলে সে ঢিল যে পরস্পরের গায়ে লাগ্‌বে, এ ত ধরা কথা। এ রাজ্যে আমি অক্ষত শরীরে বিচরণ করতে পারি, কেন না, আমি ঐতিহাসিক নই—সাহিত্যিক।

এখন হর্ষচরিতের যে কটি কথার তিনি খুঁত ধরেছেন, সে বিষয়ে আমার কৈফিয়ৎ দিচ্ছি :

(১) আমি লিখেছি যে, "ভারতবর্ষের ইতিহাসে, স্বদেশীয় একরাটের দর্শন বড় বেশি মেলে না।" সমালোচক মহাশয় বলেন যে, "বহুতর একরাটের সন্ধান ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাওয়া যায়" এবং তিনি তাঁদের নামের ফর্দ্দ দিয়েছেন। এর উত্তরে আমি বলি, অধিকন্তু ন দোষায়—the more, the merrier।" তবে কারও দর্শন পাওয়া আর সন্ধান পাওয়া এক জিনিষ নয়।

(২) আমি লিখেছি—"হর্ষবর্দ্ধন নিজ বাহুবলে দিগ্বিজয় ক'রে উত্তরাপথের সম্রাট হয়েছিলেন।" উত্তরে সমালোচক মহাশয় বলেন,—"বাস্তবপক্ষে হর্ষবর্দ্ধনের বাহুবল অর্থাৎ রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। আমি দেখাইবার চেষ্টা করিব, ইতিহাস বরং এ সম্বন্ধে বিপরীত সাক্ষ্যই প্রদান করে।"

হর্ষবর্দ্ধনের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা যে বাণভট্টও করেন নি, হিয়েন সঙও করেন নি, এ কথা বোধ হয় আমার প্রবন্ধেও স্পষ্ট ক'রে বলা আছে। তবে তিনি যে উত্তরাপথের সম্রাট হয়েছিলেন নিজ বাহুবলে, দিগ্বিজয়ের ফলে, এ আমার অনুমান মাত্র। তবে হতে পারে যে, যুদ্ধে হেরে হেরেই তিনি এ পদমর্য্যাদা লাভ করেছিলেন। সম্ভবতঃ সেকালে সবই একালের উল্টো টানে চলত এবং অনুমানকে উল্টে ফেল্লেই তা প্রমাণ হত; এবং সম্ভবতঃ হিন্দু যুগে কাপুরুষতার প্রসাদেই রাজারা অবনিপতি হয়ে উঠত, যেমন হর্ষ হয়েছিলেন। সুতরাং আমার উক্ত অনুমান যে ভুল হতে পারে, এ কথা আমি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই।

(৩) তার পর সমালোচক মহাশয় বলেছেন যে—"প্রমথ বাবুর জিজ্ঞাসা—এই ভণ্ডী নামক ব্যক্তিটি কে? রাধাকুমুদ বাবুর মতে ভণ্ডী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যশোধর্ম দেবে[illegible] প্রমথ বাবু তাহা স্বীকার করেন না। কারণ, তিনি বলেন, রাধাকুমুদ বাবু যা বলেছেন, তা হতে পারে, কিন্তু তা আঁকে মেলে না। বিশেষতঃ যশোধর্ম্মদেবের পুত্র শিলাদিত্যই নাকি ভণ্ডীর পিতা—যে রাজার বিরুদ্ধে লড়ে ভণ্ডী ও রাজ্যবর্দ্ধন জয়লাভ করেন।" এই ছুটি কথা নাকি অমূলক, তাই তিনি বলেন।

"ভণ্ডীর সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস যদিও প্রমথ বাবুর অনুরূপ, কিন্তু প্রমথ বাবু তাঁহার বিশ্বাসের পোষকতার যে ছুটা যুক্তির অবতারণা করেছেন, তারা উভয়েই ভিত্তিহীন। আমি সংক্ষেপে প্রমথ বাবুর যুক্তি ছুটির অসারত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করব।"

এখন আমার বক্তব্য এই যে, সমালোচক মহাশয়ের বিশ্বাস যে, আমার বিশ্বাসের অনুরূপ, এ কথা শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। কারণ, ঐ একটি বিষয়ে আমি রাধাকুমুদ বাবুর মত গ্রাহ্য করতে পারিনি। রাধাকুমুদ বাবু যে এর প্রতিবাদ করতে পারেন, এ ভয় আমার আছে। তিনি যদি সত্যই সে প্রতিবাদ করেন, তা হ'লে সে প্রতিবাদের প্রতিবাদ করবার বরাত আমি শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বনাথ রায়ের উপর দেব। তখন রাধাকুমুদ বাবু বুঝতে পারবেন, ইতিহাস লেখা ঠাট্টার কথা নয়।

আমার যুক্তি ভিত্তিহীন। তাতে কিছু আসে যায় না, কেন না, আমার মত ত ঠিক। একটা সত্যে পৌছন নিয়েই কথা। ভুল পথে গিয়েও যদি ঠিক যায়গায় যাওয়া যায় ত সে ত সুখেরই কথা। তবু আমার যুক্তি না হোক, উক্তি ছুটির বিরুদ্ধে সমালোচক মহাশয়ের আক্রমণ মারাত্মক কি না, দেখা যাক্। সে উক্তি ছুটির পুনরুদ্ধার করছি।

(ক) ভণ্ডী যে যশোধর্ম্মদেবের পৌত্র, এ সত্য আঁকে মেলে না।

(খ) শিলাদিত্যই নাকি ভণ্ডীর পিতা, যে রাজার বিরুদ্ধে ভণ্ডী ও রাজ্যবর্দ্ধন জয়লাভ করেন;

সমালোচক মহাশয় বলেন যে, ভণ্ডী অবশ্য যশোধর্ম্মদেবের পৌত্র নন, কিন্তু এ রক্তের সম্বন্ধ অঙ্ক কষে সাব্যস্ত করা যায়। এ বিষয়ে তাঁর কষা অঙ্ক নিম্নে বিবৃত করছি, পাঠকরা বিচার করবেন, তিনি ঠিক ঠিক নামিয়েছেন কি না।

ভণ্ডীর কুলের খবর ইতিহাসের জমাখরচের খাতায় নাকি এই পাওয়া যায়। যাঁকে আমরা বিক্রমাদিত্য ব'লে জানি, তিনি হচ্ছেন যশোধর্ম্মদেব।

বিক্রমাদিত্যর সভা কালিদাস প্রমুখ নবরত্নের প্রভায় উজ্জ্বল থাকৃত।

বররুচি উক্ত নবরত্নের অন্যতম রত্ন।

সুবন্ধু বররুচির ভাগিনেয়। [illegible]

সুবন্ধু লিখেছিলেন, বাসবদত্তা।

বাসবদত্তার নাম উল্লেখ করেছেন বাণভট্ট।

Q. E. D.—ভণ্ডী যে যশোধর্ম্মদেবের পৌত্র, এ অনুমান আঁকে যে মেলে না, তা নয়, বরং বেশই মেলে,—অর্থাৎ mathemetically proved হয়।

এক কথায়, বররুচি যখন ছিলেন সুবন্ধুর পিতার শ্যালক,তখন শিলাদিত্য যে ছিলেন হর্ষবর্দ্ধনের পিতার শ্যালক, এ কথা আঁকে কেন মিলবে না, এবং বেশিই মিলবে। এ হেন সুযুক্তি আমার কাছে গ্রাহ্য হতে পারে, কারণ, আমি সাহিত্যিক, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ হেন উক্তি ঐতিহাসিকদের কানে বিসদৃশ ঠেক্‌বে।

এখন "ক" ছেড়ে "খ"য়ে আসা যাক্।

"শিলাদিত্যের বিরুদ্ধে ভণ্ডী ও রাজ্যবর্দ্ধন ল'ড়ে জয়লাভ করেছিলেন, এ কথা প্রমথ বাবু কোথায় পেলেন,—তা প্রমথ বাবুই বলতে পারেন।" আমি কোথায় পেয়েছি, তা বলছি। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ইংরাজী হর্ষচরিতে। এ কথা যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণস্বরূপ রাধাকুমুদ বাবুর কথা নিয়ে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :—

"But these old enemies of Prabhakara, viz. Malwa and the Huns, troubled him in his last days. He had to send Crown-prince Rajya to fight the Huns in the north, while Siladitya, having regained his throne in about 604, with the help of the Huna king, proceeded against his old enemies, the Maukhari and Thaneswar Kings; with what results we have narrated. The second Malava War, was brought to an end by King Rajya in the Summer of 606. The friend and ally of the Emperor Siladitya, must have been the King named Devagupta of Malwa in the inscription, who is twice referred to also by Bana, once as "a man named Gupta" (গুপ্তনাম্না) as implicated in the conspiracy to which Rajya fell to victim."

(Harsha P. 61—62.)

এ সকল কথা যদি ভিত্তিহীন হয়, তা হ'লে তার জন্য দায়ী রাধাকুমুদ বাবু, আমি নই—কারণ, আমি যে তাঁর পদানুসরণ করেছি—সে কথা আমি স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছি। আশা করি, আমার এ কৈফিয়ৎ সমালোচক মহাশয়ের কাছে না হো'ক, পাঠক সমাজের কাছে সন্তোষজনক ব'লে গ্রাহ্য হবে। সমালোচক মহাশয় কেমন ভাষা সম্বন্ধে চলতি ভাষা ও সাধু ভাষার মধ্যে কোনটি গ্রাহ্য এবং কোনটি অগ্রাহ্য, সে বিষয়ে মনস্থির করতে পারেন নি ; এবং এক প্রবন্ধে এক সঙ্গে নির্ব্বিচারে দুইই ব্যবহার করেছেন,—তেমনি তিনি হর্ষচরিত সম্বন্ধে কোন্ কথাটি বড় আর কোন্ কথাটি ছোট, তার বিচার না ক'রে দুইই এক সঙ্গে গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করেছেন। এর জন্য আমার কি জবাব দিয়ে থাকতে পারে ?

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বক্তা

বক্তা বলে বড় আমি শ্রেষ্ঠ কেবা আছে আর,
আমার অমোঘ-বাণী করে ধরা তোল-পাড়।
দীপ-গাছা বলে বন্ধু এস কোলাকুলি করি,
সবে আলো দিই কিন্তু নিজে যে আঁধারে মরি।

শ্রীপশুপতি সরকার

যুগোশ্লাভিয়া

কোসোভো কৃষকদিগের শস্যকর্ত্তন

বিগত য়ুরোপীয় কুরুক্ষেত্র-সমরের কথা, বাঙ্গালী—শিক্ষিত-মাত্রেরই স্মৃতিপথে জাগরূক আছে। য়ুরোপীয় মহাসমরে যুগোশ্লাভিয়ার স্থান যথেষ্টই ছিল। যুদ্ধশেষে শ্লোভেনিয়া-ক্রোশিয়া, শ্লাভোনিয়া, বস্‌নিয়া, হার্সিগোভিনা, ডালমাসিয়া, বানাটের কিয়দংশ এবং মন্টিনিগ্রো-রাজ্য সার্বিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়। ইহার ফলে একটি বড় রাজ্যের উদ্ভব হয়, তাহারই নাম যুগোশ্লাভিয়া। এই রাজ্যের ভূভাগের পরিমাণ ৯৬ হাজার বর্গ-মাইল এবং লোক-সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ।

য়ুরোপের এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের অধিবাসীদিগের রীতিনীতি, কার্য্য-পদ্ধতি, বেশভূষা প্রভৃতির পরিচয় "মাসিক বসুমতীর" পাঠকপাঠিকাবর্গের চিত্তাকর্ষক হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যুগোশ্লাভিয়ার সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় সংগৃহীত করিয়া দেওয়া হইল।

"যুগোশ্লাভিয়া" নাম শ্রবণমাত্র মনে হয়, "শ্লাভিয়া" বোধ হয় রুসিয়ার অন্তর্বর্ত্তী কো[illegible]ন। কিন্তু ইতিহাসপাঠকমাত্রই জানেন যে, বল্‌কানে[illegible] জাতি মহাযুদ্ধের পর সম্মিলিত হইয়া একতাবন্ধসূত্রে খণ্ড-বিখণ্ড রাজ্যগুলিকে নূতন নামে জগতের বাজারে পরিচিত করিয়া দিয়াছে। স্বাধীন দেশের ইহাই লক্ষণ। মহাযুদ্ধের পর বলকানশ্লাভ জাতি আপনাদের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া, নানা মতভেদ ও পার্থক্য সত্ত্বেও সম্মিলিত হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়ার প্রকৃত অর্থ "দক্ষিণ-শ্লাভিয়া।"

অবগুণ্ঠনাবৃত সার্ব্বীয় মুসলমান নারী

যে কয়টি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লইয়া যুগোশ্লাভিয়া গঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে হার্সিগোভিনা অন্যতম। এই দেশটির অনেক স্থান অমুর্ব্বর। বহু পাহাড়ও এখানে বিদ্যমান। পার্ব্বত্য নদীগুলি অবশ্য স্থানে স্থানে চিত্তাকর্ষক। তবে মনুষ্যের সুখ ও আরামের উপাদান হার্সিগোভিনার মধ্যে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সমগ্র যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে এই প্রদেশের পার্ব্বত্য অধিবাসীরা অত্যন্ত শ্রমসহিষ্ণু। বিদ্যার্জ্জনেও ইহাদের আগ্রহ এবং স্পৃহা সমধিক প্রবল। যুগোশ্লাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহাদের অনেকেই যথেষ্ট যশঃ-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

হার্সিগোভিনার নদীর উপরিস্থিত পাষাণনির্ম্মিত সেতুগুলি

কোসোভোর কৃষকগণ বাজারে চলিয়াছে

অত্যন্ত সুদৃঢ়। কৃষ্ণ-অবগুণ্ঠনাবৃতা মুসলমাননারীরা এই সকল সেতু পার হইয়া হাটে-বাজারে গমনাগমন করিয়া থাকে। এ দেশের অধিবাসীরা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ইস্লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ইঁহারা এখনও কনষ্টান্টিনোপলের তুর্ক-নারীদিগের ন্যায় অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন নাই। বরং ধর্ম্মানুগত অনুশাসনের প্রতি ইঁহাদের নিষ্ঠা সমধিক প্রবল। অবশ্য বর্ত্তমান যুগের আবহাওয়া অনুসারে হার্সিগোভিনার নারীরা "সর্টস্কার্ট" পরিধানের অনুমতি পাইয়াছেন, কিন্তু সাধারণ্যে অবগুণ্ঠন উন্মোচনের প্রথা এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

সেরাজেভোর কিশোরীগণ

নেরেৎভা নদী বহু পাহাড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। নদীতে নানাবিধ মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। নেরেৎভা উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়া মোটরে যাইবার পথ প্রস্তুত আছে। উহার সাহায্যে মস্টার নগরে পৌছান যায়। এই নগরের কিছু দূরে একটি সমাধিভূমি দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহা বহু পুরাতন সমাধিক্ষেত্র। প্রাচীনকালে বগোমিল নামে এক সম্প্রদায় লোক এতদঞ্চলে বাস করিত। তাহারা যে মতবাদ প্রচার করিত, তাহা য়ুরোপের নানা পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রসৃত হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের পর এই সম্প্রদায়ের উপর নানাপ্রকার নিপীড়ন চলিয়াছিল। বগোমিল সম্প্রদায়ের নরনারীরা তাহার ফলে বস্নিয়ার নানা পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত তাহারা স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসে অটল ছিল। তার পর ইস্লামধর্ম্মে তাহারা দীক্ষিত হয়। উল্লিখিত সমাধিক্ষেত্র তাহাদের শেষ স্মৃতি বহন করিতেছে।

বস্নিয়া অঞ্চল অরণ্য-প্রধান। এতদঞ্চলে ওক গাছের প্রাচুর্ভাব। বৎসরে ৬ কোটি পিপার উপযোগী ওক কাষ্ঠ এখান হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। বস্নিয়ার ভূভাগের শতকরা ৫০ ভাগ অরণ্যসমাকুল। ওক বৃক্ষ ব্যতীত সেগুন কাষ্ঠও এখানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

সেরাজেভো বস্নিয়ার প্রধান নগর। নগরের মধ্য দিয়া নদী প্রবাহিতা। [illegible] ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই নদীর উপরি[illegible] সেতুর সন্নিহিত স্থান হইতে একটি

পিস্তলের গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। তাহারই প্রতিধ্বনি সমগ্র বিশ্বকে বিচলিত করিয়া দিয়াছিল। অষ্ট্রীয় আর্চডিউক ফ্রান্সিস্ ফার্দ্দিনান্দ সস্ত্রীক জনৈক ছাত্রের নিক্ষিপ্ত গুলীতে এই সেতুর ধারে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পর যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারই ক্রমপরিণতি য়ুরোপীয় মহাসমর।

সেরাজেভো পরম রমণীয় নগর। জনৈক মার্কিণ ভ্রমণকারী সম্প্রতি এই নগর দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট সেরাজেভোর স্মরণীয় ঘটনার অনেক তথ্য অবগত হয়েন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায় যে, ১৮০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে দক্ষিণস্লাভ জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম আরব্ধ হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা এই সংগ্রাম চালাইতেছিল। পরবর্ত্তী যুগে নূতন একটি সার্ব্বীয় রাজ্য গড়িয়া উঠে। তাহারা মুক্তিদাতার ভূমিকা অভিনয় করিতে থাকে। তুরস্কদিগের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ তিনটি সমরে দক্ষিণস্লাভ জাতির হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। বিশেষতঃ ১৯১২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে তাহাদের আশার প্রদীপ এমন সমুজ্জলভাবে জলিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদের অষ্ট্রো-হঙ্গেরীয় শাসক জাতি ইহাতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

জাতীয় পরিচ্ছদে ত্রেবিনজির নর-নারী

সেনাদলের কুচকাওয়াজ সন্দর্শনের জন্য আর্চডিউক সেরাজেভোতে আগমন করেন। এতদুপলক্ষে যুবরাজের জন্য যে সকল উৎসবানুষ্ঠান হইতেছিল, তাহা বস্নীয় তরুণ জাতীয় দলের আদৌ মনঃপূত ছিল না। তাহাদের মধ্যে অনেকেই অষ্ট্রীয়াস্থিত বন্ধুজনের কাছে এমন কথাও চিঠিতে লিখিয়াছিল, '২৮শে জুনের বৃহৎ ঘটনা লক্ষ্য করিও।'

প্রথম দিন আর্চডিউকের গাড়ীর সম্মুখে একটা বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। উহাতে কাহারও কোনও অনিষ্ট হয় নাই। যুবরাজ এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নগরের মেয়রকে আহ্বান করিয়া বলেন, "আমাকে পুষ্পমাল্যে অভিনন্দিত করা হইবে, ইহাই আমি আশা করিয়া থাকি—বোমার দ্বারা অভ্যর্থিত হইতে চাহি না।' কিন্তু প্রচুর-সংখ্যক পুলিস পাহারা থাকা সত্ত্বেও কোনও ফল হয় নাই। যে পথে যুবরাজ যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই পথে অন্যূন ত্রিশজন গুপ্ত ঘাতুক স্থান সংগ্রহ করিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত গুলীতেই সস্ত্রীক যুবরাজ নিহত হয়েন। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে য়ুরোপের মানচিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

সেরাজেভোর রুটীওয়ালা

সেরাজেভোর বাজারকে 'কার্সিজা' বলে। বাজারের

মধ্যে ফেজধারী অসংখ্য নর-মুণ্ড দেখিতে পাওয়া যাইবে। নগরে অন্যূন ২০ হাজার মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীর বাস। প্রতীচ্য বেশভূষার প্রতি তাহাদের কোনও অনুরাগ নাই। নারীরাও অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বাজারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। সমগ্র নগরের লোক-সংখ্যা ৮০ হাজার হইবে। এই স্থানের স্থপতি-শিল্প য়ুরোপীয় আদর্শানুযায়ী। নাগরিকগণের এক-চতুর্থাংশ প্রাচ্যভাবাপন্ন হইলেও সেরাজেভোকে প্রতীচ্যভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে। নগরের মধ্যে অবশ্য অসংখ্য গম্বুজ-শোভিত মসজেদ বিদ্যমান। অবগুণ্ঠনাবৃতা নারীরা রাজপথ, বাজার, প্রমোদোদ্যানে চলাফেরা করিতেছে, কাঠের কয়লায় অগ্নিদগ্ধ কাবাবের ঘন সুগন্ধ বাতাসকে মাতাল করিয়া তুলিতেছে, প্রাচ্য দেশের সজ্জাভারে বহু বিপণি সজ্জিত—ইহাতে প্রাচ্যদেশের আবহাওয়া থাকিলেও সেরাজেভো প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব্ব সম্মেলন-দৃশ্য দেখাইয়া থাকে।

গর্দ্দভপৃষ্ঠাসীনা ক্রিস্ নারী সূতা কাটিতেছে

হইতে পারে। স্থানীয় কৃষিবল প্রাচীনপন্থী, তাহাদের চাষের পদ্ধতিও প্রাচীন যুগের অনুরূপ। সমবায় কৃষি-পদ্ধতি এ দেশে প্রচলিত। একই স্থানে পুত্র ও জামাতা বসবাস করিয়া কৃষিকার্য্য চালাইতেছে। এমনও দেখা যায় যে, একই গৃহে ৬০ জন পরিবার বসবাস করিতেছে।

দক্ষিণ-শ্লাভ জাতির ইতিহাস ভূমির সহিত অবিচ্ছিন্ন, এ কথা বহু ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়াছেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ড, গ্যালিসিয়া এবং কার্পেথিয়ান পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া এতদঞ্চলে বসবাস করিতে থাকে। ক্রমে তাহারা উর্ব্বরা ভূমির সন্ধান পাইয়া উত্তরকালের যুগোশ্লাভিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তার পর ম্যাগিয়ার্স-গণ যখন তাহাদের সহিত যোগদান করিল, তখন ক্রোট্স্ ও শ্লোভেনস্‌এর অপরিসর কৃষিক্ষেত্র চিত্তপট হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ-শ্লাভজাতির তিনটি শাখার মধ্যে সার্ব্ব-গণই স্বাধীন অবস্থায় ছিল। তাহারা নেমানিক্ বংশের শিক্ষাধীন থাকিয়া শিক্ষায় দীক্ষায়, স্থপতি বিদ্যায়, আইন ও সাহিত্যে যথেষ্ট উন্নতিসাধন করে। দক্ষিণ-সার্ব্বিয়া অঞ্চলে বৈদেশিকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

সার্ব্বিয়ার প্রান্তর—সমতল ক্ষেত্রগুলি অপর্য্যাপ্ত শস্যসম্ভারে শোভা পাইয়া থাকে। দেখিলেই মনে হইবে, সমগ্র যুগোশ্লাভিয়ার ১ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীর খাদ্যাভাব এক সার্ব্বিয়ার শস্যক্ষেত্র হইতেই দূরীভূত

নমাজের পূর্ব্বে মুসলমান দোকানদার

সার্ব্বিয়ার স্কোলজি নগরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব্ব

ডালমাটিয়ার ক্লিস্ পা

রংভা নদীর উপরিস্থিত প্রাচীন সেতু

সমাবেশ। ভার্দার নদের এক তীরে য়ুরোপীয়, অপর তীরে এসিয়ার আদর্শের প্রাচুর্য্য। অথচ কোনও দ্বন্দ্ব নাই। নদের এক পার্শ্বে সুরম্য মর্ম্মরপ্রাসাদ, অপর তীরে জনকোলাহলমুখর বাজার, পান্থনিবাস, ধ্বংস-প্রায় মস্‌জেদ, আরও কত কি। দর্শনমাত্রেই মনে হইবে, এসিয়ামাইনরের কোন এক চির-পুরাতন নগর য়ুরোপ-খণ্ডের এতদঞ্চলে স্থান পাইয়াছে! স্কোল্‌জি প্রায় ৩ হাজার যাযাবরকে গৃহবাসী করিয়াছে। য়ুরোপীয় যুদ্ধের পর এই যাযাবর দলকে যুগোস্লাভিয়ার কর্তৃপক্ষ বলেন যে, তাঁহারা তাহাদিগকে বসবাসের জন্য গৃহ ও ভূমি দান করিবেন; কিন্তু সর্ত্ত এই যে, তাহারা দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবে না। অবশ্য মৎস্যকে সন্তরণ বন্ধ করিবার প্রস্তাবের মতই ইহা অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হইয়াছিল। তদবধি ভবঘুরে যাযাবরগণ এই নগর পরিত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করে নাই।

সার্ব্বীয় মুচি

এই যাযাবর বেদিয়াদল এখন ছোট ছোট ঘর বাঁধিয়া কৃষিক্ষেত্রে কায করিয়া থাকে। তাহাদের কুটীর-গুলিতে খোলার ছাউনি। প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক এবং ঐতিহাসিক মেলভেলি চ্যাটার একবার এই বেদিয়া-পল্লীতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, তাহারা শান্তশিষ্টভাবে কুটীরে বসবাস করিতেছে। তাহাদের রন্ধনাগার আছে, টেবল-চেয়ারও আছে; কিন্তু বহু বৎসরের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার প্রণালী এখনও তাহারা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাই রাজপথের ধারে আগুন জ্বালিয়া তাহারা এখনও শীত-নিবারণ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না। দেশান্তরে ভ্রমণ নিষিদ্ধ বলিয়া এখন তাহারা প্রত্যহ ঢাক-ঢোল বাজাইয়া খানিক সময় যাপন করিয়া থাকে।

স্কোলজি নগরে বিগত বাইজানটীয় প্রভাব এখনও লক্ষিত হইয়া থাকে। সার্ব্বিয়ায় মধ্যযুগে ষ্টিফেন ডুশান প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গিরিদুর্গের ধ্বংসাবশেষের চারি পার্শ্বস্থ স্থান লইয়াই এই নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইস্‌লামধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই ষ্টিফেন্ ডুশানই প্রবল অভিযান করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যযুগে গ্রীক্, শ্লাভ ও রোমকদিগের সম্রাট নামও গ্রহণ করিয়া রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়াছিলেন।

...ভিনার দুর্গ—৫ শত বৎসরের পুরাতন

সার্ব্বিয়ার সমতল ভূমিতে মধ্যযুগের যে সকল গির্জ্জা বা মঠ আছে, তাহার প্রাচীর-গাত্রে ষ্টিফেন্ ও নেমানিক্ পূর্ব্বপুরুষগণের চিত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

সার্ব্বীয় বেদিয়ার ভালুক-নাচ

বাইজানটীয় ললিতকলার বিশিষ্ট পরিচয় এই সকল চিত্রে পরিস্ফুট। স্কোলজি নগর হইতে কিছু দূর উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে কোসোভো পোলজি নামক স্থানে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থানটি অত্যন্ত উর্ব্বর এবং সার্ব্বদিগের নিকট তীর্থক্ষেত্রের ন্যায় পবিত্র। এইখানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে নেমানিক্ সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

উল্লিখিত ঘটনার ৫ শতাব্দী পরে তুষারস্তূপের মধ্য দিয়া সার্ব্বীয় সেনাদল জার্ম্মাণ ও বুলগেরীয় সেনাদলের সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া এই সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সার্ব্বীয় নাগরিকগণও তাহাদের অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। তুষারস্তূপের মধ্যে ১০ সহস্র প্রাণী দেহরক্ষা করিয়াছিল। অর্দ্ধাশনে বিপর্য্যস্ত সার্ব্বীয়গণ আল্‌বানিয়া ও মন্টিনিগ্রোর পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া করফুতে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করে। তথায় বিশ্রাম ও বললাভের পর তাহারা সালোনিকার সীমান্তে আবার বলপরীক্ষায় সমবেত হয়।

রাজধানী বেলগ্রেডের বর্ত্তমান নাম বিওগ্রাড। ড্যানিয়ুব ও সাভা নদীর সঙ্গমস্থলের ভূভাগের উপর এই নগর প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই নগরের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে তুরস্কদিগের পদ্ধতি অনুসারে এখানে দ্বিতল অট্টালিকা-সমূহ দেখা যাইত—প্রাচ্য প্রভাব তাহাতে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত। অধুনা বিওগ্রাড সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবে গঠিত। ইহার লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ৪০ হাজার। অষ্টাদশ বর্ষে লোকসংখ্যা ৪ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অত্যুচ্চ প্রকাণ্ড অট্টালিকাসমূহ নগরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

হাটের দিন বুঝিতে পারা যায়, এখনও প্রাচীন সভ্যতা বা রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ এতদঞ্চলের পল্লীনারীরা আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। নগরের নারীবৃন্দকে দেখিলে উহা অনুমান করা যায় না। নাগরিক জীবনে বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

বিওগ্রাড নগর দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কিরূপ ভাবে সার্ব্বজাতি আপনাদিগকে পুনর্গঠিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিতেছে। জমীর প্রতি যুগোস্লাভিয়ার অধিবাসীদিগের প্রবল লোভ। বর্ত্তমান কালে কর্ত্তৃপক্ষ জমী-সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। পূর্ব্বে জমীদার ভূমির মালিক ছিল। ইদানীং জমীদারীর কর্ত্তৃত্ব ৫০ লক্ষ যুগোস্লাভীয় পরিবারের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ১ শত ৫০ একরের অধিক ভূমি এখন আর এক জনের অধিকারভুক্ত থাকিতে পারে না। অবশ্য, সেই দেড়শত একর ভূমি সে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ-আবাদ

গালি[illegible]তা মুসলমান নারী

করিতে পারে। অধুনা শাসক শক্তির ঘোষণা এইরূপ—"আমাদের এই স্বাধীন রাজ্যে সকলেই স্বাধীন ভূস্বামী থাকিবে, কাহারও অধীনভাবে কেহ জমী চাষ করিবে না।"

কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য যুগোশ্লাভিয়ার বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয় মনোবৃত্তির অনুযায়ী সমবায় ও সামাজিক ব্যবহারবিধিও নূতনভাবে গড়িয়া তুলা হইয়াছে। যুগোশ্লাভিয়ার সমবায় প্রথা দেশব্যাপী হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। প্রত্যেক প্রকার খাদ্যপণ্য এবং উটজশিল্প সমবায় প্রথার দ্বারা পরিচালিত। অধুনা ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার সদস্য সমবায় প্রথার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রথা যুগোশ্লাভিয়ার পরম কল্যাণদায়ক হইয়াছে।

সার্ব্ব নরনারীর কোলো নৃত্য

১৯২২—২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। আকস্মিকভাবে কেহ বিকলাঙ্গ বা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাহাদের জীবনের বিনিময়মূল্য সম্বন্ধেও নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতিদিন ৮ ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম যাহাতে করিতে না হয়, বৃদ্ধবয়সে যাহাতে কর্ম্মীরা বৃত্তি ভোগ করিতে পায়, বালক-বালিকাদিগকে শ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত না করা প্রভৃতি বিধানও প্রচলিত হইয়াছে।

যাহারা প্রসূতি হইবে, ৪ মাস পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগকে শ্রমিকের কার্য্য হইতে অবসর দিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বিনা পারিশ্রমিকে তাহাদিগকে চিকিৎসা করা হয়। নবপ্রসূত শিশুকে বায়ুসেবন করাইবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটী হইতে গাড়ী ও লোকের ব্যবস্থা করা হয়।

বস্নিয়া কৃষিপ্রধান স্থান। এখানে চাষ-আবাদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য-শস্য এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। বহির্জগতের কোন সাহায্য না লইয়াও বস্নিয়ার অধিবাসীরা স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এতদঞ্চলের অধিবাসীরা রবিবার অথবা অন্য কোন ছুটীর দিন ব্যতীত মাংস আহার করে না।

জেসি বস্নিয়ার অন্তর্গত অন্যতম নগর। পাহাড়ের উপর এই নগর স্থাপিত। এই পার্ব্বত্য নগরে বস্নিয়ার রাজারা প্রাচীন যুগে বসবাস করিতেন। মুসলমানদিগের বহু মসজেদের গম্বুজ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বত-দুর্গটির ধ্বংসাবশেষের চতুর্দ্দিকে মসজেদের অভ্রভেদী গম্বুজগুলি দেখিতে পরম রমণীয়। জেসি প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক স্থান। ভ্রমণকারীরা বলেন যে, এখানে আসিলে মন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে মগ্ন হইয়া যায়।

"টেস্নো গর্জ্জ" নামক বন্দর এবং শিলাময় উপত্যকাভূমি জেসির অনতিদূরে অবস্থিত। ভ্রাস্ নদী এই উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত।
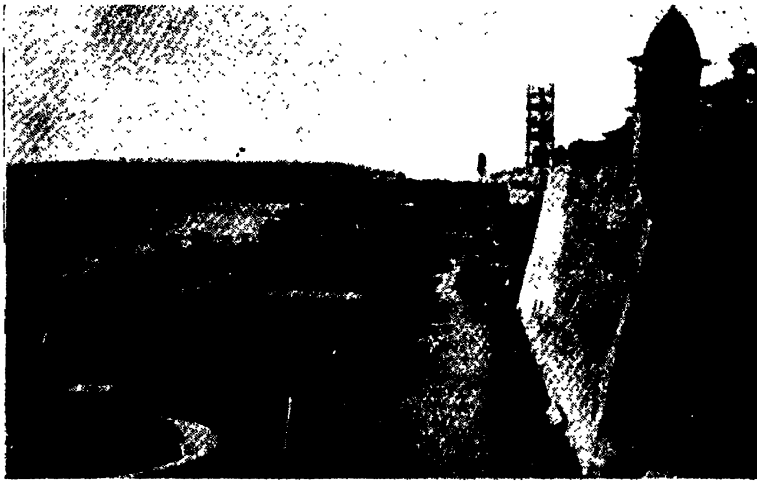
সাভা ও ড্যানিয়ুব সঙ্গম—দক্ষিণে প্রাচীন সার্ব্ব দুর্গ

নদীর তীর ঘন অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। প্রকৃতির লীলা-নিকেতন বলিয়া পরিব্রাজক এইখানে স্তব্ধ-বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া থাকে।

এই অরণ্যসমাকুল উপত্যকাভূমি অতিক্রম করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই একটি ক্ষুদ্র নগর দৃষ্টিগোচর হইবে। উহার নাম বাঞ্জালুকা। প্রথম দর্শনেই মনে হইবে, তুরস্কের কোনও সহর সহসা যেন নয়নসমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছে।

এখানে স্নানাগার বা হামাম থাকিবার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। অবশ্য কয়েকটি হামামের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে বটে, তবে জলের কোন সংস্পর্শই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রোমকগণ এখানে স্নানাগার স্থাপন করিয়াছিল; ইদানীং উহা পরিবর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

বিহাক্ বস্‌নিয়ার আর একটি নগর। এখানে নদীতীরে মুসলমান মসজেদ ও খৃষ্টান ধর্ম্মমন্দির পাশাপাশি স্থাপিত অথচ কোনও গোলযোগ ঘটে না। সমগ্র যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক পরস্পরের সহিত মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ থাকিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে। বিহাকে মুসলমান ও খৃষ্টান বিনা কলহে কালযাপন করে। নগরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মুসলমান ও খৃষ্টানের বাড়ীগুলি ছবির মত সুদৃশ্য ও পরিচ্ছন্ন। ঐতিহাসিক মিঃ মেলভিলি চ্যাটার বলেন, "যদি মুসলমান ও খৃষ্টানের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার লোক না থাকে, উহারা যদি স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা করিবার স্বাধীন সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কোনও দিনই মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি প্রধূমিত অবকাশ পাইবে না।"

বয়ন-রত বিদ্যালয়ের ছাত্র—রাজপথে

ক্রোশীয় ধনী মহিলা

ক্ হইতে কিছু দূরে লিটভিকা হ্রদমালা

বিরাজিত। এই অঞ্চল যে প্রকৃতই মনোরম, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। ষোলটি হ্রদ বর্ণ-বৈচিত্র্যে সুন্দর। কোন কোন হ্রদের মধ্যে ডোঙ্গা ভাসাইয়া আবিষ্কারকগণ হ্রদের নানা স্থান আবিষ্কার করিয়া থাকেন। ছোট ছোট হ্রদ গ্রীষ্মকালে বিলাসীদিগের প্রমোদক্ষেত্রে পরিণত হয়। মোটর-বোট-প্রতিযোগিতা, জলবিহার প্রভৃতির দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হ্রদ কবিদিগের বিহার ক্ষেত্র। জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে কবিরা এই হ্রদের তীরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

জাগ্রেবের জলপ্রপাত

ক্রোশীয় কিশোর
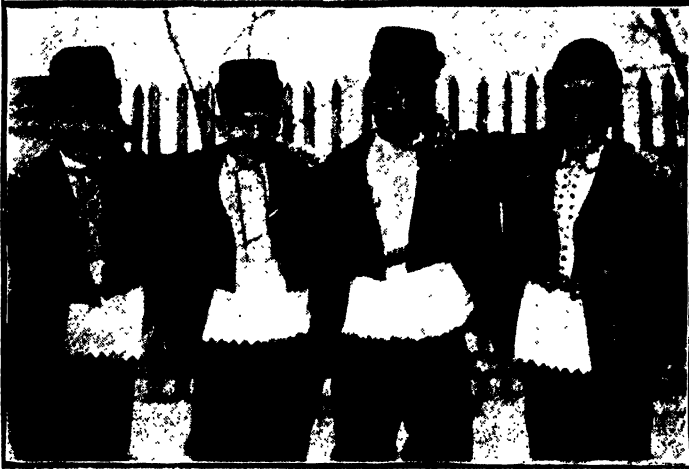
ক্রোশিয়া প্রদেশ শ্রমশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। কাষ্ঠ, রাসায়নিক দ্রব্য, লৌহ, বিটচিনি প্রভৃতিই যুগোস্লাভিয়ার শ্রমশিল্পের প্রধান উপকরণ। এজন্য কলকারখানায় যে পরিমাণ ইন্ধনের প্রয়োজন, তাহা যুগোস্লাভিয়ায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানী হয় না। ১১ কোটি মণ কয়লা ক্রোশিয়ার কারখানা-সমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহা পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন।

ক্রোশিয়ার প্রধান নগর জাগ্রেব। শ্রমশিল্পে সমগ্র যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে স্থান সর্ব্বাগ্রে। নগরের ঘ যেমন সুদৃশ্য, তেমনই বৃহদায়তন। না

বিশেষ কর্ম্মতৎপর এবং জাগ্রেবের সুনাম বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে জাগ্রেব রাজনীতিক ও ব্যবসায়-জগতে সুপরিচিত। তাতারদিগের বিরুদ্ধে এই নগর আত্মরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া এই নগরের স্বাধীনতা বিঘোষিত হয়। দুই শতাব্দী পরে তুর্কীরা জাগ্রেবের বিরুদ্ধে অভিযান করে। কিন্তু তাহারা সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে হ্যাপস্বার্গ যখন

স্লাভ-জননী ও পুত্র

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত গির্জ্জা

স্কোলজি ধর্ম্মমন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কারুকার্য্য

সমগ্র দেশটিকে টিউটোনীয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন সমগ্র ক্রোশিয়ার শক্তি জাগ্রেবে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহাতে বাধা প্রদান করিয়াছিল। বিশপ ষ্ট্রস্মেয়ার যেমন যুগোশ্লাভ জাতীয় আন্দোলনের স্রষ্টা ছিলেন, সেইরূপ শ্লাভোনিয়ার পুরোহিত ক্রোশিয়ার জাতীয় জীবনের অগ্রদূত ছিলেন। জাগ্রেবে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জাগ্রেবের বাজারে পুরাতন ও নূতনপন্থী

যুগোশ্লাভিয়া মহাযুদ্ধের পর উন্নতির পথে দ্রুত ধাবিত হইলেও তাহার সম্মুখে এখনও কতকগুলি সমস্যা আছে। সেগুলি তাহাদিগকে সমাধান করিতে হইবে। তিনটি স্বতন্ত্র জাতির সমবায়ে যুগোশ্লাভিয়া গঠিত। ভাষা শ্লাভ হইলেও তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ইহাতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু

প্রসাধনপ্রিয়া শ্লাভ কিশোরীর দল

উৎস-মূলে—মুসলমান বালক বালিকা

নবজাগ্রত যুগোশ্লাভিয়ার কার্য্য-পদ্ধতি দেখিয়া কেহই সন্দেহ করিতে পারিবে না যে, এ সকল সমস্তা সত্ত্বেও তাহাদের সমন্বয় অসম্ভব ব্যাপার।

জাগ্রেব সুরক্ষিত পার্ব্বত্য নগর। তাহার উপকণ্ঠে বা গিরিপাদমূলে ব্যবসায়-বাণিজ্য-প্রধান নূতন নগর। পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলে, নগরের কোলাহল পশ্চাতে, বহু

জাগ্রেবের বাজারে ক্রোশীয় চাষী

নিম্নে পড়িয়া থাকে। নিম্নভূমি হইতে আঁকা-বাঁকা পথ গিরিচূড়াস্থিত দুর্গ-সুরক্ষিত পুরাতন সহরে গিয়া পৌছিয়াছে। সেখানে অবাধ ও শান্ত নীরবতা। পথে গাড়ীর শব্দ নাই, দোকান আছে বটে, কিন্তু পরিমাণ অল্প। চারিদিকে প্রকাণ্ড ইমারত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে প্রমোদোদ্যান। জাগ্রেবের বাজার দর্শনীয় স্থান।

সকল দেশের নগরেই বাজার আছে, কিন্তু এই নগরের বাজারের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক দোকান এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত যে, সহসা তাহাকে দোকান বলিয়া মনে হইবে না; যেন কোনও বিরাট উৎসবক্ষেত্র। প্রত্যেক দোকানে নারী বিক্রেত্রী। বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিতা তরুণী ও প্রৌঢ়া সুন্দরীরা দোকান খুলিয়া বিক্রেয় পণ্য বেচিতেছে। প্রভাত-আলোক সমুজ্জল হইয়া উঠিলেই দোকানগুলির রুদ্ধদ্বার মুক্ত হয়। তার পর ৬ ঘণ্টা ধরিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য চলে। বেলা দ্বিপ্রহর হইলেই যেন ঐন্দ্রজালিক দণ্ড স্পর্শে সমগ্র বাজারের শোভা অন্তর্হিত হইয়া যায়। দোকানগুলি তখনই বন্ধ হয়, বিক্রেতা ও ক্রেতারা যেন মন্ত্রবলে বাজার ত্যাগ করে। তখন বাজার নিস্তব্ধ, শোভাবর্জ্জিত, জনসমাগমশূন্য হইয়া পড়ে। প্রত্যহই এই দৃশ্য অভিনীত হইয়া থাকে।

স্লোভেনিয়া অঞ্চল পর্ব্বতসমাকুল, মনোরম ও রম্য। এই অঞ্চলে প্রচুর আঙ্গুর ও নানাবিধ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমেরিকা হইতে আঙ্গুরের বীজ আনিয়া এখানে চাষ হইয়া থাকে। সমগ্র যুগোশ্লাভিয়ার আঙ্গুরের চাষে মার্কিণ বীজ সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জুলিয়ান্ ও কারাওয়ান্‌কেন্ অদ্রিমালা শ্লোভেনিয়ার পশ্চিমপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া আছে।

মারিবর নামক নগরের অনতিদূরে রোগাস্‌কাশ্লাটিনা নামে আর একটি সহর আছে। এইখানে প্রসিদ্ধ স্নানাগার বিদ্যমান। এই স্নানাগার প্রকৃতই নয়নানন্দকর স্থান। শ্যামল গিরিমালা-বেষ্টিত স্থান, উদ্যানমধ্যে স্নানাগার—ঝরণার জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে; বাদকগণ সুমধুর সঙ্গত করিতেছে। রোগাস্‌কাশ্লাটিনার পূর্ব্বনাম যুগোশ্লাভিয়া সরকার বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

যুগোশ্লাভিয়া কয় বৎসরে যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহা শুধু প্রশংসাজনক নহে, বিস্ময়কর। দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মমত, বিভিন্ন আচার এবং শিক্ষা-দীক্ষার স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে যুগোশ্লাভিয়া অভিন্ন মত পোষণ করে। রাজ্যের স্বাধীনতা, সম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে গেলে সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে হয়, যুগোশ্লাভিয়ার অধিবাসিবর্গ তাহা বুঝিয়াছে এবং তদনুসারে তাহারা জীবন-সংগ্রামে সাফল্যলাভ করিয়া পৃথিবীর জাতিগুলির মধ্যে আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সন্ধ্যা

সন্ধ্যা ধীরে ঘনিয়ে আসে, দিবস বিদায় মাগে,—
সজল রাঙ্গা চক্ষে করুণ ব্যর্থ-বেদন জাগে।
দিনের কর্ম্ম-ক্লান্তি-ভারে মন-মাধবীর ফুল
ফুট্‌ল নাক, রইল মনেই অস্ফুট মুকুল!

সন্ধ্যারাণী ধূপছায়া ঐ আঁচলখানি ভরে'
সেই কলি কি কুড়িয়ে নিল মায়ার হাতে ধরে'?
দিনের আলোয় যা' শুকাল, রাতের স্নেহ লেগে
তারায় তারায় স্বপন লতায় উঠ্‌ল কি তাই জেগে?

সেই কথাটি-ই শুধায় কি গো নীড়-ফেরা সব পাখী;
সাঁজের হাওয়া নদীর কাণে কইছে কি তাই ডাকি?
মূর্চ্ছাহত দৈন্যে নত সর্ব্বহারা মন,—
দিনের পায়ে খুঁড়ল মাথা শুধুই অকারণ?

ছায়াপথের বাতায়নের মোতির ঝালর তুলে
এই কথাটি সন্ধ্যা আমায় বল্‌বে কি তাই খুলে?—
দিনের দাহে যে প্রাণ-মরু তৃষায় ভরে ওঠে,
শীতল তব তিমির পানে তৃপ্তি কি তায়

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী।

আঘাতটা যতক্ষণ সহনের সীমার মধ্যে থাকে, ধ্বনিতে, ভাষাতে মানুষ ততক্ষণ তাহাকে অসহনীয় বলিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যথার্থই সে যখন সেই অসহনীয়তার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর সে ভাষায় প্রকাশ করিবার পথ রাখিয়া দেয় না,—রাখিয়া দেয় আপনার নিষ্ঠুর ছাপটা আহতের চোখে মুখে।

পঙ্কজ যে দিন শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতর পদটা ত্যাগ করিল, সে দিন ক্ষুব্ধ আত্মীয়বর্গ তীব্রকণ্ঠে একটা প্রতিবাদের ঝড় তুলিয়াছিল; কিন্তু যে দিন সে রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত আপনার যথাসর্ব্বস্ব সাধারণের হিতকল্পে দান করিয়া রিক্ত-হস্তে পণ্ডিচারী আশ্রমে চলিয়া গেল, সে দিন মর্ম্মাহত সুহৃদ-মণ্ডলীর মুখে আর একটিও বাণী ফুটিল না,—শুধু বর্ষার দিনে ঘোলাটে আকাশের মত নিষ্ঠুর বেদনার একটা ম্লানিমা সকলকে যেন ঢাকিয়া রাখিল।

ইহাই হইল পঙ্কজের হেঁয়ালীভরা জীবনের প্রথম আরম্ভ। কিন্তু এই আরম্ভেরও একটা সূচনা আছে,—সপ্তমীতে পূজা হইলেও প্রতিপদে বোধন আরম্ভ হয়।

চৌধুরীরা বংশানুক্রমে বড়লোক। সেই বংশের শেষ পুরুষ পঙ্কজের পিতা প্রশান্ত। জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই ভাণ্ডার যাহাদের ভোগের নিমিত্ত পূর্ণ থাকে, সৌভাগ্যের সহিত দুর্ভাগ্যও তাহাদের জীবনের অনেকটা অংশ অধিকার করিয়া থাকে। বনেদী বংশের ছেলে প্রশান্তও তাহা হইতে অব্যাহতি পান নাই। বরঞ্চ অন্তরের উচ্চতা, চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা এই উভয়বিধ জিনিষই চাঁদের আলোক-দীপ্তি ও ছায়ার অন্ধকারের মত তাঁহার সমস্ত জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ইহার একটা কারণও ছিল। শৈশবে পিতামাতাকে হারাইয়া প্রশান্ত বিধবা দিদির অঞ্চলের নিধি, নয়নের মণি হইয়া উঠিয়াছিল। শাসনের তুলনায় আদরের পরিমাপটা প্রশান্তের ভাগ্যে বেশী পরিমাণেই জুটিত। কিন্তু অতি জিনিষটা কখনই ভাল ফল দিতে পারে না, তাহার উদাহরণ অনেক আছে। প্রশান্তর বেলা তাহার অভাবও হইল না। তখন প্রশান্ত ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্র। [illegible] প্রতিমার কাণে উঠিল,—বিশ্বাস হইল না। শত্রুরা [illegible]ইয়াই বলিয়াছে।

যাহারা কথাটা বলিয়াছিল, প্রশান্তর কোপ-দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইল! ছল-ছুতার অভাব হইল না, দিদির দরবারে অভিযোগ রুজু হইল, বিদায়ের ব্যবস্থাও হইয়া গেল। বুদ্ধিমানরা বুঝিতে পারিল, চৌধুরী সংসারে স্থায়িত্ব লাভ করিতে হইলে কোন্ পথটা অবলম্বন করিতে হইবে।

কিন্তু মৃগ যেমন কস্তুরীর গন্ধ লুকাইতে পারে না, প্রশান্তর ব্যাপারটা তেমনই চাপা পড়িয়াও গুপ্ত রহিল না—প্রশান্তর জন্যই।

সে দিন প্রতিমা কনিষ্ঠের পড়িবার ঘরটায় কি একটা প্রয়োজনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এটা-ওটা নাড়িতে-চাড়িতে অকস্মাৎ অভাবনীয়রূপে মেয়েলি হাতের লেখা একখানি পত্র আবিষ্কার করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। আতর-মাখা রঙীন কাগজে আড়ম্বরপূর্ণ প্রণয়-সম্ভাষণটাও ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহার খামখানি ছিল না। তাই প্রতিমা পত্রখানি যে কাহার উদ্দেশে লিখিত, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রশান্ত জবাবদিহি করিলেন, নব-বিবাহিত বন্ধুর পত্নীর লিখিত পত্র তিনি কাড়িয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। স্নেহের দুলাল, কনিষ্ঠের কথাটা প্রতিমা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। স্নেহই মানুষকে অন্ধ বিশ্বাসী করিয়া তুলে। মাসকয়েক পূর্ব্বে প্রশান্ত বন্ধুর বিবাহ বলিয়া প্রতিমার কাছ হইতে এক জোড়া ব্রেসলেট আদায় করিয়াছিলেন। আপনার নির্ম্মল অন্তরখানির পানে চাহিয়াই যে প্রতিমা প্রশান্তর বিচার করিতে বসিতেন!

প্রতিমা অবশেষে ভ্রাতার বিবাহ দিলেন। নিজের না-পরা হীরা-মুক্তার গহনাগুলা ভ্রাতৃবধূর অঙ্গে পরাইয়া তিনি নিজের জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করিলেন। মা যে মৃত্যুকালে শান্তকে তাঁহারই হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন।

নূতন জীবন, তীব্র মাদকদ্রব্যের মত প্রশান্তকে কিছুদিন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। প্রতিমা নিশ্বাস ফেলিলেন,—দুঃখে নহে, আরামে। দুষ্টগ্রহ কাটিয়াছে বোধ করিয়া। প্রশান্তও সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিদির স্নেহ-মমতা-ভরা বুকখানিকে স্ফীত করিয়া তুলিলেন। গভীর আনন্দে প্রতিমা ক্ষণেকের জন্য কনিষ্ঠের মাথাটা আপনার

বুকে চাপিয়া ধরিলেন, দুই চোখে তাঁহার আনন্দের অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল।

গৃহের সুখ পুরাতন হইয়া আসিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত স্বাধীনতাও পাইয়াছিলেন। সুতরাং এবার তিনি গভীর জলের মাছ হইলেন।

শরতের নির্ম্মল আকাশ হইতে বজ্র বাহির হয়। এক দিন সকালে দেওয়ান শ্যামাচরণ আসিয়া মূলচাঁদ জহুরীর গহনার তালিকাখানি দিদি-রাণীর সম্মুখে দাখিল করিল। কিছু না বুঝিতে পারিয়া প্রতিমা সেখানি তুলিয়া লইলেন। তালিকার নিম্নে প্রদত্ত সংখ্যার পানে চাহিয়া সহসা তাঁহার বিশাল নেত্র বিস্ফারিত হইল—ভীতকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "এত গহনার ক্রেতা কে?"

উত্তর হইল, "খোকাবাবু।"

প্রতিমার আর বাক্‌স্ফুরণ হইল না। তিনি পাষাণ-প্রতিমার মতই স্তম্ভিত-ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শুধু অন্ন-জল নহে, চন্দ্র-সূর্য্যের মুখদেখা অবধি বন্ধ করিয়া প্রতিমা শয়ন-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বধূ রমা ভীত হইল; প্রশান্তও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। রুদ্ধ কপাটগাত্রে আঘাতের উপর আঘাত পড়িতে লাগিল; চোখের জলে ভাসিয়া প্রশান্ত পুনঃ পুনঃ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন, অনেক শপথ-বাণীর সহিত মিনতি চলিতে লাগিল; কিন্তু সকলই বিফল হইল, প্রতিমা দরজা খুলিলেন না। অবশেষে প্রশান্ত জানাইলেন, না খাইয়া তিনি আজ সারা দিন দাঁড়াইয়া আছেন, দিদি কপাট না খুলিলে তিনি অন্ন গ্রহণও করিবেন না। এবার প্রতিমার আসন টলিল। আর কি তিনি রাগ করিয়া থাকিতে পারেন? শান্ত তাঁহার অনাহারে! সারাদিনের বন্ধ দুয়ার সেই মুহূর্ত্তে মুক্ত হইয়া গেল। প্রশান্ত দিদির পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

গম্ভীর মুখে প্রতিমা কহিলেন,—"শান্ত, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে।"

প্রশান্ত কহিলেন,—"তা' হলে আমরাও যাব, দিদি-ভাই।" প্রশান্তর অন্তরটাও বোধ হয় একটা পরিবর্ত্তন চাহিতেছিল।

প্রতিমা চমকিয়া উঠিলেন। উপস্থিতবুদ্ধি একটা সৎ-পরামর্শ দিল—প্রশান্তর এ মোহ কাটাইতে হইলে এখান হইতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করাই সুপরামর্শ। এত দূরে তাহাকে লইয়া সরিয়া যাইতে হইবে, যেখানে এই সর্ব্বনাশা সংসর্গের অতি ক্ষীণ প্রভাবও পতিত হইতে পারিবে না। কনিষ্ঠের হাতখানা মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ত্বরিত-কণ্ঠে প্রতিমা কহিলেন,—"শান্ত, যাবি ভাই আমার সঙ্গে?"

অপরাধটা যখন অপরাধীর নিজের স্কন্ধে বোঝার মত ভারী হইয়া চাপ দেয়, কৃত কর্ম্মের অনুশোচনা তখনই জাগিয়া উঠিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য মনকে অধীর করিয়া তুলে। আর সেই সন্ধিক্ষণের শুভ মুহূর্ত্তে ভাগ্য যাহার সুপ্রসন্ন থাকে, নিপুণ পরিচালকের হাতে আপনাকে সঁপিয়া দিয়া সে জীবনের স্রোতটা ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হয়। দুর্ব্বল মন লতার মত একটা সুদৃঢ় অবলম্বন প্রার্থনা করিয়া থাকে; যাহাকে জড়াইয়া সে ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে। প্রশান্ত সম্মত হইলেন।

প্রতিমা কহিলেন,—"এই দণ্ডেই যেতে হবে।"

প্রশান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার কক্ষের চারিপাশে দৃষ্টিপাতের পর দিদির মুখের পানে তাকাইলেন,—কৃষ্ণ, প্রোজ্জ্বল নেত্র-তারকা তুলিয়া প্রতিমা স্থির-দৃষ্টিতে সহোদরের পানে চাহিয়াছিলেন। প্রশান্ত আর কথা কহিতে পারিলেন না। সম্মতিজ্ঞাপনের চিহ্নস্বরূপ মাথাটা এক পাশে হেলিল।

* * * *

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে উচ্ছৃঙ্খলার স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে স্বাস্থ্যের পরিণাম কি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রভাতচন্দ্রের মত ভ্রাতার দীপ্তিহারা মুখের পানে চাহিয়া প্রতিমা শঙ্কিত-চিত্তে পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর স্থানগুলায় বাসা বাঁধিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘুণধরা গাছে যেমন হাজার জল ঢালিলেও রক্ষা করা যায় না, তেমনই ঘুণধরা দেহ-মনকে হাজার যত্ন করিলেও রক্ষা করা যায় না। প্রতিমা সব বুঝিতেন! ভ্রাতৃবধূ রমার সরলতা-ভরা মুখখানির পানে চাহিলেই তাঁহার দুই চোখে জল ভরিয়া আসিত। দেবতার পায়ে প্রার্থনা করিতেন, "ঠাকুর, আমার যদি এতটুকু পুণ্য থাকে, এক দিনও যদি তোমায় প্রাণ দিয়ে ডেকে থাকি, তবে তার পরিবর্ত্তে আমি স্বর্গ-মোক্ষ কিছুই চাই না, ইষ্টদেবতা! শুধু রমার সীঁথের সিঁদুরটুকু উজ্জ্বল রেখ তুমি।"

দেবতা দয়া[illegible] একান্ত প্রার্থনা তিনি নিষ্ফল করিতে পারেন না। [illegible]মন্তে সিঁদূরের রেখাটা তিনি উজ্জ্বল

রাখিলেন। অন্নপূর্ণা তাহাকে আপনার পায়ে স্থান দিলেন। সেবার অন্নকূটের পর কাশীতে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

রমার শেষকৃত্যটুকু সারিয়া আসিয়া প্রশান্ত কহিলেন,—"আর কেন দিদি ভাই! ফেরা যাক।"

প্রথম আঘাতটা জীবনে বড় দুঃসহ হইয়াই অনুভূত হয়। প্রশান্তের অস্বাভাবিক শান্ত ও নির্বিকার মুখের পানে চাহিলেই উহা বেশ বুঝা যাইত। ভূমিকম্প থামিয়া যাওয়ার পর চূড়াহীন মন্দিরের মতই তাঁহাকে দেখাইতেছিল।

জীবনে যাঁহারা যত বেশী আঘাত পাইয়া থাকেন, সহিবার শক্তিটা তত বেশী পরিমাণেই তাঁহাদের বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মানুষের স্বভাবই এই। প্রতিমা নীরবে কনিষ্ঠের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

দিদির কোলের উপর মাথা রাখিয়া প্রশান্ত পড়িয়াছিল; বিয়োগান্তদৃশ্যপূর্ণ অতীত আজ এই শোকাহত চিত্তের উপর আপনার অমোঘ আধিপত্য দেখাইতেছিল। দিদির এই কোলটুকুতে শোয়া লইয়া শৈশবে কত দিন কত মান অভিমানের পালা অভিনীত হইয়াছে! শরীরের এতটুকু অসুস্থতা বোধ হইলে এই কোলের মাঝেই প্রশান্তর সারাটা দিন কাটিয়া যাইত। দিদি বকিতেন, নামাইতে চেষ্টা করিতেন,—আবার দুই হাতে তাহাকে বুকে চাপিয়া চুমাতে চুমাতে অস্থির করিয়া তুলিতেন। সেই আনন্দ-চঞ্চলতা-ভরা সুখের শৈশব অতর্কিতে কখন্ সরিয়া গেল; বাল্য আসিল; দুরন্তপনার আর অন্ত রহিল না। তাহাও সরিয়া গেল,—কৈশোর দেখা দিল, তাহার শেষ সীমা হইতে তিনি একটু একটু করিয়া দিদির কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। তাঁহার আলাদা ঘর, স্বতন্ত্র বিছানা। লোকজন সবই দিদি নিজস্ব করিয়া তাঁহাকে গুছাইয়া দিতে লাগিলেন। আশ্রিত অনুগতের উপর একটু একটু করিয়া প্রভুত্ব সঞ্চয়ও তিনি করিতে লাগিলেন। উচ্ছৃঙ্খলতা অনাচার লইয়া যৌবন দেখা দিল, দিদির কাছে আসিবার সাহস তাঁহার লুপ্ত হইয়া গেল। একটা মস্ত জমীদারীর মালিক তিনি, তাঁহার নামের স্বাক্ষরের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে, ইহা ক্রমে তিনি বুঝিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ যে দিন দিদি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার অনাচারের মধ্য হইতে [illegible] করিয়া কাড়িয়া লইয়া পলাইয়া আসিলেন, সে দিন [illegible] অন্তরখানি দিয়া প্রশান্তও যে যথার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, জীবনের একটা পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দিবেন! একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া প্রশান্ত পাশ ফিরিলেন।

প্রতিমা স্নেহ-কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন,—"শান্ত!"

প্রশান্ত মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন। প্রতিমা কহিলেন,—"কোথা যেতে চাস? বাড়ী?"

প্রশান্ত কাঁপিয়া উঠিলেন। সেখানে যে অনেক প্রলোভনের ফাঁদ পাতা আছে! দুর্ব্বল চিত্তকে তিনি বিশ্বাস করেন না। রমার কাছে আর তাঁহাকে অপরাধী হইতে হইবে না, ইহাই যে তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা। মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশান্ত কহিলেন,—"না।"

প্রতিমা স্নেহভরা কণ্ঠে বলিলেন,—"তবে কোথা যাবি, ভাই?"

প্রশান্তর শূন্য দৃষ্টি অস্তগামিনী দিবার শেষ আলোক-রেখার প্রতি নিবদ্ধ ছিল; সেখান হইতে দৃষ্টিটাকে সরাইয়া, দিদির কোলের উপর মাথাটা চাপিয়া কহিলেন,—"না, দিদি-ভাই, আর কোথাও যাব না।"

* * * *

দেবতার দুয়ারে তাহার জন্য যখন প্রতিমার মাথা খোঁড়ার অন্ত ছিল না, মানতেরও সংখ্যা ছিল না, তখন সে আসে নাই। যখন আসিল, তখন সম্পূর্ণ অনাহূত হইয়াই দেখা দিল। তাই তাহার আগমনে প্রতিমার ওষ্ঠে হাসি ফুটিল না। মন তাঁহার কুণ্ঠিত হইল। নিজেকে তিনি বুঝাইতে চাহিলেন,—শিশু দেবতা!

প্রতিমা এবার অতি সতর্কতার সহিত পঙ্কজকে লইয়া দূরে দূরে ফিরিতেন—আত্মীয়দের কাছে ঘেঁসিতে চাহিতেন না। জীবন-ভরা দুঃখের মধ্য দিয়া প্রতিমা সংসারের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা প্রৌঢ়বেলায় ভ্রাতুষ্পুত্র পঙ্কজের জন্য ব্যয় করিতে লাগিলেন।

প্রতিমা পঙ্কজকে শিখাইতেন, জন্ম অধিকারে প্রাপ্যটার যথেচ্ছা ব্যবহার করিলে পরিণামে ক্ষতিকর দুর্ভাগ্যকেই বরণ করিতে হয়। বুঝাইতেন, মানুষের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে কর্ম্মের উপর। অনেক জমা আছে বলিয়া অনেক খরচের অধিকারী হওয়া মহা পাপ।

উর্ব্বর ভূমিতে বীজনিক্ষেপের মত পঙ্কজের শিক্ষা সাফল্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল।

উচ্চতর শিক্ষার জন্ত পঙ্কজ য়ুরোপ যাইতে চাহিল। বিনা প্রতিবাদে প্রতিমা সম্মতি দিলেন। জীবন ভরিয়া তিনি একে একে যাহাদিগকে বুকে চাপিয়া ধরিতে গিয়াছেন, তাহারা সকলেই তাঁহাকে অসময়ে ফাঁকি দিয়া সরিয়া গিয়াছে। তাই পঙ্কজ যখন আসিয়া সুদূর সাগরপারে গোটাকয়েক বছর কাটাইয়া আসিবার প্রস্তাব করিল, নিষেধের বাণী তখন প্রতিমার ওষ্ঠে ফুটিতে পারিল না।

অক্সফোর্ড, হার্ব্বার্ট প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত—ইউনিভারসিটি হইতে প্রাপ্ত উচ্চ উপাধি-প্রাপ্তির সংবাদ পঙ্কজ যখন তার-যোগে পিসীমার নিকট প্রেরণ করিত, ভ্রাতুষ্পুত্রের এই প্রতিভার গৌরব প্রতিমা কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। আপনার ব্যথা, আনন্দ সবই আপনার ভাঙ্গা বুকখানির মধ্যে চাপিবার শক্তিটুকু প্রতিমা নিয়ত অন্তর্যামীর পায়ে ভিক্ষা করিতেন।

পঙ্কজ স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। জগতে তাহার একটি-মাত্র স্নেহচ্ছায়াশীতল আশ্রয় ছিল। দুই হাতে সে প্রতিমাকে জড়াইয়া ধরিল, শিশুর মত পঙ্কজ প্রতিমার বুকের উপর মাথাটা রাখিয়া আনন্দের অশ্রুতে তাহা ভাসাইয়া দিল।

প্রতিমা বেশী কথা কহিতেন না, আস্তে আস্তে শুধু ভ্রাতুষ্পুত্রের গাত্রে নিবিড় স্নেহভরা আপনার কোমল হাত-খানা বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

না খুঁজিলেও অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইল। অযাচিত হইয়া প্রতিমাকে পরামর্শ দিল, এইবার ভাইপোর বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরবাসী কর।

প্রতিমার তরফ হইতে উৎসাহ ত দূরের কথা, মুখের একটা উত্তর অবধি আসিল না; তা বলিয়া উৎসাহের অভাব হইল না। পাঁচজন পঙ্কজের বিবাহের সম্বন্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু প্রতিমার উদাসীনতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বিস্মিত আত্মীয়বর্গ পঙ্কজের কাছে অনুযোগ করিল। উচ্চহাসিতে পঙ্কজ কহিল—নিজে খেতে পাই না, শঙ্করাকে দেবো কোথা হতে? লোক অবাক্ হইয়া গেল। এতবড় জমীদারীর মালিক না পঙ্কজ। আত্মীয়রা আপনা-দিগকে অপমানিত জ্ঞান করিল। আত্মীয়তার দাবী লইয়া যাহারা আসিয়াছিল, অভিমান করিয়া পরের মত তাহারা সরিয়া গেল।

পঙ্কজের একটা পেটের সংস্থান এইবার যাহা হইল,—সেটাকে কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে পঙ্কজ নিজে অবধি পারিল না। গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের যে উচ্চ পদটার সে বসিবার অধিকার পাইল, তাহার বেতনের সংখ্যায় চারিটা অঙ্কপাত করিতে হয়।

প্রজাপতির দৌরাত্ম্য এইবার তাহার উপর আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। তনুহীন দেবতাটিও বোধ করি এই অব-সরে পঙ্কজের উপর একটা অলক্ষ্য শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

সে দিন অপ্রত্যাশিতভাবে পঙ্কজের এক প্রতিবাসী যখন তাহার পড়িবার ঘরে উপস্থিত হইয়া অনুনয়-বিনয় করিতে করিতে বয়সের প্রভেদ ভুলিয়া অথবা অন্তঃপুরের তাড়নায় কন্যাদায় হইতে উদ্ধারলাভের আশায় পঙ্কজের পায়ের উপর হাত দিলেন, তখন পঙ্কজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। কথাটাকে হাসিয়া উড়াইবার শক্তিও তাহার ফুরাইয়া গেল। সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে পঙ্কজ তাঁহাকে পিসীমার কাছে যাইতে অনুরোধ করিল।

উমাপদ জানাইলেন,—তাহাই করা হইয়াছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি নির্ব্বাক্।

পঙ্কজ নিজেকে মনে মনে অত্যন্ত বিপন্ন জ্ঞান করিল। রীতার কমনীয় মুখখানির উপর অজ্ঞাতে যে একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছে, ইহা সে প্রথম অনুভব করিল। উমাপদকে আশ্বাস দিল—কথাটা সে নিজেই পাড়িবে। ভদ্রলোক তখনকার মত প্রফুল্ল মুখে গৃহে ফিরিলেন।

আহার করিতে করিতে পঙ্কজ এক সময় হাসিয়া কহিল,—"তোমার হাতের রান্না না খেলে পেটই ভরে না, পিসীমা! যা অভ্যেস ক'রে দিচ্ছ।"

একটু হাসিয়া প্রতিমা কহিলেন,—"আমি ত সব রাঁধি না। দু' একখানা যা—"

বাধা দিয়া পঙ্কজ কহিল,—"ওই দু' একখানাতেই ত মাটী ক'রে দিয়েছ, পিসীমা। আর যদি কাউকে শেখাতে—" পঙ্কজ আশা করিয়াছিল,—তাহার এই ইঙ্গিত ব্যর্থ হইবে না, পিসীমা বিবাহের কথা পাড়িবেন; কিন্তু পিসীমা তাহার ধার দিয়াও গেলেন না। মৃদু হাস্যে প্রতিমা কহিলেন,—"অভ্যাসটা কোন কিছু নয় রে! যখন যেমন।"

পঙ্কজ হতাশ হইল; কিন্তু হাল ছাড়িল না। কহিল,—"হাঁ, ভাল কথা পি[illegible] আজ যে উমাপদ বাবু এসেছিলেন। সে এক মহা কাণ্ড,

পিসীমা নীরব। ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিহিত মহা কাণ্ডটা যে কি, তাহা অবধি জিজ্ঞাসা করিলেন না। তথাপি পঙ্কজ নিরস্ত হইল না। বিপরীত স্রোতের মুখ হইতে নৌকাখানা ঘুরাইয়া লইবার জন্য মাঝি যেমন করিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহার সমস্ত শক্তিটুকু হস্তস্থিত হালখানার উপর সুকৌশলে প্রয়োগ করে, পঙ্কজ তেমনই করিয়া আপনার মনের সমস্ত শক্তিটুকু একত্র করিয়া বলিয়া চলিল,—"উমাপদ বাবু বলেন, এবার ত চাকরী-বাকরী কচ্ছ—গরীবের দায় তোমাকেই উদ্ধার কর্ত্তে হবে! হ্যাঁ পিসীমা, রীতিকে তুমি দেখেছ?"

পঙ্কজ যে মেয়েটির নাম অবধি জানে, তাহাও পিসীমাকে জানাইয়া দিল। প্রতিমার মুখে কিন্তু উৎসাহ বা উদ্বেগের কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না। ঈষৎ আনত মুখে তিনি কহিলেন,—"হাঁ, রোজ যে আমায় ফুল দিয়ে যায়।"

পঙ্কজ হাসিয়া উঠিল। "ও হরি! এর মধ্যে সে তোমার ফুল যোগাতে আরম্ভ করেছে। কৈ, আমার চোখে ত তা এক দিনও পড়েনি।" যাহার প্রভাবটা নষ্ট করিবার জন্য দ্রুত-কণ্ঠে পঙ্কজ এতগুলা কথা বলিয়া গেল, যৌবন-সুলভ সেই দুষ্ট লজ্জাটা কিন্তু তাহার আরক্ত আভা পঙ্কজের সুগৌর মুখখানির উপর বুলাইয়া দিতে ভুলিল না। প্রতিমার দৃষ্টির কাছেও তাহা চাপা রহিল না।

পঙ্কজের আহার শেষ হইয়া আসিয়াছিল। "পাণ আনি" বলিয়া প্রতিমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রসঙ্গটা চাপা পড়িল।

* * * *

পঙ্কজ উমাপদকে জানাইয়া দিল,—বিবাহে সে সম্মত।

দুই হাত তুলিয়া আন্তরিক লক্ষ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে উমাপদ মহা উৎসাহে বাহির হইয়া গেলেন।

ভিতরে আসিয়া পঙ্কজ প্রতিমাকে সংবাদটা দিল,—অনেকক্ষণ একটা উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিমা মুখ তুলিলেন না; কথা কহিলেন না; নীরবে শুধু তরকারিগুলা যেমন খণ্ড বিখণ্ড করিতেছিলেন, তেমনই করিয়া যাইতে লাগিলেন।

পঙ্কজের যৌবনস্ফীত বুকখানা একটা নিগূঢ় অভিমানের ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। কুণ্ঠিত-চরণে, নিঃশব্দে সে আপনার পড়িবার ঘরখানিতে আসিয়া প্রবেশ করিল। ইটালীদেশ হইতে পঙ্কজ পিতার একখানি ফটো অয়ে ... করাইয়া আনিয়াছিল। আজ অকস্মাৎ সেই চি...ন চাহিতেই দুই চোখে তাহার জল ভরিয়া আসিল। পিতৃ-অভাবের দুঃখ জীবনে এই প্রথম ত্রিশ বৎসর বয়সে অনুভূত হইল।

একটা নিষ্ফল আবেদন পঙ্কজের সারা অন্তর হইতে উত্থিত হইয়া সেই চিত্রখানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

রাত্রিতে আহারের স্থানে প্রতিমাকে অনুপস্থিত দেখিয়া পঙ্কজ আসনের উপর থমকিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা কোথা?"

দাসী উত্তর করিল, "জ্বর হয়েছে! শুয়ে আছেন।"

আসনে আর বসা হইল না। উদ্বিগ্ন-মুখে পঙ্কজ প্রতিমার কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল।

কক্ষের আলো নিবান ছিল। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়া জ্যোৎস্নালোক শয্যায়, মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পঙ্কজ নিঃশব্দচরণে বিছানায় বসিল, পিসীমার কপালে হাত দিল।

প্রতিমা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। চমকিয়া ডাকিলেন, "শান্ত!"

পঙ্কজ কহিল,—"আমি, পিসীমা। অসুখ করেছে তোমার?"

প্রতিমা আর কোন কথা কহিলেন না। দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া পঙ্কজ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। আস্তে আস্তে কহিল,—"ডাক্তারকে ফোন করি?"

তেমনই অবস্থায় থাকিয়া প্রতিমা কহিলেন,—"না।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে পঙ্কজ ডাকিল,—"পিসীমা!"

প্রতিমা কহিলেন,—"বাবা!"

প্রতিমার বুকের উপর হাতখানা রাখিয়া পঙ্কজ কহিল,—"আমাকে এমন ক'রে তুমি দূরে ঠেলেছ কেন, পিসীমা?"

প্রতিমার ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান হাসি দেখা দিল। পঙ্কজের কোলের উপর আপনার মাথাটা তুলিয়া দিয়া কহিলেন,—"তোকে কি আমি দূরে ঠেলতে পারি, যাদু! তুই যে আমার শান্তর দেওয়া ধন, বাবা।"

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে পঙ্কজ কহিল,—"তবে?"

"তবে? সে আর কি শুনবি, বাবা। তোর পিসীমার দুঃখের বোঝা একটুখানি নেড়ে দেখতে গেলে সারা জীবনটা তোর দুঃখে যে ভরে উঠবে, সোনা আমার! তাই যত

আঘাত এই বুকখানাতেই সয়ে নিয়েছি। আমার শেষের সঙ্গে যেন এরও শেষ হয়ে যায়।"

পঙ্কজ কিছু বুঝিতে পারিল না। কি যেন একটা অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হইবার উৎকট আগ্রহে তাহার সারা বুকখানা ভরিয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,—"সুখ হোক, দুঃখ হোক, আমার ন্যায্য পাওনা হতে আমায় বঞ্চিত করো না, পিসীমা।"

প্রতিমা কহিলেন,—"ভয়াবহ ভূমিকম্পটা যতক্ষণ পৃথিবীর তলায় ঘুমিয়ে থাকে, ততক্ষণ জগতের মঙ্গল।"

"তা হোক, পিসীমা। তুমি ত এটুকুও জান, চিরদিন সে ঘুমিয়ে থাকৃতে পারে না; এক দিন তাকে জাগতেই হবে, সে আছে এই প্রমাণ কর্ত্তে। সেই জন্যই মানুষ আগে হতে তাকে চিন্‌তে শেখে তার হাত হতে নিজেকে রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করবে ব'লে।"

প্রতিমা চুপ করিয়া রহিলেন। যেন ধ্বংসকারী হলাহলকে তিনি আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, তাহা কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে এই স্নেহ-নিধিটিকে দিবেন?

পঙ্কজ আবার ডাকিল, "পিসীমা—"

প্রতিমা ব্যাকুল-দৃষ্টিতে পঙ্কজের মুখের পানে চাহিলেন। প্রাণান্তর হারানো মুখখানি যেন অনুক্ষণ পঙ্কজের মুখের মাঝে ধরা দিতেছে। ত্রস্তকণ্ঠে পিসীমা কহিলেন,—"কেমন ক'রে তোর আশা আনন্দভরা বুকখানা চুরমার ক'রে ভেঙ্গে দেব, বাবা!"

দৃঢ়কণ্ঠে পঙ্কজ কহিল, "ভাঙ্গাই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তাই হোক্। ভগবানের ইচ্ছার প্রতিরোধ করবার শক্তি মানুষের নেই। তার চেষ্টা শুধু বাতুলতা!"

প্রতিমা কহিলেন, "তা জানি; কিন্তু মানতে পারি কি? সত্য হলেও অপ্রিয় ব'লে আমরা পদে পদে অনেক কিছু গোপন কর্ত্তেই চাই—ব্যথার হাত হতে রক্ষা পাব ব'লে।"

অধীরকণ্ঠে পঙ্কজ কহিল,—"দু'দিন পার বটে, কিন্তু চিরদিন পার না। সে শুধু সত্য বলেই যে এক দিন ব্যক্ত হবে। তাকে বৃথা গোপন করার দুঃখ এমন ক'রে তুমি একা ভোগ কর কেন, পিসীমা?"

"কেন করি?—" একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া প্রতিমা চোখ বুজিলেন, সেই মুদিত নেত্রের দুই পাশ দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ক্ষণেক পরে প্রতিমা চোখ চাহিলেন। তিনি যেন এই কয় মুহূর্ত্ত ধরিয়া অন্তরের মাঝে ডুবিয়া অতীতের ছবিখানিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাহার পর যখন কথা কহিলেন, তখন মনে হইল, এ যেন প্রতিমার কণ্ঠস্বর নহে। সেই সংযত বাণী, উচ্ছ্বাসবিহীন একান্ত শান্ত কণ্ঠস্বর নহে। কঠোর অপরাধে সঙ্কুচিতা নারীর মিনতিভরা কণ্ঠের অনুনয়পূর্ণ বাণী বিচারকের কাছে দয়া-ভিক্ষার মত।

প্রতিমা কহিলেন, "তোর বাপকে, আমার শান্তকে তুই অভিসম্পাত করিস নি, পঙ্কজ। তাকে হারিয়ে তার কাছ হতে পাওয়া ব'লে তার প্রতিকৃতি তুই। তোকে বুকে জড়িয়ে আমি বেঁচেছিলুম, বাবা।"

অশরীরী আত্মার আগমনে ভয়ার্ত্ত মানুষের দেহ-মন যেমন কণ্টকিত হইয়া উঠে, পঙ্কজের দেহ-মন যেন তেমনই একটা আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মাথার চুলগুলা অবধি সোজা হইয়া উঠিল। বিস্ফারিত-নেত্রে সে শুধু কহিল, "বল!"

যন্ত্র-চালিতের মত প্রতিমা কহিলেন, "অতি জিনিষটা ভাল ফল দিতে পারে না। শান্তর জীবনে তার অভিজ্ঞতা আমার হয়ে গেছে। আমার অত্যধিক আদর-স্নেহই তাকে অমন দ্রুতভাবে অধঃপতনের চরম সীমায় ঠেলে দিয়েছিল, বাবা। তা ব'লে দিদির প্রতি ভালবাসার তার অভাব হয় নি, বাবা। বুঝতে পাল্লুম, যে ঘূর্ণাবর্ত্তে সে পড়েছে, সেখান হতে উদ্ধারের একমাত্র পথ—তাকে হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে পালান।

"তাই পালালুম। ভাই আমার একটা আপত্তি অবধি তুল্লে না। রমাকে নিয়ে, শান্তকে নিয়ে, আমি অনেক দেশ ঘুরলুম; পঙ্কজ, তখন তোর আগমনই আমার একান্ত প্রার্থনা হয়েছিল।"

প্রতিমা উত্তেজনার বশে উঠিয়া বসিলেন। পঙ্কজের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া আকুলকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "পঙ্কজ, যাদু আমার! ধন আমার! মাণিক আমার! ভগবান্ সে দিন তোকে দিলেন না যদি, তবে কেন এ পথ দিয়ে দিলেন?" প্রতিমা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পঙ্কজের মনে হইল, রবিকরালোকিত উজ্জ্বল সৌধচূড়া হইতে তাহাকে [illegible]তল অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হইতেছে। অসহায়ভাবে [illegible]র চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, আপনার

মুঠাটাই আপনি চাপিয়া ধরিল। না জানি কোন্ কঠোর সত্য তাহাকে ধূলা হইতে ধূলা করিয়া দিবে।

প্রতিমা ক'হিলেন, "অকালে যে ফুটে, অকালেই তারে শুকাতে হবে। তাই ঠাকুরের কাছে শান্তর আয়ু ভিক্ষা করতে পাত্তুম না। চাইতুম রমার এয়োত, তা পেলুম,—ভাগ্যমানী আমার কপাল-ভরা সিঁদুর নিয়ে চ'লে গেল। শান্ত যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। বুঝলুম, এ পরিবর্ত্তন তার সইবে না, তবু কথা কইতে পাত্তুম না। রমার শোকে তার দুর্ব্বল বুকখানা ভেঙ্গে গিয়েছিল। যাবার দিন শান্ত আমার হাত দুখানা চেপে ধরে, একটা ভিক্ষা চাইলে, না বল্‌তে পাল্লুম না। যত বড় বজ্র হোক, বুক পেতে নেব স্বীকার কল্লুম! শান্ত তোর কথা বল্লে। তুই আমার রমার কোলে না এলেও তুই শান্তর ছেলে। শান্ত অ কুল-মিনতিতে বল্লে, 'যে অস্থানে তাকে রেখ না! অনাচারে উৎপত্তি হলেও আমার দ্বারা আনীত ব'লে তার মানুষ হওয়ার ভারটা তোমাকেই নিতে হবে। দিদি-ভাই, শিশু-দেবতা।' আরো বল্লে কি জানিস্? বল্লে, 'দিদি-ভাই' এইবার অনেক বোঝা-পড়ার সময় হয়ে এল, যতটা পারি, বোঝাটা হাল্কা করবার চেষ্টা কর্চ্ছি।' বল্‌তে বল্‌তে সে বসে উঠল, এক ঝলক তাজা রক্ত বেলফারের পটটার তুলে দিয়ে বল্লে, 'দিদি-ভাই' আমার সব কর্ত্তব্য তুমি নিয়ে আমায় ছুটী দাও, আমি আর পার্চ্ছি না।'

"তোকে আনালুম—যে ঠিকানা সে দিয়ে গিয়েছিল, সেখান হতে। তখন তুই দেড় বছরের। দেশ হতে অনেকগুলা বছর বাইরে কাটিয়েছিলুম, কেউ বুঝতে পারে না, তুই রমার কোলে এসেছিলি কি না। সে সন্দেহ অবধি কোন দিন কারু মাথে জাগে নি। তবু ভয়, ভাবনা, আতঙ্ক আমার দেশে থাকতে দিত না। আত্মীয়বর্গের ত্রিসীমা মন আমার মাড়াতে চাইত না। সকলে জানত, শান্তর শোকেই আমি বাড়ীতে থাকতে পারি না; দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।"

চোখের সম্মুখে মুহূর্ত্তে যদি কক্ষটা উল্টাইয়া যাইত, তাহা হইলেও বোধ করি, পঙ্কজ এমন করিয়া অভিভূত হইয়া শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত না।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া প্রতিমা কহিলেন, "আমার সবখানি অন্তর জুড়ে আজ তুই বসেছিস্। শান্তর বংশধর ব'লে তোকেই প্রতিষ্ঠা করেছি। বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, রূপ সব দিক দিয়েই তুই চৌধুরী-বংশ উজ্জ্বল করেছিস। কিন্তু এমনই দুর্ব্বল এই মন, এমন ক'রে এ আপনার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রে আছে, কিছুতেই একে আমি বোঝাতে পাচ্ছি না, বাবা। চৌধুরী-বংশের চৌদ্দপুরুষ তোর হাতের জল পাবে, ভাবতে গা আমার শিউরে উঠে।"

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

প্রেমের শক্তি

বন্ধ্যা হও এবে তুমি ধরিত্রী জননি
দিনে দিনে হ'ল ম্লান মাতৃত্ব তোমার।
দিশি-দিশি হ'তে দেখ হেলায়ে তর্জ্জনী
প্রকৃতি করিছে ব্যঙ্গ—ভ্রাতৃঘ্ন-ধিক্কার।

স্বার্থ-লব্ধ, অন্ধ, মূঢ় বঞ্চকের দল
বিপুল তাণ্ডবে যা'রা ছুটে দিবা-রাতি
ভ্রাতৃ-বক্ষ-রক্ত লাগি' হইয়া পাগল,
ক্ষান্ত হো'ক ভ্রান্ত তারা—দাও সত্য-ভাতি।

সার্থক মাতৃত্ব তার!—সন্তান যাহার
প্রসারিত বক্ষ দিয়ে বিপদের মাঝে
দাঁড়ায় আড়াল করি' ভাই আপনার,
উপেক্ষিয়া বর্ব্বরতা মিথ্যা যত কাজে!

কর গো জননী,—কর, কর, আশীর্ব্বাদ,
হোক জয়ী,— হোক হিংসার নিপাত!

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

খাঁটি খাদ্যদ্রব্য বনাম ভেজাল মিশান খাদ্যদ্রব্য

আমাদের এই পবিত্র দেশে কোন বিষয়ে পবিত্রতায় আঘাত লাগিলেই মানুষ ক্ষেপিয়া উঠে। যাহারা এ বিষয়ে আন্দোলন করিতেছে, তাহাদের কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা ভালরূপ বুঝিতে চেষ্টা না করিয়াই আমরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠি। যদি আমরা যথার্থই চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই অন্যায় ব্যবহারের সম্পূর্ণরূপে প্রতীকার করিতে পারি। সকলে মিলিয়া একমত হইয়া চেষ্টা করিলে এ জগতে কিছুই অসম্ভব হয় না; কিন্তু তাহা আমরা কখনও করি না। তাহার কারণ, প্রথম, আমরা একমত হইতে জানি না, দ্বিতীয়, আমাদের ধর্ম্মে যথার্থই এইরূপ বিশ্বাস নাই—যাহার জন্য আমরা প্রাণপণে ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য চেষ্টা করি। ভগবানের প্রতি বিশ্বাসেরও আমাদের বিশেষ অভাব।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, মানুষকেও বাঁচাইয়া রাখিবে, কিন্তু আমরা এই ভাবে উপর উপর শাস্ত্র মানি, যখন সুবিধা হয় ও এক পয়সা খরচায় হয়, তখন পিপীলিকাকে চিনি দিয়া বাঁচাইয়া রাখি, আর প্রয়োজন হইলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে সর্ষপ-তৈলের সহিত mineral oil, ঘৃতের সহিত সাপের চর্ব্বি ও vegetable oil, ও ময়দার সহিত soft stone মিশাইয়া তিলে তিলে পলে পলে মারিতেছি। মুখে ধর্ম্মের ভান করি, বেদিতে বসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করি বা ধর্ম্ম-প্রচারের সহায়তা করি, তিলক-ফোঁটা কাটিয়া চিতাবাঘ সাজিয়া ধর্ম্মে ও ভগবানে ভক্তি দেখাই, কিন্তু স্বার্থে আঘাত পড়িলে সব ভুলিয়া গিয়া অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য সর্ব্বপ্রকার কুকর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হই।

পবিত্র ঘৃত দেবপূজায় ব্যবহৃত হয়, সেই ঘৃত প্রস্তুত হয় গো-নিঃসৃত দুগ্ধ হইতে, কিন্তু অনেক দিন হইতে সস্তা দরে বিক্রয় করিবার জন্য ঘিয়ের সহিত সাপের চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

১৯১১ খৃঃ অঃ একটি Trade mark Caseএ Search Warrant লইয়া টেরিটিবাজারে একটি মুসলমান দোকানদারের ঘর হইতে অনেকগুলি খাতা-পত্র ধৃত হয়। ঐ মুসলমান বণিকের ব্যবসায় মফঃস্বলে ঘি চালান দেওয়া। খাতা-পত্র পাঠ করিয়া দেখা গেল, বড় বড় পাহাড়ী সাপের চর্ব্বি ক্রয় করার জন্য টাকা খরচ লেখা রহিয়াছে। এক একটা সাপের ওজন এক মণ, দেড়মণ ও দুই মণ—দর ৫৲ টাকা। এই সাপের চর্ব্বি-মিশ্রিত ঘি মফঃস্বলে চালান হয়—দর ২০৲ ২২৲ টাকা। আর সেই ঘৃত ব্যবহার হয় দেবপূজার জন্য, আর ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের শরীরধারণের জন্য। সকলেই জানে, এইরূপ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার প্রতীকারের কোন বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে কি?

দেবতার পূজার জন্য এবং মানুষের সেবার জন্য যত রকম দ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে পবিত্র গব্যঘৃত প্রধান দ্রব্য। এই পবিত্র ঘৃত প্রস্তুত করিবার জন্য ভাল দুগ্ধের প্রয়োজন, আর ভাল দুগ্ধ পাইতে গেলে, উৎকৃষ্টভাবে গো-পালন প্রয়োজন। ইহার কোন কি চেষ্টা হইতেছে? প্রত্যেক গ্রামে গোচারণের মাঠ ছিল। সেই মাঠগুলি স্থানীয় লোকদিগের গোচারণের জন্য ছিল। এখন সেই মাঠগুলি অনেক সময়েই জমীদারগণ প্রজাবিলি করিয়াছেন। প্রজাবিলি করিবার অধিকার জমীদারের নাই, কিন্তু অধিকার থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁহারা চাষের জন্য এই সব জমী বিলি করিয়া গো-মহিষাদি চারণের বিশেষ অসুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাহার জন্য কেহ কি, কোন লোক তাহার বিরুদ্ধে একটি কনিষ্ঠাঙ্গুলিও উত্তোলন করিতেছেন?

সরিষার তৈলে অনেক স্থলেই দেখিবেন mineral oil মিশ্রিত আছে। সেই mineral oil প্রাণঘাতিকা। অনেক সময় ইহা ব্যবহারে এক এক গ্রামে কলেরা হইয়া বহুসংখ্যক মনুষ্য প্রাণত্যাগ করিতেছে। খাঁটি সরিষার তৈল পাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। যদিও আমরা দেশসেবা করিব, ব্যবসা করিব বলিয়া মুখে এই সব কথা বলিতেছি, কয় জন লোক যাহাতে খাঁটি সরিষার তৈল নানা স্থানে পাওয়া যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন?

অতি পূর্ব্বে সর্ষপ-তৈলে সরগোঁজা মিশাইত। আমি যখন প্রথম উকীল হইয়াছি, আর মিউনিসিপ্যালিটীর মামলা কলিকাতার পুলিস আদালতেই বিচার হইত, তখন যে খাদ্য-পরীক্ষকরা তেলের ভেজালের মামলা করিতে আসিত, তাহাদের নালিসই থাকিত, তেলের সহিত সরগোঁজা মিশাইয়াছে। আর আসামীদের উক্তি হইত, সরগোঁজা কতক পরিমাণে না মিশাইলে সরিষা হইতে সম্পূর্ণভাবে তৈল নির্গত হয় না। কিন্তু সরগোঁজা-[illegible]র্ষপ-তৈল প্রাণঘাতিকা ছিল না। কিন্তু এখন কে কি [illegible]ছেন, যাহাতে ইহার গতিরোধ হয়?

ময়দায় এখন Soft stone মিশ্রিত হয়। গম হইতে যে ময়দা প্রস্তুত হয়, তাহাই খাইয়া মানুষ জীবনধারণ করে ও শক্তিশালী হয়। কিন্তু এখন ব্যবসাদারদের অনুগ্রহে গম হইতে প্রস্তুত রুটী ও লুচি না খাইয়া Soft stoneএর লুচি ও রুটী খাইতেছি, ইহা হইতে মৃত্যু কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে, কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। খাঁটি ময়দা যোগাইবার জন্য বাঙ্গালী যুবকরা কি করিতেছেন ?

লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোট এলাচ, বড় এলাচ ইত্যাদি শরীর-পুষ্টিকারী মশলা ব্যবহার করি, সেগুলির প্রত্যেকটি হইতে তৈলাক্ত অংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা বাদে যে ছিবড়া থাকে, সেইগুলি বাজারে লবঙ্গ, দালচিনি, ছোট এলাচ ও বড় এলাচ ইত্যাদি বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে এবং তাহাই আমরা লবঙ্গ, দারুচিনি বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি।

আমি জানি না, সাধারণ পাঠকপাঠিকাগণ জানেন কি না, বাজারে যে দুগ্ধ বিক্রয় হয়, তাহাতে মাখন তুলিয়া লওয়া হয়। মাখন-বিবর্জ্জিত দুগ্ধ অনেক সময় বাজারে বিক্রয় হয়। অনেক সময়ে লম্বা-চওড়া নামবিশিষ্ট দুগ্ধ-সরবরাহকারী কোম্পানীর কথা শুনেন, তাহাদের অধিকাংশ কোম্পানী মফঃস্বল হইতে প্রেরিত বাজারের দুধ কিনিয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য চালাইতেছেন।

বেহারস্থিত সাঁওতাল পরগণার মধুপুরে এক জন ইহুদী ভদ্রলোক একটি মাখন গালাইবার কল লইয়া যান। তিনি গোয়ালাদের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক গোয়ালার দুগ্ধ তাঁহার কলে ফেলিয়া দিবে। তিনি সেরকরা দুই আনা হিসাবে দাম দিবেন, আর মাখন-তোলা হইয়া গেলে যে দুগ্ধ থাকিবে, তাহাও তাহাকে ফেরত দিবেন। কাযেই গোয়ালা দুধকে দুধও পাইল, আর দুই আনা করিয়া পয়সা পাইল, আর সেই দুধ বাজারে বেচিয়া তিন আনা করিয়া দাম পাইল।

এখন যেরূপ খাদ্যবিভ্রাট হইয়াছে, তাহাতে খাঁটি জিনিষ পাওয়া ও খাওয়া অতিশয় দুর্লভ। ভাত আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য, সেখানে ঢেঁকি ছাঁটা চালের বদলে কলে ছাঁটা চাল চলিতেছে। কলে ছাঁটিবার সময় ভিটামিনযুক্ত অংশ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বলিতে পারেন, মানুষ কি খাইয়া বাঁচিবে ?

প্রত্যেক ব্যবসায়ীর দুইটি করিয়া দল আছে। প্রত্যেক দলেরই প্রাণপণ চেষ্টা, লাভের সম্পূর্ণ অংশ তাহাদের দলই পায়, অপর দল যেন কিছু না পায়। আপনারা কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়া থাকিবেন, উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কোন [illegible] কতকগুলি লোক তাহাদের দেশ হইতে বানর ধরিয়া [illegible] চালান দেওয়া হইতেছে বলিয়া মহা উত্তেজনাজনক বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য, রামচন্দ্রসখা হনুমানদের উপর এরূপ অত্যাচার অতিশয় অন্যায় ও ইহাতে হিন্দুর ধর্ম্মে আঘাত কর হইতেছে। তাঁহারা চীৎকার করিয়া দেশকে উত্তেজিত করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুখে তাঁহারা বলিতেছিলেন, ধর্ম্ম গেল, দেশ উৎসন্ন গেল, কিন্তু আসল কথা অন্যরূপ। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল সভাতে ইহাই স্বীকৃত হইয়াছিল যে, বানরের সংখ্যাবাহুল্য হেতু সেই স্থানের অধিবাসীদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল, কাযেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, রেলের গাড়ী করিয়া বানরদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হউক। সেই মিউনিসিপ্যালিটীতে দুইটি দল ছিল। বানরগুলিকে স্থানান্তরিত করিবার কনট্রাক্ট একটি দলের লোক পাইয়াছিল, ভগ্নমনোরথ অপরদলের লোকগুলি অমনই চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দেশে ধর্ম্ম গেল ইত্যাদি।

এইরূপ ধর্ম্মের ভানের খেলা হইয়াছিল ১৯১৭-১৮ খৃঃ অব্দে। তখন চীৎকার উঠিয়াছিল, ঘিয়ে ভেজাল হইতেছে, দেশ গেল, ধর্ম্ম গেল ইত্যাদি। একটি দলের হাতে অনেক ঘৃত ছিল এবং তাহা খুব উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইতেছিল, অপর দলের হাতে তখন বিশেষ ঘৃত ছিল না। তাহারা দেখিল, প্রতিপক্ষ ঘি বেচিয়া অনেক লাভ করিবে, অমনই চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, ঘিয়ে অত্যন্ত ভেজাল, দেশ গেল, ধর্ম্ম গেল ইত্যাদি। ভাগীরথীর ধারে দলে দলে অনেক মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া দেশের ও দশের কাযে জীবন উৎসর্গ করিলেন, অর্থাৎ গঙ্গাকিনারায় না খাইয়া কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া ধর্ণা দিলেন। মুখে বলিতে লাগিলেন, ভেজাল ঘি খাইয়া দেবতারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, মনুষ্যের ধর্ম্মে আঘাত লাগিতেছে, অতএব ভেজাল ঘির পরিবর্ত্তে আমরা পবিত্র ঘি চাই। লোকের কি উৎসাহ !

পরে ঘৃত সম্বন্ধে একটি নূতন আইন রুজু হইল। সত্যেন্দ্র-প্রসন্ন সিংহ, যিনি পরে Lord হইয়াছিলেন, তিনি সেই Actএর জন্য দায়ী। যে মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণরা পবিত্র ঘৃতের জন্য গঙ্গা-কিনারায় ধর্ণা দিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই ধনী মাড়োয়ারীর হুকুম-তামিলদার। তাঁহাদের জীবনের কার্য্যই হুকুম তামিল করা। আমেরিকার বড় বড় হোটেল অধিকারীর সংশ্লিষ্ট আইরিশ ভোটারদের ন্যায় হুকুম মাফিক কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাঁহারা কতক আধুনিক গণতান্ত্রিক দলের ভোটারদের ন্যায় নিজেদের কোন বিভিন্ন অস্তিত্ব অনুভব করেন না। গণতান্ত্রিক দলের স্বৈরাচারী

কর্ত্তারা যাহা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহাই করেন। কোন রাজনৈতিক লেখক বলিয়াছেন, "Democracy is an institution to find out who is the worst autocract," সর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্বৈরাচারী কে, তাহাই গণতন্ত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

আইন করিয়া ভেজাল ঘৃত বিশুদ্ধ করা যায় না, আইন করিয়া মিশ্রিত খাদ্যের বিক্রয় ও ব্যবহার বন্ধ করা যায় না, আইন করিয়া ভোগবিলাসী লোককে ভোগবিলাস পরিত্যাগ করান যায় না, আইন করিয়া অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করা যায় না, আইন করিয়া লোভীকে নির্লোভ করা যায় না, আইন করিয়া দুষ্টকে শিষ্ট করা যায় না, আইন করিয়া অসৎকে সৎ করা যায় না, আইন করিয়া অধঃপতিত সমাজকে উর্দ্ধমুখীন করা যায় না। সৎশিক্ষা, চরিত্র-গঠন, স্বার্থত্যাগ দ্বারাই পতিত সমাজকে উন্নত করা যায়। অধঃপতিত জাতিকে উন্নতির পথে লওয়া যায়। রাষ্ট্রনীতিক প্রচারকার্য্য দ্বারা তাহা হয় না। তাই ঘৃত আইনবদ্ধ হইলেও তাহার উন্নতি কিছুমাত্র হইল না। যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। সেই ভেজাল ঘৃতই চলিতে লাগিল, তবে দর দ্বিগুণ হইয়া গেল। Sybills bookএর ন্যায় সেই পচা ঘৃত দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল।

যখন ঘৃতে ভেজাল চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পরে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক 'ট্রেড মার্ক'যুক্ত এক ঘৃত বাজারে ছাড়িলেন—ঘিয়ের ক্যানেস্তারার মার্কা হইল নাগরী অক্ষরে লেখা—"পাতিরাম।" এই মার্কা ঘি দিনকতক বেশ চলিল। তাহার পর আর এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বাহির করিলেন, তাঁহার মতে খাঁটি ঘি মার্কা "খাতিরাম।" খাতিরামেরও প্রতিপত্তি বেশ দাঁড়াইয়া গেল। পাতিরাম ও খাতিরাম দুইটি মার্কাযুক্ত ঘি বাজারে বেশ কাটিতে লাগিল। দুইটি মার্কার জন্য বাজারে বেশ আগ্রহও ছিল। ইহা দেখিয়া আর এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বাহির করিলেন "খালিরাম।" ইহাও বাজারে চলিতে লাগিল। একটা নাম ও মার্কা দিলে বাজারে যে চলে না কি, তাহা আমার জানা নাই। দেবনাগরী হরপে এই তিনটি মার্কার হরপ ও বানান দেওয়া গেল—**পাতিরাম** (পাতিরাম), **খাতিরাম** (খাতিরাম), **খালিরাম** (খালিরাম), ইহা হইতে পাঠকপাঠিকাগণ দেখিতে পাইবেন, "খাতিরাম" ও "পাতিরামের" মধ্যে তফাৎ একটি বার। পাতির "প"য়ের পেটে একটা 'বার' দিলেই "খাতি" হইয়া যায়। আর "খাতি"তে ও "খালি"তে দেবনাগরী হরপে তফাৎ একটা অতিরিক্ত loop।

'মধ্যাগচ্ছ' "খাতিরাম" "খালিরামের" চালানদারদের নামে তাহার ব্যবসার মার্কা জাল করিয়াছে বলিয়া নালিশ করিল। খাতিরামের উকীল হইলাম আমি, আর খালিরামের কৌন্সলী হইলেন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিংহ)। মামলা রুজু হইল, আসামীর নামে শমন বাহির হইল। মার্কার 'টিন প্লেট' (Tin plate) ও খাতাপত্রের জন্য Search Warrant বাহির হইল। আর Search Warrantএর দ্বারা খাতাপত্র এবং মামলা-সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রগুলি আদালতে আনা হইল। আসল গোড়ার যে "পাতিরাম", সে কোন মামলা করিল না। 'মধ্যাগচ্ছ' খাতিরাম খালিরামের মালিকের নামে মামলা রুজু করিয়া দিল। পুলিস-আদালতে মামলা আমি জিতিলাম। খালিরাম মার্কাওয়ালাদের সাজা হইল। যখন মামলা চলিতেছিল, তখনকার এক দিনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তর্ক করিতে করিতে মিঃ সিংহ (পরবর্ত্তী যুগে লর্ড সিংহ) বলিয়া উঠিলেন, খাতিরাম মার্কা অধিকারী আমার মক্কেল পাতিরাম মার্কা জাল করিয়াছে। সে নিজে দূষিত হস্তে আদালতের সাহায্য চাহিয়াছে, সেই জন্য তাহার এ মামলায় আমার কৃতকার্য্য হওয়া উচিত নয়।

লর্ড সিংহ।—খাতিরাম মার্কার অধিকারী পাতিরাম মার্কা জাল করিয়াছে, তাহারা দূষিত হস্তে আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, সেই কারণে আদালতে তাহাদের সাহায্য করা উচিত নয়। বরং খাতিরামের অধিকারীদের উপর পাতিরামের মার্কা জাল করার দরুণ মামলা চলা উচিত।

আমি।—মিঃ সিংহের অভিভাষণে বিশেষ সারবত্তা নাই। খাতিরামের "খ"য়ের 'বার'টি, পাতিরামের মামলা চালাইবার বিশেষ ব্যতিক্রম। That additional bar in Khatiram is a bar to its prosecution.

Lord Sinha—If that is so. the additinal loop in "ল" of Khatiram ought to be a loophole to the accused, খাতিরামের "ত"য়ে একটা loop, খালিরামের "ল"য়ের দুটো loop, সেই কারণে অতিরিক্ত loopটি আমার মক্কেলের loophole হওয়া উচিত অর্থাৎ বাহির হইবার পথ হওয়া উচিত।

লর্ড সিংহ সম্বন্ধে এই স্থানে আমি আর দুই একটি কথা বলিতে চাই। আমার ভাগ্যে তাঁহার সহিত কার্য্য করা ও তাঁহার বিপক্ষে কার্য্য করা ঘটিয়াছিল। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। ভালবাসিতেন বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না।

ভজনলাল [illegible] বিরুদ্ধে মানহানি মোকদ্দমায় নর্টন সাহেব ও আমি [illegible] তরফে ছিলাম। সিং সাহেব ও মিষ্টার

বিজয়বেহারী চাটার্জ্জি আসামী ভজনলালের তরফে ছিলেন। মামলা অনেক দিন চলিয়াছিল।

তিন কিম্বা চারি বৎসর পূর্ব্বে কোন একটা পার্টিতে লর্ড সিংহ উপস্থিত ছিলেন। সার বি, এল, মিত্রও ছিলেন। অন্যান্য অনেক লোকের মধ্যে আমিও সেখানে ছিলাম। সার বি, এল, মিত্র আমার লিখিত পুস্তকগুলি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি লর্ড সিংহ মহাশয়ের সম্মুখে বলিলেন,—"তারক, তোমার বইগুলি কি লর্ড সিংহকে উপহার দিয়াছ?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি কতকটা অপ্রতিভ হইলাম, কারণ, আমি লর্ড সিংহকে আমার পুস্তকগুলি পাঠাইয়া দিই নাই। যাহাই হউক, আমি বলিয়া উঠিলাম, "লর্ড সিংহ ত আর বাঙ্গালা বইগুলি পড়িবেন না, আমার বাঙ্গালা ভাষায় লেখা বইগুলি পাঠাইয়া লাভ কি?"

লর্ড সিংহ।—তারকনাথ, এত কাল একসঙ্গে ব্যবহার করিয়া আজ কিনা বলিলে, তোমার বাঙ্গালা ভাষায় লেখা পুস্তকগুলি পাঠ করিব না?

আমি।—আমার ভুল হইয়াছে, কিছু মনে করিবেন না, আমার পুস্তকগুলি শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব।

সেই তারিখের পরবর্ত্তী রবিবারে আমার পুস্তক চারিখানি "ভোলানাথের ভুল," "মেনকারাণী," "ঋণমোক্ষ," ও "মহামায়ার মহাদান," ইলিসিয়াম রো-স্থিত তাঁহার বাটীতে গিয়া উপহার দিলাম। তিনি পুস্তকগুলি পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। দুই সপ্তাহ বাদে আমি পুনরায় তাহার বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

লর্ড সিংহ।—তারক, তোমার বইগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে, এইরূপ পুস্তকে সমাজের বিশেষ মঙ্গল হইবে। তোমার বইগুলি ঠিক সময়ে বাহির হইয়াছে। এক দিনও অগ্রে বাহির হয় নাই।

আমি।—আপনি সমস্ত বই ভাল করিয়া পড়িয়াছেন?

লর্ড সিংহ।—আমি পুস্তকগুলি ভাল করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, শুধু আমি পাঠ করি নাই, লেডী সিংহকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। তাঁহার Reader—যিনি পুস্তক পাঠ করিয়া শুনান, তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছি, বইগুলি তাঁহাকে আগাগোড়া পাঠ করিয়া শুনাইয়া দেন। আমি তোমার পুস্তকগুলি পাঠে বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

আমি।—আমার উদ্দেশ্য ধর্ম্মহীন শিক্ষায় মানুষ সুখী হইতে পারে না। ভগবানের অনুকম্পা বি[illegible]র শান্তি হইতে পারে না, এইটিই দেখান। সকল [illegible]খাতেই আমার উদ্দেশ্য এক—ধর্ম্মহীন শিক্ষায় মানুষ সুখী হইতে পারে না। আমি আরও বলিলাম, "এইখানে আমার একটি কথা বলিবার আছে। আমার বিশ্বাস, মোগল পাঠান ইত্যাদি জাতিরা ভারত জয় করিয়া হিন্দুদের যতদূর অনিষ্ট করিয়াছে, তাহাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট করিতেছে এই হুজুগদারদের দল। আমাদের সব গিয়াছিল, তথাপি অন্দরমহলটি ঠিক থাকার দরুণ আমাদের নিজ নিজ গৃহে বেশ সুখ-শান্তি ছিল। আমাদের মা, মাসী, স্ত্রী, ভগিনী, ইঁহারা আমেরিকার কামিনীর ন্যায় Home Breaker নন, Home makers—তাঁহারা গৃহবিচ্ছেদ ঘটান না, গৃহে শান্তি আনেন। কিন্তু যে দিন অন্দরমহল প্রথাটি ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া যাইবে, সেই দিন আমাদের শান্তি কোথায় থাকিবে?"

লর্ড সিংহ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"Perhaps you are right, perhaps you are right, তারক, সম্ভবতঃ তোমার ধারণাই ঠিক।"

লর্ড সিংহের Ghee Actএর পর পবিত্র ঘৃতের অভাব সমানই আছে। সাপের চর্ব্বি, পচা কলার মাড় ইত্যাদি ত ঘিয়ের সহিত ব্যবহার হইতেছেই, তাহার উপর বনস্পতি-তৈলের মিশ্রণে বিশুদ্ধ ঘৃত এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। মাড়োয়ারী ভদ্রলোকরা নিজের ব্যবহারের জন্য ঘৃত দেশ হইতে আনেন। যে সব ঘৃত বাজারে বিক্রয় হয়, তাঁহারা তাহা ব্যবহার করেন না, সেই সব বাজারের ঘিয়ের খরিদ্দার অধিকাংশই বাঙ্গালী। তাঁহারা ঘরে বসিয়া বিশেষ অর্থ-কষ্ট সহ্য করিবেন, তথাপি ঘৃত-ব্যবসারে বা মোকাম হইতে ঘৃত আমদানী বা ঘৃত প্রস্তুত করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন না।

মধুপুরে আমার একখানি বাটী আছে। আজ ২৪ বৎসর ধরিয়া আমি মধুপুরে যাতায়াত করিতেছি। ৫ বৎসর পূর্ব্বেও ওখানে যে সব ঘি পাওয়া যাইত, সে সব খাঁটি। কিন্তু বনস্পতি-তৈলের অনুগ্রহে এখন মধুপুরে খাঁটি ঘি দুষ্প্রাপ্য জিনিষ। এক জন নীচবুদ্ধি জুয়াচোর ব্যবসার নাম করিয়া পাড়াগেঁয়ে দেহাতি গয়লাদিগকে এই পদার্থ বেচিয়া উহা ঘির সহিত মিশাইতে শিখাইয়াছে। মধুপুর সহরে গোয়ালাদের জুয়াচুরি শিখাইয়া ছোট ছোট মাটীর ভাঁড়ে বনস্পতি-তৈল-মিশ্রিত ঘি বেচা করিতেছে, মুখে বলিতেছে, ইহা খাঁটি গব্যঘৃত, আমার বাটীতে তৈয়ারী হইয়াছে, তাহাই আনিয়াছি। আর লোকেও সস্তা বলিয়া এই সকল মিশ্রিত ঘি ব্যবহার করিতেছে। খাঁটি ঘৃতের দর ২ টাকা হইতে ২।০ সের, আর এই মিশ্রিত ঘৃতের দর ৸০ আনা হইতে ১ টাকা সের।

খাঁ বাহাদুর আবদুল গফুর সাহেব আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি এখন কার্য্য হইতে অবসর লইয়া কয় মাসের জন্য মধুপুরে গিয়াছিলেন। এক দিন প্রাতঃকালে পানিয়াখোলা রাস্তা হইতে দেখিলাম, তিনি বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুইয়া আছেন। কথাবার্ত্তায় জানিলাম, তিনি শারীরিক অসুস্থ আছেন। অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—পেটটা কিছু খারাপ হইয়াছে। কথায় কথায় জানিলাম, তিনি ১।০ সিকা সেরের "খাঁটি" ঘি খাইয়া এই অবস্থায় আসিয়াছেন।

আমি।—আপনার এ অবস্থার কারণ হয় ত বনস্পতি-তৈল-মিশ্রিত ঘির ব্যবহার। ইহার গুণই নাই। চার্ব্বাক্ মুনি যখন "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" উক্তির সমর্থন করিয়াছিলেন, তখন তিনি খাঁটি পবিত্র গব্য ঘৃতের কথা ভাবিয়াছিলেন, বনস্পতি-তৈল-মিশ্রিত ঘিয়ের কথা ভাবেন নাই। ভাবিলে এরূপ উক্তি করিয়া যাইতেন না। খাঁটি ঘিয়ের যে সব গুণ আছে, ইহাতে তাহার কিছুই নাই। এক জন য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, বনস্পতি-ঘৃতের কোন গুণ নাই, ইহা খাওয়া আর না খাওয়া দুইই সমান।

খাঁ বাহাদুর।—রায় বাহাদুর, আমার জামাতা এই ঘি কিনিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কথামত এই ঘি কিনিয়াছিলাম।

আমি।—জামাতা শ্বশুর মহাশয়কে সস্তায় ঘি কিনিয়া দিতে গিয়াছেন, জানিতেন না, এরূপ পরিণাম হইবে। যাহা হউক, অদ্য আহার বন্ধ করুন, তাহা হইলেই সারিয়া যাইবেন। আর ১।০ সিকা সেরের ঘি খাইবেন না।

প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল চলিতেছে। এই সব খাইয়াও এখনও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, ইহাই আশ্চর্য্য। আমাদের দেশের যুবকরা দলবদ্ধ হইয়া যদি খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশানর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে দেশের অনেক কায করা হইবে। খাঁটি জিনিষ খাইতে পাইলেই মানুষ সুস্থশরীরে বাঁচিতে পারিবে। আমাদের সমাজের নেতারা কি এ দিকে মন দিবেন? তাঁহারা যুবকদের একটি দল করুন, যাহারা প্রাণপণে ভেজাল মিশানোর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবে।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

সিন্ধু-সঙ্গীত

সুললিত নর্ম্মলাস্যে কল্লোলিয়া কল্লোলিত হে মহাসাগর
কি গম্ভীর মহাগীতি গাহিতেছ অবিশ্রান্ত যুগযুগান্তর!
কি ভাব উছলি উঠে ঊর্ম্মিশ্রান্ত ও অনন্ত বক্ষেতে তোমার
আকুল করেছে তোমা ভাবোন্মত্ত হে নায়ক মহা-পারাবার?

তখনও অনাদির শূন্য বক্ষে জাগেনিক সৃষ্টির প্রভাত
উল্লাসে হাসেনি মহী, অনন্তের দীপ্ত ক্রোড়ে অস্তিত্বের সাথ!
তুমি ছিলে গীতোন্মত্ত, সাক্ষী তার দিব্য-চক্ষু ভাস্বর সবিতা
তোমারি বক্ষের মাঝে যার সৃষ্টি সৌর সৃষ্টি কান্তি-বিহসিতা।

তার পরে সত্য, ত্রেতা—একে একে যুগান্তর গিয়াছে বহিয়া
আজিও সে অনাহত মহাগীতি উঠিতেছে দিগন্ত ভরিয়া।
কাহারে শুনাতে গান তুলিতেছ ঊর্ম্মি কণ্ঠে অশ্রান্ত রাগিণী
হে রুদ্র, কোমল, শান্ত—হে গায়ক সৃষ্টিধাতা দিবসযামিনী?

অনন্তের পান্থ ওগো,—অনন্তের এ অনন্ত রাগিণী মধুর
আকুল করিল যে গো, এ যে মোর অতীতের চেনা চেনা সুর
এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের আলোড়নে, দ্রুত শান্ত অস্ফুট স্পন্দনে
সুদূর সে অতীতের গীতধ্বনি বাজে যেন সদা ক্ষণে ক্ষণে!

ভুলে গেনু ওগো সিন্ধু—কেবা আমি, কেবা তুমি, কিসের এ গীতি,
আমার প্রাণের মাঝে ঢেলেছিলে এ কি এক অনাবিল প্রীতি।
ওগো বন্ধু, এ কি ছন্দ—একি প্রীতি—এ কি স্নেহ—এ কি ভালবাসা
আজি মোর জড় অন্ধ আঁখি হতে মুছে দিলে এ কি এ কুয়াসা!

অনন্তের সাথী ওগো, আজি বুঝি অনন্তের পেয়েছি সন্ধান,
তবে এস ভেসে যাই—অবিরাম কলরোলে গাহি শুধু গান।

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল (বিএ)

ভারতীয় রাষ্ট্রবিকাশের ধারা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

জানপদ সমিতিও এই ভাবেই রাজধানীর বাহিরে সমস্ত দেশের মন ও ইচ্ছার বাস্তবিক প্রতিনিধি ছিল, কারণ, উহা নগর ও গ্রামের নির্ব্বাচিত নেতা বা মুখ্যগণকে লইয়া গঠিত ছিল। মনে হয়, ইহার গঠনে ধনিক সম্প্রদায়ের কতকটা প্রভাবাধিক্য হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ, অধীনস্থ সম্প্রদায় সকলের প্রধানতঃ অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিরাই ইহাতে প্রতিনিধি হইয়া আসিত, অতএব এই জানপদ সমিতি সম্পূর্ণভাবে সাধারণতান্ত্রিক ছিল না—(যদিও অতি আধুনিক সমিতিগুলি ব্যতীত সর্ব্বত্রই ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের ন্যায় শূদ্ররাও স্থান পাইত) তথাপি উহা যথেষ্টভাবেই জনসাধারণের প্রকৃত জীবন ও মনোভাব প্রকাশ করিত। যাহাই হউক, এইটি একটি শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক সমিতি ছিল না, কারণ, রাজা, রাজপরিষদ ও পৌর সমিতির মতই এইটিরও মূল আইন প্রণয়ন করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না, ইহা কেবল ব্যবহারিক বিধান ও মীমাংসা করিতে পারিত। ইহার কার্য্য ছিল জাতীয় জীবনের বিভিন্ন কর্ম্ম-পরম্পরার মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনে দেশবাসীর ইচ্ছার সাক্ষাৎ যন্ত্র হওয়া। এই সব যাহাতে যথাযথ ভাবে পরিচালিত হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা, দেশের বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সাধারণভাবে শৃঙ্খলা ও কল্যাণবিধান করা, এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক বিধান ও অনুশাসন প্রচার করা। রাজা ও তাঁহার পরিষদের নিকট হইতে সুবিধা ও অধিকার সকল আদায় করা, রাজার কার্য্যে প্রজাদের অনুমতি প্রকাশ করা বা প্রত্যাহার করা এবং প্রয়োজন হইলে, রাজাকে কার্য্যতঃ বাধা প্রদান করা, কুশাসন নিবারণ করা অথবা দেশের প্রতিনিধিদের পক্ষে যে সব পথ খোলা আছে, সেই সবের দ্বারা ঐরূপ শাসনের শেষ করা। কাহার পর কে রাজা হইবে, সে বিষয়ে পৌর জানপদের সংযুক্ত অধিবেশনের পরামর্শ লওয়া হইত, ঐরূপ সংযুক্ত অধিবেশন রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিত, যে বংশ রাজত্ব করিতেছিল, তাহার বাহিরে অন্য ব্যক্তিকে সিংহাসন অর্পণ করিতে পারিত, রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট মোকর্দ্দমায়, দেশদ্রোহিতায় বা বিচার-বিভ্রাটে কখন কখনও দেশের উচ্চতম বিচারালয়রূপে বিচার-কার্য্য করিতে পারিত। রাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজকীয় মন্তব্য এই সমিতিগুলিতে পেশ করা হইত এবং বিশেষ ট্যাক্স নির্দ্ধারণ, যুদ্ধ, যজ্ঞ, জলসেচনের বৃহৎ ব্যাপার এবং দেশের অন্যান্য অত্যাবশ্যক ব্যাপারে তাহাদে[illegible]ত গ্রহণ করিতে হইত। এই দুই সমিতির অধিবেশ[illegible]তই হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রত্যহ রাজার নিকট হইতে নানা বিষয় তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইত, তাহাদের কার্য্য রাজা রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতেন, অমনই সেগুলি আইনরূপে বলবৎ হইত। বস্তুতঃ তাহাদের অধিকার সকল ও কার্য্যপরম্পরা সমগ্রভাবে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাজাধিপত্যে তাহারা ছিল অংশীদার, শাসন-ব্যাপারে তাহাদের অধিকার ছিল স্বতঃসিদ্ধ, এবং যে সব শক্তিপ্রয়োগ সাধারণতঃ তাহাদের কার্য্যের অন্তর্গত ছিল না, অসাধারণ প্রয়োজনের সময়ে তাহারা সে সবও ব্যবহার করিতে পারিত। ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, সম্রাট অশোক যখন দেশের ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তিনি কেবল রাজানুশাসনের দ্বারাই তাহা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, পরন্তু তিনি সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন কালে এই দুইটি সমিতিকে যে রাজ্যের কার্য্য-নির্ব্বাহক বলিয়া এবং প্রয়োজনমত রাজ-শাসনে বাধা দিবার যন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইত, তাহা সম্পূর্ণভাবেই ঠিক বলিয়া মনে হয়।

এই মহান্ অনুষ্ঠানগুলি কখন্ বিলুপ্ত হয়? মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে, না বিদেশী শাসনের ফলে, তাহা ঠিক জানা যায় না। ভারতীয় রাষ্ট্রের যেরূপ গঠন, তাহাতে যদি ইহা এমন কোন ভাবে উপর দিকে শিথিল হইয়া পড়িত, যাহার ফলে রাজার শাসন ও সমাজ রাষ্ট্র-শরীরের অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, এবং রাজা এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া ও জাতির বৃহত্তর ব্যাপারগুলিতে অবাধ আধিপত্য লাভ করিয়া ক্রমশঃ বেশী বেশী স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িতেন, এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি কেবল নিজেদের ভিতরকার ব্যাপার লইয়াই ব্যাপৃত থাকিত (যেমন শেষ পর্য্যন্ত গ্রামসঙ্ঘগুলি হইয়া পড়িয়াছিল), কিন্তু রাষ্ট্রের বৃহত্তর ব্যাপারগুলির সহিত কোনরূপ জীবন্ত সম্বন্ধ যদি না রাখিত, তাহা হইলে রাষ্ট্র খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, কারণ, এই জটিল কম্যুন্যাল স্বায়ত্তশাসনমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকল অংশের সংযোগ ও সমন্বয় একান্ত আবশ্যক। যাহাই হউক, মধ্য-এসিয়া হইতে যে আক্রমণ ভারতের উপর আসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে করিয়া আনিল, এমন ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতামূলক শাসনের রীতি যাহা কোনরূপ বাধা মানিতে মোটেই অভ্যাস ছিল না, তাহা যে এই সকল স্বাধীনকর্তৃত্বশীল অনুষ্ঠানকে বা তাহাদের অবশেষকে সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, বস্তুতঃ পক্ষে সমগ্র উত্তর-ভারতে ইহাই ঘটিয়াছিল। তাহার

পরও বহু শতাব্দী ধরিয়া দক্ষিণ দেশে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে যে সাধারণ সমিতিগুলি বর্ত্তমান রহিল, প্রাচীন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলির স্থায় তাহাদের গঠন ছিল বলিয়া বোধ হয় না, পরন্তু প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলি যে সব কম্যুন্সাল সঙ্ঘ ও সমিতিকে পরস্পরের সহিত সম্মতিবিশিষ্ট করিয়া উপরিতন শক্তিরূপে সেইগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিত, দক্ষিণ দেশের সাধারণ সমিতিগুলি ছিল সেই সব নিম্নতন অনুষ্ঠানের স্থায়। এই নিম্নতন অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল কুল ও গণ, পূর্ব্বে এইগুলির রাজনীতিক স্বরূপ ছিল, প্রাচীন কুলপ্রথামূলক জাতির এইগুলিই ছিল উচ্চতম শাসন-সমিতি। নূতন ব্যবস্থায় তাহারা বর্ত্তমান রহিল, কিন্তু তাহাদের উচ্চতম অধিকার সকল হারাইল, তাহারা কেবল নিম্নতন শক্তিরূপে সীমাবদ্ধভাবে তাহাদের অন্তর্গত সম্প্রদায়-গুলির কার্য্যপরম্পরা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। কুল তাহার রাজনীতিক ক্ষমতা হারাইবার পরেও বর্ত্তমান রহিল ধর্ম্ম ও সমাজবিষয়ক অনুষ্ঠানরূপে, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে নিজের কুলধর্ম্ম (সামাজিক ও ধার্ম্মিক রীতি-নীতির ঐতিহ্য) এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কুলসঙ্ঘও (সাম্প্রদায়িক সমিতি) বজায় রাখিল। দক্ষিণ-ভারতে সে সব সাধারণ সমিতি সে দিন পর্য্যন্ত প্রাচীন সাধারণ সমিতির স্থান অধিকার করিয়াছিল, কতকগুলি পাশাপাশি থাকিয়া কখনও একত্র কখনও বা স্বতন্ত্র-ভাবে কার্য্য করিত, সেইগুলি ছিল এইরূপ অনুষ্ঠানেরই প্রকার-ভেদ। রাজপুতানাতেও কুল তাহার রাজনীতিক স্বরূপ ও শক্তি পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, কিন্তু অন্ত ধরণে; প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলি এবং তাহার সুমার্জ্জিত ব্যবহার আর ফিরিয়া আসে নাই, যদিও তাহা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মোচিত সাহস, সৌজন্য, উদারতা ও মর্য্যাদাজ্ঞান অনেক পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভারতীয় কম্যুন্সাল ব্যবহার আর একটি অধিকতর স্থিতিশক্তি-সম্পন্ন জিনিষ ছিল, সেটি প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্যের কাঠামোতে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এমন কি, শেষ পর্য্যন্ত চাতুর্ব্বর্ণ্যেরই স্থান অধিকার করিয়া অসাধারণ জীবনীশক্তি ও প্রভাবশীল প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সেইটি হইতেছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জাতিভেদ প্রথা। আজ সেইটির ম্রিয়মাণ অবস্থা হইলেও, সেটি এখনও নড়িতে চাহিতেছে না। নানা ঘটনার চাপে প্রাচীন চারি বর্ণের মধ্যে নানা বিভাগ উৎপন্ন হয়, আদিতে সেই সব বিভাগ হইতেই জাতিভেদের উদ্ভব। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে নানা বিভাগের উদ্ভব হয়, তাহার প্রধান কারণ ছিল ধর্ম্ম, সমাজ ও আচার-অনুষ্ঠান-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন রীতি-নীতি, কিন্তু স্থানভেদ ও দেশ-ভেদের ফলেও নানা শ্রেণীভেদ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়রা অধিকাংশ এক শ্রেণীই ছিল, যদিও তাহারা বিভিন্ন কুলে বিভক্ত ছিল। অন্তপক্ষে বৈশ্য ও শূদ্রগণ, অর্থনীতিক কর্ম্ম বিভাগের প্রয়োজন-বশে বংশানুক্রমনীতি অনুসারে অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতে ক্রমশঃ বেশী বেশী কঠোরতার সহিত বংশানুক্রমনীতি অনুসৃত হইয়াছিল, নতুবা এইরূপ স্থায়িভাবে অর্থনীতিক কর্ম্মবিভাগ অন্যান্য দেশের স্থায় গিল্ড্ বা বৃত্তি-সঙ্ঘ গঠন করিয়া সম্পন্ন হইতে পারিত। বস্তুতঃ নগর সকলে আমরা শক্তিশালী ও দক্ষ গিল্ড্ প্রথার * অস্তিত্ব দেখিতে পাই। কিন্তু কালক্রমে এই প্রথা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে এবং অধিকতর ব্যাপক জাতিভেদপ্রথাই সর্ব্বত্র অর্থনীতিক কর্ম্মবিভাগের একমাত্র ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়। নগরে ও গ্রামে জাতি ছিল স্বতন্ত্র, কম্যুন্সাল মূল অনুষ্ঠান, উহা ছিল একই সঙ্গে ধর্ম্ম, সমাজ ও অর্থনীতিবিষয়ক সঙ্ঘ। নিজের ধার্ম্মিক, সামাজিক ও অন্যান্য প্রশ্নের মীমাংসা নিজেই করিত এবং নিজের অন্তর্গত লোক সকলের উপর আধিপত্য করিত, তাহাতে বাহি-রের কেহ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। কেবল ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সকল সমাধানের জন্য ব্রাহ্মণদের উপরে ন্যস্ত বলিয়া এ সকল বিষয়ে তাহাদের ব্যাখ্যা ও বিধানই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হইত। যেমন কুলের, তেমনই প্রত্যেক জাতিরও জাতি ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবনযাত্রা ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে নিজ নিজ বিশিষ্ট রীতি-নীতি ছিল এবং জাতির কম্যুন্সাল বা সমষ্টিগত জীবনের মুখপাত্রস্বরূপ জাতীয় সমিতি বা জাতি-সঙ্ঘ ছিল। ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা তাহার সকল অনুষ্ঠানই কম্যুন্সাল বা সমষ্টিগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ব্যষ্টিগত ভিত্তির উপরে নহে। সেই হেতু রাজ্যের রাষ্ট্রনীতিক ও শাসনসম্বন্ধীয় ব্যাপারেও জাতিকে গণ্য করা হইত। গিল্ড্-গুলিও ব্যবসা ও শিল্পবিষয়ক মূল কম্যুন্সাল অনুষ্ঠানরূপে সেই রকমই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিত, তাহাদের কার্য্য নির্ব্বাহ ও আলোচনার জন্য সভায় সমবেত হইত; আবার তাহাদের মিলিত সভাও ছিল, বোধ হয়, সেই মিলিত সভাগুলিই এককালে নগরের শাসক সমিতিরূপে কার্য্য করিত। শাসনকার্য্য-নির্ব্বাহক এই গিল্ড্গুলি (সেগুলি কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যালিটী ছিল না) কালক্রমে অধিকতর ব্যাপক নাগরিক সমিতিতে পর্য্যবসিত হয়। এই শেষোক্ত সমিতি নগরের সমস্ত গিল্ড্ ও সমস্ত বর্ণের অন্তর্গত

---

* গিল্ড্ (Guild) বলিতে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ বুঝায়। প্রাচীন ভারতে ইহাদিগকে "শ্রেণী" বা "পূগ" বলা হই[illegible]রের গিল্ড্ সমূহকে সাধারণভাবে "নৈগম" বলা হইত। —অনুবাদক।

জাতিসঙ্ঘগুলির মিলিত প্রতিনিধি ছিল। জাতিগুলি জাতি হিসাবে রাজ্যের সাধারণ সমিতিতে (জানপদ সমিতিতে) সাক্ষাৎ-ভাবে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত না বটে, কিন্তু স্থানীয় ব্যাপারের কার্য্য নির্ব্বাহে তাহাদের নিজস্ব অধিকার ছিল।

গ্রামসঙ্ঘ ও নগরসঙ্ঘ, এই দুইটি ছিল সমগ্র রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট স্থায়ী ভিত্তি; কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে যে, এইগুলি কেবল স্থানভাগ মাত্র ছিল না, অথবা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন, শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ বা অন্যান্য সামাজিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের সুবিধাজনক যন্ত্রমাত্র ছিল না, পরন্তু সেগুলি সকল সময়ে সত্য সত্যই মূল কম্যুন্যাল অনুষ্ঠান বা সমষ্টি জীবনের জীবন্ত সঙ্ঘ ছিল। তাহাদের ছিল নিজস্ব স্বতন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত জীবন, তাহা নিজের ভিতরের প্রেরণায়, নিজের শক্তিতে কার্য্য করিত, কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের একটা নিম্নতন অংশ-রূপেই কার্য্য করিত না। গ্রামসঙ্ঘকে ক্ষুদ্র গ্রাম্য রিপাব্লিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং এই বর্ণনায় কিছুমাত্র অত্যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, প্রত্যেক গ্রাম ছিল আপন সীমার মধ্যে স্বাধীন ও স্বনির্ভরশীল, নিজের নির্ব্বাচিত পঞ্চায়েত ও নির্ব্বাচিত বা বংশানুক্রমিক কর্ম্মচারীর দ্বারা শাসিত হইত, নিজের শিক্ষা, শান্তিরক্ষা, বিচার এবং সমস্ত অর্থনৈতিক প্রয়োজন-সাধনের ব্যবস্থা করিত, স্বাধীন স্বায়ত্তশাসনমূলক মৌলিক অনুষ্ঠানরূপে নিজের জীবন নিজেই নিয়ন্ত্রিত করিত। গ্রামগুলির পরস্পরের সহিত কার্য্যও তাহারা নানাভাবে সম্মিলিত হইয়া সম্পাদন করিত; কতকগুলি গ্রাম মিলিয়া এক এক জন নির্ব্বাচিত বা বংশানুক্রমিক নেতার অধীনে সমষ্টিবদ্ধ হইত এবং এইরূপ গ্রামসমষ্টিরও একটা স্বাভাবিক সমষ্টিগত জীবন ছিল, যদিও তাহা অপেক্ষাকৃত শিথিলভাবেই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল।

কিন্তু, ভারতের নগরসঙ্ঘগুলিও কম স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসন-শীল অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া মনে হয় না, সেগুলি নিজেদের সভা ও সমিতির দ্বারা শাসিত হইত, তাহাদের নির্ব্বাচনপ্রথা ছিল, ভোটের ব্যবহার ছিল। নিজেদের স্বাধিকারে তাহারা নিজেদের ব্যাপার পরিচালনা করিত এবং গ্রামগুলির ন্যায়ই রাজ্যের সাধারণ সমিতি জানপদে প্রতিনিধি প্রেরণ করিত। নাগরিক শাসন-প্রণালীর অন্তর্গত ছিল সে সমুদয় কর্ম্ম, যাহা নগরবাসীর আর্থিক বা অন্যান্য কল্যাণের অনুকূল, যথা, শান্তিরক্ষা, বিচার, রাস্তাঘাট আদি নির্ম্মাণ ও মেরামত, ধর্ম্মস্থান প্রভৃতি সংরক্ষণ, রেজিষ্ট্রেশন, মিউনিসিপ্যাল টেক্স নির্দ্ধারণ এবং ব্যবসা, শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাপার সকলের ব্যবস্থা। যদি গ্রামস[illegible]ক্ষুদ্র রিপাবলিক বলিয়া বর্ণনা করা চলে, তাহা হইলে নগর[illegible]কও সেইরূপ বৃহত্তর নাগরিক রিপাব্লিক বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, নৈগম ও পৌর সমিতিগুলি নিজেদের মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারিত, অন্যথা এ ক্ষমতা কেবল রাজা বা রাজশক্তির হস্তেই ছিল।

আর একপ্রকার সমষ্টি-জীবনের উল্লেখ করা আবশ্যক। তাহাদের কোনরূপ রাজনীতিক অস্তিত্ব ছিল না, তথাপি সেগুলি আপন আপনভাবে স্বায়ত্তশাসনমূলক অনুষ্ঠান ছিল; এইগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রবল ঝোঁক হইতেছে নিবিড়ভাবে কম্যুন্যাল বা সমষ্টিগতরূপের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ। একটি উদাহরণ, যৌথ পরিবার; ভারতের সর্ব্বত্রই ইহা প্রচলিত এবং কেবল আধুনিক অবস্থার চাপেই ইহা এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; এই যৌথপরিবারের দুইটি মূলসূত্র হইতেছে, প্রথমতঃ এক বংশে যাহারা জন্মিয়াছে এবং তাহাদের পরিবারবর্গ সকলে মিলিয়া সমষ্টিগতভাবে সম্পত্তি ভোগ করা ও পরিবারের যিনি প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার অধীনে যতদূর সম্ভব অবিভক্ত কম্যুন্যাল জীবন যাপন করা এবং, দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক পুরুষের পক্ষে পিতার সম্পত্তিতে সমান অংশে স্বত্ববান্ হওয়া, সম্পত্তির বিভাগ হইলেই সে এই অংশ দাবী করিতে পারে। এই কম্যুন্যাল ঐক্য অথচ সেই সঙ্গেই ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্থায়ী স্বত্বাধিকার, ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায়, ভারতীয় জীবনধারা ও মনোভাব কেমন সমন্বয়ের পক্ষপাতী। জীবনের মূল সত্য-গুলিকে কেমন ইহা স্বীকার করিয়া চলে এবং সাধারণ ব্যবহারে সেগুলি পরস্পরের বিরোধী প্রতীয়মান হইলেও কেমন করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করে। সমন্বয়ের দিকে এইরূপ প্রবৃত্তিই ভারতীয় সমাজ-রাষ্ট্রের সকল অংশে যাজক, রাজকীয় ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে, ধনিক ও সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্নভাবে সামঞ্জস্যসাধন করিয়া এমন এক সমগ্রতার বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, যাহার উপরে এই সব শ্রেণীর কোন একটিরই বিশিষ্ট ছাপ পড়িবে না, তাহা কতকগুলা ঠিক-ঠাক দিয়া কিম্বা কোন মনগড়া থিওরি বা মতবাদ অনুসরণ করিয়া কেবল একটা বাহ্য মিটমাট বা মিশ্রণমাত্র হইবে না, পরন্তু তাহা হইতে জটিল বহুমুখী সমাজ মন ও প্রকৃতির সহজা[illegible] সংস্কার ও স্বরূপের স্বাভাবিক বাহ্য প্রকাশ।

আর একদিকে, ভারতীয় জীবনের বৈরাগ্য ও চ[illegible] আধ্যাত্মিকতার সীমায় আমরা দেখিতে পাই, ধর্ম্মবিষয়ক সমা[illegible] আবার ইহাও কম্যুন্যালরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। আদি বৈদি[illegible] সমাজ চার্চ বা ধর্ম্মসঙ্ঘ বা যাজক সম্প্রদায়ের কোনও স্থান ছি[illegible] না। কারণ, সে ব্যবস্থায় সমুদয় লোক ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রবিষয়ে একী[illegible]

সমগ্র জীবনে সংবদ্ধ ছিল, ঐহিক ও ধার্ম্মিক, যাজক ও সাধারণ ব্যক্তি, এরূপ কোনও ভেদ ছিল না এবং পরে নানামুখী বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম্ম মোটের উপর, অন্ততঃ ভিত্তিরূপে এই নীতিটিকেই ধরিয়া রাখিয়াছে। অন্যপক্ষে ক্রমশঃ সন্ন্যাসের দিকে বেশী বেশী ঝোঁক হওয়ার ফলে ধর্ম্মজীবনের সহিত ঐহিক জীবনের ভেদ করা হয়, এবং স্বতন্ত্র ধর্ম্মসঙ্ঘ গঠনের প্রবৃত্তি জন্মায়, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে সেই প্রবৃত্তি স্থায়ী ভাব গ্রহণ করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়েই সুসম্বদ্ধ ধর্ম্মসঙ্ঘের পূর্ণ মূর্ত্তি প্রথম বিকসিত হয়। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, বুদ্ধ ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের সুবিদিত নীতিগুলিই সন্ন্যাস-জীবনগঠনে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি যে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে সম্প্রদায় হইবে ধর্ম্ম-সঙ্ঘ, প্রত্যেক মঠ হইবে এক একটি ধর্ম্মমূলক কমিউন্ (Religious commune), তাহা সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীয় জীবন যাপন করিবে। বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মপালনই হইবে তাহার সকল নিয়ম, লক্ষণ ও জীবনযাপন-প্রণালীর ভিত্তি ও আদর্শ। ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, ঠিক এইটিই ছিল সমগ্র হিন্দু সমাজের মূল নীতি ও আদর্শ। তবে এখানে আধ্যাত্মিকতা ও শুদ্ধ ধর্ম্ম-জীবনের ক্ষেত্র বলিয়া সেটিকে উচ্চতর প্রগাঢ়তা দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল। এই সঙ্ঘ ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কম্যুন্যাল অনুষ্ঠানগুলির ন্যায়ই নিজের কার্য্যাদি পরিচালন করিত। ভিক্ষুমণ্ডলী সমিতিতে সমবেত হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার্য্য প্রশ্নের আলোচনা করিত, এবং রিপাবলিকের সভাগৃহ-গুলির ন্যায় এখানেও ভোটের দ্বারা মীমাংসা করা হইত, তবে যাহাতে অতিমাত্রায় ডেমক্রেটিক প্রণালীর আনুষঙ্গিক দোষগুলি ঘটিতে না পারে, তাহারও প্রতিবিধান করিবার ব্যবস্থা ছিল। এই মঠপ্রথা এইরূপে একবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, পরে বৌদ্ধদের নিকট হইতে গোঁড়া হিন্দুগণ সেটি গ্রহণ করে, তবে সেরূপ সবিস্তার ব্যবস্থা নহে। এইরূপে গঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি যেখানেই প্রাচীন ব্রাহ্মণতন্ত্র অপেক্ষা প্রভাবশালী হইতে পারিয়া-ছিল—যেমন শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক সৃষ্ট সম্প্রদায়—সেইখানেই সেগুলি সমাজের সাধারণ অধিবাসিগণের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নেতা হইয়া উঠিয়াছিল, তবে তাহারা কখনই রাজনীতিক শক্তি অধিকার করিবার স্পর্দ্ধা করে নাই, এবং চার্চ্চ ও ষ্টেটের মধ্যে সংগ্রাম ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাসে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতের সমগ্র জীবন, বৃহৎ রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলির সময়েও, তাহার প্রাথমিক নীতি ও মূল কর্ম্মধারা বজায় রাখিয়াছিল এবং তাহার সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থা মূলতঃ ছিল স্ব-নিয়ন্ত্রিত স্বায়ত্তশাসনশীল সঙ্ঘ সকল লইয়া গঠিত বহুমুখী জটিল সংস্থান। এই সংস্থানের উপরে সুসম্বদ্ধ ষ্টেট-আধিপত্যের বিকাশ অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভারতেও প্রয়োজন হইয়াছিল দুই কারণে; অংশত এই কারণে যে, সমাজে স্বভাবতঃ যে শিথিল শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি বিকশিত হয়, তাহা অল্প-পরিসর জীবনের পথে যথেষ্ট হইলেও, সমাজের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কার্য্যকরী বুদ্ধি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরও সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা ও সঙ্গতিবিধান করিতে চাহিয়া-ছিল; কিন্তু আরও বিশেষ কারণ হইয়াছিল এই যে, যুদ্ধ, আক্রমণ, আত্মরক্ষা প্রভৃতি সামরিক ব্যাপারের সুব্যবস্থা এবং অন্যান্য দেশের সহিত কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার এক কেন্দ্রীভূত শক্তির হস্তে ন্যস্ত করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ষ্টেটের বিস্তারের দ্বারা হয় ত প্রথম প্রয়োজনটি সিদ্ধ হইতে পারিত, কারণ, ইহার মধ্যে সে সম্ভাবনা এবং তদুপযোগী নানা অনুষ্ঠানও ছিল, কিন্তু রাজতন্ত্রের প্রণালী অধিকতর সঙ্কুচিত ও সহজ কেন্দ্রানুগতার জন্য অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ও দক্ষতর অনুষ্ঠান বলিয়াই প্রতীত হইয়াছিল। আর বাহিরের কাযটির জন্য গণতন্ত্র ভারতের উপযোগী হয় নাই। কারণ, প্রাচীনকালে ভারতকে একটা দেশ না বলিয়া মহাদেশ বলাই ঠিক হইত এবং এই বিরাট মহাদেশকে রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যে বদ্ধ করা প্রথম হইতেই এক যুগযুগব্যাপী কঠিন সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় গণতন্ত্র তাহার সুদক্ষ সামরিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, উহা আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষা করিতেই অধিকতর শক্তিশালী ছিল। এইজন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও রাজ-তন্ত্রের শক্তিশালী অনুষ্ঠানই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছিল এবং অন্য সমুদয়কে গ্রাস করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গেই ভারতের মনীষা নিজ মূল স্বানুভূতি ও আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাবশতঃ ভারতবাসীর প্রকৃতি অনুযায়ী কম্যুন্যাল স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তি বজায় রাখিয়াছিল। রাজতন্ত্রকে স্বেচ্ছাচারমূলক হইয়া উঠিতে বা তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের গণ্ডী অতিক্রম করিতে দেয় নাই এবং যাহাতে উহা সমাজ-জীবনকে প্রাণহীন যন্ত্রবৎ করিয়া না তোলে, সে বিষয়ে বাধা দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কেবল সুদীর্ঘ অবনতির যুগেই আমরা দেখিতে পাই যে, রাজকীয় প্রভুত্ব এবং জনসাধারণের স্ব-নিয়ন্ত্রণশীল কম্যুন্যাল জীবন এতদুভয়ের মধ্যস্বরূপ যে-সব স্বাধীন অনুষ্ঠান ছিল, সেগুলি হয় ক্রমশঃ লো[illegible]কে অগ্রসর হইয়াছে অথবা তাহাদের পূর্ব্বতন শক্তি [illegible]ধিতা অনেকখানি হারাইয়া ফেলিয়াছে

এবং আমলাতন্ত্রমূলক ব্যক্তিগত শাসনের ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অত্যধিক আধিপত্যের দোষগুলি একে একে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। যত দিন ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রাচীন রীতিনীতিগুলির স্মৃতি বজায় ছিল এবং যে-পরিমাণে সেগুলি সজীব ও কার্য্যকরী ছিল, তত দিন এই সব দোষ এখানে-সেখানে ক্ষণস্থায়িভাবে দেখিতে পাওয়া যাইত, অথবা সেগুলি অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। পরে যখন একদিকে বিদেশীর আক্রমণ ও পরাধীনতা, অন্যদিকে ভারতের প্রাচীন কাল্‌চারের মন্থর অবনতি এবং শেষ পর্য্যন্ত পতন, এই দুইটি একসঙ্গে মিলিত হইল, তখনই প্রাচীন অনুষ্ঠানটি বহু অংশে ভাঙ্গিয়া পড়িল, দেশের সমাজ-রাষ্ট্রজীবন অধঃপতিত ও ছন্নছাড়া হইয়া গেল। পুনরভ্যুত্থান বা নূতন সৃষ্টির আর কোন যথেষ্ট উপায় বজায় রহিল না।

ভারতীয় সভ্যতার উচ্চতম বিকাশ ও গৌরবের দিনে আমরা দেখিতে পাই, এক অপূর্ব্ব রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি। তাহা ছিল উৎকৃষ্টরূপে কার্য্যক্ষম এবং তাহা কম্যুন্যাল স্বায়ত্তশাসনের সহিত দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিতা ও সুশৃঙ্খলার পূর্ণ সমন্বয়সাধন করিয়াছিল। ষ্টেট নিজের শাসন, বিচার, অর্থনীতি ও দেশরক্ষাবিষয়ক কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু ঐ সকল বিভাগে জনসাধারণের এবং তাহাদিগকে লইয়া গঠিত অনুষ্ঠান সকলের অধিকার ও স্বাধীন কার্য্যে বিঘ্ন বা হস্তক্ষেপ করিত না। রাজধানীতে ও দেশের মধ্যে রাজকীয় আদালতগুলি ছিল শ্রেষ্ঠ বিচারালয়, সেগুলি সমস্ত রাজ্যের বিচারকার্য্যের মধ্যে সঙ্গতিবিধান করিত; কিন্তু গ্রামসঙ্ঘ ও নগরসঙ্ঘগুলি নিজেদের আদালতে যে শাসনক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল, তাহার উপর রাজকীয় বিচারালয়গুলি অযথাভাবে হস্তক্ষেপ করিত না। এমন কি, রাজকীয় বিচারালয় গিল্ড, জাতি ও পরিবারের নিজস্ব আদালতগুলির সহিত সহযোগিতা করিত, এগুলির দ্বারা প্রচুর পরিমাণে সালিশ নিষ্পত্তি হইত, এবং রাজকীয় আদালত কেবল বড় বড় অপরাধগুলিরই বিচারের ভার নিজেদের হস্তে রাখিতে চাহিত। যেমন বিচারকার্য্য, তেমনই রাষ্ট্রকার্য্য নির্ব্বাহ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগে গ্রামসঙ্ঘ ও নগরসঙ্ঘগুলির অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইত। নগরে ও দেশে রাজার শাসনকর্ত্তা ও কর্ম্মচারিগণ জনসাধারণ ও তাহাদের সমিতি কর্ত্তৃক নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা, কর্ম্মচারী ও সাম্প্রদায়িক মুখ্যগণের পাশাপাশি থাকিয়াই কার্য্য করিত। ষ্টেট দেশবাসীর ধর্ম্ম-বিষয়ে স্বাধীনতায় অথবা প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন-প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করিত না; ষ্টেটের কায ছিল কেবল সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, এবং যাহাতে জাতীয় জীবনের সমস্ত কার্য্য জোরের সহিত নির্ব্বাহিত হয়। সেই জন্য প্রয়োজনীয় পরিদর্শন করা, সাহায্য করা, সঙ্গতিবিধান করা, সকলরূপ সুবিধা ও সুযোগ করিয়া দেওয়া। ভারতের জাতীয় প্রতিভা যে স্থাপত্য, আর্ট, কাল্‌চার, শিক্ষা, সাহিত্য পূর্ব্বেই সৃষ্টি করিয়াছিল, সে-সবের উন্নতি করিতে উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা বিষয়ে ষ্টেটের যে পরম সুযোগ আছে, ষ্টেট তাহা খুবই বুঝিত এবং সর্ব্বদা উদারতার সহিত সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিত। রাজা ছিলেন এক স্বাধীন জীবন্ত জাতির মহান্ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার সম্মানার্হ ও শক্তিশালী জাতকস্বরূপ এবং রাজার শাসনপদ্ধতি ছিল ঐ শ্রেষ্ঠ কার্য্য-নির্ব্বাহক অনুষ্ঠানস্বরূপ, তাহা স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র বা আমলাতন্ত্র ছিল না বা জাতীয় জীবনকে পেষণ করিবার যন্ত্র ছিল না।

অনুবাদক—
শ্রীঅনিলবরণ রায়।

সাঁঝের আকাশ

সাঁঝের আকাশ পানে চেয়ে বসে' থাকি—
মনে হয় অইখানে বাঁধিব কি নীড়
উড়িয়া যাইবে যবে পরাণের পাখী
এ দেহ-পিঞ্জর হ'তে ?—সায়াহ্ন-রবির

অস্ত-পথে যেই সব বিচিত্র কাহিনী
ফুটে-ওঠে—প্রাণ মন করে আকর্ষণ—
ভাবি কত—শুনি কত বিচিত্র রাগিণী !—
কি যেন তন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন নয়ন।

কভু বা শুধাই প্রশ্ন উদ্‌ভ্রান্তের প্রায়—
"হে ব্যোম, তোমার অই বিরাট বিশাল
রহস্যের জালখানি শুধু ক্ষণকাল
সরাইয়া, পার নাকি দেখাতে আমায়

...হের সামগ্রীগুলি ? যাদের বিরহ,
শল্য সম মোরে বিন্ধে অহরহঃ।"

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় (বি, এ)।

ধর্ম্ম-বিরোধ

বৃটিশ শাসক জাতি ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন না। ইহার কারণ দেখাইতেও তাঁহারা বিশেষ আগ্রহান্বিত। ভারতবাসীরা অজ্ঞ, কুসংস্কারাপন্ন, তাহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার নিন্দনীয়, ইত্যাদি অনেক অভিযোগই আছে। অথচ যে বাল্য-বিবাহের দোহাই দিয়া ভারতবাসীকে কুসংস্কারাপন্ন বলা হয়, সেই বাল্য-বিবাহ তাঁহাদের প্রতীচ্যেও বিশেষরূপে প্রচলিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য 'কুসংস্কার' সম্পর্কেও এমন প্রমাণের অভাব নাই। আর একটা অভিযোগ, ভারতবাসীরা স্বৈরাচার শাসনই বুঝে ভাল, গণতন্ত্র শাসন তাহাদের ধাতুসহ নহে। অথচ ভারতের অতীত ইতিহাস হইতে ইহার বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যায়।

এ সকল ছাড়া আর এক গুরু অভিযোগ এই যে, ভারতের হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িক বিরোধ বর্ত্তমান থাকায় ভারতবাসীরা এখনও এক জাতি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য হয় নাই, এজন্য ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যায় না, দিলেই তাহারা শাসনগত অধিকারের স্বার্থ লইয়া পরস্পর গলা-কাটা-কাটি করিয়া মরিবে। কিন্তু ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, এই বিরোধ বহুকাল হইতে বর্ত্তমান থাকিতেও হিন্দু-মুসলমান গলা-কাটাকাটি করিয়া মরে নাই, বরং সদ্ভাবে প্রতিবেশিরূপে বসবাস করিয়া আসিয়াছে। এখনও রাজন্যগণের রাজ্যে—এমন কি, স্বাধীন মুসলমান-রাজ্য কাবুলে হিন্দু-মুসলমানরা রাজার প্রজা-রূপে সমান অধিকার উপভোগ করিতেছে। মুসলমান শাসন-কালেও এই ভারতে হিন্দু সেনাপতির অধীনে সমরপ্রিয় মুসলমান সৈন্যরা যুদ্ধ করিয়াছে, হিন্দু রাজস্ব-সচিবের ব্যবস্থাধীনে বস-বাস করিয়াছে। কোথাও তাহারা ধর্ম্মবিরোধের জন্য গলা-কাটা-কাটি করিয়া উৎসন্ন গিয়াছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সাধারণ্যে ইহাই সাধারণ নিয়ম—ইহার ব্যতিক্রম যে দুই এক স্থানে হয় নাই, এমন কথা বলিতেছি না। ধর্ম্মান্ধ বাদশাহ ঔরঙ্গ-জেবেরও হিন্দু সেনাপতি ছিল, তাঁহারাও মুসলমান রাজার হইয়া দিগ্বিজয় করিয়াছেন।

যাউক সে কথা। এখন দেখা যাউক, পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও ধর্ম্ম-বিরোধের ফলে কোন জাতি পরাধীনতার পাষাণ-চাপে পিষ্ট হইতেছে কি না। মেক্সিকো মার্কিণ মুল্লুকের একটি স্বাধীন গণতন্ত্র-শাসিত দেশ। গত ৫ই নভেম্বর ডাকযোগে তথা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সেখানে দুইটি খৃষ্টান সম্প্র-দায়ের মধ্যে ধর্ম্মঘটিত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার ফলে এক পক্ষ অপর পক্ষের গীর্জ্জা অগ্নিদগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করে। যখন গীর্জ্জার মধ্য হইতে তাহাদেরই স্বদেশবাসী খৃষ্টানরা প্রাণ-ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকে, তখন অপর পক্ষ তাহা-দিগকে গুলী করিয়া হত্যা করে! আশ্চর্য্য এই, এই মেক্সিকো-বাসীরা স্বাধীন, তাহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন অপেক্ষাও বড় রকমের স্বাধীনতা উপভোগ করে।

এ সম্বন্ধে চার্চ্চহিল, লয়েড জর্জ্জ অথবা সিডেনহ্যাম ওডয়ার কোম্পানীর অভিমত কি জানিতে ইচ্ছা করে। তাঁহারা কি মেক্সিকোবাসী খৃষ্টান প্রতীচ্য জাতিকেও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অনুপযুক্ত মনে করেন? যদি করেন, তবে তাহাদিগের উপরে সেই ফতোয়া দিতে অগ্রসর হইতেছেন না কেন? সে বড় শক্ত কথা! সে পথে হুতুমথুমোর ভয় আছে! স্বাধীন শক্তিমান মার্কিণের মনরো-নীতির উপর দাঁত বসাইবার মত শক্ত দাঁত যে বৃটিশসিংহেরও নাই!

বৃটিশ ও ফরাসী শাসন

আরব উপদ্বীপের কয়টি প্রদেশের গত জার্ম্মাণ যুদ্ধ হইতে ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মেসোপটেমিয়া বা ইরাক, প্যালেষ্টাইন বা যুডা এবং সিরিয়া, এই তিনটি প্রদেশই পূর্ব্বে তুর্কীর শাসনা-ধীনে ছিল। কিন্তু জার্ম্মাণ যুদ্ধজয়ের পর বিজয়ী বৃটিশ ও ফরাসী জাতি তাঁহাদেরই গঠিত জাতিসঙ্ঘের দরবারের প্রদত্ত অনুজ্ঞাবলে এই তিনটি প্রদেশ একরূপ স্বাধিকারে আনয়ন করিয়াছেন।

বহুকাল পূর্ব্বে [illegible]কের সুখ-সমৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বিশ্ববিশ্রুত ছিল [illegible]দাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদের মত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশা[illegible]তি তৎকালে আর কোন দেশে ছিল

কি না সন্দেহ। কিন্তু এ রাজ্যেরও পতন হয়। তুর্কীর অধীনে রাজ্যের অবনতিই ঘটিতেছিল বলিয়া প্রতীচ্য জাতির প্রণীত ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইরাকের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ারও পতন হইতে থাকে। কিন্তু জার্ম্মাণ যুদ্ধের ফলে তাহারা বিজেতা প্রতীচ্য জাতির নিকট ভবিষ্যৎ মুক্তির প্রতিশ্রুতি পাইয়া আবার গর্ব্বোন্নত শির তুলিয়া জগতের লোকের সমক্ষে হাসিয়াছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে যে, প্রদেশ তিনটি বিভিন্ন হইলেও আরবরা জাতি হিসাবে একই ধাতু-প্রকৃতিতে গঠিত, এক অপরের সুখে দুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনাপূর্ণ।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, একই অনুজ্ঞাবলে তিনটি আরব দেশ বিজাতি বিধর্ম্মী দ্বারা শাসিত হইলেও তিনটি আরব দেশের লোকের শাসনের প্রতি মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি? ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার আরবরা যখন ফরাসীর বিপক্ষে বিদ্রোহ-ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিল, তখন বৃটিশ কর্ত্তৃত্বাধীন ইরাক ও প্যালেষ্টাইনের আরবরা শান্ত ছিল। আবার যখন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ইরাক ও প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধ বাধে, তখন সিরিয়ার আরবরা শান্তিতে বাস করিয়াছিল। অথচ তিনটি দেশেরই অধিবাসী আরব,—এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক শিক্ষাদীক্ষা, এক আচার-ব্যবহার। ইহা প্রথমে বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে।

কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এই তিন আরব দেশের দুই দেশ বৃটিশ শাসনাধীনে এবং এক দেশ ফরাসী শাসনাধীনে আছে বলিয়াই এরূপ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। কারণ, বৃটিশ শাসন-প্রণালীর সহিত ফরাসী শাসন-প্রণালীর প্রভেদ আছে বলিয়া এমন প্রভেদের কারণ উপস্থিত হয়।

বৃটিশ শাসকরা বহুদিন যাবৎ প্রাচ্যের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেশ শাসন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের স্বদেশ অপেক্ষা বহু গুণে বড় প্রাচ্য দেশ শাসন করিয়া তাঁহারা প্রাচ্য জাতির ভাষা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এই হেতু তাঁহারা অভিজ্ঞ শাসক ও ব্যবহারাজীব প্রভৃতিকে ইরাক ও প্যালেষ্টাইন শাসন করিতে পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। কাযেই ভবিষ্যতে 'অনুজ্ঞা' (Mandate) অনুসারে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে,—এই প্রতিশ্রুতি দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে জানেন। সুতরাং প্যালেষ্টাইন ও ইরাকের আরবরা সিরিয়ার আ[illegible] সহিত জাতীয়তার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মিলিত হইবা[illegible]নীয়তা অনুভব করে না। ফরাসীরা এ বিষয়ে এক[illegible]জ্ঞ। তাহাদের অ্যালজিরিয়া বা মরক্কো রাজ্যে এ যাবৎ তাহারা দেশীয়দের ভাষার প্রতি সম্যক্ সমাদর প্রদর্শন করে নাই, ফরাসী ভাষাকেই উপনিবেশে প্রচলিত রাখিয়াছে। প্রথমে ইরাকের আরবদের মত সিরিয়ার আরবরাও ফরাসীকে সুনজরে দেখে নাই। কিন্তু ইরাকে ইংরাজ যেমন প্রাচ্যশাসনে অভ্যস্ত শাসক রাখিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের আশা দিয়া ইরাকবাসীকে বন্ধুরূপে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে, ফরাসী মনের ইচ্ছা সত্ত্বেও এ সকল গুণের অভাবে এযাবৎ সিরিয়াবাসীকে বন্ধুরূপে পরিণত করিতে পারে নাই। তাহারা সিরিয়াবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করে, তাহাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করে। কিন্তু ভাষার আদান-প্রদানের অভাবে দেশবাসীদের সহিত তাহাদের ভাবের আদান-প্রদানের সম্ভাবনা হয় না, আর সেই হেতু উভয় জাতি পরস্পরকে বুঝিতে পারে না। এই হেতু ফরাসী শাসন সিরিয়াবাসী আরবের এখনও মনঃপূত হয় নাই। অর্থাৎ পরের দেশ শাসনে শাসকের সদিচ্ছাই সব নহে, মিশিবার কৌশলই অনেক কায করে, তুলনায় সমালোচনা করিয়া ইহাই বুঝা যায়। এই জন্যই মনে হয়, ভারতে বর্ত্তমানে শাসকের কৌশলের অভাব শান্তির প্রধান অন্তরায় হইয়াছে।

রাজনীতিক দৈন্য

যে বৃটিশ জাতির মধ্যে গ্লাডষ্টোন, জনব্রাইট, ফক্স, সেরিড্যান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে বৃটিশ জাতি বার্কের মত লোককে জগতে দান করিয়াছে, পিট বা ডিসরেলি অথবা বিকনসফিল্ডের মত রাজনীতিক যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন,—আজ সেই বৃটিশ জাতির রাজনীতি-ক্ষেত্রে কি অসম্ভব দৈন্যই না দেখা দিয়াছে! কোথায় সেক্সপিয়ার মিলটন, আর কোথায় কিপলিং কবি! বস্তুতঃ কিপলিংএর ইংলণ্ডের রাজনীতির অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করা যায় না। যদি এরূপ না হইত, তাহা হইলে কি আজ বৃটিশ রাজনীতিকের মনে সংশয় জাগিত,—আমরা কি ভারত হারাইব?

এই যে ঘটা করিয়া সাম্রাজ্য-বৈঠক বসিল, অথবা গোল-টেবল বৈঠক বসান হইয়াছে, এই দুইটি ব্যাপারেও বৃটিশ জাতির উৎসাহ বা অনুরাগের কোন লক্ষণ ত দেখা যাইতেছে না। বেশী দিনের কথা নহে,—নেলসন ওয়েলিংটন বা পিট পামার্ষ্টোনের যুগের কথা নহে—এই সে দিন জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে বৃটিশ জাতির মধ্যে যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, তাহার শতাংশের একাংশও কি বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে? আড়ম্বর, বক্তৃতা,

সাজসজ্জা,—আছে সবই, কিন্তু সবই যেন প্রাণহীন। ইহার কারণ কি? এক কথায় ইহার উত্তর,—রাজনীতিক দৈন্য। পূর্ব্বের বিরাট পুরুষদের স্থলে বামনরা বড় বড় আসনে বসিয়াছে, উদার দূরদর্শনের অভাবে বড় রকমের কিছু ভাবিবার বা করিবার ক্ষমতার নিতান্ত অভাব হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে ছোট-খাটো খুঁটি নাটি লইয়াই দলাদলি ও কাটাকাটি চলিতেছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশেও অধুনা যেমন তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া কর্ম্মীদের মধ্যে সঙ্কীর্ণ দলাদলি চলিতেছে, বিলাতেও তদ্রূপ হইতেছে। ইহা কি মস্তিষ্কের অভাবের ফল নহে?

বৃটিশ জাতির উৎসাহ উদ্দীপিত হইবে কিরূপে? দলের পর দল শাসনপাটে বসিতেছেন, কিন্তু কেহই ত বেকার সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছেন না। বেকার সমস্যা এমন প্রবল-ভাবে ইংলণ্ডে আর কখনও দেখা দিয়াছে কি না সন্দেহ। ধরিতে গেলে, ভারতের সমস্যা ব্যতীত এত বড় সমস্যা ইংলণ্ডের এখন নাই। অথচ একটু রাজনীতিক দূরদর্শিতা দেখাইতে পারিলে উভয় সমস্যারই সহজে সুমীমাংসা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। আজ যদি গ্লাডষ্টোন বার্ক বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে বুঝিতেন, ভারতকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই বৃটেনের বেকার সমস্যার অবসান হইত। মহামতি বার্ক বলিয়াছিলেন,—"হে দেশবাসী! আমেরিকাকে সন্তুষ্ট কর।" আজ যদি সেই ভাবে হৃদয়ের অন্তস্তল আলোড়িত করিয়া কেহ বলিবার শক্তি ধরিত, "হে দেশবাসী! ভারতকে সন্তুষ্ট কর," তাহা হইলে দারুণ বেকার সমস্যা করাল বদন ব্যাদান করিয়া বৃটেনকে গ্রাস করিতে যাইত না।

বিলাতের বেকার-সংখ্যা ২২ লক্ষের উপরে দাঁড়াইয়াছে। পার্লামেণ্টে এখন তাই এমন একটি বক্তৃতা বা তর্ক হয় না, যাহাতে বেকারের কথার আলোচনা না হয়। কিন্তু কেহই ত এ যাবৎ এই দারুণ সমস্যা-সমাধানের উপযোগী উপায় নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন নাই। বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহেও বেকার-সমস্যা প্রবল, ভারতেও তাহাই, অথচ সাম্রাজ্যের বিধাতাপুরুষদের মধ্যে এমন কোনও মস্তিষ্কবান লোক নাই—যিনি কোন উপায়-বিধান করিতে পারেন। এ রাজনীতিক দৈন্যের ক্ষমা আছে কি?

বড় বড় গালভরা আশার কথা লইয়া শ্রমিক সরকার শাসন-পাটে বসিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ম্যাকডোনাল্ড মুখের কথা ছাড়া কাযে কিছুই দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার সদাই ভয়, যায় বুঝি সিংহাসন। তাই তিনি কেবলই উদারনীতিকদিগকে হাতে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন,—পাছে দলে হাল্কা হইলে রক্ষণশীলরা সিংহাসন কাড়িয়া লয়। এ ভাবে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থ আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে অন্য দিকে বড় বড় ব্যাপারে মস্তিষ্ক চালনা করিবার অবসরই জুটিবে কিরূপে?

কিন্তু শ্রমিক দলের পতন হইলেই বা তাঁহাদের স্থানে যাঁহারা আসিবেন সাম্রাজ্য-শাসনদণ্ড গ্রহণ করিতে, তাঁহাদের মধ্যেই বা লোক কোথায়? লয়েড জর্জ্জ উদারনীতিক দলের কর্ত্তা। যখন ইচ্ছা তিনি 'বাণিজ্য-বিরোধ বিল' অথবা 'বেকার ইনসিওরেন্স বিল' লইয়া শ্রমিক দলের বিপক্ষে ভোট দিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত ও সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন, এ কথা সত্য। কিন্তু ইহাতে তাঁহার লাভ কি? তিনি বিলক্ষণ জানেন, শ্রমিক দল সিংহাসনচ্যুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদারনীতিক দলও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। স্যামসন শত্রুকে মারিবার উদ্দেশ্যে বাড়ীটা জড়াইয়া ধরিয়া ভাঙ্গিয়া আপনার স্কন্ধে ফেলিয়াছিল, শত্রুকে মারিয়াছিল বটে, কিন্তু আপনিও মরিয়াছিল। লয়েড জর্জ্জ তত কাঁচা ছেলে নহেন।

রক্ষণশীল দলের মধ্যেই বা মানুষ কৈ? তাঁহাদের মধ্যেও দলাদলি কম নহে। শ্রমিকদলের মধ্যে যেমন ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির ফেনার ব্রকওয়ে, ম্যাক্সটন, ওয়ালটার ওয়ালস, সার অস-ওয়াল্ড মোসলে প্রমুখ মাথাওয়ালা সদস্য ম্যাকডোনাল্ডের বুকে কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিতেছে, তেমনই রক্ষণশীলদলের উইন্সটন চার্চ্চিল, চেম্বার্লেন, এমারি প্রমুখ রক্ষণশীল সদস্যরা মিঃ বল-ডুইনকে কম কষ্ট ও মনঃপীড়া দিতেছেন না। ইঁহাদের তিন জনই দলপতির পদে বসিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া থাকেন। কাযেই প্রায়ই খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া পরস্পরের মধ্যে কাটাকাটি মারামারি চলিতেছে। সে দিন ক্যাক্সটন হলে রক্ষণশীল দলের উপস্থিত ৫ শত ১৮ জন ভোটারের মধ্যে ১ শত ১৬ জন ভোটার মিঃ বলডুইনকে দলপতির পদ হইতে বিচ্যুত করিবার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। দলের এক-পঞ্চমাংশ লোক যে দলপতিকে চাহে না, সে দলপতির সম্মানের পরিমাণ কতটুকু? বাকী যে ৪ শত ৬২ জন তাঁহাকে সমর্থন করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের দলের আর কাহাকেও বলডুইনের অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ রাজনীতিক দেখিতে পান নাই বলিয়াই এই-রূপ করিয়াছেন; কারণ, বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে বস্তুতঃ 'নিরস্ত-পাদপে দেশে'র অবস্থা উপস্থিত, তাই বলডুইন-এরণ্ডই দ্রুম বলিয়া গৃহীত—তাঁহার মত অনেক এরণ্ড আছে, কিন্তু যথার্থ দ্রুম কেহ নাই! ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস তাঁহার ভ্রাতা জেমসকে (যিনি পরে দ্বি[illegible]মসরূপে রাজা হইয়াছিলেন) বলিয়া-ছিলেন, "প্রজারা [illegible] মাথা কাটিয়া তোমায় রাজা করিবে না, কারণ, আমরা এ[illegible]পিঠ দুইই সমান।" বলডুইনও চেম্বার্লেন

চার্চ্চহিলকে ঐ কথা বলিতে পারেন। বলডুইনকে ব্যক্তিগত-ভাবে সকলে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তাঁহার রাজনীতির অভিজ্ঞতা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তাহা হইতে উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিকও ত বর্ত্তমান ইংলণ্ডে নাই। সবাই সমান।

শ্রমিক সরকারের হোমরা-চোমরারাও এত দিন শাসনপাটে বসিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের নিজের দেশে বেকার-সমস্যা সমান প্রবল হইয়া রহিয়াছে। রেলে এবং কয়লার খনিতে সর্ব্বব্যাপী ধর্ম্মঘট হইবারও খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে। মিশরে ও ভারতে অশান্তি-অসন্তোষানল জ্বলিতেছে। ফরাসী মার্কিণের সহিত যে খুব সদ্ভাব রহিয়াছে, তাহাও বলা যায় না, রাসিয়ার সহিত ত কথাই নাই। সাম্রাজ্য-বৈঠক বসাইয়াও তাঁহারা জ্ঞাতিকুটুম্বের সহিত সলাপরামর্শ করিয়া সাম্রাজ্যের স্বার্থের পক্ষে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের শাসনের কৃতিত্বের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু শ্রমিক সরকারের পরিবর্ত্তে রক্ষণশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা হইলেই বা ফল কি? তাঁহাদের মধ্যেও ত কৃতিত্ব দেখাইবার উপযুক্ত লোক নাই। উদারনীতিক দলের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া হউক, কেন না, তাঁহারা মুষ্টিমেয়, আর কোন কালে যে তাঁহারা শাসনপাটে বসিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।

আসল কথা, মানুষ নাই। এমন রাজনীতিক দৈন্য ইংলণ্ডের কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ।

মিশর

অশান্তির আবহাওয়া যে কেবল আমাদের এই ভারতেই দেখা দিয়াছে, তাহা নহে, মিশরের অবস্থাও প্রায় সমতুল। খুব ঘটা করিয়া ঢাক পিটিয়া রটান হইয়াছিল যে, মিশর স্বাধীনতা পাইয়াছে, কিন্তু তাহার পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। গত ২২শে অক্টোবর মিশরের প্রধান মন্ত্রী সিদ্‌কী পাশা শাসনের কতকগুলি কঠোর পরিবর্ত্তন-সম্বলিত ঘোষণায় রাজা ফাউদের স্বাক্ষর করিয়া লন। এই নূতন শাসনব্যবস্থা ও নির্ব্বাচনের আইন-কানুন যে দিন বিঘোষিত হয়, তাহার পরদিনই চেম্বার অফ ডেপুটী ও সেনেট ভাঙ্গিয়া দিবার কথা ধার্য্য হয়। নূতন নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা অনুসারে ডেপুটীদের সংখ্যা মাত্র ১৫০ ([illegible]শত জনে) হ্রাস করা হয়। সেনেটের নির্ব্বাচিত সদ[illegible]খ্যাও কমাইয়া দেওয়া হয়।

বলা বাহুল্য, ইহাতে মিশরের জাতীয় দল (ওয়াফদ) কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। কেবল জাতীয় দল কেন, মডারেট দলের নেতা মহম্মদ পাশা মামুদও ইহাতে ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত রাজা ফাউদের মন্ত্রিমণ্ডলকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বিপরীতবুদ্ধিই অধুনা প্রায় সর্ব্বত্রই আপোষের পক্ষে কালরূপে দেখা দিতেছে। মিশরেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? জাতীয় দল ওয়াফদের নেতা মুস্তাফা নাহাস পাশা ইহার পরেই তাঁহার বিখ্যাত ঘোষণা প্রচার করেন। ঘোষণার মূল কথা,—জাতি কখনও মন্ত্রিসভাকে তাহাদের নির্ব্বাচনের অধিকারের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না; দেশের জাতীয় শাসনতন্ত্র জাতির অনুমতি ব্যতীত পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না। 'লা প্যাট্রি' নামক একখানিমাত্র সংবাদপত্রে নাহাসের ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল, পুলিস অন্যত্র উহা প্রকাশিত বা প্রচারিত হইতে দেয় নাই।

ইহা যদি মিশরের আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিচয় হয়, তবে পর-নিয়ন্ত্রণ কাহাকে বলে? জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাতির 'মঙ্গল'-সাধন করা যেন অধুনা জগতের সাম্রাজ্যবাদী দাতা-কর্ণদের স্বভাবেই পরিণত হইয়াছে।

ষড়্‌যন্ত্র-রহস্য

বর্ত্তমান সোভিয়েট রাসিয়া জগতে বিপ্লববাদী ষড়যন্ত্রীদের প্রধান আকরস্থান এবং রাসিয়া জগতের তাবৎ সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধনের জন্য জগতের সর্ব্বত্র প্রচারকার্য্য দ্বারা বিষ বিসর্পিত করিতেছে, এই ভাবের অভিযোগ প্রায়ই শুনা যায়। এই অভিযোগ এক জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিণ, ইটালীয়, জাপানী,—সকল জাতিই এই অভিযোগ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যদি অভিযোগের শতাংশের একাংশও সত্য হয়, তাহা হইলে মনে হয়, রাসিয়া জগতের স্থিতি ও শান্তির ঘোর পরিপন্থী, নরাকারে পিশাচ রাক্ষস ব্যতীত আর কিছু নহে। রাসিয়ার বলশেভিক কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত বলিয়া কত দেশের কত লোক দণ্ডিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই অপরাধে প্রাণদণ্ডও হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু রাসিয়া এইবার উল্টা গাহিয়াছে। রাসিয়ার মস্কো সহরে কয়েক জন রাসিয়ানের বিরুদ্ধে সোভিয়েট সরকারের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে বিচার চলিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক র‍্যামজীনই প্রধান। প্রকাশ পাইয়াছে যে, উক্ত অধ্যাপক অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার স্বীকারোক্তি

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। বুঝিয়া দেখুন, পৃথিবীর লোক এই রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে কিরূপ উৎসুক! ইহাতে যে কৌতূহলোদ্দীপক অনেক গুপ্ত কথা আছে, তাহা বুঝিতেও বিলম্ব হয় না।

আরও প্রকাশ পাইয়াছে যে, ষড়যন্ত্রীরা বিদেশী শক্তির সাহায্যে সোভিয়েট সরকারের ধ্বংসসাধনের উদ্দেশ্যে চক্রান্ত করিতেছে। বিদেশীদের মধ্যে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নাম ষড়যন্ত্রের সহিত গ্রথিত রহিয়াছে। যথা,—মুসিয়ে পঁয়কারে, মুসিয়ে ব্রাঁয়া, মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চহিল, কর্ণেল লরেন্স (যিনি আরবী সাজিয়া আরব দেশে অনেক খেলা খেলিয়াছিলেন, আমানুল্লার আমলে আফগানিস্থানেও ছদ্মবেশে কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়); ইহা ছাড়া আরও নাম হইয়াছে। যাঁহাদের নাম হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অপরাধ অস্বীকার করিতেছেন, কেহ কেহ নীরব আছেন। এ ব্যাপারের কোথায় যবনিকাপাত হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক।

—

ম্যারেজ এণ্ড দি ষ্টেট

এই নামের একখানি গ্রন্থ সম্প্রতি মার্কিণ দেশে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার লেখক একটি পুরুষ ও একটি নারী। উভয়ে যুক্তি করিয়া গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, মার্কিণ দেশে বিবাহ-সম্পর্কিত আইন অনেক নর-নারী মানিয়া চলেন না। যাঁহারা বিবাহের লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র গ্রহণ করেন ও দান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অসাধুতা এতই প্রবল যে, তাহার ফলে অনেক গুপ্ত বিবাহ এবং অযোগ্য নর-নারীর বিবাহ হইয়া থাকে। ফলে যে উদ্দেশ্যে বিবাহ-সম্পর্কিত আইন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইতেছে।

এই ব্যাপারের সূক্ষ্মতত্ত্ব কি, তাহা আমাদের দেশের তথাকথিত আধুনিক 'মনস্তত্ত্ববিদরা' বলিতে পারেন কি? মূল কথা, সমাজরক্ষাকল্পে বহু দিন চিন্তার ফলে মানুষ যে সকল বিধিনিষেধের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা এক দিনের ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া আসুরিক উপায়ে স্বেচ্ছাচারের স্রোত বহাইলেই এই ফল হইবে। মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ধৈর্য্য ও সংযমের শৃঙ্খলা থাকা একান্ত প্রয়োজন, কেবল দৌড়-ঝাঁপ আর নিত্য নূতন এদেশেরই ধাতুসহ নহে, কোনও দেশেরই নহে। প্রতীচ্য পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া একবারে নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টায় 'নিত্য নূতনের' আস্বাদ চাহে। কিন্তু তাহার ফল ত বড় শুভ হইতেছে না। তাহারই লোক যে এখন সেই ক্ষণিক ভোগের মোহের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে শিখিতেছে, ইহা সুলক্ষণ। আত্মসুখ-তৃপ্তির—ভোগের লালসাতৃপ্তির উদ্দেশ্যে বিবাহের নিয়মকে অস্বাভাবিক করিতেছে বলিয়াই প্রতীচ্যের হিতে বিপরীত হইতেছে।

বিশ্বনাথ

বিশ্বনাথেরে হেরেছি আজিকে নিঃস্বজনের সাথে
তাঁর চরণের ধূলা লভেছি সবার রজে :
তিনি সর্ব্বহারার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ান দিবস-রাতে—
হের মন্দির তাঁর শূন্য পুরী ও ব্রজে।

অঙ্গে তাঁহার নাই আজি আর স্বর্ণ-ভূষণরাশি,
ছিন্নবেশেতে ধূলায় শয়ন পাতা!
কোথায় নয়ন জুড়ানো সে রূপ, ভুবনমোহন হাসি?
উপবাসী রন আপনি অন্নদাতা।

সকাল সন্ধ্যা শঙ্খ ঝাঁঝর বাজায়ে অর্ঘ্য দিয়ে
মোরা উপহাস করি আপন ইষ্টদেবে!—
এমন কেহ কি নাই যে তাঁহার মন্ত্রের সুধা পিয়ে
আজি আর্ত্তসেবার পুণ্য ব্রতটি নেবে?

মন্দিরে তাঁর জ্বলিছে অযুত হৈম-প্রদীপ ভাতি—
বিবিধ পুষ্প-গন্ধে অবনী ভরা,
জগন্নাথের সাজে কি কখনো এমন সুখের রাতি,
নয়ন-সলিলে ভাসিছে যখন ধরা?

গৃহকোণ হতে আরতি উঠায়ে সেবা কর গ্রামে গ্রামে—
দীনেরে তুষিয়া দেবতারে দাও মান।
যে আছে ব্যথায় কাতর, তাহারে তুলে নাও তাঁরি নামে—
প্রেমের নদীতে খেলুক আবার বান।

লক্ষ লক্ষ বিশ্বের জীব অন্ন-বিহীন মরে!—
কে আছ তাপস স্বদেশ-প্রেমিক তুমি
দাও গো প্রেমগ্রাসে আহার তাদের, শীর্ণ শীতল করে—
ও প্রভুরে—বাঁচাও ভারতভূমি!

শ্রীসিতিকণ্ঠ দাঁ।

অষ্টাবিংশ প্রবাহ

বেসীর পুনরাবির্ভাব

হপ কিন্‌স উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পা দুইখানি কাঁপিতে লাগিল। সে সোফার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, "হাঁ মহাশয়, আমি তখন হোয়াইট হল কোর্টের বিপরীত দিকে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই সময় ছেয়ে রঙ্গের মোটর-গাড়ীখানা ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার ব্রীজের দিক হইতে সবেগে আসিয়া আমার পাশেই হঠাৎ থামিয়া গেল। আমি প্রাচীরের আড়ালে ছিলাম বলিয়া শকটচালক আমাকে দেখিতে পায় নাই। লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান। আমি সেপ্টেম্বর মাসেও তাহাকে দেখিয়াছিলাম; এজন্য তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম। সে গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ীর দরজা খুলিল; গাড়ীর ভিতর আর এক জন লোক বসিয়াছিল, তাহার পাশে একটি স্ত্রীলোককে পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম। স্ত্রীলোকটির পোষাক কালো।

"সেই পুরুষটি গাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিবে, সেই সময় সে হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইল, সে তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে মুখ ফিরাইল; এই জন্য আমি তাহার মুখ দেখিবার সুযোগ পাইলাম না। সে সেই মোটর-গাড়ীর সোফেয়ারকে কি বলিয়া পুনর্ব্বার গাড়ীর ভিতর বসিয়া পড়িল। সোফেয়ারটা তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠিয়া সবেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল। যেন সেখান হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচে! দুই মিনিটের মধ্যে এই সকল কাণ্ড ঘটিল। আমার বিশ্বাস, তাহারা অন্য কোন স্থানে গিয়া সেই স্ত্রী-লোকটির দেহ গাড়ী হইতে নামাইয়া ফেলিয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "এই সকল কথা পুলিসে জানাইয়াছিলে?"

হপি বলিল, "না, পুলিসের নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করি নাই; না করিবার কারণ আপনি জানেন ত, তবে আর ও কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

আমি বলিলাম, "সেই সোফেয়ারটার চেহারা কি রকম?"

হপি বলিল, "লোকটা খুব লম্বা, [illegible]টাও বটে; অন্ধকারে তাহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও আমার বিশ্বাস, লোকটা কালা আদমী। না, সে য়ুরোপীয় নহে।"

আমি বলিলাম, "সেই মোটর-গাড়ীর নম্বর কত, তোমার স্মরণ আছে কি?"

হপি বলিল, "যাহারা কুমতলবে গাড়ী চালায়, তাহারা পথের লোককে গাড়ীর নম্বর দেখিতে দিবে—ইহা কি আপনি আশা করিতে পারেন? নম্বর ছিল বটে, কিন্তু এক ধ্যাব্‌ড়া কাদা তাহার উপর এ ভাবে লেপিয়া রাখিয়াছিল যে, নম্বরটি পড়িবার উপায় ছিল না। আমার বিশ্বাস, পুলিস সেই স্ত্রীলোকটির মৃতদেহ কোন স্থানে দেখিতে পাইয়াছে; তাহা দেখিয়া করোনারের জুরীরা কি রায় দিয়াছিলেন, তাহা জানিতে আগ্রহ হয়! আপনি সেই স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে কোন কথা খবরের কাগজে পড়িয়াছিলেন কি?"

আমি বলিলাম, "খবরের কাগজে ইহার কোন আলোচনা হইয়াছিল কি না, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই, এবং পুলিসও তাহার মৃতদেহ দেখিতে পায় নাই; কারণ, সেই যুবতীকে পাওয়া যাইতেছে না—এইরূপ জনরবই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। পুলিস তাহার মৃত দেহ দেখিতে পাইলে সেই সংবাদ গোপন থাকিত না।"

হপি বলিল, "এই শয়তানগুলা পুলিসের তোয়াক্কা রাখে না, মিঃ কোলকাস্ক! পুলিসও তাহাদের চাতুরী ভেদ করিতে পারে না। রাত্রিকালে গাড়ী হইতে মৃতদেহ কোন নির্জ্জন পথে ফেলিয়া যাওয়া কঠিন নহে; এবং লণ্ডনে সেরূপ পথেরও অভাব নাই—ইহা সেই শয়তানরা জানিত না, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? তথাপি তাহারা বাঁধের উপর কেন আসিয়াছিল, তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য।"

আমি বলিলাম, "রাত্রিশেষে কোন মোটর-গাড়ী লণ্ডনের বাঁধের দিকে যাইলে, তাহা দেখিয়া হঠাৎ কাহারও মনে সন্দেহ না হইবারই কথা; কিন্তু ঐ সময় কোন গাড়ীকে কোন নির্জ্জন পথে চলিতে দেখিলে ঘাঁটির পাহারাওয়ালার সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক; সে হঠাৎ গাড়ী থামাইতেও পারিত। সকল দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কায করাই কুপের স্বভাব। যাহা

হুউক, সেই গাড়ীর সোফেয়ারটা যে কালা আদমী, এ বিষয়ে কি তুমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলে ?"

হপি মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "ও বিষয়ে আমার মনে এক বিন্দুও সন্দেহ নাই। আমি যে সেপ্টেম্বর মাসে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, বেটা লম্বা-চওড়া জোয়ান, পুরু ঠোঁট, চক্ষু দুটি যেন আগুনের ভাঁটা ; সেই চেহারা দেখিলে শয়তানের ছবিই মনে পড়ে, অর্থাৎ যেন ডানা-কাটা শয়তান, পাথার অভাবে মোটর-গাড়ীর সোফেয়ারি করিতেছে! এবার আমি তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও দেহখানি ত অবিকল সেই রকম !"

আমি বলিলাম, "গাড়ীর ভিতর কালো পোষাকে যে স্ত্রীলোকটিকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলে, তাহার দেহে প্রাণ ছিল না—তোমার এরূপ বিশ্বাসের কারণ কি ?"

হপি রাগ করিয়া বলিল, "আপনিও আদালতের হাড়-গিলেগুলার মত জেরা আরম্ভ করিলে আমি নাচার !"

আমি বলিলাম,—"আদালতের হাড়গিলে ?"

হপি বলিল, "হাঁ মহাশয়, আমি ঐ উকীল-ব্যারিষ্টার-গুলার কথা বলিতেছি ; উহারা কেবল মক্কেলের বুকের রক্ত শুষিয়া খায় না, তাহাদের হাড় পর্য্যন্ত গিলিয়া সাবাড় করে।—স্ত্রীলোকটা গাড়ীর ভিতর যে ভাবে পড়িয়া-ছিল, কোন জ্যান্ত মেয়েমানুষ ঐ ভাবে পড়িয়া থাকে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না! নর্দাম্বারল্যাণ্ড এভিনিউ হইতে রাস্তার একটা আলো গাড়ীর ভিতর পড়িয়াছিল, সেই আলোকে স্ত্রীলোকটাকে গাড়ীর মধ্যে ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, তাহার প্রাণপক্ষী খাঁচা হইতে পলায়ন করিয়াছিল! সোফেয়ারটা আমাকে দেখিয়া যে ভাবে গাড়ী লইয়া চম্পট দিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলাম, আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়।"

তাহার কথা সত্য বলিয়াই আমার মনে হইল। কুপই সেই যুবতীকে হত্যা করিয়াছিল, কিন্তু হত্যা করিবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সে কি কুপের গুপ্তরহস্য জানিতে পারিয়া তাহা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়াছিল ? যে কক্ষে সে নিহত হইয়াছিল, সেই কক্ষে ত মৃত্যু-যাতনা চিত্রিত করিবার সরঞ্জাম ছিল না।

হপিকে সেই যুবতীর চেহারার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম ; কি সে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

হেন্‌সা আমার পাশে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলিলেন, "এ যে অতি ভয়ঙ্কর কথা, কোলকাল্ল ? লণ্ডন সহরে এই সকল পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিতেছে, অথচ পুলিস ইহা নিবারণের কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না ?"

আমি বলিলাম, "তাহাদের যাহা সাধ্য, তাহার ত্রুটি করি-তেছে না। কিন্তু এই গুপ্ত অপরাধের প্রতিবিধান তাহাদের অসাধ্য।"

হেন্‌সা বলিলেন, "তুমি রহস্য-ভেদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছ বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তা করিয়াছি ; কিন্তু আমি যাহা আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা এরূপ দুর্ভেদ্য রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন যে, তাহা সত্য, কি আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, ইহা স্থির করিতে পারি নাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "তোমার অবস্থায় পড়িলে আমিও বোধ হয় ঐ কথাই বলিতাম। তুমি কুপের চরিত্রের যে বিশেষত্বের পরিচয় পাইয়াছ, তাহা অসাধারণ নহে। আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে ঐরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই, অর্থাৎ একই ব্যক্তির জীবনে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কুপ যখন নরহন্তা পিশাচের মনোভাব দ্বারা পরি-চালিত হইত, তখন উন্নত মনোবৃত্তির কথা তাহার স্মরণ থাকিত না, তাহাকে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মত সমাজে বাস করিতে হয়, ইহা সে ভুলিয়া যাইত। আবার যখন সে সচ্চরিত্র ভদ্রলোকের মত কালযাপন করিত, তখন তাহার অনুষ্ঠিত পাশবিক আচরণের কথা সে বিস্মৃত হইত। সে তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। একই লোকের হৃদয়ের এইরূপ পরিবর্ত্তন মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের সমস্যার বিষয় হইলেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাহার মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী এরূপ বিচিত্র যে, মনুষ্যের যন্ত্রণার দৃশ্যে, তাহাদের হত্যায় তাহার আসক্তি অসাধারণ। এই প্রকৃতির লোক প্রায়ই প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া থাকে। চিত্রশিল্পে কুপের প্রতিভার বিকাশ লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সেই প্রতিভা বিপথগামী, তাহার ফলে সে নর-নারীর মৃত্যু-যন্ত্রণার চিত্র অসাধারণ দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়া থাকে—যেমন অনেক শক্তিশালী লেখক নরকের চিত্র অঙ্কিত করিতে [illegible] স। সেই সকল চিত্র যতই নিখুঁত হউক, তাহা [illegible] কল্যাণপ্রদ নহে। কিন্তু কুপ যখন

স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন সে তুলি দ্বারা একটি রেখাও অঙ্কিত করিতে পারে না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তাহার প্রতিভা বা উদ্ভাবনী শক্তি ঐ স্থানেই সীমাবদ্ধ নহে, সে দীর্ঘকাল হইতে অদ্ভুত কৌশলে পুলিসের চোখে ধূলা দিয়া আসিতেছে। পুলিস প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাহাকে ধরিতে পারিতেছে না!—সে যেন দূর হইতে বিপদের গন্ধ পায়। কোন লোক স্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারে না।"

হপ্‌কিন্‌সন যে যুবতীর মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছিল, আমি ডেনম্যানের সাহায্যে কিরূপে সেই যুবতীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম, তাহার পরিচয়ই বা কি উপায়ে জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা হেনসার নিকট প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, "এই সকল লোক লণ্ডনে বাস করিয়া সাধারণের সহিত মিশিয়া থাকে অথচ তাহারা কিরূপ ভয়ানক লোক, মনুষ্যচর্ম্মাবৃত নেকড়ে, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। সাধারণ অবস্থায় তাহাদের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব বুঝিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান যুগের অনেক নামজাদা অপরাধী যেভাবে সমাজে মিশিয়া থাকে—তাহা দেখিয়া তাহাদের মান-সম্ভ্রমে সন্দেহের কোন কারণ পাওয়া যায় না। তাহারা সম্ভ্রান্ত লোকের মতই বাস করে; কিন্তু যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের কবলে পড়ে, তাহাদের দুর্দ্দশা ও মনস্তাপের সীমা থাকে না। তাহারা সাধারণতঃ সদালাপী হইয়া থাকে, নীতিশাস্ত্রের বড় বড় কথা আওড়াইয়া লোককে মুগ্ধ করে, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য, এরূপ দুষ্কর্ম্ম নাই—যাহা তাহারা করিতে কুণ্ঠিত হয়। তাহারা বন্ধুজনেরও সরলতা বা সংসারজ্ঞানহীনতার সুযোগ পাইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাদের সর্ব্বনাশ করে, এবং এইভাবে 'দাঁও' মারিয়া তাহারা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ বা লজ্জিত হয় না। এইরূপ অলোকাবৃত্তি অনেকের বংশগত বিশেষত্ব। অথচ সমাজে ইহাদের যথেষ্ট মান-সম্ভ্রম, অনেকে পুনঃপুনঃ প্রতারিত হইয়াও ইহাদের কথা বিশ্বাস করে। বস্তুতঃ অপরাধতত্ত্বের বিশ্লেষণ অতি দুরূহ ব্যাপার, মিঃ কোলকার্ট! আমার এই হাঁসপাতালে এই প্রকৃতির নরঘাতী উন্মাদ রোগী একাধিক আছে।"

যাহা হউক, আমি হপ্‌কিন্‌সনকে [illegible]র্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়া তাহার সহিত হাঁসপাতালের বাহি[illegible]লাম। তখন রাত্রি এগারটা; ফেব্রুয়ারী মাসের রাত্রি, বাহিরে যেমন নিবিড় অন্ধকার, সেইরূপ দুর্জ্জয় শীত।

আমরা পথে আসিয়া একখান ট্যাক্সিতে উঠিলাম। হপি এলবিয়ন ষ্ট্রীটের ও হাইড পার্ক প্লেসের সংযোগস্থল পর্য্যন্ত গাড়ীতে আমার সঙ্গে চলিল, তাহার পর আমি ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিলে সে গাড়ী হইতে নামিয়া জীর্ণ কোটের বুকের বোতাম আঁটিয়া দিল এবং ল্যাঙ্কেষ্টার ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত আমার পাশে পাশে চলিল।

হপি গাড়ীতে যে লোকটিকে দেখিতে পাইয়াছিল, সে বার্ণেস কি না, ইহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হওয়ায় আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া রহস্যের খাসমহলে চলিলাম।

কয়েক মিনিট পরে ক্লীন দ্বার খুলিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল বটে, কিন্তু আমার পাশে ছিন্ন-পরিচ্ছদধারী হপিকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল।

আমি বলিলাম, "বার্ণেস ভিতরে আছে কি? আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"

জার্ম্মাণটা বলিল, "উত্তম, আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

কিছুকাল পরে সোফেয়ার বার্ণেস আমাদের সম্মুখে আসিল। আমি তাহাকে দুই একটা বাজে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া হপির মুখের দিকে চাহিলাম; তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, সে বার্ণেসকে পূর্ব্বে কখন দেখে নাই; সুতরাং আমার সন্দেহ দূর হইল।

আমি খানসামাকে বলিলাম, "দেখ ক্লীন, তুমি থরল্ডের আর কোন সংবাদ পাইয়াছ কি? তাহার সংবাদ জানিবার জন্য ইন্‌স্পেক্টর ডেনম্যান অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। তুমি সত্য কথা বলিলে খুসী হইব।"

ক্লীন বলিল, "আজই তাঁহার একখান পত্র পাইয়াছি, তাহা আপনাকে দেখাইতে আমার আপত্তি নাই। দেখিবেন?"

আমি হাত বাড়াইলে সে পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া আমার হাতে দিল।

আমি কম্পিতহস্তে পত্রখানি খুলিয়া দেখিলাম, তাহা হোটেল ডি বেল্‌সের কাগজে লেখা। সেই হোটেলটি বেলজিয়মের স্পা নগরে অবস্থিত। পত্রখানি এইরূপ—

"প্রিয় ক্লীন, দেশান্তরে আমার বিস্তর কায আছে, এ জন্য আমি বসন্তকালের শেষ ভিন্ন দেশে ফিরিতে পারিব, এরূপ

আশা করিও না। এই সঙ্গে আমি চারি শত ফ্র্যাঙ্কের নোট পাঠাইলাম; ইহা দিয়া পাওনাদারদের বিল পরিশোধ করিবে, এবং জমাখরচ ও রসিদ তোমার কাছে রাখিবে। কোলফাক্স নামক কোন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করিতে পারে। যদি সে তোমাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তাহাকে বলিবে, আমি এখনও ফেনিতে আছি, কিন্তু সে আমার ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহাকে বাধা দিবে, কোন কারণে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে না। সে যে সকল প্রশ্ন করিবে, তুমি তাহার উত্তর দিতে পারিবে না। আমি তোমার উপর নির্ভর করিতেছি। তোমার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর আমার বিশ্বাস আছে; আমি একটা লাভজনক কাযের চেষ্টায় আছি। আমার চেষ্টা সফল হইলে তুমিও লাভের অংশ পাইবে। আমাকে পত্র লিখিবার ঠিকানা পোষ্ট রেষ্টান্টো, লীজ, বেল্‌জিয়ম্। ইহার মধ্যে যে পত্রখানি থাকিল, তাহা ডাকে দিবে।

তোমার বিশ্বস্ত থরল্ড।"

আমি বলিলাম, "তোমার পত্রের মধ্যে যে পত্রখানি ছিল, তাহা কোথায়?"

ক্লীন বলিল, "তাহা আমার শুইবার ঘরে রাখিয়া দিয়াছি। আজ সকালে বাহিরে যাইবার সময় তাহা ডাকঘরে লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "ভালই করিয়াছিলে, সেই পত্রখানি আমাকে দেখাইবে কি?"

ক্লীন তৎক্ষণাৎ অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল; কয়েক মিনিট পরে সে একখানি লেফাপা আনিয়া আমার হাতে দিল; লেফাপার উপর যে নাম ও ঠিকানা ছিল, তাহা পাঠ করিয়া আমি অন্ধকারের ভিতর আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলাম।

লেফাপার উপর লেখা ছিল—

"মিস্ যেসি মন্‌ক্রিফ্,
কেয়ার অফ্ মিসেস্ ক্রোদার,
মিঠাইওয়ালী,
সি-সাইড্ রোড, ইষ্টবোর্ণ, এসেক্স।"

আমি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলাম, "তুমি এ চিঠি ডাকে দিও না, ক্লীন! আমি কোন কাযে সকালেই ইষ্টবোর্ণে যাইব, পত্রখানি আমিই লইয়া গিয়া যেসিকে দিব। ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

ক্লীন বলিল, "আপত্তি কি? যেরূপে হউক, পত্রখানি তাহার হাতে পৌঁছিলেই হইল।

পরদিন প্রভাতে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণে চাপিলাম। যখন ইষ্টবোর্ণে নামিলাম, তখন বেলা অধিক হয় নাই। ষ্টেশন হইতে যে পথে চলিলাম, তাহার নাম 'টার্মিনস্ রোড।' এইটিই নগরের প্রধান পথ। কিছুদূর চলিয়া বাঁ-ধারে ফিরিতেই পথের ধারে একখানি রুটী-বিস্কুটের দোকান দেখিতে পাইলাম। দোকানখানি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার দ্বারের উপর যে সাইনবোর্ড দেখিতে পাইলাম, তাহা ক্ষুদ্র নহে। তাহাতে 'ক্রোদার' এই নামটি লেখা ছিল।

দোকানে কয়েকটি কাচের আলমারি, তাহাদের ভিতর রুটী, বিস্কুট, লজিঞ্জুস, এবং অন্যান্য নানা প্রকার সুলভ মিষ্টান্ন থরে থরে সজ্জিত।

একটি প্রৌঢ়া দোকানে বসিয়া 'খদ্দের বিদায়' করিতেছিল, তাহার দেহ স্থূল, মাথার চুলগুলি সমস্তই সাদা; কিন্তু তাহাকে 'বুড়ী' বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। চেহারা দেখিয়া স্ত্রীলোকটিকে শান্তপ্রকৃতি বলিয়াই মনে হইল। আমি বিনীতভাবে তাহাকে দোকানের মালিকের নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, সে নিজেই দোকানের মালিক এবং তাহার নাম মিসেস্ ক্রোদার।

আমি কোন রকম ভূমিকা না করিয়া বলিলাম, "আমি মিস্ যেসির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, আমার কাছে তাহার একখান চিঠি আছে।"

বিবি ক্রোদার বলিল, "যেসি দোতলায় আছে; তা' আপনার কোন অসুবিধা হইবে না, আমি নিজে গিয়া তাহাকে আনিতেছি। আপনি ওখানে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া ভিতরে আসিয়া বসিবেন কি?"

সে পাশের একটি দরজা খুলিয়া দিলে আমি একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলাম, ঘরটি বেশ গরম, অগ্নিকুণ্ডে কাঠের আগুন গনগন করিতেছিল। বাহিরে ভয়ানক ঠাণ্ডা, সেই কুঠুরীতে প্রবেশ করিয়া আরাম পাইলাম।

কয়েক মিনি[illegible] একটি সুন্দরী সুকেশী বালিকা সেই কক্ষে প্রবেশ [illegible] তাহার দেহ নীল পরিচ্ছদে আবৃত;

স্বর্ণাভ চুলগুলি সাদা ফিতা দিয়া দুই পাশে বাঁধা। ফুল্লনয়না মধুরহাসিনী বালিকা।

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিলাম, "কি গো যেসি! আমাকে চিনিতে পার? হাঁ, আমার কথা তোমার মনে আছে বৈ কি?"

যেসি কঠোর দৃষ্টিতে দুই এক মিনিট আমার মুখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আপনাকে চিনিতে পারিলাম না, কে আপনি?"

আমি সহজ স্বরে বলিলাম, "আমার নাম কোলকাক্স। তোমার মনে নাই? সেই যে মাস দুই আগে তুমি বাড়ী যাইবার পথ ভুলিয়া বেজ্‌ওয়াটারের একটা পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলে, সেই সময় তোমার সঙ্গে আমার দেখা।"

যেসি বিব্রতভাবে বলিল, "কৈ, আপনাকে কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না!"

বুঝিলাম, কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইলে, সে পরিচয় অস্বীকার করিতেই শিক্ষা পাইয়াছিল। সে কুপের কার্য্যসিদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ, সুতরাং কুপ তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ ছিল না।

আমি বলিলাম, "তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না! যে এক দিন তোমাকে বিপদে সাহায্য করিতে পারিয়াছিল, তাহার কথা যদি তোমার মনে না থাকে, তাহা হইলে সে জন্য দুঃখ করা বৃথা। সে কথা যাক, আমার বন্ধু অর্থাৎ তোমার কাকা মিঃ কুপ তোমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রখানি আমি তোমাকে দিতে আসিয়াছি।"

যেসি বলিল, "তিনি ত বিদেশে আছেন; তিনি কয়েক সপ্তাহ আমাকে কোন চিঠিপত্র লিখেন নাই।"

আমি বলিলাম, "এই তাঁহার পত্র, তিনি কি লিখিয়াছেন, পড়িয়া দেখ!"

পত্রখানি যেসির হাতে দিলাম।

মিসেস্ ক্রোদার যেসির পাশে দাঁড়াইয়া আমার কথা শুনিতেছিল। যেসি লেফাপাখানি হাতে লইয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল। সে পত্রখানি পড়িবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কুপের হস্তাক্ষর এরূপ অস্পষ্ট যে, যেসি দুই ছত্রও পড়িতে পারিল বলিয়া মনে হই[illegible] তাহা দেখিয়া আমি পত্রখানি তাহার হাত হইতে [illegible] লইলাম, এবং তাড়াতাড়ি মনে মনে পাঠ করিলাম। পত্রে তেমন কোন কাযের কথা ছিল না।

আমি বলিলাম, "তোমার কাকা জার্ম্মাণীর ডুসেলডর্ফ হইতে এই পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, তুমি ভাল আছ এবং মন দিয়া পড়াশুনা করিতেছ। তিনি আশা করিয়াছেন, মিসেস্ ক্রোদারের কাছে তুমি সুখেই আছ। তিনি পত্রের শেষে তোমাকে এই কথা লিখিয়াছেন যে, 'আমি তোমাকে যে কথা বলিয়াছিলাম এবং তুমি আমার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তাহা খবরদার ভুলিয়া যাইও না। যদি তোমার সেই অঙ্গীকার মনে রাখিয়া তাহা পালন কর, তাহা হইলে আমি এই বিদেশ হইতে তোমার জন্য এরূপ সুন্দর উপহার লইয়া যাইব, যাহা পাইলে তোমার খুব আহ্লাদ হইবে। তুমি যোয়ানের ভালবাসা জানিবে, আর সে তোমাকে আন্তরিক স্নেহ-সম্ভাষণ জানাইতেছে—তোমার কাকা কার্ল'।"

যেসি বলিল, "তিনি কবে দেশে ফিরিবেন?"

আমি বলিলাম, "খুব শীঘ্রই ফিরিবেন। আমি ভাবিলাম—তুমি কেমন আছ তাহা একবার দেখিয়া আসি—এই জন্যই আসিলাম।"

কিন্তু একটা কথা বুঝিতে না পারায় আমার মনে খট্‌কা বাধিল। কুপ এই পত্রখানি ডাকযোগে যেসির নিকট পাঠাইতে পারিত, তাহা না পাঠাইয়া সে তাহা ক্লীনের কাছে পাঠাইয়া ডাকে দিতে আদেশ করিয়াছিল—ইহার কারণ কি?—কোন অভিসন্ধি না থাকিলে ধূর্ত্ত কুপ এ কায করিত না, কিন্তু আমি তাহার সেই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম না। সে কোন্ মতলবে কি কায করে, তাহা বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন!

আমি যেসির সরলতাপূর্ণ সুন্দর মুখের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলাম; তাহার সরলতার অন্তরালে কি দুর্ব্বোধ্য কপটতা প্রচ্ছন্ন আছে বুঝিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া কত সদাশয় পথিক সহানুভূতিভরে তাহাকে সাহায্য করিতে গিয়া কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, তাহা আমার অবিদিত ছিল না, আমার সেই অভিজ্ঞতা কি শোচনীয়! কুপের কার্য্যপ্রণালীতে বিন্দুমাত্র জটিলতা না থাকিলেও তাহার ধূর্ত্ততা অন্যের দুরধিগম্য। তাহার দুরভিসন্ধির মৌলিকতা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না।

অতঃপর মিসেস ক্রোদারকে সঙ্গে লইয়া তাহার দোকান-ঘরে উপস্থিত হইলাম এবং তাহাকে আমার মনের কথা কিছু কিছু বলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মেসি কতদিন তাহার কাছে আছে, এবং সে মেসির কাকা কুপকে ঘনিষ্ঠভাবে জানে কি না?

মিসেস্ ক্রোদার গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি উহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না, মহাশয়! দুই মাস পূর্ব্বে আমাদের স্থানীয় গেজেটে একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম, সেই বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, কোন ভদ্রলোক দেশান্তরে যাইবেন, তিনি যত দিন বিদেশে থাকিবেন, তত দিন একটি মেয়ের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে পারে, এরূপ কোন বর্ষীয়সী মহিলার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে। কিঞ্চিৎ উপার্জ্জনের আশায় আমি এই ভারগ্রহণের সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া বিজ্ঞাপন-দাতাকে পত্র লিখিলে লণ্ডনের নেশনাল লিবারেল ক্লাব হইতে মিঃ চার্লস হিল কুপার নামক একটি ভদ্রলোকের পত্র পাইলাম। তিনি আমাকে লিখিলেন, তাঁহার শিশু ভাইঝিটিকে কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্না নারীর নিকট রাখিয়া দেশান্তরে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে তিনি কথাবার্ত্তা শেষ করিতে পারেন।

"তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে আমি লণ্ডনে গিয়া তাঁহার লেক্সহাম গার্ডেনসের ঠিকানায় উপস্থিত হইলাম; কিন্তু তিনি তখন বাহিরে গিয়াছিলেন। যাহা হউক, বাড়ীওয়ালী আমার সঙ্গে দেখা করিয়া আমাকে নানা রকম জেরা করিল। তাহার পর সে বলিল, মিঃ কুপারকে আমার সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া তাঁহার অভিমত আমাকে জানাইবে। পরদিন আমি হঠাৎ এক টেলিগ্রাম পাইলাম, তাহাতে জানিতে পারিলাম, আমার আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে; মিস মেসি সেই দিন অপরাহ্নে তিনটা কুড়ি মিনিটের ট্রেণে ভিক্টোরিয়া হইতে রওনা হইয়া পাঁচটার সময় আমার এখানে আসিবে। তাহাকে চিনিবার উপায়—তাহার মাথায় কালো টুপী ও সাদা ফিতায় বেণী বাঁধা থাকিবে এবং সে নীল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইবে। আমি মেসিকে আনিয়া নিজের কাছে রাখিলাম। সেই সময় হইতে সে আমার কাছেই আছে। মেয়েটি বড় সুশীলা, আমার স্নেহের পাত্রী।"

আমি বলিলাম, "তুমি মিঃ কুপের নিকট হইতে কখন কোন পত্র পাইয়াছ?"

মিসেস্ ক্রোদার বলিল, "হাঁ, কয়েকখানি পত্র পাইয়াছি। মেসি যে দিন আমার এখানে আসিয়াছিল, সেই দিনই তিনি কুড়ি পাউণ্ডের ব্যাঙ্কনোট ও একখান পত্র পাঠাইয়াছিলেন।"

আমি বলিলাম, "মেসি এখানে সুখে আছে ত? তাহার মনে কোন কষ্ট নাই?"

মিসেস্ ক্রোদার বলিল, "আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন। আমি তাহাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তথাপি এক এক সময় তাহাকে নিস্তব্ধ ও চিন্তামগ্ন দেখি। বোধ হয়, বাড়ীর জন্য তাহার মন কেমন করে, না হয় অতীতের কোন কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়, তখন তাহার শিশুসুলভ চাপল্যের চিহ্নমাত্র থাকে না।" [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মায়া

মায়ার স্বপন মরীচিকা
ধরেও ধরা যায় না সে,
হৃদয়-মাঝে ভ্রান্তি ছায়া—
আলোক-মালা যায় মিশে,
অসীম ছেয়ে আছে সে যে
কল্পনারি দীপ জেলে,
মানস অলি প্রীতির ফুলে
ঘুমিয়ে থাকে সব ভুলে।
মুগ্ধ বাঁশীর মূর্চ্ছনাটি
লেগে থাকে প্রাণের কোণে
দীপ্ত হাসির রেখা শুধু
ফুটে উঠে আঁধার-মনে।
অতীত যবে লুপ্ত স্মৃতি
জাগিয়ে তোলে মর্ম্ম-মাঝে,
নিশীথ-বাঁশীর করুণ সুরে
স্মৃতির ব্যথা আপনি বাজে;
হঠাৎ যবে ঝঞ্ঝাঘাতে
শান্তিলতা যায় টুটে,
মায়ার বাঁধন ভাঙ্গে তখন
অশ্রু-ধারার বন্যা ছুটে।

কুমারী কমলরাণী ঘোষ।

একদিল

ভারতের বিরুদ্ধে একটা মস্ত অভিযোগ, ভারতবাসী একদিল নহে, তাহার বারো রাজপুতের ছত্রিশ হাঁড়ী, তাই কে কি চাহে, বুঝা যায় না, তাহাদের দাবী কখনও এক প্রকৃতির বা এক শ্রেণীর হয় না। ওডয়ার ক্রাডক ও সিডেনহ্যাম লর্ড লয়েডের দল এই হেতু ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন না।

কিন্তু এবার ভূতের মুখেও রাম নাম শুনা গিয়াছে। সকলেই জানেন, বিলাতের গোল বা বাদামী টেবিলের বৈঠকে ভারতবাসীর নির্ব্বাচিত কোন প্রতিনিধি যান নাই। যে কংগ্রেস জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান এবং যে কংগ্রেস জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক, সেই কংগ্রেসের কোন নেতাই ঐ বৈঠকে যোগদান করেন নাই। যাঁহাদিগকে তথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং যাঁহাদিগকে ভারতের প্রতিনিধিরূপে জগতের সমক্ষে জোর গলায় প্রচার করা হইতেছে, তাঁহারাও গোল টেবিলে বসিয়া একবাক্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দাবী করিয়াছেন। এ দাবীতে যে কেবল শাস্ত্রী, সপ্রু, জয়াকর যোগ দিয়াছেন, তাহা নহে, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার মূর্ত্ত-প্রতীক সার মহম্মদ সফি ও মিঃ মহম্মদ আলিও এই দাবীতে কাহারও পশ্চাৎপদ নহেন। মহম্মদ আলি ভারতে এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য কত ঝগড়া মারামারি করিয়াছেন, এমন কি, খিলাফতের আমলের গুরু গন্ধীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন, অথচ বিলাতে তিনি স্পষ্ট স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, "আমি স্বায়ত্তশাসন লইয়াও সন্তুষ্ট হইব না, আমার স্বাধীনতা চাই। যদি আমি উহাতে কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলে আমার মৃতদেহকে এই বিদেশেই কবর দিও।" মনে করুন, লবণ সত্যাগ্রহে ঝম্প দিবার পূর্ব্বে মহাত্মা গন্ধীর কথা,—"যদি স্বরাজ না পাই, তাহা হইলে আর আশ্রমে ফিরিয়া আসিব না, আমার দেহ সমুদ্রের জলে ভাসিবে।"

মিঃ মহম্মদ আলি মহাত্মারই অনুসরণ করিয়াছেন। আবার রাজন্যদের পক্ষ হইতে বিকানীর ও আলোয়াড়ের মহারাজ এবং ভূপালের নবাব সাহেব ও মহীশূরের [illegible]—সকলেরই মুখে এক কথা,—ভারতবর্ষ আপন ভাগ্যনি[illegible]ন্তে চাহে। শ্রমিক সরকারের মুখপত্র "ডেলি হেরাল্ড" এই একতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। এমন কি, 'টাইমস' পত্র বলিতেছেন, "The last five days have given British opinion an object-lesson on the solidarity of Indian nationalism, অর্থাৎ জাতীয়তার দিক হইতে ভারতবাসীর একতা দেখিয়া বৃটিশ জাতির একটা শিক্ষালাভ হইয়াছে।" কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার ত কিছুই নাই। জগতে এমন কোনও জাতি আছে কি, যে স্বাধীনতা চাহে না? কংগ্রেস-পন্থীরাই কি, আর কংগ্রেস-বিরোধীরাই কি, সকলের আন্তরিক কামনা স্বরাজলাভ। ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে কেহ বা ক্রমাগত আশায় নিরাশ হইয়া প্রত্যক্ষ কর্ম্ম দ্বারা উহা লাভের চেষ্টা করিয়া জেলে যাইতেছে, আর কেহ বা এখনও আশা বিসর্জ্জন না দিয়া আপোষের পথে উহা লাভের চেষ্টা করিতেছে,—প্রভেদ এইটুকু মাত্র। দুঃখের বিষয়, ভারত জাতীয়তার ও একতার পরিচয় দিয়া স্বরাজের দাবি করিলেও সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্র শাসনের কথা পাড়িয়া আসল দাবী চাপা দিবার চেষ্টা চলিতেছে। সে চেষ্টা যে পরিণামে ফলবতী হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। আজ না হউক, অচির-ভবিষ্যতে ভারতের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিতে হইবেই।

ক্ষয়রোগ

ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েডের মত ক্ষয়রোগ বা যক্ষ্মারোগ বাঙ্গালা দেশে কায়েম-মোকাম হইয়া বসিতেছে। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ত্তা ডাক্তার বেণ্টলি সম্প্রতি কলিকাতার "ইয়ংম্যানস ক্রীশ্চ্যান এসোসিয়েশান" হলে এই সর্ব্বনাশা রোগের সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালা দেশে প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ৫০ হাজার নরনারী এই রোগে ইহলোক ত্যাগ করে।" সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে, লক্ষ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই ভীষণ কথা শুনিয়া বাঙ্গালী-মাত্রেই যে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই কলিকাতা সহরের আকাশে বাতাসে যক্ষ্মার বীজাণু ছড়ান রহিয়াছে, এমন কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সহরের সঙ্কীর্ণ গলিঘোঁজ—তাহার বদ্ধ দূষিত বায়ু এবং সূর্য্যাতপের

অভাব যে ইহার অন্যতম কারণ, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার উপর সকল খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল এবং নরনারীর অনাচার, রোগ আক্রমণ করিবে না কেন ? উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং দারিদ্র্য হেতু জনসাধারণ নিত্য বাজারের ভেজাল বিষ গলাধঃকরণ করিতেছে। ইহার ফল কি সাংঘাতিক হয় না ? সহরে চা চপকাটলেটের দোকান, সরবতের দোকান আর চাটের দোকান ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে। এক শ্রেণীর চায়ের দোকানে একই বাসনতিতে উচ্ছিষ্ট পেয়ালা একবার চুবাইয়া অন্য খরিদ্দারকে দেওয়া হয়। এইরূপ সারাদিনই চলিতেছে। রোগ সংক্রমিত হইবে না কেন ? বাসি পচা মাংস, বাসি বাটনা, ভেজাল তৈল, ভেজাল ঘৃত,—এ সকল ত উদরাময় ও অজীর্ণ রোগের আকর। উহা পরে যক্ষ্মায় পরিণত হইতে পারে। ইহার উপর দারুণ দারিদ্র্য, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, একবার কোন রোগ দেখা দিলে সে রোগের আক্রমণ সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। বিলাতের বর্ত্তমান বেকার-সংখ্যা ২২ লক্ষ বলিয়া শুনা যায়। এ দেশে বেকারের আদম-সুমারি করা হয় না, নতুবা দেখা যাইত, সে সংখ্যা কোটির অনেক উপরে দাঁড়াইয়াছে ; অন্নাভাবে এ দেশে লোক আত্মহত্যা করে, পুত্রকন্যা বিক্রয় করে। কয় জন তাহার তত্ত্ব লয় ? এই দারিদ্র্যের পেষণে প্রসূতি পুষ্টিকর খাদ্য পায় না, শিশু দুগ্ধ পায় না। তাহার উপর রোগের আক্রমণ হইলে তাহাদের সহ্য করিবার ক্ষমতা কোথায় থাকে ? কত লোক যে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হইয়াও প্রতিদিন উদরান্ন সংগ্রহের আশায়, পুত্র-পরিবার প্রতিপালনের জন্য আফিসে ও কারখানায় কায করিতে যাইতেছে এবং ক্রমশঃ দ্রুত আয়ুক্ষয় করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করে কে ?

সকল সভ্যদেশেই প্রতিবেধমূলক রোগনিবারণের জন্য সরকারের ব্যবস্থা আছে। এ দেশেও যখন যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তখন সকলেই আশা করিতে পারে যে, সরকার প্রতীকারোপায়ও অবলম্বন করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। ডাক্তার বেণ্টলি বলিয়াছেন, এই রোগের প্রতিবিধানের জন্য অন্য যে উপায়ই অবলম্বিত হউক না কেন, সমগ্র বাঙ্গালার জন্য অন্ততঃ ৩ শত ১০টি ক্ষয়রোগের চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সরকার এ যাবৎ কয়টি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ? বাঙ্গালার গভর্ণর সে দিন এক বক্তৃতায় বাঙ্গালার ব্যবসা-বাণিজ্যের, রাজস্বের ও পাটের অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া এবং সে জন্য কংগ্রেস ও কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনকে দায়ী করিয়া সাফ বলিয়া দিয়াছেন যে, 'জরুরী' বিভাগগুলির জন্য খরচ নির্দ্দিষ্ট রাখিতেই হইবে, অথচ তহবিলে আদায় কম, সে ক্ষেত্রে জাতির মঙ্গলসূচক কার্য্যে সরকারী অর্থসাহায্য-দান এবার অসম্ভব ! কথা কার্য্যেও পরিণত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নোটিশ হইয়াছে যে, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বে-সরকারী স্কুল-কলেজকে সাহায্যদান করা হইবে না। অথচ দেশবাসীরই কষ্টার্জ্জিত যে অর্থ কররূপে সরকারী তহবিলে সংগৃহীত হইতেছে, তাহা হইতে পুলিসের ব্যয়ের বহর দ্রুত বাড়িয়াই চলিয়াছে, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা পুলিসের জন্য রাহা-খরচ আদি ব্যয় সীমাহীনভাবে অঙ্কপাত করিয়া যাইতেছে। এই সকল 'জরুরী' কার্য্যের দিকে নজর না রাখিলে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষিত হইবে কেন ?

তবে দেশবাসীকে সেই কর্ত্তব্যভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে হইবে। শুনা যায়, এই কলিকাতা সহরে ন্যূনাধিক ২৮ হাজার যক্ষ্মারোগাক্রান্ত লোক আছে। ইহাদের জন্য কলিকাতা করপোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। করপোরেশন যদি নানা দিকের ব্যয়বাহুল্য কমাইয়া, পোষ্য প্রতিপালনের লালসা ত্যাগ করিয়া এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহকালে সুনাম অর্জ্জন করিতে পারিবেন, দেশবাসীরও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

বাঙ্গালার মফঃস্বলের জন্য মিউনিসিপ্যালিটী ও জেলা বোর্ড সমূহের স্ব স্ব কেন্দ্রে যথাসাধ্য প্রতীকারোপায় চিন্তা করা উচিত।

ভেষজ-তত্ত্বানুসন্ধান

ভারতীয় ঔষধ সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটি কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। পঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি সহরে কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে পেশোয়ারের মেজর বার্ক ও রাওলপিণ্ডির সিভিল সার্জ্জন লেফটানেণ্ট-কর্ণেল ওয়েলস্ বলিয়াছেন যে, "এদেশের ঔষধ এদেশে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কেন না, এদেশের ঔষধের উপকারিতা সমধিক।" ডাক্তার ওয়েলস্ অধিকন্তু বলিয়াছেন, "ভারতীয় গাছগাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে করা উচিত।" কথাগুলি এদেশবাসীর বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিবার বটে। পল্লীবৃদ্ধারা ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে নানা উৎকট দুরারোগ্য ব্যাধির এমন [illegible] 'টোটকা' ঔষধ জানিতেন, যাহাতে ডাক্তার-কবিরা[illegible]সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হইত না।

কাউর ঘা, মাকড়সার ঘা ও অন্যান্য বিষাক্ত ক্ষত, কামলা রোগ, শিশুর যকৃৎ রোগ, রক্তামাশয়, ঘুংরি কাসি, উদরাময় প্রভৃতি রোগে তাঁহারা এমন অব্যর্থ ঔষধ দিতেন, যাহার উপকারিতা তখনকার বহু খ্যাতনামা ডাক্তার-কবিরাজও শতমুখে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলা মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক ও তুকতাক শ্রেণীর হইলেও অধিকাংশই ছিল গাছগাছড়ার শিকড়লতায় প্রস্তুত। এই গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত ঔষধে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকেও আরোগ্যলাভ করিতে শুনা গিয়াছে। সুতরাং এ দেশের গাছগাছড়া হইতে যে এ দেশের লোকের ধাতুসহ সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া যায়। তবে গাছগাছড়া চিনিবার বিদ্যা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বলিয়াই আজ প্রতীচ্যের ভৈষজ্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত গাছ-গাছড়া ও ধাতুঘটিত ঔষধের উপকরণ সর্ব্বাংশে সংগৃহীত হওয়া এখনকার কালে দুর্ঘট হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই জন্য বর্ত্তমানকালে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দুরারোগ্য রোগ আরাম করাও ক্রমে বিরল হইয়া আসিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্ভবতঃ সেই কারণেই প্রতীচ্যের ঔষধ ও চিকিৎসকের প্রসার-বৃদ্ধি হইয়াছে।

তবে কিছু দিন হইতে আবার যেন দেশের ভৈষজ্যের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ ফিরিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। এখন দেশের একাধিক ঔষধ-প্রতিষ্ঠান দেশীয় গাছ-গাছড়া ও ধাতুদ্রব্য হইতে প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক প্রথায় ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বাজারে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতীচ্যের যেটুকু গুণ—তাহার যেটুকু বিশেষত্ব—তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের ভেষজ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলে দেশবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

—

ম্যালেরিয়া কমিশন

বাঙ্গালা সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগের নিয়ামক ডাক্তার বেণ্টলির কার্য্যকাল শীঘ্রই ফুরাইবে। তিনি এ দেশ ত্যাগ করিলে যথার্থই এ দেশের একটা মস্ত অভাব রহিয়া যাইবে। তাঁহার ন্যায় সহৃদয় কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন বিদেশী সরকারী কর্ম্মচারী এ দেশে বিরল। তিনি বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যেরূপ আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সচরাচর অন্য কর্ম্মচারীতে দুর্লভ। বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া, বন্যা, বাঁধ, জলনিকাশ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ অনুস[illegible] হইলে আজ বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি সা[illegible]ত। সুতরাং তাঁহার অভাব যে যথার্থই বাঙ্গালী অনুভব করিয়া দুঃখিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ দেশের সরকার লাল ফিতা অনুসারে কার্য্য করিতে অতি-মাত্র দড় বলিয়া ডাক্তার বেণ্টলির পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কেবল লাল ফিতা নহে, তাঁহাদের তহবিলে অর্থাভাব তখনই দেখা যায়, যখন এ দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি জনহিত-মূলক গঠনকার্য্যের কথা উত্থাপিত হয়। কিন্তু তাঁহারা কমিটী কমিশন গঠন করিবার সময় সে কথা মনে রাখেন না। অথচ কমিটী কমিশন গঠনের ফলে কখন কিছু হইতে দেখা যায় না। হয় ত কমিশন গঠিত হইবার পর কমিটী সৎপরামর্শ দিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, তাঁহাদেরও পরামর্শ অনুসারে যথাযথ কায হয় কি? তখনই অমনই অর্থাভাবের কথা উঠিয়া থাকে।

জাতিসঙ্ঘের দ্বারা নিযুক্ত একটি ম্যালেরিয়া কমিশন গত বৎসর ভারতের দিকে দিকে পরিভ্রমণ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টে অনেক প্রয়োজনীয় কথাও আছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, "ভারতে এই দুরন্ত ব্যাধি-দমনের জন্য কোন ব্যাপক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান ত নাই-ই, অধিকন্তু প্রদেশগুলিতেও উহার অভাব পরিলক্ষিত হয়।" ইহা কি ভারত সরকারের অথবা প্রাদেশিক সরকার-সমূহের পক্ষে খুবই প্রশংসার কথা? অন্যান্য সভ্য দেশে প্রতিষেধসাধ্য রোগ নিবারণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, সে জন্য দেশের সরকার প্রয়োজনমত অর্থব্যয়ও করিয়া থাকেন। এ দেশে তাহা হয় না। ইহাতে কি বলিতে পারা যায় যে, ভারতের মঙ্গলের জন্য বৃটিশ শাসক জাতি ভারত শাসন করিতেছেন? রিপোর্ট এইটুকু বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালা, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে এই ব্যাধির প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান চলিতেছে, কিছু কিছু কাযও হইতেছে।" তবে? যদি এইরূপ বিক্ষিপ্তভাবে কায করিয়াও কিছু কিছু ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে উপদেশমত কায আরম্ভ করিলে যে আশানুরূপ ফললাভ হইত, তাহা কি শাসক জাতি অস্বীকার করিতে পারেন? এ দেশের জনসাধারণ কিরূপ দরিদ্র, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে শত-করা ৯০ জনেরও অধিক লোকের কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া পয়সা বাঁচান অসম্ভব। এ দেশের লোকের আয় মাসে গড়পড়তা ২ টাকা, তাহাদের মতে শতকরা ৭০ জনেরও অধিক লোক দুই বেলা পেট পুরিয়া আহার জুটাইতে পারে না; কাযেই জমাইবার মত তাহাদের হাতে অর্থ থাকা অসম্ভব। এই

হেতু ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহাদের চিকিৎসিত হইবার উপায় থাকে না, ঔষধ পর্য্যন্ত তাহারা জুটাইতে পারে না। কাজেই কোনরূপে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা ব্যাধির আক্রমণ সহ্য করে এবং অকালে স্বাস্থ্যহীন হয়, সারা জীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য ও পঙ্গু হইয়া যায়, না হয় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ভবযন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়, আর কতকগুলি কুপোষ্যকে পথে বসাইয়া যায়। জাতি এইরূপে মরিতে বসিয়াছে। দেশের শাসকরা যদি এ দিকে দৃষ্টিপাত না করেন, তাহা হইলে উপায় কি? কেবল কমিশন কমিটীর রিপোর্টে ত লোকের পেট ভরিবে না বা স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে না!

পুলিসের কীর্ত্তি

কলিকাতার প্রবাসী স্কটদিগের বাৎসরিক সেন্ট এণ্ড্রুজ ভোজের উৎসবে বাঙ্গালার গভর্ণর সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন কংগ্রেসের ও আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করিবার সময়ে পঞ্চমুখে পুলিসের প্রশংসা করিয়াছেন। কংগ্রেস কি হেতু লাহোর কংগ্রেসের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত নিয়মানুগপথে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের চেষ্টা করিয়াও লাহোর কংগ্রেসের পর হইতে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে এবং মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বাধীনে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, গভর্ণর সে ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই, তিনি একতরফা ডিক্রী দিয়াছেন। নিরপেক্ষমাত্রেই তাঁহার এই নিন্দাবাদের সমর্থন করিবে না। পুলিসের প্রশংসাকালে তিনি বলিয়াছেন, "যে সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া এবং বহু ক্ষেত্রে জীবন বিপন্ন করিয়া পুলিস এই অনিষ্টকর আন্দোলন উপশমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার জন্য পুলিসের আপামর সাধারণ বিশেষভাবে প্রশংসার্হ এবং দেশের প্রত্যেক মঙ্গলকামী ব্যক্তিরই কৃতজ্ঞতাভাজন।" গভর্ণর যে শাসনতন্ত্রের স্বাসরক্ষক, তাহার দৃষ্টিতে সেই প্রণালীর পরিবর্ত্তনকামিমাত্রেই শত্রু, তা সে হিংসার পথই গ্রহণ করুক বা অহিংসার পথেই বিচরণ করুক। সুতরাং তাহাদের দমনে পুলিস যতই অনাচার করুক, তাহা অনাচার বলিয়া কখনই শাসক পক্ষের দৃষ্টিতে গৃহীত হইতে পারে না। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বোম্বাই বিভাগের গুজরাটে ও বোম্বাই সহরে অথবা মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলে পুলিস আইন অমান্য আন্দোলন দমনে যে তাহা 'ন্যূনতম' বলিয়া সরকার ঘোষণা করিতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণ তাহা বলিবে না। বাঙ্গালার গণ্যমান্য বিশিষ্ট কয়জন ভদ্রলোক কাঁথির ঘটনা তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহাতে এ কথা সপ্রমাণ হয়। শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ব্যবস্থা-পরিষদে বাঙ্গালায় পুলিসের ব্যবহার সম্বন্ধে যে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও কেহ ভুলে নাই। ঢাকায় ছাত্র অজিতের পুলিসের হস্তে প্রহার ও তাহার ফলে শোচনীয় মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ করিবার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সকলে পাঠ করিয়াছেন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিংএ পুলিসের অনধিকার-প্রবেশের ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েটগণকে প্রহারের কথাও এখনও সকলের মনে জাগরূক রহিয়াছে। এই সম্পর্কে লাহোরের দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক কলেজে পুলিসের অনধিকার-প্রবেশ ও ছাত্রগণকে প্রহারের কথাও উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই সহরের মেয়র শ্রীযুক্ত হোসেন ভাই লালজী গভর্ণর সার ফ্রেডারিক সাইকসকে এক পত্রে নারী দেশসেবিকাদের প্রতি পুলিসের অশিষ্ট অভদ্রোচিত ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কেহ বিস্মৃত হয় নাই। বোম্বাই করপোরেশানও এ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুলিস স্বেচ্ছাসেবিকাদিগকে গ্রেফতার করিয়া সহরের বাহিরে জঙ্গলে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছিল, ইহাই অভিযোগ। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তরুণী ছিলেন এবং অনেকের অঙ্গে মূল্যবান্ অলঙ্কারও ছিল। কলিকাতাতেও এমন ঘটনা ঘটিয়াছে, পুলিস নারী-কর্ম্মীদিগকে ধরিয়া সহরের বাহিরে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে। বোম্বাইএ কয়টি দেশসেবিকাকে গ্রেফতার করিয়া পুলিস-হাজতে রাখা হইয়াছিল। বিচারকালে তাঁহাদের মধ্যে একটি মহিলা বিচারককে বলিয়াছিলেন, "হাজতে আমাদের আবরু সম্ভ্রম রক্ষা করা হয় নাই। হাজত-ঘরের দ্বার-গবাক্ষ সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত এবং পুলিসের লোক সর্ব্বদা সেখান দিয়া যাতায়াত করিতে পারিত। সে অবস্থায় আমরা শীলতা ও লজ্জা রক্ষা করিয়া শৌচাদি সম্পন্ন করিতে বা বেশ পরিবর্ত্তন করিতে পারিতাম না। আপনারও জননী-ভগিনী আছেন। তাঁহাদের প্রতি কেহ এরূপ ব্যবহার করিলে আপনি কি করিতেন?"

নারীরা আইন ভঙ্গ করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, ইহাতে কোন কথা বলিবার নাই। আজকাল ১০।১২ বৎসরের বালক[illegible]দণ্ডে বা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে। সুতরাং নারীর[illegible]দণ্ডে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

কিন্তু এ সব কি? পুলিসের এই সব ব্যবহার কি শাসকবর্গ সমর্থন করেন?

এ দেশের পুলিসকে জনসাধারণ বিশ্বাস করে না, সাহায্য করে না, পুলিস হইতে দূরে থাকে,—এই সকল অভিযোগের কথা শুনা যায়। কিন্তু এ দেশের লোক সরকারকে জানে না, নিরক্ষর গ্রামবাসী চৌকীদার ও পুলিসকেই কোম্পানী বাহাদুর বা সরকার বাহাদুর বলিয়াই জানে। তাহারা জানে, পুলিসকে ধরিয়া আনিতে বলিলে, বাঁধিয়া আনে। সুতরাং তাহারা 'শতহস্তেন বাজিনাং' নীতি নিয়ত মানিয়া পুলিসের সংস্রব হইতে দূরে থাকে। কথায় বলে, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'। এ দেশের লোক মনে করে, 'পুলিসে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।' কেন এইরূপ মনে করে, তাহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। যে পুলিস মেদিনীপুরের বোমার মামলায়, মুসলমানপাড়া বোমার মামলায়, নারায়ণগঞ্জ ট্রেণ-ধ্বংসের ব্যাপারে, সিন্ধু-বালাস্বয়ের ব্যাপারে এবং অন্যান্য সংখ্যাতীত মামলায় অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া জনসাধারণের মনে বিষম ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে, সে পুলিসের অসাধ্য কায কিছু আছে বলিয়া এ দেশের লোক ভাবিয়াই উঠিতে পারে না। কিরূপে তাহারা অসাধ্যসাধন করে, তাহার একটা নমুনা এইরূপ:—

ঘটনাটি কিছুকাল পূর্ব্বের আসামের শিলচর নামক স্থানের। কিন্তু গত ২৪শে নবেম্বর তারিখে এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিসের বিপক্ষে আদালতের এক রায় বাহির হইয়াছে। রায় হইতে মামলার ঘটনার কথা জানা যায়। বিবরণটি এইরূপ:—

"ঘটনার দিন বিবাদী দারোগা গোপালচন্দ্র কুকন, (বর্ত্তমানে শিলচরের পুলিস ইনস্পেক্টর), ইনস্পেক্টর বিপিনবিহারী দাস, দারোগা অভয়চরণ শর্ম্মা (ইনি ডিগ্রেড হইয়াছেন) এবং অন্য ১১ জন পুলিস বিনা গ্রেফতারী পরোয়ানায় বাদী ইয়াসিন মিঞা প্রমুখ কয়জন বিশিষ্ট মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে খানাতল্লাসীর অজুহতে প্রবেশ করেন। দুইটি বিশিষ্ট লোককে খানাতল্লাসীর সাক্ষিরূপে আনয়ন করিতে বলা হয়। কিন্তু কেহ উহা হইতে সম্মত হন নাই (পুলিসের প্রতি প্রীতি কিরূপ দেখুন!) সাক্ষী সংগৃহীত হইল না দেখিয়া পুলিস হতাশ হইয়া চলিয়া যায়। প্রকাশ, তৎপরদিন প্রভাতে যখন বাদীদের এক জনের গৃহে কোরাণ-পাঠ হইতেছিল, বিবাদীরা সেই সময়ে তথায় প্রবেশ করিয়া কোরাণ ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, সকলকে মারপিট করে,—এমন কি, পুরনারীদিগকেও গুরু প্রহারে জর্জ্জরিত করে; অধিকন্তু কত[illegible] ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। পরে তাহারা গৃহবাসী[illegible] দুই মাইল দূরবর্ত্তী ইন্স্পেক্সন বাংলোতে লইয়া যায়। রাত্রিকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এক পুষ্করিণীতটে দণ্ডায়মান করিয়া রাখা হয় এবং নারীদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

"অতঃপর প্রকাশ যে, বিবাদীরা এই সকল দুষ্ক্রিয়া গোপন রাখিবার জন্য বাদীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিবিধ ধারা অনুসারে কতকগুলি অভিযোগ আনয়ন করে। নিম্ন আদালতের বিচারে বাদীদের গুরুদণ্ড হয়।

"ইহার পর উচ্চ আদালতে এই মামলার আপীল হয়। আপীল আদালতের বিচারক দণ্ডিতদিগকে পূর্ণ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া বে-কসুর মুক্তি দেন।

"বর্ত্তমান দেওয়ানী মামলায় সবজজের নিকট বাদীপক্ষ বিবাদীদের বিরুদ্ধে ৩ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী করেন। বিচারক বিবাদীদের বিপক্ষে মামলার খরচসহ ডিক্রী দেন। বিচারক তাঁহার রায়ে লিখিয়াছেন:—'পুলিসের আদ্যোপান্ত সমস্ত কার্য্য বে-আইনী হইয়াছে, ইহা তাহাদের পক্ষে ঘোর কলঙ্কের কথা!' বিচারক কোরাণ ছুড়িয়া ফেলার কথা বিশ্বাস করেন নাই, এ কথা সত্য, কিন্তু অন্যান্য দফায় পুলিসকে গুরু-অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।"

এ দেশের বহু আদালতের পুরাতন ফাইল ও নথিপত্র ঘাঁটিলে এমন অনেক মামলার বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে। গভর্ণর সার ষ্ট্যানলি কি ইহার পরেও পুলিসকে সর্ব্বগুণের আধার বলিয়া ঘোষণা করিতে সম্মত আছেন?

নারী-শক্তি

দেশের মুক্তির আন্দোলনে আমাদের জননী-ভগিনীরা কি ভাবে অসাধারণ ত্যাগ ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিতেছেন এবং সকল কার্য্যেই পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুঃখ-বিপদ বরণ করিতেছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে, গর্ব্বে, শ্রদ্ধা-প্রীতিতে অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠে। যে দেশের নারী বাহিরের জগতের ধূলিমলিন পথে পদার্পণ করিতে লজ্জা ও সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পড়িতেন, যে দেশের অন্তঃপুরচারিণীরা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা বলিয়া অভিহিত হইতেন, আজ তাঁহারা দেশপ্রেমের সম্মোহন স্পর্শে যেন নব জীবন লাভ করিয়াছেন। মহাত্মা গন্ধীর প্রবর্ত্তিত জন-জাগরণের ইহা অল্প বিশেষত্ব নহে। ভারতের মুক্তির ইতিহাস যখন লিখিত হইবে, তখন উহাতে ভারতের নারীর এই দেশপ্রেমের উন্মাদনার কথা, এই অপূর্ব্ব ত্যাগের কথা সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে সন্দেহ নাই। আমাদের এই বাঙ্গালার নারীদের মধ্যে

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রমুখ শিক্ষিতা মহিলাদের কথা ধরিতেছি না, তাঁহারা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জাতিকে ধন্য করিয়াছেন। কিন্তু যখন কলিকাতা মাড়োয়ারী সমাজের শ্রীমতী ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা অথবা ভাগলপুরের স্বর্গগতা চম্পকলতা দেবীর কথা স্মরণ করি, তখন বিস্ময়ে, হর্ষে ও গর্ব্বে অভিভূত হই। ইন্দুমতীকে বালিকা ব্যতীত কিছুই বলা যায় না। এই অষ্টাদশবর্ষীয়া বালিকা সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারীর ঘরের কুলবধূ। এই সম্প্রদায় কিরূপ রক্ষণশীল ও অবরোধ-প্রথার সমর্থক, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অথচ এই ইন্দুমতীই যাহা দেশসেবায় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহার জন্য হাসিমুখে কারাবরণ করিয়াছেন। ভাগলপুরের চম্পকলতা দেবী হিন্দুর পবিত্র শুদ্ধান্তঃপুরের ঘরণী—গৃহিণী। স্বামী স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, আন্দোলনে অগ্রণী হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই পরিত্যক্ত অসমাপ্ত কার্য্য তখনই তাঁহার পত্নী হিন্দুর মহীয়সী সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কেহ তাঁহাকে প্রকাশ্যে বাহির হইতে দেখে নাই। মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে এই সাধ্বী দেশসেবিকার যখন অকালমৃত্যু হয়, তখন সমগ্র ভাগলপুর তাঁহার শোকে অধীর হইয়াছিল—তাঁহার শবানুগমন করিয়া তাঁহার পবিত্র আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। এই বাঙ্গালারই পর্দ্দানশীনা সম্ভ্রান্তা মুসলমান-মহিলাদের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহাদের হিন্দু ভগিনীগণের পশ্চাৎপদ নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ জননী জন্মভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

বোম্বাইএর ও পঞ্জাব যুক্তপ্রদেশের কথা কি বলিব? যুক্তপ্রদেশের নেহরু-পরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলারা, পঞ্জাবের জুৎসি পরিবারের শিক্ষিতা বিদুষী মহিলারা এবং বোম্বাইএর কোটিপতি ধনকুবেরের পরিবারের মহিলা হইতে সামান্য দেশসেবিকারা কি অসাধারণ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। জজ তায়েবজীর মত সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পরিবারস্থ মহিলারা, দাদাভাই নৌরজীর পরিবারের মহিলারা এবং হিন্দু ধনী ব্যবসায়ী পরিবারের মহিলারা এই মুক্তিসমরে কি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে কাহার বাকী আছে? বোম্বাইএর প্রভাত ফেরী ও দেশসেবিকার নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীমতী ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা

অতঃপরে কা-কথা, বৃটিশ আদালতের বিচারক তাঁহার রায়ে তিরস্কারচ্ছলে এ কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। গত ১০ই নভেম্বর বোম্বাইএর তৃতীয় আদালতের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কাগুলাওয়ালা কয়েকটি পিকেটিং মামলার বিচার করেন। তন্মধ্যে দেশসেবিকা কুমারী কুসুম শোভানি এবং কুমারী বিমলা সরদেশাইএর মামলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী এসপ্লানেডের কারঞ্জিয়া কোম্পানীর ও মহম্মদ আলি এসালি কোম্পানীর রেশমের গুদামে পিকেটিং করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে ৩ মাস কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড দানকালে রায়ের এক স্থলে বলিয়াছেন,—"One woman is marked for the battle in every family and when she goes in the morning, they think she may come or may not. They deliberately defy the Ordinance and are prepared to meet any crisis,—বোম্বাই সহরের প্রত্যেক পরিবার হইতে একটি করিয়া নারীকে যুদ্ধে উৎসর্গ করা হয়। যখন প্রভাতে একটি নারী যুদ্ধের জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন তাহার অভিভাবকরা স্থির করিয়া রাখে যে, হয় ত সে ফিরিতে পারে, হয় ত না ফিরিতেও পারে। তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অর্ডিনান্স অমান্য করিতেছে এবং যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইতেছে।"

যে ভারতের কুসুমপেলবা লজ্জাভারনমিতা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা নারী ধূলিমলিন পথে নিষ্ক্রান্ত হইতে ব্রীড়ায় লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িতেন, আজ তাঁহারা যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রতি পরিবার হইতে প্রত্যহ প্রকাশ্য রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন—ইহার সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব কি? এ তত্ত্ব যদি শাসক জাতির শীর্ষস্থানীয়রা আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরই পক্ষে ভারতে শান্তি ও সন্তোষ প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য হইতে পারে। সে সুবুদ্ধি কি দেখা দিবে? লক্ষণ ত দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, ইহা হইতে এইটুকু জানিয়াও তৃপ্তি যে, আমাদের জননী-ভগিনীরা যে ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, তাঁহারা যে ধাতুতে গঠিত,—তাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া ভাবিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় না।

—

সত্য কথা

ভারতের প্রায় দুই শত য়ুরোপীয় খৃষ্টান পাদরী একযোগে একখানি আবেদন বা ইস্তাহার-পত্র প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা বৃটিশ শাসক জাতিকে ভারতের কথা নিবেদন করিয়া ভারতের প্রতি ন্যায়বিচার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের আবেদন-পত্রের একটি স্থান আমরা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি,—"এদেশবাসীর মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, তাহাদের ভাগ্যনিয়ন্তা বিদেশী বলিয়া তাহাদের মুক্তির পথ কণ্টককঙ্করিত হইয়াছে। এ দেশের জাতীয় জাগরণ মিথ্যা নহে। আমাদের বিশ্বাস, ভারতের এই জাতীয়তাবোধের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিলে উভয় জাতির মধ্যে কোন আপোষ সম্ভবপর হইবে না। ভারত উন্নতির পথে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। এখন ভারত আপনার অবস্থার কথা আপনি বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে। সুতরাং আমরা স্পষ্ট করিয়া জানাইতে চাই যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থায় ভারতবাসীর ইচ্ছাশক্তিই কার্য করিবে। সেই ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণে বাধা না দেওয়াই আমাদের নীতি হওয়া কর্ত্তব্য। সকল শ্রেণীর রাজনীতিকই এই নীতির পক্ষপাতী। আমরা এই নীতির সমর্থক ও ইহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্। রাজশক্তি যদি এই নীতি অনুসরণ করেন, তাহা হইলে গোল টেবল বৈঠকের সাফল্য বহুল পরিমাণে সম্ভব হইবে।"

যথার্থ খৃষ্টভক্ত য়ুরোপীয় শান্তিকামী, জগতে সকল জাতিকেই পরস্পর বন্ধুত্ব ও সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে দেখিলে তৃপ্তিলাভ করেন, কেন না, তাঁহাদের আদর্শ-দেবতা শান্তি ও প্রেমের অবতার। কিন্তু এরূপ খৃষ্টানরা সংখ্যায় কয় জন? সার মাইকেল ওডয়ার, সার রেজিনাল্ড ক্রাডক, লর্ড সিডেনহাম, লর্ড লয়েড, লর্ড মেষ্টন, মিঃ চার্চ্চহিল, লর্ড রেডিং, মিঃ লয়েড জর্জ্জ প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদীরাও খৃষ্টান। তাঁহারা ভারতের অধিবাসীকে কিরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে চাহেন? 'টাইম্‌স', 'ডেলি মেল', 'ডেলি টেলিগ্রাফ' 'অবজারভার' প্রমুখ শক্তিশালী বৃটিশ সংবাদপত্র-সমূহও এ বিষয়ে কি অভিমত পোষণ করেন?

এই গোল টেবল বৈঠক বসিবার পরেও কোন কোন বৃটিশ সংবাদপত্র এবং সাম্রাজ্যিক ভারতের বিষয়ে কি বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। 'পেটরিয়ট' নামক একখানা সংবাদপত্র লিখিয়াছেন,—"ক্ষুদ্র কংগ্রেস দল ভারতে বৃটিশ পার্লামেন্টের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অবসান করিয়া দিতে চাহে। কিন্তু যদি বৃটিশ কর্তৃত্ব অপসারিত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র কলহপরায়ণ পাশ্চাত্য বিদ্যায় অসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজনীতিচর্চ্চাকারীর দল এক মাসও ভারত শাসন করিতে পারিবে না, ঘরোয়া ঝগড়াও দমন করিতে পারিবে না।"

নেপালের ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ দূত কর্ণেল সার ফ্রান্সিস

...নার 'ডেলি একস্‌প্রেস' পত্রে লিখিয়াছেন :—"ভারত বলিয়া কোন দেশ নাই। ভারত য়ুরোপের মত অনেক দেশ, অনেক জাতি ও অনেক ধর্ম্মের সমবায়ে গঠিত। সুতরাং ভারতবাসী দাবী করিতেছে—এ কথা বলা একবারেই ভুল। ইংরাজই ভারতকে রাজনীতিক একতায় বন্ধন করিয়াছে, এই হেতু ইংরাজ ভারতকে এক করিয়া রাখিবার একমাত্র অধিকারী। ভারতের কোন নেটিভই এই দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার রাখে না।"

মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চহিল পূর্ব্বে অনেক কথা বলিয়াছেন, আবার সে দিনও সোজা কথা বলিয়াছেন,—"শাসন কর ও ভারতবাসীকে কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখ। উহাই ভারতে আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।"

লর্ড মেষ্টনও সম্প্রতি বলিয়াছেন, "বৃটেন ভারতের পথি-প্রদর্শক ও অভিভাবকরূপে এখনও বহু দিন অবস্থান করিবে, এই কর্ত্তব্য ত্যাগ করা এখন বৃটেনের পক্ষে অসম্ভব। জনরব উঠিয়াছিল, হিন্দু ও মুসলমানরা একযোগে গোল টেবলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করিবে। এ গুজব যে সত্য নহে, ইহা আনন্দের কথা। যে কথার অর্থ সাম্রাজ্য-বৈঠকও করিতে পারেন নাই, ভারত সেই স্বায়ত্তশাসন চাহে, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে বাহির হইয়া যাইবার অধিকারও দাবী করা হইয়াছে। যাহা অসম্ভব, তাহা লইয়া মাথা ঘামান বৃটিশ জাতির ধাতুসহ নহে। যতক্ষণ শয়তানের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, ততক্ষণ শয়তানকে সেলাম করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

'ডেলি মিরার' পত্র লিখিয়াছেন,—"ভারতের রাজনীতিক ক্ষেপার দল মনে ভাবিয়াছে, বৃটিশ রাজ হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছেন। এই দলের কর্ত্তা গন্ধী। এই জন্যই ভারতবাসীরা অসম্ভব সংস্কারের জন্য চীৎকার করিতেছে। এমন কি, তাহারা এখন আর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চাহিতেছে না, চাহিতেছে স্বাধীনতা। যাহারা ভারতের বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহারা জানে, আমাদের এই জমীদারী (dependency) নানা জাতি নানা ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধে জরজর—এজন্য এ দেশবাসী স্বায়ত্তশাসন পাইবার পক্ষে একবারেই অনুপযুক্ত। গণতন্ত্রের আদর্শ প্রাচ্য জাতিদের ধারণার অতীত।"

এইরূপ অসংখ্য মণি-মাণিক্য উদ্ধৃত করা যায়। এ দেশের অন্নে যাহারা পুষ্ট হইতেছেন, এ দেশের জল-বায়ুতে যাঁহারা বসবাস করিতেছেন, সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানও কম যান না। কলিকাতার স্কটদিগের সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজের উৎসবে চেয়ারম্যান কর্ণেল আর্থার বলিয়াছেন, "এ দেশের মূক জনসাধারণকে বৃটনরা রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। বৃটিশ সিভিল সার্ভ্যাণ্ট, বৃটিশ পুলিস এবং বৃটিশ সৈন্য সেই কর্ত্তব্য পালন করিতেছে ও করিবে। বৃটনরা এ দেশে থাকিতে আসিয়াছে। তাহারা ভারত-বাসীকে সাহায্য করিতে চাহে। কিন্তু যদি ভারতীয়রা সে সাহায্য না চাহে—সংখ্যায় অল্প কতক ভারতবাসী যদি সে সাহায্য না লইয়া গর্জ্জন ও দংশন করিতে চাহে, তাহা হইলে যে আত্মশক্তিতে প্রত্যয় রাখিয়া বৃটনরা জার্ম্মাণ যুদ্ধ জয় করিয়াছে, সেই প্রত্যয় রাখিয়া বৃটনরা এ ক্ষেত্রেও এই শ্রেণীর ভারতবাসীকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিয়া ভারত শাসন করিয়া যাইবে।"

'পাইওনিয়ার' এক দিন ভারতকে তাঁহার জাতির 'ব্যাঘ্র-প্রকৃতির' ভয় দেখাইয়াছিলেন। প্রবাসী বৃটন ওয়াটসন স্মাইদও এক দিন ভারতবাসীকে 'দাঁত' দেখাইয়াছিলেন। কর্ণেল আর্থারও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। এ সব কুল-তিলক থাকিতে গোল টেবল বসাইয়া আপোষের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা নহে কি?

—

মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়

ভারত সরকারের প্রত্যেক সাপ্তাহিক বিবরণে দেখা যায়, তাঁহারা জগতের লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, বিরাট জনসাধারণের উহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। এদেশের ও বিলাতের বৃটনরাও এই সুরে পোঁ ধরিয়া থাকেন। কেহ কেহ মূক জনসাধারণকে কংগ্রেস বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কবল হইতে রক্ষা করা বৃটনের এদেশে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত করেন। সরকারও মূক জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য—তাহাদের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দেশে অর্ডিনান্সের উপর অর্ডিনান্স জারী করেন ও ধর্ষণনীতি প্রবর্ত্তন করেন, এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে জনসাধারণের জন্য এই সব কঠোর ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহাদেরই সহিত পিকেটিং, খাজনা বন্ধ প্রভৃতি লইয়া প্রায়ই পুলিসের সংঘর্ষ হয়। এই সে দিনও বিহারে এইরূপ এক সংঘর্ষ হইয়াছে এবং উহার ফলে মানুষ হতাহতও হইয়াছে।

বাঙ্গালার মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার পুলিসের সহিত যাহাদের বার বার সংঘর্ষ হইয়াছে এবং যাহারা লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন ভঙ্গ করিয়া অথবা খাজনা বন্ধ করিয়া পুলিসের

সুনজরে পড়িয়াছে, তাহারা কাহারা? তাহারা ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নহে, তাহারা নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমিক। তাহাদের উপর কিরূপ অনাচার আচরিত হইয়াছে, তাহা বে-সরকারী তদন্ত কমিটীর রিপোর্টেই সুপ্রকাশ। শুনা যায়, তাহাদের মধ্যে বহু নরনারী পিতৃ-পিতামহের ভিটাবাড়ী, বাগান-পুকুর, ক্ষেত-খামার এবং শস্যসম্পদ ফেলিয়া জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছে। তাহারা কি মূক জনসাধারণ নহে?

গুজরাটের বোরসাদ বরদোলি প্রভৃতি তালুকে কি হইয়াছে? প্রকাশ, এই সমস্ত তালুক হইতে ন্যূনাধিক ৮০ হাজার নর-নারী বৃটিশ রাজ্য ত্যাগ করিয়া সামন্ত-রাজ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! তাহারা কাহারা? তাহারা কি মূক জনসাধারণ নহে?

কায়রা জেলায় বৃটিশ সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের এলাকার মধ্যে নানা স্থানে ঘুরিয়া প্রজাগণকে স্বগ্রামে থাকিবার জন্য অনুনয়-বিনয় ও ভয়প্রদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছে। কলেক্টর, কমিশনার, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এসিষ্টাণ্ট কমিশনার, মামলাতদার তালাতি, পেটেল—কেহই ক্রটি প্রদর্শন করেন নাই। সুনাভ, বোচামেন, রাস, অস্থলাভ প্রমুখ বহু গ্রামের অধিবাসীকে তাঁহারা গ্রাম না ছাড়িতে অনুরোধ-উপরোধ করিয়াছেন। কিন্তু সত্যাগ্রহী কৃষকরা কিছুতেই বৃটিশ শাসনাধীনে থাকিতে সম্মত হয় নাই। কোন কোন গ্রামের অধিবাসী তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও সম্মত হয় নাই! তাহারা দূতদিগকে বলিয়াছে, "আমরা তোমার সাহেবকে জানি না, তাহাকে দেখিতে যাইব কেন? কিন্তু যদি গন্ধীজী বা সর্দ্দারজী (বল্লভভাই পেটেল) আমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে এখনই যাইব।"

অস্থলাভ গ্রামের মণ্ডল তুলসীভাই বহু সাধ্যসাধনার পর কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি কমিশনারকে বলেন, "যতক্ষণ না মহাত্মাজী ও অন্যান্য নেতা কারামুক্ত হইয়া আমাদিগকে খাজনা দিতে বলেন, ততক্ষণ আমরা এক কড়িও দিব না। আমরা এখানে (রাজন্তরাজ্যে) বেশ আছি, যত দিন ভগবান্ এখানে রাখিবেন, তত দিন থাকিব। আমরা কাহাকেও ভয় করি না, কেন না, ভগবান্ ভারতের অসংখ্য অধিবাসীর ন্যায়সঙ্গত মুক্তিযুদ্ধ স্বয়ং দর্শন করিতেছেন।"

ইহা কি কোন আন্দোলনকারী শিক্ষিত কংগ্রেসওয়ালার কথা? তবে?

বোরসাদ তালুকের মামলাতদার, মিঃ গ্যারেটকে ও অন্যান্য বহু সরকারী কর্ম্মচারীকে লইয়া গন্ধীনগরে গিয়াছিলেন। ঐ স্থানটি বোরসাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্য রাজ্যে অবস্থিত। এই রাজ্যে রাস ও অন্যান্য বৃটিশ রাজ্যের গ্রামের ৮০ হাজার প্রজা হিজরাৎ করিয়াছিল। মিঃ গ্যারেট ও প্রজাদের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল :—

মিঃ গ্যারেট।—তোমরা কেন এখানে উঠিয়া আসিয়াছ?

প্রজারা।—তোমাদের কর্ম্মচারী ও পুলিস আমাদের উপর এমন অনাচার আচরণ করিয়াছে, যাহাতে আমাদের গ্রামত্যাগ করিয়া এখানে আসা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না।

মিঃ গ্যারেট।—তোমাদের নেতা দাদুভাই দেশাই ২ হাজার টাকা খাজনা দিয়াছে। তবে তোমরা দিবে না কেন?

প্রজারা।—কেহ খাজনা দিয়াছে, এমন কথা আমরা জানি না। আমাদের খাজনা দিবার টাকা আছে, কিন্তু সমস্ত দেশের লোকও যদি খাজনা দেয়, তাহা হইলেও মহাত্মা গন্ধী যদি মুক্তি পাইয়া আমাদিগকে খাজনা দিতে না বলেন, তবে খাজনা দিব না। আমরা যথেষ্ট অত্যাচার সহ্য করিয়াছি। আমাদের ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, আমাদের জিনিষ-পত্র লইয়া গিয়াছে, আমাদের ক্ষেত-খামার বাজেয়াপ্ত করিয়াছে এবং ক্রোকের ছুতায় আমাদের শস্য লুঠ করিয়া লইয়াছে অথবা ধ্বংস করিয়াছে। আমরা খাজনা কিছুতেই দিব না!

এই ভাবেরই কথা হইয়াছিল। কেহ বলিল, "যদি রাস গ্রামের সকলেই খাজনা দেয়, তাহা হইলেও আমি দিব না।" অপর এক জন বলিল, "আমার ২ শত বিঘা জমী আছে, কিন্তু আমি এক পয়সাও খাজনা দিব না।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "প্রয়োজন হইলে আমরা জঙ্গলে গিয়াও বাস করিব, কিন্তু তথাপি রাসে আর ফিরিয়া আসিব না।"

এ সকল কথা শুনিবার পরেও কি কমিশনার গ্যারেট বলিবেন যে, এই আন্দোলনের সহিত জনসাধারণের কোন সম্পর্ক নাই?

সংবাদপত্র-সেবক ও ন্যায়বিচার

আইন অমান্য আন্দোলনের সম্পর্কে এ দেশে বহু সংবাদপত্রসেবী এ যাবৎ লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হইয়াছেন। যে সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা যথার্থই জানিয়া শুনিয়া আইন অমান্য করিয়াছেন, সে সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা দণ্ডিত হইলে জনসাধারণের কিছু বলিবার নাই; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই তাহা হয় না। বোম্বাইএর 'ক্রণিকল' পত্রের সম্পাদক মিঃ মহম্মদ ব্রেলভির প্রতি বিচারে যে দণ্ডাদেশ হইয়াছে, তাহা কি সত্যই ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে?

মিঃ ব্রেলভির বিচার হইয়া গিয়াছে, তিনি আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছেন। এই বিচার সম্বন্ধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, ইহা ঠিক আইনসঙ্গত হয় নাই। কেন হয় নাই, বুঝাইতেছি।

'ক্রণিকল' পত্রে বোম্বাই 'ওয়ার কাউন্সিলের' একটি কর্ম্মসূচির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা ওয়ার কাউন্সিলের কার্য্যের সাহায্য করা হইয়াছে কি না, এবং ঐ সাহায্য করা ফৌজদারী আইনের সংশোধন আইনের (Cr. Law. Am. Act) ১৭ (১) ধারা অনুসারে হইয়াছে কি না, তাহাই এই মামলায় বিচারকের দেখা কর্ত্তব্য। ইহা হইতে দুইটি প্রশ্নের উদ্ভব হয় :—(১) কোন বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে মাত্র কোন একটি সংবাদ প্রকাশ করিলেই উক্ত আইনের ধারা অনুসারে অপরাধ হয় কি না, (২) এ ক্ষেত্রে ওয়ার কাউন্সিলের কর্ম্মসূচি কেবল সংবাদ হিসাবেই প্রকাশিত হইয়াছিল, না উহার কর্ম্মের সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রথম দফার প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সংবাদপত্রের যে সকল অধিকার আছে, সেই অধিকার অনুসারে কেবলমাত্র একটি সংবাদ প্রকাশ করা অপরাধে সম্পাদক বা মুদ্রাকর দণ্ডিত হইতে পারেন না। যদি কোন বে-আইনী প্রতিষ্ঠান কোন সভার বা শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করে এবং তাহার ফলে উহার সদস্যগণকে পুলিস লাঠিবেটন চালাইয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় বা গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেয়, তাহা হইলে ঐ সংবাদ প্রকাশের সময়ে ঐ বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের সভা-শোভাযাত্রার অনুষ্ঠানের সংবাদও কি প্রকাশিত হইলে আইনের ধারা সংবাদ-প্রকাশকের উপর জারী করা হইবে? এমন সংবাদ ত সংখ্যাতীত পরিমাণে এ দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, অথচ উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতেছে না। তবে?

এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্র বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মসূচির উদ্দেশ্যের কোনরূপে সহায়তা করার বিপক্ষে পুলিস কমিশনারের

মিঃ ব্রেলভি

মিঃ ব্রেলভি ও ফ্রী প্রেসের মিঃ সদানন্দ রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। মিঃ সদানন্দের মামলা বিচারাধীন, সুতরাং সে সম্বন্ধে বলিবার এখন কিছু নাই। তবে এইটুকু বিশেষ লক্ষ্য করিবার যে, তাঁহার মামলা বিচারাধীন থাকাকালে পাছে তাঁহার ফ্রী প্রেসের সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটে, এই আশঙ্কায় যখন তিনি ঐ ভার হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার শিক্ষিতা পত্নী স্বয়ং সেই ভার গ্রহণ করেন। যাঁহারা বোম্বাই সহরে শ্রীযুক্ত সদানন্দ ও তাঁহার বিদুষী পত্নীর আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, এই মহীয়সী মহিলা স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণীরূপে সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া মধুর চরিত্রগুণে অতিথি-অভ্যাগতকে সেবা-পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে অধুনা এই প্রকৃতির নারীর আবির্ভাব হইতেছে, ইহা আনন্দের ও গর্ব্বের কথা।

আদেশ প্রকাশ করিয়াছিল; সুতরাং এই সংবাদ প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ওয়ার কাউন্সিলের কার্য্যের সংবাদ প্রকাশ না করে, তাহা হইলে সে সংবাদপত্রের অস্তিত্বের প্রয়োজন কি? এমন সংবাদ ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রেও প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাতে কিরূপে আইনের ধারা প্রয়োগ হইতে পারে? মিঃ ব্রেলভি এই দুইটি সংবাদই পাশাপাশি প্রকাশ করিয়া আইনের ধারা অগ্রাহ্য ত করেনই নাই, বরং এ বিষয়ে সরকারকে সাহায্যই করিয়াছেন; কেন না, ওয়ার কাউন্সিলের কর্ম্মসূচি যে আইন-ভঙ্গের পরিপোষক, তাহা সাধারণকে বুঝাইবার অন্য কি উপায় আছে? সরকার এ যাবৎ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত প্রতিষ্ঠান-সমূহের ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচিসমূহ ইহা না হইলে কিরূপে জানিতে পারিবেন? তাঁহাদের গোয়েন্দা পুলিসের এই ভাবের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করা সাধ্য ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, বিচারক যদিও স্বীকার করিয়াছেন যে, লোকের উদ্দেশ্য বা মনের ভাব কি ছিল, ইহা বুঝিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। অথচ তিনি এ ক্ষেত্রে বলিয়াছেন, এ নিয়মের যে নমন বা সঙ্কোচন করা যায় না, তাহা নহে; অন্যায় করিবার উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক, বর্ত্তমান আইনে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা আইনের উদ্দেশ্য; যদি আইনে ইহার বিপরীত অর্থ বুঝাইত, তাহা হইলে সে কথার আইনে উল্লেখ থাকিত। বিচারক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া আপনার কথার আপনিই প্রতিবাদ করিয়াছেন। কারণ, যদি অপরাধের সারই হয় উদ্দেশ্য—অর্থাৎ উদ্দেশ্য বুঝিয়াই যদি অপরাধের অস্তিত্ব নির্ণয় করা হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা-প্রণেতাদের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, তাঁহারা কেবল তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বের ফতোয়ার জোরে উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্যকে অপরাধমূলক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন। আইনে "জ্ঞানতঃ" বা "উদ্দেশ্যচালিত হইয়া",—এই দুইটি কথা নাই, ইহা সত্য। কিন্তু তেমনই উহাতে নাই, "অন্যায় আচরণের উদ্দেশ্য থাকুক বা না-ই থাকুক।" তবে বিচারক কেবল সুবিধার জন্য কিরূপে এক শ্রেণীর কথার সাহায্য লইয়া এবং অন্য শ্রেণীর কথা অগ্রাহ্য করিয়া সুবিচারের প্রত্যাশা করিতে পারেন?

পুলিস ও বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকের উপর চড়াও হইয়া কলিকাতার পুলিস অনাচার আচরণ করিয়াছিল। সে ঘটনার যবনিকাপাত সুন্দরই হইয়াছে। ভাইস চ্যান্সেলার ডাক্তার লেঃ কর্ণেল সুরাবর্দ্দী স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় এই অনাচার ও অনধিকারপ্রবেশের কথা স্বীকার করিয়াছেন। অথচ গভর্ণর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে যে পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছে, তাহাতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এ বিষয়ে পুলিসের সহিত আপোষ-রফা হইয়া গিয়াছে; পুলিস অতঃপর আর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া তথায় অনধিকারপ্রবেশ করিবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও আনন্দে গর্ব্বে গদগদ হইয়া বলিয়াছেন, তথাস্তু। কিন্তু অতীতে যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার কি হইল? যে উদ্ধত উচ্চ পুলিস কর্ম্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিত কর্ত্তৃপক্ষের মুখের উপর বলিয়াছিল, "পুলিস ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যতে আবার এইরূপ অনধিকার-প্রবেশ করিবে",—তাহার উপযুক্ত দণ্ডের কি ব্যবস্থা হইল? আজ বাঙ্গালার ব্যাঘ্র স্যর আশুতোষ জীবিত থাকিলে যবনিকা কি এইভাবেই পতিত হইত?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভাগা অজিতের শোচনীয় অকাল-মৃত্যুর জন্যও কেহ দায়ী হইল না। ইহা হইতেই বুঝা যায় না কি, এ দেশে পুলিসই সর্ব্বেসর্ব্বা, পুলিসের কি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ? অজিত ভট্টাচার্য্য কলেজে ভর্ত্তি হইতে আসিয়া লাঠির আঘাতে আহত হইয়া পরে রাত্রিকালে ইহলোক ত্যাগ করে। তাহার সঙ্গে আরও ৬।৭ জন লোক লাঠির আঘাতে আহত হইয়াছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তদন্ত করিতে একটি কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার অধ্যাপক মিঃ ল্যাংলি ইহার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঢাকার সেই সর্ব্বনাশা ২১শে জুলাই তারিখের ঘটনা সম্পর্কে কমিটীর রিপোর্টে আছে,—

"কার্জ্জন হলের প্রাঙ্গণ এবং ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থ পথে জনতা হইয়াছিল; কতকগুলি পুলিসও তথায় উপস্থিত ছিল। তাহারা ৮।১০ জনকে গ্রেপ্তার ও বেষ্টন করিয়া কার্জ্জন হলের ফটকের কিছু পশ্চিমে দাঁড়াইয়াছিল। কতকগুলি ছাত্র ও অধ্যাপকও ফটকের মধ্যে রেলিংএর ধারে এবং বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র গাঙ্গুলী বাহিরের ছাত্রগণকে ফটকের ভিতরে আসিতে বলিতেছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মোটরে আসিয়া হাজির হন ও প্রায় তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে একখানা বাস-বোঝাই নারী তথায় উপস্থিত হন। অমনই তথায় "বন্দে মাতরম্" উচ্চারিত হয়। পুলিসও অমনই লাঠি লইয়া জনতাকে আক্রমণ করে। কতকগুলি পুলিস ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জনতার উপর লাঠি চালায়, ফলে ৬।৭ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে এক জন অজিত—সে সেই রাত্রিতে ইহলোক ত্যাগ করে।"

অতঃপর কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"আমরা যে সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, অবস্থা এমন সঙ্কীর্ণ হয় নাই, যাহার জন্ম পুলিসকে কার্জ্জন হলে প্রাঙ্গণের ফটকের ভিতরে বাহিরে দণ্ডায়মান ছাত্র ও শিক্ষকগণের উপর লাঠি চালাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। পুলিস লাঠির আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে জনতাকে সাবধান করিয়াছিল বা সরিয়া যাইতে বলিয়াছিল, এমন কোন প্রমাণও আমরা পাই নাই। সাক্ষ্য হইতে আমরা ইহাও জানিয়াছি যে, জনতা পুলিসের লাঠির আক্রমণে কোন বাধা না দিয়া চারিদিকে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে এই অভিমত প্রকাশ করিতেছি যে, কলেজ অঙ্গনের মধ্যে যে প্রচণ্ড লাঠির আক্রমণ হইয়াছিল,তাহার ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ ছিল না।"

অথচ অজিত মুকুলিত যৌবনে ঝরিয়া পড়িল! এই ব্যাপারের উপরেও কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যবনিকাপাত করিলেন? বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দের ও জনসাধারণেরও কি ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডে কোন কিছু কর্ত্তব্য নাই? পঞ্জাবে 'লাহোর দয়ানন্দ অ্যাংলো বৈদিক কলেজের' ব্যাপার কিন্তু কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ সহজে মিটিতে দেন নাই। এখানে পুলিসের বিপক্ষে অভিযোগের নোটিশ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার ফলাফল যাহাই হউক, আদালতে মামলা উঠিলে যে অনেক রহস্যই প্রকাশ পাইবে, তাহাতে ত সন্দেহ নাই।

বিপ্লবীর ধ্বংসলীলা

বাঙ্গালার ও পঞ্জাবের কয়েকটি স্থানে বিপ্লববাদীদের ধ্বংসলীলার অভিনয় হইয়া গেল। এ পথ যাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা এ দেশের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নহে, প্রতীচ্যের হিংসামূলক বিপ্লববাদের অনুকরণে তাহারা কার্য্য করিতেছে। ইহা এ দেশের ধাতুসহ নহে, ইহাতে যে পাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা কোন ধর্ম্মপ্রাণ লোক সমর্থন করিবে না। তাহাদের এটুকু বুঝা উচিত যে, বোমা-রিভলভারে শাসকপক্ষের কর্ম্মচারীকে হত্যা করিলে ফল তাহার অনিষ্টকরই হয়, এক কর্ম্মচারী গেলে তাহার স্থান পূর্ণ করিতে অন্য কর্ম্মচারী আসিবে। অথচ উহারা যে উদ্দেশ্যে এই নিন্দনীয় পথ গ্রহণ করিয়াছে, সে উদ্দেশ্য সাধিতে হইবে না। সরকার পক্ষেরও একটা কথা জানা আবশ্যক, তাঁহারা শক্তিশালী, দুই দশটা বোমা ফেলিয়া বা গুলী ছুড়িয়া কেহ তাঁহাদের সুপ্রতিষ্ঠ শাসনযন্ত্রকে অচল করিতে পারিবে না, এ কথা সত্য। কিন্তু তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য, এ দেশের পক্ষে যে বিপ্লববাদ সম্পূর্ণ নূতন, তাহা এ দেশের তরুণরা গ্রহণ করে কেন? যে পন্থাকে এ দেশের শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক এযাবৎ বিভীষিকার দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, সেই পন্থা তাহারা গ্রহণ করে কেন? মুক্তির কামনা মানুষমাত্রেরই আছে, তাহার আশা পাইয়া আশায় বার বার নিরাশ হইলে মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া মোরিয়া হইয়া উঠে। তখন তাহারা স্বভাববিরুদ্ধ কায করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। অতি ক্ষুদ্র এক শ্রেণীর উত্তপ্তমস্তিষ্ক তরুণ হয় ত এই জন্য এই গর্হিত পথ গ্রহণ করিয়াছে, সেজন্য তাহারা কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে।

মহাত্মা গন্ধী তাঁহার অহিংসার বাণী প্রচার করিয়া এই হিংসাবাদীদের দলপুষ্টিতে বাধা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কষ্ট-সহনের দ্বারা শাসক জাতির দৃষ্টির গতি ফিরাইতে চাহিয়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ,—যদি ইহাতে ফললাভ হয়, তাহা হইলে দেশ হইতে বিপ্লববাদ ও জিঘাংসার প্রবৃত্তি চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সরকার কিন্তু তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, সরকার যদি মহাত্মা গন্ধীকে ও তাঁহার ভাবের ভাবুক অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত নেতৃগণকে মুক্তি প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রভাবে বিপ্লববাদ ক্রমে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে।

আমলাতন্ত্র সরকার ও শাসন-সংস্কার

লর্ড আরউইন উদারনীতিক রাজপুরুষ, ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে এবং তিনি ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী যাহাতে পূর্ণ হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, এইরূপই শুনা যায়। কিন্তু কথা সত্য হইলেও তাহার প্রমাণ কর্ম্মক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। মহাত্মা গন্ধীর সহিত পত্র-বিনিময়ে অথবা প্রচণ্ড ধর্ষণনীতি পরিচালনে তিনি যে মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন, তাহাতে এদেশবাসী তাঁহার উদারতার পরিচয় পাইবে কিরূপে? অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স জারী করিয়া এবং প্রীতিশ্রদ্ধার পাত্র দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃগণকে কারারুদ্ধ করিয়া তিনি তাঁহার উদারনীতির পরিচয় দিতে পারেন নাই। হয় ত এমন হইতে পারে যে, তাঁহার অন্তরে ভিন্নরূপ হইলেও তিনি সিভিলিয়ান ভৈরবীচক্রের প্রভ

ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন নাই। লর্ড সিংহের গভর্ণরীর ইতিহাস আলোচনা করিলে এ কথার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

এই হেতুই কি ভারত সরকারের বিখ্যাত ডেসপ্যাচে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূল পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে? সাইমন রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁহারা যে অভিমত পত্রস্থ করিয়া সাগরপারের কর্তৃপক্ষের সকাশে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে সাইমন রিপোর্টের পরামর্শ অপেক্ষাও ভারতের শাসন-সংস্কারের প্রতিকূল পরামর্শ আছে।

অবশ্য ডেসপ্যাচে মিষ্ট কথার অভাব নাই। ইহাতে বলা হইয়াছে,—"যে শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত করা হইবে, তাহা এমন ভাবে করা উচিত—যাহাতে জাতির পূর্ণ সম্মতি থাকিবে। খুব বেশী রকমের (substantial) ক্ষমতা তাহাদিগকে হস্তান্তরিত করিয়া দেওয়ায় আমাদের অমত নাই; ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ শাসনসংস্কার করিতে যদি আমাদিগকে কিছু বিপদের (risks) সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলেও সে চেষ্টা করিবার সময় আসিয়াছে।"

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! ডেসপ্যাচখানি আলোচনা করিয়া দেখিলে কিন্তু এই কথার অনুরূপ পরামর্শ কোথাও পাওয়া যায় না। প্রথমেই দেখা যায়, ইহাতে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিবার কথা কোথাও পাওয়া যায় না। অচির-ভবিষ্যতে দূরে থাকুক, কোন কালেও ঐ অধিকার দেওয়ার কথা নাই। বরং প্রায় সকল বিষয়ে ডেসপ্যাচ সাইমন রিপোর্টের পরামর্শ অনুমোদন করিয়াছে। সাইমন রিপোর্টের মত ইহা নিখিল ভারত সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রশাসন (Federation) ভারতের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। তবে উহা অচিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব, এ কথাও বলিয়াছে। ইহার মতে রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। অর্থাৎ চাবিকাঠী আমলাতন্ত্র সরকারের শীর্ষস্থানীয়ের হস্তে থাকিবে, সিন্দুক ভারতবাসীর ঘরে থাকিবে। আইন ও শৃঙ্খলার ভারও থাকিবে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে। ব্যবস্থা-পরিষদের সহিত বড়লাটের সম্বন্ধ এখন যেমন আছে, তেমনই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বড়লাট এখনকার মত অর্ডিনান্সও জারী করিতে পারিবেন।

ইহাই হইল ডেসপ্যাচের মূল উপদেশ। অন্য পরে কা কথা, সাম্রাজ্যবাদীদের মুখপত্র 'টাইমসই' ইহাকে বলিয়াছেন,—"The outlook of Despatch is altogether too narrow to help the conference in its main decision," ইহার উপর অন্য মন্তব্যের প্রয়োজন আছে কি?

বাঙ্গালা সরকারের অভিমত ইহার অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে সংস্কারবিরোধী। তাঁহারা প্রদেশেও আইন ও শৃঙ্খলার ভার হস্তান্তরিত করিতে চাহেন না। মন্ত্রিনিয়োগেও তাঁহারা আপনাদের হস্তে ক্ষমতা রাখিতে চাহেন। অন্য কোন কোন বিষয়েও তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার হস্তে অধিকার হস্তান্তর করিতে চাহেন না।

বরং বোম্বাই সরকারকে সর্ব্বাপেক্ষা উদারমতাবলম্বী বলিয়া মনে হয়। সার ফ্রেডারিক সাইকস বোম্বাইএর গভর্ণররূপে অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। বোম্বাই সরকারের অভিমতের মধ্যে এই কয়টি কথা বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে:—

সাইমন রিপোর্টের যে অংশে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্বন্ধে পরামর্শ আছে, বোম্বাই সরকার উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বোম্বাই সরকারের মতে প্রাদেশিক সরকারের মত কেন্দ্রীয় সরকারেরও স্থায়িত্ব ও স্থিতিস্থাপকতা থাকা কর্ত্তব্য। সাময়িক-ভাবে শাসনপ্রণালী প্রচলিত করা কোন সরকারেরই কর্ত্তব্য নহে। সামরিক, বৈদেশিক, রাজস্ব-রাজ্য-বিষয়ক এবং বাহিরের ঋণ সম্বন্ধে বড়লাটের কর্তৃত্ব থাকুক, ইহাতে বোম্বাই সরকারের আপত্তি নাই, কিন্তু অন্যান্য বিভাগ মন্ত্রিগণের হস্তে ন্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা বোম্বাই সরকারের অভিমত। আইন ও শৃঙ্খলা এবং রাজস্ব বিভাগে বোম্বাই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা মন্ত্রীদিগকে হস্তান্তরিত করিবার ঘোর পক্ষপাতী; কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা বলিয়াছেন, মন্ত্রীরা ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট পূর্ণরূপে দায়ী থাকিবেন, ইহাতে যদি কোন সঙ্কট বা বিপদ উপস্থিত হয়, তাহার সম্মুখীন হওয়াও কর্ত্তব্য, নতুবা সংস্কার নামমাত্রই হইবে, সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না।

বোম্বাই সরকার এইরূপ উদার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় ও বাঙ্গালা সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ বাঙ্গালা সরকার একবারেই যেন সংস্কারের বিপক্ষে খড়্গ-হস্ত। সুতরাং বেশ বুঝা যায়, যাহারা বহুকাল একচ্ছত্র ক্ষমতা উপভোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা সহজে সেই ক্ষমতা হস্তচ্যুত হইতে দিবে না। সে ক্ষেত্রে গোল টেবলই বসান হউক বা বাদামী টেবলই বসান হউক, ফল যাহা হইবে, তাহা জানা কথা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ঘুঘু ও ফাঁদ

জীবন গিয়া ঘরে প্রবেশ করিলে বলাই সহসা কি-এক মতলব স্থির করিয়া জোর-পায়ে বালিগঞ্জের ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। দু'দিকেই সিগনাল্ পড়িয়া আছে। দু'-লাইনেই এখনি ট্রেণ আসিবে। ষ্টেশনে গ্যাসের বাতি জ্বলিতেছে। তারি আলোয় দৃষ্টি চালাইয়া সে দু'ধারের প্লাটফর্ম্ম দেখিয়া লইল,—ঐ যে সেই ভূধর-পাত্রটি! মুখে বিড়ি দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কলিকাতা-যাত্রী ট্রেণ যে প্লাটফর্ম্মে লাগিবে, সেই প্লাটফর্ম্মে।

তাড়াতাড়ি লাইন্ টপ্কাইয়া সে ভূধরের সামনে আসিয়া কহিল,—শুনচেন মশায়?

—কে? বলিয়া ভূধর একটু চমকিয়া চাহিল। বেচারী বিড়ির ধোঁয়ায় বুঝি, সত্ত-দেখা কিশোরী বধুর মুখের আব্‌ছায়া লক্ষ্য করিতেছিল!

বলাই কহিল—আমি জীবন বাবুর বাড়ী থেকে আসচি। তিনি আমায় পাঠালেন খপর দিতে...

ভূধর কহিল—কিসের খপর?

বলাই কহিল—আপনি তাঁর মেয়েকে এইমাত্র দেখে এলেন না?

ভূধর হাঁ করিয়া বলাইয়ের পানে চাহিয়া রহিল। অদূরে অন্ধকারের মধ্য হইতে চলন্ত ট্রেণের একটা গম্ভীর শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। বলাই সে শব্দ শুনিল। সে কহিল—বাড়ীতে কারো এ-বিয়েয় মত নেই। তাই জীবন বাবু বলে পাঠালেন, আপনি অন্য জায়গায় পাত্রী ঠিক করুন—এ পাত্রীর সঙ্গে আপনার বিবাহ হতে পারে না।

ভূধরের চোখের সামনে ষ্টেশনের বাতিগুলা নিমেষে ম্লান পাণ্ডুর হইয়া গেল—অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া তার দৃষ্টিকে যেন রুদ্ধ করিয়া দিল! একটা ঢোক গিলিয়া সে কহিল—কি রকম?

বলাই কহিল—তাই। এর মধ্যে আর রকম-বেরকম নেই! বুঝলেন,—জীবন বাবুর মেয়ের সঙ্গে আপনার বিবাহ হবে না, হতে পারে না।

ভূধর সাশ্চর্য্যে কহিল—কেন? হতে পারে না কেন?

বলাই কহিল—ঐ তো বল্লুম, বাড়ীতে কারো মত নেই। আপনি বুড়ো মানুষ—বুড়ো বরে মেয়ে দেওয়া হবে না!

ট্রেণ কাছে আসিয়াছিল—দু'দিক হইতে দু'খানা। যেন মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, এমনি রুদ্ধ গম্ভীর ধ্বনি! ভূধর কহিল—হবে না বললেই হলো! বটে! জীবন চক্রবর্ত্তী গুণে দু'শোখানি টাকা নিয়েচে,—কাগজে সই দিয়েচে,—লিখে দিয়েচে, বিয়ে দেবো,—মেয়ের গহনা গড়াতে হবে, তার টাকা! হুঁঃ—আমার সঙ্গে চালাকি খাটবে না! জেলে ব'সে ঘরগা গুণতে হবে তা হলে! আমি উকীল চরিয়ে খাই হে ছোকরা! তুমি তো জীবন বাবুর ছেলে? তোমার বাবাকে বলো, এ ছেলের হাতে মোয়া নয়! উনি কত বড় ঘুঘু হয়েচেন, দেখে নেবো!

ট্রেণ সশব্দে আসিয়া প্লাটফর্ম্মে ঢুকিল। ভূধরের কথায় বলাই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। ভূধর এ বলে কি? বাবা ওদিকে—কি সর্ব্বনাশ! তার মুখে কথা ফুটিল না।

ট্রেণ থামিয়াছিল। একখানা থার্ড ক্লাশ কামরার দ্বার ঠেলিয়া খুলিয়া বলাইয়ের পানে চাহিয়া ভূধর কহিল,—তুমি একরত্তি ছেলে, তোমার সঙ্গে আর কি কথা কবো! তবে তোমার বাবা-মশাইকে বলো, ভূধর চাটুয্যে তামাসার জন্য পয়সা বার করে না। অনেক মাথা খাটিয়ে পয়সা রোজগার করতে হয়!...আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার আগে তিনি নিজের বলটুকু যেন চিন্তা ক'রে দেখেন! বুঝলে? তাঁকে বলো—ভুলো না।

বকিতে বকিতে ভূধর ট্রেণের কামরায় ঢুকিল। প্লাটফর্ম্মে ভিড়ের সীমা নাই! কলরব প্রচণ্ড! ভূধরের কথা শেষ হইলে তার পানে চাহিয়া বলাই শিহরিয়া উঠিল। ও কি চোখ! মন্দিরের কার্ণিশে গাছের ডালে কবে সেই রাত্রে পাখীর ছানা পাড়িতে গিয়া সে দুটা চোখ দেখিয়াছিল, বুঝি, পেচকের চোখ! অন্ধকারের মধ্যে যেন আগুনের ডেলা! আজ ভূধরের চোখে সেই কবে-দেখা চোখের মত আগুনের হল্কা! সে ভূধরের দৃষ্টি এড়াইবার অভিপ্রায়ে ভিড়ের মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া দিল। ট্রেণও চকিতে বাঁশী বাজাইয়া দেহ-ভার টানিয়া নিজের পাড়ি সুরু করিল।

ট্রেণ চলিয়া যাইবার অনেকক্ষণ পরে বলাই ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিল। বাড়ীর তখন স্তব্ধ ভাব! জীবন খাইয়া কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। সুবোধ ভাই দুটি চিরাচরিত প্রথায় পাঠ্য পুস্তকে মনোনিবেশ করিয়া দুনিয়া ভুলিয়া আছে! মা? শান্ত?—ঐ যে রান্নাঘরে জটলা চলিয়াছে!

বলাই আসিয়া রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইল। মা কহিলেন,—কোথায় আবার তুই গিয়েছিলি এর মধ্যে? নে খেয়ে নে, বাবা,—খেয়ে সবাইকে ছুটি দে···

বলাই কহিল,—খাবো। কিন্তু তার আগে আমার একটা কথা শুনে যাও মা···

মার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! দুই চোখ বিস্তারিত করিয়া মা কহিলেন—কি কথা রে?

মা বলাইয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলাই কহিল,—তোমার ঘরে চলো। এখানে বলবো না।

বুকে উদ্বেগ বহিয়া মাকে তাই করিতে হইল। বলাই তখন তার অন্তর্দ্ধানের কাহিনী খুলিয়া বলিল। বাপ অবশেষে মেয়ের বিবাহের ওজুহাতে পয়সা-রোজগারের যে বিশ্রী উপায় অবলম্বন করিয়াছে; এবং সে রোজগার যে বলাই ঘটিতে দিবে না, তাও প্রকাশ করিয়া বলিতে সে ক্ষান্ত হইল না।

শুনিয়া মা একেবারে কাঠ! কহিলেন,—উপায়?

বলাই কহিল,—টাকাগুলি মানে-মানে ফেলে দিতে বলো। না হলে যে রকম ছুঁচো ও লোকটা, শেষে ফ্যাসাদ না বাধিয়ে ছাড়বে না।

বলাই চুপ করিল,—মার মুখে কথা নাই। বলাই কহিল—এ ফ্যাসাদ বাধলে আমার সাধ্য থাকবে না, হাড়কাঠে নিজে সেধিয়ে বাবাকে রক্ষা করবো! বুড়ো বয়সে একটা বিভ্রাট ঘটাবে শেষে!

যোগমায়া দেবী নিরুপায় স্বরে কহিলেন,—কি যে বরাতে আছে, বুঝি না। ক'দিকে রক্ষা করবো? কোথায় কি ক'রে আসচে—বলেও না তো!

বলাই কহিল— তুমি স্পষ্ট বলো, আর ঐ টাকা হাতিয়ে নাও, আমি ফিরিয়ে দিয়ে আসবো। আর কি লিখে পড়ে দিয়ে এসেচেন, সে কাগজ-পত্রও নিয়ে আসবো!

যোগমায়া দেবী কহিলেন—আমায় হাঁকিয়ে দেবে। যে মেজাজ··· !

বলাই কহিল—বুঝিয়ে বলো। মেজাজ বলে এখন যদি ছেড়ে দাও, এর পর তাহলে চোখের জলে সারা হতে হবে! শুধু চোখের জল কি! ব্যাপার জানাজানি হলে পাড়ায় মুখ দেখানো ভার হবে!

যোগমায়া দেবী থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—দুনিয়ায় এত ফন্দী-অভিসন্ধিও চলে! এবং তা চালাইবার লোকেরও অপ্রতুল নাই—ভগবান! তাঁর চোখের সামনে কূল-হারা চিন্তার সাগর একেবারে উত্তাল হইয়া উঠিল।

বলাই কহিল,—তোমার পণ্ডিত ছেলেদের বলো না··· তাঁরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান—তাঁদেরো ইজ্জৎ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বুঝিয়ে বলো, ওঁরা যদি সুবুদ্ধি দিয়ে রাজী করাতে পারেন!

যোগমায়া দেবী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—দেখি। তুই খেয়ে যা, খেয়ে নিগে। তোর জন্যেই আমরা ক'জনে ব'সে আছি রে। তুই বোস গে, আমি সুবলদের কথাটা বুঝিয়ে বলি!

বলাই রান্নাঘরে গিয়া শান্তকে কহিল,—ভাত দে ভাই শান্ত···

শান্ত কহিল,—মা কোথায় গেল?

বলাই কহিল,—মা আসচে!

শান্ত ভাত বাড়িতে বসিল। তার মন অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, কি কথা? ছোটদা এখানে মাকে বলিতে পারিল না! মাকে ডাকিয়া লইয়া গেল! তারি বিবাহের?···কিন্তু কি এমন কথা? তবে কি ছোটদাও রাজী হইয়া গিয়াছে? ঐ বুড়ো বরটাকে ধরিয়াই···

তার বুক হু-হু করিয়া উঠিল।

বলাই পিঁড়িতে বসিয়া কি ভাবিতেছিল, সহসা শান্তর দিকে দৃষ্টি পড়িল। শান্তকে যেন অত্যন্ত কাতর দেখাইতেছে! ঐ বুড়াটার জন্য?···সে কহিল,—তুই ভাবিস নে শান্তু—ও বুড়োর বিয়ের গঙ্গাযাত্রা যদি আমি না করি, তবে আমার নামই বলাই নয়!···

বলাই ভাত খাইতেছিল, ওধারে মার স্বর তীব্র হইয়া উঠিল। মা বলিতেছিলেন,—সংসারের কোনো উপকারে নেই! স্বার্থপর ছোটলোক কোথাকার! ভালোমানুষির নিকুচি করেচে···ছেলে নয় তো, মিটমিটে ডান্! এমন পাষাণ শত্রুরও হয় না!···

বকিতে বকিতে মা রান্নাঘরে ফিরিলেন। বলাই মার পানে চাহিল। মা কহিলেন,—না, ওঁরা কারো কোনো কথায় থাকতে পারবেন না। আবার লেক্‌চার দিলেন, যে যেমন কর্ম্ম করবে, তেমনি তার ফলভোগ সে করবে! কথা শোনো...ওঁরা পেটের ছেলে! ঐ ছেলেদের দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেচি! হায় রে...বরাত! না হলে এমন বেড়াপাকেও ঘেরে কখনো!

বলাই কহিল,—চুপ করো মা; বকে শুধু মন খারাপ করা বৈ তো নয়!...তোমায় যা বললুম, বাবাকে বলো—শোনেন, ভালো, না শোনেন, দেখি ভেবে চিন্তে—কোনো ফন্দীতে এ ব্যাপার ফাঁশাতে পারি কি না!

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—তাই করি। না বোঝে, যা হবার হোক! তা ব'লে ওঁদের রাজত্ব দেবার জন্তে আমার মেয়েকে আমি বলি দিতে পারবো না। অদৃষ্টে এতে যা ঘটে, ঘটবে!...ওঠ্ মা শান্ত, খেতে বোস্—আমি বেড়ে দি।

শান্ত কহিল,—না, মা, আমিই বাড়ি। তুমি বসো, দু'জনেরই বেড়ে নি একসঙ্গে—হাত করেচি যখন...

মা কহিলেন,—বাড় তবে।...কিন্তু মুখে আর রুচবে না কিছু। এই হাড়ি-মুর্দ্দফরাসের রীত-ব্যবহারের মধ্যে ব'সে মুখে কিছু দেবার প্রবৃত্তিও হয় না।

বলাই কহিল,—মন খারাপ করো না মা, খেতে হবেই তো। যে ক'দিন জোটে, খেয়ে নি, এসো। কথাটা বলিয়া সে মৃদু হাসিল। মা তখনো নিজের মনে বকিতেছিলেন। শান্ত দু'থালা ভাত বাড়িয়া আনিল, কহিল,—বসো মা—জল দে। তুমি না খেলে আমরাও খাবো না। কি বলো, ছোটদা?

বলাই কহিল—তাই!...তুমি ভেবো না, মা। আমি আছি, অথন্তে...কিন্তু এবার তা বলে পরের বোঝা মাথায় বয়ে মুগুর্নি করবো না—এবার নিজের বুদ্ধি খেলাবো পুরোপুরি। দেখি, ঐ হতভাগা পাষণ্ড বুড়ো ব্যাটার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করে তুলতে পারি কি না। আমায় শাসালেন—ঘুঘু! আচ্ছা, তোমরা কত বড় ঘুঘু—দেখচি, দাঁড়াও। আমিও ফাঁদ...এ ফাঁদে ঘুঘুকে বাঁধতে পারি কি না, দেখি!

—

বিংশ পরিচ্ছেদ

উদ্ধার

জীবনের কাছে যোগমায়া দেবী ধীরে ধীরে কথাটা পাড়িলেন। জীবন চোখ রাঙাইয়া কহিল,—এ সব কথা ওঠে কেন? তোলে কে? বলা, বুঝি?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—এ কথা শোনবার জন্যে তো তোলেনি।...

জীবন কহিল—তাকে কে বলতে বল্‌লে যে, ও-পাত্রে আমি মেয়ের বিয়ে দেবো না?

যোগমায়া দেবী মৃদু হাস্তে কহিলেন,—কে আবার বলবে!

জীবন কহিল—ও রকম কথা না উঠলে, সে শুধু শুধু বলেচে যে, দু'শো টাকা নগদ দেছে, মেয়ের গহনার জন্ত। টাকার কথা ওঠে কেন, আমি জানতে চাই।

যোগমায়া দেবী কহিলেন—আর বীরত্বে কাজ নেই। থামো। তোমার লজ্জা হয় না? দু'পয়সা পাবে বলে একটা বুড়োকে এনেচো পাত্র করে! তাও ঐ রকম ইতর, বদ্ লোক!

জীবন কহিল—পয়সা নিয়েচি! পয়সা কেন নেবো না? যে দিন-কাল, পয়সা না দিলে পাত্র মেলে না—এ পয়সা দিয়ে বিয়ে করচে! সেটা বুঝচো?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—আমি বুঝতে চাই না। মেয়ের বিয়ের জন্তে তোমার কাছে হত্যে দিয়ে পড়ি নি তো...

—বিয়ে তো দিতে হবে।

—সে হবে'খন! ছেলের বিয়ে দাও—ভালো ছেলে,—কিছু পাবে নিশ্চয়। তাই থেকে সংস্থান করে...

সে কথা কানে না তুলিয়া জীবন কহিল,—মেয়ের বরাতও তেমনি। তোমার মেয়ে যে! ঐ বিন্দী! কেমন বিয়ে হলো! জামাই কারো বাঁচে, কারো বাঁচে না, সে অদৃষ্ট! কিন্তু কি টাকাটা এলো, বলো দিকিনি...

যোগমায়া কহিলেন—চুপ করো! বিন্দুর বরাত নিয়ে বড়াই করো না। টাকায় তো সব দুঃখ ঘুচবে!

জীবন কহিল,—ব'সে আছো কোটরের মধ্যে—যা চাইছো, পাচ্ছো, টাকার দাম বুঝবে কোথা থেকে, বলো! খেটে রোজগার করতে হতো, তা হলে বুঝতে, টাকা কি চীজ্।

যোগমায়া দেবী কহিলেন—বুঝতে চাই না। তুমি বাবু, মানে মানে ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এসো। ও ফ্যাসাদ জড়িয়ো না! মেয়ের বিয়ে হোক্, না হোক্, আমি ওখানে তা বলে দেবো না।

—দেবো না! মুখের কথা বললেই হলো!…জীবন স্থির নেত্রে স্ত্রীর পানে চাহিল, তার পর স্বর কোমল করিয়া কহিল—এই পাত্রই ঠিক করো—অমত করো না। বুঝ্‌চো! এ আরো আটশো টাকা দেবে—তা ছাড়া গহনা। চাও, শামুর নামে ঐ আটশো টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখো—বিপদে-আপদে কাজে লাগতে পারে। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে—অথচ একটি পয়সা ঘর থেকে খরচ করতে হবে না।

যোগমায়া দেবী কহিলেন—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, মেয়ের বিয়ে এখন থাক্। ভগবানের দায়, ভগবানই উপায় ক'রে দেবেন!

জীবন কহিল—আচ্ছা, সে উপায়ের চিন্তা করা যাবে পরে। এখন ঘুমোতে দাও। সমস্ত দিন যে ধকল সইতে হয়—রাত্রে একটু ঘুমোতে না পেলে শরীর থাকবে না।

যোগমায়া দেবী কহিলেন—টাকা ফেরত দিচ্ছ তুমি কাল? বলো, আমায় কথা দাও।

জীবন কোন কথা কহিল না—পাশ ফিরিয়া শুইয়া চক্ষু মুদিল।

যোগমায়া দেবী তবু ছাড়িতে চান্ না। বারবার অনুযোগ অনুরোধ চলিল—কিন্তু জীবন একেবারে নির্ব্বাক্। বোবার শত্রু নাই! যোগমায়া দেবী মিথ্যা বকিয়া বকিয়া শেষে অদৃষ্টের উপর নির্ভর রাখিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন।

সকালে বৃত্তান্ত শুনিয়া বলাই কহিল—তুমি চুপ ক'রে থাকো মা—বাবাকে বিয়ে স্থির করতে দাও। তুমি কিছুতে হাত দিয়ো না। তার পর আসুক সে পাত্র বিয়ে করতে—ব্যাটাকে যদি শিশুপাল না বানাই তো কি বলেচি!

বেলা হইলে সকলের আহারাদি যথারীতি সারা হইল। সুবোধ পুত্র ছুটি বই-হাতে কলেজে ছুটিল। জীবনও কর্ম্মস্থলে বাহির হইল। গৃহ আবার তেমনি স্তব্ধ—কোথাও যে কোনো চাড় পড়িয়াছে, বা ব্যথা জাগিয়াছে, বাহির হইতে দেখিয়া তা বুঝিবার উপায় নাই।

আরো দশ-বারো দিন এমনি চুপচাপ কাটিয়া গেল। যোগমায়া দেবী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন,—বিবাহের ব্যাপার বুঝি তবে চাপা পড়িল।

ত্রয়োদশ দিনে আহারাদি সারিয়া বলাই মাকে বলিল—পিশিমাদের কোনো খবর নেই, মা—এতদিনে তাদের ফেরবার কথা। সেখানে কি চক্রান্ত চলেছে, কে জানে!

যোগমায়া দেবী কহিলেন—আমারো সেই ভাবনা হয়, বাবা…

বলাই কহিল—কি করি, বলো তো মা? একবার যাবো পিশিমার কাছে দেখা করতে?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—কি করবি তুই…যদিই কিছু হয়?

বলাই কহিল—কি হচ্ছে, দেখি আগে—একটা মতলব মাথায় এসেচে,—সেই ছলে গিয়ে দেখা করবো।

মা কহিলেন—কি মতলব?

বলাই কহিল—বলবো, বাড়ীতে সিঁধ হয়ে গেছে—মহা কাণ্ড, তাই এসেচি পিশিমার কাছে খপর দিতে…

মা কহিলেন—তার পর? বিন্দুর সঙ্গে যে তোর দেখা হবে, তার ঠিক কি? সে হলো শ্বশুরবাড়ী, বিন্দু বাড়ীর বৌ… তার উপর তারা বড়লোক—তাদের বাড়ীর বৌয়ের সঙ্গে তোকে দেখা করতে দেবে কেন?

বলাই কহিল—বিন্দুর সঙ্গে দেখা না হয় নাই হলো, পিশিমার সঙ্গে দেখা তো আটকাতে পারবে না। তাছাড়া যদি দুপুরবেলায় যাই! সে সময় পুরুষ-মানুষরা বাইরে থাকবে—বিশেষ সেই শম্ভু বাবুটি—ওঃ, কি ওস্তাদ ছেলে! এই বয়সেই বিষয়-বুদ্ধির কি চাল্ দেখান্! অথচ আসলে আমি দেখি, একটি অনড্বান্!

—সে আবার কি রে?

—'অনড্বান্' মানে জানো না মা! ইস্কুলে আমরা পড়েচি—ব্যাকরণে 'অনডুহ' শব্দ আছে। পণ্ডিত মশায় একটি ছেলেকে ডেকে বললেন,—মহেশ, তুমি অনড্বান্। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, ও কথার মানে কি, পণ্ডিত মশায়? পণ্ডিত মশায় বললেন, 'অনড্বান্' মানে বাঁড়!

ছেলের কথায় মা হাসিলেন; মুখে যত বড় বড় কথাই বলুক, মনে-জ্ঞানে বলাই এখনো সেই ছেলেমানুষটি আছে! অথচ বড় কথা যা বলে, তা তুচ্ছ করার মত নয়! স্নেহ-ভরে তিনি বলাইয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন।

চাঁদনীরাতে

বসুমতী ব্লক-বিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।
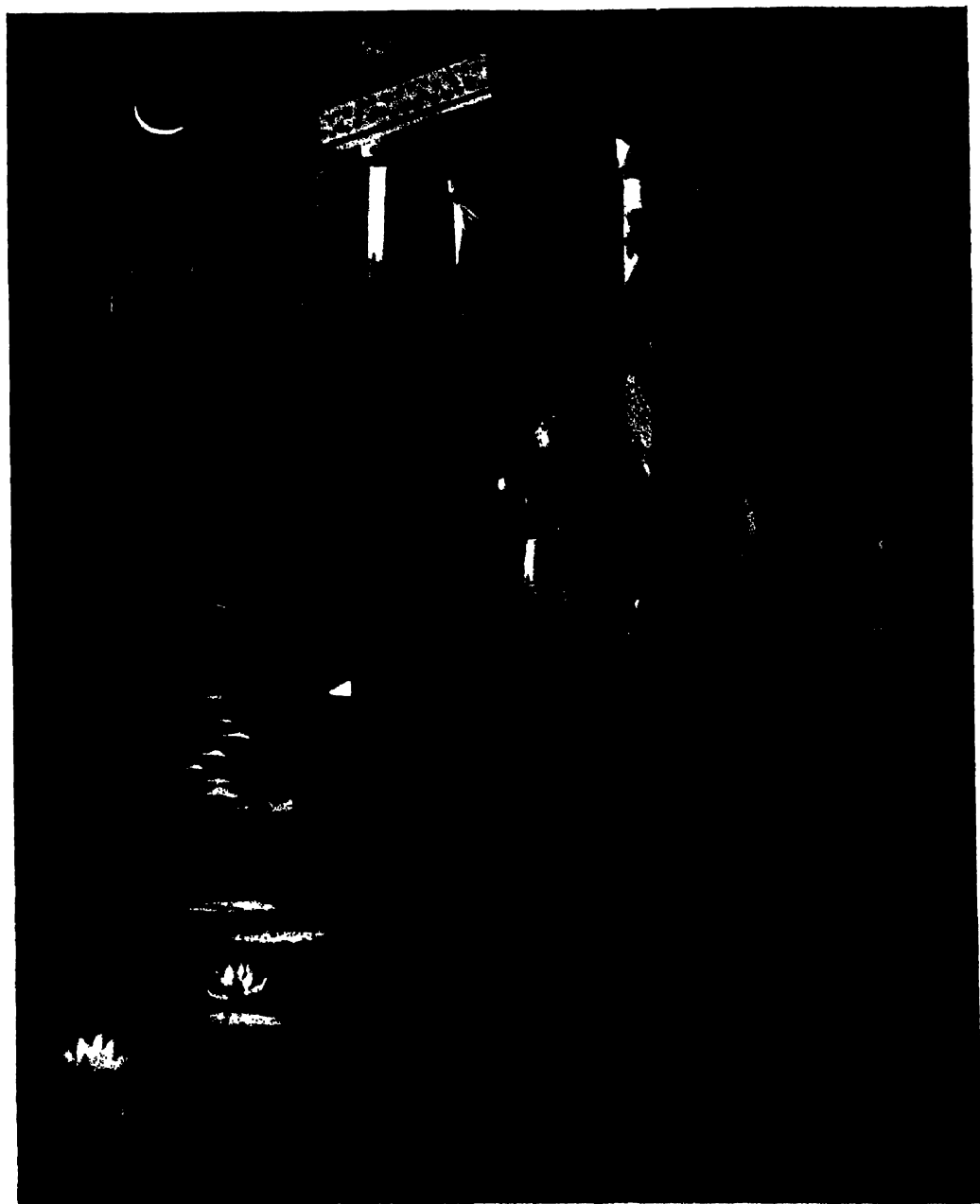
বলাই কহিল,—কি দেখচো মা আমার মুখে ?

মা কহিলেন,—আমার কেবলি মনে হয় বাবা, তুই লেখা-পড়া এমন ক'রে ছেড়ে দিস নে ! তোর এমন মন, যদি মনে করিস তো লেখা-পড়া করলে তুই তোর দাদাদেরও চেয়েও ঢের বড় ঢের ভালো ছেলে হতে পারিস্!

বলাই হাসিয়া কহিল,—তোমার ভালো ছেলেদের পায়ে সেলাম করি মা···লেখা-পড়ার ফল তো দু'বেলা ভোগ করচো মা !···বদ্ ছেলে হয়েই আমি থাকি, তবু যদি ম'রে গেলে মুখে আগুনটুকু পাও !

মা কহিলেন,—তা বড় মিথ্যে বলিস নে!···

বলাই কহিল,—তা হলে কি বলো তুমি ? একবার শ্রীযুত শম্ভু বাবুদের ওখানে যাই ! আমার সন্দেহ হচ্ছে কেমন ! যে গুণধর ছেলে ঐ শম্ভু ! তা ছাড়া আমি বিন্দুকে ব'লে দিয়েছিলুম, কিছু গোলমাল দেখলে চিঠি লিখবে !···

মা কহিলেন,—কিছু লিখেচে ?

বলাই কহিল,—না। ভাবচি, কি ক'রে ও লিখবে ! প্রথমতঃ পোষ্টকার্ড যেন পেলে,—সে পোষ্টকার্ড ডাকে দেওয়াবে কি ক'রে ! বড় লোকের বাড়ী···তাতে যদি ঐ রকম চক্রান্ত চলে, তা হলে বিন্দুকে তো সেই অশোক-বনে সীতা হয়ে থাকতে হয়েচে !

মা কহিলেন,—তা বটে ! তা যাবি মনে করেচিস যা। খপরটীও পাইনি···এত দিন গেছে···। কিন্তু একটা কথা, বাবা···

—কি কথা ?

—কোনো রকম কিছু দেখলে, গোঁয়ার্ত্তুমি করতে পাবিনে ! বল্···তা করবিনে ?

হাসিয়া বলাই কহিল,—না মা, কোনো গোঁয়ার্ত্তুমি করবো না !···

মাকে আশ্বাস দিয়া বলাই কলিকাতায় আসিল। চাঁপাতলার গলি সে জানিত। কিন্তু বাড়ী ? ছোট গলি—সে গলিতে কখানাই বা বাড়ী···লোক-জনকে প্রশ্ন করিয়া বাড়ী আর খুঁজিয়া লইতে পারিবে না ? না হয় গলির প্রত্যেক বাড়ীতে ঢুকিয়া সন্ধান লইবে···

পাঁচ-সাতটা বাড়ী ঘুরিবার পর শম্ভু বাবুর গৃহ মিলিল। বাড়ী যে খুব বড়, বা শম্ভুবাবুরা প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী, তা নয়। এমনি গৃহস্থ···শম্ভুর চালে আর কথাবার্ত্তায় বলাই ভাবিয়াছিল, না জানি, কত বড় লোক ! তা নয় ! বাড়ীর বাহিরের ঘর তালা-বন্ধ। ডাকাডাকি করিতে একটা উড়িয়া ভৃত্য আসিয়া দেখা দিল। তাকে প্রশ্ন করিতে সে কহিল,—এই বাড়ীতেই শম্ভু বাবুরা থাকেন, বালিগঞ্জ হইতে মা-লোক আসিয়াছেন, এক জন বৃদ্ধা আর এক জন বহু-মা ! শম্ভু বাবু বা অপর বাবুরা এখন গৃহে নাই !

ঠিক হইয়াছে। উড়িয়াকে বলাই কহিল, সেই যে বালিগঞ্জ হইতে বুড়া মা আসিয়াছেন, তিনি বলাইয়ের পিসিমা। তাঁকে একবার খবর দিতে হইবে, বাড়ী হইতে ভারী দরকারী খবর সে আনিয়াছে !

ভৃত্য গিয়া সংবাদ দিল এবং পিশিমা আসিয়া বাহিরের কলতলার ধারে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—কে বাবু রে, সদা ?

স্বর শুনিয়া বলাই কহিল,—আমি গো, পিশিমা। তার পর পিশিমার কাছে গিয়া প্রণাম করিল। পিশিমা কহিলেন, —বলাই ! আয় বাবা···

বলাই চারিদিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে কহিল,—খবর তো সব ভালো, পিশিমা ?

উত্তরে পিশিমা দৃষ্টির যে ইঙ্গিত করিলেন, তাহাতে খবর ভালো বুঝাইল না।

বলাই কহিল,—বাড়ী যাবে না ? এত দিন হয়ে গেল—মা বললে, খপর নে···তাই আমি এলুম।

পিশিমা কহিলেন,—যা বলেছিলি, বাবা···সব দলিল লেখা-টেখার কথা চলেছে···নিত্যি উকিল আসচে···তা, বিন্দু কাঠ হয়ে আছে···

বলাই কহিল,—বাড়ী যাবে পিশিমা ? চলো আমার সঙ্গে···

পিশিমা কহিলেন,—যেতে দিচ্ছে না, বাবা···ব্যবহার খারাপ করচে না। খুব যত্ন···

বলাই কহিল,—আমি তা বুঝেচি। তুমি চলো, আমি ব্যবস্থা করচি। বলবো, তোমার ঘরে সিঁধ হয়েচে···পুলিস ঘর খুলতে পারচে না—কিছু কিনারা করতে পারচে না। তোমায় যেতে হবে সেজন্য···

পিশিমার দুই চোখ কপালে উঠিল। পিশিমা কহিলেন, —সত্যি সিঁধ হয়েচে ?···

ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া বলাই কহিল,—ক্ষেপেচো পিশিমা ! আমি বানিয়ে এই কথা বলতে এসেচি। এখন বাবুরা তো

কেউ বাড়ী নেই! তুমি এ খপর শুনে ব্যস্ত হয়ে বলো যে বাড়ী যেতেই হবে—কি হলো, কি গেল—কি রইলো···না হয় বলো যে, দেখে-শুনে কালই আবার ফিরবে।

পিশিমা কি ভাবিলেন, ভাবিয়া কহিলেন,—কিন্তু বিন্দু ...তাকে যদি না ছাড়ে?

বলাই কহিল,—তাকে আপনি একটু উস্কে দিন। সে বলবে'খন, পিশিমার সঙ্গে আমিও বাড়ী যাবো।

পিশিমা কহিলেন,—বেশ বলেচিস বাবা। আমি তাকে বলিগে, এরা সব ঘুমোচ্ছে—বলবার যুৎও পাবো।

বলাই কহিল,—আমি এইখানে দাঁড়াই···

পিশিমা চলিয়া গেলেন, বলাই উঠানের ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পথে এক কাঁশার বাসনওয়ালা কাঁসি পিটিয়া সওদা লইয়া চলিয়াছিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলাই সেই কাঁসার রাগিণী শুনিতে লাগিল।

আট-দশ মিনিট পরে দোতলায় একটা কলরব জাগিল; এবং তার অব্যবহিত পরক্ষণেই পিশিমা আসিলেন—আসিয়া প্রসন্ন মুখে বলিলেন,—রাজী করিয়েচি, কিন্তু কাল সকালেই শম্ভু আনতে যাবে! তার পর স্বর উচ্চ করিয়া পিশিমা কহিলেন,—একবার উপরে এসো বাবা। এরা বলচে, ছেলে মানুষ, এত দূর এসেচে···কুটুম হাজার হোক্···একটু মিষ্টি-মুখ না করলে ভালো দেখায় না।

বলাইয়ের চিত্ত উল্লসিত হইল। এত সহজে ফল মিলিবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। তার উদ্বেগের সীমা ছিল না। না যাইতে দিলে কি উপায় সে করিবে, তাহা ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারে নাই।

সে পিশিমার সঙ্গে দোতলায় গেল।

শম্ভুর মা আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেন, নানা প্রশ্ন তুলিলেন,—কখন্ দেখলে? কত বড় সিঁধ? কিছু জানতে পারলে না? কি নিয়ে গেল? পাড়ার বুকে সিঁধ! মা গো···

বলাই যথাসম্ভব সদুত্তরে তাঁকে তৃপ্ত করিল। বলাইয়ের জবাবের ভঙ্গীতে অবিশ্বাসের কারণ ছিল না।

ভাড়াটিয়া-গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। পিশিমা ও বিন্দুকে লইয়া বলাই গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। শম্ভুর মা বার বার বলিতে লাগিলেন,—কালই ফিরো দিদি—কাগজ-পত্তর সই না করলে মহা-বিপদ এদিকে। কাছারিতে ঐ কাগজ দাখিল না হওয়া ইস্তক না মিলবে কাগজের সুদ, না হবে বাড়ীর ভাড়া-পত্তর আদায়··· [ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নূতন সেরিফ

আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর এক বৎসর কালের জন্য কলিকাতার সেরিফের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রফুল্লনাথ স্বনামধন্য কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র, ধনী জমীদার, সমাজে তাঁহার সামাজিক বলিয়াও সুনাম আছে। বিশেষতঃ ভারতীয় শিল্প-কলায়, ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত ও চিত্র-কলায় তাঁহার অনুরাগের কথা সর্ব্বজনবিদিত। সর্ব্বোপরি তাঁহার সাহিত্যপ্রীতির কথা উল্লেখযোগ্য। পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "পূর্ণিমা সম্মেলনের" তিনি এক জন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। সে যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীদিগকে তিনি কয়েকবার নিজ ভবনে নিমন্ত্রিত করিয়া আলাপ আপ্যায়নে পরিতুষ্টও করিয়াছিলেন। প্রফুল্ল বাবু সদালাপী, বিনয়ী, পরদুঃখ-কাতর, বিদ্যোৎসাহী পুরুষ। তাঁহার এই নিয়োগে জনসাধারণ সন্তোষলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

মেদিনীপুর

প্রথম পর্ব্ব

কাঁথিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন

বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং বে-সরকারী অনুসন্ধান-সমিতির প্রদত্ত বিবরণ হইতে যে সকল সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইল।

সংবাদপত্রের পাঠকগণ জানেন, বিগত ৬ই এপ্রিল কাঁথিতে সর্ব্বপ্রথম লবণ আইন অমান্য করা হয়। অভয় আশ্রমের কর্ম্মী ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫ জন সত্যাগ্রহী সহ বাঁকুড়া হইতে পদব্রজে কাঁথিতে উপস্থিত হন। পিছাবনী নামক স্থানে তাঁহারা লবণ প্রস্তুত করিতে থাকেন।

মহকুমা-হাকিম এবং পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লবণ বিভাগের আবগারী কর্ম্মচারী প্রভৃতি সহ পিছাবনীতে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। ত্রিবর্ণ-পতাকা-লাঞ্ছিত স্থানীয় স্কুলগৃহে সত্যাগ্রহ শিবির স্থাপিত হইয়াছিল।

কুলবেড়িয়ার বৈকুণ্ঠ শাসমলের অগ্নিদগ্ধ গৃহ

প্রথম দিনে লবণপ্রস্তুতকারীদিগের হাঁড়ি ভাঙ্গা ও কটাহ কাড়িয়া লওয়ার পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

চারিদিনের মধ্যে কাঁথিতে প্রায় ২০টি কেন্দ্রে লবণ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ মেদিনীপুরে সমবেত হইতে থাকে।

১১ই এপ্রিল হইতে স্থানীয় গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার অনেকেই লবণপ্রস্তুত-ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করে।

রংমালা কেন্দ্রের ভস্মীভূত সত্যাগ্রহ শিবির

কুলবেড়িয়ার ভগ্ন শীতলামূর্ত্তি

লবণ সত্যাগ্রহীদিগের শোভাযাত্রা

উক্ত দিবসে সুরেশ বাবু রাজরোষে পতিত হন। আড়াই বৎসর তাঁহার কারাদণ্ড হইয়াছে।

উক্ত ঘটনার পর হইতে কাঁথির এবং অন্যান্য স্থান হইতে সমাগত নেতা ও কর্ম্মীরা রাজদ্বারে অতিথি হইতে লাগিলেন। লবণ-প্রস্তুত-ব্যাপার চলিতে লাগিল।

গ্রামবাসীরা যাহাতে নিরস্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছিল। ঝাড়েশ্বর মালী স্থানীয় কর্ম্মী। সংবাদে প্রকাশ, তাহার দেড় শত মণ ধান্য এবং অনেক অস্থাবর সম্পত্তি এই ব্যাপারে ভস্মীভূত হইয়াছিল।

কাঁথিতে ক্রমে কর্ম্মকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। লবণ প্রস্তুতের সংক্রামকতা দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইবার সংবাদ দৈনিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়। লবণ হাটে প্রকাশ্যভাবে বিক্রীত হইবার সংবাদও রটিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে লবণ প্রস্তুত চলিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।
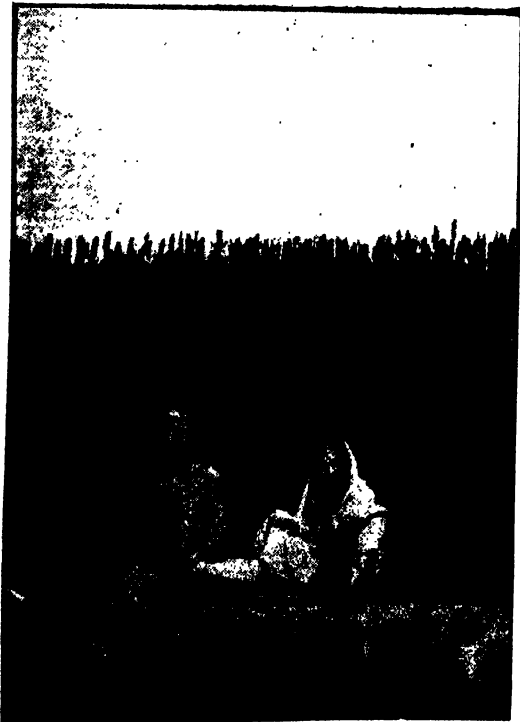
চোরপালিয়ার মৃত ১৪ বর্ষ বয়স্ক বালকের পিতা-মাতা
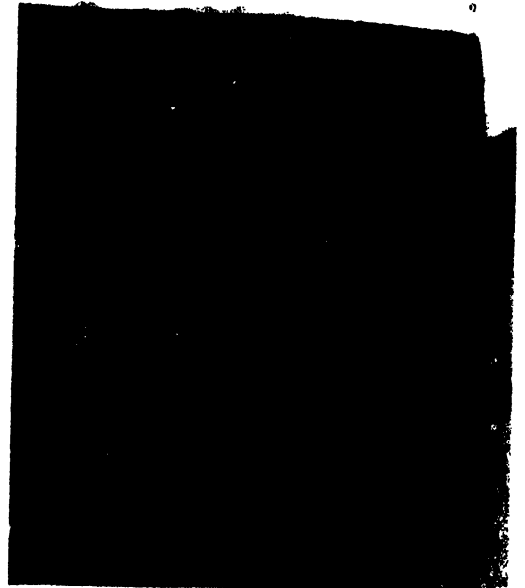
বাঁশগড় গ্রামের ভস্মীভূত গৃহ ও ধানের গোলা

গ্রামবাসীরা স্পেশাল কনষ্টেবল হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিল না। গ্রেপ্তার ও সম্পত্তি ক্রোক হওয়া সত্বেও গ্রামবাসীরা লবণ প্রস্তুত ত্যাগ করে নাই। মুষ্টিযোগ ক্রিয়াতেও লবণ প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সভাক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা লাঠির প্রহার পাইয়াছে, এমন সংবাদ সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখা দিতে লাগিল।

পিছাবনী, মির্জ্জাপুর, কালীনগর, ঠাকুরচক প্রভৃতি কেন্দ্রের সত্যাগ্রহীরা প্রহার ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া চলিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

প্রতাপদীঘিতে গুলীর আঘাতে আহত ব্যক্তি

১ শত স্ত্রীলোক জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। পতাকা কাড়িয়া লইবার সময় অনেকের দেহে আঘাত লাগিয়াছিল। তন্মধ্যে ৫ জন হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল। পদ্মা গোয়ালিনী নামক একটি স্ত্রীলোকের অঙ্গের নানাস্থানের আঘাত

প্রতাপদীঘিতে গুলীর দ্বারা আহত ব্যক্তি

কাঁথি, পিছাবনী প্রভৃতি সত্যাগ্রহ-শিবিরগুলি বাজেয়াপ্ত হইল—কর্ম্মীরা হাজতে প্রেরিত হইলেন। এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে কারাগার প্রায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় কাঁথি মহকুমার ৪০টি কেন্দ্রে লবণ প্রস্তুত হইতেছিল।

রংমালাপুট কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক-শিবির অগ্নিদাহ হয়। সন্নিহিত অনেকগুলি গ্রামের জিনিষপত্র লুন্ঠিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ রটে।

৭ই মে খোলাখালী নামক স্থানে

পিছাবনীতে কয়েক জন আহত সত্যাগ্রহী

একটি ভস্মীভূত গৃহ—পুনরায় সংস্কৃত হইতেছে

পুষ্করিণীর জলে ভাসমান একটি মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

চিড়াকুঠীর দুইটি লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা নারী

কতিপয় আহত ব্যক্তি

লবণদহ   দৃশ্য

লবণ গ্রহণের দৃশ্য

রঙ্গমালাপুট   ব্রত   গ্রহী দল

ঐ   হস্ত হইতে   গ্রহণের দৃশ্য
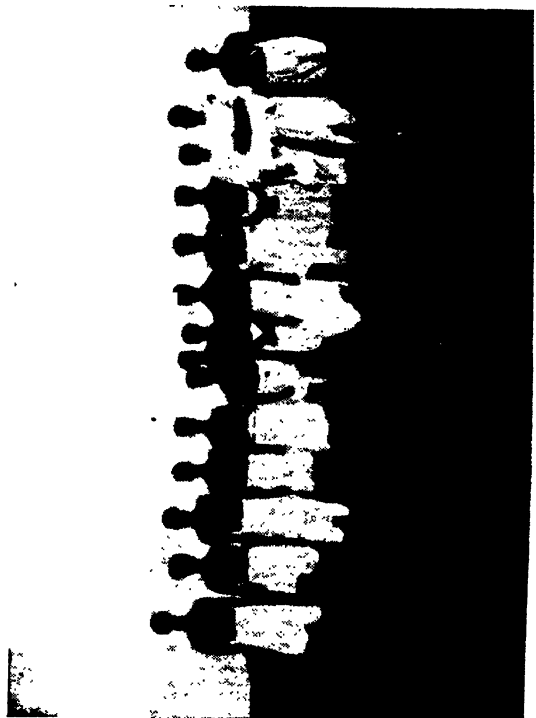
সাংঘাতিক হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। নারী সত্যাগ্রহীরা দলে দলে লবণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

৮ই মে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে লুণ্ঠন আরদ্ধ হইয়াছিল। প্রত্যেক কেন্দ্র হইতেই সত্যাগ্রহীরা কারারুদ্ধ হইতে থাকে। ১৪ই মে তারিখে মেদিনীপুর জেলার আইন অমান্য সমিতিগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। কাঁথিতে প্রবেশ করিবার প্রত্যেক পথ ও প্রত্যেক ষ্টেশন বাহিরের লোকের পক্ষে অবরুদ্ধ হইলেও সত্যাগ্রহীরা বহু বিভিন্ন উপায়ে, ভিন্ন পথে কাঁথিতে প্রবেশ করিয়াছিল।

বায়েন্দা গ্রামের আর একটি ডিস্পেন্সারীর অবস্থা

২০শে মে তারিখে ভগবানপুর থানার গোপীনাথপুর নামক গ্রামে লবণ প্রস্তুতকালে সত্যাগ্রহীরা লাঞ্ছিত হইলে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা পুলিসকে আক্রমণ করে বলিয়া প্রকাশ। সত্যাগ্রহীরা আপনাদের জীবন বিপন্ন করিয়া ক্রুদ্ধ জনতার আক্রমণ হইতে পুলিসকে রক্ষা করে।

২৫শে মে বায়েন্দা গ্রাম লুণ্ঠিত হয়। সুবর্ণদীঘি নামক স্থানের অনেক গৃহ আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। অম্বু নাম্নী কোনও আসন্নপ্রসবা নারী সে দিন কটিদেশে ভীষণ আঘাত পায়।

ভগবানপুর থানায় লবণ প্রস্তুতকারী সত্যাগ্রহী ও নারীবৃন্দ

১লা জুন তারিখে পটাশপুর থানার অন্তর্গত প্রতাপদীঘি নামক স্থানে জনতার উপর গুলী চলিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। গুলীর আঘাতে দুই জন হত ও ৯।১০ জন আহত হইয়াছিল।

৬ই জুন তারিখে বলিসাই গ্রামেও গুলী চলে।

১১ই জুন তারিখে কাঁথি মহকুমায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীরা মিলিয়া লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়াছিল। বর্ষাগমে লবণ প্রস্তুত বন্ধ হয়।

ভগবানপুর থানার বায়েন্দা সত্যাগ্রহ আপিসের লুণ্ঠন দৃশ্য

ট্যাক্স প্রদান করিতে চাহে নাই। আদায়কারী দফাদার ও চৌকীদারগণ পদত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়।

৫ই জুলাই ভগবানপুর থানায় পিটুনী পুলিস বসিয়াছিল। ট্যাক্স আদায়ের জন্ম কাঁথিতে প্রচণ্ড চেষ্টা হইয়াছিল। যাহারা ট্যাক্স দিতে চাহে নাই, তাহাদের থালা, ঘটী, বাটি ইত্যাদি তৈজসপত্র ক্রোক করা হয়। ভগবানপুর থানার ভূপতিনগর নামক গ্রামের রজনীকান্ত প্রধানকে ১ শত ২৮ টাকা দিতে হইয়াছিল। গ্রামবাসীদিগকে ৭ দিনের মধ্যে ট্যাক্স প্রদান করিবার ঘোষণা হইয়াছিল।

১লা জুলাই রামনগর থানার জগদীশপুরে ট্যাক্স আদায়কারীদিগকে আসিতে দেখিয়া এক জন গ্রামবাসী শঙ্খধ্বনি করে। তাহাতে বহু লোক একত্র হয়। ট্যাক্স আদায়কারীরা জনতা দেখিয়া চলিয়া যায়। পরদিবস মহকুমা-হাকিম সদলবলে গ্রামে উপস্থিত হইলে সমবেত জনতা হইতে কেহ অপর পক্ষকে কাদা ছুড়িয়া মারে। গুলী চলিবার ফলে ১ জন হত ও কয়েক জন আহত হইয়াছিল। সত্যাগ্রহীরা গ্রামবাসীদিগকে জনতা করিতে নিষেধ করায় সে পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয় বলিয়া প্রকাশ।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ

২৫শে জুন হইতে কাঁথিতে দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হয়। কাঁথিতেই সর্ব্বপ্রথম চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধের সূচনা হইয়াছিল। ১১ই জুন হইতে ২৫শে জুন পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

কাঁথি, ভগবানপুর, পটাশপুর, রামনগর ও এগরা থানার অধিবাসীরা বিশেষভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

সুবর্ণদীঘি অঞ্চলে চৌকীদারী ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা হয়। সংবাদে প্রকাশ, অতি অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া, কেহই

বায়েন্দার একটি লুণ্ঠিত গৃহ

৬ই এপ্রিল পিছাবনীতে লবণ প্রস্তুত দৃশ্য

নূতন কাপড়, হ্যারিকেন লণ্ঠন, থালা, ঘটী, বাটি ও নগদ ১৫৲ টাকা ক্রোক হয় বলিয়া প্রকাশ।

নীলামের ক্রেতা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সরকারী কর্ম্মচারী ও মুসলমান ছিল বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

কাঁথি মহকুমার অধিবাসীরা কোনও মতে ট্যাক্স আদায় না দেওয়ায় সর্ব্বত্র প্রচারকার্য্য আরব্ধ হয়। ইস্তাহারগুলি নরম গরম সকলপ্রকার ভাবেরই প্রকাশক ছিল। বক্তৃতাও মাঝে মাঝে চলিয়াছিল। কিন্তু গ্রামবাসীদিগের

৫ই জুলাই য়ুনিয়নের প্রেসিডেণ্ট আদায়কারী লোকবলসহ আলাদারপুট গ্রামে কর আদায় করিতে গিয়াছিল। প্রকাশ, এইখানে লুঠ-তরাজ প্রভৃতি হইয়াছিল। গ্রামবাসীরা ট্যাক্স দিতে চাহে নাই।

ক্রোকী মাল দেয় ট্যাক্সের তুলনায় বহুগুণ বেশী। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ প্রধানের দেয় ট্যাক্সের পরিমাণ ৬৲ টাকা। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ৭০৲ টাকা মূল্যের

সুবর্ণদীঘির আসন্নপ্রসবা আহতা অম্বু

বারেন্দার কোনও লুণ্ঠিত ডিস্পেন্সারীর দৃশ্য

মতিগতি ফিরিল না। তাহারা কর-প্রদান বন্ধ রাখিয়াছিল।

আদায় চেষ্টার তীব্রতার প্রভাবে নিঃস্ব, ভাগ্যহীন কৃষকরা স্ত্রীপুত্র-পরিবারসহ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন ও আশ্রয় লইতে লাগিল। দূর হইতে আদায়কারীদিগকে গ্রামে প্রবেশ করিতে দেখিলেই অস্থাবর সম্পত্তি সহ স্ত্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে বনে-জঙ্গলে, ধান্যক্ষেত্রে অথবা অন্যগ্রামে আশ্রয় লইতে চলিয়া যায়। জনশূন্য গৃহ লুণ্ঠিত হয়—গরু-বাছুর

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বেরার লুণ্ঠিত গৃহের দৃশ্য

বায়েন্দা গ্রামের আর একটি লুণ্ঠিত গৃহ

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বেরার লুণ্ঠিত গৃহের অপর দৃশ্য

১৮ই নবেম্বর—লবণ তৈয়ারীর দৃশ্য

ট্যাক্স প্রদানে অসম্মত আহত জনৈক গ্রামবাসী

চোরপালিয়া গ্রামের কতিপয় আহত

অপহৃত হয়, ঘরের দরজা, জানালা, খাট-বিছানা কিছুই পরে পাওয়া যায় না বলিয়া প্রকাশ। লুণ্ঠনকার্য্যে অনেক সময় সন্নিহিত গ্রামের মুসলমানদিগের সংশ্রবের কথাও শুনা যায়।

সংবাদপত্রে এমনও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, একখানি তক্তপোষ ।০ চারি আনা, লেপ ৴০, জামা ৵০ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল।

দিবাভাগে বাড়ীর মালিককে পাওয়া যায় না বলিয়া পরে নিশীথ রাত্রিতে

সুবর্ণদীঘির কোনও লুণ্ঠিত গৃহের দৃশ্য

ট্যাক্স আদায়কারীরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। সারাদিনের শঙ্কা ও উৎকণ্ঠার পর নিদ্রামগ্ন গৃহস্থের নিকট ট্যাক্স আদায়ের নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। মাটীর ভিতর হইতে গুপ্ত অলঙ্কার, টাকা, বাসন-পত্র ট্যাক্সের বিনিময়ে তাহাদিগকে দিতে হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০৲ টাকা মূল্যের গরু ২ টাকায় নীলাম হইয়াছে, এমন সংবাদও আছে।

৩০শে জুলাই কাঁথি থানার

গ্রাম্য নারীরা লবণ তৈয়ার করিতেছে

মরিশদা, গিরিপারা প্রভৃতি গ্রামে নৈশ অভিযান হইয়াছিল।

৩১শে জুলাই প্রায় রাত্রি ৯টার সময় রামনগর থানার করুঞ্জাগ্রামে নৈশ অভিযানের সংবাদ পাইয়া বহুসংখ্যক গ্রামবাসী পলায়ন করে। যাহারা পারে নাই, তাহারা ফলভোগ করিয়াছিল। শুনা যায়, একটি যুবতী লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা হয়। আদায়কারীদিগের কর্ত্তা সে সংবাদ পাইয়া সেই লোকটিকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করেন বলিয়া প্রকাশ।

সংবাদে প্রকাশ, চিড়াকুঠী গ্রামের নিম্নলিখিত নারীরা লাঞ্ছিতা হইয়াছে :—

(১) ক্ষীরোদচন্দ্র সাঁতরার বিধবা পত্নী ক্ষীরোদা দাসী, বয়স ২৫।

(২) মল্লিকা বেওয়া, স্বামী ভজহরি মাল, বয়স ৪৫।

(৩) চন্দনী বেওয়া, স্বামী ৺কমলাকান্ত সাউ, বয়স ৬৫।

(৪) নীরদা দাসী, স্বামী গিরিশ মাল।

(৫) শুনিয়া গ্রামবাসী সেখ আজিজের পত্নী।

কাঁথি মহকুমার বহু গ্রামের অসংখ্য গৃহ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তন্মধ্যে কুলটা ও কুলবেড়িয়ার ক্ষতিই অসাধারণ।

তমলুক ও কাঁথিতে বহু হিন্দু বিগ্রহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কুলবেড়িয়ার শীতলা ও নারিকেলদহের বাসুদেব-বিগ্রহ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এই আন্দোলন উপলক্ষে প্রতাপদীঘি, সিরাই, খেরসাই, শ্যামসুন্দরপুর, চোরপালিয়া গ্রামের অনেকগুলি লোক প্রাণ হারাইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ। চোরপালিয়া গ্রামের ৫ জন লোকের মৃতদেহ পুষ্করিণীতে ভাসিতে দেখা গিয়াছিল। এই মৃতব্যক্তিদিগের মধ্যে ৪ জন বিবাহিত। একজনের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। তাহার পত্নীর বয়স মাত্র ৫।

কাঁথি মহকুমার ৬ শত জন চৌকীদার, দফাদার ও আদায়কারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

১৮ই নবেম্বরের শোভাযাত্রা

বিদায়-বাণী

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাকা দেখা।

রামজীবন বাবু যে দিন সপরিবারে বালিগঞ্জে বোস সাহেবের ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, সে দিন ছিল ১৯শে বৈশাখ। লগ্ন কথা না হইলে নাকি বিবাহ স্থির হয় না, দেনা-পাওনা প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি হইতে প্রায় মাসখানেক কাটিয়া গেল। তিন দিন পূর্ব্বে রামজীবন বাবু সবান্ধবে গিয়া মেয়েকে পাকা দেখিয়া আসিয়াছেন। আজ শনিবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বোস সাহেব সবান্ধবে পাত্রকে পাকা দেখিতে আসিবেন। প্রভাতে রামজীবন বাবু মার্কেটে গিয়া একটা দ্রব্য ব্যতীত বাকী সব জিনিষ বাজার করিয়া আসিয়াছেন। লুচি, পোলাও, মটন-চপ, কোফ্‌তা-কারি, মাছের কালিয়া প্রভৃতি বাড়ীতেই রন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছে - কেবল মুর্গীর কারি ও কাটলেট্, এ দুইটা জিনিষ অ্যালেন হোটেলে করমাইস দেওয়া হইয়াছে—সন্ধ্যা ৭টার পর তথাকার দুই জন "বয়" সে সব জিনিষ এবং টেবিল-সজ্জা বহন করিয়া আনিবে এবং পরিবেষণ করিয়া নিমন্ত্রিতগণকে খাওয়াইয়া যাইবে। বোস সাহেবের সঙ্গে তিন জন বন্ধুমাত্র আসিবেন—বলা বাহুল্য, তিন জনই বিলাত-ফেরত। রামজীবন বাবু বিলাত-ফেরতগণের আচার-ব্যবহার সম্যক্‌ভাবে অবগত, তাই তিনি বোস সাহেবকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "একটু পেগ-টেগের‌ও বন্দোবস্ত রাখ্‌ব ত?"

বোস সাহেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "তা, খাবার আগে, দুই একটা ক'রে হলে মন্দ হয় না।"

"কি আনাব বলুন দেখি? বিলেত ঘুরে এসেছি বটে, কিন্তু আমি ত ও-সব বিষয়ে একদম আনাড়ী।"

বোস সাহেব এক টুকরা কাগজে, যে বিশেষ হুইস্কির তিনি পক্ষপাতী, তাহার নামটি লিখিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "এই একটা বোতল আনিয়ে রাখ্‌বেন। আপনাদের ও সব পাড়ায় এটা বোধ হয় পাবেন না। চৌরঙ্গি কিংবা লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের কোনও দোকান থেকে আনাবেন। আর গোটা ছয়েক ভাল সোডা—বায়রণ কিংবা স্কটটমসন—তা হলেই যথেষ্ট হবে। আর, বরফ ত বোধ হয় থাকবেই।"

এই বোতলটি কিনিতেই কেবল বাকী আছে। মার্কেটের বাজার সারিয়া রামজীবন বাবু যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন বেলা ৯টা মাত্র। দোকানে দোকানে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিলেন, দশটার পূর্ব্বে উহা বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই। তাই বিকালের দিকে গিয়া, উহা সংগ্রহ করিয়া আনিবেন স্থির করিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন।

মাংসাদি পাক করিতে সিদ্ধহস্ত চক্রবর্ত্তী নামক এক জন রসুইয়ে ব্রাহ্মণ রামজীবন বাবুর ওল্লাসে ছিল, তাহাকেই নিযুক্ত করা হইয়াছে। বেলা দেড়টার সময়, থেলো হুঁকা হস্তে সেই চক্রবর্ত্তী এক জন সহকারী সহ আসিয়া, নিম্নতলে নিজকর্ম্মে লাগিয়া গিয়াছে।

বেলা ২টার সময় রামজীবন বাবু আফিস হইতে ফিরিয়া, নিম্নতলে বামুন ঠাকুরের ব্যবস্থা সকল পরিদর্শন করিয়া এবং তাহাকে উপদেশাদি দিয়া, উপরে আসিয়া পোষাক ছাড়িয়া, বরফযুক্ত ডাবের জল পান করিয়া, তামাক খাইতে খাইতে গৃহিণীর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিবাহের পর পূজা নাগাইদ বোস সাহেব জামাতাকে বিলাতে পাঠাইবেন আইন পড়িতে—বিলাতের তিন বৎসরের সমস্ত ব্যয় তিনিই নির্ব্বাহ করিবেন। সুতরাং উপস্থিত তিনি কন্যা-বিবাহে অধিক টাকা ব্যয় করিবেন না, ইহাই স্থির হইয়াছে। রামজীবন বাবুর গৃহিণী অলঙ্কারের ফর্দ্দ যাহা দিয়াছিলেন, তাহা হইতে অনেক কাটকুট হইয়াছে, দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৪০ ভরি সোনা, এ কারণে গৃহিণী বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। বলিলেন, "এই ক'খানা হাল্কা গহনা পরিয়ে মেয়েকে কি ক'রে ছিসে ক'নে পীঁড়িতে বসাবে? লজ্জা করবে না? আমার বরাবর সাধ ছিল, বউ কোমরে বিছে ঝুলিয়ে আসবে। আমি ২৫ ভরির বিছে চেয়েছিলাম—অত না পারিস, না হয় বিশ ভরি দে, না হয় আঠারো ভরি দে, তা বিছে দিলে একদম কেটে! মাথার কাঁটা-চিরুণী পর্য্যন্ত কেটে দিয়েছে!"

রামজীবন বাবু বলিলেন, "তারা হল সায়েবী ফ্যাসানের লোক, ও বিছে-ফিছে তারা পরে কি? আর কাঁটা-চিরুণীর কথা বলছ, বউ কি তোমার মত আটওছি চুলে খোঁপা বাঁধবে? তারা বাঁধে এলো খোঁপা, কাঁটা-চিরুণী পরবে কোথা?

ও সীতা-নেকলেস, মানতাসা ফানতাসা, হাতভর্ত্তি চুড়ি-টুড়ি তারা পরে না। নইলে ধর, যে লোক বিশ হাজার টাকা খরচ ক'রে তোমার ছেলেকে ব্যারিষ্টার করিয়ে আন্‌বে, সে কি আর ঐ ক'খানা গহনা দিতে কাতর হ'ত?"

কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া গৃহিণী বলিলেন, "সে ত হল! কিন্তু, বোস সাহেবের ইচ্ছে ছেলেকে ব্যারিষ্টারি পড়াবেন, কিন্তু ছেলের যে আইন পড়তে মোটেই ইচ্ছে নয়, সে কথা ও তোমায় বলেছে কি?"

"কৈ না, আমাকে ত কিছু বলে নি। কবে বল্লে তোমায় এ কথা?"

"তিন চার দিন আগে বলেছে। বল্লে, মা, ব্যারিষ্টার হয়ে কি হবে? আজকালকার দিনে ব্যারিষ্টারিতে পসার করা খুব শক্ত কথা। কার কার বা নাম কল্লে, বল্লে, এই ত তারা চার পাঁচ বছর ধ'রে ব্যারিষ্টারি করছে, কোট-পাৎলুনের খরচটাও রোজগার করতে পারে না—ভাগিস্ ল কলেজ ছিল, সেখানে মাষ্টারি করে, দুই বেলা দু'মুঠো তাই খেতে পায়।"

রামজীবন বাবু বলিলেন, "আইন পড়া ওর ইচ্ছে নয়?"

গৃহিণী বলিলেন, "না। বলে, আইন ব্যবসার উপর ওর বিজাতীয় ঘৃণা।"

"কি পড়তে চায় ও?"

"ও চায় ইঞ্জিনিয়ারি পড়তে—কিম্বা বিজ্ঞান পড়তে। বিজ্ঞানের দিকেই কিন্তু ওর ঝোঁক বেশী। বলে, বিজ্ঞানটা খুব ভাল রকম শিখে এলে দেশের তবু কিছু উপকার করতে পারবো—একেই ত দেশ মামলা-মোকদ্দমার আগুনে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে,—সেই আগুনে ফুঁ দিয়ে আর কি হবে?"

রামজীবন বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কিন্তু বোস সাহেব কি বলেন জান?"

"কি বলেন?"

"বলেন, ব্যারিষ্টার হয়ে এসে আমার সঙ্গে ও হাইকোর্টে বেরুক,—এক বছরের মধ্যে আমি ওর মাসে হাজার টাকা আয় ক'রে দিতে পারবো। বোস সাহেব হলেন আজকালকার এক জন নামজাদা ব্যারিষ্টার কি না! রোজ অন্ততঃ একটা কেসেও যদি উনি অনিলকে জুনিয়র ক'রে সঙ্গে রাখেন, তা হলে পাঁচ মোহর—পঁচাশী টাকা ত ওর বাঁধা।"

"বোস সাহেব ওকে সঙ্গে রাখতে চাইলেই মক্কেল তা শুনবে কেন?—ফীয়ের টাকা ত বোস সাহেব দেবেন না, মক্কেলই ত দেবে?"

"হাইকোর্টের মোকর্দ্দমা সবই অ্যাটর্ণীদের হাতে কি না। পি সান্ন্যালের নাম শুনেছ তুমি? মস্ত এক জন ব্যারিষ্টার—খুব পসার। তার এক জামাই ডি, এন, ভাদুড়ী বছর তিন চা'র হল ব্যারিষ্টার হয়েছে—গোমুখ্যু বল্লেই হয়, সাত চড়ে মুখে কথা বেরোয় না। সে মাসে চা'র পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করছে। এটর্ণীরা জানে, সান্ন্যালকে নিযুক্ত করতে হলে ভাদুড়ীকেও নেওয়া চাই—নইলে সান্ন্যাল ব্রীফই নেয় না—আর, বেশী টাকার লোভে যদিও বা নেয়, মন দিয়ে কায করে না। প্রথম প্রথম, এটর্ণীরা সান্ন্যালের কাছে ব্রীফ নিয়ে গেলেই সান্ন্যাল বলতো—ভাদুড়ীর ব্রীফ কৈ?—এখন সবাই জানে, এখন আর সান্ন্যালকে কিছু বলতে হয় না। তুমি ছেলেকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বোলো। এমন সুযোগ হাতের কাছে পেয়ে, সেটা ছেড়ে দেওয়া মহা ভুল হবে।"

"আচ্ছা, বেশ। কিন্তু তুমি যা সব কথা এখনি বল্লে, সে সব কি আমি এমনভাবে গুছিয়ে তার কাছে বলতে পারবো?—তার চেয়ে তুমিই বরং তাকে বুঝিয়ে বোলো। সে তোমার পিতৃভক্ত সন্তান, তোমার কথা সে কখনই ঠেলতে পারবে না।"

বিলাত হইতে ফিরিয়া, শ্বশুরের সহায়তায় এক বৎসর-মধ্যেই ছেলে মাসে হাজার টাকা করিয়া ঘরে আনিতে পারিবে, এই আশ্বাসে, গৃহিণীর চিত্ত হইতে অলঙ্কার-অপ্রাচুর্য্যের দুঃখ অনেকটা প্রশমিত হইল।

এই পাকা দেখা উপলক্ষে, রামজীবন বাবু পাঁচ ছয় জন নিজ বিশেষ আত্মীয়বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বিলাত-ফেরতগণের সঙ্গে বসিয়া খাইতে হইবে, এই আশঙ্কায় প্রথমে কেহ কেহ—সকলের নয়—একটু কুণ্ঠিতভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। "ওঁরা টেবিলে খাবেন কি না, ওঁদের আলাদা ঘরে বসিয়ে খাইয়ে দেবো এখন।"—রামজীবন বাবু এ কথা বলাতে তাঁহাদের কুণ্ঠা দূর হইয়া গিয়াছে।

চা-পানান্তে একটি চামড়ার ব্যাগ হাতে করিয়া রামজীবন বাবু বাহির হইয়া পড়িলেন। ট্রামযোগে চৌরঙ্গিতে গিয়া, সেই বোতল, এবং ভাল চুরুট-সিগারেট প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বোস সাহেব পৌঁছিবেন কথা ছিল। পুরোহিত মহাশয় ও রামজীবন বাবুর আত্মীয়বন্ধুগণ যথা-সময়েই উপস্থিত হইলেন। সাড়ে ৭টা বাজিয়া গেল, পৌনে ৮টা হইতে চলিল, তথাপি বোস সাহেবদের দেখা নাই। নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে এক ভদ্রলোক বলিলেন, "তবে যে শুনেছিলাম, সাহেবদের কোনও কাযে এক মিনিটও দেরী হয় না,—ঠিক সময়ে তাঁদের সকল কায হয়!"—অপর এক ভদ্রলোক বলিলেন, "সাহেব হলেও, তবু বাঙ্গালী সাহেব ত!" পুরোহিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "সাতটা তিপ্পান্ন মিনিট পর্য্যন্ত শুভ নক্ষত্রটা ছিল, এখনও যদি এসে পড়েন, তা হলেও হয়।"

ঠিক আটটা পাঁচ মিনিটের সময় দুইখানি মোটরগাড়ী রামজীবন বাবুর সদর-দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি সদলবলে গিয়া বোস সাহেব ও তাঁহার বন্ধুগণকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন। সকলে ধুতি-চাদর পরিয়া আসিয়া-ছেন,কাহারও চরণে পাম্পশু, কাহারও বা চটি-জুতা। সকলে আসিয়া বৈঠকখানায় ফরাস বিছানার উপর বসিলেন। পাণ, চুরুট, সিগারেট তাঁহাদিগকে দেওয়া হইল। এক জন মাত্র পাণ লইলেন, অপর তিন জন কেহ চুরুট, কেহ সিগারেট ধরাইলেন।

কিয়ৎক্ষণ আলাপ-আপ্যায়নের পর, পুরোহিত মহাশয় বোস সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কৈ, আপনাদের পুরোহিত আসেন নি?"

বোস সাহেব বলিলেন, "পুরোহিত আসাও দরকার না কি?"

পুরোহিত বলিলেন, "শাস্ত্রে অবশ্য কিছু নির্দ্দেশ নেই, কিন্তু দেশীয় প্রথা তাই।"

বোস সাহেব বলিলেন, "সে কথা ত আমার স্মরণ ছিল না। আমার মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করবার দিন আপনি গিয়ে-ছিলেন দেখেছিলাম বটে। তবে, এখন উপায়? আচ্ছা, এক কায করলে হয় না? ধরুন, আপনাকেই যদি আমি আমার পুরোহিত নিযুক্ত করি, তাতে কায চলবে না?"

"নিযুক্ত" কথাটা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু চটিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিলেন না। কেবল বলিলেন, "আপনি যদি আমাকেই আপনার পৌরোহিত্যে বরণ করতে চান, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। আপনার মত লোককে যজমান পাওয়া আমার ত ভাগ্যের কথা। বেশ, তা হ'লে রামজীবন বাবু আর বিলম্ব করবেন না। পাত্রকে সভাস্থ করুন, শুভ কার্য্যটা সেরে ফেলা যাক্।"

রামজীবন বাবু উঠিয়া গিয়া পুত্রকে লইয়া আসিলেন। গরদের যোড় পরিয়া চন্দন-চর্চ্চিত ললাটে অনিলকুমার আসিয়া বসিল। নাম-গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া প্রথমে পুরোহিত মহাশয় সংস্কৃত মন্ত্রে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তার পর বোস সাহেবকে বলিলেন, "এবার আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।"

বোস সাহেব বলিলেন, "আমি কিন্তু বাঙ্গালাতেই আশী-র্ব্বাদ করবো।"

পুরোহিত বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে।"

বোস সাহেব, পুরোহিতের নির্দ্দেশ অনুসারে, দক্ষিণ হস্তের অনামিকা দধি ও চন্দনে লিপ্ত করিয়া উহা দ্বারা পাত্রের ললাটে টীকা দিয়া, ধান্য-দূর্ব্বা হস্তে লইয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"দীর্ঘজীবী হও।" একটু থামিয়া তাহার পর, বলিলেন, "চিরসুখী হও।"—আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভাবের আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। সতেরো বৎসর ধরিয়া যে প্রাণাধিক কন্যাকে বুকে করিয়া পালন করিয়াছেন আজ তাহার সুখ-দুঃখের সমস্ত ভার এ কাহার প্রতি অর্পণের সূচনা! তিনি পাত্রের মস্তক হইতে হাত নামাইয়া, পকেট হইতে একটি মখমলের কেস বাহির করিয়া খুলিয়া, পাত্রের হস্তে দিলেন। সকলে দেখিল, উহাতে এক সেট সোণার বোতাম চক্‌চক্ করিতেছে।

পার্শ্বের কক্ষে অদৃশ্যভাবে মহিলারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা ঘন ঘন শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর বোস সাহেবের বন্ধুগণ একে একে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তার পর রামজীবন বাবু ও তাঁহার বন্ধুগণ আশীর্ব্বাদ করিয়া শুভকার্য্য শেষ করিলেন।

এই সময়, বোস সাহেবের যে বিলাত-ফেরত বন্ধুটি পাণ খাইয়াছিলেন, তিনি বোস সাহেবের কাণে কাণে কি বলিলেন। শুনিয়া, বোস সাহেব "ওঃ," বলিয়া পকেট হইতে কয়েকটি রজতমুদ্রা বাহির করিয়া, পুরোহিত মহাশয়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য, আমার দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করুন।"—বলিয়া তিনি পুরোহিত মহাশয়ের পদধূলি লইলেন।

মুদ্রাগুলি ট্যাঁকে রাখিতে রাখিতে হাস্যমুখে পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "আপনাকে আর কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করবো। আপনি শীঘ্র হাইকোর্টের জজ হোন।" পাত্রকে বলিলেন, "যাও বাবাজী, তুমি এখন ভিতরে যাও—তোমার জননী আর অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাম কর গে।"—অনিল উঠিয়া প্রস্থান করিল।

বোস সাহেবরা পান-ভোজন শেষ করিয়া রাত্রি দশটার মধ্যে প্রস্থান করিলেন। আত্মীয়-কুটুম্বগণের ভোজনও তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

রাত্রিতে কর্ত্তা-গৃহিণী একত্র হইলে গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি যে মদ কিনে এনেছিলে, তা ওরা খেলে?"

"খেলে বৈ কি।"

"কে কে খেলে?"

"বেয়াই আর তার বন্ধু তিন জন, সবাই খেলে।"

"মাতাল হয়ে গেল, কিন্তু কৈ, টুঁ শব্দটিও শুনতে পেলাম না।"

রামজীবন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ওরা কি রামবাগান সোনাগাছির মাতাল যে, মদ খেয়ে হ্যারারারা করবে, ন্যাংটো হয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচবে? তা ছাড়া, ঠিক মাতালও হয় নি। একটা বোতল মাত্র এনেছিলাম ত? তারও প্রায় সিকি ভাগ প'ড়ে রইল। ওরা—যাকে বলে—মিতপায়ী।" [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

নোবেল পুরস্কার

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পর আর একটি ভারতের সুসন্তান ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম এ দেশে ও বিদেশে সুবিদিত। তিনি সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ। বাঙ্গালার এইটুকু লাভ যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের মত বাঙ্গালী না হইলেও আমাদের এই বাঙ্গালারই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই দশ জন মনীষীর এক জন। সমগ্র এসিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম পদার্থ বিজ্ঞানে প্রতীচ্যের নিকট এই সম্মান প্রাপ্ত হইলেন এবং আজ তাঁহার নাম জগতের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক রোঁতশে, র‍্যালে, মার্কোণি ও আইনষ্টীনের সহিত যুক্ত হইয়া রহিল।

বেঙ্কটরমণ ১৮ বৎসর বয়সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম বিভাগে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিই মানুষ গড়ে না, মানুষের অন্তরে প্রেরণা না আসিলে মানুষ তৈয়ার হয় না। ১৯ বৎসর বয়সেই তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া এসিষ্টাণ্ট একাউণ্টাণ্ট-জেনারেলের পদ প্রাপ্ত হন। এ দেশের জ্ঞান-গবেষণার এইরূপেই সমাধি হইয়া থাকে। স্বাধীন দেশ হইলে রমণের মস্তিষ্কের দেশ ও জাতিগঠনমূলক—ধনাগমমূলক কার্য্যে সদ্ব্যবহার হইত, এ দেশে কেরাণী গড়া ছাড়া আর কি হইবে?

কিন্তু দৈব অনুকূল। তখন সবে মাত্র স্বর্গগত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দির (Indian Association from the cultivation of Science) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দৈবাৎ এই মন্দিরের সহিত সার চন্দ্রশেখরের পরিচয় হয়। তখনই তাঁহার মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা জাগিয়া উঠে এবং তিনি কেরাণীগিরির পর প্রত্যহ অপরাহ্ণে বিজ্ঞান-মন্দিরে জ্ঞানার্জ্জন করিতে যাইতে আরম্ভ করেন। সার আশুতোষ সেইখানেই এই রত্নকে আবিষ্কার করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সার চন্দ্রশেখর চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এই পদে বসিয়া বিজ্ঞান-জগতে নানা আবিষ্কার করিয়াই আজ তিনি জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন। আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালার মাটিতে এই মহামহীরুহের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পরিণামে ফুলে-ফলে লতায়-পাতায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, এজন্য আমরা বিশেষ আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেছি এবং অধ্যাপক রমণকে এই সম্মানপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি।

গোলটেবল বৈঠক

ভারতের শাসন-সংস্কার-পদ্ধতি কি ভাবে পরিচালিত করা হইবে, তাহা লইয়া বিলাতে এখন একটা পরামর্শ-সভা বসিয়াছে। এই পরামর্শ-সভার নাম গোলটেবল বৈঠক। ইহার কেন এই নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ইহার নামকরণেই বিষম ভুল করা হইয়াছে। যে বৃহৎ টেবলের পার্শ্বে বসিয়া সদস্যগণ পরামর্শ করিতেছেন, তাহা গোলাকার নহে,—তাহার আকার বাদামি (oval)। প্রকাশ, সেণ্ট জেমস প্রাসাদের কক্ষে এত বড় গোলটেবল ধরিবে না বলিয়াই এই টেবলের আকার গোল না করিয়া বাদামি করা হইয়াছে। কিন্তু সরকার পক্ষ যে উহাকে গোলাকার করিবেন, এমন কথা কোথাও বলেন নাই। ইংলণ্ড-নরেশ আর্থারের যেরূপ গোলটেবল ছিল, এই গোলটেবল যে সেইরূপই হইবে, এমন কথা সরকার পক্ষ হইতে কেহই বলেন নাই। স্বরাজী দলই প্রথমে এই গোল-টেবল শব্দ ব্যবহার করেন। বিলাতী রাজনীতিবিশারদ লর্ড বার্কেনহেড কেবলমাত্র বৃটিশজাতীয় ব্যক্তিকে লইয়া যখন সাইমন কমিশন গঠিত করিয়াছিলেন, তখন ভারতের স্বরাজ-পন্থীরাই বলিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র বৃটিশ জাতিই যে ভারতের শাসনপদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, ইহা কখনই সঙ্গত ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতির নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীর এবং বৃটেনবাসীর মধ্য হইতে কতকগুলি বিচক্ষণ লোককে বাছিয়া লইয়া এক পরামর্শ-সমিতি গঠিত করিতে হইবে; সেই সমিতির প্রত্যেক সদস্য অন্য সকল সদস্যের প্রত্যেকের সহিত তুল্য-ক্ষমতাশালী হইবেন। কেহ কোন বিশেষ অধিকার লইয়া এই সমিতিতে যোগদান করিতে পারিবেন না। তাঁহারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া দিবেন, পার্লামেণ্টকে বিনা আপত্তিতে তাহাই আইনে পরিণত করিয়া দিতে হইবে। এই সময়ে এই প্রসঙ্গে রাউণ্ড টেবল এই শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে।

তাহার পর যখন নেহরু রিপোর্টের কথা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচিত হইয়াছিল, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সেই সময় বলিয়াছিলেন যে, নেহরু রিপোর্টটি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটি গোলটেবলের বৈঠক বসাইলে অনেক তথ্য জানিতে পারা যাইবে এবং তাহা হইলেই সর্ব্ববাদিসম্মত একটি শাসনযন্ত্র রচনা করিবার খসড়া প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে। সেই সময়ে দ্বিতীয়বার গোলটেবল শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। তাহার পর কত কাণ্ডই ঘটিয়া গিয়াছে। সরকার পক্ষ কখনও গোলটেবল বৈঠক বসান হইবে, এমন কথা বলেন নাই।

তাহার পর গত বৎসর লর্ড আরউইন এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন :—

When therefore the Commission and the Central Committee have submitted their reports, and these have been published, and when His Majesty's Government have been able, in consultation with the Government of India, to consider these matters in the light of all the materials then available, they will propose to invite representatives of different parties and interests in British India and representatives of the Indian States to meet them separately or together as circumstances may demand, for the purpose of conference and discussion in regard both to the British Indian and the all Indian problems. It will be their earnest hope that by this means it may subsequently prove possible on these grave issues to submit proposals to Parliament which may command wide measure of general assent.

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—অতএব যে সময়ে সাইমন কমিশন এবং ভারতীয় কেন্দ্রী কমিটী তাঁহাদের স্ব স্ব রিপোর্ট দাখিল করিবেন ও সেই রিপোর্ট দুইখানি প্রকাশিত হইবে এবং তন্মধ্যে যে সকল উপাদান সংগৃহীত হইবে, সেই সকল উপাদান হইতে যে আলোক (তথ্য এবং তৎসম্পর্কিত জ্ঞান) পাওয়া যাইবে, সেই আলোকোদ্ভাসিত বুদ্ধি লইয়া যখন বিলাতী সরকার ভারত-সরকারের সহিত সেই রিপোর্টের কথা আলোচনা করিয়া দেখিতে পারিবেন, তখন তাঁহারা বৃটিশ-শাসিত ভারতের অধিবাসীদিগের এবং ভারতবর্ষীয় সামন্ত রাজগণের প্রতিনিধিদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব করিবেন; বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদিগের প্রতিনিধিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থে স্বার্থবান্ ব্যক্তিদিগের এবং সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকিবেন; অবস্থা বুঝিয়া যেরূপ সুবিধা হয়, তদনুসারে সেই আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলে সম্মিলিত হইয়া অথবা পৃথক্‌ভাবে বৃটিশ-শাসিত ভারতের এবং তৎসহ নিখিল ভারতীয় সমস্যার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তাঁহাদের আন্তরিক আশা এই যে, এই প্রকারে বিচার্য্য বিষয়-গুলির আলোচনার ফলে এই গুরু বিষয় সম্বন্ধে অধিকাংশ লোক কর্ত্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব পার্লামেণ্টের সমক্ষে পেশ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়।

পাঠক এই কথাগুলির দিকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখুন যে, বড় লাট তাঁহার অভিভাষণে কুত্রাপিই গোলটেবল এই কথা প্রয়োগ করেন নাই। স্বরাজী দল যে ভাবের গোল-টেবল্ পরামর্শ বৈঠক বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই ভাবের গোলটেবল পরামর্শ বৈঠক যে বসান হইবে, ঘুণাক্ষরেও সেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। তাঁহার কথাগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই কয়টি তথ্য পাওয়া যায়:—

(১) সর্ব্বপ্রথমে সাইমন কমিশনের এবং ভারতীয় কেন্দ্রী কমিটীর রিপোর্ট লিখিত এবং প্রকাশিত হওয়া চাই। ইহাই হইল সর্ব্বপ্রথম এবং প্রধান কথা।

(২) তৎপরে ভারত সরকার এবং বিলাতী সরকার পরস্পর পরামর্শ করিয়া ঐ রিপোর্টে প্রাপ্ত তথ্যগুলি আলোচনা করিবেন। তথ্যগুলি আলোচনা করিয়া তাঁহারা নিশ্চিতই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

(৩) তৎপরে তাঁহারা ভারতবাসীর ও রাজন্যবর্গের মধ্য হইতে কতকগুলি লোক বাছিয়া লইয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক এই বিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতার অবধারণ করিবেন।

(৪) চতুর্থ অবস্থায় তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিবেন, সেই সিদ্ধান্তই তাঁহারা পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করিবেন। অবশ্য যে সিদ্ধান্তগুলিতে অধিকাংশ ভারতবাসী একমত হইবেন, সেই সিদ্ধান্তই সরকার ভারতবাসীর সিদ্ধান্ত বলিয়া পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটীর নিকট পেশ করিবেন।

এইটুকু হইতেছে লর্ড আরউইনের কথা। ইহাতে কোথাও তিনি লুব্ধ আশ্বাসে ভারতবাসীদিগকে প্রতারিত করেন নাই। এই পরামর্শ-পরিষদে যে দেশীয় রাজন্যবর্গ থাকিবেন, সে কথাও লর্ড আরউইন স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন। অথচ বৃটিশ সরকারের সহিত বৃটিশ ভারতের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় রাজন্য-বর্গের প্রতিনিধিদিগের থাকিবার কি প্রয়োজন, তাহা কেহ বলেন নাই। কোন আইন বা প্রথা অনুসারে তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ-সভায় থাকিতে পারেন না। তাঁহারা বৃটিশ শাসিত ভারতের বাহিরে যেমন আছেন,—তেমনই থাকিতে পারিতেন এবং পারিবেন। কিন্তু আমাদের বিজাতীয়ভাবে শিক্ষিত জননায়কগণ বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া কল্পনা-জগতে প্রবেশ করিয়া স্বপ্নাবিষ্ট লোকের ন্যায় দেখিলেন যে, নিখিল ভারতবর্ষ একই রাষ্ট্রতন্ত্রের শীতল ছায়াতলে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, দেশীয় রাজন্যগণও উহাতে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছেন,—এই নিখিল ভারত যেন শয়তান বিদ্রোহের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ভগবানসমক্ষে অবস্থিত দেবদূতের ন্যায় এক সূত্রে বাঁধা রহিয়াছে। কিন্তু কল্পনার যাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়, স্বপ্নে যাহা লক্ষিত হয়, এই মর-জগতে বাস্তবক্ষেত্রে তাহাই যে সম্ভব হইবে, তাহা মনে করা ভুল। রাজা দ্বয়ন্তের (Dionysas) আমল হইতে ভারতে রাজশাসিত এবং গণশাসিত উভয়বিধ রাজ্যই পাশাপাশি বিদ্য-মান ছিল। "প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি সে কথা কতকটা আলোচনা করিয়াছি। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে গণশাসনের কথা যেরূপ ভাবে বলা আছে, তাহাতেও মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতে নিয়মনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র পাশা-পাশিই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং গণতন্ত্রশাসিত এই বিস্তীর্ণ নিখিল এক বিরাট রাষ্ট্রতন্ত্রের স্বপ্ন না দেখিয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকে এখন রাজতন্ত্র থাকিতে দিলে বিশেষ কোন অসুবিধাই ঘটিত না। কিন্তু আমাদের পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সে বিষয়ে অবহিত হইয়া দেশীয় রাজন্যবর্গকে বৈঠকে লইয়া সেই হট্টগোল সভার গোলযোগ বর্দ্ধিত করিতেই যেন বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এখন রাজন্যবর্গ কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভের দাবী করিতে-ছেন। ইহাতে গণ্ডগোলবৃদ্ধি ভিন্ন আর কোন সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

লর্ড আরউইনের কথায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যাঁহারা গোল-টেবলের বৈঠকে উপস্থিত হইবেন, সেই সকল আমন্ত্রিত ভারতবাসী যে সিদ্ধান্ত করিয়া দিবেন, তাহাই যে পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটী যথাযথভাবে অথবা তাহার সামান্য কিছু পরি-বর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিবেন,এমন কথা লর্ড আরউইন এবং মিষ্টার ওয়েজ উড বেন একবারও বলেন নাই। মিষ্টার ওয়েজ উড বেন কেবলমাত্র বলিয়াছেন যে, গোলটেবল বৈঠকে যে সকল লোক গমন করিবেন,—তাঁহাদের সিদ্ধান্তও বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে। যাঁহারা সাইমন কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথাও পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটী বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সুতরাং উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। উভয় দলের লোকই সাক্ষী ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তবে যাঁহারা ভারতে সাইমন কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারা বিলাতী পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কমিশনের সমক্ষে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, আর যাঁহারা বিলাতী পরামর্শ-সভায় তাঁহাদের বক্তব্য বলিতেছেন,—তাঁহারা বিলাতী পার্লামেণ্টের সর্ব্বদলের প্রতিনিধিদিগের সমক্ষে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। কমিশনেও শ্বেতাঙ্গ ভিন্ন কোন ভারত-বাসীর স্থান হয় নাই। গোলটেবল নামে বাদামি টেবল বৈঠকেও যাঁহারা মন্তব্য শুনিবেন এবং পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি-রূপে উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহারাও সকলেই শ্বেতাঙ্গ হইবেন।

গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় রাজন্য ও প্রতিনিধিবর্গ

কাশ্মীরের মহারাজ

পাতিয়ালার মহারাজ

বিকানীরের মহারাজ

রেওয়ার মহারাজ

বরোদার মহারাজ

ভুপালের নবাব

সার মান্নুভাই মেটা

আলোয়ারের মহারাজ

কর্ণেল কে, এন্, হাক্সর

দ্বারবঙ্গের মহারাজ

সৈয়দ সার সুলতান আমেদ

ডাঃ মুঞ্জে

মিঃ টাম্বে

নবনগরের মহারাজ

সার প্রভাশঙ্কর পট্টনি

সাংলির রাজা

লেঃ কর্ণেল গিড্‌নি

নবাব সার মহম্মদ আকবর হায়দারী

রাও বাহাদুর আর, শ্রীনিবাসম্‌

সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা

সার তেজবাহাদুর সপ্রু

সার রামস্বামী আয়ার

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

রাওবাহাদুর কাম্বলি

সার কাওয়াসজি জাহাঙ্গীর

শ্রীযুক্ত রামস্বামী মুদালিয়র

রাও বাহাদুর পানিরসেলভাম

মিঃ গেভিন্ জোন্স

সার এ, পি, পেট্রো

সার এস, এন্, ভুট্টু

ডাঃ আম্বেদকার

মিঃ জয়াকর

আগা খাঁ

সার ফিরোজ শেঠনা

সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা

পার্থক্যের মধ্যে এই যে, এ ক্ষেত্রে সাক্ষী ও সাক্ষীর জবানবন্দী-গ্রহীতা এই দুই শ্রেণীর লোকই একটু উচ্চ অঙ্গের। কমিশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন সার জন সাইমন,—আর পরামর্শ-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন বিলাতের প্রধান সচিব মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, কোন ব্যবস্থাতেই ভারতের ভবিষ্য শাসনযন্ত্র কিরূপ হইবে, তাহার বিচারক-পদে এক জনও ভারতবাসী প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন না। সুতরাং যে দোষ কমিশনে বিদ্যমান বলিয়া কমিশন বর্জ্জিত হইয়াছিল, সে দোষ যে এই গোলটেবলের পরামর্শ-সমিতিতে প্রচ্ছন্নভাবে কতকটা বিদ্যমান নাই, তাহা নহে। যে সকল ইংরাজ এই গোলটেবলে উপস্থিত আছেন,—তাঁহারাও যে পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটী নিযুক্ত হইলেও তাহার সদস্য হইবেন, সে কথা অনেকটা নিশ্চিতভাবেই বলা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহারাই যে কার্য্যতঃ বিচারক এবং ভারতবাসীরা কার্য্যতঃ সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইলেন, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়। সুতরাং যে কারণে মডারেট দল, স্বরাজী দল এবং অন্যান্য দল এই কমিশন তাঁহাদের পক্ষে অপমানজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই গোলটেবলের বৈঠকেও সে কারণ যে বিদ্যমান নাই, তাহা মনে হয় না। যে কারণে সাইমন কমিশন বর্জ্জন করা হইয়াছিল, সে কারণ প্রচ্ছন্নভাবে এই পরামর্শ-বৈঠকেও কতকটা বিদ্যমান আছে। কিন্তু মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ভারত হইতে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে এই পরামর্শ-সমিতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

This is not only a historic conference in the sense in which I used the word, but it is historic in other senses that ought to put pride into the hearts of every one of you here.

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে,—"আমি যে অর্থে এই সমিতিকে ঐতিহাসিক সমিতি বলিয়া প্রয়োগ করিয়াছি, সেই অর্থেই ইহা কেবল ঐতিহাসিক নহে, পরন্তু অন্য অর্থেও ইহা ঐতিহাসিক,—সে হিসাবে ইহার জন্য সকলের মনে গর্ব্ব অনুভব করা উচিত।" কেন যে ভারতবাসীরা উহার জন্য গর্ব্ব অনুভব করিবে, তাহা ত আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা তথায় ভিক্ষাপাত্র হস্তে আমাদের জন্মগত অধিকারের দাবী করিতে গিয়াছি,—ইহাতে গর্ব্ব অনুভবের ত কোন হেতু আমরা দেখিতে পাইতেছি না। অবশ্য সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় সদস্যগণকে "Ah, my Indi·n friends," "Ah my Indian colle·gues" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, কিন্তু কেবল কথায় ত চিঁড়া ভিজে না। প্রিয় সম্বোধন আন্তরিক না হইলে উহা যেন অনেকটা বিদ্রূপ বলিয়া মনে হয়। আসল ব্যাপারে কুত্রাপি বৃটিশ জাতির সহিত ভারতবাসীর সমত্ব রক্ষিত হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় এই পরামর্শ-পরিষদকে গোলটেবল বৈঠক কখনই বলা যাইতে পারে না। সরকার পক্ষ হইতেও কুত্রাপি উহা গোলটেবল এই আখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। স্বরাজপন্থীরা গোলটেবল চাহিয়াছিলেন, আমাদের ব্যর্থ অহঙ্কার সেই জন্য এই পরামর্শ-সভাকে গোলটেবল এই আখ্যা দিয়াছে। এখানকার টেবলও গোলাকার হয় নাই, বাদামি আকার হইয়াছে। সুতরাং উহা অন্ধ পুত্রের পদ্মলোচন নামের ন্যায় হাস্যজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

লর্ড আরউইন এই বক্তৃতা করিলে পর আমাদের রাজনীতিক মহলে অনেকরূপ জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল। বড়লাট তাঁহার সেই বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই পরিণামে বৃটিশ জাতি ভারতবাসীকে দিবেন। সেই কথা আর এই পরামর্শ-পরিষদের কথা শুনিয়া কংগ্রেসের পরিচালকবর্গ পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন যে, একটা কথার সুমীমাংসা হইলেই তাঁহারা ঐ বিলাতী "গোলটেবল" বৈঠকে যাইবেন। তদনুসারে নূতন দিল্লীতে বড়লাটের প্রাসাদে মহাত্মা গন্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মিষ্টার প্যাটেল, সার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং মিষ্টার জিনা বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কংগ্রেস পক্ষ হইতে বলেন যে, যদি সম্রাটের সরকার তাঁহাদিগকে এইরূপ নিশ্চিত আশ্বাসবাক্য প্রদান করেন যে, ঐ বৈঠকে কেবল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানেরই খসড়া প্রস্তুত করা হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা উহাতে যোগ দিতে পারেন। লর্ড আরউইন ঐরূপ কোন আশ্বাসবাক্য দিতে পারেন না। তাহা তাঁহার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব, কাযেই কংগ্রেসওয়ালারা ঐ বৈঠক বর্জ্জন করেন। গত বৎসর ডিসেম্বর মাসেই এই ব্যাপার ঘটে।

এ দিকে ভারত-সচিব মিষ্টার ওয়েজ উড বেন বলিয়াছিলেন যে, ঐ পরামর্শ-বৈঠকে ভারতের সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের লোকই উপস্থিত হইবেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ভারতের যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান, সেই কংগ্রেসই এই পরামর্শ বৈঠকে যোগদান করেন নাই। তাঁহারা অতঃপর মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেন। এই আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে বহু সহস্র ভারতবাসী বর্ত্তমান বৎসরে জেলে নিক্ষিপ্ত হয়েন। সে কথার আমরা এ ক্ষেত্রে আলোচনা করিব না। মধ্যে সার তেজ বাহাদুর এবং শ্রীযুত জয়াকর, মহাত্মা গন্ধী, শ্রীযুত মতিলাল নেহরু এবং শ্রীযুত জহরলাল নেহরুর সহিত একটা আপোষ নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু

তাঁহাদের সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যায়। সে কথা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

এ দিকে এই পরামর্শ-পরিষদের কার্য্য স্থগিত রাখা যায় না বলিয়া লর্ড আরউইন ভারত হইতে ৬৭ জন লোককে গোলটেবলে যাইবার জন্ম নিমন্ত্রণ করেন। তন্মধ্যে বৃটিশ-শাসিত ভারত হইতে ৫১ জন, রাজন্যবর্গের মধ্য হইতে ১৬ জন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার এই আছে যে, যে বৃটিশ-শাসিত ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় পৌনে ২৫ কোটি, তাহাদের মধ্য হইতে কেবলমাত্র ৫১ জন সদস্য নিমন্ত্রিত হইলেও যে দেশীয় শাসিত রাজ্যের প্রজাসংখ্যা ৭ কোটির কিছু অধিক, সওয়া ৭ কোটির কম, সেই দেশীয় রাজগণের মধ্য হইতে ১৬ জনকে সরকার মনোনীত করিয়া নিমন্ত্রিত করিলেন। বলা বাহুল্য, এখানে আনুপাতিক হিসাবকে জাহান্নমে দেওয়া হইল। পক্ষান্তরে, বৃটিশ-শাসিত ভারতে হিন্দুর সংখ্যা মোট ১৬ কোটি সাড়ে ৩১ লক্ষ, তাহাদের পক্ষ হইতে ২৩ জন লোককে সরকার মনোনীত করিয়াছেন আর মুসলমানের সংখ্যা ৫ কোটি সাড়ে ৯৪ লক্ষ, তাহাদের পক্ষ হইতে সরকার ১৫ জনকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন। অর্থাৎ বৃটিশ-শাসিত ভারতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু চতুর্গুণ হইলেও সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হিন্দু-সংখ্যা মুসলমানের দেড়ার অধিক হয় নাই। আবার বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা এই বৃটিশ-শাসিত ভারতে প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ হইবে, কিন্তু তাহারা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় হইলেও তাহাদের মধ্য হইতে কেবলমাত্র ২ জন সদস্য মনোনীত করা হইয়াছে। এখানে মুসলমান এবং খৃষ্টানের তুলনায় আনু-পাতিক হিসাবে বৌদ্ধদিগের উপর অবিচার করা হইয়াছে। কারণ, ভারতে খৃষ্টানের সংখ্যা সওয়া ৩০ লক্ষ হইলেও তাহাদের মধ্য হইতে ৩ জনকে সরকার গোলটেবলে যাইবার জন্ম বাছিয়া লইয়াছেন। আর যে অনুন্নত জাতির সংখ্যা লর্ড বার্কেনহেডের মতে মুসলমান অপেক্ষাও অধিক, সেই অনুন্নত জাতির পক্ষ হইতে একমাত্র মিষ্টার আমেদকারই সরকারী নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সরকার সংখ্যানুপাতের হিসাবে লোককে গোলটেবল বৈঠকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। প্রদেশ হিসাবেও ঐ নিয়মের তারতম্য লক্ষিত হয়। যথা—পঞ্জাবে হিন্দুসংখ্যা প্রায় ৬৬ লক্ষ, এবং শিখদিগের সংখ্যা ২৩ লক্ষ। কিন্তু নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছেন এক জন হিন্দু আর ২ জন শিখ। তথাকার মুসলমানসংখ্যা ১ কোটি সাড়ে ১৪ লক্ষ, কিন্তু নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন ৫ জন মুসলমান। বাঙ্গালায় হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটি ২ লক্ষ আর মুসলমানসংখ্যা ২ কোটি ৫২ লক্ষ। কিন্তু বাঙ্গালা হইতে জনসাধারণের মধ্য হইতে ১ জন মাত্র হিন্দু, এবং ২ জন মুসলমান নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। অথচ সরকারের এক জন হিন্দু কর্ম্মচারী এবং জমীদার পক্ষ হইতেও এক জন হিন্দুকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীকে কখনই জনসাধারণের পক্ষীয় লোক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না; জমীদারগণকেও জনসাধারণের লোক বলিয়া ধরা যায় না। যুক্তপ্রদেশে ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ হিন্দুর বাস, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে ২ জন হিন্দু নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন আর প্রায় পৌনে ৬৫ লক্ষ মুসলমানের বাস, কিন্তু সেই মুসলমান জন-সাধারণের মধ্য হইতে ৩ জন বে-সরকারী মুসলমান নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। ইহা ভিন্ন তথা হইতে এক জন মুসলমান সরকারী কর্ম্মচারীও গোলটেবলে যাইবার অনুমতি পাইয়াছেন। বেহার ও উড়িষ্যায় হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটি ৮২ লক্ষ, তাঁহাদের মধ্যে এক জনমাত্র হিন্দু নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন, কিন্তু মুসলমানসংখ্যা ৩৬ লক্ষ মাত্র হইলেও তাঁহাদের মধ্য হইতে ১ জন নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, উড়িষ্যায় বহু হিন্দুর বাস হইলেও এক জন উড়িয়াও আমন্ত্রিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, আসাম, মধ্য-প্রদেশ, এবং বেরার মাদ্রাজ হইতে কোন মুসলমানই আহূত হয়েন নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, পঞ্জাবে, বোম্বাই প্রদেশে, যুক্ত-প্রদেশে এবং বাঙ্গালায়—বিশেষতঃ পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা অত্যন্ত প্রবল। কোন্ পক্ষে উহা প্রবল, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝেন। কিন্তু ঐ ৪টি প্রদেশ হইতে সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত মুসলমানই বাদামী—হট্ট গোলবৈঠকে যাইবার আহ্বান পাইয়াছেন।

সুতরাং এই গোলটেবল বৈঠকের গঠন কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। গত ১২ই নভেম্বর ২৬শে কার্ত্তিক বুধবার মধ্যাহ্নে বিলাতের হাউস অব লর্ডসের রয়্যাল গ্যালারিতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এই পরামর্শ-পরিষদের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। জাঁকজমকে সভা অতি সুন্দর হইয়াছিল, কিন্তু সম্রাটের অভিভাষণে কোন বিশেষ কথা বা ঘোষণা কিছুই ছিল না। সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড এই ঘটনায় নূতন ইতিহাসের আবির্ভাব সূচনা করেন। তিনি যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন, তাহা পালন করিতে থাকিলেও যদি কেহ বলে যে, তিনি তাহা পালন করিতেছেন না, তাহা হইলে তিনি সে জন্ম বিচলিত হয়েন না। ভারতের শাসন-যন্ত্র বিকাশপথে একটি নূতন অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। তাহার পর বরোদার মহারাজ, কাশ্মীরের মহারাজ, সার আকবর হাইদারী, মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মিঃ জিনা এবং উবাপে সময়োপযোগী

বক্তৃতা করেন। তৎপরে কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিবার জন্ত একটি কমিটী নিযুক্ত করা হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সেই কমিটীর সদস্য হইয়াছেন :—আলোয়ারের মহারাজা, মিঃ বেন, বিকানীরের মহারাজা, সার হিউবার্ট কার, কর্ণেল হাকসার, সার স্তামুয়েল হোর, সার আকবর হাইদারী, সার এম ইসমাইল, মিঃ জয়াকর, মিঃ জিনা, সার বি,এন, মিত্র, লর্ড রেডিং, সার তেজ বাহাদুর সপ্রু, মিষ্টার শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সার মহম্মদ সফি এবং সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং।

১৭ই নভেম্বর ১লা অগ্রহায়ণ সোমবার আবার এই হট্টগোল সভার দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ বৈঠক বসিয়াছিল। সে দিন বিলাতে দারুণ শীত পড়িয়াছিল। ঐ দিন প্রথমে সাব্যস্ত হয় যে, প্রধান সচিব মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড এই পরিষদের প্রেসিডেণ্ট এবং লর্ড স্যাঙ্কে উহার ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট হইবেন। আর ছয় জন চেয়ারম্যান হইবেন স্থির হয়। যথা—লর্ড পীল, লর্ড রেডিং, বিকানীরের মহারাজা, ভূপালের নবাব, আগা খাঁ এবং মিষ্টার শ্রীনিবাস শাস্ত্রী। এই দিন সংবাদপত্র-সেবীদিগের প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না সাব্যস্ত হয়। সভায় সেক্রেটেরিয়েট হইতে তিন জন কর্ম্মচারীর হস্তে নিরপেক্ষ-ভাবে সংবাদ সরবরাহের ভার প্রদত্ত হয়। তাঁহাদের কার্য্যপরি-দর্শনের জন্ত একটি কমিটী নিযুক্ত হয়। মিষ্টার ওয়েজ উড বেন, মিষ্টার রাসব্রুক উলিয়মস এবং মিষ্টার সি ওয়াই চিন্তামণি এই কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন।

এই দিন সংবাদপত্রের বহু সদস্যই সভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, নাবিক সমিতিতেও এত সাংবাদিকের সমাবেশ হয় নাই। ইহা একটা নূতন ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয় এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সার তেজ বাহাদুর সপ্রু বক্তৃতার দ্বারা প্রথম আলোচনার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। ইঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই ইঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ইঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিয়া-ছিলেন,—"আপনি আপনার দেশের কথা অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমরা আপনার পক্ষসমর্থন করিব।" লর্ড রেডিং বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"আপনি আপনার হৃদয় হইতে ঐ কথাগুলি বলিয়াছেন।" মিষ্টার ওয়েজ উড বেন তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন এবং লর্ড স্যাঙ্কে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা কস্মিন্‌কালেও কেবল আমলার এবং আমলাদিগের আমলা দ্বারা শাসিত হয় নাই। কেন্দ্রী সরকারে দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা না করিয়া প্রাদেশিক সরকারে দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলে সেই শাসনযন্ত্র এক সপ্তাহ-কালমধ্যেই অচল হইবে। সার তেজ বাহাদুর সংহিত রাষ্ট্র-তন্ত্রেরই (Federal Government) পক্ষপাতী। সার তেজ বাহাদুরের বক্তৃতার পর বিকানীরের মহারাজা বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন। তিনি বলেন যে, মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা করিলে, যেমন তেমন একটা শাসনযন্ত্র খাড়া করিলে ভারতে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধান হইবে না। মিষ্টার জয়াকর তৎপরে বলেন যে, ভারতীয় ঘটনাবলী দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আজ লোক যাহাতে সন্তুষ্ট হইতেছে, ছয় মাস পরে আর তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না। ফলে এই দিনই বুঝা যায় যে, সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রই গ্রহণ করিবার পক্ষে অধিকাংশ সদস্যেরই মত। এই দিন সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনের জন্ত একটি কমিটীও গঠিত হইয়াছিল।

ইহার পরদিন অর্থাৎ ১৮ই নভেম্বর মঙ্গলবার এই পরিষদের তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ বৈঠক বসিয়াছিল। আলোয়ারের মহারাজা, সার মহম্মদ সফি, রেওয়ার মহারাজা, লর্ড পীল, সার হিউবার্ট কার, কর্ণেল গিডনী এবং সিংলীর সর্দ্দার এই বৈঠকে বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন,—ইঁহারা সকলেই সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের সমর্থন করেন।

১৯শে নভেম্বর বুধবারে চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ বৈঠক বসিয়াছিল। এই দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন পাতিয়ালার মহারাজা, ডাক্তার বি এস মুঞ্জে, সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং, সার পেট্রো এবং মিষ্টার মহম্মদ আলি। ডাক্তার মুঞ্জে, লর্ড পীলের বক্তৃতায় অতি সুন্দর জবাব দিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে ছয়টি পূর্ণাঙ্গ বৈঠক হইয়া গেল, কিন্তু মূল ব্যাপা-রের কোন আলোচনাই হইল না, মীমাংসা হওয়া ত দূরের কথা। সার তেজ বাহাদুর সপ্রুও লম্ফঝম্প করিয়া বলিলেন যে, ভারত-বাসীর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্তির অধিকার বিদ্যমান। তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্ত অংশের সহিত তুল্য অধিকার-প্রাপ্তির ন্যায্য দাবী রাখে; ভারতবাসীরা যে গান গাহিবার জন্ত বিলাতে গিয়াছেন,—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীই তাঁহাদের সেই গানের মূলসুর (Key note)। বিকানীরের মহারাজা বলি-লেন যে, "কোন অর্দ্ধমাত্রা ব্যবস্থা শাসনপদ্ধতি গঠনে কোন-প্রকার জোড়-তালির কায করিলে, এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না।" মৌলানা মহম্মদ আলি বলিলেন যে, তিনি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বুঝেন না, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝেন, কিন্তু তথাপি তিনি যদি পূর্ণমাত্রায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন না পান, তাহা হইলে তিনি আর এই ক্রীতদাসের দেশে ফিরিয়া আসিবেন না। তিনি বিলাতেই তাঁহার দেহ সমাহিত করিবেন।

আর তাঁহার যদি রিক্ত হস্তে দেশে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা হইলে এ দেশ আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে না। উহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে এই বিস্তীর্ণ ভারত রাজনৈতিক ও ধর্ম্মমতে মিলিত হইয়া গিয়াছে। নবনগরের মহারাজা (রণজী) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ভারতের এই জাতীয় আন্দোলন আর শিক্ষিতসমাজমধ্যে আবদ্ধ নাই। এই সকল কথা বলা হইলেও শেষকালে এই সরকার কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত রাজনৈতিক আলখেল্লাধারী বাউলের দল তাহাদের গানের মূল রাগিণী ছাড়িয়া জংলা সুরে ফেডারাল পদ্ধতির গান গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন কেন? সর্ব্বাগ্রে মূল দাবী সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া পরে ত তাহার সূক্ষ্মাংশ স্থির করাই বিধেয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কাণ্ড ছাড়িয়া এক লম্ফে শাখাপল্লবে বিহার করিতে যাওয়া মানুষের কায নহে। আমরা দেখিতেছি, এখন ঔপনিবেশিক শাসনের দাবীটিকে মালগাড়ীর মত পথিপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া রাখিয়া অস্পষ্ট সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের ব্যাপারটাকেই মেল ট্রেণের মত দ্রুত অগ্রসর করা হইতেছে। কিন্তু এই ফেডারাল শাসন বা সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের মত অস্পষ্ট এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনিষ্টকর ব্যবস্থা আর কিছুই নাই। ইহা যদি যথাযথভাবে গৃহীত না হয়, এবং কেন্দ্রী সরকার যদি সেরূপ জাতীয়ভাবে পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে ইহার অন্তর্ভুক্ত বিবিধ রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ ও ঈর্ষ্যা জাগিয়া উঠিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। রাজন্যবর্গের জন্য আমাদিগকে এই শাসনপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবেই, ইহার অর্থ কি? ভারতে ৫ শত ৬২টি রাজন্য-শাসিত রাজ্য বিদ্যমান। তাহার মধ্যে রাজপুতানার লওয়া রাজ্যের মত ১৭ বর্গ-মাইল ভূমি-পরিমিত ক্ষুদ্র রাজ্যও আছে, আবার ইটালীর ন্যায় বিস্তীর্ণ হাইদ্রাবাদ রাজ্যও আছে; শিক্ষায়, সভ্যতায়, ইতিহাসে, ঐতিহাসিক বিকাশধারায়, অতীত অবদানে এই সকল রাজ্যের মধ্যে পার্থক্যও অত্যন্ত অধিক। ইহাদের মধ্যে একতানতার সৃষ্টি করিয়া নিখিল ভারতের সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে আনা সহজ হইবে না। ইতোমধ্যেই রাজন্যবর্গ আপন আপন স্বার্থরক্ষার্থ কিরূপ চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা পোষ্টাফিস ও রেলওয়ে প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহাদের প্রভুত্ব-রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ তাঁহাদিগকে নিখিল ভারতীয় সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে না। ইহাতে স্বায়ত্তশাসন পাইতে বিশেষ বিলম্ব ঘটিবে। ইহাদের জন্য শাস্ত্রী এবং সপ্রুর ন্যায় ব্যক্তিও ভারতে সংহিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন কেন, তাহা বুঝা গেল না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রহস্যজালে জড়িত।

ইতোমধ্যে ফেডারেশন কমিটীর কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেও হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ-সমস্যাটা মীমাংসার দিকে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হইতেছে না। মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে যাঁহারা এই পরামর্শ-পরিষদে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা জিনার ১৪ দফা দাবী একবারে শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন,—কিছুতেই তাঁহারা তাহা পরিহার করিবেন না। ইহার অন্তরালে একটা বিশেষ কিছু ব্যাপার আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সময়ে ভারত হইতে কতকগুলি মুসলমান সভাসমিতি ক্রমাগতই হট্টগোল সমিতির সদস্যদিগকে তারযোগে জানাইতেছেন যে, "খবরদার, তাঁহারা যেন জিনার ১৪ দফা দাবী হইতে রেখামাত্র বিচ্যুত না হয়েন।" ইহার ভিতর একটা কোন রহস্য না থাকিলে এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে না। এক পক্ষ যদি তাঁহাদের ষোল আনার উপর আঠার আনা স্বার্থ আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই এই ব্যাপারের মীমাংসা হইতে পারে না। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বড়লাট যে সমর-বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে কতকগুলি সামরিক কর্ম্মচারী স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, ভারতে যত দিন জাতিতে জাতিতে বিবাদ থাকিবে, তত দিন ভারতে বৃটিশ প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ৩০ পদাতিক দলের Col. T. Boisragon বলিয়াছিলেন,—Antagonism of classes is one of our surest holds on this country অর্থাৎ "ভারতে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিবাদ আমাদের ভারতে প্রভুত্ব-রক্ষার একটি নিশ্চিত উপায়।" ৩২ম পাইওনীয়ার দলের Major Crookshank লিখিয়াছিলেন:—"In the antagonism and rivalry arising from defference of caste and creed should rest our strength. অর্থাৎ জাতিতে জাতিতে, একধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বিরোধ এবং প্রতিযোগিতার উপর আমাদের প্রভুত্ব রক্ষা করা উচিত।" এইরূপ অনেক উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। আজ যদি এক সম্প্রদায় তাহা না বুঝেন, তাহা হইলে উপায় কি? তাই বলিতেছি, যিনি যাহাই বলুন, যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই পরামর্শ বৈঠক ইতিহাসে হট্টগোল সভা নামেই অভিহিত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

বন্ধু-বিয়োগ

জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, কর্ম্মী, দেশপ্রেমিক, বন্ধুবৎসল, উদার, হাস্য-প্রফুল্লানন বন্ধু মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত আমাদের বুকে বাজিয়াছে। মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে কলিকাতা হাইকোর্টের এই প্রতিভাবান্ ব্যবহারাজীব গিরিডিতে গত ১১ই নভেম্বর অপরাহ্নে সহসা অতর্কিতভাবে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন! এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে!

মৃত্যুঞ্জয় কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ উকীল সরকার যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র। পঠদ্দশাতেই তাঁহাকে চক্ষুরোগে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, কিন্তু বাণীর চরণানুরক্ত ভক্ত সেবক অন্ধকারময় কক্ষে শিক্ষকের সাহায্যে পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং অধ্যবসায় ও মেধার গুণে একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা-সোপান অতিক্রম করিয়া শীর্ষস্থানে উপনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের ব্যবহারাজীবের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিরারাধ্যা জননী বাণীর সেবা হইতেও একবারে আপনাকে অপসারিত করিতে পারেন নাই, বঙ্গবাসী কলেজে এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনা করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উদীয়মান ব্যবহারাজীবের কর্ত্তব্যের সহিত অধ্যাপনার সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিলে পর তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন।

হাইকোর্টে তিনি দিন দিন যে নাম ও যে প্রসার-প্রতিপত্তি বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তাহা কয় জনের অবিদিত? এমন কোন্ স্বদেশী মামলা উঠিয়াছে, যাহাতে এই প্রতিভাবান্ ব্যবহারাজীব আসামীপক্ষের পক্ষসমর্থনে দণ্ডায়মান না হইয়াছেন? কত অসহায় দেশকর্ম্মী তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়াছেন!

দেশসেবার পথ কুসুমাবৃত নহে। দেশের মুক্তিকামনায় যাঁহারা আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদিগকে পদে পদে বিঘ্ন-বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতে হয়। মৃত্যুঞ্জয় বাবু তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করিয়া রাজদ্বারে বন্ধুর কার্য্যই সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারে তাঁহার নির্ভীকতা, তাঁহার একাগ্রতা, তাঁহার দেশপ্রেমের পুণ্য পবিত্র আকুলতা যে দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। 'ফরওয়ার্ড' ও 'লিবার্টির' রাজদ্রোহের মামলা—দক্ষিণ-কলিকাতা কর্ম্মি-সঙ্ঘের মামলা তিনি বিনা পারিশ্রমিকে একনিষ্ঠভাবে পরিচালনা করিয়াছিলেন। দেশকর্ম্মীর বিপদের দিনে অযাচিত বন্ধুরূপে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি নীরবে দেশজননীর সেবা করিয়া গিয়াছেন,—এজন্য এই নিরহঙ্কার হৃদয়বান্ পুরুষকে কেহ কখনও আস্ফালন করিতে দেখে নাই। তাঁহার এই নীরব দেশসেবার কথা জাতির মুক্তির ইতিহাসে নিঃসংশয়ে লিখিত থাকিবে সন্দেহ নাই।

হাস্যে উজ্জ্বল, বিনয়ে নম্র সেই আনন আর দৃষ্টিপথ আলোকিত করিবে না। ছাত্রসুহৃদ অধ্যাপক অথবা প্রতিভাবান্ ব্যবহারাজীব—যেরূপেই তিনি দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়া যান, আমাদের কাছে তিনি অকৃত্রিম বন্ধু, বাণীর পূজারী, দেশজননীর সুসন্তান। এমন বন্ধুকে অকালে হারাইয়া আমরা বিয়োগ-ব্যথায় কাতর। মৃত্যু অনিবার্য্য, মরিলে শোক করিতে নাই, এ কথা জানি, কিন্তু তথাপি এ শোকে যে সান্ত্বনা নাই!

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ] পৌষ, ১৩৩৭ [৩য় সংখ্যা

পারমার্থিক রস

১৪

যে সকল মনোবৃত্তির মিলিতভাবে আস্বাদন রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে প্রধান বা ভিত্তিস্থানীয় যে মনোবৃত্তি, তাহাকেই আলঙ্কারিকগণ স্থায়ী ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই স্থায়ী ভাবের লক্ষণ অলঙ্কার-শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥"
(সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ)

অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক, কোন আস্বাদ্যমান ভাব যাহাকে তিরোহিত করিতে সমর্থ হয় না, রসাস্বাদরূপ অমৃতবল্লীর অঙ্কুরসমূহের যাহা মূলস্থানীয়, সেই মনোবৃত্তি-বিশেষই স্থায়ী ভাব বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।

আদিরসের স্থায়ী ভাব রতি, এই রতি বলিলে কীদৃশ মনোবৃত্তি বুঝা যায়, তাহাও সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন; যথা—

"রতির্মনোঽনুকূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্।"

যে বস্তু মনের অনুকূল অর্থাৎ মন যাহাকে তৃপ্তির সাধন বলিয়া বুঝে, সেই বস্তুর প্রতি মনের যে উৎকট আবেগ বা অনুরাগ, তাহাকে রতি বলা যায়। স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের অথবা পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের এইরূপ যে মনোবৃত্তি, তাহাই আলঙ্কারিকগণের মতে রতি শব্দের মুখ্য অর্থ।

এই রতি বিদ্যমান থাকিলে, যাহার প্রতি এই রতি থাকে, সে নিকটে না থাকিলে তাহাকে দেখিবার জন্য বা পাইবার জন্য উৎকট অভিলাষ, তাহার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা, তাহার প্রাপ্তির প্রতি যাহা কিছু অন্তরায়, তাহার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ, তাহার জন্য প্রবল চিন্তা, তাহাকে না পাইলে দুর্ব্বিষহ অবসাদ, তাহার জন্য আবেগ, দৈন্য, সন্তত স্মৃতি, তাহাকে পাছে হারাই, এই ভয়, কখনও বা তাহার প্রতি ক্রোধ, এই প্রকার মনোবৃত্তিসমূহ কখনও পৃথগ ভাবে কখনও বা মিলিত-ভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকে। যে ভাবেই ইহারা উদিত হউক্ না কেন, কিন্তু উদিত হইয়া সেই অনুরাগ বা রতিকে ইহারা তিরোহিত বা গুণীভূত করিতে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত নিজ নিজ আস্বাদন দ্বারা ইহারা সেই রতির উৎকর্ষ বা আস্বাদ-প্রকর্ষ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই সকল মনোবৃত্তির মধ্যে কতক-গুলি হয় ত রতির অনুকূলভাবে আবির্ভূত হয়, আবার কোন কোন সময়ে কতকগুলি সেই রতির প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়। চিন্তা, উৎকণ্ঠা, বিষাদ, আবেগ, দৈন্য প্রভৃতি অনুকূল ভাবের মধ্যে পরিগণিত; অন্য দিকে ক্রোধ, উপেক্ষা, বিদ্বেষ,

উগ্রতা প্রভৃতি প্রতিকূল-ভাবের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে; অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক, কোন ভাবই কিন্তু এই অনুরাগ বা রতির মূলোচ্ছেদে সমর্থ হয় না, উহার আস্বাদনকে ম্লান বা পরিভূত করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত তাহার আস্বাদনকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলে, আরও ঘনীভূত করিয়া দেয়। অনুকূল ভাবনিচয় জাজ্জ্বল্যমান অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ঘৃতের ন্যায় অথবা সন্ধুক্ষণার্থ ব্যবহৃত দণ্ডের ন্যায় প্রকাশ-বৃদ্ধির প্রতি কারণই হইয়া থাকে, সেইরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল মনোবৃত্তিনিচয় অভিব্যক্ত হইয়া স্থায়ী রতি-ভাবের ঔজ্জ্বল্য ও পরিপুষ্টিরই কারণ হইয়া থাকে।

তাই আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন—

"সুকৃস্বত্রবৃত্ত্যা ভাবানামন্যেষা মনুগামুকঃ।
ন তিরোধীয়তে স্থায়ী তৈরসৌ পরিপুষ্যতে॥"

(সাহিত্যদর্পণ, রস-পরিচ্ছেদ)

নানাবর্ণের পুষ্পগ্রথিত মালায় সূত্রের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবনিচয়ের সহিত অনুগত যে স্থায়ী ভাব, তাহা ঐ সকল বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাবনিচয়ের দ্বারা তিরোহিত হয় না, প্রত্যুত পুষ্টই হইয়া থাকে। অর্থাৎ মালাকার যখন নানা পুষ্পের দ্বারা মনের মত মালা গাঁথিতে থাকে, তখন প্রত্যেক পুষ্পকে সন্নিবেশিত করিতে করিতে সূত্রকেই ধরিয়া থাকে, তাহার নেত্র ও অন্তঃকরণ প্রতি পুষ্পগ্রথনে সেই সূত্রেই আকৃষ্ট থাকে, সেইরূপ রসাস্বাদকালে প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ভাবনিচয়ের অনুভূতি এই স্থায়ী ভাব বা অনুরাগের অনুভূতি দ্বারা অনুস্যূত থাকে। উদাহরণস্বরূপে মহাকবি ভবভূতির একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইতে পারে—

"অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্ গোদাবরীরোধসি।
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥"

(উত্তরচরিত, ৩য় অঙ্ক)

দণ্ডকারণ্যে বিরহব্যাকুল শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া শ্রীজানকীর অরণ্য-বাসসহচরী বনদেবতা বাসন্তী বলিতেছেন,—"রামভদ্র! মনে পড়ে কি? এই সেই লতা-গৃহ, এক দিন তুমি একাকী তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলে, জানকী গোদাবরীতীরে বিহরণশীল হংসকুলের দিকে আকৃষ্ট দৃষ্টি হইয়া কৌতূহল বশতঃ তুমি যে তাঁহার পথ চাহিয়া বসিয়া আছ, তাহা ভুলিয়া গিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি চমক ভাঙ্গিয়া যাইবার পর তাড়াতাড়ি লতাগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, ফিরিবার সময়ে তোমার সেই ঔৎসুক্য ও অবসাদভরা কাতর দৃষ্টির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, তখনই তাঁহার নয়নে কাতর ভাবের মলিনিমা প্রতিভাত হইল—আর কখনও এমন গুরুতর অপরাধ আমি করিব না, আমাকে ক্ষমা কর—ইহাই বুঝাইবার জন্য বিকাশোন্মুখ মনোহর অরবিন্দ-কলিকার ন্যায় দুই করে অঞ্জলি বাঁধিয়া তোমাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। রামভদ্র! মনে পড়ে ত, কি সুন্দর সে প্রণাম?" বনদেবী বাসন্তীর এই উক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, হংসকুলবিমণ্ডিত তটভূমির প্রান্তদেশে বহনশীলা, স্নিগ্ধ-নীলস্বচ্ছসলিলা গোদাবরীর অরুণরঞ্জিত অনুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে শ্রীজানকী প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মধুর অনুভূতির অনিবার্য্য প্রভাবে ক্ষণিক বিস্মৃতিরূপ বিরুদ্ধ ভাবের উদয়ে অনুরাগের তীব্রগতিশীল প্রবাহ যেন একটু 'থম্‌থমে' ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তিনি যেন সত্যসত্যই তাঁহার প্রাণারাম জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীরামভদ্রকে তাঁহার প্রেমময় মানস-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই গুরুতর অপরাধ প্রেমিকের পক্ষে মর্ম্মবিদারী; সুতরাং সর্ব্বথা অসহনীয়; কারণ, ইহা অনুরাগের বিরুদ্ধ ভাব। এই বিরুদ্ধ ভাব কিয়ৎকাল উদিত হইয়া কিন্তু শ্রীজানকীর অনুরাগকে তিরোহিত করিতে পারে নাই, প্রত্যুত পথের দিকে বদ্ধ-দৃষ্টি আকুল-হৃদয় চিন্তাবসাদগ্রস্ত শ্রীরামভদ্রের ম্লান মুখ-পঙ্কজের প্রতি চাহিবামাত্র যে অনুশোচনা, নির্ব্বেদ ও আকুলতার তীব্র ঝটিকা যুগপৎ সমুদিত হইয়া তাঁহার সেই অনুরাগের প্রবাহে যে খরবেগতা ও তরঙ্গাবলী অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা সেই অনুরাগ-প্রবাহের গভীরতা ও তীব্রবেগতা সহৃদয় সামাজিক মানসনেত্রে আরও মনোহর ভাবে স্ফুটতর হইয়াছিল; সুতরাং বিরুদ্ধসঞ্চারী ভাবনিচয় উদিত হইলেও তাহা অনুরাগরূপ স্থায়ী ভাবকে ম্লান করিতে পারে না, প্রত্যুত তাহাকে পরিপুষ্টতরই করিয়া থাকে। এইরূপ আলঙ্কারিক আচার্য্য-উক্তি সর্ব্বথা সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত, তাহাই মহাকবি ভবভূতি এই অনুপম সমুজ্জ্বল চিত্র দ্বারা পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন,

তাহাতে সন্দেহ নাই। আদিরসের উপাদানস্বরূপ এই স্থায়ী ভাব বা রতি, ভক্তহৃদয়ে পরমার্থিক রসের উপাদানভূত রতি নহে; কারণ, এই রতি প্রাকৃত, কিন্তু পারমার্থিক রসের উপাদানভূত যে রতি, তাহা প্রাকৃত নহে, পরন্তু তাহা অপ্রাকৃত, ইহাই হইল ভক্তশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত যে সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদেরই উক্তি দ্বারা এক্ষণে তাহার স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক স্বীয় গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী পারমার্থিক রসের উপাদানস্বরূপ স্থায়ী ভাব অর্থাৎ রতির স্বরূপনির্দ্দেশ এইরূপ করিয়াছেন, যথা—

"শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥"

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিস্বরূপ যে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ, তাহাই ভাব বা রতি। ইহা প্রেমরূপ যে সূর্য্য, তাহার নবোদিত কিরণস্থানীয়। ভগবান্‌কে পাইবার জন্য, তন্ময় হইবার জন্য, তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ্য করিবার জন্য যে অভিলাষ, সেই অভিলাষ উৎপাদন করিয়া ইহা প্রাকৃত বস্তুতে অহন্তা ও মমতা-বুদ্ধিরূপ কাঠিন্য দূর করিয়া চিত্তকে কোমল করিয়া থাকে। এই শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তিবিশেষই প্রেমভক্তিরূপ পারমার্থিক রসের স্থায়ী ভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এই শ্লোকটির মধ্যে 'শুদ্ধ-সত্ত্ববিশেষ' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে এই পারমার্থিক রসের স্থায়ী ভাবের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রীভগবানের স্বরূপভূত ত্রিবিধ স্বরূপ-শক্তি বিদ্যমান আছে, যথা—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। উপনিষদ বলিয়া দিতেছে,—"অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম—"

সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত অবিনাশী সৎ, চিৎ ও আনন্দই ব্রহ্ম। এই অখণ্ডসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া আবকারভেদানুসারে অভিহিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ইহাও শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

যে অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ব বা পারমার্থিক সদ্‌বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাই প্রকাশ-ভেদানুসারে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ বলিয়া অভিহিত হয়।

এই শ্রৌত সিদ্ধান্তানুসারে—শ্রীভগবান্‌ই সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই একমাত্র পরমার্থ সৎ, তিনিই একমাত্র চিৎ এবং তিনিই একমাত্র আনন্দ। স্বয়ং সৎস্বরূপে নিত্য বিদ্যমান থাকিয়া অন্য সকল সখণ্ড বস্তুকে যিনি যে শক্তির দ্বারা সত্তাযুক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই স্বরূপশক্তির নাম সন্ধিনী শক্তি। স্বয়ং চিদাত্মক হইয়া যে শক্তির দ্বারা তিনি জীবনিবহকে চৈতন্যসম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই স্বরূপশক্তিকে সম্বিৎ বলা যায় এবং স্বয়ং আনন্দস্বরূপ থাকিয়া যে শক্তির দ্বারা আত্মস্বরূপ আনন্দকে স্বয়ং অনুভব করিয়া থাকেন এবং নিখিল জীবকে সেই আনন্দের অনুভব করাইয়া থাকেন, তাঁহার সেই স্বরূপশক্তিকেই হ্লাদিনী শক্তি বলা যায়। এই হ্লাদিনী শক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি অর্থাৎ অন্তরঙ্গশক্তি, মায়াশক্তির ন্যায় ইহা বহিরঙ্গশক্তি নহে। এই শক্তির অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির যে বৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ পরিণতিবিশেষ, বৈষ্ণবদর্শনে তাহারই নাম শুদ্ধ-সত্ত্ববিশেষ। এই শুদ্ধসত্ত্ববিশেষেরই নাম ভাব বা রতি। এই রতিই হ্লাদিনী শক্তির সারভূত বৃত্তি। ইহার স্বরূপ-প্রতিপাদন বিশদভাবে করিতে যাইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—

এ সংসারে প্রত্যেক মানবের স্বভাব এই যে, অভিলষিত প্রাপণীক বস্তু লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে এক প্রকার অতৃপ্তিময় আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি, এ সংসারে যাহা আমার রুচি অনুসারে আমার নিকটে সুন্দর বা উপভোগ্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাকে নিজের আয়ত্ত করিয়া 'তাহা আমারই,' এইরূপ অনুভব করিয়া, তাহাকে নিজের মনের মত উপভোগ করিবার জন্য আমার প্রবৃত্তি যেমন স্বাভাবিক, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত বুঝিয়া তাহার উপভোগ করিয়া সুখের অনুভব করাও আমার—শুধু আমার কেন, জীবমাত্রেরই তেমনই স্বাভাবিক। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু লাভের পর তদ্বিষয়ক আনন্দের অনুভূতির সহিত সেই বস্তুর অপ্রাপ্তিকালে তাহাকে পাইবার জন্য অন্তঃকরণের ঐকান্তিক ঔৎসুক্যময় যে স্পৃহা, তাহার উপশমও আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেই উপশমের সঙ্গে সঙ্গে ভোগাভিলাষের তীব্রতাহানিমূলক সুখানুভূতির তারতম্যও আমাদের প্রত্যেকের অনুভব-সংবেদ্য, ইহাও বুঝিয়া থাকি। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, বহু যত্ন ও বহু পরিশ্রমে লব্ধ ভোগ্যবস্তুর লাভজনিত

তৃপ্তির পরক্ষণ হইতেই অপ্রাপ্তিকালে ভোগ্যবস্তুগত যে সৌন্দর্য্য বা চারুতা আমাদের নিকটে অনুপম বা লোকাতীত বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, সেই সৌন্দর্য্যের—সেই চারুতার মাত্রা যেন আমাদের নিকট কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে মনে অনুভূত হইতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে আরও কোন নূতন সৌন্দর্য্যের নূতন মধুরিমার আস্বাদনার্থ অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা হৃদয়াকাশের এক প্রান্তে নিদাঘান্তে বায়ুকোণে সমুদিত ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া ক্রমে বাড়িতে আরম্ভ করে। প্রাপঞ্চিক ভোগ্যবস্তুনিচয়ের প্রাপ্তিবশতঃ প্রীতির নিত্যসহচর এই অতৃপ্তিময় আকাঙ্ক্ষা—এই অজানা অচেনা কোন এক নূতন সৌন্দর্য্যের নূতন মাধুর্য্যের আস্বাদনের জন্য অব্যক্তকল্প অভিলাষ—ইহাই হইল হ্লাদিনী শক্তির সার বৃত্তি। ইহাই হইল প্রতি জীবের স্বয়ংপ্রকাশমান ভগবৎ-প্রাপ্তির অব্যক্ত অভিলাষ। নিত্য, সীমাতীত, প্রতিক্ষণে নূতন ভগবৎসৌন্দর্য্য দর্শনের জন্য তাহাতে মিশিয়া গলিয়া যাইবার জন্য স্বানুভবসম্বেদ্য, প্রাণশক্তির অফুরন্ত স্পন্দন, ইহারই নাম রতি। ইহাই প্রেমকল্পবৃক্ষের অমর বীজ, ইহারই নাম মানবের—প্রত্যেক জীবের সহজ বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

সাধনভক্তির সাহায্যে চিত্ত বিশুদ্ধ ও বিগলিত হইলে ইহার যে প্রাথমিক অভিব্যক্তি তাৎকালিক মনোবৃত্তিতে পরিস্ফুরিত হইয়া উঠে, তাহারই স্বরূপ বুঝাইতে যাইয়া আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রীতি-সন্দর্ভ গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"তদেবং ভগবৎপ্রীতেরেব পরমপুরুষার্থতা স্থাপিতা, অথ তস্যাঃ স্বরূপলক্ষণং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদেন অতিদেশ-দ্বারা দর্শিতম্।

'যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥'

যা যল্লক্ষণা, সা তল্লক্ষণা, নতু যা সৈব বক্ষ্যমাণলক্ষণৈ-ক্যাৎ। তথাপি পূর্ব্বস্যা মায়াশক্তিবৃত্তিময়ত্বেন উত্তরস্যাঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিময়ত্বেন ভেদাৎ।"

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা শ্রীভগবৎ-প্রীতিই যে মানবের পক্ষে পরমপুরুষার্থ—ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। এই ভগবৎ-প্রীতির স্বরূপ কি, তাহারই নির্ণয় করা যাইতেছে,—

বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়, শ্রীপ্রহ্লাদ অতিদেশ দ্বারা অর্থাৎ সাধর্ম্ম্যপ্রদর্শন দ্বারা ভগবৎ-প্রীতির স্বরূপ এইরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা—'বিবেকহীন সাংসারিক জীবনিচয়ের প্রাপঞ্চিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু-সমূহে অনপায়িনী যে প্রীতি বিদ্যমান থাকে, হে ভগবন্, তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে করিতে আমারও যেন তোমার প্রতি অভিব্যক্ত সেই প্রীতি অর্থাৎ সেইরূপ প্রীতি হৃদয় হইতে যেন ক্ষণকালের জন্যও অপসৃত না হয়।' এই শ্লোকে 'যা' এই শব্দটির অর্থ যাদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত এবং 'সা' এই শব্দটির অর্থ তাদৃশ-লক্ষণান্ত—এইরূপই বুঝিতে হইবে। লৌকিক প্রীতি ও ভগবৎ-প্রীতির লক্ষণগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া লৌকিক প্রীতি ও ভগবৎ-প্রীতি যে একই বস্তু, তাহা নহে। এই উভয় প্রকার প্রীতির লক্ষণ কিরূপে একই প্রকারের হইয়া থাকে, তাহা পরে বুঝান যাইবে; লৌকিক প্রীতি যে হেতু মায়াশক্তির বৃত্তিময় হয় এবং ভগবৎপ্রীতি যে হেতু স্বরূপশক্তির অর্থাৎ হ্লাদিনীর বৃত্তিময় হয়, এই কারণে লৌকিক প্রীতি ও ভগবৎপ্রীতি একই প্রকারের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও পরস্পর ভিন্ন হইয়া থাকে, তাহা উভয়ই যে এক বস্তু, তাহা নহে।

আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীর এইরূপ উক্তি দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, লৌকিক রসাস্বাদের বিষয় যে বিষয়প্রীতি, তাহা লৌকিক রসাস্বাদে স্থায়ী ভাব হইলেও পারমার্থিক রসের স্থায়ী ভাব হইতে পারে না। পারমার্থিক রসের স্থায়ী ভাবস্বরূপ যে প্রীতি, তাহা লৌকিক প্রীতি নহে; কিন্তু অপ্রাকৃত ভাগবতী প্রীতি, তাহা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি-বিশেষ, তাহা বৈষয়িক প্রীতির ন্যায় কিয়ৎকালস্থায়িনী নহে, পরন্তু তাহা নিত্যসিদ্ধ, তাহাই জীবের—জীবমাত্রের সাহজিক বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই ভক্তকবিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ-দাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদিশুদ্ধচিত্তে লভয়ে উদয়॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন:—

"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।"

পারমার্থিক রসের স্থায়ী ভাব যে কৃষ্ণরতি, তাহা নিত্য-সিদ্ধ; সুতরাং তাহা সাধ্য বা উৎপাদ্য হইতে পারে না। বিশুদ্ধ যে তাহার প্রকটতা বা অভিব্যক্তি, তাহা সাধ্য হয় বলিয়া ঐ ভাবের সাধ্যতা বা উৎপাদ্যতা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়া থাকে। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

জীবন-তীর্থ

১

"মা ক'লি !—"

মক্কেলের প্রদত্ত তাজা, বৃহৎ রোহিত মৎস্যটি অন্দরে পাঠাইয়া দিবার পরেই মৃত্যুঞ্জয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকালের অভ্যাস মানুষ ভুলিতে পারে না, তাই তিনি অন্দরে পা দিয়াই তাঁহার আদরের দুলালী ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলাকে উৎসাহভরে ডাকিলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে নির্ম্মম ভবিতব্যের নিষ্ঠুর স্মৃতি তাঁহার রসনাকে নির্ব্বাক্ করিয়া দিল। অসমাপ্ত আহ্বান!—নিজের কণ্ঠস্বরে শিহরিয়া উঠিয়া তিনি পুনরায় বাহিরের দিকে পা বাড়াইলেন।

"জ্যাঠামশাই, আমায় ডাক্‌ছেন ?"

মৃত্যুঞ্জয়ের উত্থিত চরণ সহসা গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িল। তিনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। তাঁহার জীবনের আনন্দলতিকা কমলা, শ্রীহীন বেশ এবং বিষণ্ণমূর্ত্তি লইয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘ দিনের প্রথা—আনন্দময় যুগের ব্যবস্থা অনুসারে বাড়ীতে বড়, ভাল মাছ আসিলেই সর্ব্বাগে তাঁহার আদরিণী কমলার ডাক পড়িত। মাছের ভক্ত বলিয়া কমলা মহোৎসাহে মৎস্যের অঙ্গ-সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধনের সকল পর্ব্বেই যোগ দিত। মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারে সেই জ্যেষ্ঠ সন্তান—সকলেরই আদরিণী, প্রিয়পাত্রী। দাসদাসী, পাচক প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই, নিঃসন্তান মৃত্যুঞ্জয়ের এই দুলালী ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলার সন্তোষবিধানের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিত।

ছয় মাস পূর্ব্বেও কমলার তরুণ দেহে যে যৌবন-শ্রী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, নিয়তির এক দিনের অমোঘ স্পর্শে তাহা স্তব্ধ ও তরঙ্গহীন হইয়া গিয়াছে, নারীজাতির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য-দীপ্তির রক্তরাগ ললাট ও সীমন্তদেশ হইতে নির্ব্বাসিত, বিলুপ্ত। মৎস্য-মাংসের সহিত সকল সম্বন্ধ ভুলিয়া দিয়া কমলা যে লোকান্তরবাসিনী দেবতার রাজসিক ও তামসিক ব্যাপারের অতীত, এ কথাটা মৃত্যুঞ্জয়ের স্মৃতিকে নূতন করিয়া আঘাত দিয়া গেল।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া মৃত্যুঞ্জয়-গৃহিণীও ঘরের বাহিরে আসিয়াছিলেন। প্রাঙ্গণস্থিত মৎস্য এবং বিবর্ণমুখ স্বামীর পার্শ্বে কমলাকে দেখিবামাত্র তিনি ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইলেন।

সন্তান-ভাগ্য হইতে বঞ্চিত মৃত্যুঞ্জয় কনিষ্ঠ সহোদরের সন্তানগণকে লইয়াই আনন্দভবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ধনঞ্জয়ের পুত্রকন্যাই তাঁহার তৃষিত পিতৃহৃদয়ের সমুদয় স্নেহ দস্যুর মত লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল। বিশেষতঃ কমলা তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও জ্যেঠাইমার নয়নের মণি, ইহা আত্মীয়-স্বজন সকলেরই কাছে সুবিদিত ছিল। কমলার সামান্য ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া অনেক সময় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ধনঞ্জয়ও বিস্মিত হইতেন। দ্বাদশবর্ষীয়া কমলার যখন বিবাহ দিবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন ধনঞ্জয় তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠের সমুদয় যুক্তিতর্ক তিনি অসার বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় কলিকাতা হাইকোর্টের শুধু সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ছিলেন না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। আধুনিক বিজ্ঞান, দেশ-বিদেশের সাহিত্য তাঁহার নখদর্পণে ছিল। জ্ঞানসংগ্রহের জন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম্ম ও সমাজ-বিন্যাসপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ব্যবসায় উপলক্ষে বহু বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন দেশীয় নরনারীর সহিত ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করিবার অবকাশও তাঁহার ঘটিয়াছিল। সুতরাং তিনি বুঝিয়াছিলেন, আধুনিক এবং অপরিপুষ্ট প্রতীচ্য সভ্যতার আপাতমধুর আবর্ত্তে ঝাঁপ দিয়া পড়া বাঞ্ছনীয় নহে। পাঁচ ছয় হাজার বৎসরের পুরাতন এবং পরীক্ষিত সভ্যতার পরিবর্ত্তে, বস্তুতান্ত্রিক শিশুসভ্যতাকে আঁকড়িয়া ধরিলে জাতীয় অকাল-মৃত্যু ঘটিবার যথেষ্ট আশঙ্কা বিদ্যমান।

তাঁহার অমোঘ যুক্তিজাল এবং প্রচুর অখণ্ড প্রমাণ-প্রয়োগের ফলে ধনঞ্জয় নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিলেন, মন প্রসন্ন না হইলেও উদারহৃদয়, স্নেহপ্রবণ জ্যেষ্ঠ সহোদরের

কার্য্যে প্রতিবাদ করিবার শক্তি ও সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দ্বাদশবর্ষীয়া কমলাকে বিংশবর্ষীয় সুস্থ, সবল, শ্রীমান্ এবং কৃতবিদ্য সুশীলচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। জামাতা এম, এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে নিজের ব্যবসায়ে টানিয়া লইয়া জীবনসংগ্রামের পাথেয় অর্জ্জনে নিযুক্ত করিবেন, এ বিষয়েও তিনি কৃতসংকল্প ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের মনস্কামনা সফল হইয়াছিল। সুশীলচন্দ্র যথাসময়ে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইনের অগ্নি-পরীক্ষায় জয়মাল্য লাভ করিয়াছিল। জ্যেঠামহাশয় তাহাকে নিজের কাযে টানিয়া লইয়া তাহার সাফল্যলাভে সহায় হইয়াছিলেন। কিন্তু ছয় মাস পূর্ব্বে অকস্মাৎ তিন দিনের অজ্ঞাত রোগের পীড়নে তরুণ যুবক, দুই বৎসরের শিশুপুত্রকে কমলার বুকে রাখিয়া চিররহস্যময় লোকে প্রয়াণ করিয়াছিল।

সে আকস্মিক তীব্র আঘাত কাহার বুকে অধিক বাজিয়াছিল, তাহা শুধু এক জনই বলিতে পারেন। তবে দেখা গিয়াছিল, প্রৌঢ় মৃত্যুঞ্জয়কে আংশিক সান্ত্বনা দিবার জন্য তরুণী কমলাকে শয্যাত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় তাহাকে নিরাভরণা বা শুভ্রবসনা দেখিয়া পুনরায় কয়দিন শয্যার আশ্রয় ত্যাগ করেন নাই দেখিয়া বাধ্য হইয়া কমলাকে কয়গাছা সোণার চুড়ী, সোণার হার এবং সূক্ষ্ম পাড়যুক্ত বসনের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

গত ছয় মাসের মধ্যে, মৃত্যুঞ্জয়ের সদা আনন্দ-কলরব-মুখর অট্টালিকা কোন উৎসব-আলোক বক্ষে ধারণ করে নাই, বৃহৎ মৎস্য সে গৃহে প্রবেশাধিকার পায় নাই। শুধু যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় গৃহের অধিবাসীরা জীবন ধারণ করিয়া চলাফেরা করিতেছিল।

মৃত্যুঞ্জয়-গৃহিণীর মানস-দৃষ্টির সম্মুখে নিমেষমধ্যে চলচ্চিত্রের ছবির ন্যায় অতীত যুগের দৃশ্যগুলি একে একে আবির্ভূত হইয়া অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে কমলার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কমলা প্রচণ্ড আয়াসে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া প্রফুল্লতার ব্যর্থ চেষ্টায় বলিল, "জ্যেঠা মশায়, বেশ বড় মাছ ত! কে পাঠালে, বলুন না?"

প্রৌঢ় মৃত্যুঞ্জয়ের সর্ব্বদেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। প্রচণ্ড চেষ্টাসত্বেও তাঁহার বক্ষঃস্থল স্ফীত, আন্দোলিত হইয়া উঠিল। অশ্রুবন্যা নয়নপথে নামিয়া আসিল। তিনি দ্রুতচরণে বহির্ব্বাটীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়-গৃহিণীও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিলেন। মাতৃহৃদয়ের অব্যক্ত বেদনাকে রুদ্ধ করিবার শক্তি কোথায়?

অশ্রুম্লান কমলাকে তিনি বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। নদীর স্রোতে নদীর স্রোতোধারা মিশিয়া স্ফীত হইয়া উঠিল।

২

তরঙ্গায়িত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তর রহস্য-মাধুর্য্যে হাসিতেছিল। দূরে বৈদ্যনাথজীর মন্দির হইতে সন্ধ্যার আরাত্রিক ঘণ্টা-নিনাদ দেবগৃহের মুক্তপবনে ভাসিয়া আসিতেছিল। পার্শ্বস্থ কোনও বাড়ীতে কেহ মধুরকণ্ঠে গান ধরিয়াছিল—

"আমার যাবার সময় হ'ল,
আমায় কেন রাখিস্ ধ'রে।"

কমলা মুক্ত বাতায়নের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে স্বপ্নবৎ মধুর-জ্যোৎস্না ও পুলকিত সীমাহীন প্রান্তর যেন কল্পনার জাল বয়ন করিতেছিল। অপরিচিত কণ্ঠের গানটি তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিল।

বিস্তৃত কক্ষমধ্যে মৃত্যুঞ্জয় শয্যালীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। গানের শব্দে তিনি উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। গায়ক তখন গাহিয়া চলিয়াছিল—

"চোখের জলের বাঁধন দিয়ে,
বাঁধিস্‌নে আর মায়া-ডোরে।"

"মা, ক'লি!"

জ্যেঠা মহাশয়ের কণ্ঠস্বরে কমলার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। সে ক্ষিপ্রচরণে রোগশয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "মা, গোটাকতক বালিস আমার পিঠের নীচে উঁচু ক'রে দে ত। আমি একটু উঠে বসি।"

আদেশ পালিত হইলে মৃত্যুঞ্জয় আরামসূচক শব্দ করিয়া বলিলেন, "বড় চমৎকার গান রে, মা ক'লি। এ যেন আমারই মনের কথা গানের সুরে ব'লে চলেছে।"

কমলার অন্তর ও দেহ শিহরিয়া উঠিল। আতঙ্ক-বিহ্বল-কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "জ্যেঠাইমাকে ডাকি, জ্যেঠা মশাই।"

তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "না রে, পাগলি, ভয় পাস্‌নে। তুই আমার কাছে বস্‌।"

বাতাসে তখন গান ভাসিয়া আসিতেছিল—

"ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দু'টি,—"

"সত্যি, বড় ঠিক কথা। আমারও তাই। আঃ, ভগবান্‌!"

কমলা এবার সত্যই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহার জ্যেঠা মশায়, পিতার অপেক্ষাও স্নেহে ও আদরে যিনি বুকে ধরিয়া এত দিন তাহাকে লালন-পালন করিয়া আসিয়াছেন, যাহার আশ্রয় ও অতুলনীয় স্নেহে সে পরম দুঃখকেও সহ্য করিয়া আসিতে পারিয়াছে, তাঁহার মুখে এ কি সাংঘাতিক কথা? তাহার দেহ পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল। কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় স্নিগ্ধহাস্যে বলিলেন, "ভয় পেয়েছিস্‌ মা? ভয় কি? ভয়কে জয় কর্‌তে শেখ্‌। জীবনের সেই পরম শিক্ষা। এ যাত্রা আমার শেষ হয়ে এসেছে ব'লে দুঃখ, শোক করিস্‌ নে। একটা কথা ব'লে রাখি, এখন কেউ নেই। আমি চ'লে গেলে অধীর হয়ে পড়িস্‌ না, মা। এক জন আছেন, তিনি সকলকে রক্ষা করেন, সান্ত্বনা দেন। পরম দুঃখের সময়, শোকের তীব্র আঘাতের সময় তাঁর উপর নির্ভর ক'রে থাকিস্‌।"

কমলা পুনরায় উঠিবার চেষ্টা করিল। বাড়ীর সকলকে ডাকা দরকার। জ্যেঠা মহাশয় এ সব—

মৃত্যুঞ্জয় স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাহার মনের কথা তিনি পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

"পাগলি, মা আমার। না, না, এখনই আমি যাচ্ছি না। ভয় নেই। তোকে নিরালায় পেয়ে দুটো কথা ব'লে রাখ্‌লাম। যদি পরে ভুলে যাই।"

কমলা এবার কোনও বাধা মানিল না। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ত্রস্ত-ব্যাকুল চরণে তাহার পিতা ও জ্যেঠাইমাকে ডাকিয়া আনিতে গেল।

মৃত্যুঞ্জয়ের মুখে তখনও মৃদু হাসি। বাতাসে তখনও গানের শেষ চরণ অপূর্ব্ব করুণ-রসের মাধুর্য্য ছড়াইয়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল—

"নাম ধ'রে আর ডাকিস্‌ নে ভাই,
যেতে হবে অনেক দূরে!"

৩

মানুষের ধারণা, চিকিৎসকের নির্দ্ধারণ যে সকল সময়েই অমোঘ সত্যরূপে প্রকাশ পাইবে, ইহা যথার্থ নহে। মানুষের অক্লান্ত চেষ্টা, ঐকান্তিক সাধনা অনেক সময় অসাধ্যসাধন করিয়া থাকে। সাধ্বী পত্নীর সেবা ও সাধনার প্রভাবে, প্রাণসমা ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলার প্রাণপাত সেবা-শুশ্রূষায় মৃত্যু এ যাত্রা পরাজিত হইয়া মৃত্যুঞ্জয়কে ত্যাগ করিয়া গেল।

দেবগৃহের মুক্ত বায়ু অতি দ্রুত তাঁহার বিকলপ্রায় দেহযন্ত্রকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে লাগিল। পরিবারস্থ সকলেরই বিষণ্ণ, ক্লান্ত আননে আবার আনন্দের দীপ্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ঘটা করিয়া কমলা বৈদ্যনাথজীর পূজা দিল। ভগবানের দয়ায় সে তাহার জ্যেঠা মহাশয়কে ফিরিয়া পাইয়াছে। তাঁহার এই দয়ার জন্য কমলা কি চিরজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে না?

অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয় পত্নী ও কমলার সহিত পথে প্রান্তরে বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সাঁওতাল পরগণার পৌষের দুর্জ্জয় শীত প্রৌঢ় মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষে যেন সালসার মত বলাধান করিতে লাগিল।

প্রভাত-রৌদ্রে যখন চারিদিক ঝলমল করিয়া উঠিত, শীতের উত্তরীয় কুজ্ঝটিকার মায়াজাল তখন ঐন্দ্রজালিক দণ্ড-স্পর্শের ন্যায় কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত। কমলা জ্যেঠা মহাশয়ের হাত ধরিয়া প্রত্যহ সেই সময় মুক্তপ্রান্তরে বাহির হইয়া পড়িত। কমলার চারি বৎসরের পুত্র তাহার দাদুর অগ্রে অগ্রে হাসির লহর তুলিয়া ছুটিতে থাকিত।

মৃত্যুঞ্জয় অতৃপ্ত নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকিতেন।

কমলার জীবনের একমাত্র অবলম্বন এই শিশুটির প্রতি তাঁহার সতর্ক দৃষ্টির অভাব ছিল না। ভৃত্য বা দাসীর

নিকট রাখিয়া তাঁহার মনের উৎকণ্ঠা প্রশমিত হইত না বলিয়াই তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও দৌহিত্রের সর্ব্বদা সন্ধান রাখিতেন। প্রফুল্ল পদ্মের মত শিশুর মনোহর কান্তি বৈদ্যনাথের বাতাসে দিন দিন স্বাস্থ্য ও সবলতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া গৃহের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের কঠিন পীড়ার বিভীষিকার ছায়া পরিবারস্থ প্রত্যেকের আনন হইতে অপসৃত হইয়া একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তির বিমল দীপ্তি প্রত্যেকের নয়নে, আননে দিন দিন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। দেবাদিদেব বৈদ্যনাথজীর মন্দির-প্রাঙ্গণে এ জন্য কমলা ও মৃত্যুঞ্জয়-গৃহিণী প্রত্যহ রোগমুক্ত গৃহস্বামীকে লইয়া সমবেত হইতেন।

গৃহী মানুষ, মঙ্গল ও অমঙ্গলের মূল সূত্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও নিঃসংশয় ধারণা করিতে পারিয়াছে, ইতিহাস, পুরাণ বা কাহিনী সে বিষয়ে কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখাইতে পারে কি? মানুষের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, কেন যে তাহা অকস্মাৎ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়—কোন্ মঙ্গলের বীজ সংসারী জীবের পক্ষে তাহাতে নিহিত থাকে, বিষয়াসক্ত মন কখনই তাহা ধারণা করিতে পারে না। ত্যাগী সন্ন্যাসী এ সম্বন্ধে যত উপদেশই প্রদান করুন না কেন, শাস্ত্র এ সম্বন্ধে যত তত্ত্বকথা প্রচার করুন না কেন, সাধারণ মানুষ কখনই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতে পারিবেও না।

সুতরাং কমলার অকাল-বৈধব্যের দুর্ব্বার স্মৃতি মৃত্যুঞ্জয়কে এ পর্য্যন্ত কোন সান্ত্বনাই দিতে পারে নাই। ঊনবিংশ-বর্ষীয়া তরুণী ভ্রাতুষ্পুত্রীর সংযমশান্ত মূর্ত্তি জ্ঞানী মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয়ে শুধু তীব্র বেদনারই সঞ্চার করিত। তবে তাঁহার মনের এক প্রান্তে একটা ক্ষীণ আশার আলোক জ্বলিতেছিল—শিশুটি বড় হইয়া কমলাকে আশ্রয় ও তৃপ্তিদান করিতে পারিবে।

খৃষ্টমাস পর্ব্বের দিন প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছিল। সে দিন সন্ধ্যায় বেড়াইয়া ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। চারি বৎসরের খোকা সে দিন বড় দাদুর হাত ধরিয়া ভ্রমণে কত উৎসাহই না প্রকাশ করিতেছিল। করণীবাগ হইতে বেড়াইয়া ফিরিবার পথে দোকানে গরম গরম পেঁয়াজের ফুলুরীর লোভ খোকার পক্ষে সংবরণ করা দুর্ঘট হইল। মৃত্যুঞ্জয়ের দুর্ব্বল আপত্তি সত্ত্বেও কমলা খোকাকে সান্ত্বনা ও আনন্দ দিবার জন্য উহা কিছু কিনিয়া দিল।

শিশুর তাহাতে কি উৎসাহ, কি আনন্দ! মৃত্যুঞ্জয় তৃপ্তিভরে দৌহিত্রের প্রসন্নহাস্যস্ফুরিত আননের দিকে চাহিয়া পথ চলিতে লাগিলেন।

৪

ইতিহাস প্রমাণ করিয়া থাকে, তুচ্ছতম, ক্ষুদ্রতম ব্যাপার হইতে বৃহত্তর ঘটনার পরিণতি। মানব-মনোবৃত্তির চির করগণও মানসিক ব্যাপারেও সেই একই হেতু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

সামান্য পেঁয়াজের ফুলুরী হইতে রাত্রিশেষে কমলার একমাত্র সন্তানের দেহে বিসূচিকার তীব্র বিষ কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল—চিকিৎসকগণ সে সম্বন্ধে নানামত প্রচার করিলেন। দেওঘরের যাবতীয় প্রসিদ্ধ প্রবীণ এবং অপ্রসিদ্ধ তরুণ চিকিৎসক মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু সকলের প্রাণপণ চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া মৃত্যু তাহার জয়ধ্বজা তুলিয়া ধরিল।

পরদিবস অপরাহ্নে সোনার পদ্ম শুকাইয়া মাতৃবক্ষে ঝরিয়া পড়িল। পাষাণ-প্রতিমার মত কমলা শুধু স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরিবারস্থ সকলের আর্ত্ত চীৎকারে গৃহের বাতাস অসহ্য বেদনাভরে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

মৃত্যুঞ্জয়ও শয্যার আশ্রয় ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কে যেন নিদারুণ প্রহারে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বন্ধনচ্যুত করিয়া দিয়াছিল।

গৃহে গৃহে মৃত্যুর বিষাণ-রব নৈরাশ্য ও বেদনার হাহাকারে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া অন্তর্হিত হয়, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারে মৃত্যুর আকস্মিক করালরূপ যেন ছায়ামূর্ত্তির মত চারিদিকে ফিরিতে লাগিল—অন্ততঃ গৃহস্বামী মৃত্যুঞ্জয়ের মনে হইল, এ প্রচণ্ড আঘাতের বেগ সংবরণ করিয়া কমলা ও তাহার জননী আবার যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিবে, সে সম্ভাবনা অল্প। তাঁহার গৃহিণীও এই সাংঘাতিক শোকাঘাতে বিগতচেতন হইয়া রহিয়াছেন।

চারি বৎসরের শিশু প্রত্যহ তাঁহার সহিত আহার করিত, তাঁহার পার্শ্বে না শয়ন করিলে উভয়ের কাহারও নয়নে নিদ্রা আসিত না। দাদুর সহিত তাহার যে অখণ্ড সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল! কোমল শিশুদেহের স্পর্শ

মন্দাকিনীর পূতস্নিগ্ধ বারিধারার ন্যায় কি মধুর—কি হৃদ্য! সহস্র চুম্বনে শিশু প্রত্যহ তাঁহার নয়ন ও আননকে চন্দনের প্রলেপে শীতল করিয়া দিত। নানা আদি-অন্তহীন, শৃঙ্খলা-শূন্য উপকথার গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে শিশু সুপ্তির কোমল ক্রোড়ে তাহার সুকুমার দেহ এলাইয়া দিত।

দাদুর বিশাল বক্ষঃস্থলে নিদ্রিত শিশুর ক্ষুদ্র বাহু পরম নির্ভয়ে আশ্রয় করিয়া থাকিত। নিদ্রাঘোরে তাহার মধুর কণ্ঠের অস্পষ্ট দাদুধ্বনি, পেলব-পলাশ তুল্য লোহিত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধরের উপর নৃত্য করিয়া উঠিত।

স্মৃতির বৃশ্চিকদংশনে নিশীথ রজনীতে মৃত্যুঞ্জয় উন্মত্তের ন্যায় শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

অসহ্য!—অসহ্য!—এই শোচনীয়, নির্মম দৃশ্য দেখিবার জন্য কঠোর আঘাত সহ্য করিবার নিমিত্তই কি মৃত্যু এ যাত্রা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে? নচিকেতার উপাখ্যান, গীতার অমৃত-বাণী আজ কেন তাঁহার শোকার্ত্ত হৃদয়ে কোনও আশ্বাসের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে না?

কমলা, ভাগ্যহতা তরুণীর এ কি বিধিলিপি? তাহার শেষ অবলম্বন-যষ্টি যাত্রার প্রথম পথেই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল যে! দীর্ঘ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, পিচ্ছিল, উপলখণ্ডবহুল, বন্ধুর পথে কেমন করিয়া এই তরুণী চলিতে থাকিবে? সহস্র বাধা, লক্ষ বিঘ্ন পদে পদে তাহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে না কি? কোন্ আশ্বাস, কোন্ অবলম্বন তাহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার আশ্রয়স্বরূপ হইবে?

ভগবান্! ভগবান্!—

মৃত্যুঞ্জয় টলিতে টলিতে কোনমতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পৃথিবী কি আবর্ত্তিত হইতেছে? নক্ষত্রখচিত আকাশ কি চলিতেছে? কি অশান্ত, অশ্রান্ত, অপ্রীতিকর গুরুগর্জ্জন!—

দুই হাতে মস্তক ধরিয়া মুহূর্ত্ত মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইলেন। তার পর টলিতে টলিতে তিনি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

পার্শ্বের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। উন্মুক্ত দ্বারপথে তিনি দেখিলেন, ভূমিতলে তাঁহার গৃহিণী লুটাইতেছেন। শীতের প্রচণ্ড প্রভাব বোধ হয় অন্তরের প্রদীপ্ত বহ্নিজ্বালার কাছে হার মানিয়াছিল। প্রকৃতির অমোঘ শক্তি দুর্ব্বার শোককে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার নেত্রযুগলকে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু পার্শ্বে—অদূরে উপবিষ্টা, রুক্ষকেশা কে ঐ তরুণী? কমলার ছায়ামূর্ত্তি? কয় ঘণ্টার মধ্যে এ কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! পুত্রশোকাতুরা জননী ওখানে বসিয়া কি করিতেছে?

শব্দহীন কক্ষ। নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির মত নারী ভূমিলগ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া। নিদারুণ দুর্ব্বিষহ শোকের প্রচণ্ড প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন স্তব্ধ, জমাট হইয়া রহিয়াছে! কোনও প্রকার সান্ত্বনার বহ্নিদীপ্তি সে তুষার-স্তূপকে গলাইয়া আর্দ্র করিয়া দিতে অসমর্থ। আশ্বাসের কোনও বাণী যেন তাহার শ্রবণপথের সান্নিধ্যে আসিতেও কুণ্ঠিত।

শোক যে মানুষকে এমন ভাবে বিমূঢ় ও নিশ্চল করিয়া দিতে পারে, প্রৌঢ় মৃত্যুঞ্জয় এত দিন কখনও তাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই।

মথিত-হৃদয়ে মৃত্যুঞ্জয় কমলার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। তাহার মাথায় কম্পিত হস্ত রাখিয়া শোকার্ত্ত প্রৌঢ় বলিয়া উঠিলেন, "অভাগিনী, মা আমার!"

অকস্মাৎ কমলার নিশ্চল দেহ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তাহার হস্তধৃত একখানি ছায়াছিত্র ভূমিতলে পড়িয়া গেল। তরুণী জননীর কণ্ঠ হইতে আর্ত্তস্বর বাহির হইল—"বাবা রে!"—

জ্যেঠামহাশয়ের বিশাল উরসে তাহার মাথা এলাইয়া পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় দেখিলেন, জামাতা দুই বৎসরের শিশুপুত্র সহ যে আলোকচিত্র তুলিয়াছিল, কমলার হস্তস্খলিত হইয়া তাহাই ভূমিতলে লুটাইতেছে।

অধীরভাবে মৃত্যুঞ্জয় কাঁদিয়া উঠিলেন, "ভগবান্! ভগবান্!"

মৃত্যুঞ্জয়-গৃহিণী সে শব্দে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কমলাকে ঘিরিয়া উভয়ে শোকবন্যার অশ্রুধারাকে নিরুদ্ধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আনন্দ অপেক্ষাও শোকের সংক্রামকতার প্রভাব অধিক। সমব্যথিত হৃদয় হইতে যখন শোকের ঝড় বহিতে থাকে, তখন কেন্দ্রস্থল অচঞ্চল থাকে না। নয়নপথে বন্যার ধারা বহিয়া চলে।

কাঁদো জননী!—অন্তরের জমাট মেঘরাশি, অন্ধকার

মেঘসমুদ্র লঘু হইয়া পড়ুক। প্রকৃতির অঙ্গে যখন অস্বাভাবিক স্তব্ধতার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠে, বজ্র ও বিদ্যুতের বিভীষণ গর্জ্জন ও অট্টহাসি উন্মত্ততার ব্যঞ্জনায় ভৈরবী মূর্ত্তি গ্রহণ করে, তখন আকাশ-বন্যার ধারায় ধারায় তাহার অবসান ঘটে।

অশ্রু শোকের ব্যঞ্জনা হইলেও সান্ত্বনার অগ্রদূত।

কমলা আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। সন্তানবিয়োগ-বিধুরা জননীর বুকফাটা ক্রন্দন মৃত্যুঞ্জয় জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। তাঁহার মনে হইল, এই শোকমথিতা মাতার অশ্রুধারায় পাষাণ পর্য্যন্ত গলিয়া ভাসিয়া যাইবে। তাঁহার পক্ষে এ দৃশ্য শুধু অসহনীয় নহে, অবর্ণনীয় ব্যথার বেদনায় পরিপূর্ণ।

যুক্তকরে তিনি পরম দেবতার চরণে সমগ্র অন্তর দিয়া প্রার্থনা নিবেদন করিলেন—'দয়াময়, এই মর্ম্মন্তুদ শোকের সান্ত্বনা কি, ঘনান্ধকারে পথ কোথায়, দেখাইয়া দাও, প্রভু!'

৫

গ্রামের প্রান্তদেশে ক্ষীণস্রোতা নদী, তাহার তীরে নবনির্ম্মিত অট্টালিকা। সহরের কোলাহল, চাঞ্চল্য এবং নানারূপ ব্যাধির অস্তিত্ব এই সুন্দর গ্রামের কোথাও সন্ধান করিয়া পাওয়া যাইবে না। দরিদ্র—স্বল্পে সন্তুষ্ট পল্লীবাসীরা এই প্রাসাদোপম অট্টালিকার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, বালক ও শিশুর দল অনেক সময় যেন মন্ত্রমুগ্ধভাবে অট্টালিকার সন্নিধানে খেলা করিয়া বেড়ায়।

গৃহস্বামী মৃত্যুঞ্জয় গৃহিণী ও কমলাকে লইয়া যে দিন গৃহপ্রবেশ করিলেন, পল্লীর দরিদ্র অধিবাসীরা সে দিন পেট ভরিয়া আহার পাইল। উৎসবের অনুষ্ঠান শুধু 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'এ পর্য্যবসিত হইয়াই থামিয়া গেল।

শোকের প্রথম আক্রমণ তখন হ্রাস পাইয়া আসিলেও অন্তরের জ্বালা ও শূন্যতা সমানভাবে সকলকেই প্রভাবিত করিয়া রাখিয়াছিল। কমলার নয়নের উদাস দৃষ্টি, ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় বিষয়ের উপর বিতৃষ্ণা মৃত্যুঞ্জয়কে মুহূর্ত্তের জন্যও উদ্বেগশূন্য করে নাই। সায়াহ্ন-সূর্য্য যে কোনও দিন পাটে বসিতে পারে। তার পর? পূর্ণযৌবনা অবলম্বনহীনা কমলার সমগ্র জীবন পড়িয়া রহিয়াছে। কোন্ পথে সে চলিতে থাকিবে?

কমলা সমগ্র অট্টালিকা পরিভ্রমণ করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এত বড় বাড়ী, এত ঘর—এ সব কি হবে জ্যেঠামশাই?"

মৃত্যুঞ্জয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মা ক'লি, তুই ত গীতা পড়েছিস্। নিস্পৃহ কর্ম্ম কাকে বলে, সে দিন ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়েছি। এটা তেমন ভাবের কর্ম্মক্ষেত্র যদি হয়—"

কমলা তখন একটা বৃহৎ রুদ্ধদ্বার কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে সহসা বাধা দিয়া বলিল, "জ্যেঠামশাই, এ ঘরটা বন্ধ কেন?"

মৃত্যুঞ্জয় একবার নিবিষ্টভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রীর দিকে চাহিলেন, তার পর অবিচলিতকণ্ঠে বলিলেন, "ও ঘরটা কাল খুলে দেখাব। বিশেষভাবে তোর জন্যই এ ঘরটা তৈরী হয়েছে।"

কমলার মনে কিন্তু বিন্দুমাত্র কৌতূহলের সঞ্চার হইয়াছে, এমন ভাব প্রকাশ পাইল না। মৃত্যুঞ্জয় একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

উভয়ে প্রশস্ত প্রাঙ্গণমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দূরে লৌহ-তোরণ উন্মুক্ত। পথে বালক-বালিকার দল খেলায় উন্মত্ত। সহসা মৃত্যুঞ্জয় দেখিলেন, বিস্ফারিতনেত্রে কমলা প্রাঙ্গণমধ্যে প্রবিষ্ট একটি সুকুমার বালকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সম্মুখের পথের উপর দিয়া অপেক্ষাকৃত বয়স্ক কোন বালক গলা ছাড়িয়া গাহিতেছিল,—

"যার ছেলেকে পথে দেখি;—
গোপাল গোপাল ব'লে ডাকি—"

কমলার নাসারন্ধ্র অকস্মাৎ স্ফীত হইয়া উঠিল। সে উন্মত্তার ন্যায় দ্রুত চঞ্চল চরণে প্রাঙ্গণস্থিত একটি ফুলের গাছের সন্নিহিত সুকুমার বালকটির কাছে গিয়া ঝাঁপাইয়া তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। শিশুটি কি তাহারই বক্ষচ্যুত পুত্রের রূপ ধরিয়া আবার তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে?

কমলা সহস্র চুম্বনে বিস্মিত বালকটির নয়নে আননে মাতৃত্বের ক্ষুধার প্রবল জ্বালা যেন চরিতার্থ করিয়া লইতেছিল। তাহার নয়নের সে অপূর্ব্ব দীপ্তি, সমগ্র দেহের বিচিত্র ভঙ্গী মৃত্যুঞ্জয়কে স্তব্ধ করিয়া দিল।

পথের উপর হইতে বাধামুক্ত কণ্ঠের গান বাতাসে ভাসিয়া আসিল—

"আমার মনের তীব্র দহন
বুকে রাখি মিটবে না কি!—"

"আমার বাবা, আমার যাদু!—"

কমলা বিস্ময়মুগ্ধ বালককে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কণ্ঠ হইতে বিচিত্র মাধুর্য্যরসসিক্ত ধ্বনি বাহির হইয়া আসিল, "জ্যেঠামশাই!"

"ক'লি, মা আমার!"

জ্যেঠা মহাশয়ের স্নেহপ্লুত কণ্ঠস্বরে কমলার সম্বিৎ যেন ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, "জ্যেঠামশাই, এ ছেলেটি কার? এ যেন তার ছবি নিয়ে এসেছে। একে আমায় দিতে হবে, জ্যেঠামশাই।"

কমলার দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্যও বালকের আনন হইতে অপসৃত হইল না। তাহার দীর্ঘায়ত নয়নযুগলে অশ্রু টল-টল করিয়া উঠিল। বালকও যেন এই সুন্দরী, মহিমময়ী নারীর মধ্যে তাহার জননীর সন্ধান পাইয়াছিল। কমলার আদরে সে তাহার বুকের মধ্যে পরম আরামে মুখ লুকাইল।

মৃত্যুঞ্জয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এ ছেলেটিরও মা, বাপ কেউ নাই। আমি একে জানি। এ বাড়ীর মালী রতন ও তার বৌ একে পালন ক'রে আস্‌ছে।"

তার পর কমলার দিকে না চাহিয়াই তিনি অগ্রসর হইলেন, কমলাকে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে বলিলেন। যে রুদ্ধদ্বার কক্ষটির সম্বন্ধে কমলা প্রশ্ন তুলিয়াছিল, তাহার সম্মুখে আসিয়া প্রৌঢ় বলিলেন, "আর কাল নয়, আজই ঘরটা খুলে তোকে দেখাই, আয়, ক'লি, মা!"

দ্বার মুক্ত হইল। বাহিরের আলো আসিয়া ঘরের স্বল্পান্ধকার দূর করিয়া দিল। কমলা জ্যেঠা মহাশয়ের সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। মর্ম্মর-প্রস্তররচিত কক্ষমধ্যে কোনও প্রকার সাজ-সজ্জা নাই। শুধু ছাদ হইতে একটি বিংশতিবাহু ঝাড় ঝুলিতেছে। কক্ষের মধ্যস্থানে একটি মর্ম্মর-বেদী। তাহার উপর কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি। সে কি চমৎকার কারুশিল্প! শিল্পী যেন তপোলব্ধ ভক্তি ও সাধনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরম দেবতার ওষ্ঠাধরে বিশ্বমুগ্ধকারী হাস্যরেখা ফুটাইয়া তুলিয়াছে! শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী অভয় হস্ত যেন শোকার্ত্তকে পরম আশ্বাস ও সান্ত্বনার ইঙ্গিত করিতেছে। চরণযুগলে যেন যুগ-যুগ-সঞ্চিত জ্বালা নিবেদন করিতে প্রাণ অধীর হইয়া উঠে। কমলা বালককে ক্রোড়ে করিয়া বেদীমূলে উপবিষ্টা হইতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

ও কে? ও কাহার মূর্ত্তি শিল্পী এমন করিয়া রাতুল চরণের নিম্নভাগে ক্ষোদিয়া তুলিয়াছে? কমলা দুই হস্তে স্পন্দিত বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বেদীনিম্নস্থ যুগল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নযুগল হইতে ধারায় ধারায় অশ্রু নামিয়া আসিল।

তাহার ইহ ও পরকালের সর্ব্বস্ব স্বামীর পার্শ্বে তাহার খোকার মূর্ত্তি যেন কমলাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

না, তাহার জীবন ব্যর্থ নহে। এই মন্দিরে সে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অনায়াসে কাটাইয়া দিতে পারিবে। তাহার জ্যেঠা মহাশয় মানুষ নহেন। কেমন করিয়া তাহার অন্তরের এই সাধ তিনি জানিতে পারিলেন?

আঃ!—কি তৃপ্তি! কি সান্ত্বনার বীণাধ্বনি আজ সমগ্র বিশ্বে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে!

বহুক্ষণ পরে মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "মা, ক'লি, এক দিন আমার রোগশয্যায় তোকে বলেছিলাম, এক জন আছেন, তিনি সকলের শোক-সন্তাপ হরণ করেন। যে তাঁকে প্রাণ ভ'রে ডাকে, তাকে তিনি আশ্রয় দেন। তোর জন্য এই বাড়ী তৈরী হয়েছে। ব্যাঙ্কে তোর নামে যে টাকা জমা আছে, আমার অবর্ত্তমানে তা থেকে সহজে তুই এই শিশুমন্দিরের খরচ চালাতে পারবি। আজ একের বিনিময়ে ভগবান্ তোকে আর একটি অনাথকে দিয়েছেন। পরে আরও অনেক আস্‌বে। মায়ের সেবা তাদের দরকার। তুই তা পারবি, মা। এই মন্দিরে—"

"হ্যাঁ জ্যেঠামশাই, এই পবিত্র তীর্থে ব'সে, আমি শক্তি পাব। আমার খোকা শত শত খোকার রূপ ধ'রে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন তাদের মা হ'তে পারি।"

মৃত্যুঞ্জয় নিমীলিত-নেত্রে কমলার মস্তকে হাত রাখিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নয়ন হইতে যে বন্যার ধারা বহিতেছিল, তাহা কি আনন্দ-সমুদ্রের প্রবাহধারা?

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

রেলওয়ে কামান

আটলান্টিক মহাসমুদ্রপথে যে সকল রণতরী দেশ আক্রমণ করিতে পারে, তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য আমেরিকায় রেলওয়ে

রেলওয়ে কামান

কামানের পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। এই কামানকে সহজে স্থানান্তরিত করা যায়। ইহা ১ হইতে ৯ মাইল পর্য্যন্ত দূরে গোলা নিক্ষেপের উপযোগী। ১ হাজার ৭ শত ফুট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত এই কামানের গোলা উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে। আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তীরভাগকে রক্ষা করিবার পক্ষে এই কামান বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পুষ্পরচিত ঘটিকাযন্ত্র

সেটেনহামের কোনও ঘড়ীনির্ম্মাতা কোনও ইংরাজের উদ্যানে পুষ্পদলরচিত একটি বৃহৎ ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ঘটিকাযন্ত্র সময়-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটুও ভুল করে না। বেড়া ঘেরা একটি স্থানে ঘটিকা-যন্ত্রটি স্থাপিত। উহার চারিপাশ
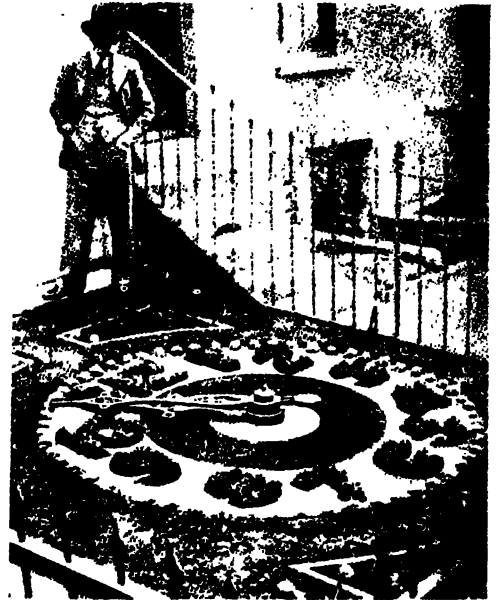
ফুলের ঘড়ী

ফুলের কারুকার্য্য-সমন্বিত। ধাতব ঘড়ীর কাঁটা ও যন্ত্র মধ্যস্থলে সংস্থাপিত। ঘণ্টা-নির্দ্দেশক সংখ্যাগুলি পুষ্পরচিত, মিনিটের ঘরগুলিও পুষ্পনির্ম্মিত। ফুলগুলি প্রতিদিনই সতেজ ও প্রস্ফুটিত থাকে।

রাইফেল কলের কামান

প্রত্যেক পদাতিক সৈনিক যাহাতে তাহার বন্দুককে কলের কামানের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে, সংপ্রতি ইংলণ্ডে তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। বন্দুকের ঘোড়ার কলের সান্নিধ্যে একটি 'লিভার' সংস্থাপিত আছে। উহার সঞ্চালনের তারতম্য অনুসারে

বন্দুকটি রাইফেলের মত অথবা কলের কামানের স্থায় ব্যবহার করা যায়। শেষোক্ত প্রকারে ব্যবহার করিতে হইলে নালিকা
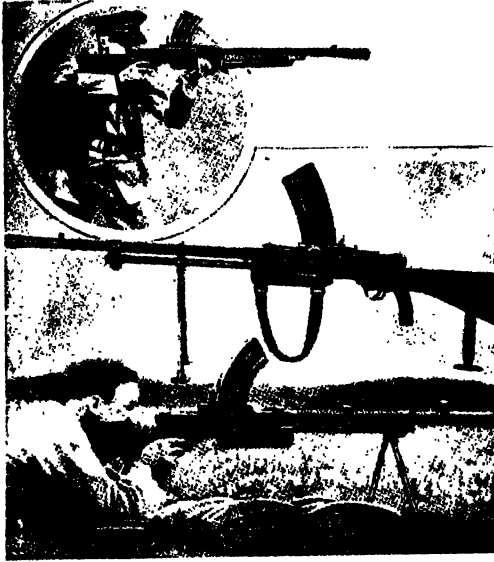
আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নতি

যন্ত্রটিকে দুইটি পায়ার উপর সংস্থাপিত করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় এই কলের কামান হইতে প্রতি মিনিটে ৩ শতবার গুলী নিক্ষেপ করা চলিবে। যদি শুধু রাইফেল বন্দুকের স্থায় ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে প্রতি মিনিটে ৯০টি গুলী বাহির হইতে পারিবে। বন্দুকটিকে শীতল হইতে না দিয়া একাদিক্রমে ১ হাজার ৫ শত গুলী ইহার সাহায্যে নিক্ষেপ করা চলে।

পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম স্বয়ং-চালিত যান

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কার্ল মেন্‌জ নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক শিল্পী জার্ম্মাণীতে একখানি স্বয়ং-চালিত যান নির্ম্মাণ করেন। ইহাই

সর্ব্বপ্রথম স্বয়ং-চালিত যান

সর্ব্বপ্রথম স্বয়ং-চালিত গাড়ী বলিয়া মিঃ হেন্‌রী ফোর্ড উহা ক্রয় করিয়া নিজ যাদুঘরে রাখিয়াছেন।

ধাতব বর্ম্ম ও ঢাল
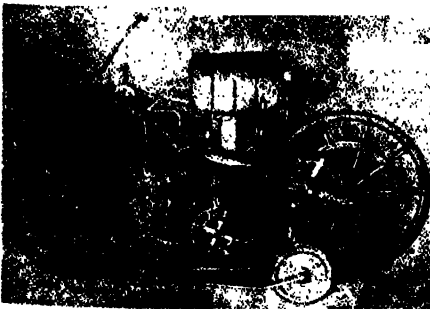
সম্প্রতি পোল্যাণ্ডে ভোটগ্রহণ উপলক্ষে এক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছিল। দাঙ্গা-নিবারণে নিযুক্ত পুলিসের জন্ত কর্ত্তৃপক্ষ ধাতব

পোল্যাণ্ড পুলিসের ধাতব বর্ম্ম ও ঢাল

বর্ম্ম ও ঢাল ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই ধাতব অঙ্গাবরণ বা বর্ম্ম গুলী-নিবারক এবং আমেরিকায় অনুরূপ প্রকার গুলী-নিবারক বর্ম্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে পোল্যাণ্ডের এই বর্ম্ম অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং জঘনবিলম্বী। ঢালের সাহায্যে মস্তক ও স্কন্ধদেশ রক্ষিত হয়।

শয্যা-কক্ষের বিচিত্র আলোক

অধুনা এক প্রকার বৈদ্যুতিক আলোকাধার বাজারে বাহির হইয়াছে, উহা শয্যা-কক্ষের বিশেষ উপযোগী। এই আলোকাধার তুলিয়া লইয়া তাহার পার্শ্বে মৃদু করাঘাত করিলেই, আলোক জ্বলিয়া উঠিবে। আবার উহা নামাইয়া রাখিলেই, আধারের তলদেশস্থ ভারের ফলেই আপনা হইতে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। আধারের বাল্‌ব, বা মুখ পীতাভ রজন বা তৃণমণির দ্বারা নির্ম্মিত।

শয্যাকক্ষের বিচিত্র আলোক

বৃত্তাকার হর্ম্যমালা

জার্ম্মাণীতে ইদানীং বৃত্তাকারে অট্টালিকা-সমূহ নির্ম্মাণ করিবার খেয়াল দেখা দিয়াছে। লিপ্‌জিগ সহরের উপকণ্ঠে জনৈক
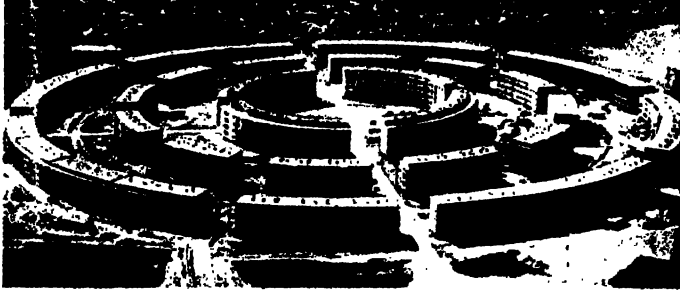
বৃত্তাকার প্রণালীতে অট্টালিকা-নির্ম্মাণ

ভাস্কর অনেকগুলি অট্টালিকা বৃত্তাকারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ২৪টি হর্ম্ম্য তিনি ৩টি বৃত্তে সাজাইয়াছেন। প্রত্যেক অট্টালিকা হইতে আগম-নির্গমের প্রশস্ত পথ এবং এক দিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত যাইবার রাস্তা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। চিত্র হইতে বিষয়টি বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

অভিনব রঙ্গমঞ্চ-সজ্জা

লস্ এঞ্জেলেসের গ্রীক-রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ নিসর্গদৃশ্যকে সজীব ও চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য জীবন্ত বৃক্ষাদির সন্নিবেশ করিতেছেন।

রঙ্গমঞ্চে সজীব বৃক্ষলতা

বিভিন্ন দৃশ্যে এই বৃক্ষলতাদি যথাযোগ্যভাবে প্রদর্শিত হয়। ইহাতে অঙ্কিতপটের প্রয়োজন হয় না। অথচ দর্শকবৃন্দ দৃশ্যগুলিকে পরমানন্দে উপভোগ করিয়া থাকেন।

নিউমোনিয়া রোগ-চিকিৎসার নূতন ব্যবস্থা

নিউমোনিয়া এবং অন্যান্য শ্বাসকৃচ্ছ্রতাপূর্ণ রোগের চিকিৎসা জন্য চিকাগো সহরের কোনও হাসপাতালে একটি কক্ষ আছে। ইহার নাম "অক্সিজেন"-সেবন কক্ষ। এই কক্ষে শ্বাসকৃচ্ছ্রতারোগে যে সকল রোগীর সাংঘাতিক অবস্থা ঘটে, তাহাদিগকে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। উপযুক্ত পরিমাণে অক্সিজেন-মিশ্রিত বায়ুপ্রবাহ এই ঘরের মধ্যে বিশিষ্ট যন্ত্র সহযোগে প্রেরিত হইতে
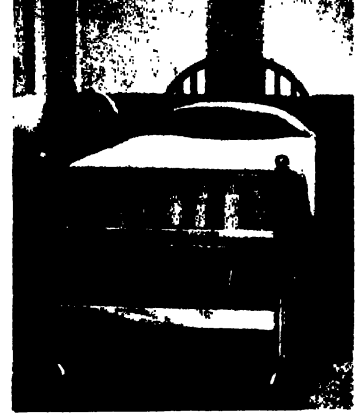
অক্সিজেন-সেবন কক্ষ

থাকে। সমগ্র দেশে এই প্রকার মাত্র ৩টি ঘর আছে।

ঘোড়ার ক্ষুরের স্তূপ

হপ্‌কিন্‌টন্ নামক স্থানের জনৈক কর্ম্মকার দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া ঘোড়ার ক্ষুর নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি অব্যবহৃত পরিত্যক্ত ক্ষুরগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার কারখানার বাহিরে সেই সঞ্চিত ক্ষুরের স্তূপ প্রায় ১০ ফুট উচ্চ হইবে। উহার

পরিত্যক্ত ক্ষুরের স্তূপ

ওজন প্রায় ৪ শত ১২ মণ। তিনি নিজের হাতে কতগুলি অশ্বের ক্ষুর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

ব্যবধান

(ছোট গল্প)

রাত্রির জমাট অন্ধকার।

পাশে বধূ অঘোরে ঘুমাইতেছে, আমি জাগিয়া আছি। কাব্য নয়, গান নয়, অথচ জাগিয়া আছি।

ফুল-শয্যার রাত্রি, শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ এতক্ষণ নিশ্চয়ই গাঢ় ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়াছে।

সকালে কাযের জন্য বাহির হইতে হইয়াছিল। পাক-স্পর্শের উৎসবে সারা বাড়ী মাতিয়াছিল। ঝড়-বাদলের মাঝে যখন বাড়ী পৌছিলাম, কৌতুক করিবার জন্য কোন তরুণীই জাগিয়া নাই।

সঙ্গে মালতীর মালা ছিল, নদীর মত্ত হুঙ্কারে যখন প্রাণ-সংশয় হইয়া উঠিল, তখনও মালা ছাড়ি নাই। যদি মরি, প্রণয়ের মধুর স্মৃতি আমার চিতাশয্যা হইবে।

পালঙ্কে বালিকা তন্দ্রাতুর!

হয় ত তাহার মনে গৃহের স্মৃতি বেদনা জাগাইতেছিল। ঘুমের আধ-বিস্মৃতির মাঝেও যেন তাহার সুন্দর মুখ ভয়-মলিন হইয়া উঠিয়াছে।

আদরের রেখা রক্তাধরে আঁকিয়া দিয়া বলিলাম—"রাণু!"

ঘুমের ঘোরেই বধূ বলিল—"আঃ, যাও।" পরক্ষণেই সে ঘুমে অবশ হইয়া পড়িল।

শ্রান্ত বধূকে না জাগাইয়া তাহার মাথাটি তুলিয়া মালতীর মালা তাহার গলায় ফেলিয়া দিলাম।

নাড়া-চাড়া লাগিয়া বধূর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে জাগিয়া বিরক্তিভরা স্বরে বলিল, "এ কি করছ?"

পরক্ষণেই গলার মালতীমালা বাহির করিয়া পাশে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। প্রেমের ভাবাবেশময় অবদান ধূসর হইয়া আর্ত্তস্বরে যেন কাঁদিয়া উঠিল।

আমার প্রতি উপেক্ষার চেয়ে ফুলের প্রতি নির্ম্মমতা আমার অন্তর মথিত করিতে লাগিল।

কথা কহিলাম না। ক্ষোভে ও অভিমানে পাশ ফিরিয়া শুইলাম। সেই হইতে জাগিয়া আছি, প্রহরের পর প্রহর রাত্রির মিছিল তারাদীপ জ্বালিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

সহস্রবার বলিয়াছি, বিবাহ করিব না।

মাতা শুনেন নাই। তাঁহার একমাত্র কথা, "আমাকে একটি রাঙা বউ এনে দে।"

মাকে জানাইয়াছিলাম, "মানুষের সাথে আমার কবি-মন মিশবে না।" মার উত্তর "ও-সব পাগলামী রাখ।"

নিরানব্বই স্থানে যাহা ঘটে, এখানেও তাহাই ঘটিল।

পাল-পাড়ার চৌধুরীরা জমীদার। তাহাদের সুরূপা মেয়ে "মেখলা।"

সকলে বলিল, মায়ের ভাগ্য ভাল, রায়পুরের কোনও ঘরেও এমন বধূ নাই।

আমি বলিলাম, "তথাস্তু।"

কিন্তু এখানেই ত জীবনের কাব্য শেষ হয় না। উপন্যাসে যখন মন মিলে না, তখন বিষপান চলে, না হয় উপসংহারের রহস্যের মধ্যে সমাধান মিলে। কিন্তু জীবনের প্রত্যক্ষ রঙ্গমঞ্চ দিনের পর দিন আসে। প্রভাতের মিলন-প্রভা সন্ধ্যার বিদায়-বাণীর মাঝে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

মেখলা সত্যই আদর্শ বধূ।

কর্ম্মে নিরলস, নির্ব্বাক মৌনতায় শোভমান। পড়শীরা মাকে পয়মন্ত বলিয়া প্রশংসা করে।

তথাপি মেখলার আর আমার জীবনের সুর মিলে না।

আমি যেখানে যতি টানি, সে সেখানে সুরের লীলা-নর্ত্তন জাগায়, এমনই করিয়া দিন কাটে।

আমি ভাবি—এই উদাস বিরহের অভিনয় কি চিরন্তন হইয়া রহিবে? কাব্য পড়িয়া আর কাব্য লিখিয়া হয় ত আমি সুস্থ ছিলাম না। মেখলার মাঝে আমি কল্পনার নায়িকা খুঁজি, তাহা কেমনে সম্ভব হইবে। দিন যেন যায় না। শীতের হিম বসন্তের লাবণ্যে ডুবিয়া যায়, [illegible]র মলয় গ্রীষ্মের রুদ্র আহ্বানে থর থর করিয়া কাঁপে, [illegible] পর বর্ষার জলদ-জাল—অবশেষে শরতের আনন্দোজ্জ্বল ছবি। এমনই করিয়া বছর কাটিয়া যায়।

মন না মিলিলেও ঘর-বসত করিতে হয়। মেখলা ও আমার দিন বহিয়া চলে, বাহির হইতে কেহ জানে না যে, আমাদের মধ্যে লবণাক্ত সমুদ্রের গভীর ব্যবধান বর্ত্তমান আছে।

আমি থাকি কাব্যের নীড়ে, মেখলা থাকে কাষের ভিড়ে। আমার মনে যখন জীবনের ফেন-পুষ্পিত ভাবধারা উদ্বেল হইয়া উঠে, তখন মেখলা হয় ত একটু কটু কথা বলিতে, সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

কেহ বলিবে, 'তুমি কেবল কাব্য করিতেছ, মেখলার ত কোন দোষই তুমি দেখাচ্ছ না।'

সত্যই এইখানেই ছিল বড় গোল। বাহির হইতে কোথাও ছিদ্র দেখা যায় না, তথাপি প্রেমের নৌকা ভরা জোয়ারে ডুবুডুবু।

ইহা ঠিক অনুভব করিবার, বলিবার নহে।

কেহ বুঝে না, তাই নিজের মনে গুমরিয়া মরি।

মা বলিলেন, "বউমাকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেই, এখানে যদি কোনও অসুবিধা হয়—"

মেখলা সন্তান-সম্ভাবিতা। মেয়েদের বাপের বাড়ীর দিকে টানের কথা সবাই জানে, কিন্তু মেখলা যাইতে চাহে নাই, ওদিক হইতেও কোনও আহ্বান আসে নাই।

আমি বলিলাম, "তোমার চেয়ে আপন আর কে হবে?"

মা কথা কহিলেন না, কিন্তু মেখলাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

মেখলা চলিয়া গিয়াছে, তথাপি যেন কোনও অভাব অনুভব করি না। দিন যেমন কাটিতেছিল, তেমনই কাটিয়া যায়।

কয়েক মাস পরে খবর আসিল, মেখলা পুত্র-সন্তানের জননী হইয়াছে।

মাতা নৌকা করিয়া পৌত্রমুখ দর্শন করিয়া আসিলেন।

আমার যাওয়ার জন্য অনুরোধ, তাগাদা, এমন কি, অনুযোগ আসিল; কিন্তু আমি অচল স্থাণুর মত নির্ব্বিকার-চিত্তে বসিয়া রহিলাম।

মা বলিলেন, "যা না পরেশ, খোকাকে দেখে আয়।"

আমি বলিলাম, "আসলেই দেখব মা, তাড়াতাড়ি কিসের?"

মা রাগিয়া বলিলেন, "তুই যে চিরকাল ছেলেমানুষ হয়ে গেলি, ছেলের বাপ হয়েও কোনও কাণ্ডজ্ঞান হ'ল না?"

রাগ গায় না মাখিয়া উত্তর দিলাম—"মা, তোমার কোলে ছেলেমানুষ হয়েই যেন থাকি।"

মায়ের রাগ গলিয়া গেল। কৃত্রিম রোষে বলিলেন, "না বাপু, তোর সঙ্গে পারবার জো নেই।"

চার পাঁচ মাস পরে খবর আসিল, নবকুমারের অসুখ, এবার না যাওয়া চলে না। পুত্রকে দেখিতে চলিলাম; শ্বশুর-গৃহে সবাই যেন আমার ব্যবহারে অপ্রসন্ন। জামাতার আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হইল না। কিন্তু তবু যেন বোধ হইল, সবাই যেন হৃদয়ের সঙ্গে মেলামেশা করিতেছেন না; আন্তরিকতার এই অভাব আমার মনকে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যায় পৌছিয়াছিলাম। খোকাকে যখন দেখিতে চলিলাম, তখন রাত হইয়াছে। মেখলা গণেশ-জননীর মত কুমারকে কোলে করিয়া রহিয়াছে।

আমি রুষ্টভাবে বলিলাম, "খোকা কেমন আছে?" আমার কথার রূঢ়তা আমায় চমকিত করিয়া তুলিল। মেখলা কথা কহিল না। সম্মুখের দীপালোকে দেখিলাম, তাহার পাণ্ডু নয়নযুগল হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

ক্ষণপরে আত্মসংবরণ করিয়া সে মিনতি-ভরা সুরে বলিল, "আমি না হয় অপরাধী, এ তোমার কি করেছে?"

কি বলিব ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

খোকা জ্বরের ঘোরে ঘুমাইয়া ছিল, কথার সাড়া জাগিয়া পড়িল। সে তাহার নীলাভ দীপ্ত চোখ দুটি মেলিয়া আমার পানে চাহিল। অমিয়-ভরা স্বর্গীয় হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল।

জননীগর্ব্বে গর্ব্বিতা মেখলা বলিল, "দেখছ, তোমার খোকা কেমন হাসছে?"

সমস্ত ভার যেন লঘু হইয়া গেল, তৃপ্তচিত্তে বলিলাম, "রাগ করো না লক্ষ্মি! খোকাকে আমার কোলে দাও।"

শ্রীমতিলাল দাশ (বি, এল)।

াজ আমাদিগকে মাত্র ১৩ মাইল যাইতে হইবে। এ যাত্রা প্রায়ই সমতল ভূমির উপর দিয়াই সম্পন্ন করিতে হইবে। ুতরাং ৮।৪৫ মিঃ বাংলো হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বদিকে লিতে লাগিলাম। আমাদের উত্তরদিকে বৃক্ষহীন পাহাড়, ক্ষিণদিকে একটি ছোট হ্রদ। তাহার অপর পারে বিস্তীর্ণ ৃণাবৃত প্রান্তর দৃষ্ট হইল। এই প্রকাণ্ড মাঠের শেষে ুষারাবৃত চুমার-লহরী পর্ব্বত।

প্রায় ৪ মাইল পথ প্রান্তর ও পাহাড়ের তলদেশ অতিক্রম রিবার পর আবার অন্য এক পাহাড়ের নিকট উপস্থিত ইলাম। ইহাও বৃক্ষলতাদিশূন্য! পাহাড়ের গায় পৌছিয়া ত্তরদিকে সামান্য অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, পর্ব্বতের নিম্ন-াগে বহুসংখ্যক ফোয়ারা হইতে স্বচ্ছ জলধারা নির্গত ইতেছে। সম্মিলিত জলধারার প্রাচুর্য্যে একটি ক্ষুদ্র নদী রতর-বেগে বহিয়া চলিয়াছে। নদীতীরে কয়েকটি চক্রবাক বং হাঁস জলক্রীড়া করিতেছিল দেখিলাম। উল্লিখিত ফায়ারাগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ বলিয়া অভিহিত। কিন্তু আমরা লে হাত দিয়া দেখিলাম যে, উহা শীতল। য়ুরোপীয় যাত্রী-দগের নিকট শ্রুত হইলাম যে, এই জলের উত্তাপ ৬০ হইতে ০ ডিগ্রীর নীচে নামে না। শীতের সময় জলাশয়-সকল মিয়া গেলেও ঐ সকল ফোয়ারা হইতে সর্ব্বদাই জল বাহির ইয়া থাকে। দারুণ তীব্র শীতেও উহার জল জমিয়া বন্ধ য় না বলিয়া উহাদিগকে উষ্ণজলের ফোয়ারা বলিয়া থাকে।

আমরা উত্তরাভিমুখে চলিলাম। আমাদের পশ্চিমে াহাড়, পূর্ব্বদিকে সামান্য দূরে ফোয়ারা হইতে নির্গত নদী াহার পূর্ব্বপারে প্রকাণ্ড সমতল ভূমি, এবং প্রান্তরে ূর্ব্বভাগে চুমার-লহরী পর্ব্বতমালা। এই অদ্রিশ্রেণীর শৃ কল তুষারাবৃত। নদীর পারে, জলের সন্নিকটে সামান্য তৃ াছে। রাস্তার কাছে তৃণাদি নাই। আমরা এই ক্ষুদ্র দীর পশ্চিম পার দিয়া উত্তরদিকে আরও অগ্রসর হইতে ইতে প্রায় ৩।৪ মাইল দূরে "বাম" হ্রদ দেখিতে পাইলাম। ানীয় লোকরা উহাকে ডোচেন হ্রদ বলিয়া থাকে।

আমরা এই হ্রদের দিক লক্ষ্য করিয়া উত্তরাভিমুখে লিলাম। হ্রদের সন্নিকটে সামান্য তৃণাচ্ছাদিত জমীতে তকগুলি বন্য ভেড়া বিচরণ করিতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। আমার দরোয়ান ঐ বন্য ভেড়া দেখিয়া শিকারের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইল; বন্দুক লইয়া সে মাঠের দিকে ধাবমান হইতেই ভেড়াগুলি দ্রুতপদক্ষেপে চক্ষুর অন্তরাল হইল। দরোয়ান নিরুৎসাহ হইয়া ফিরিয়া আসিলে আমরা পুনরায় অগ্রসর হইলাম। দূর হইতে হ্রদটি দেখিতে বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইল না; কিন্তু হ্রদের সমীপবর্ত্তী হইয়া মন আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইল। দেখিলাম, হ্রদের উত্তরদিকে

ডোচেন হ্রদ

বৃক্ষশূন্য পাহাড় ক্রমে উন্নত হইয়া অন্য উচ্চতর অভ্রভেদী [illegible] পাদদেশে মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণপূর্ব্বদিকে দূর[illegible] তুষারাবৃত চুমার-লহরী পর্ব্বতমালা, পূর্ব্বদিকও প[illegible]আবৃত, পশ্চিমদিকে কিছু দূরে বড় বড় পাহাড়। চতু[illegible] পর্ব্বতবেষ্টিত এই প্রশস্ত ও দীর্ঘ হ্রদ আমাদিগকে মুগ্ধ ক[illegible]ল। হ্রদের দৈর্ঘ্য ৯।১০ মাইল হইবে, প্রস্থেও উ[illegible] আয়তন প্রায় ৪ মাইল। হ্রদের স্থানে স্থানে চর এবং জলজ আগাছা যদি না থাকিত, তাহা হইলে উহা

পরম রমণীয় হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। হ্রদের জল কালো; কিন্তু উহার তীরদেশ ও চরসমূহ শ্বেতাভ দেখায়। হ্রদসলিলে অনেক জলজ আগাছা এবং মৎস্যও আছে দেখিতে পাইলাম। নানা জাতীয় জলজ পক্ষী হ্রদবক্ষে বিহার করিতেছিল। হ্রদটি অপরিষ্কার দেখিয়া আমাদের মন অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইল। ইহা সমুদ্রতট হইতে ১৪ হাজার ৭ শত ফুট উচ্চে অবস্থিত। যেখানে হ্রদ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সে স্থান লোণায় আচ্ছাদিত হইয়াছে।

হ্রদের পশ্চিমপার দিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা বেলা ২॥০ ঘটিকার সময় হ্রদের পশ্চিমপারে অবস্থিত ডোচেন বাংলোয় উপস্থিত হইলাম। প্রবল হাওয়া এবং বালুকার আধিক্যে বড়ই কষ্ট অনুভব করিলাম। তখন আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন। তুষারাবৃত পাহাড় সকল কুয়াশায় ঢাকা। চুমার-লহরী পর্ব্বত বরাবর দক্ষিণ-দিকে দেখা গেল। যদিও চুমার-লহরী পর্ব্বত বহুদূরে অবস্থিত, তত্রাপি বাংলোর নিকটে হ্রদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হয়, চুমার-লহরী ও অন্যান্য তুষারাবৃত পাহাড়ের পাদদেশ এই হ্রদের জলে যেন ধৌত হইতেছে।

এখানে একটি ছোট গ্রাম আছে; কিন্তু চাষবাসের কোন ব্যবস্থা দেখিতে পাইলাম না। একটি তৃণ পর্য্যন্ত এখানে জন্মে না। তবে হ্রদের পাশে কিছু কিছু তৃণ হয়। রাস্তায় আসিতে বালির উপর পূর্ব্বকথিত সেই ল[illegible] ফুলের গাছ ফিরিবার সময় বিস্তর দেখিতে পাইয়াছি। [illegible]ফুলের গাছের নীচে ছোট মূলার মত মূল উপরে ৪[illegible] ঘাসের বা বালির উপর ছড়াইয়া থাকে। 'কম[illegible]' ফুলের মত ৪।৫টি বড় ফুল প্রত্যেক গাছে দেখা যায়, পাত প্রায়ই লক্ষ্য হয় না। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন ৪।৫টি করিয়া ফুল কেহ রাস্তায় ফেলিয়া রাখিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখানে কোন শস্য [illegible] সুতরাং এখানে ঘোড়ার ঘাস ও দানা দিতে পা[illegible] বলিয়া ঠিকাদার জানাইল। অনন্যোপায় হইয়া [illegible] সর্দ্দার ও সহিস বহু চেষ্টা করিয়া গ্রাম হইতে বি[illegible] গমের ডাঁটা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং কলাইয়ের [illegible] এক প্রকার ডাইল ঘোড়ার জন্য লইয়া আসিল। মূল[illegible] যব ও গমের শুষ্কখড় ও ডাঁটি প্রতি মণ ৪৲ এবং কালো উরি[illegible] আস্ত ডাল প্রতি মণ ৮৲।

বাংলোর দক্ষিণ পার্শ্বে ডোচেন গ্রাম। ডোচেনে খুব ঠাণ্ডা বোধ হইল। আমরা ঘুঁটে জ্বালাইয়া ঘর গরম করিলাম। ডোচেন বাংলোয় চারিটি শয়ন-ঘর। ছয় জন লোকের শয়নের ব্যবস্থা আছে। বাংলোয় ডবল শাশি লাগানো এবং প্রত্যেক দরজা-জানালায় মোটা পশমের মোটা পর্দ্দা। বাথরুমের দরজা-জানালায় পর্য্যন্ত পশমের মোটা পর্দ্দা দেওয়া। এখানে ডাইল সিদ্ধ হইতে অনেক দেরী হইল। বেলা ৩ ঘটিকার সময় ডাইল চড়াইয়া প্রায় রাত্রি ৬॥০ ঘটিকার সময় উনান হইতে নামান হইল। তাহাতেও সিদ্ধ করার জন্য কিছু সোডা দিতে হইল। এই সকল উচ্চ এবং ঠাণ্ডা স্থানে যে ডাইল সিদ্ধ হইতে দেরী হয় এবং কিছু সোডা ব্যবহারে সিদ্ধের সাহায্য করে, তাহা আমাদের পূর্ব্বেই জানা ছিল। এজন্য আমরা কিছু সোডা সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সিকিমের লাচুং, ইয়ামেথিনে এবং নেটংএ আমরা সোডা ব্যবহার করিয়াছিলাম। নেটং হইতে আরম্ভ করিয়া জেলাপালা পার হইয়া তিব্বত অঞ্চলে পড়িয়া আমরা ডাল সিদ্ধের জন্য সর্ব্বত্রই সোডা ব্যবহার করিতাম।

৩রা জুন।—অদ্য আমাদের মাত্র ১২ মাইল যাইতে হইবে। তাহাও প্রায় সমান জমীর উপর দিয়া। যাহা হউক, শয্যা হইতে ৪—৪৫ মিনিটের সময় উত্থান করিয়া দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চুমার-লহরী এবং অন্যান্য তুষারাবৃত পাহাড়-শৃঙ্গ কুয়াশায় ঢাকা, কাযেই হ্রদ সহ ঐ তুষারাবৃত পাহাড়ের আলোকচিত্র লইতে পারিলাম না। ফিরিবার সময় ডোচেন হ্রদ, চুমার-লহরী প্রভৃতি পাহাড় কুয়াশায় আবৃত দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহা[illegible]ও ঐ হ্রদের আলোকচিত্র লইলাম। ৮—১৫ মিনিটের [illegible] আমাদের আহার সমাপন হইয়া গেল। আর ১৫ মিনিটে পূর্ব্ববর্ণিতমত পোষাকাদি পরিয়া ব্লাক্লাভা ক্যাপ মাথায় দিয়া রঙ্গীন চশমা আঁটিয়া আমরা ৮॥০টার সময় রওনা হইলাম। বাংলো হইতে বাহির হইয়া উত্তরদিকে যাইতে সুরু করিলাম। আধ মাইল উত্তরদিকে যাইয়া ঘুরিয়া পূর্ব্বদিকে হ্রদের পাড় দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রায় ৪ মাইল হ্রদের পার দিয়া যাইতে হইল। হ্রদের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হ্রদে নানারূপ জলজগুল্ম জন্মিয়াছে। উহা পচিয়া স্থানে স্থানে দুর্গন্ধ বাহির ও

হইতেছে। বড় বড় মশার মত এক প্রকার পতঙ্গ উড়িয়া গায়ে বসিতে লাগিল। উহাদের উৎপাতে আমরা জলের পাড় ছাড়িয়া রাস্তায় উঠিলাম। উত্তরদিকে আমরা প্রায় তিন পোয়া মাইল অগ্রসর হইলে হ্রদ শেষ হইল। হ্রদ হইতে একটি ছোট নদী উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে দেখিলাম। আমরা পাথরের সাজানো পুলের উপর দিয়া এই নদী পার হইয়া অপর পারে যাইয়া উত্তরদিকে চলিতে লাগিলাম। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে প্রকাণ্ড পাহাড় উপর দিকে মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। এই সকল পাহাড়ের উপর কস্তুরী-মৃগ পাওয়া যায়। একদলে ৫।৬ জন শিকারী পাহাড়ের উপর দেখিলাম। আমাদের এত উপরে উঠিয়া শিকার করা বোধ হয় শক্তিতে কুলায় না। ঐ পাহাড়ও ডোচেন ইত্যাদি

নালা কাটিয়া হ্রদের জল ক্ষেত্রে লওয়া হই...

স্থান হইতে ২ হাজার আড়াই হাজার ফুট উচ্চে হইবে। ক্ষুদ্র নদীর দুই পারেই সমতল ভূমিতে চাষ আছে। না... এপার ওপার পাথর সাজাইয়া, বাঁধ দিয়া জল আটকাই... পার্শ্বে নালা কাটিয়া নদীর জল ক্ষেত্রে চাষের সুবিধার জ... লওয়া হয়। নদীর অধিকাংশ জল বাঁধের উপর দি... ছাপাইয়া যায়। অল্পপরিমাণ জল ছোট নালা দিয়া ক্ষে... যায়। তিব্বতে বৃষ্টি অধিক হয় না। চাষের কার্য্যের জন্য এই নালার জলের উপরেই নির্ভর করিতে হয়।

হ্রদ হইতে আর ২ মাইল এই উপত্যকার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে আমরা একটি ছোট গ্রামের ধারে উপস্থিত হইলাম। আমাদের ডাণ্ডীর কুলী ও অন্যান্য কুলীরা গ্রাম হইতে কিছু আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করিতে গেল। আমি ইতিমধ্যে রাস্তা দিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তিব্বতদেশীয় প্রত্যেক লোকের বাড়ীতেই একটি করিয়া বড় কুকুর আছে। দিনের বেলা প্রায়ই কুকুর বাঁধিয়া রাখা হয়। কোথাও যাইবার সময় কুকুর সঙ্গে করিয়া লয়। বিশেষতঃ দূরদেশে যাইতে তাহারা কুকুর লইয়া যায়। সুতরাং আমি নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাড়ীর ছাদের উপর হইতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক শুনিলাম। গ্রামের অপর প্রান্তে পৌছিলে দুইটি বড় কুকুর ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে আমার দিকে তাড়া করিয়া আসিল। আমি ভয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া পাহাড়ের উপরদিকে উঠিলাম। এত উচ্চ স্থানে দৌড়াইয়া উঠা আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব; কিন্তু কুকুরের ভয়ে অনন্যোপায় হইয়া আমি উপরদিকে দৌড়াইয়া উঠিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া দৌড়ান আমার শক্তির বহির্ভূত হইল। এই সময় আমি তাড়াতাড়ি কয়েকটি পাথর কুড়াইয়া লইয়া কুকুরের দিকে নিক্ষেপ করিলাম। তাহারা দুটি চারিটি ঢিল খাইয়া পশ্চাৎপদ হইয়া কিছু দূরে অবস্থান করিতে লাগিল। আমি ইতিমধ্যে কায়ক্লেশে প্রকাণ্ড বড় এক পাথরের উপর চড়িয়া বসিলাম। কুকুর একটু দূরে সরিয়া গিয়া তখনও ঘেউ ঘেউ ... অনন্যোপায় হইয়া আমি পাথরের উপর ...াম। প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে আমার লোক আসিলে কুকুর দুইটি প্রস্থান করিল। আমি ...াড় হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া ডাণ্ডীতে ... করিলাম।

অপ্রশস্ত শস্য-শ্যামল মাঠ উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর-ব্যাপী। মাঠের পূর্ব্ব এবং পশ্চিমদিকে তৃণ ও বৃক্ষশূন্য গগনস্পর্শী পাহাড়। পাহাড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর। মাঠের মধ্য দিয়া নদী বক্রভাবে নীরবে কালা হ্রদে গিয়া পড়িতেছে। আমরা ক্ষুদ্র নদীর পূর্ব্বপারে, পূর্ব্বদিকের

পাহাড়ের গা দিয়া উত্তরদিকে চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর যাইবার পর কালাগ্রাম ও কালা হ্রদ দেখিতে পাইলাম।

কালা হ্রদ প্রায় ৫ মাইল লম্বা এবং প্রায় ৪ মাইল উহার পরিসর। ইহা ১৪ হাজার ৬ শত ফুট উচ্চে অবস্থিত। চতুর্দ্দিকই প্রায় পাহাড়বেষ্টিত। পাহাড়ের উপর হইতে হ্রদটি সুন্দর দেখায়। কিন্তু হ্রদের যে সৌন্দর্য্যের কথা পুস্তকে পাঠ করিয়াছি,সেরূপ সৌন্দর্য্য দেখিলাম না। আমার নিকট উহা পাহাড়ের মধ্যস্থিত একটি বিলের মতই বোধ হইল। জল কালো, তাহাতে মৎস্য আছে, এবং বিস্তর আগাছা জন্মিয়াছে। অপরাহ্লকালে সূর্য্যের রশ্মি জল হইতে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে হ্রদটি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। আমরা এই সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে কালার বিস্তীর্ণ চাষী ভূমির মধ্য দিয়া কালার ডাক-বাংলোয় পৌছিলাম।

হইল। কিন্তু এই মূর্খের ইহাতেও শিক্ষা হয় নাই। ফিরিব সময়ও সে এই পালাই পুনঃ অভিনয় করিয়াছিল। কিন্তু এব সহজে সারিতে পারিল না। জলের ধার হইতে বহু ক বাংলোয় আসিয়া অন্যের সাহায্যে ভিজা কাপড় ছাড়াই গরম কাপড় পরিয়া কম্বলমুড়ি দিয়া আগুনের কাছে খাটিয় শুইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার শরীর গ হয় নাই। শীতে তাহাকে এমন কাতর করিয়াছিল তাহার কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। আম সঙ্গী ভৃত্য তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া আমাদিগকে তা তাড়ি খবর দিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নাড় গতি পরীক্ষা করিতে কিছু জানে, সে দেখিয়া আমা ঔষধের বাক্স হইতে তাহাকে সামান্য কিছু ব্রাণ্ডী দিয়াছি উহা খাওয়াইবার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সে প্রকৃতিস্থ হয়, বি
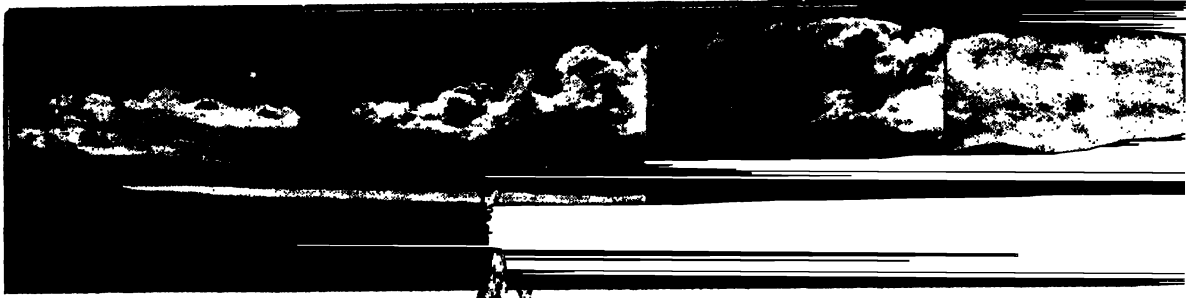
কালা হ্রদ

আমার সঙ্গের দরোয়ানটি কৌতুক ও ক্রীড়া[illegible] সে রাস্তার মাঝে মাঝে হরিণ ও বন্য ভেড়া [illegible] মনোরথ হইয়া নিরীহ পাখী মারিয়া বন্[illegible]লের করিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় নাই। এখা[illegible] নিকটবর্ত্তী ডোবা সকলে বিস্তর মাছ [illegible] যেন লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কুলীদের [illegible] সঙ্গে লইয়া সে কালা হ্রদের ডোবার পারে উপ[illegible] গায়ে অপরিমিত শক্তি, বিশেষতঃ যুবা বয়স, কিন্[illegible] অন্য কেহ জলে নামিবার পূর্ব্বেই সে লাফাই[illegible] কাপড়ে ছাঁকিয়া বহু মৎস্য ধরিল, কিন্তু তত [illegible] অনভ্যস্ত থাকায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া কুলীদিগকে কি[illegible]ছের ভাগ দিয়া তাহাদের দ্বারা কাপড় কাচাইয়া নিজে [illegible] পরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমার নিকট উপস্থিত [illegible] কম্বল জড়াইয়া আগুনের কাছে থাকিয়া তবে [illegible]

রাত্রিতে সে সামান্য একটু গরম দুধ খাইয়াই ছিল। প্রাণ করিয়া সে যে মৎস্য ধরিয়াছিল, তাহা তখন তাহার ভো হইল না। পরদিন প্রভাতে কতক রান্না করিয়া খাইয়া এবং কতক শুষ্ক করিয়া তাহার পরিবারের জন্য কলিকা[illegible] [illegible]ইয়া গিয়াছিল। এ দিকে মৎস্যের চৌদ্দ আনা ভাগ কু[illegible] [illegible]র সর্দ্দার ও ডাণ্ডীওয়ালারা নিঃশেষ করিয়া ফেলি[illegible]লে। কালায় যে মৎস্য ধরিয়াছিল, তাহা আমাদের দে[illegible] [illegible]ৎস্যের মত নহে। আমাদের দেশে ঐ প্রকার মৎস্য [illegible] [illegible]ই। এই হ্রদেও বিস্তর জলজ আগাছা আছে।

কালা গ্রাম দুই ভাগে বিভক্ত। কালা-হ্রদের দক্ষি[illegible] পূর্ব্বপারে যে গ্রাম, তাহাই বড় এবং হ্রদের পূর্ব্ব[illegible] গ্রাম উহা হইতে ছোট। দুই গ্রামের মধ্যে বিস্তীর্ণ চা[illegible] ঐ সকল ভূমিতে যব-গম চাষ হইয়াছে। পূর্ব্বকথিত ন[illegible] জল এই হ্রদের মধ্যে পড়িতেছে। নদীর জল উচ্চ [illegible]

হইতে নালা কাটিয়া চাষের সুবিধার জন্য ক্ষেত্রে লওয়া হইতেছে।

আমরা তিব্বতে সকল স্থানেই স্নানের জল ও পানীয় জল গরম করিয়া ব্যবহার করিতাম, ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

৪ঠা জুন।—অদ্য আমরা ৭টা ৪৫ মিনিটের সময় কালার বাংলো পরিত্যাগ করিলাম। শস্যশ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে উত্তরপূর্ব্বদিকে গমন করিতে লাগিলাম। ঐ গ্রাম ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অনুর্ব্বর ভূমিতে আসিয়া পড়িলাম। এই ভূমির উপর দিয়া ১।৷৹ মাইল গেলে দুই পাহাড়ের সঙ্গমস্থলে পৌছিলাম। তথা হইতে পাহাড়ে আরোহণ করিলাম। এখানে রাস্তার দুই দিকে দুইটি প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ দেখিলাম। এই স্তূপের উপরে ছোট ছোট সাদা কাপড়ের নিশানের ভিতর "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" লেখা আছে। আমরা তিব্বতী ভাষা জানি না ও তিব্বতদেশীয় লোকের আচারব্যবহারে অভিজ্ঞ নহি। সর্দ্দার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ঐ সকল পাথরের স্তূপ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকরা স্থানে স্থানে রাখিয়া থাকে। যাত্রিগণ ভগবানের নাম করিয়া রাস্তা হইতে পাথর কুড়াইয়া ঐ স্তূপের উপর ছুড়িয়া ফেলে এবং কেহ কেহ মন্ত্র লেখা নিশানও দেয়। গ্রামের আশেপাশে নদীর পারে পুলের ধারে গিরিসঙ্কটে এবং পর্ব্বতসঙ্গমে মন্ত্র-লেখা নিশান ও এ প্রকার পাথরের স্তূপ প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের কুলীদিগকে "লা শো শো" এই প্রকার চীৎকার করিয়া এই পাথরের স্তূপের উপর আরও পাথর ফেলিতে দেখিয়াছি।

পর্ব্বতসঙ্গমের অপর পারে পৌছিয়া কিছু নিম্নদিকে যাইতে হইল। ক্রমে আমরা চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত এক মাঠে পড়িলাম, স্থানটি অনুর্ব্বর। তৃণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। মাঠে শুধু কঙ্কর ও বালিতে মিশ্রিত মাটী। তৃণ না থাকিলেও ফিরিবার সময় এই যায়গায় মাঠের স্থানে স্থানে ৫।৬ ইঞ্চি উঁচু ছোট ছোট পাতাবিশিষ্ট চারা গাছ এবং তাহাতে ছোট ছোট লাল, সাদা এবং বেগুণে রংএর ফুল দেখিয়াছি। গাছের পাতাও কচি অবস্থায় রক্তাভ থাকে, পরে সবুজ রং প্রাপ্ত হয়। আমি একটি গাছ উঠাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার সঙ্গী তিব্বতদেশীয় কুলীগণ উহা বিষাক্ত গাছ বলিয়া প্রকাশ করায় উহা ফেলিয়া দিয়া হাত ধৌত করিয়াছিলাম।

পর্ব্বতসঙ্গমে পুনরায় উঠিবার সময় দরোয়ান আমাদের বামদিকে হরিণ দেখিতে পাইল। সে আমার নিকট হইতে বন্দুক লইয়া উহা মারিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠে দৌড়াইল। আমরা অপর পারে নামিয়া মাঠে পড়িয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মাঠের মধ্যে দক্ষিণদিকে কতকগুলি বন্য অশ্বতর দেখিতে পাইলাম। তাহারা

...করিবার সময় স্নানের দৃশ্য

...বেড়াইতেছিল। কিন্তু আমরা সেখানে ...দেখিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা ...পর দরোয়ান বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া ...সে দূর হইতে দুইটি গুলী চালাইয়াছিল; কিন্তু ...গায় লাগে নাই।

...কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মাঠের প্রান্তে পৌছিলাম। ...ন আমরা গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া নামিয়া কিছু অগ্রসর ...পুনরায় এক সমতল ভূমিতে পড়িলাম। কিছু দূর ...পর একটি ছোট নদীর ধারে আসিয়া পৌছিলাম। ...দুই দিকে সমতল ভূমি। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে

বৃক্ষতৃণশূন্য উচ্চ পাহাড়। নদীর দুই পাশেই সমতল ভূমিতে চাষ-জমী। এখানেও নদীর জল ছোট ছোট নালা দিয়া ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা আছে। এখানে বাতাসের জোর একটু কম বলিয়া বোধ হইল; তাহা হইলেও আমাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য বায়ুতে বেগ যথেষ্টই আছে।

নালা কাটিয়া হ্রদের জল ক্ষেত্রে লওয়ার অপর দৃশ্য

হাওয়া প্রাতঃকালে কিছু কম থাকে; বেলা ১১টা হইতে বাড়িতে আরম্ভ করে। এখানে উপত্যকার দুই দিকের পাহাড় সকল উচ্চ এবং খুব চড়াই। নদীর পারে এবং পাহাড়ের গায়ে দলে দলে ভেড়া এবং মধ্যে মধ্যে চমরীগাই সকল একত্র হইয়া চরিতেছে।

এখানে মাঠ ক্রমে পরিসরে বিস্তৃত হইল। ক্রমে আরও দূরে গেলে মাঠের পরিসর প্রকাণ্ড হইল। শামাদা বাংলোর কিছু দক্ষিণদিকে, পশ্চিমদিকের পাহাড়ের মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ মাঠ চলিয়া গিয়াছে। ঐ মাঠের পশ্চিম পারে এবং মাঠের মধ্যে ছোট ছোট বস্তি দেখা গেল এবং বহু দূরে পর্ব্বতের উপরে রিকু গোম্ফা।

তিব্বতে বহু গোম্ফা আছে এবং প্রত্যেক গোম্ফায় বিস্তর লামা থাকে। লাসার নিকট কোন কোন গোম্ফায় দুই চারি হাজার করিয়াও লামা থাকে। প্রত্যেক গোম্ফাতেই বিস্তর ধন দৌলৎ ও যায়গা-জমী আছে এবং লামারা ঐ জমী কর আদায় করে, এতদ্ব্যতীত তাহাদের গোম্ফায় মাখন দুগ্ধের জন্য চমরী-গাই ইত্যাদি আছে। এই স্থানে বিস্তর চমরী-গাই দেখিয়া উহাদের অধিকারী নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। ইহা রি গোম্ফার চমরী-গাই বলিয়া রাখাল প্রকাশ করিল। এই মাঠের মধ্যে সুন্দর চাষবাস দেখিতে পাইলাম আমরা ২টার সময় শামাদা বাংলো পৌঁছিলাম। ইহার উচ্চতা ১৩ হাজা ফুট। এই উপত্যকার প্রায় সকল স্থা বেশ সুন্দর চাষবাস হইতে দেখিলাম

৫ই জুন।—অদ্য রাত্রি ৪টার স ঘুম ভাঙ্গিল। আর শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া গাত্রোত্থান করিয়া হাত-ম ধুইতে গেলাম। আমার সঙ্গি আমার কিছু পরে উঠিল। রান্না হই গেলে আমরা আহারাদি করিয়া ৬-৪৫ মিনিটের স শামাদা বাংলো পরিত্যাগ করিলাম: আজ আমাদে সামান্য কিছু (হাজার ফুট) নামিতে হইবে। ডোে

দলে দলে ভেড়া চরিয়া বেড়াইতেছে

১৪ হাজার ৬ শত ফুট) এই সকল স্থানের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। ডোচেন হইতে কালা মাত্র ১ শত ফুট নীচু। কালা হইতে শামাদা তদপেক্ষা নীচু। এইরূপ নীচে যাইতে যাইতে গ্যাণ্টাসি পর্য্যন্ত মাত্র ১৬।১৭ শত ফুট নামিতে হয়। তাহাও ৮৫ মাইল স্থ উপর বিস্তৃত বলিয়া সমান যায়গা দিয়া যাওয়ার মত মনে হয়। গ্যাণ্টাসির উচ্চতা ১৩ হাজার ১ শত ফুট। বাংলো হইতে বাহির হইয়াই একটি ছোট নদীর ধার দিয়া এবং চাষী জমীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই স্থানের পাহাড়গুলি খুব উচ্চ, কিন্তু বরফশূন্য। জমীর বাঁকে বাঁকে ঘুরিয়া একই প্রকার দেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ৫।৬ মাইল অগ্রসর হওয়ার পর বৃক্ষহীন ও বৃষ্টিহীন দেশে এক স্থানে

তিব্বতদেশীয় গ্রাম

নদীর মধ্যে চড়াতে ও অন্য এক যায়গায় নদীর পারে ধারে কয়েকটি বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহাতে ফুল কিম্বা ফল নাই ; শুধু পাতা আছে। তাহা দেখিয়া আমরা যে আনন্দ পাইলাম, সেইরূপ আনন্দ বহুকাল অ ভব করি নাই। ইহার শোভা অনির্ব্বচনীয়। বৃক্ষ কয়ে খুব বড় নহে। ৫ হাত হইতে ১০ হাত উচ্চ হইবে।

পথিমধ্যে তিনটি তিব্বতদেশীয় গ্রাম পার হইয়া গেলাম। ঘরগুলি দূর হইতে দেখিতে বেশ, কিন্তু গ্রামের নিকটে গেলে উহার অপরিষ্কার অবস্থা দেখিয়া ঘৃণার উদ্রেক হয়। তবে এই সকল গ্রাম ফারি হইতে ছোট এবং 'ফারির' তুলনায় পরিচ্ছন্ন। গ্রামে প্রায়ই কৃষকের বাস অধিক। ঘরদরজা ফারির মত একই নমুনায় তৈয়ারী। সকালবেলা বাতাস কম ছিল। দ্বিপ্রহরে হাওয়া বাড়িতে লাগিল। যায়গা ঠাণ্ডা হইলেও রৌদ্রের তেজ খুব প্রখর। অধিকক্ষণ মাথায় রৌদ্র লাগিলে মাথা ছম্-ছম্ করে।

আমরা ৭।৮ মাইল যাওয়ার পর একটি গ্রামের পাশে পৌছিলাম। গ্রামের একটি স্ত্রীলোক এক হাতে চামড়ার থলিয়াতে ছাতু এবং অপর হাতে একটি কাঠের জগে ঠাণ্ডা মদ লইয়া রাস্তায় যাত্রীদিগকে কিছু কিছু করিয়া বিতরণ করিতেছে। স্ত্রীলোকটি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে ঐ ছাতু এবং মদ আমাকে দিতে চাহিল। তাহাদের ভাষা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সঙ্গী ডাণ্ডীওয়ালাদিগকে ডাকিলাম। তাহারা বলিল যে, ইনি আপনাকে পানীয় ও ভোজনের জন্য ছাতু দিতে বাসনা করেন। আমি মদ খাই না এবং এই সময় ছাতু খাইব না, তবে আমার সঙ্গী লোকদিগকে দিতে পারে, আমি ইহা বলিলাম। সে তাহা শুনিয়া আমার লোকদিগকে ঐ পানীয় ও ছাতু দিতে অগ্রসর হইল। তাহারা তাহাদের সঙ্গের পানপাত্রে কিছু কিছু ঐ মদ ঢালিয়া তৎসহিত কিছু ছাতু মিশ্রিত করিয়া পরমানন্দে খাইতে লাগিল। আমাদের দেশের জলসত্রের ন্যায় তিব্বতবাসীরাও ঐ সকল বস্তু ধর্ম্ম অর্জ্জনের জন্য পথিক-

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার কয়েকটি বৃক্ষ পাইলাম। এখানে উপত্যকার পরিসর কম আমরা কাংমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাংলো নদী। নদীর দুই দিকে চাষী-ক্ষেত্র এবং তার পর দুই দিকেই খুব উচ্চ বৃক্ষশূন্য পাহাড়। কিন্তু উপত্যকায় তৃণ বিদ্যমান। চমরীগাই ও মেষপাল নদী তীরে চরিয়া বেড়াইতেছে। নদী হইতে জল নালা ক্ষেত্রে দেওয়া হইতেছে।

ভাবে ক্রমে ক্রমে একঘেয়ে দৃশ্যের মধ্য দিয়া

...ম্মা বাংলোর নিকট উপস্থিত হইলাম। এই বাংলোটি একটি মালভূমির উপর অবস্থিত। আমরা নিম্নের উপত্যকা দিয়া হাঁটিয়া আসিয়া এই মালভূমির উপর দিকে উঠিয়া বাংলো পাইলাম। উহার সম্মুখে উপত্যকা। উপত্যকার মধ্য দিয়া ছোট নদী সর্পাকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নদীর উভয় পারে চাষভূমিতে গম এবং যব চাষ হইতেছে। বাংলোটি নদীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। নদীর নাম কায়েংলো। উহার পশ্চিম পারে খুব উচ্চ পাহাড়—১৮ হাজার ফুট উচ্চ। কিন্তু তাহাতে তুষার তেমন দেখিতে পাইলাম না। তবে কোন কোন স্থানে মধ্যে মধ্যে সামান্য তুষার দৃষ্টিগোচর হইল ফিরিবার সময় তাহাও ছিল না।

বস্তি ও ভেড়ার দল

নদীর পশ্চিমদিকের পাহাড় খুব খাড়াই। এই খাড়াই পাহাড়ে উঠা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব, ... দেশীয় লোককে সহজে উপরে উঠিতে নামিতে দে... নদীর পূর্ব্বপারে অল্প কতটুকু সমতল ভূমির পর ...

এই মালভূমির উপর কাংমার বাংলো; উহার পশ্চ... বিস্তীর্ণ মাঠ। এই মাঠ ক্রমোচ্চভাবে এক মাইল ... মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী এক উচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে গিয়া পৌ...য়াছে। মাঠে চাষ আছে, তবে খুব বেশী নহে। পূর্ব্বদি... পাহাড় হইতে একটি ঝরণা আসিয়া নীচে পড়িতে... এই ঝরণার জল ক্ষেত্রে লইয়া চাষের সুবন্দোবস্ত ... হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের পাহাড়ও পশ্চিমদিকের পাহা... ন্যায় উচ্চ। উত্তরপূর্ব্বদিকেও উঁচু উঁচু পাহাড়, তাহা পূর্ব্ব... পশ্চিমদিকের পাহাড় হইতে আ... উচ্চ দেখায়। এই উত্তর ও পূ... দিকের পাহাড়েও বেশী তুষার দে...লাম না। কোন কোন যায়... সামান্য এক-আধটুকু বরফ ... যায়। বাংলোর মধ্যে একটি প্রা... প্রাঙ্গণের চারিদিকে একতলা পা... ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কোঠা। ... দিকে যাত্রীদিগের থাকার ও ... নের ব্যবস্থা। দুইটি বড় শয়নঘ... দুইটি ছোট শয়নঘর। রাত্রিতে ... বৃষ্টি হইল। কাংমা ১৩ হা... ৮ শত ফিট উচ্চ।

[ক্রমশঃ।

র সোহাগ

১
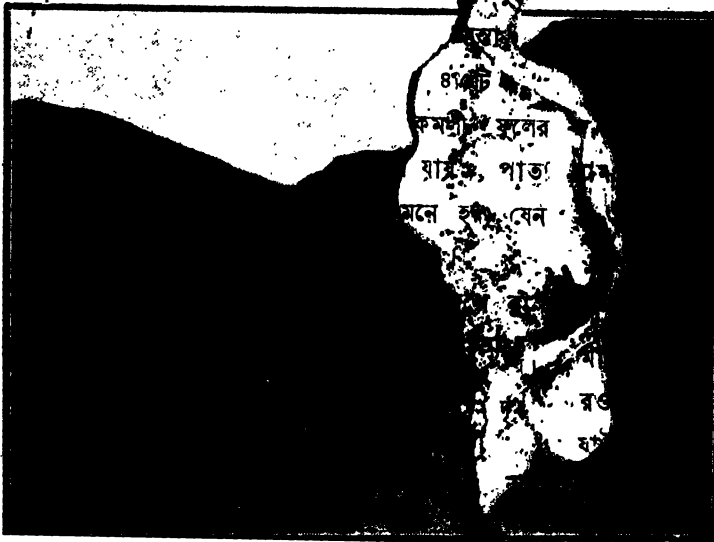
একটা অতি জীর্ণ মন্দিরের সংস্কারের জন্য কোম্পানীর বড়-কর্ত্তা মোতিজিকে জরুরী তার দিয়েছিল ন্দিরের মালিক এক জন বাঙ্গালী মহিলা ; হাতে তাঁর সম্পত্তি। এক মাসের মধ্যে কায শেষ করতে পারলে ঠিক ডবল মজুরী। কোম্পানী দেড় মাস টাইম চেয়েছিল। মহিলা রাজি নন ; বলেন, এক মাসের পরেই তিনি তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে যাবেন। দেড় মাস সবুর সইবে না ! সং-কর্ম্মে এক পয়সার যায়গায় দু-পয়সা খরচ করতে হয় ত ভালই। সময় দিতে পারা যাবে না।

মোতিজি কোম্পানীর সব চেয়ে বড় এঞ্জিনিয়ার। ছিপ্‌ছিপে চেহারা, দেখ্‌লে মনে হয়, চল্লিশ পেরোয় নি ; কিন্তু মোতিজির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বি-এ পাশের পর রুড়কী—তার পরে সাগরপারের দিগ্‌-বিজয়ী টাইটেলগুলো লোকটিকে যেন অতিরিক্ত জৌলুস দিয়েছিল। মোতিজির হাঁ-তে কোম্পানীর হাঁ ; আর না-তে না।

সকালের এক্সপ্রেসেই এসে পৌঁছুবার কথা। তাই, দীননাথ-নয়নচাঁদ কোম্পানীর বড় মালিক, ধনপৎ গোয়েঙ্কা তার লোমবহুল ঝুলে-পড়া ভ্রূর মধ্য দিয়ে বার বার দেয়ালের উঁচুতে টাঙ্গানো ঘড়িটা দেখ্‌ছে। কাণ খাড়া হয়ে উঠ্‌ছে, ঐ বুঝি "হাওয়া-গাড়ীর" হর্ণের শব্দ !

ধনপতের ডান গালের উপর একটা প্রকাণ্ড জড়ুল ; সেটার উপর বোরিক্ তুলো খানিকটা লাগানো দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ব্যথা হওয়াতে ডাক্তারের এই ব্যবস্থা। ডাক্তাররা বলে—পেকেও যেতে পারে। ধনপৎ মাথা নেড়ে, নিজের মনে মনে হেসে বলে, না ; পাক্‌বে না। জড়ুলে ব্যথা হ'লেই কোম্পানীর চারিদিক দিয়ে হুড়্‌হুড়্ ক'রে টাকা আস্‌তে থাকে ! আর তার এই হাতে-হাতে ব্যর্থ প্রমাণ—মন্দির-সংস্কারের ব্যাপারটা কি নয় ? ল পাঁচ হাজারের এষ্টিমেট, আর দিতে চায় দশ হাজার ! হাতের রক্ত-মুখী নীলার আংটীটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধনপৎ ল, শনি মহারাজ, এ সবই তোমার দৌলতে !—খোস, চিড়, ব্রণ, চুলকুনি ? এগুলো কি আর ব্যায়রাম ? টুকু উপদ্রব ? তা' আমার সইবে মহারাজ ; আমার এ দেহ ত আর ননী দিয়ে তৈরী নয় ? তুমি প্রসন্ন থেকো, দোহাই শনি ঠাকুর ! তা'হলেই সব ভাল !

২

ধনপৎ গোয়েঙ্কা ধনী ; কিন্তু কৃপণ। নিজের কার্পণ্যের জন্য সে কিছুমাত্র লজ্জিত নয়। তর্কে তার সঙ্গে পেরে উঠা মুস্কিল। আর, সে তর্ক শুধু মোতিজির পক্ষেই করা সম্ভব। আর কাউকে ডেকে দুটো কথা বলার ফুরসুৎও নেই ধনপতের। চিন্তা, চিন্তা, চিন্তা ! শুধুই দুশ্চিন্তা !

বেঁটে-খাট অথচ স্থূল, গজাকৃতি মানুষটির মুখের উপর চিন্তার অসংখ্য রেখা ! ভিতরের মানুষটি অনবরত যেন চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত ; তারি কতক পরিচয় মুখের দাগগুলোতে।

সাড়ে ন'টা ত বাজে, এখনই রাণীদের লোক এসে ... এ দিকে মোতিজির দেখা নেই। ধনপৎ কপাল কু... , কি জবাব দেওয়া যায় ? কাযটা হস্তান্তর হয়ে গেলে অনেকগুলো টাকা বেহাত হয়ে যায়, ঘরে—আসা টাকা এমন ক'রে ছেড়ে দেওয়া ;—ধনপৎ মাথা নেড়ে বল্লে, না:, আমাকেই দেখ্‌ছি নিজে যেতে হলো।

...ঠে ডাক্ পড়লো ; এই কোই হ্যায় !

...ং এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে, হুজুর !

...ড়ী তৈয়ারী করনে বলো—আউর লালচাঁদ

...রে চড়ে না। কালো জুড়ি, গাঢ় নীল ...গাড়ী, এই জুড়ি গাড়ীখানা চেনে কাশী ...ঐ চলেছে ধনপৎ গোয়েঙ্কা। গঙ্গাস্নানে ...র গাড়ী দেখ্‌লে লোকে চোখ বোজে ভয়ে ; ডুবে যায়। আর ফিরতি-পথে ত কথাই নের অন্ন যাবে কাল-ভৈরবের গ্রাসে ! এতে কারুর ছিল না।

৩

নটবর ...দার এসে উপস্থিত।

নিমেষে নিজের চিন্তাক্লান্ত মুখটা বদলে ফেলে এবং প্রসন্ন হাসি দিয়ে নটবরের অভ্যর্থনা ক'রে ...ড়ী তৈরী, কথাটা শেষ ক'রে ফেল্‌তে আমি

নিজেই যাচ্ছি। মোতিজির আজ আসা হ'লো না; একটা ভারি জরুরী কাযে আটকে গেছে বোধ হয়; কাল নিশ্চয়ই আসবে, তাতে আর ক্ষতি কি?

নটবর বেশ গম্ভীর থম-থমে প্রকৃতির মানুষ, চট্ ক'রে কোন কিছু ব'লে ফেলে পরে পস্তাবার লোক নয়; বুঝে শুঝে, ওজন ক'রে, নিক্তির তৌলে সে কথা কয়।

নটবর বল্লে, রাণীজীও তাই চাচ্ছেন, তিনি নিজেই কথা-বার্ত্তা কইতে চান্, আর আপনি গেলেই বোধ হয় ভাল হয় —যে কর্ত্তা, সে সবদিক বুঝে, সামলে কথা কইতে পারে; মোতিজি হাজার হ'লেও আপনার চাকর ত?

ধনপৎ খুসী হ'লো; আর এ কথা শুনলে কোন্ মানুষই বা না খুসী হয়ে থাক্‌তে পারে? প্রশংসা সর্ব্বদাই শ্রুতি-মধুর।

ধনপৎ হাসিটা চেপে বল্লে, তবে কি জানেন হালদার বাবু, মোতিজি আমাদের এঞ্জিনিয়ার—ইমারতের কাযটা বোঝে ভাল—

কিন্তু, হালদার বল্লে, মোতির কায শেষ [illegible] নিতে আপনিই তো!

এবার আর ধনপতের পক্ষে হাসি চাপা সম্ভব [illegible]ন, সে হে, হে, হে ক'রে হাসাতে সমস্ত শরীরটা জু[illegible]টা কম্পনের হিল্লোল বয়ে গেল।

নটবর বল্লে, তবে আর দেরি কিসের?

কিছু না, ব'লে ধনপৎ উঠে পড়লো!

৪

রাণীজীকে দেখে ধনপৎ গোয়েঙ্কা মনে[illegible] হয়ে গেল। তাঁর রূপটি প্রজ্বলিত হো[illegible] উজ্জ্বল নহে, তাতে আকর্ষণ করার শক্তি[illegible] আগুন দেখলে পতঙ্গ যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ার [illegible] হয়, তার হাত-পা শুঁড়-ডানা প্রসারিত ক'রে এগি[illegible] থাকে, তেমনি গোয়েঙ্কার বুকের মধ্যে যেন [illegible] আকুলি-ব্যাকুলি! এই সাড়ার একটা বিচিত্র ম[illegible] তাগিদ আছে!

গোয়েঙ্কা জীবনে অনেক স্ত্রীলোক দেখেছে সত্য[illegible] কিন্তু এমনটি সে আর কোন দিন দেখেনি। নারীর প্র[illegible]-সম্মানের কথা সে কাণে অনেক শুনেছিল, মনে ম[illegible] এক দিনও বিশ্বাস করার দরকার হয় নি—[illegible] অর্নি[illegible]পুঞ্জ ভেদ ক'রে যে শিখা জ্ব'লে উঠলো, তার স্নিগ্ধতা বুকের মধ্যে অনুভব করতে পেয়ে নিমেষে তার প্রাণ যেন ধন্য হয়ে, সার্থক হয়ে গেল।

সে বুঝলে, এ নারীকে সম্ভোগের জন্য বিধাতাপুরুষ গড়েন নি; গড়ে[illegible]রুষের পুজো পাবার জন্যে!

রাণীজী ব[illegible] আপনার নাম শুনেছি, আপনার কাযের সুখ্যাতিও আছে; আপনি দয়া ক'রে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে দিন্। এই সাম্‌নের মাসটি হাতে আছে, তার পর দু'মাস অকাল, আমাকে বৈশাখের সুরুতেই বেরিয়ে পড়তেই হবে, কৈলাস না দেখে আর এক তিলও বাঁচতে ইচ্ছা হয় না। এ দিকে গুরুদেবের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, মন্দির সংস্কার না ক'রে আমি তীর্থে যেতে পাব না।

গোয়েঙ্কা চিত্রার্পিতের মত কথাগুলো শুনছিল। কথার উত্তর যে তাকেই দিতে হবে, সে কথা যেন তার মনেই ছিল না।

রাণীজী থাম্‌লেন। নটবর গোয়েঙ্কার মুখের দিকে আগ্রহভরে চেয়ে রইল; কিন্তু তার মুখ থেকে কথা বা'র হয় না!

এক নিমেষে তার মনটার অদ্ভুত ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে সে কথা কইলে, রাণীমা, আপনার কথা আমার মাথার উপর রইল! আর আমি কি বলবো আপনাকে—

রাণী হাস্‌লেন, বল্লেন, আপনার ধন-দৌলতের কাছে—[illegible]মার যা আছে, তা অতি সামান্য, তাও আবার আমার [illegible]মীর দেওয়াই সব! ও টাকা আমি নিজের পিছনে খরচ [illegible]তে চাইনে, দেবসেবায় লাগুক্। আমায় আপনি রাণী [illegible] উপহাসের মত শোনায়। এঁরা (নটবরের দিকে [illegible]আঙুল দেখিয়ে) বলেন,—তা কেবল আশ্রিত জনের স্নেহ [illegible] রও ত নয়?

নটবরের মুখ নিমেষে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো।

ধনপৎ দুই কাণে হাত দিয়ে বল্লে, আমায় আর টাকার কথা বলবেন না। টাকা পাই কি না পাই—সে কোন কথা নয়! আমার জীবনেও ত কিছু সৎকর্ম করা উচিত

কৃপণের মুখে এ কথা নিতান্ত মুখের ... মনে হয়েছিল; কিন্তু গোয়েঙ্কার মুখের ... অবাক্ হয়ে রইল। এ কি! এই পাথরের বজ্রমূর্ত্তিকে নিমেষে প্রাণ-দান করলে কে?

ধনপতের হাতের কাছে একটা ... বাণ্ডিল এগিয়ে দিয়ে রাণী বল্লেন, এই রইল আপনা ... আমার টাকা —এ থেকে যদি কিছু বাঁচাতে পারেন ত সেই টাকায় অনাথাশ্রম খুললেই হবে।

ধনপৎ দু হাত উঁচু ক'রে বল্লে—টাকা আমি এখন নেব না; কায শেষ হ'লে আমার নিবেদন আপনার পায়ে আমি জানাব।

নটবরের মনে হ'লো, হঠাৎ দু'জনেরই মাথা বিগড়েছে; এদের হ'ল কি? বিশেষ ক'রে ঐ মক্ষিচুষ কঞ্জুষের হাড়—ধনপৎ গোয়েঙ্কার!

ধনপৎ প্রণাম ক'রে সে দিনের মত ফিরে গেল।

৮

অর্থের জন্য যে অধৈর্য্য, তা শান্ত নয়, এ কথা ধনপতের ভাল ক'রেই জানা ছিল। কিন্তু তার চিত্তের মধ্যে যে নবতর অধীরতা জন্মলাভ করেছিল, তা মোটেই অশান্ত নয়। ধনপতের মনে হ'লো, তার জন্মের সঙ্গে যে আত্মা এত দিন সুপ্তিতে মৃত-প্রায় হয়ে মৌন-নীরব ছিল, আজ সুধা-স্পর্শে তা সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে! বসন্তের সমাগমে লতা যেমন ক'রে পত্রে কোরকে পুষ্পে প্রাণময় হয়ে উঠে, তার মনও তেমনি যেন কোন স্বর্গীয় শক্তির স্পর্শে নবাঙ্কুরিত হয়ে উঠছে। যেন অকস্মাৎ স্পর্শমণির স্পর্শে মর্চ্চে-ধরা নোংরা লোহার শিকলটি হেমপ্রভায় ঝক্-ঝক্ ক'রে উঠলো!

এমন তৃপ্তির ঘুম, ধনপৎ হয় ত শৈশবে মাতৃক্রোড়ে এক দিন ঘুমিয়েছিল। এত মধুর স্বপ্ন সে জীবনে ... কোন দিন দেখে নাই। সকালে উঠে ধনপৎ বহুদিনের আগেকার অভ্যাসের একটা হারাণ সূত্রের যেন খেই ধ'রে খুসী হয়ে গেল। সে অনেক দিন পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়ে হেঁটে গঙ্গাস্নানে চ'লে গেল। চাকরের দল ম... করলে, মালিক রাগ ক'রে চ'লে গেছেন। কোচমান ঘাটের উপর গাড়ী রেখে ভয়ে কাঁটা হয়ে বসে রইল; আজ না জানি কত টাকাই জরিমানা হয়!

ঘাটে দীর্ঘ তিলক কেটে, গাড়ীখানা না দেখেই ধনপৎ বাড়ী ফিরছিল। কোচমান তাড়াতাড়ি নেমে প'ড়ে এগিয়ে গিয়ে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল!

গাড়ী লায়া? আচ্ছা, তব্ চলো, ব'লে ধনপৎ গাড়ীটাতে অন্যমনে চ'ড়ে বসলো। আজ যেন শরীর হাল্কা হয়ে গেছে। আজ যেন শরীরের সব ক্লেদ ধুয়ে-মুছে—নবীনতা এসে তার সেকালের ক্ষুর্ত্তির ফোয়ারা খুলে দিয়েছে!

মোতিজি এসে অপেক্ষা করছিল।

মোতিজি প্রস্তুত হয়ে এসেছিল তার না আস্তে পারার কারণটাকে খড়্গের মত ধারাল ক'রে নিয়ে। কিন্তু ধনপৎ তা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেল।

না-আসার কারণ দেখাতে গিয়ে মোতিজিকে হয় ত অনেক কিছু বাজে মিথ্যে কথা বল্‌তে আর বোঝাতে হ'ত; সে কথা ... থেকে রেহাই পেয়ে গোড়ায় তার মনটা ... স্বস্তি বোধ করেছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মোতিজির ... অবহেলা ব'লেই মনে হ'লো। মোতিজির ... ধীরে বেঁকে বসলো। কি? আমাকে জরুরী ... হ'লো, আমি এসে উঠতে পারলুম না; তা কেন ... না, জিজ্ঞাসা করারও দরকার নেই? এতই অ... মানুষ আমি? মোতিজির মন রুদ্ধ ক্রোধে বাঘের ম... ফুঁস্‌তে লাগ্‌লো।

... শান্ত হাসি হেসে বল্লে, ঠিক করেছি কি ভুল ক... নি নে, রাণীজীর কাযটা আমি এক মাসের কড়া... ছ নিয়েছি।

... ল্লে, আশ্চর্য্য! যে কায সম্বন্ধে আপনার ... নেই, তা আপনি অনায়াসে গ'ছে নিলেন? ... ঠিক হ'লো?

... অন্যমনস্কভাবে বল্লে, টাকার কোন কথাই ... কোন দরকারও নেই।

... জি বল্লে, এ ত ভারি আশ্চর্য্য কথা! সমস্ত দেশ ... রাণীকে চেনে, তার মালিকের পক্ষে এমন ... কথা, বিস্ময়ের ত' বটেই, তা' ছাড়া এর সঙ্গে ... কোন দায়িত্ব-বোধ-যুক্ত মানুষের পক্ষে গভীর চি... বিষয়!

ধনপৎ মোতিজির মুখের পানে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল।

... জি বল্লে, কেন? জানতে চাইছেন?—দীননাথ-কোম্পানীর বড় মালিকের বুদ্ধির দোষে যদি

তাই মল্লী ধনপ... ভ্রম ভাঙ্গাতেই সে বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম... ...ন করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই ম... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে আ... করতে এসেছেন।

মল্লীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা না... পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু... দু'এক দিনের মধ্যে মল্লী ধনপতের মতাম... বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত কেঁকড়া ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাযে ভাল ক...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না। ...

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তারের ... এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটি... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন; অতএ... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলো। ... মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে; আরগুলোকে ... শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে! যে নিজের ... বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না, ... কোথায়? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানু... দিতে পারে?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভার... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। ... টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না ... বড়? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বল... টাকাই বড়; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার ... গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানু... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ!

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হয়ে ...পাশে ব'সে কতক্ষণ সে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধনপৎ ...নতে পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চম্‌কে উঠলো!

কতক্ষণ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

... ...ক্ষণ নয়।

...তা বুকের ...

...রাণীজী ডেকেছেন।

এই ... কথা শুনে ধনপতের মনের মধ্যে ... আঁধারের এক... যেন নিমেষে খেলে গেল। ভয় করে, লজ্জা... ...ন্ত আরো গভীর-গূঢ় মনের মধ্যে একটুকরো হীরের আলো! সে আলোর মধ্যে আনন্দ জড়িয়ে দপ্-দপ্ ক'রে জ্বলছে! বলে, ভয় সব মুস্কিল দূর হয়ে যাবে তোর সেই-খেনে গেলেই!

ধনপতের এবার নটবরের সঙ্গে যেতে মন চাইছে নিজের দেবতার সঙ্গে যোগ যতক্ষণ একান্ত নিজের না ততক্ষণ সাধকের আশ মেটে না। গুরু-পুরোহিতের দৌত্যের প্রয়োজন যেন এ পূজায় শেষ হয়ে গিয়ে এখন মাঝের ধাপটা ব্যবধান মাত্র!

সে বল্লে, একটু কায আছে, সেরেই যাব। তুমি ... নটবর বাবু!

নটবর চ'লে গেল।

১০

নটবর বাড়ী ফেরার আগেই ধনপতের গাড়ী পৌঁছেছিল।

রাণীজী সে দিন তাঁর ফুল-বাগানে ব'সে চি... লিখছিলেন। ফোটা-ফুলের মধ্যে একটি ছোট্ট কাচের ... খোলা জানালার ধারে একটা লতায় নীল রংএর ... গোকা ফুল।

সেই কাচের ঘরের মধ্যে রাণীজীকে দেখাচ্ছি... ...কটি কিশোরী; যেন ফুলের রাণী কি স্বর্গের পরী!

ধনপৎ নীচু হয়ে প্রণাম করলে, রাণী হেসে ...দিক দিয়ে আপনি বিপন্ন হয়ে পড়েছেন, তাই ...ঠিয়েছি।

ধনপৎ সহসা কোন কথা কইতে পারলে না।

মোতিজি যে আপনাকে বিপন্ন করবে, তা ...আগেই জানতুম। সে আর আমার স্বামী এক গে... ইয়ার কি না!

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে রাণীজীর দিকে ... ধনপৎ বল্লে, আপনি মোতিজিকে চেনেন?

বিলক্ষণ! ব'লে রাণী হাসলেন। তার পর

তাই মল্লী ধনপতের ভ্রম ভাঙ্গাতেই সে বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম... করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই ম... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে আ... করেছেন। এসেছেন।

মল্লীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা না ... পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু ... দু'এক দিনের মধ্যে মল্লী ধনপতের মতামত ... বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত কেঁকড়া হ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাযে ভাল ক...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না। ...

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তারের ... এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটি... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন ; অতএ... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বস্‌লো! ... মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে ; আরগুলোকে ... শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে ! যে নিজের ... বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না ... কোথায় ? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানুষ ... দিতে পারে ?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভার ... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগ্‌ল। টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না ... বড় ? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বল্‌... টাকাই বড় ; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার ... গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানুষে... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ !

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হয়ে ... ব'সে কতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধনপৎ ... পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চম্‌কে উঠ্‌লো!

কতক্ষণ ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

... শিখরে যাওয়ার জন্যে যেন অধীর চঞ্চল; ... তা বুকের ... গতিতে। উঁচু-নীচু পথ, মনে ... ডেকেছেল গেল !

রা... কথা ... না হয় তুমি ঘোড়ায় চড় ধনপৎ ... তামা... এক... চ্ছ।

ধনপৎ বল্লে, ... চড়াইটুকু, তার পর ত আরাম! ... আরও যে সাত মাইল যেতে হবে, তবে তাঁবু ফেলার যায়গা পাওয়া যাবে।

ধনপৎ এদিক ওদিক চেয়ে বল্লে, তবে একটু বসি এখেনে।

বসন্ত বল্লে, মা, আর একটু আগে চমৎকার বসার যায়গা পাওয়া যাবে।

যা, যা, তোরা এগিয়ে যা—আমি ধনপৎকে নিয়ে আসছি।

ধনপতের পা আর সোজা হয়ে পড়ে না। রাণীজী হাত ধ'রে বল্লেন, ধনপৎ, আর দু' কদম—

আর যে পারছি না—মুখ দিয়ে তার কয়েক ফোঁটা রক্ত উঠ্‌লো!

ধনপৎ সেই পথের মধ্যে শুয়ে প'ড়ে—নিতান্ত নিশ্চিন্ত-মনে চির-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লো। কৈলাসপতি মধ্য-পথেই তাকে কোল দিলেন।

*   *   *   *

সে দিন আর যাত্রীরা আগু বাড়তে পারলে না।

সেইখেনেই বরফ তুলে, মাটী খুঁড়ে, ধনপতের অনন্ত-শয্যা রচিত হলো।

তাকে শুইয়ে দেবার সময় জামা খুলে নেওয়া হয়েছিল। ... পকেটে একটা দামি টাকার ব্যাগ—আর একখানা ...।

রাণীজীর হাতে দিতে দলিলখানা খুলে দেখে বিস্ময়... ন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ধনপৎ তার বিষয়ের ... ত্বের ভার নির্ভয়প্রিয়ার উপর দিয়ে গেছে!

মল্লীর জন্য মাসহারা স্বামীজি স্থির যা ক'রে দেবে ... তাই ন্যায্য হবে!

হাতের নীলার আংটীটি সে মোতিজিকে দিতে অনুরো... করেছে ; মোতিজির নাকি ওটার উপর লোভ ছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তাই মন্ত্রী ধনপতের ... ভাঙ্গাতেই সে বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম... ন করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই ... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে ... করতে এসেছেন।

মন্ত্রীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা ... পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু ... দু'এক দিনের মধ্যে মন্ত্রী ধনপতের মতামত ... বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত ফেঁকড়া ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাযে ভাল ক...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না। ...

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তারের ... এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটি ... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন ; অতএ... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলো! ... মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে ; আরগুলোকে ... শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে! যে নিজের ... বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না ... কোথায়? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানুষ ... দিতে পারে?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভার ... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। ... টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না ... বড়? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বল... টাকাই বড় ; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার ... গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানু... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ!

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হয়ে ব'সে কতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধনপ... পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চমকে উঠলো!

কতক্ষণ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

... আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে কোন ... বুকের ... করেন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ... ডেকেছেন ... হইতে মাল আমদানী ... রাজ চিকিৎসকগণ কোন ... বস্তুত ঔষধাদির গুণাগুণ ... করিতে বাধ্য হন। ইংরাজ ... নিবেশের ব্যক্তিবর্গ ও সৈন্যগণের জন্যই এইরূপ কার্য্যে ... ক্ষেপ মূলতঃ আবশ্যক হয়। অবশ্য তৎপরে ওসানসি, ওয়ারিং, ডাইমক্ প্রমুখ বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক উদ্ভিজ্জ ঔষধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাহাতে বহুবিধ দেশীয় ঔষধ বিদেশীয়গণের মধ্যে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু যে সময় হইতে এলোপ্যাথিক ঔষধসমূহের আমদানীর সুবিধা হইয়াছে, সেই সময় হইতেই আর দেশীয় ঔষধ প্রচলন-বিস্তারের জন্য রাজ-সরকারের বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় নাই। Indigenous Drugs Committee নামক একটি সরকারী সমিতি কিছুদিন ধরিয়া দেশীয় গাছগাছড়ার গুণাগুণ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার কার্য্যতঃ কোন ফল হয় নাই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন আবার বিলাতী ঔষধ আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, সে সময় পুনরায় দেশীয় ঔষধের উপর দৃষ্টি পড়ে। বৃটিশ ফারমাকোপিয়ার অনেক ঔষধই দেশীয় উপাদান হইতে প্রস্তুত হইতে থাকে। যদিও আয়ুর্ব্বেদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহাতে কোন উপকার হয় নাই, তথাপি অনেক মফঃস্বলের হাসপাতাল-সমূহে তৎকালে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হইত, সেগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের সংশোধিত সংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। লেফটেনেন্ট কর্ণেল বার্ডউডের Practical Bazar Medicines নামক পুস্তকে এইরূপ ঔষধের অনেক পরিচয় পাওয়া যাইবে। ডাক্তার বার্ডউড মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই প্রকার দেশীয় ঔষধ-ব্যবহার দ্বারা প্রভূত উপকার পাওয়া গিয়াছে এবং সাধারণ ব্যাধি সমূহের পক্ষে এই প্রকার ঔষধই যথেষ্ট। কিন্তু শান্তিস্থাপনের পর আবার বিলাতী ঔষধ চলিতেছে।

উন্নতির পথ

বিগত বিশ বৎসর হইতে আয়ুর্ব্বেদের সংস্কার ও প্রচারের জন্য দেশব্যাপী যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার ফলে কতিপয়

সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম... ...ন করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই ম... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে আ... করতে এসেছেন।

মল্লীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা না... পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু... দু'এক দিনের মধ্যে মল্লী ধনপতের মতামত... বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত কেঁকড়া ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাযে ভাল ক...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না। ...

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তারের... এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটি... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন; অত... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলো! ... মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে; আরগুলোকে... শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে! যে নিজের... বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না... কোথায়? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানুষ... দিতে পারে?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভার... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগ্‌ল। টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না... বড়? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বলে... টাকাই বড়; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার... গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানুষের... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ!

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হয়ে... ব'সে কতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধনপৎ... পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চম্‌কে উঠ্‌লো!

কতক্ষণ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

...মতা বুকের ...র-মন্দির... ...ডেকেছে...গেল!... ক'জন পায়! হ্যা— ...না হলাগ্... ...তামা... ...টেছে। শেষ—'তা হোক ধন...টু চোখ... ...ছলেন। বেলা সাতটায় উ... ...ভাবে, গেটের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। গোপী... ...আশায়, না এম্‌নি?

এইখানেই মাতঙ্গিনী চা দিয়ে যান। বিনা প্রসাধনে একখানি কস্তাপেড়ে কাপড়ে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী। সতক্ষ... দেখতে পেলেন, ভাদুড়ী নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন। তাঁর প্রাণটা একবার "ছি—ছি!" ক'রে উঠলো—একটা দীর্ঘ শ্বাস পড়লো। চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

কৈ, আগেকার মত কেউ ত আর কাছে আসে না, আজ যেন সেটা তাঁর কাছে ধরা পড়লো। ফল কথা— সম্প্রতি তাঁর একা একা থাকতেই ভাল লাগছিলো। মধুপুরে আসবার পর যে সব আনন্দ-মুখর উপভোগ্য দিনগুলি কত না হাস্যে রহস্যে কেটেছে, সহসা সে সব আজ তাঁর মনে প'ড়ে গেল। কিছুর ত অভাব ঘটেনি—সবই ত তাই আছে, তবে সে দিন আর নাই কেন? নবনীর যৌবন-সুলভ উৎসাহ, আচার্য্যের সরস উক্তি, মাতঙ্গিনীর সহজ কর্ত্তৃত্ব—সুমধুর আধিপত্য নাই কেন? গেলো কেনো?

তিনি সেই বিগত দিনগুলি আবার ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তবু শেষ-দেখার মত ফটকের ফাঁক ...য় পথের দূর প্রান্ত পর্য্যন্ত একবার দেখে নিয়ে, হঠাৎ ...ণ্ঠে চাকরকে হুকুম করলেন—আচার্য্য মশাই আর ...কে ডাকতে,—আজ অনেক দিন পরে।

আচার্য্য মশাই টেবিলে কনুয়ের ভর দিয়ে একদৃষ্টে ...র স্থালে যেন চাঁদমারির মধ্য-বিন্দু লক্ষ্য করছিলেন;— ...ক অভ্যাস নয় তো! টেবিলের ওপর মোহমুদ্গরখানা ...হয়ে প'ড়ে,—নিরবলম্ব!

...মনস্তত্ত্বে মালিকান স্বত্ব না পেলে লেখকদের চলে না। আচার্য্য তখন আশ্চর্য্য হয়ে মোহের মহিমা সম্বন্ধে ভাব- ছিলেন। মোহের কাছে সকলকেই মাথা হেঁট করতে হয়। ...খানে তা'বড় তা'বড় জ্ঞানী গুণী যোদ্ধা-বোদ্ধা কারো ...পর্দা চলেনি—চলে না। সেই সূক্ষ্ম অদৃশ্য মোহের কোনো

তাই মল্লী ধনপৎ... ভাঙ্গাতেই সে বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম...ন করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই ম... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে আ... করতে এসেছেন।

মল্লীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা ... পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু ... দু'এক দিনের মধ্যে মল্লী ধনপতের ... বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত কেঁকড়া ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাবে ভাল কা...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না।

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তারের ... এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটি... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন; অতএ... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলো! মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে; আরগুলোকে শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে! যে নিজের বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না, কোথায়? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানুষ... দিতে পারে?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভার... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না ... বড়? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বল... টাকাই বড়; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার ... গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানুষে... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ!

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হয়ে ব'সে কতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধনপ... পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চম্‌কে উঠলো!

কতক্ষণ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

...আটকাবে না। শেষ ... গেছি। তিরিশ বছর ...বুকের ... ডেকেছেন ... ছিল,—তাঁদের বিচ্ছেদ ... কথা ... না হারিয়ে গেছে।"

তামা... combinationএর process-... ধন... ভাদুড়ী মশাই বলতে পারেন—...তে ওঁর 'অনার্...।"

...—"শুনে যেন স্বর্গলাভ করেছি! ঘরেই বিষয়-বস্তু মজুদ—আর ভাবি না। এখন দয়া ক'রে—বোনাপার্টির জোসেফিন্‌কে ত্যাগের উদ্‌যোগপর্ব্ব থেকে অষ্ট্রীয়ার রাজ-কন্যার প্রেমের কূলপ্লাবী বন্যা—তার পর সম্রাটের শেষ দশাটাও একটু সবিস্তারে শুনিয়ে দিলেই, নাটকখানা শেষ ক'রে—বান্ধব-সকাশে আবার পেস্ করি, এবং আশাও করি ক্যালকাটা-হাউসে—একাধিক সহস্র রজনী। কি বলেন—জমবে না?—তবে বামুনে কপাল, ভয় হয়।"

শুনতে শুনতে ভাদুড়ী মশার হাসি-ঢাকা মুখে মসী-ছায় দ্রুত আসা-যাওয়া করছিল। হাসিটা টেনে রেখে বললেন,—"নবনী যে নীরব! ও—ও—ত সময় নষ্ট করবার ছেলে নয়,—ও কি নিয়ে আছে?"

আচার্য্য বললেন—"ক্যালকুলাসেই ওঁর মাথা মসগুল;—তাক্ লাগাবার মতো কিছু হাত লাগলেই বুক্‌চিরে লিখবেন।"

এইরূপ হাসি-রহস্যে স্নানের সময় এসে যাওয়ায়, সভা-ভঙ্গ হল।

ভাদুড়ী মশাই হাসিটা বরাবর বজায় রাখলেও—সেটা ...তান্ত ফিকে। তার পেছনে অপ্রতিভ ভাবের আভা ...রে লজ্জার ছোপ্ উঁকি মারছিল।

আচার্য্য আর নবনী চ'লে যাবার পর, তিনি কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক রইলেন। মনটা তাঁর গ্লানিতে ভ'রে উঠলো। ...তঙ্গিনীকে নিকটে পাবার জন্যে বিষম অতিষ্ঠতা এলো! ...র্ঘ নিশ্বাস ফেলে উঠলেন

সকলে আহারে বসেছেন। মাতঙ্গিনী দেবী একাই স্বহস্তে সব রেঁধেছেন—পরিবেষণ করেছেনও নিজেই। ক... দিনই এই ভাব চলেছে।

গন্ডে শিশিরবিন্দুর মত—মুখে ঘর্ম্মবিন্দু। কপালে

তাই মল্লী ধনপতের ঘুম ভাঙ্গাতেই সে বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম... করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই ... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে আ... করতে এসেছেন।

মল্লীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা ... পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু ... দু'এক দিনের মধ্যে মল্লী ধনপতের মতামত ... বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত ফেঁকড়া ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাযে ভাল ক...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না। ...

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তারের ... এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটীর ... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন; অতএ... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলো! মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে; আরগুলোকে শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে! যে নিজের বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না, ... কোথায়? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানু... দিতে পারে?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভার ... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না ... বড়? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বল... টাকাই বড়; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানুষে... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ!

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হয়ে ব'সে কতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধনপৎ পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চম্‌কে উঠলো!

কতক্ষণ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

... ফিরে যাওয়ার জন্যে যেন অধীর চঞ্চল ... তা বুকের ... গতিতে। উচু-নীচু পথ, মনে ... ডেকেছে গেল!

রা... কথা ... না হয় তুমি ঘোড়ায় চড় ধনপৎ, ... তামা... একটু ...।

ধনপৎ বল্লে, ... চড়াইটুকু, তার পর ত আরাম! ... আরও যে সাত মাইল যেতে হবে, তবে তাঁবু ফেলার ... জায়গা পাওয়া যাবে।

ধনপৎ এদিক ওদিক চেয়ে বল্লে, তবে একটু বসি এখেনে।

বসন্ত বল্লে, না, আর একটু আগে চমৎকার বসার যায়গা পাওয়া যাবে।

যা, যা, তোরা এগিয়ে যা—আমি ধনপৎকে নিয়ে আসছি।

ধনপতের পা আর সোজা হয়ে পড়ে না। রাণীজী হাত ধ'রে বল্লেন, ধনপৎ, আর দু' কদম—

আর যে পারছি না—মুখ দিয়ে তার কয়েক ফোঁটা রক্ত উঠ্‌লো!

ধনপৎ সেই পথের মধ্যে শুয়ে প'ড়ে—নিতান্ত নিশ্চিন্ত-মনে চির-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লো। কৈলাসপতি মধ্য-পথেই তাকে কোল দিলেন।

* * * *

সে দিন আর যাত্রীরা আগু বাড়তে পারলে না!

সেইখেনেই বরফ তুলে, মাটী খুঁড়ে, ধনপতের অনন্ত-শয্যা রচিত হলো।

তাকে শুইয়ে দেবার সময় জামা খুলে নেওয়া হয়েছিল। পকেটে একটা দামি টাকার ব্যাগ—আর একখানা ...।

রাণীজীর হাতে দিতে দলিলখানা খুলে দেখে বিস্ময়ে ... স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ধনপৎ তার বিষয়ের পূর্ণ ... তার নির্ভয়প্রিয়ার উপর দিয়ে গেছে!

মল্লীর জন্য মাসহারা স্বামীজি স্থির যা ক'রে দেবেন, তাই ন্যায্য হবে!

হাতের নীলার আংটীটি সে মোতিজিকে দিতে অনুরোধ করেছে; মোতিজির নাকি ওটার উপর লোভ ছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

তাই মন্ত্রী ধনপ... ভাঙ্গাতেই সে বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম... করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই ম... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে আ... করতে এসেছেন।

মন্ত্রীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা ন... পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু... দু'এক দিনের মধ্যে মন্ত্রী ধনপতের মতাম... বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত কেঁকড়া ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাযে ভাল ক...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না।

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তা... এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটী... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন; অতএ... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলে... মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে; আরগুলো শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে! যে নিজের বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না... কোথায়? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানুষ... দিতে পারে?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভার... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। ... টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না ... বড়? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বল... টাকাই বড়; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার ... গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানু... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ!

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হ... ব'সে কতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধনপ... পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চম্‌কে উঠলো!

কতক্ষণ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

...শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ...গতা বুদ্ধের ...র-মন্দিরের সভা-বৈদ্য জীবক শিশু... ডেকেছেলে গেল ...ধন করিয়াছিলেন। নালন্দা ...না নাগার্জ্জুনের নাম ভারতের ...তামা... হইয়া রহিয়াছে। তিনি চিকিৎসা, ধন..., জ্যো... শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন ...তন্ত্র নামক সুশ্রুতের পরিশিষ্ট তাঁহার দ্বারাই লিখিত। ...সমুদ্রপারে গিয়া তিনি আল্‌কিমিয়া বিদ্যা (Alchemy) সর্ব্বপ্রথমে অর্জ্জন করিয়া আসেন এবং আয়ুর্ব্বেদে ধাতব ঔষধ সমূহের প্রবর্ত্তন করেন। প্রসিদ্ধ যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলির সময় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। তিনিও লৌহ সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিয়া একখানি লৌহশাস্ত্র রচনা করেন। এক দিকে আয়ুর্ব্বেদে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রচলন এই যুগের যেমন একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, অন্যদিকে সাধারণ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরিপুষ্টিও তেমনই আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সম্রাট্ অশোকের মনুষ্য ও পশু চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতাল-সমূহ এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় কল্পিত পয়ঃপ্রণালীযুক্ত সুচারুরূপে বিন্যস্ত নগররাজি তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসের দ্বিতীয় যুগে চরক ও সুশ্রুতের মূলগ্রন্থ অধ্যয়ন প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। তৎপরিবর্ত্তে বাগভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয় ও মাধবকরের নিদান সমধিক প্রচারলাভ করিয়াছিল। এই দুইটি গ্রন্থ অধ্যয়নে তাৎকালিক চিকিৎসকগণ চরক ও সুশ্রুতের সারসংগ্রহ ব্যতীত পরবর্ত্তী সকল প্রকার উন্নতির বিষয় অবগত হইতে পারিতেন। ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবশ্য অবগত আছেন ..., এই যুগের শেষভাগে কেবল সম্রাট্ হর্ষের রাজত্বকাল ...তীত অন্য সময়ে ভারতে ভয়ঙ্কর অরাজকতা গিয়াছে; ...ার ফলে অনেক প্রদেশ ও বড় বড় নগর বিধ্বস্ত হয় এবং ...সঙ্গে চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানসমূহও লোপ প্রাপ্ত হয়।

খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী আয়ুর্ব্বেদের ইতি...সের তৃতীয় যুগ বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়। এই ...য়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পতন হইয়া আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় এবং দেশ হিন্দুরাজগণের হাতে আইসে। এই যুগের আয়ুর্ব্বেদীয় উন্নতি বঙ্গদেশে সমধিক প্রচলিত ...ক্রপাণের গ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইঁহার পিতা ছিলেন একাদশ শতাব্দের রাজা ন্যায়পালের সভা-বৈদ্য।

তাই মল্লী ধনপা... ভাঙ্গাতেই সে বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম... করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই ম... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে আ... এসেছেন।

মল্লীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা ... পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু ... দু'এক দিনের মধ্যে মল্লী ধনপতের মতামত ... বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত কেঁকড়া ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাযে ভাল ক...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না। ...নেন

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তারের এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটী... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন; অতএ... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলো! মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে; আরগুলোকে শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে! যে নিজের বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না, কোথায়? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানু... দিতে পারে?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভার... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগ্‌ল। টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না ... বড়? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বল্‌... টাকাই বড়; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানু... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ!

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হয়ে ব'সে কতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধনপ... পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চম্‌কে উঠলো।

কতক্ষণ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

...আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে কোন ...তা বুকের ... করেন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ... ডেকেছেল... গেল ... হাত হইতে মাল আমদানী ... না ... রাজ চিকিৎসকগণ কোন ... ব্যবহৃত ঔষধাদির গুণাগুণ ধন... মনে ... করিতে বাধ্য হন। ইংরাজ উপনিবেশের ব্যক্তিবর্গ ও সৈন্যগণের জন্যই এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ মূলতঃ আবশ্যক হয়। অবশ্য তৎপরে ওসানসি, ওয়ারিং, ডাইমক্‌ প্রমুখ বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক উদ্ভিজ্জ ঔষধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাহাতে বহুবিধ দেশীয় ঔষধ বিদেশীয়গণের মধ্যে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু যে সময় হইতে এলোপ্যাথিক ঔষধসমূহের আমদানীর সুবিধা হইয়াছে, সেই সময় হইতেই আর দেশীয় ঔষধ প্রচলন-বিস্তারের জন্য রাজ-সরকারের বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় নাই। Indigenous Drugs Committee নামক একটি সরকারী সমিতি কিছুদিন ধরিয়া দেশীয় গাছগাছড়ার গুণাগুণ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার কার্য্যতঃ কোন ফল হয় নাই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন আবার বিলাতী ঔষধ আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, সে সময় পুনরায় দেশীয় ঔষধের উপর দৃষ্টি পড়ে। বৃটিশ ফারমাকোপিয়ার অনেক ঔষধই দেশীয় উপাদান হইতে প্রস্তুত হইতে থাকে। যদিও আয়ুর্ব্বেদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহাতে কোন উপকার হয় নাই, তথাপি অনেক মফঃস্বলের হাসপাতাল-সমূহে তৎকালে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হইত, সেগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের সংশোধিত সংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল বার্ডউডের Practical Bazar Medicines নামক পুস্তকে এইরূপ ঔষধের অনেক পরিচয় পাওয়া যাইবে। ডাক্তার বার্ডউড মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই প্রকার দেশীয় ঔষধ-ব্যবহার দ্বারা প্রভূত উপকার পাওয়া গিয়াছে এবং সাধারণ ব্যাধি-সমূহের পক্ষে এই প্রকার ঔষধই যথেষ্ট। কিন্তু শান্তিস্থাপনের পর আবার বিলাতী ঔষধ চলিতেছে।

উন্নতির পথ

বিগত বিশ বৎসর হইতে আয়ুর্ব্বেদের সংস্কার ও প্রচারের জন্য দেশব্যাপী যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার ফলে কতিপয়

তাই মল্লী ধনপতের ... নাম ভাঙ্গাতেই সে বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম... ...ন করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই ম... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে আ... করতে এসেছেন।

মল্লীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা না... পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু ... দু'এক দিনের মধ্যে মল্লী ধনপতের মতামত ... বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত কেঁকড়া ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাযে ভাল ক...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না। ...

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তারের ... এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটি ... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন; অতএ... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলো ... মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে; আরগুলো ... শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে! যে নিজের ... বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না ... কোথায়? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানুষ ... দিতে পারে?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভার ... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। ... টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না ... বড়? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বল... টাকাই বড়; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার ... গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানুষে... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ!

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হয়ে ব'সে কতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধনপ... পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চমকে উঠলো!

কতক্ষণ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

...তা বুকের ...র-... ...য়া।

... ডেকেছেন ...গেল ... ... ক'জন পায়! হ্যাঁ—

রা... কথা ... না লাগ... ...বন—

...তামা... ...। ...টেছে। শেষ—'তা হোক'

ধন... ...কটু চোখ ... ...লেন। বেলা সাতটায় উঠে ...ভাবে, গেটের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। গোপীর ...শায়, না এম্নি?

এইখানেই মাতঙ্গিনী চা দিয়ে যান। বিনা প্রসাধনে, একখানি কস্তাপেড়ে কাপড়ে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী। যতক্ষণ দেখতে পেলেন, ভাদুড়ী নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন। তাঁর প্রাণটা একবার "হি—হি!" ক'রে উঠলো—একটা দীর্ঘ-শ্বাস পড়লো। চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

কৈ, আগেকার মত কেউ ত আর কাছে আসে না, ...জ যেন সেটা তাঁর কাছে ধরা পড়লো। ফল কথা—...প্রতি তাঁর একা একা থাকতেই ভাল লাগছিলো। মধুপুরে আসবার পর যে সব আনন্দ-মুখর উপভোগ্য দিনগুলি কত না হাস্যে রহস্যে কেটেছে, সহসা সে সব আজ তাঁর মনে প'ড়ে গেল। কিছুর ত অভাব ঘটেনি—সবই ত তাই আছে, তবে সে দিন আর নাই কেন? নবনীর যৌবন-সুলভ উৎসাহ, আচার্য্যের সরস উক্তি, মাতঙ্গিনীর সহজ কর্ত্রীত্ব—সুমধুর আধিপত্য নাই কেন? গেলো কেনো?

তিনি সেই বিগত দিনগুলি আবার ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তবু শেষ-দেখার মত ফটকের ফাঁক ...য় পথের দূর প্রান্ত পর্য্যন্ত একবার দেখে নিয়ে, হঠাৎ ...ঠে চাকরকে হুকুম করলেন—আচার্য্য মশাই আর ...কে ডাকতে,—আজ অনেক দিন পরে।

আচার্য্য মশাই টেবিলে কনুয়ের ভর দিয়ে একদৃষ্টে ...র ভালে যেন চাঁদমারির মধ্য-বিন্দু লক্ষ্য করছিলেন;—...ক অভ্যাস নয় তো! টেবিলের ওপর মোহমুদ্গরখানা ...হয়ে প'ড়ে,—নিরবলম্ব!

...মনস্তত্ত্বে মালিকান স্বত্ব না পেলে লেখকদের চলে না। আচার্য্য তখন আশ্চর্য্য হয়ে মোহের মহিমা সম্বন্ধে ভাবছেন। মোহের কাছে সকলকেই মাথা হেঁট করতে হয়। ...খানে তা'বড় তা'বড় জ্ঞানী গুণী যোদ্ধা-বোদ্ধা কারো ...র্দ্ধা চলেনি—চলে না। সেই সূক্ষ্ম অদৃশ্য মোহের কোনো

তাই মল্লী ধনপতের ... সম ভাঙ্গাতেই সে বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম... ...ন করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই মা... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে আ... এসেছেন।

মল্লীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা ... পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু ... দু'এক দিনের মধ্যে মল্লী ধনপতের মতামত ... বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত কেঁকড়া ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাযে ভাল ক...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না। ...মেন

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তারের ... এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটী ... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন; অতএ... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বস্‌লো ... মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে; আরগুলো ... শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে! যে নিজের ... বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না ... কোথায়? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানু... দিতে পারে?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভার ... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগ্‌ল। ... টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না ... বড়? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বল্‌... টাকাই বড়; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার ... গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানু... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ!

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হয়ে ব'সে কতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধনপ... পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চম্‌কে উঠ্‌লো!

কতক্ষণ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

...ট... ...মন্ত্রের ... আটকাবে না। ... ...তা বুকের ... ...র-মন্দির ...য়া। ... গেছি। তিরিশ ব... ... ডেকেছেন গেল ... ...ছিল,—তাঁদের বিচে... রাণী... কথা ... না হলা... ...য়ে গেছে।"

তামা... এক... ...। ইয়া ...mbinationএর proces...

ধন... মনে আ... ...ড়ী মশাই বলতে পারেন ... ...ত ওঁর 'অন...

—"শুনে যেন স্বর্গলাভ করেছি! ঘরেই বিষয়-ব... ...ছুদ্—আর ভাবি না। এখন দয়া ক'রে—বোনাপার্টি ... জোসেফিন্‌কে ত্যাগের উদ্যোগপর্ব্ব থেকে অষ্ট্রীয়ার রা... কন্যার প্রেমের কূলপ্লাবী বন্যা—তার পর সম্রাটের ... দশাটাও একটু সবিস্তারে শুনিয়ে দিলেই, নাটকখানা ... ক'রে—বান্ধব-সকাশে আবার পেস্ করি, এবং আশা করি ক্যালকাটা-হাউসে—একাধিক সহস্র রজনী। ... বলেন—জমবে না?—তবে বামুনে কপাল, ভয় হয়।"

শুনতে শুনতে ভাদুড়ী মশার হাসি-ঢাকা মুখে মসী-ছা... দ্রুত আসা-যাওয়া করছিল: হাসিটা টেনে রেখে বললেন, "নবনী যে নীরব! ও—ও—ত সময় নষ্ট করবার ছে... নয়,—ও কি নিয়ে আছে?"

আচার্য্য বললেন—"ক্যালকুলাসেই ওঁর মাথা মসগুল —তাক্ লাগাবার মতো কিছু হাত লাগলেই বুকটি... লিখবেন।"

এইরূপ হাসি-রহস্যে স্নানের সময় এসে যাওয়ায়, স... ...ঙ্গ হল।

ভাদুড়ী মশাই হাসিটা বরাবর বজায় রাখলেও—... ...তান্ত ফিকে। তার পেছনে অপ্রতিভ ভাবের আ... ...র লজ্জার ছোপ্ উঁকি মারছিল।

আচার্য্য আর নবনী চ'লে যাবার পর, তিনি কিছু... অন্যমনস্ক রইলেন। মনটা তাঁর গ্লানিতে ভ'রে উঠলো ...তঙ্গিনীকে নিকটে পাবার জন্যে বিষম অস্থিরতা এলো ...র্ঘ নিশ্বাস ফেলে উঠলেন।

সকলে আহারে বসেছেন। মাতঙ্গিনী দেবী একাই ...হস্তে সব রেঁধেছেন—পরিবেষণ করেছেনও নিজেই। ক... ...দনই এই ভাব চলেছে।

গন্ডে শিশিরবিন্দুর মত—মুখে ঘর্ম্মবিন্দু। কপালে

তাই মল্লী ধনপ... ...ম ভাঙ্গাতেই সে বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম... ...ন করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই ম... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে আ... ...করতে এসেছেন।

মল্লীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা না... পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু... দু'এক দিনের মধ্যে মল্লী ধনপতের মতামত ... বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত কেঁকড়া হ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাযে ভাল ক...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না। ...

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তারের... এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটী... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন ; অত... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলো মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে; আরগুলো শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে! যে নিজের বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না... কোথায়? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানুষ... দিতে পারে?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভার... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। ... টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না... বড়? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বল... টাকাই বড়; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার ... গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানু... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ!

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হয়ে ব'সে কতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধন... পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চমকে উঠলো!

কতক্ষণ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

...প্রেমের ... বড় দুর্ব্বল, আমাকে ...গুভা বুকের ...র-মন্দিরে ...মা। ...ডেকেছেল গেল ... ...তি, তা আমি জানি রাত্রি... কথা ... না ... আমি তোমা... তামা... এক... ...হয়া যে নয়! আমাদের অক্ষ... ধন... কোথায় ... আমার এই কষ্টই ছিল ...মরা জান না, ও-টি মায়ের জাতের কত বড় কামনা, ক... ঐশ্বর্য্য। চিরদিন গ্রহণে আত্মমর্য্যাদা ক্ষয়ই হ... নিজের কাছেও মানুষ ক্ষুদ্র হতে থাকে। তোমার দো... কি, তোমার সব থাকতে, এ অভাব তুমি সইবে কেনো!

ভাদুড়ী মশাই কিছু বলবার চেষ্টা করায়, মাতঙ্গি... দেবী সবিনয়ে বলিলেন,—"আমি এর পর আর বল... পারব না, আমাকে শেষ করতে দাও, আমি আর এ দি... পাব না—"

ভাদুড়ী কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

—"সেই সন্তানলাভের জন্যে কি না করেছি। তু... সে-সব জান না। মধুপুরের কথা শুনে আমি উন্মত্তের ম... তোমাকে টেনে আনি। পরে ব্যবস্থা দেখে,—তোমা... বিপদ আশঙ্কায় নিজেই ভয় পাই, মনে মনে সে সঙ্কল্প ত্যা... করি।

—"তার পর গোপী ঠাকুরপো আমার মরা-ঘুমে... ফাঁকে তোমাকে নিয়ে কি দেখাতে যান। আমাকে ... সন্দেহ দিন-রাত পেয়ে বসেছিল—সজাগ রেখেছিল, সে দি... তাই সত্য হয়ে উঠলো। গোপীর সঙ্গে তুমি ফিরে এ... কিন্তু তোমাকে ফিরে পাবার আশা আমার ফিরলো না— ...রিয়ে গেল! দেখে শুনে আমাতে আর আমি রইনু... ... জ্ঞান পর্য্যন্ত গেল। জাগলো কেবল পরাজি... ...হায়ার প্রতিহিংসা। তাই না আমার বাঁচবার বা বা... ...বার শেষ অস্ত্র 'আমি সন্তান-সম্ভবা' এই প্রলাপ মু... ...কে বেরিয়েছিল! তোমার সে অবস্থায় যখন অ... ...র্থনার বস্তুও কাণ দিলে না, তখনি আমি আমার সর্ব্ব... ...মার সকল অধিকার খুইয়েছি, সকল আশা ত্যা... করেছি। আমার ভ্রম ঘুচে, আমার চারদিকে জ্ঞা... অফুরন্ত পথ খুলে দিয়েছে!

—"তোমাকে কোনো দিন কোনো কথা গোপ... নি। মিথ্যা কথা কয়েছি; লজ্জায় যে মাথা অবন...

তাই মল্লী ধনপ... ...ম ভাঙ্গাতেই সে বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম... ...ন করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই মর্... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে আ... এসেছেন।

মল্লীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা না... পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু... দু'এক দিনের মধ্যে মল্লী ধনপতের মতামত... বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত ফেঁকড়া ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাযে ভাল ক...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না। ...

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তারের... এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটি... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন; অতএ... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বস্‌লো! মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে; আরগুলো... শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে! যে নিজের... বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না... কোথায়? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানুষ... দিতে পারে?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভার... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগ্‌ল। টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না... বড়? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বল্‌... টাকাই বড়; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানু... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ!

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হ... ব'সে কতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধন... পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চমকে উঠ্‌লো!

কতক্ষণ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

... ...য়ের ... ছিল না। সলজ্জ ...ভ্রতা বুকের ... ...পেরিয়ে দিলেন। ... ডেকেছেন, গেল ... ...ড়েনীর গয়না পা... রা... ...কথা ... না হলাগু... তামা... ...গ... ...ক। হেঁয়া... পায়ের ধূলো নিলে।

ধন... লো—... ...মিষ্টি মুখ করতে হবে" ব... ...কে নিয়ে মাতঙ্গিনী বারান্দায় পা দিতেই আচা... ...ই বেজায় গম্ভীরভাবে বললেন,—"গাড়ী অনেকক্ষণ ... ফিরিয়ে রেখেছি; ট্রেণের সময় কি না,—আর দাঁড়া... চায় না। ছোটলোক না ব'লে বসে—ভদ্রলোকের কথ... ঠিক্ নেই! নিন্—এখানে আর আমাদের দরকা... বা কি মা—"

মাতঙ্গিনী সহাস কটাক্ষে বললেন,—"কি দুষ্ট ছে... বাবা তুমি!"

"তাই ত মা, মায়ের আশ্রয় ছাড়া কোথাও এর উপা... নেই।"

"কথাটা যেন মিথ্যে না হয় বাবা" বলতে বলতে মাতঙ্গিনী সকলকে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

বিজয় আনন্দে আচার্য্য একটা ডিগবাজি মেরে এক পাক্ ঘুরে নিলেন!

ভাদুড়ী মশাই অকস্মাৎ অকূলে কূল পেয়ে বিস্ময়ে আনন্দে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। নবনীকে ডেকে বললেন—"একখানা সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ ক'রে এসো, কাল ফার্ষ্ট ট্রেণেই কলকেতা ফিরবো—সকলেই। জোসেফিন্ সঙ্গেই যাবেন।"

আচার্য্য শুনতে পেয়ে হতাশকণ্ঠে বললেন—"বলেছিলুম ...মুনে কপাল! প্লট্ জমতে পায় না।"

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাই মল্লী ধনপ... সম ভাঙ্গাতেই সে বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম... ...ন করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই ম... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে আ... করতে এসেছেন।

মল্লীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা না... ...য়ে পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু... দু'এক দিনের মধ্যে মল্লী ধনপতের মতামত... ...র বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত ফেঁকড়া ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাযে ভাল ক...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না।

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তারের... এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটি... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন ; অতএ... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বস্‌লো! মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে ; আরগুলোকে... শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে! যে নিজের বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না... কোথায় ? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানুষ... দিতে পারে ?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভার... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগ্‌ল। টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না... বড় ? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বল্‌... টাকাই বড় ; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানু... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ!

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হয়ে ব'সে কতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধনপ... পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চম্‌কে উঠ্‌লো!

কতক্ষণ ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

... স্থান

...র্বর মৃৎশিল্প

প্রাচীন মিশরের দেবদেবী (১)

হিন্দুদের ন্যায় মিশরীয়গ... বহু দেবদেবীর পূজা করিত। তাহাদের ... শস্যের জন্য, সৃষ্টির ... মৃতদের জন্য, শিকার প্র... ভিন্ন জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ছিল।

তাই মল্লী ধনপ... ম ভাঙ্গাতেই সে বোধ হয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল ভরেই ম... ন করেছিল। ধনপতের ঠিক মনে নেই কি যে হয়েছিল, শুধু তার এই ম... তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হবার জন্য রাণীমা তাকে আ... এসেছেন।

মল্লীকে দেখে ধনপৎ লজ্জায় কথা ন... পড়লো।

তার পর দুর্জ্জয় মান-অভিমানের পালা সুরু... দু'এক দিনের মধ্যে মল্লী ধনপতের মতামত ... বাড়ী চ'লে গেল।

অতিরঞ্জিত কথা ডালপালায় শত ফেঁকড়া হ... কুৎসা-প্রিয় মানুষের চিত্ত-রঞ্জনের কাযে ভাল ক...

৯

মোতিজি আর দেখা করতে এলো না। ...

দিন চারেক পরে তিন জন বড় ডাক্তারের ... এর সঙ্গে এক দরখাস্ত এলো, এক বছরের ছুটি... একবাক্যে বলেছেন, রোগ অতি কঠিন ; অত... জন্য বিলেত যাওয়া একান্ত আবশ্যক।

ধনপৎ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলো! মুস্কিল রাণীর ব্যাপারটা নিয়ে; আরগুলোকে শুধরে নেবার সময় এবং শক্তি দুই ছিল ধনপ... রাণীজীকে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে! যে নিজের বার হওয়া নিজের কথা রাখতে পারে না, কোথায়? সে কেমন ক'রে নিজেকে মানু... দিতে পারে?

অন্য কোন কোম্পানীর উপর ভা... ধনপৎ মনে মনে চিন্তা করতে লাগ্‌ল। টাকাই লাগে—তাও ভাল! টাকা বড় না ... বড়? ধনপতের ভিতরের সেকেলে মানুষটা বল্‌... টাকাই বড়; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু বীর হুঙ্কার ... গর্জ্জনে মনকে স্তম্ভিত ক'রে বলে, না, না, মানু... অমূল্য সম্পদ হচ্ছে ইজ্জৎ, ইজ্জৎ, ইজ্জৎ!

ইতিমধ্যে নটবর এসেছিল। সে শান্ত হয়ে ব'সে কতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করছিল, তা ধনপৎ ... পারেনি, হঠাৎ তাকে দেখে সে চম্‌কে উঠ্‌লো!

কতক্ষণ?—ধনপৎ জিজ্ঞাসা করলে।

... তা বুকের ... যা। ... ডেকে... গেল ... রা... কথা ... না ... গামা... ধন...

...মুশীলনে নৃত্য

...পুরুষরা কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া এবং নারীরা ক... ...শিকারীর অনুকরণে অভিনয়মাত্র। তাহাদের বিশ্বাস ...যদ্দারা জাতির প্রচুর আহারীয় সংগ্রহ হইত।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্রাক্ষর-লিপি

সে লিখিয়াছে; দুই একখানা তরুণ মাসিক পত্রে মধ্যে মধ্যে সে সকল বাহিরও হয়। তাহার ধারণা, অভিভাবকদিগের নির্দ্দেশানুযায়ী—বিবাহ করাই পাপ, এমন কি, বিব' জীবনটাই মানুষের পক্ষে বন্ধন ও অভিশাপ। বাঁধা-ধরার মধ্যে প্রণয়ের পূর্ণ বিকাশ হইতেই পারে না। পরকীয়া প্রেমের তুল্য নবীন ও সরস প্রেম,—যাহা মুহূর্ত্তের দর্শনে—কটাক্ষ ঈক্ষণে দুইটি অ-দৃষ্ট-পূর্ব্ব, প্রেমিক ও প্রেমিকার হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে, তাহার তুল্য প্রেম বা ভালবাসা মন্ত্রপূত দাম্পত্য-জীবনে কখনই সম্ভবপর নহে।

এবার গ্রামে আসিয়া নীরেন্দ্র অনেক দি... ক্যান্তকে দেখিল। ছেলেবেলায় ক্যান্ত যখন সর্ব্বদাই তাহাদের বাটীতে যাইত, ছোট বোন্ সৌদামিনীর সহিত খেলাধূলা করিত, তখন হইতেই নীরেন্দ্র তাহাকে চিনিত। সৌদামিনীর কৈশোর-সঙ্গিনী ক্যান্তমণির অনুপম সৌন্দর্য্যও নীরেন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ক্যান্তও নীরেন্দ্রকে মেজদা বাবু বলিয়া ডাকিত, সময়ে সময়ে নীরেন্দ্র তাহার সহিত খেলা করিয়াছে, সৌদামিনী ও ক্যান্তকে একত্র পাঠ বলিয়া দিয়াছে,—পড়া বলিতে না পারিলে উভয়কে শাসনও করিয়াছে। তখন ক্যান্তর বয়স ছিল ১২।১৩ বৎসর। এখন সে পূর্ণাঙ্গী যুবতী রূপসী—অষ্টাদশী। এতদিনের পর আবার তাহাকে দেখিয়া নীরেন্দ্র অবাক্ হইয়া গেল, তাহার সরস নবীন তরুণ হৃদয়ে আলোড়ন উপস্থিত হইল।

কয়েক দিন নীরেন্দ্র নিজের মনের সঙ্গে বুঝাপড়া করিয়া অবশেষে সে ক্যান্তর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। সুযোগ পাইলেই সে ক্যান্তর সহিত দুই একটা কথা কহিতেও সুরু করিল। ক্যান্তও সলজ্জভাবে নীরেন্দ্রের সে সকল কথার জবাব দিত। ক্যান্ত স্বামীর উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া পিত্রালয়ে আছে, মাছ ধরিয়া, মাছ বেচিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে,—তাহার মত সুন্দরী শিক্ষিতা রসিকা নারীর মর্ম্ম যে তাহার মূর্খ স্বামী মোটেই বুঝে নাই, বরং অমর্য্যাদাই করিয়াছে, ইহাই সে ক্যান্তকে জানাইত এবং ক্যান্ত নীরবে শুনিয়া যাইত, কোনও প্রতিবাদ করিত না।

কিছুদিনের চেষ্টায় হঠাৎ নীরেন্দ্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, ক্যান্ত প্রায়ই গ্রামের প্রান্তস্থিত বনের ধারের বিলটাতে একাই মাছ ধরিতে যায়। অমনই নীরেন্দ্র ছিপ, সুতা, বঁড়শী প্রভৃতি কিনিয়া ফেলিল,—এবং এক দিন ক্যান্ত আসিবার পূর্ব্বেই একধারে বসিয়া মাছ ধরিতে সুরু করিয়া দিল।

প্রথম দিবস নীরেন্দ্রকে তথায় বসিয়া মাছ ধরিতে দেখিয়া ক্যান্ত ভাবিয়াছিল, সে ফিরিয়া যাইবে। দুই এক পদ পিছাইয়াও গিয়াছিল। কি... না সে শুধু হাতে ফিরিয়া যাইবে কে... ফিরিয়া আসিয়াছিল। ... জলে নামিলেই হয় ত ...মত ... ভাবিয়া সে কোন দিকে না চাহিয়া ... আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, নীরেন্দ্র উঠিবার নামও ... না,—স্থিরভাবে ফাৎনার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ক্যান্ত ঘণ্টাখানেক ধরিয়া জল তোলপাড় করিয়া গোটা কয়েক মাছ ধরিয়া হাঁড়িতে রাখিল, তাহার পর উঠিবার সময় কি ভাবিয়া বলিল, "মেজদা বাবু, মাছ ধরছো?"—নীরেন্দ্র স্বর্গ হাতে পাইল, মুখ তুলিয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই, কিন্তু মাছ ত কৈ খাচ্ছে না?"

ক্যান্ত জবাব দিল, "এতে জাওলা মাছই বেশী, দাদা বাবু, পোনা-টোনা তেমন নেই; ছিপে ধরবার ত যুৎ হবে না। তার চেয়ে তোমাদের খিড়্কীর বড় পুকুরটায় বসো গে, হাতের সুখ হবে।"

নীরেন্দ্র বলিল, "সেখানে উপায় নেই, বাবা জলের ধারে বস্‌লে তেড়ে আস্‌বেন, বল্‌বেন, অসুখ করবে।"—এই বলিয়া সে একটু হাসিল। ক্যান্তও হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

৮

ক্যান্ত প্রত্যহ আসিতে পারুক্ বা নাই পারুক্, মেজদা বাবু কিন্তু নিত্যই তথায় আসিতে লাগিল। ক্যান্তও আসে যায়, দাঁড়াইয়া দুই একটা কথাও বলে, তাহার পর আপন কাজ সারিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। এমনই করিয়া ক্যান্তরও ক্রমশঃ যে ব্যাপারটা গা-সহা হইয়া গেল,—আর সে নীরেন্দ্রকে দেখিয়া বড় একটা লজ্জা করিত না। অবশেষে কিছুদিন পরে এমন হইল যে, জলে নামিবার পূর্ব্বে ও পরে ভিজা কাপড়েই দাঁড়াইয়া ক্যান্ত নীরেন্দ্রের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া বেশ সহজভাবেই গল্প জুড়িয়া দিত।

লোকের চোখে তাহাদের এই আলাপন অশোভন ও সন্দেহজনক হইলেও, ক্যান্তর মনে তাহার আভাসও বোধ হয় জাগে নাই।

কয়েক মাস ধরিয়া এইরূপ অবস্থা চলিতেছিল। এক জন পরম রূপবান্ মুগ্ধচিত্ত যুবক, এবং আর এক জন পতিসঙ্গ-অনভিলাষিণী সুন্দরী যুবতী! এই অবসরে উভয়ের মধ্যে যে সকল কথা হইত, হয় ত তাহার কোনও মূল্যও ছিল না। কিন্তু ক্যান্ত যখন কথা কহিত, নীরেন্দ্র মদির-বিহ্বল-দৃষ্টিতে

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ... ্য সময়ে নীরেন্দ্রের
সে তরল-তীব্র-উন্মত্ত দৃ ... িয়া। ক্যান্ত অপর
দিকে চক্ষু ফিরাইয়া লইত ... ্যাগ
করিত, দুই পাঁচ দিন ... সময়ে
ক্যান্তর মন বিদ্রোহী হইয়া ... নানা
ঘটনায়—মন যখন তাহার ... ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া
পড়িত, তখন যেন সে চুম্বকা... লৌহের ন্যায় বিলের ধারে
উপনীত হইত।

এইরূপ অবস্থায় হঠাৎ কয়েক দিবস উপর্য্যুপরি ক্যান্ত মাছ ধরিতে আসিল না। নীরেন্দ্র সারাদিন ছিপ হাতে করিয়া তাহার অপেক্ষায় বিলের ধারে বসিয়া রহিল, অবশেষে অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু পর্য্যন্ত বৃক্ষচূড় হইতে নামিয়া গেলে হতাশ ও ভারাক্রান্ত মনে সে স্থল ত্যাগ করিত। ক্যান্তর অকস্মাৎ এইরূপ অনুপস্থিতিতে নীরেন্দ্রের মনে নানা সংশয় উপস্থিত হইল। পাঁচ রকম সাধারণ কথাবার্ত্তা ব্যতীত আজও সে ক্যান্তকে মনোভাব স্পষ্টতঃ কিছুই জানিতে দেয় নাই। তত্রাচ নীরেন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে, ক্যান্ত তাহার অন্তরের সকল পরিচয়ই পাইয়াছে। সে আপনার বিচার-বুদ্ধির সহায়তায় বুঝিয়াছিল, ক্যান্ত নিশ্চয়ই তাহাকে ভালবাসে, নহিলে এমন অসঙ্কোচে সে তাহার সহিত আলাপ করিবে কেন? সে ত কোনও দিনই বিরক্তি জানায় নাই। সেই সময় হঠাৎ নীরেন্দ্রের স্মরণ হইল—এক দিন ক্যান্তর নাম ধরিয়া না ডাকিয়া তাহাকে আদর করিয়া 'রূপসী' বলা হইয়াছিল বলিয়া ক্যান্ত রাগ করিয়াছিল এবং ঠিক তাহার পরদিবস হইতেই সে আসা বন্ধ করিয়াছে। নীরেন্দ্রের ভয় হইল, হয় ত বা ক্যান্ত রাগ করিয়াই আসিল না। তখন সে সব কায ফেলিয়া গোপনে গোপনে ক্যান্তর এই না আসার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল,—তাহার বাড়ীর আশেপাশে ঘুরিতে লাগিল।

তিন চারি দিনের মধ্যেই সে পাড়ার মধ্যে একটা অস্পষ্ট খবর শুনিল—ক্যান্তর স্বামীর না কি ব্যারামে অনেক দিন কামাই হওয়ায় চাকরীতে তাহার জবাব হইয়াছে। সে এখনও আরোগ্য হইতে পারে নাই; একরূপ শয্যাগতই আছে। তাহার সেবা-শুশ্রূষার একান্ত অভাব হওয়াতে সে না কি এবার নিজে কাতর অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়া ক্যান্তকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল, কিন্তু ক্যান্ত সে লোককে তাড়াইয়া দিয়াছে। তাহাতে সেই লোক না কি শাসাইয়া গিয়াছে যে, এবার পথে ঘাটে ক্যান্তকে একলা দেখিলেই জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। সেই ভয়েই ক্যান্ত বাড়ীর বাহির হয় না।

এ সংবাদে নীরেন্দ্র আশ্বস্ত হইল, মনে মনে আনন্দিতও হইল; ভাবিল, ক্যান্ত তাহা হইলে আর যে স্বামিগৃহে যাইবে না, ইহা স্থির-নিশ্চিত। তখন সে একবার তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্যান্তর বাপ নীরেন্দ্রের পিতার নিকট বাড়ী বন্ধক রাখিয়া ঋণ করিয়াছিল, এ কথা নীরেন্দ্র জানিত। সময়ে সময়ে বলরাম ঘোষাল নন্দকে ডাকাইয়া আনিয়া কড়া তাগাদা করিতেন, বাড়ী বেচিয়া লইবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেন, ইহাও নীরেন্দ্রের জানা ছিল। এখন সেই ছুতা করিয়া নীরেন্দ্র দুই এক দিন ক্যান্তদের বাড়ী গেল—ক্যান্তর সম্মুখে ... বা সৌরভকে অনেক আশ্বাস দিল, অনেক উদারতা দেখাইয়া বলিল—নীরেন্দ্র থাকিতে কখনই তাহাদের ভিটাচ্যুত হইতে হইবে না ইত্যাদি—ইত্যাদি।

এ দিকে বারবার শাশুড়ী ও স্বামীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করাতে ক্যান্তর বাপ-মাও তাহার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে জন্য ইদানীং প্রায়ই তাহাদের মধ্যে বচসা হইত, নন্দ খুব বেশী না বলিলেও, সৌরভ যখন তখন ক্যান্তকে দশ কথা শুনাইয়া দিত। ক্যান্তও সহ্য করিতে না পারিয়া মা'র সহিত তুমুল ঝগড়া করিত। অনেক দিন নীরেন্দ্র মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছে।

এক দিবস মধ্যাহ্নে নীরেন্দ্র ছিপ হাতে করিয়া নন্দর বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া শুনিল, ক্যান্ত খুব উঁচু গলায় মা'কে বলিতেছে, "আমি ত অমনি ব'সে ব'সে খাই না যে, যা তা যখন তখন বল্‌বে, বেশী বল ত এবার থেকে আলাদা রেঁধে খাবো।" মা বলিল, "খাওয়ার খোঁটা তোকে কেউ দেয় নি। রেঁধেই খাস্‌ আর যে করেই খাস্‌, একলা আর মাছ ধরতে যাস্‌নি ব'লে রাখ্‌ছি।" ক্যান্ত বলিল, "কেন, কিসের ভয়?"

মা বলিল, "এবার পথে বেরুলে লোক দে ধ'রে নে যাবে।"

"ইস্‌! গায়ে কেউ হাত দিক্‌ না দেখি, তোমরা বুঝি তাই মনে করেছ? সে ভয় ক্ষেন্তি মনে করে না।" এই বলিয়া ক্যান্ত রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে বেড়ার গা হইতে জালখানা তুলিয়া লইল। তার পর মস্ত বড় একটা হাঁড়ি ধুইতে লাগিল।

নীরেন্দ্র যখন দেখিল যে, ক্যান্ত আজ মাছ ধরিতে বাহির হইতেছে, তখন সে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া ত্বরিতপদে অপর পথ দিয়া ঘুরিয়া একবারে পূর্ব্বোক্ত বিলের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় তিন সপ্তাহ সে এই সুযোগের অপেক্ষায় আছে, আজ তাহার অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রও আজ নীরেন্দ্রের আরামদায়ক হইল।

কিয়ৎকাল পরে ধীর-মন্থর-গতিতে ক্যান্ত আসিয়া বিলের নিকট উপস্থিত হইয়াই দেখিল যে, নীরেন্দ্র পূর্ব্বের মতই যথাস্থানে বসিয়া মাছ ধরিতেছে। মনটা ক্যান্তর সে দিন ভাল ছিল না, তাই নীরেন্দ্রের কথায় গম্ভীরভাবে দুই একটা জবাব দিয়াই সে আপনার পরিধেয় বস্ত্রাদি সংযত করিয়া লইয়া হাঁড়িটা ভাসাইয়া দিয়া প্রায় এক-বুক জলে গিয়া নামিয়া পড়িল। ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া নীরেন্দ্র উপর হইতে ডাকিল, "এই জেলেনী—"

"ফের তুমি আমায় জেলেনী ব'লে ডাক্‌ছো, মেজদা বাবু ?" বলিয়াই ক্যান্ত ঘাড় ফিরাইয়া জলের মধ্যেই থমকিয়া দাঁড়াইল।

ক্যান্তর দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি নীরেন্দ্রের দৃষ্টিতে বড়ই সুন্দর দেখাইল। সে একটু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই জেলেনী, আমি ঐ বলেই তোমায় ডাক্‌বো ভাই ;—ও ক্যান্তর ম্যান্তর চেয়ে ঐ নামটি আমার বড় মিষ্টি লাগে।"

"আহা, কি আমার মিষ্টি চিনেছে গো ? নাও, কি বল্‌বে বল, আমার আজ দেরী করলে চল্‌বে না।"

"চট কেন ভাই জেলেনী, কত দিন পরে দেখা হ'ল।—বল্‌ছি কি, আজ তুমি ঐ দিক্ পানে মাছ ধর, এ দিকে আমার চারটি গুলিয়ে দিও না।"

"আমি বাবু তা পারবো না, চারদিকেই ঘুরে বেড়াব, তা ব'লে রাখ্‌ছি। তোমার 'চার' নষ্ট হবে, তার আমি কি করবো ?"

"তা হ'লে কিন্তু দেখিয়ে দেব মজা, আমার কত কষ্টের 'চার'—"

"ইস্ !—তোমার ঘরের কানাচে অত বড় বড় দীঘি থাক্‌তে আমার বন-বাদাড়ের এইটুকু খালি বিলের ওপরেই এত নজর কেন বাপু ?"—বলিয়াই ক্যান্ত মুখ ঘুরাইয়া লইল। নীরেন্দ্রের মাথাটা টলিয়া গেল। সে বলিল, "বন-বাদাড়ের এই বিলটাই আমি পছন্দ করি, জেলেনী।" নীরেন্দ্র স্থিরদৃষ্টিতে ক্যান্তর পানে চাহিল।

"ও মা ! বটে ?"—বলিয়াই ক্যান্ত একটু হাসিল। তার পর এক লহমা থামিয়াই কহিল, "তা এখানে এক দিনও ত মাছ পাওনি, তবে কিসের লোভে এস গা, দাদা বাবু ?"

এ কথায় নীরেন্দ্র যেন একটু থতমত খাইয়া গেল ; কাযে কাযেই তাহার উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হইল। কিন্তু তবু সে বলিল, "কিসের লোভে যে আসি, তা—" আর তাহার কথা যোগাইল না, সে চুপ করিয়া রহিল। নীরেন্দ্রকে কুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া ক্যান্ত করে[illegible]তে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে [illegible]। তাহার পর আবার কি ভ[illegible]র জলে ভাসানো হাঁড়িটা একত্র ক[illegible]রয়া পড়িল, এবং হাসিতে হাসিতে[illegible]র নীরেন্দ্রের অতি সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া [illegible] তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অল্প চাপা গলায় জিজ্ঞাসা ক[illegible], "তবে কার লোভে, কিসের লোভে এস গা, মেজদা' বাবু ?"

ক্যান্তর সুগঠিত মস্তকের সেই অর্দ্ধ-এলায়িত ভ্রমর-কৃষ্ণ চিক্কণ কেশদাম, পরিপূর্ণ নিটোল যৌবনশ্রীমণ্ডিত দেহের উপর ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা, সিক্তবসনা সুন্দরীর রূপৈশ্বর্য্য এবং মুখের সেই মৃদু অথচ মনোহর হাস্য ও সকলের উপর তাহার চটুল নেত্রের চপল চাহনী দেখিয়া নীরেন্দ্র একবারে আত্মবিস্মৃত হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মোটেই বাক্যস্ফুরণ হইল না।

নীরেন্দ্রকে তদবস্থায় দেখিয়া ক্যান্ত বেশ সহজ কণ্ঠেই আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ মেজদা বাবু, বল্লে না,—আমার কথার জবাব দিলে না ?"

নীরেন্দ্র এতক্ষণে বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইল ; কহিল, "যদি বলি ক্যান্ত, তোমারই লোভে—" বলিয়াই হাতটা বাড়াইল। ক্যান্ত নিজের অজ্ঞাতসারেই অল্প পিছাইয়া গিয়া বলিল, "ছিঃ ! ও কথা কি বলতে আছে ?"

"কেন নেই ? মনে আনতে আছে, আর মুখে বল্লেই দোষ ?"

ক্যান্ত বলিল, "আর আমি বামুন মাকে কি সৌদকে যদি ব'লে দিই ?"

"তাদের ব'লে দেবে ?"

ক্যান্ত হাসিল। বলিল, "তবে তুমি যদি বল্‌তে মানা কর, মেজদা বাবু, তা হ'লে বল্‌বো কেন ?" বলিয়াই সে নীরেন্দ্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিল।

"ক্যান্ত !"

"কি মেজদা বাবু ?"

"আমায় দয়া কর।"

"আমি জেলে-মালা, ছোট লোকের ঘরের মেয়ে, আমি আর তোমায় কি দয়া করবো, মেজদা বাবু ?"—ক্যান্তর উজ্জ্বল চক্ষু হইতে আবার একটি কটাক্ষবাণ নিক্ষিপ্ত হইল। শরাহত নীরেন্দ্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে জানিত, তাহার ভগিনী সৌদামিনী ক্যান্তকে 'জেলে-মালার মেয়ে' বলিয়াই ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল। এখন ক্যান্তর এই শ্লেষোক্তিতে নিজে বড়ই

প্রতিভ হইল, বলিল, "আ[illegible] তোমায় তেমন ভাবি না—[illegible]লিও না, আদর করেই 'জেলেনী' বলে [illegible]।"

"তা তুমি বল না কে[illegible] [illegible]দের মত [illegible]ন্দর লোক হ'তে চাই নি [illegible]"

"সত্যি বলছি ক্ষ্যান্ত, মিনা[illegible] পর্য্যন্ত [illegible] আমায় এমন ক'রে কষ্ট দিও না। তুমি কি [illegible] না, আজ ছ' মাস আমি কি কষ্টই না পাচ্ছি ?"

"সে তোমার অদেষ্ট, মেজদা বাবু, নইলে এই কষ্টটা তুমি পাও ?"

নীরেন্দ্র আগ্রহ সহকারে বলিয়া উঠিল, "এ্যাঁ, সত্যি সত্যি বল্‌ছো ?"

ক্ষ্যান্ত চুপ করিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না। তাহাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া নীরেন্দ্র পুনরায় কহিল, "তবে আমার মুখ চাও, তোমার ভাল হবে, ক্ষ্যান্ত।"

ঘাড় দোলাইয়া ক্ষ্যান্ত কহিল, "কি আর আমার ভাল হবে, মেজদা বাবু ?"

"আমি যেমন করেই হোক—যে উপায়েই হোক, তোমার বাবার বাড়ী খোলসা ক'রে দেব।"

"সে আমার বাবারই লাভ, আমার তাতে কি ?"

"ও, তা বটে!—আচ্ছা, তুমি যা চাইবে, তাই আমি দেব ক্ষ্যান্ত;—তোমায় অনেক ভাল ভাল গহনা আমি গড়িয়ে দেব।"

ক্ষ্যান্ত একটু হাসিয়া বলিল, "সেই বা আমার কি হবে, মেজদা বাবু? আমি ত সে সব প'রে বেড়াতে পাব না, আর গাঁয়ের সকলকে কিছু বলতেও পারবো না যে, তুমি আমায় গহনা গড়িয়ে দেছ!"

নীরেন্দ্র ফস করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কেন, লোকে জিজ্ঞেসা করলে বলবে, তোমার স্বামী দিয়েছে ?"

নীরেন্দ্রের প্রতি আবার একটা কটাক্ষ করিয়া ক্ষ্যান্ত বলিল, "সে কি হয়? দেবে তুমি, আর নাম হবে আর এক জনের? সে কথা বল্লে আমার ধর্ম্মে সইবে কেন ?"

নীরেন্দ্রের মুখটা ভার হইয়া উঠিল। সে খুব খানিকটা ভাবিয়া লইয়া অবশেষে বলিল, "তবে আর আমি তোমায় কোন কিছু দেবার নামও মুখে আনবো না। তুমি অমনি দয়া ক'রে আমার পানে চাও, তোমার মনে একটু স্থান দেও, একখানি ভালবাস।"—বলিয়া সে কাতর দৃষ্টিতে ক্ষ্যান্তর দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় হঠাৎ ক্ষ্যান্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। দূরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "শীগ্‌গীর পালাও, মেজদা বাবু। আমাদের কে দেখছে—"

নীরেন্দ্র ত্রস্তভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

ক্ষ্যান্ত আবার বলিল, "চেয়ে দেখবার সময় নেই, আর একটু দেরী ক'রো না, শীগ্‌গীর পালাও—নইলে সব দিকে নষ্ট হবে—" বলিতে বলিতে ক্ষ্যান্ত ত্বরিতপদে জালখানা ও হাঁড়িটা তুলিয়া লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখন নীরেন্দ্র গত্যন্তর না দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে ছিপ গুটাইয়া লইয়া পার্শ্বস্থ ঝোপের মধ্যে গিয়া লুকাইল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিলের অপর দিক হইতে দ্রুতপদবিক্ষেপে সৌরভ তথায় আসিয়া বলিল, "তবে লা কালামুখী, এই জন্তেই তুমি হেথা মাছ ধরতে আস ?"

আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া সেইখান হইতেই ঘাড় ফিরাইয়া ক্ষ্যান্ত জবাব দিল, "কি হয়েছে ?"

দাঁত-মুখ খিচাইয়া সৌরভ বলিল, "কি হয়েছে?—আবার ন্যাকামো হচ্ছে? আজ ঝেঁটিয়ে তোমার মুখ থেঁতো ক'রে দেব, ঘরে এস আগে। তাই তুমি হরিশপুরে যেতে চাও না? আ মরণ, মুখে আগুন তোমার, হারামজাদী!"

একটু কঠিন ও রুক্ষস্বরে ক্ষ্যান্ত বলিল, "ভাখ, মিছে বকো না, বাবাকে গালাগাল দিও না—"

"আচ্ছা, এস আগে, তোর বাপ এবার কতগুলো রসগোল্লা মুখে দেয় দেখি। মুখপোড়া ঘোষালদের ওই কালেজে পড়া ছোঁড়াটাকেও আজ দেখাচ্ছি। ওদের বাড়ীতে আমি এখুনি গিয়ে এর বিহিত করবো, তবে ছাড়বো। পোড়ারমুখো এসেছে লোকের জাত-কুল খেতে!"

ক্ষ্যান্তর মুখটা লাল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সারা দেহ যেন লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে বলিল, "ভাখ, মিছে চেঁচিও না, লোক-ঢলাঢলি ক'রো না, ঘরে যাও—"

"তাই যাচ্ছি। তুই আগে ঘরে আয়, সাঁঝের বেলা তোর সেই গোমড়ামুখো ভাল মানুষ বাপ, মিনষেও ঘরে আসুক!" এই বলিয়া আস্ফালন করিতে করিতে দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া সৌরভ কতক দূর গিয়াই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল— "লুকুতে তুই আর পারবিনি কালামুখী, ঢের লোক তোদের কীর্ত্তি দেখেছে। তোর শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ের মাতু গয়লানী পর্য্যন্ত দেখে আমায় এক দিন বলতে এসেছিল—তার কথায় আমি তখন বিশ্বেস করিনি, ঝেঁটিয়ে দিতে গেছনু; তার পাপেই আজ নিজের চোখে দেখতে হ'ল! ও মা, আমি কোথায় যাব!—তুই মর্ মর্, ঐখানেই ডুবে মর্!—আর যেন মুখ দেখতে না হয়—"

বলিতে বলিতে সৌরভ আঙ্গুল মটকাইতে লাগিল।

ক্যান্ত অম্লান-বদনে জবাব দিল, "এখানে ডুব-জল হবে না মা, মরতে হয় ত অন্য যায়গায় মরবো, তোমাদের চোখের আড়ালে গিয়েই মরবো, এখন ব্যাগ্যস্তা করি, আর তুমি চেঁচিও না—"

"চেঁচানীতে অত ভয় যদি, তবে মরতে গিছলি ক্যান্ লা শতেকখোয়ারী ?"—বলিতে বলিতে সৌরভ তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

ক্যান্ত আড়ষ্টের মত অনেকক্ষণ জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তাহার পর ধীরে ধীরে তীরে উঠিয়া আসিয়া একবার ভাল করিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া হাতের জালখানাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিল। তার পর আবার কোমর হইতে মাছ রাখা হাঁড়িটা খুলিয়া লইয়া সেটাকে একবারে ভাঙ্গিয়া চূরমার করিল। অবশেষে আন্‌মনে নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানা নিঙড়াইতে লাগিল।

ক্যান্ত একাকিনী সন্ধ্যার ম্লান আকাশের পানে স্থির উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইল।

অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া নীরেন্দ্র বাহিরে আসিয়া চাপা গলায় ডাকিল, "ক্যান্ত !"

হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া ক্যান্ত সভয়ে পিছন ফিরিয়া দেখিল, এবং নীরেন্দ্রকে দেখিয়া যেন কতকটা আশ্বস্ত হইয়াই বলিল, "তুমি এখনও যাওনি, মেজদা বাবু ?"

নীরেন্দ্র বলিল, "না। তোমায় এমন বিপদে ফেলে আমি কি ক'রে যেতে পারি ?"—তার পর একটু নিকটে আসিয়া কহিল, "এখন তুমি কি করবে, ক্যান্ত ?—"

ক্যান্ত কোনও উত্তর দিল না। সম্মুখের অন্ধকারের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীরেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তা হলে কি করবে ?"

"জানি না।"

"তুমি আমার সঙ্গে চল, ক্যান্ত।"

স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় ক্যান্ত বলিল, "কোথায় ?"

"কোল্‌কেতায়।"

"কোল্‌কেতায়! কোন্ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে ? হরিশপুরের ইষ্টিশানে যেতে হবে ত তা হ'লে ?"

"তা হলোই বা। ঐ মাঠের রাস্তা ধ'রে সে গ্রামখানা বাঁয়ে ফেলে আরও ক্রোশখানেক হাঁটলেই আমরা ইষ্টিশন পাবো।" বলিয়াই নীরেন্দ্র উদ্‌গ্রীবভাবে ক্যান্তর মুখের দিকে চাহিল। ক্যান্ত জোর করিয়া সমস্ত জড়তা ত্যাগ করিয়া বলিল, "তবে তাই চল, অন্ধকার হয়ে গেছে।"

নীরেন্দ্র উৎসাহের সহিত বলিল, "অন্ধকারই ত ভাল ক্যান্ত পথে কোন লোকই আমাদের চিন্‌তে পারবে না।"

"কিন্তু [illegible] আর যে [illegible] [illegible]জদা বাবু ?"

"[illegible] [illegible]ড়ী থেকে তোমার পরবার শাড়ী আর এ[illegible] [illegible] এনেছি।"—বলিয়াই নীরেন্দ্র বগলের ভিতর হইতে একটা ছোটরকম পুঁটলী বাহির করিল। তাহা দেখিয়া ক্যান্ত বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ক'রে তুমি জানলে, মেজদা বাবু!"

নীরেন্দ্র বলিল, "তোমার মা যখন তোমায় লাঞ্ছনা করতে লাগ্‌লো, বার বার ডুবে মরতে বল্লে, আমি ঐখান থেকেই তোমার মুখের চেহারা দেখে ভেবেছিলুম যে, আর তুমি কখনই ঘরে ফিরে যাবে না, আর এ বদনাম নিয়ে যাওয়াও উচিত নয়, বুঝ্‌লে? অমনি এক মিনিটও অপেক্ষা না ক'রে আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে আমাদের খিড়কী-দোর দিয়ে বাড়ীতে ঢুকে সৌদামিনীর ঘর থেকেই এগুলো নিয়ে এসেছি; এই ভাখ সঙ্গে কত টাকাও এনেছি।"—বলিয়াই নীরেন্দ্র এক তাড়া নোট দেখাইল।

"ও! টাকাও এনেছ? তোমার কি বুদ্ধি, মেজদা বাবু! এ সব কাপড়-চোপড় তা হ'লে তোমার বোনের ?"

"হ্যাঁ, সৌদামিনীর। সে জানবার আগেই আমরা [illegible] দূরে পৌঁছে যাবো। এখন নাও, শীগ্‌গীর ক'রে কাপড় ছেড়ে এই চাদরখানা বেশ ক'রে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে আমার সঙ্গে চ'লে এস. আমি পশ্চিম পাড়ের ঐ অশত্থতলায় দাঁড়িয়ে আছি।" এই বলিয়া পুঁটলিটা তথায় ফেলিয়া দিয়া নীরেন্দ্র চলিয়া গেল।

ক্যান্তও আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিল এবং ভিজা বসনখানিও উত্তমরূপে নিঙড়াইয়া সেখানি চাদরের ভিতর লুকাইয়া লইয়া ত্বরিতপদে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহার পর সাঙ্কেতিক স্থলে উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়া বনানীর ঘন ছায়ার ভিতর দিয়া ষ্টেশনের উদ্দেশে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে ঝিল্লীরব উত্থিত হইয়া নির্জ্জন গ্রামখানিকে যেন সুষুপ্তির গাঢ় তমসায় আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর আকাশে অগণিত নক্ষত্র তখন ঝিক্‌মিক করিতেছিল।

১০

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় মাথায় একখানি চাদর জড়াইয়া, এক হস্তে একটা ভাঙ্গা লণ্ঠনের ভিতর একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া, অপর হস্তে একগাছা বাঁশের মোটা

লাঠি লইয়া, নন্দ জেলে হন-হন করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, দাবার উপর সৌরভ গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, আর তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা ঝরিয়া দুই গণ্ড ভাসাইয়া দিতেছে; এবং [illegible] পুঁটী অকাতরে ঘুমাইতেছে। সন্ধ্যার প্রদীপ পর্য্যন্ত [illegible] নাই।

"কোথাও আমি তাকে খুঁজে পেলুম না, সৈরভ। এখন আর অমন ক'রে কাঁদলে কি হবে বল? তুই নিশ্চয়ই তাকে তাড়িয়ে দিছিস্, আসতে মানা করেছিস্।"

সৌরভ ঝঙ্কার দিয়া উত্তর দিল, "করেছিই ত। তাকে ডুবে মরতে ব'লে এসেছি। সে আবাগী শতেকখোয়ারী আমাদের চোখের ওপর ওমনি করবে, আর আমি চুপ ক'রে থাকবো?"

"মুখটা সাম্‌লে কথা বলিস, সৈরভ। আমি আমার মেয়েকে তোর চেয়ে ভাল চিনি।"

"হ্যাঁ, চিনে চিনেই এতটা কাল তার মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছ!"

"ছ্যাঃ, তোদের মন বড় নোংরা; তোরা মেয়েমানুষগুলো বড় উল্টে কামড় দিস্! সে যখন জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পালিয়ে এসেছিল, তখন তুই-ই ত জোর ক'রে তাকে এখানে রাখতে চেয়েছিলি?"

"হ্যাঁ, চেয়েছিলুম। তখন যে মার খেয়ে মরছেল সেখানে—"

দাঁত-মুখ খিচাইয়া নন্দ বলিল, "তখন যে মার খেয়ে মর্‌ছেল সেখানে, তুই তাই জামাইবাড়ী দেখতে গিছলি?"

"ও মা, সে কি কথা! গা-ময় রক্ত জমাট বেঁধে এই এমন এমন কালশিরে পড়েছিল!"

"ছেল ছেলই। দু' দিন দশ দিন এখানে রেখে আবার তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাঠিয়ে দিতে হয়। তা না ক'রে, সে সব কথা গেরাহ্যি না ক'রে, তাকে সঙ্গে নিয়ে হেথা-সেথা ঘুরে ঘুরে মাছ ধরেই ত এই কাণ্ডটা বাধালি! যদি সত্যিই সে কিছু হয়ে থাকে, তা হ'লে সে তোর দোষেই—"

"আমার আবার দোষটা হ'ল কোন্‌খানে?"

"পথে ঘাটে তাকে বেরুতে দিছ্‌লি কেন? আমার কথা ঠেলে তাকে বাজারে নে যেতিস্ কেন?"

"কৌটর ভেতর তাকে লুকিয়ে রাখবো না কি?"

"তাই রাখতেই হয়, তোরা যে সর্ব্বনেশে জাত। এখন আমি কি করি বল দিকি? তাকে কোন কথা না ব'লে আগে যদি চুপি চুপি এসে আমায় সব জানাতিস্, আমি তোর মতন অমন হৈ-চৈ করতুম না। বেশ ক'রে আগে সব তদন্ত ক'রে তার পর যা-হয় ব্যবস্থা করতুম।"

"তুমি ওই বাবুদের বাড়ী—ওর নাম কি, ওই ঘোষালদের বাড়ী জানতে গেছলে?"

"ওই! আবার একটা মেয়ে বুদ্ধি! আমি তোর বুদ্ধি শুনে বাবুদের বাড়ী গে জিজ্ঞেসা করি আর কি, 'মেজ বাবুর সাথে আমাদের ক্ষ্যান্ত গেছে কি না', কেমন?"

"তাই কি জিজ্ঞেসা করে না কি? বাইরে বাইরে খবর নিতে হয়, সে মুখপোড়া ঘরে আছে কি না—"

"সে কথায় কাণ না দিয়াই নন্দ বলিল, "হরিশপুরের খবর জানিস্?"

সৌরভ জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি হ'ল সেখানে?"

"কে কার মুখে জল দেয়, তার ঠিকেনা নেই। বেয়ান এক বিছানায় প'ড়ে শুসছে, আর জামাই আর এক বিছানায় শুয়ে ধুঁকছে!"

কিয়ৎকাল নীরবে অধোবদনে বসিয়া থাকিয়া সৌরভ বলিতে লাগিল, "আমার মাথাটা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। আহা, কতই না জানি তাদের কষ্ট হচ্ছে! পোড়ারমুখী চলানী চুলোয় গেল, মরতে গেল, এমন অসময়ে তাদের কোন কাযেই লাগ্‌লো না!"

নন্দলাল এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া উঠানে পায়চারী করিতেছিল। হরিশপুরের দুঃসংবাদে তাহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল।

তাহারা স্ত্রী-পুরুষে বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে, যেন উভয়েই পরস্পরের সান্নিধ্য একবারে বিস্মৃত হইয়াই আপনাপন চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া হঠাৎ সৌরভ বলিয়া উঠিল, "ওগো, শুনছো?"

ঈষৎ চমকিতভাবে নন্দ বলিল, "কি?"

"আমি মনে মনে একটা মতলব এতক্ষণ ধ'রে ঠাওরালুম। ঘর-দোর সব বন্ধ ক'রে রাত থাকতেই আমরা দু'জনে হরিশপুর যাই চল।"

"সেখানে গিয়ে কি হবে?"—উদাস দৃষ্টিতে নন্দ সৌরভের দিকে চাহিল।

সৌরভ বলিতে লাগিল, "এমন অসময়ে তাদের মুখে এক ফোঁটা জলও ত দেওয়া হবে। রাত পোয়ালেই চারদিকে ঢি-ঢি প'ড়ে যাবে, পুঁটী তার মাকে খুঁজবে, সে আমি সইতে পারবো না, আমি তা হ'লে গলায় দড়ী দে মরবো। কালামুখীর যা অদেষ্টে আছে, তা হোক্, সে চুলোয় যাক্, গোল্লায় যাক্, আমরা কেন ধর্ম্মে পতিত হই? তবু তাদের অসময়ে কিছু করি গে চল। তার পর দিন কতক সেথা থেকে, এই বুকের কাঁটাটাকে তাদের

কাছে রেখে, চল আমরা দু'জনে নবদ্বীপ চ'লে যাই। এ গাঁয়ে আর মুখ দেখাবো না। কি গো, কথা কও না যে?"

নন্দলালও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিয়া অবশেষে বলিল, "তবে তাই চ' বৌ, আমিও এ গাঁয়ে আর থাকবো না। নবদ্বীপচন্দ্রের মনে যা আছে, তা হোক্।"

এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহারা উভয়ে তখন শীঘ্র শীঘ্র ঘর-দুয়ার সব বন্ধ করিয়া, যাহা কিছু সামান্য পুঁজি-পাটা ছিল, তাহা সঙ্গে লইয়া, হরির তলায় প্রণাম করিয়া, ক্ষ্যান্তর ঘুমন্ত মেয়েটিকে বুকে করিয়া, চোখের জল মুছিতে মুছিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তখন মধ্য-রাত্রি। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, গ্রাম্য পথ একবারেই জনহীন।

১১

নীরেন্দ্র পশ্চিম দিকের মাঠ ভাঙ্গিয়া বরাবর সিধা চলিতেছিল। শীঘ্র রেল-ষ্টেশন যাইতে হইলে ঐ মাঠের উপর দিয়াই যাইতে হয়, নতুবা কিছু বেশী হাঁটিতে হয়। ক্ষ্যান্তদের গ্রাম হইতে রাস্তা ধরিয়া গেলে ষ্টেশন প্রায় চারি ক্রোশ, আর হরিশপুর তিন ক্রোশ, এবং যে পথেই যাক্ না কেন, হরিশপুরের নিকট দিয়া যাইতেই হইবে।

নীরেন্দ্রের ইচ্ছা, সে যত শীঘ্র হরিশপুরের সীমানা ছাড়াইতে পারে, ততই তাহাদের পক্ষে মঙ্গল। কেন না, বিলম্বে ধরা পড়িবার যথেষ্টই সম্ভাবনা। ক্ষ্যান্তও ঘাড় নাড়িয়া নীরেন্দ্রের সে প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছে, সেই জন্য উভয়েই দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। পথে ক্ষ্যান্ত বড় একটা কথা কহে নাই, হুঁ হাঁ দিয়াই বা ইসারা করিয়াই নীরেন্দ্রের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল। সে পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখিয়াছিল যে, যতক্ষণ না ঠিকানায় পৌছিবে, ততক্ষণ নীরেন্দ্রের সহিত সে বেশী কথা কহিবে না। কারণ, এ সকল জানাশোনা পথ, গলার আওয়াজে কেহ হয় ত চিনিয়া ফেলিবে। নীরেন্দ্রের কাছেও এ প্রস্তাব সমীচীন বোধ হইয়াছিল, কাযে কাযেই সেও নিরস্ত ছিল। সে ভাবিতেছিল, যখন আসল বস্তুই এত দিন পরে তাহার হস্তগত হইয়াছে, তখন ভবিষ্যতে কথা কহিবার অনেক অবসর মিলিবে।

ক্রমাগত পথ চলিয়া, বড় বড় তিন চারিটা মাঠ পার হইয়া যখন তাহারা হরিশপুরের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন একবার দিয়াশলাই জ্বালিয়া চট করিয়া নীরেন্দ্র তাহার হাত-ঘড়ীটা দেখিয়া লইল। তখনও দশটা বাজিতে মিনিট কয়েক বাকী আছে। ট্রেণ রাত্রি সাড়ে এগারটার পর, আর মোটে এক ক্রোশ, যথেষ্ট সময় হাতে আছে।

ক্ষ্যান্ত এইবার একটু হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল; দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কত দূর, মেজদা বাবু?" নীরেন্দ্র অতি মোলায়েম কণ্ঠে উত্তর দিল, "আর বেশী নয় ভাই, মেরে দেওয়া গেছে; ঐ যে গোরস্থান আর ভাঙ্গা মস্‌জিদটা দেখা যাচ্ছে, ঐটে হ'ল হরিশপুরের সীমানা। ওর বাঁ দিক দিয়ে সোজা ষ্টেশনের রাস্তা, ডান দিকে গাঁয়ে ঢোকবার পথ।"

ক্ষ্যান্ত মৃদু-কণ্ঠে বলিল, "গেরামখানা শীগ্‌গীর পার হয়ে চল, মেজদা বাবু—"

নীরেন্দ্র বলিল, "কোন ভয় নেই, জেলেনী। যে অন্ধকার, যমেও আমাদের ঠাওর করতে পারবে না।"

"মানুষ যমের চেয়েও নচ্ছার, দাদা বাবু। শ্বশুরবাড়ীর দেশ, কায কি, চ'লে চল—"

ঈষৎ রহস্যের ছলে নীরেন্দ্র বলিল, "দেশটার ওপর মায়া হচ্ছে না কি? আচ্ছা, সেই মূর্খ গোঁয়ার মাতালটার ঘর করতে তোমার ইচ্ছে হয়, ভাই? আমি ত বলি, সে তোমার কড়ে আঙ্গুলের যুগ্যি নয়—"

"তা বটে। তা বিদ্যানও নেই, মুখ্যুও নেই, সবই তুল্যমূল্য! নাও, আর কথা নয়, এখন চল।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে ভগ্ন মস্‌জেদের সমীপে উপস্থিত হইল। তথায় আসিয়াই নীরেন্দ্রর গাটা কেমন ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। অন্ধকার গোরস্থান, তদুপরি পুরাতন জীর্ণ মস্‌জেদ সেটা নামেই মস্‌জেদ, একটা সেকেলে ছয় ইঞ্চি ইটের গাঁথা ছোট গম্বুজের মত। তাহার অর্দ্ধেকটা আবার নোণা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এবং সেই ইষ্টকের স্তূপ বেষ্টন করিয়া বহু প্রাচীন দুইটা বট ও অশথ বৃক্ষ আপনাপন শাখা বিস্তার করিয়া এমন ভাবে পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে যে, অন্ধকারে সহসা দেখিলে মনে হয়, যেন একটা বিশাল কৃষ্ণকায় বিকটাকার দৈত্য পথিকের গন্তব্য পথ আগুলিয়া রহিয়াছে এবং বটবৃক্ষের বহু পুরাতন ঝুরিগুলা ঠিক যেন পর্ব্বতাকার দৈত্যের মাথার মোটা মোটা কালো জটা ভূমি স্পর্শ করিয়া আছে।

সম্মুখে পশ্চাতে জনশূন্য মাঠ। এইখানটাই হরিশপুর গ্রামের প্রান্তভাগ। লোকালয় অর্দ্ধ-মাইল দূরে। গ্রামের অপর প্রান্তে ক্ষুদ্র এক খালের ধারে হরিশপুরের বিখ্যাত চটকল অবস্থিত। সে দিকেই অধিকসংখ্যক লোকের বাস। এ অঞ্চলে বসতি নাই। মস্‌জেদটা মধ্যস্থলে রাখিয়া দুই দিকে দুইটা পাকা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে বাম দিকের পথটাই সিধা

ষ্টেশনাভিমুখে গিয়াছে। সারা পথটাই নির্জ্জন, আলোর চিহ্নমাত্র নাই। গ্রামের অপর দিকের সহিত তুলনা করিলে এ দিক্‌টা যেন পাতালপুরীর মতই বোধ হয়।

গোরস্থানের নিকটে আসিয়াই ভয়ার্ত্তস্বরে ক্ষ্যান্ত বলিয়া উঠিল, "মা গো, কি অন্ধকার! এখানটা যেন কি!"

নীরেন্দ্র কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিল, "ভয় কি, চ'লে এস, দাঁড়ালে কেন? এই যে বাঁয়ে রাস্তা।" নীরেন্দ্রের স্বরও কম্পিত, তাহারও ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। কিন্তু পাছে ক্ষ্যান্ত তাহার দুর্ব্বলতা ধরিয়া ফেলে, সে জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেছিল।

ঠিক সেই সময়েই মাথার উপর অশত্থ ও বটবৃক্ষের ঝোপের ভিতর হইতে ঝটাপট করিয়া একটা শব্দ উত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ডালগুলাও নড়িয়া উঠিল, এবং অতিশয় কর্কশ-কণ্ঠে একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল। ক্ষান্ত অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বাপ রে!"

নীরেন্দ্র কহিল, "ও প্যাঁচা ডাকছে, ভয় নেই, চ'লে এস, দেরী করলে ওদিকে গাড়ী পাবো না, এখনও এক ক্রোশ হাঁটতে হবে।" —বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

নীরেন্দ্রের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই ভগ্ন মসজেদের ভিতর হইতে কেমন এক রকম অনুনাসিক বিকৃত কণ্ঠে ঘং-ঘং-গোঁ-গোঁ শব্দ আসিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই গাছের উপরকার ডাল-পালাগুলা নড়িয়া উঠিল। ক্ষ্যান্ত আর সামলাইতে পারিল না, পড়িতে পড়িতে টাল খাইতে খাইতে কোনওরূপে নিজেকে খাড়া রাখিয়া, ভীতিবিহ্বলস্বরে বলিয়া উঠিল, "ও বাপ রে! ও মেজদা বাবু, ছুটে চল, এখুনি মামদো ভূতে ঘাড় মটকাবে!" বলিয়াই সম্মুখের রাস্তায় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। নীরেন্দ্র খানিকটা অগ্রসর হইয়াছিল, কাযে কাযেই অন্ধকারে আর পিছন না ফিরিয়াই দৌড়িতে দৌড়িতে বলিল, "এস, চ'লে এস, এই যে আমি, ভয় কি?"

তাহাদিগের কণ্ঠস্বর দূরে মিলাইতে না মিলাইতে সেই মসজেদের ভগ্নস্তূপের ভিতরে একটা দিয়াশলায়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিল, এবং সেই ক্ষণিক আলোকের সাহায্যে এক জন অতি বৃদ্ধ-গোছের লোক কষ্টে মুণ্ডটা বাড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিবার চেষ্টা করিল, অবশেষে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া হতাশ-করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ইয়ে আল্লা—একঠো পয়সা ভি কই না দেতে,—" অমনি দারুণ কাসি আসিয়া অর্দ্ধপথেই তাহাকে থামাইয়া দিল, সে হাঁপানি রোগীর ন্যায় গোঁ গোঁ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ ফকিরের বিকৃত কণ্ঠের সেই কাসির শব্দই আমাদের ক্ষ্যান্ত ও নীরেন্দ্রের মনে অকারণ ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল।

১২

মণি হাজরার কাঁচা পয়সার চাকরীটা উপরওয়ালা সাহেবের নিতান্ত করুণায় মাস দুই ছিল, তাহার পর মণির জবাব হইয়া গিয়াছে। প্রায় বৎসরাবধি সে এক প্রকার শয্যাগত। যে শনিবার রাত্রিতে কুসুমের ঘরে আমোদ-প্রমোদ করিয়া পরদিবস প্রভাতে ঘোরতর মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে সে বাড়ী আসিয়াছিল, সেই রবিবার রাত্রি হইতেই তাহার প্রবল জ্বর হইয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এ পর্য্যন্ত আর সে ভাল সারিয়া উঠিতে পারে নাই। এখন ক্রমশঃ হাঁপানির টানের মত এক প্রকার টান ও কাসি অষ্ট প্রহরই লাগিয়া আছে। চেহারাও মলিন ও কঙ্কালসার হইয়াছে!

উপার্জ্জিত অর্থের সঞ্চয় কিছুই ছিল না। মণি হাজরা ছিল এক জন হাত-দরাজ বাবু। কাযেই যৎসামান্য যাহা তাহার ছিল, তাহা সমস্তই পীড়ায় খরচ হইয়া গিয়াছে। বাবুগিরির সময় সে যে সকল সখের দ্রব্যাদি খরিদ করিয়াছিল, সে সকলও বিক্রয় হইয়া গিয়াছে বা বন্ধক দেওয়া আছে।

পুরাপুরি অন্নাভাব এখনও তাহার হয় নাই। তাহার কারণ, নটবর হাজরা নিতান্ত নিঃস্ব ছিল না। নগদ টাকা বেশী রাখিয়া না গেলেও, তাহার জমী-জমা বিস্তর ছিল। বড় পাকা ইমারৎও সে করিয়াছিল। নটবরের মৃত্যুর পরেও তাহার বিধবা কিছুকাল লোকজন রাখিয়া স্বামীর ব্যবসা চালাইয়াছিল। কিন্তু পুত্র বাবু হওয়াবধি সে সকল ক্রমে ক্রমে উঠিয়া গিয়াছিল। বেশীর ভাগ জমী পতিতাবস্থায় থাকিলেও কিছু কিছু ধানজমী ভাগে বিলী করা ছিল বলিয়া বৎসরের চাউলটা নির্ব্বিঘ্নে ঘরে আসে; সুতরাং অন্নের চিন্তা নাই।

কিছুদিন হইতে মণি হাজরার বৃদ্ধা মা'ও জ্বরে পড়িয়াছে। গত বৎসর হইতেই তাহার শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছিল, অল্প অল্প জ্বরও দেখা দিয়াছিল—হাত-পাগুলা একটু একটু ফুলিতেছিল। এ কথা বৃদ্ধা নিজের মুখেই ক্ষ্যান্তকে প্রথমবার আনিতে গিয়া জানাইয়া আসিয়াছিল। নিউমোনিয়ার কবল হইতে কোনও গতিকে রক্ষা পাইয়াও, মণি যখন আর পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল না,—দশ দিন কাযে যায়, আবার পালটিয়া রোগে পড়ে, নিত্য কামাইয়ের দরুণ যখন মনিব মাহিনা কাটে—বকাবকি করে, সে সময়ও মণির মা ক্ষ্যান্তকে আনিবার জন্য পুনরায় গিয়াছিল, কিন্তু তখনও ক্ষ্যান্ত স্বামিগৃহে আসিতে স্বীকৃতা হয় নাই। অবশেষে মণির দ্বারা পত্র লিখাইয়া আরও একবার মাতুকে পাঠানো হইয়াছিল, কিন্তু মাতু মিষ্ট কথায় অনুরোধ না করিয়া জোর

করিয়া ভয় দেখাইয়া ক্যান্তকে আনিবার চেষ্টা করায় তাহাতেও কোনও ফল হয় নাই। মাতু ফিরিয়া আসিয়া ক্যান্তর নামে অনেক কথা শাশুড়ীকে বলিয়াছিল, এমন কি, তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কদর্য্য ইঙ্গিত করিতেও তাহার মুখে বাধে নাই। কিন্তু মাতুর মুখে সে সকল শুনিয়াও ক্যান্তর শাশুড়ী কোনওরূপ প্রতিবাদ করে নাই, বরং হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। বৃদ্ধার ধারণা ছিল, স্বামীর উপর রাগ করিয়াই পুত্রবধূ আসিতে চাহে না, এবং সকল অপরাধই তাহার নিজের পুত্রের। বধূ যতদূর সাধ্য সহ্য করিয়াছিল, যখন আর বরদাস্ত করিতে পারে নাই, তখনই বাপের বাড়ী পলাইয়া গিয়াছিল।

ইদানীং মণি হাজরার মা যখন তখন পুত্রকে গঞ্জনা দিত, মণিও চুপ করিয়া থাকিত। আজকাল সে নিজ অপরাধ ও অনাচারের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। প্রতিবাদের কিছুই তাহার ছিল না। রোগে পড়িয়া তাহার সকল রকম মত্ততাই কাটিয়া গিয়াছিল। দুঃখে পড়িলে অনেকের লুপ্ত বিবেক ফিরিয়া আসে।

শয্যায় পড়িয়া আজকাল সকল সময়েই মণি নিজের লাভ-লোকসান খতাইত। দেখিত, তাহার জীবনের কারবারে সে ষোল আনাই লোকসান করিয়াছে, লাভ সে এক কড়াও করিতে পারে নাই। ভাবিত, একটা দিন-মজুরাণী চামারের মেয়ে কুসুমকে যতটা দিয়াছি, যত যত্ন করিয়াছি, তাহার দশ ভাগের এক ভাগও যদি নিজের স্ত্রীকে দিতাম, একটুও যদি তাহাকে যত্ন করিতাম, কি প্রাণঢালা ভালবাসাই না ফিরিয়া পাইতাম! অমনি মনে হইত, সে ত আমায় ভালবাসিতে বা যত্ন করিতে কোনও দিন ক্রটি করে নাই, আমিই তাহার কোনও মর্য্যাদা রাখি নাই।

অমনই প্রাণের ভিতর তাহার হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিত, —'ওগো, এস এস, আবার ফিরিয়া এস, আমার চিঠি পাইয়াও তুমি আস নাই, আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করিতে পার নাই।' তাহার মনে হইল, তাহাকে রক্ষা করিতে—তাহাকে বাঁচাইবার জন্য সে কত চেষ্টাই না করিয়াছিল। পাছে সে মাতাল হইয়া পড়িয়া কর্ম্মস্থলে হাজিরা দিতে না পারে, সে জন্য কতই না সে তাহাকে বুঝাইত—উপদেশ দিত। এক রবিবারে ক্যান্ত তাহার মদের বোতল লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পাছে পরদিবস মাতাল হইয়া ভোরে সে কাযে যাইতে না পারে। চাওয়া সত্ত্বেও তাহা ফিরাইয়া দেয় নাই বলিয়া সে রাত্রিতে কি শাস্তিটাই না মণি তাহাকে দিয়াছিল। ঐ ছড়িগাছটা পাড়িয়া লইয়া তাহাকে আগাগোড়া কি মারটাই না মারিয়াছিল। যন্ত্রণায় কাঁদিতে পর্য্যন্ত দেয় নাই, মুখে কাপড় বাঁধিয়া তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া বাড়ী হইতে সে চলিয়া গিয়াছিল। সেই ভোরেই ক্যান্ত এখান হইতে পলাইয়া গিয়াছিল। সে রাত্রিতে সে যে আত্মহত্যা করে নাই, তাহাই যথেষ্ট। এই সকল চিন্তাই আজকাল সর্ব্বদা তাহাকে ঘিরিয়া থাকে।

১৩

আজ তাহার জ্বরটা কিছু বেশীরকম হওয়াতে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বৃদ্ধা লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। মণিও অপর শয্যায় শুইয়া নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই চিন্তা করিতেছিল। ঘরের আস্‌বাবপত্র সকলই সমভাবে আছে। কেবল সে সকল অযত্ন-বিন্যস্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক জিনি-ষের উপরই এক ইঞ্চি করিয়া ধূলি জমিয়া আছে।

ক্যান্ত যখন এখানে ছিল, সে সর্ব্বদাই এ সকল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিত। সে নিজেও যেমন সাজিতে গুজিতে ভাল-বাসিত, ঘরের জিনিষগুলাকেও ঘষিয়া মাজিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিত। মণি হাজরা রোজগারের সময় বিলাসিতার সঙ্গে সঙ্গে অনেক গৃহসজ্জা আসবাবপত্রও কিনিয়াছিল, এবং তাহার স্ত্রী ক্যান্তও বাল্যাবধি ভদ্র ও ধনীর সংসর্গে থাকার দরুণ সে সকল মূল্যবান্ বস্তু কেমন ভাবে সাজাইতে হয় বা কিরূপ যত্নের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জানিত। ক্যান্তর আদর্শটা যেমন উচ্চ ছিল, মণি হাজরার পত্নী হইয়া সেই সকল উচ্চ আদর্শগুলাকে কাযে লাগাইবারও সে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মনের মতই শ্বশুরবাড়ী হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মনের মত স্বামী পাইয়াও তাহার কোনও আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই।

আজ শয্যায় পড়িয়া মণি অনেক কথাই ভাবিতেছিল। তাহার ঘুম আর কিছুতেই আসিতেছিল না। তাহার রাত্রির আহার্য্য ঘরের মেঝেয় ঢাকা দেওয়া ছিল। জ্বর আসিবার পূর্ব্বেই মা তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

অনেকক্ষণ এক ভাবে পড়িয়া থাকিয়া মণি উঠিয়া বসিল। ধীরে ধীরে খাট হইতে নামিয়া কুঁজা হইতে এক গ্লাস জল গড়াইয়া পান করিল। তাহার পর একটা চুরুট ধরাইয়া বাহিরের খোলা বারান্দায় অন্যমনস্কভাবে পায়চারী করিতে করিতে তাহা টানিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ঘরের মধ্যে আসিয়া অতিশয় ক্লান্তভাবে খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া মণি ডাকিল, "মা! ঘুমিয়েছ না কি?"

লেপের ভিতর হইতে মুখটা বাহির করিয়া তাহার মা বলিল, "না বাবা, ঘুমুইনি ত। তুই খেয়ে নিলি?"

"না, আজ খেতে তেমন ইচ্ছে হচ্ছে না।" বলিতে বলিতে মণি বুকের উপর ডান হাতখানা চাপিয়া কাসিতে লাগিল। তাহার কাসির বেগটা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে মা কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বুকের ব্যথাটা কি আজ আবার বেড়েছে মণি?" ঠোঁট হইতে অতি গোপনে কোঁচার খুঁটে খানিকটা রক্ত মুছিয়া মণি তাচ্ছীল্যের সহিত বলিল, "নাঃ, তেমনই আছে। সে কথা যাক্ গে।—" তার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মণি বলিল, "তোমারও নিত্যি এই রকম জ্বর হতে লাগলো মা,—তাই ভাবছি, কি যে করি, কার সঙ্গেই বা পরামর্শ করি! কেউ-ই আর এদিকে উঁকি মারে না! ওরা যে সব তত আস্‌তো—"

"তারা সব সুসময়ের বন্ধু বাবা, এখন তুমি বিপদে পড়েছ। হ্যাঁ রে, কেষ্ট, বসন্ত—তারা সবাই সেখানে চাক্‌রী করছে?"

"তা করছে বৈ কি, মা!"

"হ্যাঁ বাবা, এই যে শুনতুম, সায়েব তোকে তত ভালবাসে, তোর তত কথা শোনে, বড়দিনে মেম তোকে আঁজলা ভোরে দেওয়া দেয়, আর ওম্‌নি টপ ক'রে তোকে ছাড়িয়ে দিলে?"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া মণি বলিল, "মা, জুটমিলের চাকরী ঐ রকমই!"

মণির মা বলিল, "ততটা টাকা যে রোজগার করতিস্ বাবা, অসময়ের জন্যে ত কিছুই রাখতিস্ না! এ কি কম দুঃখু! ঐ কথা বলতো বলেই ত বৌমাকে তুই তেমনি করতিস্?"

ক্ষুব্ধ অভিমানের স্বরে মণি বলিল, "তার কথা আর তুলো না, মা!"

"সে কি বাবা, তুলবো না কি বল্? আমার ঘরের লক্ষ্মী গিয়েই ত আজ এই দুরবস্থা! সে আজ ঘরে থাকলে আমি তোকে তার হাতে রেখে অনায়াসে 'তারকনাথে' তোর জন্যে হত্যা দিতে যেতুম, ক'দিন থেকেই মনে আমার তাই গাইছে! কেমন ক'রে তোকে এই অবস্থায় একলা ফেলে যাই, এই হয়েছে আমার বিষম ভাবনা! তা কোনও গতিকে কষ্টে-সৃষ্টে তুইও কেন আমার সঙ্গে 'তারকেশ্বরে' চ' না মণি?"

সে কথায় কাণ না দিয়াই মণি বলিল, "মা, তুমি ত অনেক-বারই তাকে আন্‌তে গিয়ে মান খুইয়ে ফিরে এসেছ, আবার তার নাম করছো?"

"নাম যে করতেই হবে, বাবা। সে যে—"

মা'র কথায় বাধা দিয়া একটু উত্তেজিত স্বরে মণি বলিল, "কেন? কিসের জন্যে? আমায় তেমন ক'রে চিঠি লেখা, তারই কি মান রাখলে? এত বড় যে আমার দুঃসময়,তাই-ই কি সে বুঝলে?"

মণির মা আর কোনও কথা কহিল না, ধীরে ধীরে গায়ের লেপখানা টানিয়া মুখ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল। মণিও অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া তাহার পর যেন কতকটা আত্মগতভাবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "যদিই এক সময় আমি অন্যায় ব্যভার করেই থাকি—"

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই মণির মা লেপের ভিতর হইতে মুখটা বাহির করিয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবা, বড় অন্যায় তুমি করেছ! আহা—"

মা'র কথায় মুখটা খিচাইয়া মণি বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, করেছি, বেশ করেছি—খুব করেছি, সেই-ই যেন তোমার সর্ব্বস্ব!"

মণির এই প্রত্যুত্তরে তাহার মা আর কোনও জবাব না দিয়া একবারে পাশ ফিরিয়া শুইল। মণিও কিয়ৎকাল অধোবদনে বসিয়া থাকিয়া আবার আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "যদি করেই থাকি, তখন ঠিক বুঝতে না পেরে ঝোঁকের মাথায় অন্যায় যদি আমার হয়েই থাকে, তা ব'লে—" বলিতে বলিতে মণি খাট হইতে নামিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে পায়চারী করিতে করিতে সে ঘর হইতে অপর একটা ঘরের মধ্যে গিয়া হাজির হইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াই মণি আবার পায়চারী করিতে লাগিল। ঘরের এক কোণে আলনার উপর একটা আধ-ময়লা সেমিজ আর একখানা লাল চওড়া পেড়ে সাড়ী ঝুলিতে-ছিল। অন্যমনস্কভাবে মণি সেগুলাকে লইয়া বার কয়েক নাড়া-চাড়া করিয়া আবার যথাস্থানে তাহা রাখিয়া দিয়া সে কক্ষ হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে অতি অস্ফুট স্বরে কহিতে লাগিল, "রাগ হ'লে—মাতাল হ'লে ঢের লোক অমন ঢের অন্যায় ব্যভার করে; কিন্তু তাই ব'লে কি চিরকাল তাই থাকে? পুঁটীটাকেও যদি রেখে যেত!"

মণির মা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, মণির দিকে ফিরিয়া বলিল, "তা মণি, তুই নিজে কেন একখানা গাড়ী ক'রে একবার সেখানে যা না? তোকে দেখলে সে কখনই না এসে থাকতে পারবে না।"

মা'র কথায় মণি বলিল, "বিশ্বাস কি মা? তোমাকেই ত সে দু'দুবার অপমান ক'রে ফিরিয়ে দেছে—"

"না বাবা, সে কথা বল্‌তে পারবো না, অপমান সে আমায় করেনি।"

"নাঃ, করেনি! ফিরিয়ে দেওয়াটা অপমান হ'ল না! যাক্ গে, ও কথা ছেড়ে দাও। আমি এই দেহ নিয়ে যাই তার খোসামোদ করতে। সে আমাকে অতি অযোগ্য স্বামী বলেই মনে করে,

তা জান ? তার অহঙ্কার কম না কি ? থাক্, খেয়ে নিই, অনেক রাত হোল, সাড়ে দশটা বেজে গেছে।" এই বলিয়াই মণি খুব তৎপরতার সহিত হাত-মুখ ধুইয়া একখানা আসন পাতিয়া লইয়া খাবারের ঢাকাটা খুলিয়া বসিয়া পড়িল। মণির মা বিছানা হইতেই বলিল, "ঐ আল্‌মারীতে মিষ্টি আছে, আপনি নে বাবা, আমি আজ আর উঠতে পাচ্ছিনে।"

আহার করিতে করিতে মণি বলিল, "না না, তোমায় আর উঠতে হবে না, দরকার হ'লে আমি নিজেই নেব।"

মণির মা বলিল, "তোর যেমন অদেষ্ট, আপন জন থাকতেও বঞ্চিত!"

রাগ করিয়া মণি বলিল, "থাম মা, একশোবার তুমি ঐ একই কথা বলো না, আমি মানা ক'রে দিচ্ছি। অমন করলে আমি এক দিকে চ'লে যাবো।"

সেই সময় সদর-দরজার কড়াটা ঝন্-ঝন্ করিয়া নড়িয়া উঠিল। মণির মা বলিল, "বাইরে বুঝি কে দরজা নাড়ছে, মণি।" আবার কড়া নাড়ার শব্দ হইল। মণি আহার করিতে করিতেই বলিল, "খেয়ে নিয়ে দেখছি। বোধ হয়, বসন্ত সেই আপিসের টাকাটার খবর দিতে এসেছে। ওটা যদি এখন পাই, দিন কতক তবু হাত নাড়া চলে। তা কি পাবো!"

আবার খুব জোরে দরজায় ধাক্কা পড়িল। মণির মা বলিল, "ওরে, বড্ড জোরে দরজা ঠেলছে, শীগ্‌গীর খুলে দিয়ে আয়, বাবা। আমার কাঁপুনি ধরেছে—"

অত্যন্ত বিরক্ত-চিত্তে মণি কহিল, "আঃ, কি জ্বালা! খেতেও দেবে না নাকি!" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি হাতটা ধুইয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া লইয়া সে গজ্‌গজ্ করিতে করিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

দরজা তখনও নড়িতেছে। সদর রাস্তার উপরই দরজা।

অন্দরমহলের প্রাঙ্গণ পার হইয়া সদরে পৌঁছিয়া মণি বলিল, "দাঁড়াও না হে, অত জোরে কপাট নাড়ছো কেন? আমরা কি ম'রে গেছি, শুনতে পাই-নি?" এই বলিয়া রাগতভাবে সে সদর-দরজার খিলটা খুলিয়া দিল।

কপাট খোলা পাইয়াই আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত একটা লোক তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিয়া মণিকে এক রকম ধাক্কা দিয়া সরাইয়া কোনও কথা না কহিয়া পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া তাহাতে খিল আঁটিয়া দিল। তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রুক্ষ স্বরে মণি বলিয়া উঠিল, "কে হে, কে তুমি? ভারী ত অসভ্য দেখছি! কে তুমি, শীগ্‌গীর মুখ খোল—কি মৎলব তোমার?"

"মৎলব এমন কিছু খারাব নয়, বড বাবু।" বলিয়াই তাড়াতাড়ি ক্যান্ত ঘোমটা খুলিয়া মণির সম্মুখে দাঁড়াইল।

অতিরিক্ত আশ্চর্য্য হইয়া মণি বলিল, "এঁ্যা—তুমি! তুমি ক্যান্ত!"

বেশ সহজ সরল কণ্ঠে ক্যান্ত জবাব দিল, "এলুম ব'লে আশ্চর্য্য হচ্ছ? না এসেই বা করি কি বল? আগে জানতুম, 'চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া'—এখন দেখছি, খুব শক্ত লোহার বেড়া ভেঙ্গেও পোড়ারমুখো চোররা চুরি করতে চায়!"

দুই চোখ যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া মণি জিজ্ঞাসা করিল, "সে আবার কি ক্যান্ত? তার পর?" উত্তেজনায় মণির দেহ কাঁপিতেছিল।

ক্যান্ত বলিল, "তুমি স্থির হও। তার পর আবার কি? আমরা জেলে-মালার মেয়ে, অমন মেছো কুমীর দেখা ঢের অভ্যাস আছে। কাযেই নোল্‌কাছি দিয়ে গাঙ পেরিয়ে কুমীরকে কলা দেখালুম!"

"বুঝতে যে পাচ্ছি না, ক্যান্ত, তার মানে?"

"তারও আবার মানে? খুব নোক্ যা হোক্!" তাহার পর চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া ক্যান্ত বলিল, "অনেক দিন তোমার হাতের চাবুক খাইনি কি না, তাই পিঠটা কেমন সুড়-সুড় করছে—"

"ক্যান্ত

"থামো। একবারে অত ভাব-ভালবাসা জানাতে হবে না।"

"আমার ক্যান্ত!—আমার—"

"আবার? ও কি! মুখে তোমার রক্ত কেন?—চল চল, ঘরে শোবে চল, শীগ্‌গীর! বাবা সত্যনারায়ণ!—" বলিতে বলিতে বেপথুমানা পত্নী স্বামীর দেহ নিজ বাহুলতায় বেষ্টন করিয়া ধরিল।

শ্রীশ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গ-সাহিত্যের ভাব-ধারা *

আপনারা আমাকে অদ্য যে সম্মানের আসন প্রদান করিলেন, ইহার জন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ, ইহা বলিলেই যথেষ্ট বলা হইল না। আমার প্রতি আপনাদের এই পক্ষপাতিত্বে যাঁহারা অসন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা সকলেই আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। বহু কৃতী ও যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি-পদ প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে গৌরব কিছুই নাই। যোগ্যতার পুরস্কার ত দিতেই হয়, না দিলে কলঙ্কভাজন ও প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু অযোগ্যকে যে পুরস্কার দেওয়া যায়, তাহা যুগপৎ মহত্ত্ব ও গৌরবের বিষয়। সেই মহত্ত্ব ও গৌরব আজ যথার্থই আপনারা অর্জ্জন করিলেন।

আগ্রা বলিতে আমাদের মনে কত কি ভাব আসে! আগ্রা অর্থে সৌধকিরীটিনী নগরী নহে, সমৃদ্ধিশালী একটি সহর মাত্র বুঝায় না। ইতিহাসের কত কাহিনী ইহার সঙ্গে বিজড়িত আছে, মোগল সম্রাটের তীক্ষ্ণ রাজনীতি-বুদ্ধি-বিদ্ধ অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা ও ঔদার্য্য মিশ্রিত আছে, সম্রাটের দক্ষিণ ও বাম হস্তস্বরূপ হিন্দু-মুসলমানের অদ্ভুত কার্য্য-দক্ষতা ও বাহুবলের কত অতীত কথা গ্রথিত আছে, কাব্য-কলার অফুরন্ত উৎসস্বরূপ মমতাজের স্মৃতি-সৌধমালা যমুনার নীলজলে শত-শ্বেতশতদলের ছায়া-সমন্বিত শান্তিতে তন্দ্রালস জড়িমায় বিভোর হইয়া আছে! কতবার এই প্রসিদ্ধ তাজমহল দেখিয়াছি; কিন্তু শিল্পীর এ কি অপূর্ব্ব কলা-কৌশল যে, যতবারই দেখি, নয়নের রূপতৃষা মিটে না! বাস্তব ও আদর্শের এমন অপরূপ নিবিড় সম্মিলন জগতে বুঝি আর হয় নাই। মনে হয়, যেন কোনও যাদুকরের সম্মোহন মন্ত্রে অকস্মাৎ শিল্পীর মানসী প্রতিমা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক দৈব মুহূর্ত্তে তাহাকে বর দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল। মনে হয়, তখন সে শুভ মুহূর্ত্তে শুক্লা একাদশীর চাঁদ গগন-কিনারে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, যমুনার নীলিমায় তরঙ্গভঙ্গ স্থগিত হইয়াছিল, আর মলয়-বাতাসের শেষ শ্বাসটুকু উদারা মুদারা তারার সমস্তগুলি পর্দ্দায় ঝঙ্কার দিয়া মিলাইয়া গিয়াছিল। নীল আকাশে শুধু দুই একটি তারা জাগিয়া ছিল, আর জাগিয়া ছিল তাহারই মধ্যে প্রিয়বিরহী সম্রাট্ শাজাহানের স্মৃতির পরশটুকু। মার্ব্বেল-নির্ম্মিত তাজ, অথচ প্রস্তরের কঠিনতা নাই; স্মৃতির মূর্চ্ছনার মতই কোমল—তাজ। কত ব্যথা, কত অশ্রু, কত দীর্ঘশ্বাস তাজকে অবয়ব দান করিয়াছে। সম্রাটের জমাট-বাঁধা অশ্রুরাশি যেন কাল-ক্রমে স্ফটিকে পরিণত হইয়াছে। প্রিয়ার জন্য প্রিয়তমের স্বচ্ছ শুভ্র পবিত্র প্রেম মরণকে উপেক্ষা করিয়া চিরসুন্দররূপে বিরাজ করিতেছে!

এই অনিন্দ্যসুন্দরী স্বপ্নময়ী মর্ম্মরকীর্ত্তির পাদপীঠতলে দাঁড়াইয়া সাহিত্য-রসে যাহার মন আপ্লুত হয় না, তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য কে আছে? সুতরাং আজকার এই সাহিত্য-সম্মিলনে কাহাকেও কষ্ট করিয়া সেই রসের উদ্বোধন করিতে হইবে না। নির্ঝরিণী যেখানে স্বচ্ছন্দ সলিল-প্রবাহের চির-বিরামহীন ধারা বহাইয়াছে, সেখানে কূপ খনন করিবার প্রয়াসে কি প্রয়োজন?

সাহিত্য রসের ভাণ্ডার। রস অর্থ—যাহা আস্বাদন করা যায়। রস্যতে আস্বাদ্যতে অসৌ। সাহিত্য কথাটির মূল কি, তাহা আমি জানি না। তবে 'সহিত' হইতে যে ইহা আসিয়াছে, ইহা নিশ্চিত। ধাত্বর্থ হইতে পাওয়া যায়, সাহিত্য অর্থে সম্মিলন বা সাধুভাষায় সম্মেলন। কিন্তু কিসের সম্মেলন? মানুষের পরস্পর সম্মেলন হইতে যদি এই কথাটির জন্ম হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হয় যে, একাধিক ব্যক্তি সমবেতভাবে যাহা উপভোগ করিতে পারে, তাহাই সাহিত্য। উপভোগ বা আস্বাদন করিতে হইলে চাই রস। সুতরাং সাহিত্য রসের বস্তু, এ সম্বন্ধে ভুল নাই। একটু ঘুরাইয়া বলিলে বলা যায় যে, সাহিত্য ভাব ও ভাষার সম্মেলন। ভাব যেখানে ভাষার 'সহিত' নিবিড়ভাবে সম্মিলিত হয়, সেখানেই সাহিত্যের জন্ম। ভাব কথাটিকে তলাইয়া বুঝিলে সেই রসেরই কাছে পৌঁছিতে পারা যায়। মনের স্থির সমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠে, যে কল্লোল ছুটে, তাহাই ভাব। মানুষের যত ব্যথা-বেদনা, যত মান-অভিমান, যত অনুভূতি-অনুমান সবই এই ভাবের খেলা। যাহা এই

---

* প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নবম (আগ্রা) অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

ভাবকে প্রেরণা দেয়, তাহার নাম রস। চিত্ত-সমুদ্রে যখন রসের বাতাস বহে, তখনই তাহাতে ভাবতরঙ্গ উত্থিত হয়। নহিলে চিত্ত শান্ত, সমাহিত, নিস্তরঙ্গভাবে অবস্থিতি করে।

রসের সহিত ভাবের এই নিবিড় সম্বন্ধ আমরা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি, যখন আমরা স্মরণ করি যে, সাহিত্যের জন্ম কবিতায়। কবিতা ও কাব্য রসের প্রথম ও প্রধানতম আশ্রয়। ভাব যখন ভাষাকে রসের পাকে ফেলিয়া আবর্ত্তন করে, তখনই তাহাতে কাব্যের জন্ম হয়। কাব্যের পরিণতিতে যেমন রসের দানা বাঁধে, এমন আর কিছুতেই নহে। এই যে রসের দানা (crystals) বাঁধে কাব্যে, ইহা সময়ে সময়ে হীরকদ্যুতিতে জগৎ উজ্জ্বল করে। কালিদাসের কুমারসম্ভব, মাইকেলের মেঘনাদ-বধ, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা, এগুলি রসের হীরকসন্নিভ ক্রিষ্টাল।

কবিতার খেলাঘরের মধ্যে সাহিত্যের শৈশব কাটিলেও, কৈশোরে ও যৌবনে সাহিত্যকে নানাক্ষেত্রে রসের অনুসন্ধান করিতে হয়। তখন সাহিত্যের ক্ষেত্র আর সীমাবদ্ধ থাকিতে চাহে না। মানুষের প্রয়োজনের পরিধি যখন বিস্তৃত হয়, তখন শুধু রসসৃষ্টি লইয়া সাহিত্য তুষ্ট থাকিতে পারে না। আমরা যে দিকে চিন্তার জাল বিস্তার করি, যে দিকে আমাদের জ্ঞানদৃষ্টি যায়, সাহিত্য সেই দিকে নূতন নূতন রাজ্যের বার্ত্তা বহন করে। সাহিত্য তখন বিজ্ঞান, জ্যোতিষ,আয়ুর্ব্বেদ, পশুপালন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লয়। সুতরাং সাহিত্য সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের সম্মেলন বা মিলন-ক্ষেত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ইহার পরিধি বিস্তৃত। সেই জন্য আমরা বলি, ঐতিহাসিক সাহিত্য, পৌরাণিক সাহিত্য, দার্শনিক সাহিত্য ইত্যাদি। বিশিষ্টীকরণ বা Specialisation অনেক পরের কথা। সাহিত্যের বিপুল অবয়ব ছেদ করিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। এই বিশিষ্টীকরণ সব দিকে সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়। কেন না, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, কাব্য, উপন্যাস ইহার এক একটি এরূপ বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে যে, ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে আবার বিশিষ্টীকরণের প্রয়োজন হইতেছে। ইতিহাসের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া প্রাচীন, মাধ্যযুগিক ও আধুনিক—এই বিভাগ করিতে হইয়াছে। এইরূপ বিজ্ঞানে আলোকবিজ্ঞান, তাপবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, তড়িতবিজ্ঞান প্রভৃতি শাখা-বিভাগ স্বীকার করা হইয়াছে।

চিন্তার ধারা একটি—সত্য, কিন্তু ভাবের উপলখণ্ডে আহত হইয়া ইহা শত ধারায় প্রবাহিত হয়। এইরূপ শত ধারায় যখন চিত্তের উৎস ছুটে, তখন নায়াগ্রার জলপ্রপাতের মত ইহারও জীমূতমন্দ্র গর্জ্জনে বিশ্বজগৎ স্তম্ভিত হয়। সেই বিখ্যাত জলপ্রপাতে যেমন ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণ প্রতিফলিত হয়, মানবের ভাবপ্রবাহেও সেইরূপ প্রতিভার নানা সুষমাময় বর্ণ-বৈচিত্র্য আবির্ভূত হয়। ভাবের ধারা ব্যাহত হইলে বা কোনও একটি নালিকায় চালিত হইলে, চিত্তের প্রসার রুদ্ধ হইয়া যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হয়। ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, বাঙ্গালা সাহিত্য অনতিদীর্ঘকালে পৃথিবীর জ্ঞান-মণ্ডপে একটি সম্মানজনক আসন লাভ করিয়াছে। ভাবপ্রকাশের পক্ষে যে সাহিত্য যত উপযোগী, সে সাহিত্য তত উন্নত। আমরা এই মাপকাঠি লইয়া যখন আমাদের সাহিত্যের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন দেখি যে, আমরা যতই গৌরব করি না কেন, আমাদের সাহিত্য বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে, এ কথা আমরা কখনই বলিতে পারি না। ইংরাজী ভাষার পাষাণ চাপের নিম্নে বাঙ্গালা ভাষা যাহা করিয়াছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে, সত্য; কিন্তু সে গৌরব করিতে করিতে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, এখনও দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিবার আছে। এখনও আমাদের সাহিত্য বিশ্বের সাহিত্যের হিসাবে যে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমাদের সাহিত্য কবিতা ও উপন্যাসে ভরপুর। আমরা বাঙ্গালী কথা, কাহিনী ও কল্পনা ভালবাসি। সংস্কৃত সাহিত্যের আমল হইতে আমাদের এই কল্পনা-প্রিয়তা দেখা যায়। উপনিষদে পর্য্যন্ত গল্পের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কথা-সরিৎসাগর কথা-সাহিত্যের অপূর্ব্ব অবদান। বৌদ্ধ সাহিত্যেও কথা-সাহিত্য অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। বৌদ্ধ জাতকগুলি শুধু গল্পের সমষ্টি নহে; বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত এই গল্পগুলির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। রায়

সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মূল পালি হইতে এই জাতকগুলি অনুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। পুরাণ ও উপপুরাণগুলি আমাদের গল্পপ্রিয়তার অভ্রান্ত নিদর্শন।

কবিতা সম্বন্ধেও আমাদের কিছুমাত্র ঔদাসীন্য দেখা যায় না। সেই কোন্ দিন তমসার তীরে নিষাদ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চমিথুনের একটি হত হইলে ঋষি-কবির হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া শ্লোক বা কবিতার রুদ্ধ প্রস্রবণ মুক্ত করিয়া দিল, তার পরে যুগযুগান্ত অতীত হইয়াছে, কিন্তু কবিতার স্রোতস্বতী চিরন্তন প্রবাহে চলিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য ত কবিতার ছন্দোময়ী গতিতে নৃত্যশীল। ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের ভেষজ-প্রস্তুত-প্রণালী পর্য্যন্ত কবিতার ছন্দে নন্দিত। বেদে, নাটকে, পঞ্চতন্ত্রে কখনও কখনও কবিতার মোহ কাটাইতে পারিলেও, দেখা যায়, যখনই কোনও সারবান্ ভাবের অবতারণা হইতেছে, তখনই কবিতার আশ্রয়-গ্রহণ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে যে গীতি-কবিতার যুগ আরব্ধ হইল, আজিও তাহা চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে মহাকাব্যের তূর্য্য-নিনাদ শোনা গেলেও তাহা গীতি-কবিতার মুরলী-ধ্বনিতে মিলাইয়া গিয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয়, তাঁহার অমর কাব্যের পরে ব্রজাঙ্গনার শরণ লইয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিতা, গীতি-কবিতার এক বিরাট পর্ব্ব। শ্রীকৃষ্ণলীলা যে কত কবির কল্পনা-সুন্দরীকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। এত বড় কাব্য-সাহিত্য পৃথিবীর আর কোনও জাতির আছে কি না সন্দেহ। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় বিংশ সহস্রের কম হইবে না। আমাদের বাঙ্গালীর বড় গৌরবের কবি রবীন্দ্রনাথ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া গীতি-কবিতার মধুরসে আমাদের চিত্ত-মধুব্রতকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। রবির চতুষ্পার্শ্বে কত যে ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহ উদিত হইয়া কাব্যাকাশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা কে করিবে? বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের উদীয়মান কবি পর্য্যন্ত সকলেই কল্পনার ছায়াপথে বিচরণশীল।

আমরা যে কল্পনাবিলাসী, তাহা আমাদের কবিতা ও উপন্যাসের শ্রীবৃদ্ধি হইতে বুঝিতে পারা যায়। কবিতা বা উপন্যাস যে মন্দ, তাহা বলিতেছি না। তবে বাস্তবরাজ্যের সহিত সম্পর্ক ছাড়িয়া দিলেই বা সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে কিরূপে? বাঙ্গালা সাহিত্যকে সর্ব্বতোভাবে পরিপুষ্ট না দেখিতে পাইলে আমাদের মন তৃপ্ত হয় না। সে দিন এক জন য়ুরোপীয় মহিলা আমার নিকটে উচ্চশিক্ষার উপযোগী কয়েকখানি ভূগোল ও ইতিহাসের নাম জানিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি নাই। এইরূপ পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, রসায়ন, বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও আমাদের দৈন্য স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। আমি যখন কোনও পুস্তকাগারে গিয়া বসি এবং সোনার জলে লেখা নয়নসুখকর প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি আলমারীতে পাশাপাশি সজ্জিত দেখিতে পাই, তখন আমার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আমি ভাবি, কবে বঙ্গ-সাহিত্যের সেই সুদিন আসিবে, যে দিন তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে বাঙ্গালা বই এমনই গর্ব্বভরে আলমারীতে ঝলমল করিবে। আমাদের পরম প্রিয়তম প্রবাসী কবি গাহিয়াছেন—

> মোদের গরব মোদের আশা
> আমাদের বাঙ্গালা ভাষা।

কবে সে আশা পূর্ণ হইবে, কবে গর্ব্ব করিয়া বড় বড় বাঙ্গালা বই হাতে লইয়া আমরা অর্থনীতি, সমাজনীতি, বস্তুবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় অধিগত করিতে পারিব! আমাদের এই দৈন্য যে শুধু কল্পনা-প্রবণতার জন্য, তাহা নাও হইতে পারে। ইংরাজী ভাষায় সমস্ত গম্ভীর ও জটিল বিষয়ের বই পাওয়া যায় এবং আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষভাবে জ্ঞান-পিপাসু, তাঁহাদের সকলেরই ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত আছে বলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সমস্ত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হইলে পাঠক পাওয়াও কঠিন ছিল। আমার মনে হয়, এই অসুবিধা ক্রমশঃ বিদূরিত হইতেছে। এখন পাঠকসংখ্যা বাড়িতেছে এবং আমার বোধ হয়, এরূপ পাঠকই এখন অধিক, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থ পাইলে জ্ঞানার্জ্জনের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদিগকে এখন আর অবহেলা করিলে চলিবে না। তবে পাঠকের সদ্ভাব হইলেই যে গ্রন্থকার তখনই উদ্ভূত হইবেন,

এমন কোনও কথা নাই। বঙ্কিম বাবু যখন উপন্যাস রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কি তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার রচিত গ্রন্থ অচিরকালে লক্ষ লক্ষ লোকের পাঠস্পৃহা চরিতার্থ করিবে? রবীন্দ্রনাথ যখন একখানির পর একখানি করিয়া কবিতার পুস্তক মুদ্রিত করিতেছিলেন, তখন কি তিনি জানিতেন যে, অচিরে এমন দিন আসিবে যে, কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহার গ্রন্থের আস্বাদন করিতে বিরত থাকিবে না? মোহিত বাবু যখন রবি বাবুর কাব্যগ্রন্থের একখানি অতি সুন্দর ও মূল্যবান্ সংস্করণ বাহির করেন, তখনও সেগুলির ভবিষ্যৎ কীটরাই নির্ণয় করিবে বা মানবে, তাহা নিশ্চিত ছিল না। তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই যে, তাঁহারই প্রবর্ত্তিত পন্থা অনুসরণ করিয়া রবি-কবির আরও কত মূল্যবান্ (টাকা হিসাবে) সংস্করণ বাহির হইয়াছে এবং সে সকলের গ্রাহকের অভাব নাই। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় যে, গ্রন্থকারের আবির্ভাব যে পাঠকের উপর নির্ভর করে, তাহা নহে। পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধিও গ্রন্থকারের উপর নির্ভর করে। সুনিপুণ শিল্পী যেমন জনগণের রুচিবিকাশে সহায়তা করেন, প্রতিভাবান্ গ্রন্থকারও তেমনই জ্ঞানপিপাসা সৃষ্টি করিয়া তাহা চরিতার্থ করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

রুচির কথা বলিতে গিয়া মনে পড়িল, আজকালকার উপন্যাস-সাহিত্যের কথা। আজ সভ্যতার ইতিহাসে আমরা এক অতি নূতন অধ্যায়ের সহিত পরিচিত হইতে বসিয়াছি সত্য। অনেক বিষয়ে এ অধ্যায়টি আমাদের অতীত সংস্কারজালকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান আদর্শ অতীত আদর্শকে গলা টিপিয়া বিদায় করিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে। নিত্যনূতন আবিষ্কারে আমাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। আমি বাল্যকালে যখন কলিকাতায় পড়িতে আসিতাম, তখন বিদ্যুতের আলোক দেখিবার জন্য কতবার গাড়ী ভাড়া করিয়া ইডেন গার্ডেনে ছুটিয়াছি! বেলুন দেখিতে গড়ের মাঠে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। দু'চারটি লোক সেই ভীড়ে খুন-জখম পর্য্যন্ত হইয়াছে। আর আজ! চারিদিকে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে! আমরা এই সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানাইয়া, ছন্দরক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছি না। তার উপরে টান পড়িতেছে আমাদের চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য্য লইয়া। সহস্র সহস্র বৎসরের সভ্যতার ইতিহাস চিত্তবৃত্তির সামঞ্জস্যমূলক সংস্কার গঠন করিয়া দিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসরের প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া একটি জাতির চিত্তবৃত্তি সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। সে সকল প্রতিষ্ঠানকে ধাক্কা দিলে চিত্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে, সংসারযাত্রা কোনও রূপে চলে না। তাই আহিতাগ্নিক ব্রাহ্মণ যেমন আজীবন অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিতে চেষ্টা করেন, আমরাও তেমনই সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলি জড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিতে চাহি। ভালমন্দের বিচার এইরূপ একটি প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। যাহা ভাল, যাহা সৎ, তাহা আমাদের অসন্দিগ্ধ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। যাহা মন্দ, তাহা হেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। যে সাহিত্য এই ভাল-মন্দের বিচারবুদ্ধিকে বিধ্বস্ত-বিপর্য্যস্ত করিয়া একাকার করিয়া তুলিতে চাহে, সে বিপ্লবী সাহিত্য সমাজের ঘোর অনিষ্ট করে। মানবজাতি কত দিন বিবাহ-প্রতিষ্ঠানকে বরণ করিয়াছে, তাহা জানা যায় না। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের উপর সমাজের ভিত্তি প্রোথিত। যে সাহিত্য সেই প্রতিষ্ঠানকে হেলায় লাঞ্ছিত, পদদলিত করিতে উদ্যত হয়, তাহা সাহিত্য নহে, সাহিত্যের ব্যভিচারমাত্র। আজকাল নানা গ্রন্থে এইরূপ বিপ্লবের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বাস্তবতার নামে বিকাইতেছে, কিন্তু ইহা বাস্তবতা নহে, বিভীষিকা। বিকারের ঘোরে যাহা বাস্তব বলিয়া মনে হয়, তাহা যদি সত্য হয়, তবে এই অনাচারদুষ্ট সাহিত্যও বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য হইতে পারে। বিবাহের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়া, ভালমন্দের ভেদ তুলিয়া দিয়া, ন্যায় অন্যায়ের বিবেক বর্জ্জন করিয়া কি বিষবৃক্ষের চাষ করা হইতেছে, তাহা অচিরে আমরা বুঝিতে পারিব। আমি শুনিয়াছি, নারীত্বের অধিকারের নামে অনেক রমণী সতীত্বে জলাঞ্জলি দেওয়া দোষের মনে করেন না। সতীত্ব যদি কথার কথা হয়, সুবিধা বা প্রয়োজনমত যদি উহা উপেক্ষা করা চলে, তবে গৃহের পবিত্রতা রক্ষিত হইবে কি করিয়া? নারীত্ব বা জননীত্বের মর্য্যাদাই বা কেমন করিয়া থাকিবে? নারীত্বের মর্য্যাদা না থাকিলে সংসার থাকে না, সংসার না থাকিলে সমাজ থাকে না। কি এক অস্বাভাবিক কুৎসিত অপ্রকৃত উত্তেজনাময়ী মনোবৃত্তির ফলে যে এই সাহিত্য জন্মলাভ করিতেছে এবং জন্মলাভ করিয়া তাহা

অত্যল্প সময়মধ্যে বহু ব্যাপ্ত হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়!

জগতের যত কাব্য-কবিতা, যত শিল্প-কল্পনা, তাহাদের মুখ্য অবলম্বন—প্রেম। মনুষ্যজীবনে প্রেমের ন্যায় এমন মধুর আর কিছুই নাই। সৃষ্টির মধ্যে জীবন চমৎকারিত্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। জীবনে আবার প্রেমই পরম রমণীয় বস্তু। প্রেম ও কাম—বড়ই কাছাকাছি। প্রেম স্বচ্ছ, কাম মলিন। প্রেম অফুরন্ত মধু, কাম জ্বালাময়ী মদিরা। প্রেম সুন্দর, কাম কুৎসিত। মনোবৃত্তি হিসাবে দুইয়েরই আধিপত্য জীবনে বর্ত্তমান। বিশ্লেষণ দুইয়েরই করা যাইতে পারে সাহিত্যে। কিন্তু একের মন্থনে উঠে অমৃত, অপরের মন্থনে উঠে হলাহল। যাঁহারা উপন্যাসে বা কাব্যে মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়া মানুষের কদর্য্য দিক্‌টার আবরণ উন্মোচন করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা মানব-চরিত্রের মাধুর্য্য আস্বাদনে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। তাঁহারা যাহা খুসী করিতে পারেন বটে, কিন্তু সমাজ ও সাহিত্য তাঁহাদের বিকৃত রুচির প্রভাবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, মানুষের মন তরল। তরল পদার্থ যেমন পাত্রের আকারে আকারপ্রাপ্ত হয়, মানুষের মনও তেমনই যে ভাব-বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত, সেই আকার লাভ করে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য। সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য-গৌরবে যে ভাববেষ্টনী গড়িয়া উঠে, তাহার মধ্যে অবস্থিত মন সেই সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য-গৌরবে বিকসিত হয়। পক্ষান্তরে, কুৎসিত কদর্য্য কলুষিত বেষ্টনীর মধ্যে যাহার জন্ম, সে পরিণামে তাহারই উপযোগী হইয়া দাঁড়ায়। অমৃত-হ্রদে পড়িলে মক্ষিকাও মিষ্ট হয়।

আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে যে ভাব-সম্পদ্ পাইয়াছি, একবার তাহার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব, আমরা কোথা হইতে কোথায় চলিয়াছি। আমরা যে ভাব-বেষ্টনীর মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছি, তাহা গৌরব করিবার মত। চিন্তা করুন সেই প্রাচীনকালের কথা, যে সময়ে আমাদের ধ্যানপ্রণতচিত্ত ঋষিগণ উদাত্ত স্বরে উপনিষদের বাণী প্রচার করিয়া আকাশ-বাতাস স্তম্ভিত করিয়াছেলেন। এমন বাণী আর কেহ কোনও দেশে শুনে নাই। দেশে বিদেশে আজিও সেই বাণী বিদ্বৎকুলচূড়ামণিগের সম্ভ্রম বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। বৌদ্ধ জাতকের ও হিতোপদেশের মত কথা-সাহিত্য আর কোন্ দেশে হইয়াছে? ভাস-কালিদাস-মাঘ-ভবভূতির তুলনা একালে সেকালে কোনও কালে মিলে কি? আমাদের পুরাণ সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান অধ্যাত্ম-দর্শনের অকূল পারাবার। অন্য কোনও জাতির মধ্যে এমন একাধারে কাব্য-ইতিহাস-নীতিপূর্ণ বিপুল সাহিত্য আছে কি? রামায়ণ-মহাভারতের মত গ্রন্থ অন্য কোনও জাতির সাহিত্যে পাওয়া যায়? অতি অদ্ভুত মনে হয়। মনে হয়, যেন এই দেশ এবং এই জাতি বিধাতার বিশেষ কৃপালাভ করিয়াছিল। তাহা না হইলে এমনটি হইতে পারিত না।

এই সকল সাহিত্যসম্পদ্ আপনাদের স্মরণপথে আনিয়া দিবার চেষ্টা যে শুধু অতীত লইয়া গৌরব করিবার জন্য, তাহা নহে। আমি জানি, অতীতের গৌরব আঁকড়াইয়া ধরিয়া বর্ত্তমানকে বিসর্জ্জন দেওয়া কোনও ক্রমেই অনুমোদিত হইতে পারে না। আবার বর্ত্তমানকে আলিঙ্গন করিয়া অতীতকে তুচ্ছ করাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমানের দৈন্যকে অতীতের গৌরবে ঢাকিতে চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। বরং সেই গৌরবের উজ্জ্বল আলোকে বর্ত্তমান দৈন্য আত্মপ্রকাশ করে শতগুণ নগ্নভাবে। আমার বক্তব্য এই যে, অতীতের ইতিহাস বর্ত্তমানের পথিপ্রদর্শক। কঃ পন্থা? এই প্রশ্ন মনে হইলেই স্বতঃই ভাবিতে ইচ্ছা করে, কুতঃ আয়াতঃ? কোথা হইতে আসিলে? আমরা যে পথ অতিবাহিত করিয়া আসিলাম, তাহা হইতে কি সম্মুখে অগ্রসর হইবার পথের কোনও সন্ধানই পাইতে পারি না? যে পথে চলিয়া এককালে সিদ্ধির চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছি, সে পথ কি একটি অন্ধ গলি মাত্র? তাহা কখনই হইতে পারে না। আমাদের জাতির স্বভাবজ প্রতিভা ঐ অতীত সাহিত্যে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা সে সাহিত্যের ইঙ্গিত যদি ভাল করিয়া বুঝিতে না পারি, তবে আমরা বিশ্বের হাটে হট্টগোলের মধ্যে পড়িয়া যাইব, ইহা নিশ্চিত।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যাহাই হউক, আমাদের সাহিত্য কিন্তু প্রদীপ-হস্তে ব্রতচারিণী গৈরিকবসনা ধাত্রীর ন্যায় মন্দিরের আঁধার কক্ষে পথ দেখাইবার জন্য সর্ব্বদাই পশ্চাতে ফিরিতেছে। কিন্তু আমরা মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া যদি পার্শ্বের পয়োনালার মধ্যে পতিত হই, সে আমাদেরই অদৃষ্টের দোষ ব্যতীত আর কি বলিব? যাহা

আছে, তাহাই থাকিবে, কেন না, তাহার প্রাণশক্তি আছে। আর উত্তেজনার বশে যাহা হঠাৎ আবির্ভূত হয়, তাহা তুবড়ির মত নিঃশেষে জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবেই। যে সাহিত্য এত দিন টিকিয়া আছে, তাহার জীবন কোন অদৃশ্য সোণার কৌটায় রক্ষিত আছে, তাহা প্রণিধানের বিষয় নহে কি? এই মর-জগতে অনিত্য নশ্বর পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতেই আমরা ব্যস্ত। দু'দিনের সম্বন্ধ দু'দিনেই চুকিয়া যায়। কিন্তু যাহা নিত্য শাশ্বত সনাতন, তাহা এমন শীঘ্র মিলাইয়া যায় না। আমাদের সাহিত্যের মধ্যে এই সন্ধানটুকু বোধ হয় পাওয়া যায় যে, যাহা অবিনশ্বর সত্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাই আছে জীবন্ত। আর যত কিছু সব বুদ্‌বুদের মত দুদণ্ডের হাসি-কান্না লইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত কোন্ সাহিত্য-পুস্তকের প্রতিষ্ঠা? ভগবদ্‌গীতা। বাঙ্গালীই হই আর আসামীই হই, গুজরাটী হই আর মারহাটী হই, আমাদের বক্ষের ধন ভগবদ্‌গীতা, শিক্ষার বাহন রামায়ণ-মহাভারত, আদরের সামগ্রী চৈতন্য-চরিতামৃত। এমনভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে আর কয়খানি গ্রন্থ? মহাকবি কালিদাস এই সত্য বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার অমর কাব্য কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শকুন্তলা। মানবের মর্ত্ত্যভূমির অনেক উর্দ্ধে দেবতা বা নরদেবতার লীলা লইয়া তাঁহাদের কল্পনা বিচিত্র বিলাস করিয়াছিল। দেবতার লীলায় মানবতার কারুণ্য ও কোমলতা সঞ্চার করিয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিলেন মহাকবি। মনে করুন সেই দৃশ্য—যেখানে উমা পদ্মের বীজের মালা গাঁথিয়া ধ্যানস্থ মহাদেবের পদাঙ্গুষ্ঠে ললাট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন! কি সুন্দর! কি মানবিক মধুরতা দেবতার লীলায়! উত্তররাম-চরিতের আলেখ্যদর্শনে ভবভূতি কি অপার্থিব কোমলতা ও করুণা সঞ্চার করিয়াছেন! মহাকবি তুলসীদাসের রামচরিত-মানস অমরতা লাভ করিয়াছে শুধু কবিত্বে নহে, দেবত্বের চিত্রে; আধ্যাত্মিকতার বিকাশে। পরা ভক্তির চিরন্তনী মূর্ত্তি বক্ষে ধরিয়া সে কাব্য অমর হইয়াছে। আগ্রা হইতে বেশী দূরে নয়, সুরদাস যে অমর সঙ্গীতের সৃষ্টি করিলেন, তাহা পার্থিব কোনও আখ্যান লইয়া রচিত নহে। নিখিল রসামৃতসিন্ধু সর্ব্বকালোপভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের লীলা তাঁহার সুরসাগরকে অমর মাধুর্য্য দান করিল। আপনারা হ[illegible] ত বিদ্যাসুন্দরের নাম করিলে অনেকে চমকিয়া উঠিবেন, কি[illegible] স্মরণ করুন, অমন চটুল রসের কাব্যও স্বাধীনভাবে সাহিত্যে[illegible] স্থান পায় নাই। রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্গ[illegible] বিদ্যাসুন্দর। পাছে রুচির অসঙ্গতি-দোষে তাঁহার সাধে[illegible] কাব্যখানি পরিবর্জ্জিত হয়, এই জন্য তিনি তাঁহার অন্নদা[illegible] মঙ্গলের সঙ্গে ইহাকে বুনিয়া দিয়াছেন; পরমার্থের সঙ্গে[illegible] ইহাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। আধ্যাত্মিকতার বাতাস পাই[illegible] ইহা আজিও জীবিত আছে। বৈষ্ণব কবিরা যখন নির্জ্জ[illegible] কুটীরে বা বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া ভজন-সাধনের অন্তরালে লীল[illegible] রস আস্বাদন করিতেন, তখন তাঁহারা জনসাধারণের ক[illegible] ভাবিতেন না। মুদ্রাযন্ত্র তখন পুস্তকের সংস্করণের পর সংস্কর[illegible] জলস্রোতের মত বাহির করিয়া দিবার জন্য আবির্ভূত হ[illegible] নাই। সংবাদপত্র দেশ-বিদেশে তাহার ঢাক পিটাই[illegible] দিবার আয়োজনে তখনও নিযুক্ত হয় নাই। তথাপি সে[illegible] তালপত্রের কীটদষ্ট কালজীর্ণ অস্তিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করি[illegible] তাহারা কিসের জোরে? অবিনশ্বর পদার্থ তাহাদের উপজী[illegible] বলিয়া এখনও তাহারা হাজারে হাজারে বাঁচিয়া আছে[illegible] অধিক কি, সেদিনও খৃষ্টান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রাম[illegible] চরিত্রের একটি অধ্যায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার মৃত্যুঞ্জ[illegible] মেঘনাদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন [illegible] সাহিত্যের চিরপ্রবাহশীলা রসধারার মূল প্রপাত কোথা[illegible] কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন যে, মিল্‌টনের প্যারাডাইস লষ্টের অনুকরণে তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আখ্যান-বস্তু গ্রহ[illegible] করিয়াছিলেন। কারণ, তাহা না হইলে মহাকাব্য হইত না[illegible] স্বীকার করি, কিন্তু ব্রজাঙ্গনায় তাঁহাকে পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কে বলিয়াছিল? ভাবিয়া দেখুন, ব্রজাঙ্গনা এত মধুরতা কোথায় পাইল? সাহিত্য কি অপূর্ব্ব ভাব[illegible] ধারার প্রেরণা পাইলে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে! আবর্জ্জনারাশি স্তূপীকৃত করিয়া আমরা যদি মনে করি যে[illegible] বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছি, তাহা হইলে আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিমাপ আরাবল্লী পর্ব্বতেও করিতে পারিবে না।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (এম্‌-এ)।

স্নেহের দণ্ড

১

দিবসের কর্ম্ম শেষ করিয়া কমলা সবে মাত্র অবসন্ন দেহভার শয্যায় ঢালিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় প্রবোধ ঝড়ের মত বেগে ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ বৌদিদি, আমি যা ভালবাসি না, আজকাল তোমরা তাই আরম্ভ করেছ। আমি রোজ স'য়ে যাচ্ছি ব'লে তোমরা একেবারে পেয়ে বসেছ। কিন্তু আজ আমি লঙ্কাকাণ্ড না ক'রে ছাড়ব না।"

কিছুমাত্র উদ্বেগের ভাব প্রকাশ না করিয়া প্রশান্ত দৃষ্টিতে দেবরের প্রতি চাহিয়া বেশ সহজ স্বরে কমলা বলিল, "জানই ত, লঙ্কাকাণ্ড করতে হ'লে নিজের মুখখানাও বাদ যাবে না, সে মুখ লোককে দেখাতে পারবে ত?"

কণ্ঠস্বরের উচ্চতা আরও চড়াইয়া রাগরক্ত চক্ষুর্দ্বয় ঘুরাইয়া মুখভঙ্গিসহকারে প্রবোধ বলিল, "মুখ দেখাতে পারবে ত!—সে মাথাব্যথা কেউ তোমাদের করতে বলেনি। আমার বই কোথায় রেখেছ, শীগ্‌গির দাও বলছি।"

বেশ নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরিয়া শুইয়া কমলা বলিল, "আচ্ছা, ঘুম থেকে উঠে খুঁজে দেব, এখন নিজের কাজ কর গে, আমি একটু ঘুমুই।"

"হাঁ, ঘুমুতে দিচ্ছি ভাল ক'রে! এখনি বলছি আমার বই কোথায় রেখেছ, দাও, নইলে ভাল হবে না। আমি লাইব্রেরী থেকে বই আনব আর বাবুরা মজা ক'রে পড়বেন, নন্‌সেন্স!"

উচ্ছ্বসিত হাস্যবেগ চাপিয়া কমলা বলিল, "ঠাকুরপো, ও রকম ইংরাজী গাল আর কটা শিখেছ? তোমার ইংরাজীর দৌড় বুঝি ঐ পর্য্যন্ত!"

সবলে টেবলের উপর এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া প্রবোধ বলিল, "গাল খাওয়া যে তোমাদের স্বভাব, ভাল কথায় ত চিঁড়ে ভিজে না। যত মনে করি কিছু বলব না, আমাকে ততই রাগাবে। এখন বল, বই দেবে কি না?"

"আমি কি বই দেব না বলেছি? যা হ'ক, তুমি লাইব্রেরীর এত বইয়ের শ্রাদ্ধ ক'রেও কিছু করতে পারলে না? কোন্ বইয়ে পড়েছ, কথায় চিঁড়ে ভেজে? জল নইলে কখন চিঁড়ে ভেজে?"

"তবু বাজে বক্‌তে লাগ্‌ল! আমার বই দাও, এখনও বলছি, নইলে দেখ কি করি"—এই বলিয়া একটা সুদৃশ্য কাচের ফুলদানী টেবল হইতে তুলিয়া লইয়া সে আছাড় দিবার উপক্রম করিল।

তথাপি কমলা নড়িল না, কিছুমাত্র ব্যস্ত হইল না। ধীরস্বরে বলিল, "ভাঙ্গ, ওর দাম পাঁচসিকে বৈ নয়। কিন্তু নিজে সাবধান হয়ে ভাঙ্গ, যেন হাত-পা না কাটে। টেবিলে যে চাপড় মেরেছ, তাতে বোধ হয় হাত এখন জ্বলছে।"

প্রবোধ ফুলদানী রাখিয়া দিয়া কাচের আলমারীর নিকটে গিয়া সবলে পদাঘাত করিবার জন্য পা তুলিল। এইবার কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া সরাইয়া দিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "ক্ষেপেছ না কি, এখনি যে সর্ব্বনাশ হয়েছিল!"

"ফুলদানীটার দাম পাঁচসিকে, তাই গ্রাহ্য হলো না ব'লে পঞ্চাশ টাকায় ঘা দিচ্ছিলাম, কেমন, উঠতে হল কি না?"

"পঞ্চাশ টাকায় ঘা দিচ্ছিলে ব'লে উঠিনি, একশ' টাকা গেলেও উঠতাম না। উঠে এলাম এই জন্যে যে, তুমি বাঁদরামী ক'রে পা'টা জন্মের মত খোঁড়া করবে, আর আমি শুয়ে শুয়ে তা দেখব!"

"আচ্ছা, এইবার বই দাও, লক্ষ্মীটি। তোমার পায়ে পড়ছি, বৌদিদি।"

"বই দেব, আগে তুমি বল দেখি, তোমার সঙ্গে কি সর্ত্ত ছিল?"

"সর্ত্ত আবার কি?"

"সর্ত্ত আবার কি? আচ্ছা, তা হ'লে বই পড়ার আশা ত্যাগ কর।"

"কি বলই না ছাই, আমার কি অত শত মনে আছে?"

"তোমার সঙ্গে এই সর্ত্ত ছিল যে, তুমি তোমার নিজের পড়াশুনা ক'রে তবে অন্য বইতে হাত দেবে। কেমন, এই কি না?"

"তা আমি কি নিজের পড়া না ক'রে অন্য বই পড়তে এসেছি? গ্রীষ্মের ছুটীতে যে ক'দিন পারি পড়ছি;

তার পর কি আর পড়ব, না তা কখন পড়েছি, তা তুমিই বল দেখি ?"

"দ্বিতীয় সর্ত্ত এই ছিল যে, তুমি লাইব্রেরী থেকে যে বই আনবে, সে বই আমি না দেখে তোমাকে পড়তে দেব না। আমি যে বই পছন্দ ক'রে দেব, সেই বই তুমি পড়বে; কেমন, এই কি না ?"

"হ্যাঁ, তা আমি ত তোমাকে না দেখিয়ে কোন বই পড়িনে।"

"কিন্তু আমি ত এ বইখানা দেখিনি"—এই বলিয়া কমলা নিজের বাক্সের চাবি খুলিয়া একখানা বই বাহির করিয়া দূর হইতে তাহার নামটা দেখাইয়া বলিল, "এখানা কি আমি তোমাকে পড়তে দিয়েছি ?"

প্রবোধের মুখখানা শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। গলাটা ঝাড়িয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ওখানা নূতন বেরিয়েছে, তা ওখানা কি খারাপ বই না কি ?"

বইখানা পুনরায় বাক্সের মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া কমলা গম্ভীরভাবে বলিল, "সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রে কেন আহাম্মকি কচ্ছ ? আমি কি কোন দিন কোন ভাল বই পড়তে বাধা দিয়েছি ? তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ, নইলে আর ওই জঘন্য বইখানা পড়বার জন্য এত কাণ্ড কর ! ছিঃ, আর কখন যেন এ রকম না হয়। তোমার আবদার শুনি ব'লে মনে কোর না যে, তোমার অন্যায় আস্পর্দ্ধার প্রশ্রয় দেব। তুমি এখন বালক বল্লে অত্যুক্তি হয় না, আর তোমার গল্পের বই পড়বার এত ঝোঁক যে, তুমি লঙ্কাকাণ্ড করতে চাও ! তোমাকে কোন দিন কি আমি চড়া কথা বলেছি ? কিন্তু আজ তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ দেখে বড় দুঃখিত হয়েছি।"

একবারে ধপাস্ করিয়া কমলার পায়ের উপর পড়িয়া দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া প্রবোধ অনুতপ্ত স্বরে বলিল, "বৌদিদি, এবার আমায় মাপ কর, আর কখন তোমার মনে কষ্ট দেব না। তোমার আদরই আমায় বেয়াদপ ক'রে তুল্ছে। এবার মাপ কর বৌদিদি, আর এ রকম করব না !"

অনুতপ্ত বালককে পদপ্রান্ত হইতে সাদরে তুলিয়া স্নেহ-স্নিগ্ধ কোমল স্বরে কমলা বলিল, "আদর দিই ব'লে কি অনাদরের কায করতে আছে রে, বোকা ! তুমি যে এখনও নেহাৎ ছেলেবুদ্ধি আছ কি না, তাই আমার এত সতর্কতা, ভাই !"

২

আফিস হইতে ফিরিয়া সুবোধ ঘরে ঢুকিয়াই বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রবোধটা গেল কোথায়, বল্তে পার ?"

কমলা স্বামীর বিরক্তিপূর্ণ গম্ভীর মুখের প্রতি চাহিয়া আসন্ন ঝটিকার সম্ভাবনা বুঝিয়া শঙ্কিতভাবে বলিল, "তা ত জানি না, কেন, কি হয়েছে ?"

তাড়াতাড়ি একখানি পাখা লইয়া সে স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল।

আফিসের পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে ক্রুদ্ধভাবে সুবোধ বলিল, "হয়েছে চূড়ান্ত, আজ একবার তার দেখা পেলে হয় ! ছোঁড়া তোমার প্রশ্রয় পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছে। যত মনে করি কিছু বলব না, ততই বাড়াবাড়ি কচ্ছে। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর না দিলে আর চলছে না।"

সুবোধ এইরূপে ভূমিকা আওড়াইয়া গেল, মূল ব্যাপারটা যে কি, কমলা তাহা জানিতে পারিল না। তাহা জানিবার চেষ্টা না করিয়া স্বামীকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "হাত-পা ধোও, জল খাও, বেলা একেবারে গেছে। তেতে পুড়ে এসেছ, একটু ঠাণ্ডা হয়ে তার পর তার খোঁজ ক'র।"

"হ্যাঁ, ঠাণ্ডা হব, আজ আগে শিক্ষা না দিয়ে ঠাণ্ডা হচ্ছি না।"

"শিক্ষা দিতে কি আমি বারণ করছি, নিজের শরীরটা আগে বাঁচাও, তার পর যত পার, শিক্ষা দিও।"

কমলা বারান্দায় জলচৌকীর উপর গামছাখানা রাখিয়া বলিল, "নাও, ওঠ।"

সুবোধ হাত-মুখ ধুইতে লাগিল। কমলা ইত্যবসরে গৃহমধ্যে আসন পাতিয়া রেকাবী করিয়া কিছু ফল ও মিষ্টান্ন, এক বাটি সরবৎ, এক গ্লাস জল, এক ডিবা পাণ প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিল।

হাত-পা ধুইয়া সুবোধচন্দ্র সুবোধ বালকের মত জল-খাবারের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। কমলা নীরবে দাঁড়াইয়া স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল। জলযোগ শেষ

হইলে কমলা ডিবা খুলিয়া স্বামীর সম্মুখে ধরিল। ডিবা হইতে পাণ লইয়া একটা মুখে পুরিয়া চোখ তুলিয়া চাহিতেই কমলার হাস্যোজ্জ্বল চক্ষুর সহিত সুবোধের দৃষ্টি মিলিত হইল।

"তুমি বড় ভয়ানক লোক" বলিয়াই সুবোধ হাসিয়া ফেলিল।

উচ্ছ্বসিত হাস্যবেগ প্রশমিত করিয়া কমলা বলিল, "তা এখন ভয়ানক লোকই হই আর ভয়াতুরই হই, যা-ই হই, মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে ত। যে মূর্ত্তি ধ'রে বাড়ী ঢুকলে, আমার ত ভয় হয়েছিল। ব্যাপারটা হয়েছে কি?"

"আমার নোট করবার ভাল বাঁধান খাতাখানা বাবুর কবিতার খাতা হয়েছে, ষ্টাইলো পেনটার মাথা খেয়ে রেখেছে। আমার টেবিল খুলে কাগজপত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে-তাই করেছে। জানে আমার ও সব জিনিষ ঘাঁটা আমি মোটেই পছন্দ করি না, কাউকে হাত দিতে দিই না, জেনে শুনে দুষ্টুমি!"

কবিতার খাতার নাম শুনিয়া কমলা হাসিয়া উঠিল। সুবোধ বলিল, "তুমি হাস্‌ছ, কিন্তু রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যাচ্ছে। কত বড় অবাধ্য বল দেখি!"

অতি কষ্টে হাসি থামাইয়া কমলা বলিল,—"সে কথার উত্তর পরে দিচ্ছি। কবিতার খাতাখানা একবার দেখি।"

"কবিতা ছাই আর পাঁশ, কেবল আমার মাথা খেয়েছে! আমার সঙ্গে এস, হতভাগার কীর্ত্তিটা দেখবে।"

কমলা সুবোধের সহিত তাহার বসিবার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

৩

গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাগজপত্র গুছাইতে কমলা সত্বর মনোনিবেশ করিল। পাগলের খেয়াল দেখিয়া এবং তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া সে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সুবোধ ক্রোধভরে সেই খাতাখানা কমলার দিকে ছুড়িয়া দিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "এই দেখ গুণধরের কবিত্ব!"

খাতাখানা খুলিয়া কমলা একবার চোখ বুলাইয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "কাযটা ঠাকুরপো খুবই অন্যায় করেছে, তা স্বীকার করছি, কিন্তু এ দোষ যে শুধু একা তারই, তা বল্লে শুনব না। এ দোষটা তার দাদারও ছিল।"

"ছিল, তা কি অস্বীকার কচ্ছি, কিন্তু এমনতর বেয়াদবী ছিল না। পরের জিনিষে জুলুম করা, লঘু-গুরু বিবেচনা-হীনতা দোষ ছিল না।"

"পরের জিনিষ আবার কি? আপনার মায়ের পেটের ভাইয়ের একখানা খাতা নিয়েছে, তাতে এমন কি দোষ হয়েছে, তা ত বুঝতে পাচ্ছি না! তবে না ব'লে নিয়েছে, এই সব ঘেঁটেছে, ছড়িয়েছে, এটা তার ভয়ানক অন্যায় হয়েছে বটে। খাতাখানি তোমার পছন্দসই, তাই রাগ করছ, তা তোমারও উচিত, তাকে এই রকম চক্‌চকে বাঁধান খাতা দেওয়া, তার কি আর সাধ যায় না এই রকম জিনিষ ব্যবহার করতে?"

"চুলোয় যাক খাতা, আমি সে জন্যে না হয় তাকে মাপ করলাম। কিন্তু আমার এই দামী কলমটা যে নষ্ট ক'রে দিয়েছে, এর জন্যে আমাকে যে কষ্ট পেতে হবে।"

"তোমাকে কষ্ট পেতে আমি দেব না। ওটা আমায় দাও, আমি যেরূপে হোক সারিয়ে নিজের কায চালাব, তুমি আমাকে যেটা দিয়েছ, সেটা তুমি নিও। সে পাগলকে কিছু বোল না, আমি তাকে এর জন্যে খুব ভয় দেখিয়ে দেব। তুমি রাগী মানুষ, হয় ত রাগের মাথায় তাকে দু'ঘা বসিয়ে দেবে, আর সে যে অভিমানী ছেলে, কি ক'রে বসবে, তার ঠিক নেই! তাকে কিছু বল না। আমার মাথার দিব্যি, বল বলবে না?"

"তুমি যে কি বল, তার কিছু ঠিক নেই। তার এতবড় অন্যায় আজ যদি আমি উপেক্ষা ক'রে যাই, তা হ'লে সে আরও মাথায় চ'ড়ে বসবে! দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে, তা দেখছ না? এমন স্নেহান্ধ হয়ে তার মাথা খেয়ো না, এর পর পস্তে মরবে।"

"আচ্ছা, আজকের মত মাপ কর, আবার যদি এ রকম করে, তা হ'লে আমি আর তোমাকে কোন অনুরোধ করব না, তোমার যা ইচ্ছে ক'র। আহা, কত দিন পরে বাড়ী এসেছে, দু'দিন ছুটীতে এসেও যদি মার-ধর খায়, তা হ'লে আর ও স্নেহ পেলে কোথায়, তা বল? ওর জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়! অকালে মাতৃহীন! অভাগা নয় কি?"

কমলার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

সুবোধও অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। ক্ষণেক থামিয়া বিপরীত দিকে মুখ রাখিয়াই সে বলিল, "সেই জন্যই ত কিছু বলি না। ওর সব রকম অন্যায় উপদ্রব নীরবে সহ্য ক'রে যাই। কিন্তু একেবারে সমস্ত উপেক্ষা করাও ত ঠিক নয়, তা হ'লে ওরই মাথা খাওয়া হয়।"

"আচ্ছা, আজ যা করেছে, সে জন্যে মাপ কর। আর কখনও যাতে এ রকম না করে, তার জন্যে আমি তাকে সাবধান ক'রে দেব।"

৪

কর্ম্মোপলক্ষে কমলা পিত্রালয়ে গিয়াছে। পিত্রালয়ে যাইবার অবকাশ তাহার ঘটে না। সুবোধের সহোদরা সুনীতি শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছে, সুতরাং কমলা তাহার উপর সংসারের ভার দিয়া সাত দিনের মাত্র অবকাশ লইয়া বাপের বাড়ী গিয়াছে।

দুই দিন বেশ কাটিয়া গেল। প্রবোধও কমলার উপদেশ অনুসারে শান্তশিষ্টের মত দিদির কথানুযায়ী বেশ চলিতে লাগিল। তৃতীয় দিন বৈকালে প্রবোধ জলখাবার খাইতে আসিয়া দেখিল, তাহার দিদি তখনও নিদ্রাভিভূতা। খাবারের কোন উদ্যোগই নাই দেখিয়া তাহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "বেলা চারটে বেজে গেল, এখনও কুম্ভকর্ণের মত ঘুমুচ্ছ, আজ কি খেতে দিতে হবে না? আচ্ছা লোক দেখছি।"

অসময়ে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সুনীতির বিরক্তিবোধ হইল। সে ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, "আঃ, বাঁদরটা চেঁচিয়ে মাথা ধরিয়ে দিলে। কি হয়েছে যে অমন চীৎকার ক'রে মরছ? এখনি পেটে আগুন লাগল। মানুষের কি একটু বিশ্রাম করতে নেই, এইমাত্র ত শুয়েছি, এর মধ্যেই তোমার খাবার সময় হ'ল?"

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া প্রবোধ বলিল, "না, তা কি আর হয়েছে; তোমার ঘুম হলেই হ'ল, ঘড়ী দেখ না, পাঁচটা বাজে। বৌদিদি এখানে থাকতে রোজ তিনটের সময় খেতে দিত। সে বারোমাস পারত, আর তুমি দু'দিন পার না?"

ভ্রাতার মুখে ভ্রাতৃজায়ার প্রশংসাটা সুনীতি পরিপাক করিতে পারিল না। তাহার ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়া গেল। সে কণ্ঠস্বর চড়াইয়া বলিল, "না, পারি না, তা করবি কি? আমি কি খাই, না পরি যে, তোদের খোসামোদ করব? ভাজ ভাল, আমি মন্দ! ভাজ গেল কেন বাপের বাড়ী? ভাজ খেতে দিক এসে, আমি ত কখন দেব না।"

চীৎকারের মাত্রা বাড়াইয়া লম্ফঝম্প সহকারে প্রবোধ বলিল, "ভালকথায় বলছি, তা শোনা হচ্ছে না; উল্টে নানা কথা বলছ। আমার রাগ হ'লে জ্ঞান থাকে না, তা ব'লে রাখছি। শেষে সব ভেঙ্গেচুরে তচনচ ক'রে দেব। যা খাবার আছে, দাও, খেয়ে চ'লে যাই। তুমি ব'লে তাই এখনও সয়ে আছি, বৌদি হ'লে দেখতে কি করতাম।"

সুনীতি নীতির ধার ধারিত না। সে উঠিল না, শুইয়াই উত্তর দিল, "ভয় দেখাচ্ছিস কাকে? তোর ভয়ে আমি ম'রে গেলাম আর কি! যা পারিস কর, আমি কিছুতেই তোকে আজ খেতে দেব না।"

দালানে সম্মুখে যাহা ছিল, দুমদাম শব্দে নীচের উঠানে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া সুনীতি এইবার উঠিয়া বসিয়া বলিল, "পোড়ারমুখো, হতভাগা, সব যে ভাঙ্গছ, আজ দাদা বাড়ী আসুক, তার পর তোমার বুদ্ধি বোঝা যাবে। যা ভাঙ্গছ, সবই তোমার প্রিয় বৌদিদির, এ অপ্রিয় বোনের কিছুই নয়। ভাঙ্গ না, যত পার ভাঙ্গ, আমি ত বারণ করব না। সেই লক্ষ্মীছাড়া বৌটাই ত তোকে লক্ষ্মীছাড়া ক'রে তুলেছে। যেমন কর্ম্ম, তার তেমনি ফল ফলবে না! বেশ হচ্ছে, বলি ঢেঁকি, আমার কি ক্ষতি করবি?"

"ভাঙ্গবই ত, সে পোড়ামুখী তোমার মত লোকের হাতে আমার খাওয়ার ভার দিয়ে গেল কেন? আজ তার সব ভাঙ্গবো।"

উঠানে দুমদাম শব্দে দ্রব্যাদি পড়িতে লাগিল।

সক্রোধে সুনীতি বলিল, "বটে, আমার হাতে তোর খাওয়ার ভার দিয়ে গিয়েছে, তাই এত কাণ্ড করছিস্। ওরে হতভাগা, এত বড় হলি কি ক'রে? এতটুকু রেখে মা চ'লে গেছেন, আজ ষোল সতর বছরের হাতী করলে কে, তা মনে ক'রে দেখ।"

ক্রোধে দন্তে দন্ত পেষণ করিতে করিতে আরক্ত-মুখে প্রবোধ তীব্রস্বরে বলিল, "কি! তুমি আমায় এত বড় হাতী

করেছ, না বৌদিদি করেছে? তুমি এখানে থাকতে, না আমাকে দেখতে? যে আমাকে এত বড় হাতী করেছে, তা আমি বিলক্ষণ জানি, তোমার ও ভুয়ো কথায় আমি ভুলি নে। মিথ্যা কথা ব'লে আমার রাগ বাড়িও না বল্‌ছি। তুমি আমার আপনার বোন্ এক দিন সহ্য করতে পার্ না, কিন্তু পরের বোন্ চিরদিন আমার উপদ্রব সয়ে আস্‌ছে। তুমি তার হিংসেতেই মর, তা আমি জানিনে যেন।"

অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল। ক্রোধে কি করিবে, ঠিক করিতে না পারিয়া সুনীতি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বহুদিন পরলোকগত পিতামাতাকে আজ মনে করিয়া তাহার শোক উথলিয়া উঠিল।

প্রবোধের ক্ষুধা বহুক্ষণ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। সে তখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

৫

সুবোধ আফিস হইতে বাড়ী আসিয়া দেখিল, সুনীতি কাঁদিতেছে। ব্যাপার কি? জিজ্ঞাসা করায় সুনীতি প্রবোধের কাণ্ড রীতিমত রং চড়াইয়া সুবোধকে বলিয়া নিজের রসনার তৃপ্তিসাধন করিল।

"আচ্ছা, তার এক দিন, কি আমার এক দিন! আজ দেখে নিচ্ছি" বলিয়া সুবোধ কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেল।

সুনীতির যত ক্রোধ—যত আক্রোশ সমস্ত গিয়া সেই নিরপরাধ কমলার উপর পড়িয়াছিল। সেই ত যত অনর্থের মূল, তার জন্যই ত আজ সে ছোট ভাইয়ের কাছে এত অপমান ভোগ করিল; সেই ত প্রবোধকে ক্রমাগত কুশিক্ষা দিয়া আসিতেছে, নহিলে প্রবোধের সাধ্য কি যে, বড় বোন্‌কে অপমান করে! সেই অলক্ষণা আসিল বলিয়াই ত তার বাপ-মা অসময়ে মারা গেলেন, সংসার একবারে উৎসন্নে গেল। ঐ অপয়া বৌটা যদি না আসিত, তাহা হইলে কি এ সব কাণ্ড ঘটিত! সুনীতির ক্ষোভের সীমা রহিল না।

সুনীতি ও কমলা উভয়ে সমবয়স্কা। কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যে, ব্যবহারে, কমলার কর্ত্তব্যপরায়ণতা, শীলতার পরিচয় পাইয়া লোক যে তাহার প্রশংসা করিত, সুনীতি সেটা কমলার দারুণ অপরাধের মধ্যে গণনা করিয়া লইত। কারণ, কমলার প্রকৃতি অত্যন্ত ক্রূর, তাই সে নানা কৌশলে লোকের কাছে প্রশংসা আদায় করে। সুনীতি সরলা কি না, তাই সে তাহা পারে না। তাই আজ সে ভাইয়ের নিকট অনাদৃতা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সুবোধ বিশ্রামান্তে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে গেল কোথায়?"

অশ্রুসিক্ত মুখ মুছিয়া সুনীতি উত্তর করিল, "কি ক'রে বলব দাদা, যাচ্ছেতাই অপমান ক'রে সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে, কোথায় গেছে, তা কি ক'রে জানব? সে যেখানেই থাক্, এখন তার খোঁজ করতে যেতে হবে না, যখন আসবে, তখন যা হয় করো। আগাগোড়া তোমাদের আস্কারা পেয়েই ঐ রকম অসভ্য হয়ে উঠেছে। ছোট থেকে শাসন করলে কখন অমন হ'ত না। আমি ত দুদিনের জন্য এসেছি, তোমরাই ওকে নিয়ে কষ্ট পাবে। যাক গে, তোমার খাবার ঘরে রেখে এসেছি, খেয়েছ ত?"

গম্ভীর মুখে শুধু হুঁ বলিয়া সুবোধ তথায় পায়চারী করিতে লাগিল।

সুনীতি আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিল, "মনে করেছিলাম, প্রবোধ মানুষ হয়ে দাদার দোসর হবে। সে যে উৎসন্ন যাবে, তা ত স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন, তা হ'লে কি হতভাগা এমন ক'রে বয়ে যেতে পারত? বৌদিদি ওকে একেবারে মাটী ক'রে দিয়েছে। সে যদি ভাল হ'ত, তোমাদেরই ভাল হ'ত, আমার কিছুতেই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তোমার বৌকে নিয়ে এস দাদা, আমার আর এক দণ্ডও এ বাটীতে থাক্‌তে ইচ্ছে নেই। তখনি চ'লে যেতাম, কেবল তোমার কষ্ট হবে ব'লে যেতে পারলাম না। বৌদিদি এলেই আমি চ'লে যাব। আমি ত পেটের দায়ে এসে তোমাদের ঘাড়ে পড়িনি যে, এত অপমান সহ্য ক'রে থাকব! আস্‌তে ত ইচ্ছে হয় না, কেবল মন বোঝে না, প্রাণের টান, তাই এক একবার আসি।"

সুনীতির অশ্রু আবার হু হু করিয়া নামিয়া আসিল। সুবোধ নীরবেই পায়চারী করিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়াছিল, ভৃত্য আলো জ্বালিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সুবোধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছোট বাবু এসেছে?" "আজ্ঞে না" বলিয়া সে চলিয়া গেল। এমন সময় প্রবোধ কোথা

হইতে আসিয়া সুবোধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, এই যে আমি এসেছি। কি বলছ, দাদা ?"

সুবোধ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ভীষণ দৃষ্টিতে প্রবোধের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু সে মুখে ভয়, উদ্বেগ বা ক্রোধের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না।

পরুষকণ্ঠে সুবোধ বলিল, "তুই সুনীতিকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছিস কেন ? দিন দিন তোর বড় আস্পর্দ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। কুকুরকে নাই দিলেই মাথায় উঠে, নয় ?"

"কি, আমি কুকুর! আচ্ছা, আমি না হয় কুকুরই হলাম। কিন্তু বেড়ালের কথা শুনে আমাকে বক্‌ছ কেন ? কুকুরের কথাটাও ত শুনতে হবে।"

সুনীতি চাৎকার করিয়া বলিল, "শুনছ দাদা, আমাকে বেড়াল বলছে !"

ঠাস্ করিয়া প্রবোধের গণ্ডে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিয়া সুবোধ গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেরো উল্লুক আমার সুমুখ থেকে! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! রামা, নিয়ে আয় ত আমার বেতগাছা, দেখি ওর কত বড় বুকের পাটা।"

এক মুহূর্ত্ত প্রবোধ ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বোধ হয়, চোখে জল আসিয়াছিল, তাহা সামলাইয়া লইল। পরমুহূর্ত্তে আরক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সক্রোধে বলিল, "দাদা, তুমি আমার কথাটা শুনলে না, ঐ বেড়াল-টার কথা শুনে আমায় মারলে, এ দুঃখ আমার জীবনে যাবে না। তুমি আমাকে যত মার না, যতই বক না, গাল দাও না, কিন্তু আমি ওকে বেড়াল বলতে কখনই ছাড়ব না। যে প্রত্যেক কথায় ইতর লোকের মত খাওয়া-পরার খোঁটা দিয়ে ভ্রাতৃ-স্নেহের ওজন যাচাই করে, তাকে আমি মানুষ বলি না, বেড়াল বলি—একশবার বেড়াল বলব।"

প্রবোধ ক্রোধে ফুলিতে লাগিল। সুবোধ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিল, "হতভাগা, এখনও বলছি, সুনীতির পায়ে ধ'রে মাপ চা। বড় বোন্‌কে বেড়াল বলা, এই তোর শিক্ষা হচ্ছে? আর তোর এই শিক্ষার জন্ত আমি জলের মত পয়সা খরচ করছি? লঘু-গুরু-জ্ঞান নাই, তোর রাগ হলে জ্ঞান থাকে না। পাজী শূয়ার, দূর হ, আর তোকে আমি এ বাড়ীতে স্থান দেব না। তুই যে চুলায় যাবি, যা। যে তোকে মাটী করেছে, তাকেও আর এ বাড়ীতে ঢুকতে দেব না। সে যে চুলোয় গিয়েছে, সেই চুলোয় থাকবে। এ জন্মে তোমাদের পরস্পরের মুখ দেখাদেখির পথ বন্ধ ক'রে দেব! নইলে তুমি জব্দ হবে না। তার কাছেই আস্কারা পেয়ে তোর উৎসন্ন যাবার পথ খুলে গেছে। তাকেও এর উচিতমত দণ্ড না দিলে আমার রাগ যাচ্ছে না।"

"জব্দ তোমাকে করতে হবে না, সে পথ আমিই পরি-স্কার ক'রে দিচ্ছি।" এই বলিয়া প্রবোধ বিদ্যুদ্বেগে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া সুবোধ সান্ত্বনার স্বরে সুনীতিকে বলিল, "মনে রাগ-দুঃখ কিছু করিসনে, বোন্; ও একটা পাগল! আমরা ওকে মাপ ক'রে না চল্লে ওর আর কি উপায় আছে! হতভাগার জন্য আমার একদণ্ড মনে শান্তি নেই, কি ক'রে যে ওর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে, ভেবে ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছি না। মনে করেছিলাম, গ্রীষ্মের ছুটীতে বোর্ডিং থেকে আনব না, এখানে দুষ্টামী বাড়ে, সেখানেই থাক। কেবল তোমার বৌদিদি জেদ ক'রে আনালে।"

"তুমি যেমন দাদা নিজে বিবেচনা ক'রে কায কর না, বৌয়ের কথামত চল, এখন তার ফল ভোগ কর।"

সুবোধ স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

৬

যাহার গায়ে কখনও হাত তুলে নাই, আজ তাহাকে রাগের মাথায় মারিয়া, গাল-মন্দ দিয়া সুবোধের মনটার মধ্যে কেমন এক রকম অশান্তি বোধ হইতে লাগিল। রাগটা যতই পড়িয়া আসিতে লাগিল, ততই তাহার অনুশোচনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রবোধের সেই কথাটা বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল, "আমার কথা না শুনেই তুমি আমাকে মারলে, এ দুঃখ আমার জীবনে যাবে না।"

কেন সে মারিয়া বসিল! বকিয়া, বুঝাইয়া, ভয় দেখাইয়া শাসন করা উচিত ছিল না কি ?

না, এ দুর্ব্বলতা পোষণ করা ভাল নহে; মধ্যে মধ্যে কড়া শাসন না করিলে উহার দৌরাত্ম্য কমিবে না। অন্যায় কাযে শাসন না করা নিতান্ত অনুচিত কায; সুবোধ মন

হইতে অশান্তির কাঁটা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

নানাপ্রকার চিন্তায় উষ্ণ মস্তিষ্ক লইয়া, সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া ভোরবেলায় সুবোধ ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে প্রবোধের ঘরের নিকট গিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে কেহ নাই। প্রবোধ গেল কোথায়? তবে কি সত্য সত্যই সে রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে? হাঁ, সেই ত পিতৃমাতৃহীন সহোদরকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে কঠোর আদেশ করিয়াছিল!

সুবোধ বাহিরে আসিয়া ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তাহারা প্রবোধের খবর কিছুই জানে না।

বাড়ীর ভিতর আসিয়া সুনীতিকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "সুনীতি, প্রবোধ কাল রাত্রে খেতে এসেছিল?"

সুনীতি উত্তর করিল, "বোধ হয় আসে নাই, ঠাকুর তার ঘরে খাবার রেখে এসেছিল।"

সুবোধ পুনরায় প্রবোধের গৃহে গিয়া দেখিল, অভুক্ত আহার্য্য দ্রব্য যেমন তেমনই ঢাকা রহিয়াছে, কেহ স্পর্শ করে নাই। সুবোধ বুঝিল, গত রাত্রিতে কেহই প্রবোধের খোঁজ লয় নাই। রাঁধুনী খাবার রাখিয়া তাহার কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়া গিয়াছে মাত্র; সে খাইল কি না, সে খোঁজ কেহ লয় নাই। সে নিজেও তাহার কোন সন্ধান লয় নাই। হায় রে, সেই এক জন যে প্রবোধকে না খাওয়াইয়া নিজে খাইত না!

সে দিন সুবোধের আফিস যাওয়া হইল না। ভৃত্য দ্বারা আফিসে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়া নিজে চারিদিকে প্রবোধের সন্ধানে পাগলের মত ঘুরিতে লাগিল।

যেখানে যেখানে লোক পাঠান হইয়াছিল, সকলে ফিরিয়া আসিল। সুবোধ সন্ধ্যার সময়ে ক্লান্তদেহে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল দাদা, সন্ধান পেলে?"

"না, পাওয়া গেল না।"

"বৌদিদির কাছে যায় নাই ত?"

"না" জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া সুবোধ পাশ ফিরিয়া শুইল।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সুনীতি বলিল, "সমস্ত দিন ত অনাহারে কেটে গেল, উঠে এস, কিছু খাও!"

না ফিরিয়াই সুবোধ উত্তর করিল, "ক্ষিদে নেই, তুমি শুধু এক গ্লাস জল আর সামান্য কিছু রেখে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া কর গে। আমি একটু পরে খাব।"

"আমার পেটে ত আগুন লাগেনি, দাদা। তোমরা উপোস ক'রে রইলে, আর আমি খাব, এত পেটের জ্বালা আমার নয়। প্রবোধ গেল কোথায়, দাদা?"

"কি ক'রে বল্‌ব? সন্ধান কোথাও পেলাম না শেষে তার ভাগ্যে এই ছিল!"

সুবোধের চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিতে লাগিল।

বাহিরে আসিয়া সুনীতি প্রবোধের জন্য আর এক প্রস্থ কাঁদিয়া লইল। কয়েক জন প্রতিবেশিনী আসিয়া সান্ত্বনা করিল। সকলেই একবাক্যে কমলার অবিবেচনার দোষ দিয়া সুনীতির বাক্য সমর্থন করিল। সুনীতি বলিল,—"এইবার বৌয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। প্রকারান্তরে প্রবোধকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করাই ত তার মনোগত ভাব ছিল। বাহিরে লোক-দেখান ভালবাসা জানিয়ে কেমন তাকে মাটী করেছে। তার সর্ব্বনাশ করেছে বৈ ত নয়। ভাজ কত ভাল হয়, তা সবারই জানা আছে।"

পরদিন সুনীতি শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল।

৭

অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের মত অন্তর-বাহিরে গাঢ় অন্ধকার লইয়া সুবোধ নিজের ঘরে শুইয়াছিল। এমন সময় কমলা আসিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিল।

পিত্রালয় হইতেই কমলা দাসীর নিকট হইতে সমুদায় সংবাদ পাইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ী করিয়া দাসীর সহিত চলিয়া আসিল।

সুবোধ বলিল, "সব শুনেছ ত?"

"শুনেছি, কিন্তু সে খবর শোনবার জন্যে আসিনি। কি রকম সন্ধান করলে, তাই বল? কোথায় কোথায় খোঁজ করেছ, কোন আশা আছে?"

"আমার কাছে কোন আশাপ্রদ সংবাদ পাবে না, কমলা। ভগবান্ যদি তাকে এনে দেন, তবেই আমরা আবার তাকে পাব, নইলে জন্মের মত তাকে হারিয়েছি। আমি তার খোঁজ করতে কোন স্থান বাকী রাখিনি; কলকাতার প্রায় সমস্ত যায়গা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি। থানায় খবর দিয়েছি, তার ফটো দিয়ে এসেছি, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দিয়েছি—দেখি পরে যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায়। আমি তাকে বড় কড়া কথা বলেছি, কমলা, সেই দুঃখেই সে চ'লে গেছে।"

কমলার বহু কষ্টে রুদ্ধ অশ্রুধারা আর বাধা মানিল না, বন্যা-প্রবাহের ন্যায় নামিয়া আসিয়া নীরবে তাহার বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে সুবোধ ডাকিল, "কমলা!"

কোন উত্তর পাইল না। আবার বলিল, "কমলা, কোন উপায় দেখ্‌তে পেলে?"

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া মৃদুস্বরে কমলা উত্তর করিল, "উপায় ভগবান্! আমি আর কি বলব। একটা ভাই ছিল, তাকেও হারালে, সে ত আমার কেউ নয়, তোমারই—" তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। মুখে অঞ্চল দিয়া কমলা বুক-ফাটা ক্রন্দনের শব্দকে বৃথা রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আজ আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা কমলার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। সে যখন দশ বৎসর বয়সে এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, তখন প্রবোধ দুই বৎসরের শিশু-মাত্র। তার পর যখন তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী দুই বৎসরের মধ্যে মারা যান, তখনও সে বালিকামাত্র। শাশুড়ী মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন, "বৌমা, আমি ত চল্লাম, প্রবোধকে তুমি দেখো। ওকে তোমার পেটের ছেলে মনে ক'র, ওকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, মা।"

বারো বৎসরের সংসারানভিজ্ঞা বালিকা মাতৃহীন শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিল। সেই দিন হইতে মাতৃস্নেহ-হারা শিশুকে সযত্নে মাতৃস্নেহের সহস্র ধারায় ডুবাইয়া রাখিতে সে চেষ্টা করিয়াছিল, বোধ হয়, তাহাতে সাফল্য লাভও করিয়া-ছিল। মায়ের অভাব প্রবোধ এক দিনও বোধ করে নাই। আর আজ তাহাকে সতের বৎসরের করিয়া হেলায় হারাইয়া ফেলিল! কেন সে মরিতে বাপের বাড়ী গিয়াছিল? সে যদি না যাইত, তাহা হইলে এমনতর কাণ্ড ত ঘটিত না। কমলার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

৮

এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। বহু অনুসন্ধান করিয়াও প্রবোধকে পাওয়া গেল না। সকলেই তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিল, কেবল আশা ত্যাগ করিল না কমলা। সে অন্তরে যতই ভাঙ্গিয়া পড়ুক না কেন, বাহিরে কোনমতেই তাহা প্রকাশ পাইতে দিত না। সুবোধকে প্রত্যহই আশা দিত, "সে নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বে, রাগ পড়্‌লে কোনখানে থাকবে না। তোমরা তাকে চিন্‌তে পার নি; তার অন্তরের কোন স্থান আমার অগোচর নাই, তুমি তার অশুভ চিন্তা ক'রে অকল্যাণ ক'র না।"

প্রত্যহ প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কমলা ব্যাকুলভাবে রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিত, প্রত্যহই হতাশ হইয়া সন্ধ্যায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া মনের গুরুভার লাঘব করিবার চেষ্টা করিত। পাছে স্বামী জানিতে পারেন, তাঁহার হৃদয়ের বেদনা বৃদ্ধি হয়, এ জন্য কমলা সে বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত।

এক দিন সুবোধ বলিল, "তুমি আমাকে যত মিথ্যা স্তোকে ভুলাইয়া রাখ, কমলা; কিন্তু নিজের মনকে ভুলাতে পেরেছ কি? আমার চোখকে ত ভুলাতে পারবে না। তোমাকে দেখলে পূর্ব্বের মানুষ ব'লে চেনা যায় না। আরসির কাছে দাঁড়িয়ে তোমার চেহারাটা দেখ দেখি।"

কমলা উত্তর দিল, "ওটা তোমার ভুল, না হয় তোমার চোখের দোষ। পেটের ছেলে মাকে ফাঁকি দিয়ে পালালে মা কি করে! তা সে দেওর।"

কমলা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চলিয়া গেল।

সে দিন বৈকালে যখন কমলা রাত্রির রন্ধনাদির আয়োজন করিয়া দিতেছিল, সেই সময় সুবোধ আসিয়া সহাস্যে বলিল, "একটা জিনিষ এনেছি, যদি পুরস্কার দাও, তা হ'লে পাও।"

কমলা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "জিনিষ না দেখে কে কবে পুরস্কার দেয়? কি জিনিষ আগে দেখি, তার পর না হয় কিছু বখশিস দেওয়া যাবে।"

"উপরে এস" বলিয়া সুবোধ উপরে চলিয়া গেল। হাতের কায অসমাপ্ত রাখিয়া কমলা দ্রুতপদে উপরে আসিয়া বলিল, "কি জিনিষ দেখি, মনের মত যদি না হয়, তা হ'লে দণ্ড পাবে।"

"প্রবোধ পত্র দিয়েছে, শোন।" সুবোধ পড়িতে লাগিল—

"দাদা, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, জীবনে আর আপনাদের নিকট প্রকাশ হইব না। যদি কখন মানুষ হইতে পারি, যদি কখন আপনার অপব্যয়ের সার্থকতা করিতে পারি, যদি কখন বৌদিদির অত্যধিক আদরে আমার মাথা খাওয়ার অপবাদটা ঘুচাইতে পারি, তাঁর সেই স্নেহাপরাধের মূল্য কতখানি, যদি তাহা আপনাদের বুঝাইতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক জ্ঞান করিব এবং তবেই আপনাদের পদপ্রান্তে গিয়া আবার দাঁড়াইব, নচেৎ এ জীবন অপ্রকাশ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না।

"কেন যে হইল না, তাহাও বলি। যাঁহার উপদেশ, যাঁহার স্নেহ-শাসন আমার প্রতি অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিদিন আমাকে উন্নতির পথে চালিত করিয়াছে, যাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা, অমানুষিক সহিষ্ণুতা আমাকে মনুষ্যত্বের পথ দেখাইয়া দিয়াছে, তাঁহার চরণে তাঁহার শিক্ষার ফল উপনীত করিতে না পারিলে, আমার সমস্ত সাধনাই বৃথা। যদিও আমি গোপনেই থাকিব, কোথায় আছি, কি করিতেছি, তাহা আপনাদের জানাইব না, তথাপি আমি যে বাঁচিয়া আছি এবং সুস্থ আছি, তাহা জানাইতেছি। কারণ, তাহা না জানাইলে বৌদিদিকেও আর দেখিতে পাইব না। আমি বেশ জানি, আমার এই অজ্ঞাতবাস তাঁহাকে মরণাধিক কষ্ট দিয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে এ স্নেহের দণ্ড আমাকে উপস্থিত ক্ষেত্রে না দিলে চলিতেছে না। পাছে তিনি আমার জীবনে সন্দিহান হইয়া দিন দিন মরণের পথে অগ্রসর হন, সেই আশঙ্কায় আমি পত্র লিখিতেছি। তাঁহাকে জানাইবেন, আমি মরি নাই বা মরিব না। তিনি যে শিক্ষায় আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে মরণের স্পৃহা আমার মনে স্থান পায় না; মানুষ হইবার বাসনাই বলবতী হয়। তবে যদি নিতান্তই নিয়তি পূর্ণ হয়, তাহা হইলেও নিশ্চয় জানিবেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পায়ের নীচে আমার স্থান করিয়া লইব, আর কোথাও মরিব না। সেই আমার স্বর্গ! জীবনে কখন মাকে মনে পড়ে না, মাকে কখন জানি না, জানি কেবল বৌদিদিকে। মা যে কেমন, তা জানি না, বৌদিদির থেকেও যে মা বেশী স্নেহ করিতে পারেন, এ আমার ধারণায় আসে না। আর বৌদিদিকে আমি যেমন ভালবাসি, ভক্তি করি, কোন সন্তান যে তার থেকে বেশী ভক্তি করিতে—ভালবাসিতে পারে, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। জীবনে এই আমার শ্রেষ্ঠ গর্ব্ব!

যদি বলেন, অপরিসীম স্নেহের পুরস্কার কি এই রকমে দিতে হয়? তবে তার উত্তর এই যে, আমি চিরকাল ভয়ানক একগুঁয়ে, এ কথা আপনারা জানেন। আমি সব সহ্য করিতে পারি, কিন্তু আমার জন্য আপনারা বৌদিদির প্রতি অবিচার করিতেছেন, প্রতি কথায়, প্রতি কার্য্যে তাঁহাকে দোষী করিয়া আসিতেছেন, সেই অন্যায় আমার অসহ্য। যদিও তাঁহার নিকটে থাকিলে আমার সকলপ্রকার সুখ-সুবিধা ঘটিত, কিন্তু বৌদিদির লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। সুতরাং এই অজানা লোকের মধ্যে, অচেনা স্থানে প্রতিপদে বাধাবিঘ্ন কষ্ট সহ্য করিয়া নিজের স্বভাব সংশোধন করিয়া লইব এবং অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারিব। অনেক না দেখিলে বহুদর্শিতা জন্মায় না। আমার জন্য আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না; আমি মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিব। আপনারা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। যাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাকে এই সুদূর দেশেও শান্তি ও সুখ দান করিতেছে, আমাকে দুর্ভেদ্য কবচরূপে রক্ষা করিতেছে, আমার সেই আরাধ্য উপাস্য করুণাময়ী দেবীকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইয়া বলিবেন যে, তাঁহার অযাচিত অপরিসীম স্নেহধারার প্রতিদানস্বরূপ তাঁহার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা হইল, তাঁহারই আশীর্ব্বাদের পূত সলিলে সেই অপরাধের মালিন্য ধৌত করিয়া এ দীন সেবক যথাসময়ে তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত হইবে। আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি সেবকাধম—

স্নেহাপরাধী প্রবোধ।"

পাঠ সমাপ্ত করিয়া সুবোধ পত্রখানি কমলার হাতে দিল। কমলা চিত্রপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়াছিল। তাহার অজ্ঞাতে অবাধ্য চক্ষুর জল তাহার গণ্ড বহিয়া অজস্র ধারে ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে দুই হাতে মুখ চাপিয়া স্নেহোচ্ছ্বসিত বক্ষ চাপিয়া কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীমতী ঊষা-প্রমোদিনী বসু।

পশুদিগের শীতনিদ্রা

রামায়ণে কুম্ভকর্ণের ৬ মাস নিদ্রার কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু বহু ইতর প্রাণীর মধ্যেও যে এইরূপ সুদীর্ঘ নিদ্রা-ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। রিপভ্যান্ উইঙ্কল যেমন ক্যাটাস্‌কিল পর্ব্বতের অধিত্যকায় সুদীর্ঘকালের নিমিত্ত নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেইরূপ ভল্লুক, ভেক, সর্প প্রভৃতি বহু ইতর জীবরাও প্রতিবৎসর শীত-সমাগমের সহিত যোগনিদ্রার মত এক গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন হইয়া পড়ে। অনেক সময় এই নিদ্রায় সারা শীত কাটিয়া যায়। এই নিদ্রাকে ইংরাজীতে Libernation বলে।

প্রাণীদের দীর্ঘকালব্যাপী এই নিদ্রার বিষয়ে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌রা নানারূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অনেকে বলেন, এই নিদ্রা জীবন-সংরক্ষণের সহায়ক। শীতপ্রধান দেশে শীত-সমাগমে প্রবল তুষারপাত হইয়া থাকে। তাহাতে ফল ও শস্যাদির তাদৃশ উৎপত্তি হয় না এবং কীট-পতঙ্গাদিও মরিয়া যায়। ইহাতে ভল্লুক, বাদুড় প্রভৃতি জীবের আহারপ্রাপ্তির বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। এই দুর্ভিক্ষের দিনে শত্রু হইতে সুরক্ষিত স্থানে নিভৃত বিবর, গুহা, বৃক্ষের কোটর প্রভৃতিতে আশ্রয় লইয়া ইহারা নিদ্রা যাইয়া থাকে। এরূপ সময়ে এইরূপ সুদীর্ঘ নিদ্রার অভ্যাস না থাকিলে আহারের অভাবে অনেক জীবেরই প্রাণনাশ ঘটিত। এই দৈবদুর্যোগ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই বহু প্রাণী শীতের সমাগমে মৃত্তিকার মধ্যে, ভূগর্ভে, গুহাদিতে, বৃক্ষাদির কোটরে, পর্ব্বতের কাটলে স্বচ্ছন্দভাবে নিদ্রা যাইয়া থাকে।

আবার অনেক প্রাণিতত্ত্ববিদ বলেন যে, আহার্য্যপ্রাপ্তির সুবিধা থাকিলেও অনেক ইতর প্রাণী শীতনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা মেরুপ্রদেশের শ্বেত ভল্লুকের উল্লেখ করিয়া থাকেন। হিমশিলা ও ভাসমান বরফখণ্ডের উপর যখন বহুসংখ্যক সীল মৎস্যকে অবস্থান করিতে দেখা যায়, তখন মেরু-ভল্লুকরা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গিয়া থাকে। যাহা হউক, এই সুদীর্ঘ শীতনিদ্রার সহিত যে জীব-সংরক্ষণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আহার্য্য যখনই অপ্রচুর হইয়া আসে, বহুসংখ্যক ইতর প্রাণী তখনই শীতনিদ্রার নিমিত্ত বিবরাদিতে আশ্রয় লয়।

শীতনিদ্রার সময় ইতর প্রাণীদের শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া একরূপ বন্ধ হইয়া যায় বলিলেও চলে। সে সময় ইহারা মলমূত্রাদিও ত্যাগ করে না। কেবল দেহের মধ্যে অতি ধীরে ধীরে রক্ত চলাচল করে মাত্র। ভল্লুকদিগের মলদ্বার এই কালে সর্ব্বরসের অনুরূপ এক প্রকার পদার্থ দ্বারা বন্ধ হইয়া যাইতে দেখা যায়। শম্বুকরা পূর্ব্বোক্তরূপ পদার্থ দ্বারা তাহাদের খোলার মুখ বন্ধ করিয়া নিদ্রা যায়। খোলার মুখে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য মাত্র একটি সরু ছিদ্র থাকে। ময়দানের মাঠে শীতকালে একটি ডোবার ধারে শীতনিদ্রায় নিদ্রিত বহু শামুক ও ঝিনুককে আমি দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে অনেকগুলির খোলা শূন্য থাকিতেও দেখিয়াছি।

শীতনিদ্রার কালে যে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ থাকে, তাহা বহুপ্রকারে প্রমাণিত হইয়াছে। শীতনিদ্রার সময় একটি মারমটকে প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল কারবন্ ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মধ্যে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটে নাই। একটি বাদুড়কেও এইভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। একবার এক কাচের জারের মধ্যে একটি নিদ্রিত বৃহৎ ইন্দুরকে রাখিয়া জারের মুখ ছিপি দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে বহুক্ষণ ইন্দুরটিকে রাখিয়া দিলেও জারের মধ্যস্থিত বায়ুর কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। আবার কতকগুলি জন্তুকে এইরূপ নিদ্রিতাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে অক্সিজান-বর্জ্জিত বায়ুর মধ্যে রাখিয়া দিলেও তাহাদের প্রাণবিয়োগ ঘটে নাই। এই সকল কারণেই প্রমাণিত হয় যে, এই কালে ইহাদের শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া স্থগিত থাকে।

শীতনিদ্রার কাল এবং পদ্ধতি সকল প্রাণীর পক্ষে সমান নহে। কোনও কোনও প্রাণী শীতের সময় প্রগাঢ়ভাবে নিদ্রা যায় আর কেহ বা নিদ্রার মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া থাকে। যে সকল প্রাণী সারা শীত প্রগাঢ় নিদ্রায় কাটাইয়া দেয়, তাহারা শীতের পূর্ব্বে খাদ্য সঞ্চয় করে না, আর যাহারা মাঝে মাঝে সজাগ হয়, তাহারা শীতাগমের পূর্ব্বে যথেষ্ট পরিমাণে ফল-মূল-শস্যাদি বাসবিবরে সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং শীতের মধ্যে যে সব দিন একটু গরম বলিয়া বোধ হয়, সেই সব দিনে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া আহার করে এবং আহারের পর আবার নিদ্রা যায়। শস্যভোজী প্রাণীরাই এইরূপে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে। মাংসাশী প্রাণীরা এ রীতি অনুসরণ না করিলেও আর্কটিক প্রদেশের খেঁকশিয়ালীরা শীতকালের জন্য বহু হংস, শশক, লেমিং, এর্‌মাইন্ প্রভৃতি শিকার করিয়া গর্ত্তের মধ্যে পুরিয়া রাখে।

শীতের সময় যে সকল প্রাণী নিদ্রা যায়, তাহাদের মধ্যে উত্তর-আমেরিকার কালো ভল্লুকের নিদ্রা অত্যন্ত সুগভীর। শীতের সময় একবার নিদ্রিত হইলে ইহাদিগকে আর জাগানো যায় না। সাইবিরিয়ার কটা ভল্লুকের নিদ্রা তত গভীর নহে।

শীতনিদ্রার সময় একবার জাগাইলে ইহারা অত্যন্ত হিংস্র হইয়া উঠে। রকি পর্ব্বতের এবং মেরু প্রদেশের ভল্লুকদের মধ্যে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। নভেম্বর এবং মে মাসের মধ্যে ভল্লুকীরা প্রগাঢ়ভাবে নিদ্রাভিভূতা থাকিলেও ভল্লুকরা প্রায়ই শিকার অন্বেষণে ভ্রমণ করিয়া থাকে। স্লথ বেয়ার এবং আমাদের এ দেশের ভল্লুকরা এ নিয়মের বশবর্ত্তী নহে। শীতকালে তাহারা পূর্ব্বোক্ত ভল্লুকদের মত নিদ্রা যায় না। কিন্তু এই সময়ে তাহাদের গতিবিধি মন্দ হইয়া থাকে। তাহারা বড় একটা নড়িতে চড়িতে চাহে না।

আমেরিকার অধিকাংশ কাঠবিড়াল শীতের সময় নিদ্রা যায় না; কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শীতকালে ইহারা নিদ্রা যায়। ইংলণ্ডের কাঠবিড়ালীদের শীতনিদ্রার একটু পার্থক্য আছে। শীতের মধ্যে যে দিন একটু গরম বোধ হয়, সেই দিন ইহারা জাগিয়া উঠিয়া যথেচ্ছ আহার করিয়া থাকে এবং আহারের পরেই পুনরায় নিদ্রা যায়। এই কারণেই কাষ্ঠমার্জ্জারদিগকে শীতসমাগমের পূর্ব্বে প্রগাঢ় যত্নসহকারে নানা প্রকার বাদাম, ফল, শস্যাদি সংগ্রহ করিয়া আবাসবিবর পূর্ণ করিতে দেখা যায়। আমাদের এ দেশে সকল সময়ে বাদুড়দিগকে দেখা যায় না। যাঁহারা আলিপুর পশুশালায় গিয়াছেন, তাঁহারা হয় ত পশুশালার উত্তরদিকের গাছগুলিতে অনেক সময় বাদুড়দিগের বিস্তৃত উপনিবেশ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ঐ সকল আবাসতরুতে সকল সময় বাদুড়দিগকে ঝুলিয়া থাকিতে দেখা যায় না। ইহার কারণ, কীট-পতঙ্গ ও ফলাদির অপ্রাচুর্য্য হেতু ইহারা বৎসরের কতক সময় পরিত্যক্ত গৃহাদির অন্ধকারময় স্থানে, ভগ্ন মন্দিরাদির মধ্যে, শুষ্ক পয়ঃপ্রণালীর ভিতর, বৃক্ষের কোটরে, দেওয়ালের ফাটলে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘকালের মত নিদ্রা গিয়া থাকে। অবশ্য এ দেশে বাদুড়দিগের শীতনিদ্রা তত দীর্ঘস্থায়ী নহে। ফল পাকিলেই বাগানে বাদুড়ের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়। বিলাত প্রভৃতি দেশে শীতের মধ্যে যে দিন একটু গরম পড়ে, সেই দিনই বাদুড়দিগকে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আহারের অন্বেষণে উড়িতে দেখা যায়। শীতনিদ্রার সময় বাদুড়রা মলমূত্রাদি ত্যাগ করে না। এ সময়ে ইহাদিগকে শীতল স্থানে রাখিয়া দিলে ইহাদের সুষুপ্তিভঙ্গ হইয়া থাকে। অধিক শৈত্যের মধ্যে রাখিলে ইহারা মরিয়া যায়।

একবার এক জন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ প্রগাঢ় শীতনিদ্রায় নিদ্রিত একটি বাদুড়কে প্রায় ১৬ মিনিট জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। আর এক জন বৈজ্ঞানিক শীতনিদ্রার ধারা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত একটি বাদুড়কে প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল কারবণ ডাই-অক্সাইড্ গ্যাসের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও উহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে নাই।

বিলাতের হেজ হগ্ বড় অদ্ভুত জানোয়ার। ইহাদের গায়ে সজারুর মত কাঁটা আছে। তবে কাঁটাগুলি ছোট। ইহারা সারা দিবস নিদ্রা যাইয়া সন্ধ্যাকালে খাদ্যান্বেষণে বাহির হয়। পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ ইহাদের প্রধান আহার। ছুচুন্দরীর মত শস্যের হানিকর পোকামাকড় নষ্ট করিয়া ইহারা কৃষকের যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অধ্যবসায় সহকারে শস্য রক্ষা করিলেও অজ্ঞ কৃষকরা ইহাদিগকে দেখিতে পাইলেই বিনাশ করিয়া থাকে। এই হেজ হগ্রা শীতকালে দেহকে বলের মত গোলাকার করিয়া নিদ্রা যায়। সে সময়ে ইহাদিগকে কিঞ্চিন্মাত্র স্পর্শ করিলেই ইহারা মাত্র একটি দীর্ঘশ্বাস টানিয়া লয়। কিন্তু ইহাদের সহজে নিদ্রাভঙ্গ হয় না। একবার একটি শীতনিদ্রিত হেজ হগ্কে প্রায় ২২ মিনিটকাল জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাতেও তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।

Dormouseএর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহাদের নাম এরূপ হইলেও ইহারা মানুষের ঘরে বাস না করিয়া মাঠে বাস করে। ইহাদের লেজ খুব রোমশ, কর্ণদ্বয় বৃহৎ এবং চক্ষুর্দ্বয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। বিলাতে পথের ধারে যে সব গুল্মাদি জন্মায়, তাহাদের মধ্যে ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে গাছের ডালপাতা ও শৈবালাদি দ্বারা ইহারা গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সারা হেমন্তকাল বাদাম প্রভৃতি যথেচ্ছ ভোজন করিয়া ইহারা অক্টোবর মাসের প্রারম্ভেই শীতনিদ্রার জন্য প্রস্তুত হয়। এই সময়ে কাঠবিড়ালীর মত ইহারা বিশেষ যত্নসহকারে নানাপ্রকার বাদাম, ফল, শস্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া নীড় পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। শীতকালে যে দিন বেশ রৌদ্র উঠে বা একটু গরম বোধ হয়, সেই দিন দুই এক ঘণ্টার জন্য জাগিয়া উঠিয়া ইহারা সঞ্চিত খাদ্যে ক্ষুধা তৃপ্তি করে এবং আহারের পর পুনরায় নিদ্রা গিয়া থাকে। এপ্রেল মাস না আসিলে প্রায়ই ইহাদের শীতনিদ্রার অবসান হয় না।

ছুচুন্দরীরা বোধ হয় শীতকালে নিদ্রা যায় না। তবে শীতের দিনে তাহারা ভূমির আরও অভ্যন্তরে গর্ত্ত খনন করিয়া অবস্থান করে। সে সময়ে সম্পূর্ণভাবে নিদ্রা না যাইলেও উহারা নিদ্রালসভাবে কালযাপন করে।

আমেরিকার স্কঙ্ক আর একটি অদ্ভুত জানোয়ার। ইহারা উজ্‌ল (Weasel) জাতীয় প্রাণী। স্কঙ্করা মানুষকে আদৌ ভয় করে না। তাড়া পাইলে ইহারা আততায়ীকে আক্রমণ করে এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত একরূপ তীব্র গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ দেহ হইতে

পরিত্যাগ করে। অনেকে বলেন, ইহাদের দংশনে জলাতঙ্ক রোগ হইয়া থাকে। এই স্কঙ্কদের শীতনিদ্রার মধ্যেও পার্থক্য আছে। আমেরিকার উত্তরভাগের স্কঙ্করা শীতকালে নিদ্রা যায়, কিন্তু দক্ষিণ-ভাগে ইহারা এ রীতি অনুসরণ করে না। আমেরিকার প্রেরিডগ- (Prariedog) দিগের মধ্যেও অনুরূপ রীতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কলিকাতার যাদুঘরে পিপীলিকাভুক্‌দের (ant-eaters) অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহারা উইপোকা ও অন্যান্য পিপীলিকার পরম শত্রু। সম্মুখ-পদের নখর দিয়া ইহারা উই ও নানা প্রকার পিপীলিকার বাসা খনন করিয়া ফেলে এবং পিপীলিকারা ঢিপির ভিতর হইতে বাহির হইতে থাকিলে সরু ও লম্বা জিহ্বা দ্বারা অতি ক্ষিপ্রতার সহিত ধরিয়া ভক্ষণ করে। এই পিপীলিকাভুক্‌রা অত্যন্ত নিদ্রাশীল। দক্ষিণ-আমেরিকার নানা স্থানে ইহারা বাস করে। অনেক সময়ই ইহারা গভীর নিদ্রায় কাটাইয়া দেয়। অষ্ট্রেলিয়ার Porcupine ant-eaterরা সারা শীতকাল নিদ্রা যায়। পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধাবস্থাতেও ইহাদের এই অভ্যাস পরি-লক্ষিত হইয়া থাকে।

সরীসৃপদিগের মধ্যে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রার রীতি দেখা গিয়া থাকে। শীতকালে সর্প, ভেক, কচ্ছপ, কুম্ভীর প্রভৃতি প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এ দেশে শীতকালে সর্পভয় থাকে না। ভারতবর্ষে যে প্রতি বৎসর বিশ সহস্রের উপর লোক সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেই সংঘটিত হইয়া থাকে। শীতকালে যাঁহারা পশুশালায় গমন করেন, তাঁহারা সর্পগৃহে কিছুই দেখিতে পান না। কারণ, সে সময়ে তৃণের মধ্যে কম্বলের ভিতর সর্পরা কুণ্ডলাকারে নিদ্রিত হইয়া থাকে। এ সময়ে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিলেও তাহারা দংশন করিতে চাহে না এবং দংশন করিলেও তাহা প্রায় প্রাণঘাতী হয় না।

ভেকরাও শীতকালে নিদ্রা যায়। আমাদের সুপরিচিত "কোলা" "কটকটে" "কুনো" ব্যাঙ বৃক্ষের কোটরে, অন্ধকার ঘরের কোণে, পুরাতন বাড়ীর ফ্লোরের মধ্যে, ইট, কাঠ, পাথরের নিম্নে প্রবেশ করিয়া সারা শীত নিদ্রায় কাটাইয়া দেয়। শীতপ্রধান দেশে ইহারা বৎসরের অর্দ্ধেক বা তাহারও অধিককাল ঘুমাইয়া কাটায়। আমি বহুকাল পূর্ব্বে একটি বড় ফুলগাছের তলায় কোটর হইতে ২।১টি "কট্‌কটে" ব্যাঙ বাহির করিয়াছিলাম। তাহাদের আকার কৃশ হইয়া গিয়াছিল এবং চক্ষুও মুদ্রিত ছিল। তাহাদের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাস বা জীবনীশক্তির বিশেষ কোন লক্ষণ বিদ্যমান দেখি নাই এবং বহুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়াও উহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে পারি নাই। প্রাণের অস্তিত্ব থাকিলে প্রাণিগণে ভাব যেরূপ হয়, ঐ ভেকদিগের মাত্র সেই ভাব লক্ষ্য করিয়া ছিলাম।

বর্ষাকালেই ভেকের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তখ মনে হয়, জগৎ বুঝি ভেকময়। কিন্তু ঐ লক্ষ লক্ষ ভেক শীত সমাগমে একবারে দৃষ্টির অন্তরালে সরিয়া পড়ে। বর্ষা ভেকদে প্রজননকাল। এই সময়ে যে ভেকদের অবিশ্রান্ত রব শুন যায়, উহা যৌন-সমাগমের সঙ্কেতমাত্র। যৌন-সমাগমের অবসা হইলেই উহাদের কর্ণভেদী চীৎকারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে বর্ষার শেষে ভেকরা বিরল হইয়া আইসে এবং শীতের প্রারম্ভেই কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া থাকে। এই বহুকালব্যাপী নিদ্রার সময় ইহারা আদৌ ভক্ষণ করে না। শীতপ্রধান দেশে শীতনিদ্রার সময় বহু ভেকের জীবননাশ ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ বহু শিশু ভেক ও বৃদ্ধ ভেক শীতের অবসানে আর লোকচক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত হয় না। যাহারা পঙ্কের মধ্যে এবং তুষার হইতে সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় পায়, তাহারাই শীতনিদ্রার পর আবার উঠিয়া আসিয়া থাকে। শীতনিদ্রার সময় পঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে ভেক জীবিত থাকিতে পারে না। পাক চৌবাচ্ছার মধ্যে শীতনিদ্রার নিমিত্ত ভেকের স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে তাহারা অল্পকালের মধ্যেই মরিয়া যায়।

কচ্ছপরাও খুব শীতের সময় মাটির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া নিদ্রিত হইয়া থাকে। আবার প্রবল গ্রীষ্মের সময়ে ইহারা মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রা যায়। এই নিদ্রাকে aestivation বা গ্রীষ্মনিদ্রা বলে। ইহার বিষয় পরে বিবৃত করিব। কুম্ভীররা প্রবল শীতে অসাড়ভাবে নদীর পাড়ে গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাটায়। টিক্‌টিকিও শীতের সময় এই ভাবে অবস্থান করে। আমার শয়নপ্রকোষ্ঠে কতকগুলি জ্যেষ্ঠীর গতিবিধি আমি পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। প্রবল শীতের দিন ইহাদিগকে বড় একটা দেখি নাই। আবার গ্রীষ্মের সময়েও ছবির পশ্চাদ্ভাগে ইহাদিগকে গ্রীষ্মকালীন নিদ্রায় অলসভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়াছি। সে সময়ে ছবি নড়াইয়া দিলেও ইহারা সরিয়া যায় না। টিকটিকি ব্যতীত আমি ঊর্ণনাভদিগকেও এই ভাবে ছবির পশ্চাতে, আলমারীর পাশে, তক্তাপোষের নিম্নে, বাক্সের পিছনে অসাড়ভাবে অবস্থান করিয়া নিদ্রা যাইতে দেখিয়াছি। সে সময়ে সামান্য তাড়া দিলেও ইহারা পলায়ন করে না। তবে শীতপ্রধান দেশে ইহারা সম্পূর্ণরূপে শীতনিদ্রায় কালযাপন করিয়া থাকে।

ট্রাপ্‌ ডোর স্পাইডার্‌ নামক এক জাতীয় মাকড়সা তাহাদের বাসার ডালা লালা দ্বারা একবারে বন্ধ করিয়া নিদ্রা যায়।

অপরাপর মাকড়সাও দেহজাত ঊর্ণা দ্বারা বৃক্ষত্বকের মধ্যে, প্রাচীরের ফাঁকের ভিতর, ইট-পাথরের তলে একটি কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে নিদ্রা যায়।

আমাদের গৃহ-মক্ষিকাদিগকেও শীতকালে বড় একটা দেখা যায় না। গ্রীষ্মের সহিত উহাদের আবির্ভাব হয় এবং গ্রীষ্মের প্রাবল্য যতই অধিক হয়, ইহাদের সংখ্যাও তত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শীতের প্রারম্ভে যে সব মক্ষিকা ডিম্ব প্রসব করে, সে সকল ডিম শীতের পর ফুটিয়া থাকে। সারা শীত অণ্ডের মধ্যে শিশু-মক্ষিকা নিদ্রিত থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মের সময় ডিম ফুটিতে আদৌ বিলম্ব হয় না। কয়েক দিবসের মধ্যেই অণ্ড হইতে শাবকরা নিক্রান্ত হইয়া থাকে। শীতকালে দক্ষিণ-আফ্রিকায় এই সকল কারণেই পোকা-মাকড় বিরল হইয়া পড়ে। বসন্তাগমের সহিত তথায় কীট-পতঙ্গের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

প্রজাপতিদিগের অণ্ডের মধ্যেও শাবকরা সারা শীত প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। আমি একবার একটি যজ্ঞডুম্বর বৃক্ষের ত্বকের মধ্যে একটি শুককীটকে (Cater pillar) নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়াছিলাম। চেষ্টা করিয়াও তাহাকে জাগাইতে পারি নাই। শীতপ্রধান দেশে এইরূপ বহু পোকা-মাকড় সারা শীত বৃক্ষাদির মধ্যে নিদ্রায় কাটাইয়া দেয়। প্রচণ্ড শীতের সময় অনেক শুককীট শীতে একবারে জমিয়া যায়। সে সময়ে ইহাদিগকে বরফের টুকরার মত ভাঙ্গিয়া ফেলা যায় এবং এ অবস্থায় অনেক কীটেরই প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু কতকগুলির মধ্যে গ্রীষ্মসমাগমে বরফ গলিয়া গেলে আবার ধীরে ধীরে জীবনীশক্তির সঞ্চার হইতে দেখা যায়।

শীতের সময় ছারপোকার উৎপাত থাকে না। শীতকালে মাছির মত মৎকুণরাও পর্য্যঙ্কের ফাঁকে প্রবেশ করিয়া নিদ্রা যায়। এ বিষয়ে সকলেরই কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকারা শীতকালে নিদ্রা যায় না। প্রবল শীতের দিনে ইহারা গর্ত্তের মধ্যেই সক্রিয় থাকে। মধুমক্ষিকারা চক্রের মধ্যে পুঞ্জীভূতভাবে অবস্থান করে। মধুচক্রের মধ্যে বহু মক্ষিকার সমাগম হেতু যে তাপের উদ্ভব হয়, তাহাতেই তাহারা স্বচ্ছন্দে সজাগভাবে অবস্থান করে।

বিছা, কেন্নো প্রভৃতিও প্রবল শীতে ইষ্টক, প্রস্তর ও কাঠের নিম্নে নিঝুমভাবে কালাতিপাত করে।

মাছের মধ্যেও শীতনিদ্রার রীতি দেখা যায়। বিলাতের কার্প, রোচ, প্রভৃতি মৎস্য কাদার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রা যাইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ায় একপ্রকার পেঁকো মাছ দেখা যায়; তাহারা শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই পাঁকের মধ্যে থাকিয়া নিদ্রা যায়। শীতের সময় শীতপ্রধান দেশে মাছ বরফের মধ্যে জমিয়া সুপ্তাবস্থায় অবস্থান করে। মাছরা বরফের মধ্যে জমিয়া গেলেও বহুক্ষণ সজীব থাকিতে পারে। হিমমণ্ডলে মাছ জলাশয় হইতে লাফাইয়া তীরে পড়িয়া গেলে অনেক সময় বরফের মধ্যে জমিয়া যায়, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে আবার জলের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাম্‌বারলাণ্ডে এক ব্যক্তির একটি পোষা ট্রাউট মাছ ছিল। একবার শীতকালে সে মাছটি বরফের মধ্যে জমিয়া যায়। বরফের মধ্যে জমা অবস্থায় সেই মাছটিকে কয়েক দিবস সাধারণের মধ্যে প্রদর্শিত করা হয়। পরে বরফ গলিয়া গেলে মাছটি পুনরায় সন্তরণ দিতে থাকে। সাইবিরিয়ার নদী সকল জমিয়া গেলে বরফ খুঁড়িয়া মাছ বাহির করা হইয়া থাকে। কখন কখন মৎস্যশুদ্ধ বরফের চাপ বাজারে আনিয়া বিক্রয় করা হয় এবং রন্ধনশালায় লইয়া গেলে অগ্নির তাপে সেই সমস্ত মৎস্য আবার সজীব হইয়া উঠে। এ দেশেও নিদাঘের প্রচণ্ড তাপে যখন খাল, বিল, পুষ্করিণী শুকাইয়া যায়, তখন ভেক ও মৎস্য পাঁকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রীষ্মনিদ্রার মধ্যে কালাতিপাত করে। পরে বর্ষাসমাগমে পুষ্করিণী প্রভৃতি জলপূর্ণ হইলে ইহারা পঙ্কের মধ্য হইতে বাহির হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে অনেকেই বোধ হয় এইরূপ বারিহীন জলাশয়ের তলে কাদা খুঁড়িয়া মাছ বাহির করিতে দেখিয়া থাকিবেন।

আমার বাটীর নিকটস্থ একটি নিম্ন ভূমিখণ্ডে প্রতি বর্ষায় মাত্র এক বা দেড় হাত পরিমাণ জল জমিয়া থাকে এবং গ্রীষ্মে উহা শুকাইয়া মাঠে পরিণত হয়। পূর্ব্বে যে ঐ স্থানে পুষ্করিণী ছিল, তাহা অনুমানসাপেক্ষ। বর্ষার পরে স্থানীয় লোকরা ঐ ঐ স্থান হইতে শিঙ্গি, মাগুর, শোল প্রভৃতি মাছ ধরিয়া থাকে। সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠের মধ্যে মৎস্য জন্মাইতে দেখিয়া বোধ হয় অনেকেই বিস্মিত হইয়া থাকিবেন। আমি অনেকবার কর্দ্দমের মধ্য হইতে মাছ খুঁড়িয়া বাহির করিতে দেখিয়াছি। সে সময়ে সে স্থানে আদৌ জল ছিল না এবং জল না থাকায় মাছ তখন শীতের প্রারম্ভেই শীতনিদ্রার জন্য কর্দ্দমমধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বহু প্রাণী শীতনিদ্রা অপেক্ষা গ্রীষ্মনিদ্রায় কালাতিপাত করিয়া থাকে। প্রবল গ্রীষ্মের দিনে প্রখর রৌদ্রতাপে জলাশয়ের জল শুকাইয়া গেলে ভেকরা পুষ্করিণীর তলদেশে নামিয়া পাঁকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রা যায়। পুষ্করিণীর তলদেশ খনন করিলে একই স্থানে বহু ভেককে অবস্থান করিতে দেখা যায়। বেশ এক পশলা বৃষ্টি

পাইলেই আবার তাহাদের ডাক শুনা যায়। সম্প্রতি বৈশাখের এক দারুণ গ্রীষ্মের দিনে বেলা চারি ঘটিকার সময় প্রবল বারি-বর্ষণ হইয়াছিল। বৃষ্টি থামিয়া গেলে আমি বাগানে হঠাৎ ভেকের রব শুনিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পরদিন আর সে রব শুনি নাই।

নদী, খাল, বিল প্রভৃতির জল শুকাইয়া গেলে কুম্ভীররা জলের অন্বেষণে অন্যত্র বিচরণ করে। জল না মিলিলে উহারা পঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রা যায়। আমেরিকার বহু শাখা-নদীর জল শুকাইয়া গেলে তথাকার মৃত্তিকা খনন করিলেই কুম্ভীরের প্রোথিত দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। একবার দক্ষিণ-আমেরিকার অ্যামাজন নদীর মোহানায় এক দ্বীপে ভীষণ অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাতে বহু কুম্ভীর জলের অন্বেষণে দ্বীপ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে। এক স্থানে প্রায় ৮ হাজার ৫ শত কুম্ভীরের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। বহু স্থানে এইরূপ রাশি রাশি কুম্ভীরের কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বোধ হয়, জলের অন্বেষণে গমন করিতে প্রাচীনকালেও কুম্ভীররা জলের অভাবে দেহ ত্যাগ করিয়াছিল।

গেঁড়ী, শামুক প্রভৃতিও শীতকালের মত প্রবল গ্রীষ্মের সময়ে ইট-কাঠে, পাতার নিম্নে থাকিয়া নিদ্রা যায়। বৃষ্টি পড়িলেই উহারা আবার ধীরে ধীরে ডালের উপর উঠিয়া আইসে।

ঝিনুকও প্রবল তাপের দিনে পাঁকের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে প্রবল নিদাঘের সময় বহুসংখ্যক শুক্তি জলের মধ্যে অসাড়ভাবে থাকিয়া কালাতিপাত করে।

মানুষের মধ্যেও এই শীতনিদ্রা ও গ্রীষ্মনিদ্রার রীতি কমবেশ আছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। মেরুপ্রদেশ ও হিমমণ্ডল প্রভৃতি স্থানে দিবালোকের অত্যল্পতা হেতু তদ্দেশবাসীদিগকে বাধ্য হইয়া শীতনিদ্রার রীতি অবলম্বন করিতে হয়। আবার বিষুবমণ্ডলের প্রখর সূর্য্যকিরণে অনেকেই বাধ্য হইয়া দিবানিদ্রা ও অতিনিদ্রার বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। রুসিয়ার রাজধানী লেনিনগ্রাডের দক্ষিণে স্কভ্ নামক ১১০৬৯ বর্গ-মাইলব্যাপী একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে। তথাকার অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। শুনা যায়, শস্যের অপ্রাচুর্য্য হেতু তাহারা শীতের অর্দ্ধেক দিন নিদ্রায় কাটাইয়া দেয়। প্রথম তুষারপাত আরম্ভ হইলেই স্কভ্‌বাসীরা কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দীর্ঘনিদ্রার আয়োজন করিয়া থাকে। দিবসে একবারমাত্র উঠিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিয়া তাহারা আবার নিদ্রা যায়। উত্তর-সাইবিরিয়া, ল্যাপল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন ও রুসিয়ার উত্তর-ভাগে যখন প্রবল তুষারপাত হয়, তখন ঐ সকল জনবিরল প্রদেশের অধিবাসীরা খাদ্যাভাবে ও শীতের তাড়নায় স্বভাবতঃই শীতনিদ্রায় কালযাপন করিতে বাধ্য হয়।

উদ্ভিদের মধ্যেও শীতনিদ্রার রীতি দেখা যায়। শীতের পূর্ব্বে আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি গাছের পাতার মধ্যে সূর্য্যালোকের সাহায্যে উদ্ভিদের ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য-উপাদান সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল উপাদান প্রস্তুত হইবামাত্রই মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ কাণ্ড-সমূহে চালিত হইয়া থাকে। তথায় ঐ সকল উপাদান হইতে নব কিশলয়, মুকুল, কাণ্ড, শাখা প্রভৃতির অঙ্কুর সকল উৎপন্ন হইয়া বসন্তের অপেক্ষা করে। সারা শীত এই পত্র, পুষ্প, শাখা, কাণ্ড প্রভৃতির অঙ্কুর সকল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে নিষ্ক্রিয়াবস্থায় অবস্থান করে। শীত যতই প্রবল হয়, এই সকল অঙ্কুরাদি ততই মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ কাণ্ডাদির অংশে প্রবেশ করে। তুষারপাত প্রবল হইলে উদ্ভিদ মৃত্তিকার আরও নিম্নে এই সকল অঙ্কুরকে লুকাইয়া রাখে। শীতের অবসান হইলে ঐ সকল অঙ্কুর বৃক্ষের গাত্রে পত্র, মুকুল, পুষ্পরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

হ্রদ, তড়াগ ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে অনেক জলজ লতা শীতাগমের পূর্ব্বে জলের তলে নামিয়া পড়ে এবং সারা শীত তথায় সঙ্কুচিতাবস্থায় অবস্থান করে। শীতাগমে পুনরায় উহারা জলের উপর ভাসিয়া উঠে।

শীতপ্রধান দেশে একপ্রকার জলজ লতায় শীতের পূর্ব্বে নূতন শাখার উদ্গম হইয়া থাকে এবং জলাশয়ের উপরিভাগের জল শীতল হইয়া জমিয়া যাইবার পূর্ব্বেই ঐ সকল শাখা মূল কাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জলের তলে ডুবিয়া যায় এবং তথায় পঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রবল শীত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন শাখার মূলভাগ পেরেকের মত সূক্ষ্ম হওয়ায় পঙ্কে প্রবেশ করিতে উহাদিগকে কোনও বাধা পাইতে হয় না। শীতাবসানের পর উহারা আবার উপরে ভাসিয়া উঠিয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া থাকে।

এইবার পশুদের শীত-নিদ্রার বিষয়ে আরও দুই এক কথা বলিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। শীতনিদ্রার পূর্ব্বে ভল্লুক প্রভৃতিরা বিশেষ ভোজন দ্বারা দেহকে মেদপূর্ণ করিয়া থাকে। সুদীর্ঘ উপবাস-নিদ্রায় তাহাদের শরীরের সমস্ত বসা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কারণেই শীতের শেষে ভল্লুক, সর্প প্রভৃতিকে অত্যন্ত ক্ষীণ ও নিস্তেজ দেখা যায়। উপবাসের সময় এই মেদই উহাদের জীবনী শক্তিকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে। শীতনিদ্রার পর ইহাদের দেহের ওজন শতকরা প্রায় ত্রিশ হইতে চল্লিশ ভাগ কমিয়া যায়। শীতনিদ্রার পূর্ব্বে কোন কোন প্রাণীর গলদেশের

থাইমস্ গ্ল্যাণ্ডটি চর্ব্বিতে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং ঐ গ্ল্যাণ্ডের মধ্যস্থিত চর্ব্বি শ্বেতসার ও চিনিতে পরিণত হইয়া নিদ্রিত প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ও মাংশপেশীর শক্তি রক্ষা করে। কিন্তু যে সকল প্রাণী শীত-নিদ্রায় অভ্যস্ত, তাহাদের সকলের মধ্যে এই গ্ল্যাণ্ডটি না থাকায় এ বিষয়ে এখনও কিছু সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

শীতনিদ্রার সময় কোন কোন প্রাণীর মাংসপেশীর উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের বামদিকের মাংসপেশী সামান্যমাত্র স্পর্শেই বিশেষ উত্তেজিত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও প্রায় নিশ্চল হওয়ার মতই অতি ধীরে ধীরে চলিয়া থাকে। শীতনিদ্রার সময় নিদ্রিত প্রাণীদের দেহের তাপ তাহাদের আশ্রয় বিবরের তাপের অনুরূপ হইয়া থাকে। ঐ তাপকে বর্দ্ধিত করিলে অথবা ঐ তাপকে আরও কমাইয়া দিলে নিদ্রিত প্রাণী প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে এবং বিবরের তাপের সহিত দৈহিক তাপের সমতা রক্ষা করিতে না পারিলে উহাদের অবিলম্বে প্রাণবিয়োগ ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ে একটি চর্ম্মচটিকা (চামচিকা) লইয়া অনেকেই পরীক্ষা করিতে পারেন।

সুদীর্ঘ নিদ্রার পর ইহারা প্রাকৃতিক নিয়মেই আপনা-আপনি জাগিয়া উঠে। নিদ্রাভঙ্গের সময়ে ইহাদের আশ্রয়-বিবরের তাপের বৃদ্ধি না হইলেও ইহাদের দেহের তাপ আপনা-আপনিই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং এই বর্দ্ধিত তাপই ইহাদিগকে ধীরে ধীরে প্রবুদ্ধাবস্থায় আনয়ন করে।

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু (বি, এ)।

জননী পৃথিবী

এই ও পৃথিবী নম্রা অসীমা শোভনা
তারকা-খচিতা কান্তা শ্যামল-অঙ্গনা
নীল-ব্যোম-চন্দ্রাতপা জলধি-মেখলা
তৃণ-রোমাঞ্চিতা শুভ্র-কুসুম-অঞ্চলা
সূর্য্য-চন্দ্র-আঁখিমতী অরণ্য-নিবিড়া
বিশাল-প্রান্তর-ব্যাপ্তা গিরি-উচ্চ-শিরা
পবন-প্রফুল্লা বিহঙ্গম-বাক্‌ময়ী
সলিল-শীতলা স্থিরা ঝঞ্ঝাবজ্রজয়ী
নীরদ-কুন্তলা বরিষণ-স্নেহপ্লুতা
লক্ষ-কোটি-জীব-নর-খাদ্য-অন্ন-যুতা
জননী পোষিকা পালয়িত্রী চিরদিন,
সবারে আদরে অঙ্কে রাখিয়াছ লীন—
হে মাতঃ ধরণী ধাত্রী জননী আমার!
মেঘ-ঢাকা চন্দ্র-গর্ভ এই অন্ধকার
আনিল গোপন-বার্ত্তা আমার শ্রবণে,—
বুঝি আজ অন্তরের অন্তস্তলে মনে
তুমি মোরে পোষিয়াছ, করি' স্তন্যদান
মৃত্তিকার রসে, আমি তোমারি সন্তান,
তব বক্ষে চিরকাল রব শেষ-হীন।
সন্ধ্যা ও প্রভাত আর সব রাত্রি-দিন
স্পর্শ করি' যাবে মোরে, সর্ব্ব যুগে-যুগে
জীব কিম্বা তৃণরূপে উল্লাসে ও সুখে
জীবন-অমৃত পিয়ে রব চিরজয়ী;
যে প্রাণ এখন বহি, সেই প্রাণ বহি'
রহিব জীবন্ত আমি।

এই সত্য সার
চিত্তে মোর রক্ত সাথে আজি বারম্বার
ধ্বনিয়া নাচিয়া উঠে জাগায়ে চেতনা।
তাই আজ চেয়ে রই এই অতুলনা
সুন্দরী শ্যামলা মোর পৃথ্বী মাতা পানে!
সর্ব্ব-কোলাহল ভেদি' গুপ্ত মোর প্রাণে
ধরার প্রাণের স্পন্দ করিছে আঘাত,—
মাতৃ-হৃদয়ের যথা স্নেহের সংবাদ
লভে বক্ষাশ্রিত শিশু।

নাহি অবসান,
আমি যে মৃত্তিকা-প্রাণে চিরপ্রাণবান্!

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

গোল টেবিলের বৈঠক

১

গোল টেবিলের নাম সকলেই শুনেছেন, এবং আমার বিশ্বাস, কেউ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ন'ন। কেউ কেউ হয় ত মনে করছেন যে, ব্যাপারটা "এত্তো বড়", আবার কেউ কেউ হয় ত মনে করছেন যে, ব্যাপারটা কিচ্ছুই নয়। তবে এ কথা ভরসা ক'রে বলা যায় যে, যাঁরা এ টেবিলের উপরে বিশেষ ভরসা রাখেন, তাঁদের মনেও এ ভয় আছে যে, শেষটা হয় ত দেখা যাবে, তাঁদের আশানুরূপ ফল ফল্‌ল না; অপরপক্ষে যাঁরা কোনরূপ ভরসা রাখেন না, তাঁদেরও বিশ্বাস আছে যে, আমাদের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের রূপ উক্ত টেবিলে কুছ-নেহি-ত থোড়া-থোড়া বদ্‌লাবেই।

এই গোল টেবিলের আলোচনার ফলে ভারত গভর্ণমেণ্টের রূপান্তর ঘটবেই; তবে সে নূতন রূপ আমাদের মনঃপূত হবে কি না, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন যে, বিলেতে আজ যে নাটকের অভিনয় হচ্ছে, সেটি একটি প্রহসন মাত্র, তা হ'লে তাঁর ধারণা যে অমূলক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, এ সভা যদি ফাঁকি হয়, তা হ'লে ব্যাপারটা প্রহসন না হয়ে হবে একটি ট্র্যাজেডি,—উভয় দলের পক্ষেই। বিলাতের রাজপুরুষরা এতদূর কাণ্ডজ্ঞানহীন নন যে, এই সোজা কথাটা তাঁরা বুঝতে পারেন না। বিলাত দেশটা আর যাই হোক্, রঙ্গপুর নয়—অর্থাৎ হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রীর দেশ নয়। তবে এই সব বলা-কওয়া তর্ক-বিতর্কের ফলে ভারতবাসীরা নিজের দেশের রাষ্ট্রীয় ঘরকরনা চালাবার কতটা অধিকার পাবে, তা বলা অসম্ভব। আজকের দিনে ভারতবর্ষ কি চায়, সেইটেই হচ্ছে প্রধান কথা—ইংলণ্ড কি দিতে প্রস্তুত, সেটা প্রধান কথা নয়; কারণ, তা অনুমান করবার কোন উপায় নেই। কেননা, ইংলণ্ডের রাজপুরুষদের কথা স্পষ্ট নয়। ভারতবর্ষের উক্তি যদি যথেষ্ট স্পষ্ট হয়, তা হ'লে ইংলণ্ডের জবাবও ক্রমে স্পষ্ট হতে বাধ্য হবে। দু পক্ষই হাঁ-না হাঁ-না করলে আইনে যাকে বলে ইযুধার্য্য, তা হবে না। আর এ রাষ্ট্রীয় মামলায় উভয়পক্ষের মধ্যে আর কিছু না হোক্, ইযুধার্য্য হবেই।

২

এদেশ থেকে যাঁরা দেশের লোকের মুখপাত্রস্বরূপে গোল টেবিলে আসন গ্রহণ করতে বিলেতে গিয়েছেন, অথবা যাঁদের সেখানে চালান দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মুখের কথা দেশের লোকের বুকের কথা হবে কি না, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ ছিল। কারণ, এই তথাকথিত প্রতিনিধির দলকে আমরা elect করিনি, সরকার বাহাদুর select করেছেন। বলা বাহুল্য যে, এ মামলায় উকীল নির্ব্বাচনের ভার যদি দেশের লোকের হাতে থাক্‌ত, তা হ'লে এঁদের অনেককেই আর কষ্ট ক'রে সমুদ্রলঙ্ঘন করতে হত না। এঁদের প্রতি সরকার যে অনুকূল, তার প্রমাণ পূর্ব্বেও পাওয়া গেছে। সুতরাং এঁরা যে দেশের হয়ে এই রাষ্ট্রীয় মামলা তেড়ে লড়বেন, অর্থাৎ ষোল-আনা দাবী করবেন, এ ভরসা দেশের লোকের ছিল না। তার পর আর এক দল আছেন, মুসলমান উকীল, যাঁরা মনে করেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধী। তার পর আছেন ভারতবর্ষের অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজারাজড়ার দল। এই রাজারাজড়াদের মনের কথা, আমাদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অবিদিত। ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ে যাঁদের পূর্ব্বপুরুষরা এককালে খেলা করেছেন, তাঁদের বংশধররা যে ক্রিকেট ও পোলো ব্যতীত আর কোনও খেলা খেলতে পারেন, এ ধারণা আমাদের ছিল না। সুতরাং এই তিন দলে যে গলা মিলিয়ে একই সুরে একই কথা বলবেন, এ আশা কেউ করেনি—অন্ততঃ আমি ত করিনি। কিন্তু আমাদের পরস্পরের শিক্ষা-দীক্ষা, অবস্থা ও ধর্ম্মের বৈষম্য সত্ত্বেও সকলেরই যে মনের কথা মূলতঃ এক, তার প্রমাণ—সকলেই সমস্বরে বলেছেন, ভারতবর্ষ আর পরবশ থাক্‌তে চায় না, আত্মবশ হতে চায়; অর্থাৎ সকলেই চায় স্বরাজ। এ কথা পূর্ব্বে অনেকে মুখ ফুটে না বললেও যে সকলেরই চিরকেলে মনের কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আজ যে তাঁরা মুখ ফুটে বলছেন, তার কারণ তাঁদের পিছনে আছে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রবল ইচ্ছাশক্তি। লোকমতকে উপেক্ষা ক'রে

স্মত প্রকাশ করতে আজকের দিনে কেউই সাহসী নন।

৩

মানুষের মনোভাব ততক্ষণ অস্পষ্ট থাকে, যতক্ষণ না তা একটি কথায় সাকার হয়, সংক্ষেপে তার নামকরণ হয়। আমাদের পলিটিক্যাল সমাজে এই আত্মবশ হবার আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বপ্রথম নামকরণ করেন দাদাভাই নওরোজি। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কংগ্রেসে নওরোজি মহোদয় বলেন যে, দেশের লোক যা চায়, সে হচ্ছে স্বরাজ। বাঙলা দেশের যে স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র ভারতবাসীর মনকে নাড়া দেয় ও ঝাঁকিয়ে তোলে, তার থেকেই এই স্বরাজ কথা জন্মগ্রহণ করে। তার পূর্ব্বে এ কথা যে কেউ শোনে নি, তা নয়। তবে কংগ্রেসের কাছে এই তারিখেই তা প্রথম গ্রাহ্য হয়। দাদাভাই বলেন যে, ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির গভর্ণমেণ্ট যেমন তদ্দেশবাসীদের করায়ত্ত, ভারতবাসীরাও তদ্রূপ এদেশের গভর্ণমেন্টকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করতে চায়। অর্থাৎ Dominion Statusই হচ্ছে ভারতবাসীদের কাম্য, এবং তারা যতদিন তা লাভ না করে, ততদিন অশান্তিতে থাকবে। এই স্বরাজ শব্দ Dominion Statusএর বাঙলা তরজমা, কিংবা Dominion Status স্বরাজ শব্দের ইংরাজী তরজমা, তা বলতে পারিনে। তবে বহু লোকের কাছে যে স্বরাজ Dominion Statusএর প্রতিশব্দ ব'লে গ্রাহ্য হয়েছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই বলছি এই কারণে যে, লোকে যে উপায় অবলম্বন করে, তার থেকেই তাদের উদ্দেশ্য ধরা পড়ে, মুখের কথায় নয়। আর বহু লোকের পক্ষে কোন বিষয়ে একমত হ'তে হ'লে যে একটি কথার সাহায্য চাই, তা ধর্ম্ম সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এই গোল টেবিলের বৈঠকে সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসীরা যে একবাক্যে Dominion Statusএর দাবী করেছেন, এইটেই প্রমাণ যে, অন্ততঃ এ বিষয়ে সকল সম্প্রদায়ের মতের ঐক্য আছে। যেখানে মানুষের মনের ঐক্য আছে, সেখানে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের পার্থক্য টেঁকসই নয়।

৪

মনোভাব যেমন নামের অপেক্ষা রাখে, নামও তেমনই রূপের অপেক্ষা রাখে। নাম ততক্ষণ শুধু কথার কথা থেকে যায়, যতক্ষণ না তা একটি বিশেষ রূপের ভিতর আবদ্ধ হয়। যা কিছু বাস্তব, তারই যে নামরূপ আছে, এ সত্য ত হিন্দুমাত্রেই জানেন।

ভারতবাসীদের সর্ব্বজনকাম্য স্বরাজ কি রূপ ধারণ করবে, তাই এখন হয়েছে গোল টেবিলের বৈঠকের সমস্যা। আজকে এ দেশে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যে মূর্ত্তি আছে, তারই এক-আধটু বদলসদল ক'রে আমরা তার যে রূপই খাড়া করিনে কেন, তাতে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বরাজ-রূপের দর্শন পাওয়া যাবে না। ভারতবর্ষের তিন ভাগের এক ভাগ সে স্বরাজের বাইরে প'ড়ে থাকবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ম্যাপে যে অংশ এখনও টক্-টকে লাল রঙে ছোপানো হয় নি, সেই অ-বৃটিশ ভারতবর্ষ এখন যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই থেকে যাবে—বাকী ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে। এই অর্দ্ধস্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের মনের যোগও একরকম ছিন্ন হয়ে গেছে।

ইংরাজীতে যাকে বলে Native States, সত্য কথা বলতে হলে আমরাও তাদের Natives মনে করি। যদিও এই সব অর্দ্ধ-স্বরাট দেশ ভারতবর্ষের জিওগ্রাফিরও বহির্ভূত নয়, হিষ্টরিরও বহির্ভূত নয়। এদের বাদ দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বরাজ গঠন, কারও idealও হতে পারে না, realও হবে না। ইতিপূর্ব্বে আমরা কাগজে-কলমে যে স্বরাজের নক্সা এঁকেছি, তাতে Native Statesএর কোনও স্থান নেই শুধু তাই নয়, বৃটিশ-ভারতবর্ষের সঙ্গে অ-বৃটিশ ভারতবর্ষের কি সম্বন্ধ হবে, তাও আমরা স্পষ্ট ক'রে ভাবতে পারিনি। এ দুই ভারতবর্ষের মিলনের কথাটা হয় উহ্য রয়ে গেছে, নয় গোঁজামিলন দিয়ে সারা হয়েছে।

৫

আমাদের দেশের বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রটার রূপ যে কি, তা এখন দেখা যাক্। গোল টেবিলের বৈঠকের জনৈক প্রধান ব্যক্তি—যিনি এ যন্ত্র ভেঙ্গে নূতন যন্ত্র গড়বার হদিস্ বাৎলাচ্ছেন, তাঁর মুখেই শোনা যাক্ এ যন্ত্র কোন্ শ্রেণীর। Lord Sankey বলেছেন যে :—

"British India at present is a "Unitary State," divided for convenience into provinces, and is not a number of provinces federated to form a State.

There was hardly any organic connexion between the provinces. There was no organic connexion between the States, or any one of them and British India."—Statesman, Nov. 30.

অর্থাৎ বৃটিশ ভারতবর্ষের এক প্রদেশের সঙ্গে অপর প্রদেশের কোনরূপ যোগ নেই; তাদের এইমাত্র যোগ আছে যে, সব প্রদেশই এক শাসনাধীন। অর্থাৎ বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ বা কোন জাতিরই রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নেই, সবাই অধীন, সবাই অপ্রধান। উপরন্তু Native Statesগুলিরও পরস্পরের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নেই, এবং তারা বৃটিশ ভারতের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত। বৃটিশ-রাজ আজ যে সব প্রদেশ গড়েছেন, সে একমাত্র শাসনের সুবিধার জন্য। আর যদি দরকার মনে করেন, তা হ'লে কালই একটা Province ভেঙ্গে দুটো প্রদেশ করতে পারেন, যেমন বঙ্গভঙ্গের সময় করেছিলেন; অথবা দুটোকে জুড়ে একটা করতে পারেন, যেমন বিহার ও উড়িষ্যাকে করেছেন। এ যোগ প্রাণের নয়, শাসনের। প্রাণীর দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যোগ প্রাণের যোগ, কিন্তু জড়পদার্থকে আমরা ইচ্ছামত যুক্ত ও বিযুক্ত করতে পারি। বৃটিশ ভারতবর্ষের ঐক্য এই জড়পদার্থের যোগ-ফল! যতদিন আমরা উপরের চাপের বশীভূত থাকব, ততদিন এ ঐক্য থাকবে; আমাদের প্রাণের স্ফূর্তির উদ্রেকে এ যোগ নষ্ট হবে।

৬

প্রথমতঃ এ শাসনযন্ত্রটা Unitary, তার পর এ য়ুনিয়নও যোড়াতাড়া দিয়ে গড়া হয়েছে। এ যন্ত্রটাকে মেরামত ক'রে কোনও নূতন যন্ত্রে পরিণত করা অসম্ভব। Sir John Simon এ যন্ত্রটার গড়নের বিষয় কি মতামত প্রকাশ করেছেন, তা শোনা যাক্:—

The Government of India Act was one of the most complicated instruments ever devised. He asked how many people outside experts and specialists were really prepared to give a reasonably full and accurate account of its contents.—Statesman, Nov. 30.

এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনে। কারণ, আমি এ বিষয়ে expert নই, specialistও নই। সে কারণ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, ব্যাপারটা একটা বিশ্রী খিচুড়ি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই হ য ব র ল'কে উল্টো-পাল্টা ক'রে সাজাবার প্রস্তাবই এ যাবৎ হয়েছে। ফলে যা আগাগোড়া জটিল, তাকে কেউ সরল করতে কৃতকার্য্য হন নি। যন্ত্র যেমন আছে, তেমনি রেখে, শুধু বিলেতি যন্ত্রীর পরিবর্ত্তে দেশী যন্ত্রীর হাতে এ কল চালাবার ভার যাঁরা দিতে চেয়েছিলেন, তাঁরা এ কথাটা লক্ষ্য করেন নি যে, বিরাজ্যেই এ যন্ত্র চলে, স্বরাজ্যে একেবারে অচল হয়ে পড়ে। সুতরাং স্বরাজ্যের শাসনযন্ত্র অন্য নমুনায় গড়তে হবে। ভারতবর্ষের প্রতি দেশ প্রতি জাতি যাতে ক'রে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সেই ব্যবস্থাই আমাদের করতে হবে। সে আদর্শ হচ্ছে United States of India।

৭

যে পদ্ধতি অনুসারে United States of Americaর রাষ্ট্রতন্ত্র গড়া হয়েছে, তারই নাম Federal Government; এবং আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে এ তন্ত্রের আদি ও সর্ব্বপ্রধান নমুনা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর যে-সকল দেশের Dominion Status আছে, যথা ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা প্রভৃতি, সবই উক্ত আদর্শে গড়া হয়েছে, সবই Federal Statesএর সমষ্টিমাত্র। এক কথায়, ও-সব দেশের প্রতি প্রদেশ তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে এক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কতকগুলি বিষয়ে প্রতি প্রদেশ স্বরাট, আর অপর কতকগুলি বিষয়ে রাজকার্য্য চালাবার ভার সকল প্রদেশের মিলিত প্রতিনিধি-সভার উপর ন্যস্ত হয়েছে। প্রতি প্রদেশের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা আছে,* স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা আছে, যাদের কাষের উপর হস্তক্ষেপ করবার Central Governmentএর বিশেষ কোনও অধিকার নেই। সকল প্রদেশই স্বতন্ত্র ও স্বরাট, অথচ পরস্পর যুক্ত হয়ে এক

দেশ হয়েছে। যাকে বলে Unitary গভর্ণমেন্ট, তা' কেবল ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেশের পক্ষেই সম্ভব ; আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যে-সকল দেশে Unitary গভর্ণমেন্ট আছে, সে-সকল দেশও আজ decentralisationএর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছে। এক রাজা অথবা এক পার্লামেন্টের অধীন থাকা য়ুরোপের কোন দেশই আজকের দিনে শ্রেয়স্কর মনে করে না। একমাত্র রাষ্ট্রের ঐক্যের খাতিরে এ যুগের য়ুরোপের লোকেরা অন্যান্য বিষয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বলিদান দিতে প্রস্তুত নয়। কেননা, তাদের ধারণা যে, লোক-সমাজ যখন federal, তখন রাষ্ট্রতন্ত্র federal হওয়া উচিত ; অন্যথা মানুষের বিশেষত্ব পূর্ণ বিকশিত হবার সুযোগ পায় না, উপরের চাপে দ'মে যায়। এই Federal Government-এর প্রসাদে বহু লোক আংশিকভাবে রাজ্যশাসনের ভার নিজেদের হাতে পায়। যে মনোভাবের উপর democracy প্রতিষ্ঠিত, সেই মনোভাবই বিশ্বমানবকে Federal Governmentএর দিকে অগ্রসর ক'রে দিচ্ছে।

৮

অপর দেশের কথা যাই হোক্, স্বরাট ভারতবর্ষের পক্ষে একমাত্র Federal Governmentই স্বাভাবিক এবং সম্ভব। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ, দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসীরা অসংখ্য বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, এবং প্রদেশভেদে প্রতি জাতির ইতিহাস বিভিন্ন, চরিত্র বিভিন্ন, মনের গঠন ও গতি বিভিন্ন। এই বিরাট দেশ ও বিচিত্র মানবসংঘকে এক শাসনযন্ত্রে পিষে এক জাতিতে পরিণত করা সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। পরবশ ভারতবর্ষ আপাতদৃষ্টিতে ও-ভাবে একাকার হতে পারে, কিন্তু আত্মবশ ভারতবর্ষ হতে পারে না। সমগ্র ভারতবাসীর মত ও চরিত্র এক ছাঁচে ঢালাই করা তেমনি সম্ভব, তাদের মুখের ভাষা এক ভাষা করা যেমন সম্ভব। সমগ্র ভারতবর্ষের এক ভাষা হতে পারে শুধু সরকারী ভাষা—তাও যদি আবার হয় বিদেশী ভাষা! ও জাতীয় ভাষা মানুষের অন্তরের ভাষা নয়, সরকারের দপ্তরের ভাষা! ভারতবর্ষ চিরকালই নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এই খণ্ডরাজ্যগুলিকে একসূত্রে গাঁথবার উপায় হচ্ছে Federal Government। এ স্বরাজমালা গাঁথা অবশ্য সহজ নয়।

প্রথমতঃ, যুক্ত ভারতবর্ষের Central Governmentএর হাতে কোন্ কোন্ অধিকার থাকবে, ও প্রাদেশিক গভর্ণ-মেণ্টগুলির হাতে কোন্ কোন্ অধিকার থাকবে, তা স্থির করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, Central Governmentএর সঙ্গে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কি সম্বন্ধ থাকবে, তাও স্থির করতে হবে। যাঁদের মনে বর্ত্তমান Unitary Government-এর জলুসের ধাঁধা লেগেছে, তাঁরা অবশ্য Central Governmentকে প্রবল প্রতাপান্বিত করতে চাইবেন ; অপরপক্ষে যাঁরা Federal গভর্ণমেণ্টের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁরা অবশ্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির উপর উপরের চাপ যতদূর সম্ভব হাল্কা করতে চেষ্টা করবেন। ফলে এই কল্পিত নব শাসনযন্ত্র যে কাগজে-কলমে কি মূর্ত্তি ধারণ করবে, তা বলা অসম্ভব। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকার স্বরাজের মূর্ত্তি এক ছাঁচে ঢালাই হয়নি। অথচ এ সকল দেশই স্বরাট, যদিচ এর কোন দেশই নিখুঁৎ Federal Government গড়ে তুলতে পারে নি, এবং তাদের সমাজযন্ত্রের সকল অংশ খাপে খাপে মিলে যায় নি। এ রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণাসভায় কথা কইবার অধিকারে আমি যখন বঞ্চিত, তখন এ খেলা যাঁরা খেলছেন, তাঁদের কাছে উপর-চাল দেওয়া বৃথা। সুতরাং তাঁরা পাঁচ হাত মিলিয়ে ভারতবর্ষের কি স্বরাজমূর্ত্তি গ'ড়ে তোলেন, তা পরে দেখা যাবে। শেষটা হয় ত দেখব যে, এ নব শাসনতন্ত্র নামে হবে federal, কাযে হবে monarchical। মানুষে যে শিব গড়তে ব'সে কখনো কখনো বানর গড়ে, তা সকলেই জানেন।

৯

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, এ ব্যাপারে যে পক্ষ প্রবল-পক্ষ, অর্থাৎ বৃটিশরাজ, তাঁরা যে দেশের লোকের দাবী কতটা মঞ্জুর করবেন, তা বলা অসম্ভব। কারণ, এ বিষয়ে কোনরূপ অনুমান করবার উপায় নেই। সাধারণভাবে এই পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে যে, ভারতবাসীর দাবী ষোল-আনা মঞ্জুর হবে না, বড় জোর আমাদের ভাগ্যে মিলবে আধা-ডিক্রী আধা-ডিস্‌মিস্।

কিন্তু আজকের দিনে যেটা বিশেষ লক্ষ্য করবার বস্তু, সে হচ্ছে ভারতবাসীর দাবী। এখন এই বৈঠকের নানারূপ কথাবার্ত্তার ভিতর একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সে কথাটি এই যে, সমগ্র ভারতবাসী আজ যা চায়, তা হচ্ছে স্বরাজ, আর সে স্বরাজের নাম হচ্ছে Dominion Status এবং রূপ Federal Government। আর এ দাবী করেছেন সেই শ্রেণীর লোক—যাঁরা বৃটিশ-রাজের কাছে বেশী কিছু চান না, আর ছুয়ে ছুয়ে তিন করাই যাঁরা বুদ্ধিমানের কার্য্য মনে করেন; এবং রাজপুরুষরাও যাঁদের কস্মিন্‌কালেও impatient idealist ব'লে ভুল করেন নি, বরং patient realist বলেই গণ্য ও মান্য করেছেন।

তার উপর অ-বৃটিশ ভারতবর্ষও বৃটিশ ভারতবর্ষের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ জিওগ্রাফির হিসেব থেকে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন এক-তৃতীয়াংশ বাকী অংশের সঙ্গে মিলিত হতে রাজী হয়েছে,—অবশ্য বৃটিশ ভারতবর্ষ যদি স্বরাজ লাভ করে। অপর পক্ষে বৃটিশ ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীরা, অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যুরোক্রাশি-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা, বাকী ভারতবাসীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক হবার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ জিওগ্রাফি হিসেবে গোটা ভারতের ঐক্য-সাধন হোক, কিন্তু মানুষ হিসেবে তার এক-তৃতীয়াংশ বাকী অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক হোক—এই হচ্ছে তাদের দাবী। বর্ত্তমানের বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে একটি মহা সমাসে পরিণত করবার উক্ত সম্প্রদায়ও পক্ষপাতী, শুধু তাঁরা সে সমাসকে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব-সমাস করতে চান। আমাদের স্বরাজের সাধের তরণী যদি এই বিচ্ছেদ অঙ্গীকার ক'রে কালের অকূল সাগরে ভাসানো যায়, তা হ'লে তার ফল কি হবে, তা সকলেই জানেন।

১৩

ভারতবর্ষের নানা ভূভাগের নানা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যে আমাদের ideal সম্বন্ধে একমত হয়েছেন এবং সে মত স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করেছেন, এর কারণ, এ দাবীর পিছনে লোকমতের প্রচণ্ড ঠেলা আছে। এ বৈঠকের ফলে আর কিছু হোক না হোক, এইটুকু হয়েছে যে, বর্ত্তমান ভারত যে অবিলম্বে আত্মবশ হতে চায়, সে বিষ বৃটিশরাজের কোনরূপ সন্দেহের আর অবসর নেই। দাবী ছোট ছেলের আবদার নয়, যা ভোগা দিয়ে ভুলি দেওয়া যায়।

এর পর ভারতবর্ষ যদি স্বরাজ লাভ না করে, এ দেশে বর্ত্তমান অশান্তি উত্তরোত্তর ঘোরতর অশান্তিতে পরিণ হবে। মানুষের মনের গতির সঙ্গে জীবনযাত্রা যদি পৃথ হয়ে পড়ে, তা হ'লে এই মন ও জীবনের অসামঞ্জস্যটা তা জীবন-মনকে একসঙ্গে ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির ক'রে তোলে।

অপরপক্ষে ভারতবর্ষ কাল যদি স্বরাজ লাভ করে তা হ'লে পরশুই যে আমরা পরস্পর মারামারি কাটাকা করতে আরম্ভ করব, অর্থাৎ আবার স্বরাজ হারাতে বস তার কোনও সম্ভাবনা নেই। এ দেশের লোক প্রধান সভ্যতার পোষমানা জীব, হিংস্র জন্তু নয়। পরস্প পরস্পরের প্রতি প্রভুত্বের চাইতে সখ্যের চর্চ্চা করাই এ জাতের পক্ষে বেশী স্বাভাবিক।

আর এক কথা, এই নূতন স্বরাজ যে কেউ আমাদের গালে চড় মেরে কেড়ে নেবে, এ আশঙ্কা সম্পূ অমূলক। গোটা ভারতবর্ষ কেউ কখন বাহুবলে করায়ত্ত করতে পারেনি। পুরাকালে নানা প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা যখন পরস্পর দাঙ্গাহাঙ্গামা ক'রে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করেছিলেন, তখনই যে স্বদেশী বা বিদেশী রাজা এই ভাঙ্গা ভারতবর্ষকে আঠা দিয়ে জুড়তে পেরেছেন, তিনিই ভারতবর্ষের একেশ্বর হয়েছেন। অপরপক্ষে এই নব স্বরাজ্য হবে গোটা ভারতবর্ষের যুক্ত স্বরাজ্য, এবং তা প্রতিষ্ঠিত হবে, অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বালখিল্য রাজশক্তির উপর নয়, সমগ্র ভারতের মিলিত প্রজাশক্তির উপর।

সে যাই হোক, ভারতের পূর্ণ-স্বরাজের দর্শন যে আমাদের ভাগ্যে মিলবে, তার সম্ভাবনা নেই; তবে আমাদের ছেলেরা যে তা হাতে পাবে, এ আশা করবার বৈধ কারণ আছে। অবশ্য সে স্বরাজ আকাশ থেকে পড়বে না, নীচে থেকেই গড়ে তুলতে হবে; এবং তার জন্য চাই জ্ঞান ও কর্ম্মের ঐকান্তিক চর্চ্চা। ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি গড়েছে প্রকৃতি, কিন্তু ভারতের হিষ্টরি, গড়েছে, গড়ছে ও গড়বে—পুরুষ।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কৈলাস-যাত্রী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

মানসের পশ্চিম তট দিয়া নীচে নীচে আমরা উত্তরদিকে অগ্রসর হইলাম। কিছু দূর গিয়াই এক স্থানে অনেকগুলি অস্থিকঙ্কাল (বোধ হয় ঝব্বুরই) পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া, নিকটেই শ্মশান আছে কি না, রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করায় সে হাসিয়া উত্তর করিল, "বরফ পড়িলেই এখানে জীব-জন্তুর পরিণতিতে এইরূপ শ্মশানক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়।" শীতের প্রারম্ভে হয় ত ঝব্বুরা দল বাঁধিয়া একসঙ্গে চরিয়া বেড়াইতেছে। অকস্মাৎ প্রবল তুষারপাতে তাহারা নিশ্চল হইয়া গেল! তখন আর অন্য উপায় থাকে না। প্রায় ২।৩ মাইল আন্দাজ গিয়া বামদিকে তটের উপরেই "গোসল্" গুম্ফা * দৃষ্টিগোচর হইল। উপর হইতে এক জন লামা অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাদিগকে এই মঠ পরিদর্শন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার কথায় আমরা তীর ছাড়িয়া কেহই উপরে উঠি নাই।

প্রায় ৫।৬ মাইল আরও আগে গিয়া আমরা এই হ্রদের উত্তরপশ্চিম কোণ বরাবর আসিয়া পৌঁছিলাম। তটদেশে কিছু দূর বিস্তৃত বালুর উপরে কতকগুলি বালি-হাঁস ও বক চরিতে দেখিয়া যাত্রিগণ সকলেই মানস-হ্রদের হাঁস সম্বন্ধে আলোচনা তুলিলেন। কেহ বলিলেন, "প্রবাদ আছে, মানসের হাঁস জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে খাঁটি জিনিষ অর্থাৎ দুগ্ধটুকু পৃথক্ করিয়া লইতে পারে।" তদুত্তরে আর এক যাত্রী উত্তর করিলেন, "ইহা ত সকল হাঁসই পৃথক্ করিয়া লয়, তবে মানসের হাঁসের বিশেষত্ব এই যে, আকৃতিতে ইহা রাজহংস অপেক্ষা কিছু বড় হইবে।" এ কথা শুনিয়া আর এক জন বলিয়া উঠিলেন, "বড় ত বটেই, অধিকন্তু মানসের হাঁস সাধকবিশেষ অর্থাৎ একবারে নির্লোভ ও জিতেন্দ্রিয়।" এই কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেকেই তখন সেই জলচরদলের মধ্যে আসল হাঁস নিশ্চয়ই মিলিতে পারে মনে করিয়া ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয়, একটিও সেরূপ হাঁস দেখা গেল না! অবশেষে যাত্রি-দলের মধ্যে এক জন যখন দৃঢ়ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আসল হাঁস এ সময়ে নহে, শীতকালে লোকচক্ষুর অগোচরে এই হ্রদের তটদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়," তখন সকলেই যেন তাঁহার কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। আমার কিন্তু সে সময়ে "সাহিত্য-দর্পণের" সেই শ্লোকটি কেবল মনে আসিতেছিল—

"জলধরসময়ে মানসং যান্তি হংসাঃ।"

স্বদেশ, জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন, ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত পরি-ত্যাগ করিয়া এই তুষার-কিরীটী হিমালয়-পারে আসিবার কালে সকলেরই মনে যথেষ্ট আশা ছিল, মানস-তীরে আসিয়া সাধু-সন্দর্শন অবশ্যই লাভ হইবে। কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি, সাধু-সন্দর্শন দূরের কথা, চর্ম্মচক্ষুতে সাধকরূপী হংস পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া গেল না। এত বড় অপার হ্রদের কোন্ পারে এ সময়ে তাহারা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা কে বলিয়া দিবে! সিউয়েন্ হেডিন্ "রাবণ হ্রদ" বেড়াইবার কালে বন্য হাঁসদিগের আড্ডা কোথায় অনুসন্ধান করিতে গিয়া এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন,—"At the North-eastern foot of the elevation is a rather flat pebbly Plateau. Here the wild geese breed in spring and here lay still several thousand eggs in twos, threes or fours in a nest of stones and sand."—175 page, Trans Himalaya Vol. II.

"রাবণ হ্রদের" উত্তরপূর্ব্বদিকে পাহাড়ের কোন প্রশস্ত যায়গায় এই বন্য হাঁসদিগের আড্ডা আছে বলিয়াই এইখানে মানসের উত্তরপশ্চিম তটে আমরা এই সকল বন্য হাঁসকে চরিতে দেখিলাম। এই তটই ত রাবণ-হ্রদের উত্তরপূর্ব্ব-দিকে রহিয়াছে। তিনিও যে আসল হাঁস (যাহা আকৃতিতে বড়) দেখিতে পান নাই, তাহা তাঁহার পুস্তক পাঠে বেশ বুঝা যায়। যাহা হউক, একটু আগে গিয়া চড়াইএর পথে আমরা বিস্তৃত ময়দান পাইলাম। সে পথ দিয়া একটু আগে অগ্রসর হইলে আমাদের বামদিকে সম্মুখভাগে তিন জন বন্দুকধারী তিব্বতী ঘোড়সওয়ারকে পাশ দিয়া মানসের দিকে ফিরিতে দেখিলাম। আমরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে চলিয়া আসিতেছি, কেবল রঞ্জন আসবাবাদিসহ ঝব্বুর দল

* ইহা হ্রদের জল হইতে প্রায় ১ শত ৩০ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

লইয়া আমাদের অনেকটা পশ্চাতে পড়িয়াছিল। ক্রমশঃ এই সওয়ার তিন জন ঝব্বু দলের দিকে হঠাৎ গতি ফিরাইয়া পরস্পর সম্মুখীন হওয়ায় আমাদের দলের মধ্যে অনেকেরই সে দিকে দৃষ্টি গেল। যতদূর মনে হইল, সওয়ার তিন জনে ও ঝব্বুওয়ালারা যেন দাঁড়াইয়া কোন কথাবার্ত্তা কহিতেছে। স্বামীজী ও ডাক্তারের দল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঝব্বুর উপরেই ত আমাদের যত কিছু আসবাবাদি, সুতরাং বন্দুকধারী সওয়ার-ত্রয়ের সেখানে দাঁড়াইবার কারণ কি? সংশয়সঙ্কুলচিত্তে যাত্রীদের মধ্যে প্রায় ৭।৮ জন একসঙ্গে পশ্চাদ্দিকে দৌড়িয়া গেলেন। ঝব্বুদিগের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছিলে পর তাহারা ঘোড়ার গতি ফিরাইয়া অন্য দিকে চলিল। রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, "আমরা কোথায় যাইতেছি, কোন্ পথ দিয়া ফিরিব ইত্যাদি" সমস্ত বিষয় সন্ধান লইতেছিল। পাঠকবর্গ! শুনিয়া বিস্মিত হইবেন না, মানসের তটে সাধু-দর্শনের যাহা কিছু উচ্চ আশা বা অভিলাষ ছিল, তাহা আমাদের কপালগুণে দুই দুইবার এই প্রকার সাধুর দলই (?) অযাচিতভাবে পূরণ করিয়া দিয়াছিল! বেলা ৪টা আন্দাজ সময়ে আমরা একটি খালের পার্শ্বে পাড়ের উপরে পৌঁছিলাম। নীচে জল দেখিয়া এইখানেই তাঁবু খাটাইয়া রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করাই স্থির হইল।

কৈলাস-যাত্রাপথের মানচিত্র

এই খালে জল অল্প থাকিলেও মানস ও রাবণ হ্রদের সহিত ইহা সংযুক্ত রহিয়াছে এবং ইহার গতি রাবণ হ্রদের দিকেই প্রবাহিত।* তিব্বতের মানচিত্র দৃষ্টে জানা যায় মানসের উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১৫ হাজার ৯৮ ফুট উচ্চে অবস্থিত, আর রাবণ হ্রদের উচ্চতা প্রায় ১৫ হাজার ৫৬ ফুট। সুতরাং রাবণ হ্রদ মানস অপেক্ষা প্রায় ৪ ফুট নীচেই বহিয়া যাইতেছে।

আমরা যেখানে তাঁবু খাটাইলাম, তাহার পূর্ব্ব কোণে একটা উচ্চ পর্ব্বত স্তম্ভের উপরে 'জু' (Chiu) গুম্ফা শোভা পাইতেছিল। এতগুলি নূতন যাত্রী দেখিয়া সেখান হইতে একটি ব্যাঘ্রাকৃতি কুকুর গুরুগম্ভীর আওয়াজে আমাদিগকে ঘন ঘন অভ্যর্থনা জানাইয়া দিল। আমরা কিন্তু সময়াভাবে এই গুম্ফা দর্শনে যাইতে পারিলাম না। এই গুম্ফার কিছু দূরে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। যাত্রীর মধ্যে কেহ কেহ সেখানে গিয়া বেড়াইয়া আসিলেন। আমরা আপন আপন জলযোগের আয়োজনেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এ দিন এই খালের জলই আমাদিগের সকলের তৃষ্ণা দূর করিয়াছিল।

পরদিন অর্থাৎ ৬ই শ্রাবণ সোমবার প্রভাতে ৯টার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া আবার অগ্রসর হইলাম। রাব

* রঞ্জন এই খালটিকে "শতদ্রু" বলিয়া বুঝাইয়া দিল। ইহার জল রাবণ-হ্রদে মিশিয়া তথা হইতে 'তীর্থপুরী' অভিমুখে গিয়াছে।

হ্রদকে বামে রাখিয়া এইবার আমরা সম্মুখেই প্রশস্ত ময়দান পাইলাম।

আজ "কৈলাসের" সম্মুখভাগে উপস্থিত হইবার কথা। সকলেই নবীন উৎসাহে কেহ পদব্রজে, কেহ বা ঝব্বু-পৃষ্ঠে মহোল্লাসে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। আমাদের ৪টি ঘোড়াই ময়দান পাইয়া বেশ প্রফুল্লতা বোধ করিল। বৃক্ষলতাহীন এই প্রকাণ্ড উন্মুক্ত প্রান্তরে একটা পক্ষী পর্য্যন্ত উড়িতে দেখিলাম না। চারিদিকেই নিস্তব্ধতা, কেবল আমাদেরই সঙ্গের ভারবাহী ঝব্বু গুলির গলায় বাঁধা ঘণ্টার এককালীন রুনুঝুনু শব্দ আরতির ঘণ্টার মত বিশ্ব-প্রকৃতিকে সে দিন কি যেন একটা অন্তরের আরাধনা জানাইয়া দিতেছিল! এই ঝব্বু রা একসঙ্গে দল বাঁধিয়া যাইতে বিশেষ ভালবাসে।

প্রশস্ত ঝরণার জলে ঝব্বু সমেত পার

ভালবাসার আতিশয্যে তাহারা পরস্পর পরস্পরের গাত্র-সংলগ্ন হইয়া এমনই ভাবে চলিয়া থাকে যে, সময়ে সময়ে যাত্রীদিগের পায়ে পায়ে 'ঘেঁস' লাগিবার যথেষ্ট আশঙ্কা হইয়া পড়ে। বেলা ১২॥০টা আন্দাজ সময়ে আমাদিগকে একটি নদী পার হইতে হইল। সুখের বিষয়, এ নদীতে স্থানে স্থানে জল কম থাকায়, সেখান দিয়া প্রথমে ঝব্বু রা পর পর পার হইয়া গেল। জল দেখিলে ইহারা যেন জল-হংসের মত জলে নামিতে ব্যস্ত হয়। পৃষ্ঠে যে বড় বড় বোঝা বাঁধা রহিয়াছে, সে দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করে না। ঘোড়া কিন্তু সহজে জলে নামিতে চাহে না। ঝব্বু র উপর যাঁহারা সওয়ার ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হাঁটু পর্য্যন্ত পদদ্বয় জলে ভিজিয়া গেল। উত্তরপাড়ার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঝব্বু তেই যাইতেছিলেন। তাঁহার ঝব্বু টি জল হইতে লম্ফ দিয়া যখনই তীরে উঠিতে গেল, অতর্কিতে তাঁহার দীর্ঘ দেহখানি সে সময়ে পৃষ্ঠচ্যুত হইয়া একবারে তুষার-শীতল জলের মধ্যে আছাড়িয়া পড়িল! এ ব্যাপারে যাত্রিগণ হায়! হায়! করিয়া উঠিলেন। রঞ্জন তৎক্ষণাৎ জল হইতে তাঁহাকে তুলিয়া লইল। তাঁহার ভিজা কাপড়, জামা ইত্যাদি সমস্ত খুলিয়া দিয়া অপর যাত্রীদিগের গাত্র-বস্ত্র হইতে কতক কতক আচ্ছাদন দেওয়াতে তবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে যাত্রায় একটু সুস্থ বোধ করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে আবার সকলেই আগে চলিতে লাগিলাম। প্রায় ৫ মাইল দূরে গিয়া "পরখা" নামক ছোট গ্রামটিকে বাম দিকে রাখিয়া আবার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই আকাশ বিলক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণকাল-মধ্যেই গর্জ্জন ও বর্ষণ সুরু হইয়া আমাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

মস্তকোপরি ছাতা ধরিয়া এই উন্মুক্ত প্রান্তর-মাঝে আপন আপন বাহনোপরি কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। দুই পাঁচ মিনিট বৃষ্টি হইয়াই সঙ্গে সঙ্গে নূতন উৎপাত সুরু হইল। অজস্রধারে শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল। সে শিলা-পাতের উৎপাতে আমাদের ঘোড়া বা ঝব্বু কে স্থির রাখা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষণকালমধ্যেই সমস্ত ময়দান লক্ষ লক্ষ করকায় ভরিয়া গেল। বৃষ্টির ধারা কতকটা কমিয়া আসিতেই আবার আমরা অগ্রসর হইলাম। এবারে ২।৩টি নালা পড়িল। নালার আশে-পাশে বহুদূর পর্য্যন্ত রাস্তা বাঙ্গালা দেশের মাঠের মত বিলক্ষণ কর্দ্দমযুক্ত হইয়া পড়ায় ঝব্বু ও ঘোড়াগুলির পাদদেশ প্রায় এক হাত করিয়া মাটীতে বসিয়া যাইতেছিল। অগত্যা আমাদিগকেও পদব্রজে সেই কর্দ্দমাক্ত জমী পার হইতে হইল। বেলা ৪টা আন্দাজ সময়ে "কুচু" নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত

হইলাম। আজ প্রায় ১০।১১ মাইল পথ অতিক্রম করা হইল।

আকাশ তখনও মেঘমুক্ত হয় নাই। আমরা যেখানে তাঁবু খাটাইলাম, তাহার আশে-পাশে লাসা হইতে আগত

লাসার ব্যাপারী (ফুহুতে)

অনেকগুলি তিব্বতী ব্যাপারী ব্যবসায়ার্থ আসিয়া কতকগুলি তাঁবু খাটাইয়া রাখিয়াছে। তাহাদিগের সঙ্গে অগণিত ভেড়ার দল ও এক একটি ভীষণদর্শন কুক্কুর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

তাঁবু খাটাইয়া রঞ্জন একবার এই দলের মধ্যে ঘুরিয়া আসিল। ততক্ষণে আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিল। রৌদ্র-কিরণে চারিদিক আবার উদ্ভাসিত হইতেই পূর্ব্বদিকে এই প্রান্তরের শেষ ভাগে "কৈলাসের" উজ্জ্বল তুষার-শৃঙ্গ গোলাকার রজত-শুভ্র স্তূপের মত সম্মুখে দেখিতে পাইলাম।

এই সেই "শ্রীকৈলাস"—যাঁহাকে দর্শন করিবার আশায় এতগুলি যাত্রীর আকুল নয়ন আজ এত দিন ধরিয়া বিহ্বলের মত খুঁজিয়া বেড়াইতেছে! কোথায় সেই জটাজুটধারী, বিভূতিভূষণ যোগিশ্রেষ্ঠের মহিম-সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় মূরতি—যাঁহার পার্শ্বে সমাসীনা সেই কোটি-চন্দ্রপ্রভা নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিতা দিব্যাঙ্গনা পার্ব্বতী! সিদ্ধসেবিত এই পর্ব্বতেরই শিখরদেশে কোন্ এক লুক্কায়িত রত্ন-শিলা-পরি তাঁহাদের দিব্যাসন সুসজ্জিত রহিয়াছে, তাহা কে বলিয়া দিবে! যুগযুগান্ত ধরিয়া এই শ্রীকৈলাস হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে নানারূপে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে।

তখন সেখানে তাল-তমাল-বনরাজি-পরিবেষ্টিত, বৃক্ষলতা-ফল-ফুল-শোভিত সুরম্য উপবন ছিল। আঙ্গিরস মুনির মত অসংখ্য যোগি-ঋষিদিগের সাধনাশ্রম নয়নপথে পতিত হইত! সেখানে দেব-গন্ধর্ব্ব-লোকের শত শত ভক্তবৃন্দ নিয়তই হর হর ব্যোম রবে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তুতিগানে ব্যোমমণ্ডল মুখরিত রাখিত! আশুতোষের আশু তুষ্টি লাভ করা অসহজ মনে হইত না! আর আজ সেখানে যুগযুগান্তের পরিবর্ত্তনে কি দেখিলাম, সবই প্রস্তরময়, প্রস্তরের অস্থি-কঙ্কালবিশিষ্ট কেবলই নগ্ন মূর্ত্তি উত্তরদক্ষিণে সুবিস্তৃত রহিয়াছে। মধ্যস্থলে বাণলিঙ্গের মত চিরতুষার-সমাচ্ছন্ন একটি উজ্জ্বল রজত-স্তূপ সেই স্থানের চিরন্তন মহিমা আজও প্রকীর্ত্তিত করিতেছে! এই স্তূপের দুই দিকেই পাহাড়শ্রেণীতে একবারে তুষার না থাকায় মধ্যস্থলের
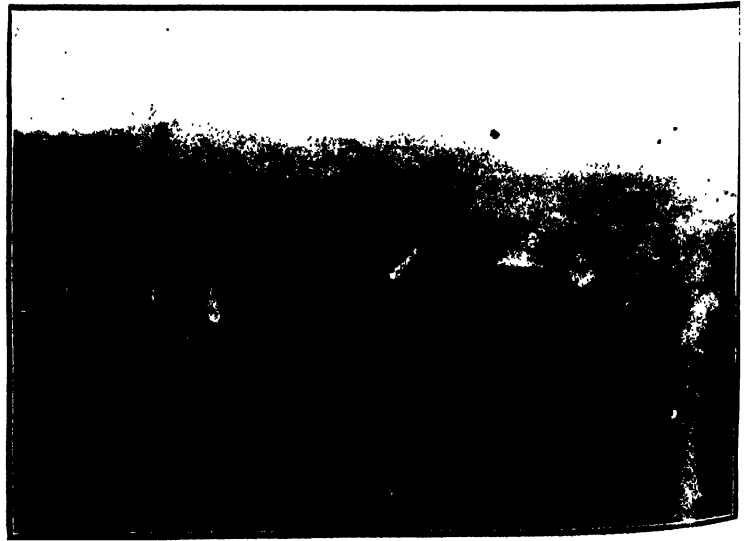
ফুহুতে আমাদের তাঁবু—সম্মুখে কৈলাস-শৃঙ্গ

এই তুষারের অত্যুচ্চ স্তূপটি দেবলোকের মন্দিরের মত চক্ষুকে সে দিন ঝলসিত করিল। পাঠকবৃন্দ! ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যদি কেহ কোন দিন চর্ম্মচক্ষুতে এ দৃশ্য দেখিবার সুযোগ লাভ করেন, তবে আমার আপনাদিগের নিকটে এইটুকু নিবেদন, জীবনের দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাত তুচ্ছ করিয়া একবার যেন এই অপরূপ শ্রীকৈলাস দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে কদাচ বিস্মৃত না হয়েন! দিগন্তপ্রসারী এই পর্ব্বতের সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া মনে করিবেন, মানুষ আপনার ভোগবাসনা প্রভৃতি তুচ্ছ প্রবৃত্তি সকল এখানে আসিয়াই যেন একবারে বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। সংসারের সুখ, সাধ, আশা, মায়া সবই যেন নিমেষের জন্য যোগি-শ্রেষ্ঠের ঐ চির-নির্ব্বাণ সমাধিস্তূপের নিম্নে আপনা হইতেই আছাড়িয়া পড়ে!

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে জানা যায়, তখনকার যুগে তীর্থক্ষেত্রের যে স্থানে যেরূপ 'খুঁটি'নাটি বর্ণনা আছে, যুগযুগান্তের পর সেই ক্ষেত্র আজ অনেক স্থানে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে। কালে হিমালয়ের অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের আশপাশ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান এক দিন সমুদ্রজলে নিমজ্জিত ছিল।

বৈবস্বত মনু বদরিকাশ্রমে তপস্যাকালে চিরণী নদীর জলের এক মৎস্য তাঁহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলে, রাজর্ষির আশ্রয় লাভ করত তাহার আকার ক্রমশঃই এত বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাধ্য হইয়া তিনি মৎস্যকে অবশেষে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে সময়ে কৃতজ্ঞ মৎস্য রাজর্ষিকে জানাইয়াছিল, অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত স্থান সমুদ্রজলে প্লাবিত হইবে, তিনি যেন সে সময়ে নৌকারোহী হইয়া তাহার (এই মৎস্যের) প্রতীক্ষা করেন। যথাসময়ে হিমালয়ের সর্ব্বত্র সমুদ্রজলে প্লাবিত হইলে, মৎস্যের কথামত রাজর্ষিপ্রবর সপ্তর্ষিমণ্ডলকে সঙ্গে লইয়া সৃষ্টি-রক্ষার্থ সকল প্রকার বীজ সংগ্রহ করিয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন,—

> "বীজান্যাদায় সর্ব্বাণি সাগরং পুপ্লুবে তদা।
> নৌকয়া শুভয়া বীর মহোর্ম্মিণমরিন্দম॥"
>
> মহাভারত, বনপর্ব্ব ১৮৭ অধ্যায়।

তার পর এই মৎস্যের সাহায্যে (ইহার শৃঙ্গের সহিত নৌকার রজ্জু বন্ধন করিয়া) তাঁহার নৌকাকে হিমালয়ের শেষ অত্যুচ্চ শৃঙ্গে (যাহা নৌবন্ধন নামে খ্যাত) বন্ধন করিয়া রাখা হইয়াছিল।

> "অস্মিন্ হিমাবতঃ শৃঙ্গে নাবং বধ্নীত মা চিরম্।
> সা বদ্ধা তত্র তৈস্তূর্ণমৃষিভির্ভরতর্ষভ॥"
>
> বনপর্ব্ব ১৮৭ অধ্যায়।

ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, পরিবর্ত্তনশীল যুগে যুগে যেখানে আজ তুষারধবল পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হইতেছে, সেখানেও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ এক সময়ে খেলিয়া গিয়াছে। সুতরাং কৈলাসের পাদদেশ আজ বনস্পতিহীন বলিয়া স্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। "কলৌ স্থানানি পূজ্যন্তে" এ কথা শাস্ত্রকারগণ শতমুখে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন-বনবিহারী নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ কবে কোন্ যুগে তাঁহার সাধের বৃন্দাবনে ঐশ্বরিক লীলায় প্রমত্ত হইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, আজ সেখানেও তখনকার বর্ণনের সহিত সবটুকু সাদৃশ্য আমাদের চোখে প্রত্যক্ষীভূত হয় না! আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তিব্বতের এ সকল প্রদেশে এখনও বৃহৎ বৃহৎ জন্তুর অস্থিকঙ্কাল বাহির করিয়া জঙ্গলের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই উন্মুক্ত প্রান্তর যে এককালে একটা বিরাট জলাশয়ে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ইহার বিস্তৃতি দেখিলেই সহজে অনুমিত হয়। এই কৈলাসের দৃশ্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া কবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

> "গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
> কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
> শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
> রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥"
>
> মেঘদূত, পূর্ব্বমেঘ, ৫৯ শ্লোক।

অর্থাৎ, মেঘকে সম্বোধন করিয়া কবি কহিতেছেন, *

> "উঠ্‌বে গিয়ে কৈলাসে ভাই
> ঊর্দ্ধে আরও এগিয়ে তুমি,
> করুলে শিথিল, বাহুর চাপে
> রাবণ যাহার ভিত্তিভূমি!

---

* শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব বিরচিত কাব্যগ্রন্থ হইতে বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল।

অভ্রভেদী বিরাট গিরি
তুষারপাতে দেখায় যেন,
দেবনারীদের প্রসাধনের
দীপ্ত উজ্জ্বল মুকুর হেন!
অসংখ্য তার শুভ্র শিখর
কুমুদ-ফুলের তুল্য সাদা,
শিবের যেন অট্ট হাসি
যুগযুগান্তে জমাট বাঁধা।"

এই যুগযুগান্তের জমাট-বাঁধা শিবের অট্টহাসি সত্যই আজ তৃষিত নেত্রে সকলে প্রত্যক্ষ করিলাম। বারম্বার দেখিয়াও হৃদয় ও মন কিছুতেই যেন পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। এত দিনে এই দুর্গম যাত্রা সার্থক হইয়াছে মনে করিয়া কবির * একটা বর্ণনা সে সময়ে ক্ষণেকের জন্য আমার স্মরণ হইল,—

"কৈলাস-গিরীন্দ্র-মাঝে সদাশিব সদা রাজে
নিরুপম মনোরম ধাম,
ভয়ে রবি শশী চলে পবন সভয়ে খেলে
সুরাসুর সকলে সমান।
পাখী গাহে শিব-গান নদীজলে কল-তান
লতা দোলে 'শিব শিব' ব'লে
মিলে যত সুরবালা ডালা ভ'রে গাঁথে মালা
নগবালা তুলে দেয় গলে।"

মহাভারতে কৈল্যাসের আশেপাশে কিম্‌পুরুষের † যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের তাঁবুর পার্শ্বে এক এক করিয়া অনেকগুলি কিম্পুরুষের আবির্ভাব হইল। কোন কিম্‌পুরুষ আজানুশোভিত আলুথালু পরিধান করিয়া বিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্ত এই সভ্যভব্য জীবগুলিকে ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিল। কেহ বা তাঁবুর কাপড় উল্টাইয়া সন্ধ্যার ঘোরে ভূতের মত অকস্মাৎ তাঁবুর মধ্যে মুখ বাড়াইয়া দিল। হারিকেন আলোর সম্মুখে অজানা দেশের স্ত্রীলোক দেখিয়া বিহ্বলের মত আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া পরক্ষণেই হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। সভ্যতা বলিয়া যে একটা সীমাবদ্ধ জিনিষ আছে, তাহা তাহাদের ধারণারও অতীত। পাগল ভোলা ভূতনাথের সীমানা-মধ্যে এই সকল জীববিশেষ যাত্রীদিগের মনে বেশ একটা আতঙ্ক উপস্থিত করে। সে দিনকার একটি ভূতকে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। ভূতটির পৃষ্ঠদেশে একটি চর্ম্মবিহীন আস্ত ছাগলের শোণিত-সিক্ত অস্থিমাংস ঝুলিতেছিল। একে তাহার দীর্ঘাকৃতি বিকট-দর্শন, তায় তাহার হাতের আঙুলে বড় বড় নখ উঠিয়াছে। মাথায় ঘন-পিঙ্গল রুক্ষ জটা, সর্ব্বোপরি বিলক্ষণ ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত লম্বা আচ্ছাদন দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। এই কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তির দৃশ্যে চমকিত না হইয়া থাকা যায় না। এরূপ মূর্ত্তির সম্মুখে এই উন্মুক্ত প্রান্তরে যদি কেহ একলা পড়িতেন, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহার সেখানে এক দফা সাহসের পরীক্ষা হইয়া যাইত। শুনিলাম, পৃষ্ঠদেশের এই কাঁচা মাংসই তাহার কিছুকালের আহার। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে প্রতিদিন ইনি এই মাংস হইতে কতকটা কাটিয়া লইয়া অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় (ইন্ধনের এখানে খুবই অভাব) উদরস্থ করিয়া থাকেন।

নূতন স্থানে আসিয়া আমরা যতক্ষণ এই সব আলোচনা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, রঞ্জন ততক্ষণে "তারচিন" হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই তারচিন এখান হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বদিকে কৈলাসের পাদদেশে অবস্থিত। আসিবার সময়ে বুদ্ধিমানের মত সে সেখানকার ৩।৪ জন পাহাড়ীর নিকট হইতে প্রায় ৫।৬ সের দুগ্ধ খরিদ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিল। বলা বাহুল্য, যাত্রীদিগের সুখ-সুবিধার প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

প্রথম কৈলাস-দর্শন-দিবসে একসঙ্গে এতটা দুগ্ধ সংগ্রহ হওয়ায় যাত্রীদিগের মধ্যে ইহাই স্থির হইল, "কৈলাসপতির উদ্দেশে আজ এই দুগ্ধের পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া নিবেদন করা হউক।" অবশ্য এই দুগ্ধকে পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ যেন গো-দুগ্ধ মনে না করেন। সমস্তই পাহাড়ী ছাগ-দুগ্ধ। তদনুসারে পায়সান্ন প্রস্তুতের ভার আমাদের দিদির উপরেই অর্পিত হইল। এই পায়সান্ন প্রস্তুতের জন্য যথেষ্ট 'ইন্ধন' আবশ্যক। অনেক কষ্টে এক জন তিব্বতীর নিকট হইতে কিছু কণ্টকযুক্ত তৃণবিশেষ খরিদ করিয়া লওয়া হইল। তার পর এই দুগ্ধকে চাউল মিশ্রিত করিয়া রূপান্তরে পরিণত করা

---

* মদীয় স্বর্গগত মাতুল ৺হরকুমার শাস্ত্রী প্রণীত "শঙ্করাচার্য্য" নাটক হইতে উদ্ধৃত।

† কিম্ অর্থে কুৎসিত বুঝায়।

সে একটা সে দিনের বিরাট উদ্যোগপর্ব্ব মনে হইয়াছিল। প্রথমতঃ তূণে আগুন ধরাইতে পুরা এক বোতল কেরোসিন তৈল নষ্ট হইল। তার পর যদি বা তূণে অগ্নিদেব দর্শন দিলেন, শীতের প্রতাপে শিখা তুলিতে তিনি একবারেই অক্ষম! এতগুলি যাত্রীর মনস্তুষ্টি করিতে শেষ কামার-মিস্ত্রীর লোহা গলাইতে আগুনে যে অস্ত্র লাগে অর্থাৎ—"হাফর" লইয়া অগ্নির পশ্চাতে সংযোগ করিতে হইল। * আমি ও শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল সেই অস্ত্রের সাহায্যে অগ্নির সহায়তা করিলেও যদি বা চাউল সিদ্ধ হইল, দুগ্ধ কিন্তু কিছুতেই গাঢ় হইল না। পূর্ব্বে জানিতে পারিলে এরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে কেহই স্বীকার করিতেন না! যাহা হউক, এইরূপে সে দিন এই "দুধ-ভাত" বা তথাকথিত পায়সান্ন কৈলাসপতিকে নিবেদন করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অরুচির মুখে এই রুচির বস্তু (ঠিকমত তৈয়ার না হইলেও) সে দিন যে অতীব উপাদেয় ও মধুর বোধ হইয়াছিল, তাহা সে সময়কার প্রত্যেকের আহারের পরিমাণেই স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল।

তারচিনের নিকটে ভেড়ার দলের পৃষ্ঠে বোঝা

পরদিন অর্থাৎ ৭ই শ্রাবণ প্রভাতে যথাসম্ভব শীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া ৮৷৷০ আন্দাজ সময়ে সকলেই অগ্রসর হইলাম। যাইবার পূর্ব্বে এখানে রঞ্জনের পরিচিত জনৈক ব্যবসায়ীর তাঁবুর মধ্যে যাত্রীদিগের কতক কতক জিনিষপত্র (যাহা না লইলে চলে) ভারবাহীদের সুবিধার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল। এ দিন হইতেই কৈলাসের পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। পরিক্রমার পথ মোটের উপর প্রায় ৩০ মাইল। কষ্টসহিষ্ণু যাত্রিগণ সাধারণতঃ এ পথ পদব্রজেই অতিক্রম করিয়া থাকেন। আমাদের এতগুলি যাত্রীর মধ্যে ৭।৮ জন ব্যতীত আর সকলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাহনোপরি চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ, আমরা বুঝিয়াছিলাম, সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১৬ হাজার ফুট উচ্চে এ প্রদেশের এই সমতল ময়দান পার হইতেই, আমাদের মধ্যে অনেকেরই শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা অনুভব হইতেছিল। তার উপর রঞ্জনের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, পরিক্রমার শেষ দিনে গৌরীকুণ্ডের অত্যুচ্চ চড়াই অতিক্রম করা এখনও বাকী আছে। সেইটি উঠিতে পারিলেই আমাদের চড়াইএ উঠার পরীক্ষা শেষ হয়। যাহা হউক, অদ্যকার এই যাত্রায় "তারচিন"কে দক্ষিণে রাখা হইল। এখানে "গাংডা" নামে একটি মঠ আছে। এখান হইতে চিরতুষার-সমাচ্ছন্ন এই স্তূপটিকে কেন্দ্র করিয়া বামাবর্ত্ত হইয়া প্রদক্ষিণ সুরু করিলাম। কতকটা উত্তর, কতকটা বা পূর্ব্বমুখ হইয়া পথ বাঁকিয়া গিয়াছে; সর্ব্বত্রই তৃণবিহীন নগ্ন পাহাড়ের অস্থিকঙ্কাল ব্যতীত কোথাও সবুজ বর্ণের লেশমাত্র নাই। পথের মাঝে মধ্যে মধ্যে কেবল বিচিত্র বর্ণের অগণিত প্রস্তরখণ্ডে তিব্বতীদিগের লিখিত সেই "ওঁ মণিপদ্মে হুং" মন্ত্র সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। ভাষা অনেকটা দেবনাগর অক্ষরের মত। এইরূপে কিছু দূর

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ

যাইতেই একটি নদী পড়িল। নদীটি প্রশস্ত হইলেও ইহার জল আদৌ গভীর নহে। স্থানে স্থানে বিভক্ত হইয়া একই

* এ পথে অগ্নি জ্বালিতে হাফরের প্রয়োজন হইবে শুনিয়া বাটী হইতে যাত্রাকালে একটি সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। এই একটি দিন মাত্র উহার ব্যবহার হইয়াছিল। এ পথে ঠোঙই বিশেষ কাযে লাগে।

দিকে তর-তর বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। আশে-পাশে কতকটা বালু ও ছোট ছোট নুড়ি-মিশ্রিত তটদেশ। আমরা এই নদীকে বামে রাখিয়া এইবার কতকটা দক্ষিণমুখ হইয়া আগে চলিলাম। এ সময়ে ক্ষণেকের জন্য কৈলাসের স্তূপটি পাহাড়ের অন্তরালে পড়ায় আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছিল। এক স্থানে একটু ঢালুপথে প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে আচম্বিতে দিদির ঘোড়াটি লাফাইয়া উঠায়, তাল সামলাইতে না পারিয়া এ দিন তিনি একটু আঘাত পাইলেন। অগত্যা আজ বেশী দূর যাওয়া হইল না। ৬।৭ মাইল পথ অগ্রসর

নিয়ান্দি গুম্ফা হইতে কৈলাস

হইয়াই এই নদীতটের এক স্থানে তাঁবু খাটান হইল। তখন বেলা প্রায় ২॥০টা বাজিয়াছে। নদীর অপর পারে পাহাড়ের কোলে আবার একটি গুম্ফা দেখা গেল। তাহার নাম শুনিলাম "নিয়ান্দি"। কেহ কেহ "শুকুর্" গুম্ফাও বলিয়া থাকেন। দক্ষিণভাগে চোখের সম্মুখেই আবার সেই তুষার-সুন্দর স্তূপ। এবারে আমরা উহার অতি নিকটেই (পাদদেশে বলিলেই চলে) রহিয়াছি। দিন থাকিতে এ স্থানে পৌঁছিয়া, সকলেই এই কৈলাস সম্বন্ধে আজ কত প্রকার তর্ক-বিতর্ক আলোচনা আরম্ভ করিলেন; মনে মনে ভাবিলাম, এই সেই শ্রীকৈলাস (?)—যাহাকে দেখিয়া কবে কোন্ যুগে মহাভারতে লিখিত হইয়াছে,—

"অত্যতিক্রম্য শিখরং কৈলাসস্য যুধিষ্ঠির,
গতিঃ পরমসিদ্ধানাং দেবর্ষীণাং প্রকাশতে।"

বনপর্ব্ব ১৫৯ অধ্যায়।

এই কৈলাসের শিখরদেশ অতিক্রম করিয়া আগে যাওয়া মনুষ্যের পক্ষে কি একবারেই অসাধ্য? শুধু তাহাই নহে, ঐ স্থানে আরও লিখিত আছে,—

"ন চাপ্যতঃ পরং শক্যং গন্তুং ভরতসত্তমাঃ,
বিহারো হ্যত্র দেবানামমানুষগতিস্তু সা।"

এইখানেই কি দেবতাদিগের চিরন্তন গতি? আজ তবে তাঁহারা কোথায়? যুগযুগান্তের পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের দেব-কায়া কি শেষ প্রস্তরে পরিণত হইল? চারিদিকেই পাহাড়, পাহাড়ের আকাশচুম্বী নগ্নবিস্তার ব্যতীত আমাদের চর্ম্মচক্ষুতে আর কি দেখিতে পাইলাম! শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করিলে এই কৈলাসের আশে-পাশে অনেক পাহাড়েরই নামের উল্লেখ রহিয়াছে জানা যায়। ঐ যে আমাদের পূর্ব্বদিকে একটির পর আর একটি করিয়া অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী কায়া বিস্তার করিয়া কেমন শোভা পাইতেছে! উহাদের মধ্যে কোন্‌টি "সূর্য্যপ্রভ," কোন্‌টি "চন্দ্রপ্রভ," আবার কোন্‌টি বা সেই মৃতসঞ্জীবন-ওষধি-বিমণ্ডিত "গন্ধমাদন" পর্ব্বত? কে আজ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবে? এ দৃশ্যে শুধুই একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা, একটা যেন বিরাট নিস্তব্ধতা আমাদিগকে সে দিন ক্ষণে ক্ষণে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছিল! এ কোন্ মুক্তির রাজ্য, যেখানে উন্মুক্ত নীলাকাশে ক্ষণেকের জন্যও একটি পাখী পর্য্যন্তকে উড়িতে দেখা যায় না! বিস্ময়াভিভূতচিত্তে সকলেই কেবল সেই সম্মুখের পর্ব্বত-প্রাসাদস্থিত উচ্চ তুষারস্তূপের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দেখিয়া দেখিয়া নয়ন যেন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। অদৃশ্য হইতে মূক ভাষায় কে যেন বিলক্ষণ বলিয়া দিতেছিল, 'ওরে ভ্রান্ত! এ ত আর সেই বৃন্দাবনবনবিহারী গোপীজনমনোমোহন শ্রীরাধারঞ্জনের মধুর লীলাক্ষেত্র নহে, যেখানে বাঁশরীর সুরে আজও কুঞ্জে কুঞ্জে পুষ্পবন মুঞ্জরিয়া উঠিতে থাকে, অলিকুল গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়! এ যে চিরমৌনী জটাজুটধারী সেই সর্ব্বত্যাগী যোগিশ্রেষ্ঠের সমাধি-মন্দির—মহানির্ব্বাণের চিরন্তন

মুক্তিক্ষেত্র! এখানে ত্যাগের মহিমময়ী মুরতির পদতলে সংসারের ভোগ-লালসা—আপনার অস্তিত্ব একবারে বিসর্জ্জন দিয়াছে! এ যে সেই মহাপ্রস্থানের পথ, মুনি-ঋষিদিগের শেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এখানকার সম্পদ শুধু বিভূতি এবং সে বিভূতি এখানে অন্য কিছুই নহে, ঐ চির-শীতল উজ্জ্বল তুষারকিরীটী। ভক্তি-গদ্‌গদচিত্তে, প্রাণ ভরিয়া উহার সদ্য দ্রবীভূত দুগ্ধের মত ধারা একবার পান করিলেই হৃদয়-মন পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিবে। আর ঐ চিরশুভ্র সমাধির নিম্নদেশে কঠিন প্রস্তর-বেদীতে যে আপনার পঞ্চ-ভূতমিশ্রিত শরীরকে একবার লুটাইতে পারিয়াছে, নরদেহে তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে। তাহাকে আর কখনও শরীর ধারণ করিতে হইবে না।

এই কৈলাসের উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ২২ হাজার ২৮ ফুট হইবে। তিব্বতীরা ইহাকে "কাং-রিং-পো" (Kang Rin Poche) বলিয়া অভিহিত করে। আমাদের দেশে সাধু-সন্ন্যাসীরা তীর্থক্ষেত্রে প্রত্যেক বারো বৎসর অন্তর যেরূপ কুম্ভ করিয়া থাকেন, ঐখানকার লামাগণও এই শ্রীকৈলাসে সেইরূপ কুম্ভ করেন। সে সময়ে এখানেও লাদাক প্রভৃতি স্থান হইতে বহু লামা ও যাত্রীর সমাবেশ হয়। যে বৎসরে এই কুম্ভ বসে, সে বৎসরকে ইহারা ঘোটক-বৎসর (Horse Year) বলে; আগামী বৎসরে (১৯৩০ খৃষ্টাব্দে) এই কুম্ভ বসিবে শুনিলাম।

তিব্বতীগণও এই কৈলাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থজ্ঞানে চির-কাল পূজা করিয়া আসিতেছেন। আমাদের পরিক্রমার পথে কতকগুলি তিব্বতী যাত্রীকে সে দিন পরিক্রমা করিতে দেখা গেল। যাত্রিগণ সাধারণতঃ ২।৩ দিনে ইহার পরিক্রমা-কার্য্য শেষ করিয়া থাকেন। তবে ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কিছু 'মানস' থাকিলে বাধ্য হইয়া তিনি এই পরিক্রমার ৩০ মাইল পথ প্রতি ক্ষেপে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শয়ন করিতে করিতে আপনার শরীরের দ্বারা পথ মাপিয়া পরিক্রমা শেষ করেন। সে অবস্থায় প্রায় ২০ দিন পর্য্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

এই কৈলাসের বাস্তব-সৌন্দর্য্য দৃশ্য হিসাবে অতি চমৎকার। বিদেশী পর্য্যটক সিউয়েন হেডিন্ মুগ্ধ দৃষ্টিতে এক দিন এই কৈলাস দেখিয়া এ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,— "It is incomparibly the most famous mountain in the world. Mount Everest and Mount Blanc cannot vie with it." তাঁহার মতে ইটালীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট ব্ল্যাঙ্ক বা হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেষ্টের সহিতও ইহার তুলনা করা যায় না।

সময় পাইলেও এ দিন আমরা কেহই ওপারের "নিয়ান্দি" গুম্ফা পরিদর্শনে যাইতে চাহি নাই। কারণ, গুম্ফায় কিছু নূতনত্ব আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় নাই। সেখানে কেবলই বুদ্ধ বা তারার মূর্ত্তি ব্যতীত বলিতে কি, মুণ্ডিত-কেশ পীত-বসন লামাদিগের মদিরা-বিহ্বল রক্তনেত্র দর্শন করিবার শ্রদ্ধা যাত্রিগণের মধ্যে কাহারও ছিল না। সেখানে যদি কিছু জানিবার থাকে, তবে তাহা প্রস্তর-লিপিতেই ক্ষোদিত আছে। বলা বাহুল্য, আমরা সে ভাষায় একবারে অনভিজ্ঞ। আরও দুঃখের বিষয়, আমাদের সঙ্গের গাইড্‌ও এ বিষয়ে আমাদেরই মত বুদ্ধিমান্। সুতরাং গুম্ফা-পরিদর্শনে ইচ্ছা করিয়াই সকলে নিরস্ত হইয়াছিলাম।

সাধারণতঃ চীন বা তিব্বত প্রদেশের অধিবাসিগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী ও তারা দেবীর উপাসক। ইহার প্রমাণ বহু গ্রন্থেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। একমাত্র "চীনাচার-তন্ত্র"ই প্রমাণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব তারার উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিতে এক সময়ে কামাখ্যাতীর্থে গিয়া তথায় অকৃতকার্য্য হইলে, ক্রোধবশে তারাদেবীর উপরেই অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলেন। সে সময়ে তারাদেবী প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে তাঁহাকে ইহাই উপদেশ দিয়া-ছিলেন, "চীনাচার ব্যতীত আমি কাহারও উপরে প্রসন্ন হই না। আমার আরাধনার আচার বুদ্ধরূপী বিষ্ণুই অবগত আছেন। তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তাঁহারই উপদিষ্ট আচারে আমাকে ভজনা কর" ইত্যাদি। এই উক্তি শ্রবণে তিনি তখন হিমালয়-পার্শ্বে মহাচীনদেশে গিয়া বুদ্ধদেবকে দেখিতে পান—

"ততো গত্বা মহাচীনে দেশে স মুনিপুঙ্গবঃ।
দদর্শ হিমবৎপার্শ্বে সাধকেশ্বরসেবিতম্॥"

(চীনাচারতন্ত্র ২য় পটলঃ)

তখনকার কালেও সেখানে বৌদ্ধ মতের প্রাবল্য ছিল। সেখানকার উপাসকশ্রেণীর মধ্যে মদিরাপান-জনিত রক্ত-মন্থর আঁখি দর্শন করিয়া বশিষ্ঠদেবও প্রথমে সন্দিগ্ধচিত্তে চিন্তা করিয়াছিলেন—

"কিমিদং ক্রিয়তে কর্ম্ম বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা,
বেদবাদবিরুদ্ধোঽয়ং নাচারঃ সম্মতো মম।"

সে সময়ে ইহাই আকাশবাণী হইয়াছিল—

"......................নৈবং চিন্তয় সুব্রত।
আচারঃ পরমো যোগস্তারিণী-সাধনে মুনে॥"

সুতরাং তারার উপাসনা চীন-তিব্বতে বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, আমরা সে দিন এই চিরতুষারসমাচ্ছন্ন নির্ব্বাণসমাধির নিম্নদেশে মনের আনন্দে দিন কাটাইলাম। সন্ধ্যাকালে অভিভূতের মত সকলেই এই চিরনির্ব্বাক্ নগ্ন মূরতির পদতলে আপন আপন হৃদয়ের যথাশক্তি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া, চির-দিনের পথের সম্বল পাদ-রজঃ এখান হইতেই সংগ্রহ করিয়া লইলেন। তার পর সে দিন প্রায় প্রত্যেকেরই অনভ্যস্ত কণ্ঠ হইতে সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ ভজন-গীত উচ্চারিত হইয়াছিল। মিষ্টতা না থাকিলেও তখনকার সুরে বিলক্ষণ মাদকতা ছিল। বেশ মনে আছে, সময় ও স্থানবিশেষে সকলের আগ্রহে সে দিন এই আমার মত ভাব-বিহীন অকবিকেও ক্ষণেকের জন্য কবির ভাষায়, কৈলাসপতির উদ্দেশে একটি গীত রচনা করিতে হইয়াছিল। কৈলাস-যাত্রীর যাত্রাপ্রসঙ্গে সে গান অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে, মনে করিয়া নোটবুক্ হইতে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। গানটি এই :—

যদি কঠিন শৈল-বেদীর উপরে
তোমারি চরণ রাজে,
যদি প্রিয় লাগে চির-উজল দীপ্ত
শুভ্র তুষার-সাজে!
তবে চেয়ে দেখ আজি ওই আঁখি দিয়া
সদা রিপুর তাড়নে কঠিন এ হিয়া
অশ্রুনীরে সেথা জমেছে তুষার
শুধু বজ্র-বেদনা বাজে!
যদি নীরব শূন্যতা চাহ চিরতরে
তবে হের এ নীরব শূন্য অন্তরে
নাই হাসি গান প্রেম-কোলাহল
সদা বিষজ্বর, হিয়া-মাঝে!
যদি লোকালয়বাস ভাল নাহি লাগে
শুধু তুষ্টমতি সদা নগ্ন অনুরাগে
নগ্ন এ হৃদে হের দিগম্বর!
ও সে কৈলাসেরি সাজ সাজে!
তবে উর মহাযোগী! যোগীর সম্বল
এই "মানসোত্তরে" চির-অচঞ্চল!
চির-জ্যোতির্ম্ময়! জাগো মোর ধ্যানে
আজি দিন যায় বৃথা কাজে!

তেমন আনন্দের দিন আর কখনও এ জীবনে পাইবার সম্ভাবনা নাই। একটা জাগ্রত স্বপ্নের মত সে রাত্রির স্মৃতি আজও মধ্যে মধ্যে মনকে চঞ্চল করিয়া দেয়। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গোধূলি ও সন্ধ্যা

রং গুলে লাল পীত গৈরিক জর্দ্দা,
পরীরা ছোঁপায়ে দেছে আস্‌মানি পর্দ্দা,
স্বর্ণ-বরণে বন প্রান্তর উজ্জ্বল,
চঞ্চল নদী-জল ঝলমল ঝলমল।
মাঠ ছাড়ি বাট ধরে চাষিগণ পল্লীর,
ঝাউবন ঝঙ্কৃত কণ্ঠেতে ঝিল্লীর,
দিবসের নাভিশ্বাস বহে মৃদু ছন্দে,
যাত্রার পথ তার ভরা ফুল-গন্ধে,
নীড়মুখী পাখিদল নভো-নীলিমায়,
তারি তরে তার-স্বরে করে হায় হায়।

লহমায় হয়ে গেল পট-পরিবর্ত্তন,
আঁধারের রাজ্যের সুরু হল পত্তন,
বধূ দিল দীপ জ্বালি তুলসীর মঞ্চে,
ফুটিল অযুত ফুল গগন-মালঞ্চে,
ঝির ঝির হাওয়া করি দুইখানি পক্ষে,
ঘুম-পরী চুম দিল ধরণীর চক্ষে,
এইবার রাত ভোর নিদ্রিত বিশ্বে,
স্বপনের ছায়াবাজী হবে নানা দৃশ্যে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

দানের মর্য্যাদা

সে দিন অপরাহ্ণে গোলদীঘির ধারে হঠাৎ সুরেশের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

বহুদিন পরে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, কাজেই কুশল-প্রশ্নের পালা শেষ করিয়া সে বলিল, "কদিন ধ'রে তোকে খুঁজছিলুম,—বিশেষ দরকার।"

আমি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিতেই,—সে একটু হাসিয়া পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল, "এগুলো রাখ,—সময়মত প'ড়ে দেখিস। আর কাকে কি দিতে হবে—আমি একরকম ঠিক ক'রে রেখেছি। তবু তোর মতটা জানা দরকার। ওটা—এই গিয়ে—আমি একখানা নাটক লিখেছি—নাম হচ্ছে 'ভরা ডুবি'। বীণায় নিয়ে গেছলুম। ম্যানেজার প্লে করতে রাজী হয়েছেন,—তবে—" বলিয়া থামিল।

ক্ষণপরে পুনরায় বলিতে লাগিল, "তবে তিনি প্রথমে আমাদের প্লে দেখতে চান। কারণ, বই জমবে কি না—এ সব তিনি আমাদের প্রথম দিনের জন-সমাগম ও লোকের মতামত জেনে তবে বইখানা রিহার্শেলে ফেলবেন। হা—হা—বুঝিস্ না,—আমরা নূতন কি না, বিশ্বাস করে না। অথচ পুরোনো যে সব বই প্লে হচ্ছে,—তা ছাই আর ভস্ম! তাঁরাও ওই সব ট্রাশ্ লিখে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পান ওটা মনে করেছি, চ্যারিটি করবো। মেয়েটাও বড় হয়ে উঠেছে, তার একটা গতি করা চাই ত। তার পর বইখানা যদি থিয়েটারে নেয় ত, মার দিস্ কেল্লা—তখন দশটা মেয়ের বিয়েও আটকাবে না।"

আমি হাঁ করিয়া এই নবীন নাট্যকারের কথা শুনিতেছিলাম।

সে আমার কাঁধে একটি চাপড় মারিয়া হাত হইতে ফস্ করিয়া কাগজের তাড়াটি টানিয়া লইয়া এক যায়গায় আবৃত্তি করিতে লাগিল।

আমি সভয়ে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম,—চারিদিকে কৌতূহলী জনতা আমাদের ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে।

তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা নির্জ্জন কোণে আসিয়া বসিলাম ও তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া জানাইলাম যে, তাহার কাব্য-প্রতিভার উপর আমার অটল বিশ্বাস আছে এবং এই নাটকখানি সুধীবৃন্দকে পরিতৃপ্তি দিবে।

আশার আলোয় তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উল্লাসভরে আমার পিঠে আর একটা চাপড় মারিয়া কহিল, "তোরা বিদ্বান্, বুঝবি বৈ কি? একটু ভাল ক'রে পড়িস্। এই দেখ, ওপরেও লিখে দিয়েছি,—'প্রথম অভিনয়-রাত্রি—৩০শে ফাল্গুন। বীণা রঙ্গমঞ্চে মহা সমারোহে অভিনীত হইবে।' সহরময় একটা হৈ-চৈ উঠবেই উঠবে। সবাই বুঝবে—শুধু লেখা নয়,—অভিনয়েও এমনটি আর দ্বিতীয় নেই। হ্যাঁ,—তা হ'লে এক দিন যাস্ রিহার্শেলে! ১৫ নং—গলি, ঠিক রামবাগানের মধ্যে—একেবারে দোতলায়! সময় ত আর বেশী নেই, দিনরাত খেটে-খুটে বইখানা দাঁড় করিয়ে নিতে হবে।"

আমি কাগজের তাড়াটা পকেটে ফেলিয়া কহিলাম, "তার পর দেশের খবর কি?"

সে চঞ্চল হইয়া কহিল, "সেই এক রকম। হাঁ,—চললুম। অনেক যায়গায় ঘুরতে হবে। যাস্ তা হ'লে। কবে সুবিধে হবে? শনিবার? বেশ, ঐ কথাই ঠিক রইলো।" বলিয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল ও এদিক ওদিক চাহিয়া দ্রুতকণ্ঠে বলিল, "বড্ড ভুল হয়ে গেছে, চার আনা পয়সা হবে—তোর কাছে? দে দেখি চট্ ক'রে।"

একটা সিকি তাহাকে দিতেই সে হাত তুলিয়া বলিল,—"মনে থাকে যেন,—গুড্ নাইট্।"

ব্যাপারটি ঘটিয়া গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই এবং সুরেশের এই সহসা-লব্ধ কাব্যপ্রতিভার সাফল্য-গৌরবময় ইতিহাস আমার বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তকে এমনই বিহ্বল করিয়া ফেলিল যে, অসংখ্য চিন্তা অন্তহীনভাবে তাহার অতীত জীবনকাহিনী লইয়া মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল!

শীতের কুয়াসা-ধূসর রাত্রি। গ্যাসের আলোগুলা ধোঁয়ায় আবদ্ধ হইয়া মাত্র খানিকটা প্রভা ছড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। ঊর্দ্ধে ঘসা কাচের মত চাঁদখানা ম্লান ব্যথাতুর দৃষ্টি মেলিয়া নিম্নে ধূম্রাচ্ছন্ন দীঘির বারিরাশিকে বৃথা

সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে; স্বাস্থ্যকামী পথচারীর সংখ্যাও বিরল। বারেকমাত্র সে দিক পানে চাহিয়া অতীত লইয়া বসিলাম।

আমাদেরই গ্রামে,—তবে ভিন্ন পাড়ায় সুরেশের বাস। সতীর্থও নহি—হয় ত তাহার অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসরের ছোটই হইব। সে যখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস হইতে বার বার তিনবার অসাফল্যের পর বিদায় গ্রহণ করিয়া দেশত্যাগ করে, তখন আমরা নিম্নতম ক্লাসের ছাত্র। তার পর বহুদিন তাহাকে গ্রামে দেখি নাই।

সহসা এক দিন সে গ্রামে ফিরিয়া আসিল ও প্রচার করিয়া দিল—কোন্ এক 'সাহেবের' সুনজরে পড়িয়া ৩ শত টাকা মাসিক বেতনের চাকুরীতে বহাল হইয়াছে ও ভালই আছে। সম্প্রতি ছুটী লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। তাহার চালচলন দেখিলে কাহার সাধ্য অবিশ্বাস করে যে,—অবস্থানুরূপ উচ্চ পদমর্য্যাদা সে পায় নাই। কিন্তু বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতা সর্ব্বদাই অনুযোগ করিয়া বেড়াইতেন, এ পর্য্যন্ত উপার্জ্জনের একটি পয়সাও না কি তাঁহার অভাবগ্রস্ত সংসারের স্বচ্ছলতায় ব্যয়িত হয় নাই।

সুরেশ বলিত,—মিথ্যা কথা। সংসারের জন্যই তাহার একটি পয়সাও জমিতে পায় না।

যাহা হউক,—এই সময়ে এক ধনি-নন্দন, সহসা পিতৃবিয়োগে দেশে আসিয়া 'ডেরা-ডাণ্ডা' স্থাপন করিলেন ও পরম উৎসাহে অবৈতনিক নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে আপনার অর্থ ও বুদ্ধি অপর্য্যাপ্তভাবেই খরচ করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, শুধু নাট্যকলা নহে—সেই পীঠস্থানে রীতিমত সর্ব্বকলারই আবাদ হইত এবং তাহার ফললাভ করিতে ন্যূনপক্ষে পনেরো কুড়ি জন নিষ্কর্ম্মা আপনাদের অন্তহীন অবসরকে নিঃস্বার্থভাবেই বলি দিয়াছিল।

সুরেশ ছিল সুকণ্ঠ, কাযেই তাহার সমাদর এই সমাজে কিছু অধিকই হইয়াছিল। মাঝে মাঝে এই দল কলিকাতায় যাইয়া সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখিয়া আসিত এবং নামজাদা অভিনেতৃবর্গের হাবভাব, দোষগুণ ও তাহাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিত। যথা,—অমুক অভিনেতা এক 'পেগ' না টানিয়া ষ্টেজে নামিতেই পারে না,—অমুকের সাজা কলিকা 'উইংসে'র পাশেই তৈয়ারী থাকে এবং সেই জন্যই তাহার অভিনয় এত উৎরায়,—অমুকের গান শুনিয়া কেহ না কি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিয়াছিল,—অমুককে অমুক চাবুক মারিয়া ষ্টেজ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল ইত্যাদি—ইত্যাদি। এই সব মুখরোচক আলোচনার ফলে সকলেই সযত্নে ইহাদের দোষগুলির অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইত। গুণগুলিরও যে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত না, তাহা নহে; কিন্তু সেটা ছিল সাধ্যাতীত। সম্ভবতঃ সুরেশের নাট্যকাব্য রচনার ইহাই বাল্য ইতিহাস।

এমনই করিয়া মাসের পর মাস চলিয়া গেল। অফিসের দীর্ঘ ছুটী ফুরাইল না, কিংবা সাহেবও ডাকিয়া পাঠাইলেন না।

বৃদ্ধ পিতা ঋণ করিয়া সংসার চালান, পুত্রকে অভিশাপ দেন আর ভগবান্‌কে ডাকেন।

সংসারে পিতা, মাতা, সুরেশ, তাহার স্ত্রী ও একটি মেয়ে। এতগুলি প্রাণীর অন্নসংস্থান অল্প আয়াসের কার্য্য নহে।

সুরেশের কিন্তু এ দিকে খেয়াল ছিল না। সে সকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ক্লাবঘরেই কাটাইত এবং ধনিপুত্রের অনুগ্রহে দুটি বেলার আহারের সংস্থান ঐখানেই সুসম্পন্ন করিত।

এমনই করিয়া দুটি বৎসর চলার পর বৃদ্ধ পিতা মরিয়া জুড়াইলেন। এ দিকে ক্রমাগত ব্যয়ে ধনিপুত্রের তহবিল শূন্য হওয়াতে তিনি এক দিন সকলের অজ্ঞাতসারে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। অন্য সকলে যে যাহার পথ দেখিল, শুধু সুরেশ লেখা-পড়া-জানা ভদ্রসন্তান বলিয়া, কোন উপায়ই বাছিয়া লইতে পারিল না। একে একে তাহার সকল চালই গেল, কিন্তু পুরুভুজের মত লক্ষ বাহু মেলিয়া যে নেশা তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল, সে তাহাকে কোনমতে পরিত্যাগ করিল না।

বাড়ী বাঁধা পড়িল।

অবশেষে—শেষ সম্বল স্ত্রীর বালা-জোড়ার প্রতি তাহার লুব্ধ দৃষ্টি পড়িল।

স্ত্রী কিন্তু কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সহজে ত্যাগস্বীকারে রাজী হইল না।

"ছুঁইও না ছুঁইও না বঁধু ঐখানে থাক—"

—চণ্ডীদাস।

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত।

ফলে, এক দিন গভীর রাত্রিতে মদোন্মত্ত পশু অন্তঃসত্ত্বা পত্নীর অঙ্কে শ্রীচরণ প্রহার করিয়া তাহার শেষ সম্বল ছিনাইয়া লইল।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে সভয়ে দেখিল, রক্ততরঙ্গের মাঝখানে মুদিত কমলিনীর মত হতভাগিনী চিরতরেই নয়ন মুদিয়া সব জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াইয়াছে।

পাড়ার পাঁচ জনে অভাগিনী জননীর মুখ চাহিয়া ব্যাপারটাকে চাপিয়া দিয়া সে যাত্রা কোম্পানীর কঠোর আইন হইতে সুরেশকে বাঁচাইয়া দিলেন।

শ্মশানে আমরাও গিয়াছিলাম। চিতাগ্নিমধ্যস্থিতা পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া, সুরেশের সে কি দীর্ঘ অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিলাপ আবৃত্তি! অবশ্য গভীর শোক বা দ্রব্য-বিশেষের মাহাত্ম্য কোনটা এ ক্ষেত্রে বেশী কার্য্যকর হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে।

এত বড় প্রচণ্ড আঘাত কিন্তু বাসনার মূলোচ্ছেদ করিতে পারিল না। দারিদ্র্য তখন চরম সীমায় নামিয়াছে।

কে এক জন দয়াবান্ তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া সামান্য মাহিনায় একটি চাকুরী করিয়া দিলেন। আপাততঃ কিছুদিন একরূপ চলিল। মধ্যে মধ্যে সে দুই-এক টাকা বাড়ীতে পাঠাইয়া দিত, কিন্তু বৎসরাবধি আর ও-মুখো হইল না।

বৃদ্ধা জননী পৌত্রীটিকে লইয়া দুঃখ-ধান্দা করেন ও ভগবানের উদ্দেশে পুত্রের মঙ্গল-কামনা করিয়া অশ্রু-নিবেদন করেন।

মায়ের প্রাণ! আঘাতে—বেদনায়—পুত্রের মঙ্গল-কামনাই করিয়া থাকে।

দুটি বৎসর পরে আবার এক দিন সুরেশ বাড়ী আসিল, সঙ্গে এক নবপরিণীতা বধূ। মা অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া বধূবরণ করিলেন। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলাম, বাঙ্গালার কন্যাদায় কি এমনই বিভীষিকা বিস্তার করিয়াছে যে, নামগোত্রহীন অপরিচিতের করে কন্যা-সম্প্রদান করিতে অভিভাবকরা কিছুমাত্র ইতস্তত করেন না! সংসারের বাহিরে দাঁড়াইয়া—নিতান্ত সাধারণ দর্শকের মত মূল্যহীন মতামত দিয়াই আমাদের কর্ত্তব্যের শেষ হইয়াছে, মনে করিতাম এবং এখনও সংসারে প্রবেশ করিয়া এ-সম্বন্ধে যে একটু উদার হইয়াছি, এমন মনে হয় না। কারণ, কর্ত্তব্যসম্বন্ধে আমাদের ভাবনা নাই বলিলেই চলে। যেটুকু ভাবি, নিজের জন্য ও তাহাও সর্ব্বক্ষণ স্বার্থকে অতি সন্তর্পণে সম্মুখে রাখিয়া।

বিবাহ করিয়া সুরেশ কিছু দিন বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। ইত্যবসরে গ্রাম্য স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া আমরাও কলিকাতায় আসিলাম। দেশের খবর মাঝে মাঝে পাই, কিন্তু অদেখা মূর্ত্তির লুপ্তপ্রায় স্মৃতি মনকে পীড়া দেয় না বা ঔৎসুক্য জাগায় না।

আট বৎসর পরে সুরেশের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ। প্রথমটা তাহার হঠাৎ নাট্যকার হওয়ার সংবাদে বিস্মিত হইয়াছিলাম, পরে তাহাতে গৌরববোধও করিয়াছিলাম। কিন্তু লুপ্তপ্রায় স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়া যে রত্ন উঠিল, তাহা বিষ্ণুর বক্ষে শোভা না পাইলেও, মহেশের কণ্ঠে স্থান পাইতে পারে। ইচ্ছা হইল, কাগজ ক'খানা গোলদীঘির জলে ফেলিয়া দিয়া এই নিষ্ঠুর স্মৃতিকে ডুবাইয়া দিই। পরক্ষণেই মনে হইল, এ বড় নিষ্ঠুরের কায। হউক সে শত অপরাধে অপরাধী, তাহার দণ্ডদাতা বা বিচারকর্ত্তা আমি নহি। আমার করে কিছু সাহায্য-প্রত্যাশায় যে বিশ্বাস সে সরল-মনেই ন্যস্ত করিয়া গিয়াছে, অন্ততঃ তাহার স্ত্রীকন্যার মুখ চাহিয়া যে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখাই উচিত। কন্যার বিবাহ! এ যে কি দায়, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীই মর্ম্মে মর্ম্মে জানে। হয় ত তাহার উচ্ছৃঙ্খল জীবন—সাধারণ গতিপথে নিয়ন্ত্রিত হইয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

কাগজ ক'খানা পকেটে ফেলিয়া উঠিলাম।

নাটকের ভাব ও ভাষা যাহা হইবে, তাহাও একরূপ জানাই ছিল। অব্যবস্থিত-চিত্ত বিদ্যাহীনের যতটুকু সম্বল, হয় ত তাহার অনেকখানি বেশীই ছিল এই লেখায়। কিন্তু ঘটনা? এ যে রক্তাক্ত মর্ম্মের আকুল ক্রন্দন—অতীতের তীব্র অনুশোচনা—ব্যর্থজীবনের জ্বালাময় ইতিহাস! হায় হতভাগ্য! তোমারই কাহিনী মর্ম্মের রক্তে রঞ্জিত করিয়া বেদনার তুলিকায় এমন উলঙ্গ সত্যকে উজ্জ্বল করিয়া কে আঁকিতে শিখাইল? এমন নিষ্ঠুর দুঃখ, কোন্ তীব্র আঘাতে রবিকরস্পর্শে তুষারের মত গলিয়া গলিয়া দ্রবময়ীর অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া অতি শীতল নির্ম্মল সলিলের তরঙ্গ তুলিল? অশ্রান্ত কুলু-নাদ—বেদনার আর্ত্তধ্বনিতে মিশিয়া এত দিনে কি মোহলুব্ধ অন্তরের সুপ্তিগাঢ় চৈতন্যকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছে?

প্রতিজ্ঞা করিলাম—যতখানি সামর্থ্য, উহাকে সাহায্য করিব।

শনিবার। ঠিকানাটা লেখাই ছিল। অপরাহ্ণে খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক জীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ভগ্ন জীর্ণ অট্টালিকার যে সব অধিবাসিনী, তাহারা কোন অংশে এই কদর্য্য বাড়ীগুলার অপেক্ষা কিছুমাত্র শোভন নহে। আমার বিতৃষ্ণ অন্তর চিরদিনই আবর্জ্জনারাশির মত এই সব বিষাক্ত পরিবেষ্টনকে নৃশংস ঘৃণা দিয়া একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। সমাজের বায়ুস্তরে ইহাদের পরিব্যাপ্তি শুধু অকল্যাণকর নহে,—স্বাস্থ্যেরও প্রতিকূল।

মনটা ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই ভাবিলাম, হয় ত অর্থাভাবে সুবিধামত বাড়ী না পাওয়ায় বাধ্য হইয়া এখানে বাসা বাঁধিয়াছে। এমন অনেক পরিবারই ত অনন্যোপায় হইয়া রহিয়াছে।

ভিতরে এক বিপুলকায়া ঝি অবাধ্য কেশগুলাকে সংযত করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। আমাকে দেখিয়া কাংস্য-কণ্ঠে কহিল, "কাকে চান?"

বলিলাম, "সুরেশ বাবুকে।"

"—ওঃ—! ওই দোতলার শেষের ঘর—ডানদিকে।"

উপর হইতে একটা উচ্ছল কলরব ভাসিয়া আসিতেছিল। বোধ হয়, উহাদের মহলার হট্টগোল। কিন্তু বাড়ীটা কি মেসবাড়ী?

দুয়ারটা ভেজানই ছিল,—স্পর্শমাত্র খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট কোলাহল সেই মুক্ত দ্বারপথে তীব্রতর বেগে ছুটিয়া বাহিরের হাওয়ায় মিশিয়া গেল এবং ততোধিক তীব্র আঘাত বিদ্যুতের গতিতে আমার হৃৎপিণ্ডে আছাড় খাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত সংজ্ঞাকে লুপ্ত করিয়া দিল।

দশ বারো জন মাতালের মাঝখানে বসিয়া এক বিগত-যৌবনা রমণী সুরার গ্লাস হাতে লইয়া সুরেশের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া,—বোধ করি,—পানের অনুরোধ করিতেছিল।

এই উহার আত্মানুশোচনা?

দুর্জ্জয় ক্রোধ ও দারুণ ঘৃণা উত্তপ্ত আগুনের স্রোতের মত আমার বুকের মাঝে টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। গম্ভীর—কর্কশকণ্ঠে ডাকিলাম, "সুরেশদা!"

স্তব্ধ কক্ষে সে স্বর আরও কঠিন হইয়া বাজিল, কেহ উত্তর দিল না। সহসা রমণীর শ্লথ-হস্ত হইতে মদ্যপূর্ণ গেলাসটা ঝন্-ঝন্ শব্দে মেঝের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। একটা উৎকট গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

তেমনই ক্রোধ-কর্কশ কণ্ঠে কহিলাম, "শোন সুরেশদা, তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ সম্বন্ধ। জানতুম না, এত অধঃপাতে গেছ তুমি। বাড়ীতে মা পায় না খেতে,—মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না টাকার অভাবে, আর তুমি এই সব জঘন্য আমোদ নিয়ে দিব্যি মেতে আছ? লজ্জা হয় না? আজন্মটা একভাবেই গেল! ছি! ছি! এর চেয়ে গঙ্গা আছে, ডুবে মর কিংবা গলায় দড়ি দাও, তবু তাঁরা সান্ত্বনা পাবেন।—ঈশ্বরকে প্রাণভ'রে ডাকতে পারবেন।" বলিয়া কাগজগুলা তাহার দিকে ছুড়িয়া দিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিলাম।

সংস্পর্শ ত ত্যাগ করিলাম,—চিন্তা মুছিতে পারি না কেন? পরন্তু, সেই পরিত্যক্ত চিন্তারাশি এতকালের বিস্মৃতপ্রায় ঘটনারাশি টানিয়া আনিয়া প্রবল আগ্রহে দেখিতে লাগিল,—এক উচ্ছৃঙ্খল লালসাময় পঙ্কিল জীবনের পাশে—অনাহারক্লিষ্টা বৃদ্ধা জননী, তরুণী পত্নী ও অরক্ষণীয়া কন্যার সকরুণ মূর্ত্তিগুলি। অলক্ষ্যে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। হায় রে ঘৃণা!

মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওদের কি ক'রে চলে জান?"

মা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ভরসা ভগবান্। বউটি দুঃখ-ধান্দা ক'রে কোন রকমে দুটো পেট—"

বাধা দিয়া কহিলাম, "কেন, স্ত্রী?"

ম্লান হাসিয়া মা বলিলেন, "সে ত বছর দুই হ'ল মারা গেছে।"

যাক, সতী-সাধ্বীর পুণ্যের জোর ছিল।

মা বলিয়া চলিলেন, "কিন্তু মেয়েটা বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে। বোধ হয় ১৫।১৬ হবে! বুড়ীর অকূল ভাবনা! ছেলেটা যদি মানুষ হতো?" বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন।

ইহার ঠিক ৩।৪ দিন পরে সুরেশের এক পত্র পাইলাম। ইচ্ছা হইল, টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ডাষ্টবীনে ফেলিয়া দিই। উহার সম্পর্কে থাকিবার আমার প্রয়োজন কি? কৌতূহল বাধা দিল। হয় ত ইহাতে কোন নূতন কথা—

নূতন অনুরোধ কিছু আছে। পড়িয়া দেখিতে দোষ কি? সে লিখিয়াছে,—

"ভাই! এই আমার শেষ চিঠি, সুতরাং বিশ্বাস করিও। ক্ষমা না কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু ঘৃণা করিও না। সেই দিন তোমার তীব্র ঘৃণা আমার মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়া সহসা চোখের সামনে নূতন জগৎ খুলিয়া দিল। তবু—নির্ম্মম লালসা সে জগতের সম্মুখে অন্ধকার মেলিয়া আমায় প্রলুব্ধ করিতে ছাড়িল না। বিস্মৃতিতে ডুবিতে সুরার বোতলটা মুখে তুলিতেছি, শান্ত সেটা হাত হইতে কাড়িয়া লইল। বলিল, 'এর পরেও কি তুমি আমায় দোষী করতে চাও? বাড়ী যাও,—মানুষ হও।' আমি হাসিলাম। কিন্তু কঠিন কণ্ঠে শান্ত বলিল, 'ঠাট্টা নয়, এখনই যাও। এ ঘরে আর তোমার যায়গা নেই। যদি আমার কথা না শোন ত গলা-ধাক্কা দিয়ে দূর ক'রে দেব।' বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। বহুক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া বসিয়া ভাবিলাম, সত্যই ত,—আর কেন? যথেষ্ট অপব্যয় ত করিয়াছি, বহু নিগ্রহও সহিয়াছি,—বেশ্যার হাতে লাঞ্ছনাটা ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া আর নাই বা ভোগ করিলাম! ব্রাহ্মণ—! এত ব্যভিচারেও শ্রেষ্ঠ বর্ণের দাবী অন্তরে জাগিয়া আছে? ইহার চেয়ে নির্ম্মম পরিহাস আর কি হইতে পারে? আমার জীবন—এই আঘাতে যে তার গতি ভিন্ন পথে নিয়ন্ত্রিত করিবে, সে আশা দুরাশা। চিরকাল পাপ করিয়াছি; পাপেই অভ্যস্ত মন; সৎপথে ফিরিবার সে প্রবল প্রবৃত্তি ও উদ্যম কই? গভীর ক্ষতের রক্তধারার মত তাহারা বারম্বার আমার সদিচ্ছাকে প্লাবিত করিবে।

আর মা! তাঁর কাছে আমি বহুদিন হইতেই মৃত। তুমি সত্যই বলিয়াছ,—আমার মৃত্যু তবু তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে, কিন্তু জীবন—জ্বালায় দগ্ধ করিতেছে। সুতরাং তোমার উপদেশই মাথায় তুলিয়া লইলাম।

কন্যা বিবাহযোগ্যা। সে দায়িত্ব তোমার স্কন্ধে চাপাইব না। শুধু অনুরোধ—কিছু সাহায্য করিও। দেশে দু'চার জন লক্ষপতি আছেন, তাঁহাদের দরবারে একবার আমার হইয়া জানাইও। আর আমার সর্ব্বশেষ অনুরোধ,—বইখানি ছাপাইয়া যদি কিছু টাকা পাওয়া যায়, কন্যার বিবাহের ব্যয় চালাইও। বই নহে, আমার হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া লেখা। আমারই হতভাগ্য জীবনের শোণিতরঞ্জিত ইতিহাস—আমার বড় আদরের জিনিষ। শান্তর ঘরে আছে। দোহাই তোমার, ঘৃণা করিও না। একবার—শেষবার সেখানে যাইও। আমার পরলোকগত আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যও অন্ততঃ সে ঘৃণাটুকু পরিপাক করিও। বিদায়—চির-বিদায়। এ পত্র যখন তোমার হাতে পড়িবে, তখন হয় ত আমি পৃথিবীর মুক্তপ্রাণী। সমস্ত চিন্তা-ভাবনার বাহিরে। ইতি—

হতভাগ্য সুরেশ।"

ভ্রষ্টাচারীর কদর্য্য জীবনের অতি পঙ্কিল কলুষিত কাহিনী আজ আর বিতৃষ্ণা দিয়া অশ্রুরাশি নয়নের কোণে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। হায়,—কে জানিত, গোলদীঘির সম্মুখে সেই কৌতুকময় সাক্ষাতের শেষ পরিণাম এমনই মর্ম্মান্তিক শোচনীয় পরিসমাপ্তিতে, আমাকেই হেতু করিয়া গড়িয়া উঠিবে?

সে আমার নিকট দুইটি দাবী রাখিয়া গিয়াছে। প্রথমটি—কর্ত্তব্য ও মমত্ববোধে প্রাণপণে সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিব। দ্বিতীয়টি—সেই রামবাগানের আবর্জ্জনারাশি হইতে টানিয়া আনিতে হইবে। সংস্কার বলিল,—"অসম্ভব অনুরোধ—কাগজের পৃষ্ঠাতেই থাকুক। না পালন করিলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না।"

কিন্তু লক্ষপতির দুয়ারে হাত পাতিয়া যাহা লাভ করিলাম, তাহার কতগুণ পাইলে বিবাহযোগ্যা কন্যা কুমারী নাম ঘুচাইয়া সমাজ-ধর্ম্ম—সঙ্গে সঙ্গে পিতৃকুল রক্ষা করিবে, সে ধারণা আমার মোটামুটি ছিল। মাত্র ২৫টি টাকা বাক্সে ফেলিয়া ভাবিলাম, সেখানে যাওয়া উচিত কি না? পত্রখানি আর একবার পড়িলাম। যেন মনে হইল,—এই দরদ দিয়া লেখা বইখানি ছাপাইবার অনুরোধ তাহার সর্ব্বপ্রধান। মৃত আত্মার সমস্ত তৃপ্তি যেন উহারই মধ্যে লুকাইয়া। না, আর ঘৃণা নহে। ভক্তির ফলে যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা অপেক্ষা ঘৃণা হইতে যদি কিছু বেশী মিলে ত পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি ও তাহার কন্যার সুপাত্র-লাভ হইবে। সে লাভ বড় সামান্য নহে।

সেই কক্ষ। দ্বার ভেজান,—কোলাহল নাই। সে-দিনকার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মাতামাতি, চীৎকার, উল্লাস গাঢ় সুপ্তিতে স্তব্ধ নিঝুম। শুধু ক্ষীণ আলোকরশ্মি কক্ষে জীবন্ত প্রাণীর অবস্থিতি জানাইতেছে।

দ্বার ঠেলিলাম।

সম্মুখেই এক শীর্ণা নারীমূর্ত্তি—মলিন বসনে দেহ ঢাকিয়া বোধ হয় বাহিরেই আসিতেছিল।

সে চমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে ?"

কি উত্তর দিব, ভাবিতে লাগিলাম।

নারীমূর্ত্তি আর একটু অগ্রসর হইয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আপনি ?"

তার পর—সব চুপচাপ।

উচ্ছল সাগরের চটুল লীলা—জানি না,—কোন্ মন্ত্রে সহসা প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে। নারী ধীরে ধীরে কহিল, "আমি দিনরাত ভগবান্‌কে ডাকছি—একবার—একটিবার আপনাকে দেখবার জন্য। তিনি আমার কথা শুনেছেন।"

কথাটা সিক্ত—চোখ ছুইটাও যেন চক্ চক্ করিতেছে। বলিলাম, "তার বইখানা—"

সে শান্ত-মৃদু স্বরে বলিল, "হাঁ,—সেই জন্যই ত। দাঁড়ান একটু—বেশীক্ষণ আপনাকে এ বদ্-হাওয়ায় আট্‌কে রাখবো না।"

লঘুগতিতে সে সিন্দুকের নিকটে গেল ও ক্ষিপ্রকরে চাবি খুলিয়া একতাড়া কাগজ ও আরও কিসের একটা বাণ্ডিল লইয়া আমার পদপ্রান্তে রাখিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

কম্পিতকরে কাগজের তাড়া ছুইটা তুলিয়া লইলাম।

একখানা পুস্তকের পাণ্ডুলিপি, অন্যটি ?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটা কি ?"

সে কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, "কিছু টাকা। তাঁর মেয়ের বিয়েয়—আমার সামান্য কিছু প্রণামী। দয়া ক'রে—"

সংস্কার বলিল,—ছি! পতিতার দান!—বাধা দিয়া নীরস স্বরে বলিলাম, "এ ত নিতে পারব না।"

সে যেন উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আকুল স্বরে কহিল, "দোহাই আপনার, ফিরিয়ে দেবেন না। জানেন না, কত দুঃখের জীবন আমাদের। আলো নাই—আশা নাই—প্রাণ নাই! বুকের মাঝে রাশি রাশি পাঁক! আপনি পুণ্যময়, বুঝবেন না। এ সামান্য টাকা না নিয়ে যদি চ'লে যান—" অশ্রুপ্রবাহে তাহার স্বর অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

একান্ত একাগ্রতার সঙ্গে এই নিষ্ঠাময় দানকে অগ্রাহ্য করিবার মত আর আমার কি কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে? সত্য বটে, নারী পতিতা—কলঙ্কিতা, কিন্তু যে হৃদয়ে ভগবান্ বাস করেন, সে হৃদয় পতিতারও আছে। যে বিচারের শুচিত্ব আমায় পুণ্যকে ভালবাসিতে ও পাপকে ঘৃণা করিতে শিখাইয়াছে, সেই শুচিত্বই ত এই অপূর্ব্ব নিষ্ঠা ও অসামান্য ত্যাগকে এমন মহিমময় উজ্জ্বল করিয়া মনের অন্ধকার আলোয় ভাসাইয়া দিল।

নতমস্তকে নীরবে সে দান গ্রহণ করিয়া উল্লসিত-মনে পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

অভিসারিকা

কে অভিসারিকা লুকায়ে চলেছ,
কবিরে ক'রো না লজ্জা;
তমী কি তোমারে লুকাবে ?—আমারে
দেখাল তোমারি সজ্জা!
তমো দিল রচি' কালো কেশজাল,
তারা দিল খচি' মণি সাদা-লাল,
বন-খদ্যোতী সাজাল বসনে
জরী-চুমকির কাজ যা'।
আধোশশী—দেখি অলক-আড়ালে
তোমারি আধেক গালটা;
ঝিল্লী-ঝুমুর রিণিকি ঝিনিকি
দেয় প্রগতির তালটা।

ব্যাকুল বাতাস ওড়নার মত
বক্ষে তোমার কাঁপে অবিরত,
পথের ধূলাতে লুটে তৃণ-সাথে
আঁচল তোমার আলুগা।
কে অভিসারিকা লুকায়ে চলেছ,
কবিরে ক'রো না লজ্জা;
ভাবানুভূতির দৃষ্টি-সমুখে
রহে কি গোপন সজ্জা ?
মোছ' আঁখি—যায় ধুয়ে যে কাজল,
গলিছে শিশির—অশ্রুর জল;
পারো যদি, হাসো, সে হাসি হেরিবে
মরমী মরম-মজ্জা!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

মেঘলোক হইতে শত্রু-কবলে

১

বৃটিশ সমর-বিভাগের উড়ো জাহাজ হইতে ওয়াজিরিস্থানের একটি বিদ্রোহী পল্লীর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। ঐরূপ একখানি এরোপ্লেন উড়িবার সময় একটি গিরিশৃঙ্গের সহিত তাহার সংঘর্ষণ হওয়ায় ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার চালক ও তাহার সহযোগী পরিদর্শক ক্রুদ্ধ গ্রামবাসিগণের কবলে নিপতিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন স্থানে অবরুদ্ধ হওয়ায় পরস্পরের সাহচর্য্য ও সাহায্যে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাদিগকে কিরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইতে হইয়াছিল, তাহার বিস্ময়াবহ বিবরণ উক্ত পরিদর্শক পত্রান্তরে প্রকাশিত করিয়াছেন। উড়ো জাহাজ হইতে ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত শত্রুর কবলে নিপতিত হইবার পর তাঁহাকে যে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ এরূপ লোমহর্ষণ যে, সেরূপ বিবরণ বঙ্গসাহিত্যে পূর্ব্বে কোন দিন প্রকাশিত হয় নাই। তাহা পাঠের জন্য পাঠক-পাঠিকাগণের আগ্রহ হইতে পারে, এই বিশ্বাসে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

উক্ত পরিদর্শক লিখিয়াছেন, তাঁহার লিখিত বিবরণ অনতিরঞ্জিত সত্য; কিন্তু সকল কথা প্রকাশের অধিকার না থাকায় তিনি কোন কোন বিবরণ গোপন করিতে বাধ্য [illegible]। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করিয়া "ব্রেভেট" এই উপনামে তাঁহার দুঃখ, কষ্ট ও দুর্গতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

'ব্রেভেট' লিখিয়াছেন, "ইংলণ্ড হইতে আমার একটি বন্ধু আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'সেখানে তোমার জীবনে নিশ্চিতই অনেক লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছিল।'—তাঁহার এই ধারণা মিথ্যা নহে।

"আমি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি ক্ষুদ্র মৃন্ময় দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলাম; তাহার চতুর্দ্দিকে মেটে রঙের যে প্রান্তর ছিল, তাহাও মেটে রঙের পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত। ওয়াজিরিস্থানের পার্ব্বত্য অধিবাসিবর্গের উপর আমরা মধ্যে মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের ক্ষতি করিতেছিলাম, কারণ, তাহারা আমাদের সৈন্যদলকে বিব্রত করিতেছিল, গো-মেষাদি পশু অপহরণ করিতেছিল, নবস্থাপিত টেলিগ্রাফের তারগুলি নষ্ট করিতেছিল এবং এঞ্জিনিয়াররা সেই অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্যপ্রদেশে অতি ধীরে ও অধ্যবসায় সহকারে যে নূতন পথ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন—তাহা বিধ্বস্ত করাই যেন তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছিল।

কিন্তু তাহাদিগকে শাস্তিদান করিবার জন্য আমাদিগকে সাধারণতঃ এক ঘণ্টার অধিক কাল উড়িতে হইত না। সেই এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা তাহাদের মৃৎকুটীরপূর্ণ গ্রামের উপর কয়েকটা বোমা নিক্ষেপ করিয়া আমাদের আড্ডায় ফিরিয়া আসিতাম। এই কার্য্যে আমরা তেমন অধিক উত্তেজনা অনুভব করিতাম না।

এই ভাবে যথেচ্ছা বোমা নিক্ষেপ করিতে গিয়া এক দিন যে ভীষণ লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার ফলে আমার সুর ফিরিয়াছিল, এবং যে উত্তেজনা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা নাই।

এক দিন সংবাদ আসিল, জালেলখেল নামক পার্ব্বত্য জাতির কোন এক সম্প্রদায় কিছুদিন হইতে আমাদের ক্ষতি করিতেছিল। তাহাদিগকে সাবধান হইতে বলা হইলেও তাহারা আমাদের শাসনবিধান গ্রাহ্য করে নাই। অধিকন্তু তাহারা প্রকাশ করিয়াছিল, যে প্রকারেই হউক, তাহারা এক জন বৃটিশ সেনানায়ককে বন্দী করিয়া তাহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেই আমাদের চৈতন্য হইবে। আমরা শায়েস্তা হইব!

সুতরাং অবিলম্বে তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হওয়ায়, ঘটনাক্রমে সেই ভার আমার উপরেই ন্যস্ত হইল। অতঃপর এক রবিকরোজ্জ্বল মধুর প্রভাতে নবোদ্যমে আমাদের এরোপ্লেনগুলিকে 'উড়ো জাহাজ-ঘাটায়' আনিয়া তাহাতে বোমা সংরক্ষিত করা হইল। পরে আমাদের যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাদের কল্পনাও তখন আমাদের মনে উদিত হয় নাই। জাহাজের মিস্ত্রীরা আমাদের সম্মুখেই বোমাগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিল।

সেই সময় আকাশে অল্প মেঘ থাকিলেও উড়িতে বেশ ভালই লাগিল। আমাদের প্রত্যেক জাহাজেই দুই জন আরোহীর বসিবার স্থান ব্যতীত আটটি বোমা, একটি লুইস কামান ও তাহার সরঞ্জাম প্রভৃতি রাখিবারও স্থান ছিল।

এইরূপ ছয়খানি জাহাজ রণসজ্জায় সজ্জিত হইলে কামানের ভার লইয়া আমাকেই প্রধান সেনাপতির পুরোবর্ত্তী জাহাজে অগ্রসর হইতে হইল।

মুহূর্ত্তমধ্যেই আমরা যেন অতি কোমল শুভ্র কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত হইলাম। আমরা এরূপ নিবিড় তুষাররাশিতে আবৃত হইলাম যে, জাহাজের যন্ত্রাদিও সহজে দৃষ্টিগোচর হইল না, এবং সকল দ্রব্যই অপরিস্ফুট ছায়াবৎ প্রতীয়মান হইল। তখন সেই তুষারস্তূপের অভ্যন্তরে যদি কোন রন্ধ্র আবিষ্কার করিতে পারি, এই আশায় স্পন্দিত-দেহে সম্মুখে মুখ বাড়াইলাম।

দিঙ্মণ্ডল কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন থাকিলে একাকী উড়িতে যাওয়াই বিপজ্জনক, তাহার উপর আরও পাঁচখানি জাহাজ সঙ্গে লইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গের ব্যবধানপথে ঐরূপ তুষারাবৃত আকাশে উড়িতে যাওয়া কিরূপ সঙ্কটজনক ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের আশঙ্কা হইতেছিল, যে কোন মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের সহযাত্রী অন্য কোন জাহাজের সহিত অথবা সুকঠিন গিরিপৃষ্ঠে সংঘর্ষণের ফলে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত হইতে পারি। দৈবাৎ ঐরূপ হইলে সকলই শেষ হইয়া যাইবে!

তবে আশার কথা এই যে, এই পার্ব্বত্য প্রদেশ সম্বন্ধে আমাদের জাহাজের চালকের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, এবং বিপৎকালে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইবে না—এ বিশ্বাসও যে না ছিল, এমন নহে। তথাপি যেন প্রাণের ভিতর এক প্রকার ত্রাসের সঞ্চার হইতেছিল। আমাদের জাহাজ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই দেখিতে পাইলাম না। উড়িবার সময় সেই নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশির মধ্যে এক প্রকার শব্দ শুনিতে লাগিলাম, এবং মনে হইতে লাগিল, উড়িতে উড়িতে কখন আমাদের জাহাজ ডিগ্‌বাজি খাইতেছে, কখন বা কাত হইয়া উড়িতেছে!

কিছুকাল পরে চতুর্দ্দিক কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হইলে দেখিলাম, আমরা বহু সহস্র ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছি। তখন আমাদের সহযাত্রী জাহাজগুলির মধ্যে দুইখানি মাত্র দেখিতে পাইলাম, অপর তিনখানির চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইল না। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, সেই তিনখানি জাহাজ আমাদের সন্ধান না পাওয়ায় আড্ডায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই, তাহারা গিরিপৃষ্ঠে সংঘর্ষণের ফলে আরোহী সহ বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং জাহাজের গবাক্ষের ভিতর দিয়া মুখ বাহির করিয়া অন্য জাহাজের আরোহিগণকে হাতের সাহায্যে ইঙ্গিত করিলাম। কিন্তু তাহারা আমার ইঙ্গিতের উত্তরে ইঙ্গিত করিবার পূর্ব্বেই আমরা পুনর্ব্বার কুজ্ঝটিকারাশি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলাম। প্রায় এক ঘণ্টাকাল এই ভাবেই চলিল; মধ্যে মধ্যে কুজ্ঝটিকার সেই গাঢ় আবরণ অপসারিত হইয়া চতুর্দ্দিক একটু পরিষ্কার হইলে বুঝিতে পারিতেছিলাম—আমাদের দলে তখনও সেই তিনখানি জাহাজই ছিল।

অতঃপর আমাদের চালক নিম্নদিকে লক্ষ্য করিলে অদূরবর্ত্তী গিরিপৃষ্ঠে একটি বৃহৎ গ্রাম দেখিয়া অনুমান করিলাম, উহা আমাদেরই উদ্দিষ্ট শত্রুপল্লী। তাহা লক্ষ করিয়া আমার মন উৎফুল্ল হইল।

আমরা তখন সবেগে নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতেছিলাম; অধোদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই শত্রুপল্লীর নালা দেখিতে পাইলাম। গ্রামখানির উর্দ্ধে বহুদূর পর্য্যন্ত মেঘমুক্ত থাকায় আমাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় নাই; এই জন্য আমরা বোমা নিক্ষেপের পূর্ব্বে পরিদর্শনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা সেখানে কতকগুলি গো-মেষাদি পশুকে বিচরণ করিতে দেখিলেও জনমানবের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। ধূর্ত্ত পর্ব্বতবাসিগণ দূর হইতে এরোপ্লেনের শব্দ শুনিতে পাইলেই সপরিবারে গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিত।

গ্রামে দুইটি উচ্চ স্থান ছিল, গ্রামবাসীরা সেই দুইটি স্থানে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিত। আমরা সেই দুইটি স্থান লক্ষ্য করিয়া নালার ধারের অভিমুখে উড়িতেছিলাম। সেই সময় এক একবারে দুইটি করিয়া বোমা নিক্ষেপ করিতেছিলাম; সেই সময় আমাদের সহযাত্রী এরোপ্লেন দুইখানিও আমাদের সঙ্গে যোগদান করিল। তখন আমরা সকলেই সতর্কতা সহকারে ব্যবস্থানুযায়ী বোমা নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম।

উপরে যে দুইটি পর্য্যবেক্ষণস্থানের কথা বলিয়াছি, তাহাদের ও তৎসংলগ্ন গৃহাদির যথেষ্ট ক্ষতি করিলাম বটে, কিন্তু আমাদের বোমা নিঃশেষিত হওয়ায় আড্ডায় ফিরিবার সঙ্কল্প করিলাম। সেই সময় ঊর্দ্ধাকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর ঘনঘটাচ্ছন্ন! অথচ গগনমণ্ডল হইতে মেঘরাশি অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করিব, ইহাও সঙ্গত মনে হইল না। কারণ, পশ্চাতে পড়িয়াছে, এইরূপ অনুমান করিয়া তাহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় একটু আরামলাভের উদ্দেশ্যে সময়োপযোগী সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে অকস্মাৎ এ কি বিভ্রাট!

সহসা চক্ষুর নিমেষে এরূপ কাণ্ড ঘটিল যে, তৎসংক্রান্ত খুটি-নাটি ব্যাপারগুলি আদৌ ধারণা করিতে পারিলাম না। যথাযথভাবে তাহা বর্ণনা করাও আমার অসাধ্য। আমার এইমাত্র স্মরণ হইতেছে যে, সহসা আমাদের জাহাজের সম্মুখে একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রাচীর দেখিতে পাইলাম। সেই মুহূর্ত্তেই আমি গবাক্ষের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইলাম, কারণ, এরোপ্লেনের চালক আকস্মিক দুর্ঘটনা অতিক্রম করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় তাহা নিরাপদ স্থানে পরিচালিত করিল।

বোমা-নিক্ষেপের পূর্ব্বে গ্রামের দৃশ্য

আমাদের জাহাজখানি ক্ষুদ্র হইলেও অতঃপর বীরের ন্যায় ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সেই কৃষ্ণবর্ণ প্রাচীরও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, এখন একটু শান্তিলাভ করিতে পারিব; কিন্তু হায়, সহসা আর একটি অভিনব ঘটনায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম।

আমাদের সঙ্গে যে পরিমাণ তেল ছিল, তাহার সাহায্যে দুই ঘণ্টার অধিক কাল উড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন অপরিহার্য্য বুঝিয়া আমাদের সহযাত্রী জাহাজ দুইখানিকে আমাদের অনুসরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

আমরা মেঘস্তরে প্রবেশ করিবামাত্র আমাদের সহযাত্রী জাহাজ দুইখানি অদৃশ্য হইল। আমাদের জাহাজের চালক গতি স্থির রাখিবার জন্য একাগ্রচিত্তে ও অত্যন্ত সতর্কভাবে জাহাজ চালাইতেছিল। কারণ, আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ গিরিশৃঙ্গগুলি এরূপ অভ্রভেদী যে, তাহা আমাদের ঊর্দ্ধগতির সীমারও ঊর্দ্ধে বিরাজিত ছিল বলিয়াই আমাদের ধারণা হইল। আমরা ১২ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়া আমাদের আড্ডার অভিমুখে ধাবিত হইলাম। কিন্তু সেই নিবিড় মেঘরাশির অভ্যন্তরে দুই এক ফুট অধিক দূরের বস্তু দেখিতে পাওয়া গেল না; আমার সহযাত্রিদ্বয় অনেক

আমাদের জাহাজের শব্দ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুস্পষ্ট হওয়ায় আমি কতকটা নিশ্চিন্ত-মনে স্থির হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হইল না। আমি যে অবস্থায় ছিলাম, তাহাতে আমার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল। আমার মস্তিষ্ক বিকৃতপ্রায় হইল। বুঝিতে পারিলাম, আমাদের জাহাজ সবেগে নীচে পড়িতেছিল! এরোপ্লেনের চালক জাহাজখানি ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করিল না, সে যেন তখন উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল; কিন্তু যখন জাহাজ-রক্ষার সকল চেষ্টাই বিফল হইল, তখন সে আমাকে জানাইল, আমাদের প্রাণরক্ষার আর কোন আশা নাই। আমি শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্যে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম, এবং বমনের উদ্রেক হওয়ায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম,

অবশেষে হতাশভাবে অপরিহার্য্য মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম!

জাহাজখানি নীচের দিকে মাথা গুঁজিয়া প্রচণ্ডবেগে মাটীতে পড়িতেছিল। জাহাজের গতিবেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় বায়ুমান যন্ত্রের কাঁটাটি কখন্ খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই।

ক্রমশঃ নীচে—আরও নীচে পড়িতে পড়িতে বুঝিলাম, মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে আর অধিক বিলম্ব হইবে না, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে জাহাজখানি কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পরে সে যেন সামলাইয়া লইয়া উর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিল; আমিও কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম।

জাহাজের চালক পুনর্ব্বার সতর্কতা সহকারে তাহা চালাইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু অল্পকাল পরেই আমাদের ধারণা হইল, প্রকৃতপক্ষে আমরা ভূতলেরই সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছিলাম। ইহাও বুঝিতে পারিলাম যে, দিঙ্‌নির্ণয়ে অসমর্থ হওয়ায় আমরা পর্ব্বতের গাত্র-সংলগ্ন হইয়া উড়িতেছিলাম। সহসা জাহাজের নিম্নভাগের সহিত কতকগুলি গুল্মের সংঘর্ষণ হইল, জাহাজখানি অধোমুখে ভূতলশায়ী হইতে হইতে হঠাৎ প্রায় ২০ ফুট উর্দ্ধে উঠিল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাহা চিৎ হইয়া মাটীতে পড়িল।

জাহাজে নিরাপদে অবস্থিতি করিবার জন্য আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহা ব্যর্থ না হওয়ায় আমি জাহাজ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইলাম না বটে, কিন্তু আমি তখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলাম না। অবশেষে আমার চেতনাসঞ্চার হইলে বুঝিতে পারিলাম, নত-মস্তকে ঝুলিতেছিলাম। আমি হাত-পা নাড়িয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিলাম, এবং অল্প চেষ্টাতেই মুক্তিলাভ করিয়া, কিরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, তাহাই জানিবার চেষ্টা করিলাম। জাহাজের চালকের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে গিয়া একটি গাঢ় কর্দ্দমপূর্ণ স্থানে অবনত-মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইলাম। যাহা হউক, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়াছি, সেই সময় কে গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল, "বেশ ভাল আছ ত? দেহে কঠিন আঘাত পাইয়াছ কি?"

আমি উত্তর করিলাম, "না, আহত হই নাই, তেমন বেশী আঘাতও পাই নাই।" এ কথা বলিলাম বটে, কিন্তু পড়িবার সময় আমার পায়ে কিরূপ নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিলাম, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আহত হইয়াছ কি?"

এরোপ্লেনের কর্ণধার বলিল, "বোধ হয় না, কিন্তু আমি যে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।"

আমি তাহাকে এক মিনিট অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহার বিপদনিবারক কোমরবন্ধ (সেফটি বেল্ট) খুঁজিতে গিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে মাথা গুঁজিয়া মাটীতে পড়িয়া যাওয়ায় তাহার বুদ্ধিলোপের উপক্রম হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমার সহযাত্রীর মস্তকাবরণটি যে ভাবে তাহার মুখে আটকাইয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমাদের সেইরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, বহু চেষ্টাতেও হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না! বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমার সঙ্গীও আমার মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল। তাহাকে ঐ ভাবে হাসিতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমার মুখভাবের এরূপ কোন হাস্যোদ্দীপক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া সেইরূপ সঙ্কটজনক অবস্থাতেও সে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। আমরা উভয়েই হাসিতে হাসিতে বে-সামাল হইয়া পড়িলাম, এমন কি, হাসির চোটে পেটে খিল ধরিয়া গেল। দীর্ঘকাল পরে আমাদের হাসি থামিল, আমরা প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং সেই সঙ্কটজনক অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম।

যদিও তখন কুজ্ঝটিকার গাঢ়তা অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়াছিল, তথাপি চতুর্দ্দিকের অবস্থা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইল না। যতটুকু জানিতে পারিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, আমরা যে স্থানে ভূতলশায়ী হইয়াছিলাম, তাহা একখণ্ড সমতল জমী। কিন্তু অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও গিরিশৃঙ্গ দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত হইয়াছিলাম। আমাদের অনুমান হইল, আমরা সেই পর্ব্বতাকীর্ণ প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী কোন সমচতুষ্কোণ ভূখণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। আমরা সর্ব্বাগ্রেই আমাদের ভগ্নাবশিষ্ট এরোপ্লেনের অংশগুলি এবং তাহাতে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ছিল, সেগুলিও বিধ্বস্ত করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম। কারণ, সেগুলি পার্ব্বত্য

শত্রুদলের হস্তগত হইলে নানা ভাবে আমাদের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল।

আমাকে ম্যাচবাক্স খুঁজিতে দেখিয়া আমার বন্ধুটি তাহার লিখিবার দপ্তর হইতে কয়েক টুকরা কাগজ ছিঁড়িয়া দিল, আমি তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলাম। বিধ্বস্তপ্রায় এরোপ্লেনের সকল অংশই অত্যন্ত শীতল মনে হইল। আমরা কাগজগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিয়াও শৈত্যনিবারণের ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না।

আমি আমাদের বিধ্বস্তপ্রায় এরোপ্লেনে প্রবেশ করিয়া পিস্তল ও আলোকাধার খুঁজিতে উদ্যত হইয়াছি, ঠিক সেই সময় একটি বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষ আমার শ্রবণগোচর হইল, আমি সেই মুহূর্ত্তেই বন্দুক-নিঃসৃত ধূমানলশিখা দেখিতে পাইলাম। আমি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, এক দল উত্তেজিত পার্ব্বত্য অধিবাসী নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পাহাড়ের গা বহিয়া দ্রুতবেগে আমাদের দিকে ধাবিত হইতেছে; তাহাদের যে বিকট রণহুঙ্কার আমার কর্ণগোচর হইল, তাহা শুনিলে শরীরের রক্ত শুকাইয়া যায়।

একদল শ্মশ্রুধারী পাহাড়ী আমাদের ঘিরিয়া ফেলিল

মুহূর্ত্তমধ্যেই দৈত্যের ন্যায় আকারবিশিষ্ট শ্মশ্রুধারী এক দল পাহাড়ী চারিদিক হইতে আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জনে সেই পার্ব্বত্য ভূমি প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে আমাদের উপর নিপতিত হইল। কেহ কেহ আমাদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা হিংস্র জন্তুর ন্যায় সবেগে আমাদের এরোপ্লেনের উপর আপতিত হইল। দস্যুগণ আমাদের পকেট লুঠ করিয়া যাহা কিছু পাইল, আত্মসাৎ করিল। একটি ঘড়ী আমার মণিবন্ধে চর্ম্মবেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ ছিল। এক জন দস্যু সেই চর্ম্মবেষ্টনী খুলিতে না পারিয়া বলপ্রয়োগে তাহা ছিঁড়িয়া লইল। আর এক জন দস্যু আমার অঙ্গুলীতে একটি অঙ্গুরী দেখিয়া তাহা আমার অঙ্গুলী হইতে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। তাহা দেখিয়া ক্রোধে আমার চোখ-মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। সেই অঙ্গুরীটি আমার অত্যন্ত আদরের দ্রব্য বলিয়া তাহা আমি অমূল্য রত্ন বলিয়াই মনে করিতাম। সেই দস্যু অঙ্গুরীটি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমার হাত ধরিয়া টানাটানি করায় আমি একটা ঝাঁকুনি দিয়া আমার হাতখানি ছাড়াইয়া লইলাম, এবং আমার আততায়ীর সুদীর্ঘ নাসিকার উপর প্রচণ্ডবেগে এক ঘুসি মারিলাম, তাহার পর দ্বিতীয়বার আর এক ঘুসিতে তাহার উন্নত নাসিকার মহিমা খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইয়াছি, ঠিক সেই সময় আমার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে এরূপ প্রচণ্ড আঘাত পাইলাম যে, সেই আঘাতে আমার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

চেতনা লাভ করিয়া দেখিলাম, অঙ্গুরীটি আমার অঙ্গুলীচ্যুত হয় নাই। কিন্তু দৈত্যবৎ বিশাল দেহ একটা পাহাড়ী আমাদিগকে তখন অদূরে অবস্থিত ক্ষিপ্তপ্রায় দস্যুদলের ভিতর টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহার পরিচ্ছদের বিশেষত্ব দেখিয়া তাহাকে সেই দস্যুদলের অধিনায়ক বা 'মালিক' বলিয়াই আমার ধারণা হইল। সেই পার্ব্বত্য দস্যুদলের পশ্চাদ্ভাগে বহুকণ্ঠ-নিঃসৃত বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিয়া আমার ধারণা হইল, আমাদিগকে বন্দী করিবার জন্য 'ওয়াজিরি' ও 'মাসুদ' দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল এবং আমরা 'ওয়াজিরি'গণের কবলে

নিপতিত হওয়ায় মাস্থদগণ আমাদের এক জনকে পাইবার জন্য দাবী করিতেছিল।

আমরা যখন 'ওয়াজির' গ্রামের অভিমুখে নীত হইতেছিলাম, সেই সময় উক্ত উভয়দলের বাদানুবাদ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। অবশেষে তাহারা অসি কোষমুক্ত করিয়া যুদ্ধোন্মুখ হইল। সহসা মাস্থদদিগের নায়ক—মোল্লা অথবা ধর্ম্মযাজক অবোধ্য ভাষায় গর্জ্জন করিতে করিতে একখণ্ড বৃহৎ লোষ্ট্র উদ্যত করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল।

এই বিভ্রাটের পর মোল্লার অনুচরবর্গ আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া বোধ হয়, তাহাদের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহারা সম্ভবতঃ কিয়ৎকাল সেখানে অপেক্ষা করিয়া, কি হয়, তাহা দেখিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে—এইরূপ স্থির করিল। কিন্তু তাহারা নিস্তব্ধ থাকিতে পারিল না; তাহারা মোল্লার মৃতদেহ পরিবেষ্টিত করিয়া আস্ফালনপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল, শীঘ্রই তাহাদের বিপদ ঘনীভূত হইবে।

মুহূর্ত্তমধ্যে মালিকের বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল

সেই মুহূর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত 'মালিক' তাহার অনুচরবর্গকে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি আদেশ করিয়া মাস্থদগণের অধিনায়ক সেই মোল্লার বিরুদ্ধে ধাবিত হইল। তাহা দেখিয়া যে সকল 'ওয়াজিরি' আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা আমাদিগকে লইয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে একটা ভীষণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল। দৈবক্রমেই হউক আর পরামর্শ করিয়াই হউক, প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা আমি জানিতে পারি নাই, কিন্তু মাস্থদদের সেই মোল্লাটিকে সহসা ওয়াজিরি মালিকের বন্দুকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে মালিকের বন্দুক বজ্রনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মোল্লা শিলাখণ্ডের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল।

অতঃপর আমরা দস্যুপল্লীর নিকট উপস্থিত হইলে তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ আমাদিগকে দেখিতে আসিল। স্ত্রীলোকগুলি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিষ্ঠীবন বর্ষণ করিতে লাগিল। একটি স্থূলকায়া রমণী আমার সম্মুখে আসিয়া আমার মুখের নিকট তাহার শীর্ণ অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করিল। আমি নানা কৌশলে আত্মরক্ষা করিতেছিলাম; কিন্তু স্ত্রীলোকটির ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার ধারণা হইল—সে উন্মাদিনী। বোধ হইল, তাহাকে স্পর্শ করাও সমাগত নর-নারীগণের পক্ষে ধর্ম্মানুসারে নিষিদ্ধ; আমার এইরূপ অনুমানের কারণ এই যে, উহারা অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে তাহার নিকট হইতে সরাইয়া দিতেছিল।

স্ত্রীলোকটির প্রলাপ শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে

তাহাদের নিকট একখানি ছোরা চাহিতেছিল ; ছোরাখানি পাইলে সে তদ্দ্বারা আমাদিগকে 'কতল' করিবে। এই সকল রাক্ষসপ্রকৃতি স্ত্রীলোক অসহায় কয়েদীগণের প্রতি কিরূপ পৈশাচিক উৎপীড়ন করে, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না ; এই জন্য আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে দূরে রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইলাম। সে পুনর্ব্বার আমার কাছে আসিলে আমি আমার বাহুপাশ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না ; তখন আমি দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রচণ্ডবেগে তাহাকে পদাঘাত করিলাম।

আমার পদাঘাতে সেই স্ত্রীলোকটাকে চিত হইয়া মাটীতে পড়িতে দেখিয়া আমাদের আততায়িগণ হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে লইয়া গ্রামের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। সেখানে একটি সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণমধ্যে একখানি বৃহৎ বাড়ী দেখিতে পাইলাম। তাহাদের মালিক সেই প্রাঙ্গণে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। পরে আমি জানিতে পারি, সেই বাড়ীখানি তাহাদের মন্ত্রণা-ভবন।

আমাদের জন্য কম্বল আনীত হইলে আমরা তাহাতে উপবেশনের অনুমতি পাইলাম। অতঃপর আমাদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে, মালিক এ বিষয়ে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল।

আমাদের নিকট হইতে মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে মুক্তিদান করাই মালিক সঙ্গত মনে করিল। তাহার যুক্তি এই যে, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি ক্রয়ের প্রয়োজন ছিল এবং তাহা ক্রয় করিবার জন্য অর্থ চাই। কিন্তু প্রধান মোল্লা আমাদিগকে হত্যা করাই কর্ত্তব্য মনে করিল। সে তাহার ছোরাখানি পুনঃ পুনঃ আমাদের সম্মুখে আন্দোলিত করিয়া তাহার যুক্তির সারবত্তা সপ্রমাণ করিতেছিল। সেই ভয়াবহ অস্ত্রের আস্ফালন দেখিয়া আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল।

তাহাদের তর্ক-বিতর্ক উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গ্রামবাসিগণ ক্রমশঃ কোন না কোন দলে যোগদান করিতে লাগিল। তাহাদের কোলাহলে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমি দেখিতে পাইলাম, মালিক সেই জনতার মধ্যে একদিকে একটু হেলিয়া তাহার অদূরবর্ত্তী লোকগুলির সহিত পরামর্শ আরম্ভ করিল। অতঃপর তাহারা আমাদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে সেই প্রাঙ্গণ হইতে অন্যত্র লইয়া চলিল। সেই সময়ে কে মোটা গলায় আমার কর্ণমূলে বলিল, "ভয় নাই, গুল্‌জার তোমাদিগকে রক্ষা করিবে।"

আমি তৎক্ষণাৎ বিস্মিতভাবে মুখ ফিরাইতেই বক্তাকে দেখিতে পাইলাম ; বিরাট-দেহ দৈত্যের মত তাহার আকার! তাহার নাসিকাটি অতি বৃহৎ—'খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।' চক্ষু দুটি আগুনের ভাঁটার মত ; কিন্তু সেই অনলবর্ষী নেত্রের অন্তরালে করুণার উৎস সংগুপ্ত ছিল বলিয়াই মনে হইল। সে আমাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য পুনর্ব্বার বলিল, "হাঁ, গুল্‌জার তোমাদিগকে সাহায্য করিবে।"

মালিকের দল কর্ত্তৃক আমরা স্থানান্তরে নীত হইতেছি দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত মোল্লা ও তাহার অনুচরবর্গ আমাদিগকে তাহাদের কবল হইতে বলপ্রয়োগে ছিনাইয়া লইবার উপক্রম করিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না ; তাহারা বিরুদ্ধ দল কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া 'মন্ত্রণাভবনে' আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথাপি তখন পর্য্যন্ত তাহাদের বাগ্‌বিতণ্ডার নিবৃত্তি হইল না।

এই বিপৎকালে আমার সঙ্গীকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে দেখিয়া আমিও তাহার সহিত যোগদানের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। গুল্‌জার আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিল, "ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও ; একটি পরিবারের মধ্যে তোমরা দুই জনে কিরূপে থাকিবে? তুমি আমার নিকট থাকিবে, আর তোমার সঙ্গীকে আমার দোস্ত মেহের আলীর নিকট থাকিতে হইবে।"

অতঃপর তাহার আদেশের প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝিয়া আমি গুল্‌জার ও তাহার অনুচরবর্গের সঙ্গে চলিলাম এবং কিছুকাল পরে গুল্‌জারের নগণ্য কুটীরে উপস্থিত হইলাম। সেই কুটীরের ছাদ ও তিন দিকের আবরণ বৃক্ষশাখা ও কর্দ্দমনির্ম্মিত, কিন্তু কুটীরের সম্মুখভাগ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত।

কুটীরের চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, সেই প্রাঙ্গণে বিস্তর ছাগ, মেষ ও উট দেখিতে পাইলাম। কুটীরাভ্যন্তরে পাঁচটি স্ত্রীলোক ও দুইটি শিশু ছিল। সেখানে একখানিমাত্র

'চারপাই' দৃষ্টিগোচর হইল। রমণীদ্বয় সেই 'চারপায়ে'র উপর একখানি কম্বল প্রসারিত করিলে গুল্‌জার আমাকে সেখানে শয়ন ও বিশ্রামের অনুমতি দান করিল। স্ত্রীলোক দুটি আমার আহার্য্য প্রস্তুতের জন্য কুটীর ত্যাগ করিল।

এই সকল ব্যাপার পর পর এত শীঘ্র ঘটিয়া গেল যে, আমি এরোপ্লেনখানি বিধ্বস্ত হওয়ায় দস্যুহস্তে যে নিগ্রহ-ভোগ করিতেছিলাম, তাহা যেন একটা উৎকট দুঃস্বপ্ন বলিয়াই আমার প্রতীতি হইল। আমি বিশ্রামের জন্য 'চারপায়ে'র উপর দেহভার প্রসারিত করিলে আমার দক্ষিণ পদের বেদনা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল। অতঃপর কথা কহিতে বা নড়িতে চড়িতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার দেহের জড়তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় আমি এরূপ অভিভূত হইলাম যে, কেহ আমাকে খাদ্যদ্রব্য আহার করিতে দিয়াছিল—ইহাও আমার সুস্পষ্টরূপ স্মরণ ছিল না! অতঃপর আমি নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলাম; কিন্তু আমার অদূরে বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিয়া হঠাৎ নিদ্রা-ভঙ্গ হইল, সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের কোলাহল ও দ্রুত পদধ্বনি আমার কর্ণগোচর হইল।

গুল্‌জার, তাহার পরিজন ও অনুচরবর্গ অল্পসময়ের মধ্যেই প্রস্তর ও বৃক্ষশাখাদির সাহায্যে এক বুক উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল। স্ত্রীলোকরা গুলী-বারুদের বাক্সগুলি বাহির করিয়া আনিলে পুরুষরা উৎসাহভরে বন্দুক গাদিতে লাগিল।

এইরূপ সমরায়োজনের কারণ জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়ায় আমি শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। আমাকে বসিতে দেখিয়া আমার প্রতি গুল্‌জারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; সে ঈষৎ হাসিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। তাহার পর একটি যুবককে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি কতকগুলি আদেশ প্রদান করিল। গুল্‌জারের মুখাকৃতি ও অবয়বাদির সহিত তাহার দেহের সাদৃশ্য দেখিয়া তাহাকে গুল্‌জারের পুত্র বলিয়াই আমার ধারণা হইল। পরে জানিতে পারিলাম, আমার এই ধারণা সত্য। কারণ, সে মুহূর্ত্ত পরে আমার সম্মুখে আসিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিল, "আমার পিতা গুল্‌জার আপনাকে শুইয়া থাকিতে বলিলেন।"

আমি বলিলাম, "কেন শুইয়া থাকিব? আমি শুইয়া থাকিতে চাহি না। এ সকল গোলমাল কিসের?"

সে ভাঙ্গা ইংরাজী পুস্তু ও হিন্দুস্থানী ভাষা মিশাইয়া আমাকে যাহা বুঝাইয়া দিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, পরাজিত মাসুদগণ আমাকে ও আমার সঙ্গীকে তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে ওয়াজিরিগণকে সদলে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল। এইজন্য ওয়াজিরিরা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাদের আশঙ্কা হইয়াছিল, আমি চুপ করিয়া শুইয়া না থাকিলে শত্রুনিক্ষিপ্ত গুলীতে আহত হইতে পারি।

সহসা আমাদের কুটীরের অতি নিকটে এক ঝাঁক গুলী বর্ষিত হওয়ায় যুবকটি তাহার কথা শেষ না করিয়াই এক লম্ফে পূর্ব্বোক্ত বক্ষপ্রমাণ উচ্চ প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইল এবং গ্রামখানিকে রক্ষা করিবার জন্য সমাগত গ্রামবাসীদের দলে যোগদান করিল। আমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে বাধা দিবে, এরূপ কোন লোক আমার নিকট না থাকায় আমি উঠিয়া তাহাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলাম।

অতঃপর যে সকল লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল, তাহার বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

আমার পূর্ব্বস্মৃতি.

১৩

অবিদ্যার চাতুরী

"I refuse to ask for security from these ladies; they follow one of the oldest professions of the world."—Observed Mr. Keays, the Second Presidency Magistrate.

কলিকাতার দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কীজ্ সাহেব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "আমি এই সকল স্ত্রীলোকের নিকট হইতে মুচলেখা চাহিব না। কারণ, তাহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পেশা অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিতেছে।"

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে, তিনটি স্ত্রীলোক বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করে, অতএব তাহাদের কোন আইন-মানিত পেশা নাই, এই কারণে কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ ধারা অনুযায়ী পুলিস তাহাদের নিকট মুচলেখা ও জামীন চাহিয়াছিল। এই মোকদ্দমাটি আইন অনুযায়ী কতদূর চলিতে পারে, তাহা পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। এই সময় কিড্ ষ্ট্রীটে আদালত বসিত। সেই আদালতে এই তিন জন স্ত্রীলোককে চালান দেওয়া হইয়াছিল। আসামীগণকে কীজ্ সাহেবের নিকট হাজির করিবার পর তিনি পুলিস-চালান পড়িয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায় বাহাদুর, আপনি এই মোকদ্দমাটি কি সমর্থন করিতেছেন?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ; পুলিস এ কেশটি Test Case করিয়া চালান দিয়াছে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট।—আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া কি এই মামলা চালান দেওয়া হইয়াছে?

আমি।—না, তবে পুলিস চায়, আপনি আইন-সঙ্গত এই মামলা করেন, আর আইনের পক্ষে কি বলা যাইতে পারে, তাহা বলিতে পুলিস আমাকে এই মোকদ্দমায় দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট।—আইন সম্বন্ধে যাহা বলা যাইতে পারুক না কেন, আমি এই মোকদ্দমায় এই হতভাগিনীদের নিকট হইতে কখনও জামীন ও মুচলেখা চাহিব না। পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে এই শ্রেণীর ধরিত্রীনন্দিনীরা, এই পেশার উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করিতেছে। আপনি আইনের তর্কে আমাকে যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করুন, আপনি কখনও এই মোকদ্দমায় জয়ী হইবেন না।

আমি তখন কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ ধারায় কি বলে, তাহা পড়াইয়া শুনাইলাম এবং বলিলাম, এই ধরিত্রীনন্দিনীরা যেরূপ ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহা আইন-অনুমোদিত নহে, আইনের কাছে তাহা পেশাই নহে। যখন ইহা আইন-অনুমোদিত নহে, তখন ইহা ১০৯ ধারার অধীনে আইসে।

ম্যাঃ।—আপনি বলিতে পারেন, ইহারা কি করিয়া খাইবে?

আমি।—সেই তর্ক চোররাও করিতে পারে, ভিখারীরাও করিতে পারে, জুয়াচোরের দলপতিরাও করিতে পারে।

ম্যাঃ।—আপনার ইহাদের উপর দয়া করা উচিত।

আমি।—অবস্থাবিশেষে চোরের উপরও দয়া করা উচিত। এক জনের স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, কিংবা অন্নাভাবে পুত্র-কন্যা মরিতেছে, সেই লোক যদি চিকিৎসা বা পথ্যের জন্য চুরি বা বিশ্বাসঘাতকতা করে, আইনের দৃষ্টিতে সে দোষী হইলেও প্রত্যেক মনুষ্যের নিকট সে সহানুভূতি পাইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া আইন তাহাকে ক্ষমা করিবে না।

ম্যাঃ।—আপনি কি এই মোকদ্দমা চালাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন? আমি যদি আপনাকে এই মোকদ্দমায় হারাইয়া দি, তাহা হইলে আপনি কি আমার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাইবেন?

আমি।—না; আমি কেবল এই পেশা আইন-অনুমোদিত নয়, এই বলিয়া আপনার হাতে এই মামলা ছাড়িয়া দিব, আপনার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিব না।

ম্যাঃ।—আইন-অনুমোদিত না হইলেও আমি ইহাদিগকে সাজা দিব না। পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে এই পেশা চলিয়া আসিতেছে। আজ বে-আইন বলিয়া এই পেশা অবলম্বনকারীদের আমি সাজা দিব না।

আমি।—তবে আমি এই মামলা তুলিয়া লইলাম।

এই ঘটনার অনেক দিনের পর যখন কীজ্ সাহেব জোড়াবাগান আদালতের হাকিম, তখন বেশ্যাদের সম্পর্কীয় আর একটি মামলা তাঁহার নিকট করিয়াছিলাম। জাহ্নবী দেবী নাম্নী এক বাড়ীওয়ালী অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে দূরদেশ হইতে আনয়ন করিয়া তাহাদের খাওয়াইয়া ও পরাইয়া মানুষ করিত এবং দশ,

এগারবর্ষবয়স্কা হইলে, তাহাদিগকে নাচগানে কিয়ৎপরিমাণে তালিম দিয়া দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পেশায় নিযুক্ত করিত। প্রত্যেক পালিত কন্যাকে নিজ কন্যা বলিয়া পরিচয় দিত এবং খুব উচ্চ বংশসম্ভূতা বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিত। অনেক সময় এই সব বালিকা দেবীরূপে আখ্যাত হয়। সোনাগাছি ইত্যাদি স্থান হইতে যে সব মামলা চালান হয়, সেই সব স্থানের বাড়ীওয়ালীর ও তাহাদের পালিতা কন্যাদের অধিকাংশই দেবী বলিয়া আপনাদিগকে ঘোষণা করে। দর বাড়াইবার জন্য মেদিনীপুরের মাহিষ্য-কন্যারাও এখানে দেবী বলিয়া পরিচয় দেয়। এক জন ইন্‌স্পেক্টর এইরূপ একটি মামলা চালান দিয়াছিল। তাহাতে বাদিনীকে দেবী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিল। আমি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলাম, আপনি ইহাকে দেবী বলিয়া কেন আখ্যাত করিয়াছেন, এই সকল স্থানে প্রত্যেক কুপথগামিনীরা কি দেবীকুলসম্ভূতা?

ইন্‌স্পেক্টার।—আমি কি করিব, পরিচয়ে ইহারা দেবী বলে, কাযেই দেবী বলিয়া আখ্যাত করিতে হয়।

এই বৃথা নামের দিনে অনেক উপদেবী দেবী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে। কুকুরের যেমন উচ্চ বংশের জন্মতালিকা (pedegree) থাকে, ইহাদের প্রত্যেকেরই উচ্চবংশের জন্মতালিকা আছে। সেই জন্ম-তালিকার অজুহাতে সকলেই উচ্চবংশসম্ভূতা বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যস্ত। তখন এই শ্রেণীর বাড়ীওয়ালীরা বলে—ও ত আমার গর্ভের মেয়ে নয়। বংশমর্য্যাদার মায়া কাটাইয়া আমার এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। মেয়ে ও মা না হইলেও ইহারা একজাত, এই হিসাবে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ সাহায্য করে। পেশা অতি প্রাচীন—বংশপরম্পরায় না চলিলেও একজনকার পালিতা কন্যা তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পেশার উৎকর্ষতা-সাধন করিতেছে। প্রত্যেক পেশাগীরের হাতে যথেষ্ট সময় আছে। সেই সময়ের অপব্যবহার করিয়া পেশার চরম উৎকর্ষতাসাধনের চেষ্টা হইতেছে। বহুকালের বহুদর্শিতার ফলে, ইহাদের শিক্ষা ও দীক্ষা এমন হইয়াছে যে, একবার তাহাদের আটাকাটিতে পড়িলে চলিয়া আসা দুঃসাধ্য। একবার তাহাদের জালে পা দিলে সেই জালের বাহিরে আসা প্রায় অসম্ভব। তাহাদের চাতুরী হইতে আত্মরক্ষা করা বড়ই দুঃসাধ্য। এই সব মন্তব্য বেশ্যাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য হইলেও চরিত্রহীনাদের পক্ষেও সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগযোগ্য। যে সব স্ত্রীলোকের সতীত্বধর্ম্ম হইতে পদস্খলন হইয়াছে, তাহাদের চাতুরী হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সকলেরই বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি একটি যথার্থ ঘটনার কথা বলিতেছি—কেবল আসল নাম না দিয়া অন্য নাম দিয়া লোকদিগকে আখ্যাত করিব। এ ঘটনার আখ্যায়িকা হইতে পাঠক ও পাঠিকারা বুঝিতে পারিবে তাহাদের জালবিস্তার কিরূপ ভয়াবহ ও দুশ্ছেদ্য।

আর কয়েকখানি দরখাস্ত শুনানী হইল, তাহার পর মুলতুবী দরখাস্তের শুনানী আরম্ভ হইল। ফরিয়াদী জাহ্নবী দে- দরখাস্তকারিণী সুন্দরভাবে বেশভূষায় বিভূষিতা এক জন রমণী ঐ নামে সাড়া দিল। সে আস্তে আস্তে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠি দাঁড়াইল; তাহার চক্ষু ১৭।১৮ বৎসরের একটি তরুণীর উপর ন্যস্ত। সে আদালত-গৃহের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। ফরিয়াদী রমণীটিকে দেখিলে বোধ হয়, অনেক দিন পূর্ব্বে সে এই তরুণীর ন্যায় সুন্দরী ছিল। তাহার বেশভূষা দেখিলে মনে হয়, সে পোষাক-বিক্রেতার দোকানের ছাঁচে গড়া পুতুলের মত আকৃতিটি কেবল পোষাকের সৌন্দর্য্যের জন্য ব্যবহৃত; পোষাকের সৌন্দর্য্যের উপর যত নজর, আকৃতির উপর তত নহে। তাহার চক্ষু দুইটি চারিদিকেই ঘুরিতেছে, মুখে অবসাদের রেখা, অথচ খুব ব্যস্তভাব, আওয়াজ স্ত্রীলোকের মত একবারেই নয়, কর্কশ ও কর্ণকটু, মুখের মাংস কুঞ্চিত হইয়াছে।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যে মেয়েটির নামে পরোয়ানা দেওয়া হয়েছিল, সে হাজির আছে?"

এক জন উকীল।—হাঁ হুজুর, মুসামত প্রমাদিনী কাহিল হাজির। তিনি এখন আমার মক্কেল মহম্মদ কাহিলের বিবাহিতা পত্নী। এখানে হাজির আছেন, আর আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয়, সেই উদ্দেশ্যে শারীরিক কাহিল থাকিলেও, কাহিল সাহেবও আদালতের মর্য্যাদা-রক্ষা হেতু এখানে উপস্থিত আছেন।

হাকিম।—আমি আপাততঃ প্রমাদিনীকে গোটাকতক প্রশ্ন করিতে চাই।

প্রমাদিনীর ডাক পড়িল। জাহ্নবী দেবীকে নামাইয়া দেওয়া হইল। জাহ্নবী দেবী কাটগড়া হইতে নামিবার সময় ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "হ্লা প্রমাদিনী, তোকে এই জন্যই কি মানুষ করিয়াছিলাম? অনেক কষ্টে এত বড়টা করেছি, সে কি এই করতে? তুই আমাকে ধনে প্রাণে মারলি?"

প্রমাদিনীর পক্ষের উকীল বাবু।—হুজুর, ফরিয়াদী আমার মক্কেলের সহিত যেন কথা না কয়, ওকে মিথ্যা শিখাইয়া দিবে; ফরিয়াদী সব পারে, ও আমার মক্কেলের মাতা নয়, উপমাতা। হাসপাতাল থেকে ২৫ টাকা ঘুষ দিয়ে নিয়ে আসে, আমার মক্কেল বেশ্যা নয় বা বেশ্যার কন্যাও নয়, তিনি এক জন উচ্চবংশীয় ভদ্রমহোদয়ের কন্যা; কোন কারণে তাঁর মাতা তাঁহাকে

হাসপাতালে প্রসব করিয়া মারা যায়, ফরিয়াদী সেইখান থেকে প্রমাদিনীকে নিয়ে আসে, আর বেশ্যা করিবার চেষ্টা করে। আমার মক্কেল ঘৃণ্যভাবে জীবনযাপন করিতে চান না, তাই মিঃ কাহিলের সঙ্গে নিজের ইচ্ছায় চলিয়া আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য, ভদ্রমহিলার ন্যায় বিবাহিত জীবন যাপন করিবেন। মিঃ কাহিলের উদ্দেশ্য মহৎ, তাই তিনি প্রমাদিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এখন পঙ্কতিলক প্রমাদিনীকে পঙ্ক হইতে উত্তোলন করিয়া কপালে রাখিয়াছেন।

ফরিয়াদীর উকীল।—তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল বলিয়াই বুঝি, গহনাগুলি পর্য্যন্ত যৌতুকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হুজুর, বেশ্যার মেয়ের আবার বিবাহ কি? উহারা চার-পুরুষে বেশ্যা (অবশ্য উহাদের মাতৃগত-কুল)। হুজুর, বেশ্যার মেয়েকে আবার কে বিবাহ করিবে? ওদের বিবাহ হয় কেবল পুলিসে তাড়া দিলে।

প্রমাদিনীর উকীল।—হুজুর, যে একবার খারাপ হয়, সে কি আর ভাল হইতে পারে না? পতিতা নারীর ভাল হওয়া ত তাহার জন্মগত অধিকার। আর সে খারাপ হইয়াছিল, তাহাও নিজ দোষে নয়, তাহার উপমাতার পীড়নে ও প্রতারণায়। আজকালকার উন্নতির দিনে যে মহাপুরুষ একটি, দুইটি বা ততোধিক পতিতা রমণীর উদ্ধার করিতে পারিবেন, তিনি সমাজের মঙ্গলস্তম্ভ; তাঁহারাই এখন সমাজকে পতন হইতে রক্ষা করিবেন। আজকালকার বাঙ্গালার সাহিত্যে দেখিতে পাইবেন, যিনি পারাকে মাথায় লেপিতে পারিবেন, তিনি ত আদর্শ পুরুষ; বেশ্যার উদ্ধারই মহাজনের প্রকৃত সৎসাহসের পরিচয়।

হাকিম।—আমি এখানে ও সব সমাজনীতির কথা শুনিতে আসি নাই। আমি বালিকাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিতে চাই। অনুগ্রহ করিয়া আপনারা এখন কিছু বলিবেন না।

প্রমাদিনীর প্রতি :—

প্রশ্ন।—তোমার নাম কি?

উত্তর।—প্রমাদিনী।

প্রঃ।—তোমার বয়স কত?

উঃ।—উনিশ বৎসর।

প্রঃ।—তোমার বাপের নাম?

উঃ।—আমার বাপ নাই।

প্রঃ।—জন্মাইবার পূর্ব্বে ত ছিল।

উঃ।—জানি না।

প্রঃ।—তোমার মায়ের নাম?

উঃ।—জানি না।

প্রঃ।—ফরিয়াদী তোমার মা নয়?

উঃ।—না, সে আমার উপমাতা; বাবো আনি।

প্রঃ।—বারো আনি কি?

উঃ।—আমাকে দিয়া উপায় করায়, অর্জ্জনের বারো আনা সে লয়।

প্রঃ।—তুমি তার কাছে যেতে চাও?

উঃ।—না।

প্রঃ।—কোথায় যাবে?

উঃ।—কাহিল সাহেবের কাছে।

প্রঃ।—কি সর্ত্তে?

উঃ।—তিনি আমাকে বিবাহ করিতে রাজি আছেন।

প্রঃ।—এ গহনাগুলি কাহার?

উঃ।—এ সমস্ত আমার রোজগারের, কিন্তু আমি এ সমস্ত পাপলব্ধ গহনার একখানাও ব্যবহার করিব না। আমি এ পাপের জিনিষ পাপীকেই দিয়া যাইব।

প্রঃ।—পাপী কে?

উঃ।—আমার উপমাতা, যাহাকে আমি মা বলিতাম। জগতে ঘোষণা করিতে চাই, যে আমার বাবু, খুড়ি, সাহেব, আমাকে গ্রহণ করিতেছেন, আমার জন্য, আমার গহনার জন্য নয়। আমি গহনাগুলি রাখিলে বাবুর নামে ঘোর কলঙ্ক স্পর্শ করিবে।

এই বলিয়া সে প্রত্যেক গহনা গা হইতে খুলিয়া সম্মুখে উকীলদের টেবলের উপর রাখিল, আর ফরিয়াদীকে ডাকিয়া বলিল, "নে সর্ব্বনাশী, এই সব গহনা নে, আমি এক কাপড়ে বাবুর সঙ্গে চলিলাম, যদি বরাতে থাকে, সোণার সুটের বায়গায় হীরা-জহরতের সুট পরিব। কি বলেন কাহিল সাহেব?"

কাহিল সাহেব এতগুলি টাকার গহনা চলিয়া যায় দেখিয়া একটু কাহিল হইলেন; কিন্তু কি করেন, উপায় নাই; অতএব হাসিয়া বলিলেন, "যাক্ ও সব। আমি আছি।"

এক জন প্রবীণ উকীল অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "বাবা, এও একটা ছেনালি। কিছুদিনের জন্য ধাড়ী ছেড়ে ছানাটা চ'লে এলো, আবার খেয়ে-দেয়ে কিছু দস্তুরমত ঠিক ক'রে নিয়ে, নিজের বাসায় উড়ে যাবে। যেমন ধাড়ী, তেমনি ছানা; যা বেটী যা, কিছু মোটা ধরণের মেয়ে দিদি! সাবাস্ কেউটের বাচ্ছা।"

হাকিম।—কি সৎসাহস, কি বিশুদ্ধ অনুরাগ, কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা! (ফরিয়াদীর উকীলের প্রতি) আমি আপনার মক্কেলের কোন সাহায্য করিতে পারিব না। বালিকাকে দেখিয়া আমার ধারণা, তাহার বয়স ১৬ বৎসরের অধিক; অতএব তাহার

যেখানে ইচ্ছা, সে যাইতে পারে, সে বিষয়ে আমি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না।

হুকুম শুনিয়া ফরিয়াদী কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে মানুষ করিতে ওস্তাদজীর মাহিনে হিসাবে আমার দুই হাজার টাকা ধার আছে, সে টাকা কে দেবে রে?"

প্রমাদিনী।—কেঁদ না, এ শুভক্ষণে চোখের জল ফেল না। (মিঃ কাহিলের দিকে চাহিয়া) এই ঘুঁটে-কুড়ানীর মেয়েটাকে দুই হাজার টাকা দিয়ে দাও, বাস্। তুই বেটী ঘুঁটে-কুড়ানীর মেয়ে, বাবুর কাছে চাহিলেই পাস, শাঁপাশাঁপি কেন? এ সময়ে কাঁদিস্ নি; বাবু, একে আর এক হাজার টাকা দিয়ে দাও।"

এই বলিয়া বাবুর কোরিয়ার ব্যাগ খুলিয়া ৩ হাজার টাকার তিন বাণ্ডিল নোট মায়ের হাতে দিয়া বলিল, "দেখিস বেটী, আকৃখুঁটের ঘরের পেত্নী, আমার মেনী-বিড়ালটি রহিল, তাকে যত্ন করিস্, দুধ-ভাত দিস্। চল বাবু, এখন নিষ্কণ্টকে তোমার সঙ্গে যাই। এত দিনে আমার জন্ম সার্থক। যাহার জন্য আমার সৃষ্টি, তাহাকে পাইলাম; দুর্ভাগ্যবশতঃ এত দিন এই বেশ্যার আশ্রয়ে ছিলাম। আমি নিজেও বেশ্যা নহি বা বেশ্যা-কুলে আমার জন্ম নহে। পূর্বজন্মে কিছু পাপ ছিল, তাই এত দিন বেশ্যার অন্ন গ্রহণ করিয়াছি। এত দিনে আমি শাপমুক্ত হইলাম। ঈশ্বর যাহার জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাকে পাইলাম।"

রমেশচন্দ্র বলিয়া এক জন স্তাবক এই কথা শুনিয়া বলিল, "কাহিল সাহেব, প্রমাদিনী যাহা কিছু বলিল, ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য, আমরা অনেক সময় নূতন নূতন বাবুর কথা বলিয়াছি। সে কিন্তু কিছুতেই রাজী হইত না। সে বলিত, আমি বড় ঘরের কন্যা, দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশ্যার ঘরে পৌছিয়াছি ও তাহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি। আমি এক জনের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, তাহার সাক্ষাৎ পাইলেই তাহার সহিত এই পাপ-স্থান পরিত্যাগ করিব।"

স্তাবক মন্মথনাথ কহিল, "সাহেব বিশ্বাস করুন আর না করুন, যে সকল কথা এখন শুনিতেছেন, এ সকল কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। হরিদাস বাবাজীর সহিত যে দিন আপনি এই বাড়ীতে প্রথম আসিয়াছিলেন, সেই রাত্রেই প্রমাদিনী সর্ব্ব-সমক্ষে বলিয়াছিল, যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি। যাহার জন্য এত কাল এই পঙ্কিল স্থানে অবস্থান করিতেছিলাম, তাহার সঙ্গে এত দিনে দেখা হইল। আমি যত শীঘ্র পারি, এই পঙ্কিল স্থান পরিত্যাগ করিব। সবই পীরের সংযোগ!"

বাহিরে আসিয়াই স্তাবক নং ১ বলিল, "হুজুর, লক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর মতন শুধু গায়ে বাড়ী নিয়ে যাবেন না। চলুন, এই-খান থেকেই হ্যামিলটন কোম্পানীর বাড়ী যাওয়া যাক, মা লক্ষ্মীকে সাজিয়ে নিয়ে যান, তবে ঘরে তুলবেন। পূজার আগে ঠাকুর সাজান চাই, আমরা সব চাল-চিত্রের ঠাকুর, আমরা সাজান-গুছান ঠাকুর দেখিতে চাই। প্রমাদিনী বিবি, কি বল?"

প্রমাদিনী।—আমার আর কি বল? আমার মানও নাই, ইজ্জতও নাই; বাবুর হাত ধরেছি, বাবুর যাহা ভাল লাগে, তাই করুন। সাজাতে হয় সাজান, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, তবে সাঁচ্চা মতির ব্রত করেছিলাম। আর যাহা কিছু মানায়, তাহাও দেবেন, তা হ'লে আমি আর অন্য বাবুর হাত ধরব না।"

স্তাবক নং ২।—তুমি আজ যা দেখালে, তাহাতে আজ থেকে এক জন আদর্শ রমণী বাড়িল। স্তবটা ভেঙ্গে গড়তে হবে, এই স্তবে প্রমাদিনীর নাম থাকিবে, এ নিশ্চয়; আর তোমার জন্য বাবুর নাম, থুড়ি, সাহেবের নাম জগতে বিখ্যাত হবে,—'প্রমাদিনীর বাবু' ব'লে। ধন্য তুমি প্রমাদিনী, আর তা হতে ধন্য তোমার বাবু, ধন্য আদর্শ রমণীর উদ্ধারকর্ত্তা। বাঙ্গালার একদল সাহিত্যিকের খোরাক জুটিল। চল সব হ্যামিলটন কোম্পানীর দোকানে যাওয়া যাক, আজ রাত্রে কি স্ফূর্ত্তি; প্রমাদিনী আজ অষ্টপ্রহরব্যাপী নাচ ও গানের ফোয়ারা ছোটাবে।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

সৌন্দর্য্যে—কালিদাস

কালিদাস কোথায় জন্মিয়াছিলেন, কোন্ বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তিনি কোন্ সময়ের লোক, এ সকল লইয়া আমি এখন এখানে কিছুই বলিব না। মাত্র এই পর্য্যন্ত বলিব যে, তিনি এক জন কবি ছিলেন। সাধারণ কবি নহেন, তিনি এক জন প্রধান ও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার তুল্য কবি আর ভারতে জন্মে নাই। শুধু ভারতে বলিলে তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ করা হয়, ভূমণ্ডলে তাঁহার তুল্য কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই, ভবিষ্যতে জন্মিবে কি না, জানি না। তাঁহার তুল্য সৌন্দর্য্য-উপাসক, সৌন্দর্য্যে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-সম্পন্ন কবি জগতে আর দেখা যায় না। আমাদের এ দেশে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, তিনি সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অসংখ্য কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে একটি উদ্ভট শ্লোক আছে :—

> কালিদাস-কবিতা নবং বয়ঃ
> মাহিষং দধি সশর্করা পয়ঃ।
> ঐণমাংসমবলা চ কোমলা
> সম্ভবন্তু মম জন্মনি জন্মনি।

কালিদাসের কবিতা, নবযৌবন, মহিষের দধি, চিনি দেওয়া দুগ্ধ, হরিণের মাংস এবং নবযুবতী এইগুলি যেন জন্মে জন্মে আমার ভোগের বস্তু হয়।

কালিদাসের কবিতায় লোক এমনই পাগল ছিল। আর একটি শ্লোক আছে :—

> পুষ্পেষু জাতির্নগরেষু কাঞ্চী
> নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
> নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ
> কাব্যেষু মাঘঃ কবি-কালিদাসঃ।

ফুলের মধ্যে জাতি ফুল, নগরের মধ্যে কাঞ্চীনগর, নারীর মধ্যে রম্ভা অপ্সরা, পুরুষের মধ্যে বিষ্ণু, নদীর মধ্যে গঙ্গানদী, রাজার মধ্যে রামচন্দ্র, কাব্যের মধ্যে মাঘ-কবির কাব্য এবং কবির মধ্যে কালিদাসই শ্রেষ্ঠ।

এই শ্লোকটি মাঘকবির পরে লিখিত হইলেও এবং মাঘকবির পক্ষপাতী লোকের লিখিত হইলেও কবি-পদ কালিদাসকেই দিতে বাধ্য হইয়াছে।

আবার আর একটি উদ্ভটে পাইতেছি :—

> উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
> নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ।

উপমায় কালিদাস, অর্থ-গৌরবে ভারবি ও পদলালিত্যে নৈষধ শ্রেষ্ঠ; কিন্তু মাঘকবির লেখায় এই তিন গুণ সমানভাবেই বর্ত্তমান।

এই শ্লোকটি যে এক জন মাঘের অন্ধভক্তের লিখিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি তিনি কালিদাস যে উপমায় শ্রেষ্ঠ, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ মাঘই বলুন, ভারবিই বলুন, শ্রীহর্ষই বলুন, ভবভূতিই বলুন, সকলেই কালিদাসের বহু পরের লোক। আর ইঁহারা এক এক জন বড় পণ্ডিতও বটেন; কিন্তু কালিদাসের সঙ্গে ইঁহাদের তুলনা হয় না। কালিদাসের সূক্ষ্মদৃষ্টির তুলনা নাই। কালিদাসের পুস্তকগুলি পড়িলে দেখা যায়, তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং যেখানে যেখানে তিনি গিয়াছিলেন, সেখানকার বিশেষত্ব তাঁহার দৃষ্টিপথ এড়ায় নাই। সুন্দর ও অসুন্দর যাবতীয় দ্রষ্টব্য পদার্থ তাঁহার অতুলনীয় ধীশক্তির কাছে ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু অন্য কবিরা তাঁহার মত বহুল পর্য্যটন করেন নাই, এ দৃষ্টিও তাঁহাদের ছিল না।

> বাচি শ্রী মাধুরীণাং জনকজনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে
> দন্তে বঙ্গাঙ্গনানাং সুললিতজঘনে চোৎকল-প্রেয়সীনাম্।
> তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজলঘনকুচৌ কেরলীকেশপাশে
> কর্ণাটীনাং কটৌ চ স্ফুরতি রতিপতির্গুর্জরীণাং স্তনেষু।

(শৃঙ্গারাষ্টক)

মথুরাবাসিনী-রমণী-বচনে,
মিথিলার নারী কটাক্ষ-ক্ষেপণে
বঙ্গযুবতীর দশনেতে মরি,
উৎকলভামিনী জঘন উপরি
তৈলঙ্গী সুন্দরী নিতম্ব বিপুলে,
কেরলকামিনী মনোহর চুলে,
কর্ণাট-ললনা কটিতটে আর,
পীন-পয়োধরে গুর্জ্জরী-বালার
পাইছে বিকাশ মদন-শাসন,
মন প্রাণ যার করে উচাটন।

এই শ্লোকটি কি তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক নহে ? নারীর বর্ণনায় কোন্ দেশীয় স্ত্রীলোকের কোন্ অঙ্গ সুন্দর, তাহা একটি-মাত্র শ্লোকে তিনি অসাধারণ নিপুণতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু স্ত্রীবর্ণনায় নহে, এইরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি কালিদাসের বহু স্থানে দেখা যায়, যেমন রঘুবংশে চতুর্থ সর্গে রঘুর বঙ্গজয়-প্রসঙ্গে :—

আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুঃ উৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ॥

যেমন প্রথমে উত্তোলিত, পরে আবার রোপিত হইয়া ধান-গাছ শস্যভরে মূল পর্য্যন্ত অবনত হইয়া পড়িয়া ফল দিয়া থাকে, —সেইরূপ প্রথমে উৎসাদিত হইয়া পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় রাজন্যগণ রঘুকে আপাদপদ্ম প্রণতি করিয়া প্রচুর ধন উপহার দিয়া সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার রোয়া ধান প্রসিদ্ধ। কালিদাস এ দেশের বর্ণনায় ঠিক এইটি লক্ষ্য করিলেন—এরূপ দৃষ্টান্ত কালিদাসের ভূরি ভূরি।

কালিদাসকে সাধারণতঃ আদিরসের কবি বলা হইয়া থাকে। কথাটা মিথ্যা নহে। এ বিশেষণ একমাত্র কালিদাস ছাড়া আর কোন কবিই দাবী করিতে পারেন না। কেন না, আর সকলে যেখানেই আদিরসের বর্ণনা করিয়াছেন, প্রায় সর্ব্বত্রই গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। কেন না, সব প্রকাশ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর কালিদাস যেখানে শৃঙ্গার-রসের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা গাঢ় রসে অভিষিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের" মত তাহা তলাইয়া বুঝিতে হয়, অনধিকারীরা সে রস উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে। রসিক ব্যাখ্যাকার উহার যথার্থ মর্ম্ম বুঝাইয়া না দিলে অরসিক তাহা বুঝিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত "মেঘদূত।" একটি শ্লোক ধরা যাক্—

তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধ-নিদ্রা-সুখা স্যাৎ
অন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্॥

(উত্তর-মেঘ ৩৪)

বিরহের পর প্রিয়-সমাগমের সূচনাস্বরূপ স্ত্রীলোকের বামাঙ্গের স্পন্দন হয়। তাই যক্ষ মেঘকে বলিতেছে, তুমি আমার সংবাদ লইয়া যখন তোমার বন্ধুজায়ার নিকট যাইতেছ, তখন তাহার বামাঙ্গ স্পন্দিত করিয়া প্রিয় সংবাদের সূচনা করিবে। আমার বিরহে তাহার ত ঘুম বড় একটা হয় না, তবে তুমি যাইতেছ, তাহার বামাঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে, এই ভাবী প্রিয়সমাগমের সূচনায় সে নিদ্রালসা হইয়াছে। ইহাই হয় ত তুমি যাইয়া দেখিবে এবং আরও দেখিবে যে, সে নিদ্রাটি সুখের নিদ্রাই হইয়াছে। কেন না, সে স্বপ্নে আমাকে পাইয়াছে এবং গললগ্ন হইয়া সম্ভোগসুখে রহিয়াছে। তখন তুমি গর্জ্জন করিয়া যেন তাহার সেই সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিও না। অন্ততঃ একটা প্রহর নীরব থাকিয়া তাহাকে সম্ভোগসুখ ভোগ করিতে দিও। তার পর এক প্রহর পরে সম্ভোগখেদনিবারণকারী "সজলকণিকা-শীতলানিলের"—সশীকর শীতল ধীর বাতাসের সাহায্যে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিও।

আর কোন্ কবি এমন মধুরভাবে এ বিষয়ের বর্ণনা করিতে পারেন ? মহাকবির এক "যামমাত্রং সহস্ব" কথাতেই আদি-রসের চরম বর্ণনা হইয়া গিয়াছে। কালিদাসের সমকক্ষ কেহ নাই, কবির ভাষায় বলিতে হয়, "তোমার তুলনা তুমিই।"

কালিদাস আর এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বের বা পরের কোন কবিই এ বিষয়ে বর্ণনা করিতে পারেন নাই। বিষয়টি শূন্য হইতে পৃথিবী দেখিয়া সেই পৃথিবীর বর্ণনা। ইহা সম্পূর্ণ নূতন। ইহা যদি নিছক কল্পনা বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে, ইহা সম্পূর্ণ মৌলিক কল্পনা। অবশ্য ইদানীং বিমানপোতের যুগে এখন ঐ বর্ণনায় আর চমক নাই। কিন্তু কালিদাসের সময়ে ইহা কতদূর মৌলিক, তাহা বিচার্য্য নহে কি ? এ এক সম্পূর্ণ নূতন ও অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

সৌন্দর্য্যের উপাসক কালিদাস, প্রকৃতির একনিষ্ঠ সেবক কালিদাস প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সংগ্রহ ও ভোগের আকুল পিপাসায় সে কালে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়াছিলেন। আজকালকার মত যানবাহনের সুবিধা তখন ছিল না, কিন্তু সাধকের নিকট কৃচ্ছ্র সাধন যেমন আমোদপ্রদ, সৌন্দর্য্য-প্রেমিক মহাকবির নিকট কষ্টপ্রদ দুর্গম দুস্তর ভ্রমণক্লেশও তেমনই

উল্লাসকর হইয়াছিল। তাই তাঁহার সৌন্দর্য্য-পিপাসা তাঁহাকে তখনকার দুর্গম দেশের পথক্লেশ সহ্য করাইয়া সারা ভারত ভ্রমণ করাইয়াছিল। সৌন্দর্য্য কি, সৌন্দর্য্য কেমন করিয়া বাহির করিতে হয়, সৌন্দর্য্য কেমন করিয়া দেখিতে হয়, কেমন করিয়া সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হয়, সৌন্দর্য্যের স্বরূপ কি, তাহা কালিদাস দেখাইয়া গিয়াছেন। কালিদাসের গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে আজকাল যাহাকে আর্ট বলে, তাহা উপলব্ধি হইবে।

সৌন্দর্য্যের রসাবতার কালিদাসকে লইয়া কত গল্পকথা প্রচলিত আছে, এখানে তাহার অবতারণা করিলে বিশেষ রসহানি নাও হইতে পারে বোধ করিয়া দুই একটি উপস্থিত করিতেছি।

সকলেই জানেন যে, কালিদাস সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের প্রধান রত্ন ছিলেন।

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি এই নয় জন বিক্রমাদিত্যের সভার নয়টি রত্ন।

এই নয়জন বিক্রমাদিত্যের সভার অপূর্ব্ব অলঙ্কার। ইহারাই এক একটি করিয়া নয়টি রত্ন।

বররুচি দিগ্‌গজ বৈয়াকরণ ছিলেন। কালিদাসও তেমনই অলোকসাধারণ কবি ছিলেন। বররুচি বৈয়াকরণ হইলেও কবিপ্রতিভায়ও হীন ছিলেন না। তিনি কাব্যে সর্ব্বদাই কালিদাসের স্পর্দ্ধা করিতেন। এক সময় উভয়ের মধ্যে কে বড় কবি, তাহা লইয়া বিক্রমাদিত্যকে মধ্যস্থ হইতে হয়। রাজা উভয়কেই বলিলেন, "প্রত্যূষে কাক কা কা করে কেন, তাই লইয়া একটি কবিতা লিখিয়া আন, আমি উহা হইতে কে বড় কবি, তাহা পরীক্ষা করিব।" প্রত্যেকেই তৎক্ষণাৎ একটি কবিতা লিখিয়া দিলেন—

বররুচি :—তিমিরারিস্তমো হন্তি শঙ্কাতঙ্কিতমানসাঃ।
বয়ং কা কা বয়ং কা কা ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ॥

"আঁধারের শত্রু নাশিছে আঁধার,
কাককুল ভয় পাইয়ে অপার
কা কা বলি তাই করিছে প্রচার,
সে নহে আঁধার, দেহ কৃষ্ণ তার।"

কালিদাস :—কা কাবলা নিধুবনশ্রমপীড়িতাঙ্গী
নিদ্রাং গতা দয়িতবাহুলতানুবদ্ধা।
সা সা তু যাতু ভবনং মিহিরোদ্‌গমোঽয়ং
সঙ্কেতব্যক্যমিতি কাকচয়া বদন্তি॥

"নিধুবন-শ্রমে পীড়িত অঙ্গ,
কোন কোন রামা দয়িত-সঙ্গ,
বাহুলতাপাশে বাঁধিয়া তায়
আবেশে অঘোরে ঘুমিয়ে যায়।
উঠিছে তপন হতেছে বেলা
উঠ উঠ আর ক'রো না হেলা
'কা কা' এ সঙ্কেতে ডাকিছে কাক
ঘুম ভেঙ্গে তারা বাড়ীতে যাক্।"

সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য উভয়ের কবিতা দেখিয়া কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিলেন।

ইঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া আর একটি রসাল গল্পও আছে। দুই জনের মধ্যে কে বড় কবিগুণসম্পন্ন, তাহার মীমাংসা পরিচিত শ্লোকের দ্বারা হইবে না স্থির করিয়া, উভয়ে দুই সাধারণ পণ্ডিতের বেশে অপরিচিত স্থানে চলিলেন। উদ্দেশ্য, সেখানে উভয়ের পরিচয় না দিয়া কেবল কবিতা দ্বারা উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপাদন করিবেন। বৈশাখ মাসে দুই জনে বাহির হইয়াছেন। এক মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। প্রকাণ্ড মাঠ। দ্বিপ্রহর বেলা উপস্থিত। বৃষ্টি নাই, সূর্য্যদেব পূর্ণ সহস্রকিরণ প্রচণ্ডতার সহিত বর্ষণ করিতেছেন। উভয়েই দারুণ গ্রীষ্মে পিপাসায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, শরীর ঝি ঝি করিতেছে ; মাঠের মধ্যে একটা গাছও নাই যে, তাহার তলায় বসিয়া বিশ্রাম করেন। বাধ্য হইয়াই উভয়ে চলিয়াছেন। প্রাণ যায় যায়, এমন সময় দূরে একটি ছোট কুটীর দেখা গেল। উভয়ে উহা দেখিয়া আশ্রয় পাইবার আশায় একটু আশ্বস্ত হইয়া নূতন উদ্যমে চলিলেন। এত শ্রান্ত হইয়াছেন যে, কাছে গিয়াও যাইতে পারিতেছেন না। পা চলে না, কোন রকমে সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, উহা একটি জলছত্র। বৈশাখ মাসের দিনে লোক পথিককে জলদান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে। এটিও তাই। একটি নিরুপমা সুন্দরী যুবতী পথিকের পিপাসা নিবারণের জন্য জলছত্র খুলিয়া জল ও ছোলা-গুড় দিতেছেন। বররুচি ও কালিদাস দুই জনেই ইহা দেখিলেন। উভয়ের অবস্থাই এক, অতি কাহিল। বররুচি কাতরকণ্ঠে জল চাহিলেন, জল পান করিয়া সেখানে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। আর কালিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন—

কস্তেয়ং তরুণি প্রপা,
উত্তর হইল—পথিক মে
কা—কিং পীয়তেহস্তাৎ
সু—পয়ঃ
কা—ধেনুনামথ মাহিষং
সু—বধির হে বারঃ
কা—কথং মঙ্গলঃ, সোমো বাথ শনৈশ্চরঃ
সু—অমৃতং
কা—অহো তৎ তে মুখে দৃশ্যতে
সু—শ্রীমৎ পান্থ! নিতান্তকান্তরসিকো যদ্ রোচতে তৎ পিব। *

যুবতী এই বলিবার পর বররুচি ও কালিদাস দেখিলেন যে, সে জলছত্র নাই, তাহার স্থানে বীণা-পুস্তকধারিণী শ্বেতমরাল-গামিনী শ্বেতমাল্যাভরণভূষিতা সর্ব্বশুক্লা মাতা সরস্বতী তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিত! উভয়ে মাকে হৃদ্‌গত ভক্তি উপচারে মানসপূজা করিলে পর, দেবী বলিলেন, "বৎস বররুচি! তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না, তুমি কবিস্পর্দ্ধা রাখ, কিন্তু কালিদাস মহাকবি। দেখ, যে পিপাসায় তুমি অস্থির, সেই অস্থির অবস্থায় পড়িয়াও কালিদাসের সুন্দরী রমণী দেখিয়াই কবিতা স্ফূর্ত্তি পাইল। মহাকবির লক্ষণই এই যে, যে অবস্থায় সে পড়ুক না কেন, কবিতার বিষয় দেখিলেই সে অবস্থা ভুলিয়া যাইয়া কেবল কবিতার বস্তুই দেখিবে ও তাহারই রসে মগ্ন হইবে। আমি তোমাদের বিবাদভঞ্জন করিবার জন্যই এই মায়া পাতিয়া বসিয়াছিলাম। এই বলিয়াই দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। উভয়ের বিবাদ মিটিয়া গেল। এইরূপ আরও কত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

* কস্তেয়ং তরুণি প্রপা পথিক মে কিং পীয়তেহস্তাং পয়ঃ
ধেনুনামথ মাহিষং বধির হে বারঃ কথং মঙ্গলঃ।
সোমো বাথ শনৈশ্চরোঽমৃতমহো তৎ তে মুখে দৃশ্যতে
শ্রীমৎ পান্থ নিতান্তকান্তরসিকো যদ্ রোচতে তৎ পিব।

['ওগো যুবতি! এই জলছত্রটি কাহার? ওহে পথিক! এটি আমার। ইহাতে কি পান করা যায়? কেন, পয় (অর্থাৎ জল)। ও দুধ, তা গরুর না মহিষের? (কালিদাস ভিন্ন অর্থ করিতেছেন)। ওগো কালা, দুধ নহে, বার (অর্থাৎ জল)। কি মঙ্গলবার, না সোমবার, না শনিবার? তা নয়, অমৃত (অর্থাৎ জল)। আ, তাহা তো তোমার মুখেতেই রহিয়াছে দেখিতেছি। হে শ্রীমান্ অতিথি! দেখিতেছি, তুমি খুব রসিক নাগর, তা তোমার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই পান করিতে পার।]

মহাকবি গ্রীষ্মাদি ঋতু বর্ণনার পুস্তক লিখিতেছেন। একবা... একটি শ্লোকে গ্রীষ্মবর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই শ্লোকটি এই :—

দীর্ঘাস্তাপযুতা যথা বিরহিণীশ্বাসাস্তথা বাসরাঃ
যামিন্যশ্চপলা যথা কুলবধূদৃষ্টিঃ সরোষাঃ প্রিয়ে।
বাতা বাঞ্ছতমা নবোঢ়বনিতা বাণীব ভূমিরুহা
নিস্পন্দাঃ সুচিরাদ্রহো মিলিতয়োর্যূনো যথা দৃষ্টয়ঃ।

[বিরহে-কাতরা রমণীর দীর্ঘশ্বাসের মত গ্রীষ্মকালের দিন... খুব বড় দীর্ঘ ও কষ্টদায়ী। কুলবধূর ক্রুদ্ধদৃষ্টি প্রিয়তমের ... যেমন অল্পক্ষণস্থায়ী, সেইরূপ গ্রীষ্মের রাত্রিও ছোট। নবপরিণী... স্ত্রীর কথা স্বামীর শুনিতে যেমন সর্ব্বদা একান্ত ইচ্ছা করে (কি... নববধূ কথা প্রায় বলে না, কদাচ বলে) সেইরূপ গ্রীষ্মকা... বাতাস গায়ে লাগে, ইহা সকলেই সর্ব্বদাই চাহে (কিন্তু বাত... হয়ই বড় কম)। আর বহুকাল বিচ্ছেদের পরে স্ত্রী-পুরু... নির্জ্জনে মিলন হইলে যেমন নিস্পন্দভাবে উভয়ে উভয়ের দি... অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে অথচ কথা সরে না, সেই... গাছগুলি নিস্পন্দ থাকে, পাতা পর্য্যন্তও নড়ে না।]

এই বর্ণনার প্রশংসা না করিয়া কে থাকিতে পারে? ক... অল্পে কেমন এক একটি উপমায় গ্রীষ্মের বিশেষ বিশেষ অবস্থ... প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন। আর এই উপমার মাধুর্য্যই কি ক... উহার একটি উপমা বাদ দিলে আর দ্বিতীয় কিছু নাই, যাহা দি... ঐ ভাবটি পূর্ণ হইবে। ইহাই কালিদাসের বিশেষত্ব।

সৌন্দর্য্য-বর্ণনার চরম উৎকর্ষ সেখানেই হয়, যেখা... স্বভাবকে খাঁটি নকল করা যায়। তাই বলা হয়, স্বরূপ প্রকটি... করাই 'আর্ট'। যতটা স্বরূপ ঘেঁসিয়া চিত্র আঁকা যায় বা বর্ণ... করা যায়, ততটা সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। কালিদাসের এ গুণ... খুবই ছিল। তিনি প্রকৃতির অনুকরণে সিদ্ধহস্ত। যতটু... প্রয়োজন, তাহাই অপূর্ব্ব দক্ষতাসহকারে বর্ণনা করেন। অমন... বর্ণিত বিষয়টি যথাযথভাবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়-... স্বরূপ উপলব্ধি করিতে রসিক পাঠকের বিন্দুমাত্র ক্লেশ হয় না... অতিরিক্ত কিছুই তিনি বলেন না, কেবল দুই চারিটি পাক... হাতের তুলির টান দিয়া ছাড়িয়া দেন, আর চিত্রটি যেন 'স্বরূপে... উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আহার করিতেছিল, এমন সময় ভয় পাইয়া পলায়মান মৃগের তিনি বর্ণনা করিতেছেন। ব্যাপারটা এই যে, রাজা দুষ্মন্ত রথে চড়িয়া মৃগয়ায় আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার... মৃগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এমন সময় মৃগটি তাহা দেখিয়া ভীত-চকিত হইয়া উল্লম্ফনে দ্রুত পলাইতেছে, আর এক একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছে, রাজার রথ কত দূর :—

পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াৎ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখ-ভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমূর্ব্ব্যাং প্রয়াতি।

(শকুন্তলা)

[সুন্দররূপে ঘাড় বাঁকাইয়া (অনুসরণকারী) রথের প্রতি বার বার দেখিতেছে, পাছে গায়ে বাণ বিঁধে, এই ভয়ে যেন দেহের পশ্চাদ্ভাগটা দেহের সম্মুখের অর্দ্ধেকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে (অর্থাৎ যখন লাফ দিতেছে, তখন পেছনের অংশটা ছোট হইয়া যাইতেছে এবং সম্মুখের অংশটা লম্বা হইয়া পড়িতেছে), পলায়নের পরিশ্রমে মুখ হাঁ হইতেছে, আর যে ঘাস চর্ব্বণ করিতে করিতে পলাইতেছিল, আধচিবান দুর্ব্বাগুলা মুখ হইতে পথে পড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, পথে ঘাস ছড়াইয়া যাইতেছে। আর এত দ্রুত লাফাইয়া পলাইতেছে যে, শূন্যপথেই বেশীক্ষণ চলিতেছে, মাটীতে অল্পই থাকিতেছে।]

কালিদাস কিরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাহার সম্যক্ প্রমাণ এই শ্লোকটি হইতে পাওয়া যায় :—

কুসুমজন্ম ততো নবপল্লবাঃ
তদনু ষট্‌পদকোকিল-কূজিতম্।
ইতি যথাক্রমমাবিরভূন্মধু-
র্দ্রুমবতীমবতীর্য্য বনস্থলীম্। (রঘু ৯।২৬)

[প্রথমে ফুল ফুটিল, তার পর নূতন পাতা গজাইল, তার পর ভ্রমর গুণ গুণ করিতে লাগিল, তার পর কোকিল ডাকিতে লাগিল, এইরূপ ক্রমে বৃক্ষবহুল বনমধ্যে বসন্তকাল প্রকাশ পাইল।]

বসন্তকালে বড় বড় ফুলের গাছে কি রীতিতে ফুল ফুটে, তাহা দেখাইতেছেন, প্রথমে ফুল, পরে পাতা জন্মায়। সকল কবিই গাছ দেখেন, ফুল দেখেন ও তাহার বর্ণনা করেন; কিন্তু এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি কোথায়? কে আগে, কে পরে, কি বিশেষত্ব, এ সব কি জানি এক কালিদাসই দেখিয়াছিলেন, কৈ, আর কেহ ত এমন ভাবে দেখেন নাই। কারণ, আর কোন কবির বর্ণনায় এগুলি ত দেখা যায় না। এক কথায় কালিদাস স্বভাব-কবি। কি নরনারী-বর্ণনায়, কি জীবজন্তু-বর্ণনায়, কি নদনদী-বর্ণনায়, কি গাছপালা-বর্ণনায়, কি ফলফুল-বর্ণনায়, কালিদাস যেমন সহজ, সরল ভাবায় স্বভাবকে দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড় করাইয়াছেন, এমন আর হয় নাই, হইলও না। তাই বলিতে ইচ্ছা করে, বুঝি আর হইবেও না।

শ্রীগণপতি সরকার।

—

আয়ুর্ব্বেদের অতীত গৌরব

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যখন হিন্দুগণ চিকিৎসা-শাস্ত্রের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন এক দূরদর্শী ঋষি তাঁহার শিষ্যগণকে একদা বলিয়াছিলেন যে, "হে শিষ্যগণ, আমি অনুমান করিতেছি যে, পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় আরম্ভ হইয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, অনল ও দিক্-সমূহের প্রকৃতিগত ভাব বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সে কারণে যে ওষধি-সমূহ আমরা ব্যাধির প্রতীকারার্থ আহরণ করি, সেই ওষধি-সমূহের ক্রমে রস, বীর্য্য ও বিপাকের অভাব হওয়ায় সম্পূর্ণ ফলদায়ক হইবে না। অতএব এই সময়ে ওষধি-সমূহ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রাখ—যাহাতে আমরা পূর্ণবীর্য্য ঔষধ-সমূহ রোগিগণের রোগপ্রতীকারার্থ ব্যবহার করিতে পারিব।"

সে কারণে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বহু পূর্ব্বেই তাঁহারা ওষধি-সমূহের উপযুক্ত গুণাগুণ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত হইয়াছিলেন। 'চ্যবনপ্রাশ' সেবন করিয়া এখন আর কেহ বার্দ্ধক্য হইতে যৌবন পাওয়া দূরের কথা, প্রৌঢ়ত্বও পায় না। তাহার মোটামুটি কারণ :—

১। শাস্ত্রোক্ত কুটী-প্রবেশের অন্যথা।
২। বমন-বিরেচনাদি শুদ্ধিক্রিয়ার অন্যথা।
৩। কয়েকটি বনৌষধির দুষ্প্রাপ্যতা।
৪। ওষধি-সমূহের পূর্ণবীর্য্যের অভাব।
৫। ওষধি-চয়নে ভ্রমপ্রমাদ।

জ্ঞানপিপাসু পাশ্চাত্য চিকিৎসক-সম্প্রদায় তাঁহাদের শাস্ত্র অভ্রান্ত ও সম্পূর্ণ বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন না। তাঁহারা শল্যতন্ত্রে (Surgery) যে উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়; কিন্তু এই শল্যতন্ত্র সম্বন্ধে হিন্দুগণ খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেও যেরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় কিঞ্চিৎ দিবার চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ তাঁহাদের অক্লান্ত গবেষণার (Research) দ্বারা দিন দিন নূতন ঔষধ-সমূহ নানা শাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া নূতন ছাঁচে ঢালিয়া তাঁহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতিসাধন করিতেছেন। প্রাচীন শাস্ত্র-সমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধুনা যেরূপ আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রচর্চ্চার অভাব লক্ষিত হয়, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। চরকরূপী চরকের অনেক উন্নতি দৃঢ়বল ঋষি করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে চক্রদত্ত অনেক তৈল ও ভেষজাদি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। মধ্যযুগেই রসচর্চ্চার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ভারতবর্ষে পোর্ত্তুগীজদের আগমনে ফিরঙ্গ রোগের (Syphilis)

দীপালি *

(সমালোচনা)

আর্টের আলোচনায় লিও টলষ্টয় কয়েকটি ভারি সুন্দর কথা বলেছেন :—

প্রতিভাশালী লেখকমাত্রেই বিষয়-বিশেষে একাগ্র অভিনিবেশের ফলে তাঁর শক্তির এমন একটি সুষ্ঠু নিয়োগ জানেন, যাতে সেই বিষয়টির সম্পর্কে তিনি এমন সকল কথা বলতে পারেন—যা ইতিপূর্ব্বে আর কেউ বলেনি।

এর সঙ্গে আরও কয়েকটি গুণের সমাবেশ হওয়া চাই ;—

(১) বিষয়ের সঙ্গে তাঁর অভ্রান্ত এবং প্রগাঢ় সত্য সম্বন্ধ।

(২) বিষয়ের উপযুক্ত ভাব-প্রকাশের বিশুদ্ধ শক্তি।

(৩) সর্ব্বত্রই লেখকের অকপট ঐকান্তিকতা।

তিনি আরও বলেন :—

কোন নূতন লেখকের লেখা পড়তে গিয়ে পাঠকের মনে সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন উঠে ; আচ্ছা, মশাই, আপনি মানুষটি কেমন ? অন্য লোকের সঙ্গে আপনার পার্থক্যটা কি ? জীবন সম্পর্কে আপনি কি কোন বিশেষ সংবাদ দিতে পারেন ?

এমনি ক'রে লেখকের যাচাই চল্‌তে থাকে তাঁর প্রতি কথায়, তা তিনি কোন সাধু ব্যক্তির কথাই বলুন, আর চোর-ডাকাতের কথাই বলুন।

লেখক যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হন ত পাঠক তখন প্রশ্ন করে, নূতন কথা কিছু কি বল্‌তে পারেন ?

দীপালি বইখানি হাতে পেয়ে আমার মনেও ঐ রকম অনেক প্রশ্নই উঠেছিল। "অগ্নি-যুগের বারিণ দা" সাহিত্যে এসে আজ আসর জমিয়ে বসার উদ্যোগ করছেন। সাহিত্য যে কেবল পদ্ম-ফুল, মালা আর মলয় নিয়ে নয়, সে ধারণা ক্রমেই আমাদের মন থেকে খ'সে পড়ছে।

সাহিত্যের মধ্যে যাদুঘরের মত আল্‌মারিতে ভালমানুষের পুতুলগুলি থরে থরে সাজান থাকবে, আর আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে বাহবা দিয়ে স'রে প'ড়ে—ঘরে এসে যাই কেন না করি—তাও যে সাহিত্য নয়, আজকালকার "ভূঁই-ফোঁড়ের" দল তাই প্রমাণ করতে চলেছেন।

সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষার নিগূঢ় যোগ, তাই লেখক অগ্নি-যুগেরই হোন্—আর জলযুগেরই হোন্—তাঁরই আহ্বান নিত্যনিয়তই এই দরবারে আছে—যিনি জীবনের দুঃখ-সুখের আবেগমন্থনে নিজের হৃৎপিণ্ডকে বার-বার নিংড়ে তার রস পান ক'রে ভোলানাথের মত কণ্ঠ করেছেন নীল, আর চক্ষু করেছেন ঢুলু ঢুলু !

জীবনের পাত্র থেকে এক চুমুক পান না করলে এই 'নেশাখোরে'র দলে তাঁর স্থান হওয়া শক্ত।

শুনেছি, বারিণদা সেকালে দড়ি পাকিয়ে ফুরসৎ পেলে কালাপানির পুলিনে ব'সে বাঁশী বাজাতেন। আবার সুবিধা পেলে ভাণ্ডার থেকে গুড় চুরি করতেও তাঁর বাধ্‌তো না। অতএব তিনি রসিক।

আবার শুন্‌লুম, বারিণদা ছবিও আঁকেন। পদ্য ত সেকালে লিখ্‌তেনই।

"দীপালি" একখানি ছোট গল্পের সংগ্রহ পুস্তক। ছোট গল্পের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই খুব সন্দিহান, দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ধন-কুবের প্রকাশকের দল মাথা চুলকে বলেন, উপন্যাস চল্লেও চল্‌তে পারে ; কিন্তু গল্পের বই চলবে না, নিঃসন্দেহ !

এই নিঃসন্দেহ-অচলে চ'ড়েই বারিণদা আজ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্র এখন প্রায় কুরুক্ষেত্রের মতই কলহ-কণ্টকিত। সাহিত্য-দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণের পালা চলেছে এখানে। সাহিত্য-"পিতামহ" তাঁর রায় দিয়ে সমুদ্রপারে পাড়ি দিয়েছিলেন। দেশে তাঁর শর-শয্যার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল।

ওদিকে দ্রোণাচার্য্য বীর-বিক্রমে তাঁর তূণ থেকে বাছা বাছা শর ছাড়ছিলেন ; এমন সময়ে তাঁকে 'হত-ইতি-গজ'র ব্যবস্থা করতেই, তিনিও অবাক্ ! অশ্বত্থামাকে অস্বীকার ক'রে বসা যে তাঁর পক্ষে সুকঠিন !

আজকাল যে রকম ব্যবসায়-বুদ্ধি মানুষের প্রবল হয়েছে, তাতে যুদ্ধক্ষেত্রের পাশে যদি তাড়ি-পান-সিগ্রেট্‌এর দোকান দেখ্‌তে পাওয়া যায় ত আশ্চর্য্য হবার কি আছে ?

বাংলা সাহিত্যের এই যুদ্ধক্ষেত্রের পাশে তেমনি লাভের জন্য 'সরাবের' দোকান খোলা হয়েছিল। দর্শকদের গলা শুকিয়ে গেলে দেদার ভিজিয়ে নেও ! গোড়ায় ছিল দু-আনা গেলাস; পরে গেল দাম চড়ে ! ঐ ত ব্যবসার চোরা-গুপ্তি ! কুঁকড়ো চড়া শনি রাজা, আজকাল বোধ হয়, কোন নল রাজার ছিদ্রে প্রবেশ করেছেন !

দীপালির মধ্যে একটি 'ভুক' আছে বোধ হয়। গল্পগুলি সংখ্যায় চৌদ্দটি মাত্র। ভূতচতুর্দ্দশীর দিন, বাংলার ঘরে ঘরে কি মন্ত্রে চৌদ্দ-প্রদীপ জ্বালা হয়, তা ত বাঙালীমাত্রেই জানেন।

* শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য দেড় টাকা।

বারিণদার এই সাহিত্যে গৃহিণীপণা সার্থক হোক। বাঙালীর পেঁচোয় পাওয়া শুচি-বায়ু-গ্রস্ত মনটি কবে সুস্থ সবল হয়ে রামকে রাম বলেই ডাক্‌তে পারবে; মরা-মরা মন্ত্র আর জপ করতে হবে না!

বস্ত্রহরণ মামলায় দ্রোণাচার্য্য এক দিন শিষ্যবর্গকে ডেকে বলেছিলেন :—

তোমাদের কি আর ও ছাড়া লেখার কিছুই নেই? জীবনের কত দিক আছে, কত বিষয় আছে। শুধু ঐ একঘেয়ে ··ঐ?

আজ বলতে হচ্ছে, সে কথার উত্তরে, আছে, আছে! বাংলার সাহিত্যে কেবলই গিন্নীর আঁচল টানার কাহিনী লেখা হবে না! বাঙালীর জীবনে সেই সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে আজ! তাই তাঁর "মেজ-বৌ"এ আজ যে কথা শুনলুম, সে কথা যে এত দিন মনের গুহার মধ্যে ভয়েই আড়ষ্ট হয়েছিল!

"অমর সুধীরকে তার সহজ দেশসেবার পথ থেকে বাঁকা কুটিল পথে টেনেছিল। অমর দীর্ঘাকৃতি সাজোয়ান পুরুষ, চোখে তার তীক্ষ্ণ চাউনী, পাতলা চাপা ঠোঁটে তার প্রতিজ্ঞার বাঁধন, সবল রাজস আধারে প্রয়োজনের অধিক শক্তি। একা খালি হাতে সে তিব্বত, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ঘুরে এসেছে, জাহাজের খালাসী হয়ে য়ুরোপ আমেরিকা আফ্রিকার অনেক বড় বড় সহর দেখেছে। তার কথায় চাপা আগুন, জলন্ত উৎসাহে চুম্বকের শক্তি সাহচর্য্যে মধু, আর চোখে ঐ সাঁড়াশীর মত অন্তর্ভেদী চাউনী। পূর্ব্বে এই রকম উপাদানে বোধ হয় তৈমুর চেঙ্গিজখাঁ জন্মাত, এমনি মানুষ ভারতে এক দিন দিগ্বিজয়ের নামে ঘোড়া ছাড়তো, আজও স্বাধীন দেশে এরা দেশ-লক্ষ্মীর আসন মণি-মুক্তায় সাজিয়ে দেয়, আর পরাধীন দেশে রাজ-রোষের আগুনে মনের আনন্দে ঝাঁপিয়ে পুড়ে মরে। আসুরিক শক্তি নিয়ে যারা জন্মায়, তারা সে অপর্য্যাপ্ত শক্তি কি ক'রে ধ'রে রাখবে, খুঁজে পায় না, একটা লণ্ড-ভণ্ড ব্যাপার ঘটিয়ে বসে।"

এই অমরকে আমরা চিনি; কাপুরুষ আমাদের বুকের মধ্যেও এত দিন ম'রে ছিল। এ অমর গিন্নীর আঁচলের মাণিক নয়। এর দৃষ্টি মেছুনি পাণওয়ালীর উপর ঘুরে নিজেকে এবং দেশকে ব্যর্থতায় জর্জ্জরিত করে না। এর নিশ্বাসে সে যেন এক কোন্ দেশের হাওয়া বয়—সেখেনে যাবার জন্যে প্রতি মানুষের মনের এক কোণ আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠে!

বারিণদার গল্পগুলির মধ্যে উদ্দামতা আছে; হয় ত অ'গতি দোষও আছে; হয় ত বা দু'চারটে এমন ভাব আর ক'া এসে গেছে, যাকে বর্ত্তমান সমালোচকরা পছন্দ করবেন না। কিন্তু বারিণদা ভয় কাকে বলে, তা ত জানেন না; বাঁশকে তিনি বাঁশই বলবেন, তা' তু'ঘা সে পিঠেই পড়ুক, কি মাথাতেই পড়ুক। তাকে 'বেণুদাদা বেণুদাদা' ব'লে তুষ্ট করার ধৈর্য্য নেই, সময় নেই, এই "অপর্য্যাপ্ত শক্তি"র দেশের দুলালটির।

দীপালির গল্পের ছন্দের সঙ্গে নিজে না চলতে পারলে হোঁচট খাবার ভয় আছে; কিন্তু হোঁচটের ভয়ে যে বিছানা নেয়, তার ভাগ্যে তীর্থ-ভ্রমণ নেই বুঝতে হবে।

বাংলা সাহিত্যে বড্ড একটুখানি পরিসরের মধ্যে কোস্তা-কুস্তি চলছিল। কেউ কবি রবীন্দ্রনাথের কপি, না হয় শরৎচন্দ্রের চুরি। কবিতাতেও তাই, গল্পেও তাই, উপন্যাসেও তাই! পরিণত বয়সে, পক্ক কেশে কবি লিখলেন গীতাঞ্জলি, আর রক্ষে আছে? দেশের সমস্ত কবিই হয়ে গেলেন পরম ভক্তের দল। পতিতার মধ্যেও যে মানুষটি আছে, তাকে অবহেলা করা যায় না। এই কথাটি মনোজ্ঞ ক'রে শরৎচন্দ্র দেখাতে না দেখাতে দেশ শুদ্ধ সাহিত্যিকের নায়িকারা ঘরের বাঁধন ভেঙে উঠলেন গিয়ে চিৎপুরের টংএ!

দীপালি বইখানির প্রতি গল্পের সমালোচনা করতে বসিনি, তাতে লাভও নেই। গল্প পড়তে ভাল লাগে। দু' একটা লিখতে গিয়ে সে লেখার সুখ দুঃখ কি, তাও হয় ত কিছু কিছু জানি। তাই গল্পগুলিকে দরদের সঙ্গে প'ড়ে দেখে বুঝেছি যে, তার মধ্যে অনেকগুলি, ছোট গল্প হিসাবে, আমাদের সাহিত্যে এত দিন যা ছিল না ব'লে দুঃখ ছিল, তাই।

সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ওর মানুষগুলো বিদেশী নয়। দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী জ্যোতির্বার্ণব এ দেশেরই লোক। তার হাব-ভাব, তার আনমনা ভাব;—চমৎকার ক'রে দেখান হয়েছে। শিল্পীর দৃষ্টির সূক্ষ্মতার কোন দৈন্য নাই। বলার ভঙ্গী চমৎকার; ভাষাও ভাল।

বইখানির চেহারা সুন্দর; কাগজ ভাল, ছাপাতেও বিশেষ কোন দোষ-ত্রুটি নাই। প্রকাশকও শূর-বীর প্রকাশকদের মধ্যে অন্যতম।

এর উপরও যদি বইখানি পাঠকদের মনে না ধরে, লোকের হাতে না কেটে যদি পোকার দাঁতে কাটে ত বুঝতে হবে যে, বাংলা সাহিত্যের এ দিকের ত্রুটির চেয়ে অপরদিকের গলদ বড়।

দীপালির দীপগুলির শিখা সাহিত্যকে রঙিন করেনি; উজ্জ্বলতাই দিয়েছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ঊনত্রিংশ প্রবাহ

নীল দরজার বাড়ী

স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়া, ছুই তিন মিনিট চিন্তামগ্ন রহিলাম। তাহার পর আরও ছুই একটি কথা হইলে আমি তাহাকে নিম্নস্বরে বলিলাম, "দেখ মিসেস্ ক্রোদার, আমি অকারণ তোমার এখানে আসি নাই, আমি একটা অপরাধের তদন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তাহা সাধারণ অপরাধ নহে—হত্যাকাণ্ড।"

আমার কথা শুনিয়া সে বিস্ফারিত-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিল, সভয়ে বলিল, "হত্যাকাণ্ড? কি সর্ব্বনাশ!"

আমি বলিলাম, "আস্তে কথা বল। হাঁ, হত্যাকাণ্ড। কিন্তু যেসি যেন ইহা জানিতে না পারে। পুলিসের নিকট সে নির্ভরযোগ্য সংবাদ দিতে পারে, এই জন্য আমি তাহাকে লণ্ডনে লইয়া যাইতে চাই।"

মিসেস্ ক্রোদার উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তা কি করিয়া হইবে? আপনি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক, আমি কি তাহাকে আপনার সঙ্গে ছাড়িয়া দিতে পারি? না, আমি তাহাকে যাইতে দিব না। আপনার এই আবদার অত্যন্ত অসঙ্গত।"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা না করিলে আমাকে অগত্যা এখানকার থানায় যাইতে হইবে, পুলিস তাহাকে ধরিয়া লণ্ডনে পাঠাইলে তুমি কি তাহাদের কাযে বাধা দিতে পারিবে? তুমি তাহাকে আমার সঙ্গে যাইতে দিলে আমাকে পুলিস ডাকিতে হইত না, এই ব্যাপার লইয়া এখানে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন-আলোচনাও হইত না। চুপি চুপি কাযটা শেষ করিবারই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু, তুমি একটা কেলেঙ্কারী না করিয়া ছাড়িবে না।" কথাগুলি খুব গম্ভীরভাবেই বলিলাম।

পুলিস আসিয়া যেসিকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে শুনিয়া স্ত্রীলোকটির মুখ শুকাইয়া গেল, ভয়ে তাহার ছুই চক্ষু কপালে উঠিল। সে অগত্যা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল, কিন্তু আমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল, পরদিন আমি যেসিকে তাহার নিকট রাখিয়া যাইব।

তাহার আতঙ্ক দেখিয়া আমি কোমল স্বরে বলিলাম, "তোমার কোন ভয় নাই, মিসেস্ ক্রোদার! আমি তাহাকে তাহার বাড়ীতেই লইয়া যাইব!"

মিসেস্ ক্রোদার অতঃপর আমার প্রস্তাবে আপত্তি করিল না। আমি তাহার সঙ্গে অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলাম। যেসি তখনও সেই কক্ষে বসিয়া কৌতূহলভরে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

আমি যেসিকে বলিলাম, "যেসি, যোয়ানকে দেখিতে তোমার ইচ্ছা হয় না? যোয়ানের সঙ্গে দেখা করাইবার জন্য আমি তোমাকে লণ্ডনে লইয়া যাইব।"

যেসির চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইল, সে সোৎসাহে বলিল, "লণ্ডনে যাইলে সত্যই কি যোয়ানের দেখা পাইব? কত দিন তাহাকে দেখি নাই! তাহার সঙ্গে দেখা হইবার আশা থাকিলে আমি নিশ্চয়ই লণ্ডনে যাইব; কিন্তু আমি মনে করিয়াছিলাম, সে কাকার সঙ্গে বিদেশে গিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তোমার কাকা কি তোমাকে সে কথা কোন পত্রে লিখিয়াছিলেন? বোধ হয়, তাহা লেখেন নাই। তুমি লণ্ডনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া এস, কাল আমি তোমাকে এখানে রাখিয়া যাইব।"

যেসি তাহার অভিভাবিকার সঙ্গে দোতলায় চলিয়া গেল এবং কয়েক মিনিট পরে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিল। তাহার অঙ্গে ছুই একখানি মূল্যবান্ অলঙ্কারও দেখিতে পাইলাম। যোয়ানের সহিত সাক্ষাতের আশায় সে অত্যন্ত উৎফুল্ল ও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কয়েক মিনিট পরে আমরা ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ ধরিলাম, এবং একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া লণ্ডনের দিকে অগ্রসর হইলাম।

গাড়ীতে বসিয়া আমি সতর্কভাবে যেসিকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

আমি কথায় কথায় তাহাকে বলিলাম, "অল্পদিনের মধ্যে মিস্ বার্লোর সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল যেসি?"

যেসি বলিল, "না, কয়েক মাসের মধ্যে তাহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। আহা, সে বেচারা এখন কোথায় আছে, তাহাও ত জানি না। কি জন্য জানি না, কাকা হঠাৎ তাহার উপর ভয়ঙ্কর চটিয়া গিয়াছিলেন, সে যেন তাঁহার চক্ষুর বিষ হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "সত্য না কি? তোমার 'গভর্ণেস্' কোথায় থাকিত?"

যেসি তাহার ক্ষুদ্র হাতখানি নাড়িয়া বলিল, "সে অনেক দূর, বোধ হয় 'ক্রিষ্টাল প্যালেসে'র নিকট একটা যায়গায়, সেই যায়গাটির নাম শুনিয়াছি পেঞ্জি। কিন্তু আমি ঠিক জানি না। আমি কোন দিন সেখানে যাই নাই।"

আমি বলিলাম, "তুমি তোমার কাকাকে বড্ড ভাল-বাস? কেমন?"

যেসি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "হাঁ, তা বাসি, কিন্তু—"

তাহাকে নীরব হইতে দেখিয়া বলিলাম, "কিন্তু—কি?"

যেসি বলিল, "তিনি আমাকে খুবই ভালবাসেন বটে, কিন্তু রাত্রিকালে পথে পথে ঘুরিয়া পথ হারাইতে আমার ভাল লাগে না। তিনি যে কেন আমাকে রাত্রিকালে ঐ ভাবে পথে পাঠাইয়া কষ্ট দিয়া থাকেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি পথ হারাইয়া কাঁদি, তাহা দেখিয়া ভদ্র-লোকরা দয়া করিয়া আমাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসেন। ইহাতে সেই সকল ভদ্রলোকের কষ্ট ও অসুবিধা হয়, ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু কাকাই ত সে জন্য দায়ী, তিনি আমাকে রাত্রিকালে অপরিচিত পথে না পাঠাইলে ঐ সকল দয়ালু লোককে ও ভাবে কষ্ট পাইতে হয় না। কাকাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কাকা বলিয়াছিলেন, ভদ্রলোকরা আমাকে বাড়ীতে লইয়া যান দেখিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হয়, তিনি সেই সকল লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার নাকি বন্ধুত্ব হয়।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এই জন্য তোমাকে বোধ হয় প্রায়ই হারাইতে হইত?"

যেসি বলিল, "হাঁ, লণ্ডনের পথে আমি অনেকবার হারাইয়াছিলাম।"

আমি।—দয়ালু ভদ্রলোকরা তোমাকে পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে দেখিয়া তোমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতেন। তাঁহারা তোমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইতেন কি? তুমি তাঁহাদের কাহাকেও পরে কোন দিন কোথাও দেখিতে পাইয়াছিলে কি?

যেসি বলিল, "কৈ, না। তাঁহাদের একজনকেও দ্বিতীয়-বার কোথাও দেখিতে পাই নাই।"

আমি বলিলাম, "কেন, এই ত আমাকে দেখিতেছ। আমি তোমাকে পথ হইতে লইয়া গিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম—এ কথা কি এখন তোমার মনে পড়িতেছে না?"

যেসি বলিল, "হাঁ, মনে পড়িয়াছে; আপনাকে আজ দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু কি করিব বলুন। কাকা আমাকে বলিয়াছিলেন, যাঁহারা দয়া করিয়া আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবেন, তাঁহাদের কথা আমাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে, এমন কি, কাহারও নিকট আমাদের বাড়ীর ঠিকানা বলিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীর নম্বর—৪৫ নং ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীট,—এই কথাই লোকের নিকট প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন।"

আমি বলিলাম, "তোমরা ত ঐ নম্বর বাড়ীতে বাস কর না?"

যেসি বলিল, "কাকার আদেশে দয়ালু লোকগুলিকে আমাদের বাড়ীর নম্বর উহাই বলি বটে, শেষে তাঁহাদিগকে আমাদের নিজের বাড়ীতেই লইয়া যাই। এখন কাকা বিদেশে, এখন আর আমাকে ঐ কায করিতে হয় না। ঐ সকল লোক পরে আমাদের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন, কাকার এরূপ ইচ্ছা নয়।"

আমি।—তোমার কাকা কি সর্ব্বদাই এইভাবে তোমাকে পথ হারাইতে পাঠাইয়া দিতেন?

যেসি।—না, সর্ব্বদা পাঠাইতেন না, যে রাত্রিতে কুয়াশায় চারিদিক ঢাকিয়া যাইত, চোখে আঙ্গুল দিলেও নিকটের বস্তু দেখা যাইত না, সেই রাত্রেই কাকা আমাকে পথে পাঠাইয়া দিতেন, আমি ঘুরিতে ঘুরিতে পথ হারাইয়া কাঁদিতাম। দয়ালু লোকরা আমাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইতেন, কিন্তু পরে তাঁহারা সেই বাড়ী চিনিতে পারিতেন না। কুয়াশায় চারিদিক ঢাকিয়া যাইত কি না।

আমি।—তোমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দেওয়ার পর সেই দয়ালু ভদ্রলোকদের বা ভদ্র মহিলাদের কি অবস্থা হইত?

যেসি।—ওঃ, কাকা তাঁহাদের দয়ার পরিচয় পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইতেন, আদর করিয়া তাঁহাদিগকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া বসাইতেন, ইব্রাহিম তাঁহার আদেশে তাঁহাদের জন্য কফি তৈয়ার করিয়া আনিত; কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে কাকার কি আলাপ হইত, তাহা কোন দিন জানিতে পারি নাই, কাকা সে সময় আমাকে সেখানে থাকিতে দিতেন না। আমাকে তিনি বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিতেন।

আমি বলিলাম, "যোয়ান সে সময় কোথায় থাকিত?"

যেসি।—সে কোন কোন দিন সেখানে থাকিত। কিন্তু

সে যাহা দেখিত বা জানিতে পারিত, তাহা কেন আমাকে বলিতে সাহস করিত না, তাহা কোন দিন জানিতে পারি নাই। এক দিন আমি হঠাৎ যোয়ানকে ইব্রাহিমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে দেখিলাম। যোয়ান ইব্রাহিমকে ভয় দেখাইয়া বলিল, সে পুলিসের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিবে। কিন্তু কি কথা, তাহা জানিতে পারি নাই। দয়ালু ব্যক্তিরা দয়া করিয়া আমাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইবার পর এক এক দিন আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতাম; কিন্তু ইহার কারণ বুঝিতে পারিতাম না। যোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার কারণ জানিতে পারি নাই।

আমি।—মিস্ বার্লোকে কোন দিন সে কথা বলিয়াছিলে?

যেসি।—না; কাকা আমাকে বারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মিস্ বার্লোকে কোন কথা বলিতে আমার সাহস হয় নাই। সে আমাদের বেজওয়াটারের বাড়ী-সংক্রান্ত কোন কথা জানিত না। কাকার অদ্ভুত খেয়াল, খেয়ালের ঝোঁকে তিনি সময়ে সময়ে যে সকল কায করিতেন, তাহার মানে বুঝিতে পারিতাম না। আমার নাম যেসি, কিন্তু হেনরিকের কাছে আমাকে রোজালি বলিয়া পরিচিত করা হইল! এক-খানি ঘর তিনি সব সময় তালা-চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতেন, সে দিকে কাহারও যাইবার হুকুম ছিল না; এ তাঁহার কি খেয়াল, তাহা বুঝিতে পারিতাম না। এক এক দিন কাকা আমাকে ট্যাক্সিতে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন, পথে চলিতে চলিতে কোন ভদ্রলোক বা মহিলাকে একাকী বেড়াইতে দেখিয়া তিনি আমাকে বলিতেন, 'উহাকে চিনিয়া রাখ।' তাহার পর কিছু দূরে গাড়ী থামাইয়া আমাকে নামাইয়া দিয়া বলিতেন, 'যাহাকে চিনিয়া রাখিলাম, তাহাকে বলিবে, তুমি পথ হারাইয়াছ; দয়া করিয়া তোমাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে বলিবে।' তাহার পর তিনি বাড়ী আসিয়া তাহাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেন। আমাকে বলিতে হইত, 'পিসীর বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলাম, একাকী বাড়ী ফিরিতেছিলাম, পথ হারাইয়াছি।' এই একই কথা বলিয়া আমাকে তাঁহাদের দয়া প্রার্থনা করিতে হইত। কাকার এ কি রকম খেয়াল, তাহা বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু বার বার ঐ একই মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাদের ভুলাইতে আমার লজ্জা হইত।"

আমি বলিলাম, "যে সকল লোককে এই ভাবে ভুলাইয়া তোমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইতে, তাঁহাদের সকলেরই পোষাক-পরিচ্ছদ কি ভদ্রলোকের মত?"

যেসি।—না, আমি সাধারণ পথিকেরও সাহায্য প্রার্থনা করিতাম। কাকা বলিতেন, তিনি সমাজের ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে ভাল-বাসেন।

আমি।—তুমি বলিলে, তুমি মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতে, সে কিরূপ আর্ত্তনাদ?

যেসি।—যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ, যেন কেহ অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিত; কিন্তু আমি সেখানে দীর্ঘকাল থাকিতে পাইতাম না। যোয়ান আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া লেক্সহাম গার্ডেনসের বাড়ীতে রাখিয়া আসিত। কিছু দিন পূর্ব্বে একটি মেয়ে—তার নাম স্মিথ, এক সপ্তাহের জন্য আমাদের বাড়ী চাকরী করিয়াছিল, সে আমাকে সঙ্গে লইয়া কেনসিংটনে যাইত।

আমি বলিলাম, "তোমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছিল, এরূপ কোন লোককে তুমি পরে কোন দিন দেখিতে পাইয়াছিলে?"

যেসি বলিল, "কেবলমাত্র আপনাকেই দেখিতেছি, আর কোন লোককে দ্বিতীয়বার দেখিতে পাই নাই। কাকা আদর করিয়া তাঁহাদের কাছে বসাইয়া গল্প করিতেন, কফি, চুরুট প্রভৃতি দিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিতেন, অথচ তাঁহারা আর কোন দিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন না; ইহার কারণ বুঝিতে পারিতাম না।"

আমি ইহার কারণ জানিতাম, কিন্তু যেসিকে তাহা বলিবার উপায় ছিল না। আমি ঐ কথা চাপা দিয়া বলিলাম, "যখন তোমরা গোল্ডার্সগ্রীণে বাস করিতে, সেই সময় এক রবিবারের রাত্রে জিলরয় নামক কোন ভদ্রলোক নদীতীরের একটি রাস্তায় তোমাকে পথহারা অবস্থায় দেখিতে পাইয়া কি তোমাকে তোমাদের বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছিল?"

যেসি বলিল, "হাঁ, হাঁ, সে কথা আমার মনে আছে। আমি যোয়ানের সঙ্গে চলিতে চলিতে হারাইয়া যাই, যোয়ানকে আর দেখিতে পাইলাম না; বাড়ীর পথ চিনিতে না পারিয়া পথে দাঁড়াইয়াছিলাম—সেই সময় সেই

ভদ্রলোকটি আমাকে বিপন্ন দেখিয়া বাড়ী পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। সেই রাত্রে একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে কথা আমাকে কেহ না বলিলেও আমি পরে জানিতে পারি। যোয়ানের ভালবাসার লোক মিঃ বার্লোকে কে খুন করিয়াছিল ?"

আমি।—তোমার কাকা কোথায় ছিলেন ?

যেসি।—তিনি তখন ব্রাইটনে বা অন্য কোন স্থানে ছিলেন। কিন্তু যোয়ান বেচারীর জন্য আমার দুঃখ হয়।

আমি।—দুঃখ কেন ?

যেসি।—তাহার মনে যেন সুখ নাই, তাহার মনে কি একটা ভয় যেন সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে! হঠাৎ কোন শব্দ শুনিলে সে চমকিয়া উঠে। সে আমাকে বলিয়াছে—কেহ কাকার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি যেন নীরব থাকি ; কারণ, তাঁহার খেয়ালের কথা প্রকাশ করিয়া লাভ নাই, বরং তাহাতে তাঁহার ক্ষতি হইতে পারে।

আমি বলিলাম, "লাভ না থাক, আমার তাহা জানিতে আগ্রহ হয়, কারণ, তুমি পথ হারাইলে আমি এক রাত্রে তোমাকে তোমাদের বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছিলাম।"

যেসি হাসিয়া বলিল, "ও আপনার ভুল ধারণা, আমি পথ হারাই নাই। আমি বেজওয়াটারের প্রত্যেক পথ, সকল বাড়ীই চিনি।—কাকার খেয়াল—তিনি অপরিচিত লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিতে হইবে ; এই জন্যই ঐ ভাবে আপনার সঙ্গে চালাকি করিয়াছিলাম। আপনি আমার উপর রাগ করিবেন না। কাকার হুকুম ত অগ্রাহ্য করিতে পারি না।"

আমি বলিলাম, "না, আমি রাগ করি নাই, তোমার দোষ কি ? কিন্তু আমি সেই বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি, তাহা ডেভেরো স্কোয়ারের কোণে দেখিতে পাইয়াছি।"

যেসি বলিল, "কিন্তু অন্য কোন লোক সেই বাড়ীর সন্ধান পায় না ; সকলেই মনে করে, ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীটে সেই বাড়ী! কাকা বলেন, লোকগুলার ভুল দেখিয়া আমোদ বোধ হয়।"

আমি।—কিন্তু আমি আর একটা কথা জানিতে চাই। যেসি, তোমার সরল ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, তুমি খাসা মেয়ে। তুমি ত অনেক কথাই বলিলে, কিন্তু তোমাদের কোন ঘর হইতে নীলবর্ণ বিদ্যুতের আভা বাহির হইতে দেখিয়াছ কি ?

যেসি।—হাঁ, এক দিন আমাদের উপর ঘরের একটা জানালা দিয়া ঐ রকম আলোর ফুল্‌কি বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কাকা ঘরে বসিয়া নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করেন কি না, তাই মনে হইয়াছিল, তিনি বিজলী বাতি লইয়া কোন রকম পরীক্ষা করিতেছিলেন। উহা অসাধারণ ব্যাপার বলিয়া আমার মনে হয় নাই।

আমি।—তুমি তাঁহার ঘরে অনেক রকম অদ্ভুত যন্ত্রাদি দেখিয়াছ বুঝি ?

যেসি।—হাঁ, দোতলার একটা ঘরে অনেক রকম যন্ত্র আছে। কোন কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রে হাত ঠেকিলেই শরীরে বিদ্যুৎ প্রবেশ করে, সর্ব্বশরীরে ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি লাগে। সাবধানে চলাফেরা না করিলেই বিপদ!

আমি।—তোমার কাকার ছবি আঁকিবারও অভ্যাস আছে ?

যেসি সগর্ব্বে বলিল, "আছেই ত। তিনি এমন চমৎকার ছবি আঁকেন যে, দেখিলে মনে হয় জ্যান্ত মানুষ! তিনি আমারও একখান ছবি আঁকিয়াছিলেন, সেখানি কোথায় আছে, তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু তাঁহার ছবিগুলি দেখিলে মনে হয়, লোকগুলি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, যেন মৃত্যু-যন্ত্রণায় তাহাদের প্রাণ বাহির হইতেছে! ঐ সকল ছবি দেখিয়া আমার ভয় হয়, ওগুলা আমার ভাল লাগে না।"

আমি।—বেজওয়াটারের সেই বাড়ীতে তোমার কাকা কত দিন বাস করিয়াছিলেন ?

যেসি।—বাবার মৃত্যুর পর হইতে। উহা বাবারই বাড়ী। সেই বাড়ীতেই আমার জন্ম হইয়াছিল। আমার মায়ের মৃত্যুর এক বৎসর পরে বাবা একটা দুর্ঘটনায় পথে মারা যান। তাহার পর হইতে কাকা সেই বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন।

আমি।—কত দিন পূর্ব্বে ?

যেসি।—প্রায় ২ বৎসর।

আমি। তোমার কাকার এই সকল অদ্ভুত খেয়াল কি সেই সময় হইতেই বর্ত্তমান ?

যেসি।—না। আমরা যখন প্যারিসে ছিলাম, তখন কাকার কোন রকম খেয়াল ছিল না বলিয়াই জানি। পরে

তাঁহার মেজাজের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহার রাগ দেখিয়া যোয়ান ও আমি ভয়ে মরিতাম, কেবল ইব্রাহিম তাঁহাকে থামাইয়া রাখিতে পারিত। ইব্রাহিম আরবী ভাষায় বিড়বিড় করিয়া কি বলিত, তাহা আমরা ত বুঝিতাম ছাই! কিন্তু তাহা শুনিয়া কাকার অত রাগ—যেন জল হইয়া যাইত।

যেসি সরলভাবে যে সকল কথা বলিল, তাহা তাহার মত বয়সের মেয়ের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না; কোন বয়স্কা যুবতীর নিকটও আমি এত কথা শুনিবার আশা করিতে পারিতাম না। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—তাহার কাকার গুপ্ত রহস্য ও গোপনীয় কার্য্য-প্রণালী তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অথচ সে তাহার কাকার হাতের অস্ত্র।

অবশেষে আমি বলিলাম, "মিঃ বার্লো যোয়ানের প্রণয়ী ছিল? লোকটিকে তোমার ভাল লাগিত?"

যেসি বলিল, "হাঁ; সে আমাকে খুব আদর করিত, আমাকে ভাল ভাল জিনিষ উপহার দিত। কারণ, তাহার ভগিনী আমার গভর্ণেস ছিল। আহা, এডুইনের মৃত্যুতে আমার বড় কষ্ট হইয়াছিল।"

আমি।—তোমার কাকা তাহাকে ভালবাসিতেন কি?

যেসি।—তাহা আমার ঠিক জানা নাই। কাকার মেজাজ ত সব সময় এক রকম থাকে না, আজ যে তাঁহার প্রিয় পাত্র, কাল সে তাঁহার চোখের বিষ! তাঁহার কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার কাকার সম্বন্ধে তোমার ধারণা ত খুব উচ্চ!"

যেসি।—কেবল আমার কেন, তাঁহার মেয়ে যোয়ানের ধারণাও যে ঐ রকম। কিন্তু কাকা এডুইনের সঙ্গে অনেক সময় গল্প ও পরামর্শ করিতেন, এইজন্য মনে হয়, তিনি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন না।

আমি।—তাহার মৃত্যুকালে তোমার কাকা বাড়ী ছিলেন না? ঠিক তোমার স্মরণ আছে?

যেসি।—হাঁ, আমার বেশ মনে আছে, কারণ, সে দিন আমার জন্মতিথি, কাকা সে দিন বাড়ী না থাকায় আমাকে এই ব্রেসলেট জোড়াটা ডাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

যেসি হাত বাড়াইয়া আমাকে তাহার অলঙ্কার দেখাইল। ইহার পর আমাদের আর কোন কথা হইল না। ট্রেণ বায়ুবেগে গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল, যেসি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া প্রান্তরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। তখন সূর্য্যাস্তের অধিক বিলম্ব ছিল না।

ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে নামিয়া আমি যেসির জন্য একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিলাম। ট্যাক্সিওয়ালাকে ডেভেরো স্কোয়ারে যাইতে বলিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি বাড়ী পৌঁছিয়া ডেনম্যানকে টেলিফোনে সকল কথা বলিব। তিনি যেসির সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমার নিকট একাধিকবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ডেভেরো স্কোয়ারে ট্যাক্সি থামিলে আমি গাড়ী হইতে নামিয়া যেসিকে নামাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছি, সেই সময় যেসি খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনি এখানে নামিলেন কেন? এ বাড়ী ত আমাদের নয়!"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "তুমি বলিতেছ কি? এই বাড়ীতেই তোমার কাকা বাস করেন, ক্লীন এই বাড়ীতেই আছে জানি।"

যেসি বলিল, "আপনার ভুল হইয়াছে বলিয়া কি আমাকেও ভুল করিতে হইবে? এ বাড়ী আমাদের নয়। আমাদের বাড়ী ঐ দিকে, ঐ দেখুন।"—সে অদূরবর্ত্তী আর একখানি বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল। সেই বাড়ীখানি ল্যাণ্ডলে ষ্ট্রীটে অবস্থিত; সেখানি প্রকাণ্ড বাড়ী।

আমি সবিস্ময়ে সেই বাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার ধারণা হইল, পূর্ব্বে আমি সেই বাড়ীতেই যেসিকে লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তাহার বাহ্য আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বারান্দার সাদা-কালো টালি অপসারিত হইয়াছিল এবং দরজার রং পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহা গাঢ় নীলবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল। সুতরাং হঠাৎ তাহা দেখিয়া চিনিবার উপায় ছিল না।

যাহা হউক, যেসি তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া দ্রুতবেগে সেই অট্টালিকার বারান্দায় উঠিল, এবং আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় করিয়া তাহার অনুসরণ করিবার পূর্ব্বেই যেসি রুদ্ধ দ্বারে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করিল। আমি ধীরে ধীরে তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম, কিন্তু রুদ্ধ দ্বার খুলিল না!

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কুঞ্জভঙ্গ

গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম পর্ব্ব সাঙ্গ হইল। এখন বৈঠকের ভারতীয় "প্রতিনিধিরা" দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। যদি নাই, অন্যান্য অনেকেই বলিয়াছিলেন, তাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কমে কোন রফাতেই সম্মত হইবেন না। শাস্ত্রী সপরু জয়াকরের দল ত এমনও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা দেশের লোকের বিদ্রূপ, ভৎ‍র্সনা ও টিটকারী সহিয়া কেবল
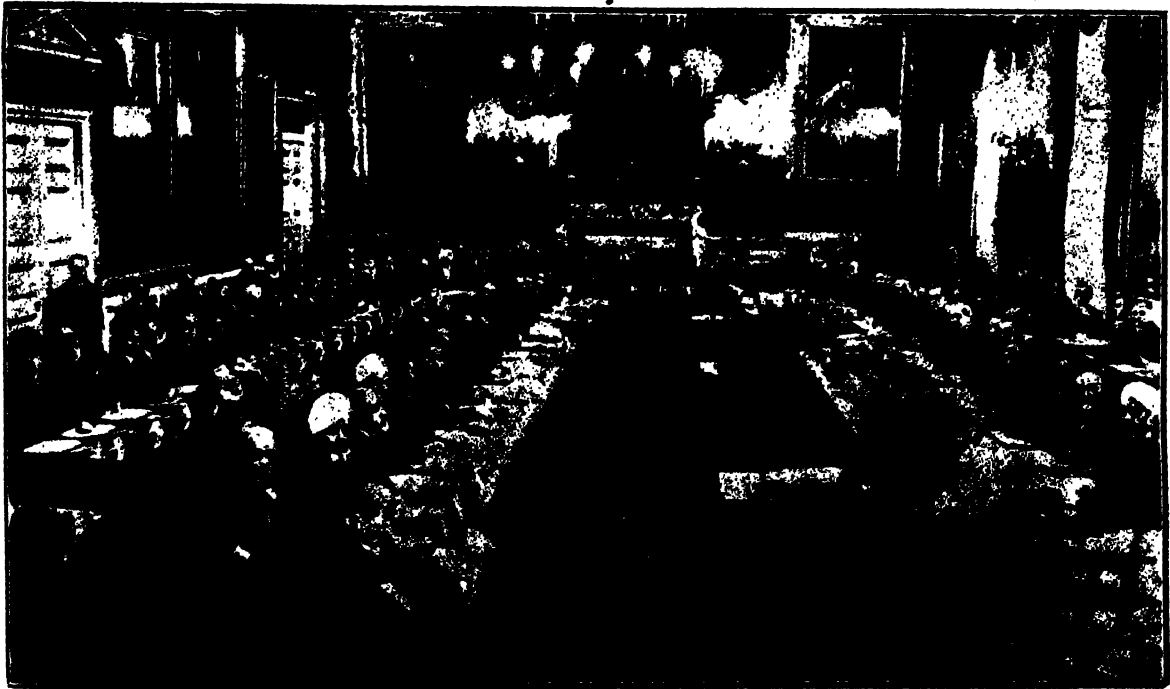
গোল টেবিল বৈঠক

তাঁহাদের দেশবাসী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন,—তোমরা সেখানে কি করিয়া আসিলে, কি লইয়া ফিরিয়া আসিতেছ, তাহা হইলে তাঁহারা কি উত্তর দিবেন ?

অবশ্য কেহ বলিতেছে না যে, তাঁহাদের কার্য্য সাঙ্গ হইয়াছে। তাঁহারা এখনও বলিতে পারেন যে, এই ত সবে কলির সন্ধ্যা, এখনও অনেক বাকী, বসিয়া থাও, সবুরে মেওয়া ফলিবে। কিন্তু হাঁড়ীর একটা ভাত টিপিলে যেমন সকল ভাতের খবর পাওয়া যায়, তেমনই মুখপাতে তাঁহারা তাঁহাদের সাফল্যের যে নমুনা দেখাইয়াছেন, তাহাতে বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না, পরিণামে কি হইবে।

প্রারম্ভে তাঁহাদের মধ্যে একাধিক জনের মুখে অনেক আশার কথাই শুনা গিয়াছিল। শাস্ত্রী, সপরু, জয়াকরের ত কথাই দেশের মঙ্গলের জন্য এই কষ্টকর ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন—দেশের লোক তাঁহাদিগকে দেশদ্রোহী বলিয়াও গালি পাড়িয়াছে।

মহাত্মা গন্ধী

মহাত্মা গন্ধী তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'আমি স্বাধীনতার ছায়া লইয়া সন্তুষ্ট হইব না, আমি উহার কায়া চাই। যদি আপনারা কায়া লইয়া দেশে ফিরিতে পারেন, তাহা হইলে আমি কংগ্রেসকে অবস্থার পুনরালোচনা করিয়া কার্য্যব্যবস্থা স্থির করিতে অনুরোধ করিব।' সুতরাং তাঁহারা যদি এখন সেই কায়া না লইয়া ফিরিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে দেশবাসীর নিকট তাঁহাদের মুখ থাকিবে কোথায় ?

ইহা হইল আদিপর্ব্ব। এই পর্ব্বে সার মহম্মদ সফি ও মহম্মদ

সার মহম্মদ সফি

আলির মত সঙ্কীর্ণ' সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রতিভূরাও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের দাবী করিয়াছিলেন। মিঃ মহম্মদ আলি ত একবারে চরমপন্থীর উগ্র তেজস্কর ভাষায় বলিয়াছিলেন, 'আমি স্বাধীনতার কমে কোন রফাতেই সম্মত হইব না।'

কিন্তু তাহার পর ? যে মুহূর্ত্তে ফাঁকা আওয়াজের পর প্রকৃত সংঘর্ষ আরম্ভ হইল, তখন সাম্প্রদায়িকতার ড্রেড্‌নট ও ফিল্ড গান হইতে ভীষণ ধূম উদ্গিরণ করিয়া বিরোধের গোলা নির্গত হইতে লাগিল। যে যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইয়া 'প্রতিনিধিরা' কোমর বাঁধিয়া সাগরপারে গিয়াছিলেন, সে যুদ্ধের নামগন্ধও আর পাওয়া গেল না, কেবল তাঁহাদের আপনাদের মধ্যেই নেতার আসন কে অধিকার করিবে—দুধের সর ও মাছের মুড়াটা কে পাইবে, ইহা লইয়াই হাউইটজার ম্যাক্সিম গান হইতে গোলাগুলী বর্ষিত হইতে লাগিল। অপর পক্ষ দূরে দাঁড়াইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, জগতের লোক চমৎকার মজা উপভোগ করিতে লাগিলেন, আর অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন কি না, তাহা জানিতে পারা যায় নাই !

মিঃ আগা খাঁ

এই যুদ্ধে এক পক্ষে প্রধান সেনাপতি মিঃ মহম্মদ আলি, জিন্না। যদিও মাননীয় আগা খাঁকে পুরোভাগে রাখিয়া মুসলমানবাহিনী হিন্দুদের সম্মুখীন হইয়াছিল, তথাপি মিঃ জিন্নাই মুখ্যতঃ ১৪টি চোখা চোখা অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই জিন্নাই এক দিন জাতীয় দলের নেতৃত্ব করিয়া সার মহম্মদ সফি ও সার ফজলি হোসেন প্রমুখ সাম্প্রদায়িকতার অবতার-যুগলের বিপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, জিন্না "কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ" এই মহানীতিবাক্য অনুসরণ করিয়া তাঁহার আজীবন অনুসৃত জাতীয়ভাকে সমাধি

মিঃ জিন্না

সার তেজবাহাদুর সপ্রু

দিয়া আগা খাঁর সাম্প্রদায়িক গণ্ডার এণ্ডা দিলেন !

এই ব্যাপারে হিন্দু প্রতিনিধিদের মধ্যেও দলাদলি উপস্থিত হইল। ডাক্তার তেজ বাহাদুর সপ্রু মুসলমানদিগের সকল দাবী সমর্থন করিয়া সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইলেন। যেমন করিয়া হউক, আপনাদের মধ্যে একতা রাখিয়া বৃটিশ পক্ষকে চাপ দিয়া স্বরাজ আদায় করা বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু অন্যান্য অনেক হিন্দু 'প্রতিনিধি' কিছুতেই বিবেকের ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই কার্য্য সমর্থন করিতে সম্মত হইলেন না। সার তেজ বাহাদুর তখন লিবারল দল ছাড়িয়া দিলেন। পাঠক জানেন, এই লিবারলরাই মডারেট নামে খ্যাত। সার তেজ বাহাদুর তাঁহার রাজনীতিক জীবনের অধিকাংশকাল যে অভিমত পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, এই সাম্প্রদায়িকতার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া সে আশ্রয় হইতে চ্যুত হইলেন। সুতরাং এই সাম্প্রদায়িকতা কত বড় শক্তিশালী, তাহা সহজেই অনুমেয়। ফলে গোল টেবিলে মিলন না হইয়া দলাদলি বাড়িয়া চলিল !

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড

তখন অনেকে আপোষের জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড প্রথম একবার যখন চেষ্টা করেন, তখন তিনি মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। কাযেই তাঁহাকে মুসলমানদের সেই ধর্ম্মভঙ্গ পণের সংস্রব হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। আগা খাঁর বাসায়, ভূপালের নবাব বাহাদুরের বাসায়, নানা স্থানে মিলনের চেষ্টা হইল। শেষে শুনা গেল, হিন্দুরা সত্যই মুসলমানদের

ভূপালের নবাব

১৪ পয়েণ্টেই সম্মত হইয়াছেন। তাঁহাদের নামে চারিদিকে ধন্ত ধন্ত পড়িয়া গেল—দেশের জন্ত এমন স্বার্থত্যাগ—এমন আত্ম-ত্যাগ হয় নাই, হইবেও না, ইত্যাদি। কিন্তু তাহার পরে যখন ভারতের হিন্দু মহল হইতে এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইতে লাগিল, তখন গোল টেবিলের কয় জন হিন্দু বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন, আবার মিলন ফাঁসিয়া গেল।

তখন কবীন্দ্র রবীন্দ্র বিলাতে। তিনি দেখিলেন, গোল টেবিল বুঝি ফাঁসিয়া যায়, কাযেই তিনি রাজনীতিতে যোগদান করিতে বিশেষ সম্মত না থাকিলেও, বোধ হয়, জগদ্বাসীর সমক্ষে দেশবাসী হাস্তাস্পদ হয়, এই ভাবিয়া একবার শেষ মিলনের চেষ্টা করিলেন। তিনি মিলনের বিষয়ে ঘোর সন্দিহানই ছিলেন, তথাপি আশা ছাড়েন নাই। কিন্তু পরে তাঁহার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল!

মিলন হইবে কি প্রকারে? যেখানে এক পক্ষ আপনাদের জিদ আঁকড়িয়া ধরিয়া বলেন,—"আমাদের সব কথার সম্মান সংরক্ষিত না হইলে আমরা অপর পক্ষের কোন কথাই শুনিব না," সেখানে মিলন অসম্ভব। সাম্প্রদায়িক স্বার্থে অন্ধ মুসলমানরা লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, সংখ্যাল্প মুসলমানকে বিশেষ অধিকার না দিলে হিন্দুরা ক্ষমতা পাইয়া হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠা করিবে। হিন্দুরা এমন ভাবের আভাস কখনও দেয় নাই, বরং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, নেহরু রিপোর্ট প্রকাশিত ও পুরাতন হইয়া যাইবার পরেও চিরদিনই কংগ্রেস পক্ষ হইতে বলিয়াছেন, উহার পরিবর্ত্তন-পরিবর্জ্জন সম্বন্ধে মুসলমানরা যুক্তিসঙ্গত যাহা কিছু প্রস্তাব করিবেন, কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু মুসলমানরা কি কখনও এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারিয়াছেন? প্রতিশ্রুতি দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামী করেন, তাঁহারা বলেন, মুসলমানরা সংখ্যাল্প, তাহাদিগকে গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয়ে না রাখিলে হিন্দুরা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। কেবল সাম্প্রদায়িকতা নহে, সঙ্গে সঙ্গে Pan Islamismএর স্বপ্ন দেখাও আছে। এ বৎসর এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতি সার মহম্মদ ইকবাল্ বলিয়াছিলেন, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্থানকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য, উহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের
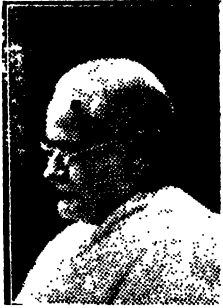
পণ্ডিত মতিলাল নেহরু

অভ্যন্তরে বা বাহিরে যেখানেই থাকুক, তাহাতে আসিয়া যায় না। তিনি যে তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমানা আফ্রিকার মরক্কো দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, ইহা তাঁহার অপার দয়া!

এই সঙ্কীর্ণতা এতই বিসদৃশ যে, মুসলমান পক্ষ হইতেই ইহার তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছে। বাঙ্গালার জাতীয় দলের মুসলমানগণের পক্ষ হইতে মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিন প্রমুখ গণ্যমান্ত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানরা বলিয়াছেন, "যদি হিন্দুরাও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চাহে, তাহা হইলে আমরা তাহার বিপক্ষে দাঁড়াইব, কারণ, উহা মুসলমানের স্বার্থের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। মাদ্রাজের মৌলভী ইয়াকুব হাসান সাহেব বলিয়াছেন, "এরূপ উক্তির পর যদি হিন্দুরা মুসলমানদের অভিপ্রায়ে সন্দিহান হইয়া শঙ্কান্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে অপরাধী করা যায় না। এই উক্তি অতি ভয়ঙ্কর ও অনিষ্টকর।"

মুসলমান পক্ষ হইতেই যখন এমন আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তখন হিন্দু পক্ষ হইতে হইবেই, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। ডাক্তার মুঞ্জে হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে বলিয়াছেন, "সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনপ্রথা জাতীয়তার বিরোধী, উহার ফলে বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিরোধমূলক অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সাম্প্রদায়িক ভেদ ও বিরোধগত সুবিধার অন্বেষণ করিতে যাওয়ার ফলে দায়িত্বপূর্ণ শাসনের যন্ত্র-তন্ত্র বিকল হইয়া যাইবে।" সত্যই নিরপেক্ষভাবে দেখিতে গেলে বলিতেই হইবে, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দিলে জাতীয়তার ও গণতন্ত্রের উচ্ছেদ সঙ্গে সঙ্গেই সাধিত হয়। যাঁহারা ইহা বুঝেন না, বা গোঁড়ামীর ও সঙ্কীর্ণতার ফলে বুঝিতে চাহেন না,—তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া আপোষের চেষ্টা যাহারাই করুক, তাহাদেরই ব্যর্থমনোরথ হওয়া ব্যতীত উপায় নাই।

ডাক্তার মুঞ্জে

শুনা যাইতেছে, শেষ মুহূর্ত্তে নাকি সার চিমনলাল শীতলবাদের চেষ্টায় হিন্দু 'প্রতিনিধিরা' আবার নরম হইয়াছেন, এবং আবার একবার শেষ মিলনের চেষ্টা হইতেছে। ভাল কথা, কিন্তু শেষরক্ষা না হইলে বিশ্বাস নাই। এখন ত কল্পভঙ্গ হইল।

তাহার পর কবে আবার মান, মাথুর ও মিলন হইবে, তাহা ভবিষ্যৎই বলিয়া দিবে।

দেশের আর্থিক অবস্থা

বড়লাট লর্ড আরউইন য়ুরোপীয় ব্যবসায়িসঙ্ঘের সভার ভোজের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—দেশের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে, যদিও জগতের সর্ব্বত্র শিল্প-বাণিজ্যের অবনতির প্রভাব ভারতবর্ষেও বিস্তার লাভ করিয়াছে, তথাপি কংগ্রেসই এই অবস্থার জন্ম মূলতঃ দায়ী।

কথাটার মূলে কোন ভিত্তি আছে কি না, আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। 'এখন ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলার' মত সকল বিষয়েই কংগ্রেসকে অপরাধী করা হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতই কি কংগ্রেস দায়ী? হইতে পারে, কংগ্রেসের আইনভঙ্গ আন্দোলনের জন্ম দেশে জনসাধারণের মনে আইনের প্রতি এবং বিচার ও আদালতের প্রতি শ্রদ্ধা-হ্রাস হইয়াছে, হইতে পারে, লোক অপরাধে ধৃত হইয়া আদালতে আত্মপক্ষসমর্থন করে না বা আদালতের সম্মুখে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করে, কিন্তু তাহার ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা মন্দ হইতে পারে না। তবে কংগ্রেসের বিদেশী ও মাদকদ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলনের ফলে উহা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। বর্জ্জন আন্দোলন দ্বারা লোক যদি মাদকদ্রব্য বর্জ্জনে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে ত দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ারই কথা। প্রথমতঃ, বিদেশী হলাহল মূল্য দিয়া কিনিতে না হইলে আমাদের ঘরের পয়সা বাঁচিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলনের ফলে কৃষক শ্রমিকের ঘরে পুত্রপরিবারকে যত্ন করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, নেশার মোহ কাটিয়া যায়, সর্ব্বোপরি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার—তাহার কড়ি ঘরে উঠে। সুতরাং মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের ফলে সরকারের তহবিলে আয় কমিয়া যায় বটে, কিন্তু প্রজার উপকার ছাড়া অপকার হয় না। আর মাদকদ্রব্যের জন্ম আয় যোগাইয়া প্রজা সরকারের নিকট শিক্ষা-স্বাস্থ্যাদি জাতিগঠনমূলক কার্য্যে কি প্রতিদান পায়?

তাহার পর বিদেশী বর্জ্জন। ইহার দ্বারা প্রজার আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিবে কেন, তাহা ত ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা দায়। ভারতেরই কোন মনীষী অর্থনৈতিক বড়লাটের উক্তির উত্তরে বলিয়াছেন যে, ভারতের অবস্থার অবনতি অন্ত যে কারণেই হউক, বিদেশীবর্জ্জনে যে হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। তাঁহার মতে বিদেশী বর্জ্জনের ফলে স্বদেশী কল ও কুটীর-শিল্পের যত দ্রুত উন্নতি হইয়াছে, ইংরাজ শাসনের দেড় শত বৎসর কালের মধ্যে কখনও তাহা হয় নাই। কথাটা অঙ্ক কষিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই, চক্ষুর সমক্ষে আমরা নিত্য তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যাহারা বিদেশী পণ্য বা বিদেশী পণ্য-সরবরাহকারক ব্যবসায়ী ও দোকানীর সহিত অর্থাহরণ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট, তাহারা ছাড়া দেশের অন্তশ্রেণীর লোক বিদেশী বর্জ্জনের ফলে নিত্যই লাভবান্ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। জুতা, সাবান, এসেন্স, গেঞ্জি, মোজা, পোর্টম্যাণ্ট, ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ভেষজ ইত্যাদি এখন ত আর বিদেশ হইতে এ দেশে আমদানী হয় না বলিলেই হয়। বিদেশীদের স্থলে স্বদেশে যাহারা এ সমস্ত পণ্য প্রস্তুত করিতেছে, তাহারা কি দেশের ধনবৃদ্ধি করিতেছে না?

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্বদেশী পণ্যের মধ্যে এখন খদ্দর ও দেশীয় মিলের কাপড়ের ব্যবসায়ই প্রায় সকল ব্যবসায় অপেক্ষা বাজারে নাম করিয়াছে। বিদেশী বর্জ্জন অর্থে অধিকাংশ স্থলে বিদেশী বস্ত্রবর্জ্জনকেই বুঝায়। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে পরিমাণে দেশীয় বস্ত্রের উৎপত্তি ও কাটতি হইতেছে, সেই পরিমাণে বিদেশী পণ্যের উৎপত্তি ও আমদানী কমিতেছে। বিদেশী বস্ত্রের প্রধান আড়ত ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেই কথাটা বেশ বুঝা যায়। দেশীয় বস্ত্রের প্রসার সম্বন্ধে একটা হিসাব দিলেই যথেষ্ট হইবে। গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে সূতা প্রস্তুত হইয়াছে—৮৮ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড (এক পাউণ্ড প্রায় আধ সের) আর কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে ৫৯ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। তৎপূর্ব্ব বৎসরে প্রস্তুত সূতার পরিমাণ হইয়াছিল ৭৪ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড এবং কাপড়ের পরিমাণ হইয়াছিল ৫০ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। সুতরাং পূর্ব্ববৎসরের অপেক্ষা গত বৎসর ভারতীয় কলে প্রস্তুত পণ্যের পরিমাণ যে অধিক হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ইহা যে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের ফল, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। গত আগষ্ট মাসের হিসাবে দেখা যায় যে, দেশীয় কলে প্রস্তুত সূতার পরিমাণ ৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, কাপড়ের পরিমাণ হইয়াছিল ৪ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। পূর্ব্ববৎসরের প্রস্তুত দেশীয় সূতা ও কাপড়ের সহিত ইহার তুলনা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্ব্ববৎসরের আগষ্ট মাস অপেক্ষা গত বৎসরের আগষ্ট মাসে মিলের প্রস্তুত পণ্যের পরিমাণ শতকরা ৪ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কারণ

কি ? কারণ একাধিক হওয়ারই সম্ভাবনা। (১) পূর্ব্ববৎসরের প্রস্তুত সূতা ও কাপড় অনেক মজুদ ছিল, (২) দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হইয়াছে, (৩) খদ্দর অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। শেষোক্ত কারণও যে একটি প্রধান কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ইহাতে দেশ উপকৃত না অপকৃত হইয়াছে ?

ন্যায়বিচার

বৃটিশ-রাজ ন্যায়বিচারের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানোদয় হইতে পাঠ্য পুস্তকে আমরা এ কথা পড়িয়া আসিতেছি। বস্তুতঃ বৃটিশ শাসনের এই অঙ্গ—অর্থাৎ আদালতের ন্যায়বিচারের উপর জনসাধারণ আস্থাবান্ আছে বলিয়াই বৃটিশ রাজত্বের মূল ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে।

কিন্তু অবস্থাবিশেষে ভারতবাসীর এই বিশ্বাস যে কখনও টলে নাই, এমন কথা ইংরাজ রাজনীতিক ও ঐতিহাসিক বলিতে পারেন নাই। মহামতি বার্ক, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে তাঁহার প্রসিদ্ধ জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সে কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া অনেক মামলায় দেশের হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের দণ্ডাদেশ নাকচ করিবার সময়ে রায়ে এ বিষয় প্রকারান্তরে সমর্থন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান মুক্তির আন্দোলনে কংগ্রেস-মতাবলম্বী সত্যাগ্রহীদের বিপক্ষে পুলিসের অনেক মামলায় যে বৃটিশ ন্যায়বিচারের মর্য্যাদা সম্যক্ রক্ষিত হইতেছে না, ইহা পর পর কয়টি হাইকোর্টের রায়ে প্রকাশ পাইয়াছে। সত্যাগ্রহীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ-সমর্থন করেন না। এজন্ত তাঁহাদের মামলার বিচারকালে বিশেষ ধীরভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণ লইয়া নিম্ন আদালতের বিচারকগণ যদি বিচার না করেন, তাহা হইলে ন্যায়বিচারের প্রত্যবায় ঘটিতে পারে। এ কথাটা এখন সরকারের ঘোষণা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে।

কলিকাতা, বোম্বাই ও পঞ্জাব হাইকোর্টে এই প্রকৃতির কয়টি মামলার পুনর্বিচারের রায়ে জানা গিয়াছে, উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের বিচারে আদৌ সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। গত ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টের গৌরব প্রধান বিচারপতি মাননীয় র‍্যাঙ্কিন ও অন্যতম বিচারপতি এস, সি, মল্লিক ছয়জন মহিলা প্রভাত-ফেরীর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে নিম্ন আদালতের দণ্ডাদেশ কিরূপ অবৈধ হইয়াছে, তাহা জানা যায়। এই মহিলা ছয়জনকে কিছু কম এক মাস কাল বিনা অপরাধে কারাগারে আটক থাকিতে হইয়াছিল। ইহার জন্ত দায়ী কে ? বিচার ন্যায়সঙ্গত হয় নাই, ইহার জন্ত মহিলারা দায়ী নহেন। তবে কি জন্ত তাঁহারা দণ্ডভোগ করিলেন ? শ্রীহট্টের দায়রাজজ মিঃ এঞ্জলিও এই ভাবের এক সত্যাগ্রহীর মামলার নিম্ন আদালতের দণ্ডাদেশ নাকচ করিয়া দিয়াছেন এবং রায়ে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি রায়ে এমন কথাও বলিয়াছেন যে, "যেহেতু আসামী আত্মপক্ষসমর্থন করে নাই, সেই হেতু তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা বিচারকের কর্ত্তব্য ছিল।" কিছুদিন পূর্ব্বে লাহোর হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি টেকচাঁদ এইরূপ একটি মামলায় কেবল নিম্ন আদালতের রায় নাকচ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু উহার উপরে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই মামলাটি গুজরাণওয়ালার মামলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মামলার দণ্ডিত আসামী পরশুরাম দাংকে মুক্তিদানকালে বিচারপতি টেকচাঁদ বলিয়াছেন,—"এই মামলা যে ভাবে পরিচালনা করা হইয়াছে এবং যে ভাবে এই মামলার বিচার করা হইয়াছে, তাহাতে বলা যায়, আইন-নির্দ্দিষ্ট সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার নিয়মের দিকে আদৌ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই।" কি ভীষণ কথা! এই ভাবে যে আরও অনেক আইন অমান্য মামলার বিচার করা হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে ?—বিশেষতঃ সত্যাগ্রহী আসামীরা যখন আত্মপক্ষসমর্থন করিয়া সাক্ষীদিগকে জেরা করে নাই ? বিচারপতি টেকচাঁদ আরও বলিয়াছেন যে,—"এই মামলায় দণ্ডিত আসামী পরশুরাম দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করে নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু সেই দণ্ডের সম্পর্কে হাইকোর্টের কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার কিছু নাই, ইহা আমি স্বীকার করি না। এই প্রকৃতির মামলায় হাইকোর্ট স্বেচ্ছায় অথবা দায়রাজজের নিবেদন অনুসারে বা তৃতীয় পক্ষের আবেদন অনুসারে নিশ্চিতই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারেন।"

আমরা আশা করি, অতঃপর বিচারপতি টেকচাঁদের এই মন্তব্য চিরদিনের জন্ত নজীরস্বরূপ গৃহীত হইবে। অন্যথা বৃটিশ ন্যায়বিচারের বিপক্ষে লোকের ধারণা ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে।

খৃষ্টান প্রতিনিধি

গোল টেবিল বৈঠকে ভারত হইতে সরকার যাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়া 'প্রতিনিধি'রূপে প্রেরণ করিয়াছেন, মিঃ

মিঃ কে, টি, পল

কে, টি, পল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি খৃষ্টান। গত সংখ্যায় অন্যান্য প্রতিনিধির সহিত ইহার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, সে সময়ে উহা আমাদের হস্তগত হয় নাই। ইনি দেশপ্রেমিক, ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারলাভের পক্ষপাতী। আমাদের ভারতীয় খৃষ্টান ভ্রাতৃগণও যে দেশের মুক্তিকামনায় কাহারও পশ্চাৎপদ নহেন, তাহা মিঃ পালের একাধিক বক্তৃতা হইতেই জানা যায়।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ কালের গর্ভে বিলীন হইল। এই ইংরাজী বৎসর ভারতের মুক্তির ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। বোধ হয়, এই এক বৎসরে যে অপূর্ব্ব ঘটনাবলী ঘটিয়া গেল, তাহা এক শতাব্দীতেও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। অবশ্য ইহার ফলাফল সম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তবে সেই সকল ঘটনার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজন এখন অনুভূত হইতেছে।

এক দিকে লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা মন্তব্য গ্রহণ, মহাত্মা গন্ধীর ও বড়লাটের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান, মহাত্মা গন্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন, তাঁহার আহ্বানে কংগ্রেস ও দেশবাসীর সাড়াপ্রদান, মহাত্মার সবরমতী আশ্রম হইতে লবণ আইন ভঙ্গ করিতে যাত্রা, লবণ সত্যাগ্রহ, বিদেশী পণ্যবর্জ্জন, বিদেশী বস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং, সভা শোভাযাত্রা জাতীয় পতাকা উৎসব, প্রভাত ফেরী, দেশ-সেবিকার শোভাযাত্রা, ওয়ার কাউন্সিল ও ডিক্টেটর সৃষ্টি,—অন্য দিকে আন্দোলনদমনে সরকারের বাধা ও ধর্ষণনীতি অবলম্বন, অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স জারী ও তাহার দ্বারা রাজ্যশাসন, বিনা বিচারে মহাত্মা গন্ধীকে গ্রেপ্তার ও আটক করা, দলে দলে দেশকর্ম্মীর গ্রেপ্তার ও জেল, ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ সহস্র দেশকর্ম্মীর কারাবরণ, লাঠি ও বেটনের আক্রমণ, মাঝে মাঝে পুলিস ও ফৌজের গুলী, ১৪৪ ধারা জারী ও সভা শোভাযাত্রা বন্ধ করা, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা, সমস্ত প্রদেশের প্রায় কংগ্রেস কমিটীগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা,—গত বৎসরের বিচিত্র ঘটনাবলীর অঙ্গ।

তাহার পর গোল টেবিল বৈঠক। যে কংগ্রেসকে চরমপন্থী এবং ভারতের সমস্ত অমঙ্গলের জন্য দায়ী করিয়া দূরে রাখা হইয়াছে, এই বৈঠক যে সেই কংগ্রেসের আন্দোলনের ফল, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি? কংগ্রেস যদি দেশে মুক্তির আন্দোলনকে সজীব ও সতেজ করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে এই বৈঠকের নাম-গন্ধও উঠিত কি? যাহা হউক, এই গোল টেবিল হইতে কংগ্রেসকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এজন্য প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ও ভারতসচিব মিঃ বেন প্রমুখ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয়রা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কিছুই করেন নাই। বরং কংগ্রেসকে দমন করিবার যত প্রকার উপায় আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এই কংগ্রেসই যে তাঁহাদিগকে 'মান দিতে পারিত', তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? কংগ্রেসকে তাঁহারা দূরে রাখিলেও তাঁহাদের শ্রমিক দলেরই মিঃ ফেণার ব্রকওয়ে স্পষ্টই বলিয়াছেন, কংগ্রেসকে বাদ দিয়া ভারতে ও বিলাতে সম্মানজনক প্রকৃত মিলন কখনও সম্ভবপর হইবে না। যাহা হউক, গোল টেবিলের পরিণাম এখনও ভবিষ্যতের অন্ধতামসে নিহিত। ইহার ফলে ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে কি না হইবে, তাহা এখন কে বলিতে পারে?

গত বৎসরের কার্য্যাবলীর মধ্যে বিপ্লববাদীদের পুনরাবির্ভাব এবং দেশে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পুনরভিনয় উল্লেখযোগ্য। ধর্ষণনীতির দ্বারা এ দেশের মুক্তির আন্দোলনকে দমন করিতে গেলে যে অসন্তোষ ও অশান্তির অগ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিবে, সাম্রাজ্যের হিতকামী এ উপদেশ পূর্ব্বাহ্নেই দিয়াছিল। কিন্তু সে উপদেশ গৃহীত হয় নাই। অহিংসা মন্ত্র প্রচারও যে বিপ্লববাদের পরম অন্তরায়, তাহাও সরকারকে বহু রাজনীতিকই বার বার নিবেদন করিয়াছিলেন। অহিংসা মন্ত্রের গুরু মহাত্মা গন্ধীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলে যে হিংসাবাদ আবার মস্তকোত্তোলন করিবে, এ কথাও বার বার সরকারকে জানান হইয়াছে। তথাপি সরকার সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। সুতরাং এই বিপ্লববাদেরই বা পরিণাম কি, তাহা এখন কেহ বলিতে পারে না।

এই অনিশ্চিতের মধ্য দিয়াই ইংরাজী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ অতীত হইল। নব বর্ষের কত দিন আর সেই অনিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকিবে, তাহা ভারতের ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন!

—

রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গন্ধী

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ মার্কিণ দেশের নিউ ইয়র্ক সহরের মুদ্রাযন্ত্র-সমিতিকে যে বাণী দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহাত্মা গন্ধীর প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, "আমার দেশবাসীরা তাহাদের মহান্ নেতা মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বাধীনে আধুনিক সামরিক জাতিগণের হিংসামূলক নীতিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া যে ধর্ম্মবুদ্ধি ও ত্যাগের মহিমা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের মুক্তির জন্ত যুদ্ধ করিতেছে,এ জন্ত আমি গর্ব্বানুভব করিতেছি। তাহারা আত্মিক শক্তিকে তাহাদের প্রধান অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা যে এখনই আদিম মানবের উপযোগী লুণ্ঠন ও হত্যার প্রবৃত্তির বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। যদি আমার দেশবাসীরা প্রচণ্ড অনাচার ও হিংসাবাদীর দ্বারা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াও এই অহিংসাবৃত্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা অচিরকালমধ্যেই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে, ইহা আমি দৃঢ়স্বরে বলিতে পারি। ভারতের মুক্তিলাভের জন্ত ভারতীয়ের এই আত্মিক যুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জগদ্‌বাসীকে স্বীকার করিতেই হইবে।"

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

বাহুবলদৃপ্ত ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত প্রতীচ্য জাতিদিগকে এক দিন না এক দিন বিশ্ববরেণ্য কবির বাণী মানিতেই হইবে। আত্মিক শক্তির নিকট যে বাহুবল তুচ্ছ নগণ্য, তাহা ইতিহাসই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকে। প্রকৃতিও ইহার পরিচয় দিয়া থাকেন। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে হিংস্র ব্যাঘ্র, সিংহ ক্ষুদ্র মনুষ্যের পদানত হইয়া থাকিত না বা বিরাটকায় মহাবলবান হস্তী মানুষকে পৃষ্ঠে বহন করিত না।

—

শিক্ষার পাষাণ চাপ

যে ভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করা হইতেছে, তাহাতে অচিরকালমধ্যে যে শিক্ষার্থী কোমলমতি বালক-বালিকারা পাঠ্য পুস্তকের গুরুভারে অবসন্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িবে, অধিকন্তু অভিভাবকরা প্রতিবৎসর পাঠ্যগ্রন্থের হিমালয়-পর্ব্বত ক্রয় করিতে করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাথমিক শিক্ষালয়ের অতি নিম্ন শ্রেণীস্থ শিশু ছাত্রগণের স্কন্ধেও অন্ততঃ দশ, বারোখানি গ্রন্থের গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে পাঠ্যগ্রন্থ-প্রণেতাদিগকে পোষণ করিয়া দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচয় দেওয়া হয় বটে, কিন্তু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের প্রাণান্ত হইতেছে। এই দরিদ্র দেশে অযথা এইভাবে দরিদ্রগণকে পীড়ন করিয়া শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়াস পাওয়ায় কি ফল হয়, আমরা বুঝিতে পারি না। যখন এ দেশে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও প্যারীচরণ সরকারের দুই একখানি পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া, আশুতোষ, রাসবিহারী, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তখন এই শিক্ষায় পাষাণ চাপ ছিল না। কিন্তু এখন শিক্ষায় কায়দা-কানুন অনেক প্রকার হইতেছে বটে, কিন্তু তেমন একটা মানুষ ত গড়িয়া উঠিতেছে না। মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, নবীন, অথবা হরিশ্চন্দ্র-কৃষ্ণদাসের আমলেও এ পাষাণ চাপ ছিল না, কিন্তু সে জন্ত দেশে প্রতিভার বিকাশের অভাব হয় নাই। কিন্তু এখন চাপ যতই অধিক হইতেছে, পাঠ্যগ্রন্থ-প্রণেতারা যতই ভিড় করিয়া কেতাব চালাইবার চেষ্টা করিতেছে, ততই যেন শিক্ষার্থীর প্রতিভার উৎস শুকাইয়া যাইতেছে।

সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যাপারেও এমন অবস্থা আনয়ন করিয়াছেন, যাহার ফলে শিক্ষায় সুফল উৎপন্ন হওয়া দূরে থাকুক, বরং কুফল ফলিবার সমধিক সম্ভাবনা হইতেছে। সরকার বে-সরকারী স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের উপর সম্প্রতি এক সার্কুলার জারী করিয়াছেন। এই সার্কুলারে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, যে সকল বে-সরকারী স্কুলে সরকারের পুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতি (Text-book-committee) অনুমোদিত পাঠ্যগ্রন্থ পড়ান না হইবে, সেই সকল স্কুলের পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে কোন বৃত্তি দেওয়া হইবে না। ইহা কি চমৎকার ব্যবস্থা নহে? এই টেক্‌স্‌ট বুক কমিটীর মরজির উপর নির্ভর না করিলে ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষা হইবে না, এই নিয়মটাও বাঁধিয়া দিলে ক্ষতি কি ছিল? যদি এই নিয়ম বহাল করাই হইবে, তবে পূর্ব্বাহ্নে উহার প্রচার করা কর্ত্তব্য ছিল না কি? আমরা জানি, বহু শিক্ষক ও পণ্ডিতের রচিত উৎকৃষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ সরকারী টেক্সটবুক কমিটীর দ্বারা অনুমোদিত হয় না। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। যে প্যারীচরণ সরকারের First book পড়িয়া এতকাল এ দেশের শিক্ষার্থী ইংরাজী শিখিয়া আসিতেছে এবং যাহা পড়িয়া এ দেশে

বড় বড় শিক্ষাভিজ্ঞ, আইনজ্ঞ, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, রাজনীতিক, সমাজনীতিক, ধর্ম্মপ্রচারক সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, এখনকার যুগে উহা আর পাঠ্য নাই, উহার স্থানে অপরের রচিত গ্রন্থ মনোনীত হইয়াছে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। বিদ্যাসাগর এ আসরে আর কলিকা পান না!

"টিচার্স জার্ণাল" নামক সাময়িক পত্র লিখিয়াছেন, টেক্সট্-বুক-কমিটী বহু শিক্ষক-রচিত প্রায় ২ হাজার ৬শত গ্রন্থ মনোনীত করেন নাই। অথচ সে সকল গ্রন্থ এতকাল বে-সরকারী স্কুল-সমূহে পঠিত হইয়া আসিয়াছে! সরকারী শিক্ষা-বিধাতাদের কলমের একটি খোঁচায় এতগুলি পাঠ্যগ্রন্থ 'অনুপযুক্ত' বলিয়া পরিত্যক্ত হইল! সুন্দর ব্যবস্থা নহে কি? যদি বলা যায়, এগুলি যদি পাঠের অনুপযোগীই হয়, তাহা হইলে এতগুলি রাবিশ গ্রন্থের বোঝা ছেলেদের ঘাড়ে এত দিন চাপাইয়া রাখা হইয়াছিল কেন? এ 'কেন'র উত্তর পাওয়া যাইবে সে দিন, যে দিন এ দেশে সরকার জনমতের নিকট দায়ী হইবেন! আরও মজা এই, যে সকল পাঠ্যগ্রন্থ মনোনীত হয়, তাহাদের মধ্যে কতক-গুলির ভাব, ভাষা, বিষয় ও রচনা-পদ্ধতি এমন চমৎকার ও অভিনব যে, শিক্ষিত অভিজ্ঞরা কষ্টে হাস্য সম্বরণ করেন। অনির্ব্বাচিত অনেক গ্রন্থ এ সকল গ্রন্থ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, এ কথাও জোর করিয়া বলা যায়। এরূপ অনাচার আর কত দিন চলিবে?

সম্পাদকীয় সত্যবাদিতা

এ দেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, দেশীয় সংবাদপত্রওয়ালাদের কোন দায়িত্বজ্ঞান নাই, কারণে অকারণে তাহারা অতিরঞ্জন করিয়া থাকে, সত্যগোপন ও মিথ্যা-প্রচার করাও তাহাদের স্বভাব। এই সকল পত্র জানে যে, তাহাদের সাত খুন মাপ না হইলে, নির্লজ্জের মত এমন মিথ্যা রটনা করিতে সাহসী হইত না। অথচ এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা কিরূপ সত্যবাদী, তাহা পরলোকগত ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগুর রোজনামচার সামান্য একটু রচনা হইতে বেশ জানা যায়। মিঃ মণ্টেগু লিখিয়াছেন, "তাহার পর খুব মজা হইল। মিঃ জোন্স নামক এক জন ওয়েলস্-ম্যান তখন 'ষ্টেটশম্যান' পত্রের সম্পাদক। আমি প্রথমে বিশেষ কোমলভাবে তাঁহার রাজনীতিক মতামত জানিতে চাহিলাম। আমি তাঁহার সম্পাদিত সংবাদ-পত্র হইতে দুই চারিটি রচনা পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'সাংবাদিকরা কি নীতি অনুসারে এ দেশে কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন? আপনারা কি পূর্ব্বে সত্য নির্ণয় করিয়া সংবাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন? আপনাদের প্রবন্ধ ছাপিবার মত মাল পাইলেই কি আপনারা সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করা না হইলেও ছাপাইয়া থাকেন?' মিঃ জোনস্ রুমালে ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

"অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি ১৭ই অক্টোবর তারিখের প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, আমি মিসেস বেশাণ্টের মুক্তির আদেশ দিয়াছি। এ সংবাদ আপনি কেন ছাপিলেন? ইহা আপনি কেন প্রকাশ করিলেন? আপনি ইহার প্রমাণ দিতে পারেন কি? কে আপনাকে এ সংবাদ দিয়াছিল? এ কথা সত্য নহে জানিয়াও আপনি ভ্রম সংশোধন করেন নাই কেন? আপনি লয়েড জর্জ্জের সম্বন্ধেও আমার নামে এক অসত্য কথা প্রচার করিয়াছেন। কেন?' ইহার উত্তরেও সম্পাদক মাথার ঘাম মুছিতে লাগিলেন!"

ইহার উপর মন্তব্যের বোধ হয় কোন প্রয়োজনই হইবে না!

পিকেটিং রহস্য

বিলাতের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের আর যে কোনও গুণ থাকুক, তাঁহাদের সকল কার্য্যের মধ্যে একটা মূল নীতির সামঞ্জস্য আছে, এ গুণের আরোপ তাঁহাদের উপর কেহ করিতে পারিবে না। এ দেশে তাঁহাদের সরকারী কর্ম্মচারীরা কোথাও পিকেটিংকে অপরাধ বলিয়া ধরিয়া লইতেছেন ও সেই অপরাধে অপরাধীকে গুরুদণ্ড দিতেছেন, আবার কোথাও বা তাঁহাদেরই অন্য কর্ম্মচারীরা শান্তিপূর্ণ পিকেটিংকে অপরাধ বলিয়া ধরিতেছেন না, বরং উহা অপরাধের পর্য্যায়ভুক্ত নহে বলিয়া দণ্ডিতকেও মুক্তি দিতেছেন। এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা সাধারণ লেখকের পক্ষে দুষ্কর। কোন বিচারক রায় দিলেন, শান্তভাবে ক্রেতাকে পণ্য ক্রয় না করিতে বলা অপরাধ নহে; আবার অন্য বিচারক রায় দিলেন, দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইলে বা ঘুরিয়া বেড়াইলেই পরের উপর জুলুম করা হয়, উহা বিষম অপরাধ। এ রহস্যের মর্ম্মভেদ করে কে?

যাহা হউক, পিকেটিংকে এ দেশে অপরাধ বলিয়াই শ্রমিক সরকার ধরিয়া লইয়াছেন, না হইলে এই অপরাধে ধরপাকড় লাঠিবেটন চলিত না, দণ্ডও হইত না। কিন্তু মজা এই, বিলাতে এই শ্রমিক সরকারই এমন এক আইনের খসড়া বানাইয়াছেন, যাহাতে ট্রেড য়ুনিয়নগুলির এবং ব্যবসায়ে বিরোধ সমূহের সম্বন্ধে সহজ সুমীমাংসা হইতে পারিবে। সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া যে সকল ধর্ম্মঘট হয় এবং যে সকল ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং হয়,

সে সকল ধর্ম্মঘট ও পিকেটিং যাহাতে বে-আইনী বলিয়া ধার্য্য না হয়,—সেই উদ্দেশ্যেই এই আইন প্রণয়নের চেষ্টা হইতেছে।

অর্থাৎ শ্রমিক সরকারের ব্যবহার বিলাতে একরূপ, ভারতে ভিন্নরূপ! মূলনীতির মধ্যে যাহাদের সামঞ্জস্য নাই, তাহাদের মতামতের মূল্য কি?

মওলানা মহম্মদ আলি

বিগত ৪ঠা জানুয়ারী রবিবার প্রভাতে মওলানা মহম্মদ আলি লণ্ডনে অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন হইতেই তাঁহার দেহ অসুস্থ হইয়াছিল। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি

মওলানা মহম্মদ আলি

অসুস্থ দেহেও লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার দেহ একবারে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি এই আঘাত সহ্য করিতে পারেন নাই।

ভারতের এই সঙ্কটের দিনে মওলানা মহম্মদ আলির ন্যায় প্রকৃত দেশপ্রেমিক কর্ম্মীর তিরোধান বস্তুতঃই দুর্দ্দৈব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। স্বধর্ম্মীর সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য শেষ জীবনে তিনি যতই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকুন, তাহা বলিয়া ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার অন্তরের নিভৃত কোণে অকৃত্রিম দেশপ্রেম সঙ্গোপনে লুকায়িত ছিল। সেই স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে যখন তিনি হিন্দুর বিরুদ্ধে কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তখনও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত তাহা তাঁহার কথার অন্তরালে প্রবাহিত হইত। যখনই অবসর বা সুযোগ ঘটিত, তখনই তাহা অগ্নিগর্ভ গিরির নিঃস্রাবের ন্যায় জ্বলন্ত ধারায় ছুটিয়া বাহির হইত। তাঁহার দেশপ্রেম ছিল জীবন্ত, তাহাতে ছিল অমৃতত্ব, অবিনশ্বরত্ব, তাহার তুলনা বিরল।

তাঁহার তিরোধানে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রের একটা দিক্ যেন অন্ধকার হইয়া গেল। আজ তাঁহাকে খিলাফৎ যুগের মহম্মদ আলিরূপেই যেন দেখিতে পাইতেছি। বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞান-গরিমায় দীপ্যমান, অগ্নিবর্ষিণী জ্বালাময়ী বক্তৃতায় অগ্রণী, মহাত্মা গন্ধীর মন্ত্রশিষ্য দক্ষিণ হস্ত মহম্মদ আলিকেই আজ মনে পড়িতেছে।

কিন্তু মানুষের ভ্রান্তি পদে পদে। হয় ত ভ্রান্তিবশেই পরিণতবয়সে তিনি গুরুর বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যাহাই করুন, তাঁহার অন্তর এক দিনের জন্যও দেশজননীর প্রতি প্রেমভক্তিতে হীন হয় নাই। যখন গোল টেবিল বৈঠকের তাবৎ 'প্রতিনিধি' ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই, তখন তিনি স্বাধীনতার দাবী করিয়াছিলেন। তিনি বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে বলিয়াছিলেন, "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার-লাভে আমি সন্তুষ্ট হইব না। যদি স্বাধীনতা না লইয়া দেশে ফিরিতেই হয়, তবে যেন আমার দেহ এই বিদেশেই সমাধিস্থ করা হয়।" তেজোগর্ব্বদৃপ্ত দেশপ্রেমিকের এ কথা সফলও হইয়াছে, বিদেশেই তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়াছে। আর এক দিন উপাধ্যায় ব্রহ্ম-বান্ধবও এমনই তেজে বলিয়াছিলেন, "আমার এই নশ্বর দেহ শাসকের কারাগারে স্থান গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই আমার দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইবে।"

যাঁহারা তাঁহাকে 'ঝড়ের পাখী' বলিয়া অভিহিত করিতেন, আজ তাঁহারাই তাঁহার শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। ভারত-সচিব বেন তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "মিঃ মহম্মদ আলি এক জন বিরাট মুসলমান, এক জন বিরাট দেশপ্রেমিক এবং মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার বিরাট সূক্ষ্ম-তত্ত্বদর্শী ছিলেন। তিনি ভারত ও বিলাতের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দান করিয়াছেন।"

মওলানা মহম্মদ আলি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামনা করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার জন্য সমগ্র দেশ শোকাচ্ছন্ন।

স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে মুসলিম মহিলা

টাউনহলে কাশিমবাজারের মহারাজার নেতৃত্বে গোলটেবিলে মুসলমান দাবীর বিরুদ্ধে যে সভা হইয়াছিল, ঐ সভায় শ্রীমতী সোফিয়া খাতুন এবং অন্য ৮০ জন মুসলমান-মহিলা যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বাঙ্গালার মুসলিম মহিলাগণের দেশপ্রেমের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইহা দেশের নারী-জাগরণের জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই শিক্ষিতা মুসলিম মহিলারা পত্রে লিখিয়াছেন, "দেশের মুক্তিযুদ্ধের এই সন্ধিক্ষণে গোলটেবিলের সাম্প্রদায়িক কলহ এতই বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে যে, আমরা অন্তঃপুরচারিকারা ইহার বিপক্ষে আমাদের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাহাতে আমাদের সম্প্রদায়ের পুরুষগণ সাম্প্রদায়িক দাবী পরিহার করিয়া হিন্দু-ভ্রাতৃগণের সহিত যোগদান করিয়া বৃটিশ শাসক জাতির বিপক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এই পত্র লিখিতেছি। অপমানকর অনুগ্রহের হস্ত হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইতে কামনা করি। দেশের বড় দাবীর নিকটে আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মুসলমান-দিগকে প্রকৃত শক্তিশালী করিবার জন্য আমাদের হিন্দু-ভ্রাতৃগণের সহিত একযোগে কার্য্য করার প্রয়োজন হইয়াছে।" দেশের মুসলিম মহিলাগণের মধ্যে যে অনলস দেশপ্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনায় সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী মুসলমান পুরুষগণের প্রচেষ্টা কত ক্ষুদ্র!

বালিকা বধূ গো

বালিকা বধূ গো কেন মৃদু হাস
চাপা ও লালিম ঠোঁটে,
চোখে চোখে আজ এ কি তব লাজ
আকুল হইয়া উঠে!
দুরু দুরু কেন কাঁপে তব হিয়া
ভোরের বাতাসে আজ,
বাতায়ন-পথে আঁখিটি মেলিতে
কেন আজি পাও লাজ!
ফুলের গন্ধে এ কি শিহরণ
জাগিছে তোমার বুকে,
আনমনে তুমি কি জানি কি ভাব
আঁচলে মুখানি ঢেকে।
আকাশে বাতাসে কারে খোঁজ আজ,
কার সাড়া সেথা পাও;
বালিকা বধূ গো,—আজিকে আমারে
বলিবে না কি গো তাও?
মনে মনে আজ কত কি যে গাও
মনের দুয়ার খুলে,
বালিকা বধূ-গো, সে সুর পরশে
প'ড় না যেন গো ঢুলে।
তোমার মনের গোপন কাননে
ফুটিল আজি যে ফুল,
বালিকা বধূ গো লুকাইতে তাহা
মিছে কেন কর ভুল।
ওগো ও বালিকা, তোমার হৃদয়
যে কথা বলিতে চায়;
আমার মনের দুয়ারে সে কথা
আগে হতে শোনা যায়।
আমি জানি বালা কি যে ভাব তুমি
আজিকার এই রাতে,
তুমি ভাব শুধু—কেমনে ও মুখ
দেখাইবে কাল প্রাতে।
কেমনে কাটাবে আজিকার রাতি
কুসুম শয্যা'পরে,
অচেনার সাথে কথাটি কহিতে
বড় যে লজ্জা করে।
তার পর আরও গভীর রাত্রে
যদি বা পড় গো ঘুমে,
তখন যদি সে জাগাইয়া তোলে
আকুল করিয়া চুমে,—
কি করিবে তুমি তখন বালিকা
কেমনে দেখাবে মুখ,
বালিকা বধূ গো জবাবের আগে
খুঁজিয়া দেখো এ বুক।

শ্রীঅনিলকুমার দত্ত।

জীবন-স্বপ্ন

একবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রগল্‌ভা

বাড়ী আসিয়া হাসিয়া বিন্দু কহিল—কোথায় সিঁধ দেছে বলাই-দা? কত বড় সিঁধ?

বলাই কোন জবাব দিল না, পিশিমার পানে চাহিল।

পিশিমা কহিলেন,—তোর মা জানে রে, তুই আমাদের আনতে গেছলি?

বলাই কহিল,—জানে। মাকে বলেই আমি গেছলুম যে।

বিন্দু কহিল,—কিন্তু হুলস্থুল বেধে যাবে'খন। তারা যখন বাড়ী ফিরে দেখবে, আমরা চ'লে এসেচি, তখন স্থির হয়ে থাকতেও পারবে না; এখানে আসবেই। আর তখন সিঁধ দেখতে চাইলে কি বলবো, বলাই-দা?

বলাই কহিল,—কি বলো, পিশিমা, খানিকটা দেওয়াল থেকে না হয় ইট বার ক'রে রাখি! বিন্দু মন্দ হুঁশ করিয়ে দ্যায়নি।

পিশিমা কহিলেন,—সত্যি বাবা, সে ভারী লজ্জার কথা হবে। তারা আসবেই। আর কেউ না আসুক—

পিশিমার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বলাই কহিল,—ঐ শম্ভুচন্দরটি! সে যদি আসে, আমার কাছে পাঠিয়ো—সিঁধের প্রমাণ তাকে দেখিয়ে সন্তুষ্ট ক'রে দেবো।

পিশিমা কহিল,—না রে, ঝগড়াঝাটি করিস্‌ নে। তোর উপর শম্ভুর মন খুব প্রসন্ন নয়।

—সে আমি জানি, পিশিমা…এখন তা হ'লে চললুম। ঘুরে এসে দেওয়ালের খানকতক ইটের উপর একটু সুরকি লাগিয়ে দেবো'খন। সরকারদের বাড়ী বৈঠকখানা তৈরী করছে মিস্ত্রীরা। সুরকির মস্ত ভাগাড় আছে—কিনতেও হবে না। তারা এলে বলো, দেওয়াল মেরামত ক'রে ফেলা হয়েচে, কোনো জিনিষ-পত্তর চুরি যায়নি!

কথাটা বলিয়া বলাই বিন্দুর পানে চাহিল, কহিল,—এখন আসি, বিন্দু। শম্ভুবাবুরা এলে আমি যেন খবর পাই। আমার আবার এখনি বেরুতে হবে কি না… আসামে চাকরি পাবার কথা হচ্ছে—সেই কথা পাকা করার জন্যে…

বিন্দু চমকিয়া উঠিল, কহিল—বলো কি, বলাই-দা! আসামে তুমি যাবে চাকরি করতে!

বলাই কহিল—হ্যাঁ, এতে অবাক্ হবার কি আছে শুনি?

বিন্দু কহিল,—চাকরি করার তোমার কি তাড়া পড়েচে, শুনি! কটা পাশ করেচো যে…

বলাই কহিল,—পাশ যাঁরা করচেন, তাঁরা বাড়ীতেই থাকুন! আমি পাশের কাঙাল নই। আমি চাই, সব পাশ ছিঁড়ে খুব দূরে চ'লে যাবো ঘুরে বেড়াতে!

বিন্দু কহিল,—ঢের হয়েচে! ভারী মাতব্বর হয়েচো কি না বয়সে, তাই দেশ-ভ্রমণে বেরুবেন!

—সত্যি রে বিন্দু…আচ্ছা, দেখে নিস্…সত্যি কি না… বলিয়া বলাই চলিয়া গেল।

পিশিমা কহিলেন,—তুই বাড়ীতে থাকবি তো, বিন্দু?

বিন্দু কহিল,—কেন পিশিমা?

পিশিমা কহিলেন,—আমি একবার ও-বাড়ী যাবো—বৌয়ের সঙ্গে ঢের কথাবার্ত্তা আছে! যা-সব শুনে এলুম, আর যে-সব ব্যবস্থা—

বিন্দু কহিল,—চলো পিশিমা, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

তাই হইল। দুজনে যোগমায়া দেবীর কাছে চলিল।

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—বলাই তা হ'লে সত্যিই গিয়ে তোমাদের নিয়ে এলো ঠাকুরঝি!

পিশিমা কহিলেন,—এনে বাঁচিয়েছে, ভাই। না হ'লে যে নাগপাশের বাঁধনে ঘিরেছিল!

যোগমায়া দেবী পিশিমার পানে কুতূহলী দৃষ্টিতে চাহিলেন।

পিশিমা কহিলেন,—জামাইয়ের নামে বিষয়-সম্পত্তি ঢের, বুঝলি বৌ! আর সে সব নাকি আইনে এখন বিন্দুকে অর্শেছে! যদ্দিন বিন্দু বাঁচবে, কেউ তাতে দাঁত ফোটাতে পারবে না। ও তীর্থ-ধর্ম্ম করুক, দান-ধ্যান করুক! গহনা-গাঁটী; নগদ টাকা ব্যাঙ্কে আছে—তবে গে, কোম্পানীর কাগজও শুনচি, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা।

যোগমায়া দেবী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না।

পিশিমা কহিলেন,—শাশুড়ী হতভম্ব হয়ে ব'সে আছে। উকিলের পর উকিলের কি আনাগোনা বাড়ীতে!...তা করেছে কি,—জামাই মারা যাবার আগে তাকে দিয়ে এক উইল করিয়ে বিন্দুকে পুষ্যিপুত্তুর নেবার অধিকার লিখিয়ে নিয়েচে। আর দুচারখানা বাড়ী শাশুড়ী-মাগীর নামেই যা করিয়েচে। এখন আমার ভাশুরের ছোট ছেলে আছে অঘোর; সাত-আট বছর বয়স—ওরা চায় সেই ছেলেকে বিন্দু পুষ্যিপুত্তুর নেয়, বিষয় জামাইয়ের জ্ঞেতেদের হাতে আর তা হ'লে যায় না! বিষয় দেখা-শোনা করবেন আমার ভাশুর। তাঁরই বুদ্ধিতে এই সব হয়েচে!

বিন্দু গর্জ্জিয়া উঠিল,—আসতে কি স্থায়! বলে, উকিল আসবে, দলিল সই করতে হবে, দরখাস্ত করতে হবে... এমনি নিত্যি একটা-না-একটা বায়নাক্কা!

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—কিন্তু সই-টই করিয়ে নেছে নাকি বিন্দুকে দিয়ে কোনো কাগজ?

পিশিমা কহিলেন,—পারেনি! ও মেয়ে ভারী সেয়ানা।

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—কি বললে, বিন্দু?

পিশিমা কহিলেন,—আমার ভাই, মুস্কিল—নাও বলতে পারি না। তা হ'লে ভাশুরকে বুঝবে সন্দেহ করচি! সে ভালো দেখাবে না—তা...

বিন্দু বলিল,—আমি বললুম, দু'দিন সময় দিন আমায়—সব বুঝে, ভেবে-চিন্তে তবে যাতে যা সই করবার, আমি সই করবো!

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—তাতে কিছু বললে না?

বিন্দু কহিল,—রেগে বললেন, স্বাধীন জেনানা, জ্যাঠা মেয়ে—কিন্তু বেশী রাগারাগিতে আমি পাছে বিগড়ে যাই, তাই তা-না-না তা-না-না করেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছিল...

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—কিন্তু সম্পত্তি ত ওদেরি হাতে! যদি না দেয়? খোঁজ তার পাবে না তো!

পিশিমা কহিলেন,—জীবনের সঙ্গে পরামর্শ করি...দেখি, ও কি বলে! আমি বলি কি, ঝগড়া-ঝাঁটী ক'রে লাভ নেই। ওদের হাতেই সব। তার চেয়ে কিছু ছেড়ে-ছুড়েও যদি দিতে হয়, তা নয় দিক! আর কিছু নয়...মেয়েটার ইহ-জন্ম তো গেছেই. রাজার ঐশ্বর্য্যেও তা পুরণ হবে না। তবু, পরের গলগ্রহ হতে না হয়, নিজের টাকার উপর ভর ক'রে কারো ঝক্কি না সয়ে দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারবে। দান-ধ্যান বার-ব্রত, পুজো-পার্ব্বণ করুক...মনটা ভালো থাকবে...তাই দেখে আমি তবু কতক নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবো। টাকার বল একটা মস্ত বল, ভাই!

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—তা ঠিক। বেশ, এদের সঙ্গে পরামর্শ করো। কি বলে, ভাখো। কোম্পানির কাগজ তো শুনি, যার কাগজ, তার সই না হ'লে তারা সুদও দেবে না!...আর মেয়ে মানুষের সম্পত্তি নিয়ে যা-তা করার অধিকারও নাকি আইনে নেই, শুনেচি!

সন্ধ্যার পর আসর বেশ জমিয়া উঠিল। বৃত্তান্ত শুনিয়া জীবন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—একটা কাজের মত কাজ হাতে আসিয়াছে। পিশিমাকে আশ্বাস দিয়া জীবন কহিল,—শুনচো মতি, কোনো ভাবনা নেই, আমি কালই উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করবো। কোম্পানির কাগজ-পত্তর কত কি আছে, কাগজের কি নম্বর, সব আদায় করচি! এ ইংরেজের রাজত্ব...আইন-আদালতের দিনে দমবাজি চলে কখনো!...

এখানে যখন এমনি আলোচনা চলিয়াছে, তখন ও-বাড়ী হইতে খবর আসিল, কলিকাতা হইতে শম্ভু বাবু আসিয়াছে। ভারী দরকারী কথা আছে।

পিশিমা কহিল,—ঐ এসেচে, বৌ...

বিন্দু কহিল,—আমি এখন যাবো না। তুমি বলো পিশিমা, আমি এখানে খেয়ে তবে যাবো। আমার এ বাড়ীতে নেমন্তন্ন। বুঝলে!

বলাই পাশের ঘরে গুম্ হইয়া বসিয়াছিল,—তার মাথায় কত চিন্তা যে তাল পাকাইতেছিল, তার ঠিকানা ছিল না। হঠাৎ শম্ভুর নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র সে চিন্তার বাধা পড়িল। সে সচেতন হইয়া উঠিল, এবং বাহিরে আসিয়া কহিল,—শম্ভু বাবু এসেচেন?

বিন্দু কহিল,—এসেচে, তাতে তোমার কি? ফাইট চালাবে না কি?

বলাই কহিল,—প্রয়োজন হয় যদি...

বিন্দু কহিল,—থাক্...অত বীরত্বে কাজ নেই। এ ক্ষেত্রে আমি যা বুঝচি, বীরত্বের চেয়ে বুদ্ধির দরকার বেশী, মশাই...

বলাই কহিল,—কিন্তু শম্ভু বাবু এত চট্‌পট্ এলো... কাল সকাল অবধি বুঝি তর সইলো না?

বিন্দু কহিল,—শম্ভুদারাই তো আসতে দিতে সব চেয়ে

বেশী আপত্তি। বলে, সে পাড়া-গাঁয়ে পাঁচটা লোকে পাঁচ রকম কুমতলব দেবে!

বলাই কহিল,—বটে!

বিন্দু কহিল,—ও কথা যাক্‌। তোমার সে আসামের চাকরির কি ঠিক হলো? আমাদের পৌঁছে দিয়েই যে ছুটলে···

বলাই কহিল,—তারা তো বলচে, চাকরিতে ঢুকে পড়ো। মা এ দিকে আপত্তি তুলচে। তা ছাড়া বাবা আর একটি যে কাণ্ড বাধিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করেচে, এই না ভাবনা!

বিন্দু কহিল,—কিসের ব্যবস্থা, বলাইদা?

বলাই কহিল,—কমলীর বিয়ের বাবা ব্যবস্থা করচে এক বেটা ঘাটের মড়ার সঙ্গে! তার কাছ থেকে আগাম টাকাও কিছু নিয়েচে···

বিন্দু কোনো কথা কহিল না, নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। ঘরের কোণে যে মাটীর দীপ জ্বলিতেছিল, দৃষ্টি তারি শিখায় নিবদ্ধ! বুঝি, নিজের বিবাহের স্মৃতি তার মনে চকিত দোলা দিল!

বলাই কহিল,—মা'র বারণে আটকাতো না। মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করানো শক্ত নয়। তবে আমি না থাকলে বাবা সেই হতভাগার হাতে কমলীকে গছিয়ে দেবেই। ভয় ঐখানে!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিন্দু কহিল,—বাপ হয়ে তা কি সত্যিই জ্যাঠামশাই করতে পারবে?

বলাই কহিল,—কেন পারবে না, বিন্দু? এই যে, তোমার কি হলো! হিতাকাঙ্ক্ষীর দল পাতাল ফুঁড়ে এসে জড়ো হয়েছিল যে···

বিন্দু কহিল,—আমার কথা ছেড়ে দাও, বলাইদা। আমার মা নেই, বাপ নেই। ঐ পিশিমা, নেহাৎ ভালো মানুষ, কাজেই···

বলাই কহিল,—তুমি নিজে আপত্তি তুলতে পারো নি! তুমি তো সব শুনেছিলে···শোনা কি, সে রুগ্ন বরকে বিয়ের আগে চোখেও দেখেছিলে!

বিন্দু হাসিল,—মৃদু ম্লান হাসি। হাসিয়া বিন্দু কহিল,—নিজের বিয়েয় বুঝি নিজে কথা কইতে পারি!

বলাই কহিল,—কেন পারবে না? যখন সইতে হবে তোমাকেই! তা পারো নি যেমন, তেমনি সারা জীবন সে বোকামির ফল ভোগ করো!

কথাটা বলিয়াই বলাই অপ্রতিভ হইল। বিধবার জীবনই যে বৃথা, এ সংবাদ বাঙালীর ঘরের ছেলের অবিদিত নয়। তবু এ ব্যাপারে বিন্দু যে মুষ্‌ড়াইয়া গিয়াছে, সে যে আর ঠিক আগেকার বিন্দু নাই, সে পরিচয় বিন্দুর কথায়-বার্তায়, বিন্দুর আলাপে, ভঙ্গীতে, চলনে, বলাই বেশ বুঝিতে পারে! দুজনে ছেলেবেলা হইতে একসঙ্গে বাড়িয়া উঠিয়াছে···খেলায় ধুলায়, কলহে, আলাপে এতখানি অন্তরঙ্গতা···দুজনের জীবনে একই সময়ে কি ঝড় বহিয়া গেল! সে ঝড়ের শেষে দুজনেই বুকে চোট্ খাইয়া আবার যখন পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে, তখন দুজনের মধ্যে ছোট ব্যবধান সেই ঝড়ের স্মৃতি! এটুকু বলাইয়ের চোখে ধরা পড়িতে বিলম্ব ঘটে নাই।

বিন্দু কহিল,—কমলীর বিয়ের জন্য জ্যাঠামশাই কত টাকা নিয়েচে সেই বুড়ো পাত্রের কাছ থেকে?

বলাই কহিল,—দুশো টাকা। সে টাকার কি যে করেচে বাবা, তাও জানি না। তবে লোকটা শাসিয়ে গেছে, বিয়ে না দিলে বাবার নামে নালিশ করবে!

নালিশ! বিন্দুর বুক ধড়াশ্ করিয়া উঠিল। নালিশের অর্থ যে কি, তা বলাইকে দিয়াই বিন্দু বুঝিয়াছে। সে নিমেষের জন্য স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল, তার পর প্রদীপের সলিতা উস্কাইয়া দিয়া কহিল,—আমি একটা উপায় করতে পারি, বলাইদা।

বলাই কহিল,—কি?

বিন্দু কহিল,—আমার কিছু গয়না এখানে আমার সঙ্গেই আছে। চুড়ি, তাগা, বালা, হার···বেশ ভারী আর দামী। ওরা বড় লোক তো! তা সেই দু'-চার গাছা চুড়ি তোমায় চুপি চুপি আমি এনে দেবো। তুমি চুপি চুপি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বেচে তা থেকে দুশো টাকা যদি সে লোকটাকে দিয়ে দাও···? অবশ্য জ্যাঠামশায় বা জ্যাঠাইমা কাকেও না জানিয়ে—

অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনিয়া বলাই অবাক্ হইয়া গেল। বিন্দু, সেই বিন্দু···তার এতখানি শক্তি হইয়াছে, যে, ফশ্ করিয়া দুশো টাকা দিয়া ফেলিতে পারে! বলাই বিন্দুর পানে চাহিল, তার মুখে উত্তর যোগাইল না।

বিন্দু কহিল,—এর পরে না হয়, তুমি যখন রোজগার-পাতি করবে, তখন ও-টাকা শুধে দিয়ো।

বলাই অভিভূত হইয়া ডাকিল,—বিন্দু—

বিন্দু কহিল,—সত্যি। পিশিমার কাছেও আমি এবার কলকাতায় থাকতে বলেছি, আমার তো গয়না পরার যো নেই। তা ঐ গয়না আর টাকাকড়ি সত্যি যদি আমি কখনো হাতে পাই তো বারব্রত করি না করি, অভাবের জন্যে যারা ভালো পাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে পারচে না, তাদের আমি সে পয়সায় সাহায্য করবো।

সেই বিন্দু···বাঃ! বলাইয়ের বিস্ময় শ্রদ্ধায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বলাই কহিল,—এ খুব ভালো কাজ, ভাই বিন্দু··· কিন্তু—

—কিন্তু কি, বলাইদা?

—কত লোকের কত দায় যে চারিদিকে—কুবের তার ভাণ্ডার খুলে দিয়েও সে দায় ঘুচাতে পারবেন না!

বিন্দু কহিল,—যেটুকু যা পারি—

বলাই কহিল,—তা ঠিক।

বিন্দু কহিল,—তা হ'লে ভাখো। কালই আমি চুড়ি এনে দেবো তোমায়। তুমি রাজী আছ?

বলাই কহিল,—ভেবে কাল আমি বলবো, বিন্দু—

বিন্দু কহিল,—এর আর ভাবাভাবি কি? আমার দরকার হ'লে যদি তোমার টাকা থাকে, তা হ'লে তুমি কি দেবে না, বলাইদা?

কথাটা ছোট—কিন্তু এই ছোট কথাটুকু বলাইয়ের বুককে একেবারে তোলপাড় করিয়া দিল।···

যোগমায়া আসিয়া কহিলেন,—তোকে ডেকে পাঠিয়েচে, বিন্দু—

বিন্দু কহিল,—আমি বাঁদী কি না—ডাকলেই যেতে হবে অমনি! আমি এখন যাবো না, জ্যাঠাইমা!

কমলী তাঁর সঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কমলী কহিল,—বাবা গেছে। শুনচি, পিশিমার ভাশুর কাল সকালে আসবেন। কাল বিন্দুর যাওয়া চাইই···ভারী দরকার।

বিন্দু কহিল,—বলচে বুঝি?

কমলী কহিল,—আমি যে পিশিমার সঙ্গে গেছলুম, শুনে এলুম। পিশিমা আমায় বললে, বিন্দুকে ডেকে দে তো মা, শম্ভু আবার এখনি চ'লে যাবে।

বিন্দু কহিল,—আমি এখন যাবো না। বিষয়ের তর্ক করবার জন্যে আমার একটুও মাথাব্যথা পড়েনি!···

কমলী কহিল,—বলবো গিয়ে?

বিন্দু কহিল,—আবার তুই যাবি কেন? আমি না গেলেই ওরা বুঝবে···এলো না। পিশিমাকে তো আমি বলেচি সে কথা। আর পিশিমা আমায় খুব জানে,—আমি যা বলি, তাই করি। তা হ'লে এখন চ' তোর কি রান্না হলো, দেখি গে—তোর সাহায্য করবো। আমিও তো আজ এখানে খাবো।

কমলী কহিল,—তুমি তো আঁশ হেঁসেলে খাবে না, ভাই। তোমার জন্যে মা আলাদা লুচি ভাজবার ব্যবস্থা করেচে।

বলাইয়ের বুকে এ কথা ছুরির মত বিঁধিল! কিন্তু বিঁধিলেই বা কি করিবে?

পরের দিন সকালে শ্বশুর পিতা শ্রীযুক্ত বংশীলাল বাবু আসিয়া দেখা দিলেন, এবং দলিল-দরখাস্তের ব্যাপারে বিন্দুর এখনি যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা জানাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না।

বিন্দু তাঁর মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া দিল,—আমি সেখানে যাবো না। কাগজপত্তর সই করতে হয় তো এখানে ব'সে করবো। একদিন কথা কইনি ব'লে আজ এই দশা! তার পর দু'দিনের জন্য সেখানে নিয়ে গিয়ে কি খাঁচায় আমায়—কি খাঁচায় সকলে পুরেছিল, তা ভুলবো না। আবার সেই খাঁচায়? না। এতে বিষয় আমার থাকুক আর যাক্, আমার কিছু এসে-যাবে না।

সেই বিন্দু—তার মুখে এমন তীব্র উক্তি শুনিয়া শ্রীযুক্ত বংশী বাবু বিস্মিত হইলেন। পিশিমারও বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ] মাঘ, ১৩৩৭ [৪র্থ সংখ্যা

পারমার্থিক রস

১৮

ক্ষুদ্রের মহতের সহিত মিশিবার জন্য—অসুন্দরের নিত্য সুন্দরের সহিত মিশিয়া অনন্ত সৌন্দর্য্যাস্বাদনের জন্য—অশান্তের চিরশান্তিময় অমৃত-সাগরে চিরদিনের তরে নিমগ্ন হইবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই ভক্তিশাস্ত্রে রতি নামে অভিহিত হয়। এই আকাঙ্ক্ষা মিটিবার নহে, ইহার আদি নাই, অন্তও নাই; কারণ, ইহা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির সারবৃত্তি, ইহা অন্তঃকরণের বিকার বা বৃত্তি নহে, সাধুসঙ্গের প্রভাবে শ্রীভগবানের লীলা-গুণ ও মহিমার অনুশীলনে, নাম-গানে ও সংকীর্ত্তন শ্রবণাদি দ্বারা অন্তঃকরণে যে দ্রবীভাবময় বৃত্তি বা পরিণতিবিশেষ হয়, সেই বৃত্তিতে ইহা অভিব্যক্ত হয়। যেমন অগ্নিপ্রবেশে লৌহপিণ্ড অগ্নিভাবাবিষ্ট হয়, নিজ স্বভাবসিদ্ধ কালিমা ছাড়িয়া অগ্নির ভাস্বররূপ গ্রহণ করে, অগ্নি হইতে নিজের সকল প্রকার পার্থক্য পরিহার করে, তেমনই ভগবদ্রতির অভিব্যক্তিতে মানবের মনোবৃত্তিও প্রেম বা ভক্তিরূপে পরিণত হয়, ইহাই বুঝাইবার জন্য চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

'শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।'

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই কথাই আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

"আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎস্বরূপতাম্।
স্বয়ং প্রকাশরূপাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ॥
বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদস্বরূপৈব রতিস্ত্বসৌ।
কৃষ্ণাদিকর্ম্মকাস্বাদহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে॥"

এই দুইটি শ্লোকে সংসারপ্রবিষ্ট ভক্তহৃদয়ে কিরূপে ভগবদ্রতির আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাই দেখান হইয়াছে। এই শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্যার্থ, যথা—

শ্রবণ, কীর্ত্তন ও লীলানুশীলন প্রভৃতির দ্বারা অন্তঃকরণে যে বৃত্তি সমুদ্ভূত হয়, তাহাতে এই নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্রতি আবির্ভূত হয় অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত হয়। যে মনোবৃত্তিতে ইহা আবির্ভূত হয়, সেই মনোবৃত্তির আকারও ইহাতে আরোপিত হয়। (যেমন প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডে প্রবিষ্ট অগ্নিতে লৌহপিণ্ডের বর্ত্তুলাকার আরোপিত হয়, সেইরূপ মনোবৃত্তিতে উদ্ভাসিত ভগবদ্রতিতেও মনোবৃত্তির যাহা আকার বা বিষয়, তাহা আরোপিত হয়।) এই ভাবে সেই রতি স্বয়ংপ্রকাশ-স্বরূপ হইয়া প্রকাশ্যমান মনোবৃত্তির সহিত অভিন্নভাবে প্রতীত হয় বলিয়া মনোবৃত্তির ন্যায়ই প্রকাশ্যমান হইয়া থাকে। এই রতি স্বয়ং আস্বাদস্বরূপ হইলেও শ্রীকৃষ্ণাদিবিষয়গ্রাহিণী

ভক্তমনোবৃত্তির স্থায় শ্রী‹ক্‌া›দিবিষয়গ্রাহী আস্বাদের হেতু হইয়া থাকে।

এই স্বয়ংপ্রকাশ ভগবদ্রতি সাধকগণের মনোবৃত্তিতে কিরূপে প্রথমতঃ অভিব্যক্ত হয়, তাহাও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা।
প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবোদ্বেধাভিজায়তে॥"

ভগবদ্রতি মনোবৃত্তিতে অভিব্যক্ত দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথম সাধনাভিনিবেশ হইতে হয়, আর দ্বিতীয় প্রকার শ্রীভগবানের এবং ভগবদ্ভক্তগণের করুণা হইতে হয়।

সাধনাভিনিবেশ শব্দের অর্থ ভক্তির যাহা সাধন, তাহার অনুষ্ঠান করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ এবং সর্ব্বদা তাহার অনুশীলন। ভক্তির সাধন বহুপ্রকার; তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, নামজপ ও লীলা-গুণ প্রভৃতির স্মরণই প্রধান। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধকের মনোবৃত্তি বিশুদ্ধ হইলে তাহাতে ভগবদ্রতির যে অভিব্যক্তি হয়, সেই অভিব্যক্তিকে সাধনাভিনিবেশজ বলা যায়। নিরতিশয় প্রাক্তনপুণ্যশালী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ভগবদ্রতির অভিব্যক্তি দুই প্রকারে হইতে পারে, এক সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের করুণাপ্রভাবে, দ্বিতীয় শ্রীভগবানের যাঁহারা একান্ত ভক্ত, সেই সাধুপুরুষগণের অনুগ্রহে। এই দ্বিবিধ অভিব্যক্তিকে অনুগ্রহজ অভিব্যক্তি বলা যায়।

প্রথম যে সাধনাভিনিবেশজ রতির স্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহাও দুই প্রকার হইয়া থাকে। প্রথম বৈধী রতি, দ্বিতীয় রাগানুরাগা রতি। এক্ষণে বৈধী রতি কি প্রকারে সমুদিত হয়, তাহাই দেখান যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বকল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে বর্ত্তমানকল্পে আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের গৃহে পরিচারিকা দাসীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন ৭।৮ বৎসরের বালক ছিলেন, সেই সময়ে চাতুর্ম্মাস্যের সময় কয়েক জন ভগবদ্ভক্ত সাধু সেই ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্বকালে যাযাবর অর্থাৎ পরিভ্রমণশীল সাধুগণের মধ্যে এই প্রকার নিয়ম ছিল যে, তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে বর্ষাকালে যে গ্রামে বা নগরে উপস্থিত হইতেন, সেইখানেই বর্ষাকাল ও শরৎকাল অতিবাহিত করিতেন কারণ, ঐ দুই ঋতুতে জনপদে ভ্রমণ বহুবিধ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া থাকে। এই কারণে ঐ সাধুগণ সেই ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহারই প্রার্থনানুসারে তাঁহারই গৃহে চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সাধুগণ সেই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ নিজ সামর্থ্যানুসারে তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানাদির সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সাধুগণ সেই গৃহে বাসকালে শৌচাহারাদি আবশ্যক কার্য্যের সময় ছাড়া সকল সময়েই শ্রীভগবানের নাম ও লীলা প্রভৃতির কীর্ত্তন করিতেন। বালক নারদও সর্ব্বদাই তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহাদের উচ্ছিষ্টাদি মার্জ্জন করিতেন, তাঁহাদের আদেশানুসারে নিজ সামর্থ্যানুরূপ কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতেন, আর সংকীর্ত্তনের সময় তাঁহাদেরই চরণপ্রান্তে বসিয়া একাগ্র-হৃদয়ে সেই ভক্ত কণ্ঠোচ্চারিত সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। এইরূপভাবে সাধুসেবার প্রভাবে ও শ্রীভগবানের মধুর গুণলীলা কীর্ত্তন শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ে কি ভাবে ভগবদ্রতি আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা তিনি শ্রীবেদব্যাসের নিকটে নিজেই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ॥"

—ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, ৫ অধ্যায়।

হে মহর্ষে! সেই স্থলে তাঁহারা প্রতিদিন মনোহর কৃষ্ণকথা গান করিতেন। সেই গানের সময় দয়া করিয়া তাঁহারা আমাকে সেইখানে বসিতে দিতেন। আমি সেই মধুর গান শুনিতাম। যতই শুনিতাম, ততই আমার ভাল লাগিত, ততই বিশ্বাস বাড়িতে লাগিল। কিছুকাল এইরূপে মনোহর কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসার উদয় হইল। ইহাই হইল 'সাধনাভিনিবেশজ' রতির অভিব্যক্তি। ইহারই নাম বৈধী অভিব্যক্তি। তাহার পর কি হইল?—

"ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরে-
র্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।

সঙ্কীর্ত্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা ॥"

সমগ্র বর্ষা ও শরৎকাল ব্যাপিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে সেই মহাত্মা সাধুগণ শ্রীভগবানের অমল যশোগান করিতেন আর আমি সেইখানে বসিয়া শ্রবণ করিতাম। ক্রমে শুনিতে শুনিতে তাঁহাতে আমার অনুরাগ জন্মিল। হে মহর্ষে! সেই অনুরাগের উদয়ে আমার হৃদয়ের সকল প্রকার রাজস ও তামস বৃত্তিনিচয় চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। ইহাই হইল শ্রীকৃষ্ণানুরাগের প্রভাব। এই অনুরাগ যাহার হৃদয়ে উদিত হয়, তাহার কাম দূর হয়, ক্রোধ বিলুপ্ত হয়, লোভ বিধ্বস্ত হয়, মিথ্যাজ্ঞান বা মোহের অন্ধকার কাটিয়া যায়, অভিমান বা অহঙ্কার চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়, মাৎসর্য্য বা পরগুণাসহিষ্ণুতা সমূলে বিধ্বস্ত হয় আর সকল প্রকার বিষাদ বা অবসাদ বিনষ্ট হইয়া যায়। সে আর প্রাপঞ্চিক বা প্রাকৃত মানব থাকে না। সাধুগণের শ্রীমুখারবিন্দ-নির্গলিত কৃষ্ণকথা-শ্রবণ যাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে, সে আর সংসারী থাকে না,—সে এই সংসারে থাকিয়াও বৈকুণ্ঠরাজ্যের প্রজারূপে পরিণত,—সে অমর হয়, জন্মান্তরে নিশ্চয়ই সে দেবর্ষিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, পরমার্থ-রসাস্বাদ তাহার নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া থাকে। প্রাকৃত কবির প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার রতির আস্বাদনরূপ প্রাকৃত রসের আস্বাদন ক্ষণিক আনন্দেরই কারণ হয়, চিরদিনের জন্য সমস্ত রাজস ও তামস বৃত্তির উচ্ছেদ দ্বারা অনন্তকালের জন্য অলৌকিক আত্মপ্রসাদ তাহা হইতে কখনও সম্ভবপর নহে, ইহাই এই ভাগবতের শ্লোক দুইটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

সাধুগণের সঙ্গ ব্যতিরেকে এই 'সাধনাভিনিবেশজ' অনুরাগ প্রায়ই হয় না। সাধুগণের লক্ষণ ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥"
—ভাগবত, ৩ স্কন্ধ, ২৫ অধ্যায়।

অপরের অপরাধ দর্শনে যাঁহাদের ক্রোধ হয় না, প্রত্যুত অপরাধীর প্রতিও করুণাপূর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সকল জীবের যাঁহারা সুহৃদ্, কাহাকেও যাঁহারা শত্রু বলিয়া বিবেচনা না করেন, শান্তি যাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান, তাঁহারাই সাধু শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন। সাধুগণের অলঙ্কার সাধুগণই হইয়া থাকেন। এই প্রকার সাধু-সঙ্গের প্রভাবে কি হয়?—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

সাধুগণের সহিত ভাল করিয়া সঙ্গ করিলে কি হয়? বৈষয়িক ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করিলে যেমন সাংসারিক বিষয়েরই কথা হয়, অন্য কথা হয় না, সাধুসঙ্গে সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, শ্রীভগবান্ই সাধুগণের একমাত্র বিষয়, এই কারণে যখনই সাধুসঙ্গ হয়, তখনই আমার (শ্রীভগবানেরই) কথা হয়। সেই কথা সাধুগণের মুখারবিন্দ হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া শ্রবণমাত্রেই কর্ণের তৃপ্তিবিধান করে এবং হৃদয়ে বল, আশা, প্রসাদ ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়া থাকে। করুণাময় শ্রীভগবানের যে অঘটন-ঘটনাপটীয়সী মহীয়সী শক্তি, তাহাতে বিশ্বাস, অপরের মুখের কথায় হইতে পারে না, কিন্তু সাধুগণের মুখে শুনিতে পাইলেই হইয়া থাকে। এই প্রকার সাধুগণের শ্রীমুখোচ্চারিত হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সংসার হইতে আত্যন্তিক নিষ্কৃতিলাভের একমাত্র উপায়-স্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দঘন রসরূপ শ্রীভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভাব ও প্রেমরূপা ভক্তি আবির্ভূত হইয়া থাকে।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্তগণের প্রসাদ হইতে যে রতি আবির্ভূত হয়, তাহার স্বরূপ বলা যাইতেছে।

"সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে।
স ভাবঃ কৃষ্ণতদ্ভক্তপ্রসাদজ ইতীর্য্যতে ॥"
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ৩য় লহরী।

শ্রবণকীর্ত্তনাদি শাস্ত্রোক্ত সাধন ব্যতিরেকে সহসা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অনুরাগ আবির্ভূত হয়, তাঁহাকে 'শ্রীকৃষ্ণ-তদ্ভক্তপ্রসাদজ' ভাব বা রতি বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ নানাপ্রকার, যথা,—বাচিক, দর্শন-প্রদান ও হার্দ্দ প্রভৃতি। বাচিক প্রসাদের উদাহরণ নারদীয় পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"সর্ব্বমঙ্গলমূর্দ্ধণ্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা
দ্বিজেন্দ্র তব মষ্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥"

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক। কেমন সে ভক্তি? যাহা সংসারের সকল প্রকার মঙ্গলের শিরোমণি, এবং নিরতিশয় আনন্দই যাহার স্বরূপ।

দর্শনপ্রদানরূপ প্রসাদের উদাহরণ স্কন্দপুরাণে দেখা যায়, যথা—

"অদৃষ্টপূর্ব্বমালোক্য কৃষ্ণং জাঙ্গলবাসিনঃ।
বিক্লিন্নদন্তরাত্মানো দৃষ্টিং নাকৃষ্টুমীশিরে॥"

জাঙ্গলদেশবাসিগণ হঠাৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীভগবান্‌কে বিলোকন করিয়া প্রেমার্দ্র-হৃদয় হইয়াছিল। তাহারা তখন শ্রীভগবানের সেই ত্রিভুবনমনোহর মূর্ত্তি হইতে নিজ নিজ দৃষ্টিকে কিছুতেই ফিরাইতে সমর্থ হয় নাই।

হার্দ্দপ্রসাদ কিরূপ, তাহা শুক-সংহিতাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

"মহাভাগবতো জাতঃ পুত্রস্তে বাদরায়ণ।
বিনোপায়ৈরুপেয়াভূদ্বিষ্ণুভক্তিরিহোদিতা॥"

হে বাদরায়ণ! তোমার এই পুত্র দেখিতেছি আজন্ম-সিদ্ধ মহাভাগবত, কারণ, ভক্তির যাহা যাহা সাধন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে, তাহার কোনটিই এই জন্মে ইনি করিয়াছেন, ইহা ত সম্ভবপর নহে, অথচ সেই সকল সাধন-সম্পাদ্য 'বিষ্ণুভক্তি ইঁহার হৃদয়ে সম্যক্‌প্রকারে আবির্ভূত হইয়াছে।

'ভক্তপ্রসাদজ' ভগবদ্‌ভক্তির আবির্ভাব পুরাণশাস্ত্রে বহু প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, যেমন দেবর্ষি নারদের কৃপায় অতি অল্পবয়সে ধ্রুব ও প্রহ্লাদ প্রভৃতির ভগবদ্রতি।

এই ভাবে ভগবদ্রতি সাধকের হৃদয়ে প্রথমে আবির্ভূত হইবার পর কি প্রকার অবস্থা উদিত হইয়া থাকে, তাহার বিশদভাবে বর্ণন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দেখিতে পাওয়া যায়—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"

পরমার্থ-রসের অঙ্কুররূপ ভাব বা রতি মানব-হৃদয়ে আবির্ভূত হইবার পর তাহার অনুভাবরূপ যে কয়টি অবস্থা সমুদিত হইয়া থাকে, তাহা এই—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, সর্ব্বদা নামগানে রুচি, তদ্‌গুণবর্ণনে আসক্তি এবং তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতি।

এই সকল অনুভাব কেমন করিয়া কি ভাবে ভক্তজনের হৃদয়ে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, এইবার তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

অনন্ত-তৃষা

ভেঙে যাক্ লোহার প্রাচীর, স্বর্গ মর্ত্ত হোক একাকার;
টুটে যাক্ নিয়ম-বন্ধন, মন মোর হোক নির্ব্বিকার।

ভারাক্রান্ত পরিশ্রান্ত প্রাণ মোর উন্মুক্ত আকাশতলে;
খুলে ফেলি সর্ব্ব আবরণ যাক্ মুক্ত বায়ুপথে চ'লে।
সীমাহীন প্রেম মোর দিক্‌হারা হয়ে চ'লে যায় ছুটে;
যেখানে যে শ্রান্ত আর্ত্ত আছে নিক্ সবে স্নেহরাশি লুটে।
ধরায় না থাকে দুঃখ-লেশ বয়ে যায় সুখের হিল্লোল;
শুধু শান্তি শুধু তৃপ্তি শুধু অনন্তের আনন্দ-কল্লোল।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কণ্ঠ ভরি ঢেলে দিক্ ধারা;
প্রাণ ভরি গাহি নিশিদিন ছন্দহীন গীত অর্থ-হারা।
সাগর ভূধর মরু সবে এক হয়ে টেনে নিক্ মোরে;
বিস্তারি অনন্ত বাহু বেড়ি লক্ষ পাকে লক্ষ লক্ষ ডোরে
বাজুক শ্রবণ ভরি মোর অনন্তের সম্মোহন বাঁশী;
উদ্দাম উন্মত্ত স্রোতে পড়ি অবিশ্রান্ত যাই যেন ভাসি।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

মাটীর স্বর্গ

(উপন্যাস)

১

শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্যেই একধারে গোপাল নাপিতের ঘর ছিল। সারা গ্রামখানিতেই তাহার একচেটিয়া ব্যবসা অর্থাৎ গোপালের কাছেই গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই নখ ফেলিত, চুল ছাটিত, দাড়ি কামাইত। কারণ, দ্বিতীয় ঘর নাপিত গ্রামে আর ছিল না। নাপিত-বৌও সংসারের কাযকর্ম্ম সারিবার পর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত না, কিছু কিছু উপায় সে-ও করিত। লোকের বাড়ী-বাড়ী গিয়া, ঝি-বউদের নখ কাটিয়া, পায়ে ঝামা ঘসিয়া, আলতা পরাইয়া দিত, আর হাসিতে হাসিতে মিঠে কথায় গল্প জমাইয়া আসিত। স্বামীর মত না হইলেও এই কাযে সে-ও বেশ দু'পয়সা ঘরে আনিত। ইহা ছাড়া, নাপিত-বৌয়ের সুমধুর স্বভাবের জন্য ভালবাসা জিনিষটা সকলেরই নিকট হইতে তাহার উপরি পাওনা ছিল। এ দিকে গ্রামের বিয়ে-পৈতা, ব্রত-নিয়ম প্রভৃতি কার্য্যেও গোপালের যথেষ্ট পাওনা ছিল। পাড়ার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মধ্যে মধ্যে তাই গোপালকে তামাসা করিয়া বলিতেন—"গোপাল রে, আমার পুথি-পঞ্জিকের ধারের চেয়ে তোর ক্ষুরের ধার এ-দিকেও বেশী, ও-দিকেও বেশী।" গোপাল মাথা নোয়াইয়া, যোড়হাত কপালে ঠেকাইয়া, মৃদু-মৃদু হাসিতে হাসিতে স-সম্ভ্রমে জবাব দিত—"সবই ঐ ছিচরণের আশীর্ব্বাদে, ঠাকুর!"

শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সত্যই গোপাল নাপিতের কোন দুঃখই ছিল না। তাহার ক্ষুদ্র গৃহখানির উপর মা-লক্ষ্মী যেন তাঁহার সচ্ছলতার অঞ্চলখানি বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার বিশ বিঘা মাল জমী এবং তাহার আবাদের জন্য এক যোড়া হেলে গরু ছিল। চাষের সময় সে কৃষাণ ভাড়া করিয়া, জো বুঝিয়া, ঠিক সময়ে তাহার জমীগুলির আবাদ করাইয়া লইত এবং তাহার ফলে সেই বিশ বিঘা জমীর সমস্ত সোনাটুকুই মাঠ হইতে বহিয়া আনাইয়া বছর-বছর সে তাহার মরাই ভরাইত। তাহার নিষ্কর ভিটাটুকুর পশ্চাতে খিড়কীর বাগানখানি ও ডোবাটিও তাহার ঐ নিষ্করেরই সামিল ছিল। প্রত্যহ পাড়া ঘুরিয়া কামাইয়া আসিয়া সে তাহার ছোট ঘুরণী জালখানি একবার করিয়া ডোবায় ফেলিত এবং তাহাতেই যে বাটা, পুঁটি, 'চুনা', মৌরলা প্রভৃতি পড়িত, তাহাতেই তাহার ক্ষুদ্র সংসারে আবশ্যকের অধিক হইয়া যাইত। এ সমস্ত ছাড়া, গ্রামের জমীদারের কাছ হইতে কয়েক বিঘা আউস-জমীও সে 'চাকরাণ' পাইয়াছিল। আশ্বিনে 'আউস' কাটা হইয়া গেলে পর ঐ জমীতে গোপাল কলাই বুনিয়া তাহার বছর-খোরাকী কলাইয়ের সংস্থান করিয়া লইত। কোন কোন বৎসর ঐ জমীর ভিতর কিছু জমীতে সে সার খরচ করিয়া, ভালরূপে জমীর পাট ও তদ্বির করিয়া আলু দিবারও ব্যবস্থা করিত। খিড়কীর বিশ পঁচিশটি খেজুরগাছ শিউলীদের শীতের সময় জমা দিয়া, বছর-শালিয়ানা এক মণ সওয়া মণ হিসাবে গুড়ও গোপাল পাইত। এ সমস্ত বাদে তাহার গোয়ালে দুগ্ধবতী যে দুইটি গাভী ছিল, তাহাদের প্রতি নাপিত-বৌয়ের যত্ন-পরিচর্য্যার আর অন্ত ছিল না। সুতরাং গোপাল নাপিতের সংসারের ক্ষুদ্র ঠাটখানির উপর মা-লক্ষ্মী যে তাঁহার আলতা-পরা রাঙ্গা পা দুইখানি রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহই ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও গোপাল হঠাৎ একটি ভুল করিয়া ফেলিয়াছিল, এবং তাহা করিয়াছিল বলিয়াই আজ এই গল্পটির উৎপত্তি হইতে পারিল।

গোপালের যে কাযটিকে ভুল বলিয়া বলা হইতেছে, অবশ্য এখনকার দিন হইলে লোক তাহাকে খাঁটি নির্ভুলই বলিত। কিন্তু দেশের তখনকার সে-দিনে আর এখনকার এ-দিনে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তখনকার সে রামও এখন নাই, সে অযোধ্যাও নাই, তখন এই শ্যামসুন্দরপুর গ্রামেই—কিন্তু সে কথা থাক্, যাহা বলিতেছি, তাহাই বলি। গোপাল একটি ভুল করিয়া ফেলিয়াছিল, অর্থাৎ পুত্র নেপালচন্দ্রের বয়স বছর দশেক হইলে, গ্রামের পাঠশালা হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া কেশববাটীর ইংরাজী স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল।

গোপীনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণের বাঁধান বকুল-বেদীর মজলিসে বসিয়া গ্রামের ভদ্রলোকদিগের মধ্যেও এই কথা লইয়া একটা আন্দোলন-আলোচনা হইয়া গেল এবং আলোচনার ফলে সর্ব্ববাদিসম্মতক্রমে মন্তব্য প্রকাশিত হইল যে,

গোপাল জাত-ব্যবসা এবং চাষ-আবাদাদি না শিখাইয়া ছেলেকে ইংরাজী স্কুলে পড়িতে দিয়া যাহা করিয়াছে, তাহা যে শুধু তাহার নিজের পক্ষেই অশুভ, তাহা নহে, সমাজের পক্ষেও অশুভ এবং শাস্ত্র হিসাবেও ঘোর অসঙ্গত।

গোপালকে সকলেই যথেষ্ট ভালবাসিত। তাহার মঙ্গলের জন্ম কথাটা সকলেই তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে গোপাল সকলকেই সবিনয়ে জানাইল—"একটা ছেলে—শিবরাত্রির সল্‌তে, কখন্ আছে—কখন্ নেই—বড্ডই ঝোঁকটা ধরেছে ইংরিজী পড়বার জন্মে! ওর গেরাভ্যধারিণীরও বড্ড সাধ যে—আপনারা সব দেবতা, আপনাদের পাঁচজনকার আশীর্ব্বাদে ছেলেটা যদি বাঁচে আর একটু মানুষ হয়!"

'গেরাভ্যধারিণীর' নাম দিয়া গোপাল যাহা বলিল, তাহা নিছক মিথ্যা। কারণ, নাপিত-বৌ-ই এক দিন গোপালকে কহিল—"ছেলে কি জজ হবে, না হাকিম হবে যে, ইংরিজী স্কুলে দিলে? দু'কলম লিখতে শিখেছে, এই ঢের। ওকে ক্ষুর-কাঁচি ধর্‌তে শেখাও, কিষেণের সঙ্গে মাঠে পাঠাও, চাষ-আবাদগুলো একটু-আধটু দেখা-শুনো করুক।" স্ত্রীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া গোপাল নীরবে বিজ্ঞের মত শুধু বার দুই মাথা নাড়িল।

পাড়ার হীরু ঠাকুর গাঁজার আড্ডার মালিক ছিল। বত্রিশ ছিলিম করিয়া সে রোজ গাঁজা খাইত। রটনাটার মধ্যে হয় ত অতিরঞ্জন-দোষ একটু থাকিতে পারে, কিন্তু বড় বড় গাঁজাড়ীকে তাহার কাছে যে হার মানিতে হইত, সে বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নাই, তেমনই আশ-পাশের দশ-বিশখানা গ্রামের গঞ্জিকাভক্তরা তাহাকে যে গুরু বলিয়া স্বীকার করিত, তাহাও সত্য। কিন্তু শুধু এইটুকু-মাত্রই হীরুঠাকুরের পরিচয় দিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। তাহার অন্য পরিচয়ও আছে এবং সংক্ষেপতঃ তাহা এই :—হীরু ঠাকুর তাহার পিতার টোলে সংস্কৃত পড়িতে পড়িতেই কেশববাটীর স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়াছিল। তাহার পর বর্দ্ধমানে থাকিয়া রাজ-কলেজে যখন আই-এ পড়িতেছিল, সেই সময় তাহার সহিত এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হইয়া উঠে। অতঃপর পরীক্ষার মাস তিনেক কাল বাকী থাকিতে তাঁহার সহিত হীরু তীর্থভ্রমণে চলিয়া যায়। বৎসর দুই তিন পরে, একই সময়ে তীর্থক্ষেত্রে তাহার সন্ন্যাসী গুরুদেবের এবং দেশে পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সুদূর সন্ন্যাসাশ্রমের বৃক্ষমূলে বসিয়া হীরু পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইল, কারণ, সুদূর ব্যবধানে থাকিলেও বাটীর সংবাদ সে রাখিত। সংবাদ পাইয়াই হীরু বৃক্ষমূল ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল এবং উত্তরাধিকারসূত্রে গুরুদেবের পাইল—গঞ্জিকার কলিকা প্রভৃতি এবং পিতার পাইল—দেশের জমীজমা প্রভৃতি স্থাবর ও অস্থাবর। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত হীরু ঠাকুর উক্ত দুই দ্রব্য নির্ব্বিবাদে ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছে।

নেপালের সম্পর্কে এই হীরু ঠাকুর এক দিন গোপালকে কহিল—"গোপ্‌লা, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

গোপাল কহিল—"আমি ত আর ছেলেকে খিরিশ্চেন ক'রে দিতে যাচ্ছিনে, দা'ঠাকুর!" রক্তচক্ষুর্দ্বয় গোপালের মুখের উপর রাখিয়া হীরু ঠাকুর কহিল—"তারই মানে তাই। নাপ্‌তের ছেলে, নাপ্‌তের কায ছেড়ে আফিসের বাবু হবে ত? তা হ'লেই ভয়াবহ হয়ে উঠ্‌বে, বুঝলি না? দেখতে পাবি ব্যাটা, এর ফল কি হয়! শেষকালে হবে কি জানিস? না ধরতে পারবে কলম, না ধরতে পারবে ক্ষুর, একটা কিম্ভুত-কিমাকার হয়ে মাথা খারাপ ক'রে বসবে আর গাঁ ছেড়ে সহরে হয়ে পড়বে। ও সব মৎলব ছেড়ে দে। এখন থেকে ন্যাপলাকে বরং হাঁড়ির তলায় কাদা মাখিয়ে ভোঁতা ক্ষুর দিয়ে চাঁচিয়ে কামাতে অভ্যেস করা।"

গোপাল স্ত্রীর কথায় যেমন নীরব ছিল, হীরু ঠাকুরের কথাতেও সেইরূপ নীরব থাকিয়া চলিয়া আসিল। যাহার যে জিনিষটা থাকে না, সেই জিনিষটা সে খুব বড় করিয়া দেখে। ছেলেকে ইংরাজী স্কুলে পড়াইবার মোহ তাহার কিছুতেই কাটিল না। নেপাল একগাদা বাজালা ইংরাজী বাঁধান বই, একসারসাইজ বুক, লেড পেন্সিল, কপিবই প্রভৃতি হাতে লইয়া প্রত্যহ প্রায় চারি ক্রোশ পথ হাঁটা-হাঁটি করিয়া কেশববাটীর ইংরাজী স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর চণ্ডীমণ্ডপের এক ধারে তালপাতার চ্যাটাইয়ের উপর বসিয়া, মোটা সলিতা দেওয়া রেড়ির তেলের প্রদীপের সম্মুখে বই খুলিয়া নেপাল যখন পড়িত—'পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল, পাঁচটি

মহাসাগরে পৃথিবী আবৃত', তখন গোপালেরও অন্তরমধ্যে আনন্দের আর এক মহাসাগর উথলিয়া উঠিত। একটি ধারে বসিয়া আনন্দগদ্গদ স্বরে হয় ত সে কহিত, "সবই জল? উঁহুঁ। ওটা বোধ হয় মিছে কথা ক্ষ্যাপ্লা, কেমন কেমন যেন লাগছে। একটু জলের জন্তে যার চাষই হয় না, আর তিন ভাগ জল! আর পিরথিবীই বা জল পাবে কোথা, দেবতা ওপর থেকে দয়া ক'রে ঢালবে, তবেই ত— আচ্ছা, যা নেকা আছে, তাই প'ড়ে যা।"

এই ভাবে প্রত্যহ নেপালের পড়িবার সময় গোপাল তাহার ছোট হুঁকাটি হাতে লইয়া একটি ধারে বসিয়া তামাক টানিত আর তাহার একমাত্র পুত্র নেপালের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সহিত নিজের ভবিষ্যৎ মিলাইয়া তাহার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিত।

এই ভাবে বৎসর চারি পাঁচ কাটিয়া গেল।

এই সময় গোপাল হঠাৎ তাহার আরও একটি মনের সাধ পূর্ণ করিয়া বসিল, অর্থাৎ নেপালের বিবাহ দিয়া ফেলিল। গাঁয়ের রক্ষিতদের বিবাহ দিতে তাহাকে বর্দ্ধমান জেলার কোন একটি গ্রামে যাইতে হয়। তথায় সে তাহার স্বজাতের একটি ছয় সাত বছরের সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া তাহাকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনিবার পক্ষে তাহার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। এ আকাঙ্ক্ষা তাহার অপূর্ণ রহিল না। সেই বৎসরেরই ভিতর গোপাল তাহার মনের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিল এবং গভীর তৃপ্তিতে তখন নিজেকে সর্ব্ববিষয়েই সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া অন্তরে একটু গর্ব্বানুভব করিল। কিন্তু অন্য দিকে বিধাতৃপুরুষ যে অলক্ষ্যে তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, গোপাল তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না।

তাহার সেই হাসির সূত্র ধরিয়া সেই বৎসরেই আশ্বিন-মাসে হঠাৎ এ গ্রামে খুব ধূমধাম ও সোরগোল করিয়া ম্যালেরিয়া আসিয়া দেখা দিল এবং গোপাল তাহার জমী জমা, বাগান-পুকুর, মরাই, পালুই, ক্ষুর-কাঁচি, স্ত্রী-পুত্র, পুত্র-বধূ প্রভৃতি সব ফেলিয়া রাখিয়া, গ্রামের অন্যান্য অসংখ্য যাত্রীর সহিত কোন্ এক সুদূর সীমাহীন মহাযাত্রার পথে যাত্রা করিল। অপর দিকে, তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহার বর্দ্ধমানের বেহাই ও বেহান ঠাকুরাণী কন্যাসহ তীর্থ করিবার উদ্দেশে পুরী যাইল এবং জগন্নাথ দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ সেইখানে কলেরায় আক্রান্ত হইয়া তিন জনেই সমুদ্রতীরে তাহাদের সমস্ত পাপক্ষয় করিত জগন্নাথের চরণতলেই নিজ নিজ দেহ রক্ষা করিল।

নেপাল তখন কেশববাটীর স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়িতে-ছিল। নাপিত-বৌ তাহাকে কহিল,—"বাবা, এইবার স্কুল ছেড়ে দাও; দিয়ে জমী-জমাগুলো দেখ আর গাঁয়ের মক্কেলপাতি সব বজায় রাখবার চেষ্টা কর"—আরও কি সব নাপিত-বৌ বলিতে যাইতেছিল, নেপাল ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও সব আমি পারব-টারব না, আমার কায নয়, কোনও 'সেন্স' নেই তোমার, মা। আমি যাব পড়া-শুনো ছেড়ে দিয়ে ক্ষুর-কাঁচি বগলে লোকের বাড়ী বাড়ী কামাতে!"

"যাবি নৈ. কি, বাবা! তুই যাবি নি ত আর এখন কে যাবে বল্? শত্তুরুর মুখে ছাই দিয়ে পনর ষোল বছরেরটি হয়েছিস ত? তোকেই কি আর এত তাড়াতাড়ি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এ কায কর্ত্তে হোত! কি করবি বল্,—সব দিকেই যে ছন্ন-ভন্ন হয়ে গেল। আমার লক্ষ্মীর ঠাট যে উল্টে গেল, বাবা! হরি মুখ তুলে ত চেয়েছিলেন, সে মুখ যে তিনি ফিরিয়ে নিলেন!" নাপিত-বৌয়ের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে দিকে দৃষ্টিপাত-মাত্র না করিয়া নেপাল পূর্ব্ববৎ রুখিয়া উঠিয়া কহিল— "ও সব আমার দ্বারা হবে-টবে না। আর কখনো যদি আমায় ঐ সব কথা বলবে, তা হ'লে—।" তা হ'লে কি যে হইবে, সে কথা আর না জানাইয়া নেপাল আরসি-চিরুণী লইয়া তাহার পমেটমের শিশি খুঁজিতে লাগিল। দিন কয়েক হইল, ঘর হইতে আড়িকতক চাউল লুকাইয়া দোকানে দিয়া আসিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সে ঐ পমেটমের শিশিটি কিনিয়াছিল।

২

উক্ত সময়ের পর বারো তের বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সুখে দুঃখে এই গ্রামের দিনগুলি চলিয়া গিয়াছে;—দুঃখেই বেশী গিয়াছে, সুখে খুবই কম। এই সুদীর্ঘ অবসরে ম্যালেরিয়া শিকড় গাড়িয়া গ্রামে তাহার আসন সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছে; বহুলোক তাহাতে গত হইয়াছে, অসংখ্য

গৃহ গৃহস্থহীন হইয়াছে। গ্রামের বারোয়ারী, সাধারণের দুর্গোৎসব, গোপীনাথের দোলযাত্রা, রাস প্রভৃতিতে পূর্ব্বের সে পুলক, সে উল্লাস, সে প্রাণ আর থাকে না।

পনর ষোল বছরের কিশোর নেপাল এখন ২৭।২৮ বছরের যুবক হইয়াছে। কিন্তু ৩০।৩২ বছরের নাপিত-বৌ একবারে ৮০ বছরের বুড়ী হইয়া পড়িয়াছে। আগেকার দিনের মত তাহার সে প্রফুল্লতাও নাই, আননে পূর্ণ-শান্তির সে সহাস্য ভাবও নাই। আল্‌তার চুবড়ী হাতে বাড়ী বাড়ী গিয়া, মিঠে কথায় গল্প জমাইয়া আসিবার আর তাহার সামর্থ্য নাই, বোধ হয়, ইচ্ছাও নাই। পুত্র নেপালচন্দ্রই তাহার এই অশান্তি ও অকালবার্দ্ধক্যের কারণ। হীরু ঠাকুরের কথাই অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। নেপাল কলমও ধরিতে পারে নাই, ক্ষুর-কাঁচিও ধরিতে পারে নাই। পারিবার মধ্যে উপর্য্যুপরি তিনবার এন্‌ট্রান্স ফেল করিয়া কৃতবিদ্য হইতে পারিয়াছে আর বাবু হইয়া বসিয়া বসিয়া খাইয়া পৈতৃক জমী-জমাগুলি একে একে সব নষ্ট করিতে পারিয়াছে। মোট কথা, রাঙ্গা পায় নাপিত-বাড়ীর আল্‌তা পরিবার সখ এত দিন ধরিয়া মিটাইয়া এখন যেন কমলা তাঁহার পাদু'খানি গুটাইয়া লইয়াছেন।

কেশববাটীর স্কুল হইতে পর পর ৩ বৎসর ধরিয়া নেপাল পরীক্ষায় ফেল হইয়াছিল। নাপিত-বৌকে বলিয়াছিল যে, কলিকাতার খাশের সাহেবরা তাহার উপর আড়ি করিয়া বারবার তাহাকে এইরূপ ফেল করিতেছে।

স্কুলের কায শেষ করিয়া নেপাল বৎসরখানেক ধরিয়া সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়াছিল, তাহার পর তাহাও পরিত্যাগ করিয়া এই কয় বৎসরকাল সে খবরের কাগজ, মাসিকপত্র, লাইব্রেরী, গল্প, কবিতা, সখের থিয়েটার, নাইট স্কুল, যুবক-সমিতি প্রভৃতি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু অন্নাভাবের টান্‌ দিন দিন যত অধিক হইয়া আসিতে লাগিল, এই সমস্ত মহৎকার্য্য হইতে ক্রমেই মনকে তাহার বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে বাধ্য করিল। অবশেষে এক দিন হীরু ঠাকুরের আড্ডায় আসিয়া নিতান্ত শরণাগতের মত জিজ্ঞাসা করিল,—"কি করা যায়, বল ত হীরুদা ?"

হীরু ঠাকুর তখন ছোট একটু কাঠের টুকরার উপর এক দলা গাঁজা রাখিয়া ছুরি দিয়া তাহা কুচাইয়া তৈরী করিবার উপক্রম করিতেছিল, কহিল—"বোস্‌ একটু নাতি, এ সময় অন্যদিকে মন দিলেই মালটা নষ্ট হয়ে যাবে।"

মিনিট পাঁচেক একাগ্রমনে কার্য্য করিয়া হীরু ঠাকুর তাহার মালের বিষয়ে কোন গোলমাল না করিয়া কার্য্য সমাধা করিল এবং যথাস্থানে তাহা রাখিয়া দিয়া, সাঁপির কাপড়টুকু গাড়ুর জলে ভিজাইয়া আনিয়া পাট করিতে করিতে কহিল—"নাতি, অমৃতের আস্বাদ ত পেলি না; কি আর বুঝবি বল্‌ ? দু'এক ছিলিম টানা অভ্যেস থাকলে কি আর আজ আমার কাছে এসে তোকে মৎলব জানতে হয়! মৎলব তা হ'লে আপনি মাথার ভেতর গজ্‌গজিয়ে উঠতো!"

মৃদু হাসিয়া নেপাল কহিল,—"তাই বুঝি দেবতারা বিপদে পড়লে মহাদেবের কাছেই পরামর্শের জন্যে ছুটতো ?"

হো হো করিয়া উচ্চ হাসির একটা ঢেউ তুলিয়া হীরু ঠাকুর কহিল—"ঠিকই বলেছিস ভায়া, হাজার হোক্‌ নাপতের ঘরের ছেলে, চালাক-চতুর, শুদ্ধি-বুদ্ধি আছে, তার ওপর লেখাপড়া শিখেছিস, আবার সবের ওপর মধ্যে মধ্যে একটু-আধটু 'মাই-ডিয়ারী'ও ক'রে থাকিস!"

চমকিত হইয়া নেপাল বলিয়া উঠিল,—"কি, আমি মদ খাই ?"

"আহা-হা! গায়ে মেখে নিস্‌ কেন, ভায়া? খাসই যদি, তার হয়েছে কি! ম্যালেরিয়ার দেশ—খাবি না? একটু-আধটু নেশা করলে কি আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? খাবি বৈ কি! আমি ত ডাক্‌সাইটে নেশাখোর, তুই হলি আমার নাতি। পথ ত দু'জনেরই এক ভায়া, তবে, তোর দিকটায় কাদা, আমার দিকটায় ধুলো।"

"সত্যি বলছি হীরুদা—"

"আবার দিব্যি গালে! হ্যা রে, 'কাষ্টবুক'খানাও একবারে ভুলে গেলি, 'ডু নট সোয়ার'—'দি মাউস ক্ষুইক্‌স্‌'—দেখ্‌, হীরুদার এই আড্ডা চিরজীবী হয়ে থাক্‌, এর বাড়্‌-বাড়ন্ত হোক্‌, আন্দাজ ক'রে যা ব'লে দেবো, জানবি নির্ঘাৎ। এই তোরি সম্পর্কে তোর বাপকে যা বলেছিলুম, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। গোপ্‌লা যে ভাললোক ছিল—স্বর্গে গিয়েছে, নইলে এক দিন অমাবস্যার রাত্রে 'আঁবাড়ি'র মাঠে তোকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে সাম্‌না-সাম্‌নি ভজিয়ে দিতে আসতে পারতুম।"

যে কথার জন্ম নেপাল আসিয়াছিল, সে কথা অনেক দূরে যাইয়া পড়িতেছে দেখিয়া কহিল,—"ও সব কথা ছেড়ে দাও হীরুদা', একটা পরামর্শ তুমি দাও দেখি, কিছু উপায়-সুপায় না হ'লে ত আর চলছে না! কোলকাতায় গিয়ে কিছু একটা ব্যবসা-ট্যাবসা করলে হয় না?"

"যদি জিজ্ঞসা কর্‌লি আমায়, তা হ'লে বলি, নাতি। কারও মন রেখে কথা বলা আমার স্বভাব নয়, জানিস ত। ব্যবসা করা খুবই ভাল, কিন্তু যখন তোর নিজের জাত-ব্যবসাই করতে পারলি না, তখন অন্য কোন ব্যবসাতে হাত না দেওয়াই তোর উচিত।"

"সকলকেই যে জাত্‌-ব্যবসা করতে হবে, এমন ত কোন কথা নেই, 'প্রেষ্টিজ' ব'লে একটা জিনিষ আছে ত?"

"দেখ্‌, এই সব পাগলামী ধরণের কথা শুনলেই আমার আপাদ-মস্তক জ্ব'লে ওঠে! সকলকে জাত্‌ব্যবসাই কর্ত্তে হবে, আর গাঁয়েতেই থাক্‌তে হবে? তেমনি কথাই আছে। আমাদের সমাজ আর তার বিধিবন্ধনগুলো অনেক বড় বড় মাথার অনেক দিনকার চিন্তায় ঠিক হয়েছিল। তাই দেশে কোন অশান্তি, কোন অনাটন ছিল না, সমাজে কোন গোলমাল ছিল না। ওটাকে এক ফুঁয়ে ওড়ালে চলবে না, নাতি। আর ঐ 'প্রেষ্টিজ' ব'লে যা বলছিস্‌, ও কথাটা আমি মোটেই বুঝতে পারি না; ওটা এ দেশের কথাই নয়, কখন ছিলও না—তোরাই ঢোকাতে আরম্ভ করছিস্‌।"

"তা হ'লে তোমার পরামর্শটা কি? বাইরে থেকে কিছু উপায়-সুপায় ক'রে না আনলে ত আর পেট চালানোই দায় হয়ে পড়বে। তোমার জাত-ব্যব্‌সা এম্‌নি চমৎকার যে, বাপ মরতে-না-মরতেই আজ তার মাগ-ছেলেকে 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'র অবস্থায় প'ড়ে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখতে হচ্ছে!"

"শূয়ার, ষ্টুপিড, রাস্কেল কোথাকার, সে জাত-ব্যবসার দোষও নয়, তোর বাপেরও দোষ নয়। অন্ধকার যে দেখছিস, সে নিজেরই দোষে। 'প্রেষ্টিজের' ভয়ে চোখ বুজিয়ে থাকবি, তা অন্ধকার দেখবি না? বলি 'প্রেষ্টিজ' তার বাবার ছিল না? গাঁয়ের লোক কেউ কি তাকে নাপিত নাপতে ব'লে মনে করত, না শুধু তার সঙ্গে চুলের চুল ছাঁটবার আর দাড়ি কামাবার সম্পর্কই ছিল? সকলেরই দাদা, কাকা, জ্যেঠা, ছোট ভাই, ভাইপো হয়েই কাটিয়ে গেছে। এই যে বাগদীপাড়ার ছিমন্ত খুড়োকে দেখলে আমাকেও গাঁজার কলকে লুকিয়ে ফেলতে হয়। কেন, ওকে শুধু ছিমন্ত বাগদী বলেই মনে করতে পারি, কিন্তু তা ত আর পারি না। আমাদের গাঁয়ে—ঘরে এই জিনিষটার ভেতর অনেকখানি আত্মীয়তা, সমবেদনা আর মাধুর্য্য আছে, ভায়া গ্রামে 'প্রেষ্টিজে'র ধার কেউ ধারে না। এখানে, ধরিস্‌ যদি ও জিনিষটা সকলেরই আছে, আবার এক হিসেবে কারুরই নেই, সবই সমান।"

নেপাল অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল—"কি যে ছাই-পাঁশ বলছো! নেশা ক'রে ক'রে তোমার দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, হীরু-দা।"

"তেমন মাথাই নয় ক্ষ্যাপ্‌লা। হাজার বছর ধ'রে গাঁজা খেলেও এ মাথা খারাপ হবার নয়। আসল কথা, দেশটা আর তোর ভাল লাগছে না, কলকাতায় একবার থাকবার ইচ্ছেটা হচ্ছে। তা—ইচ্ছে হয়ে থাকে, যা, কিন্তু গাঁয়ে থেকে, আর কিছু না পারিস, অন্ততঃ ২০।৩০ বিঘে কোরূপা জমী নিয়েও যদি ভাল ক'রে চাষ-বাস করতে পারতিস! তবে, তোকেও ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। ঝোঁক যখন হয়েছে, তখন তুই ঠিকই যাবি বুঝতে পারছি আর কিছু একটা ব্যব্‌সাও করবি। তবে এক কায কর্‌। সেখানে গিয়ে খুব বড় ক'রে একটা 'শেভিং সেলুন'ই খুলে দি গে যা। চালের ওপর থাকবি। লোকজন রাখবি, ইলেক্‌ট্রিক লাইট, ফ্যান, বাবু হয়ে চেয়ারে ব'সে থেকে 'ক্যাশ-মেমো' লিখবি। একটা জমকালো গোছের নাম দিয়ে 'এণ্ড কোং'র সাইন বোর্ড একখানা ঝুলিয়ে দিবি। আর পারিস ত—"

বিরক্তির সহিত মধ্যপথে বাধা দিয়া নেপাল কহিল—"তোমার কাছে এলুম পরামর্শ নিতে, তোমার যত সব উদ্‌ভুট্টি পরামর্শ।"

"তবে যা ভাই, যা তোর ইচ্ছে কর গে যা। তবে এই ব'লে রাখলুম,—দেশ ছেড়ে কলকাতা গিয়ে কিছুই তুই করতে পারবি না। বলে, কত এম-এ, বি-এ ফ্যা-ফ্যা ক'রে বেড়াচ্ছে। তোর না আছে কোন পাশ্‌—না আছে কোন সুপারিশ! কিছুই করতে পারবি নি, উল্টে—গাড়ী চাপা প'ড়ে ফিরে আসবি।"

"গাড়ী চাপা পড়বো ?"

"নিশ্চয়ই। গেল বছর ৭টি দিন গিয়েছিলুম। সেই ৭ দিনের ভেতর তিনবার মটরের ধাক্কা খাই। সে কলকাতা আর নেই, এখন বিশ গুণ গাড়ী-ঘোড়া আর লোক বেড়েছে। একযোড়া চোখ নিয়ে আজকাল কলকাতায় চলা-ফেরা করা যায় না ভায়', দশযোড়ার দরকার।"

মিনিটখানেক চুপ করিয়া হীরু ঠাকুর আবার কহিতে লাগিল,—"আর তা ছাড়া, কত দিকে কত অসুবিধে! না পাওয়া যায় একটু দুধ, না পাওয়া যায় মাছ, না পাওয়া যায় একটু ঘি! মুড়ি খেলে ছোটলোক মনে ক'রে হাঁ ক'রে মুখের দিকে সব তাকিয়ে থাকে। আর, মাল খাবার এত অসুবিধে যে, তা আর বলবার নয়। তুই অবিশ্যি এ দিকে খুব চালাক চতুর আছিস, রাস্তা-টাস্তা হয় ত তুই না হারালেও হারাতে পারিস, আমি কিন্তু দুবেলাই পথ হারিয়ে ফেলতুম। এমন সোনার যায়গা ছেড়ে কলকাতায় কখন মানুষ যায়!"

উচ্চরবে নেপাল হো হো করিয়া তাচ্ছীল্যের একটা হাসি হাসিয়া উঠিতেই হীরু ঠাকুর দাঁড়াইয়া উঠিয়া অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে কহিল,—"তবে যা ভাল বুঝিস্, তাই কর গে যা ভাই, আমার 'টাইম্' হয়েছে, এখন আর বকিয়ে মাথা খারাপ করাস নি।"

নেপাল যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া অপলকনেত্রে হীরু ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং খানিক পরেই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

অতঃপর হীরু ঠাকুর তাহার টাইমমত কার্য্য সমাধা করিল এবং কার্য্য-সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই একরাশ চিন্তা আসিয়া তাহার মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া বসিল। ভাবিল, নেপালটাকে বললুম বটে, কিন্তু কালের একটা প্রভাব আছে, দেশের ওপর তা না প'ড়ে পারে না। আশপাশের চারিদিককার নতুন হাওয়া যখন জোরে বইতে সুরু করেছে, তখন এ দেশেও তার ধাক্কা না লেগে পারে না। য়ুরোপ-আমেরিকার ঢেউ ভারত মহাসাগর বেয়ে ভারতের তিন কূলে এসে আছাড় খাচ্ছে। ভারতবর্ষকে আর ভারতবর্ষ ক'রে কেউ রাখতে পারবে না, 'ইণ্ডিয়া' হয়ে যাবেই। আজ বুঝিয়ে সুঝিয়ে জোর ক'রে ন্যাপলাকে নাপ্তের ছেলে ক'রে আটকে রাখলেও, তার ছেলেরা নাতিরা কিছুতেই আটক থাকবে না, বিদ্রোহী হবেই।

এই সূত্রে আরও কত কি কথা তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কে আসিয়া একে একে জমা হইতে লাগিল। গতবার যখন সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে দেখিয়াছিল, এক কোণে নামে মাত্র একটি ক্ষুদ্র ঘৃতের প্রদীপ মিট-মিট করিয়া জ্বলিতেছে, আর চারিদিকের উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিকের আলো সমগ্র মন্দিরাভ্যন্তর নাট্যশালার মত সমুদ্ভাসিত করিয়াছে। এক জন পাণ্ডাকে নাকি সেই সময় সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, মায়ের ভোগটা কি মন্দির-সীমানার মধ্যেই রান্না হয়, না, 'গ্রেট্-ইষ্টার্ণ হোটেল' থেকে রোজ 'কন্‌ট্রাক্টে' আসে? হীরু ঠাকুর সে দিন মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়াছিল। সে যখন কলিকাতায় গিয়াছিল, তখন কার্ত্তিক মাস। বাসায় যে আকাশ-প্রদীপ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ইলেক্‌ট্রিকের বাল্‌ব্। তর্ক করিতে চাহিলে বাসার কর্ত্তা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, আকাশ-প্রদীপের যা উদ্দেশ্য, তা প্রদীপেও হয়, ইলেক্‌ট্রিকেও হয়। হীরু উত্তর দিয়াছিল—"হয় ত তা হয়, কিন্তু কাযটার মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধির মাধুর্য্য বা ভাব কিছুই থাকে না।" বাসার কর্ত্তা গাঁজাখোরের সঙ্গে আর বেশী তর্ক করা সমীচীন বোধ করেন নাই।

আজ হীরু ঠাকুর এই সব কথাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিল যে, কোন্ দিকেই বা ঠেকাইয়া রাখা যায়! দেশের ঢেঁকিগুলো যাবার দাখিল হয়েছে, তার যায়গায় এক-একটা বিরাট কল পাতাল পর্য্যন্ত আসন গেড়ে রাক্ষসের মত দিনরাত হুঙ্কার ছাড়ছে। কলুর গোষ্ঠী ঘানি বন্ধ ক'রে দিয়ে, তেলকলে গিয়ে চাকরী নিচ্ছে; প্রামাণিকের দল 'গিলেট' 'ভ্যানেট' প্রভৃতি রকমারি 'সেফটি রেজরে'র চাপে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। কুমোরের চাকে আর পেতল-কাঁসার কারখানার ওপর 'য়্যালুমিনিয়ম্' তার রাজাসন বিছিয়ে বসেছে। দেশের বৈদ্যরা রুগী পায় না, ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণ হয়ে আসছে, তাঁতিরা দুধের ব্যবসা করে, গোয়ালা 'কোর্টে'র পেয়াদা হয়। তীর্থে তীর্থে আর যাত্রী হয় না, সময় ও সুবিধে পেলেই সকলে ছোটে পাহাড়ে। গাঁয়ে গাঁয়ে পণ্ডিতের টোলের যায়গায়, 'ট্রেণিং স্কুলে'র কাঠামো খাড়া হয়েছে। ঘরের মেয়েরা বাইরে যেতে চায়, ছেলেরা

'হা-ডু-ডু'র বদলে ফুটবল খেলে, সন্দেশের বদলে কেক-বিস্কুটেই তাদের বেশী লোভ। সব চেয়ে মজা এই যে, বুড়োরাও ভোরে উঠে সাজি হাতে বাগানে বাগানে ফুল তোলা ছেড়ে দিয়ে 'মর্ণিং-ওয়াক' করতেই ব্যস্ত, আর যাত্রা-কথকতা শোনবার ঝোঁক কাটিয়ে সার্কাস-বায়োস্কোপকেই তারা বাহবা দেয়।

একটি একটি করিয়া এই ধরণের অনেক কথাই আজ হীরু ঠাকুরের মনে উদিত হইতে লাগিল এবং অনেক বেলায় যখন তাহার নেশা ফিকা হইয়া আসিল, তখন বাটীর ভিতর যাইবার উদ্দেশে দাঁড়াইয়া উঠিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, আজই সন্ধ্যার পর নেপালদের বাটী যাইয়া সে তাহাকে বলিয়া আসিবে যে, সে কলিকাতাতেই যাউক এবং হয় চাকুরী, নয় ব্যবসা, যাহা সে ভাল বলিয়া বুঝিবে, তাহাই করা তাহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। তবে সে নিজে আমরণকাল পর্য্যন্ত তাহাদের এই শ্যামসুন্দর গ্রামের মাটীকে সোনা মনে করিয়া তাহার কোলের উপর গড়াগড়ি দিবে, কিন্তু অন্য কাহাকেও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশে থাকিবার জন্য বলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিল যে, দেশ পূরোপূরি যদি য়ুরোপ হয়েই পড়ে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি, কিন্তু পূরোপূরি না হলেই ক্ষতি। দেশের গরু-বছুর, ছাগল, কুকুর থেকে আরম্ভ ক'রে চাষবাস, শিল্প-স্বাস্থ্য, ধন, বিজ্ঞান সব বিষয়েরই, যদি ঐ রকম উন্নতি করতে পারে, সে ত খুব ভাল কথা; কিন্তু কোন দিকে কোন উন্নতির চেষ্টা না ক'রে, খালি পোষাক-পরিচ্ছদ আর কতকগুলো বদ আচার-ব্যবহারের নকল করাই ত সব নয়। দেশ পায় না খেতে, দেশের সে রূপও নেই, সে শ্রীও নেই। লোকের এখন না আছে সম্পদ, না আছে শান্তি! ঘরে ঘরে এখন অন্নাভাব, রোগ, হাহাকার আর চোখের জল! সুতরাং—

ভাবিতে ভাবিতে হীরু ঠাকুর সদর-দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পাড়ার একটি ছেলে পথ দিয়া যাইতেছিল। সে কলিকাতায় চাকুরী করে, কাল শনিবার রাত্রিতে বাটী আসিয়াছে। ছেলেটি কহিল,—"খুড়ো, চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে যে?" কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের স্বরে হীরু ঠাকুর কহিল, "আমার 'ওয়াইফ'এর একটি 'গেষ্ট' আসবেন আজ পুমণিং থেকে, তাঁকে 'রিসিভ' করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।" ছেলেটি হাসিতে হাসিতে তাহার পথে চলিয়া গেল।

৩

প্রায় চারি মাস হইতে চলিল, নেপাল কলিকাতায় আসিয়াছে। ভবানীপুরে আদিগঙ্গার ধারে যে অঞ্চলটা আদিযুগেরই মত এখনও পর্য্যন্ত নোংরা ও আলো-বাতাস-হীন হইয়া অবহেলায় এক ধারে পড়িয়া রহিয়াছে, সেই কেঠোপটী পল্লীর মধ্যে একটা খোলার বাড়ীর একখানা ঘর লইয়া সে থাকে এবং নিকটের একটা হোটেল হইতে দু'বেলা খাইয়া আসে। যে উদ্দেশ্য লইয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, এই দুই মাসের মধ্যে তাহা তাহার কিছুই হয় নাই। কোন চাকুরীও তাহার যোগাড় হয় নাই, অথবা কোনরূপ ব্যবসা করিবার পক্ষেও কোন সুযোগ তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। তবে 'সুবর্ণ-সুযোগ' যে শীঘ্রই ঘটিবে, সে বিষয়ে নেপালের কোন সন্দেহ ছিল না।

কোন কাযকর্ম্মের সুবিধা না ঘটিলেও, এই অল্পদিনের ভিতরে তাহার কয়েকটি মিত্র-লাভ ঘটিয়াছিল। বন্ধুবর্গের ভিতর গয়ারামই শ্রেষ্ঠ। গয়ারাম জাতিতে ব্রাহ্মণ, এই বাড়ীর বাড়ীওয়ালীরই সম্পত্তি। তাহার ৩২ বৎসর বয়সের অধিকাংশকাল কলিকাতাতেই কাটিয়াছে। শুধু বৎসর দুই পূর্ব্বে বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া পশ্চিম চলিয়া গিয়াছিল এবং নেপাল এ বাটীতে বাসা করিবার অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বেই কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি হইয়া, মাথা নেড়া করিয়া ফিরিয়া আসে।

কথাটার ভিতর কোন গোলমাল থাকিয়া না যায়, সে জন্য আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা ভাল। গয়ারাম ঝগড়া করিয়া চলিয়া যাইবার সময়, বাড়ীওয়ালী সুখদাকে দম্ভভরে বলিয়া গিয়াছিল যে, সে একবার যদি বাঁশী বাজায় ত সুখদার মত অমন ষোল শ' সুখদা তাহার কাছে আসিয়া লুটাইয়া পড়িবে এবং ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে লইয়া সে নব আর এক বৃন্দাবনেরও সৃষ্টি করিতে পারে। সুখদা সে সময় উঠান ঝাঁট দিতেছিল, অগ্নিগর্ভ তুবড়ির মত রুদ্ধ ক্রোধে সে শুধু গয়ারামকে তাহার হস্তস্থিত দ্রব্যটি দেখাইয়া কহিয়াছিল, "ছিকেষ্টোর চামর এই তোলা রইল, এর লোভে আবার শীগ্‌গীরই এই পুরোনো বিন্দাবনে ফিরে আসতে হবে।" কিন্তু গয়ারাম শীঘ্র আর ফিরিয়া আইসে নাই। সে কিছু কাল গয়া ও কাশীতে অবস্থান করিয়া গোপনে প্রয়াগে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়, এবং

তথায় যাইয়া বলাইদাস বাবাজী নাম গ্রহণ করিয়া সে তাহার প্রস্তাবিত নূতন বৃন্দাবন সৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করে। এই উদ্যোগপর্ব্বে যে সমস্ত কার্য্যের সে অবতারণা করে, তাহার ফলে এলাহাবাদের পুলিস দ্রুতগতি তাহার কাছে আসিয়া বিপুল সম্বর্দ্ধনা সহকারে তাহাকে লইয়া যায় এবং উপর্য্যুপরি কয়েক দিন ধরিয়া রাজার বিচারালয়ে হাজিরা দিবার পর তাহার ১৫ মাসের কারাবাসের সুব্যবস্থা হয়। তাহার পর দীর্ঘ দিন রাজ-অতিথিস্বরূপ থাকিবার পর যে দিন সে জেল হইতে মুণ্ডিতমস্তকে মুক্ত হয়, তাহার পরদিনই সরাসর এখানে চলিয়া আসে এবং যেখানকার সম্পত্তি, পুনরায় সেইখানে আসিয়া আবদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার স্বপক্ষে একটি কথা আছে, এবং কথাটি হইতেছে এই যে, সে মূর্খ ছিল না, সে লেখাপড়া শিখিয়াছিল। বি, এ, পাশ কিম্বা ফেল এই রকম যা হয় কিছু একটা সে করিয়াছিল। তবুও জীবনের ধারাটা তাহার এই দিকেই কেন যে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা শুধু সে-ই বলিতে পারে।

বৈকালের দিকে গয়ারাম পাণ চিবাইতে চিবাইতে হুঁকা হাতে লইয়া নেপালের ঘরে আসিয়া বসিল। নেপাল বিছানায় কাত হইয়া শুইয়া সিগারেট টানিতেছিল, উঠিয়া বসিয়া কহিল, "আপনার যুক্তিই ঠিক, দাদা। এখন তুলসী যদি আরও কিছু টাকা বার করতে পারে, তবেই সব হয়। কত টাকা আন্দাজ দরকার হবে, বলুন দেখি?"

গয়ারাম কহিল,—"কিছুই নয়,—কাগজে বিজ্ঞাপন চালানো আর আফিস অঞ্চলের দিকে একখানা ঘর নিয়ে খানকতক চেয়ার, একটা টেবল, একটা আলমারী, গোটা দুই র‍্যাক কিনে—ভাড়া ক'রে নিলেও চলতে পারবে। তা হলেও শ' চারেক হাতে নিয়ে নামতে হবে বৈ কি। সে দিন তুলসী বাবু দু'শ দিয়েছে, আরও অন্ততঃ শ' দুই চাই।"

কথাটা হইতেছে এই যে, ইহারা একটা কর্ম্মখালির আফিস খুলিবে। প্রথমে দুই টাকা ইহাদের আফিসে জমা দিয়া নাম রেজেষ্ট্রী করিলে এবং তাহার পর প্রতি মাসে এক টাকা হিসাবে চাঁদা দিতে থাকিলে, ইহারা বেকার কর্ম্মপ্রার্থীদের কর্ম্ম জুটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে। তবে সকলকেই অবশ্য ধৈর্য্যসহকারে শুভ দিনের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে এবং যদি কখনও শুভদিন আগত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রথম মাসের মাহিয়ানা হইতে তাহার এক-চতুর্থাংশ পারিশ্রমিক হিসাবে কোম্পানীকে দিতে হইবে। গয়ারাম কহিল,—"দেখবেন নেপাল বাবু, প্রথম ঝোঁকেই হাজার দরখাস্ত এসে পড়বে, ঐখানেই ত দু'হাজার টাকা, আসল লাভ ত প'ড়ে রইল। তা ছাড়া, মধ্যে মধ্যে ঝোপ বুঝে কোপ ত আছেই। কিন্তু সেয়ারের কথা যা বলেছি—আমার সাত, আপনার পাঁচ, আর তুলসী বাবু স্লিপিং পার্টনার হিসেবে চার। দেখুন বুঝে।"

বুঝিতে গিয়াই উভয়ে দেখিল, 'স্লিপিং পার্টনার' তুলসীই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। অতঃপর টাকার কথাটা তাহাকে বলা হইল। তুলসীর পিতার খুব স্বচ্ছল অবস্থা। একটু চেষ্টা করিলেই যে সে আরও শ'দুই টাকা যোগাড় করিতে পারিবে, এ কথা তাহাকে নেপাল ও গয়ারাম ভালরূপে বুঝাইয়া দিল। তুলসী কহিল,—"কিন্তু 'হোপলেশ!' বাড়ী থেকে আর একটি পাই-পয়সাও বার করবার উপায় নাই। মা'র বাক্স থেকে ঐ দু'শো টাকা হারিয়ে যাবার পর ভয়ানক কড়াকড়ি ব্যবস্থা হয়ে গেছে।" গয়ারাম ও নেপাল যত দিকে যত তাহাকে পথ দেখাইতে লাগিল, তুলসী সবই কাটাইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তুলসীর সম্বন্ধে যখন ইহারা নিজেরাই দু'জনে 'হোপলেস' হইয়া পড়িল, তখন তুলসী অনেক ভাবিয়া কহিল—"এক উপায় আছে, শ'দুই আড়াই টাকা পাওয়া যেতে পারে।"

গয়ারাম জিজ্ঞাসা করিল—"কি উপায়?"

তুলসী কহিল—"আমাকে একবার তা হ'লে হারাতে হয়।"

নেপাল কহিল—"বুঝতে পারলুম না, হেঁয়ালি ছেড়ে কথাটা খুলে বল।"

"হেঁয়ালি কিছুই নয়, সত্যিই আমাকে তা হ'লে চেষ্টা ক'রে একবার হারিয়ে যেতে—অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হতে হয়। তা হ'লেই,—হাজার হোক বাবার এক ছেলে ত বটে,—কাগজে বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দিয়ে একটা পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করবেই। আমার পুনরুদ্ধার ক'রে সেইটে, নেপাল তোমরা হস্তগত কোরো।"

গয়ারাম জিজ্ঞাসা করিল—"তা হ'লে আপনি থাকবে কোথা?"

"যাব আর কোথা, দিনকতক আপনাদের এইখানেই আস্তানা নিতে হবে।"

এই যুক্তিই স্থির হইল এবং দুই চারি দিনের মধ্যেই তুলসী হঠাৎ এক দিন নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িল। বাটীতে একখানি চিঠি লিখিয়া সে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাতে লিখিয়াছিল যে, বরাবরই বাপ-মায়ের নিকট হইতে গঞ্জনা এবং অনাদর পাইয়া আসিতেছে, ইহাতে তাহার অন্তরে চিরকালের দারুণ ব্যথা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সন্তানের প্রতি বাপ না হয় কঠিন হইতে পারে; কিন্তু মা-ও যে এমন নির্দ্দয় এবং পাষাণ হইতে পারে, ইহা শুধু তাহারই দুর্ভাগ্যের ফল। যাহা হউক, আর সে তাঁহাদের চোখের সামনে আসিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবে না সে এমন যায়গায় গিয়া থাকিবে, সেখানে থাকিয়া সে সুখী হইতে পারিবে, সেখানে কেহ তাহাকে মন্দ বলিবে না, গঞ্জনা দিবে না, অনাদর করিবে না। জন্মের মত সে চলিয়া যাইতেছে এবং তাহার শেষ অনুরোধ যে, তাহার জন্য কেহ যেন বিচলিত না হয় এবং কেহ তাহার কোন অনুসন্ধান না করে।

কিন্তু যেমন হইয়া থাকে, বাড়ীর লোক বিচলিতও হইল, অনুসন্ধানও চলিল। কিন্তু জাগিয়া কেহ ঘুমাইলে তাহাকে উঠানো বড় শক্ত; সুতরাং নিরুদ্দিষ্টের কোন উদ্দেশই মিলিল না। তখন তুলসীর অনুমানমতই কার্য্য হইল, অর্থাৎ আড়াই শ' টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়া তাহার পিতা কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির করিল। রাধাবাজারে তুলসীর পিতার সোনা-রূপার দোকান ছিল, সুতরাং এই সোনা-রূপার দোকান উপলক্ষেই তাহার ঘরে সোনা-রূপার অভাব ছিল না।

কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইবার দুই এক দিন পরেই তুলসীর পিতার সহিত নামাবলী গায়ে আধা-বয়সী একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া দেখা করিল এবং বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের গোপনে কথাবার্ত্তা হইবার পর লোকটি উঠিবার উপক্রম করিতেই তুলসীর পিতা তাহার হাতে পঁচিশটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া কহিল—"কাশীতে আপনার যাতায়াত আর তার আসবার টিকেট্ এইতে হবে'খন। কিছু বেশী থাকল, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি আছে ত।" টাকা কয়টি নামাবলীর খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া, প্রণামের উত্তরে তুলসীর পিতাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া লোকটি বাহির হইয়া গেল।

দিন পাঁচেক পরে লোকটি ফিরিয়া আসিয়া জানাইল—"অনেক ক'রে আপনার পুত্রটিকে বাড়ী ফিরে আসবার জন্যে রাজি করাতে পেরেছি। গুরুদেবের কাছে তিনি শাস্ত্র পড়তে সুরু করেছেন, কিছুতেই ফিরে আসতে চান না। গুরুদেবকে গোপনে সব কথাই জানালুম। তিনিও তুলসীবাবুকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরে আসতে রাজী করিয়েছেন। পূর্ব্বে কি রকম স্বভাব-চরিত্র ছিল, অবশ্য জানি না, কিন্তু গুরুদেবের কৃপায় এই ক'দিনের ভেতরেই তাঁর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। কিন্তু একটা গোঁ বড্ড ধরেছেন", বলিয়া লোকটি একটু সরিয়া বসিয়া অস্ফুটে অনেকগুলি কথা তুলসীর পিতাকে জানাইল। তুলসীর পিতা কহিল,—"ব্রাহ্মণ মহাত্মা ব্যক্তি—গুরু ব'লে মনে মনে যখন তাঁকে বরণ করেছে—তা বেশ, এও আর অপব্যয় নয়। ঝোঁক ধরেছে যখন একশোটি টাকা গুরু-প্রণামী না দিলে আসবে না, দেব আমি। ব্রাহ্মণকে দান—সদ্ব্যয়—এর ওপর আর কথা কি!"

"কিন্তু তিনি যে আপনার কোন জিনিষ কিছুতেই আর নেবেন না, একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বল্লেন—'দু'টি খাব আর একখানা পরব, তা ছাড়া তাঁদের একটি পাই-পয়সা-তেও আর আমি হাত দেবো না।' হাতের আংটীটা পর্য্যন্ত খুলে ফেলে আপনাকে দেবার জন্যে দিয়েছেন।"

ব্রাহ্মণ নামাবলীর খুঁট হইতে একটি আংটী খুলিয়া তুলসীর পিতার হস্তে দিল। তিনি আংটীটি দেখিয়া কহিলেন, "তারই বটে। অভিমান হয়েছে আর কি! অভিমান হয়েছে, অনুশোচনাও হয়েছে। তা বেশ ত, প্রণামীর টাকাটা যে আমিই দিচ্ছি, সে কথা আর তাকে বলবার আবশ্যক কি আছে, বলবেন যে, আপনিই যেন তাকে দিচ্ছেন, বুঝলেন না?"

"বুঝিছি, আমিও সেই কথাই তাঁকে ব'লে এসেছি।"

অতঃপর আরও দুই চারিটি কথা হইবার পর লোকটি ১০ টাকার একখানি নোট হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তুলসীর পিতা প্রণাম করিয়া কহিল,—"আগেকার রাহা-খরচ পঁচিশের ভেতর কিছু আছে, তার ওপর আজ দশ দিলুম, ওইতেই দু'জনের——কিন্তু দয়া ক'রে আজই রাত্রির

ট্রেণে চ'লে যাবেন, কেন না, তার গর্ভধারিণী বড্ডই চঞ্চল হয়ে পড়েছে। যথার্থই—আপনাকে খাটাচ্ছি—ক্ষমা করবেন।"

"এর আর খাটান কি, এ ত কর্ত্তব্য। তবে ঋণটার জন্যে মাথার আর ঠিক নেই; বড্ডই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে, তাই এর জন্যে পুরস্কারের টাকাটা নেওয়া, নইলে——"

"পুরস্কার ব'লে আর মনে করবেন না, ওটা প্রণামী হিসেবেই দেব। গুরুদেবকেও আমার প্রণাম দেবেন। যদি কখনও ভাগ্যে হয়, কাশী যাই, তাঁর চরণদর্শন হবে। কি নামটি তাঁর ?"

"সুখদানন্দ।"

তার পর ধীরে ধীরে লোকটি গৃহ হইতে বাহির হইয়া সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িল এবং বরাবর ভবানীপুর কেঠো-পটীর বাসায় আসিয়া তুলসীকে ডাকিয়া কহিল—"ভায়া, এইবার গুরুর কাছে শাস্ত্রপাঠ ছেড়ে দিয়ে স্বপ্রকাশ হবার যোগাড় করুন।"

সুখদা গয়ারামকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই ১ শত ১০২ টাকার কথা ওদের কাছে বল্লে না কি ?"

গয়ারাম জিভ্ ও টাক্‌রা দিয়া একটা শব্দ করিয়া কহিল,—"বোকা আর কি! গয়ারাম তেমন পাত্তরই নয়। আমি ত বলিই নি, ওর বাপও যাতে কিছু না বল্‌তে পারে, সেই মন্তরও ফুঁকে দিয়ে এসেছি। তবে আগের ২৫ টাকার কথাটা অবিশ্যি বলতে হয়েছে।"

নেপাল গয়ারামের কাছে আসিয়া প্রস্তাব করিল—"রেল-ভাড়ার পঁচিশটা টাকা, ধরতে গেলে 'এক্‌স্ট্রা' পাওনা! আসুন না, তা হ'লে ওর থেকে আজ একটু ফুর্ত্তি-টুর্ত্তি করা যাক্।"

গয়ারাম বিশেষভাবেই এই প্রস্তাব অনুমোদন করিল এবং তখনই খান দুই নোট হাতে লইয়া পরমোৎসাহের সহিত বাজারে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সুখদারই ঘরে সভা বসিল এবং সে সভায় সুখদাই সভানেত্রী হইয়া—সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

কৃষ্ণ-অলি

যেবা নির্গুণ তার কেন গুণ আগুনে শৈত্য দেন!
অসীমের রঙে রঞ্জিয়া কায় সসীম হ'ল বা কেন!
ওগো ষট্‌পদ, মধুপুর হ'তে সদা মধুরস লুটি',
যাবকের মাঝে শ্যাম-নাম-লেখা খোঁজ কার পদ দুটি!

ললিতা-পারুল, বিশাখা-মালতী করে সাধাসাধি যত,
রাধা-বিরহিণী কমলিনী-বেশে মানে ব'সে রয় তত;
কৃষ্ণ কাঙাল উদ্ধব তাই জলদের আভা ধরে,
বৃন্দাবনের প্রেম-নির্ঝর ভ্রমর-আঁখিতে ঝরে।
গুঞ্জনে বাঁধা বাঁশের বাঁশরী মাধবী-কুঞ্জে বাজে,
কুল-গোপী-কেলি করে কালা-অলি মদনমোহন সাজে;
নূপুরের ধ্বনি-ঝন-কিনি-কিনি, বনবালা তাই শুনে,—
বিনি সুতা গাঁথা বরণের আলো গোকুলের মালা বুনে।

বৃন্দা-মলয়া মধুরায় চলে যৌবন-ছল-মদে,
টেনে লয়ে আসে রাখাল-রাজেরে কুসুম-কোমল পদে
মিটে নাক আশা মধুর রসেতে ভজন কিশোরী বালা,
অলি-বেশে কানু ফিরে নিধুবনে ধরি' পরাগের মালা;
জটিলা কুটিলা কণ্টকে ঘেরি' রেখেছে রূপসী রাধা,
কুটিলের নীতি জানে নীলমণি পায় না মিলনে বাধা।
কত উদ্বেগ, চাতুরী, ছলনা চুম্বন সুখ-জ্বালা,
চলে প্রতি পলে ভক্তের সাথে প্রাণ লয়ে প্রাণ ঢালা!

শ্রীরাধারঞ্জন বরাট।

প্রতীচ্যে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ সুস্থদেহে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ নিবেদন করিতেছি। প্রতীচ্যে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া, নানা শ্রেণীর ভাবুক ও রাজনীতিকের সহিত মিলামিশা করিয়া তিনি এই পরিণত-বয়সেও তাঁহার অদম্য জ্ঞানস্পৃহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিশ্বপ্রেমের প্রচারক, স্বয়ং বিশ্বপ্রেমের উপাসক, সুতরাং জগতের সকল জাতির সহিত ভাবের আদান-প্রদান করা এবং সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্থাপন করা তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু যিনি সত্যের উপাসক, তাঁহাকে কখনও কখনও সত্য কঠোর ও অপ্রিয় হইলেও প্রকাশ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার প্রতীচ্য-ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এবার তিনি যে ভাবে প্রতীচ্যের অতি তরুণ সভ্য ও 'উন্নত' মার্কিণ জাতিকে স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিয়া আসিয়াছেন, বোধ হয়, সে ভাবে আর কখনও কোনও প্রতীচ্যজাতিকে দিয়া আসেন নাই।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

অতুল ঐশ্বর্য্যবিলাসের লীলাভূমি তরুণ মার্কিণের রাজধানী নিউইয়র্ক সহরের বাল্টিমোর হোটেলে বিশিষ্ট সহরবাসীদের পক্ষ হইতে তাঁহার এক সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট কুলিজ প্রমুখ মার্কিণ মনীষীরা অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য ছিলেন। ৩ শত ৫০ জন মার্কিণ নাগরিক প্রত্যেকে এই অভ্যর্থনা উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৭৫ টাকা করিয়া চাঁদা দিয়াছিলেন। প্রাচ্যের এই মনীষী পণ্ডিতের বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিবার আগ্রহ এই নবীন প্রতীচ্য জাতির কত অধিক, তাহা ইহা হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে।

কিন্তু এরূপ বিরাট আন্তরিক অভ্যর্থনাও রবীন্দ্রনাথকে সত্য কথা বলিতে পরাঙ্মুখ করে নাই। তিনি সভায় বক্তৃতাকালে এই সভ্যতা ও উন্নতিগর্ব্বদৃপ্ত তরুণ জাতির মুখের উপর তাহাদের দোষগুণের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তরুণবয়সে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথও এক দিন ইংলণ্ডে বসিয়া এমনই করিয়া, ইংরাজ জাতির মুখের উপর অপ্রিয় কঠোর সত্য কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। সে সভাতে দুই এক জন ইংরাজ বক্তা ভারতীয়কে অসভ্য অনুন্নত অজ্ঞান জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয়রা কৃপার পাত্র,

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উহাদিগকে বহুদিন বাহুপুটে আশ্রয়দান করিয়া রক্ষা করিতে হইবে এবং উহাদের ভয়াবহ জঘন্য সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে।

স্যার সুরেন্দ্রনাথ তখন অল্পবয়স্ক যুবক, ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ

করিতেছেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ চিরদিনই দেশপ্রেমিক। জন্মভূমির নিন্দাবাদ তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইল।" তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধগম্ভীর কণ্ঠে তীব্রজ্বালাময়ী ভাষায় দেশজননীর স্বপক্ষে বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, "যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ মাত্র ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে (রাণী এলিজাবেথের সময়ে) মাথায় উপধান দিয়া শয়ন করিতে জানিত না, তাহারও কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ আমমাংস ভক্ষণ করিত, বৃক্ষশাখায় অথবা গুহামধ্যে বসবাস করিত,—তাহারা হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বের সভ্যতা ও জ্ঞানালোকের উত্তরাধিকারী ভারতবাসীকে অসভ্য নিরক্ষর বলে, ইহাতে কি হাসি পায় না ?"

রবীন্দ্রনাথ ঠিক উত্তপ্তমস্তিষ্ক যুবক সুরেন্দ্রনাথের মত মার্কিণজাতিকে তীব্র কটূক্তি করেন নাই। কিন্তু তিনি তাহাদিগের ধনৈশ্বর্য্যমত্ত গর্ব্বোন্নত মস্তক ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে মার্কিণজাতির অশেষ গুণের আবৃত্তি ও প্রশংসা করেন। তাহাদের ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মানুষের বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের উপযোগী উপায় অবলম্বনের চেষ্টা,—এ সকল তিনি উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। তিনি তাহাদের অদ্ভুত কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে "ultra-magnificence of your work" বলিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "আমার যৌবনকালে যখন আমার শক্তি ছিল, তখন আমি আপনাদের দেশে আসিয়া আপনাদের দেখিতে ও আপনাদের সহিত মিলামিশা করিতে সুযোগ পাই নাই,—আমার এখন এই ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে।"

এ বৎসরে বিখ্যাত মার্কিণ লেখক সিনক্লেয়ার লুইস সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। সুতরাং এই দুই মনস্বীর সাক্ষাৎ ও আলাপপরিচয় হওয়াই স্বাভাবিক। এই সভায় ভোজের পূর্ব্বে তাঁহারা কিছুক্ষণ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহার পর 'টকি সিনেমায়' তাঁহাদিগকে চিত্রদানের জন্য বসিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সে সময়েও রবীন্দ্রনাথ মার্কিণ জাতির আতিথেয়তা দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপি রবীন্দ্রনাথ উদ্দেশ্যসাধনে অবহেলা করেন নাই। তিনি সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে বলেন, "আপনাদের বিরাট ধনৈশ্বর্য্য ও অবস্থার স্বাচ্ছল্য সত্ত্বেও আপনারা—প্রতীচ্য-বাসীরা পরিশ্রান্ত জাতি হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আপনারা সুখী নহেন, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। যাহারা অসহায়, আপনারা তাহাদের অর্থে পুষ্ট হইয়াছেন, এবং যাহারা দুর্ব্বল, আপনারা তাহাদিগকে পীড়ন করিয়াছেন। প্রতীচ্যবাসীরাই যে এই যুগে পৃথিবী ভোগ করিতেছে ও করিবে, তাহা জানি। মানুষ আপনাদিগের নিকট অনেক বিষয়ে কৃতজ্ঞ, এ কথাও আমি স্বীকার করি ; কিন্তু আমরা প্রাচ্যবাসীরা বুঝিতে পারি, আপনাদের প্রাণে কি বেদনা গুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে। আপনাদের প্রতীচ্যের সভ্যতা হইতে জগতের অধিকাংশ স্থানই যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই অপ্রিয় সত্য কঠোর কুলিশের মত যে মার্কিণ জাতির বুকে বাজিয়াছে, তাহাদের আত্মাভিমানে আঘাত করিয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু উপায় কি ? এখন এমন সময় আসিয়াছে, যখন প্রতীচ্যবাসী সাম্রাজ্যবাদী আত্মম্ভরী জাতিদিগের মুখের উপর এই ভাবের স্পষ্ট কথা বলার প্রয়োজন হইয়াছে। কোন কোন মনীষী প্রতীচ্যবাসী এখন স্বয়ং এ কথা বুঝিতে পারিতেছেন ; তাঁহারা জানেন, কেন প্রতীচ্যে এত ধনৈশ্বর্য্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলকজা, ব্যবসায়-বাণিজ্য সত্ত্বেও এত বেকার-সমস্যা, এত ব্যাঙ্ক ফেল, এত অস্ত্র-প্রতিযোগিতা, এত বাণিজ্য-প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, হিংসা, সোসালিজম, নিহিলিজম, এত অশান্তি, এত অসন্তোষ, এত পরধনলিপ্সা, এত পররাজ্যলোলুপতা। প্রতীচ্যের এই বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা রাবণের চিতার মত অহরহঃ জ্বলিতেছে, ইহার নিবৃত্তি কোথায় ?—রোমে রোঁলা ও ওয়েলস প্রমুখ দুই চারি জন দূরদর্শী মনীষী ইহার পরিণাম ভাবিয়া শঙ্কাপ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিরাট জনসাধারণ এ বিষয়ে একবারে উদাসীন। তাহারা চাহে কেবল নিত্য নূতন, কেবল দৌড়ঝাঁপ, তবেই ত জীবন ! রবীন্দ্রনাথ যদি তাহাদের সে মোহ কথঞ্চিৎ টলাইয়া দিয়া আসিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রতীচ্যেরই লাভ।

শশাঙ্ক-চরিত

[প্রতিবাদ]

গত কার্ত্তিকমাসের মাসিক বসুমতীতে "হর্ষচরিত সমালোচনার সমালোচনা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বনাথ রায় মহাশয় শশাঙ্ককে রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। ইহা তাঁহার দোষ নহে। বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিকগণ সকলেই একবাক্যে শশাঙ্ককেই রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাপরাধে অপরাধী করিয়াছেন। অন্যান্য সকলে তাহাই ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেছেন, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু শশাঙ্ক বাস্তবিক রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী নহেন। ঐতিহাসিকগণ উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে সেই বিষয়ই আলোচনা করিব।

হর্ষচরিত হর্ষবর্দ্ধনের ও শশাঙ্কের সমসাময়িক গ্রন্থ। এই হর্ষচরিতে বাণভট্ট রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারীকে গৌড়েশ্বর, গৌড়াধম, গৌড়ভুজঙ্গ ইত্যাদি লিখিয়াছেন। কুত্রাপি শশাঙ্কের নাম নাই। বুলার নাকি একখানি হর্ষচরিতে রাজ্যবর্দ্ধন-নিহন্তার নাম নরেন্দ্র গুপ্ত দেখিয়াছেন। হর্ষচরিতের টীকাকার শশাঙ্ককেই হত্যাকারী লিখিয়াছেন। হর্ষচরিতে এই পর্য্যন্ত।

হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বের শেষভাগে অনুমান ৬৩০।৩২ খৃষ্টাব্দে ইউয়ান চোয়াং তাঁহার রাজধানী স্থানেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন। ইহার সিউকী নামক গ্রন্থের অনুবাদক মিঃ ওয়াটার্স লিখিয়াছেন—"কর্ণসুবর্ণের অধিপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল শত্রু দুষ্টাত্মা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক গৌতম-বুদ্ধের পদচিহ্নাঙ্কিত পাষাণখণ্ড বিনাশে অসমর্থ হইয়া উহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিল। শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করিয়া উহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা অশোকের বংশধর মগধরাজ পূর্ণবর্ম্মার যত্নে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল।" * ইত্যাদি।

* বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত, ১০১ পৃষ্ঠা।

উক্ত 'সিউকী' গ্রন্থের অপর অনুবাদক বিল লিখিয়াছেন—"প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে (হর্ষবর্দ্ধনের) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সদ্ভাবে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। এই সময় ভারতের পূর্ব্বাংশস্থিত কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক অনেক সময় তাঁহার মন্ত্রিগণকে বলিতেন—'যদি সীমান্তপ্রদেশের রাজা ধার্ম্মিক হয়, তবে স্বরাজ্যের অকল্যাণ হয়।' এই কথা শুনিয়া তাঁহারা রাজা রাজ্যবর্দ্ধনকে সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন।" বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালবাবু কৃত, ১০২-পৃষ্ঠা।)

ইউয়ান চোয়াংএর সিউকী গ্রন্থের দুই জন সুযোগ্য অনুবাদক উপরি-উক্তমত একই কথার দুই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা ওয়াটার্স'এর অনুবাদ ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বিলএর অনুবাদ সঙ্গত মনে করিবার কারণ আছে। শশাঙ্ক তাঁহার মন্ত্রিগণের নিকট সীমান্তের রাজার আচরণ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ কথা বলিলেই যে শশাঙ্ক সেই রাজার হত্যাকারী হইবেন, তাহার কোন হেতু নাই। মন্ত্রিগণই যদি রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়া থাকে, তাহাতেই বা শশাঙ্কের দোষ কি? সে হত্যাকারী হইবে কেন?

ইউয়ান চোয়াংও প্রায় ২৫।২৬ বৎসর পরে আসিয়া রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকাহিনী শুনিয়া লিখিয়াছেন, সুতরাং সে কথার কোন মূল্য নাই। অবশ্য হর্ষবর্দ্ধন বা বাণভট্টের নিকট শুনিলে মূল্য অনেকটা ছিল বটে; কিন্তু নিশ্চয়ই তাহা তিনি শুনেন নাই। কারণ, হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার তাম্রলিপিতে ঘটনা লিখিয়াছেন, কিন্তু নাম লিখেন নাই, বাণভট্টও হর্ষচরিতে শশাঙ্কের নাম লিখেন নাই; সুতরাং ইউয়ান চোয়াংএর নিকট নাম না করাই স্বাভাবিক। ইউয়ান চোয়াং শুনিয়াছেন, শশাঙ্ক বোধিবৃক্ষ নষ্ট করিয়াছেন, বুদ্ধের পদচিহ্নাঙ্কিত শিলা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই বোধ হয়, শশাঙ্কের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বৌদ্ধদ্বেষী মনে করত হয় ত ঐরূপ লিখিয়া থাকিবেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্ক কর্ত্তৃক গয়ার বোধিবৃক্ষ নষ্ট হইতে পারে না। ইহা রোহিতাশ্বগড়ের অপর শশাঙ্কের কার্য্য।

রোহিতাশ্বগড়ে এক শশাঙ্কের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, ইহা নাকি তাঁহার মুদ্রার ছাঁচ। ঐ মুদ্রার উর্দ্ধদেশে একটি উপবিষ্ট বৃষমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে এবং তন্নিয়ে লিখিত আছে, "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্ত।" কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্কের বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার এক পার্শ্বে নন্দীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্ত্তি ও অপর-পৃষ্ঠে পদ্মাসনে উপবিষ্ট লক্ষ্মীমূর্ত্তি আছে। ঐ মুদ্রা না কি প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের মুদ্রার সহিত তুলনা করিলে কতকটা মিল পাওয়া যায়—(১) মুদ্রার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার কমলাত্মিকা-মূর্ত্তি এবং (২) প্রথম পৃষ্ঠে রাজার নাম লিখনের পদ্ধতি। যাহা হউক, সামন্তরাজ শশাঙ্কের মুদ্রার সহিত ইহার মিল নাই। রোহিতাশ্বগড় হইতে কর্ণসুবর্ণের দূরত্ব ২ শত ৬৫ মাইল। রোহিতাশ্বগড় হইতে বুদ্ধগয়া ৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত এবং বুদ্ধগয়া হইতে কর্ণসুবর্ণ প্রায় ২ শত মাইল। সুতরাং রোহিতাশ্বগড়ের শশাঙ্কেরই বুদ্ধগয়াতে অত্যাচার করা সম্ভব। হয় ত কেহ বলিবেন, রোহিতাশ্বগড়ের সামন্তই কর্ণসুবর্ণের রাজা হইয়াছেন। তাহাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, যে ইউয়ান চোয়াং শশাঙ্ককে এত ঘৃণিতভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তিনিই কর্ণসুবর্ণে গিয়া দেবমন্দির ও বৌদ্ধ সংঘারাম পাশাপাশি দেখিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্কই যদি বৌদ্ধদ্বেষী হইবেন, তবে তিনি নিজের রাজধানীতে দেব ও বৌদ্ধমন্দির পাশাপাশি রাখিয়া গয়াতে গেলেন বোধিদ্রুম নষ্ট করিতে, ইহা কি অসম্ভব নহে? এই সমস্ত প্রমাণ বিচার করিলে রোহিতাশ্বগড়ের শশাঙ্ক এবং কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্ক এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা দেখিলাম, সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই শশাঙ্ককে স্পষ্টভাবে রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী বলে নাই। রাজ্যবর্দ্ধনের সহোদর ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার তাম্রশাসনে, বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতে নাম বলেন নাই; এ ক্ষেত্রে শশাঙ্ককে আমরা দোষী করিবার কোন হেতু পাইতেছি না।

তবে কে হত্যা করিয়াছে? আমরা যখন শশাঙ্ককে নির্দ্দোষ বলিতেছি, তখন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। দেখা যাউক, কাহাকেও ধরা যায় কি না?

বাণভট্টের গৌড়েশ্বর, গৌড়াধম, গৌড়ভুজঙ্গ কে? শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের রাজা। তিনি গৌড়েশ্বর নহেন। গৌড় বলিতে আমরা মগধ বুঝি। সুতরাং মগধেশ্বরই যে গৌড়েশ্বর, তাহা অনুমান করিতে পারি। কর্ণসুবর্ণ হইতে ২ শত মাইল দূরে মগধ পর্য্যন্ত শশাঙ্কের রাজত্ব বিস্তৃত থাকার কোন প্রমাণ নাই; বরং মগধ স্বতন্ত্র রাজার অধীনে থাকার প্রমাণ আছে। রাখাল বাবু লিখিয়াছেন—"শশাঙ্কের রাজ্য ও তাঁহার বংশপরিচয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইল, তাহাতে অনুমান হয় যে, তিনি মগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন এবং মহাসেনগুপ্তের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।" বাঃ ইং ১০৫ পৃঃ।

রাখাল বাবু একটিমাত্র প্রমাণ বিশ্বাস করিয়াছেন—"প্রাচীন গুপ্ত-রাজবংশের সুবর্ণমুদ্রা-সমূহের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুই একটি বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও শশাঙ্কের মুদ্রার সহিত প্রাচীন গুপ্ত-রাজবংশের সুবর্ণ-মুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ, মুদ্রার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কমলাত্মিকা মূর্ত্তি, দ্বিতীয়তঃ মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠায় রাজার নাম-লিখনপদ্ধতি।" বাঃ ইং ১০৪ পৃষ্ঠা।

আমি বলি, এই মিল ধরিয়া এক বংশের মুদ্রা অনুমান করা যায় না। কারণ, গুপ্ত-বংশের কমলাত্মিকা-মূর্ত্তি আছে বটে, কিন্তু নন্দীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্ত্তি নাই। ইহাতে অনুমান করা সঙ্গত যে, গুপ্ত-বংশ বৈষ্ণব, কিন্তু শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। সুতরাং শশাঙ্ক গুপ্ত-বংশের কেহ হইতে পারে না। মহাসেন-গুপ্তের পুত্র দূরে থাকুক, তাহার সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহার কোন প্রমাণ কুত্রাপি নাই। অতএব আমরা এখানে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মহাসেনগুপ্ত যখন মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন হয় ত শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করিতেছিলেন।

রাখাল বাবু লিখিয়াছেন—"মগধে তৃতীয় কুমারগুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র দামোদরগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এই দামোদরের পুত্র মহাসেনগুপ্ত লৌহিত্য-তীর পর্য্যন্ত গিয়া কামরূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।" সুতরাং এই মহাসেনগুপ্ত যে মগধের রাজা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। মহাসেনগুপ্তের পর কে মগধের রাজা হইয়াছিলেন? শশাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের পুত্র হইবার কোন প্রমাণ নাই। আমরা উপরে দেখিয়াছি যে, মহাসেনগুপ্ত যখন মগধে রাজত্ব করেন, তখন হয় ত শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং মহাসেনগুপ্তের পরে কে মগধের রাজা হইয়াছিলেন? যিনিই হউন, তিনিও শশাঙ্কের সমসাময়িক বলিয়া ধরিতে পারি।

আমরা দেখিতে পাই, শশাঙ্কের মুদ্রা ও নরেন্দ্রাদিত্যের মুদ্রা বঙ্গ ও মগধের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। (বাঃ ইঃ ১০০ পৃষ্ঠা)।

যশোহরে তিনটি সুবর্ণ-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটি শশাঙ্কের নামাঙ্কিত, দ্বিতীয় মুদ্রাটি মহাসেনগুপ্তের বংশধরদের অথবা বঙ্গবাসী প্রাচীন গুপ্তবংশের সামন্ত রাজার মুদ্রা। তৃতীয় মুদ্রাটিতে 'শ্রীনরেন্দ্র বিনত' লিখিত আছে। বাঃ ইঃ ১০৩ পৃষ্ঠা।

অতএব আমরা দেখিতেছি, মুদ্রামধ্যে শশাঙ্ক, নরেন্দ্রাদিত্য ও 'শ্রীনরেন্দ্র বিনত' এই তিন প্রকারের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। শশাঙ্ককে ত কর্ণসুবর্ণে পাইলাম। নরেন্দ্রাদিত্য কে? ইহাকে কোথাও না পাইয়া রাখাল বাবু শশাঙ্ককেই নরেন্দ্রগুপ্ত বলিয়া ধরিয়াছেন। (বাঃ ইঃ ১০৪ পৃষ্ঠা)

বুলার যে নরেন্দ্রগুপ্তের নাম একখানি হর্ষচরিতে দেখিয়াছেন, এই নরেন্দ্রগুপ্ত হয় ত সেই নরেন্দ্রগুপ্ত হইবেন। কিন্তু নরেন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় শশাঙ্ক নাম নাই, শশাঙ্কের মুদ্রায় নরেন্দ্রগুপ্ত নাম নাই, এ অবস্থায় এই দুই জনকে এক ব্যক্তি ধরা বড়ই কষ্টকল্পনার কার্য্য। এরূপ কল্পনা করিবার পূর্ব্বে আমরা দেখিব, শশাঙ্কের সময় গৌড়েশ্বর কে ছিলেন।

রাখাল বাবু লিখিয়াছেন—শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা পিতৃব্যপুত্র মাধবগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই মাধবগুপ্ত কে? কোথা হইতে আসিলেন? শশাঙ্কের কোন বংশপরিচয় কুত্রাপি নাই, সুতরাং রাখাল বাবুর লিখিত মাধবগুপ্ত শশাঙ্কের ভ্রাতা বা পিতৃব্য-পুত্র বলিয়া আমরা ধরিতে পারি না। অথচ এই মাধবগুপ্ত মগধের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাহাও ঠিক।

আমরা দেখিতে পাই—প্রভাকরবর্দ্ধন মালব-রাজের কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামক পুত্রদ্বয়কে মালব হইতে স্থানান্তরে আনিয়া তাহাদিগকে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গী নিযুক্ত করিয়াছিলেন (হর্ষচরিত, ৪র্থ উচ্ছ্বাস)। মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্য সেনের অফসড়গড় গ্রামে আবিষ্কৃত ক্ষোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মাধবগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের বন্ধু ছিলেন। (বাঃ ইঃ ১১২ পৃষ্ঠা) হর্ষবর্দ্ধন যুদ্ধযাত্রাসময়ে এই মাধবগুপ্তকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। বিন্ধ্যারণ্যে হর্ষ-বর্দ্ধনের সহিত রাজ্যশ্রীর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি চিতারোহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ না লওয়া পর্য্যন্ত রাজ্যশ্রীকে অপেক্ষা করিতে বলেন, রাজ্যশ্রীও সম্মত হন। ইহার পরে হর্ষের প্রতিজ্ঞাপালন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—ভ্রাতৃহন্তা জীবিত থাকিতে দক্ষিণ হস্তে আহার্য্য তুলিয়া মুখে দিবেন না।

হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তৎপরে প্রতিজ্ঞাপালন জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন, সঙ্গে মাধবগুপ্ত ছিলেন। আমরা দেখিতে পাই, ৬১৯ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্কের রাজ্যকালে গঞ্জাম জেলায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসন দ্বারা শৈলোদ্ভব মাধববর্ম্মা ভূমি দান করিয়াছিলেন, সুতরাং ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শশাঙ্ক একরূপ প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজা। হর্ষবর্দ্ধন ১৪ বৎসরেও ত এই শশাঙ্ককে হত্যা করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারেন নাই, অথচ ইউয়ান চোয়াং লিখিয়াছেন, তিনি ৬ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধাদি করিয়া তৎপরে ৩০ বৎসর শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাপালন না করিয়া, দক্ষিণ হস্তে আহার গ্রহণ না করিয়া, তিনি ৬ বৎসর পরেও প্রবলপ্রতাপান্বিত শশাঙ্কের সম্মুখে শান্তিতে রাজত্ব করিলেন, ইহা একটু ভাবিবার বিষয় নহে কি? হর্ষবর্দ্ধন যে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারেন নাই, এ বিশ্বাস আমার নাই। আমি বলি, তিনি ৬ বৎসরের মধ্যেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। স্থানী-শ্বর হইতে গৌড় (মগধ) প্রায় ৬ শত মাইল এবং কর্ণসুবর্ণ প্রায় ৮ শত মাইল দূরে অবস্থিত। বিন্ধ্যারণ্য হইতে হর্ষবর্দ্ধন নিকটবর্ত্তী মগধে গিয়াই গৌড়েশ্বরকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লইয়া থাকিবেন। তাই তাৎকালিক প্রবলপ্রতাপান্বিত শশাঙ্ককে শাসন জন্য কর্ণসুবর্ণে যাওয়া আবশ্যক হয় নাই। তাই আমরা মগধেই রাজ্যবর্দ্ধন-হন্তার অনুসন্ধান করিব।

মগধরাজ মহাসেনগুপ্তের পুত্রের পরে মাধবগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু সে কে? মহাসেনগুপ্তের পুত্র কি? না। এই মাধবগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের যুদ্ধযাত্রার সঙ্গী। সুতরাং মহাসেনগুপ্ত ও মাধব-গুপ্তের মধ্যে অবশ্যই কেহ মগধে রাজত্ব করিয়াছেন এবং তাঁহাকে হত্যা করিয়াই হয় ত হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া মাধবগুপ্তকে সিংহাসনে বসাইয়া থাকিবেন। এই মধ্য-বর্ত্তী রাজা কে?

মালবরাজ গ্রহবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়া রাজ্যশ্রীকে কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভণ্ডী বলিয়াছে—গুপ্তনামা কোন কুলপুত্র রাজ্যশ্রীকে কারামুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। হয় ত এই ভাবে এই গুপ্তনামা ব্যক্তি রাজ্যবর্দ্ধনের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া থাকি-বেন। তাই রাজ্যবর্দ্ধন হয় ত তাঁহার আহ্বানে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। এই সুযোগে উক্ত গুপ্ত তাঁহাকে হত্যা করেন। এই গুপ্ত নরেন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না। হয় ত ইনিই মহাসেনগুপ্তের পুত্র। এই নরেন্দ্র-গুপ্তকে হত্যা করিয়া হয় ত হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়া স্বীয় সঙ্গী মাধবগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়া থাকি-বেন। তাই আমরা রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার ১৪ বৎসর পরেও শশাঙ্ককে হর্ষবর্দ্ধনের সমক্ষে প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করিতে দেখি এবং মাধবগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে দেখিতে পাই এবং হর্ষ-বর্দ্ধনকেও ৬ বৎসরমধ্যে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া তৎপরে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত শান্তিতে রাজত্ব করিবার প্রমাণ পাই। অতএব এই শশাঙ্ককে নরেন্দ্রগুপ্ত বানাইয়া হর্ষকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট করিয়া

শান্তিলাভ করিতে না। দেখিয়া শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রগুপ্তকে সমসাময়িক পৃথক্ ব্যক্তি ধরিয়া শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণে এবং নরেন্দ্রগুপ্তকে মগধে রাজত্ব করিতে দেখাই স্বাভাবিক। এইরূপ ধরিলে হর্ষবর্দ্ধনের প্রতিজ্ঞাপালন করা হইল, গুপ্তনামা রাজ্যশ্রীর মুক্তকারী ব্যক্তিকে পাওয়া গেল, এবং হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গী মাধবগুপ্তেরও মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিবার হেতু পাওয়া গেল। গৌড়েশ্বর ও গৌড়াধম এবং গৌড়ভুজঙ্গ কে, তাহাও পাওয়া গেল। আমরা এই প্রবন্ধে দেখিলাম—

১। শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণাধিপতি। রোহিতাশ্বগড়ের সামন্ত শশাঙ্ক পূর্ণবর্ম্মা নামক কোন অনামিক রাজার সমসাময়িক হইবেন। তাঁহার সময় নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

২। শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর বা গৌড়াধম নহেন। তিনি কর্ণসুবর্ণের অধিপতি।

৩। কর্ণসুবর্ণ গৌড় নহে। মগধ গৌড়।

৪। শশাঙ্কের নাম নরেন্দ্রগুপ্ত নহে। শশাঙ্কের নামের মুদ্রার সহিত নরেন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার কোন সম্পর্ক নাই।

৫। শশাঙ্ক যখন কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেন, নরেন্দ্রগুপ্ত তখন গৌড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই নরেন্দ্রগুপ্তকেই ভণ্ডী গুপ্তনামা কুলপুত্র বলিয়াছেন।

৬। শশাঙ্ক হর্ষবর্দ্ধনের প্রতিজ্ঞাপালনের পরেও প্রায় ৭ বৎসর প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছেন।

৭। হর্ষবর্দ্ধন এই শশাঙ্ককে হত্যা না করিয়া স্বীয় ভ্রাতৃহন্তা নরেন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন এবং স্বীয় সঙ্গী মাধবগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। শশাঙ্ক তখন কর্ণসুবর্ণে প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন।

এই প্রবন্ধের কেহ প্রতিবাদ করিলে, আমি সন্তুষ্টচিত্তে তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি; সত্য নির্ণয় করাই আমার উদ্দেশ্য।

শ্রীবিনোদবিহারী রায় (বেদরত্ন)।

কুসংস্কার

কোন বিশেষ ঘটনার অব্যবহিত পরে শুভাশুভ কিছু হইতে দেখিলে মানুষ স্বভাবতই ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে একটি কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ অনুমান করিয়া লয়। সম্ভবতঃ এইরূপ অনুমানই কুসংস্কার-সৃষ্টির প্রধান কারণ।

কুসংস্কারাপন্ন লোকের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা চিন্তা করিলেও দুঃখ হয়। অতি তুচ্ছ আকস্মিক ঘটনার ফলেও তাহার হাস্যচপল মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে আঁধারে মেঘের ন্যায় কালো হইয়া উঠে। পেঁচার ডাক তাহার মন অস্বস্তিতে ভরিয়া দিয়া পর পর বহু রাত্রি তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়; কোন বিশেষ অঙ্গ স্পন্দিত হইলে তাহার উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না; তোয়ালে হারাইয়া ফেলিলে ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হয়; গোলাপ-ফুলের গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়িতে দেখিলে বিপদাশঙ্কায় তাহার শরীর শীর্ণ হইতে থাকে; উল্কাপাত তাহার মানসিক প্রফুল্লতা নষ্ট করিয়া দেয়; স্বপ্ন দেখিয়াও তাহার নিস্তার নাই, নৌকা স্বপ্ন দেখিলে তাহার মন অস্থির হইয়া উঠে; হাই তুলে তুড়ি না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহার শান্তি নাই; পুত্র-কন্যাকে সুস্থ সবল বলিয়া কেহ প্রশংসা করিলে অমঙ্গল-নিবারণের জন্য তাহাদের মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তাহার প্রাণ আইঢাই করিতে থাকে। বনবিড়ালের ডাক শুনিলে 'সু' বুঝাইতেছে কি 'কু' বুঝাইতেছে, অনন্যমনে সে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করে; অবসর-সময়ে রবিবারে তৈলমর্দ্দনের কিম্বা ত্রয়োদশীতে বেগুন-ভক্ষণের স্মৃতি তাহাকে যত পীড়িত করে, অন্য কিছুতেই তেমন পারে না। মঘা নক্ষত্রে যাত্রা করা দূরের কথা, এরূপ চিন্তা মনে জাগিলেও তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে।

কুসংস্কারের বালাই যে শুধু এইরূপেই কাটিয়া যায়, তাহা নহে। ছেলেবেলায় কোনও পত্রিকায় পড়িয়াছিলাম, একটি বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে কেহ বলিয়া দিয়াছিল যে, হাতী যখন দাঁড়াইয়া থাকে, তখন তাহার নীচ দিয়া চলিয়া যাইতে পারিলে সন্তানলাভের সম্ভাবনা আছে। স্ত্রীলোকটি তাহার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া সত্যই এক দিন একটা হাতীর নীচ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু হাতীটি ঐ সময়ে হঠাৎ কি মনে করিয়া বসিয়া পড়ে, ফলে তখনই স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়। অনেক কুসংস্কারাপন্ন রমণী স্বামীর ভালবাসা লাভ করিবার জন্য তাহাকে যাহা তাহা খাইতে দিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন।

কুসংস্কার অল্পবিস্তর পৃথিবীর সকল দেশেই আছে। আদিম মানবের ভ্রান্ত সংস্কারগুলিকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানব অদ্যাবধি যে নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও সত্য।

জাপানীদের বিশ্বাস, কোথাও যাত্রা করিবার পূর্ব্বে নখ কাটিলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। অনেক রকম উৎকৃষ্ট ফুলও তাহারা অমঙ্গলজনক বিবেচনা করিয়া শুভকার্য্যে ব্যবহার করিতে সাহসী হয় না।

তুরস্কবাসীদের বিশ্বাস, গোলাপফুলের গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়িতে দেখিলে বিপদ অতি নিকটবর্ত্তী বুঝিতে হইবে।

সুইটজারল্যাণ্ডে শিশু রুগ্ন হইয়া পড়িলে অনেক ক্ষেত্রে তাহার পিতামাতা চাঁদকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা, চাঁদের আলো ঘুমন্ত শিশুর মুখে পড়িলে তাহার স্বাস্থ্য কখনও ভাল থাকিতে পারে না।

আয়ারল্যাণ্ডে সেণ্ট উইনিফ্রেড্ নামক কূপের জলে স্নান করিয়া পাপ ও রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি-বৎসরই বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

জার্ম্মাণীর পমারেণীয়া নামক স্থানে জ্বরের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্যে ইষ্টারের দিবস প্রাতঃকালে আপেল ভক্ষণের রীতি আছে।

ফ্রান্সে মায়েরা অনেক সময়ে মৃত শিশুর কফিনের ভিতর তাহার প্রিয় খেলানাটি দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, খেলানা পাইলে শিশু নির্জ্জন বোধ করিবে না।

ইংলণ্ডে যে মাসে বিবাহ হইলে দাম্পত্য-জীবন সুখের হয় না, এইরূপ কুসংস্কার আছে। তেরো জন এক টেবলে বসিয়া খাইলে অমঙ্গল হয়, ইহাও তাহাদের একটি কুসংস্কার।

গ্রীনল্যাণ্ডে কোনও শিশুর মৃত্যু হইলে তাহার সহিত একটি জীবন্ত কুকুরকে পুঁতিয়া ফেলা হয়। তাহাদের বিশ্বাস, কুকুর শিশুর পরলোকের পথিপ্রদর্শক হইতে পারিবে।

দক্ষিণ-আমেরিকার একজাতীয় লোক আছে, তাহাদের স্ত্রী প্রসব করিলে স্বামীকে কিছু দিন আঁতুড়ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া নানা কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়।

আমাদের দেশে রাত্রিকালে দোকানে গিয়া ধূপ, সিন্দূর, সূচ বা মধু চাহিলে দোকানদার জিনিষগুলি বিক্রয় করে না। কিন্তু এক একটি বিশেষ নামে চাহিলে জিনিষগুলি বিক্রয় করিয়া থাকে। যাত্রার সময়ে টিক্‌টিকীর শব্দ শুনিলে কিম্বা ধোপা-নাপিত দেখিলে আমাদের যাত্রায় বাধা জন্মে। কু-নজরে গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়, পালান কাটিয়া যায়, শিশুর সুপুষ্ট দেহ কঙ্কাল-সার হয়, এরূপ সংস্কারের কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। বধূ, ভৃত্য, এমন কি, গৃহপালিত পশুও মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের কারণ হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাসও অনেকের আছে। ধর্ম্মের নামে, বাউল, বীজমার্গী, কর্ত্তাভজা, পল্টুদাসী, সৎনামী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ বীভৎস আচারের প্রচলন আছে, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

কুসংস্কার সকল দেশেই আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া কুসংস্কার সমর্থন করিবার বাতিক আমাদের দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে সূর্য্যগ্রহণে হাঁড়ি ফেলার যুক্তিযুক্ততা দেখাইতে গিয়া জনৈক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন :—

"এই রীতির মূলে কিন্তু বিশেষ বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। গ্রহণের সময় অদৃষ্ট একরূপ বিষ (রোগবীজ) দেহে লিপ্ত হয়। সূর্য্যের অশ্ব অর্থাৎ রশ্মি দ্বারা এই বিষ নষ্ট হয়। গ্রহণসময়ে সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে পড়িতে পায় না। সুতরাং সেই সময় রোগবীজ সম্পূর্ণ নষ্ট না হইয়া কিছু দেহে লিপ্ত থাকে। ঐ অদৃশ্য রোগবীজ বা কীটাণু ধুইয়া ফেলিবার জন্যই বোধ হয় স্নানের ব্যবস্থা আছে। পাকের হাঁড়ি ধুইলে এই বিষ সম্পূর্ণ না যাইতে পারে [কারণ, তাহার শোষক গুণ আছে], সম্ভবতঃ এই জন্যই তাহা ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।"

এইরূপ কোন রোগবীজের অস্তিত্ব আমরা অবগত নহি। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগ ব্যাস-বিশিষ্ট বস্তুও অনায়াসে ধরা পড়ে। ব্যাখ্যাকর্ত্তা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ রোগবীজ দেখাইয়া দিতে পারিলে ইহার অস্তিত্বে আমরা অবিশ্বাস করিতে পারিতাম না, তিনিও চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া শুধু 'আছে' বলিলেই তাঁহার কথা আমাদের মানিয়া লইতে হইবে, এ কেমন আব্দার? যদি বলেন, এই গ্রহণবীজ অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও অদৃশ্য, তবে তিনিই বা ইহার সন্ধান পাইলেন কিরূপে? তিনি বা অন্য কেহ যাহা অনুমান করেন, তাহাই কি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা?

১৩২৭ সালের পৌষ মাসের প্রবাসীতে আর একটি ভদ্রলোক লিখিয়াছেন,—"তৈল মাখিবার সময় একটু তৈল তিনবার মাটিতে ছিটায়, ইহার ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক অথবা শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাই। হাঁচিলে 'জীব' বলে কেন? লোকে সন্ধ্যার সময়ে একটা-মাত্র নক্ষত্র দেখিয়া ঘরে যায় না, সাতটা দেখিয়া যায় কেন?"

কুসংস্কারেরও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হইবে! প্রাচীন রীতিনীতি যে অর্থহীন হইতে পারে, ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি এইরূপ অন্ধ-ভক্তি কি আমাদের কখনও দূর হইবে না?

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

পিতৃযজ্ঞের স্বরূপ

ক

কিছুদিন হইল, পিতৃযজ্ঞ কি, তাহা করা কর্ত্তব্য কি না এবং করিতে হইলে কি ভাবে করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

কালপ্রভাবে হিন্দুর ক্রিয়াকলাপ যেরূপভাবে লোপ পাইতেছে, তাহাতে হিন্দুর করণীয় প্রত্যেকটি বিষয়ের যথোপযুক্ত আলোচনা একান্ত আবশ্যক ও সমীচীন।

দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ স্থলেই আলোচনা বিপথগামিনী হওয়ায়, তদ্দ্বারা প্রকৃত সুফল ফলিতেছে না। বরং কুফলের মাত্রাই বর্দ্ধিত হইতেছে এবং ক্রিয়াকলাপ দিন দিন লোপ পাইতেছে।

পারিপার্শ্বিক আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ সংশয়াচ্ছন্ন, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট এবং বিমূঢ়। এরূপ অবস্থায় আলোচনা বিপথগামিনী হইলে যে সংশয় অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইবে এবং হিন্দু-সমাজ সম্পূর্ণ কর্ত্তব্যবিমুখ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই জন্য পিতৃযজ্ঞের স্বরূপনির্ণয় একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম।

ক

হিন্দুর অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপ নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য-ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহা দৈনিক বা নির্দ্দিষ্ট দিনে করা যায়, তাহা নিত্য; যাহা কোন বিশেষ নিমিত্ত উপলক্ষে করা যায়, তাহা নৈমিত্তিক এবং যাহা বিশেষ ফলকামনায় করা হয়, তাহা কাম্য।

তন্নিবন্ধন পিতৃযজ্ঞও নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্যভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রত্যহ কর্ত্তব্য পিতৃযজ্ঞ কালপ্রভাবে লুপ্ত। নৈমিত্তিক এবং কাম্য পিতৃযজ্ঞ এখনও প্রচলিত আছে।

যদি বলা যায় যে, আমরা পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি নিত্য করি না, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, আমরা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট, অজ্ঞ এবং বিমূঢ়। নতুবা নিত্যকর্ত্তব্য করি না বলিয়াই যে নৈমিত্তিক বা কাম্যকর্ম্ম করা হইবে না বা করা অকর্ত্তব্য, তাহার কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নাই।

খ

হিন্দুর নিত্যকর্ত্তব্য বহু প্রকার। তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত পাঁচটি সর্ব্বপ্রধান ও প্রত্যেক গৃহস্থ হিন্দুর অবশ্য করণীয়। যথা,— ১। অধ্যয়ন (ব্রহ্মযজ্ঞ), ২। শ্রাদ্ধ ও তর্পণ (পিতৃযজ্ঞ), ৩। পূজা ও হোম (দেবযজ্ঞ), ৪। বলিবৈশ্বদেব অর্থাৎ সর্ব্বজীবে অন্নদান (ভূতযজ্ঞ) এবং ৫। অতিথিসেবা (নৃযজ্ঞ)।

ইহা ভিন্ন দ্বিজাতিগণের অর্থাৎ উপবীতিকগণের পক্ষে সন্ধ্যোপাসনা একান্ত নিত্যকর্ত্তব্য।

উক্ত নিত্যকর্ত্তব্যগুলির মূল উদ্দেশ্য, যথাক্রমে,— ১। শিক্ষা ও জ্ঞান; ২। স্বাস্থ্য এবং শ্রদ্ধা; ৩। আস্তিক্য এবং নিষ্ঠা; ৪। দয়া এবং সমদর্শিতা; ৫। বদান্যতা এবং সম্মান এবং ৬। একাগ্রতা ও সাধনা।

সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই নিত্যকর্ত্তব্যগুলি যথাসাধ্য প্রতিপালন করা উচিত।

যদিও কালপ্রভাবে এবং রুচির পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বোক্ত নিত্য-কর্ত্তব্যগুলি লুপ্তপ্রায় সত্য, তথাপি নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়া-কলাপ এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই।

এরূপ অবস্থায় শাস্ত্রবাক্যের বিকৃত মর্ম্ম ও অর্থ প্রকাশ করিয়া প্রচলিত রীতিকে অযৌক্তিক ও অকর্ত্তব্য প্রতিপন্ন করত কর্ত্তব্যভ্রষ্টদিগকে অধিকতর কর্ত্তব্যবিমুখ করা অতীব মূঢ়তা এবং পাষণ্ডের পরিচায়ক।

গ

কেহ এরূপ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান প্রচলিত পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ খাস চীনদেশের আমদানী। অর্থাৎ চৈনিক বৌদ্ধগণের আচরিত শ্রাদ্ধবিধির অনুসরণেই বর্ত্তমান প্রচলিত শ্রাদ্ধবিধির পরিকল্পনা। নতুবা প্রাচীনকালে শ্রাদ্ধকার্য্য এ আকারে প্রচলিত ছিল না।

পরন্তু যাঁহারা জগতের ইতিবৃত্ত অবগত আছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, জগতের প্রত্যেক দেশে, সভ্যাসভ্য প্রত্যেক জাতির মধ্যেই মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান, মৃতের আত্মার সদ্গতির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা এবং মৃতের আত্মার তৃপ্তির জন্য জীবিত ব্যক্তিদিগকে ভূরিভোজনাদি দ্বারা তৃপ্ত করার ব্যবস্থা অল্পাধিক প্রচলিত আছে। যদিও এই সমস্ত কার্য্য মৃতের নিমিত্ত শোকপ্রকাশক বটে, তবুও উহা আংশিক উৎসবরূপেই পর্য্যবসিত হয়।

যাহা হউক, ব্যক্তিগতভাবে অথবা সার্ব্বজনীনভাবে মৃতের জন্য শোকপ্রকাশক উৎসব সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খৃষ্টানের 'Corpus Christi', মুসলমানের 'মহরম', বৌদ্ধের 'নির্ব্বাণ মহোৎসব', হিন্দুর 'ভীষ্মাষ্টমী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পর্ব্ব বলা যায়।

সুতরাং এই শ্রাদ্ধরূপ ক্রিয়া যে সার্ব্বজনীন (Universal) এবং স্মরণাতীতকাল হইতে সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

ঘ

কেহ তর্কচ্ছলে এরূপ বলিতে চান যে, হিন্দু-সম্প্রদায়, বিশেষ ব্রাহ্মণশ্রেণী) স্বকীয় জীবিকানির্ব্বাহ এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মৃতের শোকার্ত্ত স্বজনবর্গকে প্রতারিত করিয়া অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিবার জন্যই বর্ত্তমান আকারে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের প্রচলন

করিয়াছে। কিন্তু এই যুক্তিও যে ভিত্তিহীন ও ব্যক্তিগত ঈর্ষা-মূলক, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, ব্রাহ্মণ-শ্রেণীও যখন ঐ বিধানে স্মরণাতীতকাল হইতে শ্রাদ্ধ করিয়া আসিতেছে, তখন তাহাদের স্বার্থপরতা প্রমাণিত হয় না।

যদি এরূপ দেখা যাইত যে, ব্রাহ্মণগণ আদৌ শ্রাদ্ধ করে না বা করিলেও স্বতন্ত্র বিধানে করে, তবেই তাহাদিগকে স্বার্থপর বা পক্ষপাতী বলা শোভা পাইত। কিন্তু তাহা যখন নহে, তখন তাহাদিগকে অযথা দোষী স্থির করা বিজ্ঞতার পরিচয় নহে।

বিশেষতঃ জাতির বা সমাজের ২।৪ জনকে প্রতারিত করা সম্ভব হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতারিত করা সম্ভব নহে বা করিতে গেলেও উদ্দেশ্য সফল হয় না। সুতরাং এরূপ যুক্তি যে নিতান্তই হাস্যাস্পদ, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

চ

পিতৃযজ্ঞ বলিলে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ,—উভয় কার্য্যকেই বুঝায়। অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ দ্বারা পিতৃলোকবাসিগণের তৃপ্তিসাধনরূপ কার্য্যই পিতৃযজ্ঞ সংজ্ঞায় অভিহিত।

নিত্য-পিতৃযজ্ঞ যে লুপ্তপ্রায়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নৈমিত্তিক পিতৃযজ্ঞ এখনও লুপ্ত হয় নাই বা চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় নাই।

মৃতের আত্মার সদ্‌গতির উদ্দেশে কৃত ঔর্দ্ধদেহিক, সপিণ্ডী-করণ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এবং বিবাহাদি কার্য্যের অঙ্গীভূত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধরূপে বিখ্যাত।

এই সমস্ত শ্রাদ্ধের বিধানাদি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রেই অল্পাধিক পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যে অতীব প্রাচীন এবং সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহা ধ্রুব সত্য। যদি ২।১ খানি গ্রন্থে উল্লেখ না-ও থাকে, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি দেখা যায় না। কারণ, প্রত্যেক গ্রন্থেই যে প্রত্যেকটি বিষয় থাকিতেই হইবে, তাহার কোন বাধ্যতামূলক যুক্তি নাই।

ছ

শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে জানা যায় যে, উহাদের মূল অর্থ অভিন্ন। যাহা হউক, শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের ব্যুৎপত্তি পৃথক্ পৃথক্ প্রদর্শিত হইল।

১। তর্পণ শব্দের ব্যুৎপত্তি—

(ক) ব্যাকরণগত—(তৃপ্ + অনট্ (ভাবে) = তর্পণ) = প্রীণন, প্রীতিসম্পাদন, তৃপ্তিসাধন, তৃপ্তি। মহাযজ্ঞবিশেষ। পিতৃযজ্ঞ।

(খ) যুক্তিগত—পিতৃলোকবাসিগণের তৃপ্তি-সম্পাদন।

(গ) লৌকিক—মৃত ব্যক্তিগণের, বিশেষতঃ পিতা, মাতা প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গের উদ্দেশে সতিলজলাঞ্জলিদান।

২। শ্রাদ্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তি—

(ক) ব্যাকরণগত—(শ্রদ্ধা + ষ্ণ (ভাবে) = শ্রাদ্ধ) = শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, শ্রদ্ধাসমন্বিত, শ্রদ্ধের। পিতৃযজ্ঞ। পিতৃকর্ম্ম। পিতৃকৃত্য।

(খ) যুক্তিগত—শ্রদ্ধের ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে শ্রদ্ধের ব্যক্তিবর্গকে শ্রদ্ধাসহকারে অন্নাদি দান।

(গ) লৌকিক—মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে মৃতের স্বজাত্যুক্ত অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিনে অথবা মৃতের মৃত্যুস্মারক তিথিতে ব্রাহ্মণ, স্বজাতি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং দীন-দরিদ্রকে ভূরি ভোজনাদি দ্বারা তৃপ্ত করিয়া মৃতের আত্মার সদ্‌গতির নিমিত্ত পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন।

সুতরাং তর্পণ ও শ্রাদ্ধের অন্তর্নিহিত ভাব যে একই প্রকার, তাহাতে সন্দেহাভাব।

জ

শাস্ত্র যে মৃতের জন্যই শ্রাদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, তাহা নিম্নোক্ত প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়।

(ক) "যো যস্য ম্রিয়তে তস্মৈ দেয়ং নান্যস্য তেন তু।
ভোজয়েচ্চৈব জীবন্তং যথাকামন্তু ভক্তিতঃ॥"
—কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ২১ অধ্যায়।

(খ) "মৃতে পিতরি পুত্রেণ ক্রিয়া কার্য্যা বিধানতঃ॥"
—মরীচি-সংহিতা।

(গ) "কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥"
—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

(ঘ) "ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে সপিণ্ডীকরণং ভবেৎ।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং প্রেতঃ পার্ব্বণভুগ্ যতঃ॥
ততঃ পিতৃত্বমাপন্নঃ সচতুর্থস্তদা পুমান্।
অগ্নিষ্বাত্তাদিমধ্যন্তু প্রাপ্নোত্যমৃতমুত্তমম্॥"
—মৎস্যপুরাণ, ১৮ অধ্যায়।

এইরূপ আরও বহু প্রমাণ আছে। সমস্ত দিবার স্থানাভাব। যাহা হউক, শ্রাদ্ধ যে মৃতের জন্যই কর্ত্তব্য এবং তদুপলক্ষে জীবিত ব্যক্তিকে ভোজনাদি দ্বারা তৃপ্ত করান যে একান্ত কর্ত্তব্য, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করার হেতু দেখা যায় না।

ঝ

প্রসঙ্গাধীন এখানে 'পিতৃগণ' কাহাকে বলে, তাহা উল্লেখযোগ্য। কারণ, 'পিতৃগণ' সম্বন্ধে অনেকের ভ্রমাত্মক ধারণা আছে।

পিতৃলোকের অধিবাসীমাত্রেই 'পিতৃগণ' আখ্যায় অভিহিত হয়। এই 'পিতৃগণ' দুই প্রকার।

যাঁহারা সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথম পিতৃলোকের অধিবাসী বলিয়া

পরিগণিত হইয়াছিলেন,—যাঁহারা মানব-সমূহের মূল পুরুষ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহারা স্বকীয় কৃতিত্বে পরাগতি প্রাপ্ত হইয়া দিব্য সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই 'দিব্য পিতৃগণ' বা প্রাচীন পিতৃগণ অথবা সার্ব্বজনীন পিতৃগণ। অর্থাৎ আদি পিতৃগণ।

এই 'দিব্য পিতৃগণ' সংখ্যায় অনেক এবং বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে বিশ্বেদেব, অগ্নিষাত্তা প্রভৃতি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য।

আর স্বকীয় পিতা, পিতামহ প্রভৃতি 'মনুষ্য পিতৃগণ' বা সামান্ত পিতৃগণ। অর্থাৎ স্বকীয় পিতৃগণ।

উক্ত 'দিব্য পিতৃগণের' সহিত 'মনুষ্য পিতৃগণের' সমন্বয়ের নাম সপিণ্ডীকরণ। যত দিন এই সপিণ্ডীকরণ সমাধা না হয়, তত দিন মৃত ব্যক্তি প্রেত সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। সপিণ্ডীকরণ সমাধা হওয়ার পর পিতৃসংজ্ঞা লাভ করিয়া পিতৃলোকের অধিবাসিরূপে পরিগণিত হয়। এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তথাপি পুনরায় কয়েকটি প্রদত্ত হইল।

১। (ক) পিতৃণাং সম্ভবং রাজন্ কথ্যমানং নিবোধ মে।
পূর্ব্বং প্রজাপতির্ব্রহ্মা সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা সহসা ব্রহ্মা তির্য্যক্ সংস্থাংস্তদোন্মুখান্।
ভবন্তঃ পিতরঃ সন্তু সর্ব্বেষাং গৃহমেধিনাম্।
উর্দ্ধবক্ত্রাস্তু যে তত্র তে নান্দীমুখসংজ্ঞিতাঃ।
ইত্যুক্ত্বা তু তদা ব্রহ্মা তেষাং পন্থানমাকরোৎ।

—বরাহপুরাণ।

(খ) এবং শপ্তাস্ততস্তেঽপি ব্রহ্মণাত্মসমুদ্ভবাঃ।
সদ্যো বংশকরান্ পুত্রানুৎপাদ্য ত্রিদিবং যযুঃ।
লোকাঃ সন্তানকামায় যত্র তিষ্ঠন্তি ভাস্বরাঃ।
অমূর্ত্তয়ঃ পিতৃগণাস্তে বৈ পুত্রাঃ প্রজাপতেঃ।

—বরাহপুরাণ।

(গ) অগ্নিষাত্তা বর্হিষদো জাতাঃ পিতৃগণাস্ততঃ।

—কালিকাপুরাণ।

২। (ক) নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রয়তো গৃহী।

—বিষ্ণুপুরাণ।

(খ) স চ পিত্রাদিত্রিকং মাতামহাদিত্রিকঞ্চ।

—গোভিল-সূত্র।

(গ) আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্।

—তর্পণবিধি, রামতর্পণ।

সুতরাং 'পিতৃগণ' সম্বন্ধে আর কাহারও ভ্রমাত্মক ধারণা না থাকাই সম্ভব।

এও

যাহা হউক, এই শ্রাদ্ধরূপ পিতৃযজ্ঞ বহুপ্রকার হইলেও প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ঐ দুই ভাগ যথাক্রমে একোদ্দিষ্ট বা সামান্ত এবং পার্ব্বণ বা বিশেষ। একোদ্দিষ্ট অর্থাৎ যে শ্রাদ্ধ মাত্র একজনের উদ্দেশে করা হয় এবং পার্ব্বণ অর্থাৎ যে শ্রাদ্ধ ছয় জন অথবা নয় জনের উদ্দেশে করা যায়।

পক্ষান্তরে, শ্রাদ্ধরূপ পিতৃযজ্ঞ যে নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্যরূপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

নিম্নে শ্রাদ্ধের শ্রেণী বিভাগ প্রস্তার দ্বারা প্রদর্শিত হইল।
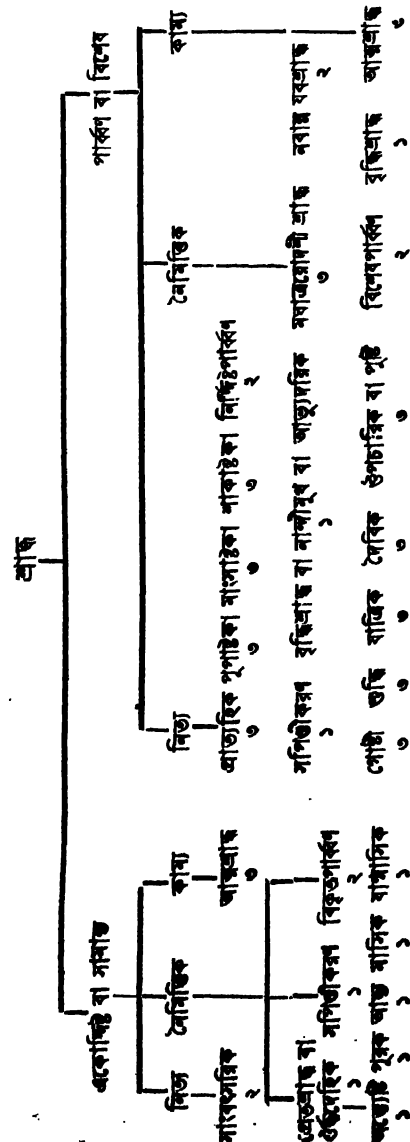
উপরিলিখিত শ্রাদ্ধসমূহের মধ্যে (১) চিহ্নিত শ্রাদ্ধগুলি সম্পূর্ণ প্রচলিত, (২) চিহ্নিতগুলি আংশিক প্রচলিত এবং (৩) চিহ্নিতগুলি সম্পূর্ণ লুপ্ত।

উক্ত শ্রাদ্ধ-সমূহের বিস্তৃত লক্ষণাদি দেওয়ার স্থান এখানে নাই। আবশ্যক হইলে শ্রাদ্ধতত্ত্ব, ভবিষ্যপুরাণ, বরাহপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি আলোচনীয়।

যাহা হউক, পিণ্ডদান শ্রাদ্ধরূপ পিতৃযজ্ঞের প্রধানতম অঙ্গ। সুতরাং ইহা ধারণা করা সহজ যে, শ্রাদ্ধকার্য্যকে সুসম্পন্ন করার জন্যই পিণ্ডদান আবশ্যক। যেহেতু, পিণ্ডদান না করিলে আত্মার সম্পূর্ণতাসাধন অসম্ভব, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি।

তন্নিবন্ধন পিণ্ডদানের মূল উদ্দেশ্য নির্ণয়ের সুবিধার্থে কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল।

(ক) যে অগ্নিদগ্ধা যে নাগ্নিদগ্ধা
মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে (মদন্তে)।
তেভিঃ স্বধা (ন সুনীতিমেতাং) বা ন
সুনীতির্ভিমেতান্ যথাবশং (যথাবংশং) তন্বং কল্পয়স্ব।
—ঋগ্বেদ ও শ্রাদ্ধপদ্ধতি।

(খ) পূরকেণ তু পিণ্ডেন দেহো নিষ্পদ্যতে যতঃ।
—বায়ুপুরাণ।

(গ) প্রেতপিণ্ডৈস্তথা দত্তৈর্দেহমাপ্নোতি ভার্গব।
—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

(ঘ) যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা।
-গরুড়পুরাণ ও গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি।

(ঙ) পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে।
মাতামহস্তৎপিতা চ পিতা তস্যাপি তৃপ্যতু।
—গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি।

(চ) জাত্যন্তরসহস্রাণি ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা।
মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।
যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা।
—গরুড়পুরাণ।

(ছ) অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু (পিণ্ডেন)
তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্।
—শ্রাদ্ধপদ্ধতি।

(জ) যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়াতু লোকায় সুখায় তৎ বৎ।
তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু
—শ্রাদ্ধপদ্ধতি ও বিষ্ণুপুরাণ।

(ঝ) নৃপাপিণ্ডং ততো রাম ইদং বচনমব্রবীৎ।
ইদং ভুঙ্ক্ষ মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নাঃ পুরুষা রাজন্ তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ।
—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড।

সুতরাং পিণ্ডদানের উদ্দেশ্য যে অতীব মহৎ এবং উদারতা-পূর্ণ, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন।

উ

গ্রহীতা না থাকিলে দান সিদ্ধ হইতে পারে না, এই যুক্তিতে কেহ কেহ শ্রাদ্ধদান ও পিণ্ডদানকার্য্যকে অসিদ্ধ প্রমাণ করিতে প্রয়াসী। কিন্তু তাঁহাদের প্রথম ভুল এই যে, প্রত্যেক শ্রাদ্ধে পিতৃলোকের প্রতিনিধিস্বরূপ বিশিষ্ট সদ্ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করার যে বিধি আছে, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করেন না। শ্রাদ্ধের প্রকৃত বিধি এই যে, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন শ্রদ্ধেয়, বিশিষ্ট, সৎ এবং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিতে হয়। পরদিন শ্রাদ্ধকালে সেই আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের বা পিতৃগণের প্রতিনিধি কল্পনা করিয়া অন্নাদি দান ও শ্রাদ্ধের অন্ন ও পিণ্ডাদি ভোজন করাইতে হয়। এখনও অনেক স্থলে সেই রীতি প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে প্রদত্ত অন্নাদি, যাহাকে সাধারণতঃ 'পাত্র' বলা হইয়া থাকে, তাহা এখনও অনেক স্থানেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ও মাস্তাই ব্যক্তিকে ভোজন করান হয়। পরন্তু বর্ত্তমানে বিশুদ্ধ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ দুর্লভ বলিয়াই, বিশেষতঃ প্রেত-শ্রাদ্ধের অন্ন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের অগ্রাহ্য বলিয়া, অধিকাংশ স্থলে অন্নাদি জলে নিক্ষেপ করা হয়। এই প্রাদ্ধান্ন যে ব্রাহ্মণ, অভাবে গো, ছাগ, কিম্বা অগ্নি অথবা জলে বিসর্জন দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহার প্রমাণ :—

(ক) পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং।
ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি।
—শ্রাদ্ধপদ্ধতি ও ঋগ্বেদ।

(খ) পিণ্ডাংস্তু গোঽজবিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেঽপি বা।
—কূর্ম্মপুরাণ।

পক্ষান্তরে, সার্ব্বভৌমিক দানে গ্রহীতা উপস্থিত না থাকিলেও দান অসিদ্ধ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তড়াগাদি খনন, পথ নির্ম্মাণ, পান্থশালাদি স্থাপন, অন্নসত্র প্রভৃতি

কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা গ্রহীতাকে দান না করিলেও দাতা যশ, সম্মান, গৌরব প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকেন। প্রমাণ—

অর্থানামুদিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনম্।
দানমিত্যভিনির্দ্দিষ্টং ব্যাখ্যানং তস্য বক্ষ্যতে।
মনসা পাত্রমুদ্দিশ্য ভূমৌ তোয়ং বিনিক্ষিপেৎ।
বিদ্যতে সাগরস্যান্তো দানস্যান্তো ন বিদ্যতে।
পরোক্ষে কল্পিতং দানং পাত্রাভাবে কথং ভবেৎ।
তৎসিদ্ধ্যর্থং তু তত্তোয়ং ভূমৌ বাপ্সু বিনিক্ষিপেৎ।
—শুদ্ধিতত্ত্ব।

ঙ

কেহ কেহ বলেন, যদি শ্রাদ্ধ করিলেই মৃতের আত্মা সদ্গতি লাভ করে বা মুক্ত হয়, তবে জন্মান্তরবাদ এবং কর্ম্মফলের কোনই মূল্য থাকে না। সুতরাং শ্রাদ্ধকার্য্য কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন।

কিন্তু স্মরণ করা কর্ত্তব্য, সদ্গতি ও নির্ব্বাণমুক্তি এক নহে। প্রকৃত নির্ব্বাণমুক্তি না হইলে আত্মার ধ্বংস নাই। সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, তাহা যে 'কর্ম্ম', তাহাতে সন্দেহ নাই। সুকর্ম্মে সুখভোগ,—কুকর্ম্মে দুঃখভোগ, ইহাই মাত্র প্রভেদ।

শাস্ত্র গয়াশ্রাদ্ধ ভিন্ন আর অন্য কোন শ্রাদ্ধই প্রকৃত মুক্তি-সূচক বলে না। পরন্তু গয়াশ্রাদ্ধের ফলও নির্ব্বাণমুক্তি-প্রদায়ক বলিয়া উল্লেখিত হয় নাই, বিষ্ণুলোক বা স্বর্গপ্রাপ্তি পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে। সুতরাং ধারণা করা যাইতে পারে যে, মৃতের কর্ম্মফলের হ্রাস বা বৃদ্ধি করাই শ্রাদ্ধের মূল্য। অর্থাৎ কুকর্ম্মের লঘুতা এবং সুকর্ম্মের গুরুতা প্রতিপাদন শ্রাদ্ধের কার্য্য বলিয়া মনে হয়। কারণ, শুদ্ধিতত্ত্বে নিম্নোক্ত বচনটি পাওয়া যায়, যথা—

পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে।
ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা।

পক্ষান্তরে, মৃতের সদ্গতি অপেক্ষা জীবিতের মঙ্গল যে অধিক কাম্য এবং তাহাই যে শ্রাদ্ধকার্য্যের অন্যতম উদ্দেশ্য, তাহা শ্রাদ্ধপদ্ধতির নিম্নোক্ত প্রার্থনাটি প্রমাণ করিতেছে, যথা—

(ক) দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমৎ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি।
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারঃ শিবাঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন।
(খ) অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু।
যেভ্যঃ সঙ্কল্পিতা স্বিন্নান্তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু।

আবার যদি নির্ব্বাণমুক্তিলাভই শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য, তাহাতেও আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কারণ, প্রত্যেকেই যে শ্রাদ্ধ করিবে অথবা করিলেও বিহিতবিধানে কায়মনোবাক্যে এবং প্রকৃত সাধনবলে বলী হইয়া যে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। সুতরাং প্রত্যেকেরই মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যদি সাধনবলে বলী হইয়া বিহিত বিধানে কায়মনোবাক্যে শ্রাদ্ধ করে, তবেই মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে। নতুবা আংশিক কর্ম্মফলের পরিবর্ত্তন ঘটে।

চ

কেহ এরূপ সন্দেহ করেন যে, মৃতের আত্মা কোথায়, কি ভাবে অবস্থিত আছে, তাহার যখন স্থিরতা নাই, তখন শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিলে তাহার ফল সেই আত্মা কিরূপে পাইতে পারে?

সাধারণভাবে এরূপ সন্দেহ সমীচীন। কিন্তু বিশেষ প্রণিধান করিলে এ সন্দেহ থাকে না। কারণ, শাস্ত্র বলেন, আত্মা অবিনশ্বর চৈতন্যস্বরূপ এবং সর্ব্বভূতে সর্ব্বসময়ে সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান। পক্ষান্তরে, পিতার আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া শ্রুতি প্রচলিত। সুতরাং পিতা ও পুত্রের আত্মার মূল যোগসূত্র যে এক, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৃতের আত্মাই যখন মূল লক্ষ্য, তখন সেই আত্মা যেখানে যে ভাবেই থাকুক্ না কেন, পুত্রকৃত সদসৎকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে বাধ্য, ইহাও শাস্ত্রবাক্য।

সৎপুত্র পরমং তীর্থং প্রাপ্য মুচ্যন্তি পূর্ব্বজাঃ।
পিতাপি ঋণমুক্তঃ স্যাৎ জাতে পুত্রে মহাত্মনি।
বৈষ্ণবো যদি পুত্রঃ স্যাৎ স তারয়তি পূর্ব্বজান্।
পিতৄনধস্তনা বংশাস্তারয়ন্ত্যতিপাবনাঃ।—পদ্মপুরাণ, ভূমিখণ্ড।

ছ

শেষ কথা এই যে, পূর্ব্বাপর সমস্ত বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিলে এবং শাস্ত্র-সমূহের বাক্য সকল অভ্রান্ত মনে করিলে দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, সাধারণ চক্ষুতে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যতই নিরর্থক, অকর্ত্তব্য বা অর্ব্বাচীনতা বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সার্থক, সুকর্ত্তব্য এবং সমীচীন।

যে সমস্ত বিষয় পারলৌকিক বা দৈব, তাহার সম্বন্ধে চিরকালই সন্দেহ পোষিত হইয়া আসিতেছে। সেই জন্যই "ঈশ্বরো ন বেত্তি বা" মতের উৎপত্তি।

কিন্তু যত মত, যত দ্বৈধ, যত সন্দেহ উপস্থিত হউক্ না, প্রাজ্ঞ এবং বিবেচক ব্যক্তি তাহাতে মুহ্যমান বা পথিভ্রষ্ট হন না।

মতভেদ সত্ত্বেও কর্ম্মফলরূপ দৈবের বিরুদ্ধে শ্রাদ্ধতর্পণাদিরূপ পুরুষকারের অভিযানই পিতৃযজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ।

সকলেই সেই মহতী বাণী স্মরণ রাখিবেন যে,—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

শ্রীতারকেশচন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতির্ব্বিদ্যাভূষণ।

কন্যার ভাগ্য

ও মা, তুই! আয়—আয়—আয়! আমি বলি, পাড়ার কেউ হবে, তাই বল্‌লাম, একটু বস্‌তে বল, হাতের কাযটা সেরে যাই। তুই জান্‌লে যে ছুটে আস্‌তাম! কত কাল পরে দেখা বল্‌ দেখি! সেই যে-বার খোকা পেটে, তখন তোর সঙ্গে দেখা হয়। সে কি আজকের কথা! খোকার বয়সই ঘাটের কোলে ১৩।১৪ বছর হ'ল।

ও আমার পোড়া কপাল! এ এতক্ষণ চোখে পড়েনি। কপাল কবে পুড়ল, ভাই?

পাঁচ বছর? আহা ম'রে যাই, ভাই! তোর কপালে এই দুঃখ ছিল—এ ত আমরা কেউ ভাবিনি! আমরা একসঙ্গে চার জনে খেলা করতাম, তোকে যে দেখ্‌ত, সেই বল্‌ত, এ মেয়ে রাজরাণী হবে। আহা, সেই তোর অদৃষ্টে এই হ'ল!

হাঁ, তা ত বটেই। রাজরাণী হইছিলি, তাতে কি আর কথা আছে!

চোখের জলের কথা আর বলিস্‌নে, ভাই। মনে আর পড়ে না সে দিনের কথা? তুই আর আমি যে একপ্রাণ ছিলাম রে! খাওয়া আর ঘুমের সময়টা বাদে সব সময় যে তোদের বাড়ীতেই কাট্‌ত। দু'জনের যে একটু ছাড়াছাড়ি সইত না। ভগবানের নিয়ম, তাই আমরা নিজের নিজের ঘর-সংসার নিয়ে ভুলে থাকি। নইলে সে সব দিনের কথা মনে হ'লে জ্ঞান থাকে, ভাই? তখন কোথায় ছিল ছেলেমেয়ে, কোথায় ছিলেন ওঁরা?

দেখেছিস্‌, ভাই, আজকালের মেয়েদের আমাদের চেয়ে জ্ঞান আছে। সত্যিই ত, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইছি, তোকে বস্‌তেও বল্‌তে ভুলে গেছি। আয় ভাই, বোস্‌; এইখানেই বসি।

হ্যাঁ, এই বড়-বৌমা। মেজ-বৌমা খালাস হ'তে বাপের বাড়ী গেছেন।

মেয়েরা? তারা কেউ এখানে নেই! না, শ্বশুর-বাড়ীতেও নয়।

সে অনেক কথা। এখন তোর ছেলেমেয়ে কি, শুনি।

পাঁচটিই মেয়ে! তা হোক্‌। তিনটির বিয়েই বা কেন দিতে গেলি? ছুটির বিয়ে দিতে এখনও বাকি? তাই ভাবনা? বিয়ের ভাবনা ভাবিস্‌ নে, ভাই। মেয়ের বিয়ে দেওয়া মানে পয়সা-কড়ি দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া আর মানুষ করা মেয়ে পরের হাতে তুলে দিয়ে চোর হয়ে থাকা। এই ত? নাই বা দিলাম এমন মেয়ের বিয়ে!

লোকে নিন্দা করবে? তা করুক্‌। যে টাকা খরচ ক'রে মেয়ের বিয়ে দিবি, তার অর্দ্ধেক খরচ ক'রে মেয়েকে লেখাপড়া শেখাস্‌ দিকি। মেয়ে স্বাধীন হোক্‌, উপায় করতে শিখুক। তার পর ইচ্ছা হয়, সুবিধে মনে করে, বিয়ে কর্‌বে, না হয়—করবে না।

এ কথা কেন বল্‌ছি? কেন বল্‌ব না? বুকের ভেতরটা যে জ্ব'লে যাচ্ছে ভাই; না ব'লে কি করি।

সব বল্‌ছি ভাই—একটু স্থির হই আগে। কত কাল পরে দেখা! পেটের ভেতর যে কথার সমুদ্র উথলে উঠ্‌ছে—কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা বলি বল দেখি!

বৌমা, দুটো পাণ দাও মা! হয়েছে, আর চাইনে। আর একটু চুণ দাও, মা। লক্ষ্মী মা আমার! বেঁচে থাক মা! রাজরাণী হও! রাজমাতা হও! মেয়েরা কেউ ত কাছে থাকে না, ভাই। তা বৌমাদের জন্ম আমার মেয়ের ক্ষোভ নেই!

মাসীমা পাণ খাবেন না বল্‌ছেন? ও মা! তুই পাণ খাস্‌নে? ছেড়ে ছিইছিস্‌? বলিস্‌ কি! পাণ না হ'লে তোর যে এক দণ্ড চল্‌ত না রে! দোক্তা পাণ সব ছেড়েছিস্‌?

তা মিথ্যে নয়। কি সুখই বা আছে তোর জীবনে! বড় দুঃখেই সব ছেড়েছিস্‌—তা কি বুঝিনে?

তবে পাণের ডিবে নিয়ে যাও, মা; আর দরকার নেই। তোমার মাসীমার সাম্‌নে আর পাণ খাব না।

হ্যাঁ বল্‌ছি। এইবার মেয়ের কথাই বল্‌ছি।

প্রথম মেয়ের বিয়ে—ওঁকে বল্‌লাম, সব রকমে ভাল জামাই হওয়া চাই। যেমন তেমন ক'রে বিয়ে দিলে শুন্‌ব না।

তিন মাসের ছুটী নিয়ে আসা হ'ল। সে তিন মাসের মধ্যে তিনটি দিনও বাড়ীতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেন নি। আজ এখানে, কাল ওখানে ক্রমাগতই ঘুরেছেন। সম্বন্ধ

অনেক আসে; একটিও মনের মত হয় না। ছেলে ভাল হয় ত অবস্থা ভাল হয় না। ছেলে ও অবস্থা দুই ভাল হয় ত বংশ ভাল হয় না। উনি এক একটা সম্বন্ধ আনেন আর আমি নাকচ ক'রে দিই। শেষে এক দিন বল্লেন, 'এ রকম কল্লে ত তোমার মেয়ের বিবাহ হওয়া অসম্ভব হবে। অন্ততঃ আমি ত হার মান্‌লাম।' বল্লেন বটে এ কথা, কিন্তু চেষ্টাও সমান করতে লাগলেন।

শেষে একটি ছেলে পাওয়া গেল। সেটিকে আর অপছন্দ করতে পারলাম না। ছেলেটি দেখ্‌তে সুন্দর, অল্পবয়সে এম্‌, এ, বি, এল পাশ ক'রে হাইকোর্টে বা'র হচ্ছে। বাপ কল্‌কাতার বেশ পসারওয়ালা ডাক্তার। অবস্থা খুব ভাল। নগদ টাকা না কি ঢের। তার উপর কল্‌কাতায় ৩।৪ খানা বড় বড় বাড়ী ভাড়া খাটে। বাপের দুটি ছেলে। এইটি বড়।

শুনেছিলাম, কল্‌কাতার লোকরা না কি বৌদের বড় যত্ন করে। মেয়েদেরও না কি কল্‌কাতার বাসিন্দাদের কাছে বড় খাতির। ঘরে শ্বশুর-শাশুড়ী। দুটি ননদ, দুটিরই বিবাহ হয়ে গেছে।

ছেলে আর ছেলের এক বন্ধু প্রথমে দেখতে এল। ছেলেকে নিজের চোখে দেখলাম। বেশ পছন্দ হ'ল। তার পর ছেলের বাপ এলেন; এসে মেয়ে পছন্দ বল্‌লেন। কিন্তু দাঁই শুন্‌লাম পাঁচটি হাজার টাকা। তার একটি পয়সা কমে হবে না। তখন মাইনে পেতেন মোটে ৪শ টাকা। খরচও ছিল তেমনি। ৫ হাজার টাকা গুণে দেওয়া বড় সহজ নয়। উনি বল্‌লেন, এত টাকা কোথা থেকে দেব? আমি বল্লাম, তা হোক্, এ ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে। বিয়ে হয়ে গেল। উনি ফিরে গেলেন দিল্লী। আমি রয়ে গেলাম দেশে। নইলে একটা বছর অজ্ঞাতবাস করে কে? মেয়েকেও পাঠাতে হবে বছরের মধ্যে এক-বার—তাঁদের হুকুম। তা হ'লে দু এক মাস পরে আবার একবার আনাও চাই। কাযেই আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে রয়ে গেলাম।

বিয়ের ছমাস পরেই বেয়াই খবর দিলেন, মেয়ে নিয়ে যাবেন। কি করি? তিনি দূরে। এই সে দিন সর্ব্বসমেত হাজার ছয়েক টাকা খরচ হয়ে গেল। আর আমাদের মতন লোকের হাতে কত থাকে, ভাই? কিন্তু সেই বয়ে শোনে কে? ধার-ধোর ক'রে, ঘর-বসতের জিনিষ দিয়ে মেয়ে পাঠাই।

মনে মনে বড় জাঁক করেছিলাম, মেয়ের বিয়ে খুব ভাল দিয়েছি। ক্রমশঃ ভুল ভাঙতে সুরু হ'ল। তিন চার মাস যেতে মেয়েকে পাঠানোর জন্ত বেয়ানকে চিঠি দিলাম। উত্তর এল, 'মেয়ে ত ছোট নয়; অত ব্যস্ত কেন? পাঠালেই হবে।'

ঢেলামারা উত্তর শুনে রাগ হ'ল খুব। কিন্তু মেয়ের মায়ের ত রাগ করবার যো নেই। কাযেই চুপ ক'রে গেলাম। মন কিন্তু বুঝল না। প্রথম শ্বশুরঘর করতে গিয়ে কত দিন থাকবে? প্রথমবারটি অন্ততঃ শীঘ্র আনা দরকার। ওঁকে লিখ্‌লাম, একবার এস, এসে মেয়ে আন্‌বার ব্যবস্থা কর।

ছুটী নিয়ে এসে বেয়াই-বেয়ানের কত খোসামোদ ক'রে মাত্র ১৫টি দিনের কড়ারে মেয়ে নিয়ে এলেন।

ছমাস পরে মেয়ে দেখে অবাক্! অমন যে মেয়ে, অমন রং, বাড়ন্ত গড়ন—কোথায় যেন লুকিয়ে গিয়েছে! বিয়ের জল পেয়ে কোথায় আরও বেড়ে উঠ্‌বে, দেখতে আরও সুন্দর হবে;—তা নয়, মেয়ে যেন শুকিয়ে গিয়েছে। এত দিন পরে মেয়ে এল, কোথায় আনন্দ হবে, তা নয়, মেয়ের মুখের পানে চেয়ে চোখে জল এল।

'হ্যাঁ মা এ কি চেহারা হয়েছে তোর!' ব'লে বুকে টেনে নিতেই মেয়ে ঝর-ঝর ক'রে কেঁদে ফেল্লে।

তার পর তার মুখে সব শুন্‌লাম। মেয়ে কাঁদে আর বলে—মা, সেখানে মুখের পানে চাইবার কেউ নেই। আর দিন-রাত্রি কি যে খাটুনি, তা যদি তুমি দেখতে, আর তার ওপর বকুনি, তা যদি তুমি এক দিন শুন্‌তে, কোন্ কালে আমাকে নিয়ে আস্‌তে।

ঝি-চাকর? সবই ছিল। দুটো ঝি, একটা বামুন, আর দুটো চাকর। একটি বেয়াইয়ের খাস চাকর, আর একটা জামাইয়ের। শুধু মনিবের কাপড় কোঁচানো, আদ্দির পাঞ্জাবীতে গিলে করা, জুতা বুরুস্ করা, বাবুদের নাইয়ে দেওয়া এই নিয়েই থাকে। বাজার ক'রে দেওয়া ছাড়া সংসারের আর কোন কায এদের করবার হুকুমও নেই, ফুরসুতও নেই। এক মাস যেতে না যেতেই শাশুড়ী বল্‌লেন, 'বৌমা, তোমায় শ্বশুরের বামুনের হাতে খেতে

আর রুচি হয় না। নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াও। শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী, আত্মীয়-স্বজনকে রেঁধে খাওয়াবে, এর চেয়ে বেশী আর মেয়েমানুষের সৌভাগ্য আছে?' বামুন ভাত, ডাল রাঁধত। বাকী ডাল-তরকারী সব রান্নার ভার আমার মেয়ের ঘাড়ে পড়ল।

মেয়ে আমার দিন-রাত সেই সৌভাগ্য মুখ বুজে ভোগ করতে লাগল। খাবার লোকও সংসারে কম ছিল না। সবারই ঘড়ীধরা সময়ে ভাত চাই। কেউ খাবেন ১০টায়, কেউ ১১টায়, কেউ বা ১টায়। মেয়ে আমার উঠত রাত ৪টায়, আর শুতো রাত ১২টায়।

ঝি দুটো কি করত? তারা বেশীর ভাগই গিন্নীর সেবা নিয়ে থাকত। গিন্নীর পায়ে তেল মালিশ করা, হাত-পা টিপে দেওয়া, তাঁর পাণ সেজে দেওয়া, বিছানাপত্র কাচা, রৌদ্রে দেওয়া এই সব কাযেই তাদের সব সময় কাটত। অবশ্য বাসনপত্র মাজা, বাটনা করার ভার তাদের উপরই ছিল। কিছু দিন বাদে বামুন ও একটা ঝির জবাব হয়ে গেল। সংসারের প্রায় সকল কাযই আমার মেয়ের ঘাড়ে এসে জমল।

শ্বশুর লোক কেমন? লোক মন্দ নয়। কিন্তু হ'লে কি হয়? গিন্নীর কাছে তাঁকে সব বিষয়ে নত হয়ে থাকতে হয়। আর বাড়ীতে তিনি থাকেনই বা কতক্ষণ? ডাক্তার মানুষ। সংসার-খরচ গিন্নীর হাতে পড়ত। তিনি বৌকে মেরে যা পারতেন বাঁচাতেন। এক দিন শ্বশুর বলেছিলেন, 'হ্যাগা, ঝি, বামুন কাউকে দেখছিনে যে কদিন থেকে? বৌমা একা কি ক'রে পারবেন?'

শাশুড়ী ঝাঁঝের সঙ্গে বল্লেন, 'না পারেন, একটা কাচের আলমারী ডিস্পেন্সারি থেকে খালি ক'রে ভেতরে পাঠিয়ে দিও, তোমার আদরের বৌমা তাতে উঠে ব'সে থাকবেন। কি ক'রে বল্লে এ কথা! একটা ঝি রয়েছে, আমি রয়েছি। আমি কি দিন-রাত ব'সে বসেই তোমার অন্ন ধ্বংস করছি?'

এর পর আর তাঁর মুখে কোন কথা সরল না। আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে বসলেন।

জামাই? সেই বা আর কি করবে? সে শান্ত-শিষ্ট ছেলের মত বল্লে, 'আমি কি করব? মাথার উপর বাবা, মা রয়েছেন; তাঁদের মুখের উপর কি ক'রে কথা বলি?'

মেয়ে আমার নীরবেই সব সহ্য ক'রে চলেছিল। মেয়েমানুষের কাযকে ভয় করলে চলবে কেন? কিন্তু অর্থের অসাক্ষাতে যখন তখন তর্জন-গর্জন এবং গঞ্জনার মাত্রা ক্রমেই বাড়তে লাগল, ছেলে পাছে বৌএর অনুরক্ত হয়ে পড়ে, এ জন্য তার সহস্র অপরাধ সৃষ্টি ক'রে ছেলের কাছে লাগানো চলতে লাগল, মেয়ে আমার অস্থির হয়ে উঠলো। তার চোখের জল আর শুকুতো না।

সবতাতেই তার দোষ। সে পাশ-করা মেয়ে, বই পড়েছে—তাও তার অপরাধ। তার চলা, বসা, কায করার শত ত্রুটি। কাপড় পরার ধরণ বিশ্রী। হেঁসেলের কায সেরে নোংরা হাতে একটু সাবান দিয়েছে, সেটাও তার বিলাসিতা—দোষ। গঞ্জনার জ্বালায় সে হাঁপিয়ে উঠল।

মেয়ে শেষে এক দিন জামাইকে বলেছিল, 'তুমি বিদেশে কোন কলেজে ১ শো টাকার একটা প্রফেসারী নিয়ে চল। আমায় তুমি খরচের জন্য ৩০টি টাকা দিও, তাতেই আমি চালিয়ে নেব।'

জামাই বল্লে, 'তা হ'লে ভবিষ্যৎ যে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। বাবার সে মত মোটেই নয়।'

স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য স্বামীর এইখানেই শেষ হ'ল। এরা কি পুরুষ—না, এরা কারু স্বামী হবার উপযুক্ত? ছেলে পিতৃভক্ত, মাতৃভক্ত হবে, এ ত বেশ ভাল কথা। কিন্তু তাই ব'লে সংসারে ঘোর অবিচার দেখলেও বলবে না—এ কি কথা? বেশ ত, মাকে নরম ক'রে বুঝিয়ে দিলেও ত চলত। তাতেও যদি না হ'ত, কিছু দিনের জন্য আমার কাছে কোন একটা ওজর ক'রে, বাপের মত নিয়ে রেখে গেলেও ত চলত। তা হ'লে ত আমার কিছু বলবার থাকত না। মেয়েও বেঁচে যেত—জামাইয়েরও পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি বজায় থাকত। তার পর জামাইয়ের উপায় যখন বেশী হ'ত, তখন নিয়ে যেতে পারত।

যা বলেছিস্ ভাই, মেয়েমানুষের অদৃষ্ট সব সময় শুধু স্বামীর উপরেই নির্ভর করে না। শ্বশুর, শাশুড়ী, দেওর, ননদ, বাড়ীর পুরাণো ঝি-চাকর—এমন কি, কারও কারও অদৃষ্ট, বাড়ীতে যদি কুকুর-বেড়াল থাকে, তাদের উপরেও কিছু কিছু নির্ভর করে।

সে হাড়ভাঙা কায করতো ব'লে দুঃখ নেই। মানুষকেই কায করতে হয়। কিন্তু এত ক'রেও তার দুঃখের ত শেষ হয়নি। এর পরেও যে দুঃখ সে পেয়েছে, সে কথা তোর

কাছে মুখে আন্‌তেও আমার মাথা হেঁট হ'য়ে আসছে। বল্‌ব কি, এত খেটেও মা আমার দুবেলা পেট পুরে খেতে পেত না। দিনের বেলা আধ-পেটা হোক্ যা হোক্ তবু এক মুঠো জুটতো। রাত্তিরে কি হ'ত জানিস্? সকলকে খাইয়ে দাইয়ে শাশুড়ীর জন্য লুচি-তরকারী ক'রে উপরে রেখে আস্‌তে হ'ত। বেগম সাহেবের আর রাত্রি ৮টার পরে নীচে নাম্‌বার ক্ষমতা হ'ত না। ভাঁড়ার থেকে চাল, ডাল, তেল, নুণ, ঘি, ময়দা সব—নিজের হাতে বার ক'রে দিয়ে তিনি সন্ধ্যার একটু পরেই উপরে উঠ্‌তেন। সে সব জিনিষ এমন আন্দাজ ক'রে বার করা হ'ত যে, পিঁপড়েরও এক-রত্তি পাবার আশা থাকৃত না। বেশীর ভাগ—রাতেই সবাইকে খাওয়ানোর পর আর হাঁড়িতে একমুঠো ভাতও থাকৃত না। মেয়ে আমার সবাইকে খাইয়ে, আবার সকালের জন্য ঘর ধুয়ে রেখে ক্ষিধের জ্বালায় এক গেলাস জল ঢক্-ঢক্ ক'রে খেয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে উপরে উঠে আসত।

খাবার কথা জিজ্ঞাসা? কে করবে ভাই? কেউ কি কল্পনা করতে পারে যে, শাশুড়ী ছেলের বৌকে রাত-'উপসী' রাখে! নিজের ছেলের কল্যাণের কথাও কি মনে হয় না? আর বৌমানুষ নিজের খাবার কথাই বা স্বামীকে কি ক'রে বলে?

তাও হয় ত চল্‌তে পারত! এর ওপর মুখ-নাড়া ও গঞ্জনার সীমা ছিল না। না খেয়ে, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ক'রে, তার চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল; মুখ বিরসও হয়ে পড়ত। অমনি শাশুড়ীর গঞ্জনা। বাপ-মায়ের আদর-কুড়োনো মেয়ের ছেনালী ষোল আনা—চেহারা কালি ক'রে লোক ভুলোনোর মতলব! এই রকম মিষ্টি কথার বহরে মেয়ে আমার অভিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লো! উনি ত সব কথা শুনে খানিকক্ষণ কাঠ হয়েই রইলেন। তার পর একটা নিশ্বাস ফেলে ম্লান-মুখে বাইরে চ'লে গেলেন। এ দিকে পনের দিন যেতে না যেতে বেয়ানের চিঠি এল, 'কথার যেন ঠিক থাকে।' মেয়ে শুনে কেঁদে বল্লে, 'মা, আমায় আর সেখানে পাঠিও না। শ্বশুর-বাড়ীর ভাত আর খেতে চাইনে, মা। তোমার বাড়ীতেও ত মা চাকর, বামুনী ঝি আছে। তুমি সবাইকে ছাড়িয়ে দাও, মা; আমি একা হাসিমুখে সব করব। তবু ত দুমুঠো পেট ভ'রে খেতে পাব, মা! রোজ রোজ নিদারুণ গঞ্জনা সহ্য করতে হবে না!'

বল্ ভাই, এ কথা শুনলে মায়ের প্রাণে কি হয়! আমার বাড়ীতে, আমার ঝি-চাকরে যা খেতে পায়, আমার বড় আদরের মেয়ে তা পায় না—তার ওপর কঠিন খোঁটা, গঞ্জনা, এ কি সহ্য হয়? ওঁকে গিয়ে কেঁদে বল্লাম, 'আমি আর মেয়ে পাঠাব না; মেয়ে আমার এই কথা বলছে। আমি আর এ সহ্য করতে পারছিনে।'

ওঁর চোখেও জল এল। চোখ মুছে শান্ত স্বরে বল্‌লেন,—'মেয়ের এ কথা সহ্য করা কঠিন। কিন্তু কি করবে? না পাঠালে যে মেয়েকে আরও কষ্ট দেওয়া হবে; ওর ভবিষ্যৎ যে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। আজ তুমি পাঠাবে না, কাল বেয়ান-বেয়াই আবার ছেলের বিয়ে দিয়ে আন্‌বেন। লোকে ত আর ভিতরের কথা জানবে না। আমরা যা দেখে ভুলেছিলাম, লোকেও তাই দেখে ভুলবে। তখন?'

বুঝি সব; তবু বল্‌লাম, 'তা হোক, মেয়ে যখন আর শ্বশুরঘর করবেই না, তখন আর ও সব ভাবনায় দরকার নেই।'

উনি বল্‌লেন, 'ভেবে দেখ—ও ত এখন শুধু মেয়ে নয়, ও যে স্ত্রীও। ও যখন শুনবে, ওর স্বামী আবার বিয়ে করেছে, তখন ওর প্রাণে যে কষ্ট হবে, সে কি ভাব্‌ছ এর চেয়ে কম?'

মেয়েকে ডেকে বোঝালেন, 'মা লক্ষ্মী আমার, অনেক কষ্ট সহ্য করেছ, আরও কিছু দিন সহ্য কর। এখন না গেলে যে এর চেয়েও ক্ষতি হবে, মা! চিরদিন এমন থাকবে না, মা; ভগবান্ মুখ তুলে চাইবেনই।'

ঠিক দিনে জামাই নিতে এলেন। মুখ ফুটে জামাইকে বল্‌লাম, 'বাবা, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, উপায় করছ। সরলার বড় কষ্ট হয়, একটু খবর নিও, একটু দেখো।'

জামাই কি বল্লেন? কি আর বলবেন! লজ্জা পেলেন। বল্লেন, 'মা-বাবার ওপর এখন কি ক'রে কথা কই? নইলে—'

হয়ে গেল—এই পর্য্যন্ত!

যাবার সময় মেয়ে চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে বল্লে, 'মা, পাঠাচ্ছ, যাচ্ছি। কিন্তু হয় ত আর ফিরে আস্‌ব না।'

"ষাট ষাট! অমন কথা বলতে নেই, মা! জামাইকে ব'লে দিলাম, একটু লক্ষ্য রাখবেই। যেমন থাকিস্, আমায়

চিঠি লিখ্‌বি। আর একবার দেখ্‌। যদি আগের মতন কষ্ট দেয়, আমাকে লিখিস্‌, আমি যেমন ক'রে পারি, তোকে আনাব"—এই সব ব'লে তার চোখের জল মুছিয়ে পাঠিয়ে শেষে নিজে কেঁদে মরি।

জামাইকে বলার ফল হয়েছিল? ছাই! তা হ'লে আর ভাবনা কি ছিল, ভাই!

এ দিকে ওঁর ছুটী ফুরিয়ে গেল। উনি চ'লে গেলেন। আমার আর যাওয়া হ'ল না। দেশে থাকাই আমার এক রকম পাকা হয়ে গেল।

সুধীর তখন হুগলী কলেজে পড়তে লাগল। বাড়ী থেকেই যাতায়াত করৃত।

মাস ছয়েক কেটে গেল। এক দিন সরোর চিঠি পেলাম—'মা, আর পারিনে! কষ্ট আর সহ্য হয় না। আমায় নিয়ে যাও মা—তোমার ছুটি পায়ে পড়ি!'

চিঠি পেয়ে কেঁদে মরি! সুধীর কলেজ থেকে ফিরে আসতে বললাম, 'কি করি, বল্‌ দিকি?' সুধীর বললে, "এখন তো আনতে গেলেও পাঠাবে না তারা। বাবাকে চিঠি লিখি, দেখি তিনি কি বলেন।"

তাই লেখা হ'ল। সরোকে কি লিখি, কি লিখি ক'রে দিন পনর কেটে গেল। ও-সব কথারই বা কি ক'রে উল্লেখ করি? আর এমনি উত্তর দিলেই বা সে কি ভাববে? এই সব ভাবছি, এমন সময় সরোর আর এক-খানা চিঠি এল। চিঠি প'ড়ে, কি বল্‌ব ভাই, একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম!

সরো লিখেছে—'মা, তোমায় চিঠি দিলাম; না দিলে তার উত্তর, না গেলে নিয়ে! এ দিকে আমার সহ্য করার আর ক্ষমতা নেই। আমার দুঃখ তোমরা বুঝলে না! সে দিন চুলের মুঠো ধ'রে যে লাঞ্ছনা করেছে, তা আর লিখে জানাতে পাচ্ছি না। বাড়ীতে সে দিন কেউ ছিল না। মনের সাধে আশ মিটিয়ে নিয়েছে। আমার কষ্ট তোমরা দেখেও দেখলে না। তুমি সেই মা আমার,—কেমন ক'রে এমন কঠিন হ'লে, তাই ভেবে আমি অবাক্‌ হয়ে যাই, মা! কিন্তু আর আমার দোষ নিও না, মা। এত দিন তোমার মুখ পানে চেয়েছিলাম। কোন ফল হ'ল না। তুমি মুখ তুলে চাইলে না, মা! সবাই ভাল মানুষ। আমার দিকে চাইবার কেউ নেই। নিজে যা পারি, তাই করব। আজ বিষ্যুৎবার সকালে তোমাকে চিঠি লিখছি, তুমি পাবে শুক্রবারে। শুক্রবার রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব। যদি এর মধ্যে আমাকে নিয়ে যাবার কোন ব্যবস্থা না কর,—আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করব। ডিস্‌পেনসারি থেকে অনেক কষ্টে বিষ আনিয়ে রেখেছি; মায়ের কোলে গিয়ে যদি জ্বালা জুড়ুতে না পাই, মরণের কোলে গিয়ে জুড়ুব। এখন যমের বাড়ী আমার কাছে ঢের ভাল।'

চিঠি প'ড়ে ঠক্‌-ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে লাগলাম। কি করি? তখন বেলা ১টা। সুধীরের তখনও আসতে দেরী। চিঠিখানা হাতে ক'রে একবার ঘর একবার বা'র করতে লাগলাম। অন্য দিনের চেয়ে সে দিন সুধীরের আসতে যেন আরও দেরী হ'তে লাগল। অন্য দিন আসত বেলা ৫টায়। সে দিন এল একেবারে সন্ধ্যা হয়ে গেলে।

সুধীর এসেই আমার অবস্থা দেখে ব্যস্ত হয়ে বললে, 'কি হয়েছে মা, অমন করছ কেন?'

কেঁদে উঠে তার হাতে চিঠিখানা দিলাম, বললাম, 'প'ড়ে দেখ; দেখে যা হয় উপায় কর্‌।'

চিঠি প'ড়ে সুধীরও কেঁদে ফেল্লে। বললে, 'কি সর্ব্বনাশ! এখন কি উপায়, মা?'

বল্লাম, "এখন বাবা, ভাববার সময় মোটে নেই, আমি যা বলি, তাই কর। ও সব কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে একখান আধ-ময়লা কাপড় পর, গায়ে একটা আধ-ময়লা শার্ট দে, আর চটিজুতা-যোড়াটা প'রে নে। আর এই রকম ক'রে যে ট্রেণ এক্ষুণি পাস, তাতেই কলকাতা যা। ষ্টেশনে পৌঁছেই একখানা ট্যাক্সি নিবি—যাতে শীগগির হয়। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে সরোর শ্বশুরের কাছে গিয়ে বলবি—'মা'র কলেরা হয়েছে, বাঁচবার আশা নেই। ডাক্তারের মুখে এই কথা শোনা মাত্র ছুটে আসছি।' এ শুনে কেউ আর 'না' বলতে পারবে না। তার পর সরো যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থায় তাকে নিয়ে আসবি!"

সুধীর যে কথা শোনামাত্র যেমন ক'রে বলেছিলাম, ঠিক তেমনি ক'রে তৈরী হয়ে তখনি বেরিয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে গিয়ে কাঁকনাড়ায় ট্রেণ ধ'রে এক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পৌঁছে ট্যাক্সি ক'রে সেখানে পৌঁছুল।

বেহাই তখন বাইরে ব'সে। সুধীরকে ঐ অবস্থায় দেখে আশ্চর্য্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি সুধীর, কি হয়েছে? এমন ক'রে কেন?'

সুধীর কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্লে, "মা'র কলেরা হয়েছে।"

বেয়াই বল্লেন, "কলেরা! কখন্ হ'ল?"

সুধীর বল্লে, "কলেজ থেকে ফিরেই দেখি, মায়ের অবস্থা খারাপ। তখনই ডাক্তার ডেকে আনি। ডাক্তার দেখে বল্লেন, 'আর বাঁচবার আশা নেই।' সেই কথা শুনেই ছুটে আসছি। আপনি দয়া ক'রে দিদিকে এখনি পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দিন্। মা দিদিকে দেখতে চান। দেরী করলে আর আমারও সঙ্গে দেখা হবে না।"

বেহাই উঠে তখনি সুধীরকে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে গেলেন। বেয়ানকে ডেকে বল্লেন, 'ওগো, বেয়ানের কলেরা হয়েছে। বৌমাকে সুধীর নিতে এসেছে, এখনি পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও। যেন দেরী না হয়। শচীশ কোথায় গেল?'

শচীশ জামাইয়ের নাম। শচীশের নাম শোনা মাত্র মাগী তিন লাফে বেহাইয়ের কাছে এসে তাঁকে এক ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে চাপা গলায় বল্লে, 'শচীশকে সেখানে পাঠানো হবে না, সে আমি ব'লে দিচ্ছি। ও এই সে দিন সবে জ্বর থেকে উঠেছে। আর সুধীর যখন এসেছে, তখন আর নিয়ে যেতে দুজনের কি দরকার?'

বেয়ানের আমার এমন চাপা গলা যে, সুধীরের কাণে সব কথাগুলি পৌছুল।

বেহাই বল্লেন, 'না, শচীশের এখন যাবার দরকার নেই। দরকার যদি হয়, খবর পেলে বরং পরে যাবে।'

মাগী বোধ হয় ভেবেছিল, বেহাই হয় ত ছেলেকেও সঙ্গে যেতে বলছেন। ছেলেকে যেতে হবে না শুনে সে তখন মহা খুসী। বৌকে যেতে বারণ করার কথাও আর তার মনে হ'ল না। আর সুধীরের দিকেও ঘেঁসলে না; ভাবলে, বোধ হয় তার গায়ে কলেরার বীজ লেগে আছে। একেবারে সোজা গিয়ে উপরে উঠ্ল। সুধীরেরও সুবিধা হ'ল। সরোকে রান্নাঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুধীর বল্লে, 'হাত ধুয়ে নে; আর উপরে যাবার দরকার নেই। যেমন আছিস্, তেমনি আমার সঙ্গে চ'লে আয়।' তার তখনও ভয়, যদি বেয়ানের মত বদ্লে যায়।

সরো তখনি হাত ধুয়ে তৈরী হ'ল। সুধীর তার হাত ধ'রে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়্ল। ট্যাক্সি দাঁড় করানোই ছিল। ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠতেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিলে। সেই রাতে সরোকে আমার কাছে পৌছে দিয়ে তবে সুধীর জল খায়।

সেই থেকে আর তাকে পাঠাই নি। নিয়ে যেতে আবার চায় নি? দিন ১০।১৫ পরেই এক চিঠি এল— 'বেয়ান কেমন আছেন? বৌমাকে কবে পাঠাবেন?' তখন আর কিসের ভয়? মাগীকে বেশ কড়া ক'রে এক পত্র দিলাম যে, কসাইনীর বাড়ী মেয়েকে আর পাঠাব না।

সেই থেকে পাঠাইনিও আর কোন দিন।

খবর পেয়ে উনি একবার এলেন। এবার আর কোন আপত্তি করলেন না। তবে সরোর পড়ার ব্যবস্থা ক'রে গেলেন। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ ত করাই ছিল। কল্‌কাতা গিয়ে তাকে বেথুনে ভর্ত্তি ক'রে বোর্ডিংএ রেখে গেলেন।

চার বছরে আই, এ, বি, এ পাশ করলে। তার পর এম্ এ পড়তে পড়তে ঢাকায় হেড্ মিষ্ট্রেসের কায পেয়ে সেখানে চ'লে যায়। সেখানে গিয়ে তবে আমাকে জানায়। এখনও সেই কায করছে। ১ শো টাকা পায়, ৫০৲ টাকা আমাকে পাঠায়, আমি তার নামে জমা দিয়ে দিই পোষ্টাফিসে। বাকি টাকায় তার আর খোকার বেশ চ'লে যায়। খোকা তার কাছে থেকে স্কুলে পড়্ছে। পড়া, পড়ানো, আর ছোট ভাইকে নিয়ে এক রকমে ত ভুলে আছে।

বাড়ী? আসে বৈ কি। বছরে ৪।৫ বার আসে। গ্রীষ্মের ছুটীতে এসেছিল। আবার আসবে বড়দিনের বন্ধে।

মেজ মেয়ে? তা বুঝি জানিস্ নে? কি করেই বা জান্‌বি? কত দিন যে চিঠিপত্র বন্ধ।

মন বোঝে না। ম্যাট্রিক পাশ করার পর তারও বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম। মেয়ে বল্লে, বড়দির বিয়ে দিয়ে ত দেখ্‌লে, মা! যত কষ্ট তার, তত কষ্ট তোমাদের! এ বিয়েতে কায কি, মা? তার চেয়ে আমাকে কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দাও।

উনিও শুনে বল্লেন, বেশ, তাই পড়ুক। তার পর ওর ইচ্ছে হয় বিয়ে করবে, না হয় কুমারীই থাক্‌বে।

হাঁ, এখনও পড়্ছে। এবার বি-এ দেবে।

না ভাই, আমি আর বিয়ের কথা বলিনি। সেবার যখন গ্রীষ্মের ছুটীতে দুই বোনে বাড়ী আসে, আমার ননদ একবার কথা পেড়েছিলেন। তা শুনে মেজ মেয়ে বলেছিল— 'যত দিন বড়দির কথা মনে থাকবে, তত দিন ত বিয়ের কথা মনেও আনব না, পিসীমা। বড়দির দুঃখ যদি ভুলে যাই, তখন সে কথা!'

এ কথার পর বল্‌বার কিছু নেই, ভাই! কাযেই চুপ ক'রে আছি। কত মেয়ের বিয়ে হচ্ছে; সকলের অদৃষ্টে কি এমন ঘটে? তা ঠিক কথা; কিন্তু প্রাণ ধ'রে আশ্বাসের কথা জানাতে ত ভরসা হয় না, ভাই!

জামাইয়ের খবর? শুনেছি, জামাই আর বিয়ে করেন নি। মায়ের আর বিনা পয়সায় একবেলা খোরাকে বাঁদী মেলেনি, রাগঝাল ঝাড়বার লোকও পাওয়া যায় নি। বাপ-মা চেষ্টা অনেক করেছিল। ছেলে একেবারে কাঠকবুল! বিয়ে সে আর করবে না।

না, এখানে আর সেই থেকে লজ্জায় আসেনি। শুনেছি, সরোকে চিঠি লিখেছিল। আমি সে কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

ভবিষ্যৎ? জানিনে, ভাই। ভগবান্ যা লিখেছেন, তাই হবে। মিছে ভেবে লাভ কি?

উঠ্‌লি? এখুনি? তা হোক্ সন্ধ্যা। কাল ঠিক আসবি ত? সত্যি ত? যদি বেলা ১টার মধ্যে না আসিস্, আমি ডাক্‌তে যাব কিন্তু। সেই ছেলেবেলার মত চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে আস্‌ব।

চ, তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি। তোকে এগুতে আর কাকে সঙ্গে দেব? বলিস্ কি ভাই!

আচ্ছা, এবার ফিরি। ঠিক ১টায়, মনে থাকে যেন! আজ রাত্রে কেবল তোর কথাই ভাব্‌ব।

স্বপ্ন? হয় ত তাও দেখবো। কেবল তোর মধ্যেই যে আমার বাল্যকাল বেঁচে আছে, ভাই!

তা আছে। আমার মধ্যেও তোর বাল্যকাল বেঁচে আছে, সে কথাও ঠিক। আচ্ছা, আজ রাতে কে কাকে স্বপ্ন দেখে দেখ্‌ব।

এইবার পা চালিয়ে যা। ঐ ত দেখা যাচ্ছে সেই নীল রংএর বাড়ী। কত কথাই যে পুরাণো বাড়ীখানির গায়ে লেখা আছে!

থাক্—সে কথা বল্‌তে গেলে রাত শেষ হয়ে যাবে। এবার ফিরি।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

কেন?

সুন্দর! তুমি কেন এসেছিলে মোর জীবনের পথে,
শুভ্র বসনে বিভূষিত হয়ে অভ্রভেদী ও রথে?
চপল চোখের চকিত চাহনি চাহিয়ে
খেয়াল সুরেতে বাঁশের বাঁশরী বাজিয়ে,
পরাণ আমার পাগল করিয়া চলিয়া গেলে গো রথে—
সুন্দর, তুমি পাগল করিতে এসেছিলে মোর পথে?

তস্কর! তুমি কেন এসেছিলে মোর জীবনের মাঝে,
চুরিটি করিয়া হৃদয় আমার ফিরে গেলে কোন্ কাজে?
গোপন পথেতে নীরব চরণ ফেলিয়ে,
অঙ্গে মৃদুল মধুর পরশ বুলিয়ে,
যৌবন মোর কুহকিত ক'রে নিয়ে গেলে ভব পাছে—
তস্কর, তুমি সুন্দর বেশে কেন এসেছিলে কাছে!

নিষ্ঠুর, তুমি কেন এসেছিলে মোর যৌবন-প্রাতে?
তোমারে দিতে গো সকলি ত্যজিনু, নিলে না কিছুই সাথে!
শান্ত নীরব সৌম্য বেশেতে আসিয়া,
আমার প্রাণের শান্তি সুষমা নাশিয়া,
আমারে রিক্ত করিয়া পলালে, কি লাভ তোমার তা'তে
নিষ্ঠুর, কেন দেখা দিয়াছিলে মোর জীবনের প্রাতে!

শ্রীআশামুকুল দাস।

(উপন্যাস)

প্রথম ভাগ

পরিচ্ছেদ—এক

চূর্ণীর তীরে, গ্রামে প্রবেশ করিবার কিছু অগ্রেই এক-খানি যে লাল ইটের চক্‌মিলান পাকা বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানি জমীদার শক্তিপ্রকাশ রায়ের।

হংসচক্র গ্রামখানির উৎপত্তির একটু বৈচিত্র্য এবং বিশেষত্ব ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, বহুদিন পূর্ব্বে এক ভূমিকম্পের পর নদীয়া জেলার এই স্থানটা অকস্মাৎ প্রায় অর্দ্ধক্রোশ বেড় লইয়া বসিয়া যায়। পরে, ধীরে ধীরে তাহাতে চূর্ণীর জল আসিয়া জমিয়া জমিয়া একটা প্রকাণ্ড সরোবরের মত হইয়া পড়ে। হাঁসদের চরিবার এবং খেলিবার এই অপূর্ব্ব লীলাভূমিটিতে ক্রমে মানুষেরও সমাগম হইল; কেন না, বঙ্গদেশের নরনারী জল বড় ভালবাসে। বাড়ীর নিকট একটি জলাশয় না হইলে কোন সুখ, কোন স্বস্তি নাই।

হংসচক্র নামটির মধ্যে কাব্য ছিল। যে কথা মানুষের মুখে-মুখে রটিতে থাকে, টাকাকড়ির মত তাহাও যেন, ঘষিয়া একটা এমন আকার ধারণ করে যে, অবশেষে তাহাকেও টাঁকশালে আবার ঢালাই করিলেই ভাল হয়। কিন্তু মানুষের জিহ্বা শব্দসম্পর্কে লঘু দ্রব্যই পছন্দ করে; তাই শব্দকে ছোট-খাট হাল্‌কা করিবার তাহার অপূর্ব্ব কৌশলও জানা আছে।

এই দুর্নিবার কঠিন নিয়মে বর্ত্তমানে হংসচক্র, হাঁসচাকি রূপ ধারণ করিয়াছে। অবশ্য গ্রামবাসীর কাণে এ নামও মিষ্ট লাগে; কিন্তু তাহার কারণ অন্য। জন্মভূমির নাম কাহার কাণেই বা না মিঠা শুনায়?

স্থানের নামের মত, মানুষের নামের একটি বিশেষ অর্থ-মহিমা আদিতে জড়িত নাও থাকিতে পারে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে নামের উপর প্রতি মানুষের কিছু না কিছু মমতা জন্মায়। তখন পিতৃদত্ত নামের মধ্যে যে গৌরবটুকুর ইঙ্গিত নিহিত থাকে, তাহা নামধারীকে যেন একটা আদর্শ দেখাইয়া সেই পথে প্রলুব্ধ করে। সুশীল, শৈশবে দুরন্তপণা করিয়া অবশেষে হঠাৎ এক দিন শান্তস্বভাব, ভদ্রলোক হয়। সুবোধের বোধহীনতা শেষ পর্য্যন্ত আর যেন দাঁড়াইতে পারে না। নামের সহিত সুজড়িত প্রশংসা তাহাদের কাণে নিত্য উচ্চারিত হইয়া অনেকখানি তাহাদের যেন, পোষ-মানার পথে ঠেলিয়া দেয়! সুশীল এবং সুবোধ মনে করে যে, তেমনটি না হইলে যে তাহাদের আদি গৌরবের বড় নামটাই ব্যর্থ হইয়া যায়। মানুষ নাম কম ভালবাসে না।

বোধ করি, হাঁসচাকির জমীদার শক্তিপ্রকাশও নামের এইরূপ মহিমায় প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহার শক্তির এমন সুস্পষ্ট পরিচয় লোক-সমাজে দিয়াছিলেন যে, তাহা ক্রমেই যেন ভয় করিবার মত হইয়াছিল।

কিন্তু শক্তিপ্রকাশ যে মন্দ লোক ছিলেন, এ কথা কেহ ভুলিয়াও বলিত না। তীব্র সত্য যেন কোটি সূর্য্যের প্রদীপ্ত বহ্নিময় তেজে চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিয়া দিতেছে! তাহার দিকে চক্ষু ফিরানই দায়; কাছে যাওয়া ত দূরের কথা!

ভায়েদের সহিত শক্তিপ্রকাশের কোনক্রমেই কোন দিনই বনিল না। দেশের লোকরা শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়াও যখন কিছুতেই তাঁহার কাছে আসিতে চাহে না—তখন তিনিই গ্রাম হইতে বাহিরে আসিয়া বাস করিলেন। জ্ঞাতি-কুটুম্ব এবং গ্রামবাসীরা যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। অগ্নি যত বড় প্রয়োজনেই মানুষের লাগুক না কেন, মানুষ তাহাকে চিরদিন কুণ্ডের মধ্যে তফাতে তফাতে রক্ষা করিয়াছে। সত্যের দাহিকাশক্তিকে তাই বোধ হয় চাণক্য পণ্ডিতও ভয় করিতেন!

যাহারা তফাৎ হইয়া পড়িবার, তাহারা ত দূরে গেল; কিন্তু যাহাদের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে শক্তিপ্রকাশ আবদ্ধ ছিলেন, তাহাদেরই বা কি হইল?

পরম নিকট-তমা গৃহিণী অপরিসীম ধৈর্য্য এবং সতীত্বের পরিচয় দিয়া যখন স্বর্গলোকে যাত্রা করিলেন, তখন হাঁস-চাকির লোক বুঝিল যে, এই রামানুজ-মনুর কঠিন নিয়ম-প্রবর্ত্তিত দেশে স্ত্রীজাতিই কেবল উক্ত সাধনায় সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সাবিত্রী দেবী কিঞ্চিৎ প্রখরা এবং মুখরা ছিলেন। কেন না, নিজের পিতৃদেব অশ্বপতিরাজ এবং দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহার সত্যবানকে লইয়া ছোট-খাট বাগ্‌যুদ্ধ

হইয়াছিল এবং অবশেষে এই দুই বীরই রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন।

শক্তিপ্রকাশের গৃহিণীর নামও ছিল সাবিত্রী; কিন্তু তিনি মুখরাও ছিলেন না এবং প্রখরাও ছিলেন না। শ্রাবণের মেঘ যেমন করিয়া নিজের গাঢ় মাধুর্য্যে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে, তিনি তেমনই করিয়া নির্ব্বাক ধৈর্য্যে এই তপ্ত-সূর্য্য-স্বরূপ স্বামীটিকে আপনার চরিত্রের শান্ত মণ্ডলের মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। তাঁহার গতিবিধির মধ্যে যাহারা ছিল, তাই তাহারা পরম সুখেই ছিল।

কিন্তু সে সুখ যেন বিধাতাপুরুষের সহিল না। তিনি এক দিন শান্ত সুনির্ম্মল শরতের প্রভাতে এই জমীদারগৃহের কল্যাণের মূর্ত্তিখানিকে ডাকিয়া লইলেন। সাবিত্রী দিন দুই তিন রোগে ভুগিয়া চলিয়া গেলেন। কাছে কন্যারা ছিল না। দুই পুত্র—ধর্ম্মদাস ও রামপ্রসাদ মায়ের মুখে গঙ্গাজলের গণ্ডূষ দিল; ওঁ গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম নাম বার বার উচ্চারণ করিল। তাহার পরের কথা স্মরণ করিতে যেন তাহাদের বুক ফাটিয়া যায়!

শক্তিপ্রকাশ সাবিত্রী দেবীকে ভালবাসিতেন না, এ কথা অধর্ম্মের ভয়ে তাঁহার পরম শত্রুও কহিবে না। কিন্তু এত বড় ব্যাপারে তিনি যে কি অটল রহিলেন, তাহা বর্ণনা করা কঠিন। তাঁহার প্রেম হয় ত সমুদ্রের অপেক্ষা গভীর ছিল; তাই এত বড় ব্যাপারেও তাহাতে একটা চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠিল না। তাঁহার স্ত্রীর সহিত বন্ধন হয় ত এমন নিবিড় ছিল যে, এই বাকি কয়দিনের বিচ্ছেদের জন্য তিনি অযথা অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়া নিজের শক্তির অপব্যয় করেন নাই। পুত্রদের সম্মুখে পিতার চরিত্রের লঘুতা ঘটিবার কোন অবসরের ফাঁকটি পর্য্যন্ত না দিবার জন্যই হয় ত বা তাঁহার এই দৃঢ়তা!

শক্তিপ্রকাশ এই ব্যাপারে নিজেকে তাজমহলের কঠিন প্রস্তরের মতই একনিষ্ঠ, অটুট এবং অটল করিয়া রাখিয়াছিলেন। হয় ত মানুষের সহিত বাড়ীর তুলনা হয় না। যদি সেরূপ সম্ভব হইত ত এই তুলনায় বোধ করি তাঁহাকে সম্যক্‌ভাবে বুঝিবার সুবিধা হইত।

ধর্ম্মদাস স্কুলে যাইত না; কিন্তু তাহার সে বয়স হইয়াছিল। বাড়ীতে শিক্ষক আসিয়া দুই পুত্রকে যথানিয়মে পড়াইয়া যাইতেন। দুপুরে তাহারা জননীর সহিত কাটাইত। মাতার মৃত্যুতে ধর্ম্মদাস ধরিয়া বসিল যে, সে স্কুলে পড়িতে যাইবে। স্কুলটি শক্তিপ্রকাশের নিজের অর্থে গড়া; অবশ্য তখন অর্থ-সাহায্য না করিতে হইলেও কর্তৃত্বের ভার সম্পূর্ণ তাঁহার হাতেই ছিল।

শক্তিপ্রকাশ মনে মনে পুত্রদের নিঃসঙ্গতা কল্পনা করিয়া এক শুভদিনে তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন।

উভয়কে ডাকিয়া উপদেশ দিলেন যে, কুসঙ্গের ভয়ে এতদিন তাহাদিগকে স্কুলে যাইতে দেন নাই। লেখা-পড়া না করিতে পারিলে হয় ত তিনি সামান্য দুঃখিত হইবেন; কিন্তু কুসঙ্গ করিতে দেখিলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মর্ম্মাহত হইবেন এবং সে অপরাধের জন্য ক্ষমা তাঁহার মনের মধ্যে নাই বলিলেই হয়।

পরিচ্ছেদ—দুই

কু-সংসর্গ বলিতে শক্তিপ্রকাশ যাহা বুঝিয়াছিলেন, বোধ করি, ধর্ম্মদাস তাহা বোঝে নাই। যাহারা নেশা-ভাঙ্গ করে, নানাবিধ অন্যায় কায করে, তাহাদের সহিত সে কেনই বা মিশিবে? এবং স্কুলে সে সকল লোকই বা কোথায়? স্কুলের খোলা হাওয়ার পরিমণ্ডল, দুই ভাইএর খুব ভাল লাগিল এবং ধীরে ধীরে কু-সংসর্গের অযথা উদ্বেগ হইতে মনও তাহাদের মুক্ত হইতে চলিল।

সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর যাহারা মানুষ হয়, তাহাদের মন ক্রমে অভ্যাসের দিক হইতে ছোট হইয়া পড়িতে থাকে। ধর্ম্মদাস এবং রামপ্রসাদের মন তখনও এই অভ্যাসের দাসত্ব গ্রহণ করে নাই; সেই জন্য তাহার মধ্যে মুক্তির আনন্দ সহসা সাড়া দিয়া উঠিল।

শুধু তাই নহে, পিতা স্কুলের সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া সাধারণ বালকে যে সুযোগ পাইত, তাহার অপেক্ষা বহুগুণ অধিক তাহারা পাইতে লাগিল। বিচার করিয়া দেখিলে শিক্ষার্থীর জীবনে এইরূপ সুযোগলাভ অনেক সময়ে প্রশ্রয়ের মত মন্দ ফল আনে। সে খেয়াল হয় ত উচ্চ-শিক্ষকদের মধ্যে ছিল; কিন্তু সাধারণ শিক্ষকরা ধর্ম্মদাসকে হয় ত অন্যায় খাতির করিতে লাগিলেন।

এ বিষয়ের জন্য শক্তিপ্রকাশ মনে মনে সতর্ক ছিলেন, এবং তাঁহার মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা স্বপ্নের মতই ছিল যে,

ছেলেদের বাড়ীতে পড়াইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করাইয়া একবারে কলিকাতার কলেজে দিবেন। গ্রামের স্কুলের মন্দ প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার এই উপায় ছিল বটে; কিন্তু কার্য্যত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

বৎসরের বাকি অংশটা তাহাদের শ্রেণীর সহিত পাঠের সামঞ্জস্য করিতে কাটিল। নূতন বৎসরে ধর্ম্মদাস নূতন উদ্যমের সহিত পড়িতে সুরু করিল।

তাহাদের ক্লাশে নবকিশোর বলিয়া একটি ছেলে ছিল, স্কুলে যাওয়ার প্রথম দিন হইতে ধর্ম্মদাসের তাহাকে ভাল লাগিয়াছিল।

নবকিশোরকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদের অবস্থা ভাল নহে। পোষাক-পরিচ্ছদ নবকিশোরের প্রায় কিছুই ছিল না। একটি ধুতির উপর একখানি চাদর মাত্র। সোমবারে সেটি পরিষ্কার থাকিত, কিন্তু শুক্রবার হইতে তাহাতে কেমন একটা ময়লার দুর্গন্ধ বাহির হইত।

নবকিশোর ক্লাসের ভাল ছেলে, তাই সে আগেই বসিত, ধর্ম্মদাসের স্থান তাহারও আগে হইয়াছিল—তাই দুই জনে পাশাপাশি বসিত। পাশাপাশি বসিতে বসিতেই পরস্পরের মধ্যে কেমন যেন বন্ধুত্বটি উভয়ের অজ্ঞাতেই জন্মলাভ করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহারা কথাবার্ত্তা কহিত সরলভাবেই; বিশেষতঃ, এই বয়সের ধর্ম্মও মনের সরলতা। যে গাছ উচ্চে বহুদূর বাড়িবে, তাহা যেমন আরম্ভে সোজা সরল হইয়া বাড়িতে চায়, যে মানুষ বড় হইবে, সেও যেন কৈশোর উত্তীর্ণ করিয়া যৌবনে সহজ, সরলের পথে অদম্য উৎসাহে বাড়িয়া উঠিতে চায়!

বাড়ী যাইবার কিছু পূর্ব্বে ধর্ম্মদাস সে দিন নবকিশোরের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল; একটা কথা রাখবি, ভাই?

নবকিশোর কহিল, কি রে?

ধর্ম্মদাস। যদি রাগ না করিস্ ত—

নব। না, রাগ করবো কেন, তুই ত কোন দিন কিছু অন্যায় বলিস্ না।

ধর্ম্মদাস খানিকটা ইতস্ততঃ করিল। মনে হইল, এ কথা নবকিশোরকে বলিলে, মনে তাহার একটা গুরুতর আঘাত দেওয়া হইতে পারে।

অপ্রিয় সত্যকে নিরোধ করিবার শক্তি ধর্ম্মদাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পিতার উজ্জ্বল আলোকের নীচে জননীর স্নিগ্ধ মুখখানি আজ তাহার বার বার কেন যে অকারণে মনে পড়িতে লাগিল, সে তাহা জানিত না।

ছুটীর পর ধর্ম্মদাস ধীর-মন্থরপায়ে বাড়ী ফিরিতেছিল, পিছন হইতে রামপ্রসাদ ডাকিল, দাদা, দাদা, শোন্—

ধর্ম্মদাস না শুনিয়া আগে চলিতে লাগিল।

রামপ্রসাদ ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, বল না দাদা, কি হয়েছে তোমার?

আঃ, বিরক্ত করিস্নে, বলছি, ছেড়ে দে আমায়—ধর্ম্মদাস বলিল।

রামপ্রসাদ বলিল, জানি, কি হয়েছে।

কি আবার হবে, বলিয়া সে চলিল।

রা। বোধ হয়, পড়া বল্‌তে পারনি—খুব ব'কেছে—

ধর্ম্মদাস কথার উত্তর না দিয়া চলিল।

রা। বলব? এবারে ভুল হবে না, মার জন্যে—

ধ। কি ক'রে জান্‌লি?

রা। তোমায় দেখেই আমি জান্‌তে পারি।

নবকিশোর তাহাদের পিছনেই ছিল। হঠাৎ ধর্ম্মদাস বুঝিতে পারিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ভাই, আজকে তোমাকে সে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না। তাহার পর তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল, বল, তুমি রাগ ক'রবে না?

নব। রাগ কেন করতে যাব?

ধ। বল, আমি যাই কেন করি না, তুমি রাগ করবে না?

ধর্ম্মদাসের কথার মধ্যে একটা নিবিড়-করুণ বন্ধুত্বের জীবন্ত দাবী ছিল। যেন হৃদয়ের নিগূঢ় ব্যথা ভেদ করিয়া তাহা দুই বাহু বাড়াইয়া নবকিশোরকে অবলম্বন করিতে চাহে!

নবকিশোরের অন্তরকে তাহা স্পর্শ করিয়া বিহ্বল করিয়া দিল। নবকিশোর চুপি চুপি বলিল, যাই কর, আর যাই তুমি বল না কেন, ধর্ম্মদাস, আমি বুঝেছি যে, তোমার মত বন্ধু আর দ্বিতীয় নেই এ পৃথিবীতে আমার, তোমাকে ভুল করব না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধর্ম্মদাস ধীরে ধীরে অগ্রসর

হইতে লাগিল। তাহার বাড়ী ফিরিতে মন চাহে না ; কিন্তু সময়ে না ফিরিলে পিতার নিকট সহস্র কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

রাত্রিতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে ধর্ম্মদাস নিজের বাক্সটি ধীরে—অতি সন্তর্পণে খুলিল ; মা'র সাজান কাপড়-জামাগুলি স্তরে স্তরে সাজান আছে। তাহা হইতে দুইখানি চাদর আর দুইটি ধুতি বাহির করিয়া রাখিয়া সে তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করিল। ভয় হয়, যদি কেহ দেখিয়া ফেলে!

সবাই নিদ্রিত ; কিন্তু রাত বেশী নহে। ধর্ম্মদাসের কেমন ভয় হইল। অবশেষে সে কাপড়গুলি বগলে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথে তখন জনপ্রাণীও নাই। সে দ্রুতপদে গিয়া নবকিশোরের জানালায় তিনটি টোকা দিতে—জানালা খুলিয়া নবকিশোর বলিল, এত রাতে?

কথার উত্তর না দিয়া কাপড়গুলি জানালার মধ্যে দিয়া ধর্ম্মদাস বলিল, বলেছিলে রাগ করবে না, মনে থাকে যেন!

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মদাস অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

আলোতে কাপড় দেখিয়া নবকিশোরের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিল। তাহার পর তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া শ্রাবণের ধারার মত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

পরিচ্ছেদ—তিন

দিন এবং রাত্রির সহিত মানুষের মনের একটা অদ্ভুত বিচিত্র সম্বন্ধ আছে। রাত্রিতে যাহা একান্ত সহজ, স্বাভাবিক —দিনের আলোতে তাহা আর তেমনটি থাকে না। ধর্ম্মদাস সকালে উঠিয়া একান্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। রাত্রির ছায়ালোকের মধ্যে মন যে মায়ার উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল, দিনের প্রকট আলোকে তাহা যেন নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল।

নবকিশোরের সুখ-দুঃখের সহিত নিজেকে জড়িত করিয়া সে এত নিকটে গিয়াছিল, সেই সম্বন্ধটি ক্ষণিকের জন্য তাহার মর্ম্মের কোথায় যেন এমন একটা ব্যথা তুলিয়াছিল যে, সহসা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাহাকে নিজের জিনিষ দিয়া আসার মধ্যে কোন অসঙ্গতিই সে বুঝিতে পারে নাই।

সকালে সে কায অসঙ্গত ঠেকিল, এমন নহে, মনে হইল, একান্ত অন্যায় হইয়াছে এবং তাহা সকলে জানিতে পারিয়া কত না বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে। তাহার নিজের কাছেও লজ্জা এবং কুণ্ঠার অবধি রহিল না। সমস্ত দেহ-মনে যেন কিসের একটা অবসাদ!

মাষ্টার আসিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মদাস টেবলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে তাহার পিঠে হাত দিয়া ডাকিলেন, ধর্ম্মদাস, অসময়ে ঘুমোও যে?

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল; কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। মাষ্টার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীর ভাল আছে ত? দেখি, বলিয়া তিনি ধর্ম্মদাসের কপালে হাত দিয়া বলিলেন, জ্বরও একটু হয়েছে, বোধ করি—

এবার ধর্ম্মদাস ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, ও সেরে যাবে'খন মাষ্টার মশাই, আপনি বসুন।

তিনি বসিলেন না, বলিলেন, আজ আর প'ড়ে কায নেই, কিছু খেও না ; ইস্কুলেও যেও না ; কাল ঠিক হয়ে যাবে ; আমি তবে যাই? কি বল?

পাশের ঘরে রামপ্রসাদ পড়িতেছিল, তাহার শব্দে বোঝা যায় যে, তাহার পড়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

ধর্ম্মদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ধীরে ধীরে মাষ্টারের পিছনে পিছনে বাহিরে আসিল। তিনি কর্ত্তার ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ধর্ম্মদাসের বোধ হয় একটু জ্বর হয়েছে—

শক্তিপ্রসাদ তাহাকে ডাকিয়া হাত দেখিলেন। বলিলেন, হুঁ, নাড়ীতে স্পষ্ট জ্বর রয়েছে—

ধর্ম্মদাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আর গা-নাড়া দিস্‌নে ; চুপচাপ শুয়ে পড় গে যা ; আজ একাদশী, কিছু খেয়েও কায নেই ; স্কুলেও যাবার দরকার নেই।

ধর্ম্মদাস চলিয়া গেল। কর্ত্তা কাগজ পড়িতে লাগিলেন। মাষ্টার ছাতা বগলে করিয়া এক-পা এক-পা করিয়া সিঁড়িতে নামিয়া গিয়া নীচে হইতে বলিলেন, তা হ'লে ও-বেলা কি আস্‌তে হবে?

কেন মিছে চেষ্টা করবেন, আজ ওকে পুরো বিশ্রাম দেওয়াই ভাল হবে।

রামপ্রসাদ ছুটী পাইয়া ছুটিয়া ধর্ম্মদাসের ঘরে গেল। দেখিল, ধর্ম্মদাস আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে তাহার

কপালে হাত দিয়া দেখিল, উত্তপ্ত। ধর্ম্মদাস হঠাৎ জাগিয়া বলিল, কি রে রাম ?

দেখ্‌ছি। কখন্ জ্বর হ'লো ?

বিপুল স্নেহে ধর্ম্মদাস রামপ্রসাদের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল। সেরে যাবে, ভয় কি ?

রামপ্রসাদ চুপ করিয়া ধর্ম্মদাসের পাশে বসিয়া বলিল, দাদা, আমিও আজ ইস্কুলে যাব না।

ছিঃ, বাবা রাগ করবেন।

রামপ্রসাদ বলিল, তুই না গেলে আমার যেতে ইচ্ছে হয় না! ধর্ম্মদাস হাসিল; আর আমি যখন পড়তে চ'লে যাব কলকাতা ?

আমিও যাব তোর সঙ্গে——আমি একলা থাকতে পারব না।

দুটিরই মনে সদ্য মাতৃশোক কোথা দিয়া যেন গুরুভারে চাপিয়াছিল; এতটুকু নাড়া পাইলে আরও যেন তাহা চাপিয়া ধরে। পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন এবং সান্ত্বনা!

খানিক পরে রামপ্রসাদ বলিল, সেও ত দু বছর পরে; তত দিনে আমি খুব বড় হয়ে যাব।

পাগল, বলিয়া ধর্ম্মদাস হাসিল।

দুপুরে একখানি পুস্তক পড়িবার চেষ্টা করিতে করিতে ধর্ম্মদাস ঘুমাইয়া পড়িল।

জ্বরের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে স্বপ্ন দেখিল, নবকিশোর তাহার উপর কঠিন রাগ করিয়াছে। সে তাহাকে বার বার প্রশ্ন করিল, কিন্তু নবকিশোর কিছুতেই কোন কথার উত্তর দিবে না।

অবশেষে অনেক সাধা-পাড়ায় নবকিশোর উত্তর দিল, তোমার আমার মধ্যে যে সম্বন্ধ, তা ত প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত নয়!

ধর্ম্মদাস বলিল, আরো পরিষ্কার ক'রে বল্ না, ভাই।

নবকিশোর। আজ যদি আমাদের দেখা-শুনা, জানা-শুনা না হ'তো ত কোন পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি ছিল না।

ধর্ম্মদাস কপাল কুঞ্চিত করিয়া ঘুমাইয়া ভাবিতে লাগিল, তাই না কি ? কোন ক্ষতি হ'তো না, সত্যি! লাভ ?

নবকিশোর বলিল, লাভ ? লাভ হয় ত আছে। কিন্তু এই সম্পর্ক শুধুমাত্র বন্ধুত্বের সূক্ষ্ম-সূত্রে ঝুলে আছে।

ধ। সূক্ষ্ম-সূত্রে কেন ?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল, কেন ? সব জিনিষের কে[illegible] হয় ? . চামেলির ফুলের বোঁটা কত সরু, আলগা; কি[illegible] কাঁঠাল কি কুমড়ার বোঁটা তেমনি হ'লে চলে ?

ধ। তার পর ?

নব। আর বলবো না—বুঝে নেও।

সেই হেঁয়ালী বুঝিতে ধর্ম্মদাস ঘর্ম্মাক্তকলেবর হই[য়া] জাগিয়া উঠিল। অনেক চিন্তার পর ধর্ম্মদাস বলিল, বুঝেছি,— ঐ কাপড় দেওয়ার মধ্যে ওদের দারিদ্র্যের ইঙ্গিত আছে আমি যদি গরীব হ'তাম ত কথা ছিল না। বন্ধুত্ব সমানে[র] সমানে হওয়া সম্ভব। আমি ওর চেয়ে বড় হ'তে গিয়েছি উঃ, কি বোকা আমি! আচ্ছা!

ধর্ম্মদাস একখানা কাগজের উপর লিখিল;—

ভাই নব, মানুষের ভুলকে ত মানুষই ক্ষমা করবে। আমি যা দিয়ে তোমার চেয়ে বড় হ'তে গিয়েছি, সত্যি সে জিনি[ষ] আমার নয়; কিন্তু তুমি যদি আমাকে ক্ষমা দেও ত সে[ই] তোমার মনের আসল বড় জিনিষ! আমায় কি ক্ষমা করবে না ?

ঘড়ির দিকে চাহিয়া ধর্ম্মদাস দেখিল, চারটা প্রায় বাজে[।] রামপ্রসাদের ফিরিবার প্রায় সময় হইয়াছে। সে একান্ত উদ্বেগে তাহার পায়ের শব্দের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ধর্ম্মদাস রামপ্রসাদকে বলিয়া দিয়াছিল যে, নব-কিশোরকে যেন বলে, তাহার জ্বর হয়েছে——আর কিছু না।

তার পর সে আশা করিতেছিল যে, এ সংবাদ পাইয়া নিশ্চয় নবকিশোর তাহাকে দেখিতে আসিবে।

কিন্তু রামপ্রসাদ স্কুল হইতে একলা ফিরিল। প্রথমটা সে খাবার খাইতে বসিয়া গেল, ধর্ম্মদাসের ঘরে যায় নাই। ধর্ম্মদাস আর সহ্য করিতে পারিল না। সে উঠিয়া প্রসাদের কাছে গেল। বলিল, রামপ্রসাদ, কি খবর রে ?

সে দুই চক্ষু বড় বড় করিয়া বলিল, গোবিন্দ মাষ্টারের বাড়ী একটা কেউটে কোঁস্ কোঁস্ করছিল দাদা, বুঝেছি—

ধর্ম্মদাস রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

রামপ্রসাদ যথাসময়ে তাহার ঘরে গিয়া বলিল, দাদা, নবকিশোর তোর উপরে উঠতে পারবে না কাল, সেও আজ আসেনি।

মনের ভিতরকার অভিমানের টনটনে টানা সুরটা

আলগা হইয়া গেল ; কিন্তু সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তায় ধর্ম্মদাসের মন পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সেই অর্দ্ধেক লেখা চিঠিটা বাহির করিয়া সে আবার লিখিতে বসিল। কোন কথা মনে হয় না। কেবল মনে হয়, অন্ধকে অন্ধ বলার যে দোষ, মুখে না বলিয়া ইঙ্গিতে উপহাস করা আরও অধিক—মারাত্মক। তাই নবকিশোর তাহাকে মার্জ্জনা কিছুতেই করিবে না।

পরিচ্ছেদ—চার

যে দিন দুই বন্ধুর দেখা হইল, সে দিন দুই জনেই কাছাকাছি বসিয়া নির্ব্বাকে কাটাইল। বিদ্যুৎ-ভরা দুইখানি মেঘ পরস্পর পরস্পরের প্রতি উন্মুখ। এ দিকে কেহই আগে কথা কহিতে সাহস করিল না। নবকিশোর ভাবিল, কিবা সে বলিবে? ধর্ম্মদাস মনে করিল, নবকিশোর যদি ক্ষুণ্ণই না হইয়া থাকিত ত নিশ্চয়ই সে কথা কহিত। অপরাধ সে করিয়াছে সত্য, কিন্তু সত্যই কি তাহা অমার্জ্জনীয়?

পরের দিন স্কুলে আসিবার পথে দুই জনের দেখা হইল। ক্লাশে নানা অছিলার অজুহাতে কথা না কহিয়াও চলিয়া যায়, কিন্তু পথে যখন দুই জন ছাড়া আর কেহ নাই সেখানে—কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকা যায়!

নবকিশোরের স্নিগ্ধ-গম্ভীর মুখখানি ঈষৎ হাসির রেখায় প্রফুল্ল বিকচ হইয়া উঠিতেই ধর্ম্মদাস তাহার হাত ধরিল। কোন কথা তাহার মুখ হইতে কিছুতেই বাহির হইল না। বন্ধুর হাতের আবেগ-স্পর্শ কথায় যাহা বলিতে পারে, তাহার অপেক্ষা যে অন্তরে অনেক অধিক ভাবাবেগ জাগাইয়া তুলে!

দুই জনে কিছুক্ষণ পাশাপাশি চলিয়া গতি আরও মন্থর করিল। তাহার পর নবকিশোর বলিল, শরীর বুঝি বড় দুর্ব্বল?

ধর্ম্মদাস এ কথার উত্তর না দিয়া বলিল, আমায় বুঝি তুমি ক্ষমা করবে না?

কিসের ক্ষমা?

আমার নির্ব্বুদ্ধিতার—

নবকিশোর কোন কথা না কহিতে নিমেষে ধর্ম্মদাসের হৃদয় অভিমানে পূর্ণ হইয়া উঠিল ; সে কতকটা চঞ্চল হইয়া বলিয়া ফেলিল, ও না হয় আমাকে ফিরিয়ে দিও।

নবকিশোর যথেষ্ট দৃঢ়তার সহিত বলিল, ফিরিয়ে দেবার মত রূঢ় ব্যবহার যেন আমি জীবনে তোমার সঙ্গে না করি—ও আমি এক দিন পরব—

কবে ভাই? কবে? আগ্রহের সহিত ধর্ম্মদাস জিজ্ঞাসা করিল।

কবে? জানিনে তা।——যবে আমি তোমার বন্ধুত্বের যোগ্য হব, যখন আমি তোমার সঙ্গে সমান হয়ে চলতে শিখব, চলতে পারব।——তবে এইটুকু বলছি যে, আমি রাগ করিনি—বিরক্ত হইনি ; শুধু বুঝেছি যে, মনের দিক দিয়ে আমি তোমার চেয়ে হয় ত এখনও অনেক ছোট—

বিস্ময়ে ভালবাসায় ধর্ম্মদাসের মন ভরিয়া গেল। বুকের আনন্দের ব্যথায়, তাহার গলার দুইটা শির যেন দম আটকাইয়া দিতে চায়!

দুই জনে সে দিন আর অধিক কিছু কথা কহিতে পারিল না।

সে দিন ধর্ম্মদাস স্কুলে যায় নাই। তাহার মাতার শ্রাদ্ধ তাহাকে নিয়মিত ভাবে করিতে হইত এবং তাহা সে পরম আনন্দের সহিত করিত। সেবারে শক্তিপ্রকাশের কেমন একটা খেয়াল হইল, ধর্ম্মদাস এবং রামপ্রসাদের শ্রেণীর সকল ছাত্রকে ডাকিয়া খাওয়াইবেন।

দুই ভাই এই কথা শুনিয়া নাচিয়া উঠিল। ইহা তাহাদের বলিতে সাহস করার কথা কি, কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। ছেলেরা যখন শুনিল, তখন তাহারাও খুশী হইল বটে ; কিন্তু সে আনন্দ অবিমিশ্র নহে। অধিকন্তু শিক্ষকরা ছাত্রদিগকে খুবই সাবধান করিয়া দিলেন, যেন কোন চপলতা তাহারা না করে। পণ্ডিত মশাই প্রধান শিক্ষককে বলিলেন, দেখুন, এ গতিক ভাল নয়, ছেলের দল বাঁদরামি করলে দোষ পড়বে কিন্তু শেষকালে আমাদের ঘাড়ে, দু-একজন মাষ্টার সঙ্গে গেলে কেমন হয়?

হেডমাষ্টার হাসিলেন ; আপনার ভয় অতিরিক্ত, অত বেশী সাবধানীর অনেক দুর্গতি হয়।

পণ্ডিত মহাশয় মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, এই সঙ্গে মাষ্টারদের ব'লে দিলে মন্দ হ'তো না—একটা বিভ্রাট ঘটবে দেখছি।

সন্ধ্যার সময় শিশুদের কণ্ঠে জমীদার-ভবন মুখর হইয়া উঠিল। গ্রামোফোনে রামপ্রসাদ গান দিয়াছিল :—কানু ক'হে রাই,—কোন কোন ছেলে সেই সঙ্গে আনন্দে গাহিয়া উঠিতেছিল। অনেকে অবাক্ হইয়া শুনিতেছে, এ জীবনে প্রথম কলের গান শোনা।

কর্ত্তা বহুদূরে বসিয়া ছেলেদের এই আনন্দ-উৎসবে যোগ দিয়া মনে মনে স্বর্গ-গতা সহধর্ম্মিণীর কথা ভাবিতেছিলেন : তিনি আজ বাঁচিয়া থাকিলে কত না আনন্দ পাইতেন ; তিনি যে ছেলেপুলে বড় ভালবাসিতেন, আহা! যদি এক দিন—কর্ত্তার চক্ষু ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল!

ঘরের এক পাশে বসিয়া নবকিশোর ধর্ম্মদাসকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ভাই, এই অত বড় বুদ্ধির আবিষ্কার যিনি করেছেন, তিনি কোন্ দেশের লোক ?

ধর্ম্মদাসের নানারকম মাসিক কাগজ আসিত, তাহার উপর এ সকল বিষয়ে তাহার উৎসাহ ছিল অধিক। সে বলিল, আমি একখানা বই পড়তে দেব'খন তোকে, সব জান্‌তে পারবি তাতে।

কিন্তু ধর্ম্মদাসের মনে হইল, এখুনি যদি সে বইখানা নবকিশোরকে দিতে পারে, তাহা হইলে হয় ত বা সে কতই না খুসী হইবে।

দুই জনে লাইব্রেরী-ঘরে গেল। বড় টেবলের উপর শামাদান জ্বলিতেছে। আলমারি হইতে পুস্তক বাহির করিয়া ধর্ম্মদাস নবকিশোরকে বলিল, ও ঘরে বড় গোল, এস, এখানে দুজনে ব'সে পড়ি বইটা।

নবকিশোর বইখানা নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, যদি বাংলাতে হ'তো ত বেশ হ'তো…

ধর্ম্মদাস। কেন ?

নবকিশোর। ইংরিজি যেন সব বুঝে উঠ্‌তে পারিনে ; বাংলায় যা' পড়ি, যেন সবটা মনের মধ্যে তলিয়ে যায়।

ধর্ম্মদাস হাসিল, বলিল, এক যায়গায় দেখছিলুম, 'নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ; বিনা, স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?'—এ কথা ভারি সত্যি কথা ভাই!

নবকিশোর বলিল, কিন্তু ইংরিজি তো আমাদের শিখতেই হবে—

ধর্ম্ম। কেন ?

নব। নৈলে ভাল চাকুরি হবে কি ক'রে ?

ধর্ম্ম। চাকুরির জন্যে লেখাপড়া শেখা, সে একটা খুব ছোট কথা ; শিখতে হবে জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য ; জ্ঞান না হ'লে, মানুষের মত মানুষ হব কেমন ক'রে ?

নবকিশোর চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে তখন যে কথা আসিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। সে ভাবিতেছিল, ধর্ম্মদাসের অর্থ উপার্জ্জনের প্রয়োজন নাই, পিতার অগাধ বিষয় ; তাই এ কথা সে অনায়াসে মনে করিতে পারে। কিন্তু তাহার ? তাহাদের সংসার উপার্জ্জন না করিলে যে একবারে অচল! তাই, ইংরাজি তাহার শিখিতেই হইবে ; চাকুরি তাহাকে করিতেই হইবে।

দুই জনে জানিত না যে, শক্তিপ্রকাশ তাহাদের অলক্ষ্যে কখন্ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন। তাই, তিনি যখন কথা কহিলেন, তখন দুই জনেই চম্‌কাইয়া উঠিল। তিনি নবকিশোরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমি বুঝি, বিপিনের নাতি ?

নবকিশোর দাঁড়াইয়া উঠিয়া অবনত-মস্তকে বলিল, আজ্ঞে হাঁ!

আর কোন কথা না বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নবকিশোর হয় ত বুঝিল না ; কিন্তু ধর্ম্মদাস পরিষ্কার বুঝিল যে, পিতা হঠাৎ অতিমাত্র অপ্রসন্ন হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিপিন ধর্ম্মদাসের দূর-সম্পর্কের কাকা। ধর্ম্মদাস বোধ হয় জানিত যে, এই বিপিন কাকাকে শক্তিপ্রকাশ দুই চোখে দেখিতে পারিতেন না। কেন, তাহা ধর্ম্মদাস অনুমান করিত। সেটা জ্ঞাতি-শত্রুতা এবং এই শত্রুতার ফলে অতীতে অনেক মারামারি—দাঙ্গা এবং ফৌজদারিতে উভয় পক্ষের বিপুল অর্থহানি হইয়াছিল।

নবকিশোর বাড়ীর যাইবার পথে সে দিন অতিরিক্ত ভারি মন লইয়া ফিরিল। কারণ, খানিক পরে শক্তিপ্রকাশ আবার সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, ধর্ম্মদাস, এই ছেলেটির সাম্‌নে তোমাকে আমি এই আদেশ দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে আর ওর সঙ্গে তোমার কোন রকম বন্ধুত্বের যোগ রাখতে পারবে না। তুমি অল্পবয়স্ক, তাই এখন কোন কারণ আমি বল্‌ছিনে, পরে তোমার বয়স হ'লে সবই জান্‌তে পারবে ; কিন্তু এই আমার আদেশ, কঠিন অনুজ্ঞা

তোমার ওপর রইল যে, ওর ছন্দাংশে তুমি থাক্‌বে না। যদি থাক ত তোমাকে কঠিন শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

নবকিশোরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমায় অনুরোধ করছি যে, যত শীঘ্র সম্ভব, তুমি বাড়ী ফিরে যাও। আর কোন দিন এ বাড়ীতে এসো না। এলে তোমার ভাল হবে না।

নবকিশোর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে আর এক দণ্ডও দাঁড়াইল না। ধর্ম্মদাসের ইচ্ছা হইল যে, বলে, ও যে খায় নি, বাবা! কিন্তু সে সাহসও তাহার ছিল না।

সে রাত্রির জন্ত ধর্ম্মদাসও জল-স্পর্শ করিল না।

গান-বাজনা আলো হাসি যেন সহসা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। ছেলেরা যাহা খাইল, তাহা উগ্‌রাইয়া দিতে পারিলে যেন বাঁচে। কচি মনগুলি অপমানের আঘাতে যেন বিমূঢ় হইয়া গেল।

কতকটা অকারণেই শক্তিপ্রকাশের রোষবহ্নি সহসা এমন কদর্য্য আকার ধারণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; সে রাত্রির জন্য সম্বরণ করিলে কোন ক্ষতি হইত না নিশ্চয়। কিন্তু রাগ সময়-কাল কিছুই মানিতে চাহে না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মালা

গভীর রাতে একলা আছি জেগে,
ঘরের কোণে হয় নি প্রদীপ জ্বালা;
বুকের কাছে কেবল আছে লেগে
অমল-দল যূথী-ফুলের মালা।
গেঁথেছিলাম সন্ধ্যা হবার আগে
আকাশ যবে মেঘের রাঙা রাগে
রাঙিয়েছিল ক্ষণেক ফাগে ফাগে
সাদা ফুলের আমার পুষ্পডালা।

মালা যখন গেঁথেছিলাম একা
বাতায়নে দাঁড়িয়ে নতমুখে,
ভাবি নাই যে কাহার পাব দেখা
মধ্যরাতের মৌন-গভীর বুকে।
মালা গলায় পরিয়ে দেব কার
মনের কোণে জাগেনি একবার
গেঁথেছিলাম যূথী-ফুলের হার
আপন মনে হার-গাঁথারি সুখে।

মালা গাঁথা হ'ল যখন শেষ
ফুরালো মোর যূথী-ফুলের ডালা,
ঘরে তখন নাইক' আলো লেশ
আকাশ জুড়ে তারার বাতি জ্বালা।
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বাতায়নে
দখিণ বায়ু শীতল পরশনে
আপন গলে পরালাম আনমনে
আপন হাতে গাঁথা যূথীর মালা।

শ্লথ বসন অলস নিশীথিনী
যূথীর ফুলের গহন পরিমলে
ঘুমিয়ে আছে বিজন সঙ্গিনী
মালাটি মোর বুকের হিন্দোলে।
ওগো আমার বরমালার বর!
এ মালা কি আমার বুকের পর
পড়বে ঝ'রে শীর্ণ অকাতর—
পাব না কি দিতে তোমার গলে?

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেঘলোক হইতে শত্রু-কবলে

২

আমি গুলজারের কুটীরে দাঁড়াইয়া উভয় পক্ষের যুদ্ধ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আততায়ী মাস্যুদগণ ওয়াজিরিদের অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক থাকায়, ওয়াজিরিরা অবিশ্রান্ত গুলী-বর্ষণে তাহাদের গতিরোধের চেষ্টা করিলেও তাহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। আমি পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ঘটনাটি যথাযথভাবে দেখিবার চেষ্টা করিলাম বটে; কিন্তু সেই সময় দক্ষিণ পদে এরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম যে, তাহাদের যুদ্ধে আর মনঃসংযোগ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে আমি এই যন্ত্রণার কারণানুসন্ধানের সুযোগ পাই নাই, এইবার বুঝিতে পারিলাম যে, আমার পায়ের মাংস লম্বাভাবে ছিঁড়িয়া যাওয়ায় তাহার সহিত পশমী মোজা আঁটিয়া গিয়াছিল, এই জন্যই তাহা ঐরূপ যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছিল। বস্তুতঃ, তাহা পায়ের সঙ্গে এ ভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল যে, ভবিষ্যতে তাহাতে যথেষ্ট বিপদেরও আশঙ্কা ছিল।

কিন্তু ওয়াজিরিদের মালিক সেই সময় আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় আমার পায়ের বেদনা ও জ্বালা-যন্ত্রণার কারণ বিশদভাবে অনুসন্ধান করিবার অবসর পাইলাম না। আমি তাহার স্কন্ধে আমাদের বিধ্বস্তপ্রায় এরোপ্লেন হইতে লুণ্ঠিত 'লুইস' বন্দুকটি দেখিতে পাইলাম। বন্দুকটির তেমন কোন ক্ষতি হয় নাই। মালিক সেই বন্দুকটি আমার সম্মুখে উন্নত করিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "এই বন্দুকে কি উপায়ে গুলী-বারুদ ভরিতে হয়, তাহা আমাকে শিখাইয়া দাও।" তাহার সেই আবদার প্রত্যাখ্যান করিয়া লাভ নাই বুঝিয়া বন্দুক চালাইবার কৌশলটি তাহাকে দেখাইয়া দিলাম। বন্দুক চালাইবার কৌশল জানিয়া লইয়া মালিক খুসী হইল; সে মুখে কিঞ্চিৎ হাস্যরস সঞ্চয় করিয়া বন্দুকে টোটা পূরিল এবং তাহা স্কন্ধে সংস্থাপিত করিয়া ঘোড়া টানিল।

তাহার এই কার্য্যের যে ফল হইল, তাহা অতীব হাস্যোদ্দীপক। বন্দুকের ভীষণ নির্ঘোষ শুনিয়া মালিকের মুখ হইতে একটি শপথ-ধ্বনি নিঃসারিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটি তাহার হাত হইতে সশব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল! মালিকও সেই কক্ষের দেওয়ালে ঢলিয়া পড়িয়া স্কন্ধে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার চক্ষুতে যেন অবসাদের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল।

যাহা হউক, সে শীঘ্রই আত্মসংবরণে সমর্থ হইল, কিন্তু বন্দুকটি যেখানে পড়িয়াছিল, সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল। আমি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম, মালিক অতঃপর সেই দিকে অগ্রসর হইল এবং আমার স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া পুস্তু ভাষায় যে সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিল, আমি অতি কষ্টে তাহার কোন কোন অংশমাত্র বুঝিতে পারিলাম। সে আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে, মাস্যুদরা যদি কায হাসিল করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের কবলে পড়িয়া আমাকে অত্যন্ত লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইবে, এমন কি, আমার উদ্ধারের সম্ভাবনা প্রায় বিলুপ্ত হইবে, ইহা তাহার অত্যুক্তি নহে।

আমাকে কয়েদ করিবার সময় মাস্যুদগণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছিল তাহাতে মালিকের কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না এবং 'অপরিচিত শয়তান অপেক্ষা পরিচিত শয়তান ভাল'— এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, 'লুইস' বন্দুকটির সাহায্যে মাস্যুদদের আক্রমণ হইতে গ্রামখানি রক্ষা করিবার জন্য সে আমাকে যে আদেশ করিয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি তাহার আদেশ পালনের পূর্ব্বে এই সর্ত্ত করিলাম যে, বন্দুক চালাইতে আমাকে সাহায্য করিবার জন্য আমার বন্ধু কয়েদীকে মুক্তি দান করিতে হইবে। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া মালিক বলিল—তাহারা শান্তিলাভের জন্য শত্রুপক্ষের সহিত আপোষ করিয়া আমার বন্ধুটিকে পূর্ব্বেই মাস্যুদগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছে; কিন্তু মাস্যুদরা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আমাকেও হস্তগত করিবার জন্য দাবী করিয়াছে।

মালিক আমাকে সম্বোধন করিয়া যে ভঙ্গীতে কথা বলিতেছিল, তাহা দেখিয়া আমার অনুমান হইয়াছিল—সে আমাকে এক জন মাতব্বর লোক বলিয়াই মনে করিয়াছিল। আমার পরিচ্ছদের উপর মেডাল প্রভৃতি দেখিয়া উহাদের

ধারণা হইয়াছিল, আমাদের দুই জনের মধ্যে আমিই প্রধান, এবং আমার অধিনায়ক আমার এরোপ্লেনের মিস্ত্রী মাত্র, কারণ, একটি সাধারণ শুভ্র আবরণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত ছিল।

আমার মানসিক অধীরতা প্রকাশিত হওয়ায় মালিক আমাকে আমার ভবিষ্যৎ সঙ্কটের কথা বুঝাইতে গিয়া কিঞ্চিৎ ভয়প্রদর্শন করিল। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, বন্দুকটির সাহায্যে আমি শত্রুদলের উপর গুলীবর্ষণ করি, ইহাই তাহার ইচ্ছা। আমারও মনে হইল, যদি আমি তাহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করি, তাহা হইলে আততায়ী মাসুদরা জয়লাভ করিয়া ওয়াজিরিদের গ্রাম বিধ্বস্ত করিবে, এবং আমাকেও তাহাদের হস্তে বন্দী হইতে হইবে। তবে এই বিপদের মধ্যেও আমি মনে এই ক্ষীণ আশা পোষণ করিতেছিলাম যে, যদি আমাকে মাসুদ-হস্তে বন্দী হইতে হয়, তাহা হইলে আমি আমার বন্ধুর সহিত মিলিত হইতে পারিব। সেই সঙ্গে অন্য সম্ভাবনাও আমার মনে উদিত হইল। যদি আমার বন্দুকের গুলীবর্ষণের ফলে মাসুদগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, তাহা হইলেও তাহাদের কর-কবলিত বন্ধুটির অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইবে না। অন্য দিকে আমি ওয়াজিরিদের গ্রামখানি লুঠতরাজ হইতে রক্ষা করিতে পারিব। অথচ মাসুদরা আমাকে বন্দী করিলে যদি আমার বন্ধুর সহিত মিলিত হইতে পারি, তাহা হইলেও তাঁহার কোন উপকার করিতে পারিব, তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? যদি উভয় পক্ষই আমাদের এক এক জনকে আটক করিয়া রাখে, তাহা হইলে তাহারা মুক্তিপণের লোভে আমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেও পারে। মুহূর্ত্তমধ্যে আমি মনে মনে এই সকল তর্কবিতর্ক করিয়া, মালিকের যুক্তিতর্ক শেষ হইবার পূর্ব্বেই যুদ্ধে যোগদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

মালিক বোধ হয় মনে করিয়াছিল, আমার বন্দুকের যুদ্ধ করিবার শক্তি অসাধারণ, কারণ, আমি আমার সঙ্কল্প তাহার গোচর করিলে সে আনন্দে বিহ্বল হইল এবং আমার অনুরোধে সমবেত স্ত্রীলোকদিগকে প্রস্তর দ্বারা একটি উচ্চ বেদীনির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিল। আমি তাহাকে জানাইয়াছিলাম, শত্রুপক্ষের উপর গুলীবর্ষণ করিবার জন্য বন্দুকটি উপযুক্ত স্থানে নির্ম্মিত ঐরূপ একটি বেদীর উপর রাখিবার প্রয়োজন হইবে।

বেদী প্রস্তুত করিতে অধিক বিলম্ব হইল না; আমি রজ্জু ও যষ্টির সাহায্যে বন্দুকটি যথাসম্ভব দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করিলাম এবং যথাস্থানে দাঁড়াইয়া গিরিপৃষ্ঠের নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া লক্ষ্য স্থির করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মাসুদগণ আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল; বিশেষতঃ সেখানে প্রচুর গুল্ম ও উচ্চ শিলাস্তূপ থাকায় ও মাসুদগণ তাহাদের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করায় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কলের বন্দুক হইতে গুলীবর্ষণের সুযোগ পাইলাম না। অগত্যা আমি পর্ব্বত-পৃষ্ঠ শত্রুসমাগমহীন করিবার উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ গুলীবর্ষণ করিলাম এবং আশাতীত ফললাভ করিয়া আনন্দিত হইলাম। প্রথমবার আমার বন্দুকের বজ্রনাদে মাসুদগণের বন্দুকের শব্দ ডুবিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই পাগড়ীধারী প্রায় দুই শত মাসুদকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পাহাড়ের পাদদেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে দেখিলাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে বন্দুকটি এই সময় বিকল হইয়া গেল; যখন আমি তাহা পুনর্ব্বার 'সচল' করিতে সমর্থ হইলাম, সেই সময়ের মধ্যেই আততায়ীর দল তাহাদের গ্রামাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল।

বন্দুকটি সেই বেদীর উপর বসাইবার ত্রুটিতে গুলীবর্ষণের সময় তাহা 'ঝাঁকি' মারিতেছিল। এই জন্যই আমার ধারণা হইল, তাহা হইতে গুলীবর্ষণ করিয়া শত্রুপক্ষের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারি নাই। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, এই পার্ব্বত্য জাতি সমরনিপুণ হইলেও 'মেসিন' বন্দুকের নামে তাহাদের হৃৎকম্প হয়! যুদ্ধের সময় তাহারা অন্যান্য অস্ত্রের সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু মেসিন বন্দুকের সম্মুখীন হইতে তাহাদের বীরহৃদয়ও আতঙ্কে অভিভূত হইয়া থাকে। 'মেসিন' বন্দুককে তাহারা 'বাবা' নামে অভিহিত করে!

অতঃপর বহু ওয়াজিরি বিজয়োল্লাস-ধ্বনিতে সান্ধ্যপল্লী প্রতিধ্বনিত করিয়া, শ্মশ্রুল মুখে হাসির লহর ছুটাইয়া আমাদের কুটীরে প্রবেশ করায়, শত্রুগণের সহসা ঐ ভাবে পলায়ন করিবার কারণ স্থির করিবার অবসর পাইলাম না। ওয়াজিরিরা আমার সমরপ্রণালী প্রত্যক্ষ করিয়া

আমার প্রতি এতদূর সদয় হইয়াছিল যে, জনে জনে আমার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া আমার শ্রবণমূলে অশেষ প্রশংসাবাণী বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা হর্ষোন্মত্ত হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া চীৎকার করিল, কেহ কেহ বন্দুকের কুঁদা সশব্দে মাটীতে ঠুকিয়া আনন্দপ্রকাশ করিল।

ক্রমশঃ তাহারা নীরব হইল, জনতাও ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইল। তখন সর্ব্বত্রগামী গুলজারকে দেখিতে পাইলাম। দীর্ঘদেহ গুলজারের মস্তক তাহার সহচরবর্গের মাথার ঊর্দ্ধে বিরাজ করিতেছিল। সে কুটীর-প্রাঙ্গণে সমাগত লোকগুলির অধিকাংশকে শান্ত ও সংযত করিতেছিল। সে চীৎকার ও ঠেলাঠেলি করিয়া উত্তেজিত জনতাকে বিদায় করিল, তাহার পর শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত দেহে কুটীরে প্রবেশ করিল। অতঃপর তাহার স্ত্রী ও পরিজন-বর্গ রন্ধনে প্রবৃত্ত হইল।

ক্রমশঃ অস্তোন্মুখ তপনের ক্ষীণ রশ্মি-জাল ক্ষীণতর হইয়া আসিল; আমার অনুমান হইল, তখন ৬টা বাজিয়াছিল। আহার্য্য সামগ্রী দেখিয়া আমার স্মরণ হইল, প্রায় ২৪ ঘণ্টা কাল আমার কিছুই আহার হয় নাই! প্রভাতে বিমান-পোতাশ্রয় হইতে উড়িবার সময় আমরা স্থির করিয়াছিলাম, কায শেষ করিয়া প্রত্যাগমনের পর মধ্যাহ্ন-ভোজনে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিব।

পর্ব্বতের সংঘর্ষণে আমাদের এরোপ্লেন ভূপতিত হইবার পর এত অল্পসময়ের মধ্যে নানা বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল যে, একটিমাত্র দিনে এবং ১২ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এরূপ বহু অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারি নাই। সেই দিন প্রভাতে শত্রুহস্তে আমাকে বন্দী হইতে হইয়াছিল, উত্তেজিত দস্যুগণ আমার দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াছিল, আমি প্রহৃত হইয়াছিলাম, তাহার পর আমাকে লইয়া কি ভীষণ টানাটানি!—আর সন্ধ্যা-সমাগমের পূর্ব্বেই এখন আমি সেই সকল দস্যুর পরিত্রাতা বীরপুরুষ! প্রভাতে যে তাহাদের হস্তে শত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিল, এখন তাহার প্রতি কত সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন! এমন কি, আমার প্রতি আদেশ হইল, আমি গ্রামের ভিতর যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারি; কিন্তু গ্রামের সীমার বাহিরে যাইবার অনুমতি পাইলাম না।

আমি তখন এরূপ অবসন্ন হইয়াছিলাম যে, স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি তখন গুলজার ও তাহার সহযোগিগণের সহিত ভূতলে উপবেশন করিয়া ভোজনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, এবং গুলজারের স্ত্রী-পরিজনরা আমাদিগকে চা, চাপাটি, সিদ্ধ ডিম প্রভৃতি ভোজ্যদ্রব্য পরিবেষণ করিলে আমি তাহার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলাম। চাপাটিগুলি রসনা-তৃপ্তিকর হইয়াছিল। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, তাহারা আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার জন্য ঐরূপ উৎকৃষ্ট 'খানার' আয়োজন করিয়াছিল।

আমি প্রথমে এক কামড়েই চাপাটির অনেকখানি

চাপাটি কৃত্রিমদন্তের সহিত জড়াইয়া গেল

অংশ কাটিয়া লইয়া তাহা চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই চাপাটি এরূপ 'আঠাল' হইয়াছিল যে, তাহা আমার কৃত্রিম দন্তের সহিত জড়াইয়া গেল! দাঁত হইতে তাহা সহজে ছাড়াইতে না পারিয়া আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম, এবং অতি কষ্টে সেই বিপদ হইতে দন্তগুলিকে মুক্তিদান করিতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু আমার কৃত্রিম

দন্তপংক্তিকে চাপাটির সেই দুশ্ছেদ্য বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস দেখিয়া আমার সঙ্গী ভোক্তার দল উদ্‌গ্রীব হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যখন তাহারা দেখিতে পাইল, আমার সম্মুখের তিনটি দন্ত অপরগুলির সহিত সামঞ্জস্যরক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, এবং স্বাধীনভাবে আসন ত্যাগ করে, আবার স্বস্থানে বসিয়া স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা আহার স্থগিত রাখিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে আমার সেই কৃত্রিম দন্তত্রয়ের অদ্ভুত ব্যবহার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং অবশেষে তাহাদিগকে যথাস্থানে সংরক্ষিত হইতে দেখিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইল।

তাহাদিগকে আমোদ-প্রমোদে পরিতুষ্ট করিবার জন্যই আমি এই দন্ত-বিভ্রাটের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, কি আমার

সকলে উদ্‌গ্রীবভাবে চাহিয়া রহিল

অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল, এ সম্বন্ধে তাহারা মনে মনে কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; কিন্তু আমার এই অদ্ভুত কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া তাহারা সকলেই একবাক্যে আমার অদ্ভুত শক্তির নূতন নূতন নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য উচ্চৈঃস্বরে আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করিল। আমার আহার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াও শান্ত করিতে পারিলাম না, অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর কিছুকালের জন্য তাহাদিগকে সংযত করিতে সমর্থ হইলাম। আমার আশা ছিল, অল্পকালের মধ্যেই তাহারা ঐ সকল ঘটনার কথা বিস্মৃত হইবে। কিন্তু যখন আমার আহার প্রায় শেষ হইল, তখনও আমি যথাসাধ্য চেষ্টায়, আমার দন্তের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে তাহারা যে গভীর গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। সেই বিষয়ের আলোচনা বন্ধ করিবারও কোন উপায় দেখিলাম না। আমার আহার শেষ হইবামাত্র তাহারা আমার দন্তের অদ্ভুত কার্য্যপ্রণালী পুনঃ প্রদর্শনের জন্য আমাকে ধরিয়া বসিল।

প্রথমে আমি তাহাদের অনুরোধরক্ষায় সম্মত হইলাম। কিন্তু তাহারা এতই উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে শান্ত করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়াই মনে হইল। অগত্যা প্রায় দশ মিনিট কাল আমার কৃত্রিম দন্ত কখন উর্দ্ধে কখন নিম্নে পরিচালিত করিয়া সমবেত কৌতূহলী দর্শকমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তাহারা আমার মুখবিবর পরীক্ষা করিতে চাহিল না। কিন্তু তাহাদের কৌতূহলের মাত্রা দেখিয়া আমার মনে হইল, এত সহজে যাহারা উল্লসিত হয়, তখন কয়েকটা ভেল্কি দেখাইয়া তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিতে পারিব।

এই উদ্দেশ্যে আমি গুলজারের নিকট হইতে একটি মুদ্রা লইয়া উহা 'উড়াইয়া দিতে' আরম্ভ করিলাম, এবং প্রতিবারই কোন না কোন দর্শকের নিকট হইতে তাহা বাহির হইতে লাগিল। তাহারা উচ্চ হাস্যধ্বনি করিয়া আমার অদ্ভুত শক্তির তারিফ করিল বটে, কিন্তু অল্পকালমধ্যে তাহাদের প্রতিবেশী অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির লোকরা কুটীরে সমাগত হওয়ায় তাহাদেরও মনোরঞ্জনের জন্য পুনঃ পুনঃ কৃত্রিম দন্তের অভিনয় প্রদর্শন করিতে হইল।

যাহা হউক, আমার অনুরোধে তাহারা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অবশেষে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিতে সম্মত হইল। কিন্তু আমি ইহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিলাম যে, আমি তাহাদিগকে মাসুদ-আক্রমণ হইতে রক্ষা করাতেই আমার প্রতি তাহাদের মনে ভয় ও তৎসঙ্গে ভক্তি-শ্রদ্ধারও সঞ্চার হইয়াছিল।

'আগন্তুকগণ একে একে গুলজারের কুটীর হইতে প্রস্থান করিলে আমি তাহাকে শয়নের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। অতঃপর তাহার আদেশে তাহার এক 'বিবি' আমার জন্য শয্যা রচনা করিল। আমি স্থির করিলাম, শয্যায় দেহভার প্রসারিত করিয়া, আমার বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় উদ্ধার-লাভের জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা চিন্তা করিব। কিন্তু আমি শয়নের অব্যবহিত পরেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

কিন্তু দীর্ঘকাল বিশ্রাম-সুখভোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। মধ্যরাত্রিতে গুল্‌জার আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া জানাইল, মাসুদগণ সদলে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে; সুতরাং আমাকে অবিলম্বে বন্দুক লইয়া গ্রামরক্ষা করিতে হইবে। গুলজার এ কথাও বলিল যে, "শত্রুগণ আমাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছিল বটে, কিন্তু আমাদের কুকুরগুলা তাহাদের সাড়া পাইয়া এভাবে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, তাহারা এক মাইল দূরে থাকিতেই আমরা তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইয়াছি।"

গুল্‌জারের এই সকল উক্তি আমার নিদ্রাবিজড়িত শিথিল শ্রবণবিবরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া আমাকে উদ্বোধিত করিবার পূর্ব্বেই দূরে সুগভীর বন্দুক-নির্ঘোষ শুনিতে পাইলাম। একে তাহার অনুরোধ, তাহার পর-মুহূর্ত্তেই এই ব্যাপার,—আমি আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া দ্রুতবেগে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখিতে পাইলাম, দুই জন লোক আমার সেই বন্দুকটি নির্দ্দিষ্টস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছে।

চন্দ্রালোক-বিরহিত রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও বন্দুক-নিঃসারিত অনলশিখার স্ফুরণে অবিলম্বেই যতটুকু দেখিতে পাইলাম, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিলাম—মাসুদগণ দলপুষ্ট হইয়া, নূতন সহযোগী দল সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে গিরিপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছিল। শত্রুবাহিনীর সংখ্যাধিক্য দেখিয়া আমার প্রতীতি হইল, অল্পসংখ্যক গ্রামবাসীরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া অচিরে শত্রুহস্তে বিধ্বস্ত হইবে।

মুহূর্ত্তের জন্য 'লুইস্' বন্দুকটি এবং তাহা পরিচালনের উপকরণগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও তাহাদের পরিমাণের অল্পতা দেখিয়া হতাশ হইলাম। আমি গুল্‌জারকে আমার আশঙ্কার কারণ জানাইলে সে আমাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য (অবশ্যই অসদুপায়ে লব্ধ) সৈনিকের একটি ঝোলা দেখাইয়া দিলে আমি তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, মাসুদগণের সহিত যুদ্ধে উপকরণের অভাবে আমাকে বিব্রত হইতে হইবে না।

যাহা হউক, অবিলম্বে বন্দুকটি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া গুলীবর্ষণ আরম্ভ করিলাম। কিন্তু মাসুদগণ এবার পূর্ব্ববৎ সহসা হটিল না। রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতা বলিয়াই হউক, বা তাহারা সংখ্যায় এবার অনেক অধিক ছিল বলিয়াই হউক, তাহারা দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছিল। ইতি-মধ্যে আমাদের কুটীর হইতে কাহারও গভীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, শত্রু-নিক্ষিপ্ত গুলীতে কেহ আহত হইয়াছে; কিন্তু আমি তখন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় কে আহত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান লইতে পারিলাম না।

বন্দুকটি তেপায়ার উপর যথাযোগ্যভাবে সংস্থাপিত করিবার উপায় না থাকায় লক্ষ্য স্থির করিয়া গুলীবর্ষণ করা অসাধ্য হইল। আমি মাসুদগণের বন্দুকের আলোক-স্ফুরণ লক্ষ্য করিয়া গিরিপৃষ্ঠে যদৃচ্ছাক্রমে গুলী চালাইতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার এই চেষ্টা বিফল হইল না; শত্রুগণকে অতঃপর আর অগ্রসর হইতে দেখা গেল না, এবং তাহাদের বন্দুক-নির্ঘোষও ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিল। সম্ভবতঃ উহারা পুনর্ব্বার আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

ইত্যবসরে মালিকের কোন চর গ্রামের প্রত্যেক কুটীরে কোনও সংবাদ প্রচারিত করিতে লাগিল। আমি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। সেই ব্যক্তি প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরে আমাদের কুটীর হইতে আমাদের দলের দুই জন লোক অত্যন্ত সতর্কভাবে বুকে হাঁটিয়া তাহার অনুসরণ করিল। তাহাদের পরিবর্ত্তে গুল্‌জারের পরি-বারস্থ একটি রমণী এবং দশমবর্ষীয় একটি বালক প্রাচীরের নিকট আসিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত-স্থান অধিকার করিল। সেই বালকটির বয়স দশ বৎসর মনে হইলেও সে প্রবীণ যোদ্ধার ন্যায় বন্দুকচালনায় সিদ্ধহস্ত!

যুদ্ধ প্রায় আধঘণ্টা কাল স্থগিত ছিল; আমার সন্দেহ হইতেছিল, শত্রুগণ হয় ত কোন নূতন কৌশল অবলম্বন করিবে। সেই সময় সেই গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে

তুমুল কোলাহল ও সুগম্ভীর বন্দুক-নির্ঘোষ আমার কর্ণগোচর হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রত্যেক সহযোগী যোদ্ধা অবিশ্রান্তভাবে গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। সেই সময় গুল্‌জার আমাকেও ঐভাবে গুলীবর্ষণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। আমি লক্ষ্য স্থির করিতে না পারিলেও মামুদগণের দিকে অশ্রান্তভাবে গুলী চালাইতে লাগিলাম। কিন্তু আমার ধারণা হইল, ইহারা শত্রুদলের সম্মুখভাগে তুমুল কোলাহল করিতে থাকিবে, সেই সুযোগে অপর দল বাম পার্শ্ব হইতে শত্রুগণকে আক্রমণ করিবে।

কিছুকাল এইভাবে যুদ্ধ চলিবার পর মার্জ্জারাক্ষ গুল্‌জার গুলীবর্ষণে বিরত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

কয়েক মিনিট চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। তখন গুল্‌জারের আদেশে দুই জন ভিন্ন অন্য সকলেই সেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, বিকট রণ-হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত করিতে করিতে গিরিপৃষ্ঠে অবতরণ পূর্ব্বক মামুদগণের অনুসরণ করিল। শত্রুগণ বামদিক হইতে আক্রমণের আশঙ্কা করে নাই; সুতরাং অতর্কিত আক্রমণে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

আমি তখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইলেও এরূপ উৎসাহিত হইয়াছিলাম যে, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলাম; কিন্তু যে দুই জন আমার অদূরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আমার ঐ কার্য্যে বাধা দিল এবং আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চারপায়ের উপর শয়ন করাইল। তাহাদের কথার ভঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম, আমাকে সেই স্থানেই থাকিতে হইবে। যাহা হউক, রণজয়ী গ্রামবাসীরা জয়ধ্বনি করিতে করিতে সেই স্থানে প্রত্যাগমন করা পর্য্যন্ত আমি সেই অবস্থায় পড়িয়া রহিলাম।

কিছুকাল পরে গ্রামস্থ কুটীরগুলি পুনর্ব্বার উত্তেজিত গ্রামবাসী দ্বারা পূর্ণ হইল। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য বক্তার উক্তি অগ্রাহ্য করিয়া অধিকতর উত্তেজনাভরে তারস্বরে বক্তৃতা করিতে লাগিল। সেই সময় কেহই আমার কোন সন্ধান লইল না; আমি সেই চারপায়ার উপরেই অবসন্ন-দেহে পড়িয়া থাকিয়া তাহাদের দুর্ব্বোধ্য কোলাহল শুনিতে শুনিতে নিদ্রামগ্ন হইলাম।

কিন্তু নিদ্রাঘোরে আমার নেত্র নিমীলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গুল্‌জার পুনর্ব্বার আমাকে ঠেলিয়া তুলিল। আমি তাহার সেই ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই দেখিলাম, গ্রামের প্রধান পথ দিয়া আমাকে স্থানান্তরে পরিচালিত করা হইল। পথিমধ্যে গুল্‌জার আমাকে কোন কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তখন আমার মানসিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, তাহার কথাগুলি আমার বোধগম্য হইল না। আমাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া গুল্‌জারের মনেও বিরক্তিসঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু অবিলম্বেই আমরা অতিথিশালার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

সেই সুপ্রশস্ত কুটীরে এবং তাহার প্রাঙ্গণে গ্রামবাসিগণ সকলেই সমবেত হইয়াছিল বলিয়াই আমার ধারণা হইল। সেই বিপুল জনতা সবলে ভেদ করিয়া গুল্‌জার আমাকে লইয়া অতিথিশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কুটীরের মধ্যস্থলে প্রজ্বলিত অগ্নির আলোকে আমি মালিককে মৃত্তিকায় উপবিষ্ট দেখিলাম। প্রধান প্রধান গ্রামবাসীরা তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া বসিয়াছিল।

আমরা সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র গ্রামবাসীরা যেন স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুসারে বিভিন্ন স্থান অধিকার করিল। মালিকের দক্ষিণ ভাগে একখানি মাদুরের উপর আমার উপবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

অতঃপর তাহাদের যে অদ্ভুত উৎসব আরম্ভ হইল—সেরূপ উৎসব আমি জীবনে সেই প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম, এবং এ জীবনে সেরূপ আর কখন দেখিব না।

সেই সময় একটি বৃহৎ কটাহ সেই কুটীরমধ্যস্থ অগ্নি-রাশির উপর ঝুলিতেছিল, তাহা নামাইয়া মালিকের পদ-প্রান্তে সংস্থাপিত হইল। সেই কটাহের পার্শ্বে একখানি বৃহদাকার পরাতের উপর প্রায় ত্রিশটি চায়ের পেয়ালা সংরক্ষিত হইল। তাহার পার্শ্বে আর একখানি পরাতে একরাশি চাপাটি স্তূপাকারে সজ্জিত হইল। অতঃপর দলপতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তারস্বরে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিল। তখনও আমার নিদ্রার ঘোর সম্যক্‌রূপে অপসারিত না হওয়ায় এবং গলিতদন্ত মালিকের বদননিঃসৃত সকল কথা আমি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারায় তাহার সেই বক্তৃতার মর্ম্ম আমার ঠিক স্মরণ নাই। তবে আমি ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, মালিক বক্তৃতায় আমার প্রশংসা-সূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল, এবং সে আমার পিঠ

চাপড়াইয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। এইভাবে আনন্দ-প্রকাশের উচ্ছ্বাসে দুইবার তাহারা আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিল, এবং একবার আমাকে চারপায়ার উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিবারও উপক্রম করিয়াছিল!

মালিকের বক্তৃতা শেষ হইলে সে পুনর্ব্বার মাটীতে উপবেশন করিল। তাহার পর সে বিনা বাক্যব্যয়ে পূর্ব্বোক্ত পাত্র হইতে একখণ্ড মেষমাংস তুলিয়া লইয়া, তাহা দুই হাতে ধরিয়া দন্তের সাহায্যে কিয়দংশ কাটিয়া লইল, এবং তাহার স্বাদ উপভোগ করিয়া অবশিষ্টাংশ আমার হস্তে প্রদান করিল। বুঝিলাম, আমাকেও ঐরূপ করিতে হইবে! অগত্যা আমি তাহার এক অংশ দাঁত দিয়া কাটিয়া লইলাম। সেই সময় সকলেরই দৃষ্টি আমার মুখের উপর সন্নিবদ্ধ।

এই সকল সরল-প্রকৃতি পার্ব্বত্য জাতি কত সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হয়, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; এই জন্যই আমি ঘৃণা ত্যাগ করিয়া মালিকের উচ্ছিষ্ট মাংসখণ্ডের এক টুকরা দাঁত দিয়া কাটিয়া লইয়াছিলাম, এবং পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমার যেন বমন না হয়। সেই মাংস বেশ সুস্বাদু, এবং তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছিল। সকলেই নির্ব্বাক্‌ভাবে সেই মাংসখণ্ড পরস্পরের হাত হইতে গ্রহণ করিতে লাগিল; এইভাবে সকলের হাত ঘুরিয়া তাহা মালিকের হাতে আসিলে মালিক তাহা অগ্নিরাশিতে নিক্ষেপ করিল।

অতঃপর সকলের আলাপ আরম্ভ হইল। তখন মালিক পূর্ব্বোক্ত পাত্র হইতে এক এক খণ্ড মাংস বাহির করিয়া তাহা একটি স্ত্রীলোককে পৃথক্ পৃথক্ মৃন্ময় পাত্রে সাজাইয়া রাখিতে উপদেশ দিল। সে প্রত্যেক থালায় এক খণ্ড মাংস একখানি চাপাটি, একটি ডিম এবং এক পেয়ালা চা রাখিয়া কতিপয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে মাত্র পরিবেষণ করিল। অবশেষে স্ত্রীলোকটি মাংসসহ পাত্রটি সেই কক্ষের এক কোণে লইয়া গিয়া পাত্রস্থ মাংসখণ্ডগুলি অবশিষ্ট গ্রামবাসিগণকে পরিবেষণ করিতে লাগিল।

সেই অতিথিশালার প্রাঙ্গণ হইতে উত্থিত জন-কোলাহল শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, সেখানেও ঐ প্রকার অনুষ্ঠান চলিতেছিল।

অতঃপর দেওয়ালে দেওয়ালে অর্দ্ধদগ্ধ মশাল জ্বালাইয়া দেওয়া হইল, তখন সেই স্থান মশালের আলোকে এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল। সেই সময় মালিক করতালি দিতেই সকলে নিস্তব্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যক্তি বেহালার আকারবিশিষ্ট একটি 'সারিঙ্গে' লইয়া সেই কুটীরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। সেই বাদ্যযন্ত্রটি আদিমকালের প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন হইলেও তাহার শ্রবণবিমোহন স্বরলহরী শ্রবণে দর্শকমণ্ডলী মোহিত হইল।

অতঃপর আমোদ-প্রমোদের তালিকা অনুসারে সেখানে এক নর্ত্তকীর আবির্ভাব হইল। সে নেপথ্য হইতে নৃত্য করিতে করিতে আসরে প্রবেশ করিলে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল, এবং ঘটা করিয়া চতুর্দ্দিকে ধূমপান ও মাদক-সেবন আরম্ভ হইল! মদির-বিহ্বল অভ্যাগত জনগণের আনন্দ-কোলাহল ও নৃত্যগীতের মধ্যে আমার চেতনা বিলুপ্ত হইল; তাহার পর কি ঘটিল, তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই; তবে এইমাত্র মনে পড়ে যে, আমি যেন কাহারও স্কন্ধে বাহিত হইয়া কুটীরে ফিরিলাম, এবং আমাকে কম্বলে আবৃত করিয়া চারপায়ার উপর ফেলিয়া রাখা হইল। তাহার পর বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকারে আমার চেতনা বিলুপ্ত হইল। [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

স্বর-লিপি

সুর-নারী বন্দী হয়ে অক্ষর-কারায়
কাঁদিতেছে দিবানিশি মর্ম্ম-বেদনায়।
গুণী তারে সযতনে করিছে উদ্ধার,
কণ্ঠে আর যন্ত্রপরে তুলিয়া ঝঙ্কার।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

নদীয়া ও যশোহরের গাজন-গীতি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আমাদের দেল (গাজন), দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলির ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার অনেক গৌরবের জিনিষই অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। এই সকল উৎসবই এক দিন পল্লী-কবিদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছে,—উৎসবের কোলাহল-মুখর প্রাঙ্গণে সহৃদয় শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসাসূচক হাসিটুকু লাভ করিতে পারিলেই তাহারা শ্রমের সার্থকতা মনে করিত।

এগুলি শুধু মনের আনন্দের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য নহে,—বিভিন্ন শিল্পজীবী সম্প্রদায়ের জীবিকা অর্জ্জনের অন্যতম অবলম্বন ছিল। তন্তুবায় নানাবিধ বস্ত্র, কর্ম্মকার নানাবিধ অস্ত্র, কুম্ভকার নানাবিধ পুতুল বিকাইবার বিশেষ সুযোগ পাইত। এত বিচিত্র ভাবের সমাবেশেই এগুলির গঠন হইয়াছিল। অনেকগুলি ধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠানের মন্ত্র খুঁজিতে গেলেও ইহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। দুর্গাপূজায় বস্ত্র নিবেদন করিবার মন্ত্রে আছে :—

"ওঁ বহুতন্তুসমাযুক্তং পট্টসূত্রবিনির্ম্মিতম্।
বাসো দেবি সুশুক্লঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বরি।
ওঁ তন্তুসন্তানসম্বদ্ধং রঞ্জিতং রাগবস্তুনা।
দুর্গে দেবি ভজ প্রীতিং বাসস্তে পরিধীয়তাম্।"

গাজনের মেলাগুলির এক দিন খুবই জাঁকজমক ছিল। বর্ত্তমানে কালের প্রভাবে ক্রমেই তাহার হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এখনও যে সকল স্থানে গাজন অনুষ্ঠিত হয়, ঐ সকল স্থানে চৈত্র-সংক্রান্তি ও ভগবতীযাত্রার (১লা বৈশাখ) দিনে মেলা হইয়া থাকে। মেদিনীপুরান্তর্গত কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী কাস্তোড় নামক স্থানের গাজনের মেলা বঙ্গদেশ-বিশ্রুত। এই সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের জাতীয় অনুষ্ঠানগুলিকে অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীসের Olymphic game প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা দিতে পারি।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কৃষক-কুটীর এক অতি প্রয়োজনীয় ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস খুলিলে আমরা দেখিতে পাই যে, দশম শতকের শেষভাগে শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত গৌড় প্রাকৃতকে বৌদ্ধপ্রচারকগণ লিখিত ভাষায় পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সে সৌভাগ্য স্থায়ী হইল না। বৌদ্ধ-প্রাধান্য অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার ভাগ্য-গগন কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সংস্কৃতজ্ঞগণ,—

বর্ত্তমানে "ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন", "হরিপত্তন" প্রভৃতি ছড়া এবং "শিবের নৌকা-বিলাস" শীর্ষক একটি গান দেওয়া গেল।

"ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন" ছড়াটিতে অজ্ঞাতনামা কবির রচনা-নৈপুণ্যের বেশ একটা নিদর্শন পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন গঙ্গাদেবীর নিকট কামাখ ঐরাবতের পরাভবে—অবলা রমণীর শুধু এক সতী-ধর্ম্মের অপরাজেয় শক্তির নিকট দুর্দ্ধর্ষ দানবী শক্তির পরাজয়ের যে চিত্র গাথা-রচয়িতা আঁকিয়াছেন, তাহা বড়ই মনোরম এবং হৃদয়স্পর্শী।

ছড়াগুলিতে বর্ণিত পৌরাণিক আখ্যায়িকাপূর্ণ ভিত্তিগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয়। অশিক্ষিত অথবা নামমাত্র বর্ণ-জ্ঞান-বিদিত গাথা-রচয়িতৃগণ কিরূপে এই সকল পৌরাণিক আখ্যায়িকাতে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিল, তাহা লইয়া বিব্রত হইবার অবসর নাই,—ইহা পাঁচালী গান ও কথকতা প্রভৃতির দান। বৌদ্ধ-প্রাধান্য ধ্বংসের পর হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের সময় (Hindu Renaissance) হইতে আরম্ভ করিয়া এগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের দেশে মিশনারীর কার্য্যই করিয়াছিল। অজ্ঞ অশিক্ষিত পল্লী-কুটীরবাসিগণ স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে এইগুলির মধ্য দিয়া ভক্তি, প্রীতি ও নীতির সর্ব্বোচ্চ ভাব ও আদর্শগুলি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। এগুলি এক দিকে যেমন জনসাধারণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া রাখিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনই পল্লী-কবিগণের কবিত্বশক্তি বিকশিত করিয়া এবং তাহা পরিপোষণের নিমিত্ত যথোপযুক্ত উপকরণ যোগাইয়া, আমাদের কুটীর-সাহিত্যকে নানা সম্পদ্-সম্ভারে সু-সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সে দিন বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে ভক্তি, প্রীতি ও প্রেমের এবং সহজ, সরল অনাড়ম্বর সাহিত্যের এক অভিনব বন্যাই বহিয়া গিয়াছিল। কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "মেঘদূত" শীর্ষক সন্দর্ভে বড় আক্ষেপ করিয়াই বলিয়াছেন :—

"রামগিরি হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে এক দীর্ঘ খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্ব্বাসিত হইয়াছি।" আমাদের আশু অতীত দিনের পল্লীজীবনের কথা ভাবিতে গেলে মনে হয়, আমরাও আজ সেই অনাবিল প্রেম-প্রীতি ও সরল সাহিত্যপূর্ণ সোনার বাঙ্গালা হইতে চিরকালের মত নির্ব্বাসিত হইয়াছি।

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ।"

প্রভৃতি শ্লোক রচনা করায় বালিকা বঙ্গভাষার প্রতি পণ্ডিত রসিকগণের আসক্তি ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল। বৌদ্ধ-প্রাধান্ত অবসানের সময় হইতে মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গভাষাকে কৃষক-কুটীরেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। "মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গভাষা কোন কৃষক-রমণীর ন্যায় দীনহীনবেশে পল্লীকুটীরে বাস করিতেছিল। এই ভাষাকেই এণ্ডারসন্, ক্রাইন, কেরী প্রভৃতি য়ুরোপীয়রা অতি উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। কেরী বলিয়াছিলেন, 'এই ভাষার শব্দসম্পদ ও কথার গাঁথুনি এরূপ অপূর্ব্ব যে, ইহা জগতের সর্ব্বপ্রধান ভাষাগুলির পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারে।' * * এই সকল অপূর্ব্ব গুণ লইয়া বঙ্গভাষা অতি অনাদর ও উপেক্ষায় বঙ্গীয় চাষার গানে কথঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।" (অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন) মুসলমান অধিকারের পরে অনুবাদের যুগে বাঙ্গালাভাষা কৃষক-কুটীর হইতে শিক্ষিত সমাজে বাহির হইল এবং তাহার অনতিবিলম্বে বাঙ্গালার মানসসরোবরে বৈষ্ণব সাহিত্যের শতদল ফুটিয়া উঠিল। পরবর্ত্তী যুগে বৃটিশ অধিকারের প্রবর্ত্তন সময়েও ইহারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। পলাশী বিজয়ের তিন বৎসর পরে ১৭৬০ অব্দে ভারতচন্দ্র বঙ্গের কাব্যকানন আঁধার করিয়া গেলেন। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রভাকরের' কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাদানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আঁধারে আলোক দিতে আর কেহ আসিল না। এই সময়ের দেশব্যাপী অরাজকতার ইতিহাস খুলিলে বেশ স্পষ্টই দেখা যায়, এরূপ সময়ে সাহিত্যের অনুশীলন বা পরিপুষ্টি সম্ভবপর নহে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ অধ্যাপক সুশীলকুমার দে মহাশয়ের "Bengali literature in the nineteenth century" নামক পুস্তক পাঠ করিলে এ বিষয়ে সম্যক্ জানিতে পারেন। এই ঘনঘোর দুর্য্যোগ-রজনীতে কেবল পাঁচালীকার ও কবিওয়ালাগণই বঙ্গের নীরব কাব্যকাননকে মুখর করিয়া রাখিয়াছিলেন। পল্লীকুটীরই এই সাহিত্যের আলোচনাকেন্দ্র; পল্লীবাসী অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ই উহার প্রধান উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময় অর্থাৎ ১৮শ শতকের শেষার্দ্ধ ও ১৯শ শতকের প্রথমার্দ্ধকালই কবি-গানের গৌরবময় যুগ। এই সময়ে কবি-গানের যে বিপুল বন্যা আসিয়াছিল, তাহার ক্ষীণ স্রোত এখনও বঙ্গের প্রায় প্রতি পল্লীতেই বহিতেছে। পরে ভাষা-জননীর সেবার ভার অপরের হাতে সমর্পণ করিয়াও পল্লী-কুটীর নিজ অর্ঘ্যডালা শূন্য রাখে নাই। এ দিকে রাজসমারোহপূর্ণ পূজার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের অবহেলা ও উপেক্ষার যবনিকার অন্তরালে পল্লীর কুটীরে কুটীরে বন-ফুল-মাল্য গ্রথিত হইয়াছে ও হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত "শিবের নৌকাবিলাস" শীর্ষক গানে বর্ণিত প্রসঙ্গটি কবি নারায়ণ দেবের রচিত "মনসা-মঙ্গলে" সমপ্রভাবে পাওয়া যায়। চণ্ডীদেবী এক দিন শিবকে ঘরে না দেখিয়া নারদকে শিবের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, উপযুক্ত ভাগিনেয়টির নিকট নিম্নোক্তরূপ উত্তর পাইলেন—

"নারদ বলেন শুন গণেশজননি।
পদ্মবনে শুনিয়াছি জন্মেছে পদ্মিনী।
তাহার যে রূপ মামী নাহি তব ঠাঁই।
বিবাহ করিতে তারে গিয়াছে গোঁসাই।"

ইহাতে চণ্ডী অতিমাত্রায় রুষ্ট হইয়া শিবকে মোহিত করিবার জন্য খেয়াঘাটে গেলেন।

"দেড় প্রহর বেলা আছে আড়াই প্রহর বাদে।
আসিয়া মিলিল শিব চণ্ডিকার কাঁদে।"

* * * *

খেয়াঘাটে বসিয়া শঙ্কর
ডুমনী ডুমনী করি, ডাক ছাড়ে অধিকারী,
নৌকা লইয়া আসহ সত্বর।

* * * *

হাসি বলে ডোমের নারী, নায়ে উঠ ত্বরা করি,
মনে কিছু না করিও দ্বিধা।
একবার করিব পার, ত্রিভুবনে জানাবার,
ঝুলি কাঁথা থুইয়া যাও বান্ধা।
সংসার মোহিত করে, হেন রূপ চণ্ডী ধরে,
দেখি শিবের সাত পাঁচ মন।
রমণ করিতে আশ, শিবের মনে অভিলাষ,
নারায়ণ দেবের সুবচন।"

তৎপর ছদ্মবেশে বিহারের পর উভয়ে নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। এই সম্মিলনের ফলে চণ্ডীর গর্ভে বিষহরীর জন্ম হয়। মনসা-মঙ্গলের বর্ণিত শিব ঠাকুরও যে শূন্যপুরাণ প্রভৃতি হইতেই আসিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহা লইয়া আর এখানে পাঠককে বিরক্ত করিতে চাহি না। তার পর আলোচ্য গানটির আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার আছে। বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের ভাবধারায় বাঙ্গালী একবারে হাবুডুবু খাইয়াছিল। তাই দেখা যায়, পরবর্ত্তী কালের রাধা-কানু ছাড়া অন্যবিষয়ক রচনাতেও অনেক স্থলে বৈষ্ণবীয় হাবভাব

আপনা আপনি আসিয়া পড়িয়াছে। পদাবলীর "নৌকা-বিলাসের" অনুকরণেই আমাদের এই "শিবের নৌকা-বিলাস" সৃষ্ট। নৌকা-বিলাসের স্থানও বাঙ্গালীর বহুদিনের প্রেম-ব্যথার স্মৃতি-বিজড়িত সেই যমুনা।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন

গীতের কারণ গঙ্গার জনম এমন ভুবনে কে। *
নিজে হরি যিনি আর শূলপাণি পাতকী তরাবে যে।
সলিল হইয়ে বিষ্ণু যায় কেহ না পাইল তার সন্ধি।
ধ্যান করিয়া নিল প্রজাপতি ব্রহ্মা করিলেন গঙ্গা বন্দী।
ব্রহ্মার কৌমণ্ডলে আছেন গঙ্গা নারায়ণীরূপ হয়ে।
ধ্যান করিলেন মুনিগণ শিব দিলেন তা কয়ে।
ধ্যান করিয়া দেখিলেন যত মুনিগণে।
সূর্য্যবংশে জন্মিবে ভগীরথ গঙ্গা আনিবে সেই জনে।
নারীর ঔরসে তাহার জনম না হইবে তার অস্থি।
মুনির শাপে হইবেক বর হইবে তাহার স্বস্তি।
বরিষেণ† জঙ্গলে ধূপেতে‡ অনলে শীতেতে জলেতে থাকে।
দশ হাজার বৎসর স্তব করে ব্রহ্মা থেকে থেকে দেখে।
শুনি প্রজাপতি জিজ্ঞাসে আরতি কহেন মধুর বাণী।
কিসের লাগিয়ে স্তব কর কিছু কহ দেখি শুনি।
তোমার বংশে আমার জন্ম নাম হইল ভগীরথ।
পুরাণে শুনেছি গঙ্গার মাহাত্ম্য তাহে করি আমি স্তব।
শুনি প্রজাপতি হাসেন চতুর্ম্মুখে মনেতে পাইয়ে ডর।
তোমার বাক্যে এড়িলে গঙ্গা পৃথিবী হইবে রসাতল।
ব্রহ্মার আদেশে করিয়া গমন আইলেন শিবের পাশ।
শিবের নিকটে করিলেন স্তব বৎসর হাজার দশ।
তুমি হরিহর সর্ব্বের সার তোমা বিনা আর কে।
তুমি না সহিলে সকলি মজিবে বাসুকি হইবে শেষ।
আসন করিয়া বসিলেন শিব যোড় করি দুই হাত।
শিবের মস্তকে ঢালিলেন গঙ্গা মূর্চ্ছিত হলেন ভোলানাথ॥
মস্তকে ধরি পাকে পাকে ফিরি জটায় বাঁধিয়া হর।
গঙ্গাকে বাঁধিয়ে না দেন ছাড়িয়ে নাম হইল গঙ্গাধর।
তুমি পশুপতি সকলের গতি শুন নিবেদন মোর।
দয়া না করিলে পাপের বাড়নে পৃথিবী হইবে ওর।
শুনি স্তব-স্তুতি ছাড়েন গঙ্গা মস্তকের জটা চিরি।
মরতে নামিতে সামনে বাধিল পর্ব্বত হিমগিরি।
কেমনে জননী নামেন মরতে সন্ধান নাহি পায়।
দশ হাজার ফেরেন গঙ্গা পথ নাহি পায়।
মনেতে ভাবিয়া কহেন গঙ্গা ভগীরথ উপায় করি কি।
ইন্দ্রবাহনে আনিয়া শিলে * ক'রে দাও দুই চীর।
সেখান হইতে করিয়া গমন ইন্দ্রের নিকটে আসি।
পাঁচ বৎসর করেন স্তব আর করেন একাদশী।
শুনি সে বারতা হাসে গজবর কাম ভাবিয়া মনে।
বাসর করিতে পারেন গঙ্গা শিলে চিরিয়া দিব এক্ষণে।
বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল মাথায় গায়ে বহে ঘন স্বেদ।
গঙ্গার নিকটে কাঁদে ভগীরথ জানায়ে মনের খেদ।
হরিষ হইয়ে আন গে ডাকিয়ে সে বুঝি বলিষ্ঠ বড়।
অন্তরে থাকিয়ে আড়াইটে ঢেউ সহে তবে সে বাসরে দড়।
বীর-দর্প করিয়ে চলিল ঐরাবত বাসুকি কাঁপিল ডরে।
এক ঢেউতে দশ যোজন গজ গেল রসাতলে।
তুমি সে জননী জগৎ-তারিণী আমি মূঢ়মতি ক্ষীণ।
মায়ের চরণ ধরিয়া সেবিব শেষে পাই যদি কভু দিন।
আর এক ঢেউয়ে ফেলিল ডাঙ্গায় গজ উঠে করে গড়।
মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়ায় সুমুখে দাঁতে তুলে নিয়ে খড়
পাহাড় ভেদিয়া গঙ্গাদেবী নামিল দক্ষিণী।
হরিদ্বার নাম গঙ্গার হইল তখনি।
আগে আগে যান ভগীরথ শঙ্খ-ঘণ্টা দিয়ে।
পিছে পিছে যান মাগো তরঙ্গে বাড়িয়ে।
ভারত-ভুবনে নামেন গঙ্গা সুরধুনী।
গঙ্গারে করেন পান যোগী জহ্নু মুনি।
জানু দিয়ে এড়িলেন গঙ্গা জাহ্নবী নাম হয়।
ত্রিধারা হইয়ে চলিলেন গঙ্গা পাইয়ে মুনির ভয়।

* পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসারে এক দিন দেবর্ষি নারদের ত্রুটিবশতঃ রাগরাগিণীগণের অঙ্গহানি ঘটে। নারদ রাগরাগিণীগণের নিকট প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন যে, শিব যদি সঙ্গীত আলাপ করেন, তাহা হইলে ঐ ত্রুটি সংশোধিত হইবে। তদনুসারে নারদ মহাদেবকে সঙ্গীত আলাপ করিতে অনুরোধ করেন। তাহা শুনিয়া মহাদেব বলিলেন যে, তিনি উপযুক্ত শ্রোতা ব্যতিরিক্ত সঙ্গীত আলাপ করিবেন না। অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু শ্রোতা নির্দ্দিষ্ট হন। ব্রহ্মা সঙ্গীতের কিছুই বুঝিতে পারেন নাই; বিষ্ণু সামান্য কিছু বুঝিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। এই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা নামে খ্যাত। তাই—"গীতের কারণ গঙ্গার জনম।"

† বর্ষাকাল।

‡ গ্রীষ্মকালে।

* পর্ব্বতকে।

ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষ যেখানে ভস্ম হয়েছিল।
দ্রুতগামী হয়ে মাগো সেই দিকেতে গেল।
সেথা হতে আসিলেন ফিরিয়া দক্ষিণে।
মিলিলেন আসি মাতা সাগর-সঙ্গমে। *

সৃষ্টি-পত্তন

অজয় মোর গোঁসাই পুরুষ প্রধান।
সৃষ্টি করিবারে প্রভু হন সন্নিধান।
আপনার শরীর হতে নিক্ষেপিলা জল।
ধেয়ানে বসিল সেই জলের ভিতর।
সেই জলে উপজিল কনক মহা অণ্ড। †
অর্দ্ধ অর্দ্ধ করি তার করিল দুখণ্ড।
এতেক সৃজিয়া গোঁসাই বসিলেন জলে।
ব্রহ্মা উপজিল যার নাভি-কমলে।
চারি বাহু চারি মুণ্ড অষ্টটি লোচন।
হাতেতে জপের মালা কমলে আসন।
এতেক সৃজিয়া গোঁসাই বসিলেন জলে।
অঙ্কুর জন্ম নিল ব্রহ্মার বদনমণ্ডলে।
রুদ্র নাম থুইল তার বেদমুখে শুনি।
নারীকণা দিল তার সতী চন্দ্রমুখী।
সেথা হতে একা করিলেন আগমন।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সৃজিলেন ত্রিভুবন।
হর-গৌরীর চরণকমল মধুকর।
শুনিলে খণ্ডায় পাপ এই বড় পথ।

নারায়ণী অষ্টক

বিকৃতি আকৃতি মা গো ধর মুণ্ডমালা।
খাণ্ডা খড়্গ করে মা গো ভকত-বৎসলা।
চণ্ড-মুণ্ড-বধে মা গো হলে একাকিনী।
চামুণ্ডা স্মরিবে দেবী নমঃ নারায়ণী।

কালী অষ্টক

মা গো যুদ্ধ কালী নাচে ডালী দিয়ে করে তালিকে।
দেবগণে করিলে পূজা দিয়ে বনের ফুলিকে।
এই সব লীলাখেলা করিলে মা আপনি।
বন্দন জগতমাতা ভৈরবী দুর্গা ভবানী।

জলশুদ্ধি

জল শুদ্ধ স্থল শুদ্ধ শুদ্ধ আপন কায়া।
আওটা কৌটা শুদ্ধ শুদ্ধ মহামায়া।
গঙ্গাসাগর শুদ্ধ শুদ্ধ বারাণসী।
তিন তীর্থের জল দিয়ে জল শুদ্ধ করি।

ক্ষীর-শুদ্ধি

বন্দিনু কপিলা * মাতা মহা পুণ্যবান।
যাহার দুগ্ধেতে স্নান করেন দেবগণ।
স্নান করে দেবগণ হন মহা সুখী।
দুগ্ধ ক্ষীর শুদ্ধ হয় বাছুরের মুখী।
সুবর্ণের পাত্রেতে ভরিয়া গঙ্গাজল।
কপিলের দুগ্ধ তাহে অতি মনোহর।
গঙ্গাজল তুলসী আর শঙ্খের আভরণ।
ক্ষীর শুদ্ধ করি বালা শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।

উত্তরী-শুদ্ধি †

মন করি ধুতি মোরা পবন করি কাছা।
সেই কাছা পরে পূজি সন্ন্যাস দেবতা।
সেই কাছা পরে করি শিবের স্মরণ।
যত কিছু পাপ মোদের হরে ততক্ষণ।
কহেন ত সদ্গুরু মহেশের বরে।
উত্তরী শুদ্ধ করেন শ্রীভোলা মহেশ্বরে।

অঙ্গুরী-শুদ্ধি

প্রভু হে তামায় উৎপত্তি তামায় বিপত্তি।
তামা সৃজিলেন গোঁসাই যোগের যোগপতি

* এই ছড়াটির শেষে আরও কয়েকটি পংক্তি আছে। বর্ত্তমানে আমরা ঐ পংক্তি কয়টি উদ্ধার করিতে পারি নাই; তবে উদ্ধারের আশা আজিও একবারে ছাড়িয়া দিই নাই।

† পুরাণের বর্ণনা অনুসারে প্রথমে মহাপুরুষ নিজ তেজে অন্ধকার দূর করিয়া জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলের মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বীজ সুবর্ণ-অণ্ডরূপে পরিণত হইলে, তন্মধ্যে মহাপুরুষ ব্রহ্মারূপে অবস্থিতি করেন। পরে উক্ত অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া এক ভাগে পৃথিবী, অপর ভাগে আকাশ সৃষ্ট হয়। গাথা-রচয়িতৃগণ অনেক স্থানেই নিজেদের সুবিধামত পৌরাণিক কাহিনীর সৃষ্টি করিয়া সংযোজনা করিয়াছে। এই সকলের মধ্যে তাহাদের কল্পনার দানও অনেকখানি আছে। পুরাণ-অভিজ্ঞ পাঠক অনায়াসেই তাহা ধরিতে পারিবেন।

* কামধেনু। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। ইনি গো, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানা প্রকার অপত্যের জন্ম দেন। "কপিলা" শব্দ অনেক স্থলেই সাধারণ গো অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "মদীয় পাণিভ্রষ্টঃ বালকঃ কস্যাপি কপিলাশবস্য ক্রোড়ম্ অভ্যনীয়ত"—দশকুমারচরিতম্।

† গাজনের সময় ব্রত গ্রহণ করিবার পর তামার অঙ্গুরী-যুক্তা একটি সূতা গলায় পরিয়া থাকে। ইহাকে "উত্তরী" বলে।

তামায় গড়িয়ে টাট তামায় গড়িয়ে ছাট।
তামায় তুলিয়ে পূজি ত্রিজগতের নাথ।
ব্রাহ্মণে বহে তামা ছুঁতে নারে আনে।
হেন তামা পরি মোরা হাতে আর কাণে।
হেন তামা প'রে মোরা এড়াব শমন।
অঙ্গুরী-শুদ্ধি করেন শ্রীহরের নন্দন।

বলরাম অবতার

গোকুল নগরে জন্ম রোহিণী-উদরে।
কত কেলি করিলেন যমুনার তীরে।
মহাবল-পরাক্রম পর্ব্বত গম্ভীর।
প্রণমি তোমারে প্রভু হলধর বীর।

নৃসিংহ অবতার

হিরণ্যকশিপু দৈত্য মহা বলবান্।
বলে ছলে দেবগণে করে অপমান।
নখাঘাতে বিদারিলেন উরুমধ্যে ধরি।
প্রণমি তোমারে প্রভু নরসিংহ হরি।

মীন অবতার

বেদ উদ্ধারিয়া গোঁসাই মন করিলেন সার।
অগাধ জলের মধ্যে করিলেন সঞ্চার।
চারি বেদ উদ্ধারিলেন মন করিলেন স্থির।
প্রণমি তোমারে প্রভু মীন-শরীর॥

অধিবাস

মীন রাশি মধু মাস শুক্লপক্ষ হয়।
একাদশী বৃহস্পতি যদি মহেন্দ্রযোগ পায়।
চন্দ্রের পঞ্চতম তিথি দিবসেতে ভানু।
দেব-ঋষি আইলেন কৌতুকে আর কানু।
গরুড়ে নারায়ণ আইলেন বিমানে সরস্বতী।
পুরোহিত বিরিঞ্চি আইলেন শীঘ্রগতি।
শুভ তিথি পেয়ে বিধি অধিবাসে বসি।
মৌশলের ধান্য আর পুষ্প রাশি রাশি।
কস্তূরী কুঙ্কুম আর ঘৃত দুগ্ধ দধি।
ষোল সন্ন্যাসীর অধিবাস করেন প্রজাপতি।

সিংহাসন (পাট) নির্ম্মাণ

ভারত ভুবনে এলেন দেব পঞ্চানন।
লাউসেনের বাড়ী ঠাকুর দিলেন দরশন।*
দরশন দিলেন ঠাকুর লাউসেনের বাড়ী।
বসিতে দিলেন রাজা কুশাসনখানি।
পাদ্য অর্ঘ দিয়ে রাজা কহে স্তব-বাণী।
কি কারণে আগমন আজ্ঞা হোক শুনি।
শিব বলেন স্নান করেন উপোষ খেয়াতি।
সিংহাসন আনি দেহ পূজার অনুমতি।
এ কথা শুনিয়া তখন রাজার গমন।
বিশ্বকর্ম্মা বলি ডাক দিলেন তখন।
হাতে গুয়া পান দিয়া বলেন বচন।
সিংহাসন গ'ড়ে দেহ পূজার বিধান।
এ কথা শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মার গমন।
সাজায়ে আনিয়া দিল রত্ন-সিংহাসন।
সিংহাসনে বসিলেন দেব পরশ মুনি।
কনক অঞ্জলি জল দিলেন তখনি।

* ইনি প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে সবিশেষ পরিচিত "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যের লাউসেন।

শিবের নৌকা-বিলাস

(গান)

ওঁ শিবঃ—শিঙ্গে ডম্বুর করে ধরি, চলিল হর ত্রিপুরারি,
চিতাভস্ম মাখে সর্ব্বগায়।
শিবের ডুম্‌ডুম্ ডম্বুরি বাজে, থমকে থমকে নাচে,
পঞ্চ বদনে গুণ গায়।
শিবের কাণেতে কুণ্ডল দোলে, হাড়ের মালা দিয়ে গলে,
কর্ণে শোভে ধুতুরার ফুল।
ভাঙ্ খায় ধুতরা খায়, হেলিয়ে দুলিয়ে যায়,
উপনীত যমুনার কূল।
ঘাটে গিয়ে কুতূহল, পাতিয়ে বাঘের ছাল,
বসিলেন শঙ্কর যোগী।
তখন যাইয়ে ঘাটের ধার, ভাবে ক্ষ্যাপা দিগম্বর,
আহ্নিক পূজা করে সেই যোগী।
তখন ভাবে ভোলা দিগম্বর, কেমনে হইব পার,
নৌকা ডোঙ্গা কিছুই না দেখি।

* * * *

তখন বুঝিতে হরের ভাব, মায়া-নৌকা করে সার,
ডুমনী হইলেন দশভুজা।
একখান মলিন বসন পরি, দাঁড় বৈঠে করে ধরি,
ধীরে ধীরে বাহিছে তরণী।

শিবের সম্মুখ দিয়ে, বাচ্ছেন তরণী বেয়ে,
উজ্জ্বল করিয়ে নদীর কূল।
দেখি শিবের লাগে ধন্দ, কালো জলে ভাসে চন্দ্র,
কালো জলে ভাসে কমল-ফুল।
ডেকে বলে শূলপাণি, কোথা বেয়ে যাও তরণী,
কি নাম তোমার কোথায় আগমন।
কাহার বনিতা হও, কোথা নৌকা বেয়ে যাও,
পিতা মাতা হয় কোন্ জন।
তখন ডেকে বলে ভগবতী, কে ডাক কোথায় বসতি,
কি নাম তোমার কোথায় আগমন।
হর বলে শোন নাম, কৈলাস-শিখরে ধাম,
পিতা মাতা নাই বন্ধুজন।
আমি থাকি তথা একা পড়ি, নগরেতে ভিক্ষা করি,
তে কারণে হেথা আগমন।
যাইব যমুনার পার, কেমনে হইব পার,
সেইজন্তেতে নৌকা প্রয়োজন।
নৌকাখানা দাও তুমি, পার হয়ে যাব আমি,
ভিক্ষা করি নগরে নগরে।
নগরের যত নারী, গৃহকর্ম্ম পরিহরি,
তুষিবেক ভিক্ষা দিয়া মোরে।
নৌকা যদি তুমি চাও, কাণের কুণ্ডল মোরে দাও,
তা হলে ত নৌকা দিতে পারি।
নইলে তুমি ফিরে যাও, দোসরা নৌকা দেখে নাও,
আমার নৌকা দিতে নাহি পারি।
শুনেছি তোমার গুণ, ভণ্ড তুমি একজন,
যোগী সেজে বেড়াও দ্বারে দ্বারে।
যোগি-বেশ আমারে দাও, নৌকাখানা নিয়ে যাও,
তাড়াতাড়ি চড় নৌকাপরে।
নৌকায় পরম সুখ, সোণা করে ঝিক্‌মিক্‌,
চন্দ্রের নিন্দিত বদনখানি।
দেবীর কথা শুনে হর, উঠিল নৌকার'পর,
স্বর্ণময় দেখে নৌকাখানি।
গৌরী বলে দেখ কি, কত ভিক্ষা এনেছি,
ঝুলি ধর ভিক্ষা তোমায় দেব।
তুমি না দেখিয়ে যাও কেনে, ভিক্ষা করতে যাও কনে,
এস এস তোমায় ভিক্ষা দিব।
হর গেল ভিক্ষা নিতে, ঝুলায় গৌরী ভিক্ষা দিতে,
কোথায় গেল মায়ার তরণী।
যেম্নি হর তেম্নি গৌরী শঙ্কর আর শঙ্করী,
একসঙ্গে যুগল মেলানি।
হরগৌরীর মিলন হল, সবে মিলে দুর্গা বল,
এই অবধি গাওনা সাঙ্গ করি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রতীক্ষায়

মোর আশাপথ চাহি ও চারু-নয়ন
আজি রাখে নীল-পদ্মে, দুটি গন্ধ-দীপ,
অনাগত দয়িতের ভবিষ্য-দর্শন
পুলকে শিহরি দেয় তব দেহ-নীপ।

দুগ্ধ-ফেন-শুভ্র ওই কুসুম-শয়নে
যে মালা পড়েছে খসি কণ্ঠ হ'তে তব,
সে মালা কাহারে দিবে মুক্ত-অশ্রুসনে
কম্পিত শিথিল হস্তে ভয়ে অভিনব ?

যার লাগি চাহি আছ হে অভিসারিকা
সুদূর দিগন্ত-পারে, ভবিষ্যের তলে,
তাহারি হৃদয়স্পন্দে ও দেহ-লতিকা
পুষ্পিত, মুঞ্জিত হয় প্রতি পলে পলে।

তোমার আঁখির ছায়া সুনীল গগনে
বেধেছে নয়নে মম, প্রণয়-স্বপনে।

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রায়শ্চিত্ত

১

মধুর সন্ধ্যা। মিত্রদের বাড়ীর সম্মুখে এইমাত্র একটা 'হা-ডুডু' খেলার 'ম্যাচ' হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য বালক-বালিকার দল আনন্দের প্রবল চীৎকারে প্রাঙ্গণটিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সকলেই সেই পাড়ার 'বড়দা'কে লইয়া ব্যস্ত। তাহার খেলা না কি অপূর্ব্ব হইয়াছে। গদাই, মাধাই প্রভৃতি চেপ্‌টা বীরগুলিকে আজ সে কাৎ করিয়াছে। তাই খেলার শেষে সকলেই যখন মিত্রদের বাহিরের দীঘির ঘাটে হাত পা ধুইবার পর সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাস সেবন করিতেছিল, তখন তাহাদের কণ্ঠে 'বড়দা'র প্রশংসাকূজন সন্ধ্যার বাতাসকে অনুরণিত করিয়া তুলিয়াছিল। ছায়াময়মান সন্ধ্যার স্বল্পান্ধকারে সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমি তাহাদের এই আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম। রমেনের এটুকু জীবনের মধ্যে পড়াশুনার দিক্‌টা উন্নত থাকিলেও, শারীরিক ব্যায়ামপটুতা ও খেলাধূলার বিষয়ে যে সে অনেকের নীচে, ইহা আমার অন্তরে অনেক সময় বেদনার সঞ্চার করিত। তাই, আজ তাহার এই কৃতিত্বে আমার পিতৃহৃদয় গর্ব্ব ও পুলকে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল।

রমেন ও নিতিন উভয়কেই আমি সমান স্নেহ করিতাম, ইহা অন্তর্য্যামী নিশ্চয়ই জানেন। রমেন আমার বংশের দুলাল, সে জন্য তাহার প্রতি আমার স্নেহ দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু রমেনের উপর মঙ্গলচিন্তার আশীর্ব্বাদধারা যখন আমার হৃদয় হইতে উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে বর্ষিত হইত, তখন নিতিনকে আমি দূরে রাখিতে পারিতাম না। কিন্তু তাহার পিতা সূর্য্য? থাক্, অশান্ত মনকে এই মধুর সন্ধ্যার মধুরতম মুহূর্ত্তে তিক্ত করিয়া লাভ নাই।

একটা বিরাট ভ্রমে আমরা আমাদের আবাল্য বন্ধুত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছি;—উদারতা তাহার অসীম, কিন্তু আশৈশব বন্ধু বলিয়াই বোধ হয় আমার বিচারশক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রতি ঈর্ষা সে প্রৌঢ় বয়সেও দূর করিতে পারিল না। এই শুভ সন্ধিক্ষণে আবার সেই অপ্রিয় চিন্তা জাগিয়া উঠিতেছে কেন?

দৃষ্টি আবার দীঘির ঘাটে ফিরিয়া গেল। রমেন যখন অজস্র প্রশংসার ডালি গ্রহণ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল, তখন প্রায় ঠিক তাহার পশ্চাতে একটি ছোট মেয়ে নিতিনের কাণে কি যেন বলিয়া গেল। তাহার সেই উৎফুল্ল, ব্যগ্র গতি যেন একটা আকুল আমন্ত্রণ জানাইয়া গেল। আমি জানি, সে নিতিনের সহোদরা—রেখা। তার পর সকলেই যখন বাড়ী যাইতেছিল, রমেনও উঠিল। শুনিলাম, নিতিন বলিতেছে, "তুমি ভাই একটু পরে যেও, বাবা তোমায় একবার ডেকেছেন।"

লঘু হৃদয় লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আমার বংশধর, আমার ভবিষ্যৎ আশার উজ্জ্বল নক্ষত্র, বেশ প্রফুল্লভাবেই গৃহে ফিরিয়া আসিল।

কিশোর সন্তানের উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সূর্য্যের প্রশংসা! তাহাকে সূর্য্য কত আদর করিয়াছেন, কত ভাল ভাল খাবার দিয়া কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইয়াছেন। শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। সূর্য্য রমেনকে বুকে তুলিয়া লইল, তবুও আমার কাছেও আসিতে পারিল না!

একটা কথা ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া আবার ফিরিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ব্যায়ামচর্চ্চা-সংক্রান্ত একখানি সুন্দর বই রমেনকে পড়িতে দিয়া ভবিষ্যতে তাহার দৈহিক উন্নতির জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

২

য়ুরোপের মহাসমরের শান্তিঘোষণার বৎসরে রমেন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ভীষণ বিক্ষোভের পর মহাশান্তির আনন্দের ঢেউ সুদূর ইংলণ্ড হইতে সপ্ত সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া আমাদের ছোট স্কুলটির তটপ্রান্তেও আহত হইল।

হেডমাষ্টার মহাশয় আনন্দজ্ঞাপনের জন্য এক সভায় আহ্বান করিলেন। দেশস্থ অনেক গণ্যমান্য লোকও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সভারম্ভের পর সভাপতি মহাশয় ছেলেদের মধ্য হইতে কাহাকেও বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি একদৃষ্টে রমেনের মুখের দিকে চাহিলাম। রমেন এই সভায় বক্তৃতা করে, ইহা আমার একান্ত অভিপ্রায়। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, সে কি তাহা পারিবে? এমন সময় দেখিলাম, সত্যই রমেন উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার প্রশস্ত ললাটে কয়েকগুচ্ছ চুল উড়িয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। ধীরে ধীরে চুলগুলি দক্ষিণ হস্তে সরাইয়া দিয়া সে নির্ভীকভাবে সভাপতি মহাশয়ের দিকে চাহিল। তার পর সতেজ, সুস্পষ্ট কণ্ঠে সে নাতিদীর্ঘ একটি সুন্দর বক্তৃতা করিল। অতটুকু ছেলে ইংরাজী ভাষায় এমন সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিবে, ইহা আমারও স্বপ্নের অগোচর ছিল। সমস্ত অন্তর অসহ্য পুলকানন্দে অভিভূত হইল। সে আনন্দের প্রবল অশ্রুপ্লাবন

আমি আমার সমস্ত গাম্ভীর্য্যের নিখুঁত অভিনয়েও চাপিতে পারিলাম না। দেখিলাম, সভার সকলেই তাঁহার এই সাহস দেখিয়া বিস্মিত এবং তাহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ। ঘন ঘন করতালির শেষে সভাপতি মহাশয়ের অজস্র প্রশংসাবাদ আমার পিতৃহৃদয়কে গর্ব্বে স্ফীত করিয়া তুলে নাই, এমন কথা বলিতে পারিব না। সভাভঙ্গের পর দেখিলাম, সূর্য্য রমেনকে তাহার সঙ্গে লইয়া চলিয়াছে।

ইহার পর এক দিন আমি রমেনকে যখন স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা পড়াইতেছিলাম, তখন হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "বাবা, সূর্য্য বাবুর ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতাগুলি বাঙ্গালা ভাষায় হ'লেও অনেকটা কেশব বাবুর ধাঁচের ;—আমার বড্ড ভাল লাগে।"

সূর্য্যের প্রতি রমেনের আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, বুঝিলাম। হইবারই কথা। সূর্য্য ত আমারই আবাল্য বন্ধু। তাহার চরিত্রে সহস্র সদ্‌গুণ আছে, তাহা আমার অপেক্ষা আর অধিক কে জানে? পুত্র সূর্য্যের অনুরাগী হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে আপত্তির কোনও কারণ ছিল না। দুরদৃষ্টক্রমে সে আমার সঙ্গ এড়াইয়া চলে, আমিও চলি, ইহা সত্য; কিন্তু আমার অন্তরতম প্রদেশে সূর্য্যের চরিত্রের মাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য কি গভীর রেখাপাত করে নাই?

রমেনকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলাম যে, গুরুজনকে মহাপুরুষের সমকক্ষ ভাবাই উচিত।

৩

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। নিতিন প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে জানিয়া আনন্দ হইল। রমেনও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু তাহার সাফল্যকে গৌরবমণ্ডিত করিবার জন্ম বিভাগীয় একটা মাসিক বৃত্তিরও সে অধিকারী হইয়াছে, সংবাদ পাইলাম। পুত্রের খ্যাতি ও গৌরবে পিতৃহৃদয় স্ফীত হইয়া উঠে, ইহা চিরন্তন সত্য। আমার একমাত্র বংশধর, আদরের দুলাল রমেন, জীবনযাত্রার সোপান-পথে দাঁড়াইয়া কিশোরবয়সেই আমার সাধ ও বাসনাগুলিকে মূর্ত্তি দিয়া চলিয়াছে, এ আনন্দ যে আকণ্ঠ ভরিয়াই উঠিল।

জীবনে কোনও দিন তোমাকে ভুলি নাই, দয়াময়। আনন্দ ও দুঃখ তোমারই আশীর্ব্বাদ বলিয়া নতমস্তকে শিরে ধারণ করিতেই শিখিয়াছি। আজ এ পরমানন্দের দিনে তোমাকে ত ভুলিতে পারি না, বিশ্বেশ্বর।

আমাদের দাম্পত্য জীবনের হ্রদসলিলে রমেন শতদলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার পিতৃহৃদয়ের সহস্র কল্পনা প্রতিদিন বিকসিত হইয়া উঠিতেছিল। সারা জীবন ধরিয়া যে আদর্শ-মানবতার স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছি, পুত্রের কার্য্যে ও চিন্তায়, শরীর ও মনে তাহাকে রূপ দিবার জন্ম আমার অন্তর যে অধীর আগ্রহে উদ্বেল হইয়া উঠিত, তাহা অস্বীকার করিতেই পারি না।

কিন্তু রমেন কি আমার অন্তরের এই একাগ্র কামনার কথা জানে? সে কি জানে, কত বিনিদ্র রজনী আমি শুধু তাহার অনন্ত কল্যাণকামনায় যাপন করিয়াছি? তাহার অগোচরে কত লক্ষবার আমি তাহার সৌম্য দেহের দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া বলিয়াছি, 'ভগবান্, আমার রমেনকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়িয়া তুলিবার সামর্থ্য আমাকে দাও।'

আহারাদির পর সহাস্য মুখে রমেনের জননী, আমার গৃহের শান্তিদায়িনী, লক্ষ্মীরূপিণী গৃহিণী ঘরের মধ্যে আসিলেন। তাঁহার একমাত্র সন্তানের সাফল্যের আনন্দ-গৌরবে আজ তাঁহার দেহের শান্তশ্রী ঝলমল করিতেছিল। প্রৌঢ়ত্বের সীমা-রেখা অনেক দিন অতিক্রম করিয়াছিলাম; গৃহিণীর ললাটেও বয়সের রেখা অঙ্কপাত করিয়াছিল।

পরস্পর পরস্পরের দিকে অনেকক্ষণ নির্ব্বাক্‌ভাবে চাহিয়া রহিলাম। এ আনন্দের দিনে মুখে কথা ফুটিতেছিল না।

তার পর ধীরে ধীরে আমার গৃহলক্ষ্মী সযত্নে আমার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইলেন। বুঝিলাম, তাঁহার অন্তর-সমুদ্রে কি প্রবাহবেগ বহিতেছে।

অতি সন্তর্পণে, অতি আদরে তাঁহাকে কাছে বসাইয়া বলিলাম, "কল্যাণি! তোমার শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। একা আমার চেষ্টায় এ আনন্দলাভের অবকাশ কখনই হ'ত না।"

পরদিবস একটা ভোজের ব্যবস্থা করিলাম। গ্রামের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইল। সূর্য্যকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্ম তাহার বাড়ীর কাছে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইল, রমেন বৃত্তি পাইয়াছে, নিতিন পায় নাই। এ অবস্থায় সূর্য্য এ নিমন্ত্রণকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করিবে না ত? বিশেষতঃ দীর্ঘকাল যাহার সহিত আলাপ বন্ধ। সে হয় ত এই ব্যাপারটাকে অপমানসূচক বলিয়াও মনে করিতে পারে।

অনেক রাত্রিতে আমি দোতলার উপর হইতে দেখিলাম যে, রমেন এক থালা খাবার লইয়া সূর্য্যদের বাড়ীর দিকে যাইতেছে। তাহার প্রীতির আন্তরিকতা দেখিয়া গর্ব্বে আমার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। পরে শুনিলাম যে, সরলপ্রাণ সূর্য্য সানন্দে রমেনের উপহার গ্রহণ করিয়াছিল।

৪

রমেন কলিকাতায় আই-এস্-সি পড়িতেছে। নিতিন আই-এ পড়ে। কলেজও আলাদা, হোষ্টেলও আলাদা, কিন্তু উভয়ের নিবিড় প্রেম নিবিড়তর হইতেছিল; তাহার সংবাদ আমার অগোচর ছিল না। সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে সূর্য্যের প্রীতিকণা—ক্ষীর, মণ্ডা, নাড়ু প্রভৃতিরূপে নিতিনের হাত ধরিয়া প্রায়ই রমেনের 'হোষ্টেলে' আসিয়া তাহার মন-প্রাণ তৃপ্ত করিত, সে সংবাদও জানিতাম। নিতিনের মাতা ছিলেন না; গৃহে অন্য নারীরও অভাব ছিল। সূর্য্যের কন্যা রেখাই স্বহস্তে পিতার তত্ত্বাবধানে সেগুলি প্রস্তুত করিত, ইহা অনুমান করিতে বিন্দু-মাত্র কষ্ট হয় না।

মাতৃহীনা এই কন্যাটির প্রতি একটা অজানা আকর্ষণ ক্রমশঃ আমার প্রাণে জমিয়া উঠিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! জীবনে কখনও তাহাকে ভাল করিয়া দেখি নাই, বা তাহার সম্বন্ধে কোন চিন্তাও আমার ছিল না। তবে তাহার কথা এমনভাবে আজকাল এই হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে কেন?

রমেন কলিকাতা হইতে উচ্ছ্বসিত আবেগভরে তাহার জননীর কাছে যে সকল পত্র লিখিত, তাহার মধ্যে সূর্য্য, নিতিন ও রেখার কথা থাকিত। এই পরিবার হইতে সে যে অযাচিত স্নেহ পাইত, সরল কিশোর তাহা জননীকে না জানাইয়া যেন তৃপ্তি পাইত না।

জানি না, কেন সময় সময় আমারও মনে হইত, সূর্য্য যেন তাহার কন্যাকে অসীম আনন্দে আমার স্নেহময় ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিতে চাহিতেছে।

গ্রীষ্মাবকাশে রমেন দেশে আসিল। দেখিলাম, প্রায় এক বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া তাহার যেন অসম্ভব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছে, কলিকাতার কলের জলে গায়ের রং অনেকটা ফর্সা হইয়াছে, আলাপ-ব্যবহার, কথা-বার্ত্তা সবই যেন একটু আধুনিক সভ্যতার আমেজে রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। বড় বড় লোকের নামগুলি সর্ব্বদা মুখে লাগিয়াই আছে। সরল হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার যেন একটু কমিয়া গিয়া সংযত সন্তোষপ্রকাশে পরিণত হইয়াছে। পরিচ্ছদের ঘটাও যে একটু বাড়িয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাড়ী আসিবার পর সূর্য্যদের বাড়ী সে প্রত্যহই সময় অসময়ে গতায়াত করিতে লাগিল, ইহাও আমার দৃষ্টি এড়াইল না।

কোনও কার্য্যে কোন দিনই আমি তাহাকে বাধা দিই নাই। নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে বিকশিতপ্রায় প্রাণকে চাপিয়া মারিবার পক্ষপাতী কোনও দিনই আমি ছিলাম না। শুধু তাহার কার্য্য লক্ষ্য করিয়া যাইতাম। মনের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাকে সর্ব্বপ্রকার আগাছার আবেষ্টন হইতে বাঁচাইয়া রাখাই আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

এক দিন বৈকালে সূর্য্যদের বাড়ীর কাছেই রাস্তায় দাঁড়াইয়া কতকগুলি লোকের সহিত দেশস্থ একটা গুরুতর ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। অকস্মাৎ আমার পার্শ্ব দিয়া কয়েকটি ভদ্রমহিলা অতি সন্তর্পণে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের দিকে চাহিতেই আমার দৃষ্টি প্রথমেই রেখার উপর পতিত হইল। আমাকে দেখিয়া তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল এবং যতদূর শোনা গেল, এক জন বর্ষীয়সী অতি নিম্নস্বরে যেন বলিলেন, "ওর শ্বশুর কি না, তাই লজ্জায় একেবারে ম'রে গেল।"

বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিল;—তাহা হইলে আমার অনুমান সত্য!

রেখা যেন একখানি লক্ষ্মী-প্রতিমা! রং খুব ফর্সা না হইলেও দেহের এমন লাবণ্য সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! রমেন যে এখনও বালক, এখনও ছাত্র! তাহার উপর আমার শত আশা নির্ভর করিতেছে। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে তাহার কতটুকু পরিপূর্ণ হইবে? সূর্য্য তাহাকে সন্তানের অধিক স্নেহ করে; সে-ও সূর্য্যের সান্নিধ্য যতক্ষণ সম্ভব উপভোগ করে। কিন্তু সূর্য্যের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে যদি এই বালিকার প্রেম রমেনকে আপ্লুত করে, তবে তাহার পরিণাম কি? ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত শাসন যদি স্খলিত হয়?—কি সর্ব্বনাশ! চিন্তাভারগ্রস্ত মনে গৃহে ফিরিলাম।

পড়িবার ঘরে রমেন বসিয়াছিল। সম্মুখে বই খোলা, দৃষ্টি গ্রন্থসংলগ্ন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তাহার মুখে ছাত্রের অধ্যয়নানুরাগের প্রগাঢ়তার চিহ্নের পরিবর্ত্তে চিন্তার ম্লানিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই ধারণা জন্মিল।

কিশোরের অন্তরে প্রথম উন্মুখ যৌবন—তাহার অনাহত কল্পনার স্বপ্নজাল রচনা করিয়া নববধূর ব্রীড়া-সঙ্কোচনত গতিতে কি আমার সন্তানের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে?

সমুদ্রসৈকতে প্রবল জলোচ্ছ্বাস যেমন মুহুর্মুহু আঘাত করিতে থাকে, দারুণ দুশ্চিন্তার তরঙ্গগুলি তেমনই ভাবে আমার মনের তটে আহত হইতে লাগিল।

বিশুদ্ধ প্রেমকে আমি ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করি। মানবজীবনে তাহা একান্ত কাম্য। কিন্তু প্রণয়কে অবলম্বন করিয়া তাহার অন্তরালে যে প্রবল দৈহিক লিপ্সা জাগিয়া উঠে,

তাহা ছাত্রজীবনের যে কত বড় শত্রু, তাহাও ত আমার অজানা নাই। সুতরাং যে কোন উপায়েই হউক, সন্তানকে প্রলোভন হইতে বাঁচাইতেই হইবে। যদি তাহার তরুণ প্রাণে এমনই কোন আকাঙ্ক্ষা আপাতমনোরম রূপ ধরিয়া তাহাকে বিমূঢ় করিবার উপক্রম করিয়া থাকে, তবে তাহার নাগপাশ হইতে রমেনকে রক্ষা করা আমার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—ধর্ম্ম।

কিন্তু সূর্য্যদের গৃহে তাহার গমন নিষিদ্ধ করিয়া দিবার মত হীনতাও ত স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

ভগবান্! প্রকৃত পথ বলিয়া দাও! পিতৃহৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে জয় করিবার শক্তিও দাও, দয়াময়!

৫

রমেনের আকস্মিক পীড়ায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম। কিছুতেই জ্বর ছাড়িতেছে না। সমস্ত পল্লীতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে পল্লীর কাহারও বাড়ীতে কোন বিপদ ঘটিলে গ্রামবাসিগণ সকলেই যেন আকুল হইয়া উঠিতেন; আজকাল সহরের মমতাহীন সংঘর্ষে আসিয়া পল্লীহৃদয়ের সেই কোমলতা একবারেই পাথর হইতে চলিয়াছে। কিন্তু রমেনের সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম।

সন্ধ্যার সময় বাটীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, রমেনের শিয়রে সূর্য্য বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছে। দেখিলাম, তাহার সেই শুষ্ক চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া গিয়াছে। তাহার হৃদয়ের বিশালতার সংবাদ আমার অপেক্ষা বেশী কেহ জানিত না। আমি নীরবে ঘরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। আজ ভাষা আমার মুখে জমিয়া পাথর হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে সূর্য্য বিদায় লইয়া নীরবে বাহিরে গেল। সে-ও কোন কথা কহিল না বটে; কিন্তু তথাপি বুঝিলাম, অনেকখানি সমবেদনা ও উৎকণ্ঠার বোঝা লইয়া সে চলিয়া গেল। আশ্বাসের কোনও বাণীই তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল না বটে; কিন্তু তাহার শব্দহীন ব্যবহারে সে যে দরদী ও মরমী, তাহা কি বুঝিতে পারি নাই?

নানা প্রকার জটিলতার আবির্ভাবে ক্রমে রোগের আকার ভীষণ হইয়া উঠিল। গৃহিণীকে রমেনের শয্যাপার্শ্ব হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও সরাইয়া আনা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

সে অঞ্চলের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ধন্বন্তরি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে রমেনকে সঁপিয়া দিয়াছিলাম। পল্লীর অন্যান্য চিকিৎসকও তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন।

চতুর্দ্দশ দিবসের প্রভাতে ডাক্তার বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন।

"জীবেন বাবু, একটা কথা আছে।"

তাঁহার গম্ভীর ভাব এবং কথা বলিবার ভঙ্গীতে আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার রমেন কি তবে বাঁচিবে না? ডাক্তার বাবু কি সেই নির্ম্মম সংবাদ জানাইবার জন্যই পূর্ব্বাহ্নে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন?

দাঁড়াইয়াছিলাম, ধীরে ধীরে আসনে বসিয়া পড়িলাম। প্রবীণ চিকিৎসক আমার কাছে দাঁড়াইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি ও আপনার স্ত্রী যেভাবে চল্‌ছেন, তাতে আপনাদের নিয়েই শেষে আমাকে বিপদে পড়তে হবে।"

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "রমেন ভাল হয়ে যাবে, তার জন্য চিন্তা করিনে; কিন্তু এ আপনারা কি কর্‌ছেন? অনাহারে অনিদ্রায় শরীরের যে রকম অবস্থা আপনাদের দু'জনের হয়েছে, তাতে—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "আমাদের যা হয়, হোক্। ডাক্তার বাবু! রমেন আমার বাঁচবে ত? আঃ! ভগবান্ আপনার মঙ্গল করবেন।"

আমার দক্ষিণ হস্তে ঈষৎ চাপ দিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আজ রমেনের জ্বর ছাড়্‌বার দিন। চলুন, তাকে দেখে আসি। কিন্তু আমার নিবেদন, আপনার শরীরের উপর যত্ন নিন। নইলে আপনার ছেলেকে শেষ পর্য্যন্ত টেনে তুলবে কে?"

সত্যই কি আমার চেহারা এতই খারাপ হইয়া গিয়াছে? দুই সপ্তাহ ত দর্পণের মুখ দেখি নাই।

ডাক্তার বাবুর সঙ্গে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র কয়েক জন রমণী তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

পরীক্ষার পর হর্ষোৎফুল্ল মুখে ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আজ জ্বর ছেড়ে গেছে।"

চাহিয়া দেখিলাম, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব রমেন উন্মীলিত নেত্রে চাহিয়া আছে। তাহার দৃষ্টি স্বাভাবিক, তবে দীর্ঘ দিনের রোগের ক্লান্তির ছায়া সুস্পষ্ট।

মাথা নত করিয়া সর্ব্বমঙ্গলময়ের চরণে প্রণাম নিবেদন করিলাম। গৃহিণী কিন্তু সমভাবেই রমেনের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার বাবুর কথায় তাঁহার ওষ্ঠাধরে আশার আলোকদীপ্তি প্রকাশ পাইল; কিন্তু নেত্রপল্লবে মুক্তাবিন্দু নৃত্য করিতেছিল।

৬

রমেনকে ফিরাইয়া পাইয়াছি, সে জন্য তাঁহাকে সহস্র প্রণতি।

দিন দিন সে বললাভ করিতেছিল। দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশও শেষ

হইয়া আসিয়াছিল। তাহাকে আবার কলেজে ফিরিয়া যাইতে হইবে। পূর্ব্বস্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ফিরাইয়া না পাইলেও তাহাকে যাইতেই হইবে। আমিও আর আপত্তি করিলাম না।

ষ্টেশন দূরে নহে। রাত্রি ৮টার গাড়ী ছাড়িবে। রমেন পদব্রজেই যাইবে। গ্রামে গরুর গাড়ী ছাড়া অন্য যান-বাহনের ব্যবস্থা ছিল না, পুরুষদের জন্য প্রয়োজনও হইত না।

অল্প পথ গ্রীষ্মের চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় রমেন বন্ধু নিতিনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিবে। ভৃত্য দ্রব্যাদি পূর্ব্বেই ষ্টেশনে লইয়া গিয়াছিল।

শুভক্ষণে, আমাদের পদধূলি লইয়া সন্ধ্যার পরই সে যাত্রা করিল। মনটা যে চঞ্চল ও অধীর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিব না। কিন্তু পুরুষের পক্ষে সে অধীরতা প্রকাশ করা চলে না।

গৃহিণীর ম্লান মুখ দেখিয়া বাহিরের দিকে চলিলাম। পঞ্চমীর চাঁদ সন্ধ্যার মেঘহীন আকাশে দুলিতেছিল। পথের ধূসর রেখা তাহার আলোকে কি স্বপ্নলেখার মত বিচিত্র দেখাইতেছে না?

বাহিরের বাতাসে শরীর ও মনের ক্লান্তি মিটাইবার আশায় পথে নামিয়া পড়িলাম। রমেনের চিন্তাই তখন সমগ্র মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিব না।

ধীরগতিতে চলিলাম। ষ্টেশনে যাইবার পথেই সূর্য্যদের বাড়ী। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে তাহাকে মায়াপুরীর মতই বোধ হইতেছিল।

অল্প দূর হইতে একটা লণ্ঠনের আলো দেখিলাম। আলোক স্ফুটতর না হইলেও দেখিলাম, রমেন বাহিরে দণ্ডায়মান সূর্য্যের চরণধূলি গ্রহণ করিতেছে।

একটা বকুল-গাছ পথটি ছায়ানিবিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারই নিম্নে দাঁড়াইলাম।

সূর্য্য রমেনকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে, তাহাও দৃষ্টি এড়াইল না। বন্ধু! তুমি এখন আমার নিকট হইতে দূরে থাকিয়াই চলিয়াছ সত্য; আমিও তোমার সান্নিধ্য হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াই চলিতেছি। কিন্তু আমার রমেন তোমার স্নেহশীতল হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হউক, এ কামনা মুহূর্ত্তের জন্য ত্যাগ করিতে পারিব না। আমাদের উভয়ের অভিমান উভয়কে প্রৌঢ় বয়সে দূরে রাখিয়াছে, ইহা নিষ্ঠুর সত্য; কিন্তু উভয়ের সন্তানদিগের সম্বন্ধে যেন অবিচার না করি।

দেখিলাম, নিতিন ও রমেন পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সূর্য্য ক্ষণেক সে দিকে চাহিয়া থাকিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত আমিও সূর্য্যের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। সহসা অর্গানের একটা করুণ সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিল। মধুর নারীকণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া শুনিলাম—

"উজাড় ক'রে লও হে আমার যা কিছু সম্বল,—
ওহে চঞ্চল!"

স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম।

এ কণ্ঠ কি সূর্য্যের কন্যা রেখার? শুনিয়াছিলাম, তাহার কন্যাকে সূর্য্য স্বয়ং গান শিখাইয়াছে। এ বিষয়ে সূর্য্য ওস্তাদ, তাহা জানিতাম।

কিন্তু কি করুণ এই সুর! মনস্তত্ত্বের অনেক গ্রন্থই পড়িয়াছিলাম। এ গানের সঙ্গে—

সহসা চাহিয়া দেখিলাম, অদূরে পথের উপর রমেনও থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়াছিলাম বলিয়া রমেন হয় ত আমাকে দেখিতে পায় নাই। নিতিনের আহ্বানে সে আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

মানব-মনের সমস্ত রহস্য কে জানিয়াছে? আমি ত সামান্য মানুষ; জীবনের অভিজ্ঞতারও সীমা আছে।

ভগবান্! এতটুকু শক্তি দিও, যেন অভিমানের মত্ততায় মানুষের প্রতি অবিচার করিয়া না বসি।

কিন্তু—কিন্তু—যদি অনুমানই সত্য হয়, তাহাকে সার্থকতা দিবার অবসর এখনও আসে নাই। রমেন জীবন-যাত্রার পাথেয়-সঞ্চয়ের অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত, অন্য কল্পনা করাও অন্যায়। কিশোর ও কিশোরীর মঙ্গলের জন্য ত বটেই!

চিন্তার বোঝা লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

৭

রমেনকে কলিকাতায় পাঠাইয়া আশা এবং নিরাশা দুই আমার অন্তরে প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিল। পুত্রের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আশৈশব তাহার মনোবৃত্তিগুলির ক্রমবিকাশকে এমন ভাবে আমি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি যে, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সেগুলি কখন্ কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিবে, সে সম্বন্ধেও একটা মোটামুটি ধারণা আমার ছিল। তথাপি কলিকাতার প্রলোভন অসংখ্য এবং দুর্ব্বার। সংযম-শিক্ষা তাহাকে আমি যথেষ্ট দিয়াছি, কেবল উপদেশে নহে, স্বীয় জীবনের দৈনন্দিন প্রতি কার্য্যে। পুত্রের সৎশিক্ষার জন্য, তাহার চোখের উপর একটা জীবন্ত আদর্শ ধরিয়া রাখিবার জন্য আমার যৌবনের সকল প্রবল তৃষ্ণাকে

প্রশমিত করিয়াছি, হৃদয়ে কোন হীন বাসনায় স্থান দিই নাই, পাছে তাহা কোন প্রকারে প্রকাশিত হইলে পুত্র আমার সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

এ হেন পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়া বিচলিত না হইয়া পারিলাম না; কারণ, তাহার প্রতি কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তাহার জীবনের ধারাকে ফিরাইয়া দিবার সেখানে কেহই নাই। তার পর সে দিন সেই সঙ্গীত-শ্রবণে পুত্রের স্খলিত গতি দেখিয়া মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছে, তাহা অমূলক হইতে পারে না।

সে দিন গানের সুরে গায়িকার কণ্ঠ হইতে যে ভাব-ধারা বাহির হইয়াছিল, তাহা অনুভূতি-সঞ্জাত। নিজের যৌবনকালের স্মৃতি দিয়া এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন নহে।

রেখার মত গুণবতী লক্ষ্মী-প্রতিমাকে পুত্রবধূ করিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আমার পুত্র এখন ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিয়া সাধনা করিতেছে। তাহার সে সাধনার সিদ্ধি-লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সে যদি কোনও অনূঢ়ার প্রতিও অসঙ্গত চিন্তার প্রশ্রয় দেয়, তবে তাহার ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত নষ্ট হইয়া যাইবে। এ চিন্তা আমার কাছে অসহ্য। ইহা কল্পনা করিতেও আমার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠে। জীবনে নিজে এ শিক্ষা পাই নাই, পুত্রকেও সে শিক্ষার অবকাশ দিবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি নাই।

এক দিন সংবাদপত্রপাঠে জানিলাম, মহাত্মা গন্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে কলিকাতার কলেজ-স্কুলগুলি শূন্য হইয়া পড়িতেছে এবং ছাত্রের দল স্বেচ্ছাসেবক হইয়া জেলে যাইতেছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া জানিলাম যে, রমেন কলেজ যাওয়া বন্ধ করিয়াছে।

দেশ-প্রেমে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। যাহার স্বদেশ-প্রীতি নাই, তাহার মনুষ্যজীবন ব্যর্থ। কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাকে বাদ দিলে চলিবে না। শিক্ষা মূল ভিত্তি, ইহার উপর গড়িয়া উঠিবে একটা বিরাট মনুষ্যত্ব। ছাত্র-জীবনে অধ্যয়নই মূল লক্ষ্য থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

গৃহিণীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। প্রথমে ত তিনি কাঁদিয়াই আকুল। তার পর দুই জনেই তাহাকে বাড়ী আসিতে লিখিলাম। রমেন কখনও আমাদের অবাধ্য হয় নাই। তাই, আমাদের এই আদেশ পালন করিতে তাহার এক দিনও বিলম্ব হইল না।

কিন্তু সে যখন আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া আমি একবারেই হতাশ হইলাম। একটা নিদারুণ নেশা যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। বড় বড় নেতাদের স্বদেশী বুলিগুলি সে খুব মুখস্থ করিয়াছে এবং দেশোদ্ধারের জন্য তাহাকে যেন একটা কিছু করিতেই হইবে, অথচ কি যে করিবে, তাহা সে বুঝিতেই পারিতেছে না। আমার শিক্ষা সে ভুলে নাই, কিন্তু স্বদেশী বক্তাদের ওজস্বিনী বক্তৃতার ঝঙ্কার যেন তাহার কর্ণকুহরকে বধির করিয়া ফেলিয়াছে। কোন উপদেশ বা ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তা তাহার মনের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করে নাই। বুঝিলাম, সন্তান লক্ষ্যভ্রষ্ট, বিচার-বিবেচনা না করিয়াই, নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া একটা স্রোতে ভাসিয়া চলিবার উপক্রম করিয়াছে। কিশোর বয়স, বুদ্ধি অপরিণত, সুতরাং তাহার এ ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

৮

আমার গৃহিণী অত্যন্ত সরলা। সহজ বুদ্ধি দিয়াই তিনি সরলভাবে সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া দেখিতেন। তাঁহার নাম মানসী, কিন্তু গোপন করিব না, আমার জীবনে তিনি প্রকৃতই মানসী ছিলেন। তিনি আমার কোনও কার্য্যের কখনও প্রতিবাদ করিতেন না—আমার কাযে যে দোষত্রুটি থাকিতে পারে, ইহা তাঁহার কল্পনার অতীত ছিল। ইহাতে আমার মাঝে মাঝে বড় অসুবিধা হইত। সংসারে এমন এক জন লোকের আমার অভাব ছিল, যিনি আমার চোখে আঙ্গুল দিয়া দোষ দেখাইয়া দিতে পারেন। মানসী সে দিক্ দিয়াও যাইতেন না। আমাকে লইয়াই যেন তাঁহার আনন্দ। ছেলে পাইয়া তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। কয়েক দিন পরে মানসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"রমেনের মনের অবস্থা কি রকম দেখছো?"

তিনি একগাল হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমি ত সে সব কিছুই ভাবিনি।"

আমি আর কোন প্রশ্ন নিরর্থক মনে করিলাম।

এক দিন প্রাতঃকালে দেখিলাম, রমেন ও নিতিন কতকগুলি ছেলে লইয়া একটি পল্লী-সংস্কার-সমিতি গঠন করিতেছে। এ বিষয়ে আমার খুবই উৎসাহ ছিল। মিথ্যা ভদ্রতার অভিমান ভুলিয়া সামান্য মজুরদের মত পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে যে পল্লী-সংস্কার করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিলাম। কোন কাযেই হৈ চৈ করা আমার কোন দিনই স্পৃহনীয় ছিল না। সুতরাং পল্লী-সংস্কারের কয়েকটি প্রয়োজনীয় কায এই ছেলেদের উপর চাপাইয়া দিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, রমেন ও নিতিন স্বহস্তে দেশের কায করিতে গিয়া আপনা হইতেই স্বদেশপ্রেমের প্রকৃত পরিচয় পাইবে, আসল ও নকলের পার্থক্য

বুঝিতে পারিবে। তার পর শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা ভ্রম করিয়াছে কি না, তাহাও বুঝিতে পারিবে।

পল্লী-সংস্কার কার্য্য যখন দ্রুতবেগে চলিয়াছে, সেই সময় সূর্য্যের কন্যা রেখার সহিত রমেনের বিবাহের প্রস্তাব আমার কাছে আসিল। সূর্য্যের এই সৃষ্টিছাড়া পছন্দ দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। রমেন এখন নিতান্ত ছন্নছাড়া—কলেজে আর কোনকালেই ঢুকিবে কি না সন্দেহ, বরং তাহার পরিবর্ত্তে পল্লী-সংস্কারের দারুণ উন্মাদনার ফলে অতি শীঘ্রই তাহার শ্রীঘর-বাস হইলেও হইতে পারে। এরূপ পাত্রের হস্তে কেহ কন্যা সম্প্রদান করিতে চাহে? ইহাতে তাহার কন্যার ভবিষ্যৎ কোথায়? গৃহিণীর নিকট আমার গোপন করিবার কিছুই ছিল না; কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবসংক্রান্ত বিষয়ের কোনও কথা তাঁহার সহিত এখনই আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিলাম না।

ধীর-চিত্তে বিষয়টির পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া মনে হইল, এ বিবাহে সম্মতিদান বর্ত্তমানে আমার পক্ষে অসম্ভব। রেখা যদি আমারই কন্যা হইত, তাহা হইলে আমি কি এইরূপ উদ্দেশ্যহীন, ভবিষ্যৎবিহীন কোনও যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দিতে পারিতাম?

অন্তরের মধ্য হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া বলিল, 'না, না!—ইহা হইতেই পারে না!'

এমন একটা ক্ষিপ্ত জীবনের সঙ্গে এমন সুন্দর একটি বালিকার ইহ-পরকালকে বাঁধিয়া দিলে তাহার ভবিষ্যৎ কখনই সুন্দর হইতে পারে না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল—দুঃখ, যন্ত্রণা, নৈরাশ্য। তাহার জন্য ভগবানের চরণে 'জবাবদিহি' আমাকেই বেশী পরিমাণে করিতে হইবে,—ইহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বিশ্বাস করিতাম।

আমার এই প্রত্যাখ্যান সূর্য্যকে নিদারুণ পীড়া দিয়াছিল, তাহা বুঝিয়াছিলাম। পিতৃহৃদয় দিয়া আমি অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম যে, সূর্য্যের বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহার কন্যা মনে মনে রমেনের অনুরাগিণী। আমার পুত্রের চরিত্রমাধুর্য্য, রূপ এবং অন্যান্য গুণ সুকুমারমতি বালিকার চিত্তে সম্ভ্রম, শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সেই সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাবৃদ্ধি হইতে আকর্ষণ ও অনুরাগ সঞ্জাত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। রমেন সূর্য্যের প্রীতিভাজন, তাহার পুত্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু, স্বজাতি ও স্বগ্রামবাসী। সুতরাং প্রিয়দর্শন ও সচ্চরিত্র পাত্রে কন্যাদান করিবার সাধ সূর্য্যের পক্ষে সত্যই বাঞ্ছনীয়। এজন্য আমি সূর্য্যের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু তথাপি সূর্য্যের পক্ষে কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা আরও সুনিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল। অহেতুক অভিমানভরে সে এত দিন আমাকে এড়াইয়া চলিয়াছিল। শুধু কন্যার জন্য সে সমগ্র পূর্ব্বস্মৃতিকে বিসর্জ্জন দিয়া আমার কাছে অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু আমার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান তাহাকে মাটীতে মিশাইয়া দিবে, তাহা আমিও জানিতাম। আর জানিতাম, তাহার এই ক্ষোভের বেদনা কখনও দূরীভূত হইবে না।

কিন্তু কর্ত্তব্য অত্যন্ত কঠোর।

৯

আমার অনুমান যে সত্য, প্রায়ই তাহার পরিচয় পাইতে লাগিলাম। পথে প্রান্তরে সূর্য্যের পরিচিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। পূর্ব্বের মতই সে আমাকে এড়াইয়া চলিত, কিন্তু যে প্রসন্ন হাস্য পূর্ব্বে তাহার অধরপ্রান্তে দেখিতে পাইতাম, তাহা এখন অন্তর্হিত হইয়াছিল। আমার প্রত্যাখ্যানকে সে বোধ হয় ব্যক্তিগত অপমান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

বন্ধু!—বন্ধু!—হাঁ, সূর্য্য আমার হৃদয়ে সেই চিরপুরাতন স্থানই অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সে স্থান হইতে তাহার বিচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনামাত্রই নাই।

ইচ্ছা হইল, তাহাকে খুলিয়া বলি, বন্ধু, আমাকে ভুল বুঝিও না। বৃহত্তর কর্ত্তব্যের অনুরোধে, ভবিষ্যতের মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই নিষ্ঠুরের মত কায করিতে হইয়াছে। বাহিরের বন্ধুত্ববন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে—উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বের মিল নাই বলিয়া প্রতিশোধবশে তোমার কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করি নাই।

কিন্তু দুর্ব্বল মন। কার্য্যকালে গোপন তথ্যটুকু ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।

রমেনের পল্লী-সংস্কার চলিতেছিল। সাধ্যমত আমি তাহাদের দলটিকে সাহায্য করিতাম। সূর্য্যও তাহাদের দলে মাঝে মাঝে যোগ দিত। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও সে সরিয়া দাঁড়াইল না।

রমেন এ বিবাহ-প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিয়াছিল কি না, জানিতে পারিলাম না। অন্ততঃ তাহার ব্যবহারে ও আকৃতিতে আমার সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নূতন কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিল না।

রেখার তরফ হইতে কোনও কথা জানিবার উপায় ছিল না। এক একবার মনে হইত, যদি সত্যই রেখার মনে রমেনের স্মৃতি রেখাপাত করিয়া থাকে? এ চিন্তায় সত্যই আমি অধীর ও

চঞ্চল হইয়া পড়িতাম।" অবশ্য এক একবার মনে হইত, সূর্য্য যেরূপ অভিমানী, তাহাতে সে আপনাকে নিতান্ত নিরুপায় মনে না করিলে আমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইত না।

বিচার আমার চিরদিনই একটু কঠিন, কিন্তু অবিচারের নামেও আমি শিহরিয়া উঠি। তাই এই সম্পর্কে প্রায়ই আমার মনে হইত, যেন সে সরলা বালিকার উপর আমি হয় ত একটু অবিচারই করিতেছি। কিন্তু যাহা সত্য, সে সংবাদ ত আমায় কেহই দিল না! কত দিন ইচ্ছা হইয়াছে, মানসীকে আমার অন্তরের সকল কথাই খুলিয়া বলি। কিন্তু তিনি যেরূপ স্নেহময়ী, হয় ত আমার কোন তর্কই তিনি শুনিবেন না।

সে দিন সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। ফিরিতে একটু রাত্রি হইয়া গেল। মৃদু জ্যোৎস্নালোক ভালই লাগিতেছিল।

সূর্য্যদের বাড়ীর কাছে আসিতেই একটা মধুর গানের ছত্র আমার কাণে প্রবেশ করিল। দাঁড়াইলাম। কাণ পাতিয়া শুনিলাম, নারীকণ্ঠে গাহিতেছে—"নিও হে নিও!"

সঙ্গীতের আমি চিরদিনই ভক্ত। সুতরাং মৃদু জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া অর্গানের সুরে ঝঙ্কৃত, বেদনা-বিধুর কণ্ঠের সে সঙ্গীত সত্যই আমার সমগ্র অন্তরকে আলোড়িত করিয়া দিল।

"বেদনায় ভ'রে গিয়েছে পেয়ালা—
নিও হে নিও।"

মনে হইল, ইহা ত গান নহে! ইহা যেন বিদীর্ণহৃদয় মানবের সমগ্র অন্তর মথিত করিয়া একটা আকুল শোকোচ্ছ্বাস সর্ব্বসন্তাপহারীর চরণে অশ্রুধারা নিবেদন করিতেছে! পুরুষের কঠিন হৃদয় শতধা দীর্ণ হইয়া গেল। নয়নপথে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল—গোপন করিব না।

না, আমারই ভ্রম। সত্যই রেখা তাহার সর্ব্বস্ব নীরবে রমেনকে বিলাইয়া দিয়াছে। এই সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে সত্য জাগ্রত হইয়া উঠিল। কিশোরী রমেনের অনুরাগিণী। চক্ষু মুছিয়া চাহিতেই সূর্য্যের বাড়ীর সম্মুখস্থ দীঘির ঘাটে দেখিলাম, আমারই রমেন নিতিনের কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে। দ্রুতপদে গৃহের দিকে চলিলাম।

সকল সমস্যারই বোধ হয় সে দিন সমাধান হইত; কিন্তু গৃহে ফিরিয়াই কলিকাতায় আমার এক আত্মীয়ের পত্র পাইলাম। তাহাতে লেখা ছিল, ছাত্রের দল আবার কলেজে ঢুকিতেছে। সুতরাং রমেনকে পাঠাইতে হইবে। রমেন যখন ফিরিল, দেখিলাম, তাহার মুখখানি বিরস, বিবর্ণ। অন্তরের সকল উদ্বেগ পাথর-চাপা দিয়া অতি কষ্টে বলিলাম,—

"রমেন, কাল তোমায় কলকাতায় যেতে হবে;—কলেজ খুলেছে।"

এতটুকু আপত্তিও সে জানাইল না। সে দিন মানসীর নিকট আমার মনের অর্গল খুলিয়া দিলাম। স্নেহময়ীর নয়নে অশ্রুবন্যা বহিল। সমস্ত রাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না।

১০

আই, এস, সি সাফল্যের সহিত পাশ করিয়া রমেন চারি বৎসর হইল শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। এখন তাহার বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনে চিন্তা জাগিতেছিল। রেখার সম্বন্ধে অনেক কথাই আমি ও মানসী বলাবলি করিতাম। এখনও পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু তাহার পিতা আর একবারও প্রস্তাব করিল না। বহুদিন ইচ্ছা হইয়াছে, সূর্য্যের নিকট গিয়া রেখার সহিত রমেনের বিবাহ-প্রস্তাব করি; কিন্তু পারিলাম না। অভিমান ও লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। সূর্য্যের ক্ষুব্ধ অন্তর বোধ হয় ত্যাগের ভিতর দিয়া শান্তি খুঁজিতে সচেষ্ট হইয়াছিল।

নিতিন আজকাল আর আমাদের বাড়ীতে আসিত না। রমেনও তাহাদের বাড়ীতে যাইত না। যে সঙ্কোচ ও লজ্জা সূর্য্য এবং আমার মধ্যে এতখানি ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে, বোধ হয়, সেই রকমই একটা কিছু তাহাদের উভয়ের আবাল্য সখ্য বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। সবই বুঝিলাম। তিলে তিলে অন্তর আমার দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু বাহিরে এতটুকুও কেহ জানিল না।

কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় যাইতে হইল। কায সারিয়া শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোষ্টেলে রমেনকে দেখিতে গিয়া জানিলাম, সে তখন ক্লাস করিতেছে। তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া সকল আস্‌বাবপত্র বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। মাথার কাছে অনেকগুলি নীরস বই'এর মধ্যে একখানি বাঙ্গালা 'ওমর খৈয়ম' রহিয়াছে। বইখানির নাম শুনিয়াছি। কৌতুহল হইল, বইখানি একবার দেখি। পাতা খুলিতে খুলিতে হঠাৎ একখানি চিঠির উপর নজর পড়িল। ডাকে দেওয়া হইবে বলিয়াই বোধ হয় একখানি খামের ভিতর রাখা হইয়াছে। কিন্তু তখনও আঁটিয়া দেওয়া হয় নাই। কি জানি কেন, চিঠিখানি পড়িবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিলাম না। পড়িলাম,—

"প্রিয় নিতিন,

তোমার পত্রে মর্ম্মাহত হইলাম। আমি পঙ্গু। পিতার মতের বিরুদ্ধে যাওয়া দূরে থাকুক, বোধ হয়, ইহ-জীবনেও বিবাহ সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। যে শিক্ষা

আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহাতে আমার পক্ষে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা মোটেই সম্ভব নয়। তিনি দেবতা, জন্মদাতা ও গুরু। তাঁহার সম্বন্ধে কোনও বিচার করিবার ক্ষমতা এবং স্পৃহা আমার নাই। রেখা যে কেন আমাকে ভালবাসিল, জানি না ; আমি তাহাকে কখনও ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি নাই। তথাপি অস্বীকার করিব না, আমি তাহার বিশেষ পক্ষপাতী এবং গুণমুগ্ধ। হয় ত আমাদের উভয়ের বিবাহ হইলে উভয়েই সুখী হইতে পারিতাম ; কিন্তু পিতামাতার অমতে আমি স্বর্গসুখও চাহি না। আশীর্ব্বাদ করি, রেখার উপযুক্ত বরই হউক। প্রার্থনা করি, আমার স্মৃতি তাহার অন্তর হইতে একবারেই মুছিয়া যাক্।

আশা করি, কুশলে আছ। পূজ্যপদে প্রণাম। আমার আন্তরিক ভালবাসা লইও। ইতি—তোমারই রমেন।"

দেহের প্রতি শিরা উপশিরায় যেন একটা প্রবল তুষার-স্রোত বহিয়া গেল। কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত। শুধু যে রেখাই মরণপথের যাত্রী, তাহা নহে, রেখার এই সর্ব্বনাশের পর বোধ হয়, আমার রমেনও সেই পথেই অগ্রসর হইবে! সে রেখাকে ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসাকে শুধু আমারই অনুশাসনে অন্তরের অতি নিভৃত গুহায় চিরনিক্ষিপ্ত করিতে চাহে, বাহিরে প্রকাশ করিয়া পিতার প্রতি অশ্রদ্ধা জানাইবে না। সমস্ত দুঃখের বোঝা সে নিজেই বহিবে, অন্য কাহাকেও ব্যথিত করিবে না। এত বড় মহান্ আদর্শ যে সন্তান আমার কোথা হইতে পাইল, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। এক দিকে তাহার এই অপূর্ব্ব ত্যাগের মহিমায় সমস্ত মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল, আবার অন্য দিকে কি দারুণ সর্ব্বনাশের আগুন যে আমার সংসারে জ্বলিয়া উঠিতে চলিয়াছে, তাহা ভাবিয়া আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম।

রেখার চিন্তাই আমাকে সমধিক বিব্রত ও অধীর করিয়া তুলিল। যে দেশে সীতা, সতী, সাবিত্রী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে সেই দেশের মাটীতেই জন্মিয়াছে। রমেনের প্রতি যদি তাহার অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি সত্যই অন্যের পত্নী হইয়া সুখী হইতে পারিবে—বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে ?

সমস্যা জটিল।

রমেন ক্লাস হইতে ফিরিয়া আসিল। আমাকে দেখিয়া সে আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে সে প্রতারিত করিতে পারিল না।

সামান্য আলোচনার পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

১১

সেই দিন হইতে আমি প্রত্যহই সূর্য্যের নিকট হইতে আর একটি অনুরোধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে অনুরোধ আর আসিল না। রমেনের পড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। চারিদিক হইতে বিবাহের অসংখ্য প্রস্তাব আসিতে লাগিল। কিন্তু সূর্য্য নির্ম্মমভাবে নীরব রহিয়া গেল। মাঝে মাঝে তাহার উপর আমার বড় রাগ হইত।

এক দিন দেখিলাম, সূর্য্য আমার বাড়ীর দিকে আসিতেছে। আগ্রহ-কম্পিত হৃদয়ে আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। নিকটে কেহই ছিল না। সূর্য্য নিকটে আসিয়া তাহার ম্লান বিষণ্ণ মুখ তুলিয়া বলিল,—'জীবেন, কাল আমার রেখার বিয়ে। তোমার নেমন্তন্ন, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে যেও, ভাই।"

আমি যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। অবশেষে সূর্য্য আমার সহিত কথা কহিল ? এ যে স্বপ্নেরও অতীত। রেখার বিবাহ ? সেই বিবাহে আমাকে যোগদান করিতে হইবে ? এ যে একসঙ্গে সৃষ্টি ও লয়। অন্তরাত্মা বিপুল আবেগে আমার কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলিল।

কি যেন বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সূর্য্য তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ আমার ঠক্‌ঠক্ কাঁপিতে লাগিল। একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, এই বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আমার এতটুকুও স্থানও কখনও হইবে কি না। কি মহাপাপ করিলাম! সূর্য্য কন্যাকে বলি দিতে প্রস্তুত, তবুও তাহার মনুষ্যত্ব বিক্রয় করিবে না! মনে হইল, কি নিদারুণ প্রতিশোধ সে আমার উপর লইল।

কাল প্রভাতে রেখার বিবাহ-বাদ্য বাজিয়া উঠিবে! ইহা মিলনের সঙ্কেত, না—

চিন্তা করিতেও মন হা হা করিয়া উঠিল।

গৃহিণী সুপ্তিমগ্ন। গভীর নিশীথে নিদ্রাহীন নেত্রে শয্যার উপর পড়িয়া রহিলাম।

পথ কোথায় ? উপায় কি ? হে বিশ্ব-নিয়ন্তা! রক্ষা কর, মহাপাপ হইতে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দাও! অপরাধী শুধু আমি!—আমি!

অনেকক্ষণ পরে অসাড় দেহটা নিদ্রার কোলে হেলিয়া পড়িল। তন্দ্রাঘোরে দেখিলাম, ধীরে ধীরে যেন কে এক অবগুণ্ঠিতা করযোড়ে আমার দিকে আসিতে লাগিল। আরও কাছে—আরও কাছে। কম্পিত হস্তে আমি তাহার অবগুণ্ঠন সরাইয়া দিলাম। এ কি! এ যে রেখা! কিন্তু সে রূপ কোথায় ? তাহার

দীর্ঘায়ত নয়নযুগল যেন জলভরে টলমল করিতেছে। তরুণী নত হইয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। তখন যেন সেই নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ মূর্ত্তি কাঁদিয়া বলিল,—

"বাবা,—বাবা!—"

"মা—মা—" বলিয়া চীৎকার করিতেই মানসী জাগিয়া উঠিলেন। আমার একটা ধাক্কা দিতেই জাগিয়া দেখিলাম যে, ভোর হইয়াছে। হঠাৎ দরজায় যেন কাহারও করাঘাত শুনিতে পাইলাম। দরজা খুলিয়াই দেখিলাম, রমেন দণ্ডায়মান।

"কখন্ এলে বাবা?" বলিতে যেন আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত মুখ হইতে কেবল "এইমাত্র" শব্দই শুনিলাম। সে মুখের দিকে আর দ্বিতীয়বার চাহিতে পারিলাম না।

১২

শুনিলাম, সূর্য্য নাকি সমস্ত দিনে পাঁচবার মূর্চ্ছা গিয়াছে। তাহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইতেছে না। বুঝিলাম, কি নিদারুণ মনস্তাপকে চাপিয়া রাখিতে গিয়া সূর্য্য আজ জীবন ও মৃত্যুর সম্মুখীন। আমি, শুধু আমিই এই শোচনীয়, মর্ম্মন্তুদ অবস্থার জন্ম দায়ী। উপায় কি?—কোন্ পথ অবলম্বন করিলে মুক্তি পাইতে পারি? ভগবান্! ভগবান্!

সংবাদ পাইলাম, সূর্য্য এইমাত্র আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহ-বাটীতে শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। আর স্থির থাকিতে পারিলাম না।

তখন অপরাহ্নের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। বিবাহ-মণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। সজোরে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিলাম। হৃৎপিণ্ডের উদ্দাম গতিকে একটুও প্রশমিত করিতে পারা যায় না কি?

বর তখনও আসে নাই। সজ্জিত বিবাহমণ্ডপ আলোকিত হইলেও যেন নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হইল। সমবেত আত্মীয়স্বজন ও নিমন্ত্রিতগণের সকলেরই মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

অদূরে দেখিলাম, নিতিন ও রমেন শুষ্ক-মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

নিতিনকে ডাকিয়া বলিলাম যে, আমি একবার সূর্য্যের সঙ্গে দেখা করিতে চাই। সে আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া চলিল। একটি ঘরের মধ্যে সূর্য্য শায়িত ছিল। তাহার মূর্চ্ছা তখন ভাঙ্গিয়াছে। সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল।

আমি কম্পিতচরণে তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। ধীরে ধীরে তাহার দক্ষিণ করপুট উভয় করে চাপিয়া বলিলাম, "সূর্য্য, ভাই!"

সে একবার উদাস দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। বোধ হয়, আমার অন্তরের ভীষণ ঝটিকার সুস্পষ্ট চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকিবে, আমার মনের অনুশোচনার জ্বালা মুখে চোখে প্রতিফলিত হইয়া থাকিবে।

তাহার নয়নে অশ্রুসিন্ধু উদ্বেলিয়া উঠিল। ভগ্নকণ্ঠে বলিলাম,—"আমায় ক্ষমা কর। যদি প্রায়শ্চিত্তের—"

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পার্শ্বের কক্ষে সমবেত নারী-কণ্ঠের মিশ্রিত শঙ্কাব্যাকুল কলরব উত্থিত হইল।

সূর্য্য ত্বরিত-গতিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুষ্টিবদ্ধ করপল্লবে আমার করপ্রকোষ্ঠ আবদ্ধ ছিল। আমিও তাহার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

পার্শ্বস্থ কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলাম, চেলাঞ্চলা, স্বর্ণাভরণা তরুণী পাট পিঁড়ির উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্বর্ণকান্তির উপর কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। নিস্পন্দ দেহ, নিমীলিত নেত্র, ঈষৎ বিস্ফারিত ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া যেন একটা অব্যক্ত, অকথিত বেদনার বাণী মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে!

সূর্য্য উন্মত্তের ন্যায় আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "নিষ্ঠুর, এ তোমারই কীর্ত্তি!"

তাহার দেহ ভীষণভাবে স্পন্দিত হইয়া আমার বিশাল বুকের উপর এলাইয়া পড়িল। দুই হাতে তাহাকে ধারণ করিয়া পার্শ্বস্থ মাদুরের উপর শোয়াইয়া দিলাম। পাখার বাতাস, জলের ঝাপ্টা দুইটি মূর্চ্ছিত দেহের উপর চলিতে লাগিল।

চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "নিতিন! নিতিন!—এ বিয়ে এখনই বন্ধ কর। রেখা আমার বাড়ীতেই যাবে।"

কে এক জন ভিড়ের মধ্য হইতে বলিল, "তা হয় না। মেয়ে যে অন্যের বাগ্দত্তা! তা ছাড়া হিন্দুর মেয়ে যে, আজ রাত্রেই—"

চীৎকার করিয়া বলিলাম, "সে আমি জানি। সে ব্যবস্থা করা হবে। তার পর বাগ্দত্তা?—কিন্তু শুধু কথার চেয়ে কথা ও প্রাণের দাম অনেক বেশী। তা ছাড়া বহু দিন থেকেই সে আমার বাগ্দত্তা পুত্রবধূ।—বন্ধু, বন্ধু! ওঠো, রেখা আমার মা, রেখা আমার গৃহলক্ষ্মী! ওঠ, ভাই—"

শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী (বি, এস্, সি)।

রহস্যের খাসমহল

ত্রিংশ প্রবাহ

নূতন তথ্য

আমরা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া পুনঃ পুনঃ ঘণ্টাধ্বনি করিয়াও কাহারও সাড়া পাইলাম না। সিঁড়ির উপরের ধাপে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, সেই ধাপটি ভাঙ্গিয়া নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সাদা কালো টালিগুলি অপসারিত হইয়াছিল। দ্বারের উভয় পার্শ্বের জানালার খড়খড়িগুলি বন্ধ।

যেসি পুনর্ব্বার ঘণ্টাধ্বনি করিয়া সাড়া না পাওয়ায় বলিল, "এ কি! বাড়ীতে কি কেহই নাই? বাড়ী বন্ধ না কি? কাকা এখানে না থাকিলেও বাড়ী পাহারা দেওয়ার জন্য কাহাকেও রাখিয়া গিয়াছেন ত?"

আমি কোন কথা না বলিয়া বারান্দার দিকে চাহিয়া রহিলাম, সন্ধ্যার অস্ফুট আলোকে তাহা রহস্যাবৃত বলিয়া মনে হইল। পথের আলোকস্তম্ভ-শিরে তখন দীপগুলি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি আমার কর্ণগোচর হইল। তাহা যেন সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল।

আমি উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি বাতায়ন দেখিতে পাইলাম, সেই বাতায়ন হইতেই পূর্ব্বে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত-চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলাম; ক্লীন ও বার্ণেস সেখানে বাস করিয়াও তাহা কেন দেখিতে পায় নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আরও বিস্ময়ের বিষয়, যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে সেই বিদ্যুৎপ্রভা উৎপাদিত হইয়াছিল, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সেই কক্ষে সেরূপ কোন যন্ত্র দেখিতে পাই নাই।

আমি যেসিকে বলিলাম, "এই বাড়ীই ত তোমাদের, যেসি? তোমার ভুল হয় নাই?"

যেসি বলিল, "ভুল হইবে কেন? এই বাড়ীই আমাদের; নিজের বাড়ী কি চিনিতে পারা যায় না?"

আমি বলিলাম, "কোণের ঐ বাড়ীখান কার?"

যেসি বলিল, "ওখানা কাহার বাড়ী, জানি না, ওখানে কে বাস করে, তাহাও জানি না, ঐ বাড়ী অনেক দিন হইতে খালি পড়িয়াছিল জানিতাম।"

আমি বলিলাম, "ক্লীন ঐ বাড়ীতেই বাস করে। তোমার কাকা এক সময় হয় ত এই বাড়ীতে বাস করিতেন, কিন্তু তিনি কোণের ঐ বাড়ীতে পরে উঠিয়া গিয়াছিলেন।"

আমরা পুনর্ব্বার ঘণ্টাধ্বনি করিয়া, এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া জানালাগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। সকল জানালারই খড়খড়ি বন্ধ দেখিলাম। অতঃপর ক্লীনের সহিত সাক্ষাৎ করাই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। হঠাৎ দ্বারের পার্শ্বস্থ একটি জানালার দিকে চাহিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম, জানালার খড়খড়ির পাখীগুলি ধীরে ধীরে উঠিয়া আবার নামিয়া পড়িল। তবে কি কেহ সেই কক্ষের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া আমাদের লক্ষ্য করিতেছিল?

কিন্তু আমি যেন তাহা দেখিতে পাই নাই, এইভাবে মাথা ফিরাইয়া যেসির সহিত গল্প করিতে লাগিলাম; যেসি তাহার পিতৃব্যের জর্ম্মাণ ভৃত্যের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অধীর হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম, কিন্তু আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

আমার ভ্রম, না সত্যই কেহ সেই কক্ষে লুকাইয়া বসিয়াছিল?

যাহা হউক, আমরা অতঃপর ডেভেরো স্কোয়ারের বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইয়া সাড়া দিলাম; কয়েক মিনিট পরে ক্লীন দরজা খুলিয়া দিল। সে যেসির মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! মিস্ রোজালি, তুমি এখানে? তুমি ফিরিয়া আসিলে, আমাদের মনিব কোথায়?"

যেসি বলিল, "কাকা দেশান্তরে আছেন, আমি সমুদ্র-তীরে ইষ্টবোর্ণ গ্রামে ছিলাম।"

আমরা হলঘরে প্রবেশ করিলে যেসি সেই কক্ষের আসবাবপত্র দেখিয়া বলিল, "বড় মজা ত! আমরা কি এই বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছি?"

ক্লীন বলিল, "তাহা জানি না, মিস্! কেন্‌সিংটনের হাই ষ্ট্রীট ষ্টেশনে এক দিন বৈকালে আমি তোমাকে একবার-মাত্র দেখিয়াছিলাম। তুমি তখন মিস্ যোয়ানের সঙ্গে ছিলে, তাহা কি তোমার স্মরণ হইতেছে না? আমি তাঁহার জন্য একখানা চিঠি লইয়া গিয়াছিলাম।"

যেসি কহিল, "হাঁ, মনে পড়িয়াছে বটে ; আমরা যখন সেরিংহামে যাইতেছিলাম, সেই সময় তুমি আমাদের লগেজের পাহারায় ছিলে। তুমি আমাদিগকে কিংস ক্রশের একখানি ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিয়াছিলে।"

ক্লীন বলিল, "আমি বাড়ী-বদল সম্বন্ধে কোন কথা জানি না ; তোমার কাকা যখন আমাকে কাযে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই বাড়ীতেই ছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি কোথায় বাস করিতেন ?"

যেসি বলিল, "ল্যাঙ্লে ষ্ট্রীটের মোড়ের ঐ প্রথম বাড়ীতে ; আমরা প্রথমে সেই বাড়ীতেই গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার দ্বার-জানালা সমস্তই বন্ধ দেখিলাম।"

ক্লীন বলিল, "সেই খালি বাড়ীটা ? তিনি কি সেই বাড়ীতে বাস করিতেন ?"

যেসি বলিল, "হাঁ, সেখানেই ত বাস করিতাম। এই বাড়ী কতকাল খালি পড়িয়াছিল ; 'এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে' বলিয়া দরজায় একখান কার্ড ঝুলিত।"

মুহূর্ত্তমধ্যে আমি সকলই বুঝিতে পারিলাম। যেসিকে ক্লীনের নিকট মিস্ রোজালি বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা পরস্পরকে আর কোন দিন দেখিতে পায় নাই। কুপ তাহার বাড়ী হইতে আসবাবপত্রাদি এখানে স্থানান্তরিত করিয়াছিল। তাহার পর সে এই নূতন বাড়ীতে ক্লীনকে নিযুক্ত করিয়াছিল। ক্লীন তাহাকে সম্ভ্রান্ত নগরবাসী মিঃ থরল্ড বলিয়াই জানিত। সে যে উন্মত্ত অপরাধী কার্ল কুপ, ইহা সে ধারণা করিতে পারে নাই।

আমার মনে হইল, যেসিও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। ক্লীনের সঙ্গে কোথায় কি ভাবে তাহার দেখা হইয়াছিল, তাহা সে আমাকে বলিয়াছিল। ক্লীনকে হাই ষ্ট্রীটের ভূগর্ভস্থ রেল-ষ্টেশনে আসিতে বলা হইলে সে সেখানে আসিয়াছিল। যোয়ানের পিতা তাহাকে যে সুপারিশ চিঠি দিয়াছিল, তাহা লইয়া সে জোয়ানের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। ক্লীন তাহাদিগকে একটি রেস্তরাঁয় লইয়া গিয়াছিল, সেখানে তাহারা আহারাদি শেষ করিয়া কুপের সহিত যোগদানের জন্ম লণ্ডনে যাত্রা করিয়াছিল। কুপ সে সময় সেরিংহামে বাস করিতেছিল।

যেসি কোন দিন সোফেয়ার বার্ণেসকে দেখিবার সুযোগ পায় নাই। বার্ণেস ক্লীনের সঙ্গেই কুপের চাকরী গ্রহ করিয়াছিল ; কিন্তু যেসি সে সময় লেক্সহাম গার্ডেন্‌সে বা করিত বলিয়া তাহাকে কোন দিন দেখিতে পায় নাই যেসি যে দিন প্রথম আমাকে কুপের বাড়ীতে লই গিয়াছিল, ইহা সেই বাড়ী নহে এবং এই বাড়ীর দ্বিতল বাতায়ন হইতেও আমরা সাঙ্কেতিক বৈদ্যুতিক আলো দেখিতে পাই নাই ; অথচ এই উভয় অট্টালিকার সাদৃ এরূপ অধিক যে, এই বাড়ীখানি অন্যবাড়ী বলিয়া ভ্র হইতেছিল।

যেসি যখন ভোজনের কক্ষে জর্ম্মাণ ভৃত্যটার সঙ্গে গ করিতেছিল, সেই সময় আমি টেলিফোনের কলের কা উপস্থিত হইয়া ডেনম্যানকে টেলিফোনে ডাকিলাম। আ তাঁহাকে ট্যাক্সি লইয়া অবিলম্বে আমার নিকট উপস্থি হইতে অনুরোধ করায় তিনি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকা করিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, "বেশ, আমি এখন গিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিতেছি।"

প্রায় পনের মিনিট পরে তিনি আমার নিকট উপস্থি হইলেন। আমি যেসিকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিলাম।

যেসি বলিল, "কাকা কেন যে এ বাড়ীতে উঠি আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এ বাড়ী আমা ভাল লাগিতেছে না।"

ডেনম্যান আমায় কাণে কাণে বলিলেন, "আমরা অন্য বাড়ীখান পরীক্ষা করিয়া দেখিব, মিঃ কোলক্রাক্স! সেখানে আমরা হয় ত কোন কাযের জিনিষ দেখিতে পাইব।"

আমি বলিলাম, "আমি প্রস্তুত আছি ; অন্য কোন লোক আমাদের সঙ্গে লইবার প্রয়োজন নাই, কেবল আমরাই দুই জনে যাইব, কি বলেন ?"

ডেনম্যান বলিলেন, "আপনার যেরূপ অভিরুচি। আমি মনে করিতেছিলাম, ক্রেণকে 'ফোন' করিব। অন্য কাযেও তাহাকে কাছে রাখিবার প্রয়োজন হইতে পারে।"

আমার সম্মতিক্রমে ডেনম্যান বিভাগীয় ডিটেক্টিভ ইন্‌স্পেক্টরকে টেলিফোনে ডাকিলেন। ক্রেণ তখন ডাইন ষ্ট্রীটের থানায় ছিলেন।

ডেনম্যান ক্রেণের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, সেই সময় আমি ডেনম্যানকে বলিলাম, আমরা প্রথমে যে বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং যাহা রহস্যের খাসমহল

বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, সেই বাড়ীর একটি বাতায়নের অন্তরালে কেহ লুকাইয়া থাকিয়া খড়খড়ির পাখী তুলিয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

আমার কথা শুনিয়া ডেনম্যান বলিলেন, "উহা আপনার দৃষ্টিবিভ্রম। আমিও কখন কখন ঐরূপ রুদ্ধ বাতায়নের দিকে চাহিয়া থাকায় আমার মনে হইত, কেহ খড়খড়ির পাখী তুলিয়া আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে! কিন্তু পরে আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি, উহা আমার কল্পনামাত্র।"

আমি বলিলাম, "না, আমি খড়খড়ির পাখী উঠিতে এবং মুহূর্ত্ত পরে নামিয়া পড়িতে দেখিয়াছি, তাহা দৃষ্টিবিভ্রম বা কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। আমার বিশ্বাস, কেহ সেখানে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিতেছিল—কাহারা বারান্দায় উঠিয়া দরজায় ধাক্কা দিতেছিল।"

ডেনম্যান হাসিয়া বলিলেন, "আপনার সন্দেহ সমূলক কি না, তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিব।"

আমরা উভয়ে ভোজন-কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিয়া দেখিলাম, যেসি তখনও ক্লীনের সহিত গল্প করিতেছিল। যেসি আমাকে দেখিয়াই বলিল, "ক্লীন বলিতেছিল, কাল সে কাকা মহাশয়ের পত্র পাইয়াছে। তিনি ভালই আছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, যোয়ান এখানেই আছে, কিন্তু সে-ও ত এখন বিদেশে। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া আমি বড় নিরাশ হইয়াছি। তাহাকে দেখিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

আমি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলাম, "তুমি ব্যস্ত হইও না, যেসি! শীঘ্রই তাহার দেখা পাইবে। কিন্তু তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, আগে তাহার উত্তর দাও। তোমার কাকা কার্লকে কি কেহ কোন দিন মিঃ থরন্ড বলিয়া ডাকিয়াছে? তোমার কাকার ঐ নামটির কথা তুমি জানিতে কি?" আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার বিস্ফারিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া রহিলাম।

যেসি আমার প্রশ্নে বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিল, "থরন্ড! হাঁ, অনেক লোকই ত কাকাকে থরন্ড বলিয়া ডাকে। তাঁহার পুরা নামই যে থরন্ড কুপার। আপনি কি তাহা জানিতেন না? হেন্‌রিক তাঁহাকে থরন্ড বলিয়া ডাকে। বার্ণেস্‌কে আমি এই প্রথম দেখিলাম, কিন্তু সে-ও তাঁহার ঐ নামই বলিল। বার্ণেস্ বেশ লোক, তাহাকে আমার পছন্দ হইয়াছে, আপনার কেমন মনে হয়?"

বালিকার সরলতায় মুগ্ধ হইলাম।

আমরা প্রায় ১৫ মিনিট ভোজনের কক্ষে বসিয়া রহিলাম। যেসি আমাদের অদূরে একখান আরাম-কেদারায় বসিয়া প্রফুল্লভাবে নানা অবান্তরকথা বলিতে লাগিল। ক্লীন আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। লোকটা খাঁটি জর্ম্মাণ; সরল, বিনয়ী, আজ্ঞাবহ; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে যদি তাহা তাহার মনিবের স্বার্থের প্রতিকূল না হয়, তাহা হইলে সরলভাবে সে কথার উত্তর দিয়া থাকে। প্রভুভক্তি জর্ম্মাণ ভৃত্যগণের চরিত্রগত বিশেষত্ব।

অবশেষে ক্রেণ আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে আমরা সকলে যেসির নির্দ্দেশানুযায়ী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল। ক্লীনের নিকট আমাদের মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিব বলিয়া যেসিকে আশ্বস্ত করিয়া আমরা সেই অট্টালিকার বাহিরে আসিলাম। কয়েক মিনিট পরে আমরা পূর্ব্বোক্ত নীল রঙ্গের দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ক্রেণ তাহার পকেট হইতে তিনটি ক্ষুদ্র বিজলী-বাতি বাহির করিল। সে আমাকে ও ডেনম্যানকে দুইটি বাতি দিয়া অবশিষ্টটি নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিল। তাহার পর সে পকেট হইতে একখানি অস্ত্র বাহির করিয়া তাহার স্ক্রু আঁটিলে তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তস্করেরা যে অস্ত্রের সাহায্যে রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করে—তাহা সেইরূপ অস্ত্র।

ডেনম্যান সেই অট্টালিকার দ্বার-জানালাগুলি বিজলী-বাতির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "জানালার পরিবর্ত্তে দ্বার খুলিয়া ফেল। তাহাই অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে। কোন বাড়ীর দ্বার ও জানালা বন্ধ থাকিলে আমি জানালা না খুলিয়া দ্বার খুলিয়াই সেই বাড়ীতে প্রবেশ করি।"

সেই সময় এক জন কন্‌ষ্টেবল ধীরে ধীরে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ডেনম্যান বলিলেন, "ক্রেণ, ঐ কন্‌ষ্টেবলটাকে অদূরে অপেক্ষা করিতে বল। তাহাকে

আমাদের প্রয়োজন হইতে পারে, ডাকিলেই সে যেন আমাদের কাছে আসে।"

"আমি বলিয়া আসিতেছি"—বলিয়া ক্রেণ বারান্দা হইতে নামিয়া কন্‌ষ্টেবলটির নিকট অগ্রসর হইল। সে কন্‌ষ্টেবলকে নিম্নস্বরে মিঃ ডেনম্যানের আদেশ জ্ঞাপন করিয়া আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিল। সে দ্বার খুলিবার অস্ত্রটি আমার কাছে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার হাতে দিলাম। সে তাহার অগ্রভাগ দ্বারের কপাট ও চৌকাঠের সংযোগস্থলে পুরিয়া চাপ দিতেই 'মড়াৎ' করিয়া একটা শব্দ হইল, তখন সে তাহা খুলিয়া কপাটের অন্য দিকে পুরিয়া দিল এবং তাহার পর তাহা চাপিয়া ধরিয়া সম্মুখে আকর্ষণ করিল, কিন্তু তাহা টানিয়া বাহির করিতে পারিল না, দ্বারের কপাটও অটুট রহিল। মুহূর্ত্ত পরে ডেনম্যান সেই অস্ত্রের গোড়া ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিতেই কপাটের সহিত তাহা খুলিয়া আসিল, দ্বার উন্মুক্ত হইল।

সেই শব্দ শুনিয়া ঘরের ভিতর হইতে কোন ব্যক্তি দ্বারের নিকট উপস্থিত না হওয়ায় আমরা বুঝিতে পারিলাম, সেই অট্টালিকায় জনমানবের সমাগম ছিল না। আমরা বিজলী-বাতির আলোকে হলঘরে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে দোতলার সিঁড়ি চিনিতে পারিলাম। সিঁড়ির গালিচা অপসারিত হওয়ায় তাহার নগ্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। আমার স্মরণ হইল, এই সিঁড়ি দিয়া প্রথম যে দিন দোতলায় রহস্যের খাসমহলে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সে দিন এই সিঁড়ির পাদদেশে কুপ ও তাহার আরব ভৃত্য দাঁড়াইয়াছিল।

হাঁ, এত দিন পরে আমি সেই রহস্যাবৃত অট্টালিকায় পুনঃ প্রবেশ করিলাম। আমি প্রথম যে দিন এখানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বে ও পরে অনেকেই আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের কেহই এই স্থান হইতে জীবিত অবস্থায় বাহিরে যাইতে পারে নাই। সেই কক্ষের রুদ্ধ বায়ুস্তর স্যাঁতা ও দুঃসহ মনে হইল। কারণ, নভেম্বর মাস হইতে সেখানে আলো ও বাহিরের বাতাস প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু যে রাত্রিতে আমি সর্ব্বপ্রথম এখানে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, সেই রাত্রিতে গন্ধকের গন্ধবৎ যে গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল—আজও ঠিক সেইরূপ গন্ধ অনুভব করিলাম।

শত্রু-গৃহেই হউক আর মিত্র-ভবনেই হউক—যেখানেই প্রবেশ করা যাউক, সেই ঘরেই কোন না কোন রকম গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা সেই গৃহেরই বিশেষত্বসূচক। যাহাদের ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ, তাহারা সেই গন্ধের সাহায্যে সেই গৃহ চিনিতে পারে। এমন কি, বহুকাল পরে সেই গৃহে প্রবেশ করিলে সেই গন্ধের কথা তাহার স্মরণ হয়।

এই গৃহ সম্বন্ধেও তাহাই হইল। আমি বহুদিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়া যে গন্ধ পাইয়াছিলাম, এত দিন পরে আজ এখানে প্রবেশ করিয়া ঠিক সেই গন্ধই পাইলাম। সেই স্মরণীয় রাত্রির ভীষণ দৃশ্য আমার মনশ্চক্ষুতে প্রতিফলিত হইল। আমার মনে হইল, যেন চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে সেই সকল লোমাঞ্চকর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। ত্রাসে আমার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল।

মিঃ ডেনম্যানের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম, "হাঁ, ইহা সেই স্থানই বটে, আমি ঠিক চিনিয়াছি।"

আমরা একে একে বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া সকল কক্ষই পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু প্রত্যেক কক্ষই আসবাব-পত্রাদিবর্জ্জিত, নগ্ন, নির্জ্জন। সৌভাগ্যক্রমে ক্রেণ এক স্থানে বৈদ্যুতিক আলোকের প্রধান সুইচ দেখিতে পাইল। আমরা সুইচ টিপিয়া চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিলাম। সেই আলোকে নির্জ্জন অট্টালিকার স্তব্ধতা, শূন্যতা ও ভীষণতা আমার সঙ্গিদ্বয়কেও অভিভূত করিয়া তুলিল। তাঁহারা আতঙ্কবিহ্বল-হৃদয়ে প্রত্যেক কক্ষে ঘুরিয়া কি একটা ভীষণ রহস্যের আবিষ্কারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একটা অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সে কিরূপ আশঙ্কা, তাহা আমার বুঝাইবার শক্তি নাই। কিন্তু আমার মনে হইল, সত্যই সেখানে কেহ লুকাইয়া থাকিয়া আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল এবং আমাদিগকে বিপন্ন করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল। তথাপি তখন আমি এই কথা ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, যে নিবিড় রহস্যজাল ভেদ করিবার জন্য আমি এত দিন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে সফল-মনোরথ হইতে আর আমাদের অধিক বিলম্ব নাই।

মরলীধ্বনি

একত্রিংশ প্রবাহ

রহস্যের খাসমহল আবিষ্কার

আমরা কাঠের সিঁড়ির সাহায্যে দোতলায় উঠিতে লাগিলাম। নির্জ্জন শূন্যগৃহে আমাদের পদশব্দের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলাম। ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেই কক্ষটি ডেভেরো স্কোয়ারের বাড়ীর ড্রয়িং-রুমেরই অনুরূপ, কেবল আকারে একটু ছোট মনে হইল; অন্য সকল বিষয়েই তাহাদের সাদৃশ্য ছিল।

আমরা তিন জনে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম।

ক্রেণ বলিল, "এই কক্ষটি ঠিক সেই কক্ষের মত; অদ্ভুত ব্যাপার!"

আমি বলিলাম, "অন্যান্য কক্ষ অন্য রকম দেখিতে পাইব। চল, বিভিন্ন কক্ষ ঘুরিয়া পরীক্ষা করি।"

আমরা সেই কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে যাইব, সেই সময় এক কোণে একখান ভাঙ্গা চেয়ার দেখিতে পাইলাম, অব্যবহার্য্য বোধে তাহা সেখানে কেহ ফেলিয়া রাখিয়াছিল। তাহার উপর কি একটা সাদা জিনিষ পড়িয়াছিল দেখিয়া আমি সেই চেয়ারের নিকট উপস্থিত হইলাম। একখানি সাদা কাগজের ঠোঙ্গার ভিতর অর্দ্ধভুক্ত 'স্যাণ্ডউইচ' দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

আমি তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলাম, "অল্পকাল পূর্ব্বে এখানে কোন লোক ছিল; টাটকা 'স্যাণ্ডউইচ'খানা খাইতে খাইতে কেহ এখানে ফেলিয়া গিয়াছে।"

ডেনম্যান তৎক্ষণাৎ আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্যাণ্ডউইচখানা হাতে লইয়া বলিলেন, "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে। কেহ অল্পকাল পূর্ব্বেই ইহার এক অংশ ভাঙ্গিয়া খাইয়াছিল। আপনি জানালার খড়খড়ির পাখী উঠা-নামা করিতে দেখিয়াছিলেন, তাহা এখন সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে; উহা আপনার কল্পনা নহে।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি ঠিকই দেখিয়াছিলাম; আমরা ঘরগুলি খুঁজিয়া দেখিলে সেই লোকটাকে নিশ্চিতই ধরিতে পারিব; চলুন, আর বিলম্ব করা হইবে না।"

ডেনম্যান ক্রেণকে বলিলেন, "ক্রেণ, তুমি নীচে যাও; খিড়কির দিকের ঘরগুলির দরজা বন্ধ আছে কি না, অগ্রে পরীক্ষা করিবে, তাহার পর সম্মুখের দ্বারে পাহারায় থাকিবে। সেই কনষ্টেবলটাকে বাড়ীর ভিতর আসিতে আদেশ করিবে; তাহাকে দরকার হইতে পারে।"

ক্রেণ বলিল, "আপনার আদেশ পালন করিতে চলিলাম।"

একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় আমরা উভয়েই উৎকণ্ঠিত হইলাম। ডেনম্যান সতর্ক রহিলেন, আমি আমার ব্রাউনিং পিস্তল বাহির করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বিপদ্ কোন্ দিক্ হইতে আসিবে, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না! ড্রয়িং-রুমের বাহিরে সিঁড়ির দরজার কাছে আমি পাহারায় রহিলাম। ডেনম্যান নীচের কামরাগুলি খানাতল্লাস করিবার জন্য ক্রেণের সহিত যোগদান করিতে চলিলেন। কনষ্টেবলটা নীচের ঘরে প্রবেশ করিলে তাহাকে হলঘরের পাহারায় নিযুক্ত করা হইল।

কনষ্টেবলটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "বাড়ীতে কি চোর ঢুকিয়াছে?—সে আমার সম্মুখ দিয়া পলাইতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম, "চোর কি অন্য কেহ, তাহা আমার জানা নাই।"

ডেনম্যান ক্রেণকে সঙ্গে লইয়া নীচের বিভিন্ন কক্ষ খুলিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; এক কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কোন কক্ষে কোন ব্যক্তির সন্ধান না পাইলেও আমি বুঝিতে পারিলাম, কোনও স্থানে কেহ লুকাইয়া আছে। আমি বহির্দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন যেসির সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম, সেই সময় কেহ লুকাইয়া থাকিয়া আমাদের দেখিতেছিল—ইহা আমি অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

ডেনম্যান ও ক্রেণ পরীক্ষা করিয়া আমার নিকট আসিলেন। ডেনম্যান বলিলেন, তিনি সেই কক্ষে আধবোতল 'ভিসিজল' দেখিতে পাইয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সেই অট্টালিকায় গোপনে বাস করিতেছিল, সে খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

অবশেষে ডেনম্যান ও ক্রেণ হলঘরে উপস্থিত হইলেন।

ডেনম্যান বলিলেন, "নীচে কাহারও সন্ধান পাইলাম না, মিঃ কোল্‌ফাক্স! আমি কনষ্টেবলটাকে পাহ

রাখিয়াছি। কাহাকেও দেখিতে পাইলে সে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।”

আমি পিস্তল হাতে লইয়া তাঁহাদের সহিত দ্বিতলের অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলাম। আমরা ক্রেণকে সিঁড়ির কাছে পাহারায় রাখিয়া চারি পাঁচটি কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। পূর্ব্বে সেই কক্ষগুলি শয়নকক্ষরূপে ব্যবহৃত হইত। সেই সময় সেই কক্ষগুলি সুসজ্জিত ছিল, এখন দেখিলাম, সেগুলিতে কোন আসবাবপত্র নাই, তাহা খালি। কোণগুলি, কাবোর্ড সমূহ পরীক্ষা করিয়া জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না।

অতঃপর আমরা রুদ্ধনিশ্বাসে সর্ব্বোচ্চ সোপানশ্রেণী দিয়া উঠিয়া সম্মুখে যে দ্বার দেখিতে পাইলাম, তাহা রুদ্ধ ছিল। আমি সেই দ্বারের হাতল ঘুরাইয়া ঠেলিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুইচ টিপিয়া কক্ষটি আলোকিত করিলাম; আমার সর্ব্বাঙ্গ মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। এত দিন আমি যাহার অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, ইহাই সেই ‘রহস্যের খাসমহল’। এত দিন পরে আমি তাহার অভ্যন্তরে উপস্থিত!

আমি সর্ব্বপ্রথম যে রাত্রিতে এখানে আসিয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, আমার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইয়াছিল, সেই রাত্রিতে আমি এখানে যে সকল সামগ্রী দেখিয়াছিলাম, এত দিন পরেও সেগুলি দেখিতে পাইলাম। সেই ধূসর গালিচা, ফরাসী দেশজাত সুদৃশ্য আসবাবপত্র, উন্মত্ত চিত্রকরের অঙ্কিত সেই সকল ভীষণদর্শন চিত্রাবলী—কোন দ্রব্যেরই পরিবর্ত্তন বা অভাব দেখিলাম না। আমার সঙ্গিদ্বয় স্পন্দিত-বক্ষে ও বিস্ফারিত-নেত্রে অমানুষিক নির্য্যাতনের সেই সকল লোমহর্ষণ আলেখ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমি আমার প্রিয়তমার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলের ভীষণ চিত্র নিরীক্ষণ করিলাম। নরপিশাচ ইব্রাহিম তাহার শিরাবহুল কঠিন হস্তদ্বয়ের গ্রন্থিবিশিষ্ট, পরিপুষ্ট ও কদাকার অঙ্গুলি দ্বারা তাহার কোমল কণ্ঠ এরূপ সজোরে টিপিয়া ধরিয়াছিল যে, সেই রূপবতী নারীর চক্ষু দুইটি অক্ষি-কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়াছিল, এবং তাহার উন্মুক্ত মুখবিবর হইতে জিহ্বাও বাহির হইয়াছিল। নিদারুণ যন্ত্রণায় তাহার মুখ বিকৃত! সেই চিত্র দেখিয়া আমার হৃদয় আতঙ্কে পূর্ণ হইল। সেই চিত্রের পার্শ্বে কয়েকটি পুরুষ, রমণী এবং বালক-বালিকার চিত্রও দেখিলাম। তাহাদের মুখে মৃত্যু-যন্ত্রণা পরিস্ফুট, সেই সকল চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলাম, কিরূপ দক্ষতার সহিত তাহাদের মুখে আতঙ্ক, উদ্বেগ, মর্ম্মবেদনা, কয়েকটি রেখার সাহায্যে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া চিত্রকরের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না; কিন্তু প্রতিভার এইরূপ অপপ্রয়োগে হৃদয় ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে অধীর হইয়া উঠে।

মিঃ ডেনম্যান স্তম্ভিত-হৃদয়ে চিত্রগুলি নিরীক্ষণ করিয়া আমাকে বলিলেন, “আপনি কি আমাকে এই সকল চিত্রের কথাই বলিয়াছিলেন, মিঃ কোল্‌ফাক্স! মানুষের মুখের এরূপ আতঙ্কজনক চিত্র আমি জীবনে কখন দেখি নাই। উঃ, কি ভীষণ নির্যাতনের দৃশ্য!”

আমি বলিলাম, “হাঁ, মানুষকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবার সময় তাহাদের মুখভাবের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ঐ দেখুন, আমার মুখের চিত্র, কিন্তু ঐ চিত্রখানি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। এই সকল চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় চিত্রকরের অঙ্গুলি কম্পিত হয় নাই, তুলিকা অচল হয় নাই। কোন চিত্রকর কি স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা অঙ্কিত করিতে পারে?”

ক্রেণ বলিল, “কিন্তু ঐ চিত্রে আপনার মুখাকৃতি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে, মিঃ কোলফাক্স! চিত্রখানি অসম্পূর্ণ থাকিলেও উহা আপনারই চিত্র।”

যে সময় সেই চিত্র অঙ্কিত হইতেছিল, সেই সময়ের কথা আমার স্মরণ হইল। সেই স্মরণীয় রাত্রিতে আমাকে এই কক্ষে বন্দী করিয়া কুপ এই চিত্র অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু সে তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই, এবং আমার বিশ্বাস, ইহাই তাহার অঙ্কিত শেষ চিত্র।

অতঃপর আমি অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া গজদন্তনির্ম্মিত ঘণ্টার বোতামটি পরীক্ষা করিলাম। আমি সেই প্রথমবার যখন সেই বোতামটি স্পর্শ করিয়াছিলাম, সেই সময় সেই কক্ষের আলোক হঠাৎ নিবিয়া গিয়াছিল। এবার আমি বোতামটি অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ না করিয়া আমার বিজলী বাতির সাহায্যে মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা

করিলাম, এবং আমার সঙ্গিদ্বয়কে বোতামটির বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য বলিলাম, এই বোতামে অঙ্গুলির চাপ দিলেই একটি শূন্যগর্ভ সূচি বাহির হইয়া আসে; সেই সূচির ভিতর এক প্রকার তরল ভৈষজ্য রস সংগুপ্ত আছে, সূচির আকস্মিক সংস্পর্শে অঙ্গুলি বিদ্ধ হইলে সেই উগ্র রস দেহে অনুপ্রবিষ্ট হয়।

আমার কথা শুনিয়া ডেনম্যান বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক কৌশল! আমি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চাকরী করিতেছি, কিন্তু এ রকম ভয়ঙ্কর ব্যাপার কখন দেখি নাই। কুপ যে প্রতিভাশালী লোক, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।"

'ম্যাণ্টেল সেল্‌ফে'র পাশে একখানি দীর্ঘাকার দর্পণ ছিল, তাহাতে আমার প্রতিকৃতি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমার মুখ মলিন হইয়াছে এবং আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি! আমি পূর্ব্বে যে চেয়ারখানিতে বসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম, সেই চেয়ারখানি তখনও সেই স্থানে সংস্থাপিত দেখিলাম। তাহা দেখিয়া আমার স্মরণ হইল, আমি যখন মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, সেই সময় ইব্রাহিম একখানি স্পঞ্জ দ্বারা আমার নাসিকা চাপিয়া ধরিলে আমার মৃতকল্প দেহে জীবনীশক্তি ক্ষণকালের জন্য ফিরিয়া আসিয়াছিল; সেই সময় আমার মনে হইয়াছিল, মৃত্যুকবল হইতে আমি হঠাৎ যেন জীবনের রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছি।

আমি সেই চেয়ারের অদূরে দাঁড়াইয়া যখন এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম, তখন আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, অতি অল্পকাল পূর্ব্বে সেই সকল কাণ্ড ঘটিয়াছে! আমি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইলাম, নরপিশাচ কুপ আমার অদূরে বসিয়া রঙ্গ ও তুলি লইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে নিশ্চিন্ত-মনে আমার মৃত্যুযাতনা-বিকৃত মুখের ছবি আঁকিতেছে এবং তাহার আরব-ভৃত্য বিকটাকার ইব্রাহিম পৈশাচিক মুখভঙ্গী করিয়া আরক্তিম-নেত্রে আমার পাশে দাঁড়াইয়া আছে!—সেই দৃশ্য স্মরণ হওয়ায় আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, আমি অতি কষ্টে আত্মসংবরণে সমর্থ হইলাম। আমার সঙ্গিদ্বয় বিস্ময়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিরূপ চিন্তায় আমার হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি? কিন্তু তাঁহারা আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

ডেনম্যান বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। মুহূর্ত্ত পরে আমি তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলাম। আমি প্রথমে যে দিন এখানে দাঁড়াইয়া সেই কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন রাত্রিতে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ হইল; কিন্তু আজও তাহার অধিক কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তিনটি অট্টালিকার পশ্চাৎস্থিত উচ্চ প্রাচীরে আমাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল। কিন্তু প্রথম বাড়ীখানির পাশে একটি বাতায়ন দেখিতে পাইলাম, সেই বাতায়নটি আমার সম্মুখস্থ বাতায়নেরই অনুরূপ। আমি বুঝিতে পারিলাম—এই বাতায়নটি হইতেই পূর্ব্বোক্ত নীল আলোকের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলাম। ক্রেণ সেই জানালার ধারি ও তাহার অদূরবর্ত্তী কোণ পরীক্ষা করিয়া বলিল, "এই যে এখানে এক বাণ্ডিল বৈদ্যুতিক তার পড়িয়া আছে!"—সে গালিচার এক প্রান্ত হইতে তারের বাণ্ডিলটি টানিয়া বাহির করিল; তাহা গালিচার নীচে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

আমরা সেই কক্ষের কার্ণিশ পরীক্ষা করিয়া তাহার অন্তরালে বৈদ্যুতিক তার খাটাইবার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম; তার সেই বাতায়নের ঊর্দ্ধে নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। কারণ, তারের মাথায় যে দুইটি শূন্য-গর্ভ পাতলা কাচের চোঙ ছিল, তাহাও আমরা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। সেই চোঙ দুইটি তিন ফুট দীর্ঘ ও চারি ইঞ্চি স্থূল।

ডেনম্যান বলিলেন, "এখানে বোধ হয়, কোন অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সংস্থাপিত ছিল। নীচের একটি নিভৃত কক্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি শক্তিশালী যন্ত্র দেখিয়া আসিয়াছি। তেলের এঞ্জিনের সাহায্যে তাহা পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। তাহা হইতেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইত। সে এই যন্ত্রের সাহায্যে কোনরূপ বৈদ্যুতিক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল কি না, জানি না, তবে ইহা কোন নূতন ধরণের বে-তার যন্ত্র হইতেও পারে।"

আমি বলিলাম, "আপনার এই অনুমান অসঙ্গত নহে, উভয় তারের সংযোগসাধন হইলে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ এবং

কার্চনল হইতে অন্যটির ভিতর প্রবেশ করিত ; সেই স্ফুলিঙ্গই আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

ডেনম্যান বলিলেন, "কিন্তু তাহা অন্য বাড়ীর জানালায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "সে'কথা সত্য ; আমার বিশ্বাস, ঐ জানালার ভিতরের দিকে ঐরূপ কোন যন্ত্র স্থাপিত আছে ; সেই জানালা হইতে যে আলো বাহির হয়, তাহাই সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই কক্ষের আলোক দৃষ্টির অগোচর থাকে। প্রকৃত রহস্যভেদের জন্য পরে আমা-দিগকে তদন্ত করিয়া দেখিতে হইবে।"

অতঃপর আমি ছবিগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া পূর্ব্বোক্ত গুপ্ত গহ্বরটি আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অনেকগুলি চিত্রপট পরীক্ষার পর একটি সুন্দরী যুবতীর চিত্র স্পর্শ করিলাম। একটি ক্ষুদ্রাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ সর্প তাহার গালে দংশন করিয়াছিল, সেই অবস্থায় সে সাপটিকে ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল ; সেই বিষধর সর্পের দংশনে তাহার মুখমণ্ডলে যে আতঙ্কপূর্ণ হতাশভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এবং যে যন্ত্রণায় সে অধীর হইয়াছিল, তাহা সেই চিত্রে এরূপ সুকৌশলে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, চিত্রকরের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। আমি সেই চিত্রখানি এক পাশে সরাইতেই তাহার পশ্চাৎস্থিত অন্ধকারময় গহ্বরটি আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইল।

আমরা সম্মুখে ঝুঁকিয়া সেই গহ্বরটি পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইতেই একটা চিম্‌সে গন্ধ আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। আমি আমার হাতের বৈদ্যুতিক বাতি সেই গহ্বরদ্বারে প্রবিষ্ট করিয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া যে ভীষণ দৃশ্য দেখিলাম, তাহা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার স্মরণ থাকিবে! আমি সভয়ে আর্ত্তনাদ করিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ সরিয়া দাঁড়াইতেই ডেন্‌ম্যান সেই দিকে মাথা বাড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "অবশেষে সন্ধান পাওয়া গেল!" [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

যাত্রা-রাগ

দুর্দ্দিন-ঘন দুঃখের রাতি,—বারিধারা উচ্ছল,—
আগল খুলিয়া পাগলরা সব বাহিরিলি আজ কা'রা?
তিমির তুফান ছাপিয়াছে পথ—দিঠির দু'কুল হারা,—
আকাশে যে নেই তারা,—

গতির তরণী ভিড়াবি কোথায় পথিক যাত্রিদল?
"পিছু ডেকে কিবা ফল,
প্রাণ আজি চঞ্চল—
দূরের বাঁশরী গাহে অভিসার,
সুরে চলি পাওদল!"

রাত্রির রাহী—শঙ্কা কি নাহি, কে দেখাবে রাহ বল্,—
নিরুদ্দেশের যাত্রীরা সব কোথা যাস গৃহ ছাড়া?
"ঘর হ'তে শ্রেয় বৃহত্তরের, বাহিরের পেনু সাড়া ;
এই পথে গেছে তা'রা—
খৃষ্ট, বুদ্ধ, কবীর, নানক, দাদু, রবিদাস।—চল্,
হোক্ পথ পিচ্ছল,
প্রাণ আজি চঞ্চল—
দূরের বাঁশরী গাহে অভিসার,
সুরে চলি পাওদল!"

দুর্দ্দিন-ঘন দুঃখের রাতি—বারি ঝরে অবিরল,—
বিদ্যুৎ হানে ভ্রূকুটি—আলেয়া খেলায় প্রেতের পারা,
প্রবল বাতাস পথে প্রান্তরে ফিরে লুঠেরার বাড়া
বনে তৃণে দিয়ে তাড়া,—
গুল্মের মূলে জাগে বিষধর শিরে বহি' হলাহল।

"পিছু ডেকে কিবা ফল,
প্রাণ আজি চঞ্চল—
ভয়ের অতীত ভাবনার পার
সুরে চলি পাওদল!"

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

ওড়ার কথা

এবার এই শীতের মরশুমে ওড়া পথে ক'দিন একটু পাড়ি জমাইবার সুযোগ মিলিয়াছিল। এক দিন নবদ্বীপ অবধি ঘুরিয়া আসিয়াছি—মেঘহীন, নির্ম্মল আকাশ—বহুদূর অবধি দৃষ্টি চলে, এবং নীচে ধরিত্রী দেবীর বিচিত্র শোভা চিত্ত একেবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়। এখানি নূতন প্লেন; পুষ-মথ। ভিতরে পাইলটের সীট্ ছাড়া আরো দুটি সীট্ আছে; এখানি 'সীডান্ বডি' প্লেন; কানেই গগ্‌লে চোখ আঁটিবার প্রয়োজন থাকে না! ভিতরে তিনটি সীট্, সহযাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আরামও প্রচুর মিলে।

এক দিন সাড়ে ৩টায় রৌদ্রস্নাত বৈকালে দমদমা ছাড়িয়া জলার উপর দিয়া দক্ষিণে ডায়মণ্ড হার্ব্বারের পথে পাড়ি দিই। কলিকাতাকে ডাহিনে রাখিয়া জলার উপর দিয়া যে পথ, সেই পথ ধরি। ঊর্দ্ধে ২ হাজার ফুট উঠিয়াছিলাম, নীচেকার দৃশ্য মোটে ঝাপ্‌সা ঠেকে নাই—বৈচিত্র্যের আর সীমা ছিল না। টালার খাল, ভাঙ্গড়ের খাল—সে খালগুলা যে কতদূর অবধি চলিয়া গিয়াছে! দীর্ঘ জলা—কোথাও গভীর জল, কোথাও চড়া ঠেলিয়া উঠিয়াছে, অসংখ্য ক্ষুদ্র দ্বীপের ছোট ছোট ভূখণ্ড, সেই ভূখণ্ডে গাছপালা, বিক্ষিপ্ত পর্ণ-কুটীর—'প্যানোরামিক' ছবির চূড়ান্ত! ঊর্দ্ধপথ হইতে দেখাইতেছিল যেন এক বিচিত্র জগৎ—ম্যাপে এ জগতের ছায়াও দেখিতে পাই না—হাঁটা পথে বা নৌকা-পথে এ জগতের চিহ্ন চোখে পড়ে না! চলিয়াছিলাম, কতকটা যেন নিরুদ্দেশ-পথের যাত্রীর মত! বহুদূর চলার পর নীচে রেল-লাইন দেখা গেল। সেই লাইন ধরিয়া দৃষ্টি চালাইয়া বুঝিলাম, ডায়মণ্ড হার্ব্বারের লাইন এবং অদূরে ডায়মণ্ড হার্ব্বার রেল-ষ্টেশনও দেখা গেল। দমদমার উপর হইতে উঠিয়া খানিক দূর আসিবার পর, অর্থাৎ রেল-লাইন নজরে পড়িবার পূর্ব্বে সম্মুখে দেখি, মাটী ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে প্রকাণ্ড কাচের মত বিস্তীর্ণ জলরাশি। এই গঙ্গা। রেল-ষ্টেশনের দিকে না গিয়া আমরা সোজা গঙ্গার মোহনার দিকে অগ্রসর হইলাম। নদীতে ভাটা। আমরা ১২ শত ফুটে নামিয়া আসিলাম। জলের বুকে বড় বড় সমুদ্রগামী ষ্টীমার। তারা কলিকাতায় আসিতেছে। ভাটা বলিয়া নোঙ্গর ফেলিয়াছে। সেগুলা পার হইয়া আমরা বিস্তীর্ণ মোহনার উপর আসিলাম। এখানে গঙ্গার মুখ দুদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে; আর জলের বিস্তার যেন সীমাহীন! মধ্যে প্রকাণ্ড চর—আগের চরটুকু শ্রেফ বালির স্তূপ। ঘোলা জলের বুকে পড়িয়া আছে যেন বিরাট তিমি মাছ বা অতিকায় কচ্ছপের খোলা! তার পর যে চর, সেটি আরো প্রকাণ্ড—জঙ্গলময়। খুব ঘন জঙ্গল, এবং একেবারে পূর্ব্বসীমানায় কেল্লার মত একটা মস্ত বাড়ী। এই চরের বুকে কত ক্ষেত, লোকের বসতি, খাল-বিল। বেশ উঁচু পাড়ওয়ালা দুটি মস্ত দীঘিও দেখিলাম। এটি সাগর-দ্বীপ—এইখানেই পৌষ-সংক্রান্তিতে পুণ্যকামী স্নানযাত্রীর মেলা বসে। এখানে পৌছিতে ছোট নালার মত আশে-পাশে কয়েকটা জলস্রোত চোখে পড়িল—গ্রামের মধ্য দিয়া গ্রাম ঘেঁষিয়া সেগুলি গঙ্গায় মিশিয়াছে। এই সব নালা বহিয়া ছোট নৌকাও যাত্রী আনিয়া সাগর-দ্বীপে নামাইয়া দেয়। ঘড়িতে সময় দেখিলাম, ৪টা বাজিয়া ১২ মিনিট হইয়াছে। শীতের বেলা বলিয়া আর অগ্রসর হইলাম না—প্রকাণ্ড নদী পার হইয়া পশ্চিম পার ঘুরিয়া ফিরিলাম। এখানে দেখি নদীগর্ভে বড় বড় ষ্টীমার নোঙ্গর

দিল্লী—কুতব-মিনার

ফেলিয়া বসিয়া আছে। রেঙ্গুন মেলকেও দেখিলাম জোয়ার আসিলে কলিকাতার পথে পাড়ি সুরু করিবে—চিমনীতে ধূমও দেখা গেল।

ফিরিবার পথে বারুইপুরের উপর একবার চক্র দিলাম এবং সেই জলার উপর দিয়াই দমদমার এরোড্রোমে ফিরিলাম, বেলা তখন ৪টা বাজিয়া ৪০ মিনিট।

ফিরিবার পথে বহুদূর হইতে কলিকাতার ঘর-বাড়ী, বিশেষ করিয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কুয়াশার আব্-ছায়ায় চকিতের জন্য চোখে ফুটিয়াছিল। এ যাত্রায় প্লেনের গতির বেগ ছিল ঘণ্টায় ৯৫।১০০ মাইল হিসাবে।

ইহার পর একবার মেহেরপুর অবধি, এবং আর এক-বার চাঁইবাসা অবধি পাড়ি দিয়াছি—বেশী ঊর্দ্ধে উঠি নাই—

কাশীধাম
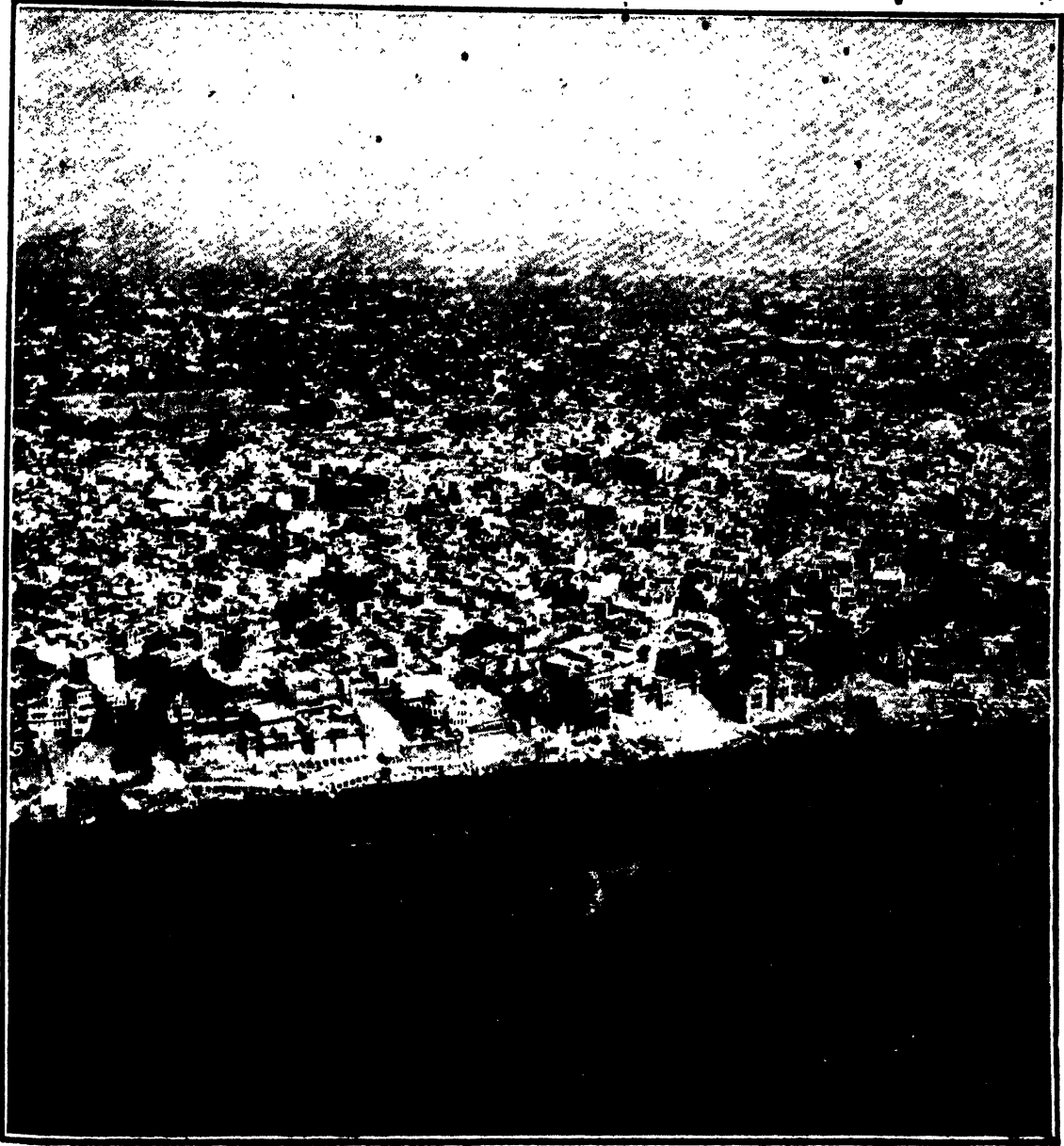
কৃষ্ণনগরে পরিচিত কয়েক জন বন্ধুর গৃহ, রাজবাটী প্রভৃতি বেশ স্পষ্ট নজরে পড়িয়াছিল। চাঁইবাসা যাওয়ার মধ্যে একটু রহস্য ছিল। জামশেদপুরে নামিব বলিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম; সাথী ছিলেন দুজন অষ্ট্রেলিয়ান্ বন্ধু। মেদিনীপুর অবধি গিয়া রেল-লাইন ধরিব ভাবিলাম; এক জন সহযাত্রী বলিলেন, না, এমনি চলা যাক। তাই করিলাম। পথ ঠিক করিতে না পারিয়া মানভূমের জঙ্গলের উপর গিয়া হাজির! সেখান হইতে চাঁইবাসা। তার পর সমুদ্রকূল, এবং সেখান হইতে ডায়মণ্ডহার্বার হইয়া দমদমায় ফিরি বেলা ১২টার পর। ৪ ঘণ্টার উপর শূন্যে ছিলাম।

তার পর একটা কথা মনে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে 'ডাচ্ মেল্' আসিয়া কল খারাপ হওয়ার দরুণ দমদমায় এক দিন
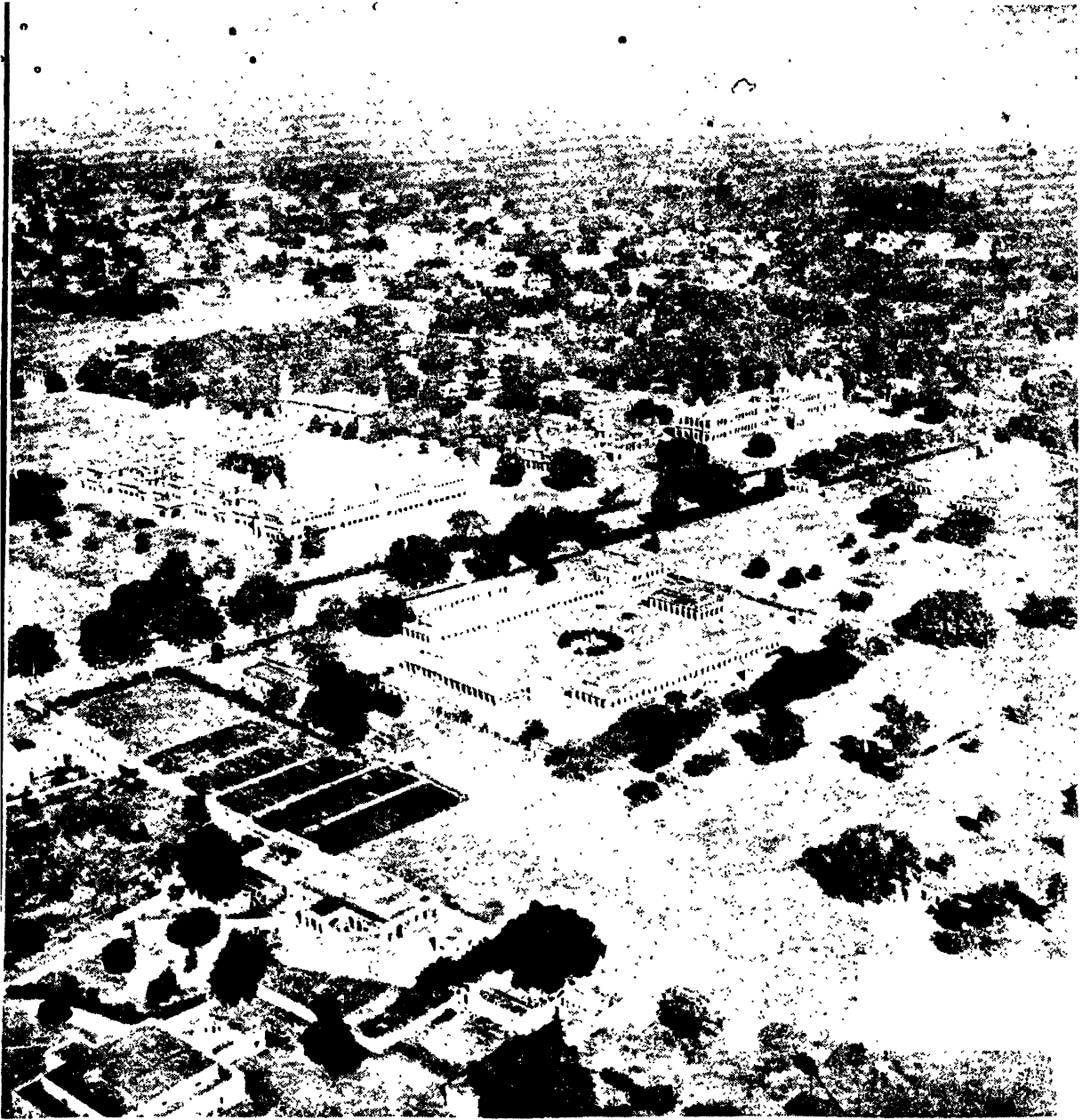
লক্ষ্ণৌ—বিশ্ববিদ্যালয়

আটক থাকে। দেখিতে গিয়াছিলাম। কি প্রকাণ্ড প্লেন্। 'ফোকার' মেশিন—যাত্রী বহিবার জন্য এখন এক্সপেরিমেণ্ট চলিতেছে। এঞ্জিনিয়ার ও কাপ্তেন অতি ভদ্র; আমাদের এরোপ্লেনের ভিতরে লইয়া গেলেন—সব দেখাইলেন। কামরা মেলট্রেণের প্রকাণ্ড ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরার মত বড়—১৮ জন যাত্রী স্বচ্ছন্দে শুইয়া বসিয়া যাইতে পারেন। এই কামরা ছাড়া দুজন পাইলটের আসন স্বতন্ত্র wireless apparatusএর সজ্জিত কামরা ও শৌচাগার আছে। সমস্ত মেশিন্‌খানি যেন একটা মস্ত বাড়ী। রাত্রিতে তাঁরা পাড়ি দেন না। ৬ ঘণ্টায় ৬ শত মাইল অনায়াসে চলে। প্রশ্ন করিতে তাঁরা বলিলেন, আগামী জানুয়ারী হইতে যাত্রী বহিবার ব্যবস্থা তাঁরা করিতে পারিবেন বলিয়া আশা রাখেন।

ভারতবর্ষে ওড়া-পথের পাড়ি কায়েমী করিবার পক্ষে বিলক্ষণ চেষ্টা চলিয়াছে। পাইলট হইবার জন্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমে বাড়িতেছে—দেশের অন্ন-সমস্যায় ইহা খুবই সুখের কথা, আশার কথা।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'ফ্লাইংয়ের পক্ষে ভারতবর্ষ একবারে ideal country অথচ 'ফ্লাইং' প্রচেষ্টা এদেশে বহু পিছনে পড়িয়া আছে। তার একটি কারণ—অর্থের অপ্রতুলতা। এদেশের ধনী সম্প্রদায় এ ব্যাপারের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে একবারে উদাসীন। গভর্ণমেণ্ট যদি এ কায হাতে লন, তাহা হইলে বোধ হয়, এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে। ফিল্ম কোম্পানী খোলার দিকে ভারতবাসীর ঝোঁক পড়িয়াছে প্রচণ্ড রকম—'ফ্লাইংয়ে'র দিকে এ ঝোঁক দিলে ধনী সম্প্রদায় যে লাভবান্ হইবেন, তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই।

এরোপ্লেনে চড়িয়া জরীপের কায এখন বিশ্বপ্রচলিত হইয়াছে। সুবিধার ইহাতে সীমা নাই। ঘন জঙ্গল, জলা, পাহাড়-পর্ব্বত,—ভূমি হইতে জরীপ করা বহু ব্যয়সাধ্য, বহু শ্রম-সাপেক্ষ এবং কত দীর্ঘকালে যে তাহা সম্পন্ন হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তার উপর দুর্গম স্থলেরও অপ্রতুল নাই—সে সব স্থান দেখা বা সে সব স্থান সম্বন্ধে কোনো সংবাদ গ্রহণ করায় জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। এরোপ্লেন সাহায্যে সেই সব স্থান নির্দ্দেশ বা জরীপ করা কত সহজ, তাহা এই সংখ্যায় প্রকাশিত ছবিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। উপর হইতে ৫।৬ শত ফুট উর্দ্ধ পথ হইতে ক্যামেরার সাহায্যে ফটো লওয়ায় কোনো অসুবিধা ঘটে না; ফটো লইয়া scale মাপে সীমা-পরিসীমা অতি সহজে নির্দ্ধারিত হয়। সব প্রদেশেই গভর্ণমেণ্ট এজন্য air surveyর অফিস খুলিয়াছেন। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের ব্যয় প্রচুর কমিয়াছে। তা ছাড়া যে জরীপের কায পূর্ব্বে ৩।৪ বৎসরে সম্পন্ন হইত, এখন এরোপ্লেনের সাহায্যে সে কায এক বৎসরেই সম্পন্ন হয়।

এখানেও এরোপ্লেনের সাহায্যে জরীপের কায চলিয়াছে। Indian Air Survey Ltd. কোম্পানি গভর্ণমেণ্টের জরীপ কায করিতেছেন। দমদমায় তাঁদের অফিস। এখানকার অফিসের Managing Director মিষ্টার রেণহাম। তিনি এরোপ্লেনে উঠিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে সব ছবি তুলিয়াছেন, তাহার কয়েকটির প্রতিলিপি মাসিক বসুমতীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় এবং এ সংখ্যাতেও তিনি প্রকাশের জন্য দিয়া আমাদের বাধিত করিয়াছেন। সে সব ছবির প্রতিলিপি হইতে সকলেই বুঝিবেন, এ কাযে সফলতা সুনিশ্চিত।

ইরাবদী নদীর অঞ্চলে এঁরা প্রথম জরীপের কায করেন, সারা পৃথিবী সে কায দেখিয়া বিস্মিত হয়। তার পর এই কোম্পানিই ব্রহ্ম প্রদেশের তিনাসেরিম জঙ্গলের (১৫ হাজার বর্গ মাইল) জরীপ করেন; এ জরীপের ফলে সকলে জানিয়াছেন, উক্ত জঙ্গলে গাছ কত এবং সে গাছ কাটিলে কাঠের ব্যবসায় কতখানি ফাঁপাইয়া তোলা সম্ভব। শ্যাম ও দক্ষিণ ব্রহ্মপ্রদেশে পাহাড়ের গায়ে বহু বিস্তীর্ণ জঙ্গল এই জরীপের ফলে আজ ব্যবসায়ীর শ্রী ফিরাইতে বসিয়াছে।

এই কোম্পানি পরে বোর্ণিও, সারাওয়াক, রেঙ্গাং প্রভৃতি প্রদেশের দুর্গম স্থান-সমূহে দেবী কমলার যে আসন পাতিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, বাণিজ্যের ইতিহাসে সে উদ্যম-কাহিনী চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

১৯২৮।২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের যুক্তপ্রদেশে প্রায় ৩ হাজার বর্গ-মাইল স্থান Air Survey কোম্পানির সাহায্যে জরীপ হয়; প্রায় ১৭ হাজার ৫ শত ফটো লওয়া হয়। উড়িষ্যায়, এবং বাংলা দেশেও জরীপের কায চলিয়াছে পূর্ণ উদ্যমে। এ জরীপে গরীব চাষার উত্যক্ত হইবার কোন কারণ ঘটে না। কারণ, জরীপীর দল তাদের ক্ষেত খামার মাড়াইতে যায় না। তাদের ফশল নষ্ট হইবার কোনো আশঙ্কা নাই; তার উপর লাভ এই, দুর্গম জঙ্গল সমূহ অতি সহজে আবিষ্কৃত হইয়া মানব-সমাজের উপকারে লাগিতেছে।

সুতরাং এরোপ্লেনের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় লাভ প্রচুর। মোটর গাড়ী বিলাসের মস্ত উপকরণ; এরোপ্লেন ঠিক তা নয়! পাইলট হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিলে মাসে অন্ততঃ ১ হাজার টাকা মাহিনা মিলিবার আশা তো আছেই, তা ছাড়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অন্য বিবিধ লাভের সম্ভাবনা ইহাতে সমধিক। এ সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ কোনো কথা জানিতে চান, তাহা হইলে দম্‌দমা ফ্লাইইং ক্লাবের ঠিকানায় আমার কাছে পত্র লিখিলে, যথাসময়ে সদুত্তর দিবার আমি প্রয়াস পাইব।

এ সব কাযের কথা রাখিয়া এরোপ্লেনের অসাধ্য-সাধনের একটি সত্য কাহিনী বলিতে চাই। গত মে মাসের ঘটনা।

কায়রোর হাঁসপাতালে একটি তিন বছরের শিশু রোগে পড়িয়া মরণের সঙ্গে যুঝিতেছিল। ডাক্তার বলিলেন, রক্ষার শেষ আশা ইঞ্জেকসনে! সেরাম পাওয়া যাইবে ফ্রান্সের পারী সহরে। রোগের অষ্টাহকালমধ্যে ইঞ্জেকসন করা চাই; তবে যদি রক্ষা পায়! কিন্তু ওদিকে অষ্টাহ পূর্ণ হইতে বিলম্ব নাই। উপায়? পারীতে কেবল্ করা হইল রাত্রি ১২টায়। সেরামও সংগ্রহ হইল। কায়রোয় পৌছিতে কিন্তু বিলম্ব হইবে। তখন ফরাসী এরোপ্লেনে সে সেরাম পাঠানো হইল ভিয়েনা সহরে। সেখানে ভারত-গামী এয়ার মেল ধরার সম্ভাবনা আছে। ফরাসী এরোপ্লেনের বিলম্ব ঘটিল ভিয়েনায় পৌছিতে। তখন সে এরোপ্লেন ছুটিল বুডাপেস্তে। ভারত-গামী এরোপ্লেন ভিয়েনার পর বুডাপেস্তে দাঁড়ায়। এখানে ভারত-গামী এরোপ্লেনের দেখা মিলিল, সেরাম তাদের হাতে দেওয়া হইল—কায়রোয় চালানির জন্য! বুডাপেস্ত ছাড়িয়া ভারতীয় এয়ার-মেল শালনিকা, ক্রীট হইয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় আসিল। এখান হইতে কায়রোর হাঁসপাতালে সেরাম পাঠানো চাই—কষ্টম অফিসে বিলম্ব না হয়, সে জন্য পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত ছিল।

এক্সপ্রেস আলেকজান্দ্রিয়া ছাড়িবে পরদিন সকালে ৯টায়। এ ট্রেণ কায়রো যাইবে। বাতাসের গতির গোলে এরোপ্লেন আসিয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌছিল বেলা ৯-১০ মিনিটে। শিশুর পিতা মোটর লঞ্চের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই লঞ্চে করিয়া সেরাম আনিয়া পরের ষ্টেশনে এক্সপ্রেসে তোলা হইল, এবং এই সেরাম ইঞ্জেকশনে শিশুর প্রাণ রক্ষা পায়।

এরোপ্লেনের প্রচলন সকল দিক দিয়া মানব-সমাজের পক্ষে প্রয়োজন—শুধু সখের জন্য নয়, কাযের দিক দিয়াও। সেই কথা বুঝাইবার জন্যই কায়রোর কাহিনীটুকু বলিলাম। এখানে আমরাও অষ্ট্রেলিয়া-যাত্রী আমাদের ক'জন বন্ধুকে অভিবাদন করিয়া আসিয়াছিলাম—এরোপ্লেনে উঠিয়া ডায়মণ্ডহার্ব্বারে গিয়া। তাঁরা মেল ষ্টীমারে যাত্রা করিয়াছিলেন বেলা সাড়ে ৮টায়, আমরা দমদমা হইতে এরোপ্লেন ছাড়ি বেলা প্রায় ১১টায়।

আর এক দিনের কথা বলি। সেদিন পরেশনাথ পাহাড় অবধি গিয়াছিলাম। সকালে ঠিক ৭-১৫ মিনিটে দমদমার এরোড্রোম ছাড়িয়া 'কম্পাশ' লক্ষ্য করিয়া ব্যারাকপুরে গঙ্গা পার হইলাম। তার পর রেল-লাইন ছাড়াইয়া জলা-মাঠ অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধমান কর্ড রেল-লাইন ধরিয়া খানিকটা উত্তর-মুখে উড়িবার পর নীচে দামোদর নদের দেখা মিলিল। শীর্ণ দেহ—বুকে দীর্ঘ চড়া যেন হাড়গোড়ের মত! গতি সাপের মত—কি বক্র—না দেখিলে বুঝা কঠিন! শক্তিগড় রেলষ্টেশন ডাহিনে রাখিয়া 'কম্পাশ কোর্শে' দামোদরের উপর দিয়া আসিয়া বর্দ্ধমানের দেখা পাইলাম—ঠিক বেলা ৭-৪৫ মিনিটে। দূরে দামোদর—দামোদরের পূবদিকে ঘর-বাড়ী-জলাশয়ে ভরা বর্দ্ধমান সহর! বর্দ্ধমান ছাড়াইয়া একটু অগ্রসর হইতেই দুর্গাপুরের জঙ্গল। কি বহুদূর বিস্তীর্ণ জঙ্গল! গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দু'ধারেও জঙ্গল বেশ ঘন। মোটরে এ-পথ কয়েকবার অতিক্রম করিয়াছি। জঙ্গল যে বেশ ঘন, সে পরিচয় ভূ-পথে পাইতে বিলম্ব ঘটে নাই। কিন্তু আকাশ-পথ হইতে সে জঙ্গলের পরিধি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়! বোধ হয়, দু দিন অবিরাম চলিলে এ জঙ্গল অতিক্রম করা সম্ভব হয়! দুর্গাপুরের পর রাজবাঁধ, অণ্ডাল পার হইলাম। এই পথেই বোলপুরে গিয়াছিলাম। সে পথ ধরিলাম না। ব্যাণ্ডেলের পর রাণীগঞ্জ। দামোদরের তীরে রাণীগঞ্জ পেপার মিল্স্—বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য হইল। তা ছাড়া কয়লার খনি অসংখ্য—ঠিক যেন মেয়েদের খেলার রান্নাঘর—খানিকটা যায়গা কয়লায় কালো হইয়া আছে। রাণীগঞ্জের পর আসানসোল। এখানে এরোড্রোম আছে। শূন্যপথ হইতে দেখিলাম, এরোড্রোমের ক্ষেত্রে সুগোল রেখাচক্র। নামিবার প্রয়োজন ছিল না; কাযেই আসানসোল অতিক্রম করিয়া চলিলাম। আসানসোল হইতে কুলটী দেখা গেল—কুলটীর কারখানা এবং বাসগৃহগুলি যেন ছবির পটে আঁকা! কুলটী-সহরে আশে-পাশে ছোট-বড় পাহাড় উঁকি দিতে লাগিল—জমীর গায়ে যেন কতকগুলা উইঢিপি! সে সব পাহাড়ের মাথা টপ্কাইয়া উড়িয়া চলিলাম। দামোদর নদ, এখনো সাথের সাথী। বিস্তীর্ণ বালির ধারে-ধারে জলরেখা—সরু-মোটা কত শাখাই যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সংখ্যা নাই! এখান হইতে বরাকরের দৃশ্য—simply imposing. ঐ বালিভরা নদী—পিছনে
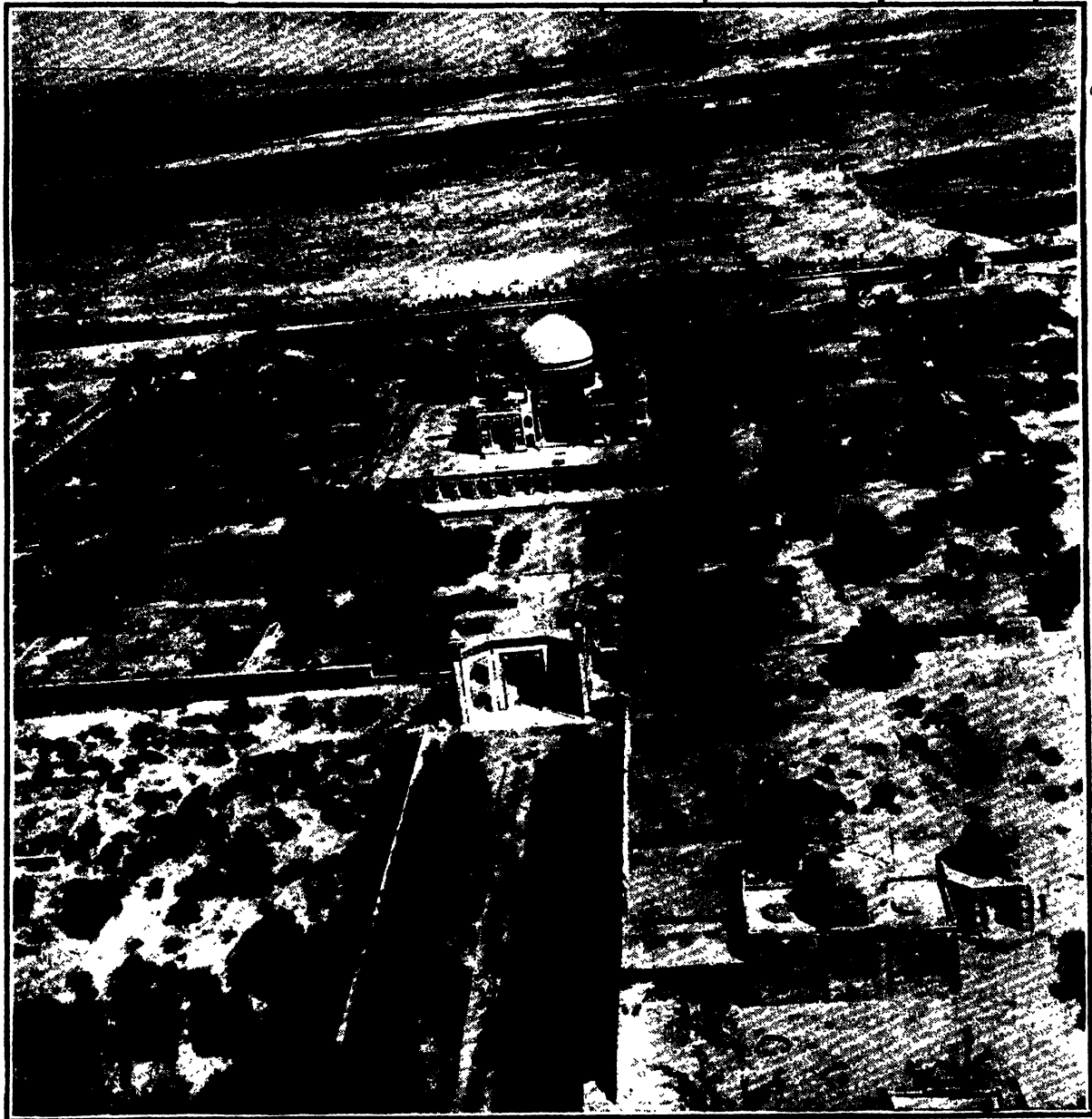
দিল্লী—হুমায়ুনের সমাধি

পাহাড়ের back ground—নদীর বুকে ছুটি পুল ; একটি রেলের, অপরটি সাধারণ যান-বাহন চলাচলের জন্য বরাকর ছাড়াইবামাত্র দিগন্তে কালো রেখার মাথার উপর দেখি, মস্ত এক উঁচু পাহাড়। আমরা ৩ হাজার ফুট উর্দ্ধপথে ছিলাম—হাতে ছিল রেলোয়ের ম্যাপ্। তার সাহায্যে স্থান-নির্দ্দেশের কায চলিতেছিল। পাহাড় দেখিয়া মনে হইল, আমরা যেন ছোট নৌকায় চলিয়াছি, আর ঐ পাহাড় যেন কলিকাতার গঙ্গাবক্ষে উঁচু সমুদ্রগামী জাহাজ! প্লেন আরো উর্দ্ধপথে তুলিলাম। পরেশ-নাথ পাহাড় উচ্চতায় প্রায় ৫ হাজার ফুট। ম্যাপে তাই লেখা দেখিলাম। ঐ পাহাড়ই যে পরেশনাথ পাহাড়, তা স্থির করিতে বিলম্ব ঘটিল না। পাহাড়ের মাথায়

কাণপুর

সাদা মন্দির—রৌদ্রে রূপার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে! ঠিক যেন নৈবেদ্যের মাথায় একটি চিনির সন্দেশ! নৈবেদ্য সবুজ হয় না—প্রভেদ এইটুকু! পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল—আপাদ-মস্তক জঙ্গলে আচ্ছন্ন বলিলেই ঠিক বলা হয়। আমরা ৬ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিলাম। ধানবাদ, তেঁতুলমারী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া অবশেষে পাহাড়ের কাছে পৌঁছিলাম.. যেন ছোট ঢিপি! উপরে উঠিতেই অত-বড় পাহাড় এতটুকু হইয়া গেল! উঁচু-পায়ার রীতিই বুঝি তাই! আমাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক দিন যারা খেলা-ধূলা করিয়াছে—তারা বড় হইয়া উঠিলে, আমাদের যে ছোট দেখে, তুচ্ছ ভাবে,—ইহাতে তাদের দোষ কি! প্রকৃতির নিয়মও যে তাই। পাহাড়ের চূড়ায় সাদা সাদা অনেকগুলি
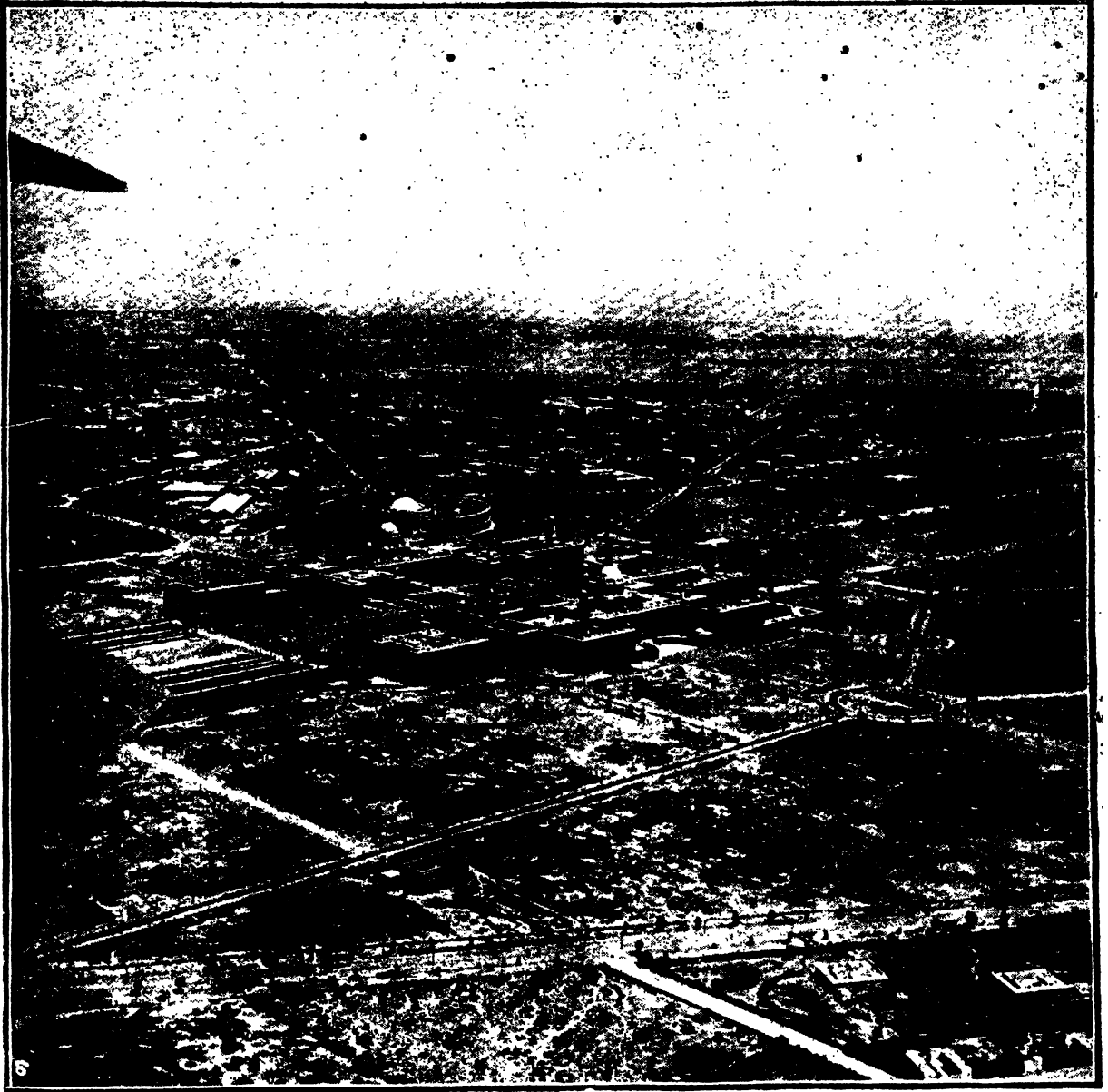
দিল্লী—এ্যাসেম্ব্লি ও সেক্রেটারিয়েট গৃহ

মন্দির দেখিলাম—পাহাড়ের পায়ের কাছে মস্ত একটি জলাশয়। পাহাড়ে পৌছিলাম। অবশ্য নামি নাই—কারণ, নামিবার চেষ্টা করিলে এ কাহিনী লিখিবার সামর্থ্য হয় ত থাকিত না। বেলা তখন ৯-১০ মিনিট। অর্থাৎ দমদমা হইতে পরেশনাথে আসিতে সময় লাগিল, ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট। পাহাড়ে প্রণাম ঠুকিয়া সে যাত্রা ফিরিলাম। ফেরার পথে গতির বেগ করিলাম ঘণ্টায় ১ শত ২০ মাইল। আসানসোল অতিক্রম করিলাম বেলা ঠিক সাড়ে ৯টায় অর্থাৎ ২০ মিনিটে! কুলটীতে এবং অন্যত্র কারখানার চিমনীতে ধোঁয়া উঠিতেছে—ধোঁয়ার রঙ বেশ সাদা—ফুলিয়া ঘন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের বহু নিম্নে ধোঁয়া দেখিতেছিলাম, যেন শিমুলের ফল ফাটিয়া

লক্ষ্ণৌ—গোমতী-তীরে

ঝলকে-ঝলকে তূলা ঠিকরিয়া ছিটকাইয়া উঠিতেছে! চমৎকার বাহার! রেল-লাইন ছাড়িয়া কম্পাশ কোর্শে ফিরিতেছিলাম, দামোদর সঙ্গে আছেন বরাবর! বর্দ্ধমানে আসিলাম ১০টা ১০ মিনিটে। তার পর ডাহিনে বাঁকি-গ্রাম। নীচে প্রান্তর ক্ষেত। তাদের গা ফুঁড়িয়া জলরেখার অন্ত নাই—ঝোপঝাপ ঠেলিয়া জল-স্রোত চলিয়াছে। দু'পারে সবুজ ঝোপের মাঝখানে সাদা জলের রেখা, ঠিক যেন কেশবতী রাজকন্তার মাথায় সুন্দর সীমন্ত-রেখা! কম্পাশ কোর্শে উড়িয়া চট করিয়া বারাকপুরে পৌছিলাম, এবং বেলা ঠিক ১০-৪০ মিনিটে দম্‌দমায় আসিয়া নামিলাম। যাতায়াতে দু'বারেই কলিকাতা-বর্দ্ধমান আধ ঘণ্টা পথ মাত্র এবং তার পর বেলা ১১টায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন!

অযোধ্যা

এ কি সম্ভব মনে হয়! ৪ ঘণ্টার মধ্যে দম্‌দমা হইতে পরেশনাথ পাহাড়ে গমন এবং প্রত্যাবর্ত্তনও! আমার সহযাত্রীরা বলিলেন, দশ বৎসর পরে ঐ সব মাঠে মাঠে যখন এরোপ্লেন নামিবার ষ্টেশন তৈয়ার হইবে, তখন মানুষ এই সহরেই ঠাশিয়া ঠুশিয়া দম বন্ধ হইয়া মরিবে না! বিশাল ধরণীর বুকে নড়িয়া চড়িয়া দুশো বৎসর পরমায়ু লাভ করিবে! এত-বড় পৃথিবী, তার কতটুকু অংশ লইয়া মানুষ বাস করিতেছে! কতটুকুরই বা চাষ-আবাদ করিতেছে! অথচ এটুকু লইয়া মামলা-মকর্দ্দমা দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাঠালাঠির একশেষ! মামলাবাজের দল একবার শূন্যে উড়িয়া যদি এ সত্যটুকু চোখে দেখেন, তাহা হইলে যে পয়সা আদালতে বিসর্জ্জন দেন, সে পয়সা লইয়া অন্ততঃ ঐ সব জলার ধারে মাঠের বুকে 'কলোনি' গড়িবার সাধু প্রচেষ্টা করেন! কিন্তু এ সব কথা আমার পক্ষে উচিত নয়—দার্শনিকের গবেষণার বিষয়ীভূত! তবে নিত্য এমন দৃশ্য চোখে দেখিয়া প্রাচীন যুগের ভারতবাসীরা
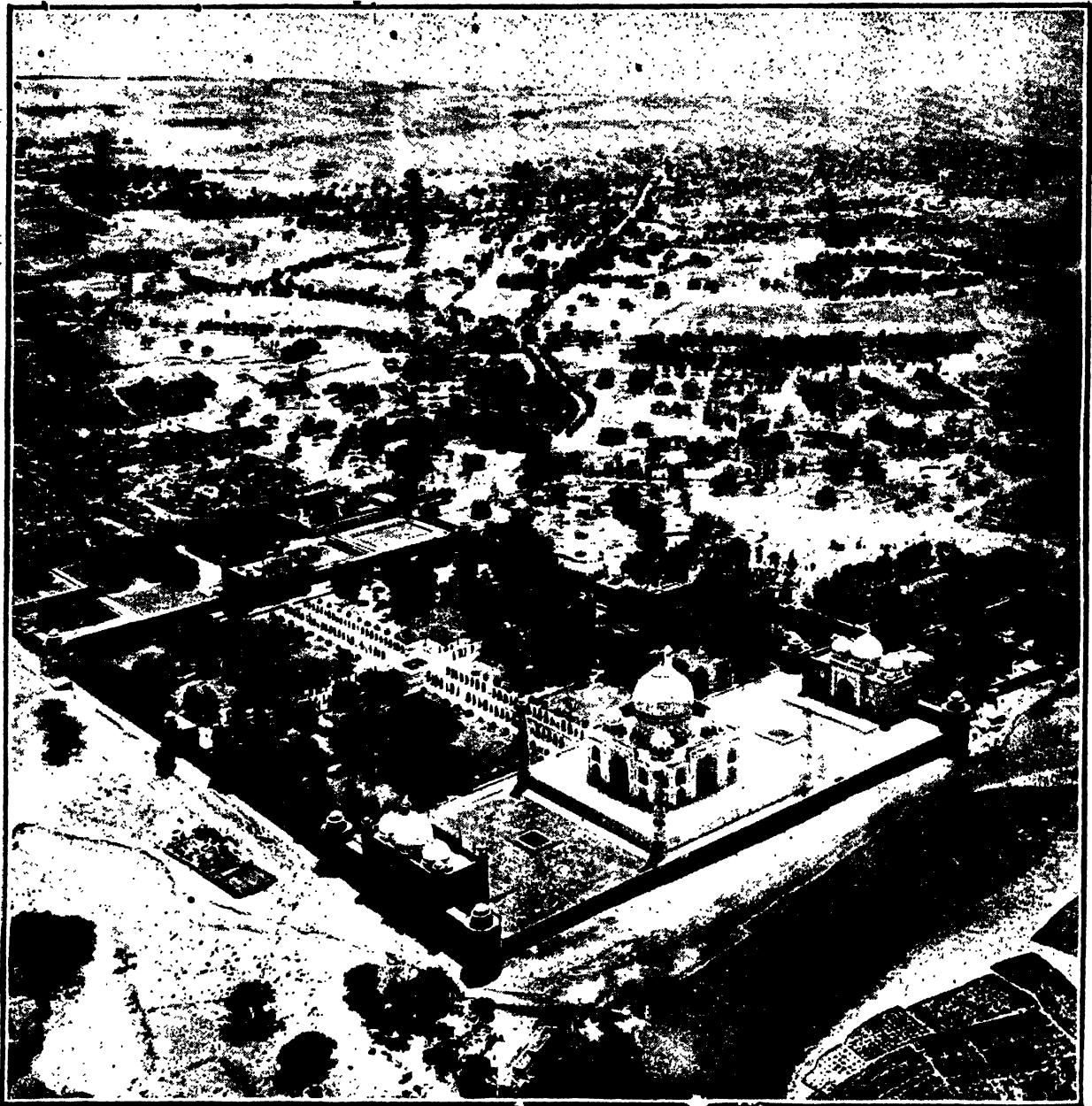
আগ্রা—যমুনা-তীরে তাজমহল

যে সংসারনির্লিপ্ত বৈরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন, (যেহেতু তাঁরা পুষ্পকে বা যোগাসনে বসিয়া হাসি-মুখে শূন্যপথে বিচরণ করিতেন) তাহা অনুমান করা এতটুকু কঠিন নয়।

শ্রীভবদেব মুখোপাধ্যায়।

পথের সাথী

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

শীতবর্ষার অপরাহ্ণ। আকাশ মেঘমেদুর, ক্লান্তবর্ষণ মেঘস্তরে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎস্ফুরণ চলিতেছে। পাথরে বাঁধা ও পিচ-ঢালা সহরের রাজপথ যেন বর্ষার জলে জুড়াইয়া বাঁচিয়াছে। পথের ধারে চুণকাম-করা রং-দেওয়া বাড়ীগুলা অবিরল বর্ষাজলধারায় ভিজিয়া ভিজিয়া ঈষৎ শ্যামলিমা লাভ করিয়াছে। পথের পাশে ছায়াতরুগুলি সজল-স্নিগ্ধ শ্যাম-কান্তি লাভ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল। কন্‌কনে শীতের হাওয়ায় সর্ব্বদেহে শিহরণ আনিয়া দিতেছে।

করবী তার ঘরের জানালার ধারে গভীর চিন্তামগ্নের মতই চুপ করিয়া বসিয়া আছে। হাতে যদিও সে একখানা বই লইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু সেখানা অনেকক্ষণ আগেই কোন সময় তার অন্যমনস্কতায় শিথিল অঙ্গুলী হইতে বিচ্যুত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে, হয় ত সে তাহা জানিতেও পারে নাই, হয় ত জানিতে পারিয়াও তাহার প্রতীকার করে নাই, করিতে প্রবৃত্তিও জাগে নাই। আজকাল তার শরীর-মন এমনই নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন কিছুতেই যেন আর আস্থা নাই! যেন কত বড় একটা কঠিন পীড়াই সে দিনরাত ভোগ করিতেছে, এমনই রুগ্ন, রুক্ষ ও ক্ষীণ তাহাকে দেখাইত। কেহ কোন প্রশ্ন করিলে সে হয় শুনিতেই পায় না, না হয় কাঁদিয়া ফেলে, এমন দশাও তার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ ডাক্তার ডাকিলেন, ডাক্তার বিশ্রাম ও টনিকের ব্যবস্থা করিলেন, মেয়েরা তাহাকে ক্ষেপাইবার জন্য গান ধরিল,—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা পড়ে ধরা কে জানে।
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।"

করবীর চোখ দিয়া সত্যই জল ঝরিতে লাগিল। সে হাত দিয়া মুখ ঢাকিল, একটুও রাগ করিল না। মেয়েরা বাস্তবিকই বিস্মিত এবং দুঃখিত হইল। রুবির এ রূপ সকলেরই অপরিচিত! তার সেই সহজ সরস হাস্যময় রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া দিনে দিনে যেন একটি নিরানন্দ প্রতিমায় পরিণত হইয়া আসিতে লাগিল।

আজ বর্ষার বর্ষণ-ক্লান্ত নিরানন্দ অপরাহ্ণে করবীকে যেন অধিকতর চিন্তাপীড়িত ও ম্রিয়মাণ দেখাইতেছিল। মা'র চিঠি আসিয়াছে, তাহাকে শীঘ্রই দুদিনের জন্য বাড়ী যাইতে হইবে, মহরমের ছুটীতে তার পাকা দেখা, তার পর বিবাহ হইবে কোন একটা শুভ দিনে—সে দিনটা এখনও পাকা হয় নাই। হিরণ্ময়ের ছুটী মঞ্জুর হইলেই তাহা স্থির হইবে, তবে সেও খুব বেশী বিলম্বিত হইবে না। করবী যে এ বৎসরটা সময় চাহিয়াছিল, সুমতি তাহা মঞ্জুর করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, বিবাহ হইয়া গেলে ইচ্ছা হয় ত রুবি প্রাইভেটে বি-এ পরীক্ষা দিক, এক বৎসর আর তিনি বিলম্ব করিতে ইচ্ছুক নন। করবীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রাস্তা দিয়া গুম্-গুম্ ঝন্-ঝন্ শব্দে একখানা লোহালক্কড়-বোঝাই করা লরী সগর্ব্বে চলিয়া গেল, তার গতিবেগে ঘরের জানালার সার্সিগুলা ঝন-ঝন্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আকাশের জমিয়া ওঠা মেঘের মধ্য হইতেও ঐ ধ্বনির প্রতিধ্বনির মতই গুম্‌গুম্ শব্দ করিয়া বজ্র হাঁকিয়া উঠিল। রুবি এই উভয় শব্দে ঈষৎ চমকিয়া তার সুগভীর চিন্তা হইতে জাগিয়া উঠিল।

"রুবিদি! বাব্বা! রুবিদি! কি যেন ধ্যান করছেন যে, সাত ডাকেও ওঁর সাড়া পায়, কার সাধ্যি! এই নাও ভাই! তোমার চিঠি! বাবা রে বাবা! এত চিঠিও রোজ রোজ রুবিদির আসে! আমাদের যদি হপ্তায় একখানা কি দুখানা এলো, তা হলেই আমরা ভাগ্যি ব'লে মনে করলুম! কে লিখেছে ভাই? যে লিখেছে, তার কিন্তু ভারি তাড়াতাড়ি ছিল, হয় আপিসের লেট হবার, নয় ত ট্রেণ মিস্ করবার ভয়, এমন বিশ্রী টানা লেখা—" এই বলিয়া সুষমা তাহাকে একখানা ডাকে আসা খামের চিঠি ধপ্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া পুনশ্চ নিজেই নিজের প্রশ্নোত্তর করিয়া লইল, সাধারণ পোষ্টাফিসের কেনা খামে বাজে কালি-কলমে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি টানা লেখায় নাম-ঠিকানা দেওয়া চিঠিটার সম্বন্ধে ঠোঁট বাঁকাইয়া তাচ্ছীল্যভরে সে বলিয়া উঠিল, "এ নিশ্চয় তোমাদের বাড়ীর পুরোনো গোমস্তার লেখা চিঠি, না? মা গো মা! কি বিশ্রী হলদে কালি! নিশ্চয়

রান্নাঘরের ঝুল আর চাল চুঁইয়ে এই কালিটা তৈরি হয়েছে, আর বালীর কাগজে ঐ কালিতে চিঠিখানির আরম্ভ হয়েছে—'রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবে। পরে দিদিমণি! আগত রবিবারে কর্ত্তামা আপনাকে এ মোকামে আসিবার জন্য অত্র পত্রে সংবাদ জ্ঞাপন করিতে আদেশ দেওয়ায়'—"

রুবি চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত তাহাতে নেত্রপাত করিয়া বলিয়া উঠিল—"সুবোটা এমন হয়ে উঠেছে! আমাদের আবার সরকার গোমস্তা কোত্থেকে আসবে যে, আমায় চিঠি দেবে শুনি। মা'রই চিঠি বোধ হয়, ঠিকানাটা কেউ লিখে দিয়েছে।"

চিঠিখানা সে হাতের মুঠায় চাপিয়া রাখিয়া পরিত্যক্ত বইখানা তুলিয়া লইল।

সুষমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "মা গো! মায়ের চিঠি পড়বারও মেয়ের ফুরসৎ নেই!"

সে চলিয়া গেল।

চিঠিখানা কিন্তু না গোমস্তার, না মায়ের, সেখানা শশাঙ্কের লেখা। শশাঙ্ক তাড়াতাড়িতে শুধু এই রকম লিখিয়াছে—

"রুবি! জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে! যে শশাঙ্ককে তুমি দেখেছিলে সৌভাগ্যের বরপুত্র, সে শশাঙ্ক আজ আর বেঁচে নেই। জমীদার বসন্তকুমার দাসের ছেলেকে তুমি অপছন্দ করনি, কিন্তু কপর্দ্দকহীন এক জন সামান্য লোককে কি তোমার স্বামিত্বে বরণ করতে সম্মত হ'তে পারবে? পৈতৃক সম্পত্তি সমস্তই আমি হারিয়েছি। আজমীরে একটা প্রফেসারী পাবার সম্ভাবনা আছে, সেইখানে যাচ্ছি, ঠিকানা দিলুম, উত্তর যদি দাও, সেইখানেই দিও। তোমার দয়াই এখন আমার ভরসা, জোর করবার কোন যোগ্যতাই আমার নেই।

তোমার কৃপাপ্রার্থী—
শশাঙ্ক।"

করবীর নিশ্চেষ্ট শরীর-মনে এই পত্র সহসা একটা গভীর উত্তেজনা জাগাইয়া তুলিল। শশাঙ্ক এই পত্র লিখিয়াছে? সেই আনন্দময় পুরুষ, আপনাতে আপনি সবল, আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি, সঙ্কল্পে অটল, সেই শশাঙ্কের এই ভাবা? রুবির প্রথমটা মনে হইল, এ তার পরিহাস। নিশ্চয়ই এ সত্য নয়। হয় ত পরিহাস-রসিক শশাঙ্কের এও এক খেয়ালের খেলা! হয় ত রুবিকে পরীক্ষা করিবার জন্যই সে এ রকম করিয়া পত্র দিয়াছে, হয় ত পৈতৃক ধন তার যেমন তেমনই মজুত আছে, হয় ত আদৌ সে চাকরী করিতে আজমীর যাত্রা করেই নাই।

কড়কড় শব্দে আবার একবার আকাশটা ডাকিয়া উঠিল, এক ঝলক আগুন জ্বালাইয়া লকলকে সাপের জিভের মত বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ জিহ্বা লেলিহান হইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল, হুড়হুড় শব্দে বৃষ্টির জল ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল। পাশের ঘরে মাদ্রাজী চটির চটাস্-চটাস্ শব্দের সঙ্গে তাল দিয়া গান শোনা গেল,—

"এস, সজল মেঘের নয়ন-পথের কাজল বুলানো!"

এখনই কেহ আসিয়া পড়িবে, রুবি তাড়াতাড়ি শশাঙ্কের চিঠিখানা তার ব্লাউজের মধ্যে পুরিয়া ফেলিয়া বই খুলিয়া বসিল; কিন্তু বইএর পাতায় কোন্ ভাষার অক্ষর ছাপা ছিল,—জিজ্ঞাসা করিলে সে কথাটাও হয় ত সে বলিতে পারিত না, বইখানাকে আত্মপক্ষ-সমর্থনের অস্ত্রস্বরূপে খাড়া করিয়া রাখিয়া তার বিস্মিত, ব্যথিত এবং কর্ত্তব্য-বিমূঢ় বিহ্বল চিত্ত অধিকতর এবং কঠিনতর অপর এক নূতন সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অথচ সমস্যার কিছুমাত্রও সমাধান হইল না, কেবল দ্বন্দ্বময় জটিল জীবন-সমস্যা আরও যেন পাকে প্যাকে জড়াইয়া গেল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

করবীর কোন আপত্তিই টিকিল না, তাকে তার বাপ নিজে আসিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। হিরণ্ময়ের দুদিন মাত্র ছুটী। পাত্র-পাত্রী আশীর্ব্বাদ এক দিনেই শেষ করিতে হইবে, সকালে বিকালে দুই বাড়ীতেই এই জন্য যথোচিত আয়োজন হইয়া গিয়াছে, দেরী করা চলে না।

করবী আসিয়া মাকে গোপনে ডাকিয়া বলিল,—"আমি ত তোমায় বলেছিলুম, এ বিয়ে আমি করতে পারবো না, জেনে শুনে তুমি এতদূর কেন এগোতে দিলে মা? কোন রকম ক'রে এখনও তুমি ওঁদের বলো, এ বিয়ে হ'তে পারে না।"

মেয়ের কথায় নর্ম্মদা যেন আকাশ হইতেই পতিত হইল! বিস্ময়ে দুই চক্ষু ভ্রূ-সমেত কুঞ্চিত করিয়া অবাক্ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া মেয়ের মুখে তীক্ষ্ণভাবে চাহিয়া তীব্র কণ্ঠে সে কহিল—"এমন কথাও কখন শুনিনি, রুবি! হিরণ্ময়কে বিয়ে তুমি করতে চাও না? তবে কা'কে চাও শুনি?"

করবী মা'র প্রশ্নের ধরণে ঈষৎ লজ্জাবোধ করিল। তথাপি এক মুহূর্ত্ত পরেই লজ্জা সম্বরণ করিয়া সে যথাসাধ্য সহজ কণ্ঠেই বলিতে আরম্ভ করিল, "সে ত তুমি জানো, মা! প্রথম যে দিন দেখা হয়, ফিরে আসতেই তুমিও বলেছিলে, তার পর থেকে বরাবর—"

নর্ম্মদা সবেগে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"থাম্ থাম্ রুবি! তার আর তুই নাম করিস্‌নে, সে ত একটা ভ্যাগাবণ্ড! বাপ তাকে ত্যাজ্যপুত্ত্র ক'রে গেছে, এখন রাস্তার একটা ভিকিরীও যে, সেও সে। ও রকম চাল নেই, চুলো নেই, বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো পথিকের সঙ্গে ত আর তোমার বিয়ে দিতে পারি নে, বিশেষ যখন অপর পক্ষে বড়লোকের ছেলে, ম্যাজিষ্ট্রেট জামাই পাচ্ছি! ও সব মন থেকে সরিয়ে ফেল, তোর ভাগ্যি ভাল, তাই এমন ঘরে-বরে পড়ছিস, আমার মতন চিরকাল পয়সার টানাটানি সইতে হবে না, রাজরাণী হয়ে জীবন কাটাবি। সে দিন সুমতি দিদি তোর জন্যে যে হীরের বালা আর হীরের নেকলেশ ক' হাজার টাকা দিয়ে কিনেছেন, সেই দুটো দেখালেন। আরও কি কি গড়তে দিয়েছেন, এখনও আসে নি।"

হীরা, মুক্তা, সুখ, ঐশ্বর্য্য করবীর চিরদিনের সুখস্বপ্ন। সে শুনিয়া স্তব্ধ নীরব রহিল। মন তার আবার ঘাত-প্রতিঘাতে সঘন চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিঃস্ব, ভিখারী, পিতৃগৃহতাড়িত, পৈতৃক সম্পত্তি-বর্জ্জিত শশাঙ্ককে বিবাহ করিলে সুখ তার কি হইবে? শশাঙ্ক মূর্খ নয়, হয় ত চাকরী একটা কোন দিন জুটাইয়া লইবে, কিন্তু সে এমন কি চাকরী এবং কত দিনেই বা তা জুটিবে, তার স্থিরতা কি? আজীবন বা ভয় করে, তার ভাগ্যে তাই হয় ত ঘটিবে, সামান্ত স্কুল-মাষ্টার বা গরীব কেরাণীর স্ত্রী হইয়া তাহাকে হয় ত রান্না-বান্না হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলে মানুষ করা পর্য্যন্ত সমস্ত সংসারের কাযকর্ম্ম লইয়া রাতদিনই খাটিতে হইবে। মনে করিলেও সমস্ত শরীরে কাঁটা দেয়। দারিদ্র্য! ওঃ, সে যে বড় ভয়ানক জিনিষ! রূপ, স্বাস্থ্য সবই সে তার নির্ম্মম হস্তে পিষিয়া ফেলে, মানুষের শরীর-মনের সকল স্বত্ব নিষ্ঠুরভাবে নিঙড়াইয়া লয়। না না, করবীর এই রাজরাণীর যোগ্য সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা পথ-ভিখারীর জন্য নিশ্চয়ই সৃষ্ট হয় নাই! দারিদ্র্য তার সহ্য হইবে না। গরীবের ঘরে ঘর করা তার পক্ষে অসম্ভব। শশাঙ্ক—মনে করিলেও বুক ফাটে; কিন্তু উপায় কি? শশাঙ্কর ভাগ্যই যে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দিল, সে আর কি করিবে? তা হিরণ্ময়, সেই বা এমন মন্দ কি? এক দিনের মাত্র দেখা, তবু সেই এক দিনেই তার সৌম্য-শান্ত ভদ্রতা তার ত বড় মন্দও লাগে নাই। হয় ত বেশী পরিচয় হইলে তাকে তার ভালই লাগিবে। আর এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে হিরণ্ময়েরই ত তার উপর দাবী বেশী ধরিতে হয়, যথার্থভাবে বাগ্‌দান তার সঙ্গেই তার বাপ-মা করিয়াছেন! কিন্তু—না না, আর দ্বিধা নাই, তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী হইতেই হইবে। কত সুখ, কত ঐশ্বর্য্য, কত সম্মান, এ সব রাজ-ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া স্বেচ্ছায় কেহ কখন পথের ধূলায় নামিয়া গিয়া দাঁড়ায়? এমন নির্ব্বোধ এই বিংশ শতাব্দীতে কে আছে? এক দিকে ত্যাগ ত করিতেই হইবে। এই দিকেই করা ভাল, শশাঙ্কর রূপ আছে, হিরণ্ময়ের টাকা।

করবীকে চিন্তিত দ্বিধাগ্রস্ত দেখিয়া নর্ম্মদা মনে মনে অনেকখানিই আশ্বস্ত বোধ করিয়া নূতন উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, "শশাঙ্কর বাপ যে সো-রাণীর ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্তুর ক'রে বড়র ছেলেকে সর্ব্বস্ব দানপত্তর ক'রে দিয়ে গেলেন, এর মানেটা কি? তুমিই ভেবে দেখে বল দেখি রুবি, এ কি সহজে কেউ করে? নিশ্চয়ই ভেতরে একটা কিছু বড় রকম ব্যাপার আছেই, না হ'লে ছোট গিন্নীই কি আর ছেলের দিক্ টানতেন না? না ছেলেকে বিদায় দিয়ে সতীনপোর কাছে বাস করতে রাজী হতেন? স্বভাবচরিত্র নিশ্চয়ই খুবই মন্দ ছিল, মদ-টদও বেশী রকম খায়, নেহাৎ বেলেল্লা হয়ে গিয়ে থাকবে, তাইতেই না রাগ ক'রে—"

করবী হঠাৎ অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া অসহিষ্ণু স্বরে ডাকিয়া উঠিল—"মা!" তার পর আবার যেন নিরুপায়ের মতই নীরব হইয়া গেল, মনের মধ্যে তীব্র একটা সংশয়ের আগুন

তার সহসা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শশাঙ্ক চরিত্রহীন! সে মদ্যপ! মন যেন তার এ কথায় উচ্চরোলে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল,—না, না, না, এ হ'তে পারে না, এ অসম্ভব! কিন্তু সংশয় বলিল, তা এমন অসম্ভবই বা কিসের? তুমি তাকে কতবারই বা দেখেছ? তার জীবনের কতটুকুই বা তুমি জানো? হয় ত তার বাহিরের ঔজ্জ্বল্য তার ভিতরকার অন্ধকার লুকাইয়া রাখিবার আবরণ মাত্র! নহিলে বাপ কি কখনও শুধু শুধু ছেলে ত্যাগ করে? বিশেষতঃ দ্বিতীয়া স্ত্রীর ছেলে, অমন বিদ্বান্ ছেলে!

রুবির মন দেখিতে দেখিতে একান্ত নীরস ও কঠোর হইয়া উঠিল। চরিত্রহীন মাতালকে কি সে তার দেহ-মন উৎসর্গ করিয়া হীনের সঙ্গে হীন হইবে? না, নিশ্চয়ই না। দূর হউক শশাঙ্কের স্মৃতি, হিরণ্ময়কেই সে বরণ করিবে।

নর্ম্মদা কহিল, "রাগ করলে তুমি হবে কি? যা সত্যি, তা সত্যি! দেশ শুদ্ধ কে না জানে যে, বসন্ত বাবু মরবার সময়—"

রুবি ব্যগ্র হইয়া কহিয়া উঠিল, "থাক গে, মা! আর ওসব কথার দরকার নেই, কাল ত তোমাদের কি সব হয়, সে হয়ে যাবে? তার পরে পরশু আমি ফিরে যেতে পারবো? আমার কিন্তু বেশী দেরী করলে চলবে না।"

নর্ম্মদা হৃষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, "তা যেও, কাল ত আগে পাকা দেখাটা হয়ে যাক্, সুমতি দিদি শুনছি পাকা দেখায় তোমাকে মুক্তার একনল মালা দেবেন।"

রুবি সহসা মনটাকে শক্ত করিয়া লইবার জন্যই সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তোমরা কি দেবে, মা! ওঁরা যে অত দিচ্ছেন।"

নর্ম্মদা ঈষৎ সলজ্জ ম্লান হাস্যের সহিত উত্তর দিল, "আমরা ওঁদের যুগ্যি দিতে কোথা থেকে পাবো বল? এক জোড়া এনামেল করা সোনার বোতাম দেব। ওই জন্যেই ত বলছি রুবি! সখ ক'রে গরীবের হাতে পড়তে যেও না, এর পরে চিরকাল ধ'রে আপশোষ ক'রে মরতে হবে, কোথায় তখন থাকবে ভালবাসা, কোথায় কি!"

রুবি মাথা নত করিল, কথা কহিল না।

নর্ম্মদা উঠিয়া গিয়া স্বামীকে সব কথা বলিল, আর বলিল, "দেখ, একটা কায কর দেখি, পরে ত আর সময় নেই, না হ'লে কাল পাকা দেখা হয়ে গেলে পরশুই বলতুম। তা' পরশু ত হিরণের ছুটী ফুরিয়ে যাবে, তুমি আজ বিকেলেই হিরণকে এখানে চা খাবার কথা ব'লে এসো গে, ওর সঙ্গে একটু দেখা-শোনা হয়, সেটা বোধ হয় ভাল। ছেলে মেয়ে বড় রাখার এ সব ঝঞ্ঝাট কি কম, যেমন এক দিকে সুবিধেও আছে, অসুবিধেও অনেক! তা' দেখ, আর কারুকে যেন ব'লে বসো না, একাই আসা ভাল, আমরাও বরং সে সময়টায় একটু ওদিকে স'রে থাকবো, ওদের কথাবার্ত্তা কইতে সুবিধে হবে। হিরণ ছেলে ভাল, একটু আলাপ-পরিচয় হ'লেই মনটি বদলে যাবে'খন।"

করবীর বাবা চিরদিন তাঁর স্ত্রীর পরামর্শকেই গ্রাহ্য করিয়া চলিয়া আসিতেছেন, ইহাতে তাঁহাকে কোন দিনই ঠকিতে হয় নাই, আজও তাঁর এ পরামর্শটি অসমীচীন বোধ হইল না।"

বিকালবেলা নর্ম্মদা যখন করবীকে সাজসজ্জার জন্য তাগিদ দিতে আসিল, দেখিয়া তার মনের শেষ দ্বিধাটুকু নিঃসন্দেহেই মিটিয়া গেল যে, রুবির মনটাকে সে যতটা ভগ্নপ্রবণ ভাবিয়া রাখিয়াছিল, তার অর্দ্ধেকও নয়। শশাঙ্ককে ভুলিতে তার সময় লাগে নাই এবং হিরণ্ময়কে বরণ করিতে সে মনে মনে স্থিরসঙ্কল্পই হইয়া উঠিয়াছে।

রুবির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রসাধনমার্জ্জিত ও সজ্জিত হইয়া আরও অনুপম হইয়া উঠিয়াছিল। সামান্য একখানি গাঢ় নীল রংয়ের রেসমী সাড়ী, ব্লাউস, আর কাণে হীরার ফুল, হাতে সোণার দু'গাছি করিয়া সরু চুড়িতে তাকে যেন রাজরাণীর মতই দেখাইতেছিল।

চাকর আসিয়া খবর দিল, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়াছেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

কৈলাস-যাত্রী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পরদিন অর্থাৎ ৮ই শ্রাবণ বুধবার প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সকলেই বেলা ৯টার মধ্যেই আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। আহার বলিতে এক্ষণে তরকারিবিহীন অন্নের আহারই বুঝায়। সঞ্চিত আলু সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আসিবার সময়ে "কাশী—কচুরী-গলির" পাঁপর খানকয়েক সঙ্গে আনা হইয়াছিল। তাহাই টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া একটু মশলা সংযোগে 'ডালনা'র মত করিয়া খাওয়া হইতেছে। তাহাতে কয় দিন চলিতে পারে? অবশেষে রোগের ঔষধ হিসাবে আনীত পুরাতন তেঁতুল তরকারিরূপে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিতে লাগিল। একটু মিষ্ট ও লবণ সংযোগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অন্নের 'ঝোল'রূপে অন্নের সহিত ইহার নিত্য ব্যবহার, গলাধঃকরণ ভিন্ন সে সময়ে আর কি বলা যাইতে পারে!

আহারে, শয়নে এবং প্রতিদিনের নিরন্তর পার্ব্বত্য পথাতিক্রমের এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও মনে সান্ত্বনা ছিল—"চিরদুর্গম কৈলাস পর্ব্বত পরিক্রমা করিতেছি।" দক্ষিণ-দিকে এই কৈলাসের উন্নত পর্ব্বত-প্রাসাদের সহিত বাম-দিকেও বেগবতী ঝরণার ওপারে একটি সমুন্নত পর্ব্বত শোভা পাইতেছিল। এই দুই বিস্তৃত পাহাড়ের মধ্যস্থলে ঝরণার ধারে ধারে কয় জন যাত্রীর নিঃশব্দে গমন কেমন একটা সাধন-মার্গের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিতেছি, মনে হইতেছিল! সেখানে জীব-জন্তু-মানবের দুরন্ত কোলাহল নাই, প্রশান্ত নীলাকাশে একটি পক্ষীরও চঞ্চল পক্ষ-বিস্তারে উড়িবার সামর্থ্য নাই। শুধুই নিস্তব্ধতা,—যুগযুগান্ত ধরিয়া এই প্রকাণ্ড সমাধি-স্তূপের চারিধার কি এক মহান্ মৌন আকর্ষণে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে! ধীরে ধীরে এ পথ অতিক্রম করিতে মধ্যে মধ্যে সেই রজত-স্তূপ হইতে শীতল তুষারধারা অভ্র-ভেদী পর্ব্বত-প্রাসাদের নগ্ন গাত্র বাহিয়া, পয়ঃপ্রণালীর মত নীচে গড়াইয়া আসিতে-ছিল। মনে হইতেছিল, এই প্রাসাদেরই অভ্যন্তরে লোক-লোচনের অগোচরে চির-মৌনী তাপস-বৃন্দ যোগ-সাধনায় অনন্তকাল নিযুক্ত রহিয়াছেন। এক স্থানে প্রায় ৮ শত ফুট উচ্চ হইতে এই পুঞ্জীভূত ফেন-রাশির ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতধারাকে ধীরে ধীরে নীচে নামিতে দেখিয়া, যাত্রিগণ সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে সে দিকে চাহিয়া দেখিলেন। স্থান-বিশেষে নয়নের পলকও এখানে স্থির হইয়া যাইতে চাহে! এইরূপ বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রায় ৫ মাইল আগে আসিয়া আমরা

ডিরীপু গুম্ফা হইতে কৈলাস

একটি বাঁকের মুখে পড়িলাম। সেখান হইতে এই প্রশস্ত ঝরণাটিও পশ্চিমমুখে গিয়াছে। এই ঝরণাটি বামে রাখিয়া আমরাও বরাবর পশ্চিমদিকে ঝুঁকিয়া আগে চলিলাম। প্রায় দুই মাইল চলিয়া ঝরণার ওপারে বাম কোণে আবার একটি গুম্ফা দেখা গেল। এই তৃতীয় গুম্ফার নাম "ডিরীপু"। এখান হইতে কৈলাসের রজত-স্তূপটি অধিকতর স্থূলগোলাকার দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে।

পাহাড়ের নীচে নীচে এ যাবৎ আমাদের পথ প্রায় সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়াই চলিয়া আসিতেছে। এইবার চড়াইএর মুখে আমাদের দক্ষিণ ভাগের রজত-স্তূপ হইতে একটি প্রশস্ত ঝরণা আসিয়া বামদিকের ঝরণার সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহা পার হইয়াই চড়াইয়ে উঠিতে হইবে। ঝরণাটিতে কেবলই রাশীকৃত প্রস্তরখণ্ড বিস্তৃত। ঘোড়া বা ঝব্বু লইয়া এই ঝরণা পার হইতে অল্পবিস্তর লম্ফপ্রদানে কেহ কেহ তাল সামলাইতে না পারায় ধাক্কা খাইলেন।

তথাপি শীতল তুষার-জলে পা ডুবাইতে কেহই রাজী হইলেন না। এই ঝরণা পার হইয়াই সকলে চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলেন। বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্ততঃ বিস্তৃত নগ্ন প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া সেদিনকার এই ভীষণ চড়াই অতিক্রম করিতে সকলকেই অসম্ভবরূপে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল। পাঁচ সাত মিনিট আগে যাইতে না যাইতেই বিশ্রামের আয়োজন। অত্যধিক শ্বাসকষ্ট সে দিন প্রত্যেক যাত্রীকেই অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছিল। এইটুকু সুবিধা ছিল যে, লিপুলেকের চড়াইএর মত এ পথে আমাদিগকে সে সময়ে তুষার অতিক্রম করিতে হয় নাই। *

ভুপ সিং বেচারী ঝব্বুর উপরেই আসিতেছিল। এক স্থানে তাহার ঝব্বুটি যখন দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছিল, সেই অবস্থায় সিংহ মহাশয় পৃষ্ঠচ্যুত হইয়া সহসা নীচে পড়িলেন। তাহার পৃষ্ঠদেশের নিজের বন্দুকে সে নিজেই আহত হইল। সকলের সমক্ষে তাহার বন্দুকের এইরূপ সদ্ব্যবহার, তথা ঝব্বুর দণ্ডায়মান অবস্থাতে নীচে পত[ন] উভয়ই হাস্যজনক ব্যাপার হইয়া পড়ায়, সকলেরই চ[ক্ষু] সে সময়ে তাহার দিকেই আকৃষ্ট হইল। পড়িবার কার[ণ] জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তদুত্তরে যাহা শ্রবণ করিলা[ম] তাহাতে সকল যাত্রীরই আর এক দফা হাসির রো[ল] উঠিল। সে বলে, লোমশবহুল বিপুলবপু ঝব্বুর পৃষ্ঠদে[শে] বসিয়া চড়াই উঠিবার কালে "ঝাঁকরাণিতে" তাহা[র] তন্দ্রাঘোর লাগিয়া এই দুর্দ্দশা-ভোগ হইয়াছে। স্থান বিশেষে এই অসাবধানতায় পড়িয়া গেলে তাহার ছাতুপু[ষ্ট] দেহখানি যে একবারে চুর্ণ-বিচুর্ণ হইতে পারে, সে ধারণ[া] সে সময়েও তাহার আদৌ মনে হয় নাই। এ দিকে এ[ই] চড়াই উঠিতে যখন সকলেই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে[ছি]লেন, তাঁহাদের দক্ষিণ ভাগে রজত-স্তূপটির আকা[র] ক্রমশঃ অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছিল। গোলাকার অংশে[র] মধ্যভাগ হইতে খানিকটা পাহাড় যেন কায়া বিস্তার করিয়[া] উত্তরদিকে কিছুদূর আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। শূল[-] পাণির পিনাকের মত সে বিস্তার হিন্দু উপাসকের চক্ষুতে বি[শেষ] পবিত্র মূর্ত্তি! পিনাকের গায়ে গায়ে আঁকা-বাঁকা তুষারের উজ্জ্বল বিস্তৃতি স্ফটিকের মালার ন্যায় চোখের সম্মুখে কেমন ঝক্-ঝক্ করিতেছে। এই নির্জ্জন তুষারগিরি-কন্দরে এরূপে পূজার মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ দর্শন মরজগতে এক অভাবনীয় আবিষ্কার বটে। বিস্মিত-নেত্রে সকলেই সেই বিরা[ট] জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি চাহিয়া দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলেন। সে সময়ে আমাদের প্রত্যেকেরই ভক্তিসম্ভ্রম[-] চিত্ত আপনা হইতেই কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট মহাপুরুষের চরণ[-] তলে নমিত হইয়াছিল, তাহা কে বলিয়া দিবে!

ইংরাজ পরিব্রাজক সিউয়েন হেডিন্ এ দৃশ্যকে "Splenbid view" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিব্বতীরা এই স্থানটিকে "গ্যাল্‌পো-নরজিঙ্গি ফোপ্‌রাং" (Gyalpo Norjingi Phoprang) অর্থাৎ ধনাধিপতি কুবেরের বাসস্থান বলিয়া থাকে। জাপানী পরিব্রাজক "কাউয়াগুচির" গ্রন্থপাঠে ইহাই জানা যায়। * ফটোতে এ দৃশ্য পাঠক

* আমাদের যাত্রার পর-বৎসরে অর্থাৎ বর্ত্তমান ১৩৩৭ সালের কৈলাসযাত্রিগণ এই গৌরী-কুণ্ডের পথে প্রায় ৪ মাইল তুষার পাইয়াছেন। সে জন্য অনেকেরই শীতে জমিয়া যাইবার মত অবস্থা হইয়াছিল। অনুসন্ধানে জানিলাম, তাঁহারা আমাদের যাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে ওখানে পৌঁছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বেশ প্রতীতি জন্মিয়াছে, যাত্রার পক্ষে আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ই সর্ব্ববিষয়ে প্রশস্ত।

* On ascending the hill (Dolma-la) one sees to the right a snowy range of the northern parts of Mount Kailasa, named in Tibeltian Gyalpo

বর্গের কতটুকু মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে, জানি না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, ঘরে বসিয়া মাটীর শিবলিঙ্গ গড়িয়া পূজায় যাঁহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদের ত কথাই নাই, প্রত্যেক সৌন্দর্য্য-পিপাসু ব্যক্তিই শক্তি ও সামর্থ্য হিসাবে একবার যেন এই নির্জ্জন হিমালয়-পারের স্বভাব-সুন্দর পবিত্র মূর্ত্তিকে জাগ্রতরূপে দেখিয়া আসিতে কদাচ বিস্মৃত না হয়েন। দেখিবেন, যে মূর্ত্তি অন্তরে অন্তরে চরম সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করিয়া দেয়, লোকালয় হইতে এতদূরে এইখানে আসিয়াই সে মূর্ত্তির উজ্জ্বলভাবে আত্মপ্রকাশ রহিয়াছে। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে কৈলাসের অনুপম দিব্য মূর্ত্তির ইহাই হইল একমাত্র বিশিষ্টতা।

পিনাক সমেত কৈলাস (গৌরীকুণ্ডের চড়াই উঠিবার কালে)

সমুদ্রগর্ভ হইতে এই কৈলাসের উচ্চতা কত, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ইহাকে ২১ হাজার ৮ শত ১৮ ফুট, কেহ বা ২২ হাজার ২৮ ফুট, আবার কেহ বা ২২ হাজার ৩ শত ফুট উচ্চ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পরিশ্রান্তচিত্তে ৪ মাইল আন্দাজ চড়াই শেষ করিয়া যখন আমরা পাহাড়ের শীর্ষদেশে উপস্থিত হইলাম, তখন অপরাহ্ণ ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। কৈলাসযাত্রার পথ-পরিভ্রমণে যাত্রীদিগের ইহাই হইল সর্ব্বশেষ উচ্চতম চড়াই। ইহার উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১৮ হাজার ৫ শত ৯৯ ফুট। তিব্বতীগণ এই স্থানটিকে "দোল্‌মালা" এবং হিন্দুগণ "গৌরী-কুণ্ডের" পাহাড় বলিয়া অভিহিত করেন। এই উচ্চতম শিখর-দেশে তিব্বতীদিগের প্রোথিত একটি দণ্ডায়মান শুষ্ক বৃক্ষদণ্ডের শাখা-প্রশাখায় নানা বর্ণে রঞ্জিত কতকগুলি ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, দুই তিনটি ভাঙ্গা 'শিং' (বোধ হয় মহিষেরই হইবে) এবং কতকগুলি ভেড়ার চুল বাঁধা ছিল। ইহাই হইল সে স্থানের জয়চিহ্ন! আমাদের তিব্বতী ঝব্বু ওয়ালারা অব্যক্ত মন্ত্রোচ্চারণের সহিত সে স্থানটি প্রদক্ষিণ করিয়া লইল। এক দল তিব্বতী যাত্রীও সে সময়ে ইহার প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া আগে চলিয়া গেল।

আমাদের সময় খুব অল্প, বিশেষতঃ রাত্রিতে অসহ্য শীতে এখানে থাকা অসম্ভব বুঝিয়া যাত্রিগণ খুবই ব্যস্ততার সহিত "গৌরীকুণ্ড" দেখিতে গেলেন। একটু নীচে নামিতেই আমাদের দক্ষিণভাগে এই কুণ্ড বা হ্রদটি একবারে তুষারাবৃত অবস্থায় শোভা পাইতেছে। ইহার পরিধি প্রায়

Norjingi Phoprang which means the 'residence of king Kuvera', the God of wealth.

["Three years in Tibet" Page 4.

গৌরীকুণ্ড

রঞ্জনের ব্যস্ততায় সকলের চমক ভাঙ্গিল। নিয়ত তুষারপাতের আশঙ্কায় এখানে কেহই বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না, বিশেষ এখনও আমাদিগকে অন্ততঃ ২ মাইল উতরাই নামিয়া গিয়া আগে পৌছিতে হইবে। দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী সেই পবিত্র হ্রদে পঞ্চরত্ন নিক্ষেপ করিলেন। কেহ কেহ শিশিতে করিয়া জল ভরিয়া লইলেন। তার পর সেই চিরসুন্দর শুভ্র দৃশ্য ফেলিয়া রাখিয়া আমরা ধীরে ধীরে উতরাই নামিতে আরম্ভ করিলাম।

৪ ফার্লং হইবে। আমরা নীচে নামিয়া ইহার জলস্পর্শ করিতে প্রায় এক ফুট পরিমাণ মোটা বরফ যষ্টি দ্বারা ভাঙ্গিতে হইল। এই বরফ অনন্তকাল ধরিয়া জলের উপর জমিয়া ভাসিয়া রহিয়াছে। কৈলাসের তুষারাবৃত পিনাকটি বরাবরই এই কুণ্ড পর্য্যন্ত আসিয়া মিশিয়া রহিয়াছে।

সে কি অপূর্ব্ব শুভ্র সৌন্দর্য্যের বিস্তার! এত উচ্চে আরোহণ করিয়া পিনাক-সংস্পৃষ্ট এই মনোরম তুষার-শোভী গৌরী-হ্রদ দেখিতে গেলে ইহার চিরসুন্দর উজ্জ্বলতায় হঠাৎ যেন চক্ষুগুলি ঝলসিয়া যায়। ইহজীবনের পাপপঙ্কিল হৃদয় এই তুষার-হ্রদের নির্ম্মল জলস্পর্শে নিমেষমধ্যেই উজ্জ্বল ও সুন্দর হইয়া উঠে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে দিন সেই রজতগিরিনিভ সদাশিব ত্রিলোচনের উজ্জ্বল অঙ্কে দিব্যাভরণমণ্ডিতা গৌরী দেবীর অনুপম দিব্য মূর্ত্তি বাস্তব ছবির মত সকলেরই চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সে দৃশ্য কখনই ভুলিবার নহে! স্বদেশ-বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত যাত্রিহৃদয় সে দিন সত্য সত্যই যেন শিবলোকের সান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে কি মধুর জাগ্রত স্বপ্ন!

এ উতরাইএ ঘোড়া বা ঝব্বু পৃষ্ঠে আসা আদৌ সম্ভবপর নহে। সুতরাং পদব্রজেই অত্যধিক সাবধানতার সহিত সকলেই এ পথ যথাসম্ভব সত্বর শেষ করিয়া প্রায়

কৈলাস-পরিক্রমণকারী তিব্বতী

২ মাইল চলিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে আর অধিক দূর যাওয়া চলিল না। একটি ঝরণার পাশেই

তাঁবু খাটাইতে সকলে ব্যস্ত হইলেন। এখানে অসংলগ্ন প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া চলিয়া আসিতে দিদিকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। শেষের দিকে খানিকটা পথে ঘোড়ায় উঠিয়া শ্রান্তি দূর করিতে গিয়া তৎপরিবর্ত্তে দ্বিতীয়বার ইহার লম্ফ-ঝম্পে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এ বিষয়ে কিন্তু তাঁহার সহযাত্রিণীর সহিষ্ণুতা ও সাহস অসাধারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না! কৈলাসযাত্রায় কঠিন অসমতল পথে (বয়সে একষষ্টিতম উত্তীর্ণ হইলেও) ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠিয়া তিনি এ যাবৎ একটুও আহত হয়েন নাই।

আমাদের তাঁবুর পার্শ্বেই জমীর উপরে জমাট তুষারখণ্ড ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকায় জমীগুলি ভিজা ও ভীষণ "স্যাঁৎ-সেঁতে" ছিল, অথচ অন্ধকারে আগে যাইবারও উপায় নাই। এই সব ভাবিয়া সে রাত্রি আমাদিগের সকলকেই একপ্রকার জলের উপরেই কম্বল বিছাইয়া কাটাইতে হইল। চলিত কথায় প্রচলিত "কৈলাসের শীত" সে দিন প্রত্যেক যাত্রীই কিরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে।

পরিক্রমার দ্বিতীয় রাত্রি এইখানে অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় দিনে বেলা ৯টার মধ্যেই আবার আমরা রওনা হইলাম। সে দিন আকাশ বিলক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। পথি-মধ্যে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই বৃষ্টিপাতের সূচনা হয়। সুখের বিষয়, এ সকল স্থানে অল্পমাত্র বৃষ্টি হইয়াই প্রায় তুষারপাত হইতে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে চির-প্রাচীন মহাভারতেও যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

"ততোঽশ্মসহিতা ধারাঃ সংবৃণ্বন্ত্যঃ সমন্ততঃ।
প্রপেতুরনিশং তত্র শীঘ্রবাতসমীরিতাঃ॥"

—বনপর্ব্ব ১৪৩ অধ্যায়।

এই অশ্ম-সহিত ধারা অর্থাৎ শিলাবৃষ্টির মধ্য দিয়াই কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা ঝব্বুতে, আবার কেহ কেহ পদব্রজে পরিক্রমাকার্য্য শেষ করিয়া আগে চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে আমাদিগের দক্ষিণভাগে চতুর্থ গুম্ফা বা আর একটি মঠ দৃষ্টিগোচর হইল। ইহার তিব্বতী নাম সুং টুল্ পুং (Tsuntulpu)। সেই মঠ হইতে অঙ্গুলিসঙ্কেতে যদিও কয়েক জন লামা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছিলেন, আমরা কিন্তু সে দিকে কেহই অগ্রসর হইলাম না। নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া বেলা ৪টা আন্দাজ সময়ে আবার সেই প্রকাণ্ড ময়দানের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে (ক্ষুচুতে) উপস্থিত হইলাম। যাত্রীদিগের যে সমস্ত আসবাবাদি রঞ্জনের দ্বারা এখানে গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল, সমস্তই আবার লইয়া আসা হইল। এইরূপে সে রাত্রি অল্প অল্প বৃষ্টি ও বিলক্ষণ ঝড়ের মধ্যে তাঁবুতে অতিবাহিত হইল।

পরদিন বেলা ৯৷৷৹টার মধ্যেই আমরা রওনা হইলাম। আমাদের সহযাত্রী পঞ্জাবীর দল (৪ জন) এখান হইতে অন্য রাস্তা ধরিলেন। তাঁহারা "লিপুলেকপাস্" দিয়া না গিয়া "জোহারের" রাস্তায় জ্ঞানিমামণ্ডি হইয়া আলমোড়ায় ফিরিবেন। শুনিলাম, আমাদের নির্দ্দিষ্ট পথ অপেক্ষা এ পথে আলমোড়ায় পৌছিতে কিছু কম দিনই লাগিয়া থাকে। তবে এ পথে লিপুলেকের মত ২।৩টি দুর্গম রাস্তা পড়ে, যথা —"কুংরীবীংরি" পাস্, "উটাধুয়ী" পাস্, "জয়ন্তী" পাস্ ইত্যাদি। আমরা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পথেই এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সুরু করিলাম। এ দিনে প্রায় ১২।১৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যা ৬টা আন্দাজ সময়ে রাবণ হ্রদে পৌছি। এবারে কিন্তু আমরা মানসের রাস্তা ধরি নাই। বেলা ১১টা আন্দাজ সময়ে "পরখা"কে বামে রাখিয়া বিরাট ময়দানটি ক্রমশঃ পার হইয়া, বেলা ৩টা হইতে চড়াই উঠিতে থাকি। তার পর সন্ধ্যা ৫টায় রাবণ হ্রদের উত্তরপূর্ব্ব কোণের পাড় ধরিয়া বরাবর দক্ষিণপূর্ব্বদিকে আসিয়া তাঁবু স্থাপন করা হইল। আসিবার কালে চড়াই হইতে আমাদের বামদিকে মানসের নীল জলের কতকটা অংশ আর একবার নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। প্রকৃতির রাজত্বে এই দুই রমণীয় হ্রদ উভয়েই পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে, এ কথা বলা অত্যুক্তি নহে। জাপানী পর্য্যটক 'কাউয়াগুচি' এ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—"A mountain, some two and a half miles round at the base, stands like a wall of partition between the two lakes and where this mountain slopes into a ravine it looks, for all the world, as though there were a channel of communication for the water from one lake to the other." [Page 147. "Three years in Tibet."]

তিনি আরও লিখিয়াছেন, এই দুই হ্রদের সম্বন্ধ ঠিক স্বামিস্ত্রীর মত। "The relations between the two lakes are those of husband and wife." তিনি

এই রাবণ হ্রদ বেড়াইবার কালে তাঁহার পুস্তকের এক স্থানে এখান হইতেই গঙ্গার উৎপত্তি বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

• Keeping Lake Lakgal (Rakhas Tal) in view, I now proceeded easily down hill for some thirteen miles or so until I arrived at a plain through which I found a large river flowing. The river was over sixty feet wide, and was known as the Mabcha Khanbab, one of the tributary sources of the Ganga.

147 Page.

অবশ্য এ কথাটা ঠিক বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সত্যাসত্য যাহাই হউক, তীর্থযাত্রীর মত আমরা এই রাবণ-হ্রদের তটে আবার এক রাত্রি অতিবাহিত করিবার অবসর পাইয়াছিলাম।

পরদিন অর্থাৎ ১১ই শ্রাবণ বেলা আন্দাজ ১০টার সময়ে সকলেই এই হ্রদ পশ্চাতে রাখিয়া আগে অগ্রসর হইলাম। এ দিনে প্রায় ১০।১১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, একটি ঝরণা দেখিয়া, তৎপার্শ্বে রাত্রিযাপন করা হইল। তার পর দ্বিতীয় দিনে সেই পুরাতন পথে সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন তাকলাকোট গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম, তখন এখানকার মণ্ডি বা বাজারের অবস্থা খুবই "সরগরম" দেখা গেল। কর্ণালী নদীর উভয় তীরেই বহু তাঁবুর সন্নিবেশ হইয়াছে। ব্যবসাদার ও খরিদ্দারদিগের নিয়ত হুড়াহুড়ি, লোমশ-বহুল অসংখ্য ভেড়া ও ছাগলের মুহুর্মুহু চীৎকার শ্রবণ করিতে করিতে যখন এখানে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, বাস্তবজগতের কথা তখন যেন অকস্মাৎ মনে আসিল।

এখানে আসিয়া আর এক দণ্ডও ভাল লাগিল না। কতক্ষণে এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া আগে অগ্রসর হইতে পারিব, সেই চিন্তায় রঞ্জনের সহিত পরামর্শ আরম্ভ হইল। তাকলাকোট হইতে যে সকল ঝব্বুওয়ালা কৈলাস দেখাইয়া আনিল, তাহারা যদি গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে সমর্থ হয়, তবে কল্যই প্রভাতে এখান হইতে রওনা হওয়া যায়, এই মনে করিয়া রঞ্জন ঝব্বুওয়ালাদিগের সহিত নানা-প্রকার আপ্যায়নে এ বিষয়ে স্থির করিয়া ফেলিল।

গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া ৪।• হিসাবে ধার্য্য হইয়া গেল। তার পর কৈলাস দেখাইয়া তাকলাকোটে ফিরিয়া আনা প্রত্যেক ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া ১২৲ টাকা হিসাবে এবং প্রত্যেক বাহককে (সঙ্গে যাওয়ার দরুণ) ৩৲ টাকা হিসাবে মজুরী চুক্তি করিয়া দিয়া সে দিনের মত তাহাদিগকে বিদায় দিয়া আমরা হাঁফ ছাড়িলাম।

পরদিন প্রভাতে যথাসময়ে আমাদের জন্য ৮টি ঝব্বু ও ৮টি মাত্র ঘোড়া উপস্থিত হইল। পঞ্জাবী যাত্রীর দল অন্য রাস্তা দিয়া চলিয়া যাওয়ায় এবারে আমাদের দলে সংখ্যায় যেমন কিছু কম হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বোঝাও (আহার্য্য দ্রব্যের) ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া এবারে ইচ্ছা করিয়া অনেকেই পদব্রজে ফিরিবার সংকল্প করিয়াছেন। কৈলাস ঘুরিয়া তাঁহাদের যেন যথেষ্ট সাহস জন্মিয়া গিয়াছে। যদিচ, এই ১২।১৩ দিনের দৈনন্দিন পরিশ্রমে, তিব্বতের শীতে তুষার-মিশ্রিত ঝড়ের মধ্যে অভিযানের ফলে, প্রত্যেকেরই নাক, মুখ, ঠোঁট (শুধু ফাটে নাই) একবারে কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত হইয়াছে, তথাপি বাটী ফিরিবার ব্যস্ততায় ও উৎসাহে 'ঘরমুখো বাঙ্গালী' কতদূর আনন্দ লাভ করেন, তাহা যিনি বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া কিছুদিন পর্ব্বতরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক করে না। আমাদের অবস্থা পাঠকবর্গ! আপনারা একবার মনে করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ, খাদ্যা-ভাবে মাসাধিককাল প্রত্যেকেরই জিহ্বা রুচিপরিবর্ত্তন করিবার জন্য একপ্রকার ক্ষিপ্ত বলিলেই হয়! তাহার উপর শরীরের অবস্থা তিব্বতীদের ন্যায় আগাগোড়া শুষ্ক, রুক্ষ, তৈলাভাবে সর্ব্বদাই যেন অসম্ভব 'খস্‌খসে' হইয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সমতলবাসী বাঙ্গালা রাজ্যে যাঁহারা বাস করেন, এ 'ধাত্' তাঁহাদের কয় দিন সহ্য হইতে পারে? এমত অবস্থায় বাটী ফিরিবার জন্য প্রত্যেক যাত্রীরই অন্তঃ-করণ বিলক্ষণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা যথাসম্ভব সত্বর অর্থাৎ বেলা ৯টার মধ্যেই এখান হইতে রওনা হইলাম। প্রায় ৬।৭ মাইল দূরে "পালা" হইতে কিছু দূর আগে গিয়াই তাঁবু খাটাইতে বাধ্য হইলাম। এ দিনে ঝব্বুওয়ালারা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। কারণ, আরও কিছু দূর যাইতে গেলে তুষারশীতল লিপুলেকের নিকটে রাত্রিবাস করিতে হয়। সেখানে

অসহ্য শীত, তায় এবারে তাহারা সঙ্গে তাঁবু পর্য্যন্ত লইয়া আসে নাই। অগত্যা লিপুর ২ মাইল পাছে থাকিয়া এ দিনে রাত্রিযাপন করা হইল।

পরদিন লিপু অতিক্রমের পালা। প্রত্যূষেই আপন আপন লগেজাদি ঝব্ব-পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া সকলে রওনা হইলেন। "রৌদ্রের পূর্ব্বেই লিপু পার হওয়া আবশ্যক" বলিয়া দিয়া স্বামীজীরা পদব্রজে আগে আগে দ্রুত চলিয়া গেলেন। অশ্বপৃষ্ঠে আমরা কিছু দূর অগ্রসর হইলে, দূর হইতে সেই ধবলাকার তুষারপুঞ্জীভূত লিপুর শৃঙ্গগুলি চোখের সম্মুখে আজ কেবল আতঙ্কই উপস্থিত করিতেছিল। ঐ পথটুকুই কি যত অনর্থের মূল? স্বামীজীদের মধ্যে ঐ ত কেহ কেহ উহার চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরাও কি ঐরূপে এই তুষার-শৃঙ্গটি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব না? প্রায় ১৯ হাজার ফুট উচ্চ গৌরীকুণ্ডের পাহাড় অতিক্রম করিয়া আসিলাম, আর লিপুর উচ্চতা সে হিসাবে অনেক কম, তবে এত চিন্তা করিবার হেতু কি? হেতু অবশ্যই আছে। দুরন্ত শীতে উঁচুনীচু পথে তুষারের রাস্তা পার হইতে হইবে বলিয়াই এতটা ভয়! গৌরী-কুণ্ডের চড়াইএ কৈ, আমরা ত কেহই তুষারের রাস্তা পাই নাই। তাই সেটা এত দুর্গম মনে হয় নাই!

যতই লিপুর নিকটবর্ত্তী হইয়া চড়াইএর পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছি, শীতও তত বেশী বোধ হইতে লাগিল। অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া হাত-পা যেন ক্রমশঃ অসাড় হইয়া যাইতেছিল। প্রায় ২ মাইল উঠিয়া এইবার তুষারের সম্মুখীন হইতে হইল। রৌদ্রের লেশ নাই, (রৌদ্র থাকিলে শরীর গরম হইত!) অথচ বেলা যথেষ্ট হইয়াছে। সময় বুঝিয়া সূর্য্যদেব আজ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন! মাথার উপরে কেবলই পুঞ্জীভূত মেঘ শীতে জড়সড় হইয়া যেন জমিয়া গিয়াছিল! এ অবস্থায় এক উচ্চস্থানে লম্ফ দিতে গিয়া, আমার ঘোড়াটি অকস্মাৎ সাজ-সমেত আমাকে পৃষ্ঠচ্যুত করিলেন!

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাওয়া—ইহাই আমার প্রথম। বাটীতে যিনি নিত্য ঘোড়সওয়ার অর্থাৎ শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ, তাঁহাকেও এযাবৎ ২।৩ বার ঘোড়া হইতে পড়িতে দেখিয়াছি; কিন্তু স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়া আসিয়াছি, যাত্রিগণ আমার মত অনভ্যস্ত ঘোড়-সওয়ারকে একবারও এ যাবৎ ঘোড়া হইতে পড়িতে দেখেন নাই। আজ কিন্তু ফেরতমুখে লিপুর চড়াইএ উঠিবার কালে, সে স্পর্দ্ধাটুকু কৈলাসপতি একবারে দূর করিয়া দিলেন। এত ক্লেশের মধ্যেও অন্যান্য যাত্রিগণের মুখে এ সময়ে হাসি ফুটিতে দেখিয়া বিলক্ষণ লজ্জিত হইলাম। যদিও হাঁটুতে ও হাতের স্থানে স্থানে আঘাত লাগিয়া একটু আধটু রক্ত বাহির হইল, সে ক্লেশটুকু সে সময়ে এত দিনের দর্পচূর্ণের হঠাৎ ক্লেশ অপেক্ষা অনেক কম মনে হইয়াছিল। যাহা হউক, পকেট হইতে "জম্‌বগ্" বাহির করিয়া ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ প্রলেপ দিয়া বীরের মত আবার আগে অগ্রসর হইলাম। এবার কিন্তু ঘোড়ায় নহে।

ঘোড়াওয়ালা (তিব্বতী) আমার দুর্দ্দশা দূর হইতেই দেখিতে পাইয়াছিল। সে নিকটে আসিলে "ঘোড়ার সাজ ভাল করিয়া কেন বাঁধে নাই" বলিয়া তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলাম। দুঃখের বিষয়, সে তাহাতে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করিল না। প্রতিবাদস্বরূপ সে নিজেই এক্ষণে তাহার বাহনের উপর চড়িয়া বসিল। বলা বাহুল্য, যে চড়াইএ ঘোড়া লইয়া চলা একটুকুও সহজ নহে, সেই পথে ঘোড়ার উপরে বসিয়াই সে অনায়াসে তুষারের নিকট পর্য্যন্ত পৌছিয়া গেল। অন্যান্য যাত্রিগণের সহিত আমি এক্ষণে পদব্রজেই ক্রমশঃ তুষারের পথ অতিক্রম করিয়া চলিলাম। দেখিলাম, যাইবার কালীন এ পথে যেরূপ তুষারের বিস্তৃতি ছিল, এ সময়ে তদপেক্ষা তুষার কিছুই কমে নাই। সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত সাবধানতা সহকারে এ তুষার অতিক্রম করিতে না পারিলে পদে পদে পা পিছলাইয়া যায়। অনেকেই এখানে এ দিনে তুষারের উপরে আছাড় খাইয়াছিলেন! স্ত্রীলোক যাত্রীর দুর্দ্দশার কথা না বলিলেই ভাল হয়। প্রথম পদ যদি বা তাঁহারা তুষারে আগে বাড়াইয়া দিলেন, সে পায়ে ভর দিয়া উঁচুতে উঠিবার জন্য দ্বিতীয় পদ আর চালাইতে পারেন না! তুষারের উঁচুনীচু রাস্তায় ইহাই হইল বিপদ্! যাহা হউক, এক জন অগ্রে এক হাত এবং পশ্চাতে আর এক জন সঙ্গে ধরিয়া কোন প্রকারে তাঁহাদিগকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমরাও ক্রমশঃ শেষ উচ্চস্তরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যাত্রীদিগের মধ্যে উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের মুখে এতক্ষণে কথা বাহির হইল। "পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইবার

এতক্ষণে শেষ হইল” এটু কথাও বড় দুঃখের সহিতই সে দিন তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়াছিল! দুঃখের কথা বলিতে কি, প্রায়শ্চিত্ত তখনও যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, এ কথা যাত্রী-দিগের মধ্যে কেহই সে সময়ে বুঝিতে পারেন নাই। যথাকালে ইহার বিবরণ পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন।

গর্ব্বিতচিত্তে যখন আমরা সকলেই লিপুর উতরাই ধরিয়া নামিয়া আসিতেছিলাম, সে সময়ে এক অভাবনীয় দৃশ্যে আমাদের সকলেরই দর্প এককালীন চূর্ণ হইয়া গেল! দেখিলাম, একটি পাঁচ বৎসরের ভুটিয়া বালক তাহার আত্মীয়স্বজনের সহিত এই দুর্গম তুষার-শিখর পদব্রজেই হাসিমুখে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। চোখের সম্মুখে সেই বীর বালকের সাহসী অভিযান চিরদিনই আমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে।

দুই ঘণ্টাকাল তুষার-সমুদ্র মন্থন করিয়া বেলা ২॥০টা আন্দাজ সময়ে সকলে নীচে নামিয়া আসিলাম। আবার অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া প্রায় ৫।৬ মাইল আগে চলিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে “কালাপানীতে” উপস্থিত হইলাম। বৃষ্টির জলে সে দিন সমস্ত পথটাই যাত্রীদিগকে ভিজিতে হইয়াছিল। রাস্তার আশপাশ সর্ব্বত্রই বিলক্ষণ আর্দ্র দেখিয়া তাঁবু খাটাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। জনৈক ভুটিয়া মহাজনের (কল্যাণ সিংএর) একখানি দ্বিতল মাটীর ঘর খালি পড়িয়া থাকায় তাহার রক্ষক একটি স্ত্রীলোককে কিছু বখশিশ দিয়া সে রাত্রি সেইখানেই কাটাইয়া দিলাম।

পরদিন বেলা ৮॥০টার মধ্যেই আমরা রওনা হইলাম। এখান হইতে আমাদের ৩ জন যাত্রীর তিনটি ঘোড়া লিপুর পথে আঘাত পাওয়ায় চলিতে অসমর্থ হয়। অগত্যা সম্পূর্ণ ভাড়ার অর্দ্ধেক অর্থাৎ দুই টাকা হিসাবে চুক্তি দিয়া সে যাত্রায় তাহাদিগকে বিদায় দিতে হইয়াছিল। এখান হইতে গার্ব্বিয়াং প্রায় ১১।১২ মাইল পথ হইবে। পদ-ব্রজেই বেশ দ্রুতভাবে এ পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ১॥০টা আন্দাজ সময়ে আমরা গার্ব্বিয়াংএ পৌছিলাম। আবার সেই কালী নদী পার হইতে হইল। ভরা বর্ষায় তাহার আয়তন দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ছোট পুলের পরিবর্ত্তে এবারে বড় বড় চীর গাছের সুদীর্ঘ গুঁড়ি দ্বারা প্রস্তুত পুল পার হইবার সময়ে, এই নদীর দুকূল-ভাঙ্গা গর্জ্জন ভীষণ-ভাবে শ্রুত হইয়াছিল। আমরা আগে পৌছিলেও আর আর সওয়ার-যাত্রী বা ভারবাহী ঝব্বুগুলির গার্ব্বিয়াং পৌছিতে এ দিন বহু বিলম্ব ঘটে। এখানকার পাটোয়ারীর হুকুম লইয়া এবারে স্থানীয় ডাক-বাংলোয় স্থান লওয়া হইল। দেখিলাম, বাংলোটি বেশ সাহেবী ধরণের। পাকা ইমারত, ২।৩টি শয়ন-ঘর। বেশ ঝরঝরে ও পরিষ্কার। পাশের দিকে একটু অগ্রসর হইলেই বরাবর স্বতন্ত্রভাবে ৩।৪টি ছোট ছোট কুঠারী আছে। যাত্রিগণ এখানেই রন্ধনাদি করিয়া থাকেন। সম্মুখেই প্রাচীর-ঘেরা প্রশস্ত অঙ্গন। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, গ্রামের মধ্যে স্থানীয় অধিবাসি-গণ যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া দুর্গন্ধ করিয়া থাকে। গ্রাম হইতে কিছু দূরের স্থানটি কিন্তু সে সকল দুর্গন্ধ হইতে একবারেই বর্জ্জিত। এত দিনে বেশ একটু থাকিবার মত স্থান পাইয়া সকলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

রঞ্জন আপন গ্রামে পৌছিয়াই যাত্রীদিগের সুখ-সুবিধায় ব্যস্ত হইল। আমাদের দলের মধ্যে কতক যাত্রীর কিছু দিন হইতেই কোন কোন দ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছিল, তাঁহারা এখানে আসিয়া চাউল খরিদ করিলেন, কিন্তু তরকারী কি পাওয়া যায়, তাহার জন্য সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। অনেক কষ্টে পানসিং (চাকর) কতকগুলি ফুলকপির ছোট ছোট গাছ (তাহাতে আদৌ কপি ছিল না) ।০ চারি আনা মূল্যে খরিদ করিয়া আনিল। ক্ষুধার তাড়নায় অন্নের সহিত সে দিন তাহারই “ছেঁচ্‌কি” তৈয়ার করিয়া গলাধঃকরণ করা গেল। অনুভবানন্দজী গ্রামে গিয়া পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রায় সকল যাত্রীরই পত্রগুলি আনিয়া দিয়া সে দিন পরম উপকৃত করিয়াছিলেন।

এখানে আসিয়াই সকল যাত্রীর ঘরের কথা স্মরণ হইল। কিন্তু বোঝা লইয়া যাইবার কুলী কৈ? কৈলাস যাইবার পূর্ব্বেই স্বামীজী মহারাজ তাকলাকোট হইতে গার্ব্বিয়াং নিবাসী এক জন ভুটিয়া বণিকের মারফত পত্র দ্বারা ধারচুলায় সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে কুলীগণ ২।৩রা আগষ্ট নাগাইদ গার্ব্বিয়াংএ আসিয়া অপেক্ষা করে। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, ধারচুলায় পূর্ব্ব হইতেই কুলীগণের মজুরী ঠিক করিয়া ১৲ টাকা হিসাবে অগ্রিম দেওয়া হইয়া-ছিল। অবশ্য আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই এক দিন পূর্ব্বে (১লা আগষ্ট তারিখে) এখানে পৌছিয়াছি, তাই আরও দুই এক দিন অপেক্ষা করিতে হইল।

দ্বিতীয় দিন প্রভাতেই রঞ্জন খবর আনিল, নীরপানির পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সরকারী ডাক বহনের জন্য ঐ পাহাড়ের উপরের রাস্তা সংস্কার করা হইতেছে। সংবাদ শুনিয়া সকলেই বজ্রাহত হইলেন! আর ২।৩ দিন পূর্ব্বে আসিতে পারিলেই এই পুল দিয়া ঠিক অবস্থায় পার হইয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু ভগবানের চক্র! লীলাময়ের লীলা বুঝিবার সামর্থ্য মনুষ্যের নাই! তাই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় সকলেই যাত্রার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।*

এ দিনে আমাদের ঝব্বু প্রভৃতির ভাড়া (৪।০ হিসাবে) চুক্তি করিয়া দিয়া তিব্বতী ঝব্বুওয়ালাদিগকে ছাড়িয়া দিলাম। এক্ষণে আর তাঁবুর আবশ্যক নাই জানিয়া, আমাদের ভাড়া করা অতিরিক্ত তাঁবুটি তাঁবুওয়ালাকে ফেরত দিয়া উহার নির্দ্দিষ্ট ভাড়া ৬৲ টাকা দেওয়া হইল। এইবার কৈলাস-দূত রঞ্জনের বিদায় দিবার পালা। হিসাব করিয়া দেখা গেল, এ পর্য্যন্ত তাহার ২০ দিনের মজুরী পাওনা হইয়াছে। প্রত্যহ ১।০ টাকা হিসাবে এই মজুরী মোট ৩০৲ টাকা তিন দলের খরচায় বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক দল ১০৲ টাকা হিসাবে বহন করিলেন। তাহা ছাড়া গার্ব্বিয়াং হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে আমাদের প্রত্যেক দলই তাহাকে ২৲ টাকা হিসাবে বখশিশ দিয়া আসিয়াছে। তাহার সর্ব্বদাই হাস্যপ্রফুল্ল চিত্ত এবং নম্র মধুর ব্যবহার কৈলাসযাত্রার পথে আমাদিগের সকলকেই আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল।

এ দিকে নীরপানি পাহাড়ের নীচের পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সংবাদে, উপর দিয়া বোঝা লইয়া যাইবার ভয়ে, হয় ত কুলীগণ ধারচুলা হইতে নাও আসিতে পারে, এই সন্দেহে, এখান হইতে আগে ফিরিবার জন্য কুলীর সন্ধান চলিতে লাগিল। অনেক কষ্টে দ্বিতীয় দিন ৮৲ টাকা হিসাবে প্রত্যেক কুলীর মজুরী স্থির করিয়া তিনটিমাত্র কুলী সংগ্রহ হইল। এত বড় দলের বোঝা লইয়া যাইতে তিনটি কুলীতে কয় মণ মাল লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে? সত্য কথা বলিতে কি, একা আমাদের দলেই ১৮টি কুলীর আবশ্যক। কারণ, আমাদের সহিত দুই জন "স্ত্রীলোক লগেজ" রহিয়াছেন! অগত্যা ডাক্তার দল (তিন জন মাত্র) এই কুলী লইয়া আগে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাদের বাটী হইতে লিখিত পত্রে, তাঁহাদিগের অভাবে সেখানে কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, জানিতে পারিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় আমরা আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। কেবল অনুভবানন্দজী বলিয়া উঠিলেন, নীরপানির উপরের রাস্তা অতি ভীষণ, একে বর্ষা, তায় সেই পুরাতন পথ (যাহাতে সবেমাত্র দু এক দিন পথিক চলিতেছে), এরূপ সাংঘাতিক যে, সে পথে পা পিছ্‌লাইয়া পদে পদে প্রাণ হারাইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা থাকে। এমতাবস্থায় ডাক্তারত্রয়ের সহিত তিনিও সঙ্গ লইলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ কথায় আমরা কেহই অমত দিতে পারিলাম না। বরং এখানে কুলীর বিশেষ অভাব দেখিয়া, সকলের পরামর্শে শেষ সিদ্ধান্ত হইল, স্বামীজী ধারচুলায় আগে পৌঁছিয়া আমাদের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কুলীগণকে (যাহাদের প্রত্যেককেই ১৲ টাকা হিসাবে দাদন দেওয়া রহিয়াছে) ধমক দিয়া সেখান হইতে শীঘ্রই পাঠাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন। এই সব বিবেচনা করিয়া ডাক্তারত্রয়ের সহিত তাঁহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যাইবার পূর্ব্বে তিনি আরও বলিলেন, নীরপানি পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে দুইটি রাস্তার মধ্যে কোন্‌টি বেশী সাংঘাতিক ও বিপৎসঙ্কুল, তাহার বৃত্তান্ত তিনি ডাক-হরকরা মারফত পত্রের দ্বারা পূর্ব্ব হইতে আমাদিগকে জানাইয়া দিবেন। তাঁহার পত্র পাইলে দলবলসহ আমরা সেই পথ দিয়াই যাওয়া স্থির করিব।

এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক পাঠককে এই বিষয় অধিকতর সুস্পষ্ট-ভাবে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি। নীরপানি পাহাড়ের নীচের পুল (অন্য সময়কার চির-প্রচলিত রাস্তা) ভাঙ্গিয়া গেলে এই পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে যে দুইটি রাস্তা পাওয়া যায়, একটিকে "মাঝের রাস্তা" এবং অপরটিকে "উপরের রাস্তা" বলা হয়। নীচের প্রচলিত পথ অপেক্ষা মাঝের রাস্তা দিয়া যাইতে ৬ মাইল এবং উপরের রাস্তা দিয়া যাইতে ৭ মাইল পথ অতিরিক্ত "ফের" পড়ে। এই দুই পথের মধ্যে কোন্ রাস্তা দিয়া যাওয়া অপেক্ষাকৃত

* বর্ত্তমান বৎসরের (১৩৩৭ সালের) কৈলাসযাত্রিগণ গৌরীকুণ্ডে যাইতে যেমন ৪ মাইল রাস্তায় তুষারের ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন, দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে ফিরিয়া তাঁহারা এই পুল ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ব্বেই ধারচুলায় ফিরিতে পাইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাদের পক্ষে সুবিধা ছিল।

নিরাপদ, তাহাই আমাদের স্বামীজী সেখান হইতে আগে গিয়া ডাকহরকরার হাতে পত্রের দ্বারা জানাইবার কথা বলিতেছিলেন।

গার্ব্বিয়াং হইতে ডাক্তারত্রয়কে বিদায় দিবার সময়ে আমরা সকলেই বিশেষ কাতর হইয়াছিলাম। এত দিনের দুর্গম পথের সহযাত্রী, সুখে দুঃখে সমান অংশীদার, অর্দ্ধেক পথ হইতেই সঙ্গী পরিত্যাগ করিলে কাহার মন সে সময়ে স্থির থাকে? স্বামীজীকে ত ধারচুলায় পৌছিয়া শীঘ্রই দেখিতে পাইব; ডাক্তারের দল তখন কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন! * যাইবার কালে ডাক্তারত্রয় আলমোড়া হইতে আনীত তাঁহাদের পাচকটিকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দিনের রাত্রি কোন প্রকারে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিনে দারুণ বর্ষা দেখা দিল। আর সে তিব্বত নাই যে, অল্পবৃষ্টি হইয়াই নিবৃত্ত হইবে। সারাদিনই বৃষ্টিতে ঘর হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না। এই অপরিচিত পার্ব্বত্যপ্রদেশে এভাবে সমস্ত দিন নীরবে বসিয়া থাকা একবারেই অসহ্য মনে হইতেছিল। বোঝাগুলিই যে আমাদের ফিরিয়া যাইবার পক্ষে প্রধান অন্তরায়! ইহার গতি করিতে গেলে সেই একমাত্র কুলীর কথাই মনে পড়ে। ধন্য এই পাহাড়ী কুলীদের শক্তি! সে শক্তি সমতলদেশবাসী বাঙ্গালীগণকে একবারেই আশ্চর্য্য করিয়া দিয়াছে। যে সকল চড়াই উতরাই পথ সহজ অবস্থায় 'উঠা-নামা' করিতে নিয়তই আমাদের হাঁফ ধরিতে থাকে, পাঁচ সাত মাইলব্যাপী সেই সকল দুর্গম পথে এই সকল পাহাড়ীই বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া, নামমাত্র মজুরীতে যাত্রীদিগকে অনায়াসে পার করিয়া দেয়! তীর্থ-যাত্রার অর্দ্ধেক পুণ্য ইহারাই ত অর্জ্জন করিয়া থাকে। এই সকল পাহাড়ী কুলীর সাহায্য না পাইলে আজ বাঙ্গালীর ভাগ্যে তীর্থপর্য্যটন অসাধ্য হইয়াই রহিয়া যাইত!

৪ঠা আগষ্ট বৈকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন আমাদের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কুলীগণের কোন সংবাদই পাওয়া গেল না, তখন কুলী সংগ্রহের জন্য সকলেই স্থানীয় পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। ইনি এক জন নব্য অথচ সদাশয় ব্যক্তি। কৈলাস যাইবার কালেও আমরা ইঁহার যথেষ্ট সৌজন্যের পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের কুলীর অভাব দেখিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্ধানাদি লইতেছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় এ দিন এক সর্দ্দার-বিশেষ পাহাড়ী কুলী সংগ্রহে স্বীকৃত হইল এবং এই কার্য্যের জন্য পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয়ের কথামত আমরা তাহার হাতে উপস্থিত (প্রতি কুলী পিছু ১৲ টাকা হিসাবে অগ্রিম দিবার জন্য) ১৬টি টাকা ফেলিয়া দিলাম। টাকা পাইয়া সর্দ্দার ব্যক্তি সন্ধ্যার মধ্যেই ৮।১০টি কুলী সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং নীরপানির (পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়) উপরের ভীষণ রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে বলিয়া প্রতি কুলী পিছু ৯৲ টাকা হিসাবে মজুরী চাহিল।

আমরা বাটী ফিরিবার জন্য বিলক্ষণ ধৈর্য্য হারাইয়াছিলাম। ধারচুলায় কুলীদিগের সহিত ৬৲ টাকা হিসাবে দর চুক্তি থাকিলেও, আজ অবস্থাভেদে এই সর্দ্দার-কুলীর কথায় সায় দিতে হইল। তার পর, আগামী কল্যই বাকী কুলী সংগ্রহ হইয়া যাইবে, এ কথা বলিয়া যখন সর্দ্দার মহাশয় চলিয়া গেল, সে সময়ে আমরা সকলেই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

পরদিন দুপুরবেলা সর্দ্দার জানাইয়া গেল, সমস্ত কুলীই ঠিক হইয়া গিয়াছে। প্রভাতে আসিয়া তাহারা বোঝা প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইবে এবং আহারাদি করিয়া পরদিন এখান হইতে রওনা হওয়া একপ্রকার স্থির হইয়া গেল। এ দিকে ঠিক সেই দিন সন্ধ্যাকালে ধারচুলা হইতে আগত কুলীসর্দ্দার "প্রধান" দলবল সহ আসিয়া আমাদিগকে সেলাম দিল। এ ব্যাপারে সকলেই বিশেষ মুস্কিলে পড়িলেন। উভয় দলেরই কুলীগণকে অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে, এমত অবস্থায় কোন্ দলকে সঙ্গে লইয়া গেলে অর্থের দিক্ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়, এই সব আলোচনা চলিল। বলা বাহুল্য, পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয়কেই মধ্যস্থতা মানিয়া, বিচারের ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত হইল। তিনি স্থানীয় কুলীসর্দ্দারকে ডাকিয়া বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পরে তাহার সহিত স্থির করিলেন যে, ধারচুলা হইতে আগত পুরাতন কুলীগণই

* দুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতে হইতেছে, আমাদের কৈলাসের সহযাত্রী ডাক্তারত্রয়ের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত শীতাংশু সরকার উভয়েই কলিকাতার বড়বন্ত্র মামলায় রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হইয়াছেন। সংবাদ-পত্র পাঠে জানা যায়, এই অপরাধে প্রথম ব্যক্তির ২০ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির মামলা বোধ হয় এখনও বিচারাধীন অবস্থায় রহিয়াছে।

বোঝা লইয়া যাইবে। তবে এ ব্যাপারে মধ্য হইতে ১৬টি টাকা যাহা স্থানীয় কুলীগণকে অগ্রিম দেওয়া ছিল, ফেরত না পাওয়ায় উহা দণ্ডস্বরূপ আমাদিগকেই বহন করিতে হইল। সে যাত্রায় এইরূপে বিচারের, নিষ্পত্তি হইয়া, আমরা রক্ষা পাইলাম। প্রধানের হস্তে অনুভবানন্দ স্বামীজীর একখানি পত্র পাওয়া গেল। বগলা হইতে তিনি লিখিয়াছেন, "নীরপানি পাহাড়ের উপরের দুইটি রাস্তাই অতি ভীষণ, বিশেষ 'মাঝের রাস্তা' আরও সাংঘাতিক। তাঁহারা মাঝের রাস্তা দিয়া গিয়া ভুল করিয়াছেন, কারণ, সে রাস্তায় মানুষ যাইতে পারে না। তাঁহাদের চোখের সম্মুখেই এক জন সাধুব্যক্তি পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িতেছিলেন। একটি গাছে আটকাইয়া কোনরূপে বাঁচিয়া যান। ডাক্তারদের মধ্যে নলিন বাবুরও ঐ দশাই হইতেছিল। পাচক তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। তাঁহারা যে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। খুব সাবধানে উপরের রাস্তা দিয়াই আমাদিগকে যাইতে বলিয়াছেন ইত্যাদি'।"

পত্র পড়িয়াই আমরা আকাশ হইতে পড়িলাম। স্ত্রীলোক যাত্রিদ্বয়ের মনের অবস্থা সে সময়ে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা তাঁহারাই একমাত্র বলিতে পারেন। যাহা হউক, কৈলাসপতির নাম লইয়া পরদিন অর্থাৎ ইং ৬ই আগষ্ট বা ২০শে শ্রাবণ তারিখে আহারান্তে বেলা ১০টা আন্দাজ সময়ে সকলে গার্ব্বিয়াং পরিত্যাগ করিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নর-নারায়ণ

অরুণ যে দিন প্রথম মাটীতে আলিপনা দিল এঁকে,
বিস্ময়ভরে চাহিল না কেহ অমন ব্যাপার দেখে!

শুধু গোটাকত নামহীন পাখী
চমকি' উঠিয়া বার দুই ডাকি'
ডানা ঝাড়া দিয়া আলোক-সাগরে নেয়ে গেল এঁকে-বেঁকে।
সাথে গোটাকয় কীট-পতঙ্গ দেখিল বিবর থেকে॥

ক্রমশঃ ফুটিল তারকা চন্দ্র, সভয়ে বহিল বায়,
শিহরি উঠিয়া বলিল না কেহ, আহা আহা, বাহা ভাই!
দুটো গাছপালা আর ঘাস-পাতা
দুলায়ে তাদের চিক্কণ মাথা
মর্ম্মর স্বরে কি কহিল ডরে, শুনিতে না পাওয়া যায়।
গোটাকত ফুল পুটপুটে চোখে ইতি-উতি শুধু চায়॥

কড়্-কড়্ করে' ডেকে উঠে মেঘ, ঝম্-ঝম্ ধারা বয়,
দয়া করো, ওগো বাঁচাও বলিয়া কেহ না জানাল ভয়!
ধরার বুকের যত ধুলি-গাদা
ভিজে ভিজে শুধু হয়ে উঠে কাদা,
যত পশু পাখী নাহি দেয় সাড়া, নিশ্চুপ হয়ে রয়।
গাছ-পালাগুলা মুছি' কাদা-ধুলা চকচকে আরো হয়॥

নদী ও সাগর পুষ্ট ডাগর, জলে জলে ভরা দেহ,
চুনো-পুঁটি শুধু কিলবিল করে, পার হয়নাক কেহ!
পরপারে তারে তরাবার তরে
যোড় হাতে কেহ মিনতি না করে;
ঈশানের মেঘ কারো জীবনের জাগায় না সন্দেহ।
পারের আশায় কেহ নাহি চায় উতরিতে নিজ গেহ॥

এত যে বাসনা, এ হেন কষ্ট সৃজন-লীলার লাগি,'
বটের পাতায় ভেসে ভেসে এই প্রলয়-যামিনী জাগি'—
সবই যে পণ্ড—ভুল হ'ল নাকি,
আপনারে নিয়ে কত আর থাকি!
এতেক ভাবিয়া মহা আক্রোশে বিধাতা উঠিলা রাগি;
অনাদি কালের জড়ত্ব বুঝি এত দিনে গেল ভাগি'।

ভক্তিতে যে বা গদ্গদ হয়ে দু'বেলা নোয়াবে শির,
বিস্ময়ে হবে অভিভূত, দুখে চক্ষে বহিবে নীর,
বুঝে' বা না বুঝে' নিয়ত যে খালি
কথায় কথায় দিবে করতালি,—
এমনি সৃষ্টি করিব, যে মোর ভয়ে সদা অস্থির—
অমনি মানব জন্ম লভিল ইচ্ছায় নিয়তির!

সার্থক হ'ল সৃষ্টি-লীলার এত দিনে আয়োজন,
মানব নহিলে কে মানিবে তাঁরে সে যে বড় প্রয়োজন,
তারিফ করিয়া নিশিদিন যেবা
করিবে তাঁহার নিষ্কাম সেবা;
নহিলে যে তিনি বাঁচেন না নিজে কে দিবে সিংহাসন?
নরের স্কন্ধে তাই নিবসেন নির্গুণ নারায়ণ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

মঞ্জুর

(গল্প)

-রবিবারের বাঙলা দৈনিকগুলায় হঠাৎ এক মজার
জ্ঞাপন বাহির হইল। দু'চারজন পাঠকের মারফৎ
-বিজ্ঞাপনের কথা প্রচারিত হইবামাত্র বেলা আটটার
ধ্যেই কলিকাতার পথে-ঘাটে বাঙলা দৈনিকগুলা এমন
হু বেগে বিক্রয় হইয়া গেল, যে, ইউনিভার্সিটির "পরীক্ষার
ল" ছাপিয়াও বাঙলা দৈনিক কখনো তেমন বিক্রয়ের
রেকর্ড তুলিতে পারে নাই।

বিজ্ঞাপনটুকু প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হইয়াছিল।
কারের মধ্যে যারা একটু সাহিত্য-রসিক, তারা এই
বিজ্ঞাপনে বেশ একটু রসান্ দিয়া আসর জমাইয়াছিল;
কাজেই হুজুগ-প্রিয় বাঙালী···কিন্তু সে কথা থাক্।
বিজ্ঞাপনটুকু এই,—

পাত্র চাই

পাত্রী বিধবা, সুন্দরী, গৃহসুখ-পিয়াসিনী, বয়স
সাতাশ বৎসর মাত্র। হাতে নগদ পাঁচ হাজার টাকা
ও তিন হাজার টাকার স্বর্ণালঙ্কার; এবং মফঃস্বলে
পৈত্রিক জমি-জমা আছে। সাত বৎসর নিষ্ঠাভাবে
বৈধব্য-ব্রত পালন; ও সেই সঙ্গে সাহিত্য সাধনা করিয়া
আসিতেছেন; ছদ্মনামে বহু কবিতা লিখিয়া মাসিকে
ছাপাইয়াছেন। সম্প্রতি নিঃসঙ্গ জীবন ভার বোধ
হওয়ায় বিবাহে অনুরাগিণী হইয়াছেন। পাত্র চাই
দরিদ্র বেকার; কিন্তু সুশ্রী, শান্ত, দরদী হইবেন।
বয়স ৩০ ত্রিশ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে। পাত্রের
বিষয়-বুদ্ধি এবং বৈষয়িক কার্য্যে পারদর্শিতা থাকা
চাই। নামধাম ও পরিচয়-সমেত পত্র লিখিলে
বিশেষ বিবরণ মিলিবে। যাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য
হইবে, তাঁহাদিগের সঙ্গে পত্রযোগে আলোচনান্তে
পাত্র নির্ব্বাচন হইবে। আবেদনের সহিত চার পয়সার
ডাক-টিকিট সংলগ্ন থাকা চাই। অন্যথায় আবেদন
গ্রাহ্য হইবে না। "একাকিনী"

কেয়ার-অফ সম্পাদক।

এইটুকু বিজ্ঞাপন। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনটুকুই গৃহে
গৃহে যে আন্দোলন তুলিল, তার ফলে বাঙালী আহার-
নিদ্রা, পিকেটিং, রাউণ্ড টেব্‌ল্—সব ভুলিয়া গেল।
প্রবীণের দল দুই চোখ কপালে তুলিয়া বসিয়া
রহিলেন, তাঁদের চোখের সম্মুখে বাঙলার সমাজ
বিপ্লবের অগ্নি-শিখায় দাউ-দাউ জ্বলিতে লাগিল; যাঁদের
মুখের কথা একেবারে লোপ পাইল না, তাঁরা চীৎকার
করিয়া উঠিলেন,—এ ঐ বিদেশী সাহিত্যের হাওয়া, আর
তরুণ দলের আধুনিক সাহিত্য···এই দ্বিবিধ আঘাতে
বাঙালীর সব গেল!

তরুণ দলে উৎসাহের সঞ্চার হইল। তারা দম্ভ-ভরে
বলিতে লাগিল,—এত দিনে জাতির জীবনে প্রাণের স্পন্দন
জাগিল! জয় গাও একাকিনী অপরিজ্ঞাতার! সনেট
ও বিবিধ ছন্দ বহিয়া ভাবের বান ডাকিল। দৈনিক
কাগজগুলার অফিসে তদ্বির-তদারকের অন্ত নাই! কিন্তু
সম্পাদকের সঙ্গে 'একাকিনী'র কঠিন সর্ত্ত—তাঁর নাম-
ঠিকানা কোনো মতে যেন প্রকাশ না হয়! এজন্য
বিজ্ঞাপনের কায়েমি হারের উপর অনেক বেশী দক্ষিণা
দৈনিকের মালিকের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। লোকেরও
কৌতূহলের সীমা নাই, কিন্তু সে কৌতূহল নিবৃত্ত হইবার
নয়। তখন রাগিয়া কেহ বলিল,—জুচ্চুরি! ঐ বিজ্ঞাপন
দিয়ে ডাক-টিকিট হাতিয়ে যা-কিছু রোজগার হয়!

কেহ বলিল,—ধেৎ! সে তো আরো পঞ্চাশ রকম
বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ডাক-টিকিট আদায় করতে পারতো!
এ নারীর নারীত্ব···নারীর প্রাণ নিয়ে কথা!···

এই বিজ্ঞাপন লইয়া বাগবাজারের 'অগ্রদূত সভার'
এক বিশেষ অধিবেশন অবধি হইয়া গেল। সভাপতি 'সব-
ভাঙো' সাপ্তাহিকের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিচক্ষণ
বক্সী মহাশয় জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—চাঁদা দাও!
এই মহীয়সী অগ্রগামিনী একাকিনী কামিনীর শুভোদ্বাহ-
দিনে আমরা তাঁর প্রশস্তি লিখিয়া রৌপ্য-নির্ম্মিত চোঙে
ভরিয়া তাঁকে অভিনন্দন দিব। তরুণ বাঙলা এই প্রাণের
জাগরণে পুলকানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া ধন্য হোক্।

সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থলে সাত টাকা স-বারো আনা চাঁদা অবধি সংগ্রহ হইয়া গেল।

তার পর বাঙালী নর-নারী কৌতূহলে উদগ্র চিত্ত লইয়া বাঙলা দৈনিক কিনিয়া প্রত্যহ তার পৃষ্ঠায় চোখ বুলায়,—কোন্ পাত্র একাকিনীর বেদনা বহিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইল, তারি সন্ধানে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিল, কিন্তু পাত্র-প্রসঙ্গে একটি ছত্রও কোনো কাগজে ছাপা হইল না!

কেহ ইহাতে ব্যথা পাইল, কেহ বিদ্রোহে ফুঁশিল। কেহ রাগিয়া বলিল—ঐ কাগজগুলোর চক্রান্ত! ষড় ক'রে 'বোগাস্' বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে একটা 'নাম্বার' খুব বেচে নিলে!

তরুণের দলে কবিতায় উৎসাহ-ধ্বনি বিলুপ্ত হইয়া ক্রমে তাহাতে বেদনার সুর ফুটিতে লাগিল; এবং যশস্বী কবি শ্রীমক্ষিকালাল মৌলিক মাসিক বসুমতীতে এক কবিতা ছাপাইয়া দিলেন,—

একাকিনী সঙ্গীহারা সপ্তবিংশতিয়া,
জানি না তোমার ওই প্রীতি-কামী হিয়া—
সপ্ত বরষের দীর্ঘ বিরহ-বেদন
ঢালিতে পেলে কি পাত্র—রসিক, সুজন!
হায় নারী, বুঝি নাকো, এ কেমন সাধ,—
তিরিশের নীচে যুবা কেন দিলে বাদ?
সে কি বুঝিত না তব হৃদয়ের দাম?
নিঃসঙ্গ জীবন চাহে প্রেম অভিরাম,
কি সোহাগ, কি আদর, ললিত-বচন—?
ব্রত যার প্রণয়ের নন্দন রচন!
প্রীতি প্রেম, লভ্—সব তিরিশের নীচে!
প্রবীণে প্রণয় যাচা, সে আশা যে মিছে!
বলো সখি, ভুল সে যে, চাহিছ তরুণ,
তীব্র দাহে ভরা বুক। প্রবীণ, সরুন্।

শ্রীমক্ষিকালাল মৌলিক।

বাহিরে এমন ঘনঘটাসত্ত্বেও একাকিনীর চিত্ত-বার্ত্তা কিন্তু রহস্যান্তরালেই রহিয়া গেল।

২

বিলাস নিজের ঘরে বসিয়া চিঠিপত্র ঘাঁটিতেছিল,—চিঠির পাহাড়! অনন্ত আসিয়া বলিল,—চিঠির তাড়া ফুরোয় না যে! রহস্যটুকু এবার প্রকাশ করো। ভয় নেই হে, আমি গেজেটে ছাপ্‌বো না।

হাসিয়া বিলাস কহিল,—এর মধ্যে রহস্য কিছু নেই…

অনন্ত কহিল—সত্যই সঙ্গীহারা একাকিনী মহিলা কেউ আছেন?—না,…

বিলাস কহিল,—নিশ্চয়। না হলে কাজটা ফৌজদারী দণ্ডবিধির অন্তর্ভূত হবে যে!

অনন্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বিলাসের পানে চাহিল।

বিলাস কহিল,—কালের হাওয়া ফিরেচে! সাহিত্য আজ আমাদের মনে-প্রাণে যে সাড়া জাগিয়ে তুলেচে, তাতে মনের বৃত্তিকে আর ঐ সংস্কৃত শ্লোক কিম্বা ভুয়ো বার-ব্রতর পয়ারের নীচে দাবিয়ে রাখা যাবে না! তুমি একজন ঔপন্যাসিক তো! তোমাদের বাণীর সার্থকতা দেখে গৌরব বোধ করচো না?

অনন্ত কহিল—কিন্তু তোমার এই আকস্মিক মাথাব্যথা…নিজেও লেখক নও!

বিলাস কহিল—জানোই তো…পাটের কাজ করছিলুম, তা, সে বাজার একদম্ টিলে…অথচ,…হঠাৎ মাথায় এই আইডিয়া…

অনন্ত কহিল—Inspiration বলো…

বিলাস কহিল—তোমাদের হলে inspiration হতো! আমরা অ-সাহিত্যিক, আমাদের আইডিয়া!

অনন্ত কহিল—এ মহিলার পরিচয় আমার কাছেও গোপন রাখবে?

বিলাস কহিল,—সিদ্ধি-লাভের ব্যাপারে মন্ত্রগুপ্তি হলো প্রথম কথা! বন্ধুপ্রীতির উপরে ব্যবসা-প্রীতির ঠাঁই?

অনন্ত কহিল,—তা হলে তুমি চিঠির তাড়া নিয়েই থাকো, আমি বিদায় নি!…কিন্তু আমারো যোগ ছিল এ ব্যাপারে! ঐ বিজ্ঞাপন ছকে দেওয়া…ভাষা আমার…

বিলাস কহিল,—তা মানি এবং আর একখানা বিজ্ঞাপন ছকে দিতে হবে। তোমার হলো লেখকের কলম,—ষ্টাইল আছে। বিজ্ঞাপন খুলবে ভালো।

অনন্ত কহিল,—আমার লভ্যাংশ? বলিয়া সে হাসিল।

বিলাস কহিল,—মিলবে। এবং এই টুকরো বিজ্ঞাপন লিখে যা পাবে, বোধ হয়, উপন্যাসের কপি-রাইট বেচেও পাব্লিসারের কাছে তেমন পাওনি কখনো!

অনন্তর দুই চোখ আবার বিস্ফারিত হইল।

বিলাস কহিল,—এই ছাখো খাতা, সাঁতাশ হাজারের উপর আবেদন এসেচে। এই ছাখো, সাতাশ হাজার ন'শো পঞ্চান্ন। সবাই ডাক-টিকিট পাঠিয়েচে। তা হলে, ২৭৯৫৫ আনা, তার মানে, প্রায় আঠারোশ' টাকা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়—still they come—অতএব টাকা ··আরো দেড় হাজার টাকা ধরতে পারি। সব-শুদ্ধ তা হলে তিন হাজারের উপর হয়। তুমি নিয়ো তিনশো টাকা। তার পর নন্দরাণী দেবীকেও কিছু দিতে হবে—

অনন্ত কহিল,—নন্দরাণী দেবী!

বিলাস কহিল,—হ্যাঁ। তবে খবর্দ্দার, নাম যেন প্রকাশ না হয়।

অনন্ত কহিল,—ইনি মহিলা? না, ফিল্মে নামতে-নামতে হঠাৎ এই inspiration, বা, idea, যাই বলো···

বিলাস কহিল,—ফিল্ম্ নয়।···ইনি মিড-ওয়াইফ। বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের তিন বৎসর পরে বিধবা হন্। তার পর এই মিড-ওয়াইফের কাজ নিয়ে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না···

অনন্ত কহিল,—তিনি যে রাজী হলেন, তোমার সহায় হতে?

বিলাস কহিল,—আমার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যালোচনা হয় খুব। তোমাদের কৃপায় আধুনিক সাহিত্যে আমার ব্যুৎপত্তি সামান্য নয়। তোমাদের রামতারক বাবুর উপন্যাস আমার সব পড়া। কেবলকান্তর ঐ কবিতাগুলো, বিশেষ, তার ঐ নতুন বই 'আলতা গোলার' কবিতা···আমার সব মুখস্থ ···আমি এখন তাঁরি ভাড়াটে। তাঁর বাড়ীতে একতলায় একটা ঘর খালি পড়ে ছিল, ভাড়া নিয়ে সেখানে বাস করচি ···ভাড়া দি মাসে সাত টাকা; আর খোরাকী-বাবদ দি মাসে আঠারো টাকা। আমায় তিনি ভারি স্নেহ করেন, সত্যি।

অনন্ত একটু বক্র হাসি হাসিয়া কহিল,—বুঝেচি···লভ!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিলাস কহিল,—দূর! আমার চেয়ে বয়সে বড়, তা ছাড়া সামনের দাঁত উঁচু, রঙ ময়লা···তবে প্রাণে দরদ আছে। গল্প-কবিতায় প্রাণ তাঁর দোলে। না, না, তুমি সে-সব কিছু ভেবো না। She is pure gold. দুশ্মণেও তাঁর দোষ দিতে পারবে না। ভদ্র ঘরের মেয়েদের অসুখ হলে তিনি এ্যাটেণ্ড করেন।

অনন্ত কহিল,—কিন্তু তিনি রাজী হলেন হঠাৎ···

বিলাস কহিল,—বিবাহে রাজী! কৈ, তা মনে হয় না। তবে আমার ঐ আইডিয়া···সাহিত্যের রস তাঁর মাথায় দেওয়া গেছে···কাজেই, অর্থাৎ তাঁকে আমি বাঙলা বইগুলো পড়তে দিতুম—এখন নিজেই চেয়ে নিয়ে পড়েন। তোমাদের প্রলয় মহান্তির বই ওঁর খুব ভালো লাগে, বিশেষ ক'রে তাঁর ঐ ছোট গল্পের বইখানা—"বস্তীর পাঁক"। উনি বলেন, ভারী জোরালো লেখা। নৈতিক বলেরও পরিচয় পান্ প্রত্যেক গল্পে!···

—বটে! বলিয়া অনন্ত একটা নিশ্বাস ফেলিল।

বিলাস কহিল,—Jealousy হচ্ছে! তার কারণ নেই। তোমার লেখাও উনি পড়েন হে···তোমার সে গল্পটা কি? সেই যে এক মজুরণী ইট বয়ে ভারায় উঠতো···আর পাশেই মেসের বাসায় থাকতো ভামিনীচরণ···

অনন্ত কহিল,—ওঃ—সে গল্পের নাম তো "বাঁশের সুর"···

বিলাস কহিল,—ঠিক! ঠিক! আজকাল তোমাদের লেখায় কিসের যে সুর না চালাও! 'আগুনের সুর', 'বিয়ের সুর', বুঝতে পারি না। মোদ্দা বাঁশের সুর, ইটের সুর, কাঠের সুর—এ একেবারে সুরের টেক্কা!

অনন্ত কহিল,—ও গল্পটা তাঁর ভালো লেগেচে তা হলে! বেশ! তা, তোমার আবার কি বিজ্ঞাপন চাই?

বিলাস কহিল,—অর্থাৎ 'একাকিনী' বহু আবেদন পেয়েচেন কি না। কাজেই তিনি চান এখন, যারা যথার্থ বিবাহ করতে চায়, তারা যেন ফটো পাঠায় এবং ফটোর সঙ্গে চার আনার ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছবি দেখে তিনি মনোনীত পাত্রদের সঙ্গে দেখা করবেন। দেখা করার স্থান আর কাল বিজ্ঞাপনে জানানো হবে। তার পর···

অনন্ত কহিল,—বুঝেচি। বেশ···লিখি।

অনন্ত বিজ্ঞাপনের মুশাবিদায় মগ্ন হইল, এবং বিলাস চিঠি-পত্র বাছিয়া খাতায় নাম-ঠিকানা টুকিতে লাগিল।

৩

এক সপ্তাহ পরে বাঙলা দৈনিক কাগজওয়ালারা পাঁচ হাজার বেশী কাগজ ছাপাইয়া বাহির করিল। এই সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলমের ঠিক নীচে 'একাকিনীর মর্ম্ম-কথা'

বলিয়া খুব বড় অক্ষরে আবার নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন ছাপা হইল।

একাকিনীর মর্ম্মকথা

একাকিনী বহু আবেদন পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। বাঙলা দেশে প্রবীণের প্রাণে দরদ যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, এই আবেদনের সংখ্যা হইতে তার প্রমাণ পাইয়া তিনি কৃতার্থ। কে বলে, বাঙালী মরণোম্মুখ জাতি!

যাঁহারা যথার্থ একাকিনীর দুঃখ-বিমোচন করিতে চান, তাঁহাদের আন্তরিকতার পরিচয় পাইব—আর একটি কাজে, যথা,—তাঁরা যেন ফটো পাঠান। ফটোর সঙ্গে চার আনার ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। অমনোনীত পাত্রদের ফটো ফেরত দেওয়া হইবে। মনোনীতদের দরদ পরখের জন্য এক দিন স্থান-কাল নির্দ্দেশ করা হইবে; তখন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্ধারিত সময়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিলে বিবাহ-অনুষ্ঠান-সম্পাদনের ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইবে। আজ হইতে দুই সপ্তাহ-কাল-মধ্যে ফটো পাওয়া চাই। নহিলে একাকিনীর মানসিক নিঃসঙ্গতা যেমন বাড়িয়া বেদনাকর হইতেছে, বৈষয়িক অব্যবস্থাও সেই অনুপাতে বাড়িয়া তাঁহাকে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। ইতি

দরদ-কামিনী কৃতার্থিনী একাকিনী।

ইহার ঠিক নীচে বড় অক্ষরে পুনশ্চের জের,—

পুনশ্চ। পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় বহু তরুণ একাকিনীর দুঃখে বিগলিত হইয়া দরদ জানাইয়াছেন, এবং তাঁর পাণিও প্রার্থনা করিয়াছেন। মানসিক নিঃসঙ্গতা ঘুচাইবার যোগ্যতা প্রবীণ দলের চেয়ে তাঁহাদের বেশী লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিতে বিচক্ষণতা কেমন, তাহা বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের আবেদন সাদরে বিবেচিত হইবে। অতএব, তাঁহারাও যেন ফটো পাঠাইতে কার্পণ্য না করেন—একাকিনীর ইহাই বিনীত নিবেদন।

এ বিজ্ঞাপন ছাপা হইলে একখানি স্বরাজী বাঙলা সাপ্তাহিকে খুব কড়া মন্তব্য বাহির হইল। সম্পাদকীয় স্তম্ভে সম্পাদক লিখিলেন,—

দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে মানিলাম, চাল-ডাল, তরী-তরকারী ঘী-তেলের দাম শস্তা হইয়াছে। বস্তা-বস্তা কিনিয়া আরামে ভোজন করিয়া শরীরে-মনে বল লাভ করিয়া বাঙালী কোথায় মাতৃ-মন্ত্র দ্বিগুণ বলে উচ্চারণ করিবে, কারাগারকে জীবনের লক্ষ্য করিবে, তা না, এক একাকিনীর ব্যক্তিগত দুঃখে গলিয়া তরুণ-প্রবীণ উভয় দলই এ কি অমানুষের পরিচয় দিতে উদ্যত! একাকিনী তো একজন,—কিন্তু তাঁহার পাণি-লাভের জন্য ত্রিংশসহস্র বাঙালী উন্মত্তের মত সাধন-রত! মনের বনে এ কি ফুল ফুটাইবার সময়? কণ্টকে মন ছাইয়া ফ্যালো, কুসুম-শয্যায় বিলাস-স্বপ্নে রাত্রি কাটাইলে চলিবে না—রাত্রে এখন খপরের কাগজের টাইপ সাজানো চাই; চাঁদার কাজে হিম্‌শিম্ খাওয়া চাই। শুধু চাঁদা, চাঁদা—চাঁদার সাধন-সমরে বিউগ্‌ল্ বাজাইয়া চলিতে হইবে। রুদ্র পীড়নের দ্বন্দ্ব-মাতনে মাতোয়ারা হও,—নহিলে স্বরাজ দু'শো বছর পিছাইয়া যাইবে!

কিন্তু এ মন্তব্যে কেহ বিচলিত হইল না। মানব-চিত্তে সাহিত্যের প্রভাব কি অমোঘ, সে-সম্বন্ধে বহু চিন্তাশীল মনীষী বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; সে সব বাজে কথার জাল-বুনানি নয়। কাজেই দুই সপ্তাহ পরে অনন্ত ও বিলাস আবার যখন বিলাসের গৃহে মিলিত হইল, তখন বিলাসের চিত্ত-সাগরে আনন্দের বান ডাকিয়াছে!…

অনন্ত কহিল—কত ফটো এলো?

বিলাস কহিল—প্রায় বত্রিশ হাজার!…

অনন্ত কহিল—তার মানে, বত্রিশ হাজার ইন্‌টু চার আনা, ইকোয়াল্-টু একলক্ষ আটাশ হাজার আনা, অর্থাৎ…

বিলাস কহিল—আট হাজার টাকা…

অনন্ত কহিল—তা হলে…

বিলাস কহিল,—নন্দরাণী দেবীর luck…

অনন্ত কহিল,—হুঁ! তার মুখ গম্ভীর।

বিলাস কহিল,—কিন্তু তিনি এক ফ্যাশাদ বাধিয়েচেন…

অনন্ত কহিল,—ফ্যাশাদ !…

বিলাস কহিল,—হ্যাঁ, তিনি জানিয়েচেন, এত ফটো ধাঁটার প্রয়োজন নেই…

অনন্ত কহিল—কেন ?

বিলাস কহিল—তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, রবিবাবু কি গানই লিখেচেন—

রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয়-মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি !

অনন্ত কুতূহলী দৃষ্টিতে বিলাসের পানে চাহিল।

বিলাস কহিল,—একজন তরুণের আবেদন তাঁর মর্ম্ম স্পর্শ করেচে !

অনন্তর দৃষ্টি পলকহীন ! বিলাস কহিল,—নন্দরাণী বললেন, হৃদয়ের যে একটা আবেগ আছে, তা তিনি জানতেন না, মানতেনও না ; এবং শুধু উপন্যাসে-গল্পেই ও জিনিষের যা অস্তিত্ব, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস! কিন্তু আবেদন পড়তে পড়তে একজনের করুণ নিশ্বাস তাঁর মনে ঝড় তুলেচে !

অনন্ত কহিল,—তার পর ?

বিলাস কহিল,—তার সঙ্গে নন্দরাণীর দেখাও হয়েচে… নন্দরাণী তার চিত্ত-দ্বারে অতিথি। কিন্তু…

—কিন্তু ? অনন্তর স্বর গাঢ়।

বিলাস কহিল,—লোকটা দরদী হলে কি হবে, সে বলেচে, নগদ আড়াই হাজার টাকা পেলে সে তার চিত্ত-দ্বার মুক্ত ক'রে নন্দরাণী দেবীকে সে চিত্ত-কক্ষে বসবাসের জন্য গ্রহণ করতে পারে !…বাজারে নাকি তার আড়াই হাজার টাকা দেনা !

অনন্ত মৌন নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল।

বিলাস কহিল,—আড়াই হাজার টাকা তাঁকে দিতেই হবে। ভেবেছিলুম, পাঁচশো টাকায় তাঁকে খুশী করবো। তা, আড়াই হাজার চাইলেন ! সেই হতভাগা পাত্র… একে কি দরদ বলে ? তোমায় তিনশো, আর ওঁকে পাঁচশো দিয়ে বাকী টাকা নিয়ে আমি সরবো, ভেবেছিলুম…

—সরবে কেন ?

—সরবো না ? বলো কি ! এই বত্রিশ হাজার নিরাশ পাণিপ্রার্থী কি ছেড়ে কথা কইবে ! যদি কেশ্ ক'রে দেয় ? তা না করলেও ধ'রে যদি প্রহার…

অনন্ত কহিল,—তোমার ঠিকানা কি ক'রে পাবে ?

বিলাস কহিল,—বলে, সাধনায় ধ্রুব-প্রহ্লাদ ভগবানকে পেয়েছিল, আর এই বত্রিশ হাজারের সাধনায় আমার নাম-ঠিকানা অজ্ঞাত অবলুপ্ত থাকবে !

—তা বটে !

সে দিন ঐ পর্য্যন্ত।

বারো দিন পরে সন্ধ্যায় আবার সাক্ষাৎ।

বিলাস বাক্স গুছাইতেছিল, দ্বারে ট্যাক্সি ; আর এক-খানা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল। ট্যাক্সি হইতে নামিয়া অনন্ত ঘরে ঢুকিল, কহিল,—কোথায় যাচ্ছ হে ?

বিলাস কহিল,—নেপালে।

—নেপাল !

—হ্যাঁ। সেখানে কাঠের কারবার করবো।…কাল দু'জন এসে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, এ জায়গা নিরাপদ নয় মোটে।

অনন্ত বিলাসের পানে চাহিল।

বিলাস কহিল,—এখনো…দেখচো না, এই কপাল ফুলে আছে ! কাজেই অপেক্ষা করা চলে না। না হলে নন্দরাণী বলেছিলেন, তাঁর বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়া অবধি যেন থাকি ! কিন্তু উপায় নেই, বন্ধু।

অনন্ত কহিল,—তাই তো ! আমিও যে তোমায় নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলুম…

—কিসের নিমন্ত্রণ ?

—বিবাহের।

—কার বিবাহ ?

—আমার।

বিলাস অবাক্ ! অনন্ত ! নানা তত্ত্বের কথা পাড়িয়া বিবাহ অসঙ্গত প্রমাণ করিতে যে পঞ্চমুখ হইত, সাহিত্য-সেবার দোহাই তুলিয়া যে সকলকে বুঝাইত, ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বদ্ধ থাকিলে কল্পনার গতি-পথ রুদ্ধ হইবে, সংসারের সংঘর্ষে কাব্য-বধূ প্রাণে বাঁচিবে না, সেই অনন্ত…

অনন্ত কহিল,—অবাক হয়ো না। মফঃস্বলে বধূর

বিষয়-সম্পত্তি কিছু আছে, তাঁর নিজের উপার্জ্জনও আছে ব্যবসার ক্ষেত্রে···তা ছাড়া নগদ আড়াই হাজার যৌতুক যখন হাতে পাওয়া গেছে···

বিলাসের বিস্ময় সীমা ছাপাইয়া উঠিল। বিলাস কহিল,—এ কি বলচো ··

হাসিয়া অনন্ত কহিল—আমিই নন্দরাণীকে বিবাহ করচি...

—তুমি···!

অনন্ত কহিল—হ্যাঁ। গোপনে আমি আবেদন পাঠিয়েছিলুম। তার পর তোমার খাতা থেকে তাঁর ঠিকানা নিয়ে দেখা করেচি তাঁর সঙ্গে—নিত্য দেখা হয়েচে। কথা কয়েচি বিস্তর—সাহিত্য আর হৃদয়-তত্ত্ব নিয়ে বহু কথা। তাঁকে বুঝিয়েচি, আমি তাঁর ভক্ত! একান্ত অনুরাগী ভক্ত! তিনি নিজের জীবনের নিঃসঙ্গতা অনুভব ক'রে যেমন কাতর ···আমিও তেমনি···

বিলাস কহিল—ও আড়াই হাজার টাকা চেয়েছিলে তুমিই!

—হ্যাঁ। এবং তা পেয়েচি।

বিলাস কহিল,—কিন্তু চেহারা···তোমাদের গল্প-উপন্যাসের নায়িকারা যে সব রূপসী! এলো খোঁপা, তা ছাড়া শাড়ী পরেন নানা কায়দায়···কনটিনেণ্টাল সাহিত্যের বুকনি ছাড়া তাঁরা কথা কন্ না···আর শ্রীমতী নন্দরাণী দেবী···

অনন্ত হাসিল; হাসিয়া কহিল—রবিবাবু একটা ভারী খাঁটি কথা লিখেচেন—কাব্য দেখে যেমন ভাবো, কবি তেমন নয় গো! কাব্যের নায়িকা কাব্যেই খাপ্ খান্! স্ত্রী? বহু দুর্ভাবনা, দারিদ্র্যের বহু অভাব যে-স্ত্রীর কল্যাণে ঘুচবে, রূপশ্রী তাঁর যেমনই হোক্, গৃহ-কল্যাণীরূপে চিরদিন তিনিই শিরোধার্য্য। তা হলে সাহিত্যসেবা নিরুপদ্রব হয় অন্ততঃ!

—হুঁ! বলিয়া বিলাস বাক্সটা লইয়া ট্যাক্সিতে চাপাইল এবং ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিয়া অনন্তর পানে চাহিয়া কহিল,—তোমাদের সাহিত্য পড়িয়ে নন্দরাণীর মনকে ভাগ্যে উর্ব্বর ক'রে রেখেছিলুম···তাই! দাঁড়াতে পারচি না, ভাই। বেলা তিনটে বেজেচে···স'তিনটেয় তোমাদের কবি মৃণালভূষণ আসবেন, শাসিয়ে গেছেন; এবং তিনি মৃণালভূষা ছেড়ে বংশভূষায় ভূষিত হয়ে আসচেন। তাঁর সে ললিত সুর ছেড়ে তিনি যে রুদ্রভৈরব ছন্দের কশরৎ দেখিয়ে গেছেন, তাতে তিলার্দ্ধকাল আর অপেক্ষা করতে ভরসা হয় না। তুমিও সাবধান, তিনিও নন্দরাণীর হৃদয়-প্রার্থী ছিলেন,···তোমার পথ শুভ হোক, বন্ধু, ঐ মফঃস্বলের বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতি এবং আড়াই হাজার টাকা সম্বল ক'রে নন্দরাণীর সঙ্গে জীবন-পথে তুমি পাড়ি দাও···নেপালের পথই আমার কাম্য!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বাণী

বিশ্ব-হিয়ার চেতন-তটে হঠাৎ উজল আলোক জ্বেলে
তুষার-গলা ফটিক জলে ফুটিয়ে কমল কে আজ এলে?
কে আজ এলে নিখিল কারায়
ভিজিয়ে ভুবন সুধার ধারায়—
মাঙ্গলিকের মন্ত্র নিয়ে ছন্দ-চপল চরণ ফেলে,
মন-মানসের পদ্মদলে কে আজ এলে, কে আজ এলে?

ধবল গিরির ধাপে ধাপে জ্বলছে পদ-চিহ্ন-জ্যোতি,
আদিম উষায় আসবে কে আর,—স্বয়ংপ্রভা সবার গতি;
জ্যোৎস্না-জরির ওড়নাখানা
জড়িয়ে বুকে স্মিতাননা
অমল আঁখির দীপ্তি ছড়ায় বীণাপাণি মূর্ত্তিমতী;
শিল্পী, কবির সিদ্ধি সহায় মহাশ্বেতা সরস্বতী।

দেবি! তোমার দিব্য জ্যোতি অদ্বিতীয় গগন-তলে,
শিশু-আঁখির মিটি মিটি বীণাখানির তারে জ্বলে;
তোমার পায়ের নূপুর-ধ্বনি
এই নিখিলে নিত্য শুনি—
স্মিত-হাসির স্মৃতি শোভে শতদলের দলে দলে,
মাথায় মুকুট স'াচ্চা হীরার, জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতির্বলে

মর্ত্ত্য-লোকের চতুর্দ্দিকে শিল্পী-কবির কাব্য'পরে
সর্ব্বজয়ী সফল আশিস বিলাও দেবি! মুক্ত-করে,
তোমার তনু চিত্ত-হরা
রিক্ত হিয়া পূর্ণ করা—
কবির তুমি, ঋষির তুমি, বিদ্যাহীনের বিদ্যা তরে,
বাণীর আশিস মৃত্যুঞ্জয়ী, পড়ুক ঝ'রে মাথার 'পরে।

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

পরশমণি

১

দিগন্তবিসারী জনসমুদ্র—সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত 'জয় মহাত্মা গন্ধীর জয়'—খাদি আশ্রমের পুরোভাগে সে উৎসাহ আনন্দোচ্ছ্বাস বর্ণনাতীত! মোটরের আসন ত্যাগ করিয়া বিনয়কুমার উত্তেজনাবশে দাঁড়াইয়া উঠিল, অঙ্গুলি-হেলনে পথের অপর প্রান্তে আশ্রমে প্রবেশোন্মুখ জনগণকে নির্দ্দেশ করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "ঐ যে সকলের আগে, পণ্ডিত মদনমোহনের হাত ধ'রে যাচ্ছেন। দেখ না, চোখ দিয়ে কি অপূর্ব্ব জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে—ঐ যে খুব রোগা—"

বলিতে বলিতে বিনয়ের মুখচক্ষুও অপূর্ব্ব উজ্জ্বল আভায় হাসিয়া উঠিল,—তাহার বিশাল উরস যেন আনন্দ-গর্ব্বের আতিশয্যে স্ফীত হইয়া উঠিল। সে যে ইত্যবসরে কখন্ মানসিক উত্তেজনাবশে মোটরের ষ্টিয়ারিং হুইল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে এবং সেই অবসরে অপ্রাপ্ত-লাইসেন্স নমিতা হস্তপ্রসারণ করিয়া হুইল ধরিয়া নবাধীত বিদ্যার পরিচয় দিতেছিল, তাহা সে ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই।

"এই, হুঁসিয়ার,"—জনতার মধ্য হইতে হঠাৎ চীৎকার শুনিয়া বিনয় অপ্রতিভ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া নমিতার হাত সরাইয়া হুইলে হাত দিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তের মধ্যেই যে সর্ব্বনাশ ঘটিবার ঘটিয়া গেল। সামাল, সামাল,—রবটা আকাশে মিলাইয়া যাইতে না যাইতেই একটা হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ আকাশ-বাতাস ছাইয়া ফেলিল। সেই আর্ত্তস্বরের স্মৃতি কি বিনয়কুমার ইহজীবনে ভুলিতে পারিবে? দরিদ্র পথচারী শ্রমজীবী মোটরের করাল চক্রতলে পিষ্ট হইয়াছে, আর তাহারই সাথীর—সম্ভবতঃ দরিদ্র পত্নীর—হাহাকার জলস্থল ভরিয়া ফেলিয়াছে। চক্ষুর সম্মুখে রক্তস্রোতের মধ্যে মরণ-দূতের বিকট তাণ্ডব! নমিতা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া দুই চক্ষু আচ্ছাদন করিল,—পরমুহূর্ত্তে সে গাড়ীর মধ্যে এলাইয়া পড়িল।

নিমেষমধ্যে গাড়ীর গতির বেগ সংযত করিয়া বিনয়কুমার একলম্ফে অবতরণ করিয়া আহত হতভাগ্যের রক্তাপ্লুত দেহ অঙ্কে তুলিয়া ধরিল—উত্তপ্ত রক্তস্রোত তখনও প্রবাহিত হইতেছিল; কিন্তু আহত পথিকের প্রাণবায়ু যে তখনও সূক্ষ্মসূত্রে অবস্থান করিতেছে, তাহা বুঝিতে ডাক্তার বিনয়কুমারের বিলম্ব হইল না।

যথারীতি পুলিস ও এম্বুলেন্স আসিয়া পড়িল। আহতকে তাহার রোরুদ্যমানা পত্নী ও আত্মীয়স্বজনের সহিত স্থানান্তরিত করিবার পর পুলিস বিনয়কুমারের গাড়ীর নম্বর, নাম-ধাম লিখিয়া লইল এবং জানাইয়া গেল যে, পত্নীসহ তাহাকে নির্দ্দিষ্ট দিনে করোনারের কোর্টে হাজির হইতে হইবে। আপনার উপরে সকল অপরাধের বোঝা চাপাইয়া দিয়া পত্নীকে এই ব্যাপারের সংস্রব হইতে দূরে রাখিবার জন্য বিনয়কুমার প্রাণপণ প্রয়াস পাইল, কিন্তু যখন একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী পথচারী তাহার মুখের উপরেই বলিল যে, তাহার সঙ্গিনীকেই তাহারা ঘটনাকালে গাড়ী চালাইতে দেখিয়াছে, তখন বিনয় শুষ্ক-মুখে চিন্তাভারক্লিষ্ট-হৃদয়ে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল।

*   *   *

খাদি-আশ্রমের উদ্বোধন উৎসবে স্বয়ং মুক্তি-মন্ত্রের ঋষি সবরমতীর সন্ন্যাসী দ্বার উন্মোচন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার দর্শনলাভের আশায় সহস্র সহস্র নরনারী ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়াছে। সকলেরই মুখে হর্ষ, আনন্দ, নবোৎসাহ। কিন্তু বহুমূল্য মোটর-যানে আরাম আসনে আসীন দুইটি প্রাণীর মুখে সে আনন্দের চিহ্ন কোথায়?

স্বামী ও স্ত্রী—উভয়ের মধ্যে এত দিন ধরিয়া নিবিড় মিলনের উৎসধারা সহস্র রেখায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে উৎস মুহূর্ত্তমধ্যে কি ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া গেল? পাশাপাশি উভয়ে বসিয়া আছে, অথচ হিমালয়ের মত প্রকাণ্ড ব্যবধান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে!

বিনয়কুমারের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল। হঠাৎ সে কষ্টে কণ্ঠে স্বর যোগাইয়া বলিয়া উঠিল, "নমি, কাঁদছ? ছিঃ!"

নমিতা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুজড়িত-কণ্ঠে সে বলিল, "ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় সানি পার্কে দিয়ে এস।"

বিনয় বিস্মিত হইল, বলিল, "সানি পার্কে? কেন, বাড়ীতে কি হ'ল?"

নমিতা বলিল, "না, না, মা'র কাছে যাব, আমার প্রাণ কেমন করছে!"

বিনয় বলিল, "তা, এখনই?"

নমিতা জবাব দিল, "হাঁ, এখনই—"

বিনয় বিষাদজড়িত কণ্ঠে বলিল, "কেন নমি, বিপদের দিনে কি আমার উপর নির্ভর করতে পার না ?"

নমিতা লজ্জিতা হইয়া বলিল, "না, না, শুধু দু'টো দিন আমায় মা'র কাছে থাকতে দাও।"

বিনয় ক্ষণেক নীরব রহিল, তাহার পর বলিল, "যা হয়ে গিয়েছে, তার ত আর চারা নেই। তবে মা'র কাছে গিয়েই বা কি করবে ? তার চেয়ে নিজের বাড়ীতেই চল না, সেখানে নিরিবিলি দুজনে মন খুলে যত ইচ্ছা দুঃখ করতে পারবো। কি বল ?"

নমিতা তাহার কথাগুলি সব শুনিয়াছিল কি না সন্দেহ। হঠাৎ সে বিনয়ের হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া কাতর, ব্যাকুল, ভীতিব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিল, "ঐ, ঐ লোকটা—ও কি বাঁচবে না ? বল না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—বল না, ও বাঁচবে ? ওর স্ত্রী না কে এক জন ডুকরে কেঁদে উঠলো—"

নমিতার কথা শেষ হইল না, সে নিজেই উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল। বিনয়কুমার চমকিয়া উঠিল। সে তখন ভাবিতেছিল, কি প্রহেলিকাময়ী এই নারী! আজন্ম সুখে বিলাসে লালিতা এই তাহার পত্নী নমিতা—দরিদ্র পথের কুলী-মজুরের জন্য তাহার চোখে জল! কত সাহস তাহার, না শিখিয়াও জনতার মধ্যে গাড়ী চালাইতে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহার হৃদয় কম্পিত হয় নাই। আর মুহূর্ত্ত পরেই সে ভয়ভীতা বালিকার মত জননীর বক্ষে লুকাইবার জন্য কাঁদিতেছে! কাঁদিয়াও ত সে সান্ত্বনা পাইতেছে না! জীবন ভরিয়া নয়নে সপ্ত সমুদ্রের তুফান বহাইলেও কি সে অনুশোচনার গাঢ় কালিমা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পারিবে ?

বিনয়কুমার আপনার মানস-দর্পণে নমিতার অন্তরের ব্যথার চিত্র প্রতিফলিত হইতে দেখিল। দেখিল, তাহার কোমল মাতৃহৃদয় দরিদ্র আহত পথিকের জন্য সমবেদনায় টন্‌টন্ করিতেছে।

নমিতা তাহার মুখে জবাব না পাইয়া পুনরায় কাতর করুণস্বরে বলিয়া উঠিল, "বল না, কি করলে ওর প্রাণটা ফিরিয়ে পাওয়া যায় ?"

বিনয় বুঝিল, তাহার কান্নায় বাধা দিল না। এ অশ্রুধারা মন্দাকিনীর পুণ্য-প্রবাহ, মানুষ এ তীর্থে স্নান করিলে শান্তি পায়। কি গভীর অনুশোচনায় তাহার মাতৃহৃদয় এমন হাহাকার করিয়া উঠিল!

কিন্তু—কিন্তু—সানি পার্কে ? সেই অপ্রীতিকর আবেষ্টনের মধ্যে এক রাত্রি বাস করিলেই নমিতা আবার কোথায় উপনীত হইবে, কে জানে ? সেখানে সাহেবিয়ানা—বাবুয়ানার আবহাওয়ায়, হৃদয় বলিয়া জিনিবের সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়াই ত সে বিবাহের পর হইতে যথাসম্ভব পত্নীকে সেই সংস্রব হইতে দূরে রাখিবার প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছে। সত্য, সে সেই আবহাওয়ার মধ্য হইতেই এ রত্ন সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু এই ৩ বৎসরের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতায় সে ত বুঝিয়াছে, বাহিরে সানি পার্কের এই দেবতার দানের সহিত যে সম্বন্ধই থাকুক, ভিতরে কিছুই নাই। আজ তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় সে পাইতেছে।

২

সার শশধরের মনটা আজ বড়ই চিন্তা-ব্যাকুল—একমাত্র আদরের কন্যা নমিতা আজ তিন দিন হইল ঘোর জ্বর-রোগে আক্রান্তা, তাহার উপর তাহার মস্তিষ্কও সুস্থ নহে। ডাক্তার কবিরাজ তাহার সানি পার্কের প্রাসাদোপম গৃহে যেন ঘর-বাড়ী করিয়া ফেলিয়াছে। রোগিণী থাকিয়া থাকিয়া কেবল বলিতেছে, "ওগো, কি করলে ঐ মানুষটার প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া যায় ?" সারা গৃহে কে যেন নীরব দুশ্চিন্তার এক রাশি কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছে।

নিত্য তাঁহার ড্রয়িং-রুমে যাঁহারা প্রভাতে চা, কেক ও দামী চুরুট উপভোগ করিতে আসেন, তাঁহারা নিয়মিতভাবে আজও হাজিরা দিয়াছেন, তবে উচ্চ হাসির রোলের পরিবর্ত্তে নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা হইতেছে। অবসরপ্রাপ্ত সবজজ বাহাদুর কেদারেশ্বর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছিলেন। নওপাড়ার রাজা বাহাদুর একখানা সোফায় অঙ্গ হেলাইয়া দিয়া কেকের টুকরা মুখে তুলিতে তুলিতে ফিস-ফিস করিয়া রায় বাহাদুরের সহিত কথা কহিতেছিলেন—তাঁহার বিলাস-লালিত দেহখানির মধ্যে নেওয়াপাতি ভুঁড়িটুকুই বিশেষরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার নয়ন দুইটি রক্তাভ, তত বেলাতেও ঈষৎ তন্দ্রাজড়িত—সেই নয়নের কোণ গাঢ় কালিমালিপ্ত। হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার মিঃ সানিয়্যাল গৃহস্বামীর প্রতীক্ষায় অন্য এক আসনে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

রাজা দিগেন্দ্রনারায়ণ বলিতেছিলেন, "লোকটা কি হাঁস-পাতালে যেতে যেতেই মরল?"

রায় বাহাদুর উত্তরে বলিলেন, "না, তা ঠিক নয়, হাঁস-পাতালেও কিছুক্ষণ ছিল। আহাম্মুখটাকে কে যে ওদের গাড়ীর সামনে আসতে বলেছিল, তা জানিনি। খবরের কাগজগুলো এর মধ্যেই চেঁচাতে আরম্ভ করেছে। লোকের আর নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ী চড়বার যো নেই।"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু ঐ লোকটার পরিবারটা দয়ার যোগ্য, এটা স্বীকার করতেই হবে। কি বলেন রায় বাহাদুর?"

রায় বাহাদুর ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কে,—ঐ কুলীটা? তুমিও যেমন সান্যেল, ওদেরও যদি মানুষের মধ্যে ধরতে হয়—এই যে সার শশধর, মেয়ে কি রকম?"

সার শশধর বিষণ্ণ চিন্তাভারাক্রান্ত মুখে আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন, "ঠিক এখনও আউট অফ ডেঞ্জার বলা যায় না। তবে রাত্তিরটা রেষ্টলেস একটু কম ছিল। ভাবনা যতটা সেজন্যে, তার চেয়ে বেশী ভাবনা হয়েছে কেসটাতে।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "হ্যাঃ, তুমিও যেমন—ওর আবাব ভাবনা কি? রাস্তার একটা কুলী—ও কিছু ধ'রে দিলেই মিটে যাবে।"

রাজা বাহাদুর বলিলেন, "তা নয় ত কি!"

সার শশধর বলিলেন, "না হে, যতটা সোজা ভাবছো, ততটা না। বল না হে সান্ন্যাল, তুমি ত এখনও আইন-কানুন ঘাঁটছো! করোনারের ভার্ডিক্ট শুনেছো তো? ম্যানস্লটার ওয়িং টু কেয়ারলেস্‌নেস্ এণ্ড নেগ্লিজেন্স! তার উপর,—নমির লাইসেন্স নেই"—

রায় বাহাদুর চমকিত হইয়া বলিলেন, "নমিতার সম্পর্ক এতে কোথা হতে এলো? সে ত ঠিক হয়েই গিয়েছে। রমেশকে তোমার জামাই বলেছে, দোষটা সে নিজের ঘাড়েই নেবে। নমিতা ত ড্রাইভ করতেই জানে না।"

এই সময়ে সার শশধরের পুত্র নবীন ব্যারিষ্টার নৃপেন্দ্র-নাথ, বন্ধু রমেশচন্দ্রকে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। রমেশচন্দ্র রায় বাহাদুর কেদারেশ্বর সিংহের পুত্র, হাইকোর্টের নবীন উকীল; সার শশধরের পুত্র নৃপেন্দ্রনাথের ও জামাতা বিনয়কুমারের সমবয়স্ক আত্মীয়, বিশেষতঃ বিনয়কুমারের বিশিষ্ট বন্ধু। ধরিতে গেলে রমেশই এই দুই পরিবারের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ ঘটাইয়াছিল। রমেশ বিনয়ের সতীর্থ। তাহাদের দুই জনকে অন্দরের দিক হইতে আসিতে দেখিয়া সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল, কেমন আছে এখন? ঘুমটা ভেঙ্গেছে?"

নৃপেন্দ্র বলিল, "না, ঘুমুচ্ছে। ভালই আছে ব'লে মনে হ'ল। নমির গাড়ী ড্রাইভ করবার কথা কি বলছিলেন, রায় বাহাদুর কা'?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "না, বলছিলুম, রমেশের কাছেই শুনেছি, বিনয় ছোকরা নিজের ঘাড়েই ড্রাইভ করার দোষটা স্বীকার ক'রে নেবে!"

রমেশ বলিল, "হাঁ, তা বলেছিল বটে। প্রথমে ভয় হয়েছিল, সে যে রকম 'সত্য' 'সত্য' ক'রে ক্ষেপে যায়, তাতে হয় ত আদালতে সত্যিটা সবই ব'লে ফেলে!"

নৃপেন্দ্র বলিল, "এখন কি মনে করছ, মিথ্যে বলবে স্ত্রীর জন্যে ও? ও ক্ষেপেনি, তোমরাই ক্ষেপেছ। আমি বিলক্ষণ জানি ঐ অপদার্থটাকে, ও কখনই মিথ্যে বলবে না। আদালতে ও ব'লে বসবেই যে, দু'জনেই সমান দোষী। জানেন ত, জানকী বেওয়ার ভাইটা কেস ফাইল করেছে? জানকী বেওয়া সেই কুলীটার স্ত্রী—"

রায় বাহাদুর বিড়বিড় করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেস? কার নামে? এর আবার কেস কি, আসামী ফরিয়াদীই বা কি?" রায় বাহাদুরের প্রচণ্ড চপেটাঘাতে টেবলটা কাঁপিয়া উঠিল, চা-চামচ ও পেয়ালা-পিরীচ ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল।

রাজা রাহাদুরের অহিফেনের মৌতাত তখন সামান্য মাত্রায় চড়িয়াছে বটে, কিন্তু চক্ষু দুইটি তখনও প্রায় অর্দ্ধ-নিমীলিত। তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ও কিছু না, কিছু না, বেটারা ছোটলোক কুলী, ওরা আবার না কি নালিশ ফরিয়াদ করবে। হ্যাঃ, তুমিও যেমন!"

নৃপেন্দ্রনাথ বলিল, "ও কথা বলবেন না। এখন আর কুলী ছোটলোক নেই—"

রমেশ বলিল, "তাই বটে। কাল পুলিস-কোর্টে একবার গিয়েছিলুম, সেখানে আমিও ঐ কথা শুনে এলুম।"

ব্যারিষ্টার মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "ঠিক কথা! আমিও একসিডেণ্ট ও নালিসের কথা কোর্টে শুনে এসেছি।"

রায় বাহাদুর তখনও কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিতে-ছিলেন না। সামান্য একটা ছোটলোক—রাস্তার কুলী—সে নালিশ করিতে সাহস করিবে ভদ্রলোকের নামে? হোঃ! তিনি মনের ভাবটা কথায় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "হ্যাঃ—তাও না কি হয়?"

নৃপেন্দ্রনাথ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "হয়েছে! হবে না কি? সত্যিই বেটা দরখাস্ত করেছে। আবার ঐ বিধবাটা নাছোড়বান্দা। ভেবেছিলুম, ওর ভাইটাকে ডেকে একটা মিটমাট ক'রে নেবো—কিছু ক্ষতিপূরণ ধ'রে দোবো—আর আদালতও তার বেশী কিছু ক'রতো না—তা, বেটা গ্রাহ্যই করলে না—যদিও করতো, মাগীটা কিছু-তেই নরম হ'ল না, বলে বাঙ্গালী বিবিকে জেলে দেবে!"

রাজা বাহাদুর ও মিঃ সানিয়্যাল সমস্বরে বিস্ময়ভরে বলিলেন, "এঁ্যা, সত্যি না কি?"

রায় বাহাদুর বিস্ময়ে একবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। যাহা শুনিতেছেন, তাহা স্বপ্নে শোনা নহে ত? এঁ্যা! কুলী—টাকা লইতে সম্মত হয় না? বিস্ময়ের ঘোরটা একটু কাটিয়া গেলে বলিলেন, "এ সব হতে চললো কি? কুলী-মজুর চোখ রাঙ্গিয়ে কথা কয়—খাঁটি কম্যুনিজম্—"

নৃপেন বলিল, "সেটাও ত ঢের ভাল ছিল, এরা যে সমান হবার অধিকারকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়—"

রাজা বাহাদুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা বাবু, অন্যায় ত কিছু চায়নি। যুগটাই হচ্ছে তাই!—মেয়ে-মর্দ্দো সবার। তবে এদেরই বা অপরাধ কি? ওদের বেলা নাক সিঁটকোচ্ছ কেন?"

সার শশধর শুনিয়া যাইতেছিলেন, এতক্ষণে কথা কহি-লেন, বলিলেন, "ও সব ত ভাবছি না, কুলীটা কেস করলেও বা, না করলেও তা—কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে হবেই। ভাবনা ত সে জন্যে নয়। আমি ভাবছি কেলেঙ্কারীর কথাটা—আমার মেয়ে কি জামাইকে কোর্টে দাঁড়াতে হবে—"

রায় বাহাদুর লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "নেভার, নেভার! তুমি ভাবছ কি, সার শশধর? তুমি হাইকোর্টের রিটায়ার্ড জজ—তোমার মেয়ে, এতেও যদি এই স্ক্যাণ্ডাল হতে দেওয়া যায়, তা হ'লে বৃটিশ সাম্রাজ্যই মিথ্যে আর আমরাও সব মিথ্যে—ভুয়ো—ভুঁইফোড়—যা বল তাই।"

যখন ড্রয়িং-রুমে এই বাদানুবাদ চলিতেছিল, তখন রোগশয্যায় পড়িয়া নিদ্রাভঙ্গের পর ছটফট করিতে করিতে নমিতা মাঝে মাঝে বলিতেছিল,—"ওগো, তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি—তাকে প্রাণটা ফিরিয়ে দাও!"

৩

কিরূপ মানসিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে আদালতে বিনয়-কুমার পত্নীর ও আপনার বিপক্ষে সত্য সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইল, তাহা জানিলে বেচারীর উপর লোকের দয়া হওয়াই স্বাভাবিক। সে সত্যবাদী, কিন্তু হয় ত আদালতে কেলেঙ্কারীর ভয়ে সে দুইটা সত্য কথা গোপন করিতেও পারিত। কিন্তু সে পক্ষে এক প্রবল অন্তরায় উপস্থিত হইল।

মামলার দিন সকালে রামখেলাওন তাহার ভগিনী জানকীকে লইয়া বিনয়ের গৃহে উপস্থিত। সে যখন জ্বলন্ত ভাষায় তাহার ভগিনীর সর্ব্বনাশের কথা—দুগ্ধপোষ্য ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীর সহায়হীনতার কথা হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, বিনয় তখনই আপনার কর্ত্তব্যপথ স্থির করিয়া লইল।

আদালতে যাইবার সময় একটা কথা রহিয়া রহিয়া তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতে লাগিল,—"সত্য নাশ কোরো না, বাবুজী! সব চ'লে যাবে, কেবল সত্য সঙ্গে যাবে। সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায়বিচার—এ সব কি কথার কথা?" এই নিরক্ষর গ্রামবাসী শ্রমিক প্রাণের উচ্ছ্বাসে যাহা বলিয়া গেল, তাহাই কি সত্য নহে? সত্য—ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই ত যুগে যুগে অবতার! যুগে যুগে মনুষ্য-সমাজে কি তাই সত্য ধর্ম্ম পূজা পাইয়া আসিতেছে না?

মনে পড়িল, অন্ধকারাকক্ষে আবদ্ধ ত্যাগী পুরুষশ্রেষ্ঠকে। তপঃক্লিষ্ট শীর্ণ খর্ব্ব দেহ, কিন্তু কত শত মত্তহস্তীর বল তাঁহার ঐ ক্ষুদ্র বক্ষোমধ্যে। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহচর, অনুচর—জগতে আপনার বলিতে যাহারা, আজ কোথায় কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে তাহারা? তাঁহার ধরিবার রহিয়াছে একমাত্র অবলম্বন,—সত্য। কষ্ট, বিপদ, লাঞ্ছনা, অপমান,—সে ত অঙ্গের ভূষণ করিতে হইবেই।

আদালতে সে অকপটে সত্য ঘটনাই বলিয়া গেল। সে শুনিল, যোগাড়ের ফলে নমিতার সাক্ষ্য কমিশনে গৃহীত হইয়াছিল—সে সাক্ষ্যে নমিতা পোষা পাখীর মত যাহা বলিতে শিখিয়াছিল, তাহাই বলিয়া গিয়াছিল। হাঁসপাতালের

ডাক্তারের সাক্ষ্যও নমিতার অনুকূল হইয়াছিল। সুতরাং বিনয়ের সাক্ষ্য ফরিয়াদীদের পক্ষে সুবিধাজনক হইল না। বিচারক বিশেষ বিবেচনার পর নিহত পথিকের অন্তমনস্কতাকে ও পথাতিক্রমের নিয়মের অজ্ঞতাকেই বিশেষরূপে দায়ী করিলেন, কিন্তু বিনা লাইসেন্সে গাড়ী চালনা করার অপরাধে নমিতাকে অপরাধী করিয়া জরিমানা করিলেন এবং জরিমানার কিছু অংশ নিহত পথিকের বিধবাকে দিতে আদেশ দিলেন।

আদালত হইতে সরাসরি শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া ড্রয়িংরুমে পদার্পণ করিতেই বিনয় বাধা পাইল,—সম্মুখেই উদ্যতমুষ্টি অগ্নিমূর্ত্তি শ্যালক। নৃপেন্দ্রনাথ ক্রোধে ঘৃণায় মুখ-চক্ষু বিকৃত করিয়া বলিল, "ড্যাম কাওয়ার্ড! মুখ দেখাতে লজ্জা হ'ল না?" সার শশধর, রায় বাহাদুর—সকলেই উপস্থিত, কিন্তু কোথাও এক বিন্দু দয়ার প্রত্যাশা নাই।

বিনয়কুমার বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যহারা না হইয়া বলিল, "যারা ঘরের মেয়েকে মিথ্যে সাক্ষী দিতে শেখায়, তারা কাওয়ার্ড, না আমি? পথ ছাড়ো, নমিতাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

বিনয় অন্দরের দিকে এক পদ অগ্রসর হইল। নৃপেন্দ্রনাথ একলম্ফে তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ষ্টপ, অর আই উইল কিক ইউ আউট অফ মাই হাউস্। যে ইডিয়ট ওয়াইফকে বিট্রে করে, তার সঙ্গে আমার সিষ্টারের কোন সম্পর্ক নেই।"

ব্যাপার অত্যন্ত অধিক দূর গড়াইতেছে দেখিয়া সার শশধর উভয়ের মধ্যে পড়িয়া বলিলেন, "কি হচ্ছে এ সব?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "এ তোমার অন্যায়, নেপেনের দোষটা কি হ'ল? স্ত্রীর সম্বন্ধে, বংশের বা পরিবারের সম্মান সম্বন্ধে যার কর্ত্তব্যজ্ঞান নেই—"

বাধা দিয়া বিনয় বলিল, "আমার স্ত্রীর প্রতি আমার কর্ত্তব্যের কথা কাউকে আমি শেখাতে ডাকিনে—"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সে ঝড়ের বেগে অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে বাধা দিবার সাহস আর কাহারও হইল না।

তাহাকে দেখিবামাত্র কিন্তু নমিতা দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রহিল, তাহার রুদ্ধ অশ্রুস্রোত নামিয়া আসিল। বিনয়ের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে পত্নীর শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া আগ্রহ ও উৎকণ্ঠাভরে তাহার কম্পিত করপল্লব ধারণ করিয়া গদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিল, "এরা যা বলছে, বল, তা সত্যি নয়, নমি? আমি কাপুরুষ? আমি তোমায় বিপদে ফেলেছি?"

নমিতার নয়নপল্লব তখনও মুদিত, সে রহিয়া রহিয়া কাঁদিতেছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা জড়িত স্বরে সে বলিল, "কি বল্‌বো, বলবার কি মুখ রেখেছ? কেন তুমি এ কায করলে, আমার নামে মিথ্যে সাক্ষী দিলে? আমার যে মুখ দেখাবার যো নেই।" নমিতা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিনয় স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সত্যই কি এ কথাগুলি তাহার শিক্ষিতা মার্জ্জিতরুচি প্রেমময়ী পত্নীর কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতেছে? তবে কি ভ্রাতার মত ভগিনীরও হৃদয় বলিয়া কোন জিনিষ নাই? নিহত পথিক ও তাহার আশ্রয়হীনা পত্নী ও পুত্র-কন্যা—ইহাদেরও জন্য কি তাহার হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠে নাই? তবে সে কেন রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া কেবল বলিয়াছিল,—"ওগো, তোমরা তাকে বাঁচিয়ে দাও?" এ কি প্রহেলিকা?

এ কি তাহারই ভ্রম? বিনয়কুমার আর একবার অগ্রসর হইয়া পত্নীর হাত দুইখানি ধরিয়া বিভ্রান্তের মত বলিল, "নমিতা, এই কি তোমার শেষ কথা?"

নমিতা তাহার মুষ্টি হইতে হস্ত মোচন করিয়া লইয়া ভীতিবিহ্বল-নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে বলিল, "ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় নিয়ে যেও না—আমি যাব না, কখ্‌খোনো না"—

বলিতে বলিতে সে মূর্চ্ছিতার মত হইয়া পড়িল, দাসী ও ধাত্রী ছুটিয়া আসিল।

নৃপেন্দ্রনাথ এই সময়ে একলম্ফে কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইয়া দৃঢ়-মুষ্টিতে বিনয়কুমারের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিল, "শুনলে ত? এখনও কি একটা 'সিন্ ক্রিয়েট' করতে চাও? ফুল!"

বিনয়কুমার তাহাকে কথা-শেষ করিতে না দিয়া সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "তোমাদের মত সত্যবাদীদের সঙ্গে থেকে নমিতাও পাছে ঐ রকম সত্যবাদী হয়ে পড়ে, এই ভয়ে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে এসেছিলুম। না হ'লে তুমি কি ভাব, তোমাদের নীচ সংসর্গ ঘাঁটতে আমি এখানে আসি? তুমি কি ভাব, দোষ ক'রে দোষের সাজা পাবার ভয়ে মিথ্যে বলাটা সভ্যতার লক্ষণ, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে সাধু

সাজবার চেষ্টা করাটা ভদ্রতা? যাক্, তোমাদের জগৎ নিয়ে তোমরা থাক; আমি সেখানে পৌঁছিবার স্পর্দ্ধা রাখিনে। চল্লুম।"

বিনয়কুমার আর দাঁড়াইল না; ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল। সে সময়ে স্বামীর নয়নে নমিতা যে পাগলের দৃষ্টি দেখিয়াছিল, তাহা ইহজীবনে সে ভুলিতে পারিয়াছিল কি?

৪

"প্রথম দর্শনেই মহাপুরুষ আমার দিকে প্রশান্ত স্নিগ্ধ ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে যা বললেন, তাতে আমি অবাক্ হয়ে গেলুম। কি মর্ম্মভেদী অন্তর্দৃষ্টি!"

বিনয়কুমার ব্যাণ্ডেজের কাপড় মুড়িয়া টেবলের উপর রাখিয়া দিল। তাহার অঙ্গে ভলান্টিয়ার এম্বুলেন্স কোরের ডাক্তারী পোষাক, সে সবরমতী আশ্রমের অস্থায়ী হাঁস-পাতালে বসিয়া একটার পর একটা ব্যাণ্ডেজ ঠিক করিয়া রাখিতেছিল। তাহার পার্শ্বে একটি বাঙ্গালী যুবক বসিয়াছিল, সে রমেশ।

রমেশ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "কি বল্‌লেন, মহাত্মা?"

বিনয় বলিল, "কি বললেন? জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়ীতে ঝগড়া ক'রে আসনি ত, বাবুজী? দেখ, এ কাযে সমস্ত মনটা ঢেলে দিতে না পারলে কায করতে পারা যায় না। মনটা যদি বাঙ্গালায় রেখে এসে কেবল দেহটা এখানে কাযে লাগাও, তা হ'লে এখনই তোমার ফিরে যাওয়া উচিত।' শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, সত্যিই ত মনটা বাঙ্গালায় ফেলে রেখে এসেছি!"

একটি দীর্ঘশ্বাস তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বে মর্ম্মভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিনয় বলিল, "রমেশদা! যাক্ গে, তুমি বোম্বাইএ কদ্দিন থাকবে? তোমাদের সব খবর কি?"

রমেশের মুখে দুষ্ট হাসি খেলিয়া গেল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি বল্‌ছিলি, মনটা বাঙ্গালায় ফেলে রেখে এসেছিস? তা, এই ভণ্ডামী কেন?"

"ভণ্ডামী?—তার মানে?"

"আহা, যোগী সর্ব্বস্বত্যাগী—যেন কিছুই বোঝেন না; কৌপীন ধারণ করলেই হয় আর কি! কি বলিস? যাক্, ভেবেছিস কি, ঘর দুয়োর ভাসিয়ে দিবি না কি?"

বিনয় হঠাৎ গম্ভীর ও নীরব হইল। ক্ষণপরে মৃদুস্বরে বলিল, "যারা চায় না—যাদের মত উঁচু যায়গায় এ গরীবের স্থান নেই—তাদের কাছে—"

রমেশ বাধা দিয়া বলিল, "তাদের কাছে কি? তোর 'তারা' বুঝি ঐ অসারে খলু সংসারে সারং জিনিষটি? আর কেউ কিছু না?"

বিনয় বিষাদমাখা স্বরে বলিল, "আর কে আছে, রমেশদা? পিসীমা? তাঁকেও ত কাশী রেখে এসেছি।"

রমেশ ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "আর কেউ নেই? ওরে গাধা, তোর তারা ছাড়া আরও যে ঢের আছে—বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ধর না গিয়ে ঐ রুগী-পত্তোর, এ সব ফেলে এলি কি ক'রে? আর বাস্তবিক, যদি এই ভাবেই জীবন কাটাবি ভেবেছিলি, তা হ'লে বিয়ে করেছিলি কেন? ওরা সবাই যে বোম্বায়ে তোর অপেক্ষায় ব'সে রয়েছে। যাবিনি তুই?"

বিনয়ের বুকখানা দুলিয়া উঠিল। রমেশ—বাল্যবন্ধু রমেশ—সে কি মিথ্যা বলিতেছে? না, এ অসম্ভব পরিবর্ত্তন হইলে দীর্ঘ আট মাস কালের মধ্যেও কি একখানা পত্র লিখিয়াও খোঁজ লইবার ইচ্ছা হইত না? সে জবাব দিল না, আপন মনে কায করিয়া যাইতে লাগিল।

রমেশ আবার বলিল, "তুই হলি কি বল দিকি? এতটা পথ বেয়ে এলুম কোর্ট কামাই ক'রে কলকাতা থেকে, তুই একবার বসতেও বল্‌লি নি? এক পাতে ব'সে দু'জনে কত খেয়েছি, সন্ন্যাসী সেজে তাও ভুলে গেছিস বোধ হয়? যাক্, চল্ দিকি আমার সঙ্গে বোম্বাই অবধি—দোহাই তোর, এতে আর ন্যাকামি করিসনি।"

বিনয় বলিল, "ডিউটি। ডিউটি ছেড়ে যেতে পরামর্শ দিস্?"

রমেশ বলিল, "ওঃ, ভারী ডিউটি! নে, নে, ওঠ, বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

বিনয় তখনও অটল, "ডিউটি শেষ না হলে কোয়ার্টার্স ছেড়ে এক পাও যাবার যো নেই।"

রমেশ বলিল, "না হয়, দুটো দিনের ছুটী নে। এতে ত আর তোর মহাত্মার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। না হয়, একবার তাদের দেখাটা দিয়েই চ'লে আসবি, কি বল্?"

কিন্তু রমেশের কোন অনুরোধ-উপরোধই টিকিল না, বিনয় কিছুতেই তাহার কর্ত্তব্যকে অসমাপ্ত রাখিয়া যাইতে সম্মত হইল না।

রমেশ ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে "এই যে ডাক্তার মিত্র! কারলার ক্যাম্পে আপনার কল এসেছে,"—এই কথা বলিতে বলিতে একটি ভদ্রলোক রঙ্গালয়ের আগন্তুকের মত হঠাৎ কোন এক অপ্রকাশ্য দ্বার-পথে তথায় আবির্ভূত হইলেন।

হঠাৎ নবাগতের দৃষ্টি রমেশের উপর নিপতিত হইল। বিনয়কুমার তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিয়াই বলিল, "ইনি আমার বন্ধু, কল্‌কাতা থেকে আসছেন।"

আগন্তুক ভদ্রলোকটি সহাস্য আননে বলিলেন, "বটে, বটে! আসুন, আসুন, এই দরিদ্র আশ্রমবাসীরা আপনার মত অতিথি পেয়ে ধন্য হ'ল।"

রমেশ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি সামান্য লোক, আপনাদের মত ত্যাগী কর্ম্মীর দর্শন পেয়েই বরং আমিই ধন্য হলুম। আমার এই বন্ধুটিকে যদি দু'চার দিন ছুটী দেন—"

আগন্তুক সবিস্ময়ে বলিলেন, "ছুটী? আপনার বন্ধু মহৎ লোক, স্বেচ্ছায় এটাকে ডিউটি ব'লে নিয়েছেন, নইলে এতে চাকুরীর কথা কিছুই নেই। তবে উনি যখন নিজেই ডিউটি ঘাড়ে ক'রে নিয়ে আশ্রমের নিয়ম-কানুন সবই মেনে চলেন, তখন আপাততঃ দিন দুই তিন ওঁকে এক যায়গায় ডিউটিতে পাঠান হচ্ছে, তার পর আপনি বন্ধুকে নিয়ে যেতে পারেন। এ ডিউটিটা আগেই ঠিক হয়ে রয়েছে কি না। যান, ডাক্তার মিত্র, আপনি একবার বাপুজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, তার পর আপনার বন্ধুকে নিয়ে আশ্রমের কায দেখাবেন। আর যদি আশ্রমের সামান্য আহারে ওঁর কোন আপত্তি না থাকে—"

রমেশ বাধা দিয়া বলিল, "সে কি বলছেন, মশাই। আপনারা যা খাচ্ছেন রোজ, আমি কে যে তা খেতে পারবো না? তবে কি জানেন, আমায় এখনই ফিরে যেতে হবে, ওকে ত আর নিয়ে যাওয়া হ'ল না।"

আগন্তুক মিনতির সুরে যোড় হস্তে বলিলেন, "আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন—ডিউটি, মায়ের কায—কি করি বলুন।" তিনি আর দাঁড়াইলেন না।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি হলেন কে?"

উভয়ে বাহিরে আসিল। বিনয়কুমার যাইতে যাইতে বলিল, "উনি শ্যামল ভাই লালজী; কোটিপতি ব্যবসায়ী, বোম্বাই আর আমেদাবাদের তিনটি কাপড়ের কলের মালিক।"

রমেশ বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

৮

প্রত্যাবর্ত্তনকালে রমেশ বিনয়ের হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল। হস্তলিপি দেখিয়াই বিনয়কুমার মুহূর্ত্তেই বুঝিল, পত্র নমিতার।

ট্রেণে উঠিয়া রমেশ মনে মনে কত কি তোলাপাড়া করিল। এ কোথায় কোন্ রাজ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহার সহিত তাহাদের কলিকাতার অতৃপ্ত আরামের জীবনের সামঞ্জস্য কোথায়? দূর-দিগন্তে ঊষার বিকাশোন্মুখ রক্ত আভার মত এ কি অননুভূতপূর্ব্ব অনাস্বাদিতপূর্ব্ব নব-জীবনের বিকাশ হইতেছে! শৃঙ্খলা ও সংযম-নিয়ন্ত্রিত এই আশ্রমের জীবন ত কর্ম্মী শিক্ষার্থীর পক্ষে দুর্ব্বিষহ ভার বলিয়া আদৌ অনুমিত হয় না, বরং এ জীবনযাত্রা অনায়াস-গতি, স্বচ্ছন্দ, সদাপ্রফুল্ল, সদা উৎসাহদীপ্ত। এ দেশের সনাতন ভাবধারার সহিত এ জীবনের কি চমৎকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! সংযম-ব্যায়াম, ভজন-সাধন, সেবা-পরিচর্য্যা, নিঃসঙ্কোচ নির্ভয় আত্মনিয়োগ, ত্যাগ ও সন্ন্যাস,—কিন্তু ইহাতে ত শিক্ষকের বেত্রদণ্ডের বিন্দুমাত্র আভাস নাই। ক্ষণভঙ্গুর দেহ ও ভয়াল মৃত্যুর উপর আধিপত্যের এ ক্ষমতা ইহারা কোথায় পাইল?

এই শ্যামল ভাই, মহাপুরুষের মন্ত্রশিষ্য, কোটিপতি ব্যবসায়ী,—একাধিক কলকারখানার একচ্ছত্র প্রভু। কিন্তু কি নিরহঙ্কার, কি সাধুপ্রকৃতি! এমন আসক্তিহীন, কর্ম্মযোগী, নীরবত্যাগী, পরহিতে নিবেদিতপ্রাণ পুরুষ কয় জন দেখিতে পাওয়া যায়?

রমেশের হৃদয় অধীর চঞ্চল হইয়া উঠিল। কোন্ পথ সত্য? বৈদ্যুতিক আলোক, মোটর-ল্যাণ্ডো, সিনেমা, থিয়েটার, ডিনার-পিকনিক, ভৃত্য-পরিজন, নিঃশঙ্ক আরাম, নিশ্চিন্ত ভোগবিলাস, জীবনের সার্থকতা কি ইহাতেই নাই? নিত্য অভাব, দারিদ্র্যের তাড়না, নিত্য দুর্ভাবনা, আতঙ্ক,—

এ জীবনে শান্তি কোথায়? কে ভ্রান্ত পথে চলিতে চাহে? সংসারে থাকিয়া সন্ন্যাসের ভাণে লাভ কি?—রমেশ স্থির করিল, আশ্রমের এই পথ শ্রেয়ঃ বা প্রেয় নহে। এ পথ ইন্দ্রজালপূর্ণ। যাদুকরের মায়াদণ্ডস্পর্শে শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান বিনয়ও মোহপ্রাপ্ত না হইলে সে আজ ধর্ম্মপত্নীত্যাগী হইবে কেন?

আশ্রমের প্রতি রমেশের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কি অসম্ভব ইন্দ্রজাল! বিনয় তাহার মত হিতাকাঙ্ক্ষী বাল্যবন্ধুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিল, প্রাণসমা পত্নীর আহ্বানেও সাড়া দিল না! যত দিনেই হউক, যেরূপেই হউক, বিনয়ের এ মোহ ঘুচাইতে হইবেই।

বোম্বাইয়ের বাসায় পদার্পণ করিয়া রমেশ দেখিল, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহীর মত নমিতা দ্বিতলের অলিন্দে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে। বুঝিল, সে তাহার তার পাইয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই নমিতা একবারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। উদ্বেগ তাহার মুখে স্পষ্ট ছাপ মাখাইয়া দিয়াছে।

নমিতার সম্মুখীন হইয়া রমেশ বলিল, "না, এলো না।—ইডিয়ট!" নমিতার প্রফুল্ল কমলের মত মুখখানি পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, সে দৃষ্টি অবনমিত করিয়া লইল। রমেশ বুঝিল, অভিমানিনী কত বড় আঘাত পাইয়াছে, আর সেই আঘাতের বেদনার চিহ্ন কত কষ্টে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে!

সুসজ্জিত কক্ষে আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় নৃপেন্দ্রনাথ একখানি ইংরাজী নভেল পাঠ করিতেছিল। রমেশের কণ্ঠস্বরে তীরের মত উঠিয়া ঢিলা ইজেরটা টানিয়া দিয়া, পাঁসনেটা যথাস্থানে সংলগ্ন করিয়া সে কক্ষের বাহির হইয়া আসিল। ক্রোধ ও ঘৃণা-মিশ্রিত স্বরে সে বলিল, "এলো না? আমি কি 'প্রেডিক্ট' করেছিলুম, রমেশ? ফর নাথিং নমিকে 'ট্রাবল' দেওয়া হ'ল। কুলী ক্লাসের সঙ্গে যার 'সিম্প্যাথি', তার কাছে তোমরা কি 'এক্সপেক্ট' করতে পার? তোমরা ওকে 'সেন্টিমেন্ট্যাল ফুল' আর 'ইডিয়ট' যাই বল, আমি কিন্তু ওকে আরো 'ষ্টাডি' ক'রে বুঝেছি, ও একটা পাক্কা রাস্কাল!"

নমিতা ততক্ষণ কক্ষমধ্যে গিয়া একখানা আসনের উপর বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুখখানি এতই ম্লান হইয়া গিয়াছিল যে, সহজে দেখিলে মনে হয়, যেন সে কোন কঠিন রোগ হইতে সদ্য উঠিয়া আসিয়াছে। তাহার ভ্রাতা ও রমেশচন্দ্রও তাহাকে অনুসরণ করিয়াছিল।

নৃপেন্দ্রনাথ তাহার 'পাঁসনে'খানা রুমালে মুছিতে মুছিতে বলিল, "ডোন্ট! 'লাইক এ গুড গ্যাল্যাল!' নমি, বুঝ্ছিস্ নি, 'হি ডাস্ নট ডিসার্ভ ইট। দি স্কাউণ্ড্রেল! একটা 'সাউণ্ড থ্র্যাসিং' দিতে পারতুম?"

নমিতা এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই, কিন্তু হঠাৎ তাহার নীলোৎপল-নয়নে অসম্ভব রক্ত আভা ফুটিয়া উঠিল। সে ব্যথিত-কণ্ঠে কেবলমাত্র বলিল, "পায়ে পড়ছি তোমাদের দাদা, আমায় একটু একলা থাকতে দাও।"

রমেশ তাড়াতাড়ি নৃপেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল, বলিল, "চল হে চা'টা কি আছে আনাও, সারা দিনটা গাড়ীতে—"

বাহিরে আসিয়া সে বলিল, "তুমিও একটা 'ইডিয়ট' কম নও। ওর সামনে অমন ক'রে বলে? ওর প্রাণের মধ্যে এখন যে কান্নার সমুদ্দুর বয়ে যাচ্ছে, তুমি তার কি বুঝবে?"

বস্তুতঃই তখন নমিতার মনোরাজ্যে রুদ্ধ ক্রন্দনের তুফান বহিয়া যাইতেছিল। নারী কি এতই হীন? না হয় একটা অপরাধই করিয়াছে সে, কিন্তু অপরাধের কি ক্ষমা নাই? বড় গর্ব্ব করিয়া সে মিলনের দূত পাঠাইয়াছিল, এই তাহার পুরস্কার? ছিঃ ছিঃ! ইহার পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইল না কেন? মান-অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সে মিলনের হস্ত প্রসারণ করিয়াছিল, লাঞ্ছনাই কি তাহার প্রতিদান?

রুদ্ধদ্বার কক্ষে বহুক্ষণ নীরবে নিশ্চেষ্টভাবে সে বসিয়া রহিল। টেবলের উপর মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া খুব খানিকটা কাঁদিল। কখনও বা অস্থিরচিত্তে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইল। বক্ষঃপঞ্জরে এ অহেতুক বেদনা কেন? কিসের জন্য, কাহার উপর ক্রোধ, কাহার উপর অভিমান? দাম্ভিক পুরুষ! নারী কি তোমার ক্রীড়নক? তুমি যখন ইচ্ছা তাহার মন লইয়া খেলা করিতে পার? নমিতার অন্তরমধ্যে স্বামীর ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল।

* * * * *

এ কি, চক্ষুকে কি বিশ্বাস করা যায়? কারণীর

হাঁসপাতালে আহত স্বেচ্ছাসেবকের শয্যা-পার্শ্বে নমিতা? বিনয়কুমারের মুষ্টিবদ্ধ ষ্টেথিসকোপটা বুঝি পড়িয়া যায়, হস্ত এতই থরথর কম্পিত হইতেছে! নমিতা—ধনী বিলাসীর ঘরের দুলালী, গর্ব্বিতা নমিতা?—সত্যই বিনয় আপনার দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে বলিয়া মনে করিল। মুহূর্ত্তকাল সে বিস্ময়-বিমূঢ়, চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। পরে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, 'নমিতা! নমি!'

সেই নব-বিবাহিত স্বপ্নজীবনের সুধাবর্ষী সুর! নমিতা চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, মুহূর্ত্তকাল চারি-চক্ষুর মিলন হইল, নমিতা তাড়াতাড়ি দৃষ্টি অবনমিত করিয়া লইল। অতি আপনার, নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়জন, অথচ অল্পকালের ব্যবধানে কত দূরে তাহারা পরস্পর হইতে সরিয়া গিয়াছে! নমিতার মনে হইতেছে, যেন কোন অপরিচিত অজানা লোক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র!

নমিতা ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "এই অপরিচিতার সঙ্গে অকারণে আলাপ করছেন, এতে আপনার ডিউটির ক্ষতি হচ্ছে না, ডাক্তার?"

বিনয় আঘাতটা হাসিয়া মুছিয়া ফেলিল, বলিল, "নিশ্চয়ই হচ্ছে। কিন্তু নমি, তুমি যদি ভাল ক'রে ভেবে দেখ, তা হ'লে বুঝতে পারবে, ডিউটি পালন ক'রে আমি তোমারই সম্মানবৃদ্ধি করছি, মর্য্যাদারক্ষা করছি।"

নমিতার মুখে তখনও ব্যঙ্গের হাসি খেলিতেছে। সে বলিল, "সত্যি না কি? আমার মর্য্যাদা রাখবার জন্যেই বুঝি আমার পত্র আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছিলে?—রমেশ-দা'র সামনে আমার অনুরোধে লাথি মেরেছিলে?"

বিনয়কুমার দুই পদ অগ্রসর হইয়া নমিতার কুসুমপেলব করপল্লব ধারণ করিল, কিন্তু নমিতা মুহূর্ত্তে হস্ত মুক্ত করিয়া দুই পদ দূরে সরিয়া দাঁড়াইল,—তাহার দৃষ্টি ক্রোধ ও ঘৃণাব্যঞ্জক। সে বলিল, "এটা হাঁসপাতাল, আরও যথেষ্ট লোক চারিধারে ঘুরছে ফিরছে, এখানে অভিনয় করবার যায়গা নেই।"

আঘাতের উপর আঘাত! বিনয়কুমার কিছুক্ষণ পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্তব্ধ ও অচল হইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "আমায় ভুল বুঝেছো, নমি! যা করেছি আমি, কর্ত্তব্যবোধে করেই আসছি। সে কর্ত্তব্য কেবল আমার নয়, তোমারও। যদি তা না করতুম, তা হ'লে তোমারও প্রতি আমি ঘোর অন্যায় করতুম।"

নমিতার হৃদয়তটে আকুলতার বিরাট তরঙ্গোচ্ছ্বাস উঠিল, কিন্তু বাহিরে তাহার চিহ্নমাত্র প্রকাশ পাইল না। তখনও কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কঠোর করিয়া ব্যঙ্গের সুরে সে বলিল, "কি, আদালতে আমার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়েও?"

বুঝি সে সীমারেখা অতিক্রম করিল! বিনয়কুমার কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর বলিল, "দেখছি, যে দিক দিয়ে তোমায় বোঝাতে যাই, সে দিকটা বোঝবার ইচ্ছা তোমাদের কারও নেই। তা হ'লে তোমায় আমায় আর না দেখা হওয়াই ভাল।"

কথাটা বলিবার সময় বিনয়কুমারের নয়নপল্লবে বোধ হয় অশ্রুবিন্দু দেখা দিয়াছিল। সে মুহূর্ত্তমাত্রও দাঁড়াইল না, অন্য ওয়ার্ডে চলিয়া গেল। নমিতা একবার স্বামীর চলন্ত মূর্ত্তির দিকে বুকভরা আকাঙ্ক্ষার সহিত বাহু-প্রসারণ করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল, তাহার পর আপনাকে সামলাইয়া লইল।

* * * *

আর এক দিন। অন্যান্য দেশ-সেবিকার সহিত নমিতা সবরমতীর স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন করিয়া আশ্রমাভিমুখে চলিয়াছে। তখন উষার রক্তরাগে দিঙ্‌মণ্ডল অলক্তরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

তাহারা দুই জন, নমিতা ও তাহার সঙ্গিনী উর্ম্মিলাবাই সরাবাই। উভয়ে প্রভাতস্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে যাইতেছিল। তাহাদের ধ্যানস্তিমিত নেত্রে কি অপূর্ব্ব ভক্তি-রাগ ফুটিয়া উঠিয়াছিল! আজ পক্ষাধিককাল নমিতা আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সবরমতীর পুণ্যাশ্রমে ব্রতচারিণীরূপে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিতেছে। সন্ধ্যা[illegible] তাহার কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তনই না ঘটিয়াছে! এ কি শান্তি! এমন শান্তি ত সে জীবনে কখনও পায় নাই।

এ পরিবর্ত্তনের মূল তাহার সঙ্গিনী উর্ম্মিলাবাই। কারণ হাঁসপাতালে তাহার সহিত নমিতার পরিচয় হইয়াছিল। সেই পরিচয় ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। উর্ম্মিলা অসামান্যা সুন্দরী, কোটিপতি ধনকুবেরের ভগিনী, 'উর্ম্মিলা মিলসের' স্বত্বাধিকারিণী। অথচ বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইলেও ব্রহ্মচারিণী, খদ্দরমণ্ডিতা সন্ন্যাসিনী

কলের শ্রমিকগণের দেহমনের উন্নতিকামিনী, পরসেবাব্রত-ধারিণী। নয়নজলে ভাসিয়া যে দিন নমিতা তাহাকে তাহার অতীত জীবনের করুণ কাহিনী শুনাইয়াছিল, সে দিন উর্ম্মিলাই তাহাকে স্নিগ্ধ কোমল প্রাণ-জুড়ানো স্বরে বলিয়াছিল, "বহিন্! সত্যাশ্রয়ী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সত্যকে ত্যাগ করিতে পারে না। শ্রীরাম প্রাণসমা পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যপথ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তোমার স্বামী মহান্ পুরুষ, তোমারই মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য তোমাকে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দেন নাই, অন্ততঃ প্রবল অন্তরায়ের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া প্রাণপণে তোমাকে সত্যাশ্রয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাণাপেক্ষা তোমাকে ভাল না বাসিলে তোমাকেও অসত্যের ধূলি-মলিন পথে নামাইয়া দিতেন, আপনিও সঙ্গে সঙ্গে তথায় নামিয়া যাইতেন। তুচ্ছ ঐহিক সুবিধা-অসুবিধার জন্য আত্মাকে এইভাবে বিক্রয় না করিয়া কি তিনি মহৎকার্য্য-সাধন করেন নাই?"

সেইক্ষণ—সেই শুভক্ষণ হইতেই নমিতার অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত হইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, সে কি অন্যায়, কি পাপ করিয়াছে। আকুল-কণ্ঠে সখীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

উর্ম্মিলা হাসিয়া বলিয়াছিল, "তোমার অজ্ঞানকৃত পাপ, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে বিলম্ব হইবে না। চল, আমি তোমায় আশ্রমে লইয়া যাইব। সেখানে মহাপুরুষের সঙ্গগুণে অজ্ঞানের মোহ অপসারিত হইবে। এ সংসারের ভোগবিলাসের বহু ঊর্দ্ধে এমন এক জগৎ এই মনোরাজ্যেই সৃষ্টি করিতে পারিবে—যাহার ফলে তুমি শান্তিতৃপ্তি অনায়াসে করতলগত করিতে পারিবে।"

সত্যই নমিতা অনন্ত অপরিমেয় অপার সুখ-শান্তির প্রথম আস্বাদ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। স্তোত্রান্তে যখন তাহারা আশ্রমে বস্ত্রান্তর পরিগ্রহণ করিয়া ভজনে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন সে ভাবিতেছিল, সে কত ক্ষুদ্র! তুচ্ছ গর্ব্ব, তুচ্ছ অভিমান! তাহার কত ঊর্দ্ধে তাহার স্বামীর গভীর প্রেমের রাজ্য! প্রত্যাখ্যাত ব্যথাহত স্বামীর ছল-ছল নয়ন যতই তাহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল, ততই সে আপনাকে ধূলায় লুটাইয়া দিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে লাগিল। ছিঃ ছিঃ! কাঞ্চন ভ্রমে সে এত দিন কাচখণ্ডের পূজা করিয়াছে!

সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার কারলায় যাইবার জন্য তাহার প্রাণের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করিয়া উঠিল। অনুমতি গ্রহণের জন্য সে উর্ম্মিলা বাইএর সাহায্য লইতে যাইতেছে, এমন সময় গোধূলির আলো আঁধারে এ কাহার মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হইল! সত্য, না দৃষ্টিভ্রম?

"নমিতা!"—তখনও সেই স্নেহভরা মধুর আহ্বান! আর ত সন্দেহের অবকাশ নাই। নমিতা পথের ধূলায় নতজানু হইয়া স্বামীর পাদস্পর্শ ধরিয়া গদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা!"—আর কথা সরিল না!

বিস্মিত বিনয়কুমার সাদরে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে বলিল, "ক্ষমা? ক্ষমা ত তুমিও আমায় করবে, আমি ত তোমাদের যোগ্য হ'তে পারিনি।"

তখন নমিতার বহু দিনের রুদ্ধ অশ্রুস্রোত বন্ধনমুক্ত হইয়া প্লাবনের আকারে গলিয়া আসিয়া স্বামীর বিশাল উরস সিক্ত করিয়া দিল। বিনয়কুমার স্নেহার্দ্র স্বরে বলিল, "ছিঃ, কাঁদে না। চল, আশ্রমে যাই।"

পথে যাইতে যাইতে নমিতা বলিল, "তোমার কাছে যাবার জন্যে—আমার পাপের কথা স্বীকার করবার জন্যে —আজ ক'দিন থেকেই প্রাণ হাঁপাচ্ছিল। তুমি যে এখানে এসেছ, তা ত জানিনে।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "আজই এসেছি; কিন্তু ডিউটি এখনও আছে, মাত্র দু'দিন ছুটী নিয়ে কায বুঝে নিতে এসেছি। কিন্তু ডিউটি—"

নমিতা চম্পককলির মত কোমল অঙ্গুলিস্পর্শে তাহার কথা রোধ করিয়া দিয়া বলিল, "আর ও লজ্জা দিচ্ছ কেন? পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হয়নি?"

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বিনয় বলিল, "নমিতা, কোন্ পরশ-মণির প্রভাবে তোমার এই পরিবর্ত্তন?"

নমিতা বলিল, "ওঃ, পরিবর্ত্তন ত ভারী! ভাগ্যে দিদি ছিলেন। উর্ম্মিলা দিদির মত মানুষ তুমি কি আর কোথাও দেখেছ?"

বিনয় গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "কে, উর্ম্মিলাবাই? তিনি ত মানুষ নন, দেবতা। মহাপুরুষের হাতে গড়া!"

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

তিব্বত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

৬ই জুন, ১৯২৭। প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া বাংলোর বাহিরে আসিয়া উত্তরপূর্ব্ব কোণের উচ্চ পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের শৃঙ্গে রাত্রিতে সামান্য তুষারপাত হইয়াছে। দৃশ্যটি উপভোগ্য। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখা চলিল না। কারণ, আমাদের শীঘ্রই রওনা হইতে হইবে। অদ্য আমাদের কাংমা হইতে ১৫ মাইল দূরে সোগাং যাইতে হইবে। আহারাদি করিয়া বেলা ৮ ঘটিকার সময় আমরা কায়েংলা নদীর পার দিয়া বরাবর উত্তরদিকে চলিলাম। কায়েংলা নদীর দুই পারে সমতল ভূমিতে গম, যব চাষ হইতেছে। চাষী ভূমির পর মাঠভূমি, তার পর অভ্রভেদী পাহাড়। উত্তরপূর্ব্বদিকের

সেতু ও ছোটেন

পাহাড়ে যে তুষারপাত হইয়াছিল, তাহা বেলা ৯৷৷০টা কি ১০ ঘটিকার সময় সূর্য্যের প্রখর তাপে গলিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে দুই এক স্থানে পূর্ব্বদিনের মত বৃক্ষ দেখিলাম। ক্রমে উপত্যকায় সমতল ভূমির পরিসর কমিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে আর ২ মাইল গেলে সমতল উপত্যকা ছাড়িয়া গিরিসঙ্কটের মধ্যে পড়িলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে বড় বড় পাহাড়। মধ্যে অপ্রশস্ত স্থানের মধ্যে নদী ও রাস্তা। এখানে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় পাথর বাহির হইয়া রহিয়াছে। রাস্তায়ও বিস্তর পাথর। এই গিরিসঙ্কট দিয়া উত্তরদিকে কিছু অগ্রসর হইলে এক যায়গায় পাথরের ভিতর দিয়া উপর হইতে নদীর জল নীচে পড়িতেছে দেখা যায়। এই স্থানে রাস্তার অপর পারে একটি স্তূপ, ইহাকে মানি বলে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যাত্রিকগণ পাথরের স্তূপের উপর কাপড়ের নিশানে "ওঁ মণিপদ্মে হুম্" বৌদ্ধ মন্ত্র লিখা নিশান প্রস্তরের স্তূপের উপর রাখিয়াছে। যাত্রিকগণ রাস্তায় যাইবার সময় ঐ মানির উপর পাথর ফেলিয়া "লা সো সো" বলিয়া চীৎকার করে। মানির পাথরের স্তূপ হইতে প্রায় আধ মাইল যায়গা রাস্তার পার্শ্ব দিয়া যে নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পাথরের মধ্য দিয়া ঢালুভাবে চলিয়াছে।

আর কিছু অগ্রসর হইলে অপ্রশস্ত উপত্যকা দিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইলাম। উত্তরদিকে সিকি মাইল কি কিছু বেশী গেলে আবার আমরা ঘুরিয়া পশ্চিমদিকে সিকি মাইল যাইয়া উত্তরদিকে চলিলাম এবং উত্তরদিকে সিকি মাইল গেলে একটি ছোটেন ও একটি পাথরের উপর রং-করা বৌদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। এই প্রতিমূর্ত্তি পার হইয়া গেলে আমরা একটি বিস্তীর্ণ উপত্যকার উপরে উচ্চভূমিতে দাঁড়াইলাম। এই মাঠভূমি হইতে আবার পূর্ব্বদিকে চলিয়া নিম্নদিকে নামিয়া উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। এখানে একটি পাথরের সাজানো পুলের উপর দিয়া কায়েংলা নদী পার হইয়া আমরা একটি গ্রামের নীচে দাঁড়াইলাম। গ্রামটি নদী হইতে সুন্দর দেখায়। গ্রামে তিব্বতদেশীয় বাড়ী। গ্রামের ধার দিয়া রাস্তা ক্রমে উপরদিকে উচ্চভূমির উপরে উঠিয়াছে। গ্রাম হইতে উপত্যকার নদীতে এবং চাষক্ষেত্রে নামিবার রাস্তা আছে। গ্রামের পশ্চিমদিকে বহু দূরে উপত্যকায় আর একটি গ্রামে একটি ছোটেন আছে। পুল ও ছোটেন এবং

ছোট গ্রাম ছবিতে দেখা যাইতেছে। উপত্যকায় যব-গমের চাষ হইতেছে। মালভূমির উপরিস্থিত গ্রামের পাশ দিয়া যাইতে গ্রামের ভিতর বড় পরিষ্কার বোধ হইল না; কিন্তু ফারির মত অত অপরিষ্কার নহে। গ্রামের দক্ষিণ ধার দিয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া গ্রামের নিম্নভাগে যাইয়া পরে এক উচ্চভূমির উপরে উঠিলাম। এই উচ্চভূমির উপর দিয়া উত্তরদিকে দেড় মাইল অনুর্ব্বরা ভূমির উপর রাস্তা চলিয়া সোগাং বাংলোয় বেলা ২॥০ ঘটিকায় পৌঁছিলাম।

সোগাং বাংলো একটি উচ্চভূমির উপরে অবস্থিত। মালভূমি ক্রমোচ্চভাবে পশ্চিমদিকে একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ের পাদদেশে মিলিয়াছে। এখানে পাহাড়ে কেবল পাথর, বাংলোর নিম্নে পূর্ব্বদিকে উপত্যকায় যব-গম চাষ হইতেছে। উপত্যকার মধ্য দিয়া নদী প্রবাহিত। উপত্যকার পূর্ব্ব পারে প্রকাণ্ড পাহাড়। এই পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের মধ্যদেশে একটি গুম্ফা। গুম্ফাটি উচ্চে অবস্থিত হওয়ায় বহুদূর হইতে সুন্দর দেখায়। ফারিজোঙ্গ হইতে এ পর্য্যন্ত কোন বাংলোর মাটীতে বৃক্ষ দেখি নাই। এই সোগাং বাংলোর পূর্ব্বদিকে ও উত্তরদিকে কয়েকটি গাছ আছে। ঐ গাছ কোন পুষ্প কি ফলের আশায় সৃষ্ট হয় নাই। বৃক্ষশূন্য দেশে শুধু পত্রের জন্যই বৃক্ষ রোপণ করা হয়। গাছগুলিতে এই সময় বেশ পাতা হইয়াছে। বৃক্ষশূন্য দেশে এই গাছেরই শোভা অতুলনীয়, এই বৃক্ষে ৩।৪ মাস বেশ পাতা থাকিবে। কিন্তু অক্টোবর মাসের শেষ হইতে তুষারপাতের তাড়নায় উহাদের পাতা সকল ঝরিয়া যাইবে। নভেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ঐ সকল বৃক্ষে পত্রাদি কিছুই থাকিবে না। আবার মে মাস হইতে নব পল্লব বিকশিত হইবে।

এই বাংলোতেও তিব্বতের অন্যান্য বাংলোর ন্যায় একই রকম বন্দোবস্ত। দুইটি বড় শয়নঘর ও দুইটি ছোট শয়নঘর। বড় শয়নঘরের মধ্যে খাওয়ার টেবল আছে। এতদ্ব্যতীত দুইটি বাথরুম, রান্নাঘর, কুলী ও চাকরদের থাকিবার ঘর এবং আস্তাবল। বাংলোর সম্মুখে একখানি ছোট গ্রাম আছে। গ্রামে কয়েকঘর চাষী লোকের বাস, তাহারা নীচের উপত্যকার জমী চাষ করে।

বৈকালে পশ্চিমদিকের পাহাড়ে বেড়াইতে যাইয়া পাহাড়ের উপর কিছু দূর উঠিলাম। পাহাড়ে কেবল পাথর; মাটীর অংশ সামান্য। পাহাড় হইতে নামিয়া মালভূমির উপর দিয়া মাইলখানেক বেড়াইলাম। কোন কোন স্থানে পূর্ব্ব-বর্ণিত কালা হইতে রাস্তা পর্য্যন্ত ৫।৬ ইঞ্চি উচ্চ চারা গাছ হইয়াছে দেখা গেল। তাহাতে লাল সাদা ফুল হইয়াছে। এই গাছ বিষাক্ত বলিয়া শুনিলাম। পাহাড় হইতে নীচে দৃষ্টিপাত করিলে এক উপত্যকা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে তৃণ-গাছ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। কেবল পাথর ও নুড়ি ভিন্ন পাহাড়ে কি মালভূমিতে অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। এই দৃশ্য নয়নানন্দকর নহে, বরং প্রখর রৌদ্রের সময় এই সকল পাথর ও বালি হইতে আলো প্রতিবিম্বিত হইয়া চক্ষুর পীড়াদায়ক হয়। পাহাড়ের গায়ে যায়গাবিশেষে ভেড়ার দল চরিতেছে দেখিলাম; কিন্তু ভেড়া এই তৃণশূন্য পাহাড়ে কি খায়, তাহা আমি অনেক সময় ভাবিয়া পাই না। এই সকল পাহাড়ে ঝরণা কি প্রস্রবণ দেখিতে পাইলাম না। বেলা ৬ ঘটিকার সময় বাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। আমরা বাংলোয় ২॥০ ঘটিকার সময় প্রবেশ করিয়া একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে নিবিষ্টমনে দেশীয় তাঁতে তিন পোয়া কি এক হাত চওড়া পশমের বস্ত্র বয়ন করিতে দেখিয়াছিলাম! ফিরিয়া আসিয়াও দেখি, সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নিবিষ্টচিত্তে তখনও বস্ত্র বয়ন করিতেছে। পরদিন প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবার পূর্ব্বে তাহার তাঁতের শব্দ শুনি। বাংলোর চৌকীদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, চৌকীদার ঐ স্ত্রীলোকটিকে রোজ চারি আনা ও খোরাক দেয়। স্ত্রীলোকটি সারাদিন বসিয়া অবিশ্রান্ত ক্লেশে চৌকীদারের নিজের ও পরিবারস্থ অন্যান্যের পরিচ্ছদের জন্য পশমের বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। সোগাং ১৩ হাজার ৫ শত ফুট উচ্চে অবস্থিত।

৭ই জুন। অদ্য প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিয়া আহারাদি সমাপন করিয়া ৮টার সময় সোগাং বাংলো পরিত্যাগ করিলাম। অদ্য আমাদের ১৪ মাইল যাইতে হইবে। আমাদের গন্তব্য স্থানের শেষ সীমা গিয়াংসিতে অদ্যই পৌঁছিব। কাযেই আমরা সকলেই হর্ষোৎফুল্ল। তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া বাংলো হইতে নির্গত হইলাম এবং ক্রমে একটু নীচু দিকে নামিয়া আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়া উপত্যকার উপরে উচ্চভূমি দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

গিয়াংসির পথে উপত্যকাভূম ও নদী

আছে। দুই পার্শ্বে উচ্চ উচ্চ পাহাড়, মাঝখানে উপত্যকা এবং পাহাড়ের মধ্যস্থিত উপত্যকার মধ্য দিয়া একটি নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এখানে দেখিলাম যে, প্রায় সমস্ত পাহাড়ই পাথরে পূর্ণ। এক স্থানে stone quary হইতে পাথর ক্ষোদাই করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই ভাবে আর ৩ মাইল অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বদিকে একটি মঠের ন্যায় তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম। ইহা দূর হইতে অতি সুন্দর দেখায়। শ্যামল ক্ষেত্রের পাশ দিয়া আর কিছু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বদিকের পাহাড় হইতে রাণার নামক একটি নদী আসিয়া এই কায়েংলা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদী পূর্ব্বদিকের তুষারাবৃত পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এই স্থানে গ্রামের পার্শ্বে দুই একটি গাছ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ এবং রাস্তার পার্শ্বের নদীর ধারে বিন্না ছোপের ন্যায় এক প্রকার নীল বর্ণের ফুল দেখিতে পাইলাম। ফুলগুলি দেখিতে মনোজ্ঞ (জেলা-পেলা পার হইয়া লেঙ্গরাম বাংলো ছাড়াইয়া নদীর ধারেও ঐ প্রকার ফুল দেখিতে পাইয়াছিলাম)। আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আমরা একটি গ্রামের পার্শ্বে আসিয়া পড়িলাম। এখানে কৃষিকার্য্যের বাহুল্য দেখা গেল। চাষীরা ছোট ছোট নালা দিয়া নদীর জল ক্ষেত্রে চাষের জন্য আনিতেছে দেখিলাম। স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে ঐ নালার জল লইবার জন্য ভারী ব্যস্ত!

কখনও কখনও স্থানে স্থানে জলের নালার উপরিস্থিত পাথর দিয়া আমরা ঐ নালা পার হইয়া গেলাম। কখনও কখনও দেখা গেল যে, ক্ষেত্রের জল রাস্তা ভিজাইয়া দিতেছে। আমরা সেই ভিজা রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। ক্রমে অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের নিম্নে বড় গুম্ফা দেখিতে পাইলাম। কিন্তু রাস্তা ছাড়িয়া প্রায় দেড় মাইল যাইতে হইবে বলিয়া উহা দেখিতে গেলাম না। কুলীগণ গ্রামের ভিতর কিছু আহারীয় সংগ্রহ করিতে গেল। আমরা পুনরায় গন্তব্যপথে রওনা হইলাম।

আমরা ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া একটি গ্রাম পাইলাম। গ্রামের পার্শ্বে রাস্তার উপরে একটি বড় ছোটেন

সৌগাং ও গিয়াংসির মধ্যবর্ত্তী স্থানের ছোটেনের দৃশ্য

দেখিতে পাইলাম। কুলীগণ এখানেও আহার্য্য খুঁজিতে গেল। আমরা এই অবসরে ছায়া পাইবার আশায় বৃক্ষের নিম্নে বসিলাম। কিন্তু বৃক্ষটি ছোট হওয়ায় ছায়া বড় সুবিধামত পাইলাম না; সুতরাং ছাতা খুলিয়া বসিলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর কুলীগণ খাইয়া ফিরিয়া আসিল। তৎপরে আমরা সে স্থান হইতে রওনা হইলাম। এখান হইতে উপত্যকার পরিসর কিছু বৃদ্ধি পাইতে দেখিলাম। শ্যামল চাষক্ষেত্রও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে লাগিল। আমরা উপত্যকা-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। চাষীরা সকলে চাষের ক্ষেত্রে জল লইবার জন্য ব্যস্ত। নদীর উপর হইতে কোদালীর দ্বারা নালা কাটিয়া উহা দিয়া জল আনিয়া ক্ষেত্রে দিতেছে। এই সব কোদালী বক্র আকার না হইয়া লম্বাভাবে তৈয়ারী। আমাদের দেশে কয়লার শাবলের ন্যায়, কিন্তু বাঁট উহা অপেক্ষা আরও অধিক লম্বা। তবে সাধারণতঃ মাটী কাটিবার কোদালী আমাদের দেশের মতই।

আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একটি বড় বাড়ী দেখিতে পাইলাম। বাড়ীতে একতলা দালান, চারিদিকে প্রাচীর, কয়েকটি বৃক্ষও দেখা গেল। বাড়ীটি দেখিলে উহার মালিক অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয়। আমরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। দরজায় যাইয়া শুনিলাম,

গিয়াংসির রেসিডেন্সী

মালিক বাড়ীতে নাই; কাজেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। পুনরায় রাস্তায় ফিরিয়া আসিয়া রাস্তার অপর পারে জলশক্তির দ্বারা চালিত একটি জাঁতা দেখিতে পাইলাম। উহা কি কৌশলে চলিতেছে, তাহা দেখিবার জন্য আমরা তথায় গমন করিলাম। নদী হইতে নালা কাটিয়া জল আনিয়া জাঁতার সম্মুখে উচ্চ হইতে নিম্নে খাড়াই ভাবে জল পড়িতেছে এবং তথায় জাঁতার নীচে জাহাজের পাখার ন্যায় কাঠের চাকায় ঐ জল পড়িয়া চাকা আবর্ত্তিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জাঁতাও ঘুরিতেছে। কৌশলটি অতি সামান্য, কিন্তু তদ্দারা কার্য্য বেশ হইতেছে। আমরা উহা দেখিয়া পুনরায় রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে
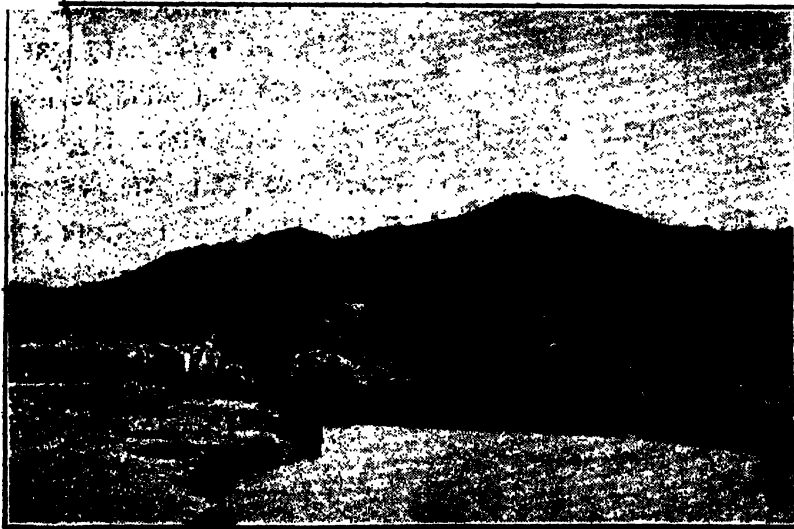
নদীর উপর পাথরের সেতু

লাগিলাম। খানিকক্ষণ অগ্রসর হইয়া নদীর অপর পারে 'রেসিডেন্সী' আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। দূর হইতে গিয়াংসি সহরটি বেশ মনোরম দেখা যায়। জোঙ্গের বাড়ীটিই সকল পাহাড় হইতে উচ্চে অবস্থিত। আর কিছু দূর যাইয়া একটি পাথরের সাজানো সেতুর দ্বারা নদী পার হইলাম। এখানে সেতুর একটি নূতন কৌশল দেখিলাম। তিব্বতের অন্যান্য স্থানে কেবল পাথর সাজানো সেতু, এই স্থানে এই সেতুও পাথরে সাজানো; কিন্তু জলের বেগ হইতে পাথর রক্ষা করিবার জন্য তারের জাল দিয়া পাথরগুলি বেষ্টিত। আমরা নদীর অপর পারে যাইয়া একটি ছোট বস্তীর ধার দিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া বেলা ২ ঘটিকার সময় গিয়াংসির সরাইখানায় উপস্থিত হইলাম।

বেলা ৪ ঘটিকার সময় বৃটিশ ট্রেড এজেন্ট মিঃ হপ-কিন্‌সন মহোদয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি Rifle Rangeএ যাওয়ায় তাঁহার সহিত তখন আমাদের দেখা হইল না। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী এক জন ভুটানো ভদ্রলোক রায় সাহেব উপাধিধারীর সহিত রাস্তায় দেখা হইল। তিনি বলিলেন যে, ৫৷৹৶টার সময় সাহেবের সহিত দেখা হইবে। সুতরাং আমরা বাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। পুনরায় বেলা ২টার পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমা-দিগকে খুব আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং চা খাইতে দিলেন। আমরা চা-পান করিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টা তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম। লোকটি খুব ভদ্র এবং মিষ্টভাষী। আমরা পরদিন সকালে বাজার দেখিতে যাইব এবং ২টার সময় উক্ত সাহেবের সহিত অথবা তাঁহার কর্ম্মচারী ভুটানী কেরাণীর সহিত তথাকার বড় গুম্ফা দেখিতে যাইব স্থির হইল। আমরা তথায় ৮ই এবং ৯ই অবস্থান করিব বলিয়া স্থির করিলাম। তদনুযায়ী ১০ই তারিখে রওনা হইব বলিয়া প্রত্যেক বাংলোর পাশের জন্য প্রার্থনা করা হইল। উক্ত রায় সাহেব প্রোগ্রাম দেখিয়া বলিলেন যে, ১০ই তারিখে রওনা হইলে সামাদা বাংলোয় ১৩ই তারিখে অন্য দুই জন সাহেব যাত্রিকের সহিত এক বাংলোয় থাকিতে হইবে। সামাদা বাংলোয় ৪ জন থাকিবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু পাকের ঘর একটি। আমাদের রান্নার অসুবিধা হইবে বিধায় আমরা ৮ই এবং ৯ই দুই রোজ গিয়াংসি না থাকিয়া কেবল ৮ই তারিখে তথায় অবস্থান করিয়া ৯ই তারিখে তথা হইতে রওনা হইব, এই বন্দোবস্ত করিয়া তদনুযায়ী বাংলোর পাশের জন্য প্রার্থনা করিলাম।

৮ই জুন। আজ বহু দিন পর্য্যটনের পর এক দিন বিশ্রামের সময় পাইয়াছি, কাযেই আজ প্রাতঃকালে কিছু বেশী সময় ঘুমাইয়া কাটাইব, কিন্তু অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের ঘুম খুব ভোরে ভাঙ্গিয়া গেল। কাযেই আর বিছানায় পড়িয়া থাকিতে ভাল বোধ হইল না। বিছানা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া সকালে বাংলোর চারিদিকে কতক্ষণ পায়চারী করিলাম। তৎপর ফিরিয়া আসিয়া কিছু কাল বসিয়া কাটাইলাম। আমি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং দরোয়ান বেলা ৮৷৹ ঘটিকার সময় বাজার দেখিতে গেলাম। জিনিষপত্র আনার জন্য সঙ্গে কুলী লইলাম। বাংলো হইতে বাহির হইয়া চাষা মাঠের মধ্য দিয়া উত্তর-দিকে যাইতে লাগিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইলে গিয়াংসির জোং যে পাহাড়ে থাকে, ঐ পাহাড় পূর্ব্বদিকে রাখিয়া একটি ছোটেনের পাশ দিয়া বরাবর উত্তরাভিমুখে চলিলাম। ছোটেন পার হইয়া সামান্য কিছু অগ্রসর হইলে সহরের ঘর-বাড়ী আরম্ভ হইল। আর কিছু অগ্রসর হইলে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাজার তখনও ভাল করিয়া বসে নাই। কাযেই আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

তপস্বিনী

১

কেশব শা'কে বাড়ী কেনবার নেশায় পেয়েছিল। মদ বিক্রী তার বাপ-পিতামহর ব্যবসা, এবং এই ব্যবসায় তারা কয়পুরুষ ধ'রে অচঞ্চলা দেবীটিকে তাদের ভাণ্ডারে ভাল করেই বেঁধে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। কেশবের পিতা যে দিন মারা যান, সে দিন গভর্ণমেণ্ট কাগজে, ব্যাঙ্কের হিসাবে, এবং নগদে যে টাকাটা রেখে যান, তার মূল্য ত কম নয়ই, তার উপরে চল্‌তি দোকানে ছোট বড় বোতল-ভরা প্রাণোন্মাদিনী, উজ্জ্বলবর্ণা যে তরল সুধার সঞ্চয় রেখে গিয়েছিলেন, তাও অবহেলার যোগ্য নহে।

এ সকল সঞ্চয়ের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কেশবের কিন্তু ইদানীং কেমন যেন একটা ধোঁকা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার কারণ কতকটা ভুবন-শার ছেলে। বাপের মৃত্যুর পর এই ছেলে-টিও নগদে এবং চল্‌তি কারবারে কম টাকা পায়নি, কিন্তু বছর দশেকের মধ্যেই সমস্ত নিঃশেষ ক'রে সে কেমন ক'রে রিক্ত-হস্তে পথের কাঙ্গাল হয়েছে, কেশব ত তার চোখের সামনে দেখলে। তারই কথা মনে ক'রে তার বুকের ভেতরটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠত। নিজের সম্বন্ধে তার সন্দেহের বিশেষ কারণ ছিল না; কিন্তু তার উত্তরপুরুষরা? তাদের মধ্যে যদি ভুলক্রমে এক জন ভুবন-শার ছেলের মত ছেলে জন্মগ্রহণ করে ত কোথায় থাক্‌বে তার এই গভর্ণ-মেণ্টের কাগজ, এই ঐশ্বর্য্য, এই চল্‌তি কারবার?

সেই জন্মে সে ভেবে ভেবে মতলব এঁটেছিল যে, কলকাতা সহরে সে বাড়ী কিনে তার প্রচুর অর্থকে তবুও খানিকটা স্থায়িত্বদান ক'রে যাবে। গভর্ণমেণ্টের কাগজের মত এরা সর্ব্বনাশের হাওয়ার ফুৎকারে উড়ে যাবে না, এদের জড় যা হোক মাটীর তলা পর্য্যন্ত পৌঁছবে ত। অথচ লাভ হিসাবে এরা কারুর চেয়ে কম নয়।

পর পর চারটা বাড়ী কিনেও তার আগ্রহ কমল না। পঞ্চম বাড়ীর যে সন্ধান পেলে, সে তার নিজের বসত-বাড়ী থেকে বেশী দূরও নয়, অথচ সস্তাও! তার কারণ, বাড়ীর তিন ভাইএর মধ্যে উপার্জ্জনশীল যে মেজ-ভাই ছিলেন, তাঁর সহসা মৃত্যু হওয়ায়, ওঁদের সংসার ঘূর্ণী-পাকে পড়া নৌকার মত বেহাল হয়েছে, এবং ঠিক করেছেন যে, তাঁদের পৈতৃক প্রকাণ্ড বাড়ীটা বেচে দিয়ে হাতে যে অর্থাগম হবে, তাতে উপস্থিত টালটা কোনও রকম ক'রে সামলে নেবেন, তার পরের কথা ত ভবিষ্যতের গর্ভে—সে কোনও রকম ক'রে চ'লে যাবেই।

গরজ যেখানে এক দিকে এবং এই রকম প্রবল, সেখানে দামের অঙ্ক যে ক'মে আস্‌বেই, তাতে আশ্চর্য্য কিছু নেই। কেশব ছিল চালাক লোক, সে এমনি ক'রে দর কসতে লাগল—যাতে তার সুবিধে হয় পুরো অথচ ছিঁড়েও না যায়। এমন ক'রে শেষ পর্য্যন্ত যে অঙ্ক দাঁড়াল, সেটা কেশবের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধাজনক বলেই বোধ হ'ল এবং অপর পক্ষকেও নিরুপায় হয়ে প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজী হতে হ'ল।

স্ত্রী সুধাময়ীকে সে কোনও কথাই বলে নি; কেন না, ইচ্ছে ছিল যে, ওটা একেবারে চূড়ান্ত ক'রে হঠাৎ তাকে তাক্ লাগিয়ে দেবে। এই বাড়ীখানা সে তার স্ত্রীর নামেই কিনবে ঠিক করলে এই জন্যে যে, সে কথা শুনলে তার স্ত্রী ভয়ানক বিস্মিত ও খুসী হয়ে যাবে, এবং সাংসারিক হিসাবমত ছু' একটা সম্পত্তি ত তার নামেও থাকা উচিত।

বাড়ীর বিক্রেতা বড় ভাই নীরদ বাবু মার্চ্চেণ্ট অফিসে চাকরী করেন, গোটা ষাটেক টাকা মাইনে। ছোট ভাই যতীন এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কবল থেকে মুক্তি-লাভ করে নাই। মেজ ভাই সরকারী চাকুরী করতেন, শ'-চারেক টাকা মাইনে এবং তিনিই ছিলেন এই পরিবারের স্তম্ভ-স্বরূপ।

ভাল ক'রে উপার্জ্জনক্ষম না হ'লে বিবাহ করবেন না ব'লে মেজ ভাইয়ের একটু বিলম্বেই বিবাহ হয়েছিল—মোটে বছর তিনেক। কিন্তু স্ত্রী পেয়েছিলেন মনের মতন। রমা যেমন রূপে সুন্দরী, তেমনই শিক্ষায় ও গুণেও অপরূপ। এই ৩ বৎসর দম্পতির কেটেছিল স্বপ্নের মত—লঘু-পক্ষ মেঘের মত এই সময়টা কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যে উড়ে গেল, তা অনুভব করবার সময় এল রমার তখন, যখন তিন দিনের জ্বরে তার স্বামী তাকে অতল পাথারে ভাসাইয়া এক দিন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে পরপারে যাত্রা করলেন।

যেখানে ঝলমল করেছিল প্রদীপ্ত সূর্য্যের আলো, সেখানে নেমে এলো আগাগোড়া কালো মসীবর্ণ অন্ধকার। তার এই সাজানো ঘর, দেওয়ালে ঐ প্রকাণ্ড মুকুর, যাতে তাদের যুগ্ম চিত্র দিবসে বহুবার ফুটে উঠত, ঐ তার স্বামীর স্নেহ-করুণ ছবি, এই শয্যাতল, এরা কেবলই রমাকে মনে করিয়ে দিতে লাগল তার জীবনের সেই অমূল্য তিন বৎসর, যার স্বপ্নময় একটি মুহূর্ত্তও সে মাথা খুঁড়ে ম'রে গেলেও আর পাবে না। তার স্বামীর বহু স্মৃতিমণ্ডিত এই ঘর হ'ল কাঙ্গালিনীর একমাত্র সম্বল, শয্যায় সে এখনও স্বামীর দেহের উত্তপ্ততা অনুভব করত, আচম্বকা মনে হ'ত, মুকুরে এই একাকিনী কাঙ্গালিনীর পাশে যেন তার রাজ-রাজেশ্বরের আবছায়া মূর্ত্তি, সে মাটীতে লুটিয়ে লুটিয়ে ডাকত তাঁকে—যিনি ৩ বৎসরের প্রতি পলে পলে তাঁর প্রেমের মন্দিরে রাজরাণী ক'রে হঠাৎ এক দিন চ'লে গেলেন।

সংসারের সকল আলো তার কাছে একবারে নিভে গিয়েছে, শুধু সেই আলোর স্মৃতির রেশ জেগে আছে এই ঘরের প্রতি ধূলিকণায়—প্রতি সামগ্রীতে, তাই অভাগিনী সকল হারিয়ে তাদেরই দুই হাতে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চায়, এবং এই তার স্বামীর স্মরণ-মণ্ডিত ঘরের মেঝেয় প'ড়ে প'ড়ে সে তার সুখের দিনের কথা মনে ক'রে অপার দুঃখের বোঝা ঠেলে ঠেলে কোনও রকমে দিনাতিপাত করে।

২

মেজো ভাইএর মৃত্যুর মাস দুই তিনের মধ্যেই সংসার অচল হবার মত হ'ল, মাত্র ষাট টাকায় কোনও প্রকারেই কুলান যায় না। তখন দুই ভাইএ স্থির হ'ল যে, এই বাড়ীখানা বিক্রয় ক'রে তারা একটা ছোট বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকবে, এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে কোনও রকম ক'রে আপাততঃ চালিয়ে যাবে—যত দিন না আবার সুদিন ফেরে।

কেশব এমনই সুবিধায় বাড়ীখানা পেলে যে, সে আর বিলম্ব করতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু কিছু সময়ও ত দিতে হবে। বিক্রেতাদের একটা বাড়ী স্থির ক'রে সমস্ত গুছিয়ে, তাদের পিতা-পিতামহের আবাস এই গৃহের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ শেষ ক'রে যেতে ত সময় লাগবে। কিন্তু তত দিন চুপ ক'রে ব'সে থাকলে হয় ত বা জিনিষটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কা কেশবকে পীড়া দিতে লাগল। একটা লেখা-পড়া না হ'লে ত কিছুই বলা যায় না, সুতরাং অবশেষে দুই পক্ষে এই স্থির হ'ল যে, বাড়ীর বিক্রয় চূড়ান্ত হয়ে গিয়ে বিক্রয়-পত্র লেখা ও রেজেষ্টারী হয়ে যাবে, এবং কেশব বাড়ীর মূল্যও সমস্ত চুকিয়ে দিয়ে, শুধু দখল ছাড়বার জন্ম এক মাস সময় দেবে, এবং এক মাসের পর সে এসে দখল নেবে। কেশবের উকীল-বন্ধুরা বলেছিলেন যে, এই বন্দোবস্তে কায পাকা হবে! কায পাকা ক'রে রাখতেই কেশব চায়, এক আধ মাস সময়ে তার কি এমন এসে যাবে?

সে দিন লেখা-পড়া চূড়ান্ত ক'রে টাকা চুকিয়ে দিয়ে, কেশব সন্ধ্যার পর খুসী-মনে বাড়ী এল। হিসেব ক'রে দেখলে যে, ও-দের দুঃস্থতার সুযোগে সে অন্ততঃ হাজার পাঁচেক সুবিধা করতে পেরেছে।

সুধাময়ীকে দেখতে না পেয়ে মনটা ব্যস্ত হ'ল। এক ত এতবড় একটা সংবাদ, তার ওপর সুধাময়ীর নামে কেনা—অবিলম্বে না বলতে পেরে মন ছটফট ক'রে উঠল।

সে চীৎকার ক'রে ডাকলে—সুধা, ও সুধা!

দুই হাতে ময়দা এবং অন্য বহুপ্রকার খাদ্যবস্তু মাখান, সুধা এসে উপস্থিত হয়ে বল্লে, কি, এত জরুরী ডাক যে?

কেশব বল্লে, এ কি, এ সব কি? তুমি এ সব করছিলে কেন?

সুধা বল্লে, তোমার জন্তে একটা নতুন রকমের খাবার তৈরী করছি।

কেশব বল্লে, কেন, বামুন ঠাকুর? তুমি ও সব করতে যাও কেন?

সুধা ভ্রূভঙ্গী ক'রে বল্লে, তোমার জন্তে করছি, তাতে জিজ্ঞাসা করছ, কেন? তোমরা কি জানবে, স্ত্রীর পক্ষে স্বামী কি?

কেশব মনে মনে আরাম বোধ করলে। কিন্তু বলতে ছাড়লে না, জবাব দিলে, আর তোমরা কি জানবে, স্বামীর পক্ষে স্ত্রী কতখানি?

চোখের মধ্যে মৃদু হাসির তরঙ্গ দেখা দিল। সুধাময়ী দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে নিতে বল্লে, জানি বৈ কি কিছু কিছু! তোমার বন্ধু ভবেশের দৃষ্টান্তই নাও না, এই ত তিন দিন

হ'ল তার আবার বিয়ে হ'ল, অথচ চার মাস আগে তার যে স্ত্রী বেচারা ছিল, সে-ও ত তার এমনিই অনেকখানি ছিল।

এই রকম প্রত্যক্ষ প্রমাণে কেশব খানিকটা দ'মে গেল—কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয়। পকেট থেকে বিক্রয়-দলীলখানা বার ক'রে বল্লে, স্ত্রী স্বামীর পক্ষে যে কতখানি, তার সাক্ষী এইটে।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে কাগজখানার দিকে চেয়ে সুধা জিজ্ঞাসা করলে, ওটা কি?

কেশব হাসলে। বল্লে, বাড়ী কিনলাম একটা, তোমার নামে সুধা। তুমিই হ'লে ও-বাড়ীর মালিক।

সুধার কথাটা ভালই লাগল,—মুখে বল্লে, কেন, আমার নামে কেন? তোমার নামে কিনলেই হ'ত,—আমি কি তোমা ছাড়া?

কেশবের বুকের ভেতরটা আরামে ভ'রে গেল, বল্লে, তুমি আমি এক বলেই ত তোমার নামে কেনা। তা নইলে হ'রে ন'রে পরাণের নামে কিনলেও ত চলত। এক বলেই ত তোমার নামই আমার নাম, আমার নাম তোমার নাম। নাও, রাখ দলীলটা।

সুধা হাসলে, বল্লে, সেই জন্যই ত তোমাকে ভাল ক'রে না খাওয়ালে আমার তৃপ্তি হয় না। বোসো, ওগুলো শেষ ক'রে হাত ধুয়ে আসছি।

৩

বাড়ীর সবাই জান্‌ত, তার স্বামীর স্মৃতি-মণ্ডিত ওই ঘরখানি রমার পক্ষে কতখানি, অভাগিনীর দিন-যাপনের ওই আপাততঃ একমাত্র অবলম্বন। নীরদ বাবু ভাইকে ভালবাসতেন অগাধ, এবং এমন স্বামীকে হারিয়ে তাঁর নিরাশ্রয় ভ্রাতৃবধূর এই যে মনোভাব, তাকে তিনি শ্রদ্ধাও করতেন যথেষ্ট। সংসার চালানর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন না হ'লে তিনি বাড়ী বিক্রয় করতে পারতেন না কিছুতেই, করতে যে হয়েছে, সে একান্ত বাধ্য হয়েই। এই সংবাদ যে অভাগিনী ভ্রাতৃবধূকে কতখানি ব্যথা দেবে, তা তিনি জানতেন, তাই এ সংবাদ তার কাছ থেকে আজ পর্য্যন্ত গোপনই রাখতে হয়েছে।

কিন্তু আর ও গোপন রাখা চলল না। এক মাস পূরতে আর মাত্র দু'দিন বাকী, এই দু'দিনের পর যখন ক্রেতা এসে দখল চাইবে, তখন কি বলবেন তিনি? বলবেন কি যে অভাগিনী ভ্রাতৃবধূর মুখ চেয়ে তিনি তাকে ঐ পর্য্যন্ত এ খবর দিতে পারেন নি?—এ সংবাদে তার সমস্ত অন্তর ব্রক্ষিত ক'রে যে বেদনা শতধারায় বয়ে যাবে, তাকে তিনি সহ্য করতে পারবেন না ব'লে কি নগদ টাকা গুণে দিয়ে যে ক্রেতা পাকা দলীল ক'রে নিয়েছে সে মানবে? সে কি অভাগিনীর অন্তরের কথা বুঝবে? হয় ত সে হেসে উড়িয়ে দেবে, হয় ত তামাসা করবে! এবং এ কথা নিশ্চয়ই যে, সে জোর ক'রে দখল নেবার কোন পন্থাই বাকী রাখবে না।

নীরদ বাবু তাঁর স্ত্রী মন্দাকিনীকে বল্লেন, মেজ বৌমাকে না বল্লে ত নয়, তুমি একবার গিয়ে বল গে, দু'দিন পরে আমাদের বাড়ী ছাড়তে হবে।

মন্দাকিনী গোড়ায় রাজী হচ্ছিলেন না, কিন্তু রাজী না হ'লেও ত চলে না,—উপায় কি? সুতরাং যেতে হলো।

এই তিন মাস ধ'রে চুল বাঁধা হয় নি—এলায়িত কেশের কালো নিবিড় সৌন্দর্য্য রমার গৌরবর্ণ দেহকে ঘিরে রয়েছে। যে যায়গাটিতে তার স্বামী শয়ন ক'রে তার সঙ্গে অস্ফুটে শেষ কথা কইতে চেয়েছিলেন, সেই প্রিয় স্মৃতিপবিত্র স্থানটিতে বৃন্তচ্যুত ফুলেরই মত সে লুটিয়ে প'ড়ে রয়েছে,—হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন দ্বিতীয়ার ক্ষীণকলেবর কৃশ চন্দ্রকলা।

মন্দাকিনী এসে ব'সে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন—তাঁর নিজের চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা বইতে লাগল। বয়সে তাঁর চেয়ে ঢের ছোট যে মেয়েটি অকালে তার সমস্ত থেকে বঞ্চিত হ'ল, তার জন্যে তাঁর নিজের প্রাণের হাহাকারও তাঁকে কম ব্যাকুল করত না।

মুখে হাত বুলিয়ে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন, এমনি ক'রেই কি প্রাণটা দিবি, বোন্?

রমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, কিছুই বলতে পারলে না।

একে কেমন ক'রে তিনি বলবেন যে, রমা, তোমার অভিশপ্ত জীবনের শেষ অবলম্বনটুকুও হারানর সংবাদ আমি তোমাকে শোনাতে এসেছি! অথচ না শোনালেও নয়,

এবং এ সংবাদ শোনাবার দ্বিতীয় ব্যক্তিও ত আর কেউ নেই।

অবশেষে মন দৃঢ় ক'রে বল্লেন, মেজবৌ, আমাদের এ বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে।

রমা চুপ করেই প'ড়ে রইল।

আবার খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, তরশু দিন আমাদের এ বাড়ী ছেড়ে একটা ছোট ভাড়াটে বাড়ীতে যেতে হবে, এত বড় বাড়ী ত আমরা রাখতে পারব না, বোন্।

কোন কথাই বল্লে না রমা।

যিনি বাড়ী কিনেছেন, তিনি ঐ দিন দখল নেবেন বলেছেন, তিনি ভারী শক্ত লোক, ঐ দিনই আমাদের সকলকে যেতে হবে।

রমা মুখ তুল্লে, আমাকেও যেতে হবে, দিদি?

হাঁ বোন্।

রমা খাটের পা শক্ত ক'রে ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো, বল্লে, আমি যাব না দিদি, এ ঘর প্রাণ থাকতে আমি ছাড়তে পারব না, আমাকে মেরে ফেলে তোমরা যেও।

মন্দাকিনী কাঠের মত ব'সে রৈলেন, তাঁর সমস্ত বুক ভ'রে একটা চাপা কান্না হাহাকার ক'রে ফিরতে লাগল।

৪

দু'দিন পরে গোমস্তাকে সঙ্গে ক'রে কেশব দখল নিতে এলো। এসে সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল—বাড়ী ছাড়বার কোনও লক্ষণই দেখতে পেলে না। জিনিষ-পত্র যেখানকার যেমন ঠিক তেমনই আছে, গৃহস্বামীদের বাড়ী বদলাবার কোনও চেষ্টামাত্র দেখা যায় না।

কেশব চ'টে গিয়ে হাঁক-ডাক সুরু করলে। শুনে নীরদ বাবু বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে কেশব বল্লে, কৈ মশাই, আজ ত আপনাদের বাড়ী ছেড়ে আমাদের দখল দেবার কথা ছিল, তার ত কোনও লক্ষণ দেখতে পাইনে। সন্ধ্যা তাগাতাগি ছাড়বেন কি?

নীরদ বাবু হাত যোড় ক'রে বল্লেন, আজ্ঞে না, আজ পারব না।

কেন?

নীরদ বাবু নরম হয়ে বল্লেন, বাড়ী একটা এখনও ঠিক ক'রে উঠতে পারিনি।

কেশব ব্যঙ্গের হাসি হেসে বল্লে, হাসালেন আপনি! এই কলকাতা সহরে পুরো এক মাস সময়ে একটা ভাড়া-বাড়ী ঠিক হয় না? একটু চেষ্টা করলে যে একটা নূতন ইমারতই তৈরী হয়ে যেত প্রায় এই সময়ে!

নীরদ অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, একবারেই যে ঠিক হয়নি, তা নয়, কথাবার্ত্তা চলছে, আরও দিন পনর সময় পেলে—

কেশব প্রবল ঘাড় নেড়ে বল্লে, না, তা হয় না, অত দিন সময় আমি কিছুতেই দিতে পারব না। আপনাদের মতলব কি, তা ঠিক বুঝতে পারছিনে,—আমি বড় জোর সাত দিনের সময় দিতে পারি—ঠিক সাত দিন, বুঝতে পারছেন? তার এক ঘণ্টা বেশী নয়—বুঝেছেন?

নীরদ ঘাড় নাড়লেন।

কেশব চটেই বলতে লাগল, ও সাধুর মত ঘাড় নাড়ায় আমি ভুলবো না। এবার কথার যেন নড়চড় হয় না—ঠাট্টা নাকি? বাড়ী বিক্রী ক'রে পুরো দাম নিয়ে তার পর ওঠবার নাম নেই। ব'লে রাখছি, সাত দিন পরে আর আমি রেয়াৎ করবো না।—বলতে বলতে সে মস্ মস্ ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেল।

নীরদ বাবু চোখের জল মুছতে মুছতে বাইরের ভাঙ্গা তক্তপোষটায় গিয়ে চুপচাপ পাথরের মত ব'সে রইলেন।

এই সাত দিনের মধ্যে আর একবার চেষ্টা হয়েছিল রমাকে রাজী করাবার, কিন্তু সে তার স্বামীর স্মৃতিমণ্ডিত এ ঘর কিছুতেই ছাড়তে সম্মত হয়নি। মন্দাকিনী তাকে বলেন, মেজবৌ, এ বাড়ী ইতিপূর্ব্বেই না ছাড়ার জন্যে তোমার বড়ঠাকুরকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু এই সাত দিনের দিন না ছাড়তে পারলে যে আরও কত অপমান আর লাঞ্ছনা হবে তাঁর আর আমাদের, তা আমরা ভেবেও পাচ্ছিনে। দয়া করো, মেজবৌ।

রমা মন্দাকিনীর পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লে, কি যে বল, দিদি! তোমরাই দয়া ক'রে আর ৭।৮ দিনের সময় নিয়ো দিদি, তার পর আর তোমাদের কোনও বাধা থাকবে না। আমি প্রাণ থাকতে এ ঘর ছাড়তে পারবো না, তোমরা যদি এর ওপর আর কিছু সময় নেও ত তত দিনে বোধ

হয়, ঐ বাধাটার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার একটা উপায় করতে পারবই। এই কথাই বুঝিয়ো বলো এই বাড়ীর মালিককে।

সেই দিন থেকে সে আহার ত্যাগ করলে।

সাত দিনের দিন গোমস্তা যখন এসে উপস্থিত হ'ল, তখন রমা তিন দিন অনাহারে। মন্দাকিনী কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছেন; নীরদ বাবুর মুখের চেহারা জল-গর্ভ মেঘের মত গম্ভীর, স্থির।

গোমস্তা নীরদ বাবুকে বল্লে, আজ ত আপনাদের বাড়ী ছাড়বার কথা, বাবু আমাকে দেখতে পাঠিয়েছেন।

নীরদ বাবু বল্লেন, আজও আমরা ছাড়তে পারিনি, কবে পারব, তাও ত জানি না।

গোমস্তা বিস্মিত হ'ল, বল্লে, কেন, সত্যিই কি আপনারা বাড়ী পাচ্ছেন না কলকাতা সহরে?

নীরদ বল্লে, এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সে কথা সত্যি নয়।

গোমস্তা পরমাশ্চর্য্য বোধ করলে, বল্লে, তবে এমনধারা কেন করছেন, বাবু?

নীরদ বাবু কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে সকল কথাই বল্লেন; বলতে বলতে তাঁর গলা কেঁপে উঠতে লাগলো, অশ্রুর প্রবাহ বাধা মানতে চায় না। বল্লেন, সর্ব্বহারা আমার বৌমার এই যে আশ্চর্য্য পতি-প্রেম, এ কেমন ক'রে বুঝবে সাধারণে? এই কড়ায় গণ্ডায় আদায়-করা পৃথিবীতে কে এর কদর করবে, কে এর পবিত্রতা অনুভব করতে পারবে? এই জন্যেই আমরা যেতে পারছিনে—আর অন্য কোন কারণ নেই।

গোমস্তার বোধ করি হৃদয় ছিল, তারও চোখ ভারী হয়ে এল। সে খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লে, বাবুকে তা হ'লে কি বলব?

নীরদ বাবু বল্লেন, বলো সব কথাই। এ কথাও বলো যে, তিনি যদি আর কিছুতেই রাজী না হন, ত বোধ করি আর ৮।১০ দিন সবুর করলে আমরা বাড়ী ছেড়েই দিতে পারব, কেন না, মা আমার আজ তিন দিন অন্ন-জল ত্যাগ করেছেন, শরীরের যে অবস্থা, তাতে বড় জোর আর ৫।৭ দিন চলবে, তার পর অবাধে তোমার বাবু এসে দখল নিতে পারবেন।

গোমস্তা চুপ ক'রে খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে নমস্কার ক'রে চ'লে গেল।

গোমস্তার মুখে সকল কথা শুনে কেশব হাত-পা ছুড়ে চীৎকার ক'রে গালাগাল দিয়ে উঠল, পাজী হারামজাদা! আমি গোড়া থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, ঠকাবার মতলব; কিন্তু কেশব শাকে ঠকায়, এমন লোক এখনও জন্মাতে দেরী আছে। যদি তার বৌমার এত বড় ধনুর্ভঙ্গ পণ ত' বাড়ী বেচতে গেলে কেন? না, ও বাড়ী আমার চাই-ই, দরকার হয় ত আদালত ক'রে পেয়াদা এনে ওদের তাড়াবই তাড়াব। জানে না, আইনমত ও বাড়ী বিক্রয় হয়ে গেছে—জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুক না উকীল-মোক্তারদের!

গোমস্তা বল্লে, হুজুর, উনি বল্লেন যে; আরও ৮।১০ দিন সবুর করলে বাড়ীর দখল অনায়াসেই পাবেন, কেন না, মেজ-বৌমা এই কথা শুনে আজ তিন দিন অনাহারে আছেন—আর ৫।৭ দিন পরে আর বাধা থাকবে না।

গরম তেলে জলের মত ছিটকে উঠে কেশব বল্লে, ঢের ঢের দেখেছি চালাকী, ঢের ঢের দেখেছি সতী-পনা, এমন ত কখনও শুনিনি! সতী সাবিত্তিরীকে ছাপিয়ে যাবে! স্বামীর ঘর ছাড়বে না! ছাড়তেই হবে। এ সমস্ত কারসাজী ও নীরদ ঘুঘুর—কিন্তু তার ফাঁদও আছে! আমি চল্লাম, দেখি কেমন ক'রে ওরা রাখতে পারে ও বাড়ী! এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছে? আমি এগোচ্ছি—তুমি দলীলটা গিন্নীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসো, দরকার হয় ত আজই উকীলবাড়ী যাব—দেরী ক'র না।—ব'লে কেশব সশব্দে বেরিয়ে চ'লে গেল।

এই গোলযোগে সুধাময়ী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। কেশব চ'লে গেলে সেইখান থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে গোমস্তা বাবু, কে অনাহারে আছে বল্লে?

গোমস্তা উপরদিকে চেয়ে অভিবাদন ক'রে বল্লে, মুস্কিল হয়েছে মা, সেই নতুন কেনা বাড়ীটা নিয়ে দখল পাওয়া যাচ্ছে না।

কেন?

তখন গোমস্তা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা খুলে বল্লে।

বল্লে, না, এমন ত ক'খনও শুনিনি, অথচ মিথ্যে কথা বলছে বলেও ত বোধ হয় না।

সুধাময়ী বল্লে, না, মিথ্যে কথা কেন হবে? তোমরা শোননি, কিন্তু আমরা জানি, এমন হয়। কত দিন বৌটির স্বামী মারা গেছে বল্লে?

তিন চার মাস মা।

সুধাময়ী চোখের জল মুছে বল্লে, আহা! এই ক'মাস সে সেখান থেকে ওঠেনি?

না মা, এই রকম ত শুনলাম।

ক'দিন খায়নি বল্লে?

আজ তিন দিন।

সুধাময়ী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রৈল; তার পর বোধ করি, সেই মহিমময়ীর উদ্দেশে দুই হাত যোড় ক'রে প্রণাম কল্লে।

গোমস্তা বল্লে, মা, সেই বিক্রয়-দলীলটা বাবু চেয়েছেন।

সুধাময়ী বল্লে, হাঁ, সে আমিই নিয়ে যাচ্ছি। ড্রাইভারকে বল, গাড়ী ঠিক করতে, তুমিও আমার সঙ্গে চল। আর তার আগে চট ক'রে নিয়ে এসো দিকিনি কিছু ভাল ফল-মূল আর সন্দেশ। দেরী করো না, আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

গোমস্তা বিস্মিত হয়ে বল্লে, মা, আপনি?

সুধাময়ী জোর ক'রে বল্লে, হাঁ, আমিই যাব, দেরী করো না।

সুধাময়ীদের গাড়ী গিয়ে যখন দাঁড়াল, তখন ভেতরে চলছে কেশবের উন্মত্ত গালিগালাজ এবং রমাকে উদ্দেশ ক'রে অভদ্রোচিত ভাষা।

সুধাময়ী বাড়ীতে ঢুকে কেশবের সামনেই গোমস্তাকে উদ্দেশ ক'রে বল্লে, গোমস্তা বাবু, ওঁকে ব'লে দেও যে, আমি যখন এসেছি, তখন ও ভাষা আর চলবে না, হয় উনি চুপ করুন, না হয় চ'লে যান।

বজ্রপাত হলেও লোকে এত চমকায় না। কেশবের পৌরুষ হঠাৎ নুণ-পড়া জোঁকের মত মুসড়ে গেল, সে তবুও চেঁচিয়ে বল্লে, সুধা, তুমি?

সুধা বল্লে, হাঁ আমি—আশ্চর্য্য কিছুই নয়, এত বড় [illegible] পারলাম না। বাজে লোক এসে চেঁচামেচি ক'রে সাধ্বীর তপস্যা ভাঙ্গছে, সে জন্যেও আমার আসা দরকার হ'ল।

কেশব হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল, নীরদ বাবুর সমস্ত দেহ ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হতে লাগল, মনে হ'ল, চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠেন!

সুধা বাড়ীর ভেতর ঢুকে গিয়ে যাঁকে দেখলে, অনুমানে বুঝলে, তিনি নীরদ বাবুর স্ত্রী। বল্লে, দিদি, মনে হচ্ছে, আপনি ওঁর বড় জা। ঠিক নয়?

মন্দাকিনী বল্লেন, হাঁ বোন্, রমার আমি বড় জা।

আমি আপনাদের বাড়ীর মালিক, আমিই কিনেছি এ বাড়ী। কোথায় আপনাদের মেজবৌ, তাঁকে যে একবার দেখ্‌ব, দিদি।

মন্দা বিস্মিত হয়ে খানিকটা তাকিয়ে থেকে বল্লেন,—আপনি—তুমি,—এস বোন্ আমার সঙ্গে।

ঘরের ভেতর ঢুকে সুধা আপনার আঁচল থেকে ফল-মূল ও সন্দেশ মেঝেয় রেখে দিয়ে চুপ-চাপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—সেই অনশন-কৃশা, বিদ্যুৎ-শ্রী, তপশ্চারিণীর আশ্চর্য্য মূর্ত্তি। তার পর চোখের জল মুছে, সেইখানে ব'সে রমার মুখ আপনার কোলের উপর তুলে নিয়ে বল্লে, এ কি তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করেছো, বোন্?

রমা তার মুখের দিকে চোখ তুলে চেয়ে রইল।

সুধা বল্লে, আমাকে চিনবে কি ক'রে, কখনও ত দেখা হয়নি। কিন্তু আমি তোমার দিদি হবার সৌভাগ্য দাবী করেই এসেছি, বোন্। তিন দিন খাওনি শুনলাম।

রমা চুপ ক'রে রইল।

সুধা বল্লে, মানুষের রাগেই মানুষ ধ্বংস হয় শুনেছি, সতীর তপশ্চর্য্যায় যে আমরা জ্ব'লে পুড়ে যাব, বোন্। আমার স্বামীকে আর আমাকে সেই নিশ্চয় ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাও, তোমার তপ সংহার কর। দয়া কর বোন্, যারা অবোধ, না বুঝে অপমান করেছে তোমাকে, তাদের হয়ে আমি ক্ষমা চাইতে এলাম। শুনেছি, সতীর একটা দেহ নিয়ে তৈরী হ'ল বাহান্ন পীঠ সে ত কত দিনের কথা। আজ সতীর সমগ্র দেহ নিয়ে যে এই আশ্চর্য্য পীঠ তৈরী হ'ল বোন্, আমি এই কামনা ক'রে এসেছি যে, তাকে এইখানেই সমগ্রভাবে প্রতি

করব। আমার মনের এই কামনাকে পরাঙ্মুখ ক'রো না, বোন্।

কাপড়ের ভেতর থেকে সেই দলীলখানা বার ক'রে রমার পায়ের কাছে রেখে বল্লে, তোমারই একটি দরিদ্র ভগ্নীর এই তুচ্ছ উপহার, ফিরিয়ে দিও না, বোন্। আজ থেকে তোমার স্বামী আরাধনার এই যে তীর্থ, এ থেকে তোমাকে কেউ নড়াতে পারবে না, এ তোমার,—এ সম্পূর্ণ তোমার। তোমার আশ্চর্য্য তপ চলতে থাকুক বোন্,—তার পুণ্য ধারায় মাঝে মাঝে স্নান ক'রে আমরাও উদ্ধার হয়ে যাব।

ভাল বুঝতে পারনি বুঝি? এ বাড়ী যে আমি কিনেছিলাম, তাই নিয়ে কত লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে তোমাদের, অপরাধ নিও না, বোন্। তোমাকে বার ক'রে দিয়ে এ বাড়ী ভোগ করতে পারে, এত বড় সাধ্য কার আছে, বোন্? —সে যে তোমার তপের প্রভাবে জ্ব'লে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তাই তোমার জিনিষ তোমার রইল। আমার দাদা উকীল, তাঁকে দিয়ে এর সম্বন্ধে আর কোন খুঁত রাখতে দেবো না। কিন্তু তাতে দু'একদিন দেরী হতে পারে—আপাততঃ তোমার সম্বন্ধে সে দেরী সইবে না, তোমার এই ইচ্ছা-মৃত্যুকে নিবারণ যে আমাকেই করতে হবে বোন্, আমাদের উদ্ধারের জন্যে।

তার পর মন্দার দিকে ফিরে বল্লে, দিদি, ওঁকে না খাইয়ে আমি ত যেতে পারব না। একটু বাটি নিয়ে এস, এই ফলগুলো কাটি।

দুই চোখে জল পড়ছে। রমা উঠে বস্‌ল, বল্লে, দিদি, তুমি কি মানুষ?

তার চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে কপালে সস্নেহ চুম্বন ক'রে সুধা বল্লে, মানুষ বৈ কি, তোমার চেয়ে ঢের ছোট মানুষ, তবু তোমার দিদি হবার সৌভাগ্য কামনা ক'রে এসেছিলাম, সে কামনাও তুমি পূরিয়েছো বোন্, ধন্য করেছ আমাকে।

এইবার তোমার মারাত্মক ব্রত ভঙ্গ কর, বোন্। আমিই তোমাকে খাইয়ে দি, এ সৌভাগ্যের লোভও যে সম্বরণ করতে পারছি না।

রমাকে খাইয়ে দিয়ে, তার মুখ ধুইয়ে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে সুধা তার কপালে আর একবার চুমু খেয়ে বল্লে, আজ থেকে তা হ'লে আমরা হ'লাম চিরদিনের বোন্, কি বল ভাই?

রমা সুধার বুকে মুখ লুকিয়ে বল্লে, দিদি, সত্যিকার বোন্, সত্যিকার দিদি তুমি,—কোনও দিনই ভুলো না ছোট বোন্‌টিকে!

সুধা তার মুখে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে, এত রূপ, এত গুণ, এত বড় তপশ্চারিণী, এমনি সতী-কুল-শিরোমণি, তোমাকে যে দেবতারাও ভুলতে পারবে না বোন্, আমি ত কোন ছার!

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বন্দী সাজাহান

জরা-জর্জ্জর দেহে মণি-হার যেন শৃঙ্খল হায়,
শিরে করাঘাত হানি' সম্রাট কাঁদিছে শিশুর প্রায়।

নমিছে খোদার উদ্দেশে—"কহ, হে প্রভু চির-মহান্,
পুত্র-হস্তে বন্দী আমি কি সম্রাট সাজাহান?"
প্রাচীর-প্রাকার-বেষ্টিত কারা—ব্যাহত হ'ল কি বাণী?
পাষাণের বুকে লুটায়ে পড়িল কম্পিত দেহখানি।
মূর্চ্ছার মাঝে দেখে সম্রাট পরিচিত এক সাজ,
শিয়রে বসিয়া সম্ভাষে যেন প্রিয়তমা মমতাজ;—

"হে প্রাণ-অধীশ, ভারতের পতি, হোয়ো না আত্মহারা;
আগুন হইতে ঝরিয়াছে কবে শীতল উৎস-ধারা?
ছুটে এসো প্রিয়, ছুটে এসো চ'লে, রয়েছ কিসের আশে?
স্মৃতির আলোকে ফুটিব দোঁহে জগতের ইতিহাসে!"
আলিঙ্গনের লাগি' উৎসুক, বাড়ালো ব্যগ্র হাত,—
কোথা মমতাজ?—হায় রে বৃথাই ব্যাকুল অশ্রুপাত!

শ্রীপ্রমথনাথ কুমার।

আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি

সমাজ-গঠন

চকচক করলেই সোনা হয় না। অনেক জিনিষ আছে, যাহাতে প্রথমটা চেকনাই দেখা যায়, কিন্তু আসলে সেটা মেকি। বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া জিনিষের দাম কষিতে গেলে অনেক সময় ঠকিতে হয়। সোনার দাম দিয়া বেঙ্গা পেতল কিনিতে হয়। এই কথাটি অনেক সময়ে ধ্রুব সত্য বলিয়া জানা যায়।

অনেক দিন পূর্ব্বে কৌন্সুলী-প্রবর নর্টন সাহেব, পরলোক-গত কৌন্সুলী জেকব ও আমি একটি আসামীর জামিনের জন্ম কোন এক জজ সাহেবের বাড়ী যাই। জজ সাহেবের বাড়ী চৌরঙ্গীতে। যে জজ সাহেবের বাড়ী গিয়াছিলাম, তিনি এক জন দেশীয় লোক।

যখন আমরা তাঁহার বাটীতে গিয়া পৌঁছাই, জজ সাহেব তখন বাটীতে ছিলেন না। জজ সাহেবের লোকরা আমাদের বসিবার জন্ম তাঁহার ঘর খুলিয়া দিল। আমরা তিন জনেই অপেক্ষা করিতেছি, কিয়ৎক্ষণ পরে জেকব সাহেব জজ সাহেবের একখানি Certificate দেখিতে পাইলেন। তাহা হইতে জানিতে পারিলেন, তিনি ও জজ সাহেব এক বৎসরেই বিলাতে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে জজ সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। অন্ত অন্ত কথার সঙ্গে আমাদের দরখাস্ত পেশ করা হইল এবং তাহা মঞ্জুরও হইল। কথাপ্রসঙ্গে জেকব সাহেব বলিলেন, দেখুন জজ সাহেব, আপনি ও আমি আমরা উভয়েই এক বৎসরে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে আপনি আজ কলিকাতার মহামান্ত হাইকোর্টের জজ। আমি পেশায় লিপ্ত আছি। হয় ত এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা আমাকেও সৌভাগ্যবান্ মনে করেন, কিন্তু আপনি যে সৌভাগ্যবান্, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

জজ সাহেব তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন—Mr. Jacob, all that glitters is not gold. ইহা অতি সত্য কথা।

প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকা দেখিয়া থাকিবেন, প্রত্যহ সায়াহ্নে বড় বড় মোটরে ও বড় বড় জুড়ি-গাড়ীতে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক, যাঁহাদিগকে সাধারণে বড় ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ গাড়ীতে বায়ু-সেবন করিতে-ছেন। যাঁহারা ছোট গাড়ীতে যাইতেছেন কিম্বা ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতেছেন, কিম্বা অন্তান্ত যানে যাইতেছেন, তাঁহারা Rolls Royceএর যাত্রীদিগকে দেখিয়া মনে করেন, ইঁহারা কত ভাগ্যবান্। কেমন বেপরোয়াভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ শরীরকে হেলাইয়া দিয়া কিরূপ্ ভাবে "পৃথিবীর কোন বস্তুর জন্তই পরোয়া করি না" এইরূপ মুখভঙ্গী প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ বড়,বড় গাড়ীতে শুইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহারা কি প্রত্যেকেই সুখী? প্রত্যেকেই কি মনের শান্তিতে আছেন? হয় ত অনেকেই বিশেষ মনের কষ্টে আছেন। অনেকেই তাঁহাদের অনেক নিম্নস্তর লোকের সহিত আত্মবিনিময় করিতে রাজি। যদি কখন বিজ্ঞানের বলে এমন কোন যন্ত্রের আবিষ্কার হয়—যাহার দ্বারা মনোভাবের ফটো লওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে দেখা যাইতে পারে, Rolls Royceএ অবস্থিত অনেক লোকের মানসিক চিত্র এইরূপ যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সামান্ত লোকের সহিত আত্মবিনিময় করিতে প্রস্তুত। তাঁহারা বাহিরে যাহাই দেখান না কেন, ভিতরে অতিশয় ক্ষুদ্র, অতিশয় সামান্ত, অতিশয় মনঃ-কষ্টে আছেন। কাযেই বলা যাইতে পারে—বাহিরে চকমক করিলেই সোনা হয় না। আমরা অনেক সময়েই বাহ্য চকমকানি দেখিয়াই ভড়কাইয়া যাই। মনে করি, "ইহা" পাইলেই আমরা বিশেষ সুখী হইব। হয় ত প্রকৃতপক্ষে আমরা সেই দ্রব্যটি আমাদের করতলগত হইলেও আমরা সুখী হইতে পারিব না।

দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে অনেক দ্রব্যের উৎকর্ষতা ও অপকৃষ্টতা নির্ভর করে।

দেশ—এসিয়ার পক্ষে যাহা মঙ্গলময়, য়ুরোপের পক্ষে হয় ত তাহা অতি সামান্ত ও নগণ্য। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে যাহা ভাল, লণ্ডনের পক্ষে তাহা ভাল না হইতেও পারে। লণ্ডনের পক্ষে যাহা মঙ্গলময়, কলিকাতার পক্ষে তাহা হয় ত অমঙ্গলময়। আমেরিকা ও য়ুরোপের স্থানে স্থানে যাহা শুভ, কলিকাতা, বাঙ্গালা ও বিহার উড়িষ্যার পক্ষে তাহা বিশেষ অশুভ। ধর, বিলাতের আবহাওয়া। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া এই দেশ-বাসীদের অনেক গরম কাপড়ের প্রয়োজন। গরম কাপড়ের স্বল্পতা হইলে জীবনান্ত হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময়েই সেখানে কম-বেশী জল পড়ে "drizzling—কাযেই বর্ষাতি সে দেশের চিরসঙ্গী। কত লোক রজনীর শীতাধিক্যে রাত্রি-যাপনের স্থান না পাইয়া সেতুর তলায় ও ফাঁকা যায়গায় রাত কাটাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; অথচ আমাদের এ দেশে ডাক্তারদের মতে শরীরকে বেশী কাপড়ে আবৃত করা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। কাযেই বিলাতের পক্ষে যাহা ভাল,

কলিকাতার পক্ষে তাহা ভাল নহে। কলিকাতার পক্ষে ভাল হইলেও বাঙ্গালার কতক কতক স্থানের পক্ষে তাহা ভাল নহে।

খাদ্যদ্রব্য।—যে সকল খাদ্য বিলাত ও আমেরিকায় উপকারী, সে সকল খাদ্য বাঙ্গালা ও বিহারের পক্ষে ভাল না হইতে পারে। পরিধেয় সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। খেলাধূলাও তদ্রূপ। শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রূপ। য়ুরোপের পক্ষে যাহা ভাল, তাহা ভারতের পক্ষেও ভাল, ইহা বলা যাইতে পারে না।

কাল।—সব সময়েই এক ব্যবস্থা হইতে পারে না। কালের পার্থক্যে বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজন। "কাল" বলিতে গেলে কালোপযোগী শিক্ষার কথাও আসিয়া পড়ে। যাহা এককালে উপযোগী, তাহা আর এককালে অনুপযোগী।

পাত্র সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এক অবস্থায় যাহা উপযোগী, অন্য অবস্থায় তাহা বিশেষ অনুপযোগী। বিলাতের ও আমেরিকার পুরুষ ও স্ত্রীলোক অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার হিসাবে বিশেষ শিক্ষিত। সকলেই তাহাদের নিজ নিজ কতদূর অধিকার, তাহা বেশ বোঝে এবং স্বাধীন দেশবাসী বলিয়া তাহাদের নিজস্ব অধিকার কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশে যাহা য়ুরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের পক্ষে ভাল, তাহা ভারতবাসীদের পক্ষে সকল সময় মঙ্গলময় নহে। ইহা যেন বেশ মনে থাকে যে, আমাদের দেশ অতি গরীব দেশ। এখানকার আর্থিক অবস্থা অতিশয় মন্দ। সকলের দুই বেলা আঁচাইবার সুবিধা হয় না।

বিলাতে ও আমেরিকায় অনেক ধনকুবের আছেন। তাঁহাদের দ্বারা সাধারণের সুবিধার জন্য অনেক অর্থব্যয়ে শিক্ষাগার, হাঁসপাতাল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ স্থানের বন্দোবস্ত আছে। আমাদের দেশে অনেক সময়ে সে সব সুবিধা নাই। কাযে কাযেই যেরূপভাবে চলিলে বিলাতের ও আমেরিকার লোকের পক্ষে মঙ্গলকর হয়, ভারতের লোকের পক্ষে তাহা হয় না।

ভারতের লোকের প্রত্যেকের আয় এত অল্প, বিলাতের ও আমেরিকার লোকের আয়ের সহিত তুলনা করিতে গেলে তাহা অতি সামান্য, অতি অকিঞ্চিৎকর। ভারতের লোকের শিক্ষায় জন্য যত টাকা ব্যয়িত হয়, বিলাতের লোকের শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক।

বিলাতের ও আমেরিকার মধ্যে অনেক ধনকুবের আছে, আমাদের মধ্যে একটি ধনকুবের পাইতে গেলে অনেক সময় বিশেষ করিয়া খুঁজিতে হয়। কাযেই অর্থকৃচ্ছ্রতা হেতু আমাদের সমাজবন্ধন তাহাদের সমাজবন্ধনের সহিত সমান হইতে পারে না এবং হওয়া উচিতও নহে। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যে সব আদর্শ দেখিতে পাই, তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। যে সব য়ুরোপবাসী ও আমেরিকাবাসী কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতে আসেন, তাঁহারা স্বদেশ ছাড়িয়া, বিদেশে আসিয়া খুব ভালভাবে ও ধনীর মত থাকিতে চেষ্টা করেন। আমাদের মধ্যেও যাঁহারা দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহারা দেশে যে ভাবে থাকেন, বিদেশে আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে তফাতে থাকিয়া অন্যভাবে দিনযাপন করেন। তাঁহাদেরই আত্মীয় ও পরিজন-বর্গ যখন বিদেশে গিয়া তাঁহাদিগকে দেখেন, তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া যান—তাঁহাদের চালচলন ও ধাঁজধরণ দেখিয়া। তাঁহারা যে ভাবে বিদেশে থাকেন, দেশে থাকিবার সময় যেরূপভাবে থাকেন, তাহার মাপকাঠি হইতে অনেক তফাত। কাযেই বিদেশে থাকার অবস্থার মাপকাঠি দিয়া দেশে থাকার অবস্থার মাপ করা উচিত নহে।

সমাজ গঠন করিতে গেলে মাপকাঠীটি ঠিক করিয়া লইতে হইবে। এক জন, দুই জন বা দশ জন উচ্চপদস্থ এবং ধনকুবেরের পক্ষে যাহা শোভনীয়, যাহাদিগকে খাটিয়া খাইতে হয় এবং অনেক পরিবারের ভরণপোষণ করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না। ধনকুবেরের স্ত্রী ও কন্যা গল্ফ খেলিয়া, টেনিস্ ও ব্যাডমিণ্টনে মন দিয়া সময় কাটাইলে কোনই অসুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু এক জন গৃহস্থ পরিবারের গৃহিণী, কন্যা বা ভগিনী এইরূপ ক্রীড়া-কৌতুকে সময় কাটাইলে বিশেষ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

তূলা জলে পড়িলে ভারী হয়, চিনি জলে পড়িলে গলিয়া যায়। যে দ্রব্য এক সময়ে পথ্য, সময়বিশেষে তাহা বিষ। অতএব কোন্ সমাজের পক্ষে কোন্‌টি উপকারী, তাহা দেশকাল-পাত্র বিচার করিয়া ঠিক করিতে হইবে। শীতপ্রধান দেশে মানুষ অনেকক্ষণ কোন কার্য্য করিয়া শীঘ্র হাঁপাইয়া পড়ে না। কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের সেই স্থানের জল-হাওয়া সাহায্য করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষ ছয় ঘণ্টা খাটিয়া যেরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, শীতপ্রধান দেশে বারো ঘণ্টা খাটিয়াও তাহা হয় না। কলিকাতার "পিটপিটে" গ্রীষ্মে মানুষ এক ঘণ্টা বেড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, অথচ দার্জ্জিলিংয়ের রাস্তায় মানুষ তিন ঘণ্টা বেড়াইয়াও সেরূপ ক্লান্ত হয় না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, স্থানমাহাত্ম্য বলিয়া একটা জিনিষ আছে। একই লোক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মঠ হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদের মধ্যে যে সব লোক সমাজ পুনর্গঠনের জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা হয় বিদেশী অথবা বিদেশী মনোভাবাপন্ন। তাঁহাদের দেশকালপাত্রে অভিজ্ঞতা একবারে নাই বলিলেই চলে। হয়ত

নিঁখুত, সাহেব, নয় সাহেবী মনোভাবাপন্ন লোক আমাদের সমাজ পুনর্গঠনের জন্য মাথা ঘামাইতেছেন। পিতা, মাতা, ভগিনী ও আত্মীয়াদের নিকট হইতে তফাৎ হইয়া অল্পবয়সেই কলিকাতায় মেসে আসিয়া জীবনসংগ্রাম সুরু করিয়াছেন। পিতা, মাতা, ভগিনী, প্রৌঢ়া, যুবতী আত্মীয়াগণের নিকট হইতে অনেক দূরে আসিয়া সময় কাটাইয়াছেন। তৎপরে আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের অর্থ-সাহায্যে বিলাত গিয়া "মানুষ" হইয়া আসিয়াছেন। আমাদের সমাজগঠনের পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অতি অল্প। ছুটীর সময় দেশে গিয়াছেন বটে, কিন্তু তখনও এই মেস-বাড়ীর ও তাহার পারিপার্শ্বিক মনোবৃত্তি লইয়া দেশে গিয়াছেন এবং সেই মনোবৃত্তি লইয়া সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যখন আমাদের সমাজ পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন, তখনই আমাদের চীৎকার করিয়া বলিতে হয়, "ভগবান্, আমাদের বন্ধুহস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।"

এক শ্রেণীর লোক লইয়া সমাজ চলিতে পারে না। প্রত্যেক সমাজের উচ্চস্তরের লোক থাকিবে (১) উচ্চ শ্রেণী (upper class)

তাহার নিম্নস্তরেই এক শ্রেণীর লোক থাকিবে (২) বিত্তশালী মধ্যশ্রেণী (upper middle class)

তাহার পর মধ্যম শ্রেণীর লোক থাকিবে (৩) Middle class গৃহস্থ শ্রেণী।

তাহার নিম্নস্তরে যাহাদিগকে প্রত্যহ খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন ও সংসার পালন করিতে হয় অর্থাৎ যাহারা দিন আনে দিন খায়, সেই শ্রেণীর লোক কৃষিজীবী, মজুর, অতি গরীব, ভদ্রলোক ইত্যাদি গরীব শ্রেণী (৪)।

এই হিসাবে আমরা ধরিয়া লইব, আমরা চারি শ্রেণীর লোক আছি।

পাঠক-পাঠিকা ধরিয়া লইতে পারেন, এই চতুঃশ্রেণীর জন্য এক নিয়ম চলিতে পারে না। ধর্ম্মবন্ধন এক হইতে পারে, সমাজ-বন্ধন এক হইতে পারে, কিন্তু একরূপ সমাজ-গঠনের অধীনে এই চারি শ্রেণীর লোক বর্দ্ধিত হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের অধিকাংশ লোকেরই অর্থকৃচ্ছ্রতা আছে। প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কতকগুলি লোক ছাড়িয়া দিলে অপর সকলেরই কমবেশী অর্থকষ্ট। প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কতকগুলি স্ত্রীলোক টেনিস্ খেলিয়া, ফুটবলে যোগ দিয়া, বিলিয়ার্ড টেবলে সময় দিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য ব্যায়াম করিয়া শরীর-সেবা করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা হারমোনিয়ম বাজাইয়া, থিয়েটার করিয়া, ষ্টেজে নাচিয়া এই পৃথিবীটা উপভোগ করিতে পারেন, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালার লোক ধরিয়া বিচার করিলে এরূপ সৌভাগ্যবতী রমণী দশ সহস্রেও এক জন মিলে না। আর সমাজ-সংস্কারকদের যাহা কিছু চেষ্টা, যাহা কিছু আগ্রহ ও উত্তেজনা, সমস্তই এই শ্রেণীর ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকের জন্য। কিন্তু যাহা ইঁহাদের পক্ষে খাটিতে পারে, অপর অপর শ্রেণীর স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা কি খাটে? মনে থাকে যেন, দেশের চৌদ্দ আনা লোক দুই বেলা খাইতে পায় না। তাহাদের পক্ষে ব্যায়ামশালায় যাইয়া ব্যায়াম করা কিম্বা ষ্টেজে নামিয়া নৃত্য করা কখনই চলিতে পারে না। যাঁহাদের এইরূপ সৌভাগ্য উপভোগ করিবার অবস্থা ভগবান্ দিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ করুন। তবে ভগবানের নামে বলিতেছি, তাঁহারা সকলকে এই দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন না। এখনও সমাজ চলিতেছে, সকলকে এই দলে টানিলে সমাজ একবারে অচল হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের সমাজ ও ফিরিঙ্গী সমাজে কিছু বিভিন্নতা থাকিবে না। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী এক লেখাতে "যাবে কোন্ পথে?" দেখাইয়াছি যে, অন্দরমহল প্রথা আমাদের নিজস্ব সমাজগঠন। এখানে আমাদের স্ত্রীলোকরা অশেষ প্রতাপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। সংসারপরিচালন বিষয়ে তাঁহারা পুরুষের একবারে অধীন নন। সেখানে পুরুষরা কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন না। তাঁহারা স্বাধীনভাবে সংসার চালান, আর সেই ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল বলিয়াই আমাদের দেশে যে সব মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্ম ও শিক্ষা সম্ভবপর হইয়াছিল।

আমি এই প্রবন্ধে সাধারণতঃ সমাজ-সংস্কারকরা স্ত্রীলোকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সব কথা বলেন, তাহারই আলোচনা করিব। তাঁহারা বলেন, ব্যায়াম না করিলে স্ত্রীলোকরা স্বাস্থ্যবতী হইতে পারে না, সেই ব্যায়াম হিসাবে হয় হকি, না হয় টেনিস্, না হয় ব্যাডমিণ্টন, না হয় বিলিয়ার্ড খেলিতে হইবে, না হয় প্যারালেল বার, হোরাইজেণ্টাল বার, ডন, কুস্তী, বৈঠক করিয়া শারীরিক গঠন ঠিক রাখিতে হইবে। শরীরটি সুঠাম ও নধর রাখিতে হইলে এইরূপ না করিলে চলিবে না। অর্থাৎ এক শ্রেণীর ফিরিঙ্গী যেরূপভাবে শরীরচালনা করে, আমাদের মাতা, ভগিনী ও কন্যাকেও ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে।

মনে যেন থাকে, অধিকাংশ লোকেরই আর্থিক অবস্থা এইরূপ —যাহাতে দাসদাসী, পাচক, ব্রাহ্মণী জিনিষপত্র বাহিয়া দিবার ও বাহির করিবার জন্য স্বজাতি গরীব-কন্যা রাখিবার অবস্থা নাই। সখী, সাথী রাখিবার ত অবস্থা একবারেই নাই। তাঁহাদের সংসারে স্ত্রী পুরুষ দুই জনে পরিশ্রম না করিলে চলিবে না, অর্থাৎ

পুরুষরা উপায় করিবে, স্ত্রীলোকরা অন্দরমহলে থাকিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সাহায্য করিবেন। মনে যেন থাকে, আমাদের স্ত্রীলোকরা এখনও টেলিফোন গার্ল (Telephone Girl), টাইপিষ্ট (Typist), Sales girl হইতে শিখেন নাই। তাঁহারা স্বামীকে সাংসারিক কার্য্য করিয়া সাহায্য করিতে পারেন। Telephone girl, Sales girl বা Typist girl হইয়া নহে। এই সব কারণে আমাদের মা, ভগিনী, কন্যা, পুত্রবধূরা অন্দরমহলেই থাকুন। অন্দরমহলের হাল ধরিয়া তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে আমাদের সংসার-ভেলা চালাইয়া দিন।

কলিকাতাই আমাদের সব নহে, সমস্ত বাঙ্গালা পল্লীর কথা ভাবিতে হইবে। কলিকাতার ক্ষুদ্র বাটীতে খাঁচায় পোরা মা-ভগিনীদের কথা ভাবিলে চলিবে না, সমস্ত বাঙ্গালা দেশে বিস্তৃত দেশগুলিতে মা-ভগিনীরা কিরূপভাবে চলেন বা তাঁহাদের কিরূপভাবে চলিতে হইবে, তাহা ভাবিতে হইবে। আমি জানি, মফঃস্বলবাসী স্ত্রীলোকরা কলিকাতায় আসিতে বিশেষ উৎসুক। তাঁহাদের মতে কলিকাতা বলিলেই বুঝায়, বায়স্কোপ, থিয়েটার, সার্কাস, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিস্তম্ভ, যাদুঘর ও কালীঘাট প্রভৃতি। তাঁহারা সর্ব্বসময়েই এই সব সুখপ্রদ স্থানের কথা ভাবিতেছেন। এই সব স্থানেরই স্বপ্ন দেখিতেছেন। কিন্তু বিলাতী ইঁদুরের খাঁচার ন্যায় এককাঠা জমীতে ত্রিতল বাটীর একখানি ঘর লইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কিরূপভাবে থাকিয়া কি কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, সে কথা একবারও ভাবেন না। এই কারণে তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত, কিন্তু এখানে আসিয়া সজনের ডাঁটা, সজনে শাক, হিন্‌চে, কলমী, লাউশাক, পুঁইশাক সবই যে পয়সা দিয়া কিনিতে হইবে, সবই যে বাড়ীর পাশের মাঠে কিম্বা বাড়ীর উঠানে উৎপন্ন হইবে না, এ কথা একবারেই ভাবেন না।

কলিকাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাড়াটীয়া বাড়ীর মধ্যে যে হাওয়া আলো প্রবেশ করে না, তাঁহারা কিম্বা সমাজ-সংস্কারকরা এ কথা ভাবেন না। তাঁহাদের আমি দোষ দিই না, কারণ, তাঁহারা অধিকাংশই অল্পবয়স্কা বালিকা। দোষ দিই তাঁহাদের অভিভাবকদের, তাঁহারা অসুবিধার কথা একবারেই ভাবেন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, হাতেমাটীর মাটী না কিনিলে কলিকাতায় থাকা সম্ভব নহে। বাঙ্গালার পল্লীসমাজ ছাড়িয়া আসিয়া কলিকাতায় কি পাই? পাই থিয়েটার, বায়োস্কোপ, সার্কাস, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিস্তম্ভ, যাদুঘর, কালীঘাট প্রভৃতি। আর পাই না, থাকিবার উপযুক্ত স্থান—হাওয়া, আলো, টাটকা তরিতরকারী, প্রতিবাসী ও আত্মীয়ের সহৃদয়তা ইত্যাদি।

অনেক সময় শুনিতে পাই, কতকগুলি মহাপ্রভু বলেন, স্ত্রীলোকরা স্বাস্থ্যসেবা না করিলে কিরূপভাবে সুস্থশরীরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে? সেই কারণে তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের ব্যায়াম অভ্যাস করা আবশ্যক। কুস্তি হইলে ভাল হয়, হকি, ফুটবল, তলোয়ারের খেলা, তলোয়ার লইয়া নাচা, নাচ, তলোয়ার ব্যবহারে আত্মরক্ষা করা, লাঠি খেলা ইত্যাদি। তাঁহারা বলেন, বদমায়েসের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে গেলে স্ত্রীলোকদিগের এ সব শিক্ষার প্রয়োজন। সময়বিশেষে এ সব শিক্ষার উপকারিতা থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহারা এ কথা একবারেই ভুলিয়া যাইতেছেন যে, সাংসারিক কাযে ব্যস্ত থাকিলে স্বাস্থ্যরক্ষা উত্তমরূপেই চলিতে পারে। সাংসারিক কায করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম হয়, তাহাতে স্বাস্থ্যও বেশ ভাল থাকে। সেই সব সাংসারিক কায করিলে প্রত্যহ ঔষধবিষকে গলাধঃকরণ করিতে হয় না, ডাক্তারদের হুজুর ভিতর আসিতে হয় না অথচ অত্যাবশ্যক সাংসারিক কার্য্যগুলি শরীরের পুষ্টিসাধনই করে।

কলিকাতার বাহিরে সর্ব্বত্রই ব্যায়ামাগারের পরিবর্ত্তে যাহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সেগুলি এই :—

ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া। যাহাদের দেশে কিছু জমীজমা আছে, সেই জমীজমা হইতে ধান্য উৎপন্ন হয় এবং অনেক রকম ডালও উৎপন্ন হয়। গৃহস্থ লোকের চাকর-বাকররা এবং কৃষকরা ক্ষেতে ধান ও বিভিন্ন ডাল বপন করে, পাকিলে কাটিয়া আনে, বাড়ীতে আনা পর্য্যন্ত চাষী ও জনের দ্বারাই চলে। ধান হইতে চাল করিবার জন্য ঢেঁকির ব্যবহার প্রয়োজন। ঢেঁকিতে পাড় দিতে হয়, তাহা গৃহস্থের বউঝির দ্বারাই হইতে পারে।

ডাল প্রস্তুত সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। ডালের খোসা হইতে ডাল বাহির করিতে হইলে শরীরের বলপ্রয়োগের প্রয়োজন, তাহাও নিজ নিজ বাটীর লোক দ্বারাই হইতে পারে। তাহা যে অস্বাস্থ্যকর নহে, যাহারা এই সব কর্ম্ম করে, তাহাদের স্বাস্থ্য দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। শরীরের বাঁধন অতি চমৎকার। এ সব কার্য্যে শরীরের যেরূপ বাঁধন হয়, ব্যায়ামে তাহার একাংশও হয় না।

পল্লীগ্রামে সাঁওতাল প্রভৃতি স্ত্রীলোক, যাহারা গৃহস্থদের এই সব কার্য্যে সাহায্য করে, তাহাদের শরীর দেখিলেই বুঝা যায়। অনেক ব্যায়াম অপেক্ষা এই কার্য্যে শরীরের রক্ত-চলাচল বেশ ভাল হয়, ইহাতে আহার ও ঔষধ দুইই হয় অর্থাৎ অর্থেরও সাশ্রয় হয়, কার্য্যও সুচারুরূপে হয়। পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-পরিজন এই চাল ও ডাল খাইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে এবং মাতা ও ভগিনীর উদ্দেশে ভগবানের কাছে তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে।

বাটনা বাটা। ইহাও নিত্য আবশ্যক কার্য্য, অথচ ইহা শরীরের পক্ষে অন্য ব্যায়াম অপেক্ষা অধিক উপকারী। শরীরে যতগুলি শিরা ও মাংসপেশী আছে, সকলেরই ব্যবহার হয় এবং ব্যবহারের দ্বারা সেইগুলির পুষ্টিসাধন হয়।

ময়দা ঠাসা। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক সংসারে ইহার আবশ্যকতা বুঝা যায়। ময়দা অনেকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া বেশীক্ষণ ধরিয়া ঠাসিতে হয়। আটা গরম জলে চার পাঁচ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাসিলে তাহার প্রস্তুত রুটী অতি নরম, মুখরোচক ও অনায়াসে জীর্ণ হয়। "যেমনি চড়াইব অমনি নামাইব" এই শ্রেণীর উড়ে বামুন দিয়া এ কার্য্য কখনই হইতে পারে না। কাযেই উড়ে বামুনের হাতে তৈরী রুটী হজম করিতে না পারিয়া মানুষ বদ হজমের কষ্ট পায়। এ কার্য্যগুলি শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী অথচ মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করায় বিশেষ সুবিধা হয়।

ডাল বাটা।—আজকালকার ভেজালের দিনে যে বিনা ভেজালের বা অল্প ভেজালের জিনিষ পাওয়া যায়, ডাল তাহাদের মধ্যে একটি। ইহা হইতে অনেক রকম মুখরোচক অথচ স্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্রব্য তৈরী করিতে হইলে অধিক সময় ডালকে ভিজাইয়া রাখিয়া বাটিতে হইবে। সেই ডাল বাটিতেও শরীরের অধিকাংশ মাংসপেশী ও শিরার ব্যবহার হয়, সেই সব ব্যবহার শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

চিঁড়া প্রস্তুত।—ইহাতেও সর্ব্বশরীরের ব্যায়াম হয় এবং আজকালকার ভেজালের দিনে ইহা হইতে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। সর্দ্দি করিলে চিঁড়া-ভাজা মুখরোচক ও উপকারক। পরলোকগত জজ আশুতোষ চৌধুরী ও তাঁহার ভ্রাতাদের সংসারে চিঁড়া ভাজার ব্যবহার যথেষ্ট ছিল ও আছে। চিঁড়ার পিঠা অতি মুখরোচক জিনিষ। দেশী বা বিলাতী বিস্কুট অপেক্ষা চিঁড়া-মুড়ির ব্যবহার বিশেষ উপকারী।

বড়ী।—ইহা অতি মুখরোচক এবং প্রস্তুত করিতে হইলে ডাল বাটা এবং ডালকে বিশেষ করিয়া ফেনানর প্রয়োজন। ইহা করিতে হইলে শারীরিক বিশেষ পরিশ্রমের প্রয়োজন, অথচ এই সব পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভালই থাকে এবং স্বাস্থ্য বিশেষ উন্নত হয়।

এ সব ছাড়া পুষ্করিণী হইতে জল আনা, হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান ইত্যাদির উপকারিতা অনেক। বলিতে পারেন কলিকাতায় কি করিয়া হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান সম্ভব? কে সঙ্গে লইয়া যাইবে? প্রত্যেক পাড়ায় একটি করিয়া যুবকদল গঠন করা যাইতে পারে। যাহাদের মধ্যে দুই জন করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে পাড়ার মা-মাসী প্রতিবাসিনী ইত্যাদিকে গঙ্গায় সঙ্গে লইয়া যাইবে এবং স্নানান্তে গঙ্গা হইতে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবে। প্রত্যহ দুই জন করিয়া যুবক ৩০ হইতে ৪০ জন পাড়ার আত্মীয়া ও প্রতিবাসিনীকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিতে পারিবে। তবে বলিবে, পরিশ্রম। পরিশ্রম বিনা এ জগতে কিছুই হয় না। টপ্পাবাজী করিয়া সংসারের কোন কাযই সমাধা হইতে পারে না, এগুলিও হইতে পারে না।

যে সকল মা ভগিনী এ সকল কার্য্য করেন, তাঁহারা বেশ মনের আনন্দেই তাহা করিয়া থাকেন, শারীরিক স্বচ্ছন্দতা অনুভব করেন, তাঁহাদের জন্য ডাক্তার-কবিরাজের প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ ডাক্তারী ঔষধকে তাঁহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করেন।

আনাজ কোটা, সুপারি কাটা, পোস্ত ধোয়া, খয়ের প্রস্তুত ইত্যাদিতেও যৎসামান্য পরিশ্রম হয়। নিয়মিতভাবে করিতে পারিলে এগুলির প্রত্যেকেই শরীরের পুষ্টিসাধন করে।

আমাদের সমাজনেতাদের চেষ্টা করা উচিত, অল্পপরিমাণে খাঁটি ঘি ও খাঁটি তৈল প্রস্তুত করিবার উপায়-নির্দ্ধারণ। এইরূপ যন্ত্র বাহির হইলে প্রত্যেক গৃহস্থেরই উপকার হইবে।

অধিকাংশ লোকই আজকাল সস্তায় কিস্তি মারিতে চান। একটি ছেলে মানুষ করিতে হইলে ২০ বৎসর অনন্যমনে পরিশ্রম না করিলে মা জানিতে পারেন না—ছেলেটি ভূত হইল কি পুত হইল। অন্ততঃ ২০ বৎসর ধরিয়া ছেলেকে খাওয়াইয়া মানুষ করিতে হইবে ও ২০ বৎসর ধরিয়া শিক্ষা দিয়া তাহার উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্য করিতে হইবে। শরীর ও মনের গঠন মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়ের হাতে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে গেলে অনেক দিনের পরিশ্রমের প্রয়োজন। অথচ একটি ফুলবাড়ী সাজাইয়া ২ ঘণ্টার মধ্যে ফুলবাড়ীর সভার সভাপতির নিকট হইতে ধন্যবাদপ্রাপ্তি স্থিরনিশ্চয়। কাযেই দেখা যায়, করতালি-ভক্ত অনেক স্ত্রীলোক পীড়িত পুত্রকে বাটীতে রাখিয়া ফুলবাড়ী সাজাইতে ব্যস্ত। ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া, তাহারা রেল-লাইনের বাহিরে যাহাতে না যায়, তাহা করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে বাল্যকাল হইতেই তাহাদিগকে ত্যাগের শিক্ষা দিতে হইবে, ভোগের শিক্ষা নহে। ভোগের শিক্ষা পাইয়া এরূপ ভাবে সাংসারিক কার্য্য করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। প্রাতঃকালে বাটীতে হারমোনিয়ম বাজাইয়া সময় না কাটাইয়া বালিকাদিগকে পূজাপাঠের শিক্ষা দেওয়া হইবে, গৃহস্থালী কাযে যাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, তাহার শিক্ষা দিতে হইবে। ধর্ম্মে বিশ্বাস বিনা সুন্দররূপে সংসার পরিচালন করা সম্ভবপর নহে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

যানবাহন-নিয়ন্ত্রণের বিচিত্র ব্যবস্থা

লস্ এঞ্জেলেস্‌এ রাত্রিকালে যানবাহনাদি-নিয়ন্ত্রণে অভিনব ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটি ব্যোমযান হইতে যানবাহন-নিয়ন্ত্রণকারী পুলিস-কর্ম্মচারী দ্রুতগামী মোটর-গাড়ী প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই ব্যোম-যান যাহাতে স্থিতিশীল থাকে, এ জন্য তাহাকে রজ্জুলগ্ন করিয়া রাখা হয়। ৫০ ফুট উপরে ব্যোমযানটি অবস্থিত। উচ্চ স্থান হইতে যানবাহনাদির গতিবেগ প্রভৃতি লক্ষ্য করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ-কার্য্য বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে।
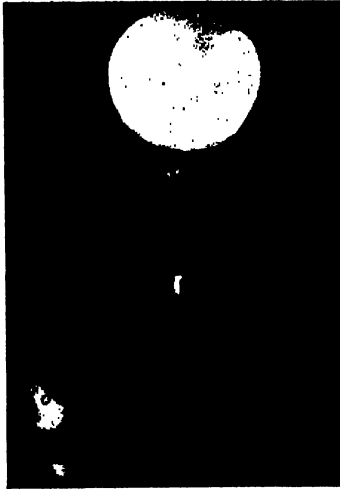
ব্যোমযানের সাহায্যে যানবাহনাদি-নিয়ন্ত্রণ

প্রেসিডেণ্ট ওয়াসিংটনের উপহৃত ঘড়ী

আমেরিকার কোনও শিক্ষিত আদিম অধিবাসীর সংগ্রহাগারে একটি পকেট-ঘড়ী স্থান পাইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, আমেরিকার মুক্তিদূত ওয়াসিংটন, লাফায়েৎকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ যে পকেট-ঘড়ী উপহার দিয়াছিলেন, ইহা সেই ঘড়ী। ফরাসী লাফায়েৎকে ওয়াসিংটন একটি ঘড়ী দিয়াছিলেন, ইহা প্রামাণিক সত্য; কিন্তু সেই উপহৃত ঘড়ীও যে লাফায়েতের গৃহ হইতে অপহৃত হইয়াছিল, তাহাও ঐতিহাসিক সত্য। এখন বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন, বর্ত্তমান ঘড়ীটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেই পকেট-ঘড়ীই বটে। ইহার চারিটি ডালা ও পাঁচটি কাঁটা আছে। একটি কাঁটা দিন-নির্ণায়ক, আর একটি সপ্তাহ-নির্দ্দেশক। উপরের দিকে ওয়াসিংটনের একটি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তিও এই ঘড়ীতে বিদ্যমান। ঘড়ীটি বর্ণরাগ-রঞ্জিত। ইহাতে নির্ম্মাতার অসাধারণ নৈপুণ্যও বিদ্যমান।

ওয়াসিংটনের ঐতিহাসিক ঘড়ী

শিশু-পালনের ব্যবস্থা

আমেরিকার ডেট্রয় অধিবাসী কোনও ভদ্রলোকের শিশু-কন্যার শ্বাসযন্ত্র আক্রান্ত হইয়াছিল। হাঁসপাতালে নবজাত শিশুদিগকে ইন্‌কুবেটার যন্ত্রে যেরূপভাবে প্রতিপালন করা হয়—গৃহনির্ম্মিত তাপ-নিয়ন্ত্রিত কোষ-কক্ষে—ইন্‌কুবেটারের মধ্যে উক্ত শিশুটিকে

গৃহনির্ম্মিত তাপ-নিয়ন্ত্রণ কোষ

রাখিয়া প্রতিপালিত করা হইয়াছিল। এইরূপ প্রণালীতে তিন মাসে শিশুটি অর্দ্ধসের ওজনে বাড়িয়াছিল!

প্রাচীন রণভেরী

ডেনমার্ক হইতে সম্প্রতি দুইটি প্রাচীন রণভেরী আমেরিকায় সংগৃহীত হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দীতে জলদস্যুগণ এই রণভেরীর সাহায্যে বহু দূরবর্তী স্থানের সহচর বা সহকর্ম্মিগণকে যুদ্ধ বা মন্ত্রণায় আহ্বান করিত। এই রণভেরীর আকৃতি সর্পাকৃতি নলের মত। শব্দ নির্গমনের শৃঙ্গটি আধুনিক রেডিও যন্ত্রের "লাউড্ স্পীকারের" মত। সমগ্র যন্ত্রটি ১০ ফুট দীর্ঘ। অষ্টম শতাব্দীতে ইহার ধ্বনি দিগন্তবিস্তৃত হইত এবং ইঙ্গিত-ধ্বনি শুনিবামাত্র দলের লোকজন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইত।

প্রাচীন যুগের রণভেরী

অতিকায় পক্ষীর ডিম্ব

মাদাগাস্কার দ্বীপের বালুকাস্তূপ খনন করিয়া সম্প্রতি একটি ডিম্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন যে, এই ডিম্ব প্রাচীনযুগের 'ঐরাবত পক্ষী' প্রসব করিয়াছিল। সংপ্রতি উহা আমেরিকায় আনীত হইয়াছে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই ডিম্ব বালুকারাশির মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। মাদাগাস্কারের অধিবাসীরা এই পক্ষী কখনও দেখেন নাই, তবে জনশ্রুতি বা কিম্বদন্তী হিসাবে এই পক্ষী পর্ব্বতের ন্যায় বিশালকায় ছিল। ডিম্বটির পরিমাপে প্রকাশ পাইয়াছে, উহার এক দিকের পরিধি ৩০ ইঞ্চি এবং অপর দিকের সাড়ে ২৬ ইঞ্চি। প্রদত্ত চিত্রে দেখা যাইবে, একটি মুরগীর ডিমের তুলনায় অতিকায় পক্ষীর ডিম্ব কত বৃহৎ।

অতিকায় পক্ষীর ডিম্ব

ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণের নূতন প্রণালী

প্রেগ্ অঞ্চলে সম্প্রতি একটি খৃষ্টান ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বহির্ভাগ হইতে দেখিলে কেহই ইহাকে গির্জ্জা বলিয়া অনুমান করিতে পারিবে না। সহসা দর্শনে মনে হইবে, ইহা কোনও মার্কিণ শ্রমশিল্প কার্য্যালয়; আধুনিক যুগের মানুষ নূতন কিছু করিবার মোহে ধর্ম্মমন্দিরের নির্ম্মাণ-পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত করিবার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে। এই নব-নির্ম্মিত ভবনের শীর্ষদেশে ক্রুশচিহ্ন না থাকিলে কেহই ইহাকে উপাসনামন্দির বলিয়া মনে করিতে পারিবে না।
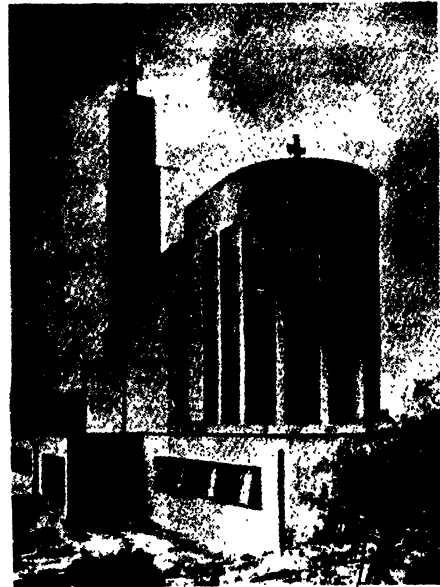
অভিনব প্রণালীর ধর্ম্মমন্দির

সৌধ-সঞ্চালন

সম্প্রতি আমেরিকায় একটি আটতল ভবনকে মাত্র ১৮ জন লোক স্থানান্তরিত করিয়াছে। এই অট্টালিকার মোট ওজন ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ২ শত ৯৩ মণ। প্রায় ৫০ ফুট দূরে এই অট্টালিকাকে

অপসৃত করা হইয়াছে। কোনও টেলিফোন কোম্পানীর কার্য্যালয় এই অট্টালিকায় স্থাপিত। যখন অট্টালিকা সঞ্চালিত হয়, সে
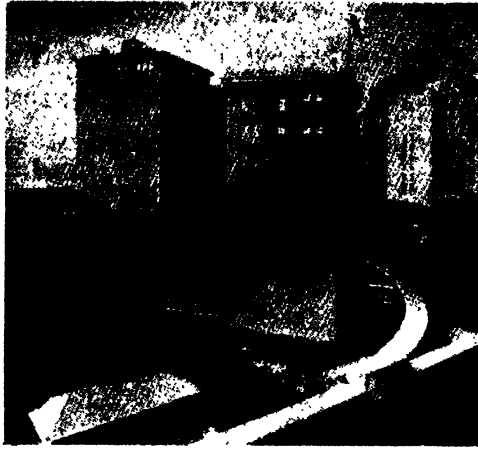
সঞ্চালিত সৌধ

সময় ৬ শত নারী উহার অভ্যন্তরে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। তাহারা বুঝিতেও পারে নাই যে, ৫০ ফুট দূরে সমগ্র অট্টালিকা সরিয়া গিয়াছে।

অভিনব কারা-ব্যবস্থা

কারাগারের দর্শক-কক্ষের বিচিত্র ব্যবস্থা

কারাগারে বন্দীদিগের আত্মীয়-স্বজন দেখা করিতে গিয়া থাকেন। দর্শক-কক্ষে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। অবশ্য উভয় পক্ষের মধ্যে জালের ব্যবধান থাকে। আমেরিকার কালিফের অন্তর্গত প্যাসাডেনার প্রধান কারাগারে দর্শক-কক্ষকে কর্ত্তৃপক্ষ একটু অভিনবভাবে নির্ম্মিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে লৌহ-জালের দ্বারা যে গবাক্ষ আচ্ছাদিত থাকিত, তাহার অপর প্রান্তে বন্দী উপস্থিত হইত। জালের ফাঁকে ফাঁকে তাহার অবয়ব আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টিগোচর হইত। এখন তাহার পরিবর্ত্তে কাচ ব্যবহৃত হইতেছে। পরস্পরের কথোপকথন যাহাতে শ্রুতিগোচর হয়, এজন্য কাচ-বাতায়নের নিম্নে ইস্পাতনির্ম্মিত ছিদ্রবহুল আবরণ আছে। এই ছিদ্রগুলি এমনই ক্ষুদ্র যে, তন্মধ্য দিয়া একটি আলপিন পর্য্যন্ত চালান করা অসম্ভব। অলক্ষ্যে বন্দীর হস্তে কোন প্রকার দ্রব্য যাহাতে অর্পিত হইতে না পারে, সেই জন্যই উক্ত জেলের কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বর্ত্তুলাকার বন্দর-ভবন
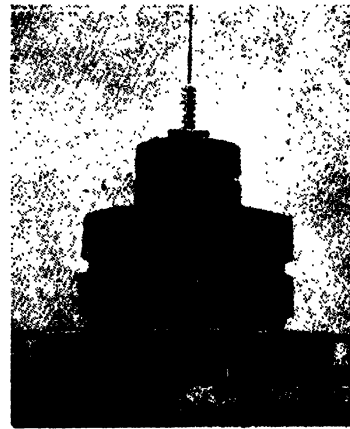
বর্ত্তুলাকার বন্দর-ভবন

নেদারল্যাণ্ডে ইমুইডেন নামক বন্দরে বর্ত্তুলাকার কার্য্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বন্দর-ভবনটি যেমন বিচিত্র-দর্শন, তেমনই সুন্দর। কার্য্যনির্ব্বাহের পক্ষে নাকি এইরূপ কার্য্যালয় প্রকাণ্ড বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

পলাতক আসামীর গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা

গ্যাসপূর্ণ বন্দুকের সাহায্যে পলাতক আসামী ধরা

লস্ এঞ্জেলেসের পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষ পলাতক আসামীর গ্রেপ্তারে নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক প্রকার বন্দুকের সাহায্যে গ্যাসযুক্ত বোমা নিক্ষেপ করা চলে। ইহাতে পলাতক বন্দীকে অচল করা যায়। কোনও অট্টালিকায় আশ্রয় লইলে, এই বন্দুকের সাহায্যে তাহাদিগকে অভিভূত করাও যায়।

ব্যোমযান সাহায্যে জলে বিচরণ

পরীকাহিনী ক্রমে বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। কালিফোর্ণিয়ার জনৈক বৈজ্ঞানিক একটি বেলুন বা ব্যোমযান
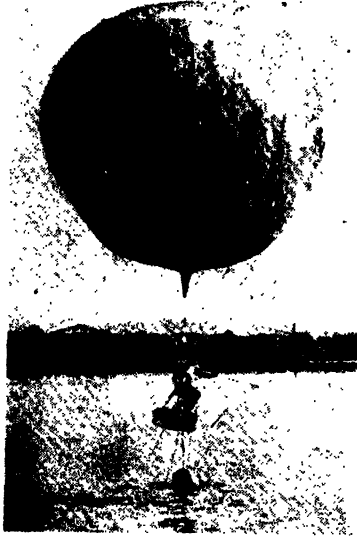
ব্যোমযান সাহায্যে জলে বিচরণ

এমন কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, ব্যোমযানের আরোহী জলের উপর বিচরণ বা ঝম্পপ্রদান করিলে ব্যোমযান স্থির হইয়াই আরোহীর ভার নিয়ন্ত্রণ করিবে।

বিচিত্র ঘটিকাযন্ত্র

কুকুরের আকারবিশিষ্ট ঘটিকা-যন্ত্র

নিউ ইয়র্ক সহরে সম্প্রতি কুকুরের আকারবিশিষ্ট একটি ঘটিকা-যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিচিত্র ঘটিকা-যন্ত্রে—কুকুরের চক্ষুর উপর অক্ষপাতে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বাম চক্ষুর শ্বেতবর্ণ রেখার দ্বারা ঘণ্টা ও দক্ষিণ চক্ষুর রেখাপাতের দ্বারা মিনিট বিজ্ঞাপিত হয়।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

সমুদ্রগর্ভে নামিয়া মানুষ যে সকল অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ এখন তাহা বিমান-পোতচারীকে সেই স্থান হইতে জ্ঞাপন করিতে পারে। বিমানপোতবিহারীও শূন্য-পথের বিচিত্র অবস্থা ও অভিজ্ঞতার কথা সমুদ্রতলচারীকে জানাইতে পারে। অবশ্য সবই রেডিওর সাহায্যে সম্ভবপর

সমুদ্রতলচারীর সহিত বিমানবিহারীর আলাপ

হইয়াছে। সম্প্রতি এ বিষয়ের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এক স্থানে এক ব্যক্তি সমুদ্রগর্ভে নামিয়া গিয়াছিল, তখন বিমানপোত ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিল। সমুদ্রবক্ষে একখানি জাহাজ উভয়ের আলোচনার মধ্যবর্ত্তিতা করিয়াছিল। রেডিও যন্ত্র উভয়ের কাছেই ছিল। চিত্র দেখিলেই ব্যাপারটি পরিস্ফুট হইবে।

বিদায়-বাণী

(উপন্যাস)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নন্দী-পরিবার

কালীঘাট হাজরা রোডের উপর সুরচিত উদ্যানের মধ্যস্থিত ঐ যে সুন্দর ত্রিতল অট্টালিকাখানি দেখা যাইতেছে, উহাই রায় বাহাদুর জে, কে, নন্দী সাহেবের বাস-ভবন। নন্দী সাহেব বিলাত-প্রত্যাগত সাহেব নহেন, এবং জাতিতে তিনি তন্তুবায়; কিন্তু হইলে কি হয়, বৎসরে তিনি লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন এবং গত বৎসর শীতকালে, স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লাট সাহেব তাঁহার উদ্যান-সম্মিলনীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছিলেন। গুজব, এই রাজ-ভক্তির পুরস্কারস্বরূপ আগামী ইংরাজি নববর্ষের দিন তিনি সি, আই, ই, উপাধি লাভ করিবেন।

কমলা কিন্তু চিরদিন নন্দী সাহেব বা জীবনকৃষ্ণ নন্দীর উপর এরূপ কৃপাপরায়ণা ছিলেন না। এক সময় ছিল, যখন জীবনকৃষ্ণ বাবু গোয়াবাগানের গলিতে মাসিক সাঁইত্রিশ টাকা ভাড়ায় এক জীর্ণ গৃহে সপরিবারে বাস করিতেন। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় উপর্য্যুপরি দুইবার ফেল হওয়ায় উহারা কলেজ হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়—তখনকার দিনে ঐরূপ নিয়মই ছিল। কলেজ হইতে বিতাড়িত হওয়ার পর, গ্রামে গিয়া জীবনকৃষ্ণ নিজ অংশের পৈতৃক জমা-জমিগুলি বিক্রয় করিয়া, হাজার পাঁচেক টাকা সংগ্রহ করেন এবং কলিকাতায় আসিয়া গোয়াবাগানে বাসা করিয়া ঐ মূলধনের কিয়দংশে কন্‌ট্রাক্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেন, দুই তিন বৎসরেই তিনি হইলেন বিল্ডার এণ্ড কন্‌ট্র্যাক্টার। কমলা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, জীবনকৃষ্ণের হস্তধৃত ধূলিমুষ্টি স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত হইতে লাগিল। তাঁহার নিজস্ব মোটর গাড়ী হইল, লোয়ার সার্কুলার রোডে বড় বাড়ী ভাড়া লইলেন, এবং তিনি হইলেন আর্কিটেক্ট বিল্ডার এণ্ড কন্‌ট্র্যাক্টার। তার বছর দুই পরেই তাঁহার হাজরা রোডস্থ ঐ প্রাসাদোপম বাস-ভবন নির্ম্মিত হইল, এবং তাঁহার চালচলন হইল সম্পূর্ণ সাহেবী-ধরণের। ব্যবসায়-সূত্রে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মিশিয়া ইংরাজি কওয়া এবং খানাপিনাটা পূর্ব্বেই তাঁহার বেশ দুরস্ত হইয়া গিয়াছিল। এখন তিনি সগৌরবে বালিগঞ্জ-বিহারী বাছা বাছা বিলাতফেরতগণের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু নন্দী সাহেবের সাহেবীয়ানায় একটি মূর্ত্তিমতী বিঘ্ন ছিল—তাঁহার সেকেলে কুসংস্কারগ্রস্ত পত্নীটি। ইঁহাকে 'মানুষ' করিবার জন্য নন্দী সাহেবের যত্নের ত্রুটি ছিল না—মেম শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। 'শুচিবাই'টা অনেকখানি কাটিয়াছিল, এই পর্য্যন্ত। বিলাতফেরত পার্টিতে মহিলা-সমাজে তিনি 'হংসমধ্যে বকো যথা' হইয়াই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিছুকাল এইভাবে স্বামীর প্রতিকূলতাচরণ করিয়া, এক পুত্র এবং এক কন্যা রাখিয়া, তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। নন্দী সাহেব তখন সাতচল্লিশবর্ষ পূর্ণ করিয়া আটচল্লিশে পড়িয়াছেন।

পর-বৎসরই নন্দী সাহেব, শ্রীফশূন্য ব্যারিষ্টার এম, দাস সাহেবের কন্যা দ্বাবিংশবর্ষীয়া বিদুষী কন্যা বিমলা দাসকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। দাস সাহেব সে সময় ঋণভারে অত্যন্ত প্রপীড়িত অবস্থায় দিন কাটাইতেছিলেন। জামাতার একখানিমাত্র চেকের বলে তিনি সম্পূর্ণভাবে ঋণমুক্ত হইলেন। বাল্যকাল হইতে ইংরাজি ও বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া প্রেম ও বিবাহ বিষয়ে বিমলা যে উচ্চ আদর্শ মনে মনে পোষণ করিত, তাহা পিতার মিনতি ও মাতার চক্ষের জলে কোথায় ভাসিয়া গেল। 'ইহাই আমার অদৃষ্ট লিখন', মনকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া, বিমলা গোপনে চোখের জল মুছিতে মুছিতে স্বামিগৃহে আসিল।

নন্দী সাহেবের পুত্র ভবানী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র সুবোধ তখন বিলাতে। বিমলা স্বামিগৃহে আসিয়া যে মেয়েটির জননী-স্থানীয়া হইল, তাহার নাম কনকনলিনী—পনেরো বৎসরের বালিকা। লরেটোতে পড়ে, ব্যারিষ্টার বোস সাহেবের কন্যা সুমতি তাহার সখী ও সহপাঠিনী। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই জননীর সহিত বোস সাহেবের গৃহে বিমলার যাতায়াত ছিল—এখন সুমতি তাহার কন্যা কনকনলিনীর সখী হওয়াতে ঘনিষ্ঠতা একটু বৃদ্ধি পাইল। বাড়ীতে কোনও পার্টি হইলে সুমতির পিতা-মাতা বাদ যাইতেন না। ছুটীর দিনে

কনকনলিনীও কখনও কখনও বোস সাহেবের গৃহে গিয়া স্ফূর্তির সহিত দিবা-যাপন করিত।

দুই বৎসর বিমলা স্বামিগৃহে অপ্রতিহত-প্রভাবে গৃহিণী-পনা করিবার পর, সুবোধ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিল। ভবানী বিলাত গিয়াছিল অনেক পরে, তাহার ফিরিবার তখনও বিলম্ব ছিল। পুরাতন কাকীমার তিরোভাব এবং নূতন কাকীমার আবির্ভাবের বিষয় সুবোধ পূর্ব্বাবধি অবগত ছিল। খুল্লতাতের উপর নূতন কাকীমার আধিপত্য দর্শনে সে মনে মনে হাসিল। সুবোধের বয়স তখন চব্বিশ, নূতন কাকীমার ঠিক সমবয়সী।

সুবোধ বাল্যাবধি পিতৃমাতৃহীন, নন্দী সাহেব তাহাকে নিজগৃহে পুত্রবৎ পালন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বিলাতের ব্যয়ও তিনিই নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সুবোধকে তিনি ইঞ্জিনিয়ারী পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, সুবোধ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, চাল-চলনে, ভাবে-ভঙ্গিতে, এমন কি, কণ্ঠস্বরে পর্য্যন্ত সাহেবীয়ানা সে ভালরূপই অভ্যাস করিয়া আসিয়াছে। চেহারাটি ছেলেবেলা হইতেই তাহার ভাল, রঙটিও গৌরবর্ণ। ইংরাজি পোষাকে তাহাকে ইংরাজ বলিয়া না হউক, এংলো-ইণ্ডিয়ান বলিয়া হঠাৎ ভ্রম জন্মিতে আটক নাই। টেনিস, ক্রিকেট, গল্‌ফ, ইংরাজি তাসখেলা প্রভৃতিতে সে রীতিমত পরিপক্ব হইয়া আসিয়াছে। ইংরাজি গান-বাজনাও সে বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। এই সকল গুণের জন্য অচিরেই সে ইঙ্গবঙ্গ-সমাজে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

নন্দী সাহেব সুবোধকে যখন ইঞ্জিনিয়ারী পড়িতে বিলাত পাঠান, তখন তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল, সে ফিরিয়া আসিলে নিজ ফারমেই তাহাকে নিযুক্ত করিয়া লইবেন। এখন কিন্তু তরুণী ভার্য্যার বৃদ্ধ পতি সুবোধকে ঠিক পূর্ব্বের মত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিলেন না। সুবোধ মাস-খানেক মাত্র ফিরিয়াছে, ইতিমধ্যে দুই দিন সে পিতৃব্যকে বলিয়াছে —"কাকা মশায়, আমার কোনও একটা কাযকর্ম্মের ভার দিন।" নন্দী সাহেব শুধু "দেখি" বলিয়া সে প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছেন।

সেই দুইবার সুবোধ যে কাকামহাশয়কে তাগাদা করিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে নীরব। একদিন নন্দী [illegible] হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "দেখ সুবোধ, তুমি আমাকে কাযকর্ম্মের কথা বলেছিলে, কিন্তু আমাদের ফারমে রছরখানেক থেকে কাযকর্ম্ম অত্যন্ত ডল্‌ যাচ্ছে। এ অবস্থায় কোনও নূতন লোক নিয়ে ফারমের খরচ বাড়ানো একেবারেই অসম্ভব। দিল্লীর হ্যারিংটন কোম্পানীর বড় সাহেব এখন কলকাতায় রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে অনেক দিন থেকে আমার বেশ হৃদ্যতা আছে। কাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—তোমার কথা তাঁকে আমি বল্লাম, তিনি বল্লেন, ও-রকম কোয়ালিফিকেশনের লোকের উপযুক্ত কোনও চাকরি ত আমাদের এখন খালি নেই, তবে তিনি যদি আপাততঃ ছোটখাট কোনও কাযে ঢুকতে রাজি হন, তবে পরে ক্রমে খালি হলে তাঁকে বড় পোষ্ট দেওয়া যেতে পারে।—আমি ত বলি, ঢুকে পড়। মস্ত বড় ফারম, হ্যারিংটন কোম্পানীর নাম তুমি শুনেছ বোধ হয়। কি বল?"

সুবোধ বলিল, "কত মাইনে দেবে এখন, তা কিছু বলেছে?"

"না, তা কিছু বলেনি। আমি বলি কি, তুমি একবার গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা কর না। গ্র্যাণ্ড হোটেলে আছেন, রুম নং ৪৬—দোতলায়। আমি বরং একখানা চিঠি তাঁর নামে লিখে তোমায় দিই।"

সুবোধ বলিল, "চিঠি লিখে দেবার দরকার হবে না। শুধু আপনার একখানা কার্ড আমায় দেবেন, তার পিঠে লিখে দেবেন—'টু ইণ্টোডিউস মাই নেফিউ মিষ্টার সো-এণ্ড-সো।"

"বেশ, তাই লিখে দেবো। আমি আপিসে যাবার আগেই লিখে দিয়ে যাব, তুমি বেলা দুটো তিনটের মধ্যেই গিয়ে দেখা ক'রে কথাবার্ত্তা কোয়ো।"

সেদিন গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়া সুবোধ সে সাহেবটির সাক্ষাৎ পায় নাই, কিন্তু চাপরাসী বলিয়াছে, বেলা ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে গেলে সাহেবের দেখা পাওয়া যাইবে।

সেই রাত্রিতে বিমলা তার স্বামীকে বলিল, "ওগো, শুনেছ, একটা ভারি মজা হয়েছে।"

নন্দী সাহেব বলিলেন, "কি মজা?"

"তোমার সুবোধ লভে পড়েছে।"

শুনিয়া নন্দী সাহেবের বুকটা হঠাৎ ধাঁৎকাইয়া উঠিল। বলিলেন, "লভে পড়েছে? কার সঙ্গে?"

"সুমতির সঙ্গে।"

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া নন্দী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যারিষ্টার বোস সাহেবের মেয়ে সুমতি ?"

"হ্যাঁ গো—ভারি মজা, না ?"—বলিয়া বিমলা হাসিতে লাগিল।

"ওরা তোমায় বলেছে ?"

বিমলা স্বামীর গা ঠেলিয়া বলিল, "নেকু! তা বুঝি কেউ বলে ? অর্থাৎ, প্রথম অবস্থায়।"

"কি ক'রে জানলে তুমি ?"

"আমায় কি ভগবান চোখ দুটো দিয়েছেন শুধু মাথার শোভার জন্যে ?"—ইহার পর বিমলা, বিগত দুই তিন সপ্তাহে, যে কয়েকবার সুমতি এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, সুবোধ ও সুমতির পরস্পরের প্রতি ব্যবহার যাহা সে লক্ষ্য করিয়াছিল, সমস্তই বর্ণনা করিল।

শুনিয়া নন্দী সাহেব বলিলেন, "সুমতির বয়স কত ? কনকের বয়সীই হবে বোধ হয় ?"

"না, কনকের চেয়ে এক বছরের বড়—আমি সুমতিকে স্পষ্ট একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে! ঠিক ষোল পূর্ণ হয়েছে। সুবোধ ত চব্বিশ তুমি বলেছিলে, তা হ'লে দুটিতে বেশ মিলবে, নয় ?"

এ কথায় নন্দী সাহেবের বুকে একটু ঘা লাগিল। আট বৎসরের তফাৎ—বয়সের ঐ প্রকার ব্যবধানেই বেশ মিলে,—আর তফাৎটা যদি ছাব্বিশ বৎসরের হয় ?—তবে গরমিল, ইহাই বোধ হয়, বিমলার মত। মুখে বলিলেন, "হ্যাঁ, তা বেশ মিলবে বৈ কি!"

বিমলা বলিল, "তা হ'লে তোমার মত আছে ত ?"

নন্দী সাহেব আহত হৃদয়ে মিল ও গরমিল বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন, স্ত্রীর কথার কোনও উত্তর দিলেন না। বিমলা বলিল, "এই জন্যে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে, আমরাই হলাম ধর সুবোধের অভিভাবক। ওর ভালমন্দ দেখা আমাদেরই ত উচিত। যদি এ বিয়েতে তোমার মত না থাকে. তবে এ ব্যাপার অঙ্কুরেই বিনাশ ক'রে দিতে হবে আমাকে।"

নন্দী এবার বলিলেন, "কি ক'রে অঙ্কুরে বিনাশ ক'রে দেবে তুমি ?"

বিমলা হাসিয়া বলিল, "তাই যদি না পারবো, আমি তবে এ বাড়ীর গিন্নী কিসের ?"

বিমলার মুখে এই কথা শুনিয়া নন্দী সাহেবের মন প্রসন্ন হইল। বলিলেন, "তোমার মত আছে কি না আগে বল।"

বিমলা বলিল, "আমি ত অমতের কোনও কারণ দেখিনে। সুমতিকে আমি তার ছেলেবেলা থেকে দেখছি। বেশ নম্র স্বভাব, বুদ্ধি-শুদ্ধি ভাল, দেখতে ডানাকাটা পরী না হলেও, বেশ চলনসই। ওর মা-বাপও বেশ লোক—সরল, অমায়িক, মিশুকে,—কুটুম্ব আমাদের ভালই হবে ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু শুধু আমার একার মত হলেই ত হবে না,—তোমার মতও হওয়া চাই ত!"

তাঁহার প্রতি পত্নীর এই নির্ভরশীলতায় নন্দী সাহেব মনে মনে খুসী হইয়া বলিলেন, "আমিও অমতের কোনও কারণ দেখি না। তবে আজকালকার বাজারে, অমন একটা পাত্র, বিয়ে ক'রে যে বিশেষ কিছু লাভবান হবে, সে ভরসা কম, কারণ, বোস সাহেব ঢের টাকা রোজগার করেন বটে, কিন্তু ওড়ানও তেমনি।"

বিমলা বলিল, "তুমি পাওনা-থোওনার কথা বলছ ?"

"হ্যাঁ।"

"তাতে কি হয়েছে ? দু'জনে যদি অকৃত্রিম ভালবাসা হয়, তবে পরস্পরকে পাওয়াই হল পরম লাভ—তার চেয়ে সুখের আর কি আছে ? তুমি আমাকে বিয়ে ক'রে কত টাকা ঘরে এনেছিলে, মশাই ?"

তরুণী পত্নীর এই কথাগুলির পরম রমণীয় ইঙ্গিতটুকু নন্দী সাহেবের অঙ্গে সুধাবর্ষণ করিল। বলিলেন, "সে ত ঠিক কথা।"

"তা হ'লে তোমার অমত নেই ত ?"

"না।"

"আমি তা হ'লে ওদের ভালবাসায় বাধা দেবো না ?"

"বাধাও দিও না, আবার হাওয়াও দিও না। কত দূরের জল কত দূরে গিয়ে মরে, দেখই না। তবে, এই পর্য্যন্ত আমাদের ঠিক হয়ে রইল, সুবোধ যদি সুমতিকে বিয়ে করতেই চায়, আমরা খুসী মনে তাতে রাজি হব।"

ইহার পর মাস-দুই বিমলা নানা ছলে সুমতিকে বাড়ীতে আনাইয়া বা বেড়াইতে লইয়া গিয়া, সুবোধ ও সুমতির

নিভৃত সাক্ষাতের সুযোগ করিয়া দিতে লাগিল। 'হাওয়া দিতে' স্বামী নিষেধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একটু-আধটু হাওয়া না দিয়া কি থাকা যায়? বলিয়াছি বাল্যাবধি নভেল পড়িয়া পড়িয়া বিমলার মনটি অতিরিক্ত মাত্রায় রোমাণ্টিক হইয়া উঠিয়াছিল। নিজ জীবনে তাহার সে রোমান্স ব্যর্থ হইয়াছে। এখন তাহার, অন্যদের প্রেম-চর্চ্চায় সাহায্য করিয়াও সুখ।

ফল যাহা হইবার, তাহাই হইল। সুমতির পিতা-মাতা কিছু কিছু সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এমন সময় সুবোধ এক দিন বোস সাহেবের গৃহে গিয়া, বসু-দম্পতির নিকট সুমতির হস্তপ্রার্থনা করিয়া বসিল।

বলা বাহুল্য, তাহার সে প্রার্থনা বিফল হইল। বোস সাহেবের মতাদির তখন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নিজে তিনি কায়স্থ-সন্তান হইয়া, তন্তুবায়কে জামাতা করিতে প্রস্তুত নহেন। আপত্তির সে কারণটুকু স্পষ্ট করিয়া তিনি না বলিলেও, আভাসে ইঙ্গিতে সুবোধের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না।

যাতায়াত, দেখা-শুনা প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ হইয়া গেল।

সুবোধ, হ্যারিংটন কোম্পানীর চাকরি লইয়া দিল্লী চলিয়া গেল।

সুমতি কিছুদিন অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া রহিল। কিন্তু সময় বড় সুচিকিৎসক,—ক্রমে তাহার হৃদয়ের ক্ষতটুকু একটু একটু করিয়া আরোগ্যলাভ করিল।

তখন বসু-দম্পতি পরামর্শ করিলেন, আর দেরী নয়, একটি স্বজাতীয় সুপাত্র অন্বেষণ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব মেয়ের বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

কিন্তু মনের মত সুপাত্র জুটিতে সময় লাগিল। সুপাত্র যে জুটিয়াছে এবং পাকা দেখাও হইয়া গিয়াছে, তাহাও পাঠক-পাঠিকাগণ অবগত আছেন—এখন শুভকার্য্যটি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেলেই হয়।

—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুমতির নিমন্ত্রণ।

বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয় পক্ষের পুরোহিত হাতীবাগান-নিবাসী শ্রীযুত অম্বিকাচরণ স্মৃতিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, শুভ বিবাহের দিনস্থির করিয়া দিয়াছেন আগামী ১১ই আষাঢ়, বুধবার, ইংরাজি ২৫শে জুন। সুতরাং কন্যাপক্ষের একটু তাড়াতাড়ি হইল। বসন-ভূষণাদি প্রস্তুত হইতেছে, নিমন্ত্রণ-পত্রও ছাপিতে গিয়াছে।

বিবাহের সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে, বোস সাহেব হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, চা-পানে মনোনিবেশ করিয়াছেন, এমন সময় বসু-গৃহিণী আসিয়া স্বামীর টেবিলের পার্শ্বে একখানি চেয়ার লইয়া উপবেশন করিলেন। বসু বলিলেন, "তুমি চা খাবে না?"

"আমি একবার খেয়েছি। মিসেস নন্দী এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমি চা খেয়েছি, এখন আর খাব না।"

"মিসেস নন্দী? বিমলা নন্দী?"

"হ্যাঁ।"

"কি মনে ক'রে?"

"বলছি। কাল কনকের জন্মদিন কি না। কনকের আসল মা যখন বেঁচে ছিল, তখন ত কৈ তার জন্মদিনে কোনও উৎসব-টুৎসব হ'ত ব'লে ত আমার মনে পড়ে না। সে ছিল পাড়াগেঁয়ে গিন্নী, অত জানতো-টানতো না। বিমলা এসে অবধি এ ক'বছর কনকের জন্মদিনে একটা পার্টি দিচ্ছে—অর্থাৎ চিলরেন্স পার্টি—সুমতিকেও নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে যায়। সুমতিকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। বল্লে, স্নানটান সেরেই যেন যায়, সেইখানেই ব্রেকফাষ্ট খাবে, অপরাহ্নে ম্যাজিক খেলা দেখানো হবে, আরও কি কি সব তামাসা হবে। তার পর চা-টা খেয়ে সন্ধ্যেবেলা বাড়ী আসবে। তা, তোমার অমত নেই ত? আমি কিন্তু পাকাপাকিভাবে নেমন্তন্ন নিই নি।"

"কি বলেছ?"

"বলেছি, হিন্দুভাবে মেয়ের বিয়ের সমস্ত ঠিক-ঠাক হয়ে রয়েছে, পাকা দেখা হয়ে গেছে, এই ২৫শে জুন বিয়ে। মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ী যাঁরা হবেন, তাঁরা সব সেকেলে ভদ্রের লোক। এ ভাবে হটর্ হটর্ ক'রে পার্টি-টার্টিতে যাওয়া তাঁরা পছন্দ করবেন কি না জানিনে ত! উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি, ওঁর যদি অমত না হয় ত সুমতি যাবে বৈ কি।—এই কথা আমি বলেছি।"

বোস সাহেব কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সে রকম কোনও কথাবার্ত্তা রামজীবন বাবু কোনও দিন

আমাকে বলেন নি অবশ্য। আর, তাঁদের অপ্রসন্নতার ভয়েই যে বিমলাকে ও কথা তুমি বলনি, তাও আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু সে সব ত চুকে-বুকে গেছে। ভাল কথা, সুবোধ ত দিল্লীতে চাকরি করত। সেখানেই আছে ত?"

বসুগৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, সে কথা বিমলাকে আমি স্পষ্ট ক'রেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সুবোধ দিল্লীতেই চাকরি করছে। মাত্র দেড়শো টাকায় ঢুকেছিল, এখন তার পাঁচশো টাকা মাইনে হয়েছে। বিয়ে-থাওয়ার কোনও কথাবার্ত্তা হচ্ছে কি না জিজ্ঞাসা করায় বিমলা বল্লে, সে রকম ত কিছু শুনিনি। আর বল্লে, সুবোধ লিখেছে, বোধ হয় শীগ্‌গিরই বিলেত যাবে, তাদের ফারমের জন্য কি সব জিনিষ-টিনিষ অর্ডার দিতে।"

"কতগুলি মেয়ের নেমন্তন্ন হয়েছে?"

"তা অবশ্য আমি জিজ্ঞাসা করিনি, কিন্তু অন্যান্য বছর কুড়ি পঁচিশ জন মেয়ে—অর্থাৎ কনকের যারা সঙ্গী সাথী সমবয়সী—জমায়েৎ হয়।"

"সে সব ঘটনার পর, আর কোনও দিন সুমতি ত ওদের বাড়ী যায় নি?"

"না, উপলক্ষও হয় নি! মিসেস নন্দী চ'লে গেলে সুমতিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি রে যাবি? মুখে সে বল্লে—তোমরা যা বলবে। কিন্তু দেখলাম, তার মনোগত ষোল আনা ইচ্ছে যাবার।"

বসু সাহেব বলিলেন, "সেটা স্বাভাবিক। সেখানে গেলে, কত সব পুরাণো সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে দেখা হবে, কত আমোদ-প্রমোদ হবে—সে সব উপভোগ করবার এই ত বয়স। বিয়ে হয়ে গেলে, অন্য জগতে গিয়ে পড়বে—এ সব কিছুই সেখানে পাবে না। যাক্ না হয়, কি বল?"

গৃহিণী বলিলেন, "তুমি যদি মনে কর গেলে কোনও দোষ নেই, তা হলে যাক্। সুবোধ এখানে নেই—থাকলে নিশ্চয়ই যেতে দিতাম না—আর, বিমলাও তা হলে বোধ হয় ওকে নেমন্তন্ন করতে আস্‌তো না। আমি শুধু এই ভাবছিলাম, সেই সব ঘর-আসবাব, সেই সব ছাদ-বারান্দা, সেই সব বাগান-টাগান দেখ্‌লে ওর পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠবে—কাষ কি আর মনটাকে চঞ্চল হ'তে দেওয়ার?"

বসু সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "ও সব কিছু নয়, বুঝেছ? আগে আমারও মনে হয়েছিল, একটু বুঝি ইয়ে হয়েছে। এখন মনে হয়, সেটা ছিল নিছক ছেলেমানুষী আব্দার। বিয়ে হবে—কত ধুমধাম হবে, কত লোকজন আস্‌বে, কত উৎসব হবে—কি মজা! মনের ভাবটা এই জাতীয়ই ছিল বোধ হয়। নইলে দেখ না কেন, এ বিয়ের সম্বন্ধ যখন হল, তখন ত টুঁ শব্দটিও করলে না। কৈ, বল্লে না ত—'আমি অন্য কাউকে বিয়ে করবো না, আজীবন কুমারী থাক্‌বো।' ওকে এ বিয়েতে রাজি করতে আমাদের ত কোনও বেগ পেতে হল না। ও পূর্ব্বস্মৃতি-ফৃতি জেগে ওঠার কোনও আশঙ্কা আছে ব'লে মনে হয় না।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা বেশ, যাক তা হলে।"

বালিগঞ্জে বসু-ভবনে কর্ত্তা ও গৃহিণীর মধ্যে যে সময় এই প্রকার কথোপকথন হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে, হাজরা রোডে নন্দী-ভবনে, চায়ের টেবিলে কর্ত্তা ও গৃহিণীতে আগামী কল্য কন্যার জন্মদিন-উৎসব সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতেছিল। এমন সময় বেয়ারা, রূপার ট্রের উপর একখানি পীতবর্ণ লেফাফাসহ প্রবেশ করিয়া বলিল, "হুজুর, তার আয়া।"

নন্দী সাহেব চশমা পরিয়া, রসিদে সহি দিয়া, লেফাফা খুলিলেন।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি টেলিগ্রাম গো? আপিসের?"

কাগজখানি স্ত্রীর হস্তে দিয়া নন্দী সাহেব বলিলেন, "না, সুবোধের। কাল সকালে পাঞ্জাব মেলে সে এসে পৌঁছবে।"

বিমলা বলিলেন, "বিলেত যাচ্ছে বোধ হয়, তাই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে। ভালই হল, কনকের জন্মদিনটায় তাকেও পাওয়া গেল।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভারত সরকার ও কৃষি-সমস্যা

আমাদিগের পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন যে, কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতীয় কৃষির বর্ত্তমান অবস্থা ও উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি রাজকীয় সমিতি (Royal Commission on Agriculture) নিযুক্ত হইয়াছিল। সমিতির সদস্যগণ তাঁহাদিগের বিবরণীতে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক বলিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বিবেচনা পূর্ব্বক ভারত গবর্ণমেণ্ট Imperial Council of Agricultural Research নামক একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছেন। সম্প্রতি নব-দিল্লীতে উক্ত কৃষিগবেষণা পরিষদের একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, গবেষণার উপরেই অধিকতর মন নিয়োগ করিতে হইবে এবং পুষা কৃষি-শিক্ষাগারকেই নিখিল ভারতের কৃষি-সমস্যা-সমাধানের কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, কৃষি-গবেষণা পরিসদই অতঃপর ভারতের যাবতীয় কৃষি ও তৎ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়-নিয়ন্ত্রণের কর্ণধার হইবেন।

অঙ্কের সাহায্য না লইয়া মোটামুটি হিসাবে ইহা বলিতে পারা যায় যে, ভারতের তিন-চতুর্থাংশ লোকের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় কৃষি। দেশের গ্রাম্য শিল্পাদি অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়া লোকসংখ্যার চাপ জমীর উপরেই অধিক পরিমাণে পড়িয়াছে। অথচ সাধারণ কৃষিকার্য্যের অবস্থা ক্রমশঃ এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, উহা দ্বারা কৃষকগণের লাভের কথা দূরে থাকুক, গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও পূর্ণরূপে হয় না। জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ইহার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্যই কৃষি-সমিতি নিযুক্ত হইয়াছিল এবং কৃষিজীবিগণ কার্য্যতঃ এরূপ ব্যবস্থা আশা করিয়াছিল—যাহা আশু ফলপ্রদ হইবে। কিন্তু সরকারী কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বোধ হয় যে, উঁহারা লাল ফিতার প্রভাব হইতে আদৌ মুক্ত হইতে পারেন নাই। কার্য্যের প্রণালী বদলাইলেও মানসিকতার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। দেশের অবস্থা বুঝিয়া কোন্ দিক্ রক্ষা করা প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা না করিয়া, অন্যের অনুকরণে সরকারী পরিষদ এরূপ পথ অবলম্বন করিতেছেন, যাহাতে আপাততঃ কৃষি-বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি ও কতকগুলি চাকুরীর সৃষ্টি ভিন্ন অন্য কোন ফল আশা করিতে পারা যায় না।

অভাব ও অভিযোগ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কৃষির অভাব বিভিন্নরূপ হইলেও মূল অভাব এই যে, ফসলের আর সেরূপ প্রাচুর্য্য নাই। অন্যান্য কারণ বাদ দিলেও অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির প্রভাবে কৃষকগণ কায়-ক্লেশে যে ফসল রোপণ করে, তাহারও ফল উপভোগ করিতে পারে না। এক বঙ্গদেশের দৃষ্টান্তেই তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায়। কৃষি-বিভাগ জমী চাষ সম্বন্ধে যে সমুদয় অঙ্কাদি সঙ্কলন করেন, তৎসমুদয় নির্ভুল না হইলেও, সেগুলি চাষ-আবাদ-বিষয়ক আভাস কতক পরিমাণে প্রদান করে। পূর্ব্বে এইরূপ অঙ্কাদি সঙ্কলিত হইত না; সুতরাং পূর্ব্বের সহিত তুলনায় চাষের হ্রাস-বৃদ্ধি অঙ্ক-সাহায্যে প্রমাণ করা চলে না। কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ ও ঐতিহাসিক বিবরণ দ্বারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আদৌ বিলম্ব হয় না যে, চাষের পরিমাণ বঙ্গদেশে কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের অঙ্কাদি হইতেই প্রকাশ পায় যে, পশ্চিম-বঙ্গে ক্রমশঃ অনেক জমী অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেছে; কয়েকটি জিলা হইতে তুলা ও কতিপয় দাইল ও তৈল-শস্যের চাষ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার পূর্ব্বাপর জলসেচনের ব্যবস্থা ও তাহার অধোগতি-জনিত কৃষি ও সাধারণ স্বাস্থ্যের সর্ব্বনাশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়াম উইলকক্স সাহেবের মন্তব্যাদি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন যে,

বঙ্গদেশের আর্থিক শারীরিক অধঃপতনের মূল কোথায়। ফলতঃ কৃষিকার্য্য লাভজনক না হওয়ায় অনেক লোক ক্রমশঃ গ্রাম ছাড়িয়া নগদ মজুরীর সন্ধানে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে; এবং এইরূপে এমন একটি ভূমিহীন, ভ্রাম্যমাণ সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে, যদ্দ্বারা কারখানা-শিল্পের কতক সুবিধা হইলেও, দেশের প্রভূত অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, এই শ্রেণীর লোকই পাশ্চাত্য দেশসমূহে বেকার-সমস্যা এত দূর জটিল করিয়া তুলিয়াছে যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞরাও তাহার কোন সমাধান করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কৃষি শুধুই জীবন-যাত্রানির্ব্বাহের একটি উপায়-মাত্র নহে; কৃষি সমাজবন্ধনেরও অন্যতম উপায়। ভূসম্পত্তি থাকিলেই লোক এক স্থানে স্থিতিশীল হইয়া থাকে এবং সেরূপ স্থানের উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্টা করে। কৃষিকার্য্যের উপর যে কোন কারণেই হউক অনাস্থাবান্ হইয়া লোক মজুরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলে দুই চারিটি শিল্পকেন্দ্র ব্যতীত দেশের ভিত্তিস্বরূপ গ্রামসমূহের আর কোন উন্নতি হয় না। সেই জন্য জাতিগঠন উদ্দেশ্যে মূল শিল্প কৃষিকেই সঞ্জীবিত করা প্রধান কার্য্য। অবশ্য লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত জীবিকা অর্জ্জনের নূতন নূতন পথ উদ্ভাবিত হওয়া আবশ্যক এবং শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও পরিপুষ্টি একান্ত প্রয়োজনীয়। তথাপি ইহাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনের উপরই জাতীয় উন্নতি মূলতঃ নির্ভর করে এবং কৃষির উৎকর্ষসাধনই তাহার উপায়। যত দিন হইতে ভারতে কৃষি-বিভাগসমূহ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে অবশ্য স্থানে স্থানে—যথা পঞ্চনদের লায়ালপুর অঞ্চলে—উল্লেখযোগ্য কৃষিবিষয়ক উন্নতি সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা কোন প্রকারে দেখাইতে পারা যাইবে না যে, পূর্ব্ব শতাব্দী অপেক্ষা বর্ত্তমান শতাব্দীতে ভারতের মোট কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্তুতঃ গবর্ণমেন্টের কৃষি অনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টাসমূহ এরূপ-ভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে যে, তৎসমুদয়ের সহিত দেশ-প্রাণের কোন যোগ নাই। সরকারী কৃষিক্ষেত্রসমূহ নিরক্ষর কৃষকবৃন্দ ত দূরের কথা, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির নিকটও অপরিচিত। ভারতীয় কৃষক নিরক্ষর হইলেও তাহার কার্য্যপ্রসূ জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সে স্বভাবজ সংস্কার দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্ প্রকার কৃষি-প্রণালী অথবা কোন্ ফসল তাহার উপকারে আসিবে। কৃষককুল যে সরকারী কৃষিকার্য্যের উত্তেজনায় সাড়া দেয় না, তাহার অন্যতম কারণ এই যে, সরকার এ পর্য্যন্ত কৃষককে এমন কোন কৃষিপ্রথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে দেখাইতে পারেন নাই, যদ্দ্বারা সে তাহার আয়ত্তাধীন সীমাবদ্ধ উপায়ে জমী হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করিতে পারে।

গবেষণা ও প্রচারকার্য্য

নবগঠিত কৃষি পরিষদ কৃষি-গবেষণাকেই প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য করিতেছেন। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, গবেষণাই সকল প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তি। উপযুক্ত প্রকার গবেষণা ব্যতীত কোন ক্ষেত্রে কোন স্থায়ী উন্নতি সম্ভবপর নহে। কিন্তু গবেষণা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যথেষ্ট সময় আবশ্যক হয় এবং গবেষণালব্ধ ফল বিস্তৃতভাবে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে আরও সময় দরকার। কিন্তু দেখিতে হইবে যে, গবেষণা কৃষি-সংস্কারের একটি অঙ্গমাত্র। অন্য উন্নতিশীল দেশসমূহে এক দিকে যেমন গবেষণা চলিতেছে, অন্য দিকে তেমনই প্রচলিত প্রথার সময়োপযুক্ত পরিবর্ত্তন করিয়া ও কৃষিজাত দ্রব্যাদির কাটতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া কৃষিকার্য্যকে লাভবান্ করিয়া তোলা হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মার্কিণেও কৃষি-উন্নতির প্রতিবন্ধক নিরূপণ ও তৎসমুদয় নিরা-করণের জন্য Business Men's Commission নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার ফলে Farm Marketing Act নামক আইন পাস্ হইয়াছে ও Farm Boardও গঠিত হইয়াছে। কৃষকগণের অবস্থাও এই বোর্ডের চেষ্টায় কিয়ৎ-পরিমাণে উন্নত হইয়াছে। ভারতের কৃষিব্যাপারে এমন অনেক বিষয় আছে—যাহার জন্য কোন গবেষণা প্রয়োজন হয় না। সরকারী সাহায্যে অন্তরায়গুলি অপসৃত হইলেই কৃষকের অবস্থা অন্ততঃ কতকটা ভাল হইতে পারে। জলসেচন ও জলনিকাশ, উত্তম সার, বীজ সরবরাহ, কৃষি-ঋণ, কৃষিজাত দ্রব্যাদির উপযুক্ত মূল্যে কাটতির ব্যবস্থা, কৃষিজ্ঞান প্রচার ইত্যাদি এইরূপ বিষয়ের মধ্যে অন্যতম। এ সকল বিষয়ে সরকারী কৃষি পরিষদ অবিলম্বে যে হস্তক্ষেপ

করিবেন, সেরূপ কোন আভাস পাওয়া যায় না। অথচ বর্ত্তমান সময়ে কৃষিজাত দ্রব্যাদির অভূতপূর্ব্ব মূল্য হ্রাস হওয়ায় কৃষকরা যে কিরূপে খাজনা দিবে ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, তাহা গুরু ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষিগবেষণা কিছু দিনের জন্য স্থগিত থাকিতে পারে; কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যলাভের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে দেশের দুর্গতির ও তজ্জনিত অশান্তির সীমা থাকিবে না। কৃষি পরিষদের আয়ত্তে এই অর্থকৃচ্ছ্রতার সময় এত অর্থ নাই যে, তাঁহারা উভয় দিকে সমান ব্যয় করিতে পারেন; সুতরাং এ সময়ে আশুফলপ্রদ কার্য্যের উপর অধিক মনোনিবেশ করা উচিত। এ স্থলে ইহাও বলিতে পারা যায় যে, গবেষণাকার্য্য-বৃদ্ধির জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ যেরূপ ব্যস্ত, তৎসমুদয়ের ফল জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য সেরূপ ব্যস্ত নহেন। আজ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক কৃষিবিভাগসমূহে এবং পুষা কৃষি-গবেষণাগারে গবেষণা দ্বারা নানা প্রকার তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে কতগুলি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত হইয়াছে? উত্তরে বলিতে হয় যে, অতি সামান্যই। অধিকাংশ তথ্যই বিদেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তক, পুস্তিকা ও বিবরণীতে আবদ্ধ হইয়া সরকারী কেতাবখানার পরিসর অথবা কীটবংশবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। এতদ্দেশে অধিকাংশ গবেষণার পরিণাম এইরূপই দাঁড়ায়। নিরক্ষর চাষীর কথা ত বহু দূরে, কৃষিকার্য্যে অল্পবিস্তর উৎসাহী শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও এই সমুদয় গ্রন্থের অস্তিত্ব অবিদিত। জর্ম্মাণী, ফ্রান্স ও মার্কিণে গবেষণালব্ধ প্রধান প্রধান কৃষি-তথ্যসমূহ সহজ ভাষায় ও সংক্ষিপ্তাকারে সঙ্কলিত হইয়া বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশিত হয়। এতদ্দেশে সরকার পক্ষ তাহা আবশ্যক মনে করেন না। ফলতঃ দেখা যায় যে, গবেষণা দ্বারা জ্ঞানের সীমা যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, ভারতে জনসাধারণ তাহার ফলভোগ করিবার কোন সুযোগ পায় না। বৈদেশিক শাসনে ইহা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু দেশীয় ব্যক্তির হস্তে কৃষি বিভাগের ভার ন্যস্ত হইয়াও বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন অথবা উন্নতি হয় নাই, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।

ফলনের হার ও চাষের খরচ

কৃষির দুরবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে দুইটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে—প্রথমতঃ অন্যান্য দেশের তুলনায় এতদ্দেশে ফলনের মাত্রার ন্যূনতা এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষিকার্য্যে ব্যয়ের আধিক্য। অনেক কারণে জমীর উর্ব্বরতা কমিয়া গিয়াছে। অরণ্য-ধ্বংসের জন্য জলস্রোত-সমূহের অবাধ ও দ্রুতপ্রবাহ এবং তজ্জনিত ভূমির উপরিভাগের সারবান্ মৃত্তিকাস্তরের ক্ষয়, বর্ষার জলবাহিত পলিমাটী জমীতে না থাকিয়া স্রোতের সহিত চলিয়া যাওয়া, মৃত পশ্বাদির অস্থি প্রভৃতি জমীর সার-বৃদ্ধির জন্য না রাখিয়া ব্যবসায়ের জন্য সংগ্রহ, খৈল ও অন্যান্য তেজস্কর পশুখাদ্যের বহুল রপ্তানী, গবাদি গৃহপালিত পশুর অবনতি ও সহজলব্ধ সারের আপেক্ষিক অভাব ইত্যাদি বিষয় যে মুখ্য অথবা গৌণভাবে উর্ব্বরতাহীনতার সহিত বিজড়িত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু শুধু জমীর অনুর্ব্বরতাই কম ফলনের কারণ নহে। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহুকাল ধরিয়া শস্যসমূহের উপযুক্ত নির্ব্বাচন না হওয়ায় ফলনের মাত্রা যেরূপ বৃদ্ধি হইতে পারিত, তাহা হয় নাই। সামান্য নির্ব্বাচন দ্বারা যে কিরূপ সুফল পাওয়া যায়, তাহা কৃষি-বিভাগের দুই একটি নির্ব্বাচিত ফসল হইতে বুঝিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ নির্ব্বাচনকার্য্য বিভিন্ন অঞ্চলে তৎপরতার সহিত সংসাধিত হইতেছে না। জল, বায়ু ও মৃত্তিকা হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এত পার্থক্য আছে যে, এক স্থলের উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ নির্ব্বাচিত ফসল অন্য স্থানে ভাল ফল না প্রদান করিতে পারে। সেই জন্য প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে এক একটি কেন্দ্র করিয়া ফসল-নির্ব্বাচন হওয়া উচিত। সঙ্কর উৎপাদন ও উহা স্থায়ী করিতে অধিক সময় ও গবেষণা আবশ্যক; কিন্তু সাধারণ নির্ব্বাচন সহজসাধ্য। অন্ততঃ এই প্রণালী বহুলরূপে অনুসৃত হইলে অনতিকালের মধ্যে ফসলের অল্পবিস্তর উন্নতি সম্ভবপর।

চাষের খরচ-বৃদ্ধির জন্য অবশ্য দেশের সাধারণ আর্থিক অবস্থা মূলতঃ দায়ী। সার ও কৃষিযন্ত্রের নিমিত্ত ভারতীয় কৃষক এখনও পর্য্যন্ত বিশেষ ব্যয় করে না, করিবার সামর্থ্যও নাই। অল্পদিনের মধ্যে চাষের খরচ যে বিশেষ কমিবে,

তাহা বোধ হয় না। তবে কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য পাইলে কৃষক ব্যয়ভারে এতদূর উৎপীড়িত হইবে না। অনেকে মনে করেন যে, কলের লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষি-যন্ত্রাদি প্রচলিত হইলে চাষের খরচ অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়া কৃষিকার্য্যের লাভ বৃদ্ধি পাইবে। সেরূপ ধারণা অমূলক; যে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে কৃষিযন্ত্রাদির যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে, সে সকল স্থানেও যে কৃষিকার্য্যের ব্যয়-লাঘব হইয়াছে, তাহা নহে। কেবলমাত্র যে যে স্থানে বহুপরিমাণ জমীতে একত্রে এক ফসল জন্মাইতে পারা যায়, সেইরূপ স্থানেই যন্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা চাষের খরচ কমাইতে পারা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে এতদ্দেশের ন্যায় অন্য দেশেও প্রধানতঃ কৃষকের স্বকীয় পরিশ্রমের উপর কৃষিকর্ম্মের আয় নির্ভর করে; বহুল পরিমাণে যন্ত্রপ্রয়োগ সেরূপ স্থলে চলে না। সম্প্রতি মার্কিণের ক্যান্‌সাস্ প্রদেশের গভর্ণর মিঃ রিড্ সুবিখ্যাত Evening Post পত্রিকায় লিখিয়াছেন :—

"There are approximately 65,00,000 separate farm businesses in this country (U. S. A). These are manned by approximately 2,70,00,000 persons, consisting not only of the farmer himself but the members of his family, all of whom do more or less actual farm labour. Only to the extent that the farmer is able to utilise the labour of the members of his family has he been able to continue to pay the rising costs of farming, taxes, food, clothing, machinery, supplies and continue to exist upon his income."—

অর্থাৎ "এতদ্দেশে (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে) প্রায় ৬৫ লক্ষ স্বতন্ত্র কৃষি কারবার আছে; তৎসমুদয়ে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ; তাহার মধ্যে শুধু কৃষক নহে, কৃষকের পরিবারভুক্ত লোকরাও রহিয়াছে; সকলেই অল্পবিস্তর প্রকৃতপ্রস্তাবে ক্ষেত্রের কার্য্য করিয়া থাকে। যে পরিমাণে কৃষক নিজ পরিবারভুক্ত ব্যক্তি-বর্গের শ্রমের সদ্ব্যবহার করিতে পারে, ঠিক সেই মাত্রায়ই সে কৃষিকার্য্য, খাজনা, খাদ্য, পরিধেয়, কৃষিযন্ত্র ও সরঞ্জামের বিবর্দ্ধমান ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া স্বকীয় আয়ের উপর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়।"—ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, কৃষিকার্য্যে শুধু বহুল পরিমাণে যন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়া লাভবান্ হইবার বিশেষ আশা নাই। বরং খাজনার হার, মালপত্র বহনাবহনের খরচ ও মজুরী প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রাখিলে অধিক উপকার হওয়া সম্ভব। অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা এতদ্দেশে মজুর সস্তা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের দক্ষতা যে কম, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। অনেকের ধারণা আছে যে, কৃষি কেবলমাত্র মাটী খোঁড়ার কায; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। একটু বিস্তৃতভাবে কৃষিকার্য্য করিতে গেলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ক্ষেত্রের লাভালাভ অনেকটা মজুরের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। গ্রাম হইতে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় লোক সহরে আসিতে আরম্ভ করায় চাষের মজুরের অভাব হইয়া পড়িতেছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কতিপয় জিলায় মজুরীর হার এত অধিক হইয়াছে যে, সেরূপ মজুর নিযুক্ত করিয়া চাষের লাভ অতি সামান্যই থাকে।

কৃষি ও শিল্প

কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ থাকিলেও, কতক-গুলি শিল্প কৃষির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। এগুলিকে কৃষি-মূলক শিল্প বলিতে পারা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিমূলক শিল্প, যথা গুড় ও দড়ি প্রস্তুত, গবাদি পালন, সূতা কাটা ইত্যাদি, কৃষকের পক্ষে প্রভূত পরিমাণে সহায়ক। এই সকলের জন্য তাহার বিশেষ অধিক ব্যয় করিতে হয় না, অথচ এ সমুদয় দ্বারা তাহার অবসরের সদ্ব্যবহার হয় ও সংসারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। যে কোন প্রকার কৃষির উন্নতি-বিধায়ক পরিকল্পনার সহিত ক্ষুদ্র কৃষিমূলক কুটীর-শিল্পের যোগ না থাকিলে তাহা এতদ্দেশে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার বিশেষ আশা করিতে পারা যায় না। আপাততঃ এইরূপ শিল্প শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। বলা বাহুল্য যে, ক্ষুদ্র শিল্প-শিক্ষার কেন্দ্র সহরে না হইয়া মফঃস্বলে হওয়াই উচিত; তাহাতে হাতে-কলমে কায শিখিবার যেরূপ সুবিধা হয়, তাহা অন্যত্র হয় না। এরূপ ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠা দ্বারা কৃষকের অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা অবশ্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ লাভ না করিলে প্রাদেশিক

গভর্ণমেণ্ট এরূপ কার্য্য সাহস করিয়া আরম্ভ করিতে পারেন না। কৃষি-পরিষদ যদ্যপি প্রত্যেক প্রদেশের উপযুক্ত কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠায় মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই সুফল ফলিতে পারে এবং কৃষকের অবস্থা উন্নত হইয়া প্রকৃত কৃষিকার্য্যের সমধিক পরিপুষ্টি হইতে পারে।

সর্ব্বশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আমাদিগের দেশেও কালবিলম্ব না করিয়া একটি Bureau of Plant Industry অর্থাৎ উদ্ভিদ্-শিল্পবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। মার্কিণে এই বিভাগ এক দিকে যেরূপ নূতন নূতন আয়কর ফসল প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের কৃষি-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, অন্য দিকে তেমনই কোন্ উদ্ভিদের কি প্রকারে প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার হইতে পারে, তাহাও দেশবাসিগণকে কার্য্যতঃ বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। মার্কিণের Trade Commissioner সমূহ ও বিশেষ কৃষি-দূতগণ পৃথিবীর কোন্ স্থানে কোন্ উদ্ভিদ্‌কে কি কাযে প্রয়োগ করা হইতেছে, নিরন্তর তাহার খবর রাখিতেছেন এবং উপযুক্ত বোধ হইলেই তৎসমুদয় নিজ দেশে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। বিদেশ হইতে উত্তম উদ্ভিদাদি আনয়ন করিয়া দেশে তাহাদের চাষ-বিস্তারে যে কত লাভ আছে, তাহা আলু, কপি, লঙ্কা ইত্যাদি কৃষিজাত ফসল ও সিঙ্কোনা, ইউক্যালিপ্টাস প্রভৃতি বাগিচা-জাত ফসল হইতেই বুঝিতে পারা যায়। যে সময়ে কোন কারণে ধান্য, গোধূম বা অন্য কোন খাদ্য ফসল নষ্ট হইয়া যায়, সে সময়ে লোকের যে কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তাহা সকলেই জানেন; এরূপ সময় অষ্ট্রেলিয়ায় বিশেষ জাতীয় গড়গড়ি (Coix spp) অথবা মার্কিণের উৎকৃষ্ট রাঙ্গা আলু কিম্বা অন্য কোন তদ্রূপ ফসল যে আসন্ন দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে না পারে, তাহা নহে। কিন্তু সেরূপ ফসল পরীক্ষা ও প্রবর্ত্তন করিবার কোন ব্যবস্থাই আপাততঃ নাই। রীতিমত অনুসন্ধান দ্বারা অনেক আনুষঙ্গিক ফসল পাওয়া যাইতে পারে। প্রকৃত ফসলের সহিত কিয়ৎপরিমাণে সেরূপ ফসল চাষের জন্য কৃষকের ব্যয়বাহুল্য নাই, অথচ তাহাতে তাহার অল্পবিস্তর লাভ আছে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদাদি সদ্ব্যবহারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সরকারী বন-বিভাগ বিগত কয়েক বৎসর হইতে সচেষ্ট হইয়াছেন বটে, কিন্তু ক্ষেত্রজাত ফসল অথবা আগাছা সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত এরূপ কোন ব্যবস্থা হয় নাই। বাস্তবিকপক্ষে দেখিতে গেলে ফসলের পরিত্যক্ত অংশ ও আগাছাসমূহ হইতেও অনেক আবশ্যক দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যত দিন তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান না হইতেছে, তত দিন সেগুলি মাটীতে পড়িয়া পচিয়া নষ্ট হইবে অথবা শস্যের অনিষ্টসাধন করিবে। আমরা আশা করি যে, উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া দীর্ঘসূত্রিতা কিম্বা একদেশ-দর্শিতার প্রশ্রয় না দিয়া, যাহাতে ভারতীয় কৃষির আশু উন্নতি সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

শাঁখের ধ্বনি

পল্লী জুড়ে উঠ্‌লো বেজে শাঁখ—
মুখর করে আঁধার ধরাতল;
নীরবতার ছন্দে এলো ভেসে
হাওয়ার বুকে গভীর কোলাহল।

সেই সুরেতে জাগ্‌লো আমার প্রাণে
অজানা কোন্ অমঙ্গলের স্মৃতি,
শূণ্য-ব্যাপী অধীর ব্যাকুলতা
বাড়িয়ে দিল দুর্ভাবনায় ভীতি।

শাঁখের ধ্বনি মিলিয়ে গেল দূরে
ভ্রান্তি-ভরা দুঃস্বপনের পুরে!

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়।

প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা

গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম পর্ব্ব সাঙ্গ হইয়াছে, 'প্রতিনিধিরা' মুখপাতের কার্য্য শেষ করিয়াছেন। এই অধিবেশনে হিন্দু-মুসলমানসমস্যার সমাধান হয় নাই। তবে গোল টেবিলের উদ্যোক্তৃবর্গের আশা আছে, হিন্দু মুসলমান সদস্যরা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনাদের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করিয়া লইবেন। সম্ভবতঃ ভারতেও গোল টেবিলের অধিবেশন হইতে পারে।

গোল টেবিলের মূল উদ্দেশ্যসিদ্ধির কত দূর কি হইল, তাহা সকলেরই জানিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। ভারতের জাতীয় দল ইহাতে যে বিশেষ আগ্রহান্বিত, তাহা নহে। তথাপি শাসক জাতি ইহার ফলাফলের উপর মিলনের আশা করিতেছেন বলিয়া ভারতবাসী বৈঠকের প্রথম পর্ব্বের ফল জানিতে ইচ্ছা করে। যে বৈঠকে ভারতের প্রকৃত নেতৃবর্গকে ও তথা জাতীয় দলকে বর্জ্জন করা হইয়াছে, তাহাতে যাহাই মীমাংসিত হউক, তাহা যে ভারতবাসী ভারতের মুক্তির পক্ষে শেষ কথা বলিয়া গ্রহণ করিবে, এমন কোন কথা নাই। তবে ভারতের মডারেট মতাবলম্বী রাজনীতিকরা সরকারের দ্বারা বৈঠকে মনোনীত হইয়া কত দূর কি করিয়া আসিলেন, তাহা জানিতে দোষ কি? মহাত্মা গন্ধী কারারুদ্ধ অবস্থায় বলিয়াছিলেন, যদি মডারেট নেতারা শাসক জাতির সকাশ হইতে স্বাধীনতার কায়া আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি মত-পরিবর্ত্তন করিবেন কি না, বিবেচনা করিতে পারেন এবং কংগ্রেসকেও সে বিষয়ে বিবেচনা করিতে বলিতে পারেন।

বোধ হয়, এই কথা স্মরণ করিয়াই মডারেট নেতা সার তেজ বাহাদুর সপ্রু বৈঠকের প্রথম অধিবেশনের শেষ মুখে প্রধান মন্ত্রীকে বৃটেনের প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমানসমস্যার সমাধান হউক বা না হউক, রাজন্যদের সহিত বৃটিশ-ভারতীয়দের আপোষ বন্দোবস্ত হউক বা না হউক, বৃটিশ সরকার ভারতের ভবিষ্যৎ শাসননীতি ও প্রণালী কি প্রকৃতির করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা ভারতবাসীরা তাঁহার নিকট স্পষ্ট করিয়া জানিতে চাহে, সার তেজ বাহাদুর ইহাই বলিয়াছিলেন। সার তেজ বাহাদুরের সেই নিবেদন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ সার তেজ বাহাদুর এই গোল টেবিলে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার তুলনা বিরল। তিনি মডারেট মতাবলম্বী হইলেও এবং জাতীয় দলের সহিত তাঁহার মতানৈক্য থাকিলেও তাঁহার প্রাপ্য গুণের মর্য্যাদা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা চলে না। তাঁহার দেশপ্রেম অস্বীকার করা যায় না। এই হেতু জাতীয় দল দুঃখ করিয়া থাকেন যে, তাঁহার মত দূরদর্শী দেশপ্রেমিক রাজনীতিক প্রথমে ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবী লইয়া গোল টেবিলে গেলেও কিরূপে সংহিত রাষ্ট্রশাসনতন্ত্র নীতি গ্রহণ করিলেন। প্রথমে তাঁহাদের সহিত বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের বৃটিশ-ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার লইয়াই আপোষের কথা উঠিয়াছিল, রাজন্য-রাজ্যসমূহের কথা.ত উঠে নাই। এইটুকুই গোল।

সার তেজ বাহাদুর

যাহা হউক, প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডও সার তেজ বাহাদুরের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা বৃটেন কি ভাবে করিতে চাহেন, তাহার সুস্পষ্ট আভাস প্রদান করিয়াছেন। তাহার সারাংশ আমাদের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহার মূল কথা এই :—

"কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের উপর শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে। অবশ্য ইহার সঙ্গে সঙ্গে

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড

কতকগুলি বাঁধন-কষণের সর্ত্ত থাকিবে। উহা সাময়িক। কিছু সময়ের জন্ত কতকগুলি বাধ্যবাধকতা পালনার্থে, কতকগুলি বিশেষ অবস্থার অভ্যুদয় হইলে এবং সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের রাজনীতিক স্বাধীনতা ও স্বার্থসংরক্ষণের উপযোগী কয়েকটি বিধি-নিষেধ অবলম্বনার্থে এই সর্ত্তগুলি রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। আইনে এই বাঁধন-কষণ রাখিবার সময় বৃটিশ সরকার ইহাও বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন যে, সংরক্ষিত বিভাগে এই সকল সর্ত্তানুযায়ী ক্ষমতা ব্যবহার করিবার কালে ভারতবাসীর পূর্ণ দায়িত্বমূলক স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্তির পক্ষে কোন ক্ষতি না হয়।"

প্রকাশ, তাঁহার এই ঘোষণায় বৈঠকে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠিয়াছিল। অবশ্য তাঁহার ঘোষণার পক্ষে ও বিপক্ষে তাঁহার দেশের সকল শ্রেণীর রাজনীতিক ও সংবাদপত্র মহলে নানা ভাবের সমালোচনা হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন, তিনি ভারত-শাসনে একটা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন; কেহ বলিয়াছেন, তিনি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, ভারতটাকে হাতছাড়া করিবার যোগাড় করিতেছেন। এ সকল মন্তব্য ও আলোচনা লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিব, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বিলাতের প্রধান মন্ত্রিরূপে যতটুকু আশার কথা কহিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধেও তিনি স্থির প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কি না। তাঁহার উপসংহারের বক্তৃতাংশ পাঠে মনে হয়, তাঁহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়াছিল, নতুবা তিনি শেষ মুখে বলিবেন কেন,—We have to go back to our own public opinion, আমাদিগকে এখন আমাদের জনমতের জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে? যদি তিনি বৃটিশ সরকারের প্রধান প্রতিনিধি ও মুখপাত্ররূপে এই ঘোষণাই করিলেন, তবে আবার এই খোঁচটুকু রাখিয়া দিলেন কেন? সুতরাং ইহাই ভারতে বৃটিশ শাসননীতির শেষ কথা, ইহা কিরূপে মানিয়া লওয়া যায়?

কাহারও কাহারও মতে এই ঘোষণা "Too much generalisation, too much sentiment and too much paper." কেহ কেহ বলিতেছেন,—"বৈঠকের ঘোষণা কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপন্থা স্থির করিয়া দেয় নাই, তবে আপোষের একটা কার্য্যপন্থা স্থির করিয়া দিয়াছে বটে।" এমনও কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, "ইহাতে স্বায়ত্ত-শাসনের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে। এই হেতু ইহার ফলে কংগ্রেস-নেতৃবর্গের মতপরিবর্ত্তন হইবে। স্বয়ং রাজা ও প্রধান মন্ত্রী ভারতবাসীকে ভবিষ্যৎ শাসনপ্রণালী স্থির করিবার জন্ত সাদর-আহ্বান করিয়াছেন, ইহাতে কংগ্রেস সাড়া না দিয়া পারিবেন না।"

কিন্তু বরোদার গাইকবাড় মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলেন, "আমি আশা করি, আমি যে মন লইয়া এই দানের কথা পাড়িয়াছি, ভারত উহার সদভিপ্রায় বুঝিয়া উহা গ্রহণ করিবে। কি বলেন?" গাইকবাড় জবাব দেন,—"আমার মনে হয়, ঘোষণা অপেক্ষা আপনার দান কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতবাসীকে অধিকতর সন্তোষ প্রদান করিবে।"

সার এ, পি, প্যাট্রো

সুতরাং সার এ, পি, প্যাট্রো প্রমুখ 'প্রতিনিধিরা' যতই বলুন,—"এই ঘোষণায় বৃটেনের হৃদয়ভাব পরিবর্ত্তনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—যে পরিবর্ত্তন মহাত্মা গন্ধী চাহিতেছিলেন," প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে ঘোষণার অনুযায়ী ব্যবস্থা কি ভাবে কার্য্য করিবে, তাহাই ভারতবাসীকে সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে হইবে।

আপত্তির কারণ কি?

প্রথমেই দেখা যায়, ঘোষণায় সময় সম্বন্ধে কোনওরূপ নির্দ্দেশ নাই, কেবলমাত্র বলা হইয়াছে,—For the transitional period. ইহার অর্থ কি? কেন্দ্রীয় সরকারে যে Safeguards অথবা বাঁধন-কষণ রাখা হইয়াছে, তাহা সাময়িক, এই কথা বলা হইয়াছে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে বলিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে আইনসভার নিকট দায়ী থাকিতে হইবে। ভাল কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে,—(১) ভারতরক্ষা, (২) বৈদেশিক ব্যাপার, (৩) রাজস্ব ও অর্থ-সম্পর্কিত বিষয় (Financial and fiscal), (৪) সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ,—এইগুলিতেই কিছু সময়ের জন্ত রাজপ্রতিনিধির ক্ষমতা সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইবে। এইখানেই গোল। কিছু সময় অর্থে কি বুঝিতে হইবে? এই সংরক্ষিত ক্ষমতাই বা কিরূপে ও কি পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে? ইহাই সমস্যার কথা—ইহাতেই সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ আছে!

মিঃ আইজ্যাক ফুট পার্লামেণ্টের সদস্য। তিনি বিলাতের লিবারল দলভুক্ত। তিনি সে দিন তাঁহার নির্ব্বাচন-মণ্ডলীর

ভোটারদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন,—"The control of Indian affairs had to pass to the Indian people, of that there can be no doubt, ভারতীয় ব্যাপারে ভারতীয়দের হস্তে যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই।" মিঃ ফুট আরও বলিয়াছেন, "ভারতের জাতীয়তার স্রোতঃ যে ভাবে দিন দিন স্ফীতকলেবর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে উহাকে আর রাজা কেমুটের হুকুমে বা মিসেস প্যার্টিংটনের সম্মার্জ্জনীর দ্বারা প্রতিহত করিয়া রাখা সম্ভব হইবে না।" এত কথা বলিবার পর কিন্তু মিঃ ফুট 'সময়' ও 'প্রণালীর' কথা তুলিতে ভুলেন নাই। তিনি বলেন, "কত কালের জন্ম এবং কি ভাবে এই বাঁধন-কষণ রাখা হইবে, তাহা তর্কের দ্বারা মীমাংসিত হওয়া কর্ত্তব্য।"

ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন সে দিন পার্লামেণ্টে গোল টেবিল বৈঠক সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কের সময়ে সাম্রাজ্যগর্ব্বী মিঃ

মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চহিল

উইনষ্টন চার্চ্চহিলের সমস্ত উক্তির উত্তরদানচ্ছলে ভারতের শক্তিসম্পন্ন বিরাট জাতীয়তার উচ্ছ্বাসের কথা স্বীকার করিয়াছেন,—"This movement cannot be regarded as something that only exists in the mind of a few, but is in fact a great national movement penetrating into every rank of society in every part of the country." জাতীয় আন্দোলন এবং জাতীয়তার ভাব যে সর্ব্বব্যাপী, তাঁহা ভারতসচিব স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে হয় অত্যাচার দ্বারা উহাকে দমনের চেষ্টা করিতে হয়, নতুবা ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন করিয়া ভারতকে বন্ধু ও সমানরূপে গ্রহণ করিতে হয়,—মিঃ চার্চ্চহিলের কথার উত্তরে মিঃ বেন এই কথা বলিয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যখন বাহুবলে লোকের মন জয় করা যায় না, তখন প্রথম পথ পরিহার করিয়া দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে ভারতবাসীকে তাহাদের আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা ও অধিকার দিতে হয়,—"What that has meant is lathi, stick and after lathi, refle and after rifle machine gun. You must either base the Government on the assent of the people or govern by force. The logical consequence of Mr. Churchill's, if put into force, is that Government by force without assent of the people. The alternative is Government by the people for the people." এই কথাগুলি শুনিলে মনে হয়, ইহা ভারত-সচিব মিঃ বেনের মুখ-নিঃসৃত নহে, আমাদেরই জাতীয় দলের কোন নেতা ইহা বলিতেছেন।

মিঃ বেন এই ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই বোধ হয় বলিয়াছেন,—"মিঃ চার্চ্চহিল কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকিতে পারে, এ কথা স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু বৃটেন এত দিন ভারতকে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন, যদি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের বন্ধন দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সেই সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়।" কেবল ইহাই নহে, ভারতের প্রতি সুবিচার করিবার পক্ষে দুইটি প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত, মিঃ বেন ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি চাহেন,—ভারতের জন্ম যাহা করা হইবে, তাহাতে সরলতা ও অকপটতা এবং দ্রুত অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প (Sincerity and speed) বিদ্যমান থাকা কর্ত্তব্য। মিঃ বেনের মতে ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসনের সাজে সাজাইতে হইলে যত শীঘ্র সম্ভব তাহা করা উচিত।

কিন্তু এইখানেই ত গোল। সময়ের ত কোন কিছু বাঁধাবাঁধি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয় নাই। শাসক জাতি এ বিষয়ে সময়ের মূল্য যে বিলক্ষণ বুঝেন, তাহা মিঃ বেনের কথাতেই সুপ্রকাশ। কিন্তু যদি কিছু সময়ের জন্ম বাঁধন-কষণ রাখা একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা এক বৎসর বা দুই

বৎসর বা আরও অধিক কাল রাখা হইবে কি না. অথবা উহা রাখা একবারেই প্রয়োজন কি না, এ বিষয়ে কোনওরূপ স্পষ্ট কথা না পাইলে সন্দেহ ও সংশয়ের বোঝা স্কন্ধ হইতে নামিবে কি? আর কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে যদি অতিরিক্ত অধিকার ও ক্ষমতা বহুকাল সংরক্ষিত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে মিঃ বেনের কথামত Government by the people for the people হইবার সম্ভাবনা থাকিবে কতটুকু ?

——

রাজবন্দী

ভারতের জাতীয় দলের প্রায় সমস্ত নেতাকে এবং বহুসংখ্যক কংগ্রেসকর্ম্মীকে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে নানা অপরাধে সাধারণ আইন বা একাধিক অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার ও দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদে সম্প্রতি সরকারপক্ষে সার জেমস ক্রেরারের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে যে, আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত মোট ৫৪ হাজার ৪৯ জন নর-নারী এই সূত্রে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালায় ১১ হাজার ৪ শতেরও উপর, বিহারে ১০ হাজার ও বোম্বাইএ ৯ হাজার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সরকারী বিবরণে অনেক আইন অমান্যের মামলাকে সাধারণ মামলার সামিল করা হয়। এমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, যেখানে মাদকদ্রব্যের পিকেটিং ব্যাপারে নর-নারীকে ধৃত করিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। বাজারে হাটে বিদেশী বস্ত্রাদি পিকেটিং করার সম্পর্কেও কোন কোন মামলায় পিকেটারদিগকে অবৈধ জনতা অথবা মারপিট করার অভিযোগে ধৃত ও অভিযুক্ত করা হইয়াছে। এ সব মামলা ইহার সঙ্গে ধরিলে যে দণ্ডিত রাজবন্দীর সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর যাহারা দণ্ডিত হইয়াছে, তাহারা ছাড়া এমন অসংখ্য লোক আছে, যাহারা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে, অথচ যাহাদিগকে নানা কারণে পুলিস গ্রেপ্তার করে নাই বা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। পরন্তু এই আন্দোলনের সহিত প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সহানুভূতি আছে, অথচ যাহারা ধরা পড়ে নাই বা ধরা পড়ার মত কার্য্য করে নাই, তাহাদের সংখ্যাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সুতরাং কংগ্রেসের প্রবর্ত্তিত এই আন্দোলন যে অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এই ধারণা থাকা ভুল ; কেন না, অবস্থা জানিয়া অবস্থার জন্য প্রস্তুত হওয়াই বুদ্ধিমান দূরদর্শী রাজনীতিকের কর্ত্তব্য। বোধ হয়, ইহা ভাবিয়াই মিঃ বেন ও মিঃ ম্যাকডোনাল্ড পার্লামেণ্টে জাতীয় আন্দোলনের শক্তির ও বিরাটত্বার কথা স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু এ কথা বুঝিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন, জনমতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া কেবল ধর্ষণনীতি অবলম্বন করিয়া থাকিলে প্রকৃত মিলন ও রাজ্যশাসন সম্ভবপর হয় না। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ত স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—"হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত সৈন্য দিয়া ছাইয়া ফেলিয়া ভারত শাসন করা কর্ত্তব্য বলিয়া যদি বিবেচিত হয়, তবে বৃটিশ পার্লামেণ্ট শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে আমাদিগকে বাধা প্রদান করুন।"

কিন্তু কথা ও কাযে অনেক সময় সামঞ্জস্য থাকে না বলিয়াই দুঃখ হয়। এবার স্বাধীনতা-দিবসে কলিকাতায় অক্টার্লোনি মনুমেণ্টের সম্মুখস্থ ময়দানে পদাতিক ও সওয়ার শান্তিরক্ষকরা যেভাবে জনতা ভঙ্গ করিয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, বিলাতের কর্তৃপক্ষ মনোভাব-পরিবর্ত্তনের পরিচয় দিলেও এখনও ভারতে সে মনোভাব-পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দেয় নাই। যাঁহারা জাতীয় পতাকা শোভাযাত্রা সম্পর্কে ঐ স্থানে আহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালার কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট এবং কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু অন্যতম ; যদিও বিলাতের কর্তৃপক্ষের প্রকৃত মিলনের ইচ্ছা সপ্রকাশ হইয়াছে, তথাপি এই কাণ্ডে এ দেশে পুলিসের কোন কোন কর্ম্মচারীর যে তাহা নাই, তাহা ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়। সুভাষচন্দ্রের মামলার বিচারকালে ফরিয়াদী পক্ষ জনতার বিপক্ষে লোষ্ট্র-নিক্ষেপের অভিযোগ করিয়াছেন। অবশ্য সত্যাগ্রহী হিসাবে সুভাষচন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। তিনি লালবাজার হাজতে আসামীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন মাত্র। এই

সুভাষচন্দ্র বসু

দুই বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন। সে পরের কথা। আপাততঃ দেখা যাইতেছে যে, এ দেশে এখনও বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের সদ্ভাব ও সদিচ্ছাপ্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি অনুভূত হইবার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। কেবল বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ নহে, এ দেশেরও শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষ লর্ড আরউইনও তাঁহার ঘোষণায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রতিনিধিদিগকে মুক্তিদান করিয়া এবং ঐ কমিটীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণার প্রত্যাহার করিয়া মিলনের চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাতে কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে গোল টেবিলের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত এবং মিঃ ম্যাক-ডোনাল্ডের ঘোষণা সম্পর্কে বিচার আলোচনা করিতে পারেন, তাহারই জন্য এই সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, বড়লাটের ঘোষণায় ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। শীর্ষস্থানীয় শাসক যখন কংগ্রেসকে এই ভাবে মিত্ররূপে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন বাঙ্গালার কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয়কে এই ভাবে আহত ও দণ্ডিত করিবার কারণ কি, বুঝিয়া উঠা যায় না। কলিকাতার মেয়রের পদমর্য্যাদা সামান্য নহে। কলিকাতার শান্তিরক্ষার জন্য পুলিস-কমিশনারের সহিত তাঁহার পরামর্শ করিবার অধিকার আছে। অথচ তাঁহাকেই এই নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে! যে শান্তি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, এই কাণ্ডের ফলে তাহা কি সম্ভব হইবে? দেশের লোকের মন কি ইহাতে সন্তোষলাভ করিবে? কর্ত্তৃপক্ষের এখন এ কথা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখা উচিত।

ভারতের পক্ষে কথা

প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের ঘোষণার সারাংশ পাঠ করিয়া যদিও প্রথম মুখে কেন্দ্রীয় সরকারে দায়িত্ব সম্বন্ধে কায়ার পরিবর্ত্তে ছায়াপ্রাপ্তির সংশয় স্বতঃই ভারতবাসীর মনে উদয় হয়, তথাপি উহাই যে তাঁহার শেষ কথা নহে এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার সরকার ভারতবাসীর মতামত অপেক্ষা করিতেছেন, তাহা তাঁহার কথা ও কাযে বুঝা যায়। যদি তিনি ও তাঁহার সরকার শান্তিপ্রয়াসী ও আপোষ-বন্দোবস্তের জন্য উৎসুক না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতীয় কংগ্রেস-নেতৃগণকে মুক্তিদান করিতেন না বা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রস্তাব আলোচনা করিয়া মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতেন না।

কথাতেও তাঁহাদের শান্তিকামনার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। কিছু কিছু বাঁধন-কষণ রাখিয়া ভারতকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রদান করা তাঁহাদের মূলনীতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের জাতীয় দলের নেতারা দেড় বৎসর পূর্ব্বে এই ভাবের ঘোষণা পাইলে বৃটিশ সরকারের সহিত আপোষ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

তাহার পর মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণায় বলিয়াছেন, "ইতি-মধ্যে যাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলনে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা যদি বড়লাটের আহ্বানে সাড়া দেন, এবং যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ঘোষণানুযায়ী মোটামুটি কার্য্যে সহযোগ করিবার ইচ্ছা ভারতীয়দের আছে, তাহা হইলে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবার সুযোগ দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।" ইহাতেই বুঝা যায়, গোল টেবিল বৈঠকের কার্য্যসাফল্য যাহাই হউক না, আপোষ-বন্দোবস্ত কংগ্রেস-নেতৃবর্গের সহিত করিবার ইচ্ছাই বৃটিশ সরকারের মনে প্রবল রহিয়াছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, কংগ্রেসের অর্থাৎ জনমতের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং বৃটিশ সরকারের প্রকৃত মিলনেচ্ছা পরিস্ফুট হইয়াছে। এখন কথা, দেশ ও কংগ্রেসের পক্ষে কথা কি বলিবার আছে? সে বিষয়ে কংগ্রেস-নেতৃবর্গ আপনাদের মধ্যে বিচার আলোচনার পর এবং বৈঠকের মডারেট নেতৃবর্গের সহিত কথাবার্ত্তার পর স্থির করিবেন। তবে জনসাধারণের পক্ষ হইতে বলা যায় যে, আপোষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এখন বিশেষ বিবেচনার সহিত বীজ বপন করিলে ভাল ফসল হইতেও পারে। ঐ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের প্রস্তাব সাইমন রিপোর্ট বা বড়লাটের সরকারের ডেসপ্যাচ অপেক্ষা অনেকটা ভাল। সুতরাং এ পর্য্যন্ত আপোষের পথের অবস্থা অনেকটা ভাল করা হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু তথাপি মিঃ ম্যাক-ডোনাল্ডের প্রস্তাব জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার পক্ষে যে যথেষ্ট নহে, এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে। লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, এ কথাও সত্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব বড়লাট গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই যে কংগ্রেসে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা গন্ধী যে প্রস্তাব করেন, তাহাতে স্বাধীনতার কথা ছিল না, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীই ছিল। তাহার পরেও মহাত্মা গন্ধী জেলে থাকিয়াও মিঃ স্লোকোম্বের মারফৎ যে প্রস্তাব করেন, তাহাতেও 'স্বাধীনতার কায়া' কথা ছিল। সুতরাং যাহাতে স্বাধীনতার কায়া আছে, এমন শাসন প্রবর্ত্তন করিলে এ দেশের জনমতের আপত্তি থাকিবে না, এইরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। দেখিতে হইবে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের ঘোষণায় তাহার আভাস পাওয়া যায় কি না।

'ষ্টেটসম্যান' প্রমুখ সংবাদপত্রসমূহ বলিতেছেন, "মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড ভারতীয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। যদি ভারতীয়দের সামান্য রাজনীতিক জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহারা এই প্রস্তাব লুফিয়া লইতে অগ্রসর হইবে। শাসনে যে দায়িত্ব তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে, তাহার উপরে তাহারা আর কি চাহে?" এ দিকে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মত মনস্বী ভারতীয় প্রতীচ্য হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কোন সাংবাদিককে বলিয়াছেন, "স্বায়ত্তশাসনের কোন কোন যন্ত্রাংশ আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই যদি আমরা মনে করি, আমরা যাহা দাবী করিয়াছি, তাহা পাইয়াছি, তাহা হইলে বিষম বিপদের সম্ভাবনা আছে। যন্ত্রের এঞ্জিন ও চাকার মধ্যে যে অনেক ব্রেক (বাঁধন-কষণ) আছে, সে কথাও আমাদিগকে ভাবিতে হইবে। আমি বলি না যে, এই দান আমাদিগকে অগ্রাহ্য করিতেই হইবে। তবে এইটুকু দেখা চাই যে, যে কল্পনা করা হইয়াছে, উহা বাস্তবে পরিণত হইলে আমাদের সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব।"

আমাদের মতে ইহাই এখন প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

মহাত্মা

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অন্যান্য সদস্যের সহিত মহাত্মা গন্ধীও মুক্তি পাইয়াছেন। যিনি অধ্যাত্মজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, ত্যাগ ও সাধনার ফলে যিনি দেহ অপেক্ষা আত্মাকে বহু উর্দ্ধে স্থান দিতে সমর্থ হইয়াছেন, নব-ভারতের মুক্তিমন্ত্রের গুরু সত্যসন্ধ সেই মহাত্মা গন্ধীকে কারাকক্ষের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও তিনি যে সদা মুক্ত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। জীবনে মরণে মুক্তপুরুষকে কেহ ক্ষুদ্র কারাপ্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। তবে ব্যবহারিক জগতের দৃষ্টিতে তিনি যে রাজবন্দী ছিলেন এবং লর্ড আরউইনের সরকার যে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দূরদর্শিতা ও রাজনীতিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

তবে সরকারের শীর্ষস্থানীয়ের মনোভাব যাহাই হউক, নিম্ন-পদস্থগণের ব্যবহারে এখনও সঙ্কীর্ণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এবার লবণ-আইন অমান্য করা সম্পর্কে তাঁহাকে যেমন গভীর নিশীথে লোকলোচনের অজ্ঞাতে ধৃত করা হইয়াছিল, মুক্তিদানকালেও ঠিক তেমনই ভাবে তাঁহাকে গভীর নিশীথে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। ইহার কারণ কি? দিবাভাগে তাঁহার মুক্তির আশায় বহু দেশবাসী যারবেদা কারাগৃহের সম্মুখে আগ্রহভরে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হতাশ হইয়াছিল। তাঁহাকে মুক্ত দেখিবার আনন্দ হইতে তাহাদিগকে অনর্থক বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। এ সঙ্কীর্ণতার কি প্রয়োজন ছিল? যখন জনগণকে সন্তুষ্ট করাই অভিপ্রেত, তখন এই আনন্দ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইল কেন? যদি স্থানীয় কর্ম্মচারীরা মনে করিয়া থাকেন যে, ইহাতে শান্তিভঙ্গ হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিতই ভুল বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে তাহাদিগকে এই আনন্দপ্রকাশে বাধা দিলেও তাহাদের হৃদয় হইতে কি মহাত্মাকে অপসারিত করিতে পারিয়াছিলেন? ইহার পর যখন মহাত্মা গন্ধী বোম্বাই সহরে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার দর্শনের জন্য আজাদ-ময়দানে তিন লক্ষাধিক লোক সমাগম হইয়াছিল। ইহাতেই কি মনে হয় না, জনগণের উপর মহাত্মার প্রভাব কি অসাধারণ?

মহাত্মা গন্ধী

মহাত্মা মুক্তির পর গোল টেবিল বা মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের ঘোষণা সম্বন্ধে কি বলিবেন, ইহা লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। কিন্তু লোকের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, হঠাৎ এ সম্বন্ধে তিনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। হয় ত এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব কোন মত সংগঠিত হইতে পারে। কিন্তু তিনি সদ্য কারামুক্ত হইয়াই দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া অথবা অন্যান্য কংগ্রেসকর্ম্মীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কিম্বা যে সপ্রু-জয়াকর প্রমুখ গোল টেবিলের মডারেট নেতারা তাঁহাকে তাঁহাদের ভারতে পৌঁছানর পূর্ব্বে কোন কিছু করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া ইচ্ছামত কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না, ইহা তিনি যত ভাল বুঝেন, তত আর কে বুঝিবে?

সাংবাদিকগণের বিবৃতিতে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "যাঁহারা আমার প্রবর্ত্তিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া ত্যাগ ও কষ্ট বরণ করিয়া কারারুদ্ধ রহিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া এখন কোন কথাই বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন নহে। বহুসংখ্যক কংগ্রেসকর্ম্মী এখনও কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। তাঁহারাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার অধিকারী। সুতরাং তাঁহাদেরও মুক্তি হওয়া এখন বিশেষ প্রয়োজন।"

যদি কংগ্রেসের সহিত সদ্ভাব-প্রতিষ্ঠার ও কংগ্রেসের মতামতের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে কংগ্রেসের প্রবর্ত্তিত আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে যে সকল কংগ্রেসকর্ম্মী দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মুক্তি না হইলে কিরূপে তাঁহাদের মতামত সংগৃহীত হইতে পারে? ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্ধ প্রবাসী য়ুরোপীয় সমাজের এক শ্রেণীর লোক রাজবন্দীদের মুক্তিতে বাধাপ্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য মান্দ্রাজের য়ুরোপীয় সমাজ তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব মানিতে চাহেন নাই, এ কথা সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও এক শ্রেণীর য়ুরোপীয় যে কংগ্রেসনেতৃগণকে মুক্তিদান করায় ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি যে তাঁহারা কিছুতেই হজম করিতে পারিবেন না, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অথচ এইভাবে মুক্তিদান না করিলে শান্তির আবহাওয়া বহিবে কি প্রকারে, তাহাও ত বুঝিতে পারা যায় না।

মহাত্মা গন্ধীর কারামুক্তির পর বহু সাংবাদিক তাঁহার সহিত কথোপকথনের বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন বিবৃতিতে আছে যে, "তিনি কংগ্রেসের ১১ দফা এবং তাঁহার তিন দফা সর্ত্ত দিয়া বলিতেছেন যে, যদি বৃটিশ সরকার ইহাতে সম্মতি দান করেন, তবেই তিনি কংগ্রেস-মিলনের কথায় সম্মত হইতে পারেন।" কংগ্রেসের ১১ দফা সর্ত্তের কথা পুরাতন, সুতরাং উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার তিন দফা নূতন। এই তিন দফায় তিনি বলিয়াছেন যে, "লবণ-আইন ভঙ্গ, মাদক-দ্রব্য পিকেটিং এবং বিদেশী বস্ত্রাদি পিকেটিং কোন কালেই কংগ্রেস কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইবে না। উহাতে আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্য নাই, দেশের দারিদ্র্য ও দুরবস্থা দূর করাই উহার উদ্দেশ্য, এবং যে কোন সরকারই প্রতিষ্ঠিত হউক, এই তিন বিষয়ে কার্য্যানুষ্ঠান করিতেই হইবে, নতুবা দেশের মঙ্গল নাই।" অর্থাৎ মহাত্মা গন্ধীর মনোভিপ্রায় এই যে, যদি স্বরাজ সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও দেশের মঙ্গলের জন্য ইহা করিতে হইবেই।

সাংবাদিকের এই কথা কতদূর সত্য, তাহা মহাত্মা গন্ধীর নিজস্ব কোন ঘোষণা প্রকাশিত না হইলে জানিবার উপায় নাই। তবে মহাত্মা গন্ধী এখনও এই বিবৃতির প্রতিবাদ করেন নাই। এই হেতু অনেকে ইহাকে মহাত্মার উক্তি ও মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া ধরিয়া লইতেছে, এবং সেই জন্যই এ দেশে ও বিলাতে কেহ কেহ তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতেছে। বিলাতের একখানি শক্তিশালী সংবাদপত্র ত তাঁহাকে "বিদ্রোহী" বলিয়া অভিহিত করিয়াই ফেলিয়াছে। অবশ্য এক হিসাবে তিনি বিদ্রোহী, কেন না, যাঁহারা জগতের গতানুগতিক ভাবধারায় বাধা প্রদান করিয়া নূতন ভাবের বন্যা আনয়ন করেন, তাঁহারা যে বিদ্রোহী, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা গন্ধী এই হিসাবে বিদ্রোহী।

কিন্তু ব্যবহারিক জগতে 'বিদ্রোহী' কথা যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মহাত্মাকে সেই হিসাবে বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত করিলে হাসি পায়। যিনি অহিংসা মন্ত্রের প্রচারক, যিনি নিজ জীবনে প্রেম ও সত্যকে আশ্রয় করিয়া মানব-হৃদয়ের জয়যাত্রায় ব্রতী হইয়াছেন, যিনি ভারতের মুক্তি-সমরে অহিংসাকেই প্রধান ও কেবলমাত্র অস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,—তিনি হিংসামূলক বিদ্রোহের নায়ক, এ কথা বলিতে যাহারা লজ্জানুভব করে না, তাহারা কৃপার পাত্র! অধিক কথা কি, এ দেশের অবস্থাভিজ্ঞ কোন উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয় রাজপুরুষ কয়েক দিন পূর্ব্বে আইন-সভায় বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই যে,—'আইন অমান্য আন্দোলন হিংসার পথ প্রশস্ত করিয়াছে।' সত্যের অপলাপ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে, আমরা জানি না।

এই শ্রেণীর বিকৃতমস্তিষ্ক স্বার্থান্ধদিগকে আমরা পার্লামেন্টের সদস্য ও ডেপুটী স্পীকার সার রবার্ট ইয়ং মহাশয়ের মহাত্মা গন্ধী সম্বন্ধে অভিমত পাঠ করিতে বলি। তিনি বলিয়াছেন, "যত দিন জগদ্বাসিমাত্রেই গন্ধী-মনোবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত না হইবে, তত দিন জগতের শান্তি ও উন্নতির কোন আশা নাই। মহাত্মা গন্ধীর ভাবধারায় স্নাত প্লাবিত হওয়া কঠিন কথা, ইহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু তথাপি আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতের জগৎ রাজা-রাজড়া, ক্ষমতা ও জাঁকজমকের পরিবর্ত্তে গন্ধী-মনোবৃত্তির দ্বারাই প্রভাবিত হইবে।" এমন লোক যদি বিদ্রোহী হয়, তাহাতেও জগতের লাভ আছে।

কারার অন্তরালে

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যরূপে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মুক্তি পাইয়াছেন। তিনি যে যারবেদা জেলে বন্দিনী ছিলেন,

সেই যারবেদা জেলে পুরুষ কয়েদী বিভাগে 'মহাত্মা গন্ধী' বন্দী ছিলেন, আর নারী কয়েদী বিভাগে তাঁহার মত স্বনামধন্যা সর্ব্বজন-মান্যা দেশসেবিকা ও দেশনায়িকা শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ও বন্দিনী রহিয়াছেন। তিনি অবশ্য মুক্তি পান নাই, কেন না, তিনি ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ছিলেন না।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

শ্রীমতী কমলাদেবীর স্বামী শ্রীযুক্ত হারিণ চট্টোপাধ্যায়ও এখন রাজবন্দিরূপে নাসিক জেলে অবস্থান করিতেছেন। তিনি Artist, রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দেশের সঙ্কটের দিনে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় হইতে তিনি প্রকৃত জীবননাটকের অভিনয়-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। বোম্বাইএর আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া তিনি পত্নীর মত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী কমলাদেবী গত ৪ঠা জানুয়ারী যারবেদা সেন্ট্রাল জেল হইতে বাহিরে তাঁহার কোনও বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর কারা-জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে উচ্চমনা দেশকর্মীর কারাজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আকুলি-বিকুলির ভাবা কি চমৎকারভাবেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে! শ্রীমতী কমলাদেবীকে দেখিবার বা তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারাই জানেন, এই দেশপ্রেমিকা মহিলা কিরূপ উচ্চশিক্ষিতা এবং কিরূপ অসাধারণ শক্তিশালী বাগ্মী। বোম্বাই সহরে লক্ষাধিক লোককে ধীরস্থির-শান্তভাবে এক ঘণ্টারও অধিককাল মুগ্ধচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে দেখা গিয়াছে। জনগণের উপর—বিশেষতঃ কলের শ্রমিকগণের উপর তাঁহার প্রভাব কিরূপ অসাধারণ।

এরূপ গুণান্বিতা মহীয়সী নারীর কারাজীবনের অন্তরাল হইতে বুকের ভাবা পত্রের মধ্য দিয়া কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা জানিতে সকলেরই আগ্রহ হয়। আমরা এই হেতু পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"প্রিয় সখি,—তুমি আমাদের উভয়কে শুভেচ্ছা জানাইয়াছ, উহাতে আমার জেলের পূর্ব্বজীবনের সুখস্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছে। এই 'স্বাস্থ্যনিবাস' (জেল) হইতে যাত্রার পূর্ব্বে আমিও তোমাকে লিখিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু সে বিষয়েও আমার 'গণ্ডী' বড় সামান্য নহে। তবে চিন্তায় আমার ভালবাসা তোমাকে অনুক্ষণ অনুসরণ করিয়াছে—তোমায় স্পর্শ করিয়াছে!

"তোমার শুভেচ্ছা আমি হারীণকে জানাইব—অবশ্য অপরের মারফতে। আমি জানি, তিনি উহা পাইলে খুবই আনন্দিত হইবেন। তিনি এখন নাসিক জেলে আছেন, তাঁহাকে দড়ী বুনিতে দেওয়া হইয়াছে—সশ্রম কারাদণ্ড কি না! তাঁহার ভাব-প্রবণ অঙ্গুলীর স্পর্শে দড়ী বুনিয়া উঠিতেছে, ইহা ভাবিতেও কি বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় না!

"রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে তাঁহাকে অনেক ক্ষেত্রে কর্কশ-চরিত্রের সংস্পর্শে আসিতে হয়। দড়ীটাও যে বিশেষ কোমল নহে, তাহাও সকলে জানে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, একটিতে কলা-কৌশলের অপূর্ব্ব সৃষ্টিশক্তির বিকাশ হয়, অপরটিতে দৈনন্দিন বাঁধাধরা 'রুটীনের' কাবে অবসন্নতা ও জড়তার আত্মপ্রকাশ হয়! তবু জেলের জীবনের একটা নিজস্ব মাদকতা আছে, আকর্ষণী শক্তি আছে, এ জীবন মানুষের গতানুগতিক সাংসারিক জীবন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহার অভিজ্ঞতা স্পৃহণীয়।

"প্রথমে জেলে আসিয়াই আমি সাংসারিক জীবনের যেটুকুর অভাব অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা দিক্‌চক্রবাল! মনে কি বিস্ময়ের উদয় হয় না যে, আমি যে জগতে বাস করিতেছি, তাহার আকাশে দিক্‌চক্রবাল নাই? কারাকক্ষের সম্মুখের অঙ্গনের মাথায় একটুকু খণ্ড আকাশ—তবুও সে আকাশ! কিন্তু কারাপ্রাচীরের বিকট উচ্চতার অপর পারে দূরে—বহু দূরে কোথাও ত সে আকাশে দিক্‌চক্রবাল নাই, কেবল কর্কশ প্রাণহীন প্রাচীর আর প্রাচীর!

"আমি প্রথমে দিক্‌চক্রবাল না দেখিতে পাইয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম। আমার মনে তখন কেবল একটা অবসন্নতা, জড়তা আসিয়া উদয় হইল। সে অবসন্নতা আমার নয়নে কি মোহিনী তন্দ্রার সুখস্পর্শের তুলিকা বুলাইয়া দিয়া গেল। সেই হইতে আমার মনে হইয়াছিল, যেন আমি ৭ দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘুমাইয়াছিলাম! এই বিরাট কারার নির্জ্জন কক্ষে আমি একা, আর আমার সঙ্গে আমার বিরাট ঘুম,—কি সুন্দর!"

ত্যাগের দীপ্তিতে সমুজ্জল দেশপ্রেমিকার মুখে কারাকষ্টের বিপক্ষে একটা অভিযোগ নাই, কেবল উন্নত শিক্ষিত মনের ক্ষুধার পরিচয় আছে! ইহা কি উপভোগ্য নহে?

বর্ত্তমান আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ

মহাত্মা গন্ধী যখন প্রথম অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন, তখন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গন্ধীর নীতির কঠোর সমালোচক ছিলেন, বোধ হয়, এ কথা দেশবাসী বিস্মৃত হন নাই। তিনি সে সময়ে তাঁহার কার্য্যপদ্ধতিকে কল্পনাপ্রবণ বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। চরকা ও খদ্দরের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রতীচ্য-ভ্রমণের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, এখন তিনি মহাত্মা গন্ধীর ও তাঁহার আন্দোলনের গুণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বিপ্লবের ইতিহাসে ভারতবর্ষ এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। উহা ভারতের আধ্যাত্মিকতার সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। ভারত তাহার উদ্দেশ্যসাধনার্থে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহার মূল উপাদান নৈতিক আবেদন—ত্যাগ ও দুঃখকষ্ট বরণ। রাজনীতিক মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে ভারত যে সংগ্রাম করিতেছে, কেবল তাহার জন্য নহে, এই অপূর্ব্ব নৈতিক আবেদনের দ্বারাও ভারতবর্ষ জগদ্‌বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি রাজনীতি চর্চ্চা করেন না। তথাপি যখন তাঁহার মুখ হইতে এই বাণী প্রচারিত হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায়, বর্ত্তমান আন্দোলন নীতিধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য ইহাতে অনাচার একবারে স্পর্শ করে নাই, এমন কথা আমরা বলি না। প্রত্যেক আন্দোলনেই অনাচার ও ব্যভিচার দেখা দিয়া থাকে। যেখানে সংখ্যাতীত জনগণকে লইয়া কার্য্য করিতে হয়, সেখানে ইহা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মূলতঃ দেখিতে হইবে, সেই আন্দোলনের 'প্রাণ' কোথায়। যিনি অহিংসা ও ত্যাগের মূর্ত্ত প্রতীক, সেই সত্যসন্ধ মহাত্মা গন্ধীর আন্দোলনের সম্পর্কে যদি কোথাও হিংসা বা অসত্যের বা স্বার্থের সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যাহাদের দ্বারা সে অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারা মহাত্মার প্রকৃত উপদেশ বুঝিতে সমর্থ হয় নাই।

নারী-জাগরণ

লাহোরে নিখিল এসিয়া নারী-সম্মেলনের বৈঠক হইয়া গেল। মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ব্যাপার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু কালের স্রোতঃ অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে, উহার সম্মুখে বহু দিনের সঞ্চিত বাধা-বিঘ্ন ভাসিয়া যাইতেছে। জাপান, চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম, পারস্য, আরব, ভারত প্রমুখ প্রাচীন এসিয়ার নারীমণ্ডলী একত্র সমবেত হইয়া পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করিবেন ও তথা নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে তাঁহাদের দাবী জগদ্‌বাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন, ইহা কি কেহ ইহার পূর্ব্বে কল্পনাও করিয়াছিল? প্রতীচ্যের ইংলণ্ডে নারী আন্দোলন ও সফ্রেজিষ্টদের মুক্তি-সংগ্রাম ত সে দিনের কথা। তাহার পূর্ব্বে কত যুগ ধরিয়া প্রতীচ্যের নারীরা আপনাদের অধিকারের জন্য যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিলেন! কিন্তু ভারতের নারী আন্দোলন ও তথা এসিয়াবাসিনী নারীর এই জাগরণ কত অল্পসময়ের কথা! যাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এত দিন অসূর্য্যম্পশ্যা বিশুদ্ধান্তঃপুরচারিকা ছিলেন, তাঁহারা যে কোন কালে প্রকাশ্য জগতের ধূলিমলিন সংসারের পথে আবির্ভূত হইয়া আপনার গণ্ডা আদায় করিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইবেন, ইহা কি বাস্তবিকই স্বপ্নকথা ছিল না?

মাত্র ২০ বৎসর যাবৎ জগতের সর্ব্বত্রই নারী-জাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। কোন কোন দেশে নারীরা পুরুষের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন এবং একে একে শৃঙ্খলের অনেক বন্ধন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রধানতঃ জার্ম্মাণ যুদ্ধের পরই নারী আন্দোলন প্রবল হইয়াছে। তথায় পূর্ব্বে যে সকল আইনের বলে নারীরা পুরুষের নিম্নস্থান অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশই প্রত্যাহৃত অথবা সংশোধিত-পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

সুদূর প্রাচ্যে জাপান ও চীনে নারীর অবরোধ ছিল না বটে, কিন্তু নারীর স্থান পুরুষের নিম্নে বহু শতাব্দী ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। জগতের নূতন ভাবধারায় স্নাত-প্লাবিত হইয়া তথাকার নারীদের মধ্যে জাগরণ দেখা দিয়াছে। নিকট প্রাচ্যে অর্থাৎ য়ুরোপের সান্নিধ্যে তুর্কী ও আরব দেশে মুস্তাফা কামাল পাশার স্বাধীনতাযুদ্ধে জয়যাত্রার সময় হইতেই নর-নারীর মুক্তির আবহাওয়া প্রবাহিত হইয়াছে। মধ্য-এসিয়াতেও তাহার প্রভাব বিসর্পিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে মহাত্মা গন্ধীর মুক্তির আন্দোলন নারী-জাগরণের মূল কারণ। ভারতের বর্ত্তমান মুক্তির আন্দোলনে

এ দেশের নারীর প্রাপ্য জয়ের অংশ কতটুকু, তাহা মহাত্মা গন্ধী স্বয়ং কারামুক্ত হইবার পর নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"এই আন্দোলনে নারীর ত্যাগ, সাহস ও বীরত্ব অতুলনীয়।" বস্তুতঃ ভারতের নারী পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুঃখ-বিপদ-বরণে ত্যাগের ও সাহসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই জাগরণ যে অল্পসময়ের মধ্যে সম্ভব হইয়াছে, অন্য সময়ে তাহা শত শতাব্দীতেও হইত কি না সন্দেহ। গোল টেবিল বৈঠকের প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টে বক্তৃতাকালে স্বয়ং ভারত-সচিব মিঃ বেন ভারতের নারী-জাগরণের কথা বলিতে গিয়া শ্রদ্ধায় অবনতমস্তক হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, "যাঁহারা ভারতের সংবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, ভারতের পুরুষ ও নারীর তরুণবয়স্করা ভারতের জাতীয়তা পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছে।"

এই বৈঠকে সিংহল, পারস্য, আরব, ব্রহ্ম, চীন, শ্যাম, যবদ্বীপ, ভারত প্রমুখ বহু প্রাচীন দেশের নারী প্রতিনিধিরা মনীষা, শিক্ষা-দীক্ষার উৎকর্ষ ও চিন্তাশক্তির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে কোনও দেশের মনীষী পুরুষগণেরও পক্ষে গৌরবের বিষয়। এতদ্ব্যতীত মার্কিণ, নিউজিল্যাণ্ড ও য়ুরোপেরও কোন কোন দেশ হইতে নারী দর্শক এই বৈঠকে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। এ দৃশ্য কি অভিনব ও আশ্চর্য্য নহে?

বৈঠকের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী রাফি। তিনি মুসলমান মহিলা। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় বৈঠকের অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এসিয়ার ভগিনীদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত মঞ্চের সামিয়ানার সম্মুখে রক্তবর্ণ খদ্দরে লিখিত ছিল,—"এস ভগিনীগণ, ভারতের সাদর প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ কর।" নিখিল ভারত অভ্যর্থনা সমিতির লাহোর শাখার সদস্যারা মণ্ডীর রাণী অমৃত কউরের নেতৃত্বে দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিদিগকে মঞ্চের উপর সাদরে লইয়া গিয়াছিলেন। ঐ সদস্যাদের মধ্যে সিংহলের লেডী বন্দরনায়িকা এবং রাণী রাজওয়াড়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী পি, কে, সেনের নেতৃত্বে বালিকারা বেদমন্ত্র গান করিয়াছিল।

কাপুরথালার মহারাণী অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যা পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন ব্রহ্মবাসিনী প্রতিনিধিরা। অপর পার্শ্বে ছিলেন সিংহলের প্রতিনিধি লেডী দিয়াস

লাহোরে নিখিল এসিয়া নারী-সম্মেলনের সদস্যাবৃন্দ

উপবিষ্ট—(১) শ্রীযুক্তা দস্তুর, (২) শ্রীযুক্তা দে, (৩) ডাঃ সুখলওকার (৪) শ্রীযুক্তা হামিদ আলি, (৫) শ্রীযুক্তা পি, কে, সেন, (৬) ডাঃ রেড্ডি, (৭) রাণী রাজোয়াড়ে, (৮) রাজকুমারী অমৃত কউর, (৯) মিসেস মাইলস আরভিং, (১০) মিসেস কজিনস, (১১) শ্রীযুক্তা ফরিদুনজি।
দণ্ডায়মান—(১) মিস্ কোপল্যাণ্ড, (২) শ্রীযুক্তা নাপ্পাম্মা, (৩) মিস্ ভিনসেণ্ট, (৪) শ্রীযুক্তা প্রাণনাথ, (৫) কুমারী গুপ্তা, (৬) কুমারী যাদব, (৭) কুমারী ভবনগরী, (৮) শ্রীযুক্তা দয়াকুবেণ।
ভূমিতে উপবিষ্ট—(১) কুমারী ক্ষেমচাদ, (২) শ্রীযুক্তা ওয়াগ্‌লে, (৩) শ্রীযুক্তা কমলা কৌল।

বন্দরনায়িকা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ। নিকটেই ছিলেন আয়তলোচনা পারসীক ও আফগান মহিলা প্রতিনিধিরা। যবদ্বীপ হইতে যে দুইটি নারী প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাহার পর ভারতের নারী প্রতিনিধিরা। তন্মধ্যে মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার মুথুলক্ষ্মী রেড্ডীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই নারী বৈঠকের সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়,—তাঁহাদের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন। সভায় যখন বিঘোষিত হইল যে, অধিকাংশ প্রতিনিধিই শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তখন এমন হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল যে, সভা বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়! ভারতের জাতীয়তার প্রতি এই সম্মান-প্রদর্শন নারী-জাগরণের যে পরিচয় দিয়াছে, তাহার তুলনা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? জগতের নারীগণের মধ্যে যাঁহার মনীষা ও প্রতিভার কথা সর্ব্বত্র বিদিত, এসিয়ার নারীর কোমলতা, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির যিনি যোগ্যা প্রতিভূ, যাঁহার দেশমঙ্গলের জন্য অদ্ভুত ত্যাগের কথা দিকে দিকে বিঘোষিত,—তাঁহার প্রতি সমগ্র এসিয়ার নারী আজ যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভারতের নারী-জাগরণের এবং নারীর মুক্তিচেষ্টার প্রতিই প্রদর্শিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

আরও সুখের কথা এই যে, সিরিয়া প্রদেশের বেরুট বন্দরবাসিনী শ্রীমতী হামিদা নূর সর্ব্বপ্রথমে সরোজিনী নাইডুর নাম প্রস্তাব করেন। শিক্ষিতা মুসলমান নারীর ভারতের মুক্তি-যুদ্ধের প্রতি এই সহানুভূতি বস্তুতঃ বড়ই উপভোগ্য। শ্রীমতী হামিদা নূর স্বয়ং গত জুলাই মাসে প্রাচীন দামাস্কাস সহরে আরবের প্রাচ্য নারীগণের যে কংগ্রেস বসিয়াছিল, তাহার প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

প্রাচ্যের এই নারী-জাগরণ, অভূতপূর্ব্ব, অচিন্তনীয়, অনুপমেয়। আশা করা যায়, ইহা হইতে জগতের মঙ্গলই উদ্ভূত হইবে। আমাদের মনে হয়, প্রাচ্যের নারী পুরুষের সহিত যে সমানত্বের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রতীচ্যের নারীর একত্ব-লাভের চেষ্টার অনুরূপ হইবে না, প্রাচ্যের নারীর জাতীয় ভাবধারারই অনুরূপ হইয়া সংসার ও গৃহের অশেষ মঙ্গলকর হইবে। পরন্তু এই জাগরণের ফলে যাহা কিছু পুরাতন, তাহাই জঘন্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে না। বহু শতাব্দী যাবৎ যে সকল আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া এখনও জীবন্ত রহিয়াছে, তাহাও সময়োপযোগী নহে বলিয়া ঘৃণায় পরিত্যক্ত হইবে না। অবশ্য যাহা যথার্থ ই কুসংস্কার এবং অধর্ম্ম ও অসদাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা দূরে পরিত্যক্ত হউক, তাহাতে কোন শিক্ষিত সমাজতন্ত্রেরই আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যেহেতু বিদেশী বিধর্ম্মীর দৃষ্টিতে এই আচার জঘন্য, অতএব ইহা পরিত্যাজ্য,—ইহাও সমর্থিত হইতে পারে না। আমাদের আশা আছে, এই নারীপ্রগতি এসিয়াকে উচ্চস্তরে উন্নীত করিবে।

—

এ দেশ ও বিদেশের গম

এ দেশে পঞ্জাবের গমের সকল প্রদেশেই কাটতি আছে। পঞ্জাবে গম অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আর পঞ্জাবের গম বিদেশের গম অপেক্ষা গুণে উৎকৃষ্ট। অথচ অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম এ দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? দেশে ভাল ও অধিক গম উৎপন্ন হইলেও কলওয়ালারা অষ্ট্রেলিয়ার গম আমদানী করে কেন, ইহা জানিবার বিষয়। তদন্তের ফলে দেখা গিয়াছে যে, লাহোর হইতে রেল-যোগে কলিকাতায় গম আমদানী করিতে গেলে যে মাশুল পড়ে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে জাহাজে আনিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম পড়ে, সেই হেতু অষ্ট্রেলিয়ার গম অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে বিকায়। ইহাই বিদেশী গম আমদানীর মূল কারণ। লাহোর হইতে কলিকাতায় গম আনিতে মণকরা ১ টাকা ।/০ আনা মাশুল লাগে; আর অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আনিতে মণকরা ।৶০ আনা মাশুল লাগে। অথচ দূরত্ব হিসাবে অষ্ট্রেলিয়া কত নিয়ে পড়িয়া থাকে!

গুণের তারতম্যও এইরূপ:—পঞ্জাবের গম হইতে শতকরা ৭১·৫ হইতে ৭৫·৮ ভাগ আটা-ময়দা পাওয়া যায়। পঞ্জাবের অন্য এক শ্রেণীর গম হইতে শতকরা ৭৩·৯ হইতে ৭৫·৫ ভাগ আটা-ময়দা প্রস্তুত হইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ার গম হইতে শতকরা ৭৫ ভাগ আটা-ময়দা পাওয়া যায়। পরন্তু পঞ্জাবের আটা-ময়দা হইতে যে চাপাটি প্রস্তুত হয়, উহা অষ্ট্রেলিয়ার আটা ময়দার চাপাটি হইতে খাইতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।

সুতরাং বুঝা যায়, পঞ্জাবের গমের তুলনায় বিদেশের গম দাঁড়াইতে পারে না। যদি এ দেশের রেলের মাশুল কমাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিদেশী গমের এ দেশে কাটতি হয় না। স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে এ দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি নিশ্চিতই আকৃষ্ট হইত।

বিদেশের দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জেণ্টিনা, রুসিয়া, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দানিউব নদ-তটবর্ত্তী দেশ প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন করে। এবার সকল দেশেই অত্যধিক পরিমাণে গম উৎপন্ন হইয়াছে। আর্জেণ্টিনায় ২ কোটি কোয়ার্টার, অষ্ট্রেলিয়ার

দেড় কোটি কোয়ার্টার, কানাডায় ৩ কোটি কোয়ার্টার। মোট ৬ কোটি ৫০ লক্ষ কোয়ার্টার গম এবার বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। জগতের সমস্ত চাহিদা সরবরাহ করিবার পরেও আগামী জুলাই মাসে এত মাল মজুত থাকিবে যে, পর-বৎসরের জন্য ভাবিতে হইবে না। এ দিকে আর ৪ মাসের মধ্যেই আমেরিকায় নূতন ফসল উৎপন্ন হইবে।

অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সপ্তাহে দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে সাড়ে ১২ লক্ষ কোয়ার্টার, রুসিয়া ও দানিয়ুব-তটবর্ত্তী দেশ হইতে ১৫ লক্ষ কোয়ার্টার, কানাডা হইতে ৩৫ লক্ষ কোয়ার্টার গম জগতের বাজারে ছাড়া হইবে। এই ভাবে জগতের বাজার গমের দ্বারা ছাইয়া ফেলিলে গমের দর কত নামিয়া যাইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার উপর কানাডায় জুলাই মাসের নূতন ফসল দেখা দিলে দর যে আরও নামিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও আর্জেন্টিনা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে ঠিকমত গম আমদানী আরম্ভ হয় নাই, তাহাতেই গম ও আটা-ময়দার দর নামিয়া গিয়াছে। যখন রীতিমত আমদানী হইবে, তখন যে দর হু হু নামিয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। এখন সকল দেশেই হইয়াছে অর্থাভাব, তাই যে যত কাঁচা মাল বা পণ্য অপরের বাজারে কাটাইতে পারে, ততই তাহার সুবিধা। এই হিসাবে লোকের সস্তা বাজারে যেমন একপক্ষে লাভ, অপর পক্ষে তেমনই টাকার দুর্ভিক্ষে পরম ক্ষতি।

সলমা চুমকির কারবার

বিদেশ হইতে এ দেশে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও করাচী বন্দরের মার-ফতে প্রতি বৎসর বিস্তর সলমা চুমকি আমদানী হইয়া থাকে। এই আমদানীর ফলে দেশের সলমা-চুমকির ব্যবসায় ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। আমাদের দেশের সুরাট সহরেই দেশী চুমকির ছোট ছোট কারখানার সংখ্যা অধিক। অন্যান্য কয়েক স্থানেও কিছু কিছু মাল দেশীয় কারখানায় উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতায় এই দেশীয় ব্যবসায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না।

টেরিফ বোর্ড ভারতের সলমা চুমকি ব্যবসায় সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই ব্যবসায়ের রক্ষণকল্পে বিদেশী আমদানী পণ্যের উপর মূল্য হিসাবে শতকরা ৫০ টাকা শুল্ক বসাইতে হইবে। সোনা, রূপা বা নকল—তিন রকম সলমা চুমকির উপরেই এই শুল্ক বসান প্রয়োজন।

বোর্ড বলিয়াছেন, "আমরা সুরাটকেই এই দেশীয় ব্যবসায়ের প্রতিভূরূপে ধরিয়া লইয়া তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি, বর্ত্তমানে সুরাটে ৪ শত ১০টি ছোট কারখানা আছে, এ সব কারখানায় বিদ্যুতের সাহায্যে কল চালান হয়। ২ শত কারখানায় দিন-মজুরের হাতের কায চলে। কারখানাগুলির কারিকর ও মজুরের সংখ্যা মোট ৬ হাজার হইবে, আর বৎসরে কারখানা-সমূহ হইতে ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের বাণিজ্যের হিসাব দেখিলে জানা যায়, বোম্বাই বন্দরে ঐ বৎসরে ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের, মাদ্রাজ বন্দরে ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের এবং করাচী বন্দরে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা মূল্যের বিদেশী সলমা চুমকি আমদানী হইয়াছিল। ভারতের মোট আমদানী ৩৬ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা।

ভাবিয়া দেখুন ব্যাপারটা। দেশের প্রয়োজন ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য, অথচ দেশ স্বয়ং সরবরাহ করে মাত্র ৬ লক্ষ, আর অবশিষ্ট সমস্তটাই আসে বিদেশ হইতে! এ সব ব্যাপারে শাসনকর্তৃত্ব থাকিলে রক্ষণনীতি নিশ্চিতই অবলম্বিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় টেরিফ বোর্ডের পরামর্শ গৃহীত হইবে কি? তবে দেশের লোকের হস্তেও ইহার প্রতীকারোপায় আছে। তাহারা যদি বিদেশী সলমা-চুমকি না লয়, তবে কে তাহাদিগকে উহা লওয়াইতে পারে?

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য

কলিকাতার রোটারী ক্লাবে "সাধারণ স্বাস্থ্য ও মঙ্গলবিধান" সম্বন্ধে বক্তৃতা-দানকালে বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লেফটানেণ্ট বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বলিয়াছেন, "গত ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে গ্রেট বৃটেনের স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী ঐ দেশের স্বাস্থ্যো-ন্নতির উদ্দেশ্যে লোকপ্রতি গড়পড়তায় ২১ টাকা ব্যয় করিয়া-ছিলেন। ঠিক ঐ সময়ে আমাদের এই অভাগা বাঙ্গালা দেশে (যার রাজধানী কলিকাতায়) লোকপ্রতি গড়পড়তায় মবলক চারি আনা পয়সা স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইয়াছিল।" কেমন চমৎকার ব্যবস্থা!

বাঙ্গালার স্বাস্থ্যবিভাগের বড়কর্ত্তা ডাক্তার বেণ্টলি—যিনি শীঘ্রই বাঙ্গালা হইতে অপসৃত হইতেছেন—রোটারী ক্লাবে তর্ক-বিতর্ককালে বলিয়াছেন, "দশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার বরাত ফিরিয়াছিল। সে সময়ে বাজেটে বাঙ্গালার স্বাস্থ্যবিভাগের প্রচারকার্য্যে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ

বরাদ্দের টাকা কখনও ব্যয়িত হয় নাই। সম্ভবতঃ লাট দপ্তরের তাক তৈয়ারী করিবার জন্ত ঐ টাকাটা ব্যয়িত হইয়াছিল। ঐ বরাদ্দের পর স্বাস্থ্যবিভাগ এত বড় বরাদ্দ কখনও পায় নাই। বাঙ্গালা সরকার সাধারণের স্বাস্থ্য-বিভাগে প্রচারকার্য্যের বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন নাই।" ইহা কোনও চরমপন্থী কংগ্রেসওয়ালার অভিমত নহে; স্বয়ং সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ত্তার মুখে এ কথা কি শোভনই হইয়াছে!

—

পরলোকে ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ

বাঙ্গালার প্রবীণ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৭৪ বৎসর বয়সে গত ১৪ই জানুয়ারী রাত্রিকালে
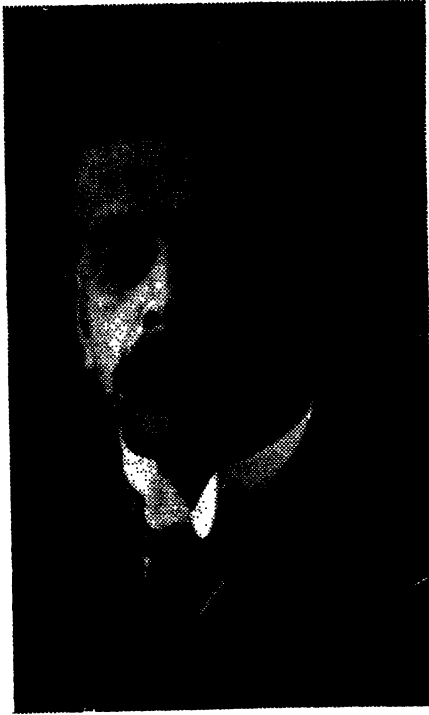
ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহার কলিকাতাস্থ থিয়েটার রোডের ভবনে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। নদীয়া জেলার সুবর্ণপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম।

এ দেশে প্রেসিডেন্সী কলেজে এম, এ পাঠকালে তিনি মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন এবং তথায় আড়াই বৎসর শিক্ষাগ্রহণের পর বিলাতে ডাক্তারী শিক্ষা করিতে যান। তথায় ৭ বৎসরকাল শিক্ষালাভের পর তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হন।

এ দেশে সরকারী ডাক্তারী স্কুল-কালেজ ব্যতীত চিকিৎসাশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান না থাকায় বহু জ্ঞানপিপাসু ছাত্রের অভাব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত না। এই হেতু কয়েক জন দেশীয় চিকিৎসক কলিকাতায় একটি বে-সরকারী মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। আজ সেই স্কুল বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেডিক্যাল কালেজে পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের মধ্যে তাঁহার নামও কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য। স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই তিনি ইহার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। ১৯১৫ খৃঃ তিনি এই কালেজের অধ্যক্ষ-পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অন্য কিছুতে না হইলেও ইহার জন্য তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন।

মহেন্দ্রনাথ কিছু দিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারও হইয়াছিলেন। সে হিসাবে তিনি যে জনসেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, ইহাও নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। তিনি বেঙ্গল মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতিরূপেও সাধারণের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্যপদেও বসিয়াছিলেন। সরকারও তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ সাহিত্য-জগতেও আপনার স্থান করিয়া লইতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অগ্রজ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ যখন তাঁহার 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন তিনি উহাতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেন। তখন তিনি বি-এ ক্লাশে অধ্যয়ন করিতেন।" তাঁহার "বিলাত-যাত্রীর পত্র"ও সে সময়ে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল।

তিনি বিনয়ী, নিরহঙ্কার, মিষ্টভাষী, সদালাপী ছিলেন। তাঁহার অভাবে বাঙ্গালা যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরলোকে নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন

সাহিত্য-রসে সুরসিক প্রথিতযশা নাট্যকার—লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক—প্রিয়দর্শন বন্ধুবর পণ্ডিত নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন গত ২৩শে মাঘ শুক্রবার প্রাতে ৫২ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার গৌরব পণ্ডিতবংশে নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত-কুলপতি—

নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন

সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ-সম্পাদক ও প্রকাশক জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র;—সুবিরাট বাচস্পত্য-অভিধানসঙ্কলনে অমরকীর্ত্তি পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সুযোগ্য পৌত্র ছিলেন। সাহিত্য-সাধনাই নিত্যবোধ বাবুর জীবন-ব্রত ছিল। তাঁহার প্রণীত লক্ষ্মণসেন—একাদশ বৃহস্পতি প্রভৃতি নাটক প্রহসন মিনার্ভা—ক্লাসিক থিয়েটার এবং সাবিত্রী প্রভৃতি হিন্দী নাটক করিন্থিয়ান—এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে সগৌরবে অভিনীত হইয়াছিল। শেষ জীবনে তিনি ইংরাজী কথিত-ভাষায় নাটক রচনার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতর্কিত মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগ-বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। এমন সদা-হাস্য-প্রফুল্ল-বদন সহৃদয় বন্ধু—সরল উদারহৃদয়—সৎসাহিত্যে অশেষ অনুরাগ—সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিবেদন আর দেখিব কি? তাঁহার বিয়োগব্যাথায় অধীর—শোকসন্তপ্ত পরিবারের শিশু পুত্র—সদ্য বিধবা পত্নী—স্নেহময় আদর্শ জ্যেষ্ঠ সহোদরকে এ দুর্ব্বিষহ শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা সাহিত্যে নাই।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু

বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, অনন্যসাধারণ ধীমান্, একনিষ্ঠ দেশ-প্রেমিক, সর্ব্বজনমান্য জননায়ক, ভারতের রাষ্ট্রনীতিকগণের প্রদীপ্ত-জ্যোতিষ্ক পণ্ডিত মতিলাল ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ২০শে মাঘ শুক্রবার দিক্‌চক্রবালে উষার আকাশ কুসুমরাগরঞ্জিত হইবার অব্যবহিত পরেই—বেলা ৬টা ৪০ মিনিটের সময় ভারতের মুক্তিসমরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনানায়কের আত্মা সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছে।

পণ্ডিত মতিলালের নামের সহিত বর্ত্তমান শতাব্দীর বিরাট জাতীয় আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত। ভাগ্যহীন ভারতবর্ষ—মাতৃভূমির সেবায় মতিলাল তাঁহার দেহের শেষ শোণিতবিন্দু অর্ঘ্য-প্রদান করিয়া অমরধামে প্রয়াণ করিলেন—ভারতবাসী তাহা কখনও বিস্মৃত হইবে না, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহা সোনার অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু

ধনী, বিলাসী, য়ুরোপীয় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত এবং অগ্রণী মতিলাল, লক্ষ লক্ষ অর্থার্জ্জনে আত্মবিস্মৃত পণ্ডিতজী কেমন করিয়া অকস্মাৎ মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া, মায়ের পূজায় বিরাট ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বিশ্ববাসীকে বিস্মিত, চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন, দেশবাসীকে অবশ্যই তাহা স্মরণ করিতে হইবে।

পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও মতিলাল এক দিন পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া তরুণবয়সে আচারধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা হারাইয়াছিলেন সত্য; এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবরূপে কার্য্যে অজস্র অর্থোপার্জ্জনকালে তাঁহার গৃহে প্রতীচ্য হাবভাবের স্রোতোধারা প্রবাহিত হইত সত্য; এমন কি, প্যারিস সহরের শ্রেষ্ঠ রজকালয় হইতে তাঁহার পরিধেয়াদি ধৌত হইয়া আসিত, এমনও জনশ্রুতি ছিল; কিন্তু পরিণত-বয়সে, মাতৃভূমির সেবায় সেই মতিলাল যখন ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সংস্রবে আসিয়া তিনি ভিন্ন মানুষে পরিণত হইলেন।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর, পঞ্জাবের অনাচার, রৌলট আইন—সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গন্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষকে অভিনব প্রেরণা দান করিল। দেশের ডাকে সাড়া দিয়া মতিলাল মহাত্মাজীর মন্ত্রশিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন—বিলাস-ব্যসনের আলিঙ্গন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দুঃখ, কষ্ট, বিপদের কণ্টকমুকুট শিরে তুলিয়া লইলেন। অসাধারণ বাগ্মী, অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী, তার্কিক, উচ্চশ্রেণীর আইন-বিশারদ, কূটরাজনীতিক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়া ভারতবর্ষের মুক্তিসমরে নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন।

দেশবাসী সবিস্ময়ে দেখিল, কাউন্সিল-প্রবেশ-ব্যাপার লইয়া পরলোকগত রাষ্ট্রনায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত

মহাত্মা গন্ধীর মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে, কাউন্সিল-প্রবেশের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া দেশবন্ধুর গঠিত স্বরাজ্যদলে মতিলালজী যোগদান করিলেন। তার পর চিত্তরঞ্জনের লোকান্তরপ্রাপ্তির পর উক্ত দলের কার্য্যভার স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। মহাত্মাজীর সহিত এ বিষয়ে তাঁহার ভিন্ন মত থাকিলেও মহাত্মার প্রতি মতিলাল কোনও দিন শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাব অনুভব করেন নাই। দেশসেবার জন্য যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, মতিলাল এক দিনের জন্যও তাহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই।

তাহার পর আশা ও নৈরাশ্যের তরঙ্গ মথিত করিয়া কর্ম্মসমুদ্রে স্বরাজ্যতরণী পাড়ি দিয়াছে। মতিলাল নিপুণ কর্ণধাররূপে জয়যাত্রা করিয়াছেন। কোনও দিন কেহ তাঁহাকে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইতে দেখে নাই। ভারতের শাসকসমাজ তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতবাসী তাহাদের দাবী প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে নাই। এই সদম্ভ উক্তির প্রতিবাদে নেহরু কমিটী গঠিত হয় এবং তাহার ফল নেহরু রিপোর্ট! মতিলালজীর এই অতুল কীর্ত্তি ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দিল্লীতে নেতৃসম্মেলন, ল আরউইনের সহিত মহাত্মা গন্ধীর পত্র-বিনিময়, নেতৃবৃন্দের সর্ত্তে লর্ড আরউইনের অসম্মতি, মহাত্মা গন্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন, শাসক সম্প্রদায়ের ধর্ষণনীতি প্রবর্ত্তন, গোলটেবল বৈঠকের আয়োজন, বৈঠকে কংগ্রেস বর্জ্জন প্রভৃতি এখন ঐতিহাসিক ব্যাপার। মতিলালজী এ সকল বিষয়ে নেতৃত্ব করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। কারাগারেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তাঁহার শরীরের সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থা দেখিয়া সরকার তাঁহাকে মুক্তিদান করেন।

দেশজননীর সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অজাতশত্রু মতিলাল পরিণত-বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। তাঁহার রোগের উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশবাসী প্রত্যহ তাঁহার স্বাস্থ্যসমাচারের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকিত। তাঁহার রোগমুক্তির জন্য জনসাধারণ ভগবানের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করিত; কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর আকুল আবেদন তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না।

'ভারতবর্ষ মতিলালজীর দেহকে হারাইয়াছে, কিন্তু তাঁহার আত্মা ভারতবাসীর মধ্যে চিরজাগরূক থাকিবে। পরিণত-বয়সে—জীবনের সায়াহ্নে, তাঁহার অতিপ্রিয় প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা "আনন্দভবন" দেশের সেবায় দান করায় তিনি দেশবাসীর স্মৃতিতে পূজিত হইতে থাকিবেন।

মতিলাল নেহরু—রোগ-মুক্তির পরে

তাঁহার স্ত্রীপুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ দেশের মুক্তিযজ্ঞে আহিতাগ্নিক! দেশবাসী কোনও দিন তাহা ভুলিবেন না—ইতিহাসে ইহা চিরস্মরণীয় হইয়াই থাকিবে।
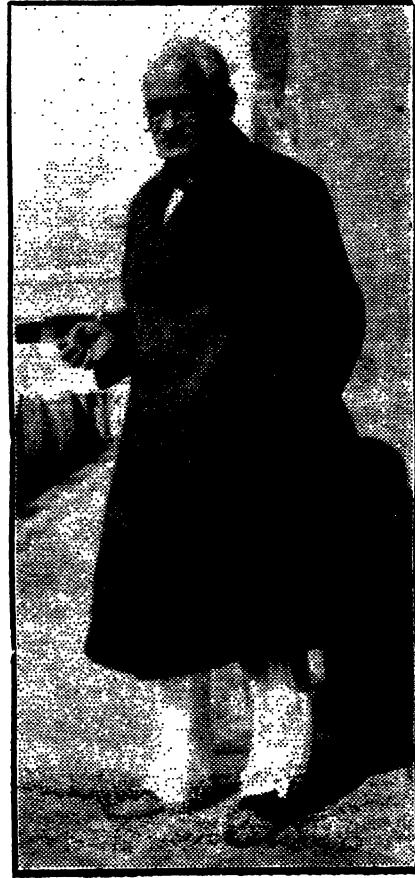
কোনও স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে, পণ্ডিত মতিলাল যে কোনও দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি মুক্তিকামী জাতির পথিনির্দ্দেশ এবং অগ্রগতির পক্ষে নায়কতা করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার করণীয় কর্ত্তব্য সমাধার পর পণ্ডিতজী অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

মতিলালের মত কুশাগ্রবুদ্ধি, ধীমান্, জ্ঞানগরিমায় গরীয়ান্, মহাপ্রাণ দেশনেতার অভাব পূর্ণ হইবার নহে। রাষ্ট্রনীতিক মহাসমস্যা-সমাধানের সন্ধিক্ষণে তাঁহার মত স্থির-ধীরবুদ্ধি, সত্যনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নেতার অভাব জাতিকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

সমগ্র দেশবাসী শোকস্তব্ধহৃদয়ে ভাবিতেছে, মতিলালের নশ্বর দেহ পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইলেও তাঁহার আত্মা অজর

অমর ভাবে জাতিকে মুক্তিসমরে অঙ্গুলি-সংকেতে অগ্রসর হইয়া জয়মাল্যলাভে সহায়তা করিবে। অসমাপ্ত কর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া হে কর্ম্মবীর, তুমি লোকান্তরে প্রয়াণ করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার ভাবধারা ও কর্ম্মশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তোমার দেশবাসী কাম্যফল লাভ করিয়া ধন্য হইবে, এ আশীর্ব্বাদ তোমার আত্মার নিকট হইতে ধারায় ধারায় বর্ষিত হউক!

সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দিল্লী সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দিল্লীর কোতোয়াল পদে অধিষ্ঠিত

শ্রীমতী স্বরূপকুমারী নেহরু

ছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল যে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন, কাশ্মীরে সে পরিবার সুপরিচিত ছিলেন। মতিলাল যে সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়েন, তখন তাঁহার পিতা পরলোকে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত নন্দলাল নেহরু দিল্লীতে ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিতেন। তিনিই পিতৃহীন ভ্রাতাকে লালন-পালন করেন।

প্রথমতঃ পণ্ডিত মতিলাল মুসলমান মোক্তবে পার্শি ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত এই ভাবে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি পরে কাণপুরের সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। অতঃপর তিনি এলাহাবাদ মুয়ার কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। আইন-শাস্ত্র অধ্যয়নের দিকে তাঁহার এমন আকর্ষণ ছিল যে, তিনি বি, এ, পরীক্ষা না দিয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। তিন মাসের মধ্যে হাইকোর্টের আইন-পরীক্ষা দিয়া মতিলাল উত্তীর্ণ ছাত্রগণের শীর্ষস্থান লাভ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কাণপুরে ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন। ৩ বৎসর পরে তিনি কাণপুর হইতে এলাহাবাদ হাইকোর্টে গমন করেন এবং ৫।৬ বৎসরের মধ্যে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে তিনি অর্থ ও যশঃ অর্জ্জন করিয়া আইনজ্ঞ বলিয়া এলাহাবাদে সুপরিচিত হয়েন। ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী মতিলালের শিরোদেশে সোনার ঝাঁপি খুলিয়া আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিতে থাকেন। এইরূপে দীর্ঘকাল

শ্রীমতী কমলা নেহরু

ধরিয়া তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। অবশেষে দেশমাতার আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় ওকালতী ব্যবসায় বন্ধ করিতে হয়। ব্যবহারাজীবের কার্য্য পরিত্যাগের পূর্ব্বে পণ্ডিত মতিলাল সর্ব্বজনসমাদৃত দেশনেতার সম্মানজনক আসন অধিকার করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বক্তৃতা স্বাধীনতা রক্ষার্থ তিনি অকুতোভয়ে প্রবল আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন।

হোমরুল

পণ্ডিত মতিলাল যৌবনকালেই কংগ্রেসে যোগদান করেন, এবং রাজনীতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশে সর্ব্বপ্রথম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভার অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলাল সভাপতিপদে বৃত হয়েন। দেশের রাজনীতিক অবস্থার উন্নতির জন্ত তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে হোমরুল আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলে পণ্ডিতজীর রাজনৈতিক কর্ম্মদক্ষতার সম্যক্ পরিচয় জনসাধারণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই আন্দোলন দমনের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট জননেতৃগণকে গ্রেপ্তার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পণ্ডিত মতিলাল তৎকালে রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যপন্থী বলিয়া পরিচিত ছিলেন; মধ্যপন্থী দলের অন্ততম মুখপত্র "লীডার" পত্রের পরিচালনকার্য্যেও তিনি কিছু কাল আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টকে দমননীতি অবলম্বন করিতে দেখিয়া পণ্ডিত মতিলাল মধ্যপন্থা ত্যাগ করিয়া হোমরুল আন্দোলনে যোগদান করেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

"লীডার" পত্রের সহিত আর সংস্রব রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে দেখিয়া মতিলাল অবশেষে "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" পত্র প্রকাশে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই পত্রপরিচালন করিতে গিয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু লোকশিক্ষার্থ তিনি এই ক্ষতি অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন। হোমরুল আন্দোলন অচিরে প্রশমিত হয়। এই সময়ে তদানীন্তন ভারত-সচিব মহাশয় ভারতবর্ষকে কিছু অধিকার দিবার প্রস্তাব করেন; ভারতের ইতিহাসে ইহা "মণ্টফোর্ড স্কীম" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইলে অনেক দেশনেতা তাহার সমর্থন করেন। ঠিক এই সময়ে পঞ্জাবে [illegible] পণ্ডিতজীর নেতৃত্ব অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। হিন্দু-মুসলমান-মিলনসাধনের জন্ত তিনি একান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বৃটিশ-ডেমোক্রেসীর প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাসবান্ ছিলেন। পঞ্জাবের ঘটনার পরও তাঁহার এই বিশ্বাস বিচলিত হয় নাই, তবে তিনি বর্ত্তমান ব্যুরোক্রাটিক শাসনব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং ইহার পরিবর্ত্তনসাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল।

মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার সময় হইতে মতিলাল ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যরূপে নির্ভীকভাবে শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলির সমালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। "ব্ল্যাকবিল" নামে পরিচিত পাণ্ডুলিপি দুইটি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবর্ত্তিত হইলে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। পণ্ডিত নেহরু অনেক প্রতিবাদ-সভায় সভাপতিরূপে এই বিলের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ অব্দের ২৭শে ডিসেম্বর অমৃতসরে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহার সভাপতিরূপে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার অভিভাষণে পঞ্জাবের ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে তীব্র ভাষায় ব্যুরোক্রেসীর নিন্দা করেন। পঞ্জাবের ঘটনাবলীর তদন্তের জন্ত কংগ্রেস হইতে যে বে-সরকারী তদন্ত-কমিটী গঠিত হয়, তাহাতে স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সহিত তদন্তকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি যে সকল ব্যাপার জানিতে পারেন, তাহাতে বৃটিশ ব্যুরোক্রেসীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা টুটিয়া যায়।

মণ্টফোর্ড স্কীম শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হইলে, অনিবার্য্য বোধে তিনি দেশবাসীকে ঐ ব্যবস্থার অনুমোদন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। অবশেষে মহাত্মা গন্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিলে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার প্রদেশকে এই আন্দোলনের পথে অগ্রসর করিয়া দেন। তাঁহার লিখিত "স্বরাজের পথে" পুস্তিকা অসহযোগ মন্ত্রেরই প্রচার করিয়াছিল। ইহাতে তিনি প্রথমে স্বরাজের ব্যাখ্যা করেন, পরে পঞ্জাবের অত্যাচার ও খেলাফৎ-সংক্রান্ত অবিচারের প্রতীকারের দাবী করেন। অসহযোগ

ব্রত গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতজীকে অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে তিনি রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত জীবনযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু অসহযোগী হইয়া তিনি সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া খদ্দর পরিধান পূর্ব্বক দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ উপলক্ষে খদ্দর ও অসহযোগ ব্রত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

কংগ্রেস ভলান্টিয়ার সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করায় পণ্ডিত মতিলাল ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সহ গ্রেপ্তার হয়েন। বিচারে তাঁহাদের দণ্ড হয়। তিনি এই মামলায় আত্মপক্ষসমর্থন করেন নাই এবং আদালতকে আদালত বলিয়া স্বীকারই করেন নাই। একমাত্র পুত্র জহরলালের সহিত মতিলাল কারাবরণ করিলে তাঁহার গুণবতী পত্নী অসহযোগ আন্দোলন পরিচালন করিতে থাকেন। এই সময়ে একটি গোল টেবলের বৈঠকের প্রস্তাব হয়। পণ্ডিত মতিলাল ও অন্যান্য নেতারা তখন কারাগারে। সহকর্ম্মীদের কারাবাসজনিত দুঃখে কাতর হইয়া মহাত্মা গন্ধী তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্ম পাছে গভর্ণমেন্টের প্রস্তাবেই সম্মতি দান করিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় জেলের ভিতর থাকিয়াই পণ্ডিত মতিলাল নেহরু দেশবাসীর মূল দাবীর উপর বিশেষ জোর দিয়া বলেন, এই দাবীর পূরণ না হইলে সরকারের সঙ্গে কোনরূপ মিটমাট হইতে পারে না। যুক্তপ্রদেশের অসহযোগ আন্দোলনে পণ্ডিত মতিলালের প্রভাব কিরূপ সুদূরব্যাপী ছিল, তাহা জানা যায় তাঁহার গ্রেপ্তারের পর। কারণ, তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারে, এমন এক জনও লোক পাওয়া গেল না। পণ্ডিতজী তখন হাঁপানি রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অন্যতম রাজবন্দী দুই জন ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন এবং তাহাতে বিশেষ উপকারও হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যের অজুহাতে মতিলালের সম্পূর্ণ অনভিমতে সরকার তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ জেল হইতে নৈনিতালের জেলে স্থানান্তরিত করিলেন। দণ্ডের কাল অতিক্রান্ত হইলে পণ্ডিতজী মুক্তিলাভ করিয়া আসিয়া নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকের পদে নির্ব্বাচিত হয়েন। এই সময় হইতে তিনি খদ্দর প্রচারে এবং দেশের আর্থিক উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করেন। অসহযোগ ব্রত পূর্ণরূপে পালন করিবার জন্ম স্কুল, কলেজ, আদালত প্রভৃতি বর্জ্জন করার আবশ্যকতা তিনি অকাট্য যুক্তিসমূহের দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। দেশ আইন অমান্ত করিবার উপযোগী অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি না, তাহা সরেজমিনে তদন্ত করিবার জন্ম এক কমিটী গঠিত হইয়া সমগ্র দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। পণ্ডিত মতিলাল এই কমিটীর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে পণ্ডিতজী মানবতার আদর্শ। তিনি অজাতশত্রু। তাঁহার উদারতা ও বদান্যতা অসাধারণ। তিনি যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। কিশোরবয়সেই তিনি সামাজিক গোঁড়ামীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কলেজের অধ্যক্ষ হ্যারিসনের সহিত একত্র প্রকাশ্যভাবে ভোজন করিয়াছিলেন। মতিলাল যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি সেই সমাজে সর্ব্বপ্রথম পর্দাপ্রথা উঠাইয়া দেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হয়েন নাই। তাঁহার দুই কন্যা শিক্ষালাভার্থ বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীজাতির নির্ব্বাচনাধিকারলাভের সমর্থনকারী। কংগ্রেসে তিনি এই বিষয়ে আন্দোলন করেন।

আইন অমান্য সমিতি

১৯২২ খৃষ্টাব্দে যথাসময়ে কারামুক্ত হইবার পর পণ্ডিতজী আইন অমান্য সমিতির সদস্য হন এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কোকনদ কংগ্রেসের সম্মতি অনুসারে তিনি সদলে ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করেন।

তার পর ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্ম সাইমন কমিশন প্রেরণের ব্যবস্থা হইল; পণ্ডিতজী তীব্রকণ্ঠে উহার প্রতিবাদ করেন এবং ভারতের পক্ষ হইতে শাসনতন্ত্রের একখানি খসড়া প্রণয়নের জন্ম আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর সর্ব্বদল-সম্মিলনের ফলে বিশিষ্ট নেতৃবর্গের সহযোগিতায় তিনি নেহরু কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ করেন। উহা তাঁহার রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান ও দূরদর্শিতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতজী কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। কলিকাতাবাসী রাজোচিত অভ্যর্থনা সহকারে ৩৪ ঘোড়া-বাহিত যানে তাঁহাকে কংগ্রেস-মণ্ডপে লইয়া গিয়াছিল। সেই সময় তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা যেমন যুক্তিপূর্ণ, তেমনই সুচিন্তিত। দেশবাসী সে অভিভাষণের কথা কখনও বিস্মৃত হইবে না।

তিনি মুক্তকণ্ঠে, উদাত্তস্বরে বলিয়াছিলেন যে, বস্তু-তান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতিকের কাছে আদর্শবাদ আশা করা বৃথা। দাসত্বের বিনিময়ে পুরস্কারস্বরূপ ভারতবর্ষ দায়িত্বপূর্ণ শাসন চাহে না ভারতবর্ষের মূল লক্ষ্য কি, সে বিষয়ে পণ্ডিতজী বলিয়াছিলেন

প্রকৃত স্বাধীনতা। আমি পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে এ কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি; কিন্তু আমি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের বিপক্ষেও নহি। বৃটিশ উপনিবেশসমূহ যে অধিকার ভোগ করিতেছে, আমি তাহাই চাহি।" "বর্ত্তমানে ইংরাজের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ আছে, আমি সে সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহি; কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশসমূহের সহিত ইংরাজের যে সম্বন্ধ আছে, আমি তাহার বিপক্ষ নহি।"

করিল। পণ্ডিতজীও নিশ্চিন্ত রহিলেন না। এলাহাবাদের আনন্দ-ভবন নামক বিরাট অট্টালিকা তিনি কংগ্রেসের কার্য্যের জন্য জাতির হাতে তুলিয়া দিলেন। আনন্দ-ভবনের মূল্য বহু লক্ষ টাকা। জাতিকে আনন্দ-ভবন উৎসর্গ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে তিনি রায়-বেরেলিতে গিয়া লবণ আইন ভঙ্গ করেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর কারাগমনের পর মহাত্মা গন্ধীর

সপরিবারে মতিলাল নেহরু ['এ্যাডভান্স'এর সৌজন্যে

কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি নেহরু রিপোর্ট প্রচার করিবার জন্য এক বৎসর বিশেষ চেষ্টা করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতজীর পুত্র জহরলাল লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হন। লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং তাহার পরেই মহাত্মা গন্ধীর পৌরোহিত্যে জাতি ঐ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিল। দিকে দিকে আইন অমান্যের সাড়া পড়িয়া গেল—দলে দলে লোক কারাবরণ

অনুরোধে তিনি কংগ্রেসের সভাপতিপদ গ্রহণ করেন।

কংগ্রেসের কার্য্য প্রচারের জন্য এই সময় তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। জুনমাসে তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য শৈলাবাসে গিয়া বিশ্রামের সঙ্কল্প করেন। স্থির হয়, ১লা জুলাই তারিখে তিনি মুসৌরী যাত্রা করিবেন; কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ৩০শে জুন তারিখে অকস্মাৎ তিনি ডাক্তার মামুদের সহিত

কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে ধৃত হন। বিচারে তাঁহার প্রতি ৬মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল।

এলাহাবাদের নাইনী কারাগারে তাঁহাকে কয়েক দিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। পণ্ডিতজী কারাগারে থাকিতেই সার তেজ বাহাদুর এবং জয়াকর শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টা করিলে, তৎসম্পর্কে তাঁহাকে পণ্ডিত জহরলালের সহিত গন্ধী-সন্দর্শনে যারবেদা জেলে যাতায়াত করিতে হয়। শান্তিপ্রচেষ্টা সম্পর্কে পিতা ও পুত্রের সেই তেজোগর্ভ বাণীর নূতন করিয়া উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নাইনী প্রত্যাবর্ত্তনের দিন প্রভাতে পণ্ডিতজী প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে সে দিন যাত্রা বন্ধ থাকে। পরদিন অতিরিক্ত পরিমাণ কুইনাইন সেবনের ফলে জ্বর বন্ধ হইলেও অপরাহ্ণে তাঁহার কফের সঙ্গে রক্ত দেখা দেয়। ১৯শে তারিখে যারবেদা ত্যাগ করিয়া পুত্রের সহিত তিনি ২১শে আগষ্ট নাইনী জেলে ফিরিয়া আসেন। এই কয়দিনই তাঁহার নিষ্ঠীবনে অত্যাধিক রক্ত দেখা যায়। তার পর ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, সার নীলরতন সরকার, ডাক্তার আন্সারী প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। ২৫শে আগষ্ট তারিখে যুক্তপ্রদেশের সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত কয়েক জন চিকিৎসকও তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

মুক্তিলাভ কা[illegible]

মুসৌরীতে তিনি প্রায় এক [illegible]

৮ই নভেম্বর তিনি কলিকাতায় [illegible] সুরধুনী-কাননে কিছুকাল অবস্থান করেন। এখানে [illegible] কালে কবিরাজ শ্রীযুত শ্যামাদাস বাচস্পতির চিকিৎসাধীনে তাঁহ[illegible] স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়, কিন্তু তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীমতী কম[illegible] নেহরু হঠাৎ এলাহাবাদে কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হওয়ায়, তি[illegible] কলিকাতা ত্যাগ করেন। কলিকাতাত্যাগের পূর্ব্বে তিনি [illegible] বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য।

এলাহাবাদে গিয়া কয়েক দিন পরেই আবার তিনি রোগ[illegible] আক্রান্ত হন। ২৭শে তারিখের অপরাহ্ণে জানিতে পারা যা[illegible] যে, তাঁহার হাত-পা ফুলিয়া গিয়াছে। তার পর অনেক বিখ্যাত চিকিৎসক তাঁহার রোগমুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, রঞ্জন-রশ্মি পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, দেশের নানাস্থানে তাঁহার আরোগ্যকামনা করিয়া সভা হইয়াছে, দেবালয়ে পূজা হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সমগ্র দেশবাসীর ঐকান্তিক কামনাকে নিষ্ফল করিয়া দিয়া ২৩শে মাঘ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মতিলালের আত্মা চিরালোকিত রাজ্যে প্রয়াণ করিয়াছে।

নিঃস্ব চাষী

তিরিশ বিঘে খামার আমার
চৌদ্দ বলদ হাল,
চার পাঁচটা আমের বাগান
দুইটা খেজুর তাল।
চৌরি ছিল টিনের দুখান,
চারটে ধানের গোলা,
পিছে ছিল মস্ত পুকুর
সামনে পতিত খোলা।
ছয়টা ছিল বকনা গরু
দুইটা রাখাল তার,
দু'জন মজুর খবরদারী
করত খামারটার।
'দাবড়' খেলাইছিল এঁড়ে
দুখান বা'ছের না,
চিনত আমার আশে পাশের
দশ বিশখান গাঁ।

'তেনার' ছিল সোনার বাজু
রূপোর খাড়ু গোট,
রাসমণ্ডল গুলবাহারের
একটি ছোট মোট।
বাপের কাথে চাকলা ডেকে
দিয়েছিলাম কলার,
ব্যাটার বিয়ের মস্ত ঘটা
বাজী ও বাজনার।
আজকে আমি পথের ফকির
ভিক্ষে ক'রে খাই,
মাথা গোঁজার মতন আমার
স্থানটুকু আর নাই।
নায়েব বেটার কারসাজি আর
মহাজনের [illegible]
আমায় যে গো ক'রে দেছে